সচিত্র মাসিকপত্র

তৃতীয়বর্ষ—প্রথমখণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩২২

সম্পাদক—

লধর সেন

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ ব

প্রকাশক—

চ োপাধ্যায় এণ্ড

বিষয়-সূচি

তৃতীয় বর্ষ

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ড—আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ, ১৩২২]

বিষয়নির্ব্বিশেষে বর্ণানুক্রমিক

প্রবন্ধমালা

কবিতা—

গাথা—

গান—

গল্প—

শিল্প-বিজ্ঞান—

সঙ্কলন—

সমাজতত্ত্ব—

সাহিত্য—

স্বরলিপি—

সম্পাদকীয়

নীর ও ক্ষীর—

পুস্তক পরিচয়—

ভারতবর্ষ—সূচি

তৃতীয় বর্ষ

[প্রথম খণ্ড—আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ, ১৩২২]

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক নামানুসারে

প্রবন্ধমালা

মাসপঞ্জী—১৩...

শোক-সংবাদ

চিত্রাবলী

মনস্বিবর্গের প্রতিকৃতি

[পত্রাঙ্কানুক্রমিক]

স্থানীয় দৃশ্যাবলী

(পত্রাঙ্কানুক্রমিক)

সূচীপত্র

বহুবর্ণ চিত্র

"যক্ষপত্নী"

"অশ্রুজলে রুদ্ধ আঁখি, মনে হয় যেন সুনয়নী
আধো সুপ্তা—আধো ফোটা মেঘলায় স্থল-কমলিনী"

উত্তর মেঘ। ২৯—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ়, ১৩২২

প্রথম খণ্ড] তৃতীয় বর্ষ [প্রথম সংখ্যা
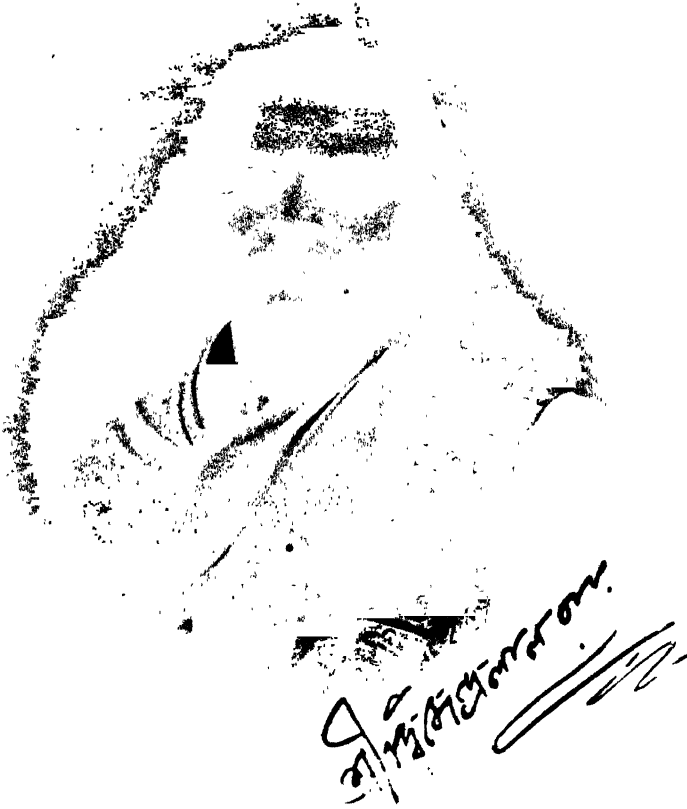
দ্বিজেন্দ্রলাল

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ.]

আজিকে মনে পড়ে তোমারে বার বার
সুদূরে গিয়া আরো হলে কি আপনার?
হাসিতে আসিতেছ ঝরিছ আঁখিজলে,
আসিছ উৎসাহে, নিরাশে নববলে;
প্রণতি লহ ওগো এ নব বরষের,
যেথায় রহ তবু তুমি যে আমাদের।
কনক-কমলিনী ঢেউয়ে ব্যাকুল করি,
আকাশ-গাঙে যদি বহে তোমার তরী,
ত্রিদিব-পরিমলে সুরবালার গানে
ধরার ভোলা স্মৃতি জাগাবে তব প্রাণে,
তোমার 'ভারতেরে' স্মরাবে মহাকবি,
সে জাগে বুকে লয়ে তোমারি স্মৃতি-ছবি।
আশীষ মাগি তব সে বাণী অভয়ের,
যেথায় রহ তবু তুমি যে আমাদের।

নিবেদন

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কৃপায় এবং বাঙ্গালা দেশের পাঠকপাঠিকাগণের অনুগ্রহে 'ভারতবর্ষ' দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া, অদ্য তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যিনি প্রথম 'ভারতবর্ষ'-প্রকাশের সঙ্কল্প করেন এবং সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করেন, আজ তাঁহারই কথা পুনঃপুনঃ আমাদের মনে পড়িতেছে। আদরের পুত্র-কন্যা পড়িয়া রহিল, বড় আগ্রহের ধন 'ভারতবর্ষ' পড়িয়া রহিল, বন্ধুবান্ধব পড়িয়া রহিলেন, 'আমার দেশ' পড়িয়া রহিল—আর দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন! এত আগ্রহের,—এত সাধের—'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যাও দেখিয়া গেলেন না! আমাদের এ গভীর মনোবেদনা প্রকাশের ভাষা নাই। তাঁহার সাধের 'ভারতবর্ষ' দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া, তৃতীয় বর্ষ-দ্বারে উপস্থিত, ইহার জন্য যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ প্রকাশ করিবেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল নাই! আমরা তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারী, আমরা তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, এই দুই বৎসর 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিলাম।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ'কে যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, যে আদর্শ তাঁহার নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল, আমরা তাহার সান্নিধ্যও লাভ করিতে পারিয়াছি কি না, কেমন করিয়া বলিব? দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ'কে যে সমস্ত সুন্দর ভূষণে সুসজ্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গ-জননীর কণ্ঠে যে রত্নহার পরাইতে চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহা কোথায় পাইব? তবে আমরা পাইয়াছি—দ্বিজেন্দ্রলালের ভবিষ্যদ্বাণী; আমরা পাইয়াছি—

"আমাদের ভাগ্যবিধাতা দূরে অলক্ষ্যে বসিয়া, আমাদের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন। আমরা যেন না পিছু হটি। আমরা যেন না ভয় পাই। আমরা যেন সাহিত্যের বাতাসকে পবিত্র রাখিতে পারি। আমাদের বন্দনায় যেন বিগলিত-স্নেহা জননীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। আমাদের গানে জগৎ মাতিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে। আমরা যেন আত্মসম্মানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া, সাহিত্যের কুসুমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে, আমাদের আর জগতের কাছে সম্মান-ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সম্মান দ্বারে আপনি আসিয়া পঁহুছিবে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল স্পর্দ্ধাভরে বলিয়াছিলেন—"আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে রাজামহারাজাদিগকে পড়াইব।" আমরা তাঁহার সে স্পর্দ্ধা-বাক্য অধিকতর রূপে সফল করাইয়াছি—আমরা সুধু রাজামহারাজাদিগকে পড়াই নাই, তাঁহাদিগকে লিখাইয়াছি। এখন কাশীমবাজারের মহারাজ-বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক; এখন প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর বংশধর নাটোরাধিপতি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সম্পাদক, মাসিকপত্রাদির লেখক; এখন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্যের পরমহিতৈষী, বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক, বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণেতা; এখন সুসঙ্গের শ্রীমান্ মহারাজ-বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক; এখন লালগোলার রাজা-বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক; এখন বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী, বাঙ্গালা ভাষার লেখক, বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সম্পাদক; এখন বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে মহাসম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। দ্বিজেন্দ্রলালের স্পর্দ্ধা, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে।

বিগত বৎসরে যাঁহারা প্রবন্ধাদি দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতেছি; যাঁহারা আমাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ-দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেছি; যাঁহারা যে ভাবেই হউক, আমাদিগের ভ্রম-ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ করিতেছি; আর যাঁহারা আমাদিগের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, পরম বন্ধুভাবে তাঁহাদিগের আলিঙ্গন প্রার্থনা করিতেছি। সকলে একবাক্যে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন 'আত্ম-সম্মানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া, মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া, সাহিত্যের কুসুমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই।'

'স্বস্তি পন্থামনুচরেম
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দ্দতাঘ্নতা
জানতা সঙ্গমেমহি।'

'ভারতবর্ষে'র বর্ষারম্ভ

[শ্রীআমোদর শর্ম্মার রোজনামচা হইতে সংগৃহীত]

অষ্টম সাহিত্য-সম্মিলনের পিণ্ডদান নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করার পর আমাদের বিশ্বনিন্দুক সভার হাতে তেমন কিছু কায ছিল না। সুতরাং প্রশ্ন উঠিল—'ভারতবর্ষে'র বর্ষারম্ভ আষাঢ় মাসে কেন? সভার অবৈতনিক সম্পাদক বিশ্বনিন্দুক দেববর্ম্মা বলিলেন—"পহেলা বৈশাখ আমাদের নববর্ষারম্ভ—পুণ্যদিন। মাসিক পত্রের স্থাপনা ঐ দিনেই হওয়া স্বাভাবিক। প্রধান প্রধান মাসিক পত্রগুলি ঐ দিনেই স্থাপিত হইয়াছে। যদিও আজকাল অনেক মাসিক পত্র ঠিক নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় না—কার্ত্তিকের কাগজ ফাল্গুনে, পৌষের কাগজ চৈত্রে দেখা দেয়, ফলে কোজাগরী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে লিখিত কবিতা শিবরাত্রির সময় নর-লোকের গোচর হয়, আর পৌষপার্ব্বণের ছড়া ছাতু-সংক্রান্তির দিন পাঠকের পাতে পড়ে—তথাপি ঠাট বজায় রাখিবার জন্য বৈশাখে সকল কাগজেরই বর্ষারম্ভ। আর বৈশাখ-সংখ্যাটা একটু নিয়মমতই বাহির হয়—ভিঃ পিঃ মারফত হালখাতা করিবার জন্য। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র এ ভারত-ছাড়া ব্যবস্থা কেন?"

সবজান্তা ভায়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"কেন, বেমক্কা সময়ে বর্ষারম্ভ হয়, এমন মাসিক পত্রের ত অভাব নাই; একা 'ভারতবর্ষ' 'মৎস্যরঙ্কঃ কলঙ্কী' কেন?" এই বলিয়া তিনি ফড়ফড় করিয়া খানকতক মাসিকের নাম করিয়া গেলেন। (বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিতে আমরা নারাজ বলিয়া নামগুলি উহ্য রাখিলাম।) তিনি আরও বলিলেন, এই শ্রেণীর মাসিক পত্রের জনৈক সম্পাদককে একবার এ জন্য প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, "তিনি কি বিক্রমাদিত্য বা শালিবাহনের মত নূতন কাল-গণনা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন?"

রসিক দাদা এই সময় একটু টিপ্পনী ঝাড়িলেন, "মাসিক পত্রগুলা পহেলা বৈশাখে না বাহির করিয়া পহেলা এপ্রেল বাহির করিলে মন্দ হয় না। গ্রাহকগণ ঠিক সময়ে কাগজ না পাইলে বুঝিয়া লইবেন যে, তাঁহাদিগকে এপ্রেল ফুল (April Fool) বানান হইয়াছে।"

ঠোঁটকাটা ভায়া ও সব বাজে কথা অগ্রাহ্য করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"একটা নূতন কিছু করো' এই গানের ধূয়া যিনি তুলিয়াছিলেন এবং 'আষাঢ়ে' কাব্য যিনি রচিয়াছিলেন, তিনি যে কাগজের প্রতিষ্ঠাতা, তাহার আষাঢ় মাসে বর্ষারম্ভ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? বরং পহেলা আষাঢ় বাহির না করিয়া, ৩১এ আষাঢ় বাহির করিলে আরও নূতনতর হইত!"

বৈজ্ঞানিক বন্ধু সে দিন পথ ভুলিয়া আমাদের সভায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"শেষোক্ত বক্তার বক্তৃতা নিতান্ত personal, ব্যক্তিগত-বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত। আষাঢ়ে আরম্ভে একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে। সেটুকু কৃষি-কলেজের ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল বেশ বুঝিতেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আষাঢ়ে নবজলধর-বিমুক্ত-বারিবর্ষণে কৃষকের আশা পূর্ণ হয়। এত সাধুভাষা না বুঝেন—'আইল ঋতু বরষা, চাষার হ'ল ভরসা'—এই সোজা কথাটা 'পদ্যমালা'য় পড়িয়াছেন ত? বর্ষা-ঋতুর আরম্ভ আষাঢ়ে, সুতরাং কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মুখপত্র 'ভারতবর্ষে'র আরম্ভও আষাঢ়ে।"

বৈয়াকরণিক বন্ধু ঈষৎহাস্যসহকারে (বন্ধুবর ক্ষমা করিবেন, আমরা ঈষদ্ধাস্য লিখিতে পারিলাম না) বলিলেন, "এ ঠিক কথা। বর্ষার আরম্ভ, আর বর্ষের আরম্ভ, উভয়ত্রই সন্ধিসূত্রে বর্ষারম্ভই গ্রথিত হয়।"

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"ঠিক, ঠিক। জলধর দাদা নিজেই কবুল করিয়াছেন। 'প্রাবৃটের' এই এমনই প্রথম ধারার মত, মা বঙ্গবাণীর অমৃত ধারা বর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া,—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

রসিকদাদার তাল ফাঁক যায় না। তিনি বলিয়া বসিলেন—"আপনারা তাহা হইলে প্রকারান্তরে

ভারতবর্ষের নিরীহ পাঠকগণকে কৃষক অর্থাৎ চাষা বলিতেছেন!"

আমরা সে কথা আমলে না আনিয়া, বৈজ্ঞানিক-বৈয়াকরণিক-সাহিত্যাচার্য্য—এই ত্রিমূর্ত্তির মিলিত-প্রতিভা-প্রসূত মীমাংসা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময়ে আমাদের কবিবন্ধু সভাগৃহের আধ-আলো আধ-ছায়ায় ঢাকা নিভৃত কোণ হইতে মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি কিন্তু বরাবর অন্যরূপ বুঝিয়া আসিতেছি। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র যে করুণ সুর কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে, তাহাই 'ভারতবর্ষে'র প্রাণের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাই 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই 'অনন্ত মুহূর্ত্তের' স্মৃতির সহিত 'ভারত-বর্ষ'কে নিবিড়ভাবে জড়িত করিয়াছেন। দেখুন, কালের আরম্ভ হইতে কর্ম্মভূমি ভারতভূমিতে কত নিদারুণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে; রাম-বনবাস, দশরথের পুত্রবিরহে প্রাণত্যাগ, সীতাহরণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, লক্ষ্মণবর্জ্জন, পাণ্ডব-নির্ব্বাসন, অভিমন্যু-বধ, দ্রৌপদীর অবমাননা, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ, যদুবংশ-ধ্বংস, যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, নল-দময়ন্তীর ও শ্রীবৎস-চিন্তার বিচ্ছেদ, হরিশ্চন্দ্রের দুর্দ্দশা, শ্রীরাধার বিরহ,—ভারতের কাব্যে ইতিহাসে এমন কত করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এ সব ব্যাপারের সন তারিখ মিলে না, কালনির্ণয় হয় না। আর অলকাপুরী হইতে নির্ব্বাসিত কান্তাবিরহবিধুর যক্ষ 'মেঘালোকে' উন্মনাঃ হইয়া, বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' নবমেঘকে প্রিয়ার নিকট দৌত্যে পাঠাইয়াছিলেন, উজ্জয়িনীর কবির স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ সেই দিনটি ভারতবর্ষের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়াছে। প্রিয়াবিয়োগবিদীর্ণহৃদয় দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এই চিরস্মরণীয় দিনে 'ভারতবর্ষে'র পত্তন করা কি কবিজনোচিত হয় নাই? আপনারাই বিচার করুন।"

কবি-বন্ধুর সুমধুর বচনবিন্যাস সকলেই যেন কেমন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার বাক্য শেষ হইবামাত্র সকলেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সবজান্তা ভায়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "এ সব কথা শাস্ত্রীর মেঘদূত ব্যাখ্যা হইতে চুরি।" (উক্ত গ্রন্থের প্রচার নাই সুতরাং সত্য মিথ্যা ধরিবার যো কি?) ঠোঁটকাটা ভায়া চীৎকার স্বরে বলিলেন—"এ সেরেফ গাঁজাখুরি, উন্মত্তপ্রলাপ।" বৈজ্ঞানিক বন্ধু মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ওরূপ অশিষ্টোচিত (UN-PARLIAMENTARY) ভাষা ব্যবহার করেন কেন? বলুন—কবি-কল্পনা বা হেঁয়ালি!" রসিক দাদা জনান্তিকে বলিলেন—"রবি বাবুর বাতাস লাগিয়াছে।" বৈয়াকরণিক বন্ধু বিকট বদন-ব্যাদান করিয়া মন্তব্য করিলেন—"'কশ্চিৎ কান্তা' এই ব্যাকরণ-বিভীষিকায় যে কাব্যের আরম্ভ, তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। স্বয়মসিদ্ধঃ কথং অন্যান্ সাধয়তি?"

আমরা এই নানা মুনির নানা মতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিলাম। ইতি

The conclusion in which nothing is concluded.

দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম. এ., বি. এল.]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র

মহাসিন্ধু-পার হ'তে সে যেন রে ভেসে আসে
এ মধুর চন্দ্রালোকে মধুময় ফুলবাসে ;
সমীর বহিয়া যায়,
পিক কলকণ্ঠে গায়,
এই গীতিগন্ধময় যামিনীর আবরণে
সে যেন আবার আসে তার গীতিগন্ধসনে।
আজি এ মধুর ভুলে সেই কথা ভুলে যাই ;
ভুলিয়া যাই যে তার মূরতি মরতে নাই ;
হেরিতেছি বার বার
জীবন্ত মাধুরী তার ;
গায়িতে গায়িতে যেন সে এখনি ঘুমায়েছে,
যে হাসি হাসিতেছিল তাই যেন হাসিতেছে !

স্মৃতি যেন ভুলে গেছে শেষ অঙ্ক জীবনের,
ফুটিয়া উঠিছে সেই ফোটা ফুল প্রমোদের ;
সেই গালভরা হাসি,
বুকভরা সুখরাশি
উজলি আলয় যেন মলয়ে বহিয়া যায় ;
আজি এ দুঃখের দিনে সেই সুখ ফিরে চায়।
দাও দাও হৃদি খুলে, আসুক বহিয়া তার
প্রাণের সে কথাগুলি, হৃদি ভরি আরবার ;
এই স্নিগ্ধ মন্দানিলে,
উছলিত এ সলিলে
সে যে ঢেলে দিয়েছিল তার সব ভালবাসা ;
শেষ দিনে সে পূরাল সকল দিনের আশা।
স্বপ্নের নন্দনশোভা, স্মৃতির উষার হাসি—
তার দেশ তারে দিল ক্ষুধাহরা সুধারাশি ;
জীবনের ভালবাসা,
মরণের পর আশা—
তার ভাষা তারে দিল অমৃতের বরদান ;
এ দু'য়ের সেবাতে সে ভুলেছিল অর্থমান।
এ দেশের মাটি তার মনসাধ পূরায়েছে ;
সে কেন দেশের সাধ না পূরায়ে চ'লে গেছে ?
গাথিতে গাথিতে মালা,
চ'লে গেছে নিয়ে ডালা ;
দু'চারিটি ফেলে গেছে মধুর সুবাসে ভরা ;
তাই বুকে ক'রে আছে তার জনমের ধরা।
কই স্মৃতি ভুলাইতে পারিলি ব্যথার হিয়া ?
সে সে বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে বহিছে নয়ন দিয়া ;
অন্তিম শয়ন-তলে
প্রফুল্ল প্রসূনদলে
সজ্জিত মলিনজ্যোতি সে মুখকমলখানি
যখনি পড়িবে মনে; কাঁদিবে অন্তরপ্রাণী।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্ এ]

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আপাততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১। পারিভাষিক শব্দ

ইংরাজী 'নভ্‌ল্' শব্দটির বাঙ্গালায় 'উপন্যাস' অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছে। অনেকে খাস ইংরাজী শব্দটিই বিকৃত উচ্চারণ করিয়া কথাবার্ত্তায় চালান, অনুপ্রাসের অনুরোধে নাটক-নভেল শব্দযুগ্মক লিখিত ভাষায় ব্যবহার করেন, কিন্তু লিখিত ভাষায় সাধারণতঃ 'উপন্যাস' নামটিই গৃহীত হইয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু এই শব্দটি সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় 'অর্থঘোরা' শব্দের প্রসঙ্গে এ কথার আলোচনা করিয়াছি। পুনশ্চ এখানেও করিতেছি। সংস্কৃত ভাষার অভিধানে 'উপন্যাস' শব্দের নানা অর্থের মধ্যে উপন্যাসস্তু বাঙ্মুখম্' এই অর্থ দেখা যায় বটে, কিন্তু 'বাঙ্মুখ' বা 'কথারম্ভ' অর্থ হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ (extension of meaning) করিয়া সমগ্র গল্পটাকে বাঙ্গালাভাষায় ঐ নামে অভিহিত করা হয় কেন, বুঝিতে পারি না।

আবার কেহ কেহ ইংরাজী 'নভ্‌ল্' শব্দের মূল অর্থ ধরিয়া 'নবন্যাস' নাম গঠন করিয়াছেন, কেহ কেহ ইংরাজী 'রোমান্স' শব্দের সহিত অক্ষরসাদৃশ্য রাখিয়া 'রমন্যাস' নাম সৃষ্টি করিয়াছেন, কেহ কেহ বা ইংরাজী মিষ্ট্রীস্-জাতীয় (Mysteries) গ্রন্থগুলিকে 'গুপ্তকথা' বা 'রহস্য' না বলিয়া 'রহোন্যাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপন্যাস, নবন্যাস, রমন্যাস, রহোন্যাস, এই চারিটি নামের মধ্যে শেষ তিনটি নূতন উদ্ভাবিত; প্রথমটি নূতন উদ্ভাবিত না হইলেও নূতন অর্থে ব্যবহৃত।

কিন্তু সংস্কৃতভাষায় 'গল্প' অর্থ বুঝাইতে 'আখ্যান' 'উপাখ্যান' শব্দদ্বয় আছে; পরন্তু 'নভ্‌ল্' ও 'রোম্যান্সে'র তুল্যজাতীয় গদ্যকাব্যেরও সংস্কৃতভাষায় নিতান্ত অভাব নাই এবং সেগুলি লক্ষণভেদে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' নামে পরিজ্ঞাত। ভাষার ভাণ্ডারে যখন এই শ্রেণীর সাহিত্যের পারিভাষিক নাম পূর্ব্ব হইতেই আছে, তখন বিদেশের 'নভ্‌ল্' শব্দগ্রহণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? 'উপন্যাস' শব্দের নূতন অর্থ কল্পনা করিবারই বা আবশ্যকতা কি? সংস্কৃতভাষা হইতে এই শব্দ দুইটির একটি গ্রহণ করিলে অনায়াসে চলিতে পারে। সংস্কৃতভাষায় যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, তাহা 'কাদম্বরী' 'বাসবদত্তা' প্রভৃতি কাব্যের পাঠকদিগের অবিদিত নাই। বাস্তবিক সংস্কৃত-কাব্য 'কাদম্বরী' ও ইংরাজী নভেল 'শী' (She) যে পরস্পরের নিতান্ত নিকট জ্ঞাতি, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

'কথা' নামটিতে একটু সন্দিগ্ধার্থতাদোষ (ambiguity) ঘটিতে পারে, কেন না 'কাদম্বরীকথা'ও 'কথা', আবার 'পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশে'র 'সিংহশৃগাল-কথা'ও 'কথা'; অথচ উভয়ত্র শব্দটির এক পারিভাষিক অর্থ নহে। 'কথাসরিৎ-সাগরে' উভয় প্রকারের 'কথা'ই আছে,—নীতিশিক্ষাত্মক

পশুপক্ষীর গল্প (Beast-Stories, Fables)—হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় এবং বাঙ্গালা কথামালার ন্যায়—আছে, আবার খোষগল্পও আছে। 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে'—এই শ্লোকার্দ্ধে 'কথা' শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, 'কাদম্বরী'র প্রারম্ভে কথা-প্রশংসায় 'কথা জনস্যাভিনবা বধূরিব', 'নবৈঃ পদার্থৈ রূপপাদিতাঃ কথাঃ' ইত্যাদিস্থলে সে অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্তবিক, কাদম্বরী-'কথা' ও কাকোলুক-'কথা'য় আকাশপাতাল প্রভেদ। অতএব এ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধার্থক 'কথা' শব্দটি গ্রহণ না করিয়া, অপর পারিভাষিক শব্দ 'আখ্যায়িকা' শব্দটি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের 'আখ্যায়িকা'র লক্ষণের সহিত ইংরাজী নভ্‌লের লক্ষণের অল্পস্বল্প প্রভেদ থাকিলে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। এই প্রভেদ সত্ত্বেও 'আখ্যায়িকা' শব্দ, 'উপন্যাস' শব্দ অপেক্ষা ইংরাজী 'নভ্‌ল্' শব্দের প্রতিরূপ-রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। সংস্কৃত নাটকের সহিত ইংরাজী ড্রামার অনুকরণে লিখিত আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের লক্ষণগত সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও যখন সে ক্ষেত্রে 'নাটক' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন 'আখ্যায়িকা' শব্দ ব্যবহারেই বা আপত্তি কি? বঙ্কিমচন্দ্র 'আখ্যায়িকা' শব্দটি বহুবার নিজের আখ্যায়িকাবলিতে এইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

ইংরাজী নভ্‌লের অনুবাদ হিসাবে 'আখ্যায়িকা' শব্দ প্রচলিত হইলে আর একটু লাভ আছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইংরাজী নভ্‌ল্ এ দেশে আমদানী না হইলে আমাদের সাহিত্যে 'রোমাবতী', 'বিজয়বসন্তে'র ন্যায় কাব্য রচিত হইত, কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' বা 'স্বর্ণলতা'র ন্যায় কাব্য কখন রচিত হইত না। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে, 'দুর্গেশ-নন্দিনী' 'মৃণালিনী' প্রভৃতি কাব্য ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে রচিত হইলেও, এগুলি ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতি নহে। যেমন একদিকে দুর্গেশনন্দিনী 'আইভ্যানহো'র নিকট জ্ঞাতি, তেমন অন্যদিকে 'শী' (She) 'কাদম্বরী'র নিকট জ্ঞাতি। অতএব 'আখ্যায়িকা' নামগ্রহণে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকিবে। জাতীয় আত্মসম্মান-বোধের দিক্ হইতে এই লাভ নিতান্ত অবহেলার বস্তু নহে। সুধীবর্গ 'আখ্যায়িকা' নামটি নিতান্ত সেকেলে ও টুলোধরণের (antiquated and pedantic) বলিয়া প্রত্যাখ্যান না করিয়া, এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন কি?

২। প্রকাশের প্রণালী

বিলাতী আখ্যায়িকাকার রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্কট্ প্রভৃতির আখ্যায়িকাগুলি একেবারেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ডিক্‌ন্‌স্ প্রভৃতি আখ্যায়িকাকারের অনেক আখ্যায়িকা প্রথমে (periodicals) সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া, পরে পুস্তকাকারে পরিণত হয়। অবশ্য, পরবর্ত্তিকালে এই শ্রেণীর পত্রিকাদির বহুলপ্রচারই প্রকাশ-প্রণালী-পরিবর্ত্তনের কারণ। বঙ্কিমচন্দ্রকে সাধারণতঃ আখ্যায়িকাকার হিসাবে বাঙ্গালার স্কট্ বলা হয়; কিন্তু প্রকাশ-প্রণালীর দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, স্কট্ অপেক্ষা ডিক্‌ন্‌সের সঙ্গে তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কেন না, ডিক্‌ন্‌সের ন্যায় তাঁহারও অধিকাংশ আখ্যায়িকাই প্রথমে সাময়িক পত্রে ('বঙ্গদর্শনে' বা 'প্রচারে') প্রকাশিত হইয়া, পরে পুস্তকাকারে পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক পত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, এই সূত্রেও তাঁহার অধিকাংশ কাব্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বিষয়েও ডিক্‌ন্‌সের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কেননা তিনিও এই সকল পত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। প্রকাশ-প্রণালীসম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'বঙ্কিম-জীবনী'তে দ্রষ্টব্য।

৩। নামকরণ

(১) সকল ভাষায়ই দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের নামকরণে, কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হয়। অনেক স্থলে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হয়। যথা—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, মেঘনাদবধ, তিলোত্তমাসম্ভব, পলাশীর যুদ্ধ, বঙ্গাধিপ-পরাজয়, প্যারাডাইস্ লষ্ট—ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র এই নিতান্ত সাধারণ প্রণালীতে তাঁহার কোন আখ্যায়িকার নামকরণ করেন নাই। বলা বাহুল্য, এই প্রণালীতে কোন গুণপনা, কলাকৌশল নাই।

(২) অনেকস্থলে গ্রন্থের নায়কের নামে গ্রন্থের নামকরণ হয়। কখনও শব্দটিতে চরিতবাচক শব্দ জুড়িয়া দেওয়া

হয় ; যথা—নৈষধচরিত, শ্রীহর্ষচরিত, রামায়ণ, শিবায়ন। কখন শব্দটি একা একাই ব্যবহৃত হয়। যথা শেক্‌স্‌পীয়ারের হেমলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো ইত্যাদি। স্কটের ওয়েভার্লি ও আইভ্যানহো এই নিয়মের দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি আখ্যায়িকার এই নিয়মে নামকরণ হইয়াছে। যথা, 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম'। 'চন্দ্রশেখর' সম্বন্ধে একটু আপত্তি হইতে পারে, কেননা এই আখ্যায়িকার নায়ক প্রতাপ, ইহাই বোধ হয় সাধারণ মত। (পর-পরিচ্ছেদে 'চন্দ্রশেখর' নামকরণের সমীচীনতা বিচার করিব।) 'রাজসিংহ' ও 'সীতারামে' ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এই এই স্থলে নায়কের কার্য্যাবলী বা চরিত্র গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য।

স্কটের পূর্ব্ববর্ত্তী আখ্যায়িকাকারদিগের পুস্তকের নায়কের পুরানামে পুস্তকের নামকরণ হইতে দেখা যায়। যথা—Sir Charles Grandison, Joseph Andrews Tom Jones, Tristram Shandy, Roderick Random ইত্যাদি। স্কটের Quentin Durward, লিটনের Eugene Aram, ডিক্‌ন্সের Nicholas Nickleby প্রভৃতি এই নিয়মের অধীন। কিন্তু এরূপ নামকরণ বড়ই বিশ্রী (Clumsy)। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল তাঁহার শ্লেষাত্মক (Satirical) কাব্য 'মুচিরাম গুড়ে' এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ওরূপ কাব্যে এই ধরণের নামকরণ মানাইয়াছেও ভাল।

(৩) অনেক স্থলে নায়িকার নামে গ্রন্থের নামকরণ হয়। বলা বাহুল্য, নায়িকার নামে কাব্যের নামকরণ হইলে কাব্যামোদিগণের মনোমদ হয়, তজ্জন্য কবিকুল এই প্রথার পক্ষপাতী। সংস্কৃত সাহিত্যে, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী, ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী (উপাখ্যান) ও ৺দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী প্রভৃতি এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, পামেলা, এমিলিয়া, এমা, রোমোলা ইত্যাদি। জেন আয়ার, ক্ল্যারিসা হার্লো, প্রভৃতি স্থলে নায়িকার পুরানাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, শেক্‌স্‌পীয়ারের একখানি নাটকেরও এই নিয়মে নামকরণ হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে সাতখানির এই নিয়মে নামকরণ হইয়াছে। যথা—কপাল-কুণ্ডলা, মৃণালিনী, রজনী, ইন্দিরা, রাধারাণী, দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরাণী। শেষ দুইখানির বেলায় একটু সূক্ষ্ম প্রভেদ দেখা যায়, ঠিক নায়িকার পিতৃদত্ত নামে নামকরণ না হইয়া, গ্রন্থখানি নায়িকার পরিচায়ক বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' ও 'কমলে কামিনী' ইহার অনুরূপ। স্কটের The Bride of Lammermoor, The Surgeon's Daughter ও পদ্যকাব্য The Lady of the Lake এই ধরণের দৃষ্টান্ত। (এ দুইটি স্থলে নামের এরূপ প্রভেদ কেন, তাহা পর-পরিচ্ছেদে বিচার করিব। কোন গ্রন্থ নায়কের নামানুসারী, কোন গ্রন্থ নায়িকার নামানুসারী, এরূপ প্রভেদ কেন, এই প্রশ্নও পর-পরিচ্ছেদে বিচার করিব।) যাহা হউক, দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অর্দ্ধেকগুলি আখ্যায়িকায় নায়িকার জয়জয়কার। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যখন ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তখন ইহা ইংরাজী নজীরের নকল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই।

এ স্থলে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচিত আখ্যায়িকাদ্বয়ের নাম মোটেই মোলায়েম নহে। কপাল-কুণ্ডলা ত একেবারে মহিষমর্দ্দিনী গোছের। অবশ্য, ইহারও সূক্ষ্ম কারণ আছে। আপাততঃ এইটুকু বুঝা যায় যে, উভয়ত্র গ্রন্থকারের গালভরা জাঁকালো নামের দিকে বেশ একটু ঝোঁক রহিয়াছে। পরবর্ত্তী নামগুলি—মৃণালিনী, রজনী, ইন্দিরা, রাধারাণী সুখোচ্চার্য্য ও হৃদয়গ্রাহী।

(৪) গ্রন্থ-পরিচয়ে নায়কের বা নায়িকার নাম একা একা থাকা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। সেইজন্য সংস্কৃত ভাষায়, তথা ইংরাজী ভাষায়, বহু কাব্যনাটকে নায়ক-নায়িকার নাম গাঁটছড়া-বাঁধা থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সংস্কৃত সাহিত্যে বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতীমাধব প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়ারের Romeo & Juliet, Antony & Cleopatra, Troilus & Cressida, Venus & Adonis সুপরিচিত। বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর, শরৎসরোজিনী, সুরেন্দ্রবিনোদিনী, নলিনীবসন্ত, মুকুল-মুঞ্জরা প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্কট বা বঙ্কিমচন্দ্র একখানি আখ্যায়িকারও এই নিয়মে

নামকরণ করেন নাই। 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' এইরূপ যুগলে নাম রাখার পরিবর্ত্তে গ্রন্থকার যুগল অঙ্গুরী দিয়াই সারিয়াছেন! সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় এরূপ নামকরণ নাটকের বেলায়ই প্রচলিত, শ্রব্য কাব্যে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ সেই জন্যই স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্র নিজ নিজ আখ্যায়িকার নামকরণে এই পথ ধরেন নাই।

(৫) কোথাও কোথাও, কাব্য বা নাটকের মেরুদণ্ড-স্বরূপ কোন ঘটনা বা বস্তু বা বিষয়ের অনুসারে নামকরণ হইয়া থাকে। সংস্কৃতভাষায়, অভিজ্ঞান-শকুন্তল, প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। শেক্স্পীয়ারের The Tempest ও স্কটের The Talisman ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি আখ্যায়িকায় এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। যথা—কৃষ্ণকান্তের উইল, যুগলাঙ্গুরীয়, আনন্দমঠ।

(৬) প্রবাদবাক্য প্রভৃতি অবলম্বনেও গ্রন্থের নামকরণ হইয়া থাকে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ইহার দৃষ্টান্ত। শেক্স্পীয়ারের Much Ado About Nothing, Love's Labour's Lost, Measure for Measure প্রভৃতিও এই শ্রেণীর। স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও এ প্রণালী অবলম্বন করেন নাই।

(৭) অবশিষ্ট একখানি আখ্যায়িকার নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নায়কের নাম, নায়িকার নাম, নায়ক-নায়িকার যুগলে মিলিত নাম, ঘটনার বা বস্তুর বা বিষয়ের নাম, প্রবাদ-বচন-প্রয়োগ, বিষয়-নির্দ্দেশ, প্রভৃতি মামুলি প্রথা পরিহার করিয়া, রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ' এই অভিনব প্রণালীতে অভিহিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব গ্রন্থকার গ্রন্থের নানা অংশে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গ্রন্থের নামকরণে আরও কোন কোন প্রণালী অনুসৃত হয়। কিন্তু সেগুলির সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ না থাকাতে অপ্রাসঙ্গিক বোধে সেগুলির আলোচনা করিলাম না।

৪। নামকরণের হেতুবাদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের সাতখানি আখ্যায়িকার নায়িকার নামে নামকরণ হইয়াছে। নায়িকার নামে নামকরণ হইলে শ্রুতিসুখকর হয়, সেইজন্যই যে এরূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহা নহে। এ সকল ক্ষেত্রে নায়িকাই আখ্যায়িকার কেন্দ্রস্থানীয় (Centre of interest), নায়িকার জীবনের ঘটনাবলী পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে, নায়িকার সুখদুঃখ পাঠকের হৃদয় দ্রব করে; অথবা কোন কোন গ্রন্থে নায়িকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। যথা—

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসমসাহস, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, নায়িকার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও অদ্ভুত পতিভক্তি আমরা বিস্ময় ও প্রশংসার চক্ষে দেখি বটে; 'রমণীরত্ন' আয়েষার অপরিমেয় করুণা, অগাধ প্রণয়, অপূর্ব্ব আত্মজয় ও অনুপম সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হই, আমাদের হৃদয় গভীর শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়, ইহাও সত্য; নায়ক জগৎসিংহের শৌর্য্য, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণাবলি ও তাঁহার প্রবল প্রণয় তাঁহার প্রতি আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, ইহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু প্রেমবিহ্বলা কোমল প্রকৃতি তিলোত্তমার চরিত্রে বিমলা ও আয়েষার চরিত্রের উজ্জ্বলতা না থাকিলেও, তিনিই পাঠকের কৌতূহলের কেন্দ্র, তাঁহার সুখদুঃখই পাঠকের লক্ষ্য বস্তু; তাঁহার দুঃখে আমরা দুঃখী, তাঁহার সুখে আমরা সুখী। সুতরাং তাঁহার নামে গ্রন্থের নামকরণ সঙ্গত হইয়াছে।

আর একটু কথা আছে। গড়মান্দারণের দুর্গমধ্যে রাজপুত-পাঠানের বিবাদ-কাল তিলোত্তমার জীবনের সন্ধিক্ষণ (Crisis); সুতরাং গ্রন্থের নাম তাঁহার নিজ নামে না হইয়া, উক্ত দুর্গের অধিপতির কন্যা অর্থাৎ 'দুর্গেশনন্দিনী' হইয়াছে। ইহা সুসঙ্গত।

'মৃণালিনী' পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের অব্যবহিত পরবর্ত্তী না হইলেও, উভয়গ্রন্থের অনেক অংশে মিল আছে। অতএব 'মৃণালিনী'র কথাই আগে বলি। ইহাতে নায়ক মগধরাজ-পুত্র হেমচন্দ্রের বীরত্ব, বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা, প্রণয়শীলতা ইত্যাদি প্রশংসনীয়; মনোরমার চরিত্র অপূর্ব্ব রহস্যময়; গিরিজায়ার সখীত্ব মধুর; কিন্তু তথাপি পতিগতপ্রাণা নায়িকা মৃণালিনীই এই গ্রন্থের কেন্দ্র; তাঁহার চরিত্রে মনোরমাচরিত্রের উজ্জ্বলতা না থাকিলেও তাঁহাই পাঠকের লক্ষ্যস্থল। সুতরাং গ্রন্থের নামকরণ যথাযুক্ত হইয়াছে।

'কপালকুণ্ডলা'য় নায়ক নবকুমারের চরিত্রে সাহস, পরোপকারিতা, ভাবুকতা, গভীর প্রণয়, সংযম ইত্যাদি সদ্‌গুণ বিরাজিত; পদ্মাবতীচরিত্রের জটিল রহস্য বিস্ময়াবহ; শ্যামার সখীত্ব মধুর; কিন্তু এ গ্রন্থে কবির প্রধান উদ্দেশ্য—কপালকুণ্ডলার সম্পূর্ণরূপে মৌলিক চরিত্রের সৃষ্টি ও পুষ্টি। পরন্তু কাপালিক-পালিতা দেবীভক্তিময়ী যোগিনীর কপালকুণ্ডলা নাম গৃহপিঞ্জরবদ্ধা মৃন্ময়ী নাম অপেক্ষা কবির উদ্দেশ্যের অধিকতর উপযোগী।

'রজনী'তে লবঙ্গলতার চরিত্রের মাধুরী উপভোগ্য, অমরনাথের শেষজীবনের চিত্তজয় সুমহান্, কিন্তু কাণা ফুলওয়ালীর সুখদুঃখের কথা পাঠকের প্রকৃত লক্ষ্য এবং তাহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য। অতএব এ ক্ষেত্রে রজনীই গ্রন্থের কেন্দ্রস্থানীয়।

এইরূপ ইন্দিরার 'পতি উদ্ধার' ও রাধারাণীর রুক্মিণী-কুমারের আশাপথ চাহিয়া দীর্ঘ আট বৎসর প্রতীক্ষার বৃত্তান্তে নায়িকাদিগের প্রতিই পাঠকের সমবেদনা উৎসারিত হয়, তাঁহারাই গ্রন্থদ্বয়ের কেন্দ্রস্থানীয়। সুতরাং গ্রন্থদ্বয়ের **'ইন্দিরা' ও 'রাধারাণী'** নামকরণ ঠিকই হইয়াছে।

'দেবীচৌধুরাণী'তে নায়ক ব্রজেশ্বরের চরিত্রে পিতৃভক্তি ও পত্নীপ্রীতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় অনুধাবনযোগ্য, সাগরের মাধুর্য্য উপভোগ্য, কিন্তু 'দেবী'-মাহাত্ম্য-খ্যাপনই গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রফুল্ল 'দেবী চৌধুরাণী'র পদগ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হইল, তাহাতেই সে আদর্শ গৃহস্থবধূ হইল; 'ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র সংসারগ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল।' সুতরাং গ্রন্থের নাম নায়িকার পিতৃদত্ত 'প্রফুল্ল' নামে না হইয়া 'দেবীচৌধুরাণী' হওয়াই সুসঙ্গত।

এক্ষণে আর এক শ্রেণীর নামকরণ আলোচনা করি।

'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর উদ্দাম প্রণয়, তজ্জনিত নৈতিক পতন এবং পরে গভীর অনুতাপ ও কঠোর প্রায়শ্চিত্ত, এই সমস্ত বিচিত্র বৃত্তান্ত প্রাণস্পর্শী সন্দেহ নাই; প্রতাপের গভীর প্রণয়, ইন্দ্রিয়জয়, বীরত্ব, মহত্ত্ব সকলই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; দলনীর অবিচলিত পতিভক্তি অতি সুন্দর, অতি করুণ; সুন্দরীর সখীত্ব সুন্দর; কিন্তু গ্রন্থের মেরুদণ্ড উদারচরিত্র শুদ্ধ সংযত ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর। সেই জন্যই গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাণা রাজসিংহের ক্ষাত্রধর্ম্ম, উদারতা, রণকৌশল ও বীরত্বগাথায় পরিপূর্ণ। রাজপুতনারী চঞ্চলকুমারীর তেজ, সাহস ও বীরপক্ষপাতী অনুরাগ; (বিমলার ভগিনী?) নির্ম্মলকুমারী বা ইম্‌লি বেগমের সখীত্ব, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা; মবারক জেবউন্নিসা-দরিয়ার বিচিত্র প্রেম-কাহিনী—এ সমস্ত হৃদয়স্পর্শী হইলেও, এখানে—ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায়—এগুলি, (of subordinate interest) অপ্রধান বিষয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও নামকরণ যুক্তিসম্মত।

সীতারাম 'ঐতিহাসিক ব্যক্তি।' কিন্তু 'গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' সীতারাম-চরিত্রের বিকাশ-প্রদর্শন গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য, শ্রী জয়ন্তী, নন্দা রমা উপকরণ মাত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও নায়কের নামে গ্রন্থের নামকরণ যুক্তিসঙ্গত।

এইবারে বাকি চারিখানি আখ্যায়িকার নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করি।

"যুগলাঙ্গুরীয়ে" পুরন্দর ও হিরণ্ময়ীর আবাল্য-বর্দ্ধিত প্রেম গল্পের উপজীব্য হইলেও, তাহাদের রহস্যাবৃত বিবাহব্যাপারে আখ্যানের গ্রন্থিবন্ধন এবং গ্রন্থিবন্ধনের নিদর্শন (শকুন্তলার অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ের ন্যায়) যুগলাঙ্গুরীয়। গ্রন্থিচ্ছেদনও এই অঙ্গুরীয়-দর্শনে সমাহিত হইয়াছে। অতএব গ্রন্থের নাম যথাযুক্ত হইয়াছে।

"কৃষ্ণকান্তের উইলে" গোবিন্দলাল ভ্রমর-রোহিণীর প্রণয়-বৃত্তান্ত মর্ম্মভেদী সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কাহিনীর জটিলতার মূলে বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল। উহাই ভবিষ্যৎ বহু অনিষ্টের মূল। পুস্তকের আরম্ভেই প্রথম ও দ্বিতীয় উইলের কথা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জাল উইল লইয়া। ইহাতে রোহিণীচরিত্রের এক দিকের বিকাশ। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের চরিত্রের প্রথম পরিচয়। উইল চুরি ও পরে জাল উইল চুরির চেষ্টায় এই তিনটি চরিত্রের অধিকতর বিকাশ ও জটিলতার বৃদ্ধি। তাহার পর আবার শেষ উইলে (১ম খণ্ড, ২৬ পরিচ্ছেদ) ভ্রমরকে উত্তরাধিকারিণী করাতে, বিপদ আরও ঘনাইল, ব্যাপার আরও জটিল হইয়া পড়িল। অতএব দেখা গেল, উইল যেন গ্রন্থখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও নামকরণ সার্থক হইয়াছে। 'রজনী'তে উইলসূত্রে নায়ক-

নায়িকার ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সে ক্ষেত্রে রজনীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণই গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

"আনন্দমঠে" জীবানন্দ-শান্তির দাম্পত্য-সম্পর্ক আদর্শস্থানীয়; নিমাইএর সখীত্ব এবং মাতৃভাব মধুর; কল্যাণীর অপত্যস্নেহ মধুর এবং স্বামীর, তথা দেশের, মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ বিস্ময়াবহ; সত্যানন্দের জ্ঞান ও দেশভক্তি মহনীয়। কিন্তু এ সকলের ভিত্তি 'জননী জন্মভূমি'র মূর্ত্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠামন্দির 'আনন্দমঠ।' এইখানে দেশভক্তি মূর্ত্তিগ্রহ করিয়াছে। অতএব গ্রন্থের নামে আনন্দমঠের মহিমা কীর্ত্তিত।

"বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্রনাথ-সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়কাহিনী 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলাল-ভ্রমর রোহিণীর প্রণয়কাহিনীর ন্যায়, অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর মর্ম্মন্তুদ। কমলমণির মাধুরী ও উজ্জ্বলতা এই নিদারুণ কাহিনীর ঘনঘোরমেঘে ক্ষণপ্রভার বিকাশের ন্যায়। দেবেন্দ্র দত্ত ও হীরার পাপকাহিনী এই আঁধারকে আরও আঁধার করিয়া দেয়। কিন্তু এই দারুণ ব্যাপারের মূল কোথায়, বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবিদের ন্যায়, মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায়, সমাজ-তাত্ত্বিকের ন্যায়, তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং গ্রন্থের বহুস্থলে সেই জটিল তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ। কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না—তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্ত-সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। ইহার ফল বিষময়; যে খায় সেই মরে।' (২৯শ পরিচ্ছেদ।) এই তত্ত্ববিচার গ্রন্থের প্রাণ, গ্রন্থের মজ্জা, গ্রন্থের ভিত্তি, তাই গ্রন্থের নাম—'বিষবৃক্ষ'।

সংক্ষেপে আখ্যায়িকাবলির নামকরণের সার্থকতা বিচার করিলাম। যদি প্রত্যেক আখ্যায়িকার স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনা করিবার সময় ও সুযোগ পাই, তাহা হইলে আরও বিশদভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

আকাঙ্ক্ষা

[শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়]

শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়

ন) রক্ত আঁখি তরুণ রবি, তুলিয়ে আপন মোহন ছবি,
র) সিঞ্চি সুধা সঞ্জীবনী ফুল্ল করে সবি;
ন) স্তব্ধ ভুবন আলোয় ঘেরা, কুসুম গন্ধে কুঞ্জ ভরা,
ন) গৃহের কাজেই সকল চিত্ত লুটিয়ে দেয় সে নিতি;
কৃষক-বধুর রীতি, সে যে কৃষক-বালার প্রীতি!

সকল দিনের অবসর গো পায় সে সাঁঝের বেলা,
(যখন) মুহূর্ত্তেরে স্থির করে সে আপন চিত্তদোলা;
(তখন) নিজে সেজে মোহন বেশে, চিকণ শোভন কেশে,
উদাস মনে থাকে বসে, দেখতে প্রিয়ের হাসি,—
(আর) সেই হাসির ঢেউয়ে গড়িয়ে পড়ে কতই মুক্তারাশি।

(যখন) প্রাণেশ তা'রে সোহাগ করে, আদর করে,
আবেগ ভরে,
কৃষক-বধূ ভাবলে নামল স্বর্গ ধরা' পরে;
সকল বীণা উঠল বেজে, সাজল ভুবন মোহন সাজে,
(আর) হিয়ার মাঝে পাগল হাওয়া গাইল কতই গান,
হ'ল, সিঞ্চিত তার সকল দেহ, অধীর তার প্রাণ।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তার—প্রার্থনা তার—সর্ব্ব কাজের শেষে,—
কিসে সর্ব্বস্ব তার রেখে যাবে নিরুদ্দেশের দেশে।
র'বে তাহার সকল আশা, অটুট র'বে ভালবাসা,
কেবল, বিদায়-কালে প্রিয়ের করে নিজহস্ত রাখি—
বলবে,—"দাও গো মাথে চরণ-ধূলি সিক্ত করি আঁখি"।

ওলন্দাজ-সাহিত্যসেবীর বৈঠক

আমেরিকা-প্রবাসী

আমেরিকা-প্রবাসী

আজ যেখানে নিউইয়র্কনগর পূর্ব্বে সেখানে নিউ-আমষ্টার্ডম্-নগর ছিল। আমেরিকার এই অঞ্চলে ওলন্দাজ-জাতির উপনিবেশ ও প্রাধান্য ছিল। সে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। তখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র —ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ খোলা হইয়াছে মাত্র। সেই যুগে আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—দুই দেশকেই India বলা হইত। আমেরিকার নাম ছিল—পাশ্চাত্য ইণ্ডিয়া, ভারতবর্ষের নাম রাখা হইল—প্রাচ্য ইণ্ডিয়া। ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই পর্ত্তুগীজ নাবিকেরা একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলে। সুতরাং ভুল-ক্রমে তাহারা এই জগৎকেই ইণ্ডিয়া বিবেচনা করিত। এইজন্য এখনও আমেরিকার আদিমবাসীদিগকে ইণ্ডিয়ান বলা হইয়া থাকে। যথার্থ ইণ্ডিয়া বা ভারতবর্ষের লোকেরা —হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক বা খ্রীষ্টান হউক— আমেরিকায় হিন্দু বা হিন্দুস্থানী বা East Indian নামে পরিচিত। কোন ভারতীয় পর্য্যটক যদি কোন ইয়াঙ্কিকে নিজ পরিচয় দিবার সময়ে বলেন—"আমি ইণ্ডিয়ান," তাহা হইলে ইয়াঙ্কি বিবেচনা করিবেন, ইনি আমেরিকার আদিম-নিবাসী কোন ব্যক্তি।

যাহা হউক, সেই নব ভূখণ্ড এবং নব বাণিজ্য-পথ আবিষ্কারের যুগ ইয়োরোপের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় কাল। রাষ্ট্রশক্তি এবং ব্যবসায়শক্তি নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। জ্ঞানের গতিও নূতন দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই যুগকে ইয়োরোপে "রেনাসাঁস" বা নবাভ্যুদয়ের যুগ বলা হয়।

ওলন্দাজ জাতির গৌরবযুগ

সেই যুগের রাষ্ট্রমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন, স্পেন ও পর্ত্তুগাল; তাহার পর ওলন্দাজ-জাতির ক্ষমতা প্রকটিত হয়। কি বাণিজ্য, কি সাম্রাজ্য-কোন বিষয়েই তখনও ইংরাজ বা ফরাসী, ওলন্দাজদিগের সমকক্ষ ছিলেন না। ওলন্দাজ-প্রতিভা, এশিয়া ও ইয়োরোপ, উভয় খণ্ডেই নানারূপে দেখা দিয়াছিল।

এই যুগের ওলন্দাজ চিত্রশিল্পে ভ্যান্‌ডিক, রুবেন্স, রেম্ব্রাণ্ড ইত্যাদি কারিগরগণ জগৎপ্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। এই যুগে দর্শন-ক্ষেত্রে ওলন্দাজজাতীয় স্পিনোজা ইয়োরোপের একমেবাদ্বিতীয়ং গুরুরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। International Law বা আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্মদাতা হিউগো গ্রোসিয়াস্‌ও এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ওলন্দাজ চিন্তাশক্তির সাক্ষ্য দিতেছিলেন। এই যুগেই আবার ওলন্দাজসাহিত্যের সেক্সপীয়ার Vondel তাঁহার নানাবিষয়িণী সাহিতসেবার দ্বারা ইয়োরোপে ওলন্দাজ-প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন।

কবিবর ভণ্ডেলের লুসিফার

ভণ্ডেলের নাম ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ সুপরিচিত নয়। কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Lucifer হইতে ইংরাজ-কবি মিল্টন তাঁহার Paradise Lost-এর বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এমন কি, ওলন্দাজ কাব্যের নানা পদ ও বাক্য মিল্টনের রচনায় রহিয়া গিয়াছে। মিল্টন ওলন্দাজ-সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন—কাজেই মৌলিক গ্রন্থ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

"লুসিফার" গ্রন্থ এতদিন অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পর ওলন্দাজ-জাতি রাষ্ট্রীয় হিসাবে ইয়োরোপে নগণ্য হইয়া পড়ে; কাজেই তাহাদের গুণিব্যক্তি-গণের বিশ্বব্যাপী সমাদর ঘটিয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তী যুগে ফরাসী ও ইংরাজ জগতে মাথা তুলিতেছিলেন এবং অবশেষে ইংরাজই জগতের এক প্রকার "হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা" হইয়া পড়েন। কাজেই ইংরাজ সেক্সপীয়ার দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি, জার্ম্মাণিতে সেক্সপীয়ার-প্রচারের প্রভাবেই সাহিত্যে একটা নবযুগ আসিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মাণ সাহিত্যের নবাভ্যুদয় সেক্সপীয়ার-আলোচনায় বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। ফলতঃ ওলন্দাজদিগের কালিদাস, বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার অবসর পাইলেন না। বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোন জাতি প্রবল না হইলে, তাহার আদর্শ চিন্তা, শিল্প বা ধর্ম্ম জগতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের কবি হিন্দু-কালিদাস সম্বন্ধে গায়িতে বাধ্য হইয়া-ছেন—"জগতের সেক্সপীয়ার, ভারতের তুমি।" কিন্তু ভারত-প্রভাব যদি বিশ্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে ভারতীয় ভাষাই বিশ্বের ভাষা হইত, ভারতের কালিদাসই জগতের কবি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আজকাল জগতের সর্ব্বত্র ইংরাজীভাষার প্রচলন দেখিতে পাই; অথচ জার্ম্মাণ বা ফরাসী তত দূর বিস্তৃত নয়—তাহার কারণ আর কিছুই নয়, ইংরাজের বিশ্বসাম্রাজ্য এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের নিকট উদীয়মান জার্ম্মাণ বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য নাবালক মাত্র—এবং ফরাসী-প্রভাব হতপ্রভ।

ওলন্দাজ-সাহিত্য-প্রচারক

সম্প্রতি একজন ইয়াঙ্কি সাহিত্যসেবী ভণ্ডেলের লুসিফার কাব্য ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি কাব্য হিসাবে মন্দ নয়। অনুবাদক স্বয়ং একজন কবি। নাম—ভ্যান নোপেন (Van Noppen) ইনি স্বয়ং ওলন্দাজ কিন্তু অল্পবয়স হইতে আমেরিকায় বাস করিতেছেন—এক্ষণে হল্যাণ্ডের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ওদেশে কিছুকাল বাস করিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক ওলন্দাজ সাহিত্য ও ভাষা শিখিয়াছেন। এক্ষণে ওলন্দাজ-সভ্যতার প্রচার করা ইনি জীবনের ব্রত-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হল্যাণ্ডের রাণী, ভ্যান নোপেনকে জগতে ওলন্দাজ-কীর্ত্তি প্রচারের জন্য নিযুক্ত করেন। ইহার মধ্যে ইঁহার আন্দোলনে আমেরিকার ১৫।২০টি বিশ্ববিদ্যালয় ওলন্দাজ-সাহিত্য-আলোচনার জন্য ব্যবস্থা করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। ইনি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বক্তৃতা করিবেন। সম্প্রতি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকালের জন্য স্থায়িভাবে শিক্ষকতা করিতেছেন।

কলাম্বিয়ায় ইনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখাইয়া থাকেন:—

1. The Dutch Language, Beginner's Course; Rudiments of the Grammar, Brief Survey of the History of the language; Rapid Reading of the Selected Texts.
2. Recent Dutch Literature.
3. Dutch Literature of the Renaissance with special reference to Vondel.
4. Holland in the sixteenth century with special reference to Dutch influence in New York and New Jersey.

যবদ্বীপের ওলন্দাজ সাম্রাজ্য হইতেও ভ্যান নোপেন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দুই এক বৎসরের ভিতর তিনি এসিয়ায় আসিবেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষও দেখিয়া যাইবেন বলিতেছেন।

ভ্যান নোপেন বেশ মিশুক লোক। ইঁহার গৃহে নানা দেশীয় লোকজনের সমাগম প্রায়ই দেখিতে পাই। এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা—সকল স্থানের নরনারী ইঁহার বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত। সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদি বিদ্যাসংক্রান্ত লোকজনের বৈঠকে ইঁহার সবিশেষ আনন্দ

বুঝিতে পারিলাম।' কেহ নব্য পারশ্যের Bahaismএর প্রচারক—কেহ আইরিশ-গেলিক আন্দোলনের পাণ্ডা—কেহ থিয়জফিষ্ট, কেহ বা বিবেকানন্দ-ভক্ত। তাহার উপর আজকালকার সাহিত্যের বাজারে 'গীতাঞ্জলি' পূজা এবং Hindu Art, Primitive Art, Futurism, Cubism ইত্যাদি ত একটা ফ্যাশন আছেই। সঙ্গে সঙ্গে "Interests in the far east"-ওয়ালা কবি, চিত্রকর এবং গ্র্যাজুয়েট রমণীও দুই চারি জনকে দেখিলাম।

সাহিত্যসঙ্গীতসেবক গ্রীয়ার্সন

একজন আজীবন সাহিত্যসেবীর সঙ্গে ভ্যান নোপেনের গৃহে আলাপ হইল। ইনি ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বহুকাল ফ্রান্সে ছিলেন—ফরাসীতে লিখিবার ক্ষমতাও আছে। বিংশশতাব্দীর নব্য ভাবুকতা ইঁহার দ্বারা ইয়াঙ্কিস্থানে প্রচারিত হইতেছে, মনে করি। গল্প ও প্রবন্ধ এবং সমালোচনা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গদ্যে ইঁহার হাত পাকা। সকল দিক হইতে অনাগতের প্রতি একটা স্পৃহা-জাগান ইঁহার রচনার অন্যতম বিশেষ লক্ষণ। The Celtic Temperament" এবং "Modern Mysticism" এই হিসাবে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইঁহার সম্বন্ধে একজন অধ্যাপক "Trend" নামক পত্রে লিখিয়াছেন :—

"Probably there is no other figure on the literary horizon to-day who is so enigmatic as Francis Grierson. His works exercise a potent influence, not only on the culture and thought of Europe and America, but one of his books The *Celtic Temperament* has recently been adopted as a text-book by the Universities of Japan. He is one of the silent influences, and the element of wonder which enters so largely into his work is derived from his own life.

* * * *

Throughout all his essays, whether they deal with one or another form of art or directly with life there runs a single note of emphasis. Mr. Grierson does not place his trust in reason or science, but in that up-welling of intuition and emotion from the unconscious depths which have always been the source of the greatest art and religion."

আজকাল যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রেই একটা প্রতিবাদ উঠিয়াছে। তাহার নাম Re-action against Intellectuation। লণ্ডনে থাকিতে আমাদের চিত্র-সমালোচক ডাক্তার কুমারস্বামীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি সুকুমার শিল্প-বিভাগে এই আন্দোলনের পরিচয় দিয়া, কোন কোন পরিষদে বক্তৃতা করিতেছিলেন। ফ্র্যান্সিস গ্রিয়ার্সনও আমেরিকায় এই ভাবুকতা প্রচার করিতেছেন।

আর একজন উদীয়মান কবির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনিও এইরূপ Anti Intellectualism প্রচার করিতে-ছেন। ইঁহার ভাবুকতার মূল-প্রস্রবণ 'বাহা'-প্রতিষ্ঠিত নব্যধর্ম্ম। ইনি বাহাতত্ত্ব প্রচারকের এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের সংস্পর্শে আসিয়া, Emotion-Intuition, অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, অনন্ত, অসীম, আত্মা ইত্যাদির সন্ধান পাইয়াছেন।

বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য

ভ্যান নোপেন তাঁহার স্বরচিত বিরাট কাব্য গ্রন্থের কিয়দংশ স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে মনে হইল, আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এই ধরণেরই বিশ্বশক্তিমূলক বিপুল কাব্যের রচনায় ব্রতী রহিয়াছেন! ভ্যান নোপেনের "ARMAGEDDON" বিংশ শতাব্দীর "FAUST"-রূপে বিবেচিত হইবে, বিশ্বাস হইতেছে।

"It is rather a unique fact that in this day of almost universal war, Mr. Van Noppen has just completed a musical drama : "Amageddon." On this, his masterpiece, he spent ten years of hard work, often he worked all night until eight o'clock the following morning. He rewrote the whole drama thirty times before he called it "finished." One of the foremost Finnish, and also a Russian, composer have reached out their musical

"antannae" for this drama. Sibelius wrote of it : "Van Noppen's 'Amageddon' presents one of the greatest themes of modern opera. It is immensely rich in all those great pictures which make an opera lasting and fascinating. The poet has done his part, the rest is up to the composers, I am going to study English and the libretto until I can write the music for it."

Gliere said : "It does not make any difference whether Sibelius writes an Armageddon opera or not, I am decided to use it as one and the same time." Gliere is the composer whose symphony, Illa Muromets has created one of the greatest sensations in Russian music.

"Armageddon means a battle of the eternal now," writes Mr. Van Noppen in his introduction. "We live in Eternity and act in Time. I have intended to rivet the 'To Come' and the 'Gone-Before' in the socket of Today. It should depict the eternal battle between the individual and the Universal forces, between the material and the spiritual nature of man. Although the drama takes place in ancient Egypt, Palistine and Philistia, yet the reader will easily imagine he is seeing the conditions and the life of modern America. In the parade grounds of Eternity we humans are the marionets of a dreamer of unimaginable dreams. History repeats itself, and the characters repeat themselves in new settings and under new names, but fundamentally they are the same as they were hundreds of thousands of years ago."
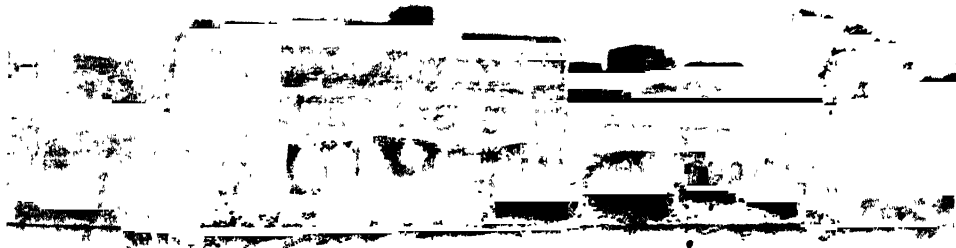
ঋণ-শোধ

[শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী]

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ও মহাজন, গাঁয়ের গোসাই,
দেখ এসে গোয়ালঘরে,
ফাঁসী-লট্‌কে খালাস খাতক
তোমার তাড়ায় দেনার ভরে।
ভিটে-ছাড়া কর্‌বে তারে,
দুনিয়া ছেড়ে গেল চলে!
ডাকাত, খুনী, এই বিধবার
প্রবোধ কি তা দেবে বলে'?
ফকিরের শেষ পুঁজি নিয়ে
শোধ হ'ল না তোমার ধার,
ঢোল বাজিয়ে কর্‌লে জারী
ঘর্ নীলামের ইস্তাহার!
কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে পাগল
মাথা খুঁড়্‌ল তোমার পায়;
সাপের প্রাণেও যেটুক দয়া
তাও লেখেনা তোমার খাতায়!
সুদের সুদ—ছানা পোনা
পলে পলে বাড়্‌ছে তাহা,
তোমার ফাঁদে পড়েছে যে
ঠাঁই-জলে সে ডুব্‌বে ডাহা!
তোমার সোণার বাটী-থালায়
ছানা-মাখন পড়্‌ছে খাসা;
দুধের বাছাগুলি আমার
মরুক্—তারা ছেলে চাষা।
এম্‌নি করে চুলোয় যাক্ না,
তারা যে সমাজের মলা;
তাদের কুঁড়ে পড়ুক খসে,
তোমাদের হোক্ সাত-মহলা!
খাটুক্ ওরা রোদে পুড়ে',
তোমরা থাক গদীয়ান;
ফাঁপ তোমরা ওদের টাকায়,
বল উল্টে—ওরা বেইমান্!
ও মাটি পাষাণের বেটী,
সোণা নয়—তোর বুকে ছাই;
তোরে ধরে' এই দশা আজ!
দরদে আর কাজ কি মাই?
গরীবের কি মা-বাপ আছে?
ক্ষ্যাপার মত শূন্যে কাঁদা!
ধর্ম্ম ও মহাজনের দোরে
দিয়েছে তার বিবেক বাঁধা!
জলজ্যান্ত তাজা জোয়ান,
হো হো, ঝুলছে গলায় দড়ি!
এস এস, নেমে এস
কড়ায় গণ্ডায় হিসাব কড়ি!

খাজরাহো

[শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য]

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

ভারতে অনেক স্থানে অনেক দেবমন্দির আছে; কিন্তু খাজরাহো ছাড়া এত সুন্দর মন্দির শ্রেণী আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দিরগুলির গঠন-প্রণালী দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের মত।

এই খাজরাহো কোথায়, তাহা বলিতেছি। খাজরাহো এক্ষণে গণ্ডগ্রাম মাত্র—ইহা ছত্রপুর হইতে ২৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত; মহোবা ষ্টেশন হইতে ৩৭ মাইল। মহোবা হইতে গোশকট যাওয়া যায়। ছত্রপুর দিয়া যাইলে, ছত্রপুর-দরবারে আবেদন করিলে, টঙ্গাগাড়ী পাওয়া যায়। এখানে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। ছত্রপুর হইতে রাজনগর পর্য্যন্ত ডাকের এক্কা-গাড়ীতে বমিঠা পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এখান হইতে খাজরাহো তিন ক্রোশ।

শিবরাত্রির সময় এখানে মহাসমারোহে মেলা হয়। তখন ছত্রপুরের মহারাজ সপারিষদ এখানে মাসাবধি অবস্থান করেন। মহারাজ লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে এখানকার অনেক মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন।

এখানে যতগুলি মন্দির বিদ্যমান আছে, মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে ও অন্যান্য চিহ্ন হইতে তাহাদের বিবরণ জানিতে পারা যায়। দুইটি ব্যতীত আর সকল মন্দিরই দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। সেকেন্দর লোদী, পান্না ও বাঘেলখণ্ড আক্রমণের সময় (১৪৯৫ খৃঃ অঃ) এই পথ দিয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে অগ্রসর হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত হয়।

খাজরাহোর পুরাতন নাম "খর্জ্জুর বাহক"। চাঁদকবি খর্জ্জুরপুর বলিয়া এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, এক সময় এখানে একটি প্রকাণ্ড রাজধানী ছিল। নগরের সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি সুবর্ণময় খর্জ্জুরবৃক্ষ স্থাপিত থাকায়, ইহার 'খর্জ্জুরপুর' নামকরণ হয়। কেহ বলেন, এক সময় এই স্থানে খর্জ্জুরবৃক্ষের আধিক্য থাকাতেই ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। ১০২২ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদের কালঞ্জর দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্গী আবুরিহান, যথাহুতির রাজধানী বলিয়া এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর ইবন বটুটা ১৩৩৫ খৃঃ অব্দে এই নগর পরিদর্শন করেন ও এই মন্দিরগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হউক, খাজরাহো যে, এক সময় যঝোতীর (বুন্দেলখণ্ডের) চান্দেল রাজপুতগণের রাজধানী ছিল, তাহার বহু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সং ৬৪১ খৃঃ অব্দে এইস্থান দিয়া গমন করেন ও "চিচিতো" বা যঝোতী নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখনও এখানে অনেক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ছিল। যঝোতীর রাজা ব্রাহ্মণ হইলেও সদ্ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্প-সংখ্যক বৌদ্ধ স্থবির এখানে সেই সময় বাস করিলেও

দ্বাদশটি হিন্দু-মন্দিরে প্রায় সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-পূজারী নিযুক্ত ছিলেন। বহুদূর হইতে এখানে বিদ্বজ্জনের সমাগম হইত। কালে এখানকার প্রায় সমস্ত বৌদ্ধকীর্ত্তিই লোপ পাইয়াছে। তবে গন্থাই-মন্দিরটি ও খাজ-রাহো গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বের কয়েকটি ধ্বংসাবশেষকে বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। গন্থাই-মন্দিরের সন্নিকটে একটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তির সিংহাসন এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার উপর লেখা আছে—"যে ধর্ম্মহেতু প্রভব" ইত্যাদি। লেখা দেখিয়া ইহা ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। গন্থাই মন্দিরের চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি বৌদ্ধের "ধর্ম্মের" প্রতিমূর্ত্তি।

কানিংহাম এখানকার মন্দিরগুলি তিনটি পৃথক্ মণ্ডলীতে বিভাগ করিয়াছেন। (ক) পশ্চিমের মণ্ডলী, (খ) উত্তরের মণ্ডলী, (গ) দক্ষিণের মণ্ডলী। পশ্চিমের মণ্ডলী শিবসাগর নামক জলাশয়ের তীরে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের কতকগুলি শিবমন্দির, কতকগুলি বিষ্ণুমন্দির। উত্তরের মণ্ডলীর সমস্তগুলিই বিষ্ণুমন্দির ও দক্ষিণের জৈন-মন্দির। চৌষট্টি যোগিনী ও গন্থাই ব্যতীত, আর সকল মন্দিরই বেলে-পাথরে নির্ম্মিত।

আদিনাথ-মন্দির

পশ্চিমের মণ্ডলী

চৌষট্টিযোগিনী মন্দিরটি স্ফটক (gneiss) নির্ম্মিত ছিল—এক্ষণে ইহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কেবল কক্ষ কয়টি বিদ্যমান আছে। এইটিই এখানকার সর্ব্বপুরাতন মন্দির বলিয়া অনুমিত হয়। কানিংহামের মতে এই মন্দিরটি ৮ম শতাব্দী অপেক্ষা পূর্ব্বের অনুমান করিলেও বোধ হয়, বিশেষ ভ্রম হয় না। এই মন্দিরের সম্মুখে একটি ৪হস্ত পরিমিত বৃহৎ গণেশ-মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে; মূর্ত্তিটি মন্দির-নির্ম্মাণের বহুপরে (দশম বা একাদশ শতাব্দীতে) এখানে আনিয়া বসান হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়।
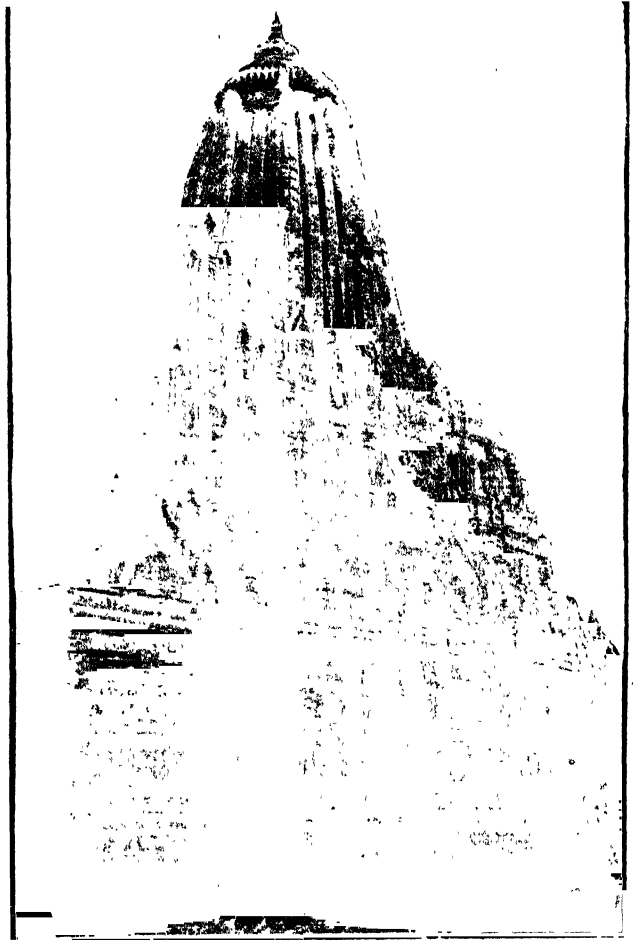
কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির। এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে এইটি বৃহত্তম—ইহা ভূমি হইতে প্রায় ৭৮ হাত উচ্চ। মন্দিরটি মণ্ডপ, অর্দ্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহে বিভক্ত—সবগুলিই পৃথক্ চূড়া-পরিশোভিত। গর্ভগৃহের চারিদিকে একটি পথ আছে। ছাদ-গুলি এত সুন্দর তক্ষণ-কার্য্য-সমন্বিত যে, কিছুক্ষণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। মন্দির-গাত্র বহু পুত্তলিকায় পরিশোভিত। ইহাদের সর্ব্বনিম্ন তিন সারি অত্যন্ত অশ্লীল। তদুপরিস্থ মূর্ত্তিগুলি হিন্দু দেবদেবীর। গর্ভগৃহ-প্রবেশ-পথের উপরে মধ্যভাগে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। কানিংহাম, মন্দিরের ভিতরে ২২৬টি, ও বাহিরে ৬৪৬টি, মোট ৮৭২টি মূর্ত্তি গণনা

গণেশ মূর্তি

করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই দুই হস্ত উচ্চ। মন্দির মধ্যস্থ শ্বেত প্রস্তরের শিব লিঙ্গটির পরিধি প্রায় ৩ হস্ত। এত বড় লিঙ্গ মূর্তি অপর কোথাও বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার উত্তরেই আর একটি ক্ষুদ্র শিব মন্দির অবস্থিত। কাণ্ডারীয় মন্দিরটি দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

জগদম্বা মন্দির। কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দিরের উত্তরে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি অবস্থিত—দৈর্ঘ্যে ৫২ হস্ত ও প্রস্থে ৩৩ হস্ত। গর্ভ গৃহ প্রবেশের পথের উপরে মধ্যভাগে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও দক্ষিণে ও বামে শিব ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গর্ভ-গৃহের মধ্যভাগে একটি চতুর্হস্ত-পরিশোভিত প্রায় ৪ হাত উচ্চ কমলধারিণী লক্ষ্মীমূর্ত্তি অবস্থিত। এই মন্দিরে মাত্র চারিটি কক্ষ আছে। মন্দির গাত্রও বহু মূর্ত্তি-পরিশোভিত। মূর্ত্তি গুলির সর্ব্ব নিম্ন তিন সারি বহু অশ্লীল মূর্ত্তিবিশিষ্ট। মন্দিরটি ১০ম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হয়।

ছতর কো পতর। জগদম্বা মন্দিরের উত্তরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। গর্ভগৃহ প্রবেশ পথের উপর তিনটি সূর্য্য মূর্ত্তি খোদিত আছে দেখিয়া, ইহাকে সূর্য্য-মন্দির বলিয়াই অনুমান হয়। মন্দিরের মধ্যে প্রায় ১০।১১ হাত পরিমিত দুই হস্তে পদ্ম পরিশোভিত সূর্য্য মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির সিংহাসনে সপ্তাশ্ব যোজিত রথ অঙ্কিত আছে। মন্দির গাত্র ও পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগুলির মত বহুমূর্ত্তি পরিশোভিত এবং ইহাদের নিম্নের তিন সারি সমানই অশ্লীল। মন্দির গাত্রের দক্ষিণদিকের মূর্ত্তিগুলি ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর, পশ্চিমে শিব পার্ব্বতীর এবং উত্তরে বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও বরাহের। এ মন্দিরও দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

বিশ্বনাথ। এই মন্দিরটি শিবসাগরের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ইহার গঠন প্রণালী কাণ্ডারীয় মন্দিরেরই মত —পঞ্চ কক্ষ বিশিষ্ট কিন্তু ইহা আয়তনে কিছু ছোট—দৈর্ঘ্যে ৫৮ হস্ত ও প্রস্থে কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ হস্ত। গর্ভ-গৃহের মধ্যস্থলে একটি বৃষারূঢ় শিবমূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে হংসারূঢ় ব্রহ্মামূর্ত্তি ও গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। মন্দিরের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির গাত্রের মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই হর পার্ব্বতী সম্বন্ধে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিল্পকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বাহিরের মন্দির গাত্রের মূর্ত্তিগুলির কতকগুলি অতীব অশ্লীল। কানিংহাম মন্দির গাত্রে ২ হস্ত উচ্চ ৬০২টি মূর্ত্তি গণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মন্দিরের দশ কোণে অবস্থিত দশটি হস্তীর অর্দ্ধ মূর্ত্তি মন্দিরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। মন্দির প্রবেশ পথে দুইটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এ মন্দিরও দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এবং পূর্ব্বে এখানে মরকতময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম কোণের ছোট মন্দিরটির মধ্যে একটি অষ্টভুজা মূর্ত্তি আছে।

বিশ্বনাথ মন্দিরের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে একটি বৃহদায়তন বৃষ প্রতিষ্ঠিত আছে। বৃষ-মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে দশহস্ত পরিমিত। মূর্ত্তিটির শৃঙ্গ ও অন্যান্য স্থানে যেখানে যেখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা সংস্কার করিয়া রাখা হইয়াছে।

বিশ্বনাথ মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির

কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির
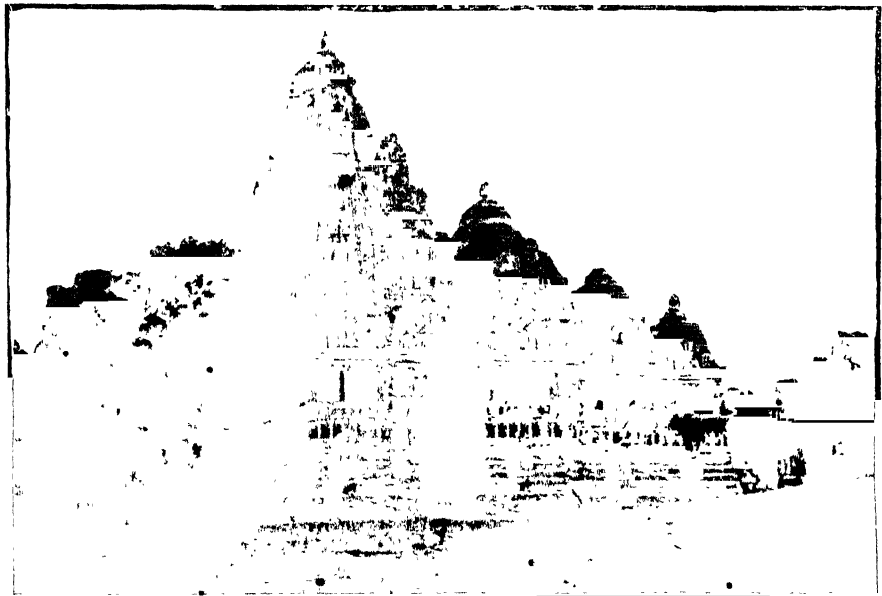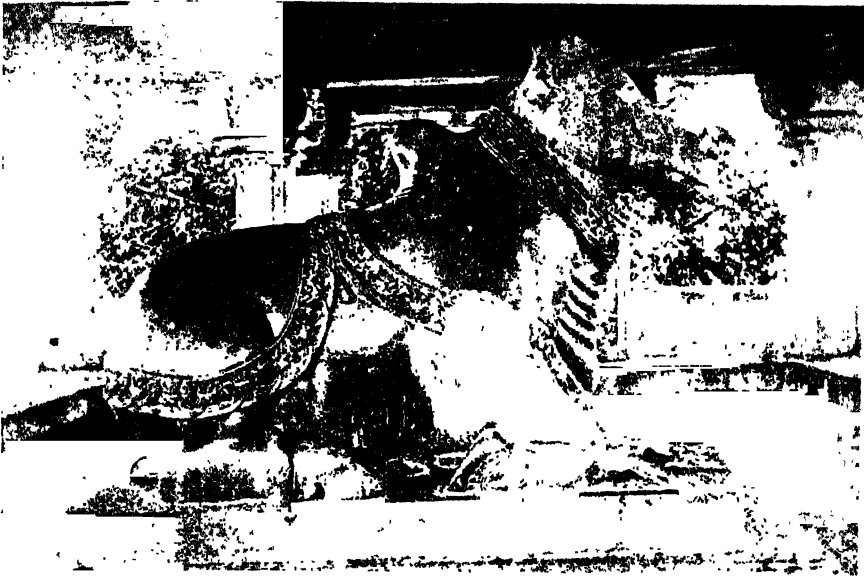
বৃষ-মূর্ত্তি

পার্ব্বতী মন্দির বলিয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারের উপরিস্থিত বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবীমূর্ত্তি ও তদুপরিস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতে অনেকে ইহাকে বিষ্ণু-মন্দির বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু দেবী মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও শিব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

চতুর্ভুজ মন্দির। এই মন্দিরটিকে কেহ রামচন্দ্র কেহ বা লক্ষ্মণ জীউর মন্দিরও বলে। মন্দিরটি আয়তনে ও গঠন-প্রণালীতে প্রায় বিশ্বনাথ-মন্দিরেরই সমান। মন্দির-গাত্র বহু মূর্ত্তি-পরিশোভিত। এই মন্দিরের ভিত্তির উপরিস্থিত তক্ষণ-কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়; বরাহ-শিকার, হস্তী ও ঘোড়ার মিছিল, যোদ্ধৃগণের মিছিল প্রভৃতি বহু চিত্রশোভিত। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ ও ত্রিমুখ—একটি মনুষ্যাকৃতি ও দুইটি নরসিংহাকৃতি। মন্দির-গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহা চান্দেলরাজ যশোধর্ম্ম দেবের পুত্র ধঙ্গ কর্ত্তৃক ৯৫৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত।

মৃতঙ্গ মহাদেও মন্দির এই মন্দিরটি "মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব মন্দির" নামেও অভিহিত হয়। মন্দিরটি চতুর্ভুজ-মন্দিরের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গটি ৮ ফুট উচ্চ ও ইহার পরিধি ৩ ফুট আট ইঞ্চি। এ মন্দিরটিও চতুর্ভুজ-মন্দিরের সামসময়িক। মন্দির-গাত্র চুণকাম করা, ইহাতে কোন শিল্প কার্য্য নাই।

বরাহ মন্দির। চতুর্ভুজ মন্দিরের পূর্ব্বে অবস্থিত এই মন্দিরটি ছোট কিন্তু মন্দিরমধ্যস্থ বরাহ-মূর্ত্তিটি বৃহৎ—দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ হস্ত পরিমিত ও প্রায় ৪ হাত উচ্চ। সিংহাসনের উপর একটি নাগ-মূর্ত্তি খোদিত আছে। নাগের ফণার উপর একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি উপবিষ্ট। বরাহের সর্ব্বাঙ্গে বহুমূর্ত্তি খোদিত আছে। কানিংহাম ইহার ৬৭৪টি গণনা করেন।

উত্তরের মণ্ডলী

এই মণ্ডলীর অধিকাংশেরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। কানিংহাম এগুলিকে হুয়েন সং বর্ণিত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের একটি "শতধারা" নামে পরিচিত।

বামন-মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় তিন হস্ত উচ্চ বামনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। গর্ভগৃহ-প্রবেশ-পথের উপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি শিবমূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-মূর্ত্তি অবস্থিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৪০ হস্ত ও প্রস্থে ২৬ হস্ত পরিমিত। মন্দির-গাত্রস্থ মূর্ত্তিগুলি পশ্চিমের

মৃতঙ্গ মহাদেও-মন্দির
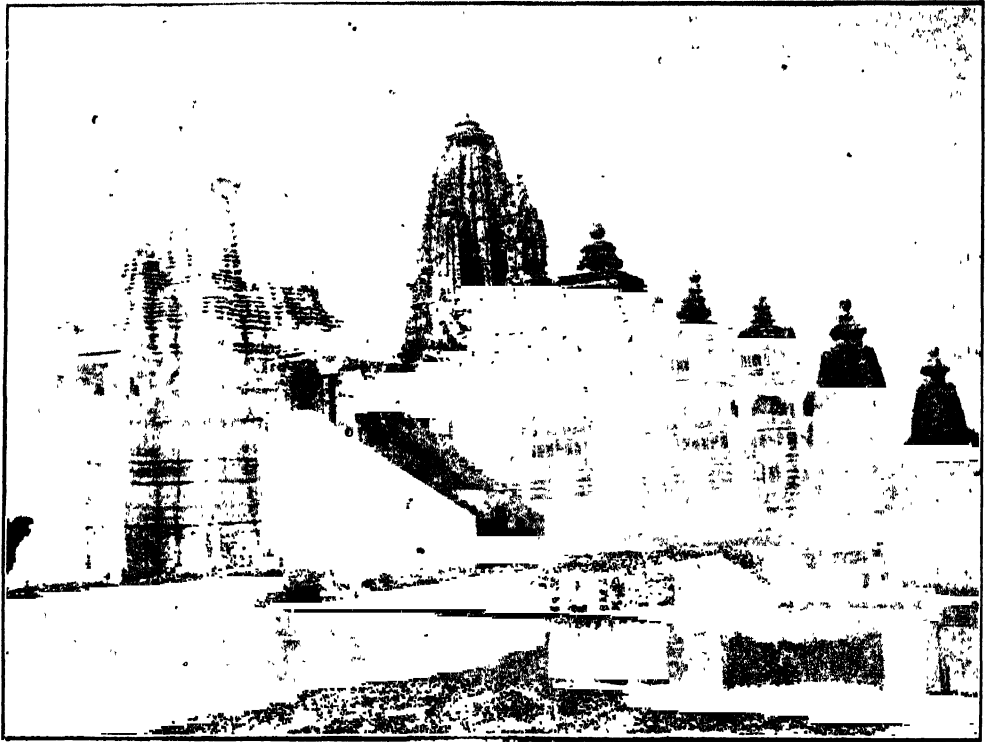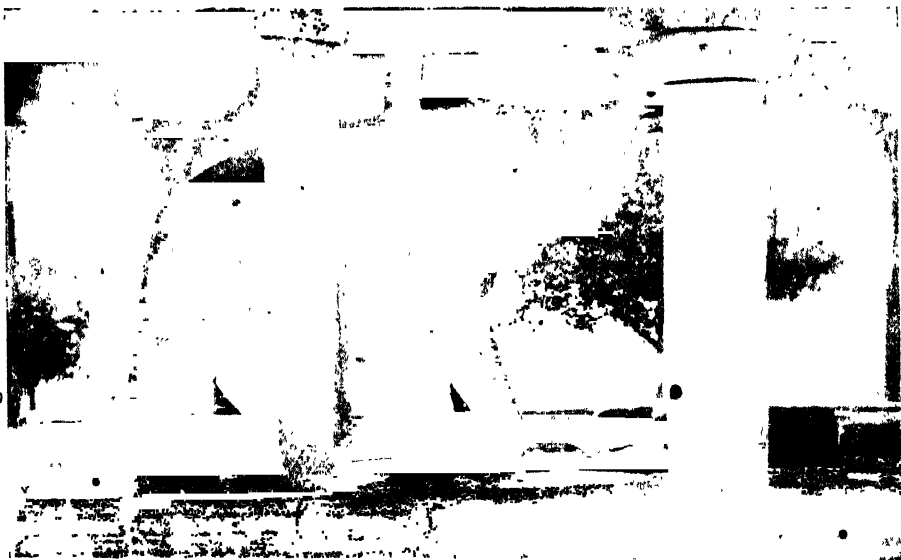
বরাহ-মন্দির
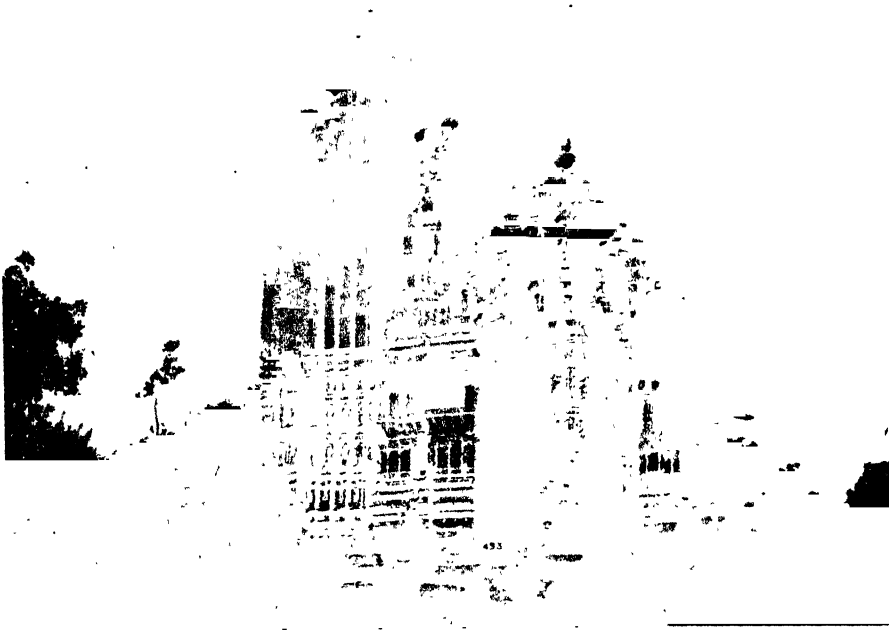
বামন-মন্দির

মণ্ডলীর মন্দিরের মত অধিক ও বিবিধ না হইলেও ইহাতে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত ৩০০শত মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইহাও দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্বের মণ্ডলী

এই মণ্ডলীর অধিকাংশই বৌদ্ধ ও জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

বামন-মন্দির-গাত্রস্থ মূর্ত্তি

গন্ধাই-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

গন্ধাই মন্দির। কানিংহামের সময় ইহার অবশিষ্ট স্তম্ভগুলি ও তত্পরিস্থিত ছাদমাত্র বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে আবার ছত্রপুর মহারাজ এ মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন। প্রবেশ-পথের মধ্যভাগে একটি চতুর্ভূজা দেবী-মূর্ত্তি বিদ্যমান—ইহাকে অনেকে বৌদ্ধগণের ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। একটি বড় মূর্ত্তির সিংহাসনের উপর "যে ধর্ম্মহেতু প্রভব" ইত্যাদি খোদিত দেখিয়া, ইহাকে বৌদ্ধ-মন্দির বলিয়াই অনুমান হয়।

পার্শ্বনাথ মন্দির। ইহা একটি পুরাতন ক্ষুদ্র মন্দির এক্ষণে জৈনগণের ব্যয়ে ইহার সংস্কার হইয়াছে। এই মন্দিরের যে টুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা আদি মন্দিরের গর্ভগৃহ বলিয়াই অনুমিত হয়। দ্বারের বামদিকে একটি উলঙ্গ পুরুষ মূর্ত্তি ও দক্ষিণে একটি নারী মূর্ত্তি ও মধ্যভাগে তিনটি উপবিষ্ট স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যস্থলে একটি উপবিষ্ট পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি হইতেই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে।

জিননাথ মন্দির। জৈনমন্দিরগুলির মধ্যে এইটিই বৃহত্তম—দৈর্ঘ্য ৪০ হস্ত ও প্রস্থ ২০ হস্ত। ইহা জৈনগণ কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত অবস্থায় রক্ষিত। গর্ভগৃহ-প্রবেশ-পথের চতুষ্পার্শে বহুমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। মন্দিরটি মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ-বিশিষ্ট। গর্ভগৃহ-প্রবেশ-পথের উপরি ভাগে একটি উপবিষ্ট উলঙ্গ মূর্ত্তি
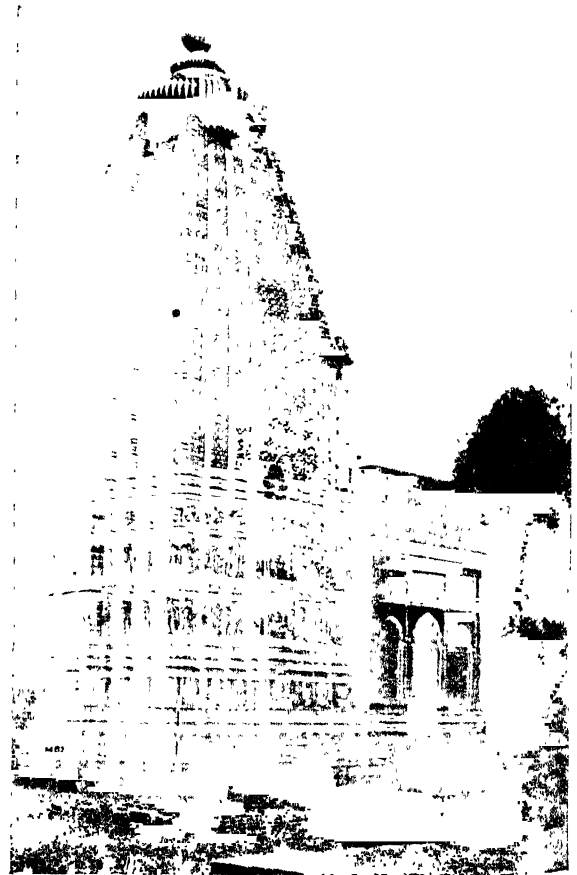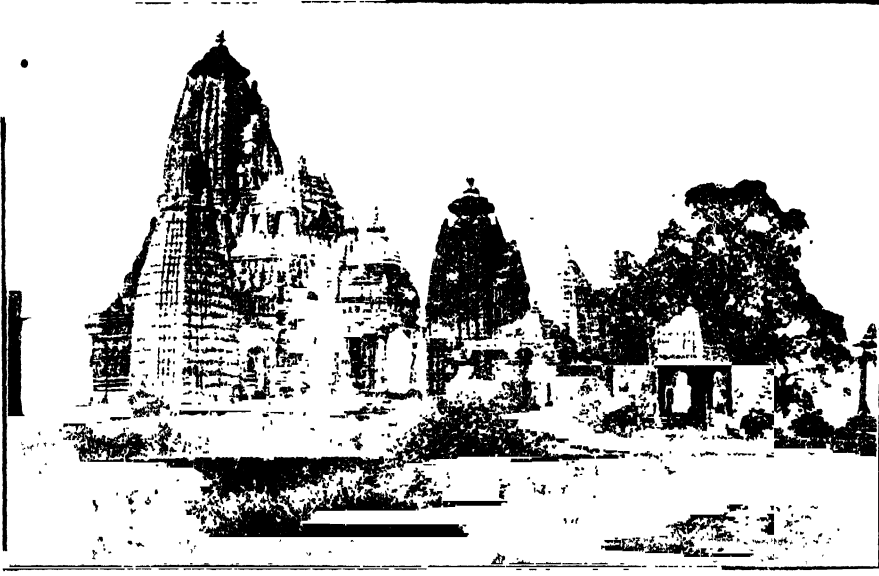
জিননাথের মন্দির

দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান দুইটি মূর্ত্তি আছে। সম্মুখেই টি সমুদ্রমন্থনের চিত্র। এই মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে মৃত বলিয়া অনুমিত হয়।

এখানকার অপর উল্লেখযোগ্য জৈনমন্দিরের মধ্যে ও সেটনাথ মন্দিরটি বৃহৎ নহে তথাপি ইহার মধ্যের সুবৃহৎ আদিনাথের মূর্ত্তিটি দ্রষ্টব্য। ইহা প্রায় ১০ হস্ত পরিমিত উচ্চ।

ইহার সন্নিকটেই আদিনাথের মন্দির। মন্দির-গাত্রে এক সারি পুত্তলিকা খোদিত আছে—ইহার কতক গুলি উলঙ্গ স্ত্রী-মূর্ত্তি।

জিননাথ-মন্দিরে অঙ্কিত মূর্ত্তি

endeavour and a loftier achievement that he was right, and that the World was wrong. It was a repetition of the story of Lord Byron whose earlier poems were condemned, and who retaliated with the might of a giant in his English Bards and Scotch Reviewers. Only Madhu Sudan retaliated in a noble manner; he did not abuse his critics, he convinced and silenced them by his success in a higher endeavour. * * * * *

All Bengal felt that a new light had dawned on the horizon of the nation's literature, that a genius of the first magnitude had appeared."

সাহিত্য রণাঙ্গনে উপরোক্ত প্রকারে মহাযুদ্ধে বিজয়-লাভ করিয়া, কাব্যরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ হইয়া, আমাদের মধু সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা ও কয়েকজন মনস্বীর মতামত লিপি-বদ্ধ করিতেছি।

ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া-নাট্যশালায় অভি-নয়ের নিমিত্ত তৎকাল-প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত রত্নাবলী নাটক কর্তৃপক্ষগণ মনোনীত করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও ইংরাজ-মহিলাদিগের বুঝিবার জন্য উক্ত নাটকের ইংরাজি অনুবাদের আবশ্যকতা হয়। "হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকাল হইতেই ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। ক্যাপ্টিভ লেডী হইতেই অনেকে মধুসূদনের ইংরাজি ভাষার উপর অসাধারণ অধিকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মধু-সূদনের নাম নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণের অবিদিত ছিল না।"

গৌরদাস বাবুর প্রস্তাবে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মধুসূদনের উপর রত্নাবলীর অনুবাদের ভার অর্পণ করিলেন। এই অনুবাদে সকলেই বিমোহিত হইলেন। তদানীন্তন সমস্ত ইংরাজি সংবাদপত্র এই অনুবাদের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ছোটলাট স্যর ফেডরিক হ্যালিডে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সমবেত সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ,—সকলেই সেই অনুবাদ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বাঙ্গালীবিদ্বেষী 'হরকরা'-সম্পাদক লিখিলেন—"এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজী রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙ্গালী নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া, আপনা আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে, অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবেন না।"

রাজা ৺প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

রত্নাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক সম্প্রতি লিখিয়াছেন—

"It is a masterpiece, if we may be allowed the expression, in the English language handled by a master-hand. The author whose name has now become a house-hold word among the Bengalees and who is known as the greatest of the Epic and Lyric poets in modern Bengali literature, and whose fame as a great genius resounds through the length and breadth of India, is no other than our dear Michael Madhusudan Dutta. * * Madhusudan could write with the

same facility and penmanship, and with the same poetic inspirations, English poems and dramas, as he did in the field of the Bengalee dramatic and epic literature."

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক বিরচিত হয়। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম নাটক। এই নাটক দেখিয়া সংস্কৃত পণ্ডিত-পুঙ্গবেরা কি গোলমালই না করিয়াছিলেন! মধুসূদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলে, তিনি তাঁহার পরিচিত কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উহা তাঁহাদের সভাপণ্ডিত বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "যে যে স্থলে নাটকখানির দোষ আছে, সেই সেই স্থলে

রাজা ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

তিনি যেন দাগ দিয়া দেন। তাঁহার দাগ দেওয়া হইলে, আপনি গ্রন্থখানি লইয়া আসিবেন।" ভদ্রলোকটি তর্কবাগীশের নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই কথা বলিয়া, গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে দিলেন। তর্কবাগীশ-মহাশয় গ্রন্থখানি কিয়ৎক্ষণ অবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া, ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "আপনি এখন যান, আমি কিছু পরে স্বয়ং গ্রন্থখানি লইয়া রাজাদিগের নিকট যাইতেছি।" ভদ্রলোকটি এই কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ-মহাশয় নাটকখানি লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে মধুসূদনও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিলেন—"আপনি আপত্তিকর স্থানসমূহে দাগ দিয়াছেন কি?" তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন—"দাগ দিতে গেলে কিছু থাক্‌বে না। তবে কি না—আমি যে চোখে দেখ্‌ছি, সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হ'য়ে গেলে, তোমার বই, খুব চ'লে যাবে, বাহবা বাহবা পড়্‌বে।"

মধুসূদনকে তাঁহার কোন কোন বন্ধু শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে তদানীন্তন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মধুসূদন তর্করত্নকে কেবল মাত্র নাটকের ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে বলেন; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে নাটকখানি সংস্কৃত রীত্যনুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পরামর্শ দেন। মধুসূদন এই প্রসঙ্গে গৌরদাস বাবুকে যে পত্র লেখেন, তাঁহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"I shall either stand or fall by myself."

* * * *

"You know that a man's style is the reflection of his mind and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self."

* * * *

"I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism? Byron's poetry for its

Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking*; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit."

* * * *

"In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit."

"Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old * * * in the shape of Pandits."

এতটা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর না থাকিলে কি মধুসূদন কখনও দুস্তর দুর্গম বাধাবিঘ্নসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া, স্বীয় লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারিতেন? কি বিষম বিঘ্ন, কি প্রচণ্ড বাধাই না তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! কিন্তু যে দীপ্তপ্রভা সহস্র রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া গগনমার্গে উদিত হইতেছে, ক্ষুদ্র করাঙ্গুলি প্রসারণে তাহার জ্যোতিরোধ করিতে কে কবে সমর্থ হইয়াছে?

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক মহা সমারোহে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। সেরূপ 'কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা' আর কখনও বঙ্গদেশে হইল না। স্বয়ং গবর্ণর স্যর ফেড্রিক হ্যালিডে মহোদয়, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ইংরাজরাজকর্ম্মচারী অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। * প্রত্যেক সাহেব ও বিবিকে এক একখানি মধুসূদন-কৃত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজী-অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। জনৈক বিশিষ্ট ইংরাজি সামরিক কর্ম্মচারী অভিনয়ান্তে রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "এই ইংরাজি নাটকের অনুবাদ কি অভিনীত হইল?" রাজা তাঁহাকে উহার বিপরীত বলিলে, সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অনুবাদ এত সুন্দর যে, আমি ইহাকে মূল গ্রন্থ বলিতে কুণ্ঠিত নহি।"

অভিনয় কালে হিন্দুকলেজের প্রবীণ শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র আনন্দে অর্দ্ধোন্মত্তভাবে মধুসূদনের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—

"Why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!'

৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র (পরে রাজা)

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র শর্ম্মিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক

* "The performances at Belgatchia were honoured by the elite of Calcutta Society, both European and Indian, and elicited the warmest plaudits of even such accomplished actors and fastidious critics as Mr. Clinger and Mr. James Hume."

"The following extract taken from a paper submitted in 1859 by the late Rev. J. Long to the Government of Bengal gives a correct account of Bengalee Dramatic Works of that period. * * The Sarmista Natak, by Michael Madhu Sudan Dutt, has been performed successfully on the stage, as have been the Ratnábali and the Sakuntalá."

—National Magazine, Vol. VI. 1892.

এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণজনগণে শর্ম্মিষ্ঠাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।"

মধুসূদন রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ও তাহার ইংরাজি অনুবাদ, এই তিনখানি গ্রন্থ অসীম কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাহাদুরকে উৎসর্গ করেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও গ্রন্থত্রয়ের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় ব্যতীত, মধুসূদন এই রাজভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে প্রচুর অর্থসাহায্যলাভ করিয়াছিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শর্ম্মিষ্ঠা নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হইয়া গেলে দর্শকবৃন্দ উৎকৃষ্ট প্রহসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। তখন বাঙ্গালায় অভিনয়োপযোগী আনন্দপ্রদ প্রহসন ছিল না। শর্ম্মিষ্ঠা রচনায় মধুসূদনের অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়া, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মধুসূদনকে প্রহসন রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার ফলে, মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনদ্বয় রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ'দুখানিও বঙ্গভাষার প্রথম সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রহসন এবং আজিও বাঙ্গালার সকল প্রহসনের অগ্রগণ্য। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদন শিক্ষিত পানদোষাশ্রিত নব্য যুবকের (Young-Bengal) অধঃপতন দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রহসনের মধ্যে এইখানিই প্রথম। একবার নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্রের সহিত সুপরিচিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহা এইরূপ ;—

"যুবক নবকুমার সুরাপানে বিভোর হইয়া, অধিক রাত্রে প্রত্যাগত হইয়া, নিজের শয়নগৃহে বড়ই উপদ্রব করিতেছেন, তাঁহার পত্নী ও ভগিনী বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে চুপ করাইতে পারিতেছেন না—ক্রমেই তাঁহার মত্ততা বৃদ্ধি হইতে লাগিল—

"পার্শ্বের ঘরে কর্ত্তা (নবকুমারের পিতা) ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে এবিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন না। নব নেশার ঘোরে অর্দ্ধ অচৈতন্য হইলে, তাঁহার মাতা ভীতা হইয়া, কন্যা প্রসন্নময়ীকে কর্ত্তাকে সত্বর ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কর্ত্তা কন্যার মুখে এ সংবাদ শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ভোজনত্যাগ করিয়া পুত্রের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, পুত্রের অবস্থা দেখিলেন ; তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া গৃহিণীকে ও পুত্রকে অশেষ ভর্ৎসনার পর বলিলেন, কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো ! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমক –

নব।—হিয়র, হিয়র— আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।"

নববাবুর উত্তরটি সম্বন্ধে গিরিশ বাবু বলিলেন যে, "এ কথাটা নব'র পিতার সম্মুখে বলাটা কি ঠিক হইয়াছে ? আমার বোধ হয় ঠিক হয় নাই।" দীনবন্ধু বাবু বলিলেন, "উহা এ স্থলে ঠিকই যুক্ত হইয়াছে ; নবর নেশাটা প্রায় কেটে এসেছে অথচ একবারেও কাটে নাই এবং ইতিপূর্ব্বে তাহাদের সভাতে 'resolution' 'second' ইত্যাদি শব্দ লইয়া আলোচনা হইয়াছিল, কাজেই কর্ত্তার প্রস্তাব শুনিবামাত্র ঐরূপ উক্তি তাহার মুখ হইতে স্বতঃই নির্গত হইয়াছিল ; ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মাইকেল বলিয়াই ওরূপ লিখিতে পারিয়াছিলেন।"

সহৃদয় গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধুর কথাটি বেশ করিয়া তলাইয়া দেখিয়া, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ; এবং শেষে ঐ পংক্তিটির এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রশংসা আর তাঁহার মুখে ধরিত না। আমরা তাঁহাকে এই কথা বলিয়া যথাতথা আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি—'মাইকেল কি খেয়েই ও কথাটা লিখেছিল ; আমরি মরি ! Hear ! Hear ! I second the resolution !'

উপরোক্ত 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনকে আদর্শ করিয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক প্রহসন 'সধবার একাদশী' রচনা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মধুসূদনকে একত্র 'তিলোত্তমা' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন ;—'It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tillottama."

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন—'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ,' বাহিরে গোঁড়া হিন্দু অথচ ভিতরে ভিতরে পশুবৎ লাম্পট্য-দোষে দূষিত এক বৃদ্ধের চিত্র লইয়া অঙ্কিত। চলিত ও ইতরশ্রেণীর মুসলমানদিগের গ্রাম্য কথায় মধুসূদন এই প্রহসনে অসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার ইংরাজী নাম—'The Silvered Rake!' বহুকাল হইতে এই প্রহসনের অভিনয় বঙ্গদেশে প্রচলিত। শুনিয়াছি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দী ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল।

নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদের পর হইতেই দীনবন্ধুর সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। উভয়ের মধ্যে সময় সময় সাহিত্যচর্চ্চাও হইত। একবার কোন সামাজিক বিষয় লইয়া একখানি গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, মধুসূদন দীনবন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়া ছিলেন ;—'Why don't you try your Roman hand ?'

একবার মধুসূদন ও দীনবন্ধু কৃষ্ণনগর হইতে প্রত্যাগমন-কালে অতি প্রত্যূষে হাঁসখালিতে নদী পার হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তখনও ভোরের ঘোর কাটে নাই—কাককোকিল সাড়া দেয় নাই। রজনীর শেষ অন্ধকার তখনও বনের ঝোপে ঝাপে, ঝাড়ে ঝোড়ে, লুকোচুরি খেলিতেছিল! মাঝি নৌকার ভিতর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দীনবন্ধু নৌকার নিকট তীরে দাড়াইয়া, তাঁহার স্বভাবসুলভ পরিহাসরসিক স্বরে মাঝিকে ডাকিতে লাগিলেন, 'ও বাবা মাঝি একবার ওঠ্, উঠে আমাদের পার ক'রে দিয়ে, আবার ঘুমুস।'—দীনবন্ধুর এইরূপ ধীরকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ডাকা সত্ত্বেও মাঝির কুম্ভকর্ণের নিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন মধুসূদন বলিলেন—'ওরূপ ভাবে ডাকিলে কি আর মাঝির সাড়া পাইবে! তিনি তৎক্ষণাৎ সাহেবী ঢংএ "OH! YOU", প্রভৃতি বাক্যে গুরুগম্ভীর স্বরে ডাকিবা মাত্রই মাঝির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া,

সেই ঘাটে খেয়া দিল তন্দ্রালু পাটুনী ;
ত্বরায় বাহিল নৌকা 'মধু'-স্বর শুনি।

মধুসূদন তদানীন্তন নাট্যকলানুরাগী যুবকবৃন্দকে তাঁহাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সতত উৎসাহ দিতেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেন। কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গীতশিক্ষক ও 'গীতসূত্রসার'-রচয়িতা স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত আলাপ করাইয়া দিবার সময় বলেন—'ইনি আমাদের লাইনে আছেন।' দীনবন্ধু বলিলেন 'ইনি কি Lawyer ?' মধুসূদন বলিলেন—'না হে না, ইনি একজন নাট্যকলাপ্রিয়—শর্ম্মিষ্ঠা-নাটকে শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় করিয়াছিলেন।' মহাকবি মধুসূদন য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর এই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনদ্বয় রচনা করিবার অব্যবহিত পরেই মধুসূদন গ্রীক-পুরাণের ছায়াবলম্বনে তাঁহার পদ্মাবতী নাটক রচনা করিলেন। "চীয়তে বালিশস্যাপি সংক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ"—"মুদ্রারাক্ষস" হইতে এই সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থের উপরিভাগে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা বাহাদুর)

যে নৃত্যগীতবহুলনাটকসমূহ বর্ত্তমান রঙ্গালয়সমূহে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে, পদ্মাবতী নাটকেই তাহার সূচনা।

সুদূর ভবিষ্যৎদর্শী মধুসূদন সেই অতীত যুগেই বুঝিয়াছিলেন যে, একদিন বঙ্গদেশের নাট্যশালা নৃত্যগীতে প্লাবিত হইয়া যাইবে।

মধুসূদন সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "আমি এমন গ্রন্থ রচনা করিব যে, প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।" এ গর্ব্বোক্তি সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে একদিন মধুর সন্ধ্যায় পাইক-পাড়ায় রাজাদিগের বেলগাছিয়ার নন্দননিন্দিত সুরম্য উদ্যানের সুন্দর বাটিকার (villa) নিম্নস্থ হলে সোফায় বসিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মধুসূদন বিশ্রম্ভালাপে নিরত ছিলেন। সে দিন রত্নাবলী নাটকের মহড়া (Rehearsal) হইবে। একে একে অভিনেতৃগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। উভয়ের কথোপকথনে নাট্যপ্রসঙ্গে মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন—"যতদিন না বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইবে, ততদিন বাঙ্গালা নাটকের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই।"

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "আমার বোধ হয় না যে, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তন সম্ভব ; আর আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ গঠন ও প্রকৃতি, তাহাতে অমিত্রচ্ছন্দের মহান্ গাম্ভীর্য্য ও সুললিত পদবিন্যাসের উপযোগী হইতে পারে না।" মধুসূদন বলিলেন, "এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারি না ; আমার মতে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত।"

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রহস্য করিয়া বলিলেন, "স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত কবিতাটা আপনার মনে আছে কি? এই বলিয়া যতীন্দ্রমোহন নিম্নলিখিত ব্যঙ্গ কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন ;—

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন—'বৃদ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রচ্ছন্দ লিখিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া, আর কেহ যে লিখিতে পারিবে না, ও কথা একটা যুক্তির মধ্যেই নহে।'

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, 'আমি যতদূর জানি, ফরাসী ভাষার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ও বিস্তৃত ভাষায়, অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ নাই। নিঃসন্দেহই সে ভাষা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। সে স্থলে বাঙ্গালাভাষা যে অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?'

মধুসূদন বলিলেন, 'আপনি যে বিস্মৃত হচ্ছেন, সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালাভাষার জননী, যাহার তুল্য সমৃদ্ধিশালিনী ভাষা আর নাই!'

যতীন্দ্রমোহন উত্তর দিলেন,'সে কথা সম্পূর্ণ সত্য ; যদিও বঙ্গভাষা বলশালিনী বীরপ্রসূতির গর্ভসম্ভূতা, তবুও এখনও তাঁহাকে নিতান্ত দুর্ব্বলা বলিয়াই অনুমিত হয়।"

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, 'যদি আমি আপনাকে অতি অল্পকালের মধ্যে আপনার ভ্রম বুঝাইতে না পারি ত আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন ; আর যদি আমি আপনাকে দেখাই যে, বাঙ্গালাভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য-রচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তা'হলে আপনি—'

যতীন্দ্রমোহন বাধা দিয়া বলিলেন, 'তা'হলে আমি আপনার গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব—আর সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিব।'

এ কথা শুনিবামাত্র মধুসূদন করতালি দিয়া বলিলেন—'হয়েছে আপনি দুইতিন দিনের মধ্যেই আমার নিকট হইতে অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কবিতার কিয়দংশ শুনিতে পাইবেন?'

প্রকৃতপক্ষেই উভয়ের এই তর্কবিতর্কের পর, তিন-চারি দিনের মধ্যেই মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ রচনা করিয়া পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-মহোদয়কে পাঠাইয়া দিলেন।

গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন কাব্যের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কবির রচনা-কৌশল, ছন্দের শিল্পনৈপুণ্য, কবিতার ভাব ও মাধুর্য্য (Sentiments and rich imageries of poetry) দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি সাগ্রহে ও সানন্দে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লইয়া একেবারে পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট ছুটিলেন। সেখানে সাহিত্য-রুচি কয়েকটি বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও উপস্থিত সকলেই উহা পাঠ করিয়া, একবাক্যে যতীন্দ্রমোহনের মতের পোষকতা করিলেন, এবং মধুসূদনের চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলবতী

হইয়াছে, তিনি যে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে পূর্ণরূপে সফল-কাম হইয়াছেন, সকলেই ইহার অনুমোদন করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে বেলগাছিয়া-ভবনে যতীন্দ্রমোহনের সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ হয়। মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্যসহকারে যতীন্দ্রমোহনের নিকট আসিয়া সজোরে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট বন্ধু-বর্গকে ঐরূপেই সম্ভাষণ করা তাঁহার প্রকৃতি ছিল। তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নমুনা-স্বরূপ যে অমিত্রাক্ষর কবিতা পাঠান হইয়াছিল, তাহা কেমন লাগিয়াছে?' সহৃদয় যতীন্দ্রমোহন উত্তর করিলেন, 'বাস্তবিকই তাহা অতি সুন্দর, অতি মনোমুগ্ধকর হইয়াছে; আপনি বাজী জিতিয়াছেন, আমি সরল অন্তঃকরণে আমার পরাজয় স্বীকার করিতেছি।'

মধুসূদন হাসিয়া কহিলেন, 'দুর্ব্বলা বাঙ্গালাভাষার শক্তি যে কতদূর, ইহা যে আমি আপনাকে বুঝাইতে পারিয়াছি, তাহাতেই যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি।' রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এক্ষণে যত শীঘ্র হয়, বন্ধুবর মাইকেল তাহার কাব্য সমাপ্ত করুন।'

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃতালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। এত শীঘ্র যে, তিনি সংস্কৃত কাব্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া শব্দরত্ন সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে এই বেলগাছিয়ার বাগানেই রত্নাবলী নাটকের মহড়ার সময়, মধুসূদন রত্নাবলী নাটককে অতি অকিঞ্চিৎকর নাটক বলিলে, তদীয় বন্ধু গৌরদাস বলিয়া-ছিলেন, 'ভাল নাটক পাইলে কি আর এখানা আমরা অভিনয় করিতাম!' উত্তরে মধুসূদন বলিয়াছিলেন, 'ভাল নাটক—আচ্ছা আমি রচনা করিব।" তখন মধুসূদনের কথায় কেহই আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই; কিন্তু সেই কথার ফলে মধুসূদন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া, সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে একদিন গৌরদাস বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তাঁহাকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, 'গৌর! গৌর! আমি রঘুবংশ শেষ করিয়াছি। হায়, এতদিন আমি কেন এই দেব-ভাষা অধ্যয়ন করি নাই! ইহাতে যে রত্নরাজী বিদ্যমান আছে, পৃথিবীর কোন ভাষাতেই তাহা নাই!'

অনেকের ধারণা যে, মধুসূদনের সংস্কৃত ভাষাতে তাদৃশ অভিজ্ঞতা ছিল না। এটি তাঁহাদের মহাভ্রম। হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়া, প্রথমে বিসপ্‌স্ কলেজে কুমার স্বামী-নামক একজন মান্দ্রাজী পণ্ডিতের নিকট কিছুদিন সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন; পরে মান্দ্রাজের সুদীর্ঘ প্রবাসে অন্যান্য ভাষা অধ্যয়নের সময় * তিনি প্রত্যহ প্রায় তিনঘণ্টাকাল তেলেগু ও সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। তৎপরে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া বীরভূম-ভেদিয়ানিবাসী পণ্ডিত ৺রামকুমার বিদ্যারত্নের নিকট রীতিমত সংস্কৃত কাব্য-সমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। আরও একটি বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট (সম্ভবতঃ ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ) কিছুদিন সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত রামকুমারের মুখে শুনিয়াছি যে, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, বিশ্বনাথ, প্রভৃতি বড় বড় কবি ও পণ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি মেঘদূত পড়িতে বড়ই ভাল-বাসিতেন। এই খণ্ডকাব্যখানি তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল যে, তখন (১৮৫৬—১৮৬১ খ্রীঃ) তিনি ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রুভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের উপরিভাগে সংস্কৃত শ্লোকগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; ইহা (Quotations) তাঁহার সংস্কৃতে একান্ত অনুরাগেরই পরিচায়ক।

উপরিউক্ত আলোচনার ফলে মধুসূদনের মধুময়ী লেখনী হইতে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রসূত হইল। প্রথমে এই কাব্যের দুই সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহের ৬ পর্ব্বে, ৬৪ খণ্ডে ১৭৮১ শকাব্দে শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশিত হয় (ইং ১৮৫৯ জুলাই); পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। সহৃদয় যতীন্দ্রমোহন মুদ্রাঙ্কণের সমগ্র ব্যয়-ভার বহন করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসে তিলোত্তমা মুদ্রিত হইয়াছিল। মহাকবি ভবভূতি, হোরেস

* মান্দ্রাজের অধ্যয়নের বৃত্তান্ত তাঁহার বন্ধুকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

"My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine: 6—8 Hebrew; 8—12 school; 12—2 Greek; 2—5 Telegu and Sanskrit; 5—7 Latin; 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers'?"

ও মিল্টন হইতে মধুসূদন যে তিনটি গর্ব্বিত শিরোবাক্য (Quotations) উদ্ধৃত করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিলোত্তমার প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার দুইটি বর্ত্তমান সংস্করণে নাই। আমরা পাঠকপাঠিকার কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত নিম্নে সেই শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত করিলাম।

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মমকোঽপি সমানধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"
—ভবভূতিঃ।

—"Neque te ut turba miretur, labores,
Contentus paucis lectoribus"—
—Horace.

"Fit audience find—tho' few."—
—Milton.

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে এই কাব্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তাহাতে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ;—

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন না, এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।"

মধুসূদনের ভবিষ্যৎবাণী কিরূপ সফল হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দেন। মহারাজা উহা সযত্নে বাঁধাইয়া পরমশ্রদ্ধার সহিত কবির চির-স্মৃতি-স্বরূপে নিজের লাইব্রেরীতে আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির কতকাংশ মধুসূদনের স্বহস্ত-লিখিত ও অপরাংশ তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিতের লিখিত। এই পাণ্ডুলিপির প্রতি স্বর্গীয় মহারাজের কি অনুরাগ ও যত্ন ছিল, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। তিনি একটি স্বতন্ত্র বাক্সের মধ্যে উহা চোখে চোখে রাখিতেন ; সদা-সর্ব্বদা পরম আনন্দের সহিত অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলী আগন্তুক ও বন্ধুবর্গকে দেখাইতেন ; কখনও হস্তান্তর করিতেন না। বিশেষ আত্মীয় বা বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কখন কখন পাণ্ডুলিপি লইয়া যাইতে দিতেন, কিন্তু দুই তিন দিনের অধিক রাখিবার যো ছিল না। পরলোকগত কবি-বন্ধুর প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান বর্ত্তমান সময়ে ত আদৌ পরিলক্ষিত হয় না।

মধুসূদন তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে উপহার দিতেছেন এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহা হস্তপ্রসারণ করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, এরূপ ভাবের একখানি ছায়াচিত্র (Photograph) তদানীন্তন ফটোগ্রাফার রিণেক কোম্পানী (Messrs. Rinecke and Co.) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। মধুসূদন যেন মাষ্টার ও যতীন্দ্রবাবু যেন ছাত্র, ছবির ভাবটি এরূপ হওয়াতে তাঁহারা উহা বাতিল করেন।

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়া, গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কিরূপ আনন্দিত হইয়া কবিকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল : —

"My dear Sir,

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own hand-writing! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a *Monument that marks a grand epoch in our literature*, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves, I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the Poet himself.

* * * *

'Praying sincerely that you may live long

to adorn the literature of our mother country with your inestimable contributions.

I remain, very sincerely, yours

22nd May, 60. J. M. Tagore.

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রথমে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের সমালোচনা করেন। তাঁহাদের ও অন্যান্য প্রবীণ সমালোচকগণের সমালোচনায় প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে মধুসূদনের রচনার সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু, রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লিখিয়াছিলেন,—"If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description; compared to it, what are "Lucent syrups tinct with cinnamon?"

মধুসূদনকেও তিনি লিখিয়াছিলেন,—"Your extra ordinary genius has enabled you to arrange your immense store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight mankind from generation to generation."

য়ুরোপে থাকিতে মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের পুনর্লিখন আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"এবে দিনমণি দেব দিবা অবসানে
গেলা চলি অস্তাচলে স্বর্ণচক্র রথে
মন্দগতি। নলিনীর মুখ শুকাইল,
দুরূহ বিরহকাল কাল সম দেখি
সম্মুখে, মুদিল আঁখি ভানুর ভামিনী;
সপত্নী ছায়ার সুখে দুখিনী হৃদয়ে।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্, আইল
তরুকুলরাজ কোলে, ভাসি চক্ষুজলে
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
কিম্বা দময়ন্তী যথা হায় কান্তহারা
অরণ্যে, আইল কাঁদি বিদর্ভ-ভবনে।
মৃদুহাসি শশাঙ্কের সঙ্গে নিশাদেবী
পরি তারাময় সীঁথি সীমন্তে সুন্দরী
উতরিলা; শৈলে সরে জলাশয়ে বনে
উজ্জ্বল চন্দ্রমা পশি কেলি আরম্ভিল।
ফুটিলা কুমুদী জলে, কুমুদ-বাসনা
চাঁদেরে আকাশে হেরি, শোভিল ধুতূরা
ধরি পূত বেশ স্থলে;—ধুতূরা কিঙ্করী
শঙ্করের তপস্বিনী, অলি, ফুলসখা,
না চুম্বয়ে কভু যার অধর তরাসে।
পরিমল বহি বায়ু বহিল সুস্বনে;
পড়িল শিশিরবিন্দু চেতায়ে চৌদিকে
প্রখর তপন-করে দগ্ধ ফুলফলে;
নূতন জীবন যেন পাই পাতা যত
নাচিল মর্ম্মরি সুখে বৃক্ষশাখা-দলে।
উতরিলা এবে নিদ্রা বিরাম-দায়িনী
স্বপ্নদেবী কুহকিনী স্বজনীরে লয়ে
সঙ্গে রঙ্গে। বসুমতী নিদ্রার চরণে
জীবকুল সহ নমি নীরব হইলা।"

অন্য এক স্থল হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল;—

"কোথায় পৌলমী সতী অনন্তযৌবনা
দেবেন্দ্র হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী
ত্রিদিব লোচনানন্দ—আয়তলোচনা
রূপসী! কোথায় কহ স্বর্ণ কল্প-তরু
কামদ বিধাতা যথা; যার পদতলে
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন সুপ্রবাহিণী কল কল রবে।
কোথা মূর্ত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্ত্তিমতী, নিত্য যায় সেবিত দেবেশে
সে দেববিভব সব কোথা কহ আজি
কোথা সে দেবমহিমা দেবী বীণাপাণি?"

বাস্তুভিটা

[শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

জমিদারের পাইক্ আসিয়া বলিল,—"খাঁসাহেব! বাবু তোমায় তলব ক'রেছে, একবার এখুনি যেতে হবে।"

জমিদারের ডাক বাথর খাঁ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; পাইকের সহিত মধু-গ্রামের জমিদার শশিভূষণ বাবুর কাছারীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে সে প্রশ্ন করিল,—"কেন গোলামের ডাক প'ড়েছে, জান সরদার?"

"ব'লতে লারনু!"—বলিয়া সর্দ্দার রঘুনাথ একটা বিড়ি ধরাইল। দেশলাইটা টেঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল,—"খাজনা-ফাজনা বাকি আছে বুঝি?"

বাথর বলিল, "কই—না ত' সর্দ্দার! খাজনা ত' আমি হাল সনের চোৎ-কিস্তি অবধি মিটিয়ে রেখেছি!"

"কে জানে বাপু, বড় লোকের কি যে কখন মর্জ্জি হয়, তা ত' বুঝতে পারি না।"—বলিয়া সে নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল।

অগত্যা বাথর খাঁও নীরবে চলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা শশীবাবুর কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরকার শ্রীকণ্ঠ বলিল,—"এই যে বাথর এসেছিস্! চ' তোকে বাবুর কাছে নিয়ে যাই।"

বাথরের মনে একটু ভয় হইল। আজ জমিদার স্বয়ং তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন সুতরাং ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুচ্ছ নহে। বাথর মনে মনে পীরের দরগায় মুরগী দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল; মনে মনে পীরের নিকট আপনার মঙ্গল কামনা করিয়া, সরকার ম'শায়ের পিছু পিছু কম্পিত পদে জমিদারের সদর-মহলে প্রবেশ করিল।

সরকার একস্থানে জুতাটা খুলিয়া রাখিয়া নগ্নপদে সন্তর্পণে অগ্রসর হইল।

ঘর জোড়া ফরাসের উপর বড় বড় তাকিয়া ফেলা ছিল; তাহার একটাতে হেলান দিয়া জমিদার-বাবু গড়গড়ার নল টানিতেছিলেন। সম্মুখে এবং পার্শ্বে কয়েকজন যোড়হস্তে দাঁড়াইয়াছিল ও একজন আমলা অনেকগুলা বালির কাগজ নাড়িয়া চাড়িয়া, জমিদার-বাবুকে কি একটা বুঝাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল। শ্রীকণ্ঠ নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল; অগত্যা বাথরকেও অপেক্ষা করিতে হইল।

পূর্ব্বোক্ত আমলা অনেকগুলা নজীর দেখাইয়া বলিল,—"হুজুর! হারাধন পাত্র এই তিন ছটাক জমি আজ দশ বচ্ছর ফাঁকি দিয়ে ভোগ ক'রে আসছে, কেউ তা ধ'র্ত্তে পারিনি!"

জমিদার-বাবু নলটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন; "হারাধনকে সদরে তলপ কর। আর মহিত বেটাকে ডেকে পাঠিয়ে এর কৈফেৎ চাও,—কেন সে দেখে না, বোসে ঘুমুবার জন্যে আমি তাকে মাইনে গুণি না। হারামজাদাকে বলবে, তার একমাসের মাইনে আমি জরিমানা ক'রলুম।"—তাঁহার দৃষ্টি হঠাৎ শ্রীকণ্ঠের উপর পড়িতেই তিনি বলিলেন,—"কিরে শ্রীকণ্ঠ, বাথর এল?"

শ্রীকণ্ঠ যুক্তকর মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল,—"আজ্ঞে, এয়েছে হুজুর!"

"কৈ সে ?"

বাথর একটু অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

জমিদার বাবু বলিলেন, "ওরে বাথর ! তুই ত' খালের পশ্চিম ধারের জায়গাটায় থাকিস্।"

"আজ্ঞে কর্ত্তা !"

"তা এ হ'য়েছে, তোকে ওখান থেকে উঠ্‌তে হবে ?"

"বল কিগো কর্ত্তা !"

"হ্যাঁ, ও জায়গাটায় আমার দরকার প'ড়েছে।"

"কিন্তু কর্ত্তা আমরা যে তিন পুরুষ ধ'রে ওখানে র'য়েচি !"

"তাই কি ? তোর ঘরের দাম পাবি।"

"না কর্ত্তা, তা হতি হবে না।"

শ্রীকণ্ঠ বলিল,—হতি হবে না কিরে ব্যাটা, হুজুরের নিজের দরকার !"

"তা ত' বুঝলুম কর্ত্তা, কিন্তু সেই বাপ পিত'ম থেকে যেখানে ভূমিষ্টি হ'য়েছে, সে জায়গা কি চট্ ক'রে ছাড়া যায় ?"

জমিদার বাবু এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—"পাজি ব্যাটার আস্পর্দ্ধা দেখেছ, আমার জমি আমার দরকারে পাব না ?"

বাথর কথা কহিল না।

শ্রীকণ্ঠ নিম্নস্বরে তাহাকে বলিল,—"মিথ্যে কর্ত্তার রাগ বাড়াসনি বাথর, চুপচাপ যা ন্যায্য দাম হয় নিয়ে চ'লে যা। কর্ত্তার যখন ঐ জমিটার ওপর ঝোঁক প'ড়েছে, তখন উনি ওটা নেবেনই ; তবে রাগালে এই হবে যে জমিটা ত' যাবেই উপরন্তু একপয়সাও পাবি না।"

বাথর জাতিতে পাঠান। মারপিটের ভয় সে কোন দিন রাখিত না—আজিও রাখিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না কর্ত্তা, তা আমি পারবনি। তোমার জমির দরকার হ'য়ে থাকে ত' নালিশ ক'রে আমায় উঠিও।"

জমিদার-বাবু দরিদ্র প্রজার এতটা সাহস কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না ; বলিলেন—"হারামজাদার যত বড় মুখ তত বড় কথা, পাজি বেটাকে থামে বেঁধে ঘা কতক জুতিয়ে দে ত !"

বাথর বলিল,—"কর্ত্তা, তোমার বাড়ী এসেছি, এখন সব ক'র্‌তে পার কিন্তু আমিও পাঠান বাচ্ছা। মায়ের দুধ অনর্থক খাইনি, এর শোধ আমি নিতে পারব ; যে ঠেঁয়ে জন্মেছি, সে ঠাঁই রাখবার জন্যে জান কবুল ক'রলুম, দেখি তুমি কেমন ক'রে খেদাও !"

রক্ত চক্ষে জমিদার বাবু হাঁকিলেন—"কৈ হ্যায় ?"

মুহূর্ত্তে দুইজন বলিষ্ঠ দ্বারবান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে জমিদার-বাবু বলিলেন,—"হারামজাদাকে থামে বেঁধে বিশ জুতি লাগাও।"

দ্বারবানদ্বয় বাথরকে ধরিয়া লইয়া গেল।

শ্রীকণ্ঠ তখনও দাঁড়াইয়াছিল। জমিদার-বাবু তাহাকে বলিলেন,—"যেমন ক'রে হয় এ হারামজাদাকে দু'দিনের ভেতর ভিটে-ছাড়া কর।"

"যাজ্ঞে, হুজুর মা বাপ, হুজুর যখন ব'লছেন, তখন জান দিয়েও আমি একাজ ক'রব।"

"হাঁ, মনে থাকে যেন, দু'দিনের ভেতর একায হাসিল হওয়া চাই-ই।"

"য্যাজ্ঞে !—" বলিয়া শ্রীকণ্ঠ বিদায় হইল।

জমিদার-বাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই মূর্খ বাথরের এত সাহস হয় কিসে ? হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কেহ যদি তাঁহাকে তাঁহার ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বলে, তবে সেটা কেমন হয় ? মনে হইতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বিলাস অন্ধ নয়ন মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইল, এই ক্ষুদ্র জমিটুকুর উপর কত গাঢ় তাঁহার মমতা ! চকিতের মত তাঁহার মন কোমল হইল ; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রিয়তমা রোসেনা বিবির কথা মনে পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল,—"আমাতে আর এই মূর্খ চাষাতে সমান ? আমার বাগান-বাড়ীর জন্য যে জমি দরকার, তার ওপর যদি ভগবানেরও লোভ থাকে, তবু তা আমায় নিতে হবে। আর ছোটলোকের আবার মায়া-মমতা কি ? তাদের যখন নিজের বল্‌তে কিছু নেই, তখন এ অনর্থক মায়া ক'রেই বা ফল কি ?"

হায় দরিদ্র !

(২)

বাথরের পত্নী দিলজান উঠান ঝাঁট দিয়া সবে মাত্র মুরগীর ঘরটা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এরূপ সময়ে টলিতে টলিতে বাথর ফিরিয়া আসিল।

দিলজান নীরবে তাহার ক্ষতগুলা বাঁধিয়া দিতে লাগিল

দিলজান সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। স্বামীর পদশব্দ পাইয়াই বলিয়া উঠিল—"কিরে মুনিব ডেকে—" তাহার কথা অর্দ্ধ-সমাপ্তই রহিয়া গেল, স্বামীর অঙ্গে ক্ষত চিহ্ন ও তাহা হইতে প্রবাহিত রক্তধারা দেখিয়া তাহার গলা শুখাইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি ঝাঁটা ফেলিয়া, সে স্বামীকে ধরিয়া, দাওয়ার উপর বসাইল, তাহার একখানা চেটাই আনিয়া বিছাইয়া দিয়া তাহাকে শুইতে বলিল। বাখর অত্যধিক রক্ত স্রাবে ক্লান্ত হইয়াছিল, দ্বিরুক্তি না করিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার ক্ষতগুলা জল দিয়া ধৌত করিতে করিতে দিলজান বলিল,—"তোর হ'ল কি ?"

কপালে হাত ঠেকাইয়া বাখর বলিল—"নসীব !"

দিলজান বুঝিল, বাখরের কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে ; সুতরাং সে আপনার দারুণ কৌতূহল আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার অবকাশ না দিয়া, নীরবে তাহার ক্ষতগুলা বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাখর একটু সুস্থ হইয়া বলিল,—"শয়তান বলে কি জানিস ? তার বাগানবাড়ীর জন্যে আমায় ভিটে ছেড়ে যেতে হবে !"

"তা তোকে মারলে কে ?"

"সেই শয়তানের হুকুমে রামসিং আর তেওয়ারী বেটা আমায় জুতো খুলে মারলে।"

"তুই কিছু বল্লি না ?"

"কি ব'লব ? আমি একা, তারা সেখানে পঞ্চাশটা ! শুধু খোদাকে বল্লুম,—দেখে যাও খোদা, গরীবের ওপর অত্যাচারটা ! এর কি কোন বিচার নেই ! জানি না, খোদার পায়ে কথাটা পৌছেচে কি না !"

দিলজান কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—"কাজ কি বাপু এখানে থেকে, আমরা ত মোটে দু'টো প্রাণী, যেথায় হ'ক থাকবো।"

"দিলজান ! তুই বলিস কি ? এর প্রতি মাটিটুকুতে যে আমার বাপ-পিত'মোর জীবনের কথা মাখান রয়েছে ;—আর

আমি তাদের ছাওয়াল হ'য়ে এক কথায় এ বেহেস্ত্ ছেড়ে যাব? কেন আমি কি জোয়ান নই, মায়েব দুধ কি খাইনি? বাপ-পিতোমর রক্ত কি গায়ে এত টুকুও নেই রে!"

"সব বুঝলুম, কিন্তু তুই ক'রবি কি বলত?"

"ক'রব কি? এই খানে মাটি নেব। জানি শয়তান বেটার সঙ্গে পারব না, তার লোক অনেক, কিন্তু তা ব'লে ত আমায় এখানে কেউ মরতে বাধা দিতে পারবে না।"

"তুই কি আত্মহত্যা করবি?"

"তা কেন? আগে চেষ্টা ক'রব, আমার ভিটে রক্ষে ক'রতে; তারপর না হয় সেই চেষ্টাতেই জান দেব।"

দিলজান দেখিল, স্বামীর মুখে একটা দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে আর কথা কহিল না। বাখরকে সে ভালই বুঝিত;—বুঝিত একবার সে যাহা করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে দুনিয়ার কেহই বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

কাজেই সে উঠিয়া গিয়া একবাটী ফেন ও খানিকটা লবণ লইয়া আসিয়া স্বামীকে খাওয়াইল; তাহার পর বলিল,—"তুই একটু ঘুমো, আমি ঘরের কাজ গুলো সেরে নি।"

দিলজান চলিয়া গেলে বাখর একটু নিদ্রা যাইবার প্রয়াস পাইল কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। মন তাহার কেবলি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল,—"দুনিয়ায় এত অত্যাচার, এ রদ করবার কেউ নেই! দুনিয়ার মালেক খোদাও তাই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে দেখছেন! হা নসীব! আজ আমি গরীব ব'লেই না শয়তানটা আমায় এমন ক'রে জব্দ ক'রে দিলে! আমার হ'য়ে লড়বার, আমার হ'য়ে কথা কয়বার কেউ নেই ব'লেই না! দুনিয়ায় কি গরীবের কেউ নেই—কেউ না?—কেউ না?"

তাহার পর যখন তাহার উত্তেজনাটা একটু কমিয়া আসিল, তখন তাহার মনে হইল, এই বাস্তুভিটারই কথা। সেই তাহার দাদার আমল, তখন তাহারা এইখানেই ছিল, অবস্থাও বেশ ভাল ছিল; তাহার পর তাহার অলস পিতার দোষে একটু একটু করিয়া তাহারা দারিদ্রতার অসীম গহ্বরে নামিয়া পড়িল। কিন্তু সেই বালাটা! আঃ কি মধুর সে দিনগুলা তাহার কাটিয়াছে! এই মাটির উপরই সে প্রথম হামাগুড়ি দেয়, তাহার পর ছোট ছোট পা ফেলিয়া টলিয়া টলিয়া চলা, তাহার পর স্থিরপদে প্রথম দাঁড়ান, সবই এই মাটিতে হইয়াছে, আর আজ কিনা এই মাটি ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে! কখনই না!

হাত বাড়াইয়া সে দাওয়ার মাটি স্পর্শ করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল,—"দাদার মাটি, মাটি, আমার মাটি! তোকে ছেড়ে বেহেস্তে গিয়েও আমি সুখ পাব না!"—হাতটা তুলিয়া সে মাথায় ঠেকাইল। সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ বুজিল। তাহার পর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে জানে না।

(৩)

সেদিন রাত্রিতে ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় দিলজানের একটুও নিদ্রা হয় নাই।

গভীর রাত্রিকালে সে ঘরের পার্শ্বে যেন দুই তিন জন লোকের চলা ফেরার শব্দ পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। ভাল করিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল, হাঁ তাহাই বটে!

সে বাখরকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল—"ওরে ওঠ, লোক লেগেছে।"

বাখর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, —"আমার লাঠি?"

দিলজান তাহার হাতে লাঠিটা তুলিয়া দিল। বাখর নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিল।

বাহিরে বিরাট অন্ধকার। উপরে শুধু অসংখ্য তারার ম্লান জ্যোতিঃ সেই অন্ধকার নাশ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল।

ভাল করিয়া দেখিয়া বাখর দেখিল, অদূরে তিনটা লোক প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একজনের হাতে একটা দীর্ঘাকৃতি কি রহিয়াছে।

সাবধানে বাখর দাওয়া হইতে নামিয়া চালের ছাঁচতলে দাঁড়াইল।

লোক তিনটা কি পরামর্শ করিল। তাহার পর একটা লোক বাখরের শয়ন-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। রুদ্ধশ্বাসে বাখর তাহার কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

লোকটা অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল,—"ওরে দেশলাইটা।"

একটা লোক অগ্রসর হইয়া, কি একটা তাহার হস্তে দিল। বাথর কম্পিত বক্ষে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, অগ্রগামী লোকটার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর দৃঢ়-মুষ্টিতে লাঠিটা দুইহস্তে চাপিয়া ধরিল।

অগ্রবর্ত্তী লোকটা একটা দেশলাই জ্বালিয়া হস্তস্থিত দীর্ঘাকৃতি মশালটা ধরাইয়া মটকায় আগুন ধরাইতে ব্যস্ত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত বিকৃতকণ্ঠে বাথর চীৎকার করিয়া উঠিল,—"জানটা রেখে যাও দাদা!"—কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তস্থিত লাঠিটা প্রচণ্ড বেগে লোকটার মাথায় পড়িল।

"বাপ্"—বলিয়া লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে আর দুইজন আসিয়া বাথরকে ঘেরিয়া ফেলিল। বাথর প্রাণপণ বলে লাঠি চালাইতে লাগিল। বিপুল উত্তেজনায় তাহার ক্ষত মুখগুলা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার চক্ষে দুনিয়া অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, পায়ের তলে পৃথিবীটা যেন কুমারের চাকার মত ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে আর পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির উপর বসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের দুর্বৃত্ত পাইকদ্বয় তাহাকে প্রহার করিল। বেচারা মাতালের মত টলিলে টলিতে শুইয়া পড়িল। ক্রমে একটু একটু করিয়া একটা বিরাট মসীরাশি তাহার সম্মুখের সমস্ত দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল। বেচারা শ্রম ও আঘাতের যন্ত্রণায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

* * * *

বাথর যখন চোখ চাহিল, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্মিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিল, পূর্ব্ব-রাত্রির ঘটনা তাহার একটুও মনে ছিল না। সহজ অবস্থার মত

আমার বেহেস্তের উপর পড়ে গেছলুম ?

সে উঠিয়া বসিতে চাহিল। কিন্তু পারিল না, বিপুল বেদনায় সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। পার্শ্বে দিলজান ও এলামৎ ছিল, তাহারা তাহাকে উঠিতে দিল না।

এলামৎ দিলজানের ভগিনীপতি। বাথর তাহাকে আপন শয্যাপার্শ্বে দেখিয়া বিস্মিত হইল। ঘরটার চারিদিকে একবার চাহিতেই সে বুঝিতে পারিল, এ ঘর তাহার নহে! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

দিলজানের দিকে চাহিয়া বাথর প্রশ্ন করিল,—"এ আমি কোথায়?"

এলামৎ বলিল—"এ যে ভাই আমার বাড়ী!"

বিস্মিত ভাবে বাথর বলিল,—"তোমার বাড়ী—কেন?"

দিলজান বলিল,"আমাদের বাড়ী যে পুড়িয়ে দিয়েছেরে!"

"পুড়িয়ে দিয়েছে ?—এঁ্যা, দিলজান, আমাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে ? কে রে ? আমি কি তখন মরে ছিলুম ? আমার ঘর—আমার ভিটে অন্য লোকে এসে পুড়িয়ে দিয়ে গেল, আর তুই তাকে কিছু বল্লি না ?—আমাকেও একবার খবর দিলি না ?"

"তোর কিছু মনে নেই বাখর, তুই ত' তাদের বাধা দিতে গিয়েই এমন জখম হয়েছিস্ !"

"আমি ?–ওঃ ! মনে হয়েছে—এ সেই শয়তানের কাজ ! আমার আর কি হয়েছিল রে !"

"তুই লাঠি খেয়ে প'ড়ে গেছলি।"

"প'ড়ে গেছলুম ? সেই আমার ভিটে,—আমার বেহেস্তের ওপর প'ড়ে গেছলুম ? মরিনি !—এঁ্যা খোদা, তুমিও বাদ সাধলে ?—মরতেও দিলে না আমায় সেই মাটি কামড়ে মরতেও দিলে না আমায় ! হা নসিব ! কেন আমায় এখানে নিয়ে এলি দিলজান ? সেই খানেই আমায় মাটি চাপা দিলি না কেন ? জানিস্ না তুই, সে মাটির ওপর আমার কত দরদ—এই কল্‌জেটা ফেটে যাচ্ছে,দিলজান ! কি ব'লব, দেখাবার নয়, তা নইলে ক'লজে ছিঁড়ে দেখাতুম—সেখানে কি আগুন জলচে ! আমার ভিটের ওপর শয়তানটা হেসে খেলে দিন কাটাবে,তাই দেখার জন্য এখনও আমি বেঁচে রইলুম !—হা খোদা ! আমি যাব—না না—ওরে তোরা বাধা দিস্‌নি—আমি যাব। সেই আমার মাটি—আমার মা—টি—" উত্তেজিত ভাবে উঠিতে গিয়া বাখর ঘুরিয়া পড়িল, মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল। তাহার পর—তাহার পর সব ঠাণ্ডা !

ফলগুতীরে বিষ্ণুমন্দির—গয়া
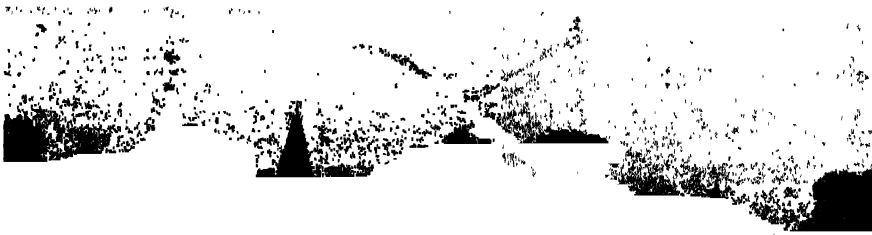
সংস্কৃত-সাহিত্যে ট্রাজেডী *

[শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. কাব্যতীর্থ]

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গিরিজায়ার মুখে গাইয়াছেন :—

"ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে!
কিন্তু,—গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টকতরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, সুখের নেশার চমক সত্যের সঙ্ঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়ই। তখন হাল্কা হাসির ফোয়ারা শুকাইয়া আসে—পৃথিবীর সুন্দর পদার্থনিচয়ের উপর আশার অরুণ আভার পরিবর্ত্তে নিরুৎসাহের পাণ্ডুরতা অধিকার করে। স্ফূর্ত্তির স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়—বিষাদের জড়তা জীবনকে বিড়ম্বিত করে। অনিষ্ট যখন নানামুখে আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসে, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমোহন দ্বিধায় নির্যাতিত হই—প্রত্যাগমনের পথ রুদ্ধ, সম্মুখে প্রতিকূল দৈব—এইরূপ উৎকট-কোটিক সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া ফলে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকি। জীবনে ইহা একটি অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু যৌবনের মলয় হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া, সুখের পতাকা উড়াইয়া, জীবন-তরণী যখন প্রথম সংসার সাগরের বক্ষে ভাসে—তখন আত্মবিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক। তৎকালে প্রমত্ত মানব-মনকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই বোধ করি—সাহিত্যের সনাতন অবয়বের মাঝে দুঃখের বেদনা স্থান পাইয়াছে—তাই Tragedy কাব্যের এক প্রধান বিভাগ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ এই ট্রাজেডী বা বিয়োগান্ত নাটকের উপর খড়্গহস্ত বলিয়া একটি ধারণা সচরাচর প্রচলিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানাবিষয়ক দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে superstition বা অন্ধ-বিশ্বাস এখনও শিক্ষিত সমাজকে আক্রমণ করিয়া কাছে—এ ধারণা তাহারই অন্তর্গত, অথবা ইহার মূলে কোন সত্য আছে—তাহার আলোচনা আবশ্যক। দৃশ্যকাব্যে করুণরসের অবতারণাই যদি ট্রাজেডীর লক্ষণ হয়—তাহা হইলে অলঙ্কার শাস্ত্রে উহা মোটেই নিষিদ্ধ হয় নাই—বলা যাইতে পারে! দশ-রূপকের প্রধান ভেদ নাটক—তাহার লক্ষণে সাহিত্যদর্পণকার বলেন—

"এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যো নির্ব্বহণেঽদ্ভুতঃ॥'

মুখ্যভাবে না হউক গৌণভাবে সকল রসের আলোড়ন কাব্যের বৈচিত্র্যবিধানের অপরিহার্য্য উপকরণ। নাটক যদি সংসার-নাটকের প্রতিচ্ছবি হইতে চায়, তবে সুখদুঃখ, হাস্যক্রন্দন, মহত্ত্ব ও ভণ্ডতার অপূর্ব্ব সমাবেশ এই জীবনের

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত স্মৃতি-পুস্তকাগারের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সকল দিক্ হইতে ফুটিয়া উঠিবে। প্রতিবাদী বলিবেন—কিন্তু প্রধান রস ত বীর ও আদি ভিন্ন হইতে পারে না। তাহার উত্তর ইহাই যে, উক্ত কারিকায় অঙ্গী রসের যে নির্দ্দেশ, তাহা নিদর্শক বা illustrative মাত্র—নিঃশেষক বা exhaustive নহে। বোম্বাই সংস্করণের টীকাকার দুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদী উদ্ধৃত শ্লোকের টিপ্পনীতে ইহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। আদি ও বীর রস ভিন্ন অন্য রসও যে নাটকের উপজীব্য হইতে পারে—তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ, আমাদের ধারণায়, উত্তররাম-চরিত। অলঙ্কারশাস্ত্রের আক্ষরিক মর্ম্মের সহিত বিরোধ হইবে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মনে হয়, এখানে স্থায়িভাব করুণ। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম ক্ষণ হইতে এ যাবৎ পতিপত্নীতে যদি একাত্মতা কভু ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা রামচন্দ্র ও জানকীতে। পতিলীন-প্রাণা সতী ও পত্নী-প্রেমিক ভর্ত্তা—এ দু'য়ে মিলিয়া হিন্দু-গার্হস্থ্যের এক অপূর্ব্ব আদর্শ এই দিব্য মানব-যুগলেই চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে;—তাই আজও হিন্দুকুশ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত হিন্দু গৃহীর পঞ্চম বেদ রামায়ণ। যখন কুলোকের কুকথায় এই মিলনের মাঝখানে বিচ্ছেদের করাল ছায়া পড়িল, তখন অন্যান্য-নির্ভর সেই হৃদয়যুগল হইতে যে মর্ম্ম-স্পর্শী কালজয়ী করুণার পূতপ্রবাহ বহিল, ভবভূতি তাহাকেই কাব্যের ভাগীরথ-খাতে আবদ্ধ করিয়া, চিরদিনের জন্য রক্ষা করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, উত্তরচরিতের অবসান ভবভূতিকল্পিত রাম-সীতার মিলনে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে ইহা গতানুগতিক ব্যতীত আর কিছু ধারণা হয় না। প্রথমতঃ এই মিলনের কাহিনী পুরাণাদিতে সমর্থিত নহে—কবির উদ্ভাবন মাত্র। অধিকন্তু ছায়া-নামক অঙ্কের অভিনয়ান্তে এই মিলনে চমৎকারিতা বোধ হয় না। এই প্রসিদ্ধ তৃতীয় অঙ্কে মনুষ্যহৃদয়ের চিরানুভূত বিয়োগব্যথা মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। গৌরী বা সাহানার এই করুণতম ঝঙ্কার সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করে—দুঃখের এই অতল রত্নাকরে আমরা ডুবিয়া থাকিতে চাই—মামুলী-ধরণের পতিপত্নী-সমাগমের চিত্র ইহার পর আর আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। নাটক ভিন্ন রূপকের অন্যান্য ভেদে যে কোন রসই প্রধান হইতে পারে। তাই বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে, ব্যায়োগে—

"হাস্যশৃঙ্গারশান্তেভ্য ইতরেঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ।"

"এইরূপ 'ডিমে' রৌদ্র-প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উৎসৃষ্টিকাঙ্কের লক্ষণ অনেকটা ট্রাজেডীর অনুরূপ। ইহাতে "নেতারঃ প্রাকৃতাঃ নরাঃ"—

"রসোঽত্র করুণঃ স্থায়ী বহুস্ত্রীপরিদেবিতং
প্রখ্যাতমিতিবৃত্তঞ্চ কবিবুর্দ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ।
ভাণবৎসন্ধিবৃত্ত্যঙ্গান্যস্মিঞ্জয়পরাজয়ৌ
যুদ্ধঞ্চ বাচা কর্ত্তব্যং নির্বেদবচনং বহু॥"

অতএব ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, রসের মানদণ্ডে যদি বিচার করিতে হয়—তাহা হইলে ট্রাজেডী নির্ব্বাসিত হয় না।

একথা স্বীকার্য্য যে, বধ, যুদ্ধ ও রাজ্য দেশাদি-বিপ্লব প্রত্যক্ষ অভিনয়ে নিষিদ্ধ—কিন্তু এ সকলও প্রবেশকাদি দ্বারা সূচিত হইতে পারে। ইহাদের প্রত্যক্ষ-নির্দ্দেশ শ্লীলতার ব্যতিক্রম-বা improprieties বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু একটি বিধি ট্রাজেডীর মূলে আঘাত করে বলিয়া স্পষ্ট মনে হয়।

দশরূপকার ধনঞ্জয় পণ্ডিত বলেন, "নাধিকারিরধং-কাপি"—অধিকৃতনায়কবধং প্রবেশকাদিনাপি ন সূচয়েৎ। অথচ দ্রষ্টার সহানুভূতির অবলম্বন—নাট্যবস্তুর কেন্দ্রস্থল—নায়কের কোনরূপ বিপৎপাত হইতেই—করুণরসের উদ্ভব এবং তাহাতেই ট্রাজেডীর লয়। এই জন্যই বোধ করি, ট্রাজেডী সংস্কৃত সাহিত্যে নিষিদ্ধ, এই মত প্রচারিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে দুঃখাবসান নাটক একেবারে বর্জ্জিত না হইলেও যে বিরল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে উৎসৃষ্টিকাঙ্কের দৃষ্টান্ত হিসাবে একমাত্র "শর্ম্মিষ্ঠা যযাতি"র উল্লেখ করিয়াছেন। Rice সাহেবের মহীশূরদেশীয় হস্তলিখিত পুঁথির তালিকায় উক্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। M. Schuylerএর ১৯০৬ সালে সংগৃহীত নির্ঘণ্ট হইতে আমরা পঞ্চশতাধিক সংস্কৃত নাটকের উপস্থিত অস্তিত্বের বিষয় জ্ঞাত হই। কিন্তু তন্মধ্যে কয়খানি পাশ্চাত্য Tragedy'র লক্ষণের সহিত মিলে - তাহার নির্ণয় করা উপভোগ্য চেষ্টা হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রচলিত গ্রন্থের কোন খানির সহিত উহার সঙ্গতি হয় না। আবার সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের গ্রন্থই অপেক্ষা এই বিভাগের গ্রন্থই কালবশে অধিকতর নষ্ট হইয়াছে—তাহা মনে করাও অযৌক্তিক। তবে এস্থলে প্রাচীন পুস্তক-তালিকার সহিত যেরূপ পরিচয়

অশোক-তরুতলে প্রতীক্ষমাণা বৈদেহী

শিল্পী শ্রীবীরেশ্বর সেন

থাকিলে চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব, তাহা লাভ করিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। তবে এ সকল বিষয়ে আলঙ্কারিকগণের ঐকমত্য ও ঐ জাতীয় গ্রন্থের বিরলতা দেখিয়া—ফলে ইহাই মনে হয় যে, হিন্দুপ্রতিভা সংসারের দুঃখবহুল দিকটাকে দৃশ্যকাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে অনিচ্ছুক। অনিচ্ছুক, ইহার অর্থ অপারক নহে। অথবা ইহাও বুঝায় না যে, হিন্দু, সংসারের দুঃখের মাত্রা যথাযথ উপলব্ধি করে নাই। "কর্ম্মকথা" গ্রন্থে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয় বলেন—"মহাভারত এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি। আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের ইতিহাসও এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি; তাহাতেই ভারতবর্ষে মহাভারতের উৎপত্তির বুঝি সার্থকতা।" ভারতের আদি মহাপুরাণ, রামায়ণও এক ট্রাজেডী। তাই মনে হয়, এদেশে ভূমিষ্ঠ হইয়াই বাণীদেবী যে ক্রন্দনের স্বর তুলিলেন—রামায়ণ সেই করুণগাথা। এদিকে দুঃখত্রয়াভিঘাতের উপায় চিন্তা হইতে দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি—এই দর্শনশাস্ত্রের বিস্তৃত ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা হইতে আর্য্যাবর্ত্তবাসীর মনে দুঃখের বর্দ্ধিতায়তন সহজেই অনুমেয়।

তবে ট্রাজেডীর প্রতি প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তবাসীর অবহেলার কারণ কি, তাহা এখন বিবেচ্য। Ward সাহেব বলিতেছেন—In accordance with the childlike element of their character the Hindus dislike an unhappy ending to any story and a positive rule accordingly prohibits fatal conclusion in their dramas.

উদ্ধৃত মতে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে হইবে; প্রথমতঃ অলঙ্কারের প্রভাব ট্রাজেডীর প্রতি হিন্দু নাট্যকারদিগের বিরূপতার কারণ কি না; এবং দ্বিতীয়তঃ childlike element of the Hindu character, ইহাই এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা কি না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বা সমালোচক স্বদেশের অবস্থা-পরম্পরার বিশ্লেষণ করিয়া, যখন কোন সত্যে উপনীত হন, প্রথমতঃ সেইরূপ সত্যকে তাঁহারা সার্ব্বজনীন—সর্ব্বত্র প্রযোজ্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের উদারতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে—নিঃসন্দেহ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের—বিশেষতঃ প্রাচ্যদেশের সম্বন্ধে তদনুরূপ বিষয়ের আলোচনাকালে ঐ সকল পণ্ডিতই অনেক সময়ে বিপরীত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

Ward সাহেব সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্যোন্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে—

"The multitude of technical terms and formulae which has gathered round the practice of the most living and the most Protean of arts has at no time seriously interfered with the operation of creative power. On the other hand no dramaturgic theory has ever succeeded in giving rise *to a single* dramatic work of enduring value, unless the creative power was there to re-animate the form."

অলঙ্কারের নিয়মকে ভিত্তি করিয়া, শাস্ত্রের কারিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, নাট্যকার কখনও গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। বরং কবি-প্রতিভা সময়ে সময়ে অলঙ্কারের বিধানের উপর নির্ভর করে নাই—তাহা প্রমাণের বিষয়। তাই মনে হয়, এদেশেও যদি কোন শক্তিমান্ পুরুষ সহৃদয়হৃদয়কে হরণ করিয়া পাশ্চাত্য ট্রাজেডীর অনুরূপ নাটকের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন—তাহা হইলে আলঙ্কারিকের শত নিদেশ তাহার নির্ব্বাসনে কৃতকার্য্য হইত না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের এই সীমার কথা অবগত ছিলেন না, তাহা নহে। চতুঃষষ্ঠিবিধ অঙ্গের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত ক্রমান্বয়ে উল্লেখের পর বিশ্বনাথ বলিতেছেন—

"রস ব্যক্তিমপেক্ষ্যৈষাং অঙ্গানাং সন্নিবেশনং।
নতু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসংপাদনেচ্ছয়া॥"

অতএব ট্রাজেডীর বিরলপ্রচার একমাত্র অলঙ্কারের বিধি-নিষেধের ফল—একথা মানিয়া লইতে পারি না। ইহার কারণ হিন্দুজাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত জড়িত—তাহার নৈতিক চিন্তা ও আচারের বিশেষত্ব—তাহার Ethics এ নিহিত। এই কর্ম্মমতের বিশেষত্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট Ethicsকে childlike element of their character বলিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া সুবিধাজনক হইতে পারে—কিন্তু সত্যানুগত নহে।

ট্রাজেডীর প্রতিষেধক এইরূপ জাতীয় প্রবণতার প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য দেশে এ জাতীয় নাটকের স্বরূপ কি, তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। Aristotle বলিয়া গিয়াছেন যে, আতঙ্ক ও করুণারূপ বৃত্তিদ্বয়ের সাহায্যে মনুষ্যহৃদয়ের বিশুদ্ধিসাধনই ট্রাজেডীর কার্য্য। গ্রীস দেশে প্রথম প্রবর্ত্তন হইতে আজ পর্য্যন্ত Tragedy একটা বিরোধের কাহিনীই গাহিয়া আসিতেছে। সে বিরোধের এক পক্ষ মানব—প্রতিপক্ষ মানুষের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রত্যবায়সকল। চিরদিন নিয়তির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ ইহাই যে, আমরা নিক্তির ওজনে "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল" পাই না। তিল পরিমাণ দোষের কারণ, কখনও বা সামান্য অজ্ঞান বা অসাবধানতার জন্য আমরা নির্বিচারে অসহ্য দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকি। এই দণ্ডের মাত্রা নিরূপণে বিধাতা দোষগুণের পাপপুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার করেন না। এইরূপ ঘটনার কথা যখন আমাদের মনকে অধিকার করিয়া বসে, তখন আমরা ভগবানের দয়ার কথা—বিচারের কথা অমূলক বলি, তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে চাহি, তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান হই। বিশ্বের অপ্রত্যক্ষ নিয়ামক শক্তির এই যে অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকলাপ—এই যে মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, নির্ম্মম বলিয়া প্রতীয়মান, অবিচারী বলিয়া অভিযুক্ত বিধান—ট্রাজেডী যুগে যুগে তাহারই বিভিন্ন চিত্র আঁকিয়া আসিতেছে। এই অপ্রতিষেধ্য শক্তির নিকট মানুষের যে পরাজয়—তাহাই Tragedyর উপজীব্য। প্রাচীন গ্রীসে Fate বা দৈব এই বিড়ম্বনার নিমিত্ত বলিয়া বর্ণিত হইত। উপস্থিত প্রত্যক্ষবাদের যুগে শুধু অদৃষ্টের মহিমা বর্ণনে ট্রাজেডী আর জমে না। আমরা অকারণ অচিন্তিত বিপৎপাতকে ট্রাজেডীর বিষয় বলি না। জীবনের উজ্জ্বল আলোকে হয় ত এইরূপ বিপদের কথা সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব tragedy—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সত্য—কিন্তু কাব্যকলার বেষ্টনীর মাঝে—এইরূপ তত্ত্বের প্রচারে কোন উপকার নাই। অগ্ন্যুৎপাত কিংবা অশনিপাতের মত—প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সাজান সংসার সহসা শ্মশানে পরিণত করিল, এরূপ গল্প Tragedy'র অবলম্বন নহে। তবে ঐরূপ বহিশ্চর শক্তির প্রতিকূলতার সহিত মানুষের মনোবৃত্তির যে দ্বন্দ্ব, তাহাই প্রকৃত tragic fact। অর্থাৎ শুধু দেবতার নিষ্ঠুরতা বা নিয়তির বিড়ম্বনায় মানুষ নির্য্যাতিত হইতেছে—এরূপ চিত্রে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না,—আমরা এরূপ ঘটনার সমাবেশ নাট্যকারের নিকট প্রত্যাশা করি, যাহাতে এই সত্যই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, মানুষই মানুষের শত্রু, আমরা নিজ সুখদুঃখের বীজ নিজেই রোপণ করি। Shakespeare এর স্বভাবসুলভ মনোহারী ভাষায় বলিতে গেলে—আমরা অন্তঃকরণের মধ্যে সেই বিরোধের চিত্র চাই—যাহাতে মনে হয় যে—

"The genius and the mortal instruments
Are then in council; and the state of man,
Like to a little kingdom, suffers then
The nature of an insurrection."

লোকোত্তর ব্যক্তির মনের মধ্যে এই যে সংগ্রাম, এই যে বিপরীত বৃত্তির বিরুদ্ধ আকর্ষণ—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়, কর্ত্তব্য ও অভিরুচি, ধর্ম্ম ও স্বার্থ—যে আকারেই হউক না কেন, এই যে মর্ম্মক্রন্দন দ্বন্দ্ব—ইহাই ট্রাজেডী।

বলিতে চাহি, ভারত-সন্তান এই দ্বন্দ্বের মহিমা যে বুঝে নাই, এ কথা সত্য নহে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের পরিণামকে সে স্বীয় নৈতিক প্রকৃতির বা প্রবণতার, ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা ও আচারের যে বিশেষত্ব—তাহার অনুগত করিতে চাহিয়াছে। Sir Alexander Grant Socratesএর স্বেচ্ছামৃত্যুর বিবরণের সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"To modern ideas, there may seem to be something wanting in this picture; we might have preferred to see the strong light relieved by shadow, by some touch of nature at the thought of parting from family and friends, by some human misgiving on the threshold of the unknown. But the ancients must be judged by their own standards. The Greek ideal was one of strength and widely different from the later and deeper Christian ideal of strength made perfect in weakness."

হিন্দু আদর্শের সহিত এই মতের মিল নাই। পরন্তু নৈতিক সাধনার ক্ষেত্রে প্রাচীন Hellas এর সহিত এদেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। হিন্দুর মন একথা বলে না যে, দেবত্বের অভিব্যক্তিতে আমাদিগের মনুষ্য ধর্ম্মের ন্যূনতা প্রকাশ পায়। "দেবতারে মোরা করেছি আপন।" স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝে ত্রিপাদ মাত্র ব্যবধান; এবং অনেক মানবদেব ও দেবমানব এ ব্যবধান আমাদের পুরাণেতিহাসে অতিক্রম করিয়াছেন। মহাপুরুষের আদর্শ এদেশে

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"

এই দৃঢ়তা ও কোমলতার যুগপৎ একত্র অবস্থিতি আমাদিগের মনশ্চক্ষুর দৈনন্দিন প্রত্যক্ষের বিষয়। তাই অনন্যনিষ্ঠ সাধনায় যদি অলৌকিক সিদ্ধি হয় তাহাতে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি না।

শাস্ত্র আশ্বাস দিতেছেন—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।" এই কারণেই বোধ করি যে সকল নাটকের মুখ বা প্রতিমুখে বিয়োগ বা অনিষ্টের বীজ রহিয়াছে বলিয়া আপাত ধারণা হয়—সেখানে এরূপ উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনা সম্ভাবিত বিঘ্নের পথরোধ করে এবং বলবৎ অহিতকেও হিতের কারণে পরিবর্ত্তিত করে! তাই সাবিত্রী সতীত্বের অবিচলিত মহিমায় মৃত ভর্ত্তার পুনঃসঞ্জীবনে সমর্থা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে বেহুলা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতের নাট্যশালায় সমস্বরে উভয়ে এই আশ্বাস-বাণী প্রচার করিতেছেন যে, যদি পতিপত্নীর সম্বন্ধে সংশয়, অশ্রদ্ধা বা পাপের ক্ষীণতম ছায়া না পড়ে—সতীত্বের উজ্জ্বলতা যদি চিরদিন অম্লান থাকে, তাহা হইলে বিচ্ছেদের ভয় নাই—মৃত পতিও সতীর অঙ্কে ফিরিবে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলকে যদি—

"অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ" এই সূত্রের গল্পাকার ভাষ্য মনে করা যায়—তাহা হইলে পঞ্চম অঙ্কের পরই যবনিকাপাত সমীচীন। কিন্তু রাজসভায় নিজের কলঙ্কের সম্ভাবনায়ও মিতভাষিণী, পতি-নির্ভর-হৃদয়া আশ্রমপালিতার এরূপ শাস্তি কখনই ন্যায্য হইতে পারে না। তাই tragic possibilities থাকা সত্বেও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন নৈতিক হিসাবে অবশ্যম্ভাবী।

আমার স্বল্প বুদ্ধিতে সংস্কৃত সাহিত্যে tragedyর বিরলতার ইহা একটি কারণ। তবে এতৎ সংশ্লিষ্ট অন্য কারণও আছে, অনুমান করি। তাহা বিবৃত করিতে সঙ্কোচ বোধ করি—নিজ ইয়ত্তার বাহিরে যাইতেছি বলিয়া ভয় হয়। যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার বৈলক্ষণ্যের বিষয় ভূয়সী চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, আত্মজ্ঞান ও জন্মান্তরবাদ এ দুটী আর্য্যাবর্ত্তের বিশিষ্ট সম্পত্তি এবং ধর্ম্ম ও নীতিসম্পৃক্ত অন্য সকল মতবাদের মূলীভূত। নাটকে আত্ম প্রত্যক্ষের কথা উঠিতে পারে না—কেন না তদবস্থায় "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" এই জন্য দশরূপকার বলিতেছেন—

"সর্বথা নাটকাদাবভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বমস্মাভিঃ শমস্য নিষিধ্যতে। তস্য সমস্ত ব্যাপার প্রবিলয়রূপস্যাভিনয়া যোগাৎ।" যতদিন এই মায়াপ্রপঞ্চ বিদ্যমান, তত দিনই সংসারনাট্য বা রঙ্গনাট্য এই দুয়ের অস্তিত্ব ও উপযোগিতা। এবং ব্যাবহারিক দশায়, অমুক্ত অবস্থায় জন্মান্তরবাদই নৈতিক শাসনের ও মর্য্যাদার দৃঢ়ভিত্তিস্বরূপ। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার পার্থিব জীবনের অবসানের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র ঘটিয়া উঠে না। "বিচিত্র প্রসঙ্গে" আচার্য্য ত্রিবেদী বলেন যে—"ইহাই লক্ষ্য করিয়া আর্য্য ঋষিগণ জন্মান্তরবাদের কল্পনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—লোকের মনে এই ধারণা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যে, এজন্মে না হউক, অন্ততঃ পরজন্মে নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে।" কর্ম্মের ধারা ছিন্ন হইবার নহে—এইরূপ একটা নিশ্চয়তা Moral order বা জগতের নৈতিক শাসনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের শৃঙ্খলায় যে কার্য্যকারণ নিয়ম অব্যাহত ভাবে চলিতেছে—জনসাধারণ তাহা সকল সময়ে শুধু আপ্তবাক্যের উপরে নির্ভর করিয়া মানিয়া লইতে পারে না। দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবার পূর্ব্বে, সমাজের যাবতীয় পরিচিত লোককে যদি স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে দণ্ডিত ও পুরস্কৃত হইতে দেখি—তাহা হইলে শাস্ত্রে আমাদের আস্থা দৃঢ়তর হয়। দৈনন্দিন সংসারে সেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দুর্ঘট। সংসার রঙ্গভূমির এই দীনতা—এই অপূর্ণতা—এই অপকর্ষ দূর করিবার জন্যই যেন নাট্যরঙ্গভূমির সৃষ্টি। লৌকিক তন্ত্রে যাহা অসম্ভব—অলৌকিকের সাহায্যে নাট্যকার তাহা সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন। সৎ ও

অসৎ কর্ম্মের যে পরিণাম প্রমাণিত করিবার জন্য জন্মান্তরের কল্পনা—সামান্য পটক্ষেপে তাহা সুচারুরূপে বুঝাইয়া দেন।

দ্যুলোক ও ভূলোকের যে সন্নিকর্ষ, মনুজ ও দেবতার যে ঘনিষ্ঠতা আমাদের পুরাণের বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি—তাহাও পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে ট্রাজেডীর বিরলতার হেতু বলিয়া মনে হয়। সত্য বটে, ইংরাজ কবি Shakespeareও তাঁহার নাটকে স্থলবিশেষে ভৌতিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচনার ভঙ্গী দেখিলে ইহাই মনে হয় যে মনস্তত্ত্ববিদ্ সহৃদয়েরা এই প্রথাকে সর্ব্বতোভাবে অনবদ্য মনে করেন না। বরং তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, এরূপ অশরীর ব্যক্তির নিবেশ তাঁহার নাট্যবস্তুর রহস্য-রচনায় বা রহস্যোদ্ভেদে অপ্রধান ভাবে কার্য্য করে। এ দেশের নাট্য-ধুরন্ধরগণ যখন তাঁহাদের কৃতিতে দেবতা বা অপ্সরার—যক্ষ বা কিন্নরের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন, তখন তাঁহারা দ্বিধা বা সঙ্কোচের অপেক্ষা রাখেন নাই।

গ্রীক্ নাট্যের deus ex machinae এখন উপহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে—প্রাচীন সময়ে ও যে তাহা একটা আড়ষ্ট ব্যাপার ছিল—তাহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু এদেশে অতিমানুষ জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব সহজেই সম্পাদিত হইত। দর্শকগণ ভক্তিপ্রবণতার জন্যই হউক, অথবা সমালোচনা-শক্তির বা দোষদর্শিতার তীক্ষ্ণতার অভাবেই হউক,—ঐরূপ দৃশ্যকে অসম্ভব জানিয়া, করতালি-দানে নটনটীদের ব্যতিব্যস্ত করিত না। ফলে নাট্যকারেরও অনেক সুবিধা হইত।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্ধিতে, নির্বহণে মিলন ও আনন্দের অননুকূল ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও তিনি পরিশেষে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় এই ধারণার পরিপোষণ করিতে সমর্থ হইতেন।

মোট কথা, সংস্কৃত সাহিত্যে tragedyর বিরলতা যে ভারতের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত, তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। এবং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। Europeএ মধ্যযুগে Mysteries, Miracles এবং Moralities এর উদ্ভবের কথা স্মরণ করিলে, ইহা প্রতিপন্ন হইবে। প্রত্যেক প্রাচীন সমাজই সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রসারকে ধর্ম্ম ও নীতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে চালিত করিতে প্রয়াসী ছিল। কাব্য ও নাট্যকলার উৎকর্ষবিধানে কল্পনা ও রীতি, রস ও বর্ণনা প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রাচীন যুগে সর্ব্বোপরি ইহাই ঈপ্সিত ছিল যে, ধর্ম্ম ও নীতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়। গ্রীক্ সাহিত্যেও আমরা এই জাতীয় ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। Plato তাহার Republic এ বলিতেছেন—"Excellence of thought, harmony of form and of rhythm is connected with excllence of character with good nature, with the disposition which is really well and nobly equipped from the point of view of character. ...পুনশ্চ—We must look for artists who are able out of the goodness of their own natures to trace the nature of beauty and perfection, so that our youngmen like persons who live in a healthy place may be influenced for good.

যাহা মঙ্গল, যাহা সাধুতার দিকে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে—সাহিত্যের মাঝে সেই গুণই একালে প্রথম লক্ষণীয়। প্রাচীন Hellas এর এই ভাব ভারতেরই প্রতিবিম্ব বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এদেশে কাব্য মাত্রেরই সাধারণ সার্থকতা—

"কান্তাসম্মিততয়া"—"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" এই উপদেশ প্রদান। আবার আপামর জনসাধারণের ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্যই নাটকের প্রবর্ত্তন। তাই আর্য্যাবর্ত্তের জাতীয় প্রতিভা বুঝিল যে অযথা বিপৎপাত বা খল মানবের জয়লাভ, এ সকল চিত্র রূপকের নির্বহণে স্থান পাইতে পারে না। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভবের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হয়। মহেন্দ্রাদি দেবগণের অনুরোধে পিতামহ এই "সার্ব্ববর্ণিকং শূদ্রজাতিষু সংশ্রাব্যং" পঞ্চম বেদ সৃজন করিলেন।

ধর্ম্মামর্থ্যং যশস্যং চ সোপদেশং সসংগ্রহং।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্ব্বকর্ম্মানু দর্শকং।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থ সংপন্নং সর্বশিল্পপ্রবর্ত্তকং।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহং।

ইহাই বিশ্বকর্ম্মার নিজ অঙ্গীকার উক্তি। এই লোক শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপকের উৎপত্তির কারণ—এবং ইহাই নাটকের স্বরূপ ও তাৎপর্য্যকে নিয়মিত করিয়াছে।

এখানে এই পর্য্যন্ত। ভবিষ্যতে যদি সময় ও সুযোগ ঘটে তাহা হইলে এক একখানি নাটক লইয়া উপরিউক্ত তত্ত্বগুলির প্রযোজ্যতা নিরূপণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মুক্তি

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল]

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

(১)

ঘুমিয়ে পড় ওরে অবুঝ, নাই বা থাকুক বিছানা,
নাই বা থাকুক মাথার তলায় বালিস।
রাখিস্‌নে তোর দুঃখ-ব্যথার কোন রকম নিশানা,
করিস্‌নে আর বৃথা কথার নালিস।

(২)

আঁক্‌ড়ে ধরা হাত ছাড়িয়ে, কেড়ে থা যা নিয়েছে
স্বয়ং দাতা, সেইটি কেন মাগিস্‌ ?
তুচ্ছ ক'রে উচ্চ রোদন, যদি সাজা দিয়েছে,
নিজে রাজা তাতে কেন রাগিস্‌ ?

(৩)

বইলে ঘাড়ে ভারি বোঝা, শক্ত হবে গর্দ্দানা,
খুঁজ্‌বে নাকো নরম নরম বালিস।
শিলার পথটি করলে ভুলা, বাড়্‌বে তোমার মর্দ্দানা ;
উড়ে যাবে ছিঁচ্‌-কাঁদুনের নালিস্‌।

(৪)

কাপুরুষের কাঁধে ঝুলি, ভিক্ষা মাগে বাজারে,
মানের খোঁজে সোজা মাথা নোয়ায় ;
বোঝে না যে সেইটি তাহার সাজার উপর সাজা রে !
দিনটি খালি কোকিয়ে কেঁদে খোয়ায়।

(৫)

গভীর দুঃখের অনুভূতি ভাগ্যে ঘটে জীবনে ;
টনক্‌ নড়ে পরের দুঃখ দশায়।
বুকের জ্বালায় জ্বলে বাতি আঁধার রাতির দীপনে।
বুঝ্‌লেন কি না কথাটা ঠিক মশাই ?

(৬)

জপে তপে যোগে ধ্যানে জন্মে ভাবের ফক্কিকা,
মিষ্ট করুণ নভেল পড়ার মতই।
লোকের মেলার ধক্কলে আর সইলে বিষম ঝক্কিটা,
মানুষ হয়ে দাঁড়ায় মানুষ স্বতঃই।

(৭)

নির্ভয়ে তুই চল্‌রে ছুটে, ফেলে বালিস-বিছানা,
মুক্ত করে আঁধার ঘরের আগল ;
উড়িয়ে দে সেবার ধ্বজা—বিশ্বজয়ের নিশানা !
এই ত মুক্তি, ওরে অবুঝ পাগল !

ব্যক্তিত্ব কি চিরস্থির ?

[শ্রীশশধর রায় এম্. এ. বি. এল.]

শ্রীশশধর রায়

আমি একটি লোককে চিনিতাম, সে আমাকে বলিত, "কালেক্টর সাহেবের নিকট একখানা দরখাস্ত লিখিয়া দেন, আমি তাহার নিকাশ লইব ; কেন সে এত দিন আমাকে নিকাশ দেয় না ?"—আমি বলিতাম, "তুমি কে ?" তাহাতে সে উত্তর দিত, "সে মহারাণীর স্বামী। তাহার স্ত্রীর সম্পত্তি বেটারা লুটে পুটে থায়, নিকাশ চাইলে দেয় না। সেই জন্য সে উকীল দ্বারা দরখাস্ত দিতে চায়।" এই ব্যক্তিকে অনেকে পাগল বিবেচনা করিত। কিন্তু সে অন্য সকল বিষয়েই দশজনের মতই ছিল ; কোন বিকৃতি দেখা যাইত না। কেবল কালেক্টর সাহেবের নিকাশ লইবার সময়ই তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সে মহারাণীর স্বামী। কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও জানিত যে, সে ইংরাজের প্রজা ; সুতরাং দরখাস্ত দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। আমি. উকীল, ইংরাজ হাকিমদিগের নিকট দরখাস্ত দিতে হইলে উকীল আবশ্যক। কালেক্টর হাকিম ; হাকিমের নিকট মোক্তার অপেক্ষা উকিলই আদরণীয়। এ সকলই সে জানিত। তাহাকে পাগল বলিলে, তিনটি অক্ষর উচ্চারণ করা হইল মাত্র ! কিন্তু এরূপ হয় কেন, তাহা বুঝা হইল না।

আমি কতিপয় বৎসর হইল,একবার বহরমপুর পাগলা-জেল দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় দেখি, একটি ভদ্র-লোক পরিষ্কার ধুতি, পিরান ও চাদর-গায়ে জুতা-পায়ে দিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া, জেল-দারোগা-বাবুর পুত্রকে পড়াইতেছে ! তাহার অধ্যাপনা-কার্য্য ও কথাবার্ত্তা দেখিয়া শুনিয়া কেহ তাহাকে পাগল বলিতে পারে না। সে সকল বিষয়েই দশের মত ; কিন্তু তাহার সমক্ষে কেহ থু থু ফেলিলে সে জ্ঞানশূন্য হইয়া রাগারাগি গালাগালি লাফালাফি করে ; এবং অনেক সময় তাহাকে মারিতেও উদ্যত হয়। কিন্তু ইহা সে জানে না। ছোট লাট সাহেব জেল পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিলে, সে তাঁহার নিকট আবেদন করে যে, সে সুস্থ ব্যক্তি, তাহাকে জেলে আবদ্ধ রাখা নিতান্ত অসঙ্গত ; এই বলিয়া সে মুক্তি চায়। সে পূর্ব্বে রংপুরে নেটিব্ ডাক্তার ছিল, তাহা তাহার স্মরণ আছে ; কিন্তু কি কারণে পাগ্লা জেলে আসিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সেই সময়ে একটি জ্যোতিষীর সহিত ঐ জেলেই দেখা হইয়াছিল। তিনি কাগজ-পেন্সিলে অনেক গ্রহ-উপগ্রহের ছবি আঁকিয়াছেন। জোয়ারভাটা কেন হয়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন ; সূর্য্য-গ্রহণ এবং ঋতুভেদ কিরূপে হয়, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু দিবা-রাত্রি হইবার কারণ বুঝাইয়া দিতে পৃথিবীর দৈনিক গতির কথা বলা মাত্র তাঁহার মনে কি যেন উদয় হইল ; তিনি অতিশয় ভীত হইয়া জানালার লোহার শিক জড়াইয়া ধরিয়া, চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমাকে ধর, ধর ; আমি পড়িয়া গেলাম, ম'লাম, ম'লাম।" ইহাই কেবল পাগলের চিহ্ন ছিল ; অন্য কোন চিহ্নই ছিল না। তিনি কে, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন।

একজন মদ্যপায়ী নেশার ঝোঁকে একটি ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া, তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করিয়াছিল। হত্যা করিবার সময় বুদ্ধিপূর্ব্বক আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিয়া— ছিল, তাহাতে ভ্রম হয় নাই। পরে তাহার সে বিষয় কিছু মাত্র মনে ছিল না। তাহার বিচার হইবার সময় সে প্রথমতঃ হত্যা করা অস্বীকার করে, পরে সাক্ষীদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে তাহার হত্যার কথা স্মরণ হয়। তখন সে অকপটে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল।

একজন সিনিয়ার স্কলার জ্বরবিকার রোগগ্রস্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করিলে, ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা ভুলেন নাই; পূর্ব্ববৃত্তান্ত আর কিছুই বিস্মৃত হন নাই। ইঁহার নিবাস পাবনা জেলায় ছিল।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি সমস্ত দিন প্রকৃতিস্থ থাকিতেন। সন্ধ্যার পর একটু কাঁপিতেন এবং এদিক ওদিক মাথা নাড়িতেন ও বিপন্নের মত তাকাইতেন।

এই অবস্থায় তিনি কে তাহা জানিতেন। তাঁহাকে এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা সুরসিকা, বুদ্ধিমতী ও ধার্ম্মিকা বলিয়া বোধ হইত। এইরূপ হইলে তিনি বাইবেল পড়িতে ভাল বাসিতেন। তিনি অন্ধকারে রুটি প্রস্তুত করিবার উপকরণ লইয়া রুটি প্রস্তুত করিতে পারিতেন। কিন্তু পরিচিত ব্যক্তির ফটোগ্রাফ চিনিতে পারিতেন না। রাত্রিতে নিদ্রা করিয়া প্রভাতকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর তিনি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতেন। কিন্তু সে সময় গত রাত্রিতে কি করিয়া ছিলেন, তাহা কিছুমাত্র জানিতেন না। * প্রকৃতিস্থ হইলে ঐরূপ অবস্থা মনে থাকিত না।

মেরি বার্ণস্ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভালই ছিল; তখন তাহার ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়া হয়। তৎপর হইতে সে আর পূর্ব্বের কথা জানিত না; সে কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে তখন হইতে যত দিন জীবিত ছিল, ক্রমে দশটি পৃথক্ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিত। এক এক অবস্থায়, এক এক সময়ে কিছু কালের জন্য এক এক পৃথক্ ব্যক্তির মত হইত। ডাক্তার উইল্‌সন ইহাকে ১৮৯৫ সালে দেখিয়াছিলেন; তদবধি ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাহা স্বীয় গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া ছেন। এই সকল বিভিন্ন অবস্থার সে তাহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স কালের প্রকৃত অবস্থা ত জানিতই না; প্রত্যেক অবস্থার কথা অন্য অবস্থায় তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকিত না। একটি অবস্থায় সে লেখাপড়া জানিত; অন্য অবস্থায় জানিত না। একটি অবস্থায় সমুদ্র তাহার চির-পরিচিত, অন্য অবস্থায় সে সমুদ্র চিনিত না, কখনও দেখে নাই বলিত। কোন অবস্থায় সে সন্তরণ করিতে জানিত, অপর অবস্থায় জানিত না। এক অবস্থায় সে অন্ধ হইত, কিছুই দেখিতে পাইত না, তথাপিও চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিত; অন্য অবস্থায় সে চক্ষে দেখিত, কিন্তু চিত্র করিতে অক্ষম ছিল। এক অবস্থায় সে বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া যাইত, অন্য অবস্থায় দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে লিখিত। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থায় অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ছিল। এক অবস্থায় হস্তাক্ষর হিজিবিজি, অন্য অবস্থায় কদর্য্য, আবার অপর অবস্থায় অনেক ভাল।

এই সকলকে পাগল বা বিকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিলে হইবে না। এ সকলের ন্যায় আরও বহু দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। মাইয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঈদৃশ অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে প্রথমতঃ বোধ হয়, যেন একই ব্যক্তি সময়ভেদে এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়, অথবা তাহার ব্যক্তিত্বই ন্যূনাধিক ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যক্তিত্বটা কি পদার্থ? উহা কি চিরস্থির? পঞ্চম বর্ষের বালক যে ব্যক্তি, সে অশীতি বর্ষ বয়স্ক হইলেও কি সেই ব্যক্তি? দেহ ত সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহাকে পঞ্চম বর্ষে দেখিয়া অশীতি বর্ষে দেখিলে এবং ইহার মধ্যে আর না দেখিলে, কেহ চিনিতেই পারিবেন না। মনও তাহার সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। ঐ উভয় বয়সে তাহার ভাব, বুদ্ধি ও চিন্তা সম্পূর্ণ পৃথক্; অথচ ব্যক্তিটি কি সম্পূর্ণ সেই রহিল? এক আকৃতির দেহ এবং এক প্রকৃতির মন না থাকিলেও কি বলিতে হইবে, ব্যক্তিটি এক-ই? তাহা হইলে তুমি এবং আমিও একই ব্যক্তি বলিতে দোষ কি?

সর্ব্ব প্রথম যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে জানিত,

* Dr. Wilson's Education, Personality & Crime (1908 Page 156-7.

সে মহারাণীর স্বামী; অপরে জানিত সে নহে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি অন্য সকল সময়ে একরূপ প্রকৃতির ছিল, কিন্তু কেহ সাক্ষাতে থুথু ফেলিলে সে সম্পূর্ণ পৃথক্-প্রকৃতির হইয়া যাইত। তৃতীয় ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ ছিল; তবে জানালার শিক ধরিয়া চীৎকার করিতেন কেন? মত্তপ হত্যা করিয়া যখন আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াছিল, তখন সে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল; কিন্তু পরে তাহার কিছুই মনে ছিল না। কলিকাতা হাইকোর্টে একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিনয়ী সুবুদ্ধি ও পিতৃভক্ত উকিল ছিলেন। তিনি মদ খাইলেই কর্ত্তব্য-জ্ঞান হারাইতেন। কাছারি যাইতেন না; অর্থ লইয়াও মক্কেলের মকদ্দমার সর্ব্বনাশ করিতেন। সেই পিতৃভক্ত উকিল মদের নেশায় কখনও কখনও পিতাকে প্রহারও করিয়াছিলেন। বিনয়, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পিতৃভক্তি, এ সকল মনোবৃত্তি থাকিলে এবং না থাকিলে, প্রকৃতি কি সমানই রহিল? মন কি একই রহিল?

যুক্ত রাজ্যের স্ত্রী লোকটি এক অবস্থায় পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তি সকলের ফটোগ্রাফ চিনিতে পারিতেন না; অন্য সময়ে যাহারা তাঁহার সুপরিচিত ছিল, সন্ধ্যার পর তিনি যদি পূর্ব্বেকার ব্যক্তিই থাকিলেন, তবে তাহাদিগকে চিনিতেন না কেন? তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি সন্ধ্যার পর এত রসিকতাপূর্ণ হইয়া উঠিত কেন? তিনি কি এই সমস্ত অবস্থায় একই ব্যক্তি? মেরী বার্ণস্ এক অবস্থায় লেখাপড়া জানিত না, অন্য অবস্থায় জানিত; এক অবস্থায় সমুদ্র চিনিত অন্য অবস্থায় চিনিত না; এক অবস্থায় অন্ধ হইত, অন্য অবস্থায় চক্ষে দেখিত; এক অবস্থায় সন্তরণ জানিত না, অন্য অবস্থায় জানিত; এক অবস্থায় দক্ষিণ দিক হইতে, অন্য অবস্থায় বাম দিক হইতে লিখিত। এই সকল অবস্থাও ক্ষণ স্থায়ী ছিল না; দীর্ঘ সময়ব্যাপী ছিল। এ সকল সময়ে সে কি একই ব্যক্তি?

উপরের লিখিত ব্যক্তিগণের কিংবা তত্তুল্য অবস্থাপন্ন-দিগকে আমরা সচরাচর পাগল বলি। যদি একটু বিশেষ ভাবে বলিতে চাই, তবে বলি, উহাদিগের স্মৃতিশক্তি লোপ হইয়াছে; অথবা বায়ুবৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু ব্যক্তিটি একই আছে। যখন সন্তরণ, চিত্র-বিদ্যা প্রভৃতি জানিত না তখনও সে যে ব্যক্তি, আবার তৎপর ক্রমেই যখন জানিত, তখনও সে এক-ই ব্যক্তি! ইহাই কি প্রকৃত কথা?

উহারা ঐ সকল পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও স্মৃতি-শক্তির এবং বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় দেয়। কালেক্টর সাহেবের নিকাশ লইতে হইলে দরখাস্ত দিতে হয়, আপিস্ আদালতের কার্য্যে উকিল দিতে হয়, ইহা স্মরণ থাকে; হত্যা করিলে যে সকল কৌশলে আত্মগোপন করিতে হয়, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক অবলম্বন করে। দক্ষিণ দিক হইতে লেখা ইংরাজের পক্ষে সহজ নহে, তাহা অনায়াসে করিতে সক্ষম হয়। চিত্রকলা না শিখিয়াও চিত্র করিতে পারে। এ সকল কি স্মৃতি-লোপের অথবা বুদ্ধি লোপের পরিচয়? তৎকালোপযোগী স্মৃতি, বুদ্ধি, সকলই থাকে, কিছুই তো যায় না।

তবে ব্যক্তিত্ব কি? দেহ ও মন, এই দুই পদার্থের উপর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মনের ভাব-সমষ্টি এক প্রকার থাকিলেই ব্যক্তিত্ব এক থাকিয়া গেল। ইহাই তো পণ্ডিতের কথা। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল আছে, অকস্মাৎ অন্যের মত হইয়া যায়, এবং মনের ভাব সকল যদি অন্যের ন্যায় হয়, তবে আমাকে আমি বলিয়া চিনিবার কোনই উপায় থাকে না। সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সকল ভাবসমষ্টি, যদি অন্য প্রকার না হয়, কেবল অল্পাংশ অন্য প্রকার হয়; অথবা অধিকাংশ অন্য প্রকার হইলেও সে অবস্থা চিরদিনস্থায়ী না থাকে; তাহা হইলে আমাকে সেই পূর্ব্বেকার আমি বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় থাকে। নচেৎ তাহা থাকে না।

বয়সের সহিত দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইলেও, আমরা নানা উপায়ে ব্যক্তিটিকে এক-ই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লই। ইহা অনুমান মাত্র। এক বাড়ীতেই বাস করে, এক ব্যবসাই করিতেছে, এক জিনিষ-পত্রই দখল করে, এক আত্মীয়স্বজনকে এক সম্বন্ধের মতই ডাকে, এক প্রকারই ব্যবহার করে,—ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া একব্যক্তিই অনুমান করি। যদি এক বাড়ীতে না থাকিত, এক পিতামাতা-স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগিনীদিগকে এক প্রকার সম্বন্ধোচিত না ডাকিত, এক জিনিষ-পত্র দখল না করিত; তাহা হইলে দেহের অত্যন্ত অধিক পরিবর্ত্তনে কখনই আমরা এক ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিতাম না।

সে ব্যক্তি নিজেও নিজেকে [দীর্ঘকাল পরেও] বিভিন্ন

ব্যক্তি মনে করে না। ইহা তাহার স্মৃতি-শক্তির ফল। প্রথম বয়সের ঘটনাবলীর স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে সে আপনাকে একব্যক্তি বিবেচনা করিত না। অন্য বিষয়ের স্মৃতি থাকিয়াও যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কাহারও ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে, ক্ষণকালের জন্যই হউক অথবা দীর্ঘকালের জন্যই হউক, আপনাকে সেই বিষয়ে পৃথক মনে করিতে পারে।
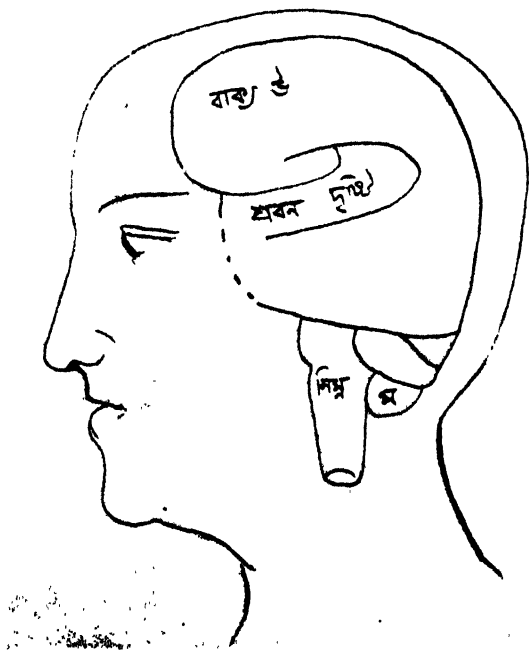
মনই প্রধান কথা। কাহারও মনের ভাব অন্য প্রকার হইয়া গেলে, আমরা সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপ হইয়া গেলে, সকলেই বলিয়া থাকেন, "সে কি আর সে মানুষ আছে, সে এখন আর এক জন হইয়া গিয়াছে।" এরূপ উক্তিতে দোষ দেওয়া যায় না। মনের যন্ত্র মস্তিষ্ক * সুতরাং ভাব মস্তিষ্ক হইতে হয়। মস্তিষ্ক পদার্থের নানা অংশ নানা ভাবের আধার এবং নানা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই বিষয়টি এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই; কিন্তু মস্তিষ্কই যে ভাবের আধার, তাহাতে সন্দেহ নাই। মস্তিষ্কের প্রধান ভাগ তিনটি; নিম্নভাগ, মধ্য ভাগ এবং উৰ্দ্ধ ভাগ।

উৰ্দ্ধ ভাগকে সেরিব্রাম্ বলে; স্নায়ুগণের উৎপত্তি স্থান এই পদার্থে পূর্ণ। মধ্যভাগ ইহার নীচে, কিন্তু পশ্চাতে। ইহাকে সেরিবেলাম্ বলে। মনুষ্যের সেরিব্রাম্ সেরিবেলামকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সিরিব্রাম একটি যোজক দ্বারা মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে; উহাকেই নিম্নভাগ বলিয়াছি। উহার নাম মেডুলা অবলংগেটা। মস্তক হইতে দেহে যে সকল স্নায়ু গিয়াছে, তাহা ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের, হৃৎপিণ্ডের, ও পাকস্থলীর স্নায়ুকেন্দ্র সকল ইহাতেই নিহিত। মুখের, শ্রবণের, জিহ্বার এবং আস্বাদনের স্নায়ুকেন্দ্রের মূল ইহারই মধ্যেই পাওয়া যায়। মধ্যভাগ অর্থাৎ সেরিবেলাম সমস্ত দেহের অনুভূতি পথ, সমস্ত শরীরের পেশিসকল এই স্থান হইতে বল পাইয়া থাকে। আমাদিগের গতিবিধির সময়ে এই যন্ত্র দিক স্থির রাখে। পক্ষিগণকে আকাশে উড়িবার সময় বহুবার দিক পরিবর্ত্তন করিতে হয়; সুতরাং এই যন্ত্র তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং পুষ্ট হইয়াছে; মৎস্যেরও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু কচ্ছপের তদ্রূপ হয় নাই। সেরিব্রামই সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত, পুষ্ট এবং উন্নত। ইহা মানবের যে ভাবে পুষ্ট, নীচ জন্তুগণের সে ভাবে নহে। ইহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিলে, নিম্ন ও মধ্য ভাগে কতকগুলি স্নায়ুদণ্ড দেখা যায়; ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুলের ন্যায়। কোন ভাব-তরঙ্গ সেরিব্রামের সর্ব্বোচ্চ ভাগ হইতে মেরুদণ্ডের মধ্যগত মেরুমজ্জায় যাইবার সময় এই সকল স্নায়ুদণ্ডের মধ্য দিয়া যায় এবং বাহ্য জগতের প্রতিক্রিয়াও এই গুলির মধ্য দিয়াই সেরিব্রামে নীত হয়। যেমন দেহের দুইদিক আছে, দক্ষিণ ও বাম; তেমনি সেরিব্রামেরও বাম ও দক্ষিণ দুইটি অনুরূপ দিক আছে। সুতরাং এই যন্ত্র যুগলমূর্ত্তি। বাক্য-উচ্চারণ, দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, ইত্যাদি অনুভূতি, বিভিন্ন ভাব ও বুদ্ধি, এই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ হইতে হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বোচ্চভাগ (cortex) মানবমনের অত্যুন্নত ভাব সকলের আধার।

মস্তিষ্কের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা একটু স্মরণ রাখা আবশ্যক; নচেৎ ব্যক্তি কি, তাহা ভাল বুঝা যাইবে না।

* পুরাতত্ত্ববিৎ চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন, ভাব হৃৎ-যন্ত্র হইতে হয়। তাহা প্রকৃত নহে। ডারুইন হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা হৃৎযন্ত্র অথবা হৃৎপিণ্ড অধিক মাত্রায় প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে, ইহাই প্রমাণ হয়, ভাবের যন্ত্র প্রতিপন্ন হয় না।

মস্তিষ্কের সকল কেন্দ্র অথবা কতিপয় কেন্দ্র আঘাত, পীড়া, মাদকসেবন—প্রভৃতি নানাকারণে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতে পারে। সে অবস্থায় ইতর প্রাণী-এবং কদাচিৎ মানুষকেও সেরূপ ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিত্ব একটি নির্দ্দিষ্ট চির-স্থির পদার্থ নহে। সেরিবেলাম্ কাটিয়া ফেলিয়া দিলে, জ্ঞানবুদ্ধি, ভাবসকল কিছুই লোপ হয় না, কিন্তু হাঁটিবার, ধরিবার, দিক্ পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি লোপ হয়, অথবা অতি অল্পই থাকে। [এই অসুবিধা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, ক্রমে উহা নিবৃত্ত হয়।] মস্তিষ্কের নিম্নভাগ অর্থাৎ মেডুলা অবলংগেটার কোন কোন অংশ নষ্ট করিয়া দিলে কিংবা কাটিয়া ফেলিলে, জন্তুগণ পশ্চাৎ দিকে চলিতে পারে, কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। অপরাংশ নষ্ট অথবা কর্ত্তন করিলে, উহারা সম্মুখের দিকেই দৌড়ে, অন্য কোনদিকে নহে; এবং তৃতীয় একটি অংশ নষ্ট অথবা কর্ত্তন করিলে, উহারা চক্রগতিতে ঘুরিতে পারে মাত্র *। কখন কখন কুকুর ক্ষেপিলে এই সকল লক্ষণ ন্যূনাধিক দেখা যায়, তাহার মস্তিষ্কের নিম্নভাগের ঐ সকল অংশ নষ্ট অথবা বিকৃত হইলে ঐরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। সেরিব্রামের কোন কোন অংশ নষ্ট করিলে কিংবা কাটিয়া ফেলিলে মনোভাব নানারূপে পরিবর্ত্তিত হয় অথবা সম্পূর্ণ লোপ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া ঐ সকল অংশ নষ্ট করিয়া ফেলিলে, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সকল লোপ হইয়া থাকে; কখন কখন তৎপরিবর্ত্তে হিংসা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুকুরের সেরিব্রামের সম্মুখস্থ অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিলে তাহার বুদ্ধিলোপ হয়, এবং মেজড়বৎ হইয়া যায় †। কোন কোন জীবের প্রজনন কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট ঋতু আছে; সেই সকল সময়ে সেরিব্রামের কোন অংশ নষ্ট করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার ঐ বৃত্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়; স্ত্রী-পুরুষ চিনিতেই পারে না। উপরের চিত্রের "দৃষ্টি"-প্রভৃতি কেন্দ্র নষ্ট হইলে প্রাণিগণ অন্ধ, বধির ইত্যাদি হইয়া থাকে। তাহাতে মনোভাবও ক্রমে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ সকল উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, মস্তিষ্কের নানাস্থান পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, নষ্ট অথবা লুপ্ত হইয়া গেলে মনোবৃত্তি নানাভাবে পরিবর্ত্তিত, নষ্ট অথবা জাত হইতে পারে। বাল্যে মস্তিষ্কের যে ভাব ও গঠন থাকে, যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন, বৃদ্ধি অথবা লোপ হয়; সুতরাং, দৈহিক ক্রিয়ার এবং মানসিক ক্রিয়াও তেমনই পরিবর্ত্তিত, বিনষ্ট অথবা [নূতন প্রকারে] জাত হইয়া থাকে। এরূপ হওয়া স্বত্বেও আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে, ব্যক্তিত্ব ঠিকই আছে।

দেহ ও মন উভয়ই বিভিন্ন হইয়া গেল; তথাপিও ব্যক্তিত্ব ঠিক থাকিল; এ কেমন কথা! দেহযন্ত্রের প্রত্যেক কোষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার স্থানে পূর্ব্ববৎ কোষই জাত হয় এবং বংশগত ধারা ঠিক রাখে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। দেহের কোন ক্ষতস্থান নূতন কোষদ্বারা পূর্ণ হইবার সময় ঐ সকল কোষ নিকটবর্ত্তী কোষসকলের এবং পুরাতন বিনষ্ট কোষসকলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই জাত হয়। কোন ক্ষতস্থান পূর্ণ ও সুস্থ হইলে তাহার যে দাগ অথবা চিহ্ন থাকে, দীর্ঘকাল পরে ঐ চিহ্নের প্রত্যেকটি কোষ পরিবর্ত্তিত হইলেও চিহ্ন বিলুপ্ত হয় না; সুতরাং নূতন কোষও ঐ চিহ্নই বহন করে। কিন্তু দেহের অংশ কিংবা অঙ্গ যদি নষ্ট অথবা পরিবর্ত্তিত হওয়ার পর আর পূর্ব্বভাব না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাবস্থার বিকার হইয়া থাকে। একটি হস্ত কাটিয়া ফেলিলে আর যদি সেই হস্ত জাত না হয়, তবে পূর্ব্বাবস্থা হইল না। পূর্ব্বের ব্যক্তিত্ব ঐ অংশে খর্ব্ব অথবা ক্ষুন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কোন শৃঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে, আবার যদি পূর্ব্ববৎ শৃঙ্গ জাত হয়, তবে পূর্ব্বের ব্যক্তিত্ব ঠিকই রহিল।

মস্তিষ্কের সম্বন্ধেও তাহাই। উহা একটা গোটা পদার্থ নহে; বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, এবং সে সকলের ক্রিয়াও বিভিন্ন। কোন অংশ নষ্ট, রুগ্ন কিংবা পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত হইলে, মানসিক ক্রিয়াও পূর্ব্ববৎ থাকে না। সে হিসাবে ব্যক্তিত্বও পূর্ব্ববৎ থাকিল না। মনোবৃত্তি বিভিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিত্বও সেই অংশে বিভিন্ন হইল। ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

* Loeb's Comparative Physiology of the Brain. pp. 173—175.

† Ibid p. 263.

কিন্তু ব্যক্তিত্ব চিরজীবন এক থাকাই আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন হইয়া গেল, ইহা কেহই স্বীকার করি না। তৎপরিবর্ত্তে বলি যে, ব্যক্তি অসুস্থ হইয়াছে। বাস্তবিকও অনেক স্থলে ব্যক্তিত্ব ঠিক-ই থাকে। বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও সে সকল স্থলে ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন হয় না। ইহা কিসের ফল? জড়বাদীর পক্ষে এ প্রশ্নের বিজ্ঞান-সম্মত উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এস্থলে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত বৃত্তান্ত এবং তদনুরূপ ও অন্যান্য প্রকার সহস্র বৃত্তান্ত বোধগম্য হইতে পারে; নচেৎ হয় না। জীবাত্মা স্থির থাকিলেই ব্যক্তিত্বও স্থির থাকিল। ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব হইতে পারে, পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; সে কেবল দেহ-যন্ত্রের পরিবর্ত্তনবশে। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন হয় না। দেহের ও মনের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, হ্রাসবৃদ্ধি যেরূপেই হউক, তাহাতে ব্যক্তিত্ব পরিবর্ত্তিত, ক্ষুণ্ণ অথবা বিকৃত হইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল স্থলে ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন হইবে না। জীবাত্মা এক থাকিলে ব্যক্তিও একই রহিল।

এ মীমাংসা সত্য হইলে মেরি বার্ণস্ প্রভৃতির যেরূপ অবস্থা দেখা গিয়াছে, তাহাতে কি বলিতে হয়? যে সময় সে অন্ধ হইত, তখন তাহার মস্তিষ্ক-নিহিত দৃষ্টি-কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হইত; যে সময় সে সমুদ্র চিনিত না, তখন তাহার মস্তিষ্কের কেন্দ্র-বিশেষের সংযোগ সূত্র নিষ্ক্রিয় হইত, কারণ ঐ সকল কেন্দ্রের ও সূত্রের উপর [সম্ভবতঃ] স্মৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে।* পণ্ডিতগণ যাহাকে associative memory বলেন, তাহা মস্তিষ্কনিহিত যে সকল কেন্দ্রের এবং তাহাদিগের সংযোগ-সূত্রের উপর নির্ভর করে, সে সকলের নাশ অথবা পরিবর্ত্তনেই স্মৃতির সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির নাশ অথবা পরিবর্ত্তন হয়। এ সকল স্বীকার করিলেও মেরিবার্ণস্‌কে যে অবস্থায় চিত্র-বিদ্যায় সুদক্ষ, কিংবা সন্তরণে পটু দেখা যাইত, অথবা অপর একজনকে যে অবস্থায় সঙ্গীতবিদ্যায় অভূতপূর্ব্ব ব্যুৎপন্ন দেখা গিয়াছে, সে অবস্থায় এবং তদ্রূপ অন্যান্য স্থলে পূর্ব্বের মীমাংসায় কিছুই বুঝা যায় না। এই সকল স্থলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, এক দেহে একটি জীবাত্মা ভিন্ন ও সময় বিশেষে অন্য জীবাত্মা আসিয়া বাস করিতে পারে। এই নবাগত জীবাত্মার অধিকার সময়ে পূর্ব্বের ব্যক্তিত্ব সুপ্ত হইয়া থাকিতে পারে এবং নবাগতের প্রাধান্যই অধিক হইতে পারে। তখন সে ব্যক্তি পূর্ব্বের অজ্ঞাত বিদ্যাও জানিতে পারে; এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করাও সম্ভব হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে ব্যক্তিত্বই বিভিন্ন হইয়া যায়।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, (১) ব্যক্তিত্ব এক থাকিলেও সময় সময় ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; (২) এবং সময় সময় একদেহে ব্যক্তিত্বই পৃথক হইতে পারে। তখন অন্য জীবাত্মা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

* Ibid ch xv and ch xvii

বাদ্যমঞ্চ, ইডেন উদ্যান—কলিকাতা

সামুনিতে তিনটি অন্ধ

[শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি, এম. এ. এল. এল ডি.]

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি

আবার সেই সামুনিতে আসিয়াছি, যে সামুনির নীল আকাশ একদিন শেষ বিদায়ের করুণ চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি ভাবি নাই যে, আবার এখানে আসিব। তাই আসিবামাত্রই পাইনঘেরা গ্রামটির চারিধার একবার ঘুরিয়া উপত্যকার যে প্রান্তটি ভুসারগলা আরভেরণ নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেখানে দাঁড়াইয়া আল্‌প্‌সের মাথার উপরের বরফের স্তূপ ও বস্তা বস্তা তুলার গাদার মতন মেঘ একদৃষ্টিতে দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া এই নীল পাহাড় এমনি করিয়া মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; আর মেঘের দল সমানে এর মাথায় ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বছরের পর বছর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আল্‌প্‌সের এই বিরাট গাম্ভীর্য্য টলেনি। অধীর প্রকৃতির মধ্যে যে স্থৈর্য্য আছে, তাহাতে আমাদের মনের ভিতর কেমন তোলপাড় করিয়া দেয়। আমার ক্লান্ত হৃদয় যেন এই রকম একটা আবেগই চায়। মনে করিলাম, এখানে খানিক পায়চারি করিব।

আমি ত্রিশ পা'ও যাইনি, তখন দেখি, পক্‌ আমার কাছে নাই। পক্‌ আমার স্প্যানিয়েল। তাহাকে কেহ শীঘ্র ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আমি তাকে যখন প্রথম আনি, সে কিছুতেই বশ মানিতে চায়নি। তাই ভাবিলাম, হঠাৎ সে গেল কোথায়? দুই এক বার তাকে ডাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে, সে তাহার পিঠ দুমড়ে বৃত্তার্দ্ধে পরিণত করিয়া, মুখটা প্রায় মাটিতে ঠেকাইয়া জাদিগের * কুকুরের মত আসিয়া উপস্থিত। পক্‌কে এরকম অবস্থায় দেখলে তার উপর রাগ করা চলিত না। আমিও তাহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। সে কিন্তু স্থির হ'য়ে দাঁড়াইল না। একবার আমার কাছ থেকে ছুটে চ'লে যায়, আবার ছুটে কাছে আসে। এই রকমে ছুটোছুটি আরম্ভ করিল। আমি তাহার হঠাৎ এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানিবার জন্য সে যে দিকে ছুটিয়াছিল, সেইদিকে চলিলাম। খানিক দূরে গিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেখানে দেখি, একটি ঢিবির নীচে একখানি পাথরের উপর একটি লোক বসিয়া আছে। লোকটির গায়ে একটি নীল কোর্ত্তা, পাশে একখানি আগা-বাঁকা লাঠি। তাহার পোষাকপরিচ্ছেদে তাহাকে অনেকটা অতীতকালের গ্রীসের মেষপালক বলিয়া বোধ হয়। তাহার বয়স কম, তাহার লম্বা লম্বা চুল কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, বাতাস চুলগুলিতে ঢেউ তুলিতেছিল। তাহার গম্ভীর আকৃতি বিষাদমাখা, কিন্তু শোকচিহ্নহীন। তাহার মুখে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট, কিন্তু সে বিরক্তিতে দুঃখের লেশ-

* ভল্‌তেয়ারের লেখা একটি গল্পের নায়ক

মাত্রও নাই। তাহার চোখে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব, —স্বচ্ছ বড় চোখ দুটি স্থির, আলোহীন, ভাষাহীন—যেন জীবনের কোন আহ্বানে সাড়া দিতে জানে না।

বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ আমার পদশব্দ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটি জানিতে পারে নাই যে, আমি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছি। আমি তখনই বুঝিলাম, সে অন্ধ।

পক্ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আমার মনের ভাব পরীক্ষা করিতেছিল। সে যেই বুঝিল, আমার চোখে করুণাচিহ্ন দেখা দিয়াছে, অমনি সে দৌড়াইয়া তাহার নূতন বন্ধুর দিকে গেল। প্রকৃতির সকলের চেয়ে, সদাশয় জীবের সকলের চেয়ে, দুর্ভাগ্যের প্রতি যে আকর্ষণ হয়, তাহার কারণ কে বলিতে পারে? এই কুকুরটি স্বতঃই এই অন্ধের প্রতি মমতাপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। হা পরমেশ্বর! আমিই কেবল তোমার সন্তানদের মধ্যে পরিত্যক্ত!

লোকটি পকের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়া উঠিল—"তুই ত এ জায়গার কুকুর নয়, তবে তুই আমাকে কেমন করে চিন্‌লি? আহা! আমার এমনি একটি কুকুর ছিল। সে কেমন আমার সঙ্গে খেলা করিত! তবে তাহার লোম এত লম্বা ছিল না। হয়ত সে তোর মতনই সুশ্রী ছিল। সেও আমাকে ছেড়ে গেল। সকলেই গেল, পক্‌ও গেল।"

আমি বলিলাম—"কি আশ্চর্য্য, তোমার কুকুরের নামও পক্?"

"ও! আপনি কে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা জানিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন। আমার পা দুটা বড় দুর্ব্বল।" এই বলিয়া, সে লাটিতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। আমি বলিলাম—"উঠিবার দরকার নাই। বস, যেমন বসিয়া আছ তেমনিই থাক। তুমি কি অন্ধ?"

সে বলিল—"হাঁ, আমি দুই বছর বয়স থেকেই অন্ধ।"—"তুমি কখনই কিছু দেখিতে পাও নাই?"—"হাঁ দেখিয়াছি, কিন্তু এত অল্প, যে ভাল মনে নাই। কেবল এই মনে আছে যে, সূর্য্য যখন আকাশে উঠিত, তখন আকাশ বড় উজ্জল বোধ হইত। আল্‌প্‌সের সমস্ত গা যেন আরও নীল হইয়া যাইত। এখনও সূর্য্য যেদিকে উঠে, সেদিকে ফিরিয়া মনে মনে ভাবি, মেঘে কত রকমের রং ফলিয়া যাইতেছে। সাদা বরফ—আর নীল পাহাড়ের কথা এখনও মনে পড়ে।"

"তাহ'লে তুমি জন্মান্ধ নও?"—"না," আমি দৈবদুর্ব্বিপাকে জন্মের দুই বৎসর পরে অন্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট অন্ধত্ব লইয়াই শেষ হয় নাই। আমার যখন দুই বৎসর বয়স, সেই সময় একদিন পাহাড়ের উপর থেকে বরফের গাদা ভেঙ্গে নীচে পড়িতে লাগিল। আমাদের ছোটবাড়ীটির উপর সেই সব বরফ এসে পড়িল। আমার বাবা বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি আল্‌প্‌স্ আরোহণকারীদিগকে পথ দেখাইয়া দিতেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীর অবস্থা দেখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেলেন। বাড়ীটি শীঘ্রই বরফের চাপে ভূমিসাৎ হইছে! কোন রকমে আমাকে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া, যেমন আমার মাকে লইয়া বাহির হইবেন, আমি হুড়মুড় করে বাড়ী ভেঙ্গে তাঁহাদের উপর পড়িল। আমি একেবারে পিতৃমাতৃহীন হইলাম। ঘণ্টা কতক পরেই আমার চোখের উপর যেন একটা পর্দ্দা পড়িয়া গেল। আর সেই থেকে আমি আলো দেখি নাই।"

"আহা! তাহ'লে পৃথিবীতে তোমার কেহই নাই!" অন্ধ বলিল—"আমাদের এই উপত্যকাতে দুরদৃষ্টদের সাহায্য করিবার অনেক লোক আছে। পাহাড়ের মুক্তবাতাস মানুষের হৃদয়কে ছোট ছোট ভাব থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে। এখানে পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়কে পাড়ার লোকে সাহায্য করে, মানুষ করে; আমাকেও পাড়ার দশজনে মানুষ করিয়াছে। একজন পুত্রহীনা বিধবা আমার মায়ের স্থান নিয়েছে। আমি তাহার বাড়ীতেই থাকি, সেও আমাকে নিজের ছেলের মতনই ভালবাসে।"

"তা'হলে তোমার পাড়াপড়্‌শী ছাড়া আর কোন বন্ধু নাই?"

"ছিল, আরও ছিল, কিন্তু তাহারা চ'লে গিয়েছে।", এই বলিয়াই কেমন এক প্রহেলিকাপূর্ণ সঙ্কেতস্বরূপ সে তাহার ঠোঁটের উপর একটি আঙ্গুল রাখিল।

"তাহারা কি আর ফিরিবে না?" "তাই বোধ হয়। অনেকদিন আমি ভাবিয়াছিলাম, পক্ হয়ত ফিরিবে। তারপর দেখিলাম, সেও ফিরিল না। এ পাহাড়ে দেশে যে বরফের মধ্যে পড়ে, সে আর ফেরে না। কই, পক এসে

আর আমার সঙ্গে খেলা করিল না ত?" এই বলিয়া লোকটি এক কোঁটা চোখের জল কোটের আস্তিন দিয়া মুছিয়া ফেলিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নাম কি?" সে বলিল—"জারভে।" "শোন জারভে, আমাকে তোমার হারাণ বন্ধুদের কথা ভাল করিয়া বলত। আচ্ছা·····" এই বলিতে বলিতে আমি তাহার নিকট বসিতে গেলাম। সে অমনি বাধা দিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া গিয়া বসিল। বলিল—"না, না, এখানে বসিবেন না। ইউলালি এখানে বসিত। এ জায়গায় সে যাওয়ার পর আমি আর কাহাকেও বসিতে দিইনি।" "ইউলালি? ইউলালি কে?"

জারভে বলিতে আরম্ভ করিল—"আমি আগেই বলিয়াছি, দুর্ভাগ্য হইলেও আমি অনেকের নিকট জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার অনেক উপকরণ পাইয়াছি। আমার জীবন বোধ হয়, এক ভাবেই কাটিত। কিন্তু হঠাৎ এক রবার্টস আসিয়া আমার জীবনের ধারা অন্যদিকে বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। রবার্টস এক বিদেশী বড়লোক। শুনিতাম যে, দেশে তাঁহার অনেক টাকা কড়ি ছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এক অন্ধ কন্যা রাখিয়া মারা যান। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবার্টস এই দেশে নির্জ্জনে থাকিবার জন্য তাঁহার অন্ধ মেয়ে ইউলালিকে নিয়ে আসেন। ইউলালি যে কি রকম দেখিতে, তাহা জানি না, কারণ আমি অন্ধ। আর বাহিরের সৌন্দর্য্য লইয়াই বা কি করিতাম? ইউলালির যে সৌন্দর্য্য আমার মনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্মৃতি কখনই মুছিয়া যাইবে না।"

"ইউলালি কি মরে গিয়েছে!" "মরে গিয়েছে? আহা তাহাই যেন হয়।" তাহার কথাতে যেন হাসি, অশ্রু মিশ্রিত। "মরেছে? - কে আপনাকে বলিল?" "না জারভে, তা বলিনি। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম মাত্র।" জারভে রুক্ষ হাসি হাসিয়া বলিল—"সে বেঁচে আছে।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জারভে বলিল—"আপনাকে বোধ হয় বলিয়াছি,তার নাম ইউলালি। সেই ইউলালি এখানে বসিত।" এই বলিয়া সে যে স্থানে বসিয়াছিল, সেই স্থানটি দেখাইয়া দিল।

আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, সে সেই জায়গাটা হাতড়াইতে লাগিল, যেন হাত দিয়া দেখিল, ইউলালি সেখানে বসিয়া আছে কি না। পক্‌ও করুণ দৃষ্টিতে অন্ধের মুখের দিকে তাকাইল। পকের মানুষের মনের ভাব বুঝিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। আমি লক্ষ টাকাতেও পক্‌কে বিক্রি করিব না।

"জারভে তুমি স্থির হও। আমি না জানিয়া তোমার হৃদয়ের কোন লুকান দুঃখের তারে আঘাত দিয়াছি। আমি তোমার ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশ বুঝিয়াছি। ইউলালির পিতা তাঁহার কন্যার মতন আর একজন অন্ধ দেখিয়া, তোমার উপর স্নেহান্বিত হন, তোমাকে তাঁহার আর একটি সন্তানের মত দেখিতে আরম্ভ করেন।"

জারভে বলিল—"তাই বটে। আমাকে আর একটি সন্তানের মত তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। ইউলালি আমার বোনের মত হইয়া দাঁড়াইল। আমি আমার পালয়িত্রী বৃদ্ধার সঙ্গে ইউলালিদের বাড়ীর নিকট গিয়া বাসা লইলাম। ইউলালির শিক্ষকগণ আমারও শিক্ষক হইলেন। আমরা দুইজনে মাঝে মাঝে মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনিতাম। বোধ হইত, যেন আমার আত্মা স্পর্শবোধজাত পৃথিবী ছাড়িয়া, কোন অনির্দ্দিষ্ট সুরলোকে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা একসঙ্গে অন্ধদের জন্য মুদ্রিত বইএর পাতায় অঙ্গুলিস্পর্শে অক্ষর চিনিতাম। পরে অঙ্গুলির সাহায্যে কবিকল্পিত নূতন জগতের কতক আভাষ পাইয়াছিলাম। দার্শনিকদের গভীর বিশ্লেষণের ধরণ বুঝিতে শিখিয়াছিলাম। আমি কবি-কল্পিত জগতের অনুকরণে নূতন রঙ্গে মানসিক জগৎ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতাম। অন্ধেরা বাহ্যজগৎ দেখে না, কিন্তু অন্তর-জগতে প্রবেশের ক্ষমতা তাহাদের আছে। কবিতায় যে প্রকৃতির পরিচয় পাইতাম, তাহার ও আমার অন্নস্মৃতিতে যে জগৎ জাগরূক ছিল, এই দুই মিলাইয়া, আমার ইচ্ছামত কবিতা রচনা করিতাম। ইউলালি সে কবিতা বুঝিত, ভালবাসিত। আমি আর কি চাহিব? যখন ইউলালি গান করিত, তখন আমার বোধ হইত, আল্পসের চূড়ার উপরের আকাশ থেকে কোন অপ্সরী আমাদের সামুনিতে নামিয়া আসিয়াছে। তাহার গানের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাহাড় পর্য্যন্তও শিহরিয়া উঠিতেছে। একটি ভৃত্য প্রত্যহ আমাদের দুইজনকে এই পাথরটির উপর বসাইয়া দিয়া যাইত। ইউলালির বাপ

আসিয়া, আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এই পাথরটির নাম হইয়াছিল— অন্ধদের পাথর। আমাদের চারিধারে রডডেনড্রন্ ফুটিয়া উঠিত। লোকে বলিত, রডডেনড্রন্ লাল। আমরা শুধু দুই একটি ফুল লইয়া, একটি একটি করিয়া পাপড়ী ছিঁড়িতাম। ইউলালিকে বলিতাম, হয়ত ভালবাসার ধরণই এই। কতবার পৃথিবীতে এই দৃশ্য অভিনীত হইয়াছে, এখনও কতবার হইবে। দুজনার কাছে বসিয়া সাধ্যমত মনের কথা ব্যক্ত করিবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতাম না।"

জারভে এই কথা বলিতে বলিতে যেন একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। কোন লুপ্ত স্মৃতি হঠাৎ জাগরূক হইয়া একটা কাল মেঘের মতন তাহার উজ্জ্বল মুখ অন্ধকার করিয়া দিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ পদাঘাতে একটি শুকান আল্পসের গোলাপ গুঁড়াইয়া ফেলিল। আমি গোলাপের চূর্ণাবশিষ্ট তুলিয়া পকেটে রাখিলাম; জারভে বুঝিতে পারিল না। আরও খানিকক্ষণ সে নিস্তব্ধ থাকিল – বোধ হইল, সে যেন আর কিছু আমাকে বলিবে না। আবার হঠাৎ ত্রস্ত হস্তে সে যেন তাহার চোখের সম্মুখ থেকে কি একটা তাড়াইয়া দিতেছে, এই রকমে হস্তচালনা করিয়া, একটু হাসিয়া বলিল—"মহাশয় কিছু মনে করিবেন না। এখনও আমার বয়স বেশী হয় নাই; তাই জগতের সব অভিজ্ঞতা হয় নাই। সেই জন্যই মাঝে মাঝে বোধ হয়, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ে পড়ি। পুরাতন কথা মনে করিয়া রাগ হয়। একদিন আসিবে, যখন সকল অভিজ্ঞতা আমার হৃদয়কে নূতন জ্ঞানে রূপান্তরিত করিবে, তখন বোধ হয়, আর এ রকম ছেলেমানুষি থাকিবে না।"

আমি বলিলাম—"দেখ জারভে, আমার বোধ হয়, তোমার কথা বলিতে কষ্ট হইতেছে। আমি আর তোমার অতীত-স্মৃতি জাগাইয়া তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না।" জারভে বলিল—"আপনি আমার অতীত স্মৃতি ডেকে আনেন নি। আমার গত জীবন আপনা-আপনিই আমার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। আমি তাকে আদরে ডেকে লই। আমার সমস্ত জীবন একটি সুদীর্ঘ বেদনা। কিন্তু আমার সকল শোক, সকল ব্যথাই আমার এখনকার শেষ বন্ধু। আর সবাই আমাকে ছেড়েছে, তাহারা ছাড়েনি। একা একা দিন কাটান'র চেয়ে যে রকমেরই হউক, দুই একজন সাথী থাকা ভাল। তাই আমার জীবন-স্মৃতি আমার বড় যত্নের অতিথি। আর সেই স্মৃতি সবই যে কষ্টের, তাহাও নয়। আমার সময় সময় বোধ হয় যে, আমার বাস্তব জীবন গত, এখন আমি স্বপ্নের মধ্যে জীবিত। আমার যাহা কিছু দুঃখকষ্টবেদনা এখন অনুভব করিতেছি, তাহা স্বপ্নজগতের; আর আমার যত কিছু সুখ, সৌভাগ্য, আনন্দ, তাহাই আমার প্রকৃত জীবনে ছিল। ইউলালি আমার কাছেই আছে, একটু দূরে বসিয়া সেও স্বপ্ন দেখিতেছে। আমরা দুজনায় অনেক সময় এমনি স্থির হইয়া প্রকৃতির মর্ম্মগতবাণী শুনিয়াছি। অনন্তকাল যদি এই রকম কোমল মর্ম্মসুখের ব্যাপ্তিকে অনন্ত বিস্তৃত ক'রে, তবে এমনি জীবনে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি!"

"একদিন আমরা দুজনে এই পাথরের উপর বসিয়া অন্যান্য দিনেরই মতন বাতাসের শব্দ, পাখীর গান, ভায়লেটের গন্ধ ও আমাদের হৃদয়ের আবেগ মিশাইয়া একটি সুকুমার জগৎ তৈয়ারি করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ মস্ত একখণ্ড বরফ হুড়মুড় শব্দে আরভেরণের জলের উপর পড়িল। সেই শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। ইউলালি আমাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিল। আমার যেন বোধ হইল, কোন এক অজানা ভয় হঠাৎ দানবমূর্ত্তি ধরিয়া আমার তরুণ জগতের সকল নিয়ম উল্টাপাল্টা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। ইউলালি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। সে তখনও আমাকে বাহু দিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। আমি বলিলাম—'ইউলালি আমরা যেন বরাবরই এমনি করিয়া এক হ'য়ে মিশে যাই—বরাবর ইউলালি।' লোকে, আমাদের অন্ধ বলিয়া দুর্ভাগ্য মনে করে, তারা জানে না, লোক-সাধারণের অপরিচিত সুখ আছে, তৃপ্তি আছে। তাহারা কত রকমের আমোদ-আহ্লাদ, কত প্রকারের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, আলস্য, পরিশ্রম, উন্নতি-অবনতি লইয়া তোলাপাড়া করিতেছে, কিন্তু আমরা সমস্ত জগতের সাধারণ চিন্তার বাহিরে আসিয়া, দুজনে এক নূতন ধরণের পূর্ণতা লাভ করিতেছি। আমরা অসম্পূর্ণ বলিয়া—আমাদের দৃষ্টি নাই বলিয়া—তাহারা দুঃখ করে। কিন্তু ঈথার-তরঙ্গের অনুভূতি যে দৃষ্টি বলিয়া পরিচিত, সেই

দৃষ্টিহীন হইলেই কি অসম্পূর্ণতা আসিয়া পড়ে? সত্য, মিথ্যা ভাগ লইয়া ব্যস্ত থাকিলেই কি জীবনের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করে? মানুষের দৃশ্য জগৎ যে কতখানি জড়ত্ব তাহাদের উপরে আনিয়া বসাইয়াছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা দেখিতে পায় বলিয়াই ত নূতন-পুরাতনের পার্থক্য তাহাদের কষ্ট দেয়। দেখিতে পায় বলিয়াই ত তাহারা চিরন্তনের মর্ম্মবোধহীন। আমাদের কাছে কিন্তু জগৎ চিরকালই এক। আমরা সনাতনের সহযাত্রী। সময় আমাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আমরা যে বন্ধনে একত্র হইয়াছি, তাহা চিরকাল অটুট থাকিবে। এই আরভেরণের প্রবাহধ্বনির মত চিরকালই আমরা একসুর গায়িয়া যাইব। পরিবর্ত্তনশীল নারী-সৌন্দর্য্য আমাকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করেনি; আমি তোমার ভিতর এমন কিছু পাইয়াছি, যাহা সুধু অনুভব করা যায়,—ব্যক্ত করা যায় না। এ সৌন্দর্য্য যেন তোমার সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে; শুধু তাই নয়, তোমার সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে; তোমার কথায়, তোমার হাসিতে, তোমার স্পর্শে, তোমার নিঃশ্বাসে, সেই সৌন্দর্য্য স্ফুরিত হচ্চে। শুনিয়াছি—সূর্য্যের আলোতে ফোয়ারার জল একটি একটি আলোর ফোঁটার মত ঝক্‌ঝক্ করে। সেই কিরণোদ্ভিন্ন জলবিন্দুর মত তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার সমস্ত শরীর, সমস্ত আত্মাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। তোমার মনে আছে, আমরা দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন মানুষদের ভালবাসার কথা, আমাদের যে সব বই পড়িতে দিত, তাহাতে পড়িয়াছি; কিন্তু তাহাতে ত কোন রকমেই বোধ হয় না, তাহারা অন্ধদের অপেক্ষা বেশী সৌভাগ্যশালী। আমার চক্ষুর উপরে যে অন্ধকার-পরদা পড়িয়াছে, তাহা সরাইয়া আমি ফের সূর্য্যের আলো দেখিতে চাই না; কারণ আলোর সমস্ত আভা, আমি তোমার স্পর্শে অনুভব করিতেছি। তোমার গণ্ডস্থল আল্পসের বরফের মতন সাদা কি না জানি না, জানিয়াও কাজ নাই। যদি কখনও আমি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হই, তাহ'লে শুধু তোমাকেই একবার দেখিয়া, আমার দৃষ্টি আবার হারাই যেন। আমি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে চাই না, আমি সমস্ত জগতের সারসংগ্রহস্বরূপ তোমাকেই নানা রকমে কল্পনা করিতে চাই। রসিনি, ভেবার্টের গান এক সময়ে শুনিয়াছি; লামারতিনের কবিতা পড়িয়াছি; কিন্তু তোমার কথায় তোমার গানে সকল সুর সকল ঝঙ্কার এক হইয়াছে।

"আমি এই সব কথা বলিবার সময় বুঝিতে পারি নাই যে, ইউলালির পিতা রবার্টস্ সেথানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি এই সব উচ্ছ্বাসের কথা শুনিয়াছিলেন। তাহার পিতা সব শুনিয়াছেন বুঝিয়া, ইউলালি একটু ভীত, একটু অপ্রস্তুত হইল। আমিও যেন ভাবিলাম, কি এক অকর্ম্ম করিয়াছি! কিন্তু রবার্টস্ বলিলেন—'তোমারা সরিয়া যাইতেছ কেন? আমি কি তোমাদের দুজনকে একত্র রাখিতে পারি না? আমার যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি আছে। তোমরা দুজনে চিরকাল আরামে থাকিতে পারিবে।' ইউলালি এই কথা শুনিয়া আবার আমার কাছে আসিল, আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি অমন স্পর্শসুখ আর কখনও অনুভব করি নাই। আমার বুক যেন ভেঙ্গে যাওয়ার মত হইল। আহা! সত্যই কেন তখন বুক ভেঙ্গে গেল না?

"অন্যলোকের সুখানুভূতি কি রকম, তাহা জানি না। আমার সুখবোধের ভিতর কেমন একটা অশান্তি, কি একটা নৈরাশ্য লুকান ছিল। যে রাত্রিতে রবার্টসের মনের ভাব বুঝিলাম, সে রাত্রিতে আমার ঘুম হ'ল না। ঘুমাইতে ইচ্ছাও হইল না। মনে হইতে লাগিল, এত অপরিমেয় সুখভোগ করিতে হইলে, অনন্তকালও যথেষ্ট নয়। মানুষ কয়দিনই বা বাঁচিয়া থাকে? আমি আমার সুখানু-ভূতির চরম সীমায় যাইবার জন্য এই একটি রাত্রিও ঘুমাইয়া নষ্ট করিব না। আমি যতই আমার নবোদ্বোধিত সুখের পরিমাণ করিতে যাই, ততই আমার বোধশক্তি যেন কমিয়া আসে, আমার সমস্ত চিন্তা কেমন জটা-পট্‌কি থাইয়া যায়। কিছুতেই আমার অবস্থার স্বরূপ ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। তখন আমার অতীত জীবনের কথায় একটু দুঃখবোধ হইতেছিল; সে গতজীবনে সুখের স্বর্ণমদিরা পান করি নাই, তেমনি তাহাতে ভয়েরও কিছুই ছিল না। যাহার কোন কিছু আশা নাই, যাহার কিছু আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখার নাই, তাহার কিসের ভয়? তখন মনে হইতে লাগিল, আমি আর একবার সেই শৈশবের নির্ম্মল আনন্দধারায় আমার উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়কে ডুবিয়ে আনি। যে ভবিষ্যতের নিষ্ঠুর ভালবাসা হয়ত মর্ম্মগ্রন্থি

টুক্‌রা টুক্‌রা করিবে—যখন ভবিষ্যৎ একদিনের বেশী দূর নয়—অন্ততঃ খানিকক্ষণ সেই ভবিষ্যতের হাত থেকে এড়াইতে পারিব।• এইরকম ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর চাকরদের চলাফেরার আওয়াজ কাণে আসিল। ভোর হইয়াছে দেখিয়া নিজেই পোষাক পরিয়া আর্ভ নদীতীরের তাজা বাতাসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করিতে বাহির হইলাম। গেটের কাছে আসিয়া বুঝিলাম, কে একজন গেট খুলিয়া ভিতরে আসিতেছে। পায়ের শব্দে জানিলাম, ইনি রবার্টস্ নহেন। কে একজন আমার হাত ধরিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ও! আপনি মোনোয়ার?' অনেকদিন পূর্ব্বে মোনোয়ার একবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার হাতের কোমল স্পর্শ, তাঁহার কেমন সাদাসিদে অমায়িক ধরণ আমার সমস্ত বোধশক্তিকে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহাকে আমি ভুলি নাই। মোনোয়ার অন্য একজনকে বলিতে লাগিলেন—'হাঁ এই সেই জাব্‌ভে। এর কথাই তোমাকে বলিয়াছিলাম।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার অঙ্গুলি দিয়া আমার চোখের পাতা একটু তুলিয়া ধরিলেন। পরে বলিলেন—'সকলই পরমেশ্বরের হাত। হায় যদি তোমাকেও চক্ষু দিতে পারিতাম। যাই হ'ক তোমার কোন কষ্ট বোধ হয় না?' আমি বলিলাম—'আমার কোন কষ্টই নাই। বরং সুখেই আছি। রবার্টস্ বলেন—আমি আজকাল বেশ পড়িতে শিখিয়াছি, আর তাঁহার মেয়ে ইউলালি আমাকে ভালবাসে।' মোনোয়ার উত্তর দিলেন—'সে তোমাকে দেখিতে পেলে আরও ভালবাসিবে।' 'যদি সে আমাকে দেখে' কথাটার মানে বুঝিতে পারিলাম না। আমার কেবল মনে হইল, সেই অনন্ত যাত্রার কথা, যখন অন্ধদের চোখে অফুরন্ত দিনের আলো আসিয়া পড়িবে। সেদিনের রাত নাই!

"আমার মা (পালয়িত্রী) আমাকে অভ্যাসমত এই পাথরের উপর বসাইয়া দিয়া গেলেন। ইউলালি কিন্তু বড় দেরী করিতে লাগিল। আমি তাহার বিলম্বের কারণ জানিতে উৎসুক হ'য়ে পড়িলাম। আমার পক্ ইউলালি আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য একবার ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। সে দূরে চ'লে গিয়ে, খুব দূরে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, আবার অধীর হয়ে, আমার কাছে এসে করুণস্বরে কাঁদিতে থাকে। এই রকম খানিক ছুটোছুটির পর সে আহ্লাদে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল ও ঘেউ ঘেউ করে আনন্দের চীৎকার আরম্ভ করিল। আমি বুঝিলাম, ইউলালি আসিতেছে। রবার্টস্ একাই মেয়েকে আনিয়াছেন, সঙ্গে চাকর আসে নাই। আমি বুঝিলাম—রবার্টসের বাড়ীতে অনেক লোকজন আসিয়াছে, সেইজন্য ইউলালির আজ আসিতে দেরী হইয়াছে।

"কিন্তু ইউলালি আসিবামাত্রই আজ যেন কেমন একটু ভিন্নভাব অনুভব করিলাম। এতক্ষণ যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সে যেন কেমন আজ বদলাইয়া আসিয়াছে। সে যেন আমার চেনা ইউলালি নয়। কিন্তু আমরা দুজনে দুজনের বড় কাছে আসিয়াছি, তাই তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। ইউলালির পিতা আমাকে নূতন অধিকার দিয়া, যেন আমার স্বাধীনতা একটু সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছেন; আমার যেন কথা কহিতে, ইউলালিকে স্পর্শ করিতে ভয় হয়। ইউলালি আমার বড় আত্মীয় হ'য়ে উঠেছে, তাই ইউলালিকে আদর করিতেও যেন সাহস হচ্চে না। আমার বোধ হইতেছিল, বুঝি আমার স্পর্শ, আমার নিঃশ্বাস, আমার কথা, ইউলালির পবিত্রতা মলিন করিয়া দিবে। শুনিয়াছি, আয়নার উপর নিঃশ্বাস পড়িলে, উজ্জ্বল কাচ মলিন হ'য়ে যায়; আজ ইউলালি রজতদর্পণের সমগ্র শুভ্রতা নিয়ে আমার কাছে আসিয়াছে; তাই আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, পাছে সে ম্লান হ'য়ে পড়ে। ইউলালির মনের হয়ত কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, আমরা অন্ধেরা একটুতেই বিচলিত হয়ে পড়ি। আগেকার মতন কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। গতরাত্রির মোহ তখনও কাটে নাই। কিন্তু বেশীক্ষণ সে ভাব থাকিল না। আমি আবার কেমন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। পক ও যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়া, ইউলালি ও আমার মধ্যে যেন কি একটা ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, চঞ্চল হ'য়ে উঠিল। ঠিক সেই সময়ে ইউলালির চোখে হাত দিয়া বুঝিলাম, তাহার চোখের উপর একটা কাপড়ের আবরণ রয়েছে। 'ইউলালি! তোমার কি চোখে লেগেছে?' সে বলিল—'একটু, বেশী নয়।' তারপর বলিল—'শোন জাব্‌ভে, আজ থেকে আমাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সবুজ পরদার ব্যবধান থাকিবে।' 'সবুজ পরদার ব্যবধান কেন?' ইউলালি বলিল—'আমি দৃষ্টিলাভ

করিয়াছি' এই বলিয়া সে একটু কেঁপে উঠিল, কি যেন দোষ করেছে, কি এক অশুভ সংবাদ যেন আমাকে দিয়াছে। 'তুমি দেখিতে পাইতেছ, তুমি চক্ষু ফিরিয়া পাইয়াছ?' হা! আমিই অভাগা।

"তুমি এখন থেকে দেখিতে পাইবে। যে আরসি তোমার কাছে ঠাণ্ডা মসৃণ সমতল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আজ সে তোমার জীবন্ত মূর্ত্তি তোমাকে দেখাইবে। সেই দর্পণ মৌন চঞ্চল ভাষায় তোমাকে কেবলই বলিবে—তুমি সুন্দরী। আজ থেকে আমাকে দেখে তোমার কেবল দয়ার উদ্রেক হইবে। তুমি ভাবিবে, আমার সকলের চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য যে, তোমাকে আমি দেখিতে পাই না। তুমি ক্রমেই আমার নিকট থেকে আরও দূরে চলে যাবে। অন্ধকে কোন্ চক্ষুষ্মান্ ভালবাসে? হায়, আমি অন্ধ!' এই বলিয়া প্রায় পড়িয়া যাইতেছিলাম, ইউলালি আমাকে ধরিল। তাহার সমস্ত হৃদয়ের আবেগ যেন কথায় ফুটাইয়া বলিল—'না জারভে, আমি অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না। কালই তুমি বলিয়াছিলে, চিরান্ধ থাকিতে তুমি চাও, কারণ তাহ'লে আমার উপর তোমার ভালবাসা কমিবে না। আমি অন্ধ থাকিলে তোমার হৃদয়ে যদি শান্তি পাও, তবে বল আমি আমার চোখের দৃষ্টি আবার নষ্ট করিয়া ফেলি।' আমি বলিলাম—'একটু থাম। এখন আমার ঠিক উত্তর দিবার অবস্থা নয়। আমরা দুজনেই আপাততঃ অপ্রকৃতিস্থ। তুমি এখানে বস। আমি আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি এক করিয়া লইব।' সে আমার হাতে হাত দিয়া দিয়া পার্শ্বে বসিল। আমি বলিলাম—'শোন, তুমি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইয়াছ, ভালই হইয়াছে। এখন হইতে তুমি সম্পূর্ণ হইলে—আমার পক্ষে দেখিতে পারা না পারা, বাঁচা-মরা একই কথা। কিন্তু তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, কখনই আমাকে দেখিবে না—বা দেখার চেষ্টাও করিবে না। কারণ আমাকে দেখিলেই তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্য লোকের সঙ্গে আমার তুলনা করিবে; তাহারা—যাহাদের মন, যাহাদের আত্মা চোখের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে, যাহাদের চাহনি রকমারি ভাবব্যঞ্জক। আমি চাইনা যে, তুমি আমাকে তাহাদের সহিত তুলনা কর। আমি একটি ছোট অন্ধ-মেয়ের চিন্তার জগতেই থাকিতে চাই, আমি তোমার কাছে চিরকালই যেন প্রহেলিকাপূর্ণ স্বপ্নের মতন থাকিয়া যাই। তুমি শপথ কর যে, আমার কাছে যখনই থাকিবে, তখনই চোখে এই সবুজ পরদা দিয়া আসিবে। যত সপ্তাহ, যত মাস, যত বছর আমার কাছে আসিবে, এই রকমের সবুজ পরদা যেন তোমার চোখের উপর থাকে। না, তুমি আর একবার আসিও, তারপর আর আসিও না। কিন্তু সেই শেষবারেও তোমার চোখের আবরণ যেন সরে না যায়।' ইউলালি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আমি তোমাকে বরাবর ভালবাসিব—চিরকালই ভালবাসিব।' এইবার আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম; রবার্টস্ আমাকে তুলিয়া আমার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া মার হাতে আমাকে দিয়া গেলেন; ইউলালি তখন আর সেখানে ছিল না।

"সে তার পরদিন, পরের পরদিন এবং তারপরেও অনেকবার আসিয়াছিল। তাহার চক্ষুর উপর হইতে সবুজ-পর্দ্দা সে সরাইয়া ফেলেনি। আমি ভাবিতাম, যতদিন সে আমাকে দেখিতে পাইবে না, ততদিনই তাহার কাছে আমি একই রকম সেই আগেকার মতই থাকিব। আমি ভাবিতাম, শৈশবের যে গভীর আনন্দ আমরা অন্ধকারের মধ্যে পাইয়াছি, সে আনন্দের স্মৃতি ইউলালি চক্ষু পাইয়াও মুছিতে চায় না। সে আমার কাছে অন্ধ ইউলালিই থাকিবে। সে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, সে আমাকে কখনই দেখিবে না। আমি তাহার সবুজ ফিতাতে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতাম, আমি তাহার চক্ষুকে ভালবাসিতে পারি নাই, সেই চক্ষুর আবরণ সবুজপর্দ্দাই আমার বেশী প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

"তাহার পর একদিন—আবার যদি আমার জীবন আরম্ভ করিতে হইত, আমি সেইদিনের অপেক্ষায় থাকিতাম—একদিন ইউলালি যেন আমার কাছে বড় আসিয়াছিল! তাহার বুকের স্পন্দন যেন আমার সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া তুলিতেছিল! তাহার চোখের সবুজ ফিতায় হাত দিয়া যেন আমি আলোর আভাস কতক পাইলাম। আমার মনে হইয়াছিল, যেন সেই শৈশবের দিনের, দুই বছরের প্রাতঃকালের সূর্য্যের আলো, আকাশ নানা রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া, আল্পসের গায়ের নীল রং আরো নীল করিয়া, আমার মুখের উপর কতবর্ণ-খচিত ছটা আনিয়া ফেলিয়াছে। আমি আমার শিশুশয্যা থেকে আস্তে আস্তে উঠিয়া দেখিলাম—

আকাশ আলোয় ভরিয়া গিয়াছে—সে কত আলো! ইউলালি, তুমি যদি আমাকে একবার দেখিতে পাইতে!

'আমি তোমাকে দেখিয়াছি। তোমাকে বলি নাই কিন্তু যখন তোমার কাছে শপথ করিয়াছিলাম যে, চোখের উপরের সবুজপর্দ্দা আমি তোমার কাছে আসিলে কখনই খুলিব না, তাহার আগেই তোমাকে দেখিয়া লইয়াছি। আমার প্রথম দৃষ্টি-লাভের পর জগতের নূতন আকারের নূতন সৌন্দর্য্যের মধ্যে তুমি অপরূপ শোভামণ্ডিত হ'য়ে আমার চোখের সম্মুখে পড়িয়া গিয়াছিলে। সেবার আমি চোখ ফিরাই নাই। তাহার পর আবার সবুজ আবরণে চোখ ঢাকিয়াছি।'

"তুমি আমাকে দেখিয়াছ তাহলে? আর কি দেখিয়াছ?' 'আমি আরও দেখিয়াছি, মোনোয়ারকে, আমার বাবাকে, জুলিয়াকে আর এই প্রকাণ্ড জগৎ, এই গাছপালা, নীল আলপ্‌স্‌, আকাশ, সূর্য্য। আমার বোধ হইতেছিল, আমি যেন সমস্ত প্রকৃতির সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল, আমাকে কোন অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলিয়া আনিয়া এত সৌন্দর্য্য-ঘটার মধ্যে কে হঠাৎ বসাইয়া দিয়াছিল।' 'তাহার পর আর কাহাকে দেখিয়াছ?' 'গেব্রিয়েল পেরো, বাবা, তেরা, মারগারিৎ—' 'আর কাহাকেও?' 'আর কাহাকেও নয়।'

"ও! আজ রাত্রিতে বাতাসটা বড় ঠাণ্ডা। ইউলালি তোমার চোখের আবরণ খুলে ফেল, তা নইলে আবার অন্ধ হইয়া যাইবে। ইউলালি বলিল—'তা হ'ক না,কেন, আমি ত তোমার কাছে শপথ করিয়াছি, তোমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি ভালবাসার চক্ষে দেখিব না। আমি যে দৃষ্টিলাভ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কাছে আরও এগিয়ে আসিয়াছি। আর একটা নূতন ইন্দ্রিয় দিয়া তোমাকে উপলব্ধি করিতেছি। আমি ভাবি, আমার যদি আকাশের অগুন্তি তারার মত চোখ থাকিত, তাহলে কত সহস্র সহস্র ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমাকে কত সহস্রগুণ বুঝিতে পারিতাম। দেবতারা মানুষের চেয়ে এই জন্যেই যেন বড়, তাঁহাদের উপলব্ধিজনক ইন্দ্রিয়ের অভাব নাই। আমি আজ যে চক্ষু পাইয়াছি, তাহাতে আর একটি বেশী বন্ধন তোমাকে আমাকে এক করিয়াছে!'

"ইউলালি ঠিক এই কথাগুলি বলিয়াছিল। আমার কাণে আজও সেই স্বর পৌঁছিতেছে। সে তাহার নূতন ইন্দ্রিয় দিয়ে আলোর রাজ্য জয় করেছিল, তাই তাহার কল্পনার বেগও যেন অধিক পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে সূর্য্যের রশ্মি দুই চোখে পান করিয়া, যেন নূতন মাদকতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

"আমি যেন আমার জীবনের সৌন্দর্য্য আবার ফিরে পাইলাম। মানুষ এত শীঘ্র আশাতে ভুলে যায়! যে ভুল তাহাকে আস্তে আস্তে কোমল স্পর্শে পরিবর্ত্তিত করে, সে ভুল তাহার বড় ভাল লাগে। আমাদের জীবন আবার নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। আমি বুঝি নাই কি এক নূতন সত্তা—নূতন কর্ম্মস্পৃহা—ইউলালি আমার মধ্যে জাগাইয়াছিল। আমাদের আগেকার ধীর, চেষ্টাহীন জীবন আর সে রকম ভাল লাগিতেছিল না। আমরা আগেকার মতন "অন্ধের পাথরের" উপর আসিয়া বসিয়া থাকিতাম। ইউলালি আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া বেড়াইত। কখন কখন উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইউলালি আলোকপূর্ণ জগতের মনোরম চিত্র কথায় আঁকিয়া যাইত। আমি শুনিতে শুনিতে কত স্বপ্নজগতের কথা ভাবিতাম। আমার বোধ হইত, ইউলালি কোন পরীর দেশ থেকে আসিয়া আমার আত্মাকে কঠোর বাস্তবজগৎ থেকে মুক্ত করিয়া দিত। আমি আলোভরা আকাশের মধ্যে কত রংএর মেঘ দেখিতাম। মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইত। মাঝে মাঝে পাখীর গান, জগতের গতি সঙ্গীত, সমস্ত প্রকৃতির নীরব ভাষা যেন অর্গানের সুরের মতন আমার আত্মার ভিতরে গিয়া পৌঁছিত। আবার তখনই সমস্ত উপলব্ধি, সমস্ত আলো গভীর অন্ধকারে পরিণত হইত। আমার অন্ধজীবন কল্পনাকে বেশীক্ষণ কাছে থাকিতে দিত না। বেশী আলোর পর অন্ধকার তীব্রতর হয়ে উঠিত, আমি আবার অনন্ত অন্ধকারে ধ্যানে ডুবিতাম। সেই দুঃখময় বাস্তবজীবন ইউলালির অনেক যত্নেও কাছ থেকে স'রে যেতে চাইত না, ইউলালি তখন নানা প্রকারে আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত। সে গান গাহিত, আমাকে নূতন নূতন বই পড়িয়া শুনাইত। যদিও আমরা দুজনেই অন্ধ অবস্থায় পড়িতে পারিতাম, কিন্তু অন্ধদের জন্য মুদ্রিত বেশী বই পাওয়া যাইত না। তাই ইউলালি যখন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান থেকে কত রকমের চিন্তা-প্রবাহের ধারা আমাকে বুঝাইত, আমি সেই সময় বুঝিতাম,

চোখ থাকিলে জগতের ব্যাপ্তি বিস্তৃত থেকে কত বিস্তৃততর হ'য়ে পড়ে! বাইবেল-বর্ণিত জোবের সহিত পরমেশ্বরের আলাপ শুনিয়া, এক সঙ্গে মনে মনে বিস্ময় ও ভক্তি জাগিয়া উঠিত। আবার জোসেফের কথা শুনিয়া আমার মনে জগতের উপর প্রীতি ও দয়ার সঞ্চার হইত। কখন কখন সে হোমারের বালকসুলভ বিশ্বাসপরতার উদাহরণ তাঁহার কাব্য হইতে পড়িয়া শুনাইত; কখনও বা মিল্‌টনের ধর্ম্ম-কবিতা শুনাইত, কখন ও বা গেটে পড়িত। কবি যে আলোছায়ার সম্পাতে মেঘ ও রৌদ্রের পরিচয় মানুষের জীবনের চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সেই অন্তর-জগতে গতিবিজ্ঞানের নিয়মাতীত শক্তির বিকাশ দেখিয়া কেমন এক ভাষহীন আবেশ আমার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিত। ইউলালি এ সময়ে আমাদের অবস্থার অনুরূপ বই সকলই বেশী পড়িয়া শুনাইত। কোন খানিতে মানুষের মনোবৃত্তি সকল উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোন খানিতে প্রিয়-বিরহের কথা, কোন খানিতে মিলনের পূর্ণ আনন্দ, আবার কোন খানিতে সরল চাষীদিগের গৃহস্থালির বর্ণনা—এই সবই সে বেশী পড়িত। কাব্য-জগতে আর ইন্দ্রিয়-বোধ্য জগতে কত তফাৎ, তখন আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতাম।

"কিছুকাল পরে আমি লক্ষ্য করিলাম যে, ইউলালির মন অন্য রকমের সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে। সে আর আগেকার মতন সাধারণ জীবনের চিত্র দেখিতে ভালবাসে না। সে এখন জাঁকজমকের কথা, পোষাকপরিচ্ছদের কথা, ডিনারের কথা, বিলাসীদের লালসাময় জীবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা পড়িতে ভালবাসে। এক দিন সে একজন সৌখীন রমণীর বেশবিন্যাসের বর্ণনা আমাকে শুনাইতেছিল। বর্ণের সামঞ্জস্য কি রকমে চেহারার আকর্ষণ বাড়াইয়া দেয়, সেই কথা বইখানির সেই জায়গায় লেখা ছিল। ইউলালি ভুলে গিয়েছিল যে আমি অন্ধ, আমার বর্ণজ্ঞান নাই; কল্পনায় যে বর্ণের সৃষ্টি আমি করি, তাহার সহিত বাস্তবের সম্পর্ক হয়ত মোটেই নিকট নয়, তাহা ইউলালির মনে ছিল না। আমি বুঝিলাম, চক্ষু-চিকিৎসক মোনোয়ারের যত্নের ফল ফলিতেছিল। ইউলালি তাহার বাড়ীর আগন্তুকদের জাঁকজমক দেখিয়া, আস্তে আস্তে অন্য রকম হইয়া যাইতেছেন। ইউলালির পিতা রবার্টস্ বড় লোক। তিনি কন্যার দৃষ্টি-প্রাপ্তির পর অনেক বড়লোককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আল্পসের পরপার হইতে ফ্যাসনের ঢেউ এই বিরল-মানুষ উপত্যকাতে আছড়িয়া পড়িতেছিল। সেই কিরণোজ্জ্বল বিলাস-ভঙ্গীর চাঞ্চল্যে ইউলালি আর সে ইউলালি নাই। বিজ্ঞান বলে, কম্পমান কোন বস্তুতে কম্পনের অনুযায়ী ধাক্কা দিতে পারিলে, কম্পনসীমা খুব বাড়াইয়া দিতে পারা যায়। অবশেষে বস্তুটি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার বিনাশ হয়। ইউলালির চরিত্র সেই রকম নূতন কম্পনের ধাক্কায় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সে একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইউলালি এখন ঘাট্-বাঁধা বীণার মতন কেবল বিশিষ্ট গানের উপযুক্ত হইতেছে। সে আগেকার মতন সকল স্পর্শে সাড়া দেয় না। তাহার জীবনের তরঙ্গ এখন উচ্চ তালে উঠিতেছে পড়িতেছে। আমি অন্ধ জারভে, আর তাহার সকল সুর জাগাইতে পারিতেছি না। একবার ভাবিলাম, ভালই, ইউলালি তাহার পরিপূর্ণতায় জগতের সমক্ষে আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ আমার গর্ব্বের কথা; পরেই কি এক নিবিড় বিষাদ অন্ধকারময় আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

"যাহারা সামুনি দেখিতে আসিত, তাহারা আল্পসের জন্য নয়, ইউলালির জন্যই শীঘ্র উপত্যকা ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। আমার তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। ইউলালির ভালবাসা কমেনি। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, শীঘ্র শীঘ্র শীত এসে পড়লে হয়, তখন বিদেশীরা সব চলে যাবে, আর ইউলালি এত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়বে না। শীত এসে পড়ল। কিন্তু আমি তখন বুঝি নাই যে, আমার ভাগ্যদেবতা আমার জীবনের প্রবাহ অন্যদিকে ফিরাইয়া দিতেছেন। রবার্টস্ আসিয়া বলিলেন, 'এবার শীতকালে তিনি তাঁহার ইউলালিকে লইয়া জেনিভাতে যাইতেছেন। সামুনিতে শীতকাল বেশী দিন ত থাকে না, শীত চলিয়া গেলেই আবার তাঁহারা ফিরিবেন।' আমি যেন আকাশ থেকে পড়িলাম। সামুনিতে শীতকাল বেশী লম্বা নয়! হা অদৃষ্ট! এখানে শীতই বেশী প্রবল, বড় অসহ্য! এই শীতের সময়ই ত এক সন্ধ্যায় আমি আমার পিতামাতা, বাড়ী, চোখ সব হারাইয়াছিলাম। রবার্টস্ বলিলেন, 'সেই শীত বড় বেশী কিছু নয়!' এখনি যে মস্ত মস্ত বরফের চ্যাঙ্গড় পাহাড় থেকে ভেঙ্গে পড়বে। আবার কতলোক গৃহশূন্য হ'য়ে পড়বে, অথচ রবার্টসের কাছে এই

শীত দারুণ নয়, ভয়ের নয়। আমি বুঝিলাম, ছুইটি প্রাণী আমার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় এই রকম বৃথা আশ্বাসে তাহাদের রূঢ় আচরণ কোমল করিবার চেষ্টা করিতেছে।

"ইউলালি তাহার পিতার সঙ্গে চলিয়া গেল। আমি একদিন এই পাথরের উপর বসিয়া ভাবিতেছিলাম—কত কি ভাবিতেছিলাম, ঠিক্ মনে নাই—তবে বেশ মনে হইতেছিল, ইউলালি আবার সামুনিতে হয়ত আসিবে, কিন্তু তখন সে আর এ ইউলালি নয়। সে কোন বিলাস-পরায়ণ ধনকুবেরের স্ত্রী হইয়া, গ্রীষ্মকালে সামুনিতে আল্পস্ দেখিতে আসিবে—আমাকে পাথরের কাছে কোন সন্ধ্যা-বেলায় দেখিয়া বলিবে—'কি জারভে, ভাল ত?' এই বলিয়া অন্ধকে এক পাশে ফেলিয়া, তাহার নূতন জগতে নূতন প্রমোদের ভিতর অদৃশ্য হইবে!

"সেই থেকে ইউলালির দেখা পাই নাই। শীত চলে গেল। আবার বসন্ত শেষে গ্রীষ্মকাল আসিল; আল্পসের উপত্যকায় একটি একটি করিয়া বিদেশীরা আসিতে লাগিল। আমি প্রত্যহ সেই পাথরের কাছে বসিয়া শুনিতাম—ঠুক্ঠুক্ করে পাহাড়ের গা থেকে লোক নেমে আসছে। রোজই ভাবিতাম, হয়ত আজ রবার্টস আসিবেন। কিন্তু দিনের পর দিন গেল। অক্টোবর মাসের একদিন একটি লোক আমার কাছে একটি ফিতা দিয়ে গেল। ফিতার উপরে অন্ধদের পড়িবার উপযোগী উঁচু উঁচু অক্ষরে লেখা আছে—'এই সবুজ ফিতাই আমি চোখের উপর পরিতাম।' দেখুন—এখনও সেই ফিতাটি রহিয়াছে।" এই বলিয়া অন্ধ আমাকে একটি সবুজ রঙ্গের ফিতা দেখাইল। পরে বলিতে লাগিল—"কিছুদিন পরে ইউলালি আমাকে চিঠি লিখিল, তাহারা জেনেভে ছাড়িয়া মিলানে গিয়াছে। মিলানেই সমস্ত গ্রীষ্মকাল কাটাইবে।"

"আমার মা আমার জন্য বড় ভীত হইয়া পড়িলেন, আমি কিন্তু একটু হাসিয়াছিলাম। আমরা যখন আমাদের কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছি, তখন আর ভয়ের কিছুই থাকে না।

"এই আমার জীবনের সকল কথা। একবার একটি মেয়ে আমাকে ভালবাসিয়া আমাকে যেন আরও কর্কশ ক'রে দিয়ে গিয়েছে; কিন্তু একটি কুকুর আমাকে ভাল-বাসিয়াছিল; সে বেঁচে থাক্তে ছেড়ে যায়নি। হায়! পক্!"

আমার কুকুর পক্ তাহার নাম শুনিবামাত্রই অন্ধের দিকে ঝাঁপিয়ে গেল। অন্ধ তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"আমি আমার পকের নাম করিয়াছিলাম, তুইও আমাকে ভালবাসিস?"

আমার চোখ জলে ভরে এল। আমি বলিলাম—"একদিন আস্‌বে, যখন আবার একটি রমণী আসিয়া তোমাকে ভালবাসিবে।"

জারভে বলিল—"আপনি কি এমন কোন অন্ধ রমণীকে জানেন, যার অন্ধত্ব ঘুচিবার নয়?"

আমি বলিলাম—"কেন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কোন রমণী তোমারই কাছে এই সামুনিতে আবার আসিবে।"

জারভে পুনরায় বলিল—"আপনি ইউলালির কথা বলিতেছেন!"

আমি বলিলাম—"হাঁ, আমি আশা করি, ইউলালি আবার ফিরিবে। তুমি পক্‌কে ভালবাসিতে, সে তোমাকে ভালবাসিত বলিয়া। এবার আবার তুমি সেই রমণীকে ভালবাসিবে, কারণ সে আসিয়া বলিবে, সেও তোমাকে ভালবাসে।"

"সে অন্য কথা। পক্ আমাকে ভুলিয়ে চলে যায় নি, ঠকিয়ে চলে যায় নি। পক যে মরে গিয়েছে।"

"শোন জারভে। আমি ভাবছি শীঘ্রই মিলানে যাব, সেখানে গিয়া ইউলালিকে তোমার খবর সব বলিব। তারপর আবার এখানে ফিরিব। দেখি কি হয়। আমারও অনেক দুঃখ ভুলিবার আছে, অনেক ক্ষত এখনও আমার পূরে উঠে নি। যদি তোমার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চলিত, দেখিতে—ব্যথা আমার মনের মধ্যে গভীর-সন্নিবিষ্ট হ'য়ে আছে। আমার ইচ্ছা হয়, আমার দৃষ্টি-শক্তি তোমাকে দি; তা'হ'লে দেখিতে পাইবে, এ পৃথিবীতে তোমার চেয়েও অনেক দুর্ভাগা আছে।"

জারভে হাতড়ে হাতড়ে আমার হাত খুঁজিয়া নিজের হাতে লইল, এবং বেশ জোরে চাপিয়া ধরিল। সহানুভূতি জন্মানই যে দুঃখের প্রধান কাজ।

তারপর আমি বলিলাম—"যতদিন আমি না ফিরে আসি, ততদিন তোমাকে ভালবাসিবার একটি জিনিষ

দিয়া যাব। আমার পক্‌কে আমি তোমাদের সমস্ত গ্রামটি পাইলেও দিতাম না। তোমার হৃদয় ও পক্ এই উভয়ে আজ থেকে খেলার সাথী হইবে।"

জারভে অত্যন্ত বিস্ময়ের স্বরে বলিল—"আপনি পক্‌কে আমার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, পক্‌কে আমি তোমায় দিলাম।"

জারভে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না মহাশয়, তাকি হয়! আপনি আপনার কুকুর আমাকে দিবেন না। আপনার কুকুর আপনারই থাক। সে..."

"দেখ, পক্ সব বুঝিতে পারিয়াছে। সে কেমন মানুষের চাহনিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। সে তোমার কাছে যাইতে চায়, অথচ আমাকেও ছাড়িতে চাহিতেছে না। তাহার এই বেদনাক্লিষ্ট চাহনি যেন শেষ বিদায়ের চাহনি।" এই বলিয়া যেই আমি অন্ধের দিকে অঙ্গুলি হেলাইলাম, অমনি পক্ একলাফে জারভের কাছে গিয়া সম্মুখের পা-দুখানি তাহার জানুর উপর তুলিয়া দিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। পক্ একবার আমার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে এক নূতন মুক্তির আভাষ ছিল।

"জারভে! আমি তবে চলিলাম।" আমি পকের নাম করিলাম না। কারণ, পক্‌কে ডাকিলে, বোধ হয়, সে আবার আমার সঙ্গে আসিত। কিন্তু যেই আমি খানিক দূর গিয়া মোড় ফিরিয়াছি, অমনি দেখি, পক্ ছুটিয়া আসিয়া হাজির! সে যেন নিজের উপর একটু রাগিয়াছে, নিজের ব্যবহারে যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়েছে। সে আমার কাছে এসে সম্মুখের পা দুটি ছড়াইয়া, তাহার উপর মাথাটি রাখিয়া বড় করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিল। আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—"তোমাকে আমি মুক্তি দিয়াছি, তুমি তোমার নূতন মনিবের কাছে যাও।"

যে ছুটে চলে গেল, আবার একবার ছুটে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিরে গেল। শেষে গিয়ে জারভের পাশে বসিল। আমি ভাবিলাম—"যাই হ'ক, অন্ধ একটি সঙ্গী পাইল।"

দিন কতক পরে আমি মিলানে গেলাম। আমার যে সেখানে বিশেষ কোন কাজ ছিল, তা নয়; ঘুরতে ঘুরতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের জীবনে কখন কখন এমনি সময় আসে যে, দিনগুলির কোন দরকারই থাকে না। আমরা তাহাদের ব্যবহার করি না, তাহারাই যেন আমাদিগকে ব্যবহার করে। আমারও তখন সেই অবস্থা।

জারভের ইতিহাস আমার মনে একটি করুণ অস্পষ্ট ছাপ দিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা তখন যেন কোন স্বপ্ন-জগৎ থেকে আস্তে আস্তে ভেসে আসিতেছিল। আমি ঠিক বলিতে পারিতেছিলাম না, তাহার কতখানি আমার জীবন্ত অভিজ্ঞতার ভিতর—আর কতখানি বাহিরে। সে সময় আমার কোন কিছুর দিকেই টান ছিল না। তাই মিলানে গিয়া জনতা দেখিলে, কোন নির্জ্জন রাস্তার দিকে চলিয়া যাইতাম। দেখিতাম যে, বড় সহরেই খুব বেশী নির্জ্জনতা লাভের সম্ভাবনা। এখানে কেহ কাহাকে চেনে না, দেখে না। তবে পথের মধ্যে হঠাৎ কখন কোন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেই মুস্কিল। খানিক দাঁড়াইয়া দস্তুরমত অনেক আজে বাজে বকিতে হয়। আমারও তাই হইল। একদিন মিলানের রাস্তায় দেখি, বেশ ফিটফাট পোষাকপরা একটি লোক রাস্তার ওপার থেকে তাহার চশমার ভিতর দিয়ে, আমার দিকে একটু বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে। আমি দেখিয়াই বুঝিলাম এ রভারবেল। রভারবেলের সঙ্গে একবার সুইজারলাণ্ডের এক হোটেলে ছিলাম। রভারবেল বলিল—"কি, তুমি যে!" আমি বলিলাম—"কি রভারবেল যে?"

রভারবেল অমনি বক্ বক্ ক'রে বকিতে আরম্ভ করিল ও আমার কাণে তাহার স্বর উচ্চিঙ্গের আওয়াজের মত রি রি করে পৌছিতে লাগিল। আমি তাহার কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া, রাস্তার এধার ওধার তাকাইতে ছিলাম। এমন সময়ে দেখি, একটি বাড়ীর জানালা থেকে একজন রমণী আমাদিগকে দেখিতেছে। রভারবেল অমনি বলিয়া উঠিল—"ও ঐ জন্যেই বুঝি আমার কথা কাণে যাচ্ছে না। ও স্ত্রীলোকটি কে জান? আহা, ওর চোখের দৃষ্টি না পেলেই ভাল ছিল।"

আমি বলিলাম—"কি রকম?"

"জাননা বুঝি। ইতিহাস একটু নূতন রকমের। ও রবার্টস বলিয়া একজন ইংরেজের মেয়ে। অন্ধ হইয়াই

ও জন্মায়। ছেলে বেলায় ওর মা মরিয়া গেলে, রবার্টস্ মেয়েকে নিয়ে সামুনিতে চলে যান। সেখানে মোনোয়ার বলিয়া একজন চক্ষু-চিকিৎসক মেয়েটির চোখ ভাল করিয়া দেন। তারপর মিলানে আসিয়া রবার্টসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েটি একজন বিদেশীকে বিবাহ করে। সে কিন্তু জুয়াচোর। সে উহার টাকা-কড়ি লইয়া উহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, সামুনিতে নাকি এক অন্ধের সহিত উহার বিবাহের কথা হইয়াছিল।"

আমি বুঝিলাম—এই সেই ইউলালি। হায় জারভে! তখন ইউলালির উপর আমার কেমন একটু ঘৃণা হইল। ইউলালি এখন জারভের উপর যে অবিচার করিয়াছে, তাহার কি প্রতিশোধ পাইয়াছে? সে বড়লোকের মেয়ে, তাহার টাকা-কড়ির অভাব নাই। কিন্তু মানুষের জগৎ শুধু ভোগসুখ নিয়ে নয়। আল্পসের উপত্যকায় যখন সে এক পাথরের উপর বসিয়া তাহারই মতন একজন অন্ধের জীবনের ভাগ পাইয়াছিল, তখন কি সে এই মিলানের প্রাসাদের সব দীপ্তির চেয়ে বেশী কিছু পায় নি? হয় ত তাহার মনে হইতেছে, তাহার চোক দুটি অন্ধ থাকিলেই ভাল হইত। আমার বোধ হয়, আমরা যদি কাহারও জীবনের কোমলতা নিংড়াইয়া কর্কশ করিয়া ফেলি, যদি কাহারও সকল ইচ্ছা, সকল আশা শুকাইয়া ফেলি, তা হ'লে হাজার ঐশ্বর্য্যের ভিতর হইতেও যেন মাঝে মাঝে কি নৈরাশ্যের ধ্বনি প্রমোদ-কল্লোলের ভিতর দিয়া, মমির হাসির মতন কাণে আসিয়া পৌঁছে। জগতের ইতিহাসে এক সময় আসিয়াছিল, যখন পাপের শাস্তি এই জীবনেই হয়, এই রকমের একটি প্রবাদ চলিত। তখন পাপপুণ্য এই দুটি কথায় দুর্ভেয় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝানর চেষ্টা হইয়াছিল। তারপর যতই মানুষের দিন যাইতেছে, যতই লোকে বুঝিতেছে, সনাতন পাপ নাই, সনাতন পুণ্য নাই, ততই লোকে দেখিতেছে, সোজা কথায় জটিল রহস্য আপাততঃ সরল করিয়া লাভ নাই। পাপের শাস্তি, পুণ্যের জয় এই রকমের সাদাসিদে মন্ত্রে আর নির্ম্মম ভাগ্য-দেবতার পূজা হয় না। বিজ্ঞান বলিতেছে—প্রত্যেক একজন মানুষের ভিতর হাজার হাজার নরনারী নিহিত রহিয়াছে, বাহিরের এক একটি শষ্প-দলের সঙ্গে সঙ্গে এই এক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়। যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু ঘটিবে, সকলেরই ছাপ এই ভিন্ন ভিন্ন আত্মার মধ্যে চিরকাল থাকিবে। তাই জীবনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনাও আমাদের বড় সুখের মধ্যেও মর্ম্মন্তুদ বেদনা জাগাইয়া দেয়। ইউলালির জীবনে সে বিজ্ঞানের এই কথাটি না জানিয়াও ইহার সার্থকতা বোধ করিতেছিল। সে ঘটনাক্রমে একবার আল্পসের উপত্যকায় আসিয়া যে নূতন আঘাত, নূতন বোধ লাভ করিয়াছিল,—যে আঘাত, যে বোধ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন আত্মার কম্পন প্রণালী, চিরকালের জন্য অন্য ধাঁজের করে দিয়ে গিয়েছে। তাই সে ভাবিতেছে, হয়ত তাহার চোখ হইতে অন্ধকারের পরদা না সরিলেই ভাল হইত। আলোর চেয়ে অন্ধকারের ভিতর শান্তি আছে।

খানিক পরে ইউলালি গেটের কাছে নামিয়া আসিল। আমি বাচাল রভারবেলের কাছ থেকে যেন অব্যাহতি পেলাম। ইউলালির নিকট গিয়া বলিলাম—"তুমি জারভে বলিয়া একজন অন্ধকে জান?" হঠাৎ ইউলালির মুখ কেমন অন্ধকার হ'য়ে গেল। বিদ্যুৎ চম্‌কে গেলেই পরে আকাশ যে রকম বেশী অন্ধকার হ'য়ে যায়, সেই রকম। সে পড় পড় হ'ল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। খানিক পরে দেখি রভারবেল চলে গিয়েছে।

কিছুদিন পরে আবার সামুনিতে ফিরে গেলাম। এক বছর আগে এমনি এক আলোয়ভরা গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় এই আল্পসের উপত্যকায় আসিয়াছিলাম। সেদিনের মত আজও আল্পস নীল ও কত রকমের ফুল ঘাসের মধ্যে ফুটে উঠেছে; বাতাসে তেমনি পাহাড়ে গোলাপের গন্ধ, আরভেরন তেমনি এক কুল কুল শব্দ করিয়া যাইতেছে; নিকটেই সেই অন্ধের পাথরখানা পড়ে রয়েছে। কিন্তু জারভে সেখানে নাই। আমি বার দুই 'জারভে' 'জারভে' বলিয়া ডাকিলাম; কেহই উত্তর দিল না। খানিক পরে যে বৃদ্ধা জারভেকে মানুষ করিয়াছিল, সে আসিল।

আমাকে দেখিয়াই বলিল—"ও! আপনি আবার ফিরে এসেচেন?" আমি বলিলাম—"জারভে কোথায়?" বুড়ী বলিল—"কাল জারভে এখানে একা আসিয়াছিল কিন্তু তারপর—"আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর সে কি ঘরে ফেরেনি?" বৃদ্ধা বলিল—"না মহাশয়! আমি

তাহারই খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছি। আপনি যে কুকুরটি তাহাকে দিয়াছিলেন, সে কুকুরটি আপনি চলিয়া যাওয়ার আট দিন পরেই অন্ধ হইয়া গেল। জারভের যেন কুকুরটির উপর আরও মায়া বাড়িল। সে রোজ সেই অন্ধ কুকুরটির সঙ্গে কত গল্প করিত। অনেক আগে একটি অন্ধ মেয়েকেও জারভে ঠিক এমনি ভালবাসিয়াছিল। আজ দিনকতক হইল, রভারবেল বলিয়া এক বিদেশী এখানে বেড়াতে আসেন। জারভের সঙ্গে তাঁহার কি কথা হইল। তারপর থেকে জারভে কেমন বেশী অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল। কালকে সে সন্ধ্যার সময় আমাকে বলিয়াছিল—"মা, আজ আমি পক্‌কে সঙ্গে নিয়ে যাব না, তুমি একে একটু দেখ। তারপর সে এখনও ফেরেনি।"

পক্ আমার গলার স্বর শুনে আমার কাছে ছুটে এল। আমি তাহার চোখের ওপরকার রোঁয়া সরাইলা দেখিলাম—তার চোখ ছুটি ঘোলা ঘোলা হ'য়ে গিয়েছে, সে আমার হাত চাটিতে লাগিল ও ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। আমি পক্‌কে বলিলাম—"তোমার নূতন মনিব কোথায় গেল। তাঁহাকে খুঁজে আন্‌তে পার?" বলিতে না বলিতে পক্ আরভেরনের তীরের দিকে ছুটিয়া গেল। খানিক পরে ঝপাং ক'রে একটা শব্দ হ'ল। আমি শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখি—আরভেরনের এক জায়গায় জল তখনও তোলপাড় করছে, কাছেই একটা নীলকোর্ত্তা ভাসিতেছে।

সেদিন আরভেরনের কালজল যেন আরও কালো হ'য়ে উঠেছিল। জারভে প্রকৃতির নির্জ্জন-কোলে তাহার জীবনের শেষ স্বপ্ন দেখিতেছিল। *

---

* Les Avengles de Chamouny—C. Nodier. অবলম্বনে অনুবাদিত।

সন্ধান

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

(১)

আমি শুধু আমায় ভুলে'
খুঁজ্‌তে তোমায় চাই,
ভোরের বাতাস যেমন করে'
খোঁজে সকল ঠাঁই।

(২)

খুঁজ্‌তে তোমায় চাই গো আমি
একলা আপন মনে
সাঁজের বায়ু খোঁজে যেমন
স্তব্ধ কুঞ্জ বনে।
কোথায় শ্যামলিমার মাঝে
কোমল তনু লুকিয়ে রাজে
গোলাপ রাণী, আনন খানি,
লাজের আবরণে।
গন্ধ, শুধুই গন্ধে খোঁজে
মাতাল সমীরণে!

(৩)

সাধ মেটে না শুধুই ওগো
পেয়ে তোমার সাড়া,
দেখ্‌ব খুঁজে মানুষ আমি
মুগ্ধ মৃগের পারা।
মৃগ নাভির গন্ধে মাতি'
খোঁজে যেমন পাতি পাতি;
আমার মাঝেও তোমায় ওগো
খুঁজ্‌ব আত্মহারা,
কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ
ওগো সবার বাড়া!

পাপের আদিধারণা

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.]

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.

ব্যাধির উৎপত্তি হইতেই যেমন স্বাস্থ্যের তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, তদ্রূপ পাপের উৎপত্তি হইতেই নৈতিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব সকল নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং পাপের প্রথম অনুভূতির ইতিহাস জানিতে পারিলে, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের প্রথম সূত্রপাতের ইতিহাসও আমরা জানিতে পারিব। এই প্রবন্ধে পাপের সেই প্রথম ইতিহাসের সন্ধান লইবার জন্যই আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পৃথিবীর অপর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা বাইবেল ধর্ম্মেই পাপের প্রথম উৎপত্তির ইতিহাস পরিষ্কাররূপে সংরক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মমতেই মনুষ্যের প্রথম পাপ Original sin (আদিপাপ) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই আদি পাপের ফলেই মনুষ্যের আদি পিতামাতা আদম ও ইভকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়। ইহাই Fall of Adam বলিয়া বিদিত।

আদমের অধঃপতনের যে বিবরণ আমরা বাইবেলে প্রাপ্ত হই, তাহাই আমরা পাপের রূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পাপ করিলে, আমাদের অধঃপতন হয়, ইহাই এই রূপকের প্রকৃতমর্ম্ম।

পাপের বাচক প্রাচীন শব্দসকলের মূলার্থের অনুধাবন করিলেও পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক সত্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সংস্কৃতে পাপের বাচক 'পাতক' শব্দ পত ধাতু হইতে জাত; 'পত' ধাতু স্পষ্টই পতনার্থের দ্যোতক। সুতরাং 'পাতক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়—'যাহা পাতিত করে'।

বেদে পাপবাচক যে 'নির্ঋতি' শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইতে 'পাতক' কিরূপ পতন বুঝা যায়, তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। 'নির্ঋতি' শব্দ 'নির' ও 'ঋতি' এই দুইটি শব্দদ্বারা গঠিত। 'ঋতি' ঋধাতু হইতে উৎপন্ন। ঋ-ধাতুর অর্থ গমন; সুতরাং 'ঋতি' শব্দের ধাতুগত অর্থও গতি হয়। গতি অর্থ হইতে ঋতি শব্দের 'পথ' অর্থ সহজেই হয়। এই ঋতিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রকৃতপথ। ঋত শব্দে যে সত্য বুঝা যায়, তাহাতেও এই পথকে সত্যপথ বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় right শব্দটি ঋত শব্দেরই অপভ্রংশ। পাশ্চাত্য ভাষায় right course বলিতে যাহা বুঝায়, ঋতি শব্দেও তাহাই বুঝায়। ঋতি বা প্রকৃতপথ হইতে দূরাপসরণই 'নির্ঋতি' শব্দের অর্থ।

পাপপর্য্যায়ভুক্ত এনস্, অঘস্ অংহ প্রভৃতির ধাতুগত অর্থও গতি; তাহা হইতেই ইহাদের 'বিপথ গমন' অর্থ হইয়াছে।

এই প্রকারে প্রকৃতপথ বা সত্যপথ হইতে পতনই যে পাতক শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই যে পাপের এই আদি পতনার্থের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, কিন্তু বিভিন্ন বহু প্রাচীন ভাষাতেই ইহার নিদর্শন বিদ্যমান দেখা যায়। এসম্বন্ধে

'বেদের শিক্ষা' ('The Teaching of the Vedas)' নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকপ্রবর ফিলিপ্‌স্ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"The Aryan's infantile notion ofsin, is forcibly expressed in the terms which they used to denote it. These terms are pâpa, * from root pat, to "fall" 'to fall down'; aghas, Gr. ayos, enas and amhas, from roots signifying first 'to go,' and then 'to go astray' "miss the mark". 'Nirriti', and the word for sin, which was afterwards personified as a power of evil or destruction, is derived from the same root which yields 'rita' in the sense of right; and 'nirriti' means not right or a deviation from the right path. Sin there fore, according to the earliest conception of the Aryan mind, is a fall from a higher to a lower moral state, a deviation from the path of duty, a missing of the mark of moral excellence once set before the mental Vision. The same ideas are conveyed in the Tamil (Turanian) words Tappu, Tappidam, and Kuttam, sin, fault. pp. 142-3.

"আর্য্যগণ পাপ বুঝাইতে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন, তৎসমস্তেই পাপসম্বন্ধে তাঁহাদিগের শৈশবসংস্কার দৃঢ়রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পতন বা অধঃপতনার্থক পত ধাতুমূলক পাপ (পাতক) অঘস্, (গ্রীক্—অয়োস্,) এনস্, অংহস্, এই সমস্তই সেই সমস্ত শব্দ। শেষোক্ত শব্দসকলের মূল-ধাতু গতি-অর্থ প্রকাশ হইতে বিপথ-গমন, লক্ষ্যভ্রংশ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। গ্রীক্, পেট্, লাটীন্ পেক্, ওয়েলশ্ পেক্, হিব্রু পাশ্ প্রভৃতি শব্দ পাপশব্দেরই অনুরূপ। নির্ঋতি অপর একটি পাপবোধক শব্দ। ইহা পরে পাপদেবতারূপে পরিণত দেখা যায়। সত্য অর্থে 'ঋত' যে মূল হইতে উৎপন্ন—ইহাও সেই মূল হইতেই উৎপন্ন। 'নির্ঋত' 'যাহা ঋত নয়' বা 'যাহা সত্যপথ হইতে দূরবর্ত্তী' তাহাই বুঝায়। সুতরাং আর্য্যমনের প্রথম ধারণানুসারে পাপ—উচ্চনৈতিক অবস্থা হইতে নিম্ননৈতিক অবস্থায় পতন বুঝায়; কর্ত্তব্যপথ হইতে বিপথগামী হওয়া বুঝায়, মানসচিত্রে অঙ্কিত নৈতিক উৎকর্ষের লক্ষ্যলাভে অকৃতকার্য্য হওয়া বুঝায়। পাপ ও অপরাধ-বোধক তামিল (টুরাণীয়) তাপ্‌পু, তাপ্পিদম্, ও কুট্টম্ শব্দ সকলে সেই অর্থই প্রকাশিত হয়।"

* Gr. Pet. Lt. Pec. Welsh Pech, Heb. Pasha.

পাপের একার্থক 'পাতক' শব্দের পূর্ব্বোল্লিখিত পতনার্থের আলোচনা হইতে মনুষ্যের অধঃপতন উপাখ্যানের মূলবীজ যে, এই পাতকশব্দের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই ভাষার প্রমাণ কখনও উপেক্ষণীয় নহে, ইহা শিলালিপির প্রমাণ অপেক্ষাও নির্ভর-যোগ্য। মিশনরীপ্রবর ফিলিপ্‌স্ পাতক শব্দের পতনার্থের মধ্যে মনুষ্যের অধঃপতন-উপাখ্যানের মূল নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, ভাষার প্রমাণের প্রকৃত মর্য্যাদা যেরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই বিশেষ প্রণিধানের বিষয় হওয়া উচিত। আমরা নিম্নে তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Words are fossilised thoughts, and their testimony respecting the earliest conceptions of the human mind is as valuable as the testimony of the rocks respecting structure of animals which have long become extinct. What a marvellous confirmation of the Fall of man mentioned in the third chapter of Genesis, we have in the words used for 'sin' in the Semitic Aryan, and Turanian languages.'

—"The Teaching oft he Vedas" by Murice Phillips—p. 143.

"শব্দসকল প্রস্তরীভূত চিন্তা। যে সমস্ত জন্তু বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের গঠন সম্বন্ধে প্রস্তরের প্রমাণ যেরূপ মূল্যবান্—মনুষ্যমনের প্রাচীনতম ধারণা সম্বন্ধে শব্দ-সকলের প্রমাণও তদ্রূপই মূল্যবান্। বাইবেলের 'সৃষ্টি-প্রকরণের' তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত মনুষ্যের অধঃপতন উপাখ্যানের কিরূপ বিস্ময়জনক পোষকতা আমরা সেমেটীক্, আর্য্য ও তুরাণীয় ভাষায় পাপবোধক শব্দ সকলে প্রাপ্ত হই!"

কেবল যে ভাষাপ্রমাণেই আমরা "পাতক"শব্দে পাপের প্রথম অনুভূতির ইতিহাস নিবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহা নহে; কিন্তু এইসম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থায় সেই ইতিহাস আরও পরিষ্কাররূপে মুদ্রিত দেখিতে পাই।

পাপের দ্বারা প্রকৃত উৎকর্ষ হইতে পতন হওয়ার ধারণা হইতেই স্মৃতিশাস্ত্রে পাপকারী সম্বন্ধে 'পতিত' 'পাতিত্য' প্রভৃতি শব্দ, বহুল প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাপ-জনিত নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অধঃপতনের ভাব হইতেই সামাজিক দুষ্কার্য্যহেতু ও দুষ্কৃতকারীকে সমাজে 'পতিত' বলিয়া পরিগণিত হইয়া স্বকীয় পদমর্য্যাদার লঘুতা ভোগ করিতে হয়। প্রকৃত উৎকর্ষে অবস্থিত থাকিয়া যাহাতে পাপের দ্বারা পতন না হইতে পারে—তজ্জন্যই আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ও সামাজিক সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শসকল আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সমস্ত আদর্শের যথোচিতরূপে অনুসরণ করিতে না পারিলেই আমরা 'পতিত' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকি।

পাপীদিগের অধোগতি হয় আর পুণ্যাত্মাদিগের ঊর্দ্ধগতি হয়, এই সংস্কারের মূলেও পাতকের অধঃপতনের ধারণাই বর্ত্তমান। পাপের দ্বারা যদি অধঃপতন হয়, তবে পুণ্যের দ্বারা অবশ্যই উর্দ্ধগতি হইবে, এই সহজ যুক্তি হইতেই পূর্ব্বোক্ত সংস্কারের উৎপত্তি হয়। গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহারই আভাস পাওয়া যায়:—

"উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥"

—১৮-১৪শ অধ্যায়।

"সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকে, আর নিকৃষ্টগুণাবলম্বী তামসেরা অধঃপথে গমন করে।"

স্বর্গ উর্দ্ধলোক ও নরক অধোলোক বলিয়া প্রতীতি যে, পূর্ব্বোক্ত সংস্কার হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে—তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রাগুক্ত 'উর্দ্ধ' ও 'অধঃ' ধারণার অনুসরণেই 'উন্নতি' 'অবনতির' ধারণা সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সংস্কৃত 'পাতক' শব্দের পতনার্থের সহিত আমাদের সামাজিক, নৈতিক, ও ধর্ম্মজীবনের যে মূল সংযোগ আমরা উপরে প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা হইতে বাইবেলের উক্ত মানবের পতন যে একদিনের পতন নহে, ইহা যে মানবের নিত্যপতনেরই রূপক, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

মানবপিতা আদমের আদিপাপ (original sin) মানবসন্তানে সংক্রামিত হওয়া সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্রের যে নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাও আদমেরই পতন যে একমাত্র পতন নহে পরন্তু চিরদিনই যে আদমের ন্যায় মানবের পতনের সম্ভাবনা আছে, তাহা স্পষ্টরূপেই সপ্রমাণ করে।

বাইবেলের পাপের ধারণা, ভারতীয় পাপের ধারণা দ্বারা যেরূপ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ভারতীয় শাস্ত্রে পাপের পতনার্থমূলকধারণা যেরূপ বিশদ হইয়াছে, তাহাতে ভারতেই যে এই ধারণার মূল উৎস, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে।

সুন্দর মহান্

[শ্রীবিশ্ববন্ধু মিত্র]

(রমণী)—এ সৌন্দর্য্য, বিধাতাও বিচলিত
হয় যাহা হে'রে;
এত গর্ব্ব তাপস তোমার?
চাহিলে না ফিরে!

(তাপস)—কণামাত্র রূপ লয়ে যার, গর্ব্ব তুমি
কর'গো সুন্দরি!
সে যে সুন্দর মহান্, আমি যে গো
পূজারী তাঁহারি।

সেকালের ডেপুটী

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

(১)

হীরালালবাবুর পিতা মুক্তালালবাবু, বল্লভপুরের নীলকুঠীর দেওয়ানী করিয়া,ধনে মানে হরিপুর পরগণার মধ্যে 'দিগ্‌গজ' হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুক্তালালবাবুর শ্যালক ভজহরি বলিত, "আমার ভগিনীপতি মাসে দেড়টা সদরালার সমান পয়সা উপার্জ্জন করেন।" বস্তুতঃ, কুঠীর দেওয়ানী করিয়া, যেদিন মুক্তালালবাবুর কণ্ঠবিলম্বিত হরিনামের ঝুলিটি ঘুষের টাকায় পূর্ণ না হইত, সেদিন 'মালাজপ' মাঠে মারা গেল বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইত। হরিনাম করিয়া ঝুলি যদি টাকায় ভরিয়া না গেল, তাহা হইলে হরিনাম করিয়া ফল কি?—যাহা হউক, কয়েক বৎসর চাকরী করিয়া মুক্তালালবাবু দুই সিন্দুক টাকা ও তিনখানি তালুক সঞ্চয়পূর্ব্বক সজ্ঞানে গঙ্গা-লাভ করিলেও, তাঁহার একমাত্র পুত্র হীরালাল তাঁহার 'কানুন্‌গো-গিরি' চাকরীটির মায়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতার মুরুব্বি কোদাল্‌কাটি 'কান্‌সার্ণে'র ম্যানেজার জনষ্টন্ সাহেবের সুপারিসে হীরালাল সবডেপুটীর পদে উন্নীত হইলেন। উপরওয়ালা হাকিমদের বশ করিবার মন্ত্র হীরালালের অজ্ঞাত ছিল না; তিনি মহকুমার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কমিশনার সাহেব পর্য্যন্ত সকলকে 'মাই লর্ড' বলিয়া সম্বোধন করিতেন; এবং পঞ্চাশ গজ তফাতে জুতা খুলিয়া নগ্নপদে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া বাদশাহী কেতায় কুর্ণিশ করিতেন; উপরওয়ালা হাকিমেরা তাঁহার এই অতিভক্তি সাধুর লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতেন। একালের হাকিমেরা তাঁবেদারের নিকট এতখানি খাতির সম্মান পান না বলিয়া অনেকেই চটিয়া যান।

হীরালালের কার্য্যদক্ষতাও প্রশংসনীয় ছিল। সুতরাং তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনেক উচ্চ 'গ্রেডের' পক্ক-কেশ সবডেপুটীকে ডিঙ্গাইয়া, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটি লাভ করিয়া বাঙ্গালী জন্ম সফল ও ধন্য করিলেন। তখন গ্রামের মহা-মহোপাধ্যায় প্রাচীন বাচস্পতি খুড়া বলিলেন, "পুত্রে যশসি তোয়েচ নবাণাং পুণ্যলক্ষণম্'—না হবে কেন, ছেলে কার? মুক্তালাল দাদা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।"

(২)

কয়েক বৎসর সদরে ডেপুটীগিরি করিয়া হীরালালবাবু মামুদনগর সবডিভিজানের ভার পাইলেন, এবং সেই বারই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'হীরক জুবিলি' উপলক্ষে 'রায় বাহাদুর' নামক বাঙ্গালা-দুর্ল্লভ খেতাবটি ব্যক্তিগত মর্য্যাদার নিদর্শন-স্বরূপ আজীবনকাল ভোগ করিতে পাইলেন। তাহার পরদিন হইতে হীরালালবাবুর পুত্র জহরলালের বন্ধু-গণ তাহাকে 'কুমার জহরলাল চট্টোপাধ্যায়' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া, তাহার লাঙ্গুল স্থূল করিয়া দিল। ডেপুটী হীরালাল চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের পুত্র কুমার জহরলাল চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এল.-এ. পড়িত।

হীরালালবাবু মামুদনগর সবডিভিজানের ভার পাইবার পূর্ব্বে এই সবডিভিজানে সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। মফস্বলের লোক 'রাঙ্গামুখো' ম্যাজিষ্ট্রেটকে যেমন ডরায়—

ভতো বাঙ্গালী হাকিমকে তেমন ডরায় না ; এমন কি সময়ে সময়ে তাহার সহিত তর্ক করে ও মুখের উপর জবাব দেয়। বিশেষতঃ, মামুদনগর সবডিবিসানের এলাকায় কয়েকজন ইংরাজ কুঠিয়াল ছিলেন ; তাঁহাদের আপত্তি সত্বেও গবর্ণমেণ্ট হীরালালবাবুকে সবডিবিসানের কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। হীরালাল বুঝিলেন, এমনভাবে কাজ চালাইতে হইবে, যাহাতে কুঠিয়ালেরাও খুসী থাকেন, জন সাধারণও অসন্তুষ্ট না হয়।

হীরালাল নিষ্ঠাবান হিন্দুর পুত্র ; কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। অনেক দিন হইতে তাঁহার মাথায় একটি ছোট টিকি ছিল, টিকিটি পুচ্ছ সঙ্কোচ করিয়া চুলের মধ্যে মিশিয়া থাকিত। একদিন পুলিস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কিম্বারলি সাহেব, হঠাৎ তাহার এই কেশগুচ্ছের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে 'হিদেন' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন ; সেই দিন রাত্রিতেই হীরালাল গৃহপ্রাচীরবিলম্বিত দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কাঁচির সাহায্যে টিকির মূলোচ্ছেদ করেন, এবং চোগাচাপকানের পরিবর্ত্তে 'র‍্যাঙ্কেনের' দোকানে হ্যাট, কোট, টাই, কলার প্রভৃতির 'অর্ডার' পাঠাইয়া দেন। সপ্তাহ অতীত না হইতেই সবডিবিসানের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, ডেপুটী বাবু চোগা চাপকান ও 'সামলা' ছাড়িয়া হ্যাটকোটে মজ্‌গুল হইয়াছেন।—পূর্ব্বে তিনি কুশাসনে 'আসনপিঁড়ি' হইয়া বসিয়া, পুঁইশাকের চচ্চড়ি ও কাঁচা কলায়ের ডাল দিয়া দক্ষিণ হস্তে ভাতের গ্রাস সপাসপ উদরগহ্বরে নিক্ষেপ করিতেন ; কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি টেবিলে আহার ধরিলেন, উভয় হস্তে কাঁটা-চামচে ও ছুরীর ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। একদিন তাঁহার কোর্টের প্রবীণ মোক্তার সদাশিব বাবু তাঁহার খাস্ কামরায় কাঁটা চামচে ও পিরিচ-পেয়ালার পত্তন দেখিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিলেন, "হুজুরের এ যে কেঁচে গণ্ডূষ দেখিতেছি !"

হুজুর বৃদ্ধ মোক্তারকে শ্রদ্ধা করিতেন, কারণ মোক্তার মহাশয় প্রথম যৌবনে তাঁহার পিতার সহিত এক কুঠিতে চাকরী করিতেন, ও তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন।— সুতরাং মোক্তারবাবুর অনধিকার চর্চ্চা তিনি প্রসন্ন মনে ক্ষমা করিয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "বুঝেছেন সদাশিব বাবু, যেখানে যেমন, সেখানে সেই রকম ব্যবস্থা করিতে হয়। এ সবডিবিসানে চিরদিন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট-রাই হাকিমী করে গিয়েছেন, সাহেবেরা আমার খুব খাতির করেন বলেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এখানে হামেসা সাহেব সুবোর সঙ্গে দেখা হবে, তাদের নিমন্ত্রণ আস্‌টাও করতে হবে, 'পজিসন' বজায় রাখতে চাই, কাজেই কাঁটা-চামচে ধরতে হয়েছে।"—প্রতিভাশালী হীরালাল বাবু কিছুদিনেই কাঁটা চামচে চালনে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিলেন। নিষিদ্ধ মাংসেও আর তাঁহার আপত্তি রহিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একদিন তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদেও 'অফিসিয়েট' করিতে পারেন,—তখন ? ইহকালটা যে পরকালের আগে, ইহা বুঝিতে তিনি কোনও দিন গোলে পড়েন নাই।

কুঠিয়াল ব্রাউন সাহেব বড় রসিক ছিলেন। ডেপুটী হীরালালবাবু জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ারে বসিয়া ভোল বদল করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে একদিন অপদস্থ করিতে সাহেবের ইচ্ছা হইল। একটা সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিল। ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের কিছু পূর্ব্বে কালেক্টার নিউবোল্ড সাহেব মামুদনগর সবডিবিসানে সফরে আসিয়া সরকারী 'ইনস্‌পেক্‌সন বাঙ্গালায়' আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। নিউবোল্ড অত্যন্ত ন্যায়বান ও ধর্ম্মভীরু ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমা দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া, মহকুমার জমাদারেরা তাঁহাকে বড় বড় ডালি পাঠাইতে লাগিলেন ; ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেরই ডালি ফেরত দিলেন।—কিন্তু তিনি স্বদেশীয় নীলকর ব্রাউন সাহেবের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

ব্রাউন সাহেব কাঁকুড়গাছি কুঠির ম্যানেজার। প্রকাণ্ড কুঠি, ধূমধামও সেই রকম। মহকুমা হইতে কুঠি আট ক্রোশ দূরে।—ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কুঠি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইল। রেলের ষ্টেশন হইতে ডাক বসাইয়া 'পেলেটী'র হোটেলের উপাদেয় খানা ও কেল্‌নারের দোকান হইতে দেবভোগ্য সুধা আনীত হইল। দিগরে যত 'কুঠেল সাহেব' ছিলেন, সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। সব-ডিবিসনাল অফিসের মহকুমার কর্ত্তা ; বাঙ্গালী হইলেও তিনিও নিমন্ত্রিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইবেন শুনিয়া, হীরালালবাবু পূর্ব্ব হইতেই কুঠিতে মোতায়েন রহিলেন। ব্রাউন্ সাহেব মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। হীরালাল বাবু ব্রাউন সাহেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইলেন।

অপরাহ্ণে দেওয়ানজি ব্রাউন সাহেবের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডেপুটী বাবুর খানার বন্দোবস্ত কিরূপ হইবে?"

ব্রাউন সাহেব বলিলেন, "লোকটা শুনিয়াছি খাঁটী হিন্দু; কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে; উহার আহারের বন্দোবস্ত তোমার বাসায় হইবে; আমি তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আয়োজনের যেন কোনও ত্রুটী না হয়। যাহা যাহা আবশ্যক, কুঠি হইতে লইয়া যাইবে।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "তিনি আপনার অতিথি, আপনি তাঁহাকে এ কথা না বলিলে, কি আমার বলা ভাল দেখাইবে?"

মিঃ ব্রাউন্ বলিলেন, "ভেরি গুড! তুমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বল, আমার এখানে তাঁহার হিন্দুয়ানী রক্ষার সুবিধা হইবে না; তাই তোমার বাসায় তাঁহার আহারের যোগাড় করিয়াছি। খৃষ্টানের বাড়ীতে ব্রাহ্মণকে খাইতে বলিলে, তাহার অপমান করা হয়। ভদ্রলোককে অপমানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমার বাৎ সমঝাইয়াছ?"

দেওয়ান্ বলিলেন, "হাঁ হুজুর! আমি ডেপুটী বাবুর তাম্বুতে চলিলাম।"

রায়বাহাদুর হীরালালবাবু তখন তাম্বুর বাহিরে 'ডেক চেয়ারে' বসিয়া অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ আলোকে কি একখানি বিলাতি 'নভেল' পাঠ করিতেছিলেন।—দেওয়ানজি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই হীরালালবাবু কেতাবখানি কোলে ফেলিয়া মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?"

দেওয়ান্ মহাশয় সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাকে ব্রাউন সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

শুনিয়া ডেপুটীবাবুর ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাউন্ সাহেবের কামরায় আজ কোন্ কোন্ সাহেবের নিমন্ত্রণ আছে?"

দেওয়ানজি সেই দিগরের সাতজন কুঠিয়াল সাহেবের ও খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম বলিলেন।

হীরালালবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ দেওয়ান্, সেকেলে বুড়োদের মত খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আমার কোনও রকম 'প্রেজুডিস্' নাই; সাহেবকে আমার সেলাম দিয়া বল—তাঁহার টেবিলেই আমার আহার চলিবে; আমার আহারের ভিন্ন রকম ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমার আহারের অসুবিধা হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, তিনি যে তোমাকে আমার কাছে লোক পাঠাইয়াছেন, এ জন্য তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইবে।—'অল্ রাইট', এখন যাইতে পার।"

ডেপুটীবাবু পুনর্ব্বার 'ক্যাম্বিসে' পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া উপন্যাস দৃষ্টিসংযোগ করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মন তখন কিঞ্চিৎ চিন্তিত।—তিনি মনে মনে বলিলেন, "তাই ত! সব্‌ডিভিসনাল অফিসার আমি; হ্যাট্‌কোট্, সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চাম্‌চে ধরিয়াছি, তাম্বুতে বাস করিতেছি, তবু সাহেবরা আমার সঙ্গে বসিয়া খাইতে ইতস্ততঃ করে! —সাহেবরা জানে না, জাত এখন আমার পকেটে!"

দেওয়ান্ যথাসময়ে ব্রাউন্ সাহেবকে তাঁহার দৌত্য-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; সকল কথা শুনিয়া সাহেবের রৌদ্রদগ্ধ লালমুখ তিনগুণ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বিরক্তিভরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "কি বেয়াদব!—উহার জাতি যাইবে ভাবিয়া, আমি তোমার বাড়ীতে উহার খাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম! কিন্তু দেখিতেছি, উহার জাতির ভয় নাই, ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া যে খানার লোভে সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, ভিন্ন জাতির উচ্ছিষ্টভোজী হইতে পারে,—সে মহকুমার হাকিম হইলেও, আমি তাহাকে আমার 'ডিনর টেবিলে' স্থান দিতে পারি না।—তবে সে আমার খানা খাইয়া পরকাল নষ্ট করিতে চাহে, আমার তাহাতে আপত্তি নাই; তুমি আমার খানসামাকে বল—আমার গোসলখানার মধ্যে একটা ছোট টেবিল দিয়া হীরালালকে খাইতে দেয়। 'হ্যাম্, অক্স্-টং' প্রভৃতি যা যা আসিয়াছে, সব দিবার ব্যবস্থা করিও।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাহেবরা মজলিস্ ছাড়িয়া ডিনার-টেবিলে যাইবেন, এমন সময় দেওয়ানজি ডেপুটী-বাবুকে বলিলেন,—"আপনার ডিনারের যায়গা ঐ দিকে হইয়াছে,—আমার সঙ্গে আসুন।"

ডেপুটীবাবু অতিমাত্র বিস্মিত—কতকটা মর্ম্মাহত হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার অগ্রগামী ব্রাউনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।—মিঃ ব্রাউন্ তখন কালেক্টর বাহাদুরকে প্রধান অতিথিরূপে সঙ্গে লইয়া ভোজন-কক্ষের অভিমুখে

ধাবিত হইয়াছিলেন; ডেপুটীবাবুর করুণ দৃষ্টি তিনি লক্ষ্য করিলেন না।

ডেপুটীবাবু তখন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য দিকে আমার খাবার যায়গা হলো কেন?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "সাহেবের হুকুম। তিনি বলেন, আপনি নৈকষ্য কুলীনের ছেলে, এক টেবিলে আপনাকে লইয়া খাইলে আপনার জাতিপাত হইবে, ইহা তাঁহার ধর্ম্মে বরদস্ত হইবে না।"

ডেপুটীবাবু চটিয়া বলিলেন, "ওঃ, ভারি ত ধর্ম্মজ্ঞান! --তা কোথায় আমার খাবার যায়গা হয়েছে?"—

দেওয়ানজি বলিলেন, "সাহেবের ঐ গোসলখানায়।— আমি চেয়ার টেবিল, কাঁটা চাম্‌চে সবই যোগাড় করে রেখেছি। হুজুর সেখানে যাইবামাত্র ছিদাম মেথর আপনার খানা নিয়ে আস্‌বে।"

ডেপুটীবাবু নীলাভ মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছিদাম - কে?"

দেওয়ানজি অধিকতর বিনয়বিনম্রবদনে বলিলেন, "ছিদাম মেথর। আজ কাল সেই আমাদের এসিষ্টাণ্ট বাবর্চ্চি। বেটা জাতে মেথর বটে, কিন্তু শুনেছি রসুই করে যেন অমৃত! আপনি একদিন তার হাতে খেলে জীবনে তার আস্বাদন ভুল্‌তে পারবেন না। আমাদের গফরুদ্দীন বাবুর্চ্চি বলে,—ছিদাম এমন চমৎকার সাঁড়ের ডাল্‌না পাক করতে পারে যে—"

ডেপুটীবাবু হতাশভাবে বলিলেন, "আমার ক্ষুধা নাই।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "ক্ষুধা না থাকিলেও একবার বসিতে হইবে। আপনি যদি অনাহারে চলিয়া যান, তাহা হইলে সাহেব কি মনে করিবেন?—আর কালেক্টার সাহেবও ভাবিতে পারেন,—কি আশ্চর্য্য! এতবড় একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট--তাহার এত কুসংস্কার! দেখুন হুজুর,— আপনাকে বুঝাই, এরূপ আমার শক্তি নাই, আমার পক্ষে ত শোভাও পায় না। চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

গোসলখানায় বসিয়া হীরালাল-বাবু সাহেবী ডিনার আহার করিয়া, চতুর্ভুজ হইলেন কি না, জানিতে পারি নাই; কিন্তু তিনি ছিদাম-মেথরের রন্ধন-নৈপুণ্য জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

(৩)

মামুদনগরে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। হাতকাটা বড়লাট লর্ড হার্ডিং বড় বিদ্যানুরাগী রাজপ্রতিনিধি ছিলেন; ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের তিনি বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁহার আমলে বঙ্গদেশের অনেক নগরে ও গণ্ড গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।— মামুদনগরের এণ্ট্রেন্স স্কুলটিও সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং স্কুলটি বনিয়াদি।

কিন্তু সুদীর্ঘ কালেও এই বিদ্যালয়ের অট্টালিকা করিবার সুবিধা হয় নাই, খড়ের আটচালাতেই গ্রাম্য বালকেরা লেখাপড়া শিখিত।---কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর এই বনিয়াদি বিদ্যামন্দিরটি বহ্নার কুক্ষিগত হইল।-- অদূরবর্ত্তী গোপপল্লীতে সাঁজালের আগুন কেমন করিয়া রামচন্দ্রের ঘোষের পাঁচচালা ঘরের কঞ্চির বেড়ায় ধরিয়া যায়, তাহার সন্ধান না হইলেও সেই আগুন বহু গৃহস্থের খড়ের ঘর দগ্ধ করিয়া, অবশেষে বিদ্যালয়টিকেও ভস্মীভূত করিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাহায্যে শিক্ষক-মহাশয়েরা কয়েকখানি চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল ও বোর্ড ভিন্ন আর কিছুই বহ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

বিদ্যালয়টি দগ্ধ হওয়াতে গ্রামের অধিবাসিগণ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু গ্রামবাসিগণের অধিকাংশেরই অবস্থা সচ্ছল নহে, গ্রামে ধনাঢ্যের সংখ্যাও অল্প। স্কুল কমিটীর মেম্বরগণ সভা করিয়া চাঁদা-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; উদ্দেশ্য স্কুলঘরটি পাকা করিবেন। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও চাঁদার খাতায় ৯৭॥৶০ টাকার অধিক চাঁদা-স্বাক্ষর হইল না। চাঁদা সহি করিবার ভয়ে যে সকল গ্রামবাসী সভায় যোগদান করেন নাই, তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না; খাতা তাঁহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হইল না। বিদ্যালয়টি পাকা করিতে হইলে অন্ততঃ দুই হাজার টাকার আবশ্যক; ৯৭॥৶০ টাকায় কি হইবে? গ্রামবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের মনস্তাপের সীমা রহিল না। চারিদিকে দশ ক্রোশের মধ্যে আর একটিও এণ্ট্রেন্স স্কুল ছিল না; অথচ জেলার সদরে বা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ছেলে রাখিয়া, তাহাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন, এরূপ আর্থিক অবস্থা কয় জনের?—স্কুল কমিটীর মেম্বরেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া

অবশেষে সবডিভিসনাল অফিসার হীরালালবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। হীরালালবাবু সকল কথা শুনিয়া স্কুলের সম্পাদক মহাশয়কে বলিলেন, "মামুদনগর সবডিভিসনের এলাকায় এই একটি মাত্র এণ্ট্রেন্স স্কুল; মফঃস্বলে বড় লোকের অভাব নাই, তাহাদের নিকট চাঁদা আদায়ের কোনও চেষ্টা করিয়াছ ?"

স্কুলের সম্পাদক নীলকমলবাবু বলিলেন, "চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই হুজুর! এ এলাকায় যে সকল বড়লোক আছেন, তাঁহাদের সকলকেই পত্র লেখা হইয়াছে; কিন্তু চাঁদা দেওয়া দূরের কথা তাঁহারা পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই! সুবলপুরের হারাধন সা আমাদের এ দিগরের মধ্যে প্রকাণ্ড মহাজন; জমীদারী, মহাজনী, তেজারতী প্রভৃতিতে তাঁহার আয় বার্ষিক ৫০।৬০ হাজার টাকার কম নয়; তাঁহার নিকট কিছু চাঁদার প্রত্যাশায় চিঠি দিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম; তাঁহার ঘরের উকীল রাখালদাস বাবুও তাঁহাকে অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন, কিছু কোনও ফল হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'এবার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা বড় মন্দা। অজন্মা বৎসর—প্রজার ঘরে ভাত নাই, মাল গুজারী সংগ্রহ করিতেই তাঁহাকে বেগ পাইতে হইতেছে,—চাঁদা দিবেন কোথা থেকে ?—তিনি কিছুই দেন নাই।' "

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "বটে!—আর কোথাও লোক পাঠাইয়াছিলে ?"

সম্পাদক বলিলেন, "হাঁ হুজুর, দধিহাটের চৈতন্য চৌধুরী মস্ত বড় লোক। ছেলের অন্নপ্রাশনে তিনি থিয়েটার, যাত্রা, আর খেমটা নাচে সেবার পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের 'স্কুল-বিল্ডিং' কণ্ডে তিনি পাঁচ টাকাও দিতে পারিলেন না। সে দিন তিনি একটা মামলা করিতে পালকী হাঁকাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন; আমরা তাঁহাকে চাঁদার জন্য ধরিলে তিনি বলিলেন, 'যত ছোট লোকের ছেলে স্কুলে দু'পাতা ইংরাজী শিখে গোল্লায় যাচ্ছে। বাপ্‌দাদাকে মানচে না, গুরুজন দেখ্‌লে মাথা নোয়ায় না। ইংরাজী শিখে ত এই লাভ ?—আমি এক পয়সা চাঁদা দিচ্ছিনে।' "

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "বটে! আচ্ছা স্কুলের ইমারত নির্ম্মাণের জন্য যে দু' হাজার টাকার আবশ্যক, আমি তার জন্য দায়ী রহিলাম। টাকা আমার কাছে পাইবে। এত দিন বলিতে হয়! তা নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে ত তোমরা আমার কাছে আসিবে না। আরে ভায়া, বাঁকা আঙ্গুল নৈলে কি ঘি বেরোয় ? আমি তোমাদের টাকা আদায় করিয়া দিব।"

স্কুলের সম্পাদক ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আশ্বস্ত চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ডেপুটীবাবু ঘি বাহির করিতে আঙ্গুল বাঁকাইতে জানেন।

(৪)

দধিহাটার জমিদার চৈতন্যচরণ চৌধুরী মহকুমার মধ্যে একজন প্রধান সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। তাঁহার পিতামহ ভবতারণ চৌধুরী কমলার কৃপায় সামান্য জোতদারী হইতে সুবৃহৎ জমিদারীর মালিক হইয়াছিলেন। স্বকীয় চেষ্টায় এক-পুরুষে এরূপ অগাধ সম্পত্তি অর্জ্জনের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল বলিয়া, গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা বলাবলি করিত—'তারণ'-চৌধুরী তাঁহার বাস্তভিটার নীচে যক্ষের ধন পাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিত, যক্ষের ধন পাওয়া-টাওয়া সব মিথ্যা কথা। বিশে ডাকাত, ডাকাতি করিয়া যে সকল সোণা রূপা লুটিয়া আনিত, 'তারণ চৌধুরী' তাহার 'কিনারা' করিয়া দিত বলিয়া, রীতিমত বখ্‌রা পাইত, সেই জন্যই হঠাৎ এমন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। এ সকল জনরবের মূলে কোনও সত্য আছে কি না, বলা যায় না, তবে 'তারণ'-চৌধুরীর পৌত্র চৈতন্য-বাবু সৎ ও অসৎ নানা উপায়ে পৈত্রিকসম্পত্তির পরিমাণ অনেকাংশে বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

চৈতন্য-চৌধুরীর চালানী কারবার ছিল। তাঁহার জমিদারীতে যে সকল গোধূম, মসিনা, ছোলা, সর্ষপ প্রভৃতি রবিশস্য ও পাট উৎপন্ন হইত, তাঁহার প্রজারা তাহা অন্য কোনও মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে পাইত না। শস্য পাকিবার পূর্ব্বে তাঁহার নায়েব-গোমস্তারা তাহার দর ঠিক করিয়া বায়না-স্বরূপ কিছু টাকা 'দাদন' দিয়া রাখিত; ফসল কাটা-মাড়া হইবামাত্র তাহা তাহারা 'খোলা' হইতে পাইক-বরকন্দাজ মারফৎ জমীদারের গোলায় মজুত করিত। ইহাতে কৃষিজীবী প্রজাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা হইত। একটা দৃষ্টান্ত দিই। প্রজার ক্ষেতে ছোলা হইয়াছে; নায়েব-মহাশয় প্রজাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন, যত মণ

গণেশ-জননী

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা]

ছোলা উঠিবে, জমিদার তাহার মূল্য প্রতি মণ সাত সিকা—কি এক টাকা চৌদ্দ আনা হিসাবে দিবেন। উৎপীড়নের ভয়ে বা উঠবন্দী ফসলী-জমি হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, প্রজারা ক্ষেতের ফসল সেই দরেই বিক্রয় করিয়া ফেলিত। শেষে দেখা গেল, বাজারে ছোলার দর তিন টাকা হইয়াছে। তখন কাঁদাকাটি করিয়াও জমিদারের নিকট এক পয়সা বেশী আদায় করিতে পারে না। চৈতন্যবাবু প্রতি বৎসর এই ভাবে প্রজাবর্গকে শোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়; অসহায় দুর্ব্বল প্রজা এ অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পারে না।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। তাছের মণ্ডল চৈতন্যবাবুর তালুকভুক্ত বিদ্যাধরপুরের একজন মাতব্বর প্রজা। সে তাহার গ্রামবাসী দুই চারিজন অবস্থাপন্ন প্রজার সহিত পরামর্শ করিয়া, বাজার-দর অপেক্ষা কম দরে জমিদারকে ফসল বিক্রয় করিতে রাজী হইল না। তাহারা নানা রকম ওজর আপত্তি করিয়া, আগাম দাদন লইতে অস্বীকার করিল; এবং জমিদারের বরকন্দাজ পাইককে তাড়াইয়া দিয়া, খোলা হইতে ফসল 'মাড়িয়া' ঘরে আনিল। ডিহি বিদ্যাধরপুরের নায়েব পঞ্চানন বিশ্বাস তাছের মণ্ডল দিগরের এই স্পর্দ্ধার কথা চৈতন্যচরণের গোচর করিল।

নায়েবের পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে চৈতন্যচরণের চৈতন্য লোপ হইল। তিনি সেই দিনই অপরাহ্নকালে অশ্বারোহণে বিদ্যাধরপুরের ডিহি কাছারীতে উপস্থিত হইলেন, এবং চারিজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া 'পালের গোদা' তাছের মণ্ডল ও তস্য 'চাচাতো' ভাই কেরামতুল্লা মৃধাকে কাছারী-বাড়ীতে ধরিয়া আনাইলেন। চৈতন্যচরণ—নায়েব, গোমস্তা, মুহুরী, হাল্‌সানা প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গের সমক্ষে বিদ্রোহী প্রজাবর্গের উপর 'মার্সাল ল' জারি করিলেন; নায়েবের প্রতি আদেশ হইল, অপরাধীদের প্রত্যেকের পিঠে পাঁচ পাঁচ জুতা এবং তাহাদের প্রত্যেকের পঁচিশ পঁচিশ টাকা জরিমানা। নায়েব পঞ্চু বিশ্বাস নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া, তাহার প্রচণ্ড আঘাতে তাছের-মণ্ডলদিগরের শরীর 'বেজুত' করিয়া ছাড়িয়া দিল।

তাছের মণ্ডল পয়সাওয়ালা লোক। চাষী গৃহস্থ হইলেও গ্রামে তাহার খাতির মর্য্যাদা ছিল। বিশেষতঃ গ্রামের পঞ্চায়েৎ নুরমহম্মদ জোয়ার্দ্দার তাহার 'মামু' হইত। তাছের মণ্ডল জুতা খাইয়া, তাহার মামুর পরামর্শে স্বয়ং মহকুমায় উপস্থিত হইয়া, এক ফৌজদারী মামলা রুজু করিয়া দিল। রায় বাহাদুর হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা। হীরালাল বাবু জমিদার চৈতন্যচরণ চৌধুরী ও তস্য নায়েব পঞ্চানন বিশ্বাসকে আসামী করিয়া আদালতে হাজির হইবার জন্য তলব দিলেন।

(৫)

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ। আম কাঁঠাল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। চৈতন্যচরণ প্রতিবৎসর মহকুমার দেবতাদের সুপক্ক আম-কাঁঠাল ও অন্যান্য বহু সামগ্রীপূর্ণ 'ডালি' পাঠাইয়া পূজা করিয়া থাকেন। ডেপুটি, মুন্সেফ হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহাদের সেরেস্তাদার, পেস্কার এবং থানার দারোগা, জমাদার, এমন কি, জমিদারের বেতনভোগী উকীল মোক্তার পর্য্যন্ত কেহই এ পূজায় বঞ্চিত হন না। চৈতন্যচরণ যে বৎসর হীরালালবাবুর এজলাসে প্রজাপীড়ন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন, সে বৎসরও হাকিম মজ্‌কুরার নিকট যথারীতি 'ডালি' প্রেরিত হইল। কিন্তু ডেপুটী বাবুর নিকট যে ডালি গেল, তাহার ঘটা অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা কিছু অধিক হইল। একদিন প্রভাতে চৈতন্যচরণের আমমোক্তার নিত্যানন্দ পাঠক ভারীর কাঁধে সেই ভার চাপাইয়া, জমীদার বাবুর প্রতিনিধিস্বরূপ ডেপুটি বাবুর কামরায় পূজা দিতে চলিলেন।

ডেপুটি হীরালালবাবু তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া সেই দিনের ডাকে প্রাপ্ত 'ইংলিশম্যান'খানি পাঠ করিতেছিলেন। নিত্যানন্দ পাঠক সসঙ্কোচে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, হাঁটু পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইতেই হীরালালবাবু কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া, ভ্রুভঙ্গী-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

নিত্যানন্দ ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞে, চৈতন্যচরণ বাবু কিছু 'ভেট' পাঠিয়েছেন। হুজুরকে তাই দিতে এসেছি।" নিত্যানন্দের ইঙ্গিতে ভারী বাঁক হইতে প্রকাণ্ড ঝোড়া দুইটি নামাইয়া দ্বারপ্রান্তে রাখিল। পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, 'গের্দ্দা বালিসের' মত এক জোড়া সুপক্ক তরমুজ, চম্পক-বর্ণাভ দুই ছড়া পাকা মর্ত্তমান কলা,—সে ত কলা নয় যেন এক একটা বোম্বাই মূলা! আনড়ার

মত মোটা মোটা শ'দুই লিচু, গণ্ডা পাঁচেক কমলা লেবু, আরও কত রকম ফল;—দেখিয়া হীরালাল বাবুর চক্ষু দুটি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "কোথাকার চৈতন্য-চরণ বাবু?"

নিত্যানন্দ আম্‌মোক্তার বলিল, "দধিহাটার জমীদার চৈতন্যচরণ চৌধুরী। তিনি ত হুজুরের অপরিচিত নন!"

হীরালাল বাবু অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "দধিহাটার চৈতন্য চৌধুরী? হাঁ, তাকে জানি বৈ কি! তার মত অত্যাচারী প্রজাপীড়ক জমীদার আমার সবডিবিসনে দ্বিতীয় নাই। আমার এজলাসে তার বিরুদ্ধে একটা সঙ্গীন মামলা ঝুলছে, তা জেনে শুনেও সে কি মতলবে আমাকে ডালি পাঠিয়েছে? তুমি ঘুস দিতে এসেছ?"

নিতানন্দ তাড়া খাইয়া একেবারে বেকুব হইয়া গেল। চাদরের মুড়াটা কাঁধ হইতে টানিয়া লইয়া সে তাহার কপালের ঘাম মুছিল; তাহার পর বলিল, "হুজুর এমন কথা বল্‌বেন না। হুজুরেরই সব দেওয়া-থোয়াটা কেবল বেশীর ভাগ। আমাদের কর্ত্তারা আম উৎসর্গ না করিয়া পাকা আম মুখে দিতেন না; এখন বাপ-দাদাকে আর আম উৎসর্গ করি না, আপনারাই আমাদের বাপ দাদা, তাই আপনাদের কাছেই 'উচ্ছুগ্‌গু' করি। যে নিয়ম বাঁধা আছে—সেই নিয়মেই ত হুজুর—চৈতন্য বাবু কাজ করেছেন।"

হীরালাল বাবু 'ইংলিশম্যান'খানা সরোষে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন, "'ড্যাম ইয়োর চৈতন্য বাবু'; এবার আমি তাকে চৈতন্য দান কর্‌বো। সেই 'রাস্কেল' আমাকে দুটো কলা-মুলো ঘুষ দিতে চায়? এত বড় তার 'ধাষ্টেমো!' আমি খবর পেয়েছি, সে মামলা করতে এখানে এসেছে। সে নিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না? এত বড় তার গোস্তাকি! তোমার ও কলা-মূলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর বালিসের মত ও দুটো কি? তরমুজ! আমি ওর চেয়ে অনেক বড় ঢের ঢের তরমুজ দেখিছি। আম্‌মোক্তার দিয়ে ঘুষ পাঠিয়ে সে আমাকে চতুর্ভুজ করেছে! তাকে আজ বৈকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বল্‌বে। যদি সে রাজি না হয়, তা হলে আমি তাকে হাজতে দেব।"

নিত্যানন্দ প্রণাম করিয়া ভেট সহ প্রস্থান করিল। যে 'বাঁকি' বাঁক লইয়া আসিয়াছিল, সে নিত্যানন্দের অনুসরণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু মশায়, এ হাকিমডা ভেটগুলো নেলে না কেন? ও বাবা, হুজুরের কি চড়া চড়া বোল। মনে হতে লাগ্‌লো আমাগোর কুলে দাম্‌ড়াডার মতোন হাকিম সায়েব বুঝি বা গুঁতোতে আসে!"

নিত্যানন্দ কষ্টে হাস্য-সংবরণ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

(৬)

সেই দিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় চৈতন্য-বাবু হীরালালবাবুর কুঠিতে আসিয়া, একজন চাপরাসীর হাতে নামের কার্ডখানি দিলেন।

বৈশাখ মাসের শেষ; তখনও অনেকখানি বেলা ছিল; কিন্তু একখানি ঘোলা মেঘ সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। জোরে বাতাস বহিতেছিল, কুঠির আঙ্গিনায় গোটা দুই ঝাউ গাছ ছিল; তাহাদের শাখা-পত্রের আন্দোলনে 'সন্ সন্' শব্দ হইতেছিল। কামিনীর পাতাগুলি ফুলের ভারে ঢাকিয়া গিয়াছিল; সৌরভে বায়ু-প্রবাহ সুরভিত; জাম গাছে কতকগুলি পাখী কালো জামের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অর্থহীন কাকলীতে নৈশ আকাশ ধ্বনিত করিতেছিল। কিন্তু সেদিকে চৈতন্যবাবুর লক্ষ্য ছিল না। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া, ডেপুটী বাবুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হীরালাল বাবু তখন কামরার মধ্যে সব-ডেপুটী বাবুর সঙ্গে কালেক্টরের কি একখানা জরুরী পত্রসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলা, চৈতন্য-বাবুর তাহা স্মরণ ছিল না। তাঁহার 'কার্ড'খানি দেখিয়া হীরালাল বাবু বলিলেন, "এক ঘণ্টা খাড়া রহেনে বোলো।"

সেই জলদগম্ভীর স্বর চৈতন্য বাবুর কর্ণগোচর হইল। চাপরাসী বক্‌শিসের প্রত্যাশী; সে হুজুরের এত কড়া হুকুম প্রতিধ্বনিত না করিয়া বলিল, "হুজুর কাজে ব্যস্ত আছেন, আপনি ঐ চেয়ারখানাতে একটু বসুন। সময় হ'লে আপনাকে খবর দিবেন।"

হুজুর দাঁড়াইতে বলিয়াছেন, চৈতন্যবাবু বসিতে

ারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে চট্ করিয়া তাঁহার ানে পড়িল,—আজ 'বিস্মাৎবারের বারবেলা'!

সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের গান মনে ড়িল—

"বিস্মাৎবারের বারবেলায় যে আমার জন্ম হৈল!"

আধঘণ্টা পরে সবডেপুটী বাবু সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। হীরালাল বাবুর কামরার টেবিলে ইলেক্‌ট্রিক বেল্‌ 'টুং টুং' শব্দ করিল। এবারৎআলী চাপরাসী তৎক্ষণাৎ 'হুজুর' বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

হীরালালবাবু তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"বাবুকে পাঠাইয়া দে।"

চৈতন্যবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হীরালাল বাবুকে একটি প্রণাম ঠুকিয়া, টেবিলের ধারে মাটির পুতুলের মত দাড়াইয়া রহিলেন।

হীরালালবাবু তখন 'ইংলিশম্যানে' মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। মিনিট দুই পরে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কি চৈতন্যচরণ যে! তাড়া খেয়ে বুঝি এদিকে আসা হয়েছে? আমি যে একটা বিদেশী লোক তোমাদের জিল্লায় পড়ে আছি—তা এখানে এসে মধ্যে মধ্যে, খোঁজ খবরটা ত নিতে হয়। ও কি! দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঐ চেয়ারখানায় বোস।"

প্রস্তরীভূত চৈতন্যচরণ হঠাৎ চলৎশক্তি পাইয়া কম্পিতপদে অগ্রসর হইলেন। চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—"হুজুরই আমাদের অভিভাবক। আপনার আশ্রয়ে আমরা নির্ভাবনায় আছি। আমাদের খুব সুখে রেখেছেন।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "তা সুখে আর রাখ্‌তে দিলে কৈ?—যে ফৌজদারীতে পড়েছ! এবার যে রক্ষা পাও, এমন ত আশা দেখ্‌চি নে।"

চৈতন্যচরণ বাবু জড়িত স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে, আমার কোন অপরাধ নাই, ঐ নায়েব বেটাই আমাকে ফাঁসিয়েছে।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "সাক্ষীর মুখে তোমার অপরাধ প্রমাণ হবে। আপাততঃ তোমাকে হাজত থেকে কি করে বাঁচাই, আইনের কেতাব ঘেঁটে তার ত কোনও ফন্দী পাচ্ছি নে।—তা তুমি ব্যারিষ্টার দিচ্ছ ত?"

চৈতন্যচরণ বলিলেন, "আমার উকীল সদাশিব বাবু বলেছেন, ঘোষ সাহেবকে আনাই কর্ত্তব্য।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "কত দিতে হবে তাঁকে?"

চৈতন্যচরণ বলিলেন, "'ডেলি' তিন শো টাকার কম তিনি এখানে আস্‌তে রাজি নন; তাতেই সম্মত হয়ে তাঁকে মামলার দিন সঙ্গে করে আন্‌তে আমরা তাঁহাকে পত্র লিখেছি। আরও লিখেছি, সে যেন আমার দ্বিতীয় পত্র না পেলে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "মামলা শেষ হতে দশ দিন লাগ্‌বে। তা হলেই দেখ, ব্যারিষ্টারকে দিতে হবে—তিন হাজার টাকা।—তা দু'হাজার টাকার ত কথাই নাই। তার পর, ধর তোমার হাজতের হুকুম হোলে, সে হুকুম রদ করবার জন্য উপরে চেষ্টা করতে হবে, তখনও ব্যারিষ্টার চাই;—সেও ধর—পাঁচশো। তা, এই সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করেও, তোমার হাজত থেকে উদ্ধার-লাভের উপায় নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়।"

চৈতন্যবাবু একথায় অচেতনপ্রায় হইলেন, মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন, "হুজুর রাখিলে রাখিতে, মারিলে মারিতে পারেন।—আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাকে বধ করে কি লাভ হবে হুজুরের?"

হীরালালবাবু হাসিয়া বলিলেন," 'লাভঃ পরম গোবধঃ।' —আমার লাভ নাই, কিন্তু তোমার ধনক্ষয়ের বহর দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে।—মামলায় যদি অপরাধী সাব্যস্ত হও—তা'হলে জেলখানায় না গেলেও হাজার খানেক টাকা জরিমানা ত আর ফাঁকি দিতে পারবে না।—তবেই ধর, সাড়ে চারি হাজার গেল।—তার উপর যদি আপীল কর, চারি হাজার পাঁচ হাজারের উপর উঠ্‌বে।"

চৈতন্যবাবু মৃতকল্প হইয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন, "হুজুর, আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন।"

হুজুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে রাখ্‌বার মারবার কে?—আইনে আমার হাত-পা বাঁধা।—তুমি বাবু, দু ঝোড়া কলা-মূলো ঘুস পাঠিয়ে আমাকে ভুলোবার চেষ্টা করেছ; আমি কি সেই পাত্র!—ঠিক তোমার হাজত হবে।"

চৈতন্যচরণ আর্ত্তনাদ করিলেন, "হুজুর আমাকে রক্ষা করুন।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "দেখ চৈতন্যচরণ! তুমি স্বীকার কর আর না কর, তুমি অপরাধ করেছ, তা বুঝেছি।—আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। তোমার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।—আর কত বড় বংশে তোমার জন্ম! দানধ্যানে তোমরা চিরবিখ্যাত।—তুমি আমাদের এই স্কুলটা পাকা করবার জন্যে কিছু ইট কিনে দাও না। টাকাটা দিলেই আমরা ইট কিনে নিতে পারি—তোমাকে আর সে সব ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হবে না।"

চৈতন্যচরণ বলিলেন, "কত টাকা?"

হীরালালবাবু বলিলেন, "তোমাকে কি দু' পাঁচ হাজার দিতে বল্‌চি? সব জিনিসই হয়েছে দুর্ম্মূল্য; তা তুমি হাজার খানেক টাকা দিও, তা হলেই অনেকটা সাহায্য হবে।"

চৈতন্যবাবু বলিলেন, "হা-জা-র টা-কা!"

হীরালালবাবু বলিলেন, "হাজার টাকা শুনে যে অচৈতন্য হবার উপক্রম করলে!—পাঁচ হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছিল—সে ভাল! আর এই হাজার টাকায় দেশের একটা মস্ত উপকার হবে—এ কাজটা তুমি পার্‌বে না? তা পারবে কেন?—বাবু-বাছা বলে ত তোমাদের পারবার যো নাই,—'কুটুম্বু' না বল্‌লে আর খুসী হও না।"

চৈতন্যবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে আমি তাই দেব।—আমার মামলাটা—"

হীরালালবাবু বলিলেন, "খবরদার, আমার কামরায় এসে মামলা-মকদ্দমার কথা তুলো না। আদালতে, উভয় পক্ষের সাক্ষাতে, তোমার যা বলবার আছে বল্‌তে পার।"

চৈতন্যবাবু বলিলেন, "চাঁদার কথাটাও?"

হীরালালবাবু বলিলেন, "না, ঐটে বাদ। চাঁদাটা ত আর তোমার সাফাই নয়।"

* * * *

সেই দিন সন্ধ্যার পর চৈতন্যবাবু একশত টাকার দশ কেতা নোট হীরালাল বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইংরাজী স্কুলের সম্পাদক ও স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট, ডাক্তার ভবকিঙ্কর বাবু, বসিয়া আছেন।

হীরালালবাবু মহাসমাদরে চৈতন্যবাবুকে চেয়ারে বসাইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকদ্বয়কে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের গুণগৌরব ও দানধ্যানের কথা শুনাইয়া, অবশেষে বলিলেন, "বড়ই সুখের বিষয় চৈতন্যচরণ বাবু 'স্কুল-বিল্‌ডিং ফণ্ডে' হাজার টাকা 'ডোনেশন্ দিচ্ছেন।—না হবে কেন? কত বড় লোকের ছেলে?—টাকা এনেছেন চৈতন্যবাবু?

চৈতন্যচরণ পকেট হইতে এসেন্স সুবাসিত রুমাল বাহির করিয়া, তাহার ভাঁজ খুলিয়া দশ কেতা নোট বাহির করিয়া হীরালাল বাবুর হস্তে প্রদানোদ্যত হইলেন।

হীরালালবাবু বলিলেন, "স্কুলের সম্পাদক হরিমাধব বাবু; উঁহাকেই টাকা দিতে পারেন। উনি আপনাকে রসিদ দিবেন। আপনিও দু' ছত্র লিখে দিলে ভাল হয়।"

হীরালাল বাবু বলিতে লাগিলেন;—চৈতন্য বাবু টেবিলের উপর হইতে কাগজ লইয়া নিজের 'ফাউণ্টেন পেন্' দিয়া লিখিলেন,—

"মামুদনগরের ইংরাজী স্কুলের গৃহ-নির্ম্মাণ-'ফণ্ডে' সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, আপনারা আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন; আমি তখন তাড়াতাড়ি আপনাদের কোনও আশা দিতে পারি নাই।—আজ আমি আপনাদের স্কুল-গৃহ-নির্ম্মাণের 'ফণ্ডে' আহ্লাদের সহিত হাজার টাকা প্রদান করিলাম। গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।—শ্রীচৈতন্যচরণ চৌধুরী।"

সম্পাদক-মহাশয়ও যথারীতি রসিদ দিলেন।

চৈতন্যবাবু খয়রাৎ শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, হীরালাল বাবু বলিলেন, "কেমন আপনাদের দু হাজার টাকার মধ্যে হাজার টাকা পেলেন ত?—আর এক হাজারও শীঘ্র পাবেন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে চৈতন্যবাবুর মামলা উঠিল। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণিত হইল না। নায়েব পঞ্চু বিশ্বাস, অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাহার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইল।

এই মামলার অল্পদিন পরে হীরালাল বাবু মফঃস্বল তদারক উপলক্ষে দধিহাটী গিয়া তাম্বু ফেলিলেন; এবং সেই দিনই অপরাহ্ণে বেড়াইতে বেড়াইতে চৈতন্যবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

চৈতন্যবাবু কোনও দিন প্রত্যাশা করেন নাই যে, ডেপুটীবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার গৃহে আসিবেন।—তিনি মহকুমার কর্ত্তাকে কোথায় বসাইবেন, কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

হীরালাল বাবু তাঁহাকে ভয়ে তটস্থ দেখিয়া মধুর সম্ভাষণে তাঁহার আতঙ্ক দূর করিলেন। চৈতন্যবাবু বলিলেন, "হুজুরের কাছে আমি বড়ই অপরাধী হইয়া আছি।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "কিছু না।—এজলাসের বাহিরে তুমিও যা, আমিও তাই। বাপুহে, হাকিমী করিতে গেলে কি সকল সময় আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব বজায় রাখা চলে?"

চৈতন্য বাবু সাহস পাইয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু আপনি আর একটু হলেই ত আমাকে হাজতে পূরে ছিলেন! ভাগ্যে দেশের কাজে কিছু সাহায্য করতে পেরেছিলাম—তাই। কিন্তু এখনও গ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয়।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "বিলক্ষণ!—তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমাকে সত্য সত্যই হাজতে দিতাম? রাধামাধব!—ওটা কেবল প্রেমার'র তাড়া, কাজ নেবার জন্যে ওটা যে চাই-ই।"

চৈতন্য বাবু বলিলেন, "লোকে ত তা বোঝে না; তারা বলে, ডেপুটীবাবু জমীদার-বেটার উপর হাড়ে চটা, সেখানে 'টুঁ ফুঁ' করবার যো নেই। এমন কি, সেই সাহসে প্রজারা এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, তারা আমাকে গ্রাহ্য করতেই চাচ্ছে না। আমি মনে করছি, আর বাড়ীতে বাস করবো না। কল্‌কাতায় বাসা করে থাক্‌বো।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "আরে রাম, একি একটা কাজের কথা?—তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে আস্তানা ফেল্‌বে, এদিকে তোমার পৈত্রিক ভিটায় শৃগাল-কুকুর চরবে, পূজোর দালানে ছুঁচো-চাম্‌চিকের বাসা হবে!—এ সকল কথা থাক। তোমার টম্‌টম্ জুততে বল।—চল একটু বেড়িয়ে আসি।"

চৈতন্য বাবুকে সঙ্গে লইয়া হীরালাল বাবু টম্‌টমে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং গাড়ীতে উঠিয়া এমন হাসি-গল্প আরম্ভ করিলেন যে, গ্রামের সকল লোক বুঝিল,—চৈতন্য বাবুর সহিত হাকিমের গলায় গলায় ভাব!—দুইচার দিনের মধ্যেই চৈতন্য বাবু পল্লী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহার মনোবেদনা দূর হইল।

মহাসমারোহে নূতন স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও হাজার টাকার অভাব! স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ডেপুটী বাবুকে তাঁহার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিলেন; হীরালাল বাবু 'ফাঁও' খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

পূজার পর একদিন সুবলপুরের সুবিখ্যাত বণিক্ হারাধন সাহা হীরালাল বাবুর কুঠিতে আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, "তরা অগ্রহায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ। হুজুর যদি এই উপলক্ষে একবার তাঁহার গৃহে পদধূলি দান না করেন, তাহা হইলে বড়ই মনস্তাপের বিষয় হইবে।"

হারাধন সাহা জাতিতে 'সৌ'; কিন্তু উচ্চকুলোদ্ভব না হইলেও মহকুমার মধ্যে এত বড় ধনী মহাজন আর দ্বিতীয় ছিল না। ষোলটি বিভিন্ন স্থানে তাঁহার মোকাম। এমন দিন ছিল না, যে দিন তিনচারিখানি নৌকা মাল বোঝাই হইয়া, তাঁহার সদর মোকামে না আসিত। তাঁহার জমীদারীর আয়ও বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নহে।

হারাধন সাহা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি; তাঁহার চালচলনও অত্যন্ত সাদাসিধা। এত বড় লোক কিন্তু কেহ কোনও দিন তাঁহাকে ঘড়ি-চেন দূরের কথা, এক জোড়া মোজা বা একটা গঞ্জি ব্যবহার করিতেও দেখে নাই! তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামধন বাবুই বৈষয়িক কাজকর্ম্ম দেখিতেন; তিনি পূজার্চ্চনা, অতিথিসেবা, দান-ধ্যানেই কালাতিপাত করিতেন।

অধিক বয়সে হারাধন দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন; প্রথম পক্ষের ঐ একটি মাত্র পুত্র, সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। দ্বিতীয় পক্ষে, সৌদামিনী তাঁহার প্রথমা কন্যা। এই কন্যার বিবাহে তিনি পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই সুবলপুরে উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল।

হারাধন সেকেলে লোক, হাকিম শ্রেণীকে তিনি বড় ভয় করিয়া চলিতেন; এবং সাহেব-সুবোর সহিত কোনও কারণে দেখাসাক্ষাৎ করিতে তাঁহার হৃৎকম্প হইত। কিন্তু তাঁহার হিতৈষিবর্গ, বিশেষতঃ মহকুমার প্রবীণ উকীল তাঁহার পরম শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ দুর্গাশঙ্কর বাবু, তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, এত বড় সমারোহকাণ্ডে মহকুমার কর্ত্তাকে নিমন্ত্রণ না করিলে, বড়ই দোষের কথা হইবে। আর হীরালাল বাবুর সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাবও ছিল; সুতরাং হারাধনকে সর্ব্বাগ্রে হীরালাল বাবুর নিকটেই আসিতে হইল।

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তুমি টাকার মানুষ, তোমার লোকজনেরও অভাব নাই; আমি গিয়া আর তোমার কি উপকার করিব?"

হারাধন বলিল, "বিলক্ষণ! আমি মূর্খ লোক, দুটাকা খরচ করিতে পারিব বটে, কিন্তু কি করিলে সৌষ্ঠব হয়, লোক-নিন্দা না হয়, নির্ব্বিঘ্নে এ দায় থেকে উদ্ধার হইতে পারি, তা আপনি না দেখিলে আর কে দেখিবে? বিবাহের তিন-চারি দিন আগে আপনাকে যাইতেই হইবে। আপনি গিয়া না দাঁড়াইলে—সকল ব্যবস্থা স্থির না করিলে—বিবাহই হইবে না।"

হীরালাল বাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে আর শক্ত কথা কি? আমি যাব। তবে আমার হাতে বিস্তর কাজ, বেশী আগে যাইতে পারিব না। তা তোমার কোনও চিন্তা নাই—শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই শেষ হইবে; আমি বিবাহের পূর্ব্বদিন তোমাদের গ্রামে উপস্থিত হইব।"

"হুজুরের পায়ের ধূলো পড়িলেই আমি চরিতার্থ হইব। হুজুরের অনুগ্রহ; আমার সাধ্য কি এ গরীবের বাড়ী হুজুরকে নিয়ে যাই।" ইত্যাদি মামুলী বিনয় প্রকাশ করিয়া, হারাধন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৮)

৩রা অগ্রহায়ণ রবিবার হারাধনের কন্যার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। রাজসাহী জেলার কোনও জমীদার-পুত্রের সহিত বিবাহ। বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ, উভয়েই ধনবান। সুতরাং কোনও পক্ষেই সমারোহের ত্রুটী হইল না। দূরের বিবাহ বলিয়া, ২রা অগ্রহায়ণ মধ্যাহ্নে বর ও শতাধিক বরযাত্রী লইয়া বরকর্ত্তা সুবলপুরে উপস্থিত হইলেন। হারাধনের প্রকাণ্ড গোলাবাড়ীতে তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করা হইল। হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, গরুর গাড়ী, ঢুলি, বাদ্যকর, চোপদার, আরদালী, বরকন্দাজ, বেহারা, মসালচি প্রভৃতির সমাগমে ক্ষুদ্র সুবলপুর গ্রাম সরগরম হইয়া উঠিল। এমন সমারোহের বিবাহ এ অঞ্চলে কেহ কখনও দেখে নাই। আত্মীয় কুটুম্ব ও ভদ্রাভদ্র দুই সহস্রাধিক লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; অনাহূত, রবাহূত, ভিখারী-কাঙ্গালীর সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ! বিবাহের পনের দিন পূর্ব্ব হইতে সাহাজির বাড়ী 'ভিয়ান' আরম্ভ হইয়াছিল। দশখানি নৌকা বিবাহের দ্রব্য-সামগ্রী বহনে নিযুক্ত হইয়াছিল। সাতটি পুষ্করিণীর মৎস্য-মহলে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকের বিশখানি গ্রামের গোয়ালারা দধি, ক্ষীর, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি গব্যদ্রব্যের বায়না লইয়া, সাহাসদনে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছিল।

বিবাহের পূর্ব্ব দিন এক প্রহরের সময় সুবলপুরের নদীতীরবর্ত্তী মাঠে ডেপুটী বাবুর তাম্বু পড়িল। হীরালাল বাবু হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সুবলপুরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। হাকিম আসিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া, হারাধন স্বয়ং তাঁহার তাম্বুতে আসিয়া শিষ্টাচার-প্রদর্শনের চূড়ান্ত করিলেন। হারাধনের আয়োজন দেখিয়া, হীরালাল বাবু বিস্মিত হইলেন। আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া, হীরালাল বাবু হারাধনের গৃহে পদধূলি দিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে চলিলেন।

হীরালাল বাবু দেখিলেন, হারাধনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আত্মীয়কুটুম্ব ও অভ্যাগত বন্ধুবান্ধব, কর্ম্মচারী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ; চারিদিকে আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। হাকিম আসিয়াছেন, পদরজোদানে গৃহ পবিত্র করিয়াছেন, বৃদ্ধ হারাধনের আর আনন্দ ধরে না! তিনি ভক্তিভরে হীরালাল বাবুর পদস্পর্শ করিয়া 'বুটের' ধূলা গ্রহণ করিলেন; দেখাদেখি অনেকেই কুলীন ব্রাহ্মণের শিরোমণি হীরালাল বাবুর চরণে মস্তক নত করিল। হীরালাল বাবু যেন তাহাদের কত আত্মীয়, তাহাদের সঙ্গে তাঁহার যেন কত দিনের পরিচয়, এইভাবে তাহাদের সাদর-সম্ভাষণ করিলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বর-পক্ষের বাসায় চলিলেন।

হারাধন গরদের দোব্‌জাখানি ঘাড়ে ফেলিয়া হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে বরকর্ত্তা তাঁহার 'বেয়াই মশায়ে'র সহিত হাকিমের পরিচয় করাইয়া দিতে চলিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বরের পিতা জমীদার শ্রীনারায়ণ বাবু ও মান্যগণ্য বরযাত্রীদের সহিত হীরালাল বাবুর আলাপ হইয়া গেল। হীরালাল বাবুই যেন কন্যাকর্ত্তা! তিনি মিষ্ট হাসিয়া বরকে 'জামাই বাবাজী', বরের পিতাকে 'ব্যাই মশায়' প্রভৃতি মিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। বরের মাতুল নবদ্বীপ 'সাউর' সহিত কিঞ্চিৎ রসিকতা করিলেন; বরযাত্রীদের ঘন ঘন তামাক দেওয়া হইতেছে কি না, সকলে চা পাইয়াছেন কি না, কাহারও কোনও অসুবিধা নাই ত, ইত্যাদি সময়োপযোগী কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন! তাহার পর রাত্রি প্রায় নয়টার সময় তাঁহার তাম্বুতে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদি পাকের জন্য হারাধন দুইজন পাচক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হারাধনের বাড়ী হইতে রূপার থালা ও দশটা রূপার বাটী-পূর্ণ নানা জলখাবার আসিল; সোণার গ্লাসে সুমিষ্ট পানীয়, সোণার ডিবায় পান! অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন দেখিয়া তাঁহার মন বড়ই প্রফুল্ল হইল; কিন্তু ভবি ভুলিবার নহে!

(৯)

পরদিন বিবাহ। সমস্ত দিন গোলমালে গেল।—সকলেই আশা করিয়াছিল, হীরালাল বাবু প্রভাতেই স্নান শেষ করিয়া হারাধনের গৃহে পদার্পণ করিবেন;—কিন্তু তিনি আসিলেন না।—প্রভাতে তিনি তাম্বু হইতে বাহির পর্য্যন্ত হইলেন না!

ডেপুটীবাবুর এই ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ কেহ স্থির করিতে পারিল না। হারাধন কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ডেপুটী বাবুর তাম্বু সেখান হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে;—নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে হারাধন হীরালাল বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইতে পারিলেন না।

'ক্রিয়া' করিতে বসিয়া হারাধনের হঠাৎ মনে হইল, ডেপুটী বাবুকে সামাজিক হিসাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই!—তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্র রামধনকে ডাকিয়া বলিলেন, "একবার ডেপুটী বাবুর তাম্বুতে যা, 'বাচপোৎ' মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া যাস্। আজ নিমন্ত্রণ ভিন্ন তিনি ক্রিয়ার বাড়ী আস্‌বেন কেন?—সঙ্গে ব্রাহ্মণ না থাক্‌লে তিনি হয়ত নিমন্ত্রণই গ্রহণ করবেন না। দস্তুরমত কাজ করা চাই। নানা কাজে তাঁকে আহ্বান করতে বিলম্ব হয়েছে—একথা জানিয়ে যেন মাফ্ চান। একে ব্রাহ্মণ, তার উপর মহকুমার হাকিম।—দেখিস্ যেন কোনও ত্রুটী না হয়।"

রামধন বাচপোৎ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটী বাবুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। হীরালাল বাবু তাম্বুর ভিতরে ছিলেন; চাপ্‌রাসী সংবাদ দিল, হুজুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

হীরালাল বাবু বলিলেন, "সঙ্গে আর কে আছে?"

চাপ্‌রাসী বলিল, "ফোঁটা-তিলক-কাটা টিকিওয়ালা এক ঠাকুর।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সে বাহিরে থাকিলেও ক্ষতি নাই; রামধনকে ডাকিয়া আন্।"

রামধনও হাকিমদের বাঘের মত ভয় করিতেন; একাকী ব্যাঘ্রগুহায় প্রবেশ করিতে তাঁহার পা সরিতেছিল না!—তিনি একবার কাতর দৃষ্টিতে বাচপোৎ ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলেন,—কিন্তু চাপ্‌রাসী তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া একটু বাঁকা সুরে বলিল, "বাবু, আপনি চলো, ও ঠাকুরকো হুজুরের সাম্‌নে লিয়া জানেকো হুকুম নেই।"—সময় বুঝিয়া বকাউল্লা চাপ্‌রাসী আজ 'আধ্‌বাঙ্গলা পৌন খোট্টা'য় তাহার চাপ্‌রাসের মর্য্যাদা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইল না।

রামধন তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিয়া হীরালাল বাবুর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রণাম করিলেন। হীরালাল বাবু তাঁহার এ সুদীর্ঘ অভিবাদন আমলে না আনিয়া, বক্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"—রামধনকে বসিতে বলাও তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না!

রামধন বলিলেন, "আজ আমার ভগিনীর বিবাহ; কর্ত্তা বল্‌ছিলেন, আজ এ গরীবদের বাড়ী হুজুরের পায়ের ধূলো পড়ে নি,—তাই—"নিমন্ত্রণের কথা বলিতে রামধনের মুখে বাধিয়া গেল।

তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ডেপুটী বাবু বলিলেন, "ওঃ! আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছ?—তা তোমার বাবা কোথায়? তিনি বুঝি ছেলে পাঠিয়ে দায় সারতে চান? খুব ভদ্রতা যা হোক! আমি আর ঘণ্টা খানেক পরেই সদরে ফিরে যাচ্ছি। সরকারের কোনও প্রজার—তা সে যতই পয়সাওয়ালা লোক হোক—তার মেয়ের বিয়েতে মোড়লী করবার জন্যে গবর্মেণ্ট আমাকে চাকরীতে বাহাল রাখেন নি।"

ডেপুটীবাবুর মুখে বাঁকা কথা শুনিয়া রামধনের মুখ চূণ হইয়া গেল; তিনি ভীতিবিহ্বল স্বরে বলিলেন, "বাবা ক্রিয়ায় বসেছেন,—তাই তিনি হুজুরের এতলা দিতে আস্‌তে পারেন নি। হুজুর আমাদের মা-বাপ, আমাদের কসুর মাফ্ করতে আজ্ঞা হোক।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "সামাজিক শিষ্টাচার—সামাজিক লৌকিকতা—এ সকল আলাদা জিনিস; তুমি ছেলেমানুষ,—এ সকলের মর্ম্ম কিরূপে বুঝবে?—আমি আর দু'ঘণ্টা এখানে আছি,—যাও তোমার বাপকে এখানে

পাঠিয়ে দেওগে। তাঁকে বলবে,—দু'ঘণ্টার মধ্যে যদি তাঁর এখানে আস্‌বার ফুরসৎ না হয়,—তা হলে এখানে আর দেখা হবে না।"

রামধন বুঝিলেন,—'যঃ পলায়তি স জীবতি';—তিনি, আর ব্যাঘ্রগহ্বরে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাম্বুর বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

পথে যাইতে যাইতে বাচপোৎ ঠাকুর রামধনের নিকট ডেপুটী বাবুর আলাপের মর্ম্ম অবগত হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,

"বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।"

(১০)

কিন্তু সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইলে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। পুত্রের মুখে সকল কথা শুনিয়া হারাধন সাহাজির মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি কোন রকমে 'ক্রিয়া' শেষ করিয়া, ডেপুটী বাবুর তাম্বুর দিকে ছুটিলেন।

হারাধনকে ব্যস্তভাবে আসিতে দেখিয়া হীরালাল বাবু চেয়ারে খুব গম্ভীর হইয়া বসিলেন। চাপরাসী যে টুল-খানিতে বসিয়া তাম্বুর বাহিরে পাহারা দিতে দিতে ঢুলিত, এবং ছারপোকার ফৌজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত 'উঃ-আঃ' করিয়া দংশন-যন্ত্রণা ব্যক্ত করিত, হীরালাল বাবুর আদেশে সেই টুলখানি তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে, হারাধন তাহাতে উপবেশন করিলেন।

হীরালাল বাবু খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বাড়ীতে বিয়ে,—এক মুহূর্ত্ত অবকাশ নাই; এ সময় হঠাৎ তুমি এখানে ?"

হারাধন বলিলেন, "হুজুর তলপ দিয়েছেন!"

হীরালাল বাবু আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন, "আমি?—রামঃ! আমিত ক্ষেপিনি, যে তোমার এই কাজের মধ্যে তোমাকে ডেকে পাঠাব! তোমার ছেলে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, তাই তাকে বলেছিলাম—'তুমি ছেলে মানুষ, সামাজিক লৌকিকতার মর্ম্ম কি বুঝবে?—তোমার বাবার একবার আসা উচিত ছিল।'—সামাজিক কাজে তোমার কোনও ত্রুটী থাকে, এটাত দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল নয়।"

হারাধন মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "হেঁ, হেঁ, তাত বটেই। আমার দুর্নাম হ'লে তাতে হুজুরেরই দুর্নাম।—খবর পেয়েই আমি ছুটে আস্‌ছি।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "এসেছ ভালই করেছ।—দেখেশুনে কাজকর্ম্ম শেষ কোরো, যেন কোনও বিষয়ে অপযশ না হয়; আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সদরে যাচ্ছি, জরুরী কাজ আছে।"

হারাধন বলিলেন, "হুজুর এমন আদেশ করবেন না। হুজুর ছাঁদ্‌লা তলায় উপস্থিত থেকে মেয়েটার বিয়ে না দিলে, বিয়েই নামঞ্জুর! দশখানা গ্রামের লোক জানে, এ বিবাহে হুজুরই কন্যাকর্ত্তা; আজ যদি হুজুর সব ফেলে রেখে হঠাৎ চলে যান,—তা হ'লে বিয়ের মজলিসে আমার মাথা কাটা যাবে; আমি আর কাকেও মুখ দেখাতে পারবো না।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তফাৎ তফাৎ থেকে যতটুকু পারা যায়, আমি তার ত্রুটী করিনি; কিন্তু তোমার সামাজিক কাজে আমি কি করে যোগ দিই বল দেখি!—তুমি 'সৌ' লোক, আর আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, নৈকষ কুলীন। আমাদের সমাজের শাসন বড় কঠিন। তোমাদের সামাজিক ব্যাপারে আমার যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। দেখ, হারাধন, একথা তোমাকে জানাতে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু উপায় নাই।"

হারাধন কাতরভাবে বলিলেন, "কোনও উপায় কি নাই হুজুর? আমার বাড়ীতে এ দিগরের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের পায়ের ধূলো পড়্‌বে; কেবল কি হুজুরেরই অকৃপা হবে?"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তাদের কথা ছেড়ে দাও, হারাধন—তাদের কথা ছেড়ে দাও।—আমি ফলারে বামুন নই, আতপ-চা'ল-কাঁচকলা-ভোজী পুরুতও নই, যে দু'-পাঁচ টাকা ভোজন-দক্ষিণা পেলেই ফলারে বসে যাব!—তবে তুমি যদি আমার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পার—তাহ'লে না হয় চোককাণ বুজে তোমার বাড়ী গিয়ে দাঁড়াই। তা, এত টাকা তোমাকে অপব্যয় করতে পরামর্শ দিই না। বেলা শেষ হলো—যাও; এখানে তুমি দেরী করলে, কাজ-কর্ম্মের বিস্তর ক্ষতি হবে।"

হারাধন সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিলেন, "হুজুরের কৌলীন্যমর্য্যাদা কত টাকা দিতে হবে—হুকুম করুন;

তাই দেব; আপনি একবার না দাঁড়ালে হবে না হুজুর!"

হীরালাল বাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আরে, সে দুই-একশ টাকার কাজ নয়! আমার কোনও পুরুষে শূদ্রের দানগ্রহণ করেন নি—শূদ্রের সামাজিক ব্যাপারে যোগ দেওয়া ত দূরের কথা!—তা দেখ, যদি হাজার খানেক টাকা আমার মর্য্যাদা দিতে পার—তা হ'লে না হয়, একবার গিয়ে দাঁড়াই। পেটে খেলে পিঠে সয়।"

মহকুমার হাকিম, তাহার উপর ব্রাহ্মণ—নৈকষ্য কুলীন!—তাঁহার মর্য্যাদার পরিমাণ লইয়া দোকানদারী করিতে হারাধনের সাহস হইল না। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাই হবে হুজুর!—আপনি একবার গা-তুল্‌লে, আমার সকল কষ্ট দূর হবে।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তবে এক কাজ কর; তোমার গোমস্তাকে এক খান চিরকুট্ লিখে দাও, সে যেন হাজার টাকার তোড়া নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়।—সে আস্‌তে আস্‌তে আমার হাতের কাজ শেষ করি।"

হারাধন বুঝিলেন—হাকিম তাঁহার অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে রাজী নহেন; টাকাটা আগে চান।—অগত্যা হারাধন গোমস্তাকে একখানি রোকা লিখিয়া দিলেন। হীরালাল বাবুর চাপ্‌রাসী সেই রোকা লইয়া প্রস্থান করিল। আধঘণ্টার মধ্যেই হারাধনের গোমস্তা রাধিকানাথ সাহা হাজার টাকার এক তোড়া লইয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করিল।

হীরালাল বাবুর আর কোনও আপত্তি রহিল না।—তিনি তাঁহার টম্‌টমে উঠিয়া, হারাধনকে তাঁহার পাশে বসাইয়া, হারাধনের গৃহে উপস্থিত হইলেন।—বিবাহের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, এমন কি, ঢুলি-বাদ্যকর-বেহারা-দিগের আহারাদিরও সুব্যবস্থা করিয়া, যখন তিনি তাম্বুতে ফিরিলেন, তখন পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়াছে।

পরদিন হীরালাল বাবু মহকুমায় ফিরিয়া, স্কুল-কমিটীর সম্পাদকের হস্তে হাজার টাকার সেই তোড়াটি দিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার প্রতিশ্রুত দুই হাজার টাকাই পাইলেন। শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ করুন; কালেক্টর সাহেবকে দিয়া স্কুল 'ওপন' করাইতে হইবে।"

কয়েকদিন পরে, কলিকাতার ইংরাজী-বাঙ্গালা সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, "সুবলপুরের সুবিখ্যাত জমীদার ও মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন সাহা তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মামুদনগর উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়-নির্ম্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য স্কুল-কমিটী উক্ত সাহা মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধনকুবের হারাধন বাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে দেশের সেবা করুন।"

এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর, দুই-এক সপ্তাহ অতীত না হইতেই, দেশের সেবার এত সুযোগ তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া চাপিল যে, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইল।—কোথাও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইবে, চাঁদা দাও; কোথাও জলকষ্ট উপস্থিত, ইঁদারা কাটাইতে হইবে, চাঁদা দাও; কাহারও কন্যাদায়, চাঁদা দাও; কোথাও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে, চাঁদা চাই!

চাঁদার তাড়ায় বিব্রত হইয়া, হারাধন অবশেষে মহকুমায় আসিয়া হীরালাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "হুজুর, আপনাকে হাজার টাকা মর্য্যাদা দিয়া আমার যে নাকালের সীমা নাই! গত এক সপ্তাহে আমি ৭০ খানি চাঁদার চিঠি পাইয়াছি। অনেকে চাঁদার খাতা লইয়া আমার মোকামে পর্য্যন্ত চড়াও করিতেছে।"—

হীরালাল বাবু বলিলেন, "দাতা বলিয়া তোমার খুব নাম বাহির হইয়াছে—এ মন্দ কি?—তুমি, দিন কত এখন গা-ঢাকা দাও; না হয়, দিন কত তীর্থভ্রমণ করিয়া এসো।—কেহ চাঁদার জন্য চড়াও করিলে—গোমস্তাকে শিখাইয়া রাখ, সে যেন বলে, 'কর্ত্তা সাংঘাতিক কাহিল।—এখন তাঁহার নিকট চাঁদার কথা উত্থাপন করিবার উপায় নাই।'"

হারাধনকে অবশেষে কাশীধামে যাত্রা করিতে হইল।

কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ, হীরালাল বাবু উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।—মামুদনগরের অধিবাসীরা তাঁহার বদলীতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষুণ্ণ হইলেন, জমীদার চৈতন্যচরণ ও হারাধন সাহা। তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এমন প্রজারক্ষক পরোপকারী হাকিম আর এ মহকুমায় আসিবেন না। তিনিই আমাদের প্রধান মুরুব্বি ছিলেন।"

মামুদনগরের দাতব্য চিকিৎসালয়টির জন্য একটা পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করাইবেন, হীরালাল বাবুর এইরূপ সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মামুদনগরের নিকট চিরবিদায় লইতে হইল।

বিবিধ

অবরোধ ও অবগুণ্ঠন

[শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য এম, এ,]

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

অবরোধ ও অন্তঃপুরিকা শব্দ ভারতে অবরোধ-প্রথার বহু প্রাচীনতা প্রকাশ করে। মহাভারতাদি প্রাচীন সাহিত্যে ঐ দুই শব্দের বহু প্রয়োগ পাওয়া যায়। অন্তঃপুরে বিশেষভাবে স্ত্রী-জনকে রক্ষা করা হইত বলিয়াই ঐ দুই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অসূর্য্যম্পশ্যা শব্দটিও ইহাই প্রকাশ করিতেছে। রাজপত্নীগণ যে, সূর্য্যকেও দর্শন করিতেন না, ইহা তাহার অভিপ্রেত অর্থ নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজপত্নীগণকে এমন ভাবে রক্ষণ করা হইত যে, যাহাতে সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত না; সূর্য্যকে না দেখিয়া পারা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের রক্ষণবিধি এরূপ সুচারু হইত যে, যেন তাঁহারা সূর্য্যকেও দেখিতে পাইতেন না,—যেন সূর্য্যও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত না। পাণিনির (৩-২-৩৬) ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপই ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"গুপ্তিপরং চৈতৎ। এবং নাম গুপ্তা যদপরিহার্য্য দর্শনং সূর্য্যমপি ন পশ্যন্তীতি" (কাশিকা)। "তেন সত্যপি সূর্য্যদর্শনে প্রয়োগো ন বিরুধ্যতে" (তত্ত্ববোধিনী)। শত্রুর আক্রমণ নিবারণই যে, এইরূপ রক্ষাবিধির উদ্দেশ্য, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়।

সাধারণ লোকের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, অবরোধ-প্রথা ভারতে মুসলমানদের নিকট হইতে আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শব্দ কয়টিই তাহা খণ্ডন করিবে। অবগুণ্ঠন-প্রথাও ভারতে বহুপ্রাচীন। কালিদাস ত (শকু—৫-১৩) ইহা প্রয়োগ করিয়াছেনই, তাঁহার বহু পূর্ব্বের মনু-মহাভারত প্রভৃতিতেও ইহা বহুবার প্রযুক্ত দেখা যায়। পালি-সাহিত্যের সুবিখ্যাত অর্থ-কথাকার বুদ্ধঘোষ (৪র্থ শতাব্দী) প্রাতিমোক্ষের টীকায় (সেখিয় ২) প্রসঙ্গতঃ অবগুণ্ঠন বর্ণনা করিয়াছেন:—"যেমন অন্তঃপুরিকারা কেবল চোখের তারাটি বাহির রাখিয়া সমস্ত শরীর প্রাবৃত করিয়া থাকেন," ("যথা চ অন্তেপুরিকায়ো অক্‌খিতারকমত্তং দস্‌সেত্বা ওগুণ্ঠিকং পারুপন্তি")। বুদ্ধঘোষের এই বর্ণনা ঠিক মুসলমান-জানানাদিগেরই মত।

আজকাল এ দেশে সমাজ-বিশেষে অবগুণ্ঠন-প্রথা অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক আলোচনার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। পাঠকগণকে আমরা এখানে এ বিষয়ে এক অতি প্রাচীন যুক্তির কথা শুনাইব। এখনই যে, এদেশে আমাদের মধ্যে এক দল অবগুণ্ঠন-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাহা নহে; বহু প্রাচীন কালেও এইরূপ হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের সহধর্ম্মিণী গোপাদেবীই অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি শ্বশুর-প্রভৃতি গুরুজনকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন করিতেন না, বদন-মণ্ডল আচ্ছাদন করিতেন না,* তাঁহার এই ব্যবহারে সকলেই নিন্দা করিয়া উঠেন, কিন্তু গোপা দেবী নিরস্ত হইবার ছিলেন না। তিনি যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া, সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মহাযানের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ললিতবিস্তরে (১২শ অধ্যায়) ইহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতেই আমরা এখানে তাঁহার কয়েকটি কথা গ্রহণ করিতেছি:—

"শরীর যাঁহাদের সংযত, বাক্য যাহাদের সংযত, এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহাদের সুরক্ষিত ও মন নির্ম্মল, বদন আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের কি হইবে? যাঁহাদের চিত্ত সুরক্ষিত ও ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত থাকে, অন্য পুরুষের দিকে যাঁহাদের

* "তত্র যদপি গোপা শাক্যকন্যা ন কঞ্চিদ্‌ দৃষ্ট্বা বদনং ছাদয়তি স্ম শ্বশ্রূং (শ্বশ্রূং) বা শ্বশুরং (শ্বশুরং) বা অন্তর্জনং বা। তে তামুপধ্যায়ন্তি স্ম বিচারয়ন্তি স্ম। নববধূকা হি নাম অপ্রতিলীনা তিষ্ঠতে।" ললিতবিস্তর, ১৭৯ পৃঃ

চিত্ত গমন করে না, এবং স্ব-পতিতেই যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারা উন্মুক্ত ভাবে প্রকাশ পান, তাঁহাদের বদন আচ্ছাদন করিবার প্রয়োজন কি!"

"জানন্তি আশয় মম ঋষয়ো মহাত্মা
পরচিত্তবুদ্ধিকুশলাস্তথ দেবসঙ্ঘাঃ।
যথ মহ্য শীল গুণ সংবরু অপ্রমাদো
বদনাবগুণ্ঠনমতঃ প্রকরোমি কিং মে॥"

—ললিত বিস্তর, ১৮২ পৃঃ।

ঋষিগণ ও দেবগণ পরের চিত্তবৃত্তিকে জানিতে পারেন, আমার হৃদয়ের ভাব কি, তাহা সেই মহাত্মারাই জানেন। তাঁহারা আরও জানেন—আমার শীল, গুণ, সংযম ও অপ্রমাদ কিরূপ, অতএব আমি আমার বদনের অবগুণ্ঠন করিব কেন?

রাজা শুদ্ধোদন ও আর আর সকলে শাক্যকন্যা গোপার এই সকল গাথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার

[শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.]

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মানবের জ্ঞান তাহার ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর যে কয়টা ইন্দ্রিয় তাহার আছে; চোখ ও কাণ সব চেয়ে তীক্ষ্ণ। কোন কিছু ঘটনার উপর জোর দিতে হলে আমরা বলে থাকি, স্বকর্ণে শুনেছি—নিজের চোখে দেখেছি—যেন চোখ ও কাণ একেবারে সবজান্তা—তাদের সাক্ষ্য একেবারে অকাট্য। কিন্তু এই চোখ-কাণের দৌড়টা কতদূর, একবার দেখা যাউক।

একটা গেলাসের গায়ে ঘা দিলে একটা শব্দ শুনা যায়। সেই সময় গেলাসটা যদি খুব আস্তে আস্তে ছোঁয়া যায়, তো দেখা যায়, গেলাসটা কাঁপচে। এখন এই গেলাসের সঙ্গে সঙ্গে গেলাসের গায়ের বাতাসটাও কাঁপতে থাকে এবং তার জন্য বাতাসে যে একটা ঢেউ উঠে, সেই ঢেউটা আমাদের কাণের ভিতর যে একটা খুব পাৎলা চামড়া আছে, সেই চামড়াটাকে ধাক্কা দেয়; আর অমনি আমাদের মরমে পশিয়া যায়—মনে হয়, একটা শব্দ শুনছি। শুনা জিনিষটার আসল ব্যাপার হচ্চে এই। শুধু বাতাসের ঢেউ থেকেই এই অনুভূতিটা আমাদের হয়। এখন বাতাসের কাঁপুনিটা খুব দেরীতে দেরীতেও হতে পারে—খুব তাড়াতাড়িও হতে পারে। ধীরে ধীরে হলে শব্দটা ঢাবঢেবে বলে মনে হয়, আর ঘন ঘন হ'লে সুরটাকে খুব কড়া বলে লাগে। মনে করা যাউক, একটা বেহালা 'সি' সুরে বাঁধা আছে; বেহালার কাণটা যতই মোচড়ান যায় বা তারটা যতই ছোট করা যায়, সুরটা ততই চড়া হয়। মনে করা যাউক, তুই করা যাচ্চে—যাতে করে সুরটা খুবই উঠে যাচ্চে—সা থেকে রে, রে থেকে গা—আরও উঁচু—এক পর্দ্দা থেকে আর এক পর্দ্দা—আরও উঁচু—আরও কড়া, কাণ যেন ফেটে যায়—আরও জোরে মোচড়াও—তার আরও ছোট কর—বস্! একেবারে নিঃশব্দ কোন আওয়াজ নেই সব স্থির। এখন 'সি'-সুরটা হচ্চে—এক সেকেণ্ডে বাতাসের ২৫৬ বার কম্পন; তার কড়া করে বাঁধলে, কাঁপুনিটা আরও বেশী তাড়াতাড়ি হতে থাকে—৩০০, ৪০০, ৫০০, ১০০০, ২০০০, ১০০০০, ২০০০০, ৩০০০০। এখন হিসাব করে দেখা গেছে যে, কম্পনটা যদি প্রতি সেকেণ্ডে আন্দাজ ৩২০০০ বত্রিশ হাজারের উপর হয়, তো সেই ঢেউগুলো কর্ণের ঐ চামড়াটাকে আর ধাক্কা

দিতে পারে না—সুতরাং বাতাসের ঐ সকল ঢেউ সম্বন্ধে মানুষের কাণ একেবারে কালা। আবার ধরা যাউক, একগাছা ছড়ি বাতাসে দোলান যাচ্চে—কোন কিছু শব্দ নাই। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যদি ছড়ি গাছটা নাড়ান যায়—তো একটা বন্ বন্ শব্দ আমাদের কাণে লাগে; এদিকেও দেখা গেছে, বাতাসের কম্পন সেকেণ্ডে যদি ৩২ বারের কম হয়, তাহা হ'লেও মানুষ সেটা ধরতে পারে না।

মানবের শ্রুতির অনুভূতিটা বাতাসের কম্পন হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এই অনুভূতি একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। বাতাসের ঢেউ হলেই যে আমরা সেটা ধরতে পারি, তা নয়; বাতাসের প্রতি কম্পনই যে আমাদের শ্রুতির গোচর—তা নয়। ৩২ এর এ দিকে বা ৩২০০০ এর ওদিকের কম্পন সম্বন্ধে আমাদেব ইন্দ্রিয় একেবারে অসাড়; শুধু এই সাতটি অক্‌টেভের মধ্যে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় নিবদ্ধ। এই সীমার বাহিরে কত লক্ষ লক্ষ কত কোটী কোটী বায়ুতরঙ্গ বহিয়া চলিতেছে, সেই তরঙ্গের মধ্যে দিবারাত্র ডুবিয়া থাকিয়াও আমরা জ্ঞানহীন—আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে বধির!

বায়ু পৃথিবীর উপর আন্দাজ ৫০ মাইল অবধি ব্যবস্থিত—কিন্তু এই নিখিল চরাচর পরিব্যাপ্ত হইয়া জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈথর বলিয়া বৈজ্ঞানিকের কল্পিত একটি পদার্থ আছে; এই ঈথর সমস্ত বিশ্বের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া, সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহ মধ্যে সংযোগ-সাধন করিয়া সকলকে এক কোলে স্থান দিতেছে। এক জগতের স্পন্দন এই ঈথর মধ্য দিয়া অন্য জগতে সঞ্চারিত হইতেছে; শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটী কোটী জগৎ এই ঈথর-সূত্রে গ্রথিত। এ ঈথরকে চাক্ষুষ দেখান যায় না; তবে নানা উপায়ে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বাতাসের ন্যায় এই ঈথরেরও ঢেউ তোলা যায় এবং এই ঈথর-তরঙ্গই আমাদের দৃষ্টির উৎপাদক। কিন্তু এখানেও সেই গম্ভীর কথা—ঈথরের ঢেউ মাত্রই আমাদের চক্ষুর গোচর হয় না। মনে করা যাউক, একটি অন্ধকার ঘরে আমরা আছি এবং কোন ব্যক্তি-বিশেষ কোন যন্ত্র-বিশেষ দ্বারা ইচ্ছামত ঈথর-তরঙ্গ করাইতেছে; ঢেউএর সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এক, দশ, শত, হাজার, দশ-হাজার, লক্ষ, কোটী, দশ কোটী, হাজার কোটী, লক্ষ কোটী, কোটী কোটী! আমরা কিছুই অনুভব করিতেছি না—কিছুই দেখিতেছি না—আরও বাড়ান যাউক। কম্পন-সংখ্যা যখন প্রতি সেকেণ্ডে চার কোটী কোটী পৌছায়, তখন হঠাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয়কে জাগরিত করিয়া, অন্ধকার ভেদ করিয়া, রক্তিম আলোক দেখা দেয়। সংখ্যা আরও বাড়ান যাউক। আলোর রং লাল হইতে পীত, পীত হইতে সবুজ, সবুজ হইতে নীল; কম্পন-সংখ্যা যখন সেকেণ্ডে ৮ কোটী কোটী পৌছায়, তখন বেগুনে বলিয়া মনে হয়; আরও বাড়ান যাউক—আমাদের চক্ষু পরাস্ত হইবে, যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। অগণিত অসংখ্য ঈথর-তরঙ্গ মধ্যে শুধু যেগুলির কম্পন ঐ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কেবল সেইগুলি আমাদের চক্ষুকে অভিভূত করে, বাকী কোটী কোটী তরঙ্গ আমাদের মধ্যে সদাসর্ব্বদা প্রবাহিত হইলেও তৎসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধ। বায়ু-তরঙ্গের বরং সাতটা অক্‌টেভ্ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়; ঈথর-তরঙ্গের মাত্র একটি অক্‌টেভ্ আমাদের চক্ষুকে আকৃষ্ট করে।

বকের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, বিশ্ব-সঙ্গীতের এই টুকু মাত্র শ্রবণ করিয়া বিশ্বসৌন্দর্য্যের এই কণামাত্র দর্শন করিয়া মানব ঠিক করিয়া ফেলে যে, সমস্ত বিশ্বরহস্য সে উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছে; এবং এই শ্রবণেন্দ্রিয়ও এই দর্শনইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে তাহার জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সাহায্যে শুধু বিশ্বের নয়—বিশ্বনিয়ন্তারও সবিশেষ তথ্য এক নিঃশ্বাসে বলিয়া যায়!

সাধারণের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠে—বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি? তাহার উত্তর বোধ হয় এই—বিজ্ঞানের চরম পরিণতি, হাউইজারে নয়—জেপলীন নয়—সব ম্যারিনে নয়—ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফিতে নয়—বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হচ্চে এই যে, মানুষকে যে জানিয়েছে—কত কম সে জানে!

উত্তর-ব্রহ্মে—

শাণ-রাজ্য

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রেঙ্গুন প্রবাসী মদীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রসাদে, আমার ভাগ্যে দুইবার ব্রহ্মদেশ-দর্শন ঘটিয়াছে। সেবার—১৯১২ সালের মার্চ্চমাসের শেষে, এক দিন মধ্যাহ্নকালে মান্দালয় মহানগরী হইতে মেমিয়ো অভিমুখে যাত্রা করি। সঙ্গে দুইজন বন্ধু ছিলেন। একজন আমার সহিত মেমিয়ো পর্য্যন্ত যাইবেন; অপরটি আমার সহচরদ্বয়. শ্রীযুক্ত চুণীলাল চট্টোপাধ্যায়। চুণী বাবুর সাহায্যে ও সৌজন্যে আমি সমগ্র ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ প্রান্ত রেঙ্গুন হইতে উত্তর প্রান্ত—চীন-সীমান্ত মিচিনা পর্য্যন্ত পরমানন্দে পর্য্যটন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কথা ছিল, চুণীবাবু আমার সহিত মেমিয়ো হইয়া বরাবর 'গোয়েটিক্ সেতু' (Gokteik Viaduct) পর্য্যন্ত যাইবেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমায় মোহায়ং পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া, তিনি মান্দালয় ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

এইখানে বর্ম্মা-রেলওয়ে সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই মিটার-গজ রেল লাইন সাড়ে তিন ফুট্ প্রশস্ত, সুতরাং গাড়ীগুলি একটু ছোট। গাড়ীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে। এখানে যাত্রীদের আহার্য্য ও পানীয়ের জন্য আদৌ ভাবিতে হয় না। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেসনেই দেখা যায়, বাকবাহী বিক্রেতারা অনেক প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য লইয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের নিকট সিদ্ধ অন্ন, সিদ্ধ শাক-সবজি, সিদ্ধ মৎস্য মাংস, ডিম্ব, ফল মূল ও রুটী-বিস্কুট প্রভৃতি আহার্য্য ব্যতীত চুরুট, দেশলাই, সাবান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি থাকে। এতদ্ভিন্ন বড় বড় ষ্টেশনে নানাবিধ সৌখীন সামগ্রী ও খেলানাও বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অবশ্য কর্ত্তব্য ও মহা পুণ্য কর্ম্ম; সেই জন্য সকল ষ্টেসনেই তাহাদের সযত্নরক্ষিত জলপূর্ণ কুম্ভ ও পান-পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীরা সেই জলসত্র হইতে প্রয়োজনমত জলসংগ্রহ করে;—ভারতবর্ষীয় রেলযাত্রীদের মত চাতকবিনিন্দিত কাতরকণ্ঠে "পানি পাঁড়ে"—"পানি পাঁড়ে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে হয় না।

বাষ্পীয় শকট যথাসময়ে পুঞ্জীকৃত ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে সদর্পে মোহায়ং-জংসন ছাড়িয়া গেল। আমরা প্রাচীন ব্রহ্ম-রাজধানী অমরপুরার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। হায়, এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "আভা" রাজ্যের একদিন কতই না ঐশ্বর্য্য ও গৌরব ছিল! 'কুসুমদাম-সজ্জিত, উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম' যে রাজপ্রাসাদগুলি এক দিন অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহাদেরই জীর্ণ প্রাচীরগুলি কালের করাল কুঠারাঘাতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!

ক্রমে, দূরে মান্দালয়ের উত্তরসীমাস্থ মার্ব্বেল পাহাড় নয়নগোচর হইল। এই তুষার-ধবল মার্ব্বেল পাহাড় হইতেই প্রস্তর আনাইয়া ব্রহ্মদেশবাসী উপাস্যদেবতা

পর্ব্বতারোহণ

বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিয়া থাকে। অবশেষে, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষান্তরালে অৰ্দ্ধপ্রচ্ছন্ন দুই চারিটা বৌদ্ধমন্দির ভিন্ন, সকল দৃশ্যই বিলীন হইল।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমরা সিডা (Sedaw) ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। পশ্চাতে আর একখানি ইঞ্জিন জুড়িবার জন্য গাড়ি এইখানে অন্যূন ১০ মিনিট অপেক্ষা করিবে। আমরা গাড়ীর বাহিরে নামিলাম। এইবার আমাদের পাহাড়ে উঠিবার পালা। কিছু পূর্ব্বে যে শাণ শৈল সুদূর গগনপ্রান্তে কৃষ্ণবর্ণ মেঘবালাবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, এখন আমরা তাহারই পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছি। কি কৌশলে গাড়ীখানি এই সু-উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিবে, সহযাত্রি-মহাশয় আমাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

অন্যূন সহস্র ফুট উচ্চ এই লোহিত বর্ণ পর্ব্বতের অঙ্গ কাটিয়া ও প্রতি ২৫ ফুটে ১ ফুট উচ্চ ঢালু করিয়া, ছয় প্রস্থ পথ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রস্থ অতিক্রম করিয়া গাড়ী থামে। তখন সম্মুখের ইঞ্জিনখানি পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পড়ে ও পশ্চাতের ইঞ্জিনখানি গাড়ীটিকে টানিয়া বিপরীত উচ্চ ঢালু পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। এইরূপে পাঁচবারে থামিয়া অবশেষে রণোন্মত্ত সেনাপতির দুর্গজয়ের ন্যায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ট্রেণখানি পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া পড়িল। বিখ্যাত দার্জ্জিলিং-পথে রংটং (Rungtong) হইতে তিন্ধারিয়া (Tindharia) পর্য্যন্ত লাইনের উচ্চতা প্রতি ২৮.৭৭ ফুটে ১ ফুট এবং তিন্ধারিয়া হইতে গাইবারি (Gybaree) ষ্টেসন প্রতি ২৮.৭০ ফিটে ১ ফুট। সেই স্থানটাই উক্ত রেলপথে সর্ব্বাপেক্ষা ঢালু। সুতরাং এই হিসাব হইতে প্রমাণ হয়, অন্ততঃ মেমিয়ো পথে এই ভয়াবহ স্থানের কাছে দার্জ্জিলিং লাইন পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

এইটুকু পথ অতিক্রম করিতে প্রায় আধঘণ্টা লাগিয়াছিল। অবশ্য সে সময় আমার মনের মধ্যে আনন্দ, বিস্ময় ও ভীতির কিরূপ প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা বর্ণনা করা সহজ নহে। প্রত্যেক ধাপ অতিক্রম করিয়া আমি নিম্নে রেলপথপানে চাহিয়া মনে মনে ইঞ্জিনীয়ারদের বুদ্ধিনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম; আর ভাবিতে লাগিলাম—যদি ট্রেনখানি কোনও ক্রমে রেলচ্যুত হইয়া পার্শ্বস্থ সুগভীর খাদে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হইবে। গিরিশিখরে উঠিয়া ট্রেনখানি একটু অপেক্ষা করিল; সেই অবকাশে আমি বাহিরে নামিয়া, দূরবীক্ষণ সাহায্যে চারিদিকের মনোমোহন শোভা দেখিয়া, নয়নমন চরিতার্থ করিলাম।

পর্ব্বতনিম্নে আভা-প্রদেশস্থ সুশ্যামল অধিত্যকাভূমি; সবুজ মখমলের ন্যায় বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের চারিধারে গাঢ় নীলবর্ণ জঙ্গলগুলি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া, দূরে, গগনের সীমাপ্রান্তে, সাগায়িং পর্ব্বতের গাত্রদেশে মিলাইয়া গিয়াছে। এক দিকে সাগায়িং পর্ব্বতের কৃষ্ণবর্ণ চূড়াগুলি দর্শকের মনঃ প্রাণ হরণ করিতেছে, অন্যদিকে আবার মান্দালয় প্রদেশস্থ তুষারধবল মার্ব্বেল পাহাড়ের রৌপ্য-মুকুটোপরি অস্তাচলগামী রবিকিরণ প্রতিফলিত হইয়া এক অভাবনীয় উজ্জ্বল চিত্রে নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে; অতিদূরে, পর্ব্বত দুইটির মধ্যদেশে পুণ্যতোয়া ইরাবতী মহানদী রজত-রজ্জুর ন্যায় শোভা পাইতেছে! সম্মুখে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ—অনন্ত শৃঙ্গ—গগনস্পর্শী! অদূরে, বামভাগে, দুইটি রক্তবর্ণ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে এক সুশ্যামল বিটপিমণ্ডিত সুবিশাল পার্ব্বত্য খাদ। সেখানে এক গিরি-নির্ঝরিণী নাচিতে নাচিতে নদীর উদ্দেশে চলিয়াছে। নিম্নে একবার সিডা

মনোমোহন দৃশ্য

অসংখ্য ঝিল্লী কুলের আর্ত্তনাদ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে; সেই সুবিশাল দুর্ভেদ্য বনরাজি ভেদ করিয়া সে নিনাদ শূন্যে মিলাইতে পথ পায় না! এখনও মেমিয়ো যাত্রা স্মরণকালে সর্ব্বাগ্রে সেই নিরবচ্ছিন্ন ঝিল্লিরব-মুখরিত ভয়াবহ স্থানের ভীষণ দৃশ্য মনে পড়ে।

পাষাণ বক্ষঃ সংগৃহীত আহার্য্যে শরীর পোষণ-পূর্ব্বক তাহারই গর্ব্বোন্নত শিরে যাহাদের অবস্থিতি, শোণিত-পিপাসু হিংস্রশ্বাপদ-সম্প্রদায় যাহাদের আশ্রিত ও শরীররক্ষী, স্বয়ং সংহারকর্ত্তার জন্মদাতাও যাহাদিগকে ভয় করিয়া চলে—মহাশক্তিশালিনী এহেন মহারণ্যানীও, বিজ্ঞানবলে বলীয়ান, মানবসৃষ্ট বাষ্পীয়যানকে, সভয়ে জড়সড় হইয়া, সসম্ভ্রমে শিরসঞ্চালন করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া দিল। সেও স্বীয় বিজয়োল্লাসে বক্ষস্ফীত করিয়া, ভয়ার্ত্তদিগকে সুতীব্রস্বরে শাসাইতে শাসাইতে, মানবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ছুটিয়া চলিল।

ষ্টেসনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বোধ হইল যেন একটা তাসের খেলাঘর!

বন্ধুর আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল। দ্রুতপদে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। সেই অরণ্যসঙ্কুল বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া,—যেন স্বীয় বাষ্প বলে সমস্ত জড়জগৎ তুচ্ছ করিয়া সুতীব্র অবজ্ঞাভরে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, সোল্লাসে বিজ্ঞানের জয়-ঘোষণা করিতে করিতে, ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে, বিসর্প বেগে বাষ্পীয় শকট ছুটিয়া চলিল। কোথাও শাল বন, কোথাও সেগুন, দেবদারু ও পিংকাড়োর বন, আর কোথাও বা পুঞ্জীকৃত বাঁশ ও কদলীর জঙ্গল; যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই নিবিড় বৃক্ষরাজি; সেই সব ঘন পল্লববিশিষ্ট মহাপাদপ মধ্যে লতাগুল্মাদি জন্মাইয়া সেই নিবিড় অরণ্যানীকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে! ভিতরে অস্পষ্ট আলোক—রবিকিরণও বুঝিবা সেই নিবিড়তা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না! তদুপরি অবিরাম পার্ব্বত্য ঝিল্লীর উচ্চরব সে স্থানের ভীষণতাকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে! সে বিকট শব্দে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—যেন সেই বিরাট বনস্পতির প্রতি-পল্লবে-অবস্থিত

মনে পড়ে—একবার এক পর্ব্বতপ্রান্তে এমন একস্থানে আসিলাম, যেখানে আমাদের বামপার্শ্বে, মাত্র দশহস্ত মধ্যে, এক পাতালস্পর্শী সুবিশাল খদ, দক্ষিণে এক গগনচুম্বি পাষাণস্তূপ; আর সেই পাষাণবক্ষ দ্বিধা বিদীর্ণ
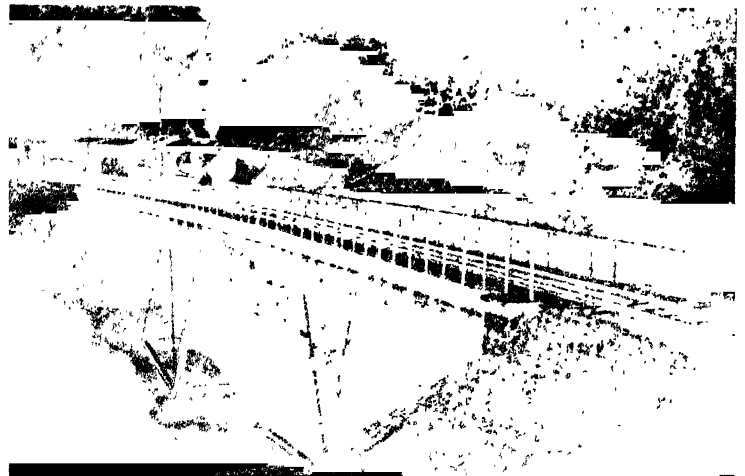
ঝরণা-অতিক্রম
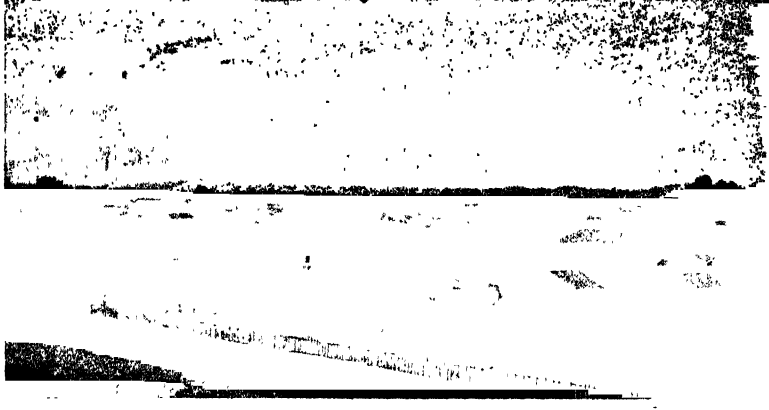
মেমিয়ো

করিয়া এক স্বচ্ছসলিলা বারিধারা বিদ্যুৎবেগে কান্ পাতালপুরে ধাববানা! একটি সেতু অতিক্রমকালে নিম্নের সেই মহান্ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিলাম।

এইরূপে, কত গিরি-নির্ঝরিণীর অনন্ত কল কল বাণী ও কত মহারণ্যসমাকীর্ণহিংস্রজন্তুরবমুখরিত অশ্রান্ত মর্ম্মর ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে, সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে মেমিয়ো ষ্টেসনে অবতীর্ণ হইলাম।

একাকী আসিলে আশ্রয় অনুসন্ধানের জন্য কতই চিন্তিত হইতাম; কিন্তু বন্ধুবরের অনুগ্রহে আমাকে আর কিছুই দেখিতে-শুনিতে হইল না। যথাসময়ে আমাদের অশ্বযান একটি সরল অনতিবিস্তৃত রাজপথ অবলম্বন করিয়া, একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। শকট হইতে অবতরণ করিয়া বন্ধুবর উপরে উঠিয়া গেলেন এবং একটু পরেই একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে পরমসমাদরে দ্বিতলে এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া, আসনগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আমার চিত্ত আপ্লুত হইল। কোথায় কলিকাতা, আর কোথায় মেমিয়ো! প্রায় দেড়হাজার মাইল দূরবর্ত্তী এই প্রবাসে একজন স্বজাতির আবাসে, অতিথি-ভাবে এরূপ সমাদরলাভে মুহূর্ত্তের জন্য অভিভূত হইয়া রহিলাম। যাঁহারা কখনও বিদেশে গিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারেন যে, সেখানে একজন স্বদেশীর প্রথম আদর-সম্ভাষণ কিরূপ মিষ্ট, কত মর্ম্মস্পর্শী!

যথারীতি পরিচয় আদান-প্রদান করিয়া জানিতে পারা গেল যে, গৃহস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর আমার সহপাঠী; দুইজনে একই সময়ে শিবপুর কলেজের ছাত্র ছিলাম।

এক রেকাবী জলখাবার হস্তে যখন একজন প্রাচীন হিন্দুস্থানীর সেই বৈঠকখানা ঘরে শুভাবির্ভাব হইল, তখন আমি হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলাম; কোন প্রকার শিষ্টাচার না দেখাইয়া, আমি সে সমস্ত মিষ্টান্নের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিলাম। আপনারা হয়ত আমাকে পেটুক মনে করিতেছেন; কিন্তু সে সময় আমার বিদ্রোহী জঠররাজ্যের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, আমি স্বয়ং উপযাচক হইয়া, গৃহস্বামীকে কিছু খাদ্যানয়নের জন্য অনুরোধ করিলেও কিছুমতে অসঙ্গত বা অশোভন হইত না। সেই কোন্ সকালে দুই-চারি গ্রাস আতপান্ন গলাধঃকরণ করিয়া ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিয়াছিলাম; 'সিডা' অতিক্রম করিতে না করিতেই সে অন্ন পরিপাক হইয়া গিয়াছিল। তদুপরি এতটা পাহাড়িয়া রাস্তা ছুটাছুটি করিয়া আসা বড় সহজ ব্যাপার নহে; পথিমধ্যে কি-একটা ষ্টেসনে—বর্ম্মীদের প্রস্তুত অন্যবিধ খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি না থাকায়—একটি নাবালক পেঁপে সংগ্রহ করিয়া, সে অনলে ঘৃতাহুতি দিয়াছিলাম মাত্র!

জগৎ তুষ্ট হইল;—এইবার এই সদাশয় ভদ্রলোকটির একটু পরিচয় না জানাইলে অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে। ইনি মেমিয়োর একজন খ্যাতনামা এড্‌ভোকেট্—নাম শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়। গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে পুত্রকলত্রাদির সহিত এখানেই বসবাস করিতেছেন।

মান্দালয় হইতে যাঁহার সহিত আসিলাম, তিনি ইঁহারই খুল্লশ্বশুর। ক্রমে শুনিলাম, সেই খুল্লশ্বশুর-মহাশয় মেমিয়োবাসী সকলেরই সরকারী "খুড়া"। কাজে কাজেই আমিও তাঁহার ভাইপো-সম্প্রদায় ভুক্ত হইলাম।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, একটু বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, খুড়া-মহাশয় আমাকে লইয়া বহির্গত হইলেন। আমাদের বাসার নিম্নেই একটি অনতিবিস্তৃত রাজপথ; তাহার দুই পার্শ্বে দুই সারি ইউকেলিপ্‌টস বৃক্ষরাজি ও তৎপশ্চাতে ক্ষীণ দীপাবলী শোভিত সুসজ্জিত

খুড়ামহাশয়ের সঙ্গে একটি অপরিচিত বাঙ্গালীকে দেখিয়া, সেই কটেজের একজন প্রবাসী-মহাশয়ের বদনমণ্ডলে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। হয়ত তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, কালাপাণি-পারস্থিত এই সুদূর প্রদেশে কেবল তাঁহারা কয়জনই ভ্রমবশে আসিয়া পড়িয়াছেন; আর কোনও বঙ্গবাসী সেখানে আসিতে পারেন না!—অন্ততঃ স্বেচ্ছায় এই নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করা কাহারও পক্ষে বিজ্ঞোচিত নহে।—এরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়োৎপত্তি আশ্চর্য্য নহে, এবং আনন্দের কারণ,

মেমিয়ো রাজপথ

বিপণীশ্রেণী। উভয় পার্শ্বের শাখাপ্রশাখাগুলি পরস্পর বিজড়িত হইয়া ঠিক খিলানের মত রাস্তাটিকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলো, সেই পত্রাবলীর মধ্য হইতে বিকীর্ণ হইয়া, সেই পরিষ্কৃত রাজপথের উপর পতিত হওয়ায় পথটিকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। জনতা অতি অল্প;—কোলাহলও তেমন ছিল-না। সেই সুরম্য রাজপথ অবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, বামদিকে অন্য একটি অপ্রশস্ত রাস্তায় পড়িলে, খুড়া-মহাশয় "বেঙ্গল কটেজে" যাইবার প্রস্তাব করিলেন। ট্রেনে আসিবার কালে, তাঁহার মুখে "বেঙ্গল কটেজ"-সংক্রান্ত অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। মেমিয়োপ্রবাসী বাঙ্গালীবাবুদের মধ্যে দুই চারিজন সপরিবারে স্বতন্ত্র বাটীতে অবস্থান করেন; অবশিষ্ট বাবু কয়টীর আশ্রয় এই "বেঙ্গল কটেজ"। আশ্রমে আছে—একজন হিন্দুস্থানী মহারাজ ওরফে পাচক ব্রাহ্মণ; সে একাই ভৃত্য ও পাচক—উভয়ই।

হয় ত' বহুকাল পরে একজন নূতন বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়াই হউক, অথবা তাঁহাদের মেসের একজন মেম্বর জুটিল অনুমান করিয়াই হউক!

বলা বাহুল্য, আধ-ঘণ্টার মধ্যেই বেশ একটা মজলিস জমিয়া গেল। মান্দালয়বাসী বন্ধুবর্গকে একদিন দুই চারি খানি সঙ্গীত শুনাইয়া ছিলাম; খুড়ামহাশয় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, আমাকে "আমার জন্মভূমি" গানখানি গাহিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন। অগত্যা আমি স্বর্গীয় কবির সেই "ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা" গান আরম্ভ করিলাম।

সে রাত্রিতে আরও দুইখানি সঙ্গীত হইবার পর সভা-ভঙ্গ হইল।

আহারাদির পর 'বেঙ্গল কটেজেই' রাত্রিযাপন হইবে স্থির হইলে, আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। সেই ক্ষুদ্র 'বেঙ্গল কটেজের' দুইদিকে দুইটি পাকা রাস্তা এবং অন্য

দুইদিকে বিস্তৃত উপত্যকা-সংলগ্ন তৃণভূমি ও কৃষিক্ষেত্র। সুনির্ম্মল আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। দূরে অনুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলি চাঁদের কিরণ মাখিয়া নয়নরঞ্জন হইয়াছে। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। সেই ধুলিহীন পাকা রাস্তা ধরিয়া, মনে মনে জন্মভূমির এক চাঁদিনী রজনীর সহিত সেই দৃশ্যের তুলনা করিতে করিতে, যথাস্থানে উপনীত হইলাম। ভোজনের সুবন্দবস্ত হইয়াছিল, তৃপ্তিপূর্ব্বক উদরপূরণ হইল। তাহার পর 'কটেজে' গিয়া শয়ন ও নিদ্রা।

পরদিন সহর ঘুরিয়া আসিলাম। পর্ব্বত প্রাচীর-বেষ্টিত উপত্যকামধ্যে এই মেমিয়ো, পূর্ব্বে (Pyin-u-lwin) পিন্-উ-লুইন্ নামে পরিচিত ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। ১৮৮৫ খৃঃ কর্ণেল মে, নিজ নামানুসারে তাহার 'মেমিয়ো' নামকরণ করেন। এক্ষণে মেমিয়ো ব্রহ্মদেশীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের গ্রীষ্ম শৈলাবাস। সহরটি মান্দালয়ের ৪২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে, সমুদ্রতীর হইতে ৩৬০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ক্যাণ্টনমেণ্ট লইয়া মেমিয়োর আয়তন এক বর্গ মাইল। জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

সহরে জলের কল আছে। নিকটস্থ এক ঝরণা হইতে সহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহ হয়। ব্রহ্মদেশপ্রবাসী শ্বেতাঙ্গ নরনারীদিগের পক্ষে শীতপ্রধান মেমিয়ো সহর স্বর্গতুল্য। 'গভর্ণমেণ্ট হাউস' 'বটানিকাল গার্ডেন' ও 'মেমিয়ো ক্লব' দর্শনীয় বস্তু হইলেও, আমি সেখানে তেমন কোনও বিশেষ চিত্তাকর্ষক—উল্লেখযোগ্য দৃশ্য দেখিলাম না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ক্ষুদ্র সহরটি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দেখিতেও নিতান্ত মন্দ নহে। ষ্টেসনসংলগ্ন, সাহেবি ধরণের মেমিয়ো সহরে বেড়াইলে পুষ্পোদ্যান ও অর্কিড-শোভিত গির্জ্জা, কতকগুলি কোম্পানির অফিস, হাঁসপাতাল ও বাজারের চক দৃষ্টিগোচর হয়।

বীরেশ্বর বাবুর বাটীর সম্মুখে, বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নানা দিগ্দেশ হইতে আগত সদানন্দময়ী শাণ রমণীরা শাকসব্জী, তরিতরকারী, ফলমূল ও মৎস্যাদি লইয়া উপবিষ্ট। * সে ক্ষুদ্র বাজারে চাল, ডাল, শুষ্ক মৎস্য, মধু, চা, বিস্কুট, সাবান হইতে পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিবিধ সৌখীন সামগ্রী, এমন কি, গাছগাছড়া প্রভৃতি দেশীয় ঔষধ পর্য্যন্তও বিক্রয়ার্থ সুসজ্জিত রহিয়াছে। এইরূপ বাজার ব্রহ্মদেশে, কি সহরে কি পল্লীতে, সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; রেঙ্গুন, মান্দালয় প্রভৃতি রাজধানী স্থানে ত' কথাই নাই।—সেখানকার প্রধান বাজারগুলি কলিকাতা 'মিউনিসিপ্যাল' বাজারের তিন চারিগুণ বৃহৎ, এবং প্রত্যেক বাজারেই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। মেমিয়োতে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা অল্প নহে। তথাপি সেখানে অযথা কোলাহল, বা দ্রব্যাদির মূল্য লইয়া অধিক দাম কসামাজা, নাই। নানাজাতীয় ফল এবং সুগন্ধ ফুলেরও আমদানি হয়। কপি, কলাইসুটী, বিলাতী বেগুন, স্কোয়াস প্রভৃতি আনাজ সেখানে বার মাসই পাওয়া ও কলিকাতার তুলনায় সস্তা। হাঁ—একটা জিনিস কিনিলাম বটে; সে একটি মাঝারি লাউএর আকারের পেঁপে! দামও চূড়ান্ত সস্তা—এক আনা মাত্র, খাইতেও সুমিষ্ট। মেমিয়োতে এই বাজার পাঁচ দিন অন্তর বসে।
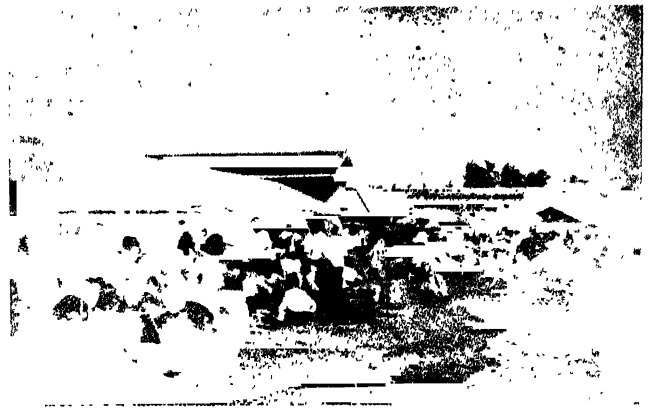
মেমিয়ো—বাজার

ব্রহ্মদেশীয় সকল বাজার দিবাভাগেই বসে, সন্ধ্যার প্রারম্ভে বন্ধ হইয়া যায়। বড় বড় সহরে ব্যবসায়ীরা রাত্রিকালে রাজপথের দুই ধারে সারি সারি দোকান সাজাইয়া দেয়। তবে সেখানে কাষ্ঠ দ্রব্য, পোষাকপরিচ্ছদ ও অন্যান্য বিলাসের সামগ্রীই বেশী! স্থানবিশেষে

* মেমিয়ো প্রদেশে চা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে; আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে লবণ, তুলা, পশমী বস্ত্র এবং লৌহই প্রধান। বাণিজ্যসম্পর্কে মেমিয়ো চীন ও ব্রহ্মদেশজাত দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে প্রধানতম কেন্দ্রস্থান।—লেখক।

হোটেলওয়ালারা বৃহদায়তন টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্যবস্তু প্রদর্শন করে। খরিদ্দার আসিয়া, টেবিলের সম্মুখে চেয়ার অথবা বেঞ্চের উপর বসিয়া, আহার্য্য কিনিয়া খায়। খাদ্যদ্রব্যগুলিও বেশ। বৃহত্তর আহার-স্থানে অন্ন, সিদ্ধ মৎস্য, মাংস, সর্প, কেন্নুই, ও রুটী বিস্কুটাদি আহার্য্য দ্রব্য ব্যতীত হ'ল বা একমাত্র নাপ্পি * মিশ্রিত কাষ্ঠ পিপীলিকার বা বোলতার কালিয়া, একথালা কোলা কিম্বা কট্‌কটিয়া ব্যাঙের কাটলেট্ অথবা এক কটোরা হাঙ্গর-কুম্ভীরের কোর্‌মা, টেবিলগুলির শোভা বর্দ্ধন করে। এতদ্ভিন্ন হয়ত একটা আস্ত হংস সিদ্ধ, একটা প্রমাণ রাম-পক্ষী দগ্ধ, কিংবা জনৈক অজরাজের পশ্চাৎপদ ঝলসান, সব টেবিলের উপর সিকে ঝোলান। সংক্ষেপতঃ, ব্রহ্মবাসী স্বহস্তে হত্যা করিয়া কোনও প্রাণী উদরস্থ করে না বটে, তবে মৃতাবস্থায় পাইলে ভূচরের মধ্যে চৌকি, খেচরের মধ্যে ঘুড়ী ও জলচর শ্রেণীসম্ভূত জাহাজ নৌকাব্যতীত অন্য কিছুরই বোধ হয় তাহারা অনাদর করে না। এই শ্রেণীর হোটেল ভিন্ন -চা, সরবৎ প্রভৃতি পানাগারের সংখ্যা ত প্রচুর।

বস্তুতঃ ব্রহ্মদেশীয় এই "নৈশ বাজার" ও তৎসহিত চিরপ্রফুল্ল জনমণ্ডলীর হাসি-তামাসা গল্প-গুজবও দর্শন ও উল্লেখযোগ্য।

বিকালে একবার 'ক্যাণ্টনমেণ্টে' গিয়াছিলাম। দেখিলাম, একদল গোরার সহিত একদল গুর্খার 'ফুটবল ম্যাচ' হইতেছে। একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতচূড়ার পাদদেশে খেলিবার জায়গা। সেই ঢালু পর্ব্বতগাত্রে সারি সারি গোরা ও গুর্খা বসিয়া খেলা দেখিতেছে। খেলোয়াড়দিগের বাহাদুরী আর কিছু না-থাকুক, খুব ধাক্কাধাক্কি ও চীৎকার চলিতেছে। প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গেরাই আছাড় খাইয়া জখম হইতেছে। মনে হ'ল, যদি 'মোহন বাগান'কে কোনও রকমে আনা যায়, যাদু-ভায়ারা অন্ততঃ ছয় 'গোল' খাইবে।

সরকারি তালিকা হিসাবে ১৯১১ সালে মেমিয়োর জনসংখ্যা ১১৯৭৪ জন ছিল। মেমিয়ো-অধিবাসীদের মধ্যে শাণ জাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বর্ম্মী ও দামু জাতীয় স্ত্রী-পুরুষও প্রচুর। ভারতবাসীর সংখ্যা অল্প। কতিপয় মুসলমান ও মান্দ্রাজী ব্যবসায়ের জন্য এখানে বসবাস করিতেছেন। দুই চারিজন ভারতীয় কুলিও দেখা গেল। চাকুরিজীবি বাঙ্গালীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; শুধু মেমিয়োতে কেন, ব্রহ্মদেশের প্রায় প্রত্যেক সহরেই দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি—মান্দ্রাজী কুলী ও বাঙ্গালী কেরাণী সর্ব্বত্রই বিরাজমান। রেঙ্গুন, মান্দালয় ত' ঘরের কথা, উত্তর-ব্রহ্মের অনেক সুদূর স্থানেও মাত্র ২৫।৩০ টাকা বেতনভোগী বাঙ্গালীর আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি।

শাণমণ্ডলী

শাণেদের আদিম ইতিহাস চীনের ন্যায় অতীতগর্ভে বিলুপ্ত। মানবজাতির ইতিহাস-প্রণেতা নানা মুনির নানা মত। বিশেষতঃ ব্রহ্মবাসীর উৎপত্তিসম্বন্ধে কেহই একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। সুতরাং সে বিষয়ে যত সংক্ষেপে বলা যায়, ততই ভাল।

তেরিঅঁ দে-লা-কুপ্রিএ হোল্ট্ এস্ হ্যালেট্ (Terrien De La Couprie Holt. S. Hallett) বলেন :—

"চীন-ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, শাণেদের উৎপত্তি-স্থান চীনের অন্তর্গত Kiu-lung পর্ব্বতে। চীনাদের উত্তর-পূর্ব্ব-চীনে বাস করিবার সময়ে শাণ জাতি আসামবাসীদের

* মৎস্য পচাইয়া তাহার সহিত অন্য প্রকার গলিত দ্রব্যমিশ্রণে 'নাপ্পি' নামক এক রকম আচার প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মবাসী ঘৃত ও তৈলের পক্ষপাতী নহে; তৎপরিবর্ত্তে ঐ সুগন্ধপ্রদ 'নাপ্পিই' আহার্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভোক্তার রসনা পরিতৃপ্ত করে। বহুদূর হইতে 'নাপ্পির' সুতীব্র আঘ্রাণে আমার অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল।

হেনরি গুগার বলেন—"নাপ্পি অতি চমৎকার মসলা। উহার গন্ধ কিছু উগ্র হইলেও আস্বাদন খুব ভাল। আজ ৩৮ বৎসর বর্ম্মা ছাড়িয়া ইংলণ্ড আসিয়াছি কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে নাপ্পি আনাইয়া থাকি।"—লেখক।

সহিত চীনের দক্ষিণভাগ অধিকার করে।" চীনা ভাষায় 'শাণ' অর্থে পর্ব্বত বুঝায়।

যোসেফ্ দাঁএ্ মেয়ার্ (Joseph Dantre mer) বর্ণিত পুস্তকে লিখিত আছে—"চীনা ও শাণেরা মঙ্গোলীয় বংশ-সম্ভূত এবং চীনারা শাণের বড় ভাই।"

নিজ্‌বেট্ (Nisbet) বলেন :—"প্রাচীনকালে এক প্রধান পরাক্রান্ত জাতি আসিয়া ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও চীন রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। শাণ জাতি তাহাদেরই এক শাখা। খৃষ্ট জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন-প্রান্ত হইতে শাণেরা উত্তর ব্রহ্মস্থ প্রাচীন কারেণ জাতিকে দক্ষিণ দিকে, আটন্ ও ইরাবতী প্রদেশে তাড়াইয়া দেয়।"

তাহাদের তিনটি প্রধান শ্রেণী—

(১) উত্তরে চীনা শাণ।

(২) মধ্য-প্রদেশে 'তাই' অথবা বর্ম্মা শাণ। ইহাদের রাজা, ইংরাজ, রাজত্বের পূর্ব্বে বর্ম্মী রাজের করদ রাজা ছিল।

(৩) দক্ষিণে শ্যামবাসী বা ফরাসী রাজ্যবাসী 'তাই শাণ'। ফরাসীরা 'Shan'কে *'Sciam'* বলে এবং তাহারই অপভ্রংশ 'Siam'

ভাষা ও আকৃতি হিসাবে শাণেদের সহিত চীনাদের জাতিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। শাণ ভাষায় কথার স্বর এবং একই বানানের ভিন্নার্থক শব্দ চীন ভাষার মত; তদ্ভিন্ন প্রতি বাক্যের ব্যাকরণ-প্রণালী দুই ভাষাতেই একই রূপ।

খৃষ্ট জন্ম হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে এই বিরাট শাণ-বংশ চীন, তিব্বত-সীমান্ত ও আসাম-প্রদেশ, উত্তর ও পশ্চিম বর্ম্মা, পেগু হইতে মালয়ের অন্তর্গত তাভয় পর্য্যন্ত—এমন কি যবদ্বীপ, মালাক্কা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব-অংশ হইতে শ্যাম ও কম্বোজ পর্য্যন্ত—বহির্ভারতের সমগ্র স্থান অধিকার করে।

কিন্তু চিরকাল তাহাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল না। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ শাণ রাজা (San Hum Hpa) সান্-হুম্-ফা' র মৃত্যুর পরেই ব্রহ্মদেশে শাণ-আধিপত্যের অবসান হয়। কেবল মোগায়ংই অর্দ্ধস্বাধীনভাবে দেড় শত বৎসর অবস্থিত থাকে; পরে তাহারও পতন হয়। তাহারা বহুবার বর্ম্মী-রাজার শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু গৃহ-যুদ্ধেই তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। ব্রহ্মরাজ থিবার পরাজয়ের পরেই, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শাণ-রাজ্যের সহিত অন্যান্য দেশগুলি ও ইংরাজাধিকৃত হয়।

বহুকাল বর্ম্মীরাজার অধীন থাকিলেও শাণেরা নিজেদের ভাষা ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এবং জন্মভূমি পার্ব্বত্য প্রদেশের মায়া পরিত্যাগ করে নাই। অধীনতা স্বীকার করিলেও শাণেরা নিজেদের বিধি-পদ্ধতি সাধ্যমত বজায় রাখিয়া, নিজেদেরই সর্দ্দার (Sawbwa) * সব্‌ওয়ার অধীনে চলিত; সাধ্যপক্ষে বর্ম্মীদের সহিত বিবাহ-বন্ধনও স্থাপন করে নাই। কিন্তু তাহারা বর্ম্মী বর্ণমালা ব্যবহার করে;
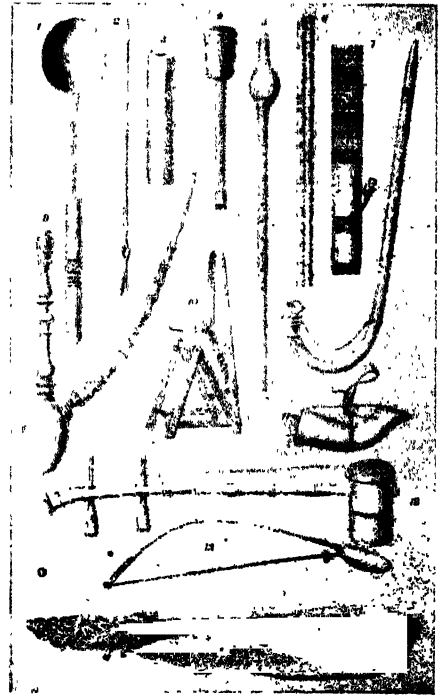
শাণ-জাতির হুঁকা ও বাদ্যযন্ত্র

প্রভেদ সামান্য মাত্র। এক্ষণে শাণ প্রদেশ ইংরাজাধীন করদ রাজ্য।

আকৃতির মত পরিচ্ছদেও চীনাদের সহিত তাহাদের কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমার বোধ হয়, চীনাদের নাকটুকু একটু মেরামত করাইয়া ও চক্ষু দুটী বেশ ডাগর করাইয়া, বর্ণে ঈষৎ রক্তিম আভা দিলে ও সেই সঙ্গে ওষ্ঠ

* ১২২৯ খ্রীঃ অব্দে শাণ-বংশীয় 'চ্যান্ রাজা (Chan kuampha) চান্-কোয়াম্-ফা' আসাম অধিকার করেন। সেই সময় হইতেই শাণেরা আসামে 'অহম্' নামে অভিহিত।

প্রান্তে কিঞ্চিৎ সরলতা মাখান মৃদু হাসি ফুটাইয়া দিলে, ঠিক শাণ দাঁড়াইতে পারে। তাহারা বর্ম্মী ও চীনা অপেক্ষা কিছু লম্বা-চওড়া ও গোলগাল। মুখখানি দেখিলে খব ভাল মানুষ, আর একটু বোকা-ধরণের সাদাসিদে লোক বলিয়া অনুমান হয়; আর বলিতেও বাধা নাই যে, তাহারা দেখিতে প্রিয়দর্শন।

শাণেদের পরিচ্ছদও আড়ম্বরবিবর্জ্জিত। পুরুষেরা গায়ে নীলবর্ণ ও লম্বা তুলা-ভরা (tamein) 'তামেইন' অর্থাৎ মির্জ্জাই, পরণে তাদৃশ খাটো potsoe 'পৎস্যয়ে' পায়জামা বা ও মস্তকে নীল পাগড়ি ধারণ করে। ধনীদের মধ্যে কাপড়ের জুতারও প্রচলন দেখা যায়।

বর্ম্মী-শাণ ও চীনা শাণ পুরুষদের পরিচ্ছদে বিশেষ বিভিন্নতা না থাকিলেও, মেয়েদের পোষাকে তাহা পরিলক্ষিত হয়—অবশ্য বড় ঘরের কথা বলিতেছি।

বর্ম্মী-শাণ-স্ত্রী জাতির গায়ে ঢিলা জামা। জ্যাকেটের মত সেই রেশমী জামার গলদেশে কারুকার্য্য শোভিত, রূপার পাত বসান ও তাহার নিম্নে নানাবর্ণরঞ্জিত কৃত্রিম ফুল ও পক্ষী বসাইয়া সেলাই করা। কোমরে জরির পাড় বসান, খাটো, রেশমী লুঙ্গী আর শিরোভাগে পার্শী পুরুষদের টুপীর মত—নীল রেশমী পাগড়ি। অর্থাৎ একটি টোপরের অগ্রভাগ হইতে কিয়দংশ কাটিয়া টোপরটি উল্টাভাবে বসাইলে যেরূপ দেখায়, কেশগুচ্ছের চারিদিকে পাগড়ির আকার সেইরূপ।

শাণেদের মুকুট ও অলঙ্কার

বেণীর মধ্যে উপরে অর্দ্ধচন্দ্রের মত জরি পাকান এক চূড়া হইতে কতকগুলি রূপার ঝুমকা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝোলে। পাগড়ির মধ্যে সেই কেশস্তবকে ফুল ও পতঙ্গাকৃতি রূপার কাঁটা বসান—যেন একটি ফুলের তোড়ার উপর এক ঝাঁক মৌমাছি ও ফড়িং মধু পানে রত।

চীনা-শাণ স্ত্রীলোকেরা সচরাচর জ্যাকেট ও পুরুষদের মত পায়জামা ব্যবহার করে, এবং একটি রেশমী চাদর স্কন্ধ দেশ ঘুরাইয়া কোমর পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখে।

নানাবিধ অলঙ্কারভূষিত মুকুটের মত তাহাদের কবরীর ঘটা দেখিলে কবি ও চিত্রকরের নয়ন সার্থক হয়। সুবর্ণ বলয়, ইয়ারিং ও অঙ্গুরী ব্যতীত অন্যবিধ অলঙ্কার সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই দুই কাণে, দুইটী সুবৃহৎ ছিদ্র মধ্যে, ফুল অথবা লম্বা কঞ্চির মত একপ্রকার

* (Yong tse) য়াঙ্ৎসে নদীর দক্ষিণে (Szechuan) সে-চুআন্-এ বাস করিবার পূর্ব্বে, শাণেদের সহিত চীনাদের বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

খৃষ্ট জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত স্থান চীন-শাসনে আসিলে, দেশীয় অনেকগুলি সর্দ্দারকে করদ জমীদার করা হয় ও তাহারা 'তাই' উপাধি মত (Chow or Sow) চাউ বা সাউ নামে অভিহিত হয়। সেই প্রথানুযায়ী আজ পর্য্যন্তও বর্ম্মী শাণ-রাজাগণ (Sawbwa) সব্‌ওয়া এবং শ্যামদেশীয় শাণ-রাজারা (Chawpya) চ-প্যা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। —লেখক

শাণ-পল্লী

দ্রব্য দেখা যায়। চর্ব্বি মাখাইয়া চুলের শোভা বৃদ্ধি করা তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। শাণ জাতি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করে না। সকল পরিচ্ছদই দেশীয় তাঁত হইতে উৎপন্ন হয়।

শাণ-পল্লী মধ্যে, ফাঁকে ফাঁকে, শাণদের গৃহ। প্রত্যেক বাটীর সংলগ্ন প্রায় ৮ ফিট উচ্চ বাঁশের বেড়ায় ঘেরা একটি বাগান; বেড়ার সরু সরু বাঁশগুলি খুব ঘন ঘন—ঠিক যেন কঞ্চির বেড়ার মত। ধনবানের ফটক পার্শ্বেই, চালার মধ্যে, একটি পিতলের কামান। প্রাঙ্গণে কলা, পেঁপে, পেয়ারা, পিচ, ডালিম ও আম প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও শাক্‌সব্‌জির গাছ। এক কোণে 'মরাই' অর্থাৎ ছেঁচা বেড়া ও উলুখড়নির্ম্মিত চতুষ্কোণ ধানের গোলা। স্থানে স্থানে অশ্ব ও গো-মহিষাদি থাকিবার চালা ঘর।

বাগানের মধ্যস্থলে বাঁশ ও সেগুনের খুঁটীর উপর অবস্থিত বাসগৃহ। চাল খড়ো ও ঢালু। দেয়াল ও মেঝে তক্তা-নির্ম্মিত। চারি ফিট উচ্চ সেই গৃহের নিম্নতলে ছাগল, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী থাকে। সম্মুখে একটি বারাণ্ডার পরেই কতকগুলি ঘর। প্রয়োজন হিসাবে পশ্চাৎসংলগ্ন ঘরও আছে। বাঁশের মইএর সাহায্যে উপরে উঠিতে হয়।

পরিশ্রমী ও বলিষ্ঠ শাণেরা কৃষিজীবী ও সুদক্ষ ব্যবসায়ী। তাহারা সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহুবিধ দ্রব্য বহন
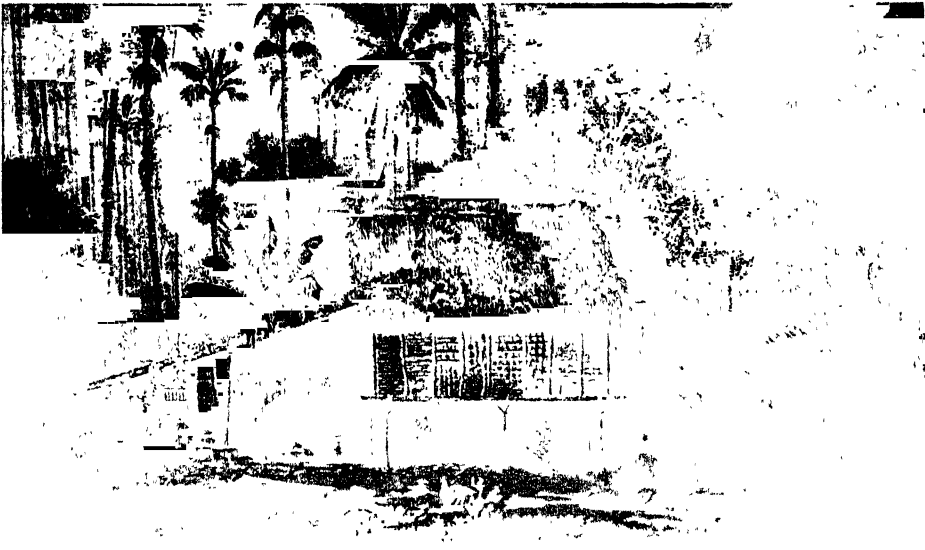
শাণ কুটীর
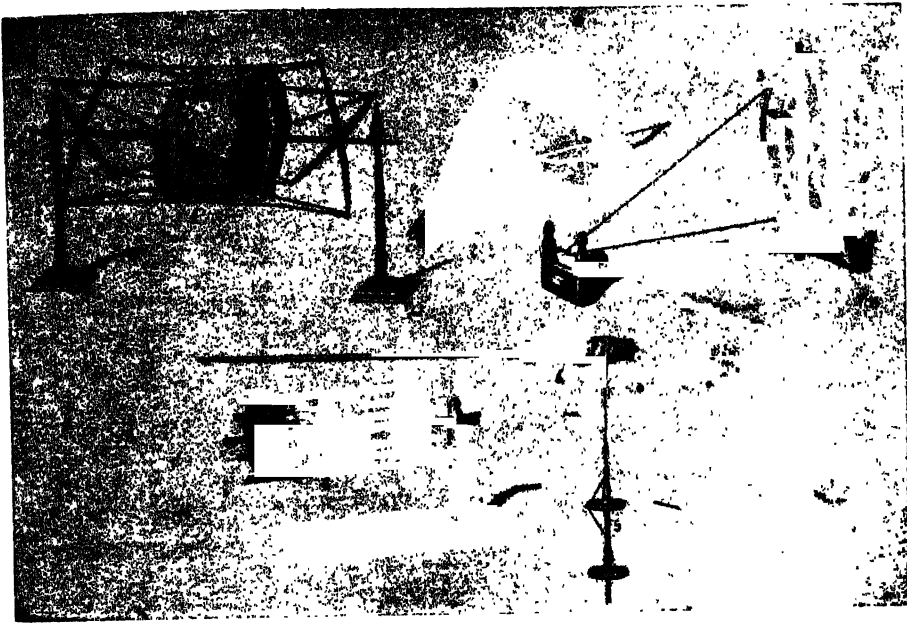
শাণদের বয়ন-যন্ত্র

করিয়া ষ্টেসনের হাটে বিক্রয় করে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ক্রয় করিয়া চিরপ্রিয় পর্ব্বতাবাসে ফিরিয়া যায়।

রন্ধন, পোষণ, পশুপালন প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য—নদী তীর হইতে মাটি তুলিয়া মৃৎপাত্র ও বাঁশের চুপড়ি, বাক্স এবং অন্যান্য নানাবিধ তৈজস নির্ম্মাণ করা। গৃহস্থ মাত্রেরই বস্ত্র বুনিবার তাঁত ও সূতা কাটিবার চরকা আছে; তদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র বোনা হয়। একটি বৃহৎ কাষ্ঠপাত্র মধ্যে ডালপালা-ফুলসমেত এক প্রকার গাছ পিষিয়া রং প্রস্তুত হয়। সেই পাকা রঙে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে। সূচীকার্য্য ও বুটী-তোলা রেশমী কার্য্যে নানাবিধ চিত্রবিচিত্র সৌখীন পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেও তাহারা সুপটু; খড়ে বিনান মাথার টুপী ও ছাতা দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; পালকের কৃত্রিম ফুলের মালা এবং তার, রেশমী সূতা ও পালকনির্ম্মিত বালা দেখিতে মনোরম।

ব্রহ্মদেশে রমণীমাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীনা। একদিকে তাহারা যেমন শ্রমশীলা, কার্য্যকুশলা, পাকা গৃহিণী,—অন্য দিকে আবার তদ্রূপ ঘোর বিলাসিনী; বস্তুতঃ তাহারাই পরিবারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়,—ব্রহ্মনারী নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। বড় সহরে রাজপথে দেখিতে পাইবেন, চুরুটসেবনরতা ব্রহ্মবালারা বাজরা শিরে দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে।
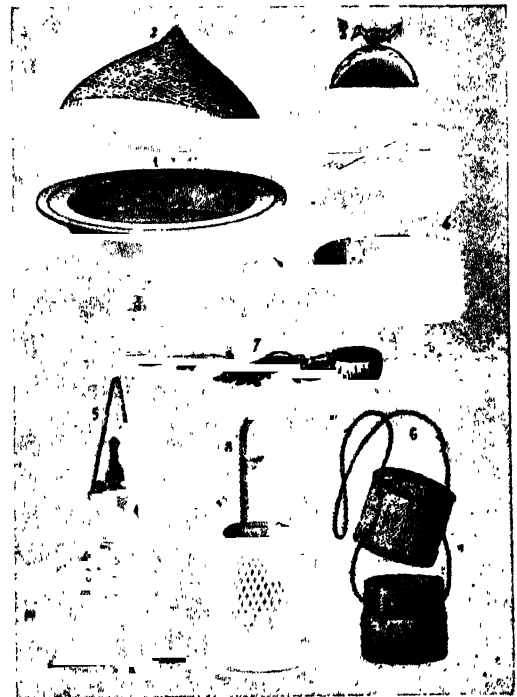
শাণদের তৈজসপত্র

বাজারে দেখিবেন স্ত্রীলোকের হাট! ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই স্ত্রীলোক। নানা রত্নাভরণ ভূষিতা, আয়ত-লোচনা, সুন্দরী বিক্রেতীরা কেহ ঘন কৃষ্ণ কেশকলাপে কুসুম সংযোগ করিয়া দিতেছে; কেহ হাস্য বিজড়িত গোলাপী ওষ্ঠে চন্দন চর্চ্চিয়া, ভঙ্গিমা সহ, মুকুর সম্মুখে স্বীয় রূপের বড়াই করিতেছে; আবার কেহ বা ভ্রমরগঞ্জিনী গুন্ গুন্ রবে গান গাহিতেই ব্যস্ত। খরিদ্দারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, লাভ-লোকসানে 'লক্ষ্য নাই—সকলে নিজ নিজ সাজসজ্জা লইয়াই বিভোরা। হয়ত কোনও সুরসিকার পান-বিক্রয়ের ব্যবসা, সম্বল—মাত্র এক বাজরা মিঠা পান, কিন্তু তাহার আভরণ ও চাল-চলন দেখিলে বোধ হয় স্বর্গের বিদ্যাধরীও লজ্জা পায়।

প্রকৃতই ব্রহ্মদেশীয় বাজারগুলি দেখিবার জিনিস। ব্রহ্মবালার জীবনের এক প্রবল উচ্চাভিলাষ যে, বাজারে একটু স্থান ভাড়া লইয়া, আড়ম্বর সহকারে, সে এক মনোমত দোকান সাজাইয়া বসে।

শাণদের তৈজস-পত্র

আবার বড় বড় আড়তে গিয়া পরীক্ষা করুন—এই অবলা রমণীর কিরূপ অদ্ভুত কার্য্যক্ষমতা ও ক্ষিপ্রকারিতা। এতদ্ব্যতীত ষ্টেশনের কুলিগিরি ও রাজমিস্ত্রির কার্য্য করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে।

ধান্য ও কাষ্ঠের বড় বড় ব্যবসা পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া থাকে।

শাণেরা নিরীহ প্রকৃতি ও দয়ালু। তাহারা সামান্য কারণে ক্রোধের বশীভূত হয় না; কিন্তু তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে, কেহ তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছে, তখন তাহারা উগ্রভাবে আততায়ীকে আক্রমণ করে। প্রধানতঃ একগাছি বৃহৎ বাঁশের লাঠি ও একখানি শাণিত তরবারি সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে থাকে। কোনও অরণ্য-সঙ্কুল স্থানে গমনাগমন কালে ঐ তীক্ষ্ণধার তরবারিই তাহাদের পথ করিয়া দেয় এবং বিপদ্‌কালে আত্মরক্ষার্থ ঐ অস্ত্রই তাহাদের সহায়। প্রয়োজনমত বন্দুকও ব্যবহার করে।
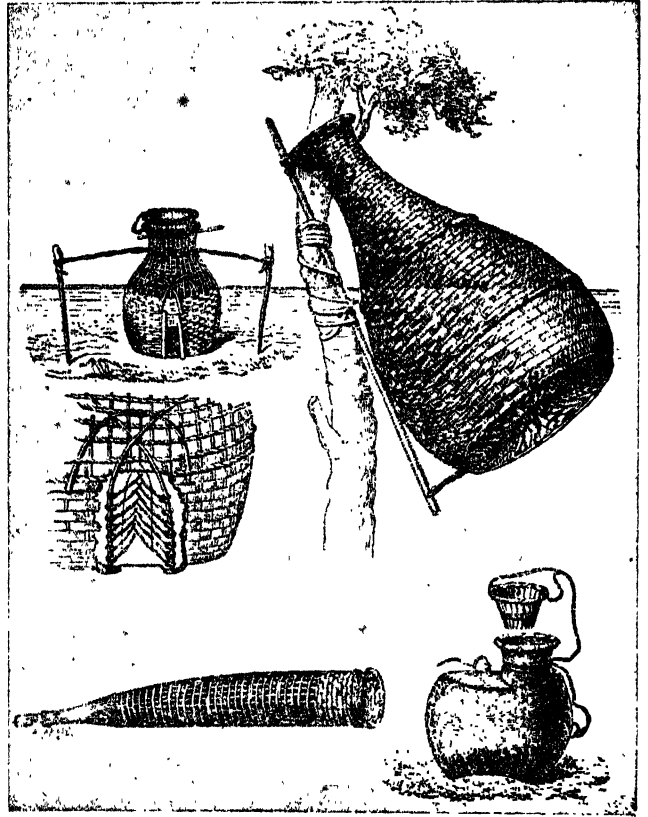
তাহারা সুদক্ষ অশ্বারোহী। সমগ্র ব্রহ্মদেশের এই শাণপ্রদেশীয় অশ্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কলিকাতায় আমরা যে সকল মনোহর 'বর্ম্মা পনি' দেখিতে পাই, তাহাদের অধিক সংখ্যকই শাণ-রাজ্য হইতেই প্রেরিত।

কৃপণতা কাহাকে বলে, ব্রহ্মদেশবাসী তাহা জানে না। এমন অব্যবস্থিত চিত্ত, অপব্যয়ী ও বদান্য জাতি বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও নাই। যাহারই কিছু অর্থ হইল, অবিলম্বে সেই ব্যক্তি অর্থগুলি কোনও প্রীতিভোজে অথবা কোনও সৌখিন সামগ্রী ক্রয়ার্থে অথবা মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোনও সৎকার্য্যে অম্লানবদনে ব্যয় করে।

বাজি রাখিয়া মুরগীর লড়াই, মহিষের যুদ্ধ ও ঘোড়দৌড়ে ইহারা অত্যন্ত অনুরক্ত। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পাকা জুয়াড়ী। খুব বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখেই শুনিয়াছি, কোনও উৎসবে বা মেলায় এই সর্ব্বনাশী দ্যূতক্রীড়ায় অনেক স্ত্রীলোক, সর্ব্বস্ব হারাইয়া, পরিশেষে আত্মপণ করিতেও দ্বিধা

করে না। এই জুয়া-খেলা দমনকল্পে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এক 'জুয়া আইন' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, অন্যান্য দেশের ন্যায় সুরাদেবী এখানেও ষোড়শোপচারে পূজা পাইতেছেন। সেবায়েৎ চীনা মামাদের অসীম অনুকম্পায় সর্ব্বত্রই তাহার পূজা-মন্দির, ও নৈবেদ্য বিপনিস্বরূপ বন্ধকী-কারবারের দোকান, জাজ্বল্যমান; যাত্রীর ভিড়ও যথেষ্ট এবং প্রসাদ সুধার মূল্যও নাকি চূড়ান্ত সস্তা। ব্রহ্মবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঘোর ধূমপায়ী। আমি একবার একটি শাণ রমণীর মুখে প্রায় এক ফুট লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি গোলাকার চুরুট দেখিয়াছিলাম। নিম্নবঙ্গে এই জাতীয় চুরুট 'শালে' নামে অভিহিত।

ভূমিষ্ঠ হইলে, কোনও শিশুর কর্ণবেধ অথবা পুত্রকন্যার বিবাহ উপলক্ষে ত কথাই নাই; মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কালেও ইহাদের আনন্দোৎসব, সাজসজ্জা ও ধূমধাম দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

শাণরাজার অধীনে প্রতি গ্রামে একজন (Sawbwa) 'সবওয়া' অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত আছে। তাহার সাহায্যকারী কয়েকজন (Ama't) 'অমাৎ' অর্থাৎ অমাত্য ও (Puke) 'পুকে' অর্থাৎ মোড়ল আছে। সবওয়াই প্রকৃত পক্ষে সকল শাসনকার্য্যের নেতা—দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল বিচারই নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। প্রতি গৃহস্থ, উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ সবওয়াকে প্রদান করে এবং
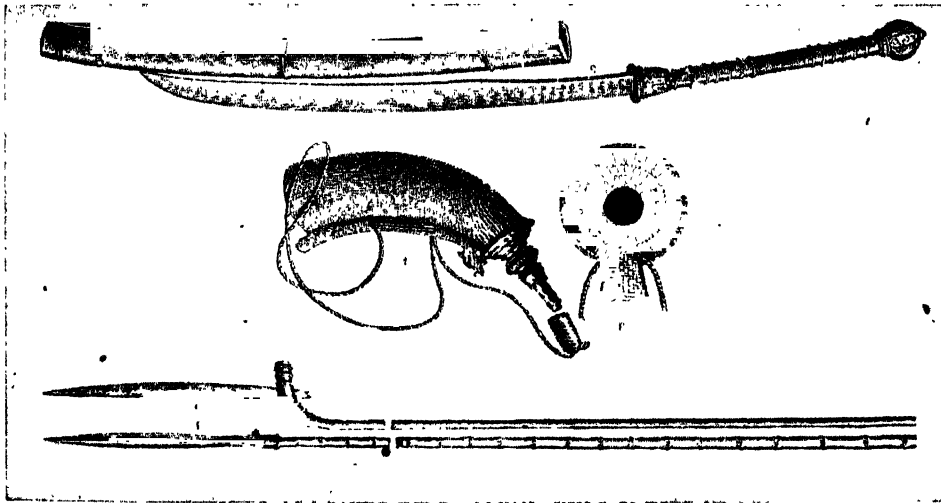
শাণদের অস্ত্রশস্ত্র

ব্রহ্মবাসী অন্যান্য সকলের ন্যায় শাণেরাও কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত উল্কি পরে; কোন কোন 'ফুলবাবু' আবার সর্ব্বাঙ্গেই বাঘ, দৈত্য, রমণী ও অন্যান্য রকমারি নক্সা করে। প্রবাদ, পূর্ব্বে তাহারা যুবতীদের মুখে নানাবর্ণের উল্কি পরাইয়া মুখসের ন্যায় বিকৃত চিত্র করিয়া রাখিত—পাছে তাহাদের সুন্দরীদিগকে বর্ম্মীরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়! এ প্রথা অবশ্য এখন উঠিয়া গিয়াছে।

নৃত্য-গীত, হুজুগ, তামাসা ও থিয়েটারের এদেশের লোক বিশেষ পক্ষপাতী। যে কোনও উৎসব উপলক্ষে তাহারা নাচ-তামাসার ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়। কাহারও সন্তান

বৎসরান্তে সেই রাজপ্রতিনিধির তরফ হইতে নির্দ্দিষ্ট খাজনা রাজসমীপে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এদেশে কনিষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা কনিষ্ঠের অধীনে থাকিয়া সাংসারিক বিষয়কর্ম্ম দেখে, ভাল; নতুবা তাহারা অন্য কোনও ব্যবসায়ের আশ্রয় লইয়া পৃথক্ থাকে।

পূর্ব্বে, পশুচুরি করা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অপরাধ ছিল; সে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। নরহত্যা অপরাধে, আসামী অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইত।

সেকালে শাণরাজ্যে ঝিনুকের মত একপ্রকার রৌপ্য-

শাণদের কৃষি-যন্ত্রপাতি
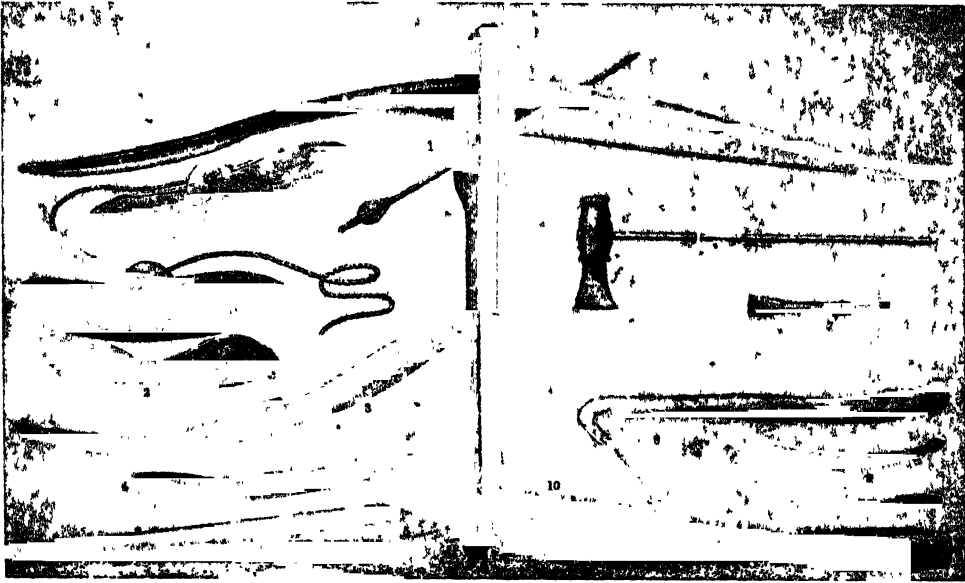
মুদ্রার প্রচলন ছিল। আজ পর্য্যন্ত ছেলেদের গলায় সেই মুক্তার কণ্ঠি ঝোলান দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনী শাণেদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত নহে; তবে, অধিকাংশ গৃহস্থই একটি মাত্র বিবাহ করে। বিবাহের বয়স পুরুষের প্রায় কুড়ি ও মেয়েদের ষোল হইতে কুড়ির মধ্যে। বিবাহে বরকন্যার মনের মিল হইলেই হইল; পিতামাতা কোনও রূপ আপত্তি করে না এবং জ্যোতিষীর অনুমতি লইবারও প্রয়োজন হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে উভয়পক্ষে উপহার বিনিময় হয়। শুভকার্য্যের দিন বরের আত্মীয় স্ত্রীপুরুষ সকলেই কন্যার বাটী আসে। বরের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চা ও লবণ প্রেরিত হয়; বর কতকগুলি মুদ্রা আনিয়া, তাহার বিনিময়ে, কন্যার পিতৃ-মাতৃসমীপে পত্নীভিক্ষা করে—তাঁহারাও শুল্ক লইয়া কন্যা-সম্প্রদান করেন। তৎপরে একজন প্রবীণ পুরোহিত সেই চা ও লবণ লইয়া রাস্তার উপর যায়েন ও সেইগুলি নিজ মাথার উপরে রাখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সূর্য্যদেব, আকাশ ও পৃথিবীকে নিবেদন করেন এবং তাহাদের সেই বিবাহের সাক্ষী হইতে প্রার্থনা করেন; শেষে তিনি সভাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বরের দক্ষিণ ও কন্যার বাম মণিবন্ধে সাতপাক সূতা জড়াইয়া দেন। উপসংহারে, বরের নিমন্ত্রিত পুরুষদিগকে কতকগুলি মুদ্রা বিতরণ, সকলের সহিত আনন্দ ভোজন ও মদ্যপান করিবার পালা।

অবিবাহিত অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হইলে, কবরের পূর্ব্বে একটি বৃক্ষশাখারূপী বর অথবা কন্যার সহিত মৃত ব্যক্তির বিবাহ দিতে হয়। ইহাদের বিশ্বাস, বিবাহের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে, পরজন্মেও তাহার বিবাহ ঘটিবে না।

ইচ্ছামাত্রই শাণরমণী পত্যন্তর গ্রহণে সমর্থ। স্বামীর মত হইলে, স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অনুমতি-পত্র পায়; নতুবা স্বামীকে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা দানে বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে হয়। টাকাকড়ি ও পুত্রকন্যা থাকিলে, স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ও পুত্রগুলিতে পিতার অধিকার। জননী, কন্যাদের ও টাকার থলি লইয়া, নিজের পথ দেখুক। এ দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হইলে, স্বামী (১) শূকর-চারণ করে না, (২) মৃতদেহ স্পর্শ করে না, (৩) মৃত্তিকা খনন ও গর্ত্ত পূরণ, এবং (৪) অপরকে বিদ্রূপ করে না।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে, জননী সাত দিন আঁতুড় ঘরে তাপ লয়। 'আট-কৌড়ে'র দিনে, স্নানান্তে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রসূতি সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা হয়। মাসাবধি-

শাণরাজ্যের বৌদ্ধ-মন্দির

কাল প্রভৃতির হরিণ মাংস, মাছ, ময়দা, চিনি ও ডিম্ব-নির্ম্মিত কেঁচোর আকার এক প্রকার খাদ্য, তিলের তৈল, লেবু ও পেঁয়াজ ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

এক মাস পরে সন্তানকে স্নান করান হয়। সন্তানের কল্যাণের জন্য স্নানার্থ জলে সোণা ও রূপা ডুবান দরকার। তৎপরে, পুরোহিত সন্তানের কোমরে সাতপাক সূতা জড়াইয়া, নিম্নলিখিত নিয়মে তদীয় নামকরণ করেন—

(১) ১ম পুত্র—Ai—আই
২য় „ —Ai-yi—আই-য়ি
৩য় „ —Ai Hsam—আই-শাম্
৪র্থ „ —Ai Hsai—আই-শাই
৫ম „ —Ai Ngo—আই-ঙো
৬ষ্ঠ „ —Ai Nok—আই-নোক্
১ম কন্যা—Nong-ye নাঙ্-য়ে
২য় „ —Nang-yi নাঙ্-য়ি
৩য় „ — „ Am „ আম্
৪র্থ „ — „ Ai „ আই
৫ম „ — „ O „ ও
৬ষ্ঠ „ — „ Ok „ ওক্

(২) কিশোর পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রেরণ করা হয়। যথাসময়ে গুরু পরীক্ষা লইয়া, ছাত্রকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নববস্ত্রপরিধানে আশ্রম প্রবেশে অনুমতি দান ও নূতন নামকরণ করেন।

(৩) কোনও উৎকট ব্যাধির আক্রমণে, (Ning-foi) নিঙ্‌ফোই দেবীর পূজা দিয়া, রোগীর নূতন নামকরণ আবশ্যক। বস্ত্র অথবা রৌপ্য বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাইলে জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম—

Ai man—আই-মন্	শ্রীমান বস্ত্র
Nang ye man—নাঙ্ য়ে মন	শ্রীমতী বস্ত্র
Ai Ngun—আই-ঙিউন্	শ্রীমান রৌপ্য
Nang ye Ngun—নাঙ য়ে ঙিউন্	শ্রীমতী রৌপ্য

পিতামাতা অবর্ত্তমানে অনেক সময় কোনও নিকট আত্মীয় রোগীকে ভূমিতলে রাখিয়া দেয় এবং অন্য কেহ রোগীকে তুলিয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ করে। রোগমুক্ত, বাপের তৃতীয় পুত্র বা কন্যা হইলে, তাহাদের নাম হইবে—

Ai Hsam kip—আই-শাম্ কিপ্ শ্রীমান কুড়ান
Nang Am kip—নাঙ-আম্ কিপ্ শ্রীমতী কুড়ান

সাড়েতিন শত বৎসর পূর্ব্বে, পেগুরাজার শাসনকালে শাণরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে। শাণেরা বৌদ্ধ হইলেও, তাহারা আদিম ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে 'নাৎ' বা দেবদেবী পূজা করিতে বিমুখ নহে। কতকগুলি 'নাৎ'এর নাম ও পূজোপকরণ শুনুন—

Ning-gon-wa—নিঙ্-গোন্-ওয়া —ব্রহ্মা।

সব্ওয়া, মৃত্যুর পরে, এই দেবত্ব লাভ করেন। রূটী, রৌপ্য মুদ্রা, ফুল, রেশমী বস্ত্র, এবং আটটি বাঁশের পাত্রে মদ্য দান করিয়া ইঁহার পূজা করিতে হয়।

Mum Sum—মম্-সম্ —লক্ষ্মী।

শাণ-মন্দির-গাত্রাঙ্কিত চিত্র

এই দেবীর পূজা হইলে কৃষকের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়। চাল, শুষ্ক মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, মহিলা-পরিচ্ছেদ ও অলঙ্কার, চুরুট খাইবার রূপার নল ও চারি পাত্র মদ্য দানে এই দেবীর পূজা বিধেয়।

ধান্য কাটা হইলে ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবার সময় ও Chan—চান—সূর্য্যদেব ও Sada—সাদা—চন্দ্রদেবীর পূজা করিবার ব্যবস্থাও এইরূপ। কেবলমাত্র সূর্য্যপূজা কালে স্ত্রী-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে একটি লাল পায়জামা ও কাঁসর দিতে হয়।

নানা কুসংস্কার ইহাদের মধ্যে প্রচলিত, ও ভূতের গল্পে ইহাদের অটল বিশ্বাস। একটি গল্প শুনন—

বহুপূর্ব্বে গ্রাম-প্রান্তে শাণ কবর ভূমির উপর একটি পাখী বসিয়াছিল। (Keng Hung Kyaing Yongye Zawti Nagara Maha Wuntha Thiri Thudham Mayaza)—কেঙ্ হুঙ্ চাইং-য়োঙ্গি জতি নগর মহাবনথ থিরি-থুধম্ম মাজ।—নগরপতি মহাবংশ শ্রী সুধর্ম্মরাজ নামে একজন সব্ওয়া সেই পাখী লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোঁড়েন। শব্দ মাত্রেই সেই পাখী রূপী 'নাৎ' বিকট ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাকে বন্দুকসহ গ্রাস করে। সেই অবধি সেই স্থানে বন্দুক ছোড়া নিষিদ্ধ।

দশ মাইল দূরে কোনও গ্রামে একব্যক্তির কলেরা হইয়াছে; শ্রবণ মাত্রেই গ্রামে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। গ্রাম-প্রবেশের প্রত্যেক রাস্তার উপরেই কাষ্ঠফলকে বস্ত্রলিখিত-অনেকগুলি বিজ্ঞাপনী ঝোলান হইল। মন্ত্রপ্রভাবে 'নাৎ'কে গ্রামের বাহিরে তাড়াইবার জন্যই এই ব্যবস্থা। যদি কোনওরূপে 'নাৎ' গ্রামে প্রবেশ লাভ করিয়া কাহাকেও আক্রমণ করে, উপর্য্যুপরি তিন দিন সন্ধ্যাকালে সঙ্কেত মত একটি কামানের আওয়াজ হইলেই, গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সহসা ঢাক, কাঁসর, গৃহতল অথবা যে কোনও দ্রব্য বাজাইয়া, সমবেত কণ্ঠে সাধ্যমত আর্ত্তনাদ করে। এততেও যদি অপদেবী পলায়ন না করে, তখন মহাড়ম্বরে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, চাল, ডিম, মদ প্রভৃতির এক নৈবেদ্য-সহ একটি মহিষ বলিদান করিয়া, (Waroom nat) 'ওয়ারুম্ নাৎ' অর্থাৎ 'ওলা বিবি'র পূজা দিতে হয়।

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।—হুগলী পাণ্ডুয়া হইতে কিছু দূরে বাকুল গ্রাম ; বৃদ্ধ রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গ্রামে বাস করেন। অবস্থা ভাল, কিন্তু সংসারে কেহ নাই, কেবল এক সরকার বা মুহুরী বিহারী। বৃদ্ধ একমাত্র জামাতার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, জামাতা ও কন্যা শশিবালাকে ত্যাগ করেন। সেই কন্যার একমাত্র বিধবা কন্যা সৌদামিনী একমাত্র কুমারী কন্যা লইয়া, দারিদ্র্যের পীড়নে কাতর হইয়া, দাদামহাশয়ের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া পত্র লেখেন। বুড়া পত্র পাইয়া রাগিয়া আগুন ! বিহারী লোকটা বড় ভাল, বড় দয়ালু ; বুড়াও লোক ভাল কিন্তু মেজাজ ঐ এক রকম। বিহারী বুড়াকে বেশ চিনিত। তাই বিহারী বুড়াকে না জানাইয়া, একদিন সৌদামিনী ও তাহার কন্যা অপর্ণাকে বাড়ীতে লইয়া আসিল। বুড়া ত রাগিয়াই অস্থির। বিহারী সৌদামিনীকে সব সহিয়া যাইতে বলিল, কারণ বুড়া নিশ্চয়ই নরম হইবে ; ইহাই বিহারীর বিশ্বাস। সৌদামিনী বুড়ার তিরস্কারে ব্যথিত হইল, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। সে মেয়ে লইয়া থাকিয়া গেল। অপর্ণা মেয়েটি খুব চালাক ও বাক্‌পটু, এদিকে রান্নাবান্না ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মেও খুব তৎপর। বুড়া এই মেয়েটির কথাবার্ত্তায় ও সেবা-শুশ্রূষায় তাহার নিকট হারি মানিল, কিন্তু বিরক্তি ত্যাগ করিল না। সৌদামিনী যখন নিজ গৃহে ছিল, তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এক বড় মানুষ ব্রাহ্মণের গৃহে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করে।* সেই বাড়ীর গৃহিণীর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ বাড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করিত, কলিকাতায় কালেজে পড়িত। সেই ছেলেটি সৌদামিনীর কন্যা অপর্ণাকে খুব ভালবাসিত। সৌদামিনী তাহাকে মেয়ের জন্য একটি বর দেখিতে অনুরোধ করিলে, সে-নিজেই অপর্ণাকে বিবাহ করিতে চাহিল। সৌদামিনীর দুর্ভাগ্যক্রমে ইহারই কয়েকদিন পরে ছেলেটি ঘোর দুর্দ্দশায় পড়িল ; সে পিতৃঋণে এমন জড়িত হইয়া পড়িল যে, তাহাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া, অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য বর্ম্মায় তাহার এক পিতৃবন্ধুর আশ্রয়ে গমন করিতে হইল। যাইবার সময় সে সৌদামিনীকে পত্র লিখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া যায় যে, এক বৎসরপরে দেশে ফিরিয়া, সে অপর্ণাকে বিবাহ করিবে। ছেলেটি বর্ম্মায় তাহার পিতৃবন্ধু মুরলীধর শর্ম্মার আশ্রয়ে গমন করে। মুরলীবাবু বর্ম্মায় ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া অতুল বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন ; তাঁহার পুত্র ব্রজনাথ পিতার বিষয় ভোগ ও বাবুগিরি করিয়া বেড়াইত।]

৬

এই চিঠি পত্র লেখালেখির প্রায় দেড় বৎসর পরে সৌদামিনী তাঁহার নিজের মাতামহগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ কয়মাসের সংবাদ তাঁহাদের দিক হইতে যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত, এবং বোধ হয়, তাঁহার এই সংগ্রামপূর্ণ জীবনের মধ্যে ইহার প্রথম বৎসর যেমন শান্তির—সুখের এবং আশার, ইহার দ্বিতীয় বৎসরারম্ভ তেমনি নিরানন্দ ও তীব্র যন্ত্রণাময়। যে তাঁহার আশার অতীত আশা দিয়া লুব্ধ করিয় ছিল, সে সংসারের সাধারণ একজন অতি লঘুচিত্ত লোকের মতনই, একদিন নিজের প্রতিজ্ঞা অনায়াসে বিস্মৃত হইয়া বসিল। একবৎসর আশাপূর্ণ হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে করিতে যে আশার মূল হৃদয়োদ্যানের তলস্পর্শী হওয়ায় দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল, বৎসর প্রায় পূর্ণ এবং তারপর ক্রমেই অতীত হইয়া যাইতে থাকায়, সে আশাতরুর শাখা-প্রশাখা এবং এমন কি, কাণ্ডে অবধি বিষম আঘাত লাগিতে থাকিলেও মূলে একদিনের জন্যও টান পড়িতে পায় নাই। গৃহিণীর নিকট 'কথনসথন'ও তাঁহার প্রবাসী ভ্রাতুষ্পুত্রের খবরাখবর পাওয়া যায়। মুখ ফুটিয়া সৌদামিনী কোন দিন তাঁহার কাছে উহার কথা পাড়িতেই সাহসী হন না। পাছে গৃহিণী ভবিষ্যতে মাথানাড়িয়া মনে করেন—'ওঃ সে এই জন্যেই তাহার খবর খুঁজিত বটে !' নিজে হইতে যদি কখন কোন কথা উঠে, তবেই যেটুকু খবর পাওয়া যায়। এইরূপেই শোনা গিয়াছিল, পিতৃবন্ধু বন্ধুপুত্রকে নিজ সন্তানের ন্যায় পরম স্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। সে এখন সম্পূর্ণরূপে পিতৃ-ঋণ-মুক্ত !

গোপন-আনন্দে সৌদামিনীর বক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। দুইহাত যোড় করিয়া তিনি কপালে ঠেকাইয়া মনে মনে বলিলেন—"কাঙ্গালের ঠাকুর, তুমি কি এই একটি মাত্র ভিক্ষা না শুনিয়া থাকিতে পার? কোন দিন

বড় দুঃখেও যে নিজের জন্য তোমার কাছে কিছু চাহি নাই! মনে করিয়াছিলাম, তুমি যাহা দিবে, তাহাই সহিব, তাহাই বহিব, দেখি তুমিই বা কত দিতে পার, আর আমিই বা কত সহিতে পারি। কিন্তু এবার তুমিই আমায় জয় করেছ! আমার জন্য যে এতটা করিতেছে, আমি কেমন করিয়া তার জন্য তোমার দয়া না চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিব? সেত' পারি না, তা তুমিও তোমার নামের মহিমা বজায় রাখিয়াছ! ধন্য তুমি!"

ইহার পর দুই চার ছয়মাস চলিয়া গেল—বৎসর পূর্ণ হইল। উদ্বেগে আকাজ্ক্ষায় দিন যেন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছিল। এত বিলম্ব কেন? কেন কোন সংবাদ আসিতেছে না? কবে সে আসিবে? আর তো কোন বাধাই দেখা যায় না, তবে কিসের এত বিলম্ব? এমন সময় বাটির গৃহিণী হঠাৎ একদিন হাসিহাসি মুখে গজেন্দ্র-গমনকে যথাসম্ভব চঞ্চল করিয়া, রান্নাঘরের পার্শ্বে আসিয়া, সৌদামিনীকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"আর শুনেচ বামুন ঠাকুরুণ! আমাদের নিমুর যে ওখানে বে!" সৌদামিনী তখন স্কুলের ছেলেদের জন্য বড় তাড়াতাড়ি করিয়া একটা চুল্লিতে বড় একটা হাণ্ডায় ভাত চাপাইয়া অপরটাতে মাছ ভাজিতে ব্যস্ত ছিলেন। আর কাহারও মুখে অপর কোন নাম শুনিলে হয় ত তিনি তখন সে দিকে চোক-কাণ দিতেও সাবকাশ পাইতেন না। কিন্তু একে ত' গৃহিণীর কথা নিতান্ত অসার সংবাদ হইলেও কাণ পাতিয়া শুনিয়া, হাসি পাউক না পাউক, একটু শুক্‌নো হাসিও অন্ততঃ হাসিতেই হইবে। তার উপর তাঁহার এই সংবাদটার মধ্যে এমন কোন দুঃসহ শব্দ ছিল, যাহা দশরথের শব্দভেদী বাণের চেয়ে কোন অংশেই কম বেঁধে না। হাতের খুন্তি মাছের অঙ্গ স্পর্শ না করিয়াই হাতের মধ্যে স্থির হইয়া গেল, বিদ্যুতের বেগে ফিরিয়া রন্ধনকারিণী ঈষদুচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"কি বল্লেন, কার বিয়ে?"

গৃহিণী তাঁহার এই অস্বাভাবিক ও বিশেষতঃ তাঁহার স্বভাবের বিপরীত এতখানি উত্তেজনা আদৌ লক্ষ্যই করিলেন না, কেননা তাঁহার নিজের মন তখন এই সু-খবরটার উপরেই পুরামাত্রায় ব্যস্ত রহিয়াছে। হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমাদের নিমুর গো, নিমুর। এই মাসেই বুঝি বে। তাও স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। শুধু লিখেছে, 'বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, তাই আগে খবর দিতে পারিনি'। সেই বন্ধুরই মেয়ে। তা খুব হলো। আহা যেমন মা নেই, বাপ নেই, তেমনি ভাললোকের জামাই হলো, তোমরা সবাই মনখুলে আশীর্ব্বাদ করো—বেঁচে থেকে ভোগ করুক। ওতো এখন রাজা! ও মা! ও কি গো! বামুন ঠাকরুণ, পড়ে গেলে না কি? হ্যাঁগা কথা কওনা যে! ওরে ও কে আছিস্, দেখ দেখি, বামুন ঠাকরুণ হঠাৎ রাঁধতে রাঁধতে অমন হয়ে পড়লো কেন?"

কারণ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। বাড়ীর একটি ছেলে ডাক্তার—সে মূর্চ্ছিতা সৌদামিনীর শরীর পরীক্ষা করিয়া মার দিকে চাহিয়া, সহানুভূতির স্বরে কহিল, "এই মানুষ তোমাদের এই যজ্ঞির রান্না বারমাস রাঁধচেন মা! এঁর শরীরে তো কিছুই নেই! আর বুকের অবস্থা যা, যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণ বার হয়ে যেতে পারে!"

সারাদিন নীরব স্তব্ধ থাকিয়া, রাত্রিতে সৌদামিনী একখানা পত্র লিখিয়া লেফাফায় ভরিয়া তারপর মেয়েকে খুব কাছে নিজের বুকের মাঝখানে টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। মেয়ে ঘুমের ঘোরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া, আবার ঘুমাইয়া পড়িল। আজ তাঁহার চোখে জল আসিল না, বক্ষেও নিশ্বাস ছিল না, নিদ্রাও দেখা দিল না, কেবল গভীর ক্লান্তি ও অবসাদে সর্ব্বশরীর এবং সমস্ত মনটা যেন পাথরের মত ভারি এবং ভারাক্রান্ত নিশ্চল হইয়া জড়বৎ পড়িয়া রহিল। সে কোন দিন জগতের কোন একটা প্রাণীর নিকট বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পায় নাই, কোন খানেই তাহার এতটুকু দাবী করিবার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এতখানি দিয়া—সে কি জবরদস্তি করিয়াই গুঁজিয়া দেওয়া! আবার এমন করিয়া ছিনাইয়া লওয়া! এ কি ধর্ম্ম কোন মতে সহিতে পারিবেন? সৌদামিনী যদি ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু উপরের একজন—তিনি কি এতবড় অপরাধ মার্জ্জনা করিতে সমর্থ?

বাড়ীর ডাক্তার-ছেলেটি নিজের মাকে বিশেষ ভয় দেখাইয়া, দিন কয়েকের জন্য সৌদামিনীর আগুন-তাতে যাওয়া এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিল, এবং নিজের খরচে তাঁহাকে গোটাকত ঔষধ আনাইয়া দিল। শরীর একদিনের মধ্যে এমন হইয়া পড়িয়াছে যে, আর যেন উঠিয়া বসিবার মত সামর্থ্য তাঁহার শরীরে নাই। এতদিন যে আশার বলে

তাঁহার ভগ্ন শরীর মনকে বলীয়ান করিয়া রাখিয়াছিল, সেটুকু ঘুচিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলবেগে তাহার প্রত্যাকর্ষণ আরম্ভ হইয়া, তাঁহাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল। অপর্ণা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঁধিয়া রান্নাবান্না এক রকম চলনসই শিখিয়া ফেলিয়াছিল। ইদানীং সে মার হইয়া প্রায় তিনভাগ রান্নাই রাঁধিত—এখন প্রায় পূরা-ভারই প্রাপ্ত হইল। তা তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া যায় না, মা সবটা করিতে দেন না এবং বলেন—কাজ না হইলে তাঁহার কষ্ট বেশি হয়, তাই সে মাকে কাজ করিতে দেয়; না হইলে কাজ তার হাত পায় লাগে না। কর্ম্মে তাহার নৈপুণ্যও যেমন, আনন্দও তেমনি। এই কর্ম্মদক্ষতার জন্যই সে বাড়ীর গৃহিণীর কাছে যথেষ্ট স্নেহযত্ন পাইয়া আসিতেছিল, এমন কি কখন-সখন মন ভাল থাকিলে, তিনি একথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "যদি এক গোত্র না হইত, তো অপর্ণাকে যে আমার খুড়তুত দেওরের সঙ্গে বে দিয়ে এই ঘরেই নিতে পারতাম; কি করি বলো, হবার তো নয়!"

অপর্ণা তাহার এই কচি বয়সেই যখন পরের ঘরের ভাত-রাঁধার সম্পূর্ণ ভার নিজের উপর হাসিমুখে তুলিয়া লইয়া মাকে মুক্তি দিল, তখন সৌদামিনীর যেন আর সহ্য করিবার শক্তি রহিল না। এত দিন পরে যথার্থই তাঁহার একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। নিজের মৃত্যুর কামনা সর্ব্বপ্রথম সেই দিনই বেগে আসিল, এর পূর্ব্বে আর কোন দিন দুঃখ তাঁহার এমন অসহ্য বোধ হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী বোধ হয়, মাঝখানের সেই সর্ব্বনেশে আশাটুকু; সে স্বাদ না জানিলে চিরসঙ্গী দুঃখকে আজ তাঁহার এমন দুর্ব্বিষহ ঠেকিত না।

কিন্তু ঠেকিলে আর কি হইবে! সে দিন যে শক্তি তিনি সেই মুনিবগৃহের রন্ধনচুল্লীর সম্মুখে মূর্চ্ছাবসন্ন অবস্থায় হারাইয়া আসিয়াছিলেন, সে জিনিষ আর তাঁহার ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব রহিল না। উঠিতে গেলে হাত-পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে থাকে, প্রতিদিন অপরাহ্ণে জ্বর দেখা দেয়। মাথার বেদনা, অল্পস্বল্প কাশি, সকল শরীরে ব্যথা—ক্রমেই যেন শরীর তাঁহার ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। কাজেই অপর্ণার দুবেলা মুনীববাড়ী রাঁধিয়া দিয়া আসা বন্ধ হইল না। কাজ ছাড়িলে ঘরে এমন কিছু সঞ্চয় নাই, যাহাতে দুইটি প্রাণীর বসিয়া খাওয়া চলে। মানুষের আর সব নহিলে চলে, কেবল যেটা বড় তুচ্ছ, সেই আহারটা না হইলেই চলে না। মুনিবগৃহিণী তবু অনেক করিতেছেন। পর আর পরের জন্য এর চেয়ে বেশি কি করিতে পারে? ছেলেমানুষ অপর্ণা যতদূর পারে, তেমনি করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে। তিনি দোষকসুর দেখিলেও বড় একটা কিছু বলেন না। রাত্রিতে সে সকাল সকাল কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে, বধূদের বেড়াইয়া ফিরিতে রাত্রি হইলে গৃহের কোন বধূর উপর পরিবেশনের ভার দিয়া তিনি ঝি সঙ্গে দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। তাহার মায়ের জন্য পথ্য ও ঔষধও নিজেই খোঁজ করিয়া পাঠাইয়া দেন।

কয়েকদিন পরেই সৌদামিনীর পত্রোত্তর আসিল। সে পত্র সঘনকম্পিত হস্তে খুলিয়া, জ্বরজ্বালা পূর্ণনেত্র অঞ্চলে বারংবার মুছিয়া, তারপর অনেকক্ষণ সৌদামিনী সাহস করিয়া সেখানার দিকে চাহিতে পারিলেন না। হায় রে মানুষের অবুঝ মন! সে বোধ হয় তখনও সেই নির্ঘাত সংবাদের যথার্থতার উপরে কোনখানে একটু সংশয়াপন্ন হইতেছিল। বুঝি তখনও বলিতেছিল, সংবাদ হয় ত ঠিক নাও হইতে পারে! কিন্তু এখনি তো সেই শেষ সন্দেহ—শেষ-আশা মরু-মরীচিকাবৎ শূন্যে বিলীয়মান হইয়া যাইতে পারে? কে জানে!

পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

"সবিনয় নিবেদন

"আপনার অভিজ্ঞতার নিকট আমার জ্ঞান সামান্য, বালকের অজ্ঞতা মাত্র। আপনিই তখন যথার্থ বলিয়াছিলেন, সহসা কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আমাদের উচিত হয় না। সে কথা ঠিকই। এখন আমি আপনার সে অনুজ্ঞার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

"যাহা শুনিয়াছেন, সে সংবাদ মিথ্যা নহে। আশা করি, মনে কোন ক্ষোভ রাখিবেন না। আমি আপনার নিকট যে অপরাধে অপরাধী, ইহার ক্ষমা চাহিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যদি কোন প্রকারে কখনও কোন উপকারে আসিতে পারি, নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব, একথা লিখিলে বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি? এর চেয়ে বেশী কোন কথা জোর করিয়া বলিবার অধিকার বা বিশ্বাস আমি নিজেই রাখি নাই। আর কি লিখিব, প্রণাম করিবার অযোগ্য হইলেও প্রণাম করিবার লোভ দমন করিতে পারিলাম না।" আপনার

স্নেহের বিন্দু লিখিয়া তাহা কাটিয়া দিয়া লিখিয়াছে—"নির্ম্মলচন্দ্র।"

পরদিন অপর্ণা ম্লানমুখে মুনিব-গৃহিণীকে জানাইল—"নূতন লোক খোঁজ করা হোক, মার কাল সারারাত্রি বড় জ্বর গিয়েছে, আজও সে জ্বর ছাড়ে নাই, আমি কেমন করিয়া তাঁকে ফেলিয়া রাঁধতে আসি?"

চাকরিটি ঘুচাইয়া, মায়ে ঝিয়ে কয়মাস ঘরে বসিয়া-যেখানে যা সামান্য সঞ্চয় ছিল, সমস্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার পর সৌদামিনী দুটি পথ্য করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু তখনি তখনি আর অত বড় বাড়ীর যজ্ঞের ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। এখনও চলিতে গেলে পা কাঁপে, মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিয়া যেন ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। তাঁহারাই বা বারমাস এতটা সহ্য করিতে পারিবেন কেন? শক্ত-সমর্থ দেখিয়া লোক তাঁহারা নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের উপায়?

ভিক্ষা করিতে বাহির হইবেন কি? না দেশান্তরে আবার কোন ঘরে রাঁধুনি-বৃত্তি খুঁজিতে যাইবেন? এই শরীরে কেহ কি কাজ দিবে, এবং দিলেও কি তাহা এই শত প্রকার রোগের হাত এড়াইয়া রক্ষা করিতে পারিবেন? তবে উপায়?

উপায়?—উপায় এক আছে, হয়ত অন্যের পক্ষে সে উপায় অতি সহজ উপায়, সবচেয়ে সেই উপায়েরই আশ্রয় লইতে বোধ হয়, অপর যে কোন লোকেরই সর্ব্ব প্রথম মনে পড়িতে পারিত। কিন্তু সৌদামিনীর পক্ষে সেইটেই সব চেয়ে শেষ উপায়! দাদাবাবুর দ্বারস্থ যদি কখনও হইতে হয়, তবে এই সেই সময়! ভিখারীর পক্ষে দ্বার-বাছাই করা সাজে না! যে হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে সকল দ্বারেই একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য আজ বাদে কাল হাত পাতিতে বাধ্য হইবে, তাহার আর এ অহঙ্কার কেন?

অপর্ণা যখন মুখ শুকাইয়া, মার বিছানার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল, কিছু বলিল না, তবু স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, কাল হইতে না খাইয়া, তাহার আর ঘুরিয়া বেড়াইবার শক্তি বড় নাই, তখন সৌদামিনী জোর করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া, সে চিঠি লিখিতে গিয়াও অনেকবার মন তাঁহার পিছু হটিয়া আসিয়াছিল, সেখানাকে দৃঢ় হস্তে লিখিয়া ফেলিলেন। বাক্সর মধ্যে আর কিছু থাক, না থাক, দু-এক-খানা কাগজ ও লেফাফা ছিল। সেগুলি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশ্বাস ছিল, মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইবে। তাই আজ তাহারা কাজ দিল, নহিলে দুইটি পয়সাও আজ বাহির করা শক্ত হইত। চিঠি লিখিয়া সেখানি অপর্ণার হাতে দিতেই তাহার ম্লানমুখে যেন মুহূর্ত্তে

তখন সৌদামিনী… …সেখানাকে দৃঢ়হস্তে লিখিয়া ফেলিলেন

আপালোক আসিয়া পড়িল। আশার সহিত সে বলিয়া উঠিল, "চল না মা, আজই আমরা সেখানে যাই, চিঠি লেখার দরকার কি?"

সৌদামিনী যে কত বড় দুঃখে এ পত্র লিখিয়াছিলেন, ছেলেমানুষ অপর্ণা তাহা ধারণাও করিতে পারে না। পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তখন তাঁহার আদৌ ছিল না, ক্লান্তভাবে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, উত্তর করিলেন—"না মা, কারু অমতে কি কোথাও যেতে আছে?"

অপর্ণার এ যুক্তি তেমন সমীচীন ঠেকিতেছিল না। এতদিন যে কথা সে মায়ের বিরাগের ভয়ে সাহস করিয়া ফুটতে পারে নাই, আজ সুযোগের মুহূর্ত্তে তাহার স্বপক্ষে দুইটা কথা না বলিয়া চুপ করিয়া যাওয়া, তাহার অসঙ্গত মনে হইল। সে একটু জিদের মতন করিয়া বলিল—"তা হোক, তবুতো তিনি গুরুজন; আপনার লোক যদি বিদায় করিয়াও দেন, তাতেও অপমান নাই, চল না মা আমরা যাই।"

"অপর্ণা!"

মায়ের তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে চমকিয়া অপর্ণা থামিয়া গেল। সৌদামিনী সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার অতিপাণ্ডুর মুখে রক্তহীন একটা উত্তেজনার উচ্ছ্বাস দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, নেত্রের অতিশুভ্রতার মধ্যস্থ কৃষ্ণতারকা অধিকতর কালো দেখাইতেছিল। অপর্ণা মায়ের এ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মনে মনে উদ্বেগ অনুভব করিয়া নিরুত্তর হইয়াছিল। ইচ্ছাসত্বেও তাঁহার ভ্রম দেখাইতে সাহসী হইল না। সৌদামিনী কহিলেন—"আপনার লোক তুমি কাহাকে বল, অপর্ণা! আমার আবার আপনার লোক কে? এ আমি ভিখারীর মত কিছু ভিক্ষা চাহিয়াছি মাত্র। আত্মীয়তার দাবী আমার কারু কাছে নাই।" এ অভিমানের লক্ষ্য যে শুধু দাদাবাবু একাই নহেন, আরও একজন কেহ এই দারুণ হতাশার নিমিত্ত-কারণ ছিল, এ ইঙ্গিতে যে তাহারও প্রতি একটা মর্ম্মভেদী নিগূঢ় অভিমান ব্যক্ত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে অপর্ণার বিলম্ব হয় নাই। সে মায়ের লুকাইবার চেষ্টা সত্বেও সেই পত্র দুখানা পড়িয়াছিল। এবং তাহার মা যাহা না জানেন, এমনও কিছু তাহার জানা ছিল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা মৃদুশ্বাস উঠিয়া নাসাপথে বাহির হইয়া গেল। মাকে এই নিত্য একাদশীর বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলিতে তাহারও বুঝি তাই প্রবৃত্তি হইল না।

৭

নূতন গৃহস্থালীতে অপর্ণার আনন্দের সীমা রহিল না। ছেলেবেলা হইতে মায়ের সঙ্গে বড় লোকের বাড়ীতে আসা যাওয়া করিয়া তাহার নজরটুকু বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, নিত্য-নাই ঘরের মেয়ে হইলে কি হয়, প্রকৃতি তাহার সেরূপ ভাবে গঠিত হইতে পারে নাই। সৌদামিনীর কর্ম্ম-প্রবৃত্তি তেমন প্রবলা নয়। তাঁহাকে যে খাটিতে হইয়াছে, তাহা দায়ে পড়িয়া। আপীসের বাবু যে দায়ে নয়টা-ছটা কলম পিষিয়া খুন হয়, এও সেই একই দায়। কেরাণী-বাবুর মসী-যন্ত্রে কোন প্রকার আগ্রহ বা উদ্দীপনা থাকে না, নহিলে নয়, তাই করে। সৌদামিনীরও কাজ করা ব্যতীত উপায় নাই, তাই করিতে হইত। অপর্ণার নিকট কাজের স্বতন্ত্র মূল্য ছিল, কর্ম্ম তাহার উপার্জ্জন নয়—আনন্দ; খোরাকী নয়—খোরাক। তাই পরের ঘরেও তাহার সে কর্ম্ম-সুখ অব্যাহত থাকিতে পাইয়াছিল। গৃহিণী ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া দিতেন, সে অতি নিপুণতার সহিত নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীসকল তাঁহার অনুজ্ঞামত গুছাইয়া বাহির করিয়া দিত। ভাণ্ডারের হাঁড়িকুড়ি ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িয়া প্রত্যেকের উপর খড়ি দিয়া সুচারু ছাঁদে ভিতরের জিনিষটার নাম লিখিয়া রাখিত। ইহাতে তাড়াতাড়ির সময় কোন একটা জিনিসের জন্য সৃষ্টি হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় না। আবার খড়ি উঠিয়া যায় বলিয়া, ইদানীং সে কাগজের টিকিট করিয়া আটা দিয়া আঁটিয়া চিহ্ন করিয়াছিল। প্রতিদিন ভাণ্ডারটি ঝাঁট দিয়া, ঝুল ঝাড়িয়া, রান্নাঘরখানি গুছাইয়া, মাজা বাসন নদীর জলে পুনর্ধৌত করিয়াও সে যেন গৃহস্থালী গুছাইবার সম্পূর্ণ সুখলাভ করিতে পারিত না। আরও কতখানি যে সে করিতে পারে। কিন্তু কে তাহাকে তাহার এদারুণ কর্ম্মতৃষ্ণা মিটাইয়া কাজ দিবে? পরের ঘর, বিভিন্ন রুচি, তাহার সবটাইতো তাহার জন্য নয়! এখানে যতপারো খাটিয়া যাও, কেহ ভুলিয়াও বারণ করিবে না; কিন্তু সে খাটুনিতে, আর নিজের ইচ্ছানুরূপ একটি গৃহের পূরাপুরি গৃহিণীপনার কর্ম্মে যেমন আকাশ পাতাল-ভেদ, ইহার মাঝখানের কর্ম্মসুখেও যেন তেমনি প্রভেদ!

কিন্তু নিজের ঘরে তাহার জন্য একখানি ছিন্ন মলিন শয্যা ও পরিধেয়বস্ত্র কয়খানির লজ্জা-নিবারণ ছাড়া আর কোন কর্ম্মই ভগবান যে রাখেন নাই !

তাই এখানের সমস্ত গৃহস্থালীর ভার এক নিমেষের মধ্যে যখন নিজেই আসিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইল, তখন সে বিজয়ের গৌরব অপর্ণার যেন আর ধরিতেছিল না। সে পরম পরিতোষের সহিত অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, অঙ্গনস্থ কূপ হইতে জল উঠাইয়া, স্নান সারিয়া লয়। জল খুব নিকটেই—সাতআট হাতের বেশি-নীচে নয়, তুলিতে কিছুই শ্রমবোধ হয় না। যদিই হইত, তবু অপর্ণা বোধ হয়, তাহা অনুভবও করিতে পারিত না। তাহার শরীর যথেষ্ট সবল, আর মন তাহার শরীরের অপেক্ষা বহুগুণেই বলিষ্ঠ। সেই যে সাতসকালে স্নান সারা হইয়া গেল, সেই হইতে ঠাকুরঘরের পাট হইতে আরম্ভ করিয়া, রান্নাবান্না সকল কর্ম্মই তাহার অতি সুনিয়মিত ভাবে হাসিখেলার মত সহজেই সম্পন্ন হইয়া যায়, কাজ যেন হাতে পায়ে স্পর্শ করে না। তারপর দুপুরবেলা সারাবাড়ী উপর-নীচে সমস্তটা ঝাড়িয়া মুছিয়া ঝকঝকে করিয়া তোলা, ইহার কোথায় কি থাকিলে মানানসই দেখিতে হয়, এই লইয়া বিহারীর সহিত পরামর্শ, এবং শেষে বিহারীর যুক্তির অসারতা দেখাইয়া, তাহাকে কলহাস্যে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া, নিজের পছন্দসই জয়জয়-কার। এমনি করিয়া এই ক্ষুদ্র সংসারটি লইয়া সে যেন মাতিয়া রহিল।

সৌদামিনীকে এসকল উদ্যমের মধ্যে পাওয়াও সম্ভব ছিল না এবং প্রয়োজনবোধও হয় নাই। প্রশস্ত-বক্ষ নদীর মধ্যে বর্ষার ঢল নামিলে, সে জল যেমন অত্যন্ত প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটে, অথচ বাহিরে আসেপাশে কোথাও কাহারও কোন ক্ষতি করে না, নিজের সীমা লঙ্ঘন করে না, আপনার চিররুদ্ধ গৃহিণীপনার আকাঙ্ক্ষা তেমনি তীব্র উৎসাহে জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়া, একমাত্র তাহাকে নিজেকে লইয়াই খাটাইয়া ভাবাইয়া সন্তুষ্ট ছিল; তাহার মধ্যে কাহারও মধ্যস্থতার প্রয়োজন সে বোধ করে নাই, শুধু বাধা না পাইলেই তাহার যথেষ্ট হইল। কেবল বিহারী তাহার এই উৎসাহী নূতন অতিথিটিকে নিজের এতদিনকার সমস্ত বিশৃঙ্খল রাজ্যপাট ধরিয়া দিয়া তাহার এই সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মপূর্ণ শাসনব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবকত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। অপর্ণা হুকুম করিত, সে অবনত-মস্তকে পালন করিত; আর অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিত—তাহার এতদিনকার সমস্ত অক্ষমতার লজ্জা চাপা দিয়া, কেমন করিয়া সেই ধূলি-আবর্জ্জনা-ভরা অপরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী দেখিতে দেখিতে ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবির মত আপনার চেহারা বদলাইয়া ফেলিয়া, আর একরকম হইয়া উঠিতে ছিল। আর যে মানুষটি তাহার বানরটিকে 'শিবে' পরিণত করিয়া লইতেছিল, মনে মনে তাহার প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতে থাকিয়া, মুখে তাহার জয়গানে সে ভক্তির নিদর্শন-প্রদর্শনে সে কদাচ ক্লান্তিবোধ করিত না। তাহার দিদিমণি যে কিরূপ আশ্চর্য্যক্ষমতাপন্ন—তাহার যে কত কীর্ত্তিগাথা, এ শুনিতে তাহার ভাবিসাবির দল অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু রাধিকাপ্রসন্নর প্রসন্ন মুখচোকে দেখা কাহারও তপস্যায় ছিল না। অপর্ণা যখন বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তখন হইতেই সে কল্পনায় ইঁহার যে ছবিখানি আঁকিয়া আসিয়াছিল, দুপাঁচ দিন ঘর করিবার পরই বুঝিল যে, বাস্তবটি কল্পিতের চেয়ে আরও একশতগুণ ঘোরালো। ইঁহার প্রসন্নতালাভ কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেহেতু ঐ বস্তুটি ইঁহার প্রকৃতির মধ্যেই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যাহারা বদরাগী হয়, তাহাদেরই মন আবার খুব সরল হইয়া থাকে, ইহাও সর্ব্ববিদিত সত্য। কিন্তু তাঁহাদের এই সম্মানিত বৃদ্ধটি যে কেমন শান্তস্বভাব, তাহা এ পরিবারের কাহারও তো অজ্ঞাত নাই, অথচ এদিকে আবার তাঁহার মনটি ঠিক রাধাচক্রের ন্যায় অহরহঃ ঘূর্ণনশীল।

সৌদামিনী সেদিনের পর হইতে কি জানি কি ভাবিয়া এই অন্ধকারমুখ কটুভাষী বৃদ্ধের বিরুদ্ধে একটু ক্ষমার সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর্ণা এখনও তেমনি করিয়া জ্বলিয়া তাঁহাকে জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, ইঁহাকে বশে রাখিতে গেলে, নিজেকে ইঁহার বশতাপন্ন করিলে চলিবে না। সেদিন মাসকাবারী হিসাব দেখিতে বসিয়া, রাধিকাপ্রসন্ন বিহারীকে চড়া-গলায় গালি দিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এই কদিনে এত এত তেল-ঘিয়ের খরচ কিসের জন্য হে বিহারী বাবু?

জকাল ও জিনিষগুলো চুমুক দিয়া খাওয়া হয় নাকি ?”
-তেলের খরচা যে সম্ভবাতিরিক্ত এমন কিছু হইয়াছিল, নয়। লোক বাড়িলেই যে বৃদ্ধিটুকু অনিবার্য্য, তাহাই ত্র বেশি হইয়াছে।' বিহারী সেকথা স্মরণ করাইয়া না য়াই মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল। “তা, কিছু কম রিতে আ—আচ্ছা—তা”

“খোকার মতন 'তা—তা' করতে শিখচো যে নূতন মা াকরুণ পেয়ে। ঐ নূতন রাঁধুনীটেকে একটু ধমকে দিও দখি, এতকরে জিনিষ না লোকসান করে।” শেষ কথাগুলা হস্বামী বিলক্ষণ চেঁচাইয়াই বলিলেন—তাহাতে বিহারীর আর উহা বলিবার সঙ্কট ভোগ করিতে হইল না। পাশের ঘরে দরজার কপাট ও দেওয়ালের 'সর্‌দালে' উইপোকার বাসা জন্মিয়াছিল, একগাছা মুড়া ভাঙ্গা ঝাঁটা হস্তে অপর্ণা সেইগুলি সাফ করিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তার এই মন্তব্য কাণে ঢুকিতেই সেই অবস্থায় এদিকের খোলা দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—“ওরচেয়ে কম ঘি তেল দিয়ে কে রাঁধ্‌তে পারে, রেঁধে দেখাক্‌ দেখি!”

“কেন পার্ব্বে না! বেহারি তুই পারিস্‌নে ?”

বিহারীর এই সওয়ালে পড়িয়া গিয়া জবাব করা কঠিন হইয়া উঠিল। না বলাও যায় না এবং হাঁ বলাও ভাল দেখায় না; সে আবার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল। অপর্ণা তাহার সঙ্কট দেখিয়াও যেন দেখিতে পায় নাই, এমনি করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—“বেশতো, বেহারিদাদা বলুক না কেমন পারে ? তা আর কাউকে পারতে হয় না গো!” “কি বেহারি তোমার বাক্য হরে গেল যে! মগজে ঘা দিয়ে বুদ্ধি বার করা হচ্চে না কি ?”

“আজ্ঞে না, তা—হাঁা—পারা যাবে না কেন ? তবে কি না সে তেমন তোমার গিয়ে—তেমন ইয়ে হয় না।—ভাল হয় না।”

রাধিকাপ্রসন্ন মুখ বিকৃত করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন—“তোমার গোষ্ঠির মুণ্ড হয়! ওগো রাধুনি ঠাকরুণ! দোহাই তোমার, এ গরীবের গলায় তোমরা দু মা-বেটিতে একেবারে পা তুলে দিও না। একটু দয়ার সঙ্গে রান্নাবান্নাগুলো করো। বাবাঃ দশ দশ দিনে এক এক টাকার সর্ষের তেল!” যা কখন হয়নি, অপর্ণা ক্রমাগত রাঁধুনি-ঠাকুরাণী-রূপ মহৎ পদলাভ করিতে করিতে মনের মধ্যে একটুখানি চটিয়াছিল, এবার সে শোধ লইবার জন্য বলিয়া উঠিল।

“কক্‌খনো হবে কি করে ? আবার আমাদের যদি গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করতে পারেন, তবেই না আবার ষোল ষোল দিনে বেহারী-দা! করতে পারবে! মানুষ এলেই খরচ বাড়ে, এত' কচি ছেলেটিও জানে।”

“সেই জন্যই তো মানুষকে অনুগ্রহ করে না আসবার জন্য প্রত্যহ বলা হচ্চে, কিন্তু বেহায়া মানুষরা শুনতে চায় কই ?”

অপর্ণা হারিয়া গিয়া নিরুপায়ের রোষে বিহারীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হানিয়া সবেগে কহিল, “আমি কাল থেকে তোমাদের রাঁধ্‌তে পারবো না বেহারিদা, তা এই বলে রাখলাম।”

“আঃ, তা'হলে আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগবে দেখতে পাচ্চি। সত্যি কাল তুই গোটাকত রান্না রেঁধে ওবেটিকে একবার দেখিয়ে দিস্‌ তো বেহারি! নিজের রান্নার গুমরেই মেয়েটা গেল! যেন ভূভারতে আর কারু হাত দিয়ে অমন ফুল-বড়ী দিয়ে কাঁটানটে শাকের ঘণ্ট সৃষ্টি হতেই পারে না!”

বিহারী নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের এমন সুযোগে একটুও আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতে পারিল না। বরং মনে মনে সে অপর্ণার এই পরাভবে কিছু উদ্বেগ-ব্যথিত হইয়াই উঠিতেছিল। সর্ব্বদা হাসিমুখী অপর্ণাকে কোন্‌ খান দিয়া যথার্থ স্পর্শ করিতে পারা যায়, তাহা তাহার এই মান্যবান আত্মীয়টি যে ইহার মধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছেন, বিহারীও সেটুকু দেখিতে পাইল। রান্নার নিন্দা তাহার কাছে প্রসূতির নিকট সন্তানের গ্লানির মতই অসহ্য। বৃদ্ধ যখন তাহার এই ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীটির গোপন রহস্য-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন হাজার চেষ্টা করিলেও আর সে দ্বারের চাবিকাটিটি তাঁহার নিকট হইতে ভুলাইয়া আদায় করা যাইবে না, একথাও বিহারী জানে। এখন হইতে মাঝে মাঝে এই স্বীয় গুণপণায় আত্ম-তৃপ্ত-বালিকাকে তাঁহার নিকট হইতে তাহার এই নিরীহ আত্মগর্ব্বে আঘাত পাইতেই হইবে, ইহা অনিবার্য্য। এবৃদ্ধের প্রতিহিংসা-পরায়ণ চিত্ত সুকুমারমতি বালিকার এ চিত্তক্ষোভকে কোনমতেই ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নয় বরং হুল ফুটাইয়া দিয়া গোপন হাসি হাসিয়া, বিদ্ধের মর্ম্মব্যথা চাহিয়া দেখিতেই প্রস্তুত। বিহারীর চিরবাধ্যতাবদ্ধ চিত্ত হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে

চকিতের মধ্যে একবার অপর্ণার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সস্মিতস্বরে উত্তর করিল—"আমি রাঁধ্‌লেত' মায়ের খাওয়া হবে না !"

"সেই ভাবনাতেই তো আমার ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে ! না হয় তিনি আর একদিন একাদশীই করবেন ! না না, বেহারি, একদিন তুই ওকে দেখিয়ে দিস্ যে, ওরচেয়ে কত ভাল বেন্নন তুই কত কম ঘি-তেল দিয়ে রাঁধতে পারিস। ভারি তো রান্না, তারি আবার ঐ অত গুমোর ! আরে রামঃ ! অমন রান্না ঢের খেয়েচি।"

পরদিন আহারে বসিয়া পরম পরিতোষের সহিত ভেটকি মাছের ঘণ্ট আস্বাদন করিতে করিতে গৃহস্বামী অদূরে দণ্ডায়মান বিহারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রসন্নমুখে কহিয়া উঠিলেন—"একেই বলে রান্না ! তোফা রেঁধেছিস্ বেহারি ! যেমন মূলোর শুক্তোটির তার হয়েচে, তেমনি সোণামুগের দালটুকু ! আর সবার ওপোর এই মাছের ঘণ্ট ! একবার মুখে দিলে যেন সাত বছর প্রমাই বৃদ্ধি হয় !" এই বলিয়া উৎসাহসহকারে মাছের কাঁটা বাছিয়া, ভাতের সহিত ঘণ্ট মাখিয়া বড় করিয়া গ্রাস তুলিয়া বলিলেন—"চমৎকার হয়েচেরে বেহারি, বেড়ে রেঁধেছিস্ !"

বিহারী সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া দুধ আনিতে উঠিয়া গেলেন। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা সত্যি কি আজ রান্না খুবই ভাল হয়েচে ?"

"হয়নি তো কি মিথ্যা বল্‌চি ? খেয়েই দেখিস্, এমন কখনও খেয়েছিস্ কি না ? দেতোরে বেহারি, আর একটু মুগের ডাল। আহা, এমন যে সোণার বর্ণ, অন্যদিন এ যেন কালী হয়ে যায় ! কথায় বলে—'অরাঁধুনির হাতে পড়ে কই মাছ কাঁদে, নাজানি রাঁধুনি আমার কেমন করেই রাঁধে !' জানিস্ দামিনি ! তোর দিদিমা এই কথাটি সর্ব্বদা তার এক সম্পর্কে বোন হয়,—তোর মার জন্ম সময় এসে এই বাড়ীতে কিছুদিন ছিল—তাকেই বল্‌তো। আমার সেই শ্যালীটির রান্না মোটে ভাল ছিল না ; যেমন এই তোমার মেয়ের অন্নপূর্ণার। এই রকম আর কি।" অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সবেগে কহিয়া উঠিল—ইস্, "তা বই কি ! আজ কে রেঁধেচে !" কর্ত্তা কহিলেন—"কেন বেহারি ?" "ইস্ ! তা আর নয় ! বলুক না—বেহারি দা, নিজেই বলুক না ! হ্যাঁ বেহারি দা !"

বিহারী আজিকার 'রন্ধন-খ্যাতি' শুনিতে শুনিতে মনে মনে অত্যন্ত পুলকগর্ব্বিত হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই অপরিসীম আনন্দে মুখ টিপিয়া হাঁসিয়া অপর্ণার প্রচ্ছন্ন আনন্দে স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানির প্রতি মধ্যে মধ্যে চাহিয়া দেখিতেছিল। এখন জিজ্ঞাসিত হইয়া আনন্দের হাসি হাসিয়া প্রফুল্লস্বরে উত্তর করিল—"উনিই তো সব রেঁধেছেন।"

"বটে ! আমিও তো তাই বলি,—সেই জন্যই শুক্তোনিটাতে অমন নুনের ঘটা, একেবারে যেন যবক্ষার হয়ে গেছে ! আর এই যে এমন চাল্‌তার গুড়-অম্বল, এ যেন টকে বিষ হয়ে আছে। আরে রামঃ ! এর নাম আবার রান্না !" বলিতে বলিতে রাধিকাপ্রসন্ন পাথরবাটী-শুদ্ধ গুড়-অম্বল কোলের দিকের ভাতের উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া সৌদামিনী ও বিহারী মুখ টিপিয়া হাসি চাপিয়া ফেলিল। অপর্ণাও এবার আর রাগ না করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ; হাসিতে হাসিতে সে বলিয়া উঠিল—"ওঃ বুঝেছি ! আপনার ও সব মিথ্যা কথা ! আচ্ছা, এইবার একদিন বেহারীদার রান্না খেয়েই দেখা যাবে। কাল মার পুর্ণিমার উপোস আছে। রেঁধোতো তুমি কাল, বেহারি দাদা !"

বিহারী উত্তর না করিয়া প্রথমে কর্ত্তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে রহিল, তারপর সহাস্যে কহিল—"আচ্ছা"।

রাধিকাপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ নাসিকা কুঞ্চিত ও ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া গর্জ্জন শব্দে বাধা দিয়া উঠিলেন—"নেমক হারাম ! তোর হাতে আমি আর কক্‌খন খাবো নাকি, যে তুই কাল রাঁধবি ! কেন আজ রাধ্‌তে তোর কি হয়েছিল ? তাহ'লে তো ও বেটির দর্পচূর্ণ হয়েই গিয়েছিল আজ। নাঃ অন্নপুন্নো ! তুই-ই বাপু রাঁধ্‌তে শিখেছিস্ ভালো। তুই-ই রেঁধে খাওয়া বাপু, যদ্দিন না বিদেয় হোস্। ও বেহারি চামারটা কি রাঁধে ? অতি জঘন্য—অতি বিশ্রী রান্না ওর। সেখানে চোক ফেটে কান্নাই বার হয়ে যায়। ওর হাতের রান্না খাওয়া ঘুচেছে—না বেঁচেছি।" রাধিকাপ্রসন্ন আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। বিহারী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে আচমনের জল ঢালিয়া দিবার জন্য জলের ঘটি ও খড়িকা লইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। প্রশংসায় সে যেন মরিয়াছিল, চিরদিনের পাওনা পাইয়া এখন আবার বাঁচিয়া গেল।

য়ূরোপে তিনমাস

[মাননীয় শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্‌-এ., এল. এল. ডি]

মাননীয় শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

ংগ্রেস-পালা শেষ হইয়া যন্ত্রণার ও পরিশ্রমের অবসান হইবে নে হইয়াছিল ; কিন্তু গত তিন দিন যে কি ভাবে কাটিল, কাথা দিয়া গেল, ভাবিয়া পাঁই না ! মহামতি গ্লাডষ্টোন র্ণিতেজের উপর যখন কাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার Iidlothian Campaign বাহুল্য স্থলে পরিচয় দিবার ময় ছিল। অতি মহতের সহিত অতি ক্ষুদ্রের তুলনায় ময়ে সময়ে গৌরব না হউক, উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ হয়। ামার শরীর ও ক্ষমতার আপেক্ষিক তুলনায়, এই কয় নের কার্য্য Midlothian Campaignএর বাহাদুরীর পেক্ষা কম নয়। কংগ্রেসের চারি দিন যে ভূতগত পরিশ্রম ইয়াছে, তাহার আংশিক বর্ণনা মাত্র হইয়াছে। গত নিবারের পূর্ব্ব শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া, কল্য ামবার পর্য্যন্ত আট দিনে অক্‌স্‌ফোর্ড, বার্ম্মিংহাম, াঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, লীড্‌স্‌ ও ক্যাম্ব্রিজ এই কয় জায়গা ওয়া, সহর-লাইব্রেরী-মিউজিয়ম দেখা, ভদ্র লোকের ইত পরিচয় ও তদানুষঙ্গিক ভদ্রতা ও পরিশ্রমকরা,বেড়ান, লেজ-দেখা, খানা, ভোজ, বক্তৃতা, কথাবার্ত্তা পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে ! বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা প্রত্যহ দৌড়াদৌড়ি ; তাহাতেও কুলায় না। তার অপেক্ষাও বাহাদুরি মঙ্গল, বুধ এবং আজ বৃহস্পতিবারের কাজ। শরীর এত পরিশ্রান্ত যে, ভ্রমণবৃত্তান্ত দূরে যাউক, বাড়ীতে চিঠি লিখিবার সাধ্য পর্য্যন্ত কুলাইতেছে না।

মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই, প্রাতঃকাল। 'ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি'তে রয়েল সোসাইটির সার্দ্ধদ্বিশততম উৎসব উপলক্ষে প্রকাণ্ড Service হইল। রাজাদের অভিষেক, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পুরুষদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্ম কার্য্য এই বহুপুরাতন পুণ্যকীর্ত্তি নয়নাভিরাম ধর্ম্ম-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। বাহিরে মন্দিরের শিল্পচাতুর্য্য যেমন মনোহর, ভিতরেও তেমনি ; প্রাচীন কারুকার্য্যে মন্দিরের ভিতর-বাহির শোভিত। প্রকাণ্ড চ্যাপেল, প্রকাণ্ড ডবল অরগ্যান, একটা অরগ্যান সাম্‌নে বাজিতেছে, একটা ভিতর হইতে অদৃশ্যভাবে বাজিয়া যেন উত্তর দিতেছে। যেন মঙ্গল-শঙ্খ-নিনাদের মঙ্গল-প্রত্যুত্তর অদৃশ্যভাবে আসিতেছে। তার উপর সুশিক্ষিত choir, অর্থাৎ যাজক-গায়কমণ্ডলী, উপযুক্ত নেতার নেতৃত্বে অপূর্ব্ব সঙ্গীতসম্ভারে উপাসনার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিল ! আবাল্যপরিচিত ধর্ম্ম-সঙ্গীত "The spacious firmament on high" সুর-লয়ে বহুকণ্ঠে গীত হইয়া, বড়ই মনোহর শুনাইতেছে। ১৮৭৫ সালে হেয়ার স্কুলের থার্ডক্ল্যাসে এই লোক-বিমোহন ভগবৎ-মহিমা-স্তোত্রের সহিত শিশু-সূত্রে পরিচয় হইয়া, সেই অবধি যেন প্রাণে জাগিতেছিল। আজ এই মহামন্দিরে, বিজ্ঞানাচার্য্যগণের মহাসঙ্ঘে এই মহাগীতি কবিকথার মহাজীবন সঞ্চার করিল।

চর্চ্চ অব্‌ ইংলণ্ডের শোভাযাত্রা, পোষাক, আসা-সোঁটা, ধর্ম্ম-উপাসনার অঙ্গ প্রচুর আয়োজনও—রোম্যান ক্যাথলিকদিগের মত না হউক—অনেকটা হিন্দু-ধরণের। উপাসনা-ভাগটা চিরপরিচিতের ন্যায় মনে হইতে

লাগিল। Dean of West Minister ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। স্যর অলিভার লজকে সভামধ্যে দেখিলাম। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য-চেষ্টা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া, সার অলিভার লজের শরীর ধারণ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত! নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া করিয়া, ভগবৎ-বিশ্বাসে অভিভূত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"Oh God, thou art and must be." এইরূপ কিম্বদন্তী। হিন্দু-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের মূলে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব দেখিয়া, অনেক ইংরাজীনবীশের হিন্দুয়ানীতে ভক্তিসৃষ্টির কথা শুনা যায়। Fourth state of matter-আবিষ্কর্ত্তার ধর্ম্মপ্রাণ ভাব ও বিজ্ঞান-গাম্ভীর্য্য, বোধ হয়, কাহাকেও মনে করিয়া দিতে হইবে না। Dean এর বক্তৃতাটি যেমন সময়োপযোগী—তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইল। ভাইস চেন্‌সেলার ম্যাডাম স্মিথ, ভাইস চেন্‌সেলার ম্যাকালিষ্টার, মিঃ ব্যালফুর প্রভৃতি আরও অনেক বড়

ব্যালফুর

বড় লোককে দেখিলাম। তারপর উপাসনা অন্তে এবির ভিতর বেড়াইয়া, মহামতিগণের শেষশয্যা ও গৌরব-নিদর্শন দেখিয়া, ধন্য হইলাম। এক দিকে পীল, গ্ল্যাডষ্টোন, ডিস্‌রেলী,—একদিকে উল্‌ফ্‌ প্রভৃতি বীর পুরুষগণ,—একদিকে সেক্‌স্‌পীয়ার, স্কট, ড্রাইডেন, বায়রণ প্রভৃতি কবি-সমাধি (Poets' Corner) অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। যশোমন্দিরে মহামতির সমাবেশ একত্র এত অধিক প্রায় দেখা যায় না। ফ্রান্সের 'প্যান্থিয়নে' দুই-চার-দশ জনের গৌরবমণ্ডিত সমাধিস্থল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আজ ওয়েষ্ট্‌ মিনিষ্টার এবিতে দুই চার শত সমাধি দেখিয়া, চিরপরিচিতপ্রায় মহাজন-গণের বিশ্রাম-শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মনের ভাবের কথা বর্ণনা-চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে এবং এই মহাজনগণের পার্শ্বে পার্শ্বে গা-ঘেঁসিয়া অনেক অপকর্ম্ম পাপিষ্ঠের সমাধি রহিয়াছে। ফ্রান্সের নজীর অনুকরণে, ইহাদিগের দেহাবশেষ টেম্‌সের জলে মগ্ন করিয়া, তাহাদের পাপ-স্মৃতি বিধৌত করিলে, তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল। ইতিহাস ঘৃণ্য নরাধম অনেকেও শুদ্ধ সাময়িক কৃতিত্ববলে এই যশোমন্দিরে স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস তাহাদিগের অপ-কীর্ত্তির যখন মূল্য-নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তখন পরবর্ত্তিগণ তাহাদিগের অস্থি স্থানচ্যুত করিয়া, অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত মনে করেন নাই।—ক্লান্তদেহে 'ইণ্ডিয়া অফিসে' স্যর জেম্‌স্‌ ডন্‌লপ্‌ স্মিথের সহিত দেখা করিয়া আসিলাম। ইনি ভাইস্‌ চেন্‌সেলার ম্যাডাম্‌ স্মিথের ভ্রাতা; কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন; এখন ইণ্ডিয়া আপিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী।

রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিলাম, একটা দোকানে আগুন লাগিয়াছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। 'নীলকমল' শ্যামবাজারের পুলের কাছের ভিড় দেখিয়া যেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়াছিল, অন্ধকার আগুন লাগার ভিড়ে আমারও ততোধিক। মানুষের মাথার উপর দিয়া বরাবর হাঁটিয়া গেলে যাওয়া কঠিন হইত না, এমনি অনড়, জমাট, নিরেট ভিড়; এবং তেমনি করিয়া অনেক দূর গেলেও যাওয়া যায়। আগুনটি ছোট, কিন্তু জনতাটি ভীষণ। দেখিতে দেখিতে দমকলের দল আসিয়া পড়িল। নানা রঙের গাড়ী, নানা ঢঙ্গের যন্ত্র, নানাবেশের Fireman, Fire Ladder, Pump, Hose—দেখিতেই আশ্চর্য্য! লোকজন যেমন সায়েস্তা—বন্দোবস্তও তেমনি আশ্চর্য্য। গাড়ী, লোকের জনতা—সেই ভীষণ জনতা সব ভেদ করিয়া, আশ্চর্য্য কৌশলে অবিরাম দ্রুতগতিতে Fire

Brigade আসিয়া পড়িল। রাস্তার ভিড়ের লোকেরাও অসাধারণ সায়াস্তা—জলের মত জনতা পরিষ্কার হইয়া গেল। দূরবিশ্রুত সেই কঠোর ঘণ্টা-নিনাদ যাহার কর্ণগোচর হইতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ ফায়ার বিগ্রেডের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। চক্ষের নিমেষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল! ঘুষ দিতে হইল না—ঘুষা খাইতে হইল না—খোসামোদ করিতে হইল না—যাহার যে কার্য্য, সে কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়া, নিঃশব্দে অমিতবলে তাহা করিয়া, আবার নিঃশব্দে চলিয়া গেল; সহরে কার্য্যস্রোত দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বমত অক্ষুণ্ণভাবে চলিল। বিলাতের বাড়ী ঘর-দ্বারে কাষ্ঠের প্রাচুর্য্যে সহরে অগ্নিদাহের সতত আশঙ্কা। অগ্নি-নির্ব্বাণের এরূপ সুবন্দোবস্ত না হইলে, বিপদ্ আরও ভয়ানক হইত। অগ্নিদাহে লণ্ডনের সর্ব্বনাশ অনেকবার হইয়াছে; মহারাণী এলেকজ্যাণ্ড্রার শয্যা-গৃহ পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পায় নাই।

বাড়ী আসিয়া, বিশ্রাম করিয়া, সেণ্ট এণ্ড্রুজ যাইবার জন্য গোছগাছ করিয়া লইলাম। ক্রমওয়েল রোডে 'নর্থব্রুক সোসাইটি'তে মিঃ কেনের পার্টিতে গেলাম। মিঃ কেন, Temperance সম্বন্ধে ভারতের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সেই কার্য্যে মনঃপ্রাণ দিয়াছেন। তাঁহার দুই জামাতা—স্যর হার্ব্বার্ট রবার্টস্ ও মিঃ লুইস—পার্লামেণ্টের মেম্বর; দুই জনেই এই কাজে পূর্ণপ্রাণে লিপ্ত আছেন।

মিঃ কেন,—গোখ্‌লে ও আমার সম্মানার্থ এই পার্টি দিয়াছেন। টেম্পারেন্স্ কার্য্যে ঘনিষ্ঠভাবে আমার সম্বন্ধ বলিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বিলাতে কিছু কিছু কাজের চেষ্টা করা গিয়াছে বলিয়া, আমাদের এই অভ্যর্থনা। বিস্তর সাহেব-বিবি, ভারতবাসী ও দুই চার জন ভারতবাসিনীও উপস্থিত ছিলেন। গানবাজনা, খাওয়া-দাওয়ারও প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। তারপর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা। আমাকেও বক্তৃতা করিতে হইল। বক্তৃতার পর সাহেববিবিদের বক্তৃতার গুণ-পরিচয়, আশীর্ব্বাদ, Congratulation, ভদ্রতা-অনুমোদিত মাফিক দস্তুর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নবপরিচিতগণের নিমন্ত্রণের ছটাও পড়িয়া গেল। গোখ্‌লে সাহেব বড়লাটের কাউন্সেলের প্রধান মেম্বর ও প্রসিদ্ধ বক্তা; তাঁহার বাহবা ত জুটিবারই কথা। কিন্তু আমার ভাগ্যেও বাহবার কম্‌তি হইল না। কত সাহেব-মেম আসিয়া আলাপ-পরিচয় করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তখন সেদিকে আমার মন নাই। শত শত ক্রোশ দূরে সেণ্ট এণ্ড্রুজ নগরে রাতারাতি যাইতে হইবে, আবার কাল রাতা-রাতি আসিতে হইবে, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল রহিয়াছি এবং ভদ্রতার নিয়ম অতিক্রম না করিয়া পলাইব কেমন করিয়া, তাহাই ভাবিতেছি। পাঁজীতে দেখিলাম, আজ অশ্লেষা—কাল মঘা; অর্থাৎ, অশ্লেষায় গমন মঘায় প্রত্যাগমন। 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' বলিয়া ত রওয়ানা হইলাম।

দিনের বেলায় সকলেই থার্ডক্লাসে চড়ে। কিন্তু রাত্রি-কালে বিনা-নিদ্রায় ও ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবে, এই ভয়ে ফার্ষ্টক্লাসে ও 'স্লিপিংকারে' যাইতে বাধ্য হইলাম। অতএব, ৪৫৲ টাকার জায়গায় যাতায়াতে প্রায় ১২০৲ টাকা খরচ। লোকসাধারণ থার্ডক্লাসে কেন চড়ে বুঝিতে কষ্ট হয় না।

স্বয়ং যাইয়া মহাসম্মান গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা সেণ্টএণ্ড্রুজ কর্ত্তাদিগের বিশেষ অনুরোধ; এবং বৃহস্পতিবার সেক্রেটারী অব ষ্টেটের ডেপুটেশনে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব, রাত্রিতে যাওয়া, রাত্রিতে আসা ভিন্ন উপায় নাই।

গাড়ীর গার্ড কালা-আদমীর ফার্ষ্টক্লাসে যাওয়ার স্পর্দ্ধা দেখিয়া, একটু চালাকীর যোগাড় করিয়াছিল। বলিল—"একখানা বেঞ্চ একজন 'রিজার্ভ' করিয়াছে, অপর বেঞ্চে আমি যাইলে সে আপত্তি করিতে পারে।" আমি বলিলাম, "তাহার, আমার সম্বন্ধে, আপত্তি করিবার যে অধিকার, আমারও, তাহার সম্বন্ধে, আপত্তি করার সেই অধিকার এবং সে আপত্তি আমি করিতেছি।" এই কথা বলিয়া জাঁকিয়া বসিয়া যাওয়াতে গার্ড অপ্রস্তুত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিল পরে পরিচয় পাইলাম যে, আপত্তিকারী কোন ভারত প্রত্যাগত মহামনা ইংরেজ, গার্ডকে দুই শিলিং দিয়া আমায় ভড়কাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; অগত্যা অকৃতকার্য্য হইয়া স্থানান্তরে পথ দেখিলেন, এবং আর কেহ সে গাড়ীতে আসা দূরে থাকুক, আমি একা বরাবর যাইলাম। আস্ফালন দেখিয়া গার্ডসাহেব বরাবর "হুজুর" "মহাশয়" "স্যার" করিতে করিতে চলিল। বলিয়া রাখা ভাল যে, গাড়ীর গার্ড, Corridor সাহায্যে, সমস্ত রাস্তা বাস্তবিক আরোহিগণকে যথার্থ "গার্ড" করিতে করিতে যায় এবং ভোর বেলা তুলিয়া দেয় ও চা খাওয়ায়।

বুধবার, ১৭ই জুলাই, সেণ্টএণ্ড্রুজ। পুনরায় এডিনবরার পুণ্যতীর্থের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। পথে গাড়ী বদল করিয়া, যখন সেণ্ট এণ্ড্রুজ পৌছিলাম, তখন ষ্টেসনে ভাইস্‌চ্যান্সেলারের গাড়ী ও লোক অপেক্ষা করিতেছিল। সমুদ্রতীরে তাঁহার বাড়ী বড় সুন্দর জায়গায়, সুন্দর দৃশ্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য-ভোগের সময় ত ছিল না। তাড়াতাড়ি খাইয়া লইলাম। মুখহাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া উপাধি বিতরণ সভাস্থলে যাইলাম। পূর্ব্ববারের পরিচিত বিস্তর লোকের সহিত দেখা হইল এবং উপাধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মঙ্গল ইচ্ছা লাভ করিলাম। নূতন লোকও অনেকে পরিচিত হইল। সকলের নাম মনে রাখা অসম্ভব হইতেছে। একজন লণ্ডনের লর্ড মেয়র স্যরজন ক্রাস্‌বি—ব্যবসায়ে ডাক্তার। ডাক্তার লর্ড মেয়র এই প্রথম হইয়াছে। বয়স ৮৩ বৎসর—এখনও যুবকের মত অদম্য তেজ ও উৎসাহ। ইনি ও আর কয়েকজন প্রাচীন অধ্যাপক আমার সহিত উপাধি পাইলেন। ভাইস চেন্‌সেলার স্যর জেম্‌স্ ডোনাল্‌ড্‌সনও প্রাচীন (৮২ বৎসর) বয়সে অদ্ভুত তেজ ও উৎসাহ দেখাইতেছেন।

প্রকাণ্ড সভাস্থল—ছাত্র, অধ্যাপক ও সাহেববিবিতে পরিপূর্ণ। আমার উপাধি-প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্য গ্যাণ্ডেরিয়া, বঙ্গার প্রভৃতি ১০।১২ জন ভারতীয় ছাত্র এডিনবরা হইতে কষ্ট ও খরচ করিয়া সেণ্টএণ্ড্রুজ গিয়াছিল। তাহাদের টিকিট ছিল না বলিয়া ঢুকিতে পায় নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল। আমি যাইয়া অধ্যাপককে বলিবামাত্র সস্নেহে ও সসম্মানে তাহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহারাও যথেষ্ট প্রীত হইল। প্রবাসী স্বদেশবাসিগণ, অপরিচিত এবং অজ্ঞাতনামা একজন দেশবাসীর উপাধি-প্রাপ্তিতে এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, ইহা আমার পরম শ্লাঘা ও সন্তোষের বিষয়।

তারপর সেণ্টএণ্ড্রুজের ছাত্রদের পালা। যেমন উপাধি-বিতরণ-গৃহে প্রবেশ করিলাম, তাহারা বিকট চীৎকার, অট্টহাস্য, হৈ হৈ শব্দ, করতালি ইত্যাদি আহ্লাদধ্বনিতে ঘর ফাটাইতে লাগিল! স্কটল্যাণ্ডের ছাত্রসম্প্রদায় এইরূপ ভীষণ ভাবেই আনন্দ প্রকাশ করে।—বরং পাছে আতঙ্কে আমার দাঁতকপাটি লাগে বলিয়া—তাহাদের আনন্দের বিকাশ কিছু নিম্ন মাত্রায় ছিল বলিয়া—বন্ধুগণ আমায় অভয় দিতেছিলেন। ভাইস্ চেন্‌সেলার ম্যাডাম স্মিথ এবার্ডিন-উপাধি-বিতরণ-সভায় ছাত্রদিগকে যাইতে দেন নাই। কেন না পূর্ব্বে রায়ের উপাধি-বিতরণে তাহারা প্রায় ৩০০৲ টাকার চৌকি ভাঙ্গিয়াছিল। চৌকি ভাঙ্গিয়া বিকট চীৎকার, কুকুর-বিড়াল ডাকা, এবং ভীষণ তামাসা করিয়া ইহারা আনন্দ প্রকাশ করে;—তাহার জন্য আমাদের দেশের মত ইহাদিগকে পুলিশে বা জেলে যাইতে হয় না।

অধ্যাপক স্কট ল্যাং আমার গুণগান ঘটকালী করিয়া, বক্তৃতা করিলেন। অবশ্য তার ভিতর দুই চারটা ভুলও ছিল। তারপর মাথায় টুপী ঠেকাইয়া (Capping) এবং লাল রেশমের হুড গলায় ঝুলাইয়া দিয়া, দ্বিতীয়বার L. L. D. অথবা D. C. L. উপাধি দান হইল।

তারপর ভোজ-বক্তৃতা। অতঃপর ছাত্রবর্গের সম্মেলনের চা-পার্টি ইত্যাদি দস্তুরমত সব কাজ হইল, তথাপি নিস্তার নাই। এডিনবরার ছাত্রমণ্ডলী ইহার মধ্যে 'প্রিন্সেস হোটেলে', সমুদ্রের ধারে তৃতীয় এক ভোজের আয়োজন করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। ছবি তুলিল—আর যতদূর আদর-আপ্যায়ন করিবার করিয়া বিদায় দিল। পুনরায় 'স্লিপিংকারে' আশ্রয় লইয়া সমস্ত রাত্রি ঘণ্টায় ৬০ মাইল হিসাবে দৌড়িতে লাগিলাম। ঊষা-আলোকে এবং সন্ধ্যা-প্রদোষে একদিন দুইবার, এডিনবরা দিয়া গেলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে একেবারে দেহ অসাড় করিয়া দিল। কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল—তাহা বড় টের পাইলাম না। 'স্লিপিংকার' না লইলে, এই ১২ ঘণ্টা যাওয়া ১২ ঘণ্টা আসা এবং উর্পয্যুপরি তিন দিন পরিশ্রম করা সম্ভব হইত না। যাঁহার কৃপায় সকল বিপদে উদ্ধার হইতেছি ও হইবার অক্ষুণ্ণ ভরসা রাখি, অশ্লেষা-মঘার ফলাফল হইতে তিনি রক্ষা করিলেন এবং তিনিই ব্রিটীশ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সম্মানে দ্বিতীয়বার সম্মানিত করিলেন। ভবিষ্যৎও তাঁহারই পদ্মহস্তে।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই জুলাই, লণ্ডন।—সকালে প্রস্তুত হইয়া প্যালেস চেম্বারে টেম্পারেন্স কমিটি-ঘরে গেলাম। স্যর হারবার্ট রবার্টস্, মিষ্টার গোখ্‌লে, স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, রেভারেণ্ড মিষ্টার এণ্ডারসন্, গুড্‌উইল এবং প্যারেথ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। কমিটি-মিটিঙের

ইণ্ডিয়া অফিসে, সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া, লর্ড ক্রুর নিকট যাওয়া গেল। লর্ড কিনেয়ার্ড, পার্লামেন্টের মেম্বর জোন্‌স্ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার ভার ছিল—গোখ্‌লে, এণ্ডার্সন এবং আমার উপর। লর্ড ক্রু তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন—"India is fittingly represented by two of her best known and most eloquent of public men, Messrs. Gokhale and Sarvadhicary. I am deeply impressed by what has been urged by Mr. Sarvadhicary and shall with sympathy communicate the same to the Government of India for communication and action, as far as possible."

Sir William Wedderburn ও পার্লামেন্টের মেম্বর জোন্‌স সাহেব আলাপ করিলেন এবং নানারূপে আপ্যায়িত করিলেন।

সেবামন্দিরের দ্বারবানদিগের সহিত যথেষ্ট সদ্ভাবের অভাবে এ সকল বক্তৃতা report হইতেছে না এবং যত লোকে যত মিষ্ট কথা বলিতেছে, তাহার একটা তালিকাও থাকিতেছে না; ইহা বেজায় আপ্‌শোষের কথা!

ইণ্ডিয়া অফিস হইতে বরাবর স্পেশ্যাল ট্রেণে (আবার first classএ) প্যাডিংটন ষ্টেসন হইতে রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের উইণ্ডসর ক্যাসেল প্রাসাদে গেলাম—বাগান-পার্টির নিমন্ত্রণ ছিল। যদিও আমি অল্প দিন বিলাতে আসিয়াছি এবং বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এ সকল পার্টির নিমন্ত্রণ হওয়া দস্তুর, তথাপি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়া আমায় এ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। টেম্‌স্ নদীর উপর, ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর, উইণ্ডসর ক্যাসেল অতি সুন্দর স্থান—রাজারাণীর প্রিয় বাসস্থান। বাগান-পার্টি লোকে লোকারণ্য—লাট, লাটপত্নী একটা দেখিয়া আমরা ভারতবর্ষে জড়সড় হই সেইরূপ শত শত লাট, লাটপত্নী চারিপাশে ঘুরিতেছে। ভারতে উপঢৌকনপ্রাপ্ত বিচিত্র তাঁবু অভ্যর্থনার জন্য পড়িয়াছে; ভারতীয় সাজসজ্জায় তাঁবু সুশোভিত; ভারতের সেনাপতিগণ, ও রাজার আর্দ্দালী, ভারতবাসিগণকেও প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করা হইল। সভাজন-পরিবেষ্টিত রাজারাণী সকলের সহিত সদালাপে আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখানে রাজসকাশে নিমন্ত্রণ, আমাদের রাজপ্রতিনিধির নিমন্ত্রণের মত সহজ নয়। এইরূপ নিমন্ত্রণ এখানে বিশেষ গৌরবের বিষয়—অনেক যোগাড় করিতে হয়। প্রথমে বৃষ্টি হইয়া, একটু গোলযোগ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। তারপর তা কাটিয়া গিয়া, বেশ রৌদ্র হইল। এরোপ্লেন আকাশে উড়িয়া অনেক তামাসা দেখাইল। বৃহৎ হাওয়ার জাহাজ মাথা নোয়াইয়া যখন রাজ-অভিবাদন করিল, তখন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। গণ্যমান্য লোকের সহিত দেখা হইল; নূতন পরিচয়ও অনেক হইল। রাজবাটী—রাজ-উদ্যান—কতক ঘুরিয়া দেখা হইল; সব দেখা সাধ্য নয়! নূতন ধরণের বাড়ী। বাটী বাগান, বৈঠক, সাজগোজ দেখিয়া চমক লাগিয়া গেল। গঠন প্রণালী অতি চমৎকার। চিত্রে উইণ্ডসর প্যালেস, আর প্রকৃত উইণ্ডসর প্যালাসে, বিস্তর পার্থক্য।

আমীর আলি, স্যর ফ্রান্সীস ম্যাকলীন (আমাদের ভূতপূর্ব্ব চীফ জষ্টিস), কংগ্রেস ও ইউনিভারসিটির বিস্তর প্রতিনিধি ও অধ্যাপকদলের অনেকের সহিত দেখা হইল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনার জন্যই যেন এই আয়োজন; এবং সকলেই বিশেষ স্নেহ-যত্ন অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী সাহেব বলিলেন 'তাঁহার কেম্ব্রিজের বন্ধু লুইস সাহেব—তিনি পূর্ব্বে এলাহাবাদ-ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার ছিলেন—দয়া করিয়া আমার সম্বন্ধে বিশেষ অনুগ্রহসূচক মতপ্রকাশ করিতেছেন।' স্যার হার্ব্বার্ট রবার্টস্ বলিলেন, 'তাঁহার খুড়ী, না পিসী, কে মঙ্গলবারের বক্তৃতার বড় তারিফ করিয়াছেন।' এইরূপ অনেক কথা হইল। ডাক্তর রায় সাহেব বলিলেন, "তুমি বিলাতের লোককে যাদু করিয়াছ (Fascinated), অতএব দেশে যাইয়া আমি তোমার যথোপযুক্ত নিন্দা করিব।" আগামী সপ্তাহে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবেন এবং আমার নিন্দাবাদ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, বলিয়া বায়না দিলেন—উত্তম কথা; ইহা বিশেষ নূতন কিছু হইবে না।

শুক্রবার, ১৯এ জুলাই, লণ্ডন। অদ্য সকাল হইতেই মেঘাচ্ছন্ন। সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছে। শীতও হইয়াছে। জল হাওয়ার, জন্যও বটে, আলস্যের জন্যও বটে, এবং ভারতীয় ডাক লিখিবার খাতিরেও সকালে কোথাও গেলাম না। কিন্তু সকাল হইতে বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। চিঠিপত্র ভাল

করিয়া লিখিবার সময় পাইলাম না। হয় কাজের গতিকে বাহিরে থাকিতে হয়, না হয় বাড়ীতে কত লোক আসিয়া কত কথা কয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব আরাম বিশ্রামের সময় পাইতেছি না। ডবল 'এল. এল. ডি.' হইয়া মহা বিপদ হইয়াছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত মনে করিয়া নানা লোকে পরামর্শ করিতে আসে, অনেকের বিশ্বাস যে পৃথিবীতে হেন বস্তু নাই যে, এল. এল. ডি.র অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতব্য। বিলাতী লোক এ সম্বন্ধে বিশেষ অজবুক। যাহাকে যেমন পারি, "জ্ঞান, উপদেশ এবং পরামর্শ দানে বাধিত করিতে" বিস্তর সময় যাইতেছে।—অভ্যর্থনা-আশীর্ব্বাদ করিতে আসে। বিশ্রাম, বইপড়া, এমন কি, কাগজ পড়া, চিঠি-লিখার অবকাশ নাই। কাগজে কাগজে নিন্দাস্তুতি অনেক বাহির হইতেছে, তাহাও দেখিবার সময় না হওয়াতে মগজমস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকার সুবিধা হইতেছে; নতুবা আত্মবিস্মৃতি অসম্ভব নয়।

শুক্রবার, ১৯এ জুলাই, ১৯১২ লণ্ডন।—শুক্রবার ভারতীয় মেল চিঠি লিখিয়া পিকাডেলির নিকট ট্রোকিডারো হোটেলে গোখ্‌লে সাহেবের অভ্যর্থনা সভায় গেলাম। ভারতবাসীদিগের মিলিত হইবার স্থান ক্রমওয়েল রোডে ক্রমওয়েল হাউস রহিয়াছে; অথচ সেখানে এ সভা না হইয়া, একটা হোটেলে হইল কেন, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মিসেস্ কেন আমাকে ও গোখ্‌লে সাহেবকে যে পার্টি দিয়া ছিলেন, তাহাও ক্রমওয়েল হাউসে হইয়াছিল; বিস্তর লোকও হইয়াছিল। বোধ হয়, আরও "বড়ত্ব" ও বাহাদুরীর আশয়ে একটা Fashionable Hotel বাছিয়া এই Party দেওয়ার কোন অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য আছে। স্যর রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এস. পি. সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। জাহাজে যে মিসেস রাওয়ের সহিত আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার সহিত দেখা হইল। মিসেস্ ডুবে তাঁহার বাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। আরও কত সাহেবমেম কত নিমন্ত্রণ করিলেন, বলা যায় না। যদি নিমন্ত্রণ খাইতে অত খরচ না হইত, আর অসুখ ও সময় নষ্ট

গোখলে

না হইত, শুদ্ধ নিমন্ত্রণ খাইয়াই বিলাতবাস কিছু কাল হইতে পারিত। স্যর মঞ্চারজি ভবনাগরি, মিঃ গোখ্‌লের দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।

শনিবার, ২০এ জুলাই, ১৯১২।—'হেগ এক্‌ষ্টার ন্যাশানাল্ কন্‌ফারেন্স অব মরাল্ এডুকেশনে' যাইবার দিন স্থির রহিয়াছে; ততদিন পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়া থাকিতেই হইবে। তারপর হেগ কন্‌ফারেন্স শেষ হইলে, য়ুরোপের দেশ কয়টা বেড়াইয়া, বৃণ্ডিসী হইয়া, ইজিপ্ত হইয়া, বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে। সকালের ডাকে, কেম্ব্রিজ হইতে পত্র পাইলাম যে, ২৭এ জুলাই হইতে ২০এ আগষ্ট পর্য্যন্ত 'ইউনিভার্সিটি এক্‌ষ্টেনশান্ লেক্‌চার্স' হইবে এবং তথায় নিমন্ত্রণ—'ডেলিগেট্' হিসাবে।

ইংলণ্ডের কোন ইউনিভার্সিটিতে, কিছুদিন লেখা-পড়ার চর্চ্চার সঙ্গে, আধুনিক প্রণালী-পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা ইহাতে হইলেও হইতে পারে, মনে হইল। সব কলেজ

প্রভৃতি বন্ধ বলিয়া লেখাপড়ার চর্চ্চা দূরে যাক, লেখাপড়া কি প্রণালীতে হয়, তাহা দেখিতে পাই নাই। সবই উপর উপর দেখা হইতেছে। ঘর-বাড়ী-বাগান দেখা হইয়াছে। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি Vacation term অর্থাৎ ছুটীর পড়া বলিয়া একটা নূতন সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইউনিভার্সিটির বাহিরের লোকের শিক্ষার সাহায্যে জন্য University Extension Lecture আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতে বড় বড় অধ্যাপক নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আমাদের দেশেরও আমরা সামান্যভাবে এই কাজ অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিতেছি। ইহার প্রণালী বুঝিবার এমন সুবিধা আর হইবে না। পুনরায় বিদ্যালাভ-চেষ্টা উপলক্ষ করিয়া, পি. সি. রায় সাহেব অনেক উপহাস করিলেন। যে এবর্ডিন ইউনিভার্সিটি উপাধি দিয়া ধন্য করিয়াছেন, তাহার হলের উপর Motto লেখা আছে:—

"They say : What say they, Let them say"

"তারা বলে; আচ্ছা বলে বলুক"—সে কথা রায়-মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিলাম। জীবনের মূলমন্ত্র ইহা করিতে পারিলে, পথে কাঁটাখোঁচা বড় কিছু করিতে পারে না। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সম্মানসূচক উপাধিদানে আমায় গৌরবান্বিত করিলেন;—তাঁহাদের মূলমন্ত্র যে ইহা, তাহা জানিতাম না।

বেলা ১টার সময় ফেডরিক্ গ্রব্ সাহেব আসিয়া তাঁহার হ্যাম্বল্ডন্স্থিত বাড়ীতে লইয়া গেলেন। একটা শনিবার, রবিবার তাঁহার বাড়ীতে কাটাইবার জন্য আমায় বহুকাল হইতে নিমন্ত্রণ ও পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন; নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। এ সপ্তাহে অবকাশ থাকাতে, তাহা হইল। গ্রব সাহেব 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েসনে'র সেক্রেটারী—বিনীত ভদ্র লোক। আমায় কি করিয়া আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য দিবেন, তাহার জন্য তিনি ও তাঁহার স্ত্রী দুইদিন যে যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাহা বলিতে পারি না;—নিজ হস্তে জুতা পর্য্যন্ত আনিয়া দিয়াছিলেন! ইংরাজ আতিথ্য জানে না—একথা যে বলে সে মূর্খ। তবে, ভদ্রইংরাজকে তাঁহার গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে না দেখিলে, তাঁহাকে ঠিক চেনা যায় না। এবং ভদ্রইংরাজ সহজে কাহাকেও নিজ গৃহগণ্ডির ভিতর ঢুকিতে দেন না। যে একবার সে-গণ্ডির ভিতর স্থান পাইল, পরিবার মধ্যে তাহার অবাধ গতি এবং সময়ে সময়ে সে-অধিকারের অপব্যবহার করিয়া অপদার্থ ভারতবাসী স্বদেশের মুখে কালিমা লেপন করিয়াছে বলিয়া, আজ বিলাতে ভারতবাসীর এত অনাদর। উয়েম্বলডন লণ্ডনের উপনগর; নিকটেই লর্ড মর্লি বাস করেন। বিস্তর লোক প্রত্যহ সহরে যাতায়াত করে; সহরকে সহর—পল্লিগ্রামকে পল্লিগ্রাম—এইরূপ। ওয়েম্বলডন, ইটিং, হেম্প্‌ষ্টিড, চিস্, বয়েস ওয়াটার ইত্যাদি নানা উপনগরেই লণ্ডনের স্বাস্থ্য রাখিতেছে। গ্রব-পরিবার তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবার জন্য বরাবর আমায় জেদ করিতেছেন। এইবার কাজশেষ হইয়া গেছে; তাঁহারা আরও পীড়াপীড়ি করিলেন যে, দিন কয়েক আমাদের বাড়ীতে থাকুন। কিন্তু কেম্ব্রিজ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, অতএব তাহা হইবে না, বলিলাম।

গ্রবের একমাত্র পুত্র গত বৎসর মারা গিয়াছে। গ্রব-পত্নী এখনও শোকাকুলা; কিন্তু আমার জন্য যতদূর কষ্ট করিবার করিতে লাগিলেন।

আহারের পর, দীর্ঘ বেলা কাটাইবার জন্য, 'রয়েল একাডেমি'র এ বৎসরের ছবি দেখিতে গেলাম। প্রতি বৎসর যত নূতন ছবি, প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে ভালগুলি বাছিয়া বৎসর বৎসর এক একজিবিশন্ হয়। অতি চমৎকার সমাবেশ। চিরদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবার উপযুক্ত অনেক ছবি দেখিলাম। তবে, পুরাতন চিত্রকরদিগের নমুনার মত উচ্চশ্রেণীর শিল্প আর সহজে জন্মিবে, অনুমান হয় না। কয়েকখানি খুব উচ্চ অঙ্গের ছবি দেখিলাম।

পুনরায় এক হোটেলে চা প্রভৃতি খাইয়া 'রয়ালটি থিয়েটারে' 'মাইলষ্টোন' নামক নূতন নাটকের অভিনয় দেখিতে গেলাম। অনেকে এই থিয়েটার দেখিবার জন্য সুপারিস করিয়াছিলেন। ইহাই নাকি এখন ইংলণ্ডের প্রধান থিয়েটার; আর এই নাটকের প্রতিপত্তি খুবই চলিয়াছে। লোকের ভিড়ও তেমনি। যাহা হউক, আমরা ভাল স্থান পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে বই কিনিয়া পড়িয়া লইলাম। ঘটনা—১৮৬৫ সালে ১ম দৃশ্য—১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় দৃশ্য—১৯১২ সালে তৃতীয় দৃশ্য—অতএব, অলঙ্কারশাস্ত্রমতে এবং Rules of unlties হিসাবে, ইহা Bad Drama। চমৎকারিত্ব ও বিশেষত্ব

দেখিলাম না। তবে ঘটনা-বিন্যাস মন্দ নয়। যাঁহারা প্রথম-বয়সে পিতৃমাতৃদ্রোহী হইয়া স্বাধীন মত স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, শেষ-জীবনে তাঁহারাই সংকীর্ণচেতা হইয়া পড়েন,—তাঁহাদের সন্তানেরাও পিতৃমাতৃদ্রোহী হইয়া নিজের মত স্বাধীনভাবে চালাইতে যায়, এবং পিতামাতাকে সমান কষ্ট দেয় ;—ইহাই এই নাটকের প্রতিপাদ্য। ইংরাজ এতদিনে ইহা বুঝিতে শিখিতেছে—ইহাই মঙ্গল। ইংরাজ-ভক্ত ভারতবাসীও কালে পুনরায় ইহা বুঝিবে—আশা আছে।

রাত্রি বারটার সময় উম্বোল্ডনে ফিরিয়া গেলাম। শয়নের পূর্ব্বে গ্রব-সাহেবের সহিত ভারতের সামাজিক অবস্থার কথা অনেক হইল। ভারতের রমণী দাসী নয় ; পাত্র-বিশেষে,গৃহ-বিশেষে,তাঁহারা দেবস্থানীয়া ইহা বুঝাইয়া দিলাম ; কথাটা তাঁহার ভাল লাগিল না। আমাদের রমণী-নির্য্যাতন প্রধান কার্য্য, ইহাই সাধারণ ইংরাজের বিশ্বাস। আমাদের অপেক্ষা হীনতর জাতিভেদ ও রমণী-নির্য্যাতন ইংরাজ-সমাজের শিরায় শিরায়---স্তরে স্তরে রহিয়াছে কি না; বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াতে গ্রব সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। বিরক্ত হইলেও কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে পারিলেন না।

রবিবার, ২১ জুলাই, ১৯১২।—উম্বলডন্ হইতে কিছু দূরে, বাল্হাম নামক স্থানে 'কোয়েকর্'-সম্প্রদায়ের এক গির্জ্জা আছে। সেই খানে, গির্জ্জায় বক্তৃতা করিবার জন্য, গ্রবসাহেব আমায় জেদ করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে এই নিমন্ত্রণ। ট্রেণ এবং ট্রাম করিয়া, নগর-উপনগর দেখিতে দেখিতে, সেখানে যাওয়া গেল। কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করিবার কথা ছিল—বলিতে বলিতে এক ঘণ্টা হইয়া গেল। ভারতের ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা—ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নৈতিক—অনেক কথার অবতারণা হইল। সভান্তে যে ভাষায় বক্তাকে সভার মুখপাত্রগণ ধন্যবাদ দিলেন, তাহা কালীকলমে লিখিতেও লজ্জা বোধ হয় ; অতএব, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ইংরাজের যে যে বিষয়ে দোষ দেখান সম্ভব, তাহা দেখাইয়া দিতে ত্রুটী হয় নাই ; সভার বিশেষ আনন্দের কারণ তাহাই। মনে হইয়াছিল, যে, শ্রোতৃবৃন্দ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন। তাহা হওয়া দূরে থাক, তাঁহাদের প্রশংসা, ধন্যবাদ, ও পুনরাগমন-নিমন্ত্রণের জেদ, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইল। ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসী সম্বন্ধে সাধারণ ইংরাজের এত বিশাল অজ্ঞতা ও অন্ধ-কুসংস্কার যে, তাহা নিবারণের জন্য ভারতহিতৈষী ইংরাজ ও ভারতবাসী মাত্রের নিয়ত বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। আর মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞ, সম্মানভাজন ও সচ্চরিত্র, স্বধর্ম্মনিরত ভারতবাসীর বিলাতে যাইয়া, বিলাতবাসীদিগকে দেখা ও দেখা-দেওয়া বড় দরকার। ভারতের কথা যাহারা ভাল জানে ও বোঝে, এমন ইংরাজ অনেকেই ভারতবিদ্বেষী ;—এই জন্য এই অঘটন ঘটিতেছে।

ট্রামের ছাদে চড়িয়া সহর দেখিতে দেখিতে 'ক্লাপহাম কমন' প্রভৃতির মাঝখান দিয়া' ব্লাক 'ফ্রায়ার ব্রিজ' হইয়া 'সেণ্টপল্স্ ক্যাথিড্রালে' গেলাম। পথে মেকলে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, স্পর্গন্ যে গির্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, 'ক্যাসল এলিফেণ্ট পবলিক হাউস' প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত স্থান দিয়া গেলাম। ব্লাক ফ্রায়ারের উপর হইতে লণ্ডনের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্টপল্স্ ক্যাথিড্রাল এখান হইতে যেমন সুন্দর দেখায়, নিকটে তেমন দেখায় না ; কারণ, নিকটে অনেক বড় বড় বাড়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং রাস্তা এমন সরু যে, এই মহামন্দির-সৌন্দর্য্য যেন চাপা পড়িয়াছে। আর কালীর ধোঁয়ায়, প্রস্তর ত সব কালীমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। মন্দির-চূড়া, নদী-গর্ভ হইতে প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চ ; গির্জ্জার ডোম, রোমের সেণ্টপিটার্সের অনুকরণে গঠিত। বিখ্যাত শিল্পী রেণ ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা এবং তাহারই সমাধির উপর এই মহামন্দিরে লিখিত আছে—"Si Maurmenhem Queries Circumspice", অর্থাৎ 'এই মন্দির-নির্ম্মাতার কীর্ত্তিস্তম্ভ অনুসন্ধান করিতেছ ? চারিদিকে চাহিয়া দেখ।' যে মন্দির গঠন করিয়াছেন, রেণে'র তাহাই অমরকীর্ত্তিস্তম্ভ। আমরা যখন পৌছিলাম, তখনও উপাসনা কার্য্য শেষ হয় নাই। সুন্দর সংগীতসংযোগে যেন পূর্ণ হিন্দুভাবেই ভগবানের পূজা চলিতেছিল। সেই বিপুল মহান্ মন্দিরের ভিতর বিশ্ব-নাথের মহাপূজায় প্রাণমন যেন মিলিয়া গেল ; ধূপ-ধূনা, দীপ, যীশু ও মেরি, এবং 'এপসলদে'র প্রস্তরমূর্ত্তি রোম্যান-ক্যাথলিকদিগের নিকট হইতে 'চর্চ্চ অব ইংল্যাণ্ড' ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুর পূজা-বিধির উপরই বা তবে এত আক্রোশ কেন ?

মন্দিরের ভিতরের কারুকার্য্য ও স্থাপত্যকার্য্য—উভয়ই সুন্দর। মহাকায়, অথচ সৌষ্ঠবশালী, সেই প্রকাণ্ড গির্জ্জার ভিতর স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে হয়। যশঃকীর্ত্তি-পথের পথিক অনেক বীরপুরুষ ও প্রধান প্রধান মনীষিগণের প্রস্তরমূর্ত্তিও ভিতরে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু ভগবৎ-মন্দিরের ভিতর ওয়েলিংটনের অশ্বারোহী রণমূর্ত্তির ন্যায় সব মূর্ত্তি যেন আমার ভাল লাগিল না।

'সেণ্টপল্‌স্ চার্চ্চ-ইয়ার্ডে'র ভিতর দিয়া গ্রবসাহেবকে হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় বিরক্ত করিতে করিতে চলিলাম। বক্তৃতার দৌড়ে পথে 'কুক এণ্ড সন্সে'র বেক বই রাস্তায় পড়িয়া গিয়া হাত বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। জনৈক সহচর পথিক উঠাইয়া বাঁচাইয়া দিল।

তারপর চীপ সাইড, প্যাটারনষ্টার্ রো, রয়াল এক্‌শ্চেঞ্জ, মানসন্ হাউস, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, গিল্ডহল, বার বিল চার্চ্চ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে 'বেনেট' ঘড়ীওয়ালার ঘড়ী দেখিলাম। ঘণ্টা বাজিবার সময় তিন বীরমূর্ত্তি হাতুড়ি দিয়া ঘণ্টায় ঘা দেয়! দেখিতে এত লোক জমে যে, পুলিস দিয়া ভিড় ঠেলিতে হয়। তবে আজ রবিবার। লণ্ডন নগর যেন নিদ্রাচ্ছন্ন। কাজেই আমরা দেখিলাম ভাল।

গ্রব পরিবারের সহিত মধ্যাহ্নভোজন করিয়া বিদায় হইলাম। স্যর জেম্‌স্ ডন্‌লপের সহিত দেখা করিবার কথা ছিল; অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম না। ইংলণ্ডে যত বড় লোক হউক, ঠিক ঠিকানা জানা না থাকিলে, কেহ কাহাকেও চেনে না। তারপর শ্রীযুক্ত পি, কে, রায়ের স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। রবিবার তাঁহার বাড়ীতে অনেক লোক জোটে; শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ পাউয়েল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির সহিত দেখা হইল।

রবিবাবুর কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য রোডেন্‌ষ্টীন ঈট্‌স্ প্রভৃতি সহৃদয় ইংরাজ বন্ধুগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। কোন কোন বৈঠকে তাহা পাঠ হইতেছে। দুই-এক জায়গায় আমার আহ্বানও হইয়াছিল। ইংরাজী-অনুবাদসাহায্যে, রবিবাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লোকের কবিতা যুরোপবাসীর নিকট সমাদৃত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা।

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে অনেক ছেলেপুলে জুটিল। গল্প-কথায় অনেক রাত্রি হইল।

সোমবার, ২২এ জুলাই। ভারতীয় ডাকের চিঠি আজ কতক আসিয়াছে, কাল কতক আসিয়াছে, এবং সন্ধ্যার পর কতক আসিল।

চিঠির কতক কতক অংশ প্রফুল্ল রায়কে পড়িয়া শুনাইয়া কতকটা চমক জন্মাইয়া দিলাম। আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা ও অন্ধতা যথেষ্ট আছে; কেননা তিনি অভুক্তভোগী। চিঠি শুনিয়া যেন কতক অজ্ঞান কাটিয়া গেল, মনে হইল। বন্ধুবান্ধব ডবল 'এল. এল. ডি'র সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহাদের অনেক চিঠিপত্র ও খবরের কাগজের Extract পাইলাম। তাহাদের সুখেই আমার সুখ। সুবোধ পূর্ণপ্রাণ, সন্তোষ আর চাটুয্যে মহাশয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদের আর অবধি নাই। ছেলেপুলে ও পরিবারবর্গের উৎফুল্ল উৎসাহে হৃদয়ের বল বাড়িল; তাহাদের সন্তুষ্ট হইবার কথা হইবেই ত। চাঁদনীর দর্জ্জী পর্য্যন্ত সুখী হইয়া পত্র লিখিয়াছে। মানুষের ইহাতেই নিজেকে ধন্যজ্ঞান করা উচিত। সকলেরই স্নেহাভিভাষণ ও আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। ভগবান সকলকে মঙ্গলে এবং সুখে রাখুন,—এই প্রার্থনা। বহুদূরে পড়িয়া আছি। তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত আর ভরসা নাই।

স্যর হেনরি রস্কো, বিখ্যাত কেমিষ্ট, পি সি. রায় দ্বারা আমার দেখা করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। একত্র গেলাম। রস্কোর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভারতীয় ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্য অনেক করিয়া বলিলাম। তাঁহার জামাতা ম্যাল্লেট্ এখন এ বিষয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। প্রাচীন স্থবির ঋষিতুল্য মহাজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। রায় সাহেবের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ রয়াল সোসাইটির মেম্বর হন না, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়; একথা Roscoeকে বার বার বিশদভাবে বলিলাম। তিনিও সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইবেন। তবে বাধা অনেক। বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ যতটা, অন্য সম্প্রদায়ে ততটা বড় দেখা যায় না। একজনের সঙ্গে কথা কহিলেই দশ জনের "হাঁড়ীর খবর" পাওয়া যায়।

তারপর, 'ইলিয়ট্ ফ্রাই' নামক বিখ্যাত ফটোগ্রাফার্দিগের নিমন্ত্রণ অনুসারে নূতন 'গাউন ও হুড্' পরিয়া ছবি তোলাইলাম। তাঁহারা ইউনিভার্সিটি গ্রুপের জন্য এই ছবি তুলিতে চায়, বলিয়া লিখিয়াছিল এবং বারংবার জেদ করিয়াছিল। 'ডার ষ্ট্রীট্ ষ্টুডিও' নামক ছবিওয়ালাও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার সময় পাইলাম না। কারণ আজ সমস্ত দিন দুর্য্যোগ ও বৃষ্টি।

'ন্যাসন্যাল্ লিবারেল্ ক্লবে' এস্. পি. সিংহ-মহাশয় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহা রক্ষা করিয়া, দেশে ফিরিবার জাহাজের বন্দোবস্ত করিতে 'কুক এণ্ড সন্সে'র বাড়ী গেলাম। এখনও সুবিধামত বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। পুনরায় যাইতে হইবে। রায়-সাহেব বাড়ী যাইবেন, এই মেলে। মন আমার বড় উতলা হইয়া উঠিয়াছে। কেম্ব্রিজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে, বোধ হয়, এই মেলেই চলিয়া যাইতাম।

ভ্রমণ-কথা লিখিতে রাত্রি ১২॥ বাজিয়া গেল। ইহাই লিখিবার সময় পাই না। ছেলেমেয়েদের ইহাতেও মন উঠে না! খুকী বলিয়াছিল—"যেখানে যখুনি যা দেখ্‌বে, তাই আমাদের লিখ্‌বে।" তা'ত হ'য়ে উঠ্‌ছে না! এই দেবাক্ষর তাহারা পড়িতে পারে না—বুঝিতে পারে না। আবার বেশী করিয়া লিখিবার ফরমাইস করে। বোধ হয়, অপাঠ্য কাগজ নাড়াচাড়া করিয়াও তাহাদের আমার সঙ্গসুখ-লাভ কল্পনা করিয়াও আনন্দ। মায়ার নিয়মই এই; আশ্চর্য্যও তাই!

দিনে এত পরিশ্রম করি, তথাপি রাত্রিতে শীঘ্র নিদ্রা আসে না। শয্যাগ্রহণ করিলেই, নানা চিন্তা আসিয়া মন অধিকার করে। নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, শ্রান্তি দূর হয় না, শরীরের শ্রান্ত ভাব কোন মতেই দূর হইতেছে না।

মঙ্গলবার, ২৩এ জুলাই, ১৯১২। 'ইটন' কলেজের হেড মাষ্টার অদ্য মধ্যাহ্নে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিলাতের স্কুলের মধ্যে 'ইটন্' ও 'হ্যারো' প্রধান। কথিত আছে যে, ইংলণ্ডের বীরগণ ইটনের ক্রীড়া-প্রান্তরেই রণপাণ্ডিত্যে প্রস্তুত হয় এবং সেই ক্রীড়াপ্রান্তরেই ইংলণ্ডের যাবতীয় যুদ্ধের জয়পরাজয় স্থির হয়; অর্থাৎ প্রধান স্কুলে বিশিষ্ট বংশের বালকেরা যে শিক্ষায় গঠিত হয়, সেই শিক্ষানুসারেই তাহাদের ভাবী জীবনের ফলাফল স্থির হয়। সময়ের অল্পতার জন্য এই মহা-নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না। 'হ্যারো' স্কুলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব, লিখিয়া দিলাম। সকাল হইতে লোকযাত্রী এত অধিক আসিতে লাগিল যে,যথাসময়ে পত্রাদির উত্তর দিবারও সময় পাইলাম না। পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান কোল্ডষ্ট্রীম্ সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের পার্টিতে দেখা হইয়াছিল; তিনি আসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিলেন। মিউটিনীর গল্প, মিউটিনীর সময়ে বাবার ইংরাজ-সাহায্যের গল্প প্রভৃতি অনেক হইল; ভারত 'সার্ভে' বিভাগে তাঁহার পুত্র কাজ করেন। পুত্রের সহিত ও পাদ্রীর সহিত আলাপ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বিলাতে আসিলাম, অথচ ব্রিটীশ মিউজিয়ম (British Museum) এপর্য্যন্ত দেখা হইল না—বড় লজ্জার কথা বলিয়া দেখিতে গেলাম। প্রস্তর-মূর্ত্তি, শিল্পদ্রব্য ও পুস্তকসম্ভার এরূপ নাকি কোথাও নাই! ইংরাজী ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থ এখানে আছে। বড় বড় লোকের হস্তাক্ষর কত শত শত রহিয়াছে, পুরাণ পুঁথি নানা ভাষায় কত সহস্র সহস্র রহিয়াছে, মুদ্রিত পুস্তক কত লক্ষ লক্ষ রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্যারিসে ও অন্যান্য স্থানে পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত কোথাও নাই। শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী যে উচ্চ ধরণের হইয়াছে, তাহা দেখিবার। কলিকাতা মিউজিয়াম হইতে সম্প্রতি কতকগুলি জিনিস এখানে আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল। মিউজিয়ামের ট্রষ্টী-স্বরূপে তাহাতে বাধা দিয়া, আমি কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। সেকথা এখানে দাঁড়াইয়া মনে করিয়া আজ যেন একটু কষ্ট বোধ হইল।

বৃটীশ মিউজিয়ামের পড়িবার ঘর অতি অদ্ভুত জিনিস; শুদ্ধ সেইটা দেখিলেই যেন জন্ম সার্থক হয়। সরস্বতী-উপাসনার এমন প্রকৃষ্ট মন্দির আর কোথাও আছে কি না জানি না। বহু ব্যক্তি অবনত মস্তকে ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে বসিয়া পড়িতেছে—কাজ করিতেছে। নিঃশব্দে পরিচারকগণ ইঙ্গিতমাত্র পুস্তক আনিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ হইতে একরকম খেলা-ঘরের রেলের মত বন্দোবস্তের সাহায্যে ইঙ্গিত মাত্র বই আসিয়া উপস্থিত হয়। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বাদামী-আকারের টেবিলের চারিধারে পরিচারকগণ

সর্ব্বদা প্রস্তুত। প্রকাণ্ড আকার ক্যাটালগ খোলা রহিয়াছে। যে পুস্তক চাও, তাহার রসীদ করিয়া দিলেই সেই ভীষণ ক্যাটালগী খুলিয়া, নম্বর মার্কা হইয়া, রেলে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রসীদ চলিয়া গেল; আর নিমিষের মধ্যে পুস্তক আসিয়া পড়িল। ধন্য বন্দোবস্ত!

স্যর রাজেন্দ্র ও লেডী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী চা খাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে লেডী জেঙ্কিন্স আসিয়া কয়েক দিন ছিলেন, আজই চলিয়া গিয়াছেন; দেখা হইল না। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে যাইতাম। মুখোপাধ্যায়েরাও ওয়েল্‌সে লেডী জেঙ্কিন্সের বাড়ী শীঘ্র যাইবেন। আমারও লেডী জেঙ্কিন্সের বাড়ী ওয়েল্‌সে নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু তত দূরের নিমন্ত্রণ এত অল্প সময় মধ্যে রক্ষা করা আমার সাধ্য নয়। আমার নানা স্থানের যাওয়া-আসা, পরিচয় ও নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা-সংবাদ শুনিয়া, মুখোপাধ্যায়-পরিবার সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইলে, আরও কোন কোন স্থানে পরিচয় করিয়া দিতেন। আমি বলিলাম, যেসব পরিচয় হইয়াছে, তাহার জ্বালাতেই অস্থির; এখন প্রাণ লইয়া দেশে পৌছিতে পারিলেই হয়। এসব কি আমার পোষায়!

লেডী বোশ্যাম্পের পার্টিতে আমি যাইতে পারি নাই, কারণ তাহা নির্ভাজ আমোদের পার্টি। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"এসব জায়গায় না যাইয়া ভাল কর নাই।" এইরূপ, লর্ড বিউট (Lord Bute)-এর পার্টিতে যাই নাই বলিয়াও অনুযোগ করিলেন। বলিলেন—"কেবল সব অধ্যাপক-পণ্ডিত লইয়া বেড়াইলে কি হইবে! লাট ও লাটপত্নীদের কাছেও যাওয়া চাই।" সময়াভাবে তাহা হইয়া উঠিতেছে না, বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। লর্ড বোশ্যাম্পের পার্টিতে একজন বড় সাহেব মুখোপাধ্যায়-সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "Your countryman with that unpronounceable name made a wonderful speech." মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার একথা শুনাইয়া, বিশেষ তুষ্ট হইলেন; আমিও বিশেষ শ্লাঘা জ্ঞান করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"রমুয়া উড়েমালী দুইটা বাঁকাসিধা বাঙ্গালা কথা বলিলে, আমরা যেরূপ বাহুল্য-বিস্তার করিয়া তাহার তারিফ করি, সাহেব-মেমেরা আমাদের লোকের মত লোকের বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া যদি সেইরূপ বাহুল্য করেন, তাহা হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত বিজ্ঞ লোকের বোঝা উচিত যে, তাঁহারা ভদ্রতা-প্রণোদিত হইয়া দুটি মিষ্ট কথা বলিতেছেন মাত্র। ফলে, এরূপ সুখ্যাতিতে স্বদেশবাসীর সুখী না হইয়া, দুঃখিত হওয়া উচিত; কারণ, আমার দেশে শত শত লোক আছে, যাহারা আমার অপেক্ষা শতগুণ ভাল ইংরাজী বলে। তাহাদের বক্তৃতা না শুনিয়া, ইংরাজ, বাঙ্গালীর বক্তৃতাশক্তির মূল্যনিরূপণ করিলে, বক্তৃতা-বাজারে আমাদের দর নিতান্ত খেলো হইয়া পড়িবে!" মুখোপাধ্যায়-সাহেব এ সকল কথা বুঝিলেন না। মুখোপাধ্যায়-পরিবার ৮ই সেপ্টেম্বর ব্রিণ্ডিসী হইতে 'ইজিপ্ত' জাহাজে দেশে যাইবেন; আমিও সেই দিন যাইব, স্থির করিলাম। ইহার মধ্যে, কেম্ব্রিজ ব্রত সারিয়া ও লণ্ডনের বাকী যাহা দেখিবার আছে দেখিয়া, আগষ্টের শেষে যুরোপ যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

ভারতীয় ছাত্রাবাস সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার জন্য দালাল 'বার্লি'কে লইয়া ইস্‌লিংটনে এক বাড়ী দেখিতে গেলাম। বিস্তর দূর—দেখিয়া ঘুরিয়া আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম! পাতালের সুড়ঙ্গ দিয়া কত ক্রোশ যে প্রত্যহ ভ্রমণ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সন্ধ্যার সময়ও বিস্তর লোকজন আসিল। তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া, কয়েক দিন কাটাইবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করিতেছে। কেম্ব্রিজ বাস পাছে সুবিধাজনক না হয়, তাই এই তিন সপ্তাহ স্থানে স্থানে ঘুরিয়া দেখিব। আজ প্রফুল্ল রায় যাইবার জন্য বাঁধাছাঁদা কাজে ব্যস্ত; আমার মন তাঁহার গমন উদ্যোগ দেখিয়া, কেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! লোকজনের কাছে বসিতে পারিলাম না, ঘরে চলিয়া আসিলাম; কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসে না। কাগজ পড়া ও ভ্রমণ-কথা-লেখা লইয়া নিঃশব্দে ১২টা রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইলাম; অথচ প্রফুল্ল কাল ভোরেই যাইবে, কাজেই সকাল সকাল উঠিতে হইবে। যদিও তাহার সঙ্গে আমি একত্র আসি নাই, তবুও বহুদিন একত্র বাস ও ভ্রমণ করিয়া কেমন মায়া বাড়িয়া গিয়াছে। এবং সে দেশে চলিয়া যাইবে, আমি রহিলাম, ইহাতেও যথেষ্ট কষ্ট। ইচ্ছা করিলে যাইতে পারিতাম না, তাহা নয়; কিন্তু কেবল ভূতের ব্যাগার বহিয়াই চলিয়া যাওয়া ভাল নয়। বিলাতের দেখা-শুনা ও যুরোপ দেখাশুনার আর

অবসর হওয়া অসম্ভব। অতএব, আর তিন সপ্তাহ বিলাতে কাটাইয়া, ২০এ আগষ্ট হেগ ('মরাল এড়ুকেশন কংগ্রেস্' হইয়া, জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী হইয়া, নাগাইৎ ৮ই সেপ্টেম্বর দেশে যাত্রা করিব। সকলেই বলিতেছে, এ সময় ইজিপ্টে যাওয়া ভাল নয়, অতএব সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। আপাততঃ এইত মতলব ; তারপর দাঁড়াইবে কি, ভগবান জানেন।

বুধবার, ২৪এ জুলাই, ১৯১২।—পি. সি. রায় যাইবে বাড়ী—আমার হইল না সমস্তরাত্রি নিদ্রা! যেন আমাকেই সকাল সকাল উঠিয়া উদ্যোগ করিতে হইবে। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম হইল। একে ত রাত্রি তিনটার পর হইতেই আলো হইয়া ঘুম হওয়া দায় হয় ; তারপর মনের এই অবস্থায় নিদ্রা আসলেই হইল না। নিতান্ত লোকে পাগল বলিবে, নতুবা এই সঙ্গেই যা হয় করিয়া চলিয়া যাইতাম। কিন্তু দেশ দেখা ও যে যে কাজ মনে করিয়া আসিয়াছি, তাহার কিছুই হইল না। অতএব, এই শ্রাবণ-ভাদ্র মাস মাথায় করিয়া যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত মনে হইল না ; অথচ পি. সি রায় যাইলে টেঁকাও ভার হইবে।

সকাল সকাল উদ্যোগ করিয়া ত সে চলিয়া গেল। আমিও বাকিংহাম প্যালেস রাজবাটীর নিকট স্যর এণ্টনী ম্যাকডনেল্ডের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। ইনি এক-দিন বাঙ্গালার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ছোট লাট ছিলেন ; এখন লর্ড উপাধি পাইয়াছেন। ভারতের একজন বন্ধু বটে। এক ভাড়াটে বাড়ীর তেতালায় ঘর লইয়া আছেন। স্যর এণ্টনীর সহিত নানা বিষয়ে কথা হইল। তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সাহেবদের সঙ্গে একত্র খানা-খাওয়া প্রভৃতি সামাজিক আচার-ব্যবহার না করিতে পারিলে যদি সাহেব-বাঙ্গালীর যথার্থ মিল হইবে না—এমন হয়, তাহা হইলে সে মিল কখনও হইবে না ; কারণ অতি অল্প লোকেই এরূপে মিলিতে রাজী হইবে ; কথাটা তাঁহার ভাল লাগিল না।

তারপর নানা রেল ঘুরিয়া হ্যারো স্কুল দেখিতে গেলাম। ইংলণ্ডের প্রধানতম স্কুলের মধ্যে ইহা প্রধান। পাহাড়ের গায় সুন্দর গাছপালা, তপোবন-সদৃশ স্থান দেখিয়া আবার পড়াশুনা করিতে ইচ্ছা গেল। হেডমাষ্টার লায়নেল্ ফোর্ড অতি সুপণ্ডিত ও সজ্জন লোক ; যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন। চ্যাপেল্, লাইব্রেরী, স্পীচ্রুম্ প্রভৃতি সব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ক্লাস্ ঘরগুলি কতক পুরাতন, কতক নূতন। একবাড়ীতে সব ক্লাস নয়, কিংবা সব বিষয় এক জায়গায় পড়ান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে সহরময় ছড়াইয়া স্কুল। বড় বড় ইউনিভার্সিটি ঘুরিয়া দেখিলাম—প্রকাণ্ড এক উঠানের ভিতর বড় বড় বাড়ী ; তাহাতেই সব বন্দোবস্ত। এখানে তা নয়। বলে এক ক্লাস হইতে আর এক ক্লাস যাইতে যাইতে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। আসল কথা, যেমন যেমন প্রয়োজন বাড়িয়াছে, তেমনি তেমনি স্থানে স্থানে ছোট ছোট বাড়ী করিয়া লইয়াছে। পাহাড়ের গায় অতবড় বাড়ী হওয়া দুষ্কর। এক একজন মাষ্টার এক এক বাড়ী লইয়া আছেন। ছেলেদের মাষ্টারের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিতে হয়। হেড মাষ্টারের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে ৬০ জন ছেলে থাকে। তাহারা সব একত্র আহার করে। হেড্ মাষ্টার, তাহাদিগকে লইয়া, আমার সহিত জলযোগ করিয়া বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। তারপর, হিন্দুয়ানীর কথা - বিদ্যাশিক্ষার কথা—নানা কথা হইল। কথাবার্ত্তায় নিতান্ত প্রীত হইলেন, একথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। বুঝাইয়া বলিলে অনেকেই বুঝে ;—এদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অদ্ভুত এমন সব ধারণা আছে যে, বলা যায় না।

আজ পুনরায় বেশ গরম পড়িয়াছে। বাড়ী আসিয়া, শ্রান্তি দূর করিয়া আহারাদি করিলাম। বাড়ীর সম্মুখে আর্লস্কোর্টে 'সেক্ষপীয়রের আমলের ইংলণ্ড' বহুকাল ধরিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু একদিনও দেখা হয় নাই। লণ্ডন ত্যাগ করিবার সময় আসিতেছে বলিয়া দেখিতে গেলাম। কত বড় বড় প্রদর্শনী এইখানে হয়। প্রকাণ্ড জায়গা ঘিরিয়া নানা রকমের তামাসার আয়োজন। 'সেক্ষপীয়রের লণ্ডন' বলিয়া কথাটার মানে বড় বুঝিতে পারিলাম না। 'সুইচ্ব্যাকে'র ধরণের 'এল্পাইন্ রেলওয়ে,' সংবদ্ধ 'এরোপ্লেন্' বামনের নাচ, ভাঁড়ের নাচ, দোকান-পসরা—এই সবই অধিক। সেক্ষপীয়রের সময়ে বাড়ী-ঘর-দ্বার কি রকম ছিল, তাই কতক কতক তৈয়ার করিয়া, তাহার ভিতর দোকানপাট বসিয়াছে। আর সেই সময়ের মত কাপড় চোপড় পরিয়া, কতক

উৎকণ্ঠিতা উত্তরা

শিল্পী - শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সোম]

গুলা লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর সর্ব্বত্র আলাদা আলাদা পয়সা দাও। নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-তামাসার জন্য প্রত্যহ বিস্তর লোক জমায়েৎ য়। ইংরাজ, আমোদ না হইলে থাকিতে পারে না। আমোদ, খেলা—এগুলাও যেন ইহাদের কাজের সামিল হইয়া পড়িয়াছে! বোধ হয়, সেই জন্যই এত কাজও করিতে পারে। স্যর কে. জি. গুপ্ত, মিঃ ডুবে প্রভৃতি আহারের নিমন্ত্রণ করিতেছেন; কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে—কেননা কেম্ব্রিজ-ব্রত গ্রহণ করিলে সে সব কিছুই হইবে না। ইটন স্কুল দেখিতে যাইতে পারিব না বলিয়া কাল লিখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা পুনরায় বিশেষ জেদ করিয়া লিখিয়াছেন। কোন্ দিকে কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা করিবার অবকাশ পাইলাম না। মেয়েদের নিমন্ত্রণের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এত পত্র জমিয়া গিয়াছে যে, একটা আলাদা বাক্স দরকার হইবে!

বৃহস্পতিবার, ২৫এ জুলাই, ১৯১২। আবার গরম পড়িয়াছে—"সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী" দেখিয়া প্রাণ পুলকিত। পথে ঘাটে লোক ধরে না। রৌদ্রের কাঙ্গাল দেশে রৌদ্র দেখিলে বিশেষ আনন্দের কথা। শীতপ্রধান দেশেই গায়ত্রীর উৎপত্তি, তাহার সন্দেহ নাই।

আহারান্তে প্রিভিকাউন্সেলে মোকদ্দমা দেখিতে গেলাম। ছোট ঘর, সামান্য সাজসজ্জা। জজেরা গাউন-উইগ পরেন না। আমাদের দেশে 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ' প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সামান্য ভাবে মামলা হয়, এখানেও তাই। তবে ব্যারিষ্টরদের গাউন-উইগ পরিতে হয়। নূতন লর্ড চেন্সেলার লর্ড হাল্ডেন্ সভাপতি। বিজ্ঞ বিখ্যাত লর্ড ম্যাকনটন ও আর তিনজন জজ বসিয়াছেন। ক্যানেডা-সংক্রান্ত মামলার দরখাস্ত হইতেছিল। ভারতবর্ষীয় মোকদ্দমা সংক্রান্ত দরখাস্ত পরে হইবে শুনিলাম। জজ আমির আলি বসেন নাই; কারণ, আজ ক্যানেডা প্রভৃতি উপনিবেশ-প্রদেশ সংক্রান্ত মামলার দিন।

লর্ড হাল্ডেন পূর্ব্বে ছিলেন—মিঃ হাল্ডেন্, ব্যারিষ্টর,—প্রিভিকৌন্সিলে ব্যারিষ্টারী করিতেন। তারপর পার্লামেন্ট-মেম্বরী-বলে রাজমন্ত্রী হইলেন—যুদ্ধসংক্রান্ত ও প্রধান মন্ত্রী একজন ব্যারিষ্টার হইলেন! অতঃপর এখন Lord Chancellor ইহার যোগ্য পদই বটে! ব্যারিষ্টারেরা মুখ না খুলিতে খুলিতে, মোকদ্দমা বুঝিয়া লইয়া, বিচার করিতেছেন। লর্ড ম্যাক্নটনও অতি যোগ্য জজ। অন্য সব জজ তেমন নয়। প্রিভিকাউন্সেলে বিচার সম্বন্ধে লোকের মতামত সংক্রান্ত প্রধান ব্যারিষ্টার স্যর রবার্ট ফিন্লে ও ডাঃ গ্র্যানার্ডের সঙ্গে অনেক হইল। সেখানে তিন জন জজ এখানকার প্রধান তিন জন জজের রায় রদ করিতে পারেন, ইহা সঙ্গত নয়; অন্ততঃ পাঁচ জন বসা উচিত। তিন জন ভাল আসল বিলাতি জজ ও দুইজন ভারতবর্ষীয় আইনজ্ঞ জজ না হইলে, সুবিধা সম্ভব নহে;—এ কথা তাঁহারাও স্বীকার করিলেন। আর এইরূপ কিছু একটা ব্যবস্থা না হইলে, শীঘ্র ভারতবর্ষের জন্য সুপ্রীম্ কোর্টের প্রয়োজন হইবে। নিকটেই ইণ্ডিয়া আপিস (India office)। সেখানে যাইয়া স্যর জেমস্ ডন্লপ্ স্মিথ্ ও জজ্ সেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

তারপর, য়্যাশ্‌বি গার্ডেন্ ১৯৪তে স্যর উইলিয়ম্ য়্যান্সনের বাড়ী গেলাম। নিমন্ত্রণ করিয়া দুই তিনবার পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড—'অল্ সোল্স্ কলেজে'র Master; বিখ্যাত আইনগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অথচ মাটির মানুষ। বাড়ী হইতে তাঁহার ক্লব—Brook's Club—এ লইয়া গেলেন। সেইখানেই উত্তমরূপ জলযোগ হইল। সকলেই প্রায় বাসায় থাকেন; আর বন্ধুবান্ধব দিগকে লইয়া ক্লবে খাওয়া দাওয়া করেন। ভারতবর্ষ ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

কেম্ব্রিজ-লেকচার সম্বন্ধে যাহা সব শুনিতেছি, তাহাতে আমার তিন সপ্তাহ সেখানে কাটান যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। বিশেষ লণ্ডনের অনেকের সহিত দেখা হওয়া, অনেক জায়গা দেখার কাজ বাকী রহিয়াছে। সে সব সারিয়া পরে কেম্ব্রিজে যাইব, লিখিয়া দিলাম।

তারপর, বাড়ীতে সব লোকজন আসিতে আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত লোক রহিল। বহুকষ্টে ভারতের ডাকলেখার কাজ শেষ করিলাম। কারণ কাল সকালেই ইটন (Eton) যাইতে হইবে—তাঁহারা বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়া দ্বিতীয়বার পত্র লিখিয়াছেন। প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

ইটন, উইণ্ডসর, শুক্রবার, ২৬এ জুলাই, ১৯১২।—সকালে ভারতীয় ডাকের বাকী কাজ সারিলাম। ইউনিভার্সিটি কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বলিয়াছিলেন যে, আমার বক্তৃতা তাড়াতাড়ি বলার দরুণ তাঁহাদের রিপোর্টার রিপোর্ট করিতে পারেন নাই; যাহা হয় একটা দাঁড় করাইয়া প্রুফ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহার পক্ষোদ্ধার করিতে অনেক কাঠখড় খরচ হইবে। তারপর, রাস্তায় কথা কহিতে কহিতে, এবং কাহাকেও বা নাপিতের দোকানে লইয়া বসাইয়া, কথা কহিয়া, অভ্যাগতগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপেই এখানকার কাজকর্ম্ম, অভ্যর্থনা, সম্মান করা পর্য্যন্ত হয়—তাহাতে কেহ কিছু মনে করে না। এখানে—বড়লোক কেন, সাধারণ লোকের সহিত দেখাশুনা করিতে গেলেও—এই রকম একটা যাহা হয়, ব্যবস্থা করিয়া কাজ সারিয়া লইতে হয়। খাইবার সময় দুইজন একত্র হইয়া খানিক কথাবার্ত্তা না কহিলে হয় না; কাজেই আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টায় এত কাজ বাড়িয়াছে। অন্যসময় লোক জন কেবল দৌড়াইতেছে, মান-প্রাণ লইয়া টানাটানি। কাজ কর্ম্ম লইয়াই হউক, আর আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই হউক, কেবল দৌড়।

আর্লস্‌কোর্ট হইতে হাইষ্ট্রীট—তথা হইতে প্যাডিংটন—তথা হইতে উইণ্ডসর—তথা হইতে ইটন উপস্থিত হইলাম। আবার এই পথে ফিরিতে হইলে, বেলা ৫টা। তারপর, ডুবে সাহেব ব্যারিষ্টারের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে, আর্লস্ কোর্ট হইতে লীষ্টার স্কোয়ার—তথা হইতে বেলসাইজ পার্ক—তথা হইতে পার্ক হিলরোড। প্রত্যহ বোধ হয়, কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান, দুইবার যাতায়াত করিলে যত সময় যায়, তত পথ এখানে সাধারণ কাজে ভ্রমণ করিতে হয়। লণ্ডনের সাধারণ কাজকর্ম্ম, ও সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিতে হইলেও তাই হয়। খরচও প্রায় তদ্রূপ। স্থানমাহাত্ম্য নিশ্চয় আছে; নতুবা শরীর "মহাশয়" হইলেও সহিতেন না—কতদিন সহিবেন জানি না! পলায়নের পথও দেখিতেছি না—কাজ অনেক বাকী। আজ আবার দেখা-শুনা করিবার ঝুড়িঝুড়ি পত্র আসিয়া পড়িল।

উইণ্ডসর-পথের নূতন বর্ণনা করিবার বিশেষ কিছু নাই। সে দিন রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; তবে সে দিন স্পেসিয়াল ট্রেণে ফার্ষ্ট ক্লাসে বিস্তর সুবেশ নরনারী সহযাত্রী ছিল—কথাবার্ত্তায় সময় কাটিয়াছিল। আজ পথের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যে সকল হরিৎ-শ্যামল ক্ষেত্র ইংলণ্ডে আসিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহা ক্রমশঃ সোণালী রং ধরিয়া রূপান্তর হইতেছে; গাছের পাতায় রং সবুজ ও ঘন হইয়া আসিতেছে। Leafy Juneএর পরিবর্ত্তে Autumn fallএর ছায়া ক্রমশঃ পড়িতেছে! পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। নতুবা জগৎ কেন?

রেলপথ হইতে Vulile and Sonএর Nursery সাজান বাগান, নানা ফুলের গালিচার মত, বড় সুন্দর দেখায়। বিজ্ঞাপন হিসাবেই রাস্তার ধারে এমন সুন্দর কারখানা করিয়া রাখিয়াছে। অন্য অন্য বাগান, ক্ষেত্র, ছোট ছোট পাহাড়ও সুন্দর। বিশেষ টেমস্ নদীর বাঁকের কাছে উইণ্ডসরের সুন্দর রাজবাড়ী, পাহাড়ের উপর বড় চমৎকার দেখায়। নদী, পাহাড়, বন, বাগান, রাজবাড়ীর একত্র সমাবেশ, চিত্রের উৎকর্ষ অপকর্ষ—যা বল, সব একাধারে ঘটে।—চিত্রকরের যোগ্য বস্তু বটে।

ষ্টেশনে হঠাৎ অক্সফোর্ডের ম্যাগুলেন কলেজের প্রোফেসর কুকসনের সহিত দেখা হইল। মুখের সঙ্গে নামের সংযোগ করাটা অনেক সময়েই গোলমাল হয়। তারপর, ইংলণ্ডে শত শত কেন সহস্র সহস্র নাম ও মুখ একত্র মনে করিয়া রাখার ভার মনের উপর পড়াতে আরও গোলমাল হইতেছে।

কুকসন সাহেব রাজবাড়ী ও ইটন কলেজ সংক্রান্ত অনেক পরিচয় দিলেন। ইটন প্রকৃতই কলেজ নয়, বড় স্কুল। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ হেনরীর "পেয়ারের" স্কুল বলিয়া ইহার নাম কলেজ। ৬০।৭০ জন বালক বিনাবেতনে ও বিনাখরচায় এখানে পড়ে। তাহারা কলেজ-বাড়ীতে স্থান পায়। হ্যামিল্টন নামে একজন ছোকরার সাহায্যে ছোকরাদের ঘর দেখিলাম। ছোট কুঠুরী, প্রাচীন বন্দোবস্ত, বিছানা-মাদুর একটা আলমারীর মত যায়গায় দিনের বেলা থাকে;—Bed by night and chest of drawers by day। বড় ছেলেদের খিদমৎ ছোট ছেলেদের করিতে হয়; তাহাদের (fag) ফ্যাগ বলে। বড়রা যে ফরমাইস করিবে, ছোটদের তাহা পালন করিতে হইবে।

াসের পড়া বড় অধিক হয় না। Tutorial systemএর ড়াই বেশী, আর তার চেয়েও বেশী খেলাধূলা। On the playfields of Eton, England's battles are won। য়ার-যুদ্ধে ১১০ জন ইটন-বালক অকাতরে প্রাণ দিয়াছে; াহাদের নাম প্রধান হলে মার্ব্বেলে খোদিত রহিয়াছে! র্ড রবার্টস্, লর্ড ডফারিণ প্রভৃতি সব ইটন-বালক। প্রধান "বালক"দিগের ও মাষ্টারদের ছবি রহিয়াছে। াকী প্রায় হাজার বালককে মাষ্টারদের বাড়ীতে থাকিতে য়। সর্ব্বদা স্কুলের পোষাক পরিয়া থাকিতে হয়, াহাতে সকলেই চিনিতে পারে; এবং সামান্য অপরাধেরও গুরুতর শাস্তি হইয়া নিয়ম রক্ষা হয়।

Hon'ble Dr. Lyttleton স্বর্গীয় Colonial Secretary of Stateএর ভ্রাতা, Etonএর Head Master। Etonএর হেড মাষ্টার খুব বড় লোকেই হন। Prime Ministerএর মান্যের অপেক্ষা ইঁহার মান্য কম নয়, বেতনও প্রায় সমান। ইঁহাকে অধ্যক্ষতাকাজেই সময় দিতে হয়। অধ্যক্ষেরা কোথাও পড়ানর কাজে সময় দেন না। ভাল ভাল মাষ্টার আছে। জলযোগের সময় তাঁহার সহিত যা' কথাবার্ত্তা হইল। স্কুল বন্ধ, ও পরীক্ষার কাজের জন্য ইনি বড় ব্যস্ত। তাঁহার দুই কন্যা আমায় বাগানবাড়ী, লাইব্রেরী, চ্যাপেল, হল, cloister সব দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সেই পুরাতন বিদ্যা-মন্দিরের প্রতিভিত্তিতে যেন ইংলণ্ডের গৌরব-মহিমার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, মনে হইল। স্কুল সব ঠিক না হইলে—বিশ্ববিদ্যালয় বল, আর যাই বল, সব বৃথা; নূতন বাড়ী ঘরে ঘরে প্রয়োজন মত অনেক হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন উঠান দালানের মত চোখে ও মনে কিছুই লাগিল না। চ্যাপেলটা কেম্ব্রিজের King's Collegeএর চ্যাপেলের ধরণের।

টেমস্ নদীর ধারেই তাহাদের Play-field; ও সেখানকার পুরাতন বৃক্ষগুলিও দেখিবার জিনিষ বটে। এই সকল সমালোচনার মধ্যে শরীর-মন-তেজের আদর হইবারই কথা। পুরাতন ও নূতন, দুইটি লাইব্রেরী আছে। নূতন লাইব্রেরীতে Grey's Elegyর কবির স্বহস্তের কাটকুট করা আদিম পাণ্ডুলিপি আছে। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া অনুচ্চ স্বরে পড়িতে লাগিলাম। হেড মাষ্টারের কন্যা উচ্চ-স্বরে পড়িতে অনুরোধ করিলেন—অপ্রস্তুত হইলাম; বিশেষ, অনুরোধ রক্ষা না করা অভদ্রতা হইবে বলিয়া, পড়িলাম। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলেন—মিষ্ট কথাও অনেক বলিলেন। পুরাতন বাণী-মন্দিরের বাণীর ভক্ত-সাধকের অপূর্ব্বগাথা অসিদ্ধকণ্ঠে শ্রুতিকটু হইলেও শ্রোত্রীর গুণে, বোধ হয় মধুরতাময় হইয়া থাকিবে। অল্প বয়সে ইংরাজ ঘরের মেয়েরা কত উন্নত ও কত ভাল হয়, তাহা ইহাদিগকে না-দেখিলে বোঝা যায় না। অথচ এই প্রকাণ্ড স্কুলের নির্জ্জন গৃহে-গৃহে এই তরুণী অবাধে হাসিতে হাসিতে, গল্প করিতে করিতে, নিতান্ত পরিচিতার ন্যায় আলাপ-রহস্য করিতে করিতে, পথ দেখাইয়া দুই তিন ঘণ্টা কাটাইলেন। দ্বিধা-বাধা-সঙ্কোচের নাম মাত্র নাই। মা-ভগিনী-কন্যা যেরূপ অবাধে কথাবার্ত্তা বলেন,—অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহারা সেইরূপে অপরিচিতকে আপনার করিয়া লন। আমিও এতদিন ইঁহাদের অন্তস্তল দেখিলাম! যেখানে মন্দ সেখানে মন্দ,—ভদ্রঘরে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই। যাহারা মন্দ, মন্দ-চেষ্টায় বেড়ায়—মন্দ তাহাদের চক্ষে স্বতঃই আসিয়া উদয় হয়। মিস লিটেলটন রূপসী, গুণবতী, তরুণী, অথচ তাহার কিছুমাত্র ধারণা নাই যে, সে এই তিনের এক এবং ব্যবহারেও তাহার কণামাত্র পরিচয় নাই। তবে, সাধারণ বাঙ্গালী ছাত্রেরা, কিংবা ভ্রমণকারীরা, বিলাতে আসিয়া সচরাচর এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ-অধিকার পায় না; কাজেই বিসদৃশ ধারণা লইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। আমারও সৌভাগ্য, কিংবা দুর্ভাগ্য, ইতর শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচয় হওয়া দূরে থাকুক, নজরে পর্য্যন্ত পড়িল না; কারণ, কংগ্রেসের কাজে আসিয়া যে শ্রেণীর লোকের সহিত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মিশিতে হইতেছে, ইহাদের ও তাহাদের মধ্যে ব্যবধান অতি দূর ও অভেদ্য! সেইজন্য সেদিন টেম্পারেন্স সভায় বলিয়াছিলাম যে, আমায় বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে—ইংলণ্ডের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পানদোষ নাই—অন্ততঃ আমি দেখি নাই। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কারণ পানদোষ ও অন্যান্য দোষ ইতর শ্রেণীর মধ্যে ভয়াবহরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

জলযোগের পরও খানিক কলেজ দেখাশুনা হইল। কিন্তু আমার, সেই বুড়া ঝির মত, ট্রেন-মিস হইবার

ভয়। সময় যথেষ্ট ছিল, তাই বেড়াইতে বেড়াইতে টেমসের উপর, উইণ্ডসর রাজবাড়ীর শোভা, এবং টেমসের পুলের উপর হইতে নদীর শোভা, দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনে আসিলাম। তখনও এক ঘণ্টার অধিক সময় ছিল।

বাড়ী আসিয়া বিশ্রাম করিয়াই বেলসাইজ পার্ক, পার্ক হিল রোডে হিন্দুস্থানী ব্যারিষ্টার B. Dube (দোবের) বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণে গেলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্রও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। একত্র ডর্ব্বিশায়ার—বক্সটনে, বাতের চিকিৎসার জন্য, mineral water পান করিতে যাইবার কথা হইল। আহারের পর মিস স্মিথ অমৃত-বাজার পত্রিকার London correspondent) ইত্যাদি আসিয়া জুটিলেন। গল্প-গুজব অনেক অধিক হইল। সব চেয়ে জাঁকাল অতিথি মিসেস ডেসপার্ড। প্রাচীনা তেজস্বিনী অতি উচ্চদরের রমণী; Suffragate-হাঙ্গামায় কয়েক বার জেলে গিয়াছেন এবং আবার যাইবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। লিখিতে বলিতে সমান মজবুৎ।

আহারাদি সম্পূর্ণ হিন্দুধরণের - মাছ-মাংস আদৌ নাই। বহুকাল পরে দেশীধরণের আহারে তৃপ্ত হইলাম।

শিশু

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রেম-সাগরের পদ্ম, ওরে মর্ত্ত্যভূমির নিমন্ত্রিত,
নরনারীর চিরন্তন বাঁধন ওরে আকাঙ্ক্ষিত,
আত্মা মহাশক্তির বীজ, জীবন-তরুর নামাল্ ঝুল,
মহাকালের রুদ্রতালের লয়ের একটি ঠেকার মূল।
জীবন ও তোর লোকান্তরের মৃত্যু-সাগর মথন-করা,
(যে জীবনের আরাধনায় মরণের দেশ আলোয় ভরা)
সেই সাধনার উল্কা—শিশু; একটি চুমার হৃদয় তোর;
নিবিড় আলিঙ্গনের অঙ্গ; রূপটি আকিঞ্চনের ঘোর।
তরুণ দেহে ও শিশু তোর মায়ের বাঞ্ছা জড়িয়ে আছে,
মলিন মহল্লোকের জ্যোতিঃ তোর ও বিমল মুখের কাছে;
অধরপুটে হাসির সুধা, কণ্ঠে ভরা কান্না-বিষ,
তুই মহাদেব, ও নীলকণ্ঠ সর্ব্বশুচি অহর্নিশ।
সৃষ্টির এই অক্ষয়বট তারি ছোট বীজটিরে তুই,
ভাঙনধরা মরণ তটে বসাস্ নগর কতই নিতুই;
সৃষ্টিধারার মূর্ত্তি শিশু, একের ভিতর অনেক লীন,
তুই নারায়ণ পিতা পাতা বর্ণ জাতির বিচারহীন।
হাসি-কান্নার রৌদ্র-মেঘে তুই নন্দন-মরূদ্যান,
স্নেহ-প্রেমের আল্‌বালে তুই করিস্ নিতি সলিল দান;
মূর্খ পাপী তোরে হেরে নয়ন ফিরায় ঘৃণা করে,
পাওয়া স্বর্গ পায়ে ঠেলে হাওয়ায় আরেক স্বর্গ গড়ে'!
স্বর্গ যদি থাকে কোথাও, যদিই সেটা পাওয়া যায় –
সে কি তবে চক্ষু মুদে হৃদয়হীনের কঠোরতায়?
স্বর্গকামী চায় না শিশু—সে যে তাহার বিষম ভুল,—
সুন্দর সে স্বর্গে যে গো সৌন্দর্য্যের পূজাই মূল!
জড়বাদী বুঁজুক্ আঁখি মাংসপিণ্ড ভেবে তোরে,
মুক্তিবাদী বলুক যতই বন্ধন তুই ভবঘোরে,
মায়াবাদী করুক্ নিন্দা, মিথ্যা স্বপ্ন তুচ্ছ বলে,
করব কোলে—তোর যে রে ঠাঁই দেব্‌তাদেরও উচ্চতলে।

ভারতীয় শ্রম-শিল্প*

[শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রসঙ্গ লইয়া দেশে বিদেশে শাসক, ব্যবস্থাপক, রাজনীতিজ্ঞ, শ্রম-শিল্প তত্ত্ববিশারদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে একাল পর্য্যন্ত বহু তর্কবিতর্ক, বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বিষয়টি অতি গুরুতর—রাজস্বই বলুন, বা শাসন-নীতিই বলুন, ইহা অপেক্ষা কোনটিই প্রয়োজনীয় নহে। 'ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী' যখন সর্ব্বপ্রথম এদেশে ব্যবসায়ে একাধিপত্য স্থাপনের জন্য কৃতপ্রযত্ন হন, সেই সময় হইতেই আলোচ্য বিষয়টির আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী অবসানের অনতিপূর্ব্বে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী' ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপনে সচেষ্ট হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সে একাধিপত্যের বিলোপ সাধিত হয়; কিন্তু তথাপি উক্ত বিষয়ের বাক্‌বিতণ্ডার বিরাম নাই। কেহ বলেন, ইংরেজাধিকার হইতে এতদ্দেশীয় শ্রমশিল্পাদির যে অমিত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এরূপ ইতঃপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। অপর পক্ষ বলেন, ভারতে ইংরেজের আগমন হইতেই ভারতের শিল্পকলা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

উভয় পক্ষের বক্তব্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। বস্তুতঃ ইংরাজ রাজত্বের সূচনাবধি ভারতবর্ষীয় শিল্পাদি একপক্ষে যেমন উন্নতি—তেমনই অপর পক্ষে সমূহ অবনতিই সাধিত হইয়াছে। এই বিশ্বাস কেবল আমাদের নহে, ভারতীয় শ্রম-শিল্প বিষয়ক বিবরণী-সংগ্রহ-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তা (Late Director General of Statistics, India, শ্রীযুক্ত জে. ই. ওকনর C. I. E. মহোদয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, যে বিগত পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে ভারতের শ্রম, শিল্প ও স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যাদির যতদূর উন্নতিসাধন হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। আবার, প্রতিপক্ষীয়গণ বলিয়া থাকেন যে, রোগ নিরাকৃত হইলে—তাহার বৃদ্ধি রোধ হইলে—সেই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে রোগের প্রতিকার সূচিত হয়। সুতরাং, আজি দেড়শত বৎসর হইতেই ভারতীয় শ্রম-শিল্পাদির যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এসম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদের স্বাধীন মত প্রকাশ না করিয়া, যে সকল বিষয়ের উন্নতি-কথা এই প্রসঙ্গে সর্ব্বদা উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই সকলের প্রকৃত অবস্থা মাত্র লিপিবদ্ধ করিব।

সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটনকালে, অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল ও সেই সময়ে বোম্বাই হইতে কয়েক মাইল এবং

* মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গগত তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, M.A., B.L., (Retired S Judge)-কর্ত্তৃক ১৯০৭ সালে লিখিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি হইতে সঙ্কলিত এবং বর্ত্তমানকালের বিবরণী পর্য্যন্ত সম্বলিত।—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা হইতে মাইল কয়েকমাত্র রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল। দূরদেশে যাইবার জন্য স্থলপথের মধ্যে মাত্র গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক রোড এবং স্থলযানের মধ্যে অশ্ব, গোশকট মাত্র আশ্রয় ছিল; অথবা পদব্রজে যাইতে হইত। পথ ও যান উভয়ই বিপদসঙ্কুল ছিল এবং সময়ও যথেষ্ট লাগিত। বর্ষাকালে স্থলপথের কাজকর্ম্ম, যাতায়াত প্রায় বন্ধ থাকিত। জলপথে মহাজনী নৌকাই এক মাত্র মাল-সরবরাহের বা যাতায়াতের উপায়, তাহাও সাতিশয় বিপদ্-সঙ্কুল ছিল। পত্রাদি প্রেরণের জন্য হাঁটাপথে—পদব্রজে বা অশ্বারোহণে লোক নিয়োজিত হইত। সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রাজপথে ডাক গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও লোক-সাধারণের পক্ষে নিতান্ত ব্যয়সাধ্য ছিল।—সে সময় অনাবৃষ্টি-সূচনা-কালে ক্ষেত্রাদিতে জলসেচনের সুব্যবস্থা আদৌ ছিল না।

দ্রব্যাদি প্রেরণের অসুবিধায় একস্থানে প্রচুর ফসল হইলেও, হয়ত তৎসন্নিহিত স্থানবিশেষ দুর্ভিক্ষ-পীড়নে অস্থির হইত—প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যা-প্রদেশ যে দুর্ভিক্ষ-পীড়নে প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; মাল-সরবরাহের অসুবিধাই তাহার প্রধান কারণ। উক্ত প্রদেশীয় রায়পুর ও সম্বলপুরে সে বৎসর টাকায় ।৫.হইতে ।৭ সের চাউল বিক্রীত হইয়াছিল; অথচ তৎসন্নিহিত বিলাসপুরে সে সময়ে টাকায় দুইমণ চাউল বিক্রয় হইতেছিল! এইরূপ কারণেই ১৮৭৭ সালে মহীশূর রাজ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়নে প্রায় জীবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। নিম্ন ব্রহ্মে কখনও দুর্ভিক্ষ দৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু উত্তর-ব্রহ্মদেশ ১৮৮৫ সালে পর্য্যন্ত প্রতি দুই তিন বৎসর প্রায় অজন্মা বা অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষের প্রকোপে অস্থির হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে প্রত্যেক প্রদেশ—প্রতি জেলা, মহকুমা—এমন কি প্রতি গ্রাম স্ব স্ব উৎপন্নের উপর নির্ভর করিত।

বন্দরগুলির অবস্থাও অতি শোচনীয় ছিল; অর্ণবপোত-গুলি বর্ষাকালে প্রায় ঝটিকাদির ভয়ে গতায়াত করিত না; অন্য সময়ে নদী মধ্য দিয়া কোনরূপে যৎসামান্য মালপত্র সরবরাহ করিত।

লর্ড ডাল্‌হৌসী রেলপথ ও টেলিগ্রাফ বিস্তৃত করিয়া, কয়েকটি বন্দরের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া, বন্দরগুলিতে প্রচলিত শুল্কের হার পরিবর্ত্তিত ও হ্রাস করেন এবং আমদানী শুল্কের হার সাধারণতঃ শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য ও রপ্তানী-শুল্ক লোপ* করিয়া সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা-সাধন করেন। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৫ সালে সর্ব্বপ্রথমে ঈষ্টইণ্ডিয়ান্ রেল-পথ উদ্ঘাটিত হয় ও তৎপূর্ব্ব বৎসর ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম তাড়িত-টেলিগ্রাম প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৭০ সালে সুয়েজ খাল খনন করিয়া ভারতবর্ষীয় দ্রব্যাদি বিদেশে—য়ুরোপ ও আমেরিকায়—প্রেরণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা আমদানী-রপ্তানী উভয়েরই বিশেষ সুবিধা সংঘটিত হইয়াছে।

এদিকে ভারতজাত দ্রব্যাদি দেশান্তরে প্রেরণের সুবিধা করিয়া দিয়া, ইংরাজ-রাজ এতদ্দেশবাসীর ধন-বৃদ্ধির যেমন সুবিধা করিয়া দিলেন, তেমনই ভারতীয় প্রজাবর্গের নিকট হইতে অধিকতর কর আদায় করিয়া বিলাতে সমধিক পরিমাণ "হোম-চার্জ্জ"-প্রেরণেরও ব্যবস্থা হইল। এই বাবদে ভারতবর্ষ হইতে এক্ষণে (১৯১২—১৩ সালে) ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ২ হাজার ২ শত ২২ পৌণ্ড অর্থাৎ ২৮ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত ৮০ টাকা বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বসমেত অন্যান্য বিবিধ বাবদ লইয়া প্রতি বর্ষে প্রায় মোট ৯০ হইতে ১০৫ কোটি মুদ্রা বিলাতে প্রেরিত হয়! অঙ্কশাস্ত্র-ধুরন্ধরেরা এমন কথাও বলিয়া থাকেন, যে বিগত শতাব্দীতে মোট সাড়ে সাত সহস্র কোটি টাকা এদেশ হইতে বিলাতে গিয়াছে। এক বাটা-বিভ্রাটেই ভারতবাসীর প্রতিবৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ পৌণ্ড অর্থাৎ ১২ কোটি টাকা ক্ষতি হইত। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ স্যর জেমস্ ম্যাকে-প্রমুখ মনস্বিবর্গের প্রভূত চেষ্টায় অধুনা স্বর্ণ ও রৌপ্যের তুলনায় একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য, অর্থাৎ প্রতি পৌণ্ডের মূল্য ১৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য ও কার্য্যতঃ ফলাফল কি তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য। আপাততঃ ইহাই বলিয়া রাখি যে, অনেকেরই বিশ্বাস যে, ইহাদ্বারা ভারতীয় প্রজাবর্গের অনেক ক্ষতি নিবারিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় মোট (Gross) রাজস্ব-সংগ্রহের পরিমাণ

---

* কেবল মাত্র চাউল রপ্তানীর উপর শুল্ক এপর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত আছে। ইহার হার প্রতি ভারতবর্ষীয় মণের উপর (কাঁড়া বা আকাঁড়া চাউলে) ৩ টাকা হিসাবে।

৮৮০ সালে ছিল—৬ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯১৩-১৪ সালে কোটি ৪৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৩ শত পৌণ্ড আর্থাৎ প্রায় ড়গুণ। বিলাতী রাজপুরুষেরা ও রাজনীতিজ্ঞগণ লেন যে, অভিনব করপ্রবর্ত্তন করায় এই বৃদ্ধি ঘটে নাই ; জাগণ বর্দ্ধিত কর প্রদানে সমর্থ বলিয়াই কর-হার-বৃদ্ধি ওয়ার এরূপ ঘটয়াছে। আবার ভারতীয় মোট সাধারণ ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া (১৯১৩-১৪ সালে) ভারতবর্ষে প্রতি ১৫৲ টাকায় পৌণ্ড হিসাবে) ৭ কোটি ৯০ লক্ষ ইতে ৯ কোটি ৭১ লক্ষ ২৭ হাজার ১১৯ পৌণ্ডে এবং লণ্ডে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ হইতে ১৭ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭ হাজার ৯ শত ৯৩ পৌণ্ডে উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, ই সর্ব্বসমষ্টি ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকেই পরিশোধ করিতে হবে। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমোক্ত টাকা ঋণের না এতদ্দেশীয় করদাতৃগণের নিকট যে পরিমাণ অর্থ গৃহীত ইত, অধুনা তদপেক্ষা কতকটা কম গৃহীত হইয়া থাকে ; ক্ষান্তরে আবার, বিলাতে পৌণ্ড হিসাবে যে ঋণ গৃহীত ইয়াছে, উহার দেয় অংশ এক্ষণে অত্যধিক পরিমাণে আদায় রা হয়। তবে এই উভয়বিধ ঋণের পক্ষে একটা কথা এই , ইহার মোট পরিমাণের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এতদ্দেশীয় রলপথ বিস্তারে ব্যয়িত হইয়াছে—অর্থাৎ একটি প্রভূত াভজনক ব্যবসায়ের মূলধন রূপে ন্যস্ত আছে এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে নিয়ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। কারণ ভারতবর্ষীয় রলপথ সম্বন্ধে গূঢ় কথা এই যে, যাবতীয় রেলপথ বর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধারণে স্থাপিত হয়, তাহার উদ্বৃত আয় ইতে টাকায় সুদ এবং মূলধন পরিশোধার্থ বার্ষিক র্দ্দিষ্ট অর্থ আমানত করিয়া,যাহা বাকী থাকে, তাহাই রাজ-কাষে জমা হইয়া থাকে। এইরূপে যখন মোট ব্যয়িত লধন সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়া যাইবে, তখন যাবতীয় রলপথ গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব সম্পত্তি হইবে। রেলপথ দেশে প্রতিনিয়তই বর্দ্ধিত হইতেছে ; ১৯০৪ সালে ২৭ হাজার মাইল ছিল, পর বৎসরে মোট ৩২ হাজার মাইল হয় ; ১৯১২-১৩ সালে মোট ৩৩,৫৯৯ মাইল দাঁড়াইয়াছে ; তদ্ভিন্ন আরও ২,৫৭২ মাইল রেল-বিস্তারের প্রস্তাব হইয়াছে। রেল-বিস্তার ও শ্রম-শিল্পাদির উন্নতি, এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, এই রেলপথের উভয় পার্শ্বের ১০ মাইল পরিধির মধ্যের স্থানসমূহের দ্রব্যাদি আনয়ন-প্রেরণের যদি সুবিধা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ বর্গ মাইলের সৌকর্য্য সাধিত হইয়াছে ; সমগ্র ভারতবর্ষের বিস্তৃতি প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ বর্গ মাইল। ভারতবর্ষের মোট রাজস্বের শতকরা ২৬ ভাগ কেবল এই রেলপথ হইতেই উঠিয়া থাকে।

১৯০৪ হইতে ১৯০৭ এবং ১৯১১ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মোট আমদানী রপ্তানীর নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, বুঝা যাইবে :—

এতদ্ব্যতীত সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং প্রেসিডেন্সীব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত টাকা পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, এই সমুদায় দেশের ধনবৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া উল্লিখিত হয়।

প্রচলিত নোটগুলির মূল্য ১৮৮০ সালে ছিল ১৩ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা, ১৯০৩-৪ সালে হইয়াছিল ৩৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ; এক্ষণে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯০৪-৫ হইতে ১৯০৬ ৭ এবং ১৯১২ ১৪ সাল পর্য্যন্ত লবণ ব্যতীত অপরাপর আমদানী-দ্রব্যের উপর গৃহীত (Gross) শুল্কের পরিমাণ, এবং উপরন্তু ১৯০৪ ৭ পর্য্যন্ত রপ্তানীশুল্কের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯১১ সালের আদম-সুমারীর হিসাবানুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে বয়নকার্য্যে ব্রতী লোকের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

আমদানী

	১৯০৪-৫	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭
বেসরকারী পণ্য ...	৯৬,৬৭,৮২,৮৮৪৲	১,০৩,০৬,৫৬,৬০২৲	১০৮,৩০,৬৯,১১৪৲
সরকারী পণ্য ...	৭,৭৩,৪৪,৫৭০৲	৯,০২,৯৬,৭১৪৲	৮,৯৩,৪৬,১৫০৲
সোণারূপা (বেসঃ)	৩৩,০২,৭৫,২৯৮৲	২০,৯২,১১,৮৯০৲	২৭,২০,০৯,৮৫৮৲
ঐ (সঃ)	৬,৪৮,০৬,৪৫২৲	১০,৭২,৯৭,২৪৩৲	১৭,৩৭,৮৮,২৫৬৲
মোট ...	১,৪৩,৯২,০৯,২০৪৲	১,৪৩,৭৪,৬৩,৪৪৯৲	১,৬১,৮২,১৩,৪০৮৲

রপ্তানী

বেঃ সঃ পঃ	১,৫৭,৫১,৪৩,৪৪৪৲	১,৬১,৭০,৭৮,৯৯২৲	১,৭৬,৫৬,১৫,১৬৫৲
সঃ পঃ	২০,৭৭,০৮৫৲	১১,৭৫,৮৮৫৲	১০,৭৯,১০৫৲
সোঃ রূঃ (বেঃ সঃ)	৮,০৮,৮৫,৬৫৬৲	৬,৪৪,৯৭,৫৬৯৲	৫,৭১,৩০,০৭৬৲
ঐ (সঃ)	৮,৪৫,২২,৫১১৲	৯,০২,০২,৪৮৫৲	৫২,৪৫০৲
মোট	১,৭৪,২৬,২৮,৬৯৬৲	১,৭৭,২৯,৫৪,৯৩১৲	১,৮২,৩৮,৭৬,৭৯৬৲

আমদানীশুল্ক

১৯০৪-৫	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭
৭,২৩,৪৫,৯২২৲	৬,৮৪,০৬,৪০৫৲	৬,৯২,০৩,৬১২৲

রপ্তানীশুল্ক

১,৩১,৭৫,৭৭২৲	১,১৫,১১,২৫৭৲	১,০৫,৩০,৯১৯৲

আমদানী

		১৯১১-১২	১৯১২—১৩	১৯১৩—১৪
পণ্যদ্রব্য—				
বে-সরকারী	...	১,৩৮,৫৭,৪৮০০০	১,৬০,৯৯,৮৬,০০০	১,৮৩,২৫,০৬,৫০০
সরকারী	...	৫,৪৮,০৫,৫০০	৫৬,৩১,০০০	৮,০২,১৪,০০
ধন —	...	১,৪৪,০৫,৫৩,৫০০	১,৬১,৫৬,১৭,০০০	১,৯১,২৭,২০,৫০০
স্বর্ণ	...	৪১,৪৯,৩৬,০০০	৪১,২৯,০৮,০০০	২৮,২২,৬৪,০০০
রৌপ্য	...	১১,৯৭,৭২,০০০	২০,৫৪,১০,০০০	১৫,২১,৩১,৫০০
		৫৩,৪৭,০৮,০০০	৬১,৮৩,১৮,০০	৪৩,৪৩,৯৫,৫০০
মোট—	...	১,৯৭,৫২,৬১,৫০০	২,২৩,৩৯,৩৫,০০	২,৩৪,৭১,১৬,০০০

রপ্তানী

ভারত জাত পণ্য		২,২১,৮১,৮৫,০০০	২,৪১,৩৪,৮৯,৫০০	২,৪৪,৩৮,৪৮,০০০
বিদেশ জাত পণ্য		৬,০২,৭১,৫০০	৪,৭৪,০০,০০০	৪,৬৭,৭৩,০০০
সরকারী মালপত্র		১৪,৪০,০০০	১২,৯৩,০০০	১১,৪৫,৫০০
		২,২৭,৯৮,৯৬,৫০০	২,৪৬,২১,৮২,৫০০	২,৪৯,১৯,৬৬,৫০০
ধন —				
স্বর্ণ	...	৩,৭৩,৩৮,০০০	৭,২৮,৯৪,০০০	৫,৪৪,২৬,০০০
রৌপ্য	...	৩,৬৪,০০,৫০০	৩,৩৪,২৩,০০০	২,১৮,০২,৫০০
		১০,৩৭,৩৮,৫০০	১০,৬৩,১৭,০০০	৭,৬২,২৮,৫০০
মোট—		২,৩৮,৩৬,৩৫,০০০৲	২,৫৬,৮৪,৯৯,৫০০৲	২,৫৬,৮১,৯৫,০০০

আমদানী শুল্ক

১৯১২—১৩	১৯১৩—১৪
১০,৭৭,৮৮,৬৪৫৲	১১,০৫,২৬,০০০৲

বঙ্গদেশে ৯,৪৬,৪৬৩ (তাঁতী ও জোলা লইয়া মোট
য় ১১ লক্ষ)

মধ্যপ্রদেশে, ২,৭৩,৯৩৪
উঃ পঃ „ ১৯,১৮,৭২২
বোম্বাই „ ১,৪১,০৫২
মান্দ্রাজ „ ৩,২৫,৯১২
পাঞ্জাব „ ৬,৯৫,২১৬

মোট ৪৩,০১,২৯৯ জন বয়ন-ব্যবসায়ে ব্রতী আছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র-বয়ন কার্য্যে ব্রতী আছে, এবং তাহাদিগের সহায়তা করিবার জন্য যোগানদার আছে প্রায় ২৭ লক্ষ লোক। ভারতীয় তুলার কলগুলিও অধুনা বহুল বর্দ্ধিত হইয়াছে—১৮৮০ সাল অপেক্ষা ১৯০৬-০৭ সালে প্রায় চতুর্গুণ হইয়াছিল; সম্প্রতি আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রায় ২১,৫৪,৫৬৭ বিঘা জমিতে তুলার চাষ হইতেছে। ১৯০৭ সালে ৩১এ মার্চ্চ ২১০টি কলে ৫৫,৪৪৬২৪ টাকু; ৫৯৪৬৭ খানি তাঁত; ১,৮৪৭৭৯ শ্রমী; ২০, ,১১,৬৬০৲ টাকা মূলধন; ১৭,৪৪,৭৬৬ গাঁইট তুলা প্রয়োজিত হইয়াছিল। উৎপন্ন হইয়াছিল ৫৭,৬০,০০,০০০ পৌণ্ড সূতা; (তন্মধ্যে ২৫,২৫,০০,০০০ পৌণ্ড সূতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; তাহার মূল্য ৮,৮৪,১৫, ১১৲ টাকা) এবং বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল সূক্ষ্ম সূতা ২,৮৮ লক্ষ পৌণ্ড এবং ১২,৩০,০০,০০০ পৌণ্ড-ওজনের বস্ত্র। এখানে বলিয়া রাখি, লর্ড লীটনের শাসন-কালে তুলাশিল্পপণ্যের উপর কর উঠিয়া যায়; পরে আবার লর্ড এল্‌গিনের শাসনকালে ল্যাঙ্কাশায়ারে তুলা লইয়া যাইবার যে ব্যয় পড়ে এবং তথায় রপ্তানী তুলার উপর যে শুল্ক দিতে হয়, সেই সকল সামঞ্জস্য সুবিধার জন্য ১৮৯৬ সালে এতদ্দেশজাত তুলাশিল্পপণ্যের উপর শতকরা ৩॥০ হারে শুল্ক ধার্য্য হয়। পশমজাত বস্ত্রাদি প্রস্তুতার্থ ভারতবর্ষে মাত্র ছয়টি কল—বোম্বায়ে ৩টি, কানপুরে ১টি, ধারিওয়ালে ১টি এবং বাঙ্গালোরে ১টি প্রতিষ্ঠিত ছিল;—এখন সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ছয়টিতে মোট ৪,৯৩১ চরকা এবং ৭৩৭খানি তাঁত আছে। কানপুর ও ধারিওয়ালে পুলিশ ও সৈন্যবিভাগের জন্য এবং সূক্ষ্মতর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শীতবস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এই কলগুলির মোট মূলধন ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা; বার্ষিক উৎপন্ন বস্ত্রের মোট মূল্য প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য যে, এই কলগুলিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রবয়নের জন্য অষ্ট্রেলিয়া-জাত পশম এতদ্দেশোৎপন্ন পশমের সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়।

তুলার কলগুলির নিম্নেই পাটের কলের স্থান। ১৮৯৫ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত পাটের কলগুলির তাঁত ও উৎপন্নের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

সাল		তাঁত		উৎপন্ন	
১৮৯৫	...	৯,৮৪১	...	৩,৪৪৪	লক্ষ
১৮৯৬	...	১৯,৪৯০	...	৩,৪৯৮	„
১৮৯৭	...	১৩,৪৭৫	...	৪,৬৬১	„
১৮৯৮	...	১৪,২৭৮	...	৪,৯২৩	„
১৮৯৯	...	১৪, ৭৮	...	৫,০১৪	„
১৯০০	..	১৫,৩৩৬	...	৫,৮০১	„
১৯০১	...	১৬,৬৮০	...	৬,৩৩৯	„
১৯০২	..	১৭,৫৯৫	...	৭,২৭৩	„
১৯০৩	...	১৯,৪৪১	...	৭,৮৮৯	„
১৯০৪	...	২৩,০১৮	..	৮,২৯১	„
১৯০৫	...	২৩,৮৮৪	...	৮,৫৭২	„

১৮৮০ সালে এতৎকার্য্যে নিযুক্ত ছিল ৩৮,৪৪৪ জন এবং ১৯০৪ সালে ১১৮,০০০ জন লোক।

১৮৮০ সালে কয়লা উৎপাদিত হইয়াছিল ১০ লক্ষ টন (প্রতি টনের ওজন ২৭৷৮৫০ সের); ১৯০৪ সালে ৬৫ লক্ষ টন এবং ১৯১১ সালে ১,২৭,১৫,৫২৪ টন!

১৯০৪ সালে যতগুলি যৌথ-কারবার ভারতবর্ষে স্থাপিত ছিল তাহার মোট মূলধন ছিল—৩৮,২৫,০০,০০০৲ টাকা।

যৌথ কারবার সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব; তবে একটা কথা, অপরাপর যাবতীয় দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে নিতান্তই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া আছে। সময়—সুযোগ উপস্থিত; এসময়ে উদ্যোগী পুরুষ সিংহগণ এবিষয়ে মনোযোগী হইলে, অনায়াসে অনেক শ্রম-শিল্প বিস্তার করিতে পারেন।

ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। এদেশের অধিবাসীসংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল—২৪, ৪২, ৬৭,

৫৪২ জন; বহির্ব্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কিঞ্চিদূন ২৪০ কোটি টাকা অর্থাৎ লোক প্রতি প্রায় ১০৲ মাত্র!

এতদ্দেশীয় শ্রম-শিল্পের উন্নতি হয় না কেন?—এতদুত্তরে বিলাতবাসিগণ বলিয়া থাকেন, যে এতদ্দেশীয় মধ্যবিত্তগণ কর্ত্তৃক সুখসচ্ছন্দতার জন্য অধিকতর বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদি ব্যবহৃত না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। এতদ্দেশীয় ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়স্থানে জীবন-যাপন প্রণালীতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। সচরাচর এদেশীয় ব্যবসায়দারগণ যে গৃহে তাঁহার বিপণী, প্রায় সেই গৃহই বৈঠকখানা, ভোজনগৃহ, শয়নকক্ষ—একযোগে সকলরূপেই ব্যবহার করেন। একটি বাক্স বা তোরঙ্গ মধ্যে তাঁহার যাবতীয় ব্যবহার্য্য পোষাক-পরিচ্ছদ রক্ষিত হইয়া থাকে। হয়ত, সেই গৃহেরই এক-স্থানে একখানি কাংস্য বা পিত্তলনির্ম্মিত থালায় তাঁহার আহার্য্য প্রদত্ত হয়, এবং তাহারই এক পার্শ্বে একখানি কন্থা, কম্বল বা অপর কোনরূপ গাত্রবস্ত্র লইয়া তিনি শয়ন করেন। একই পাত্র তাঁহার স্নানপানের জন্য ব্যবহৃত হয়; জল—সিদ্ধি বা সরবত—ক্বচিৎ বা দুগ্ধ ভিন্ন অন্য পেয় তাঁহার গলাধঃকরণ হয় না। বিলাসের মধ্যে ক্বচিৎ ফুলেল তৈল বা আতর ব্যবহার, কোনও মিষ্টান্নদ্রব্য ভক্ষণ ঘটে। এইরূপে তৈজসপত্রের মধ্যে এক থালা, এক ঘট, ভিন্ন অপর কিছুই তাঁহার প্রয়োজন হয় না; আর আসবাবের মধ্যে একটি বাক্স-তোরঙ্গই যথেষ্ট!

যেখানে প্রয়োজনের অভাব, সেখানে শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা অতি সামান্য। থালা, ঘট, বাটি প্রভৃতি প্রস্তুতের উন্নত-প্রণালীর কারখানা—বাক্স, তোরঙ্গ নির্ম্মাণের কার্য্যালয়, এদেশে ভালরূপ চলিতে পারে। অপরাপর শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুতের আবশ্যক অল্প বলিয়াই বোধ হয়, অপরবিধ শিল্প-বিস্তার এদেশে এখনও সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্য জাতীয়ের সংস্রবে আসিয়া আমাদের অধুনা বিলাসব্যসন অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতরাং এখন শিল্প-বিস্তারেরও আবশ্যকতা ঘটিয়াছে।

একথা নিতান্ত সত্য যে, এতদ্দেশবাসীর যাহাকিছু প্রয়োজন, তাহার সকলই এদেশে অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে এবং এককালে হইতও তাহাই;—এদেশের ধনবান-দিগের এপক্ষে ঔদাসিন্যই ভারতবর্ষের শিল্প-প্রসারের পক্ষে একমাত্র অন্তরায়। ইংরাজগণ কিন্তু বলেন যে, এদেশের লোকের আবশ্যক-দ্রব্যাদি অপর দেশ হইতে আমদানী হওয়াই সুবিধাজনক। কারণ, ব্যবসায়ের জন্য যে ব্যক্তি অর্থনিয়োগ করিবে, সে ব্যক্তি যে পণ্য লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, সেই দ্রব্যের বাজারে কি পরিমাণ কাট্‌তি হইবে, তাহা সর্ব্বাগ্রে 'যাচাই' করিবে। কারণ—কাট্‌তিতেই ত আয়—লাভ। এপক্ষে ভারতবর্ষের বাজারে পণ্যের কাট্‌তির পরিমাণ একান্তই সীমাবদ্ধ। য়ুরোপ প্রভৃতি প্রদেশের ব্যবসায়িগণের পণ্যের জন্য সমগ্র জগতের যাবতীয় পণ্য-বীথিকা উন্মুক্ত—ভারতবর্ষ তাহার সামান্য একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র! সুতরাং ইংরাজ-বণিক্ বা ধনী কেবল এদেশের উপযোগী কোন দ্রব্যজাত প্রস্তুতের জন্য এ দেশে কোন কারখানা স্থাপিত করিয়া, তাঁহার মূলধন আবদ্ধ করিতে সহসা সম্মত হন না। যে সকল পণ্যের ভারতবর্ষে অথচ অন্যত্রও কাট্‌তি হয়, সেই সকল দ্রব্য যে স্থান হইতে সহজে ও সুলভে সর্ব্বত্র প্রেরণ করা চলে, সেইরূপ কেন্দ্রেই প্রস্তুত করা সুবিধাজনক। ভারতবর্ষীয় ধনীদিগের কারখানা প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে এই একটা বড়ই যুক্তিযুক্ত আপত্তি। তজ্জন্যই দেখিতে পাই, যে সকল দ্রব্যের কাট্‌তি কেবল এদেশেই আবদ্ধ হইলেও, খুব বেশী পরিমাণে বিক্রয় হয় এবং যেগুলি অন্যত্র অপেক্ষা এদেশে সুবিধা মত উৎপাদিত হয়, এপর্য্যন্ত কেবল সেইগুলিরই কারখানা এদেশে স্থাপিত হইয়াছে। তবে, এখনও এবংবিধ আরও অনেক শিল্পপণ্যাদি আছে, যেগুলি নির্ম্মাণের কারখানা এখনও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ হওয়া সম্ভবপর এবং বাঞ্ছনীয়।

কোথায় কোন্ জিনিষের কারখানা স্থাপন করা লাভ-জনক ও যুক্তিসিদ্ধ, তাহার দু-একটা উদাহরণ দিই;—ধরুন এই কাচের কারখানা। বিলাতপ্রভৃতি দেশে যাবতীয় ঘরবাড়ীতে কাচের সার্সী আবশ্যক; তদ্ভিন্ন কাচের তৈজস-পত্রই সে দেশের লোকে প্রধানতঃ ব্যবহার করে। সুতরাং, সে দেশে কাচের কারখানা যেমন চলে, এদেশে সেরূপ চলে না। অধিকন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাচ-প্রস্তুতের জন্য যে দারুণ উত্তাপের প্রয়োজন, গ্রীষ্মপ্রধান এদেশে তাহা বিষম কষ্ট-দায়ক। এই প্রকার অপরাপর অনেকানেক শিল্প-পণ্যের ব্যবসায়োপযোগী বিস্তৃত কারখানা-স্থাপনের পক্ষে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় প্রভূত অসুবিধা দৃষ্ট হয়।

এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই ইংরাজেরা

বলিয়া থাকেন, যে এ দেশের লোক অধিকতর "সভ্য" না হইলে—এতদ্দেশবাসীর জীবনযাপনপ্রণালী সমধিক উন্নত, অর্থাৎ তাহাদের অভাব বিশিষ্টরূপে বর্দ্ধিত না হইলে,—বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদির প্রয়োজনাধিক্য না ঘটিলে, এদেশের শিল্পবিস্তার হওয়া সুদূরপরাহত! উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা ব্রহ্মবাসী ও পার্সীদিগের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে মোট যত পৌণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানী হয়, এক ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক লোকে তাহার ৭ শিলিং ৬ পেনী অর্থাৎ ৫৷৷৵০ মূল্যের পণ্য ক্রয় করে; আর, ভারতের অপরাপর প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রত্যেকে ২৷৷৵০ মূল্যের বিদেশীদ্রব্য ব্যবহার করে! কি দুর্দ্দৈব!—তাঁহারা বলেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অন্যান্য জাতীয়ের অপেক্ষা ব্রহ্মবাসীদিগের সংসার যে উন্নত প্রণালীর—তাহাদিগের মধ্যে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান এবং তাহাদিগের রমণীগণ যে প্রকৃত বিলাসিনী, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ! পার্সীদিগের পক্ষেও এই কথা প্রযুজ্য। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, সকল জাতির রমণীকুলই অধিকতর বিলাস প্রিয়; সুতরাং, যে জাতির মধ্যে রমণীর সমধিক আধিপত্য বর্ত্তমান, সেই জাতিই অধিকতর পরিমাণে বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করে—সেই জাতিই সমধিক সভ্য—তাহাদের মধ্যেই শ্রম-শিল্প বিস্তারের বিশালক্ষেত্র বিরাজমান। অবশ্য একথা নিতান্ত সত্য, যে দেশের লোকের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল না হইলে, দেশের শ্রম-শিল্পের অবস্থা সমুন্নত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ; এদেশের কৃষিজীবীর সংখ্যা প্রায় বিশকোটি; তাহাদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা উন্নত না হইলে, দেশের অপর কোনও উন্নতিই সম্ভবপর নহে। সেপক্ষে আমাদের উদার ইংরাজরাজ কি কি করিয়াছেন ও করিতেছেন, সংক্ষেপতঃ তাহার উল্লেখ করি;—১ম, ৪,২৪,৮৬,৭২৪ একর্ জমিতে জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন; ২য়, বিশেষ কষ্টে পতিত কৃষকগণকে "তাগাবী" বা অগ্রিম অর্থ-সাহায্য (কর্জ্জ) করিবার নিয়ম ত ছিলই, সম্প্রতি আবার 'কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; ৩য়, উন্নত প্রণালীতে চাষাদি কার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা, এবং সমুন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিবিষয়ক কলকব্জা প্রচলিত করিবার চেষ্টাযত্নও চলিতেছে; আসন্ন দুর্ভিক্ষকালে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর রেহাই দিবারও বিধি হইয়াছে। এই এতগুলি সুব্যবস্থা হইয়াছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেয় কর-বর্দ্ধনেরও সুব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ লোক ঋতুর মুখাপেক্ষী হইয়া কৃষিকার্য্যের উপর জীবিকার্জ্জন নির্ভর করে; ইহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক তিন কোটী লোক গড়ে কচিৎ দৈনিক ৵০ হারে মজুরি উপার্জ্জন করিয়া জীবনযাপন করে। অথচ ইহারা প্রত্যেকে বিলাতের "হোমচার্জ্জের" অনুপাতে স্ব স্ব অংশ দিতে বাধ্য। এই হোমচার্জ্জ কি কি বাবদে গৃহীত হয়, বলি;—১। জাতীয় ঋণের সুদ দিবার জন্য; ২। রেলপথনির্ম্মাণের জন্য যে টাকা ঋণ লওয়া হইয়াছে, তাহার আসলের নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিশোধ ও সুদ দিবার জন্য; ৩। বিদায় প্রাপ্ত 'ইণ্ডিয়া আফিস', 'সিভিল', সৈন্য এবং নৌ-সেনানী বিভাগের রাজকর্ম্মচারিবর্গের পেন্সন বাবদে দেয়। ৪। অবকাশপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীদের বেতন। অর্থাৎ, মোট কথা এই যে, ভারতবর্ষে নগদ অর্থের (মূল ধনের) এবং উপযুক্ত কার্য্যকারকের অভাব-প্রযুক্ত বিলাতের লোকের নিকট যে অর্থ কর্জ্জ করিতে এবং বিলাতবাসী যে সকল কার্য্যবীরের, সহায়তা-গ্রহণ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তজ্জন্যই (১৯১২-১৩) ১,৯৩,০২,২৯২ বিলাতবাসীকে "হোমচার্জ্জ" বলিয়া এতদ্দেশবাসীদের দিতে হইয়াছে এবং বর্ষে বর্ষে প্রায় ঐ পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত রাজস্ব হইতে বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। আর রাজস্বের Land Revenue, অর্থাৎ মাত্র জমির যে মোট কর আদায় হয়—সেই অংশটি সমস্ত বা কিছু অধিক (অর্থাৎ মোট রাজস্বের এক চতুর্থাংশ) রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্য-বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য নিয়োজিত হয়।* আর ভারতীয় প্রজাকুলের মানসিক উন্নতিসাধনকল্পে, প্রাথমিক বিদ্যা-শিক্ষাদানার্থ, ব্যয়িত হয়, সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়িত অর্থের সাত ভাগেরও কম।†

তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যা

* ১৯১৩-১৪ সালে মোট জমির খাজনা আদায় ছিল, ২,১২, ৫০, ৭০০ পৌণ্ড; সৈন্য-সংক্রান্ত ব্যয় হইয়াছে, ২, ১৩, ১', ২৩১ পৌণ্ড।

† ১৯১৩১৪ সালে বিদ্যাদানের ব্যয় হইয়াছে—৩২,২৯,১৮৩ পৌণ্ড।

বিষয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র পুরুষ অধিবাসী সংখ্যার প্রতি সহস্র জনের মধ্যে একশত ছয় জন মাত্র, য়ুরোপের প্রতি ছয় জনের মধ্যে একজন এবং জাপানে শতকরা নব্বই জন লেখাপড়া জানে। উপার্জ্জন বিষয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয় ১৫৲ হইতে ৩০৲, প্রত্যেক ব্রিটনবাসীর ২১০৲, প্রত্যেক উপনিবেশাধিবাসীর ২২৫৲ টাকা। মানবগণের সাধারণতঃ এক কৃষিজাত দ্রব্যাদি হইতে অথবা শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। যে দেশে প্রতি বর্গ মাইল ভূমি হইতে যত অল্পসংখ্যক লোক প্রতিপালিত হয়, তদ্দেশের কৃষিকার্য্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বুঝিতে হইবে এবং শিল্পশ্রম সেই পরিমাণে অল্পতর। ভারতবর্ষে প্রতি বর্গ মাইলে গড় ২৩২,* জার্ম্মানীতে ২৩৭, ইতালীতে ২৬৫, চীনদেশে ২৯০, হলাণ্ডে ৩৬১, ইংলণ্ডে ৫০০ এবং বেলজিয়মে ৭৪০ জন লোকের জীবিকা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান দেশ। তবুও কিন্তু ভারতবর্ষের চাষোপযোগী সমগ্র জমি কর্ষিত হয় না! সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় অর্দ্ধাংশ চাষোপযোগী। তন্মধ্যে মাত্র শতকরা ৩৭ ভাগে ফসলোৎপাদিত হয়, বক্রী শতকরা ১৩ ভাগ জমি পড়িয়া থাকে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার মধ্যে প্রায় সাড়ে চারি কোটী বিঘা জমিতে তূলা উৎপাদিত হইতেছে। ফলতঃ স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের ধনরত্ন যাহা কিছু একমাত্র জমি—এই জমির উপর যাহাতে অধিক কর ধার্য্য না হয়, জমিকর্ষণে রত কৃষাণকুলের উপর যাহাতে অযথা করভার ন্যস্ত না হয়, এরূপভাবে হইলেই এতদ্দেশবাসীর মজ্জাস্বরূপ কৃষাণকুলের উন্নতি সাধিত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শ্রম-শিল্পাদি ও বিস্তৃত হইবে। এতৎসম্বন্ধে যুক্তি পরে নির্দ্দেশ করিতেছি।

ভারতবর্ষে ভূমির কর কিরূপ অমিত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার একটু আভাষ দিই। পঞ্জাবে ১৮৯১ সালে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল—মোট ১৫ লক্ষ পৌণ্ড; ১৯০৬ সালে হইয়াছিল—১৯ লক্ষ ২৫ হাজার, অর্থাৎ ১৬ বৎসরে ক্রমে শতকরা ৩৯ মুদ্রা হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। বোম্বায়েও বিগত ৪০ বৎসরে প্রায় শতকরা ৩০ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কোনও কোনও তালুকে শতকরা ৩৩ হইতে ৬৬ মুদ্রাবৃদ্ধি পাইয়াছে। মাদ্রাজে বিগত ৩০ বৎসরে প্রায় ৩৩ মুদ্রা শতকরা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মধ্যভারতে পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৫০ হইতে ৬০ মুদ্রা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। বোম্বাই ১৮১৭ সালে দেশীয় শাসন কর্ত্তার অধীনে ছিল, সে সময় তথায় রাজস্ব সংগৃহীত হইত ৮০ লক্ষ টাকা, বৃটিশ অধীনস্থ হইবার দুই বৎসর পরে তথা হইতে ১ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। ১৮২৩ সালে হইয়াছে দেড় কোটী টাকা; ১৮৫৫ সালে ২ কোটী ৮০ হাজার; ১৮৯৫ সালে ৪ কোটী ৮৫ হাজার টাকা রাজস্ব-সংগ্রহ হইয়াছে। ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতে ১৯১২-১৩ এবং ১৯১৩-১৪ সালে যথাক্রমে মোট ২,১২,৮২,৪৬৮ এবং ২,১২,৫০,৭০০ পৌণ্ডভূমির রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রধান সচিবের কথায় সম্প্রতি প্রকাশ, 'যে শাসন-সৌকার্য্যার্থ যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধাংশ কেবল ভূমির কর হইতে উদ্ভূত হওয়া উচিত এবং সেই অনুপাতে ভূমি-কর বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।' সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশই ভূমির রাজস্ব পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প দৃষ্ট হয়—নচেৎ অন্য সর্ব্বত্রেই ক্রম-বর্দ্ধমান। লর্ড সালিসবরী বলিতেন যে, 'অপরাপর কর যে যে পরিমাণে গৃহীত, ভূমি-করও সেই পরিমাণে আদায় হওয়াই উচিত;—হইতেছেও তাহাই।' কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, যে কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এই নীতি হিতকর নহে। বস্তুতঃ, ভূমিকর না কমাইলে এ দেশের কৃষাণকুলের অবস্থা ইহারই মধ্যে যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অতঃপর তদপেক্ষা ভীষণতর হইবে, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়।

ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য-সভ্যতায় দীক্ষিত করিয়া—তাহার বিলাস-ব্যসনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়া—তাহার ভোগলালসা পরিবর্দ্ধিত করিয়া—তাহার নব নব অভাব সৃজন করিয়া—ভারতবর্ষের শিল্পশ্রম বিস্তারের চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নহে। অত্যধিক ভোগলালসা আমদানী করিয়া তৎতৃপ্ত্যর্থে বিলাস-দ্রব্যাদির আমদানী বর্দ্ধিত হইলে, যথার্থ জাতীয় উন্নতি কখনই সাধিত হয় না। বিজাতীয় ভাবে জাতিবিশেষ উন্নত হওয়া কি কখনও সম্ভব? জাতীয়তা অক্ষুন্ন রাখিয়া যে জাতি উন্নত হয়, সেই জাতির উন্নতিই প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী এবং কার্য্যকরী হয়। আমদানী করা উন্নত লইয়া জাপান উন্নতি হয় নাই—স্বদেশের

* কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান কালে ১৭৭ জন!

অভ্যন্তরীণ শক্তি-বিকাশেই জাপান এই অল্প কালের মধ্যেই এরূপ উন্নত হইয়াছে। ভারতে যে বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল, যদি সেই প্রথা অদ্যাপি বলবৎ থাকিত, সেই রীতিনীতি অব্যাহত থাকিত, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতন—শ্রম-শিল্পের বিলোপ-সাধন কখন হইত না। এখনও যদি সেই জাতীয় ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় শ্রম-শিল্প বিস্তারিত হইবার পক্ষে অণুমাত্র অন্তরায় ঘটে না,—অনায়াসেই সেই সকলের উন্নতি সাধিত হয়। ভারতবর্ষ অসভ্য দেশ নহে—এ দেশে কিরূপ সভ্যতা-বিস্তার ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; শ্রম-শিল্পের এতদ্দেশে কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহাও সর্ব্বজন বিদিত। ভারত দরিদ্র দেশও নহে—এখানে দারিদ্র্য দমনার্থে (poor-law) "দরিদ্র আইন" বিধানের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। কথা সত্য বটে, অভাবই উদ্ভাবনার জনক, পরিপোষক; কিন্তু আমাদের নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া, শিল্প-উদ্ভাবনার আবশ্যকতা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। আমাদের যে অসংখ্য অত্যাবশ্যক দ্রবচয় নিত্যনিয়ত প্রয়োজন- যে শ্রম-শিল্প আমাদের দেশে এককালে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—কিন্তু অযত্নে সে সকল বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে—সমুন্নত প্রণালীতে স্বল্প পড়তায় প্রস্তুত করিবার প্রয়াস করিলেই এদেশে প্রচুর শিল্প-বিস্তার সংঘটিত হইতে পারে। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে সকল শিল্প-পণ্যের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়, সে সকল প্রদেশে সেই শ্রেণীর শিল্প-বিশেষের উন্নতি-বিস্তৃতি-কল্পে অদম্য অধ্যবসায়-সহকারে অসংখ্য উর্ব্বরমস্তিষ্ক উদ্ভাবন-আবিষ্কার কার্য্যে ব্রতী থাকেন; কিন্তু সেই সকল নবোদ্ভাবনা হয়ত আমাদের দেশে সে পরিমাণে প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, আমাদের দেশের জন্য সেইশ্রেণীর উদ্ভাবনাদির সেরূপ আবশ্যকতা নাই। আমাদের দেশোপযোগী পণ্যপ্রস্তুতপক্ষে নবোদ্ভাবন নাই—আমাদের দেশজাত দ্রব্যাদি কার্য্যকরীরূপে পরিণত-করণোদ্দেশে অভিনব প্রক্রিয়াদি অবলম্বন-আবিষ্করণই আমাদের পক্ষে হিতকর—লাভজনক। আমেরিকায় সম্প্রতি কাষ্ঠকে অদাহ্য করিবার এক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে—উহা সেই সকল প্রদেশের, অর্থাৎ যে সকল দেশের লোক কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস করে, সেই সকল দেশের পক্ষে প্রভূত হিতকর। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা এদেশে আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদ্রূপ উডেন্ পেন্সিল, নিব প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা-স্থাপনও এদেশে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া আমাদের মনে হয় না; কারণ, লিখনাদি কার্য্য এদেশে অদ্যাপি সেরূপ বিস্তারিত ভাবে হয় না, যে পেন্সিল্, নিব্ প্রভৃতি প্রস্তুতের প্রশস্ত কারখানা স্থাপন করিয়া অপরাপর দেশোৎপন্ন উক্তবিধ পণ্যচয়ের প্রতিযোগিতা করা চলে। কিন্তু মোজা, ছাতা প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পক্ষে এ যুক্তি প্রযুজ্য নহে—এ সকলের প্রস্তুতি বিষয়ে যে আমরা চেষ্টা করিলে, সহজে বিদেশীয়গণের সহিত সমকক্ষ ভাবে না হউক, অন্ততঃ কতক পরিমাণে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে ছাতার পক্ষে একটা কথা, ইহার লৌহ-অংশগুলি এখনও বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে—সেগুলি এদেশে নির্ম্মাণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এদেশে প্রথম এমন সকল শ্রম-শিল্প প্রবর্ত্তিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ—এমন সকল পণ্যপ্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হওয়া বিধেয়—(১) যাহা বিদেশ হইতে আমদানী তৎশ্রেণীর পণ্য অপেক্ষা অল্প পড়্তায় উৎপাদিত হইতে পারে; অথচ যাহার এদেশে নিশ্চয়ই প্রভূত কাট্তি সহজেই হইবে। (২) যাহার জন্য সূচনায় অধিক পরিমাণ মূলধনের আবশ্যক হয় না। আলপিন্-সূঁচ প্রস্তুতের কারখানা বিলাতপ্রভৃতি দেশে চলে; কারণ তথা হইতে ঐগুলি সমগ্র পৃথিবীতে রপ্তানী হয়। তবে এতদ্দেশীয় বালক-বালিকাগণের বিবিধ খেলেনা সহজেই এদেশ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আবার "ওরাটরবরির" ন্যায় ট্যাঁক-ঘড়ি আমেরিকার ন্যায় প্রদেশেই প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর, অন্যত্র ঐরূপ সুলভে ওরূপ ঘড়ি প্রস্তুত করিতে পারা যায় না—সুপ্রশস্ত কারখানায় উহার যাবতীয় অংশ সুবৃহৎ কলে লক্ষলক্ষসংখ্যক এককালে উৎপাদিত ও যথাযথভাবে সমাবেশিত হইয়া, জগতের সর্ব্বত্র ঐ ঘড়ি-সকল নীত হয়। বোম্বায়ের কাপড়ের কলগুলির সূত্র ও মোটা কাপড়—মোট উৎপন্নের ৯০ ভাগ—যদি আফ্রিকা চীন প্রভৃতি প্রদেশে রপ্তানি না হইত, তাহা হইলে এতকাল ঐ কলগুলি কোন্ কালে বন্ধ হইয়া যাইত। কারণ, এই সকল দেশীয় কলে প্রস্তুত কাপড়ের কেবল মাত্র এতদ্দেশে যেরূপ কাট্তি বর্ত্তমান ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিলে ঐ কল-গুলি চলা একেবারেই অসম্ভব হইত। ফলে, একথা বারংবার

উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, যে যেসকল দ্রব্যের পৃথিবীব্যাপী কাট্তি বর্ত্তমান আছে, সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুতের যেখানে সুবিধা সুযোগ আছে, সেইখানেই সেই দ্রব্যের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সুবিধা ও লাভজনক। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে যত অধিক পরিমাণে বিভিন্ন জাতীয় তন্তু-উৎপাদক উদ্ভিদ্ জন্মে, তেমন আর জগতের কোথাও দেখা যায় না। অধুনা কত অসভ্য উলঙ্গ জাতি বস্ত্রাদি পরিধানে সভ্য হইতেছে, অর্ণবপোতাদি যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে গড়া-কাপড়, রজ্জু, কাছি প্রভৃতির যে পরিমাণে প্রয়োজনাধিক্য—টান • ঘটিতেছে, তাহাতে ভারতবার্ষীয় আঁইস যুক্ত বন্য উদ্ভিজ্জাদি,—যথা ঢেঁড়স, জবা, কস্তুরিদানা, বন-আনারস, হেঁতাল, ফণী-মনসা প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষাদি যে, কতবিধ কার্য্যে প্রয়োজিত হইতে পারে—কত বিপুল লাভজনক পণ্যে পরিণত হইতে পারে—তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে, ঐকান্তিক যত্নসহকারে এদেশের বন্য উদ্ভিজ্জগুলিকে কার্য্যকরী করিয়া লইতে পারিলে, এদেশে বহুতর বিস্তৃত, লাভজনক অভিনব-শ্রম-শিল্প স্থাপিত হওয়া বিশেষ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। তবে, প্রাচীন পন্থা-প্রক্রিয়ায় কার্য্য করিলে যে, প্রাচীন ধরণের পণ্য উৎপাদিত হইবে—নবোদ্ভূত পদ্ধতি অনুসরণে প্রস্তুত করিলে আধুনিক উন্নত-প্রণালীর পণ্য উৎপন্ন হয়, একথা সকলেই জানেন, সুতরাং উল্লেখ করাই বাহুল্য। ফলে, বর্ত্তমান অবস্থায় নূতন উপকরণের অনুসন্ধান ও নব-প্রণালী-প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান-গবেষণা-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে, নব পন্থা—নূতন পণ্য উদ্ভাবনা করা সম্ভবপর হয়—অনুসরণে অনুকরণে মনোমত, আবশ্যকমত দ্রব্যাদি জন্মে না। (Original Research) মৌলিক গবেষণা শ্রম-শিল্প-বিস্তারের প্রধান অঙ্গ। যেমন দেখুন, আঁইসযুক্ত লতাগুল্ম, এবং ছিন্ন-বস্ত্র, চট প্রভৃতি হইতে পোষ্ট-কার্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বন্য লতাগুল্মাদি হইতে পোষ্ট কার্ড প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে প্রক্রিয়াবিশেষে অদহনীয় করিয়া, চালা-ঘরের চাল-নির্ম্মাণোপযোগী খোলা বা টালির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট করিলে, দেশের একটা মহদুপকার সাধিত হয়। আবার কতশত গ্রাম, গণ্ডগ্রাম, নগর, মহামারীর প্রকোপে বিধ্বস্ত, ত্যক্ত হইয়া বনজঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ মাত্র ভস্মীভূত হইলে অল্লাধিক ক্ষারে পরিণত হয়—সাধারণতঃ, সমুদ্রতটসন্নিহিত স্থানোৎপন্ন বৃক্ষলতাগুল্মাদি ভস্মে অধিকতর Soda এবং সমুদ্র হইতে সুদূরবর্ত্তী স্থানজাত উদ্ভিজ্জাদি ভস্ম করিলে, অধিকতর Potash পাওয়া যায়; এতদুভয়ই ক্ষার-দ্রব্য-বিশেষ। এই সকল ক্ষারের কোন্‌টির কি রাসায়নিক ক্রিয়া স্থির করিয়া এই সকল বনজঙ্গল পুড়াইয়া, কার্য্যকরী দ্রব্যবিশেষে পরিণত করিতে পারিলে, ঐ সমুদয় পরিত্যক্ত প্রদেশ পুনরায় স্বাস্থ্যকর জনপদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অথচ নব নব শ্রম-শিল্পও উদ্ভাবিত হয়। এইরূপ সকল প্রচেষ্টায় দেশের অবস্থা, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শ্রম-শিল্পোন্নতিও সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গতঃ মৌলিক অনুসন্ধান-গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকার অবান্তর ফল-লাভ সম্বন্ধে একটা কথার উল্লেখ করি। এ দেশে যে চা গাছ উৎপন্ন হয়, বা হওয়া সম্ভব, তাহা পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। চীন দেশই চা-উৎপাদনের এক-মাত্র স্থান বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ছিল। জনৈক ইংরেজ পর্য্যটক এক সময়ে আসাম-প্রদেশে ভ্রমণকালে এক জাতীয় পতঙ্গ দেখিতে পাইয়া, কীটপতঙ্গবিদ্যানুসন্ধিৎসু তাঁহার বন্ধু-বিশেষকে উক্ত পতঙ্গ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করেন। বন্ধুবর পরীক্ষায় দেখিলেন, যে উক্ত পতঙ্গ চা'র পাতামাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং, তিনি অনুমান করিলেন, যে যে প্রদেশে এই পতঙ্গ জন্মে, সেই সেই অঞ্চলে চা'র বৃক্ষও নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। এই সূত্রে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা গেল যে, আসামের বন-প্রদেশে চা-বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে! সেই হইতেই আসাম প্রদেশে চা-আবাদ প্রবর্ত্তিত হইল। ডাঃ রক্সবরো (Dr. Roxburough) কর্ত্তৃক ভারতীয় "প্যারা রবার" আবিষ্কার-কাহিনীও এইরূপ কৌতূহল ও গবেষণার ফল।

আর একটা নূতন শিল্পের কথা বলি—ইষ্টকের পাঁজা পুড়াইবার সময় যেখানে সমধিক উত্তাপ লাগে, সেই সকল অংশের ইষ্টকগুলি 'ঝামা'য় পরিণত হয়। ঝামা সহজে ভগ্ন হয় না; অথচ যেমন ভারসহ, তেমনি অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। সচরাচর চালা ছাইবার জন্য যে সকল "খোলা" ব্যবহৃত হয়, সেগুলির দোষ—সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়, তজ্জন্য প্রতি বর্ষে বর্ষাকালের পূর্ব্বে সেগুলিকে পাল্‌টাইয়া আবার কতক নূতন "খোলা" দিতে হয়। উক্ত ঝামার ন্যায় উপকরণে

খোলা” প্রস্তুত করিতে পারিলে, সেগুলি বিশেষ ভঙ্গপ্রবণ হইবে না। এইরূপ “খোলা” প্রস্তুত করিলে কতদূর কার্য্যকরী হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, দেশের একটা বিশেষ অসুবিধা বিদূরিত, অথচ একটা নূতন শ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্য এরূপ খোলা যাহাতে বেশ সুলভ মূল্যে উৎপাদিত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অর্থ-নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, অর্থ-নীতি-সমুন্নতির প্রধান উপকরণ—ভূমি; এদেশে তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান। দ্বিতীয় উপকরণ অসিদ্ধ বা কাঁচা মাল;—এদেশের মত বহুল পরিমাণ বিবিধ জাতীয় পণ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনার্থ প্রয়োজনীয় অসংস্কৃত মাল-মসালা বা কাঁচা মাল জগতের অপর কোথাও সুলভ নহে। এককালে এই সকল সুবিধা-সংযোগেই এদেশের শ্রম-শিল্প যথেষ্ট উন্নীত—প্রসারিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতবাসিগণ বিবিধ ধাতুদ্রব্যের গুণাগুণ, বিবিধ ক্ষার (alkali), লবণ (salts), প্রভৃতির ক্রিয়া—উপকারিতা ও অপকারিতা জ্ঞাত ছিলেন; Sulphuric (গন্ধদ্রাবক), Nitric (যবক্ষার), Muriatic-প্রভৃতি দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিতেন—রসায়নাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; কাশী ও মোরাদাবাদের ধাতু-তৈজস, মৈনপুরীর ‘তারকাশী’ কার্য্য, পঞ্জাব ও আহম্মদাবাদের দারু-তক্ষণ (কাষ্ঠ খোদাই) শিল্প, মহীশূর ও কানাড়ার চন্দনকাষ্ঠ-শিল্প, সুরাটের শুক্তি-শিল্প, ভিজাগপত্তনের দ্বিরদশিল্প, কাশ্মীরের শাল-দোশালা, ঢাকার মস্‌লিন্ প্রভৃতি, বিভিন্ন প্রদেশের পশুলোমজাত, কৌষেয় ও কার্পাস বস্ত্র-শিল্প পৃথিবীতে কিরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন! কিন্তু সে সকলের অবনতি ঘটিল কিরূপে?—প্রধানতঃ যে পঞ্চবিধ কারণে পূর্ব্বকালে শ্রম-শিল্পে উন্নতি ঘটিয়াছিল, সেইগুলির অভাবেই অধুনা অবনতি ঘটিয়াছে; সে কারণগুলি এই—

১। সে সময়ে দেশের কৃষি-উৎপন্ন কোন দ্রব্য রপ্তানী হইত না, লোকসংখ্যাও অল্পতর ছিল; আহার্য্য দ্রব্য সুলভ বলিয়া লোকে উদরপূরণ করিয়া শীতল মস্তিষ্কে পূর্ণ উদ্যমে স্ব স্ব বৃত্তি অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিত।

২। আহার্য্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সুলভ বলিয়া সাধারণলোকের অর্থ উদ্বৃত্ত হইত; তদ্দ্বারা দেশসম্ভব ভোগবিলাসের বহুমূল্য শিল্পপণ্যাদি ক্রয় করিয়া শিল্পিকুলকে প্রোৎসাহিত করিত। আহার্য্য, ও নিত্য-প্রয়োজন দ্রব্যাদির মূল্য মহার্ঘ্য হইলে, লোকে অপরবিধ দ্রব্য স্বতঃই সুলভ মূল্যে ক্রয় করিতে চাহে; কাজেই প্রাচীন বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি, ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে লোকে ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়।

৩। যখন দেশের অধঃপতন ঘটে, তখন তাহার পক্ষে বিদেশী স্বাধীন জাতির সহিত কোন বিষয়েই প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় না। এইরূপে ক্রমে বহির্ব্বাণিজ্য লুপ্ত হয়।

৪। বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ-নীতি যখন প্রবল ছিল, তখন কেহই স্ববৃত্তি-ভিন্ন অপর বৃত্তির অনুসরণ করিতে সাহসী হইত না; কিন্তু কালে সে নীতি শিথিল হওয়ায় সকল বর্ণই সর্ব্ববিধ বৃত্তিতে পরস্পরের প্রতিযোগিতা-সাধনে প্রবৃত্ত হইল! বৃত্তিবিশেষে একাধিপত্য থাকিলে সেই বৃত্তিমাত্রই যাহাদের আশ্রয় ছিল, তাহাদের যেমন প্রভূত উপার্জ্জন ঘটিত, কালে তাহার অন্তরায় ঘটিল। কাজেই জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, লোকে স্বেচ্ছাচারী ও দরিদ্রতর হইয়া পড়িল। এইরূপেই অনেকানেক বর্ণগত শিল্প বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

৫। জাতীয়তার শৈথিল্যে এদেশীয় শিল্প বিশেষের যেমন অবনতি ঘটিল, বিজাতীয়েরা সেই সুযোগে তাহাদের দেশজাত কলকব্জার সাহায্যে প্রস্তুত সুলভ পণ্য প্রচালনে সচেষ্ট হইলেন। লোকের “সুলভ”-প্রীতিও কলকব্জা-প্রস্তুত বিদেশীয় পণ্যবিস্তারে সহায় হইল। আবার বিদেশীয় সুলভপণ্যের বহুপ্রচলনে এতদ্দেশজাত শিল্পপণ্য বিলুপ্তপ্রায় হইল!

মোট কথা, ল্যাঙ্কাশায়ার—ঢাকা, চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গাপ্রভৃতি স্থানের বস্ত্র-শিল্প বিলুপ্ত-প্রায় করিয়াছে; পেস্‌লী (Paisley)—কাশ্মীরি শালকে লাঞ্ছিত করিয়াছে; বার্ম্মিংহাম—কাশী, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে! এখন আর সে সকল ঠিক পূর্ব্বমত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্যও নহে, এবং বিশেষ অর্থকরী হইবে বলিয়াও মনে হয় না। গতিশীল পৃথিবী, সেই বিগত কাল অপেক্ষা এক্ষণে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে; এই উন্নতি, নূতনত্বের দিকে; সেই সকল প্রাচীন পরিকল্পিত শিল্পপণ্য আর লোকের মনোরঞ্জনে সক্ষম হইবে কি না, সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল!

সুতরাং, পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, আবার তাহাই পুনরাবৃত্তি করি ;—এক্ষণে আবশ্যক এই যে, অভিনব প্রক্রিয়ায় অভিনব উপকরণ-সংযোগে আধুনিক রুচিসম্ভব পরিকল্পনা-সমন্বয়ে অভিনব শিল্পের উদ্ভাবনা—প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্ভবমত প্রাচীন শিল্পগুলিকে নূতন পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত করা প্রয়োজন। এই একাকারের দিনে বর্ণভেদে বৃত্তি-ভেদ-নীতি যখন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সুসাধ্য নহে, তখন "উঞ্ছ-বৃত্তি" এবং যাবতীয় বর্ণ-বৃত্তিগুলিকে শিক্ষিত-সমুন্নতবৃত্তিতে উন্নীত করিতে একান্ত যত্নবান্ হওয়াই আশু কর্ত্তব্য। কারণ, তবেই শিক্ষিতসম্প্রদায় সেই সকল বৃত্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে—নচেৎ নহে।

প্রাচীন একটা ধারণা আছে—যাবতীয় শ্রম-শিল্প বা হস্ত-সম্পাদিত শিল্প সমাধানে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। এটা কিন্তু একান্তই ভ্রান্ত ধারণা ; কারণ, শিল্পমাত্রেরই সৌকর্য্য সৌন্দর্য্য-সমন্বয় ভিন্ন সম্ভবে না ; আবার প্রকৃত সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি বিদ্যা-শিক্ষা ব্যতীত ক্বচিৎ ঘটে ; অধিকন্তু বিদ্যা-শিক্ষা, জ্ঞান-ব্যুৎপত্তি ভিন্ন মৌলিকতা—উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ—যথাযথ রূপ হয় না। মৌলিকতা—অভিনবত্বই শ্রম-শিল্পের শ্রী, শিল্প-সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের একমাত্র সহায়। সুতরাং সকলবিধ শ্রম-শিল্পের উঞ্ছ-বৃত্তি বা বর্ণ-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন—সমাধানকল্পে বিদ্যাশিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। শিল্পিবর্গের মধ্যে বিদ্যা-বিদ্বেষ—বিদ্যাশিক্ষাসুলভ উদারতার অভাবও এতদ্দেশীয় শ্রম-শিল্পাদির ক্রমাবনতির অন্যতম কারণ।

এইবার উদ্ভাবনা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এ দেশে সুনিপুণ, মৌলিকতা-সম্পন্ন শিল্পীর যে অভাব, এ কথা কেহ যেন মনে না করেন। বোধ হয়, এ দেশে বর্ণগত বৃত্তি প্রচলিত বলিয়াই—বংশ-পরম্পরায়, পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকে বলিয়াই সুদক্ষ কারুকর বিরল নহে—তাহাদের অনেকেরই পৈত্রিক বৃত্তি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তির প্রকৃত সমাদর, যথাযথ "কদর" এ দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! তাই বলিয়া, যে এ দেশের নব-উদ্ভাবিত কলকব্জার আদর নাই, তাহা নহে। আকমাড়া কল, সেলাইয়ের কল, কুটী-কাটা কল, প্রভৃতি এখনই যথেষ্ট সমাদৃত হইতেছে। সেইরূপ কার্য্যকর ছোট-খাট, অথচ সুলভ মূল্যের "ধান ছাঁটাই কল" বা "মশলা পিষাই কল" প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে, যে এ দেশের লোকে সাদরে সে সকল গ্রহণ না করিবে, তাহাও নহে। তবে, এ সকল সামান্য সামান্য উদ্ভাবনা কল্পে একান্তনিষ্ঠ হইয়া ব্যাপৃত থাকেন কয় জন ?* তদ্ভিন্ন, বিলাত প্রভৃতি দেশে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উদ্ভাবনা করিয়াই উদ্ভাবনকর্ত্তা যেরূপ লাভবান হন, এ দেশে তদ্রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। উদাহরণ-স্বরূপ বিদেশীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করি :—

১। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেই "পাইপ" দ্বারা ধূমপান করিয়া থাকেন ; এই পাইপের রন্ধ্রপথে তামাকের "কাট্" জমিয়া ধূম তীব্র বা কটু হইয়া উঠে। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এই অসুবিধা-দূরীকরণার্থ একটি সূক্ষ্ম লৌহ-তার লইয়া, অপর একটা তার উহাতে জড়াইয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়কের ন্যায় করিয়া, পাইপে প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিলেন, তদ্দ্বারা পাইপগুলি সহজে সুপরিষ্কৃত করা চলে ; ইহাতে সিকি পয়সাও ব্যয় নহে। এই সামান্য উদ্ভাবনার "পেটেণ্ট" লইয়া উদ্ভাবনকর্ত্তা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

২। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে বালক-বালিকাদিগের জুতাগুলির মুখাগ্রই সর্ব্বপ্রথমে অচিরে ছিন্ন হইয়া যায়। এক ব্যক্তি এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জুতাগুলির শিরোভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তাম্রফলক সংযোগ করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত করিয়া, তাঁহার এই কৌশলের জন্য অন্যূন ১৫ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন।

৩। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম "রবার ষ্ট্যাম্প" প্রস্তুত-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার মাত্র এই উদ্ভাবনা হইতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের সংস্থান হইয়াছে।

৪। চিঠির খামের মুখে যে ভাবে গঁদ লাগান থাকে, সেইরূপ গঁদযুক্ত সংবাদপত্রের মোড়ক উদ্ভাবিত করিয়া, জনৈক ভাগ্যবান্ বিপুল ধনশালী হইয়াছেন।

* গৃহকার্য্যোপযোগী কলকব্জা উদ্ভাবন করিতে হইলে, যাহাতে সে কল বিশেষ সুলভে উৎপন্ন হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আট আনা দশ আনা মূল্যের জাঁতিতে যে কাজ চলে, তাহার জন্য দশ-বার টাকা মূল্যের "গুপারি কাটা কল" সহজে কেহ কিনিবে না।

৫। জনৈক উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী, একদা ভূমিসদৃশ জলশূন্য পথে কুচ্ করিয়া যাইবার সময়, াভাবে একান্ত কষ্ট পাইয়া, Tube well নামক সহজে ল জল-নিষ্কাশনের কৌশল আবিষ্কৃত করিয়া, প্রায় তিন াটী টাকার বিত্ত সংস্থান করিয়া গিয়াছেন।

৬। জনৈক সামান্য মজুর খনিতে কার্য্য করিত। ার যন্ত্রপাতি-বহনের অসুবিধা দেখিয়া, লোকটি স্বীয় াট ও পেণ্টালুনের উপর "আই-হুক" সম্বলিত এক ক খণ্ড বস্ত্র সংযুক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা স্বীয় আবশ্যক পাতি পোষাকের উপর আবদ্ধ করিয়া লইল এবং িরে এই কৌশল-উদ্ভাবনাফলে প্রভূত ধনশালী হইয়া ঠল।

এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিরল নহে। ফল কথা, তদ্দেশবাসিগণ চিন্তা-বষণা করে—প্রত্যেক সামান্য সামান্য বিষয়েও যে উন্নতি-ধিত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করে, এবং নব নব াশলাদি উদ্ভাবনা করিতে পারিলে যে, প্রচুর ধনসম্পত্তি পার্জ্জিত হইতে পারে, তাহারও দৃঢ় ধারণা আছে। ধিকন্তু, তাহারা ইহাও জানে যে, যে কোনও অভিনব াশল উদ্ভাবনা করিতে পারিলে, তাহার স্বত্ব-সংরক্ষণের য "পেটেণ্ট" আফিস বর্ত্তমান রহিয়াছে। উদ্ভাবকের বলমাত্র লোকসাধারণের কোন্ বিষয়ের কোথায় সুবিধা-অভাব রহিয়াছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া কিরূপে তাহা সহজে অথচ সুলভে বিদূরিত হইতে পারে, তদুপায় বা কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিলেই শ্রমসার্থক ও অর্থলাভ ঘটে।

পরিশেষে দুই একটা কথা বলি ;—শ্রম-শিল্প সম্বন্ধে সুবৃহৎ কারবার-কারখানা স্থাপিত করিতে হইলে, তৎপণ্যের বিপুল কাট্তির প্রয়োজন—তাহা রপ্তানী করা আবশ্যক। সে সুযোগ সুবিধা আমাদের দেশে আপাততঃ ঘটা দুরূহ। সুতরাং, যে সকল পণ্য এতদ্দেশবাসী মাত্রেব একান্ত প্রয়োজন, সেই সকলের ছোট ছোট কারখানাদি স্থাপনে উদ্যোগী হওয়াই উচিত। আবর্জ্জনা-জঞ্জাল বলিয়া যে সকল দ্রব্যাদি আমরা উপেক্ষা করিয়া দূরে ফেলি, সেই সকল দ্রব্যকে আবশ্যকমত কার্য্যে প্রয়োগ করা—ভারতবর্ষে ঘাটে, মাটে, বনে, জঙ্গলে, ভূগর্ভে, যে অসংখ্য বিচিত্র দ্রব্য-সম্ভার বিক্ষিপ্ত অযত্ন-পতিতভাবে বিরাজমান, তৎসমুদায়কে পণ্যবিশেষে পরিণত করিতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। একটি নূতন শিল্প উদ্ভাবিত করিতে পারিলেই, সঙ্গে সঙ্গেই আনু-ষঙ্গিক বিবিধ শাখা-শিল্প অভ্যুত্থিত হইবে—এইরূপে শিল্প প্রসার ঘটিবে। প্রকৃতির কোনও বস্তু বৃথায় নষ্ট হয় না—পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করা মানবের কার্য্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, ঐকান্তিকতা সহকারে লক্ষ্য করিলেই প্রত্যেক অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যেরও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি হয় —উপলব্ধি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে, সংযতরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলেই অর্থসিদ্ধি ঘটে।

মানব ও তৃণ

[শ্রীগণেশচন্দ্র রায়]

নব কহিল,—"ওরে তৃণ,—ওরে চরণে দলিত ওরে,
ারাটি জীবন কাটাইলি নর-চরণের তলে পড়ে!
শুব আহার জীবনে তোমার চরম সার্থকতা,
তোমার মতন ঘৃণিত জগতে কেবা আর আছে কোথা?"
ঈষৎ হাসিয়া মাথা তুলি' তৃণ কহিল, "নাহি কি মনে,
মস্তকে তব আশীষের ধারা বরষি ধান্য সনে!"

বিশেষ শাস্তি পাইতে হয়। এই দেশের বৃদ্ধেরা আজকাল ক্ষোভ করিয়া বলিয়া থাকে, "হায় হায়! আজকাল এমন হইয়াছে যে, লোকে বাসদেবের দেশে সর্প মারিতে সুরু করিয়াছে!"

এখনকার মন্দিরগুলি সর্পের নামে উৎসর্গীকৃত নয়। এই দেশের অধিবাসীদের প্রাচীন শাসনবিধাতা ছিলেন নাগরাজা; তাঁহাদেরই নামে তাঁহাদেরই পূজার জন্য মন্দির গুলি উৎসর্গীকৃত।

শেষ নাগ, তথৎনাগ, বাসবনাগ প্রভৃতির মূর্ত্তি নরাকারে গঠিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকে। প্রতি নাগের শিরোপরি পাঁচটি, সাতটি অথবা নয়টি করিয়া ফণার বিস্তার রহিয়াছে। এগুলি মস্তকের উপর চন্দ্রাতপ-আকারে পরিশোভিত। আমরা নিম্নে Frgusson সাহেবের "Tree and serpent worship" হইতে এইরূপ একটি মূর্ত্তির প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। এমন অনেক নাগ-দেবতা

নরাকৃতি নাগপূজা

আছেন, যাঁহারা বড় খ্যাতিশীল ন'ন। এই ছোটখাট রকমের নাগ-দেবগণও সর্পদ্বারা পরিবৃত থাকেন, তবে তাঁহাদের মাথার উপর সাপের চাঁদোয়া থাকে না। নাগিনীগণও ইহাদের পূজা পাইয়া থাকে। নাগিনীগণ নাগপত্নী —কিন্তু আজকাল অনেক সময় এই নাগপূজকগণ নাগিনীগণকে দেবী-দুর্গা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। আদিম যুগের এই সমস্ত মন্দিরের কোথাও সপ্তশিরোবিশিষ্ট নাগ অথবা পুচ্ছযুক্ত নর-নারীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। Surgeon Major Oldham বহু অন্বেষণেও ভারতের অন্যত্র সুলভ এরূপ মূর্ত্তি কুত্রাপি খুঁজিয়া পান নাই।
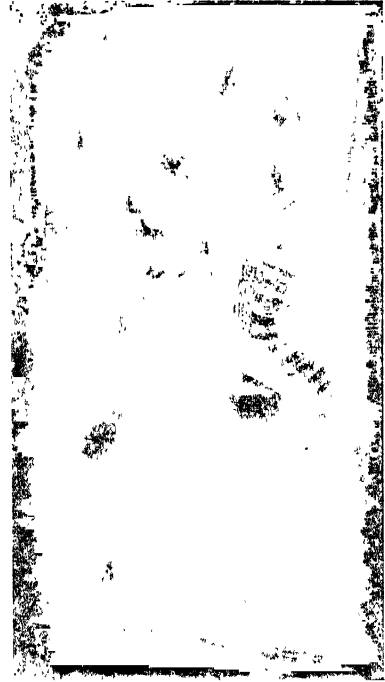
সনাগ শিবমূর্ত্তি

ভারতে অন্য সকল স্থানেই সর্পাকৃতিবিশিষ্ট নাগের পূজা হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু সেটুকু হইবার যো নাই। নাগ-দেবতাগুলি সবই মানবাকারের—এখনকার নাগ-পূজা বলিলে বুঝায়—নাগজাতির রাজার পূজা। নাগদেবতাকে ইহারা যেরূপ উচ্চাসন দিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কোন দেবতাই নাগদেবতার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। ভারতের অন্যান্য স্থলে হিন্দুদেবদেবীর তুলনায় নাগদেবের আসন কোথাও সর্ব্বোচ্চে নয়—বরং কয়েক পইঠা নীচে। ইহাদের এখানকার পূজাপদ্ধতি হিমালয়ে পূজিত অন্যান্য দেবদেবীর মত। ইহাদের নাগ-পূজায় ছাগ ও মেষ বলি হইয়া থাকে। পূজাকালে ধূপদীপাদি প্রজ্বালিত করা হয়। কোন বিপদাপদের সময় অথবা কোন বিশেষ কারণে আবশ্যক হইলে ইহারা নাগ-দেবের আদেশ-প্রার্থনা করে।

নরাকৃতি নাগপূজা

নাগ-দেবের পুরোহিতগণের মুখ হইতে তাহাদের প্রার্থিত আদেশ তাহারা পাইয়া থাকে। উৎসব-কালে নাগদেবগণকে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়; উৎসবের সময় মেলা বসে, অনেক রকম ক্রীড়াকৌতুকের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই উৎসব প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ-যোগ্য মনে করি। উৎসবে বিভিন্ন বর্ণ উচ্চনীচ অনুসারে বিভিন্ন আসন পাইয়া থাকে। সকলে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একত্র বসিতে পায় না। মন্দিরের আশেপাসে গন্ধর্ব্ববিদ্যা-কুশলীদিগের বাসস্থান। ইহারা নীচবংশোদ্ভব, কাজেই ইহাদিগকে মন্দিরের নিকট আসিতে দেওয়া হয় না। ইহারা দূর হইতে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করে এবং নৃত্যগীতবাদ্য করিয়া থাকে। অধিকাংশ মন্দিরই খুব পুরাতন, বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়া বেশ ভাল করিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কৃতপরিচ্ছন্ন করিয়া, মন্দিরগুলি তৈয়ারি করা হইয়াছে। এই সমস্ত কাঠে সূর্য্য, সর্প এবং অন্যান্য মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দুঃখের বিষয়, আজকাল রেলের কার্য্যের সুবিধার জন্য এই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ-গুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।

প্রত্যেক মন্দিরে নাগ-রাজার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। পূজারিগণ সাধারণতঃ এই মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলি লৌহের ত্রিশূল রাখিয়া থাকে। কিন্তু এই ত্রিশূলের সঙ্গে শিবের কোন সম্পর্ক নাই। শিবকে ইহারা আদৌ আমল দেয় না। শুনা যায়, শিবলিঙ্গের উপর ইহারা বসিবার আসন তৈয়ারি করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে একজন কাশ্মীরের শৈব অধিপতি কর্ত্তৃক এখানে কয়েকটি শিবলিঙ্গ আনীত হইয়াছিল। তিনি নিজের বিজয়-চিহ্নের স্বরূপ শিবপূজাপ্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নাগ-পূজকগণ শিবলিঙ্গের সম্মান রক্ষা না করিয়া, এই রূপই ব্যবস্থা করিয়াছে।

ইহাদের সমস্ত মন্দিরে সূর্য্যমূর্ত্তির কিছু বাড়াবাড়ি। ছাদের উপরে এবং প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে সূর্য্যমূর্ত্তির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। রাবী নদীর উপরিস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেকগুলি মন্দির বা আস্তানা আছে। সেই মন্দিরগুলির অধিষ্ঠাতৃদেব—"ইন্দ্র-নাগ"। এই ইন্দ্র-নাগ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

এই নাগ-জাতির এক রাজা ছিল। তাঁহার নামটি আর জানিবার কোন উপায় নাই। ইনি নাকি প্রবলপ্রতাপান্বিত ছিলেন, এমনই ইঁহার বিক্রম যে, ইনি স্বর্গে ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত তাড়া করেন। ইন্দ্র ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইনি শেষে স্বর্গে ইন্দ্র হইয়া বসিলেন। নবীন ইন্দ্রের স্বর্গ বড় ভাল লাগিল না। কিছুকাল স্বর্গে বাস করিয়া আবার নাগ-দেশে আগমন করিলেন, তখন হইতেই তিনি নাগদিগের দ্বারা ইন্দ্রনাগ বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। আমাদের বোধ হয়, এই ইন্দ্র-নাগ আর কেহই নহেন;—মহাভারত-প্রখ্যাত নহুষ। বায়ু, হরিবংশ এবং মহাভারতে নহুষের উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র-নাগের মস্তকে উষ্ণীষ, হস্তে ধনু, এবং ইনি সর্পকুল পরিবেষ্টিত।

কোন কোন অসুর অধিপতিকে ইহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। নহুষের সহোদর রজি জাতিতে নাগ ছিলেন। দেবতারা ইঁহাকে নাকি দেবতা বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। বাসুকি হইতেছেন, ইঁহাদের বাসদেব; প্রবাদ আছে যে, ইনি গরুড়ের সহিত যুদ্ধে নিরত ছিলেন।

এদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, একদিন বাসুকি

সহসা গরুড় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, হঠাৎ এইরূপ ভাবে বিপন্ন হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি কৈলাসকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন। কৈলাসকুণ্ড, রাবি ও চিনাব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য হ্রদ। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে এই কুণ্ডে মেলা বসিয়া থাকে। দেশবিদেশ হইতে হিন্দুযাত্রীরা এখানে পুণ্যলাভের জন্য আসিয়া থাকে।

কথাসরিৎসাগরে জীমূতবাহনচরিতের সঙ্গে এই আখ্যায়িকার কতক সাদৃশ্য আছে! নাগানন্দের গল্পাংশও তাই—কেবল নাট্যাকারে লিখিত।

আমরা যাহাদিগকে নাগ-জাতি বলিতেছি, তাহারা কিন্তু কখনও আপনাদিগকে নাগ বলিয়া উল্লেখ করে নাই। এই নাগদেশীয় লোকে আপনাদিগকে তাখ বা তখ বলিয়া থাকে। ইহাদের মতে ইহারা তখ্য নাগ বা বাসদেবের জাতি। তাখ বা তক্ষকদিগকে দেখিতে বেশ সুন্দর। আজকাল কাশ্মীর-সেনা-বিভাগে অনেক তাখ কাজ করিতেছে। ইহাদের চেহারা রাজপুতদের ন্যায়। তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহারা সূর্য্যবংশোদ্ভব। ভারত-বিশ্রুত চাঁদকবিও ইহাদিগকে ছত্রিশটি রাজবংশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্জাবের পাহাড়িয়া অঞ্চলে যে প্রাচীন তাখারি বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা এই তাখ-জাতির নাম হইতে উৎপন্ন।

কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বাসক-নাগ ও তক্ষকের নাম প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত। নাগরাজগণ হিমালয়, উত্তর ও মধ্য ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ, সিন্ধু-উপত্যকা এবং সিন্ধুনদের মোহানার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহল প্রভৃতি সুদূর প্রদেশেও ইহারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সিন্ধুনদের উপত্যকা ইহাদের পাতাল।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, এবং প্রথমযুগের বৌদ্ধ-গ্রন্থে নাগজাতির প্রতাপের বিষয় বিশেষভাবে লিখিত আছে।

নাগগণ সূর্য্যোপাসক ছিল এবং সংস্কৃতে কথা কহিত। ফণাবিস্তারশীল সর্প তাহাদের জাতীয় চিহ্ন ছিল। কালক্রমে এই চিহ্নের কথা লোকে ভুলিয়া গেল; নাগ বলিয়া যে একটি জাতি, তাহাও লোকের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইল। ক্রমশঃ লোকে প্রাকৃত নাগ বা সর্পকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কাশ্মীরের সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে নাগ-জাতীয় রাজাদেরই পূজা এখনও হইয়া আসিতেছে। তবে লোকে সে পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে, সমস্ত গোলমাল করিয়া সর্প-পূজাকে নাগ-পূজার স্থান দিয়াছে।

সর্পাকৃতি নাগপূজা

বর্ত্তমান যুগে এসিয়ার প্রায় সমস্ত প্রদেশে কোন না কোন আকারে নাগ-পূজা হইয়া থাকে। এ সমস্ত নাগ-পূজা সর্পরাজেরই পূজা—নাগ-জাতীয় রাজার পূজা নহে।

ভারতবর্ষে বহুস্থানে বর্ব্বরজাতিদিগের মধ্যে নাগ-পূজার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। অমরাবতীর স্তূপে যে সমস্ত স্থাপত্যের নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তিতে শিরোপরি চন্দ্রাতপ-আকারে নাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্তূপের অন্যান্য স্থাপত্যেও সর্পপূজার যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শ্রমণগণকেও নাগপূজার অনুষ্ঠানে রত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। নেপালে বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির শিরোদেশ সপ্তশীর্ষ নাগ দ্বারা আচ্ছাদিত। বৌদ্ধ গ্রন্থে এমন অনেক উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, বৌদ্ধযুগেও নাগ-পূজার যথেষ্ট প্রচলন* ছিল। এক-স্থানে উল্লেখ আছে যে, যেখানে বুদ্ধ নাগ-রাজ মুচলিন্দ দ্বারা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেখানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অশোক নাগ-পূজা করিতেছেন, এরূপ একটি মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে। মহাবংশ পাঠে আমরা অবগত হই যে, অশোক মহাকাল-নামক নাগরাজকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। Fergusson সাহেব লিখিয়াছেন যে, আজও মণিপুরে একটি উৎসব হইয়া থাকে, সেই উৎসবে নাগরাজ-সর্পকে শয্যার উপরে শায়িত করা হয় এবং সোপচারে তাঁহার যথাবিধি পূজাদির অনুষ্ঠান করা হয়। চৈনিক পরিব্রাজকদিগের বিবরণ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে নাগ-পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। Fa Hien লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে সঙ্কিস নামক স্থানে একটি নাগ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ নাগ-মন্দিরে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ নাগ-দেবের পূজা করিতেন। Young Chwang বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন দেশে অনাবৃষ্টি হইত, তখন তক্ষশীলাবাসিগণ এলাপত্র নাগ-মন্দিরে পূজা দিত। তাহাদের উদ্দেশ্য—নাগরাজ সন্তুষ্ট হইলে দেশে সুবৃষ্টি হইবে। এলাপত্র নাগ-মন্দিরে পূজক থাকিতেন বৌদ্ধ শ্রমণগণ। লিচ্ছবিগণ বুদ্ধদেবের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিল। ইহারাও নাগ-পূজা করিত। নাগ-লিচ্ছবিদিগের রাজধানী বৈশালীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ছিলেন। ইহারা নেপাল, লাহুল, এবং তিব্বতের কোন কোন স্থানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। এই সমস্ত স্থানে নাগ-পূজার যথেষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কমায়ুন ও গাড়োয়াল প্রদেশে এখনও নাগ-পূজার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি স্থানে ৮০টি নাগমন্দির আছে। পঞ্জাবের হিমালয় প্রদেশে কতগুলি মন্দির আছে, তাহা বলিতে পারি না; তবে নাগপূজার ব্যবস্থা সেখানে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের স্থাপত্যে যে সমস্ত পূজোপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্প একটি। এতদ্ভিন্ন সূর্য্য এবং ত্রিশূল উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বস্তিকাদি চিহ্নও কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ এবং ইহার সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে সর্পপূজার বহু প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে। Frederick বলি-দ্বীপের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে বাসুকিপূজার বিধি লিপিবদ্ধ আছে। উত্তর-ভারতের নাগ-মন্দিরগুলিতে একটি করিয়া ত্রিশূল রক্ষিত হইয়া থাকে। এই ত্রিশূল না থাকিলে মন্দিরগুলির পবিত্রতা সংরক্ষিত হয় না। ত্রিশূলগুলির একটি চিত্র এবং তৎসঙ্গে লোহাডাঙ্গায় যে বাসদেবের মন্দির আছে, তাহার একটি চিত্র এই স্থলে প্রদত্ত হইল।
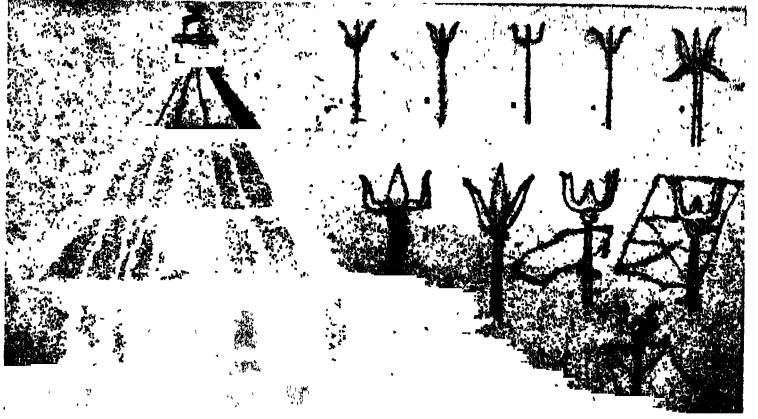
বাসুদেব মন্দির

প্রাচীন নাগপুরে নাগপূজার প্রচলন খুব বেশী। এখানকার নীচ জাতিরা নাগের পূজা করিয়া থাকে, কেহ কখনও নাগহত্যা করে না। ইহাদের নাগ-পূজায় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা—জল, চন্দন, পুষ্প, তণ্ডুল, বিল্বপত্র, দুগ্ধ, দধি, বস্ত্র, রক্তচূর্ণ, জাফরাণ, আবির, মালা, পঞ্চপ্রদীপ, মিষ্টান্ন, পান, সুপারী বা নারিকেল, অর্ঘ। যাহারা পূজা করে, তাহাদিগকে পাণ্ডে বলা হয়। ইহারা মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং কাহাকেও সর্প দংশন করিলে মন্ত্রদ্বারা সর্পবিষ নষ্ট করিয়া থাকে।

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম এ.]

(৩৪)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি :—কলিকাতার অদূরে কোনও গণ্ডগ্রামে হরিহর নামে এক ব্রাহ্মণ বালকের যখন তিন বৎসর বয়স তখন ৬ মাসের এক ব্রাহ্মণ বালিকার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। নবম বৎসর বয়সে উপনয়নের পরেই বিবাহ উদ্যোগের সময় উহার পিতামহ রামসেবক শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়। শিরোমণি মহাশয়ের অনেক সাহেব সিভিলিয়ান্ ছাত্র ছিল। তাঁহাদেরই একজনের সুপারিশে শিরোমণি পুত্র অঘোরনাথ ডেপুটীগিরি চাকরি পান। অঘোরনাথের পত্নী শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতেই শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করিতে থাকেন। পুত্রের এত অল্প বয়সে—বিশেষতঃ এক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব তাঁহার ভাল লাগে না। এই সূত্রে শাশুড়ীর সহিত বিবাদ করিয়া স্বামী পুত্রের সহিত পতির কার্য্যস্থলে সাহেবিআনায় চালিত স্বামীর উপযুক্ত বিবিয়ানায় চলিতে থাকেন। শাশুড়ী, পুত্র ও পুত্রবধূর বিষম ব্যবহারে ব্যথিত বিরক্ত হইলেও নাতির সহিত ভট্টাচার্য্য কন্যার বিবাহদানে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। ভট্টাচার্য্য 'সাভ্যোম' মহাশয়ও প্রতিশ্রুতি মত কন্যা সম্প্রদানের জন্য একান্ত অনুনয় বিনয় করিয়া নিষ্ফল হইলে, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কন্যাকে দুরূহ ব্রতচারিণী করেন। ব্রতপ্রতিষ্ঠার দিবসেই যখন সম্পূর্ণ নিরাশার সংবাদ পান, তখন প্রথমে সামান্য ধৈর্য্যচ্যুত হইলেও অবশেষে কৌশলক্রমে হরিহরের পিতামহীর সহযোগে বালক হরিহরকে কোনমতে কিছুক্ষণের জন্য তাহার পিতার নিকট হইতে সরাইয়া এক বৃক্ষতলে কন্যা সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে মনোদুঃখে কি কোন অপ্রকাশিত কারণে হরিহরের মাতামহী নববিবাহিতা বালিকাবধূকে সঙ্গে লইয়া নিরুদ্দেশ হন। ডেপুটী বাবু বাড়ী আসিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সন্ধান পান নাই। মার সন্ধানে নিষ্ফল হইয়া কতকটা ব্যথিত হৃদয়ে ছুটি ফুরাইলে অঘোরনাথ সপুত্র পরিবার কার্য্যস্থলে ফিরিতে ছিলেন, হঠাৎ পথমধ্যে ডাকাত পড়িয়া হরিহরকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ডাকাতরা বলে, তাহারা পাঠান-সর্দ্দার কন্যার সহিত হরিহরের সাদী দিবে, বলিয়াই তাহারা হরিহরকে হরণ করিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে বন্ধ-পালকীর ভিতরে আমি চলিয়াছি। অবশ্য মুখ আমার বহুক্ষণ আবদ্ধ ছিল না। যখন দস্যুরা বুঝিল, আমার পিতা-মাতা আর আমার চীৎকার শুনিতে পাইবে না, তখন তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিল। খুলিয়া অভয় দিল। দস্যু-সরদার সেই পাঠান বলিল—"হুজুর! তোমার কোনও ভয় নাই। সুতরাং চীৎকার করিয়ো না, অথবা কাঁদিয়ো না। আমরা শীঘ্রই আবার তোমাকে তোমার বাপ-মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু চীৎকার করিলে পাঠাইব না। ইহজন্মে আর তা' হইলে বাপ-মায়ের মুখ দেখিতে পাইব না।"

তাহার কথাতে আমি চীৎকার করি নাই। কিন্তু চোখের জল অথবা বক্ষের স্পন্দন কিছুতেই রহিত করিতে পারি নাই।

ভয়—কি যে ভয় তা এখন কেমন করিয়া বলিব?

পিপাসায় আমার তালু শুষ্ক হইয়াছে; তবু আমি ভয়ে তাহাদের কাছে জল চাহিতে পারি নাই। সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের পলক ফেলি নাই।

সমস্ত রাত্রি অবিরাম গতি। কাঁধ বদল করিতে বেহারারা পথে এক একবার মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়াছে; আবার উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। রাত্রির শেষ যামে পাল্‌কীর গতির বিরাম হইল। বেহারারা এইবারে পাল্‌কী ভূমিতে নামাইল। সর্দ্দার তখন পাল্‌কীর দ্বার খুলিয়া আমাকে বলিল—"হুজুর! এইবারে বাহিরে এসো।"

আদেশ-মত বাহির হইয়া দেখি—হা ভগবান্, এ আমি কোথায় আসিয়াছি? সম্মুখে চাহিয়া দেখি—শূন্য। চোখ মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখি যতদূর দৃষ্টি যায়, যেন একটা জলের বিরাট পাত পড়িয়া আছে। পশ্চাতে দেখি, গাছ, গাছ—গাছের গায়ে গায়ে, মাথায় চলিয়া, বেড়িয়া, জড়াইয়া, কেবল গাছ—যেন আমার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে। তখনও ঊষার আলোক সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় নাই। সেই আলোক-আঁধারের মাঝে পড়িয়া আমি সমস্ত জগৎটা শূন্যময় দেখিলাম। আমার দেহ পতনোন্মুখ হইল। সর্দ্দার তাহা বুঝিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। এবং অগণ্য আশ্বাস দিয়া বলিল—"হুজুর! আমরা সকলেই তোমার নকর। তুমি আমাদের সকলের মনিব। আমরা তোমাকে ভয় করিব। তুমি আমাদের ভয় করিবে কেন?"

তাহাদের কথা আমাদের দেশের লোকের কথার মত নয়; উচ্চারণে অনেক প্রভেদ। সেইজন্য তাহাদের আশ্বাসবাক্য আমার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। তবে তাহার কথার সঙ্গে তাহার মুখচোখের ভাব-পরিবর্ত্তনে স্নেহ ও কারুণ্যের আভাষ দেখিয়া, এবং তাহাদের বারংবার হুজুর সম্বোধনে তাহারা আমার অনিষ্টকারী নয় বুঝিয়া, আমি অল্পে অল্পে কতকটা আশ্বস্ত হইলাম।

এইবারে আমি কথা কহিলাম। বলিলাম—"তোমাদের কথা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না! তোমরা কে?"

সর্দ্দার এইবারে বুঝিল, তাহার আশ্বাসবাণী আমার বোধগম্য হয় নাই। তখন সে যথাসম্ভব ধীরে ধীরে তাহার পূর্ব্বকথার পুনরুক্তি করিল। তাহাতে এই বুঝিলাম, তাহারা যেই হোক না কেন, তাহাদের দ্বারা আমার কোনও অনিষ্ট হইবে না। তবে সর্দ্দারের স্নেহ-সূচক বাক্যে তাহাদের হইতে আমার ভয় ঘুচিল বটে, কিন্তু স্থানের ভয় যে কিছুতেই ঘুচিতেছে না!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ আমাকে কোথায় আনিলে?"

"এখানে অধিকক্ষণ থাকিব না, হুজুর! আমরা আর একটু পরেই এখান হইতে রওনা হইব। বেহারারা এই রাত্রির মধ্যে প্রায় ষোল ক্রোশ পথ ছুটিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তাহারা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতেছে।"

দেখিলাম, বেহারারা সকলেই একটা প্রকাণ্ড গাছের তল আশ্রয় করিয়াছে। সেখানে একটা অগ্নি-স্তূপকে পিছন করিয়া, আধাআধি পা ছড়াইয়া, জানুতে হাতের ভর দিয়া, বৃক্ষমূলদেশ বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়াছে। কেহ তামাক খাইতেছে; কেহ একটা কাটি লইয়া মাটি খুঁটিতেছে; কেহ বা পার্শ্বস্থ সঙ্গীর সঙ্গে কি এক দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতেছে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁগা, এ কোন্ দেশ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যে দিকে কেবল গাছ, সেই দিক হইতে একটা কি রকম গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল। শব্দে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সর্দ্দার আবার আমাকে ধরিল। আবার অভয় দিল। বলিল—"ও শালা তোমাকে হুজুর মানিয়া বনের ভিতর হইতে আদাব করিতেছে।"

"এই কি বন?"

"সুন্দরবনের নাম শুনিয়াছ, হুজুর?"

"এই সেই—?"

"এই সেই সুন্দর-বন।"

সবিস্ময়ে সভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বনে অনেক বাঘ আছে?"

সর্দ্দার ঈষৎ হাসিমুখে বলিল—"আছেই ত। দেদার আছে। কিন্তু তাতে কি হুজুর, তুমি এ বনের রাজা—তারা প্রজা। তারা তোমাকে কাঁধে করিয়া নাচিবে।"

বাঘের কাঁধে চড়িয়া নাচিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন

না বুঝিয়া, আমি বলিলাম—"এইত তোমার কথামত আমি চুপ করিয়াছিলাম। এইবারে আমাকে বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

"এখনও শ্বশুরবাড়ী দেখা হইল না, আমাদের রাণীমায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হইল না, খানাপিনা কিছু করিলে না—এখনি যাইবার কথা কি হুজুর? আমি যখন বলেছি, তোমার বাপের কাছে তোমাকে পাঠাইয়া দিব, তখন তাহার অন্যথা হইবে না। তবে ব্যস্ত হইলে, আর বারবার পাঠাইবার কথা তুলিলে, পাঠাইতে দেরি করিব।"

আর আমি পাঠাইবার কথা তুলিতে সাহস করিলাম না। পিপাসা-নিবারণের জন্য তাহার কাছে আমি পানীয়ের প্রার্থনা করিলাম। সরদার আমাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিল। সে মুসলমান। সে ত আমাকে জল দিবে না। যে জল দিতে পরিবে, সে আসিতেছে। তাহারই আগমনের প্রতীক্ষায় তাহারা সেখানে পাল্‌কী রাখিয়াছে।

আমি বলিলাম -"সম্মুখে অগাধ জল—শুধু জল তার একগণ্ডূষও কি আমি মুখে দিতে পারি না?"

"না। তা'হ'লে তোমাকে এখনি আমি জলের কাছে লইয়া যাইতাম। জল লোণা; মুখে দিতে পারিবে না।"

তবে কে আমাকে জল আনিয়া দিবে? সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে, আর একবার দেখিলাম—কালো জল দুলিতে দুলিতে কালোবরণ একটা প্রাচীরের তলে যেন মিশিয়া যাইতেছে। পশ্চাতে সুন্দরবন—কালোবরণ মাথা তুলিয়া কালোবরণ আকাশ হইতে দুই একটা তারা ধরিবার জন্য যেন হাত নাড়িতেছে। ইহার ভিতরে কে কোথায় আছে? সে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিবে যে, আমাকে জল দিবে?"

আবার একবার বনাভ্যন্তর হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন উঠিল। আমি পিপাসা ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, সরদারকে জড়াইয়া ধরিলাম। সে হাসিয়া, হাত দিয়া আমার দুই পার্শ্বে ধরিল। এবং কুক্কুটী যেমন চিলের ছোঁ হইতে শাবকগুলিকে রক্ষা করে, সেই মত আনত হইয়া, তাহার বিশাল বক্ষে আমাকে আচ্ছাদিত করিল। তাহার পর্য্যাপ্ত-সস্নাত শ্মশ্রু আমার কপোলযুগল স্পর্শ করিল। সে বলিল—"গোলাম কাছে থাকিতে সেরকে ভয় কি হুজুর! আমি তাকে শিয়াল মনে করিয়া থাকি। আর সে বাঘ এখানে কোথায়? এখান হইতে সে চার পাঁচ ক্রোশ তফাতে খাড়ীর পরের জঙ্গলে ডাকিতেছে। কাছে থাকিলে সে চীৎকার করিত না—চোরের মত চুপি চুপি আসিত। আসিলে তোমার সুমুখে তখনই তাহাকে জাহান্নমে পাঠইতাম।"

মন আমার বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফালাফি করিতেছিল। তাহার আশ্বাসবাক্যে আবার আমি মুখ তুলিলাম। সরদার এবারে আমাকে কাঁধে উঠাইল। কাঁদে উঠিয়াই আমি একেবারে নির্ভয় হইয়াছি। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে বেহারাদের মধ্যে কাহাকেও ভীতির চিহ্ন প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। তাহারা যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া আছে। তাহাদের তামাকের কলিকা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ফিরিতেছে।"

সরদার তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এত দেরী হচ্ছে কেন রে?"

তাহারা কি উত্তর করিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহারা আমার শরীররক্ষীকে সরদার সম্বোধনে উত্তর দিল। তাই শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সরদার!—"

প্রশ্ন শেষ না হইতেই সরদার বলিল—"হুজুর!"

"উহারা কি বলিল?"

"বলিল, বজরা খাড়ীর ভিতরে নোঙ্গর করা আছে। জোয়ার হয় নাই বলিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না।"

বজরা আমি হুগলী যাইবার পথে কলিকাতার গঙ্গায় দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খাড়ী কি আমি জানিতাম না। এই একটু আগে শুনিলাম, বাঘ খাড়ীর পারে গর্জ্জন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"খাড়ী কি?"

"এবারে আর তোমাকে তা দেখান হইল না। দেখাইতে হইলে এই গভীর জঙ্গল ভেদ করিতে হয়। কি জানি, ইহার ভিতরে অন্ধকারে কোথায় কোন সম্বন্ধী ওৎ করিয়া বসিয়া আছে! দেখিতে না পাইলে, তোমাকে লইয়া একটু মুস্কিলে পড়িতে হইবে।"

এই বলিয়া সরদার খাড়ী কি, আমাকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিল। আমি বুঝিলাম, সাগর-সঙ্গম-

মুখে ভাগীরথী সাগরতুল্যাই বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে। খাড়ী তাহারই একটি অপরিসর শাখা। অরণ্যানী ভেদ করিয়া, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র আরণ্য দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া, এইরূপ অসংখ্য প্রণালী জালরূপে এই অনুপদেশে বিস্তৃত হইয়া আছে। বড় 'গাঙে' বজরা রাখিলে জোয়ার মুখে বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া, বজরা খাড়ীর ভিতরে নিরাপদ স্থানে নোঙ্গর করা আছে।

আমাকে বুঝানো শেষ হইতে না হইতে ভৈরব কল্লোলে জোয়ার আসিল। দেখিতে দেখিতে নিম্ন তটভূমি প্লাবিত করিয়া, যে বৃক্ষতলে বসিয়া বেহারারা বিশ্রাম লইতেছিল, জলোচ্ছ্বাস সেই উচ্চভূমিতে উঠিয়া আসিল। অমনি সমস্বরে উচ্চ কোলাহলে আল্লার নামে দরিয়ার উল্লাসের প্রতিধ্বনি তুলিয়া, বেহারারা যে যার লাঠি হাতে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কারে কাননভূমি মুখরিত করিয়া অসংখ্য পাখীর কলধ্বনি হইল।

সর্দার বলিল—"হুজুর! এইবারে আবার আমাদের চলিতে হইবে। ফিরিবার সময় যদি আমরা এই পথ দিয়া ফিরি, তাহ'লে তোমাকে খাড়ী দেখাইব।"

সর্দারের এই সরল প্রতিশ্রুতিতে আমার দেশে ফিরিবার আশা হইল। শুনিয়া আমার ভয় ঘুচিল। তাহার এতক্ষণের ব্যবহারে, তাহার স্নেহপূর্ণ কথায়, সর্ব্বোপরি তার বার্দ্ধক্যের যোগ্য বীরোচিত মূর্ত্তিতে অল্পে অল্পে তার প্রতি আমার প্রীতি জন্মিয়াছে।

আমি বলিলাম—"তবে চল।"

'চল' কথা শুনিবামাত্র সর্দার হো হো হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি শুনিয়া আমি কিছু অপ্রতিভ হইলাম। হাসিবার কথা আমি এমন কি কহিয়াছি?

সর্দার বলিল—"জল খাইতে চাহিয়াছিলে না হুজুর?

তাইত! আমার সে দারুণ পিপাসা? কই, এখন ত তার অর্দ্ধেকও নাই! এ পিপাসা আপনা আপনি কেমন করিয়া মিটিল! তবে কি সত্য সত্যই আমি পিপাসিত হই নাই!

আমার উত্তরদানে বিলম্ব দেখিয়া সর্দার বলিল— "যদি পিপাসা না থাকে, তাহা হইলে পাল্‌কীতে উঠ। বজরা খাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। আমরা আর একটুও বিলম্ব করিব না।" আসল কথা, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না লইয়া জলপান করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বলিয়া, সর্দার নানা কথায় কতকটা সময় অতিবাহিত করিতেছিল। ইত্যবসরে উষার শীতল জলীয়বাষ্পের বারংবার শ্বাসগ্রহণে আমার কণ্ঠতালু আবার সরস হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও অনেক উপশম হইয়াছে।

তথাপি আমি সর্দারের কথায় উত্তর করিলাম। বলিলাম—"কই, তুমি জল ত আমাকে দিলে না!'

"তোমাকে আর কেমন করিয়া দিব হুজুর! তোমার বাবা হইলে দিতাম।"

"আমার বাবাকে দিতে বলিতেছ, তবে আমাকে দিবে না কেন?"

"তোমার বাবা যে আমাদের বেই। তাঁহাকে শুধু জল কেন, আমার ঘরের সুরুয়া পর্য্যন্ত দিতে পারি। তুমি জামাই—তোমাকে দিতে পারি না।"

আমি পাঠান-সর্দারের জামাই হইতে চলিয়াছি, শুনিয়া ভয়ে আবার আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি হতভম্বের মত সর্দারের মুখ পানে চাহিলাম।

সর্দার আমাকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দীর্ঘ যষ্টিতে দুই হাতের ভর দিয়া ঈষৎবক্রভাবে দাঁড়াইল। তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল—"মুখপানে দেখিতেছ কি হুজুর? তোমাকে ধরিয়া লইয়া আমার বেটীর সঙ্গে তোমার সাদী দিব।"

আমার পূর্ব্বের পিপাসা ফিরিয়া আসিল। সর্দার বলিল—"এইবারে জল খাও।"

সাদীর কথা শুনিয়াই আমার মেজাজ চটিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বালকসুলভ আত্মবিস্মৃতির বশে আমি স্থানাস্থান অবস্থা সব ভুলিয়াছি। আমি ঈষৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলাম—"তোমরা জল দিলে আমি খাইব না।"

"আমি দিলেও খাইবে না ভাই?"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী রমণী! যুবকের চক্ষে তাঁহাকে দেখি নাই। সুতরাং যুবকের দৃষ্টিতে লাবণ্যময়ী পরিণতযৌবনার রূপের যে বিশ্লেষণ, তাহা ক্ষুদ্র দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে হইবার সম্ভাবনা নাই। বালক—বিশেষতঃ ভয়বিস্ময়ে ব্যাকুল বালক—এক অপূর্ব্ব মধুময় কথার ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া, প্রথমেই

তাঁহাকে যেরূপে আবির্ভূতা দেখিয়াছিল, তাহাই আমি বলিতেছি। ইহার পরেও তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন অবস্থার প্রতিকৃতি স্বরূপ অনেকবার তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। আবার বলিব? ইহার পূর্ব্বেও তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। কিন্তু সে দৃষ্টি-হীনের চক্ষে দেখা। অভিমান-বিড়ম্বিতের গৃহে জন্মিয়া-ছিলাম। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে অলক্ষ্যে মিশ্রিত অভিমানেই পুষ্ট হইয়াছিলাম। অভিমানিনী আঁখিরতারকাবরণী ভেদ করিয়া সে রূপ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আজি পিপাসা-ব্যাকুলিতের নেত্রে প্রথম তাঁহাকে দেখিলাম। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় রসপূর্ণ হইল! পিপাসা মিটিল! হৃদয় অতিরিক্ত রস ফুৎকারে লোচন-পথে নিক্ষেপ করিল। দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল।

রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাই, আমায় চিনিতে পারিলে না?"

আমি উত্তর করিলাম না। সর্দারের কাছ হইতে উন্মত্তের মত তাহার দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম।

"থামো—থামো। আমার এক হাতে গরম দুধ অন্য হাতে জল।"

আর দুধ আর জল! আমি বাহুদ্বয়ের দৃঢ়বেষ্টনে তাহার কটিদেশ আবদ্ধ করিয়াছি। উষ্ণদুগ্ধ আমার দেহে পড়িবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্তা অবনমিতদেহার পয়োধরযুগল-তলে মুখ লুকাইয়াছি।

আপনাদের বোধ হয় বলিতে হইবে না, এ রমণী কে? আমাদের হুগলীতে অবস্থানকালে ইনি এক বৎসর আমাদের বাসায় ঝিয়ের মূর্ত্তিতে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ইহার অধিক এখন আর আমি বলিব না। অবকাশ পাইয়া তাঁহাকে আজ সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছি। ধন-গৌরবের সঙ্গেই আমরা আজিকালি সম্ভাষণের অনুপাত করি! পূর্ব্বেও এ ভাবটা আমাদের মধ্যে একেবারে যে ছিল না, এমন নহে; ছিল,—তবে এতটা ছিল না। তখন অন্ত-র্গৌরবের দিকেও আমাদের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। সদ্‌গুণ-সম্পন্ন দরিদ্রকেও আমরা শ্রদ্ধা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

এখন হইতে আর তাঁকে ঝি বলিব না। তাঁর নাম দয়াময়ী। এ নাম আমাদের হুগলীর বাসায় এক বৎসরের মধ্যেও কাহারও জানিবার অবকাশ ঘটে নাই। পিতা-মাতারত নয়ই, আমারও না। ঝি ত ঝি—তার কি আবার নাম থাকে! যদিই থাকে, সে নাম কি মধুর-ভাবে মুখে আনিবার যোগ্য! সেইজন্য এমন মধুময় নাম আমরা কেহ কাণের কিনারায় আসিতে দিই নাই। যে সময়ের কথা বলিয়াছি, সে সময়েও কি জানিয়াছি? জানিয়াছি পরে। অন্তর্গৌরবই যাঁর কাছে একমাত্র গৌরব বলিয়া গ্রাহ্য, তাঁহার মুখে শুনিয়া জানিয়াছি। তবে এখন হইতে তাঁহাকে দয়া-দিদি বলিয়াই আপনাদের কাছে পরিচিত করিব। সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা, সম্ভ্রান্তবংশের কুলবধূ—পরনির্ভরতা হেয় জ্ঞানে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যিনি গতর খাটাইয়া জীবিকানির্ব্বাহের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজাতিরই সম্মাননার যোগ্য।

কোনও ক্রমে জল ও দুধের পাত্র ভূমিতে রাখিয়া, দয়াদিদি আমাকে বাহুপাশে দৃঢ় বাঁধিয়া বক্ষের উপর তুলিয়া ধরিল। এবং আমার মুখ অজস্র চুম্বিত করিল। বামুনের মুখ বলিয়া আর সে মানিল না। তার উপর কোল হইতে একবার আমাকে ভূমিতে নামাইল। ঘটা হইতে জল লইয়া আমার মুখচোখ প্রক্ষালিত করিল। শেষে অঞ্চল দিয়া আমার মুখচক্ষু মুছাইয়া আমাকে দুগ্ধপান করাইল।

সর্দার বলিল—"মায়ীজি, আর নয়। 'গণ' বহিয়া যাইতেছে।"

দয়াদিদি বলিল—"চল।"

বেহারারা আবার আমাকে পাল্‌কীতে উঠাইল। রশিখানেক তীরস্থ বনপথ ভেদ করিয়া যাইতে না যাইতেই সুন্দর এক বজরা দৃষ্টিগোচর হইল। বজরাকে ঘেরিয়া অনেকগুলা ক্ষুদ্রাকার নৌকা।

পাল্‌কীশুদ্ধ আমাকে সকলে বজরার উপর উঠাইল। দয়াদিদিও আমার সঙ্গে বজরায় আরোহণ করিল। সর্দার ও তাহার সঙ্গিগণ নৌকায় উঠিল। আবার একবার গগনভেদী সমবেত কণ্ঠের আল্লাধ্বনি। ধ্বনির দিগন্তগত ঝঙ্কার নিস্তব্ধতায় বিলীন হইলে দেখি, তীরস্থ বনভূমি ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীতমুখে ছুটিয়াছে।

(৩৫)

বজরায় উঠিয়া দেখি, আরও দুইটি স্ত্রীলোক তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি অর্দ্ধবয়সী,

অপরটি যুবতী। উভয়েই শ্যামাঙ্গী। তাহাদিগের আকারেঙ্গিতে উভয়কেই পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইল। আমার দুইদিকে, দুইখানি ঝালরযুক্ত সুন্দর পাখা লইয়া তাহারা আমাকে ব্যজন করিতে বসিল। বজরায় যখন প্রথম প্রবেশ করি, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই একটিও কথা কয় নাই। অবস্থার গুরুত্বে তখন সকলেই নীরব। নদীর ঢেউ দুইধারে ঢালিয়া গমনশীল বজরার তলদেশে কেবল থাকিয়া থাকিয়া কল্লোলধ্বনি উঠিতেছিল। আর সর্ব্বত্র নীরবতা। বায়ুর প্রহারে বজরার পাল পূর্ণ বিস্ফারিত হইয়াছে। দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে, আমার অপহারক সঙ্গিগণের নৌকা বজরার বূহের আকারে চলিয়াছে। তাহারাও নীরব। সমস্ত প্রকৃতিতেই যেন নিস্তব্ধতা। দূরে তীরভূমি এখনও শয়নশায়িনী দিগঙ্গনার লম্বমানা বেণীর মত দৃষ্ট হইতেছিল।

ধীরে ধীরে অরুণালোক দূরস্থ অরণ্যপ্রাচীরশীর্ষে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেখি, সূর্য্যদেব সাগরজলে সুবর্ণকুম্ভের মত ভাসিয়া উঠিতেছে। সাগরে সূর্য্যোদয় কখনও দেখি নাই। সাগরে কেন, দেশেও কখন সূর্য্যোদয় দেখা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এই প্রথম দেখিলাম। অরুণের অভ্যুত্থান আমার দৃষ্টিতে কিছু বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল। আমি প্রথমে তাহা সূর্য্য বলিয়াই বুঝিতে পারি নাই। বস্তুটা কি জানিবার জন্য দয়াদিদিকে ডাকিবার আমার প্রয়োজন হইল। বজরার কামরার খড়খড়ি দিয়া আমি সে দৃশ্য দেখিতেছিলাম। মুখ না ফিরাইয়াই দয়াদিদিকে ডাকিলাম। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম জানি না। দিদি বলিয়া ডাকিতে তখনও অভ্যস্ত হই নাই।

আমি ডাকিলাম—"ঝি!"

পার্শ্বস্থা যুবতী-পরিচারিকা উত্তর করিল। আমি অমনি মুখ ফিরাইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিলাম। সে বলিল—"কি বল জামাই বাবু!"

"তোকে নয় ললিতা! তোর জামাই-বাবু আমাকে ডাকিতেছে।"

আমি তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া দয়াদিদির পানে চাহিলাম। বজরার ভিতরে দুইটি কামরা। দয়াদিদি দেখি, ভিতরের ছোট কামরাটিতে বসিয়া বঁটিতে ফল কাটিতেছে। আমি তাঁহার পানে চাহিতেই দিদি বলিল—"কেন ডাকিতেছ ভাই?"

মধ্যবয়সী রমণী বলিল—"আপনি কি ঝি? জামাই-বাবু ললিতাকেই ডাকিতেছে।" দয়াদিদি বলিল—"আমি ঝি বই কি!"

ললিতা বলিল—"তা মাসীমা যখন শুদ্দুর আর জামাইবাবু বামুন, তখন তিনি জামাইবাবুর একরকম ঝি বই কি।"

"এক রকম কেন, পুরাদস্তুর। আমি মাহিনা লইয়া উঁহার বাপের ঘরে বহুদিন চাকরি করিয়াছি।" ললিতা উচ্চহাসিয়া বলিল—"মাসীমার এক কথা।"

মধ্যবয়সী বলিল—"তোমার পিছনে পাঁচটা ঝি, তুমি পরের ঘরে চাকরাণী বৃত্তি করিয়াছ! আর এ কথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করিব?"

"আমি মিথ্যা বলি নাই অহল্যা!"

আমি একান্ত বুদ্ধিহীন ছিলাম না। এই সকল কথার উত্তর-প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, দয়াদিদির ঝিয়ের কার্য্যে বিধাতা একটা গোলমেলে রকমের বাদ সাধিয়াছে। সে গোলমালটা তখন আমার বুদ্ধির সাহায্যে মীমাংসিত করিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও আমি মনে মনে স্থির করিলাম, দয়াদিদিকে আর ঝি বলিব না।

বস্তুতঃই তাহারা দয়াদিদির কথায় বিশ্বাস করিল না। তখন দিদি সাক্ষ্য-দানের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন না দাদাবাবু? তুমি ত আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ঝি বলিয়াছ?" আমি আর ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"না।"

"তবে তুমি কাকে মনে করিয়া বলিয়াছ?"

আমি পার্শ্বস্থ যুবতী ললিতাকে দেখাইয়া দিলাম। অমনি সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ হাসির কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমি অপ্রতিভ হইলাম। তবে কি ললিতা ঝি নয়?

মধ্যবয়সী তখন মুখ নাড়িয়া তাহাকে বলিল—"হাসিতেছিস্ যে? খানিকটে যৌবনের লাবণ্য চুরি ক'রে, জড়োয়াবালা হাতে প'রে, তুই কি জামাইবাবুর চোখ এড়িয়া যাইবি?"

ও হরি! কি করিলাম! আমি মাথা নামাইয়া চুপি চুপি ললিতার হাতখানার দিকে চাহিলাম। আমি সে বালা দেখিয়াছিলাম; ক্ষণেকের জন্য দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া সোণার নয়, সুতরাং মূল্যবান নয় মনে করিয়াছিলাম। বসন তাহার ভূষণের অনুরূপ ছিল না। একখানা আধময়লা লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী। বর্ণে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্যামা, তিনভাগ কৃষ্ণে এক ভাগ গৌরবর্ণ মিশিয়াছে। অত খুঁটিয়া রূপ দেখিবার সে বয়স নয়, আমার তখন সে অবস্থাও নয়। সত্য কথা বলিতে কি, তাহাকে সম্ভ্রান্তা বুঝাইতে, তাহার রূপ সে সময়ে আমাকে কোনও সাহায্য করে নাই। তাহার উপর পাখা লইয়া তাহার বাতাস করিবার আগ্রহে তাহাকে আমি ঝিই মনে করিয়া ছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে তাহাকে ত লক্ষ্য করিয়া বলি নাই! এখন কাহাকেও আর ঝি বলা চলে না দেখিয়া, আমি মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম।

"যাক্, তোরা আর আমার ভাইকে বিরক্ত করিস্ নি।"—এই বলিয়া দয়াদিদি একখানি রূপার রেকাবি সুপক্ক আম্র ও অন্যান্য ফল এবং মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া, আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তার পর ললিতাকে জল আনিতে এবং অহল্যাকে ভাল করিয়া একটি পান সাজিতে আদেশ দিয়া, আমাকে বলিল—"জল খাও।" আমি আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। দয়াদিদি বলিল—"না খাইলে বড় কষ্ট হইবে। দু'পুরের এদিকে অন্ন মুখে দিতে পাইবে না। সারারাত্রি বোধ হয়, একটু সময়ের জন্যও ঘুমাইতে পাও নাই। পেট ভরিয়া এখন আহার করিয়া, নিদ্রা যাও। নহিলে অসুখ করিবে।"

বাসায় দয়াদিদি যখন চাকরী করিত, তখন তাহার জেদ কিরূপ, আমি জানিতাম। মায়ের জেদ অনেকবার অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাহার জেদ পারি নাই। আমি জলযোগে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার মধ্যে ললিতা ও অহল্যা দুইজনেই ছোট কামরাটির ভিতরে চলিয়া গেল।

দয়াদিদি অবকাশ পাইয়া বলিল—"আমাকে ডাকিতেছিলে কেন?"

সূর্য্যোদয়ের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, আমাদিগের কথার অবসরে বালসূর্য্য মার্ত্তণ্ড হইয়াছে। আমি মুখ ফিরাইয়া দিদির মুখপানে চাহিয়া হাসিলাম। দিদি আমাকে একটু মিষ্ট তিরস্কার করিল। বলিল—"অমন ঠাকুরমার নাতী তুমি, তুমি মিথ্যা কহিবে কেন?"

"আমি তোমাকে কি বলিব?"

"কেন, ঝি বলিবে। পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই তোমাদের ঘরে ঝি হইয়াছি।"

"আমি ঝি বলিব না।"

দিদি ঈষৎস্মিতবিকশিত মুখে বলিল—"তবে কি বলিবে?"

"আমি 'মা' বলিব।"

তড়িতের ক্রিয়াবশে যেন দয়াদিদির চক্ষু হইতে জলধারা গণ্ড বহিয়া ছুটিয়া গেল। আত্মহারার মত দিদি আমার গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিতে মুখ বাড়াইল। কিন্তু কি বুঝিয়া নিবৃত্ত হইল। বোধ হয়, দিদি বুঝিয়াছিল, সে শূদ্রাণী আর আমি ব্রাহ্মণকুমার। দিদি বলিল—"না ভাই, অত ভাগ্য আমার সহিবে না। তুমি আমাকে দিদি বলিয়ো।"

মা কোথায়? রূপে না কথায়? চেতনা মায়ের রূপ। মমতা মায়ের কথা। চেতনায় মায়ের উদ্বোধন। মমতায় অধিষ্ঠান। এই মমতার স্বরূপ না বুঝিলে মায়ের রূপানুভূতি হয় না। অনুভূতি সন্তান। তবে মমতাময়ী দয়াময়ী তোমাকে আমি মা বলিব না কেন? যাঁহা হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে, তিনি আমার গর্ভধারিণী মা। যাঁর স্নেহে আমি প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছি, সেই পিতামহী আমার ধাত্রী-মা। আর যাঁহা হইতে আমার ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব প্রতিপালিত হইয়াছে, তিনি একাধারে আমার গর্ভধারিণী ও ধাত্রী—জননী ও পিতামহী। সত্য কথা বলিতে কি, জগজ্জননীর স্মরণে যখনই আমি বলিয়াছি—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা", তখনই সর্ব্বাগ্রে দয়াময়ীর মূর্ত্তি আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

দয়াদিদি পাত্রটি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া আমাকে বলিল—"ইহার পরে আহার ঘটিবে কি না ঠিক বলিতে পারি না। শুধু ফলাহারেই হয়ত আজ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। সুতরাং আহারে সঙ্কোচ করিয়ো না।"

আমি বলিলাম, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ দিদি?"

"আগে জল খাইয়া লও। তার পর বিশ্রাম কর। বিশ্রামান্তে যাহা জানিতে চাও, বলিব, এখনও অনেক ক্ষণ আমাদের বজরায় থাকিতে হইবে।"

দিদির আগ্রহাতিশয্যে উদর পূরিয়া আহার করিলাম। ললিতা একটি রূপার গেলাসে জল, আর অহল্যা একটি রূপার ডিপায় পান লইয়া আমার সম্মুখে রাখিল। পান দিয়া অহল্যা শয্যা বিছাইল।

আমি শয়ন করিলাম। হাতে পাখা লইয়া, মাথার শিয়রে বসিয়া দিদি নিজে এবারে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

সাগরে নিক্ষিপ্ত জীবের ভাগ্যবশে প্রাপ্ত স্থিরচ্ছায়া-দ্রুমাকীর্ণ তটভূমির মত দয়াময়ী-দেবীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতলে আশ্রয় পাইয়া অচিরে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

(৩৬)

ঈশ্বরের নামে পাঠানগণের সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ মেলিয়া দেখি, দিদি তখনও পর্য্যন্ত আমার শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। আমাকে জাগিতে দেখিয়াই দিদি বলিয়া উঠিল—"উঠ হরিহর, আমরা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছি।"

আমি সর্ব্বপ্রথম দিদির মুখে আমার নাম শুনিলাম। শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিলাম। খড়খড়ির ভিতর মুখ দিয়া দেখি, কলিকাতার সন্নিহিত গঙ্গার ন্যায় এক প্রশস্ত নদীর তীরে বজরা ভিড়িয়াছে। তার অপর পারে শ্যামশষ্পাচ্ছন্ন নীলাকাশ-স্পর্শী প্রান্তর। এপারে আম্র, পনসাদি বিশাল তরু-সমাচ্ছন্ন উদ্যানভূমি। অনুচরেরা নৌকা তীরে বাঁধিতে ব্যস্ত হইল। বজরার ভিতরে ললিতা ও অহল্যা বজরার এক কোণ আশ্রয় করিয়া তখনও ঘুমাইতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরা উঠিতেছে না কেন?"

"এখনি সকলকেই উঠিতে হইবে। এখনও একটু বিলম্ব আছে বলিয়া, উহাদের উঠাই নাই। সর্দার উহাদের জন্য পাল্কী আনিতে গিয়াছে। সে ফিরিলেই উঠাইব। উহারাও তোমার মতন সারারাত্রি জাগিয়াছে।"

"উহারা জাগিয়াছে কেন?"

"উহারা বাঘের ভয়ে ঘুমাইতে পারে নাই। "বনের ভিতরে বাঘ কেবল গর্জ্জন করিয়াছে।"

"তা হ'লে তুমিও ত সারারাত্রি জাগিয়াছ! তুমি ঘুমাইলে না কেন?"

"আমি ত আর বাঘের ভয়ে জাগিয়া ছিলাম না। আমি জাগিয়াছিলাম, তোমার জন্য উৎকণ্ঠায়। সে উৎকণ্ঠা ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই। এইবারে দূর হইল। তোমাকে প্রাণে প্রাণে তীরে আনিয়াছি। এইবারে ঘরে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইব।"

"এইখানেই তোমার ঘর?"

"এখন তাই বই কি। তবে আগেকার ঘর নয়। আর পরেও থাকিবে কি না বলিতে পারি না।"

"এ আমি কোথায় আসিয়াছি?"

দয়াদিদি বিনত বিভাষিত মুখে বলিয়া উঠিল— "তা তোমাকে বলিব কেন? তোমাকে যে চুরী করিয়া আনিয়াছি। স্থানের নাম তোমার বাবা-মা জানিতে পারিলেই আমাকে ধরিয়া জেলে দিবে।"

অনেক ধীবর ছোট ছোট ডিঙ্গিতে চড়িয়া নদীবক্ষে মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ঠিক এমনি সময় গাহিয়া উঠিল:—

কানু এখন কালাপানিতে—শোন্‌গো ললিতে!
রাজার বেশে বজরা চেপে যাচ্ছে চন্দ্রাবলী আনিতে।
রাজার ধর্ম্ম নিগূঢ় মর্ম্ম বোঝা বড় দায়;
রাইকে বুঝব বাপের বেটা
যদি তোরে ইসারায়
ধরে আনতে পারে কিনারায়।
নইলে একূল ওকূল দুকূল যে যায়
দরিয়ায় চোরা বালিতে—ওগো ললিতে!

গানের সুর ললিতার ঘুমন্ত কাণে প্রবেশ করিল। সে স্বপ্নোত্থিতার মত উঠিয়া বসিল। চারিদিক চাহিল। বোধ হইল, সে সুষুপ্ত হইয়াছিল। ঘুমের ঘোরে সে স্থান, কাল, সঙ্গ সমস্তই ভুলিয়াছে। উঠিয়া এখন সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইতেছে। আমাদের পানেও সে একবার চাহিল। গানের মিষ্টতায় আমরা উভয়েই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম দয়াদিদি কোনও কথা কহিলেন না।

ললিতা এইবারে জিজ্ঞাসা করিল—"মাসীমা! তুমি কি আমাকে ডাকিলে?"

মাসীমাকে উত্তর দিতে হইল না। ধীবর গাহিতে

য়িতে গানের শেষ কলিতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। রিয়ায় চোরা বালিতে—ওগো ললিতে!"

আমি বলিলাম—"কে ডাকিতেছে, বুঝিলে?"

ধীবর গীতশেষে আবার গানের প্রথমাংশের পুনরাবৃত্তি রিল। অমনি অন্য নৌকা হইতে হাতে পায়ে হাল লাইতে চালাইতে অন্য এক ধীবর ললিতার নামে এক র্ঘতান ধরিল!

ললিতা তাই শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"দূর মুখপোড়ারা! ামরা যে কানুকে কোন্ কালে কিনারায় আনিয়াছি।" এই লিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল।

দয়াদিদি বলিল—"আর কেন, অহল্যাকে ডাকিয়া গাল্। পাল্কী আসিতেছে।"

"সত্য সত্যই দেখি, আর দুইখানা পাল্কী লইয়া তকগুলা উড়িয়া বেহারা নদীতীরে উপস্থিত হইল। াহাদের সঙ্গে আরও কতকগুলা বেহারা আসিয়াছিল। াহারা আমার পাল্কী লইতে বজরায় উঠিল। এতক্ষণ র্দারকে দেখি নাই। এখন দেখি, সে লাঠি কাঁধে ীরস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আমাকে সতর্কতার হিত উঠাইতে বেহারাদের আদেশ করিতেছে।

আমি পালকীতে চড়িয়া বজরাত্যাগ করিলাম। অপর ইটি শিবিকার একটিতে দয়াদিদি, অপরটিতে ললিতা ারোহণ করিল। অহল্যা ললিতার শিবিকার সঙ্গে দব্রজে চলিল। তীরের উপর উঠিতেই ললিতার শিবিকা- ার রুদ্ধ হইল। তখন বুঝিলাম, ললিতা ঝি নহে। য়য়ের মধ্যে যদি কেউ আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে সে কমাত্র অহল্যা।

অশ্বত্থতলে আমার পাল্কী উপস্থিত হইতে না হইতেই র্দার আমার শিবিকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া একটি লম্বা গাছের সেলাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"হুজুর! াহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা ঘটল না। মনে করিয়া- ছলাম, আমার বেটীর সঙ্গে তোমার সাদী দিব। আসিয়া ানিলাম, বেটীর সাদী হইয়া গিয়াছে। তবে আমি যখন থা দিয়াছি, সে কথা ত আর নয় হইবে না। আমি তামার সঙ্গে তার নিকা দিব। তোমাকে জামাই না রিয়া ছাড়িতেছি না।"

রহস্তের মর্ম্ম আমি যেন এখন অনেকটা বুঝিয়াছি। পালকীতে উঠিয়াই গম্যস্থানের একটা মনের মত ছবি আঁকিয়া তাহার ভিতরে আমি বিচরণ করিতেছি। আমি তাহার ভিতরে যাহাকে খুঁজিতেছি, তাহার সেই মুখখানি —আমলকীতল সান্নিধ্যে আমার বইপ্লেট বগলে করিয়া, আমার পানে যে চাহিত, যে মুখখানি, দক্ষিণরায় ঠাকুরের আশীষ পুষ্পের মত আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, সেই মুখখানিই কেবল যেন আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। দয়াদিদি কি সে মুখখানি পাঠানের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে? অদৃষ্টে যা থাকুক, আমি পাঠানের ঘরে গিয়াও সেই মুখখানি দেখিব। হুগলীর বকুলতলে আলোআঁধারের মাঝে পড়িয়া, ভয়বিস্ময়ের বেড়ায় জড়িয়া, সে মুখ দেখিয়াও আমার দেখা হয় নাই। চারি চক্ষুর মিলন সময়ে আমার সম্মুখে কেবলমাত্র দুটি নেত্র অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দীঘীর কালোজলে ফুল্লারবিন্দের আয়ত পত্রের মত নিমিষের জন্য ভাসিয়া আবার অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করিয়াছিল। মুখখানি দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই। আজ আমার সেই মুখ দেখিবার আশার যেন আভাষ আসিতেছে। আমি ভাবিলাম, হউক পাঠান, সেই মুখ যদি পাঠানের ঘরেই লুকানো থাকে, আমি পাঠানের ঘরে গিয়াও তাহা দেখিয়া আসিব। জানিতে এক দিদি। আর কে এখানে এ ঘটনা জানিতে আসিতেছে?

সর্দার জিজ্ঞাসা করিল—"কি হুজুর, রাজী আছ?"

আমি চক্ষু মুদিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে বলিলাম— "আছি।"

সর্দার হাসিয়া উঠিল। ললিতা বদ্ধ পালকীর ভিতরেই হাসিল। অহল্যা বলিল—"কি মাসীমা, শুনিলে?"

দয়াদিদি উত্তর করিল—"শুনিয়াছি। ভাইত আমার ঠিক উত্তর দিয়াছে। তোরা কি মনে করিয়াছিস্, হরিহর এখনও কিছু বুঝে নাই? সর্দারকে সে এখনও চিনে নাই? সে বুঝিয়াছে, সর্দারের কন্যা দুইবার বিবাহ করিতে পারে না। সে কন্যা ভাগ্যবতী পতিব্রতা —সতী।"

এই বলিয়া দয়াদিদি সর্দারকে যাত্রার অনুরোধ করিল। বলিল—"সর্দার! আর বিলম্ব কেন? যে অসমসাহসিক কাজ করিয়াছ, তাহা ইহ জীবনে ভুলিব না। যে স্থানে গিয়াছিলাম, তাহাও ইহজীবনে

ভুলিতে পারিব না। আর ললিতা ও অহল্যার ঋণ, মরণের পরও সঙ্গে লইয়া যাইব। তোরা যে জানিয়া শুনিয়া ওরূপ স্থানে আমার সঙ্গে যাইতে সাহস করিয়াছিলি, তাহাতে বুঝিয়াছি, তোরা কখন মানুষ ন'স।"

ললিতা কি উত্তর করিল, তাহা আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল, সুন্দরবনের জঙ্গল যে কিরূপ, তাহা তাহাদের মধ্যে কেহই আগে জানিত না। জানিলে তাহারা দয়াদিদির সঙ্গিনী হইতে সাহস করিত না।

আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। গন্তব্যস্থানে পঁহুছিবার জন্য সকলেই অল্পাধিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তবু কি ছাই এ পথের শেষ আছে! তাহার উপর এবারে কেবল গ্রাম্য পথে চলিয়াছি। অনেক সময়েই পথ এক একটা বিশাল আম্রকানন ভেদ করিয়া চলিয়াছে; মাঝে মাঝে এক আধটা গ্রাম, বাহকগণের সানুনাসিক আবেদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে বালকবালিকাগুলার মুখে উচ্চচীৎকার পূরিয়া পথের উভয় পার্শ্বে সেগুলাকে সমবেত করিতেছে। বিরক্ত হইয়া আমি পালকীতে শুইয়া পড়িলাম। শয়নের সঙ্গে সঙ্গে দিবসের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম পিতামাতাকে স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বরাত্রির ঘটনাগুলাও মনোমধ্যে উদিত হইল। এই পালকীর মধ্যেই বদ্ধচক্ষে কাল আমি না পুত্রবিয়োগিনী জননীর আকুল আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি? মুক্তচক্ষু লজ্জায় পলকের সাহায্যে আপনাকে অন্ধ করিতে চেষ্টা করিল। অমনি নির্ণাণের স্বতঃসঞ্চারী স্বপ্নবিষাদ দিবসের সংগোপনে আমার পলকমধ্যে অশ্রুবিন্দু রচনা করিল।

কিন্তু হায়, বিধাতা যে আজ আমাকে কাঁদিতে দেয় নাই। অশ্রুবিন্দু সুতরাং গণ্ডস্পর্শেরও অবকাশ পাইল না। অপাঙ্গে আশ্রয় লইতে না লইতে অসংখ্য বাদ্য-ভাণ্ডের বিকট আরাবে পথ হইতেই মুক্তাকাশে মিলাইয়া গেল।

মুখ বাহির করিয়া দেখি, আমি এক অপূর্ব্ব পুরীর পত্রপুষ্পপতাকাসজ্জিত বিচিত্রতোরণ দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

গায়ত্রী-মঙ্গল

[শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন, এম.এ]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

অনির্ব্বচনীয়া দেবী হে গায়ত্রি, রহস্যরূপিণি!
ত্রিলোকের বোধাতীত, বিশ্বের অনাদি প্রহেলিকা,
বেদের অতীত বেদ, অদ্যাপিও নাহি যার টীকা!
ছিলনা ছিলনা যবে দেশ কাল, দিবস-যামিনী
নাহি ছিল,—নাহি ছিল সূর্য্যচন্দ্র তারা-কিরীটিনী
রূপময়ী এ প্রকৃতি,—নাহি ছিল সীমার পরিখা—
ছিলে তুমি হে গায়ত্রী, অপরূপা হিরণ্ময়ী শিখা,
'নেতি' শব্দরূপা প্রভা—অনন্তে অনন্তপ্রসারিণী।
তারপর, একদিন, জাগি উঠি, হইয়া সাকারা,
অব্যক্তে করিলে ব্যক্ত, অপরূপা জ্যোতিঃ-নির্ঝরিণি!
হেরিলে নিজেরি দেহে কোটী কোটী রবি-শশী-তারা।
ভাবনা আবেশে যথা, নেত্রমুদি ধেয়ায় গর্ব্বিণী
গর্ভের অজাত রত্নে! চিত্রকর রেখার সম্পাতে
চিত্রে যথা রেখা-মূর্ত্তি, প্রতিভার বাসন্তী-প্রভাতে!

বঙ্গে অকালবার্দ্ধক্য *

[শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এম. ডি.]

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী-মহাশয় উপরিলিখিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম। নিয়োগী মহাশয়ের মত বিজ্ঞ এবং বিদ্বান ব্যক্তি যখন এই অশেষ উপকারী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন ইহাতে যে বিশেষ উপকার দর্শিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়াই তিনি এ বিষয়ে লেখনীধারণ করিয়াছেন। আমাদের অকালবার্দ্ধক্যের তিনি যে সমুদায় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যে যে উপায়ে নিবারিত হইতে পারে, প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অকাট্য। এ বিষয়ে কোন মতভেদ হইতে পারে না। আমরা সকলকেই এই প্রবন্ধটি আমূল পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এবং তাঁহার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি।

আমাদের প্রধান দোষ এই যে, আমরা কোন বিষয়েই স্থির বুঝিয়া কাজ করিতে পারি না। এই অকাল বার্দ্ধক্যের প্রধান কারণ—আমাদের বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদের—তাচ্ছিল্য ও অকালপক্কতা। আমরা শীঘ্র শীঘ্র বড়লোক হইয়া উঠিব, বিদ্বান্ এবং গণ্যমান্য লোক হইয়া দাঁড়াইব, এই জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বা অযথা শক্তিনিয়োগ করিয়া, জীবনীশক্তিকে নষ্ট বা দুর্ব্বল করিয়া ফেলি।

কিছুদিন গত হইল, আমি "জীবনী শক্তি" নামে এক-খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছি। ইহাতে আহার, পরিশ্রম, অবসর, মানসিক চিন্তা, কার্য্যক্ষমতার উপযুক্ত ও নিয়মিত চালনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। এই সমুদায় সংযত করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়, জীবনী শক্তির অযথা ক্ষয় হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমুদায় যুবক এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন—এবং যাঁহারা মুখে এই সমুদায় ঠিক বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে উপরিলিখিত নিয়ম অবজ্ঞা করিয়া কষ্ট-ভোগ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে, তন্মধ্যে অনেকেই বলেন ও সকল বিষয় আমরা জানি বটে কিন্তু ওরূপ নিয়মে কার্য্য করা সকলের সাধ্য নহে।

যে দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যুতে নিয়োগী মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন, তিনি আমার জামাতা। তাঁহাকে চিরকালই নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছি ; তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বরং আমাকে অনেক সময় বলিয়াছেন, "আপনার মত নিয়মপালন করিয়া কাজ করা অসম্ভব। এরূপ কাজ করিয়া জীবনে আরাম বোধ হয় না।" কি ভ্রম! তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তারেরা এবং আমি নিজেও তাঁহাকে মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম ; তিনি তাহা শুনেন নাই, বরং বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি

* আশী বৎসরের অধিক বয়স্ক জীবিত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি সম্বলিত জীবনী আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব।

যে, এত পরিশ্রম করি, তাহা আমার শ্বশুর-মহাশয়কে যেন জানিতে দেওয়া না হয়। দেখুন, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণই জানিতেন, স্বাস্থ্যের নিয়মলঙ্ঘনের কি বিষময় ফল। তবুও তিনি কার্য্যকালে এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া ছিলেন। তাহার ফল হাতে হাতেই ফলিল।

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দরের অকালবার্দ্ধক্যের কথা নিয়োগী-মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমি বিশেষ দুঃখিত। তিনি আমার বাল্যবন্ধু এবং আমি বহুকাল হইতে তাঁহাদের গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি। তাঁহাকে অনিয়মিত পরিশ্রম করিতে কত যে বারণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষতঃ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া এবং তদুপযুক্ত বিশ্রাম না লওয়াতে শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিত, বিজ্ঞ এবং ধীর প্রকৃতির লোকসকল স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই—তখন আর কাহার কথা বলিব!

অনেকে বলেন—ওরূপ নিয়মপালন করা সম্ভব নহে। কেন নহে—তাহা ত বুঝিতে পারি না। তাঁহারা বলেন, বিশ্রাম করা আমাদের হইয়া উঠে না। আমাদের অবস্থার লোকের তাহাতে সংসার চলে না। ইহার মত অযৌক্তিক কথা আমি কখনই শুনি নাই। আমার শ্বশুর ডাক্তার স্বর্গীয় বিহারীলাল ভাদুড়ী-মহাশয় তাঁহার এক বন্ধু রোগীকে বলিয়াছিলেন—"দেখ—এখন কিছু বিশ্রাম লাভ করিতে চেষ্টা কর। একবার বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম প্রদেশে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন কাটাইয়া আইস।" তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিলেন—আমার উহা করিতে গেলে সংসার চলে না। ভাদুড়ী মহাশয় বলিলেন—"তুমি মরিয়া গেলে কি তোমার সংসার চলিবে না? তোমার পরিবারস্থ সকলেই কি তোমার অভাবে মরিয়া যাইবে?" তাঁহার সেই বন্ধু কিছুকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে সকল বিষয়েই—বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেন। এইরূপ ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কথা এই যে, স্বাস্থ্যরক্ষা অগ্রে করিতে হইবে, ইহা আমাদের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। না করিলে অনিষ্ট হইবে, ইহাই আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না। পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেই আর একটি কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে অল্পবয়সে অসাধারণ পরিশ্রম করিতাম। আহারাদি ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রায় কোন নিয়মই রক্ষা করিতাম না। তাহার ফল হাতে হাতেই পাইলাম। কিছুদিন পরেই পিত্তশূল রোগ প্রকাশ পাইল। তাহাতে এত কষ্ট হইত যে, মৃত্যুও তাহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইত। এখানে চিকিৎসা করিয়া উপশম হইত বটে কিন্তু আবার অনিয়ম করিতাম এবং কষ্ট পাইতাম। এই সময়ে আমি আমেরিকা গমন করিলাম এবং তথায় একজন অশীতিবর্ষবয়স্ক চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার রোগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যে উপদেশ দিলেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।

তিনি প্রথমেই বলিলেন, "সকল বিষয়েই নিয়ম রক্ষা করিয়া না চলিলে উন্নতিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি এত অল্প বয়সে পরিশ্রম করিয়া, চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, ব্যাধির পীড়নে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না, হয়ত অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে ও সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার সুবিধামত একটি সময় স্থির করিয়া লইবে এবং প্রত্যহ সেই একই সময়ে আহার গ্রহণ করিবে ও উপযুক্ত বিশ্রাম করিবে। এইরূপ করিলে তুমি রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। এবং তোমার পরিবারস্থ ব্যক্তি-দিগের, দেশের ও সাধারণতঃ সকলেরই উপকার করিতে পারিবে।" এই মহাত্মার একমাত্রা ঔষধ সেবন করিয়াই আমি রোগমুক্ত হইলাম, এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে আহারাদির নিয়ম পালন করিয়া, অদ্যাবধি (প্রায় ২০ বৎসরের উপর হইল) সুস্থ ও সবল শরীরে রীতিমত কার্য্য করিতে পারিতেছি। রোগও আর প্রকাশ পায় নাই। পাঠকবর্গ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, নিয়মিতরূপে কার্য্য করিলে এবং যথাসাধ্য বিশ্রাম লইলে, জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়া, সকল দিকেই উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। সেই জন্য আমি আমার দেশীয় যুবকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী-মহাশয়ের প্রবন্ধটি উত্তমরূপ পাঠ করিয়া, তৎপ্রদর্শিত নিয়মগুলি সযত্নে পালন করুন। কেবল পাঠ করিয়া ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না, হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন; অমৃত ফল লাভ করিবেন।

ছেলেবেলার টান

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

করতে সেবন মুক্ত বায়ু
সহর ছেড়ে প্রান্তরে,
রাজার কুমার দিবস শেষে
যেতেন হ'লে শ্রান্ত রে।
শ্যামল 'খেতে' কুটীর মাঝে
কৃষকবালা একলাটি
গাইত যে গান, শুনতো কুমার
কেউ ত নাহি জানতো রে।
থাকতো 'খেতের' বেড়ার গায়ে
হলুদ—ঝিঙ্গা-ফুল দুলে,
নদীর মাঝে উজান যেত
নৌকাগুলি পাল তুলে।
কাজল-কালো অলক-বেড়া
মুখখানি তার ফুট্ ফুটে;
টুক্ টুকে তার অধরখানি
চোখ-দুটী তার ঢুল ঢুলে।

কণ্ঠ তাহার অকুণ্ঠিত
মিষ্টি তাহার দৃষ্টি রে,
করতো বালক রাজার প্রাণে
সুধার ধারা বৃষ্টি রে।
কোথায় গরিব চাষার মেয়ে
কোথায় রাজার রাজরাণী,
ভাবতো দোঁহে আপন মনে
কতই অনাসৃষ্টি রে।
কেটে গেছে অনেক বরষ,
মগ্ন কুমার রাজকাজে,
এসেছেন আজ মাঠের দিকে
অবসর ত নাই সাঁজে।
জাগিয়ে প্রাণে সুদূর স্মৃতি
হঠাৎ কাহার সুর চেনা,
অন্য সুরে সুর মিশায়ে
কুটীর মাঝে ওই বাজে।
দেখেন রাজা সলাজ মধুর
সেই সে চেনা মুখখানি,
বারেক চেয়ে তাঁহার পানে
ঘোমটাটি তার লয় টানি।
দাঁড়ায় স্বামী সসম্ভ্রমে,
নাচছে ছেলে উল্লাসে,
রাজা ভাবেন—ইহার চেয়ে
নয় গো সুখী মোর রাণী।
বলেন 'কৃষক মুগ্ধ আমি
তোমাদের ওই সঙ্গীতে;
অধিক-তর মুগ্ধ তোমার
ছেলের নাচের ভঙ্গীতে।
অদ্য হ'তে এ সব জমি
ভোগ করগে নিষ্করে,
রাজার হুকুম ভক্ত প্রজা
নাইকো জেনো লঙ্ঘিতে।'

লুসিটেনিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী]

শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী

...দন হইল, সার্দ্ধ সহস্রাধিক আরোহীর সহিত 'লুসি-টেনিয়া' নামক একখানি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া, জর্ম্মন ...নাসেনারা যে নিম্মমতার ও বর্ব্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা প্রায় সকলেই জানেন। এই লুসি-টেনিয়া জাহাজখানি যে অতি প্রকাণ্ড, এই পর্য্যন্তই অনেকে ...নিয়াছেন; কিন্তু তাহার আয়তন সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা, ...ধ হয়, অনেকেরই নাই। জাহাজখানি ৩১,৫০০ টন ওজনের মালপত্র লইতে পারিত, এই পর্য্যন্তই অনেকে জ্ঞাত ...ছেন। যাঁহারা বেশী খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, ...হা দৈর্ঘ্যে ৭৯০, ও প্রস্থে ৮৮ ফীট্; যাঁহারা আরও ...শী খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে ২,৩০০ ...রোহীর ও প্রায় ৯০০ নাবিকের—সর্ব্বসমেত ৩,২০০ ...াকের—স্থান ছিল। যাঁহারা ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহারা হয়ত পর্য্যন্তও খবর রাখেন যে, ইহার ইঞ্জিন ৬৮,০০০ অশ্ব-বল-...লী; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, এসমস্ত তথ্য জ্ঞাত ...কিলেও ইহার বিপুল আয়তন সম্বন্ধে সম্যক্ সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে না। ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিদিত হইলে, অনেকেই এই জাহাজখানিকে আরব্য-উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত একটা অসম্ভব পদার্থ বলিয়া মনে করিবেন।

আমার এই প্রবন্ধে যে চিত্রগুলি সন্নিবেশিত করিলাম, আমাদের বিশ্বাস যে, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকলেরই এই জাহাজখানি সম্বন্ধে অনেকটা যথাযথ ধারণা জন্মিবে।

লুসিটেনিয়া (Lusitania) জাহাজ সর্ব্বপ্রথম ১৯০৬ সালে জলে ভাসান হয়। গ্লাসগোর বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম—জে. ব্রাউন এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক তিন বৎসরে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই জাহাজের স্বত্বাধিকারী কনার্ড কোম্পানী (Cunard Co.)। ইহারা ১৯০৭ সালে সর্ব্ববিষয়ে লুসিটেনিয়ার অনুরূপ 'মারিটানিয়া' নামক (Mauretania) আর একখানি জাহাজ তৈয়ারী করান; এখানি তৈয়ারী করিয়াছিলেন—নিউ কাসেলের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র্ সোয়ান এবং হান্টার (Swan and Hunter —New Castle)। এই দুইখানি জাহাজকে 'সোদর পোত' (Sister-ships) বলে;—আমাদের মতে যমজ-পোত বলিলে যথোপযুক্ত হইত।

এই জাহাজ দুইখানির নির্ম্মাণ কৌশলের একটু বিশেষত্ব আছে;—আরোহী ও মালবহন ব্যতীত প্রয়োজন হইলে এগুলিকে যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত করা যাইতে পারে।—অবশ্য আজকাল মার্কিন, জাপানী, জর্ম্মন, ফরাসী প্রভৃতি সকল জাতিই বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণে এই প্রণালীই অবলম্বন করিতেছেন। ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত কনার্ড কোম্পানীর একটি বন্দোবস্ত হয়; তাহাতে স্থির হয় যে, গভর্ণমেণ্টের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন কনার্ড কোম্পানির সমস্ত জাহাজ তাঁহারা কিনিতে, বা ভাড়া লইতে পারিবেন। এখানে ভাড়ার পরিমাণের একটা আভাষ দেওয়া আবশ্যক;—অবশ্য আমরা যতদূর জানি, এপর্য্যন্ত একবারও এইসকল জাহাজ ভাড়া

লইবার প্রয়োজন হয় নাই ; এমন কি, এই মহাযুদ্ধের জন্যও নয়। তবে, যদি গভর্ণমেণ্ট ভাড়া লইতেন, তাহা হইলে, মাসিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ভাড়া দিতে হইত।

লুসিটেনিয়া 'ফোর ক্যাসেল' (Fore-castle), অর্থাৎ জাহাজের একবারে সম্মুখের অংশের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া ৬ ইঞ্চি ব্যাস মুখ কামানের এবং 'প্রমেনেড্ ডেক' (Promenade Deck), অর্থাৎ মধ্যস্থলে বেড়াইবার অংশের উভয়দিকে চারিটি করিয়া ঐরূপ ৬ ইঞ্চি মুখ কামানের—সর্ব্বসমেত বারটি কামানের—স্থান ছিল। এই জাহাজখানি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দুই কোটী টাকা খরচ পড়িয়াছিল। অবশ্য একখানি ড্রেডনট (Dreadnought) যুদ্ধের জাহাজ তৈয়ারী করিতে ইহা অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী ব্যয় হয়। তথাপি, বাণিজ্যপোত-নির্ম্মাণে ইহার পূর্ব্বে এত টাকা কখনও ব্যয়িত হয় নাই। আজকাল লুসিটেনিয়া অপেক্ষা কয়েকখানি বড় জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে সত্য (শেষভাগে তাহাদের নাম, আয়তন ইত্যাদি দেওয়া হইল) কিন্তু ইহা যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেসময়ে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং বর্ত্তমানেও (ইহার সোদরপোত মারিটানিয়া ব্যতীত) ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ছিল। ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ইহার গতি বেগ গড়ে প্রায় ২৬৬ 'নট' (Knot) অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় (২৭৯৩) ২৮ মাইল পর্য্যন্ত ছিল। আমাদের দেশের সাধারণ যাত্রীগাড়ী-গুলির (পাসেঞ্জার ট্রেণ) বেগ ইহা অপেক্ষা অধিক নয়। মারিটানিয়ার গতি ঘণ্টায় ২৭১ নট্, অর্থাৎ ২৮৷৷০ মাইলের উপর (২৮৬৬)। লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক ১২০০ মাইল যাইতে লুসিটেনিয়ার ৪ দিন ১৮ ঘণ্টা ও ৪০ মিনিট লাগিত।

লুসিটেনিয়ার ২৫টি বয়লার এবং সেগুলির জন্য ১৯২টি চুল্লী (Furnace), এবং সেগুলির ধূমনিকাশের জন্য চারটি ভীষণকায় চিমনি ছিল। চিমনিগুলির মধ্যভাগ হংসডিম্বাকৃতি ; তাহার বড় ব্যাসটি (major axis) ২৪ ফুট।

ইহার ইঞ্জিনের শক্তি ৬৮,০০০ অশ্ব-বলের সমান। *—এতগুলি ঘোড়াকে যদি পর পর সোজাসুজি দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা ৯০ মাইল ব্যাপিয়া থাকিবে—অর্থাৎ শিয়ালদহ হইতে যদি আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে শেষ ঘোড়াটি ই. বি. এস্. রেল লাইনের মুন্সিগঞ্জ ষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌছিবে! ইহার শক্তি এইরূপে বুঝাইতে পারা যায়—পঞ্জাব মেল, বম্বে মেল, বা দার্জ্জিলিং মেলে অনেকে চড়িয়াছেন ; ঐ সকল ডাক্-গাড়ীর ইঞ্জিনের ২৩০ খানি যদি একসঙ্গে জোড়া যায়, তাহা হইলে, লুসিটেনিয়ার ইঞ্জিনের সঙ্গে সমান হয় ;—অর্থাৎ যদি একটি নদীতে লুসিটেনিয়াকে রাখিয়া, দুধারে দুইটি লাইনে, ১১৫ খানি করিয়া ইঞ্জিন রাখিয়া, জাহাজখানির সঙ্গে "গুণ"-বাধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবেই জাহাজখানি নির্দ্দিষ্ট বেগে চলিবে—ইহার অল্পসংখ্যক ইঞ্জিন হইলে সেরূপ চালাইতে পারা যাইবে না।

ইহার বাহিরের আয়তন যেরূপ বিশাল, ভিতরের আয়তনও সেইরূপ প্রশস্ত, অর্থাৎ তিন সহস্রাধিক লোক থাকিবে বলিয়া কামরাগুলি মোটেই পায়রার খোপের মত নহে—বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। যদি কাহাকেও, চোখ বাধিয়া আনিয়া এই জাহাজের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কখনও ভাবিতে পারিবে না যে, সে জাহাজে আসিয়াছে—কোনও রাজ-প্রাসাদে বা স্বপ্ন রাজ্যে আসিয়াছে ভাবিয়া সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ২৬০টি কামরা, তাহাতে ৫০০ যাত্রীর স্থান ছিল—কোনও কোনও কামরায় দুই জন এবং কতকগুলি কামরায় এক একজন করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা। ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম পাঁচটি অক্ষরের নামে পাঁচটি ডেক ছিল, সেগুলি প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ; এগুলিতে যাতায়াতের জন্য দুইটি 'ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌ট্' (Electric lift) এবং অনেকগুলি সোপান-শ্রেণী ছিল। জাহাজের পশ্চাদ্ ভাগে একটি উন্মুক্ত এবং সুপ্রশস্ত বারাণ্ডা ছিল—এখানে মুক্তবায়ু সেবনের সম্পূর্ণ সুবিধা ঘটিত, অথচ ঝড় বা ঢেউয়ের উপদ্রব হইতে নিরাপদ ছিল। 'ডি' নামের ডেক্‌টা লম্বায় ৮৫ এবং চওড়ায় ৮৮ ফীট ; এইরূপ দুইটি ডেক্ 'লন টেনিস্' (Lawn-Tennis) খেলিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রথম শ্রেণীর ভোজনাদির জন্য ১৮,০০০ খানি মিশ্র-রৌপ্যের (Ornate Silver) তৈজসপত্র ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দোবস্ত এত চমৎকার ছিল যে, অন্যান্য জাহাজের প্রথম শ্রেণীতেও অত সুন্দর ব্যবস্থা থাকে না! তৃতীয় শ্রেণীর জন্য একটি প্রকাণ্ড ভোজনগৃহ (Dining

Room) তাহা (Revolving chair) ঘূর্ণনশীল কেদারা দ্বারা সজ্জিত, একটি বিশ্রামাগার, একটি বৃহৎ ধূমপানাগার—আমাদের কলিকাতায় (Government House) রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে (N. E wing) কাউন্সিলের সদস্যদের জন্য যে ধূমপানাগার আছে, ইহা তাহা অপেক্ষা ছোট ছিল না, বরং অধিকতর সুসজ্জিত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও ডেকের খানিকটা খানিকটা অংশে বেড়াইবার অধিকার ছিল।

এই জাহাজ যখন জলমগ্ন হয়, তখন তাহাতে প্রথম শ্রেণীর আরোহী ২৯০, ২য় শ্রেণীর ৬৬২, ৩য় শ্রেণীর ৩৬১, নাবিকাদি ৬৬৫ সর্ব্বসমেত ১৯৭৮ লোক ছিল;—তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক পাঁচশত ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিল; তাহার মধ্যেও আবার অনেকে জাহাজ ডুবিবার সময় আহত হওয়ায়, হাস পাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে, দুর্ঘটনায় জাহাজ ডুবিয়া, কোথায় কত লোক মারা গিয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশেষে দেওয়া হইয়াছে।

লুসিটেনিয়ার আয়তনাদি—

দৈর্ঘ্য	৭৯০ ফীট
চওড়া	৮৮ ,,
তলদেশ হইতে ডেক পর্য্যন্ত উচ্চতা	৮০ ,,
পূর্ণ পরিমাণ বোঝাই হইলে জলমগ্ন অংশ	৩৭॥০ ,,
সম্পূর্ণ বোঝাই অবস্থায় জাহাজ দ্বারা উৎসারিত জলের ওজন—	৪৫,০০০ টন
কেবল জাহাজের ঐ	৩১, ৫৫৫ ,,
ইঞ্জিনের শক্তি	৬৮,০০০, অশ্ববল
চিমনি পর্য্যন্ত উচ্চতা	১৫৫ ফীট
মাস্তুল ঐ	২১৬ ,,
যাত্রীর স্থান—১ম শ্রেণীর আয়তন—	৫০০ ,,
২য় ”	৫০০ ,,
৩য় ”	১৩,০০ ,,
নাবিকাদির ঐ—	৮০০ হইতে ৯০০ ,,

একবারের যাত্রায়, যাত্রী ও নাবিকদের জন্য যে, রক্ষিত ও জীবন্ত পশুপক্ষী, মাত্র আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন, তাহার তালিকা দেখুন।

রক্ষিত খাদ্য		জীবিত খাদ্য—	
* কচ্ছপ	৩টি	বৃষ	৪০টি
Mackeral মৎস্য	২ বাক্স	ভেড়া	৮৮ ,,
Red Herrings,,	১২ পিপা	শূকর	১৩০ ,,
টাট্কা ঐ	১০ বাক্স		
Herrings ,,	১২ ,,	মেষশাবক	৬০ ,,
Salmon ,,	৭৬০ সের	গো বৎস	১০ ,,
Ling ,,	৪১ মণ	মুরগী	২০০০,,
বিবিধ টাট্কা মাছ	৪৫ বাক্স	পাতিহাঁস	৯০ ,,
Kippers (লোণামাছ)	৭০ ,,	রাজহাঁস	৩৫০ ,,
Haddocks মাছ	৮৪ ,,	টার্কি	১৫০ ,,
বড় গুগ্‌লি	২০ কেগ্	স্নাইপ	২০০ ,,
	ইত্যাদি—	Quail পাখী	৮০০ ,,
		Grouse ,,	২৫০ ,,
		পায়রা	৪০৩ ,,
		ময়ূর	২০০ ,,
		তিত্তির	২৫০ ,,

লুসিটেনিয়া জাহাজের পরিচয় যাহা উপরে লিখিত হইল, তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, কি বিশাল জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে। এই জাহাজখানি সম্বন্ধে আরও বিশদ পরিচয় দিবার জন্য, অন্য একটি উপায় অবলম্বিত হইল;—নিম্নে যে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা হইতে এই বিরাট জাহাজের পরিচয় আরও পরিস্ফুট-রূপে উপলব্ধ হইবে।—

লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ যেমন বড়, তাহার গম্বুজাদিও তেমনই উচ্চ। পর পৃষ্ঠায় উপরের চিত্রে সেই পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ প্রদর্শিত হইল, এবং তাহার সম্মুখে লুসিটেনিয়ার যমজভগিনী মারিটানিয়া জাহাজখানি বসাইয়া দিলে, এত বৃহৎ পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের কতখানি ঢাকিয়া যায়, তাহা এই চিত্র দর্শন করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। বিশাল প্রাসাদের

---

* বলা বাহুল্য এগুলি মহাকচ্ছপ। মহাভারতে যে 'গজকচ্ছপের যুদ্ধে'র কথা আছে, এগুলি সেই আদি-কচ্ছপের বংশধর; কিংবা যাঁহারা অবতার-মতের বিরোধী, তাঁহারা বোধ হয়, ইহার আকৃতির কথা শুনিয়া, একেবারে কূর্ম্ম-অবতারের সত্যতা-সম্বন্ধে আস্থাহীন হইবেন না। এই সকল কচ্ছপের এক একটির ওজন ১ মণ ১৫ সের।

দুই একটি চূড়া ব্যতীত, আর সকল অংশই এই জাহাজখানি ঢাকিয়া রাখিতে পারে।

গ্লাসগো নগরের আর্গাইল ষ্ট্রীট, একটি নামজাদা বিস্তৃত রাজপথ; এমন বিস্তৃত রাজপথ অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। উপরের চিত্রে সেই রাজপথের দৃশ্য প্রদর্শিত হইল। সেই রাজপথের মধ্যে

পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ ও মারিটেনিয়া জাহাজ

'লুসিটেনিয়া' জাহাজের একটা 'ফাঁদল' (Funnel) শোয়াইয়া দিলে, রাজপথটির কতখানি স্থান জুড়িয়া যায়, তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। 'লুসিটেনিয়া' জাহাজে এই প্রকার বিপুলায়তন চারিটি ফাঁদল (Funnel) আছে।
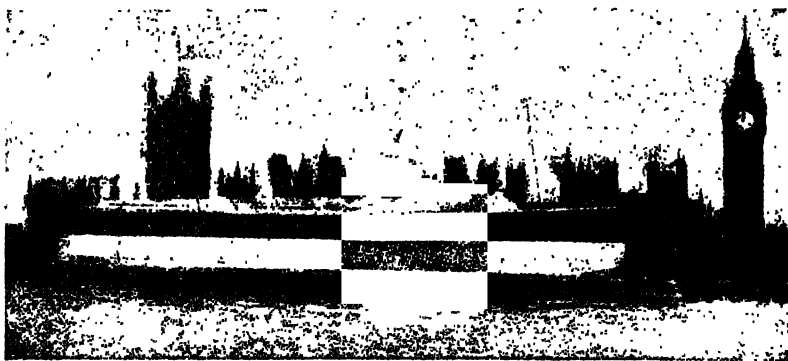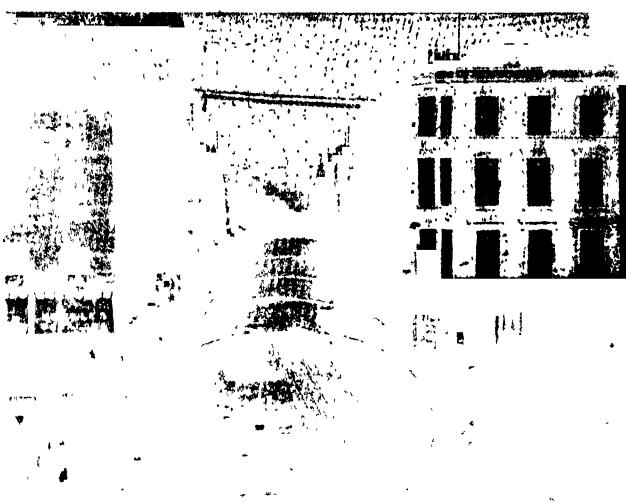
গ্লাসগো নগরের আর্গাইল ষ্ট্রীট ও লুসিটেনিয়ার ফাঁদল

রোমের সেণ্টপিটার গির্জ্জার পরিচয় আর 'ভারতবর্ষের' পাঠকদিগকে বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় এত উচ্চশির উপাসনালয় আর নাই; এবং পোপ মহাশয়গণের প্রাসাদ

রোমের সেণ্ট পিটার গির্জ্জা, ভ্যাটিকান্ প্রাসাদ ও লুসিটেনিয়া

(Vatican) বলিতে গেলে অভ্রভেদী। এই অভ্রভেদী উপাসনালয়ের সম্মুখে 'লুসিটেনিয়া'কে বসাইয়া দিলে, তাহার কতখানি এই জাহাজের পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহাই এই চিত্রে প্রদর্শিত হইল। এ চিত্রে জাহাজখানি যথাযথভাবে অঙ্কিত না করিয়া, তাহার কাঠামো মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

ইজিপ্টের পিরামিড ও লুসিটেনিয়া

ইজিপ্টের 'পিরামিড' জগদ্বিখ্যাত। এই পিরামিড ৪৫ ফিট উচ্চ ; এই উচ্চ পিরামিডের পার্শ্বদেশ ক্রমে ঢালু হইয়া আসিয়াছে, এবং ইহা প্রায় চল্লিশ বিঘা ভূমির উপর অবস্থিত। এই বৃহৎকায় পিরামিডের গাত্রে 'লুসিটেনিয়া' জাহাজখানিকে শোয়াইয়া দিলে, পিরামিডের মস্তক হইতেও জাহাজখানির প্রান্ত কত উচ্চে থাকে, তাহাই এই চিত্রে প্রদর্শিত হইল। জাহাজখানি যে কত বড়, তাহা এই চিত্র দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।
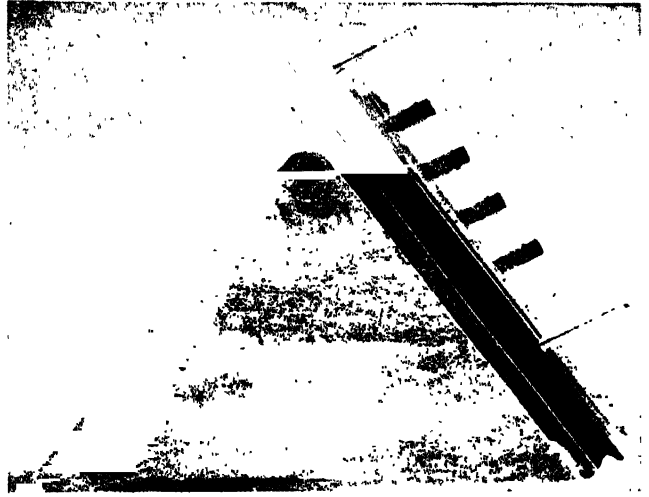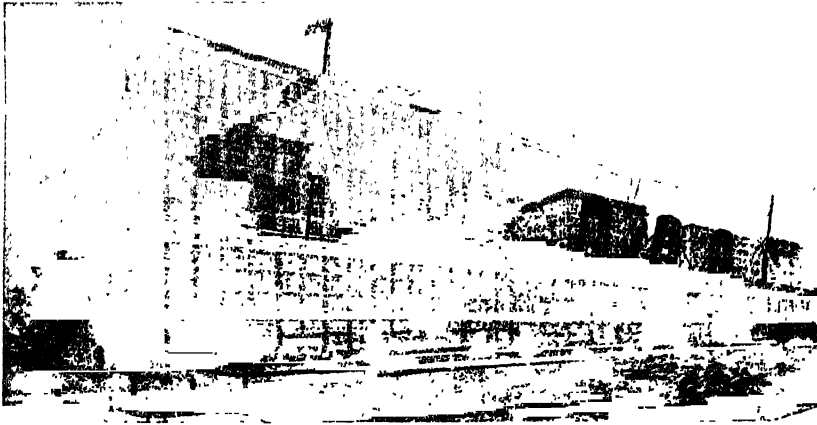
চিকাগো সহরের 'অডিটোরিয়ম্' হোটেল (Auditorium Hotel) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভোজনাগার। এত উচ্চ গৃহ পৃথিবীতে আর নাই। এই হোটেলে দুই হাজার কক্ষ আছে। হোটেলটি ১৯১ ফিট উচ্চ। এই হোটেলের গায়ে 'লুসিটেনিয়া' জাহাজখানি বসাইয়া দিলে

চিকাগোর 'অডিটোরিয়ম' হোটেল ও লুসিটেনিয়া

ব্রুকলিন সেতু ও সমজ জাহাজদ্বয়

কি রকম দেখায় এবং হোটেলটির কতটা জাহাজখানি ঢাকিয়া ফেলিতে পারে, তাহাই এই চিত্রে দেখান হইল।

পৃথিবীর মধ্যে ব্রুকলিন ঝোলা সেতু (Brooklyn Suspension Bridge) সর্ব্বাপেক্ষা বড় ;—স্থাপত্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার দৈর্ঘ্য দুইদিকের স্তম্ভ পর্য্যন্ত ১৫৯৫ ফীট। সেতুটির প্রস্থ ৮৫ ফীট। তের বৎসর ধরিয়া এই সেতু নির্ম্মিত হয়। এই সেতুর গায়ে 'লুসিটেনিয়া' ও 'মারিটানিয়া' দাঁড় করাইয়া দিলে, কতখানি স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাই এই দৃশ্যে প্রদর্শিত হইল।

লুসিটেনিয়া, লিভারপুল হইতে নিউইয়র্কে যাতায়াত করিত। ইহার একবার যাত্রায়, অর্থাৎ লিভারপুল হইতে নিউইয়র্কে যাইতে, যে পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হইত, তাহা আনিতে ২২ খানি ট্রেণের দরকার হইত। প্রত্যেক ট্রেণে ৩০০ মণ কয়লা থাকিত। এখন সকলে হিসাব করিয়া দেখুন, একবার লিভারপুল হইতে নিউইয়র্কে যাইতে এই জাহাজের কত মণ কয়লা লাগিত! উপরে তাহারই চিত্র প্রদত্ত হইল।

প্রাসাদময়ী নগরী (City of Palaces) কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ অট্টালিকা Writers' Buildings, বা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার অফিস। কিন্তু যদি এই লুসিটেনিয়াকে তাহার সামনে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে, লম্বায় সমস্ত আচ্ছাদিত হইয়া, জাহাজখানি দুই ধারে ৪৫ ফীট করিয়া বাহির হইয়া থাকিত। উচ্চতায়ও সমস্ত ঢাকিয়া যাইত, কেবল চারতালায় যে তিনটি ঘর (mansheds) আছে সেগুলির খানিকটা খানিকটা ডেকের উপর জাগিয়া থাকিত। অবশ্য জাহাজের চিমনি ও মাস্তুলাদি যে, বাড়ীটি ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে থাকিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অতীত দুর্ঘটনা*

নিম্নলিখিত জাহাজগুলি বিভিন্ন সময়ে জলমগ্ন হইয়াছে ;—

জাহাজের নাম (আয়তনানুসারে) — মৃত যাত্রিসংখ্যা

(১) কানাডার ষ্টীমার এক্‌স্‌প্রেস,
সেণ্ট লরেন্সে ডুবি হয় (মে, ১৯১৪) ... ১০১১

(২) ভলটারণো,
আটলাণ্টিক মহাসাগরে দগ্ধ হয়, (অক্টোবর, ১৯১৩) ১১৬

(৩) টাইটানিক,
আটলাণ্টিকে ডুবি হয় (১১ই এপ্রিল, ১৯১২) ১৫০৩

'লুসিটেনিয়ার কয়লা

(৪) জেনারেল ক্রন্‌জি,
মাইনরকার অদূরে নিরুদ্দেশ হয়, (ফেব্রুয়ারী, ১৯১০) ২০০

(৫) ওয়ারাটা,
ডরব্যানের নিকট অন্তর্হিত হয় (সেপ্টেম্বর, ১৯০৯) ২১১

(৬) টেস্‌,
জাপান-উপকূলে ডুবিয়া যায় (নবেম্বর, ১৯০৮) ১৫০

(৭) মুৎসু মারু,
হাকোডেটের নিকট ডুবি হয় (মার্চ্চ, ১৯০৮) ৩০০

* 'ভারতবর্ষ'—২য় বর্ষ—১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩২১) ৫৩৬-৭ পৃষ্ঠায় "জাহাজ-ডুবি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—ভাঃ সঃ।

জাহাজের নাম	মৃত যাত্রিসংখ্যা
(৮) সার্ডিনিয়া, ভূমধ্য-সাগরে দগ্ধ হয় (নবেম্বর, ১৯০৮)	১২৩
(৯) কাপ্টেন, উত্তর-সাগরে মগ্ন হয় (নবেম্বর, ১৯০৭)	১১০
(১০) বার্লিন, হুক অব হল্যাণ্ডে ডুবি হয় (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭)	১২৮
(১১) সিরিয়ো, স্পেন উপকূলে মগ্ন হয় (আগষ্ট, ১৯০৬)	৩০০
(১২) হিলডা, সেণ্ট ম্যালোর নিকট মগ্ন হয় (নবেম্বর, ১৯০৫)	১২৮
(১৩) নরজ্, রকল রিফে মগ্ন হয় (জুন, ১৯০৪)	৬৩৭
(১৪) জেনারেল স্লোকাম, নিউ ইয়র্কে দগ্ধ হয় (জুন, ১৯০৪)	১০০০
(১৫) ষ্টেলা, অলডার্নির নিকট অন্তর্হিত হয় (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯)	১০৫
(১৬) লা বোর্গোঁ, নবাস্কোশিয়ার নিকট মগ্ন হয় (জুলাই, ১৮৯৮)	৫৪৫
(১৭) রোলিট্ (জুলাই, ১৮৯৮)	৪৬৯
(১৮) মোহিগান্, কর্ণওয়ালের নিকট মগ্ন হয় (অক্টোবর, ১৮৯৮)	১০৭
(১৯) এল্‌ব্, লোষ্টফের নিকট মগ্ন হয় (এপ্রিল, ১৮৯৮) ...	৩৩৪

জাহাজের নাম	মৃত যাত্রিসংখ্যা
(২০) ড্রমণ্ড ক্যাসল্, উসাণ্টের নিকট মগ্ন হয় (জুন, ১৮৯৮) ...	২৪৭
(২১) সালিয়ার, করুবেডি অন্তরীপের নিকট মগ্ন হয় (ডিসেম্বর, ১৮৯৮)	২৮০
(২২) কোলিমা, মেক্সিকোর দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে মগ্ন হয় (মে, ১৮৯৬)	১০৮
(২৩) ইউটোপিয়া, জিব্রাল্টরের নিকট মগ্ন হয় (মার্চ, ১৮৯১) ...	৫৬৪
(২৪) সাংঘাই, চিংকিয়াংয়ের নিকট দগ্ধ হয় (ডিসেম্বর, ১৮৯০)	৩০০
(২৫) সিডান ও গিজন, ফিনিষ্টার অন্তরীপের নিকট পরস্পর সংঘর্ষে দুইখানি মগ্ন হয় (জুলাই, ১৮৮৪) ...	১৫০
(২৬) সিম্‌ব্রিয়া, ডচ্ উপকূলে মগ্ন হয় (জানুয়ারী, ১৮৮৩) ...	৪৫৪
(২৭) প্রিন্সেস এলিস, টেম্‌স্ নদীতে মগ্ন হয় (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮)	৭০০
(২৮) কুইন্স্‌ল্যাণ্ড, ফিনিষ্টারের নিকট মগ্ন হয় (জুলাই, ১৮৭৬) ...	৫৬৯
(২৯) কস্‌পাট্রিক, নিউজিল্যাণ্ডে দগ্ধ হয় (নবেম্বর, ১৮৭৪) ...	৪৭০
(৩০) সার জন লরেন্স, পুরীযাত্রীসহ বঙ্গোপসাগরে মগ্ন হয় (জুন, ১৮৭৭)	১৪০০

সর্ব্ববৃহৎ কয়েকখানি জাহাজের পরিচয়

		পরিমাণ (টন্)	বেগ (নট)
হামবর্গ আমেরিকা লাইন্	ভ্যাটরল্যাণ্ড	৫৪২৮২	২৪
কনার্ড	অ্যাকুইট্যানিয়া	৪৫৬৪৭	২৪
হাঃ আঃ লাঃ	ইম্পরেটর্	৫১৯৬৯	২৩॥
হোয়াইট্ ষ্টার্ লাইন্	অলিম্পিক	৪৬৩৫০	২২॥
কনার্ড	মারিটানিয়া	৩১৯৩৮	২৫
হাঃ আঃ লাঃ	কলম্বস	৩৫০০০	২৫

এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট চিত্র ও উপকরণগুলির অধিকাংশ সংগ্রহের জন্য আমি আমার অগ্রজোপম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায় (ভাইস-প্রিন্সিপাল 'মূক ও বধির বিদ্যালয়'—কলিকাতা) মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি ১৯১১ সালের অগষ্ট মাসে, আমেরিকা যাত্রাকালে লুসিটেনিয়ার প্রথম শ্রেণীর আরোহী ছিলেন।

বেলজিয়ম সেনাবিভাগে রসদাদিবাহী কুক্কুর

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

'সরমা' অর্থে, যে খেলা বা শিকার করে। পুরাণে সরমা কশ্যপ-কন্যা। 'সারমেয়' দেবশুনি সরমার পুত্র; আবার মহাভারতে দেখিতে পাই—"শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন, ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এক কুক্কুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে যজ্ঞীয় ঘৃত অবলেহন বা তাহা দর্শন না করিলেও, জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করে। নিরপরাধ পুত্রকে প্রহার করায় তাহার মাতা তাহাদিগকে শাপ প্রদান করে। জনমেজয় সরমা-শাপ-মোচন-কল্পে ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।" সুতরাং পুরাণের সারমেয় বড় যে সে জীব নহে।

আবার "একদা যখন অরিমর্দ্দন কুরুপাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করেন, তখন তাহাদের সমভিব্যাহারে এক কুক্কুর ছিল। সেই কুক্কুর অলক্ষিতভাবে বনচারী হিরণ্যধনুপুত্র একলব্যের প্রতিগমন করিয়া চীৎকারধ্বনি করিতে থাকিলে, নিষাদ-রাজতনয় সেই রোরুদ্যমান কুক্কুরের আস্য মধ্যে এককালে সপ্ত শরক্ষেপণ করেন।" সুতরাং সে কালেও মৃগয়াকল্পে কুক্কুর নিয়োজিত হইত।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গ হইতে দেবযান উপস্থিত হইলে, স্ব সমভিব্যাহারী কুক্কুরকে ত্যাগ করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সে কুক্কুররূপী সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। রূপক পরিবর্জ্জনে, ইহা হইতেই সারমেয়-কুলের প্রভুভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কলের কামানবাহী কুক্কুর

গৃহপালিত যাবতীয় পশুর মধ্যে কুক্কুর মানবজাতির অশেষ উপকারী— ইহা অনেক কাজে লাগে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের দ্বারা যত প্রকার কার্য্যসম্পাদন হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে বর্ত্তমান প্রতীচ্য মহাযুদ্ধক্ষেত্রে

কয়েকটি নূতন ধরণের অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে;—সে কার্য্য সামরিকও বটে, সেবামূলকও বটে। এই প্রবন্ধে 'উইণ্ডসর্ ম্যাগেজিন্' হইতে আমরা সে সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

কুক্কুর-জাতি অতি সহজেই নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। বেলজিয়ম্, হল্যাণ্ড প্রভৃতি নিম্ন-প্রদেশে (Low Countries) কুক্কুরদিগকে ভারবাহী পশুরূপে নিয়োগ করা হয়। নেদার্ল্যাণ্ডস্ এবং ফ্ল্যাণ্ডার্স প্রদেশে পথে ঘাটে কুক্কুরবাহিত দুগ্ধ শকট, শাক-সবজীর গাড়ী, মণিহারী দ্রব্যের গাড়ী প্রভৃতি ছোট ছোট গাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক গাড়ীতে দুই তিনটি কুক্কুর জোতা থাকে।

ফরাসী মোটরদ্বিচক্রযানারোহী দূতের সহগামী সংবাদবাহী কুক্কুর

হল্যাণ্ড দেশের এই সকল গাড়ী এমন সুন্দর যে, মিঃ, ডি. এস. মেলড্রম্, তাঁহার 'Home life in Holland' পুস্তকে হল্যাণ্ডবাসীদিগের দৈনিক জীবন-যাত্রাপ্রণালী-বর্ণনচ্ছলে ইহাদের অপূর্ব্ব উপযোগিতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্যারী-পুলিশের গুপ্তচর-সহায় ও অকস্মাৎ জল-পতিত লোকের উদ্ধারকারী, বর্ব্বর এস্কুইমোঁ জাতির নিত্যসহচর, তুষারপ্রধান দেশের তুষারক্লিষ্ট বিপন্ন জনের জীবনরক্ষাকারী, এবং প্রভুভক্তির বিবিধ অদ্ভুত পরিচয়-প্রদানকারী কুক্কুরের

মেজর রিচার্ডসনকর্তৃক-শিক্ষিত ইংলণ্ডের "রেড্ ক্রস্" কুক্কুর

বিচিত্র কার্য্যকাহিনী আমরা অনেকেই বিদিত আছি। কিন্তু শান্তিকালের এই সকল কার্য্য ব্যতীত, বেলজিয়ম্-বাসীরা বর্ত্তমান মহাযুদ্ধক্ষেত্রে এই মানব-অনুচরদিগকে রণাঙ্গনে বিশেষ সাহায্যকার্য্যে সুশিক্ষিত করিয়া, কুক্কুর-জাতির মহোপকারিতা যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। রণ-ক্ষেত্রে যে, তাহাদিগের নিকট হইতে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে, একথা বেলজিয়মবাসীরা অনেক দিন হইতে বুঝিয়াছে এবং যুদ্ধের উদ্যোগ পর্ব্ব হইতেই ইহাদিগকে সেই ভাবে সুশিক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। কুক্কুরে যখন ছোট ছোট গাড়ী টানিতে পারে, তখন তাহারা যে লঘুভার কামান, ম্যাক্সিম্‌নির্ম্মিত কলের কামান প্রভৃতি অনায়াসে টানিতে পারিবে, এ কথা বেলজিয়মবাসীরা বহুদিন পূর্ব্বেই ধারণা করিয়াছিল। এই মহাসমরের সূত্রপাতকালের যুদ্ধ-চিত্রগুলিতে আমরা কুক্কুরদিগকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়াছি। এক একটি কামানের গাড়ীতে দুইটি করিয়া কুক্কুর জোতা থাকে, একজন সৈনিক তাহাদের পাশে থাকিয়া চালনা করিয়া লইয়া যায়, তাহাদের পাশে পাশে সেই দলের বাকী সৈনিকগুলি পাশাপাশি দুইজন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কুচ করিতে থাকে। ইহাদের সাজ সাদাসিধা ধরণের কিন্তু খুব শক্ত, বুক বেড়িয়া একটি 'পাটা' দিয়া ইহাদিগকে গাড়ীর সহিত সংবদ্ধ করা হয়—তাহার বলেই গাড়ীতে টান পড়ে। গাড়ীগুলিকে লঘুভার করিবার জন্য প্রায়ই সেগুলিতে বাইসাইকেলের চাকার মত সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত রবারের 'ছাল'-সংযুক্ত চাকা সংযোজিত থাকে; আবার কোন কোনটিতে

বায়ুপূর্ণ রবারের 'হাল' (pneumatic tyres) সন্নিবেশিত থাকে। 'ত্রিপদ'-বন্দুকগুলিকে ফেরীওয়ালাদের সাধারণ গাড়ীতে করিয়াই লইয়া যাওয়া হয়। শান্তিকালে কুক্কুরগুলি পুলিশের অধীনে থাকিয়া, তাহাদের আবশ্যকমত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু যুদ্ধসূচনা হইলেই সেগুলিকে সমরবিভাগের অধীনে দেওয়া হয়। ফলে, এই রূপেই উহারা পালিত ও শিক্ষিত হইয়া থাকে।

মেজর রিচার্ডসন্ ও তাঁহার "ব্লড্-হাউণ্ড" কুক্কুরসমূহ

যুদ্ধক্ষেত্রে যে কেবল বন্দুককামান-বহনেই ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়, তাহা নহে। সুদূর অতীতকাল হইতেই ইহারা দূত এবং প্রহরীরূপে নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে বড় বড় ডালকুত্তা রোমের ছাউনীগুলির প্রহরী কার্য্য করিত। ফ্রেডরিক দি গ্রেট এবং নেপোলিয়ান্, কুক্কুরের কার্য্যকারিতা ও মূল্যবত্তা সুবিদিত ছিলেন। নেপোলিয়ন্, আলেকজেণ্ড্রিয়ার পরিবেষ্টনী প্রাচীর পাহারা দিবার জন্য কুক্কুরের শ্রেণী সজ্জিত করিয়া রাখিতে মার্ম্মণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে একদা উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট্ ছাউনি করিয়া মোনায় অবস্থান করিতেছিলেন; এমন সময় শত্রুপক্ষ গুপ্তভাবে নিঃশব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। অরাতিকুল সফলকাম হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত ও পরাভূত হইতে

ফরাসীদের "রেড্-ক্রস্" কার্য্যে রত কুক্কুর

হইত। কিন্তু একটি প্রভুভক্ত স্প্যানিয়েল জাতীয় কুকুর স্বাভাবিক শক্তিবলে আসন্ন বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়া, চীৎকার শব্দে সকলকে জাগরিত করিয়া, বিপদ্‌পাত হইতে রক্ষা করে। ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ তীব্র ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তিপ্রভাবে কোনও গুপ্ত আসন্ন বিপদ্-সম্ভাবনার অনুমানে ইহারা অদ্বিতীয়। যুদ্ধোপযোগী হইবার পক্ষে যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, ইহাদের সে সকলের কোন গুণেরই অভাব নাই। ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু; আহার সম্বন্ধে ইহাদিগকে সহজে সুলভে তৃপ্ত করিতে পারা যায়। আর সর্ব্বোপরি ইহাদের বিশ্বস্ততা কিছুতেই কলুষিত বা নষ্ট হয় না! এই জন্যই যুদ্ধশীল জাতি মাত্রেই রণক্ষেত্রে ইহাদিগকে নিয়োগ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। শুনা যায়, জর্ম্মন জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে ছয় সহস্র কুক্কুর নিযুক্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যে Colly, Pointer, Airedale প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় কুক্কুর আছে। রুষেরা ককেসস্ পর্ব্বতজাত কুক্কুরগুলিকেই পছন্দ করে; অষ্ট্রীয়াদেশে ড্যাল-মেশিয়ান জাতির আদর বেশী; বেলজিয়ান্ ও ফরাসীরা এক জাতীয় কুক্কুরকে এপক্ষে উপযোগী মনে করে; তুর্কীরা এসিয়ার মেষরক্ষক কুকুর জাতিকেই উপযোগী বিবেচনা করে—তবে লঘু অস্ত্রশস্ত্র, বরফ-রসদাদি বহনের জন্য জর্ম্মন Boarhound এবং রুষ্ Borzoiগুলিকে নিযুক্ত করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রীয়ানদিগের ধারণা যে, পার্ব্বত্য যুদ্ধে সুগম পথপ্রদর্শনের পক্ষে কুক্কুরের ন্যায় দ্বিতীয় সহায় নাই। আলজিরিয়ার ফরাসীরা বহুকাল হইতেই যুদ্ধে কুক্কুর নিযুক্ত করিয়া আসিতেছে; এক কুক্কুরবংশাবতংস বীর প্রথমে 'কর্পোরাল' এবং পরে 'সার্জ্জেণ্ট' পদে উন্নীত হইয়াছিল—সেই সকল পদচিহ্ন ধারণ করিয়া সে সগৌরবে বেড়াইত।

Trans-Siberian এবং Manchurian রেলপথ নির্ম্মাণকালে কুক্কুরের সতর্কতা বলেই সেগুলি জাপানীদিগের শত্রুতাচরণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। আরব-অভিযানে কুকুরের কার্য্যকারিতা বিশেষরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ইংলণ্ডে কুক্কুরদিগকে বিবিধ সামরিক
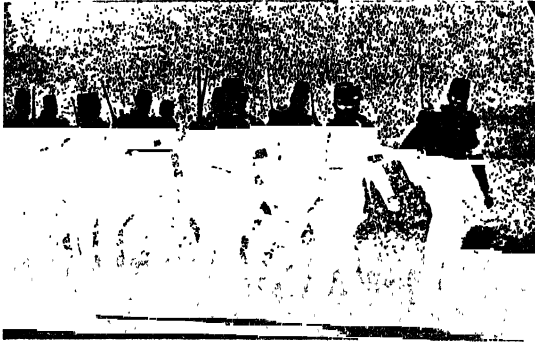
ফরাসী "রেড্-ক্রস" সেনানীসহ ও কুক্কুরের কুচ

শিক্ষা দিবার পক্ষে অগ্রণী মেজর-রিচার্ডসন্; ইনি Airedale জাতীয় কুক্কুরের ভক্ত। আরব-অভিযানে অষ্টম গুর্খা-সৈন্যদলের অধিনায়ক Major Alban Wilson মহোদয়ের পত্নী অভিযানকালে এই সৈন্যদলকে রিচার্ডসন্ কর্তৃক শিক্ষিত দুইটি Airedale উপহার দিয়াছিলেন। গুর্খারা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও তীব্র শ্রবণশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ পক্ষে কুক্কুরেরা যে তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। মেজর উইলসন্ বলেন—"পথের আশেপাশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত শত্রুর অবস্থান-বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই জানাইতে ইহারা কখনও ত্রুটি করে নাই। ফলে, এই জন্যই আমাদের কি পূর্ব্বগামী, কি মূল সৈন্যদল একবারও সেরূপ ভাবে বিপন্ন হয় নাই।" সম্প্রতি এড্রিয়ানোপল্ আক্রমণকালে বুলগেরিয়ান্‌গণ মেজর রিচার্ডসনের কয়েকটি কুক্কুর রাখিয়াছিল; যখনই তুর্কীরা সহসা গুপ্ত আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তখনই ইহারা তাহার পূর্ব্বঘোষণা করিয়া শত্রুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে।

তর্কস্থলে অনেকে একথা বলিয়া থাকেন যে, একপক্ষে কুক্কুর-অতিতায়ীর আগমনবার্ত্তা, ঘোষণা করিয়া স্বপক্ষকে সতর্ক হইতে সাহায্য করে; কিন্তু অপর পক্ষে বিপক্ষ-দলকে স্বপক্ষের অবস্থান-নির্দ্দেশ করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলে। যে জাতীয় কুক্কুর বিকট চীৎকারে দিগন্ত মুখরিত করে, তাহাদিগকে লইয়া অবশ্য এরূপভাবে বিব্রত হইতে হয় বটে; কিন্তু এই কারণেই মেজর রিচার্ডসন্ সমর-সারমেয় হইবার পক্ষে Airedale-জাতীয়কেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। শত্রুর সন্ধান পাইলে এই জাতীয় কুক্কুর কোন বৃথা গোলমাল করে না—গুরুগম্ভীরস্বরে একটা হুঙ্কার মাত্র করিয়া স্তব্ধ হয়। এই ইঙ্গিতই অবশ্য মানবপ্রহরীর পক্ষে যথেষ্ট এবং ইহা লক্ষ্য করিয়াই সে বিহিতবিধানে তৎপর হয়।

সন্নিকটবর্ত্তী ফাঁড়িগুলির সংবাদাদি আদান-প্রদানের জন্য দূতরূপে নিয়োগ করিবার পক্ষেও কুক্কুর বিশেষ উপযোগী। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট্ এই কার্য্যের জন্য রিচার্ডসন সাহেবের নিকট হইতে কতকগুলি এয়ারেডেল লইয়া ফণ্টেন ব্লোতে রাখিয়াছেন। Algeriaতে Chasseurদিগের এবং টিউনিস ও আল্জীয় রেজিমেণ্টের সঙ্গে থাকিয়া ইহারা ইহাদের কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন করিয়াছে। ফ্রান্সে এখন ইহারা বেশ কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যে অবস্থাবিশেষে ইহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে নিয়োগ করা হয়—তন্মধ্যে, সাধারণ একজন Motor Cyclist পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ীতে ইহার একটিকে বসাইয়া লইয়া যায় এবং গন্তব্য স্থানে উপস্থিত
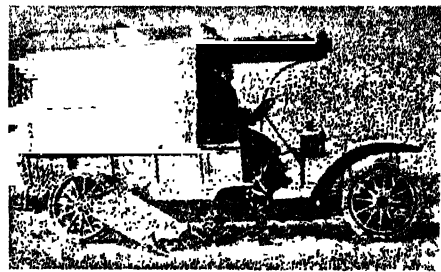
"রেড্-ক্রস্"-যান সহগামী কুক্কুর

হইয়া আবশ্যক সংবাদ তাহার গলার 'কলারের' মধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়া ছাড়িয়া দেয়; সে আত্মগোপন করিয়া, কৌশলে যথাস্থানে সেই সংবাদ বহন করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করে। মানুষ যেখানে অলক্ষিতভাবে গমন করিতে অক্ষম, কুক্কুরেরা অনায়াসে সেই সকল স্থানে গমন করিতে সমর্থ। তাহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে (instinct) অনায়াসে সুদূরে অবস্থিত তাহার প্রভুসকাশে উপস্থিত

হইতে পারে। এইরূপে স্বপক্ষ-দলের কেন্দ্র ও ফাঁড়িগুলির মধ্যে কুক্কুরের ডাক যাতায়াত করে। Pruses নামক একটি কুক্কুর এই কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে—তাহার কোন না কোন অদ্ভুত কার্য্যকারিতার কথা প্রায়ই যেথানে সেথানে অনেকের মুখে শুনা যায়।

হাঁসপাতাল-উদ্দেশে প্রেরিত আহত কুক্কুর

যুদ্ধ ব্যাপারে কুক্কুর যেরূপে সাহায্য করে, এতক্ষণ তাহারই উল্লেখ করা গিয়াছে; কিন্তু যোদ্ধৃবর্গের সঙ্গে সঙ্গে আহতদিগের শুশ্রূষাকারী যে সেবকদল গমন করে, তাহাদের সহায়তা করিতেও কুক্কুরসেনানী পশ্চাৎপদ নহে। আমরা এইবার সেই কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। রেড ক্রশ বা শুশ্রূষাকারীর কার্য্যেও তাহাদের কার্য্যকারিতা অমূল্য। মেজর রিচার্ডসনই সর্ব্বাগ্রে সারমেয়কুলকে সমর-কার্য্যোপযোগী শিক্ষা দিয়াছেন—তাহাদিগকে সেবাকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার পক্ষেও তিনি আদি-গুরু। তাঁহার কতকগুলি সুশিক্ষিত এয়ারেডেল্ ও ব্লড্ হাউণ্ড্ লইয়া সম্প্রতি তিনি স্বয়ং প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা-কার্য্যের উদ্দেশে গমন করিয়াছেন।

মানুষের বিপদ্‌আপদে প্রভুভক্ত কুকুরে কত উপকার-সাধন করে, ছেলেরা স্ব স্ব পাঠ্য পুস্তকে তাহার অসংখ্য সত্যঘটনামূলক দৃষ্টান্তের বিবরণ পাঠ করিয়াছে। কুকুরের মানুষের ন্যায় অনুরাগ—আসক্তি—দয়ালুতার কথা অনেকেই অবগত আছেন; কুকুরকে স্বীয় আহত বা নিহত প্রভুপার্শ্বে জীবন বিসর্জ্জন দিতে, বুদ্ধিকৌশলে আবশ্যক-মত সাহায্য সংগ্রহ করিতে অনেকেই শুনিয়াছেন। ফলে, তাহার আশ্চর্য্যবুদ্ধিবৃত্তির এক একটি পরিচয়-কাহিনী শুনিয়া মনে হয়, বুঝি ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা সমধিক প্রখর করা যাইতে পারে। শৃঙ্খলা ও কার্য্যপরম্পরার ক্রমও ইহারা বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে পারে।

পূর্ব্বে যুদ্ধস্থান প্রায়ই একটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ থাকিত; অধুনা কিন্তু সে রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—এখন যুদ্ধক্ষেত্র সুদূরবিস্তৃত—অনির্দ্দিষ্ট; সুতরাং কোথায় কখন কোন্ সৈন্য আহত হইয়া—হয়ত প্রচ্ছন্ন স্থানে—পড়িয়া আছে, তাহা নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে বড়ই সুকঠিন, এবং অনেক সময় অনেক স্থানে কত আহত সেনানী এমন ঝোপেঝোপে পড়িয়া থাকিয়া বিঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে। এক্ষণে কুকুরদিগকে এই সকল আহত সৈন্যের সন্ধান করিতে শিক্ষিত করায় সেইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। এই সকল কুক্কুরের সঙ্গে এক বোতল Cordial বা সঞ্জীবনী পেয় এবং কতকটা ব্যাণ্ডেজের কাপড় দেওয়া থাকে। ইহারা স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে নিভৃতে অদৃশ্যভাবে শায়িত আহত সেনানীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে আশু প্রয়োজনীয় পেয় এবং ক্ষতস্থান-বন্ধনোপ-যোগী ব্যাণ্ডেজ যোগাইয়া দেয়—পতিত সৈন্য তৎসাহায্যে কতকটা আশ্বস্ত হয়। কুক্কুরগুলির এমনই সুন্দর শিক্ষা যে, তেমন সঙ্গীন অবস্থা দেখিলে, পতিতের দেহ-তাপ রক্ষার জন্য তাহাকে ঘেঁসিয়া শুইয়া থাকে। পরে অদূরে

সমর-অবসরে বেল্‌জিয়ান্ সেনানী ও কুক্কুরের বিশ্রাম

কোন অনুসন্ধানকারী বা বাহক-দলের অবস্থিতির আভাষ পাইলে, চীৎকার করিয়া তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যক্ত হইবার পরক্ষণেই Ambulance Corps যোদ্ধৃবৃন্দের পথ ধরিয়া সে স্থানে উপস্থিত হয়

এবং তাহাদের সঙ্গে আনীত কুক্কুরগুলিকে ছাড়িয়া দেয়। ইহারা কোথায় কোন্ অলক্ষিত স্থানে কোন্ আহতসৈন্য পড়িয়া আছে, তাহার সন্ধান করিয়া দেয়। কুচ্ করিবার সময় পাশাপাশিভাবে তিন তিন জন সৈন্য প্রত্যেকের বামহস্তে এক একটি কুক্কুরের দড়ি লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলে। প্রত্যেক Ambulance Waggonএর সঙ্গেই প্রায় এক একটি কুক্কুর থাকে। এম্বুলেন্স্ কুকুর-গুলির সঙ্গে যে, কেবল আহতদিগের প্রথম আবশ্যক সাহায্য-উপকরণগুলি থাকে, তাহাই নহে; তাহাদের দেহ লালবর্ণ ক্রশ চিহ্নিত থাকে। সভ্যতানুমোদিত, মনুষ্যত্বসম্ভব-নীতি-অনুসারে এবং জেনিভার সন্ধিসর্ত্তমতে আহত, চিকিৎসক এবং সেবকসম্প্রদায় অবধ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শত্রুপক্ষ কিন্তু সে সকল বিধি অগ্রাহ্য করিয়া—সভ্যতার শিরে পদাঘাত করিয়া, তাহাদিগকেও অবাধে নিহত করিয়াছে। আশা হয়, ভবিষ্যতে অপর কোনও জাতি এহেন বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিবেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধে সেবাকার্য্যে ব্রতী কতগুলি লোক আহতনিহত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহা স্থির হয় নাই। তবে, নামুরে কলের বন্দুকবাহী বিপজোড়া অর্থাৎ ৪০টি কুক্কুরের মধ্যে মাত্র একটি প্রত্যাগত হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও তাহারা নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে। সম্প্রতি য়্যাণ্টওয়ার্পে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কতকগুলি আহত কুক্কুরকে হাঁসপাতাল উদ্দেশে যাইতে দেখা গিয়াছিল; তাহার একখানি চিত্র প্রদর্শিত হইল। চিত্রে সম্মুখবর্ত্তী কুক্কুরটির সম্মুখের বামপদে আঘাত লাগিয়াছে। প্রথম আবশ্যক শুশ্রূষা করা হইয়াছে; এক্ষণে উপস্থিত চিকিৎসার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আর একটি কুক্কুর আহত হইয়াও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতেছিল—সে কখন তিন পায়ে, আবার কখনও চারি পায়েই হাঁটিতেছিল।

জিব্রাল্টরে প্রহরীকার্য্যে নিয়োজিত কুক্কুর

বর্ত্তমান যুদ্ধে যেমন অধিকসংখ্যক কুক্কুর নিয়োজিত হইয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনও তেমন হয় নাই, আবার এবারে তাহাদের নিহত সংখ্যাও সমধিক! ফলে সর্ব্বপ্রকারে এত বলক্ষয়কারী যুদ্ধ আর ঘটে নাই! আর এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই সৈন্যদল কিরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহার লিখিত বিবরণ অপেক্ষা আলোক-চিত্রণে বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। লুভেন্ যুদ্ধে কলের বন্দুকধারী একদল সৈন্য পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে, তাহারই একখানি চিত্র স্থানান্তরে দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিলেই সৈন্য ও কুক্কুরের অবস্থা পরিস্ফুট-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বেলজিয়মবাসী নিরীহ গৃহস্থ ও কৃষক-সম্প্রদায় শত্রু-পক্ষের উপদ্রব-উৎপীড়ন-ভয়ে অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত ও নিরুপদ্রব প্রদেশে আশ্রয় লইবার জন্য স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। এ সময়ে তাহাদের গৃহস্থালীর তৈজসপত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার অপর বাহক কোথায় মিলিবে?—সুতরাং এক একখানি ক্ষুদ্র শকট যথাসম্ভব দ্রব্যজাতে পূর্ণ করিয়া কুক্কুরবাহনে তাহা বাহিত হইতেছে। এপক্ষেও কুক্কুর বড় কম সাহায্য করিতেছে না। সে বিপুল ভার, হয় ত অন্য সময়ে বহন করা তাহাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে যেন বিপন্নাবস্থা বুঝিতে পারিয়া, তাহারা অসাধ্যসাধনে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছে!

এতদিন পর্য্যন্ত সমরে সারমেয়ের উপযোগিতা অপরাপর অনেক জাতিই বুঝিয়াছিল—কেবল ব্রিটেন্ পশ্চাদ্পদ ছিল। এইবার কিন্তু তাঁহাদের সে জ্ঞান জন্মিয়াছে। সম্প্রতি নর্ফোক রেজিমেণ্ট সৈন্যদল একটি প্রতিহারী কুক্কুর

প্রার্থনা করায় মেজর রিচার্ডসন্ তাঁহাদিগকে একটি কুক্কুর উপহার দেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাহা বিলক্ষণরূপে স্বীয় কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছে। নৌবিভাগও এবিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। জিব্রাল্টারে শান্ত্রীবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি প্রহরী-কুক্কুর প্রেরিত হইয়াছে।

রুষ 'রেড্ ক্রস্' সম্প্রদায় বিগত যুদ্ধে শিক্ষিত-কুক্কুর সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ার জওয়ারের ক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানে এমন ঝোপেঝাপে আহত সেনানী পতিত ছিল যে, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা মানুষের পক্ষে দুরূহ—কিন্তু এই কুক্কুরেরা অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল। এইরূপ একটি যুদ্ধক্ষেত্রে সেবক-সম্প্রদায় অনুসন্ধান করিয়া, যখন আর এক প্রাণীরও সন্ধান পাইল না, তখন কুক্কুর-নিয়োগ করায় সেই স্থান হইতে ২৭ সাতাইশ জন আহত সৈন্যের সন্ধান পাওয়া গেল।

অষ্ট্রীয়ার সীমান্তপ্রদেশে কুক্কুরেরা ইটালীয় শুল্করক্ষকের কার্য্য করে; সম্প্রতি ট্রিপলিতে তাহারা তুর্কীদিগের বিপক্ষে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছে। জর্ম্মনগণ বূহরক্ষাকল্পে কুক্কুর নিয়োগ করে।

পঞ্চদশসংখ্যক সৈন্য (15th Army Corps) সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, সনন্দবিহীন (unauthorized) কোনও ব্যক্তিই গুপ্তভাবে প্রহরীদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে ইহাদের নিকট পরিত্রাণ পায় নাই। অথচ মিত্রপক্ষের গুপ্তভাবে অবস্থিত কিংবা আপনাদের পাইকের দলকে তাহারা কিছুই বলে নাই। এপক্ষে মানুষ অপেক্ষা তাহাদের বাহাদুরী—কৃতিত্ব দেখা যায়। 'হেগ' (Hague) নগরে কুক্কুরদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় আছে; নেদর্‌ল্যাণ্ডসের রাজকুমার হেনরী তাহার সম্পাদক (President)। ডচ্ Grenadier সৈন্যদলের সহিত শিক্ষিত কুক্কুর সম্মিলিত থাকে।

রুষের রাজকীয় দেহরক্ষিবর্গের সহিত তেইশটি এয়ারেডেল্ কার্য্য করে। বুলগেরিয়ার সীমান্তপ্রদেশ সংরক্ষণার্থ কুক্কুর-প্রহরী আছে। সুইডেনে মধ্যে মধ্যে সামরিক পুলিসের বিবিধ কার্য্যে কুক্কুরের উপযোগিতা অবিসংবাদী। দুষ্ট লোকে নিশীথ অন্ধকারে মানুষের চোখ অনায়াসে এড়াইতে পারে, কিন্তু কুক্কুরের নিকট তাহাদের নিস্তার নাই। মেজর রিচার্ডসন-কর্ত্তৃক পুলিশকার্য্যে শিক্ষিত কুক্কুর এখন নানা রাজ্যে ব্যবহৃত হইতেছে এবং সর্ব্বত্র সকলেই তাহাদের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী

ভক্তি

[শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী]

উষার কনকদ্বার ধীরে উদ্ঘাটিয়া
প্রেমতাপসের এই প্রেম তপোবনে
এসেছিল কি অপূর্ব্ব লাবণি মাখিয়া
প্রতিভা বালিকা এক প্রসন্ন আননে।
মুরলীভাষিণী সেই বালিকার বাণী
এনেছিল হর্ষ-বন্যা নিখিল ভুবনে,
এনেছিল অলকার সুষমায় টানি'
পূর্ণ হয়েছিল চিত মধুর স্বপনে।
হৃদয়ের উৎস টুটি' করুণা উচ্ছ্বাস,
প্রেমময় জনকের মঙ্গলের তান
দ্যুতিমান জ্যোতিষ্মান মাধুর্য্য আভাষ
মুগ্ধ করেছিল এই বিশ্বের পরাণ।
কোন শিল্পী নিরালায় পাতিয়া আসন,
রক্ত রাগে রঞ্জে চিত্র, চিত্ত-বিমোহন।
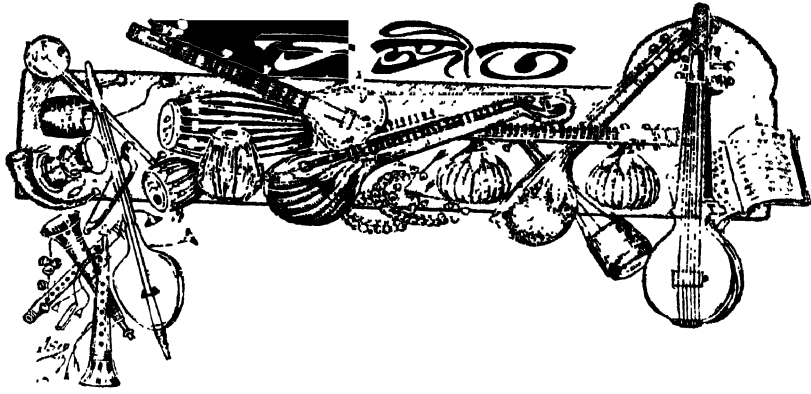
সাজাহান

পিয়ারার প্রতীক্ষা

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বি. এল্.

আমি, সারা সকালটি বসে' বসে' সাধের মালাটি গেঁথেছি,
আমি, পরাব বলিয়া তোমারি গলায় মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু করি নাই কিছু বঁধু আর,
শুধু, বকুলেরি তলে বসিয়া বিরলে, মালাটি আমার গেঁথেছি।

তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া,
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া,
তখন, প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি, কুসুম কুঞ্জ ভবনে ;
আমি, তার মাঝখানে বসিয়া বিজনে মালাটি আমার গেঁথেছি।

বঁধু, মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম জড়ায়ে,
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ গীতি, কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে,
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু তব মধুময় হাসি গো,
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারি কারণে গেঁথেছি।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বরলিপি

সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্. এ.

স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ

	+	১	০	৩	
স স	সধ্ সরসর গ গ	,গগ গ	গ গ	গ গ	———
আমি	সা—রা--- সকা—ল	টি	ব'সে	ব'সে	———

০				১		+		৩	
গ	প	ম	গ	রগমগম	গর	পপ	ক্ষপ	ক্ষ	প
সা	ধে	র	মা	লা- - -	টি	গেঁ	—	থে	ছি

০ ১ + ৩
ম ম ম ম ম ম পধ পমপম গ মপপম গর রগ রগমগ রস
আমি পরাব বলি য়া- -তো মা---রি গ-লা- - - -য়

০ ১ + ৩
স স র সস রগমপ প গমপ মগ গমগমগর রগ রগরস রগরস
মালাটি আ—মা- -- র গেঁ- - - থে- - - - ছি- - - - - - - -
আ—প্র

০ ১ + ৩
স স স র্স র্স র্স র্স র্স নর্স নর্স নর্স নধন ধ ধ
আমি সারা সকা— লটি করি না— — —ই কিছু
তখন প্রভাতের হাসি পড়েছি ল আসি
আছে সবার উ পরে মাথা তা য় বধু

০ ১ + ৩
ধ ন র্র র্স নর্সন নধনধ পক্ষ প ক্ষপ প
করি নাই কি- - - ছু- - - বধু আ — --র
কুসু ম কু — ঞ্জ ভব নে
তব মধু ময় হাসি গো

০ ১ + ৩
ম ম ম ম ম ম মপধ পমগ গ মপ মগর গমগম গর সস
শুধু বকুলেরি তলে বসি য়া বি- - - র- লে
আমি তার মাঝখানে বসিয়া বিজনে
ধর গলে ফুলহার মালাটি তোমার

০ ১ + ৩
স স র সস রগমপ প গমপ মগ গমগমগর রগ রগরস রগরস
মালাটি আ-মা- -র গেঁ- - থে- - - - ছি- - - - - - - -
মালাটি আমা র গেঁ থে ছি
তোমারি কারণে- - - গেঁ থে ছি
আ— প্র

০ ১ + ৩
স সস স ধ — — — — — — ন ধ নধনধ প প
তখন গাঁথি তে ছিল সে তরু শা খা- - - প রে
বঁধু মালা টি আমা র গাঁথা ন- হে শু ধু

০ ১ + ৩
প ধ নর্স র্স র্সন নধ প ক্ষ প ক্ষপ
সুললি ত স্ব- রে পা পি য়া —

০ ১ + ৩
ম মম ম ম ম মপধধ প ম গম গমমগ র র স স
তখন দুলিতে ছি--ল সে ত-রু- - -শা খা ধীরে
আছে প্রভাতে র প্রী তি স মী - - - র ণ গীতি

০ ১ + ৩
স স র র গরগরসর স সর গসর সর সর গগ
প্রভাত স মী- - - - রে কাঁ- পি-- য়া- - - - -
কুসু মে কু সু- - - - মে জ ড়া য়ে- - - - -

কত দূরে ?

[শ্রীজলধর সেন]

শ্রীজলধর সেন

আমার পূর্ব্বপরিচয় একটু দিই, তাহার পর আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিব। আমার পিতা জমিদার ছিলেন; এখনও জমিদারী আছে, তবে সেদিন আর নাই। আমাদের জমিদারীর আয় আমার পিতার আমলে লক্ষ টাকার উপর ছিল। সে সময়ে মফঃস্বলের একজন জমিদারের নিট আয় লক্ষ টাকা, বড় কম কথা ছিল না। আমরা রাজার হালে থাকিতাম। বিশেষতঃ আমাদের জমিদারী বাঙ্গালা দেশময় ছড়াইয়া ছিল না—ময়মনসিংহ, বীরভূম, দিনাজপুর, কটক ঘুরিয়া আমাদের জমিদারীর টাকা সংগ্রহ করিতে হইত না। যে পরগণায় আমাদের বাড়ী, সেই পরগণার সমস্তটাই আমাদের জমিদারী, সুতরাং আমাদের বড় সুখের বাস ছিল; চারিদিকেই আমাদের প্রজা, আর সেই সকল প্রজা আমাদের বাধ্য ছিল; তাহারা আমার পিতার মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে পারিত।

আমার পিতা ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন না; তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়কর্ম্মে অতিশয় নিপুণ ছিলেন; সেকালের জমিদারদিগের মত তিনি অত্যাচারী ও বিলাসী ছিলেন না; প্রজারা তাঁহাকে পিতার মত সম্মান করিত; তিনিও প্রজাদিগকে পুত্রের মত দেখিতেন; তাহাদের সুখসুবিধার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন।

আমার পিতার কোন বদখেয়াল ছিল না—একেবারেই না। তাঁহার সখের মধ্যে একটি ছিল—তিনি লোকজন খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। আমাদের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, আর সেই উপলক্ষে বাবা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। গানবাজনা, আমোদআহ্লাদ তিনি ভালবাসিতেন না; পূজা প্রভৃতি উপলক্ষে যাহা কিছু ব্যয় হইত, তাহা সবই লোক খাওয়াইতেই হইত—তাহাতেই বাবা পরম আনন্দ অনুভব করিতেন।

আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময় যেন যজ্ঞক্ষেত্র হইত। পূজার তিন দিন আমাদের দেশের লোক নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আমাদের বাড়ীতেই বাসা বাঁধিত; সমস্ত দিন সমাগত লোকদিগের আহার চলিত। আমরাই দেখিয়াছি, তিনদিনে কম করিয়া হইলেও এক শত মণ চাউল খরচ হইত। আমরা ব্রাহ্মণ, সকলেই পূজার সময় আমাদের বাড়ীতে অন্ন প্রসাদ পাইতেন। তিন দিন সমানে ভাতের যজ্ঞি হইত, হাজারে হাজারে লোক প্রসাদ পাইত। আমার পিতা সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া, এই সকল লোকজনের আহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বিজয়ার দিনের ভোজই আমাদের বাড়ীর সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার ছিল; সেদিন কাঙ্গালীভোজন হইত। পূজার তিন দিনের আয়োজন এক রকমের, বিজয়ার আয়োজন অন্য রকমের—বিজয়ার দিন আমাদের দেশের দুঃখীকাঙ্গালীরা পেট ভরিয়া লুচিমিঠাই খাইত। বাবা বলিতেন, "মায়ের গরিব ছেলেদের মুখে হাসি দেখিয়া মা যদি চলিয়া না গেলেন, তবে আর পূজা কি ?" তাই তিনি সেদিন দরিদ্র-নারায়ণগণের জন্য বিপুল ভোজের আয়োজন করিতেন। এদিনে বাবার

আনন্দ দেখে কে? তিনি নগ্নপদে, কোমরে গামছা জড়াইয়া, বেলা দশটা হইতে অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত কাঙ্গালী ভোজন করাইতেন; নিজে পরিবেশন করিতেন। দুই তিন হাজার কাঙ্গালী হইত; তিনি সকলকে দেখিতেন, সকলকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন। খাওয়া শেষ হইলে, তিনি সকলের মাথায় নিজের হাতে তেল ঢালিয়া দিতেন এবং একখানি করিয়া নূতন বস্ত্র দান করিতেন। সে যে কি দৃশ্য, তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। এখনও সে কথা মনে হইলে, প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠে। সেদিন কোথায় গেল? সে সুখের বাসা কে ভাঙ্গিল? সেই কথা বলিবার জন্যই আমার পিতার কথা এমন করিয়া বলিলাম।

আমার বয়স যখন এগার বৎসর, তখন তিন দিনের জ্বরে আমার পিতা পরলোকগত হইলেন। আমাদের পল্লী-অঞ্চলে যতদূর চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার ক্রুটি হইল না; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—তিন দিন পরে সজ্ঞানে মা ব্রহ্মময়ীর নাম করিতে করিতে বাবা আমার সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন, দেশময় হাহাকার উঠিল; সুধু আমিই পিতৃহীন হইলাম না, আমার দেশের হাজার হাজার নরনারী পিতৃহীন হইল।

আমিই পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা নিজে ইংরাজী লেখাপড়া শিখেন নাই; আমাকে কিন্তু তিনি ইংরাজী শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। আমাকে পড়াইবার জন্য বাড়ীতে একজন পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন ও একজন মাষ্টার ছিলেন। আমি তাঁদের নিকট লেখাপড়া শিখিতাম।

বাবা বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কখনও কলিকাতায় যাইতেন না; তিনি কলিকাতাকে বড়ই ভয় করিতেন। তিনি যখন-তখনই বলিতেন—"কল্‌কাতা যাদুকরের দেশ, ওখানে গেলে আমার মত ক্ষুদ্র জমিদারের জমিদারী তিন মাসেই যাদুমন্ত্রের চোটে উড়িয়া যাইবে।" সেইজন্য তিনি কখন কলিকাতায় বাড়ী নির্ম্মাণ করেন নাই, কলিকাতায় গেলে কখনও দুই তিন দিনের অধিক বাস করিতেন না; বলিতেন—"রাজধানীতে তিনরাত্রি বাস করিতে নাই।"

আমার যিনি মাষ্টার ছিলেন, তিনি ইংরাজী লেখাপড়া খুব ভাল জানিতেন; তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল; কিন্তু তিনি একটু বেশী রকম ইংরাজীনবীশ ছিলেন; সাহেবী আদবকায়দা, সাহেবী চালচলনের উপর তাঁহার একটু বেশী টান ছিল। আমার বয়স কম হইলেও আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু বাবা তাহা বুঝিতে পারিতেন না, বুঝিতে পারিলে তিনি এমন মাষ্টারের হাতে আমার শিক্ষার ভার কিছুতেই দিতেন না। মাষ্টার-মহাশয় বাবার ভয়ে আত্মগোপন করিতেন। যতদিন বাবা বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি কোন প্রকার ইংরাজী চাল দেখাইতেন না; কিন্তু সময়ে অসময়ে আমাকে ইংরাজী মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি একটু আধটুকু ইঙ্গিত করিতেন।

বাবার পরলোকগমনের কিছুদিন পরেই মাষ্টার-মহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমাকে যথারীতি শিক্ষিত করিতে গেলে, আমাকে দশজনের একজন করিতে গেলে, এই পাড়াগাঁয়ে থাকিলে হইবে না। কলিকাতায় থাকিলে অনেক সুবিধা; দশটা না দেখিলে কি শিক্ষা হয়? মাতাঠাকুরাণী প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কিন্তু মাষ্টার-মহাশয় ক্রমাগত যখন এই কথাই তুলিতেন, এবং বাড়ীতে থাকিলে আমার মোটেই লেখাপড়ার উন্নতি হইবে না, এই কথা যখন মাষ্টার-মহাশয় সর্ব্বদাই বলিতে লাগিলেন, তখন একমাত্র পুত্রের মঙ্গলকামনায় আমার মাতাঠাকুরাণী আমার স্বর্গীয় পিতার উপদেশ ভুলিলেন। কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাবে আমিও নাচিয়া উঠিলাম—আমার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইল। আমার সুখ ও শান্তির বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিন পরে সে কথা বুঝিয়াছি; কিন্তু বড় অধিক মূল্য দিয়া এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি—একটি অমূল্য, অতুল্য, অপার্থিব জীবনের বিনিময়ে আমার ভ্রম দূর হইয়াছে। সেই কথা—সেই নিদারুণ কাহিনী বলিবার জন্যই আজ চেষ্টা করিব।

লেখাপড়া শিখিবার জন্য, দশজনের একজন হইবার জন্য, গণ্যমান্য হইবার জন্য আমার কলিকাতায় যাওয়াই স্থির হইল। ম্যানেজার বাবুর উপর বিষয়কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করিয়া, মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। নাবালকের বিষয় প্রথমে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাওয়াই স্থির হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের প্রধান উকিল-বাবুর চেষ্টায় ও তদ্বিরে আমার মাতাই আমার বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইলেন। আমার লেখাপড়া শিখিবার যে ব্যবস্থা হইল, তাহা শুনিয়া কালেক্টার সাহেবও

সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় আমাদের বাড়ী ছিল না; আমরা একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিলাম। মাষ্টার-মহাশয় আমাদের সঙ্গেই থাকিলেন। আমাকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করা হইল। মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা ছিল যে, আমি কোন স্কুলে না পড়ি, বাড়ীতে মাষ্টারের নিকটই পড়াশুনা করি। কিন্তু মাষ্টার-মহাশয় পরামর্শ দিলেন যে, বাড়ীতে পড়িলে যে, পড়াশুনা হয় না, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে হৃদয় বড়ই সঙ্কুচিত হয় এবং দশজন ভাল ছেলের সহিত প্রতিযোগিতায় স্কুলে বড় কাজ হয়। এই সমস্ত যুক্তি শুনিয়াই মাতাঠাকুরাণী আমার স্কুলে যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পড়াশুনা চলিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতারও আয়োজন হইতে লাগিল। আমি এত বড় লোকের ছেলে, রাজপুত্র বলিলেই হয়, আমি কি আর প্রতিদিন কলিকাতার রাজপথ দিয়া পদব্রজে স্কুলে যাইতে পারি, অথবা সেকেণ্ড ক্লাস—কি থার্ড ক্লাসের ভাড়াটিয়া গাড়ীতে কি আমার স্কুলে যাওয়া ভাল দেখায়! সুতরাং গাড়ী-ঘোড়া ক্রয় করা হইল। দেশে আমাদের সেকেলে ধরণের যে সমস্ত আসবাব পত্র ছিল, তাহা কি আর কলিকাতায় চলে; ফরাসে বসিয়া কি আর পড়াশুনা হয়! সহরে থাকিতে গেলে সহরের মত আদবকায়দা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, সেই প্রকার পোষাকপরিচ্ছদ, সেই প্রকার জিনিসপত্র সমস্তই করিতে হয়। তাহাই হইতে লাগিল; সহরের বেনো-জল আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল; আমার পোষাক পরিচ্ছদও বদলাইয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে নানা দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল; বিলাস দ্রব্যে আমাদের সেই ভাড়াটিয়া বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাতা-ঠাকুরাণী বিশ ত্রিশ হাজার টাকাকে টাকা বলিয়াই মনে করিলেন না। বাবা যে যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন।

মাসে দেড় শত টাকা বাড়ীভাড়া দিতে হয়, অথচ বাড়ীটা ঠিক মনের মত নয়; যেখানে যেটি করিলে ঠিক মানায়, পরের বাড়ীতে তাহা ত করা যায় না। মাষ্টার-মহাশয় মাতা-ঠাকুরাণীকে বুঝাইলেন যে, যখন কলিকাতাতেই থাকিতে হইতেছে, এবং পরেও বাস করিতে হইবে, তখন এখানে একখানি নিজের বাড়ী থাকা উচিত। মাতা-ঠাকুরাণী এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ম্যানেজার-বাবুর সহিত পরামর্শের অপেক্ষা রাখিলেন। এ দিকে আমাদিগের কলিকাতার ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, ম্যানেজার বাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন; তিনি মধ্যে মধ্যে পত্রেও এ কথা বলিতেন এবং যখনই কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতেন, তখনই মাতা-ঠাকুরাণীকে একটু দেখিয়া শুনিয়া ব্যয় করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। যখন কলিকাতায় বাড়ীনির্ম্মাণের প্রস্তাব ম্যানেজার বাবুর নিকট পৌছিল, তখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাতাঠাকুরাণীকে বলিলেন যে, কলিকাতায় বাড়ী প্রস্তুত করিবার এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু মাতাঠাকুরাণীকে মাষ্টার-মহাশয় পূর্ব্বেই বুঝাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় একটা বাড়ী করিলে, তাহা ভবিষ্যতে একটা লাভের সম্পত্তি হইবে। যদি পরে আমরা কেহ কলিকাতায় বাস নাও করি, তাহা হইলেও বাড়ীটা ভাড়া দিলেও যথেষ্ট আয় হইবে। ম্যানেজার-বাবু যখন দেখিলেন যে, তর্কবিতর্ক করা বৃথা, তখন তিনি গৃহনির্ম্মাণে সম্মতিপ্রদান করিলেন; কলিকাতায় আমাদের একটা কায়েমী মোকামের ব্যবস্থা হইল।

এদিকে আমারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; তিন চারি বৎসরের মধ্যেই আমার প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; আমি ঠিক কলিকাতার বাবু হইবার শিক্ষা-নবিশী করিতে লাগিলাম। পনর বৎসর বয়সের সময় আমাকে খুব ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য, অথবা সোজা করিয়াই বলি, আমাকে সাহেব সাজাইবার জন্য, সাহেবী কায়দাকানুন শিখাইবার জন্য, একজন ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। সাহেবের কাছে না পড়িলে কি ভাল ইংরাজী শিক্ষা হয়!

এই ভাবে আমার যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল; আমি একেবারে বিলাসসাগরে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু একটি কথা বলিয়া রাখি, আমার মাষ্টার-মহাশয় এবং আমার মাতা-ঠাকুরাণীর বিশেষ চেষ্টায় ও সতর্কতায় এবং মাষ্টার-মহাশয়ের শিক্ষার গুণে আমি অসৎ সংসর্গে মিশিবার সুযোগ মোটেই পাই নাই। মাষ্টার-মহাশয় ইংরাজী ভাবের বিশেষ পক্ষ-পাতী হইলেও তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র ছিলেন। আমি তাঁহার

নিকট হইতে অনেক বিলাতী বিলাসশিক্ষা করিয়াছিলাম, একথা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব; কিন্তু তিনি আমাকে সচ্চরিত্র রাখিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি সাহেব সাজিলাম, আমি বিলাতী আদবকায়দায় একেবারে মস্‌গুল হইয়া গেলাম, দেশীয় আচারব্যবহারের উপর বীতস্পৃহ হইলাম, মাতাকে লুকাইয়া, মাষ্টার-মহাশয়ের সঙ্গে যাইয়া, হোটেলে আহারাদিতেও বিশেষ অভ্যস্ত হইলাম; কিন্তু আমি চরিত্র হারাইলাম না। মাষ্টার-মহাশয় আমাকে কখনও কোন থিয়েটারে যাইতে দেন নাই, কোন প্রকার কুৎসিত আমোদে লিপ্ত হইতে দেন নাই, কোন অসচ্চরিত্র যুবককে আমার নিকট আসিতে দেন নাই।

আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; হিন্দুস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াই আমি স্কুলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম, এত বিষয় পড়া আমার পোষাইয়া উঠিল না। আমি তখন সুধু ইংরাজী শিখিবার জন্যই চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কারণ সাহেব হওয়াই আমার তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। বলিতে কি, আমি অনেক সময় বাঙ্গালী-দিগের সহিত মিশিতেও কুণ্ঠিত হইতাম; বাঙ্গালা বই অতি কমই পড়িতাম। আমার ধারণা জন্মিয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষায় লেখা বই পড়িয়া কোন লাভ নাই, সুধু সময় নষ্ট করা। এই সময়ে বয়স ২০ বৎসর। মাষ্টার-মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে মাতাঠাকুরাণী এত দিনও আমার বিবাহ দেন নাই।

যখন বয়স কুড়ি বৎসর হইল, তখন মাতাঠাকুরাণী আমার বিবাহের জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত হইলে কি হয়, আমার সহধর্ম্মিণী হইবার মত মেয়ে যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে কি আমার মত পুরা সাহেবের স্ত্রী হইতে পারে? চারি দিকে অনুসন্ধান চলিল, অনেক সম্বন্ধ আসিল; কিন্তু মেয়ে সুন্দরী হইলে কি হয়, তাহার চালচলন আদব-কায়দা যে একেবারে বাঙ্গালী ধরণের! এমন একটা মেয়েকে কি আমি আমার জীবনসঙ্গিনী করিতে পারি? এতদিনে মাতাঠাকুরাণীর চৈতন্যোদয় হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমাকে সাহেব করিয়া তিনি নিজের পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু উপায় কি?

যাহা হউক, প্রায় এক বৎসর নানাস্থানে অনুসন্ধান করিবার পর একটি মেয়ে আমার মনোনীত হইল। কলি-কাতা হাইকোর্টের একটি উকিলের কন্যা আমি পছন্দ করিলাম। উকিলবাবুর অবস্থা ভাল। তিনি যদিও কখন বিলাতে গমন করেন নাই এবং তাঁহার পরিবারের মধ্যেও তখন পর্য্যন্ত কেহ বিলাতী ছিলেন না, তবুও তিনি তাঁহার পরিবারের মধ্যে অনেক বিলাতী আদবকায়দা চালাইয়াছিলেন। বাড়ীতে বাবুর্চি ছিল, টেবিলে বসিয়া তাঁহারা সপরিবারে খানা খাইতেন, মেয়েরা জুতা-মোজা পরিতেন, একটু আধটুক প্রকাশ্যভাবে বাহিরেও যাইতেন। যে মেয়েটির সহিত আমার বিবাহ স্থির হইল, তিনি বেথুন কলেজের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন; তাহার পর ঘরে বসিয়া অনেক ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, গান-বাজনাও বেশ জানিতেন, নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্মও জানিতেন; ঘরগৃহস্থালীর কাজ জানিতেন কি না, সে কথা তখন জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় নাই; সে বিষয়ে পারদর্শিতার কথা শুনিলে আমি বিবাহ করিতাম কি না সন্দেহ। মেয়েটি দেখিতেও বেশ সুন্দরী, বয়স প্রায় সতর বৎসর। আমার বয়সও তখন প্রায় একুশ বৎসর।

মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "একমাত্র পুত্রের বিবাহ; তিনি বাড়ীতে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।" কিন্তু এ প্রস্তাবে আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের কোন আপত্তি ছিল না, কারণ তিনি ত আর মেয়ে স্কন্ধে করিয়া, আমাদের গ্রামে যাইয়া বিবাহ দিবেন না; বরকে তাঁহার বাড়ীতেই আসিয়া বিবাহ করিতে হইবে; সুতরাং গ্রাম হইতেই আসুন, আর কলিকাতা হইতেই আসুন, তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। কিন্তু আমি এ ব্যবস্থায় আপত্তি করিলাম; বাড়ী হইতে বিবাহ হইতে পারিবে না। তবে আমি অনেক অনুরোধে একথা স্বীকার করিলাম যে, বিবাহের পর সুবিধামত আমি সস্ত্রীক দেশে যাইব এবং সেখানে সপ্তাহ খানেক থাকিয়া আসিব। মাতাঠাকুরাণী অগত্যা আমার প্রস্তাবেই সম্মতা হইলেন। মহাসমারোহে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর সাহেবরা 'হনি মুনে' যান, আমিও তাহার অনুকল্প করিলাম। বিবাহের একমাস পরেই আমি সস্ত্রীক দেশভ্রমণে বাহির হইলাম। নানা-

স্থানে ভ্রমণ আর হইল না, একেবারে ওয়ালটেয়ারে যাইয়া প্রায় আটমাস কাটাইয়া আসিলাম। ক্রৌঞ্চমিথুনের মত আমরা এই আটমাস সমস্ত পৃথিবী ভুলিয়া, মহাসুখে কাটাইলাম ; সে সময়টা যে কেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা রচনায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব !

আটমাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তখন একবার দেশে যাইতে হইল ; কারণ তখন যথারীতি জমিদারীর কার্য্যভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। আইন অনুসারে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কোন মতে শেষ করিয়া, জমিদারীর কার্য্য পূর্ব্বাপর যেমন চলিতেছে, তেমনই চালাইবার জন্য ম্যানেজার-বাবুকে আদেশ করিয়া, আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। জমিদারীর ভার গ্রহণ করিবার সময় ম্যানেজার-বাবু আমাকে বলিলেন যে, আমাদের কলিকাতার ব্যয় যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে, তাহাতে আমাদের জমিদারীর যে আয়, তাহাতে কুলাইতেছে না ; আমার ব্যয়সংকুলানের জন্য ইহারই মধ্যে অনেক টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। অতঃপর একটু হিসাব করিয়া না চলিলে ঋণ বাড়িতেই থাকিবে। আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না। বলিলাম, 'খরচপত্র এখন কমাইলে আমার চলিবে না।' ম্যানেজার-বাবু বিষণ্ণ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

এখন আমিই কর্ত্তা ; আমার উপর কথা বলিবার কেহই আর রহিল না। মাতাঠাকুরাণী বাড়ীতেই রহিলেন, কলিকাতায় আসিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া এবার আমার ব্যয় আরও বাড়িয়া গেল। এতদিন একলা ছিলাম, নাবালক ছিলাম, সুতরাং ইচ্ছামত অনেক কাজ করিতে পারিতাম না। এখন আর সে সকল বাধা রহিল না। বিশেষতঃ, এখন আর আমি একেলা নহি ; মনের মত সহধর্ম্মিণী পাইয়াছি। সরলা আমার কোন সাধই অপূর্ণ রাখিত না। আমি যখন যাহা বলিতাম, সে তাহাই করিত, কোনদিন কোন বিষয়ে কোন অন্য মত প্রকাশ করে নাই।

এই সময় আমার কয়েকটি সঙ্গী জুটিয়া গেল। তাহার মধ্যে দুই তিনজন বিলাত ফেরত বারিষ্টার, আর দুই তিন-জন বিলাত না গেলেও আমার মতই সাহেব। সকলেই বেশ অবস্থাপন্ন ; গরিব লোকের সঙ্গে আমি মিশিব কেন ? প্রায়ই ডিনারপার্টি চলিতে লাগিল ; নানাপ্রকার আমোদ-আনন্দও চলিল। আমারও ধীরে ধীরে অধঃপতন আরম্ভ হইল। সোডা-লিমনেড হইতে ধীরে ধীরে একটু আধটুকু বিয়ার, হুইস্কি, শ্যাম্পেনও আমার টেবিলে আসিতে লাগিল। সরলা আমার সাহেবীয়ানাতে কোন দিনই আপত্তি করে নাই। কিন্তু আমার টেবিলে যখন বিলাতী বোতলের আমদানী হইতে লাগিল এবং তাহার পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন সে অতি ধীরভাবে আমাকে ঐ সকল হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিত। কিন্তু তখন আমার বিলাস সাগরে জোয়ার আসিয়াছিল ; আমার তখন কি আর নিবৃত্তির কথা ভাল লাগে !

আমি আমার স্ত্রীকে লইয়া প্রকাশ্যভাবে ভ্রমণে বাহির হইতাম ; বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে তাহাকে আসিতে হইত ; আমাদের ডিনার-টেবিলেও তাহাকে বসিতে হইত। সে কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ভাল মনে করিত না। আমাকে অনেক সময় বলিত, "তোমার সঙ্গে যাহা করিতে বল, তাহা করিতেছি ; কিন্তু তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতে আমার যেন কেমন বোধ হয়। অবশ্য তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে বল, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তাহাতে আমি অভ্যস্তও হইয়াছি ; কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত মেলা-মেশা ঘনিষ্ঠতা করা আমি মোটেই ভাল মনে করি না—মোটেই না।"

আমি ইহাতে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতাম ; আমি বলিতাম—"যাঁহারা আমার এখানে আসেন, যাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়া আদর করি, তাঁহাদের প্রকৃতি না জানিয়াই কি আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিশি ? তাঁহারা অতি ভাললোক। এই সকল শিক্ষিত লোকের সহিত মিশিলে তোমার উপকার বই অপকার হইবে না। তাঁহারা সকলেই আমার অপেক্ষা বিদ্বান ;—তাঁহারা সকলেই সচ্চরিত্র, সাধু ব্যক্তি। তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।"

সরলা কি করিবে। আমার অবাধ্য হওয়া তাহার সাধ্যাতীত ছিল ; সে সত্য সত্যই আমাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। আমার সুখের জন্য সে সমস্ত কষ্টই সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

জোয়ারে নৌকা ভাসাইয়াছিলাম, আমার বিলাসের তরণী তরতর বেগে চলিয়াছিল। কোন ভাবনা নাই ;

উপার্জ্জন করিতে হয় না; টাকার দরকার হইলে ম্যানেজারকে পত্র লিখিবামাত্র টাকা আসে; ঘরে স্নেহময়ী সুন্দরী পত্নী, বাহিরে বন্ধুগণ;—সংসারটা বেশ সুখে কাটিতেছিল। বিশেষ কোন কার্য্য নাই, অথচ অবসরের সম্পূর্ণ অভাব; আজ এখানে সন্ধ্যা-সমিতি, কাল এখানে ডিনার—এবেলা ষ্টীমার পার্টি, ওবেলা বন্ধু-সম্মিলন;—একেবারে সুখের সাগরে সাঁতার দিতে লাগিলুম। বিলাসের উপকরণে বাড়ী বোঝাই হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল। আমার আগ্রহ-উৎসাহ সমভাবেই থাকিল; শরীরও নানা অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভাঙ্গিয়া পড়িল না; সহরের মধ্যে আমি একজন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু সকলেরই শেষ আছে; আমারও সুখের দিনের শেষ যে ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিবার কি অবকাশ ছিল? এমন কি, আমার সরলার মুখ যে মধ্যে মধ্যে বিষণ্ণ হইত, তাহাও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমার মনে হইত, সরলাও আমারই মত সুখের নেশায়, বিলাসের মদিরায় বিহ্বল হইয়া গিয়াছে। তাহার শরীর যে দিনে দিনে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, তাহা আমি বুঝিতেও পারি নাই।

তাহার পর একদিন সরলা বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িল; তাহার শয্যাত্যাগ করিতেও কষ্ট হইল। আমি তখনই তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনিলাম। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাহেব ডাক্তার আসিয়া সরলাকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিলেন; মানসিক দুর্ব্বলতা ব্যতীত তাহার আর কোন বিশেষ অসুখ নাই; কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেই শরীর ভাল হইবে। ডাক্তারের কথা শুনিয়া সরলা একটু বিষাদের হাসি হাসিল। আমি তাহার সে হাসির অর্থ তখন মোটেই বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি সরলাকে বিশ্রাম করিতে বলিলাম। সে একবার সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

দুই দিন এই ভাবেই গেল। এ দুই দিন আমি আর বাড়ী হইতে বাহির হইলাম না। তৃতীয় দিনে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ছিল। সন্ধ্যার পর দুই তিনটি বন্ধু আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিলেন, নিমন্ত্রণে যাইতেই হইবে। সরলাকে একাকিনী ফেলিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু বন্ধুরা আমাকে কিছুতে ছাড়িলেন না; বলিলেন রাত্রি অধিক হইবে না, এগারটা মধ্যেই আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিব। তখন আ[illegible] কি করি, সরলাকে সমস্ত কথা বলিলাম। সে বলিল—"তুমি যাও; আমার জন্য ভয় কি?" এই বলিয়াই সে আমা[illegible] মুখের দিকে চাহিল। মূর্খ আমি—আমি তখন তাহার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহার শয়নক[illegible] হইতে বাহির হইয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলাম এবং নানা গল্প করিতে করিতে নিমন্ত্রণস্থানে চলিয়া গেলাম।

রাত্রি যখন সাড়ে নয়টা তখন আমরা যে হোটেলে আমোদআনন্দে মত্ত ছিলাম, সেই হোটেলের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন—"মিঃ মুখার্জ্জিকে টেলিফোঁয় ডাকিতেছে।" এ রকম ডাকাডাকি আমাকে অনেক শুনিতে হয়; সুতরাং কর্ম্মচারীকে বলিলাম—"তুমি শুনে এস না, কে কেন ডাক্‌ছে।" একটু পরেই সেই কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল—"আপনাকে এখনই বাড়ী যাবার জন্য বল্‌ছে, একটুও বিলম্ব সইবে না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল; মনে হইল, নিশ্চয়ই সরলার অসুখ বাড়িয়াছে। আমি তখনই উঠিয়া পড়িলাম। দ্বারেই আমার মোটর প্রস্তুত ছিল। মোটরে উঠিয়াই সাফুরকে তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ী আসিয়া আমার বাড়ীর দ্বারে লাগিল। আমাদের পুরাতন ভৃত্য রামচরণ দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রামা কি রে?" রামচরণ বলিল—"উপরে চলুন,—বৌমার—"

আমি তাহার কথা শেষ করিতেও দিলাম না; এক দৌড়ে উপরে উঠিয়া সরলার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম—কি ভয়ানক দৃশ্য—কি ভয়ানক! সরলা উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে! আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। আমার সংজ্ঞালোপ হইবার মত হইল; আমি চীৎকার করিয়া ধরাশায়ী হইলাম।

আমার যখন চেতনাসঞ্চার হইল, তখন চাহিয়া দেখি, মাতা-ঠাকুরাণী আমার শিয়রে বসিয়া আছেন, ম্যানেজার-বাবু আমার বিছানার পার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া, মাতাঠাকুরাণী

আমার মুখের উপর মুখ দিয়া বলিলেন—"বাবা, বাবা গো—" আমি কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ম্যানেজার-বাবু স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"ব্যস্ত হইও না, বিশ্রাম কর। এখন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।" আমি চক্ষু মুদিত করিলাম।

তাহার পর ক্রমেই আমি সুস্থ হইতে লাগিলাম। শুনিলাম—সেই রাত্রিতে আমি যে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, সেই হইতে তিনদিন অনেক চেষ্টাতেও চিকিৎসকেরা আমার চেতনাসঞ্চার করিতে পারে নাই। তিনদিন পরে আমার জ্ঞানসঞ্চার হয়।

আমি বিছানায় পড়িয়া দিনরাত্রি সুধু ভাবিতাম, কিসের জন্য সরলা এমন কার্য্য করিল! আমি ত তাহার প্রতি কখনও কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই, কোনদিন তাহাকে একটি অপ্রিয় কথাও বলি নাই, সামান্য কোন কারণেও কখনও তাহার উপর বিরক্তির ভাব প্রকাশ করি নাই! তবে সে এ কার্য্য করিল কেন? আত্মহত্যা—সামান্য কারণে কি কেহ আত্মহত্যা করিতে পারে? বিষম আঘাত না পাইলে কি কেহ প্রাণবিসর্জ্জন করিতে পারে? সরলা এমন কি আঘাত পাইয়াছিল যে, সে এমন কর্ম্ম করিল! ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না, অথচ ভাবনাও ত্যাগ করিতে পারি না। চিকিৎসকেরা আমাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতে বলেন; কিন্তু আমি প্রফুল্লতা কোথায় পাইব? সরলা যে সে সমস্ত চুরি করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে! বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে সান্ত্বনা-দান করিতে আসিয়া ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া যান; অনেক সময়ে বন্ধুদিগের সহিত দেখাও করি না—কাহারও সহিত কথা বলিতে যে ইচ্ছা করে না; দিবানিশি সুধুই মনে হয়, আমার কি অপরাধ পাইয়া সরলা আমাকে ছাড়িয়া গেল? এ চিন্তা যে আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না।

একটু সুস্থ হইয়া যখন এঘর ওঘর চলাফেরা করিতে লাগিলাম, তখন মনে হইল, সরলা কি কোন রকম কিছু আভাসই দিয়া যায় নাই, কেন সে এমন কার্য্য করিল! তখন আমি সরলার বাক্সতোরঙ্গ, বইকাগজপত্র খুঁজিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, সে মধ্যে মধ্যে একটু আধটুকু ইংরাজীবাঙ্গলা রচনা করিত, দুই চারিটা কবিতাও লিখিত। সেগুলি সে কাহাকেও দেখাইত না; দেখিতে চাহিলে বলিত—"ও সব ছেলেমানুষী দেখিয়া কি হইবে? আমি কি লিখিতে জানি!" তবুও সে মধ্যে মধ্যে লিখিত।

এখন আমি তাহার সেই সকল লেখা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। কয়েকখানি ছোট খাতা পাইলাম, তাহাতে অনেক কাটাকুটি করা পাঁচ সাতটা কবিতা লেখা আছে; কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই; সকলে যেমন কবিতা লেখে, সেই রকমই আর কি। তবে কোন কবিতাতেই আজকালকার মামুলী প্রেমের গন্ধ পাইলাম না, সবই প্রার্থনা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি।

কৈ, এ সকল কবিতা পড়িয়া ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর দুইচারিখানি খাতা পড়িয়া দেখিলাম; তাহাতে দুই একটি ছোট গল্প, দুই তিনটি রামায়ণের কথা,—আর ত কিছুই পাইলাম না। দুই তিনদিন অনুসন্ধান করিয়াও কোন পত্র বা কোন লেখা পাইলাম না, যাহা হইতে এই ব্যাপারের কোন মূল পাই।

একদিন সরলার একটি কপড়ের বাক্স খুলিয়া কাপড়গুলি ওলটপালট করিতেছিলাম; বাক্সের তলায় একখানি বাঁধান খাতা পাইলাম। খাতাখানি খুলিয়া দেখি, তাহাতে কয়েকটি ছোট ছোট প্রবন্ধ লেখা আছে—সরলারই হাতের লেখা। তাহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ দেখিলাম—অতি সুন্দর, তাহার নাম আত্মনিবেদন। প্রবন্ধটি পড়িতে বড়ই ভাল লাগিল। তাহাতে অনেক প্রাণের কথা লেখা আছে; স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর আলোচনা আছে। সবটা উদ্ধৃত করিব না, একটা স্থান উদ্ধৃত করি; কারণ তাহা পাঠ করিয়া আমার বড়ই উপকার হইয়াছিল, আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সরলা 'আত্ম-নিবেদনে'র সেই স্থানে লিখিয়াছে—"স্ত্রীলোকদিগের কি ভাবে লেখাপড়া শেখান উচিত, সেটা ভারি ভাববার কথা হয়েছে। আমরা যে রকম শিক্ষালাভ করিছি, এই ইংরাজী-বাঙ্গালা-সংস্কৃত পড়েছি; ঘরগৃহস্থালীর কাজ শিখি নাই, গান বাজনা শিখেছি; বাইরে বেড়াতে শিখেছি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশ্‌তে শিখেছি; সেই ভাল—না সেকালে যে রকম শিক্ষা হতো, তাই ভাল?—এটা সত্যসত্যই ভাববার কথা। সুধু ভাববার নয়, ভেবেচিন্তে এখন থেকেই মেয়েদের সেই রকম শিক্ষা দেবার

ব্যবস্থা করা দরকার। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই বল্‌তে পারি—বল্‌তে পারি কেন, দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌তে চাই যে, আমরা যে রকম শিক্ষা পেয়েছি, এবং আমাদের স্বামী-মহাশয়েরা যে রকম শিক্ষার আদর করেন, তা আদপেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ শিক্ষায় বিলাসিতা বাড়ে। এ শিক্ষার গোড়ায় যে কিছুই নেই। চরিত্রবল এ শিক্ষায় হয় না। কতকগুলো বই পড়া, কতকগুলো বাজে নবেল-নাটক পড়া, আর স্বাধীনতা পেয়ে তার ষোলআনা অপ-ব্যবহার করা—এই সবই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ শিক্ষা চাই না। যাতে আমাদের মন উন্নত হয়, যাতে আমরা পাপের সঙ্গে—প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারি, সেই শিক্ষা আমাদের চাই। আমরা যা শিখেছি, তাতে ত ঐ সকল শিক্ষা হয় নাই। আমরা পুরুষ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশি, গল্প করি, আমোদ করি; এ সকল আমি ততদিন ভাল মনে করি না, যতদিন আমি আমার চরিত্রকে সমস্ত প্রলোভনের উপরে নিয়ে না বসাতে পারি। মন যদি ঠিক রাখ্‌তে পারা যায়, তা হলে আর ভয় কি? কিন্তু তা কি সকলে পারে? না সকলের সে রকম শিক্ষা হয়েছে? এ সকল আগুননিয়ে খেলা বড়ই ভয়ঙ্কর, বড়ই ভয়ঙ্কর। এ থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করতে হয়। প্রলোভন জয় কয়জন করতে পারে? যে পারে সে নারীরত্ন! কিন্তু আমি বলি, প্রলোভন জয় করতে গিয়ে একেবারে কাদামাখার চেয়ে, অথবা মনকে অন্ততঃ কলুষিত করবার চেয়ে, প্রলোভনের দিক দেখে দূরে—অনেক দূরে—বহু দূরে থাকাই ভাল। এতে লোকে ভীরু বলে—বলুক। মনের বল চাই, প্রলোভন জয় করবার শক্তি সঞ্চয় করা চাই; তবে ত আগুন দেখে ভয় হবে না। তা নয়, শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ঢাল নাই, তলোয়ার নাই,—প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম! এতে যে কত-জন পরাজিত হয়েছে, তার খবর কে রাখে? কত জীবন যে, একেবারে পাপে ডুবে গেছে, তার কথা কে জানে? কতজন যে চিরজীবন আত্মগ্লানির নরকভোগ করছে, তার ইতিহাস কয়জন জানে? শরীরের পাপও পাপ, মনের পাপও পাপ! এ কথা কয়জন বোঝে? এ পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত নাই, ও পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত নাই! আমিত এই বুঝি, এই জানি।”

খাতাখানিতে এই রকমের অনেক ভাল ভাল কথা লেখা আছে, অনেক উপদেশের কথা আছে। কিন্তু এ উপদেশ ত আমাকে কেহ কখন দেয় নাই!" সরলার এই উপদেশে এত কাল পরে আমার ভ্রম ঘুচিয়া গেল; আমি যে ভাবে জীবনযাপন করিতেছি, তাহা যে ঠিকপথ নহে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কৈ, সরলা কেন আত্মহত্যা করিল? তাহার কোন কারণই ত জানিতে পারি-লাম না! কোথাও একটু লেখাও দেখিতে পাইলাম না! তাহার অনেক আত্মীয়া, অনেক সখী ছিলেন, তাঁহারাও ত কিছুই বলিতে পারেন না! আমার মত সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, “তাই ত, এমন কি হয়েছিল যে, সে আত্মহত্যা কর্‌ল?”

তারপর—তারপর আর কি? আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছি; ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছি। এখন চেষ্টা করিতেছি, বাবা যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন, তাহাই করিতে পারি কি না। কিন্তু এখনও প্রায় প্রতিদিনই সহস্র কর্ম্মের মধ্যে মনে হয়, কি অপরাধে সরলা আমাকে ছাড়িয়া গেল! জীবনের বিনিময়েও কি সে কথাটা জানিতে পারা যায় না? এ জীবনে কি এ কথার মীমাংসা হইবে না? না হয়, না হউক! পরকাল নিশ্চয়ই আছে—সেখানে যাইয়া সরলাকে জিজ্ঞাসা করিব, কেন সে আমাকে এমন করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। সেই আশায়, সেই আশ্বাসেই ত বাঁচিয়া আছি! সে দিন কতদূরে?

রাঁচিতে দিনকয়েক

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্বনিধি, বি.এ.]

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাঁচিতে আমাদের এক টুকরো জমী আছে। আজ বছর কয়েক হোল, রাঁচিতে একটি কলেজ হবার ধূয়ো উঠেছিল। সেই সময়ে আমাদের একটি আত্মীয়, সেই কলেজ যে যায়গায় হবার কথা হয়েছিল, তারই কাছাকাছি একটি জমী কিনলেন এবং তাঁরই জমীর এক অংশ আমাদের কাছে বিক্রী করলেন। স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার যখন বাঙ্গালায় ছোটলাট ছিলেন, সেই সময়ে তিনি ঝোঁক ধরেছিলেন যে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ উঠিয়ে দিয়ে, রাঁচিতে একটা কলেজ ও তারি সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস তৈরি করাবেন। এরকম একটা কলেজ রাঁচিতে হলে, যারা সেখানে পড়তে যেত, তাদের শরীর প্রভৃতি নিশ্চয়ই ভাল থাকত; কিন্তু লোকের শেখবার ঝোঁকটা ঢের কমে যেত। গবর্ণমেণ্টের মতে যাই কেন হোক না, আমরা তো চোখে দেখতে পাচ্ছি যে, অধিকাংশ ভারতবাসী পেটভাতা অবস্থায় আছে; কাজেই তারা লেখাপড়া শেখাবার জন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে কুণ্ঠিত হোত। উচ্চশিক্ষার নামে পাছে শিক্ষাস্রোতই, সরস্বতী নদীর মত, গা ঢাকা দেয়, সেই ভয়ে দেশের নেতাগণ রাঁচিতে কলেজ খোলবার বিরুদ্ধে খুবই আপত্তি করেছিলেন। তাঁদের আরও একটি আপত্তি ছিল যে, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং তার তত্ত্বাবধানস্থ হিন্দুস্কুল ও হেয়ার স্কুল তৈরি হবার সময় অনেক বাঙ্গালী চাঁদা দিয়েছিলেন; চাঁদা দেবার সময় তো তাঁরা ভাবেন নি যে, এই কলেজ রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁরা ঠিক কথাই বলেছিলেন যে, এই সকল বিদ্যালয় কলকাতা থেকে সরাতে গেলে, সেই সকল চাঁদাদাতা অথবা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মত লওয়া উচিত। ফ্রেজার সাহেব আর কিছু দিন ছোটলাট থাকলে, তাঁদের এসমস্ত যুক্তি টি*ঁকত, কি না, সন্দেহ। তিনিও অবসর গ্রহণ করলেন, রাঁচিতে কলেজ হবার প্রস্তাবও একেবারে নিবে গেল।

রাঁচির যে অংশে আমাদের যায়গা, সেই অংশের নাম "গাড়ি।" জমীটি কেনা হয়ে যাবার দু'এক বৎসর বাদে, দাদা সেটা দেখ্‌তে যান। তাঁর যায়গাটি বড় ভাল লেগে ছিল। দুঃখের বিষয় যে, তিনি সেখান থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই মারা যান। সেই কারণে, রাঁচির উপর আমাদের কেমন একটা অভক্তি জন্মে গিয়াছিল। তবু, জমীটি কেনা হয়েছে বলে, আমাদের সকলেরই সেটা একবার দেখে আসবার কথা হচ্ছিল। কিন্তু কাজে আর দেখে আসা হয় না। অবশেষে, কোন ঘটনায়, হঠাৎ আমার রাঁচি যাওয়া স্থির হোল এবং নানা কারণে আমাকে একলাই যেতে হয়েছিল।

৩রা জানুয়ারি—শনিবার

আজ ৩রা জানুয়ারি (১৯১৫) শনিবার। আজই

সকালে স্থির হোল যে, আমি রাঁচি যাব। শুনেছি যে সেখানে নাকি বড্ড ঠাণ্ডা। কাজেই ট্রঙ্কটি গরম কাপড়ে ভর্ত্তি করা গেল। বিছানা বাঁধা হোল। বাজার থেকে একটা ছোট কুঁজো এনে জল ভোরে, তার মুখে কানি বেঁধে, একটা কাঁসার গেলাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া গেল। সমস্তটা একটা বিঁড়ের উপর বসিয়ে দেওয়া হোল। টিফিন বাক্সটি পূর্ব্বেই খাবার-দাবারে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এইবারে সরকার বাবুকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে একটি বার্থ রিজার্ভ করা গেল।

ট্রেণ রাত সাড়ে নয়টায় ছাড়্বে। বাড়ীতে দিব্য আহার করে, গাড়ীর মাথায় ট্রঙ্ক ও বিছানা চাপিয়ে, আর ভিতরে টিফিন বাক্স ও জলের কুঁজো নিয়ে, সাড়ে আটটার সময় বাড়ী থেকে রওনা হওয়া গেল। ষ্টেশন পর্য্যন্ত সরকারকে সঙ্গে নেওয়া গেল। আর, রাঁচি পর্য্যন্ত যাবার জন্য, বারো বছরের একটি ছোকরা-চাকর নেওয়া গেল। চাকরটার মুখখানা চেপ্টা, নাকটা তার নিতান্তই খাঁদা। সে, বোধ হয়, ভোট দেশে না জন্মে, ভুলে বাঙ্গালা দেশে জন্মেছে। দেশ-বিদেশে ঘুরতে গেলে, একজন পুরোণো দশকর্ম্মান্বিত চাকর সঙ্গে থাক্‌লে বড়ই সুবিধা হয়। আমার তাই ইচ্ছা হোল যে, এই ছোকরাটিকে তৈরি করে তুলি। তার গুণ আছে ঢের। তাকে নিয়ে দু-চারটে খুব হাসির কথা বল, সে আশ্চর্য্যরকম গম্ভীর হয়ে থাকবে। তাকে একটা গরম কোট, একটা পেণ্টুলান, একটা পাগড়ী, শোবার জন্য একটা কম্বল, আর গায়ে দোবার জন্য একটা কম্বল দেওয়া গেল। ছোকরাটির দেহখানি মোটেই স্থূল নয়, বরঞ্চ পাতলার দিকে যায়; কিন্তু, তার মা, আদর করে, তাকে কখনো বা ভোঁদা বলে, কখনো ভোঁদড় বলে। তার আসল নাম নকুল। সকলের সঙ্গে আমরাও তাকে ভোঁদড় বলেই ডাকি। আমার হেপাজত কর্‌বার জন্যই ভোঁদড়টিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; কিন্তু সারা ট্রেণের পথটি আমাকেই তাঁর হেপাজাত করে চল্‌তে হয়েছিল। ভয়, পাছে সে কোন ষ্টেশনে নেমে পিছনে পড়ে থাকলে, তার মা আমাকে অভিসম্পাত দেয়। ভোঁদড়কে পুরুলিয়া ষ্টেশনে যে নামতে হবে, তা নানা রকমে বুঝিয়ে চাকরদের কামরায় বসিয়ে দেওয়া গেল; আর খুব করে শাসিয়ে দেওয়া গেল, যাতে, পুরুলিয়া ছাড়া, অন্য কোন ষ্টেশনে না নেমে পড়ে। ট্রেণ ছাড়্‌বার সময় হোল,- সরকার বাবু বিদায় নিলেন। আমিও, বিছানা বিছিয়ে, নিদ্রার যোগাড় করলুম।

৪ঠা জানুয়ারি—রবিবার

আজ সকালে ভোর সাতটার সময় পুরুলিয়াতে নামা গেল। সেখানে ট্রেণ প্রায় একঘণ্টা থামে। 'কুলি' 'কুলি' করে খানিকটা চেঁচিয়ে একটি বেশ মজবুত কুলি পাওয়া গেল। আগে দেখতুম যে, যে সে রেলের কুলিগিরি করত; আজকাল দেখি যে, রেল-কোম্পানি লাইসেনী কুলির একটি প্রথা চালিয়েছেন। কতকগুলো লোককে একটা "ফী" (fee) নিয়ে ষ্টেশনের কুলিগিরি করবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়—ধর্‌তে গেলে কোম্পানিই এক রকম তাদের জামিন থাকে। তারত সুবিধা এই যে, আগেকার মত প্যাসেঞ্জারদের জিনিসপত্তর তত বেশী চুরি যাবার সম্ভাবনা থাকে না। গাড়ী থেকে আমার জিনিসপত্তর নামিয়েই, আমার প্রথম ভাবনা হোল যে,ভোঁদড় বাবু কোথায়? তখনও তিনি আমার কামরার দিকে এসে পৌছেন নি। এদিক ওদিক খুঁজে, তাঁকে যখন বের করলুম, তখন আমি মহা বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করলুম—"এতক্ষণ ছিলি কোথা?" তাঁর গম্ভীরভাবে উত্তর হোল—"এই এদিকে একটু দেখছিলুম।" মুখটুখ খিঁচিয়ে, এক ধমক দিয়ে, তবে আমার জিবের চুল্‌কুনি থাম্‌ল। কুলি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"বাবু, রাঁচির গাড়ীতে যাবেন?" আমি বল্লুম "হাঁ।"—রাঁচির ছোট লাইনের গাড়ীতে ওঠা গেল।

গাড়ীর কামরাগুলি নিতান্ত মন্দ নয়। দোষের মধ্যে দুই কামরার মাঝখানে একটি সাধারণ পায়খানা। রাত্তিরে এতে চুরির আশঙ্কা থাক্‌তে পারে। এক কামরার লোক, যদি পায়খানার ভিতর দিয়া, অন্য কামরায় এসে চুরি করে চলে যায়, তবে তাকে ধরবে কি করে? যাক, এ সকল বিষয় ভেবে আমার মাথা বকিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই। আমি দিনের বেলায় গাড়ীতে চড়েছি, সুতরাং আমার ওরকম চুরি যাবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। পুরুলিয়া থেকে রাঁচি ঘণ্টাকতকের রাস্তা। রাঁচিতে প্রায় বেলা সাড়ে এগারটার সময় পৌছানো গেল। রাঁচি যায়গাটা যদিও ছোটনাগপুরের ভিতর এবং সাঁওতালদের আড্ডা, কিন্তু আজকাল এখানে বেহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট

গরমের সময় থাকেন কি না, তাই অনেকগুলি ঘোড়ার ঠিকাগাড়ী হয়েছে। একটা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে, একেবারে মোরাবাদিতে, নতুন কাকামহাশয়ের বাড়ীতে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছানো গেল।

ষ্টেশন থেকে একটা লম্বা রাস্তা পূব দিকে চলে গেছে, তার নাম, দু-একজন সাঁওতাল বল্লে, মোরাবাদি রাস্তা। কেউ কেউ বল্লে যে, এই রাস্তা "কুকু" গ্রাম পর্য্যন্ত গেছে বলে, এই রাস্তার নাম "কুকু রাস্তা।"
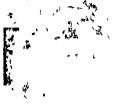
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই রাস্তা ধরে গেলে, এক যায়গায় দু চারটে ছোটখাটো পাহাড় উঠেছে দেখা যায়। সেই পাহাড়গুলোর কাছাকাছি একটা গাঁ জমে গেছে। এই গাঁয়ের নাম মোরাবাদি। পাহাড়ে-অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায় যে, যেখানে দু-একটা পাহাড়, সেইখানেই পাহাড়ের নীচে দু একটি "ঝোর", অর্থাৎ ঝরণা, বয়ে যায়; আর সেই ঝরণার কাছাকাছি গাঁ বসে যায়। এই মোরাবাদি গাঁয়ের কাছের পাহাড়টির উপরে আমার এক কাকা (শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) একটি সুন্দর বাড়ী তৈরি করিয়েছেন। ঠিকা গাড়ীতে চড়ে একবারে সেই বাড়ীতে আসা গেল। সেখানে দেখি, নতুন কাকামহাশয় এবং মেজজ্যেঠামহাশয় (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর) রয়েছেন। তাঁরা তো আমাকে দেখেই অবাক! আমার আসবার কোনই স্থিরতা ছিল না, কাজেই আমি কোন খবর দিই নি; আর তাঁরাও আমাকে রাঁচিতে দেখবার কোন আশাও করেন নি।

নতুন কাকামহাশয় তাঁর চাকরকে আমার থাকবার আর আহারের বন্দোবস্ত করে দিতে বল্লেন। চাকরটা গরম জল দিলে। আমিও সহমত গরম জলে চট্ করে স্নান করে নিলুম। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় মেজজ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করলুম। নতুন কাকামহাশয় আরও প্রায় একঘণ্টা পরে, বেড়িয়ে এসে, আহারাদি করলেন। আহারাদির পর, আমরা, আপনার আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে, পড়াশুনা করতে লাগলুম। আমি, বাড়ীতে দু একখানা চিঠি লিখে, আমার "প্রাণের কথা" লিখ্তে বসলুম।

বেলা প্রায় দুটোর সময় রাঁচির কমিশনর সাহেবের এক চাপরাসী, মেজজ্যেঠামহাশয়ের নামে, এক চিঠি এনে উপস্থিত। নতুন কাকামহাশয় সবেমাত্র সেই খাওয়া শেষ করে, উঠেছেন। তিনি, মেজজ্যেঠামহাশয়ের ঘরের দরজায় ঘা মেরে, বল্লেন যে --"কমিশনর সাহেবের আফিশ থেকে 'On His Majesty's Service' একটা চিঠি এসেছে।" আমি, নিজের ঘর থেকেই, সব শুনতে পাচ্ছি। মেজজ্যেঠামহাশয়, চিঠি পড়ে, আমার ঘরে এসে বল্লেন যে—'কমিশনর সাহেবের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট কান্তি বাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন যে, খিতেন্দ্র বাবু, বা জিতেন্দ্র বাবু, নামে তাঁর কোন আত্মীয় এই পাহাড়ে বাড়ীতে এসেছেন, কি না; এবং, এসে থাক্‌লে, ফরেষ্ট সাহেব সেই বাবুটির সঙ্গে দেখা করতে চান—কখন দেখা করবার সুবিধা হবে।' আমি মেজজ্যেঠামহাশয়কে দিয়েই লিখিয়ে দিলুম যে, আজ, এই মাত্র, এসে পৌঁচেছি; কাল সকালে আমি ফরেষ্ট সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করব।

সন্ধ্যার সময়, বাড়ীরই চারপাশে, দু চার পা পায়চালি করে, একখানি বিস্কুট ও এক পেয়ালা চা খেয়ে, একটু হিম পড়্তে আরম্ভ করলেই, ঘরে ঢুকে পড়া গেল। যতটা ঠাণ্ডার ভয় পেয়েছিলুম, সে রকম কিছুই দেখ্লুম না। তবু, সাবধানের বিনাশ নেই, এই মন্ত্র অনুসারে, উপযুক্ত গরম কাপড় পরে থাক্তে কসুর করি নি। মেজজ্যেঠামহাশয় একটু ঘুরে ফিরে এলেন। প্রতিবেশী একটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এঁদের বাড়ীতে বেড়াতে এলেন। ইনি, প্রায়

রোজই, এঁদের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। রাত নটার সময় তিনি চলে গেলেন। আমিও, মেজজেঠামহাশয়ের সঙ্গে রাত্রি-ভোজন শেষ করে, রাত দশটার সময় বিছানা আশ্রয় করে, বিস্মৃতি সাগরে একটি লম্বা ঘুম দিলুম।

৫ই জানুয়ারি—সোমবার।

আমার অভ্যাসমত, ভোর চারটার সময়, ভগবানের নাম নিয়ে উঠলুম। ছটা পর্য্যন্ত "প্রাণের কথা" লিখলুম। বড় ঠাণ্ডা বলে, আর নতুন যায়গা বলে, চারটার সময় বাহিরে বেরোতে সাহস করিনি। ছটার সময়ে, মুখধুয়ে চা খেয়ে, ফরেষ্ট সাহেবের কাছে যাবার জন্য তৈরি হলুম।

রাঁচিতে শ্রীযুক্ত এইচ. টি. এস. ফরেষ্ট সাহেব আজকাল ডেপুটী কমিশনর। এক সময় তিনি হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁর অধীনে আমি, হাবড়া মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারী ছিলুম। সেই সময়ে "স্বদেশী" গোলমাল খুব জোরে চলেছিল। ফরেষ্ট সাহেব হাবড়ায় এসেই দেখলেন যে, ওয়ার্ড-কমিশনরগণের, এবং তাঁদের বন্ধুদের বাড়ীগুলির টেক্স খুব কম দাম ধরে করা হয়েছে। তিনি বল্লেন যে, এতো বড়ই অন্যায় - যাঁরা দেশের মধ্যে বড় লোক, যাঁরা অন্য লোকদের চেয়ে টেক্স দিতে সক্ষম, তাঁরাই সব চেয়ে কম টেক্স দেবেন; অথচ গরীব করদাতাদের উপর যত দূর সম্ভব চেপে টেক্স আদায় করা হবে! তাঁর মতে, সব বাড়ীগুলিরই উপর, ন্যায্যমত দাম ধরে টেক্স বসানো হোক; তার পরে, অবস্থা অনুসারে, কারো টেক্স মাপ করা দরকার মনে কর, মাপ করে দাও। ফরেষ্ট সাহেব, তাঁর এই মতটি কাজে পরিণত করিবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগ্‌লেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁর ব্যবস্থা স্বদেশী গোলমালের সময়েই শেষ হোল। সেই ব্যবস্থা কাজে আনবার ফলে দাঁড়াল এই যে, অনেক লোক, যাঁরা কম টেক্স দিচ্ছিলেন, তাঁদের ঢের বেশী টেক্স দিতে হোল। পকেটে হাত পড়্‌লে, কে কবে চুপ করে থাকে বল? অনেকে ভাব্‌লেন যে, একটা মহা হৈ চৈ কর্‌লে, গবর্ণমেণ্ট ভয় পেয়ে, ফরেষ্ট সাহেবকে টেক্স কমাতে বাধ্য কর্‌বেন। এই সময়ে হাবড়াতে, আরো দুএকটি ঘটনায়, হৈ চৈ করবার সুযোগ ঘটেছিল। হৈচৈয়ের বেশ একটা দল জমে গিয়েছিল। চারধারে সভাসমিতি বস্‌তে লাগ্‌ল; ফরেষ্ট সাহেব, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের, উপরও অজস্র অযথা গালাগালি বর্ষণ হতে লাগ্‌ল। কিন্তু [illegible] বাবার ছেলে নয়। নিজের [illegible] থেকে তাঁকে টলানো কারো সাধ্য ছিল না।

ফরেষ্ট [illegible] তার গুণে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তারপর, তাঁর আরো অনেক গুণ ছিল, যার জন্য তাঁর প্রতি অনুরক্ত না হয়ে থাকা যায় না। সাহেব-নেটিভের মধ্যে তিনি ভেদবিচার করেন না। হাবড়াতে তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন; কিন্তু একথা কেহই বলিতে পারিবে না যে, তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে সাহেবদের প্রতি কোন রকমের পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন। এই টেক্স বাড়ানোর বিরুদ্ধে হাবড়ার সমস্ত কলওয়ালা সাহেবেরা একজোট হয়ে আন্দোলন করেছিলেন—এমন কি, কলকাতার 'চেম্বার্ অব কমার্স' পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে, অল্পস্বল্প, যোগ দিয়াছিলেন;—এঁদের আন্দোলনে অবশ্য গালাগালির বিষ ছিল না। এই আন্দোলনের ফলে, ছোটলাট, টেক্স বাড়ানোর ব্যাপার, নিজে তদন্ত করে, ফরেষ্ট সাহেবেরই রায় বহাল রাখিলেন। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে'র মত প্রতাপান্বিত কোম্পানির বড় সাহেবও এই টেক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন। সেই আপত্তির রীতিমত বিচার হল; তাতেও ফরেষ্টসাহেবেরই রায় বহাল রহিল। স্বজাতিপ্রিয়তা দেখাতে ইচ্ছা কর্‌লে, তিনি এই এক মহা-অবসর পেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যের পথ থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নি। তাঁর এই সকল কর্ত্তব্যসাধনে আমারও যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌বার অবসর হয়েছিল বলে, আমি গৌরব অনুভব করি। তাঁর আর গুণ ছিল এই যে, অন্যায় না করলে, তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর এতটা দায়িত্ব দিতেন যে, কর্ম্মচারীরা অধীনতা অনুভব করিতে পারিত না। অনেক সিবিলিয়ানদের মত তিনি কাণপাতলা ছিলেন না। কর্ম্মচারীদিগকে নানা উপায়ে তিনি, কষ্টিপাথরে ঘষে, পরীক্ষা করে নিতেন। যে কর্ম্মচারী সেই কঠোর পরীক্ষায় একবার উত্তীর্ণ হতো, তার উপর তিনি বিশ্বাস ঢেলে দিতেন। তিনি, ছোট-বড়, সকল কর্ম্মচারীরই যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করে চল্‌তেন। এইসকল গুণে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর অধীনস্থ প্রত্যেক কর্ম্মচারী, উপযুক্ত দায়িত্ব নিয়ে, কাজ করত, এবং তাঁর শাসনকালকে, নানা শুভকার্য্যে, ভূষিত ও উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করত—কেবল যন্ত্রের মত 'যে আজ্ঞা' বলে, হুকুম তামিল করেই,

নিশ্চিন্ত থাক্‌ত না। হাবড়ায় অবস্থানকালেই তিনি মিউনিসিপালটির উপর একখানি গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এই বিষয় আমি, ও হাবড়া মিউনিসিপালিটির পরলোকগত ইঞ্জিনিয়ার, হেল সাহেব, আমরা দুজনে, সাধ্যমত পরিশ্রম করে, গ্রন্থের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছিলুম। ফরেষ্ট সাহেবও উদারভাবে আমাদের উভয়কেই বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

গত ক্রিস্‌মাসের সময়ে তিনি একবার কলকাতায় গিয়াছিলেন। সেই সময়, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে—আমি রাঁচিতে বেড়াইতে যাইনে কেন? আমি তাঁকে বলেছিলুম যে, সম্ভবতঃ, দোসরা জানুয়ারি রওনা হইয়া, তেসরা তারিখে রাঁচি পৌঁছিব। ঘটনাক্রমে ২রা তারিখে আমার রওনা হওয়া ঘটেনি; আমি, ৩রা রওনা হয়ে, ৪ঠা তারিখে রাঁচি পৌঁছে ছিলুম। তাই, ফরেষ্ট সাহেব ৪ঠা তারিখে খোঁজ করেছিলেন যে, আমি রাঁচি এসেছি কি না।

ধড়াচূড়া পরে, অর্থাৎ চাপকান, জোব্বা, পেণ্টুলুন ও পাগড়ী পরে, যাত্রার প্রধান নায়ক সেজে, পদব্রজে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে বেরোলুম। আমার নামের কার্ড একটি, আর সঙ্গে পথপ্রদর্শকরূপে নতুন কাকামহাশয়ের চাপরাশীকে, নিলুম। চাপরাশীটি সময়ে সময়ে দুচারপাত্র বেশ টানেন্‌ শুন্‌লুম। পূর্ব্বরাত্রে তিনি বেশীমাত্রায় কিছু টেনেছিলেন, কি না, জানিনে; কিন্তু তিনি ফরেষ্ট সাহেবের বাড়ী জানেন বলে, পথ দেখাতে অগ্রসর হয়ে, শেষকালে আমাকে অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও যখন বাড়ীর কিনারা কিছু করতে পারলেন না, তখন অগত্যা, অন্যান্য সাহেবদের খানসামা প্রভৃতির কাছে জিজ্ঞাসপত্তর করে, বাড়ীর ঠিকানা ঠিক করতে হয়েছিল। গিয়েই, প্রথমে বাড়ীর দালানে একটা বেতের চৌকীতে বসে, আমার নামের কার্ডখানি পাঠালুম। ফরেষ্ট সাহেব স্নানের ঘর থেকে কাপড় চোপড় পরে, চা পান করে, বেরিয়ে এলেন। খুব খাতিরযত্ন করে আমাকে বাড়ীর এদিক-সেদিক—চারিদিক দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। সেই দিন দুপুর বেলায়, তিনি তাম্বু সফরে যাবেন বলে, ঘরদুয়োর অগোছালো হয়ে পড়েছিল। সাহেবের তো রাঁচি বড়ই ভাল লেগেছে; তিনি বাঙ্গালা দেশে আর ফিরে যেতে চান না। তবে এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় তাঁর উন্নতির মুখ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাতেই যা দুঃখ। তিনি শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি সহরটা দেখেছি, কি না। আমি বল্লুম—"না, দেখেনি।" তিনি বল্লেন, "কিসে দেখবে? আমি বল্লুম, "একটা ঠিকা গাড়ী নিয়ে ঘুরব।" তিনি বল্লেন, "না, চল, আমার মোটর গাড়ীতে এস, তোমাকে সহর দেখিয়ে আনি।" মোটর গাড়ী ঠিক হোল; হাজারিবাগ রোড প্রভৃতি লম্বা লম্বা রাস্তা দিয়ে, প্রায় তিন চার ঘণ্টা ঘোরা গেল—এই হাঁসপাতাল, এই ক্লব, এই রকম অনেক জিনিস দেখা গেল। শেষে, তিনি তাঁর আফিসে নেমে পড়লেন, আর তাঁর মোটরগাড়ী আমাকে মোরাবাদি পৌঁছিয়ে দিলে। কলকাতায় ফিরে আসবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি—তিনি সফর থেকে ফেরেননি।

ফরেষ্ট সাহেবের কাছে থেকে এসে, স্নানাহার করে, বসেছি—নতুন কাকামহাশয়ও বেড়িয়ে এলেন। তিনি কাল থেকে আমাকে তাঁদের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতে বল্লেন। আমি জানতুম না যে, এঁরা এখানেও পারিবারিক উপাসনা রক্ষা করে এসেছেন।

নতুন কাকামহাশয় বাল্যকাল অবধি মনে মনে করতেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, দেশের উন্নতির একটা নতুন পথ খুল্‌তে হবে। সময়ে তিনি, 'ফ্লোটিলা কোম্পানি'র সঙ্গে টক্কর দিয়ে, কলকাতা থেকে বরিশাল পর্য্যন্ত স্বদেশী জাহাজের একটা লাইন খুলেছিলেন। ফ্লোটিলা কোম্পানি হোল পাঁচজনের টাকায়, আর নতুন কাকামহাশয় হলেন নিজে একা। ফ্লোটিলা কোম্পানি উঠে গেল; কিন্তু সেই কোম্পানির যা কিছু সমস্তই কিনে নিলে ফ্লোটিলার কোম্পানি। এদিকে, নতুন কাকামহাশয়ের দু'একখানি জাহাজ ডুবে যাওয়াতে, আর টক্কর দেবার ফলে, তাঁর অনেক টাকা ধার হয়ে গেল। যখন সেই ধার শোধবার একটা বন্দোবস্ত হয়ে উঠল, তখন আর তাঁর সেই যৌবনের তেজ ও উৎসাহ ছিল না। সেই অবধি তিনি ভিতরে ভিতরে ধ্যান-ধারণা করবার অবসর খুঁজছিলেন।

বীণার তান

হিন্দী

সরস্বতী, মার্চ্চ, ১৯১৫। সামসুল উল্‌মা মৌলানা আল্‌তাফ হুসেন (হালী)। উর্দু ভাষার একজন বিখ্যাত দার্শনিক কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত দীবান (কাব্যসংগ্রহ) উর্দু সাহিত্যের এক উজ্জ্বল রত্ন। তিনি গদ্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

পানিপতের এক অভিজাত-কুলে ১৮৩৭ সনে হালী জন্মগ্রহণ করেন। গৃহে মক্তবে সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া মৌলানা হালী রাজধানী দেহলী (দিল্লী)তে ফারসী ও আরবী শিক্ষা করেন। এই সময় দেহ্‌লীতে তিনি উর্দু ভাষার মহাকবি গালিবের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। গালিব ইঁহার প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া কবিতারচনার দিকে হালীর চিত্ত আকর্ষণ করেন। দেহলীতে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া হালী অতি সামান্য বেতনে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সনের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অতিকষ্টে ইঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। বিদ্রোহ-শান্তির পর ইনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ইঁহার সহিত

শামসুল্ উল্লা মৌলানা আল্‌তাফ হুসেন্ আলি

সার সৈয়দ আহমদের আলাপ হয়; আর সৈয়দ আহমদ হালীর ন্যায় সুকবি অথচ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ একজন উপযুক্ত লোক খুঁজিতেছিলেন। তিনি হালীকে আলীগড় কলেজ স্থাপনায় প্রধান সহযোগিরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। এই সময় হালীর রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য মুসদ্দস প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই মুসদ্দসের আদর্শে বাবু মৈথিলী-শরণ গুপ্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ হিন্দীকাব্য ভারতীভারত রচনা করিয়াছিলেন। সরকার বাহাদুর হালীকে সমসুল উল্‌মা খেতাব দিয়া যোগ্যের সম্মান করিয়া ন্যায়পরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আলীগড় কলেজে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া হালী অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবন কেবল ভগবদুপাসনায় যাপন করিতেন। গত ৩০এ ডিসেম্বর (১৯১৪) সমসুল উলমা মৌলানা আলতাফ হুসেন হালী পানিপতে চিরদিনের জন্য ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। হালী অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় সরল ছিল। লোকের সহিত ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট অমায়িকতার পরিচয় দিতেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে গদ্য—সরসৈয়দ আহমদ কা জীবনচরিত, মির্জা গালিব কা জীবনচরিত, শেখ শাদীকা জীবনচরিত, কবিতাসম্বন্ধে একটি গবেষণা পূর্ণ সন্দর্ভ এবং পদ্য—দীবানে হালী, মুনাজাতেবেবা, মুসদ্দস, কইমসনবিয়াঁ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরস্বতী, এপ্রিল, ১৯১৫। মির্জাগালিব উর্দু সাহিত্যা-কাশের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মির্জাগালিবের সম্পূর্ণ নাম মির্জা আসদ-উল্লা খাঁ গালিব। তিনি ফারসীতেও সুবিদ্বান ও সুকবি ছিলেন। গালিব মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বাদসাহ আফরা-সিয়াবের বংশধর ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরাও সৈনিকবিভাগে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। গালিবের পিতামহ দেহলীতে আসিয়া বসবাস করেন। গালিবের পিতা আবদুল্লা বেগ খাঁ লখনউ, হায়দরাবাদ ও অলোয়ারে উচ্চপদস্থ সৈনিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে গালিবের বয়স মাত্র ৫ বৎসর ছিল। পিতৃবিয়োগের পরে হইতে গালিবের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। বিদ্রোহের পর দেহলী উৎসন্ন হইলে গালিব রামপুরের নবাবের নিকট আশ্রয় পাইয়াছিলেন। নবাব ক্রমে গালিবকে মাসিক ১০০৲ এবং পরে মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি দিতেন। গালিব উর্দু ও ফারসী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর গদ্য ও পদ্য লেখক ছিলেন। গালিব পরিহাসরসিক ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মতের স্বাধীনতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায়
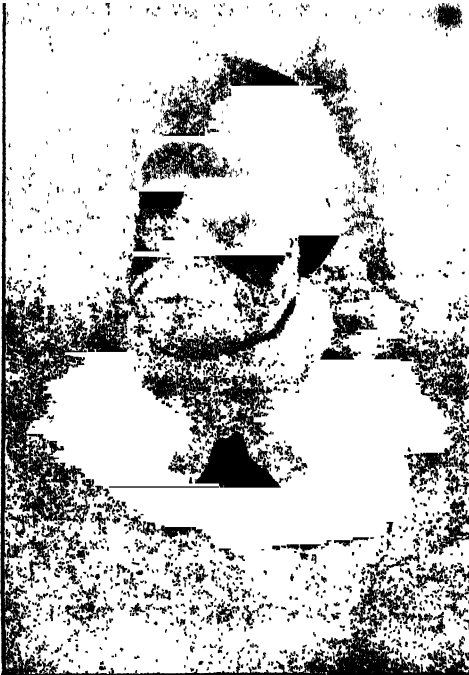
পরলোকবাসী শিবচন্দ্র জী ভরতিয়া

প্রত্যহ সুরাপান করিতেন। 'আপ ন কভী নমাজ করতে ঔর ন রোজা রখতে থে।' তাঁহার মতে প্রেমই ধর্ম্ম এবং প্রেমই কর্ম্ম। কবির উদার প্রাণ বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা ছিল। সন ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে গালিব কবিলীলা সাঙ্গ করিয়া 'বহিস্ত' (স্বর্গ) গমন করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা বলিতেছেন, জবতক উর্দূভাষা হৈ চন্দ্রবৎ আপ সাহিত্যাকাস মেঁ পূর্ণকলা কে সাথ অমৃতবর্ষণদ্বারা অপনে চকোরোঁ কো তৃপ্ত করতে রহেঙ্গে।'

বাবু জগন্মোহন বর্ম্ম লিখিত অশোকলিপি ১১শ প্রস্তাব (অসম্পূর্ণ) উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ।

শিবচন্দ্রজীভরতিয়া ৺ শিবচন্দ্রজীভরতিয়া হিন্দী ও মরাঠী ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) তিনি স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অনুমান ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি জাতিতে মারোয়াড়ী ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি বম্বই, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতিস্থানে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত মোত্যঞ্চী কণ্ঠী (মারাঠী কবিতা), কেশরবিলাস নাটক, ফাটকা জঞ্জাল নাটক, বুড়োর বিয়ে, কনকসুন্দর, প্রবাস কুসুমাবলী এবং গীতার্থ পদ্যাবলী প্রভৃতি পুস্তক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানা মারোয়াড়ী ভাষায় রচিত। ইঁহার সর্ব্বশেষ পুস্তক সূর্য্যচক্রবেধ। মর্য্যাদা, চৈত্র, ১৯৭২। মনুষ্যত্তত্ব অতি উপাদেয় প্রবন্ধ।

ইন্দু।—সচিত্র মাসিকপত্র, মার্চ্চ, ১৯১৫। বর্ত্তমান সংখ্যার বর্ণনীচিত্রখানি অতিশয় মূল্যবান্। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা (দ্বিতীয় প্রস্তাব) উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ইন্দু এখন ১ম শ্রেণীর মাসিক পত্রে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু 'কাজেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করে কোলে।' ইন্দুর এ অপবাদ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। আলোচ্য সংখ্যা ইন্দুর কান্তি মলিন দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। কিছুদিন হইতে ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহের মধ্যে একটা একতার ধ্বনি স্থাপন করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যেই আমরা বীণার তানে নানা ভাষার মাসিকপত্রের গুণের প্রশংসা ও দোষের নিন্দা করিয়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলাম, এবং আমাদের জনৈক লেখক ভারতবর্ষেরও আরও কোন কোন বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সাহায্যে হিন্দী সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালী পাঠকদিগের পরিচয় করাইয়া দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই শুভকার্য্যে হিন্দীর সুসন্তান মাত্রেই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হইয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন। কিন্তু ইন্দুর জনৈক লেখক (স্বতঃপ্রবৃত্ত না নিয়োজিত ?) অধীর হইয়া যেরূপ হিন্দী প্রেমবিকারের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দীর ও হিন্দুস্থানের প্রকৃত হিতৈষী কি কপটবন্ধু, তাহা সামসময়িক হিন্দী সাহিত্য-সেবক সুধীগণ বিচার করিবেন। হিন্দী ভাষার এই শ্রেণীর লোকেরা বস্তুতঃই অর্দ্ধশতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া বৃথা অভিমানের কূপমণ্ডূক হইয়া আছেন, তাহা তাঁহাদের কার্য্য ও বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা হিন্দী কেন, অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের ভাষা হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আমাদের রুচি, প্রকৃতি, শিক্ষা ও সাধনানুযায়ী

জৈন-পণ্ডিত শ্রীমদ্বিজয়ানন্দ সূরি উর্ফ আত্মারামজী (ভাঃ ২বঃ ২খঃ ৬সং ১০৮৮ পৃঃ)

নূতন আলোক পাত করিয়া, বঙ্গজননীর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিব; তাঁহাদিগকেও আমরা সেই পথে আহ্বান করিতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দীর দেশ 'কনোজ' হইতে আসিয়াছিলেন, অতএব হিন্দী বর্ত্তমান বঙ্গভাষারূপ আদর্শ সৌধের ভিত্তিভূমিতে থাকা অসম্ভব নহে। ভারতচন্দ্র ও রবিবাবু তাঁহাদের যদি অনুসরণ করিয়াই থাকেন তাঁহারা সেই আত্মশ্লাঘার মোহনিদ্রায় অচেতন্ থাকিলে তাঁহাদের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দুর্দ্দশার সীমা নাই। ভবিষ্যতে ইন্দু আত্মদোষসমর্থনের চেষ্টা না করিয়া ত্রুটী সংশোধনে মনোনিবেশ করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। হিন্দী লেখকগণ বাঙ্গলার কতকগুলি অপদার্থ অসার বাজে গল্পের অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের ভাষায় ও সমাজে বিপ্লবের সূত্রপাত না করিলে ভাল হয়। মূল্যবান্ ভাব সংগ্রহ করুন এবং যাঁহার যাহা গ্রহণ করিবেন, নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করুন। ইন্দু-সম্পাদক-মহাশয়কে আমরা করযোড়ে নিবেদন করি, প্রার্থনা ভঙ্গহেতু আক্রোশের বশে মিলনের পথে বৃথা বিরোধের কণ্টকবীজ বপন করিবেন না।

হিন্দী-মৈথিলী

মিথিলামিহির।—মৈথিলী ভাষার একমাত্র সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, দারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত। ১৩ই মার্চ্চ, ১৯১৫। মটো 'সত্যপ্রমাত্ম্যাং সকলার্থসিদ্ধিঃ'।

দেশে অরাজকতা ও শান্তিরক্ষার উপায় আলোচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন,—

(১) অস্ত্র আইনের কঠোরতা কম করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আত্মরক্ষার উপযোগী করিতে হইবে।

(২) যে সকল শিক্ষিত যুবক বিপথগামী ও অরাজকতাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সৎপথে আনয়ন করিতে হইবে।

(৩) এজন্য কৃষিকার্য্যের উন্নতি করা আবশ্যক।

(৪) এক্ষণ সরকার বাহাদুরের শান্তি ও উদারতা অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কেন না—

"ঠণ্ডা লোহা গর্ম্ম লোহেকো কাট ডালতা হৈ।"

মৈথিলী

মিথিলামোদ,—মাসিকপত্র, রামকটোরা, বেণারস ক্যান্টনমেণ্ট হইতে পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ ঝা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার্ষিক 'সওয়া টাকা'।

এই ক্ষুদ্র মাসিকপত্রিকা পাঠ করিয়া আমরা মৈথিলী ভাষাসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। ৮ম বর্ষের মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত অসমাপ্ত 'মিথিলাক ইতিহাস (শ্রীইন্দ্রপতি সিংহ লিখিত) উপাদেয় প্রবন্ধ। ৯ম বর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত শব্দকোষ সম্পূর্ণ হইলে মিথিলাভাষার এক প্রধান অভাব দূর হইবে। ঐ বৎসরের আষাঢ় সংখ্যা হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

মৈথিলী সঙ্গীত পুস্তক

"সবসঁ পৈঘ বিদ্যাপতিক পদাবলী জে কলকত্তাক লিপি বিস্তার পরিষৎ দ্বারা প্রকাশিত ভেল ছনিহ, মূল্য ৪্ টাকা রহলহু পর তাহিমে অশুদ্ধিকা ঢেরী ভেটত। এক মৈথিল কোনি-বিদ্যাপতিক নামসঁ আরা নাগরী প্রচারিণী সভাদ্বারা প্রকাশিত ভেল অছি কিন্তু কতহু কতহু এহুমে অশুদ্ধি রহি গৈলেক। বিদ্যাপতিক গীত থোড়েক একটা করাএ অপনে অঙ্গরেজী টীকা কৈ ডাঃ গ্রিয়র্সান সাহেব 'এসিয়াটিক-সোসাইটী' দ্বারা প্রকাশিত করৌলে ছথিহ তীহুটা পুস্তক দেবাক্ষর মেঁ অছি। বঙ্গলাক্ষর মেঁ উক্ত কবিক গীত অনেকো সংস্করণ ছপনা অছি জে হিতবাদী কর্য্যালয়ের মধ্য জস্‌টিস্ সারদাচরণ মিত্র ও জস্‌টিস্ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ক আজ্ঞা সঁ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত অছি তথা এক বৈষ্ণব পদাবলী নামক অছি জহিমেঁ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসক বনাওল রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধী গীত সব সংগ্রহ কৈল অছি, বঙ্গলা-সংস্করণমেঁ ওরো কৈএক ঠাম ছপল অছি। যদ্যপি বিদ্যাপতিক গীত সংগ্রহ মৈ অনেক আবৃত্তি বংগলা দেবনাগরীমেঁ ছপল তথাপি অশুদ্ধিকম্বা অছি, কারণ ওহিমেঁ বঙ্গলা, ভোজপুরী, মাগধী, নেপালী, ও হিন্দী (কুজম্মভাষা)ক অধিক দুর্গন্ধ লগলৈ, আর আশা করৈতছী জে হঁ কোঁ মৈথিল মহোদয় উক্ত সংগ্রহক উদ্ধার করথি ও সবক্রটিক পূর্ত্তি অ.শু ভৈ জাএত।" আমরাও শেষের আশায় সায় দিতেছি।

মরাঠী

বিবিধজ্ঞান বিস্তার আণি মহারাষ্ট্র-সাহিত্য পত্রিকা, মার্চ্চ, ১৯১৫।

সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় কবি গঙ্গাধর রামচন্দ্র মোগরের পরলোক গমনে শোক গাথা, কবি কে, বি ফণসে,—

এই কবিতায় মোগরের রচিত 'আনন্দী, কন্যাদান, বিলাপ প্রভৃতির নাম ও গুণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মরাঠীর সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মহাদেব মোগরে গত ২১এ মার্চ্চ বোম্বাই নগরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। অর্ব্বাচীনকালে মহারাষ্ট্র দেশের উৎকৃষ্ট কবিদিগের মধ্যে ইঁহার আসন ছিল। ইঁহার কবিতা প্রসাদগুণবিশিষ্ট। ইনি ব্যঙ্গ কবিতাও লিখিতেন। ইঁহার রচিত 'অভিনব কাদম্বরী' মরাঠী ভাষার এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

মনোরঞ্জন,—মার্চ্চ, ১৯১৫। এই সংখ্যাকে গোখলে সংখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'ভারত সেবক গোখ্‌লের অন্ত্যদর্শন' দর্শনীচিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। মহাপুরুষ কুসুমহারে শোভিত হইয়া

৺গঙ্গাধর রামচন্দ্র মোগরে

৺গোখলের ভারত-সেবক সমাজ ভবন—পুনা

যেন নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেছেন। মহামতি গোখ্‌লের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সংক্রান্ত যতগুলি চিত্র 'মনোরঞ্জনে' প্রকাশিত হইয়াছে, এত আর কোন ইংরাজী বা ভারতীয় ভাষার কাগজে এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

'ইতিহাসাস্তীল এক অতিশয় জঙ্গীলঢ়াই' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত রে. জে. এফ. এডোয়ার্ডস মরাঠী ভাষায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কারণ ও ঘটনা আলোচনা করিয়াছেন।

সার্থকতা

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি. এল্]

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

ওগো নব মেঘ, স্নিগ্ধ শ্যামল
সৌম্য শান্ত ছবি,
ইন্দ্রধনুর মুকুটে তোমায়
মণ্ডিত করে রবি।
অবিচল রাজ- গৌরবে তুমি
উচ্চ আকাশ-পথে,
দিগ্‌দিগন্তে অবারিত গতি,
ধাইছ অনিল-রথে।
ধরণীর ধূলি— কোলাহল তোমা
পরশ করে না কভু,
বৃষ্টি-সলিল- রূপে ধরাতলে
কেন নামি আস তবু?
'বিদ্যুৎ-জ্বালা বহিয়া বক্ষে
শূন্য গগনে আর
পারিনা ছুটিতে সুখের স্বর্গ-
সন্ধানে অনিবার।
শুষ্ক ধরায় করিব সরস
বৃষ্টি-ধারায় নামি।
তরুলতিকায় করিব ফুল্ল;—
সার্থক হব আমি।
শত তটিনীর শীর্ণ প্রবাহে
সঞ্চারি' দিব প্রাণ,
সিন্ধুর পানে ছুটিব আবার
তুলি কল্লোল তান।'

পুস্তক-পরিচয়

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম. এ-প্রণীত ; মূল্য দশ আনা মাত্র।]

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম. এ মহাশয়ের 'বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র' ইতঃপূর্ব্বে 'গৃহস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সেই সময়েই বর্ত্তমান যুদ্ধসম্বন্ধে এই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী সন্দর্ভ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যখন য়ুরোপে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যখন ইংলণ্ডও জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, তখন বিনয়বাবু ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন ; তাই তিনি এমন সুন্দরভাবে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। এই পুস্তকে যুদ্ধের বিবরণ নাই, কোথায় কোন্ পক্ষ জিতিল বা হারিল, তাহার কোন সংবাদ এই 'কুরুক্ষেত্রে' নাই ; কিন্তু ইহাতে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা আর কোথাও পাইবার যো নাই ; সমস্তই বিনয়বাবুর স্বচক্ষে দেখা। তাহার পর, ঘটনাত অনেকেই দেখেন, ঘটনার বিবরণও অনেকেই লিখিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহার মধ্যে অতি অল্পলোকেই বিনয়বাবুর মত দেখিতে জানেন—কাজেই তাঁহার লিখিত বিবরণ তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। বিনয়বাবু যে চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই তাঁহার প্রণীত অনেক গ্রন্থে পাঠকগণ পাইয়াছেন ; এই গ্রন্থে তাহার অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন এবং অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। পুস্তকের গুণের হিসাবে ইহার মূল্য যৎসামান্য বলিলেই হয়। বিনয়-বাবুর লেখনী হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধসম্বন্ধে আরও অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া, আমরা আশা করিতেছি।

কৈসার-অন্তঃপুর-রহস্য

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত, আগামী মহাপূজা পর্য্যন্ত মূল্য ১।০ স্থলে ৸০ মাত্র।]

জর্ম্মন-সম্রাট্ কৈসার দ্বিতীয় উইল্‌হেমের প্রতি আজ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—নেপোলিয়ানের উপর 'টেক্কা' দিবেন। একজন নির্ভীক দস্যু মহাবীর আলেক্‌জান্দারকে বলিয়াছিল—"আপনি খুব বড় ডাকাত!" পৃথিবীর সকল দেশের দস্যু, আজ কৈসারের কুকীর্ত্তি দেখিয়া বলিতে পারে, "আপনি ডাকাতের সম্রাট্।" আজ সে আলেক্‌জান্দার নাই, নেপোলিয়ান নাই—কৈসারও একদিন নাম-শেষ হইবেন ; তাহার কীর্ত্তি বা কুকীর্ত্তি, ইতিহাসের শোণিতরঞ্জিত পৃষ্ঠা হইতে মুছিবে না। কিন্তু কৈসারের রাজত্বকালের ইতিহাস-পাঠে যে সকল কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই এই কৈসার-অন্তঃপুর রহস্যে' তাহার উল্লেখ আছে। সঙ্গে সঙ্গে কৈসার মহিষীকেও চিনিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে।

পুস্তকখানি উপন্যাসের মত কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে, পাঠে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে কৈসারের অনেক 'ঘরের খবর' জানিতে পারা যায়। আমরা এতদিন নানাপ্রকার দেশী ও বিলাত কাগজপত্র ঘাঁটিতেছি,—কিন্তু কৈসার ও তাঁহার মহিষী, এমন কি, তাঁহার মোসাহেবদের সম্বন্ধে এত আমোদজনক নূতন নূতন কথা, পূর্ব্বে 'The Secret History of The Court of Berlin"-ব্যতীত অপর কোথায়ও পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

চৈনিক পরিব্রাজক—প্রথমখণ্ড

[শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার-প্রণীত, মূল্য তিনটাকা।]

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি. এ.-মহাশয় "সমসাময়িক ভারত" নামক যে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছেন, সে সম্বন্ধে "ভারত-বর্ষের" পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংখ্যায় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, উক্ত সমসাময়িক ভারতের দ্বিতীয় কল্প, চৈনিক পরি-ব্রাজকের প্রথম খণ্ড, আমরা সমালোচনার জন্য উপহার পাইয়াছি। আলোচ্য খণ্ডে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা হিয়ান ও সাং-ইয়ানের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্রদাস, সি আই. ই-মহাশয় ইহার একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়াছেন ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহার্শয় ইহাতে অনেকগুলি মূল্য-বান্ পাদটীকা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সেক্রেটারী অব ষ্টেট, ভারতগবর্ণমেণ্টে, বেঙ্গলগবর্ণমেণ্ট, ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনার এবং পাটনা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জাকসন্ সাহেবের অনুগ্রহে সমাদ্দার-মহাশয় অনেকগুলি মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য ছবিদ্বারা এই খণ্ড ভূষিত করিয়াছেন।

ফা-হিয়ান, হিউয়েনসিয়াং প্রভৃতি চীনদেশীয় পর্য্যাটকগণ বহু-প্রাচীনকালে এতদ্দেশে আসিয়া যে সকল স্থানের বর্ণনা করিয়া

গিয়াছেন, সেই সকল বর্ণনায় একণে অনেক প্রাচীন জনপদাদি নির্দ্ধারিত হইতেছে। তাঁহাদের বর্ণনাদি না পাইলে, অনেক স্থান চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিত। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় কোন ভাষায় এই সকল মূল্যবান বৃত্তান্ত ভাষান্তরিত হয় নাই। সুতরাং অধ্যাপক সমাদ্দার-মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে এইগুলি বঙ্গীয় পাঠকবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়া, বঙ্গভাষার সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ, তিনি এই গ্রন্থখানিতে যে সকল মূল্যবান ছবি প্রদান করিয়াছেন, সেগুলিও ইতঃপূর্ব্বে সাধারণ পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর নাই। সে হিসাবেও গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি সুন্দর। তিন খানি বহুবর্ণে ছাপা, ১৬খানি হাপটোন ও দ্বিবর্ণে চিত্রিত একখানি মানচিত্রে ইহা সুশোভিত হইয়াছে।

কমলা

[শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ; মূল্য একটাকা চারি আনা মাত্র।]

ইহা একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস ; সাধারণ গৃহস্থের জীবনে যে সকল ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, সেই প্রকার একটি ঘটনা লইয়া এই পুস্তকখানি লিখিত। গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা হইলেও, লেখকের লিপিকুশলতায় গ্রন্থখানি পরমসুন্দর হইয়াছে। লেখকের এই প্রথম উদ্যম হইলেও, তিনি কোথাও কোনও প্রকার ত্রুটী রাখেন নাই। স্থানে স্থানে যে ভাবে তিনি পাত্রপাত্রীদিগের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন বিচক্ষণ, সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পুস্তকখানি সুপাঠ্য। ইহার আর একটি গুণ এই যে, এই বইখানি নিঃসঙ্কোচে স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীদিগের হস্তে দেওয়া যায় ; আজকালকার দিনে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।

শেষ-আঘাত

[শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়]

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সদ্যঃ-বিধবা, দুখিনী জননী চেয়ে আছে পথ পানে,
বাছনি তাহার এখনো ফেরেনি বিহানে গিয়াছে স্নানে ;
তিন 'পোর' বেলা শেষ হয়ে গেছে, রৌদ্র এসেছে ঘিরে,
'পড়শী' ছেলেরা ঘুর-পথ দিয়ে নেয়ে গেছে সব ফিরে'।
'দা'য়ার' খুঁটিটি ধরিয়া উতলা উঠিছে বসিছে কত,
ওই বুঝি আসে—কই এল না ত !—ভাবিতেছে নানা মত।
ছোট পিঁড়িখানি রাখিল পাতিয়া, ফেরোয় ভরিয়া জল,
'বাড়িয়া' থইল সিদ্ধ পক্ক—[illegible]

এখনি আসিয়া, মুখে দুটি দিয়া, পাঠে যাবে বাছা তার,
আগে হ'তে তাই গুছায়ে রাখিল যাহা কিছু চাহি আর।
সূতা-বাঁধা সাদা দোয়াতটি তার, শরের কলম কাটি,—
কানি দিয়ে ছোট দপ্তরখানি বাঁধি দিল পরিপাটী,—
গায়ের দোলাই ঝাড়ি শতবার, ঝুলায়ে রাখিল বাঁশে,
ধূলামাখা দুটি চটী জুতা তার মুছি' রাখি দিল পাশে।
'গাঁয়ের' পথের সীমানার পানে মনটি ফেলিয়া রাখি,
শঙ্কা-আহত মায়ের পরাণ শিহরিছে থাকি' থাকি'!
নিঃসাড়ে কেন বালকের দল পড়িবারে গেল চলি' ;—
বুঝি তারা আজ ডাকিতে এল না—বাছা ঘরে নাই বলি'।
দুয়ারের পথে প্রহর ধরিয়া সুধাইল জনে জনে,
ঠিক মত কেহ দিল না জবাব, আন রাখি দিল মনে।
বেলা বেড়ে গেল, ঘুঘুর কণ্ঠে নীরব হইল 'গাঁ'টি,
পুত্র-বিরহব্যথার গুমটে—মার বুক যায় ফাটি,'—
গৃহ হ'তে বা'র, বা'র হতে গৃহে খুঁজে যতবার আসি'
স্নেহে ছল ছল অভাগীর তত আঁখি দুটি যায় ভাসি'।
কাঁদিল কাতরে স্বামীরে ভাবিয়া—চারিদিক পানে চাহি,
"নীলু"রে আজিকে কে দিবে খুঁজিয়া—বিধবার কেহ নাহি।
তুলসীমঞ্চে, অঞ্চল গলে, প্রণমিছে বার বার,
'গাঁ'য়ের ঠাকুর "গোপীবল্লভে" কত পূজা মানে তাঁর ;
মুছিল কাঁদিয়া—অশুভ বলিয়া, সজল নয়নপুট—
'ফিরে দাও মোর আঁচলের নিধি—দিবহে হরির লুট।'

* * *

কে নাড়ে কপাট ? এল বুঝি বাছা - অভাগিনী গেল ছুটি,
দেখে সে ত নয়—'তিনু'র পিসি যে দুয়ারে পড়েছে লুটি !
মাথামুড় খুঁড়ে, বলে চুল ছিঁড়ে—"পড়েছেরে বুকে বাজ !
'তি[illegible] বাঁচাতে—'নীলমণি' তোর [illegible] আজ।"

প্রতিধ্বনি

ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্য

"ক্ষত্রিয় নামের প্রকৃত রহস্য" প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-মহাশয় লিখিয়াছেন, "কর্ম্মবিভাগ হইতেই যখন অনেকে জাতিভেদের অর্থ কল্পনা করেন, কর্ম্মের ইতিহাসের অনুসরণ করিলে, তখন ক্ষত্রিয় জাতির জাতীয় নাম সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, বেদে পুরোহিত ও রাজারূপে আর্য্যদিগের মধ্যে প্রথম জাতিভেদের সূচনা হয়। বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে 'ক্ষত্রিয়' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাজন্য' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজন্য শব্দের অর্থ 'রাজার সন্ততি'; সুতরাং রাজার জাতি ইহাই রাজন্য শব্দের অর্থ। এই রাজার জাতি, বল বা ক্ষত্রের অধিকারী বলিয়াই, ক্ষত্রিয় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। অথর্ব্ব বেদেও রাজার উল্লেখে ক্ষত্রিয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। বেদ ব্যতীত অন্য শাস্ত্রেও দেখা যায়, রাজা শব্দ ক্ষত্রিয় শব্দের তুল্য অর্থ প্রকাশ করে। যেমন 'রাজার একাদশ বৎসরে উপনয়ন দিবে' 'ভূমিপ বা রাজার দ্বাদশ দিনে শুদ্ধ হয়'—ইত্যাদি। ক্ষত্রিয় জাতির এই প্রকারে রাজার সহিত আদিতে সম্বন্ধ হইতে ক্ষত্রিয় শব্দের মূল 'ক্ষত্র' শব্দকে বিশেষ অর্থবৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইতেই দেখা যায়। পূর্ব্বের 'বল' অর্থের স্থলে, 'ক্ষত্র' শব্দে রক্ষা অর্থেরই বিশেষ যোগ লক্ষিত হয়। শব্দকল্পক্রমে ক্ষত্রিয় শব্দ এইরূপেই সাধিত ও অর্থপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেলফোর তাঁহার (Cyclopaedia of India) নামক গ্রন্থে ক্ষত্রিয় শব্দের মূল 'ক্ষত্র' শব্দে কেবল 'রাজত্ব' ও 'রাজ্য' অর্থ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু এই 'ক্ষত্র' শব্দ উক্ত উভয় অর্থে বৈদিক সংস্কৃত বৌদ্ধ ভাষায় ও পারসীক শিলালিপিতে প্রযুক্ত হওয়ার প্রমাণও তিনি পাইয়াছেন। এস্থলে আমরা 'ক্ষত্রিয়' শব্দ হইতেই যে রাজত্ব ও রাজ্য অর্থের বিকাশ হইয়াছে—তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি।—**ভারতী**, জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল-মহাশয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ধারাবাহিক আলোচনায় 'তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞানলাভেচ্ছা যাহার দ্বারা নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়, তাহাই কৃষ্ণতত্ত্ব।

এই তত্ত্বের একটা ইতিহাস আছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যাগযজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্মকেই লোকে ধর্ম্ম বলিত। আমাদের ধর্ম্ম, আর বিলাতি 'রিলিজিয়ন' একই ভাবদ্যোতক বা একই বস্তু-জ্ঞাপক শব্দ নহে। আমাদের দেশের রিলিজিয়নের দুইটি বিভাগ কর্ম্মকাণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের 'রিলিজিয়ন'কেই সূক্ষ্মভাবে আমরা ধর্ম্ম বলিতাম। এই কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বিহিত কর্ম্ম কি, আর অবিহিত কি,—লোকের মনে যখন এই সন্দেহের উদয় হইল, তখনই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সত্য ও প্রামাণ্য জ্ঞানলাভেচ্ছাও তাহাদের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাকেই শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'জিজ্ঞাসা' কহে। ইহাতেই জৈমিনির প্রথম সূত্র—'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।' 'অথ' শব্দ অর্থে—এক মঙ্গলাচরণ, অপর সাধারণ 'অনন্তর'। এখানে উভয় অর্থেই ব্যবহৃত। কিন্তু এই 'অনন্তর' বলিলে, একটা কিছুর পরে বুঝায়। সেই বস্তু বা ঘটনা কি, যাহার পরে এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে? এই বস্তুটি ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা সাধারণ, অথচ সন্দেহবহুল জ্ঞান। জিজ্ঞাসা অর্থে—জানিবার ইচ্ছা। সর্ব্বদাই "জ্ঞানজন্য ভবেৎ ইচ্ছা"—জ্ঞান হইতেই ইচ্ছার জন্ম হয়। যেমন একান্ত অজ্ঞাত বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা জাগিতেই পারে না; সেইরূপ যাহাকে নিঃশেষে জানিয়া ফেলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে কোনও জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। যে বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আছে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান নাই, তাহারই নিঃশেষে উত্তর পাইবার জন্য 'জিজ্ঞাসা'। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা, শাস্ত্রে পৃথক্ প্রস্তাবিত না হইলেও, গীতায় তাহারই প্রশ্ন ও সমাধান আছে।—**নারায়ণ** জ্যৈষ্ঠ।

ওলন্দাজ সাহিত্য-সেবীর বৈঠক

[১১ হইতে ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ওলন্দাজ সাহিত্য-প্রচারক লিওনার্ড চার্লস্ ভ্যান্ নোপেন্

ওলন্দাজ সাহিত্য সঙ্গীতসেবক ফ্রান্সিস্ গ্রিয়াসন্

সাগরে

শি দিন নিশি-দিন, বিরাম—বিশ্রামহীন
উথলিছে সৌন্দর্য্য-সাগর !
ত গান, কত হাসি, আলো'-অন্ধকার-রাশি,
দেখিতে দেখিতে রূপান্তর।
ইন্দ্রধনু-বর্ণরাগে, রূপের মাধুরী জাগে,
তরঙ্গে তরঙ্গে কিবা খেলা !
কত রঙ্গভঙ্গিমায় উথলি' উছলি' ধায়,
কোনো খানে নাহি কূল-বেলা !
ক মহাশক্তির দর্পে, অপূর্ব্ব আনন্দগর্ব্বে,
আপনারে করিছে মন্থন।
শি-দিন নিশি-দিন, বিরাম—বিশ্রামহীন,
নাহি বাধা নাহিক বন্ধন।
ত পারিজাত-মালা, বজ্র-বিদ্যুতের জ্বালা,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে উঠে ফুটে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

বিম্বে বিম্বে শত শত, চন্দ্রসূর্য্য ফুটে কত,
তরঙ্গের মুকুটে মুকুটে !
আছাড়িয়া আছাড়িয়া, কত রূপ-রস দিয়া,
আপনারে ভাঙ্গিছে-গড়িছে,
কত কল্প কল্পনার, এ সৌন্দর্য্য পারাবার,
নিরন্তর উঠিছে পড়িছে।
এ মহাসাগর-মাঝে, কি মহাসঙ্গীত বাজে,
কি উদাত্ত—সুগম্ভীর ভাষা !
এ রূপ সাগরজলে— এ মহা অতল-তলে
না জানি জাগিছে কোন্ আশা !
হা হা ! চিত্ত কত ক্ষুদ্র, এ সৌন্দর্য্য, এ সমুদ্র,
প্রাণপণে পারি না ধরিতে।
স্থির, নির্নিমেষ আঁখি, আত্মহারা চেয়ে থাকি,
সাধ হয় ডুবিয়া মরিতে !

বিশ্বদূত

বঙ্গ-প্রসঙ্গ

রঙ্গপুর

রঙ্গপুরে কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে! স্বল্লাহার, অর্দ্ধাহার, অনশন ও অনশনজনিত মৃত্যু-কাহিনী আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে।

"গত বৎসর ইউরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, পাটের বাজার নিতান্ত মন্দা ছিল, এবং তজ্জন্য চাষীরা অতি অল্পমূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর, হৈমন্তিক ধান্য রীতিমত না জন্মায়, চাষী মহলে হাহাকার পড়িয়া যায়। এ জেলার অশিক্ষিত লোকগুলি অতি অপরিণামদর্শী। বর্ত্তমানে মুসলমান রাজবংশী প্রভৃতি কৃষিজীবী এবং মাসি প্রভৃতি মৎস্যজীবী, বা যাহারা জনমজুর খাটে, তাহাদের কষ্টের সীমা নাই।"

গত বৎসর পাটের দর না থাকায়, এবার পাটের আবাদ কম হইয়াছিল। সুন্দর ধানের আবাদ হইয়াছিল, এবং, আবাদের অবস্থা দেখিয়া, চাষীর মুখে হাসি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ১৫।১৬ দিন হইল, অনবরত বৃষ্টি হওয়ায়, সে ধানের আবাদও নষ্ট হইয়া গেল। চারিদিকে অন্নকষ্টের হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, প্রায়ই বারিপাত হইতেছে। সহরের কোন কোন রাস্তা কর্দ্দমাক্ত। অতিবৃষ্টির ফলে লোকে অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে।

দুগ্ধ ও তরিতরকারীর মূল্য কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে বটে; কিন্তু চাউল, চিনি, গুড়, মৎস্য প্রভৃতির মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।—**রঙ্গপুর দর্পণ**।

আসাম—শিলচর

কয়েকদিন প্রচণ্ড রৌদ্রের পর গত দুই সপ্তাহ যাবৎ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় শিলচরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এসমস্ত রোগের প্রতীকার ও প্রতিরোধকল্পে, এসময়ে পরিষ্কৃত জল পান, উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য আহার, করিতে ও ঘরবাড়ী যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে সত্বর যত্নবান হওয়া উচিত। এতৎসম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এরূপ আশা করা সহরবাসীর পক্ষে অসঙ্গত নহে।

সহরের কোন কোন স্থানে বৃষ্টির জল, নানাকারণে, উপযুক্তরূপে নিঃসারিত হয় না। গতপূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায়, গতসপ্তাহেও শিলংপট্টি অঞ্চলে অনেকের বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল। উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাবেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। পয়ঃপ্রণালীর উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে, ইহার প্রতীকার অসম্ভব।—**সুরমা**।

ময়মনসিংহ

দীর্ঘ দিন যাবৎ অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, এ জেলার শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। পাটের মূল্য হ্রাস হওয়ায় এ বৎসর কৃষকগণের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়াছে।

এখন নগরেই দেশী উষ্ণা চাউল ৬৲—৭৲ মণ; আতপের মণ ৮৲-৯।০ কম নহে।—**চারু-মিহির**।

বরিশাল

তিল ও মরিচ বেশ উত্তম জন্মিয়াছে। পাটের অবস্থা মধ্যম। আশুধান্যের অবস্থা উত্তম।

গবর্ণমেণ্ট বরিশালে 'কৃষিপ্রদর্শন-ভবন' খুলিবেন। নানা স্থানে যে ফসল জন্মে, তাহা এই ভবনে প্রদর্শিত হইবে।—**বরিশাল-হিতৈষী**।

পাবনা

পাবনা জিলার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহার সামান্য মাত্রও অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই বলিবেন—পানীয় জলের অভাবে কত সহস্র সহস্র পল্লিবাসী কত নিদারুণ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি-যন্ত্রণায় অকালে ইহলীলা শেষ করিতেছে, কত সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশানে পরিণত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট বোর্ডের হাতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন; বোর্ড সমগ্র জেলার মধ্যে একটীও জলাশয় খননের, বা সংস্কারের, ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই—**সুরাজ**।

মানভূম

বিলক্ষণ গরম পড়িয়াছে। জলাভাবে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে।—**পুরুলিয়া দর্পণ**।

শোক-সংবাদ

রায় ৺প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

জন্ম। ১লা অক্টোবর, ১৮৩০।
মৃত্যু। ২১এ এপ্রিল, ১৯১৫ সাল।

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে গত ২১এ এপ্রিল তারিখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কেবল নিজ অধ্যবসায় ও যত্নে ধনে ও সম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, দেশের উন্নতি-কল্পে মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন, রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহাদিগের অন্যতম। প্রসন্নবাবুর প্রপিতামহ ৺শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত ঘোষাল-বংশে বিবাহসূত্রে কিছু জমী পাইয়া, আড়িয়াদহে আসিয়া বাস করেন। সেই অবধিই ইঁহারা আড়িয়াদহে বাস করিতেছিলেন। পরে, প্রসন্ন-বাবুর পিতা আনন্দমোহন, তাঁহাদের পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণেশ্বরে বাটী নির্ম্মাণ করেন। ইং ১৮৩০ অব্দে প্রসন্ন-বাবুর জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, পিতা আনন্দমোহন, বালক প্রসন্নকে উত্তরপাড়া স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। বালক-প্রসন্ন বিশেষ অধ্যবসায়ী ছিলেন এবং অতিশয় যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তৎকালীন উত্তরপাড়া স্কুলের শিক্ষক (Mr. Hand) হ্যাণ্ড, তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যাহা হউক, তিনি উত্তরপাড়া স্কুলে হইতে প্রশংসার সহিত Junior Scholarship পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। পরে, তিনি Senior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় Oriental Seminaryতে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এ পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই; দারিদ্র্যের পীড়নে এই সময়েই তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ নগরে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার অনুকূল হইলেন না। এইস্থানে একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়! সন্ন্যাসী, যুবক প্রসন্নকে বলেন—"তুমি দেশে ফিরিয়া যাও; বাংলা মুলুকে তোমার জন্য সম্পদ ও রাজসম্মান অপেক্ষা করিতেছে।"

যুবক-প্রসন্ন দেশে ফিরিয়া নানাস্থানে চাক্‌রীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২।১ বৎসর এইভাবে গত হইলে, কিছু দিনের জন্য নানা স্থানে অল্প বেতনে কার্য্য করিবার পর তাঁহার একজন পিতৃ-বন্ধুর পরামর্শে তিনি পবলিক্ ওয়ার্কস বিভাগের পরীক্ষা দিলেন। এইবার ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। এই পরীক্ষায় তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন; এবং সঙ্গে সঙ্গে হিজলীকাঁথীতে P. W. D'র Overseer নিযুক্ত হন। এই কাঁথীতে তিনি এমনই যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন যে, তৎকালীন P. W. D'র Secretary, ট্রেভার সাহেব, তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কলিকাতায় বদলী করিয়া লইয়া আসেন। পরে তিনি যথাক্রমে কর্ণেল পেরো, কর্ণেল নীল প্রভৃতির অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় Eden Gardens স্থাপিত হয়। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আলিপুরের ছোট লাটের প্রাসাদ Belvedere ও তৎসংলগ্ন উদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট, তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, ইং ১৮৭৮ অব্দে তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে

'রায় বাহাদুর' বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। ইং ১৮৮৯ সালে আগষ্ট মাসে তিনি গবর্ণমেন্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, তিনি Contractএর কার্য্য ও ফুলের ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

আজকাল অনেকে ফুলের ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন; এমন কি, এই ব্যবসায়েই অনেকে ধনবান্ হইয়াছেন। প্রসন্নবাবুই সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যবসায়ে লাভবান্ হইয়া, ভদ্রলোকদিগের জীবিকা-অর্জ্জনের এক উপায় নির্দ্ধারণ করেন। তিনি অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া, কেবল নিজের আত্মীয়দিগের সুখ-সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন নাই,—দরিদ্রের দুঃখ-নিবারণ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ৺শরদীয়া পূজায়, ষষ্ঠীর দিন প্রতি বৎসর তিনি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অতিথি ও দুঃখীদিগকে অকাতরে অর্থদান করিতেন; এতদ্ব্যতীত অনেক নিঃস্ব পরিবারকে মাসিক সাহায্য করিতেন; এবং তিনি তাহাদের একরূপ অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে অনেক দুঃস্থ পরিবারই অভিভাবক-শূন্য হইল।

বরাহনগর ও কামারহাটী মিউনিসিপালিটির তিনি একরূপ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একাদিক্রমে ৪০ বৎসরকাল বরাহনগর মিউনিসিপালিটির কার্য্য করেন;—কমিশনর হইতে ভাইস্ চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালে দক্ষিণেশ্বর ও আড়িয়াদহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়; তাঁহার চেষ্টায় এই দুই গ্রামের অনেক রাস্তা পাকা হয়। তিনি নিজ ব্যয়ে অনেকগুলি রাস্তা বিস্তৃত করেন। আড়িয়াদহের শ্মশান-ঘাট নির্ম্মাণ, আড়িয়াদহের বালিকা-বিদ্যালয় ও দক্ষিণেশ্বরের বঙ্গ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় হইয়াছিল। আড়িয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আড়িয়াদহ 'এসোসিয়েশন', 'লাইব্রেরী' ও আড়িয়াদহ 'অনাথ-ভাণ্ডারে'র পৃষ্টপোষক ছিলেন।—তাঁহার অভাবে দেশের সকল অনুষ্ঠানগুলিই তাহাদের একজন বিশিষ্ট পৃষ্টপোষক হারাইল। তিনি, কন্যা, পৌত্রপৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী প্রভৃতি বিস্তৃত সংসার রাখিয়া, সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি' উপন্যাস বাহির হইয়াছে।—মূল্য দেড়টাকা।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের পত্নী 'ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবনী' প্রকাশিত হইল।—মূল্য বার আনা।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান-প্রণীত 'শুকদেব' সচিত্র কবিতা-পুস্তক বাহির হইয়াছে।—মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী-প্রণীত 'ঘুমের গল্প' নামক শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।—মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত নূতন উপন্যাস 'বিদেশিনী' প্রকাশিত হইল।—মূল্য দেড়টাকা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়-প্রণীত নূতন পুস্তক 'কৈসার অন্তঃপুর রহস্য' প্রকাশিত হইল।—মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল, এম. এ, বি এল, মহাশয়ের গল্প-পুস্তক 'বারুণী' বাহির হইল।

সুকবি কালিদাস রায়ের 'কুন্দ' ও 'কিসলয়' নামক দুইখানি কৈশোর-কাব্য একত্র 'বল্লরী' নামে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে; এই মাসের মধ্যেই বাহির হইবে। এই পুস্তকে অনেকগুলি নূতন কবিতাও সংযোজিত হইয়াছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

কুণাল-কাঞ্চন

"ইদং ন চক্ষুর্মম ভৌতিক চিরং
স্বচারু তিষ্ঠেৎ নহু যাস্যতি ক্ষয়ম্‌ ।
কদা সমায়াৎ সুদিনং যদা ভবেৎ
বিকাশিতং জ্ঞানবিলোচনং মম ॥"

শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ]

শ্রাবণ, ১৩২২

প্রথম খণ্ড] তৃতীয় বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বিত্ত ও চিত্ত

[শ্রীকালিদাস রায়, বি. এ.]

বিত্ত হতে চিত্ত বড়—এই ভারতের পুণ্যবাণী
নিত্য, ধ্রুব, সত্য যথা, বিত্ত তথা যুক্তপাণি।
কুবের যদি রতন-মতি
ঢালে পায়ে, বিমুখ সতী;—
বক্ষে তুলেন—নন্দী যদি দেয়গো জবাপুষ্প আনি ;
নিত্য, ধ্রুব, সত্য যথা, বিত্ত তথা যুক্তপাণি।
শ্মশানবাসী পাগ্‌লা ভোলার চরণতলে সে কোন্ ভূমা,
যাহার লাগি কৃচ্ছ্র সহে রাজাধিরাজকন্যা উমা ?
অ-মৃত যায় হয় না'ক নর,
নারী হেথায় চায় না সে বর,
গতায়ু দীন ঋষির চাহে রাজার মেয়ে পা দু'খানি ;
নিত্য, ধ্রুব, সত্য যথা, বিত্ত তথা যুক্তপাণি।
বক্ষে ধরে' গোপ-রাখালে গোপীমাতার স্তন্য পিয়া
রাজতনয়ের প্রেমের ব্রজে তৃপ্ত হলো তপ্ত হিয়া ;

শ্রীকালিদাস রায়, বি. এ

হস্তিনাতে রাজার দলে,
অর্ঘ্যমালা যাহার গলে,
বিপ্রগণের চরণতলে, ধন্য সে যে পাদ্য দানি' ;
বিত্ত হতে চিত্ত বড়—এই ভারতের পুণ্যবাণী।
চণ্ডালে যে হেরেছি গো যুবরাজের বক্ষোপরে,
নিষাদ-বীরের দক্ষিণাটি মহাভারত শীর্ষে বরে।
তপোবনের বহির্দ্দেশে
রাখিয়া রথ, দীনের বেশে,
ঋষির ধেনুর করে সেবা মহারাজ ও মহারাণী ;
নিত্য, ধ্রুব, সত্য যথা, বিত্ত তথা যুক্তপাণি।
বামনপদে পাতাল-রাজের ধূলিধূসর শিরটি জাগে,
বিদুর-দ্বারে ক্ষুদের কণা রাজন্যেরা ভিক্ষা মাগে,
ছত্র-চামর হেলায় ফেলে,
মগধদেশের রাজার ছেলে,
বেড়ায় ঘুরি শৈলে বনে শাশ্বতধন সত্য মানি ;
বিত্ত হতে চিত্ত বড়—এই ভারতের পুণ্যবাণী।
মণি-মাণিক কেঁদে লুটে চিরন্তনের চরণতলে,
মাথার জটায় তপশ্ছটায় মহিমারি সূর্য্য জ্বলে।
ত্যাগী যোগীর চরণধূলায়
রাজা তাহার শীর্ষ বুলায়,
গুরুর খড়ম, বন্দ্য পরম, সিংহাসনের যোগ্য জানি' ;
নিত্য, ধ্রুব, সত্য যথা, বিত্ত তথা যুক্তপাণি।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

ভূমিকা।—বলিতে লজ্জায় শির নত হইয়া পড়িতে চায় যে, আজো এদেশে এই সব তথা-কথিত শিক্ষিত মহোদয়-গণের ভিতরে খুব অল্প লোকি দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত পরিচিত। যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে জাতীয় উন্নতিসাধন কল্পনামাত্র। আজ আর বঙ্গভাষা 'দীনা,' 'মলিনা,' 'ভিখারিণী' নহেন; আজ বঙ্গভাষা হাস্যোজ্জ্বল গীতিমুখরা, মহীয়সী সম্রাজ্ঞী। আজ বঙ্গভাষার সেবা করিয়া চরিতার্থ হইবার দিন আসিয়াছে; কিন্তু, দুঃখের বিষয়—এখনো বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশীয় গ্রন্থকারের সহিত আশানুরূপ পরিচিত হইতে পারিতেছেন না। এখনো অনেকেই বঙ্গ-ভাষার উত্তম পুস্তক উপেক্ষা করিয়া, বিলাতী অসার ও কুরুচিপূর্ণ নভেলগুলিকে পর্য্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন! বলিতে কি—এখনো শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের ভিতর কেহ কেহ এমনো আছেন, যিনি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ না করায় একটা গর্ব্বই অনুভব করেন!

আমাদের বিশ্বাস—দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে আরো একটু বেশি দিনের প্রয়োজন হইবে। আজো বঙ্গদেশ তাঁহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই।

যে সকল লেখক কোনো একটা নূতন রকমের (Style) ঢং বা ধরণের প্রবর্ত্তক, সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে

সন্দর্ভটির বর্ণ-বিন্যাস সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। পদান্তে যুক্তাক্ষর না থাকিলে, উক্ত পদের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্বরবর্ণকে আমি সেই পদের শেষ বর্ণের সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে ভাবের বা ভাষার কোনরূপ অঙ্গহানি বা ব্যতিক্রম ঘটার আদৌ কোন সম্ভাবনা না থাকায়, এ পদ্ধতি সবিশেষ নিন্দনীয় গণ্য হইবে না, ভরসা করি। আধুনিক বহু খ্যাতনামা লেখকের রচনায় এইরূপ বর্ণবিন্যাস চলিত হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাই; অথচ তাঁহারা কেন জানিনা—সর্ব্বত্র এ রীতির অনুসরণ করেন না। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; যথা,—'কোনও' পদটি 'কোনো', 'আরও' শব্দটি 'আরো', 'কখনও' স্থলে 'কখনো'—এরূপ লিখন-পদ্ধতি সম্প্রতি বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণেই পরিদৃষ্ট হইবে। আমি এ প্রবন্ধে এবংবিধ স্বরবর্ণকে যৎসামান্য রূপান্তরিত করিয়া, হসন্তোচ্চারিত পূর্ব্ব পদের সহিত সর্ব্বত্রই সংযুক্ত করিয়াছি। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যদি ইহা কোন কারণে অযৌক্তিক বা বর্জ্জনীয় গণ্য করেন, আমিও ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত রহিলাম।—লেখক।

আমরা এই ব্যবহার-পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহি। ইদানীং অনেকে 'মত' কে 'মতো' 'কোনও' কে 'কোনো' প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই—যাহা স্থলবিশেষে গৃহীত হইলে, হয়ত সামান্য সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ-ভাবে গৃহীত হইবার সুবিধা নাই, তেমন সকল নব-প্রবর্ত্তন, অপেক্ষা প্রাচীন রীতির অনুসরণই শ্রেয়ঃ বলিয়া আমরা মনে করি। একই (বানানের) শব্দ বিভিন্ন অর্থে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়—

তাঁহাদের কিছু বেশি দিন বিলম্ব লাগে। যাঁহারা পাঠকের রুচি অনুসারে খাদ্য যোগান, অথবা কোনো সাময়িক ভাবের উপর নির্ভর করিয়া লেখনী চালনা করেন, তাঁহারা অতি অল্পদিনেই প্রশংসিত ও পরিচিত হন। জগদ্বিখ্যাত কবি Shakespear'এর অনন্যসাধারণ প্রতিভাও তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রথমত সমাদৃত হয় নাই। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালেরো সেই অবস্থা। যাহারা তাঁহার নিন্দক, তাহারা সত্যই হতভাগ্য! আবার, যাহারা তাঁহার চাটুকার, তাহারাও কবিবরের প্রতিভা ও ক্ষমতা বুঝিতে পারে নাই, কেবল বিশেষ কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনার্থই তাঁহাকে স্তব করিয়াছে। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্যক্ বুঝিতে পারি, এরূপ গর্ব্ব করিতেছি না; কিন্তু, কেবল এইটুকুই আত্ম-প্রসাদ আছে যে, বুঝিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, এবং চেষ্টা করিয়া যাহা না বুঝি, তাহা লইয়া মূর্খের মত অনর্থক বাগাড়ম্বর করি না।

পরিহাস-রসিক, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এ দেশের যতগুলি উপকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটা প্রধান এই যে, ভবিষ্যবংশধরগণ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া এ দেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতির একখানি মোটামুটি চিত্র স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। কেবল সন, তারিখ, এবং জন্মমৃত্যুর ধারাবাহিক বিশুদ্ধ তালিকাই যদি প্রকৃত ইতিহাস না হয়, তাহা হইলে কবিবর বর্ত্তমান ভারতের একজন সুনিপুণ ইতিহাসলেখক।

বঙ্গ-গৌরব, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু, সম্ভবত তিনিও কোনো নূতন "ধরণের" প্রবর্ত্তক নহেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নূতনের মধ্যে পুরাতনের এবং পুরাতনের মধ্যে নূতনের আভাস পাওয়া যায়। এগুণটি আমাদের আর কোনো নাট্যকারের নাই, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বসাধারণে কেবল "হাসির কবি" বলিয়াই বেশি পরিচিত। অবশ্য একথা সত্য যে, তিনি একমাত্র হাসির কবিতার দ্বারাই বঙ্গ-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; কিন্তু, হাসির কবিতা ছাড়া—কি নাটকে, কি প্রহসনে, কি গানে, কি অন্যান্য কবিতায়—সর্ব্বস্থলেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় যথেষ্টই আছে। একটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে; তবে, ভগবৎ-কৃপায় ভবিষ্যতে সুযোগ উপস্থিত হইলে, একদিন ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইব যে, দ্বিজেন্দ্রলালের তুল্য আর কোনো ব্যক্তি—বিশেষভাবে নাট্য-সাহিত্যে, ব্যঙ্গ-কবিতায়, এবং জাতীয় ভাবের অনুপ্রাণনায়—আপাতত আর বঙ্গদেশে ছিলেন না। তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এমন কিছু দান করিয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই দিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা মৌলিকতায় উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ রুচিপরায়ণতায় মনোজ্ঞ, এবং সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে কবি, ব্যঙ্গ-কবি বা পরিহাসরসিক, দার্শনিক, সমালোচক, প্রবন্ধ-লেখক, ঐতিহাসিক, এবং নাট্যকার।

এখন গোড়াতেই একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, যদি কেহ কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণই ভ্রম-প্রমাদশূন্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে, দুঃখের সহিত জানাইতেছি—তাঁহার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও সাহিত্য

এমন শব্দ সকল ভাষাতেই প্রচলিত আছে; যেমন ইংরেজী read শব্দটি মাত্র উচ্চারণ-পার্থক্যে বর্ত্তমান ও অতীত উভয় কাল বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়। বাংলায়ও তেমনই এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে, তাহাদের পদান্ত বর্ণটি হসন্তযুক্ত এবং বিশেষণরূপে সেগুলির অন্তে স্বরবর্ণবিশেষ যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। ফরাসী-ভাষায় পুংলিঙ্গবাচক অধিকাংশ শব্দের অন্ত্যবর্ত্তী 'e' বর্ণটি 'mute' অর্থাৎ অনুচ্চারিত থাকে। পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্বরবর্ণগুলি—অর্থাৎ 'ই' 'ও' প্রভৃতি suffix বা বিভক্তিগুলি—অযুক্তভাবে থাকিলে সেই শব্দ আমরা যে ভাবে উচ্চারণ করি, সেই স্বরবর্ণগুলি পদের শেষ বর্ণের সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত করিয়া দিলে, ঠিক সেই উচ্চারণ প্রকাশিত হয় না। আর এক কথা, অনেক স্থলেই যখন "পদান্তে যুক্তাক্ষর না থাকিলে, উক্ত পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্বরবর্ণ সেই পদের শেষ বর্ণের সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত করিয়া" দেওয়া চলে না—এই প্রবন্ধান্তর্গত 'কোনই' 'প্রায়ই' 'এতই' 'প্রকৃতই' 'খুবই' 'বস্তুতই' প্রভৃতি পদ—তখন, এই পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তনের সার্থকতা কতটুকু! অধিকন্তু আমাদের মনে হয়, এই পরিবর্ত্তনফলে, অনেক স্থলেই ভাবের ও ভাষার অঙ্গহানি ও ব্যতিক্রম যত ঘটুক, বা নাই ঘটুক, জটিলতা যে বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইবে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ, এই প্রবন্ধেরই দুইটি পদ উদ্ধৃত করা গেল—'এই যে একি কবির রচনায় ইত্যাদি'; 'উভয়ের কবিতায় একি রকমে প্রকাশ পাইয়াছে'।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

এবং আমার এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কোন ব্যক্তিকে প্রশংসা করিতে হইলে, তাহার ক্ষুদ্র-তুচ্ছ দোষগুলি সম্বন্ধে একটুও অন্ধ হইলে চলিবে না। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, দ্বিজেন্দ্রও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনার এমন সঙ্কীর্ণ নিয়ম হইতেই পারেনা যে, দোষগুলিকেও গুণ বলিয়া প্রচার করিতে হইবে! এরূপ পক্ষপাতিতা ও অসার ভাবপ্রবণতার ফলে জগতে খাঁটিকথা এবং খাঁটি মানুষ মেলা ভার হইয়াছে। দোষ সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকাই যে কেবল ভক্তিমানের লক্ষণ নহে, তাহা নহে; তাহা এক হিসাবে তোষামোদো বটে। শ্রদ্ধা বা ভক্তি যখন অসংযত ভাবে উচ্ছলিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যকে প্রশ্রয় দেয়, তখনি তাহার নাম হয় – অসার ভাব-প্রবণতা। সাহিত্য-জগতে সমালোচনার স্বেচ্ছাচারিতা ও ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। সত্যকথা বলিতেই হইবে। সমালোচনার অর্থ—নিরপেক্ষ বিচার, উহা নিন্দা বা প্রশংসা নহে।

রসিকতা।—সর্ব্বাগ্রে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতার কথাই বলিব। উক্ত কবিবরের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ হাস্যরসের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে একপ্রকার অপরিচিত ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র ও রসরাজ অমৃতলাল প্রভৃতি কবিগণ হাস্যরসের কবিতা রচনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু, তাঁহাদের রচনার বহু স্থানে বাহুল্যবর্ণনা বা অত্যুক্তি ও অশ্লীলতার যথেষ্ট সমাবেশ ঘটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায়, প্রহসনে, গানে এবং Parody--অর্থাৎ, অনুকৃতি-কৌতুকে হাসাইয়াছেন। তাঁহার অশ্লীলতার লেশস্পর্শশূন্য, অনায়াসোপহিত হাস্যরসোদ্ভাবন-প্রয়াস কোন স্থলেই সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই। তাঁহার হাসির কবিতার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত ভাষা ও ছন্দ। এ সকল রচনার ছন্দ তাঁহার নিতান্তই নিজস্ব। এমন একটি কবিতা বা গানো নাই, যাহার ছন্দ ভাবানুগ ও সম্যক্ স্বাভাবিক নহে। দ্বিতীয়ত, তাঁহার ভাষা ভাবপ্রকাশের একান্ত উপযোগী। বক্তব্য বুঝিয়া ছন্দোনির্ব্বাচনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। অনেক সময়ে ছন্দ, মিল, ও ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশে খুব একটা সাধারণ কথাও সরস-রসিকতায় 'জমায়েৎ' হইয়া উঠিয়াছে। মিলের অনায়াস গতি ও অপূর্ব্বতাও বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার ছন্দ পূর্ব্ব-প্রচলিত ছন্দ অপেক্ষা প্রায়ই একটু নূতন ধরণের,—অনেকস্থলে মাত্রিক এবং সর্ব্বত্রই নিপুণ হস্তের কারু কার্য্য-মণ্ডিত।

তাঁহার হাসির কবিতার রুচি পরিমার্জ্জিত; কিন্তু, এই বিশুদ্ধ রুচি রক্ষা করিতে যাওয়ায় কোন স্থলে তাঁহার একটা 'আড়ষ্ট' ভাবের সাবধানতা পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বোধ হয় না—যেন তিনি কোন কথা ইচ্ছা করিয়া 'বাদসাদ' দিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া লইয়াছেন। বরং, দেখা যায়—তিনি এতই অনায়াসগামী যে, আর একটু এদিক ওদিক হইলেই যেন কোন কোন স্থলে তাঁহাকে অশ্লীলতাপঙ্কে পড়িতে হইত, কিন্তু অপূর্ব্ব কৌশলে সামলাইয়া নিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতাই রসিকতায় ভরপূর। প্রতি রচনাটি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, এমন একটি ছত্র খুব অল্পই আছে—যাহা আড়ষ্টভাবের বা প্রয়াসের পরিচায়ক। অনেকেই হাসির কবিতা লেখেন; কিন্তু, তাঁহাদের রচনায় হাস্যরসোদ্ভাবনের ব্যর্থ প্রয়াসেই হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া থাকে। অনেক স্থলে এই পণ্ডশ্রম, এই 'সাহিত্যিক ব্যায়াম' দেখিয়া হাস্যের পরিবর্ত্তে করুণারি উদ্রেক হয়। এরূপভাবে হাসাইবার চেষ্টা 'সুড়সুড়ি' বা 'কাতুকুতু' দিয়া হাসাইবার মত।

দীনবন্ধুবাবু, অমৃতবাবু, কাব্যবিশারদ যথেষ্ট রসিকতা করিয়া আমাদিগকে হাসাইয়াছেন বটে; কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাঁহাদের সে সব ধরণ দ্বিজেন্দ্রলালের মত নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের এ হাসি অনেক স্থলে অশ্রুরি রূপান্তর; তাঁহার প্রতি হাসির গানি চিন্তা ও শিক্ষার প্রচুর খোরাক যোগাইয়া থাকে; অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, তজ্জন্য অনাবিল উচ্ছ্বসিত হাস্যের কোনই ব্যাঘাত জন্মে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গোঁড়ামি ছিল না। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। যেখানেই আবর্জ্জনা, যেখানেই গলদ্, যেখানে আগাছা দেখিতেন, সেখানেই তাঁহার ব্যঙ্গের কশাঘাত সমভাবে চলিত। সর্ব্বপ্রকার 'ন্যাকামি' ও ভণ্ডামির উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। তাই, দেখিতে পাই—কখনো হংসপুচ্ছ-পরিহিত কাকের মত বিলাত-ফেরৎ সম্প্রদায় তাঁহার বিদ্রূপের পাত্র, কোথাও দেখি – ফোঁটা-তিলক-টিকিধারী, অনাচারী বিপ্রের উপর তাঁহার আক্রমণ; কোথাও দেখি—ভণ্ড দেশ-হিতৈষীর

ধাপ্পাবাজী প্রকাশ করিয়া দিতেছেন ; কোথাও দেখি—অর্ব্বাচীন সমাজ-সংস্কারক তাঁহার কশাঘাতে বিপর্য্যস্ত, এবং কোথাও দেখি—উচ্ছৃঙ্খল 'বাবু'-সম্প্রদায় তাঁহার সম্মার্জ্জনী প্রহারে সন্ত্রস্ত। অথচ, তাঁহার এই সকল সুন্দর, সরস-কঠোর ব্যঙ্গের অভ্যন্তরে এমনি স্বভাব-সরল রসিকতা আছে যে, আক্রান্ত ব্যক্তিও সাময়িকভাবে তাহা মধুরভাবেই উপভোগ করিতে বাধ্য হয়।

অবশ্য তাঁহার সকল আক্রমণ, সকল ব্যঙ্গই যে ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত, তাহা বলিতে পারিনা। তবে, যাহা অযৌক্তিক, তাহা অপরের কাছে অযৌক্তিক হইতে পারে; কিন্তু, তিনি নিজে অযৌক্তিক ও অশোভন বুঝিয়াও, কেবল ব্যঙ্গের প্রলোভনে অথবা কোন অসাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, কিছু লিখেন নাই। তিনি নিজে যাহা ঠিক বুঝিতেন, তাহাই সরল ভাবে লিখিয়া যাইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এই কারণে অনেক সময়ে তিনি দাম্ভিক বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন ; কিন্তু, সরলতারো একটা তো মূল্য আছে! বিবেচক সাহিত্যসেবী ইহা একটু চিন্তা করিলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তাঁহার ব্যঙ্গকবিতার ব্যঙ্গ মাত্রই উদ্দেশ্য নহে। যে হাস্যকবিতার উদ্দেশ্য কেবল হাস্য-রসোদ্রেক মাত্র, তাহা তেমন উচ্চস্তরের নহে। দ্বিজেন্দ্র-লালের ব্যঙ্গ-কবিতার প্রভাব বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজকে যে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর করাইয়া দেয় নাই, ইহা বলিতে যাওয়া, বোধ হয়—একান্তই অশোভন এবং অসঙ্গত হইবে। স্মরণীয়, স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরগুপ্ত বা রসরাজ অমৃতলাল—ভাল হোক, মন্দ হোক,—ব্যঙ্গ করিতে পারিলেই ছাড়েন নাই ; দ্বিজেন্দ্র লাল কিন্তু সেরূপ করেন নাই। তিনি ব্যঙ্গের বিষয় বা পাত্রকে যেমন ব্যঙ্গ করিতেন, আবার ভক্তির পাত্রকেও তেমনি অকুণ্ঠ আগ্রহে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে পারিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গান,' 'আষাঢ়ে,' 'কল্কী অবতার'—এই তিন খানি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন।

স্বদেশিকতা।—দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধে বর্ত্তমান বঙ্গভাষী ব্যক্তিবর্গকে আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহার্ঘ রত্ন। ভাবের সম্পূর্ণ মৌলিকতার হিসাবে এ গুলির খুব শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলেও, পুরাতনের ভিতরে একটু যে নূতনত্ব আছে এবং প্রকাশের ধরণে,—সরল, সতেজ ও সুস্পষ্ট ভাব-বিন্যাসে এ সকল সঙ্গীতের যে একটা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য আছে, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধে অসার ভাব-প্রবণতার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার "নেতা" কবিতাটিতে ইহার বিশেষ পরিচয় আছে। তিনি জানিতেন যে, জন্মভূমির জন্য কেবল অলস অশ্রুপাত করা খুবই সহজ ; কিন্তু, তাহার জন্য ত্যাগীর ন্যায় কার্য্য করা বস্তুতই কঠিন।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-ভক্তির ভিত্তি সার্ব্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়। এ দেশ-ভক্তির পরম পরিণতি দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে—এই সমগ্র জগন্মঙ্গলেচ্ছায়! তাঁহার দেশভক্তি কোন জাতি বা দেশের উপর ঘৃণার উদ্রেক করে না। বলা বাহুল্য—এই বিশেষত্বটুকুই তাঁহার এবংবিধ রচনাগুলিকে অবিনশ্বর যশের অধিকারী করিয়া রাখিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল জানিতেন যে, ধর্ম্মোন্নতিতেই জাতীয় কল্যাণের পরাকাষ্ঠা। আমরা বর্ত্তমানে ধর্ম্মে খাটো হইয়া পড়িয়াছি। আচারের আবর্জ্জনা বাড়িয়া উঠিয়া, দেবতার সিংহাসনখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে ; তাই, তিনি অনেকস্থলে আচার-গত কুসংস্কারের উপর ভীষণ আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—ধর্ম্মই আমাদের মজ্জাগত। দ্বিজেন্দ্র লালের অচপল স্বদেশভক্তি কখনো অসংযতভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া অতিবৃষ্টির মত নিজের কাজকে নিজেই নষ্ট করিয়া ফেলে নাই।

প্রেম।—বঙ্গদেশে প্রেমের কবিতার অভাব নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সকল কবিই প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় কবিদিগের একটি অস্থি-মজ্জাগত দোষ এই যে, তাঁহারা কবিতা লিখিতে হইলেই প্রেম লইয়া বসেন। অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে, প্রেমের কবিতা লেখা উচিত নহে ; বরং, এক হিসাবে দেখিতে গেলে—প্রেমি কবিতার প্রাণ। কিন্তু, আজকাল প্রায় কবিরাই যেন কেমন এক প্রকার 'এক ঘেয়ে' ও জরাজীর্ণ, সেই 'মামুলি' রকমের প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্র লাল কিন্তু এই 'মামুলি' ধরণের প্রেমের কবিতা খুব অল্পই লিখিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, প্রেম ছাড়া স্নেহ, ভক্তি, অনুকম্পা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কবিতা লিখিবার উপাদান

অনেক আছে। 'আর্য্যগাথা'-নামক কবিতা গ্রন্থে যে সকল প্রেমের কবিতা পাওয়া যায়—যদিও তাহাতে বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই তথাপি—সেগুলির রুচি অতি বিশুদ্ধ ও ভাব যথার্থই আন্তরিকতাপূর্ণ। এই পুস্তক কবিবরের পঞ্চদশ কি ষোড়শ বর্ষ বয়সে লিখিত। যে প্রতিভা একদিন সমগ্র দেশকে স্তম্ভিত করিবে, কিশোর বয়সেই—উন্মেষ সময়েই তাহার এই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল "আর্যাগাথা," "মন্দ্র," "আলেখ্য," "ত্রিবেণী" নামক চারিখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কাব্যে তিনিও প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন; কিন্তু, তাহা অতি পবিত্র, স্বর্গীয় এবং সর্ব্বত্রই সুরুচিসঙ্গত।

একমাত্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা ব্যতিরেকে আধুনিক বঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম-কবিতার তুলনাই হয় না। তিনি "মেবার পতন" নাটকে মানসী, কল্যাণী ও সত্যবতীতে তিন রকম প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া এক স্থানে তাহাদের চরম পরিণতি দেখাইয়াছেন। প্রথমে পতিপ্রেম বা দাম্পত্য, সেই পতিপ্রেম পরে স্বদেশ প্রেমে, অবশেষে এই স্বদেশপ্রেমি বিশ্বপ্রেমে পরা-পরিণতি লাভ করিল। তিনি বিভিন্ন নাটকে বিভিন্নপ্রকারে প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম সম্বন্ধে ধারণা খুবি Practical! তিনি স্বাভাবিক প্রেমকে কেবলি একটা 'কি-যেন-কি' রহস্যময়, 'বুঝি-বুঝি-বুঝিনা' ভাবে দেখিতেন না। প্রেমকেও তিনি যেন বিচারপূর্ব্বক 'তন্ন তন্ন' করিয়াই দেখিয়াছেন।

প্রেমের কবিতা লিখিতে যাইয়া অনেক উচ্চস্তরের কবিরো পদস্খলন হইয়াছে; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যেক প্রেমের কবিতাই সুরুচিসঙ্গত। তাঁহার প্রেম রূপজ নহে, —অনেক স্থলেই গুণজ। সৌন্দর্য্য ও প্রেম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার "আলেখ্য" কাব্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"সৌন্দর্য্য নয় দেহের বর্ণ,
ওষ্ঠ-অক্ষির আকার ভেদ,
গ্রীবা-গণ্ডের প্রকার মাত্র,
—সে তো শুদ্ধই অস্থিমেধ!
দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি,
—সুখের সেবা, প্রেমের নয়;
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি
সে সৌন্দর্য্যই ধন্য হয়।"

এই মার্জ্জিত রুচির পরিচয়ে তিনি বুঝি বঙ্গীয় যাবতীয় কবিকেই পরাস্ত করিয়াছেন। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল নারী জাতিকে কেবল মধুর ভাবে অথবা কামনার বস্তু বলিয়াই দেখেন নাই;—তাঁহার নারী জাতিকে দেখিয়া মাতৃত্ব-স্বস্বত্বের কথাই বেশি মনে পড়িত, এবং নারীর ললিত দেহ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিগুলির কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে জাগিত।

পৌরুষ।—দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়, চরিত্রে, ও আচরণে—সর্ব্বত্রই পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েলি ধরণটা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। তাই, তিনি লম্বা লম্বা, কোঁকড়ানো চুল রাখা, নাকিস্বরে কথা বলা, মন্থর পাদক্ষেপে গমন, অপাঙ্গ দৃষ্টি-নিক্ষেপ প্রভৃতির উপর চিরদিনি 'হাড়ে চটা' ছিলেন। পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকের মত হইবে, ইহা তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইত। তাঁহার "আনন্দ-বিদায়"-নামক (Parody) অনুকৃতি-কৌতুকে তিনি যেন কতকটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, অশোভনরূপে ও অন্যায়ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নাটকেও বীরচরিত্র অঙ্কন করিতেই বেশি ভালবাসিতেন। কেবলি প্রেমের ছড়াছড়ি তাঁহার নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুরুষত্ব সম্বন্ধে তিনি পাশ্চাত্যজাতির অনুকারী। তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধবর্ণনার গানগুলি বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং অভাবনীয়রূপে অতুল। এস্থলে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও পরাজিত করিয়াছেন, ইহা নিঃসঙ্কোচই বলা যাইতে পারে।

এই পৌরুষের আধিক্যে আবার তাঁহার অনেকগুলি কবিতা—কবিতার প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিক কোমলতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কবিতা বীররসের হইলেও তাহার মধ্যেও একটা স্বাভাবিক কোমলতা থাকিবেই; কারণ, কোমলতাই কবিতার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন একটু বেশি 'মেয়েলি', দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা তেমনি আবার একটু বেশি পৌরুষ। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত একাধারে 'মেঘনাদবধে' গভীর নির্ঘোষে দুন্দুভি

বাজাইয়াছেন, আবার 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে মধুর বংশীধ্বনিও করিয়াছেন। এই যে একি কবির রচনায় মধুর ও কঠোর দুইটি বিপরীত ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ, দ্বিজেন্দ্রলালের ভিতরে বুঝি তাহা তেমন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের করুণ রসের ভিতরেও যেন কিছু কিছু কাঠিন্যের বা পরুষের—আভাষ পাওয়া যায়। ইহাতে অবশ্য একটু নূতনত্ব আছে; কিন্তু, নূতন হইলেই তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। দ্বিজেন্দ্র লালের ভাষা সর্ব্বদাই ওজস্বিনী ও পৌরুষপ্রকাশিনী। তাঁহার ছন্দ, শব্দ, বিষয় নির্ব্বাচনো সর্ব্বথাই পৌরুষব্যঞ্জক।

আধ্যাত্মিকতা।—দ্বিজেন্দ্রলাল কতকটা নিরাশাবাদী অর্থাৎ Pessimist. দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যভাবের দার্শনিক। তিনি তার্কিক ও যুক্তিবাদী। কিন্তু, তর্কের তো কোনো মীমাংসা নাই! তিনি জগতের প্রত্যেক বিষয় তর্কের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন; সুতরাং, তর্কের অন্ত না পাইয়া, অনেক স্থলে সন্দেহবাদী হইয়া পড়িয়াছেন! এই জন্যই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ও আধ্যাত্মিকতার দিক্ দিয়া তাঁহার কবিতার স্থান উচ্চে নহে। তাঁহার কবিতা-পাঠে বুঝিতে পারা যায়—তিনি Personal God মানিতেন না। যখন জগতে নানা বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া, জগতের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে, তখনি মানুষ এই জগৎছাড়া, অপ্রত্যক্ষ, কোনো চৈতন্যময়, সর্ব্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাস করিয়া, অন্তরে সান্ত্বনা ও শান্তি পায়। এই অপরোক্ষানুভূতির প্রভাবেই লোকে সম্পূর্ণরূপে Pessimist হইয়া পড়ে না। কিন্তু, যাহাদের জগতের উপর বীতশ্রদ্ধা হয়, অথচ তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অতীন্দ্রিয় এমন কোনো সত্তার অনুভব করিতে পারেনা—যাহা সর্ব্বশক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, অন্তর্যামী, এবং সর্ব্বভূতে দয়াবান, অনিবার্য্যরূপেই তখন নিরাশভাব বা Pessimism তাহাদের প্রাণে আসিয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালেরো সেই অবস্থা। তাঁহার কবিতায় দেখা যায়—তিনি স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, দেব-দেবী সম্বন্ধে বড় বেশি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি ভালমন্দ যাহা-কিছু—প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়াই দেখিতেন। তিনি পুরুষকার ও নীতি মানিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কি কবিতায়, কি নাটকে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, যুক্তি-তর্কের দিকেই তাঁহার মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাঁহার "পরপারে" নাটকের সেই একমাত্র ভবানী-প্রসাদ ছাড়া আর কোনো নাটকে তিনি ভক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান নাই। শেষ জীবনে তিনি কতকটা মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু, এই আংশিক আধ্যাত্মিকতায় তিনি যে কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা পৌছিয়াছিলেন, এমন বলা যায় না। তিনি মানুষ; মানুষের পক্ষে এই জগতের একটা অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবেই। বিখ্যাত হার্বার্ট স্পেন্সারো লিখিয়াছিলেন যে, "এই এত বড় বিরাট ব্যাপার—এই অসংখ্য সৌরজগৎ, ইহা কে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে? কে জানে ইহার পশ্চাতে কি আছে!" নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল সন্দেহবাদী কর্ম্মীর চিত্রই বেশী অঙ্কিত করিয়াছেন। শক্তসিংহ ও চাণক্যই এ কথার প্রধান দৃষ্টান্ত। চাণক্যের হৃদয়হীন, ভক্তিহীন পুরুষকার অবশেষে তাঁহার নিজের আত্মার কাছে নিজেই পরাজয় স্বীকার করিল। তবু, সে সময়েও তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেন না; অথচ, কি যেন একটা কোমল ও মধুময় আকর্ষণে তাঁহার জীবনের গতি সহসা ফিরিয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাতেও দেখা যায়—কি যেন একটা অপার্থিব, অনুভবনীয় সংবেদনা তাঁহাকে আঘাত করে, যাহার নিকটে তিনি লুটিয়া পড়িতেছেন; কিন্তু, সেটা যে কি তাহা তিনি নিশ্চিতরূপে ধরিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরের উল্লেখ তাঁহার কবিতা ও নাটকের স্থানে স্থানে থাকিলেও, তন্মধ্যে ভক্তিবাদ নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ঈশ্বর কতকটা অপরিচিত, অস্পষ্ট, এবং সে অজ্ঞাত সত্তা কেবল মাত্র বিশ্বপ্রেমেই প্রস্ফুট। তাঁহার এই ঈশ্বরের সহিত সম্পর্ক বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় কান্তভাবে বা হাফেজের ন্যায় প্রণয়িনীভাবে নহে; তাঁহার ঈশ্বরের সহিত রাজা-প্রজা ও পিতাপুত্র সম্বন্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ধর্ম্ম ও স্বর্গ—'পরহিত ব্রত'; মরণ তাঁহার কাছে মধুর নহে,—আবার ভীষণো নহে। মৃত্যু তাঁহার কাছে একটা নিয়ম মাত্র,—একটা রহস্য! দ্বিজেন্দ্রলালের গান বা কবিতার সহিত এই অংশেই কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের কবিতাদির সম্পূর্ণ বিরোধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় (Humanity) বিশ্বপ্রেম কম, দ্বিজেন্দ্রলালে তাহা প্রচুর। আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কোমল ভক্তিবাদ বেশী, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তাহা নাই। এইজন্যই, আমরা বলিতে বাধ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ভাব-সম্পদে সম্পূর্ণই মৌলিক, তাহাতে রবি বাবুর প্রভাব নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভাষা ও ছন্দের প্রচুর পার্থক্য;

এস্থানে দেখিলাম যে, ভাবেরো অনৈক্য। তবে কিনা—অনেক স্থলে এরূপ হওয়া সম্ভব যে, অনেক উপমা, বা অনেক কথা, উভয়ের কবিতায় একি রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, উপমা বা ভাব কাহারো একার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক ভিন্ন দেশবাসী কবি এক ভাবেরি কবিতা লিখিয়াছেন। তবে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যেক লেখকের ন্যায় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালো কোন কোন বিষয়ে অল্পাধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী। Sheley'র প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে Byron'এর উপরে পড়িয়া তাঁহার কবিতায় নূতন শক্তি দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাবের দিক দিয়া বৈষ্ণব কবি ও উপনিষদের প্রভাব বেশী, আর দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ইংরেজ কবির প্রভাব বেশী। আমি এস্থলে রবীন্দ্রনাথের কথাও উত্থাপন করিলাম; বোধ হয়—ইহাকে অবান্তর বলিয়া ভাবিবার কোনো কারণ নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল সামসময়িক কবি। একের সমালোচনা করিবার সময়ে অপরের কথার উল্লেখ করা, অনেক কারণে অনিবার্য্যরূপেই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কথা আংশিক উত্থাপন করিতেই হইবে।

সত্যনিষ্ঠ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আদৌ আধ্যাত্মিকতার ভাণ ছিল না। এই ভক্তির অল্পতা তাঁহার সরলতারি পরিচায়ক। তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা কেবল প্রচলিত বিশ্বাসেরি অনুবর্ত্তন করেন, নিজেদের কিছুমাত্র বিচার-ক্ষমতা নাই; তাঁহাদের ভিতরে আদৌ হয়ত ঈশ্বর-প্রেমি নাই; কিন্তু, ঈশ্বর-প্রেমের ভাণ করিয়া অনায়াসেই কল্পনা-বলে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। এই সব কবিদের কবিতা কাজেই প্রাণহীন, সরলতাশূন্য, আড়ষ্ট ও মামুলি হইয়া পড়ে।

স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, অনুকম্পা, দয়া প্রভৃতিতে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়-তন্ত্রী স্বতই সর্ব্বদা বাজিয়া উঠিয়াছে। যেথানেই কোন সদ্ভাবের পরিচয় পাইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার আত্মা সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধ-বিশ্বাসে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কার প্রশ্রয় পায়; তাই মনে হয়—অন্ধ-বিশ্বাস বা গোঁড়ামি অপেক্ষা সত্যকাম সন্দেহবাদো অনেক ভালো। একটা উচ্চতম আদর্শের অপূর্ব্ব কল্পনা দ্বিজেন্দ্রলালের মনে নিয়তই জাগরূক ছিল; কিন্তু, সেটা যে কি, তাহা তিনি কখনো ঠিক নির্দ্দিষ্টরূপে ধরিতে পারেন নাই। ইহাকে যদি ঈশ্বরানুভূতি কেহ বলে, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু, যে ভাবে সাধারণ লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তিনি সেভাবে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার "সত্যযুগ" কবিতাটি পড়িলে দেখা যাইবে যে, একটা মহান আদর্শের অস্পষ্ট আভাস তিনি মনে মনে অনুভব করিতেন।

ভগবৎ-কবিতাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু, ভগবৎ-কবিতা না লিখিলেই একজনকে নিম্নস্তরের কবি বলিতে পারি না। কারণ, কবিতার কোনো নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই। দেখিতে হইবে যে, কবি যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাকেই তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিয়াছেন কি না। তাহা পারিলেই সে কবিতা উচ্চাঙ্গের হইল। যদি কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কবিতা ভালো করিয়া না লিখিতে পারে এবং অপর আর একজনে যদি বৃক্ষ সম্বন্ধেও একটি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, তাহা হইলে সেই বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কবিতাটিই প্রশংসনীয় হইবে। অর্থাৎ, কবিতার বিচার—বিশেষত্ব ও কবিত্ব লইয়া, বিষয় লইয়া নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহাকেই সরল সহৃদয়তার সহিত স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কবিতা আদৌ দুর্ব্বোধ্য নহে। একটা সহজ ও সতেজ ভাবে তাঁহার সমস্ত রচনা অনুপ্রাণিত।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে একটু অস্পষ্ট ভাব—অর্দ্ধব্যক্ত, অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন ভাব আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তাহা কম। অবশ্য সাঙ্কেতিকতাই (Suggestiveness'ই) কবিতার প্রাণ; কিন্তু, অনেক স্থলে এই 'কি-যেন-কি' ভাবটা আধুনিক বহু কবিতায় এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে অর্থবোধেরি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন, যাহা প্রকাশের ভিতরে প্রকাশের অতীত তাহাকেই প্রকাশ করিতে; এইজন্যই তাঁহার কবিতা একটু অস্পষ্ট। কারণ, সে অনুভূতিকে বাহিরে বুঝাইতে হয়—'না-বুঝা'র মধ্যে দিয়া, তাহাকে পাইতে হয়—'না-পাওয়া'র মধ্যে দিয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল

সে ভাবের কবিতা লেখেন নাই। ছন্দ ও ভাষার বিশেষত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে, বোধ হয়—এই ভগবদ্ভক্তির অল্পতাহেতুই জাতীয় কবিতা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কবিতাগুলি এদেশবাসীর হৃদয় তেমন স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভগবদ্ভাব ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জাগত। খুব সাধারণ ভাবেও একটা ভগবৎ-কথা লিখিলেই এদেশবাসীর হৃদয়ে তাহা বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় স্পন্দন তোলে। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় যাহা দিয়াছেন, তাহা এদেশবাসীর পক্ষে নূতন; কিন্তু, এ নূতনত্বে তাহারা এখনো মুগ্ধ হয় নাই; কারণ, ইহা তাহাদের অপরিচিত ও ধারণার অতীত।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।—দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তর্জগতের কবি। তিনি দার্শনিক। তিনি বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতিতেই অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্যই, পরিশেষে তাঁহার কবিত্ব নাটকের ভিতরে পরিণতি লাভ করিল। তিনি আকাশ-বাতাস, আলোছায়া অপেক্ষা সুখঃদুঃখ, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি-অনুকম্পা লইয়াই বেশি কবিতা রচনা করিয়াছেন। অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনা করিতে যতটুকু বহিঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হইত ততটুকুই তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মুখ্য বর্ণনার বিষয়ই ছিল—অন্তঃপ্রকৃতি। তাঁহার রচনায় বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিবার উপায় মাত্র। তাঁহার নাটকেও তিনি অন্তঃপ্রকৃতির সহিত পরিপূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির ভিতরে সেই আনন্দময়ের খেলা দেখিয়া ভক্তি-পুলকিত হন নাই বা সেই অরূপকে রূপের মাঝে স্পর্শ করিয়া সার্থক হইয়া ওঠেন নাই;—তিনি প্রকৃতির কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সম্যক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, একটা রহস্য-মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়া, তর্ক দিয়া, বিজ্ঞান দিয়া, তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, প্রকৃতিকে তো কেহ কখনো এমন প্রশ্ন করিয়া কিছু বুঝিতে পারে নাই, দ্বিজেন্দ্রলালো পারেন নাই; সুতরাং, অবশেষে স্বতই তাঁহার সন্দেহবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা প্রায়শ যাহা প্রত্যক্ষ—তাহা লইয়া, তাহাকে পরিস্ফুট করিয়াই তৃপ্ত থাকিত। অতএব, দ্বিজেন্দ্রলাল Realistlc.

নাট্যকাব্য ও প্রহসন।—তিনি "পাষাণী" "সোরাব রুস্তাম" ও "সীতা" নামক তিনখানি নাট্যকাব্য লিখিয়াছেন। "সীতা" মিত্রাক্ষর, এবং "পাষাণী"ও "সোরাব রুস্তাম" অমিত্রাক্ষর। "তারাবাই" নাটকও তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দেই লিখিয়াছেন। তাঁহার অমৃতাক্ষর ছন্দ মাইকেলের মত গম্ভীর ও সতেজ নহে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ললিত-মধুরো নহে। তবু, তাহাতে যে ভাষা ও ছন্দের অনায়াস-গতি এবং ভাবপ্রকাশের সহজ স্বাভাবিকতা নাই, এমত বলা ন্যায্য হইবে না।

তিনি "সীতা" কাব্যে পৌরাণিক রামচরিত্র, যুক্তি-তর্কের দ্বারা যেরূপ বুঝিয়াছেন, সেইভাবেই প্রকটিত করিয়াছেন। কোন স্থলে তিনি কেবল অন্ধভাবে প্রচলিত মতেরি অনুবর্ত্তন করেন নাই। তিনি কাব্যে ও জীবনে সর্ব্বথাই স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন! তাঁহার "পাষাণী" নাটকেও দেখিতে পাই—অহল্যা-চরিত্র এই প্রচলিত মতের প্রতিকূলেই চিত্রিত হইয়াছে। 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তিনি তাঁহার এ সম্পর্কীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যেক পুস্তকেরি ভূমিকা লিখিতেন, এবং ভূমিকায় সর্ব্বথা অযোগ্য সমালোচকগণের উপর অতীব তীব্র আক্রমণ থাকিত। অনেকে মনে করেন—এই ভূমিকাগুলি একটু ঔদ্ধত্যপ্রকাশক; কিন্তু, আজকাল সাহিত্য-জগতে ঔদ্ধত্য নাহৌক, অন্ততঃ একটু কঠোরতার প্রয়োজনি হইয়াছে। অনেক নগণ্য ব্যক্তি না বুঝিয়া, এমন কি পুস্তকগুলি আগাগোড়া না পড়িয়াও, সমালোচনার ছলে আক্রোশ করিয়া অনর্থক তাঁহাকে গালাগালি দিয়াছে।

'সোরাব রুস্তম' অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীর যোগ্য হয় নাই; কিন্তু, 'সীতা' নাট্যকাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যের একখণ্ড অমূল্য রত্নস্বরূপ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক ও প্রহসন।—"তারাবাই" ও "পাষাণী"ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকে আমার বিশ্বাস, তিনি আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। "তারাবাই"ও "পাষাণী"র স্থলবিশেষে কবিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও, ছন্দ ও ভাষার দোষে এবং কতিপয় দৃশ্যের অশোভন, অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত বর্ণনায় এ পুস্তক

দু'খানি সাহিত্যে সর্ব্বথা প্রতিষ্ঠা লাভের সম্যক্ যোগ্য হইল না। অতঃপর গদ্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইতে থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল "একঘরে," "বিরহ," "বহুৎআচ্ছা," "পুনর্জ্জন্ম" প্রভৃতি কতকগুলি প্রহসন লিখিয়াছেন। ইহাতে বিবিধ প্রকার সমাজচিত্র এবং রসিকতা আছে। স্বর্গীয় দীনবন্ধু ও রসরাজ অমৃতলালের দু'একখানি প্রহসন ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রহসন বঙ্গসাহিত্যে আর কে লিখিয়াছেন, জানি না। এই সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণ সুরুচিপূর্ণ। সাহিত্যে কোনরূপ কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়ার উপর চিরকালি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল।

নাট্য-সাহিত্য।—দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহার্ঘ সম্পৎ। যদি উক্ত কবির সর্ব্বপ্রধান অক্ষয় কীর্ত্তি কিছু থাকে, তাহা তাঁহার এই নাটকসমূহ। বঙ্গের কোন রঙ্গালয় তাঁহার এই সকল নাটক অভিনয় করিবার মত উপযুক্ত অবস্থায় এখনো উপনীত হয় নাই। দু'একজন মাত্র অভিনেতা কেবল তাঁহার নাটকের জটিল চরিত্রগুলির অভিনয় করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। নতুবা, সাধারণত অন্যান্য অভিনেতৃগণ হাততালি পাইবার জন্য, ব্যবসার খাতিরে, নাট্যরসানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের অমার্জ্জিত রুচির অনুযায়ী অভিনয় করিয়া, তদীয় নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য নষ্টই করিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা কেবল রঙ্গমঞ্চেই তাঁহার নাটকের সহিত পরিচিত, তাঁহারা তাঁহার নাটকের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এই জন্যই, অপ্রিয় হইলেও এই সত্যটুকুর উল্লেখ, আবশ্যক বোধ করিলাম।

তিনি কোন সাময়িক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া নাটক লেখেন নাই; অথচ, বর্ত্তমান কাল যাহা চায়, তাহা তাঁহার নাটকে আছে। কিন্তু, তা' সত্ত্বেও, তাঁহার কোন কোন নাটক সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেরি স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। কেবল কোন সাময়িক ভাবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা করিলে, সে গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্যরূপে গণ্য হইতে পারে না; যতদিন সেই সাময়িক ভাবের প্রবাহ-টুকুর অস্তিত্ব থাকে, শুধু ততদিনি ঐ গ্রন্থের সমাদর হইতে থাকে।

তিনি কোন তত্ত্বকথা প্রচারের জন্য নাটক লিখেন নাই; অথচ, অনেক তত্ত্ব সরলভাবে তাঁহার নাটকে আপনা আপনি পরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুত পক্ষে নাটক, নাটক-মাত্র; তাহা সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ অথবা দর্শন-শাস্ত্র নহে। যদি শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন, ইতিহাস নাটকে থাকে, তাহা গৌণ ভাবে। নাটকের নাটকত্বই মুখ্য লক্ষ্য।

তিনি ব্যবসার খাতিরে অথবা অভিনয়ের জন্যই কেবল নাটক রচনা করেন নাই। এই ব্যবসার খাতিরে নাটক লিখিতে গিয়া শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রেরো সময়ে সময়ে পতন হইয়াছিল; এই ব্যবসার খাতিরেই মাননীয় অমৃতলাল বসুরো পদস্খলন ঘটিয়াছে এবং অধুনা ব্যবসার খাতিরেই কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর নাট্যকার নাট্যজগতে নিতান্তই বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা নাটকে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দৃশ্য, উড়ে যাত্রার মত অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক গান, বটতলার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত অসম্ভব ও আকস্মিক অনাবশ্যক সমাবেশ নিঃসঙ্কোচেই ঘটাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো নাটক অতি জঘন্য অশ্লীলতা দোষদুষ্ট, গ্রাম্যতাপূর্ণ এবং নিতান্তই 'সেকেলে' ধরণের।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক—ভাষার মাধুর্য্য, চরিত্র-বিশ্লেষণের নিপুণতা, দৃশ্যসমাবেশের কৌশল, ঘটনাপরম্পরার দ্রুততা, সরস বিবৃতি, সঙ্গীতে নূতন ধরণের রাগরাগিণীর সমাবেশ, পদ-লালিত্য, ঘটনাবলীর কেন্দ্রানুবর্ত্তিতা, রুচির বিশুদ্ধতা, বক্তব্য বা উক্তির নাতিদীর্ঘতা, উপাখ্যান ভাগের মৌলিকতা প্রভৃতি গুণে নাট্যজগতে শীর্ষস্থান লাভ করিবার উপযোগী।

তিনি নাটকে স্বগত উক্তি বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন। দুইজন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতেছে, ইতিমধ্যে আর একজন উচ্চৈঃস্বরে গোপনীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে; সমস্ত শ্রোতৃবর্গই তাহা শুনিতেছেন, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী অভিনেতাটিই তাহা শুনিতে পাইতেছেন না,—ইহা একান্তই অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর। দ্বিজেন্দ্রলাল অতি চমৎকার কৌশলে এই স্বগত উক্তি বাদ দিয়া, নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পরের কথা ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া, অতি সংক্ষেপে এবং বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহাদের মনোভাব প্রকটিত করিয়াছেন।

এই স্বগত-উক্তি বর্জ্জন-প্রয়াস সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন।

তাঁহার নাটক অনেক অভিনেতাকে 'অর্থপূর্ণ দৃষ্টি' নিক্ষেপ করিতে এবং 'অর্দ্ধ-স্বগত' কথা কহিতে শিখাইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকেও অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বর্ণনাগুলি যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তিবিশেষের চিত্তে অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বলা বাহুল্য—তাহাতে যথার্থই প্রকৃতি-দর্শন-জ্ঞান জন্মে।

তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারেই অতিক্রম করিয়া যান নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বিবিধ বিচিত্র বর্ণপাত করিয়াছে। নাটক ইতিহাস নহে; কিন্তু, আবার ঐতিহাসিক নাটক যে একেবারেই ইতিহাস ছাড়া নহে,—তিনি তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

তিনি মানব-চরিত্রের সকল দিক্, সকল বৃত্তির ক্রিয়া দেখাইতে পটু ছিলেন। কোন কোন স্থানে খুব সাধু চরিত্রের মধ্যেও দুই একটি দুর্ব্বলতা দেখাইয়া, এবং অসাধু চরিত্রের ভিতরেও দুই একটি মহত্ত্বের দিক্ দেখাইয়া, চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকত্বে অপূর্ব্ব কমনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

অনেক গুণরাশির ভিতরে কোথায় কোন্ পাপটুকু লুক্কায়িত রহিয়াছে, পরবর্ত্তী ঘটনা-পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাই অবশেষে কিরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়া, সর্ব্ববিধ অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়,—তিনি তাহা অসাধারণ দক্ষতার সহিতি দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, অনেক দোষের মধ্যে কোথায় একটু মহত্ত্বের বীজ গোপনে নিহিত আছে, অনুকূল আবেষ্টনের ফলে তাহা কিরূপে বাড়িয়া উঠিয়া মানুষকে দেবত্বে লইয়া যায়, তাহাও তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। মানব-চরিত্রের যে সমস্ত গুণ বা দোষ সহজে অন্যের চক্ষে ধরা পড়ে না, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহারি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্পষ্টরূপে দেখাইতে পারিয়াছেন। এরূপ চরিত্রাঙ্কনে মনুষ্যসমাজের জ্ঞানসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ শুভ সাধিত হয়। অনেক সময়ে মানুষ হৃদয়ের মধ্যে কোথায় একটু পাপ আছে, প্রথমতঃ অনবধানবশতঃ তৎসম্বন্ধে অথবা তদুচ্ছেদ-সাধনকল্পে আদৌ কোন সতর্কতা অবলম্বন করে না; কিন্তু, অবশেষে দেখিতে পাই—ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সেই ক্ষুদ্র অসৎ প্রবৃত্তির বীজটিই কালে মহা বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া তাহার শাখা-পল্লবে হৃদয়-দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ চরিত্রালোচনা করিলে মানবের মানসানুসন্ধানের ক্ষমতা জন্মে। অনেক সময়ে তাঁহার নাটক পড়িতে পড়িতে এমনো মনে হইয়াছে যে, হয়ত বা দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইতে স্থানে স্থানে সেক্সপিয়রের ন্যায় শক্তিশালী! মানুষের ভিতরে যে দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিতে পারিতেন। এই প্রকার জটিল চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। অন্তর্বিরোধের বহির্বিক্ষেপ অপেক্ষা, পুটপাক যন্ত্রমধ্যস্থ আচ্ছাদিত প্রদাহের মত, অন্তর্নিগূঢ় তীব্র আক্ষেপ প্রদর্শনেই সমধিক কৃতিত্ব। এইজন্য বঙ্গীয় নাট্যজগতে "নুরজাহান", "চাণক্য", এবং "ঔরংজেবের" চরিত্র-সৃষ্টি অতুলনীয়। অন্যান্য অনেক চরিত্রেই তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রদর্শনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় আছে; কিন্তু, "সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত" এবং "নুরজাহান" এই তিনখানি নাটকেই সেরূপ চরিত্রাঙ্কন বেশি। তিনি দুই একটি মাত্র দৃশ্যে অদ্ভুত মহত্ত্বের ছবি অঙ্কিত করিতে পারেন; যথা—সেকেন্দার, শেরখাঁ, সাহাবাজ, প্রভৃতি চিত্র। তিনি কখনো নাটকে হাস্যরসোদ্ভাবনের জন্য কোনো বিদূষক-চরিত (যেমন সচরাচর যাত্রায় অথবা নিম্নস্তরের নাটকে দেখা যায়) অঙ্কন করিতেন না। নিত্যকার স্বাভাবিক কথা এবং স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই হাস্যরস জমাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; যেমন—বাচাল, পৃথ্বী সিংহ প্রভৃতি। কিন্তু, এ কথা বলিতে আমি বাধ্য যে, এ সকল হাস্য মোটেই জমে নাই।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক।—দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক। প্রহসনগুলিকেও তাঁহার সামাজিক নাটকের অন্তর্গত ধরিয়া লইলাম। তিনি প্রহসন লেখার উপলক্ষে সমাজ-সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজের কোন্ কোণে, কোথায় কি গলদ্ রহিয়াছে, সূক্ষ্মরূপে তন্ন তন্ন করিয়াই তিনি তাহা দেখাইয়াছেন, এবং শুধু তাহা দেখাইয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই,—কৌশলে সে সকল সংশোধনের উপায়ো ইঙ্গিতে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।

কবি নীতিশাস্ত্রের মূলসূত্রের মত সংক্ষেপে কেবল

তত্ত্বকথার উপদেশ দান করেন না। বহুকালের চেষ্টায় এই স্থূল কথাটা এখন অনেকে বুঝিয়াছেন যে, যাহারা সমাজ-সংস্কারের জন্য কটীবদ্ধ হইয়া চীৎকার করে, অথবা কেবল বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসিয়া, আল্‌বোলার নল মুখে দিয়া দুঃখপ্রকাশ করে, তাহাদের অপেক্ষা সমাজ-সংস্কার-ব্যাপারে কবি ও সাহিত্যিকের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, সংহিতাকার অপেক্ষা রামায়ণ-রচয়িতার দ্বারা জগতে কম উপকার সাধিত হয় নাই। কেবল নীরস শুষ্ক উপদেশে তেমন কাজ হয় না। বাল্যশিক্ষা নামক গ্রন্থেই আমরা 'চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়', 'মিথ্যাকথা কহিও না', প্রভৃতি অনেক উপদেশ পাইয়াছি। কিন্তু, উপদেশটিকে যে পর্য্যন্ত দৃষ্টান্তদ্বারা জীবন্ত না দেখান যায়, ততক্ষণ উহা কেবল উপদেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত থাকে, সহজে তাহা সাধ্যে পরিণত করিবার সুবিধা হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক সম্বন্ধে এস্থানে আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি। কোন সামাজিক নাটক সমালোচনা করিতে হইলে কেবল ইহা দেখাইলেই চলিবেনা যে, নাট্যকার কিরূপ ভাবে সমাজকে গ্রহণ করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন; ইহাও আংশিকভাবে বিচার করিতে হইবে যে, অবস্থান্তর-বিপর্য্যয়ে, নাট্যবর্ণিত ঘটনাপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ কিরূপভাবে তদীয় নাটকের ভিতরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। যাহা বাস্তব জগতে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান কেবল তাহাই না দেখাইয়া, যাহা ঘটিতে পারে, সুকৌশলে, সুসঙ্গত কার্য্যকারণঘটনাপরম্পরার সমাবেশে, সেই কাল্পনিক আদর্শটিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলাই উচ্চ শ্রেণীর নাটকীয় কবিত্ব। আর, যাহা আছে, কেবল তাহাকেই মধুর করিয়া দেখান 'চলনসই' কবিত্ব। প্রথমোক্ত কবিকে একপ্রকার দার্শনিক বা ভবিষ্যদ্বক্তা বলা যাইতে পারে।

বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন না হইলেও, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কবিদিগের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ আছে। কবির কল্প-লোক,—অর্থাৎ সেই বিচিত্র জগৎকে বাস্তবের মত ধরিয়া লইতে, তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে প্রচুর পরিমাণেই চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। নাটক-সমালোচনার পক্ষে এই স্থূল অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়টি ভুলিয়াই কোন কোন সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে অনেক স্থলে আংশিক অবিচার করিয়াছেন। যখন যে পুস্তকখানি সমালোচনা করিতেছি, সমালোচ্য চরিত্রগুলির বিচার সেই পুস্তকের বর্ণনীয় অবস্থা বা ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সূর্য্যমুখী' বা সেক্সপীয়ারের 'হ্যাম্‌লেট', 'কিংলিয়ার' প্রভৃতি চরিত্র খুবি অসাধারণ সন্দেহ নাই;—কারণ, সেরূপ চরিত্র সচরাচর সুলভ বা সুপ্রাপ্য নহে;—কিন্তু, অসাধারণ হইলেই তাহা অস্বাভাবিক হয় না। অনেকে কোন চরিত্র একটু নূতন বা অসাধারণ হইলেই তাহাকে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলিয়া বসেন;—তাই, এখানে এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

সমাজের অবস্থা পুরাতন কালে একরূপ ছিল, আর বর্ত্তমান অন্যরূপ এবং ভবিষ্যতে আর একরূপ হইবে। সমাজের অবস্থা নিত্যই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু, মানুষের চিত্তবৃত্তি কখনো রূপান্তরিত হয় না। তবে, চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া দেশকালপাত্রবিশেষে প্রযুক্ত হইলে তাহার ফল কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অবস্থান্তর বিপর্য্যয়ে মানুষের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক নাটক লিখিতে হইবে, এবং সমালোচকেরো বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেটুকু বুঝিয়া লইতে হইবে। নতুবা, আধুনিক সমাজে পুরাতন আদর্শ, এবং পুরাতন সমাজে আধুনিক আদর্শ অঙ্কন করিতে গেলে নাটক অস্বাভাবিক হইয়া পড়েই। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের আদর্শগুলি একালের ছাঁচে গঠিত। এই সকল চরিত্র বুঝিতে হইলে, একালের মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে।

এজগতে "ইহা হইতে পারে", আর "উহা হইতে পারে না—" এককথায় এরূপ কথা বলা যায় না; এবং কি কি হইতে পারে ও কি কি হইতে পারে না তাহার একটা সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়াও মোটেই সম্ভবপর নহে। দেখিতে হইবে যে, নাট্যবর্ণিত ঘটনার সমাবেশে বর্ণিত চরিত্রকে কোন্ ভাবে পরিচালিত ও পরিণত করিয়াছে, এবং সেই পরিচালন বা পরিণতি নাট্য-বর্ণিত অবস্থানুসারে সম্যক্ স্বাভাবিক হইয়াছে কি না। নাটকীয় চরিত্রাঙ্কনের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা বুঝিবার এই একমাত্র উপায়।

নতুবা, কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি ও দেশ-কালের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহা অন্য জাতি বা দেশ-কালের পক্ষে অস্বাভাবিক বোধ হওয়া অসম্ভব নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু, দুঃখের বিষয়—কোন সমালোচনাই ঠিক যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল "বিলাত ফেরত", তিনি বঙ্গীয় সমাজের সহিত বিশেষভাবে মিশিয়াছেন কি না, প্রধানত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন কিরূপ ছিল,—এইসব নানা ভাব লইয়া সমালোচনা করিতে গিয়া ইঁহারা কেবল বাজে তর্কই করিয়াছেন।

প্রহসনগুলির কথা বাদ দিলে, "পরপারে" নাটকি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ও শেষ সামাজিক নাটক। এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'দাদামহাশয়ের চিত্র নিতান্তই অসাধারণ; কিন্তু, তথাপি ইহাকে আমরা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করি না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্‌স্‌পীয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই তো অত্যন্ত অসাধারণ,—হ্যামলেট, কিংলীয়ার, লেডি ম্যাকবেথ, মীরাণ্ডা প্রভৃতি কোন চরিত্রই পথে-ঘাটে সচরাচর আমাদের চক্ষে পড়ে না;—কিন্তু, তা' বলিয়া এগুলিকে অস্বাভাবিক আখ্যা প্রদান করা কি সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত হইবে? নিষ্ঠুর নিয়তি আর অবকাশ দিল না; নতুবা, দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্ল্লভ প্রতিভা কালে যে তাঁহাকে সামাজিক নাট্যসাহিত্যেও উচ্চাসন প্রদান করিতে পারিত, তাহা অল্পাধিক ত্রুটিপ্রমাদ সত্ত্বেও, এই 'পরপারে' পাঠ করিলেই আমরা দ্বিধাহীন নিশ্চয়তার সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

আদর্শ চরিত্রাঙ্কন।—দ্বিজেন্দ্রলাল কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক—কোন নাটকেই কেবল আদর্শ-চরিত্রই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পান নাই। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে নাট্যকারদিগের বহু মত আছে, এই অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিবার স্থান নাই। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করা সহজ; কেহ কেহ এই জন্যই, যে নাটকে আদর্শ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা সাধারণ মানব-চরিত্র-বিশ্লিষ্ট নাটককেই উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন।

আদর্শ-অঙ্কনের পদ্ধতি দুই প্রকার। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শ সৃষ্টি করেন, কেহ বা দোষ-গুণসমন্বিত মনুষ্য-চরিত্রেই কোন একটি বা দুইটি মাত্র উচ্চ প্রবৃত্তি—বর্ণনীয় চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতসঙ্কুল জীবনের জটিল গতির মধ্য দিয়া—কিরূপ ভাবে বিকশিত হইল, কেবল তাহাই দেখাইতে চাহেন। এই বিভিন্ন প্রকার চরিত্র সৃষ্টির তারতম্য বা তুলনা করিতে পারা যায় না। ইহার প্রত্যেক-টিই এক এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু, মানুষ কখনো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ হইতেই পারে না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ—একমাত্র শ্রীভগবান। সুতরাং, মানুষকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শরূপে চিত্রিত করিতে গেলে উহা একান্তই অস্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য মনুষ্যের অস্তিত্ব কল্পনাতেই সম্ভব। সাধারণত দোষগুণের মিশ্রণেই মানব-চরিত্র গঠিত। দুই চারিটা ভুলভ্রান্তি আছে বলিয়াই মানুষ "মানুষ"; তবে কি না—এক এক ব্যক্তি অবশ্য এক এক বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় হইতে পারেন। যিনি স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই যথার্থ উচ্চস্তরের কবি। দ্বিজেন্দ্রলালের এ ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তিনি 'মেবার পতনে' মহাবৎ খাঁর চরিত্রে আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রতাপ সিংহে আদর্শ স্বদেশ-ভক্তির দৃঢ়তা, হেলেন চরিত্রে আদর্শ প্রেম ও আত্মত্যাগ, চন্দ্রকেতুতে আদর্শ বন্ধু-প্রেম, কাশীমে প্রভুভক্তি প্রভৃতি নানা ভাবের মধ্য দিয়া মনুষ্য চরিত্রের নানা প্রকার মহত্ত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন।

তিনি একমাত্র দুর্গাদাসের চরিত্রকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যাইয়া তাহাকে একটু অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। এই দুর্গাদাস চরিত্রের কোন স্থানেই ত্রুটি বা পতন দেখানো হয় নাই। অন্তত দুই এক স্থানে একটু পদস্খলন ঘটিলে সম্ভবত চরিত্রটি স্বাভাবিক হইত।

ভাষা।—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা বালুবেলা-মধ্যবাহী নদীধারাবৎ অনায়াস-গামিনী ও স্ফটিক-স্বচ্ছ। তাঁহার ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বেদনায় বিকম্পিত, আবেগে আন্দোলিত। একটা সতেজ, সরল ভাবের অনুপ্রাণনা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানে তাঁহার ভাষা শুনিতে একটু ইংরাজী তর্জ্জমার মত; কিন্তু, এ অভিনব ভাষা নাট্যসাহিত্যের পক্ষে অনেক সময়ে বড়ই উপযোগী। এই ভাষার বাঁধুনির নূতনত্বে তাঁহার নাটক অভিনয়ের পক্ষে বড়ই সুবিধাকর। অনেক স্থলেই তিনি প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

যেখানে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে অকারণ দুর্ব্বোধ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার আদৌ আবশ্যকতা নাই। বস্তুত তাঁহার ভাষা যেমন মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল ও মধুর, তেমনি সরল, শোভন ও সতেজ।

দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু অজ্ঞবিজ্ঞ এবং স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি সকলের ভাষার বিভিন্নতা বা পার্থক্য রক্ষা করেন নাই অথবা করিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে তিনি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির মুখ দিয়াও সাধুভাষা প্রয়োগ করাইয়াছেন। এইটুকু না হইলে তাঁহার নাটকের ভাষা সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ হইত। নাট্য-সম্রাট্ দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনার এই গুণ আছে।

তাঁহার উপমা-প্রয়োগ বঙ্গসাহিত্যে অভিনব ও অতুলনীয়। কিন্তু, স্থানে স্থানে অনাবশ্যক উপমাপ্রাচুর্য্যে রচনা ভারাবনত হইয়া পড়িয়াছে। অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশ করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার উপমা প্রত্যক্ষ অর্থের দ্বারা যতটা ভাব ব্যক্ত করে, তদপেক্ষা অনেক অধিক ভাব কল্পনায় জাগাইয়া তোলে।

সহজে ও সংক্ষেপে কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া, এ প্রবন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্যই অসম্পূর্ণ থাকিতে লেখনী বন্ধ করিতে হইল। আশা করি—ভবিষ্যতে অনুকূল অবসরে বিস্তৃতরূপে এক একটি বিষয়ে আরো স্ফুটতর ও সুস্পষ্ট আলোচনা করিতে সমর্থ হইব।

উপসংহার।—দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের ভিতরে জ্যোৎস্নার মত মৃদুল আবেশে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন মধ্যাহ্ন তপনের মত,—উজ্জ্বল, দীপ্ত, জ্বালাময় প্রতাপে। দ্বিজেন্দ্রলাল শ্যামার মত ললিত উচ্ছ্বাসে কুঞ্জবনে গীত গান নাই, তিনি গায়িয়াছেন পাপিয়ার মত প্রবল, গম্ভীর, উদাস স্বরে—ঐ উন্মুক্ত, উদার নীলাকাশে! দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা কতকটা বর্ষার আকাশের মত,—তাহাতে গর্জ্জন আছে, বিদ্যুৎ আছে, বর্ষণ আছে; তাঁহার সাহিত্য যেন হিমাচলের ন্যায়—তাহাতে গাম্ভীর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে, মহিমা আছে, বন্ধুরতাও আছে; আবার তাঁহার কবিত্ব ঐ সমুদ্রেরি মত—তাহাতে তরঙ্গ আছে, আলো আছে, ছায়া আছে, এবং অসীমতায় তাহা দুলিয়া দুলিয়া এক একবার যেন কাঁপিয়া ওঠে!

এতক্ষণে আমরা তাঁহার কাব্য ও নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। এক একটি কুসুম ছিঁড়িয়া যেমন উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখানো যায় না, এক একখানি ইষ্টক আনিয়া যেমন একটি প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দেখানো যায় না, তেমনি একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সম্যক্‌রূপে রসাস্বাদন করিতে হইলে তাঁহার কাব্য ও নাটক নিবিষ্টমনে পড়িতে হইবে, এবং পড়িয়া তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

আজ বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান-নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। সহৃদয় বিদ্বন্মণ্ডলী আশা করি—আমাদের জাতীয়গৌরব দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে নীরব রহিয়া অকারণ আর আত্ম-বঞ্চিত হইবেন না।

উপসংহারে, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আমার এই অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য প্রবন্ধে কোনো অশোভন, অসংযত অথবা অসঙ্গত কথা বলিয়া থাকি, মনীষিগণ নিজগুণেই তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমার এ তুচ্ছ সন্দর্ভ যদি এক ব্যক্তিকেও কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তবেই, বলা বাহুল্য—ইহার চরম সাফল্য লাভ হইল মনে ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব।

রাঁচিতে দিনকয়েক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্বনিধি, বি.-এ.]

আহারের পর নতুনকাকামহাশয়ও আপনার ঘরে ঢুকলেন, আমরাও আপনার আপনার ঘরে ঢুকলুম। অনেকক্ষণ ধরে "প্রাণের কথা" লিখলুম। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লুম, তখন বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে দেখি যে, অনেক-গুলি সেল্‌ফে অনেক ভাল ভাল বই আছে—নানা বিষয়ের আছে। মনে মনে ঠিক করলুম যে, যে কয়দিন রাঁচিতে থাকি, যতদূর পারি, এই সমস্ত বইয়ের সদ্ব্যবহার করব। কবিতার বই পড়লে ক্লান্তি আসবে না ভেবে, প্রথমেই কবিতার বই পড়তে বসলুম। "প্রাণের কথা" লিখতে লিখতে ক্লান্তি বোধ করলেই কবিতার বই পড়তে বসতুম। কবিতার বই পড়তে পড়তে আমারও দু'একটি কবিতা লিখ্‌তে ইচ্ছা গেল। ফলে দাঁড়াল এই যে, যে কয়দিন রাঁচিতে ছিলুম, সেই কদিন প্রায় রোজই একটি করে কবিতা লিখেছি। কবিতাগুলি ভাল কি মন্দ, সে কথা আমার বিচার্য্য নয়।

সন্ধ্যার সময় আমি বেরিয়ে সূর্য্যের অস্তমিত মহিমা দেখতে দেখতে মনে মনে ঈশ্বরকে নমস্কার করতে লাগলুম। আমার মনে এই ভাব উঠতে লাগল যে, এই সূর্য্য যখন সৃষ্ট হয় নি, তখনও আমি ঈশ্বরের নিত্য বর্ত্তমান জ্ঞানে বিদ্যমান ছিলুম, এই সূর্য্যও বিদ্যমান ছিল এবং আজ যে আমি রাঁচিতে এসে সূর্য্যের মহিমা দর্শন করব আর ঈশ্বরের মহিমাতে ডুবে যাব, এ সকলও তাঁরই জ্ঞানে স্থির ছিল। তাঁর নিত্য বর্ত্তমান জ্ঞানে যখন ছোট বড় সমস্ত ঘটনারই অস্তিত্ব বিদ্যমান, তখন আমাদের সংসারের ছোটখাটো ঘটনায় ভয় পাওয়া কিছুতেই উচিত নয়—ভয় পাওয়াটাই অভক্তির লক্ষণ। এই সব ভাবছি, এমন সময় মেজ-জ্যেঠা-মহাশয় ও নতুন-কাকা-মহাশয় বেরিয়ে এলেন। বাহিরের একটা চাঁদনীতে সকলে বসে এক পেয়ালা করে চা ও একটি করে Cream Cracker বিস্কুট খাওয়া গেল। তারপর মেজজ্যেঠা-মহাশয় সান্ধ্যভ্রমণে বেরোলেন; বড় শীত বলে নতুন-কাকামহাশয় ঘরে ঢুকলেন, আর আমি তারাগুলি উঠে-পড়া পর্য্যন্ত একটা গরম আলখাল্লা পরে বাহিরেই রইলুম; ঠাণ্ডা পড়লে ঘরে ঢুকলুম।

আমি ও নতুনকাকামহাশয় 'হল' ঘরে বসে গল্পস্বল্প করছি, খানিক পরে মেজজ্যেঠামহাশয়ও এসে উপস্থিত হলেন। মেজজ্যেঠামহাশয় হলেন, ডাকসাইটে স্ত্রী-স্বাধীনতা-প্রবর্ত্তক। এই সুদূর অঞ্চলেও যে তিনি কি রকম করে আস্তে আস্তে বক্তৃতা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, এখানকার পাড়াপড়শী বাঙ্গালী বন্ধুদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তন করেছেন, সেই বিষয়ে অনেক গল্প বলতে লাগলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থে কেহ যেন এটা মনে না করেন যে, এখানকার বাঙ্গালী মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম্ম ছেড়ে, কেবলই এবাড়ী সে বাড়ী করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর সভাসমিতি করছেন। আগে এখানকার বাঙ্গালী বন্ধুবান্ধবদের মেয়েরা পরস্পরের স্বামীদের সামনে বেরোতে চাইতেন না। এখন সেই ভাবটা চলে গেছে। তা ছাড়া এখন পাড়াপড়শীদের মেয়েরা নতুনকাকামহাশয়ের কাছে ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি শিখতে আসেন, কেহ কেহ বা সেতার বাজাতেও শিখেছেন।

গল্প করতে করতে রাত ৯টা হয়ে গেল। খাবার এল—মেজজ্যেঠামহাশয় ও আমি খেতে বসলুম। নতুন-কাকামহাশয় একবেলা খান। তিনি বলেন যে, এতে তাঁর শরীর ভালই আছে। রাত্তিরে লুচিতরকারী হয়, আর তার সঙ্গে একটু মাংস ও মিষ্টান্ন থাকে। আমি বাড়ীতে যা খাই, এখানে প্রায় তার অর্দ্ধেক খেয়েও বেশ ভালই আছি। প্রথম দিন থেকেই আমি এখানকার জলহাওয়ার গুণ বুঝতে পেরেছি। আমাদের খেতে খেতে

রাত দশটা হয়ে যায়। আমি খেয়ে উঠেই মেজজ্যেঠামহাশয়ের কাছে বিদায় নিয়ে ঘর বন্ধ করে একটু লিখি। মেজজ্যেঠামহাশয় খাবার পর গুড়গুড়ি টানতে টানতে কোন একখানা বই কিংবা খবরের কাগজ পড়তে বসেন। ১১টা বাজলেই তিনি আলোটি নিবিয়ে শুতে চলে যান।

আগেই বলে এসেছি যে, রাঁচিতে যখন কলেজ হবার প্রস্তাব হয়, তখন, সেই ভাবী কলেজেরই কাছাকাছি, জমী নেবার জন্য অনেকেরই টান হয়েছিল। তার পর, সেই কলেজের প্রস্তাব থেমে গেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে, জমী কেন্‌বার হিড়িক্‌টা কেটে গেলে, নতুন কাকামহাশয়, মেজজ্যেঠাইমা প্রভৃতি কয়েকজন মিলে রাঁচি দেখতে গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে, যখন তাঁরা মোরাবাদির দিকে এসে ছিলেন, তখন, এই পাহাড়ে যায়গাটাই তাঁদের সকলেরই ভাল লেগেছিল। তাঁরা এইখানেই একটা বাড়ী তৈরি করা স্থির করলেন। বিশেষতঃ, মেজজ্যেঠাইমার মোরাবাদির পাহাড়টি দেখে বড়ই ভাল লেগেছিল এবং তাঁরই ভারি ইচ্ছা হোল যে, তাঁদের মধ্যে কেহ, পাহাড়ের উপর একটি বাড়ী ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নতুনকাকামহাশয়, ভিতরে যা চাচ্ছিলেন, তার অবসর পেলেন। তখন তিনি, কাছাকাছি একটি কুটীর তৈরি করে, তাতেই অনেক দিন বাস করে, সেই পাহাড়ের উপর বাড়ী তৈরি করালেন। এখানকারই মিস্ত্রী দ্বারা বাড়িটি তৈরি করান হয়েছে। কিন্তু মন্দিরটি, কাশী থেকে পাথর ও পাথরকাটা মিস্ত্রী আনিয়ে, তৈরি করানো হয়েছে। বাড়ী কর্‌বার সময়, যখন পাথরকাটা হচ্ছিল, মাটিকাটা হচ্ছিল, তখন একবার এক যায়গায় অজগর সাপের এক রাশ মোটা মোটা বাচ্ছা পাওয়া গিয়াছিল। নতুনকাকামহাশয়, সেগুলি না মারিয়ে, সীমানার বাহিরে ফেলিয়ে দিলেন।—বাড়ীর ফটকে দেখা যায় যে, বাড়ীর নাম দেওয়া হয়েছে—"শান্তিধাম"। নামটি যে সার্থক হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। ফটকের দুইটি থাকের বাহির দিকে দুইটি পাথর বসানো আছে। তার একটিতে হিন্দীতে, দ্বিতীয়টিতে বাঙ্গলায় লেখা—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবাসগৃহ—রাঁচি

"ভগবানের আরাধনা ও ধ্যানধারণার জন্য শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক এই মন্দির ইং ১৭ এপ্রিল ১৯১০ বাং ৪ বৈশাখ ১৩১৭ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

নতুনকাকামহাশয় অনেক বৎসর ধরে হাঁপানি আর অর্শরোগে ভুগছিলেন। এই দুইটি রোগকে তাড়াবার জন্য তিনি বিধিমতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হন নি। মাঝে একবার অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ—এই তিন মাস ভোর ৪টার সময় উঠে গঙ্গাস্নান আরম্ভ করেছিলেন! গাড়ী করে লোহার ঘাটে স্নান করে, ইডন গার্ডনে গিয়ে, ৬টা পর্য্যন্ত খুব একটা চক্কর দিয়ে, বাড়ী ফিরতেন। এতে তাঁর বেশ একটু উপকারও হয়েছিল। কিন্তু সে উপকার স্থায়ী হয় নি। রাঁচির জলহাওয়াতে তাঁর বেশ উপকার হয়েছে। তাই তিনি এইখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়েছেন। তিনি আর কলকাতায় নাম্‌তে চান না।

৬ই জানুয়ারি—মঙ্গলবার।—ঘড়িতে ৪টা বাজল, আর অভ্যাসবশে আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন আর বদ্ধাসন হয়ে ব'সে, বেশীক্ষণ ভগবানের নাম করতে পারি না। এখন খানিকক্ষণ বসে থাকলেই ঘুম এসে চোখ আর মাথাকে একটা কুয়াসাতে ঢেকে ফেলে। লোকে ভাবে যে, ভগবানকে ডাক্‌বে, তাঁকে প্রাণের কথা বল্‌বে, এতে আবার কষ্ট কিসের? তা নয়। আমার

সামান্য অভিজ্ঞতাতে এই দেখ্‌তে পাই যে, বিরাট্ পুরুষকে ডাকবার মত ডাকা যত সহজ—তেমনি খুবই শক্ত। নিজের আত্মাকে ব্রহ্মচক্রের আত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে গেলে, রীতিমত পরিশ্রম চাই। তাই বেশ সহজভাবে ভগবানকে ডাকলে দেখেছি যে, আমার ক্লান্তি আসে না। কিন্তু বেশীক্ষণ বদ্ধাসন হয়ে তাঁকে ডাক্‌বার মত ডাক্‌তে গেলে বড়ই শ্রান্ত হ'য়ে পড়ি।

ঘণ্টা দুই ভগবানকে ডেকে, ৬টার সময় মুখ ধুয়ে নিলুম। মেজ-জ্যেঠামহাশয়েরা কেহই তখনও ঘর থেকে বেরোন নি। কাজেই আমিও ঘরে বসে "প্রাণের কথা" লিখ্‌তে থাক্‌লুম। স্থানটি এমন নিস্তব্ধ যে, সমস্ত ক্ষণ, স্নানাহার সব ভুলে, কেবলই একমনে ভগবানের সঙ্গে প্রাণের কথা কই, আর তাঁর সাড়া পেলেই জগতে প্রকাশ করতে চাই। এই সমস্ত কথা সামান্য কথা নয়—এই সমস্ত কথার ঢেউ সমস্ত অতীতকাল ও সমস্ত ভবিষ্যৎকাল ব্যাপ্ত করে ফেলে—এ যে অনন্তকালব্যাপী অনন্তপুরুষের সঙ্গে কথা।

ঘণ্টা খানেক "প্রাণের কথা" লিখে, রোদ পোহাবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ীর চারপাশে প্রায় আধ ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছি, এমন সময় একটা ঘণ্টা বাজল। নতুন কাকা-মহাশয় সেই ঘণ্টা বাজান, ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে, সেটা প্রাতঃকালীন উপাসনার ঘণ্টা। আমাদের কলকাতার বাড়ীতেও সকালে সাড়ে সাতটার সময় পারিবারিক উপাসনার ঘণ্টা পড়ে। একটি ব্রাহ্মণসন্তান সেই উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করবার জন্য নিযুক্ত আছেন এবং পাথেয় প্রভৃতি হিসাবে তিনি মাসিক একটি বৃত্তি পান। সেই উপাসনাতে আমাদের পরিবারের যাঁর ইচ্ছা, তিনিই যোগ দিতে পারেন। আমার দেখে ভারি আনন্দ হোল যে, রাঁচিতেও নতুন-কাকামহাশয় পারিবারিক উপাসনার প্রথা বজায় রেখেছেন।

উপাসনা হবে কোথায়? উত্তরে জানলুম যে, পাহাড়ের উপরস্থ মন্দিরের ভিতর। নতুনকাকামহাশয়ের এটি বড় সখের মন্দির। আগেই বলে এসেছি যে, কাশী থেকে পাথর ও পাথরকাটা মিস্ত্রী আনিয়ে, তিনি এই মন্দিরটি তৈরি করিয়েছেন। এটা করাতে তাঁর অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। ছত্রক ষ্টেশনে দূর থেকে এই মন্দিরটি দেখা যায়। মন্দিরটি বেশী লম্বা চওড়া নয়—আন্দাজ আট দশ হাত লম্বা আর আট দশ হাত চওড়া। চারিদিকে আটটি থামের উপর মন্দিরটি দাঁড়িয়ে। তা ছাড়া আর সমস্তই খোলা। বাড়ী থেকে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠবার জন্য ছোট ছোট পাথরের টুকরো পাহাড়ের গায়ে বসিয়ে সিঁড়ি করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, হয়তো পাঁচশত হাজার বৎসর পরে কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ অথবা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই সিঁড়ি দেখে জলস্রোতের দ্বারা পাথরগুলির এরূপ স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ির মত বসে যাওয়া দেখে—কত না আশ্চর্য্য হবেন। উঠতে উঠতে মাঝপথে একটি শ্লেটের ফলকে লেখা আছে দেখা যায় যে, "এক নম্বরের গুহাতে যাবার রাস্তা।" মন্দিরের ভিতর ঢুকলেই মনে হয়, বুঝি এই রকম ভগবানের আলো ও বাতাস-পাওয়া কোন এক যায়গাতেই দাঁড়িয়ে, সেই মুক্তপ্রাণ ঋষি সুদূর অতীতের কোন একটি শুভ্র নির্ম্মল প্রাতঃকালে বিশ্বজগৎকে আপনার বিরাট বুকের ভিতর আহ্বান করে বলে উঠেছিলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই অন্ধকারের পরপারস্থিত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

মন্দিরের ভিতর আসন বিছানো হোল, ধুনুচিতে ধুনো দেওয়া হোল, ধুনোর সুগন্ধ ধোঁয়াতে কেমন একটা পূজার ভাব স্বভাবতঃই মনের মধ্যে উদয় হতে লাগল। আমরা তিনজনে বলতে গেলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত পুরুষের আরাধনাতে প্রবৃত্ত হলুম। প্রথমে নতুনকাকামহাশয় "দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান" গান ধরলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে গানে যোগ দিলুম। তার পর আর একটি গান গাওয়া হোল। মেজজ্যেঠামহাশয় শেষের গানের পদ ধরে উদ্বোধনের মত সংক্ষেপে দুচার কথা বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থোক্ত প্রণালী অনুসারে (দীর্ঘস্তোত্রটি বাদ দিয়ে) উপাসনা শেষ করলেন। সংস্কৃত ভাষাতেই উপাসনা করা হোল, কারণ এখানে কাউকেই বাঙ্গালা ভাষায় কোন কিছু বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না। আমার বাল্য সংস্কারের কারণেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, উপাসনার সময় সংস্কৃত ভাষায় একবার ভগবানকে না ডাকলে মনে

হয়, যেন উপাসনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। সংস্কৃত ভাষায় উপাসনার প্রতি মন্ত্রে সমস্ত অতীত কালের সাধনা নেমে এসে পিছনে ও সামনে দুই দিকে দুই অনন্ত বাহু বিস্তার করে দিয়ে, সেই অনন্ত পুরুষকে যেন জোর করে টেনে আনে।

উপাসনা শেষ হয়ে গেলে, মন্দির থেকে নামবার সময় সেই গুহাতে যাবার রাস্তা ধরে গিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরগুলো পরস্পরের গায়ে লেগে বেশ ঘরের মত একটা যায়গা করে রেখেছে। সেখানে দিব্যি বসবার যায়গা আছে, দুতিনটি বেঞ্চিও রাখা হয়েছে। শুনলুম যে, চূড়ার মন্দিরে বড় বেশী বাতাসের জন্য যে দিন উপাসনার সুবিধা হয় না, সেই দিন এই গুহার ভিতরে উপাসনা হয়। দেওঘরের তপোবন যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সহজে এই গুহার ভাব মনে আনতে পারবেন। গুহার ভিতরে বসলে সংসারের ভয়ভাবনা কিছুই মনে স্থান পায় না।

গুহা থেকে নামতে নামতে দেখি যে, কতকটা স্থলদে গোলাপের মত দেখতে কাঁটাওয়ালা এক রকম গাছে গোছা গোছা ফুল হয়েছে; কিন্তু একই ডালের ফুল দু তিন রংয়ের হয়েছে—কতক অংশ বা ঘোর লাল, কতকটা বা সাদা, আর কতকটা বা গোলাপী—একই ডালে দুতিন রংয়ের ফুল হতে দেখে আমার ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল, আর তাই নতুনকাকামহাশয়কে গাছের নাম জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বল্লেন, গাছের নাম এখানকার লোকেরা বলে—পুটুস। কোন এক সময়ে নাকি এক বাঙ্গালী এই গাছ এখানে আনেন। এখন এই গাছ 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' নিয়মানুসারে সমস্ত জেলাটাই ছেয়ে ফেলেছে। এর এরকম্ বাড় যে, এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি প্রজাদের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এতে দেশে ম্যালেরিয়া আসা সম্ভব এবং সেই কারণে পুটুস গাছের ধ্বংসই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। আমার মতে কিন্তু তা নয়। এর ফুলের একটি সুন্দর গন্ধ আছে। এই যে আমাদের দেশের কত লোক ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে এসেছেন ও আসছেন, তাঁদের মধ্যে কোন উৎসাহী পুরুষ কি চাষ করে, ফুলের উন্নতি করতে পারেন না? ফুলের উন্নতির পর তা থেকে আতর তৈরি করলে, নিশ্চয় সে একটি ব্যবসার সুন্দর জিনিস হতে পারবে।

চা-খাবার সময়ে আমাদের গল্পগুজব বেশ জমে যেত। আজ প্ল্যান্‌চেটের কথা উঠিল। নতুনকাকামহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি এসকল বিশ্বাস করি কি না? আমি বল্লুম যে, বিশ্বাস না করবার কোনই কারণ দেখি না। ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্য, তাঁর অনন্ত লীলা—হতেও পারে যে, তাঁরই আদেশে দেহমুক্ত আত্মা প্ল্যানচেটের উপায়ে আমাদের সঙ্গে কথা কয়। নতুনকাকামহাশয় বল্লেন যে, তিনি যদিও এসকলে বড় একটা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তিনটি ঘটনাতে তিনি বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ঘটনা, গতমাসের ভারতীতে বসন্তবাবু লিপিবদ্ধ করেছেন—সেটি কৈলাস মুখুয্যের কথা। কৈলাস মুখুয্যে মহর্ষিদেবের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, জীবিত অবস্থায় তিনি পেটের জ্বালা নিবারণে একটু বেশী রকম ব্যস্ত থাকতেন। নতুনকাকামহাশয় প্ল্যান্‌চেটে কৈলাস মুখুয্যের আত্মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "পরলোক কি রকম?" তার উত্তরে কৈলাস বাবুর আত্মা খুব ঝোঁক দিয়ে বল্লেন যে—"এখানে পেটের জ্বালা নেই।"

আর দুইটি ঘটনাও এইখানে বলে ফেলি। একবার ঠাকুরদাদার (মহর্ষিদেবের) জ্যাঠতুত বড় ভাই মথুরানাথ ঠাকুরের আত্মাকে ডাকা হয়েছিল। ঠাকুরদাদা এবারে তাঁর নিজের সামনেই প্ল্যান্‌চেট ধরতে বলেছিলেন। তাঁরই সামনে প্ল্যান্‌চেট ধরা হোল। মথুরানাথ ঠাকুরের আত্মা প্ল্যান্‌চেটে এসে আমাদের বাড়ীর সংক্রান্ত একটি সরকারী অপহৃত দলিলের কথার উল্লেখ করিলেন। এই ঘটনায় মহর্ষি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। একমাত্র মহর্ষি ছাড়া প্ল্যান্‌চেটধারীদের মধ্যে আর কেহই সেই দলিলের কথাই জানতেন না।

তৃতীয় ঘটনাটি এই। একবার কাশীশ্বর মিত্রের আত্মাকে ডাকা হোল। কাশীশ্বর বাবুর সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি একজন খুব উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে দু এক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্ল্যান্‌চেট ধরেছিলেন গুণু কাকামহাশয় আর সেজ পিসেমহাশয়। সেজ পিসেমহাশয় কাশীশ্বর বাবুকে 'মামা' বলে ডাক্‌তেন। নতুনকাকামহাশয় এবার ঠিক করলেন যে, তিনি একটি প্রশ্ন একটি কাগজে লিখে আলাদা যায়গায় রেখে দেবেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কি,

এই প্রশ্নটি তিনি একটি কাগজে লিখে আলাদা করে রাখলেন। কাশীশ্বর বাবুর আত্মা প্ল্যান্‌চেটের উপর চেপে লিখিতে আরম্ভ কর্‌লেন। আ—ছি—এই দুটি অক্ষর লেখা হয়েছে, এমন সময়ে সেজ পিসেমহাশয় ঠাট্টা করে বল্লেন যে, "মামা আবার ভারি উত্তর দেবে।" তিনি যেমন ঠাট্টা করে এই কথা বল্লেন, অমনি প্ল্যান্‌চেটের পেনসিল একেবারে ঘুরে ঘুরে কাগজখানি ছিঁড়ে খুঁড়ে তবে নিশ্চিন্ত হোল। তখন নতুনকাকামহাশয় সেজ পিসেমহাশয়কে বল্লেন—"কর্‌লে কি? এই দেখ আমার প্রশ্ন।"

বেলা ১১টার সময় আমি স্নান করে এ ঘর সে ঘর করে, দু'একটা খবরের কাগজ দেখে বেড়াতে লাগলুম, ও দিকে মেজজ্যেঠামহাশয় ১২টার সময় স্নান করে, ঘর থেকে বেরোলেন। তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজন হোল।

যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অনেকেই লেখাপড়া, ঈশ্বরের ধ্যান প্রভৃতি নিয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে ভালবাসেন। তার জ্বলন্ত প্রমাণ মহর্ষির বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা, আর এই সুদূর রাঁচিতে নতুনকাকামহাশয়ের শান্তিধাম প্রতিষ্ঠা। এখানে এঁদের বেশী সময়ের সঙ্গী ভাল ভাল বই।

আমি দু'একখানি বই দেখছি, এমন সময়ে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। চাকরদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে, নতুনকাকামহাশয় বেড়িয়ে ফিরে এসে স্নান করে বেরিয়েছেন, আর এই ঘণ্টা বাজিয়ে খাবার দিতে বলছেন। আমিও গিয়ে খাবার কাছে বসলুম। আমরাও যা খেয়েছিলুম, তিনিও তাই খেলেন—উপরন্তু দুখানি পরোটা খেলেন। তখন প্রায় দেড়টা বেজেছে। অত বেলায় খাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয় বলাতে তিনি বল্লেন যে, তিনি এই এক বেলা মাত্র খান, রাত্রে আর কিছু খান না, সেইজন্য একটু বেলা করে খান এবং তাতে তাঁর শরীর ভালই আছে। তাঁর মতে বৃদ্ধাবস্থায় এগোতে থাকলে, আহারও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়ে আনা দরকার। নতুনকাকামহাশয় খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে পড়তে গেলেন, আমিও আমার ঘরে পড়তে বসলুম।

আজ বেশ একটু শীত পড়েছে। একটুখানি মেঘলা হয়েছিল, অমনি কোত্থেকে বাতাস বইতে আরম্ভ করে, শীতটাকে জমাট বাঁধিয়ে দিলো। বেলা ৪টার কাছাকাছি শীতের আলিস্যি কাটাবার জন্য গরম আলখাল্লা পরে বেড়াতে বেরোলুম। কাছেই যে আর দু'একটা পাহাড় আছে, সেই দিকেই গেলুম। এদিকে চারটে পাহাড় পরে পরে দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে এক যোড়ার নাম বরিয়াতু, আর কাছের যোড়ার নাম ভারং। আমি ভারং যোড়ারই একটাতে গিয়ে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় অর্দ্ধেকটা উঠলুম। তারপর পাথরগুলো এত বড় বড় আর খাড়া যে, তাতে জুতো পরে আর চড়া চোল্ল না। আর সেই কাঁটাওয়ালা পুটুস গাছ এমন ছেয়ে ফেলেছে যে, সেগুলি ভেদ করে যেতে গেলে গা-হাত পা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হবার সম্ভাবনা। সেই পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ব্বাক হৃদয়ে ভগবানের মহিমা দেখতে লাগলুম—তেতালা-চৌতালা সমান এক একটি পাথর অতীতের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবার জন্য একই ভাবে কতশত বর্ষ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলের সকল পাহাড়েরই পাথরগুলি যে ভাবে ফাঁক হয়ে আছে, যে ভাবে তাদের ফাট হয়েছে দেখা যায়, তাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, এককালে এখানে একটা ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছিল।

ভগবানের আশ্চর্য্য কাজ যে, এই সকল পাথরের ভিতর ঘাসের শিকড়ে গাছের শিকড়ে যে জল আটকে থাকে, তাই "ঝোরে"র আকারে নেমে সম্বৎসর ধরে গ্রামবাসীদিগকে জলদান করে। আমরা একবার সিমুলতলায় "হলদিঝোর" দেখতে গিয়েছিলুম; সেটা আর কিছুই নয়—একটা ছোট পাহাড় থেকে একটু মোটা ধারে একটা ঝরণা থেকে জল পড়ছে। সেই পাহাড়টা গাছে গাছে ভরা। আমরা তার উপরে উঠলুম—মাথাটা একটা সমতলভূমি, অথচ সেই মাথা থেকে এত জল যে কি করে বেরোচ্ছে, ভাবলে সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে মস্তক আপনিই অবনত হয়ে পড়ে। সারা বছর ধরে যে জলধারা পড়বে, সেই সমস্ত জল গাছপালা ও ঘাসের শিকড়ে জমা করা থাকে। একেবারে সমস্ত জলটা যে পড়ে বেরিয়ে যাবে, তাও নয়—ঐ একটু একটু করে সমস্ত গ্রামপল্লীকে শস্যশ্যামলা করবার, আর গ্রামবাসীদিগকে সারা বছর জলদান করবার জন্য যে টুকু দরকার, সেই টুকুই আস্তে আস্তে বেরোতে থাকবে।

তারং পাহাড়ের একটা থেকে আর একটাতে গেলুম। এটাতেও যেমন বড় বড় পাথর, তেমনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহা! সামনেই দেখলুম, একটি প্রকাণ্ড গুহার মত। নতুনকাকামহাশয়দের কাছে শুনেছিলুম যে, এই পাহাড় গুলোতে নেকড়ে বাঘ আছে—থাকাই সম্ভব। আমার কিন্তু গুহা দেখবার একটা বাতিক আছে। গুহা দেখলেই অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্য সংসারের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সেই অতীত কালের গুহাবাসী ঋষিমুনিদের সঙ্গে একমন হয়ে পড়ি। পাথর থেকে পাথরে উঠে, মধ্যে মধ্যে জিমন্যাষ্টিক করে সেই গুহাতে উঠলুম। দেখি, সংসারত্যাগী সাধু পুরুষের উপযুক্ত বেশ একটি গুহা। ইচ্ছা হচ্ছিল যে, মানুষের অদৃশ্য হয়ে সেই গুহাতে বসে সারা জীবনটা ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে থাকি।

গুহা দেখে আবার জিমন্যাষ্টিকের সাহায্যে একটু নেমে এসে একটা পাথরের উপর বসলুম। কি নিৰ্জ্জন—নির্জ্জনতা যেন জমাট বেঁধে মনের উপর দাঁড়াতে চায়! সময়ে সময়ে নির্জ্জনতার চাপে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। আকাশটা যেন কাছে নেমে এসেছে বোধ হয়। আকাশের উপর দিয়ে মেঘের টুকরা যতই ভেসে যায়, দু'চারটি পাখী যখন নিঃশব্দে উড়ে যায়, আর তার সঙ্গে টুনটুনি জাতীয় দু'একটি পাখী যখন গায়ের কাছে একটা গাছের ডালে অদৃশ্যভাবে বসে শীষ দিতে থাকে, তখন ভগবানের ব্রহ্মচক্রের নির্জ্জনতার মধ্যে ততই আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়।

সন্ধ্যা হব-হব সময়ে নেমে এলুম। দূরে একটি মুণ্ডা-জাতীয় রাখালবালক বাঁশী বাজিয়ে নিজে মহা আনন্দ অনুভব করছে। কিন্তু সে বুঝতে পারে নি যে, আমিও তারই সঙ্গে সঙ্গে সেই একই বাঁশী বাজিয়ে আনন্দ পাচ্ছিলুম। ধেনুগুলি আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলেছে, মধ্যে মধ্যে এক একবার হাম্বারব করছে—কি গভীর শান্তির চিত্র! হে চিত্রকারগণ, আমাকে তোমরা তৈলপটে আঁকা ছবি দেখিয়ে আর ভোলাতে চেষ্টা কোরো না। যে ছবি আমি মনের মাঝে এঁকে নিয়ে এসেছি, তোমাদের চিত্র তার অতি ক্ষীনতম আভাস মাত্র প্রকাশ করতে পারে। আমি দূর থেকে দেখছিলুম যে, সেই রাখাল বালকের বাঁশীর সুর অনুকরণ করে, আরও কতকগুলি রাখাল বালক-বালিকা তালে তালে ছন্দে ছন্দে গান করছে আর নাচছে। পাহাড়ে যায়গাতে ছোট ঝরণা যেমন কুলকুল সুরে স্বাধীন ভাবে হাসতে থাকে, নেচে খেলে চলতে থাকে, প্রকৃতির স্বাধীনতাস্তন্যে পরিপুষ্ট এই সব মুণ্ডা বালকবালিকারাও তেমনি স্বাধীন ভাবে কুলকুল সুরে হাসছিল, আর তেমনি হাতে তালি দিতে দিতে তালে তালে নাচছিল—খেলছিল। তারা আমাকে দেখতে পায়নি, আমি কিন্তু তাদেরই লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছিলুম; তারা জানে না, আমিও যে তাদেরই একজন। আমি বেশ অনুভব করতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীদের প্রেমে কেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমি সেই ছেলেমেয়েদের কাছে আসতেই তারা বাঁশী-নাচগান সকলই থামিয়ে দিলে। আমি বল্লুম—"থামলি কেন?" তারা তো হেসেই কুটি কুটি। শেষে অনেক

বলাতে সেই সর্দ্দার ছেলেটি বাঁশী বাজিয়ে আমার প্রাণ কাড়তে লাগল। তাদেরও বাড়ী মোরাবাদি—আমিও তাদের পিছনে বাঁশী শুনতে শুনতে আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তাদের অজ্ঞাতে তাদের উপর বর্ষণ করতে করতে বাড়ী ফিরলুম।

আজ সর্দ্দার চাপরাশীকে কাল সকালে একটা ঠিকা গাড়ী নিয়ে আসতে বলে দেওয়া গেল। মোরাবাদি যায়গাটা ষ্টেশন থেকে এত দূর যে, একদিন আগে থাকতে না বল্লে, যথাসময়ে গাড়ী পাবার সুবিধে হয় না।

৭ই জানুয়ারি—বুধবার। নিয়মিত সময়ে অর্থাৎ ভোর ৪টার সময়ে উঠলুম। প্রভাতের শুকতারা কি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল! শুকতারা উঠে ক্রমে মাথার উপরে অদৃশ্য হতে লাগল, আর ওদিকে প্রাতঃ সূর্য্যের অরুণ জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল। আমার ঘর পূর্ব্বদিকে থাকাতে আমি প্রাতঃ সূর্য্যের উদীয়মান মহিমা নিত্যই অনুভব করতুম। প্রতিদিন ঋষিদের মন্ত্রে সত্যতত্ত্ব আমার সমক্ষে প্রকাশ করবার জন্য প্রার্থনা করতুম—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণ সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

উপাসনার পর চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল, আর ঠিকা গাড়ীও এসে পৌছোল—আমিও চড়ে বসলুম। আমাদের যে জমী "গাড়ি"তে আছে, সেই জমী সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করার জন্য এখানকার একটি গণ্যমান্য উকীলের সঙ্গে দেখা করতে চল্লুম। ইনিই আমাদের জমী কেনার বিষয়ে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শুনি যে, তিনি কাছেই একটা নতুন বাড়ী তৈরি করছেন, সেইখানে গেছেন। সেই দিকেই চল্লুম। পথের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হোল—তিনি বাড়ী ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্থির হোল যে, কাল সকালে তিনি তাঁর মিস্ত্রীকে আমার সঙ্গে দেবেন, সেই মিস্ত্রীই সমস্ত জানে, আর সেই আমাদের জমী দেখিয়ে দেবে। লোকটি খুব অমায়িক ও পরোপকারী। তাঁকে যদি একবার বলা যায় যে---"মহাশয় আমার এইটি করে দেবেন", তাহলে তিনি সে বিষয়ে খুবই যত্ন দেখান। শুনলুম যে, তিনি খুব নিঃস্ব অবস্থা থেকে এখন রাঁচির একজন বড় লোকে দাঁড়িয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইলেই বোঝা যায় যে, তাঁর এরকম উচ্চস্থান অধিকার করা খুবই স্বাভাবিক। একজন উকীলের কৃতকার্য্য হতে গেলে যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, সেই সমস্ত গুণ তাঁতে প্রচুর পরিমাণে আছে। আজকের মত আমি ঘরে ফিরে গেলুম।

বাড়ী ফেরবার পথে দেখি যে, যত দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মুণ্ডা বুড়োবুড়ী, যুবকযুবতী—বালকবালিকা দলে দলে কাজের যায়গায় চলেছে। কি সুন্দর—ইচ্ছা হচ্ছিল, তাদের প্রত্যেককে আমার এই প্রেমপূর্ণ বলিষ্ঠ বুকের দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়ে বলি যে, 'তোরা আমাকে কলকাতার গোলমাল থেকে ছিনিয়ে এনে, তোদেরই কুঁড়েঘরে এক কোণে একটুখানি যায়গা দে—আমি তোদেরই একজন হয়ে যাই।' এই সব পথিকের মধ্যে দু'একটি বালক মাথায় ছটো পিতলের পাত কি সুন্দর ভাবেই পরেছিল, আর চুলগুলি কি সুন্দর ভাবেই বেঁধে রেখেছিল; আর কাণে বড় বড় পিতলের মাকড়ী পরাতে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! শুনলুম যে, বিয়ের আগে পর্য্যন্ত ছেলেরা এইরকম গয়না পরে সুন্দর থাকে। মুণ্ডা মেয়েরা যে এই সব সুন্দর ছেলেদের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যায়, সেটা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই সব সুন্দর ছেলেদিগকে আমারই বুকের ভিতর পূরে রাখবার জন্য আমারই হৃদয়ে কেমন একটা আকুলিবিকুলি পড়ে গিয়েছিল!

৮ই জানুয়ারি—বৃহস্পতিবার।—আজ খুব পশ্চিমে হাওয়া চলছে। সকালে ঘরে বসে আছি, কোথা থেকে সাঁওতালী বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমার জানিবার কৌতূহল হোল যে, এত সকালে কে বাঁশী বাজায়! বাহিরে বেরিয়ে এসে আওয়াজ ধরে ধরে চলতে চলতে পাহাড়ের উপর সেই গুহার কাছে গিয়ে পড়লুম;—দেখি যে, সেই গুহার ভিতর থেকে বাঁশীর আওয়াজ আসছে, অথচ সেখানে কোন লোক দেখতে পেলুম না। বুঝতে পারলুম যে, এই গুহার ভিতর দিয়ে হাওয়া চলে এই রকম বাঁশী বাজাচ্ছে। স্বভাব কবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের সেই শ্লোকটি মনে পড়তে লাগল—

"যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্ দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্॥"

কাল রাত্রেই সর্দ্দার চাপরাশীকে আজ সকালে গাড়ী আনবার কথা বলে রেখেছিলুম। বেলা ৯টার সময় গাড়ী এসে হাজির। আগেই খবর পেয়েছিলুম যে, সেই উকীল

বাবু যেখানে তাঁর বাড়ী তৈরি করছেন, সেইখানেই থাকবেন। আমি সেইখানেই চললুম। তিনি একটি ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ী তৈরি তদারক করছেন। আমাকে চারিদিক ঘুরিয়ে দেখালেন—প্রকাণ্ড একটা পুকুর কাটিয়েছেন, ঘাট বাঁধিয়েছেন, আর মার্ব্বলপাথরের চবুতরা বসিয়েছেন। তাঁকে আমাদের জমীর বিষয় জিজ্ঞাসা করলুম—দেখলুম যে তিনি অনেকদিন "গাড়ি"র অঞ্চলে না যাওয়াতে আমাদের জমীর বিষয় ঠিক ঠিক সব মনে করিতে পারলেন না। আর তাঁকেই বা দোষ দিই কি করে? তাঁর নিজের ওকালতী পশার খুব, তার উপর নিজের সংসারের কাজকম্মের যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট, আবার তারও উপর অনেক বড় লোকের ফাইফরমাইস তাঁকে বিস্তর সহ্য করতে হয়। আমার সঙ্গে তাঁর মিস্ত্রীকে দিলেন। মিস্ত্রী যায়গাটা দেখিয়ে দিলে। জমী দেখে বাড়ী ফেরা গেল। আবার ২টার সময় গাড়ী আনতে বলে দিলুম—আজ বড় হাটবার। বৃহস্পতিবার আর শনিবার রাঁচি সহরে হাট হয়, তার মধ্যে বৃহস্পতিবারেই বড় হাট বসে।

যথাসময়ে গাড়ী এল। আমিও হাটে চল্লুম। আমি ভেবেছিলুন—মস্তহাট দেখব। রাঁচি হোল ছোটলাটের গরমিকালের রাজধানী; তাই ভেবেছিলুম যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সমস্ত স্বদেশী জিনিস এই হাটে একসঙ্গে দেখতে পাব। কিন্তু হাটে গিয়ে খুবই হতাশ হতে হোল। হাটে জর্ম্মাণ ঠগদের তৈরি ছেলে ভুলোনো জিনিসই বেশী। স্বদেশী জিনিসের মধ্যে বেশী ভাগ হচ্ছে মোটা কাপড়—অবশ্য সেই কাপড়ের সুতো সমস্তই বিলিতি। তাই গোটা কয়েক কিনলুম। সেই মোটা কাপড় গামছার বদলে বেশ চলতে পারে, তার খুব ভাল ঝাড়ন হতে পারে। ছোটনাগপুর অঞ্চল যে রকম গরীব, তাতে এই কাপড় কিনে যদি বাঙ্গালা দেশে লোকে ব্যবহার করে, তাহাকে অনেক গরীবের সত্যিসত্যি খুব উপকার করা হয়। এই কাপড়গুলোর দামও খুব বেশী নয়। দু-হাত লম্বা দু-হাত চওড়া ঝাড়ন বা গামছার উপযুক্ত কাপড়ের দাম দু আনা মাত্র। একবার কিনলে, বোধ হয়, দু-তিন বছর বেশ চলে যেতে পারে। কাপড় ছাড়া মুণ্ডাদের বোনা গলার কণ্ঠী কয়েকটা কিনলুম। শুনলুম যে, এই কণ্ঠীর পুঁতিগুলি কড়ি থেকে তৈরি। তাড়াতাড়িতে হাটে পরীক্ষা করে দেখিনি, কিন্তু ঘরে এসে দেখি যে, সেগুলি সব জর্ম্মণ বা বিলিতি পুঁতিতে বোনা। খাবার জিনিসের মধ্যে পেঁয়াজ, আলু, কুমড়ো, মুরগীর ডিম, এই সমস্তই বেশী ছিল। বিলিতি বেগুন (Tomato) শুনলুম তিন পয়সাতে এক কুড়ি। আমি শুনেছিলুম যে, অসভ্যেরা এক কুড়িও ঠিক করে গুণতে পারে না। আমি সেই বিষয় পরীক্ষা করবার জন্য তিন পয়সার বিলিতি বেগুন কিনতে চাইলুম। এক কুড়ির যায়গায় প্রায় আটাশটা না বত্রিশটা পেলুম।

হাটে কেনবার মত জিনিস বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু তবু সেই হাটের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভারি ভাল লাগছিল। ঐ যে মুণ্ডাদের সরল প্রাণের হাওয়া গায়ে লাগছিল, সেই জন্য, সেই মানুষের জন্য—আমার ভারি ভাল লাগছিল। আমার গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল—'এস, প্রাণের সই এস, প্রাণের বোন এস, আমি তোমাদের বড় ভালবাসি; এস তোমরা, একবার আমার এই বিশাল বিরাট বুকের উপর আছড়িয়ে পড়।'

রাঁচিতে এসে অবধি একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছিল—সেটা মেয়েদের কাণের গয়না। বাঙ্গালী মেয়েরা কাণের যেখানে সচরাচর এয়ারিং বা মাকড়ি পরে, সেইখানে মুণ্ডা মেয়েরা দেখি, দুই তিন আঙ্গুল মোটা কি একটা গুঁজে রাখে। সেই গুঁজিগুলি লাল, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙ্গের। আমি দূর থেকে প্রথমে ভেবেছিলুম যে, গুঁজিগুলো হাতীর দাঁত বা হাড়ের তৈরি ও রং করা। সদ্দার চাপরাসীকে জিজ্ঞেস করে করে জানলুম যে, সেগুলি তালপাতায় তৈরি ও রং করা। চাপরাসী আমার জিজ্ঞাস্যটা তো প্রথমে বুঝতে পারে না—বেচারী কেমন করে জানবে যে মেয়েরা কাণে তালপাতায় কি একটা রং করে পরে, তারও জন্য আমার এতটা কৌতূহল হবে? আমি তাকে একটা গুঁজি আমাকে যোগাড় করে দিতে বলায় সে দু'একদিনের সময় চাইলে। আসলে সে আমার প্রার্থনাটা এত তুচ্ছ ভাবছিল যে, আমার আগ্রহ তার কাছে কোন রকমে ঠাঁই পেলে না—সে ভাবলে যে দু'একদিনের সময় চেয়ে আপাতত তো নিষ্কৃতি পাক, তারপর বাবু সাহেবও ভুলে যাবেন,—আর তিনি ত দুই এক দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে

যাচ্ছেন। আমি তাকে দু'একদিনের সময় দিলুম বটে, কিন্তু আমার মনে একটি গুঁজি সংগ্রহ করবার আকাঙ্ক্ষা বেশই জাগ্রত রহিল।

হাটের কাছেই রাঁচি পাহাড়। হাট থেকে সওদা করবার পর সেই পাহাড় দেখতে গেলুম। উপরে একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মেজের উপরে সিন্দুর পড়ে আছে। চাপরাসী বল্লে যে, এখানে মুণ্ডারা পূজো দেয়। এই মন্দিরে উঠে চারধারের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখায়, তাই অনেকে এইখান থেকে ফোটোগ্রাফ তোলেন, দেখেছি। এই সব পাহাড়ে যায়গায় আসতে কাঁকর প্রভৃতি পায়ে বড় লাগে। একটি মজা দেখলুম যে, অনেক বাঙ্গালী স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে বেড়াতে এসেছেন, কিন্তু পুরুষদের পা হাজার শক্ত হলেও তা একেবারে মোজা জুতোয় ঢাকা,—আর মেয়েদের পা, ছোট মেয়েরই হোক বা বুড়ীরই হোক, হাজার নরম হলেও তাতে মোজার মো নেই, জুতোর জু নেই—যেন মেয়েদের পা বজ্রের চেয়ে শক্ত, তাঁদের পায়ে যেন কাঁকরপাথর একটুও বাজে না।

রাঁচি পাহাড়ের সামনেই রাঁচি হ্রদ। এটা একটা "বাঁধ" অর্থাৎ বর্ষায় জল ধরে রাখবার যায়গা মাত্র। তার গভীরতা খুব কমে গেছে, তাই তার মধ্যে মধ্যে দু'এক যায়গায় খুব লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে। দূর থেকে এটি অতি সুন্দর দেখতে, তাই অধিকাংশ ফোটোকরেরা এই হ্রদের ছবি তুলে নেন। হ্রদের কাছে নেমে দেখলে তেমন বিশেষ ভাল দেখায় না। এই হ্রদের ধারে দু'একটি পুরাণো মন্দির আছে—খুব বেশী পুরোণো নয়। এই সমস্ত দেখে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। যেমন খাবার এল, খেয়েই একেবারে শুতে গেলুম। খাবার সময় মন্দিরের কথা বলাতে মেজজ্যেঠামহাশয় বল্লেন যে, বুড়ুয়া গাঁয়ে একটা আড়াইশ তিনশ বছরের পুরাণো মন্দির আছে। আমি বল্লুম—কাল সকালেই দেখতে যাব।

হার-জিত

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

ইদের দিনে গরু জবাই
হিন্দু বল্‌ছে—'খবরদার'!
মুসলমান বল্‌ছে—'হিন্দু,
কোরবাণী এ—হুঁসিয়ার!'
এমন সময় মোল্লা একটি
তস্‌বী হাতে এলেন তথা,
বল্‌লেন—'যারা মুসলমান,
শুনবে তারা আমার কথা।
কোরাণ যাদের অস্থি-মজ্জা,
ইমান্ যাদের ধর্ম্মের জান্,
ইস্‌লামের ভাব বুঝ্‌বে তারা,
বুঝ্‌বে ভা'য়ের দরদ—টান।
হোক্ হিন্দুদের আচার যুদা,
দু'দলের এক জন্ম মাটি;
একটি ক্ষেতের ফসল কেটে
সমাজ বাঁধ্‌ল দুইটি আঁটি।'
কোরবাণীর দল সর্‌ছে দেখে
উঠ্‌ল হিন্দুর জয়গান!—
অন্তরীক্ষে একজন লিখ্‌লেন—
"লড়াই জিত্‌ল মুসলমান!"

শক্তিময়ী

[শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন]

শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন

প্রবল বুদ্ধবিদ্বেষী অজাতশত্রু মগধের রাজা। অতি ভীষণকান্তি নবীন রাজা অজাতশত্রু সভাসীন! তাঁহার তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি দেখিয়া সভাসদ্‌গণ প্রমাদ গণিলেন।

রাজা বলিলেন, "কোশলের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য, যুদ্ধের সকল উদ্যোগই হইয়াছে কিন্তু শুনিতেছি, কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিতেছেন।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী ইন্দ্রদেব গাত্রোত্থান করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"মহারাজ এ যুদ্ধ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; সুতরাং নিবৃত্ত হওয়াই মঙ্গল।"

তীব্র রোষ দমন করিয়া রাজা বলিলেন, "কেন? মগধের রাজা কি এতই অধম যে, আদেশ পাইবামাত্র কোশল-কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য ছুটিয়া যাইবে? আমি কি এতই কৃপাপাত্র!"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, এ সম্বন্ধে মগধ ও কোশল উভয়েই গৌরবান্বিত হইবেন।"

রাজা বলিলেন, "গৌরবান্বিত! কোশলপতির বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া তিনি কাশীর রাজকর প্রত্যাহার করিয়াছেন।"

মন্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন না। কি যে নিদারুণ ঘৃণায় কোশলরাজ অজাতশত্রুর সহিত সম্পর্ক রহিত করিয়া কাশীর রাজস্ব প্রত্যাহার করিয়াছেন, মন্ত্রী ইন্দ্রদেব তাহা জানিতেন।

রাজা বলিলেন, "আমি আপনাদের রাজা। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি যাহা বলিতেছি, আপনারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন না, ইহার কারণ কি? সত্য কথা বলুন।"

মন্ত্রী ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলা হইল বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ! চিরজীবন সত্য বলিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে যে আমি মিথ্যা বলিতে পারি, এরূপ ধারণা করা আপনার উচিত নহে। প্রজার ধন ও ধর্ম্ম রক্ষাই রাজধর্ম্ম। কিন্তু রাজা হইয়া আপনি রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিতেছেন। সেজন্য বাধ্য হইয়া প্রজাকেও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইতেছে।"

রাজা জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিতেছি? সত্যপথভ্রষ্ট হইলে মানুষ এইরূপ অন্ধই হইয়া থাকে। কিন্তু আমি রাজধর্ম্মই পালন করিতেছি। ধর্ম্ম ভুলিয়া আপনারা যে অধর্ম্ম পথে যাইতেছেন, তাহা হইতে আপনাদের ফিরাইয়া আনিতেছি; তবে জোর করিয়া আনিতেছি সত্য। কিন্তু ইহাও কর্ত্তব্য। গাঢ় অন্ধকার আপনাদের জ্ঞানকে আবৃত করিয়াছে। আপনাদের এই সুপ্ত জ্ঞানকে জাগরিত করিবার জন্যই

আমি অশেষ চেষ্টা করিতেছি; আমি রাজধর্ম্ম পালনই করিতেছি।”

মন্ত্রী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “না মহারাজ! আপনি ভ্রম করিতেছেন। কিন্তু চিরদিন আপনার এ ভ্রম থাকিবে না। এমন দিন আসিবে, যে দিন আপনি ভ্রম বুঝিতে সক্ষম হইবেন। আপনি এখন যতই বৌদ্ধদ্বেষী হউন, একদিন এ ধর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিবেন—স্বীকার করিবেন।”

উত্তেজনায় রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! মন্ত্রী-মহাশয়, বৃদ্ধ ও জ্ঞানী হইয়াও আপনি এরূপ বলিতেছেন? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চিরপূজ্য বৈদিক ধর্ম্ম। কেবল পূর্ব্বপুরুষগণের পূজ্য বলিয়া নহে; যে ধর্ম্ম সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যার দ্বারা মুনিঋষিগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহার এক একটি বাক্য বহু তপস্যায় লব্ধ, এক একটি উপদেশ অমূল্য, সেই গরীয়ান্ হিন্দুধর্ম্ম অ-পথ—অন্যায়? এই উদার সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেন যে আপনারা দুদিনের স্থাপিত সামান্য গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইতেছেন, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি! শাস্ত্রবিদ্ হইয়াও যখন আপনি এই মহান্ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, রীতিনীতিহীন, উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্ম ও সমাজ গ্রহণ করিতেছেন, তখন নিশ্চয় আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। যে সমাজ কোন রীতিতে আবদ্ধ নহে, যে ধর্ম্ম এরূপ মহা আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পতন হইতেও বেশী বিলম্ব হইবে না। ইহা আপনিও জানিবেন।”

মন্ত্রী এ কথার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না।

রাজা রোষরক্তিম নেত্রে মন্ত্রীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, “এ সকল বিষয়ে আলোচনা এখন স্থগিত রাখিয়া যুদ্ধের আয়োজন করুন। দেবদত্ত! এ যুদ্ধে তোমাকে আমি প্রধান সেনাপতি করিলাম।”

দেবদত্ত বলিল, “এ সম্মানে দাস কৃতার্থ হইল। এ যুদ্ধের দায়িত্ব যখন দাসকে অর্পণ করিলেন, তখন যুদ্ধে আপনার জয় ও যশ অনিবার্য্য।

২

পঞ্চপর্ব্বতবেষ্টিত, নির্ঝরমুখরিত, সুন্দর শোভাপূর্ণ রাজগৃহ নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে রাজপ্রাসাদতুল্য এক সুরম্য অট্টালিকা। সম্মুখে পর্ব্বতবক্ষঃচ্যুতা খরস্রোতা একটি নির্ঝরিণী বহিয়া রমণীয় অট্টালিকার শোভা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। ইহা মগধের সর্ব্বপ্রধান ধনী রত্নচাঁদ শ্রেষ্ঠীর ভবন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। পত্নী ও পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া, বৃদ্ধ রত্নচাঁদ সুখে সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

রত্নচাঁদ বলিলেন, “অনুপমাকে দেখিতেছি না কেন?” দাসীকে বলিলেন, “কুমুদিনি, অনুপমাকে ডাকিয়া আন।”

শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুপমা তখন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছাদে বসিয়া আপন চিন্তায় বিভোর ছিল। দাসী আহ্বান করিবামাত্র পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

রত্নচাঁদ বলিলেন, “অনুপমা, তোমাকে এরূপ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কি ভাবিতেছিলে মা? তুমি কি অসুস্থ হইয়াছ।”

অনুপমা বলিল, “না বাবা। আমাকে ডাকিয়াছ কেন?”

রত্নচাঁদ বলিলেন, “অনুপমা, শুন। এখন তোমার বিবেচনা করিবার বয়স হইয়াছে। কল্যাণকুমারকে আর কতদিন অপেক্ষা করিতে বলিব? তক্ষশীলা হইতে সংবাদ পাইয়াছি, তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। তোমাকে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে বলিয়াছিলাম। তুমি কি স্থির করিয়াছ?

অনুপমার প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইল। তাহার সম্মুখে রাজা অজাতশত্রুর যৌবনতেজঃপূর্ণ বীর্য্যমণ্ডিত উন্নত সুন্দর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। ইঁহার নিকট কল্যাণকুমার! অনুপমা নিরুত্তর হইয়া অপর দিকে চাহিল।

অসামান্যা রূপসী অনুপমার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি মগধ ছাড়াইয়াও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যজালে রাজা অজাতশত্রু ক্ষুদ্র মীনের ন্যায় আবদ্ধ। কিন্তু বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

কন্যার ভাবান্তর দেখিয়া চিন্তাকুল বৃদ্ধের মুখ অপ্রসন্ন হইল। অনুপমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “বুঝিয়াছি, সেই পিতৃঘাতকের ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন তোমাকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত করিতেছে। তুমি মনকে সংযত কর। কল্যাণকুমার বিদ্বান্, সুশীল ও

ধার্ম্মিক ; তোমার সৌভাগ্য যে তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন। তোমার মন হইতে পিতৃঘাতকের স্মৃতি মুছিয়া ফেল।"

অনুপমা এবার ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, জনরবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, রাজাকে অপরাধী মনে করিতেছ, কিন্তু একথা মিথ্যা। রাজা অজাতশত্রু এত পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইয়া কখনও পিতৃহত্যা করিতে পারেন না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইলেন। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শুন অনুপমা, নারী অসাধারণ শক্তিময়ী। নারীর অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। নারী ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তে না হউক, বহু দিনের বিশেষ চেষ্টায় পর্ব্বতকেও বিচলিত করিতে পারে। তুমি বিদ্যা বুদ্ধিতে উত্তমা, তুমি ইচ্ছা করিলে রাজার মনের ভাব নিশ্চয় অপর দিকে ফিরাইতে পার। ইহা সম্ভব বুঝিলে, আমি আনন্দের সহিত রাজার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতাম। কিন্তু সে ইচ্ছা তোমার নাই ; রাজার অন্যায় কার্য্যকে ঘৃণা না করিয়া তুমি তাহার অনুমোদন কর।"

অনুপমা নতমুখে বলিল, "বাবা, রাজা কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছেন না। যাহা তিনি সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাই করিতেছেন। তিনি স্থানচ্যুত বৈদিকধর্ম্মকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই আন্দোলন করিয়াছেন, তিনি ভীত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তিনি সাধারণের অপ্রিয় হইয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।"

বৃদ্ধ কঠোরদৃষ্টিতে কন্যার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তৎপ্রতি চাহিয়া অনুপমা দৃষ্টি নত করিল।

বৃদ্ধ পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শুন অনুপমা, ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব অপেক্ষা, ভোগ বা লালসা অপেক্ষা, একটি উচ্চ পদার্থ আছে—তাহা ধর্ম্ম। আমি কোন বিষয়ে তোমাকে বাধ্য করিব না ; কেবল বলিতেছি, বিবেকের নির্দ্দেশানুসারে চলিও। কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া কর্ত্তব্যপথ ত্যাগ করিও না।"

অনুপমা নতমুখে চলিয়া গেল। এমন সময়ে রত্নচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত রাজা অজাতশত্রু সেই গৃহে আগমন করিলেন। রত্নচাঁদের পুত্রের সহিত মিত্রতা হেতু এই পরিবারে অজাতশত্রুর অবাধ প্রবেশ ছিল এবং বন্ধুর পিতাকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন।

রাজাকে দেখিয়া, রত্নচাঁদ পুত্রগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তোমরা এখান হইতে যাও। রাজার সহিত আমার কোনও কথা আছে।"

গৃহ তৃতীয় ব্যক্তি শূন্য হইল। রাজা বুঝিলেন, রত্নচাঁদ অনুপমা সম্বন্ধে কোন কথা কহিবেন। তিনি সাগ্রহ দৃষ্টিতে রত্নচাঁদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রত্নচাঁদ কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, অনেক দিন হইতেই আপনাকে একথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমি অনুপমার বিবাহ সম্বন্ধ করিতেছি, সুতরাং আপনি তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না।"

রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"উত্তম। কিন্তু স্বয়ংবরা হইয়া অনুপমা আমাকেই বরণ করিবে।"

রত্নচাঁদ সংযত স্বরে বলিলেন—"অনুপমা স্বয়ংবরা হইবে না, তাহাকে আমি সুপাত্রে সম্প্রদান করিব।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ? আর আমার অপেক্ষা সুপাত্র আপনি কোথায় পাইবেন ?

রত্নচাঁদ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আমি আপনার নিকট উপদেশ চাহি নাই।"

রাজা গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"শ্রেষ্ঠি-মহাশয়, অনধিকার চর্চ্চা করিতেছি না। আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে অবশ্যই আপনার গৃহ হইতে জোর করিয়া লইয়া যাইব।" রাজা গাত্রোত্থান করিলেন।

রত্নচাঁদ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন —"না ; সে যদি আমার কন্যা হয়, তবে কখনই পিতৃহত্যাকারীকে বরণ করিবে না।"

রাজা আত্মবিস্মৃত হইয়া কোষবদ্ধ অসিতে হস্তার্পণ করিলেন।

"অস্ত্রহীন বৃদ্ধকে বধ করিবে,তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই !"

রাজা মুক্ত তরবারি পুনরায় কোষে আবদ্ধ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"শ্রেষ্ঠি, তোমার কন্যার কথা স্মরণ করিয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু তুমি

জানিয়া রাখ যে, যদি অনুপমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দাও, তবে অজাতশত্রুর ক্রোধাগ্নি হইতে তোমার অব্যাহতি নাই।"

৩

অপরাহ্ণ কাল। উচ্চ পর্ব্বত হইতে একটি ক্ষুদ্র নির্ঝর বহিয়া যাইতেছে। সেই নির্ঝরের নিকটে একটি সুন্দরী যুবতী একখণ্ড প্রস্তরে বসিয়া, তাহার জলমগ্ন পদযুগলের প্রতি চাহিয়াছিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভা সুন্দরীর অনুপম সৌন্দর্য্য শতগুণে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। সুন্দরীর সম্মুখে কিঞ্চিৎ নিম্নে মহার্ঘ বস্ত্র ও অস্ত্রসজ্জিত একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিল। যুবক রাজা অজাতশত্রু, যুবতী অনুপমা।

রাজা বলিতেছিলেন—"অনুপমা, তুমি বোধ হয় জান, আর একপক্ষ পরেই আমরা কোশল যাত্রা করিব। তাই বিদায় লইবার জন্য, এরূপ নিজ্জনে তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হইতে পারে, ইহাই তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ!"

অনুপমা অন্যান্য দিনের ন্যায় সহজে রাজার সহিত আলাপ করিতে পারিতেছিল না। রত্নচাঁদের সহিত রাজার কলহের কথাগুলি ক্রমাগতই তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

যথাসাধ্য সহজ ভাবে সে বলিল—"শেষ কেন মহারাজ?"

রাজা বলিলেন, "তাহা কি বুঝিতেছ না? শেষ দুই কারণে হইতে পারে। যদি যুদ্ধে আমি হত হই অথবা পিতার মনোনীত সুপাত্রে তুমি আত্মসমর্পণ কর।"

অনুপমা উত্তর দিল না। অগণ্য উপলখণ্ড সঞ্চালিত করিয়া তীরবেগে যে জলস্রোত তাহার পদের অলক্তক ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

ব্যথিতস্বরে রাজা বলিলেন, "অনুপমা, কেন কথা কহিতেছ না? বল—আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তুমি আমার অপেক্ষা করিবে?"

অনুপমা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আপনি কি আজ নূতন করিয়া আমার পরিচয় চাহেন?"

রাজা বলিলেন, "না, অনুপমা, তোমার হৃদয় আমি অনেক পূর্ব্ব হইতেই জানি। কিন্তু তোমার পিতার ব্যবহার আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। আমার কথায় রাগ করিও না।—তবে আমারই জন্য তুমি অপেক্ষা করিবে, পিতার আদেশে অপরে আত্মসমর্পণ করিবে না?"

অনুপমা এবার মুখ তুলিল। রাজার প্রতি বিহ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "না মহারাজ, আমি রমণী। আপনার চরণে আশ্রয় পাইবার জন্য স্নেহময় পিতার অবাধ্য হইয়াছি। মহারাজ, আমার মনে শান্তি নাই পিতার স্নেহ হারাইয়া আমার মনে সুখ নাই।"

অজাতশত্রু কোমল ভাবে বলিলেন, "কি করিব অনুপমা, ইহাতে যে আমার কোন অপরাধ নাই, তাহা তো জান। কিন্তু তোমার জন্য আমি তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি।"

অনুপমা বলিল, "মহারাজ, উহাতে পিতা সন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি যদি একটি কাজ করিতে পারেন, তবে পিতা সন্তুষ্টচিত্তে আপনার চরণে আমাকে সমর্পণ করিবেন মহারাজ, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমার সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষণীয়।" রাজা যে হস্ত দ্বারা অনুপমার হস্ত ধরিয়াছিলেন, অনুপমা রাজার সেই হস্ত, আপনার হস্তদ্বয়ে চাপিয়া ধরিল।

অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, "মহারাজ, আপনি আমাকে ভালবাসেন, সেইজন্য এই অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি। আপনি বৌদ্ধবিদ্বেষ ত্যাগ করুন। যাহা অপরাধ মনে করিতেছেন, তাহা ক্ষমা করুন। পিতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া, আমি শান্তিলাভ করি।"

অতি গম্ভীরস্বরে রাজা বলিলেন, "অনুপমা, আমার উত্তর শোন। তুমি আমার অন্তরাকাশের ধ্রুবতারা, আমার হৃদয়ের আনন্দদায়িনী, আমার সাক্ষাৎ প্রেম-প্রতিমা। আমি হৃদয়ের সকল বৃত্তি প্রেমাকারে পরিণত করিয়া তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। কিন্তু অতি নিষ্ঠুররূপে তুমি তাহা ফিরাইয়া দিলে। কারণ, আমি বুঝিয়াছি, তোমার উপদেশ না মানিলে, তোমাকে আমি পাইব না। তথাপিও তুমি চিরদিন আমার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী থাকিবে।" রাজা থামিলেন। তাঁহার কথায় কিছুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না। সে আন্তরিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাগুলি মৃদু তরঙ্গের ন্যায় অনুপমার হৃদয়তটে আঘাত

করিল। শেষ কথা শুনিবার জন্য অনুপমা রাজার প্রতি চাহিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে রাজা পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু তথাপি এই প্রেমের জন্য আমি কর্ত্তব্যলঙ্ঘন করিতে পারি না। যাহা আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, যাহা রাজা অজাতশত্রুর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, সেই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-সঙ্কল্প আমি ত্যাগ করিতে পারি না। অনুপমা, তোমার জন্য জীবন ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ইহা পারি না।"

তখনও উভয়ের হস্ত চারিখানি একত্র ছিল। সে বন্ধন ছেদন করিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "অনুপমা, তোমাকে পাইবার আশা আমি পরিত্যাগ করিলাম। আমার হৃদয় আজ আমি স্বহস্তে ছেদন করিয়া গেলাম। কিন্তু আমার কথা কি তোমার হৃদয়ের এক কোণেও রাখিবে? যদি এ যুদ্ধে আমি হত হই, সেজন্য এ কথা বলিতেছি। অনুপমা, অজাতশত্রু জীবিত থাকিতে তোমাকে যেরূপ ভালবাসিত, পরলোক হইতেও সেইরূপ ভালবাসে, এ কথা ভুলিও না।"

তখনই অনুপমার কুসুমকোমল হস্ত অজাতশত্রুর বামহস্ত ধারণ করিল এবং ধীরে ধীরে একটি অঙ্গুরীয়ক তাহার অঙ্গুলীতে স্থিত হইল। রাজা বিস্মিত হইলেন। যে প্রেমকে তিনি এতক্ষণ সবলে রোধ করিয়াছিলেন, বাধামুক্ত স্রোতের ন্যায় সেই প্রেম রাজার অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। আবেগে রাজা অনুপমার সম্মুখে হস্ত প্রসারণ করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার বিবেক ফিরিয়া আসিল। পুনরায় স্বস্থানে বসিয়া রাজা অনুপমার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি নূতন শক্তি লাভ করিলাম। তোমার প্রেম আমাকে জয় করিল, তথাপি আমিই জয়ী হইলাম। আমি মহা ভাগ্যবান।"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অন্ধকারে অনুপমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। তথাপি ধৃত হস্তের রক্তসঞ্চালনে রাজা তাহার মানসিক চঞ্চলতার পরিচয় পাইতেছিলেন।

বহুক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, "চল, অনুপমা, তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।—কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্রামকালে তোমার এই অঙ্গুরীই আমার একমাত্র সুখস্মৃতির চিহ্নস্বরূপ হইবে।

৪

কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীপুরের বিখ্যাত ধনকুবের সুদত্তের ভবনে রাজা প্রসেনজিৎ নিমন্ত্রিত। অন্তঃপুরের একটি নিভৃত সুসজ্জিত কক্ষে রাজা প্রসেনজিৎ, গৃহস্বামী সুদত্ত এবং তাঁহার বিংশতিবর্ষীয়া কন্যা উর্ম্মিলা উপবিষ্টা।

সুদত্তই অনাথপিণ্ডদ নামে বৌদ্ধ ইতিহাসে বিখ্যাত। ইঁহার যত্নেই বৌদ্ধধর্ম্ম কোশলে বিস্তৃত হইয়াছিল।

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "মহাপুরুষের পবিত্র চরণচ্ছায়ায় আমার শেষ জীবন যাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। তৎপূর্ব্বে আমার একটি উদ্দেশ্য—যাহাকে আমি এতদিন একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম—আমার সেই কার্য্যভার মহারাজের নিকট সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।"

প্রসেনজিৎ বলিলেন, "যদি আমার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে, আপনি এরূপ মনে করেন, তবে তাহা ব্যক্ত করুন।"

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "মহারাজের অনুগ্রহের তুলনা নাই। মহারাজ, আমার কন্যা উর্ম্মিলাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। আপনি উর্ম্মিলার পিতৃস্থানীয় হইলেন।"

অনাথপিণ্ডদ কন্যার হস্ত লইয়া রাজার চরণে রাখিলেন। রাজা সম্ভ্রমের সহিত সে হস্ত আপন হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বন্ধুবর, আমার কন্যা নাই। আজ হইতে উর্ম্মিলাই আমার কন্যা।"

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "মহারাজ, যে প্রকারে হউক, উর্ম্মিলাকে মগধেশ্বর অজাতশত্রুর সহিত পরিণীতা করিবেন, তাহা হইলেই আমার মহাব্রত সমাপ্ত হইবে।"

প্রসেনজিৎ বিস্মিত হইলেন। অনাথপিণ্ডদ তাঁহার কন্যাকে নানা বিদ্যায় ভূষিতা করিয়াছেন; জ্ঞানে, ধর্ম্মে উর্ম্মিলা মৈত্রেয়ীতুল্যা ব্রহ্মবাদিনী। বহু প্রকাশ্য সভায় বহু পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া উর্ম্মিলা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; এই অসামান্যা বিদুষী ললনার পাণিলাভেচ্ছু হইয়া, কর্ণাট-কলিঙ্গ হইতে রাজগণ দূত প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাত্মা অনাথপিণ্ডদ কিজন্য জ্ঞাতসারে অজাতশত্রুর ন্যায় পাপীর হস্তে কন্যা-সম্প্রদানে অভিলাষী! প্রসেনজিৎ বিস্মিত হইয়া অনাথপিণ্ডদের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিলেন।

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "মহারাজ, পাপের দ্বারা পাপকে জয় করা অসাধ্য, পুণ্যের দ্বারা পাপকে জয় করিতে

হইবে, আপনি অবশ্য এ কথা স্বীকার করিবেন। অজাতশক্র যেরূপ মহাপাপী, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই রূপ মহাপুণ্যাত্মার প্রয়োজন। অল্প চেষ্টায় তাহা হইবে না; তাহার জীবন কেবল এই কার্য্যেই নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু কে তাহা করিবে? কে অজাতশক্রর অন্তরে অবাধ গতিতে প্রবেশ করিতে পারিবে? কাহার ক্ষমতায় তাহার মনের গতি ফিরিবে? সে তাহার প্রেমময়ী পত্নী।"

বিস্মিত প্রসেনজিৎ নীরবেই রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে অনাথপিণ্ডদ বলিতে লাগিলেন, "আপনি ভাবিয়া দেখিবেন মহারাজ, আমি যথার্থ কথা বলিতেছি কি না? এখন ভাবিয়া দেখুন, যে নারীর হস্তে এই মহান্ কার্য্যভার সম্পন্ন করিতে হইবে, সে নারীর কিরূপ হওয়া প্রয়োজন!—শৈশব হইতে তাহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে। কেবল এই জন্যই তাহাকে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

বহুদিন চিন্তা করিয়া, অজাতশক্রকে সৎপথে আনয়ন করিবার এই একমাত্র উপায় আমি স্থির করিয়াছি। পত্নী দ্বারা যে, তাহাকে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার যুক্তি সত্য, আমি ঠিক পথ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।"

প্রসেনজিৎ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, অনাথপিণ্ডদের দূরদর্শিতা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি যে কতদিন হইতে এ মহান্ কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "কিরূপ নারীর দ্বারা এ কার্য্য সাধন হইতে পারে? যে নারী বিদ্যা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বিভূষিতা, জ্ঞান ও ধর্ম্মে গার্গীতুল্যা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ক্ষমায় পূর্ণা, স্বাধীনতা ও তেজস্বিতায় অলঙ্কৃতা, আপন ক্ষমতা যে বুঝিতে সমর্থ, অধিকন্তু অসামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী, এরূপ নারীর প্রয়োজন। যে নারী ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত, জগতের নশ্বরত্ব যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই নারীই পাপী অজাতশক্রকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবে।"

প্রসেনজিৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বন্ধু, আপনি বড়ই অধিক কল্পনাকুশল। কল্পনায় ভিত্তিস্থাপন করিয়া এতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না তাহা বিবেচনার বিষয়।"

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "মহারাজ, আমার এ কল্পনা যাহাতে বিফল না হয়, আমার দশবৎসরের প্রাণপণ যত্ন যাহাতে বৃথা না হয়, আপনি তাহার সহায়তা করুন।"

রাজা বলিলেন, "আমাকে কি করিতে বলেন?"

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "আপনি উর্ম্মিলার পিতা হইয়া বিবাহপ্রস্তাব করিয়া, মগধে দূত প্রেরণ করুন, ইহাতেই কার্য্যের সূচনা হইবে।"

প্রসেনজিৎ বলিলেন, "আমার প্রতি অজাতশক্র সন্তুষ্ট নহেন। আমার কন্যাকে যদি তিনি বিবাহ করিতে সম্মত না হন।"

অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "মহারাজ, বহুদিন হইতে—যে দিন উর্ম্মিলাকে পাইয়াছি সেই দিন হইতে আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি।—যদি অজাতশক্র বিবাহে সম্মত না হন, তবে আপনি কাশ্মীর রাজকর প্রত্যাহার করুন, ইহাতেই কার্য্য আরম্ভ হইবে।"

প্রসেনজিৎ বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি; কিন্তু বন্ধুবর, আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে; উর্ম্মিলা কি অজাতশক্রকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন?"

কন্যার প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া অনাথপিণ্ডদ বলিলেন—"তাহা না হইলে উর্ম্মিলা এতদিন কি শিক্ষা পাইল? মহারাজ, উর্ম্মিলা প্রকাশ্যে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা, অজাতশক্রর রাণী; কিন্তু অন্তরে উর্ম্মিলা ধ্যানরতা, পতিতোদ্ধারিণী সংসার-আসক্তিহীনা সন্ন্যাসিনী। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।"

প্রসেনজিৎ সম্মত হইলেন। তখন অনাথপিণ্ডদ বলিলেন—"একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। মহারাজ, উর্ম্মিলা আমার পালিতা কন্যা। 'শক্রজিৎ সিংহ' নাম গ্রহণ করিয়া আমি উর্ম্মিলাকে পাইয়াছি।"

প্রসেনজিৎ মহাবিস্মিত হইয়া বলিলেন—"মগধের বিখ্যাত দস্যু শক্রজিৎ সিংহের নাম শুনিয়াছিলাম।"

অনাথপিণ্ডদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বৌদ্ধবিদ্বেষী অজাতশক্রর রাজ্যে অনেক সময় এই নামেই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। বিপন্ন বৌদ্ধকে রক্ষা করাই আমার দস্যুতার একমাত্র কার্য্য ছিল।"

৫

অজাতশত্রু বন্দী।—উপর্য্যুপরি তিনবার জয়লাভ করিয়া চতুর্থ বারের অভিযানে প্রবলপরাক্রান্ত মগধেশ্বর তাঁহার মাতুল প্রসেনজিতের নিকট পরাজিত।

রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী "আনন্দ নিকেতনে" রাজোচিত সম্মানের সহিত অজাতশত্রু বাস করিতেছেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রহরিগণই তাঁহার পরিচারক নিযুক্ত হইয়াছিল।

একদিন অপরাহ্ণে উদ্যানে বসিয়া রাজা অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বৈদিকধর্ম্মের পার্থক্যনিরূপণ করিয়া, এবং উভয়ের তুলনায় বৈদিকধর্ম্মকে উচ্চাসন দিয়া, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধ কোশলপতি তথায় উপস্থিত হইলেন।

অজাতশত্রু নীরবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

অবশেষে প্রসেনজিৎ বলিলেন—"অজাতশত্রু, আশা করি, এখন তুমি মনঃস্থির করিয়াছ। এবং বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে আমি এ বিবাহ প্রস্তাব করি নাই।"

অজাতশত্রু মুখ উত্তোলন না করিয়া বলিলেন—"মাতুল মহাশয় যে কি জন্য আপনার বিত্তবী কন্যার আমাকেই যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি!" অজাতশত্রুর কথায় তীব্র বিদ্রূপ গাম্ভীর্য্য দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া প্রসেনজিৎ বলিলেন—"তাহা আমার বিবেচ্য। কিন্তু তুমি অসম্মত কেন? উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিয়া মহাসমারোহে তুমি মগধে ফিরিয়া যাও। কন্যার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ কাশী তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব।"

উপহাসের হাসি হাসিয়া অজাতশত্রু বলিলেন—"কেন বৃথা ভাবিতেছেন, মাতুল মহাশয়! আপনার কন্যা বা কাশীর জন্য আমি লালায়িত নহি।"

প্রসেনজিৎ জানিতেন, অজাতশত্রুকে বিবাহে সম্মত করা সহজ হইবে না। এজন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। বলিলেন—"বৎস, বারবার কেন তুমি আমাকে আঘাত করিতেছ? কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ? যদি উর্ম্মিলাকে তোমার যোগ্য পত্নী বিবেচনা না কর, তবে তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।"

অজাতশত্রু সবেগে মস্তকোত্তোলন করিলেন। তাঁহার স্কন্ধস্পর্শী কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ দুলিয়া উঠিল। উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন—"মাতুল, বিবাহের পর আমি পত্নীত্যাগ করিব, ইহাই আমাকে উপদেশ দিতেছেন? স্বধর্ম্মে আহ্বান করা সকলের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তাহাতে রত হওয়া সকলের ধর্ম্ম নহে।"

অজাতশত্রু পুনরায় স্বকার্য্যে রত হইলেন।

প্রসেনজিৎ সন্তুষ্ট হইলেন। মহাপাপী হইয়াও অজাতশত্রুর যে এতখানি কর্ত্তব্যবোধ রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। বুঝিলেন যে, বিবাহ করিয়া অজাতশত্রু কখনও পত্নীকে অসম্মান বা উপেক্ষা করিবেন না।

সন্তুষ্টচিত্তে প্রসেনজিৎ বলিলেন—"অজাতশত্রু, তোমার উপযুক্ত কথা বলিয়াছ। তোমাকে জামাতারূপে পাইলে আমি ধন্য হইব;—আমার অনুরোধ তুমি রক্ষা কর। এই বিবাহ কোনদিন তোমার মনে অনুতাপের সঞ্চার করিবে না।"

অজাতশত্রুর মন ঈষৎ নরম হইল। কিন্তু তখনই তাঁহার হৃদয়ে একজনের সুন্দর মুখের সাগ্রহ দৃষ্টি উদিত হইল। অন্তরের দীর্ঘশ্বাস অন্তরে চাপিয়া বলিলেন—"ইনি আপনার পালিতা কন্যা বলিলেন, ইঁহার পরিচয় কি? এরূপ প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকে আপনি কোথায় পাইলেন?"

প্রসেনজিৎ বলিলেন—"অনাথপিণ্ডদকে জান; উর্ম্মিলা তাঁহার কন্যা। ভগবান বুদ্ধের শিষ্য হইয়া যখন তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তখন উর্ম্মিলাকে আমার নিকট সমর্পণ করিয়া যান।—আমার আত্মজা কন্যা নাই, থাকিলেও উর্ম্মিলা অপেক্ষা আমার স্নেহাস্পদা হইত না। আজ দুই বৎসর হইতে উর্ম্মিলার পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছি, সে তোমার পত্নী হইবার যোগ্যা।"

অজাতশত্রু বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার একমাত্র শত্রু বুদ্ধ,—তাঁহারই ভক্ত শিষ্য অনাথপিণ্ডদের কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে! ইহাই অজাতশত্রুর স্বাধীনতার বিনিময়! প্রাণের বিনিময়েও তো তিনি বুদ্ধ-শিষ্য-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না!

অজাতশত্রু পরিষ্কার স্বরে বলিলেন—"আমি আজীবন কোশলের কারাগারে বন্দী থাকিতে প্রস্তুত; তথাপি বুদ্ধ-শিষ্য-কন্যাকে বিবাহ করিব না। আমি আত্মশক্তিতে

স্বাধীনতালাভ করিতে পারি—উত্তম, নচেৎ আপনার অনুগ্রহ চাহি না।"

প্রসেনজিৎ বিজ্ঞ ব্যক্তি। অজাতশত্রুর উত্তেজনার কারণ বুঝিয়া কোমলভাবে বলিলেন—"বৎস, কারাগার কেন বলিতেছ, ইহাকে কি তুমি মাতুলালয় মনে করিতে পারিতেছ না? উর্ম্মিলাকে কি তুমি আমার কন্যা বলিয়া ভাবিতে পার না?———"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অজাতশত্রু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না।"

৬

নিদাঘের প্রভাত। রাজা অজাতশত্রু "আনন্দ-নিকেতনে"র এক কক্ষে গভীর চিন্তায় মগ্ন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চক্ষু হইতে তীব্র ক্রোধাগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জ্ঞাপন করিল, "রাজকন্যা উর্ম্মিলা আসিতেছেন।"

উর্ম্মিলা বুদ্ধশিষ্যকন্যা; তাঁহাকে দেখিয়া অজাতশত্রু বলিলেন—"রাজকন্যা, বন্দী অজাতশত্রুর নিকট আপনার কি প্রয়োজন?"

উর্ম্মিলা রাজার দিকে অচঞ্চল স্থিরদৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আপনার ধর্ম্মমত জানিতে আমার আগ্রহ ছিল। সেজন্য পিতার অনুমতি লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

অজাতশত্রু বলিলেন—"আপনি কি জানিতে চাহেন?"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"কোন্ যুক্তি আপনাকে বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে উত্থিত করিয়াছে, কেবল তাহাই জানিতে চাহি।"

রাজা বলিলেন—"রাজকুমারি, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আমার কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই। এ ধর্ম্মও মোক্ষলাভের একটি পথ, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু রাজ-কন্যা, চিন্তা করিলে আপনিও বুঝিবেন যে, এই উদীয়মান নবধর্ম্ম ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের অপকার সাধন করিবে। যে মোহনমন্ত্র শাক্যসিংহকে রাজচক্রবর্ত্তী না করিয়া, সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে, সেই মোহনমন্ত্রের আকর্ষণে সুপণ্ডিত ও জ্ঞানি-গণ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, এবং সংসারের প্রতি তাঁহাদের অনাসক্তিবশে ধনোন্নতি হ্রাস হইয়া, দেশ দারিদ্র্যপঙ্কে মগ্ন হইবে। এই সন্ন্যাসবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।"

উর্ম্মিলা রাজার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন, কোনও প্রতিবাদ করিলেন না।

রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন—"আমাদের বৈদিকধর্ম্মে যে সন্ন্যাসবাদ আছে, তাহা শাস্ত্রবিদের দূরদর্শিতার সাক্ষ্য; তাহা বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলে। তাহাই সন্ন্যাস গ্রহণের উৎকৃষ্ট সময়। ভাবিয়া দেখুন, মেধাবী ও বিজ্ঞ যুবকগণ যদি সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তবে কি তাহাদের অনাসক্তিবশে সংসারের অবনতি ঘটিবে না?"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"তাহা সত্য। কিন্তু এক বস্তুকে ত্যাগ না করিলে কখনই অপর বস্তু লাভ করা যায় না। ভোগবিলাসাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে, ভগবানকে লাভ করা যায় না; সম্পদ্ পরিত্যাগ না করিলে, পরমার্থ লাভ হয় না। সে জন্য কি সার পদার্থ বিস্মৃত হইয়া, অসার সংসারের মায়াতে বদ্ধ হইয়া, মানুষ চিরদিনই ভ্রম করিতে থাকিবে? পরমার্থ লাভ করিবার জন্য, সংসারে অনাসক্তিবশে যদি সংসারের ধনোন্নতি হ্রাস হয়, তবে তাহা তো আনন্দের বিষয়। যাহা আমাদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিবে না, তাহা লইয়া আমরা কি করিব?"

রাজা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"একথা সন্ন্যাসীর, সংসারীর নহে; যদি পৃথিবীতে সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহার ফলে মানব জাতির ধ্বংস হইবে, তখন কে এই সন্ন্যাস লইবে? আমি ধর্ম্মবিদ্বেষী নহি—আমি জগতের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। এ ধর্ম্ম এখনও সেরূপ বিস্তৃত হয় নাই, এখন ইহা কেবল মস্তকোত্তোলন করিতেছে মাত্র। যদি ইহার স্বল্পোত্তোলিত মস্তক এখনই চূর্ণ করা যায়, তবে জগতের যথেষ্ট উপকার হয়।—আমার জীবনে ইহাই একমাত্র কার্য্য।"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"মহারাজ, যিনি স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝেন, তাঁহার নিজের একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত আছে। এরূপে সকলকে বাধ্য করা সেই অজাতশত্রুর উপযুক্ত কার্য্য নহে। আপনি চিন্তা করিয়া সাধারণের অন্তর্নিহিত ভাব অনুভব করুন; তাহারা মানুষ।"

রাজা বলিলেন—"হাঁ, তাহারা মানুষ; কিন্তু এই সকল মানুষ যখন ঈশ্বর বলিয়া নখ, চুল ও নিষ্ঠীবনের পূজা করিতেছে, তখন তাহাদের মনুষ্যত্ব কোথায়, এবং যে মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ ইহাতে তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছেন,

তাহারই ঈশ্বরত্ব কোথায়, তাহা আপনি বিবেচনা করুন।” রাজা হাসিয়া উর্ম্মিলার প্রতি চাহিলেন।

উর্ম্মিলা বলিলেন—“আপনি কি জন্য এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন? আমরা কি বুদ্ধদেবের নখ-চুলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছি? তাহা নহে। আদর্শ শ্রেষ্ঠ পুরুষের পবিত্র চিহ্নস্বরূপ রাখিয়াছি।”

রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন না। উর্ম্মিলা পুনর্ব্বার বলিলেন—“ভগবান্ বুদ্ধের কথা বুঝিতে আমরা ভ্রম করিতেছি, সে অপরাধ আপনি তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিতেছেন কেন? আপনি তাঁহার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন, তবে তাহার মনের অনুগমন করেন না কেন?”

রাজা বলিলেন—“বুদ্ধ কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন—‘কাহাকেও ভালবাসিও না, কাহাকেও বিদ্বেষ করিও না। যাহা দেখিতেছি, সবই ভুল,—সংসার ত্যাগ কর, বৈরাগ্য অবলম্বন কর।’ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কিছুই কিছুই নহে। উর্ম্মিলা দেবি, ইহা অত্যন্ত হাস্যকর।”

উর্ম্মিলা বলিলেন—“কেন? সকলেই দুঃখ হইতে দূরে থাকিতে চাহেন, সকলেই সুখ চাহেন, কিন্তু তাহা কি সম্ভব? যখন তাহা সম্ভব নহে, তখন সুখদুঃখের অতীত হওয়া কি শ্রেয়স্কর নহে? সুখদুঃখে লিপ্ত থাকিলে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব, কর্ম্মত্যাগ না করিলে কর্ম্মফলও ভোগ করিতে হইবে; তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাই ভাল,—না সুখদুঃখের অতীত হইয়া জন্মান্তর ভোগ না করিয়া, মোক্ষলাভ করা ভাল?”

রাজা বলিলেন—“নিশ্চয়ই তাহা শ্রেয়ঃ। কিন্তু সকল লোকের জন্য সন্ন্যাস নহে, মূর্খ এবং নির্ব্বোধেরাই কি সংসার লইয়া থাকিবে? যাহাতে তাহা না হইতে পারে, আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি।”

রাজা তর্ক ত্যাগ করিলেন বুঝিয়া উর্ম্মিলাও ভিন্ন পথ ধরিলেন। বলিলেন—“কিন্তু আপনি তো এই চারিমাস সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। আপনার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই থামিয়াছেন কেন?”

রাজা বলিলেন—“আমি বন্দী।”

উর্ম্মিলা বলিলেন—“আজ চারি মাস হইতে মুক্তি আপনার দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, চারি মাস হইতেই আপনি ক্রমাগত মুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।”

রাজা বলিলেন—“এ মুক্তি আমি চাহি না।”

উর্ম্মিলা বলিলেন—“কেন মহারাজ? যদি কেবল মাত্র একটি বিবাহের দ্বারা আপনার কারাবন্ধন দূর হয়, আপনি স্বাধীন হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে সে বিবাহে দোষ কি?”

রাজা সকৌতুক দৃষ্টিতে উর্ম্মিলার প্রতি চাহিলেন; অচঞ্চল কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে উর্ম্মিলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন।

ক্ষণপরে ইতস্ততঃ করিয়া রাজা বলিলেন—“কোশল-কন্যার পাণিলাভ সৌভাগ্য কোন দিন আমি অর্জ্জন করিতে পারিব না। কারণ, অপর একটি কুমারীকে আমি বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত।”

উর্ম্মিলা বলিলেন—“কোশল কন্যাকে বিবাহ করিলেও সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিবেন; এবং কোশল-কন্যা নিশ্চয় সে জন্য সচেষ্ট রহিবেন।”

রাজা বলিলেন—“তাহা হইতে পারে, কিন্তু সে কুমারী কখনই সম্মত হইবেন না এবং আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।”

উর্ম্মিলা উঠিয়া রাজার পদ সমীপে নতজানু হইয়া বলিলেন—“স্বামিন্, আমাকে আপনাতে সমর্পণ করিলাম, আপনি অবশ্যই আমাকে গ্রহণ করিলেন?”

রাজা চমৎকৃত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, এ উপায়ে মুক্তিলাভ করা বাঞ্ছনীয়; কারণ বন্দী হইয়া থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না।

রাজা উর্ম্মিলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—“উর্ম্মিলা, উঠ। তোমাকে আমি গ্রহণ করিলাম। আজ হইতে তুমি আমার পত্নী।”

রাজার চরণে মস্তক নত করিয়া উর্ম্মিলা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৭

রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত-প্রায়। রাজগৃহ নগরের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে এক খণ্ড প্রস্তরের উপর একটি রমণী বসিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আকাশে চন্দ্র ছিল না, নক্ষত্রমালার ক্ষীণ আলোকে অতি অস্পষ্টরূপে চতুর্দ্দিক্ দৃষ্ট হইতেছিল।

রমণী অনুপমা। এইখানেই রাজার সহিত তাহার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সকল কথা স্মরণ করিয়া সে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা ; এখনও অনুপমা রাজাকে ভুলিতে পারে নাই।

কিছুক্ষণ পরে একজন সশস্ত্র পুরুষ অনুপমার সম্মুখীন হইয়া বলিল—"অনুপমা, তুমি কি অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছ?"

মুখ তুলিয়া অনুপমা বলিল—"হাঁ। দেবদত্ত, সন্ধ্যার পর হইতেই আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

দেবদত্ত বলিল—"তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছ দেখিয়া, আমি ধন্য হইলাম।—আমি বৃথা বিলম্ব করি নাই, চারি বৎসর পূর্ব্বে যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সম্পন্ন হইল।"

অনুপমা কষ্টে স্বাভাবিক ভাব আনিয়া বলিল—"তুমি পুরুষসিংহ।—এতদিন সংবাদ দাও নাই কেন? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি দুরূহ বলিয়া এ কার্য্য ত্যাগ করিয়াছ।"

দেবদত্ত বলিল—"তাহা কি সম্ভব? যে দিন তোমার জগজ্জয়ী রূপ দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি কেবল তোমারই চিন্তা করিতেছি।—তারপর যে দিন তুমি বলিলে—অজাতশত্রুকে তুমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে, তাহার সিংহাসনের জন্য, তাঁহার জন্য নহে;—যে এই সিংহাসন তোমাকে প্রদান করিবে, তুমি তাহারই হইবে ; সেই দিন হইতে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছি।—রাজাও এখন পূর্ব্বের ন্যায় নাই, তিনি দিন দিন স্বৈণ হইতেছেন, তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষ ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। বুদ্ধের নিধন-চেষ্টাতেই আমি তাঁহার দাসত্ব করিতেছিলাম কিন্তু সে ভাব যখন তাঁহার নাই, আমিও তাঁহার দাস নহি।—রাজার সিংহাসন টলিয়াছে। প্রায় সকল সৈন্যই এখন আমার পক্ষ। অনুপমা, এ আয়োজন তোমারই জন্য।"

অনুপমার অন্তরে যেন বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল! সে নীরবে অধর দংশন করিল।

অনুপমাকে নীরব দেখিয়া দেবদত্ত পুনরায় বলিল—"আমি জানি অনুপমা, রাজাকে তুমি কোন দিন ভালবাসিতে না।"

অনুপমা বলিয়া উঠিল—"না না, দেবদত্ত, কোন দিনও না। রাজাকে আমার পদতলে আনিয়া দাও, আমি চিরদিন তোমার দাসী হইয়া রহিব।"

কিছুক্ষণ পরে দেবদত্ত উঠিয়া বলিল—"এখন আমি যাই। আমাকে সর্ব্বদা বড় সতর্ক থাকিতে হইতেছে, আমার প্রতি রাজার অগাধ বিশ্বাস সত্ত্বেও রাণী আমাকে অতিশয় সন্দেহ করেন। তিনি আমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন।" দেবদত্ত চলিয়া গেল।

তাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া অস্ফুটস্বরে অনুপমা বলিল—"কাপুরুষ, তোর অঙ্গে পদাঘাত করিতেও ঘৃণা হয়। রাজার প্রতি প্রতিহিংসা লইবার জন্য তোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতেছি। যে দিন সিংহাসনচ্যুত রাজা বন্দিভাবে আমার নিকট আনীত হইবেন, সেই দিন সম্পূর্ণ সুখী হইয়া আমি বিবাহ করিব, ইহা সত্য। তোর নিকট মিথ্যা বলি নাই। কিন্তু বিবাহ তোকে করিব না, বিবাহ করিব মৃত্যুকে।"

সহসা পশ্চাৎ হইতে একটি সুকোমল হস্ত তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। অনুপমা চমকিত হইয়া ভীত ভাবে বলিল—"কে?"

মৃদুমধুর স্বরে উত্তর হইল—"ভয় নাই শ্রেষ্ঠিকন্যা, আমি রমণী"—কথার সঙ্গে সঙ্গে অমলশুভ্রবসনা একটি রমণী অনুপমার সন্নিকটে উপবেশন করিলেন।

রমণী পুনর্ব্বার বলিলেন—"আমি সব শুনিয়াছি। তুমি কি মনে কর, ইহাতেই তুমি শান্তি পাইবে?"

অনুপমা ভুলিয়া গেল যে, রমণী অপরিচিতা। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল—"নিশ্চয় শান্তি পাইব। রাজা অজাতশত্রু আমার জীবন সুখহীন শান্তিহীন করিয়াছেন; আমিও তাঁহার প্রতি এইরূপে প্রতিশোধ লইব। তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, অনুপমা কেবল ভালবাসিতেই জানে না, সে প্রতিশোধ লইতেও জানে।"

রমণী বলিলেন—"তুমি কি মনে করিয়াছ, প্রতিশোধ লইলেই শান্তি পাইবে? তাহা পাইবে না। যে আগুনে তুমি প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছ, তাহা শত গুণ বর্দ্ধিত হইবে মাত্র। কিন্তু যে শান্তি তুমি হারাইয়াছ, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না।"

অনুপমা হতাশভাবে বলিল—"আর ফিরিয়া আসিবে না!"

রমণী বলিলেন—"না। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া মানুষ কখনই শান্তি পায় না। তুমি মনে করিতেছ—রাজাকে তুমি আর ভালবাস না, কিন্তু তাহা সত্য নহে। তুমি রাজা অজাতশত্রুকে ভালবাসিতে এবং এখনও ভালবাস। সে জন্যই তাঁহার পত্নীগ্রহণে তুমি এত অধিক ব্যথা পাইয়াছ। যখন সিংহাসনচ্যুত রাজা তোমার সমীপবর্ত্তী হইবেন, তুমি কি মনে কর, তখন তুমি সুখী হইবে?—না; তাঁহার ক্লেশ ও দুর্গতি দেখিয়া তুমি মর্ম্মাহত হইবে, তোমার জীবনে ধিক্কার জন্মিবে। তাঁহাকে তুমি ভালবাস।"

অনুপমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তবে আমি কি করিব? আমি বড় দুঃখিনী, বড় কষ্ট পাইতেছি। কি করিলে আমি শান্তি পাইব?"

রমণী স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "রাজা অজাতশত্রুকে তুমি ক্ষমা কর। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে।"

বিস্মিত হইয়া অনুপমা বলিল,—"ক্ষমা করিব! যে আমার সহিত এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিব? কখনই নহে!"

রমণী বলিলেন—"হাঁ ভগিনি, তাঁহাকে ক্ষমা করিবে। শান্তির জন্য তুমি ধর্ম্মপথ ভুলিতেছ, স্নেহময় পিতার বেদনার কারণ হইতেছ, সেই শান্তি লাভ করিবে। যিনি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষমা কর।"

অনুপমা কেবল মাত্র বলিল—"ক্ষমা করিব!"

রমণী বলিলেন—"ইহা কি অসাধ্য মনে করিতেছ? না,—ইহা সহজসাধ্য। তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আপন মঙ্গল অনুসন্ধান কর; সুখ পাইবে—শান্তি পাইবে।"

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল—"কি সে মঙ্গল?"

রমণী বলিলেন—"পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। দেখ কত অধিক শান্তি—কত অধিক সুখের তুমি অধিকারিণী হইবে। মনুষ্যের নিকট হইতে প্রতিদান পাও নাই, ইহাতে আক্ষেপ করিও না। তাঁহার স্মরণ লও, কত অধিক প্রতিদান তিনি করিবেন। ভগিনি, দুঃখিনী বলিয়া আপনাকে ব্যথা দিতেছ,—তাঁহার স্মরণ লও—যিনি পুত্র দ্বারা মাতাকে শান্তি দিয়াছেন, যিনি সমাজত্যক্তা স্বৈরিণীকে মুক্তি দিয়াছেন, সেই প্রভু বুদ্ধের চরণে শরণ লও, তোমাকেও তিনি স্বর্গের শান্তি দিবেন।"

অনুপমা বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল, অন্তরের গ্লানি অশ্রুরূপে অনুপমার অন্তর হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

গভীর সহানুভূতিতে রমণী অনুপমার হস্ত ধরিয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ পরে রুদ্ধ স্বরে অনুপমা বলিল—"কে তুমি দেবি, আমাকে পথ দেখাইয়া দিলে—আমার সম্মুখে শান্তির দ্বার খুলিয়া দিলে—তুমি কে?"

"তোমার ভগিনী উর্ম্মিলা।"

৮

বুদ্ধ আজ ভিক্ষার্থ রাজগৃহের রাজপথ অতিক্রম করিতেছেন। যিনি ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু দেখিয়া, দুঃখময় বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি রাজপুত্র হইয়া পূর্ণযৌবনে, ভোগবিলাস ও প্রেমময়ী পত্নী ত্যাগ করিয়া চীরদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি জগৎকে নির্ব্বাণ-সাধন শিক্ষা দিয়াছেন, সেই বুদ্ধদেব কেবল এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য কি ঐশ্বর্য্যসমন্বিত রাজগৃহের রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন?

"জাগো ভিক্ষা দাও"—দূরাগত স্বর্গসঙ্গীতের ন্যায় এই মহাধ্বনি প্রভাতের সুখনিদ্রিত নরনারীর কর্ণে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের মনকে কি এক অনির্ব্বচনীয় আবেগে পরিপূর্ণ করিল। তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইল।

বুদ্ধদেব ক্রমে রত্নচাঁদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সম্মুখীন হইলেন। মহানিস্তব্ধ রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া—"ভিক্ষা দাও"—এই মহারব উত্থিত হইবামাত্র, সেই অট্টালিকার বিশাল প্রবেশদ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল। আলুলায়িত কুন্তলা, শান্তিহারা অনুপমা দ্রুতগতিতে আসিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে, ভগবানের চরণসমীপে নতজানু হইল। তাহার অশ্রুধারা ভগবানের চরণকমল সিক্ত করিল।

করুণাবতার বুদ্ধদেব শান্তিহারা উপেক্ষিতা নারীর মস্তকে ভক্তবাঞ্ছিত করযুগল স্থাপিত করিলেন; প্রসন্নহাস্য-বিরাজিত মুখমণ্ডল নত করিয়া বলিলেন—"বৎসে, শান্তি-লাভ কর।"

সকল দুঃখ, বেদনা ও নৈরাশ্যের জ্বালা ভগবানের একটি

আশীর্ব্বাদে দূরীভূত হইল। অনুপমা যখন উঠিল—তখন সকল বেদনা তাহার মন হইতে চলিয়া গিয়াছে. অন্তর তখন শান্তিপূর্ণ।

রজনীর নিস্তব্ধতা জগতের কর্ম্মকোলাহলকে কিছুক্ষণের জন্য শান্ত করিয়াছে; এই শান্ত ও শান্তিপূর্ণ সময়ে, উর্ম্মিলার সুললিত মধুর বৈরাগ্যগীতি বীণাধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া নৈশগগন পূর্ণ করিতেছে। স্বর্গীয় সঙ্গীতলহরী বায়ুতে ভাসিয়া রাজার কর্ণের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল; গীতের শেষ পর্য্যন্ত রাজা স্থির হইয়া শুনিলেন। বিমুগ্ধচিত্তে উর্ম্মিলার কক্ষে যাইবার জন্য রাজা সোপান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ও কি! কোথায় ও আলোকমালা জ্বলিতেছে! রাজ-আদেশে যে বুদ্ধচৈত্যে বহুদিন হইতে পূজা নিষিদ্ধ ছিল, সে মন্দিরে আজ আলোকমালা সাজাইয়া কে বুদ্ধের পূজা করিতেছে!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা নিঃস্পন্দভাবে সেই আলোকোজ্জ্বল মন্দিরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে বিস্ময়াবেশের কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, অতিভীষণ ক্রোধ তাঁহার মনকে অধিকার করিল। দৃঢ়পদক্ষেপে সোপানাবতরণ করিয়া, রাজা মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেবদত্তকে আহ্বান করিলেন।

গম্ভীরস্বরে রাজা বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আমার রাজ্যে বুদ্ধের পূজা করে, এখনও এরূপ লোক বর্ত্তমান আছে! যাও এখনই তাহাকে ধৃত করিয়া আন।"

দেবদত্তকে লক্ষ্য না করিয়া উর্ম্মিলা রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ, প্রজাগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, আজ এ আদেশ দিচ্ছ কেন?"

রাজা বলিলেন—"রাণী আমার রাজ্যে ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান নিষিদ্ধ নাই, কিন্তু সেজন্য যে তাহার পূজা করিতে হইবে, আমি এরূপ বলি নাই। তোমার অনুরোধে আমি অনেক নিয়ম শিথিল করিয়াছি। নিঃসঙ্কোচে বৌদ্ধগণ মগধে বাস করিতেছে। কিন্তু এরূপ অপরাধকে আমি ক্ষমা করিতে পারিব না। আমায় এ অনুরোধ করিও না।"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"না মহারাজ, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করিব! বিচার এবং যুক্তিদ্বারা যদি ইহাকে অপরাধ বলিয়া বুঝ, তবে অবশ্যই ইহার প্রতি শাস্তিবিধান করিও। মহারাজ, আমি অনুরোধে কোন কার্য্যে তোমাকে বাধ্য করি নাই। বিচার এবং যুক্তিদ্বারা যাহা তোমাকে অন্যায় বলিয়া বুঝাইয়াছি, তাহাই তুমি ত্যাগ করিয়াছ, আমার অনুরোধে নহে।"

রাজা বলিলেন—"একার্য্যেও আমি বিচার ত্যাগ করি না।" রাজা দেবদত্তের প্রতি চাহিলেন—দেবদত্ত প্রস্থানোদ্যত হইলেই উর্ম্মিলা আদেশব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"দাঁড়াও, দেবদত্ত, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

দেবদত্তকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া রাজা বলিলেন—"দেবদত্ত আমার আদেশে অপরাধীকে ধৃত করিতে যাইতেছে; রাণি, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"হাঁ, আমি জানি, যে ব্যক্তি আত্মীয়গণের নিধন চেষ্টা করিতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।"

উর্ম্মিলার কথা শুনিয়া রাজা ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া দেবদত্ত অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল—"মহারাজ, আমি আপনার দাসানুদাস। কিন্তু রাজ্ঞী আমাকে বিশ্বাস করেন না। আপনার আদেশেই আমি সকল কার্য্য করিতেছি।"

উর্ম্মিলা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেবদত্তের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"দেবদত্ত, মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তুমি যে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছ, তাহাতেও কি মহারাজের আদেশ লইয়াছ?"

দেবদত্ত বজ্রাহত হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার প্রতি চাহিয়া রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন—"সে কি উর্ম্মিলা!"

রাজার প্রতি চাহিয়া দৃঢ়স্বরে উর্ম্মিলা বলিলেন—"মহারাজ, আশ্চর্য্য কিছুই নহে। যে নরাধম সর্ব্বপাপে অকুণ্ঠিত, আত্মীয়গণের নিধনচিন্তায় যে মহারাজের আশ্রয় লইয়াছে, সে মহাপাপী যে, তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে পারে, ইহা আশ্চর্য্য নহে।"

দেবদত্ত বুঝিল—রাণী তাহার বিষয় সকলই জানিতে পারিয়াছেন; তথাপি আত্মসমর্থন করিবার জন্য সে বলিল—"মিথ্যা কথা, মহারাজ, ইহা আমার শত্রুদের চক্রান্ত।"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"সাবধান দেবদত্ত, মগধের রাণীর সম্মুখে তাহার ভৃত্যের অনুচিত সাহস প্রদর্শন করা সুবুদ্ধিসঙ্গত নহে।—যাও, তোমার পাপ পূর্ণ হইয়াছে, এখন

নিদ্রিতা

শিল্পী—শ্রীবীরেশ্বর সেন

—সোনার তরী - শ্রীরবীন্দ্রনাথ

অনুতাপ কর, কেহ কোন দিন ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই, তুমিও পাইবে না।"

পুণ্যের সম্মুখে পাপ অবনত হইল। তেজস্বিনী উর্ম্মিলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেবদত্ত মস্তক নত করিল।

রাজার বিস্ময় সীমাতিরিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি সকলই বুঝিলেন। তথাপি ভ্রুকুটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"দেবদত্ত, ইহা সত্য ?"

ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখবর্ত্তী দুর্ব্বল শশকের ন্যায় দেবদত্ত আপনাকে অসহায় বোধ করিল। সে আর দৃষ্টি উন্নত করিতে পারিল না।

রাজা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"ঘৃণিত কুক্কর, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! প্রহরি, দেবদত্তকে বন্দী কর।"

উর্ম্মিলা রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—"স্বামিন্, এ হতভাগাকে ক্ষমা করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত কর। দেশের মঙ্গল হউক। উহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।"

রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। উর্ম্মিলার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অতুল শক্তির পরিচয়, বহুদিন পূর্ব্বেই রাজা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার কার্য্যে, ক্ষমতায় ও মহত্ত্বে, উর্ম্মিলার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইল। যেদিন তাঁহার নিকট আপনাকে পত্নী বলিয়া, উর্ম্মিলা আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য তাঁহার মানসপটে উদয় হইল। এই পাঁচবৎসরব্যাপী দাম্পত্য জীবন পূর্ব্বের অটল সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। কিন্তু উর্ম্মিলা তাঁহার উপর আধিপত্য করেন নাই, তাঁহার জ্ঞানকে উর্ম্মিলা আচ্ছন্ন করেন নাই, তাঁহার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই। আপন হৃদয় হইতে অতুল প্রেম রাজার হৃদয়ে প্রবাহিত করিয়া, সংসারের সকল মলিনতা হইতে আপনাকে বিমুক্ত রাখিয়া, দেবী উর্ম্মিলা রাজাকে সত্য দেখাইয়া দিতেছেন।

প্রহরী দেবদত্তকে লইয়া গিয়াছিল।—রাজা সরিয়া আসিলেন। দর্পণে রাজার বক্ষঃসংলগ্ন উর্ম্মিলা প্রতিবিম্বিত হইল। রাজা পরম আবেগে বলিলেন—"উর্ম্মিলা তোমার স্বামী হইয়াছি, জগতে ইহা আমার অতুলনীয় গৌরব!"

৯

আলোকিত ও পরিষ্কৃত মন্দির মধ্যে, পূজারিণী তন্ময় চিত্তে ভগবান বুদ্ধের আরাধনা করিতেছিল। তাহার দেহ স্থির—নিঃস্পন্দ ও চক্ষু নিমীলিত। মন্দির নিঃশব্দ। এমন সময় অতি ধীরে ধীরে রাজা অজাতশত্রু মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কুঞ্চিত চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছে। দৃঢ় মুষ্টিতে রাজা কোষস্থ অসি ধারণ করিয়া আছেন।

মুহূর্ত্তের জন্য রাজা পূজারিণীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন; পরে কোষ হইতে সবলে অসি বিমুক্ত করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া রাণী রাজার উদ্যত হস্ত ধরিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন –"স্বামিন্, ক্ষান্ত হও। ভক্তের রক্তে ভগবানের মন্দির প্লাবিত করিও না। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিলেই পূজারিণীর ধ্যানভঙ্গ হইবে।"

রাজা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না,—কিছুতেই আমি এ অপরাধ ক্ষমা করিব না।"

উর্ম্মিলা বলিলেন-"স্বামিন্, ক্ষমা করিতে বলিতেছি না। কল্য তুমি আমার অনুরোধে দেবদত্তকে ক্ষমা করিয়াছিলে, আজ আমার অনুরোধে ইহার ধ্যানভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"

কথোপকথনের শব্দে পূজারিণীর ধ্যানভঙ্গ হইল। ভূলুণ্ঠিত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করিয়া, ধীরপদে পূজারিণী মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইল।

প্রদীপগুলি তখন কতক নিবিয়া গিয়াছে, কতক নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের আলোকে পূজারিণীকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তাহার প্রতি চাহিয়াই রাজা চমকিত হইলেন। মুণ্ডিত মস্তক ও তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি অজাতশত্রু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে চিনিলেন। রাজা বলিয়া উঠিলেন—"একি অনুপমা!—তুমি ভিক্ষুণী!"

স্মিতবদনা ভিক্ষুণীর মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হইল না। উর্ম্মিলা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"হাঁ স্বামিন্, বিস্মিত হইও না, অনুপমা আজ ভিক্ষুণী। সংসারে অনেক বেদনায় যে ব্যথিত, প্রভু বুদ্ধের চরণে সকল সমর্পণ করিয়া, আজ সে শান্তিলাভ করিয়াছে।"

রাজা এতদূর বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ কখন অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রাজা কেবল মাত্র বলিলেন—"অনুপমা, তুমি সন্ন্যাসিনী!"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"হাঁ স্বামিন্, কেন আশ্চর্য্য হইতেছ?

দুঃখার্ত্তের কাতর ক্রন্দন যিনি শ্রবণ করেন, অনুপমা তাঁহারই দাসী। যাঁহাকে পাইবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া, মনুষ্য ব্যাকুল মনে ছুটিতেছে, সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ যাহার জন্য ছুটিয়াছেন, অনুপমা আজ তাঁহারই দাসী।"

আত্মসংবরণ করিয়া গম্ভীরস্বরে রাজা বলিলেন—"তাহা হইলেও রাজাজ্ঞালঙ্ঘনকারিণীর শাস্তি হইবে।"

কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া উর্ম্মিলা বলিলেন—"কিন্তু স্বামিন্, অনুপমা তোমাকে ক্ষমা করিয়াছে।"

রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ক্ষমা করিয়াছে! এ ক্ষমা অনুপমা কোথা হইতে পাইল?"

উর্ম্মিলা বলিলেন—"তিনি দিয়াছেন।—যিনি অনুপমাকে শান্তি দিয়াছেন, যিনি সকল পাপীকে শান্তি দিতেছেন—সেই করুণাবতার বুদ্ধের কৃপায় অনুপমা আজ এ ধনের অধিকারিণী।"

অজাতশত্রু চমৎকৃত হইলেন। এরূপ অপূর্ব্ব কথা তিনি কখনও শুনেন নাই।

উর্ম্মিলা আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"স্বামিন্, এখন কি তুমি প্রবল প্রতাপশালী, রাজরাজেশ্বর অজাতশত্রুর সহিত এই দীন ভিক্ষুণীর পার্থক্য অনুভব করিতে পারিতেছ? দেখ—তুচ্ছ নশ্বর বস্তু ত্যাগ করিয়া অনুপমা আজ কি মহান্ শান্তির অধিকারিণী! যিনি তাহাকে এই শান্তি প্রদান করিয়াছেন, এস স্বামিন্, আমরাও তাঁহার পদতলে শরণ লই। সংগ্রাম করিয়া অবসন্ন হইতেছ, জয়লাভ করিবে।"

রাজা চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ রহিলেন। যে সত্য অস্পষ্টরূপে রাজার অন্তরে দেখা দিতেছিল, এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে তাহা প্রকাশিত হইল। আপনার দৈন্য উপলব্ধি করিয়া রাজা শিহরিত হইলেন।

রাজা ব্যাকুলনেত্রে উর্ম্মিলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"যাহা তোমরা পাইয়াছ, তাহার নিকট আমাকে লইয়া চল—উর্ম্মিলা!"

রাজার হস্তধারণ করিয়া উর্ম্মিলা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে নতজানু ও বদ্ধকর হইলেন। উর্ম্মিলার সহিত রাজা অজাতশত্রু আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন—

"বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি
শ্রমণং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।"

রত্ন

[শ্রীচিন্তামণি মহান্তি]

রত্ন নাম কেন এত গৌরবমণ্ডিত,
আছে কোন গুণ তার ঔজ্জ্বল্য ব্যতীত।
ধনিগণ ভাবে তায় জীবনসম্বল,
কিন্তু সে প্রস্তর-ধাতু-বিকার কেবল।
রতন-ধারণে মূর্খ না হয় পণ্ডিত,
ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা তাহে নহে প্রশমিত।
হয় কি রতনে কভু পাপী যে ধার্ম্মিক?
ভ্রান্ত ধারণার তাহা চিত্র কাল্পনিক।

সত্য-জ্ঞান-দয়া-ক্ষমা-পাণ্ডিত্য-ভকতি,
পবিত্রতা-শান্তি-প্রীতি স্বধর্ম্ম-বিনতি—
এ সকল অপার্থিব পরশ-রতন,
মানব-লৌহকে করে বিশুদ্ধ কাঞ্চন।
না যায় এ মহারত্ন চুরি কদাচন,
যত কর ব্যবহার—অক্ষয়-রতন!
ইহাতে যাহার অঙ্গ চির-অলঙ্কৃত,
সে কেন বাহিবে ধাতু-প্রস্তর প্রাকৃত!

চিরসাথী

[শ্রীলক্ষ্মীনাথ ফুকণ]

আঁধারে আলোকে সর্ব্বদাই
চির-সাথী তুমি যে আমার;
সুখে দুখে নির্জ্জনে সজনে
সর্ব্বক্ষণে আছ অনিবার।

পরশনে পরাণ ভরিয়া
কায়ারূপে থাকনা যখন;
অঙ্গে অঙ্গে আবরি আমায়
ছায়ারূপে আছত তখন!

বিরোধ বা ব্যাঘাত-দোষ বা বাধ

এবং

অদ্বৈতবাদ

[অধ্যাপক শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম. এ.]

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম. এ.

দার্শনিকদিগের মধ্যে যত বিবাদ, সে সকলের অধিকাংশই বিরোধ বা ব্যাঘাত-দোষ (LAW OF CONTRADICTION) বা বাধ লইয়া। আমাদের দার্শনিকগণ অনেক সময়ে একে অন্যের কথার মধ্যে বিরোধ-দোষ প্রদর্শন করিতেই ব্যগ্র। এ জন্য এস্থলে বিরোধ-দোষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে বিরোধ বা ব্যাঘাত-দোষের * এইরূপ সংজ্ঞা করিতেছেন—"যে দেশ কালাদি সম্বন্ধরূপে 'আছে' বলিয়া যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, তত্তদ্দেশকালাদি সম্বন্ধ যোগেই সেই পদার্থ 'নাই,'—এইরূপ উপলব্ধির নাম 'বাধ' বা 'বিরোধ'। কিন্তু কালান্তরে 'আছে' বলিয়া অনুভূত পদার্থের পরিণামাদি হেতু কালান্তরে 'নাই' এইরূপ উপলব্ধি 'বাধ' বা 'বিরোধ' নয়, কারণ কালভেদহেতু বিরোধের অভাব। অতএব তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। রামানুজ আবার বলিতেছেন * —"যে দেশে এবং যে কালে প্রমাণ দ্বারা যে পদার্থের সদ্ভাব প্রতিপন্ন হয়, সেই দেশে এবং সেই কালে যদি তাহার অভাবও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিরোধ হেতু যে জ্ঞান বলবৎ, তাহার 'বাধকত্ব' বা 'ব্যাবর্ত্তকত্ব' এবং যাহা দুর্ব্বল তাহার 'বাধ' বা 'নিবৃত্তি' স্বীকার করিতে হয়।" অপর দিকে জর্ম্মাণ দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) দেখাইতেছেন যে, "পরিচ্ছিন্নাকারের জ্ঞান মাত্রেরই মূলে বিরোধ অন্তর্নিহিত।" † রামানুজও তাহা স্পর্শ মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন—"বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ।" "বৃক্ষাগ্রে শ্যেন" বলিতে বৃক্ষাগ্রের বাহিরেব শ্যেন বুঝায়। বৃক্ষাদি বস্তু বিশেষের আকার বস্তন্তর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্নাকারে বৃক্ষ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাঁহার পরিচ্ছেদক বস্তন্তর বা তথা-কথিত শূন্যেরও জ্ঞান লাভ করিতে হয়। যে কোন

* "বাধোঽপি যদ্দেশ-কালাদি-সম্বন্ধিকতয়া যদস্তীত্যুপলব্ধং তস্য তদ্দেশকালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ। নতু কালান্তরেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ। কালভেদে ন বিরোধাভাবাৎ। অতো ন মিথ্যাত্বং।"

* "যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কালে যস্য সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্যাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চেৎ, তত্র বিরোধাৎ বলবতো বাধকত্বং বাধিতস্য তস্য চ নিবৃত্তিঃ।"

† Compare—"Every act of knowledge is an act of distinction."

পরিচ্ছিন্ন বস্তুর জ্ঞানের মধ্যেই সেই বস্তু যাহা নয় বা তাহার পরিচ্ছেদকেরও জ্ঞান অন্তর্নিহিত। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান মাত্রেরই মূলে বিরোধ রহিয়াছে, এবং গ্রাহকাত্মা বা দর্শক প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যেই "যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ" দুই বিরুদ্ধ বস্তুর জ্ঞান নিয়ত লাভ করিতেছে :—যথা (১) বৃক্ষ, এবং (২) বৃক্ষের পরিচ্ছেদক, যাহা বৃক্ষ হইতে অন্য, অথবা শূন্য। স্পিনোজা সূত্র করিতেছেন :—"প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তাহার অভাব জ্ঞানও অন্তর্নিহিত" ("Omne determinatio est negatio")। এই মূল সূত্র অনুসারে স্বপ্রকাশ গ্রাহকাত্মাকেও পরিচ্ছিন্নাকারে 'এই আমি' 'ঐ আমি নই' এই ভাবে আপনাকে আপনি জানিতে হইলে, সেই স্বপ্রকাশ গ্রাহকাত্মা (Subject) যাহা নয়, অর্থাৎ স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্য বিষয় বা অনাত্মাকেও (Object) জানিতে হয়—("The determination of the *ego* involves the *non-ego*")। এইরূপে দেখা যায়, আত্মা এবং অনাত্মা, গ্রাহক এবং গ্রাহ্য, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় (Subject and Object) আপাততঃ পরস্পর বিপরীত মনে হইলেও, পরস্পর অচ্ছেদ্য (Inseperable) সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বিষয়-জ্ঞান মাত্রই যেরূপ তাহার পরিচ্ছেদক বিষয়ান্তরের জ্ঞান দ্বারাই পরিস্ফুট হয়, আত্মা-সম্বন্ধী জ্ঞানও সেইরূপ আত্মা-সম্বন্ধী জ্ঞান দ্বারাই পরিস্ফুট হয়। কোন এক বস্তুর সহিত অন্য কোন বস্তুর তুলনাই সম্ভব হয় না, যদি উভয়ই যুগপৎ গ্রাহকাত্মা দ্বারা গৃহীত না হয়।

স্বপ্রকাশ গ্রাহক-আত্মার পক্ষে যুগপৎ নানারূপ অনুভূতিলাভ অথবা নানা প্রকার ক্রিয়াসাধন সম্বন্ধে বিরোধজনিত বাধের আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন :—"ব্রহ্ম এক। কিন্তু সেই একত্ব স্বরূপ পরিত্যাগ না করিলে, ব্রহ্মের মধ্যে এই অনেকাকারা সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিবাদের কোন স্থান নাই, যে হেতু আমাদেরই মধ্যে দেখা যায়, স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা এক হইয়াও তাহার একত্ব স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই অনেকাকারা সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাস্ত্রেও পাঠ করা যায়, 'তথায় রথ নাই, রথদণ্ড নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা রথ, রথদণ্ড, এবং পথ সৃষ্টি করে'। স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া একই ব্রহ্মের মধ্যে অনেকাকারা সৃষ্টিও সেই রূপই সিদ্ধ হওয়া সম্ভব।" —ব্রহ্মসূত্র ২-১-১৮।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভোজবৃত্তিকার শঙ্করাচার্য্যের এই শুদ্ধাদ্বৈতমত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বিরোধ দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন :—"একই ব্যক্তি দ্বারা একই অবস্থাতে বা রূপে নানা প্রকার বিরুদ্ধ অবস্থার যুগপৎ অনুভব সম্ভব হয় না। যথা, আত্ম-সমবেত সুখ উৎপন্ন হইলে, যে অবস্থাতে আত্মার সুখানুভবিতৃত্ব সিদ্ধ হয়, সেই অবস্থা থাকিতেই তাহার পক্ষে দুঃখানুভবিতৃত্ব সম্ভব হয় না।" (কৈবল্য ৩৩)। পাতঞ্জলের বৃত্তিকারের এই আপত্তির উত্তরে সক্রেটিসের একটি কথা আমাদের স্মরণ হইতেছে। আথেন্স্ (Athens) নগরে কারাগারে অবরোধকালে সক্রেটিসের পাদদ্বয় নিগড়বদ্ধ ছিল। মৃত্যুর সময় নিকট হইলে, তাঁহার পাদদ্বয় শৃঙ্খলমুক্ত করা হইয়াছিল। তখন তিনি পায়ের উপরে পা তুলিয়া ক্রাইটো (Crito) প্রভৃতি শিষ্যদিগের নিকট সুখ-দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :—'পায়ের উপরে পা তুলিয়া বসিতে পারাতে আমার এখন কত সুখ বোধ হইতেছে! পূর্ব্বে ত কখনো পায়ের উপরে পা রাখিয়া আমার এত সুখ হইত না! ইহার কারণ কি? শৃঙ্খলবন্ধনজনিত তীব্র দুঃখের স্মৃতি শৃঙ্খলমোচনজনিত সুখের অনুভূতির সহিত যুগপৎ মনের মধ্যে বর্ত্তমান থাকাতে উভয় অনুভূতির পরস্পর তুলনা দ্বারা শৃঙ্খলমোচনজনিত সুখের অনুভূতি এত প্রবল হইতেছে।' যে ব্যক্তি দন্তশূলের বেদনায়, অথবা জ্বরের জ্বালায় অস্থির, সেই মুহূর্ত্তে যদি তাহার পুত্র দূর দেশ হইতে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে, তখন কি সে সেই দন্তবেদনার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রদর্শনজনিত আনন্দেরও অনুভব করেনা? অথবা বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে—লক্ষ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন ;—"ইতি ব্রুবতি রামেতু লক্ষ্মণো-হবাক্ শিরাইব। ধ্যাত্বা মধ্যং জগামাশু মনসা দৈন্যহর্ষয়োঃ।" (অযোধ্যা ২৩-১)। এবং রামানুজও তদীয় টীকায় যাহা বলিতেছেন ;—"রামস্য ধর্ম্মে ধৈর্য্যং দৃষ্ট্বা হর্ষঃ তস্য রাজ্য ভ্রংশাৎ দুঃখমিত্যোষা মধ্যাগতিঃ",—এইরূপ সুখদুঃখের বিরুদ্ধ অনুভূতি সময়ে সময়ে সকলের মনেই যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে। একই গ্রাহক-আত্মার মধ্যে যদি যুগপৎ নানারূপ অনুভূতির, স্মৃতির, কল্পনার অথবা চিন্তার সমাবেশ

অসম্ভব হইত, তবে প্রকৃত পক্ষে এই "নানা রসযুত অবনী-মণ্ডলের" উপলব্ধিই অসম্ভব হইত। যদি কোকিলের বর্ণের অনুভূতির সময়ে তাহার সঙ্গীতের অনুভূতিকে বিস্মৃত হইতে হইত, তবে কোকিলের আর কোকিলত্বই থাকিত না। একটি কল্পনা বা চিন্তাকে মনে স্থান দিতে গেলে, যদি অপর সকল কল্পনার বা চিন্তার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হইত, তবে মানুষের পক্ষে উপন্যাস-রচনা, অথবা দার্শনিক-বিচার, অথবা স্বপ্ন-দর্শন—অথবা দুই বা ততোধিক বস্তুর পরস্পর তুলনা করা অসম্ভব হইত। স্ফুটরূপেই হউক, অথবা অস্ফুটরূপেই হউক (Conscious or Subconscious), জীবের নিজের মধ্যেই যখন যুগপৎ নানা প্রকার বিরুদ্ধ অনুভূতির এবং চিন্তার সমাবেশ সম্ভব হইতেছে, তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে সে বিষয়ে প্রশ্নই হইতে পারে না।

একখণ্ড কাগজ যুগপৎ 'সাদা' এবং 'সাদা নয়' হইতে পারে না। কিন্তু কাগজখণ্ড সাবয়ব—তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ রহিয়াছে; সুধু যে রহিয়াছে তাহা নয়, তাহার বিভাজ্যত্বের কোন সীমাই নাই (Infinite divisibility)। অতএব যুগপৎ সেই কাগজখণ্ডের এক অংশ সাদা এবং অপর সকল অংশ সাদা নয়—লাল, কাল, সবুজ ইত্যাদি যে রং ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, সামান্য কাগজ খণ্ডের ন্যায় তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ নাই। কাগজের মধ্যে অংশ-ভেদে নীল, লোহিতাদি বর্ণের যুগপৎ সমাবেশের ন্যায় আত্মার মধ্যে যুগপৎ এক অংশ সুখী, অপর অংশ সুখী নয়—দুঃখী,—এরূপ বলা যায় না। তাহা বলিয়া কি বিভাজ্যত্বগুণ হেতু সামান্য কাগজখণ্ডেরও নানাত্ব-গ্রহণের যে শক্তি রহিয়াছে, আত্মার তাহার অনুরূপ কোন শক্তি থাকিবে না? আত্মা কি তবে সামান্য কাগজ খণ্ড হইতেও অল্পশক্তি? তাহা নয়। এজন্য আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রাহক-আত্মার পক্ষে সুখ-দুঃখের যুগপৎ অনুভূতি সময়ে সময়ে মানুষ মাত্রেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অনাত্মার সহিত তুলনা দ্বারা দেখা যায় যে, আত্মা-পদার্থের ইহাই বিশেষত্ব যে, যেস্থলে অনাত্মা স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্য, আত্মা স্বসম্বেদ্য বা স্বপ্রকাশ; অর্থাৎ যে স্থলে অনাত্মার গ্রাহক বা জ্ঞাতা তাহা হইতে ভিন্ন, আত্মার গ্রাহক-আত্মা নিজেই। আত্মা নিজেই নিজের জ্ঞাতা (Subject) এবং নিজেই নিজের জ্ঞেয় (Object), যদিও জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। অনাত্মা গ্রাহ্য মাত্র, যথা রূপরসাদি অথবা সুখ-দুঃখাদি। এ সকলের গ্রাহক বা জ্ঞাতা এ সকল হইতে ভিন্ন। এজন্যই কাগজাদি সাবয়ব অনাত্মার দৃষ্টান্ত নিরবয়ব আত্মার প্রতি সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য।

দার্শনিকেরা বলেন যে, স্পিনোজা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার অনুকরণে ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি প্রমাণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কারণ, জ্যামিতি—সাবয়ব অনাত্মা সম্বন্ধী, ঈশ্বর-নিরবয়ব আত্মা। জ্যামিতির পথ অবলম্বন করিতে গেলে, চিদাত্মাকেও সাবয়বের ন্যায় বিভাজ্য কল্পনা করিতে হয়, চিদাত্মার নিরবয়ব চিৎস্বরূপত্ব বা যুগপৎ জ্ঞাতৃত্বজ্ঞেয়ত্ব, অথবা "বিন্দুতে সিন্ধু স্বরূপত্ব" ("All in the whole, and all in every part") ভুলিয়া যাইতে হয়। বৈদিক ঋষি পরমাত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন:—"পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" সাবয়বের ন্যায় বিভাজ্যত্ব গুণ না থাকিলেও আত্মত্ব হেতুই আত্মা যুগপৎ নানা কার্য্যসাধনে অথবা নানা অবস্থা অথবা নানা অনুভূতিলাভে সক্ষম।

আবার জ্যামিতি সাবয়ব সম্বন্ধী, অতএব নিরবয়ব আত্মা সম্বন্ধে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সকল যেমন অপ্রযোজ্য, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রও (Logic) সেইরূপ স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্যবিষয় সম্বন্ধী, অতএব স্বসম্বেদ্য গ্রাহক আত্মা সম্বন্ধে ন্যায়ের স্বতঃসিদ্ধ সকলও অপ্রযোজ্য। জ্যামিতির ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া স্পিনোজার যে দশা হইয়াছিল, ন্যায়ের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া আমাদের দার্শনিকদিগের মধ্যেও অনেকের কতকটা সেই দশা হইয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্র দেশকালের সীমায় আবদ্ধ, এজন্য তাদাত্ম্য (Identity), বিরোধ (Contradiction), এবং মধ্যাভাব (Excluded middle), ন্যায়ের এই সকল মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ স্বাতিরিক্ত-গ্রাহ্য বাহ্য অথবা মানস ব্যাপার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; "স্বসম্বেদ্য" দেশকালের অতীত গ্রাহকাত্মা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। (১) "যাহা যেরূপ সেরূপই" (তাদাত্ম্য), (২) "যাহা যেরূপে আছে, যুগপৎ সেরূপে নাই" (অস্তি-নাস্তিকতা বা বিরোধ) এবং (৩) "যে কোন পদার্থ হয় এরূপে আছে, না হয় এরূপে নাই" (মধ্যাভাব), ন্যায়ের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ দেশকাল দ্বারা (Time and Space) গণ্ডিবদ্ধ রূপরসাদিবিশিষ্ট বাহ্যবস্তু—অথবা কালদ্বারা গণ্ডিবদ্ধ আগমাপায়ী সুখদুঃখাদি মানস-ব্যাপার সম্বন্ধেই

প্রযোজ্য। রূপাদিরহিত দেশকালের (Co-existence and sequence or space and time) সীমার অতীত গ্রাহকাত্মা সম্বন্ধে সে সকল প্রযোজ্য নয়। যে গ্রাহক চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া, দেশ এবং কাল, এবং সর্ব্বপ্রকার গ্রাহ্য রূপরসাদি, এবং সুখদুঃখাদি বিষয় স্রোতঃপ্রবাহের ন্যায় নিয়ত আসিতেছে এবং যাইতেছে - স্বসম্বেদ্য হওয়াতে অপর সকল স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্য বিষয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়-মনের ব্যাপার দ্বারা যে গ্রাহক চৈতন্যের আপনাকে গ্রহণ করিতে হয় না,—সেই 'নেতি নেতি' স্বরূপ বা নির্ব্বিশেষ আত্মার সম্বন্ধে তাদাত্ম্য, বিরোধ, এবং মধ্যাভাব, ন্যায়ের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য হইতে পারে না। যাহা এরূপ অথবা সেরূপ, ইহা অথবা উহা, আছে অথবা নাই, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিশেষানুভূতির অদ্বিতীয় সাক্ষী এবং ভিত্তিস্বরূপ, যাহা স্বতঃ এরূপও নয়—সেরূপও নয়, ইহাও নয়—উহাও নয়, 'অস্তি' 'আছে' বলা ভিন্ন কোন প্রকার বিশেষত্বযুক্ত অনুভূতি যাহার সম্বন্ধে অসম্ভব, "অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্রকথং তদুপলভ্যতে,"—"যিনি বিদিত এবং অবিদিত সকল হইতে ভিন্ন"—অথচ বিদিত এবং অবিদিত উভয়েরই সাক্ষী এবং ভিত্তিস্বরূপ, "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"—এইরূপ কেবল বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র স্বরূপ আত্মা সম্বন্ধে তাদাত্ম্য বা "যেরূপ সেরূপই", —বিরোধ বা "যেরূপ আছে—যুগপৎ সেরূপ নাই," অথবা মধ্যাভাব বা "হয় এরূপ, না হয় এরূপ নয়",—ইত্যাকার বাক্য কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? যাহার "মোটে মায় রান্ধে না, তাহার আবার তপ্ত আর পান্ত কি"? যাহার মোটেই রূপ নাই, তাহার আবার এরূপ আর সেরূপ কি? রূপাদি অথবা সুখদুঃখাদি কোন বিশেষত্বযুক্ত পদার্থ 'অস্তি' বলিলে 'এইরূপে' অথবা 'সেইরূপে' অস্তি এবং গ্রাহক-চৈতন্য সম্বন্ধেই অস্তি, সেরূপ 'নাস্তি' বলিলেও 'এইরূপে' অথবা সেইরূপে 'নাস্তি' এবং তাহাও গ্রাহক চৈতন্য সম্বন্ধেই নাস্তি। যাহা 'এরূপ' 'সেরূপ' সর্ব্বরূপের 'অস্তিতানাস্তিতা'র সাধারণ ভিত্তিস্বরূপ,—সেই গ্রাহক-চৈতন্য সম্বন্ধে "এরূপ সেরূপের" বিরোধের নিয়ম কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে?

রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে 'অস্তিতা' 'নাস্তিতা' সম্বন্ধে বলিতেছেন *—"কাদাচিৎকরূপ অবস্থাবিশেষের যোগে অচিৎবস্তুর 'নাস্তি' শব্দবাচ্যত্ব, এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ চিদ্বস্তুর নিয়ত নিজ সিদ্ধজ্ঞানরূপে একাকারত্ব হেতু 'অস্তি' শব্দ বাচ্যত্ব।" তিনি বলিতেছেন—"যে বস্তু প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হয় ("Becoming") এবং সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর অবস্থা-প্রাপ্তি দ্বারা তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ করে,—এমন কি, তাহার উত্তরাবস্থাতে তাহার পূর্ব্বাবস্থার কোন প্রতিসন্ধান বা নিদর্শনই থাকে না ("Become nothing"), তাহা সর্ব্বদাই নাস্তি (nothing)† শব্দবাচ্য। সর্ব্বদা একরূপত্ব হেতু চিদংশ সর্ব্বদা 'অস্তি' শব্দবাচ্য ("Being")। প্রতিমুহূর্ত্তে পরিণামিত্ব হেতু অচিদংশ সর্ব্বদা নাশগর্ভ, অতএব তাহা সর্ব্বদাই নাস্তি" ("nothing")। শঙ্করের মতেরই প্রতিধ্বনি স্বরূপ রামানুজও বলিতেছেন:—"সত্যত্ব একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মেরই। অন্য কাহারও নাই - অন্যের অসত্যত্বই। ভুবনাদির সত্যত্ব ব্যাবহারিক মাত্র।" এই 'অস্তি নাস্তি'—অথবা 'সত্যত্ব অসত্যত্ব' পরস্পর বিরুদ্ধ। গ্রাহক চিদাত্মার মধ্যে উভয়ের যুগপৎ সমাবেশ সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তবে আর গ্রাহক চিদাত্মার সম্বন্ধে বিরোধের নিয়ম কোথায় রহিল?

এইরূপে আমরা দেখিতেছি, একই বস্তুর যুগপৎ নানা রূপে অবস্থান স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্য রূপরস অথবা সুখ-দুঃখাদি বিষয় সম্বন্ধেই বিরোধ দোষ দ্বারা বাধিত। সাক্ষী-স্বরূপ গ্রাহক চিদাত্মা সম্বন্ধে সে দোষ অপ্রযোজ্য; "অয়ং আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (বৃ ২-৫-১৯) "এই আত্মাই অস্তি নাস্তি সকল প্রকার অনুভূতির একাধার-স্বরূপ ব্রহ্ম।" বেদান্ত

---

* "অচিদ্বস্তুনঃ কাদাচিৎকত্বাবস্থাবিশেষযোগিতয়া 'নাস্তি' শব্দাভিধেয়ত্বং। ইতরস্য সর্ব্বদা নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন 'অস্তি' শব্দাভিধেয়ত্বং"। "যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাত্বং যাতি তদুত্তরোত্তরাবস্থাপ্রাপ্ত্যা পূর্ব্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্ব্বাবস্থস্যোত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তি অতঃ সর্ব্বদা তস্য নাস্তি শব্দাভিধেয়ত্বমেব। চিদংশস্য সদৈকরূপতয়া সর্ব্বদা হস্তি শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্য প্রতিক্ষণ পরিণামিত্বেন সর্ব্বদা নাশগর্ভ ইতি নাস্তি।" "জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণ এব সত্যত্বং নান্যস্য। অন্যস্য চাসত্যত্বমেব। ভুবনাদেঃ সত্যত্ব ব্যাবহারিকং।"

† Ramanuja herein anticipated Hegel's 'Being-becoming-nothing" or "the identity of contraries."

শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ। বিশিষ্টবাদী রামানুজ এবং নির্ব্বিশেষ-বাদী শঙ্কর উভয়ের মতেই স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্যবিষয় মাত্রেই বিরোধ নিয়মের অধীন। আর্হত-মত-খণ্ডন উপলক্ষে শঙ্করও রামানুজের সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন—"ন হ্যেকস্মিন্ধর্ম্মিনি যুগপৎ সদসত্ত্বাদি-বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতি শীতোষ্ণবৎ" (২ ২ ৩৩)—"একই ধর্ম্মীর মধ্যে শীতোষ্ণের ন্যায় যুগপৎ সত্ত্ব এবং অসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব নয়।" আবার গ্রাহক চিদাত্মার যুগপৎ নানা অবস্থাতে অবস্থান, এবং যুগপৎ নানা কার্য্য সাধন যে বিরোধের নিয়ম দ্বারা বাধিত হয় না, শঙ্করাচার্য্য তাহা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—"যদি আপত্তি হয় যে, আত্মা যখন নানা রূপে প্রবিভক্ত, অতএব তাহার বিকার এবং বিকার হেতু তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।" একথার উত্তরে বলা যাইতেছে, আত্মার আপনা হইতে আপনার বিভাগ নাই (অর্থাৎ সাবয়ব বস্তুর বিভাজ্যত্বের ন্যায় নিরবয়ব আত্মার বিভাজ্যত্ব অসম্ভব)। বুদ্ধ্যাদি উপাধি হেতু প্রবিভাগের প্রতিভাস বা আভাস মাত্র—যেমন ঘটাদি সম্বন্ধজনিত আকাশেরও বিভাগের প্রতিভাস বা আভাস। ব্রহ্ম এক এবং বিকাররহিত হইলেও তাহার অনেক বুদ্ধিময়ত্ব শ্রুতি দেখাইতেছে। ব্রহ্মের (সচ্চিদানন্দ) স্বরূপের পৃথক্‌অনভিব্যক্তি হেতু তাহার তন্ময়ত্ব (অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি উপাধির সহিত তন্ময়ত্ব) অথবা (বুদ্ধ্যাদি দ্বারা) তাহার উপরক্ত-স্বরূপত্ব, যেমন "স্ত্রীপরতন্ত্র" অর্থে কামাতুর ব্যক্তিকে বলা যায়—"স্ত্রীময়।" জীবব্রহ্মের লক্ষণভেদও উপাধি জনিত, যে হেতু সর্ব্ব-সংসার ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যান দ্বারা (অর্থাৎ নেতি নেতি সাধনা দ্বারা) বিজ্ঞানময় (বা জীব) আত্মারই পরমাত্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে।"—
* ব্রহ্মসূত্র-২-৩-১৭) কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য যেন বিরোধ-দোষের বিভীষিকা দেখিয়া, তাঁহার অদ্বৈতমত খর্ব্ব করিয়া, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নিত্য "তমঃশব্দবাচ্য" "অচিৎ বস্তুর সমষ্টিস্বরূপ" সাঙ্খ্য প্রকৃতির এক প্রকার সূক্ষ্মাবস্থা কল্পনা করিতেছেন। * তত্ত্বমসি শ্রুতি-বাক্যের ব্যাখ্যাতেও রামানুজ বলিতেছেন—"শরীরাত্ম-ভাবমূলং তাদাত্ম্যং সমানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি"—"তত্ত্বমসি এই সামানাধিকরণ্য বাক্য দ্বারা শরীরের সহিত জীবের নিজের তাদাত্ম্য সম্বন্ধের ন্যায় তাদাত্ম্য উক্ত হইতেছে।" তিনি বলিতেছেন,—'তৎ'পদ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প জগৎকারণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইতেছে। তাহার সহিত সমানাধিকরণ 'ত্বং'পদ দ্বারা অচিদ্বিশিষ্ট জীব শরীরক পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করা যাইতেছে। যেহেতু "সামানাধিকরণ্য প্রকারদ্বয়াবস্থিত একবস্তুপর।" † রামানুজের মতে জীব অচিদ্বিশিষ্ট অতএব পরব্রহ্মের শরীর স্বরূপ মাত্র। জীব ব্রহ্মের তাদাত্ম্য দেহ দেহীর তাদাত্ম্যের তুল্য। দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহা অদ্বৈতবাদের ভিতরে দ্বৈতবাদের 'গুজামিল' ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদিও রামানুজ শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া—"সর্ব্ববেদান্তপরিত্যাগঃ স্যাৎ"—বলিয়া, ভেদবাদের প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার এই প্রকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একরূপ প্রচ্ছন্ন ভেদবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সে যাহা হউক, ইহা সত্ত্বেও জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, রামানুজও ব্রহ্মসম্বন্ধে বিরোধ দোষের আপত্তির কোন স্থান রাখিতেছেন না; কারণ, তিনিও বলিতেছেন—"অসংখ্যেয়কল্যাণগুণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সেৎস্যতি, কিং নোপপদ্যতে।" "সর্ব্বং সমঞ্জসং।"—"অসংখ্যেয় কল্যাণগুণের আকর, সর্ব্বজ্ঞ, সত্য সঙ্কল্প পরব্রহ্মকে স্বীকার করিলে কি অসিদ্ধ থাকিতে পারে, কি অনবগত হইতে পারে?" "সকলই অসামঞ্জস্যশূন্য।" এতদ্দ্বারা তিনিও পাকতঃ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বিরোধজনিত কোন আপত্তির স্থান রাখিতেছেন না। অপর দিকে

* "ননু প্রবিভক্ত ত্বাদ্বিকারো বিকারত্বাচ্চোৎপদ্যত ইত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে—নাস্য প্রবিভাগঃ স্বতোঽস্তি বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি নিমিত্তং তস্য প্রবিভাগ-প্রতিভাসমাকাশস্যেব ঘটাদি সংবন্ধনিমিত্তম্। ব্রহ্মণ এবাবিকৃতস্য সতোঽপ্যেকস্যানেক বুদ্ধ্যাদিময়ত্বং দর্শয়তি। তন্ময়ত্বং চাস্য বিবিক্তস্বরূপানভিব্যক্ত্যা তদুপরক্তস্বরূপত্বং স্ত্রীময়ো জন ইত্যাদিবদ্দ্রষ্টব্যম্। লক্ষণভেদোঽপ্যনয়োরুপাধি নিমিত্ত এব বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্ম প্রত্যাখ্যানেন পরমাত্মভাব প্রতিপাদনাৎ।"

* "অপ্যয় কালে অচিৎ সমষ্টিভূতে তমঃ শব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয় প্রতি-পাদনপরত্বাৎ তমঃশব্দেন অচিৎসমষ্টি-রূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে।"

† তৎপদং হি সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি। তৎ সমানাধিকরণং ত্বং পদং চাচিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরকং পরং-ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি। প্রকারদ্বয়াবস্থিতৈক বস্তু পরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য।" [শ্রীভাষ্য—১পঃ—পৃঃ ৫৪৭]।

শঙ্করাচার্য্য বিরোধ-দোষের বিভীষিকা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া, প্রকৃত দার্শনিকের ন্যায় রামানুজের দেহ-দেহীর সম্বন্ধের ন্যায় জীবব্রহ্মের আভাস-তাদাত্ম্যের পরিবর্ত্তে, জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক তাদাত্ম্য স্বীকার করিয়া এবং রামানুজের "তমঃ শব্দাভিধেয় অচিৎ সমষ্টির" পরিবর্ত্তে—"অবিদ্যা বা 'আত্মাজ্ঞান' নামে আধুনিক দার্শনিকদিগের বিশেষ-বিজ্ঞানের সাপেক্ষত্ব" (Relativity of knowledge) স্বীকার করিয়া, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধী 'চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তিত্ব' অথবা "অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয়ত্ব রহিত' মতের অনুকরণে শঙ্করও সেই অবিদ্যা বা আত্মা জ্ঞান সম্বন্ধে বলিতেছেন—"শরীরদ্বয়কারণং আত্মাজ্ঞানং। তচ্চ নসৎ নাসৎ। নাপিসদসৎ। নভিন্নং নাভিন্নং, নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ। ন নিরবয়বং ন সাবয়বং, নোভয়ং। কেবল ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানাপনোদ্যং" (পঞ্চীকরণ)। বিরোধ-দোষের বিভীষিকা নির্মুক্ত হইয়া, শঙ্কর তাঁহার বৃহদারণ্যকীয় অন্তর্যামি বিদ্যার ভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের ভিতরেই ত্রিত্ববাদও প্রদর্শন করিতেছেন!—(১) "যমন্তর্য্যামিনং ন বিদুঃ" —'যে অন্তর্য্যামী "প্রশাসিতাকে" পৃথিব্যাদি দেবতাগণ (ক্ষেত্রজ্ঞ) জানে না,—(২) "যে চ ন বিদুঃ"—"যে সকল পৃথিব্যাদি দেবগণ (ক্ষেত্রজ্ঞ) সেই অন্তর্যামীপ্রশাসিতাকে জানে না" এবং (৩) "যচ্চ তদক্ষরং দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তৃত্বেন সর্ব্বেষাং চেতনা ধাতুঃ"—"সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) যাহা দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব হেতু সকলের চেতনা-ধাতু-স্বরূপ।" শঙ্করাচার্য্যের মতে এই তিনে মিলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং।" শঙ্করের মতে (১) "নেতি নেতি ব্যপদেশ্য"—"নিরুপাধিক আত্মা," (২) "অবিদ্যাজনিত কামকর্ম্মবিশিষ্ট কার্য্য-করণোপাধিযুক্ত সংসারী জীব-আত্মা" এবং (৩) "নিত্য নিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধিযুক্ত * আত্মা অন্তর্যামী ঈশ্বর" —এই আত্মাত্রয় মিলিয়া—"একমেবাদ্বিতীয়ং বা পরমাত্মা।" 'একে তিন, তিনে এক।' এইরূপে বিরোধ-দোষের বিভীষিকা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া শঙ্কর জ্ঞানভক্তি কর্ম্মের মিলনভূমিতে দাঁড়াইয়া ভক্তিবিগলিতচিত্তে পরমাত্মার স্তব করিতেছেন—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ন তু তারঙ্গোহি সমুদ্রঃ॥"

* পৌরাণিক মহাপ্রলয় মত স্বীকার করাতে, শঙ্কর ঈশ্বরের নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানশক্তিকে পরমাত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম না বলিয়া, 'উপাধি' মাত্র বলিতেই বাধ্য হইয়াছেন।

দলাদলির গান

[শ্রীদিল্‌দরিয়া শর্ম্মা]

ডল বেঁধেছি, ডল বেঁধেছি, বল বেঁধেছি ভাই,
আমাদের এই ডলে ডাডা ডলাডলি নাই ;
আমরা করি গলাগলি,
প্রেম-আবেগে ঢলাঢলি,
নেশার ঝোঁকে আছি—কিন্তু টলাটলি নাই !
আমরা খাঁটি, নইক মেকি—মস্ত সমজ্‌দার,
হিমালয়ের চাইতে উঁচু বুদ্ধির অহংকার !
আমরা জাতি-সমালোচক,
বিজ্ঞ এবং সুবিবেচক,
এ খোঁয়াড়ে 'পেয়ার' ছাড়া নাইক কারো ঠাঁই !

আমরা যশের ফেরিও'লা—হাঁক্‌ছি দ্বারে দ্বার ;
পেশা মোদের লেখক-পেষা—দলের-যারা-বা'র।
আমরা ক'ভাই নইক যা' তা,'
উঠ্‌ছি ফুঁড়ে ব্যাংঙের ছাতা ;—
অধঃপাতের অথই তলে তলিয়ে মোরা যাই !
এতদিনেও মিলায়নি'ক মোদের গলার দাগ,
প্রাণের ব্যথায় রঙীন্ হ'য়ে জাগ্‌ছে অনুরাগ !
সোণার কাঠির পরশ পেয়ে,
অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছি চেয়ে,—
শ্রীচরণের ছুঁচো হ'য়ে কিচির মিচির গাই !

বিমান-বিজয়

[শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী]

প্রথমবর্ষের "ভারতবর্ষে" * "বিমান-বিহার" প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছি যে, আকাশবিজয়ের এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ কেহ পক্ষীদের উড়িবার কৌশল অনুসরণে, অপর কেহ কেহ উষ্ণ বায়ুর উত্তোলন-ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া,
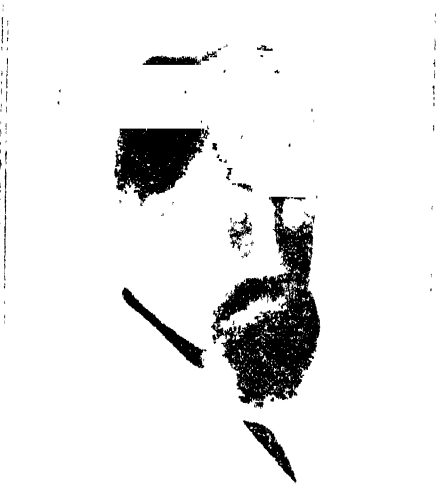
স্যর হিরাম ম্যাক্সিম্

ঠিক সেই উপায় অবলম্বনে, শূন্যে রথ উড়াইবার কৌশল-আবিষ্কারে যত্নবান্ হন। ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে, এই উভয় শ্রেণীর উদ্যোগীদের চেষ্টাই সফল হইয়া, প্রধান দুই শ্রেণীর বায়ুরথের সৃষ্টি হইয়াছে। † আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে, এই উভয় শ্রেণীর বায়ুরথেরই ইতিহাস একে একে বিবৃত করিব।

* "ভারতবর্ষ" ১৩২০, ফাল্গুন, পৃঃ ৪০৬ দ্রষ্টব্য।

† প্রথম শ্রেণী—এরোপ্লেন, সিপ্লেন ইত্যাদি } বায়ু অপেক্ষা ভারি যন্ত্র।
দ্বিতীয় শ্রেণী—এয়ারসিপ্, বেলুন ইত্যাদি } বায়ু অপেক্ষা লঘু যন্ত্র।

এরোপ্লেন

সাড়ে চারিশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বের কথা—লিওনার্ডো (Leonardo de Vinci) ১৫০৫ সালে লিখিত "*Codice sul Volo degli Uccelli e Varie Altre Materie*" নামক পুস্তকে মানুষের পক্ষে পাখীর মত দুই বাহুতে দুইটি পাখা বাঁধিয়া উড়িবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিবরণী মূলতঃ ভ্রান্তিপূর্ণ। পরে, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে, G. A. Borelli কৃত্রিম পক্ষ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ১৭৬৮ সালে A. J. P. Paucton এবং ১৭৯৬ সালে Sir George Cayley, এইরূপ কৃত্রিম পক্ষ যাহাতে নির্দ্দোষ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে ইঙ্গিত-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তবে, তখন স্থির হইয়াছে যে, মানবদেহে কৃত্রিম পক্ষ সংযুক্ত না করিয়া, ঐরূপ পক্ষযুক্ত একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করা চাই,—যাহাতে চড়িয়া উড়িবার চেষ্টা করা যাইতে পারে,১৮১০ সালে স্যর জর্জ্জ কেলি এইরূপ একটি যন্ত্রনির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। ১৮৪২ সালে W. S. Henson এইরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার স্বত্ব রক্ষার্থ পেটেণ্ট গ্রহণ করেন; ইহা Aerostat নামে খ্যাত। ১৮৪৭ সালে J. Stringfellow এবং ১৮৫৭ সালে F. du Temple ঐ ধরণের এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, পরিচালনপক্ষে সেগুলি নির্দ্দোষ হয় নাই। ১৮৬৩ সালে G. de la Landelle একটি ক্ষুদ্র আদর্শ উড়িবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যোপযোগী হয় নাই। ১৮৬৬ সালে F. J. Wenham নামক জনৈক ইংরেজ হেন্‌সনের যন্ত্রের উন্নতিবিধান করিয়া একটি উড়িবার যন্ত্র প্রস্তুত করেন। ইহার স্তরে স্তরে একটির উপর একটি করিয়া বস্ত্রনির্ম্মিত কতকগুলি "প্লেন" (plane) স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং দুই পাশে ব্যোম-

বিহারীর পরিচালনার জন্য দুইটি পাখা সংযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছা-পরিচালন নিমিত্ত (rudder) কর্ণের প্রবর্ত্তনও তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত। ফলে, ইহাকেই তিনি সর্ব্বপ্রথম 'Aeroplane' নামে অভিহিত করেন। ১৮৬৭ সালে J. Bell Pettigrew, ১৮৬৮ সালে Ponton d' Amecourt এবং ১৮৬৯ সালে E. J. Marey, প্রত্যেকে সমুন্নত প্রণালীর এক এক উড়িবার যন্ত্র প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। অটো লিলিয়েন্‌থল (Otto Lilienthal) একজন প্রতিভাশালী জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা Ger. Lilienthal, ১৮৪৮ হইতে ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহে একান্তমনে শূন্যরথের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হন। ইঁহাদের অধ্যবসায়ের ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, ইঁহাদের "এরোপ্লেন"ই সর্ব্বপ্রথম আকাশে উড্ডীন হইয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে আকস্মিক দুর্ঘটনায় অশ্রান্তকর্ম্মী অসাধারণ অধ্যবসায়ী অটো লিলিয়েন্‌থল শূন্যরথ আবিষ্কার-ব্রতে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করেন। ১৮৭২ সালে Alphonse Penaud, উন্নতপ্রণালীর 'Helicopteri' প্রভৃতি নানাপ্রকার উড্ডয়ন যন্ত্রের আদর্শ প্রস্তুত করেন।

সামসাময়িক উদ্যোগীদের মধ্যে আমেরিকার প্রফেসার লেঙ্গলি (Prof. Langley) এবং ইংলণ্ডের স্যার হিরাম মেক্সিমের (Sir Hiram Maxim) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিকজগতে ইঁহাদের উদ্যম ও আবিষ্কারের মূল্য খুবই বেশী। স্যার হিরাম সর্ব্বপ্রথম একটি পূর্ণায়তন শক্তিপরিচালিত (Power-driven) ব্যোমযান আকাশে উড্ডীন করেন। ইহার ৬৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮০ মণ ভার উত্তোলন-ক্ষমতা এবং ঘণ্টায় ২৭ মাইল গতিশক্তি ছিল। ৩৫০ অশ্ব-শক্তি (350 H. P.) সম্পন্ন একটি ষ্টিম ইঞ্জিন এই বায়ুরথে সংযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাপরিচালন-যন্ত্র (rudder) বা কর্ণ এবং ভার (balance) ঠিক রাখিবার কৌশলের অভাবে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। যাহা হউক, যন্ত্রটির নির্ম্মাণ প্রণালী অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং প্রায় বিমানের নির্ম্মাণ-কৌশলে উৎসাহী হইয়া অনেকে "এরোপ্লেন" নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

বিশপ্ মিল্টন্ রাইট্, এবং পুত্রদ্বয় অর্ভিল্ রাইট্ উইলবার রাইট্

কিন্তু লিলিয়েন্‌থলের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে য়ুরোপের উদ্যোগিগণ এই বিষয়ে অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু য়ুরোপে এই সময় মোটরগাড়ীর অদ্ভুত উন্নতি সংসাধিত হইতে লাগিল।

আমেরিকায় আলেকজাণ্ডার (Alexander), হেরিং (Herring) এবং সেন্নুট্ (Chanute) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ আকাশবিহারে অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রফেসার লেঙ্গলির বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শূন্যচারীদের অনেক অত্যাবশ্যক সমস্যার সমাধান হইতে লাগিল। কিন্তু রাইট্-ভ্রাতৃদ্বয়ের (Wright Brothers) কার্য্যই প্রকৃত সফল ও সারবান হইয়াছিল। ইঁহারাই বিমানবিহারের প্রধান পথপ্রদর্শক। মোটর-ইঞ্জিন-পরিচালিত ব্যোমযানের প্রবর্ত্তনের পথও ইঁহারাই প্রথম প্রদর্শন করেন। অনেকে বলেন, পরবর্ত্তী কালে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইতেছিল, বহুপূর্ব্বেই এই রাইট্-ভ্রাতৃদ্বয় সে সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গোপন-প্রিয়তার ফলে অনেক অত্যাবশ্যক বৈজ্ঞানিক সমাধানের সহিত জগৎবাসী পরিচিত হইতে পারে নাই।

১৯০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইঁহারা প্রকাশ্যভাবে প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। উত্তর কেরোলিনের (North Caroline) বালুকাময় উপকূল ইঁহারা আপনাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাস্থলরূপে মনোনীত করিলেন। এই উপকূলভাগের একটা সুবিধা ছিল এই যে, এস্থানে বায়ু
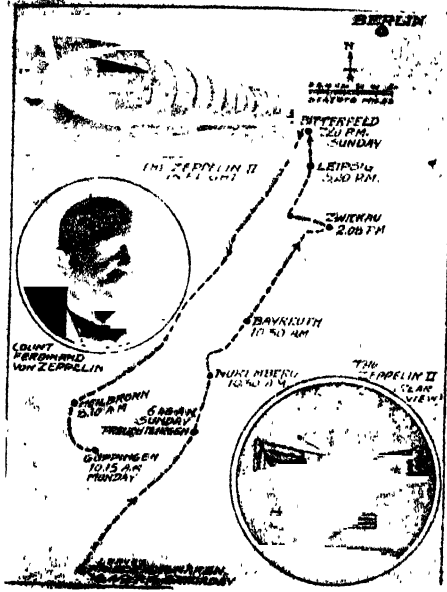
কাউন্ট্ জেপেলিন

সর্ব্বদাই সমবেগে সমান অবস্থায় প্রবাহিত হইত। নিকটেই একটি বালুকা-পর্ব্বত হইতে ঝাপ দিয়া ইঁহারা তথাকার ঐ বায়ুপ্রবাহে উড়িয়া ভাসিয়া বেড়াইতে পারিতেন; কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় যদিই বা তাঁহাদের ব্যোমযান নিয়ে পতিত হইত, তাহা হইলেও কোমল বালুকারাশি থাকায় তেমন মারাত্মক অনিষ্ট হইত না। এই প্রকার সুবিধার অভাবে অন্যান্য কত উদ্যোগীই না অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন! রুক্ষ প্রচণ্ড বায়ুবেগে বিতাড়িত হইয়া কত উদ্যোগী পুরুষই না প্রস্তরময় কঠিন ভূমিতে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন!

ক্রমাগত উড়িতে উড়িতে ইঁহারা বায়ুস্রোতের প্রতিক্রিয়ার সহিত এতদূর পরিচিত হইয়াছিলেন যে, কিরূপ বায়ুপ্রবাহে কিরূপ ভাবে ব্যোমযানকে পরিচালিত করিলে, তাহা বিপথে যাইবে না—কিংবা বায়ুবেগে উল্‌টিয়া যাইবে না, ইত্যাদি বিষয়ে ইঁহারা আশ্চর্য্যরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা কিটি হকে (Kitty Hawk) ১৯০২, অক্টোবর মাসে ৬২২ ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আকাশে এরূপে কেহই এতদূর উড়িতে পারেন নাই।

এইরূপে ব্যোমবিহার কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া, তাঁহারা পরবৎসর একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ "এরোপ্লেন" নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন। এই ব্যোমযানটির পরিচালনার নিমিত্ত উহাতে একটি মোটর-ইঞ্জিন সংযুক্ত করিলেন। ইহাই বিজ্ঞানজগতের পেট্রোল-পরিচালিত প্রথম ব্যোমযান। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে ইহা নির্ম্মিত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহার আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে ইঁহারা যে এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিলেন, উহা বিশেষ সন্তোষজনক হইল, বৈজ্ঞানিক জগতে রাইটভ্রাতাদের এই যন্ত্র তখনকার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল। কিন্তু মোটর ইঞ্জিনের যথোচিত উন্নতির অভাবে এরূপ সুন্দর যন্ত্র হইতেও তেমন সুফল প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর, ইঁহারা ৩৮ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে ২৪ মাইল উড়িয়া বৈজ্ঞানিক জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিলেন। দেশে বিদেশে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। রাইট ভ্রাতৃগণ আপনাদের আবিষ্কারের এরূপ প্রচার পছন্দ না করিয়া, তাঁহাদের প্রকাশ্য পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের মধ্যে তাঁহারা ১১, ১২, ১৩, ১৫½, ২০¾ ও ২৪¼ মাইল আকাশে বিচরণ করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তাঁহারা ৯৫বার আকাশে উড়িয়াছিলেন এবং ঘণ্টায় ৩৮ মাইল বেগে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।—নানারূপ আকস্মিক বিপৎপাতেও ইঁহাদের অদম্য উৎসাহের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

রাইট্ ভ্রাতৃগণ এই সময় তাঁহাদের যন্ত্রের স্বত্ব বিক্রয় করিবার জন্য য়ুরোপে গমন করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে য়ুরোপেও ব্যোমযানের বিশেষ উন্নতি হইতেছিল। ফ্রান্সে আর্চ্চডিকন্ (M. Archdeacon)

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক ঐ প্রণালীতেই একটি "এরোপ্লেন" প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ইহাতে তেমন সন্তোষজনক সাফল্য হইল না। তথায় স্যান্‌টস্ ডিউমণ্ট (Santos Dumont) বহু চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে মাত্র ২০০ গজ উড়িয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে একজন নূতন ব্যোমবিহারী দেখা দিলেন; ইঁহার নাম—হেনরি ফারমেন (Henry Farman); ইনি দুর্জ্জয় সাহস, অত্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য, অদম্য অধ্যবসায় ও অসাধারণ সৌভাগ্যগুণে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম আকাশবিহারে আশানুরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি শূন্যে এক কিলোমিটার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, ২০০০ পাউণ্ডের ডিউস্ আর্চ্চডিকন পুরস্কার (Deutsch Arch Deacon Prize) লাভ করিলেন। য়ুরোপে পূর্ব্বে কেহ এতদূর আকাশ পরিভ্রমণ করিতে পারেন নাই।

এই সময় ফ্রান্সে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডিলাগ্রেঞ্জ (Delagrange), ব্লেরিয়ট (Bleriot), বার্টিন (Bartin), গ্যাস্‌টেম্‌বিড্ (Gastaimbide) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। ইঁহারা বিভিন্ন নমুনার এরোপ্লেন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ফ্রান্সে ইঁহাদের মধ্যে বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল।

ডিলাগ্রেঞ্জ্ ও ফারমেনই অধিক সফল হইলেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল; একজন অন্য জনকে অতিক্রম করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

১৯০৮, মার্চ্চমাসে ২২এ তারিখে ফারমেন দুই কিলোমিটারেরও অধিক দূর পর্য্যন্ত ব্যোমবিহার করিলেন। সেইদিনই ডিলাগ্রেঞ্জ একজন যাত্রী সঙ্গে করিয়া কিছু দূর আকাশ ভ্রমণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন; এবং এপ্রিল মাসে ৫ মাইল, জুনে ৯৳ মাইল এবং জুলাই মাসে ১১ মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া বেড়াইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন।

প্রাচীন ব্লেরিয়েট্ মনোপ্লেন্

ঐ বৎসর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে রাইট্-ভ্রাতারা এক নূতন "এরোপ্লেন" নির্ম্মান করিয়া ৭ মাইল দূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং সেই যন্ত্রে একজন সহকারীও গ্রহণ করা যাইত। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহাদের উদ্যম স্থগিত রহিল।

৬ই জুলাই ফারমেন পুনরায় ২০ মিনিট ১৯ সেকেণ্ড সময় আকাশে অবস্থান করিয়া, এ বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া লিপিবদ্ধ রহিল। কিন্তু এ দিন ডিলাগ্রেঞ্জ ২৯ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত আকাশে ভ্রমণ করিয়া শূন্য বিচরণ শক্তিতে সকলকে অতিক্রম করিলেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত জয়মালা তাঁহারই কণ্ঠে শোভা পাইতে লাগিল।

১৯০৮ সাল বিজ্ঞান-জগতে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ব্যোমযানের অতি আশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল এবং নানা নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিতে লাগিল। আমেরিকার রাইট্ ভ্রাতারা তাঁহাদের শূন্য-বিচরণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া, এক ভ্রাতা (Wilber Wright) প্রতিযোগিতার জন্য ফ্রান্সে আগমন করিলেন। অন্য ভ্রাতা (Orville Wright) আমেরিকাতেই অবস্থান করিলেন; এইরূপে উভয় দেশে একযোগে একসঙ্গে তাঁহাদের অধ্যবসায় ও প্রতিভার নিদর্শন দেখাইবার কল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উইলবার ৮ই আগষ্ট ফ্রান্সে

সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ্ সামরিক এয়ারশিপ্

আকাশে প্রথম উড্ডীন হইলেন; কিন্তু ১ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড কাল-মাত্র শূন্যে অবস্থান করিয়াই—নিম্নে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ইঞ্জিনে অপ্রত্যাশিত গোলযোগ বাধিয়াছিল; এই মাসে সর্ব্বপ্রধান শূন্যবিহারও ৮ মিনিট ১৩ সেকেণ্ডের অধিক স্থায়ী হয় নাই। এইরূপে তিনি ফ্রান্সের প্রতিযোগীদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া, পরে, সেপ্টেম্বর মাসে ইঞ্জিনের অনেকটা উন্নতি করিয়া ১৯ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড শূন্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমেরিকার প্রস্তুত তাঁহার ব্যোমযান ফ্রান্সের বায়ব-অবস্থার তেমন অনুকূল হয় নাই; ইঞ্জিনের বার বার গোলযোগে তাঁহাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

অনুভ্রাতা অরভাইল আমেরিকার সামরিক কর্ম্মচারীদের সমক্ষে ৯ই সেপ্টেম্বর ৫৭ মিনিট ৩১ সেকেণ্ড সময় পর্য্যন্ত আকাশে অবস্থান করিলেন এবং সেই দিনই বারান্তরে ১ ঘণ্টা ৩ মিনিটকাল শূন্যে ভ্রমণ করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। ঐ দিনই পুনরায় তিনি একজন যাত্রীর সহিত ৬ মিনিট আকাশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর উইলবারও ফ্রান্সে ৩৯ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডকাল আকাশ-বিহার করিয়া ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অতিক্রম করিলেন। এইরূপে আমেরিকার রাইট্-ভ্রাতৃদ্বয় পৃথিবীর সমস্ত প্রতিযোগীদের অতিক্রম করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বিজয়মাল্য লাভ করিলেন;—চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের গৌরবকাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল! কিন্তু অকস্মাৎ এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাঁহাদের অপ্রতিহত উৎসাহে বিঘ্ন জন্মিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার ফোর্ট মায়ার্সে (Fort Myers) আকাশপর্য্যটন-কালে দুইটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়; তাহাতে বিখ্যাত ব্যোমবিহারী লেফ্টেনেন্ট সেল্ফ্রিজের জীবনান্ত ঘটে এবং অরভাইল রাইট গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। অরভাইল, লেফ্‌টেনেণ্ট সেল্‌ফ্রিজকে সঙ্গে লইয়া আকাশে উড়িয়াছিলেন; অকস্মাৎ ব্যোমযানের একটি দাঁড় (propeller) স্থানচ্যুত হইয়া হইলে (rudder) আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই ব্যোমযানটি প্রবলবেগে নিম্নাভিমুখী হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে সাঙ্ঘাতিকরূপে প্রতিহত হয়; "এরোপ্লেনটি" একেবারে চুরমার হইয়া যায় এবং সেল্‌ফ্রিজের শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হয়। এই প্রকারে ব্যোমবিহার চেষ্টায় একে একে পাঁচটি জীবন উৎসর্গীকৃত হইল।*

ফ্রান্সে এই শোচনীয় সংবাদ পৌঁছিলে উইলবার নিতান্ত শোকার্ত্ত এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল তিনি আকাশ-ভ্রমণ স্থগিত রাখিলেন—কিন্তু ২১এ সেপ্টেম্বর তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষকদিগকে ও উৎসাহদাতাদিগকে, শূন্য-বিচরণ-ক্ষমতাসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করিবার নিমিত্ত, তিনি পুনরায় আকাশে উড্ডীন হয়েন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক উন্নতি প্রদর্শন করিয়া ১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শূন্যে অবস্থান করেন। এইরূপে ফ্রান্সের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক নূতন শক্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় ৫২ মাইল অতিক্রম করিলেন। ইহার পর, তিনি ক্রমাগতই অধিকতর শক্তি প্রদর্শন

* The Victims of the Flying Machine :—

[1] Letour (1854), [2] De Groof (1854), [3] Lilienthal (1896), [4] Ritcher (1899), & [5] Selfridge (1908).

'রাইট্‌ এরোপ্লেনের গঠন-প্রণালী

করিয়া ফ্রান্সবাসীকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন; এবং ২০,০০০ পাউণ্ডের ডিউস্‌ পুরস্কার (Deutsch Prize) প্রাপ্ত হইলেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে উইলবার ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটকাল আকাশে অবস্থান করিয়া অন্যান্য সকলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিলেন।

ইহার পর এই যন্ত্রের স্বত্ব ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন।

রাইট ভ্রাতাগণ "বাইপ্লেন" * যন্ত্রে আকাশভ্রমণ করিয়াছিলেন; ১৯০৯ সালে "মনোপ্লেনের" আবির্ভাব হইল। এই সময় লণ্ডনের 'ডেলি মেল্‌' (London, Daily Mail) সংবাদপত্র, ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যোম-বিহারী আকাশপথে প্রথম ইংলিশ-প্রণালী (English Channel) অতিক্রম করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ১০০০ পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করিবেন। এই পারিতোষিক লোভে সেই বৎসর জুলাই মাসের ২৫এ ব্লেরিয়ট (Bleriot) নামক একজন ফরাসী ব্যোমচারী, শূন্যপথে ইংলিশ-চেনেল অতিক্রম করিয়া, ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সসম্মানেই ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন; প্রণালীটি অতিক্রম করিতে তাঁহার ২১ মিনিট ২৭ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল। ফরাসী উপকূলস্থ বারকোয়ে (Barques) হইতে ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটের সময় তিনি আকাশে উড্ডীন হন। এই অদ্ভুত কর্ম্মের জন্য তিনি ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যে সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অনেক বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষকেও সেরূপ সম্মানলাভ করিতে দেখা যায় না। *

ইহার অল্পদিন পরেই হিউবার্ট লেথাম (Hubert Latham) ইংলিশ্‌-চেনেল পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া সাগরজলে পতিত হ'ন। ভাগ্যক্রমে নিকটে অবস্থিত একখানি জাহাজ তাঁহাকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করে।

কিছুদিন পরেই ডেলি মেল্‌ আবার ঘোষণা করেন— যিনি লণ্ডন হইতে মেনচেষ্টার পর্য্যন্ত, পথে মাত্র একবার থামিয়া, শূন্যপথে গমন করিতে পারিবেন—তাঁহাকে ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। ১৯১০, সালের ২৭এ এপ্রিল পলহন (Paulhan) নামক একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ফরাসী ব্যোমবিহারী এবং গ্রেহাম্‌ হোয়াইট (Graham White) নামক একজন ইংরেজ, উক্ত পুরস্কারের প্রতিযোগী হইয়া আকাশে উড্ডীন হইলেন। এই প্রতিযোগিতায় পলহন অল্পের জন্য গ্রেহামকে পরাজিত করিয়া ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিলেন। ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পলহন বলিয়াছিলেন—ভবিষ্যতে তিনি দশ

* বায়ু অপেক্ষা ভারি ব্যোমযান দুই প্রকার (১) এরোপ্লেন (২) হাইড্রো-এরোপ্লেন। এরোপ্লেন আবার কয়েক প্রকারের নির্ম্মিত হইয়া থাকে [১] বাইপ্লেন—ইহার পাখাগুলি উপর্য্যুপরি দুইস্তরে সন্নিবিষ্ট থাকে; [২] মনোপ্লেন—পক্ষীর ন্যায় দুইদিকে দুইটি পাখা থাকে; [৩] ট্রাইপ্লেন- দুইভাগে পাখাগুলি তিনস্তরে সন্নিবিষ্ট; এই প্রকার যন্ত্রের এখন প্রচলন নাই। হাইড্রো-এরোপ্লেন—এরূপ গুণসম্পন্ন যে, ইহারা জল হইতে উড্ডীন হইতে পারে এবং জলেই অবতরণ করিতে পারে; এতদ্ভিন্ন এরোপ্লেনের সহিত ইহাদের অন্য কোনও পার্থক্য নাই।

* Aerial Navigation of To-day by C. C. Turner, Chap. v, p. 254.

হাজারের চতুর্গুণ পরিমাণ অর্থের জন্যও এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

এই প্রতিযোগিতার পরে, ডেলি মেল, ব্রিটেন্ দ্বীপ পরিভ্রমণের (Circuit of Britain) জন্য, পুনরায় ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। ব্রুকল্যাণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমান্বয়ে হেন্ডন, হিরোগেট্, নিউকেসল, এডিনবরা, ষ্টারলিং, গ্লাস্গো, কারলাইল্, মেনচেষ্টার, ব্রিষ্টল্, এক্সিটার, ব্রাইটন প্রভৃতি স্থানে এক একবার অবতরণ করিয়া ব্রাইটন্ হইতে পুনরায় ব্রুকল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হইবে—এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৯১১, জুলাই মাসে ১৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বী এই কার্য্যে প্রতিযোগিতার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কার্য্যকালে ফরাসী নৌবিভাগের কর্ম্মচারী লেফ্‌টেনাণ্ট কনো (Conneau)—বিমান-বিহার-ক্ষেত্রে ইনি বোমণ্ট (Beaumont) বলিয়া পরিচিত—এবং ঐদেশেরই ভেড্রাইনস্ (Vedrines) নামক একজন যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ, এই দুইজনের মধ্যেই প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইয়াছিল। ভেড্রাইনস্ পথ ভুলিয়া যাওয়ায়, কনোই জয়ী হইলেন।

ইহার পর, এইরূপ আরও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হইয়াছিল। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে, শূন্যবিজ্ঞানে অসম্ভব রূপ উন্নতি ঘটিয়াছে। যুদ্ধকার্য্যে ব্যোমযানের অসাধারণ কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া য়ুরোপীয় জাতিবৃন্দ নিজ নিজ শক্তিসাধনানুসারে ব্যোম-বাহিনী নির্ম্মাণকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। যাহাতে, যুদ্ধকালে এইগুলির যথেষ্ট সহায়তা লাভ করা যাইতে পারে, গত দুইতিন বৎসর তাহারই চেষ্টা চলিতেছিল।

"এরোপ্লেনে"র যাবতীয় উন্নতি গত দশ বৎসরের ভিতর সংসাধিত হইয়াছে। ক্রমেই এগুলির অধিকতর উন্নতি হইতেছে; এবং, আশা হয়, ভবিষ্যতে এরোপ্লেনযোগে মানুষের অনেক দুরূহ কার্য্য সাধিত হইবে।

১৯০৮ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে এরোপ্লেনযোগে দূরত্ব, সময়, গতি ও উচ্চতা বিষয়ে কে কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, বিচার করিতে গেলে, বলিতে হইবে—
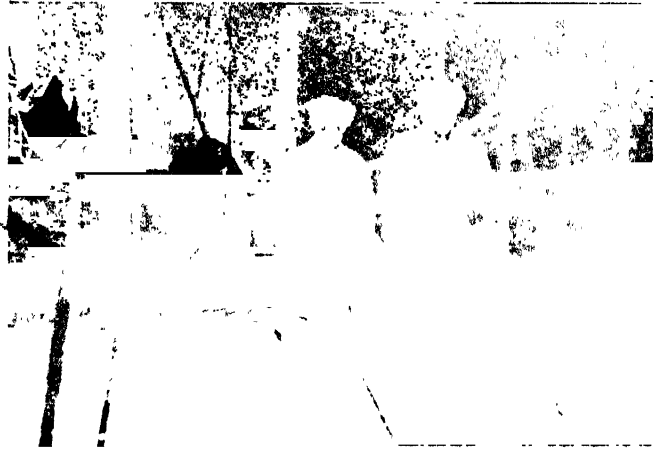
রাইট্ এরোপ্লেনে উইলবার রাইট্ এবং জনৈক আরোহী

দূরত্ব	সময়	গতি	উচ্চতা
৫৬ মাইল	১— ঘণ্টা	এক ঘণ্টায় ৮০ মাইল	১৫০ ফিট
উইলবার রাইট	উইলবার রাইট	ব্লেরিয়ট	উইলবার রাইট

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কিরূপ ভাবে ব্যোমযানের উন্নতি সংঘটিত হইতেছে। এইরূপ আশ্চর্য্য উন্নতির কথা ভাবিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, য়ুরোপ হইতে এরোপ্লেনযোগে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকা ভ্রমণ করিবার যে কল্পনা চলিতেছে, তাহা আদৌ দুরাশা নহে।

এয়ার-শিপ

'এরোপ্লেনের' কথা বলিলাম; এখন দ্বিতীয় প্রকার ব্যোমযানের কথা বলি। এ সম্বন্ধে ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' (পৃঃ ৪০৬) "বিমান বিহার" প্রবন্ধে, অনেক কথাই বিবৃত হইয়াছে।

তখনকার চলৎশক্তিহীন এবং হালশূন্য বেলুনগুলিকে আয়ত্তে রাখা বড় কঠিন হইত। বায়ুস্রোতের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া ব্যোমযান ইতস্ততঃ পরিচালিত হইত—এ বিষয়ে বিমানচারীর কোনও হাত ছিল না। কিন্তু 'পেট্রোল মোটর' আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বপর্য্যন্ত এরূপ অসুবিধা দূরীকরণের কোনও উপায় কেহই স্থির করিতে পারেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে জেনারেল মাস্‌নিয়ারের

ফরাসী সামরিক এয়ারশিপ্ "পাটি"

অপেক্ষাকৃত উচ্চে উড্ডীন হইতে হইলে, অল্প বায়ু ভরিয়া লইলেই চলে ; কিংবা, শূন্যে অবস্থান কালে, বাহিরের থলে হইতে বাতাস আবশ্যকমত বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি গিফার্ড (Henri Giffard) নামক একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার লম্বাকৃতি একটি বেলুন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহাতে দাড় চালাইবার জন্য তিনি অশ্বশক্তি সম্পন্ন (3 H. P.) * একটি ষ্টিম-ইঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। ঘণ্টায় ৩৪ মাইল বেগে ইহা উড়িতে পারিত সত্য, কিন্তু ব্যোমযানটি তেমন মজবুৎ হয় নাই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিক দুর্ঘটনায় ইহা নষ্ট হইয়া যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেয়েনলিন (Haenleen) নামক একজন বৈজ্ঞানিক গ্যাস্-ইঞ্জিনের ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদিও তিনি যথাযথ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফললাভ করিতে পারেন নাই বটে, তথাপি তিনি যে ব্যোমযানের অতি প্রয়োজনীয় উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি বেলুনের যে সুন্দর আকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত ফরাসীগণ সময় সময় সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন।

আবার কিছুদিন পরে—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রেনার্ড এবং ক্রেব্‌সের (Renard & Krebs) অত্যাশ্চর্য্য উন্নতিসম্পন্ন

(General Musnier) বেলুন-নির্ম্মাণ-প্রণালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী সময়ে, তাঁহার প্রণালী অনুসরণ করিয়াই, বেলুনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বেলুনটি ডিম্বের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ছিল এবং গ্যাস্ ব্যাগটির (Gasbag) ভিতরে অন্য একটি ছোট যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল—উহাকে গ্যাসপূর্ণ করিয়া, বাহিরের বড় আবরণটিতে বাতাস ভরিয়া দেওয়া হইত। এই প্রকারে ক্ষুদ্র বেলুনের (Balvonet) সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে বেলুনের উত্তোলন-ক্ষমতা ইচ্ছানুযায়ী বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বালি (sand) ব্যবহার হইত ; ইংরেজীতে তাহাকে ballast বলে। কতকগুলি বালি সঙ্গে লওয়ায় বেলুনের ওজন অধিক হইত ; পরে, বালি ফেলিয়া দিয়া, বেলুনকে আবশ্যকমত হাল্কা করা যাইত—সুতরাং বেলুনও সেই কারণে অধিকতর উচ্চে উড্ডীন হইতে পারিত। এতদ্ভিন্ন, বেলুনের গ্যাস্ ছাড়িয়া দিয়া—উহার ওজন বৃদ্ধি করিয়া—ইচ্ছানুরূপ নিম্নে অবতরণ করা হইত। বেলুনে আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে বড় থলের ভিতর যে বাতাস ভরিয়া দেওয়া হইত, তাহাই ballastরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ছোট থলেটি গ্যাস্‌পূর্ণ করিয়া, বাহিরের বড় বেলুনটিতে বাতাস ভরিয়া দেওয়ায়—বাতাসের ভারে ব্যোম্‌যানটির ওজনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার উর্দ্ধগমন-ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ সেই বাতাসের চাপে ভিতরের গ্যাসপূর্ণ বেলুনেটটিও কতকটা সঙ্কুচিত হয় ; কাজেই উহার উর্দ্ধগমন-ক্ষমতা আরও কমিয়া যায়।

* H. P. বা 'অশ্ববল'—যন্ত্রাদির একটা নির্দ্দিষ্ট শক্তির নিদর্শন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Watt কষিয়া মাজিয়া দেখিয়াছিলেন যে, লণ্ডনের এক একটা মালগাড়ীর ঘোড়া প্রতি মিনিটে ৩৩,০০০ পৌণ্ড ওজন মাল এক ফুট টানিতে সক্ষম ; অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের বল বা শক্তি প্রতি মিনিটে ৩৩,০০০ ফুট-পৌণ্ড। এইরূপে ষ্টীম-এঞ্জিনের শক্তি স্থির করিতে হইলে—

$$\frac{\text{চাপ} \times \text{কালি} \times \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{সংখ্যা}}{৩৩,০০০}$$ —এই ভাগফল

হইতে, তাহার এক-দশমাংশ বাদ দিলে, তাহার অশ্ববল স্থিরীকৃত হয়।

চাপ অর্থে, প্রতিবর্গ ইঞ্চে সেই বাষ্প-যন্ত্রের নলান্তর্গত দণ্ডের উপর যে চাপ পড়ে, পৌণ্ডহিসাবে তাহার পরিমাণ ; কালি অর্থে, ইঞ্চ হিসাবে উক্ত দণ্ডের কালি ; দৈর্ঘ্য অর্থে, ফীটহিসাবে উক্ত দণ্ডাঘাতের দৈর্ঘ্য ; সংখ্যা অর্থে, প্রতি মিনিটে প্রতি দণ্ডসংঘাতের সংখ্যা।

—'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক।

"এয়ারশিপ" নির্ম্মাণের কথা অবগত হওয়া যায়। হোয়েনলিনের মতই ইঁহারা "গ্যাসবেগটি"র (gasbag) আকৃতি করিয়াছিলেন; কিন্তু, এতদ্ব্যতীত, তাহাতে একটি দৃঢ় সংবদ্ধ "কার" (car), বা যাত্রী ও পরিচালকের বসিবার স্থান, সংযুক্ত করিয়াছিলেন—ইতঃপূর্ব্বে কেহ তাহা করেন নাই। এই ব্যোমযানটি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর হইলেও, ইহাতে rudder) ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিদ্যুৎ-পরিচালিত মোটরে ইহার দাঁড়গুলি পরিচালনা করা হইত। যথোচিত গুণসম্পন্ন ইঞ্জিন ব্যবহার সম্ভব হইলে এই "এয়ারশিপের" কোনও ত্রুটি থাকিত না। অন্যান্য সকল বিষয়েই ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। ঘণ্টায় ইহা ৬ মাইল যাইতে পারিত।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড্ স্কোয়ার্জ নামক (David Schwartz) নামক একব্যক্তি এলিউমিনিয়াম ধাতু সাহায্যে একটি "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনিই "রিজিড্ এয়ারসিপের" প্রথম প্রবর্ত্তক।* স্কোয়ার্জের করুণ ইতিহাস বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার নির্ম্মিত প্রথম ব্যোমযানটি গ্যাসপূর্ণ করিবার সময় ফাটিয়া যাওয়ায় উপযুক্ত অর্থাভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি অন্য একটি যন্ত্রনির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অন্য একটি মনোমত ব্যোমরথ নির্ম্মাণ করিলেন—ইহাতে ১২ অশ্বশক্তিসম্পন্ন (12 H. P.) একটি ইঞ্জিন সংযোজিত হইল।

কয়েকমাস পর্য্যন্ত মোটরপরিচালিত যন্ত্রে তিনিই একমাত্র আকাশ-পর্য্যটক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। সেই বৎসরেই ওয়ালফার্ট (Walfert) নামে একজন

"ভিলি ডি প্যারী"র বন্দর ত্যাগ

জার্ম্মান ব্যোমচারী—একটি লম্বাকৃতি ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র মোটর ইঞ্জিন সংযোজিত করিলেন। আকাশ-বিচরণ কালে একদিন অকস্মাৎ মোটরের পিট্রোলে (petrol) আগুন ধরিয়া যায়; তাহারই শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ ওয়ালফার্ট এবং তাঁহার সহযাত্রীর জীবনলীলা সমাপ্ত হইল।

এই দুর্ঘটনায়ও বিচলিত না হইয়া স্কোয়ার্জ তাঁহার আরব্ধকার্য্যের সমুন্নতিসাধনে ব্যাপৃত রহিলেন। ১৮৯৭ সালে নবেম্বর মাসে তিনি তাঁহার যন্ত্র সাহায্যে অতি বেগবান বায়ুর বিরুদ্ধেও বহুদূর শূন্যে উড্ডীন হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর বিরুদ্ধে গমন করিতে করিতে তাঁহার ব্যোমযানের দাঁড়গুলি (Propellers) যথোচিত দৃঢ়তার অভাবে স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িল—এবং কিছুকাল বায়ুস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে—ব্যোমযানটি সবেগে নিম্নে পতিত হইল। ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বসাধনার মূল, সকল পরিশ্রমের ফল ব্যোমযানটি প্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হইল। এই দুর্ঘটনায় স্কোয়ার্জের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর তিনি পূরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার সমস্ত আশাভরসার এইখানেই যবনিকাপাত হইল—তিনি মর্ম্মে দারুণ আহত হইলেন। অধিক দিন আর তাঁহাকে সে ভগ্নহৃদয়ের ভারবহন করিতে হইল না; শীঘ্রই মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে সকল দুঃখ-অশান্তির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তিধামে লইয়া গেল। এইরূপে পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্য-বিস্তার-কল্পে আর

* তিন প্রকার "এয়ারসিপ" প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতুনির্ম্মিত সুদৃঢ় কাঠামোর (Frame) উপর সূক্ষ্ম ধাতুপত্রে যে গুলির "গ্যাস্‌ব্যাগ" ছাউনী করা হয়—তাহাদিগকেই "রিজিড্ এয়ারসিপ" (Rigid Airship) বলে। "সেমিরিজিড্" ও "নন্‌রিজিড্" এয়ারসিপের (Semirigid and Non-rigid Airships) কথা অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে।

উড্ডীয়মান 'ফার্ম্মান্' এরোপ্লেন্

এতদ্ভিন্ন উত্থান কিংবা অবতরণ এবং পরিচালনা সম্বন্ধে নানা-প্রকার সুবন্দোবস্ত ছিল।

কনষ্ট্যান্স হ্রদের (Lake Constance) উপরে ইহার শক্তি পরীক্ষা করা হইত। ১৮৯৯ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি, তাঁহার 'এয়ারসিপ' অনেকবার আকাশে উড্ডীন হইয়া, ইহার দোষগুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; ফলে, ইহার এমন কতকগুলি দোষ বাহির হইল, যাহা সারিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। ইহা খুব অধিক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু ইহার ঘণ্টায় ১৬ মাইল ছুটিবার শক্তি ছিল। ইহার নির্ম্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার সফলতা সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চয়তা না থাকিলেও সেসময় জর্ম্মন জাতি প্রভৃত অর্থদ্বারা তাঁহাকে যেরূপ ভাবে সাহায্য করিয়াছিল—সে জন্য উহাদিগকে যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে হয়। তিনি প্রথম প্রথম পদে পদে বিফলমনোরথ ও বৈদেশিকগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছিলেন এবং অসংখ্য প্রতিযোগীর সহিত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

একজন অক্লান্তকর্ম্মা বীরপুরুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

ইহার পরই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত কাউণ্ট জেপ্‌লিন (Count Zeppelin) তাঁহার নূতন প্রণালীর ব্যোমযান লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। এই ক্ষণজন্মা জার্ম্মান আবিষ্কর্ত্তার নাম চির স্মরণীয় থাকিবে। তিনি যে ব্যোমরথ প্রথম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ম্মাতাদের অপেক্ষা তাহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। একটি ধাতু-নির্ম্মিত কাঠামোর (frame-work) ভিতর কতকগুলি 'গ্যাস্‌ব্যাগ' সন্নিবেশিত করিয়া, তদুপরি আর একটি বৃহত্তর সূক্ষ্ম ধাতুর পাতে ছাউনি দ্বারা আবৃত করিয়া তিনি ইহা নির্ম্মাণ করেন। এইরূপ করায়, বায়ুপূর্ণ করিবার জন্য ভিতরে কতকটা স্থান শূন্য থাকে এবং ভিতরের "গ্যাস্‌ব্যাগ"গুলি যাহাতে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে বাহিরের কাঠামোটি নির্ম্মিত হয় এবং আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে না। এতদ্ভিন্ন "গ্যাস্‌ব্যাগ"গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় অধিক থাকায়, কোনও দুর্ঘটনায় দুই একটি গলে নষ্ট হইলেও ব্যোমযানটির সহজে নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। অন্যান্য নানা বিষয়েই ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহার আকার অতি বৃহৎ—প্রায় ৩০০ শত ফিট লম্বা। উহাতে দুইটি "কার" (car) সংলগ্ন থাকে; প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মোটর-শক্তি-পরিচালিত দাঁড় (propeller) এবং তাহাদের প্রত্যেকটির চারিটি করিয়া পাখা থাকিত।

এদিকে ফ্রান্সে সেণ্টস্ ডিউমণ্ট (Santos Dumont) নামক একজন ব্রেজিলিয়ান আবির্ভূত হইলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোটরপরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেলুন লইয়া আকাশভ্রমণের চেষ্টা করিতেছিলেন। পরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি লম্বাকৃতি 'এয়ারসিপ' নির্ম্মাণ করিয়া, উহার সাহায্যে আকাশপর্য্যটনে অনেকটা সফলতা লাভ করেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারীতে ইফেল টাওয়ারের (Eiffel Tower) চতুর্দ্দিক বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া ১০০,০০০ ফ্রেঙ্কের ডিউস্ প্রাইজ (Deutsch Prize) প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। তাঁহার যন্ত্র "নন্ রিজিড্" শ্রেণীর ছিল এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ছোট ১৪টি "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটির যন্ত্র পূর্ব্বনির্ম্মিত "এয়ারসিপ"গুলি অপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে

"রিপব্লিকে"র ডেক্

নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও রাজকীয় সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাহার সমর্থন করিলেন না।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন ব্যোম বিহারী আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—এ বিষয়ে এই বৎসরটিকে বড়ই দুর্ব্বৎসর বলিতে হয়। সিভেরোর (Severo) এয়ারসিপ প্যারীর বহু উচ্চে শূন্যে অবস্থানকালে অকস্মাৎ বিস্ফুটিত হইয়া যায়—তাহারই শোচনীয় পরিণামে তিনি এবং তাঁহার সাহায্যকারীর মৃত্যু ঘটে।

বেরন ব্রেড্স্কি (Baron Bradsky) প্যারীর সন্নিকটে শূন্যে উড্ডীন হইয়া, তাঁহার যন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। বেলুন হইতে ঝুলান 'কার'টির এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে গমনকালে অধিক জোর পড়ায় 'কার'টির বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া যায়। ফলে শূন্য হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া, তাঁহার জীবনাবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহচরও প্রাণত্যাগ করেন।

এই উভয় প্রকার ব্যোমযানেই 'কার' গুলি রজ্জু সাহায্যে 'গ্যাসব্যাগের' সহিত আবদ্ধ করা হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি দুর্ঘটনা হওয়ায় এই শ্রেণীর ব্যোমযানের একটি দোষ বাহির হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ বিজ্ঞানজগতে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই বৎসর ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সামরিক বিভাগে প্রথম ব্যোমযানের প্রচলন করেন। ফরাসী দেশে এক্ষণে যে সকল "এয়ারসিপ" বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লিবডি (Lebaudy Brothers) ভ্রাতৃগণের "এয়ারসিপের" অনুকরণে নির্ম্মিত; ইহা 'সেমি-রিজিড্' (Semi-rigid) প্রকারের। লিবডি ভ্রাতৃগণই এই "সেমিরিজিড্" এয়ারসিপের প্রবর্ত্তক। এই বৎসর ফ্রান্সে যে দুই'টি দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা 'নন-রিজিড্' এয়ারসিপে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীর ব্যোমযানের ভঙ্গপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়াই অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে "সেমিরিজিড" এয়ারসিপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এবং ফ্রান্সে এই শ্রেণীর "এয়ারসিপ"ই বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে।

১৯০২, অক্টোবর, এবং ১৯০৩, নবেম্বরের ভিতর লিবডিদের "এয়ারসিপ" ৫০ বার আকাশভ্রমণ করিয়াছিল; ঘণ্টায় ২২ মাইল পর্য্যন্ত তাঁহাদের "এয়ারসিপ" ছুটিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৩ নবেম্বর মাসে, শূন্য হইতে অবতরণ করিবার সময় অকস্মাৎ একটি বৃক্ষে প্রতিহত হইয়া এই "এয়ারসিপটি" একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়।

তাঁহাদের "এয়ারসিপের" সফলতায় আনন্দিত হইয়া এবং ফ্রান্সের সামরিক কর্ম্মচারিবর্গের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া, লিবডি-ভ্রাতৃগণ অন্য একটি বৃহত্তর "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণ করিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের সমর-সচিব (Minister of war) নানা প্রকার পরীক্ষাদির পর লিবডি-ব্যোমযান যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিবেন, স্থির করিলেন। মিসিমের (Missim) কারখানা হইতে চেলঁ (Chalons) পর্য্যন্ত ১৩০ মাইল ইহা তিনবারে ভ্রমণ করিবে, এরূপ স্থির হইল। প্রথম দিবস ঘণ্টায় ২২ মাইল বেগে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে ইহা ৫৯ মাইল ভ্রমণ করিল। দ্বিতীয় দিবস ৪৭ মিনিটে ১০½ মাইল এবং তৃতীয় দিবসে ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে ৬১ মাইল গমন করিল। তৃতীয় দিবস বায়ুবেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল। কিন্তু আবার নির্দ্দয় ভাগ্যলক্ষ্মীর প্ররোচনায় তাঁহার আকাশ-

ফ্রেডিক্‌সেভেন্‌ নগরের উপর উড্ডীয়মান্‌ জেপ্‌লিন্‌

৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে, ঘণ্টায় ২২২ মাইল বেগে ছুটিয়া, ইহা ভার্ডুনে পৌছিল; প্রবল বায়ু-বেগের বিরুদ্ধেই ইহাকে যাইতে হইয়াছিল।

এ স্থানেও উপযুক্ত আশ্রয় গৃহের অভাবে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। ১৯০৭, নবেম্বর মাসে ভীষণ ঝড় হয়। 'প্যাট্রি'কে উপযুক্ত আশ্রয়-স্থানে রক্ষা করিতে না করিতেই এক প্রচণ্ড বাত্যা-বিতাড়নে—বন্ধন রজ্জু ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া—উহা বায়ুপ্রবাহে ছুটিয়া চলিল; এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, আইরিস্‌ সাগর ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া, আয়র্লণ্ডের উপর দিয়া অবশেষে আটলাণ্টিক্‌ মহাসাগরে সলিলসমাধি লাভ করিল।

এই দারুণ ক্ষতিতে সমস্ত ফরাসীদেশ শোকাকুল হইল। যাহা হউক, এই সময় ফরাসীদেশে দুইজন অক্লান্তকর্ম্মী বৈজ্ঞানিক ব্যোমযান-নিৰ্ম্মাণে আশ্চর্য্য উন্নতি প্রদর্শন করিতেছিলেন—ইঁহাদের 'এয়ারসিপে'র মধ্য হইতে হেনরি ডিউস্‌-নির্ম্মিত (Henri Deutsch) Ville de Paris নামক একটি "এয়ারসিপ" ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সমর-বিভাগের জন্য গ্রহণ করিলেন। ইহার মধ্যে উঁহাদের 'রিপব্লিক' (Republique) নামক নূতন শূন্য-যুদ্ধ-জাহাজও প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল।

ডিউসের "এয়ারসিপ" ঘণ্টায় ২১ মাইল বেগে ৭ ঘণ্টা ৬ মিনিটে ১৪৬ মাইল ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জর্ম্মানীতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্ট জেপেলিন (Count Zeppelin) সমুন্নত প্রণালীতে তাঁহার দ্বিতীয় এয়ারসিপের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ইহাকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার দোষও লক্ষ্য হয়। এই সকল দোষ সংশোধন করিবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝড়ে ব্যোমযানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। সেই বৎসরই মেজর পার্সিভেল (Major Parceval) নামে আর একজন সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মন

বিজয় সম্পূর্ণ হইল না। তৃতীয় দিবস শূন্য হইতে অবতরণ করিবার সময়—'এয়ারসিপ'টি একটি বৃক্ষে প্রতিহত হইয়া পুনরায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আশ্রয়-গৃহ প্রস্তুত না করিয়া "এয়ারসিপ"-নিৰ্ম্মাণই এইরূপ দুর্ঘটনার কারণ।

ব্যোমযানটির যে যে ক্ষতি হইয়াছিল—তাহা সত্বরই সংস্কার করা হইল—এবং ১৯০৫, অক্টোবর মাসে ঐ 'এয়ারসিপে' ফরাসী দেশের সমরসচিব শূন্যপর্য্যটন করিয়া আসিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্যূন ৭০ বার সেই ব্যোমযানটি আকাশে উড়িয়াছিল। অতঃপর উহা সত্য সত্যই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে ব্যোমযান-ব্যবহার ইহাই প্রথম।

ময়র্শ সহরে লিবডি ব্যোমযান নির্ম্মিত হইত, অতঃপর এই স্থান ব্যোমযান নির্ম্মাণের একটি বিখ্যাত কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। এই স্থানে সামরিক কর্ম্মচারীদের তত্বাবধানে, অন্যান্য 'এয়ারসিপ' নির্ম্মিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে "প্যাট্রি" নামক শূন্য-জাহাজ নির্ম্মিত হইয়া আকাশে উড্ডীন হইয়াছিল। ইহা ঘণ্টায় ২৫ মাইল ছুটিতে পারিত। অনেক উল্লেখযোগ্য উপযোগিতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া—সৈন্যবাহিনীর সহিত একযোগে অভিযান করিয়া—অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্যারী হইতে ভার্ডুন (Paris to Verdun)—(রাজধানী হইতে সীমান্ত-প্রদেশ পর্য্যন্ত) ১৫০ মাইল ভ্রমণ করিবে, স্থির হইল। ভার্ডুনেই উহা স্থায়িভাবে থাকিবে, ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল।

তাহার প্রথম "এয়ারসিপ" লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ তাঁহাদের প্রথম "এয়ারসিপ" উড্ডীন করিলেন। ইহা "ননরিজিড্" শ্রেণীর; তেমন সুনির্ম্মিত না হইলেও, ইহাতে যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং একনিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে ইংরেজদিগকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; এবং তাঁহাদের "এয়ারসিপ"-নির্ম্মাণের চেষ্টার কথাও সম্পূর্ণ গুপ্ত ছিল।

চতুর্থ জেপেলিন ও তাহার ভাসমান আশ্রয় গৃহ

উহার গ্যাস্‌ব্যাগটি চর্ম্মনির্ম্মিত এবং অত্যন্ত পুরাতন প্রণালীতে নির্ম্মিত; যন্ত্রাদিও নির্দ্দোষ নহে; বিশেষতঃ ইঞ্জিন তেমন শক্তিসম্পন্ন হয় নাই—সুতরাং ইহা বিশেষ বেগবানও হয় নাই। ১৯০৭ সালে অক্টোবর মাসে, কয়েক-বার আকাশে উড্ডীন হইবার পর, ইহার শক্তি সম্বন্ধে তেমন স্থিরনিশ্চয় না হইয়াই এই "এয়ারসিপে" অল্‌ডারসট (Aldershot) হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবার কল্পনা করা হইল। অনুকূল বায়ুতে ইহা ঘণ্টায় ৮ মাইল বেগে গিয়াছিল; কিন্তু ফিরিবার সময় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। প্রতিকূল বায়ু ভেদ করিয়া, ইহা আদৌ সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। অবশেষে পথেই এক স্থানে অবতরণ করা আবশ্যক হইল। কিছু-দিন অনুকূল বায়ুর প্রতীক্ষায় থাকিয়া অবশেষে সমস্ত যন্ত্রাদি ও গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিয়া, গাড়ী বোঝাই করিয়া, "এয়ারসিপটি" যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

ঐ বৎসরই কাউণ্ট জেপেলিন তাঁহার নির্ম্মিত "এয়ার-সিপে" কনষ্টেন্স হ্রদের উপরে ১০ ঘণ্টা-কাল বৃত্তাকারে উড়িয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে জুন মাসে ইহা অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী সুবৃহৎ Z. IV. নামক "এয়ারসিপের" নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। এই "এয়ারসিপ" সাহায্যে তিনি জর্ম্মন গবর্ণমেণ্টকে ইহার ক্ষমতা দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন বলিয়া, তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা ২৪ ঘণ্টাকাল শূন্যে ভ্রমণ করিতে পারিবে এবং জলে স্থলে নিরাপদে অবতরণ করিতে পারিবে; এতদ্ব্যতীত ইহা জর্ম্মন গবর্ণমেণ্টের অনেক গুপ্ত উদ্দেশ্যও সাধন করিতে সমর্থ হইবে। স্থির হইল, যদি তিনি ইহার উপযুক্ত গুণ প্রদর্শন করিয়া, গবর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তবে তাহা সামরিক কার্য্যের জন্য এক লক্ষ পাউণ্ডে ক্রয় করা হইবে।

১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে ১লা জুন তারিখে Z. IV ১৬ জন যাত্রীর সহিত ফ্রেডরিকসেভেনে ইহার আশ্রয় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আকাশপথে যাত্রা করিল এবং আলপ্‌স্ পর্ব্বত-মালার (Mts Alps) উপর দিয়া লুসার্ণ (Lucerne) পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ঝড় ও শিলাবৃষ্টির মধ্যেই তথা হইতে বিজয়গর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ১২ ঘণ্টা ইহাকে শূন্যে অবস্থান করিতে হয়; এই সময়ের মধ্যে ঘণ্টায় ২২ মাইল বেগে ২৭০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। পৃথিবীতে এরূপ দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্ব্বে কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

এইরূপে প্রথমেই যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়া কাউণ্ট জেপেলিন বিশেষ উৎসাহান্বিত হইলেন। এবং জুলাই মাসে ২৪ ঘণ্টা শূন্যে অবস্থান করিবার জন্য দুইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সামান্য সামান্য দুর্ঘটনায় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। জনসাধারণও তাঁহাদের

চতুর্থ জেপেলিনের ধ্বংসাবশেষ

করে। ইহা দীর্ঘে ২১০ ফীট; ইহাতে ৮০ অশ্বশক্তির (80. H P.) মোটর সংযুক্ত করা ছিল; ইহা ৯ জন যাত্রী বহন করিতে পারিত—মোট ৩০০০ পাউণ্ড ভারবহন করিবার ক্ষমতা ছিল। Z. IV. ছিল দৈর্ঘ্যে ৪৪৬ ফীট উহাতে ১২০ অশ্বশক্তির দুইটি মোটর সংযুক্ত ছিল—১৮ জন যাত্রী লইয়া উহা আকাশে উঠিতে পারিত এবং উহার মোট ৮৬০০ পাউণ্ড ভারবহন করিবার ক্ষমতা ছিল। বাহিরের বড় আবরণটির ভিতরে ১৬টি পৃথক্ পৃথক্ গ্যাস্‌ব্যাগ উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল—এবং একবারে ৮০০ মাইল পর্য্যন্ত উহা ভ্রমণ করিয়াছিল।

ভ্রান্ত ধারণাবশে প্রচার করিতে লাগিল, কাউণ্ট জেপেলিনের ২৪ ঘণ্টা আকাশ পর্য্যটনের কল্পনা আকাশকুসুম মাত্র!

১৯০৮ সালে জুলাই মাসে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিনির্ম্মিত "রিপাব্লিক" শূন্যে উড্ডীন করিলেন। ইহা ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগবিশিষ্ট ছিল, এবং ৬।৭ জন আরোহী লইয়া শূন্যে উঠিতে সমর্থ হইত।

ঐ সময়েই ইংরেজগণ তাঁহাদের পূর্ব্বনির্ম্মিত "এয়ার সিপ"টিকে নূতন আকারে বাহির করিলেন। "গ্যাস্‌ব্যাগ"টি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, এবার পূর্ব্বাপেক্ষা লম্বাকৃতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ও হইয়াছিল। "গ্যাস্‌ব্যাগ"টির উপরে রেশমের কাপড় মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনজন যাত্রী লইয়া ইহা আকাশে উঠিতে পারিত। তবুও ইহার অসংখ্য ত্রুটী বাহির হয়। সুতরাং, কিছুকাল মধ্যেই ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, ইংলণ্ডের অক্লান্তকর্ম্মী বৈজ্ঞানিকগণ নূতন উৎসাহে পুনরায় নূতন করিয়া এয়ারসিপ নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদের কার্য্য তেমন অগ্রসর হইতে পারিল না। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে এই কার্য্যের জন্য মাত্র ১৩,৭৫০ পাউণ্ড মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু সুনির্ম্মিত সুসজ্জিত একটিমাত্র "এয়ার-সিপে"ই প্রায় ১০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবার কথা।

১৯০৮ সালের জুলাই মাসও বিশেষ স্মরণীয়। ঐ মাসে "রিপাব্লিক" ময়র্শ হইতে চেলে-মেণ্ড (Chalais-Mendon) পর্য্যন্ত ৫০০ মাইল পথ, ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে, অতিক্রম করিয়াছিল।

কাউণ্ট জেপেলিন ২৪ ঘণ্টা উড়িবার জন্য, জুলাই মাসে আবার, দুইবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। প্রথমবার, শূন্যে উঠিতে না উঠিতেই, ইঞ্জিন বিকল হইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অবতরণ করিতে হয়। দ্বিতীয় বার কন্‌ষ্টেন্স-হ্রদস্থ ভাসমান আশ্রয়-গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময় অসাবধানতাবশে গৃহগাত্রে প্রত্যাহত হইয়া "এয়ারসিপ"টি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দক্ষিণ-জর্ম্মনীর অধিবাসিগণ দারুণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

অবিলম্বেই কাউণ্ট জেপেলিন যথাবশ্যক ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইলেন এবং আগষ্ট মাসে শূন্য-অভিযানের জন্য পুনরায় প্রস্তুত হইলেন। জেপেলিন স্থির করিলেন, এবার আর আকাশ-বিচরণের সময় পূর্ব্বে ঘোষণা করিবেন না; গোপনে একবার তাঁহার "এয়ারসিপে"র শক্তি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৪ঠা অগাষ্ট, ভোর ৬টা ৪৭ মিনিটের সময়, তিনি কন্‌ষ্টেন্স হ্রদ হইতে যাত্রা করিলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রগতিতে ৭টায় কন্‌ষ্টান্স হ্রদ অতিক্রম করিয়া ৯-৩০ মিনিটে বেস্‌ল (Besle) এবং দ্বিপ্রহরে ষ্টাসবার্গ (Strasburg) পার হইয়া গেলেন। অতঃপর অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে ভ্রমণ করিয়াও বেলা ২-৫০ মিনিটে মেনহিম এবং ৪-৩০ মিনিটে ড্রামষ্টেড্ (Dram

stadt) অতিক্রম করিলেন। অবশেষে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়, যাত্রার ঠিক ১২ ঘণ্টা পর, ওপেনহিমে (Oppenheim) অবতরণ করিলেন। এই সময়ে তিনি ২৭০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ঘণ্টায় গড়ে ২৪ মাইল বেগে ভ্রমণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অল্প বিশ্রামের পরই, পুনরায় আকাশে উঠিয়া রাত্রি ১১টায় তিনি মেয়েন্স পৌছিলেন। এইবার তাহার যন্ত্র, অধিক ব্যবহারে, কেমন ভুল চলিতে লাগিল। ক্রমেই তাহার ইঞ্জিনে গণ্ডগোল বাধিতে লাগিল। অবশেষে, গতি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, ঘণ্টায় ১২ মাইলে পরিণত হইল। পরদিন বুধবার প্রাতে, ষ্টাটগার্ট (Stuttgart) অতিক্রম করিবার পর, ৮টার সময় তাঁহাকে এচার ডিন্‌জেন (Echterdingen) নামক গ্রামে বাধ্য হইয়া অবতরণ করিতে হয়।

"এয়ারসিপটিকে" তথায় অস্থায়িভাবে উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ প্রবল ঝড় উঠিল। চারিদিকে অবিরত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, এবং সেই দুর্যোগে বন্ধনরজ্জু ছিন্নভিন্ন হইয়া, কাউণ্ট জেপেলিনের আজীবন সাধনা ও অপর্যাপ্ত অর্থব্যয়ের ফল—সমস্ত জীবনের একমাত্র সম্পত্তি—Z.IV. এয়ারসিপটি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং কোনও প্রকারে ইঞ্জিনে আগুন ধরিয়া, দেখিতে দেখিতে সে আগুন সমস্ত জাহাজে পরিব্যাপ্ত হইল।

এই অচিন্ত্য দুর্ঘটনায় সমগ্র জর্ম্মনীবাসী হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। কাউণ্ট জেপেলিন শোকে দুঃখে একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন - ধ্বংসোন্মুখ Z.IV র প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এই সময়ে জর্ম্মন গবর্ণমেণ্ট এবং জার্ম্মানজাতি যে মহানুভবতা দেখাইয়াছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে। এই "এয়ারসিপ"টি পুড়িয়া শেষ হইতে না হইতেই, তিনি গবর্ণমেণ্ট এবং স্বজাতির এই প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার এয়ারসিপ-নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার জন্য যত অর্থ আবশ্যক, তাহাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট ২৫,০০০ পাউণ্ড অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিলেন এবং ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে জনসাধারণের অর্থসাহায্য সমেত উহা ৩০০,০০০ পাউণ্ডে পরিণত হইল। এই অর্থ সাহায্য পাইয়া কাউণ্ট জেপেলিন, একটি কোম্পানি স্থাপন করিয়া, "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০০ শত একার (acres) পরিমিত স্থান তাঁহার কারখানার জন্য নির্দ্দেশ করা হইল। এই স্থানে অতি বিস্তৃত প্রণালীতে, জেপেলিন কার্য্যারম্ভ করিলেন। "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণে যে সমস্ত দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তৎসমস্তই সেস্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারখানায় নির্ম্মিত হইতেছে এবং প্রতি বৎসর এই কারখানায় ১০।১২টি বৃহৎ জেপেলিন নির্ম্মিত হইতেছে।

ইহার পর ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল দেশই "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণে অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। প্রতি দেশে রাশি রাশি অর্থ প্রতি বৎসর এয়ারসিপ-নির্ম্মাণ কল্পে ব্যয় হইতেছে।

ঋগ্বেদের দার্শনিক তত্ত্ব *

[অধ্যাপক—শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম.-এ.]

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম এ

সৃষ্টিতত্ত্ব।—সকল দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিদ্বদ্গণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাই প্রথমতঃ সৃষ্টির কথা উত্থাপিত করিলাম। সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরাণ ও সংহিতায় বিশদরূপে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়,—এই সৃষ্টিতত্ত্ব পুরাণের একরূপ বিশেষত্ব—প্রতি পুরাণের প্রারম্ভেই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা দেখিতে পাই,—ইহা পুরাণের পঞ্চলক্ষণের মধ্যে একতম। পুরাণের লক্ষণ যথা,—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

কিন্তু পুরাণগুলি সরল সংস্কৃতে রচিত, এজন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে অধ্যয়ন করিতে পারেন। সেইজন্য পুরাণের বীজস্বরূপ আদিম আর্য্য সাহিত্য ঋগ্বেদে কি ভাবে উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং উহার দার্শনিক-তত্ত্ব কি ভাবে অনুসৃত হইয়াছে, তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে যেমন জিউস্ পিটর (Zeus Peter) এবং ল্যাটিন্ সাহিত্যে যেমন জুপিটর (Jupiter) —বৈদিক সাহিত্যেও ঠিক উহার অনুরূপ শব্দ—"দ্যৌঃ পিতা।" এই কয়টি শব্দের সৌসাদৃশ্য হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, উক্ত ত্রিবিধ সাহিত্যের আলোচনাক্ষেত্র—গ্রীস্, রোম এবং ভারতবর্ষে,—জিউস্, জুপিটর এবং দ্যৌ—একই পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি সর্ব্বত্রই একরূপ। বৈদিক সাহিত্য হইতে যেমন আমরা অবগত হই যে, দ্যৌ দেবগণের এবং সমস্ত জগতের পিতা-স্বরূপ এবং পৃথিবী মাতা-স্বরূপ; গ্রীক ও ল্যাটিন্ সাহিত্য হইতে জিউস ও জুপিটর সম্বন্ধেও ঠিক একই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। আবার এই দ্যাবা-পৃথিবী দেবগণের পিতামাতা হইলেও উঁহারা যে আবার দেবগণ হইতে উদ্ভূত, ইহার উল্লেখও পাওয়া যায়। ১০ ম ৫৪ সূ ৩ ঋকে ইন্দ্র হইতে দ্যাবা পৃথিবীর উদ্ভব স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় এইরূপ কিছু কিছু বিপর্য্যয় হওয়াই স্বাভাবিক। ১০ ম ৭২ সূ ৪ ঋকে দক্ষ অদিতি হইতে এবং অদিতি দক্ষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্বের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ দেবগণ অপেক্ষা মহত্তর একজন স্রষ্টার কল্পনা করা হইয়াছে,—ইনিই বিভিন্ন সূক্তে পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

সৃষ্টিবিষয়ক কিঞ্চিৎ আভাস আমরা "পুরুষসূক্ত" হইতে পাইয়া থাকি। এই সূক্তস্থ কল্পিত পুরুষই সর্ব্বজগন্ময়,—ইনিই ভূত এবং ইনিই ভব্য,— "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।" আবার—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি,"—সমস্ত প্রাণিজাত ইঁহার কেবল এক চতুর্থাংশ (¼)। এবং স্বর্গীয় অক্ষয় অমর দেবগণ ইঁহার ত্রিচতুর্থাংশ (¾)। এই পুরুষের

* "কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট"-সভাগৃহে পঠিত।

শিরোদেশ—আকাশ, নাভি—অন্তরীক্ষ, পদ—পৃথিবী, কর্ণদ্বয়—প্রাচী ও প্রতীচী দিক্, ইঁহার মন হইতে চন্দ্র,—মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি,—চক্ষু হইতে সূর্য্য এবং শ্বাস হইতে বায়ু উদ্ভূত,—এইরূপে ইঁহা হইতে নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই পুরুষকে বলিরূপে কল্পনা করিয়া দেবগণ এক যজ্ঞ করেন,—এই যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই যজ্ঞ হইতেই গো, অশ্ব, অজ এবং উভয়াদত অর্থাৎ অশ্বতরাদি পশু উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং পূর্ব্বোক্ত পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের,—বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের,—উরু হইতে বৈশ্যের এবং পদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছিল। এক কথায় সমস্ত জগতই এই এক পুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই সূক্তে বিরাটের উল্লেখ আছে—"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ" অর্থাৎ পুরুষ হইতে বিরাট্ এবং বিরাট্ হইতে পুরুষ উৎপন্ন। এই পুরুষ এবং বিরাট্ এক, কি বিভিন্ন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কেহ কেহ বলেন যে, এই পুরুষ এবং বিরাট্ পরবর্ত্তী বেদান্তদর্শনে যথাক্রমে ব্রহ্ম ও জীবাত্মারূপে আখ্যা পাইয়াছেন। এই "পুরুষসূক্ত" ব্যতীত বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি কতিপয় দেবের স্তবে সৃষ্টিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যও যে সৃষ্টিকারক দেবগণের মধ্যে অন্যতম, তাহা—"সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"—বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

জগতের আদিম অবস্থা জল—সৃষ্টির আদিম অবস্থায় যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সলিলময় ছিল, তাহা আমরা সংহিতা ও পুরাণাদি পাঠে অবগত হই। মনুসংহিতায় স্পষ্টই উল্লেখ আছে—

"অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ"

আবার বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায়স্থ ৩য় পাদের ১২ সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"শ্রুত্যন্তরমপি সমানাধিকারমদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি ভবতি,—তদ্ যদপাং শরঃ আসীৎ তৎসমহন্যত সা পৃথিব্যভবদিতি" অর্থাৎ শ্রুত্যন্তরেও পৃথিবীর জলযোনিত্ব কথিত আছে; যথা—"সৃষ্টিকালে যে জলের শর হইয়াছিল, তাহা সংহত অর্থাৎ কঠিন হইলে, পৃথিবী হইল।"

খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের Genesis খণ্ডের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া এ ধারণা অণুমাত্র বিচলিত হয় না। উহা হইতেও অবগত হই যে, সৃষ্টির আদিম অবস্থায়—

"The Earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters."

ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে; যথা—

"চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো
ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে।
যদেদন্তা অদদৃহন্তপূর্ব্ব
আদিদ্যাবা-পৃথিবী অপ্রথেতাং॥

অর্থ।—সেই ধীর পিতা উত্তমরূপে সৃষ্ট করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া, জলাকৃতি পরস্পরসম্মিলিত এই দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইল।

আরও।—

১। "পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা
পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি
কং স্বিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো
যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে॥
২। তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো
যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে
অজস্যনাভাবধ্যেকমর্পিতং
যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥"

অর্থ।—যাহা দ্যুলোকের অপর পারে, যাহা এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছে, যাহা অসুর ও দেবগণকে অতিক্রম করিয়া আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখিতেছেন? ১।

সেই অজাতপুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, উহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। ২।

জল হইতে অগ্নির উৎপত্তি—এই বিশ্বব্যাপী জল হইতে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ১০ম ১২১ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

"আপো হ যদ্ বৃহতী বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনংয়ন্তীরগ্নিং
ততো দেবানাং সমবৰ্ত্ততাসু
রেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"

অর্থ।—ভূরিপরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; ইনিই সমস্ত দেবগণের এক প্রাণস্বরূপ। ইত্যাদি

ঋগ্বেদের অপরস্থলে (২ম ৩৫ সূ) আবার অগ্নিকে "অপাং নপাৎ"—অর্থাৎ জলগণে নপ্তা বা নাতি বলা হইয়াছে। সায়নাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জল হইতে মেঘের এবং মেঘ হইতে বৈদ্যুতিক অগ্নির উৎপত্তিই ইহা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। বাইবেল গ্রন্থেও (Genesis, Chap. I.) জলের পর অগ্নির উৎপত্তির উল্লেখ আছে।

আবার ১০ম মণ্ডলস্থ ১৯০ সূক্তটিতেও সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু আভাস পাওয়া যায়। যথা,—

"ঋতঞ্চ সত্যং চাভীদ্ধাৎতপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ, দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।"

অর্থ।—প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্মগ্রহণ করিল, পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিল, তাহার পর (পরমেশ্বর) দিনরাত্রি সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর সূর্য্য ও চন্দ্র এবং স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন।

সৃষ্টি-পূর্ব্ব অবস্থা।—এই ত সৃষ্টির আদিম অবস্থা। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কি ছিল,—জগতের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঋক্ কয়টি [১০ম ১২৯ সূক্তস্থ] হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যাইতে পারে। যথা,—

১। "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্
নংভ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং ॥

২। ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিং চ নাস ॥

৩। তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রে
ঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং ॥"

অর্থ।—তৎকালে "অসৎ"ও (Non-existent) ছিল না, "সৎ"ও (Existent) ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না, আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? ১।

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না; কেবল একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে জীবিত ছিলেন। ইনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ২।

সর্ব্বপ্রথম অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক জলময় ছিল, অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন, অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তিনি তপস্যার প্রভাবে জন্মিয়াছিলেন। ৩।

বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রসঙ্গে এই ঋক্‌ত্রয়েরই প্রতিধ্বনি একটি শ্লোকে দেখিতে পাই।—শ্লোকটি এই—

"নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভূমি
র্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥"

ঐ ঋক্ কয়টিতে যাহা "অবাতমেকং" রূপে অস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকে "একং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমান্" রূপে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপে সৃষ্টির পূর্ব্বকার অবস্থা বর্ণন করিতে করিতে ঋষি অবশেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময়সহকারে বলিতেছেন :—

১। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আ জাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগদেবা অস্য বিসর্জনেনা
যা কো বেদ যত আ বভূব।

২। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোম-
ন্তসো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥"

কেই বা প্রকৃত জানে, কেই বা বর্ণন করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত সৃষ্টির পর হইয়াছেন; কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে? ১।

এই নানা সৃষ্টি, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি অধ্যক্ষ-স্বরূপ পরমধামে আছেন, অথবা তিনিও না জানিতে পারেন! ২।

তবেই দেখা যাইতেছে, সৃষ্টি বিষয়ে এখনও যে বিস্ময়, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা মহাতপা বৈদিক ঋষিরও সেই বিস্ময় সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তবে "যো অস্যাধ্যক্ষঃ"—ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, এই সৃষ্টি-ব্যাপার এক অজ্ঞাত পরমপুরুষের অধ্যক্ষতায় নিষ্পন্ন হইয়াছে,-যিনি তৎকালে বিশ্বব্যাপী সলিলে ভাসমান ছিলেন। ইনিই পৌরাণিক আখ্যানে সলিলে ভাসমান অণ্ডমধ্যগত হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মারূপে কল্পিত হইয়াছেন। এইরূপে আর্য্যগণের আদিম সাহিত্য ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যাইলেও, আমাদিগের তৎসম্বন্ধে বিস্ময় বা কৌতূহলের বিশেষ লাঘব হইল বলিয়া মনে হয় না। তবে অন্যান্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে যে, ইহা হইতেই উক্ত তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছে,—তাহা একরূপ সুনিশ্চিত। আরও এই সকল ঋক্ বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ঐ ঋষির মতে "অসৎ" (Non-Existent) হইতে সৎ (Existent) এর উৎপত্তি হইয়াছে। "অসৎ" হইতে সতের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট মন্ত্র দেখুন। [১০।১২৯]

১। "সতো বং ধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।"

অর্থাৎ মনীষিগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি-স্থান নিরূপণ করিয়াছেন।

আরও স্পষ্ট দেখুন—[১০।৭২।২—৩]

২। "দেবানাং পূর্ব্বেযুগেঽসতঃ সদজায়ত।"

৩। "দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।"

এই "অসৎ" হইতে "সতের" উৎপত্তি হইয়াছে, কি "সৎ" হইতে "সতের"—অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ কি অসৎ ছিল, তাহা লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, উহারা প্রত্যেকেই উৎপত্তির পূর্ব্বে সতেরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। এই সকল দর্শনের বীজভূত ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে,—আরুণি শ্বেতকেতু-সংবাদে,—"তদেক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত"—এই প্রতিপক্ষ-মত নিরাশ করিয়া—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই মত স্থাপন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য "অসতঃ সজ্জায়েত"—এই বিপরীতবাদী প্রতিপক্ষবৈনাশিক বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত যে পাণ্ডিত্যসহকারে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিবিষয়ক কোনই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না—"দৃষ্টান্তাভাবাৎ নাসতঃ সজ্জায়েত।" যদি বল, বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্ভব এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হউক, যেহেতু বীজের প্রথম ধ্বংস হয়। তাহার পর অঙ্কুর হয়, অর্থাৎ বীজধ্বংসরূপ অসৎ হইতে অঙ্কুর-রূপ সতের উৎপত্তি হইল; ইহার উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"না, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু বীজের ধ্বংস স্বীকার করা যায় না।" এই সকল দর্শনের মতে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি আর কিছুই নহে—অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান সৎ পদার্থেরই ব্যক্তরূপে প্রকাশ। যেমন মৃৎরূপ অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক চক্রাদি দ্বারা স্পষ্ট ঘটরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু বৌদ্ধগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাহারা সৃষ্টির প্রথমে অভাব বা শূন্য, দৃঢ়তার সহিত অঙ্গীকার করেন এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে যে "তদেক আহুঃ" বলিয়া আরম্ভ করিয়া ঐ মতটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঐ মতটি তৎকালে বিশেষ প্রবল ছিল। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ঋক্ কয়টির আলোচনার ফলে স্পষ্টই দেখিতেছি যে, বৌদ্ধগণের ঐ অসদ্বাদের প্রথম অঙ্কুর ঋগ্বেদে নিহিত। ঋগ্বেদ যখন আর্য্যগণের আদিম সাহিত্য এবং ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার আদিম বীজ, তখন আপাততঃ বেদবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বৌদ্ধদর্শনের অসদ্বাদ যে, উহা হইতে সংগৃহীত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে উপনিষদ্ ও পূর্ব্বোক্ত দর্শনসমূহ উহাকে সতেরই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত-রূপে প্রকাশ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, আর বৌদ্ধগণ অন্য ভাবে লইয়াছেন—এই যা প্রভেদ।

মা

[বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে]

[অধ্যাপক—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্. এ.]

'সতীন ও সৎমা'-শীর্ষক প্রবন্ধ চারিটির শেষটিতে * দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'রজনী', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' যথাক্রমে বিমলা, ললিতলবঙ্গলতা, প্রফুল্ল ও নন্দার চরিত্রে সপত্নীসন্তানের প্রতি বিমাতার অকৃত্রিম স্নেহের সুন্দর মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও এই চারিটি চরিত্রে মহাভারতবর্ণিত কুন্তীর মহান্ আদর্শের পুনঃপ্রচার করিয়া আর্য্যসাহিত্যের পবিত্রধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যিনি বিমাতার স্নেহ এরূপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী জননীর স্নেহ কি বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

গোড়ার কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাধারাণী', 'রাজসিংহ' এই তিনখানি নায়ক-নায়িকার বিবাহে শেষ হইয়াছে। অতএব এই তিনখানিতে, সাধারণ ইংরাজী নভেলের ন্যায়, নায়িকা তিলোত্তমা, রাধারাণী ও চঞ্চলকুমারী প্রেমময়ী প্রণয়িনীর ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন, মাতৃপদবীতে আরূঢ় হন নাই। 'যুগলাঙ্গুরীয়,' 'ইন্দিরা' ও 'মৃণালিনী'তে নায়ক-নায়িকার বিবাহ পূর্ব্বে সংঘটিত হইলেও, পতিপত্নীর প্রকৃত মিলন গ্রন্থশেষে ঘটিয়াছে। সুতরাং এ তিনখানিতেও নায়িকা হিরণ্ময়ী, ইন্দিরা ও মৃণালিনী মাতৃপদবীতে আরূঢ় হন নাই। 'রজনী'তে রজনীর বিবাহের পর একটি পরিচ্ছেদ আছে, সেই একটি পরিচ্ছেদেই রজনীর জননীমূর্ত্তির একখানি সুন্দর খণ্ডচিত্র আছে। সে আলোচনা যথাস্থানে করিব।

পক্ষান্তরে 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' এই সাতখানিতে অর্থাৎ সমস্ত আখ্যায়িকাবলির অর্দ্ধেকগুলিতে নায়কনায়িকার বিবাহ, হয় গ্রন্থারম্ভেই সংঘটিত হইয়াছে, আর না হয় গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই শুভকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানিই গার্হস্থ্য জীবনের ইতিহাস হইবার কথা, সুতরাং তাহাতে মাতৃভাবের সম্যক বিকাশ ঘটিবারও কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যথাসময়ে বিবাহিতা হইলেও নায়িকাদিগের সন্তানভাগ্য ভাল নহে। যৌবনে 'যোগিনী' কপালকুণ্ডলা নিঃসন্তানা, 'পাপিষ্ঠা' শৈবলিনী নিঃসন্তানা, পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখী নিঃসন্তানা, শান্তি ব্রহ্মচারিণী, শ্রী প্রথম জীবনে স্বামিসঙ্গবঞ্চিতা, পরে সন্ন্যাসিনী। প্রফুল্ল পুত্রপৌত্রবতী। * ভ্রমরের একটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু সেটি সূতিকাগারেই নষ্ট হইয়াছিল। সেই মৃতশিশুকে অবলম্বন করিয়া ভ্রমর যে মাতৃভাবের পরিচয় দিয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

নায়িকা না হইলেও অন্য পাত্রীদিগের জননী হইবার কোন আটক নাই। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের সন্তানভাগ্য অধিকাংশ স্থলেই নায়িকাদিগের অপেক্ষা ভাল নহে। আয়েষা চিরকুমারী, বিমলা নিঃসন্তানা, ললিতলবঙ্গলতা বন্ধ্যা, দরিয়া নিঃসন্তানা, রূপসী নিঃসন্তানা, (অন্ততঃ তাঁহার সন্তানাদির কথা কিছুই জানা যায় না). বিষবৃক্ষে হৈমবতী নিঃসন্তানা, পতিপ্রাণা দলনী নিঃসন্তানা, অভাগিনী কুন্দনন্দিনী নিঃসন্তানা। মিহরুন্নিসার সন্তানাদির উল্লেখ নাই। নির্ম্মলকুমারী, বসন্তকুমারী, মণিমালিনী, গিরিজায়া, রত্নময়ী, ইঁহাদিগের ত নায়িকার সখী সাজিতেই জন্ম, সুতরাং ইঁহাদিগের সন্তানলাভ হইল কি না হইল

* ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২১ দ্রষ্টব্য।

* যথাকালে পুত্রপৌত্রপরিবৃত হইয়া, প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। (দেবী চৌধুরাণী, শেষ পরিচ্ছেদ)—লেখক।

তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোন উদ্বেগ নাই; এমন কি বসন্তকুমারী শেষ পর্য্যন্ত অনূঢ়া কি না, তাহারও খোলসা সংবাদ পাওয়া যায় না। ইহাতে যদি ইঁহাদিগকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ন্যায় 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বলিতে চাহেন, বলুন, আপত্তি নাই। ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী নলিনা, ইন্দিরার কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনী, শৈবলিনীর জ্ঞাতিসম্পর্কে ননদ সুন্দরী সম্বন্ধেও এই কথা বলা নয়। মনোরমার স্বামীর সহিত মহামিলন একেবারে শ্মশানে। শ্যামা 'সধবা হইয়াও বিধবা।' বিমলা ও ললিতলবঙ্গলতা গর্ভজ সন্তান না থাকিলেও মাতৃত্বের মহিমায় মণ্ডিত, একথা 'সতীন ও সংমা' প্রবন্ধে পরিস্ফুট করিয়াছি। পক্ষান্তরে সুভাষিণী কন্যাপুত্রবতী, কমলমণি পুত্রবতী, বিষবৃক্ষে শ্রীমতী পুত্রবতী, শৈলবতী পুত্রবতী, সলিমের প্রধানা মহিষী মানসিংহের ভগিনী পুত্রবতী, যোধপুরী পুত্রবতী, কল্যাণী কন্যাজননী, সাগর বৌ ও নয়ান বৌ সন্তানবতী, * নন্দা ও রমা পুত্রবতী। নিমাইএর সন্তান জীবিত ছিল না, কিন্তু তাহার মাতৃভাব বড় করুণ। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। রজনী, ভ্রমর, সুভাষিণী, কমলমণি, নিমাই, কল্যাণী, সাগর, প্রফুল্ল, নন্দা, রমা, এই দশটি 'নবীনা জননী।' 'কালপেঁচা' নয়ান বৌকেও এই শ্রেণীতে ধরিতে হইবে। হৈমবতী শচীকান্তের মাতা কিন্তু তাঁহার মাতৃভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহার নাম এক্ষেত্রে উহ্য রহিল। মোগলসম্রাটের মহিষী ও রুজননীর ও যোধপুরীর মাতৃভাবের অন্য আকারে বিকাশ হইয়াছে। বিপথগামিনী শ্রীমতীর নাম পরিহার করাই শ্রেয়ঃ।

এতদ্ভিন্ন, আখ্যায়িকাগুলিতে প্রবীণা জননীও অনেকগুলি বর্ত্তমান। ইঁহাদিগের উল্লেখও প্রয়োজনীয়। +

মাতৃমূর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত হরিচরণ মজুমদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, কতক স্থলে মাতাপিতা অনুল্লিখিত, কতক স্থলে উল্লেখমাত্রেই পর্য্যবসিত, কতক স্থলে তাঁহারা পরলোকগত; আবার কতক স্থলে মাতাপিতার পুত্র বা কন্যার প্রতি আচরণের অল্পবিস্তর বিবরণ আছে। যথাস্থানে সে সব প্রসঙ্গ তুলিব।

এই দ্বিবিধ শ্রেণীর জননীর (নবীনা ও প্রবীণা) চিত্র কোথাও নিতান্ত ক্ষুদ্র, কোথাও পূর্ণায়তন, আবার কোথাও মাতা নামমাত্রে পর্য্যবসিত। কতকগুলি স্থলে মাতৃভাবের বিকাশ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ঘটে নাই। তথাপি সমালোচকের নিকট কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। সমালোচনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই মত একটি বিজ্ঞান, (observation) পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সমস্ত দৃষ্টান্ত নিঃশেষে সংগ্রহ না করিলে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা চলে না, নিয়মসূত্র আবিষ্কার করা চলে না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইতেছি। কপালকুণ্ডলা, সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, শান্তি, শ্রী এই পাঁচজন নায়িকাই নিঃসন্তানা। ইঁহাদিগকে

---

* 'তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন।' [৩য় খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ] 'নয়নতারার কতকগুলি ছেলে মেয়ে হইয়াছিল।' [৩য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ]

+ বাঙ্গালীর ঘরে বধূ স্বামীর (অর্থাৎ অমুকের স্ত্রী) পরিচয়ে পরিচিত। সন্তানবতী হইলে সন্তানের নামে (অর্থাৎ অমুকের মা) পরিচিতা। বঙ্কিমচন্দ্র এই হিন্দু-প্রণালী অবলম্বনে 'রাধারাণীর মা,' 'রমণ বাবুর মা,' 'ব্রজেশ্বরের মা' ইত্যাদি পরিচয় দিয়াছেন; ইঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই।

এইরূপে বিড়ম্বিতা করিবার উদ্দেশ্য কি, ইহার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতত্ত্ব কি, তাহা ভাবিবার কথা। তত্তৎস্থলে এ প্রশ্নের আলোচনা করিব। তাহা ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্ লেখকের সৃষ্ট তুচ্ছ জিনিষটিকেও নাড়িলে চাড়িলে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলে, শিক্ষা লাভ করা যায়, (আর্টের) কলাকৌশলের গুহ্য তত্ত্ব আদায় করা যায়। আবার ক্ষুদ্র চিত্রও প্রণিধান যোগ্য, কেননা নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত ক্ষুদ্র চিত্রেও তাক লাগাইয়া দেয়, খণ্ডচিত্র হইলেও তাহাতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদিগের গঠিত মৃন্ময় মূর্ত্তি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও বিরাট্ পাষাণ-মূর্ত্তি অপেক্ষা কম প্রশংসনীয় নহে।

এক্ষণে একে একে চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার আলোচনা করিব।

১। 'দুর্গেশনন্দিনী'

(✓০) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা নায়িকার বিমাতা হইয়াও মাতৃভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং তিনি জগৎসিংহের প্রার্থনায় বর্ম্ম আনিবার জন্য প্রহরীকে যে স্তোক দিয়াছিলেন:—"আজ আমার বীরপঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীর পুত্র হয়; তাহাতে রাত্রে অস্ত্রপূজা করিতে হয়; আমি পুত্র কামনা করি, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।" [১ম খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ] তাহা হইতে কষ্টকল্পনা করিয়া বিমলার মাতৃত্বলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক বিমাতা বিমলার মাতৃমূর্ত্তি এই আখ্যায়িকায় অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কবি তাঁহাকে বিমাতার আদর্শরূপে অঙ্কিত করিবেন বলিয়াই তাঁহার গর্ভজ সন্তানের কল্পনা করেন নাই।*

(৵০) আয়েষা যখন 'অবিশ্রান্তা হইয়া কুমারের শুশ্রূষা' করিতেন, সেই সময়ে অধিক রাত্রি হইলে 'তাঁহার জননী বেগম তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইতেন'। [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ ও ৮ম পরিচ্ছেদ] এইটুকু মাত্র আয়েষার বর্ষীয়সী জননীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কতলু খাঁর গার্হস্থ্য জীবনের বিবরণ দেওয়া আখ্যায়িকার উদ্দেশ্যের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় গ্রন্থকার এ ক্ষেত্রে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পান নাই।

(৵০) ওসমানের মাতাপিতার গার্হস্থ্যজীবনযাত্রার বিবরণও এই কারণে নিষ্প্রয়োজন। কেবল ওসমানের শৈশবের একটি ঘটনার † প্রসঙ্গে বিমলার পত্রে তাঁহাদিগের অপত্যস্নেহের উল্লেখ আছে। ওসমান যাহাতে পূর্ব্বকৃত উপকার-স্মরণে বিমলার অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য অধিকতর উৎসাহী ও ব্যগ্র হন, এই উদ্দেশ্যেই ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে। যদিও কতলু খাঁর বর্ত্তমান সেনাপতিই যে সেই শিশু, বিমলা তাহা পত্রলিখনকালে জানিতেন না, তথাপি গ্রন্থকারের মনে এই উদ্দেশ্যই জাগরূক ছিল।

(।০) নায়ক জগৎসিংহ বিদেশে যুদ্ধস্থলে। সুতরাং তাঁহার মাতার পরিচয় দেওয়া, এমন কি উল্লেখ করা, গ্রন্থকার আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

(।✓০) নায়িকা তিলোত্তমার মাতা 'উপযুক্ত কালে এক কন্যা প্রসব করিলেন। কিছুদিন পরে কন্যার প্রসূতির পরলোকপ্রাপ্তি হয়।' [১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] মনে হয়, যেন নায়িকাকে নরলোকে আবির্ভূতা করিতেই তাঁহার গর্ভধারণের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তাঁহার তিরোভাব। তিলোত্তমা এই সুন্দরী মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। 'ন প্রভা তরলজ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।' বিমলার পত্রে [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ] তিলোত্তমার মাতার জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ জুগুপ্সিত ব্যাপার বলিয়া জানা যায়, তাহাতে তাঁহার তিরোভাব এক প্রকার ভালই হইয়াছে বলিতে হয়। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে

* 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ দুইখানি আখ্যায়িকায় গর্ভজ সন্তান সত্ত্বেও সপত্নীসন্তানের প্রতি স্নেহবতী বিমাতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

† ঘটনাটি এই:- একজন আঢ্য পাঠান—সঙ্গে বিবি ও একটি নবকুমার- বিমলার মাতার কুটিরে রাত্রিকালে আশ্রয় গ্রহণ করেন: একজন চোর সিঁদ দিয়া বালকটি অপহরণ করিতে যাইতেছিল, ছয় বৎসরের বালিকা বিমলা তাহা দেখিয়া চীৎকার করায় সকলের নিদ্রাভঙ্গ হয়: পাঠানের স্ত্রী দেখিলেন, বালক শয্যায় নাই। একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। চোর ধরা পড়িল, শিশুকে পাওয়া গেল ইত্যাদি;—[২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। এই শিশু ওসমান, আঢ্য পাঠান ও তাঁহার বিবি ওসমানের জনক-জননী।

নায়িকা জন্মাবধি মাতৃস্নেহবঞ্চিতা; তবে বিমাতা বিমলা তাহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, জননীর অভাব অনুভব করিতে দেন নাই, বিমলার ব্যবহারে ইহা বেশ বুঝা যায়।

(৵০) ও (৶০) তিলোত্তমার মাতামহীর এবং বিমলার মাতার একবারমাত্র চরিত্রস্খলন হইয়াছিল, সে কুৎসিত কথায় 'আবরণ নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য।' [২য় খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'বিমলার পত্র' দ্রষ্টব্য।] তবে তাঁহাদিগের জননাগৌরবলাভের পর জীবনপ্রণালীর এইরূপ বর্ণনা আছে। তিলোত্তমার মাতামহী 'অচিরাৎ বিধবা হইলে, নিজ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।' [২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] বিমলার দুঃখিনী মাতাকে যখন বিমলার 'মাতামহ দুশ্চারিণী বলিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন' তখন তিনি 'কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন' এবং স্বামীর সন্ধানের চেষ্টা করিতেন। [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] * উভয়ত্রই কন্যার প্রতি মাতার স্নেহের, মাতৃভাবের কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এই দুইটি স্খলিতচরিত্রা নারীর প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে চাহি। পাষণ্ড প্রণয়িকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিতা ও পরিত্যক্তা সন্তানসম্ভাবিতা নারী (Fantine) কি প্রকারে কন্যাপ্রসবের পর দারিদ্র্য-বশতঃ শিশুকন্যার (Cosette) জীবনরক্ষার জন্য নিজের সৌন্দর্য্যের উপাদান কুন্দদন্ত ও চাচর চিকুর অম্লানবদনে বিক্রয় করিল, পরন্তু দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে অনন্যগতি হইয়া মাতৃভাবের প্রবল উত্তেজনায় নারীর সর্ব্বস্বধনে জলাঞ্জলি দিয়া রূপোপজীবিনীর জঘন্য জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইল, দারিদ্র্যের তাড়নে মাতৃত্বের মহান্ আদর্শের কাছে সতীত্বের পবিত্র আদর্শও ক্ষুণ্ণ করিল—বিখ্যাত ফরাসী আখ্যায়িকাকার, ভিক্টর হিউগো, তাঁহার Les Miserablesএ অর্থাৎ 'দরিদ্রের কাহিনী'তে এই যে করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়া নরকের ভিতর স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয়

মাতৃমূর্ত্তি

[র‍্যাফেল্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

গভীর সমবেদনায় আলোড়িত হয়, ইউরোপীয় সমাজে 'মন্ত্রপূত ব্যতীত পাণিগ্রহণে'র অর্থাৎ স্বাধীন প্রণয়ের পরিণাম, দারিদ্র্য, কুলটাবৃত্তি, প্রভৃতি সমাজসমস্যার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃদায়িত্বজ্ঞানের উৎকটতা ও মাতৃত্বের মহিমা প্রকট করিবার অজুহাতে যে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, তজ্জন্য জানি না, বিজ্ঞ সমালোচক তাঁহাকে নিন্দা করিবেন কি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় বাঙ্গালী জাতি ও 'জননী বঙ্গভাষা' তাঁহার নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ।

২। 'মৃণালিনী'

'মৃণালিনী' যদিও 'দুর্গেশনন্দিনীর' অব্যবহিত পরবর্ত্তী নহে, তথাপি উভয় গ্রন্থের পরস্পর সাদৃশ্য বড় বেশী, তজ্জন্য 'দুর্গেশনন্দিনী'র পরেই 'মৃণালিনী'র প্রসঙ্গ তুলিলাম।

(৴০) 'মৃণালিনী'তে নায়িকা মৃণালিনীর পিতার কয়েকবার উল্লেখ আছে। কিন্তু কেবল একটি স্থানে মাতার উল্লেখ আছে। 'অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল

* শশিশেখর ভট্টাচার্য্য (পরে অভিরামস্বামী) দুষ্কর্ম্মের জন্য পিতার নিকট ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন—(২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহার পিতার অমতে বিবাহ করাতে পিতা-কর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হন—(১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)। ইঁহাদিগের উভয়ের মাতার উল্লেখ না থাকাতে, বোধ হয় মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাই।

হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; আমার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন।... তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহ্লাদিত হইলেন † যে, আর কোন কথাতেই অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন।' [মৃণালিনীর উক্তি, ৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।] ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, তিলোত্তমার ন্যায় মৃণালিনীও শৈশবে মাতৃহীনা, মাসী-মা তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মাতার স্নেহের শাসনের অভাবে ও মাসীমার আদরে তিনি একটু স্বাধীনপ্রকৃতি হইয়াছিলেন। তাহার পরিচয় প্রেমময়ীর জীবনে বেশ একটু পাওয়া যায়।

(৶০) নায়ক হেমচন্দ্রেরও জগৎসিংহের ন্যায় বিদেশে বাস, মাতাও বোধ হয় স্বর্গগতা, সুতরাং বিবরণ নাই। কেবল মাধবাচার্য্য তাঁহার অসংযমে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছেন—'নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল?' [১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

(৷৹) সখী মণিমালিনীর পিতা ও ভ্রাতার চিত্র আছে, মাতার উল্লেখমাত্র নাই। ব্যোমকেশের কাণ্ডে যখন তিনি জাগরিতা হন নাই, তখন বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বেই তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছিল। মণিমালিনীই সংসারের কর্ত্রী। (তাঁহার স্বামী গৃহজামাতা ইহাও বোধ হয়।)

(।০) মনোরমাও মাতৃহীনা। তাহার পিতা কেশবের প্রসঙ্গে দেখা যায় 'তাঁহার মেয়ে পূর্ব্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল।' [৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।] মনোরমার সহিত আমাদিগের যখন হইতে পরিচয়, তখন তিনি পিতৃগুরু বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মা ও তাঁহার নিঃসন্তানা পত্নীর আশ্রিতা। কপালকুণ্ডলার ন্যায় মনোরমাও শৈশবাবধি মাতার প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন।

(।৴০) পশুপতির সহিত যখন আমাদিগের প্রথম পরিচয় হয়, তখন তাঁহার 'বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে' [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] সুতরাং তাঁহার বৃদ্ধা জননীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন দেখি না। তাঁহার পূর্ব্বইতিহাস-বর্ণনায় 'তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন' [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] এইটুকু জানা যায়, মাতার উল্লেখ নাই।

(।৶০) ও (।৷০) রত্নময়ী জেলেনীর মা বাপ উভয়েই বর্ত্তমান, এই উল্লেখমাত্র আছে। [৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ। ভিখারীর মেয়ে গিরিজায়ার মা বাপের সন্ধান নাই, 'তাহার আত্মীয়ার মধ্যে এক বুড়ীমাত্র। তাহাকে আয়ি বলি।' [১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] 'গোড়ার কথা'য় বলিয়াছি, ইহাদিগের সখী সাজিবার জন্যই জন্ম, সুতরাং ইহাদিগের পারিবারিক জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা গ্রন্থকার নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছিলেন।

৩। 'কপালকুণ্ডলা'

(৴০) প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার শৈশবের ইতিহাস লুপ্ত, 'ইনি ব্রাহ্মণকন্যা।... ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎকালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।' [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।] অধিকারীর মুখে এইটুকু বৃত্তান্ত জানা যায়, ইহাতে তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় নাই। যে উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সে সব পরিচয় থাকিবারও কথা নহে। তিনি এক্ষেত্রে মাতাপিতার প্রভাব হইতে দূরে রক্ষিতা, প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালিতা, মনুষ্যসংসর্গের মধ্যে কেবল কাপালিক ও অধিকারীর দ্বারা গঠিতচরিত্রা নারীর কল্পনা করিয়াছেন।

(৶০) বিবাহিত জীবনে তাঁহার স্বামী ছাড়া, শাশুড়ী ও দুইজন ননদের সংস্পর্শে আসিবার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রেও মনুষ্যসংসর্গের প্রভাব যথাসম্ভব অল্পপরিমাণ করিবার জন্যই গ্রন্থকার তাঁহাকে কেবল স্বামী এবং সমবয়স্কা সখী ও কনিষ্ঠা ননদ শ্যামার সহচারিণী করিয়াছেন। সেই জন্যই গ্রন্থকার শাশুড়ী ও জ্যেষ্ঠা ননদকে আসরে আনেন নাই। কপালকুণ্ডলা মনুষ্যসমাজে বাস করিয়া, নবকুমার ও শ্যামার সংস্পর্শে 'কতকটা গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না' হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার পত্নীভাবের ও মাতৃভাবের বিকাশ ঘটে নাই। 'সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগে'—শ্যামার মুখের এই মধুর মাতৃভাবে মসগুল ছড়া তাঁহার হৃদয়ে কোন সাড়া পায় না, appeal করে না। সেই

† 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারের মাতার আহ্লাদ এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।

জন্যই কবি তাঁহাকে নিঃসন্তানা করিয়াছেন। মাতৃপদবীতে আরূঢ়া হইলে তাঁহার 'বন্যপ্রকৃতি' অন্তর্হিত হইত। 'দুর্গেশনন্দিনী' তিলোত্তমা' প্রেমের প্রভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে চপলা বালিকা হইতে গম্ভীরা যুবতীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন; কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিও মাতৃভাবের প্রভাবে আমূল পরিবর্ত্তিত হইত।

(৩) শ্যামা 'সধবা হইয়াও বিধবা' কিন্তু তিনি যেরূপ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে 'সোণার পুত্তলি ছেলে' ছড়াটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, মাতৃভাব তাহার প্রকৃতির ভিতর প্রচ্ছন্ন (latent) রহিয়াছে; অনুকূল অবস্থা ঘটিলে 'আনন্দমঠে'র নিমাইএর মত উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কিন্তু গ্রন্থে সে অনুকূল অবস্থা অবতারণার প্রয়োজন ঘটে নাই, কেননা সখীজনের ন্যায় কপালকুণ্ডলার স্নেহময়ী সঙ্গিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে এবং পরে কপালকুণ্ডলার জীবনের শেষ ঘটনার নিমিত্তমাত্র হইতে তাঁহার সৃষ্টি।

(৪) পদ্মাবতীর মাতৃভাবের অভাবের কারণ-প্রদর্শন, আশা করি, কেহই আবশ্যক মনে করিবেন না।

(৫) পদ্মাবতীর মাতার দুই একস্থলে উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত পরোক্ষভাবে।* পদ্মাবতীকে কলঙ্ক জন্য 'তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন' এই বৃত্তান্তেও তাঁহার মাতার উল্লেখ নাই। [তৃতীয় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।] যাহা হউক, পদ্মাবতীর পিতৃগৃহবাস যখন গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেকার ঘটনা, তখন এক্ষেত্রে মাতার বিস্তৃত বিবরণ আশা করা যাইতে পারে না।

নবকুমারের মা

(৬০) নবকুমারের মাতার বিবরণ নিতান্ত যৎসামান্য। প্রথমবধূত্যাগের সময় নবকুমারের পিতা জীবিত ছিলেন, [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।] এক্ষেত্রে পিতারই পূরা কর্ত্তৃত্ব, মাতার কর্ত্তৃত্ব নাই, সুতরাং তাঁহার অনুল্লেখ দোষের নহে। নবকুমার যখন কাপালিকের কবলগত, মৃত্যু আসন্ন বলিয়া জানিলেন, তখন 'একবার বহুদিন অন্তর্হিত

মাতৃমূর্ত্তি
[র‍্যাফেল্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল'। [১ম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] এই স্থানে মাতার প্রথম উল্লেখ। পরে ২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় 'যে নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন।' নবকুমারের 'সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে'। 'যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন।' পুত্রশোকের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় শেক্‌স্পীয়ারের কন্‌ষ্টান্সের মর্ম্মভেদী বিলাপধ্বনি কর্ণগোচর হইল না বটে কিন্তু তাঁহার তৎকালীন যাতনা অনুভবে পাঠককে বুঝিতে হইবে। পরে এই সংবাদ অলীক প্রমাণিত হইল। 'যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটি আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা। সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূবরণ করিয়া গৃহে লইলেন।' হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া মাতা বধূর কুলশীল বা পরিচয় কিছুই জানিতে চাহিলেন না। এখানে মাতার নিকট এসব যেন তুচ্ছ হইয়া পড়িল। ইহাতে তাঁহার পুত্রস্নেহের গভীরতা বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের অনুরূপ এই

* রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন, সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন ইত্যাদি। [১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ]

বধূবরণে নবকুমারের মাতার শেষ উল্লেখ। ইহা ছাড়া আর কোথাও তাঁহার ও তাঁহার পুত্রস্নেহের প্রসঙ্গ পাই না। এই অভাব আমরা ভবিষ্যতে ব্রজেশ্বরের মাতার বেলায় পূর্ণ হইতে দেখিব *। অধিক লোকের চরিত্র চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে হইলে, কপালকুণ্ডলার চরিত্র-চিত্রণের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই গ্রন্থকার নবকুমারের জননী সম্বন্ধে এত অল্প কথা বলিয়াছেন। [(৵০) ও (৶০) দ্রষ্টব্য।]

খস্রুজননী

(।৶০) সেলিমের প্রধানা মহিষী মানসিংহের ভগিনী খস্রুর জননীর চিত্রে আমরা [৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ] সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মাতৃচিত্র দর্শন করি। ইহা গৃহস্থঘরের কথা নহে, বাদসাহের ঘরের কথা। পুত্র গৌরবগর্ব্বিতা উচ্চাভিলাষিণী জননী কিরূপে বাদসাহজননী হইবার আশায় স্বামীর বিরুদ্ধে রাজনীতিক চক্রান্তে যোগ দেন, এক্ষেত্রে তাহারাই বর্ণনা পাওয়া যায়। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা, এরূপ মাতৃচরিত্র, বিরল নহে। যাহা হউক, এ চিত্র আমাদের ও পাঠকবর্গের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহে। তথাপি, 'বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয় বটে, কিন্তু যে বাদশাহজননী সেই সর্ব্বোপরি'—খস্রু-জননীর এই কথায় স্বামিগর্ব্ব অপেক্ষা পুত্রগর্ব্বের প্রবলতা পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও পুত্রস্নেহের আর এক ভাবে বিকাশ।

৪। 'বিষবৃক্ষ'

(৴০) 'বিষবৃক্ষে' নায়ক নগেন্দ্রনাথ 'মাতাপিতা, বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন' [২৯শ পরিচ্ছেদ।] এই উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, তিনি গ্রন্থারম্ভে মাতাপিতৃহীন। মাতা গৃহকর্ত্রী থাকিলে নগেন্দ্রনাথের নিজ অন্তঃপুরিকা কুন্দনন্দিনীর সহিত অবৈধ প্রণয়ব্যাপার বাধাপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে 'বিষবৃক্ষে'র অঙ্কুরোদ্গম ও পরিণাম ঠিক এই ভাবে সংঘটিত হইতে পারিত না, গ্রন্থকার বোধ হয় এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নগেন্দ্রনাথকে স্বাধীন গৃহপতিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

সত্য বটে, অন্য গ্রন্থে গোবিন্দলালের মাতাঠাকুরাণী ও জ্যেঠ মহাশয় বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দলাল-রোহিণী-ঘটিত ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছিল ; কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে রোহিণী কৃষ্ণকান্ত রায়ের অন্তঃপুরিকা ছিলেন না, ব্যাপারও গৃহমধ্যে সংঘটিত হয় নাই, সুতরাং গোবিন্দ-লালের উপরে থাকিলেও, রোহিণীর উপর তাঁহাদিগের কোন এক্তিয়ার (control) ছিল না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষ্ণকান্ত রায় উইল পরিবর্ত্তন করিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ-সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহাতে হিতে বিপরীত হইল, সে কথা স্বতন্ত্র।

(৵০) সূর্য্যমুখীর পিতার সামান্য উল্লেখ আছে, মাতার উল্লেখ নাই। যাহা হউক, গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাকালে তাঁহারা জীবিত ছিলেন না, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিলে সূর্য্যমুখী দারুণ মর্ম্মবেদনা পাইয়া ভ্রমরের ন্যায় পিত্রালয়ে যাইতেন, অন্ততঃ ভ্রমরের দারুণ দুঃখের বেলায় যেরূপ তাহার মাতা, পিতা ও ভগিনী তাঁহার সহিত সমবেদনা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সাহায্য করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিত। সে পথ বন্ধ করিবার জন্যই গ্রন্থকার সূর্য্যমুখীর মাতাপিতার তিরোভাব ঘটাইয়াছেন।

(৶০) শ্রীশচন্দ্রের বিধবা মাতার উল্লেখ আছে। "কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈত্রিক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।" [৫ম পরিচ্ছেদ।] 'শ্বাশুড়ীবধূ' প্রবন্ধে বলিয়াছি, এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার আধুনিক বাঙ্গালীজীবনের একটা বাস্তব দিক্ খোলসা করিয়া দেখাইয়াছেন, কেন না ইহা ঠিক হালের সমাজচিত্র, পূর্ব্ব তিনখানি আখ্যায়িকার ন্যায় আকবর শা বা লক্ষ্মণসেনের আমলের বিবরণ নহে।

(।০) তারাচরণের বিপথগামিনী মাতা শ্রীমতীর প্রসঙ্গ তুলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, এইরূপ পতিতা নারীরও পরিত্যক্ত সন্তানের প্রতি প্রবল স্নেহের আকর্ষণ অর্থাৎ নাড়ীর টান থাকে, এই গভীর তথ্য আজকাল ফরাসী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচার করিবার যে উদ্যম দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে সে উদ্যম দেখা যায় না। আমার বিবেচনায়,

---

* ব্রজেশ্বরের মাতাও, পুত্র প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে ফিরিলে, কর্ত্তাকে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি প্রফুল্ল এতদিন কোথায় কিভাবে ছিল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা না করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালী সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গল-জনক।

(।৵০) বিষবৃক্ষের বীজ, অঙ্কুর, শাখাপ্রশাখা, ফল ইত্যাদি ক্রমিক বিকাশের যে সূক্ষ্মতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইতে চাহেন, তজ্জন্য সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী নিঃসন্তানা হইবার প্রয়োজন। কেননা, সন্তানবতী হইলে তাঁহাদের মর্ম্মবেদনা এতটা তীব্র ও দুঃসহ হইত না। সন্তানের মুখ দেখিয়া তাঁহারা যন্ত্রণা অনেকটা ভুলিতেন। আর এক কথা, সূর্য্যমুখীর যদি সন্তান থাকিত, তাহা হইলে সেই সন্তানই পতিপত্নীর দৃঢ় প্রেম বন্ধনের নিদান হইত, সূর্য্যমুখী তখন কমলমণির ন্যায় সপত্নীশঙ্কা হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিতেন। অবশ্য বাস্তবজগতে এমন মায়ার ডোর ছেদন করিয়াও পুরুষ উন্মার্গগামী হয়, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। কিন্তু আর্টের হিসাবে, কল্পনার জগতে এই সুন্দর তথ্যটি বেশ খাপ খায়।

(।৶০) সূর্য্যমুখী ও কুন্দ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, দেবেন্দ্র দত্তর পত্নী হৈমবতী সম্বন্ধেও তাহা খাটে।

(।৶০) চারিত্র্য-নীতির যে তত্ত্ব-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে নিরাশ্রয়া কুন্দকে কবি নগেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করাইয়াছেন, তাহার অনুকূল অবস্থাসৃষ্টির জন্য তাঁহাকে কুন্দর মাতাপিতার মৃত্যু ঘটাইতে হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু কুন্দর পরলোকগতা মাতার প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য আছে।

কুন্দর স্বপ্নদৃষ্টা মাতা

মাতা—কুমারী বা 'সধবা হইয়াও বিধবা' কন্যার জন্য কিরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্তা হন, তাহা আমরা পরে শৈবলিনীর মাতা, রাধারাণীর মাতা, ভ্রমরের মাতা, হিরণ্ময়ীর মাতা, ইন্দিরার মাতা, প্রফুল্লর মাতা প্রভৃতির বেলায় দেখিব। কিন্তু জীবনান্তেও যে মাতার স্নেহ ও আশঙ্কা—'স্নেহঃ সদা পাপনাশঙ্কতে'—কত প্রবল, তাহা কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদৃষ্টা পরলোকগতা মাতার চিত্রে সুন্দরভাবে কল্পিত হইয়াছে। অবশ্য, এখানেও কল্পনাজগতের কথা। বাস্তবজগতে স্বপ্ন 'অমূলক চিন্তামাত্র' অথবা মনের দুশ্চিন্তার বিচিত্র লীলামাত্র।

কুন্দ যে রাত্রিতে পিতার মৃত্যুতে নিরাশ্রয়া হইল, সেই রাত্রিতে সে স্বপ্নে পরলোকগতা মাতাকে 'চন্দ্রমণ্ডলমধ্য-

মাতৃমূর্ত্তি

[মাইকেল্ এঞ্জেলো কর্তৃক অঙ্কিত]

বর্ত্তিনী জ্যোতির্ম্ময়ী দৈব মূর্ত্তি'র আকারে দেখিল। 'রমণীয় কারুণ্যপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল; স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে।......আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন।......পরে কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া' তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃসহ দুঃখনিবারণকল্পে তাহাকে অমৃতলোকে, শান্তিধামে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কুন্দ যখন বলিল—'আমি অতদূর যাইতে পারিব না, আমার বল নাই,' তখন তিনি দুঃখিতা হইলেন এবং তখনও কুন্দের প্রতি কারুণ্য-পরবশা হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ শত্রুদ্বয়ের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে 'বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যাত' করিতে বলিলেন। [৩য় পরিচ্ছেদ।]

আবার কুন্দ যখন অনেক মর্ম্মবেদনা পাইয়া ও অপরের অনেক মনোবেদনার কারণ হইয়া, নগেন্দ্রনাথের পত্নী হইয়াও সুখী হইতে পারিল না, স্বামীর নিকট 'তুমিই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের কারণ' এই তিরস্কার-বাক্যে লাঞ্ছিতা হইল,—আবার সূর্য্যমুখীর অলীক মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া একবার অভাগিনী কুন্দনন্দিনীর সহিত বাক্যালাপ করিলেন না, তখন

পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইয়া কুন্দর ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। সে মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। 'সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। সে তন্দ্রাভিভূত হইয়া' আবার মাতাকে স্বপ্ন দেখিল। করুণাময়ী মাতা আবার তাহাকে আহ্বান করিলেন। [৪৭শ পরিচ্ছেদ।]

কি সুন্দর কবিকল্পনা! কি অপূর্ব্ব করুণরস! শকুন্তলার মাতা শকুন্তলার বড় বিপদের সময় স্বশরীরে আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এখানে স্বপ্নদৃষ্টা মাতাও সেইরূপ কন্যার বিপদের সময় আশ্রয় দিতে ব্যগ্র। কুন্দের মাতা স্বপ্নে দেখা দিয়া, কবি কূপরের চিত্রাঙ্কিতা পরলোকগতা মাতার ন্যায় যেন স্নেহগদ্‌গদকণ্ঠে বলিতেছেন; 'Grieve not my child, chase all thy fears away'—"দুঃখ নাহি কর বৎস, দূর কর ভয়,"—যেন কবির প্রশ্নের এখানে উত্তর মিলিল, 'Hover'd thy spirit O'er thy sorrowing child?' 'দুঃখিত সন্তান পাশে, তোর আত্মা স্নেহবশে, স্বর্গ ছাড়ি এসেছিল ধরায় তখন?'—যেন কবির বাক্য সফল হইল—'thyself removed, thy power to soothe me left'—"কাল শুধু আধখান, হরিয়াছে তব প্রাণ, রেখে গেছে স্নেহটুকু তুষিতে আমায়।" * অতএব একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, 'বিষবৃক্ষে' শুধু 'টুকরা কমলমণি' একমাত্র মাতৃচিত্র নহে। অবশ্য বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচক কুন্দর স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে আনন্দমঠের মহেন্দ্রসিংহের কথায় বলিবেন—"স্বপ্ন কেবল বিভীষিকা-মাত্র। আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়! জীবনের জলবিম্ব।" The Earth hath bubbles as the water has and these are of them—ইহাতে বস্তুতন্ত্রতার একান্ত অভাব। কিন্তু কবির কাব্য একটু ভাবুকতার চক্ষে দেখিলে ক্ষতি কি? †

মৃণালিনী, ইন্দিরা, রাধারাণী প্রভৃতির ন্যায় কুন্দর সমবেদনাময়ী সখী নাই; বাল্যে পিতৃবিয়োগের পর বাল্যসঙ্গিনী চাঁপার কাছে কুন্দ স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দুঃখের জীবনে চাঁপার সমবেদনা হইতে সে বিচ্ছিন্ন; নূতন জীবনে কিছুদিন হীরা তাহার সহিত মৌখিক সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু শেষে সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; কমলমণিও সকল সময়ে তাহার হৃদয়ক্ষতে স্নেহের প্রলেপ দেন নাই। বিমলার মত স্নেহময়ী বিমাতাও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। এ অবস্থায় অভাগিনীর সমস্ত অভাব যেন স্বপ্নে আবির্ভূতা মাতা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

কমলমণি

(॥৹) কমলমণির পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য, সূর্য্যমুখীর মর্ম্মান্তিক হৃদয়বেদনায় সমবেদনাময়ী সখী ও ননদের কার্য্যসম্পাদন। কিন্তু এই চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য গ্রন্থকার তাঁহার পতিপুত্রের সহিত মধুর সম্পর্কের দিক্‌টাও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। 'নবীনা জননী' কমলমণির মাতৃভাব অতি সুন্দর, অতি মধুর। জননী ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন।* এই ম্যাডোনা-মূর্ত্তি মাতৃভাবের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু অল্পবয়সী মা শিশুসন্তানকে লইয়া আদর করিতেছেন, ছেলের সহিত ছেলেমানুষ হইয়া ছেলেখেলা করিতেছেন, স্নেহে তাঁহার নবনীতকোমল মাতৃহৃদয় গলিয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য বোধ হয় আরও সুন্দর, আরও মধুর। দৌহিত্রসন্তানের কল্যাণে এই মাধুর্য্য-উপভোগে ধন্য হইয়াছি বলিয়াই যে এমন কথা বলিতেছি, তাহা নহে, সকল গৃহীই এ কথায় সায় দিবেন। এইরূপ আর একটি সুন্দর চিত্র ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সমাজের' প্রথম পরিচ্ছেদে (সুধা ও তাহার শিশু) দেখা যায়। বলা বাহুল্য, রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ 'বিষবৃক্ষের' অনেক পরে রচিত। যত দূর স্মরণ হয়, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই চিত্রের সৌন্দর্য্যের একটি বিশিষ্টতা এই যে, প্রত্যেক

* অনুবাদ 'বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত শ্রীমান্ রমেন্দ্রলাল গুপ্তের 'মাতৃচিত্রদর্শনে' কবিতা হইতে গৃহীত।

† দেবী চৌধুরাণীতে ফুলমণির প্রফুল্ল সম্বন্ধে উক্তি—'কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গিয়েছে।'—(১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ)। এরূপ কল্পনায় Comic treatment.

* বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামে বলিয়াছেন 'শিশু মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে।' আমার মনে হয়, মাতৃক্রোড়ে শিশু দেখিলে আমাদের লুপ্ত শিশুত্ব ফিরিয়া আসে, আমরাও তখন এই মাতৃমূর্ত্তিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখি।

সেই মধুরে করুণে মিশিয়া একটি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার করিয়াছে। পর পর কয়েকটি দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম দৃশ্য। কমলমণি যখন সূর্য্যমুখীর পত্রে—'একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো!' এই আকুল আহ্বান পাইলেন [১২শ পরিচ্ছেদ।] তখন 'কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। অমনি স্বামীর কাছে গেলেন'। সূর্য্যমুখীর দুঃখে সান্ত্বনা দিবার জন্য, তাঁহার দাম্পত্যসুখের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য, তিনি গোবিন্দপুরে যাইবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া স্বামীর অনুমতি লইতে গেলেন। মাতৃগর্ব্বে গর্ব্বিতা কমলমণি বড় মিষ্ট করিয়া সেই সঙ্কল্প স্বামীর গোচর করিলেন। 'বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা' সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।' এই কথার টীকাবৃত্তি রচনা করিতে গিয়া যখন পতিপত্নী 'মহাসমরে' মত্ত হইলেন, তখন রণক্ষেত্রে সেই ঘন ঘন চুম্বনবৃষ্টির grapeshot এর মধ্যে 'সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাঁহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়ের মুখপানে চাহিয়া হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কাণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিল। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন।' 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুন প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ, কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র-সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল।' [১৩শ পরিচ্ছেদ।]

পুত্রই পুত্রবতী জননীর স্বামীর সহিত প্রণয়বন্ধনের সোণার শিকল (golden link); এই চিত্রে কবি একাধারে পতিপ্রীতি ও সন্তানপ্রীতির কি সুন্দর সমন্বয় দেখাইয়াছেন। কালিদাসের কথায় বলিতে হয়—

"রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং
বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ং।
বিভক্তমপোকসুতেন তত্তয়োঃ
পরস্পরস্যোপরি পর্য্যচীয়ত॥"

পরক্ষণেই শ্রীশচন্দ্র বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, অর্থাৎ সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত না হইলে কমলমণি প্রণয়কোপ দেখাইয়া বলিলেন—"আয়, সতীশ! আয়, আমরা দুজনে দুই দিকে কাঁদতে বসি।" 'মার, আদরের ডাক সতীশের কাণে গেল—সতীশ অমনি লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল। সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না। তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন।' দারুণ দুঃখদুশ্চিন্তার সময়ও মায়ের প্রাণ সন্তানের মুখ দেখিলে সকল জ্বালা ভুলিয়া যায়, এখানে কবি মাতৃহৃদয়ের এই রহস্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য। সূর্য্যমুখী যখন কুন্দ ও হরিদাসী বৈষ্ণবীর বিরলে কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করিয়া সন্দিহান হইয়া কমলকে সে দৃশ্য দেখাইলেন, এবং হাস্যময়ী কৌতুকময়ী কমলমণি যখন বৈষ্ণবীকে কাঁটা ফোটার সুখ দেখাইবার জন্য বাবলার ডালের সন্ধানে গেলেন, তখন পথে সতীশকে দেখিয়া কমল—'বৈষ্ণবী—বাবলার ডাল, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।' [১৫শ পরিচ্ছেদ।]

তৃতীয় দৃশ্য। কমলমণি যখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এদিকে ঘরের কোণে বিরহিণী বাতায়নে', আর 'বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস কোটা' 'জড়ায়ে সহস্র পাকে' শ্রীশচন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছে, সুতরাং কমলের কিছুই ভাল লাগে না, 'কার্পেটে কারচুপি করা নবাচালে' তাঁহার বিরক্তি ধরিল, তখন তিনি জননীর চিত্তবিনোদনের অমোঘ উপায় স্বরূপ 'সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন!' [২৫শ পরিচ্ছেদ।] এবং সতু বাবুর কাণে মন্ত্র দিলেন—'আপিস যেও না—আপিসে গেলে বৌ দুপুর বেলা বসে কাঁদবে।—মনে থাকে যেন। আপিসে গেলে বৌ মারিবে!'

এই কথোপকথনে কেবল মধুর বাৎসল্যরসটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই সূর্য্যমুখীর পত্রে কুন্দ-

নন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রনাথের বিবাহের নিদারুণ সংবাদ পাইয়া 'কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।...তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি, বল দেখি সতু বাবু?" সতু বাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকাভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন।' বিজ্ঞ পাঠক হয় ত ব্যাপারটাকে ছেপলামি বলিয়া উড়াইয়া দিবেন এবং কমলকে এমন মর্ম্মান্তিক সংবাদ লইয়া ছেলেমানুষি করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইবেন। কিন্তু আশা করি, প্রকৃত রসজ্ঞ ও মাতৃহৃদয়ের রহস্যজ্ঞ পাঠক—'সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন' এই 'সুতরাং' এর মাধুর্য্য বুঝিবেন। এবং কালিদাসের 'পুত্রোৎসবে মাগ্নতি কা না হর্ষাৎ' বাক্যটি স্মরণ করিবেন।

তাহার পর, যখন তিনি মন্ত্রীর (স্বামীর) সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন, তখন আবার সতু বাবুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'সতু বাবু, আজ এস আমরা রাগ করিয়া থাকি।' 'কমলমণি শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাটের উপর শুইলেন।' এই দৃশ্যও প্রথম দৃশ্যের ন্যায় মধুরে করুণে অপূর্ব্ব মিশ্রণ।

চতুর্থ দৃশ্য। তিন তিনবার সূর্য্যমুখীর মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা জানিয়াও সমবেদনাময়ী কমলমণি সতু বাবুর চাঁদমুখ ও বাল্যলীলা দেখিয়া, আধ আধ বাণী ও হাসির লহর শুনিয়া, সূর্য্যমুখীকে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেলেন, এই ব্যাপারে যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, কমলমণি দুঃসংবাদ পাইয়া যখন স্বামিপুত্র সঙ্গে গোবিন্দপুরে পৌঁছিলেন, তখন 'অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সতীশ যে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন।' [২৮শ পরিচ্ছেদ।] এইবার গভীর সমবেদনার নিকট অপত্যস্নেহ পরাজিত, কারুণ্যের নিকট বাৎসল্য পরাজিত, স্নেহময়ী সখী ও ননন্দার কর্ত্তব্যের নিকট সন্তানগর্ব্ব পুত্রমুখদর্শন-সুখ পরাজিত।

পঞ্চম দৃশ্য। 'কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন। কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আলুলায়িতকুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া আসিল।.. সতীশ মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন তাহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি সতীশের অঙ্গে হস্তপ্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, আদরও করিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া, মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল।' [৩৯শ পরিচ্ছেদ।] এখানে অপত্যস্নেহ গভীর সমবেদনার সহিত অনেকক্ষণ যুঝিল, কিন্তু শেষে পরাজিত হইল।

শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে কমলমণি বুক বাঁধিয়াছিলেন। "কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন; তার পরে ভাবিলেন, 'কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে—কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না; তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না, কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে তবে কেন হাসব না?' এই ভাবিয়া কমলমণি রোদন ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।" [৪৩শ পরিচ্ছেদ।] তিনি স্বামিপুত্রের মুখ চাহিয়া হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিলেন। মাতৃভাব শেষে জয়ী হইল। টেনিসনের গানে 'Sweet my child, I live for thee' 'রে জাদু আমার, নয়নের নিধি, তোরি তরে আছি বাঁচিয়া'† ইহা অপেক্ষাও করুণ, কেননা সে শোক (পতিবিয়োগজনিত) ইহা অপেক্ষাও তীব্র। তথাপি বলিতে হইবে, এই চিত্রে মধুর ও করুণের একত্র সমাবেশ অপূর্ব্ব। পর পর পাঁচটি দৃশ্যে এই যে মনোহর মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা কি পূর্ণায়তন নহে? ইহাকে 'টুক্‌রা' চিত্র বলিলে অন্যায় হয় না কি?

'বিষবৃক্ষে' মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় নগেন্দ্রনাথ-সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়ব্যাপার ও তাহার শোকাবহ পরিণাম। গৌণ বর্ণনীয় বিষয়—দেবেন্দ্রদত্ত-কুন্দ-হীরা-ঘটিত ব্যাপার মুখ্য আখ্যানের অঙ্গীভূত কমলমণিচরিত্র; সূর্য্যমুখীর

† 'বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত অনুবাদ হইতে গৃহীত

...স্বরূপ সখী ও ননন্দার কর্ত্তব্যসাধন করিবার জন্য ...র সৃষ্টি। এ অবস্থায় তাঁহার চরিত্রের সকল দিক্ ...ফুটাইলেও গ্রন্থকারকে দোষী করা যাইত না। ...তথাপি তিনি যে এমন সুন্দরভাবে কমলমণির ...ভাব ফুটাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রশংসার্হ।

৫। 'চন্দ্রশেখর'

'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষে' গার্হস্থ্য জীবনের বিবরণ ..., অতএব এ দুইখানিতে মাতৃচিত্রের আশা করা ... সে আশায় আমরা বঞ্চিত হই নাই, তবে ...কুণ্ডলা'য় মাতৃচিত্রটি নিতান্ত ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত। ...র কারণ প্রদর্শন করিয়াছি। 'বিষবৃক্ষে' চিত্র ... ও মনোরম। ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'চন্দ্রশেখরে' ... মাতৃচিত্রের একান্ত অভাব। শৈবলিনীর অসংযত ... প্রণয় যে গ্রন্থের অস্থিমজ্জা, তাহা কি মাতৃভাবের ...রণের উপযুক্ত স্থান?

... বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি আখ্যায়িকায় মাতা ...যোগ্যা কুমারী কন্যা অথবা বিবাহিতা কিন্তু ...ত্যক্তা যুবতী কন্যা লইয়া দারিদ্র্যের সহিত ...তেছেন, এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে বিমলার মাতা ও তিলোত্তমার মাতামহী ... শ্রেণীর। বর্ত্তমান গ্রন্থে শৈবলিনীর মাতা এই ...র। কিন্তু গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ অতি সামান্য। ... বিধবা মাতার বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহ ...য়ে দারুণ উৎকণ্ঠা জন্মে। এই ভাবটুকুও ...লিনীর মাতার উল্লেখে বড় ফুটে নাই। 'শৈবলিনী ...দের কন্যা। কেহ ছিল না—কেবল মাতা। তাহাদের ... ছিল না, কেবল একখানি কুটীর। শৈবলিনী বাড়িতে ...লি। কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে, কে ... করে?' আর পাত্রের সন্ধানই বা কে করে? উপক্রমণিকা—২য় পরিচ্ছেদ।) পর-পরিচ্ছেদে জানা যায়, চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।' এস্থলে শৈবলিনীর জননীর উল্লেখও নাই। 'বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।' কন্যাদায়-মুক্তা বিধবা স্বর্গলোকে পতির সহিত মিলিতা হইলেন কি না কিছুই জানা যায় না। তিনি একেবারে অন্তর্হিতা। (১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদে গৃহত্যাগিনী শৈবলিনী বলিতেছেন, 'গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।' ভাবে বুঝা যাইতেছে, শৈবলিনীর মাতা তখন ইহলোকে নাই।) এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সূর্য্যমুখীর ন্যায় গৃহত্যাগ ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই, (উভয় ক্ষেত্রে গৃহত্যাগের কারণ ভিন্ন ভিন্ন), ভ্রমরের ন্যায় মাতাপিতাভগিনীর স্নেহ পাইবার তাঁহার উপায় ছিল না, এই উদ্দেশ্যে কবি শৈবলিনীর মাতাকে পথ হইতে অপসারিত করিয়াছেন।

(খ) প্রতাপের মাতাও দরিদ্রা বিধবা। চন্দ্রশেখর জলমগ্ন প্রতাপকে উদ্ধার করিলে প্রতাপের মাতা কৃতজ্ঞতা বশে অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কেবল এইটুকু জানা যায়। (উপক্রমণিকা ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ।) প্রতাপের বিবাহিত জীবনে আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না। পুত্র পুত্রবধূকে ঘরকরনা বুঝাইয়া দিয়া তিনি চণ্ডীকাব্যে নিদয়ার মত কাশীবাসিনী হইলেন, কি নবকুমারের মাতার মত গৃহেই রহিলেন, কিছুই জানা যায় না। এই গ্রন্থ ...হালের বিবরণ নহে, সুতরাং তাঁহার অবশ্যই শ্রীশচন্দ্রের মাতার মত অবস্থা হয় নাই। প্রতাপের গার্হস্থ্য জীবন অপ্রধান বিষয় বলিয়াই এ বিষয়ে গ্রন্থকার নীরব।

(গ) চন্দ্রশেখরের মাতা বিধবা, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মত দরিদ্রা নহেন। যাহা হউক, উপক্রমণিকায় জানা যায়, তিনি উপক্রমণিকা আরম্ভেরও 'বৎসরাধিক কাল' পূর্ব্বে পরলোকগতা। তাঁহার অভাবে সংসার অচল হওয়াতেই জ্ঞানব্রত ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে হইল। বিবাহিত জীবনে ভ্রমরের অথবা কপালকুণ্ডলারও উপর যেটুকু চাপ (check) ছিল, (সূর্য্যমুখী বা) শৈবলিনীর বেলায় সেটুকুও নাই। ইহারই জন্য সূর্য্যমুখীর ন্যায় শৈবলিনীরও ষোল আনা স্বাধীনতা। তাহার ফল তাহার জীবনের ইতিহাসে পরিদৃশ্যমান। অতএব এক্ষেত্রে শৈবলিনীচরিত্রের বিকাশ যে ভাবে প্রদর্শন করা কবির উদ্দেশ্য, সে জন্য শাশুড়ীর তিরোভাব প্রয়োজনীয়, তজ্জন্যই গল্পটি এই ভাবে গঠিত হইয়াছে।

(ঘ) গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে (দলনী ভ্রাতৃসঙ্গে 'ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে।'

ষষ্ঠ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ। এ অবস্থায় তাহার জননীর প্রসঙ্গ গ্রন্থে আশা করা যায় না।

(৮০) মর্শামর্ণীর নিঃসন্তান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, দলনী সম্বন্ধেও অনেকটা সেই কথা বলা যায়।

(৮০) সুন্দরীর সখী সাজিবার জন্যই জন্ম, সুতরাং তাহার সন্তানাদি ছিল কি না ছিল, তাহা গ্রন্থকারের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, 'গোড়ার কথা'য় বলিয়াছি।

(৮০) রূপসী প্রতাপের পত্নীর ভূমিকাগ্রহণের জন্য প্রতিমার সাজ হিসাবে গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট। সুতরাং তাহার সম্বন্ধেও গ্রন্থকারের বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। মর্শামর্ণীর নিঃসন্তান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাও এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

শৈবলিনী

(৮০) শৈবলিনীর নিঃসন্তান অবস্থা ঘটাইবার পক্ষে একটা প্রবল হেতু আছে। এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে।

যখন সুন্দরী নাপিতানীবেশে গৃহত্যাগিনী শৈবলিনীর সহিত দেখা করিল এবং তাহাকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিল, তখন শৈবলিনী যে সকল আপত্তি জানাইল, তন্মধ্যে এই কথাগুলি আছে—"ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ দিবে?" (১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) এই 'ঈশ্বর না করুন' হইতে আপাততঃ মনে হয় যে—পরপুরুষে অনুরাগিণী শৈবলিনীর মাতৃভাবের একান্ত অভাব ছিল, সন্তানলাভে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে কি মনে হয় না যে, ইহার ভিতরেও হিন্দুনারীর সন্তান কামনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কেবল তিনি যে পথে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে সন্তান না জন্মানই * পরম মঙ্গল, এই কথা বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য? অতএব ধরিতে গেলে, প্রকৃত মাতৃভাব পরিচালিত হইয়াই তিনি সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার জানিয়া এই সৌভাগ্যলাভে বীতরাগ।

* টেনিসনের 'ঈনোনি'তে (Œnone) নায়িকার সন্তানলাভে আপত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে।

যাহা হউক, শৈবলিনী নিঃসন্তানা কেন, এ প্রশ্ন করিলে টেনিসনের কবিতাবলির তিনটি স্থানে প্রশ্ন-সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। টেনিসনের 'লক্‌স্‌লে হল' (Locksley Hall) নামক ক্ষুদ্র কাব্যে আছে :—

"Nay, but Nature brings thee solace ; for a tender voice will cry
'Tis a purer life than thine ; a lip to drain thy trouble dry
Baby lips will laugh me down ; my latest rival brings thee rest.
Baby fingers, waxen touches, press me from the mother's breast.
O the child too clothes the father with a dearness not his due.
Half is thine and half is his ; it will be worthy of the two."

টেনিসনের এই ক্ষুদ্র কাব্যের আখ্যানাংশ এইরূপ:—বাল্যকাল হইতে একত্র সাহচর্য্যে দুই জনের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহারাও প্রতাপ ও শৈবলিনীর মত (cousin) সম্পর্কিত। পরে গুরুজনের আদেশে যুবতীর অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ হয়। তৎপ্রসঙ্গে ভগ্ন-হৃদয় প্রণয়ী বলিতেছেন, যুবতীর প্রথম প্রথম পূর্ব্বরাগের স্মৃতি লুপ্ত না হইলেও, সন্তান জন্মিলেই সন্তানের জনকের প্রতি নৈসর্গিক নিয়মে সন্তানজননীর প্রণয় জন্মিবে। শৈবলিনীসম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সন্তানজননী হইলে প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরের অনুরাগিণী হইতেন, এই গূঢ় মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে টেনিসনের গিনিভিয়ারের (Guinevere) ন্যায় নিঃসন্তানা করিয়াছেন।

এই তত্ত্ব টেনিসন তাঁহার Enoch Arden-এও প্রকটিত করিয়াছেন। নায়িকা এনি (Annie) যখন অনেক আপত্তি, অনেক ইতস্ততর পর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, উপকারী বাল্যসখাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল, তখনও কিছুদিন তাহার মনের ভিতর একটা অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য বেদনা, আকুলতা জাগিয়া থাকিত, কিন্তু নব-বিবাহিত স্বামীর ঔরসে সন্তান জন্মিবামাত্র সে ভাব দূর

মাতৃমূর্ত্তি The Virgin with Donor

শিল্পী- ভ্যান ডাইক

হইল, নবজাত শিশু ও তাহার জনক অভাগিনীর সর্ব্বস্ব হইয়া দাড়াইল।

টেনিসনের আর একটি কবিতা (The Bandit's Death) 'দস্যুর মৃত্যু' তেমন সুপরিচিত নহে। সেটিতেও এই তত্ত্ব প্রকটিত। জনৈক দস্যু একটি বিবাহিতা নারীর স্বামিহত্যা করিয়া তাহাকে হরণ করে। দস্যুর ঔরসে নারীর একটি সন্তান হয়, এই সন্তান উভয়ের প্রেমবন্ধন-স্বরূপ হয় ('that was a link between us'), এক সময়ে অনুসরণকারী শত্রুর কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যখন উভয়ে পলায়নপর হয়, তখন শিশুর ক্রন্দন শব্দে পাছে শত্রু তাহাদিগের পলায়ন-পথ জানিতে পারে এই ভয়ে দস্যু শিশুটিকে বধ করে। তৎক্ষণাৎ প্রণয়বন্ধন টুটিল ('The link was broken') এবং রমণী স্বামিপুত্রঘাতক দস্যুকে বধ করিলেন।

অবশ্য এক্ষেত্রেও সাংসারিকজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলিবেন, বাস্তবজগতে ইহার ব্যতিক্রম বহুস্থলে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে শকুন্তলার প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি, এসব স্থলে এবংবিধ কল্পনাত্মক তথা কাব্যকলার অধিকতর উপযোগী। (East Lynne) ইষ্ট লিন্ নামক বিখ্যাত আখ্যায়িকার ইজাবেল মুহূর্ত্তের ভ্রমে স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, শয়তান লেভিসনের প্ররোচনায় অবৈধ প্রণয়ের উত্তেজনায় সন্তানের মায়া কাটাইয়া গৃহত্যাগিনী হইয়াছিলেন এবং পরে তজ্জন্য অনুতাপিনী হইয়াছিলেন, কাব্য জগতে এরূপ কল্পনাও আছে বটে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধ্যা 'বিরাজবৌ' এর এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় গৃহত্যাগ সমীচীনতর নহে কি?

৬। 'রজনী'

(ক) রজনীর মাতার রজনীর শৈশবেই মৃত্যু হয়; হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশু কন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়।' [৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদেও এই প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং তাহার মাসীকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। রজনীর মাসীর চিত্র মৃণালিনীর অরুন্ধতী মাসীর চিত্র অপেক্ষা পরিস্ফুট। শিশুসন্তান লইয়া মাতার দারিদ্র্যের সহিত যে সংগ্রামের সামান্য পরিচয় আমরা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলার মাতা ও তিলোত্তমার মাতামহীর বেলায় এবং 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের মাতা ও শৈবলিনীর মাতার বেলায় পাই, এখানে মাসীর সেইরূপ অবস্থা। তবে তিনি সধবা, পূর্ব্বকথিতাদিগের ন্যায় বিধবা নহেন। গ্রন্থারম্ভে রজনীর মাসী ও মাসুয়ার। তাহারা মা বাপ বলিয়াই পরিচিত। দারিদ্র্যের কথা, ফুলের মালা গাঁথিয়া কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহের কথা জানা যায়। তখন রজনী শিশু নহে, যুবতী। বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহসমস্যা হিন্দুর ঘরে মাতাপিতার এক প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয়। ইহা মাতাপিতার স্নেহের একটা দিক্। গ্রন্থে রজনীর বেলায় সেই দুশ্চিন্তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। [১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদে] তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় জানা যায় যে, ললিত লবঙ্গলতার চেষ্টায় তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, রজনী বিবাহের জন্য লালায়িত তাহার মা (মাসী) এইরূপ বুঝিয়াছেন। সুতরাং এ বিবাহে 'মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, অবশ্য স্বাভাবিক। তাহার পর, অনন্যোপায় হইয়া 'লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। যোড়হাত করিয়া বলিলাম,— "আমার বিবাহ দিওনা—আমি আইবুড় থাকিব।" আর কিছু বলিতে পারিলাম না।' [রজনীর উক্তি, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] জুলিয়েটের মাতার ন্যায়, তিনিও কন্যার পূর্ব্বরাগের কথা কিছু জানিতেন না, কন্যার প্রকৃত দুঃখের কথা বুঝিলেন না, রজনীও কিছু ভাঙ্গিয়া বলিল না। সুতরাং 'মাতা বিরক্ত হইলেন,- রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন।' ইহা হিন্দু মাতার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহাতে স্নেহের অভাব প্রকাশিত হয় না। তাহার পর রজনী হঠাৎ গৃহত্যাগিনী হইলে মাতার হৃদয়ে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু অমরনাথ রজনীকে আনিয়া দিলে রজনীর 'মাতা অনেক রোদন করিল, বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল', এ কথার উল্লেখ আছে। [২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] রজনী কেন গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার কিসের দুঃখ, তখনও পর্য্যন্ত মাতাপিতা বুঝেন নাই। বাপ থাকিতে কন্যার বিবাহ দেওয়ার ঝুঁকি মায়ের উপর নহে, সুতরাং

এক্ষেত্রে রজনীর মাতা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি নিতান্ত নিরীহ লোক ছিলেন। 'আমি মেয়েমানুষ, অত কি জানি' [৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।] এই একটি ক্ষুদ্রবাক্যে তাঁহার প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পরিচ্ছেদে তাঁহার সহিত ললিত লবঙ্গলতার, রজনীর শচীন্দ্র বা অমরনাথের সঙ্গে বিবাহ বিষয়ে, যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহাও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'বিয়ের কন্যার আবার মতামত কি?' এ কথার উত্তরে তিনি বলিলেন—'রজনী ত ক্ষুদে মেয়ে নয়, তাতে আমার পেটের সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়।' ইহাও স্বাভাবিক। ঘটকীবিদায়ের লোভে যত না হউক, লবঙ্গলতার নিকট প্রাপ্ত পূর্ব্ব উপকার স্মরণে রজনীর মাসী শচীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে উৎসুকা দেখাইলেন, এবং বলিলেন 'আপনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করিতে পারেন।' ললিতলবঙ্গলতার সহিত দেখা করিবার পর হইতে রজনী কেন কাঁদিয়াছিল, তিনি তাহারও কিছু কারণ বুঝিলেন না। [৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।] রজনীর দুঃখের প্রকৃত কারণ না জানিয়া যতটা স্নেহ-মমতা দেখান যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন ত্রুটি ছিল না। ফলতঃ এই চিত্রে মনোরম বা চমৎকার কিছু না থাকিলেও, যাহা আছে, তাহা সাধারণ জীবনের অনুরূপ।

(৮০) শচীন্দ্রের মাতা গ্রন্থারম্ভে 'চিররুগ্না ও প্রাচীনা' [১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ]। বিমাতা ললিতলবঙ্গলতার শচীন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিবার জন্যই গ্রন্থকার শচীন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতার প্রসঙ্গ বড় একটা তোলেন নাই; কেবল তিনটি স্থলে তাঁহার পুত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। এক স্থলে আছে—'ছোট বাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মার কাছে গেলেন।' [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] আর একস্থলে আছে, শচীন্দ্র কাণা ফুলওয়ালীর সঙ্গে নিজের বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য পিতার কাছ ছাড়িয়া মার কাছে গেলেন। 'কিন্তু মার কাছে রাগ করিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল' —শচীন্দ্রের উক্তি।—[৩য় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।] আর একস্থলে আছে, শচীন্দ্রের কঠিন পীড়ার সময় ললিত-লবঙ্গলতা বলিতেছেন—'দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করেন না' [৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ]।

(৯০) গ্রন্থে প্রকৃত গর্ভধারিণীর জননীর স্নেহের নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গ থাকিলেও, বিমাতার স্নেহ অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে—তাহা 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি, যে চারিখানি পুস্তকে বিমাতার স্নেহের প্রসঙ্গ আছে, তাহার প্রথম দুইখানিতে বিমাতার (বিমলা, ললিতলবঙ্গলতা) গর্ভজ সন্তান নাই।

(১০) গ্রন্থে অমরনাথের পূর্ব্ববৃত্তান্তে তাঁহার পিতার উল্লেখ আছে, মাতার উল্লেখ নাই। বোধ হয় অমরনাথ শৈশবেই মাতৃহীন।

রজনীর মাতৃত্ব

(১/০) রজনীর বিবাহ গ্রন্থের উপান্ত পরিচ্ছেদে, তাহার মাতৃমূর্ত্তি গ্রন্থশেষে, শেষ পৃষ্ঠায় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। কিন্তু ইহার অঙ্কুর ১ম খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। 'যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল —জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "থাব" বলিত, রজনী বলিতে, "জুঞ্জি" বলিত, তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিবে?' ইহা প্রকৃত-পক্ষে মাতৃভাব। তবে যদি কেহ আপত্তি তোলেন যে, রজনী হাসিতে হাসিতে শিশুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহারা না হয় ইহাকে দাম্পত্যপ্রেম বলুন! যাহা হউক, শেষ পরিচ্ছেদের মাতৃচিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও অতি সুন্দর, অতি মনোরম। ইহা কমলমণি বা সুভাষিণীর মাতৃ-মূর্ত্তি অপেক্ষা কম হৃদয়গ্রাহী নহে। যখন বালক হস্তোত্তোলন করিয়া অমরনাথকে "দা!" (যা) বলিল, তখন টেনিসনের লক্‌সলি হলের—Baby fingers, waxen touches, press me from the mother's breast—মনে পড়ে। তবে এ ক্ষেত্রে উহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নহে, কেন না রজনীর প্রতি অমরনাথের প্রণয়সঞ্চার হইলেও, অমরনাথের প্রতি রজনীর কখন প্রেমসঞ্চার হয় নাই, কেবল গভীর কৃতজ্ঞতাসঞ্চারই হইয়াছিল।

৭। 'যুগলাঙ্গুরীয়'

'ইন্দিরা' পরে পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনর্লিখিত হয়, অতএব 'ইন্দিরার' আলোচনা পরে করিব।

(১০) 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' নায়ক পুরন্দরের পিতার উল্লেখ কয়েক স্থলে পাওয়া যায়, (১ম, ৫ম ও ১০ম পরিচ্ছেদ।) মাতার উল্লেখ একেবারে নাই। বোধ হয়, নায়ক শৈশবেই মাতৃহীন।

(৮০) 'রজনী'র প্রসঙ্গে বলিয়াছি, কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মাতাপিতার দায়িত্বজ্ঞান ও দুশ্চিন্তা তীব্র। স্বামী বর্ত্তমানে পত্নীর এবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই, তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া স্বামীকে এবিষয়ে অনুরোধ অনুযোগ করেন। এই ক্ষুদ্র গল্পে দেখা যায়, হিরণ্ময়ীর মাতা 'কন্যা বড় হইল' বলিয়া স্বামীকে তিরস্কার করিতেন, স্বামী শুনিতেন না। পরে তিনি স্বামীর নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া কৌটায় পত্রের অর্দ্ধাংশ রাখিয়াছিলেন এবং স্বামীর কথামত গুরুদেবের আজ্ঞায় কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্য কাশী গিয়াছিলেন। (২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ।

তাহার পর, হিরণ্ময়ীর মাতার একবার মাত্র উল্লেখ আছে। হিরণ্ময়ীর পিতা ধনদাসের মৃত্যু হইলে 'ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন।' (৪র্থ পরিচ্ছেদ।) 'হিরণ্ময়ীর আর কেহ ছিল না, এজন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন, যে তুমি মরিও না। কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না।... মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, যে বাছা, তোমার কিসের ভাবনা? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।'

হিরণ্ময়ীর পিতা যে মৃত্যুকালে প্রভূত পরিমাণে ঋণগ্রস্ত ছিলেন এবং ভবিষ্যতে যে হিরণ্ময়ী 'অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী, হইবেন, একথা অবশ্য তাঁহার মাতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।+ সুতরাং তিনি বয়ঃস্থা বিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গত কারণ দেখাইয়া সান্ত্বনা দিলেন ও মহাভারতের মাদ্রীর ন্যায় স্বামীর অনুমৃতা হইলেন, বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজ জীবনরক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলেন না। রূপযৌবন-সম্পন্না প্রভূতধনশালিনী (?) কন্যাকে অরক্ষিতা অবস্থায় রাখিলে যে কত বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাহা তিনি ভাবিলেন না বলিয়া যাঁহারা পতিপরায়ণা সাধ্বীর সহমরণের নিন্দা করিবেন, তাঁহারা ভগবান্ মনুর বচন স্মরণ করিবেন—

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

বলা বাহুল্য, গ্রন্থকার নায়িকার চরিত্রের যে ভাবে বিকাশ ঘটাইতে চাহেন এবং প্লটের বিবর্ত্তন যে ভাবে করিতে চাহেন, তাহাতে নায়িকার মাতার তিরোভাব নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৮। 'রাধারাণী'

(১০) 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র নায়ক পুরন্দরের ন্যায়, এই ক্ষুদ্র আখ্যানের নায়ক রুক্মিণীকুমার ওরফে 'রাজা' দেবেন্দ্র নারায়ণের পিতার উল্লেখ আছে, (৫ম পরিচ্ছেদ) মাতার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তিনিও শৈশবে মাতৃহীন।

(৮০) বসন্তকুমারীর মাতাও সম্ভবতঃ মৃতা।

রাধারাণীর মাতা

(৬০) 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'চন্দ্রশেখরে' বালিকা কন্যা লইয়া বিধবা মাতার দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের অতি সামান্য উল্লেখ আছে। 'রাধারাণী'তে এই চিত্র বিশদ। রাধারাণীর মাতা ধনীর পত্নী হইলেও বিধবা অবস্থায় জ্ঞাতির দুর্ব্যবহারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কন্যার জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করাতে তাঁহার হৃদয় ও স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। 'আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটিরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না।' (১ম পরিচ্ছেদ।) এ অবস্থায় বালিকা রাধারাণী কত যত্নে কত কষ্টে কতখানি ব্যাকুলতা ও একাগ্রতার সহিত রুগ্না মাতার সেবা ও পথ্য সংগ্রহ করিত, এই পরিচ্ছেদে তাহারও বিবরণ আছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে অঙ্কিত মাতা ও কন্যার দারিদ্র্যের ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসার চিত্র 'দেবী-

+ স্বয়ং গুরুদেব আনন্দস্বামী জ্যোতিষে ব্যুৎপন্ন হইয়াই যখন একথা জানিতে পারেন নাই (১০ম পরিচ্ছেদ), তখন অন্য পরে কা কথা?

চৌধুরাণী'র প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত সুপরিচিত চিত্র অপেক্ষা কম উজ্জ্বল ও করুণ নহে। হিন্দুর ঘরে কন্যার বিবাহ দেওয়া মাতাপিতার প্রধান কর্ত্তব্য। দারিদ্র্যবশতঃ বিধবা মাতার এই কর্ত্তব্যপালনে অক্ষমতার কথা, শৈবলিনীর মাতার প্রসঙ্গের ন্যায়, এখানেও উক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অঙ্কিত—রুগ্নার মৃত্যুশয্যার চিত্রখানি বড় বিষাদময়। 'রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল,' এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, বিলাতের আপীলে তাঁহার জিত হইয়াছে, রাধারাণী এখন প্রভূত ধনের অধিকারিণী। উকীল কামাখ্যানাথ বাবু 'স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন।' সুসংবাদ শুনিয়া রুগ্নার অবিরল আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন "......আমার এই সুখ যে রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনি ভরসা।.. আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।'* [২য় পরিচ্ছেদ।] কামাখ্যা বাবু ইহাতে সম্মত হইলে রাধারাণীর মাতার 'সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আনন্দের হাসি দেখা দিল।' কন্যাকে কামাখ্যা বাবুর হাতে সঁপিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। এই ভিক্ষা, এই 'আহ্লাদের হাসি' হইতে বুঝা যায়, ভগ্নহৃদয়া আসন্নমরণা বিধবার মাতৃহৃদয়ে কত গভীর স্নেহ সঞ্চিত ছিল। বইখানি ছোট, চিত্রটিও ছোট, কিন্তু বর্ণনাটি বড় মধুর, বড় করুণ। পুস্তকের অন্য অংশে 'প্রস্তরনির্ম্মিত Niobe প্রতিকৃতির' উল্লেখ দেখা যায়। অপত্যস্নেহশালিনী অশ্রুময়ী রাধারাণীর জননী যেন সেই Niobeর রক্তমাংসে গঠিত মূর্ত্তি। (গ্রীকপুরাণে 'Niobe, all tears' মাতৃস্নেহের আদর্শ।

'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ীর মাতার অসহায়া কন্যাকে রাখিয়া সহমরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় যদি কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, গ্রন্থকার তৎপরবর্ত্তী রাধারাণীর মাতার চিত্রে তাহা সংশোধন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও নায়িকার চরিত্র-বিকাশের ও (প্লট) আখ্যানবস্তুর বিবর্ত্তনের প্রয়োজনে নায়িকার মাতার তিরোভাব।

৯। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

(/০) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' হরলালের জননী নাই অর্থাৎ বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত রায় বিপত্নীক। নতুবা বৃদ্ধের প্রসঙ্গে অবশ্যই কোথাও না কোথাও তাঁহার উল্লেখ থাকিত। হরলালের দুর্দ্দমনীয় চরিত্রের উপর স্নেহময়ী জননীর যে প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারিত, তাহা হইল না।

(৵০) রোহিণীর মাতাপিতা এমন কি মৃত স্বামী ও শ্বশুরকুলের কোথাও উল্লেখ নাই।

(৶০) পুস্তকে শৈলবতী ও তাঁহার পুত্র শচীকান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার মাতৃভাবের কোন প্রসঙ্গ নাই। এমন কি তিনি সধবা কি বিধবা, তাহা পর্য্যন্ত পুস্তক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। গ্রন্থকার তাঁহা দ্বারা স্নেহময়ী ননদের কার্য্যও করান নাই। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণকান্ত রায়ের দৌহিত্র সন্তান জন্মিবে এবং সেই সন্তান গোবিন্দলালের পরিত্যক্ত বিষয় পাইবে, এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার সৃষ্টি।

(।০) গোবিন্দলালের বিধবা মাতার অনেকবার উল্লেখ আছে। তিনি শ্বশুর বর্ত্তমানে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন না, সুতরাং ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান বা তথা হইতে আনার বিষয়ে গৃহপতি কৃষ্ণকান্ত রায়েরই কর্তৃত্ব দেখা যায়। [১ম খণ্ড, ২৮শ পরিচ্ছেদ।] এই পরিচ্ছেদেই গোবিন্দলাল ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন, এইস্থলে কেবল মাতাপুত্রের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। বরং পুত্রবধূর প্রসঙ্গে তাঁহার স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে। সে সব কথা 'শ্বাশুড়ীবধূ' প্রবন্ধে বলিয়াছি। 'কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন' [২৭শ পরিচ্ছেদে] এইটুকু মাতার কর্ত্তব্যপালনের ও গৃহিণীপনার পরিচয় পাওয়া যায়। পুত্র বিপথগামী হইলে তিনি তাহাকে শাসন করিতে, তাহাকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে, † তাহার

* রাধারাণীকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিবেন, একথা খোলসা করিয়া বলা নাই বটে, কিন্তু 'আপনার কন্যার ন্যায় রক্ষা করিবেন, এই কথা বলাতেই সব বলা হইল। কেন না সৎপাত্রে কন্যাসম্প্রদান হিন্দু পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

† চেষ্টা করিলেও যে তিনি কৃতকার্য্য হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ। তবে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী

চরিত্র সংশোধন করিতে, বধূর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে উৎসাহিত করিতে, কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার চরিত্রে বিষম ত্রুটি। উইলের সূত্রে ভ্রমরের প্রতি বিরাগ-বশতঃই তিনি একেবারে সংসারের কর্ত্তব্য হইতে অপসৃত হইবার জন্য কাশীবাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গোবিন্দলালের মাতা যে আদর্শচরিত্রা মাতা বা শ্বশ্রূ বা গৃহকর্ত্রী নহেন, গ্রন্থকার নিজেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্রের মজ্জাগত ত্রুটির কথাও বলিয়াছেন। 'একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাব সুলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এতদিন যাইতে পারেন নাই। .....' তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন- "তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময়ে আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।" [১ম খণ্ড, ৩০শ পরিচ্ছেদ।] মাতাপুত্রের স্নেহবন্ধনের কথা এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থকার পুত্রস্নেহের কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, কিন্তু কার্য্য ও ব্যবহারে তাহার পরিচয় দেন নাই। বহুকাল পরে রোহিণীহত্যাকারী গোবিন্দলাল বড় কষ্টে ভ্রমরকে লিখিয়াছিলেন—'আমার যাইবার একস্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে।' [২য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।] কিন্তু তখন তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। কথাটা ঠিক। মাতা অবশ্যই পাপী সন্তানকে আশ্রয় দিতেন, কেন না 'কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই স্নেহের পরিচয় দিবার সুযোগ গ্রন্থকার দেন নাই।

৮। এই গ্রন্থে গোবিন্দলালের মাতা অপেক্ষা ভ্রমরের মাতার চিত্র বিশদ। ভ্রমর যখন গোবিন্দলালের উপর অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, তখন তিনি মাতাকে লিখিলেন যে "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও .." ইত্যাদি এই মিথ্যা সংবাদ পাইয়া মায়ের প্রাণ কেমন কাতর হইল, সহজেই বুঝা যায়। কন্যাকে শ্বশুরঘর করিতে পাঠাইয়া মা যে কেমন অৰ্দ্ধমৃতা হইয়া থাকেন, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই সুবিদিত। সুতরাং তিনি পত্রের ভিতর যে জুয়াচুরি আছে তাহা বুঝিলেন না। গ্রন্থকার বলিতেছেন—'মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে একলক্ষ গালি দিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য ভ্রমরকে আনিতে যাইবে।' [১ম খণ্ড, ২৪শ পরিচ্ছেদ।] অবশ্য গোবিন্দলালের মাতার ন্যায় তিনিও পরাধীনা, সুতরাং পত্রব্যবহার বেহাই এ বেহাই এ চলিল। এই ক্ষুদ্র চিত্রে বাঙ্গালী কন্যাজননীর স্নেহময় চরিত্রের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

পরে, ভ্রমর যখন মর্ম্মান্তিক হৃদয়বেদনায় কাতর, তখন পুনঃ পুনঃ তাঁহার পিতা মাধবীনাথ কিরূপে তাঁহার কষ্ট প্রশমনের চেষ্টা করিলেন, তাহার বিবরণ পুস্তকে বিশদভাবে প্রদত্ত। ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী তখন ভ্রমরের সমদুঃখসুখা সান্ত্বনাদায়িনী শুশ্রূষাকারিণী সখী। ভ্রমরের বিষাদময় ইতিহাসে পিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কার্য্য ও আচরণের বিবরণ বিশদভাবে প্রদত্ত, মাতার উল্লেখ সামান্য। প্রসাদপুরের কুঠীতে রোহিণীকে খুন করিয়া যখন গোবিন্দলাল গা ঢাকা দিলেন, সে সংবাদ মাধবীনাথ ভ্রমরের মাতাকে বলিলেন, মাতা জ্যেষ্ঠা কন্যা দ্বারা ভ্রমরকে জানাইলেন। [২য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।] ইহা সঙ্গত। ভ্রমরের মাতার হৃদয় অবশ্য কন্যার দুর্দ্দশাদর্শনে বিদীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু সান্ত্বনার ভার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উপর থাকাই উচিত। ভ্রমরের বিপদ উদ্ধার করিতে যে জটিল ব্যাপার সংসাধিত করিতে হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীবুদ্ধিসাধ্য নহে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভ্রমরের পিতার কর্তৃত্বই প্রয়োজনীয়। সেটুকু মেয়েলি ঢঙের ব্যাপার, তৎপ্রসঙ্গেই কেবল ভ্রমরের মাতার উল্লেখ দেখা যায়। [১ম খণ্ড, ২৪শ পরিচ্ছেদ।]

ভ্রমরের মাতৃত্ব

৯। ভ্রমরের বহু সাধ্যসাধনাসত্ত্বেও যখন শাশুড়ী ও স্বামী একসঙ্গে ভ্রমরকে চরণে ঠেলিয়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, যখন 'এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে' তাঁহার সকল কামনা, সকল আশা, সকল সুখ, সকল শান্তি ঘুচিল, তখন সেই চরম দুর্দ্দশার সময়, ভ্রমরের স্বামিসৌভাগ্যের দিনের বিস্মৃত পুত্রশোক উথলিয়া উঠিল। এই করুণ দৃশ্যে ভ্রমরের মাতৃভাব উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। 'এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া

হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। ইত্যাদি [১ম খণ্ড, ৩০শ পরিচ্ছেদ।]

দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুতলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজ তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস না? মরিলে কি আর দেখা দেয় না?" [১ম খণ্ড, ৩১শ পরিচ্ছেদ।]

নারীর শেষ অবলম্বন সন্তান। ভ্রমরের সন্তান থাকিলে স্বামীর সহিত প্রীতিবন্ধন দৃঢ় থাকিত, আবার স্বামিপরি ত্যক্তা হইলেও বেদনা অসহ্য হইত না— সূর্য্যমুখী-শৈবলিনীর প্রসঙ্গে একথা বুঝাইয়াছি।*

(ক্রমশঃ)

* এই পুত্রের জোরেই কমলমণি ও সুভাষিণীর স্বামীর উপর এত জোর। তবে পুত্রবতী নয়ান বৌ ও নন্দা-রমা স্বামীকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ প্রফুল্ল ও শ্রীও বিবাহিতা পত্নী, কুন্দ-রোহিণীর মত পরকীয়া নহেন।

অনুদ্দিষ্ট

[শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী]

নিরখি বিকালে বসি বাতায়নে,
কত ছেলে মাঠে করিছে খেলা,
একজন শুধু সদা সঙ্কুচিত
কে যেন তাহারে করেছে হেলা।
সকলে খেলিছে হাসিছে ছুটিছে
সেই এক পাশে দাঁড়ায় একা,
দীনতায় ভরা কচি মুখখানি,
অধরে ফোটেনা হাসির রেখা।
সঙ্কোচ সরমে কি যেন বেদনে
আনত সজল কমল আঁখি,
নবীন নধর চারু দেহখানি,
ধূলা মাটি যেন রয়েছে মাখি।
বুঝি কেহ তারে—খেলা অবসানে,
ডাকিবে না আসি অধীর বুকে,
আদর করিয়া ধুইয়া মুছিয়া,
কিছু নাহি দিবে সে সোণা-মুখে!—
এরা ওরা সব করি কলরব
দরপে যাইবে স্নেহের ঘরে,
সে বুঝি চলিবে উদাস পরাণে,
কেহ ডাকিবে না মধুর স্বরে!
* * *

সে দিন সায়াহ্নে সরসীর তীরে,
সে যে যেতেছিল পিছলে পড়ে,
সহসা ধরিয়া বাহুখানি তার,
লইলাম টানি আদর করে।
বলিলাম—"বাপ! যাও সাবধানে,
আঁধারে অবনী গিয়েছে ছেয়ে।"
অবাক বালক পড়ে না পলক,
মোর মুখ পানে রহিল চেয়ে।
"কি দেখিছ বাবা?" সুধিনু যখন
কহিল নিরাশা জড়িত-ভাষে,
"মা আমার ছিল তোমারি মতন,
মোরে ছেড়ে গেছে স্বরগ-বাসে!"
দুজনেরি চোখে অশ্রু উথলিল,
প্রবোধিতে তারে না পাই ভাষা,
তপ্ত কচি হিয়া জুড়া'ব কি দিয়া
কেমনে মিটাব মায়ের আশা?
ফিরে দেখি হায়! গেছে বাছা চলি—
তখন মুছিনু নয়ন-ধারা,
তদবধি তারে খুঁজি অনুদিন,
আসেনা আমার সে মাতৃহারা!

দারুমূর্ত্তি

[শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী]

যখন সুরাট বন্দর আরব সাগরের প্রধান বন্দর ছিল, সেই সময়ে সেখানকার একজন দরিদ্র শিল্পী সমুদ্রোপকূলস্থিত নগরোদ্যানের জন্য কতকগুলি কাঠের আলোকস্তম্ভ তৈয়ারী করিবার কাজ পায়। শিল্পীর বয়স অল্প, সবে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে এবং সরকারী কাজে সে অতিযত্নে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিল।

প্রথম স্তম্ভটির পরিকল্পনা তাহার এত মনোমত হইয়াছিল যে, বেচারা আনন্দাতিশয্যে বাটালির শেষ সংস্পর্শে স্তম্ভটিকে সম্পূর্ণ করিয়া, নিজের জীবনও সেইখানে সমাপ্ত করিয়া ফেলিল। মৃত্যুর কারণ চিকিৎসকেরা সাময়িক উত্তেজনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

শিল্পের হিসাবে সত্যসত্যই স্তম্ভটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। একটি তরুণ যুবক তাহার উৎপ্রেক্ষিত হস্তে বাতিটি ধরিয়া আছে, তাহার সুকুমার মুখ বিমল আনন্দে ভরা, তাহার নয়নদ্বয়ে প্রেমের দিব্য শ্রী মাখান।— কিন্তু নগরের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এ সৌন্দর্য্য ভাল লাগিল না—বিবসনা নারী-মূর্ত্তি অথবা এইরূপ একটা কিছু হইলে, বোধ হয়, তাঁহাদের পছন্দ হইত।

যাহাই হউক, যুবকের মূর্ত্তির সম্মানার্থ, অথবা ইহার জন্য তাহাকে কিছু অগ্রিম অর্থ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, যে কোনও কারণেই হউক, তাঁহারা স্তম্ভটিকে ফেলিয়া দিলেন না, সেটিকে বাগানের সর্ব্বোচ্চ অংশে যেখানে কদাচিৎ কেহ বেড়াইতে যাইত, স্থাপিত করিলেন। জায়গাটি বড়ই ভয়াবহ ;—স্তম্ভের পিছনে একটি কাঠের বেড়া, তাহার পরই পাহাড়ের গাত্র সোজা সমুদ্রে নামিয়া গিয়াছে ; প্রায় ২০০ হাত নীচে কতকগুলি প্রস্তরস্তূপ পড়িয়া আছে—জোয়ারের সময় সেগুলি ডুবিয়া যায়।

এই ভীষণ বিজনতার মধ্যে এই দারুমূর্ত্তি অনেকদিন ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে এক আধজন সেই দিকে বেড়াইতে আসিত, কিন্তু সকলের সভয় দৃষ্টি পশ্চাতের গভীরতার উপরেই পড়িত—তাহার দিকে কেহ চাহিতও না। ইহাতে সে মর্ম্মাহত হইত।

যে সৌন্দর্য্য বুদ্ধি সেই মৃত শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করিয়া ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছিল সেই বুদ্ধি ইহার মধ্যে আসিয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে এই অবহেলায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িত এবং ভাবিত যে, যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে গিয়া একজন প্রাণ দিল, এ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে তাহার প্রতি কেহ একটি সামান্য মুগ্ধ দৃষ্টিপাতও করিল না।

সে তাহার জড় চক্ষু ও কর্ণ স্ফুরিত করিয়া একটা বিফল অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত—যদি কোন একটা প্রীতির সন্ধান পায়। কিন্তু সে উড্ডীয়মান পক্ষী ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইত না এবং তাহাদের কলরব, পত্রের মর্ম্মর ও নীচে সমুদ্রবেলার গর্জ্জন ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইত না।

হঠাৎ একদিন তাহার জীবনে সে একটা নূতনত্বের আভাস পাইল। তখন সন্ধ্যাকাল, নীচে নাগরিকদের প্রমোদ কলরব কমিয়া গিয়া, একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনে পরিণত হইয়াছে, এমন সময়ে একটি বালিকা-কণ্ঠের সংগীত চারিদিক ধ্বনিত করিয়া তুলিল,—যেন গোধূলির কনকরেখা সহসা শব্দময়ী হইয়া চারিদিকে ফিরিতে লাগিল।

একটা অভিনব ভাবের হিল্লোল আসিয়া দারুমূর্ত্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইয়া রহিল—কেবল তাহার কর্ণ ঐ কোমলধ্বনি শুনিতে লাগিল। জগতের অন্য সমস্ত তাহার কাছে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—কেবল ঐ একমাত্র ধ্বনি তাহার সত্ত্বাকে ঘিরিয়া রহিল। তাহার বহুদিনের অবহেলা কাতর অন্তর এতদিনে একটা সান্ত্বনা পাইল,—সে বুঝিতে পারিল যে, সে এতদিন বৃথা অভিমান করিয়া আসিতেছে।—তাহার কি এমন গুণ আছে যে, সে লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারে? যদি

গুণ বলিতে হয় তো এই কোমল ধ্বনিকে বলিতে পারা যায়। —জগতে কে ইহাকে না ভালবাসিবে?

সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন একটা বেদনা ছড়াইয়া দিয়া, সেই করুণ রাগিণী ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। প্রকৃতি তন্ময়চিত্তে গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল—রাত্রি তাহার নীরবতাকে সাথী করিয়া আসিয়া পৌছিল। রজনীর দীর্ঘ প্রহরগুলি দীর্ঘতর হইয়া তাহার মোহাবিষ্ট কর্ণে সেই স্বরলহরী ঢালিতে লাগিল।

সকাল হইল—ঘাসের উপর পাখীরা লাফালাফি করিতে লাগিল, নীচে তরঙ্গগুলি তটের পদে মাথা কুটিতে লাগিল—ধীর সমীরণ বৃক্ষপল্লবের ভিতর তাহার হৃদয়ের গোপন সঙ্গীত অস্ফুটস্বরে গাহিতে লাগিল, কিন্তু দারুমূর্ত্তি সেই গত সন্ধ্যার গানের কথা ভাবিতেছিল। এমন সময় সেই গান সে নিকটেই শুনিতে পাইল।

আজিকার গান আরও কোমল আরও করুণ। বালিকা তাহার দিকেই সেই চাল বাস্তা বাহিয়া আসিতেছে। তাহার পরণে একখানি ছেড়া মলিন কাপড়, তাহার কোঁকড়ান রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হইয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়ভার বেদনা তাহার বড় বড় কাল চক্ষু দিয়া ছাপাইয়া পড়িতেছিল—সে আপন মনে একটি করুণ রাগিণী গাহিতেছিল—বুঝি এই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা।

দারুমূর্ত্তির সত্তা লাফ দিয়া গিয়া এই বালিকার অশ্রুটুক মুছাইয়া দিতে চাহিল কিন্তু তাহার জড়দেহ বন্ধন যাইতে দিল না। সে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, বালিকা একবার তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চায়—তাহাতেই সে তাহার এত দিনকার সব অনাদর ভুলিয়া যাইবে এবং হয়ত তাহার প্রেম প্রফুল্ল সৌকুমার্য্যে বালিকাও কিছু সান্ত্বনা পাইবে।

অবশেষে বালিকা তাহার সম্মুখে আসিয়া পৌছিল এবং তাহার সিক্ত নয়নদুইটি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। ক্ষণপরেই বালিকার মুখে একটা আনন্দের ভাতি জাগিয়া উঠিল; মনে হইল, যেন এই মুখখানি তার বড় আপনার, ইহার সহিত তাহার যেন কতকালের সম্বন্ধ—সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার ছোট হাত দুটি কাঠের বেদি ছাড়াইয়া হাঁটু পর্য্যন্ত পৌছিল; সে মিনতিমাখা স্বরে বলিল—"তুমি অন্ততঃ আমার উপর দয়া করিবে—আমাকে ভালবাসিতে দিবে। তুমি এত সুন্দর—তুমি কখনও আমাকে ভুল বুঝিবে না।"

তারপর সে তাহার সমস্ত হৃদয় খুলিয়া, দারুমূর্ত্তিকে তাহার সমস্ত কথা বলিল,—সে যে কত দুঃখী, তাহার মনিব যে তাহাকে ছোট বেলায় পথ হইতে কুড়াইয়া পায় এবং তাহার গান গাহিয়া উপার্জ্জিত পয়সাগুলির পরিবর্ত্তে প্রহার করে,—সেই মনিবের দুর্ব্যবহারের কথা এবং সর্ব্বশেষে সে যে একজনকে ভালবাসিতে চাহিয়াছে কিন্তু কাহাকেও পায় নাই, এই সমস্ত কথা সে তাহার বালিকাসুলভ সরলতার সহিত ব্যক্ত করিল।

"বিদায়, বিদায় তবে"—বালিকা যাইবার সময় বলিয়া গেল—"আমি তোমাকে চিরকাল ভালবাসিব এবং আবার তোমায় আমায় দেখা হইবে।"

দারুমূর্ত্তি সমস্ত দিন ধরিয়া আর একবার বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল—কিন্তু সে স্বর আর আসিল না। তবু সে আর অসুখী রহিল না। যদিও তাহার অন্তরের মধ্যে শূন্য জায়গাটুকু এই বালিকার সহিত সাক্ষাতের পর আরও বাড়িয়া গিয়াছিল,—তথাপি সে নির্ভর করিবার জন্য একটা অবলম্বন পাইয়াছিল। "একদিন সে আবার আসিবে"—এই বলিয়া সে আপনাকে আশ্বস্তও করিতেছিল।

আর সে পথিকের অবহেলার জন্য দুঃখিত হইত না। বালিকার নিকট সে যে আদরের ডালি পাইয়াছে, তাহাতেই তাহার তৃপ্তি ভরিয়া গিয়াছে। বালিকা তাহার কোমল কণ্ঠে যে সরমধু তাহার কর্ণে ঢালিয়া দিয়াছিল, নিদাঘের দীর্ঘদিন ও শীতের দীর্ঘ রজনী ধরিয়া, সে তাহারই আস্বাদ মনে মনে লইত। মধ্যে মধ্যে সে যেন বালিকার কোমল স্নেহস্পর্শ তাহার হাঁটুতে অনুভব করিত, বালিকার চোখে যে ভালবাসার দ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাও যেন সে কখনও কখনও দেখিতে পাইত।

এইরূপে একবৎসর অতীত হইয়া গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে আবার সেই স্বর শুনিতে পাইল; এবার আরও মিষ্ট! স্বপ্নাবিষ্টের মত সে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আবার সকাল হইল—পাখীরা চিরদিনকার মত গাহিতে

লাগিল, বাতাস পাতার মধ্য দিয়া তাহার অস্ফুট আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল, ঢেউগুলি সৈকতে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িল,—তাহার অচল দারুআবরণের ভিতর একটা আনন্দের স্পন্দন সুরু হইয়া গেল।

বালিকা সেইরূপই আছে—বোধ হয়, যেন একটু বড় হইয়াছে! সে একটু আনন্দধ্বনি করিয়া, তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। যেরূপ সে আগে বলিয়াছিল, সেইরূপ এবারও সে অনেক কথা বলিল;—সে এখনও মুখরী। যাইবার সময় সে কাঠের বেদিটির উপর উঠিয়া দারুমূর্ত্তির হাতে একটা রাখী বাঁধিয়া দিয়া গেল।

আবার এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে আবার সে সেই স্বর শুনিতে পাইল। এবারকার স্বর একবারে স্বর্গীয়—এ রাগিণী পৃথিবীতে আবদ্ধ রহিল না, ক্রমশঃ শূন্যে উঠিতে উঠিতে স্বর্গের পানে যাইয়া মিলাইয়া গেল। সে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে মুগ্ধ হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃদয়ভেদী সংশয়ে তাহার সমস্ত রাত্রি কাটিল। তাহার ভাবনা হইল, বালিকার মনে যদি অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে!

বিদায়- বিদায় তবে আবার তোমায় আমায় দেখা হইবে

সে এবার বড় হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্যও ঢের বাড়িয়াছে। একটা দিব্য লাবণ্যে, তাহার সমস্ত শরীর ভরিয়া গিয়াছে। তাহার বসনভূষণের যদিও কোনও উৎকর্ষ হয় নাই তথাপি এবার আর তাহাকে দুঃখিতা বোধ হইল না। তাহার নয়নের দীর্ঘপক্ষ্ম একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস কিছুতেই ঢাকা দিতে পারিতেছিল না।

এবারও সে আগেকার মত ছুটিয়া আসিয়া দারুমূর্ত্তিকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর সে একে একে এক বৎসরের সমস্ত কথা বলিল। একজন খুব মস্ত বড় সঙ্গীতজ্ঞ বড় লোক তাহার গান শুনিয়াছেন—তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিবেন,—নিজ কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন!—কয়েকবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—কিন্তু ইহা আর দুঃখের নহে—আনন্দের!

"বিদায়, বিদায়"!—অবশেষে বালিকা বলিল—"বোধ হয় আর আমাদের দেখা হইবে না—কিন্তু আমি চিরকাল ভালবাসিব।" সে চলিয়া গেল। দারুমূর্ত্তির চক্ষে জগতের সমস্ত আলো নিবিয়া গেল।—এমন সময় সে আবার পদধ্বনি শুনিতে পাইল,—কিশোরী ফিরিয়া আসিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—"প্রিয় সখা, আমাকে ক্ষমা কর—আমি বোধ হয়, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা

তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল

করিতেছি, আবার আমি ফিরিয়া আসিব। শীঘ্রই আমি স্বাধীনা হইব, তখন তোমায় আমায় আবার দেখা হইবে, —তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, আমি সেই প্রেমের নামে শপথ করিতেছি। এখন তবে বিদায়!"

সে চলিয়া গেল—তাহার ফিরিবার পথ চাহিয়া দারুমূর্ত্তির দীর্ঘ দুঃসহ বৎসরগুলি কাটিতে লাগিল।

একদিন উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া দারুমূর্ত্তিকে পরীক্ষা করিতে লাগিল—সব জায়গায় টোকা মারিয়া অবশেষে তাহার সঙ্গের মজুরকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল যে, "একেবারে পচিয়া গিয়াছে—তবে যতদিন লোহার স্তম্ভটি না বসান হয়, ততদিন পর্য্যন্ত টিকিতে পারে।"

একটা আভ্যন্তরিক শিহরণের সহিত দারুমূর্ত্তি এই সকল কথা শুনিল। সে বুঝিল, তাহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"আর তাহার সহিত দেখা হইল না।"

একমাস অতীত হইয়া গেল—কতকগুলি মজুর আসিয়া দারুমূর্ত্তির পাশে একটা লোহার আলোকস্তম্ভ খাড়া করিল। তাহার পর তাহারা দারুমূর্ত্তির গা হইতে লোহার জোড় টোড়গুলি খুলিয়া লইল এবং পরদিন মূর্ত্তিটিকে সরাইয়া লইয়া যাইবে, এইরূপ স্থির করিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাত—আজ শেষ প্রভাত! দারুমূর্ত্তি এতকালের সুখদুঃখের আলোচনা করিতে লাগিল—ছোট একটি বালিকা ঢালু রাস্তা দিয়া উপরে উঠিতেছে—একটি কিশোরী তাহার হাতে একটি রাখী বাঁধিয়া দিতেছে—এ সমস্ত ছবি স্বপ্নের মত তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনবার তাহার সহিত দেখা হইয়াছে;—সে সকল কি সুখের মুহূর্ত্ত,—তার পর মিশ্রসুখদুঃখের সহিত কতদিন প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছে, সমস্ত কথা তাহার মনে আসিয়া তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। এই নির্জ্জনতার মধ্যে সে একটা স্বর্গ গড়িয়া লইয়াছিল, আজ তাহাকে তাহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। —এমন সময় সে একটা পদধ্বনি শুনিতে পাইল—কে একজন আসিতেছে।

একটা উন্মত্ত আশা তাহার বুকের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া উঠিল—কিন্তু না—এ যে একজন যুবক—সুন্দর ও সুবেশ।

যুবক আপনার মনে কি বলিতেছিল—কখনও হাসিতেছিল—কখনও বা ভ্রূকুটি করিতেছিল—হঠাৎ তাহার দৃষ্টি দারুমূর্ত্তির উপর পড়িল। সে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া

বলিল—"তোমারও তো বেশ চেহারা দেখিতেছি—কিন্তু তুমি আমার চেয়ে ভাল আছ—কোনও রমণীর ভাবনা তোমার নাই। কিন্তু বল দেখি, আমার মত অবস্থায় পড়িলে তুমি কি করিবে? একজন স্ত্রীলোককে অসৎ পথে প্রলোভিত করিয়া, পরে তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে পাইবার সুযোগ উপস্থিত! বল দেখি কি করা উচিত! এ সুযোগ কখনই ছাড়া উচিত নয়! কি বল? হাঃ হাঃ," এই বলিয়া একটা বীভৎস হাস্য করিয়া, যুবক যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।

দারুমূর্ত্তির মন আরও খারাপ হইয়া গেল—তাহার শেষ দিন এই ঘৃণ্য নরপশুর সাহচর্য্যে কলুষিত মনে করিল,—তাহা ছাড়া তাহার কেবল দুঃখ হইতে লাগিল—"হায়, কে সেই অভাগিনী রমণী, যে এই নরাধমের মোহে পড়িয়াছে—যাহার ইহকালের সুখ চিরকালের জন্য লুপ্ত হইতে চলিল?"

এমন সময়ে আবার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল—না, এবার আর ভুল হয় নাই। তাহার আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয় তাহার আবরণ চূর্ণ করিতে চাহিল—কিন্তু এ কি, তাহার গায়িকার সঙ্গে ও কে?

দারুমূর্ত্তি যুবতীর ভয়ে স্থানচ্যুত হইয়া, যুবতীকে লইয়া, সশব্দে নীচে গভীরতার মধ্যে পড়িয়া গেল

উদ্বেলিত সমুদ্র সহসা শান্ত হইয়া গেল—সেই যুবক গায়িকার হাত ধরিয়া আসিতেছে!

গায়িকা এখন পূর্ণাঙ্গী যুবতী—তাহার রূপের প্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়া গেল—তাহার বসনভূষণও এবার চমৎকার। কিন্তু এ সকলে কোন প্রভেদ আনে নাই—কারণ সে আগেকার মত ছুটিয়া গিয়া দারুমূর্ত্তিকে জড়াইয়া ধরিল।—দারুমূর্ত্তি কাঁপিয়া উঠিল—আনন্দে কি?

তাহার সঙ্গী অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। যুবতী পার্শ্বস্থিত লোহার স্তম্ভ দেখিয়া বলিল—"এ কি! ইহারা কি তোমাকে স্থানান্তরিত করিতেছে! যাই হউক, ইহারা কখনও আমার হৃদয় হইতে তোমাকে ভুলিতে পারিবে না। প্রিয় বন্ধু, এককালে তুমি আমার বিশ্বাসের ও ভালবাসার সমস্ত অর্ঘ্যটুক পাইয়াছিলে—আমার অন্তরের কোনও কথা তোমার নিকট অবিদিত ছিল না। আজও কোনও কথা তোমার নিকট লুকাইব না। এই যে আমার সঙ্গীটি দেখিতেছ—ইনিই আমার প্রণয়ের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন—ইঁহাকেই আমি বিবাহ করিব; আর তুমি,—তুমি আমার আরও পবিত্র, আরও মধুর ভগিনীর ভালবাসা গ্রহণ করিবে।"

এই বলিয়া সে দারুমূর্ত্তির হস্তে চুম্বন করিবার জন্য নত হইল। তাহার চক্ষে একটা স্নেহস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখা গেল—সেই দরিদ্র শিল্পীর বাটালির শেষ-চালনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে যে আনন্দের ভাতি দেখা গিয়াছিল—ইহা ঠিক তাহারই মত।

সঙ্গী যুবক সহসা চিৎকার করিয়া উঠিল। অবলম্বনহীন পুরাতন দারুমূর্ত্তি যুবতীর ভয়ে স্থানচ্যুত হইয়া, যুবতীকে লইয়া, সশব্দে নীচের গভীরতার মধ্যে পড়িয়া গেল এবং তাহাকে জীবনব্যাপী সন্তাপ ও অশান্তি হইতে রক্ষা করিল।

রসিকের গান

[ভাবরাজ্যের ভ্যাক্সিনেটর]

["তোরা কেউ যাস্‌নে ধরতে কুলবালা"র সুর।]

তোমরা কেউ ভিড় ক'রনা
সরে দাঁড়াও—পলাও দূরে,
নাই সে ঠাই অরসিকের
আমাদের এ স্বপন পুরে।
এ হাটে আমরা বেচি,
এ হাটে আমরা ক্রেতা,
এখানে আমরা গাহি
এখানে আমরা শ্রোতা।
তোমরা সব দাঁড়িয়ে দেখ,
কান্নাটা দেখিই কাঁদো;
ভকতি-প্রীতির মালা
দিয়া এ চরণ ছাঁদো।

তোমাদের দৃষ্টি কর
ঠেকলে কঠোর পরুষ পাণি
ফুটবে না রইবে পড়ে
মৌলিকতার ডিম্বখানি।
বোকারা সরে দাঁড়াও
এসো অনুরাগীর দলে,
বুঝবে যারা মজবে যারা
এসো মোদের চরণতলে।
বাই যে মোরা সোণার তরী,
আমরা যে সব রসিক নেয়ে;
মনের মত মানুষ পেলেই
নি-কড়িতে নেযাই বেয়ে।

মধু-স্মৃতি

(৫)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

মধুসূদনের মহাকীর্ত্তি - মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' - মাইকেল রত্নভাণ্ডারের সর্ব্বোত্তম রত্ন! বিশ্বকাব্য কাননের মহার্ঘ কুসুমাহৃত মধুভরা মধুচক্র! ত্রিদিবের সদ্যঃফুল্ল পারিজাত! ভাব সরোবরের সহস্রদলে বিকশিত কমল কানন! —

মেঘনাদবধ কাব্য ভাষার পীযূষোদধি, এ ভাষা তুলনাতীত অনুকরণাতীত! ইহা মধুসূদনেই আবদ্ধ ও মধুসূদনেই পর্য্যবসিত! এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা হইয়াছে যে, এসম্বন্ধে আমরা নিজে আর কোনও কথা না বলিয়া, দেশের কয়েকটি মহামনস্বীর মতামত উদ্ধৃত করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(“সাহিত্য-পরিষদে” রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত)

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' হইতে মধুসূদন নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রন্থের উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

"—কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ,
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

অমিত্রাক্ষর-কাব্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডে,—য়ুরোপে, মহাকবি মিল্টন, যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একচ্ছত্র সম্রাট্‌—বঙ্গদেশে, এমন কি সমগ্র এসিয়ায়, তেমনই মহাকবি মাইকেল মধুসূদনও এপক্ষে সমকক্ষবিহীন— অদ্বিতীয়। এ সম্বন্ধে এই দুইজন মহাকবির সহিত তুলনীয় হইতে পারেন, এ পর্য্যন্ত এমন কোন কবি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। "প্যারাডাইজ লষ্ট্" ও "মেঘনাদবধ" নটনটীর নৃত্যগীতপ্রধান নহে —

ভেরীনিনাদিত রণভূমির ও কল্লোলিত সমুদ্রের গম্ভীরগর্জ্জন মুখরিত! যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া লোকে পুরুষোচিত শক্তিলাভে উৎসুক হয়,—হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করে—এই দুই অতুল্য মহাকাব্যে সেই ঐশিক শক্তিই পূর্ণ বিকশিত। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক মনস্বী রাজনারায়ণ বসু। সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই আমরা তাঁহার সমালোচনার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু

"মাইকেল মধুসূদন একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে 'শ্যামা জন্মদে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচনশক্তি ও প্রয়োগনৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। * * * * দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল ইহা দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে; অথচ সকল স্থানে ইয়ুরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কাব্য এসিয়ারূপ জনিতা ও ইয়ুরোপরূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ।"

গুণগ্রাহী স্বনামধন্য পুণ্যশ্লোক বসুজ মহাশয় পরবর্ত্তী কালে কবির মৃত্যুর বহুবৎসর পরে আত্মচরিতে মেঘনাদ বধের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

"১৮৬০ সালের শেষে মেদিনীপুর যাইবার পূর্ব্বে, কবিকুলসূর্য্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। * * মধু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই তিন সর্গ আমার অভিপ্রায়ের জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া ছিলেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, ব্যগ্র হইয়া কলিকাতায় আসি এবং আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে লিখিয়া ছিলাম, "কবে আমি দেখিব—'মধুসূদন বদন-সরোজং'। আমি যে দিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি, সে দিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের একটি প্রুফ দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন "My dear Raj, this will surely make me immortal." আমি বলিলাম—'তাহাতে আর সন্দেহ নাই'। অনেক কবি আত্মশ্লাঘা দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন,—

'মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং।
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং॥'

হাফেজ বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমণ্ডল, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার উপর তারকা স্বরূপ মুক্তাফল বর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে রহস্য করিয়া বলিলেন যে, 'ভবিষ্যদ্বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া, মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।' তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের পর বলিলাম, যে "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে, যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপ হিন্দু।"

"তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ; আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না, এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘেঁসিয়া থাকা

কর্ত্তব্য।' তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যে দিন আহার করিব, সেই দিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম, তাঁহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। সেদিন তাঁহার মান্দ্রাজের একটি ফিরিঙ্গী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন, ও বিদায় লইবার সময় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক, তাঁহার হৃদয় প্রেম ও স্নেহে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল।

"... বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে যে পত্র লিখেন, তাহা তাঁহার শেষপত্র। তাহাতে আমাকে লেখেন, Take care of my fame! আমি তাঁহার জীবনী প্রণয়ন কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান দ্বারা তাঁহার পরোক্ষ কার্য্যের ভাগী হইয়া, তাঁহার অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছি। ইহা আমি শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করি। মধু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কলিকাতায় আমার সঙ্গে তাঁহার বড় দেখা হইত না। তখন আমি [illegible] পীড়ায় অত্যন্ত পীড়িত। তবে প্রতিবাসী [illegible] বাটীতে কখন কখন দেখা হইত। একদিন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে আমরা কয়েকজন বসিয়া আছি, সেই সময় তিনি Wordsworth's Sonnet—in praise of the Sonnet এমন করিয়া আবৃত্তি করিলেন যে, আমরা বিমোহিত হইলাম। মধুসূদনের সম্বন্ধে আমার সকল স্মৃতিই মধুময়।"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বপ্রতিষ্ঠিত "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"র পক্ষ হইতে মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছায় এক আয়োজন করিলেন। বঙ্গদেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনা সেই প্রথম। মধুসূদনের পূর্ব্বে কোন কবি বা লেখক এরূপ মহা সম্মান লাভ করেন নাই। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক ও মেঘনাদবধ কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদনের এ সম্মান যে, তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য, সহৃদয় কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি, তাঁহার যোড়াসাঁকোর প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা পুষ্পপত্রে, পল্লব পতাকায় সুসজ্জিত করিয়া, তাহার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপ রচনা করিলেন। কালীপ্রসন্নের প্রাসাদ ভবনের বিশাল প্রাঙ্গণ, অচিন্তনীয় লোক সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ

উঠিল। সেই সভায় মহাকবি মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধিত করিবার উল্লাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু গৌরদাস বসাক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও যাবতীয় সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন সম্বর্দ্ধনা গীতি গাহিবার নিমিত্ত সুগায়কগণ তানপুরা, তবলা, ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

সেই অভিনন্দন প্রদানের দিনে, অপরাহ্নে, শ্রীমধুসূদন, বন্ধুবর বাবু গৌরদাস বসাক ও তাঁহার সংস্কৃতপণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নকে সঙ্গে লইয়া, ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড হইতে, দ্বি অশ্ব শকট যানে, সিংহ মহাশয়ের যোড়াসাঁকোর প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধুসূদন যাইতে যাইতে শকট মধ্যেই পণ্ডিত রামকুমারকে উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! কালীপ্রসন্ন আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিরাট সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু আমার বড়ই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে!' পণ্ডিত বলিলেন, "কিসের দুর্ভাবনা?" মধুসূদন বলিলেন, "সভায়

"অভিনন্দনের উত্তরে আমাকে বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিতে হইবে। বাঙ্গালা বলা ত আমার অভ্যাস নাই।" পণ্ডিত বলিলেন, "উত্তর ত প্রস্তুতই আছে, আপনি সভাতে গুছাইয়া বলিতে পারিলেই হইবে।" এইরূপ বলিতে বলিতে শকট দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহ, অন্যান্য বন্ধুর সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধুসূদন শকট হইতে অবতরণ করিবামাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁহার 'পাণিপীড়ন' করিয়া, তাঁহাকে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। সভাস্থলে মধুসূদন উপস্থিত হইবামাত্রই সমবেত সুধীমণ্ডলী ও বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পণ্ডিত রামকুমার বলিতেন, সভার সুমহান্ দৃশ্য দেখিয়া ও বিরাট জনমণ্ডলীর উল্লাসধ্বনি শ্রবণে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মধুসূদন আসনগ্রহণ করিলে, গম্ভীর মৃদঙ্গ সংযোগে "স্বাগত গীতি" গীত হইয়া, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া, কবির কণ্ঠে স্বহস্তে মাল্যদাম পরাইয়া দিয়া—হ্যামিল্টন কোম্পানীর কর্তৃক নির্ম্মিত একটি রজতময় সুরম্য পান পাত্র (Silver Claret Jug) কবিকে উপহার দিলেন। সভাজন সানন্দে করতালি দিতে লাগিল। পরে, কয়েকজন সভ্যের বক্তৃতার পর আবার সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

এ সম্বন্ধে, মধুসূদন একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছেন;—"There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers." মধুসূদন সম্ভবতঃ অভিনন্দনের উত্তরে তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন; রাজনারায়ণ বাবুর পত্রের উপসংহারে লেখা ছিল—Fancy! I was expected to speechify in Bengalee!

যিনি মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতা, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া, তাঁহার পক্ষে বিষম অগ্নি-পরীক্ষা! ইহার অপেক্ষা কৌতুকজনক বিষয় আর কি হইতে পারে!

মেঘনাদবধ কাব্য যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন একদিন মধুসূদন কোন কার্য্যোপলক্ষে চীনাবাজারে গিয়াছিলেন। তথায় দেখেন, জনৈক দোকানদার তাহার দোকানের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে "মেঘনাদ" পাঠ করিতেছে। কৌতূহলাবিষ্ট রহস্যপ্রিয় কবি, দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন?"

দোকানী।—আজ্ঞে এ একখানি নূতন কাব্য।

মধুসূদন।—কাব্য! আপনাদের ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাই নাই—তা আবার কাব্য!

দোকানী।—সে কি মহাশয়! মাত্র এই একখানি কাব্যই ত যে কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতে পারে।

মধুসূদন।—আচ্ছা, পড়ুন দেখি শুনি!

এই কথা শুনিয়া সেই সাহিত্যপ্রিয় দোকানদার সন্দিগ্ধ নেত্রে মধুসূদনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার বোধ হয় আপনি এ গ্রন্থকারের ভাষা বুঝিতে পারিবেন না।"

মধুসূদন।—কেন? ইহার ভাষাটা এতই কঠিন নাকি? —ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখিতে হানি কি?

অগত্যা সেই দোকানদার স্বেচ্ছামত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেন।—

"* * বাচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন।"—ইত্যাদি

কিয়ৎকাল পরে, তিনি নিরস্ত হইলে, মধুসূদন তাঁহার হস্ত হইতে পুস্তকখানি লইয়া, কয়েকটি স্থল নিজে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাঠের ভাবভঙ্গি, উচ্চারণ ও সুরলালিত্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, বিস্ময় ব্যগ্রস্বরে সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,"মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?" মধুসূদন তাঁহাকে অস্পষ্টভাবে একটা জবাব দিয়া, প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে কি?"

তিনি উত্তর করিলেন, "খুব চলিবে মহাশয়, খুব চলিবে,

---

* বড়ই পরিতাপের বিষয় আমরা বহুচেষ্টা করিয়াও সংবাদপত্রে মুদ্রিত এই অভিনন্দন সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সে বৎসরের কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই। যদি কোনও বিদ্যোৎসাহী মহোদয় এই অভিনন্দনটি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একান্ত কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থমন্য জ্ঞান করিব।

লেখক।

হই। বাঙ্গালার এক নূতন সৃষ্টি—মনে হয়, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছন্দ।"

তখন, মধুসূদন সোৎসুকে সহাস্য আস্যে ব্যস্তভাবে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া তথা হইতে অবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন।

বন্ধুবর্গের নিকট তিনি নিজেই এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন। ফলে, সেই অজ্ঞাতনামা দোকানদারের কথা সার্থক হইয়াছিল—অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ মেঘনাদবধ বাঙ্গালায় চলিয়াছিল; প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই ১২৫০ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৬৩-৬৪) কবিবর হেমচন্দ্র মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কাব্যের সমালোচনা ও মলের টীকা প্রভৃতি সংযুক্ত করেন।

গুণমুগ্ধ কবিবর হেমচন্দ্র বলেন,—

"মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন? অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবেন, এ কথা কাহার মনে ছিল? কিন্তু বোধ হয়, এক্ষণে সকলে স্বীকার করিবেন ... মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্ল্লভ যশঃপ্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

* * * *

"এই গ্রন্থখানিতে (মেঘনাদবধ কাব্যে) গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্র এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইতাগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদয়ই করুণ কিংবা আদিরসে পরিপূর্ণ, বীর অথবা রৌদ্ররসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালাভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুতক্ষমতাপন্ন কবি! * * মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি!

* * * *

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় ও ভয়ানক প্রাণী ও পদার্থসমূহ, সম্মিলিত করিয়া, পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় জ্ঞান হয়, যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী, জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণ রসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন. ইহার বিচিত্রতা কি? সত্য বটে, কবি গুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক, এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মালা গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন।" হেমচন্দ্রের এই ভূমিকা সম্বন্ধে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

"Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months."

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' লিখিয়াছেন –

"মাইকেল হেমবাবুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, মাইকেলের প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে চলিয়াছিল, তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দসিন্ধু মন্থন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কিন্তু আমি একটি বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বাঙ্গালীর flexibility of intellect অসাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক্ হইয়া যাইত।"

একবার "বার লাইব্রেরীতে" মধুসূদন বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় একটি উকীল আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! মেঘনাদবধের নরক বর্ণনাটা আপনি মিল্টন হইতে লইয়াছেন, ঠিক কি না?" মধুসূদন হাসিয়া কবিগুরু দান্তে হইতে কতকটা নরক বর্ণনা আবৃত্তি করিলেন—পরে মিল্টন হইতেও ঠিক তদ্রূপ ভাবের বর্ণনা আবৃত্তি করিয়া উকীল মহাশয়কে বলিলেন—"এই দেখুন মিল্টন যে স্থান হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও সেই স্থান হইতে লইয়াছি!"

Paradise Lostকে আদর্শ করিয়া তিনি বাঙ্গালায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক হোমর ব্যতীত অপর সকল কবি অপেক্ষা তিনি মিল্টনকে উচ্চাসন দিতেন। মিল্টনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—

"The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa, I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets: Milton is divine."

প্রবাসী পত্রে 'ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক' প্রবন্ধের লেখক মেজর বামনদাস বসু বলেন—"তাঁহাকে সচরাচর 'Milton of Bengal' বলা যায়; তাহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় নাই"।

বঙ্গদেশে একমাত্র মধুসূদনেরই সহিত ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টনের তুলনা হইতে পারে। মিল্টন যেমন অসাধারণ বিদ্বান—বিদ্যালয়ে অদ্বিতীয় মেধাবী ছাত্র ও বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন, মধুসূদনও তদ্রূপ সেই তিনটি গুণে বিমণ্ডিত ছিলেন। য়ুরোপীয় কোন কবির সহিত এরূপ তুলামূল্য সৌসাদৃশ্য ভারতের কোন অঞ্চলের অপর কোন কবির দেখা যায় না। সেই জন্য অনেকে মধুসূদনকে Miltonic Michael বলিয়া অভিহিত করেন।

"কবি মিল্টন সম্বন্ধে কবিবর ড্রাইডেন (John Dryden, Born 1631 Died 1700) লিখিয়াছেন—

'THREE poets, in three distant ages born,
Greece, Italy, and England did adorn.
The first in loftiness of thought surpassed,
The next in majesty, in both the last.
The force of Nature could no farther go;
To make a third she joined the former two.'

ড্রাইডেন যাহা মিল্টন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, আমরা মাইকেল সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই বলিতে পারি। তিনি বাঙ্গালার মিল্টন ছিলেন, এবং প্রকৃতিদেবী তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াই বঙ্গদেশে হোমর, দান্তে ও মিল্টন এই তিন মহাকবির মহাপ্রতিভার, মহামনীষার ও মহাশক্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বিধান করিয়াছিলেন।

মধুসূদন সময়ে সময়ে বলিতেন—"My writings are three-fourth Greek"—এ কথাটি গ্রীকভাষা ও গ্রীকদিগের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগের নিদর্শন—হোমর-পাঠের ফল। গ্রীক আদর্শেই তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ বিরচিত। কিন্তু তিনি সেগুলি সম্পূর্ণ হিন্দুত্বের ছাঁচে

গঠিত ও হিন্দু পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ রচনাকালে তিনি একখানি পত্রে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—"It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done."

তখন 'মেঘনাদ' অনেকেই পাঠ করিতে পারিতেন না। এমন কি প্রথম বিধবাবিবাহকারী পণ্ডিতবর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নও অমিত্রচ্ছন্দের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি উহা পাঠ করিতে সমর্থ না হইয়া প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দাই করিতেন। একদিন দীনবন্ধু মিত্র শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, 'আচ্ছা তুমি শোন দেখি, আমি পড়িতেছি'। দীনবন্ধু মেঘনাদ পাঠ করিয়া যাইতেছেন। অনেকক্ষণ পাঠ করিবার পরে দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, 'আপনি কোন্ কাব্য পাঠ করিতেছেন? এ অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! এ বই ত আর সে বই বলিয়া বোধ হইতেছে না!'

সেই দিন হইতে শ্রীশচন্দ্র মধুসূদনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

সুরধুনী কাব্যে দীনবন্ধু গাহিতেছেন;—

"মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত,
প্রবল-কবিতা-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত,
যত্নশৈলে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন,
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার,
'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বাজে মধুর সেতার।"

মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত মেঘনাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"We will therefore confine our remarks

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

to one of his works, Meghnad Badh, which is the Greatest literary production of this Century."

"The reader, who can feel and appreciate the sublime will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe, with which few poets can aspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas: Homer, Dante or Shakespeare."

একদিন স্বর্গীয় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সহিত স্বর্গীয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের, কে কোন্ শ্রেণীর কবি, এই প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়ায়, মহারাজা গিরিশ বাবুকে বলিলেন—'আপনি মাইকেলকে কবি হিসাবে কোন্ স্থান দিতে পারেন?' গিরিশবাবু উত্তর করিলেন যে, 'কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের পরই আমি মধুসূদনের স্থান নির্দেশ করি।' তাহাতে মহারাজা প্রথমে একটু হাসিলেন; পরে বলিলেন,

—"যদি আমার এ বাচালতা বিবেচনা করেন, তবে কিছু মনে করিবেন না। আমার মতে মাইকেলের আসন সর্ব্বোচ্চ স্থানে। আমি মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গ হইতে কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করিয়া শুনাই, অবশ্য আপনারও যে, সে স্থান মনে নাই, এমন কথা আমি বলি না; তবে আমি মাইকেলের লেখা একপ্রকার গিলিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সেই জন্য 'মেঘনাদ', 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রভৃতি কাব্যের প্রায় প্রত্যেক লাইনই আমি একপ্রকার মুখস্থ বলিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি আবৃত্তি করিলেন,

"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবী করে।
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর কর রাশি বেশে সুরবালা কেলি
পদ্মবনে; * *
* * * কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ; চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী জামাই বলি বরিতাম তারে!
* * * *
* * কহিলা হবে সরমা সুন্দরী;—
'শুনিলে তোমার কথা, রাঘব রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে! ইচ্ছা করে, তাজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে;
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা?
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী।
কহ, দেবি কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবররব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!'"

আবৃত্তির পরে গিরিশ বাবুকে বলিলেন,—"এ গুলির সমতুল্য কোন ভাবার্থপূর্ণ কবিতার কয়েকটি ছত্র ইংরাজি ও বাঙ্গালা যে কোন কবির গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করুন দেখি।" গিরিশ বাবু ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহারাজা বলিলেন 'মনে কিছু পড়িতেছে কি?' গিরিশ বাবু উত্তর করিলেন, 'উপস্থিত ত কিছু মনে পড়িতেছে না।' মহারাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন 'কোথাও কিছু থাকলে তবে ত মনে পড়্‌বে? ঘরে বসিয়া ইংরাজি বাঙ্গালা গ্রন্থ ঘাটিতে ত আপনার বাকী নাই। যদি এ ভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও কোন পুস্তকে প্রস্ফুটিত থাকিত তা' হলে নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়িত?'—গিরিশ বাবু নীরব।

পরিশেষে মহারাজা তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরী হইতে মধুসূদনের হস্তলিখিত 'তিলোত্তমা'র পাণ্ডুলিপি আনাইয়া অতিশয় যত্ন ও আনন্দ সহকারে গিরিশ বাবুকে দেখাইয়া ইংরাজিতে বলিলেন,—"I have preserved it like a precious treasure."

স্বামি শিষ্য সংবাদে, জ্ঞানগুরু স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যের সহিত মহাকাব্য মেঘনাদবধ সম্বন্ধে তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন,—'ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাই-ই, সমগ্র ইয়রোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্ল্ভ।'"

শিষ্য বলিল,—"কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বর প্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"

স্বামিজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন কর্‌লেই, তোরা তাকে তাড়া করিস্‌। আগে ভাল করে

দেখ্, লোক্টা কি বল্ছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগ্ল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুট-মণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা ছুঁচোবধ কাব্য লিখা হ'ল। তা যত পারিস্ লেখ্ না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যারা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নতুন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?'

"এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন,—'যা, নীচে লাইব্রেরী হইতে মেঘনাদবধ খানা নিয়ে আয়।' শিষ্য মঠের লাইব্রেরী হইতে মেঘনাদবধ লইয়া আসিলে, বলিলেন,—'পড়্দিকি কেমন পড়তে জানিস?'

"শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিজীর মনোমত না হওয়ায়, তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া, শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া, প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্দিকি এ কাব্যের কোন্ অংশটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট?'

"শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া, স্বামিজী বলিলেন,—'যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমানা হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা! 'যা হ'বার হ'ক্ গে; আমার কর্ত্তব্য আমি ভুল্ব না, এতে দুনিয়া থাক্ আর যাক্'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।'

"এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজিও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগরূক রহিয়াছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বেলুড়মঠের ধর্ম্মাশ্রমের ন্যায় বঙ্গদেশে আর একটি স্থানে মেঘনাদবধ পাঠের স্মৃতি মহা সাহিত্য-তীর্থের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। নৈহাটি কাঁটালপাড়ায় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম বাবুর বাটীর পূর্ব্বদিকে মাঠের পার্শ্বে অতি নির্জ্জনস্থানে ফুলবাগান নামে একটি শোভন উদ্যান। তন্মধ্যে একটি সুরম্য অট্টালিকা অবস্থিত। ফুলবাগানের সম্মুখে অচ্ছ[illegible] পুষ্করিণী। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর এবং প্রসিদ্ধ তেজস্বী ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য যখন তরুণ যুবক, তখন তাঁহারা দুইজনে সেই ফুলবাগানের নির্জ্জন-নিকেতনে সদাসর্ব্বদা 'মেঘনাদ' পাঠ করিতেন। সঞ্জীববাবু, পূর্ণবাবু, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের মেঘনাদবধের মনোমুগ্ধকর আবৃত্তি শুনিয়া আত্মহারা হইতেন। সেই মধুস্মৃতি আজিও বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রের রশ্মির ন্যায় বিভাসিত রহিয়াছে।

কবীন্দ্র স্যর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সে ভারতী পত্রিকায় মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রবীণ বয়সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বরচিত 'জীবন স্মৃতিতে' তিনি লিখিয়াছেন,—

"এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা 'ভারতী' পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই আর একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্ব্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্দ্ধার বেগে 'মেঘনাদবধের' একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে, তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি 'ভারতীতে' প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতিতে মধুসূদনের আবৃত্তির কথা যাহা আছে তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।

"এই সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রং কালো, চুলগুলি ইংরাজি ফ্যাশানে ছাঁটা, বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া, মাঝখানে সিঁথি। চোখ ছ'টি বড় বড়, চেহারাটি দোহারা। তাঁর গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা ভাঙা। আমার মনে পড়ে একদিন তিনি তাঁর "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁর সেই ভাঙা গলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর কবিতা পাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট, স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন।'"

বৰ্দ্ধমানজেলাবাসী স্বগগত ডাঃ মনোমাধব মুখোপাধ্যায় (V. L. M. S.) মহাশয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ছাপরায় গভর্ণমেণ্ট্ নেটিভ্ ডাক্তাররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাঁহাদের পাঠদশাকালে মধুসূদন যখন মধ্যে মধ্যে তদানীন্তন মেডিকেল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ্ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য গমন করিতেন, তখন এক একদিন তথাকার 'ভার্ণ্যাকুলার' বিভাগের ছাত্রগণকে স্বরচিত মেঘনাদবধ কাব্যপাঠ করিয়া শুনাইতেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "গুরুগম্ভীর মেঘনিনাদে ভাববিভোরে যখন তিনি 'মেঘনাদ' পাঠ করিতেন, তখন কোমল হৃদয় ছাত্রবৃন্দের পক্ষে অশ্রুবর্ষণ নিরোধ করা দুঃসাধ্য হইত!"

বন্ধুবর নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় "তুলনায় সমালোচনা" নামক গল্পে মধুসূদনের কবিতা সম্বন্ধে দুইজনের কথোপকথনচ্ছলে লিখিয়াছেন,—

"আপনার কাহার কবিতা ভাল লাগে?

"বাবা বলিলেন, 'মধুসূদনের কবিতা। মধুসূদনের কবিতা মৃতের সমাধিপূর্ণ, সুধু কথার তাজমহল নয়। মধুসূদন-নির্ম্মিত সেই সৌধের স্থানে স্থানে ইষ্টক বাহির হইয়াছে। ভিত্তিভেদ করিয়া হয়ত বটবৃক্ষ উঠিয়াছে, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে জীবন্ত মানবের কোলাহলধ্বনি আইসে। মধুসূদন প্রাণহীন মর্ম্মর-প্রতিমা গড়েন নাই-গড়িয়াছেন যৌবনবিকসিতা সুন্দরী মানবী। মধুর কবিতা গৌড়জনের সুখদুঃখের বারতা বহিয়া আনে—মধুর কবিতা মধুর মধুর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব'।"

"আমি হাততালি দিয়া বলিলাম, 'সাবাস! সাবাস! তোমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক করা উচিত।'

"'তুমি আমাকে ঠাট্টাই কর আর যাই কর, তোমাদের এই নূতন প্যান্‌পেনে কবিতা আমার ভাল লাগে না'।"

মেঘনাদবধ সম্বন্ধে 'ন্যাশন্যাল গার্জ্জেন'-সম্পাদক বলেন;—

"In less than three years, he wrote and published several dramas and poems, among which the Meghanadabadh will compare well with any Epic in any language, dead or living.

"There is scarcely a Bengali household of tolerable culture that is without a copy of his grand epic, the Meghnadabadha; to be brief, Michael was veritable "Fancy's Child." He occupies the first place in the rank of Bengal poets, ancient and modern, and to him was left to show to the world what dignity, grandeur and sublimity his Vernacular language was capable *of*."

কলিকাতা 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'র প্রথম অধিবেশনে "বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক প্রস্তাবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মধুসূদনের বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।

"আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইঁহার জীবনে ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে (মেঘনাদবধ ও তিলোত্তমাসম্ভব) স্বর্গ, নরক, ভূলোক,

ভূর্লোক, স্বর্লোক সব দেখাইয়াছেন ; উন্মত্ত কল্পনা উদ্দাম ভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন ; ইঁহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার 'তিলোত্তমা' কি কাব্য ? না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য ? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য ? তাঁহার 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' অত্যুৎকৃষ্ট নাটক। তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' খণ্ডকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয় ; তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ দেশান্তরাগত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়া ছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সাত আট বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, আর কত কত কল্পনা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকাল মৃত্যু হেতু বিকাশ পায় নাই, তাহা কে বলিতে পারে ? তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য ; তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য ; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল ; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতি-সমূহ মধ্যে মহামান্য হয়।"

স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার সাহিত্যিক বৈঠকে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

"যদি বাঙ্গালার সমস্ত কবিদিগের একটা সভা হয়, আর সেখানে যোগ্যতা অনুসারে সকলের আসন নির্দ্দেশ করা হয়, তা' হলে মাইকেল বস্‌বেন ঘরের ভিতর এই চেয়ারে * * * * আর আমার (দ্বিজেন্দ্র বাবুর) যদি কোন স্থান সে সভায় থাকে, তা' হলে সেটা (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই—এই বাড়ীর ফটকের কাছে।"* এইরূপ কথা প্রসঙ্গে আর একদিন বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালায় এমন কবি এ পর্য্যন্ত জন্মান নাই, যাঁহাকে মাইকেলের উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।"

'ভারতবর্ষে'র প্রথম বর্ষের সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন,—

"মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরেজী সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধি রসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল যেন একটা উত্তাল ভাব সমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরেজী সাহিত্য দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক যৌবনময় নূতন ভাব রাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল, বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল।

* * * * * *

"মাইকেল অমিত্রাক্ষর কবিতা সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন, খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নূতন বৈষ্ণব কবিতা সৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ও মাইকেল আধুনিক পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক। * * এই দুই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অতুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন।

* * * * "আমাদের শাসন কর্ত্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

"বঙ্গভাষা পরাধীন দেশের ভাষা বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পরাধীন ইটালি দান্তে ও পেট্রার্কের জন্ম দিয়াছিল। এই পরাধীন বঙ্গই চণ্ডীদাস ও মাইকেলের জননী। হতাশার কারণ নাই।"

* আর অন্যান্য কবিদিগের সম্বন্ধে তিনি যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ কাহারও টেবিলের নীচে, কাহারও দ্বারের কাছে, কাহার সিঁড়ির উপর, কাহারও নারিকেল তলায়) সে সবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।—লেখক।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিদেশীয় ভাষার অধ্যয়নে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি করিয়া তিনি বঙ্গভাষার এতাদৃশ উন্নতি সাধন করিলেন!"

বর্ত্তমান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বলেন :—

"মধুর কাব্য ত অমর কাব্য—আমার চক্ষে অমন কবি ত আর নাই। জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন মধু।"

ঔপন্যাসিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন,

"মেঘনাদ বধ কাব্যের ন্যায় অমন অপূর্ব্ব মিষ্ট কাব্য এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইল না।"

গত বৎসর কলিকাতার সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য বিভাগের সভাপতি পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় অভিভাষণে বলিয়াছেন,—

"একদিন উত্তর গোগৃহের মহা সমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীমগর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল; একদিন মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপূরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রলয় পয়োনিধির ঘোরগর্জ্জনে বিশ্ববিজয়ী মহারথদিগকে পর্য্যস্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদাপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে গম্ভীর গর্জ্জন কি আর কবির মুখে শুনিব না? চিরদিনই কি বীণার নিক্বণ, বেণুধ্বনি ও নূপুরশিঞ্জিত শুনিব? বাঙ্গালীর শক্তি নাই, বলিতে পারি না। সে দিনও মেঘনাদবধে বাঙ্গালীর মেঘমন্দ্র গভীর ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন—এই জন্য দুঃখ হয়।"

আর এই গত চৈত্রে বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের প্রধান সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই, মহোদয় কি বলিয়াছেন,—

"প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী-শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য "মেঘনাদবধ"। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানাভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাবসংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সে গুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। * কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই? * *"

সভাপতি মহাশয়ের কথাটি ঠিক নহে—মহাকাব্য কি এতই সুলভ যে, নিত্য নিত্য হইবে? এক শতাব্দীতেও একটি মহাকবি জন্মেন না। প্রায় সকল দেশেই এই রীতি। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি এক জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর "শ্রীমধুসূদন"।"

মধুসূদনের জীবনীলেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মধুসূদনের প্রতিভার বিশেষত্ব' প্রস্তাবে বলেন, "মধুসূদনের দোষ উল্লেখ করিতে আমরা কোন স্থানেই কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু সেই সকল দোষ স্বত্বেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ কবি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

যোগীন্দ্র বাবু বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম, ও ভারতচন্দ্রকে কোন কোন বিষয়ে মধুসূদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিতেছেন,—"কিন্তু সমস্ত বিষয় লইয়া বিবেচনা করিলে মধুসূদন তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়। বিভিন্ন রসের উদ্দীপনে আর কোন বাঙ্গালী কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তিনি অতি অল্পদিন মাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, অন্য কাহারও কার্য্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কাব্যে, নাটকে, গীতি-কবিতায়, এবং প্রহসনে, সর্ব্বত্র, তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হউন, আর পরবর্ত্তী হউন, এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী কবি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পুরুষোচিত শক্তিতে তিনি বঙ্গসাহিত্যে অতুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী।"

"মেঘনাদবধ কাব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় এরূপ কোন মহাকাব্য অদ্যাবধি ভারতের অন্য কোন ভাষায় আর বিরচিত হয় নাই। সকল দিক হইতে সম্যগ্‌ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা বলিতে বাধ্য যে, মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় কবি, ভারতবর্ষে, এমন কি সমগ্র এসিয়াতে এ পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভূত হন নাই। তিন বৎসরের মধ্যে জাতীয় সাহিত্যে এরূপ যুগান্তর সংঘটন, অপর কোন কবি কর্ত্তৃক হইয়াছে কি না, এ কথা পৃথিবীর কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ।"

আমরা যে সমালোচক-কেশরীর লেখা উদ্ধৃত করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম, আবার তাঁহারই লেখনী-বিনিঃসৃত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্যের সহিত এই পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি করিলাম।

"পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময় কে বলিতে পারিত যে, এত অল্পকালের মধ্যে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়ড ও মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের ন্যায় এবং স্থান বিশেষে করুণরসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ সময় মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কাল মনুষ্যকে উচ্চ করিয়া তুলে না, মনুষ্যই কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। * * * * আমরা যখনই ইহা (মেঘনাদবধ কাব্য) পাঠ করি, তখনই ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহুশতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই বিস্মৃত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমণীয়—কি অক্ষয় প্রভাব! কত বংশ-পরম্পরা গত হইবে, তথাপি আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের যে সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে; তূরীধ্বনির ন্যায় যে সকল স্থান বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে। এবং যে সকল স্থান আমাদিগের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমলতায় বিগলিত করিতেছে, তাহাদিগেরও সেইরূপ করিবে। শাসনকর্ত্তা ও বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চিত ও সুদূরব্যাপ্ত। কবির ভাব সকল, স্বজাতির মনোবৃত্তির উপাদান হয় এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ত্ব সাধনের পক্ষে প্রভূত সহকারিতা করিয়া থাকে।"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাবু দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ভার বহন করেন। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কৃতজ্ঞতার পূর্ণমূর্ত্তি মধুসূদন তাঁহারই নামে এই মহাকাব্য উৎসর্গ করেন। কিন্তু পরে, তাঁহার য়ুরোপপ্রবাসকালে মিত্রজা তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তিরও হৃদয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ উৎসর্গপত্র প্রত্যাহার

স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র

করেন। য়ুরোপ প্রবাসে তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, সে বিপদ মনুষ্যের হয় না। সেই বিপদেই তাঁহার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাহাই তাঁহার এক প্রকার অকাল-মৃত্যুর কারণ বলিতে হইবে। জগতে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাসহিষ্ণু মধুসূদন কঠোর সাধন সমরে জয়যুক্ত হইলেও অভ্যন্তরে তিনি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। অসহ্য ক্লেশ না হইলে মহানুভব মধুসূদন তাঁহার দত্ত উৎসর্গ পত্র কখনই প্রত্যাহার করিতেন না। আমরা যথাস্থলে তাঁহার য়ুরোপ প্রবাসের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী মধুসূদনেরই লিখিত পত্রাবলী হইতে বিবৃত করিব।

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ মেঘনাদবধ ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কতকাংশ বেঙ্গলীপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব অনুবাদ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মেঘনাদবধের আর একখানি ইংরাজি অনুবাদ আছে, সে খানি সম্পূর্ণ।

বাঙ্গালা কাব্যসমূহের মধ্যে মেঘনাদবধ বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পঠিত হইতেছে। আমরা ইহার ছয় আনা হইতে তিনটাকা পর্য্যন্ত অষ্টাদশ প্রকার সংস্করণ দেখিয়াছি। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বহু বালিকাবিদ্যালয়ে মেঘনাদবধের বহুঅংশ পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ একদিন পাশ্চাত্য প্রভাব বিকট প্রতিভাস রূপে পরিত্যক্ত হইত, তাহা সর্ব্বজন সমাদৃত প্রকৃত কবিত্বের স্বতঃনিঃসৃত উচ্ছ্বাসরূপে আপামর সাধারণের মুখে ধ্বনিত হইতেছে। কালের কি অমিত প্রভাব! মধুসূদনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহার 'রচিত মধুচক্র' হইতে গৌড়জন—আবালবৃদ্ধবনিতা নিরবধি সুধা পান করিতেছে।

কর্ম্মভূমি সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মসাধনা করিতেই মানবের জন্ম। যে কর্ম্মে সে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করে—যে কর্ম্মের সাধনায় সে জীবনের যাবতীয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মাবমাননা উপেক্ষা করিয়া, সাংসারিক সর্ব্বস্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, আত্মপর বিস্মৃত হইয়া, একনিষ্ঠভাবে মগ্ন থাকে—যে ব্রত উদ্যাপনে সে হৃদপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া, সহস্র ধারায় রক্ত ছুটাইয়া, আরাধ্যাদেবীর পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করে—তাহাতে তাহার সিদ্ধিলাভ অবার্য, অবশ্যম্ভাবী; তাহা মানবজাতির ইতিহাসে অক্ষয় অমর মহাকীর্ত্তিরূপে চিরপূজিত হইবেই হইবে! জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা—সুকৃতি—তপোবল না থাকিলে, জীবনে—এই মর্ত্ত্যজন্মে, এরূপ একনিষ্ঠ আত্মহারা নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ সম্ভবে না! তাই, ইহজগতে কর্ম্মযোগীর সংখ্যা এত বিরল;—তাই, বহু যুগযুগান্তে—তবে তেমন কীর্ত্তিকুশল এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখিতে পাই!

আমাদের মধুসূদনের জীবন-কথা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বর্ণে বর্ণে এই বাক্যের সমীচীনতা উপলব্ধি করি। তাঁহার জীবনেও আমরা এই মহাসাধনার যাবতীয় অঙ্গ গুলি বিশদভাবে প্রকটিত দেখিতে পাই। জন্মজন্মান্তরের তেজঃপুঞ্জ সঞ্চিত হইয়া, তবে বিশিষ্ট প্রতিভার বিকাশ হয়—সে গুপ্ত গুণও পূর্ণব্যক্ত হয় প্রায় মহাদুঃখের মহাপীড়নের চরমাবস্থায়। মধুসূদনের কৈশোরে—'মহাবিদ্যালয়' হিন্দু কলেজে যে প্রতিভার উন্মেষ, তরুণ যৌবনে বিশপস্ কলেজে যে প্রতিভার অঙ্কুরোদ্গম, অন্তিম যৌবনে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতিভার পত্রপুষ্পবিকাশ, প্রৌঢ় জীবনে পুলিশকোর্টে কার্য্যকালে সেই প্রতিভারই পূর্ণপরিণতি! তরুণ বয়সে, তরুণ দুঃখভরে, তরল বুদ্ধিবশে তিনি বিজাতীয় 'মিউস্' দেবীর আরাধনায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে, যখন প্রবীণ বয়সে, দারুণ—অরুন্তুদ দুঃখঘোরে, পরিণত বুদ্ধিফলে স্বদেশীয় সরস্বতী দেবীর পূজায় আত্মনিয়োগ করিলেন—কঠোর কৃচ্ছ্রাসহকারে তদ্গতচিত্ত হইয়া স্বজাতিসম্ভব মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন,—তখন, সেই মহাযোগ সাধনায়, অচিরে কীর্ত্তি আসিয়া সিদ্ধিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবিনশ্বর জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া দিল!

তিনি মাতৃভাষার দাসীত্বমোচনকল্পে, আপনার পার্থিব ঐশ্বর্য্যরূপ পক্ষপুট হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া, সাংসারিক সর্ব্ববিধ সুখস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া বৈনতেয়ের ন্যায় কাব্যরূপ চন্দ্রলোক হইতে যে সুধা আহরণ করিয়া অক্ষয় মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহ হইতে আজি গৌড়ের আবালবৃদ্ধবনিতা নিরবধি সুধাপান করিতেছে—কবিত্বের ত্রিদিব সৌরভে জীবন জুড়াইতেছে!—আজ গৃহে গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় 'মেঘনাদবধ' বিরাজ করিতেছে!—কবি মহাদুঃখেই এই মহাকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন!—আমরা তাঁহারই ভাষায়, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া, 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সমাপন করিলাম;—

"পুড়ি ধূপদানে হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহুক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি! সুযশে!"

এদিকে ইন্দ্র ভীত হইলেন। সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হইলে, ইন্দ্রের যে ইন্দ্রত্ব থাকে না। তখন পরামর্শ চলিতে লাগিল—

"বলেন বাসব ব্রহ্মা কোন্ বুদ্ধি করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তুমি ঘোড়া কর চুরী॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায়।
ঘোড়া চুরী করি ইন্দ্র পাতালে পালায়॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল যে স্থানে।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাহার বিদ্যমানে॥"

তখন চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। সগরের ত এক আধটি ছেলে নয়—ষাট হাজার ছেলে ঘোড়ার রক্ষক। তাহারা স্বর্গ মর্ত্ত্য অনুসন্ধান শেষ করিয়া, পাতালে উপস্থিত হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখে কপিল-মুনির পার্শ্বে ঘোড়া রহিয়াছে,—

"ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়াচোর দেখিতে পাইলাম এই ঠাই॥
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি।
ধ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি॥
ক্রোধেতে নয়নে অগ্নি জ্বলে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি॥"

এ দিকে ঘোড়ারও খোঁজ নাই, ছেলেদেরও খোঁজ নাই। তখন সগরের প্রথম পুত্র অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান সকলের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে ঘোড়া পাইলেন। অংশুমান বুদ্ধিমান ছেলে; সে তখন কপিল মুনির স্তব করিতে লাগিল;—

"ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল।
প্রসন্ন হইয়া মুনি কহেন কপিল॥
মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে সে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার॥"

অংশুমান ঘোড়া লইয়া দেশে গেলেন, কোন রকমে যজ্ঞশেষ হইল। তাহার পর গঙ্গা আনয়নের পালা। একে একে কত রাজা গেলেন; কেহই আর ফেরেন না; গঙ্গার উদ্দেশ হয় না। কতদিন যায়; শেষে দিলীপের পুত্র ভগীরথ, গঙ্গা আনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভগীরথ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে; তাহা বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়। ভগীরথ মহাতপ আরম্ভ করিলেন। তখন সকল দেবতার আসন টলিল; এবার গঙ্গাকে ধরা দিতেই হইল। তখন ভগীরথ শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে আগে আগে চলিতে লাগিলেন; আর তাঁহার পিছে পিছে পতিত পাবনী আসিতে লাগিলেন। ঐরাবত ভাসিয়া গেল; স্বয়ং জহ্নু-মুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষে পান করিয়াও আটকাইয়া রাখিতে পারিলেন না, শেষে তাঁহার জানুভেদ করিয়া গঙ্গা বাহির হইলেন—তাই তাঁহার এক নাম হইল জাহ্নবী। পথ আর ফুরায় না—

"গঙ্গা বলিলেন বাপ শুন ভগীরথ।
কতদূরে তোমার দেশের আছে পথ॥
ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব দক্ষিণ দিক তার মধ্য খানে॥
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে॥
আছিল সগরবংশ ভস্মরাশি হৈয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া॥
মহাতীর্থ হইল সে সাগর-সঙ্গম।
তাহাতে কতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥"

ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া কপিল-মুনির আশ্রমে সগর সন্তান উদ্ধার করিয়াছিলেন; তাই এই কপিল-মুনির আশ্রমে প্রতি বৎসর গঙ্গাস্নান হইয়া থাকে। এখন শুধু স্নান হয়; কিছুকাল পূর্ব্বে এখানে হিন্দু নরনারী পুত্র কন্যা বিসর্জ্জনও দিতেন। সে ইতিহাস সকলেই জানেন। এ হেন গঙ্গা সাগর সঙ্গমে স্নান করিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়াই উচিত। আমার তেমন আগ্রহ যে হইয়াছিল তাহা নহে, তবে 'ব্যাপারের দৌলতে গঙ্গাস্নান'—এই প্রবচনটা আমি সার্থক করিয়া দিয়াছি, এ কথা আমার পাঠকপাঠিকা মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

পৌরাণিক কাহিনী ত বলা হইল; এখন নিজের কাহিনী বলি। সাগর দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, যেখানে লাল নিশান উড়িতেছে, তাহাই ইজারাদার বাবুর আড্ডা। তখন সেই বালুকার চর ভাঙ্গিয়া লাল নিশানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। লাল নিশান পর্য্যন্ত আর যাইতে হইল না, কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখি, কুটুম্বপ্রবর আমাদের শুভাগমন-সংবাদ শুনিয়া

অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"যা হোক, আপনি ত এসেছেন। কিন্তু এ দিকের রকম বড়ই শোচনীয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শোচনীয় কি রকম?" তিনি বলিলেন—"কাল স্নান; আজ এখনও বেশ যাত্রী আসে নাই। অন্যান্য বছর স্নানের পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে মেলায় লোক ধরে না; যেমন করিয়া হউক দশ পনর হাজার লোক আসিয়া থাকে; আর এই যে নদী দেখছেন; এতে নৌকা দাঁড়াবার স্থান থাকে না। আর আজ দেখুন, বড় বেশী হয় ত দুই তিন শত নৌকা আসিয়াছে। উপরে গিয়া দেখিতে পাইবেন, দুই তিন হাজারের বেশী লোক জমে নাই। এত ঘর বাঁধিয়া দিয়েছে, প্রায় সবই খালি পড়িয়া আছে; দোকানী পসারীও বেশী আসে নাই। এবার দেখ্‌ছি দাঁড়িয়ে ক্ষতি খেসারৎ করতে হবে।" আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম "আরে মশাই! এখনও ত একখানিও ষ্টীমার আসে নাই। এবার ষ্টীমারেই বেশী লোক আসিবে। সাধারণ লোকের যে এখনও 'এমডেনের' ভয় ঘোচে নাই; তাই এবার বেশী লোক নৌকায় আসিবে না। হোরমিলার আর [illegible]বরণ কোম্পানীর জাহাজ বোঝাই যাত্রী আসিবে।" [illegible] বাবু সে কথায় প্রবোধ মানিলেন না; বলিলেন—"এবার যা হবে তা বুঝতেই পারছি। এখন চলুন, বাসায় যাওয়া যাক্।"

বাসা অর্থাৎ হোগলা নির্ম্মিত কয়েকখানি কুটীর। এখানে সকলেরই তাই। বাসায় উঠিয়া চা-পান করিয়া চারিদিকে দেখিতে গেলাম। সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে এই মেলার স্থান; মেলার সম্মুখেই স্নানের ব্যবস্থা। বিঘা [illegible] চল্লিশ স্থানের জঙ্গল কাটিয়া মেলার স্থান করা হয়। প্রতি বৎসরই মেলার পূর্ব্বে জঙ্গল কাটা হয়; মেলার পরে আবার জঙ্গলে স্থানটি পূর্ণ হয়। এই স্থানে সারি সারি হোগলার কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে; যাত্রীরা ভাড়া দিয়া এই সকল কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। মেলার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। ডায়মণ্ডহারবারের সবডিবিজনাল আফিসার সাহেব মহাশয় মেলায় আসিয়াছেন; তিনি আর হোগলার কুটীরে থাকেন না; সরকারী ছোট ষ্টীমারেই তিনি রহিয়াছেন। সঙ্গে আসিয়াছেন—সেরেস্তাদার, পেস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন বৃদ্ধ অনাহারী হাকিমও মেলার সুশাসনের জন্য সাহেব হাকিমের সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই হোগলার কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; হাকিম মহাশয়ই একটি ছোট তাঁবু পাইয়াছেন। আর একটি তাঁবু দেখিলাম, তাহাতে টেলিগ্রাফ আফিস বসিয়াছে; মেলার কয়দিনের জন্য এই আফিস। এতদ্ব্যতীত প্রায় দুই শতের অধিক লাল পাগড়ী; এবং তাঁহাদিগের প্রভু—জমাদার, সব ইনস্পেক্টর, ইনস্পেক্টর ইঁহারাও সংখ্যায় বড় কম নহেন। ডিটেক্‌টিব পুলিশও আসিয়াছে অনেক। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ারও দশ দিন পূর্ব্বে আসিয়া বসিয়া আছেন। চব্বিশ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ইনজিনিয়ার বাবুও প্রতি বৎসরই আসিয়া থাকেন, এবারও তাঁহার আসিবার কথা ছিল; কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে গবর্ণর সাহেব মোটর যোগে কলিকাতা হইতে যশোহর যাইবেন। ইনজিনিয়ার বাবুকে যশোহরের সীমা পর্য্যন্ত লাট সাহেবকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে; তাই তিনি আসিতে পারিবেন না। এ দিকে ডিস্পেনসারী বসিয়াছে, হাসপাতাল খোলা হইয়াছে, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার আসিয়াছেন, দলে দলে মেথর ঝাড়ুদার আসিয়াছে, ইজারাদার মহাশয় দুই নৌকা বোঝাই সুমিষ্ট জলপূর্ণ জালা আনিয়া রাখিয়াছেন, দশ হাত অন্তর পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়াছে, ইনস্পেক্টর বাবুরা চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতেছেন। বন্দোবস্তের কোনই ত্রুটী দেখিলাম না। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবক দল ঔষধপত্র লইয়া আসিয়াছেন; মাড়োয়ারি সেবক সম্প্রদায় আসিয়াছেন; কিন্তু যাহাদের জন্য এত আয়োজন, সে দিন প্রাতঃকালে দেখিলাম, তাহাদের সংখ্যা চারি হাজারের অধিক নহে। মেলা মোটেই জমে নাই। যে সাধুসন্ন্যাসিগণ এই গঙ্গাসাগরের স্নানে দলে দলে হাজারে হাজারে আসিয়া থাকেন বলিয়া শুনিয়াছি, প্রাতঃকালে সমস্ত মেলার স্থান নদীর তীর ঘুরিয়া দেখিলাম, তাঁহাদের সংখ্যা দুই তিন শতের অধিক নহে এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সাধু কয়জন ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না; অনেকেই যাত্রীর নিকট ভিক্ষা লাভের জন্যই আসন করিয়া বসিয়া আছেন, বলিয়া মনে হইল। সাগরে গঙ্গাস্নানের জন্য আমি তত ব্যস্ত হই নাই; আমার আশা ছিল যে, এই উপলক্ষে অনেক সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হয়। তাঁহাদের দুই দশজন মহাত্মার সাক্ষাৎলাভ হয় ত হইতে পারে, কিন্তু সারা বেলা প্রদক্ষিণ করিয়াও সে আশা সে বেলা

ফলবতী হইল না। আমার আত্মীয়-মহাশয় যেমন লাভের আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন, আমিও তেমনই সাধুদর্শনের আশায় নিরাশ হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া মনে হইল যে, শুনিয়াছি একজন সন্ন্যাসী বহুদিন হইতে এখানে আছেন। তিনি বারমাসই এখানে থাকেন। মেলার পরে যখন এই স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে, তখনও তিনি এখানেই থাকেন এবং দূরবর্ত্তী ধবলাটের দোকানদার ও অন্যান্য লোকেরা এই সন্ন্যাসীর সেবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তখন আর বিলম্ব না করিয়া সেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে গেলাম। মেলার এক প্রান্তে এক অত্যুচ্চ ভূমিখণ্ডে সন্ন্যাসীর কুটীর—একখানি মাত্র খড়ের চালওয়ালা ঘর। সেই স্থানেই সন্ন্যাসী একাকী বাস করেন। তাঁহার কুটীরের অনতিদূরেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। মেলার কয়দিন যাত্রীরা সেই পুষ্করিণীর জলপান করিয়া থাকে, তাহার পর সাগর দ্বীপের স্থায়ী অধিবাসী ব্যাঘ্রাচার্য্যগণ সেই পুকুরের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। মেলার কয়দিন জনতার ভয়ে ব্যাঘ্র মহাশয়েরা আর ঐ মেলার দিকে আগমন করেন না।

সন্ন্যাসীর কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি মহাব্যস্ত; যাত্রীরা সাধুসেবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিতেছে, তাহা সযত্নে কুটীরের মধ্যে তুলিতে তিনি নিযুক্ত আছেন। এই দৃশ্য দেখিয়াই ত আমার ভক্তি উড়িয়া গেল। তবুও অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন ভাবান্তর দেখিলাম না, তিনি সেবা গ্রহণেই ব্যস্ত হইলেন। দূর ছাই, এ সন্ন্যাসীতে আমার কাজ নাই! এমন সন্ন্যাসী ত পথে ঘাটে অনেক দেখিয়াছি, অনেক দেখিতে পাই। বড়ই নিরাশ হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এখন নিজের কুটীরখানির ব্যবস্থা করিতে হয়। দুই তিন দিন যখন এখানে বাস করিতে হইবে, তখন এই দারুণ শীতের সময় আশ্রয়-স্থানটুকুকে বাসের মত ত করিয়া লইতে হইবে; সন্ন্যাসগিরি ত আর এখন নাই! সে দিন চলিয়া গিয়াছে।

আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ঘরের মেঝে বালুকাপূর্ণ; তখন উঠান হইতে দুইতিনখানি হোগলা আনিয়া সেই বালুকারাশির উপর পাতিলাম; কিন্তু সঙ্গে ত আর লেপ-তোষক নাই; সেই হোগলার উপর কম্বল বিস্তৃত করিলেও শীতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিলাম না। বাহিরে আসিয়া দেখি, এক পার্শ্বে পনর কুড়িখানি মৃতদেহ বহন করিবার উপযোগী খাটিয়া রহিয়াছে, সেগুলিকে কলিকাতা হইতে আমদানী করা হয় নাই, জঙ্গলে স্বচ্ছন্দপ্রাপ্ত কাষ্ঠের দ্বারা বিশ্বকর্ম্মাগণ এই অনিন্দ্য সুন্দর 'চতুষ্পদ'-সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে সাধু উদ্দেশ্যে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল; কারণ, অন্যান্য বৎসরে এই সঙ্কীর্ণ স্থানে পঞ্চাশ-ষাট-হাজার লোকের সমাগম হইত; সুতরাং ওলাদেবীও সদলবলে আবির্ভূতা হইতেন। এবার লোক সংখ্যা যে প্রকার কম এবং আয়োজন যে প্রকার বিপুল, তাহাতে এক গঙ্গাদেবী ও কপিলমুনি ব্যতীত আর কোন দেবদেবী এখানে আগমন করিতেছেন না, ইহা নিশ্চিত বন্ধুবরের শব-বহনোপযোগী খট্টাগুলি একেবারে কোন কাজেই লাগে না বুঝিয়া, আমি তারই একখানি আমার কুটীরে লইয়া আসিলাম এবং একই সময়ে খট্টাশয্যা ও ভূমিশয্যা উভয় সুখই অনুভব করিবার ব্যবস্থা করিলাম; কারণ, সেই খট্টার উপর আমার এই বিপুল দেহভার পতিত হওয়ায় আমরা মস্তক শূন্যে অবস্থিত হইল বটে, কিন্তু আমার পৃষ্ঠদেশ ভূসংলগ্ন হইল। যাক, ও সব কথা এখন থাকুক।

বেলা প্রায় এগারটার সময় দূরে বংশীধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, হোরমিলার কোম্পানীর যাত্রী ষ্টীমার আসিতেছে। হোর মিলার কোম্পানীর ষ্টীমারগুলি বাহির সমুদ্র দিয়া আসে না; তাহারা নদী দিয়া আসে। ষ্টীমারের আগমন-সংবাদ পাইয়া, আমরা সদলবলে নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—তিনখানি ষ্টীমার এক সঙ্গে আসিতেছে। ষ্টীমার হইতে যাত্রী নামাইবার জন্য নদীতীরে জেটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই জেটির মুখেই গেট প্রস্তুত হইয়াছিল। এই গেটে দাঁড়াইয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে লোক পিছু দুই আনা হিসাবে দর্শনী আদায় করিতে হইবে। নৌকা ও নৌকারোহী যাত্রীদিগের

দর্শনী আদায়ের জন্য ধবলাটে এক আড্ডা স্থাপিত হইয়াছিল; কারণ, সকল নৌকাই ঐ পথেই আসিবে, বাহির সমুদ্র দিয়া নৌকাযোগে আসিবার সাহস আমার ব্যতীত আর কাহারও হয় নাই। তবুও লোকে বাঙ্গালীকে কাপুরুষ বলে!

তিন খানি ষ্টীমার পাশাপাশি লাগিল; যাত্রী নামিতে আরম্ভ করিল। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিশের লোকেরা টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ সেবকগণ যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি নামাইতে লাগিলেন। সে এক সুন্দর দৃশ্য! এমন কি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের বড় বড় মোট বহিয়া আনিতে লাগিলেন। আমরাও যাত্রীদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করিলাম। তিনখানি ষ্টীমার হইতে প্রায় দুই হাজার যাত্রী নামিল। ষ্টীমারের বাবুরা বলিলেন যে, সন্ধ্যার মধ্যেই ভার্বিলার কোম্পানীর আরও সাতখানি ষ্টীমার আসিবে। বাহির সমুদ্র দিয়া কিলবরণ কোম্পানীরও পাঁচখানি ষ্টীমার আসিবে, তবে তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিবে না। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম; বারখানি ষ্টীমারে যেমন করিয়া হউক দশ হাজারের অধিক যাত্রী নিশ্চয়ই আসিবে। সেদিন আর আমাদের অবকাশ ছিল না, এক একখানি ষ্টীমার আসে, আর যাত্রী নামাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কিলবরণ কোম্পানীর ষ্টীমার বাহির সমুদ্রে থাকিবে, তাহারা তীরের নিকট আসিতে পারিবে না, নৌকায় করিয়া যাত্রী নামিবে। সে দিকেও দর্শনী আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইল। সন্ধ্যার সময় মেলা-স্থান ও সমুদ্রের বালুকাপূর্ণ উপকূল ঘুরিয়া দেখিলাম, বেশ জনতা হইয়াছে। সমুদ্রতীরে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছে; সকলেই সেই বালুর উপরে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়াছেন। অনেকের সঙ্গেই শিষ্য আছেন। কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, কেহ আগন্তুকগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে; সে সময় সাধুদিগের দর্শন করার অবকাশ আমার ছিল না, কারণ ক্রমাগত ষ্টীমার পৌঁছিতে লাগিল, কিলবরণ কোম্পানীরও চারিখানি ষ্টীমার পৌঁছিল। যেমন করিয়া হউক, এই কয়খানি ষ্টীমারে প্রায় বার তের হাজার যাত্রী আসিয়া পৌঁছিল! তখনও কিলবরণ কোম্পানীর একখানি ষ্টীমার আসিতে বাকী ছিল। ষ্টীমারের সাহেবরা বলিল, সে ষ্টীমারখানি রাত্রিতে আর আসিবে না, পরদিন প্রত্যূষে যাত্রী পৌঁছাইয়া দিবে। সুতরাং আমরা বন্দরের যে কাযোর ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিলাম, তাহার এক অংশ প্রায় শেষ হইল; দ্বিতীয় অংশ দোকানদারদিগের নিকট হইতে ভাড়া আদায়; তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না। সারাদিন এবং এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্ত শরীরে আমরা বাসায় আসিলাম। কিন্তু সে দিন আমাদের অদৃষ্টে বিশ্রাম ছিল না। রাত্রি যখন নয়টা, তখন দূরে সমুদ্রের মধ্যে বংশীধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, তখন কি আর ঘরে থাকা চলে। ঐ বাঁশী বাজিয়াছে ঐ বাঁশী বাজিয়াছে! এই শীতের অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্র সৈকতে শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধিকাও হয় ত ঘরের বাহির হইতেন না; কিন্তু আমাদের আকর্ষণ যে শ্রীরাধার প্রেমের আকর্ষণ অপেক্ষাও অধিক আমাদের অর্থলোভের আকর্ষণ! ছুট ছুট ছুট। সেই কনকনে শীতে, সেই অন্ধকার রাত্রিতে কদর্য্যাবস্থ বালুকাময় উপকূলে আমরা ছুটিলাম। একে এই শীত, তাহার পর উত্তরে বাতাস প্রবলবেগে বহিতেছিল, সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়াছিল, সমুদ্রগর্জ্জন শুনিয়া মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছিল। কিন্তু তখন কাব্য করিবার সময় ছিল না। আমরা সমুদ্রতীরে আমাদের গেটের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে আলোর বন্দোবস্ত ছিল; বহু কষ্টে আলো জ্বালা হইল। কিন্তু ষ্টীমার হইতে যাত্রী আর নামে না, একটি লোকও আসে না। আমরা অপেক্ষা করিয়াই রহিলাম। একটু পরে ষ্টীমারের সার্চ লাইট (search light) উপকূলের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমরা দেখিলাম যে, একখানি বোট সমুদ্র তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তীরের দিকে আসিতেছে। বোট কিছুতেই স্থির থাকিতেছে না। তাহার পর দেখিলাম, কতকগুলি লোক জলে ঝাপাইয়া পড়িল এবং সেই তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া তীরে আসিতে লাগিল। তাহারা গেটের নিকট আসিলে দেখিলাম, সকলেই সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী না হইলে কি এমন ভাবে কেহ আসিতে পারে! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এ ষ্টীমারে গৃহী-যাত্রী একজনও নাই—নয় শত যাত্রী আছে—সে নয় শতই সাধু সন্ন্যাসী! কলিকাতার মাড়োয়ারিগণ জাহাজভাড়া দিয়া এই নয় শত সন্ন্যাসীকে সাগরস্নানে প্রেরণ করিয়াছেন! আজকালকার দিনে এ কথা শুনিলেও প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়! ধন্য মাড়োয়ারিগণ! তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেও জানেন, সদ্ব্যয় করিতেও জানেন।

আমাদের কার্য্য ফুরাইল; সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে পয়সা আদায় হইবে না। আমরা গেট ছাড়িয়া দিলাম। যে বোটে এই কয়েকজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, সেই বোটের একজন খালাসী আসিয়া বলিল, সে রাত্রিতে আর যাত্রী নামানো হইবে না। আমরা তখন ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। সেই সময়ে অদূরে জঙ্গলের পার্শ্বে আমাদের দৃষ্টি পতিত হইল। সেখানে ওলাউঠা রোগীদিগের জন্য একটা বড় কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই কুটীর হইতে আলোক বহির্গত হইতেছিল। আমি তখন আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম—"তোমরা যাও, আমি 'কলেরা কুটীর' দেখিয়া যাইব।" সঙ্গীরা চলিয়া গেল, আমি সেই অন্ধকারে কুটীরের নিকট গেলাম। দেখি একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ওলাউঠা হইয়াছে; তাহাকে এখানে লইয়া আসা হইয়াছে; আর তাহার সেবা করিতেছেন—ভগবান রামকৃষ্ণের তিনটি সেবক! তিনটিই যুবক—বয়স কাহারও কুড়ির অধিক নহে। কি তাহাদের সেবাপরায়ণতা, কি তাহাদের সাহস, কি তাহাদের আত্মোৎসর্গ! সে যে কি দৃশ্য, তাহা কেমন করিয়া আমি বর্ণনা করিব! তাহারাও বাঙ্গালী, আর আমরাও বাঙ্গালী! ইচ্ছা হইল যুবকগণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া পবিত্র হই, তাহাদের এই পরোপকার—এই সেবাব্রতের অংশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। এই শীতের দিনে, এই জনশূন্য স্থানে তিনটি বাঙ্গালী যুবক মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছে! হে ভগবান রামকৃষ্ণ, হে বীর বিবেকানন্দ, তোমরা এই সকল সাধকের কর্ণে কি মহামন্ত্রই প্রদান করিয়াছ, যাহার জন্য ইহারা মরণকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে, এমন করিয়া আর্ত্ত দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা করিতেছে!

অনেকক্ষণ তাহাদের নিকট থাকিলাম। রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম। যে পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া আসিলাম তাহারই ফল-স্বরূপ সেই সমুদ্র-উপকূলে সেই বালুকারাশির উপর এক মহাপুরুষকে দেখিলাম। আমার হাতে একটি লণ্ঠন ছিল, সেই লণ্ঠনের আলোকে দেখিলাম, একজন গৌরকায়, তেজঃপুঞ্জ শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী বালুকার মধ্যে বসিয়া আছেন। কোন আসন নাই, গায়ে একখানি শতছিন্ন চট, পরিধানে সামান্য একখানি লেঙ্গট! কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ!

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বারান্তরে এই মহাপুরুষের কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

মাতৃ-স্নেহ

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু]

থাকে যদি হীরক-মাণিক, থাকে যদি পান্না-চুনি
লৌহ পাশে,
হোক্ না সে সব দেখ্‌তে ভাল, হোক্ না তা'দের মূল্য বেশী,
কি যায় আসে।

চুম্বক এসে তাজ্‌বে সবে, বক্ষে শুধু লৌহ ল'বে
চুম্বি মুখে,
হোক্ দুরন্ত, কুরূপ অতি, তবু সে যে মায়ের ছেলে
মায়ের বুকে।

শঙ্খ

[শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম. এ., বি. এল.]

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম এ, বি এল

হে দিবাবসানশংসী, স্নিগ্ধগম্ভীরনাদী, কঙ্কালসার মহাশঙ্খ! তুমি যখন তোমার তীব্রকণ্ঠে ধ্বনিগুলিকে স্তরে স্তরে উদ্গীর্ণ করিতে করিতে কোন্ ঊর্দ্ধলোকে বিলীন হইয়া যাও, তখন মনে হয়, যেন তোমার সেই স্বরোৎকীর্ণ রন্ধ্রপথ দিয়া শাশ্বত পীযূষধারা—দেবলোকের আশীষ বৃষ্টি ও রজনীর স্বপ্তি-সুধা মর্ত্ত্যধামে ছড়াইয়া পড়ে। তুমি দিগ্বলয়বেষ্টিত করিয়া যে এক বিরাট স্বরপরিখা নির্ম্মাণ কর, যেন তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যেই দিবসের সমস্ত বিক্ষিপ্ত কোলাহল নিঃশেষ হইয়া যায়। আবার কখন মনে হয়, যেন তুমি তোমার একটি বিশাল ফুৎকারে প্রধূমিত দিবালোক-বহ্নিকে পুনরুদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা কর, যেন তাহারই উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ-কণিকা-সমূহ দেখিতে দেখিতে চন্দ্রতারকারূপে গগনাঙ্গনকে সুশোভিত করে এবং লক্ষলক্ষ ক্ষুদ্রতর জ্যোতির্বিন্দুতে দেউলে—দেবালয়ে—সৌধশিরে—রাজপথে ও তটিনী বক্ষে জ্বলিয়া উঠে।

হে বঙ্গদেশীয় 'কার্ফিউ'; হে দিনকর বিদায়সঙ্গীতোচ্চারী বৈতালিক, হে সন্ধ্যাবাহনকারী ঋত্বিক, তুমি ইংরাজ ভজনালয়ের ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় কেবল মন্দিরনিবদ্ধ নও, তুমি আমাদিগের ভবনে ভবনে সঙ্গীতোচ্ছ্বাস তুলিয়া থাক। তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে হিন্দুর গৃহে তিনবার করিয়া ধ্বনিত হইয়া থাক। আমার বোধ হয়, প্রথমবার তুমি তপনদেবের বিদায়গীত গাও, দ্বিতীয়বার তাঁহার অস্তাচল বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কর্ণকুহরে নিদ্রা সঙ্গীত ঢালিয়া দাও; এবং তৃতীয়বারে তোমার মঙ্গল নিঃস্বনে বঙ্কিমাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাবধূকে বরণ করিয়া আমাদের গৃহে আনয়ন কর।

তুমি হিন্দুর প্রতি মাঙ্গলিক ব্যাপারের সহিত একাঙ্গীন ভাবে সংশ্লিষ্ট। তুমি উৎসবের প্রচারক, আরতির অঙ্গ, উদ্বাহের সহায় ও হুলুধ্বনির নিত্যসহচর। তুমি মন্দিরের গৌরব, গৃহের শোভা এবং পূর্ব্বে রণক্ষেত্রের বাদিত্রও ছিলে। তখন তুমি কর্ম্ম জীবনের দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে যুগপৎ অবস্থিত থাকিতে। তখন তুমি পুরোহিতের শান্ত পবিত্র করকমলে বা যোদ্ধার রুধিররঞ্জিত বর্ম্ম সজ্জায় বিরাজমান থাকিতে। সে দিনও নাই—সে তূরী ভেরী দামামাও নাই, সে তুমিও নাই। যে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে বীরকেশরীর হৃদয়ও কি এক অব্যক্ত ত্রাসে দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত, যাহার নিকট সিংহের বিকট নিনাদও কোমল বলিয়া প্রতীত হইত, যাহার নিকট আধুনিক "বিউগল" নামক বংশী একটি ক্ষীণকণ্ঠ অজাতশ্মশ্রু বালক ব্যতীত আর কিছুই নয়, সে শঙ্খ এখন কোথায়? প্রাচীন বীরত্বের উপর যে জরা আসিয়া পড়িয়াছে, আজ সেই জরায় তুমিও জীর্ণ, আজ তোমার দেহও কঙ্কালসার হইয়াছে।

প্রাচীন যুদ্ধে শঙ্খ যে একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল, এ বিষয়ে কি কেহ সন্দেহ করেন? যদি করেন, তবে একবার মহাভারতের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখুন। দেখিবেন—স্বয়ং

শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অন্যান্য অনেক যোদ্ধাই শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। যদি পুরাণ অনুসন্ধান করিতে কষ্ট হয়, তবে ইতিহাসই অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইবেন। আর যদি তাহাতেও কষ্ট হয়, তবে আসুন, আরও সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। কবিবর ৺ মধুসূদন দত্তের কবিতা পুস্তকখানি উল্টাইয়া দেখুন। তাঁহার একটি বাল্য কবিতার প্রথম ছত্রে এইরূপ লেখা আছে—"শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল।"—মশকের সিংহকে এইরূপভাবে আক্রমণ করা অবশ্য অতি প্রাচীন যুগের কথা, এবং কবিও প্রাচীন যুগের পদ্ধতি অনুসারে মশককে শঙ্খনাদ করাইয়া, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়াছেন। কবিবর সে পদ্ধতি জানিতেন না, ইহা বলিলে, তাঁহার অবমাননা করা হয়, সুতরাং জ্যামিতির ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে পারি যে, প্রতিজ্ঞাটি সপ্রমাণ হইল।

ন্যায়শাস্ত্রে বলে যে, দুইটি নিকটবর্ত্তী সাময়িক ঘটনা, হয় কার্য্যকারণভাবে সংশ্লিষ্ট, না হয় দিবারাত্রির ন্যায় নিত্যানুসঙ্গী হইয়াও কার্য্য-কারণ সম্পর্কহীন, না হয় কাক তালীয়বৎ। এক্ষণে দেখা যায় যে, ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হইলেই বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতায় ও বঙ্গের অন্যান্য অনেক সহরে ও গ্রামে চতুর্দ্দিক হইতেই শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? ভূমিকম্প ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে কি প্রকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান? বোধ করি, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে অনেক নৈয়ায়িকেরই ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইবে। প্রথমতঃ, কাকতালীয়বৎ হইলে যখনই ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হয়, তখনই শঙ্খধ্বনি হয় কেন? দিবারাত্রির ন্যায় পরস্পরসম্বদ্ধ হইলে, শঙ্খধ্বনির পর আবার ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হয় না কেন? অথবা যেরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনরূপ কারণ স্থগিত হইলে দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন আর আসিবে না, সেইরূপ শঙ্খধ্বনির এমন কি অদৃশ্য কারণ আছে, যাহার অভাব হইলে ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাত হইবে অথচ শঙ্খধ্বনি হইবে না? আর যদি ঐ দুইটি ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাবই বিদ্যমান থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি যে, ঐ নিয়ম জগতের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয় না কেন?

সে যাহা হউক, ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাতের অব্যবহিত পরেই যে, শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, তাহা কি অনির্ব্বচনীয়—কি গভীর ভাবোদ্দীপক! গভীর রজনীতে অবরুদ্ধ নদীর আর্ত্তনাদের ন্যায়, ঝটিকা-প্রহত সাগর-তরঙ্গের ন্যায়, উহা ভীমবেগে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইয়া, নিমেষ মধ্যেই সুষুপ্তিমগ্না নিশীথিনীর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেয় কে নগরবাসিগণকে উৎকর্ণ—উৎকণ্ঠিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে; ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাতের ক্ষণিক আতঙ্ককে দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে শঙ্খধ্বনির সমকক্ষ আর কিছুই নাই। নিদাঘতপ্ত মধ্যাহ্নে যেরূপ পবন চালিত বহ্নি চিন্তার ন্যায় দ্রুতবেগে গৃহ হইতে গৃহান্তরে সংক্রমিত হয়, এই শঙ্খধ্বনিও সেইরূপ গৃহ হইতে গৃহান্তরে পরিচালিত হইয়া অবিলম্বেই এক ঘোরতর ঝঙ্কারে কর্ণযুগলকে বধির করিয়া দিবার উপক্রম করে। কেহ কেহ বলেন, শঙ্খধ্বনির ঐ প্রকার উন্তরোল বড়ই কৌতুকপ্রদ ও শ্রোত্রসুখকর। কিন্তু আমার মত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ন্যায়-শাস্ত্রের ও সাহিত্যের দিক্ ছাড়িয়া দিয়া, প্রাণি বিজ্ঞানের দিক হইতে বিষয়টিকে দেখিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের সহিত শৃগালের অনেকটা সম্পর্ক আছে। একটি শৃগাল চীৎকার করিলে যেরূপ সকল শৃগাল চীৎকার করে, সেইরূপ একব্যক্তি শঙ্খধ্বনি করিলে, সকলেই শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকেন। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের অনুকরণ-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল এবং সমাজ-নীতির দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, মনুষ্য সামাজিক জীব বলিয়াই পরস্পরের অনুকরণ করিয়া থাকে।

যদি শঙ্খধ্বনির পৌরাণিক যুক্তি চান, তাহা হইলে তাহাও দিতে পারি। পুরাণে বলে যে, বাসুকির মস্তকের উপর পৃথিবী অবস্থিত; সুতরাং যখন তিনি কোন কারণে মস্তক সঞ্চালন করেন, তখন ভূমিকম্প হইয়া থাকে এবং বজ্রধ্বনির কারণ এই যে, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের গাত্রে ছিদ্র করিয়া দিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে বজ্রনিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তিনি বারিবর্ষণেরই দেবতা এবং বারিবর্ষণই তাঁহার উদ্দেশ্য। সুতরাং শঙ্খধ্বনি যদি পৌরাণিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেহেতু সঙ্গীতধ্বনিতে সর্প মাত্রেই মুগ্ধ হয়, অতএব শঙ্খধ্বনি-মুগ্ধ হইয়া বাসুকি তাঁহার ফণাকে স্থির করিবে এবং দেবরাজ বুঝিতে পারিবেন যে,

তাঁহার বজ্র বড় অধিক জোরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় মেঘের গাত্র ভেদ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে সুতরাং তিনি ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্ক হইয়া বজ্র নিক্ষেপ করিবেন।

হে শঙ্খ, তোমার কণ্ঠে যে অপূর্ব্ব স্বর জীমূতমন্দ্রে ধ্বনিত হয়, যে স্বরের ভীষণ গাম্ভীর্য্যে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়, সে স্বরের তুলনা আর কোথাও পাই না কেন? আমার বোধ হয়, তাহার কারণ এই যে, তুমি চিরকলশায় সমুদ্রের অনন্তমুখী সুমহান্ কল্লোল সঙ্গীত শুনিয়াছিলে। সে সঙ্গীত তোমার প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তখন মূকতা নিবন্ধন তাহা তুমি প্রকাশ করিতে পার নাই; এক্ষণে নরের নিশ্বাস পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়া তোমার সে পূর্ব্বজন্মের মূকতা দূরীভূত হইয়াছে, এখন তুমি তোমার সেই অস্থিনিহিত সাগরসঙ্গীত যাহা বহুদিন ধরিয়া তোমার পঞ্জরগুলির মধ্যে নিদ্রিত ছিল, তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া, জগতের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছ।

কিন্তু নরলোকে আসিয়াও সকল শঙ্খের বাকস্ফূর্ত্তি হয় না, জলশঙ্খগুলির সেই দশা। তাহারা বোধ হয়, এখনও সেই বিরাট অনন্ত সঙ্গীতের অনুধ্যানে মগ্ন! যে সঙ্গীত যাহার কর্ণে অনুক্ষণ বাজিতেছে, সে চিরদিনই নীরব থাকিবে, সে চিরদিন মহামৌনী যোগীর ন্যায় সেই ব্রহ্মরূপিণী উদাত্ত রাগিণীর উপাসনা করিবে। অন্য লোকের ক্ষুদ্র কলরব সে কখনও তুলিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু নরলোকে সবাই বক্তা—সবাই আপনার উচ্চকণ্ঠে অপরের কণ্ঠকে ডুবাইয়া দিতে সচেষ্ট। তাই নরলোকে আসিয়া কোন কোন শঙ্খের মুখ খুলিয়া যায়।

কিন্তু কোন কোন শঙ্খকে জলশঙ্খ * বলা হয় কেন? জলশঙ্খ আবার কোন্‌টি? সকল শঙ্খই ত এককালে জলে ছিল। যদি ভিতরে জল ভরিয়া রাখিতে হয় বলিয়া ঐ নামকরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, জল ভরিয়া রাখি কি জন্য? উহার দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়? উত্তর—উহা চিরাগত প্রথা। কিন্তু সে চিরাগত প্রথার মূলে কি কোনই যুক্তি নাই? সকল শঙ্খে জল ভরি না কেন? উত্তর—জলশঙ্খের মুখে ছিদ্র নাই—সে মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকে—তাই তাহার জলটুকু ধরিয়া রাখিবার শক্তি আছে। ওঃ—এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, উহার উদ্দেশ্য কি! উহা একটা ভয়ানক প্রকাণ্ড রূপক। যেরূপ "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে"; সেইরূপ রূপকচ্ছলেন ইহার দ্বারা আমাদিগকে একটা মস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইবার রূপকটির ব্যাখ্যা করিব। শঙ্খ মাত্রেই মনুষ্য এবং জল—মন্ত্রণা। যাহার কথা বলিবার শক্তি আছে, তাহার কর্ণে গুপ্তমন্ত্রণা প্রদান করিও না। কি জানি, কোন্ দিন তাহার মুখ দিয়া তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। যদি মন্ত্রণা বলিতে হয়, তবে এমন লোকের সম্মুখে বলিও—যে বোবা, যাহার বাকশক্তি নাই, অথবা যে শিশু—যাহার বাকস্ফূর্ত্তি হয় নাই, অথবা যে মন্ত্রণাটুকু চিরদিন নিজের মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে, কখনও মুখ খুলিয়া অপরের নিকট ব্যক্ত করিবে না।

এক সমস্যার ধারে যাইতে না যাইতেই অপর সমস্যা আসিয়া উপস্থিত। "একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে।" শঙ্খকে মাটির উপর রাখিতে নাই কেন? "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি" এটা ঠিক কথা। আমাদের বুদ্ধির দ্বারে কোথায় একটি ছিদ্র আছে, যেটা অনেকটা বিকল বেলুনের "সেফটি ভ্যালভের" ন্যায়। ভিতরের গ্যাস অর্থাৎ জ্ঞান বড় বাহিরে যাইতে না পারিলেও বাহিরের প্রশ্নগুলি মাঝে মাঝে এক একটা ঝড়ের মত হু হু করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। ঐ ছিদ্রটুকু আছে বলিয়াই এত গোলমাল। সেই বাহিরের বাতাসটুকুকে নিয়া মহা গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। যতক্ষণ না তাকে নিরস্ত করা যায়, ততক্ষণ মনের ভিতর একটা ভয়ঙ্কর উপদ্রব চলিতে থাকে। অবশ্য আমার উপমাটির শেষাংশটুকু বেলুনের পক্ষে বোধ হয় খাটে না; কারণ বেলুনের ভিতরের গ্যাসের চাপ বাহিরের বাতাসের চাপের চেয়ে বেশী; কিন্তু আমাদের ভিতরকার জ্ঞানের চাপটার চেয়ে বাহিরের অজ্ঞানটার চাপ বেশী; তাই সর্ব্বদাই নূতন নূতন

* পদ্ম ও শঙ্খকে সর্ব্বত্রই একত্র দেখিতে পাই—

১। নারায়ণের হস্তে শঙ্খও আছে—পদ্মও আছে।

২। স্ত্রীলোকের মধ্যে পদ্মিনীও আছেন—শঙ্খিনীও আছেন।

৩। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে শঙ্খও একটি সংখ্যা—পদ্মও একটি সংখ্যা।

৪। কালিদাসের যক্ষের গৃহদ্বারে শঙ্খও আছে—পদ্মও আছে।

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম-ভেদে পদ্ম দুইপ্রকার থাকার সামঞ্জস্যের খাতিরে শঙ্খকেও স্থলশঙ্খ ও জলশঙ্খভেদে দুই প্রকার করা হইয়াছে।—ইতি কশ্চিৎ টীকাকারঃ।

বিষয় মনের ভিতর আসিয়া পড়ে আর সর্ব্বদাই নূতন নূতন প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু যাক্, যে প্রশ্নটা তুলিয়াছি, তাহার উপদ্রব আগে দূর করা যাক্। "শঙ্খকে মাটির উপর রাখা হয় না কেন?" কাষ্ঠের উপর, বা ধাতু-পাত্রের উপর রাখিলে দোষ হয় না, অথচ অনাবৃত মৃত্তিকার উপর রাখিলেই দোষ হয় কেন? শুনিয়াছি সিমেণ্ট করা মেজের উপর রাখিলেও নাকি দোষ হয়। ইহার অর্থ কি? ভূতলে বা অনাবৃত মেঝের উপর রাখিলে কি শঙ্খের অনাদর করা হয়? যিনি নির্ব্বিকার—যাঁহার নিকট আদর-অনাদর উভয়ই তুল্য—তাঁহার আবার অনাদর কি? তবে কি ইহার মধ্যেও একটা রূপক আছে? আছেই ত, এখন যে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। ইহার রূপকার্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করেন, তা দুই একদিনের জন্যই হউক, আর নিত্যনৈমিত্তিক রূপেই হউক, তাঁহাকে কখন ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে দিও না। তা তোমার অতিথি বা আশ্রিত ব্যক্তি যদি তোমার কোন সাংসারিক কার্য্যে সাহায্য করিতে না আসেন, যদি কেবল তাকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, যদি কেবল পূজা-উৎসবে নামিয়া আসিয়া, খানিকটা সোরগোল ও চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার শয্যাটি ভাল যায়গায় দিও, নতুবা বাতগ্রস্ত হইয়া যখন তিনি কোঁ কো করিতে থাকিবেন, তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরে তোমাকেই ডাক্তার ডাকিতে হইবে, অথচ অপযশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে শঙ্খ, তুমি চিরদিনই ঐশ্বর্য্যসূচক। তুমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে কোনও মহামূল্য সামগ্রী ছিলে। জানি না, তোমার ভিতর কি অপূর্ব্ব রত্ন নিহিত থাকিত। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, মুক্তাগর্ভ শুক্তি অপেক্ষাও তোমার মর্য্যাদা অধিক ছিল। মেঘদূতের যক্ষ আপনার গৃহদ্বার পদ্ম ও শঙ্খচিহ্নিত বলিয়া মেঘের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইলিয়াড-বর্ণিত "ডেমিগড্"-দিগের ন্যায় আমাদের যক্ষেরাও দেবতা ও মনুষ্যের মাঝামাঝি ছিলেন; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, কিন্নর, প্রভৃতি তাঁহাদিগের ন্যায় আরও কয়েকটি জাতি ছিল সত্য, কিন্তু যক্ষের ন্যায় ধনশালী জাতি আর কোনটিই ছিল না। তাঁহারা বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশের স্বর্ণবণিকদিগের ন্যায় ছিলেন; তাঁহাদিগের রথচাইল্ড কুবেরের নাম কে না শুনিয়াছেন? দেবতারা তাঁহার নিকট হইতে বিনা হ্যাণ্ডনোটে বা বন্ধকী খতে মাঝে মাঝে কোটী কোটী টাকা ধার লইতেন, এরূপ প্রমাণ পুরাণেও পাওয়া যায়। আজ কত শতাব্দী হইল, সে যক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্বেরা কাল্পনিক "মিথে" পরিণত হইয়াছেন; কিন্তু এখনও "যক্ষের ধন" প্রবাদটি রহিয়া গিয়াছে। এহেন ধনসম্পন্ন যক্ষ জাতির মধ্যে কালিদাসের যক্ষ বড় একটা নগণ্য ছিলেন না। তাঁহার বাটীর বর্ণনাটা শুনিলে, এত বড় তাজমহলটাকেও একটু ক্রীড়নক বলিয়া বোধ হয়। তাহার বাটীর তোরণদ্বারের উভয় পার্শ্বে মর্ম্মরফলকে পদ্ম ও শঙ্খ-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, ইহার অর্থ কি? পদ্মচিহ্ন যে ঐশ্বর্য্যসূচক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; কারণ, লক্ষ্মী কমলালয়া; কিন্তু শঙ্খ চিহ্নের অর্থ কি? শঙ্খও নিশ্চয় লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রমাণ স্বরূপ বলিতে পারি যে, এখনও লক্ষ্মীদেবীর চিত্রে শঙ্খ ও শঙ্খ জাতীয় জীবের কঙ্কালগুলি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বোধ হয়, অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও শঙ্খ রহস্যের কতকটা সমাধান হইতে পারে। শঙ্খ একটি প্রকাণ্ড সংখ্যা বিশেষ। উহা কোটী অর্ব্বুদ অপেক্ষাও অধিক। আমার মনে হয়, একটি সুলক্ষণসম্পন্ন শঙ্খের মূল্য তৎকালে কোটি কোটি মুদ্রারও অধিক ছিল। হয়ত অনেকের ধারণা ছিল যে, ঐরূপ ক্ষণজন্মা শঙ্খ যাহার বাটীতে থাকে, তাহার বাটীতে লক্ষ্মী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। *

শঙ্খের বিষয় যতই ভাবিয়া দেখি, ততই তাহাকে মহাত্মা বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা দধীচি যেরূপ দেবলোকের হিতার্থ আপনার অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন, শঙ্খও সেইরূপ নরলোকের হিতার্থ আপনার অস্থি প্রদান করিয়াছে। কারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, শঙ্খধ্বনি দ্বারা মনুষ্যের প্রধান শত্রু যে ব্যাধি-বীজাণু, তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু হে অর্ণবচারি, তোমার করাত কি ভীষণ! শুনিতে পাই, তাহা দ্বারা নাকি তুমি জাহাজের তলদেশ

---

* দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এখনও মহামূল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে

পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া দিতে পার; আবার সে করাতের দুই দিকের দাঁতগুলি নাকি এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তাহাতে আসিতেও কাটে যাইতেও কাটে! এই জন্যই কি আমরা দুষ্টা স্ত্রীলোককে শঙ্খিনী নামে অভিহিত করি? শঙ্খ শব্দের উত্তর স্ত্রীত্বাং 'ঈপ্' প্রত্যয় করিয়া যদি শঙ্খিনী শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে শঙ্খের সহিত শঙ্খিনী রমণীর আর অন্য কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে? শঙ্খিনী রমণী আপনার করাতের সাহায্যে উভয় কূলই বিদীর্ণ করিয়া থাকেন। একদিকে যেমন তিনি পিতৃকুলে গিয়া তিরস্কার করাতে ভাতৃজায়াদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেন, অপর দিকে সেইরূপ পতিকুলে আসিয়া মন্ত্রণা করাতে সহোদর দিগের সহিত পতির ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন বিদীর্ণ করেন এবং একদিকে যেরূপ পতিগৃহে আসিয়া অভিমান-করাতের সাহায্যে দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে নেকলেসাদি আদায় করিয়া থাকেন, সেইরূপ পিতৃগৃহে গিয়া মিষ্টবাক্য রূপ করাতের সাহায্যে বিধবা মাতার যা দু-দশ টাকা সম্বল থাকে, তাহাও হস্তগত করেন।

কিন্তু শঙ্খিনী রমণী কেবল শঙ্খের করাতটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অন্যান্য যে সকল অনন্যসাধারণ গুণ আছে, তাহার কিছু মাত্রও গ্রহণ করেন নাই। শঙ্খ গৃহে থাকিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী অচঞ্চলা থাকেন, আর শঙ্খিনী রমণী গৃহে আসিলে, তিনি অন্তর্হিতা হন; শঙ্খ অমঙ্গল দূর করেন, শঙ্খিনী তাহাকে আনয়ন করেন; শঙ্খ শান্তির প্রতিষ্ঠা করেন, শঙ্খিনী অশান্তির বীজ বপন করেন; শঙ্খ ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তা করেন, শঙ্খিনী তাহার অন্তরায় হন।

হে শঙ্খ! তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী এ জগতে আর কে আছে? তুমি নারায়ণের পাণিমুষ্টিতে এবং কমলার চরণ নিম্নে বর্ত্তমান, সুলক্ষণা রমণীর বাঁকুম করতলেও তুমি চিহ্নরূপে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, তুমি সুন্দরী রমণীর গ্রীবারও উপমাস্থল। যাহাদের পদনখরের তুলনায় চন্দ্রও গৌরবান্বিত, তাঁহাদের অমলধবল গ্রীবাও তোমার শোভার অনুকরণ করিবা থাকে। আবার তাঁহাদিগের রতন বলয়াদি-শোভিত প্রকোষ্ঠও তোমার স্থান। শঙ্খবলয় হাতে না থাকিলে সধবা হিন্দুললনার সকল শ্রীই অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু ইহাও তোমার সৌভাগ্যের শেষ সীমা নয়, —কারণ, যখন তাঁহারা তোমার মুখে আপনাদিগের বিম্বাধর সংস্থাপিত করিয়া জলমগ্না রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকেন, তখন যথার্থই মনে হয়—যে মরিয়া যদি পুনর্জন্ম থাকে, তবে যেন শঙ্খ জন্ম পরিগ্রহ করি।

অনিন্দিতা

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি এ.]

তোমার চরণে প্রভু সর্ব্বস্ব আমার
সপিয়া দিয়াছি—শুধু কলঙ্কের ভার
পারি নাই দিতে—সে যে অঙ্গের ভূষণ—
সে যে মোর নর্ম্ম সখী—বড়ই আপন!
এই কলঙ্কের রজঃ মলয়জ প্রায়
মাখি' মোর সর্ব্ব অঙ্গে যাই যমুনায়
গাগরি ভরিতে নাথ!—ধন্য বলে' মানি
এরূপ যৌবন মম, যবে কাণাকাণি
করে লোক পথে ঘাটে চাহি' মোর পানে
অপাঙ্গে,—ভ্রূকুটী করি' বাক্যবাণ হানে!
শুনিয়া তাদের সেই মিথ্যা তিরস্কার,
করি গর্ব্ব অনুভব; তুলিয়া ঝঙ্কার
মুখর নূপুরে মোর বাজায়ে কিঙ্কিণী
চলে' যাই লীলা ভরে—যেন বিজয়িনী!
রাধা বটে কলঙ্কিনী—তবু অনিন্দিতা—
তুমি তারে করিয়াছ বিশ্বের বন্দিতা!

মহানিশা

[অনুরূপা দেবী]

একরকম করিয়া সুখেদুঃখে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু শুধু দিন কাটিয়া গেলেই যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে হয় ত সৌদামিনী তাঁহার সেই পলাশডাঙ্গার ভাঙ্গা ঘরখানির মমতা কাটাইয়া বাহির হইতে রাজী হইতেনই না ; কোন প্রকারে দুঃখ ধান্দা করিয়া, জীবনের স্বল্পাবশেষ দিন কয়টা কাটাইয়াই দিতেন। যে শৃঙ্খল তাঁহার কর চরণ আঁটিয়া, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শান্তির অন্তরায় হইয়াছে, যাহার জন্য তাঁহার এমন যে প্রার্থিত মরণ, তাহার কথাই একদণ্ড চিন্তা করিবার সাহস হয় না, সেই অপর্ণার কথা ভাবিয়া এখানে আসিয়াও, তাঁহার এমন আশ্রয়ের মধ্যেও এতটুকু নিশ্চিন্তত। ঘটিল না। নিজের মনে যা ভাবনা-চিন্তা আছে, সেতো আছেই, তাভিন্ন পাড়ার পাচ জনের কল্যাণে সে চিন্তা যেন সময় সময় অসহ্য হইয়া উঠিতে থাকে। যে কেহ এতকাল পরে এই নাতনি দাদামহাশয় সংঘটিত কাহিনী শুনিয়া ব্যগ্র কৌতূহলে এ বাড়ীতে চাক্ষুষ দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসে, সেই অন্যান্য দুচারিটা খোঁচার সহিত আর একটাকে যোগ করিয়া যাইতে ভুল করে না।

হরিধন মুখুয্যের স্ত্রী গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচারশীলা স্ত্রীলোক। সকলেই ইঁহার বিবেচনা বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। ইনি প্রথম যেদিন অপর্ণাকে দর্শন করিলেন, বিস্ময়ে ইঁহার দুই চক্ষু ললাটমধ্যবর্ত্তী হইয়া উঠিল। গালে হাত দিয়া অতি কষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া কহিয়া উঠিলেন--"তা লোককে দুষবোই বা কি? এ মেয়ে দেখে কে না পাচ কথা কইতে ছাড়বে? তা হ্যা মা সৌদামিনি! এত বড় মেয়ে রেখে তোমার গলা দিয়ে জল 'উল্‌চে' কেমন করে মা?"

তাঁহার সর্ম্মভিব্যাহারিণী নন্দর মা ঠোঁট টিপিয়া বক্র হাসি হাসিলেন--"মেয়েটিকে বুঝি ঝিঙ্গে, শসার মতন বীজ রেখেচ, হ্যাঁগা সদু?"

বক্তাদের বলার ধরণে অভিমানিনী দুঃখিনীর বক্ষে অপমানের আঘাত বজ্রবলে গিয়া আঘাত করিলেও মুখে তাঁহার কোন তীব্র উত্তর বাহির হইল না। তিনি জানেন, এক্ষেত্রে এ পীড়ন, নিরপরাধের উপর অযথা নির্য্যাতন নহে, তিনি নিজেই তাঁহাদের এ গায়ের জ্বালার জন্য একান্ত অপরাধী। সত্যই তো এত বড় বেয়াড়া কাণ্ড ঘটিতে দেখিলে, পাচজনে কেন না পাচটা কথা বলিবে? সঙ্গত অসঙ্গত বলিবার অধিকার তো কেহ কাহারও নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না! হিন্দুর ঘরে মেয়ের বিবাহ না দিতে পারা যে মা বাপের মস্ত বড় অপরাধ। তা সে মা বাপের অন্ন জুটুক আর নাই জুটুক। দু'একদিন এমনি খোচা খাইয়া একদিন নিতান্ত তিক্তচিত্তে তিনি অবসর খুঁজিয়া সন্ধ্যার পর যখন তাঁহার মাতামহ একা বসিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন, তখন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত তাঁহার আসনের অনতিদূরে মাটি চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া তাঁহার প্রশ্নের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাধিকা প্রসন্নর এই অসময়ে তাহাকে এমনভাবে আসিয়া বসিতে দেখিয়া, মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটি অনুমান করিয়া লইতে অধিক বিলম্ব ঘটে নাই ; কিন্তু তাঁহার স্বভাব এমন নয় যে, তিনি নিজে সরল সোজা পথে চলিয়া অন্যকেও সেই পথে ডাকিয়া লইবেন। একবার যেন বিস্ময়ের ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার অন্য দিকে চাহিয়া, তিনি খুব নিবিষ্টভাবেই যেন মালাজপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টিতেও কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ পাইল না।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুর-ঘরের সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আরতির বাতাসা-প্রসাদ লইয়া পাচু-ভুলু প্রভৃতি শিশুর দল বিদায় লইয়াছে। রাত্রি শুক্লপক্ষের, অন্ধকার তাই তরল, এবং সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে চারিদিককার গাছপালা, কলাঝাড়, রুদ্ধদ্বার গৃহ এবং অনতিদূরবর্ত্তী ভগ্নাবস্থ জমিদারদের পুরাতন ইষ্টক প্রাসাদ সমুদয়ই স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল।

আকাশের গাঢ় শুভ্র মেঘগুলাকে কে যেন কোদাল দিয়া কোপাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই এ পাশে ওপাশের ফাঁক দিয়া ইতস্ততঃ ছিটানো বীজগুলির মত কতকগুলি সন্ধ্যা-তারা ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছে। রাধিকা প্রসন্নর একতলার ঘরের বাহিরে বাড়ীর পিছনে বেড়া ঘেরা খানিকটা বাগান। সেখানের একটা বাদাম গাছে দিনের বেলা কতকগুলা বাদুড়কে উর্দ্ধপদে ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যায়। বোধ করি, সেইগুলাই এখন ঝটপট করিয়া সাড়া দিতে দিতে উড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সৌদামিনী দেখিলেন, এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে অদ্ধবারেও হয় ত দাদা বাবুর মালাজপা সমাপ্ত হইবে না। তিনি একবার একটু নড়িয়া চড়িয়া আবার কিছুক্ষণ স্থির হইয়া তাঁহার জপভঙ্গের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তারপর বৈঠকখানার ঘড়িতে এক দুই করিয়া দশবার ঘণ্টা না পড়িয়া তাহার শেষ শব্দ অস্পষ্ট হইতে হইতে অন্তরের অশেষ শব্দতরঙ্গের মধ্যে মিলাইয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িল, এবং রান্নাঘর হইতে অপর্ণার ডাক শুনা গেল—"মা!"—তখন হতাশ হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, আপন হইতে মালাজপের মাঝখানে যে কোন একটা কথা 'খপ' করিয়া বলিয়া বসিবেন, সে রকম সাহস তাঁহার ভীরু চিত্তে আদৌ ছিল না। যদিও রাধিকাপ্রসন্নকে জপের সময় বাহিরের সহিত কতবার বৈষয়িক আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে, তবু তাঁহার সে ভরসা হইল না।

রাত্রের আহার্য্য ডুচারখানা গরম লুচি ও একটু দুধ আনিয়া অপর্ণা টাই এর নিকট নামাইয়া রাখিতেই রাধিকা প্রসন্ন 'কুঁড়ো জালি'র ভিতর মালা রক্ষা করিয়া আসনে নামিয়া বসিলেন ও একবার চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর মা কোথা রে অন্নপূর্ণা?"

"মা নিজের ঘরে; আপনি বুঝি আমায় চিরকাল ভুল নামেই ডাকবেন? আমার নাম তো অন্নপূর্ণা নয়—অপর্ণা।"

"আচ্ছা আচ্ছা, ডাকি যে এই কত না,—আবার এ নামে নয়, সে নামে! কেন অপর্ণার চেয়ে 'অন্নপূর্ণা' মন্দ শুনতে নাকি?"

অপর্ণা তাহার স্বভাবসিদ্ধ কলহাস্য সংকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল;—"নিজের জিনিষ মন্দ হলে বুঝি পরের ভালটি বদলে নিতে হয়? বেশ শেখাচ্ছেন তো? মাকে ডেকে দেবো?"—

"কিসের জন্য ডেকে দিবি? তোর মার সেই শুকনো চেহারা না দেখে গেলে কি আমার পেটে তোমার এই অপূর্ব্বসৃষ্ট বস্তুগুলি হজমের ব্যাঘাত করবে? যা তুই যা, আমি কিনা কারুকে গ্রাহ্য করি—না কারুকে চাই!"

"তা জানি; কে'ই বা না জানে।" বলিয়া অপর্ণা সরিয়া গেল, এবং গিয়া তখনি মাকে বিছানা হইতে উঠাইয়া পাঠাইয়া দিল। অনেকক্ষণ ঠায় বসিয়া থাকিয়া, সৌদামিনী দুর্ব্বল শরীরে কেশানুভব করিতেছিলেন, সেইজন্য ইহারই মধ্যে বিছানা লইতে হইয়াছিল।

সে দিন কিছু না বলিতে পারিলেও দুএকদিনের ভিতর একদিন অবসর বুঝিয়া কোন মতে চোককাণ বুজিয়া সৌদামিনী নিজের আবেদন দাদামহের দরবারে পেশ করিয়া বসিলেন। বলিতে তাঁহার রক্তাল্পতায় পাণ্ডুর মুখ যথাসম্ভব লাল দেখাইল এবং স্বর কণ্ঠ হইতে সহজেই অস্ফুট হইয়া নির্গত হইল। সে কোন দিন কাহারও উপরে জোর করিতে—আব্দার করিতে পায় নাই, তাহার হৃদয় অতি সহজেই ভীরু হইয়া পড়িয়াছে। সে আব্দার সহিবার লোক পাইলেই জবরদস্তি করিতে পারে না, কেন না তাহার সে শিক্ষাই হয় নাই। অতি মৃদু সংশয়জড়িত স্বরে কহিলেন "অপর্ণার বিয়ের জন্য বড়ই ভাবনায় পড়েছি। কি করে যে কি হবে তাতো ভেবেই পাই না।"

রাধিকাপ্রসন্ন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহজ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"তার জন্য আবার ভাবনা কি?" শুনিয়া সৌদামিনীর বর্ণহীন মুখে একটা আশার জ্যোতিঃ মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিতে গেল। দাদামহ তাঁহার কথাটা শেষ করিয়া ফেলিলেন,—"ওর বিয়ে হবে না।"

সৌদামিনীর উচ্ছ্বসিত চিত্ত অদ্ধপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সঙ্কোচে মরিয়া গেল। মৃদুস্বরে কহিলেন—"কিন্তু ওকে তো আর ঘরে রাখা যায় না; লোকেও চারিদিক থেকে নিন্দা করচে—।"

"বটে! তাহলে ওটাকে না হয় বাড়ী থেকে বার করেই দে না। লেঠা চুকে যাক।"

যাহার মনে আনন্দ নাই, বড় সহজে তাহার মুখে হাসি ফুটে না। বিশেষতঃ এ সকল আলোচনা সৌদামিনীর

পক্ষে মোটেই হাসিতামাসার জিনিস নয়। এমন অনেক সৌভাগ্যবতী জননী আছেন, যাঁহাদের ছেলেমেয়ের বিবাহ তাঁহাদের নিকট আমোদ ও উৎসবের বস্তু; কিন্তু সৌদামিনীর মেয়ের বিবাহ—প্রকৃত পক্ষে যথার্থ কন্যাদায়; ইহার ভিতর আনন্দ কোন খানেই নাই। এ সত্ত্বেও ঐ কথায় তাহাকে বাধ্য হইয়াও একটু হাসিতে হইল। তারপর বিষণ্ণ ম্লাননেত্র ধীরে ধীরে উঠাইয়া কাতর স্বরে কহিলেন—"আপনি একটু মনে করুন, তাহলেই সব হয়ে যাবে। বড় হয়েচে, এর পর যে আর কেউই ঘরে নিতে চাইবে না।"

"আমি!—আমি কি করবো?" রাধিকাপ্রসন্ন যেন আকাশ হইতে পতিত হইলেন।

বিজড়িত লজ্জায় মাথা নত করিয়া সৌদামিনী কোন মতে বলিয়া ফেলিলেন—"আপনি না করলে আর কে করবে? ওর আর কে আছে?"

"খেপেচ! আমি ও সব পারবো টারবো না বাপু, তা এককথায় বলে দিচ্চি। আঁা! এমন আশ্চর্য্য কথাও তো কখন শুনিনি! আঁা! বলে কি এরা! আমি! আমি কে ওর! মায়ের মাতামহ! আহা কি নিকট সম্বন্ধ গো! একেবারে পরমাত্মীয়!"

সৌদামিনী আর কোন কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। যতখানি বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত! বলিবার পর এখন নিজের শক্তিতে নিজেই বিস্ময় বোধ হইল যে, কেমন করিয়া এতটাই বা তাঁহার মুখে ফুটিয়াছিল!

রাধিকাপ্রসন্ন তাহার আর সাড়া শব্দ পর্য্যন্ত না পাইয়া, মুখ ফিরাইয়া, সেই ক্ষীণ স্তব্ধ মূর্ত্তির পানে কিছুক্ষণ এক প্রকার পরিহাস-প্রচ্ছন্ন, রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ক্ষণ পরে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন—"বেহারি।"

বিহারী বোধ করি, কাছাকাছিই কোথায় কি একটা কাজ করিতেছিল, এক ডাকেই সে সাড়া দিল। "আজ্ঞে যাই" বলিয়া জবাব দিয়া অল্প পরেই আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। "শোন একবার বেহারি! এতবড় মজার কথা তুমি আর কখন শুনেছ? ইনি আমায় এঁর মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করবার জন্য ধরেছেন। আমার কি ঐ ব্যবসায়? না মায়ের মাতামহ কাহারও বিয়ের কর্ত্তা হয়ে থাকে?"

বিহারীকে এতখানি ব্যাখ্যা করিয়া বলার বিশেষ আবশ্যক ছিল না; সে এ ঘরের চৌকাঠে পা দিয়াই সকল ব্যাপার বুঝিয়াছিল। করুণচক্ষে সে অপমানিত লজ্জায় বিবর্ণা সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া, একটু সাহসের সহিত কি যেন বলিবার চেষ্টা করিয়া আবার কি ভাবিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইল। দুবার কাশিয়া গলাটা ঝাড়িয়া লইল, তারপর মাথা চুলকাইয়া নীচু দিকে চোক করিয়া কহিল—"না, কিন্তু তাছাড়া"—"তোমার মুণ্ড! ভাল লোককে মধ্যস্থ মেনে ছিলাম! 'কিন্তু তাছাড়া'—কি আবার? হ্যাঁ; বিশ্ব-বহ্মাণ্ডে কেউ কখনও শুনেচে যে, মা'র মাতামহ কারু বিয়ে দিয়েচে! দিতে হয় তোমরা দাও না। ঘটক ডাকো, যা জানো সবই করো। আমায় বরং বিয়ের দিন নিমন্ত্রণ করে নিয়ো যেও, গরম গরম লুচি একপাত্তা খেয়ে আসবো এখন। আর একখানা পার্শীসাড়ি বড় জোর আইবড় ভাত পাঠিয়ে দেবো। বাস্!"

রাধিকাপ্রসন্ন যে বিধি-ব্যবস্থার বিধান করিয়া দিলেন, সৌদামিনী তাহা গ্রহণ না করিলেও বেহারি অসঙ্কোচে তাঁহার অনুজ্ঞাপালন করিতে বসিল। সে পরদিনই গ্রামের বাহিরে চলিয়া গেল এবং ঘটকপাড়ায় শ্রীদাম ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি বরের তালিকা লইয়া আসিয়া সৌদামিনীর সহিত কিছুক্ষণ বিচারবিতর্ক করিবার পর পুনশ্চ যখন সেই মূল্যবান সম্পত্তির হিসাবখানি প্রত্যর্পণ করিতে গেল, তখন সেই সঙ্গে একখানি হলদে তুলোটের লম্বা করিয়া পাকান জিনিষও লইয়া গিয়াছিল। সেখানি কন্যা-যাচাই করিবার প্রথম কষ্টি-পাথর—মেয়ের জন্মকোষ্ঠি। ইহাই মেয়েদের বিবাহ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বা বিয়ে পাশ করার প্রথম পরীক্ষা বা প্রবেশিকা। এখান হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তাহার পর ফার্ষ্ট আর্ট বা দৈহিক বর্ণ প্রভৃতির পরীক্ষা; তারপর সর্ব্বশেষ বা সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষা বা বিয়ে একজামিনটি হইতেছে—ঐ কন্যার পিতৃদত্ত যৌতুক-পরীক্ষা। এইটিতে পাশ হইতে বা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তখন বি'য়ে বা ব্যাচিলর অফ্ আর্টস্' অর্থাৎ কি না নৈপুণ্য সহকারে বরের কৌমার্য্য হইতে উত্তীর্ণ হওন, এবং কন্যাটির বিবাহিতা এই উপাধি লাভ ঘটে।

বরের তালিকায় অনেকগুলি অতুল্য-রত্নের সংবাদ লেখা ছিল। কিন্তু সে সকল দিকে চোক তুলিয়া তাকাইতে গেলেও, বোধ করি, ইংরাজ-বিবিদের দিকে তাকাইয়া থাকার ন্যায় তাঁহাদের সম্মানহানি করা হয়। অপর্ণার বরের দল পূর্ব্বের চেয়ে একধাপই না হয় উপরে উঠিয়াছে; না হয় মুহুরি গোমস্তা ছাড়াইয়া কেরাণি-ওভারসিয়ারই তাঁহাদের দল হউক। আর কতই হইবে? তাজা তাজা বি এ, এম. এ—যাহারা একদিন রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দো, অথবা রমেশচন্দ্র হইলেও হইতে পারে, সেই সকল বরের বাজারের শ্রেষ্ঠ রত্ন কি গরীবের মেয়ে অপর্ণার সহিত মালাবদল করিতে দাঁড়াইতে পারে? এ আশা করিতে যাওয়াই যে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা! মেয়ে সুন্দরী! হইলেই বা সুন্দরী? সৌন্দর্য্য লইয়া কি ধুইয়া খাওয়া যায়? এমন সুরূপা লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না কন্যা সংসারে সর্ব্বদা দেখা যায় না! বেশ, সর্ব্বদাই যখন দেখা যায় না তখন ক্বচিৎ দেখিয়াই বা লাভ কি? পাঁচ, সাত, দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া ফেলিলে, নিজেদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লক্ষ্মীশ্রী ঘরে আনিবে, কিন্তু 'ডোমের চুপড়ি ধোয়া' মেয়েটিকে তুগাছি 'কর' হাতে দিয়া, ঘরে তুলিলে, লক্ষ্মীর শ্রীটুকু বধূটির অঙ্গেই থাকিয়া যাইতে পারে কিন্তু সেটুকু কোন মতেই গৃহস্থালির মধ্যে নামিয়া আসিবে না বা ঘর করনার কোন লাভ-লোকসানে লাগিতে পারিবে না। অতএব এই অকেজো-জিনিষের চাইতে কাজের জিনিষ টাকাটাই সংসারের পক্ষে অধিক আবশ্যক এবং এই জিনিষটা যিনি যত বেশি দিতে সমর্থ, তাঁহার মেয়েটির জন্য নিলামের চড়া দরে তিনিই তত ভাল মালটি খরিদ করিতে অধিকারী। অপর্ণার মার যখন দিবার মত বড় যৌতুক নাই, তখন শুধু মেয়ের গায়ের রং বা মুখের বাহার দিয়া কেমন করিয়া তিনি একটি পাঁচ-সাত-দশ-হাজারি জামাই কিনিয়া আনিবেন?

তা সৌদামিনী নিজেও এ সংবাদে অজ্ঞ নহেন। তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তিনি সংসারের এ সকল খবর পূর্ব্বে বিশেষরূপেই পাইয়াছেন। বিহারীর এতখানি বয়স হইয়া গেলে কি হয়, সে তাহার এই উত্তীর্ণ প্রায় চল্লিশেও সংসারের 'হাল-চাল' যাহা না বুঝিয়াছিল, সৌদামিনী তাঁহার ত্রিশ-বত্রিশে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি অভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন। সেই বরেদের খাতাখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কোন একটি সবজজ-পুত্র বি. এ. কোথায়ও একটি রিসার্চ্চ-স্কলার-এ-মের সংবাদ চোকে পড়িতে থাকে, লোভ-কম্পিতস্বরে বিহারী অমনি বলিয়া উঠে, "ওই দেখ মা, এইটি দিব্যি হবে! এই রকম না হলে আমার অমন রাণীর মতন দিদিমণির সঙ্গে মানান হবে কেমন করে।" তখন সৌদামিনীর ঠোঁটের আগায় বড় দুঃখেই এক ফোঁটা তীব্র বিষাদের মলিন হাসি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। পাগল! বিহারীর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে! তাঁহার মেয়ের যোগ্য হইবে না! হায়রে! এ জগতে কি মানুষের কোন দাম আছে? না মানুষ লইয়া কেহ বিচার করে? তা যদি করিত, তাহা হইলে সে, যে তাঁহাকে অতবড় আশা দিয়া ছিল,—জীবনে সর্ব্ব প্রথম ও শেষ বারের জন্য সেই একবার মাত্র দুরাকাঙ্ক্ষার দুঃস্বপ্ন দেখাইয়াছিল,—সে এমন করিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিতে পারিত না! সেই যথেষ্ট হইয়াছে, সে শিক্ষার পর আবার মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারে? নিজেদের দাম বাড়াইতে চেষ্টিত হয়? না এমন বোকা কেহ পৃথিবীতে নাই।

কিন্তু যে বিহারী তাঁহার সকল ছোটখাট কথাগুলিকেও দেবতার আদেশের মত মানিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা মাথা পাতিয়া থাকে, আজ সে কিছুতেই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিল না। মা বলে কি! তাহার দিদিমণি যে কি অমূল্য রতন তা উনি কি বুঝিবেন? নিজের সন্তানকে কি কখন নিজে চিনিতে পারা যায়? তা যদি পারিতেন, তবে কি মা যশোদা ননীচোরা গোপালকে মন্থন দণ্ডে বাঁধিতে চাহিতেন? মনে মনে সেই তাহার অপূর্ব্বসৃষ্টি দিদিমণিকে রাজরাণীর পদে অভিষেক করিতে করিতে তুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বিহারী ঘটকঠাকুরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীদাম-ঠাকুর তখন একটি থেলো হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আরাম করিয়া ধূমপান করিতে করিতে কেমন করিয়া একটি কুঁজো মেয়েকে বস্ত্রে-অলঙ্কারে ঢাকা দিয়া, একটি বংশজ বরের বংশরক্ষার্থ চালান করিয়া দিবেন, সেই চিন্তায় তদ্গদ ছিলেন। চটিজুতার ফট ফট শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন।

"আরে কেও, সরকার মশাই যে! এসো এসো।—তারপর খবর কি?"—বিহারী দাওয়ার একদিকে তাহাকেই

প্রদত্ত একখানা ফাটা চটা জলচৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। খাতা এবং কোষ্ঠিখানি বাহির করিতে করিতে সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল —"এম. এ. পাশ ছেলেটিকেই আমরা পছন্দ করলাম। তেমন বড় লোক নয় বটে—তা হোক্, চলে যাবে। তা এই তো হলোগে এটা কার্ত্তিক মাস। অঘ্রাণ মাসে অবশ্যই বিয়ের ছটো একটা দিন থাকবেই; তা হলে কি বলে গে, হাঁ, ঐ অঘ্রাণ মাসেই একটি ভাল দিন দেখে বিয়েটি হয়ে যায়, এই আমাদের ইচ্ছা। তা আপনার এখানে পাঁজি আছে? একবার আনুন তো?"

শ্রীদামঘটক আজিকার লোক নহেন। ঘটকালি কাজ করিয়াই তাঁহার এই কোটা বালাখানা যা কিছু সবই। বিহারীর এই গম্ভীর মন্তব্য শুনিয়া তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু অর্থপূর্ণ হাস্য চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিহারীর মুখের সেই পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ ঐকান্তিকতার ভাবে সে হাসি উচ্চ হাস্যে পরিণত হইতে পারিল না। ঠাকুর-দেবতার সম্বন্ধে বিশ্বাসী ভক্ত যেমন করিয়া ভক্তি ও মাধুর্য্যের সহিত কথা কহে, বিহারীর মুখভাবে ও কণ্ঠস্বরে তাহারই পূর্ণাভাষ ছিল। ইহাকে অবহেলা করিতে গেলে, সে অপমান যেন নিজেরই গায়ে ফিরিয়া বাজে। তথাপি ভাবের মুখে ভাসিয়া গিয়া জাগ্রৎ সত্যকেও উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ তাহাতে কাব্য হইতে পারে, কিন্তু কাজ হয় না। কাজে কাজেই বিহারী যখন এই এম. এ-পাশকরা ছেলেটিকে তাহাদের তরফ হইতে চলনসই গোছ মনোনয়নের সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াই পরম নিশ্চিন্তভাবে বিবাহের দিন স্থির করিতে বসিয়া গেল, তখন ইহার যে আর একটি কঠিন দিক্—বাস্তব দিক্ তাহার চোখে পড়িতে বাকি আছে এবং সেইটিই ইহার আসল দিক্, এই সহজ কথাটুকু যে বুঝে নাই, তাহাকে চোকে আঙ্গুল দিয়া না বুঝাইয়া দিলেই বা চলে কেমন করিয়া?

শ্রীদাম-ঠাকুর হুঁকাটায় ছইটা বড় বড় টান দিয়া, সেটা নামাইয়া রাখিতে রাখিতে, তাঁহার সম্মুখস্থ গাম্ভীর্য্যের অনুকরণ চেষ্টা করিয়া কহিলেন—"কিন্তু জানই তো, ও ছেলেটির বাপের ধনুর্ভঙ্গ-পণ যে, দশ হাজারের একটি কড়ি কমেও তিনি ছেলের বউ ঘরে আনিবেন না।" বিহারী আপন মনে কি হিসাব করিতেছিল, এই কথাটা কাণে যাইতেও সে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিল, অর্থাৎ কিনা—তোমার মত এমন মূর্খ আর ভূ-ভারতে দ্বিতীয় নাই! কি তুমি তুচ্ছ কয়টা টাকার ভয় দেখাইতেছ? আমার হাতে যে গিনি আছে, তার কাছে দশ হাজার টাকার দাম কতটুকু? বিহারী কহিল,—নিতান্ত গর্ব্বের সহিতই কহিল—"আগে মেয়ে দেখেই যাইতে বলো—তবে না টাকার কথা!" মনে মনে বলিল - এমন আমাদের মেয়ে নয় যে, সে দেখিলে লোকে আর কোন অবান্তর কথা কহিতে পারিবে!"

শ্রীদাম-ঠাকুর মনে মনে মাথা নাড়িলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন—"তা বেশ তাই চেষ্টা করিব।" তা তাঁহার কিছু দোষ নাই, তিনি চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু—কি কিন্তু তা বোধ হয় অনেক কনের মা ও অনেক বরের বাপের জানাই আছে! রিসাচ-স্কলার দশ হাজারের বন্দোবস্ত না হইলে, ঘর ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে রাজী নহেন। ঘটক-মহাশয় মেয়ের অনেক করিয়া রূপবর্ণনা করায় কোন একটি দশ সহস্র-দাতার কন্যার ভবিষ্যৎ শ্বশুর-মহাশয় উত্তর করিয়াছিলেন—"বউ তো আর মাটির ঠাকুর নয় যে, প্রতিমা সাজিয়ে পূজা করিতে হবে! রূপের জন্য বেশী বায় নই। দেখুন কে টাকা দিতে পারিবে। মন্টাতোষের পড়ায় অনেক খরচা করিয়াছি, টাকা চাই।"

এই প্রথম আঘাতটা বিহারীর অক্ষুণ্ণ গর্ব্বের উপর বড় বেশী করিয়া ঘা দিয়াছিল! বি. এ.-পাশের নিকট সে নিজেই ওকালতি করিতে গেল কিন্তু সেখানেও জবাব বেশী মোলায়েম মনে হইল না। ছেলেটি বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ সন্তান, পিতা তাঁহার সমপদস্থগণের ন্যায় কিছু সঙ্গতিও করিতে ভুল করেন নাই। সাত, আট হাজারের কমে সেখানে পুত্র-বৎসলা-গৃহিণী কোন মতেই মেয়ে দেখিতে পাঠাইতে সম্মত নহেন। বধূ অবশ্য তিনি ডানাকাটা পরীই চান,—ডানা-খসা হইলে আরও একটু ভাল হয়; কারণ, তা না হইলে পিঠে ছইটা ডানার দাগ থাকিয়া গিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর একটু খুঁৎ করিতে পারে।

সাত—আট—হাজার? এত টাকাই বা কোথায়?

বিহারী জানিত—রাধিকাপ্রসন্ন এতগুলা টাকা পাত্রপক্ষকে দিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। তাঁহার অবশ্য টাকার দুঃখ নাই, দিলে যে না দিতে পারেন এমনও নয়। কিন্তু পণ দেওয়ার তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিরোধী। বিহারী চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, কুলীন নয়; শ্রোত্রীয়। তাহাদের শ্রেণীতে বরপণের মতই কন্যা-পণ প্রচলিত, তবে পণ এমন চড়া নয়। পাঁচ-সাত-শত টাকা হইলেই এই নিঃসঙ্গ বিহারীরই একটি পাঁচ সাত-বৎসরেরই বালিকা বধূ ঘরে আসিতে পারিত। কিন্তু এই কথা আজ পনেরো—কি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই ঘটক স্বয়ংই একদিন কর্ত্তার সাক্ষাতে তুলিয়াছিলেন, তখন এমনি বজ্রনির্ঘোষে তিনি সে আবেদনকে তীব্রতম ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ বিহারীর আশানন্দের শিশিরাভিষেকে ফুটনোন্মুখ মনোমুকুলটিও তৎক্ষণাৎ জন্মের মতই ভস্মীভূত হইয়া যায়। তারপরই কিছু আর বসন্তের অবসান হইয়া যায় নাই, কিন্তু সেই যে তাহার বিকাশোন্মুখ হৃদয় আকস্মিক বাধা ঝড়ে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে দ্বার আর মলয় মারুতের আহ্বানে বা কোকিলের ঝঙ্কারে মুক্ত হইল না। সেদিন হইতে সে স্বেচ্ছায় নাই হউক, ভীষ্মের মত কৌমার জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। এবং সে জন্য আজ পর্যান্ত তো তাহার মনে কোনরূপ অনুতাপও জাগে নাই। বরঞ্চ সে জানে সে ভালই কাটাইতেছে। কিন্তু আজ আবার তাহার স্মৃতির ভাণ্ডার উলটিয়া সেই পুরাতন দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে জল জল করিয়া উঠিতে লাগিল, এবং বেশ সুস্পষ্ট স্বরে চেঁচাইয়া বলিতে ছাড়িল না যে, সেই মানুষ কখনও এত বরপণ দিতে রাজী হইবেন না। এই সকল উজ্জ্বল রতনের আশা করা যথার্থই তাহার ধৃষ্টতা হইয়াছিল! বিহারী হঠাৎ যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল।

রাজধানী

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

আমার হৃদয় রাজ্য তোমার
প্রেমের ছিল রাজধানী,
সেথায় স্বর্ণ সিংহাসনে
বস্‌তে যেন রাজরাণী!
তুমি ত গেলে!—নাম্‌ল আঁধার—
উঠ্‌নু কেঁপে অন্তরে,
হৃদয় রাজ্য শ্মশান হ'ল,
কি জানি কার মন্তরে!
কাল-পারাবার সাম্‌নে পড়ে,
কালো জলে উঠ্‌ছে ঢেউ;
দিনের শেষে দাঁড়িয়ে ঘাটে,
সঙ্গে আমার নেইক কেউ
আজকে যদি থাকতে কাছে,
বস্‌তে হেসে হাল ধরে,
দিক্ হারানো আঁধার হ'তে
নিতে আমায় পার করে!
অজানাতে ভাসিয়ে তরী
চলে যেতাম বেশ জানি;
নূতন দেশে নূতন করে
গড়তে হৃদয় রাজধানী?

মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা *

[শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ রায়]

পুস্তকগত বঙ্গ-ভাষা বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ; সাধারণতঃ কথাবার্ত্তায় যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, এবং প্রত্যেক জেলার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যেরূপ পার্থক্য, পুস্তকগত ভাষায় এবং প্রচলিত কথায় (Colloquial language) ও স্থানবিশেষে উচ্চারণ ও স্বরের বিভিন্নতা আছে। এবং একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত; আমরা নিম্নে যথা-সম্ভব ঐরূপ বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত দিতে এবং তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্বিভাগে প্রচলিত ভাষাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। নিরক্ষর গ্রামালোক এবং কৃষকেরা যেরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন এবং যে ভাষায় গীতি, ছড়া, কবিতা প্রভৃতির রচনা করিয়া থাকেন, আমরা এই প্রবন্ধে কেবল সেই ভাষারই আলোচনা করিব।

মহারাজ বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশ সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; যথা রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, মিথিলা এবং বঙ্গ। তন্মধ্যে এই মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঢ় ও বাগড়ীর কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। বরেন্দ্র, মিথিলা ও বঙ্গের কোন অংশ এই জেলায় না থাকায় ঐ সকল বিভাগের আলোচনার কোন আবশ্যকতা নাই, সুতরাং তাহা পরিত্যক্ত হইল। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাসে বল্লালসেনের সময়ে "রাঢ়" ও "বাগড়ীর" যে সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। "রাঢ়—ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অন্যান্য রাজগণের অধিকার।" কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঢ়ের যে অংশ দৃষ্ট হয়, তাহার পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম এব দক্ষিণে বর্দ্ধমান।

"বাগড়ী" এই দেশ ত্রিকোণ, সমস্তই জল দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহাকে দ্বীপও বলিত; ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্ব্বে পদ্মা ও দক্ষিণে সমুদ্র, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় বাগড়ীর যে অংশ আছে, তাহার দক্ষিণে নদীয়া। বাগড়ী কথার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন—"বকেরি" কথা হইতে "বাগড়ী" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। "বকেরি" অর্থে "বক-চর,"—গঙ্গা নদীর যে পরিত্যক্ত স্থানে বক চরিত, তাহাকেই বকেরি বলিত। এই "বকেরি" এক্ষণে "বাগড়ী" রূপে পরিণত হইয়াছে।

কাহার কাহার মতে বাগড়ী প্রদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের "ব" দ্বীপাংশে জলঙ্গী ও মেঘনা নদীর অন্তর্নিহিত একটি প্রাচীন জনপদ, ইহার দক্ষিণে সমুদ্র। হিউএনসিয়াং এই স্থানকে সমতট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিক্রমপুর নগর এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। এক্ষণে বিক্রমপুর গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত, কিন্তু ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ দিক্ দিয়া উক্ত নদী প্রবাহিতা ছিল। কৃষ্ণনগর, মুরলী (যশোহর) ও বর্ত্তমান কলিকাতা এই প্রাচীন সমতট প্রদেশের অন্তর্গত।

আমাদের মতে "বাগড়ী" শব্দটা "বাকারী" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাগড়ী দেশটি একটা "ব"-দ্বীপ, যাহাকে ইংরাজীতে △ Delta বলে। উহা দেখিতে গ্রীক্ অক্ষর △ 'ডেল্টা'র ন্যায়। "ব"এর ন্যায় আকার যার সে 'ব'-আকারী, সন্ধি করিয়া বাকারী হইয়াছে; তারপর কথোপকথনের ভাষায় "বাকরী"

* [কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনে (Literary Conference) পঠিত।]

পশ্চিম-রাঢ়	পূর্ব্বরাঢ়	বাগ্‌ড়ী	পুস্তক-গত বাঙ্গালা
হামি	আম্হি	আমি	আমি
হামাকে, মোকে	আম্হাকে	আমাকে	আমাকে
তুম্হি	তুমি	তুমি	তুমি
তুম্হাকে	তুমাকে	তুমাকে	তোমাকে
ছে (উচ্চারণ)	ছে (উচ্চারণ)	সে	সে
কহিছ	বুল্‌ছো	বুল্‌ছো	বলিতেছ বা কহিতেছ
যেছো	যেছো	যাইচ	যাচ্ছ, বা যাইতেছ
গেল্‌ছিলা	গিয়্যাছিলা বা যেয়্যাছিলা	যেল্‌ছিলা যেয়্যাছিলা	গিয়াছিলা
কতি	কতি কুন্‌ঠিঁয়ে	কতি, কুণ্ঠে,	কোথায়
গাহন	ঘাটা	পথ	পথ
ওসারা	ওসারা	পিঁড়া	বারান্দা
আগীন্না	আগ্‌নে	আগ্‌নে, আঙ্গনে	আঙ্গিনা
লক্ষ্যাং	মতন	মুতন	মত
হামারঘের, মোরঘের	হামারদের	আমাধেরে	আমাদিগকে।
লাছ	নাছ	নাছ, বাটীর সম্মুখীন স্থান	বাটীর সম্মুখীন স্থান বা পথ।
মাছা	মাছ	মাছ	মৎস্য।
বিকা	বিকা	বড্‌ডা	বড
ব্যাঝিল্	বুঝিন্	বুজিন্	বুঝি
তাঁদোড়	ত্যাদড়	কন্না, দুষ্টু	দুষ্ট
সান	ছান	সিয়ান্, স্যান্	স্নান
দোহন	দুধাল্	দুধাল্	দুগ্ধবতী
মেয়্যা	সী	চী	স্ত্রী।
ভ্যাংরা	খাচ্‌রা	খাচ্‌ড়া	দুশ্চরিত্র।
চোঁহা	চোঁহা	চুম্যা	চুমা, চুম্বন
চিক্যাস্	চিক্যাস্	চিক্যাস	আলো
গোঢ়া	গোঢ়া	গাঢ়্যা	গর্ত্ত
রোক, এঘে	কুশুর, কুশাইর	আক্, কশুর	ইক্ষু

পশ্চিম-রাঢ়	পূর্ব্বরাঢ়	বাগ্‌ড়ী	পুস্তক-গত বঙ্গভাষা
ওঝা	রোঝা	রোঝা ও ওঝা	কবিরাজ—
গুধ্যা	ছাইলাবা গুধ্যা	গোধা, ছেল্যা	ছেলে
গুধী	ছাইলা	গুধী, মেয়্যা	মেয়ে
ওটে	ওটে	ওবী বা ওরীয়ে	স্ত্রীলোকের সম্বোধন বিশেষ, ওলো
গাজর	গাজল্	গাজল্, বাদল	বাদলা বা বর্ষা
এঁওরে	এওরে	এদিক্	এদিকে
ঔরে	ঔরে	উদিক্	ওদিকে
সরম্	সরম্	লজ্জ্যা	লজ্জা
ডর	ডর	ভয়, ডর	ভয়
ওখনি	ওখ্‌নি	ওখ্‌নি, পরে	ভবিষ্যতে
ভোইড্	পা,	পা	পা বা পদ
পোহাতে	পোহাতে, শোন কালে	বিহানে, বড্‌ভ্যানে	প্রাতঃকালে
ছেন্যা	ছেলা	ছেলা	ছেলে
ওতাল্	ওতাইল্	উরালী	অপদার্থ
লিতুই	লিথুই	নিত্তি	নিত্য, রোজ, প্রত্যহ

কতকগুলি বিশেষ উচ্চারণ-প্রণালী :—

(ক) রাঢ় আঞ্চলে “শ” ও “স” এর স্থানে প্রায়শঃ “স” এর সংস্কৃত উচ্চারণ “ছ” (১) উচ্চারণ করিয়া থাকে। “বোছেছিচ্” অর্থাৎ “বসেছিস্”, “ছিথানে দিবার বালিছ নাই” অর্থাৎ সিথানে দিবার বালিস নাই। “ছামছুন্দর ঠাকুর” অর্থাৎ “শ্যামসুন্দর ঠাকুর”।

(খ) কতকগুলি শব্দের অন্তস্থ “য” এর স্থানে “ই”, অন্ত্য “আ” কারের ও “এ”কারের স্থানে য-ফলা-আকার

(১) “স” এর উচ্চারণ “ছ” বলিলেও প্রকৃত উচ্চারণ হয় না। সংস্কৃত ভাষায় “থ” এর যেরূপ উচ্চারণ, এখানে তাহাই হইবে। পাছে লোকে “স” এর ন্যায় উচ্চারণ করে, এই ভয়ে আমরা উহার উচ্চারণ “ছ” এর মত লিখিলাম।

ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা :—কল্যা (কুলা), বুন্যা, (বুনো), বিহ্যা (বিয়ে), বুঢ়্যা (বুড়া), তুল্যা (তুলা)।

(গ) "ড়" স্থানে "ঢ়"; যথা বুঢ়্যা (বুড়া), কুঢ়্যা (কুড়ে), ইত্যাদি।

(ঘ) কতকগুলি অকারান্ত ক্রিয়াপদের "অ" কার স্থানে "উ"-কার ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা :—বুল (বল) বুলছি (বল্‌ছি) বুল্‌বো (বল্‌ব) ইত্যাদি।

(ঙ) "ও" কারযুক্ত ঘ ক্রিয়াপদের "ও"-কার স্থানে" "উ" কার ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা :—বুঝ (বোঝ), চুষ (চোষ), পুষ (পোষ), ইত্যাদি।

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্তভাগে "ই" কার ও অনুস্বার সংযোগ করিয়া থাকে। যথা :—করি‍ং (করিয়া), খাইং (খাইয়া) ডুবিং (ডুবিয়া) বসিং (বসিয়া) ইত্যাদি। যথা রাম গাছতলায় বসিং গল্প করছিল। চিক্যাস্ ডুবিং গ্যাল হামরাও ঘরকে গেলাম ইত্যাদি। রাম গাছ তলায় বসিয়া গল্প করিতেছিল, সূর্য্য ও ডুবে গেল, আমরাও ঘরে গেলাম।

(ছ) কতকগুলি ক্রিয়াপদের ভূতকালে প্রথম বর্ণের পরে একটি হসন্ত "ল" কারের আগম করিয়া থাকে। যথা : তুমাকে জ্বর হোলছিল? অর্থাৎ তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ইত্যাদি।

(জ) কতকগুলি স্বরাদ্য বিশেষ্য পদের স্বরবর্ণের স্থানে "র" উচ্চারণ করিয়া থাকে। যথা রাম (আম) বা আব। রুকীল অর্থাৎ (উকীল)।

(ঝ) কতকগুলি বিশেষ্য পদের আদ্য "র" কারের স্থানে "অ"-কার উচ্চারণ করিয়া থাকে। যথা :—আড়িরে (রাড়িরে) আসিক—লোক (রসিক লোক) ইত্যাদি।

তার ভালবাসা

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

(সিন্ধু মিশ্র)

সে আমায় কতই ভালবাসে!
এই, সুখের বেলা কেঁদেই আকুল,
দুখের বেলা হাসে কাশে!
পথের মাঝে পড়ে গেলে,
গড়িয়ে দেয় বিষম ঠেলে,
টেনে তোলা তো দূরের কথা—
বুকের ওপর চেপে বসে!
অথই জলে ডুবে গেলে,
সে যে বাঁচে মরণ হলে,
জলে, ঝাঁপ দেয়াও তো দূরের কথা—
পারে বসে মুচকি হাসে!
ওরে, গোরুর পিছে ব্যাঘ্র যেমন,
তেমনি সাথে সাথে গমন,
শেষে, ঘাড়টি ভাঙে বাগে পেলে,
সাবাড় করে এক নিশ্বাসে!

পূর্ণচন্দ্র ও প্রদীপ

[শ্রীগণেশচন্দ্র রায়]

পূর্ণচন্দ্র কহিল প্রদীপে—জ্যোৎস্না প্রভাবে ম্লান—
চেয়ে দেখ্ ওরে মর্ত্ত আমার উজল কান্তিখান্।
বিধাতার এই নির্ম্মিত কায় ভুবন উজলি হাসে,
ক্ষুদ্র মানব নির্ম্মিত তুই ম্লান মম পরকাশে।"
হাসিয়া কহিছে প্রদীপ তাহারে,—"বলিয়াছ ঠিক ভালো,
তোমার প্রভায় হয় বটে ভাই নিখিল ভুবন আলো।
কিন্তু যখন গগনে তোমার দীপ্তি পায় না প্রভা,
তখন প্রদীপ মানবের ঘরে উজ্জ্বল পায় শোভা!"

ঘড়ি ও মানুষ

[শ্রীমধুসূদন ঘোষাল]

ঘড়ি বলে "মমতুল্য শকতি কাহার?
শ্রেষ্ঠ জীব নরগণ অধীন আমার।
উঠে বসে করে কাজ আমার আজ্ঞায়"
বলে নর "জন্ম তব মোদের কৃপায়।"

উন্মাদ ও প্রতিভা

[শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত]

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত

আলোকের সহিত ছায়ার যে সম্বন্ধ, প্রতিভার সহিত উন্মাদেরও সেই সম্বন্ধ। মনে হয়, গুণ বিশেষের উৎকর্ষই প্রতিভা ও অপকর্ষই উন্মাদের লক্ষণ,—উভয়ের মধ্যেই যে কোনও একটি মনোবৃত্তির আধিক্য বর্ত্তমান। সুতরাং, উভয়ের মধ্যে একপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক;—উন্মাদ ও বোধশক্তিহীনত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,—এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে বোধশক্তিহীনত্ব বা জড়বুদ্ধি (Idiocy) এবং কোন মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যে উন্মাদ (Insanity) বা পাগলামি প্রকাশ পায়। সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাঃ হলাণ্ডর (Dr. B. Hollander, M. D.) বলেন—"Idiocy is due to developmental arrest. Insanity is only an exaggeration of some of the mental functions." অর্থাৎ বোধশক্তিহীনতা বা জড়বুদ্ধির বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ-রোধ, আর মাত্র কয়েকটি মনোবৃত্তির বাহুল্য বা অতি বিকাশই উন্মাদ।

প্রতিভাও অনেকটা পাগলের মত। প্রতিভার ব্যাখ্যায় ডাক্তার হলণ্ডার বলেন,—"Men possessing first rate talents of a certain order are sometimes perfectly insignificant in every other. Genius is in well nigh every instance partial, and limited to the exaltation of a few mental powers." * —অর্থাৎ, সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর কয়েকটি বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রায়ই কোনও কোনও বিশেষ বিষয়ে তাহাদের স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু অন্য বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করেন। মনুষ্যমাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন; একজনের মানসিক শক্তি অন্যের সমান নহে। কাহারও স্মৃতিশক্তি অতীব বিস্ময়প্রদ, কিন্তু হয়ত অপরাপর বিষয়ে সে অত্যন্ত হীন; কাহারও বুদ্ধিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ কিন্তু মেধা আদৌ নাই। কাহারও বা কেবল উদ্ভাবিনী-শক্তিই প্রবলা, কাহারও বা সঙ্গীত-শক্তি অপূর্ব্ব; কিন্তু তাহাদের অন্যান্য শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রতিভা এক এক শ্রেণীর কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য অনুসারে বিষয়-বিশেষেই বিকাশ পাইয়া থাকে।

কোন একপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই যখন উন্মাদ ও প্রতিভার পরিচায়ক, তখন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যথাযথ পথে উক্ত মনোবৃত্তির পরিচালনাই প্রতিভার নিদ্দেশক। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রতিভাবান্

* "MENTAL FUNCTIONS OF THE BRAIN by Dr. B. Hollander, M. D."—দ্রষ্টব্য।

লোকেরও কোন বিষয়ে একটু না একটু পাগলামির ছিট্ আছে! জনসন্, কাণ্ট, মলিয়ার, শেলী প্রভৃতি মনস্বিগণ সকলেই এক এক প্রকার বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন। বিথোভেন্, কোলরিজ, মিল্, নিউটন্, পো, সোপেনহর প্রভৃতি মহাত্মগণ সর্ব্বদাই একপ্রকার বিষাদখিন্নতা অনুভব করিতেন। বার্ক, পাস্কাল, সুইফ্ট্, কীটস্, বেকন, [illegible] আরেগুন, নেপোলিয়ান্, ফ্যারাডে, মর, ডেকার্টে, [illegible], মেণ্ডেলসন্, পোপ, সক্রেটিস্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মধ্যে মধ্যে চিত্তবৈলক্ষণ্য ঘটিত।

অতএব, দেখা যাইতেছে, প্রতিভা থাকিলেই কোন না কোন বিষয়ে একটু পাগলের মত ঝোঁক থাকিবে। কিন্তু পাগলামির ঝোঁক থাকিলেই যে প্রতিভার বিকাশ হইবে, তাহা নহে। বস্তুতঃ, একটু ভাবিয়া দেখিলে, প্রতিভা ও উন্মাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা অলীক বলিয়া বোধ হয় না।

মানবচরিত্র নির্ণয়ের জন্য হিন্দু শাস্ত্রে নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। আর্য্যঋষিগণ মানবের জন্ম সময়ে নভোমণ্ডলে গ্রহদিগের সংস্থান হইতে প্রকৃতি নির্ণয়ের নানা সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি তাঁহাদের রচিত ফলিত জ্যোতিষের অন্তর্গত। চরিত্রাঙ্কনের বিদ্যার মধ্যে ফলিত জ্যোতিষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বর্গীয় ডাক্তার [illegible] গার্নেট ফলিত-জ্যোতিষের আলোচনায় আর্য্যঋষিদিগের নিয়মগুলির সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন লোকের জন্ম সময়ের গ্রহসংস্থান সূচিত ফলের সহিত তাহার বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তিসমূহের সম্যক্ আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার মনোবৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

কথাটা ঠিক, কি না পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, পরীক্ষায় ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইলে, ইহা যে সমগ্র মানবসমাজের বিশেষ হিতকর হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশুদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা উপলব্ধি হইবে।

মানবজীবনের উপর গ্রহসমূহের যে একটা স্বাভাবিক প্রভাব সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন এই পৃথিবীই তাহাদিগের আকর্ষণের বশীভূত এবং বৃক্ষাদি স্থাবরজঙ্গম পদার্থ যখন তাহাদিগের প্রভাবে বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের প্রভাব যে মানব জাতির উপরে নাই, একথা বলা চলে না। সুতরাং, বিনা পরীক্ষায় আর্য্যঋষিগণ প্রণীত ফলিত জ্যোতিষের উপর অশ্রদ্ধা করা অযৌক্তিক ও অন্যায়। কারণ, যদি এই শাস্ত্র সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা গুরুতর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আর নাই।

গ্রহসমূহের প্রভাব দেখিয়া মানব প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, যে যে গ্রহ মন বা বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। আর্য্যঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, "মনঃ প্রসাদকারকশ্চন্দ্রঃ। মতিপ্রতিভাপ্রজ্ঞাবেদাস্ত্রবিদ্যাকারকো বুধঃ।"

—অর্থাৎ, চন্দ্রের আধিপত্য মনের উপর এবং বুধের আধিপত্য বুদ্ধিবৃত্তির উপর। সুতরাং জাতকের জন্মকালে চন্দ্র এবং বুধ গ্রহের সংস্থান দেখিয়াই আমাদিগকে জাতকের ভাবী জীবনের মন ও বুদ্ধির প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিয়া থাকেন যে, মঙ্গল বা শনি গ্রহ, বুধ বা চন্দ্রের সহিত এক রাশ্যংশে বা সপ্তভাস্করে অর্থাৎ পরস্পর সপ্তমরাশিতে, অথবা উহাদের যে কোন একটি অবস্থিত স্থান হইতে চতুর্থ বা দশম রাশির সম রাশ্যংশে বা তাহার সন্নিকটস্থ অংশে অবস্থিত হইলে কোন গুণের অত্যধিক আতিশয্য বা মানসিক বৈলক্ষণ্য সূচিত করে।

গ্রহদিগের সংস্থান যে, রাশিচক্র হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সমস্ত রাশিচক্র দ্বাদশভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ আবার ৩০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং এক রাশ্যংশ অর্থে একরাশির সমঅংশে সংস্থান, যেমন নিম্নের চিত্রে মঙ্গল এবং বুধ মেষ রাশির ৫ অংশে অবস্থিত। সপ্তভাবে অর্থাৎ একরাশি হইতে তাহার সপ্তমরাশির সমঅংশে অবস্থিতি বুঝায়, যেমন মঙ্গল মেষ রাশির ৫ অংশে ও চন্দ্র তুলা রাশির ৫ অংশে অবস্থিত। প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশ বলিয়া উহাদের পার্থক্য ১৮০ অংশ হইল। কোন রাশির কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে উক্ত রাশি হইতে চতুর্থ বা দশম রাশির সম রাশ্যংশের ৯০ অংশ ব্যবধান। যেমন মঙ্গল—মেষ রাশির

৫ অংশে অবস্থিত; উক্ত স্থান হইতে ৪র্থ ও দশম রাশি যথাক্রমে কর্কট ও মকর রাশি এবং কর্কটের ও মকরের ৫ অংশ মঙ্গলের অবস্থিতি-স্থান হইতে ৯০ অংশ ব্যবধান; যথা বৃহস্পতি কর্কটের ৫ অংশে এবং রবি মকরের ৫ অংশে অবস্থিত, ইহার উভয়েই মঙ্গল, বুধ ও চন্দ্র হইতে ৯০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত এবং ইহাদের পরস্পরের ব্যবধান ১৮০ অংশ।
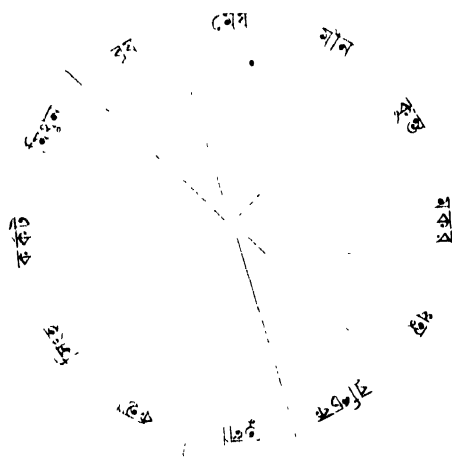
নীলকণ্ঠ প্রভৃতি তাজিক গ্রন্থকারেরা উক্তপ্রকার ব্যবধানকে গ্রহগণের একপ্রকার দৃষ্টি কহিয়াছেন। চতুর্থ ও দশমস্থানের দৃষ্টির নাম গুপ্তবৈর, সপ্তম ও অবস্থিত স্থানের দৃষ্টির নাম প্রত্যক্ষবৈর। ইহা ছাড়া তাজিকমতে আরও দুইপ্রকার দৃষ্টি আছে, প্রত্যক্ষস্নেহ ও গুপ্তস্নেহ দৃষ্টি। যে গ্রহ যে রাশিতে থাকে, সেই স্থান হইতে পঞ্চম ও নবমে প্রত্যক্ষ স্নেহ-দৃষ্টি করে; এবং তৃতীয় ও একাদশ স্থানে যে দৃষ্টি, তাহার নাম গুপ্তস্নেহ দৃষ্টি। চিত্রে মঙ্গল ও বুধের সহিত শুক্র ও শনির গুপ্তস্নেহদৃষ্টি, এবং শনির সহিত চন্দ্রের প্রত্যক্ষ স্নেহদৃষ্টি আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য—উভয় গ্রহের পরস্পর দ্বাদশাংশের মধ্যে উক্ত দৃষ্টিসমূহ কল্পনীয়। যেমন, মঙ্গল যদি মেষ রাশির ৫ অংশে না থাকিয়া মেষ রাশির ১২ অংশে থাকিত, তাহা হইলেও উক্ত দৃষ্টিসমূহ ফলপ্রদ হইত।

উদাহরণ-স্বরূপ, নিম্নে কয়েকটি উন্মাদ রাজার জন্ম দিবসে বুধ, চন্দ্র, শনি ও মঙ্গলের রাশিচক্রে অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইল।

রুষিয়ার সম্রাট পল্

বুধ—কন্যা ১৬ অংশ।

চন্দ্র—মীন ২১ "

শনি—ধনু ২১ "

তুরস্কের সুলতান পঞ্চম মুরাদ

বুধ—কন্যা ৫ অংশ।

শনি—বিছা ২৭ "

সুইডেনের রাজা চতুর্থ গষ্টেভস্

চন্দ্র—মীন ৩ অংশ।

মঙ্গল—কন্যা ১ অংশ।

অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ্

বুধ—মেষ ২০ অংশ।

শনি—" ১৫ "

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ

বুধ—মিথুন ৬ অংশ।

চন্দ্র—ধনু ২১ "

শনি—মিথুন ৮ "

মঙ্গল—মীন ১৯ "

স্পেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্

বুধ বিছা ৭ অংশ।

শনি—" ৮ "

ইহাদের প্রত্যেকটিতেই দৃষ্ট হইবে যে, বুধ বা চন্দ্র, শনি ও মঙ্গল হইতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী দূর ব্যবধানে অবস্থিত।

পূর্ব্বে আমরা কেবল শনি ও মঙ্গলের বৈরদৃষ্টি হেতু মানসিক বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে শনি ও মঙ্গল কুগ্রহ, সুতরাং তাহাদের বৈরদৃষ্টি দ্বারা মানসিক বৈলক্ষণ্য সম্ভব। নবাবিষ্কৃত য়ুরেনস গ্রহকে আধুনিক জ্যোতিষীরা কুগ্রহ বলিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত গ্রহেরও শনি ও মঙ্গলের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সকল মানসিক বৈলক্ষণ্যের পরিচায়ক।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা কয়েকটি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্মদিবসের উক্তরূপ গ্রহসংস্থান উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের সকলেরই বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির লোপ পাইয়াছিল। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

কবি মূর

বুধ—মেষ ২৯ অংশ।

চন্দ্র—তুলা ২৯ "

শনি—বিছা ৪ "

মঙ্গল—তুলা ২৭ "

সুইফট্

বুধ—ধনু ২১ অংশ।

চন্দ্র কন্যা ২১"

মঙ্গল—কন্যা ২১"

বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে

বুধ—তুলা ১ অংশ।

চন্দ্র—কর্কট ৪ "

শনি—মীন ১৮ "

কেবল উন্মাদ নহে, যে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্মদিনে উক্ত প্রকারে চন্দ্র ও বুধ গ্রহের সহিত মঙ্গল, শনি ও নবাবিষ্কৃত য়ুরেনসের দৃষ্টি বা ব্যবধান পরিলক্ষিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

চন্দ্র -- সিংহ ২১ অংশ।
বুধ --- মীন ৬ "
মঙ্গল – মকর ৭ "
শনি -- বিছা ২১ "
য়ুরেনস্ ধনু ১৫ "

স্বামী বিবেকানন্দ।

চন্দ্র --- কন্যা ৯১ অংশ।
বুধ --- মকর ১৪ "
শনি — কন্যা ১৫ "
মঙ্গল -- মেষ ৮ "
য়ুরেনস্ --- বৃষ ২৭ "

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

রবি — কুম্ভ ৮
চন্দ্র — " ২১
বুধ — কুম্ভ ১৫
শুক্র — মীন ৮
মঙ্গল --- মকর ২১
বৃহঃ — মিথুন ১৪
শনি — তুলা ১৩
য়ুরেনস্ — কুম্ভ ৮

কেশবচন্দ্র সেন
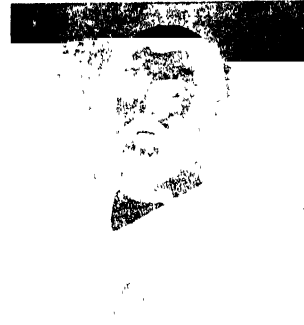
চন্দ্র — বুধ ২ অংশ।
বুধ — বিছা ১৫ "
মঙ্গল — সিংহ ১৭ "
শনি — বিছা ১১ "
য়ুরেনস্ — কুম্ভ ১৮ "

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

চন্দ্র বৃষ ৮ অংশ।
বুধ— কন্যা ৮ ”
মঙ্গল— তুলা ১২ ”
শনি —মীন ২১ ”
য়ুরেনস্— ধনু ৫ ”
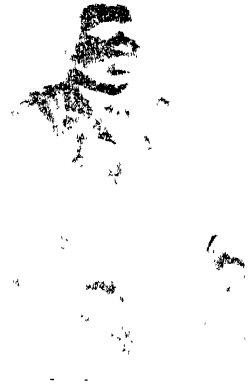
বহুভাষাতত্ত্ববিদ্ হরিনাথ দে।

চন্দ্র কন্যা [illegible] অং
বুধ— সিংহ ২০
মঙ্গল — কুম্ভ ২৮
শনি ” ২৯
য়ুরেনস্ — সিংহ ৫

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

চন্দ্র—বিছা ১৭ অংশ।
বুধ—কুম্ভ ২৩ ”
মঙ্গল—সিংহ ১২ ”
শনি—মেষ ২ ”
য়ুরেনস্—ধনু ১৬ ”

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
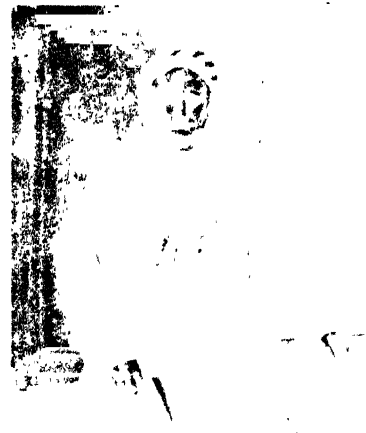
চন্দ্র—সিংহ ১৯ অংশ।
বুধ—বৃষ ২৮ ”
মঙ্গল—বৃষ ১৮ ”
শনি—তুলা ২৩ ”
য়ুরেনস্—কুম্ভ ২২ ”

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

চন্দ্র—বিছা ১৩ অংশ। বুধ—মকর ২৯ অংশ।
মঙ্গল—কন্যা ২৯ " শনি—মেষ ২৭ "
য়ুরেনস্—ধনু ২৩ "

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্র—মকর ৫ অংশ। বুধ—মেষ ২৫ অংশ।
মঙ্গল—মীন ২৬ " শনি—বিছা ৭ "
য়ুরেনস—কন্যা ২১ "

নবীনচন্দ্র সেন।

চন্দ্র—বিছা ২৪ অংশ
বুধ মকর ২৬ "
মঙ্গল—ধনু ১০ "
শনি—কুম্ভ ১২ "
য়ুরেনস্—মীন ২১ "

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্র—মীন ১৮ অংশ। বুধ—মেষ ৯ অংশ।
মঙ্গল—মিথুন ২ " শনি—সিংহ ১২ "
[illegible] "

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তৌফি।

চন্দ্র—মকর ২১ অংশ।
বুধ—ধনু ১৮ „
মঙ্গল—কর্কট ১৫ „
শনি—মেষ ৭ „
য়ুরেনস্—„ ১১ „

শ্রীযুক্ত ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ।

চন্দ্র—কন্যা ২৯ অংশ।
বুধ—ধনু ২১ „
মঙ্গল—মীন ১১ „
শনি—মকর ২৫ „
য়ুরেনস্—মীন ১৬ „

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার।

চন্দ্র—মিথুন ১৪ অংশ।
বুধ—বিছা ৬ „
মঙ্গল—তুলা ১৯ „
শনি—কন্যা ১৬ „
য়ুরেনস—মকর ২৮ „

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়

চন্দ্র—বৃষ ১৭ অংশ।
বুধ—কর্কট ৫ „
মঙ্গল—„ ২৭ „
শনি—সিংহ ১৮ „
য়ুরেনস—বৃষ ২৫ „

উপরে বিভিন্ন বিভিন্ন বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচায়ক প্রতিভাবান্ মহাত্মগণের জন্মদিবসের গ্রহসংস্থান প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, বুধ ও চন্দ্র উভয়ের মধ্যে অথবা উহাদের সহিত অন্য কোন গ্রহের পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট দূর ব্যবধান পরিলক্ষিত হইবে। ইহার দ্বারা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিয়মেরই সত্যতা সূচিত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, কি কারণে এই প্রকার গ্রহ দৃষ্টি হইতে কতকগুলি লোক উন্মাদ এবং কতকগুলিই বা প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া থাকে? প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে; তবে মনে হয়, বংশানুক্রমিক বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের উপর গ্রহদৃষ্টির প্রভাবে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির স্থলে প্রতিভা এবং অপকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্মাদ সূচিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বৈর ও স্নেহ দৃষ্টি উভয়ের মধ্যে বৈরদৃষ্টি বিশেষ বলবান; এই জন্যই বোধ হয়, বৈরদৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য ও তজ্জন্য কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যও বিশেষভাবে প্রকটিত হয় এবং যেরূপ ক্ষেত্রের উৎকর্ষাপকর্ষের উপর বীজ হইতে শস্যের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে, সেইরূপ বংশানুক্রমিক মনোবৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষের উপর একই প্রকার গ্রহদৃষ্টি হইতে প্রতিভা ও উন্মাদলক্ষণ নির্ভর করে। কিন্তু গ্রহদিগের স্নেহদৃষ্টি দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলভাব দমন এবং চিত্তস্থৈর্য্য ও প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়।

উন্মাদ ও প্রতিভা নির্দ্দেশ করিতে—অন্ততঃ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয় করিতে—আমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহা সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আমরা প্রত্যক্ষ ঘটনাসমষ্টি হইতে কেবল গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে গ্রহগণের অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া যে, তথ্য প্রকাশে সাহসী হইয়াছি, তাহাতে যে কোন ব্যক্তিই উক্ত প্রদর্শিত পথাবলম্বনে আমাদের বাক্যের সত্যতা নিরূপণে সমর্থ হইবেন এবং আর্য্যঋষিপ্রণীত অভ্রান্ত জ্যোতিস শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনাস্থা দূরীভূত হইবে। যে আর্য্যঋষি-প্রণীত দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র-পাঠে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর ও মিথ্যা হইলে, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের বহুমূল্য সময় ইহাতে ক্ষেপণ করিতেন না।

ডাক্তার সার্প (Sharp) তাঁহার Essays on Medicine নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মানসিক সুস্থতার উপর দেহের এবং দেহের সুস্থতার উপর মানসিকবৃত্তির স্থিরতা নির্ভর করে। যখনই কোন বুদ্ধিবৃত্তির আতিশয্য বা তজ্জন্য বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তখনই দেখা যায় যে, কোন প্রবল গ্রহ কর্তৃক বুধ ও চন্দ্র বৈরদৃষ্টিযুক্ত। কিন্তু কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির আতিশয্য ও চরিত্রের স্থিতিস্থাপকতা স্নেহদৃষ্টি দ্বারা রক্ষিত। সকলেরই যে প্রতিভা থাকিবে তাহা নহে, এবং ব্যক্তিমাত্রেই যে প্রত্যেকের জন্ম দিবসে উক্তরূপ গ্রহগণ দৃষ্টিসংশ্লিষ্ট হইবে তাহা নহে, যে কোন ব্যক্তিরই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দৃষ্ট হইবে, তাহারই জন্ম দিবসে গ্রহগণের পূর্ব্বোক্ত বৈরদৃষ্টি ও স্নেহদৃষ্টি উভয়ই পরিলক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র বৈরদৃষ্টি প্রায়ই বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য হেতু কোন না কোন বৈলক্ষণ্য সূচিত করে এবং যে স্থলে বোধশক্তিহীনত্ব দৃষ্ট হয়, সে স্থলে ব্যক্তিগণের জন্ম দিবসে গ্রহগণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ দৃষ্টিসম্বন্ধ থাকে না, এবং কয়েক স্থলে কেবলমাত্র বৈরদৃষ্টিই পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিভা স্বর্গের দেবতা। ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া নর জগতের সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া, সেই মঙ্গলময়ের অভিপ্রেত কার্য্যসম্পাদনে জীবন উৎসর্গ করেন। কবি গাহিয়াছেন,—

"পাগলকে যে পাগল ভাবে,
এমন সে পাগল কি এ পাগল,
কেবা সেটা বুঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবনভরে?
কেউ বা পাগল মানের তরে,
কেউ বা পাগল রূপের লাগি,
কেউ বা পাগল ধনলোভে।
নিমাই সন্ন্যাসী হ'লো,
প্রেমে পাগল বলে শুনি।
জ্ঞানে পাগল হ'লো বুদ্ধ,
রাজ্য ছাড়ি হ'লো মুনি।
রক্ষা পাগল ধ্যান করি,
পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবের পাগল শ্মশান ভূমে
বেড়ায় ভোলা উদাস ভাবে॥"

জগদ্বন্ধু

[রসিকলাল রায়]

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

প্রায় দুইযুগ পূর্ণ হইতে চলিল, একদিন দিবা ও নিশার সন্ধিকালে পদ্মাযমুনার সঙ্গমতীরে গোয়ালন্দ ঘাটে ষ্টীমারে নদীর জল উজান কাটিয়া তীরে আসিয়া নামিলাম। নব-যৌবন-গর্ব্বিতা, কল্লোলিনী, স্রোতস্বিনী, ভাগীরথী-ভগিনী, রুখরা-প্রখরা পদ্মার ধারা তরঙ্গে তরঙ্গে, আবর্ত্তে আবর্ত্তে নৃত্য করিতে করিতে পদাঘাতে কূলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাগরপানে ছুটিয়াছিল। উন্মাদিনীর সে সময়ের সে ভীমরূপ দেখিয়া অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ভগিনীর অভিশাপ উপহাস করিয়া, বিজ্ঞানের গর্ব্বে টিটকারী দিয়া, পঙ্কিল

জগদ্বন্ধু

পদ্মার বিশাল সলিলরাশি সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; অস্তগমনোন্মুখ কাতর তপনের রক্তরঞ্জিত স্নেহ-করস্পর্শে চঞ্চলার চপলতা শান্ত হইতেছিল না। গুল্মলতা ভেদ করিয়া, বাঁশের ঝাড়, বেতের কাঁটা ও সুপারিবাগানের ভিতর দিয়া, নিশার আঁধার ধীরে ধীরে জলে স্থলে ধরণীবক্ষ পক্ষপুটে আবরণ করিতেছিল।

সেইক্ষণে সেইস্থানে যাত্রীর ভিড়ে আমি একা নদীর তীরে জনাকীর্ণ প্রান্তরে প্রবাসযাত্রী বিদ্যার্থী। পশ্চাতে রক্তকমলপুট জিনি আরাধ্য চরণযুগলের ও ঊষার শারদ শশীর ন্যায় একখানি বিরহবিধুর মলিন আননের স্মৃতি, সম্মুখে কলিকাতার কলরব ও নীরস সভ্যতার কম্মোৎসবের প্রাণহীন অভ্যর্থনা। বাহ্যজগতে কালের ও স্থানের সন্ধি-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, অন্তর্জগতে বিপরীত চিন্তাধারার সংঘর্ষ-জনিত বিক্ষুব্ধচিত্তে আমি স্তব্ধ হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় চিন্তায় উদাসীন ছিলাম। এমন সময় চমক ভাঙ্গিল; কলিকাতার ডাকগাড়ী সশব্দে লাইনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার সঙ্গের সম্পদ একটি ২।০ নয়সিকা মূল্যের টিনের তোরঙ্গ (trunk), একখানি পাটনাই খেরোর 'জনকে' তোষক ও একটী টিকিনের বালিস তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে দরজার কাছে বেঞ্চের উপর রাখিয়া, সারারাত্রি দরোয়ানি করিয়া, গাড়ীতে বেশী ভিড় জমিতে দিব না, মনে মনে এই সঙ্কীর্ণতার সঙ্কল্প আঁটিয়া, জানালার কাছে বসিয়া, যতক্ষণ পারি জুন মাসের শেষের সেই দারুণ নিদাঘে রজনীর শীতল বাতাস সম্ভোগ করিবার আশায় আশ্বস্ত হইলাম—চলিষ্ণু শকটের panorama view দেখিবার লোভও যে মনের মধ্যে একেবারেই উঁকি মারিতেছিল না, এমন নহে। যাহা হউক, গাড়ীতে তখনও যাত্রীর ভিড় ছিল না, যাত্রীরা তখন এদিক ওদিক পান্থশালায় শ্রান্তিবিনোদনে ব্যস্ত। আমি প্লাটফর্ম্মে বসিয়াই সিঙ্গাড়া সন্দেশে সলিলযোগ করিয়া, গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। প্লাটফর্ম্মে কেরোসিন গ্যাসের আলো দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছিল, গাড়ীর মধ্যে ঘোর অন্ধকার, তখনও বাতি জ্বালা হয় নাই—শিক্ষার দোষে আমাদের বাহিরের ময়লা কাটিয়া গেলেও মনের ভিতরে এমনি আঁধার থাকিয়া যায়! কিন্তু আমার সেই মৌরুসী-পাট্টার গাড়ী কোথায়? আমার মনে করিয়া যে কুঠরীতে

উঠিলাম, তাহা যাত্রীতে পরিপূর্ণ, আমার বাক্‌স, বিছানার আসবাব দুই বেঞ্চের মাঝখানে নীচে নামিয়া ক্ষুণ্ণমনে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি স্থানচ্যুত—আমার জিনিসপত্র স্থানচ্যুত, অতএব আমি আগন্তুক যাত্রীদিগের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া বিরক্তি ও জিদের সহিত আমার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিতে উদ্যত হইলে, অপর আরোহীরা বাধা দিয়া সাগ্রহে সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'সাধু! সাধু!' আমি যেন বশীকরণ মন্ত্রের যাদুগুণে মুগ্ধ হইয়া অপরাধীর ন্যায় নীরবে যেখানে স্থান পাইলাম, বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া দেখি, পার্শ্বেই বাল্যবন্ধু রা—(ভগবান্ তাহার আত্মার কল্যাণ করুন) আমার কাণে কাণে বলিল—'জগৎ'। জায়গা গিয়াছে বলিয়া মনের দুঃখ তখনই ঘুচিয়া গেল। আমাদের সহপাঠী ও সমসময়িক ছাত্রমহলে জগতের কথা লইয়া প্রায়ই আলোচনা—শুধু আলোচনা নহে, তুমুল বাদবিবাদ হইত। জগৎ সাধু হইয়া বন্ধুদিগকে হরিনামে মাতাইয়া ফেলিয়াছিলেন; আমরা Sceptic দলে। কিন্তু সেদিন সামনাসামনি বসিয়া, I came to scoff and remained to pray. গাড়ী নিস্তব্ধ—শিষ্যেরা ভক্তিতে, আমি দ্বৈধমতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরব! সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, অপর সকলের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, স্বভাবতঃ অল্পভাষী, শান্তিপ্রিয়, সদাসঙ্কুচিত জগদ্বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রসিক, কলিকাতা যাচ্ছেছ?' এইরূপে আমার সহিত মাত্র দুই একটি সাধারণ কথায় আলাপ চলিল। আমি প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। রা—তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; তাহার মিষ্ট কথা, অমায়িক ব্যবহার, স্নিগ্ধ প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বন্ধুবান্ধবদিগকে সহজেই আকৃষ্ট করিত। রা—জগদ্বন্ধুর সহপাঠী, তাহার ইচ্ছা হইল—জগতের সহিত আলাপ করে। কিন্তু জগৎ স্বয়ং কথা না কহিলে, কেহই তাঁহার সহিত উপযাচক হইয়া আলাপ করিতে সাহস করিত না—চেষ্টা করিলেও পারিত না। একখানা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মৌনী হইয়া একটি দিব্যকান্তি গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ মানুষের কোলাহল হইতে এককোণে সরিয়া, কি যে সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব লোকের মনে অনায়াসে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে। রা— আমাকে তাহার মনের কথা বলিলে আমি বলিলাম, 'জগৎ হয়ত তোমাকে দেখিতে পান নাই, তুমি গান ধর, তাহা হইলেই তোমার দিকে উঁহার মন আকৃষ্ট হইবে।' রা— তাহার মধুরকণ্ঠে জগতের একটি প্রিয় সঙ্কীর্ত্তন গান করিল। গান শেষ হইলে আমরা আবার সকলে নীরব। গাড়ী ছাড়িল, আলো জ্বলিল, এবং আমরা নীরব। আমি মুখ ফুটিয়া জগৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রা— কথা মনে আছে না?' জগৎ,—'হাঁ, আছে।' আমি, 'রা— বেশ গায়।' জগৎ নিরুত্তর। কিছুকাল পর জগৎ বলিলেন, 'মানুষ এত মলিন হইয়া যায় কেন? রা- আগে বেশ গান করিত, এখন মলিন হইয়া গিয়াছে। তুমি আগে কেমন সুন্দর ছিলে, এখন কেন মলিন হইয়াছ?'. আমি জগৎকে তখন প্রভু জগদ্বন্ধু মূর্ত্তিতে দেখি নাই, বাল্যবন্ধু জগৎ বলিয়াই আলাপ করিতেছিলাম; সুতরাং দুষ্টামি করিয়া কহিলাম, 'আমরা ত ভাই সাধু হই নাই, সংসারের জীব—পাপীতাপী, কাজেই মলিন।' জগৎ ধীরে ধীরে যেন ব্যথিত ও কাতরকণ্ঠে কহিলেন, 'পাপে কি ঘৃণা হয় না?' নিমেষে আমার কাকু শতমুখ হইয়া আমারই নিকট ফিরিয়া আসিল। সে দিনের সে প্রশ্ন আজও থাকিয়া থাকিয়া আমার প্রাণের গোপন পর্দ্দার পরতে পরতে ঘা মারিতেছে। জগৎ রাজবাড়ী ষ্টেসনে নামিয়া গেলেন, আমি লজ্জিত না হইলেও, চিন্তিত হইয়া কলিকাতা আসিলাম। তাহার পর কত জায়গায় জগতের কথা উঠিয়াছে, আমার মুখে ঠাট্টা বা অশ্রদ্ধার মন্তব্য আর কখনও বাহির হয় নাই। অন্তরে জগতের প্রতি অশ্রদ্ধা কখনও ছিল না, তবে শিষ্যগণের বাড়াবাড়িতে অনেক সময় আমরা তৎপূর্ব্বে বালসুলভ চপলতাবশতঃ তাঁহাদের প্রভুকে শুষ্ক ব্যঙ্গের আসরে নামাইয়া অপরাধী হইতাম।

ইহার অনেক দিন পরে আমরা একবার ফরিদপুরের এক গ্রামে কোন বাল্যবন্ধুর গৃহে অতিথি। বুনোরা * মাটি কাটিয়া ডগুয়া বাঁধিতেছিল। সন্ধ্যাকালে তাহারা হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া চাটাই পাতিয়া বারান্দার একপাশে বসিল।

* যে সকল কোল ও সাঁওতাল কুলি রাস্তা বাঁধিতে আসিয়া, যশোহর ও ফরিদপুরে বসবাস করিতেছে, তাহারা ও তাহাদের সন্তানসন্ততিরা স্থানীয় লোকের নিকট অনাদরে 'বুনা' নামে পরিচিত, আদরের নাম 'সর্দ্দার'।

বুনোরা সকলেই যুবক, একজন বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু একটা খোল (মৃদঙ্গ) পাইতে পারি?' হিন্দু বাবুরা মৃদঙ্গ দিতে পারিলেন না—তাঁহারা তাসপাশা-দাবা, পরনিন্দা ও সুদের হিসাব লইয়া ব্যস্ত। বুনোরা তথাপি হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জগতের প্রভাবে তাহাদের এইরূপ সুমতি হইয়াছে। বুনোরা প্রভু-জগতের নাম মুখে উচ্চারণকালে উদ্দেশে ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিল।

ইহারও কয়েক বৎসর পরে ফরিদপুরে বন্ধুবর ক্ষিতি বাবুর বাসায় সায়ংকালে সুখালাপ হইতেছিল। পাশের বাড়ীতে মৃদঙ্গধ্বনি ও হরিসঙ্কীর্ত্তনের মধুর রোল উঠিলে, আমরা নীরব হইয়া সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। ক্ষিতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সেটা বুনোবাড়ী। কি পরিবর্ত্তন! শৈশবে শুনিয়াছি, বুনোবাড়ী অশ্লীল নাচগান, ব্যভিচার ও সুরাপানের জন্য বিখ্যাত (notorious) ছিল। পরে পাদ্রী খৃষ্টানেরা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, কিন্তু তাহাদের অন্তর বদলাইতে পারিতেন না। বুনো ও চণ্ডাল জুটাইয়া ছোটনাগপুরের মত ক্রমে ফরিদপুরও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ একদিন নীরব সাধক জগদ্বন্ধু ঘৃণিত বুনোদিগের বাড়ীর উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন। সে ব্রহ্মচর্য্যের অদ্ভুত তেজে তাহারা বিস্মিত হইল, সে অপরূপ মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের সরলপ্রাণ মোহিত হইল। ফরিদপুরের অনাচারী বুনো শুদ্ধাচার হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিল। শুনিয়াছি, ভাঙ্গা অঞ্চলের মুসলমান মাঝিসম্প্রদায়বিশেষও নাকি এইরূপে জগতের নামে মাতিয়া হরিনাম গায়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

ফরিদপুর-যশোহর রাস্তার ধারে সহর হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে গোয়ালচামট আমবাগানে চারিদিকে ঘনবাঁশের বেড়ায় ঘেরা একখানি খড়ের ঘরে মৌনী সাধু জগদ্বন্ধু গভীর তপস্যায় নিমগ্ন। জগদ্বন্ধু হাটে বাজারে মেলায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন না, বেদিতে বসিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন না, নগরে নগরে ঘুরিয়া মুক্তিমন্ত্র কর্ণে ফুঁকিয়া শিষ্যসংগ্রহ করেন না, মুদ্রিত পুস্তকপুস্তিকা বিতরণ করিয়া মত প্রচার করেন না। তিনি ভেল্কী জানেন না, যাদু জানেন না, ভবিষ্যৎ গণিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করেন না এবং তুকতাক তন্ত্র-মন্ত্র-ঔষধকবচের ভাণ করেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহার ক্ষুদ্র আশ্রম লোকে লোকারণ্য কেন? এ রহস্য কে বুঝাইয়া দিবে? তিনি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষ, তাঁহার ত্যাগ আছে, সাধনা আছে, সুকৃতি আছে, জীবন আছে। তাই তিনি নীরব হইয়াও মুখর, নিষ্ক্রিয় হইয়াও কর্ম্মশীল, মৌনী যোগী হইয়াও প্রচারক। যাহার প্রাণ নাই, সে অপরকে প্রাণের স্পর্শ দিবে কি প্রকারে? যে নিজে না মজিয়াছে, সে অপরকে মজাইবে কিরূপে? আমরা আমাদের সমাজের কল্যাণের জন্য সংসারে শুষ্ক বাক্যের আবরণে প্রাণহীন চপলতা দেখিতে চাই না। জগদ্বন্ধুর ন্যায় নীরবসাধনাপূত সন্ন্যাসজীবন চাই, যেখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া পরাণের জ্বালা জুড়াইতে পারি। এই হেতু **'জগতের'** বাক্‌হীন বাগ্মিতার উদ্দীপনা বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিতে পারিয়াছে।

জগদ্বন্ধু মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ডাহাপারা গ্রামে ১২৭৮ সনের ১৭ই বৈশাখ সীতানবমীতে বারেন্দ্রব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺দীননাথ চক্রবর্ত্তী ন্যায়রত্ন এবং মাতা ৺বামা সুন্দরী দেবী এখন স্বর্গে। দীননাথ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার আদি বাসস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে ছিল। গোবিন্দপুরের গৃহ নদীসাৎ হইলে, তিনি ফরিদপুর সহরের অনতিদূরে ব্রাহ্মণকান্দা গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। জগদ্বন্ধু—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। জগদ্বন্ধু একবৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা শ্রীযুত তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তীর উপর পতিত হইয়াছিল। জগৎ প্রথমে ফরিদপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তৎপর জিলাস্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, কোন কারণবশতঃ স্কুল পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সেই ঘটনা নিরপরাধ অভিমানী জগতের প্রাণে যে ঝটিকার উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার বর্ত্তমান জীবন-গঠনের মূলকারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। সমভাবে প্রবাহিত ধীর, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল সলিলধারা হঠাৎ বিষম ব্যাঘাত পাইলে, চঞ্চল হইয়া, ভীম তরঙ্গে পরিণত হইতে পারে। তখন তাহার গতিরোধ করে, এমন সাধ্য কার? এই সময় তারিণীবাবু রাঁচিতে কর্ম্ম করিতেন। জগৎ রাঁচি জিলাস্কুলে কিছুদিন পাঠ

করিয়া ফরিদপুর ফিরিয়া আসেন। তাঁহার মধ্যম সহোদর জগতের অনতে তাঁহাকে পুনরায় জিলাস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করাইতে গেলে, জগৎ প্রবন্ধ-লেখকের সহিত এক শ্রেণীতে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ এক লম্ফে জানালা দিয়া বাহির হইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে হয় ভাবগ্রস্ত, না হয় বাতগ্রস্ত বলিয়া আমাদের অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল। ইহার পর জগৎ পাবনা ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেন।

এই সময় তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না, অধিক কথা কহিতেন না এবং সর্ব্বদাই একাকী নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। "তের বৎসর বয়সে জগতের উপনয়ন হয়। উপনয়ন-সংস্কার হওয়ার পর হইতেই খুব সন্ধ্যা পূজা ও ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোর ভাবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন।" জগতের হৃদকোষ ভক্তিকমল বিকশিত হইলে, 'সর্ব্বপ্রথম পাবনায় তিনি আত্মগোপন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন।' 'সাধু বৈষ্ণব দেখিলে গড় করিয়া প্রণাম করিতেন, হরিনাম শুনিতে শুনিতে অজ্ঞান হইতেন।' 'ছোটকাল হইতেই তিনি হরি সংকীর্ত্তন ভাল বাসিতেন।' "হরিনামের ধ্বনি শুনিলে অবিচারে তথায় যাইতেন সংকীর্ত্তনে যাওয়ায় বাধা মানিতেন না। কীর্ত্তনে অল্পসময় নৃত্য করিয়াই আবিষ্ট হইতেন। সকলে তাঁহাকে ধরিয়া স্কন্ধে লইয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিত।"

"পাবনায় একপক্ষ লোকে তাঁহার ঘোর বিরুদ্ধে দাড়ায়। জগদ্বন্ধু হরিনামে মত্ত করিয়া লোকদিগকে সংসার ত্যাগী করিয়া ফেলিবে। ছেলেরা পড়া শুনা না করিয়া অকর্ম্মণ্য ও চরিত্রহীন হইবে। বিশেষতঃ সকলে তাঁহাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তা করিয়া তাহারা প্রভুকে বাক্যতঃ ও কার্য্যতঃ কঠোর শাসন আরম্ভ করে।... তাঁহার কোমলাঙ্গে প্রথম দুইবার গুরুতর রূপে প্রহার করে। কিন্তু প্রভু চিরদিনই ক্ষমার দেবতা।...... কাহারও নাম প্রকাশ করেন নাই। নিন্দা, কুৎসা, নির্যাতন অম্লান বদনে নীরবে সহ্য করিয়াছেন।"

স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও প্রচারের ফলে পূর্ব্ববঙ্গে যে ধর্ম্মান্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, কালীবর বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির বক্তৃতায় হিন্দুর প্রাণে যে ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল, এবং কুমারখালির ভক্ত হরিনাথের দেহতত্ত্বপূর্ণ সঙ্গীতে ও হরিনামের ধ্বনিতে লোকের সুকৃতিলব্ধ সাধু প্রকৃতির ভক্তি-বীণার নীরবতন্ত্রে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সেই সকলের পরোক্ষ ফলে জগতের নির্ম্মল শুদ্ধ পবিত্র প্রাণে ভাবের বন্যা আসিয়াছিল কি না বিচার্য্য বিষয়।

পাবনায় জগৎ আড়াই বৎসর ছিলেন। তারপর তড়াসের স্বনামধন্য জমীদার ৺রাজর্ষি বনমালী রায় মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তিনি শ্রীবৃন্দাবন চলিয়া যান। তথায় প্রায় ৮মাস বাস করিয়া কলিকাতা আসিয়া কয়দিন থাকেন। পরে ব্রাহ্মণকান্দা ফিরিয়া যান।

আমরা জনরব শুনিয়াছিলাম ইহার মধ্যে তিনি নবদ্বীপও গিয়াছিলেন এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত শিষ্য সেবক মণ্ডলী তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া রটনা করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় জগৎ হ্যারিসন রোড ও বেনেটোলার মোড়ে বর্ত্তমান সানাটোরিয়ামের সম্মুখস্থ দ্বিতল বাটীতে মেসে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার দর্শন দুর্লভ ছিল। শুনিয়াছি, Victoria Boarding এর বাড়ীতেও তিনি কিছুকাল ছিলেন এবং তথায় কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। "সে সময় তাঁহার পরিধানে সাদা ধুতি চাদর, মাথায় বড় চুল, গলদেশে স্বর্ণতার গ্রথিত ত্রিসূত্র রুদ্রাক্ষমালা ছিল। সর্ব্বদাই ভাবে ঢল ঢল ও সময় সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন।" জগৎ সঙ্কীর্ত্তন শুনিলে ভাবে বিভোর হইতেন। কিন্তু গানের তাল কাটিয়া গেলে, কিংবা কোন চরিত্রহীন লোক গান ধরিলে, তিনি অত্যন্ত চঞ্চল ও বিরক্ত হইতেন। ১২৯৫ সনে জগৎ কলিকাতায় আসেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। কলিকাতায় সেইবার তাঁহার ছবি তোলা হয়। সেই ছবির প্রতিরূপ উপরে দেওয়া হইল। তখন জগতের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অপূর্ব্ব দেহকান্তি, পবিত্র সুন্দর মুখজ্যোতিঃ এবং মিষ্ট মধুর সম্ভাষণ মানুষমাত্রকেই মুগ্ধ করিত ;—

"মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভো র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥"

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।"—গীতা. ১১, ৫৪।

কিন্তু উক্ত ছবির সহিত বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সাদৃশ্য নাই বলিলেই চলে,—১৭ ও ৪৫ এর মধ্যে ব্যবধান অনেক! কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বকুলাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত অতুল চম্পটী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জগতের চরণতলে মাথা নোয়াইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এই সংবাদে তখন ছাত্রমহলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। বকুলাল এখন মুন্সেফ, রমেশ ব্রহ্মচর্য্য ও ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু সংসারী হন নাই। আমরা ও ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী রমেশকে জগতের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে এই সময় বলরামদের ষ্ট্রীটে ও নানা স্থানে ঘুরিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলাম।

যাহা হউক, জগৎ ফরিদপুরে ফিরিয়া গিয়া বাকচরে নদীর তীরে শ্রীআঙ্গিনা স্থাপন করেন এবং তথায় এক সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-সমাজের একজন প্রধান চেলা এখন রামদাস সাধু নামে পরিচিত, এক্ষণে মতিলাল শীল মহাশয়ের বাড়ীতে ইঁহার আখড়া। ১৮৯৮ সনে জগতের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বুনোজাতির সংস্কার আরম্ভ হয়। তিনি "বুনো জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে নানারূপ উপদেশ দ্বারা তাহাদের জাতীয় ভাব-ব্যবহারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন।......... বুনোজাতির এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন অপূর্ব্ব দৈন্য, বিনয় ও সত্যতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। এই সময় আবকারী নামক বিলাতী মাসিক পত্রিকায় ইহাদের ও জগদ্বন্ধুর বিষয় বিশেষ আলোচনা হয়।..... বুনোজাতির পরিবর্ত্তনের পর আরও নানা দেশ দেশান্তর হইতে নানা জাতীর বহুলোক আগমন করে এবং তদ্দ্বারাও অনেক কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠিত হয়।" অতএব আজকাল চারিদিকে যে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন রব উঠিয়াছে, তাহার প্রকৃত পথ প্রদর্শক নীরব সাধু জগদ্বন্ধু। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আমরা পাইয়াছি,—

"স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণনাম লয় নাচে হয় উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত॥

এবং

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥"

জগতের জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান।

১৮৯৯ সনে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গন স্থাপিত হয়। জগৎ এখন তথায়ই মৌনসাধন করিতেছেন। বন্ধুকথা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন,—

"মৌনাবস্থায় গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে প্রায় শতেক বাঁশ ও কাঠের খুঁটি পরিবেষ্টিত ১৬×১১ হস্ত পরিমিত সামান্য এক পর্ণকুটিরে দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ অবস্থান করিতেছেন।" "গত ১৩২০ সনের মাঘমাসে তিন দিবস ঘর হইতে বাহিরে প্রাঙ্গণে বহির্গত হওয়া ব্যতীত এই দ্বাদশ বৎসরকাল বাহিরে আসেন নাই এবং এখনও বাহির হন না।' *

"ঘরের মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশ করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই।

"বর্ত্তমানে তাঁহার কোনরূপ জাতিবিচার নাই। সকল জাতির, সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রীতির সহিত প্রস্তুত খাদ্যজিনিসই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত এবং পরিধানে বস্ত্র নাই। সরল শিশুর ন্যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থা।

"ম – শয়নের নিকটবর্ত্তী স্থানেই ত্যাগ করেন। বাহ্যও জ্ঞানশূন্য, যে অবস্থাতেই হউক সময় সময় শয্যাতেও ম— ত্যাগ করিয়া থাকেন।

"ঘরের বাহিরে তালা বন্ধ থাকে। তাঁহার কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, এজন্য সেবাইত ভিন্ন অন্য কোন লোককে ঘরের ভিতর যাইতে দেওয়া হয় না।"

১৩১০ সনে অগ্রহায়ণ মাসে জগৎ কয়েক দিনের জন্য অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েক জন ভক্তের চেষ্টায় ও শুশ্রূষায় দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি আবার সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছিলেন।

"জগৎ যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না পান এবং তাঁহার আশ্রমে যাহাতে কোনরূপে অপবিত্রতার প্রশ্রয় না হয়, এই জন্য ১৩১৯ সনে ফরিদপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একটি পর্য্যবেক্ষণ-কমিটি গঠন করিয়াছেন। সেবার অং

* "যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥"—গীতা, ৬,১০।

যাহাতে কোনরূপে অপব্যয়িত না হয় তজ্জন্য একটি ট্রাষ্ট কমিটিও গঠিত হইয়াছে।" হইয়াছে সব, কিন্তু বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া রাখা তাঁহার সেবকগণের পক্ষে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ও সহৃদয় ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন।

জগৎ সাধু-জীবনের প্রথম যামে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি গান সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত দুই একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত বন্ধুকথা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে।
আমি ধোয়া'ব শ্রীপদ আজি নয়নধারে॥
প্রকাশি সে রূপরাশি, তামস বিনাশ আসি,
আমি সকল ভুলে, নয়ন খুলে, হেরি তোমারে।
প্রেম সুধা বরিষণে, জুড়াও এ তাপিত জনে,
তোমার রূপসাগরে বিশ্বম্ভর ভাসাও আমারে।
তব প্রেম-ধনে ধনী কর গৌর গুণমণি!
রাখ **বন্ধুদাসে** পদপাশে কৃপা-সঞ্চারে॥
ভব-ভাবন ভকত-ভয়-ভঞ্জন হে,
তনু তাপিত ত্রিতাপে তারণ হে।
ওহে গোরাচাঁদ নাশ হে বিষাদ,
দেহ **পতিত জগতে** চরণ হে।"

উল্লিখিত সঙ্গীত হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, জগৎ কখনও আপনাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার দুরাশা রাখেন না। তিনি দাসভাবে, বন্ধুভাবে, আপনাকে পতিত, অভাজন মনে করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম সাধন করিয়াছেন।

"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥"

তাঁহার পাপ-বোধ প্রবল, অতএব তিনি তাপিতপ্রাণে ত্রিতাপতারণ, ভকতভয়ভঞ্জন গোরাচাঁদের শরণাপন্ন হইয়াছেন। জগতের উপদেশের সার—সংযম ও হরিনাম। একবার কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়সকলকে শাসনে রাখিবার উপায় কি?' জগতের উত্তর —"ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও পরমেশ্বরে নির্ভর।" জগদ্বন্ধু স্বয়ং জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন এবং হরিনাম সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মসাধনই ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়,—

"আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥"

জগৎ গুরু, জগৎ ধর্ম্ম প্রচারক; কিন্তু তাঁহার কোন মন্ত্রশিষ্য নাই। গুরুগিরি করিয়া শিষ্য জোটান তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না; তথাপি তিনি যেখানে গিয়াছেন, অনল শিখার আকর্ষণে পতঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য শিষ্য হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলী গঠন করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"গুরু-অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরু দীক্ষা বলে; তারক ব্রহ্ম হরিনামই মহা উচ্চারণ মন্ত্র, কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সকলে হরিনাম কর।"

আমরাও চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি,—

"হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

অর্থাৎ হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিযুগে ইহ বই গতি নাই আর॥

জগতের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া বন্ধু কথা প্রণেতা লিখিয়াছেন,—'তিনি কদাপি স্ত্রীলোক এই শব্দ উচ্চারণ করিতেন না। স্ত্রী জাতিকে প্রকৃতি বলিতেন এবং স্ত্রীলোক দেখিলে স্বয়ং দূরে সরিয়া থাকিতেন।'

জগতের কয়েকটি উপদেশ নিম্নে সংগৃহীত হইল,—

১। আত্মরক্ষা করিও।
২। অন্য চাহিও না, মৃত্তিকা বই।
৩। অন্য ভাবিও না, গুরু গোবিন্দ বই।
৪। শুন্য থেক না, সদা স্মরণ বই। *
৫। উদর ভরিও না, ক্ষুধা বই। (নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি।—গীতা)
৬। সকলকেই হরিনাম শুনাইবে, ছোট বড় বাছিও না। †

* "পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান।" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

† "উঠত বৈঠত সোবত নাম।
কহ নানক জনকে সদা কাম॥"

৭। প্রকৃতির * মুখাবলোকন করিবে না।

৮। বৃথা কথা বলিও না।

৯। আলস্য চিরতরে ত্যাগ করিবে, শরীরকে সর্ব্বতো ভাবে রক্ষা করিবে।

১০। ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালন ও হরিনাম সাধন, এ ভিন্ন অন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই।

১১। চিরদিন সাধু হয়ে থেক, কোন অভাব থাকবে না।

১২। নিঃশঙ্ক হও, নিষ্ঠায় থাক।

১৩। সকলে এক হয়ে থেক।

১৪। ভাল হও, অন্যের ভাল কর।

১৫। কাহাকেও আঘাত করিও না, জীবদেহে নিত্যা নন্দের বাস।

১৬। পরচর্চ্চা বিষের মত ত্যাগ করিও।

১৭। কেহ দীক্ষা লইও না—দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র।

১৮। তোমরা 'বিদ্যা উপার্জ্জন—করো'; নিশাজাগরণে চিরদিন পড়িবে (ছাত্রদিগের প্রতি)।

১৯। 'বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণবাস, গোপীভাব, যুগলাশ্রয়—ইহার উপর আর কিছুই নাই।' অতএব গোপী ভাবে সদা মধুর ভজন করিও, 'সদা আত্মগোপনে থাকিও।'

ইহাই জগতের শেষ কথা। জগৎ বৈষ্ণব, জগৎ ভক্ত, জগৎ সাধক, জগৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের শেষ সাধন মধুরভাবে মুগ্ধ "শ্যাম বিলাসিনী রাই"।† যুগল প্রেমের মদিরাপানে বিভোর নিত্যমুক্ত জগদ্বন্ধুর প্রাণে আনন্দের সীমা নাই,—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর,
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

তাই তিনি লোকসংস্পর্শ হইতে দূরে নির্জ্জনে, নীরবে মধুযামিনী রসে গোঁয়াইতেছেন।

ভক্ত জীবনের বিভিন্ন অবস্থার ক্রম-বিকাশ জগতের জীবনে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন তিনি শ্রেষ্ঠ সাধনে সিদ্ধ হইয়া দেবত্বে উন্নীত হইয়াছেন। এখন তাঁহার বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান—তৃতীয় অবস্থা। অন্ধ ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলে বলুক, তাঁহাকে কেহই বুঝিল না; বুঝিবেও না। সেদিন গোলদীঘীতে ভক্ত চম্পটী বলিতেছিলেন, 'তাঁহাকে কেহই বুঝিতে পারিবে না।' তথাপি সাধু ভক্তের কথা লইয়া যত আলোচনা হয়, ততই আমাদের নিজের ও অপর দশজনের মঙ্গল। এই শুভইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আমরা ভক্তশিরোমণি সাধককুলতিলক জগদ্বন্ধুর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। আমাদের বহু পুণ্যের ফলে, দেশের, সমাজের, সাধনার ও শিক্ষার যুগযুগসঞ্চিত পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ও সাধুতা, রূপ-পরিগ্রহ করিয়া আমাদেরই মধ্যে আমাদেরই একজন হইয়া কলুষরাশি ধ্বংস করিতে আগমন করেন। ইঁহারা দেউটীর ন্যায় অমানিশার ঘোর আঁধারে উজ্জ্বল আলোক কেন্দ্র *; অবসন্ন শ্রান্ত পথিক ঐ আলোকরশ্মি লক্ষ্য করিয়া পান্থশালার পানে আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসে।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে যদি শ্রদ্ধা হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥" †

---

* আলোকের।

† 'হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

* "I am the Light of the World; he that followeth me shall not walk in the darkness, but shall have the Light of Life."—St. John.

† শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-লিখিত 'বন্ধুকথা' হইতে এই প্রবন্ধের অনেক উপাদান গৃহীত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জগদ্বন্ধুর জন্মোৎসব উপলক্ষে, ফরিদপুর ও পাবনায় কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার জীবন কথা আলোচিত হইয়াছে।

কুণাল-কথন

"ইদং ন চক্ষুর্ন ভোতি চিরং
স্বাকি ভিষ্টেং নস্ম নাস্তি শংয়ম্ ।
কদা সমায়াং সুদনং যদা ভবেং
বিকাশিতং জ্ঞানবিলোচনং মম ॥"

শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র বোষ]

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ.]

৩৭

একটু রোমান্স রচনা করিতে আমি এই হরণ-কাহিনীর অবতারণা করি নাই। কতকগুলি ঘটনা, একটির পর একটি, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া, বিচিত্রভাবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার মধ্যে যদি কোনওটিতে রোমান্সের কিছু রঙ লাগিয়া থাকে, সেটি কেবল দয়াদিদির আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনে।

এখানে বলা অবান্তর হইবে না বুঝিয়া, যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশত্যাগের পূর্ব্বে পিতামহী দাক্ষায়ণীকে সঙ্গে লইয়া প্রথমেই তাহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য বধূকে তাহার পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তিনি কাশীযাত্রা করিবেন; এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন সেই স্থানেই তিনি অতিবাহিত করিবেন। দয়াময়ী তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না জানিয়া, একমাত্র তাহাকেই তীর্থবাসের সঙ্গিনী করিতে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন।

দয়াদিদিও দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। পাকস্পর্শ-ক্রিয়া উপলক্ষে যে কয়দিন দাক্ষায়ণী আমাদের গৃহে অবস্থিত ছিল, সেই কয়দিন নিভৃতে এই ক্ষুদ্র বালিকার সঙ্গে দয়াময়ীর অনেক গোপন কথা চলিয়াছিল। সে কথা অন্যের জানা দূরে থাকুক, আমার পিতামহী পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সে রহস্য কথা, কাহারও কাছে প্রকাশযোগ্য নয় বলিয়া, দীন তন্তুবায়কন্যা তাহা চিরদিন মন্ত্রের মত গোপন রাখিয়াছে। আজিও পর্য্যন্ত আমি তাহা জানিতে পারি নাই। জানিবার জন্য আমি দুই একবার দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিলাম; দিদি অনুরোধ রাখে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই হাসিয়া উত্তর করিত—"ভাই! সে গুহ্য কথা। সে কথা শুনিবার অধিকার হইতে অকারণ তোমরা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছ। পতিব্রতার গুহ্য কথা। তুমি যদি অনুমান করিতে পার, তাহ'লে তুমিও ধন্য।"

সেই গভীর রহস্যাত্মক কথা আর তাহার কাছে জানিতে সাহস করি নাই। যথাশক্তি একটা অনুমান করিয়াছিলাম। কাহিনী-বর্ণনান্তে শ্রোতৃবর্গকেও আমি অনুমান করিবার ভার দিব।

পিতামহী—সার্ব্বভৌম ও তৎপত্নীকে দাক্ষায়ণী গ্রহণে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনুরোধ রাখেন নাই। বলিয়াছিলেন—"যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার পৌত্রকে দান করিয়াছি, তাহাতে আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার। তীর্থে দাক্ষায়ণী আপনার সেবায় জীবন সার্থক করিবে।"

পিতামহী ব্রাহ্মণদম্পতীর কথায় আশ্বস্তা হইলেন না। তিনি দাক্ষায়ণীর পানে চাহিয়া তাঁহাদের বলিলেন—"এই এতটুকু বালিকা! সে বাপ মা ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে কেন? আমিত আর ফিরিব না।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া ব্রাহ্মণী দাক্ষায়ণীকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বালিকা নিজেই পিতামহীর প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল। দয়াদিদির মুখে যাহা শুনিয়াছি, দশ বৎসরের একটা ছোট মেয়ের মুখের সে কথা শুনাইয়া প্রতীচ্য জ্ঞান গর্ব্বিত আপনাদের কাছে আমি হাস্যাস্পদ হইতে ইচ্ছা করি না। তবে সে কথা পিতামহীর নীরস চক্ষে জল আনিয়াছিল। তিনি তখনই পৌত্রবধূকে কোলে লইয়া বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন। কোলে লইয়াই তিনি তাহার জনকজননীর নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদায়-দানের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণী, দাক্ষায়ণীর মুক্ত কেশরাশি

গুচ্ছাইয়া ঝুঁটির আকারে মাথার পুরোভাগে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পিতা তাঁহার ব্যাহৃতি-হোমকুণ্ডের ভস্মের কিয়দংশ একটি অনতিবৃহৎ কাঠের কৌটায় পুরিয়া কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মা দিয়াছিলেন—আর একটি কৌটাপূর্ণ করিয়া সিন্দূর।

জনকজননীর দত্ত আয়তির উপযোগী এই অপূর্ব্ব সম্পত্তি লইয়া দাক্ষায়ণী আমার পিতামহীর সঙ্গে তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিল।

যখন তাহারা গৃহত্যাগ করিল, তখনও অনেকটা রাত্রি অবশিষ্ট ছিল। গ্রামের কেহই তাহাদের স্থানত্যাগ জানিতে পারে নাই। দাক্ষায়ণীর পূর্ব্বোক্ত দিদিমা সেইদিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তিনিও বালিকার প্রব্রজ্যা জানিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী গ্রামপ্রান্ত পর্য্যন্ত পিতামহীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই সময় পথ চলিতে চলিতে দাক্ষায়ণীর মাতা ও আমার পিতামহীর অগোচরে দয়াদিদির সঙ্গে ব্রাহ্মণের দুই চারিটা কথা হইয়াছিল। কথা কেন, দয়াময়ী আমার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে গোটাকতক প্রশ্ন করিয়াছিল।

হুগলীতে বকুলতলে ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব শাস্ত্রের বিধান রক্ষা করিয়া আমাকে কন্যা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একমাত্র দয়াময়ী সে দানের সাক্ষী ছিল।

দয়াদিদি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! আপনার কন্যার স্বামী কে?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"নারায়ণ ইহার স্বামী।"

"কোন্ নারায়ণ?"

প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ সহসা তাহার কোনও উত্তর দিলেন না। রমণীর, বিশেষতঃ শূদ্রারমণীর মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিবার তিনি কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। উত্তর দিলেন না কেন;—আমার বোধে, ব্রাহ্মণ উত্তর দিতে পারিলেন না।

দয়াদিদি বলিয়াছিল, বহুক্ষণ পথের দিকে চক্ষু রাখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। একটিও কথা কহিলেন না।

যখন তাহারা সকলে গ্রাম ছাড়িয়া প্রান্তরে প্রথম পাদক্ষেপ করিয়াছেন, নদীও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন দয়াদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! বকুলতলে আমার সম্মুখে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সেগুলা কি বিধিসঙ্গত হয় নাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা! তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝিয়াছি।"

"আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সাধু। সত্যরক্ষার জন্য আপনি যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার মূল্য আপনি যেমন বুঝিয়াছেন, অন্যে তেমন বুঝিবে না।"

"মা! তুমি দেখিতেছি পরমা বুদ্ধিমতী। তুমি ত সে দানকালে উপস্থিত ছিলে। কার্য্যের কি কোন ক্রুটী তোমার বোধ হইয়াছে?"

"আমি এরূপ বিবাহ এ জন্মে আর কখনও দেখি নাই।"

"কি করিব মা! আমি তখন বিপন্ন। তাড়াতাড়ি দানকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছে। তবে যথাসম্ভব অনুষ্ঠানের আমি ক্রুটী করি নাই।"

"না ঠাকুর, তা বলিতেছি না। আমি জন্ম জন্মান্তরের বহুপুণ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মিলন দেখিয়াছি। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, লক্ষ্মী নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছে—নারায়ণকে আঁচলে আঁচলে বাঁধিয়া পথ চলিতেছে।

"মা! আমারও সে সময়ে তাই বোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণীরও হইয়াছিল।"

"তবে এরূপ করিলেন কেন?"

"কুশণ্ডিকার কথা কহিতেছ?"

"কুশণ্ডিকা কি আমি জানি না! কন্যা নারায়ণকে দিয়াছেন, এই বোধই যদি আপনার হইয়াছিল, তবে আবার একটা পাথর কন্যার গলায় ঝুলাইলেন কেন?"

"আমি এই শিলায় হরিহরের নারায়ণত্ব আরোপ করিয়াছি।"

"তারপর?"

"তারপর কি? আমি তোমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়াও যেন পারিতেছি না।"

"আপনার কন্যা পত্নীরূপে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে?"

"তুমি কি মনে করিয়াছ, দাক্ষায়ণী হরিহরের আর কখন মিলন হইবে?"

"আপনি কি মনে করেন?"

"আমার ত মনে হয় হইবে না। তাহার গর্ব্বান্ধ পিতা এ দরিদ্রের কন্যাকে কখনও তাহার গৃহে স্থান দিবে না।"

"তিনি না দিলেও ইহাদের মিলনে বাধা কি? হরিহরের পিতামাতার দম্ভ কি এ মিলন রোধ করিতে পারে? সীতার মত দুঃখিনীর কথা কেহ কখন শুনে নাই। বিধাতা তাঁহাকে পতিসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। এখন হরিহরের সঙ্গে যদি দাক্ষায়ণীর কখন সাক্ষাৎ হয়, দাক্ষায়ণী তাহাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবে?"

"যখন সীতার কথা তুলিলে তখন বলি, রামচন্দ্র ত অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার স্বর্ণ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতেই সীতার অস্তিত্ব আরোপ করিয়াছিলেন; তাহাতেই আপনাকে সস্ত্রীক বোধে যজ্ঞকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।"

"রামচন্দ্র পুরুষ মানুষ। স্বর্ণ সীতা না করিয়া, আর একটা বিবাহ করিলেও তাঁর ক্ষতি ছিল না। সীতা ত স্বর্ণ স্বর্ণরাম রচনা করিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সীতা তাহার হৃদয়ের রামমূর্ত্তি ছাড়া বাহিরের কোন বস্তুতে পতির আরোপ করেন নাই; করিতে তাঁহার সতীত্ব নিষেধ করিয়াছিল। করিলে, আপনাকে পতিপরিত্যক্তা মনে করিয়া, কখনও তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে হইত না।

"তুমি কে?"

"আমি ঝি।"

"তুমি স্বয়ং প্রজ্ঞা—ঝি কেন?"

"না ঠাকুর, বোকা তাঁতীর মেয়েকে অমন গোলমেলে কথা বলিও না। তোমার কন্যার মূর্ত্তি দেখিয়া এ অন্ধের চোখ ফুটিয়াছে। তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া এ মূর্খ তাঁতিনীর জ্ঞান জন্মিয়াছে। হাঁ ঠাকুর, অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছ;—বলিতে পার, নারীর সতীত্ব কি?"

ব্রাহ্মণ সে সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া একেবারে দাক্ষায়ণীর সমীপস্থ হইয়াই তাহাকে বলিলেন—"দাক্ষায়ণী।"

দাক্ষায়ণী পিতামহীর হাত ধরিয়া পথ চলিতেছিল। পিতার সম্বোধন শুনিবামাত্র সে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে পিতামহী ও তাহার মাতা দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া, দাক্ষায়ণীকে নিভৃতে লইয়া গেলেন।

দয়াদিদিও দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেও সে তাহাদের নিকটে গেল না। তাহার যাইবার প্রয়োজন ছিল না। সে আগে হইতেই দাক্ষায়ণীর মনোভাব বিদিত হইয়াছিল। সুতরাং দাক্ষায়ণী যে কি উত্তর দিবে, তাহা আগে হইতেই তাহার জানা ছিল। সে সেই অন্যের অজ্ঞেয় গুপ্ত কথা।

নিভৃতেই পিতা ও পুত্রীর মধ্যে কতকগুলা প্রশ্নোত্তর হইল। কথা শেষে ব্রাহ্মণ দয়াদিদির নিকটে আসিলেন। দাক্ষায়ণী আবার পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল। নিকটস্থ হইয়া ব্রাহ্মণ দয়াদিদিকে বলিলেন—"মা! মিছে শাস্ত্র পড়িয়াছি! শাস্ত্রের শব্দার্থ লইয়াই এতকাল কেবল সময় অতিবাহিত করিয়াছি; মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। কন্যাকে নারায়ণ ব্রত গ্রহণ করাইয়াছি। পতিব্রতা হইতে উপদেশ দিয়াছি। অথচ ব্রতের মর্ম্ম বুঝি নাই। নারায়ণের সঙ্গে পতিব্রতার যে কি মধুর সম্বন্ধ, তাহা অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানেও নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমার পাণ্ডিত্য-দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে। শুন মা! এখন যদি আমার এই কন্যা এই বালাসন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তিতে চণ্ডালের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তোমরা নিমন্ত্রণ করিও। আমি সেই চণ্ডালান্ন গ্রহণ করিয়া আসিব। যাহার পুষ্পমূর্ত্তি এক সময়ে যমকে নিয়মভঙ্গ করিতে বাধা করিয়াছে, আমি তাহাকেই কিনা সাধারণ তৈজসপত্রের ন্যায় দানের বস্তু জ্ঞান করিয়াছি!"

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে প্রতিনিবৃত্তা হইতে আদেশ করিলেন। আশীর্ব্বাদ-প্রণামাদি কার্য্য সেই প্রান্তর মধ্যে একরূপ নিঃশব্দে শুধু ইঙ্গিতে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পিতামহী একখানি শালতী ভাড়া করিলেন। দেশবাসীর অজ্ঞাতসারে, পশু পক্ষীর অলক্ষ্যে, কাহার নাম লইয়া জানি না, তিনটি পরস্পরাশ্রয়-কারিণী অনন্যসহায়া অবলা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

(১৮)

দ্বিতীয় দিবস রাত্রির প্রথম প্রহরের পর সকলে কালীঘাটে উপস্থিত হইল। পিতামহী পঞ্চাশটি মাত্র টাকা পথের সম্বলস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে আশী টাকা তাঁহার নিজস্ব বোধে তিনি পিতাকে দিতে চাহিয়াছিলেন,

টাকা কয়টি তাহারই বায়াবশেষ। দাক্ষায়ণী যে সঙ্গিনী হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। তিনি মনে করিয়া ছিলেন—দুই দুইটি বিধবা স্ত্রীলোক—পথের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে তাঁহাদের কাশী-বাসের অন্ততঃ তিনটে মাসের সঙ্কুলান হইবে। কাশীতে গিয়াই তিনি গোবিন্দ-ঠাকুরদাকে পত্র লিখিবেন। পত্র পাইলেই ঠাকুরদা তাঁহার কাশীতে সচ্ছন্দবাসের ব্যবস্থা করিবেন। দেশে তাঁহার কাছে যাইবার কথা প্রকাশ করিলে, পাছে ঠাকুরদা বাধা দেন, এই জন্য তিনি তাঁহাকেও সঙ্কল্পের কথা শুনান নাই।

যদি পত্র পাইয়া ঠাকুরদা টাকা পাঠাইবার কোনও ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! দুই দুইটা বিধবা। তাহাদের জীবনের মূল্য কি? যদি অন্নাভাবে উপবাসে ভারতের পবিত্রতম তীর্থে তাহাদের মৃত্যুই ঘটে, সেত হিন্দু বিধবার পরম ভাগ্যেরই কথা!

দয়াদিদির সঙ্গে কাশীবাস সম্বন্ধে পিতামহীর উক্ত পরামর্শ স্থির হইয়াছিল। দয়াদিদিও পিতামহীর কথায় সায় দিয়াছিলেন।

কিন্তু এখনত আর সে ব্যবস্থায় চলিবে না! তাঁহারা না হয় উপবাসে দুই একদিন অতিবাহিত করিতে পারেন, কিন্তু বালিকাকে তাঁহারা কেমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপবাসী রাখিবেন?

শালতীতে যে সময় দাক্ষায়ণী ঘুমাইতেছিল, সেই সময় পিতামহী দয়াদিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হাঁ দয়া, নাতবৌ সঙ্গে চলিল—এ সামান্য সম্বল লইয়া কি সাহসে কাশী যাইব?"

দয়াদিদি উত্তর করিল—"কাশী প্রাপ্তি কি আর আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে?"

"তাইত দেখিতেছি।"

"এখন ত ঘরের মায়া ত্যাগ করিয়াছ। প্রথমতঃ কালী-ঘাটে চল। তারপর দেখা যাক্, মা আমাদের কোথায় লইয়া যায়।"

"তাইত দয়া, কোথায় যাইতেছি, তাতো বুঝিতে পারিতেছি না!"

"বুঝিবার দরকার কি ঠাকুর-মা? তুমি ত আর ঘরে ফিরিবে না, মনস্থ করিয়াছ?"

"ঘরে আর ফিরিব না।"

"তোমার নাতবৌএর যদি শ্বশুর-ঘর করা অদৃষ্টে থাকে?"

"থাকে, সে যাইবে।"

"তা হলে তুমি আর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেছ না?"

"তাহারা সম্পর্ক রাখিতে দিল কই, দয়া!"

"তবে তুমি স্থানের ভাবনা ভাবিতেছ কেন? সন্ন্যাসিনীর থাকিবার স্থানের অভাব কি!"

"সে তোর আমার বেলায় না হয় হইল। এই যে ননীর পুতুল সঙ্গে চলিল—"

"ঠিক এমনি সময়ে দাক্ষায়ণী যেন ঘুমাইতে ঘুমাইতে বলিয়া উঠিল—"আমার জন্যও তোমাকে ভাবিতে হইবে না ঠাকুর-মা!"

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"তাহার কথা শুনিবামাত্র আমরা দুইজনেই চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, যেন কপটনিদ্রিতা চির-জাগরিতার কাছে আমরা জাগিয়া ঘুমাইতেছি। দাক্ষায়ণীর এক কথাতেই আমাদের ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল।

পিতামহী বলিলেন—"তাইত নাতবৌ, তা হলেত তুই আমাদের সকল কথা শুনিয়াছিস্!"

"শুনিয়াছি ঠাকুর মা।"

দয়াদিদি বলিল—"ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুমি জাগিয়া ঘুমাইতেছ!"

"ঘুম চোখে কিছুতেই আসিতেছে না।"

পিতামহী বলিলেন—"তুই ভাই, আমাদের আসিবার সময়ে বাপমাকে জড়াইয়া ধরিলি না কেন?"

"জড়াইতে দিল কই! আমি একটা কথা কহিতে না কহিতে তাহারা তোমার সঙ্গে আমাকে যাইতে বলিল।"

"তুই যাইব না বলিলি না কেন?"

দাক্ষায়ণী এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। পিতামহী উত্তর না পাইয়া মনে করিলেন, দাক্ষায়ণী বড় অনিচ্ছায়, শুধু পিতা-মাতার শাসনে তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তাইত ভাই, তোর বাপমা কি নিষ্ঠুর! পণ্ডিত হইলেই কি মানুষকে নির্ম্মম হইতে হয়!"

"বাবাকে নিষ্ঠুর কেমন করিয়া বলিব! বাবা ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিয়াছিল।"

"তবে ?"

"মা থাকিতে দিল না।"

"মা দিল না !"

"না। বলিল, বিদেশে আমাকে তোমার সেবা করিতে হইবে।"

"কেন, আমার কি সেবা করিবার লোক নাই ?"

"কই ?"

"কেন তোর দয়া ঠাকুরঝি কি করিতে সঙ্গে চলিয়াছে ?"

পিতামহী দয়াদিদির সঙ্গে দাক্ষায়ণীর সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তবে ক্ষুদ্র বালিকার মুখে ঠাকুরঝি কথাটা শোভা পায় না বলিয়া দয়াময়ী তাহাকে দিদি বলিতে উপদেশ দিয়াছিল।

দাক্ষায়ণী বলিল —"দিদি তোমাকে রাঁধিয়া দিবে, তুমি খাইতে পারিবে ?"

"তুই আমার সঙ্গে রাঁধুনী চলিয়াছিস নাকি ?"

"নয় ত কি ?"

"এই বিধবা বুড়ীর পেট পুরাইতে তোকে হাতে পুড়াইয়া রাঁধিতে হইবে !"

"আমি আর দিদি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই যে ঠাকুরমা !"

পিতামহী এ কথার কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিশ্বাস শব্দ দাক্ষায়ণীর কাণে পশিল। সে অমনি বলিয়া উঠিল- "তবে কি তুমি আমারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে না ?"

এ প্রশ্নেরও পিতামহী উত্তর করিলেন না। তিনি আমার পিতাকে উদ্দেশ করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"হা হতভাগ্য সন্তান !"

মনের আবেগে পিতামহী পুত্রকে তিরস্কারচ্ছলে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন ; দাক্ষায়ণী বাধা দিয়া বলিল— "ঠাকুরমা! মা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, বাবা ও মার নিন্দা কখন করিও না—কাহারও মুখে তাঁহাদের নিন্দা শুনিও না।"

এ বাবা ও মা কে, তাহা উভয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না। দয়াদিদি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাক্ষায়ণীর কথা শুনিতেছিল ; এইবারে সে পিতামহীর হইয়া উত্তর করিল — "ঠাকুরমা যে তাদের মা !"

"আর আমি যে তাদের বউ !"

"কেহ যদি তোর সুমুখে তাদের নিন্দা করে, তাহলে তুই কি করবি ?"

"তখনি সে স্থান ত্যাগ করিব।"

"আমরা যদি নিন্দা করি ?"

"কেন তোমরা নিন্দা করিবে ? বাবা ও মা আমাকে ত দেখে নাই। আমিও তাদের দোষ পাই নাই। তখন তোমরা কেন তাদের নিন্দা আমার কাছে করিবে ? তোমাদের অধর্ম হবে না ?"

দয়াদিদি আমাকে বলিয়াছিল —"ভাই! আমি তোমাকে দাক্ষায়ণীর কথা শুনাইলাম, কিন্তু তাহার কথার ঝঙ্কার শুনাইতে পারিলাম না। নিজেও তাহার [illegible] শুনিয়াছিলাম। এমন পিতামহীর সঙ্গে তাহার বাক্যের কথা শুনিতেছিলাম। শুনিয়া বড়ই আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। আনন্দে একটু আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীর কথার ঝঙ্কার শুনিয়া আমার নীরব হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আনন্দের আধিক্যবশে আর একটা কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কথা কহিবার আর একটু উদ্দেশ্য ছিল। তোমাদের হুগলি হইতে আসিবার পর হইতেই ঠাকুরমার মর্ম্মবেদনা একরূপ অসহ্য হইয়াছিল। আমি তোমাকেও না জানাইয়া বাসা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম। মনে করিও না যে, স্বেচ্ছায় আসিয়াছি। তোমার বিবাহের ঘটকালী করিতে গিয়া আমি পুরস্কারের উপর পুরস্কার পাইয়াছি। তার মধ্যে একটা পুরস্কার ঠাকুরমায়ের সঙ্গ। হুগলিতে বড় সৌভাগ্যে তার সঙ্গে আমার দেখা। নহলে তোমার বাপের মতন না-হিন্দু, না কৃশ্চান, না কিছু আবার কোন বাবুর ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করিতে হইত। বাপমায়ের পুণ্যে ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ। ভাই! সে বড় অনুরোধের নিমন্ত্রণ—আমি এড়াইতে পারিলাম না।

"ঠাকুরমা'র দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়া দেখি, তোমরা তার মনে বড়ই ঘা দিয়াছ। অমন ধীর শান্ত মেয়ে আমি দেখি নাই। তোমরা তাহাকে চঞ্চল করিয়াছ।

"স্বামীর নরকের ভয়ে ঠাকুর-মা চঞ্চল। ব্রাহ্মণের অকার্য্য ম্লেচ্ছের চাকুরি। যে বাপ মুখে রক্ত তুলিয়া সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে, পূজারীর দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া হাকিমের আসনে বসাইয়া দিয়াছে, সেই সন্তান পিতৃসত্য পালন করিল না।

"তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া অবধি একদণ্ডের জন্য ঠাকুর মার মম্মব্যথার বিরাম দেখি নাই। দাক্ষায়ণীকে ঘরে আনিবার পর হইতে সে ব্যথা আবার চতুর্গুণ বাড়িয়াছে।

"বিবাহের যেমন অনুষ্ঠান, দাক্ষায়ণীর বিবাহ ব্যাপারে ঠাকুরমা সে অনুষ্ঠানের কিছুই দেখিতে পান নাই। গোবিন্দ ঠাকুর দা'র উৎসাহে, সার্ব্বভৌম মশায়ের সত্য কথায়, গ্রামবাসীদের আশ্বাস বাক্যে—উপায়ান্তর না দেখিয়া—দাক্ষায়ণীকে তিনি পৌত্রবধূ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার হাতের রান্না মুখে দিয়াছেন। কিন্তু সেকালের গৃহিণী এখনও বুঝিতে পারেন নাই, হরিহরের সঙ্গে দাক্ষায়ণীর কখন কেমন করিয়া বিবাহ হইল!

"সেই সমস্ত মর্ম্মবেদনার কথা আমি শুনিয়াছি। শুনিয়া অশ্রুজল ফেলিয়াছি। শূদ্রের মেয়ে তোমাদের বিবাহ-রহস্য যখন বুঝি নাই, তখন ঠাকরমাকে সান্ত্বনা দিবারও কোনও উপায় দেখি নাই।

"অথচ কয়দিনের একত্রবাসে দাক্ষায়ণীর উপর ঠাকুর-মার যে মমতা পড়িয়াছে, ভাই, আমার মনে হয়, তোমার পিতা, এমন কি তুমি পর্য্যন্ত সে মমতা পাও নাই।

"অন্যান্য কারণের মধ্যে পাড়াপড়সীর কাছে মুখ দেখানোর লজ্জা হইতে আত্মরক্ষাও তাঁহার গৃহত্যাগের একটা কারণ ছিল।

"একদিনের নির্জ্জন কথায় আমি দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তোমার ও সেই সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্ক বুঝিয়াছিলাম। সেই দাক্ষায়ণীর সঙ্গে ঠাকুরমা'র সম্পর্ক লইয়া কথাবার্ত্তায় আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। সম্পর্কটা ঠাকুরমাকে পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরণকাল বৃদ্ধা যাহাকে পথের সঙ্গিনী করিতে চলিয়াছে, যাহার হাতের রান্না খাইয়া তাহাকে জীবনরক্ষা করিতে হইবে, সে তার কে, এটা বুড়ীকে বুঝাইতে না পারিলে আমারই বা মনে শান্তি আসিবে কেন? এই জন্য আমিও আর নীরব না রহিয়া তাহাদের কথায় যোগ দিয়াছিলাম।

"তাহার কথার ঝঙ্কারে নিরস্ত না হইয়া আমি আবার বলিলাম—'তা যা হইবার হইবে, আমরা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা করিতে ছাড়িব না। যখন নিন্দার কাজ করিতে পারে, তখন আমরা তাহা বলিতে পারি না?'

"এই কথা যেমন বলা, অমনি দাক্ষায়ণী, পাগলিনীর মত, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে 'ছই' হইতে বাহির হইবার জন্য স্থানত্যাগ করিয়া ছুটিল। উঠিতে গিয়া তাহার মাথায় ছইএর আঘাত লাগিল। বালিকা তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিল না। সে আমাকে ডিঙ্গাইয়া ঠাকুরমাকে ডিঙ্গাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

"ঠাকুরমা বালিকাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাকে দুইহাতে বেষ্টন করিয়া বক্ষের মধ্যে টানিয়া বলিলেন—'দাক্ষায়ণি তুই ছাড়া আপনার বলিবার আমি আর কাহাকেও দেখিতেছি না। তুইও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবি?'

"আমি তাহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিলাম। আর কখন তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইবে না শুনিয়া, বালিকার ক্রোধ দূর হইল।

"ভাই! মন-মুখ এক না হইলে সত্য হয় না। পতি ধর্ম্মে সতীর রহস্য পর্য্যন্ত সয় না।

"সেই দিন হইতে আর একটি দিনের জন্যও আমি তোমাদের কথা লইয়া দাক্ষায়ণীকে রহস্য করি নাই।

"ঠাকুরমাও তখন হইতে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মনে সাহস আসিল। তিনি বুঝিলেন, পবিত্রা কুলবধূর আবির্ভাবে, তাঁহার অঙ্গীকারমুক্ত স্বামীর স্বর্গের পথ মুক্ত হইয়াছে। আঁচলে তীর্থ বাঁধা পড়িয়াছে। পথের বিভীষিকা মিটিয়াছে।"

* * * *

"যখন কালীঘাটে শালতী পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। মায়ের আরতি হইয়া গিয়াছে। স্থান ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হইতেছে।

"তীরে উঠা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া আমরা সে রাত্রি শালতীতেই মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম।"

(৩৯)

"সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে একটা বিকট চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, অসংখ্য লোক বাঁধাঘাটে জড় হইয়াছে। ঘাট হইতে গঙ্গার জল পর্য্যন্ত পরদায়-ঘেরা একটা পথ প্রস্তুত হইয়াছে। আর সেই পরদার পার্শ্বে অসংখ্য কাঙ্গালী কর্কশ কণ্ঠে "রাণীমায়ীকি জয়" বলিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে।

"বুঝিলাম, কোন ধনি গৃহিণী আজ তীর্থদর্শনে আসিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক। রাণীকে দেখিতে আমার সাধ ছিল না। কৌতূহলপরবশ হইয়া আমি শালতী হইতে তীরে নামিলাম।

"শয়নকালে আমি স্থানপরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। ঘুমের ঘোরে পাছে ব্রাহ্মণকন্যার অঙ্গে পা ঠেকিয়া যায়, সে ভয়ে ছইয়ের বাহিরে পা রাখিয়া আমি একরূপ বহির্ভাগেই শুইয়াছিলাম। ঠাকুরমা ছিলেন ছইএর অপর দিকে। মধ্যভাগে ছিল দাক্ষায়ণী।

"রাণী দেখিবার আগ্রহে আমি তাহাদের দিকে আর লক্ষ্য করি নাই। যেখানে আমাদের শালতী বাঁধা ছিল, ঘাট সেখান হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে।

"তীরভূমি ধরিয়া যেই আমি ঘাটে উঠিতে যাইতেছি, অমনি এক নিদারুণ দৃশ্যে আমার মর্ম্মভেদ হইয়া গেল।

"দেখি—দাক্ষায়ণী ঘাটের পার্শ্বে একস্থানে জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া আছে। বসিয়া আছে বলি কেন, পড়িয়া আছে। এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী তাহাকে ধরিয়া, তাহার মুখেচোখে অঙ্গে জল দিয়া সর্ব্বাঙ্গের কাদা ধুইয়া দিতেছে। সে কেবল দুইহাতে গলার পুঁটুলিটি ধরিয়া আছে!

"আমি ঘুমাই নাই—মরিয়াছিলাম! নইলে দাক্ষায়ণী উঠিয়া আসিয়াছে, আমি জানিতে পারিলাম না কেন? সে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে আমি জানিতাম, কিন্তু সেদিনও সে, অত প্রত্যূষে উঠিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রত্যূষে উঠিয়া সকলের অলক্ষ্যে সে গলার ঠাকুরটির পূজা করিত। শয্যায় বসিয়াই পূজা করিত। কিন্তু সেদিন কি জানি কেন, গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলে তাঁহার পূজা করিতে সে উঠিয়া আসিয়াছিল। এমন সময় অসংখ্য অনুচর ও কাঙ্গালী সঙ্গে লইয়া, পাল্কীতে চড়িয়া কোথাকার রাণী গঙ্গাস্নানে আসিল।

"অনেক লোক- সকলে যে যার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। অন্ধকারে ঘাটের ধারে কোথায় একটি ক্ষুদ্র বালিকা ছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। অথবা পশুগুলা দেখিয়াও দেখে নাই। রাণীর আবরু বজায় রাখিতে ব্যস্ত চাকর দরোয়ানগুলার ঠেলাঠেলিতে বালিকা স্থানের উপর পড়িয়া গিয়াছে! পড়িয়া শরীরের নানা স্থানে আঘাত পাইয়াছে। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী দৈববশে সেখানে উপস্থিত না থাকিলে, পশুগুলার পায়ের তলায় পড়িয়া দাক্ষায়ণীর জীবন থাকিত কি না সন্দেহ।

"আমি দাক্ষায়ণীকে ডাকিলাম। বালিকা তখনও ক্লান্ত। উত্তর দিতে তাহার শক্তি ছিল না। ব্রহ্মচারী হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিলেন।

"আর প্রশ্ন না করিয়া আমি ঘাটের উপর উঠিলাম। ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আমি জ্ঞানশূন্যের মত হইয়াছি। সে কত বড় রাণী একবার আমি দেখিব।

"আমি হাতে পায়ে ভর দিয়া ঘাটে উঠিলাম। সেখান হইতে রাণী দর্শনের সুবিধা হইল না। আমি লোক ঠেলিয়া জলে পড়িলাম। চাকর দরোয়ানগুলা পরদার খুঁটি ধরিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষেরটা কোমর পর্য্যন্ত জলে নামিয়াছিল। আমি সাঁতারিয়া তাকে অতিক্রম করিলাম। একেবারে রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

"দেখি—পরদার ভিতরে কতকগুলা মেয়ে কিল বিল করিতেছে। তাহাদের মধ্যে সধবা-বিধবা দুই আছে। তাহার মধ্যে কোনটা রাণী, কোনটা কে, কিছুই আমি তখন দেখি নাই।

"আমাকে দেখিবামাত্র তাহাদের ভিতর হইতে একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল—"আরে মর্! এখানে কি?"

"সে আমাকে ভিখারিণীই মনে করিয়াছিল। আমি বলিলাম—'ভয় নাই। আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই।'

"সে বলিল—'তবে কি করিতে আসিয়াছিস?'

'তোমাদের মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।'

"এই বলিয়া আমি—যাহা জীবনে কখন করি নাই—টেনে

তীব্র—নারীর পক্ষে অতি তীব্র ভাষায় তাহাদের গালি দিলাম। এখন তাহা মুখে আনিতে লজ্জা করে।

"আমার গালি শুনিয়া সকলে কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হইয়াছে?'

"তাহার মুখ দেখিয়া, কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সেই রাণী। তখনও আমার ক্রোধের তীব্রতার উপশম হয় নাই। আমি উত্তর করিলাম—'পরদা উঠাইয়া কি করিয়াছিস্ দেখিয়া আয়! সতীর বুকে পা দিয়া সতীর রাজ্যে ধন্য করিতে আসিয়াছিস্?'

"তারপর আরও কত কি বলিয়াছিলাম—সমস্ত আমার মনে নাই। তবে আমার মনে আছে, তাহার ঐশ্বর্য্যের ও বৈধব্যের অনুচিত অঙ্গসৌষ্ঠবে আমি যথেষ্ট অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলাম। তাহার নরজন্মে ধিক্কার দিয়াছিলাম।

"অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। তাহার সঙ্গিনীগুলা আমাকে গালি দিবার উপক্রম করিতে না করিতে আমি আবার সাঁতারিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

"বাহিরের অনেক লোক আমার যাতায়াত দেখিল, দারোয়ান-চাকরগুলার কেহ কেহও যে দেখিল না, এরূপ নহে। কিন্তু ব্যাপারটা কি হইল, কেহ বড় বুঝিতে পারিল না। বাহিরের কোলাহলে আমার তীব্র তিরস্কার ডুবিয়া গিয়াছিল।

"ফিরিয়া দেখি, ব্রহ্মচারী তখনও পর্য্যন্ত দাক্ষায়ণীর সুশ্রূষা করিতেছেন। দাক্ষায়ণীও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সে দাঁড়াইয়াছে।

"তাহার অঙ্গে ত আঘাত লাগে নাই; সে আঘাত আমার বুকের একখানা পাঁজরা যেন চূর্ণ করিতেছিল! আমি চোখের জল রোধ করিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—'আমাকে কেন লুকাইয়া চলিয়া আসিলি ভাই? এখনি আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলি!'

"আমার আত্মীয়তার কথা, আমার মুখের 'ভাই' শব্দ শুনিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন—'হাঁ মা! এটি তোমার ক ?'

[illegible]ও পর্য্যন্ত আমার মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই। আ[illegible]র বাক্যে তাহাকে আমার মূর্খ বলিয়াই বোধ হইল। মনে হইল সে দৃষ্টিহীন। তাঁর ব্রহ্মচর্য্যের এখনও কোন ফল হয় নাই। আমি উত্তর করিলাম—'এটি কি শুধু আমার কে? এতক্ষণ তবে কি সুশ্রূষা করিলে ব্রাহ্মণ?'

'সাক্ষাৎ গৌরী।'

"'তাই বলুন। আমি এটিকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি'। কিন্তু ঠাকুর, পথেই বুঝি ইহাকে আজ হারাইতে বসিয়াছিলাম।'

"ব্রাহ্মণ আমাকে কথা শেষ করিতে দিলেন না। বলিলেন—'মা পথে হারাইবার সামগ্রী নয়। সুতরাং মায়ের এ ভূপতনে আক্ষেপ করিও না। সতী আজ মাটিতে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া, কোমল অঙ্গে আঘাত লইয়া পথের কণ্টক দূর করিয়াছেন। পথ আজ মুক্ত।'

"ব্রাহ্মণের আশ্বাস-বাণীর অর্থ বুঝিলাম না। কিন্তু আশ্বাসে মনে আনন্দ হইল। আমি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করাইতে গেলাম, ব্রাহ্মণ প্রণাম গ্রহণ করিলেন না। অগত্যা দাক্ষায়ণীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। এতক্ষণ ঠাকুরমা হয়ত জাগিয়াছেন। উভয়কেই না দেখিয়া হয়ত ব্যাকুল ভাবে আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"ঘাটের নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত অন্তর হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—'একবার দাঁড়াও।'

"ফিরিয়া দেখি, এক বৃদ্ধ ঘাট হইতে নামিয়া তীরভূমি ধরিয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আমি দাঁড়াইতে, বৃদ্ধ আমার নিকট আসিল। এবং দাক্ষায়ণীর আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। পরিচয়ে জানিলাম, সে ব্যক্তি রাণীর কর্ম্মচারী।

"আমি তাহাকে দাক্ষায়ণীর অঙ্গের আঘাত চিহ্ন দেখাইলাম। ইত্যবসরে দেখি, ঠাকুর-মাও শালতী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কাছে আসিয়াছেন।

"ঠাকুর-মা দাক্ষায়ণীর তদবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলতার সহিত আমাকে কতকগুলা প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরেই বৃদ্ধ সমস্ত ঘটনা অবগত হইল। দাক্ষায়ণীর মাথার এক স্থানের ক্ষত হইতে তখনও পর্য্যন্ত অল্প রক্ত পড়িতেছিল।

"বৃদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিল। ঠাকুর-মা সমস্ত দোষ দাক্ষায়ণীর স্কন্ধে আরোপ করিয়া, তাহাকে দুঃখ

করিতে নিষেধ করিলেন। কেন সে গিন্নী-বুড়ীর মত কাহাকেও না জানাইয়া অমন অসময়ে ঘাটে গিয়াছিল। মাটিতে পড়িয়াছিল, তাই বালিকাকে ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে। আদিগঙ্গার খরস্রোতে পড়িলে কি সর্ব্বনাশ যে না ঘটতে পারিত, তাহা কে বলিতে পারিত?

"বৃদ্ধ সেই সময় দাক্ষায়ণীর সঙ্গে ঠাকুর-মার সম্বন্ধের পরিচয় পাইল। তাহার গলার পুঁটুলিটিরও পরিচয় এই সঙ্গে বৃদ্ধ জানিতে পারিল।

"জানিয়া, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা চাহিয়া বৃদ্ধ স্থানত্যাগ করিল।

"এদিকেও দেখি, কোলাহলচীৎকার সঙ্গে লইয়া, রাণী ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

(৪০)

"আমরা ভিখারিণীর পথ ধরিয়াছি, কিন্তু ভিখারিণীর ভাব এখনও ধরিতে পারি নাই। চক্ষুলজ্জায় তিনটি প্রাণী এক সঙ্গে কোনও গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে পারি নাই। পরদিন যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটিবে, এই মনে করিয়া সেদিনের মত মন্দিরের কাছেই এক চটিতে বাসা লইয়াছি।

"দেবী-দর্শনান্তে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা তিন জনে একটা চ্যাটাইএর উপর বসিয়া বিশ্রাম লইতেছিলাম। আমি দাক্ষায়ণীর অঙ্গের কোথায় কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, পরীক্ষা করিতেছিলাম। ইহার পূর্ব্বেও বার দুই তিন পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতেও মনস্তুষ্টি হয় নাই, আবার করিতেছি। আহত স্থানগুলির কোথায় কিরূপ ব্যথা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঠাকুরমা চিন্তান্বিতার মত নীরবে চ্যাটাইএর এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

"এমন সময় সেই প্রাতঃকালের বৃদ্ধ একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আমাদের চটির মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহারা আমাদের দেখিতে পায় নাই। আমি দেখিলাম, সে চটিওয়ালাকে কি বলিল। কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না। চটিওয়ালা কি উত্তর করিল—তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু মনে হইল, তাহারা যেন আমাদেরই অন্বেষণ করিতেছে। দেখি, লোকটা উত্তর শুনিয়া চলিয়া যায়। কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, কেন করিতেছে, জানিতে আমার সাধ হইল। আমি সেই দূর হইতেই বৃদ্ধকে ডাকিলাম। আমাকে দেখিয়াই বৃদ্ধ উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিল—'এই যে মা, তুমি এইখানেই রহিয়াছ!'

"বুঝিলাম, বৃদ্ধ আমাদিগকেই খুঁজিতেছিল। চটিওয়ালা হয় তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই; নয় বুঝিয়াও বুঝে নাই। হয় ত তাহার মনে দুরভিসন্ধি ছিল। চটিওয়ালার প্রতি বৃদ্ধের তিরস্কারে সেটা কতকটা অনুমান করিলাম। এদিকেও আমরা দেখিতেছি, চটিতে অন্যান্য যে সকল তীর্থযাত্রী আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা আহারাদি শেষ করিয়া একে একে চটি পরিত্যাগ করিল। আমরা তিনটি প্রাণীই কেবল অনাথ স্থানাভাবে পড়িয়া আছি। চটিওয়ালা ইতঃপূর্ব্বে বার দুই তিন সেখানে আমাদের রাত্রিবাসের সঙ্কল্প জানিয়া লইয়াছে। এবং সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিবার আশ্বাস দিয়াছে।

"বৃদ্ধের তিরস্কারে চটিওয়ালা, বোধ হইল, যেন মর্ম্মাহতের ভাণ দেখাইল। সে বলিল 'আপনি যে ইহাদেরই খুঁজিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।' 'সুতরাং আমার প্রতি উল্লাসযুক্ত সম্বোধন, আমার পক্ষে আত্মীয়ের আশ্বাস বলিয়াই বোধ হইল।

"তথাপি সে কি কথা কহিবে জানি না। ঠাকুরমার সম্মুখে কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া, আমি উঠিয়া তাহার নিকটে গেলাম।

"বৃদ্ধ বলিল 'মা! তোমাকে খুঁজিতে সারা চটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।'

"আমি বলিলাম—'কেন?'

"একবার রাণী মার সঙ্গে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।'

'কিসের জন্য?'

"'তা' মা আমি বলিতে পারি না।'

"এই সময়ে আমি একবার তাহার সঙ্গিনী স্ত্রীলোকের পানে চাহিলাম। দেখিয়া বুঝিলাম, স্নানের সময় সে রাণীর সঙ্গে ছিল। আমি তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলাম—'কি গো! আমাকে তোরা ধরিয়া জেলে দিবি নাকি?'

"'না মা', রাণী মার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। একবার তোমার সঙ্গে গোটা দুই কথা কহিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন।'

"মুখে যাই বলি, দাক্ষায়ণী ও ঠাকুরমার ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম। আজ চটিতে

বালিকাকে লইয়া রাত্রিবাস করিতেই আমার ভয় করিতেছে। ভয় বলি কেন, রাত্রিবাসের কথা মনে উঠিতেই আমার বুক গুর গুর করিতেছে। কালীঘাট বড় বিষম স্থান। ঠাকুরমার কাছে কিছু টাকাও আছে। চটিওয়ালাকেও বিশ্বাস নাই। মায়ের কাছে প্রাতঃকালে সেই জন্য অবিরাম মাথা খুঁড়িয়া, আমি একটি আশ্রয় চাহিয়াছিলাম।

"স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। মন যাইতেই আমাকে আদেশ করিল। আমি বলিলাম—'চল।'

"ঠাকুর মার কাছে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইলাম। এবং আমার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের চটির বাহির হইতে নিষেধ করিয়া বৃদ্ধের অনুসরণ করিলাম।"

* * * *

"কোথা হইতে কেমন করিয়া এক একটা ঘটনার এরূপ বিচিত্র ভাবে সংযোগ উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দৈব না না বলিয়া থাকিবার যো নাই। তাহার স্বাভাবিক কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ যে নির্ণয় করিতে পারা যায় না এরূপ নহে। কিন্তু করিতে গেলে ঘটনার গাম্ভীর্য্যের যেন অনেকটা হানি ঘটে। তাহার কাব্য-মাধুর্য্যটুকুও বিনষ্ট হইয়া যায়।

"দয়াদিদি বলিয়াছিল—সে দিন অরুণোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত যেন একটা দৈবলীলার স্রোত চলিয়াছিল। সেই অদ্ভুত ঘটনাপরম্পরার মধ্যে আমি যেন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার হাত স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"চটির বাহিরে পা দিয়াই দেখি, চারিজন বেহারা একখানি সুন্দর পালকী চটির সম্মুখে রাস্তায় রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পালকীর পার্শ্বে একজন দরোয়ান।

"বৃদ্ধের আবাহনের ভাবে বুঝিয়াছিলাম—পালকী আমাকেই লইয়া যাইবার জন্য। তথাপি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ রাণীর পালকী এখানে কেন?'

"স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—'তোমাকেই লইয়া যাইবার জন্য।'

"আমি তাহাকে নিজের মলিন বস্ত্র দেখাইয়া বলিলাম—'ঝিকে কি তামাসা করিবার জন্য তোমাদের রাণী এই পালকী পাঠাইয়াছেন। পদব্রজে চল—আমি পালকীতে উঠিব না!'

"বৃদ্ধ বলিল—'রাণী মা'র আদেশ। আপনি না উঠিলে আমাদিগকে তিরস্কার পাইতে হইবে। বিশেষতঃ আমাদের বাসা এখান হইতে নিতান্ত নিকটে নয়।'

"আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—'তারপর? কাল যখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইব?'

"স্ত্রীলোকটি বলিল—'তুমি প্রবেশ কর। আমি পালকীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেছি। কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না।'

'আমাকে উঠিতেই হইবে?'

'উঠিতেই হইবে।'

'তবে শুন, যদি একেবারে বাড়ীর অন্দরে পালকী লইয়া রাণীর সম্মুখে দ্বার মুক্ত কর, তবেই আমি উঠি, নহিলে উঠিব না।'

"বৃদ্ধ বলিল—'তাহাই হইবে।'

"আমি পালকীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।"

* * * *

"কিছুক্ষণ ধরিয়াই আমি চলিতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই বদ্ধ পালকীর ভিতরে বসিয়া আমি রাণীর বাসার দুয়ারে পৌঁছিবার আশা করিতেছি। কিন্তু কই এখনও ত পালকীর গতি ও বেহারাদের চীৎকারের বিরাম হইল না! এ তবে আমি কোথায় চলিতেছি! নিতান্ত নিকটে নয় কেন, রাণীর বাসা চটি হইতে যে অনেক দূর! তাইত! পৌঁছিয়া রাণীর সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ করিয়া চটিতে ফিরিতে যে রাত্রি হইবে! ঠাকুরমা যে চিন্তাভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন! তাঁহাকে ত কোন কথা বলিয়া আসিতে পারি নাই!

"ভীত হইয়া আমি পালকীর দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। খুলিতেই—কি আশ্চর্য্য!—দেখি, ব্রহ্মচারী পালকী হইতে কিছু দূরে পথ ধরিয়া বিপরীত মুখে চলিয়াছেন। দরজা খুলিতেই তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়া গেল। আমি দুই হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি অমনি হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও মুখ ফিরাইয়া গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন! আপনা আপনি মনে আশ্বাস আসিল। আমি একবারে দরজা বন্ধ করিলাম।

"অল্প দূর যাইতে না যাইতেই এবারে আমি বুঝিতে

পারিলাম যে, আমি এক কোলাহলপূর্ণ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি।

"দ্বার পার করিয়া, উঠান পার করিয়া, জনকোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া বেহারারা যে স্থানে পালকী রাখিল, সে স্থান নিস্তব্ধ।

"পালকী ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতে বাহির হইতে কে দরজা খুলিল। এবং অতি মৃদুভাবে আমাকে বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিল।

"বাহিরে আসিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তিনি রাণী। প্রাতঃকালে তাঁহাকেই আমি অতি তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলাম।

"সেখানে তাঁহার পরিচারিকা অথবা আত্মীয়ের মধ্যে কেহ ছিল না। বেহারারা পালকী লইয়া চলিয়া গেল। সুতরাং দুই জন ভিন্ন আর সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি রহিল না।

"আমাকে বাহিরে আসিতে বলিয়াই রাণী চুপ করিয়াছেন! আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া;—তিনি কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—তাঁহার মুখেও একটি কথা নাই।

"তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমাকে আয়ত্তে আনিয়া তিনি যেন প্রাতঃকালের গালির যোগ্য প্রতিশোধের চিন্তা করিতেছেন।

"কালীঘাট সহর—আমি দরিদ্র আর সে রাণী বলিয়া—প্রকাশ্য স্থানে আমার উপর তাহার অত্যাচারের সাহস নাই। তাই হয় ত মিষ্ট বাক্যের নিমন্ত্রণে আমাকে সে নিজের অধিকারে আনয়ন করিয়াছে।

"রাণী যখন কথা কহিল না, তখন আমিই কথা কহিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—'লোক পাঠাইয়া আমাকে কি জন্য আনাইলে রাণী?'

"যে স্ত্রীলোকটি আমাকে আনিতে গিয়াছিল, সে ঠিক এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। পালকীর সঙ্গে সে ছুটিতে পারে নাই—বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল।

"সে আসিয়া আমাদিগের তদবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'মা! বহুকষ্টে বাহির করিয়াছি। সারা কালীঘাট তন্ন তন্ন খুঁজিয়াছি।'

"রাণী এইবারে কথা কহিল; স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—'দেওয়ান?'

"স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—'দেওয়ান এবং সঙ্গীগুলিকে আগুলিতে চটির দোরে দরোয়ানকে লইয়া বসিয়া আছেন।'

'শীঘ্র উপরে গিয়া আমার ঘরে ইঁহার বসিবার আসন রাখিয়া আয়।'

"সে চলিয়া গেলে, আমি আবার আমাকে আনানো সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। স্ত্রীলোকটির উত্তরে আমার মনে ভয় ও ভরসার দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তবে আসনের কথায় ভরসাই এখন মনোমধ্যে প্রবল হইয়াছে।

"রাণী আমার প্রশ্নে এবারে একটু হাসিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘশ্বাস। আমি বড়ই বিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিলাম।

'দয়া দিদি! আমাকে চিনিতে পারিলে না?'

"আমি আবার চাহিলাম—আবার চাহিলাম—কই! কে তুমি? কে তুমি?—আমার আত্মীয়? চক্ষু মুদিয়া রাণীর মুখশ্রীকে মস্তিষ্কপথে পাঠাইলাম। সে পূর্ব্ব জীবনের লুপ্ত স্মৃতিকে টানিয়া আনিতে মস্তিষ্কের প্রতি বিবরণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল—কে তুমি, ভিখারিণীকে আয়ত্তে পাইয়া সম্পর্কের পীড়নে তাকে নিষ্পীড়িত করিতে রাণীরূপে তার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছ?

'চিনিতে পারিলে না—পারিলে না দয়াদিদি?'

'নন্দরাণী!'

"দেখিতে দেখিতে নন্দরাণীর গণ্ড চক্ষুজলে ভাসিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টি জলে অবরুদ্ধ হইল। পরস্পরে বাহু পার্শ্বে আবদ্ধ—পরস্পরের স্কন্ধে পরস্পরের নির্ভরে—বহুক্ষণ আমরা উভয়েই সংজ্ঞাহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মকাণ্ড

[শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

সুখের বিষয়, বঙ্গে অদ্বৈতবাদের আলোচনায় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মনোনিবেশ করিতেছেন, ইংরাজরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তীর শান্তিময়ী শীতল ছায়ার আশ্রয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সুপ্রতিষ্ঠার মঙ্গল মুহূর্ত্তে হিন্দু সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ অদ্বৈতাত্মভাবের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি ধীরে ধীরে আবার আকৃষ্ট হইতেছে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অনন্ত বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চের নিষ্প্রপঞ্চ-অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনাবিল সত্তায় আত্মসত্তার উপলব্ধি করিবার জন্য একটা মহতী জাতীয় আকাঙ্খার উন্মেষণে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে আশার আলোক ফুটিয়া উঠিতেছে, দেখিয়া কাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার না হয়? এই অদ্বৈতবাদের অনুশীলনরূপ বঙ্গে হিন্দু জাতীয় জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার শুভদিনে অদ্বৈতবাদের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে কর্ম্মের অস্তিত্ব থাকে না, সংসার চলে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম লুপ্ত হয়, সমাজবন্ধন শিথিল হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের পরিপুষ্টি প্রবণতার ব্যাঘাত করে, এই প্রকার বহুতর আপত্তি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে সত্য কি না তাহার পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক; তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে অদ্য তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমে দেখা যাক, অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে কি বুঝাইয়া থাকে?—অদ্বৈতবাদ বলে—জীব ও ব্রহ্ম এক; ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু; ব্রহ্মের আদি, মধ্য বা অন্ত নাই—তাহা দেশতঃ কালতঃ সর্ব্বপ্রকারে পরিচ্ছেদরহিত; তাহা চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দাত্মক; এই ব্রহ্ম, মায়া বা অজ্ঞানবশতঃ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাসমান হয়, ইহাই হইল সংসার; অর্থাৎ যাহা পরমার্থ, সৎ, আনন্দময় ও চৈতন্যস্বরূপ, তাহাকে বিনাশী, দুঃখময় ও জড়রূপে যে বুঝা ও তদনুসারে এই আনন্দের সীমাতীত সাম্রাজ্যে অগ্রে পশ্চাতে মধ্যে আশে পাশে ভিতরে বাহিরে শোকতাপ, জরাব্যাধি, জন্মমৃত্যু ও হাহাকারের যে ভীষণ বিপ্লব সৃষ্টি করা, তাহাই এই অনাদি মায়া ও অজ্ঞানের কার্য্য। —এই মায়া বা অজ্ঞান—অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারিলেই জীব কৃতকৃত্য হয়, তাহার আত্মাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ব্রহ্মভাব জাগিয়া উঠে, দুঃখের সংসার তাহার কাছে ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্টির ন্যায় সদ্যঃ বিলীন হইয়া যায়, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদ। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত যদি হৃদয়ে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে মানসিক অবস্থা আমাদের কিরূপ হইয়া দাঁড়ায়? অদ্বৈতবাদের বিরোধিগণ বলিয়া থাকেন যে, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমাদের আর সংসারে কোন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। আমার আত্মাই যদি ব্রহ্ম হয় এবং ব্রহ্মই যদি জগতে একমাত্র সদ্‌বস্তু হয়, তাহা হইলে কার্য্য, কর্ত্তা ও করণ এই তিনটি বস্তুই মিথ্যা হইয়া পড়ে। কেন কার্য্য করিব—কিসের জন্য কার্য্য করিব? কার্য্য ও যেমন মিথ্যা, কার্য্যের ফলও সেইরূপ মিথ্যা; আবার সেই সেই ফলের ভোক্তাও তদ্রূপ মিথ্যা। তখন মিথ্যার জন্য মিথ্যা কার্য্য করিয়া লাভ কি? অদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যই মনুষ্য-জীবনের সার। সেই কার্য্য করিবার অনুরাগ, কার্য্যের জন্য উৎসাহ, কার্য্য করিয়া সন্তোষ, এই সকলই যদি অদ্বৈত-ভাবনার দ্বারা উন্মূলিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই লুপ্ত হয়, মানুষ জীবিত অবস্থাতেই জড়পিণ্ডরূপে পরিণত হয়, জগদীশ্বরের প্রপঞ্চরচনা-শক্তির সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে। যে অদ্বৈতাত্মভাবনা মনুষ্যের যুগযুগান্তব্যাপিনী তপস্যার পরিণতি-স্বরূপ, তাহা যদি এই সুশৃঙ্খলা-নিয়ন্ত্রিত সমাজের মূলভিত্তিকে শিথিল করে, তবে তাহা মনুষ্যসমাজের মধ্য হইতে যত শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, ততই আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় হইবে—ইত্যাদি।

এইত গেল, অদ্বৈতবাদের বিরোধিসম্প্রদায়ের কথা। ইহা যে আজই শুনা যাইতেছে, তাহা নহে; যে দিন হইতে অদ্বৈতাত্মভাবনা হিন্দুসমাজে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার প্রতিকূলে এই জাতীয় অনেক কথা দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের মুখকমল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, বড় বড় পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়া, ভারতের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতেছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বিদিত আছেন।

অদ্বৈতাত্মজ্ঞান যে দ্বৈতভাবনা ও তন্মূলক ক্রিয়াকলাপের মূলোচ্ছেদকারী, তাহা অদ্বৈতবাদীরও অঙ্গীকৃত সিদ্ধান্ত, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই; কিন্তু তাই বলিয়া এই অদ্বৈতাত্মজ্ঞান যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বা বিহিত ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবহারভূমিতে বিরোধী, তাহা অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত নহে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝার দরকার। অদ্বৈতবাদের ব্যাবহারিক ভূমি ও পারমার্থিক ভূমির পার্থক্য ও তন্মূলক সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, অদ্বৈতবাদের অনুশীলনে ও সাধনায় যে, মনুষ্যসমাজের মধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইতে পারে, তাহা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করেন না। অপরপক্ষে ব্যাবহারিক দশায় এই অদ্বৈতাত্মতত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞান মনুষ্যসমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে; মনুষ্যহৃদয়ের আজন্মলব্ধ সঙ্কীর্ণ আমিত্বের ক্রমিক প্রসারসাধন করিয়া, সাম্যবাদ ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা মনুষ্যজাতির মধ্যে দেবভাবকে উন্মেষিত করে, ইহাও অদ্বৈতবাদীর দৃঢ়বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যে, যুক্তি ও প্রমাণের দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাহাই এক্ষণে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ব্যাবহারিক, পারমার্থিক—এই দুইটি সত্তার স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। একটি লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারাই প্রথমে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক স্বত্তার স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। আজকাল পাঠশালা বা স্কুলের ছাত্রগণ অতি শৈশবেই ভূগোল শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। এই বালকগণকে আমরা যখন দিক্ সম্বন্ধে প্রথমশিক্ষা দেই, তখন তাহাকে বুঝাইয়া থাকি যে, যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, তাহাকে পূর্ব্বদিক্ কহা যায়, আর যে দিকে সূর্য্যের অস্ত হয়, তাহাকে পশ্চিমদিক কহা যায়। বালকের এই শিক্ষাকে আমরা ব্যাবহারিক শিক্ষা বলিতে পারি। কারণ, সূর্য্য সম্বন্ধে পারমার্থিক শিক্ষা এই যে, সূর্য্য বাস্তবপক্ষে উদিতও হয়েন না—তাঁহার অস্তও হয় না; কিন্তু আমাদের ব্যবহারের অনুরোধে আমরা তাঁহার উপর উদয় ও অস্তের আরোপ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি, সূর্য্য উদয়াস্তরহিত, ইহা আমার কাছে বাস্তব সত্য হইলেও এবং এই সত্যের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও, আমি তুমি অন্যান্য সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকি যে, সূর্য্যের অস্ত হইলে আমি অমুক কার্য্য করিব, সূর্য্যের উদয় হইলে, আমি অমুক কার্য্য করিব। আমি সূর্য্যের উদয় হইতেছে বা অস্ত হইতেছে, তাহা দেখিয়া থাকি; দেখিবার পর আমাদের কাহারও মনে এরূপ জ্ঞান হয় না যে, এই সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত বিষয়ে আমার যে জ্ঞান হইল, এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক বা ইহা বাধিত। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, এই সংসারক্ষেত্রে কার্য্যের ও সংকীর্ণ সংস্কারের অনুরোধে যাহা বাস্তব সত্য, তাহাকে ব্যবহার রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ না করাইয়া, যাহা ব্যাবহারিক সত্য তাহাকেই লইয়া আমরা আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, হৃদয়ের বিশ্বাস আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া প্রতিভাসমান হইলেও, তাহা আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানের উৎপত্তি বা কার্য্যকারিতাবিষয়ে কোন প্রকার বাধা প্রদান করে না।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক্।—আমরা অকারাদি শব্দের পরিবর্ত্তে লিপি বা রেখার ব্যবহার করিয়া থাকি। এই লিপি ও রেখা যে বাস্তব অকারাদি শব্দ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা আমরা সকলেই বুঝি এবং সেইরূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকি। এই সকল লিপি ব রেখা সমষ্টিকে কিন্তু আমরা অভ্যাসবশতঃ বর্ণাত্মক শব্দসমষ্টি হইতে এমনই অভিন্নভাবে বুঝিতে শিক্ষা করিয়াছি যে, তাহার বশে আমরা ব্যবহারকালে ঐ সকল লিপি বা রেখাগুলিকে বর্ণসমষ্টি হইতে অভিন্ন বলিয়াই বুঝিয়া থাকি এবং এই ব্যাবহারিক অভেদজ্ঞানই এক্ষণে শিক্ষিতব্যক্তিনিবহের প্রধানতঃ যাবতীয় ব্যবহারের মূলীভূত হইয়া উঠিয়াছে; ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বুঝিয়া থাকেন। প্রকৃত স্থলেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, লিপি ও বর্ণের ভেদ পারমার্থিক হইলেও, উহা আমাদের ব্যবহারোপযোগী লিপি ও বর্ণের

অভেদ জ্ঞানের উৎপত্তি বা কার্য্যকারিতা শক্তির ব্যাঘাত করিতে পারিতেছে না। এই প্রকার ব্রহ্মাত্মৈক্য-সিদ্ধান্ত, পরমার্থিক হইলেও, উহা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরগত ব্যাবহারিক ভেদজ্ঞানের আপাততঃ বিরোধী হইতেছে না; এবং এই ভেদজ্ঞানের কার্য্যকারিণী শক্তিরও কোন প্রকার ব্যাঘাত করিতেছে না। এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সেই অভেদাত্মজ্ঞান, পরিপক্কতা লাভ করিয়া, অনাদিসঞ্চিত এই দ্বৈত-বাসনার মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত প্রমাণ, যুক্তি ও শাস্ত্রের সাহায্যে অদ্বৈতজ্ঞান, আমাদের কচিৎ কদাচিৎ উৎপন্ন হইলেও, তাহা আমাদের ভেদজ্ঞানমূলক জাগতিক ব্যবহারনিচয়েরও কোনপ্রকার বিরোধী হইতে পারিবে না,—ইহা স্থির।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই অভেদ জ্ঞান লইয়া আমরা কি করিব?—এই অভেদজ্ঞান সত্য হইলেও, ইহার অনুশীলন করিয়া, আমাদের অর্থাৎ ব্যাবহারিক জীবনিবহের লাভ কি?—সংসারেই আমাদিগকে যখন থাকিতে হইবে, তুমি ও আমি পৃথক্ জ্ঞান,জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা পৃথক্—এই জাতীয় জ্ঞান ছাড়া যখন একপদও আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই অপার অতল চিন্ময় আনন্দময় ও সত্তাময় পরব্রহ্মরূপ মহাসাগরে তুমিত্বের ও আমিত্বের বিসর্জ্জন দিয়া, এক হইয়া, চিদানন্দ-ঘনভাবে মিশিয়া যাওয়া যখন একেবারে একসময়ে সকল জীবের পক্ষে অসম্ভব, তখন তাহা ভাবিয়া, বা তাহার প্রচার করিয়া, এই সহস্র সহস্র বৎসরের জ্ঞান ও তপস্যার পরিণতিস্বরূপ মানবীয় সমাজের সুশৃঙ্খলতার বিরোধী, একটা ভাবময় সাম্রাজ্য সৃষ্টিদ্বারা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া, মানুষের কি লাভ হইবে? সমাজের কি উন্নতি হইবে? মানুষের কোন্ উপকার সাধিত হইবে?

এই প্রকার প্রশ্ন-সমষ্টির উত্তরপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদিগণ যাহা বলিয়া থাকেন, আমরা এইবার তাহারই অবতারণা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়টি স্থির করিতে হইবে যে, মানুষ কি চায়? এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়—মানুষ চায় সুখ; আর তারই সঙ্গে চায়—দুঃখ-নিবৃত্তি (যাহা বর্ত্তমান দুঃখ তাহার নিবৃত্তিই যে কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি, তাহা নহে; যে দুঃখ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহারও নিবৃত্তি বা নিবৃত্তির সাধন-সম্পাদন)। এই সুখ, বা দুঃখ-নিবৃত্তি, যে কেবল মানুষেরই পুরুষার্থ, তাহা নহে; নিম্নতর স্তরের জীব হইতে উন্নততম জীবমাত্রেরই ইহা পুরুষার্থ। এই সুখ বা দুঃখ-নিবৃত্তির—যাহা সাধন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিবার জন্য আমরা আজীবন নিজ নিজ সামর্থ্য ও বুদ্ধি অনুসারে চেষ্টা করিয়া থাকি; সেই চেষ্টার ফলে, অদৃষ্ট অনুকূল থাকিলে, আমরা অভীপ্সিত সুখলাভ করি, বা সম্ভাবিত দুঃখের নিরাকরণ করিতে সমর্থ হই। আর, অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে, আমাদের চেষ্টা বিফল হয় এবং সেই বৈফল্যপ্রযুক্ত আমরা নূতন নূতন দুঃখের অনুভব করিয়া, আত্মজীবনকে বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। ইহা যে কেবল মানবেরই স্বভাব, তাহা নহে; এক কথায় বলিতে গেলে জীবমাত্রেরই ইহা স্বভাব;—তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এই প্রকার সুখলাভের বা দুঃখনিবৃত্তির সাধনের প্রসার ও সুশৃঙ্খলা যে জাতীয় মানবের যত পরিমাণে বেশী, সেই জাতীয় মনুষ্য আপনাদিগকে অপর জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষা আপনাকে সেই পরিমাণে অধিকতর উন্নত ও সভ্য বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এইভাবে সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির জন্য, আজীবন জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া, আমরা মধ্যে মধ্যে মনের মধ্যে কেমন একটা উপচীয়মান অশান্তির দাহ অনুভব করিয়া থাকি। প্রাণাতিপাতি ব্যবসায় করিয়া, অদৃষ্টবশতঃ নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সুখসাধনকে করায়ত্ত করিবার পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তেই, কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় অতৃপ্তির অবসাদে আমরা যেন মধ্যে মধ্যে আত্মহারা হইয়া থাকি। সুখ ও দুঃখের অতীত, কি জানি কি এক শান্তির আকাঙ্ক্ষা অকস্মাৎ আমাদের হৃদয়ে অভ্যুদিত হইয়া, আমাদিগকে যেন জোর করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে যে—এই যে আমাদের কার্য্যকলাপ—এই যে আমাদের কার্য্যকলাপের লৌকিক সাফল্য—এই যে আমাদের কার্য্য-সাফল্যপ্রযুক্ত চরিতার্থতার অনুভূতি—আত্মসম্মানের উন্মাদনা—সুস্থতার আবেশ—ইহা সকলই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ইহা ছাড়াও কি জানি কি একটা অবস্থা-বিশেষ আছে, যাহা পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে প্রাণে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে; সেই অবস্থা-বিশেষ যে কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার ভাষা আমার আয়ত্ত না হইলেও, অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত

ভাবের শীতল জ্যোৎস্নার কল্পিত আভাস যেন এই অতৃপ্তিময় উন্মাদনাময় নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আমার কার্য্যময় জীবনের প্রচণ্ড নিদাঘের মধ্যে মধ্যে একটি তৃপ্তিময় শান্তিময় সর্ব্বোদ্বেগবিবর্জ্জিত স্বর্গরাজ্যের নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সেই অবস্থাবিশেষের এই প্রকার কাল্পনিক অনুভূতি যাহার হৃদয়ে একবার সমুৎপন্ন হয়, তাহার পক্ষে সময়ে সময়ে এই অভ্যস্ত জীবন সংগ্রামের উপর কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব—অনির্ভরের ভাব—অন্তঃকরণে জাগাইয়া দিয়া, আমাদের জীবনের কার্য্যস্রোতকে অন্য এক প্রকার অনভ্যস্ত অপরিচিত পথের দিকে চালাইবার চেষ্টা করে। ইহা অনেকেই জীবনে অনুভব করিয়া থাকেন ;—তাহা বোধ হয়, অস্বীকার করা যায় না। এই প্রকার মানসিক অবস্থাই আমাদের হৃদয়ে অদ্বৈতচিন্তার প্রথম উন্মেষ। এই উন্মেষ—এই অবিদিতকে বিদিত করিবার ইচ্ছা—এই অচিন্ত্যবস্তুকে চিন্তা সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করাইবার প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ পরিণতি ও ফলের যথাযথ বিচার করিতে পারিলেই আমরা মানব-হৃদয়ে অদ্বৈতানুভূতির আবশ্যকতা ও সফলতা নির্ণয় করিতে পারিব। এই জন্য অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব।

একটি ভিক্ষা

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

কত সাজে সাজি মাগো এই রঙ্গভূমে
করিতেছি অভিনয় তব ইচ্ছা-ক্রমে,
করি কত যাতায়াত ধরি কত বেশ,
বল—বল-মাগো, ইচ্ছা কবে হবে শেষ !
স্থাবর জঙ্গম সাজি ভূচর খেচর,
রত্নাকর-গর্ভে কভু সাজি জলচর,
নগরে বিচরি কভু ভীষণ প্রান্তরে,
পর্ব্বত-কন্দরে কভু সাগরের তীরে।
কভু সাজি রাজা কভু ভিখারী সাজিয়া,
ফিরি দ্বারে দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষার লাগিয়া ;
কভু সাজি সাধু—কভু যোগী—কভু চোর,
আর কত সাজ মাগো, বাকী আছে মোর !

লাল, কাল, সাদা, পীত নানা রঙ্গ দিয়া,
সাজাইলে কত সাজে রঙ্গমঞ্চে নিয়া ;
হাসাইলে কাঁদাইলে নাচাইলে কত—
আর কেন ! ছাড় মোরে পায়ে ধরি মাতঃ !
কভু প্রিয় সমাগমে আনন্দে মগন,
বিরহে তাদের পুনঃ করেছি ক্রন্দন ;
হাসি-ক্রন্দনের মাঝে আসি কত বার
করিয়াছি অভিনয় সংখ্যা নাহি তার !
তুষ্ট হয়ে থাক যদি মোর অভিনয়ে,
মুক্তি দেহ এই ভিক্ষা মাগি সবিনয়ে ;
আর যদি দেখ আমি অক্ষম ইহাতে,
দূর করে দাও মাগো, রঙ্গমঞ্চ হ'তে !

দিবা-স্বপ্ন

[শ্রীমতী সুশীলা সেন]

এক বৃদ্ধ নিভৃতে বসিয়া মৃত্যুর কথা ভাবিতেছিল। পৃথিবীতে সে বহুদিন হইল আসিয়াছে, সংসারের অনেক লাভ-ক্ষতি সে ভোগ করিয়াছে। তাহার দীর্ঘ-জীবনের বহুদর্শিতায় সে বুঝিয়াছিল, জীবনে নূতন পাইবার আর কিছু নাই। চির-বিচিত্র, চির-নূতন জগৎ-সংসার তাহার চক্ষে নিতান্ত পুরাতন ও আকার্ষণহীন ঠেকিত। তাই, সে শ্রান্ত হৃদয়ে মৃত্যুর কথা ভাবিতেছিল।

বাহিরে, বন উপবনে, তখন বসন্তের সাড়া পড়িয়াছে। পুরাতন পৃথিবীর বক্ষকে বসন্ত আবার তাহার বিচিত্র বর্ণের তুলিকা-হস্তে নূতন করিয়া সাজাইতে আসিয়াছে। বর্ণ, গন্ধ ও সঙ্গীতে ধরণী আবার নবযৌবন লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধের ঘরের সম্মুখে একটি কামিনীফুলের ঝাড়ে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে, এবং অসংখ্য ভ্রমর তাহার চারিদিকে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। মৃদুমন্দ দক্ষিণ বায়ু ফুলের সৌরভে সুরভিত। অস্পষ্ট, অবিরাম গুঞ্জনধ্বনি, ফুলের আবেশময় সৌরভ এবং মৃদু-শীতল সমীরণ বৃদ্ধকে যেন আবিষ্ট করিয়া তুলিল; মৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ—তন্দ্রাভিভূত হইল।

তন্দ্রাবেশে সে এক স্বপ্ন দেখিল।

যেন, সে এক বৃহৎ জনহীন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছে। তৃণহীন, অসমতল ভূমি—ঢেউয়ের পর ঢেউ দিগন্তে বিলীন হইয়াছে। চারিদিকের অবারিত শূন্যতা এবং সুগভীর নীরবতার মধ্যে বৃদ্ধ আপন হৃদয়-স্পন্দন শুনিতে পাইল। দিগন্ত-প্রসারিত আকাশে কি যেন একটি অস্ফুট আলোক; তাহা উষার পূর্ব্বাভাস, কি সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকার, বৃদ্ধ তাহা স্থির করিতে পারিল না। সহসা চারিদিকের অস্পষ্টতার মধ্যে সে এক সুস্পষ্ট গম্ভীর বাণী শুনিতে পাইল।

বাণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৃদ্ধ! তুমি কি চাও?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "আমি মৃত্যু চাহিতেছি। জীবনের দীর্ঘপথ চলিয়া আমি শ্রান্ত হইয়াছি, এখন আমি বিশ্রাম চাই।"

অদৃশ্য বাণী কহিল,—"হে বৃদ্ধ! দীর্ঘজীবনে ঈশ্বর তোমাকে যাহা পালন করিতে দিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছ?"

বৃদ্ধ অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিল; পরে কহিল —"আমার শক্তি অনুসারে সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি; যাহা আমার শক্তিতে কুলায় নাই, তাহা অসমাপ্ত রহিয়াছে।"

তখন বাণী হইল,—"হে বৃদ্ধ! তোমাকে আর একবার সুযোগ দিতেছি, যাহার জন্য তোমার জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিয়া এস।"

বৃদ্ধ ভীতকণ্ঠে বলিল,—"হে অদৃশ্য-পুরুষ! আমাকে কৃপা কর। আমি বহুদিন বাঁচিয়াছি, আর আমি বাঁচিতে চাহিনা; এখন মৃত্যুর ক্রোড়ে আমাকে স্থানদান কর।"

সুগভীর কণ্ঠে বাণী ধ্বনিত হইল,—"তবে চাহিয়া দেখ! তোমার বামদিকে ঐ দূরে মৃত্যুর রাজ্য দেখা যাইতেছে; এস! তোমার অভীষ্ট স্থানে তোমাকে লইয়া যাই।"

বৃদ্ধ চাহিয়া দেখিল, অস্পষ্ট আলোকে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। ক্রমে সেই ঘনায়িত অন্ধকারে তাহার চক্ষু যখন অভ্যস্ত হইল, তখন দেখিতে পাইল, প্রান্তরের অনতিদূরে সমুচ্চ শিখর কৃষ্ণকায় এক ভীষণ-দর্শন পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কঠিন, কঠিন তাহার দেহ! পাষাণ বক্ষ ভেদ করিয়া একটি কিশলয়ও সেথায় জন্মায় নাই, একটি পাখীরও হর্ষ-কাকলী সেস্থানের চিরস্থির নীরবতা ভঙ্গ করে না। অধঃ, উর্দ্ধে, কোনও দিকে প্রাণের সাড়া মাত্র নাই। ধূমায়িত কুহেলিকা-জাল সুদূরের সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহমণ্ডিত চিরপরিচিত আকাশকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; কেবল শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, অস্পষ্ট অন্ধকারময়

চিত্রপটে তাহাদের কঠিন কৃষ্ণরেখা-গুলি অঙ্কিত করিতে করিতে উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিয়াছে।

বৃদ্ধ দেখিল, প্রত্যেক শৃঙ্গ হইতে অসংখ্য সোপান-শ্রেণী নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে এবং সেই সোপান বহিয়া একটির পর একটি পথিক নামিতেছে। কেহ যুবা, কেহ বৃদ্ধ, কেহ পুরুষ, কেহ নারী, কেহ সুস্থ শরীর কেহ বা জীর্ণ দেহ। তাহাদের আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত, চক্ষু ঢাকিয়া অন্ধের মত তাহারা সেই বিরাট নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সোপানের পর সোপান নামিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ সহসা অনুভব করিল, সেও কেমন করিয়া সেই পর্ব্বতের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। অত্যুচ্চ-শিখর হইতে নীচের দিকে একবার চাহিল, অন্ধকার শূন্যতা যেন সকল পথ এবং আশ্রয়কে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে! পার্শ্ববর্ত্তী নিঃশব্দ সঙ্গীর দিকে সে একবার চাহিল, তাহার মুখে সুখ কিংবা বেদনার কোনও চিহ্ন —জীবনের পরিচয় মাত্র প্রকাশ নাই।
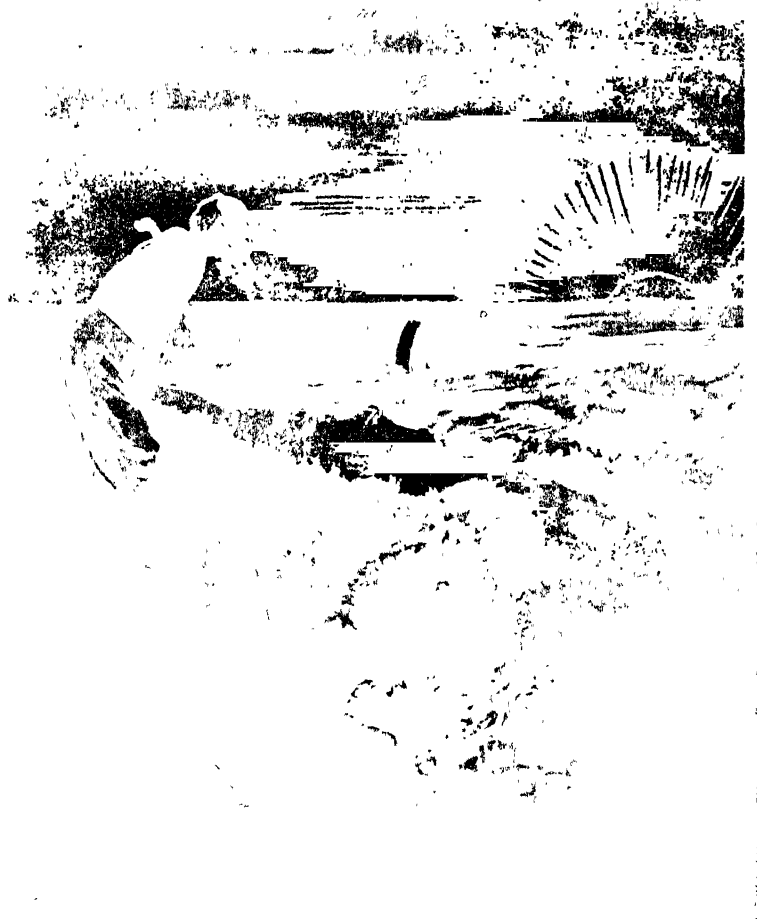
বাণী কহিল, ঐ দূর নদীর মোহানায় কিছু কি দেখিতে পাও?

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "হে মহাপুরুষ! এই পথিকগণ কোথায় চলিয়াছে?"

উত্তর হইল, "ইহারা মৃত্যুকে চাহিয়াছিল।"

বৃ। নীচে নামিলে ইহারা কি পাইবে? বিশ্রাম পাইবে কি?

বা। গভীর শূন্যতার মধ্যে যদি কিছু বিশ্রাম থাকে, তবে তাহাই পাইবে।

বৃ। ইঁহারা চক্ষু, হস্তপদ, বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছেন কেন?

বা। ইচ্ছা করিয়াই উহারা এইরূপ করিয়াছে। জীবনের কোন দিক্ ইহারা দেখিতে চাহে না। ইহারা কোনও কাজ করিবে না, পাছে শীত-রৌদ্র-তাপে কষ্ট পাইতে হয়, তাই সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র জড়াইয়া ইহারা চলিয়াছে।

বৃদ্ধ দেখিল—মাঝে মাঝে উন্মুখ হইয়া, তাহারা কি যেন শুনিতেছে; পরক্ষণেই বস্ত্রাবৃত দুই হস্ত তুলিয়া কর্ণ ঢাকিতেছে। দেখিয়া, বৃদ্ধ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বাণী উত্তর দিল,—"দূর হইতে জীবননদীর কল্লোলধ্বনি ইহাদের কাণে আসিতেছে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহারা কাণ ঢাকিতেছে।"

তখন বৃদ্ধ সেই উচ্চশিখর হইতে চারিদিকে চাহিল, বিশাল পর্ব্বতের অপর দিকে কি আছে? অতি সন্তর্পণে বৃদ্ধ সেই দিকে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু সেদিকে সোপান নাই, পথ-চিহ্ন নাই। বৃদ্ধ সেখানে দাঁড়াইয়া দূর হইতে

কিসের যেন কোলাহল শুনিতে পাইল। সুদূরের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, প্রান্তরের দক্ষিণপ্রান্তে এক উদ্দাম স্রোতস্বতী নদী বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বাকাশ হইতে নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণালোক নদীজলে প্রতিফলিত হইয়াছে। উত্তাল তরঙ্গমালার উপরে যাত্রীরা অসংখ্য নৌকা ভাসাইয়াছে। কাহারও নৌকা বড়, বহু যাত্রী লইয়া চলিয়াছে, তাহাতে অনেক লোক হাল ধরিয়া বসিয়াছে। কাহারও বা ছোট, দুটি তিনটি আরোহী। কেহ বা একটি ছোট নৌকায় পাল তুলিয়া একাই চলিয়াছে। বৃদ্ধ দেখিল, সে যাত্রা বড় সহজ নহে। নদীপথে বিপদ্ ও দুর্যোগের অন্ত নাই। কোথাও বা জলমগ্ন পর্ব্বত, কোথাও বা ভীষণ আবর্ত্ত, ঢেউগুলি উন্মত্ত সর্পের মত পাক খাইয়া ঘুরিতেছে। নৌকা যখন সেই ঘূর্ণীর মুখে পড়িতেছে, আরোহীদের মধ্যে 'সামাল্' 'সামাল্' রব পড়িয়া যাইতেছে; ভীষণ সংগ্রামের পর, জয়ধ্বনি করিয়া আবার তাহারা অগ্রসর হইতেছে। কাহারও বা নৌকা বালুতটে আট্‌কাইয়া গিয়াছে, আরোহীরা তীরে নামিয়া গুণ টানিয়া নৌকাকে জলপথে আনিতেছে। তীরবর্ত্তী উপলখণ্ডে তাহাদের চরণ বিক্ষত—কঠিন পরিশ্রমে তাহাদের ললাটের স্বেদ সিক্ত-বস্ত্রের উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, তাহারা কেবল নৌকা বাহিয়া গমাস্থানে যাইবার জন্য উৎসুক। কেহ অগ্রসর হইয়াছে, কেহ বা পিছাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ দেখিল, তাহাদের চেষ্টারও বিরাম নাই, আশারও অন্ত নাই। যাত্রীদের কণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনি নদীর আনন্দ-কল্লোলের সহিত মিশিয়া, প্রভাত আকাশকে স্ফুটতর আলোকে জাগাইয়া তুলিতেছে।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল; অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যাত্রীরা কোথায় চলিয়াছে? নদী-পথের শেষে কি আছে?"

বাণী কহিল, "চাহিয়া দেখ! ঐ দূরনদীর মোহানায়, কিছু কি দেখিতে পাও?"

বৃদ্ধ চক্ষুর উপর হস্ত অন্তরাল দিয়া সুদূরের দিকে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল,—কূল নাই—কিনারা নাই,—ঢেউয়ের পর ঢেউ, উদ্দাম তরঙ্গমালা এক সীমাহীন নীলিমার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ আবার কহিল, "যাত্রীর দল এত কঠোর সংগ্রাম করিয়া কোথায় চলিয়াছে? সেখানে কি আছে? জীবন-নদীর শেষে কি মৃত্যু তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে?"

জলদগম্ভীর কণ্ঠে বাণী কহিল,"মৃত্যুকে ইহারা চাহে না; কঠিন সাধনায়, ইহারা মৃত্যুর তুষারশীতল উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে; তাই, মৃত্যু তাহার কৃষ্ণ-সিংহ-দ্বার মোচন করিয়া ইহাদের জীবননদীর পার-ঘাটে পঁহুছিয়া দিয়াছে। ইহারা অমৃতধামের যাত্রী। এই প্রবহমাণ নদীর চঞ্চল স্রোত এক অক্ষয়-অমৃত-মহাসিন্ধুতে গিয়া মিশিয়াছে, সেই সিন্ধুর অভিমুখে ইহারা যাত্রা করিয়াছে।"

বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে তাহারা কি পাইবে?"

বাণী কহিল, "কিছুই না। সকল পাওয়ার অবসান সেইখানে হইবে—এক আনন্দময় অমৃতের আস্বাদ পাইয়া ইহাদের সকল তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবে।"

তখন ব্যাকুল কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "হে দেবতা! এই মৃত্যুর অন্ধকারশূন্যতা হইতে ঐ জীবনের আলোকে ফিরিয়া যাইবার কোন পথ কি নাই? যদি থাকে আমাকে দেখাইয়া দাও।"

বাণী কহিল,"একটিমাত্র পথ আছে। সে বড় দুর্গম পথ।"

বৃদ্ধ আগ্রহভরে বলিল,"দেখাও,আমাকে দেখাইয়া দাও।"

বাণী কহিল, "নীচের দিকে দেখ।"

বৃদ্ধ দেখিল, তরুগুল্মসমাচ্ছন্ন পথহীন এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কাণ পাতিয়া শুনিল—সেখান হইতে জীবন-নদীর কলধ্বনি আরও স্পষ্টতর শুনা যায়, এবং সুদূর পূর্ব্বাকাশের নীলাঞ্জন রেখা একটুখানি দেখা যায়।

বাণী কহিল—"হে বৃদ্ধ! এই দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিয়া যাও,জীবনের পথে পঁহুছিতে দেরী হইবে না।"

বৃদ্ধ ফিরিয়া চলিল। প্রথম পদবিক্ষেপ শুষ্ক তরুগুল্মের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশে তাহার পদদ্বয় বিদ্ধ হইল।

সেই আঘাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশ,নির্ব্বাক প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে এবং নৈশবায়ু পুষ্পশাখায় কি যেন অপরূপ রহস্য বলিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধের ঘুম ভাঙ্গিয়াও যেন ভাঙ্গিল না; সে তখনও দেখিতে লাগিল, যেন তাহার দীর্ঘ দুর্গম পথের অবসান হইয়াছে, তাহার মুমূর্ষু প্রাণের ক্ষীণ দীপালোকে সে যেন দেখিতে পাইল, সম্মুখে জীবননদীর কূলে সে পঁহুছিয়াছে। তখন সে অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় আবেগাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল— "মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয়—জীবন!"

শ্রীশ্রীবাণী *

মুলতানী—চৌতাল

(বাঙ্গালা-ধ্রুপদ)

[বর্দ্ধমানাধিপতির গায়ক—সঙ্গীত-বিদ্যার্ণব ও সঙ্গীতনায়ক—
শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক বিরচিত]

বাণী গুণ গাওরে সবে
সকল-বিদ্যা প্রকাশিনী,
ব্রহ্ম-বাদিনী ত্রিলোক-ব্যাপিনী।
যাঁরে পূজে চরাচরে,
যে নামে আর্ত্তি যায় দূরে,
যিনি শুভ-দায়িনী।
যে সঙ্গীতে ত্রিলোক মোহিত,
যে সঙ্গীতে বিশ্ব সৃজিত,
যাঁ'র দয়া বিনা মানব
কোন কালে হয় না জ্ঞানী।
তাঁ'র-চরণ চাহি শরণ
যাঁ'র কৃপাতে এ সম্মিলন,
ধন্যা তিনি জগত-জননী।

স্বরলিপি—

[শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ বৎসর বয়স]

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ||
II পাঃ.ক্ষাঃ | জ্ঞা জ্ঞা | -ঋা সা | সা-া | সা সা | সঋা ন্া I
বা ০ ণী গু ০ ণ গা ০ ওরে স ০ বে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ন্া সা | ক্ষজ্ঞা ক্ষা | -পা পা | ক্ষা জ্ঞক্ষা | -জ্ঞা জ্ঞা | -ঋ সা I
স ক ল বি ০ দ্যা প্র কা ০ শি ০ নী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ন্া-সা | জ্ঞা ক্ষা | পা পা | -পা-না | -দা-পা | -ক্ষা-জ্ঞা I
ব্র ০ হ্ম বা দি নী ০ ০ ০ ০ ০ ০

* বর্দ্ধমান—অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে বর্দ্ধমানাধিপতির গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রদ্বয়—আট বৎসর-বয়স্ক পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তের বৎসরবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—এই গীত এক সঙ্গে গায়িয়াছিল, এবং উভয়েই শ্রীলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুর-প্রদত্ত, "স্বর্ণ মেডেল" প্রাপ্ত হইয়াছে।]

```
১´      ০      ১      ০      ৩      ৪
-পক্ষা-জ্ঞা | -ঋা-সা | -ঋা-ন্‌া | সা ক্ষজ্ঞা | জ্ঞা পক্ষা | -নদা পা II
০  ০  ০ ০  ০ ০  ত্রি লো  ক ব্যা ০  ০ পি নী।

১´      ০      ১      ০      ৩      ৪
II ¦ জ্ঞা-ক্ষা | পা না | -া না | র্সা র্সা | -া ঋর্না | -র্সা র্সা I
যাঁ ০  রে পূ  ০ জে  চ রা  ০ চ ০  ০ রে

১´      ০      ১      ০      ৩      ৪
পা না | র্সা জ্ঞা | -ঋা র্সা | সর্না-ঋনা | -র্সা না | -দা পা ¦ I
যে না  মে আ  ০ র্ত্তি  যা ০ ০ ০  য়্‌ দূ  ০ রে

১´      ০      ১      ০      ৩      ৪
পা ক্ষজ্ঞা | -ক্ষা পা | -া না | দপপাঃ-ক্ষাঃ | -জ্ঞা জ্ঞপা | -ক্ষনা দপপা II
যি নি ০  ০ শু  ০ ভ  দা ০ ০  ০ য়ি ০  ০ ০  নী ০।

১´      ০      ১      ০      ৩      ৪
II পা পা | -া পা | -া পা | পক্ষা দা | পা পা | ক্ষা জ্ঞা I
যে স  ০ ঙ্গী  ০ তে  ত্রি ০ লো  ক মো  হি ত

১´      ০      ২      ০      ৩      ৪
জ্ঞা ক্ষা | -পা না | -দা পা | পাঃ ক্ষাঃ | জ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা |
যে স  ০ ঙ্গী  ০ তে  বি ০  শ্ব স্থ  জি ত

১´      ০      ২      ০      ৩      ৪
সা-ঋা | না সা | ক্ষজ্ঞা-া | জ্ঞা ক্ষা | পা পা | পা পা I
যাঁ ০  র দ  য়া ০  বি না  ০ মা  ন ব

১´      ০      ২      ০      ৩      ৪
জ্ঞা ক্ষা | -পা না | -দা পা | পাঃ ক্ষাঃ | জ্ঞা জ্ঞা | -ঋা সা II
কো ন  ০ কা  ০ লে  হ য়্‌  না জ্ঞা  ০ নী।

১´      ০      ২      ০      ৩      ৪
II ¦ জ্ঞা-ক্ষা | পা না | না না | র্সা র্সা | -ঋর্না | র্সা র্সা I
তাঁ ০  র চ  র ণ  চা হি  ০ শ ০  র ণ

১´      ০      ২      ০      ৩      ৪
পা-না | র্সা জ্ঞা | ঋা র্সা | সর্না-ঋা | র্সা না | দা পা ¦ I
যাঁ ০  র কৃ  পা তে  এ ০ ০  স ম্মি  ল ন

১´      ০      ২      ০      ৩      ৪
পা ক্ষজ্ঞা | -ক্ষা পা | -া না | দা পক্ষা | জ্ঞা পক্ষা | দা পা II II
ধ ন্যা  ০ তি  ০ নি  জ গ ০  ত জ ০  ন নী।
```

ভারত-ভারতী

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ—চার্ব্বাকদর্শন (২)

[শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন সাংখ্য বেদান্ত দর্শনতীর্থ]

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শব্দপ্রমাণকেও ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের (ব্যাপ্তিজ্ঞানের) উপায় বলিতে পার না, কেন না বৈশেষিকদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদের মতে শব্দ অনুমানের অন্তর্গত ; [এই মতে শব্দ ও অনুমান—এই দুই প্রমাণ, উপমান-প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত ; ভাষ্যকার প্রশস্তিপাদাচার্য্য বলিয়াছেন,— 'সমান-বিধি হেতু শব্দপ্রভৃতির অনুমানে অন্তর্ভাব জানিবে।' অতএব শব্দের ও উপমানের অনুমান-রীতি অনুসারেই প্রামাণ্য, স্বতন্ত্রভাবে উক্ত দুই প্রমাণের কোন প্রামাণ্য নাই ; কিন্তু নৈয়ায়িকগণ শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া ন্যায়দর্শনে যুক্তিপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন] * শব্দপ্রমাণ যদি অনুমানের অন্তর্গত না হয়, তবে বৃদ্ধ (প্রযোজক ও প্রযোজ্য বৃদ্ধ) ব্যবহার-রূপ কারণ-সাপেক্ষ-হেতু পূর্ব্ব-প্রদর্শিত হেতু ও ব্যাপ্তি-জ্ঞানে দোষসমূহ অলঙ্ঘনীয় জঙ্ঘালের (অত্যুচ্চ প্রাচীর, সেতু, অতি বেগবান হরিণ, বা জাঁঘাল) স্বরূপ হইবে। আর মহর্ষি মনুর বাক্যে * ধার্ম্মিকগণ যেরূপ নিঃসন্দেহ আস্থা স্থাপন করেন, তদ্রূপ ধূম এবং ধূমধ্বজের (বহ্নির) অবিনাভাব (নিয়ত সম্বন্ধ) আছে,—এইমাত্র বলিলে বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। যে কখনও হেতু-সাধ্যের অবিনাভাবজ্ঞাত হয় নাই, তাদৃশ পুরুষের নিয়ত-সংবদ্ধ বস্তুর একদেশ দর্শনে অপর দেশের অনুমান না হওয়াতে 'স্বার্থানুমানের' কথা যে ন্যায়শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহাও কথার কথায় (নামমাত্রে) পর্য্যবসিত হয়। (+) (অনুমান দুই প্রকার, স্বার্থে অনুমান (১) পরার্থে অনুমান (২) স্বার্থানুমানে পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন হয় না, (২) পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হয়।)

আর উপমান প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, (যখন অনুমানও প্রমাণরূপে টিকিল না, তখন আর উপমান প্রভৃতির প্রামাণ্য কোথায় ?) ‡ উপমানাদির সংজ্ঞা (উপমান) ও সংজ্ঞী (উপমেয়) সম্বন্ধাদির জ্ঞাপকত্বরূপে প্রয়োজন আছে বলিয়া উপাধিবর্জ্জিত সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর জ্ঞান হওয়া ত সম্ভব হয় না। এবং উপাধিরহিত উপমান (গবাদির) উপমেয় (গবয়াদির) জ্ঞান হওয়া সুদূরপরাহত।

* "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" বৈঃ দঃ (১-১-৩)।
"লিঙ্গাচ্চানিত্যঃ শব্দঃ" বৈঃ দঃ (২-২-৩২)।
"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে" বৈঃ দঃ (৬ ১-১)।
—বৈশেষিকদর্শনের সূত্রাদি দ্রষ্টব্য। "উপমিতিঃ পৃথক্ প্রমাণং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং অতিরিক্তত্বাৎ বিলক্ষণোপমিতিকরণত্বেন" ইতি নবীনান্যায়বিদঃ।

* "মনুর্যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজম্" (শ্রুতিঃ)। "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্" : মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।" "যঃ কশ্চিৎকস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ, সসর্ব্বোঽভিহিতোবেদে..."।

(+) "অনুমানং দ্বিবিধং—স্বার্থং পরার্থঞ্চেতি। স্বার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চাবয়বানাং প্রয়োজনং নাস্তি। পরার্থানুমানে ন্যায়পঞ্চকস্য প্রয়োজনং বিদ্যতে।" (তর্ক সংগ্রহ)।

‡ "প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনমুপমানম্" (ন্যায় সূঃ)।
প্রসিদ্ধ গো প্রভৃতির সহিত গবয়াদির সমান-ধর্ম্মত্বের প্রত্যভিজ্ঞানহেতু যে সাধ্যসংজ্ঞা ও সংজ্ঞী, এই দুইএর সম্বন্ধ জ্ঞান ; তাহার সাধনের নাম 'উপমান'। আচার্য্য উদয়নের মতে, সংজ্ঞা সংজ্ঞীর যে সম্বন্ধ, তাহা উপমানের প্রমেয়। উক্ত দুইএর সম্বন্ধ-জ্ঞান উপমানের ফল। সাংখ্য মতে উপমান প্রমাণ অনুমানের অন্তর্ভূত, পৃথক্ প্রমাণ নয়। তাহা যুক্তিবিশেষ দ্বারা শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র স্বীয় 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য বরদরাজও উদয়নের মতানুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন,—"প্রমেয়ং তস্য সম্বন্ধঃ সংজ্ঞায়াঃ সংজ্ঞিনা সহ।" সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা উপমানের (প্রমাণের) বোধ্য।

উপাধি প্রভৃতির প্রত্যক্ষরূপে কোন জ্ঞান হওয়ার নিয়ম না থাকায়, প্রত্যক্ষ পদার্থের অভাবের যেমন প্রত্যক্ষ হয়; সেরূপ অপ্রত্যক্ষ যে অভাব প্রভৃতি তাহাদিগেরও অপ্রত্যক্ষ হেতু (অবশ্যই) সে সকলের জ্ঞানের জন্য অনুমানের আবশ্যক হয়। তাহাতে অনুমানে যে সকল দোষ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমুদয়ের (উপাধি প্রভৃতি) কোন উপায় নাই। [যে হেতু ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না, যদি সকৃদ্দর্শনে ব্যাপ্তির নিশ্চয় স্বীকার করা যায়, তবে বহ্নিরাসবেরও ব্যাপ্তি নিরূপণ হইতে পারে। আর যদি বহুবার দর্শনে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে পার্থিবত্বে এবং লৌহলেখ্যত্বে হীরকেতে ব্যভিচার হয়; অতএব সকৃৎদর্শন কিংবা ভূয়োদর্শন—এই দুইএর মধ্যে কোনটাই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ হইতে পারে না]। এখন বিশেষরূপে উপাধির লক্ষণ বলিতেছেন।—'সাধনের (হেতুর) অব্যাপক হইয়া যে, সাধ্যের সমব্যাপক হয় (সে) উপাধি।' এইরূপ উপাধি-লক্ষণ প্রাচীন সুধীগণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার নিষ্কর্ষ লক্ষণ এইরূপ; যথা,—'যে সাধনের অব্যাপক হইয়া সাধ্যের (ধূমাদির) সমব্যাপক হয়, তাহাকে উপাধি বলে।' শব্দে (পক্ষে) নিত্যত্বের (সাধ্যের) সাধন করিতে হইলে, উক্ত উপাধি-লক্ষণে যে, তিনটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সে তিন বিশেষণের সার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত (অথবা সকর্তৃকত্ব, ঘটত্ব, অশ্রাবণত্ব—এই তিনের উপাধি-ধারণের নিমিত্ত ক্রমে লক্ষণে তিনটি) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ লক্ষণে উক্ত তিনটি বিশেষণ না দিলে, সকর্তৃকত্ব (কৃতকত্ব বা কার্য্যত্ব) প্রভৃতি তিনটিকে ব্যাবৃত্তি (ব্যবচ্ছেদ) করা হয় না। এই প্রাচীনমত লক্ষণোক্ত 'সমব্যাপ্তের' উপাধিত্ব নব্য নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। উপাধিলক্ষণের ভাবার্থ এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, সাধন সমান দেশে বিদ্যমান না থাকিয়া (অনুমান কালে) সাধ্যের সমান দেশে যে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই 'উপাধি' নামে অভিহিত হয়। উপাধি-লক্ষণে যে 'সম' পদটি নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্যাপ্যত্ব থাকিয়া, ব্যাপকত্ব লাভের নিমিত্ত সূচিত হয়। (অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপকত্ব থাকিয়া সাধ্যের ব্যাপ্যত্ব থাকাই 'সমব্যাপ্তি' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে)। যথা বৈধ হিংসায় হিংসাত্ব-পুরস্কারে যদি অধর্ম্মের (সাধ্যের) সাধন করা হয়, তবে 'নিষিদ্ধত্ব' উপাধি হইবে; কেননা বেদ হিংসা-সামান্যের নিষেধ করিয়াছেন, সে যে সাধ্য অধর্ম্মত্বের ব্যাপক হয় নাই। কিন্তু সাধনত্ব অভিমত হিংসাত্ব তাহার ব্যাপক হইয়াছে। বৈধ হিংসারূপ পক্ষেতে হিংসাত্ব থাকিলেও তাহাতে অনিষ্টজনকত্ব নাই। যদি 'সাধনের অব্যাপকত্ব'ই উপাধি এইরূপ লক্ষণ করা হয়; তবে 'শব্দে অনিত্যসাধনে কৃতকত্বে (কার্য্যত্বে) সাবয়বত্ব উপাধি হয়; যথা 'অনিত্য, শব্দ, কৃতকত্ব হেতু, যথা ঘট, এই অনুমানে সাধনের অব্যাপক-হেতু ঘটে 'সাবয়বত্ব' উপাধি হইল। অমূর্ত্ত ক্রিয়াদিতে কৃতকত্ব থাকিলেও সাবয়বত্বের অভাব থাকাতে সাধনের অব্যাপকত্ব হেতু লক্ষণে দোষ হয়। অতএব লক্ষণে 'সাধ্যের অব্যাপক' এই পদ বা বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে; সাবয়বত্ব-রূপ সাধ্য অনিত্যত্বের ব্যাপক হয় নাই। যেহেতু অনিত্য ক্রিয়া প্রভৃতিতে সাবয়বত্বের ব্যাপকতা নাই। যদি বা 'সাধ্যের ব্যাপক' এইমাত্র উপাধির লক্ষণ করা হয়, তাহাহইলেও অনিত্যত্ব-সাধনে সাবয়বত্ব হেতু, কৃতকত্ব উপাধি হইবে। 'ক্ষিতি প্রভৃতিতে অনিত্য অনিত্য (সাধ্য) সাবয়বত্ব হেতু, ঘটের ন্যায়'—এই অনুমানে অনিত্যরূপ সাধ্যের ব্যাপকত্ব না থাকায় কৃতকত্ব উপাধি হইবে। কেন না সাবয়বত্বটি সাধ্যরূপ অনিত্যত্বের ব্যাপক হইয়াছে। 'সাধনাব্যাপক' এইমাত্র উপাধির লক্ষণ করিলে, তাহার সাবয়বত্ব (অবয়ব, অংশ, প্রদেশ তৎসহ বর্ত্তমান) ব্যাপক-হেতু উপাধিশূন্যত্ব ও নিরুপাধিক সাধ্যসম্বন্ধ এই উভয় হইয়া পড়ে। তাহা আচার্য্যগণও বলিয়াছেন,—'কৃতকত্ব ও সাবয়বত্ব প্রভৃতি প্রযুক্ত বস্তুর বিনাশিত্ব হয়; অতএব উভয় বিশেষণই সার্থক হয়। কেহ কেহ বলেন, লক্ষণে প্রদত্ত 'সমপদ' পক্ষ ভিন্নত্ব নিরাসের জন্য (অর্থাৎ পক্ষ ভিন্ন অন্যত্র সাধ্যের সত্তা নিরাকরণের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে। [এই বিষয়ে অনুরূপ ভঙ্গীতে আচার্য্য উদয়ন স্বপ্রণীত 'আত্মতত্ত্ব বিবেক', 'কিরণাবলী', 'কুসুমাঞ্জলি'তে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থের মূলীভূত উপাধিলক্ষণ;—কিন্তু আমি উল্লিখিত গ্রন্থত্রয়ে এই উপাধিলক্ষণের অনুরূপ লিপি কোন স্থানে দেখিতে পাই নাই। কুসুমাঞ্জলির 'একসাধ্যা-বিনাভাব" ইত্যাদি কারিকায় উপাধি-লক্ষণের অর্থগত একত্ব আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সমারোপিত ও শঙ্কিত—এই দুই উপাধি-শূন্যই ব্যাপ্তি, তাহাও সাধনের অব্যা-

পকত্ব সাধ্যের ব্যাপকত্বরূপ সমারোপিত বা নিশ্চিত উপাধি। যথা—'যজ্ঞে পশুহিংসা, অনর্থজনক, হিংসাহেতু যাগবাহ্য হিংসান্যায়' হিংসাত্ব ও নিষিদ্ধত্ব—এই দুইএর যজ্ঞীয়হিংসাতে ও কলঞ্জ (বিষাক্তবাণ-নিহত মাংস) ভক্ষণে ভিন্নবৃত্তি—এই দুইটির মধ্যে যাগীয় হিংসাতে অধর্ম্মত্ব সাধ্য করিলে, তাহার সহিত যাগবাহ্য-হিংসাতে হিংসাত্ব ও নিষিদ্ধত্বের অবিনাভাব থাকিলেও কদলীফল ভক্ষণাদিতে নিষিদ্ধত্বের নিবৃত্তিদ্বারা অধর্ম্মত্বের নিবৃত্তি হেতু উক্ত হিংসানুমানে নিষিদ্ধত্ব উপাধি সিদ্ধ হইল।

সেই হেতু আচার্য্য দিঙ্নাগ "সমাসমাবিনাভাবৌ" * ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা উপাধির নির্দ্দোষ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উপাধিবর্জ্জিত অনুকূলতর্কযুক্ত হেতুই প্রয়োজক (সাধ্যের অনুমাপক) হয়। অন্যথাসিদ্ধ কিংবা সোপাধিক হেতু, অথবা ব্যাপ্যত্বা সিদ্ধ যে, তাহা অপ্রয়োজক জানিবে। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে অপ্রয়োজক হেতু যে সোপাধিক (উপাধিশূন্য নয়) তাহা 'সমাসম' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের প্রথম ব্যাখ্যা,—'যে সময় সম অবিনাভাব (হেতু সাধ্যের নিয়ত সহ অবস্থান) ও বিষম অবিনাভাব, (সাধ্য হেতুর অনিয়ত অবস্থিতি) অর্থাৎ সাধ্যের সমব্যাপকত্ব, হেতুর বিষম ব্যাপকত্ব—এইরূপ হেতুদ্বয় হয়, সে সময় সেই দুইএর মধ্যে যে হীনব্যাপ্তহেতু সমব্যাপক কর্ত্তৃক অব্যাপ্ত হয়, তবে উপাধি জানিবে। অন্যথা শব্দে অনিত্যত্বসাধনে সাবয়বত্ব এবং কৃতকত্ব এই দুইএর উপাধিত্ব প্রসঙ্গ হেতু অনুমানের বেলায় হেতুকে অপ্রয়োজক বলিতে হইবে। তাহাতে সোপাধিক হেতুরই অপ্রয়োজকত্ব হইল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাপ্তিবাদের মাথুরী টীকার আশয় অনুসারে লেখা হইল। 'যে যে সময় এক ধর্ম্মীতে (পক্ষেতে) সম-অবিনাভাব, (দুইএর মধ্যে একক ছাড়িয়া অন্যের না থাকা) ও বিষম-অবিনাভাব হয় [সাধ্যসমব্যাপ্তত্ব হেতুসমব্যাপ্তত্ব] তাহা হইলে উপাধি হইবে। উক্ত দ্বিবিধ, (সমব্যাপ্তত্ব, সমব্যাপ্তত্বের অভাব) এই দুইয়ের মধ্যে যদি একটি রহিত হয়, তাহাতেও অপ্রয়োজক কিংবা ব্যভিচারের অনুমাপক হইবে।' কুমারিল ভট্ট তাঁহার মীমাংসা-ভাষ্যবার্ত্তিকে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'পরপ্রযুক্ত ব্যাপ্তির উপজীবক হেতুই অপ্রয়োজকরূপে ব্যবহৃত হয়।' অন্যের মতে আরও এই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতেছি: শব্দ, অনিত্য, কৃতকত্ব-হেতু, এই অনুমানে সামান্যবত্ব থাকিয়া, আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয়যোগ্যত্ব (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রহণ যোগ্যত্ব) উপাধি হইতে পারে। সেইজন্য উপাধিলক্ষণে 'সাধ্য ব্যাপকত্ব' বিশেষণ দিতে হইবে। শুদ্ধ 'সাধ্য ব্যাপকত্ব' মাত্র বলিলে, সামান্যবত্বাদি রূপ হেতু দ্বারা অনিত্যত্বের সাধন করিলে কৃতকত্ব উপাধি হইবে। সেই জন্য লক্ষণে 'সাধনাব্যাপকত্ব' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন নৈয়ায়িক মতে উপাধি-ভেদ গ্রহণপূর্ব্বক অসম্ভব নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্যাপকত্বশরীরে 'অত্যন্ত' এই পদও দেওয়া উচিত। সাধনভেদগ্রহণপূর্ব্বক সাধনের উপাধিত্ব নিরাকরণপূর্ব্বক অব্যাপক শরীরেও 'অত্যন্ত' এই পদ বিশেষণরূপে প্রযোজ্য। সেই পুনঃ তিন প্রকার:—(১) কেবল সাধ্যব্যাপক, (২) পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, (৩) সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক। প্রথমটির উদাহরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। 'যজ্ঞীয় হিংসা অধর্ম্মজনক হিংসাত্ব-হেতু যাগবাহ্য হিংসার ন্যায়' এখানে নিষিদ্ধত্ব উপাধি। যেখানে অধর্ম্মজনকত্ব আছে, তাদৃশ স্থলে নিষিদ্ধত্বও আছে, অতএব সাধ্যব্যাপকতা, যেখানে হিংসাত্ব আছে, সেখানে নিষিদ্ধত্ব নাই, অতএব নিষিদ্ধরূপ উপাধি সাধনের অব্যাপক হইল; কেননা যাগীয় হিংসাতে নিষিদ্ধত্ব নাই। 'সকল ভূতে হিংসা করিবে না' এই সামান্য বাক্য দ্বারা 'পশু দ্বারা যজ্ঞ করিবে'

* 'সমাসম'—এই শ্লোকটির অর্থ কি? প্রণেতা বা কে? আমি এই বিষয়ে তিন বৎসর অনুসন্ধান ও বহু মহামহোপাধ্যায়ের নিকট নানাস্থানে পত্রাদি লিখিয়া সদুত্তর না পাওয়ায়, পরিশেষে তাহার অর্থাদি স্থির করিতে অক্ষম হই। দর্শন শাস্ত্রের প্রাচীন নানা গ্রন্থ অবলোকন করিয়াও শ্লোকার্থ জানিতে পারা যায় নাই। তাহাতে চার্ব্বাক দর্শনের 'উপাধি-অংশ' আমার অবোধ্য থাকিয়া যাওয়াতে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে 'তার্কিক-রক্ষা'য় উক্ত শ্লোক এবং 'কার্য্যকারণ ভাবাদ্বা'—এই শ্লোক অর্থের সহিত প্রাপ্ত হই। উক্ত মহামহোপাধ্যায় অধ্যক্ষ মহাশয় এই বিষয়ে আমার বহু সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। এই দুই শ্লোক দিঙ্নাগাচার্য্যের বলিয়া স্থির করিয়াছি। উপরে মাথুরীর আশয় অনুসারে ও কোলাচলসূরি মল্লিনাথের ব্যাখ্যানুসারে অর্থ করিয়া দিয়াছি। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—'সমা-সমাবিনাভাবাবেকত্রস্তো যদা তদা (যদা)। (দিঙ্নাগাচার্য্যঃ) যেন যদি নো ব্যাপ্তস্তয়োর্হীনোঽপ্রযোজকঃ।"—অনুবাদক শ্রীঃ—শাস্ত্রী।

—এই বিশেষ বাক্য বলবান্ জানিবে। সেই হেতু হিংসাত্ব অধর্ম্মের জনকত্বে কারণ হইল না; কিন্তু নিষিদ্ধত্বই (অধর্ম্মের) প্রযোজক হইল। দ্বিতীয় উপাধি যথা,—"বায়ু প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্ব হেতু' এই অনুমানে উদ্ভূতরূপবত্ব উপাধি হইল। যেথানে প্রত্যক্ষ হয়, সেথানে উদ্ভূতরূপবত্ব অবশ্য থাকে, অতএব তাহা কেবল সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই, যেহেতু রূপেতে ব্যভিচার হয়। কিন্তু দ্রব্যত্ব লক্ষণ যে পক্ষধর্ম্ম, তদবচ্ছিন্ন যে বাহ্য প্রত্যক্ষ, তাহাতে উদ্ভূত রূপবত্ব আছে; অতএব পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক হইল। আত্ম-মানস প্রত্যক্ষে ব্যভিচার নিবৃত্তির জন্য লক্ষণে 'বহিঃ' (বাহ্য) এই পদ দেওয়া হইয়াছে। যেস্থলে প্রত্যক্ষস্পর্শের আশ্রয়ত্ব আছে, সেথানে উদ্ভূতরূপবত্ব নাই; অতএব বায়ুতে উদ্ভূত রূপবত্বের অভাব হেতু সাধনের অব্যাপকত্ব আছে। তৃতীয় উপাধি যথা,—'প্রাগভাব বিনাশী জন্যত্ব হেতু,' এই অনুমানে ভাবত্ব উপাধি হয়, যেথানে বিনাশিত্ব আছে, সেথানে ভাবত্ব আছে, কিন্তু প্রাগভাবে ভাবত্ব নাই বলিয়া কেবল সাধ্যব্যাপকত্ব হয় নাই। কিন্তু যেথানে জন্যত্বরূপ সাধনাবচ্ছিন্ন-বিনাশিত্ব আছে, তাহাতে ভাবত্বও আছে, অতএব সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক আছে। যেথানে জন্যত্ব, সেথানে ভাবত্ব নাই বলিয়া সাধনাব্যাপকত্বও হয় নাই; যেহেতু ধ্বংসেতে (ধ্বংসে অভাবে, বিনাশে) ভাবত্ব নাই। এবং মিত্রার তনয়ে শ্যামত্বের অনুমান তৃতীয় উপাধির অন্তর্গত জানিবে। নীলবর্ণ ঘটাদিতে শ্যামত্ব আছে বলিয়া, কেবল সাধ্যব্যাপকত্ব না হওয়াতে, এবং সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য-ব্যাপকত্বই হয়। অষ্টম পুত্রেতে শাকপাকজত্ব নাই বলিয়া সাধনের অব্যাপকত্বও হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকেরা সাধ্য-সমান-অধিকরণে অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বকে 'সাধ্য-ব্যাপকত্ব' বলেন। সাধনবান্ পদার্থে নিয়তস্থিত যে, তাহার অত্যন্ত অভাবের প্রতিযোগিত্বকে 'সাধনের অব্যাপকত্ব' বলা হয়। উদাহরণ যথা,—'পর্ব্বত (পক্ষ) ধূমবান্ (সাধ্য) বহ্নিসত্ব (হেতু), এইরূপ অনুমান স্থলে আর্দ্র ইন্ধন (ভিজা কাঠ) বহ্নি-সংযোগ উপাধি। যেথানে ধূম থাকে, সেথানে বহ্নি ও ভিজা কাঠাদির সংযোগ বর্ত্তমান থাকে। তৎপ্রভবই ধূম হয়। এইভাবে ধূমরূপ সাধ্যের ব্যাপকত্ব হয়। আর যেস্থলে বহ্নি থাকে, সেথানে আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ ত দেখিতে পাওয়া যায় না; যেমন অয়ঃগোলক (অতিদগ্ধলৌহপিণ্ড) অতএব সাধনের অব্যাপকত্ব হইল জানিবে। এই ভাবে সাধ্যের ব্যাপকত্ব থাকিয়া সাধনের (বহ্নির) অব্যাপকত্ব হেতু আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ (বহ্নির) উপাধি হইল; তাহাতে সোপাধিক হেতু বহ্নিসত্বটিকে (নব্য মতে) 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়।

'উপদেশ-সাহস্রী'

১। অবিদ্যা ও বিদ্যা

[শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্-এ.]

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

আত্মার যাহা কিছু অনুভবের বস্তু, তৎসমস্তই বুদ্ধির ক্রোড়ীকৃত। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদের বুদ্ধি যে আকার ধারণ করে, আত্মাতে তদনুরূপ উপলব্ধি জন্মিয়া থাকে। বুদ্ধি—বিষয়াকার ধারণ করিলে, তবে আত্মা সেই আকারগুলি অনুভব করিয়া থাকেন। যেথানে বুদ্ধি নাই, বুদ্ধির আকার বা বৃত্তিগুলি সুপ্ত; সেথানে আত্মারও বিষয়ানুভূতি থাকে না। অহংকার বা 'আমি' 'আমার' বোধটা, বুদ্ধিরই একটা ধর্ম্ম। সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি, বিষয়বর্গে এই প্রকারে আত্মীয়তা স্থাপন করে। এই যে 'আমি', 'আমার' বা 'অহং'-বোধ—এটাও ত আত্মার জ্ঞেয় বা দৃশ্য। এটাকেও ত আত্মাই অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং আত্মা, এই 'অহং' বোধ হইতেও স্বতন্ত্র হইতে-ছেন। এই 'অহং' বোধটাও, আত্মার প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় দেয় না। যাহার উপরে বুদ্ধি এই 'অহং'-বোধ স্থাপন করে, সেটি 'ইদং'এর অংশ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, 'অহং'এর অংশ এবং 'ইদং'-অংশ,—এই দুই অংশই আত্মার দৃশ্য বা জ্ঞেয়। আত্মা, এই দুই অংশ

হইতেই স্বতন্ত্র। অতএব আত্মা,—কি আন্তর, কি বাহ্য,—সর্ব্ব প্রকার দৃশ্যবর্গ হইতেই স্বতন্ত্র। বিষয়ানুভব-কালে যেমন, আত্মার এই প্রকারে স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারা যায়; এইরূপ সকল মনুষ্যেরই আত্মা, তাহার নিজের নিজের বিষয়ানুভবকালে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র। অতএব সকল মনুষ্যেরই আত্মা, সকল দৃশ্যবর্গ হইতে স্বতন্ত্র এবং দৃশ্যবর্গের সাক্ষীস্বরূপ। অতএব, আত্মা সকল বিকারের সাক্ষী ও স্বতন্ত্র বলিয়া, তিনি নির্ব্বিকার। বুদ্ধি জড়, বুদ্ধির অবয়ব বা অংশ আছে। এইজন্য বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম বা গুণ —বুদ্ধিতেই জন্মিয়া থাকে। বিষয় উপস্থিত হইলেই, বুদ্ধির ক্রিয়া উত্তেজিত হয়। আত্মা,—বুদ্ধির এই সকল ক্রিয়াকেই অনুভব করেন, দেখিয়া থাকেন। বুদ্ধির যেমন যেমন ক্রিয়ার উদ্ভব হয়, বিশেষ বিশেষ 'জ্ঞান'ও সঙ্গে সঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়। আত্মা, বুদ্ধিতে উৎপন্ন সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং বুদ্ধির ন্যায় আত্মা 'অল্পজ্ঞ' হইতে পারেন না। আত্মা—'সর্ব্বজ্ঞ'; সকল জ্ঞানেরই আত্মা অনুভবকারী। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে, বুদ্ধির যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উত্তেজিত হয়; বুদ্ধিতে তখন তদ্রূপ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানও উদ্রিক্ত হয়। এই সকল জ্ঞান, অসম্পূর্ণ, খণ্ড খণ্ড এবং ক্ষুদ্র। কিন্তু আত্মার জ্ঞান, এরূপ সীমাবদ্ধ বা খণ্ড খণ্ড হইতে পারে না। কেন না, আত্মা, বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বিকার বা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সাক্ষী।

আত্মা—নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিশেষ। আত্মার কোন বিকার নাই, কোন ভেদও নাই, কোন বিশেষত্বও নাই। বুদ্ধিতেই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির এই বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর উৎপন্ন হইবামাত্র, বুদ্ধির মূলগত আত্মারও,—ঐ সকল বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর দ্বারা, বিশেষ বিশেষ 'জ্ঞানের'ও প্রতীতি হইতে থাকে। এক, অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার জ্ঞানের,—বিশেষ বিশেষ আকার কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহারই কারণ স্থির করিবার জন্য, 'বুদ্ধি'র অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

জড় আছে, অথচ আত্মার তাহা বোধের বিষয়ীভূত হইতেছে না;—ইহা অসম্ভব। দৃশ্য বস্তু রহিয়াছে, অথচ সেই দৃশ্য বস্তুকে কোন 'দ্রষ্টা' অনুভব করিতেছে না;—ইহা হইতে পারে না। আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, যাহা কিছু আত্মার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তৎসমস্তই বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর মাত্র। বিষয়বর্গ-যোগে বুদ্ধির যখন যে অবস্থান্তর ঘটে, আত্মাতে তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থান্তরগুলির প্রতীতি হইয়া থাকে। গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে বুদ্ধি, উহার সর্ব্বপ্রকার অবস্থান্তরের সহিত, প্রাণে লীন হইয়া যায়। বুদ্ধির কোন অবস্থান্তর তখন থাকে না বলিয়াই, তৎকালে আত্মারও কোন বিশেষ প্রতীতি হয় না। আত্মা,—বুদ্ধির সকল প্রকার অবস্থার মধ্যেই অনুগত, সকল প্রকার অবস্থারই সাক্ষী। বুদ্ধির সকল অবস্থার মধ্যেই যখন আত্মা অনুস্যূত, তখন বুদ্ধির এ সকল অবস্থার, নিজের নিজের কোন ত সত্তা থাকিতে পারে না। অনুস্যূত আত্ম-সত্তাতেই ইহাদের সত্তা। 'রূপ' জ্ঞান,—বুদ্ধির একটা অবস্থা। আবার 'রস' জ্ঞানও, বুদ্ধিরই অপর একটা অবস্থা। যখন রূপ জ্ঞান হইতেছে, তখন রস জ্ঞান থাকে না; কিন্তু আত্ম সত্তা,—এই রূপজ্ঞান ও রসজ্ঞান—উভয়ের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছেন। মূঢ় লোকেরা, বুদ্ধির এই সকল অবস্থান্তরের মধ্যে, আত্ম সত্তাটিকে হারাইয়া ফেলে। আত্মা—স্বতন্ত্র থাকিয়াই, নির্ব্বিকার থাকিয়াই, এই সকল অবস্থান্তরকে অনুভব করিতেছেন। কিন্তু মূঢ়েরা, এই সূক্ষ্ম ভাবটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা বুদ্ধির এই সকল অবস্থান্তর ব্যতীত আর কিছু যে আছে, তাহা ভুলিয়া যায়। তাহারা মনে করে, ঐ অবস্থান্তরগুলি আসিতেছে ও যাইতেছে। মনে করে, উহারা নিজেই নিজেকে বুঝিতেছে, অনুভব করিতেছে। ঐ সকল অবস্থান্তর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র একজন দ্রষ্টা ব্যতীত যে, উহাদিগের উপলব্ধি সম্ভব হয় না, এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি সাধারণ লোক বুঝে না। এইরূপে 'দেহাত্মবাদ' প্রবর্ত্তিত হয়। মূঢ়েরা দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বস্তুগুলিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করে। আত্মা যে এই সকল জড় দৃশ্য-বর্গ হইতে স্বতন্ত্র; এ সকলের তিনিই যে অনুভবকারী, ইহা মূঢ়েরা বুঝিতে পারে না। ঐ সকল জড় ব্যতীত, আর কাহারও অস্তিত্ব উহাদিগের নিকটে অলীক, আকাশ-কুসুম মাত্র। এই বিচারবিহীন মূঢ়তাকেই বেদান্তে "অবিদ্যা" নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর, সকল দৃশ্য হইতে এই যে আত্মার স্বাতন্ত্র্য-প্রতীতি, ইহাকে "বিদ্যা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমাদের মলিন বুদ্ধিতে এই 'বিদ্যা' উদিত হয় না। সাধন-প্রভাবে বুদ্ধির মালিন্য যতই দূরীভূত হইতে থাকে, ততই ধীরে ধীরে, তাদৃশ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে 'বিদ্যার' উদয় হইতে থাকে।

তন্ত্রে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব

[শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ]

শ্রীমল্লক্ষ্মণাচার্য্য সঙ্কলিত "শারদাতিলক"-নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ তান্ত্রিক-সমাজে সুপরিচিত। ইহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় একাদশশতাব্দী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। * এই গ্রন্থে অন্যান্য দেবতার মন্ত্রের ন্যায় কৃষ্ণের মন্ত্র ও ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এই—

"কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র যে বাহ্যরূপের ইঙ্গিত করে, ধ্যানে তাহা বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৃন্দাবনবিহারী গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ অতি পুরাকাল হইতে উপাস্যরূপে পরিচিত ছিলেন। ধ্যানটি এই—

"স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥
দন্তপঙ্‌ক্তি প্রভোদ্ভাসি স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তী র্বিবিধৈ র্বিভ্রমৈ র্ভাবগর্ব্বিতৈঃ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং করবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥"

তন্ত্রোক্ত কৃষ্ণমন্ত্রসাধনা তান্ত্রিক সাধনা। তাহা রুদ্রযামলে কালীবিলাস তন্ত্রে ও অন্যান্য অনেক তন্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণমন্ত্রসাধনার সহিত কেবল যে কৃষ্ণেরই সম্বন্ধ আছে, তাহা নহে; তাহার সহিত রাধার সম্বন্ধও দেদীপ্যমান। সুতরাং রাধাকৃষ্ণোপাসনা কতদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে, তন্ত্র-সাহিত্যেরও আলোচনা করিতে হইবে। রুদ্রযামলে অতি বিস্তৃতভাবে রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব ও উপাসনা-প্রণালী বর্ণিত আছে। প্রাচীন তান্ত্রিক নিবন্ধকারগণ রুদ্রযামল হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রুদ্রযামলমতে রাকিনীশক্তিই রাধা। রাকিনীশক্তিসংযুক্ত কৃষ্ণের উপাসনা ভিন্ন কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তুলিবার উপায় নাই; সুতরাং তান্ত্রিকসাধনার মূলে রাকিনীশক্তি-সংযুক্ত কৃষ্ণোপাসনা নিহিত রহিয়াছে। এই রাকিনীশক্তিই যে কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধা, রুদ্রযামলে ৪২ * পটল রাকিনীস্তবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে। যথা—"কৃষ্ণপ্রিয়া মমসুখং পরিপাতু দেবী।

....

রাধেশ্বরী প্রিয়করী সুরসুন্দরী সা।

....

শান্তিং কৃপাং কপটকোপবিলাসমূর্ত্তিং
শক্তিং শিবাং পরমবৈষ্ণবপূজিতাঙ্‌ঘ্রিম্।
রাধাং সুধাং বরময়ীং জগতাং গুণস্থাং
ধর্ম্মার্ণবাং রসদলে পরিপূজয়ামি॥

....

সামে কুলেশ্বররমা হরিহস্তপূজ্যা
ক্ষান্তিঃ সদা মমধনং পরিপাতু রাধা।

....

* পরমপূজ্যপাদ মদীয়াগ্রজ শ্রীযুক্তগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ-মহাশয়-কর্ত্তৃক 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে'র ৭ম অধিবেশন পঠিত ও ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত "সৌরভ" নামক পত্রিকায় ১৩২১ সনের জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় প্রকাশিত "শারদাতিলকের রচনা-কাল" নামক প্রবন্ধে লক্ষ্মণাচার্য্য, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

* 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি'র পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত তিনখানা 'রুদ্রযামল' দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনখানা পুস্তকেই পরস্পর পটল-সংখ্যার সমতা নাই। আমি যে পুস্তক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহারই পটল-সংখ্যা দিলাম। অন্যান্য পুস্তকে পূর্ব্বাপর পটলও হইতে পারে।

ষট্‌চক্রভেদসময়ে সদা পাঠ্যং সুযোগিভিঃ।
কুলবিন্যাসসমক্ষে কুলচক্রপ্রবেশনে॥
অবশ্যং প্রপঠেদ্বিদ্বান্ রাকিণী রাধিকাস্তবম্।"

তন্ত্রোক্ত উপাসনাপদ্ধতি অনুসারে বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য পূজায় বহিশ্চক্ষুর সাহায্য বাহ্য উপচারে বাহ্য মূর্ত্ত্যাদিতে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়। আভ্যন্তর পূজায় মনশ্চক্ষুর সাহায্যে মানস উপচারে স্বশরীরাভ্যন্তরে ইষ্টদেবতার উপলব্ধিমূলক অপরোক্ষ উপাসনা করিতে হয়। শেষোক্ত উপাসনা পদ্ধতির সহিত ষট্‌চক্রের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। রুদ্রযামলের ৪২ পটলে যাঁহাকে আভ্যন্তর পূজায় রাকিণী শক্তি বলা হইয়াছে, বাহ্য পূজায় তাঁহাকেই রাধিকা বলা হইয়াছে। যথা ৪২ পটলে—

"কুণ্ডলী পৃথিবী দেবী রাকিণী স্বাধিদেবতা।
তদ্দেহগামিনী দেবী রাধিকা বাহ্যকামিনী॥"

এই শ্লোকে কুণ্ডলীকে [কুলকুণ্ডলিনী] মূলাধারে ধরাচক্রে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিবার জন্য "কুণ্ডলী পৃথিবী দেবী" বলা হইয়াছে। মূলাধারের পরবর্ত্তী চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান; তাহা ভেদ করিতে হইলে রাকিণী শক্তির শরণাপন্ন হইতে হয়। রুদ্রযামলের ৪৪ পটলে ইহা আরও বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে—"সাধক স্বাধিষ্ঠানচক্রে শক্তিযুক্ত আদিদেবেশ্বর ত্রিলোকরক্ষক রাধিকা-রাকিণীব্যাপ্ত পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজের দর্শন-লাভ করিয়া মণিপূরচক্র-ভেদে প্রবৃত্ত হইবে *।

রুদ্রযামলের ৩৮ পটলে দেখিতে পাওয়া যায়,—স্বাধিষ্ঠানচক্রাবস্থিত কৃষ্ণ "প্রকৃতিযমুনাতীরতরুগত" তথা "গোপীজনপরিমিলিত" "কুলীন" অর্থাৎ কুলাচার-পরায়ণ ও "শ্যাম" †। এই সকল প্রমাণে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের তান্ত্রিক রহস্য জানিতে পারা যায়।

অ, উ, ম, বিন্দু, নাদ, শক্তি, শান্ত—এই সাতটি প্রণবের অবয়ব। প্রণবের কলাসংখ্যা পঞ্চাশৎ; তন্মধ্যে জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি, দীর্ঘা—এই দশটি বিষ্ণুরূপী উকার হইতে উৎপন্ন *। সুতরাং হ্লাদিনী বিষ্ণু-শক্তি। আহ্লাদোৎপাদন তাহার কার্য্য। ব্রহ্মের পালনী-শক্তিই বিষ্ণুমূর্ত্তি। আহ্লাদ জীবনী-শক্তির বর্দ্ধক বলিয়া পালনী-শক্তির পরমসহায়ক। সুতরাং হ্লাদিনী শক্তির উপাসনা সকল সাধকের পক্ষেই অপরিহার্য্য। বলা বাহুল্য, হ্লাদিনী-শক্তিই রাধা, ইহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপরিচিত।

তন্ত্রশাস্ত্রে সাতটি আচার ও তিনটি ভাব † এবং কোন্ ভাবের সহিত কোন্ আচারের সম্বন্ধ, তাহা উল্লিখিত আছে। আভ্যন্তর পূজায় মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সাতটি স্থানে সেই সাতটি আচার অবলম্বন করিতে হয়। তন্মধ্যে একটি আচারের নাম বৈষ্ণবাচার। বৈষ্ণবাচার অবলম্বন করিয়াই স্বাধিষ্ঠানচক্র-ভেদে প্রবৃত্ত হইতে হয়। আচারগুলি পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব-ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম আচারচতুষ্টয়ের সহিত পশুভাবের ও শেষোক্ত আচার-ত্রিতয়ের সহিত বীর দিব্য-ভাবের সম্বন্ধ আছে। পশুভাবের সাধনা প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা; বীরভাবের সাধনায় প্রবৃত্তি সংযম করিতে করিতে নিবৃত্তিমার্গে দিব্যভাবে উপনীত হইতে হয়। বৈষ্ণবাচারে পশুভাব অবলম্বনীয়। এই জন্যই রুদ্রযামলে ৩৯ পটলে দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিনা কৃষ্ণাশ্রয়েণাপি ব্রহ্মতুষ্টো ন কস্যচিৎ।
ন তুষ্টা কুণ্ডলী দেবী পশুভাবং বিনা প্রভো॥"

তান্ত্রিকাচার্য্যগণ এই সাধনরহস্য সম্যক্ অবগত ছিলেন বলিয়া কৃষ্ণভাবতৎপরতার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অস্মৎ পূর্ব্বপুরুষ পরমারাধ্যপদ সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস তৎকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের মুখবন্ধে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম

---

* "কুর্য্যাৎ পরমসন্দর্ভং মণিপূরে বিচক্ষণঃ।
কৃত্বা চ দর্শনং বিদ্বান্ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্॥
স্বাধিষ্ঠানাদি দেবেন্দ্রং শক্তিযুক্তং নিরঞ্জনম্।
রাকিণী রাধিকাব্যাপ্তং ত্রিলোকরক্ষণং পরম্॥"

† "নিরালম্বঃ শ্যামঃ প্রকৃতি যমুনাতীরতরুগঃ।
কুলীনো গোপীভিঃ পরিমিলিত পার্শ্বস্থলসুখঃ॥"

* 'প্রপঞ্চসার'—তৃতীয় পটল দ্রষ্টব্য।

† বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কৌলাচার—এই সাতটি আচার এবং পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব এই তিনটি ভাব—তন্ত্রশাস্ত্রের বহু গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাব ও আচার লইয়াই সমস্ত তন্ত্রসাহিত্য।

করিয়াছেন।* তন্ত্রসারকার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ গ্রন্থারম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন। †

কালীবিলাসতন্ত্রে কৃষ্ণোৎপত্তিবিষয়ক একটি আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই :—একদা কালী কামবাণ পীড়িতা হইয়া সদাশিব সঙ্গত হইলে "দলিতাঞ্জনচিক্কণ" অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল ; তাহা হইতেই "আরক্তচরণদ্বন্দ্ব" "আরক্তকরপঙ্কজ" "পুণ্ডরীকদলেক্ষণ" কৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কালী সেই বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার স্তন্যপানাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অমৃততুল্য স্তন্যপান করাইয়া, "কৃষ্ণমাতা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন।‡ ব্রহ্মার দিবসান্তে কৃষ্ণ কালীক্রোড় হইতে রাধা সমীপে গমন করেন। স্তন্যপান-কালে কৃষ্ণ দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"মা, ইহা কি ক্ষীর না অমৃত?" দেবী বলিয়াছিলেন—"ইহা সহস্রদলপদ্মনিঃসৃত নিত্যানবোদ্ধৃত অমৃত।" কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমি কে এবং কাহার পুত্র?" কালিকা বলিয়াছিলেন—"সদাশিব তোমার পিতা, আমি তোমার মাতা ও তুমি গুণাতীত জ্যোতিঃ। অমৃত হইতে গুণ আবির্ভূত হয় বলিয়া তুমি অমৃত পান করিয়া, অদ্য হইতে সগুণ হইলে।"* ব্রহ্মার দ্বিতীয় দিবসে [২য় কল্পে] কৃষ্ণ গোলোকে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসম্পৎ লাভ করিলেন, এবং যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া রাধিকার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তথায় "শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী" "হুঁকার নাদিনী মুরলী" ও "অনন্ত সুখদা" "ব্রহ্মাণ্ডমোহিনী" চূড়া লাভ করিলেন। প্রথম মুরলীধ্বনিতে তিনি লাভ করিলেন—"নারীণাং ষোড়শীং কলাং," দ্বিতীয় মুরলীধ্বনিতে তিনি কামধেনু লাভ করিলেন এবং তৃতীয় মুরলীধ্বনিতে দ্বাদশ গোপাল প্রাপ্ত হইলেন। † কৃষ্ণের ন্যায় রাধাও কালিকার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ‡

কালীবিলাস তন্ত্রোক্ত আখ্যায়িকাটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আভাস প্রদান করিতে পারে। মূলাধার চক্রে (১) কুণ্ডলিনী শক্তি, (২) স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, (৩) পৃথিবীচক্র, (৪) কন্দর্প বায়ু এই চারিটি অবস্থিত। তাহার ঊর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠানচক্র ; তাহাতে "প্রথম যৌবন গর্ব্বোল্লসিত" "শ্রীবৎসকৌস্তুভ লাঞ্ছন" "পীতাম্বর" বিষ্ণু ও রাকিণী শক্তি অবস্থিত। কামবীজও এই চক্রেই অবস্থিত §। চিরনিদ্রিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে

* "যস্যাস্তোদরকান্তিসুন্দরতরে বক্ষঃস্থলে নির্ম্মলে
ভাস্বৎ কৌস্তুভনায়কেন মিলিতা সংশুদ্ধমুক্তাবলী।
কালিন্দীসলিলেকপঙ্কজলসদ গঙ্গাম্বুধারোপমাং
শোভামাতনুতে স মে বিতনুতাং দামোদরো মঙ্গলম্ ॥"

† "নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতম্ ।"

‡ "সদাশিবাঙ্গসংস্পর্শাদ্দলিতাঞ্জনচিক্কণম্ ।
অমৃতং পরমেশানি সহসাভূৎ পরাৎ পরম্ ॥
অমৃতাজ্জায়তে কৃষ্ণো দলিতাঞ্জনচিক্কণঃ ।
আরক্তচরণদ্বন্দ্ব আরক্তকরপঙ্কজঃ ॥
তথা বক্ত্রেক্ষিযুগলঃ পুণ্ডরীকদলেক্ষণঃ ।
নিরীক্ষ্য বালকং কালী ক্রোড়েকৃত্য সুরাচ্চিতে ॥
চুচুম্বে বদনং তস্য বালকস্য বরাননে ।
* * * *
বালকউবাচ
"স্তনপানং দেহি মাত দেহি দেবি কৃপাং কুরু ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বালকস্য চ কালিকা ॥
তিষ্ঠ পুত্র নাস্তি চিন্তা অমৃতাক্তং স্তনং পিব ।
তৎ শ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ কালিকায়াঃ শুচিস্মিতে ॥
অনিশং প্রপিবেৎ কৃষ্ণোহ মৃতং মরণবর্জ্জিতম্ ।
গীয়তে তেন সর্ব্বেণ কৃষ্ণমাতাচ কালিকা ॥" ২৩ পটল ।

* "সদাশিব স্তব পিতা তব মাতা অহং সুত ।
ত্বমেব ঈশ্বর-জ্যোতি র্গুণাতীতঃ শিবঃ সদা ॥
অমৃতাদ্ গুণমিত্যাহুঃ শরীরে তন্ময়ং স্থিতম্ ।
অদ্য প্রভৃতি রে পুত্র সগুণস্ত্বং গুণাকর ॥"

† "গোলোকং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বসম্পদমাপ্নুয়াৎ ।
ব্রহ্মণো দিবসস্যান্তে দ্বিতীয় দিবসেঽপিচ ॥
যমুনাপুলিনং যত্র তত্র স্থানে তবস্থিতিঃ ।
মুরলী তব হে পুত্র শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী ॥
হুঁকারনাদিনী বিদ্যা শক্তিরূপাতু তে সুত ।
সুভগে শব্দরূপা সা মুরলী কৃচ্ছরূপিণী ॥
ব্রহ্মাণ্ডমোহিনী চূড়া অনন্তসুখদা মতা ।
প্রথমং মুরলীশব্দাৎ নারীণাং ষোড়শীং কলাম্ ॥
প্রাপ্নোসি কৃষ্ণ হে পুত্র দলিতাঞ্জনচিক্কণ ।
প্রাপ্নোসি মুরলী শব্দাৎ কামধেনুমমধ্যমাম্ ॥
প্রাপ্স্যসে দ্বাদশ গোপালান্ মুরলীশব্দমাত্রতঃ ।" ৩৪ পটল ।

‡ "মমাঙ্গসম্ভবা রাধা ত্রিপুরাপুরবাসিনী ।" [২৮ পটল ।]

§ "তস্যাঙ্গদেশলসিতো হরিরেব পায়া
নীলপ্রকাশরুচিরশ্রিয়মাদধানঃ ।
পীতাম্বরঃ প্রথমযৌবনগর্ব্বধারী
শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো ধৃতবেদবাহুঃ ।

জাগ্রৎ করিতে না পারিলে, ষট্‌চক্রভেদের উপায় হয় না। সেই আদ্যাশক্তি যখন জাগ্রৎ হন, তখন কন্দর্পবায়ুসংস্পর্শে কামপীড়িতা হইয়া, স্বয়ম্ভুলিঙ্গসঙ্গতা হইবামাত্র কৃষ্ণের উৎপত্তি হয়, তাহাই ব্রহ্মার প্রথম দিন বা কল্প। দ্বিতীয় কল্পে মাতৃরূপিণী কুণ্ডলিনী কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্বাধিষ্ঠানচক্রে আরোহণ করেন। তথায় যে রাকিণী শক্তি বিরাজিত তাহাই রাধা; তাহার সহিত আদ্যাশক্তির অভেদ কল্পনা করিয়া * রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিহ্বল সাধক উপাসনায় নিরত হইয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারাবস্থিত পরমশিবের সহিত মিলিত করিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই কৃতার্থতা লাভ করিতে হইলে স্বাধিষ্ঠানচক্র ভেদ করিবার সময়ে সকল সাধককেই রাধাকৃষ্ণোপাসক হইতে হয়। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহাদের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব কখনও বর্ত্তমান ছিল না—থাকিতে পারে না। তন্ত্র এইরূপেই সকল দ্বন্দ্ব নিরস্ত করিয়া, যে অদ্বৈততত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করে, তাহা কালী কৃষ্ণের মধ্যে প্রভেদ কল্পনার অবসর প্রদান করে না। †

"অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিণী সা
নীলাম্বুজোদরসহোদরকান্তিশোভা।
নানাযুধোদ্যতকরৈ লসিতাঙ্গলক্ষ্মী
দিব্যাম্বরাভরণভূষিতমত্তচিত্তা ॥"

[ষট্‌চক্র নিরূপণ ১৭,১৮ শ্লোক।]

"অথ স্বাধিষ্ঠানং কুলবরগতং ষট্‌কুলগতং
প্রভাকারং বিন্দো রতিশয়পদং কামনিলয়ম্।"

[রুদ্রযামল— ৩৮ পটল।]

* "ততো ধ্যেয়া মহাবিদ্যা রাকিণীশক্তিরুত্তমা।"

[রুদ্রযামল—৪১ পটল।]

† উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের বাজসাহী অধিবেশনে পঠিত।

অঞ্জলি

[শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সাহিত্যভূষণ]

কবিবর।

কোথা কোন্ নন্দনের চিরস্নিগ্ধ কবিকুঞ্জ মাঝে
নিভৃতে নিরালে; তোমার ও দেবমূর্ত্তি কোথায় যে রাজে—
কেমনে জানিব তাহা? ক্ষুদ্র নর আমি, রুদ্ধ সে যে দ্বার;
কেমনে যাইব সেথা? দুর্গম সে পথ, তবে কি আমার—
হবে না অঞ্জলি দেওয়া? বৃথা হবে পূজা উপচার;
বৃথা হবে অর্ঘ ডালা, বৃথা হবে গন্ধ-ফুলহার?

অথবা যেমন, ভক্ত তার ইষ্টদেবে মর্ত্তলোক হ'তে—
পূজে সযতনে; ভক্তি ভরে, তুষ্ট হন্ ভগবান তাতে;
সেই মত দেব! করিয়াছি পূজা আয়োজন আজি;
ভক্তি মন্দারের মালা, প্রীতি কুসুমের সাজি—
লও দেব লও তুলে! দীনের এ দীন আয়োজন,
তুষ্ট হও! প্রীত হও! ধর এ অঞ্জলি হে মধুসূদন!

জ্ঞান ও প্রেম

[শ্রীকালিদাস রায়, কবিরঞ্জন, বি.এ.]

জ্ঞান-প্রেম দু'জনেই ত্যাগবীর তপস্বী বিরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘৃণা বলি তবু নাহি মানে ॥

জ্ঞান বিশ্বামিত্র সম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি,
প্রেম সে কণ্বের মত বুকে টানে পরের সন্তানে ॥

নীরুর বিবাহ

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ, বি. এ]

হীরু মোড়ল গ্রামের মাতব্বর প্রজা। অনেক জমা-জমি, ধানের মরাই, সামান্য তেজারতি, তাহার সম্পত্তি ;—আর একমাত্র কন্যা নীরু তাহার সব। নীরুর জন্মের পাঁচ বৎসর পরে তাহার পত্নীর মৃত্যু হয়।

মুনিষ-রাখাল রাখিয়া সে চাস করিত, কিন্তু একেবারে তাহাদের উপর নির্ভর করিত না। বর্ষার জল, গ্রীষ্মের রৌদ্র, তাহার পিঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইত, তাহাতে সে কাতর হইত না। পৌষের শেষে যখন তাহার ধানের গোলা পরিপূর্ণ হইত, নানাবিধ শাকসব্জী, তরিতরকারী যখন তাহার বাড়ীর আঙ্গিনায় হাটের দিনে সাজান রহিত, তখন তাহার ক্লেশ, মাথার ঘাম, বর্ষার জল ভোগ সার্থক মনে হইত।

মা-লক্ষ্মীর কৃপা হীরুর উপর বরাবর সমানই আছে ; তবে মা-ষষ্ঠী বিমুখ ছিলেন, একটি পুত্রের জন্য সে মাথা খুঁড়িয়াও দেবীর কৃপা লাভ করিতে পারে নাই।

হীরুর ভিতর বাড়ীতে দুইখানি বড় ঘর, বাহিরে দুইটী গোয়াল, আর একখানি চণ্ডীমণ্ডপ ; চণ্ডীমণ্ডপের ধারে বসিবার ঘর।

এবার গ্রামে ফসল তত ভাল হয় নাই। টাকার লোভে যাহারা আগে ধান বেচিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের বিষম ভাবনা। মহাজনেরা হীরুর নিকট আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, সে ধান বেচিতে সম্মত হয় নাই। দুই বৎসরের খোরাক রাখিতে হইবে, জমীদারের খাজনা দিতে হইবে, তার উপর নীরুর বিবাহ দিতে হইবে। গ্রামের ছোট লোক মজুরেরা হীরুকে আসিয়া ধরিল—তাহাদের কিছু ধান "বাড়ি" দিতে হইবে। হীরুর নিজের ধান থাকিতে লোকগুলি খাইতে পাইবে না, এটা ভাল কথা নয় ; তাই সে একটি গোলা ভাঙ্গিয়া তাদের এবারকার মত ধান ধার দিতেছে। অন্যান্য লোকের মত সে ধান ধার দিয়া কখনও "বাড়ি" লয় নাই, এবারও লইবে না বলিয়া দিয়াছে। গ্রামের কৃষাণ-মুনিষেরা সেইজন্য তার অত্যন্ত বাধ্য ছিল।

হীরু মাঠ হইতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, এমন সময়ে তাহার শুভার্থী বন্ধু, গ্রাম্য পাঠশালার ফকির ঘোষ, হুঁকাহস্তে আগমন করিলেন। ফকির জমিদারের বৈঠকখানায় যাতায়াত করিত, তজ্জন্য তাহার মেজাজ একটু উগ্র হইয়াছিল ; সে তাহার পাঠশালার জ্ঞানের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেজন্য তাহার একটু খাতির ছিল। মুসাবিদা, দলিল, ইত্যাদি ফকির ঘোষ না দেখিয়া দিলে হীরুর মত লোকদের মনঃপুত হইত না ; আর গ্রামের দুইপক্ষের বিবাদ-মোকদ্দমায় ফকির দু'পয়সা রোজগার করিত। অনেক কথাবার্ত্তার পর নীরুর বিবাহের কথা উঠিল। আজকাল টাকা ঢালিতে না পারিলে ভাল পাত্র পাওয়া যায় না ; ধার করিয়া সোণার গহনা না দিতে পারিলে, সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ কথায় ফকির হীরুকে বুঝাইয়া দিল যে, ধানের গোলা সে শীঘ্রই বিক্রয় করিয়া তাহার কন্যার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হউক ; কারণ, বিবাহের ফুল যে কখন ফুটিবে, তা কে জানে। কতকগুলি ধানের মহাজন ফকিরকে মুরুব্বি ধরিয়াছিল ; টাকা প্রতি দুই আনা পাওনা তাহার সহিত গোপনে চুক্তি হইয়াছিল। সেই জন্য নীরুর বিবাহের জন্য তাহার এত চেষ্টা !

হীরু চাষ করিয়া খাইলেও, সে একেবারে বুদ্ধিহীন ছিল না। সে তাহার তেজারতির খাতা বাহির করিয়া ফকিরকে দেখাইল, সেই খাতার টাকা হইতেই সে কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করিবে, প্রাণ থাকিতে ধানের গোলা বিক্রয় করিয়া সে লক্ষ্মীছাড়া হইতে পারিবে না।

ফকির দেখিল, সেই খাতায় তাহারও নাম আছে। হীরু এ পর্য্যন্ত কখনও তাগাদা করে নাই ; কিন্তু তাহার কন্যার টাকা না দিতে পারিলে, তাহার পণ্ডিতি-জীবিকা-:

টুকুও বুঝি চলিয়া যাইবে! সে শুষ্ক মুখে তখন বন্ধুর মতনই বলিয়া উঠিল, "তা নীরুর বা এমন কি বয়স হইয়াছে, তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক নাই; তবে আমার টাকাটা, কি জান হীরু—"

হীরু সাদাসিদে মানুষ; সে ফকিরকে বুঝাইয়া দিল—'অসময়ে সে টাকা ধার দিয়াছে, সে এক পয়সা কখনও সুদ লয় নাই বা প্রত্যাশা করে না; তবে নীরুর বিবাহের সময় তাহার সমস্ত টাকা পাওয়া চাই।' ফকির বুঝিল, হীরুর কথার অর্থ—"উকীলের চিঠি"। হীরু এত সেয়ানা হইয়াছে, ফকির বুঝিতে পারে নাই। সকলেই যদি আইন বোঝে, উকীলেরা কি করিবে। তাহাদের ব্যবসা বুঝি যায়!

এমন সময় মাঠ হইতে মুনিষেরা মাথায় করিয়া নানা রকমের তরকারী, বাগান হইতে নানা রকমের ফলমূল লইয়া হাজির হইল। হীরু সেই সকলের মধ্য হইতে কিছু বাছিয়া ফকির-মশাইকে দিতে বলিল। তেমন তাজা তরকারী, সুমিষ্ট ফলমূল দেখিয়া মশাইএর রসনা সরস হইয়া উঠিল।

"কাল নীরুকে দেখতে আসবে, তাই কিছু তরকারী আনিয়ে রাখলাম; মশাই, তোমারও কাল নেমন্তন্ন, নীরু তোমার কাছে ক খ, শিখেছিল,—"

মশাই একটু গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, 'আহা! তার যদি আজ মা থাকতো, লক্ষ্মী---সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, জগদম্বা—'

হীরু এই কথায় তাহার তামাকটানা বন্ধ করিয়া, চণ্ডীমণ্ডপের ঘরে প্রতিমার কাঠামোর প্রতি একবার চাহিল;—তাহার স্ত্রী নীরুর জন্মবৎসরে মায়ের পূজা আনিয়াছিল। স্মৃতিও নীরব, প্রার্থনাও নীরব।

মশাই হীরুর ভাবান্তর দেখিয়া মনে করিল, টাকার তাগাদা হইতে যদি এ যাত্রা করিয়া পরিত্রাণ পায়। কিন্তু মুরুব্বি আনা ছাড়িল না আমরা আছি, ভাবনা কি তোমার। তারপর একছিলিম তামাক পোড়াইয়া পণ্ডিত-মশাই হুঁকা ও তরকারী লইয়া চলিয়া গেলেন।

(২)

একটি বড় পুকুরের ধারে আটচালা ঘরে গ্রামের পাঠশালা। প্রায় ৪০।৫০টি ছেলে তথায় পড়িতে যায়। কেহ চালডাল, কেহ তামাক-টিকে, কেহবা এক ঝুড়ি ঘুঁটে-কাঠ লইয়া পণ্ডিতের জন্য রাখিয়া দিয়াছে; উহার মধ্যে যাহাদের একটু বয়স হইয়াছে, তাহারা গোপনে ঐ তামাকের পরীক্ষা করিতেছে, দা-কাটা তামাক, দু' একবার কাশিয়া তাহারা রাখিয়া দিল। আর যাহারা শীঘ্রই পাঠশালা হইতে ছুটি লইবে, তাহারা পুকুরের ধারের আমগাছে বসিয়া মুড়ির মোয়া খাইতে খাইতে "কাষ্ঠরে ভালো তোর কাপাল" ও "গয়লা ঘরের বাগান" আবৃত্তি করিতেছিল।

একখানি ছোট সতরঞ্চের উপর আমকাঠের বড় চৌকী, পণ্ডিত-মহাশয়ের আসন। দুই পার্শ্বে দুইটি বেত। এখনও মশাই আসেন নাই---তাহার বিলম্ব দেখিয়া ছেলেরা অধীর হইয়া উঠিল। যাহারা গাছে চড়িয়াছিল, তাহারা নামিয়া রাস্তা পর্যন্ত কতদূর গিয়া দেখিয়া আসিল, মশাই আসিতেছেন কি না। প্রায় আটটা বাজিয়া গেল, মশাইএর দেখা নাই! আজ বুধবার, সকলের নিকট পাওনা আদায়ের দিন, তবু পণ্ডিতের দেখা নাই!

এমন সময় হীরু মাঠে যাইতেছিল, সঙ্গে দুইজন মুনিষ। ছেলেরা তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে গেল, একজন জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গো—নীরুর বাপ—দিদির বুঝি বিয়ে?" আর একজন দুষ্ট ছোকরা বলিয়া উঠিল, "ধুচুনি মাথায় দিয়ে" আর একজন তাহার গালে এক চড় মারিয়া বলিল, "মারবে মশাই বেত নিয়ে" তখন রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল। "কাল তোদের নেমন্তন্ন—নীরুর বিয়ে হবে, সকলেই যাবি, তাদের এই কথা বলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চলিয়া গেল। এমন সময়ে পণ্ডিত-মশাই ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উদয় হইলেন। দূর হইতে ছেলেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, স্ব স্ব স্থানে বসিয়া, নূতন-পড়া পুরাণ পড়া, লালফুল, নূতন কাপড়, ক এ ই করি, ব এ ই বয়ি---আবৃত্তি করিতে লাগিল। পণ্ডিত দূর হইতে ল্যাখ, ল্যাখ---বলিয়া আসর জমাইয়া আসনপরিগ্রহ করিলেন। পণ্ডিতের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ছেলেরা আর মুখ তুলিল না।

"কইরে, পাওনা সব এনেছিস্—"

আজ্ঞে এনেছি, সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। পণ্ডিত প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এমন সময়ে নায়েব-মহাশয় তাহার ছেলেকে লইয়া পাঠশালায় উপস্থিত হইলেন। মশাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া "আসতে আজ্ঞে হয়—ওরে কেদেরা-খানা দে; এটি বুঝি আপনার পুত্র—"

"হাঁ একে তোমার এখানে দোব্ মনে করেছি—জমিদারী হিসেবটা,—"

"তা আর কথা আছে ! পাওনার হিসেব, দেনার হিসেব, এই হলো সংসারের হিসেব।"

"একটা কথা আছে, ফকির ?"

"আজ্ঞে, আপনার ছেলের আর মাইনে দিতে হবে না।"

"না হে তা নয়—"

এইবার পণ্ডিতের মুখ শুষ্ক হইল ! কিজানি কি হিসেব নায়েব মশাই এনেছেন।

"ওরে তোদের আজ ছুটি, কাল সকাল সকাল আসবি।"

ছেলেরা আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল, কতকদূর গিয়া—"আজ আমাদের ছুটি, গরম গরম রুটি', আবৃত্তি করিতে করিতে চলিয়া গেল !

* * * *

"দেখ ফকির—"

"আজ্ঞে !"

"হরুর মেয়েকে নাকি কাল দেখতে আসবে ?"

"আজ্ঞে তাই তো শুনছি।"

"সে না কি সব টাকার তাগাদা করেছে ?"

"আজ্ঞে, আমাকেও। এমনই অকৃতজ্ঞ, মেয়েটা এতদিন পড়লে, কেবল ড়টো শাক-তরকারী দিয়েই সেরেছে—"

"এটা তো উপ্রি পাওনা—"

"আজ্ঞে ওটা আর ধরবেন না, আপনাদের যেমন তহুরী !" নায়েব ও কথায় কাণ দিল না। চুপি চুপি বলিল, "ত্থাথ, আমাদের ছোট বাবুর সহিত নীরুর বিয়ে দিলে হয় না, সম্পত্তিটা ঘর ঢোকে।"

"ছোট বাবুর সঙ্গে ! না, না আপনি তামাসা করছেন্ !"

"না হে ফকির, হীরু শেষ কালে মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেটা কি ভাল—"

"আজ্ঞে সে যতই হোক, চাষী, এখনও লাঙ্গলধরে—

"তার আর ক্ষতি কি ? আমাদের বাবুরাও তো এই হালি হাত বদলেছেন ; ওর সম্পত্তিটা ঘরে এলে, আমার চাকরীও থাকে, তোমার পণ্ডিতিও থাকে।"

পণ্ডিত বুঝিল, এই আটচালা ঘর জমিদারের, ইচ্ছা-করিলে নাও দিতে পারে। কিন্তু নীরুর বিয়ে হবে—জমিদারের বেয়াই হবে—তা হলে আর কি বাকী রহিল !

পণ্ডিত বলিল, "দেখুন নায়েব মশাই, ছোটবাবু কি রাজী হবেন ?"

"খুব রাজী হবেন—নীরুকে একদিন পুকুর থেকে জল আনতে দেখে, ছবি তোলাবেন, বলছিলেন। কল্‌কাতায় গেলে ছেলেরা প্রায় প্রেমিক হয়ে ওঠে।"

পণ্ডিত এবার বলিল, "জমিদারের ছেলেরা যদি না যাবে, তবে পাড়া গাঁ সভ্য হবে কি ক'রে ? দেখুন দেখি, বাবুর দেখাদেখি রামা-ব্যাটাও ইস্তিরি-করা কামিজ পরছে ! আমার বাবাও তো চাষ করে গেছে, কিন্তু আমার জমি পর্য্যন্ত নাই !"

"সেই জন্যই তো হীরু তোমার তাগাদা করেছে ; তার উপায় কি করেছ ?"

"আজ্ঞে সেই জন্যই কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, বায়ুগ্রস্ত লোক, পেটের ফাঁপ বৃদ্ধি হ'য়ে, যাই আর কি !"

"দেখ, ওসবই বাজে কথা রাখ, তুমি হীরুকে ঠিক কর, আমি ছোট বাবুকে ঠিক করি"—এই কথা বলিয়া নায়েব মহাশয় সপুত্র চলিয়া গেলেন।

(৩)

বসন্ত বাবু হীরুর জমিদার। তিনি হীরুর স্বজাতি। তবে হীরু চাষ করিয়া খাইত। 'বাবু'র পূর্ব্বপুরুষেরা লাঙ্গল কাঁধে করিয়া চাষ করিয়াছে ; তজ্জন্য তিনি স্বজাতি-প্রজার উপর ততটা রাজী নহেন। এই স্বজাতিবাৎসল্য সুধু 'বাবু'তেই দেখা যাইত না ; অনেক বাবুরই আছে।

বাবু নামে মাত্র জমীদার, ড়'একবার কলিকাতা যাওয়ার পর তাহার অনেক বিষয় হস্তান্তরিত হইয়াছে, তবু তাহার জমিদারী সাজসজ্জা—নায়েব, কারকুন সবই আছে, কিন্তু নাই কেবল অর্থ। তাহার নায়েব ছিরু দাস একজন পাকা লোক ; অন্য সকালে সে অনেক নীল কাগজ ঘাঁটিয়া যখন দেখিল যে, হীরুর নিকট এক পয়সাও পাওনা নাই, তখন সে খাতা-দেখা বন্ধ করিল। এমন সময়ে স্বয়ং হীরু নানাবিধ সামগ্রীর ভেট লইয়া জমিদারী কাছারীতে উপস্থিত হইল। নায়েব দেখিল, বসন্ত-বাবু এখানে নাই, এমন ভেট এখন তাঁহারই প্রাপ্য।

নায়েব হীরুকে দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। তাহার

সুবৃহৎ উদর ; সেই উদরের গর্ত্ত প্রজার জিনিষের দ্বারাই পূর্ণ হইত। আজ একটি বড় রকমের প্রজা কাছারীতে আসিয়াছে।

মনের আনন্দ সামলাইয়া লইয়া, একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "হীরু, শুনলাম, তোমার মেয়ের না কি বিবাহ, বেশ বেশ—তোমার ভাবনা কি, একটি মেয়ে,—"

"আজ্ঞে গরীবের মেয়ে, যেমন ক'রে হোক দিতেই তো হবে, তাই আজ বাবুর কাছে অনুমতি নিতে এসেছি, আর কিছু নজর—"

নায়েব জমিদারী-কায়দায় চাকর রামাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, হীরুর নামে যেন এই নজর জমা করিয়ে দেওয়া হয়। রামা, অর্দ্ধেক পথে অর্দ্ধেক দ্রব্যাদি নিজের জন্য রাখিয়া, অর্দ্ধেক নায়েবের বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিল। কারকুন, নজর জমা করিবার সময়, রামার দিকে চাহিল ; রামা বলিল, "আজ্ঞে সে জিনিষ ভিতরে পাঠান হইয়াছে।" কারকুন এই কথা শুনিয়া মনে করিল, পুকুরে বোয়াল মাছ থাকিলে চুনোপুঁটির রক্ষা নাই।

"ওহে হীরু, বাবু তো কলিকাতা গিয়াছেন, তা তুমি কাল একবার এস।"

"আজ্ঞে, কাল আমার মেয়েকে দেখতে আসবে ; আর আপনি অনুমতি দিলেই সব হবে—"

"তা বটে ; কিন্তু বাবুকে তো জান। হাঁ, দেখ—হীরু, বাবু ছোট ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ ক'রতে গেছেন ; তা তুমিও খুব স্বজাতি—'

জমিদার উপস্থিত থাকিলে, বোধ হয়, নায়েবের চাকুরী যাইত।

"আজ্ঞে, ও কথা বলবেন না, আমরা চাকর।—একথা কেউ শুনলে বাবুর অপমান হবে। বুঝছেন তো, আমি নিজে চাষ করে খাই, আমি নীরুর চেয়ে জমিগুলিকে বেশী ভালবাসি। আমার চাষবাসগুলি রক্ষে হয়, দোল-দুর্গোৎসবটি বজায় থাকে, এই হলেই হলো।"

এমন সময়ে বসন্ত বাবুর ছোট পুত্র হেমন্ত বাবু কাছারীতে পদার্পণ করিলেন। "এই যে—ছোট-বাবু" বলিয়া হীরু নমস্কার করিল। ছোট-বাবু, পিতার সহিত, একবার কলিকাতায় গিয়া, সভ্য হইয়া আসিয়াছেন ; সেই সভ্যতার চিহ্ন তাঁহার নাসিকার অগ্রে, মাথার চুলে, গায়ের কাপড়-চোপড়ে, সর্ব্বদা প্রকাশ থাকিত।

ছোট বাবুর বয়স ২০।২১ ; পিতৃপুরুষদের Original Sin পরিত্যাগ করিয়া, তিনি দুই পুরুষ হইতে কুলীন হইয়াছেন। তিনি ও তাঁহার পিতা, হীরুর স্বজাতির ভিতর 'সভাপতিঘর।' স্কুলের বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া, তিনি পিতার সহকারীরূপে জমিদারী দেখিতেছিলেন ; কিন্তু এই কূট হিসাবের দীর্ঘ ফর্দ্দ দেখিয়া, তিনি দুই তিন বার অসুখের ভাণ করিয়া, মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। নায়েব বুঝিয়াছিল, যত না দেখে ততই ভাল,—এই ভাবিয়া তিনি নিজের চক্রব্যূহে নিজেই দ্রোণ সাজিয়া থাকিতেন।

নায়েব, অন্য কোন ভূমিকা না করিয়া, ছোট বাবুকে বলিল, "হীরুর মেয়ের বিবাহ হইবে, তাই অনুমতির জন্য এসেছিল। মেয়েটি বেশ, কে ব'লবে চাষার মেয়ে"—এই কথা বলিয়া নায়েব জিব কাটিল। ছোট-বাবুর মেজাজ মরুভূমির ন্যায় গরম হইল। সেই পূর্ব্বস্মৃতি এত কষ্টে বালি চাপা পড়িয়াছে—আবার জীর্ণসংস্কার! বসন্ত বাবু Census Report এ "দাস ঘোষ" লিখিয়া একটু উঁচু হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে ছোটবাবুর ইচ্ছা ছিল, নীরুকে বিবাহ করিয়া সম্পত্তিটা হাত করে। সেই জন্য ছোট-বাবু খুব বিক্রমের সহিত বলিলেন, "হীরু, তোমার মেয়ের বিবাহ এখন বন্ধ—পরে দেখা যাইবে।" একেই তো বলে জমীদার!

(৪)

হীরু ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। শ্যামা, যে নীরুকে মায়ের মত আশৈশব লালনপালন করিয়াছে—সে এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। নীরু, শ্যামার কান্না শুনিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন কাঁদছিস্ বড়মা?" শ্যামা কি উত্তর দিবে—নিরুত্তর!

নীরু ১২।১৩ বৎসরের বালিকা, ফুটফুটে রঙ, চেহারা-খানি বেশ, বড় ঘরের মেয়ের মত। বিবাহের কথা হওয়া অবধি সে আর বাহিরে যাইত না। তার খেলাপাতি এখন বন্ধ। এখন সে সাঁজ-সলতে দেয়, পুণ্যিপুকুর করে, চণ্ডী-মণ্ডপ ঝাঁট দেয়, গোলার নীচে জলমারুলি দেয় ; আর শ্যামাকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করে। তাহার বাপের গৃহে যে সব তরকারীপত্র বাঁচিত, তাহা নষ্ট না করিয়া, গরীব

লোকদের বিলাইয়া দিত; কতবার হাঁড়িপূর্ণ চাল ধার দিয়া আর ফেরত চাহিত না—শ্যামা, বা তাহার বাপ, এজন্য কোন দিন কিছু বলিত না; কারণ, নীরুরই তো সব। সে জন্য সে মনে করিত, এ বেশ ভাল কাজ। ভাল কাজের অভ্যাস এমনি করিয়া হয়। পাড়ার মেয়েরা নীরুকে খুব ভালবাসিত; তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া পাড়ার মেয়েরা দল বাঁধিয়া তাহার ঘরে আসিয়াছে, কাজ করিবার জন্য। পাড়াগাঁয়ে এখনও এই নিঃস্বার্থপরতার বলটুকু আছে বলিয়া, বন্যার জলস্রোত, জমিদারের অত্যাচার কিছুই করিতে পারে নাই! যাহা কিছু করিয়াছে, উপরের অভিশাপ—ম্যালেরিয়া!

পাড়ার মেয়েরা শ্যামার নিকট ছোট-বাবুর শাসন বাক্য শুনিয়া ভীত হইল। আজ যে নীরুকে দেখিতে আসিবে, তাহার কি হইবে?

শ্যামা নীরুর বাপকে বলিল, "নীরুর মামার বাড়ী থেকে ওর বিয়ের চেষ্টা কর। আমার বোধ হয়, ছোট-বাবুর কোন মতলব আছে।"

হীরু বলিল, "কপালে যা হয় হবে, আমি ভিটে ত্যাগ করিব না। মা জগদম্বা যা করেন, তাই হবে।" এই বলিয়া সে বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখে, নীরুকে দেখিবার জন্য ব্যাইবাড়ীর লোক আসিয়াছে। পণ্ডিত-মশাইও উপস্থিত হইয়াছেন।

"আগেই বলেছিলাম, হীরু এত তাড়াতাড়ি করো না, যতই হোক জমীদার—মরা হাতী সোয়া লাখ্!" এই কথা বলিয়া মশাই হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন।

যে দেখিতে আসিয়াছে, সে আগেই পণ্ডিত মশাইএর নিকট কতকটা এ বিষয়ে আভাষ পাইয়াছে। তাহারও মন ভারী হইয়াছে। "যদি জমিদারের ভয়ই থাকে, তবে মেয়েকে আইবুড়া রাখাই ভাল। কি বলুন, পণ্ডিত মহাশয়!" হীরু তাহার ব্যাইবাড়ীর লোকের এই কথা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইল। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে বলিল, "যখন এসেছ, আমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে যাও। তার মা নাই, সেই আমার সব। তার কোন অমঙ্গল হলে আমার এত কষ্ট সব বৃথা হবে।"

লোকটির মন ভিজিল না। সে একটু বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল, "আর আশীর্ব্বাদে কাজ নাই, ছেলের বিয়ের ভাবনা কি"—এই বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল।

পণ্ডিতের হুঁকার টান বড় জোরে চলিতে লাগিল। এসব কথা যেন তার কাণেই যায় নাই! বিয়েটা ভাঙ্গিলেই সে রক্ষা পায়! কি স্বজাতি-প্রেম!

হীরুর চক্ষে তখন জল আসিয়াছে। কত রৌদ্র কত বর্ষা, কত ঝঞ্ঝাবাত—তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ "আর আশীর্ব্বাদে কাজ নাই" এই কথায় সে যেন দমিয়া গেল! তাহার কন্যা যে সকলের আশীর্ব্বাদ ভিখারিণী—কত লোকের আশীর্ব্বাদের জোরে তাহার কন্যা এখনও জীবিত আছে।

পণ্ডিতের যেন ঘুম ভাঙ্গিল। সে বলিল, "হীরু, এখন যদি বিবাহ নাই হয়—তবে না হয় আশীর্ব্বাদ দুদিন পরেই হবে।"

"আমার কন্যার অমঙ্গল হবে; একটিবার ভিতরে আসুন। আমি এত ক'রে রান্নাবান্না তৈরী করিয়েছি, আজ গ্রামের নেমন্তন্ন, সকলের মনে বড় দুঃখ হবে—"

পণ্ডিত তো খাইতেই আসিয়াছিল; সে আর বাক্যব্যয় করিল না; তবে সে লোকটির এখনও রাগ ভাঙ্গে নাই। যে জাতিই হোক না কেন, ছেলের বাপের রাগ সহজে ভাঙ্গে না;—অবশ্য আমরা বাঙ্গালীর কথাই বলিতেছি।

ভিতরে গিয়া দেখে—খাবারের আয়োজন হইতেছে, পাড়ার ছেলেগুলি পাত পাড়িয়া বসিয়া আছে।

তারা আসনে বসবার পর, নীরু তাদের প্রণাম করে গেল। মেয়েটির হাতে দু'গাছি সোণার বালা, আর সুধু একখানি পরিষ্কার কাপড়। পণ্ডিত মনে করিলেন, 'এমন মেয়ে দেখে আর ছোটবাবু ভুলবে না! উঃ, এত গোবরের মধ্যেও যেন পদ্মফুল!'

আগন্তুক লোকটি নীরুকে আশীর্ব্বাদ করিল না, বা কোন কথা বলিল না। সে ছেলের বাপ—এখনও তার রাগ ভাঙ্গে নাই!

হীরু তাকে আহারান্তে বাহিরে আনিয়া বলিল, আমার "মেয়েকে যে আশীর্ব্বাদ করে না, তেমন ঘরে আমার মেয়ের বিয়ে হতে পারে না!" এই বলিয়া হীরু ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

লোকটি রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

"দেখে নেবো, চাষার পো, আমিও জমীদারের লাঙ্গল ধরি! পণ্ডিত শুনিয়া অবাক! 'এঁ্যা—হীরু এমন! বেয়াই হ'লে তো আমাকেও তাড়াবে!'

(৫)

এই কথা প্রচার হইবামাত্র হীরুর স্বজাতিরা গোঁট করিয়া বসিল। তাহার বিরুদ্ধে জমীদারের নিকট নালিশ রুজু হইল। হীরুও হাজির হইল। জমীদার বসন্তবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; ছেলের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।—তাঁহার আর্থিক অবস্থা প্রকাশ হওয়ায়, এবং ছেলের চরিত্রের কথা বাহির হওয়ায়, টাকা দিয়া সে ছেলে গ্রহণ করিতে কেহ রাজী হইল না; অমনি দিলেও বোধ হয় কেহ লইত না। মেয়ের বাপেরা, এত দুঃখের মধ্যেও যে এ কথাটা ভাবিতে শিখিয়াছে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, মেয়ের বাপেদের "সম্মিলিত শক্তি" বঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবে।

হীরুর একমাত্র কন্যা, সম্পত্তিও বেশ আছে; তবে সে এখনও মাঠে গিয়া চাষ করে, তাহার কন্যার সহিত জমিদার পুত্রের বিবাহ—স্বয়ং জমিদার এই কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে আদালতের পেয়াদা এক জরুরী পত্র লইয়া হাজির হইল। পত্র পড়িয়া জমিদারের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—জমিদারী ক্রোকের পরওয়ানা আসিয়াছে! উপায় কি?—হীরুর মেয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

জমীদার, উগ্রমূর্ত্তি হইতে হঠাৎ অতি নরম, অতি ঠাণ্ডা। তিনি হীরুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, হীরু! তুমি, আমার প্রজা, আমার জমিদারীর ভিতর তুমি একজন বিশিষ্ট-প্রজা; তবে ন্যায়-অন্যায় আমার বিচার করা উচিত—"

"জমীদারের কর্ত্তব্যই তাই'—পণ্ডিতমশাই এই কথা বলিয়া হীরুর দিকে চাহিল।

হীরু নীরব।

জমিদার আবার বলিলেন, "হীরু, তুমি ক্ষমা চাও, তোমার কন্যার বিবাহের ভাবনা নাই।"

হীরু এইবার কথা কহিল।

"আমার কন্যার বিবাহ না হইলেও ক্ষমা চাহিব না—"

"আমি আজ্ঞা করিতেছি—"

"কাহারও আজ্ঞাতে নয়।"

এই কথা শুনিয়া সমস্ত লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিল; কিন্তু হীরুর মূর্ত্তি দেখিয়া জমীদারও ভীত হইল। তবে, পাছে হীরুর সম্পত্তি হাতছাড়া হয় বলিয়া, তিনি আর একবার নরম হইলেন—"আমার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিব—তুমি ক্ষমা চাও।"

সকল লোকে—"কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

কিন্তু সেই চীৎকার ভেদ করিয়া হীরু বলিয়া উঠিল—

"আমারই মতন চাষার ছেলের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব; সে বিষয়ে হীরু কাহারও মতের অপেক্ষা রাখে না।"

এমন সময়ে কাছারীর বাটীর ধারে একটি বালিকার কান্না শুনতে পাওয়া গেল। শ্যামা দৌড়িয়া আসিয়া হীরুকে জানাইয়া গেল, "তোমার মেয়ে নীরুকে ছোটবাবু ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে—"

আগুনে যেন ঘি ঢালিয়া দিল।—হীরুর সমস্ত শরীর দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। সে একলম্ফে প্রাচীরের উপর উঠিয়া, নীচে নামিয়া, লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইল!—তখন গ্রামের অন্য ছোটলোকেরা, যাহারা এ পর্য্যন্ত বিনা "বাড়িতে" হীরুর ধান খাইয়া আসিয়াছে, তাহারা আসিয়া ছোটবাবুকে ঘেরাও করিয়াছে! তাহারা জানে, হীরুই তাহাদের জমিদার। —গরিব লোকের প্রাণে কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটিয়াছে; আজ তাহারা তাহার জন্য মরিতে প্রস্তুত। আজ, এই সম্মিলিত শক্তির নিকট জমিদারের দর্প, অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল।

জমিদার স্বয়ং আসিয়া হীরুর হাত ধরিল; "আমায় রক্ষা কর হীরু, আমার জাতি-মান তোমার হাতে। আমার জমিদারী-রক্ষার জন্য তোমার মেয়েকে চাহিয়াছিলাম—অন্য কোন স্থানে বিবাহ হইলে, আমার আশা পূর্ণ হইবে না, ভাবিয়া, তোমার মেয়েকে আটকে রাখিবার আদেশ দিয়াছিলাম—"

"হীরুর জীবন থাকিতে আপনার জমিদারী বিক্রয় হইবে না। তবে, আমার কন্যা আপনাদের মত বাবুর জন্য নয়। আমারই মত যথার্থ চাষী লোকের সহিত বিবাহ দিব।"

হীরু তাহার উভয় কথাই রক্ষা করিয়াছিল।

হাসির মাদকতা *

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

হাসি জিনিসটা সব সময়ই বেশ। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ মানুষকে, অন্যান্য জন্তুদের চেয়ে পৃথক্ করবার সময়, এই কথাটাই বলে থাকেন যে, মানুষ হাসতে পারে, অন্যান্য প্রাণী তা পারে না। অবশ্য এখন বানরের হাসি, ভল্লুকের হাসি, বাঘের হাসি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে; এরাও হাসতে পারে, এদেরও সুখদুঃখ বোধ আছে; আনন্দে দন্তবিকাশ, দুঃখে নয়নের অশ্রু-নির্গম এদেরও হ'তে পারে। যাক্ সে কথা, মানুষের হাসি নিয়েই আমাদের কথা। হাসিতে মানুষ জগৎ জয় করতে পারে। কথায় আছে --মুখখানা যার সব সময় হাসিহাসি, লক্ষ্মী সদাই তাকে অনুগ্রহ করে থাকেন। হাসিতে, অন্তরের কাহিনী মুখে প্রকাশ হয়ে, পরের হৃদয়ে আনন্দ-তৃপ্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসকারগণ অনেক রকম হাসির কথা বলে গেছেন; কোন কোন হাসির ব্যাখ্যা. তাঁরা করেছেন—যাতে, প্রাণে আনন্দ না দিয়ে, ব্যথাই দেয়; সেটাকে, হাসি না বলে, অন্য কোন নামে অভিহিত করাই ঠিক। সুন্দরীর—যার রূপের জ্যোতিতে চোক্ ঝলসে যায়, তার--মুখেও হাসির আভা পড়লে, একটা অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত হয়ে ওঠে; কারণ, দেহের সঙ্গে তার আত্মাও বিকাশিত হয়ে ওঠে। দু'টার সমবায়ে সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীতে উদ্ভাসিত হয়।

কেহ কেহ গর্ব্ব করে থাকেন, তাঁরা কখনও তাঁদের মনের ভাব মুখভঙ্গীতে প্রকাশ করেন না। যদি তাঁরা জানতেন

'মোনা লিসা' চিত্রে মুচ্‌কি হাসি

যে, হাসিশূন্য মুখটা দেখতে কেমন—তাহা হইলে তাঁরা এবিষয়ে একটু সদাশয়তা দেখাতে কখনও কার্পণ্য করতেন না; আর, যাঁরা স্বভাবতঃই একটু আনন্দপ্রিয়, হৃদয় যাদের

* "লেডিস্ রেল্‌ম্" (LADY'S REALM) হইতে গৃহীত।

তরুণ, এমন লোককে যদি অরসিক সহবাস করতে হয়, তবে তার চাইতে দুর্ভাগ্য, বোধ হয়, আর কারও নেই।

শ্রীমতী প্যাভলোভা—সার্থকতার হাসি

হৃদয়ের আনন্দটাকে লুকিয়ে রাখাই হয় তো উচ্চ সভ্যতার একটা আদর্শ হতে পারে; কিন্তু এর চেয়েও একটা উচ্চ জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে অপরকে সুখী করবার চেষ্টা করা। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ অন্তরের আনন্দটা লুকিয়ে রাখতে পারাটাই একটা গর্ব্বের বিষয় বলে মনে করতো, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই আদর্শ সভ্যতার নমুনা দেখায় নি। সমাজে বাস ক'রে, যারা হাসতে অনিচ্ছুক, তারা সভ্যতাটাকে এগিয়ে না নিয়ে বরং পিছেয়েই নিয়ে যাচ্ছে।

জাপানীদের জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে, তারা নিজেরা সুখী হবে, আর যারা তাদের পাশে আছে, তাদেরও সুখী করবে। এ ধর্ম্মটা নিশ্চয়ই কোন ধর্ম্মের চেয়ে হীন নয়। একজন ইংরেজ-রমণী, রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় একজন জাপনারীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন; এই নারী যুদ্ধে তার স্বামী ও একমাত্র পুত্র হারিয়েছিলেন। কর্ত্তব্যের আহ্বানে হাজার হাজার স্বদেশবাসী যে পথে গিয়েছেন, তারাও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন। ইংরেজরমণী ভেবেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই জাপ-রমণীকে ভারি বিমর্ষ ও অবসাদগ্রস্ত দেখবেন; কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন, তাকে অভ্যর্থনা করবার সময় জাপ-রমণীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। এই বিধবা, সন্তানহারা জননী একটুও দুঃখের চিহ্ন না দেখিয়ে বেশ হেসে হেসে তার সঙ্গে কথা কহিতে লাগলেন,—যুদ্ধের প্রসঙ্গ—কি কষ্ট কি যাতনা তিনি ভোগ কচ্ছেন, সে কথা মোটেই উত্থাপন করলেন না।

ইংরেজ-রমণী অতি নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। তিনি ভাবলেন, জাপ-রমণীর মোটে হৃদয় নাই। তিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন, কি যাতনায় অভাগিনীর অন্তর দগ্ধ হচ্ছিল; কিন্তু তাঁর দুঃখ অন্য কারও দুঃখের কারণ হতে পারে, এইজন্য তিনি সেটি প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্যই হৃদয়ের ব্যথা সত্বেও তিনি হেসেছিলেন।—আমাদের মনে হয়, এই সাহসই সাহস; এই বোধ হয়, উচ্চসভ্যতা। আর হাসিই বোধ হয়, সমাজ জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

নাট্যশালায় অভিনেত্রীরা—আনন্দদানই যাদের ব্যবসায় —অন্তর তাহাদের সহস্র ব্যথায় পূর্ণ থাকতে পারে, একটু হাসিতে তারা অতবড় বেদনা চেপে রাখে; কারণ, অভিনেত্রীর সব চেয়ে বড় আকর্ষণী শক্তিই হচ্ছে, তার সহাস্য মধুর আনন। জগতে সে আনন্দ দিতে এসেছে। আর এটাও সে ভালমত জানে যে, তার বিষাদ-মূর্ত্তি দেখলে কেহই সন্তুষ্ট হবে না।

কোন অভিনেত্রীর ফটো দেখতে গেলে, প্রায়ই দেখা যায়, তিনি হাসচেন; অবশ্য অনেক রকমের হাসি আছে; কিন্তু বিভিন্নতাটা বড় বেশী নয়।

কুমারী আইরিস্ হোয়ে—ঔৎসুক্যের হাসি

চিত্রকর যাঁরা চিত্রের প্রাণ সঞ্চার করতে চান, প্রায়ই তাঁরা নারীর মুখে মৃদু হাসি খেলিয়ে দেন। কারণ, তাঁরা

কুমারী মে ইথারিজ্ সশঙ্ক হাসি

জানেন, অবয়বের মাধুর্য্য—মনের সাহস—এতেই প্রতিফলিত হয়, এতেই চিত্রে প্রাণসঞ্চার করে।

ম্যাডোনা—নারীর শ্রেষ্ঠ আলেখ্য—যখন খৃষ্টের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসছেন, কি আনন্দ—কি তৃপ্তি বিশ্বের ব্যাকুলতা যেন ফুটে বের হচ্ছে সেই হাসি দিয়ে! গণেশজননী, যশোদা—এদের মুখের হাসিটুকুতে মাতৃহৃদয়ের আকুলতা যেন শতধারায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

'মোনা লিসার' যে চিত্রখানি দেখছেন, এমন মধুর হাসি নাকি জগতে চিত্রিত হয় নাই। আত্মার শান্তি স্থৈর্য্য—ক্ষমতা সব যেন ওই হাসিটুকুর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এমনি জীবন্ত চিত্র এখানি যে, কত লোক এর জন্য উন্মাদ হয়ে গেছে, কত হৃদয় আকুল হয়ে যুগ যুগ ঘুরে মরেছে।

সুপ্রসিদ্ধ রুস নর্ত্তকী ম্যাডাম্ প্যাভলোভা হাস্ছেন। এ হাসি যেন তার কৃতকার্য্যতার সঙ্গে ফুটে উঠছে।

মিস্ মে ইথারিজ্ হাস্ছেন। এ যেন লাজ-বিমিশ্রিত হাসি। এতে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, তিনি আমাদের বন্ধুভাবে বরণ করে নিতে রাজী আছেন; কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরই।

"এমন লাজুক তিনি মধ্যাহ্ন সূর্য্যও যেন তার লুকোবার জায়গার জন্য ছায়া দিচ্ছেন।"——

মিস্ আইরিস্ হোয়ে—নৃত্য-গীত-পূর্ণ নাট্যে যার খ্যাতি অসীম—তাঁহার হাসি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এ হাসি যেন বলছে—"আমি আশা কচ্ছি যে, আমি তোমাদের সন্তুষ্ট করতে পারবো।"

মিস্ ফিলিস্ মস্কম্যান্-এর হাসি—"সম্পূর্ণ কৃতিত্বের হাসি"; দেখা দিয়েই যেন সব হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। বিশ্বে নারীর এই তো রীতি।—ইনি নিজেও সুখী; আর ইনি চান, যাঁরা এঁকে দেখবেন, তাঁরাও যেন বেশ সুখী হন। হাসি জিনিসটাও সংক্রামক; একবার হাসি আরম্ভ হলে সেটা সকলেই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। অন্তর যাদের বিষাদপূর্ণ, তারাও বিষাদটা একটু দূরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়।

"হাস যদি জগৎ তোমার সঙ্গে হাসবে,
কাঁদ যদি—একাকী তোমাকেই কাঁদতে হবে।"

কেউ ইচ্ছা করে অতৃপ্তি চায় না; জগতে লোকে চায়—আনন্দ—চায় তৃপ্তি।

মিস্ মড্ থরনটন্ এর হাসি—"সম্পূর্ণ তৃপ্তির হাসি।"—জীবন সুখে কেটে যাচ্ছে—যেন তার কোন আশা, অতৃপ্তি নেই, জীবন-যুদ্ধে বরাবরই জয়ী হয়ে আস্ছেন। অনেকেই আমরা জীবন-যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত হয়ে হতাশ হয়ে পড়ি,—এ হাসি যেন আমাদের আশার বাণী শুনিয়ে দিচ্ছে। এতে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে

কুমারী ফিলিস্ মস্কম্যান—কৃতিত্বের হাসি

পরাজয় ইনি কখনো স্বীকার করবেন না। অজস্র ব্যথা বেদনা পর পর তার উপর দিয়ে যেতে পারে; কিন্তু আবার সদা উঠবে, আবার জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ হবে; যে পর্য্যন্ত জয়ী না হই, ফিরবো না।"

জয়ী হবই—জাতীয় চরিত্রে এর প্রভাব সামান্য নয়; মিস থরনটন জয়ী হয়েছেনও প্রকৃত পক্ষে।—আর এ হাসি দেখিয়া দিচ্ছে—জগতে নারী কি করতে পারে।

কুমারী মড্ থরনটন্—পরিতৃপ্তির হাসি

মিস্ মার্গারেট প্যাটিসন্এর হাসিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের; ইনি যেন হেসে খুন হচ্ছেন—অজস্র অতি-হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। এঁকে দেখে বোধ হচ্ছে, ইনি যেন জীবন সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পেরেছেন—অনন্ত সুখের গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। জীবন-সংগ্রাম-বিধ্বস্ত নর-নারী হৃদয়ের এই পূর্ণ আনন্দের প্রতিচ্ছবিখানা দেখে অবাক্ হয়ে থাকে। এ যেন বলে দিচ্ছে—জীবনে প্রকৃত সুখ আছে—পাবে—শুধু খুঁজে নাও তাকে। মনে হয়, ইনি যেন গাচ্ছেন—

কুমারী মার্গারেট্ প্যাটিসন্—আতিশয্যের হাসি

"দূরে যাও—দৈন্য অবসাদ

তোমায় আমায় মিলন তো কখনো হবে না।"

মিস্ সিসেলি কার্টনিজ্ দুহাতে এর হাসিভরা মুখখানা ধরে রেখেছেন, এর দৃষ্টি যেন তোমার পানেই সন্নিবদ্ধ—এও হতে পারে, হয়তো আয়নায় ইনি স্বীয় ছবিখানি দেখছেন। এতে যেন আমাদের বলে দিচ্ছে—"তিনি তৃপ্ত হয়েছেন।"

কিন্তু তৃপ্তিও তো কখন কঠিন পরিশ্রম—অসহ্য নিরাশা-বিরক্তি ছাড়া আসে না। কিন্তু সমস্ত বাধ কেটে গেছে—এখন পূর্ণ তৃপ্তি। মিস্ কার্টনিজ যেখানেই উপস্থিত হন, তাঁর জ্যোতিতে সমস্ত স্থান উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এর জ্যোতিতে সহস্র সহস্র লোক আকর্ষিত হয়ে আসে—আর আর যাঁরা দেখ্তে আসেন—তাঁদের হৃদয়েও বিদ্যুৎ খেলে যায়—সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে নব আলোকে জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

মিস্ ডেজি ডর্মার হাস্‌ছেন—ইনি যেন বন্ধুকে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছেন। এমন মধুর হাসি—মস্তকের

কুমারী সিসেলি কোর্টনীজ্ - মনোহর হাসি

মিস ফিলিস ডেয়ার প্রাণ খোলা হাসি

একটু মৃদু সঞ্চালন ভঙ্গীতে এ হাসির মাদকতা যেন আরও বেড়ে গেছে। আমাদের যেন তিনি আনন্দ দিতে পেরেছেন। আমরা আনন্দ পেয়েছি—আমাদের আনন্দে তিনিও যেন আনন্দিত হয়েছেন। ইনি আমাদের যেন সম্পূর্ণ আপন করে নিতে পেরেছেন—যেন বন্ধুভাবে তিনি আমাদের ডেকে নিচ্ছেন। এ হাসির কিরণে যে নিতান্ত অরসিক, তার চিত্তও সরস হয়ে উঠবে—অপরের চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে যাবে।

"হৃদয় অরুণের কনক কিরণ হাসি—এতে শীতকে বসন্ত করে তোলে; বসন্তের পুষ্পরাশি এর সংস্পর্শে বিকশিত হয়ে উঠে। এমন হাসি সঙ্গে থাক্‌লে অতি দীর্ঘ রজনী আনন্দে কেটে যায়! এমন হাসি যদি সঙ্গে থাকে, বহু দূরের পথ অতি অল্প হয়।"

মিস্ ফিলিস্ ডেয়ার হাস্‌ছেন। 'সরল হাসি'—প্রাণ খোলা হাসি। এ হাসি আন্তরিকতার হাসি—কৃত্রিমতা বিন্দুমাত্র নেই। এ হাসি তার স্বভাব-হাসি—জীবনও তো তার কখনও মেঘাবৃত হয়নি!

এ হাসি যেন বলে দিচ্ছে—"কিসের চিন্তা?"—দুঃখকে পদদলিত করে চিরদিনই তিনি সূর্য্যকিরণরঞ্জিত-পথে চলেছেন। তাই এর স্বভাব এমন আনন্দিত

"ফিলিস হেসে ভুলিয়ে—
জীবন-বৃক্ষের সব ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছে
শুধু কাঁটাগুলিই আমার জন্য রেখে যাচ্ছে।"

জগতে অনেক বীর আছেন—সাধারণে তাঁদের প্রশংসা করতে আনন্দ পায়—কিন্তু যারা হৃদয়-ব্যথা মুখের হাসিতে লুকিয়ে রাখতে পারেন—তাদের চেয়ে বড় কেহ আছেন কি? নীরবে অসহ্য বেদনা সহ্য করে যাচ্ছেন—কারণ, পাছে আর কেহ তার ব্যথায় ব্যথিত হন!

হাসি চিরদিনই আদর করে নেবার বস্তু—মানবের সহায়—আমাদের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ জিনিসের প্রতিচ্ছবি।

কুমারী ডেজি ডর্ম্মর্—সৌহৃদ্যসূচক হাসি

কুণাল-কাঞ্চন

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়ন মেলিছে শয়ন-শিয়রে রজনী-গন্ধা-বালা,
জাগিয়া বসিয়া অশোকের প্রিয়া ছিঁড়িছে বরণ-মালা,
কুসুম ধনু সে খালি করে' তূণ
বরাঙ্গে যে তার জ্বেলেছে আগুন,
ভাবিছে কিশোরী কটাক্ষে কা'র উপেক্ষা-বিষ ঢালা।
রাজার দুলাল, তরুণ কুণাল, সতীনের ছেলে তার,
দলিয়া গিয়াছে রূপের অর্ঘ্য, বাসনার উপহার ;
রতির গলার মুকুতার মালা
ঝলসিয়া গেছে বিদ্যুৎ-জ্বালা,
বুকের ভিতরে ফুঁসিছে নাগিনী 'তিস্‌সরক্ষিতা'র।
"চূর্ণ করিব স্পর্দ্ধা তাহার"—কহিল আত্মহারা,
"উপাড়ি' তুলিব বজ্রনখরে কুণালের আঁখিতারা,
"সে যে 'কাঞ্চন-মালিকা'র রূপ
ভুঞ্জিবে সুখে পুলক-লোলুপ—"
শিরায় শিরায় ফেনায়ে উঠিছে হিংসা-মদিরা-ধারা।
ফেনায়ে উঠিছে হিংসা-মদিরা, কাঁপিছে মর্ম্মাহতা ;
চীৎকারি' ওঠে ক্ষিপ্ত বাতাসে প্রতিশোধ-মাদকতা ;

"পাগল করেছে যে পরশ মণি,
হরিব গো তার আলোর অবনী—"
উথলে চক্ষে, কপোলে, বক্ষে, উন্মাদ চপলতা।
অন্ধরাত্রে নিদ্রা তেয়াগি' উঠিল মহিষী জেগে,
বাহিরে তখন বাদল-নৃত্যে মাদল বাজিছে মেঘে
এ ঘর ও ঘর ছুটিয়া ছুটিয়া,
অলিন্দ পথে পড়িল লুটিয়া,
অন্ধকারের অতল রন্ধ্রে ধাইল পবন বেগে।

গেছে তার পরে বরষ ঘুরিয়া ; 'পুষ্পপুরে'র পথে
কে গাহিছে ওই অন্ধ যুবক ? উতলা সুরের স্রোতে
গলিছে চরণে পথের পাথর ;
প্রভাতের আলো করুণা কাতর,
কোন্ ভুলে যাওয়া শেষ পথ চাওয়া ফুরায়েছে
আঁখি হ'তে।
হাতে হাত রাখি' সাথে সাথে তার পথ দেখাইছে নারী,
নাথের মলিন মুখপানে চেয়ে ঝরিছে শিশির ঝারি —
হায় কাঞ্চন মালিকা তোমার
বেদনা-জলধি এপার ওপার !—
পথের কিরণে শিহরি' উঠিছে সোণার খাচার সারী।

(কুণালের গান)

"আকাশের যাদুমন্ত্র নীরব,
সাগরের নীলে কুহক নাই ;
কাণ পাতি শুনি জোয়ার-ভাঁটায়,
উজান বাহিয়া ফিরিয়া যাই।
নিশা আজি মোর দিনের মতন,
আঁধার আড়ালে হারাণ' কিরণ
নিবে নি নিবে নি—চির-উন্মীল
জ্ঞানের নয়নে পলক নাই।"

* * * *

উধাও—ঊর্দ্ধে—দূর-দূরান্তে কাঁপে অন্ধের গান,
এ যেন নিশুতি নিশীথ-নিথরে ঝরণার কলতান—

হা উষার পাখী বেদনা-আতুর,
কোথা শিখেছিলি কাকলি মধুর ?
টুটে' গেছে ফুল কটান'র তৃষা— মধুমাস অবসান !
প্রাসাদ-কক্ষে নিদ্রোত্থিত রাজার পরাণ-মাঝে
সেই পুরাতন শিশুর কণ্ঠ—আরতির সুরে বাজে ;
অতীতের স্মৃতি পাত্র ছাপিয়া
স্নেহের ফোয়ারা উঠিছে কাঁপিয়া,
বাতায়ন পথে নেহারে ত্নলাল দাঁড়ায়ে ভিখারী সাজে।
তোরণ-বাহিরে আসিল অশোক আবেগে ত্ব'বাহু মেলি',—
"কাল রাতে তোরে স্বপন দেখেছি, কুণাল, ত্নলাল, এলি,
ফিরে কি এলি রে নয়নের মণি ?"
উত্তরে তার গর্জ্জে অশনি,
কে দহিল হায় প্রাণের কমল অনল-কুণ্ডে ফেলি'।
"ওরে প্রভাতের খসা তারা মোর, কথা কও আঁখি তুলি',
ওরে নির্ম্মল, সোণার অঙ্গে কেন গৈরিক ধূলি ?
পুত্র কহিল—"পিতার আদেশে
নয়ন হারায়ে ফিরিয়াছি দেশে,
দাও পদধূলি—" ওঠে নীল শিখা পাতালের দ্বার খুলি'।
একি আঁখিহীন ! নৃপতি অশোক লুটায় ধূলার 'পরে—
সহসা 'তিস্‌সরক্ষিতা' আসি' কহিল ক্ষিপ্ত স্বরে—
"জ্বলে' যায় আঁখি বজ্র-শলায়,
গরলের ক্ষত কটি-মেখলায়,
আয় রে কুণাল, রাজার ত্নলাল, ফিরে আয় তোর ঘরে।
শোন' মহারাজ, নাহি আর লাজ, এই তরুণের পায়
সঁপিনু নারীর পরম রতন, হায় বুক ফেটে যায়,
নব-যৌবন-পশরায় মোর
পদাঘাত করি' গেল মনোচোর,
তারি প্রতিশোধ নিয়েছি, কুণালে অন্ধ করেছি হায় !
আমরাই ছায়া, আমরা স্বপন, রূপের ফুলের ডালি,
আহতা, দলিতা ফণিনীর মত কাল-কূট-ফেনা ঢালি।
রসাল-শাখার মধুমঞ্জরী
কেতকীর খর কণ্টকে ভরি ;
পান করি মোরা শ্যামা যামিনীর কালো দুকূলের কালী।"

* * * *

চাহিছে প্রকৃতি উদাস নেত্রে, মানবের সুখ-দুখে
দেয় না সে সাড়া, জাগে না হর্ষ, বাজে না বেদনা বুকে !
হেরিল নৃপতি পিছু পানে চেয়ে,
ফাগুনের পাখী ওঠে গান গেয়ে—
এ পারে অরুণ, ও পারে গোধূলি—চির-প্রশান্তি মুখে !
"তুষানলে তব প্রায়শ্চিত্ত, হে তিস্‌স-রক্ষিতা,
দেশের রাজার বিচারে আজিকে হইলে শৃঙ্খলিতা।"
অশোক রাজ্যে শোকের তুফান
ভাসাল দিগ্বিজয়ের নিশান,
নয়ন হারা সে তনয়ের সাথে কাঁদিল মৌনী পিতা।
মঠে —মন্দিরে—বিহারে— চৈত্যে, পাষাণের স্তূপতলে
গলিয়া পড়িল শোকের কাজল ভিক্ষুর আঁখিজলে ;
নমি' বুদ্ধের পদপল্লবে
রাজ-মঙ্গল বর যাচে সবে,
হায় কুণালের আঁখির বিকার টুটে কি পুণ্যফলে !
সন্ন্যাসী এক চলিল একদা, দূর রাজধানী পানে,
তপোবল তার অন্ধ আঁখির আঁধার হরিতে জানে—
কহিল অশোকে—"হোক্ মহাসভা,
প্রভু বুদ্ধের করুণার প্রভা
জাগাও অঙ্গে, মগধে, বঙ্গে, ধর্ম্ম-সংঘ-গানে।
শরণ লয়েছ চরণে যাঁহার, গাও গো তাঁহারি জয়,
পরিহর' শোক, উঠ গো অশোক, দূরে যাক্ ক্ষতি ক্ষয়।
ডাকিছে তোমারে মহানির্ব্বাণ,
জ্ঞান-হিমালয়ে উড়িছে নিশান,
উঠ নরনাথ, ফুটিছে প্রভাত, নাহি শোক, নাহি ভয়।
নবীন নেত্র মেলিবে কুণাল, করিবেন প্রভু দয়া,
বোধি-দ্রুম-ছায়ে পরমা-সিদ্ধি হয়েছে সর্ব্বজয়া ;
সেই তথাগত-গৌরব-গীতে
গলিবে নয়ন ভক্তি-সরিতে,
অন্তর-তলে কর নির্ম্মাণ প্রেমের বুদ্ধ-গয়া।
সঞ্চিত কর' কাঞ্চন-ঘটে সাধুর অশ্রুকণা
ঝরিবে যখন দিব্য জীবনে তন্ময়-উপাসনা—
ঢালি' দিও সেই পুণ্য সলিল
পুত্রের আঁখি হবে অনাবিল,
নিরঞ্জনের ধ্যান-অঞ্জনে হও গো ধন্য-মনা।"

* * * *

সে এক প্রভাত, পাটলিপুত্র জাগিল সগৌরবে,
স্বর্গ হইতে পুষ্প বরষে নির্ম্মল নীল নভে,
হেরিল কুণাল ভাস্বর ভাতি,
পূর্ব্ব-আশায় পোহাইছে রাতি,
নমিল অশোক—নমিল কুণাল ভকতি-মহোৎসবে।

য়ুরোপে তিনমাস

[শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্. এ., এল্. এল্. ডি.]

শনিবার, ২৭এ জুলাই, ১৯১২।—আজ সাউথ কেনসিংটনের মিউজিয়াম কয়টি দেখিতে গিয়াছিলাম। সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সময় সহজেই কুলায় না। 'ইম্পিরিয়াল্ ইনষ্টিটিউট্', 'য়্যালবর্ট' এবং

কেন্সিংটন্ মিউজিয়ম্

'ভিক্টোরিয়া' মিউজিয়ম্ ও বর্ত্তমান সম্রাট্ বাহাদুরের ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত উপহাররাজির সংগ্রহ—এইগুলি একটু ভাল করিয়া দেখিবার সময় পাইলাম। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ও বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র ভাল করিয়া সাধারণে দেখিতে পায়, এইরূপভাবে সাজান রহিয়াছে। আমার সৌভাগ্যবশতঃ এই উভয় অভিনন্দন-পত্রেই আমি সাক্ষর করিতে অধিকার পাইয়াছিলাম। বিলাতে পদার্পণ করিতেই, একজন ইংরাজ-বন্ধু রেলওয়ে ষ্টেসনেই বলিয়াছিলেন যে, আমার স্বাক্ষর সকলস্থানে সসম্মানে রক্ষিত রহিয়াছে। এই অভিনন্দন-পত্রের স্বাক্ষর দেখিয়াই, বোধ হয়, তিনি এই সমুদয় কথা বলিয়াছিলেন। আমার গুণপনা ইহাতে কিছুই নাই। তবে কেপ প্রকাশ্য স্থানে সসম্মানে রক্ষিত নিজ স্বাক্ষর দেখিয়া, বন্ধুগণ আনন্দিত হইয়াছেন; ইহাতে গর্ব্ব কিছু যে না ছিল, তাহা নহে। যাহা হউক, মিউজিয়ম দেখিয়া, ক্রমওয়েল হাউসে আসিলাম। এখানকার অধ্যক্ষ আরনল্ড্ সাহেবের সহিত ভারতীয় ছাত্রদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সে সকল কথা সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন ও সুবিধা এস্থানে বড় নাই। অল্পবয়সে, অল্প বিদ্যার পুঁজি লইয়া, এখানে আসিয়া ভারতীয় ছাত্রদিগের অতি অল্পসংখ্যকের লাভ ও উন্নতি; কিন্তু বহুসংখ্যকেরই ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। এ সম্বন্ধে ভারতহিতৈষী মাত্রেরই ভাবিবার এবং সংশোধনের উপায়-চেষ্টা করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যে প্রণালীতে ক্রমওয়েল হাউসের কাজ চলিতেছে, কাহারও কাহারও অভিমতে তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে। কেহ কেহ আবার অন্যরূপ মনে করেন। এই সকল সমস্যার মীমাংসার জন্যই আমি রাজরাজেশ্বরের ভারত আগমনের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ বিলাতে ভারত-ছাত্রাবাসের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আপাততঃ অল্প।

রবিবার, ২৯এ জুলাই।—আজ 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার চ্যাপেল' গির্জ্জায় উপাসনা দেখিতে গেলাম। পরিচারকেরা বিদেশী দেখিয়া, অতি যত্নের সহিত আমায় প্রধান স্থানে লইয়া গেলেন। ডাক্তার ক্যাম্বল ক্লিফোর্ড যিনি সচরাচর এই গির্জ্জায় প্রচারকার্য্য করেন—একজন খ্যাতনামা
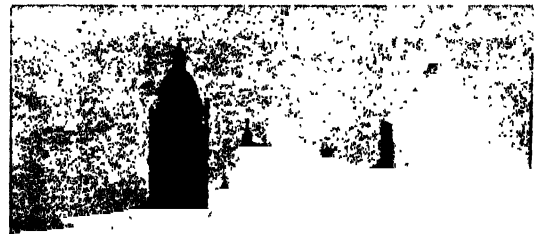
ইম্পিরিয়াল্ ইনষ্টিটিউট্

প্রচারক। আজ তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি-মহাশয় একটি সুন্দর 'সার্ম্মন্' বা ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ইহার উপদেশের মধ্যে একটি সুন্দর উক্তি পাইয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম। তাহা এই যে—যাহা মিষ্ট লাগে ও যাহাতে সুখশান্তি হয়, আমরা ভগবানকে কেবল তাহারই জন্য ধন্যবাদ দিই। যাহা সুখপ্রদ নহে, বরং অশান্তিকর, তাহার জন্য আদৌ ধন্য

রয়াল্ য়্যালবর্ট মিউজিয়ম্

বাদ দিই না। ইহা কিন্তু অন্যায়; কারণ, আমরা যাহাকে অসুখ, অশান্তি, অসম্মান বা বিপদ্ মনে করি, তাহাতে অবশ্যই কোন গূঢ় মঙ্গল অন্তর্নিহিত আছে। ভগবানের রাজ্যে "অমঙ্গল" বলিয়া কোন বস্তু নাই—জীবনে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, বহু অশান্তি ও মনোবেদনা দূরীভূত হয়। বড়ই সুন্দর কথা'!

উপাসনা-অন্তে 'রিজেণ্টস্ পার্ক', 'পিকাডেলি' প্রভৃতি বেড়াইয়া বাড়ী আসিতে রাত্রি হইল। অনেক দিন ধরিয়া বিলাতে অনেক স্থানেই ত বেড়াইলাম। কিন্তু পাপের প্রকট মূর্ত্তি কোথাও চোখে পড়ে নাই। এ কথা কয়েকজনকে বলাতে তাঁহারা বলিলেন যে, "তোমার মত গ্লাসকেসে ঝাঁটা থাকিলে পাপের পূর্ণলীলা কি প্রকারে দেখিতে পাইবে?"—আমি বলি যে, যাঁহারা কার্য্য-অনুরোধে কিংবা বিদ্যাশিক্ষা-উপলক্ষে বিলাতে আসেন, তাঁহাদেরই বা খোঁজ করিয়া, পাপমূর্ত্তির ঘাড়ে পড়িবার প্রয়োজন কি, তাহাত বুঝিতে পারি না! 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যে যাহা খোঁজ করে, সে তাহা পায়; এই উপলক্ষে মহাভারতে বর্ণিত একটি সুন্দর ঘটনার কথা মনে পড়িল।
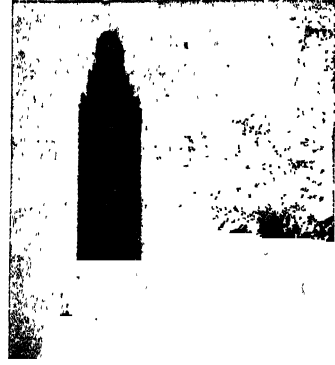
ওয়েষ্টমিনিষ্টার চ্যাপেল্

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পাঁচটি অসৎ লোক আনিয়া দিন। যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া, একটিও অসৎ ব্যক্তি পাইলেন না। কারণ, তিনি সকলকেই নিজের মত সৎ দেখিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনকে পাঁচটি সাধু ব্যক্তি আনিতে অনুরোধ করিলে, তিনি জগতে একটিও সাধু পাইলেন না; নিজের মত সকলকে দেখিলেন।

আর্ণল্ড্ সাহেবের সহিত সেদিন যেসকল কথা হইয়াছিল, তাহার কতকটা এই প্রসঙ্গের। সৌভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালী ছাত্রেরা এসকল বিষয়ে অধিকাংশই নির্দ্দোষ; কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদিগের জন্য সকলকেই ভুগিতে হইতেছে।

'ফ্রোবেল সোসাইটি'র মিস্ অর্ম্ম ও মিস্ ম্যাক্লিয়নের সহিত দেখা করিতে গেলাম। ভারতবর্ষে কিণ্ডারগার্টেন্-প্রণালীতে শিশু-জীবন গঠন ও শিশুশিক্ষা প্রচারকল্পে কি কি কাজ হইতে পারে, তাহার বিচার করিবার জন্য ইঁহাদের সহিত দেখাশুনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসুর মত একজন

বর্লিংটন্ হাউস্—পিকাডেলি

'কিণ্ডার-গার্টেন্' শিক্ষাপ্রণালী-অভিজ্ঞ ও উৎসাহী লোককে এখানে পাঠাইয়া, দেশী-বিলাতী উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য
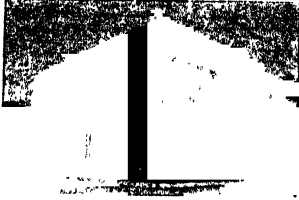
এথিনিয়ম্ ক্লব

করিতে পারিলে, তবে এক প্রকার উপকার হইবে; নতুবা যাহা হইতেছে, তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ।

সেখান হইতে 'ন্যাশন্যাল্ ইন্সিয়োরান্স্' আফিসের মিঃ ওয়াইসের সহিত দেখা করিতে গেলাম। এরূপ স্থলে "দেখা করার" অর্থ—একত্রে কোন হোটেলে জলযোগ এবং সেই সময়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া লওয়া। বিলাতী সমাজে নিম্নস্তরের ভিত্তিস্থলে নৈতিক ভাবের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এবং পান ও অপরাপর দোষ দূর করিয়া, সমাজের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু নিতান্ত অবহেলিত, সম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধানের নানারূপ চেষ্টা হয়। ভারতবর্ষেও এইরূপ চেষ্টার সময় আসিয়াছে। বিলাতে এ শ্রেণীর উন্নতিকারিগণের মধ্যে ওয়াইস্ সাহেব একজন অগ্রণী। সেই সম্বন্ধে তাহার সহিত কথা হইল।

ইংরাজ-জীবনে একটা বিশেষত্ব বরাবর দেখিতেছি যে, আমোদ-আহ্লাদ লইয়া সকল শ্রেণীর নরনারীই দিবারাত্র ব্যস্ত; এবং তাহার জন্য অর্থব্যয়েরও বিরাম নাই। ইহাতে বিলাসী ধনীদিগের তত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প।

রিজেন্টস্ পার্ক গার্ডেনস্

অনুকরণপ্রিয় মধ্যশ্রেণীর লোকই মারা যায়। তাহাদের দেখিয়া ভারতবর্ষীয় যে সমস্ত ছাত্র এইরূপ আমোদপ্রিয় হইয়া উঠে, তাহাদেরই সমূহ বিপদ্। এবং ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে এ সমস্ত প্রলোভন অনেক বেশী।

মঙ্গলবার, ৩০এ জুলাই।—ব্রিটিশ কংগ্রেস-কমিটির

স্যর উইলিয়ম্ ওয়েডরবর্ণ

অধিবেশনে নিমন্ত্রণ ছিল। সভাস্থলে স্যর উইলিয়ম ওয়েডরবর্ণ, গোখলে প্রভৃতি কংগ্রেসের শুভানুধ্যায়ী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। 'কংগ্রেস' ও তাহার মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' নামক কাগজ সম্বন্ধে ইঁহাদের সহিত অনেক কথা হইল। কংগ্রেস কমিটি ও "ইণ্ডিয়া" যে ভাবে চলিতেছে,

গোখলে (বিলাত প্রবাস কালে)

তাহা যে ঠিক নহে ও তাহাতে কোন কার্য্য হইবে না, একথা বলাতে ক্ষুণ্ণ, কেহ বা ক্রুদ্ধও হইলেন। কিন্তু আমরা রীতিমত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে না পারিলে, যে সকল চেষ্টাই বিফল, ইহা অতি সত্য।—উপনিবেশবাসিগণ, ইংলণ্ডের জনসাধারণের মতামত নিয়মিত করিবার জন্য যে, কত অর্থব্যয় ও চেষ্টা করে, তাহা তাহাদিগের লণ্ডনস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বৃহৎ আফিসগুলি হইতেই

স্পষ্ট বোঝা যায়। এগুলিতে তত্তৎ দেশের মঙ্গলের উপায়-নির্দ্ধারণ ও প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে দিনরাত পরিশ্রম করিতেছে। আমাদের এক
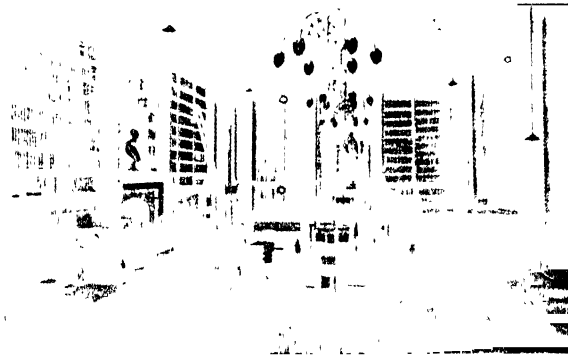
পালিয়ামেণ্ট গৃহ— অভ্যন্তর দৃশ্য

ভাঙ্গা কংগ্রেস্-কমিটি মাত্র ভরসা! কাযেই ফল আর কত বেশী আশা করা যাইতে পারে! যাহা হউক, সভাভঙ্গে ইণ্ডিয়া অফিসের শিক্ষাবিভাগের নূতন মন্ত্রী মিঃ ম্যালেটের সহিত দেখা করিতে গেলাম। ইনি স্যর হেনরী রস্কোর জামাতা। আর্ণল্ড সাহেবের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, এস্থলেও সেই শ্রেণীর কথাই অনেক হইল। আমার
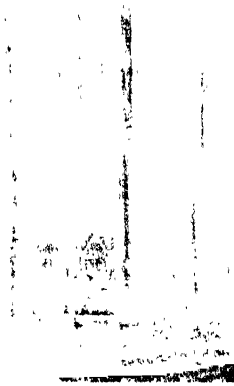
রাজ-সিংহাসন- হাউস্ অব্ লর্ডস

কয়েকটি কথার তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন এবং পার্লামেণ্টে আজ ভারতীয় বজেটের আলোচনা-স্থলে 'অণ্ডার্ সেক্রেটারী' মণ্টেগু সাহেবও অনেকটা সেই ধরণের কথাই বলিলেন। কথা ত সমস্তই ঠিক বটে; কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বীকারও করেন বটে; কিন্তু অর্থব্যয় ও কার্য্য কালে ইহার বিপরীত ঘটে।

তাহার পর, 'হাউস্ অব্ কমন্সে' ভারতীয় 'বজেট্'-বিতণ্ডা দেখিতে শুনিতে গেলাম। স্যার হার্বাট রবার্টস
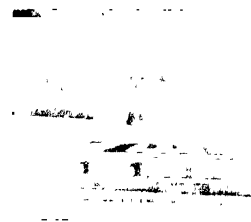
পার্লিয়ামেণ্টে লর্ডদিগের মন্ত্রণাকক্ষ

প্রভৃতি পরিচিত মেম্বারগণ পার্লামেণ্টের সভাগৃহ, 'লবি' ইত্যাদি দর্শনীয়স্থান সব দেখাইয়া আপ্যায়িত করিলেন। এসকল স্থানে আমার মত বাহিরের লোকের আসা কঠিন. তবে পার্লামেণ্টের মেম্বরদের সঙ্গে আসা যাইতে পারে। মিঃ বিরেল, উইন্সটন্ চার্চ্চিল্, লয়েড জর্জ্জ, ও অন্যান্য বড় বড় মেম্বরদের সঙ্গে আলাপ হইল। উচ্চপদস্থ বৈদেশিকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বসিবার স্থানে, মহারাজা ঝালোয়ারের সহিত একত্রে, বসিয়া 'বিতণ্ডা' শোনা গেল। ইতঃপূর্ব্বে পার্লামেণ্ট গৃহ প্রায় পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু ভারতীয় বজেট প্রসঙ্গ আরম্ভ হইলেই অনেকে 'সরিয়া পড়িলেন'। প্রায় শূন্যবেঞ্চ লইয়াই তর্ক হইল। চিরকালই নাকি এইরূপই হয়। এখানে একটা প্রবাদ আছে যে, "Indian debate is the dinner bell of the house"—অর্থাৎ ভারতবর্ষের

কেন্সিংটন্ গার্ডেন্—গোলদীঘী

কথা উঠিলেই পার্লামেণ্টের মেম্বরদিগের আহারের সময় হয়। অতএব, প্রায় সকলেই চলিয়া যান।—আমাদের প্রতি সহানুভূতির ইহা প্রকৃষ্ট পরিচয়! যাহা হউক 'অণ্ডর সেক্রেটারী' মণ্টেগুসাহেব মোটের উপর বিশেষ সহানুভূতির পরিচয় দিয়া বক্তৃতা করিলেন।

তৎপরে, অন্যান্য কয়েকজনের বক্তৃতায় প্রায় রাত্রি নয়টা

...ছিল। তখনও কিন্তু বক্তৃতা চলিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নিতাই প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট চলে। কি করিয়া যে ইহারা এত পরিশ্রম করে, বুঝিতে ত পারি না!

বুধবার, ৩১এ জুলাই।—স্যার কে. জি গুপ্তর বাটী নিমন্ত্রণ ছিল। একটু সকাল সকাল বাহির হইয়া অমনিবাসে সাউথ কেনসিংটন গার্ডেনস্ বেড়াইতে গেলাম। এই বাগানের পাশেই সাউথ কেনসিংটন রাজবাটী। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম এই স্থানেই হয় এবং তাহার শৈশব ও কুমারী কাল এখানেই কাটে। তাহারই স্মৃতিকল্পে রাজ্ঞীর কুমারী-অবস্থার এক প্রস্তরমূর্ত্তি ছবিলিব

কেন্সিংটন্ প্রাসাদ

সময়, স্থানীয় সাধারণ, চাঁদা তুলিয়া, এই বাগানে বসাইয়াছে। বাগানের ভিতর একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। তাহাতে সুন্দর কয়েকটি হাঁস খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। আবার ছোট ছোট ছেলেরা খেলার নৌকা গুলি (yacht পাল তুলিয়া ভাসাইয়া দিতেছে। সেগুলি মন্দ বাতাসে বেশ স্বতন্ত্র করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। চারিদিকে সুন্দর গাছপালাও বেশ সজ্জিত রহিয়াছে; মোটের উপর বাগানটি আমার বড়ই সুন্দর লাগিল। পরিশ্রান্ত হইয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়াছি, অমনই একজন দ্বারবান আসিয়া এক পেনি (৪ পয়সা) ভাড়া আদায় করিয়া, একখানি টিকিট দিল! দেশের বাহাদুরী আছে বটে! পয়সা ছাড়া কথা নাই। অথচ পয়সা দিলেই সকল ব্যবস্থা সহজেই হয়। সন্ধ্যার পর স্যার কে. জি. গুপ্তর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা ঝালোয়ার এবং মিষ্টার জে. ঘোষাল অতিথি ছিলেন। আহারাদি সম্পূর্ণ দেশীভাবেই সমাধা হইল। ভোজনান্তে নানা কথাবার্ত্তায় মজলিস বেশ জমিয়া উঠিল।

রবিবাবু 'ব্রাইটনে' আমার জন্য স্থান ঠিক করিয়াছিলেন।

স্যর কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত

কিন্তু এক সপ্তাহ সেখানে থাকিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব; অন্ততঃ একমাস থাকা চাই। এই কথা শুনিয়া সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।

মহারাজা ঝালোয়ার অতি অমায়িক—সকলের সহিত সমানভাবে মেশেন। তিনি বিদ্যোৎসাহীও বড় কম নহেন। তাহার সহিত আলাপে বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম; মোটরে করিয়া তিনি আমায় বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন এবং আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

'টেম্পারেন্স এসোসিয়েসনে'র গ্রাব সাহেবের অনুরোধ ব্যালহামে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম; তাহাতে নাকি সকলে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই সম্বন্ধে তাহাকে এক পত্র লিখিয়া পুনরায় আমায় কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি সেই পত্রখানি আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। বন্ধুবর্গের এইরূপ সহৃদয় অনুরোধ এত আসিতেছে যে, একটা সমস্ত বৎসর বক্তৃতা করিলেও সকলের অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন! কিন্তু এত আগ্রহ ও অযাচিত সম্মান প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। অগত্যা আর একদিন ব্যালহামে যাইয়া কিছু বলিতে স্বীকার করিলাম।

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র
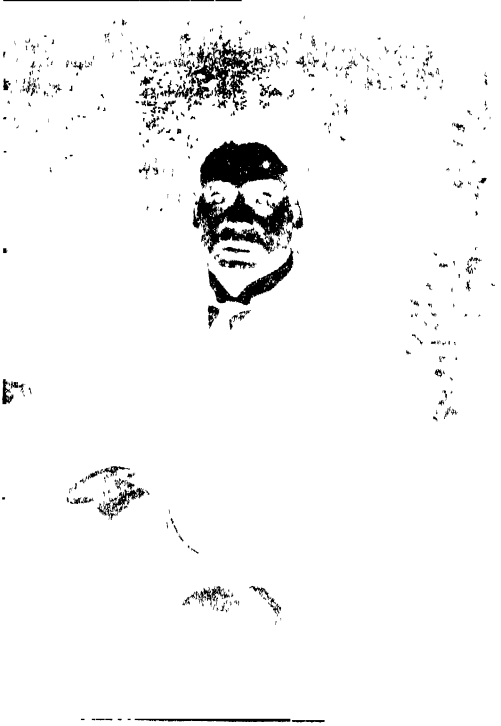
৺বরদাচরণ মিত্র

হুগলী জেলার জজ, সুপ্রসিদ্ধ কবি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানে সুপণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারী, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক বরদাচরণ মিত্র বিগত ১৩ই আষাঢ়, রাত্রি এক ঘটিকার সময়, হৃদ্-রোগে ইহসংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে গমন করিয়াছেন।

বরদাচরণ প্রায় এক বৎসর হইতে যকৃতের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। এই একবৎসর কাল তিনি কার্য্য হইতে অবকাশগ্রহণপূর্ব্বক বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বিগত তিনমাস হইতে তাঁহার রোগের ক্রমশঃ উপশম হইতেছিল;—সকলেই ভাবিয়াছিলেন, আর এক মাসের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণস্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু সহসা যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এখনও তাঁহার বৃদ্ধা মাতা বর্ত্তমান। তাঁহার মাতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা ও সমস্ত আত্মীয় স্বজনবর্গকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া, ভগবান তাঁহাকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

বরদাচরণ ১২৬৮ সালের ১লা মাঘ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ কালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রায় ছয় ঘটিকার সময় (ইংরাজী ১৮৬২, ১৩ই জানুয়ারী) জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৫৪ বৎসর হইয়াছিল।

বরদাচরণ তাঁহার ছাত্রজীবনেও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রবেশিকা হইতে এম. এ. পর্য্যন্ত বরাবর বৃত্তিলাভ করিয়া আসিয়াছেন। ইংরাজী ১৮৮২ সালে তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, এবং ১৮৮৬ সালে ভারতবর্ষীয় (Uncovenanted) সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, তখন ভারতেও এই পরীক্ষা হইত। ১৮৮৮ সালে তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া বরিশাল, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন; তৎপর ১৮৯৫ সালে জেলা জজের পদে উন্নীত হন এবং বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ফরিদপুর, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করেন।

এই রাজ-কার্য্যের গুরুতর পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হন নাই। মনে হয়, ১৮৯৩ বা ৯৪ সালে তাঁহার রচিত বঙ্গানুবাদ "মেঘদূত", ও "অবসর" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার বহুকবিতা মাসিকপত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং কয়েকটি কবিতা অপ্রকাশিত আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে বরদাচরণ "মহিম্ন স্তোত্র" বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আর

এক সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে, বর্ণনাগুলি অতি স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী।

বরদাচরণ যে কেবল বাঙ্গালাভাষার সেবা করিতেন, তাহা নহে। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার ইংরেজী কবিতা পাঠ করিয়া, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালীর দ্বারা ইংরেজীতে কবিতা লেখার আমি বিপক্ষ। কিন্তু বাঙ্গালী এমন সরস কবিতা ইংরেজীতে লিখিতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। বাঙ্গালীর রচিত অনেক ইংরেজী কবিতা দেখিয়াছি। তাহা বাঙ্গালী-বাঙ্গালী গন্ধ কহে। কিন্তু এরূপ গন্ধ ইহাতে কিছুমাত্র নাই।"

কেবল কবিত্ব-প্রতিভা ও উচ্চ-রাজপদই যে তাঁহার গৌরববর্দ্ধক ছিল, তাহা নহে। তাঁহার ন্যায় উদারহৃদয়, অমায়িক, নিরহঙ্কারী, ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, পরোপকারী ব্যক্তি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

বরদাচরণ চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অমর স্মৃতি বঙ্গবাসীহৃদয়ে চিরজাগরূক রহিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। আমরা প্রার্থনা করি—মঙ্গলময় ভগবান তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া, তাঁহাদের শোকাপনোদন করুন।

স্বর্গীয় মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল্. মহাশয় গত ৮ই আষাঢ় বুধবার চল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মন্মথ বাবু ওকালতী পাশ করিয়া, ২৩৷২৪ বৎসর বয়সে হইতে ভাগলপুরে ওকালতী করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায়, গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হন। গত তিন বৎসরকাল তিনিই পত্রিকার একরূপ সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন; তেজস্বিতা, গুণগ্রাহিতা ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেও তিনি ভূষিত ছিলেন।

ইংরেজী ব্যতীত তিনি সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেও পারিতেন। গত ১৩২০ সনের পূজায় (কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষে) তাঁহার "উপন্যাস প্রকরণ"-শীর্ষক একটি সুন্দর

৺মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত উদ্বোধন, সাহিত্য, ও আনন্দবাজার প্রভৃতি সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্রেরও তিনি লেখক ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

স্বর্গীয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

"তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!" এই নির্ভর বাক্য হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া, ইন্দুপ্রকাশ স্বদেশ-ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াই তিনি আমেরিকা হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন—সেই মহাবাক্য স্মরণ করিতে করিতেই তিনি পৃথিবী হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন! ইন্দুপ্রকাশ, তাঁহার পিতাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যদি, তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ফিরিতে পারি ও ভগবান শক্তি দেন, তাহা হইলে তোমাদের সামান্য সেবা করিতে পারিলেও জীবনকে ধন্য বোধ করিব।" ইন্দুর সে আশা সফল হয় নাই;—তিনি নিজেই অনন্ত জীবন লাভ করিয়া, অমর ধামে সেই জগৎ-পিতার সেবা করিতে চলিয়া গিয়াছেন।

ইন্দু,—'বিদ্যাসাগর জীবনী,' 'অদৃষ্টলিপি,' 'মনোরমার গৃহ' প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. A. পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, তিনি কিছুকাল বঙ্গের জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকের

৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ম্ম করিয়া, "শিক্ষায় ও চরিত্রে দশজনের একজন" হইবার আকাঙ্ক্ষায় আমেরিকা যাত্রা করেন। "অনন্ত জলধির পরপারে" একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও স্বাভাবিক মেধাবলে বি. এ. পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিয়া, ১৯১৪ সালে ১১ই জুন তিনি সনন্দ লাভ করেন। পরে, প্রাতে ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া, "টানা তিন মাস কাল অবাধে পড়িয়া"—"অবিশ্রান্ত খাটিয়া," ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এম্. এ. উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর, সুবিখ্যাত "প্রিন্সটন্" বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া, Ph. D. উপাধির জন্য পড়িতেছিলেন। তাঁহার Ph. D. লওয়া হয় নাই; দেশে ফিরিয়া, ৪।৫ বৎসর চাকরী করিয়া, তারপর আবার আমেরিকায় গিয়া ঐ উপাধি গ্রহণ করিবেন, ইচ্ছা ছিল। সকল সাধই অপূর্ণ রহিয়া গেল!

ইন্দুর 'ট্রান্সেল্‌ভিনিয়া' জাহাজে ১লা মে আমেরিকার নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিবার কথা; কিন্তু তিনি পরে শুনিতে পাইলেন, ১লা 'লুসিটেনিয়া' ছাড়িবে—ট্রান্সেল্‌ভিনিয়া ছাড়িবে—৭ই মে। "বাড়ীর দিকে মন ছুটিয়াছে" বলিয়া, তিনি টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া দ্রুতগামী 'লুসিটেনিয়া'রই টিকিট লয়েন। ইন্দু লিখিয়াছিলেন—"দেশ ছাড়িয়াছিলাম শনিবার বারবেলায়। প্রিন্সটন ছাড়িব (২৯এ এপ্রেল) বৃহস্পতিবারের বারবেলায়; নিউইয়র্ক ছাড়িব শনির (১লা মে) বারবেলায়।" "৭ই মে লণ্ডনে পৌছিব।" "লণ্ডনে ৫।৭ দিন" থাকিয়া, "ব্রিষ্টলে রাজার (রামমোহন রায়ের) গোর", "অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি" প্রভৃতি দেখিয়া, লণ্ডন হইতে ১৫ই মে 'নিভানা' নামক জাহাজ যোগে, "২১।২২এ জুন নাগাদ কলিকাতায় পৌছিব।" কিন্তু হায়! পারে আসিয়া 'ভরা ডুবি' হইয়া গেল! ট্রান্সেল্‌ভিনিয়া নির্ব্বিঘ্নে ২৩এ মে ইংলণ্ডে পৌছে; কিন্তু, লুসিটেনিয়া, যে দিন ইংলণ্ডে পৌছিবার কথা, সেই ৭ই মে আয়র্লণ্ডের উপকূলে জর্ম্মণের টর্পিডোর আঘাতে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে! সেই সঙ্গে অসংখ্য অপূর্ণ আশা-উচ্চাভিলাষ লইয়া ইন্দুপ্রকাশও অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরহবিষাদক্ষিন্ন পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রকন্যাকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? তাঁহারই কথায় বলি—"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!"

ইন্দু এখন যে স্বর্গে, সেই স্বর্গের বর্ণনা করিয়া তিনি আমেরিকা হইতে আমাদিগকে একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হইল।

মাননীয় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র আগরার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ স্বনামধন্য স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। সতীশচন্দ্রের জন্ম ১৮৭১ সালে ২০এ জুন। আলিগড়েই ইঁহার ছাত্র-জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। আলিগড় স্কুল ও কলেজ হইতেই তিনি সসম্মানে প্রবেশিকা ও এফ্. এ. এবং কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. ও এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি-লাভের জন্য অধ্যয়ন করিতে কলিকাতা-অঞ্চলে আসিয়া, তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল হুগলি কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী থাকেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি-লাভ ও বি. এল্. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৯৬ সালে যুক্তপ্রদেশে যাত্রা করেন। কিছুদিন এলাহাবাদের

ভূতপূর্ব্ব জজ সৈয়দ মামুদের সহিত লক্ষ্ণৌয়ে যাপন করিয়া, পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অনন্তর এল্. এল. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত তিনি এলাহাবাদে আইন-শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি 'এড্‌ভোকেট্' পদলাভ করিয়া, ঐ সালেই ঠাকুর-আইন-অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এলাহাবাদের "Law Journal"-নামক আইনবিষয়ক পত্রিকার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; বি এ. অধ্যয়নকালে তিনি টেনিসনের "প্রিন্সেস্" নামক পুস্তিকার যে সরলব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, পাশ হইবার পর তাহা প্রকাশিত হয়। 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইবার পর 'সাংখ্যদর্শন' সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রচারিত হয়। পরে তিনি ডাক্তার বার্কলের "তিনটি কথোপকথন" (Three Dialogues) এবং মিল্টনের "কোমস্" নামক পুস্তকদ্বয়ের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন।
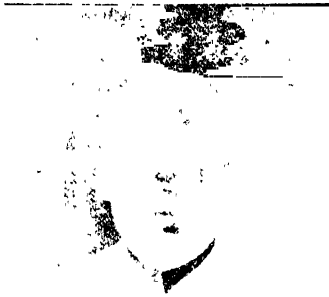
৺ ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ম্মময় জীবনেও তিনি নানাভাষার বিবিধ পুস্তক পাঠ করিতেন। সম্প্রতি গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। জনহিতকর নানাকার্য্যেও তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। যুক্ত-প্রাদেশিক-সমিতির সেক্রেটারী, ভারতীয় জাতীয়-মহাসম্মীলনির পঞ্চবিংশতি অধিবেশনের সেক্রেটারী, যুক্ত-প্রাদেশিক-রাজনৈতিক সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতি, বিগত যুক্ত-প্রাদেশিক-মহাসম্মেলন-সমিতির সভাপতি প্রভৃতি কার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। ভারতসেবক-সম্প্রদায় যুক্তপ্রদেশে যে দুর্ভিক্ষসাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্যকারী সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। গত মাসে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বদান্য, আর্ত্তরক্ষক, সৎকার্য্যে সহায়, সমাজ ও দেশহিতৈষী, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তক, তাঁহার ন্যায় মধুর উদারচেতা লোক আজকালিকার দিনে অতি অল্পসংখ্যকই দেখা যায়। অনেকদিন হইতেই তিনি এলাহাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ছাত্রীরা সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করিত; তাঁহার অগাধ শিশু-প্রীতি ছিল; সারাদিনের পর কর্ম্মক্লান্ত অবস্থাতেও রাত্রিকালে তিনি নিজে ছেলেদের পড়াইতে বসিতেন।

একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একবার তাঁহার 'ডবল নিউমোনিয়া' হয়;—সেই হইতেই চিরদিনের মত তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। পরিণত জীবনে বহুদিন হইতেই সতীশচন্দ্র বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে এক মঙ্গলবার তাঁহার জ্বর ও একটা ছোট স্ফোটক হয়; পরবর্ত্তী মঙ্গলবার বেলা ৯টার সময় তাঁহার আত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া গেল! তিনি একাধারে আদর্শ-পিতা, আদর্শপুত্র, আদর্শস্বামী, আদর্শদাতা, আদর্শ আত্মীয়, আদর্শ মিত্র, এবং সমগ্র ভারতের আদর্শসন্তান ছিলেন। দেশবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য, জীবনের মধ্যাহ্নে—মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে—তাঁহার অসংখ্যকর্ম্মময় জীবলীলা অকালে শেষ হইল! তাঁহার শোকমুহ্যমান্ বৃদ্ধাজননী, সুশীলা পত্নী, পিতৃবৎসল সন্তানসন্ততি প্রভৃতিকে আজি আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব! ভগবান্ তাঁহাদিগকে শান্তি সান্ত্বনা প্রদান করুন!

স্বর্গীয় রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর প্রধান উকিল স্বনামখ্যাত দেশপূজ্য ৺যদুনাথ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। যদুবাবু, স্বার্থত্যাগ ও দানশীলতার জন্য দেশবিখ্যাত ছিলেন। যদুবাবুর আদি

৺রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়

বাসস্থান খুলনা জেলার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে। ওকালতি ব্যবসা উপলক্ষে তিনি কৃষ্ণনগরে বাড়ী করিয়াছিলেন।

সন ১৮৬৯ সালে উক্ত মদনপুর গ্রামে রাখালবাবুর জন্ম হইয়াছিল। বাল্যকালে রাখালদাস পিতামহীর বড়ই অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন। অতি শৈশব কালে রাখালদাসের বিদ্যাভ্যাসে বড় মনোযোগ ছিল না; তিনি স্বগ্রাম হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশ করেন। রাখালদাস ১৮৮৪ সালে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়-মহাশয়ের সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা জন্মে। রাখালদাস—কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন, এবং পঁচিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়েই তাঁহার সহপাঠী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ১৮৮৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত এবং দর্শন শাস্ত্রে অনার কোর্সে প্রথম বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; রাখালদাস দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি ঐ কলেজে হইতেই দর্শন শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এবং সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।

এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রাখালদাস হালিসহর-নিবাসী ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। ইহার পর, একবৎসর কাল তিনি ভাগলপুর টি. এন্ জুবিলি-কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ১৮৯১ সালে, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। প্রথমে কৃষ্ণনগরেই কিছু দিনের জন্য শিক্ষানবিশ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া, তিনি দিনাজপুরে বদ্‌লি হন এবং ক্রমে নানা স্থানে স্থানান্তরিত হইয়া, অবশেষে, বৎসর-খানেক পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রেসেডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতে করিতে গত বৎসর তাঁহার একটি ফোঁড়া হয় এবং ঐ বংশের সুহৃদ্ বিখ্যাতনামা সার্জ্জন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ঐ ফোঁড়া অস্ত্র করেন। সেই সময়ে রাখালদাসের প্রস্রাব পরীক্ষা করাইয়া, তাঁহার Bright's disease হওয়া সাব্যস্ত হয়। পরে, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, ৺পূজার ছুটির সময় তিনি তিন মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া, জলবায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমযাত্রা করেন। বিগত ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। অচিরে আবার তাঁহার উক্ত পীড়া দেখা দেয় এবং শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকে। পরে এক দিন কার্য্য করিতে করিতে হাত হইতে কলম পড়িয়া যায়। তিনি তিনমাস ছুটির দরখাস্ত করেন এবং আবার শয্যাগত হইয়া পড়েন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজের চিকিৎসাধীন থাকিয়াও বিগত ২রা জুন

তারিখে, তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, পরলোক গমন করেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর হইয়াছিল!

রাখালবাবু জীবনে অনেক কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন; এখন বিশ্বপিতা পরমেশ্বর তাঁহাকে স্বীয় শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন! তাঁহার অমৃত হস্তস্পর্শে রাখাল বাবুর জীবনব্যাপী পরিশ্রমের শান্তি এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণ সাধিত হউক,—জগদীশ্বরের নিকট আমারা ইহাই প্রার্থনা করি!

স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী

শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশজ গোস্বামী-বংশের গৌরব, স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী, সুপণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় অশীতিবর্ষ বয়সে বিগত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার, পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র-আত্মীয়স্বজনের মুখে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

গোস্বামী-মহাশয় সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন।—তিনি ত্রিশ বৎসরাধিকাল শান্তিপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং, তাঁহার অসংখ্য ছাত্রবর্গের মধ্যে অনেকেই সংসারে নানাকার্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গলাসাহিত্য-ক্ষেত্রে 'তিনি সেকালের সহিত একালের সংযোগ-গ্রন্থির মত বিদ্যমান ছিলেন।' বিগত অর্দ্ধশতাব্দির অধিককাল তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্রতী ছিলেন। এত দীর্ঘকাল এরূপ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসাধনা করিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না।

কিঞ্চিদধিক ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রণীত "কাব্য-দর্পণ" প্রচারিত হয়। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালায় অলঙ্কারশাস্ত্রসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ ছিল না। এই পুস্তকে তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে, তিনি 'বাসব-দত্তা'র গদ্যে বঙ্গানুবাদ, 'সীতাহরণ', 'চারুগাথা,' 'শৈবলিনী' 'রত্নযুগল' প্রভৃতি নানা গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ-রচনা করেন। "গোবিন্দদাসের কড়চা"ই তাঁহার শেষ সাহিত্য-প্রচার। এখনও তাঁহার কতকগুলি রচনা অপ্রকাশিত আছে।

গোস্বামী মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। এমন মধুর ও উদারচরিত, 'নিরীহ, নির্ব্বিবাদী, অমায়িক, অল্পে সন্তুষ্ট, স্নেহময় মনস্বী আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি সুকবি ও ভাবুক ছিলেন; এবং ইদানীং অনেক নূতন পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র সেইগুলি আশ্রয় করিয়া কথকতায় যশস্বী হইয়াছেন। বাঙ্গালাসাহিত্যে সুপরিচিত কবি বেনোয়ারীলাল গোস্বামী পিতার সাহিত্যপ্রিয়তার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। "বনোয়ারীবাবু একজন সুকবি, সুরসিক এবং বহু সাহিত্যপত্রের যশস্বী লেখক। তাঁহার 'খিচুড়ি'র রসাস্বাদন, বোধ হয়, অনেকেই করিয়াছেন। ব্যঙ্গ এবং শ্লেষবাণের সন্ধানে তিনি সব্যসাচীর মত লঘু-হস্ত এবং অব্যর্থ-লক্ষ্য। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র—এবং পিতৃগুণের উত্তরাধিকারী।" তিনি এবং তাঁহার সহোদর ও পরিবারবর্গ শোকে শান্ত-সমাহিত হউন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা!

স্বর্গ

[৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সে দেশ জানো কি, জানো কি সে দেশ, যেথায় জীবন উৎসরে,
সেথাকার জল প্রাণ এনে দেয়—ধারার নাহিক অন্ত রে!
নন্দন-শিশু দেবদূতসনে গানেতে মিলায় কণ্ঠ,
ধূপ-ধূনা জ্বলে, সঙ্গীত উঠে মথিয়া তাহার গন্ধ;
সে দেশ জানো কি,জানো কি সে দেশ,ভাতি নাহি দেয় সূর্য্য—
নিত্য যেথায় দেবমহিমায় আলোক তাহার তুচ্ছ!
ক্ষেতগুলি যেথা হরিৎ বরণ, অমল ফুলের বর্ণ—
স্নিগ্ধমাধুরী লুটিছে বাতাস, চঞ্চল ফুলপর্ণ!
বিষাদের শ্বাস পড়ে না যেথায়, অশ্রু ঝরে না নেত্রে,
হৃদয় যেথায় ভাঙে না কখনো—দুঃসহ দুঃখবেত্রে;
দুঃখের স্বাদ পায় নাই কেহ, অজ্ঞাত তার নাম;
নিত্য যেথায় ধ্বনিয়া উঠিছে—আনন্দ ঋক্-সাম;
সুরের লহরী কাঁপিয়া উঠিছে, বাজিছে স্বর্ণবীণ্;
বাজিছে যেথায় রম্য যন্ত্র, ধরার দৃষ্টি ক্ষীণ;
সুর-স্বরময় আলোক-ধারায় যন্ত্রীরা করে স্নান—
যথায় হীরক, রজত শুভ্র, সব হ'য়ে যায় ম্লান!
ইন্দ্রধনু হ'তে ঝরি পড়ে কত মরকত মণিকান্তি,
সত্য নহেন বাক্যমাত্র, স্বপ্ন নহেন শান্তি;
বিশ্বরাজের আসন হেথায়, পুণ্যবানের দেশ,
মহিমার দেশ এই তো, এখানে শান্তির নিতি-উন্মেষ!
পৃথিবীর সব শেষ হ'য়ে গেলে, বাকি থাকে শেষবর্গ;
প্রেমের আলোকে উজল এ দেশ—স্বর্গ!—এই তো স্বর্গ!

"বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোর" *

বিগত ১১ই আষাঢ় শনিবার প্রাতে আলিপুর বারিকের সম্মুখস্থ ময়দানে 'বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোরে'র 'প্যারেড্'ও বিদায়-সম্মেলন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে স্যর গুরুদাস অসুস্থতানিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায়, 'কোরে'র সেক্রেটারী মহোদয় তাঁহার রচিত এই স্তোত্রটি পাঠ করেন—.
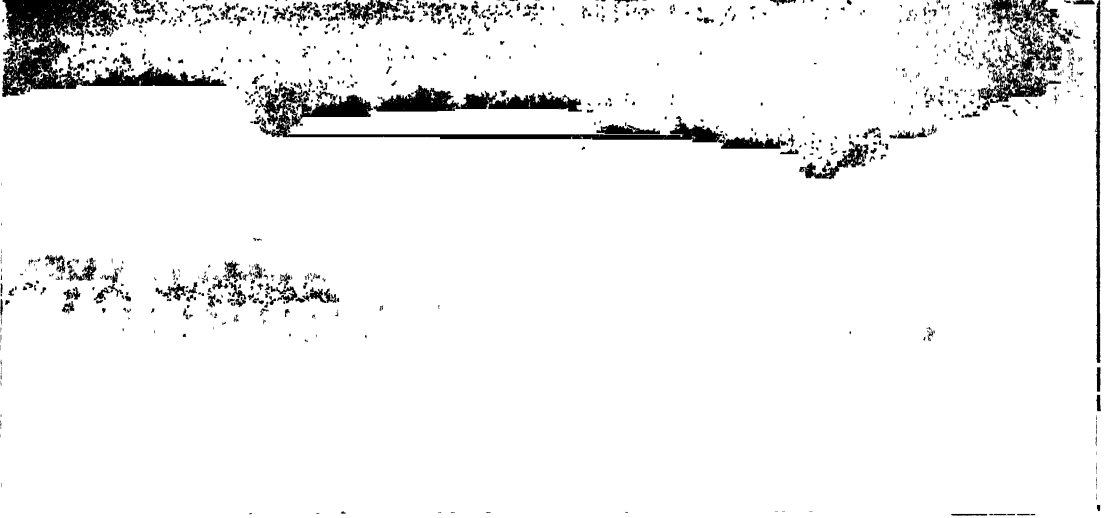
কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রার্থে "প্যারেড"

আশীষ-গীতি

রাগিণী ললিত (বা অন্য রাগিণী)—তাল আড়াঠেকা।

বিতর করুণা বিভু এ তব সেবকগণে!
লোক-সেবা—তব সেবা—ভাবে তারা এক মনে।
আত্মজন পরিহরি, বিপদ-ভয় পাসরি,
চলে তারা দেশান্তরে, সেবিতে আহত-জনে।

জননীর সুসন্তান, বাড়ায়ে দেশের মান,
সাধিবে রাজার কার্য্য, এই সাধ রাখে মনে।
ঘোষিয়া রাজার জয়, যেন তোমার কৃপায়,
হেসে ফিরে আসে, এই যাচিছে তব চরণে॥

অপরাহ্নে 'কোরে'র লোকজন কার্য্যস্থলে যাত্রা করিয়া যখন হাওড়া ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মে পৌঁছিল, তখন দর্শকের ভিড় এত বৃদ্ধি পাইল যে, সেখানে স্থান পাওয়া কঠিন হইল।
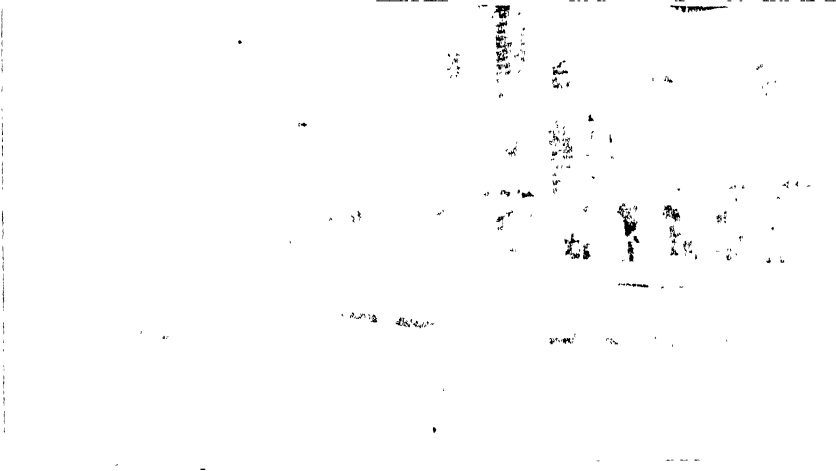
উদ্যোগপর্ব্ব

এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত পি. চাম্পাটী-মহাশয়ের আলোক-চিত্র হইতে গৃহীত।

শুভাশীষ ও প্রীতি-সম্ভাষণান্তে, আনন্দধ্বনির মধ্যে, ট্রেণ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল, 'কোরে'র লোকেরা উৎসাহের সহিত গাড়ীর জানালা দিয়া হাত ও মুখ বাড়াইয়া শেষ প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন। গাড়ী একটু দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ক্রমবর্দ্ধিত শব্দের উপরেও দ্বিজেন্দ্র লালের "আমার জন্মভূমি" গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছিল!

'কো'র গঠন-প্রণালী

গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে এই 'কোরে'র কর্ম্মচারীদিগের পদ গঠন করিয়াছেন তাহা এইরূপ,—একজন কমাণ্ডেণ্ট, চারিজন বৃটিশ কমিশণ্ড অফিসার, পাঁচজন ভারতীয় কমিশণ্ড অফিসার এবং ৬০ জন সাধারণ সেবক। এই 'কোরে'র কর্ম্মচারীবর্গ।

কমাণ্ডাণ্ট—লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল এ. এইচ. নট, আই এম এস।

লেপ্টনাণ্ট ও এডজুটাণ্ট—পি. কে. গুপ্ত, আই-এম-এস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

লেপ্টেনাণ্ট—ইউ.এন. বানার্জি, আই-এম-এস (পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়);

লেপ্টনাণ্ট—পি. এন. ঘোষ, আই এম-এস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

লেপ্টেনাণ্ট—এন. আর. চাটার্জি, আই-এম এস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

সুবাদার করম চান্দ।

জমাদর—কে. বাগচি, আই-এম-এস; জে. চক্রবর্ত্তী, এম বি (কলিকাতা); কে. সি. দাশগুপ্ত, আই-এস, এম-ডি ও এন. বি. ভট্টাচার্য্য, আই-এস-এম-ডি, আই-এম-এস।

তুরস্কে বসোরার আড্ডা এবং রণরঙ্গভূমির মধ্যস্থলে সামরিক হাসপাতালে এই 'কোর'কে ২০০ রোগীর ভার লইতে হইবে।—২৮এ জুন বোম্বাই হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, ঐ দিন প্রাতে 'বেঙ্গল এম্বলেন্স কোর' নির্ব্বিঘ্নে বোম্বায়ে পৌঁছিয়াছে। এতদিনে তাঁহারা পারস্যোপসাগরগামী "মান্দ্রাজ" হাসপাতাল জাহাজে যুদ্ধস্থল উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে।

অনুশীলন

বিদায়-বাণী

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

আহতের সেবাব্রতে—শত পুত্র, উৎসর্গিত প্রাণ!
জগতের মহাযুদ্ধে, বাঙালীর হৃদয়ের দান!
স্নেহ, মায়া, সুখ, সাধ, সংসারের স্বার্থপরিহরি,
চলেছে আতুর-ত্রাণে সিন্ধুপারে প্রাণ তুচ্ছ করি!
বাজাও মঙ্গলশঙ্খ; পুরাঙ্গনা তোল হুলুধ্বনি;
কর শিরে পুষ্পবৃষ্টি, দাও ভালে চন্দন-লেপনী!

মহাত্মা ভদ্রবাহু স্বামী ঐ সকল স্বপ্নের নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,—(১) দ্বাদশাঙ্গ শাস্ত্রবেত্তা কেহই থাকিবে না, (২) যতিদিগের মধ্যে একতা থাকিবেনা, (৩) ক্ষত্রিয়েরা জিনধর্ম্মে আস্থাহীন হইবে, (৪) রাজা নীতিপটু হইবেন না, (৫) বার [১২] বৎসর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ [আকাল] স্থায়ী হইবে, (৬) দেবতারা ভারতভূমিতে আসিবেন না, (৭) রাজা মিথ্যাধর্ম্মের অনুযায়ী হইবেন, (৮) সময় সময় বর্ষা কম হইবে, (৯) তরুণাবস্থায়ই ধর্ম্মলাভ হইবে, (১০) ক্ষত্রিয় নীচবৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং শূদ্র রাজা হইবে, (১১) কুদেবতার পূজা অধিক প্রচলিত হইবে, (১২) ধনীদিগের ধন দুষ্কর্ম্মে ব্যয়িত হইবে, (১৩) জৈনধর্ম্মের প্রভাব দিন দিন খর্ব্ব হইবে, (১৪) দক্ষিণ দেশে বর্ষা কম হইবে এবং ঐ দেশেই জৈনধর্ম্মের আদর থাকিবে, (১৫) ব্রাহ্মণ অজৈন, ও বৈশ্য জৈন হইবে, এবং (১৬) জিনমতে বিরোধ উপস্থিত হইবে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইলেন এবং ভদ্রবাহুর নিকট জৈনধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দীক্ষানাম প্রভাচন্দ্র। চন্দ্রগুপ্ত বা প্রভাচন্দ্র বহুকাল গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

জৈনসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বা প্রভাচন্দ্রের বংশেই বৌদ্ধ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের আবির্ভাব হইয়াছিল।

২। আরা নাগরী-প্রচারিণী সভার দশম ও একাদশ বার্ষিক বিবরণ,—

হিন্দীর বর্ত্তমান অবস্থা

[লেখক শ্রীব্রজনন্দন সহায়]

বিহারে হিন্দীলেখকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও এখনও সন্তোষপ্রদ নহে। উৎসাহী নব্যযুবকেরা হিন্দীভাষার উন্নতির জন্য সবিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন। বিহারপ্রান্তে কোন প্রভাবশালী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নাই এবং উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রেরও অভাব। নাগরী প্রচারিণী সভার মাসিকপত্রিকা আজকাল সূর্য্যপুরাধীশ্বর কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ প্রসাদসিংহের প্রসাদে যথারীতি প্রকাশিত হইতেছে। বাঁকীপুরের 'খড়্গবিলাস প্রেস'ও হিন্দীভাষার যথেষ্ট সেবা করিতেছেন। ভাগলপুরের হিন্দীসভা মাননীয় রাজা কীর্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দীর উন্নতি ও প্রচারকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিতেছে। প্রয়াগের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধী পত্রদ্বারা জননীজাতির মধ্যে হিন্দীর চর্চ্চা বৃদ্ধি হইয়াছে। 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, প্রয়াগের অন্যান্য প্রেস হইতেও অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। 'রাঘবেন্দ্র ও যাদবেন্দ্রের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ শর্ম্মাচতুর্ব্বেদী হিন্দীতে অনেক বালপাঠ্য পুস্তকাবলী রচনা করিয়াছেন। প্রয়াগের হিন্দীগ্রন্থ-প্রচারকমণ্ডলী 'হিন্দীনবরত্ন' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছে। হিন্দীর কতিপয় সাময়িক পত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

দৈনিক,—ভারতমিত্র।

সাপ্তাহিক,—অভ্যুদয়, ভারতমিত্র, হিন্দী বঙ্গবাসী, বীরভারত, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার, স্বধর্ম্মপ্রচারক, নারদ, ত্রিহুত-সমাচার, মিথিলা-মিহির, বিহারবন্ধু, ভারতজীবন, শিক্ষা, আনন্দ, শুভচিন্তক, ভারতদশা-প্রবর্ত্তক, আর্য্যমিত্র।

পাক্ষিক,—রাজপুত ওর ক্ষত্রিয় মিত্র, জৈনমিত্র।

মাসিক,—সরস্বতী, মর্য্যাদা, হিন্দী চিত্রময় জগৎ, ইন্দু, স্বদেশবান্ধব, লক্ষ্মী, নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা, উদুম্বর, মনোরঞ্জন, জৈনহিতৈষী, গাঢ়-বালী, গৃহলক্ষ্মী, ধন্বকুসুমাকর, উপন্যাস বহার, আত্মবিদ্যা, আর্য্যাবর্ত্ত, ঊষা, নবনীত, নবজীবন, প্রভা, প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন—তৈলীসমাচার, ভারতোদয়, সুধানিধি, মিথিলা-আমোদ প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

ত্রৈমাসিক,—জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর।

৮ম মারাঠী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি
স্যর্ শ্রীমন্ত গঙ্গাধর রাও, কে. সি. এস্. আই.

৩। সরস্বতী, মে ১৯১৫—

বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীঅপ্পা শাস্ত্রী রাশিবড়েকর,—

সংস্কৃতচন্দ্রিকা ও সূনৃতবাদিনীর সম্পাদক, সংস্কৃত-সাহিত্যের অদ্বিতীয় উৎসাহী, ওজস্বী, মর্ম্মজ্ঞ লেখক, বিদ্যাবাচস্পতি পণ্ডিত অপ্পা শাস্ত্রী রাশিবড়েকর কোলাপুর রাজ্যের রাশিবড়েকর গ্রামে ১৭৯৬ শকের কার্ত্তিক শুক্ল ত্রয়োদশীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পণ্ডিত শম্ভুভট্ট (সদাশিব) প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী এবং বৈদিক ছিলেন। অপ্পা শাস্ত্রী, গৃহে ও টোলে অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃতশিক্ষা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ভট্টাচার্য্য 'সংস্কৃত চন্দ্রিকা'র জন্মদাতা। অপ্পাশাস্ত্রী ঐ পত্রিকায় 'মাতৃভক্তি' প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার লাভ করেন এবং সিদ্ধান্তমহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। পরে, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের অনুরোধে, তিনি 'সংস্কৃত চন্দ্রিকা'র সহকারী-সম্পাদকতা

গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস করিলে, কল্পাশাস্ত্রী কাগজের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার যত্নে 'চন্দ্রিকা'র সম্যক্ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

'সংস্কৃত চন্দ্রিকা'দ্বারা পণ্ডিতগণের মধ্যে সংস্কৃতের সবিশেষ প্রচার হইতেছিল না, দেখিয়া শাস্ত্রীমহাশয় 'সুনৃতবাদিনী' নাম্নী সাপ্তাহিক সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে বিবিধ সংবাদ, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজনীতি, জীবনচরিত, প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইত। এতদ্ভিন্ন ইনি 'প্রাচ্যং ভূগোল-বিজ্ঞানম্' এবং 'পদার্থবিজ্ঞানসূত্রম্' নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মালবিকাগ্নিমিত্র, বেণীসংহার, বুদ্ধচরিত (অশ্বঘোষ প্রণীত), সাবিত্র্যুপাখ্যান এবং নলোপাখ্যানের টীকা করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুপুরাণ, শান্তিপর্ব্ব ও দেবীভাগবতের মারাঠী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সং ১৯১০, আশ্বিন কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে শাস্ত্রীজী কাল 'গ্রস্তিষ্ক্র'র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। নিঃসন্তান ব্রাহ্মণীভিন্ন তাঁহার সংসারে আর কেহই ছিল না।

মরাঠী

১। বিবিধজ্ঞান-বিস্তার আনি মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পত্রিকা, এপ্রিল, ১৯১৫।—

(১) আন্ধ্রমধ্যে গীর্ব্বাণ বিষয়ক জাগৃতি

—লেখক ডাঃ শ্রীধর বেঙ্কটেশ কেডকর, পি-এচ্ ডি। আন্ধ্র, অর্থাৎ তেলগুভাষার চেতনা সঞ্চার হইয়াছে। তেলগুভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক রাজমহেন্দ্রীর অধিবাসী বীরেশ লিঙ্গম্ পন্তুলু। ইনি পূর্ব্বে লিঙ্গায়ত ছিলেন, পরে ব্রাহ্ম হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্যও ইনি প্রাণপণে খাটিয়াছেন। তেলগুর প্রসিদ্ধ ও একমাত্র দৈনিক 'আন্ধ্র পত্রিকা'। তেলগু সাপ্তাহিকের মধ্যে মচ্ছলীপট্টন হইতে প্রকাশিত 'কৃষ্ণা পত্রিকা' সর্ব্বপ্রধান। 'আন্ধ্র-ভারতী' মচ্ছলীপট্টন হইতে প্রকাশিত তেলগু-পত্রিকাই ঐ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক। স্ত্রী-সম্পাদিকারা দুইখানা মাসিক পরিচালনা করিতেছেন; যথা, 'হিন্দুসুন্দরী' ও 'সাবিত্রী'। দ্রবিড়দেশে কোন প্রসিদ্ধ 'নাট্য কোম্পানি' নাই। কিন্তু অন্ধ্রে 'সরস বিনোদিনী সভা' ও মাদ্রাজের 'সুগুণবিলাস সভা' এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। তেলগুভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অনেক সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে 'বিজ্ঞান-চন্দ্রিকা-মণ্ডলী' ও 'আন্ধ্র সাহিত্য পরিষৎ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।
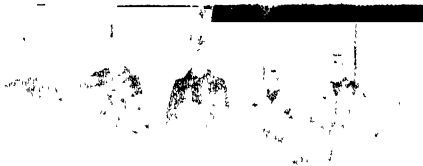
মহারাষ্ট্রীর কবি-মণ্ডলী

মহারাষ্ট্রীর লেখক লেখিকা মণ্ডলী

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেঞ্চের বরদ্বান (বর্দ্ধমান) য়েণ্টীল আটবেঁ সাহিত্য সংমেলন

বঙ্গদেশে আজ পর্য্যন্ত হাজার হাজার সভারম্ভ হইয়াছে; কিন্তু "আপল্যা মাতৃভাষেকরিতাং পরন্তুং বয় দোয়ান যেথে আপল্যা বঙ্গ বন্ধুনী কেলেলা উৎসাহ অগদীক অপূর্ব্ব হোতা, বঙ্গাল মধ্যে উৎপন্ন ঝালেলী জাগৃতী আজপর্য্যন্ত ইতক্যা স্পষ্ট রীতিনে পুর্ণী কচিতয় দৃষ্টীস পড়লী অসেল।" সম্পাদক মহাশয়ের মতে মাতৃভাষাসম্বন্ধে এরূপ সজীব সভা আর্য্যাবর্ত্তে এই প্রথম।

২। মনোরঞ্জন, মে ১৯১৫—

অষ্টম মহারাষ্ট্র সাহিত্য সংমেলনের সভাপতি-স্যর শ্রীমন্ত গঙ্গাধর রাও উর্ফ বালাসাহেব পটবর্দ্ধন,—

গত ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ও ১৯এ মে বোম্বাই মহানগরীতে অষ্টম মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। মিরজ 'সংস্থানের' অধিপতি শ্রীযুক্ত সার গঙ্গাধর রাও, ওরফে বালাসাহেব পটবর্দ্ধন, কে. সি. এস আই. সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বালাসাহেব শ্রীযুক্ত বাবাসাহেব সাঙ্গলীকরের দ্বিতীয়পুত্র। ইনি ১৮৬৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বালাসাহেবের আদি নাম গোপাল রাও রাওসাহেব। ১৮৭৪ সনে মিরজ রাজ্যের (সংস্থানের) জন্য দত্তক পুত্রের প্রয়োজন হয়। সরকার বাহাদুর ইঁহকে মনোনীত করেন। তদনুসারে পরলোকবাসী মিরজ-রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীযুক্ত গণপতরাও তাত্যাসাহেবের পত্নী, পঃ বাঃ শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই, ১৮৭৫ সনে গোপালরাওকে দত্তক গ্রহণ করেন। গোপালরাও রাওসাহেবের দত্তক নাম—গঙ্গাধর রাও গণেশ; উপনাম বালাসাহেব। ১৮৮১ সনে বালাসাহেবের বিবাহকার্য্য মহাসমারোহের সহিত

সম্পন্ন হয়। কোলাপুরের রাজারাম কলেজে বালাসাহেবের বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। ১৮৮৭ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী বালাসাহেব, সাবালক হইয়া, মিরজ-রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৩ সনে সরকার বাহাদুর বালাসাহেবকে 'কে.সি.এস আই.' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

বালাসাহেবের শরীর ও মন—উভয়ই সুন্দর। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, কর্ত্তৃত্বশক্তি অসাধারণ, ও উদ্যমশীলতা প্রশংসনীয়। তিনি, শতকার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়াও, বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। বালাসাহেব 'রাসায়নিক পরীক্ষণ' ও 'মূত্রপরীক্ষণ' নামক দুইখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি 'ডেক্কন এডুকেশন সোসাইটী'র সহকারী-সভাপতি। তাঁহার সাহায্যে অনেক যুবক ভারতে এবং বিলাতে সংস্কৃত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নানাশাস্ত্র শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। বালাসাহেব রাসায়নিক বিদ্যারই সবিশেষ অনুরাগী। তিনি সুকুমার শিল্পকলাও আয়ত্ত করিয়াছেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন। বালাসাহেব দাতা, উদার চরিত এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। এরূপ সুযোগ্য ব্যক্তির অধ্যক্ষতায় মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্য যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

৩। **মনোরঞ্জন**, জুন, ১৯১৫—এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, বার-এট্‌-ল-লিখিত এবং গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যক ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'কুমুদের বন্ধু' নামক গল্পের মরাঠী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভাতবাবুর চিত্র ও নাম 'মনোরঞ্জন'-সম্পাদক দয়া করিয়া প্রদান করিয়াছেন বটে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ভারতবর্ষের নামোল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে এরূপ ক্ষেত্রে সম্পাদক-মহাশয় শিষ্টাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

গুজরাতী

১। চিত্রময়-জগৎ, মার্চ্চ, ১৯১৫,—

প্রার্থনা

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে। ভারত ভাগ্য বিধাতা !
মহারাষ্ট্র পঞ্জাব দ্রবিড় নে গুর্জর উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ ;
তবশুভ নামে জাগে ! তবশুভ আশেষ মাগে !
গাঁতা তবজয় গাথা !

জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ! ভারত ভাগ্য বিধাতা।
জয় হে ! জয় হে ! জয় হে ! জয় জয় জয় জয় হে।
অহরহ তচ আবহান প্রচারিত সুণোতব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসী মুসলমান খিস্তানী
রাষ্ট্রোদয় কেরী আশে ! তচ সিংহাসন পাসে !
গাঁতা শুনি প্রেমনী গাথা !

* *

সংকট দুঃখত্রাতা।

জনগণ পথ পরিচালক জয় হে ! ভারত ভাগ্য বিধাতা।
জয় হে ! জয় হে ! জয় হে। জয় জয় জয় জয় হে।
ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশিথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত তে তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে,
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে। রক্ষা করী লেতু অঙ্কে !
স্নেহথকী জগনাথা !

২। **গুজরাতী পঞ্চ**,—১লা হইতে ২৯এ মার্চ্চ ১৯১৫।

সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ইংরেজ জনসাধারণ ভারতের অবস্থা ঘনিষ্টতরভাবে জানিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবাসী চির রাজভক্ত শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ। ভারতবাসীর আশা—প্রথমে Provincial autonomy, তৎপরে ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির ন্যায় ভারতেও স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবিস্তার।

গত ৫ই মার্চ্চে বড়োদায় সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের এক পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতের নানাস্থান হইতে পণ্ডিতেরা তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পরিষদে মহারাজ সর সয়াজী রাও গাইকোয়াড়ের বক্তৃতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "মাতৃঋণ" উপন্যাস প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস "কবিশেখরে"র "বল্লরী" প্রকাশ হইল ;—মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্তের "প্রাচীন ভারত" প্রকাশ হইল ;—মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়-প্রণীত "ব্রাহ্মণবংশ-বৃত্তান্ত" প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, 'মিনার্ভা থিয়েটারে' অভিনীত, নূতন নাটক "বীররাজা" প্রকাশিত হইল ,—মূল্য ৸০ আনা।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "পঙ্করত্ন" প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ।০ আনা।

"মানসী" পত্রিকা-সম্পাদক মহারাজা নাটোর ও "সঙ্কল্প"-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ-বিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, "মর্ম্মবাণী" নামক সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,

বেদ-ভাষ্যকার

[শ্রীসাতকড়ি অধিকারী, এম্‌. এ.]

বেদ-ভাষ্যকারগণের মধ্যে সায়ণাচার্য্যই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সায়ণাচার্য্যের নাম বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বেদ-ভাষ্যকারগণের নাম অনেকেই অবগত নহেন। নিঘণ্টু গ্রন্থের টীকাকার দেবরাজ-যজ্বা, তাঁহার টীকার ভূমিকায়, নিঘণ্টুস্থ পদের ব্যাখ্যা করিতে কোন্ কোন্ গ্রন্থের সাহায্য অবলম্বন করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি * যাস্কের নিরুক্ত, স্কন্দস্বামিকৃত নিরুক্তটীকা, (১) স্কন্দস্বামী, (২) ভবস্বামী, (৩) রাহদেব, (৪) শ্রীনিবাস, (৫) মাধবদেব, (৬) উবটভট্ট, (৭) ভাস্করমিত্র (৮) ও ভরতস্বামী প্রভৃতির বেদভাষ্য, পাণিনির ব্যাকরণ—বিশেষতঃ উণাদি সূত্র ও তাহার বৃত্তি, ক্ষীরস্বামী ও অনন্তাচার্য্য প্রভৃতির রচিত নিঘণ্টু ব্যাখ্যা, ভোজরাজের ব্যাকরণ ও কমলনয়নের নিখিলপদসংস্কার, অবলোকন করিয়া, নিঘণ্টুস্থ পদের প্রকৃতিপ্রত্যয়নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবরাজ-যজ্বার এই বাক্য হইতে আমরা স্কন্দস্বামী প্রভৃতি আটজন বেদভাষ্যকারের নাম পাইতেছি। এই আটজন ব্যতীত অপর বেদভাষ্যকারগণেরও গ্রন্থ তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন লিখিয়াছেন; সুতরাং, দেবরাজ-যজ্বার সময়ে ঐ প্রসিদ্ধ আটজনের ভাষ্যব্যতীত অপর বেদভাষ্যও প্রচলিত ছিল, বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি যে আট জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাধবদেবেরও নাম দেখিতে পাইতেছি। এই মাধবদেব প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য, কি না, এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য নিঘণ্টু-টীকার সম্পাদক ৺সত্যব্রত-সামশ্রমী-মহাশয় টীকার টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন, এই মাধব * সায়ণ মাধব হইতে প্রাচীন; ইনি একজন বিবরণ-গ্রন্থকার। সায়ণাচার্য্য ঋগ্‌বেদ-ভাষ্যে "বিহিসোতোঃ" ইত্যাদি ঋঙ্-মন্ত্রের (ঋঃ মঃ ৮।৪।১।১১) ব্যাখ্যাস্থলে মাধবভট্টনামক বিবরণকারের উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাই। † এই সায়ণ-কথিত মাধবভট্ট ও দেবরাজযজ্ব-কথিত মাধবদেব—যাঁহাকে পণ্ডিত সামশ্রমী-মহাশয় বিবরণকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—উভয় নামে এক ব্যক্তি, কি না, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। দেবরাজ-কথিত আট জন ভাষ্যকারের মধ্যে উবটভট্টের বেদভাষ্যব্যতীত অপর কাহারও বেদ-ভাষ্য এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, কি না, জানি না। উবটভট্ট শুক্ল-যজুর্ব্বেদসংহিতার ভাষ্যকার—তিনি ঋগ্‌বেদের প্রতিশাখ্যগ্রন্থেরও ব্যাখা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উভয়গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। উবট, তাঁহার শুক্লযজুর্ব্বেদভাষ্যের শেষে, নিজের সামান্য পরিচয় দিয়াছেন; তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়, ভোজরাজের রাজ্য-কালে অবন্তীনগরে অবস্থান করিয়া, তিনি তাঁহার বেদ-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম বজ্রট ও তাঁহার বাসস্থান আনন্দপুর। ‡ মালবদেশাধিপতি ভোজ-রাজ সংস্কৃতসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, ও পাতঞ্জলদর্শনের বৃত্তি, তাঁহারই রচিত। দেবরাজযজ্বাও তাঁহার ব্যাকরণ-

---

* "নির্ব্বচনঞ্চ নিরুক্তং স্কন্দস্বামিকৃত নিরুক্তটীকাং, (১) স্কন্দস্বামী—(২) ভবস্বামী—(৩) রাহদেব—(৪) শ্রীনিবাস—(৫) মাধবদেব—(৬) উবটভট্ট (৭) ভাস্করমিত্র—(৮) ভরতস্বাম্যাদিবিরচিতানি বেদভাষ্যাণি—পাণিনীয়ং ব্যাকরণম্ বিশেষতঃ উণাদি-তদ্বৃত্তিং ক্ষীরস্বাম্যনন্তাচার্য্যাদিকৃতাং নিঘণ্টুব্যাখ্যাং, ভোজরাজীয়ং ব্যাকরণং কমলনয়নীয়নিখিলপদসংস্কারাংশ্চ নিরীক্ষ্য

* "সায়ণমাধবাৎ প্রাচীনোঽয়ং মাধবঃ 'অজোজুবে জন্মনি সূনবেধসে' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ-পূর্ব্বকবিবরণ-গ্রন্থকারঃ।"

† "মাধবভট্টাস্তু 'বিহিসোতোঃ' রিত্যেষা পঙ্‌ক্তিরাখ্যা বাক্যমিতি মন্যন্তে।"

‡ "আনন্দপুরবাস্তব্যবজ্রটাখ্যস্য সূনুনা।
উবটেন কৃতং ভাষ্যং পদবাক্যৈঃ সুনিশ্চিতৈঃ॥
ঋষ্যাদীংশ্চ নমস্কৃত্যাবন্ত্যামুবটো বসন্।
মন্ত্রাণাং কৃতবান্ ভাষ্যং মহীং ভোজে প্রশাসতি॥"

গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভোজদেবের রাজ্যকাল খ্রীঃ অঃ ১০১৮—১০৬০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং উবটও খ্রীঃ অঃ ১০১৮—১০৬০ এই সময়ের মধ্যে কোন সময়ে, অবন্তীনগরে অবস্থানকালে, তাঁহার বেদভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উবটের পরবর্ত্তী শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতার ভাষ্যকার মহীধর। মহীধরের বেদভাষ্যও প্রকাশিত হইয়াছে। তদীয় ভাষ্যে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি উবটের ও মাধবের ভাষ্য দেখিয়া, নিজ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; * তাঁহার ভাষ্যের নাম - বেদদীপ। মহীধর যে মাধবীয় ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, এই ভাষ্য যে কোন্ মাধবের রচিত, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। দেবরাজযজ্বা তাঁহার নিঘণ্টুটীকা-ভূমিকায় দুইজন মাধবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; একজনের ভাষ্য দেখিয়া, তিনি তাঁহার নিঘণ্টুর পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। এই মাধবের পিতার নাম বেঙ্কটাচার্য্য, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। † অপর একজন মাধবদেবের বেদভাষ্য অবলোকন করিয়া, তিনি নিঘণ্টুস্থ পদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বেঙ্কটাচার্য্যতনয় মাধবের কোন্ গ্রন্থের ভাষ্য দেখিয়া তিনি পাঠ-সংশোধন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং মহীধর-কথিত মাধবীয় ভাষ্য কোন্ মাধবের রচিত, তাহা দেবরাজের বাক্য হইতে মীমাংসিত হইতে পারে না। মহীধর ও দেবরাজযজ্বা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারা যায় না। দেবরাজযজ্বা ও মহীধর উভয়েই ভোজরাজের ও উবটের পরবর্ত্তী। উভয়েই উবটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মহীধর ও উবটের ভাষ্য একসঙ্গে পাঠ করিলে দেখা যায়, মহীধর অনেক স্থানেই উবটের ভাষ্যের অবিকল নকল করিয়াছেন; তবে অনেক স্থানে উবট হইতে ভিন্নরূপও অর্থ করিয়াছেন। মহীধরের ভাষ্য অতি-প্রাঞ্জল। মহীধরকথিত মাধবীয় ভাষ্য—সায়ণ-মাধবের রচিত নহে, বলিয়া বোধ হয়। সায়ণাচার্য্য, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা করেন নাই; এই কারণে মনে হয়, মহীধরকথিত মাধব, দেবরাজকথিত মাধবদেব হইতে পারেন। দেবরাজযজ্বা মাধবদেবের পরেই উবটের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী স্কন্দগুরাচার্য্য-নামক আর একজন বেদব্যাখ্যাতার নাম, হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে, উল্লিখিত করিয়াছেন *। হলায়ুধকেও আমরা আংশিক ভাবে বেদব্যাখ্যাতা বলিতে পারি। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখার ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, দশসংস্কারের সমস্ত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বগ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে, 'দেশমধ্যে বেদপাঠ বিরল হইয়া গিয়াছে—পশ্চিম প্রদেশে বেদ কেবল পঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের সহিত বেদ পঠিত হয় না। বঙ্গদেশে কেবল বেদমীমাংসা-শাস্ত্র আলোচিত হয়; কিন্তু বেদ পঠিত হয় না। অর্থ-জ্ঞানসহকৃত বেদপাঠ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধ্যানুসারে অবশ্য বেদের একদেশও পাঠ করা উচিত। তবে, এই একাংশ নির্দ্দিষ্ট সংহিতা-গ্রন্থের প্রথম মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহীত ও পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপভাবে একদেশ গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণগণের অবশ্য-অনুষ্ঠেয় সংস্কার ও সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্রগুলির অর্থজ্ঞানসহ পাঠ হয় না। এজন্য আমি ব্রাহ্মণগণের অবশ্যজ্ঞাতব্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করিলাম। এই মন্ত্রগুলি পঠিত ও ইহাদের অর্থপরিজ্ঞাত হইলে, ব্রাহ্মণগণের বেদৈকদেশ যথাশাস্ত্র পঠিত হইবে।' হলায়ুধ বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে লক্ষ্মণসেনের রাজপণ্ডিত,—তাহার পর—যৌবনকালে তাঁহার মন্ত্রী, ও পরে, তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রাপ্ত হন। হলায়ুধের অপর দুইজন অগ্রজ ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পশুপতি, যজুর্ব্বেদি-ব্রাহ্মণগণের শ্রাদ্ধাদি-পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই পদ্ধতি-অনুসারে বঙ্গদেশের যজুর্ব্বেদি-ব্রাহ্মণগণের দশকর্ম্মাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহার অপর ভ্রাতা ঈশান, ব্রাহ্মণগণের আহ্নিকবিধি-পদ্ধতি

* "প্রণম্য লক্ষ্মীং নৃহরিং ভাষ্যং বিলোক্যোবট-মাধবীয়ম্।
যজুর্ম্মনূনাং বিলিখামি চার্থং পরোপকারায় নিজেক্ষণায়॥"

† "শ্রীবেঙ্কটাচার্য্যতনয়স্য মাধবস্য ভাষ্যকৃতো নামানুক্রমণ্যা আখ্যাতানুক্রমণ্যাঃ স্বরানুক্রমণ্যাঃ নির্ব্বচনানুক্রমণ্যাস্তদীয়ভাষ্যস্য, চ বহুশঃ পর্য্যালোচনাৎ বহুদেশসমানীত বহুকোষনিরীক্ষণাচ্চ পাঠঃ সংশোধিতঃ।"

* "কিন্তস্মিন্ স্কন্দগুরুেন যদ্ রচিতং প্রাগেব চেদিদ্যতে।
ব্যাখ্যানং কিয়দেকবেদবচসাং তেনেদমারভ্যতে॥"

রচনা করিয়াছিলেন। * এই আহ্নিকপদ্ধতির প্রচলন দেখা যায় না। হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বব্যতীত—মীমাংসা-সর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব ও পণ্ডিতসর্ব্বস্ব নামে আর চারিখানি গ্রন্থ রচনা করেন †। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব ব্যতীত, ইঁহারও অপর চারিখানি গ্রন্থের প্রচলন নাই। হলায়ুধ, গুগড়াচার্য্যের নাম ব্যতীত, উবটের নামোল্লেখ করিয়াছেন।‡ তাঁহার "উবটপ্রভৃতিভির্ভাষ্যকারৈঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অনুমিত হয়, তাঁহার সময়েও অন্যান্য বেদভাষ্য প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানকালে অনেকেই বেদের অভিনব ব্যাখ্যা করিতেছেন। বেদমন্ত্রের গুরুত্ব-বোধ এই অভিনব ব্যাখ্যা-কারিগণের নাই বলিয়া, তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপই ব্যাখ্যা করিতে কোনরূপ সঙ্কোচবোধ হয় না। কিন্তু যখন বেদ-মন্ত্রের গুরুত্ব-বোধ ছিল, তখন কেহ প্রাচীন সম্প্রদায়গত ব্যাখ্যাদি না পাইলে, নিজের বুদ্ধি-অনুসারে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বড়ই ভীত হইতেন। হলায়ুধ, অঘমর্ষণ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,'এই মন্ত্রের আমার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যাদি পাইলাম না; এজন্য ইহার ব্যাখ্যা করিতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে ("হৃৎকম্পো মে মহান্ জায়তে"); কারণ, মন্ত্রটি সর্ব্ববেদের সারভূত। লক্ষ্মণসেনের রাজ্য ব্যক্তিয়ার খিলিজি-কর্ত্তৃক ১১৯৯ খৃঃ অঃ অধিকৃত হয়; সুতরাং, হলায়ুধ খৃষ্টীয় ১১দশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। হলায়ুধের ন্যায়, আর একজন আংশিকভাবে বেদব্যাখ্যাতা বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার নাম গুণবিষ্ণু। তিনি, বঙ্গদেশের সামবেদি-ব্রাহ্মণগণের পদ্ধতিকার ...ভট্ট-ধৃত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বেদভাষ্যকারগণের মধ্যে সায়ণাচার্য্যই বর্ত্তমানকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সবিশেষ পরিচিত। সায়ণাচার্য্য চারি বেদেরই ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ভাষ্য এরূপ প্রাঞ্জল যে, সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও, এই ভাষ্যের সাহায্যে মন্ত্রের মোটামুটি অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সায়ণ-ভাষ্য আছে বলিয়াই এখনও বেদমন্ত্রের আলোচনা যৎসামান্য আমাদের দেশে হইতেছে। প্রতীচ্য দেশের পণ্ডিতগণও সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ মন্ত্রার্থ অবগত হইতে চেষ্টা করেন, ও পরে, "তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" এই নীতি-অবলম্বনে, তাঁহারা একস্থানের শব্দার্থ-অবলম্বনে অন্যস্থানের অর্থ অসংলগ্ন, ইত্যাদি প্রমাণ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হইয়া থাকেন।

সায়ণাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যগ্রন্থকে, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নামানুসারে, মাধবীয় বেদার্থপ্রকাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহাদের বিশেষ বৃত্তান্ত কিছু অবগত হওয়া যায় না। তবে, ইঁহাদের গ্রন্থের ভূমিকায়, ইঁহারা যে সামান্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে ইঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্য, তাঁহার ভাষ্যগ্রন্থের ও মাধবীয় ধাতুবৃত্তির ভূমিকায়, এবং মাধবাচার্য্য, তাঁহার সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের ভূমিকায়, যে সামান্য আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া, মাধবীয় ধাতুবৃত্তির সম্পাদক, পণ্ডিতশ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী, সায়ণাচার্য্যের নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সায়ণ, মাধবের সহোদর, কম্পরাজপুত্র সঙ্গমমহারাজের প্রধান অমাত্য ছিলেন। ইনি, ইঁহার কুলনাম সায়ণ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইনি মাধবাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বেদার্থপ্রকাশক। * ইঁহার কুলনাম—সায়ণ, ও ব্যাব-হারিক নাম—যজ্ঞনারায়ণ। ইঁহার পিতার নাম—সায়ন। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামে দর্শন-শাস্ত্রের সংগ্রহ-গ্রন্থ

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তমপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমাল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥
ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রতঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদি কৃত্যে ব্যধা-
দীশানঃ কৃতবান্ দ্বিজাহ্নিকবিধৌ জ্যেষ্ঠোঽপরঃ পদ্ধতিম্।
তেনাস্মিন্নমুনা ফলস্তুতিপরাঃ প্রস্তত্য নানাস্মৃতীঃ
সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্ম্মবচসাং ব্যাখ্যাপরং খ্যাপিতা ॥"
—ইতি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে।

"মীমাংসাসর্ব্বস্বং বৈষ্ণবসর্ব্বস্বমকৃতশৈবসর্ব্বস্বম্।
পণ্ডিতসর্ব্বস্বমসৌ সর্ব্বস্বং সর্ব্বধীরাণাম্ ॥"

"যদ্যপি যজুঃপুরুষস্ততো উবটপ্রভৃতিভির্ভাষ্যকারৈর্বিনিয়োগো ব্যাখ্যাতঃ।"

* "অয়ঞ্চ সায়ণো মাধবসহোদর-কম্পরাজসুত-সঙ্গম-মহারাজ প্রধানামাত্যঃ স্বকুলনাম্নৈব প্রসিদ্ধিং গতঃ। অয়ঞ্চ মাধবাচার্য্যস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেদার্থপ্রকাশকশ্চেতি—

রচনা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বমীমাংসার অধিকরণসংগ্রহ —জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর নামে ও উত্তরমীমাংসার অধিকরণসংগ্রহ—বৈয়াসিকন্যায়মালাবিস্তর নামে রচনা করিয়াছেন। * উত্তরমীমাংসার অধিকরণমালা—ভারতীতীর্থ মুনিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদান্তপঞ্চদশী গ্রন্থও তাঁহার রচিত। এই গ্রন্থ—বিদ্যারণ্য মুনি কর্ত্তৃক-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাধবাচার্য্য, প্রথমে—বিজয়নগরের রাজা বুক্কের অমাত্য বা ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন, পরে—সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত দাক্ষিণাত্যে—রামেশ্বর তীর্থের নিকটস্থ —শৃঙ্গেরীমঠের অধ্যক্ষ হন। সন্ন্যাস-অবলম্বন করিলে,তাঁহার —বিদ্যারণ্য মুনি নাম হইয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি পঞ্চদশী রচনা করেন। সেইজন্য পঞ্চদশী গ্রন্থ—বিদ্যারণ্য মুনি-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যখন তিনি ব্যাসাধিকরণমালা রচনা করেন, তখন তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই,—তাহা ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের ভাষ্যোপক্রমণিকা-লিখিত "যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে ব্যাখ্যায়াতি সংগ্রহাৎ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অথচ, ব্যাসাধিকরণমালা, বা বৈয়াসিক ন্যায়মালাবিস্তর, ভারতীতীর্থমুনিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ কেন, তাহা জানা যায় না। সায়ণাচার্য্য তাঁহার বেদভাষ্যে, উভয় ন্যায়মালাবিস্তর হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, স্বপক্ষস্থাপন করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থের রচনা একজনের বলিয়াই বোধ হয়। পরাশর-সংহিতার ভাষ্য, বা পরাশর-মাধব, এবং কাল-মাধব নামক গ্রন্থও মাধবাচার্য্য-বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সায়ণাচার্য্য যখন মাধবীয় ধাতুবৃত্তি রচনা করেন, তখন তিনি কম্পরাজপুত্র সঙ্গমরাজের মন্ত্রী ছিলেন,—একথা আমরা তাঁহার, ধাতুবৃত্তির অধ্যায়সমাপ্তিস্থানে (Colophon), লিখিত নিজ পরিচয়ে জানিতে পারি। মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, তিনি বুক্ক রাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায় ঋগ্বেদভাষ্য রচনা করেন। এই বিষয় তাঁহার, ঋগ্বেদভাষ্যের অধ্যায়-সমাপ্তিস্থানে, পরিচয়প্রদানদ্বারা জানিতে পারা যায়। * সায়ণাচার্য্য যখন অথর্ব্বসংহিতার ভাষ্য-প্রণয়ন করেন, তখন, বুক্ক নৃপতির পর,তদীয় পুত্র হরিহর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। এই হরিহরের আদেশেই তিনি অথর্ব্বসংহিতার ভাষ্যরচনা করেন, একথা তিনি অথর্ব্বসংহিতার ভাষ্যে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। †

"স চাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ।
সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥"

ইত্যাদি তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যগ্রন্থসন্দর্ভতো নির্ণীয়তে। এতস্য কুলনাম সায়ণেতি—

"শ্রীমৎ সায়ণদুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভেন মহৌজসা।
ক্রিয়তে মাধবার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ॥"

অতএব—

"পূর্ব্বেষামতিদুস্তরাণি সুতরামালোড্য শাস্ত্রাণ্যসৌ-
শ্রীমৎসায়ণ-মাধবঃ প্রভুরুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে।
দূরোৎসারিতমৎসরেণ মনসা শৃণ্বন্তু তৎসজ্জনাঃ
মাল্যং কস্য বিচিত্রপুষ্পরচিতং প্রীত্যৈ ন সংজায়তে॥"

—ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে।

এতস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ কুলনাম্নৈব প্রসিদ্ধিঃ···ব্যাবহারিকন্ত নাম—

"যজ্ঞনারায়ণার্য্যেণ প্রক্রিয়েয়ং প্রপঞ্চিতা।
তস্যা নিঃশেষতঃ সন্ত বোদ্ধারোভাষ্যপারগাঃ॥"

—ইতি ক্রমধাতৌ।

"অত্রাপি শিষ্যবোধায় প্রক্রিয়েয়ং প্রপঞ্চিতা।
যজ্ঞনারায়ণার্য্যেণ বুধ্যতাং ভাষ্যপারগৈঃ॥"

—ইতি শ্লোকাভ্যাং যজ্ঞনারায়ণ ইতি নির্দ্ধার্য্যতে।

"তেন সায়নপুত্রেণ সায়ণেন মনীষিণা।
আখ্যয়া মাধবীয়েয়ং ধাতুবৃত্তির্বিরচ্যতে॥"

—ইতি পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমসমুদ্রাধীশ্বরকম্পরাজসুত সঙ্গমমহারাজ মহামন্ত্রিণা সায়নপুত্রেণ মাধবসহোদর সায়ণেন বিরচিতায়াং মাধবীয়ায়াং ধাতুবৃত্তৌ শচ্চিকরণা ভ্বাদয়ঃ।"

* "যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুর্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ॥
"স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ
সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্।
ইত্যুক্তো মাধবার্য্যেণ বীরবুক্কমহীপতিঃ।
অন্বশাৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥"

—ঋগ্বেদভাষ্যে।

* "ইত্থং দ্বিতীয়াষ্টকগস্তৃতীয়াধ্যায় আদরাৎ।
ব্যাখ্যাতঃ সায়ণার্য্যেণ পুরুষার্থপ্রদর্শকঃ॥"

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পারমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্কভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে ঋক্সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়াষ্টকে তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

† "অবিদ্যাতামসন্তপ্তো বিদ্যারণ্যমহং ভজে।
যদর্ককরসন্তপ্তমরণ্যং প্রীতি-কারণম্॥
তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধতঃ বুক্কভূপতেঃ।
অভূদ্ধরিহরো রাজা ক্ষীরাব্ধেরিব চন্দ্রমাঃ॥

* * *"

মুদ্রিত অথর্ব্ববেদের ভাষ্যোপক্রমণিকায় দেখা যাইতেছে, সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন—তিনি, অতি সংক্ষেপে পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা ব্যাখ্যা করিয়া, বেদার্থ বলিতে উদ্যত হইয়া, প্রথমে পরলোকে ফলপ্রদ বেদত্রিতয় ব্যাখ্যা করিয়া, এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ চতুর্থবেদের ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। যজুর্ব্বেদ ও ঋগ্বেদ ভাষ্য-ভূমিকায় কিন্তু কৃপালু মাধবাচার্য্য পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া, বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া, নৃপতি (বুক্কনৃপতি)কে বলিলেন—"আমার অনুজ সায়ণাচার্য্য বেদের সমস্তই অবগত আছেন, তাঁহাকে ব্যাখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত করুন।" অথর্ব্ববেদভাষ্যের বর্ণনা-অনুসারে সায়ণ পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন; যজুর্ব্বেদ ও ঋগ্বেদ-ভাষ্যের বর্ণনানুসারে মাধবই এই দুই সংগ্রহ-গ্রন্থের রচয়িতা। এই বিরোধের কেহ সমাধান করিয়াছেন,কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের সময়-নিরূপণ করিতে হইলে, বিজয়নগরের রাজগণের রাজ্যকালের নিরূপণ করিতে হয়। এই বিষয় আমরা—Robert Sewell's 'Forgotten Empire' ও Lewis Riceএর 'Mysore Gazetteer' হইতে জানিতে পারি। Sewell, 'Epigraphia Indica' অনুসারে, বিজয়নগরের রাজগণের নিম্নলিখিত বংশতালিকা প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের রাজ্যকালের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—
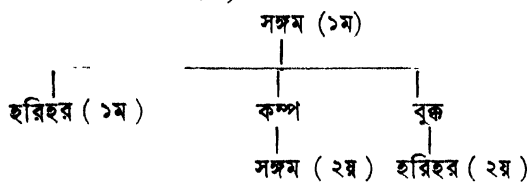
"বিজয়ী হরিহরভূপঃসমুদ্বহন্ সকলভূভারম্।
ষোড়শমহাস্তিদানাস্তনিশং সর্ব্বস্ত তুষ্টয়ে কুর্ব্বন্॥
তস্য লভূতমালোচ্য বেদমাধবণাভিধম্।
আদিশৎ সায়ণাচার্য্যং তদর্থস্ত প্রকাশনে॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতি সংগ্রহাৎ।
কৃপালুঃ সায়ণাচার্য্যঃ বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ॥
ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয়মামুষ্মিকফলপ্রদম্।
ঐহিকামুষ্মিকফলং চতুর্থং ব্যাচিকীর্ষতি॥"

হরিহর (১ম) প্রায় ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করেন এবং প্রায় ১৩৪৩ খ্রীঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

হরিহরের পর, বুক্ক রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন ও ১৩৪৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৩৭৯ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বুক্কের উৎকীর্ণ-লিপি ১৩৫৪ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৩৭১ খ্রীঃ অব্দে খোদিত হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী, ২য় হরিহরের প্রথম উৎকীর্ণ-লিপি ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়।

নেলোরের কলেক্টরের অফিসে একখানি তাম্রলিপি রক্ষিত আছে; তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়—১ম হরিহরের পর কম্প রাজা হন এবং কম্পের পুত্র, ২য় সঙ্গম, কম্পের পর রাজ্যলাভ করেন এবং ১৩৫৬ খ্রীঃ অঃ ৩রা মে তারিখে ব্রাহ্মণগণকে নেলোর জেলায় একখানি গ্রাম দান করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, সঙ্গম ১৩৪৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৩৫৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। Mysore Gazetteer, Vol. I. (Lewis Rice) হইতে জানা যায়, সঙ্গমের পাঁচটি পুত্র ছিল। এই পুত্রগণের নাম—হরিহর, কম্প, বুক্ক, মরপ্প ও মুদ্দপ। হরিহর প্রথমে রাজা হন, তাঁহার পর বুক্ক সিংহাসনলাভ করেন। কম্প, নেলোর ও কদপ প্রদেশে রাজ্যলাভ করেন—তাঁহার পর, তাঁহার পুত্র সঙ্গম সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাধবের সহোদর সায়ণ, এই সঙ্গমের অমাত্য ছিলেন। Lewis Rice বলেন, মাধবাচার্য্য ৩৬ বৎসর বয়সে, ১৩৩১ খ্রীঃ অব্দে, শৃঙ্গেরীমঠের অধ্যক্ষ হন, ও ১৩৮৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

Sewell বলেন যে, ১৩৬৮—৬৯ খ্রীষ্টাব্দের (শক ১২৯০) একখানি উৎকীর্ণ-লিপিতে মাধবাচার্য্য-বিদ্যারণ্যের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ, তখন তিনি জীবিত ছিলেন।

উপরিলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনানিচয় আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, অনুমান ১৩৪৩ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া, ঐ শতাব্দের প্রায় শেষপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

দিবা-স্বপ্ন

নারীর পূজা

[শ্রীমতী সুশীলা সেন]

পূজাগৃহে বসিয়া এক নারী পূজা করিতেছিলেন। সম্মুখে বেদীর উপরে নারায়ণ শিলা। ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া, ফুল-চন্দন প্রভৃতি বিবিধউপচারে নৈবেদ্য সাজাইয়া, নারী পূজা করিতে বসিয়াছিলেন।

তখন দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নারীর পূজাগৃহপ্রান্ত নির্জ্জন এবং নিস্তব্ধ। মৃদু সমীরণ বারবার আসিয়া পূজারতা নারীর নত মস্তক;—তাহার সদ্যস্নাত কেশগুলি এবং কৌষেয় বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। নিয়ত ব্রতপালন এবং দীর্ঘ উপবাসে তাহার শরীর-মন শ্রান্ত এবং অবসন্ন ছিল। ধূপ এবং অগুরু চন্দনের আবেশময় সৌরভ, চারিদিকের নিস্তব্ধতা এবং শরীরের অবসন্নতা—সব মিলিয়া যেন তাহাকে তন্দ্রাতুর করিয়া তুলিল।

নিদ্রাবেশে নারী এক স্বপ্ন দেখিল—

যেন, তাহার ছোট পূজার ঘরটি দেখিতে দেখিতে কত বড় হইয়া গেল। অভ্যন্তরের অস্পষ্ট অন্ধকার দূর হইয়া, তাহা আলোকে পরিপূর্ণ হইল। বিস্মিত নয়নে নারী চাহিয়া দেখিল—সম্মুখের চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বেদীটি শূন্য, তাহার উপরে নারায়ণ শিলা নাই! দেখিতে দেখিতে, সেই শূন্য ক্ষুদ্র বেদী যেন বহুদূর বিস্তৃত হইল;—তাহার উপরে আবার একি দৃশ্য! নারী যেন আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। দেখিল, পূজার ঘরে, নারায়ণের বেদীর উপরে, তাহারই রোগশোক-দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসারের চিত্র! দারুণ শোকের আঘাতে, বহুদিন হইল সে এই সংসারকে অনিত্য—আসক্তি ও মায়ার বন্ধন বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে এবং তদবধি রাত্রিদিন পূজার ঘরে তাহার নারায়ণকে লইয়া দিন কাটাইতেছে। আজ একি! সেই পূজার ঘরে—নারায়ণের বেদীর উপরে; সেই সংসার তাহারই গৃহপরিবার আত্মীয়-স্বজনবর্গে দেবমন্দির পরিপূর্ণ!—তাহার কন্যার শিশুপুত্রটি ধূলিমাখা ছোট পাদুখানি নারায়ণের বেদীর উপরে তুলিয়া দিয়া পরম আনন্দে পূজার উপকরণগুলি ছড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল! তাহার অম্লান কুসুমকোমল দেহখানি পূজার ফুলের মতই যেন পবিত্র এবং সুন্দর! নারী এই শিশুকে কখনও প্রায় কোলে লইত না,—পাছে অস্নাত শিশুকে স্পর্শ করিলে তাহার পরিশুদ্ধ বস্ত্রখানি অশুচি হয়। মনে পড়িল, একদিন সন্ধ্যাবেলায় শিশুটি তাহার কোলে উঠিবার জন্য আবদার ধরিয়াছিল; নারী তখন শুদ্ধবাস পরিয়া সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে,—অশুচিভয়ে সে তাহাকে কোলে লইল না; ক্ষুদ্র শিশু নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সেই শিশু, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা-ময়লা লইয়া, তাহার পূজার উপ-করণসম্ভার স্পর্শ করিল!—এখনও যে তাহার ছোট হাত-দু'খানিতে আহারের উচ্ছিষ্ট লাগিয়া রহিয়াছে!—ছি, ছি—এ কি অনাচার! আবার, তাহার পূজার আসনে, কে ঐ দীনা মলিন-বসনা বসিয়া আছে? রুক্ষ চুল, মলিন দেহ, কে ঐ নারী? তাহার পূজার পুষ্পমালাটি উহার গলায় কে পরাইয়া দিল? সেই শুভ্রপুষ্পের অকলঙ্ক মালাছড়াটি—সে প্রাতঃস্নান করিয়া নিজহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া, দেবতার চরণে দিবে বলিয়া যে মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল,—সেই ছড়াটি ইহার গলায় কে পরাইল? ভাল করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া, নারী তাহাকে চিনিতে পারিল;—অতি নীচজাতীয়া সে,—তাহাদেরই গৃহের উঠান ঝাঁট দিয়া, গোয়াল পরিষ্কার করিয়া, জঞ্জাল ফেলিয়া, তাহার দিন চলিত। নারী জানিত, সংসারে ইহার বড় দুঃখ। ইহার স্বামী, ইহাকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিয়া, আর একটি বিবাহ করিয়াছিল। গৃহে ইহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা এবং বৃদ্ধা শাশুড়ী ছিল। দুঃখিনী, কঠিন পরিশ্রম করিয়া, তাহাদের প্রতিপালন করিত; বৃদ্ধা শাশুড়ী রাত্রিদিন তাহাকে যন্ত্রণা দিত—গৃহে তাহার শান্তি ছিল না। কিন্তু এই শান্তপ্রকৃতি সর্ব্বদুঃখসহিষ্ণু রমণী

অসীম ধৈর্য্য ও স্নেহসহকারে সকলের সেবা করিত। নীচ অস্পৃশ্য-জাতীয়া বলিয়া, ইহাকে নারী তাহার পূজার ঘরের সম্মুখে আসিতেও বারণ করিয়া দিয়াছিল,—ভয়, পাছে পূজার সময় ইহাকে দেখিলে তাহার পূজার মন্ত্র অপবিত্র হয়! সে-ই কিনা তাহার পূজার আসনে উপবিষ্ট! দেবতার মালা তাহার গলায়! ক্ষোভে, রোষে, ঘৃণায় নারীর হৃদয় পূর্ণ হইল। সে তো কোনও দিন তাহার সংসারকে দেবতার আসনে স্থান দেয় নাই!—তবে, একি ছলনা? নিশ্চয়ই নারায়ণপদে তাহার কোনও অপরাধ হইয়া থাকিবে, তাই এই দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইল। অনুতপ্ত হৃদয়—সঙ্কোচপূর্ণ চিত্ত স্থির করিয়া, সে পুনরায় ধ্যানে বসিল। অন্তর মন্দিরে—যেখানে সে, ভক্তির দীপ জ্বালাইয়া, প্রতিদিন তাহার দেবতার পূজা করে, সেইখানে নিশ্চয়ই সে তাঁহার দর্শন পাইবে।—কিন্তু হায়! কোথায় তিনি?—অন্ধকার অন্তরপুটে ধূপ নাই, দীপ নাই, পুষ্প নাই, গন্ধ নাই, দেবতা নাই!—কেবল রহিয়াছে, তাহার কামনা বাসনা উচ্ছ্বসিত ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিবিড়—ঘন রোল! হায় নারী! বাহিরের আসন শূন্য, অন্তরেও কেহ নাই! ব্যাকুলকণ্ঠে নারী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল,—"হে দেবতা! কোথায় তুমি? আমাকে ছলনা করিও না, তোমার সেবিকাকে দর্শন দাও।" তখন সে অন্তরের মধ্যে দৈববাণী শুনিতে পাইল—"বৎসে! চক্ষু মেলিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখ।" নারী চক্ষু মেলিয়া তাকাইল,—দেখিল, সেই সংসারের ছবি! কে যেন তাহাতে অশুচি, মলিনতা, মায়া, মোহ, মাখাইয়া রাখিয়াছে! ইহার মধ্যে কোথায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে? সহসা অন্তরে পুনর্ধ্বনিত হইল, "নিরীক্ষণ করিয়া দেখ! ইহারই মধ্যে আমি আছি।" তখন নারী দেখিল, সেই সমস্ত আবিলতা-মলিন আবর্জ্জনার মধ্যস্থলে দেবতার আসনখানি শুভ্রশতদলের মত ফুটিয়া আছে! যাহা সে বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেছেন! সে দেখিল, দেবতার শুভ্রজ্যোতিঃ, তাহার সংসারের উপর পড়িয়া, তাহাকেও যেন জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে! গভীর লজ্জা এবং অনুতাপে মূঢ়া নারী নিজের মস্তক নত করিল। মস্তক লুটাইয়া সে তাহার নারায়ণকে প্রণাম করিতে গেল, অমনি তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘরের বাহিরে তখন দিবা অবসান হইয়াছে। প্রাঙ্গণ-তলে শিশুরা খেলিতেছে। প্রান্তর হইতে গৃহগমনোৎসুক গাভীর দল ত্বরিতপদে গৃহে ফিরিতেছে। বধূরা নিত্য-গৃহ-কর্ম্মে রতা। অন্ধকার পূজাগৃহে বসিয়া নারী বাহিরের সাড়া শুনিতে লাগিল। বহুদিন পরে, পূজা অসমাপ্ত রাখিয়া, নারী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ক্ষুদ্র দুঃখসুখ-সেবাশুশ্রূষা, প্রতিদিনের গৃহকর্ম্ম, কত আবশ্যক—কত অনাবশ্যক—সামান্যতম তুচ্ছ আয়োজনটিও তাহার হৃদয়কে বিচিত্রসুরে আহ্বান করিতে লাগিল! নারী, পূজা গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া, সংসারের ধূলির উপরে মস্তক লুটাইয়া, তাহার দেবতাকে প্রণাম করিল এবং ভক্তি বিনম্র চিত্তে, বহুদিন পরে কর্ত্তব্যপালন করিতে, সংসারের মধ্যে ফিরিয়া গেল।

রূপ ও প্রেম

[শ্রীআমোদিনী ঘোষ]

মাঝখানে মহানদী, কাঁদি কহে প্রেম—
"উতরিব ওপারে কেমনে,"
রূপ কহে—"সেতুরূপে আমি হব পথ—
মিলাইব ঈপ্সিত সদনে।"

উতরিল প্রেম যবে, রূপ কহে ডাকি—
"চাহ বন্ধু! মোর পানে চাহ",
প্রেম কহে—"হায় সখা, পথ শুধু তুমি—
আত্মার নহ ত তুমি গেহ!"

ত্রিপুরার পথে

[শ্রীরসিকলাল রায়]

"It is a long—long way to Tipperary."—*Tommy Atkins.*

শ্রীরসিকলাল রায়

চিরসুহৃৎ দেবীপ্রসন্নবাবু বলিলেন, 'চলুন যে দেশে গাছ—পাথর হইতেছে, সেই দেশ দেখিয়া আসিবেন।' আমি ভাবিলাম, 'এদেশে যখন মানুষই পাথর (fossil) হইয়া গিয়াছে, তখন গাছ—পাথর হইবে, তাহা বিচিত্র কি?' তথাপি সরস, সজীব উদ্ভিদের প্রাণ কেমন করিয়া নির্জীব, নীরস, নির্ম্মম, কঠোর পাষাণে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে কৌতূহল জন্মিল। অতএব, বিহারের বিবাহের নিমন্ত্রণের লোভ পরিত্যাগ করিয়া, সাধ করিয়া, কুমিল্লার জলে ভিজিতে যাত্রা করিলাম।

শনিবার ও রবিবার কুমিল্লা সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন। আমরা শুক্রবার (২১এ মে, ১৯১৫) প্রাতে কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। শুনিয়াছিলাম, প্রাতে ৭ টার গাড়ী (5 Down Chittagong Mail) ছাড়ে; আমরা তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। 'জলি'কে বলিলাম, 'পাণ্ডববর্জ্জিত' দেশে যাইতেছি, সেখানে তোমার অধিকার নাই; স্বর্গে যাইবার সময় তুমি সঙ্গ লইও। সে, মূক হইলেও, মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, ম্লানমুখে নিরস্ত হইল। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় টিকিট কেনা হইয়াছিল। শিয়ালদহে অষ্টবজ্র মিলিত হওয়া গেল। সহযাত্রী—(১) কুমিল্লা সাহিত্য-সম্মেলনের মনোনীত সভাপতি দেবীবাবু, (২) সাহিত্য-সেবক অস্মদ্ পুরুষ, (৩) দেবীবাবুর পুত্রবধূ—মিসেস্ রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

মিসেস্ রায়চৌধুরী, পুত্রকন্যা লইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধিষ্ঠান করিলেন; আমরা মধ্যমশ্রেণীর আরোহী হইয়া, পেচকের ন্যায় গম্ভীর মধ্যশ্রেণী বাঙ্গালীর অতলস্পর্শ অহঙ্কার-বারিধিতে sound line ফেলিবার চেষ্টা করিয়া, হতাশ হইয়া, শেষে মাতৃভাষায় স্মৃতি ঝালাইতে আরম্ভ করিলাম,—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?"

ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি স্বদেশের প্রচলিত ভাষা মক্শ করিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করা গেল। বিলাত যাইবার আগে ইংরেজী-কথা আওড়ান, কাঁটা-চামচ ধরা শিখিতে হয়;—পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় দখল না থাকিলে কুমিল্লা সাহিত্য-সম্মেলনে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।*

* "The people of Eastern Bengal greatly resent the fact that the Metropolitan writers sneer at the idioms and expressions current in that Province, while they themselves freely use their own peculiar words and phrases, not understood elsewhere, and take pride in doing so."—*The Englishman*—June 21, 1915.

না। যাহা হউক, প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া অপরাহ্ন ১—৩০ মিনিটে বেলুচী সত্যসত্যই নদীবক্ষে ভাসিল,—
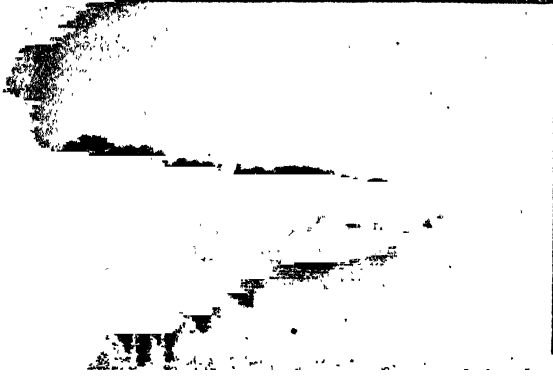
পদ্মার তীর

'ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়—ভেসে যাব রঙ্গে।'

কিন্তু—

'গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্কে।'

—বঙ্কিমচন্দ্র।

পদ্মাবক্ষে বীচিমালা নাচিয়া নাচিয়া, বেলচীকে নাচাইয়া, পবনের 'সনে' জলকেলি করিতেছিল। দূরে 'বনরাজি-নীলা' তীরভূমি—ঢাকা ও ফরিদপুরের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ

যোগী যোপা

করিয়া, চঞ্চলদৃশ্যের শোভা সম্পাদন করিতেছিল, —

"—সলিল সীমায়
শোভিতেছে (চারি) দিকে তালনারিকেল
নানাজাতি, শোভিতেছে স্তবকে স্তবকে
বেষ্টি চারিদিকে তীরে মেখলার মত,
ফলপুষ্প-লতাগুল্ম—বৃক্ষ-মনোহর,
সৃজিয়া নয়নানন্দ কানন সুন্দর।"

— নবীনচন্দ্র।

"—A bank whereon the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet
grows ;"

Shakespeare.

ক্ষিতিজপ্রান্তে অসীমের ও সসীমের মিলনের দৃশ্য দেখিয়া, শীকরসিক্ত হিল্লোলের সুখস্পর্শে মুগ্ধ হইয়া, তরঙ্গ-তাড়িত দোদুল্যমান বাষ্পযানগর্ভে আমরা অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। অকস্মাৎ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে তাহাতে বাধা পাইয়া, ক্ষুণ্ণ হইতে হইল,—
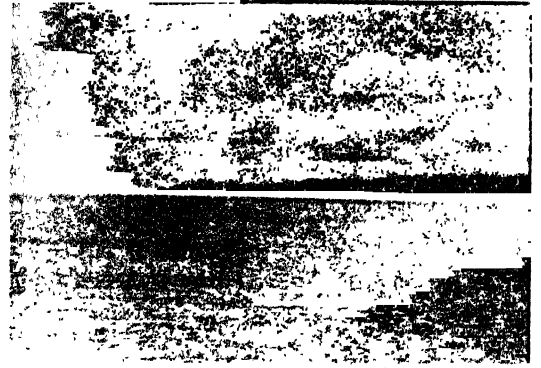
নদীবক্ষে

"গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতালতরু সভয় তবধ সব
পান্থবিজন অতি ঘোর।"

—রবীন্দ্রনাথ।

পশ্চিমগগন মেঘাচ্ছন্ন হইল। এ সেই বিরহবিধুর যক্ষনিয়োজিত সন্দেশবহ, পুষ্করবংশাবতংশ পূর্ব্বমেঘ নহে, যাহার দর্শনে পথিকবনিতাদিগের প্রাণে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে,—

"ত্বমারূঢ়ং পবন পদবীমুদ্ গৃহীতালকান্তাঃ,
প্রেক্ষিষ্যাঃ পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যপেক্ষেত জায়াং,
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিবজনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ।"

—কালিদাস।

খর বায়ু বহিল, মেঘ উড়িল, বৃষ্টি ঢালিয়া পড়িল, কলের বজরা টলিতে লাগিল, গতি মন্দ হইল,—

"Here all shall see
No enemy
But winter and rough weather."

– Shakespeare.
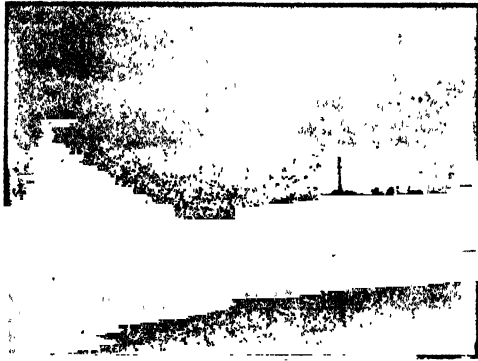
পথে

বাতাসের তোড়ে ষ্টীমার একপাশে কাত হইয়া, বিপদ্ বাড়াইয়া দিয়াছিল; প্রথমশ্রেণীর দুইটি শ্বেতাঙ্গযাত্রী ছুটিয়া আসিয়া, তাড়াতাড়ি ডেকের যাত্রীদিগকে সরাইয়া দিলেন। তাঁহাদের একজন সারঙ্গের সহিত বচসা করিতে উদ্যত হইলে, সেই ৪০ টাকা বেতনের মুসলমান মালিকটি মুখফিরাইয়া উপরে উঠিয়া গেল—তাহার কর্ত্তব্যের উপদেশ, সে যাহার-তাহার নিকট গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে!

জলে হাবুডুবু খাইতে খাইতে দুঃখকষ্টের মধ্যে আমরা যখন চলিতে থাকি জীবনে ঝড়তুফান অনেক আসে, কিন্তু তাহাদের তীব্রতা অনেকক্ষণ থাকে না; নদীর বক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া আমরা যে প্রবল বারিধারার ও তুফানের বেগ সহিতেছিলাম, তাহারও বেগ অধিকক্ষণ থাকিল না। চড়ায় ঠেকিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ঝড়ের তাড়নায় টলিয়া টলিয়া, আবার আমাদের কলের বজরা নদীর ভাটিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল।—

"———Up, Spirit of the storm!
That Courage may find something
to perform;"

—Wordsworth.

জাহাজে হিন্দুস্থানী দোকানে মিঠাই-মণ্ডা ছিল, চিড়া-মূড়ী ছিল, কাঁঠাল-আম-কলা-তরমুজ ছিল; আর ছিল, দিল্লীকা লাড্ডু; তাহা 'জো খায়া, সোভি পস্তায়া—জো নেহী খায়া, সোভী পস্তায়া।' সেই জাহাজে পঙ্গপালের ন্যায় একপাল স্ত্রীপুরুষ-কুলী ছিল; লোহার জাল দিয়া, তাহাদের স্থান অপর যাত্রীদিগের জায়গা হইতে আলাদা করা ছিল। তাহাদের খর্ব্ব দেহ, মিশ কালো চেহারা, গায় নতুন লালকুর্ত্তা মুখে একগাল হাসি—মানাইতেছিল ভাল। কুলীদের মাঝে মাঝে বাঙ্গালী আড়কাটি পাহারা ছিল। সকলের উপরে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার, একচিবুক দাড়ী মুখে করিয়া, কুলীর রঙে রঙ মিলাইয়া, উদরান্নের উপায়চিন্তা করিতেছিলেন। দেবীবাবুর সঙ্গী, আমাদের প্রাচীন বন্ধু—ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু—পণ্ডিত মশাই, আড়কাটির ও ডাক্তারের তাড়া খাইয়াও কুলীদের সহিত আলাপ করিয়া আসিলেন। ময়ূরভঞ্জরাজ্যের জিতুমাঝি, কুলী-পদগৌরব লাভ করিয়া, আশা করিতেছিল, সে চা-বাগানে পৌছিলে, তাহার প্রোষিতভর্ত্তৃকা বিরহিণীবধূও, কালরূপের ডালি দেহে বহিয়া, তাহার 'আদমীর' অনুসরণ করিবে। লাল

ত্রিপুরার পথে

কুর্ত্তা গায় দিয়া, পাহাড়ের উপর চায়ের চারার সবুজবাগানে তাহারা ঘরে-বাহিরে দুইজনে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, যেদিন সঙ্গীতলহরী তুলিবে, সে দিন কি সুখের! সে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, ডেকে বসিয়া, কল্পনার লালিমার ঘোরে

সেই সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল : আর, মনে মনে আড়কাটী-নামক অপূর্ব্ব দেবদূতকে, ময়ূরভঞ্জের ন্যায় একটা মস্ত স্বাধীন পাহাড়েরাজ্যের রাজা করিয়া দিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতেছিল !

পদ্মার তীরে

বেলুচীর মালিক (master) একজন বাঙ্গালী মুসলমান ; তাহার উপাধি সারঙ্গ। আমরা ছেলেবেলা প্রত্যেক ষ্টীমারে কাপ্তেন সাহেব দেখিয়াছি, এখন বোধ হয়, পদ্মা নদীর কোন জাহাজেই সাহেব কাপ্তেন নাই। বেলুচীতে সারঙ্গ ও তাহার দলবলের সংখ্যা প্রায় ২০ জন ; দুইজন সারঙ্গ, তিনজন সুগানি ও অবশিষ্ট খালাসী। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক জাহাজে অন্ততঃ একজন করিয়া আড়কাটী (guide) থাকে। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত সমস্ত পথে একাধিক আড়কাটী—তাহাদের মধ্যে পথ ভাগ করা আছে। সারঙ্গখালাসী প্রভৃতি মাল্লামাঝিদের সাহায্যের জন্য নদীর উভয় তীরে লাইটম্যেন্ (lightmen) এবং আড়িয়াল থাকে। এক শ্রেণীর লাইটমেনেরা তীরে ও অল্পজলে এবং অপর শ্রেণী গভীর জলে বাতি দেয়।

সারঙ্গদের বেতন মাসিক ৪০।৫০, সুগানিদের বেতন ১৮।২০, খালাসীদের ৮।১০ টাকা। খালাসীদের খোরাকীখরচা সারঙ্গ দেয় ; সারঙ্গ, কোম্পানীর নিকট হইতে খালাসীদের বেতন ও খোরাকী বলিয়া, থোক টাকা পায়। লাইটম্যানদের মাহিনা ১২।১৪ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ; তাহাদের আলোর খরচ, ইহারই মধ্যে। গভীর জলে লাইটম্যানদিগের কাজ খুব বিপজ্জনক ; অনেক সময়, ঝড়তুফানের মধ্যে বাতি দিতে যাইয়া, তাহারা নৌকাডুবি হইয়া মারা পড়ে। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত, উভয়পার্শ্বে প্রায় ২০০ আলোর বন্দোবস্ত আছে। এই সকল ছাড়া, মিস্ত্রী, বা লোকো-(loco), বিভাগের লোক স্বতন্ত্র। বজরার কাজে হিন্দু দেখিলাম না, মুসলমানই প্রায় সব। হিন্দু—পানীপাড়ে, মিঠাইওয়ালা, বড় জোর আড়কাটী। লাইটম্যানেরা উন্নতিলাভ করিয়া, আড়কাটীপদের গৌরবভাজন হয়। বাবুভদ্রলোক হইবার ঝোঁক হিন্দুর যত বেশী, মুসলমানের তত নয়। তাই, মুসলমানেরা বঙ্গের সকল প্রকার শ্রমজনক কাজ, হিন্দুর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতেছেন ; হিন্দু—ডিগ্‌বাজী খাইয়া, গলাবাজি করিয়া, নেতা সাজিতেছেন।

চাঁদপুর এক্সপ্রেস, গোয়ালন্দ ও চাঁদপুরের মধ্যে, মাত্র টেপাখোলা, তারপাশা ও সুরেশ্বরে থামে। তারপাশায় জাহাজ ভিড়িলে, দুধ ও পাতক্ষীর বেচিতে নানাবয়সের অগণিত বেপারী, লাফাইয়া লাফাইয়া ডেকে উঠিয়া, ডাক ছাড়িতে আরম্ভ করিল। পাতক্ষীরের শব্দ দেশদেশান্তরে ঢাকার নাম বিখ্যাত করিয়াছে। এখন শঠীর পালো ও ময়দার ক্ষীর দুধের গন্ধ গায় মাখিয়া, পাতে পাতে অর্দ্ধআনা আদায় করিয়া, ঢাকার প্রাচীনগৌরব রক্ষা করিতেছে। লটোরী পদ্মা দোহন করিয়া, ঢাকার সাধু গোয়ালারা ৶০, ।৵০, এমন কি, ।১০ হিসাবেও সস্তায় দুধের ধারা বহাইতেছে !

ফুলছড়ি ঘাট

ডানপারে ফরিদপুর ও বামপারে ঢাকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের সম্ভার রাখিয়া, কীর্ত্তিনাশা পদ্মার জল তীরবেগে চলিয়া, ঢেউ তুলিয়া, বাতাসের সঙ্গে যুঝিয়া, সুরেশ্বরে—মেঘনায় যাইয়া মিশিল,—
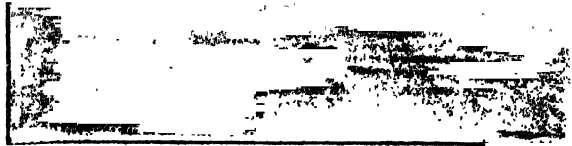
নদীর তীর

"ডানদিকেতে তাকাই যখন,
বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের দিকে ফিরিলে তখন,
দক্ষিণ ডাকে আয়রে আয়।"

রবীন্দ্রনাথ।

"All hail, then, the gale then,
Wafts me from thee, dear shore!"

Burns.

মেঘবরণ মেঘনার গতি—স্থির, শান্ত, মৃদুমন্দ। শ্যাম দরশনে রাই পাহাড়পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া, সারাপথ রড়ারড়ি করিয়া, উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, প্রিয়তমের চরণপ্রান্তে স্তব্ধ, অবসন্ন ;—

"আকূলপূরিত স্থির অচঞ্চল,
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যথন।"
(আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ
প্রবিশন্তি যদ্বৎ"।

গীতা।

সিন্ধুর শব্দ শুনিয়া, বাঞ্ছিতের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া, প্রিয়তমের পরশে' চেতনা হারাইয়া, আবেশে অবশতনু, ব্রীড়াবিহ্বলা পদ্মা—গম্ভীর, মন্থর মেঘনায় রূপান্তরিতা,—

"মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে
হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত ধরি থেহ।"

—চণ্ডীদাস।

নীলসিন্ধুর অঙ্গের ছটায়, পদ্মার গৌরবরণ মেঘনার মেঘের রঙে লুকাইয়াছে,—

"শ্যাম হরিতদ্যুতি হোই পরত তন পীরী ঝাঁই
রাধাহু পুনি হরী হোত লহি শ্যামল ছাঁই।"

বিহারী বিহার অম্বিকাদত্ত ব্যাস।

অভিসারিকা মেঘনার অভিমান ও সঙ্কোচ-নাট্যে অধীর হইয়া, প্রেমোন্মত্ত পয়োধি আকুলহৃদয়ে বক্ষে করাঘাত করিতেছিল ;—সে কলিজাভাঙ্গা 'বরিশাল-গনে'র ভুম্ ভুম্ শব্দ চিরকাল বৈজ্ঞানিকের নিকট দুরূহ রহস্য হইয়া রহিয়াছে। রসের নাগর বঙ্গসাগর ভাগীরথীর সপত্নী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী পদ্মা (মেঘনা)র মানভঞ্জন করিতে ব্যগ্র হইয়া, বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া, বানের জলে চড়া ডুবাইয়া, তরঙ্গ তুলিয়া, পরাণবঁধুর অধরচুম্বন করিতে ছুটিতেছে,—

"আইস আইস মোর বিনোদিনী রাধা।
তোমা দরশনে গেলু মনসিজ বাধা॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনা দশদিক হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপতপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্রমন্ত্র তুমি হরিনাম॥"

—জ্ঞানদাস।
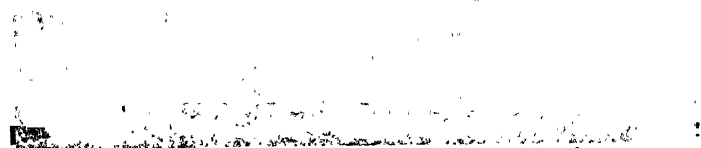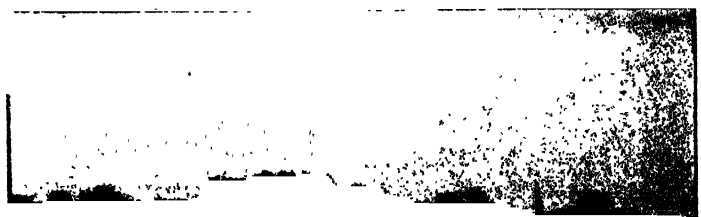
ত্রিপুরারপথে

পৃথুজঘনা মেঘনা সোয়াসে তুফান তুলিয়া, মনের দুঃখে বুকে চড়া বাঁধিয়া, অভিমানভরে কহিতেছে,—

"ছুঁইওনা ছুঁইওনা বঁধু ঐ খানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ-মুখখানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল॥"

— চণ্ডীদাস।

দুর্য্যোগহেতু সুরেশ্বরে ষ্টীমার থামিল না। আমরা মেঘনার বক্ষে বসিয়া, উভয়তীরে চাহিয়া, শিহরিয়া উঠিলাম। পূর্ব্ববঙ্গে মেঘনা-পারের মাঝিদের নামডাক না শুনিয়াছে কে? 'কাল বৈশাখী'র দিনে মেঘনার নাম শুনিলে, যাত্রী ও মাঝি—উভয়েরই বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। কত মমতায় গড়া জনক-জননীর বুকে, অনুরাগী পতির প্রাণে, নবোঢ়া বধূর চিত্তে নির্ম্মম শেলাঘাত করিয়া, সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী মেঘনার জল কাল হইয়া গিয়াছে, তাহা কে জানে?

"সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারান'—হিয়ার কুঞ্জ;
ঝরে' পড়ে' আছে কাঁটা তরুতলে
রক্তকুসুমপুঞ্জ;
সেথা দুইবেলা ভাঙ্গা-গড়া খেলা
অকুল সিন্ধুতীরে!
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথভুলে' মর ফিরে!"

— রবীন্দ্রনাথ।

উপরে সুনীল অম্বর মেঘের মলিনবসনে বদন ঢাকিয়া, অনবরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছিল; তাহার দীর্ঘনিশ্বাসে আমাদের দৃষ্টিপথের অতীত তীরতরুগণ ভূমিতলে শীর্ষ নোয়াইয়া সহানুভূতি দেখাইতেছিল। আমাদের কাঠের তরী কাতর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মেঘনার বুকে গড়াগড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কাল আকাশের তলে মেঘনার কালজল বেলাভূমির কাল দাগে মিশিয়া, সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারের গভীরতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রকৃতির
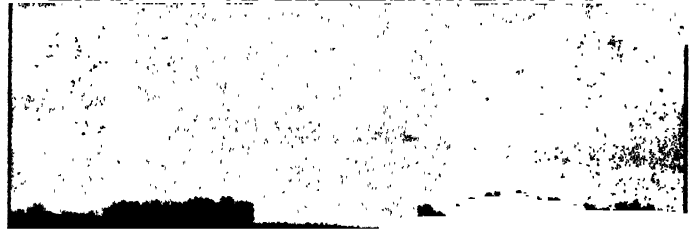
সুন্দর বন

উজ্জ্বল, সুন্দর, প্রফুল্লাননে সহসা এরূপ কালিমালেপ কোন্ বিধির বিধান?

সেই ঘন অন্ধকারে গগনে অশনিনির্ঘোষ থাকিয়া থাকিয়া প্রাণের মর্ম্মস্থল কম্পিত করিতেছিল। অকস্মাৎ তড়িতের কুঞ্চিত তীব্র আলোকরেখা নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া, অন্ধকারের গাঢ়তা বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া, নিমেষমধ্যেই তিরোহিত হইতেছিল।

"The doubling storm roars
through the woods
The lightnings flash from
pole to pole,
Near and more near the
thunders roll";

— Burns.

বাহিরে প্রকৃতির এই ভীষণ ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়াও আমরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ক্ষীণ আনন্দের একটু স্থির, স্নিগ্ধ, মৃদু আলোকবিন্দু অনুভব করিতেছিলাম। জগতের জীবনতত্ত্বে ইহাই এক প্রহেলিকা!

"আমি আপনার মাঝে
আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ
আপনারে সঁপিয়াছি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

আমার দৈবকী তীর

ঝাপটার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, প্রাণপণে বাঙ্গালীর সমরধ্বজা ছাতাটী রক্ষা করিলাম। ট্রেণে মধ্যমশ্রেণীর গাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম না। নিরুদ্যম না হইয়া, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া, ইঞ্জিন হইতে ব্রেক ও ব্রেক হইতে ইঞ্জিন - দুই তিনবার ছুটাছুটি করিয়া, অবশেষে কামাবস্থর সন্ধান পাইয়া, সকল কষ্ট 'পাশরিলাম'। ক্রমে সঙ্গীরা আসিয়া জুটিলেন। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া, সিক্তবসন শুকাইতে দিলে, গাড়ীখানা রজকালয়ের শ্রী ধারণ করিল। কিন্তু আসাম-বাঙ্গালার সরস দেশের সরস ছাতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পয়োবিন্দু ক্ষরিতে লাগিল। তখন আমাদের দশা যেন 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ' (a pimple on the nose).

দৈববিড়ম্বনায়,বৃষ্টির দুর্যোগে, গাড়ী ছাড়িতে একটু বিলম্ব হইল ; (রেল) ৮টা ৮০ মিনিটে ছাড়িবার কথা। পথে লাখ্‌শাম (লক্ষগ্রাম) ষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছিল। বৃন্দাবনের এক শ্যামের পাশে ষোড়শ সহস্র গোপিনী - গোপী - কেলী কুঞ্জবনে মহারাসে মহোল্লাসে মাতিত,—

> "শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
> বেগেতে ধাওত যুবতীবৃন্দ
> খসত বসন রসন চোলি
> গলিত বেণী লোলনী।"
>
> - বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস।

এদেশে লক্ষগ্রামের 'মুরলী-মিলিত অধর নব পল্লবে' শুধু এক 'রাধা রাধা বলি গান'।

দুপুর রাত্রির মহানিশা অতিক্রম করিয়া, ইংরেজী শনিবার বা বাঙ্গালা শুক্রবার, রাত্রি ১১টা ১০ মিনিটে কুমিল্লার গাড়ী থামিল, বৃষ্টিও থামিল। কুমিল্লা তখন কাল কাথামুড়িদিয়া, নিঃশব্দে ঘুমাইতেছিল। দেবীবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে তাঁহার বৈবাহিকসুত বিধুবাবু ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। উভয় পুরুষ আমি, তৃতীয়শ্রেণীর শকটে মালপত্রের সহিত স্থান লইয়া বিবাদ করিতে করিতে সাড়ে বারটায় আশ্রয়স্থান কৈলাসভবনে উপনীত হইলাম,—Haven at last ! *

* এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট যাবতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছায়াচিত্রগুলি মিষ্টার পি. রায়চৌধুরীর সৌজন্যে মুদ্রিত।

প্রকৃত রূপ

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.]

প্রকৃত সাধক বিনা সাধনার ধন
তোমারে চিনিতে নাহি পারে ভগবন!
—নিরক্ষর হ'লেও সে, তার চিত্ত-পটে
তোমার স্বরূপ সদা আপন প্রকটে!

কিন্তু যারা শিক্ষাদৃপ্ত—বিদ্যা-অভিমানী,
ন্যায়ের বাগুরা দিয়া আনে তোমা টানি',
তোমার প্রকৃততত্ত্ব বোঝে নাই তারা,
—বাক্যের বেষ্টন মাঝে হয় দিশেহারা!

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৯)

"বাবা! কই, স্থির তো হতে পারচো না বাবা? যন্ত্রণাটা কি একটুও কমচে না? ঘুম কই আসচে না তো? কপালে কত ঘামই হচ্চে! ছটফট করচো যে এখনও! ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই?—না—একবার পাঠাই বাবা, একবার এসে ঘুমের একটা ওষুধ তোমায় দিয়ে যান্ না। ঘুম না হলে, কাল তো আর কিছুই খেতে পারবে না;—গলার স্বর আরও কত ক্লান্ত শোনাবে! উঃ—এরই মধ্যে কি রকম আস্তে কথা কইচো! শুনলে ভয় করে যে!—"

"ঘুম যে পাচ্চে না, মা! ডাক্তার তো অনেক ওষুধ দিয়ে গেছেন; আর নূতন ওষুধ তিনি দিতে কোথা পাবেন, বাছা? তোর বাবার নিত্যি ওষুধ বদল করলেও তা' একদিন বই আর কাজ দেয় না যে! এত নূতন নূতন আবিষ্কার কে ক'রে ওঠে, বল্‌তো? ঘাম হচ্চে? হোক; কত মুছবি, ধীরা! দে;—ঘাম একটু হতে দে না—বাতাস আজ সহ্য হচ্চে না। ও ঘাম তো গরমের ঘাম নয়; ও শুধু যন্ত্রণার ঘাম। হ্যাঁ, কমেচে বই কি; একটু কমেচে। সে রকম যন্ত্রণা;—থাকলে—উঃ—না—কিছু না—কিছু না। ধীরা!"

"বাবা!"

"কত রাত মা?"

"কত রাত? কি জানি, বাবা, কত! ঘড়ীর শব্দে তোমার ঘুম আসবে-না বলে, উপরের বাজা-ঘড়ীগুলো সব নিচেয় পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ;—এই কতক্ষণ যেন

সেবারতা ধীরা

কোথাকার—বোধ হয়, সোয়েডাগোনের ঘড়ীতেই ক'টা বেজেছিল। ক'টা, তাতো গুণিনি। কিন্তু, বোধ হয়, এখনও ভোর হতে দেরি আছে। কোথাও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্চে না তো! একটিও পাখী এখনও তো কই জাগে নি। তোমার মাথার যন্ত্রণা একটু কমে এসেচে; না বাবা? ঘামটা বন্ধ হয়ে এলো যেন। এইবার একটু স্থির হতে পারচো; না? তবে, খুব করে ঘুমোবার চেষ্টা করে দেখদেখি। আমি তোমার মাথায় মুখে খুব আস্তে আস্তে; এই এমনি করে—হাত বুলিয়ে দিই।"

"আচ্ছা মা, তাই দাও; তোমার হাত আমায় বড় বড় ওষুধের চেয়েও ঠাণ্ডা করে দেয়।"

ফাল্গুনের নাতি-শীতোষ্ণ মধ্যরাত্রিকালে রুদ্ধদ্বার কক্ষমধ্যে মেহগ্নিকাষ্ঠনির্ম্মিত পালঙ্কে শয়ান বৃদ্ধের মাথার কাছে বসিয়া, তাঁহার বালিকাকন্যা তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল। পিতা পুত্রীতে মধ্যে মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল; আবার মধ্যে মধ্যে উভয়ের বাক্যহীন নীরবতার মাঝখান দিয়া, একটা রোগ-যন্ত্রণার রুদ্ধস্ফুট উর্দ্ধশ্বাস স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়া, সেই গৃহপ্রান্ত-বর্ত্তী সবুজ আবরণের ঘনবেষ্টনে আবিষ্ট একটিমাত্র বর্ত্তিকা-লোকের মৃদুছায়ায় ছায়াান্ধকার বৃহৎ কক্ষটার স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের সহিত মিশিয়া, তাহাকে সমধিক পরিমাণে রহস্যপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। জানালাগুলা কাচাবরণের আবেষ্টনে বাঁধা; তাহার উপর আবার, মোটা সবুজ কাপড়ের পর্দ্দাটানা। বহির্জ্জগতের আলো বা অন্ধকারের সহিত তাহাদের মধ্যদিয়া এ'লোকের কোথায়ও কোন যোগ ছিল না। ঘরে আসবাব খুব সামান্যই ছিল এবং যা কিছুও ছিল; তাহাও সেই সবুজ পুরীর ছায়ালোকে অস্পষ্ট। এই নিশুতি মধ্যরাত্রিতে সেই যন্ত্রণার্ত্ত শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রতিধ্বনিত কক্ষভূমি, মৃত্যুপুরীরূপেই প্রতীয়মান হইতে পারিত,—যদি না ইহার সেই প্রেত দীর্ঘ ছায়ান্ধকার মধ্যে একমাত্র সেই ক্ষুদ্রাকৃতি করুণা-শীতলমূর্ত্তি বালিকাটির আবির্ভাব থাকিত। এ মেয়েটিকে কোনমতেই মৃত্যুদূতের সহিত তুলনীয় করা চলে না। মরণের সহিত লড়াই করিয়াই, তাহার ওই অতিক্ষুদ্র দু'খানি হাতে, তাহার এই চলনোন্মুখ পিতার জীবনটিকে সে আজ বৎসরাধিক কাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যু-দূতের যে এখানে আনাগোনা না-ছিল, তা অবশ্য খুব সাহস করিয়া বলাও যায় না। কারণ, ঘরখানার ঐ ছমছমে ভাবই তো এ সন্দেহের প্রধান সাক্ষ্য দিতে পারে। আর, তা' ছাড়া, যেমন ঠাকুরমায়েদের মুখে শোনা যায় যে, ভূত-যোনি যদি কাহারও শরীরাশ্রয়ী হয়, তবে রোজার ঝাঁটার চোটেই হোক, আর 'গয়ায়-পিণ্ডদান'দ্বারাই হোক, যখন সেই আশ্রয়-ভূত শরীর নামক ভৌতিকপদার্থ হইতে সেই অগতি-জনিত 'ভূত'-নামধেয় বিশেষ-জীব! ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়, তখন সে নাকি, তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার চিহ্ন-স্বরূপ, সেই বাড়ীর কোন গাছের ডাল, ঘরের ছাদ,—আবার দুষ্টভূত হইলে, যাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই হাতটা—বা পাখানা—ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়! এই শয্যালীন যন্ত্রণার্ত্ত বৃদ্ধের দেহেও এমন কতকগুলি চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, যাহার দ্বারা তাঁহার শরীরকেও ঐ প্রকার, মানুষের দুঃখে একান্ত সহানুভূতি বিবর্জ্জিত, নিষ্ঠুরপ্রকৃতিক কোন এক অ-শরীরীদ্বারা আক্রান্ত হইবার সন্দেহ করা যায়। হিন্দুস্থানী অশিক্ষিতদের মধ্যে এই বৃদ্ধটির জন্ম হইলে, তাঁহাকে, বোধ করি, এমন গভীর নিঃস্তব্ধতার মধ্যে বিনিদ্র নিশাযাপনের ক্লেশ, রাত্রির পর রাত্রি, ভোগ করিতে হইত না। তাঁহার চারিদিক ঘেরিয়া, এতক্ষণ শতলোক মিলিয়া, গগনভেদী রবে ঢাকের বাদ্য বাজাইত, এবং তাঁহার দেহাশ্রিত প্রেতযোনিকে শান্তি দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এই শুষ্কচর্ম্মাচ্ছাদিত শীর্ণবপু—তপ্ত লৌহে, মুড়া-ভাঙ্গা খ্যাংরায়, এবং আরও কতরকম অস্ত্রশস্ত্রে বিক্ষত করিয়া, সেই আশ্রিত-ভূতের সহিত এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের জৈবপদার্থটিকে শুদ্ধ দুদিনে আশ্রয়চ্যুত করিয়া তুলিত।—হয়ত তাহাদের সেই শুভানুষ্ঠান এই জীবন্মৃত-জীবনের কাছে, যথার্থই অশুভ ঠেকিত না। অবিকৃত মস্তিষ্ক লইয়া, এই বিকৃত শারীরযন্ত্রসকলের বশীভূত হইয়া, চৈতন্য-শক্তির পূর্ণ-বিকাশ-স্থল, শক্তিমান মানব, তাহারই হাতের গড়া একটা মাটীর পুতুলের মত নিস্পন্দ অবস্থায় যদি দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তবে, সে আর কোন্ শোচনীয় অবস্থায় তার চেয়ে দুর্ভাগ্য বোধ করিবে?

শয্যাশায়ী এই অসহায় রোগী, ব্রহ্মরাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী বাঙ্গালী, অতুলধনসম্পত্তির একমাত্র সংগ্রহকর্ত্তা—মুরলীধর বাবু।

জাগতিক সম্মানসম্পদ যে কিরূপ 'তরঙ্গ-ভঙ্গ চপল', এবং জীবন যে, কত বড় 'বিদ্যাচ্চল', তাঁহার এই

জীবনের ইতিহাসেই ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় লিখিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়কাল, এক এক বিভিন্ন দেশ, কাল, এবং পাত্র লইয়া, কি পরস্পরবিরোধীভাবেই যে কাটিয়াছে, নিজের কাছেই তাহা বিস্ময়কর! কোথায় সুজলা সুফলা শান্ত-শীতলা বঙ্গভূমি! সেখানে পরান্নপালিত—বিতাড়িত,—পত্নী-অন্নে জীবিত—নগণ্য বাঙ্গালী বালক! উচ্চ-শিক্ষার কোন সুযোগ তাহার ঘটে নাই; আধুনিক সমাজের দর্শনলাভ তাহার জুটে নাই; একান্তই অতি সাধারণশ্রেণীর সাধারণ জীবনে জীবিত! আবার কোথায় ইংরাজরাজ্যের বাহিরে প্রায় অরাজকতা-কালে উচ্চরঙ্গে ভীষণ জীবনযুদ্ধে জয়শালী —দেশের, দশের মাঝখানে মহোচ্চ সম্মানে বিভূষিত—বিত্ত, পদ, ঐশ্বর্য্যযুক্ত-পত্নীপুত্র—পরিবৃত মানবের অভীষ্ট সকল প্রকার সুখের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত যুবক!—তারপর?—তারপর আবার কোথা হইতে এক বিপ্লবতরঙ্গে সে ছন্নছাড়া হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল! ধন গেল—মান গেল—গৃহ, পুত্র, আশাভরসা—সবই সেই প্লাবনমখে ফুরাইল। সকলেই দেখিল—বুঝিল,—অনুমান করিল—বুঝি, হতভাগ্য জন্মের মতই এবার গেল! সহৃদয়গণ সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আহা!' ঈর্ষান্বিত খল স্বস্তির প্রশ্বাস লইয়া বলিল—"অত বাড় কি সয়? বলে, 'অতিবাড়, বেড়োনা ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে!' কিন্তু,—তারও আবার পর ছিল! "নিরবধিকাল" সময়-স্রোতের জোয়ার-ভাটা-খেলার শেষ দুএকবারের টানেই হয় না। মানুষের কলমের লিখন—এই জোয়ার হইতে ভাটা, অথবা উদয় হইতে অস্ত—না হয়, ভাটা হইতে জোয়ার এবং অস্ত হইতে উদয়, এই টুকুকেই ঘুরাইয়া অথবা ফিরাইয়া দেখাইতে সক্ষম। তাই আমরা মানুষের রচনাকরা ইতিহাসে সর্ব্বদা এই সীমাবদ্ধ কল্পনার চিত্রই দেখিতে পাই। অখণ্ড দণ্ডায়মান কালচক্রের অবিরাম নর্ত্তন লীলার সঙ্গে সঙ্গে শতচন্দ্রাদিত্যের উত্থানপতন, বীজে বৃক্ষ এবং বৃক্ষে বীজের অযুতজন্মমৃত্যুলীলা, তাই সে ইতিহাসের বিষয় হইতে পায় না। আমরা সেখানে অনাদি আরম্ভের অথবা অনন্ত অ-শেষের কোন খবরই রাখি না। কেবল দেখিতে পাই, চিরপরিচিত জগতের একটি শুভপ্রভাত এবং তাহার পরিণাম একটি কুহেলিকা-ছন্ন রহস্যময় সন্ধ্যার ঘনায়িত অন্ধকার! অথবা যেথানে গভীর মধ্যযামিনীর ঘনান্ধকারের মধ্যে আমাদের পরিচয় আরম্ভ, সেখানে একটি উদয়োন্মুখ ঋজু শুভ্র প্রভাতের আলোকেই আমাদের সে পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটে। যেমন একটি বিশেষ ছুটির দিনে, একখানি মেলট্রেনের কামরায় কতকগুলি অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরিচয়ের আরম্ভ ও শেষ; এও তেমনি। যেন এ সন্ধ্যার পর আর নবীন উষালোকের রাঙ্গা আলো জ্বালাইয়া নির্ম্মল প্রভাত আসিতে জানে না; অথবা সেই যে একটি সদ্যোভূমিষ্ঠ অম্লান শিশু-সুকুমার সুপ্রভাতের উদয় দেখা দিয়াছিল, তাহারই অন্তরাল-পথে আর কোথায়ও রাত্রির ঝটিকান্ধকার জমা করা নাই। জোয়ারে যে জল উচ্ছ্বসিত হয়, ভাটায় তাহা নামিয়া যায়; আবার তাহাতে জোয়ার আসে, সে জোয়ারও চিরস্থায়ী হয় না। মানবরচিত কাহিনীর সহিত মানব-জীবন ইতিহাসের শুধু এই খানেই বিরোধ। মানুষের নায়ক-নায়িকারা দুঃখভোগের শেষে সুখী হয়,—না হয় তো সুখের পর দুঃখ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই তাঁহাদের কলম থামিয়া যায়। অবশ্য সে দুঃখসুখকে তাহারা কোন কোন ধর্ম্মমতের 'অনন্ত সুখ দুঃখের' সহিত তুলনীয় করিয়াই থামেন কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেন না তাঁহাদের নায়কনায়িকারা তখনও রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া, পৃথিবীরই প্রজা। আর এই ভূলোক-বিধাতার কড়া আইনে অনন্ত সংজ্ঞার আত্যন্তিক অভাবটা যে অবিসম্বাদী সত্য, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু তা হইলেও মানুষের সত্য-সন্তানদের চেয়ে তাঁহার কল্পিত-সন্তানদের এইটুকুই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের জয়। বিশ্ববিধাতার চেয়ে মানব-ধাতার এই শক্তিটুকু বড়ই সুপ্রত্যক্ষ;—তাঁহারা তাঁহাদের সৃষ্টদের ললাটে যে ভাগ্যলিপি লিখিয়া দেন, তাহা শুধু পোকায় কাটে; তা নহিলে, ইহা চির-যুগস্থায়ী।

কিন্তু মানব-জীবনের কাহিনী এমন সুশৃঙ্খলার কাহিনী নয়। এ চন্দ্রাদিত্যের লক্ষ উদয়াস্তেও পরিসমাপ্তি নাই। ইহার জোয়ার-ভাটাও অশেষ! মুরলীধরের জীবনেও এই ভাটা-পড়ার সঙ্গেই 'নটে গাছ মুড়ায় নাই।' ইন্দ্রজালের মত যাহা গেল, দেখিতে দেখিতে আবার তাহা চতুর্গুণ

হইয়া ফিরিয়া আসিল। ধন-ঐশ্বর্য্য, সামাজিকপদ, দরবারে প্রতিপত্তি, এমন কি, কন্যাপুত্র কিছুই ফিরিয়া পাইতে বাকি থাকিল না। যদি তাঁহার পত্নীর মতই তিনিও তাঁহার জীবন-ইতিহাসে এইখানেই শেষ অধ্যায় লিখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে, সকল রঙ্গভূমির সমুদয় মিলনান্ত আখ্যায়িকার ন্যায় তাঁহারও জীবন-নাট্য দর্শকদলের সহর্ষ করতালির মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইতে পারিত। চির-পুরাতন সকল কাহিনীরই ধনে-পুত্রে পরিবৃত হইয়া, দম্পতির স্বর্গারোহণ-কাহিনীর সহিত তাঁহাদের এই উপাখ্যানের কিছুমাত্র পার্থক্যও দেখা যাইত না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কল্পনার সহিত বাস্তবের—মানব-রচনার সহিত ঐশ্বরিক রচনার এইখানেই ভেদ। মুরলীধরের অদৃষ্টের ভোগ বা তাঁহার সুখদুঃখের চক্রবৎ পরিক্রমণের তখনও বুঝি শেষ হইয়া যায় নাই; তাই, যেখানে এই অতুল সুখসম্পদের শেষে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পশ্চাদনুসরণে স্বর্গযাত্রা উচিত ছিল, সেখানে সেই ঈপ্সিত ত্রিদিববাসের পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার মৃতা-পত্নীর শেষচিহ্ন সেই মন্দস্বাস্থ্য, মন্দভাগ্য মেয়েটিকে বার্দ্ধক্যের অবলম্বন-স্বরূপ বিপুল করুণাস্নেহে বুকে চাপিয়া, নিজের বিস্তৃত ব্যবসায়ের কর্ম্মকাজে যথাপূর্ব্ব মনোযোগীই হইয়া রহিলেন। এমনি করিয়াই কিছুকাল কাটিয়া গেল এবং তারপর এক সময় একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার উপর আবার এক বজ্রপাত করিয়া, তাঁহার ভাগ্য অলক্ষ্য হইতে আর একবার উপহাসের নিষ্ঠুর হাসি হাসিল। চিরজীবন নিজের সমুদয় শক্তিকে অদৃত বাধার বিরুদ্ধে উদ্যত করিয়া রাখায়, সে শক্তি অবশ্য বর্দ্ধিত হইয়া-ছিল; কিন্তু অজস্র খরচে যত বড়ই জমার সংখ্যা হোক, তাহার ক্ষয়ও তেমনি বিপুল ভাবে হওয়া অনিবার্য্য। বৃদ্ধ বয়সেও যখন নিমেষের বিশ্রাম পাওয়া গেল না, তখনই অবিরত ধাক্কা খাইয়া, ভিতরদিকে যে খাদটা জন্মিয়াছিল, সেইটে জোর করিল; হুড় করিয়া, সেই ফুটাটা দিয়া, জল ঢুকিয়া, ভিতরটাকে শূন্য করিয়া আনিতে আর বড় বেশি বিলম্বও করিল না। শক্তির অতিরিক্ত অপরিমিত শ্রমের ফলস্বরূপে শারীরযন্ত্রের বিকৃতি ঘটিতে লাগিল। মেয়ে তাঁহার মুখে বুকে হাত বুলাইয়া, ব্যাকুল হইয়া কহিল "বাবা, তুমি এ কি রকম রোগা হয়ে যাচ্ছ? বাবা, তুমি আর কাজ করো না—অত ভাবলে তোমার শরীর খারাপ হবে।" এ মেয়েটির ঐ স্পর্শ-টুকুই পৃথিবীর সকল জাগ্রৎ নেত্রের চেয়েও সত্য ছিল। এই ক্ষুদ্রস্নিগ্ধ স্পর্শটুকু, যে খবর সেই স্নেহসজাগ চিত্তপটখানিতে লিখিয়া দিয়াছিল, কোন মস্তবড় বৈজ্ঞানিক তাঁহার 'ষ্টিথস্-কোপ', 'এক্স্ রে' প্রভৃতি হাজারটা যন্ত্রতন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াও, এর চেয়ে যথার্থ সংবাদ জানাইতে পারিতেন না। কিন্তু প্রাণের টানের এই ব্যাকুলতার স্পন্দন, যাহাকে এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়া সাবধান করিতে চাহিল, তাহাকে প্রতারিত করা এমনি সহজ যে, সে প্রলোভন তাহার নিজের পিতাই সম্বরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। স্নেহ-সকরুণ-কণ্ঠে প্রত্যুত্তর হইল, "বুড় হইলে, মানুষ শুকাইয়া যায় যে না; ও তো কোন অসুখের জন্য হয় নাই।"

কিন্তু তথাপি সেই স্নেহব্যাকুল চিত্তটুকু এ সান্ত্বনাকে পরমবিশ্বাসে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে তাহার দাদাকে একদিন ডাকিয়া এ সম্বন্ধে ভীতি প্রকাশ করিয়া, ব্যাকুলভাবে তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছিল; কিন্তু সেখানেও কোন ফল সে পায় নাই। দাদা অবজ্ঞার হাসিতে সবটা উড়াইয়া দিয়া, উত্তর করিয়াছিলেন—"তুই ক্ষেপেছিস! কোথায় আবার বাবা রোগা হচ্চেন! বয়স হ'লে কি মানুষ একটু বদলাবেও না?"

পরের কথার উপরই যাহার সারা জগৎ গঠিত, মানব শরীরের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যখন তাহার সেই সৃষ্টিকর্ত্তারাই এমন জোর করিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন, তখন অবিশ্বাস করিলেই বা উপায় কি? আর শাস্ত্রও প্রত্যক্ষের পরই আপ্তকে বড় প্রমাণ ধরিয়াছেন।

একদা গ্রীষ্মের কোনও মধ্যাহ্নে এক জটিল বৈষয়িক সমস্যার সমাধানকালে মুরলীধর অকস্মাৎ ভীষণ পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন; এবং সেই প্রথম আক্রমণের ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়া, এখন এই জীবন্মৃত অবস্থাই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনের শেষ নিশ্বাস যে, এই অবস্থার মধ্য হইতেই লইতে হইবে, ইহাতে তাঁহার অথবা অপর কাহারও সন্দেহের লেশ ছিল না। কর্ম্মীর পক্ষে এই বিশ্রাম—প্রকৃতির এই জোর করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে বাধ্য করা, যে কত বড় শাস্তি, তাহা সেই জানে, যে জীবন্ত থাকিয়া, পলে পলে নিস্পন্দ জড়ের ন্যায় মরণের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আবার যে গতি

তাহাকে সেই অনির্দ্দেশ্যের পানে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, সে গতিও তাহার নিজের নহে ; কারণ, জগতের যাবতীয় পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক জড়বস্তুর ন্যায় তাঁহারও এই স্থূল দেহটা বিরাট ভারগ্রস্ত মহাজড়ে পরিণত হইয়া গিয়াছিল ; ইহার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যপুরুষ বর্ত্তমানেও তাহার মধ্যে চৈতন্য-শক্তির সর্ব্বক্ষম শক্তিমত্তা আর বর্ত্তমান ছিল না ; তাই, সে গতিও তেমন বেগবান নয় ; নদীর মৃদুচঞ্চল বীচিমালা যে ইচ্ছাপ্রবাহে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ধীরে ধীরে ভাসাইয়া স্রোতের মুখে আনিয়া দেয়, এও সেই ধীর শান্ত গতি। ইহার শেষ কোথায়, তাহা জানাই আছে: কিন্তু কবে, তাহা খুব নিশ্চিত নয় ; ইহার মাঝখানে কেবল একটা বৃহত্তর তরঙ্গের প্রতীক্ষা !

হাঁ—কেবলই একটুখানি প্রতীক্ষা ! তা ভিন্ন আর কোন কিছুর আশা সেখানে বাকি ছিল না। মৃত্যুর বাঁশি এখানে রাত্রিদিন বাজিয়া বাজিয়া, যাত্রাপথ প্রতিনিয়ত সেই যাত্রাপথ পথিকের পরিচিত করিয়া তুলিতেছিল। সে পথে আগ বাড়াইয়া, সেই মৃত্যুরথের রাজদূত তাহার বিচিত্র চিত্রণে চিত্রিত-করা জয়পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার শব্দহীন শুভ্র ওষ্ঠ দিয়া নিঃশব্দ জয়ের হাসি হাসিতেছে। তাহারই রক্তহীন নীল অঙ্গুলী উদ্ধে প্রতিনিয়ত ভীষণ ইঙ্গিতে তাহাকে অনুসরণের আদেশ করিতেছে। তাহার বাক্যবিহীন, শীতল জিহ্বা অসহিষ্ণু অভিযোগে ডাকিয়া বলিতেছে—'আর কেন ? আর কত দেরি ?'

তা দেরিই বা এমন কি ? মৃত্যু জিনিষটা সকলের চক্ষে ভয়াবহ হইলেও, সকলের পক্ষে যে সেটা খুবই অপ্রার্থনীয়, তাও নয়। এই চিররহস্যময়, চিরপুরাতন,—চিরনবীন অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়াই ভীষণ হইয়াও এমন সুন্দর—এত প্রিয়। মুরলীধরের পত্নী যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইয়াও তাঁহার শেষ জীবনটুকুতে সে ধর্ম্মটুকু ঠিক রজায় রাখিয়া যাইতে পারিলে, সেই দুঃখসুখে চিরসমানুবর্ত্তিনী পত্নীহারা হইবার পর এই সন্তপ্ত বিরহীর নিকট মৃত্যু,বোধ হয়, মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষের নিকট দৌত্যে নিযুক্ত আষাঢ়ের প্রথম মেঘের ন্যায়ই কুটজ-কুসুমসম্ভারে সুপূজিত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি সেই শেষজীবনে,—বিপ্লবকালের আকস্মিক অদৃষ্ট-বিপর্য্যয়ের ভগ্নশোকে মুহ্যমান অবস্থায় যে শেষ সন্তানটি শরীরে বহন করিতেছিলেন, সেটিকে যখন তাঁহার অতুল ধনৈশ্বর্য্যে ধনী এবং যে ধন কোটি মুদ্রা বিনিময়েও পাওয়া যায় না, সেই স্নেহ-প্রেম-সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত স্বামীকে তাঁহার শেষ উপহাররূপে দিয়া, ইহলোকের সকল দেনা-পাওনা মিঠাইয়া যান, সেইদিন হইতেই ইঁহাকে তাঁহার বিরহ সহনীয় করিয়া, মরণ-চিন্তার পরিবর্ত্তে নূতন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কথা ভাবিতে শিখিতে হইয়াছিল। তা নহিলে, এই মরিবার বয়সে মরিলেই বা কি এমন দুঃখ ছিল ! বিশেষ যাহার হাহাকার করিবার জন্য মা-বাপ বাঁচিয়া নাই, একাদশী করিবার জন্য স্ত্রী এবং বিষয় লইয়া ছিনাছিনি করিবার জন্য বহু-সন্তানও অবর্ত্তমান, তাহার মত মরিবার সুবিধা কয়জনের ভাগ্যে থাকে ?

কিন্তু হইলে কি হয়, যেখানে যা কিছু সুযোগ হইয়াছিল, একা এই একটি মেয়েতেই সে সকল সুযোগকে দুর্য্যোগ করিয়া তুলিয়াছিল। তাই, দূরের মৃত্যু যতই কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেছে, ততই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে তাঁহারও প্রযত্ন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। বিপুল কুরুসৈন্য মধ্যে একা অসহায় অভিমন্যু, অস্ত্রশস্ত্রহারা হইয়াও, রথচক্র তুলিয়া, যেমন শেষ পর্য্যন্ত যুঝিতে ছাড়ে নাই, তিনিও তেমনি যে মহাশত্রু ইহার মধ্যেই তাঁহার আধখানা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সহিত মরণোন্মুখ ক্ষীণ আশাটুকু মাত্র সহায় করিয়া, প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টার মধ্যে এই একটি মাত্র অভিযোগ এই যে, 'তাঁহার মরিলে যে এখন কিছুতেই চলিবে না। তা হইলে তাঁহার ধীরাকে কে দেখিবে ?' হায়রে বুদ্ধি ! কাঁদুনি গায়িবার কি আর মুল্লুকে স্থান ছিল না ? কার কাছে এই কান্না কাঁদিতে যাওয়া ? জননীর কোলের নিধি, পত্নীর চক্ষের তারকা, বৃদ্ধ-পিতার বক্ষের আশা, পতির সংসারের লক্ষ্মী, অতর্কিতে অপহরণই যাহার প্রতিদিনের খেলা, প্রতিক্ষণের আকাঙ্ক্ষা, সেই সাধু সদাশয় বিশ্ব-বিখ্যাত দয়াবতারের নিকট চলা-না-চলার আব্দার-আবেদন-কথাটা, হাসিবার কিংবা কাঁদিবার, বোঝা যায় না !

তা আমরা পাঁচজনে বৃদ্ধবয়সের এ মরণাতঙ্ক লক্ষ্য করিয়া, হাসি আর কাঁদি ; কিন্তু আতঙ্ক যে একটা ছিল, এবং খুব প্রবলই ছিল—তাহা কোন মতেই অস্বীকার

করিবার যো নাই। আর সেই আতঙ্কের কেন্দ্রটি যে কে, সে খবরও আমরা যথাশ্রুত দিয়া দিয়াছি। এই সেই মেয়ে, যাহাকে তাহার মা, মরণ-কালের দান-স্বরূপে তাহার বাপের হাতে সঁপিয়া গিয়াছেন, এবং বাপও সেই গ্রহণ-করার সমুদয় কর্ত্তব্যটুকুকে অসীম স্নেহে গলাইয়া, ইহার জন্য নিজের বক্ষে সেই যে একটি নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখান হইতে বাহিরের এই বিপুল বিশাল কঠিন জগতের মাঝখানে ইহাকে নামাইয়া রাখিয়া যাইতে কোনমতেই তিনি বুক বাধিতে পারিতেছিলেন না। এই মেয়ে রাখিয়া মরা যে, তাঁহার পক্ষে কত কঠিন, তাহা সেই অন্তর্যামী ব্যতীত এ পৃথিবীতে আর কে বুঝিবে! মরণে শুধু দোসর লওয়া চলে না; তা যদি চলিত, তবে বোধ হয়, তিনিও তাঁহার এই আশ্রিতামাধবী-টিকে এমনি করিয়া বুকে জড়াইয়াই, সেই বক্ষে কুঠারাঘাত গ্রহণ করিতেন। তিনি জানিতেন, যাহাকে তাঁহার বুক হইতে নামাইয়া, পৃথিবীর এই তপ্ত ধূলির উপরে ফেলিয়া যাইতে হইবে, সেখানে সে যে অপর কোন আশ্রয় পাদপ-লাভ করিতে সমর্থ হইবে, সে আশা মরীচিকা মাত্র। সেখানে তাহাকে রাখিয়া যাইতে হইবে—শুধু দলিত হইয়া মরিবার জন্যই। আপাদমস্তক চমকিয়া শিহরিয়া উঠে। প্রাণপণে মনে ইচ্ছা জাগে—"ভগবান—ভগবান—আমায় যত যন্ত্রণা দিতে পার দাও, শুধু বাচাইয়া রাখ; পঙ্গু হইয়াছি, আরও কিছু করিতে হয় করো—কেবল ভিক্ষা দাও—এই ব্যাধিপীড়িত, যন্ত্রণার্ত্ত মুমূর্ষু প্রাণটুকু!"

মরিবার যে যো নাই! মরণে এত বড় উৎকট রোগের জ্বালা চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যায়, তার চেয়ে বড় এই নিরুপায় স্নেহের জ্বালাও হয়ত নিঃশেষ হইতে পারে, কিন্তু তা বলিলে তো হয় না; এ যে তাহার সাধ্বী পত্নীর হৃদয়ের ধন,—জন্মমুহূর্ত্তে সে যে মায়ের কোলভ্রষ্ট হইয়া, তাঁহার বক্ষে স্থান খুঁজিতে আসিয়াছে;—আর তার উপর সে যে সঙ্গে করিয়া,এতটুকু একটুখানি আলোর পুঁজিও সঙ্গে আনে নাই। এই তাঁহারি স্তিমিত চ'চোক যে এতদিন তাহাকে একমাত্র আলোর জোগান দিয়া আসিয়াছে; এত'টির উপর নিবিড় কালোর পর্দ্দা পড়িয়া গেলে, তাহার সেই রুদ্ধদুয়ার অন্ধকার ঘরখানি যে চিরতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে! কত বড় অসহায়, কি নিরুপায়ই সে তখন হইয়া যাইবে! আবার সমস্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন বলশক্তিকে রুদ্ধশ্বাসে সংগ্রহ করিয়া, মন উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলে—"আরও কিছুদিন—আরও কিছুদিন—হে ভগবান্। আরও কিছুদিন বাঁচিতে দাও! এখনি মারিও না।"

কিন্তু শুধু 'কিছুদিনের' মেয়াদ বাড়াইয়াই বা কি ফল-লাভ হইবে? সে 'কিছুদিনের' শেষে আবার কি উপায় দেখা দিবে? এই ভয়াবহ প্রশ্নের অস্ফুট আভাষ মনে জাগিতে চাহিলেই একটা গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকার মাত্র কঠোর উপহাসের অট্টহাসিতে ক্ষীণ ধমনীর মধ্যে অৰ্দ্ধশীতল স্বল্পশোণিত হিমশিলায় জমাট বাধাইয়া দেয়। মেয়েটি অন্ধ! জন্মকাল হইতেই সেই চিত্রাঙ্কিতবৎ সূক্ষ্ম সুন্দর চটি বঙ্কিম ভ্রূলেখার তলে বৃহদায়তন পক্ষ্মরাজিসুশোভিত নেত্র চইটি দর্শনশক্তিবিরহিত।

কাচের বড় বড় নীলচোক-পরান মোমের বিবি পুতুলকে যেমন দেখায়, এই মেয়েটিকেও হঠাৎ দেখিলে, এই বাড়ীর নানাবিধ আশ্চর্য্য সংগ্রহেরই সামিল তেমনি একটি কলে চলা বলা বড়মাপের কাচের পুতুল বলিয়াই মনে হইত। মানুষের নেত্রই তাহার মনের দর্পণ। যাহার সেই নেত্রেই দৃষ্টি নাই, তাহার সে দর্পণ মসীম্লান। সেই মুখ যাহার, তাহাকে দেখিলে, দর্শকের এমনও বিভ্রম ঘটা অসম্ভব নহে যে, বুঝি বা ইহার তলে একটি সুখচঃখের সমবায়ে গঠিত, আশানিরাশার আলোকান্ধকারে নর্ত্তিত মানবচিত্তও জাগিয়া নাই! তাই অন্ধের চঃখ অবাক্ত!

(১০

"ডাক্তার বাবু! এমন কোন ওষুধ কি আপনাদের নাই, যাতে করে' রাত্রে ওঁর ঘুমটা বেশ হয়; আর খাওয়াটা একটু বাড়ে, আর বুকের কষ্টটা, মাথার যন্ত্রণাটা একটু কম থাকে?' ডাক্তার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াও একটু হাসিলেন। সে হাসিতে বিদ্রূপের লেশও ছিল না; বড় চঃখে দীর্ঘশ্বাসের মত আকস্মিক যে হাসি অধর প্রান্তে জমিয়া উঠে, এ সেই সহানুভূতিপূর্ণ বেদনার শুষ্ক হাসি। ডাক্তার বলিলেন—"সেই সব ওষুধইতো দিচ্ছি মা!"

ডাক্তার প্রবীণ এবং এবাড়ীতে তাঁহার পদার্পণ এই নূতন নয়। "খুবভাল করে কি বই দেখে দিয়েচেন? আরও কোন নূতন রকম ওষুধ কি আর কোন দেশে বার

হয়নি? খুব টাট্‌কা তৈরি ওষুধ কি এখানে পাওয়া যায় না? আজ অনুগ্রহ করে, আবার একবার খুব ভাল করে আপনাদের বইগুলি খুঁজে, একটি খুব ভাল ওষুধ দিন না। কাল রাত্রে বাবা একটি বারও যে ঘুমুতে পারেন নি।"

রোগীর গৃহের বাহিরে প্রভাত-সূর্য্য সমস্ত মুক্ত জগতের উপর অজস্র কিরণধারা ঢালিয়া দিয়া, ঊর্দ্ধপথে নিজের সপ্তাশ্বযান চালিত করিতেছিলেন। রাত্রির অন্ধকার সেই নির্ম্মল দিবালোকে ধুইয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার দেখিলেন—খোলা বারান্দার খিলানের ফাঁকে সেই দেবপতির বিপুল করুণালোক তাঁহার সম্মুখস্থিত করুণ মুখখানিকে মণ্ডিত করিয়াছিল। তাহার ভিতরের সূচিভেদ্য অন্ধকারে সে আলো বিন্দুমাত্র রেখাপাত না করিলেও বাহিরে তাহারি দীপ্ত কিরণ সেই জাগরণ কালিমাময় চোখ দুটিতে একটি দিব্য সুষমা দান করিয়াছে। তাহাতে দৃষ্টি না থাক, অপরের দৃষ্টি তাহা আকর্ষণ করে।

ডাক্তারি ব্যবসা করিতে গেলে, নিজের মনের মধ্যের দয়ামায়া প্রভৃতি রোগের জড়গুলাকে সকলের আগে মারিয়া ফেলিতে হয়। ও সকল উপসর্গের বালাই থাকিতে, 'ভাল ডাক্তার' হওয়া চলে না। এ শাস্ত্রাধ্যয়ন তন্ত্রশাস্ত্রের চেয়ে খুব নীচে নয়। সেই রকমই ইহাতেও পঞ্চমকারের সাধনারও বিধি আছে। শব-সাধনাই এই সাধনা-পথের প্রধান সোপান। ঘৃণা পিত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, ইহাতে অবশেষে ভয়লজ্জা অবধি সমুদয় মানসিক বৃত্তিকেই বলিদান দিতে হয়। ভয়—অবশ্য পরলোকের ভয় এবং লজ্জা অর্থাৎ কি না চক্ষুলজ্জা! এ দুটি মনোবৃত্তির অধীন থাকিতে ডাক্তারিতে উন্নতি নাই; তাই যেখানে ডাক্তারিতে বড় বাড়ী, গাড়ী-জুড়ী, সেখানেই এই দুটি বস্তুর অত্যন্তাভাব। এই ডাক্তারটিরও ঐ সকল জাগতিক সম্পদের অভাব ছিল না; কাজেই তাঁহার সেই ডাক্তারি সাধনার সিদ্ধসংযত চিত্তের কাছে, এই আসন্ন বিপদের ছায়াভীতা বালিকার করুণ মর্ম্মভেদী আবেদনটুকু কিছুই না; কিন্তু এতো শুধু জগতের সাধারণ আরও পাঁচটির মধ্যের একটি পিতৃবিচ্ছেদভীতা কন্যামাত্র নয়;—এ যে একটি পিতৃজীবনে জীবিতা অন্ধ-বালিকার তাহার জগৎসংসারের সর্ব্বস্ব আগলাইয়া রাখিবার অসহায় চেষ্টা! ইহাকে অবহেলা করিতে পারে, এমন সয়তানও বোধ হয় সৃষ্টির মধ্যে নাই। ডাক্তার করুণাকোমলকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আচ্ছা, আমি আজ খুব ভাল করিয়া বই দেখিব; কখনও এলোপ্যাথিভিন্ন অন্য ওষুধ আমি ব্যবহার করি না; কিন্তু আজ তোমার কথায় আমার মনে হইতেছে, আমাদের বোধ হয়, সময়বিশেষে, তাও করা উচিত। রোগীকে সুস্থ রাখিতে, নূতন নূতন উপসর্গ দূর করিতে, যখন যেটা কাজে লাগে, সেইটা ব্যবহার করাই দরকার। বৃথা একটা সংস্কার বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা রোগীর মুখপানে চাই না;—তাতে, শুধু অন্যায় হয় না, পাপও হয়।"

"তবে আজ নূতন ওষুধ দিবেন? আজ তাহলে বাবা নিশ্চয় ঘুমুতে পার্ব্বেন! তাহলে নিশ্চয় কাল সকালে গ্রাসে দুধ পড়ে থাকবে না! বেদানার রস সবটুকুই হয়ত খেতে পারবেন! কি ভালই হবে! ডাক্তারবাবু, আপনি বড় ভাল!"

"হ্যাঁ—হবে মা, হবে। আচ্ছা, আমি এখন যাই। এখন ঐ ওষুধটাই খাওয়াবার কথা বলে এসেছি। বারোটার পর আবার আসচি। মালিশ-টালিস সব আগের মতই।"

"আর নতুন ওষুধ? সেটা দিতে দেরি করবেন কেন?"

"সেটা ওবেলা থেকে। বই দেখে ঠিক করতে হবে কিনা।"

"হাঁ হাঁ;—ভুলে গেছলাম। আচ্ছা, মনে রাখবেন। খুব ভাল করে বই দেখে—"

"হাঁ—ভাল করেই বই দেখবো। আচ্ছা তাহলে আসি। নিজের শরীরের উপর একটু যত্ন ক'রো মা, বড্ড পরিশ্রম করচো।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাঁহার পায়ের ভারি জুতার শব্দ অনেকদূরে মিলাইয়া গেল। ধীরা ফিরিয়া, পিতার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া, আবার কি ভাবিয়া, তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া, বারান্দায় খানিকটা অগ্রসর হইয়া রেলিঙের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। এই বারান্দাটার নীচে বাড়ীর সামনের বাগান; দেখিবার মতন জিনিষ সেখানে, একটা ছাড়িয়া, শতেকটাই ছিল; কিন্তু যেখান দিয়া দৃষ্টবস্তুর ছায়া, চিত্তফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া, দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়, সেই কবাটই যখন রুদ্ধ, তখন এই বাসন্তী প্রভাতের নির্ম্মল নীলাকাশের উজ্জ্বল সৌরকর, বাসন্তী প্রকৃতির সমস্ত লাবণ্যমাধুরী,

তাহার নিকট অমাবস্যা রাত্রির মতই—সেই একই কৃষ্ণ-বসনাচ্ছাদিত। নীচের বাগানে, কদিন আগের একটা বৃষ্টিতে, গাছগুলা শ্যামলতায় ভরিয়া গিয়াছে। আবার, তাহাদের সেই সবুজ প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দের আভাষ তাহাদের সেই শ্যামলিমাকে, শুভ্রগোলাপিরক্তপীত—বিবিধ বর্ণসাজে সাজাইয়া দিয়াছিল। কেয়ারি-করা গাছের শ্রেণী, পাতাবাহারের সারি, চায়না টবে অপূর্ব্ব গুল্মপুষ্প, বৃক্ষজগতের বিভিন্ন জাতি, গোত্র, গোষ্ঠির একত্র সমাবেশ! লতায় লতায় থোকায় থোকায় ফুল ঝুলিতেছে, গাছে গাছে থোলো থোলো ফল ফলিয়াছে, পাখী-প্রজাপতি ভ্রমর-মৌমাছির ব্যস্ততার পরিসীমা নাই। ধীরা চুপ করিয়া, তাঁহার ধ্যানস্তিমিত শান্ত চিত্তখানি দিয়া, প্রভাতের এই আলাহীন সুপ্রচুর সৌন্দর্য্যটুকু নিজের অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। এমনি কত প্রভাতেই সে এইখানে,তাহার পিতার সহিত, দাড়াইয়া, তাঁহার দৃষ্টির মধ্য দিয়া, এই সব প্রভাতদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে। হাঁ—সে একরকম প্রত্যক্ষই করা। তাহার হাত ধরিয়া, ওই সম্মুখের উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে, সে তাঁহারই মুখেই তো তাহার চারিপাশের এই সব অপরিদৃশ্যমান—অপরিচিত বিশ্বজগতের সহিত নিজের অবগুণ্ঠিত চিত্তের পরিচয় সংস্থাপন করিয়াছিল! পাখীর ডাক শুনিয়া, সে আজও তাঁহার মুখের বর্ণনায় চিত্রিত সেই পাখীগুলিকে যেন তাহার মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল। এইটি সেই কালো কোকিলের ডাক—কুহু, কুহু, কুহু,—ওই পাপিয়াও 'পিউ—পিউ কাহা' রব তুলিয়াছে যে! আহা! পাখীগুলি কি কোমল ক্ষুদ্র সুখস্পর্শ জীব! তাহাকে তাহাদিগের সহিত পরিচিত করিবার জন্য, তাহার পিতা কতগুলি পাখী, পায়রা, খরগোস, হরিণ, ছাগল, ময়ূর, বিড়াল, কুকুর, তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিলেন; সে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে হাতবুলাইয়া তাহাদিগকে অনুভব করিত—কোনটি কোন্ বর্ণের, কাহার লেজে সাদারছিটা, বুকে ধূসর রং—সে সমুদয়ই সে তাঁহার মুখেমুখে চিনিয়া রাখিয়াছিল। ও পশুপক্ষী গাছফুলফলের সম্বন্ধে তাহার এই আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতায়,অকস্মাৎ কোন ব্যক্তি তাহার অন্ধত্বে, বোধ করি, সন্দিগ্ধ হইতেও পারে। কিন্তু পিতার হাতের গণ্ডিঘেরা এই জগৎটুকুর বাহিরে ঘন কালো অন্ধকারের অতি স্থূল যবনিকাভিন্ন আর কোন কিছুই ছিল না! সেই কৃষ্ণারাক্ষসীর বিকটব্যাদিত বদনগহ্বর, তাহার সমক্ষে যেন নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, নক্ষত্র—অগ্নি—এমন কি, একটি জোনাকির আলোকবিন্দু অবধি—সে রাজ্যে অপরিচিত। ফুল, ফল, পাখী, মানুষ তো সেই অপরিজ্ঞাতালোক অন্ধতামসের মধ্যে কোথায় তলাইয়াই গিয়াছে, তাহার খবর আর কে লইবে? তা যাক্—ক্ষতি নাই; সে অন্ধকারের রাজ্য যেন অন্যের চির-অপরিচিতই থাকে!—তাহার জন্য শুধু এই একটুখানি স্নেহের আলোই অনির্ব্বাণ হোক! হে ভগবান্! সেই তাহার পর্য্যাপ্ত, সেই তাহার ঢের!

"বাবা আমায় একটু বাহিরে থাকিতে বলিয়াছিলেন, সে একটুতো হইয়া গেছে, এইবার যাই—" ঘরে ফিরিবার জন্য সে রেলিঙের অবলম্বন ছাড়িবামাত্র, সেই রেলিঙের নীচে, বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের নিকট, একটা অচেনা, গলার বাঙ্গালীর কণ্ঠ শুনিতে পাইল। কে একজন বড় কাতর-স্বরে আরএকজন কাহাকে বলিতেছিল—"দেখা হইবে না বলিতেছ! কিছুতেই হইবে না? কিন্তু তা না হইলে আমার যে সর্ব্বনাশ হইবে! জন্মের মতই যে আমি ধ্বংস হইব। দয়া করো;—আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে, তোমার কাছে হাতযোড় করিতেছি। পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যও একবার দেখা করিয়ে দাও; বড় আশা করিয়া যে এতদূরে ছুটে আসিয়াছি!"

যাহার নিকট বাহিরের সৃষ্টির সমস্তটাই শূন্য, ভিতরের সত্যটা কিন্তু তাহার কাছে তেমনি প্রত্যক্ষ। শুনা যায়,শব্দই বিশ্বসৃষ্টির প্রথম উপাদান। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের অহেতুকী আনন্দ দ্বারা যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল, তখন তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তি-বলে, সেই সৎ এবং অসৎ, প্রাণ এবং অপ্রাণ, আলোক এবং অন্ধকার, মৃত্যু এবং অমৃত, সর্ব্বপ্রকার 'অস্তি' এবং 'নাস্তি'-বিবর্জ্জিত অবস্থায়—সর্ব্বপ্রথম স্পন্দনের বা শব্দ ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। এই স্পন্দন বা শব্দ হইতেই বিবিধ ছন্দ এবং তাহা হইতেই বৈচিত্র্যময় জগতের আবির্ভাব। তাই মনোজগতেরূপের—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ—যেখানে অপ্রকাশ, শব্দই সেখানে সর্ব্বময়। এই অন্ধবালিকার নিকট স্পর্শময় পৃথিবী চিরতিমিরাবৃতা, তাই তাহার জগৎ কেবলমাত্র কদাচিৎ স্পর্শ এবং সর্ব্বত্র শব্দময়ী। এই শব্দের বিচিত্র ছন্দেই শুধু তাহার পৃথিবীতে দিনরাত হয়, ঋতু

পরিবর্ত্তন চলে, বৎসর ঘুরিতে থাকে। তাহার আলোকহীন জীবনের সমুদয় অন্ধকার যখন পুঞ্জীভূত করিয়া দিয়া, দশদিক্ নীরব নিথর হইয়া যায় তখনই তাহার রাত্রি আসে; আবার পাখীগুলির কবিগলার তাজাগানে তাহার জগতে দিবসের প্রথম-অভ্যুদয় অভিনন্দিত হন,—তাঁহার জগত-জাগান আলোকের স্রোতে নয়। তেমনি, যখন বিশ্বের সমস্ত তৃষার্ত্ত হৃদয়ের হাহাকারে হা হা করিয়া, অজস্র বুকফাটা অশ্রু ঢালিয়া দিয়া, বর্ষা নামিয়া আসে, তখনও তাহার বিজুলী হানাহানির খবর, তাহার নূতন দেশের রুদ্ধবাতায়নের মধ্যে প্রবেশপথ পায় না,—তাহার মেঘডম্বরুর রব, তাহার গাছপালার সর্ সর্ শব্দ, নদীর কলকল্লোল তাহাকে সেই কাব্য-জগতের—আর চাষার দলের—প্রিয়বন্ধুর শুভাগমনবার্ত্তা জানাইয়া দেয়। আর আর ঋতুগুলি স্পর্শ দিয়া নিজেদের খবর পাঠায়। নীচের বাগানে, বাড়ীর দ্বারপথে, দাঁড়াইয়া এই যে কোন বিপন্ন ভিখারী কথা কহিল, মূর্ত্তি তাহার যতই অপ্রকাশ থাক না কেন, তাহার কাতরকণ্ঠের সেই সকরুণ মিনতিটুকু যে কত বড় সত্য, সেটুকু সেইমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারা এই বালিকার-পক্ষে একটুকুও কঠিন হইল না। ইহার কারণ, ভগবান যাহাকে একটা বড় জিনিষ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহাকে তার বদলে যেটা দেন, সেটা তাঁহার যথার্থ দেওয়া;—তার মধ্যে একটুও শূন্যতা রাখিয়া দেন নাই।

ধীরা রেলিং এর নিকট গিয়া দাঁড়াইল

প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য সে রেলিংগুলার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ শুনিতে পাইল,—"তুমি ধ্বংস হবে—কি মরে যাবে—সে খবরে আমার কি? বাবুর ভয়ানক ব্যায়রাম; নিজেই তিনি এখন-তখন,—দেখা-টেকা হবে না বাবু,—সোজা কথা বলে দিনু, পথ দেখে নাও।" পুরাতন ভৃত্য পাঁচকড়ির স্বভাবসিদ্ধ প্রভুবাৎসল্য! কিন্তু এই চিরানুগত বৃদ্ধের সোজা-সরল অভিব্যক্তির মধ্যে কি যে অগ্নিতপ্ত লৌহশেল বর্ত্তমান ছিল, তাহা যাহার বুকে গিয়া সেটা বিঁধিল, শুধু সে একাই বুঝিয়াছিল। শব্দ! হায় যে শব্দে জগৎবন্দনাগান গাহিয়া কোমলকিসলয়তুল্য পাখীগুলি, স্নিগ্ধসুখস্পর্শ ফুলের গাছে নাচিয়া বেড়ায়, সঙ্গীতের যে স্বরে চিরনিরানন্দমূর্চ্ছিত-প্রাণেও আনন্দের মূর্চ্ছনা বাজিয়া উঠে, শব্দের সেই পুলকসঞ্চারী-আনন্দ-রূপও সময়-সময় মানুষকে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাঘাত করিতে পারে! রামায়ণের রাজা দশরথও কি এমনি শব্দঘাতী শর দিয়াই মুনিবালক সিন্ধুর প্রাণহরণ করিয়াছিলেন?—আর্ত্ত-ভাবে ধীরা তাহার অবলম্বন কাষ্ঠটাকে ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়া চাপিয়া ধরিল,—"এখন তখন!" উঃ! কি নির্ঘাত এ সংবাদ!

সত্য কি এ,—না সত্য নয়! মূর্খ, অজ্ঞ, কর্ম্মভীরু বৃদ্ধের এ অসংলগ্ন প্রলাপমাত্র! এতবড় নিষ্ঠুর সত্য তাহার জীবনে আসিয়া পৌঁছিবারপূর্ব্বে নিশ্চয়ই সে তাহা নিজের মনের ভিতর জানিতে পারিবে; আর, তাহার বিধাতা তাহার পূর্ব্বেই তাহাকে সেই দুঃসহ জীবন হইতে মুক্ত করিয়া লইবেন। প্রাণপণ শক্তিতে এই একবৎসর ধরিয়া, সে শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে,—আর করিতেও ছাড়িবে না।

আবার শব্দ আসিল—"তবে নিতান্তই এই একমাত্র শেষ আশাও বিসর্জ্জন দিতে হলো! হা ভগবান্! শেষকালে আমার ভাগ্যে চোর-ডাকাতের সঙ্গী হওয়াই লেখা ছিল!" ধীরা ডাকিল—"পাঁচকড়ি!" "কি দিদিমণি!" বলিয়া পাঁচু উপরদিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া, আগন্তুকও সাগ্রহে বারেক উর্দ্ধে চাহিয়াই পরক্ষণে নিজের দৃষ্টি নত করিয়া লইয়াছিল। তাহার মন, সেই একটি মুহূর্ত্তের মাঝখান দিয়া,কেমন করিয়া কে জানে,সহসা একটা দুরাশা করিয়া ফেলিয়াছিল!—কিন্তু এই চকিতের দৃষ্টিটুকুতে সেই অজ্ঞাতপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই যেন সে মাথা হেঁট করিল।—যাহাকে সে তাহার পরম আশ্বাসের কেন্দ্র করিয়াছিল, এখন সরল সত্যের খাতিরে—এমন কি, এই নিরাশা-নদীবক্ষে তৃণগুচ্ছাবলম্বনের চেষ্টা সত্ত্বেও—স্বীকার করিতে হয় যে, বাহ্যদর্শনে যদি মানুষকে বিচার করিতে হয়, তবে তাহার বিচারশক্তি আদৌ সহজাবস্থায় ছিল না! গম্ভীরমুখ, বা বিচক্ষণবুদ্ধি, বা বিজ্ঞ-প্রবীণার এমন কোন নিদর্শন, সেই ক্ষুদ্রাকৃতি ক্ষীণতনু বালিকাটির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহাতে করিয়া তাহার উপরে এতটুকু ভরসা স্থাপন করা চলে!

ধীরা বলিল—"পাঁচকড়ি, ওঁকে বলো—বাবার কাছে যদি খুব দরকার থাকে, তা হলে, দুপরবেলা, অল্পক্ষণের জন্য দেখা হতে পারবে। বাবা এখন অনেকটা ভাল আছেন তো।"

শেষ কথাটা সে, পাঁচকড়ি, আগন্তুক কিংবা নিজের মনকে—কাহাকে শুনাইয়া বলিল, তাহা সেই ভালো বলিতে পারে। হয়তো, অপরের চাইতে,এসংবাদটা তাহার আপনার সদ্যঃ-আঘাত-প্রাপ্ত চিত্তের পক্ষেই সমধিক প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

যে বস্তু হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহার স্থিতিপ্রকৃতিও তদ্‌গুণানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। দার্শনিকের মতে—এই পরিদৃশ্যমান বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব সত্তা নাই, ইহা মায়ার বিকার মাত্র, মিথ্যারই একপ্রকার অবভাস। তা কথাটা, নেহাৎ হাসিয়া উড়াইবার মত হইলেও, কিন্তু উড়ান যায় না; কেন না, কথায় বলে—"প্রত্যক্ষের চেয়ে প্রমাণ নাই।" অথচ সেই নিজের নিজের চোখ দিয়েই তো দেখিয়া আসিতেছি যে, এ সংসারের কোন জিনিষকেই যথার্থ সত্য বলা চলে না। সত্য অর্থে—যাহা সৎ, যাহা অবিনাশী। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যাহা এই আছে, তাহা পলক ফেলিতে, আর নাই!—এবং যাহা গেল, তাহা স্বপ্নের মতই চির অতীত হইয়া গেল!

ব্যাধি জিনিসটা তমোশক্তিসম্ভূত; তাই, তামসী রজনীতেই তাহার পূর্ণশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক রাত্রিচর প্রাণীর ন্যায় দিবা প্রকাশের মুক্ত আলো ও হাওয়ায়, সেও সঙ্কুচিত হইয়া, অন্ধকারের কোণ খুঁজে; কারণ, তাহার মধ্যে সত্ত্বসম্ভূত শুভ্রালোকের স্থান নাই; ইহারা উভয়েই পরস্পর বিরোধী।

মুরলীধরও আজ, দিনের আলোয়, অনেকখানি সহজ অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ঘরখানারও সেই আলো-আঁধারে ছমছমে ভাবটা এখন নাই। দীর্ঘ দীর্ঘ সবুজ পর্দ্দাগুলা একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া, জানালা-দ্বার খোলা হইয়াছিল। পূর্ব্বের জানালা দিয়া সুপ্রচুর সূর্য্যকিরণ ও আমের 'বউলে'র গন্ধমাখা সকালবেলার ক্লান্তিনাশা—তাজা বাতাস অবাধে ঘরে ঢুকিতেছিল। সেই আলোর অনেকখানি রোগীর মুখে পড়িয়া, তাঁহার মুখখানাকে, রাত্রির মরণাপন্নভাবের পরিবর্ত্তে, অপেক্ষাকৃত জীবনীযুক্ত দেখাইতেছিল। আর, তাঁহার দুইটি ক্ষীণদৃষ্টি নেত্র,তাঁহার কপালের উপর নত করা যে মুখখানির উপর পরম স্নেহে থাকিয়া থাকিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউতোলা কালো চুলের বেড়ের ভিতরকার এতটুকু ছোট, মুখখানিকেও আজ সকালে, রাত্রির সেই মৃত্যু-গৃহের সবুজ পরীটির সবুজে মুখের পরিবর্ত্তে, একটি অর্দ্ধবিকশিত গোলাপ-কুঁড়ি বলিয়াই ভ্রম হইতেছিল। তেমনি শুভ্র, তেমনি সুগন্ধ, তেমনি আত্মৈশ্বর্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ!

মুরলীধর অতৃপ্ত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বুকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছিল; রোধ করিয়া বলিলেন, "কৈ—তোর ভিখারী এলোনা রে? ওরা বুঝি আবার বাধা দিয়েছে!"

"না বাবা, তা কেউ দেবে না;—আচ্ছা দেখুন দেখি, কেউ দরজার কাছে এসেছে কি না।—হ্যাঁ ঐ যে,—ঐ, বোধ হয়, সে এসেচে।"

ভৃত্য যাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চোক ফিরাইয়াই মুরলীধর চমৎকৃত হইলেন। এ মূর্ত্তি তিনি তাঁহার সম্মুখে দেখিবার আদৌ আশা করেন নাই! সংসারচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট—রুক্ষমূর্ত্তি দুশ্চিন্তা-পীড়িত—শীর্ণমূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই তাহার কল্পনায় ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সম্মুখীন হইল—একটি অতি সুকুমারকান্তি কৈশোর অতিক্রান্ত তরুণ পুরুষ! বয়স তাহার কুড়ি বাইশের অনধিক; দুঃখ ভারাবনত চোকের দৃষ্টি যেমন উজ্জ্বল, তেমনি কোমল,—প্রশস্ত ললাটখানি, বিষাদচ্ছায়ায় মেঘাচ্ছন্ন হইলেও, আকাশের মতই উদারতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক! মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, তিনি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বাবা—তুমি?"

সম্মুখীন হইল—একটি অতি সুকুমারকান্তি ...তরুণ পুরুষ

আগন্তুক, ঘরে ঢুকিয়াই, কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের স্বার্থের জন্য যতক্ষণ তাহাকে যোঝাবুঝি করিতে হইয়াছিল, ততক্ষণ অপরপক্ষের আপত্তিগুলাকে ওজন করিয়া দেখার অবসর তাহার ছিল না। সেগুলা নিতান্তই অনিচ্ছার বাঁধা-গৎ বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল; অথবা, সেসম্বন্ধে কোন কথাই তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ পায় নাই। কিন্তু এখন, হঠাৎ এতবড় একটা মাহেন্দ্র যোগের মুহূর্ত্তে, এই অপ্রত্যাশিত সুযোগের ক্ষণে, একেবারে অন্দরের প্রান্তে শতলোকের অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার স্থলে পৌছাইয়া, তাহার মনের সমস্ত গতি সহসা বিপরীতপথানুগামী হইয়া গেল! শয্যা-প্রসারিত সেই স্থিরমূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই, তাহার মনের উপর বিবেকের তীক্ষ্ণকশা অতি তীব্রবেগে আঘাত করিয়া উঠিল। হায় রে স্বার্থসর্ব্বস্ব! এই লোকের উপরেও তোদের কাজের সংঘাত আনিয়া ফেলিতে মায়া করে না? এ যে গঙ্গাযাত্রীকে কলম-বাড়ার ফরমাইস দেওয়া! সে, মাটিতে জানু পাতিয়া, ভূমে মাথা রাখিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, উঠিয়া লজ্জাতাড়িত—ব্যথাবিজড়িত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমাকে ক্ষমা করিবেন; আপনাকে যে এ অবস্থায় দেখিব, তা আমি ধারণাতেও আনিতে পারি নাই।"

ধীরার মুখখানি কালি হইয়া গেল! 'সকলেই কেবল ঐ এককথাই বলে! তবে কি তাঁহার অবস্থা যথার্থ ই বড় খারাপ?'

মুরলীধর, ঘাড় কাৎ করিয়া, একটুখানি মাথা তুলিয়া, আগন্তুককে দেখিতেছিলেন। তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া, তাঁহার শীর্ণ অধরে ঈষৎ করুণার হাসি ফুটিয়া উঠিল; হস্তদ্বারা অদূরস্থিত একখানা চৌকি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "বোস"।

যুবক, তাঁহার সে আদেশ পালন না করিয়া, ঘরের মধ্যে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া, তাঁহার পালঙ্কের অনতিদূরে মেজের কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িলে, আবার তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে সেই হাসি দেখা দিল।—"কোথা থেকে আসচো?—কিছু প্রয়োজন আছে?"—যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"খুলনায় আমাদের বাড়ী ছিল; আমার পিতার নাম ৺জগমোহন চট্টোপাধ্যায়, আ—"

"আঃ! জগ'র ছেলে তুমি?—সে আগেভাগেই তা হলে চলে গেছে!—হুঁ! আচ্ছা ভালই করেচে সে; গিয়ে আবার দুজনে সেই সেকালের মত দাবা নিয়ে বসা যাবে।—"

"বাবা! বেশি কথা বল্‌লে আপনার কষ্ট হবে।—"

"ওরে না রে ধীরা; আমায় বলতে দে;—এই তো এই সেদিনের কথা! সেই আভাতে—সেখানে তখন আমরা শুধু দুজন বাঙ্গালী; আর সেই দুজনে কি যে আত্মীয়তা! কি গলাগলিভাব!—এমন বুঝি, নিজের ভাইএর সঙ্গেও হয় না! তোমার নাম?—দাঁড়াও—আমিই বলে দিচ্চি,—নিমু,—নিমু না? হাঁ ঠিক্ ঠিক্—নির্ম্মলচন্দ্র!—এ নাম যে আমারই রাখা! আঃ—সেসব এক আলাদা দিনই ছিল! সেদিন আর কখনও এলো না;—সে সেইখানেই রেখে আসা গেছে! তারপর, কত-কিই হয়ে গেল! আবার এখন, এও আর-একরকম! এই এমনি করেই দিন শেষ করে যেতে হবে!—আর কিছু হবে না, আর কিছুতেই—"

"বাবা! একটু বেদানার রস দিই না, বাবা! অনেকক্ষণ তো কিছুই খাওনি!"

"দেবে? আচ্ছা দিও—আর একটু পরে দিও। জগমোহন চলে; গেছে আহা বন্ধু আমার! নির্ম্মল! কত কথাই যে তোমায় দেখে আবার মনে আসছে! উঃ—সেসব যেন এক বিচিত্র স্বপ্নের মত! বেশ করেছ—তুমি এসেছ। প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠে ছিল; কাতর হয়ে, আমার সারা হৃদয়টা যেন কাকে চাচ্ছিল। আজ, এই অপ্রত্যাশিতভাবে, হঠাৎ তোমায় দেখে, এক্ষণি মনে হলো—আমি যেন আজ একবৎসর ধরে কেবল তোমাকেই খুঁজছিলাম;—কেবল যেন তোমায় পাবার জন্যই সর্ব্বদা ভগবানকে ডাকছিলাম। তোমার যে কি কাজ আমার কাছে, তা জানিনে। কিন্তু তোমায় আমার যে কতকাজ, তার তুলনায় তোমার সে কাজ কাজের মধ্যে গণ্যই নয়। আজ আমার হঠাৎ এমনি মনে হলো যে, আজথেকে, বোধ করি, মরণও একটু সহজ ঠেকবে।"

"বাবা—বাবা! কেবল-কেবল আপনি কথা কইচেন। —পাঁচকড়ি, ক্ষমার মাকে বলো, বাবার জন্য বেদনার রসটা নিয়ে আসুক।—আর—সেইটে খেয়ে উনি এখন একটু ঘুমুতে চেষ্টা করবেন।"

গভীর কৃতজ্ঞতার আনন্দে নির্ম্মল এতক্ষণ যেন বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাই কোন কথা কহিতে পারে নাই। ইঙ্গিত বুঝিয়া সে পুনশ্চ প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়া, কহিল —"আমি তা হলে এখন যাই; আজ এতদূরে আসিয়া আবার বাপ পাইলাম।"—ঝর ঝর করিয়া অনেকখানি জল তাহার ডাগর চোকের পাতা কাঁপাইয়া ঝরিয়া পড়িল। পুরুষ মানুষ হইয়া জন্মিলেও, যাহারা ঠিক পুরুষ প্রকৃতি লইয়া জন্মিতে পারে না—সেও তাহাদেরই মধ্যের একজন। তা ভিন্ন সে এইবার বড্ড বেশি সহিয়াছে।

ধীরা তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি পিতার মাথার নীচে ঢুকাইয়া, তাঁহার মস্তকাকর্ষণপূর্ব্বক উত্তোলনচেষ্টা করিয়া, অতি মৃদুতর কণ্ঠে কহিল—"বাবা মাথাটা একটুখানি তোল; প্রণাম করবে হয় তো।"—

নির্ম্মল ততক্ষণে প্রণাম সারিয়া, এবার তাঁহার পায়ের গোড়ায় আসিয়া পায়ের উপর নিজের মাথাটা বারেক ঠেকাইয়া লইল, এবং, তারপরই, আর দ্বিতীয় মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা না করিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, পাশ কাটাইয়া কাটাইয়া, বাহির হইয়া গেল। নিজের উপর এর চেয়ে বেশিক্ষণ বিশ্বাস রাখা সম্ভব ছিল না; বাঁধ ভাঙ্গিয়া হয় ত এখনি কি হইয়া যাইবে! তাহার এ গোপন করিবার চেষ্টাটি যে সফল হয় নাই, সে কথা কিন্তু বলাই বাহুল্য! মুরলীধরের দৃষ্টিশক্তি, যদিও বয়সে ও রোগে অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে এমন তেজের অভাব ছিল না যে, তাহার সেই গণ্ডপ্রবাহী ধারাবর্ষী বালকোচিত অশ্রুচিহ্ন সে দৃষ্টি হইতে গোপন রাখা যায়!

আগন্তুক চলিয়া গেলে, ক্ষণকাল এই অতর্কিত সাক্ষাতের বিস্ময় ও অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের বেদনা, বোধ করি, তাহার দুর্ব্বলচিত্তকে কেমন অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর, ধীরে ধীরে মাথা ফিরাইয়া, মুরলীধর কন্যার দিকে চাহিলেন; মাটীর একটি গড়া-প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া, অভ্যাসমতই সে তাহার পিঠের উপর হাতটি রাখিয়া, বসিয়া আছে!—এমনি করিয়া, সেই এতটুকু বেলা হইতে, সর্ব্বদা তাঁহাকে আপনার কাছে সে অনুভব করিয়া আসিতেছে। এই স্পর্শটুকু দিয়াই সে, তাঁহার সেই অসীম বাৎসল্য, নিজের সমস্ত মনঃপ্রাণে উপভোগ করিতে থাকে; এইটুকুতেই সে সেই উৎকণ্ঠিত স্নেহদৃষ্টিটুকু নিজের বদ্ধনেত্রের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ করে: এই স্পর্শের মাঝখান দিয়া সে যাহাকিছু দিবার তাহার সমস্তই ঢালিয়া দেয়, যাকিছু পাইবার তাহাও ফিরাইয়া লয়;—এইটিই যেন তাহাদের যোগ-সূত্র। হঠাৎ মেয়ের দিকে চাহিয়া, মুরলীধর কহিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা তোর কি মনে হয়? নির্ম্মলের বিয়ে-টিয়ে কি হয়ে গেছে? সে আবার কি দেশে ফিরে যেতে চাইবে?"

"তা আমি কি জানি বাবা? তা যদিই চায়, তাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কি? না ক্ষতি—তেমন—আচ্ছা কে ওকে এমন অসময়ে আমাদের মধ্যে এনে দিলে? আঃ!—নিশ্চয় যিনি আমায় এমন সুযোগ দিয়াছেন, তিনিই তা ব্যর্থ করিবেন না। নিশ্চয় আমার এতদিনের—"

"বাবা! বাবা!—তুমি কেবল কেবল আজ কথা কইচো—ঘুমুতে চেষ্টা করচো কই?"

"ওরে! আজ আমার মন যে কত লঘু হয়ে গেছে, তা জানতে পারলে, আর তুই আমায় ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা হতে বলতিস্ না! আহা! ওর মুখখানিতে যে কি ভালজিনিষ দেখতে পেলাম। যেরকম করুণচোখে সে আমার দিকে চাইছিল, তাইতেই, আমি একমুহূর্ত্তে বুঝতে পেরেচি, ভগবান আমার ব্রজর মধ্যে দিয়ে, যা আমায় দিতে পারেন নি, এই বন্ধুর ছেলে-টিকে দিয়ে, আজ, শুধু আমার সেই পাওনাটুকু শোধ করা-বার জন্যই, তাকে বিপন্ন করে এতদূরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেছেন! না না - ধীরা রাগ করিসনে মা, এইবার চুপ করচি, এইবার তুই তোর দুষ্টু ছেলেকে ঘুমপাড়া; আর কোন বাধা দেবে না সে। মন আমার আজ বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেছেরে! অনেক দিনের পুরণো কথা সব মনে আসচে; ভবিষ্যৎটাতেও যেন ভোর হয়ে আলো দেখা যাচ্চে। আচ্ছা—আর কথা কবো না। নে—চোকের উপর এইবার তোর আঙ্গুল-গুলি বুলিয়ে নে যা।

"দেখ্—শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ি কিনা! এমন মনে সহজেই যে ঘুম আসে।"—

প্রতীক্ষা

[মলিনা]

আমি সারানিশি আঁখি জলে ভাসি'
আছি পথপানে চাহিয়া,—
হিয়ার মাঝারে পাতিয়া শয়ন
প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া।
বসে' আছি—কবে আসি' অলখিতে
বিভোরতা মম হেরিয়া
ওগো চিত-চোর! অবিদিতে লোর
মুছিবে নয়ন চুমিয়া!

তোমার পরশে অজানা হরষে
চমকি' দেখিব চাহিয়া,—
নিভায়ে তখন দীপের আলোক
বাহুপাশে ল'বে বাঁধিয়া!
ভেবেছিনু যত সোহাগ যতন,
যাইব সকলি ভুলিয়া,
রহিব সতত ভাবের অতীত
পরশন-সুখে ডুবিয়া!

রাঁচিতে দিন কয়েক

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্বনিধি, B. A.]

৯ই জানুয়ারী—শুক্রবার। চা খাওয়া শেষ হ'লে আন্দাজ ৯ টার সময় একটি ছাতা হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোলুম। এঁদের বাড়ীর সামনে যে লম্বা 'কুচু' রাস্তা চলেছে, সেই রাস্তা ধরে চল্লুম—সেটা বুড়ুয়াগাঁ হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য সেই মন্দির দেখা। আজ ঠাণ্ডাও পড়েছে মন্দ নয়—চলতে বিশেষ কষ্ট হবে না। যাবার পথে চোক রেখে চলেছি যে, যদি পথের ধারে মেয়েদের সেই গুঁজি একটি পাই। পথের মধ্যে, যার জন্য এত লালায়িত সেই ধন পেলুম। কোন মুণ্ডাসুন্দরী, হয় তো কাণের ছেঁদা আরো বড় করবার জন্য, এই গুঁজিটি পথের ধারে ফেলে দিয়েছে। এটি তালপাতার গোড়ার অংশ থেকে তৈরি বলে বোধ হলো। এটি পুরো দুই অঙ্গুল মোটা। সুন্দরী হয় তো আপাততঃ তার দ্বিগুণ মোটা গুঁজি চান। আমি ছেলেবেলায় বিবিধার্থ-সংগ্রহে পড়েছিলুম মনে পড়ে যে, লঙ্কাদ্বীপের আদিমঅধিবাসী মেয়েরা কাণের গুঁজি পরবার ছেঁদা এত বড় করে যে, তার ভিতর নাকি হাতের মুঠো ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তখন সেটা আমার একটা অসম্ভব গল্প বলে মনে হয়েছিল। এখন দেখছি তা নয়। অসভ্যজাতিদের মেয়েরা এই রকম কাণের বড় বড় ছেঁদাকে সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান লক্ষণ বলে মনে করে। এ রকম অসৌন্দর্য্যের লক্ষণকে তারা কেন সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলে মনে করে, এই তত্ত্বটি অভিব্যক্তিবাদীদের গবেষণার বিষয় হতে পারে।

গুঁজিটি পকেটে রেখে, এগোতে এগোতে নতুন কাকা-মহাশয়দের বাড়ীর পিছনে কতকগুলো পাহাড় আছে, সেইগুলোর সামনাসামনি এসে পৌছলুম। মুণ্ডা পথিক-দিগকে সেই পাহাড়ের নাম জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে, তার নাম চিরঙ্গী পাহাড়। আমার বোধ হয় যে, এই চিরঙ্গী পাহাড়ই রাঁচি নামের মূল। ষ্টেসনের কাছে যে রাঁচি সহরটা মাথা তুলেছে, সেটা বলতে গেলে ইংরেজের কীর্ত্তি। অনুসন্ধানে জানলুম যে, ষ্টেসনটি দুটি গাঁয়ের যায়গায় হয়েছে; তার মধ্যে একটির নাম "চুটিয়া", যা থেকে 'চুটিয়া নাগপুর' এবং ক্রমে 'ছোটনাগপুর' হয়েছে। এই চিরঙ্গী পাহাড় ছাড়িয়া বুড়ুয়া গাঁই বোধ হয় এই অঞ্চলের মুণ্ডাদের আদিম বাসস্থান ছিল—"বুড়ুয়া" নাম থেকেই তা বোঝা যায়। 'বুড়ুয়া'র অর্থ বৃদ্ধ বা বড়। আর এই বুড়ুয়া গাঁয়েই এঅঞ্চলের প্রাচীনতম মন্দির দেখা যাচ্ছে—যা দেখতে আমি চলেছি। যে রাজা এই মন্দির করান, তিনি, এত গাঁ থাকতে, এই গাঁ অধিকার করে এখানেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করালেন কেন? আমার বোধ হয় যে, 'বুড়ুয়া' গাঁ এক 'মাঝি' বা সর্দ্দারের অধীনে ছিল—তার জমীর সীমানা এদিকে এই চিরঙ্গী পাহাড় পর্য্যন্ত ছিল। এই পাহাড়ের পর থেকে চুটিয়া প্রভৃতি ছোটখাটো গাঁগুলো আর এক সর্দ্দারের অধীনে ছিল—তার জমীর সীমানা ছিল, বোধ হয় "রাচি পাহাড়"—শুনলুম যে রাচি পাহাড়ের নীচে "রাঁচিয়া" বলে একটা গাঁ ছিল। "মোরাবাদি" নামটা, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আধুনিক—এটাও সম্ভবতঃ রাঁচির সর্দ্দারের অধীনে ছিল। এই চিরঙ্গী পাহাড়ের উপর দ্বার-ভাঙ্গার মহারাজ একটি বাড়ী করবেন, স্থির করেছিলেন। সেই রাঁচিতে কলেজের হিড়িক চলে গেলে, তিনি দেখলেন যে—এখানে বাড়ী করে বিশেষ কোন লাভ নাই, বরঞ্চ জল, রাস্তা প্রভৃতি নানাবিষয়ের অসুবিধা; তাই তিনি বাড়ী করবার মৎলব ছেড়ে দিলেন।

'কুচু' রাস্তা ধরে, তিনটে নদী (অবশ্য এখানকার নদী) পার হয়ে অনেকটা চলতে চলতে বুড়ুয়া গাঁয়ে পৌছানো গেল। পথিকদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম যে, দেবমন্দির—যেখানে বামুনেরা পূজা করে—সেটা কোথায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে কেহ কেহ বল্লে—"হাঁ—বামুন—ঐ দিকে বা"—সেই পথ ধরে 'ঐদিকে'ই চল্লুম। মন্দিরে পৌছানো গেল। একটি মালিক বামুনের সঙ্গে দেখা হোল। তিনি

বল্লেন যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা এসে এই মন্দির পশ্চিম থেকে লোক আনিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। এখন কুড়িপঁচিশ-ঘর সরিক হয়ে পড়েছে, কাজেই এই মন্দিরের উপর কারো বিশেষভাবে যত্ন পড়ে না। এই মন্দিরের সেবার জন্য চার পাঁচটি মৌজা দেওয়া আছে; তার উৎপন্ন থেকেই মালিকদেরও সেবা চলে, আর ঠাকুরেরও ভোগ চলে। এই বামুনদের বিবাহ প্রভৃতি করণ-কারণের জন্য আর পশ্চিমে যেতে হয় না; কারণ, এদের স্বদল অনেকগুলি বামুন এসে এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী হয়েছে।

মন্দিরের গড়নটি ঠিক কাশীর মন্দিরের মত নয়—আর একটু পশ্চিমাঞ্চলের তাজ প্রভৃতির ধরণের গম্বুজওয়ালা মন্দির। মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ির নীচেই একটা পাথর পড়ে আছে দেখলেম; মনে হলো যে, জুতো রাখবার জন্য বা তার উপর দিয়ে ওঠবার জন্যই সেটা ওখানে রাখা হয়েছে। আমি সেই পাথরের উপর জুতো খুলতে যাচ্ছিলুম; মন্দিরের লোকেরা ঐ পাথরের উপরে জুতো রাখিতেও আমাকে নিষেধ করলেন। কারণ-জিজ্ঞাসায় উত্তরে তাঁরা বল্লেন যে, যখন মুণ্ডারা একবার ক্ষেপে উঠেছিল, সেই সময়ে একদল মুণ্ডা মন্দির লুঠ করতে এসেছিল। তারা এই সিঁড়ির কাছ-বরাবর আসতেই এই পাথরটি তিন তিনবার শূন্যে উঠেছিল আর নেবেছিল। এই দেখেই তো মুণ্ডারা এই পাথর ভূতাবিষ্ট মনে করে, একেবারে সেখান থেকে দে দৌড়—ছুট।

মন্দিরের ভিতরে দেখি—রাধাকৃষ্ণের পিতলের বিগ্রহ। বামুনেরা বল্লে যে, মন্দির যখন তৈরি হয়, সেই সময়েই এই বিগ্রহ দুটি এনে, এখানে স্থাপিত করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম যে, মন্দির কবে তৈরি হয়েছে? তার উত্তরে দুতিনজন বামুন মিলে মন্দিরের গায়ে কতকগুলো ইট জমা-করা ছিল, তার ভিতর থেকে একটা পাথর বের করলে। তাতে পুরোনো দেবনাগরীতে কতকগুলো লেখা খোদা আছে। সেই লেখা সমস্তটা কেহই পড়তে পারলে না। তার ভিতর থেকে এইটুকু পড়া গেল যে, সংবৎ ১৭২২ অব্দে বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরের মঠের সূত্রপাত হয়, ১৭২৫ সংবতের শ্রাবণ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে তাহার দরজা বসানো হয় এবং ১৭৩৯ সংবতে মন্দির প্রভৃতি তৈরি শেষ হয়। এই সময়ে এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন—শ্রীশ্রীরঘুনাথ নরেশ; ঠাকুরের সেবায়েত ছিলেন—লক্ষ্মী-নারায়ণ তেওয়ারি এবং মন্দির-নির্ম্মাতার নাম ছিল—অনিরুদ্ধ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে, পাথরটা আমাকে বিক্রী করতে পারে কি না। তার উত্তরে বামুনেরা বল্লে যে, 'এই লেখা দেখতেই দূর দূর থেকে সাহেবসুবো বড় বড় লোকেরা আসে; এই লেখাটা দিয়ে দিলে দেখবার আর থাকবে কি?' আমি তাদের যুক্তির সারবত্তা বুঝে বল্লুম যে 'আমাকে দাও আর নাই দাও, পাথরগুলো ভাল করে রেখে দিও।'

আমার কাছে দুটী পয়সা ছিল, ভোগ-চড়াবার জন্য তাই দিলুম। সেদিনকার পূজক বালভোগ আগন্তুকের মধ্যে বেঁটে দিচ্ছিলেন। আমাকেও একটা মিষ্টান্নের টুকরো দিলেন। আমি স্নান করে ভোগ সেবা করব বলে, সেটা একটা বটপাতায় মুড়ে হাতে নিলুম, আর এদিক্ ওদিক্ একটু ঘুরেফিরে বাড়ীমুখে ফিরলুম। দুচার পা চলেছি, এমন সময়ে একটা ছোট ছেলে চীৎকার করে কাঁদছে, দেখ্‌তে পেলুম। আমি একে ওকে জিজ্ঞেস করছি যে, ছেলেটা এত কাঁদছে কেন? একটি মুণ্ডা মেয়ে দড়ি বুনছিল। সে বল্লে যে—'ওর মা অসুখে মারা গেছে, ওর বাপ আর একটা বিয়ে করেছে, ওর ক্ষিধে পেয়েছিল, তাই ভাত খেতে চাওয়াতে ওর বাপ ওকে খেতে না দিয়ে, ওকে মাথায় মেরে, মাথা ফুলিয়ে দিয়েছে—ওর বাপ আগেকার ছেলেদের একটু যত্ন করে না।' শুনে তো আমার ভারি দুঃখ হোল। অমন বাপটা কোথায় আছে, সন্ধান করে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন রে তুই ছেলেটার মাথায় দাণ্ডা মেরে তার মাথাটা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছিস?" সে বল্লে—"বাবু, আমি ওকে ভাত খেতে বল্লুম, ও বুঝতেই পারলে না—কেবল চীৎকার করতে লাগল।" আমি বল্লুম "দেখ্ ও হোল তোরি রক্তমাংসের ছেলে, ও দুটো ভাত চেয়েছে বলে, কি ঐ রকম করে মারতে হয়?" বাপটা হয় তো আমাকে মস্ত একটা হোমরাও চোমরাও লোক ঠাউরে বল্লে যে, আর সে তার ছেলেকে ও রকম করে মারবে না। আমি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলুম "কি করেছিলি?" সে বল্লে "আমার বড় ভুখ লেগেছে।"

আমি বল্লুম "এই নে, দেবতা তোর জন্য এই বালভোগ পাঠিয়েছেন, পেটপুরে খা।" আহা, ছেলেটি খেতে পেয়ে বেঁচে গেল। আসল কথাটা এই বোধ হোল যে, প্রথম স্ত্রী মারা যেতে, লোকটা একটু খিঁচড়ে আছে। দ্বিতীয় স্ত্রীর হাতে বোধ হয়, নিজেই এখন ভাল করে পেটপুরে ভাত খেতে পায় না ; কাজেই, ছেলেটা তাতে ভাগ বসাতে যেতেই রেগে গিয়ে এক দাণ্ডা মেরে দিয়েছে।

আজ বিকেলে মেজ জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে বাড়ীর কাছাকাছি একটু বেড়িয়ে এলুম। বেড়াতে বেড়াতে তিনি এখানকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের কথা বল্লেন। এক সময়ে আমার বিলেত গিয়ে সিবিল সার্বিসে ঢোকবার কথা হয়েছিল। সেই সময়ে আমাকে ভাল করে ইংরিজি আর অঙ্ক শেখাবার জন্য দুইজন মাষ্টার রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে এই উকীলটি আমাকে অঙ্ক কষাতেন। আমি তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়তুম, আর তিনি সবে মাত্র বি-এতে অনরে পাশ হয়েছেন। আমাদের দুজনের বয়সের মধ্যে বোধ হয়, পাঁচ ছয় বৎসরের ব্যবধান ছিল। তিনি আমার সঙ্গে ঠিক শিক্ষকের মত ব্যবহার না করে, বন্ধুর মতই ব্যবহার কর্‌তেন। আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে, কাল ভোরে উঠেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

১০ই জানুয়ারি—শনিবার। আজ একেবারে ভোরে সাড়ে পাঁচটার সময় একটা গরম আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে, উকীল বাবুর বাড়ীর দিকে চল্লুম। কাছারীর কাছাকাছি মধ্যম গোছের একটা একতালা বাড়ীতে তিনি আছেন। তিনি আজকাল এখানকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। আমার সঙ্গে আজ কুড়ি-বাইশ বৎসর পরে তাঁর দেখা হবে। আমি বাড়ীতে পৌছে ভাবছি যে, তিনি দেখা হলে, আমাকে চিন্‌তে পারবেন কি না।

তাঁর বাড়ীতে প্রায় ৭টার সময় পৌছলুম। বাড়ীতে লোকজনের সাড়াশব্দ নেই, কেবল দু একটি বুড়োহুড়ো মক্কেল দেখি বারান্দায় বসে আছে। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তারা বল্লে যে, বাবু এখনও বেরোন নি। আমি তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে, একটু মক্কেল গোছের সুর করে ডাকতে লাগলুম—"—বাবু,—বাবু, ঘরে আছেন কি ?" শীতকালের ভোর, তিনি দিব্যি নিদ্রাসুখ অনুভব কর্‌ছিলেন। এ রকম ডাকের চোটে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়াতে আমার অধঃপাতে যাবার পথটা যাতে বেশ ভাল রকম খুলে যায়, বোধ হয়, তার জন্য তিনি মনে মনে ইচ্ছা করছিলেন। কিন্তু সে কথাতো মুখে বলতে পারেন না—মক্কেল যে উকীলদের প্রাণ। তিনি ঘুমভাঙ্গা সুরে বলে উঠলেন "কে হে ?" আমি বল্লুম "একবার বাইরে আসতে পারেন কি ?" ইতিমধ্যে তাঁর মেয়ে অথবা গৃহিণী খড়খড়ের আড়াল থেকে আমাকে দেখে বোধ হয়, ভেবেছিলেন যে, একজন মস্ত মক্কেল এসেছে! খানিক পরে উত্তর এল "একটুখানি বসুন, আমি এখনই আসছি।" বাইরে একটা বেঞ্চি ছিল, তাতেই কিছুক্ষণ বসে রইলুম। উকীল বাবু বেরিয়ে এলেন। আমিও দাঁড়িয়ে উঠলুম। দেখলেম যে তাঁর চেহারা খুব বদলে গেছে। বুঝলুম যে আমারও চেহারা খুব বদলে গেছে, কেন না তিনি আমাকে একটুও চিনতে পারেন নি।

আমি বেশ মজা পেলুম। আমাকে তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা হোল "মশায় কি তামাক ইচ্ছা করেন ?" আমি বল্লুম "আজ্ঞে না।" তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কি কাজের জন্য মশায়ের এখানে আসা হয়েছে ?" আমার উত্তর হোল ধান ভানতে শিবের গীত—"আমি এ রকম অসভ্য সাজে এসেছি, আশা করি, ক্ষমা কর্‌বেন।" এই সময় বোধ হয়, মকদ্দমার কোন কথা না বলাতে তাঁর ঘুমভাঙ্গানোর অপরাধে আমার উপর যথেষ্ট অভিসম্পাত দিচ্ছিলেন। মুখে তিনি বল্লেন বটে "না,না, তাতে আর কি ?" হয় তো বা তাঁর মনে হচ্ছিল যে, এ একজন বড় রকমের মক্কেল—গায়ে দিব্যি গরম overcout, পায়ে উঁচুপাশ চটি, আর তার উপর বড় রকমের ক্ষমা-প্রার্থনাযুক্ত কথাবার্ত্তা। আমি বলতে থাকলুম—"আমার নাম শ্রী—চাটুর্য্যে, ব্রাহ্মণ। মশায়ের নাম শুনে এসেছি ; শুনেছি যে, মশায় বড় অতিথিসৎকার-প্রিয়। আমি নতুন রাঁচিতে এসেছি, মশায় যদি দয়া করে দু এক দিনের জন্য থাকবার একটু যায়গা দেন।"

উত্তর—"আপনি ব্রাহ্মণ, আমার এখানে তো পাক করবার জন্য বামুন নেই। মশায় কোথায় উঠেছেন ?"

আমি—"আমি এই ষ্টেশনেই উঠেছি ; আমি কেবল একটুখানি থাকবার যায়গা চাই, আর আমাকে সিধে দিলে, আমি এই বাগানের একধারে স্বপাক করে আহার করব।" এই সময় তাঁর মনে যে কি রকম রাগ হচ্ছিল, তা বোঝাই

যাচ্ছে—কোথায় মক্কেল, আর কোথায় এই ঘাড়ে-পড়া একটা বিট্‌কেল বামুন! আমি আরও বল্লুম "আমি জ্যোতিষ কিছু কিছু জানি, আপনার অতীত কথা অনেক গুণে বলে দেব।" এর আগে খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলছিলুম; কিন্তু এই কথা বলবার পর আর হাসি চাপতে না পেরে, হো হো করে হেসে বল্লুম—"ও—বাবু, আমাকে চিনতে পারছেন না?" তখনও তিনি আমাকে চিনতে না পেরে, আমতা আমতা করে "আপনি কে?" ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন। তখন আমি বল্লুম "এই গরীব ব্রাহ্মণের নাম শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" তখন তিনি পাল্টা জবাবে হো হো করে হেসে, একটা মস্ত আলিঙ্গন দিলেন। প্রহসনও এইখানে শেষ হোল।

আজ দুপুর বেলায় যাতে কালকের রাঁচি এক্সপ্রেশ গাড়ীতে পুরুলিয়া থেকে হাবড়া পর্য্যন্ত বার্থ রিজার্ভ পাই, তার জন্য ষ্টেশন-মাষ্টারকে লিখে দিলুম। আর কাল যাতে ৩টার সময় ঠিকাগাড়ী আসে, তারও বন্দোবস্ত করলুম।

১১ই জানুয়ারি—রবিবার। আজ বিকেলে ৩৷৹ টার সময় বোঁচকা-বুচকি নিয়ে নতুন-কাকামহাশয়কে ও মেজ-জ্যেঠামহাশয়কে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করে, মোরাবাদি ছাড়া গেল। ষ্টেশনে এসে একটা কামরাতে ট্রাঙ্ক প্রভৃতি বোঝা নিয়ে ওঠা গেল। পথে আসতে আসতে এখানকার গির্জ্জা দেখা যায়। এর পূর্ব্বেই আমি খৃষ্টান-মুণ্ডাদের সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করেছিলুম। খৃষ্টান-মুণ্ডাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশী। খৃষ্টান-মুণ্ডা-মেয়েরা দেখেছি, কাণে গুঁজি পরে না, আর মাথায় ফুল কিংবা অন্য স্বদেশী গয়না না প'রে, খুব টকটকে লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে। যতদূর শুনলুম, তাতে বোঝা গেল যে, খৃষ্টান-মেয়েরা স্বধর্ম্মী মেয়েদের চেয়ে নীতি বিষয়ে হীন। এটা আমার শোনা কথা—এ বিষয়ে আরো ভাল করে অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা রইল।

একটি বেলজীয় মিশনরি রাঁচি থেকে দারজিলিঙ্গে বদলী হচ্ছিলেন, তিনিও আমার কামরাতে উঠিলেন। তিনি অন্য কামরাতে জায়গা পাচ্ছিলেন না, আমি মিশনরি দেখে, তাঁকে ডেকে যায়গা দিলুম। গাড়ীতে বেলজিয়মের জন্য আমরা দুজনেই অনেক দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বেলজিয়মের লোক বলে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়ে, তাঁকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেছিলুম। তারপর পুরুলিয়াতে নেমে, তিনি রাত্রির জন্য কোন বেঞ্চি খালি পাবেন কি না ভেবে যখন আকুল হচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে আমার রিজার্ভ-করা বার্থ-দিতে প্রস্তুত হলুম। কথায় কথায় "Thank you" অনেকগুলি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি হাবড়া ষ্টেশনে নামলেন, তখন থেকে তাঁর আর এক মূর্ত্তি! ষ্টেশনের প্লাটফরমে আমি তাঁর যে কিছু উপকার করলুম, তার জন্য তিনি ধন্যবাদ দেওয়া বা অন্য কোন প্রকার ভদ্রতা বা সৌজন্য দেখানো কিছুমাত্র আবশ্যক মনে করলেন না। শেষকালে তিনি একটা ঠিকা গাড়ীতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, আর আমি আমার ঘরের গাড়ীতে একটু পরে বেরোলুম। পুলের কাছে ঘটনাচক্রে আমাদের দুজনেরই গাড়ী ক্ষণকালের জন্য পাশাপাশি দাঁড়ালো। কাজেই আমাদের চারচক্ষুর পরস্পর মিলন হোল। আমার পূর্ব্ব-পুরুষদের পরম সৌভাগ্য যে, তিনি একটুখানি মাথা নুইয়ে একটিবার nod করে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

যাক্, এখন ভোর ৬টার সময় ঘরে এসে বাঁচলুম। যতই দেশ-বিদেশ বেড়াই না কেন, ঘরের চেয়ে মিষ্টি কোন যায়গাই নয়। ঘরে এসে দেখি যে, শীতের কুয়াশা সকলেরই ভোরের ঘুমটাকে খুব জমিয়ে দিয়েছে। আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে সকলে উঠে, আমার মুখ-ধোবার আর উপোস-ভাঙ্গার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমিও চা-রুটী খেয়ে, আবার প্রতিদিনের অভ্যস্ত সাংসারিক কাজে মন দিলুম। আমার কথাটি ফুরোল - নটে গাছটি মুড়োলো।

বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি! আমি গেলুম রাঁচিতে দিন সাতেকের জন্য, তাতেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা হয়ে গেল! পাঠকগণের নিকট ধৈর্য্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, এইখানেই শেষ করলুম।

বাঙ্ময় জগৎ

[আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম. এ.]

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ.

প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জগতের কথা বলিয়াছি। এবার একটা তৃতীয় জগতের আবিষ্কার করিব। উহার নাম দিব—বাঙ্ময় জগৎ।

তৎপূর্ব্বে গোড়ার কথাগুলা আর একবার আওড়াইয়া লওয়া যা'ক। আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জগতের মাঝখানে বসিয়া আছি এবং তৎকর্ত্তৃক অভিভূত হইতেছি। এই জগতের নাম দিয়াছি—প্রাতিভাসিক জগৎ। ইহা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষলব্ধ। প্রত্যক্ষই যদি সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে প্রাতিভাসিক জগতের মত সত্য পদার্থ আর কিছু থাকিতে পারে না। ইহাকে যদি সত্য না বলি, তাহা হইলে সত্য কাহাকে বলিব, আমি জানি না। আমি যদি একাকী হইতাম, তাহা হইলে আমার এই প্রাতিভাসিক জগৎ লইয়াই আমাকে সকল কারবার করিতে হইত। আমি কিন্তু একা নহি; আমার মত আরও বহু জীব বর্ত্তমান আছে; তাহাদের সহিতও আমাকে আদান-প্রদান করিতে হয়। এই আদান-প্রদানের নাম জীবনযাত্রা। আমার মত অন্যেরও এক একটা প্রাতিভাসিক জগৎ আছে। প্রত্যেকেই যদি স্বতন্ত্রভাবে আপনাপন প্রাতিভাসিক জগতের সহিত কারবার করিত, তাহা হইলে পরস্পরের আদান-প্রদান চলিত না—অর্থাৎ কাহারও জীবনযাত্রা চলিত না। পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য সকলকে মিলিয়া মিশিয়া এইরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইয়াছে যে, প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগতের অন্ততঃ কিয়দংশকে তুল্যরূপে একভাবে দেখিতে হইবে। ইহা একটা ব্যবস্থা মাত্র; আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য পরস্পর সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত একটা convention মাত্র। প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যেকের নিজস্ব হইলেও, উহার কিয়দংশকে আমরা অন্যের সহিত তুল্যরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। প্রাতিভাসিক জগতের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশকে নিজস্ব না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। এই সাধারণ অংশটুকুর নাম দিয়াছি—ব্যাবহারিক জগৎ। পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য—পরস্পর ব্যবহারের জন্য—ইহাকে নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে বলিয়াই, ইহাকে বলা যাইতে পারে—ব্যাবহারিক জগৎ। এই ব্যাবহারিক জগৎকেই বাহ্য-জগৎ নাম দেওয়া হয়। মনে করা হয়, ইহা আমাদের সকলেরই বাহিরে আছে। বাহিরে থাকিয়া ইহা সকলকেই তুল্যরূপে অভিভূত করিতেছে।

এই বাহিরে-থাকা কথাটার আর একটু আলোচনা আবশ্যক। যাহার সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমারই; আমাকে ছাড়িয়া তাহার স্ব-তন্ত্র অস্তিত্বের কল্পনা একবারে অনাবশ্যক। আমাকে

লইয়াই তাহা আছে, অথবা তাহাকে লইয়াই আমি আছি; অতএব, তাহাকে বাহিরে মনে করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাহা আমার নিজস্ব নহে, যাহা আমারও বটে—অপরেরও বটে, যাহা আমিও দেখি—অপরেও দেখে এবং তুল্যরূপে দেখে, যাহা আমাকে অভিভূত করে এবং অপরকেও অভিভূত করে এবং তুল্যরূপে অভিভূত করে, যাহার সহিত আমি কারবার করি এবং অপরেও কারবার করে এবং তুল্যরূপে কারবার করে, সে বস্তুটা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি; কাহারও নিজস্ব নহে। কাজেই মনে করিতে হয়, উহার স্ব-তন্ত্র স্বাধীন নিরপেক্ষ পৃথক্ অস্তিত্ব রহিয়াছে। উহা আমারও নহে, তোমারও নহে, অন্য কাহারও নহে। কাজেই উহা স্ব-প্রধান ও স্ব-তন্ত্র। উহা আমাদের সকলের হইতেই পৃথক্। উহা পৃথক্ থাকিয়া, স্ব-তন্ত্র থাকিয়া, আমাদের প্রত্যেকের উপরেই প্রভুতা-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। আমি উহাকে যেমন ভাবে দেখিতেছি, তুমিও উহাকে সেইরূপ দেখিতেছ, রাম শ্যাম হরি সকলেই উহাকে সেইরূপ দেখিতেছে। আমরা যখন ছিলাম না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও উহাকে সেইরূপ দেখিতেন; এবং আমরা যখন থাকিব না, আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষেরাও উহাকে সেইরূপ দেখিবেন। এইরূপ যখন ধরিয়া লওয়া হয়, তখন আপনা হইতেই এই ধারণা জন্মে যে, উহার অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের কোন অপেক্ষাই রাখে না। মনে হয়—উহার একটা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। আমি থাকিলেও উহা আছে, আমি না থাকিলেও উহা থাকিবে। অতএব, উহা আমার বা তোমার বা অন্যের কাহারও কোন অপেক্ষা না রাখিয়া, আপনা হইতেই আছে। যাহা সর্ব্বতোভাবে আমার নিজস্ব, তাহাকে আমি রাখিলেও রাখিতে পারি, নাশ করিলেও নাশ করিতে পারি। কিন্তু যাহা কেবল আমার নহে, যাহাতে অন্যেরও তুল্যরূপ ভাগ, তুল্যরূপ অধিকার, তুল্যরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা আমার ইচ্ছায় থাকিবে না, আমার ইচ্ছায় যাইবেও না। সেইরূপ উহা তোমার ইচ্ছাতেও থাকিবে না বা যাইবে না। তুমি আমি চলিয়া গেলেও তাহা অন্যের সম্পর্কে থাকিয়া যাইবে। কাজেই, তাহার অস্তিত্ব নিরপেক্ষ অস্তিত্ব, স্ব-তন্ত্র অস্তিত্ব। প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশকে আমরা এইরূপে সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহা, সেই অভ্যাসের ফলেই, তোমার আমার এবং সর্ব্বসাধারণের নিরপেক্ষ, সকলের হইতে স্বতন্ত্র, বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা যখন সকলেরই, তখন উহা কাহারও নহে। এই যে স্বতন্ত্রভাবে, স্বাধীনভাবে, অন্যের নিরপেক্ষভাবে থাকা, ইহারই নাম বাহিরে থাকা। যাহা একান্ত ভিতরের, যাহা একান্তভাবে আমার, যাহার সহিত অন্যের কোন সম্পর্কই নাই, অন্যে যাহার কিছুই জানে না, অন্যে তাহাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া টানিয়া আনিতে পারে না; তাহা আমার অন্তরের সামগ্রীই রহিয়া যায়। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সুখ-দুঃখের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক বা ভাগ নাই; অতএব, উহা আমার অন্তরের সামগ্রী;—উহাকে বাহিরে রাখা হয় না। কিন্তু যাহা লইয়া সকলেই টানা-হেঁচড়া করিতে পারে, যাহাকে কেহই অন্তরের নিধি করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাকেই বাহিরের জিনিষ বলা হয়। আমার দৃষ্ট রূপরসাদির সহিত অপরের দৃষ্ট রূপরসাদির ঐক্য দেখিলেই, ঐ রূপরসাদিকে বাহিরে মনে করিতে হয়। বাহিরে-থাকা কথাটার মানেই তাই। আমি বলিতে চাহি যে, আমাদের প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যেকের নিজস্ব হইলেও, প্রত্যেকের অন্তরের সামগ্রী হইলেও, উহার যে অংশকে আমরা পরস্পর ব্যবহারের জন্য সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পৃথক্‌ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যে অংশে আপনার স্বত্বটুকু ত্যাগ করিয়া, তাহাকে সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি, বা বিসর্গ করিয়াছি, বা বিসর্জ্জন করিয়াছি, বা ছুড়িয়া ফেলিয়াছি, সেই অংশই এইরূপে বাহ্যজগৎরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

বেইন সাহেবের উক্তি লইয়া আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম। বেইন সাহেবের উক্তি লইয়াই এখানে আমার উক্তি সমর্থন করিব। পূর্ব্বে যে উক্তি তুলিয়াছিলাম, তাহার একটু পরেই বেইন সাহেব বলিতেছেন, "In order to distinguish what is common to all men from what is special to each, we ascribe separate and independent existence to the common element —the Object". অর্থাৎ, নিজস্ব প্রত্যক্ষ হইতে সাধারণের প্রত্যক্ষটুকু প্রভেদ করিবার জন্যই আমরা সেই সাধারণ অংশটুকুতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আরোপ করি। বেইন সাহেব

খুব সাবধানে কথা কহিতেছেন। ঐ সাধারণ জগতের separate and independent existence আছে, ইহা না বলিয়া তিনি বলিতেছেন, "we ascribe separate and independent existence to the common element". ঐ অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ইহা না বলিয়া তিনি বলিতেছেন, ঐ অংশে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা আরোপ করি। আমি আরও একটু সাবধানে কথা কহিতাম; in order to distinguish what is common to all, এরূপ না বলিয়া, আমি বলিতাম, in order to distinguish what we take to be common to all. আমি বলিতাম, প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশটাকে আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট তুল্যরূপ বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছি, বা অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই অংশটাতেই আমরা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করি; তাহাকে আমাদের সকলের বাহিরে রাখিয়া, তাহার বাহ্যজগৎ আখ্যা দিয়া থাকি। সেই অংশ বাহিরে আছে, এইরূপ আমি বলিব না। আমি বলিব যে, সেই অংশকে আমরা বাহিরে দেখি বা বাহিরে রাখি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক সাহিত্যের একটা বিতণ্ডার কথা না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনারা একজীববাদ ও বহুজীববাদ, এই দুইটি কথা শুনিয়া থাকিবেন। একজীববাদীরা বলেন, জগতে একমাত্র জীব আছে এবং আমিই সেই একমাত্র জীব; আর দ্বিতীয় জীব কেহ নাই। বহুজীববাদীরা এই উক্তিকে পাগলামি বলিয়া ভাবেন; এবং বলেন, সে আবার কি, আমি তুমি সকলেইত তুল্যরূপ জীব; সকলেইত তুল্যরূপে সুখী দুঃখী এবং ক্রিয়াপর। এখানে জীব শব্দের অর্থ—conscious being—চেতন পুরুষ; যে পুরুষ একটা objective world সম্মুখে রাখিয়া, তাহার সহিত আদান-প্রদান কারবার করে, সেই পুরুষ। একজীববাদ পাগলামি হউক, আর নাই হউক, সে তর্কে এখন কাজ নাই। তবে, একজীববাদ বলিয়া যে একটা মত আছে, তাহা আপনারা জানেন। কার্য্যতঃ আমরা সকলেই বহুজীববাদী। বহুজীবের অস্তিত্ব মানিয়াই আমরা জীবনযাত্রা চালাইতেছি। আমি যদি একজীববাদী হইতাম, অর্থাৎ, আপনাদিগকে চেতনপুরুষ বলিয়া মানিয়া না লইতাম, তাহা হইলে এই উৎকট প্রসঙ্গ লইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কোন প্রয়োজনই হইত না। আপনারা যদি বলিয়া ফেলিতেন, আমাদের অস্তিত্বই যখন তুমি স্বীকার কর না, তখন আমাদের উপরে এই উৎপীড়ন কেন, তাহা হইলে আমার গত্যন্তর থাকিত না। আপনারা অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিলে তাহাই সহিতে হইত। অতএব, কার্য্যতঃ আমি বহুজীববাদী। আমিও যেমন চেতন, আপনারাও তেমনই চেতন, ইহা মানিয়া লইয়াই আমি আপনাদের সহিত কারবারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।—আপনাদের সহিত আদানপ্রদান না করিলে আমার জীবনযাত্রা চলে না বলিয়াই,—আপনাদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি এই বাহ্যজগৎকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই রূপরসাদি লইয়া আমিও যেমন কারবার করি, আপনারাও ঠিক সেইরূপই কারবার করেন, ইহা দেখিয়াই—এই রূপরসাদিকে স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ আমাদের সকলের বাহিরে, আমি স্থাপন করিয়া লইয়াছি। আপনাদিগকে চেতনপুরুষ বলিয়া মানি, এই জন্যই আমাকে এই বাহ্যজগৎ স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি না থাকিলেও যখন আপনারা উহার সহিত কারবার করিতে থাকিবেন, তখন উহার অস্তিত্ব আমার অপেক্ষা করিতে পারে না; উহার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, অতএব বাহ্য। আপনাদিগকে চেতন পুরুষ বলিয়া যদি স্বীকার নাই করিতাম, আপনাদিগকে কেবল কলের পুতুলমাত্র ভাবিতাম, —পুত্তলিকার মত কর্ণ থাকিলেও আপনারা শুনিতে পান না, চক্ষু থাকিলেও দেখিতে পান না, এইরূপই আমার যদি ধারণা থাকিত,—এক কথায় আমি যদি একজীববাদী হইতাম, তাহা হইলে, এই রূপরসাদিময় জগৎকে বাহিরে স্বীকার করা আমার পক্ষে আদৌ আবশ্যক হইত না। স্বপ্নদৃষ্ট রূপরসাদি যেমন অন্তরের সামগ্রী, ইহাও তেমনই অন্তরের সামগ্রী থাকিত। ফলে, পৃথিবীতে যদি একটি মাত্র চেতন পুরুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটা জগৎ থাকিত, সন্দেহ নাই। নতুবা তাহাকে চেতন পুরুষ বলিতাম কেমন করিয়া? কিন্তু সেই জগৎ সর্ব্বতোভাবে ষোলআনায় তাহার নিজস্ব হইত; তাহার কিয়দংশ বাহিরে, কিয়দংশ অন্তরে, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু থাকিত না; তাহার ষোলআনাই প্রাতিভাসিক হইত, কোন ভগ্নাংশই ব্যাবহারিক হইত না। ব্যবহারই যখন থাকিত না, তখন ব্যাবহারিক জগৎ লইয়া সে কি করিত? আপনার প্রাতি-

ভাসিক জগতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে 'I am monarch of all I survey' বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারিত। জাগরণে আর স্বপ্নে তাহার পক্ষে কোন প্রভেদ থাকিত না। আজ-কাল আমরা স্বপ্ন ভাঙ্গিলে অপরের সাক্ষ্য লইয়া স্থির করি, এটা আমার স্বপ্ন। হঠাৎ কোন apparition দেখিলে, অন্যের সাক্ষ্য লইয়া বলিতে পারি, ইহা একটা ভ্রান্তি মাত্র, hallucination মাত্র। বলিতে পারি যে, উহা একটা subjective phenomenon, উহার কোন objective existence নাই। কিন্তু সেই একমাত্র জীবের পক্ষে অন্যের সাক্ষ্য পাওয়া চলিত না। সাক্ষ্য দিবার জন্য কেহ যখন থাকিত না, তখন কিরূপে সে স্থির করিত, কোন্‌টা তাহার পক্ষে subjective, আর কোন্‌টা objective,—কখন্ তাহার স্বপ্ন, আর কখন্ তাহার জাগরণ? সমস্তটাই তাহার স্বপ্ন, অথবা সমস্তটাই তাহার জাগরণ হইত। উভয়ের মধ্যে সীমা-নির্দেশ তাহার পক্ষে অসাধ্য হইত।

আপনারা বেদান্তদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনের নাম শুনিয়াছেন। আপনারা আরও শুনিয়া থাকিবেন যে, বেদান্তদর্শন—একজীববাদী, আর সাংখ্যদর্শন—বহুজীববাদী। বেদান্ত বলেন, জীব এক বই দুই নয়;—আমিই একমাত্র চেতন-পুরুষ; তোমরা জীব নহ, জীবাভাস মাত্র। বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বাক্যের আর কোন তাৎপর্য্য নাই। আপনাদের যদি উহার তাৎপর্য্যসম্বন্ধে অন্যবিধ ধারণা থাকে, তাহা সমূলে উৎপাটন করুন। বেদান্ত যখন এক বই দুই জীব মানেন না, তখন বাহ্য জগতের প্রতি তাঁহার কিরূপ attitude হইবে, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। আর সাংখ্যদর্শন বহুজীববাদী,—তিনি বহু চেতন পুরুষ মানেন। কাজেই, তিনি স্বতন্ত্র independent বাহ্যজগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য আছেন। বহু পুরুষ যখন বিদ্যমান, তখন, তাহাদের সাধারণ সম্পত্তি কিছু থাকিলে, তাহা তাহাদের সকলের independent বা স্বতন্ত্র ত হইবেই। এই স্বাধীন নিরপেক্ষ বাহ্য জগতের স্বীকারে সাংখ্যদর্শন কাজেই বাধ্য। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'প্রকৃতি'। বহু পুরুষ যখনে বর্ত্তমান, তখন তাহাদের সকলের জন্য স্বতন্ত্র প্রকৃতি থাকিবেই। সেই এক প্রকৃতি বহু চেতনপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তুল্যরূপে, অথবা প্রায় তুল্যরূপে, তাহাদের নিকট প্রতিভাত হয়। যতক্ষণ তাহা কোন চেতন-পুরুষের সম্মুখে থাকে না, ততক্ষণ তাহার স্বরূপ-নির্ণয় অসাধ্য থাকে। ততক্ষণ, তাহার অস্তিত্ব থাকিলেও, সে অস্তিত্ব অব্যক্ত থাকে। যখন তাহা কোন চেতন-পুরুষের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা তাহার নিকট ব্যক্ত হয়। যে রূপ লইয়া সে চেতন পুরুষের সমীপে ব্যক্ত হয়, তাহাই তাহার ব্যক্ত রূপ। এখন আপনারা বুঝিবেন, সাংখ্যদর্শন কেন প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য, আর বেদান্ত বাধ্য নহেন। আমি যাহাকে বিজ্ঞানবিদ্যা বলিয়া আসিতেছি, তাহার standpoint এ বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনের standpoint হইতে অভিন্ন। বিজ্ঞানবিদ্যা কাজে লাগান বিদ্যা, কর্ম্মের বিদ্যা, আদান প্রদানের বিদ্যা, জীবন-যাত্রায় সফলতা লাভের বিদ্যা। ইহাকে বহু জীব মানিয়া চলিতে হয়। বহুজীবের অস্তিত্ব postulate করিয়া লইতে হয়। কাজেই ইহাকেও বাহ্যজগতের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। সাংখ্যদর্শনও একহিসাবে কাজে লাগান বিদ্যা। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি—সেই কাজ। বিজ্ঞানবিদ্যার কাজের মত মোটা কাজ না হইলেও, কাজ বটে। এই যে দুঃখ, ইহার অধিকাংশ অন্য জীবের সহিত আদান-প্রদান হইতে উৎপন্ন; জীবনযাত্রাই দুঃখময়; কাজেই সাংখ্য দর্শনকে দুঃখের উৎপাদক অন্য জীবকে মানিতে হইয়াছে। অতএব, সাংখ্য দর্শনকে বাধ্য হইয়া বাহ্যজগৎকে বা প্রকৃতিকেও মানিতে হইয়াছে। সর্ব্ব-জীবের পক্ষে যাহা সাধারণ, তাহাই সেই বাহ্যজগৎ। সর্ব্বজীবের সাক্ষ্য লইয়া তাহার ব্যক্তরূপ নির্ণয় করিতে বিজ্ঞানবিদ্যা নিযুক্ত আছে। সর্ব্বজীবে একরূপ সাক্ষ্য দেয় না বলিয়া, অধিকাংশের সাক্ষ্য লইয়াই বিজ্ঞানবিদ্যাকে তুষ্ট থাকিতে হয়। অব্যক্ত রূপ কেমন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ব্যক্তরূপের নির্ণয়ের জন্য চতুঃপার্শ্ব হইতে সাক্ষী ডাকিতে হয়, এবং সাক্ষীদের মধ্যে, যাহারা খুব বড় এবং যাহারা খুব ছোট, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া, কেবল মাঝারি জীবের সাক্ষ্য লইয়া, তাহারই average কষিতে হয়।

পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, scientific observation ব্যাপারে এই মাঝারি মানুষের সাক্ষ্যই মাতব্বর। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সাক্ষ্যের কোন বিশিষ্ট মূল্য নাই। হয় ত

কেহ প্রশ্ন করিয়া বলিবেন, তবে কি আমরা মাঝারি মানুষের সাক্ষ্য অনুসারে এখন হইতে বলিতে থাকিব যে, পৃথিবী সচলা নহে—অচল? দার্শনিক সাহিত্যে আমাদের গুরুস্থানীয় পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ পড়িয়া এইরূপ প্রশ্ন তোলায় আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি। মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা কত কঠিন, তাহা ইহাতেই বুঝিতেছি। কোপার্ণিকস্ যখন সিদ্ধান্ত করেন, যে সূর্য্যটাই স্থির আছে, আর পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমিতেছে, তখন দেশশুদ্ধ মাঝারি মানুষ তাঁহার কথায় হাসিয়াছিল। তথাপি আমি বলিব যে, observation ব্যাপারে, পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপারে, কোপার্ণিকসের সাক্ষ্যের চেয়ে সেই সকল মাঝারি মানুষের সাক্ষ্যের দাম বেশী। বস্তুতই মাঝারি মানুষে যাহা দেখে, কোপার্ণিকস্ও চর্ম্মচক্ষে তাহার অধিক কিছু দেখিতে পান নাই। সকলেই যেমন দেখে পৃথিবী অচল, তিনিও তাহাই দেখিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা একটা সিদ্ধান্ত, একটা থিয়োরি, তাহা observation নহে। উহা চর্ম্মচক্ষুর বিষয় নহে, উহা দিব্যচক্ষুর বিষয়। সে রকম চোখ লইয়া যে সে লোক জন্মগ্রহণ করে না। একালে বৈজ্ঞানিকদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে সূর্য্য চলিতেছে না পৃথিবী চলিতেছে, তাহা হইলে তাঁহারাও বলিবেন, যে ঐ প্রশ্ন লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার কিছুমাত্র দরকার নাই। চলা, আর না-চলা—এই দুইটা কথার আমার কাছে বিশেষ কোন মানেই নাই। পৃথিবী স্থির আছেন আর সূর্য্য গ্রহগুলিকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, অথবা সূর্য্যই স্থির আছেন আর পৃথিব্যাদি গ্রহগণ ভ্রমিতেছেন, আমার নিকট উভয় বাক্যই প্রায় তুল্যমূল্য। যাঁহারা Dynamics শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঐ শাস্ত্রের আরম্ভেই সকল motionকে relative বলিয়া, সকল গতায়াতকে আপেক্ষিক বলিয়া, ধরা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের কার্য্য ভবিষ্যৎ গণনা। কোন্ গ্রহটাকে কখন্ আকাশের কোন্‌খানে দেখা যাইবে, ইহা বৈজ্ঞানিককে গণিয়া বলিতে হইবে। পৃথিবীকে স্থির ধরিয়া বৈজ্ঞানিক গণিতে পারেন, আবার সূর্য্যকে স্থির ধরিয়াও গণিতে পারেন। তবে, সূর্য্যকে স্থির ধরিলে গণনাটা খুব সহজ হয়, আর পৃথিবীকে স্থির ধরিলে গণনাটা জটিল হয়,—এইটুকু যা প্রভেদ। পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া আমরা যখন আকাশের দিকে চাই, তখন মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগুলার যাতায়াতের জটিলতায় যেন অন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু কোপার্ণিকস্ যখন মনোরথে চড়িয়া আকাশ বাহিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই জটিলতা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। তখন দেখা গেল, ঐ জ্যোতিষ্কগুলি যেন সারি বাঁধিয়া, ঘানিগাছের গরুর মত, আপনাপন নির্দ্দিষ্ট চক্রপথে চলিতেছে,—উহাদের গতিবিধিতে কোন জটিলতা নাই। ফলে, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সাধারণলোকের প্রভেদ পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতায় নহে,—কোথায় দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে, তাহার নিরূপণের ক্ষমতায়। বৈজ্ঞানিকও যেমন দেখেন, মাঝারি মানুষও তেমনই দেখে—সবল সুস্থ ইন্দ্রিয় থাকায় হয় ত বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা ভালই দেখে। কিন্তু কোথায় হইতে দাঁড়াইলে দেখিবার সুবিধা হইবে, সেটা মাঝারি মানুষে নিরূপণ করিতে পারে না,—বৈজ্ঞানিক তাহা নিরূপণ করেন। মাঝারি লোকের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া, তিনি একটা নূতন standpointএ তাহাকে দাঁড়াইতে বলেন; এবং তার পর, বলেন, 'দেখ দেখি, এখান হইতে তুমি কি দেখিতেছ?' যেখানে-সেখানে দাঁড়াইলে ভূপৃষ্ঠের গোলত্ব বুঝা যায় না। বৈজ্ঞানিক মাঝারি মানুষকে সমুদ্রকূলে ডাকিয়া দূরে জাহাজের মাস্তুল পানে তাকাইতে বলেন, তখন সে পৃথিবীর গোলত্ব বুঝিতে পারে। ইহা নূতন standpoint হইতে দেখার ফল। সেই নূতন standpointএর নির্দ্ধারণ বৈজ্ঞানিকের কাজ। ইহা observation নহে,—কোথা হইতে কিরূপে observe করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ। ইহা ইন্দ্রিয়ের কাজ নহে, বুদ্ধির কাজ; চর্ম্মচক্ষুর কাজ নহে, মানসচক্ষুর, এবং অনেক সময়ে দিব্যচক্ষুর কাজ। দাঁড়াইবার সেই জায়গা কোথায়, ইতরসাধারণে তাহার কোন সন্ধান রাখে না। বৈজ্ঞানিক কেবলই তাহার সন্ধানে রহিয়াছেন, এবং সন্ধান পাইলেই পথের পথিককে ধরিয়া আনিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া দেখিতে বলিতেছেন। পথের পথিক আপনার উদর পূরণের ব্যাপারেই ব্যস্ত আছে। বৃহন্নাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্যের মত সে আপনার বিবরকর্ম্মে ব্যস্ত। যাহাতে তাহার বিবরকর্ম্মের সুবিধা না হয়, যাহাতে তাহার immediate interest কিছু নাই, তাহা দেখিবার [illegible]

নির্দ্ধারিত standpointএ গিয়া সময় নষ্ট করিতে রাজি হয় না। বৈজ্ঞানিক তাহাকে ডাকিতে গেলে সে বিরক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক যখন তাহাকে সেইখানে ডাকিয়া নূতন point of view হইতে নূতন দৃশ্য দেখাইতে যান, তখন হয় সে দিশাহারা হয়, অথবা গালি পাড়ে। অবশেষে, বহু লোকে আসিয়া যখন এই নূতন স্থানে দাঁড়াইয়া নূতন দৃশ্য মানিয়া লয়, তখন, সকলের দেখাদেখি, সেও মানিয়া লইতে অভ্যাস করে। কোপার্ণিকাস্‌ও সৌরজগৎ পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটা নূতন standpoint আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন সেখানে দাঁড়ায় নাই। তিনি যখন সকলকে দাঁড়াইবার জন্য ডাক দিলেন, তখন সেখানে দাঁড়ান সকলের সাধ্য হইল না। কেন না, কোপার্ণিকাস্ বলিলেন, পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া আকাশে তাকাইলে চলিবে না, সূর্য্যে দাঁড়াইয়া তাকাইতে হইবে। পৃথিবীর জীব, পৃথিবী ছাড়িয়া, সূর্য্যে যাইতে সহসা সাহস করিল না। কাঠের রথ সেখানে পৌঁছে না,—মনোরথে সেখানে যাইতে হয়। হুকুম করিলেই এ রথ সকলের নিকট আসে না। কাজেই কোপার্ণিকসের সিদ্ধান্ত মানিতে মাঝারি লোকের এত কষ্ট হইয়াছিল। এখনও যে মাঝারি লোকে উহা মানে, তাহা গুরুমহাশয়ের বা ছাপা বহির খাতিরে।

ফলে, কোথা হইতে দেখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক তাহা নির্দ্ধারণ করেন। কিরূপ attitude লইয়া দেখিতে হইবে, তাহা নিরূপণ করেন,—কিভাবে কিরূপে দেখিতে হইবে,তাহা নিরূপণ করেন। চর্ম্মচক্ষুতে যখন দেখিতে পায় না, তখন চোখের সামনে কাচের পরকলা লাগাইয়া দেখিতে বলেন। যন্ত্রতন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া দর্শনের ইন্দ্রিয়গুলিকে সাহায্য করেন। আপনার observatory অথবা laboratoryর ভিতরে বসিয়া তিনি এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এবং যখনই একটা নূতন attitude পাইয়া নূতন যন্ত্রের সাহায্যে নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইতেছেন, তখনই বাহিরে আসিয়া রাস্তার লোককে, পথের পথিককে, টানিয়া ঠেলিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছেন এবং সেই নূতন দৃশ্য তাহাদিগকে দেখাইতেছেন—এবং কেমন দেখাইতেছে, তাহা তাহাদের, মুখে শুনিতেছেন। এই শেষ কাজটুকু না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ থাকে। পথের পথিক আসিয়া সাক্ষ্য না দিলে, তাঁহার আবিষ্কৃত কোন তত্ত্বই মঞ্জুর হইবে না। তিনি যত বড়ই উকীল হন, বিচারের ফল প্রথমতঃ সাক্ষীর হাতে এবং অবশেষে জুরির হাতে;—এবং এই সাক্ষী এবং জুরি, সকলেই মাঝারি মানুষ।

আপনারা কখনই মাঝারি মানুষ নহেন, আমিও কোনরূপ বৈজ্ঞানিকতার স্পর্দ্ধা করি না। তবে, আমি বাহ্য-জগতের আলোচনা করিতে গিয়া আপনাদিগকে একটা নূতন attitude লইতে বলিব। নূতন একটা standpointএ দাঁড়াইয়া নূতন একটা attitude লইয়া দেখিলে, কতকগুলা পুরাতন বাগ্-বিতণ্ডার অবসান হইতে পারে,—ইহাই আমার বিশ্বাস। আমি বলিতে চাহি, আমরা সর্ব্বসাধারণে বহু-জীববাদী; এবং আমাদের প্রত্যেকেরই এক-একটা নিজস্ব জগৎ আছে। ইহারই নাম দিয়াছি—প্রাতিভাসিক জগৎ। এই প্রাতিভাসিক জগৎ সংখ্যায় বহু। যত জীব, তত জগৎ এবং প্রত্যেকের জগৎ ভিন্নরূপ। হয়ত একের জগতের সহিত অন্যের জগতের কোন অংশেই মিল নাই। মিল থাকিলেও তাহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে, আমরা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য,পরস্পর কারবারের জন্য ধরিয়া লইয়াছি যে, এই সকল জগতের অন্ততঃ কিয়দংশ সকলের পক্ষেই একরূপ। সকলের পক্ষে যে অংশ একরূপ, সেই অংশ কাহারও নিজস্ব হইতে পারে না। অতএব উহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে। সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমাদের কোন অপেক্ষা রাখে না। আমরা না-থাকিলেও উহা থাকিবে। কাজেই উহা আমাদের বাহিরে আছে। অতএব উহা বাহ্য-জগৎ। বৈজ্ঞানিকেরা এই বাহ্যজগতেরই বিবরণ দেন এবং ইহারই আলোচনা করেন। যাঁহারা বহুজীববাদী, তাঁহারা এই বাহ্যজগৎকে মানিয়া লইতে বাধ্য। বাহ্যজগৎ এই হিসাবে সত্য। এই সত্যকে আমি ব্যাবহারিক সত্য নাম দিয়া পুরাতন বিতণ্ডার মীমাংসা করিতে চাই।

বেইন সাহেবের text লইয়া আমি তাহার ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেখিয়াছি যে, আমাদের প্রাতিভাসিক জগতের মধ্যে যটুকু special to each, তাহাই subjective world এবং যেটুকু common to all, সেই টুকু objective world; এবং এই উভয় অংশকে ভিন্ন করিতে গিয়া we ascribe separate and independent existence to the common element, that is, to the

objective world.—বেইন সাহেব পরক্ষণেই বলিতেছেন, "In doing this, we are guilty of converting an abstraction into reality—the error of Realism".—অর্থাৎ বেইন সাহেবের মতে, এই বাহ্য-জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-স্বীকার,—আমাদিগকে ছাড়িয়া আমাদের বাহিরে যে একটা জগৎ আছে, এইরূপ স্বীকার—একটা মস্ত ভুল,—একটা অধ্যাস,—যাহা যা-নয়, তাহাকে তাহাই বলা; যাহা একটা abstraction মাত্র, একটা concept মাত্র, একটা মনগড়া-জিনিষমাত্র, তাহাকে real বলিয়া ভুল করা।

এই Realism কথাটার পিছনে মস্ত একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের অবতারণা এখানে করিতে চাহি না। কিন্তু একটু আলোচনা না করিলেও আমার বক্তব্য সমাধান হইবে না। কোন্ বস্তুটা real, কোন্ বস্তুটা real-নহে, এই বিতণ্ডায় পণ্ডিতে পণ্ডিতে বহুকাল হইতে বাগ্-বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। অধিকাংশস্থলেই কথা কাটাকাটি এবং বকাবকি ঘটিয়াছে, এবং এই বকাবকির ফলে উভয় পক্ষই প্রচুররূপে পিত্তবমন করিয়াছেন। আমি যে attitude লইতে চাহিতেছি, সেই attitude হইতে দেখিলে, বোধ হয় এতটা হুঙ্কার-উদ্গিরণের প্রয়োজন থাকিত না। উদ্দেশ্য সত্তানির্দ্ধারণ,—সত্তা কি, ইহাই নিরূপণের চেষ্টা। এক কথায় যাহা আছে, তাহাই সত্য—যাহা নাই, তাহাই অসত্য। কিন্তু—কি আছে, ইহাই হইল বিতণ্ডার ক্ষেত্র। একপক্ষ যাহাকে বলেন—আছে, অন্যপক্ষ জোরের সহিত বলেন—তাহা নাই। 'আছে' কথাটার মানে লইয়াই যত মারামারি। উভয়পক্ষ ভিন্নভিন্ন অর্থে 'আছে' শব্দটা ব্যবহার করেন। আমি বলি, উভয়পক্ষই ঠিক। আপনাপন attitude-অনুসারে উভয়পক্ষই ঠিক। অনর্থক গণ্ডগোলের কোন প্রয়োজন নাই। একটা অতি সেকেলে দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্।—প্রশ্ন, গরু আছে কি না? অধিকাংশ লোকেই সমস্বরে বলিয়া উঠিবে, 'গরু আবার নাই? ঐত সম্মুখে ঐ শ্যামলা গাইটি পরমানন্দে ঘাস খাইতেছে, চক্ষে দেখিতেছি। ঐত গরু রহিয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তা হাসিয়া বলিবেন, 'আমিত এই শ্যামলা গাভীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করি নাই; আমি প্রশ্ন করিয়াছি—গরু আছে, কি না? যে গরু শ্যামলাও নয়, ধবলাও নয়,—বাছুরও নয়, বুড়াও নয়,—গাভীও নয় বলদও নয়,—যাহা গরুমাত্র। ঐ শ্যামলা গরু, ঐ ধবলা গরু, ঐ গাইটি, ঐ বাছুরটি, আমি চোখে দেখিতেছি, উহাদের অস্তিত্ব আমি perceive করিতেছি, বা প্রত্যক্ষ করিতেছি। উহারা আমার objects of perception—perceptual objects, অথবা percepts; উহাদের অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করিলাম না। কিন্তু আমি জানিতে চাহিতেছি—গরু আছে, কি না? যাহা কালাও নহে—ধলাও নহে, গাইও নহে—বাছুরও নহে, যাহা গরুমাত্র, যাহাতে সকল perceptible গরুর সাধারণ ধর্ম্মগুলি বিদ্যমান, কিন্তু কোন গরুবিশেষের বিশিষ্ট ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই;—এমন গরু আছে কি না? যদি তেমন গরু থাকে, ত আমাকে দেখাও দেখি।' বলা বাহুল্য, তেমন গরু দুনিয়ার মধ্যে নাই। গরু দেখাইতে হইলে, হয় গাই নয় বলদ, হয় কালা নয় ধলা গরু, দেখাইতে হইবে। যদি তুমি বল গরু আছে, আমি অমনই তোমাকে চাপিয়া ধরিব যে—আচ্ছা সে গরু কেমন?—আমাকে একটা ছবি আঁকিয়া দেখাও দেখি। অমনই তোমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কাহারও সাধ্য নাই যে, আমাকে নির্ব্বিশেষ গরু আঁকিয়া দেখায়। মনে থাকে যেন, আমি গাই চাইনা; বলদও চাইনা, বাছুরও চাইনা, বুড়ো গরুও চাইনা; এমন কি—চারপেয়ে গরুও চাই না; কেননা, খোঁড়া গরুকেও গরু বলিতে কেহ দ্বিধা বোধ করিবে না। আমার প্রশ্নোক্ত এই যে 'গরু', ইহা object of perception অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে পারে না; এমন কি, object of possible perception অর্থাৎ প্রত্যক্ষগম্যও হইতে পারে না। ইহা একটা concept মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় গরুর বিশিষ্ট ধর্ম্ম কাটিয়া ছাঁটিয়া এমন একটা মনগড়া পদার্থ তৈয়ার করিয়াছি, যাহার অস্তিত্ব ব্রহ্মাণ্ডে নাই; যাহা আঁকিয়া দেখান দূরে থাক্, যাহার স্পষ্ট ছবিপর্য্যন্ত মনে কল্পনা করাও অসাধ্য। অতএব, আমি বুক ফুলাইয়া বলিব যে, গরু নাই। জীয়ন্ত গরুগুলা objects of perceptionরূপে থাকিতে পারে। আর, যে গরু conceptমাত্র, তাহা কোনরূপ মনগড়া জগতে বিদ্যমান থাকিতে পারে;—কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই perceptual জগতে থাকিতে পারে না। প্রত্যেক গরুর রূপরসগন্ধ আছে, কিন্তু এই মনগড়া গরুর রূপরসগন্ধ থাকিতে পারে না। যিনি বলিবেন উহার রূপ এইরূপ,

তাহাকে ঠকিতে হইবে। অতএব, গরু এক অর্থে অস্তি, অন্য অর্থে নাস্তি। এক অর্থে সত্য, অন্য অর্থে অসত্য। গরু conceptরূপে সত্য, কিন্তু perceptরূপে অসত্য। যাহা object of immediate perception, ইন্দ্রিয়-দ্বারাই হউক, বা অন্তরূপেই হউক, যাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; অথবা যাহা object of possible perception,—সম্প্রতি প্রত্যক্ষবিষয় না হইলেও অন্য সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারে; সেই perceptual objectকেই যদি real বলা যায়, তাহা হইলে গরু নামক conceptএর, বা conceptual গরুর, কোনরূপ reality থাকিতে পারে না। অথচ লোকে কথায়-কথায় এই conceptগুলায় reality আরোপ করে। অন্যে সংশয় প্রকাশ করিলে, ঠেঙা তুলিয়া মারিতে আসে। এইরূপ যাহা যা নয়, তাহাকে তাই বলার শাস্ত্রীয় নাম 'অধ্যাস'। ইহাকেই বেইন সাহেব error of realism বলিয়াছেন। এই অধ্যাসের ফলে কত অনর্থক বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে, বলা যায় না।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, Scienceএর কাজ কি?—আমি বলিব, Scienceএর প্রধানকার্য্য কতকগুলা object of perception অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে মিলাইয়া দেখিয়া, তাহাদের সামান্য এবং বিশেষ, agreements ও differences, মিলাইয়া দেখিয়া, কতকগুলা concept গড়িয়া তোলা। নানাবিধ এবং নানা জাতীয় জীয়ন্ত গরু—objects of perception বা প্রত্যক্ষ পদার্থ। তাহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্টধর্ম্ম ছাঁটিয়া ফেলিয়া, কেবল সাধারণ ধর্ম্মগুলিকে একত্র জড়াইয়া, যে মনগড়া পদার্থের কল্পনা হয়, তাহারই নাম গরু। এই গরু একটা concept মাত্র। এই গরু কখন কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই, হইবেও না। ঐরূপ অন্যান্য concept—মানুষ, পশু, প্রাণী, সুন্দর, কুৎসিত, কালা, ধলা প্রভৃতি। ঐ সকল পদার্থ কোনরূপেই কাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহাদের real existence আছে কি না, ইহা লইয়া তর্ক তুলিলে, কেবল কথাকাটাকাটিই সার হয়। Real কথাটার অর্থান্তর ঘটাইয়া প্লেটো হয়ত বলিতেন যে, এই conceptগুলা বা ideaগুলাই real জিনিষ; আর যাহা percepts, যাহা প্রত্যক্ষগোচর, তাহা un-real। তিনি বলিতেন, ঐ যে conceptual অশরীরী গরু, উহাই খাঁটী বিশুদ্ধ জিনিষ। উহাতে খানিকটা ময়লামাটী আবর্জ্জনা মিশাইয়া আমাদের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা জীয়ন্ত গরুগুলা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। আমার গোয়ালের শ্যামলীধবলী, ঐ বলদটা, ঐ বাছুরটা, খাঁটী গরু নয়; উহা খাঁটী গরু + খানিকটা আবর্জ্জনা। ঐ আস্ত জীয়ন্ত গরুগুলাকে লইয়া মোটা জীবনযাত্রার কাজ চলিতে পারে—চাষে খাটান, বা গাড়ী বহা, বা উদরপূরণের কাজ, চলিতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্মতর মননকার্য্য চলিতে পারে না; কোনরূপ thinking চলিতে পারে না। কালা গরুর সঙ্গে ধলা গরুর সম্পর্ক পাতাইতে হইলে—উভয়েই ঘাস খায় এই সম্পর্ক পাতাইতে হইলেই,—আমাদিগকে গোত্ব বা গোজাতি, এইরূপ একটা concept খাড়া করিতে হয়। আবার, একটা conceptএর সহিত আর একটা conceptএর সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া, আর একটা ব্যাপকতর concept খাড়া করিতে হয়। গরুর সঙ্গে ভেড়ার বা ঘোড়ার সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া চতুষ্পদ পশুর concept তৈয়ার করিতে হয়। চতুষ্পদ পশুর সাহত দ্বিপদ মানুষের এবং ষট্‌পদ ভ্রমরের সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া 'প্রাণী'র concept খাড়া করিতে হয়। প্রাণীতে প্রাণীতে সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া প্রাণি-সামান্য দেখিয়া, মরণধর্ম্মের concept আনিতে হয়। এইরূপ perceptএ perceptএ এবং conceptএ conceptএ সম্পর্ক পাতানই মননকর্ম্ম। মনুষ্যের অন্তঃশরীরে বসিয়া বসিয়া যিনি এই মননকর্ম্ম করিতেছেন,ইংরেজিতে তাঁহাকে Reason বলা হয়; তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য বড় হাতের R দিয়া লিখিতে হয়। এদেশে উহার শাস্ত্রীয় নাম কি, ঠিক্ জানি না; প্রজ্ঞা বলিলে বোধ করি দোষ হইবে না। এই প্রজ্ঞা মানুষের অন্তরে বসিয়া কেবলই concept গড়িতেছেন; এবং conceptএর সহিত conceptএর সম্পর্ক পাতাইতেছেন। ইহা বস্তুতই সৃষ্টিকর্ম্ম—প্রজ্ঞা বস্তুতই সৃষ্টিকর্ত্রী। প্রজ্ঞা conceptগুলিকে সৃষ্টি করিয়া ছুড়িয়া ফেলেন—অন্য জীবের সহিত কারবারের জন্য উহাদের একটা মূর্ত্তি দিতে বাধ্য হন। সেই মূর্ত্তি শব্দময়ী মূর্ত্তি বা বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। আমার মননকর্ম্মকে অন্যের গোচর করিতে গেলে, উহাকে বাক্যরূপে বা শব্দরূপে প্রকাশ করিতে হয়। এই জন্য বাক্যকে বা শব্দকেই মননকর্ম্মের প্রধান সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে জিনিষটা concept, তাহার গায়ে একটা নামের

টিকিট বসান যায়। ঐ নাম একটা শব্দমাত্র। Thought-এর সঙ্গে Languageএর কি সম্পর্ক, তাহা লইয়া অনেক বিতণ্ডা হইয়াছে। Language বা ভাষা না থাকিলে, thoughtএর প্রকাশ দূরে থাকুক, thinkingকার্য্যটাই সম্ভব হইত কি না, তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই। আগে thought, না আগে ভাষা,—সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বোধ করি হয় নাই। Logic শাস্ত্রের গোড়াতেই এই প্রশ্ন উঠে। মক্ষমূলর প্রভৃতির Language and Thought-ঘটিত বিচার এই প্রসঙ্গে মনে করুন। যে সকল ইতর জন্তু কোনরূপ ভাষার ব্যবহার করে না, তাহাদের মনের ভিতর ঢুকিতে না পারিলে, তাহারা think করিতে পারে কি না, জানিবার কোন উপায় দেখি না; কাজেই এপ্রশ্ন হয়ত অমীমাংসিতই থাকিয়া যাইবে। ইতর জন্তুর পক্ষে যাহাই হউক, মানুষের পক্ষে language এবং thoughtএর সম্পর্ক,—বাক্যের সহিত অর্থের সম্পর্ক,—কালিদাসের ভাষায় বলিতে গেলে, একরূপ নিত্য-সম্পর্কই দাঁড়াইয়াছে। Gesture language, অথবা mimetic language নামে একটা কাজচালান ভাষা আছে বটে; ইহাতে মুখভঙ্গী দ্বারা বা অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা, শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও, মনের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করা যায় বটে। কোনরকম ভাবের বা emotionএর তাড়নায় যে সকল interjection বা ধ্বনি স্বভাবতঃ বাহির হয়, তাহাও অনেকটা gesture languageএর কাছাকাছি। স্বাভাবিক বা নৈসর্গিক নিয়মে এই gesture-গুলা বা অঙ্গভঙ্গীগুলা এবং এই interjection গুলা বা ধ্বনিগুলা, আপনাহইতেই বাহির হয়; law of associationএর দ্বারা, নিজের অবস্থার সহিত অপরের অবস্থা মিলাইয়া, অপরের ইঙ্গিত, বা অপরের ধ্বনি, অবলম্বনে অপরের মনের কথার অনুমান চলে বটে। এইরূপে একটা ভাষা তৈয়ার হয় বটে। এই ভাষাকে স্বাভাবিক, স্বভাব-প্রেরিত, জীবধর্ম্ম-প্রেরিত, natural language মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের languageএর যাহা বিশিষ্টতা, তাহা এই ভাষাতে নাই। আমরা যাহাকে language বলি, উহা স্বাভাবিক জিনিষ নহে। উহা অস্বাভাবিক—সম্পূর্ণ artificial ও conventional.—হইতে পারে, গোড়ায় স্বভাবদত্ত ধ্বনির অনুকরণে natural language হইতে কালক্রমে এই conventional languageএর উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু এখন ঐ conventionটুকুই, ঐ অস্বাভাবিকতাটুকুই, মানবীয় ভাষার প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা কোন conceptএর আমরা গায়ে আমরা একটা শব্দের বা নামের টিকিট লাগাইয়া দিই। সেই শব্দটার উচ্চারণের সহিত সেই conceptএর কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক হয়ত কোন কালে ছিল, হয়ত এখনও চেষ্টা করিলে তাহা আবিষ্কার করা যাইতে পারে; কিন্তু ভাষার কাজ চালাইবার জন্য উহা আবিষ্কারের কোন প্রয়োজনই নাই। যে conceptএর গায়ে যে নামের টিকিট আঁটা গিয়াছে, সকলে মিলিয়া সেইটাকে মানিয়া লইলেই কাজ চলিবে। নামটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইলেও কোন ক্ষতি নাই। যে কোন conceptকে যে-কোন নাম দিলেই চলিতে পারে। যাঁহারা নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা যে কোন সঙ্কেতকে যে কোন conceptএর পরিচায়করূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সঙ্কেতটার প্রয়োগে সুবিধা আছে কি অসুবিধা আছে, কেবল সেইটুকুই তাঁহারা দেখেন। আমাদের এই লট্ লোট্ লঙের দেশে, হুঁ ফট্ স্বধা স্বাহার দেশে, দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। বিদেশের শাব্দিক পণ্ডিতেরা এবিষয় লইয়া যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, আপনারা তাহা জানেন; আমারই বরং অনধিকার চর্চ্চা। সেকালের নিরুক্তকার ও ব্যাকরণকার হইতে শাকটায়ন গার্গ্য ও যাস্ক হইতে, একালের মীমাংসক ও নৈয়ায়িকগণপর্য্যন্ত,আচার্য্যেরা শব্দের সাঙ্কেতিকত্ব লইয়া যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও আপনারা জানেন। Convention মাত্রই—সঙ্কেতমাত্রই সম্পূর্ণ arbitrary। ইহার নির্ব্বাচনে আমাদের একটা freedom বা স্বাধীনতা আছে। গোড়ায় আমরা যে কোন সঙ্কেতকে প্রয়োগযোগ্য বলিয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিতে পারি। পরে সকলে মিলিয়া সেই সঙ্কেতের ব্যবহার করিতে হয়। Gesture languageএ, বা অন্য কোনরূপ স্বাভাবিক languageএ, সে স্বাধীনতাটুকু নাই। মনুষ্যসাধারণের যে gesture language বা যে natural language, তাহা জীবধর্ম্ম-প্রেরিত, স্বভাব-প্রেরিত। উহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা থাকে না। স্বাধীনতা

বেগম জেবউন্নিসা

লইতে গেলে উহার প্রয়োগও ব্যর্থ হইয়া যায়। মানুষের নিম্নে ইতরজীবে যদি কোন ভাষা ব্যবহার করে, উহাও স্বভাবদত্ত ভাষা। তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভাববিনিময়ে উহা সাহায্য করে বটে, কিন্তু উহার প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। বানর বা বনমানুষের মত উচ্চ শ্রেণীর জন্তুও কোনরূপ সাঙ্কেতিক বা artfiicial language তৈয়ার করিয়া লইতে পারে নাই। এই স্বাভাবিক ভাষা পরস্পর ভাববিনিময়ে, পরস্পর communicationএ কাজে লাগিতে পারে বটে ;—কিন্তু মনন-কর্ম্মে, thinking processএ ইহা কোনরূপ কাজে লাগে কি না, তাহা বলা দুষ্কর। আমি ইঙ্গিতে ইসারায় মুখভঙ্গীদ্বারা কিংবা চেঁচামেচি কোলাহল করিয়া অপরের নিকট আমার মনের কথা কতকটা জানাইতে পারি বটে, কিন্তু অপরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, আপনার মনে মনে মননের সময়, চিন্তার সময়, বিচার বিতর্কের সময়, আন্দোলন-আলোচনা করিবার সময়, ঐ সকল অঙ্গভঙ্গীতে বা চেঁচামেচিতে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। মনে মনে এই আন্দোলন আলোচনাই মনন-কার্য্য। ইহার জন্য এই অস্বাভাবিক, সাঙ্কেতিক, artificial, ভাষারই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সমস্ত Logic শাস্ত্রটা এই মননকার্য্যের বিধি-ব্যবস্থা-প্রণয়নে নিযুক্ত রহিয়াছে। কোন একটা concept যখন এইরূপে শব্দরূপে বা নামরূপে বাহিরে প্রেরিত বা বিসৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে সংজ্ঞা বলা যায়। আমরা প্রত্যেক conceptকে একটা নাম দিতে পারি, একটা শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি। সেই শব্দটাই সেই conceptএর সংজ্ঞা। ঐ শব্দটাকে বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহিরে প্রকাশ করারও সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না। সংজ্ঞাগুলা যেন মনের ভিতরেই মূর্ত্তিহীন শরীরহীন শব্দরূপে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। শব্দের যেন একটা বাহ্য, আর একটা আভ্যন্তর মূর্ত্তি আছে। অপরের নিকট মনের কথা প্রকাশের সময় কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা বায়ুতে আঘাত দিতে হয়, তখন উহা একটা শ্রবণেন্দ্রিয়গম্য বাহ্য মূর্ত্তি লইয়া, অপরের নিকট প্রকাশ হয়। কিন্তু যখন আমরা নীরবে মনন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি, তখন উহার বাহ্যপ্রকাশ আবশ্যক হয় না। অথচ সেই শব্দগুলাই যেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগম্য কোনরূপ ছায়া-শরীর লইয়া, আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের ভিতরে তোলপাড় করিয়া বেড়ায়। শব্দের এই আভ্যন্তর অশরীরী বা সূক্ষ্মশরীরী মূর্ত্তিকেই এ দেশের পণ্ডিতেরা বুঝি, স্ফোট নাম দিয়াছিলেন। এই অশরীরী শব্দ কখনও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না। উহা অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর থাকে। অপরের সহিত কারবারে ইহার দরকার হয় না, নিজের সহিত কারবারে ইহার দরকার হয়। প্রত্যেক সংজ্ঞা, প্রত্যেক concept, আমাদের নিকট শব্দরূপে বা নামরূপে পরিচিত। পরের সহিত কারবারে আমরা ঐ নামগুলিকে শ্রবণগোচর শব্দরূপে প্রেরণ করি। নিজের সহিত কারবারেও উহাদিগকে শ্রবণের অগোচর শব্দরূপেই নিজের নিকটে উপস্থিত করি। প্রত্যেক conceptএর প্রকাশই এই শব্দরূপে। বাহিরে প্রকাশ এবং ভিতরে প্রকাশ—উভয়ত্র প্রকাশই শব্দরূপে। অতএব শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ এই অর্থে নিত্য এবং অচ্ছেদ্য। আপনারা Conceptualism এবং Nominalism এই দুইটা বড় বড় কথা শুনিয়াছেন ; ইউরোপের মধ্যযুগে এই দুইটা নাম লইয়া দুই দলে বকাবকি হাতাহাতি এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। প্লেটো যেগুলাকে idea বলিতেন, এবং তৎসম্বন্ধে বলিতেন—এইগুলাই খাঁটি জিনিষ, বিশুদ্ধ জিনিষ, আসল জিনিষ, real জিনিষ ; অন্যে তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেন, না না—ওগুলা সব concept মাত্র উহাদের real existence কিছুই নাই ; উহাদের অস্তিত্ব আমাদের মনের মধ্যে ; উহারা আমাদের মনগড়া, আমাদের সৃষ্ট বা বিসৃষ্ট। ইঁহারাই Conceptualist। আর একদল বলিতেন, না না—উহারা কেবলই নামমাত্র, শব্দমাত্র—আমাদেরই দেওয়া pure convention মাত্র ; তদতিরিক্ত সত্তা উহাদের কিছুই নাই। ইঁহারা Nominalist. আপনারা দেখিতেছেন, এই যে গণ্ডগোল আর তর্কসংগ্রাম, ইহা কেবল ইউরোপখণ্ডেই ঘটে নাই। এদেশেও ইহা নিরুক্তকারদের বা তাঁহাদেরও পূর্ব্বের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

অধিকাংশ স্থলেই কথার মানে লইয়াই প্যাচ-খেলান। Real শব্দের অর্থ যদি আমি প্রত্যক্ষগোচর বা perceptual ধরি, তাহা হইলে গো-জাতি-বাচক গরু জিনিষটা real হইতে পারে না। উহা percept হইতে পারে না, উহা concept হয়। Perceptual worldএ উহার স্থান থাকে না, Conceptual worldএ উহার স্থান হয়।

এই Conceptual World বস্তুতই একটা নূতন জগৎ। এই জগৎ মানুষের ইন্দ্রিয়গম্য নহে, ইহা কোনরূপে প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ইহা আদৌ অধিগম্য নহে। প্রত্যক্ষ যে সকল প্রমাণের ভিত্তি, সেই অনুমানাদি প্রমাণও এই জগতের কোন ঠিকানা দিতে পারে না। কাজেই ইহাকে প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। প্রাতিভাসিক জগৎ—রূপের জগৎ; উহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য রূপ আছে—উহা রূপময় জগৎ। কিন্তু এই conceptual world এর অন্তর্গত কোন দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ রূপ নাই, কোনরূপে তাহারা অনুভূতির সম্পর্কে আসে না। Concept গুলা একবারে রূপরসগন্ধবর্জ্জিত—মানুষের সুখ-দুঃখের, আশার আকাঙ্ক্ষার সহিত কোন সম্পর্কই তাহারা রাখে না। উহারা সংজ্ঞামাত্র—নামমাত্র—শব্দমাত্র। বাহিরের শ্রবণেন্দ্রিয়গম্য মূর্ত্তিমান্ শব্দ নহে, অন্তরের মননকর্ম্মে নিযুক্ত অমূর্ত্ত শব্দমাত্র। এই জগতের স্বতন্ত্র নামকরণ আবশ্যক। ইহাকে নামের জগৎ বলিব—শব্দময় জগৎ বলিব—বাক্যময় জগৎ বলিব—বাঙ্ময় জগৎ বলিব। মানুষের প্রজ্ঞা এই বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করে,—স্বাধীনভাবে free agentরূপে সৃষ্টি করে।

যাহা object of perception, তাহাকেই আমি real বলিব। শ্যামলা, ধবলা, পিঙ্গলা গাইকে আমি real বলিব। আর যাহা গরু মাত্র, তাহাকে conceptual বলিব। ইহাকে সংজ্ঞামাত্র বল, বা নামমাত্র বল, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। যাহা প্রত্যক্ষগম্য, perceptual, এবং এই অর্থে real, তাহা রূপজগতের জিনিষ। আর যাহা আমাদের কল্পিত, উদ্ভাবিত, মনগড়া, conceptual, তাহা নামজগতের জিনিষ। রূপজগৎ এবং নামজগৎ—এই দুই জগৎ লইয়া সমস্ত বিশ্বজগৎ। কে অস্তি, কে নাস্তি,—কে সত্য, কে অসত্য, ইহা লইয়া তর্ক তোলা নিষ্ফল। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা রূপজগতে অস্তি। এই রূপজগৎই প্রাতিভাসিক জগৎ। এই প্রাতিভাসিক জগতে তাহা অস্তি। ইহার কিয়দংশকে আমরা ব্যবহারের জন্য ব্যাবহারিক জগৎরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। জীবন-যাত্রার জন্য এই ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছি। সেই অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যেকের কাছে real জগৎ। আমাদের প্রত্যেকের নিকট এই ব্যাবহারিক জগৎও প্রাতিভাসিকরূপে, perceptualরূপে, রূপজগতের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের প্রত্যেকের ব্যাবহারিক জগতের average লইয়া, সর্ব্বসাধারণের জন্য একটা মনগড়া জগৎ তৈয়ার করিয়াছেন। আমি বলিতে চাহি যে, সেই জগৎ সর্ব্বতোভাবে বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত, বৈজ্ঞানিকেরই সৃষ্ট, নামময় জগৎ। উহা প্রাতিভাসিক ত নহেই। উহাকে ব্যাবহারিক বলাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। কেন না, আমরা প্রত্যেকে যে বাহ্য জগতের সহিত কারবার করি, তাহা প্রাতিভাসিক জগতেরই এক অংশ মাত্র। তাহা ব্যবহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইলেও প্রত্যেকের পক্ষে স্বভাবতঃ প্রাতিভাসিক। প্রত্যেকের পক্ষে উহা ভিন্নরূপ। ভিন্ন রূপ বলিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা কল্পিত Mean Manএর জন্য একটা কল্পিত মাঝারি জগৎ উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উহা conceptual জগৎ, মনন-কর্ম্মের জন্য উহা আবশ্যক। এই মনন-কার্য্যটা বৈজ্ঞানিকেরই কার্য্য। এতদর্থে তাঁহাদিগকে নানা conceptএর উদ্ভাবনা করিতে হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে নানা সম্পর্ক পাতাইতে হইয়াছে; প্রত্যেক সম্পর্কের এক একটা নাম দিতে হইয়াছে। আমি ক্ষণেকের জন্য nominalist সাজিতে চাই। ঐ নামসমূহে নির্ম্মিত জগৎকে আমি বাঙ্ময় জগৎ বলিব।

Scienceএর কাজ মনন কর্ম্ম; বাহিরের প্রত্যক্ষ গোচর কতকগুলি percept মিলাইয়া, তাহা হইতে concept তৈয়ার করিয়া, সেই সকল conceptএর সম্পর্ক-নির্দ্ধারণ, ইহাই মনন-কর্ম্ম। Inductive and Deductive Logic এই মননকর্ম্মের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে। Conceptএ পৌঁছিতে হইলে, প্রত্যক্ষলব্ধ percept গুলিকে নাড়াচাড়া করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হয়। প্রত্যক্ষ জগতে কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা আসিতেছে, কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা আসিতেছে, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়; ইহার নাম observation বা পর্য্যবেক্ষণ। কোথায় দাঁড়াইয়া, কিরূপে দেখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা স্থির করেন, তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু দেখিবার সময় তিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস না করিয়া, পাঁচজন পথের পথিককে ডাকিয়া আনেন। পথের পথিকও এক একজন ছোটখাট

বৈজ্ঞানিক, তাহাকেও পাঁচটা জিনিষ দেখিয়া, পাঁচটা concept খাড়া করিতে হয় বটে, কিন্তু সে আপনার immediate interests লইয়া, আপনার জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাপার লইয়া, এত ব্যস্ত যে, কোনরূপ সূক্ষ্ম conceptএ পৌঁছিবার তাহার অবসর নাই। সূর্য্য ঘুরিতেছে কিংবা পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ বিষয়ে তাহার মাথাব্যথার কোন প্রয়োজনই হয় না। কেন না ডালরুটি-সংগ্রহ-ব্যাপারে উভয়ই প্রায় তুল্যমূল্য। কাজেই সে পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াই পর্য্যবেক্ষণ করে। মনোরথে চড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইবার তাহার প্রবৃত্তিই নাই। বৈজ্ঞানিকের interests আরও দূরব্যাপী। তিনি সাধারণ লোককে টানিয়া আনিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উধাও হইয়া দৌড়িতে বলেন। জলের ভিতর hydrogen oxygen আছে, তাহা না জানা সত্ত্বেও পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রা এতকাল চলিয়াছে ও চলিতেছে। কাজেই জলকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার তাহাদের প্রবৃত্তি নাই। বৈজ্ঞানিক কিন্তু আপনার laboratory ঘরে জলকে তাড়িত-প্রবাহদ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া, পথিকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া দেখান, এই দেখ, জলের ভিতর হইতে কিরূপ দুইটা নূতন জিনিষ বাহির হইল। জল হইতে hydrogen-oxygen বাহির করিতে হইলে হাত, পা, দাঁত, নখ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কুলায় না; তাহার জন্য বিশিষ্ট রকমের হাতিয়ার বা tool তৈয়ার করিতে হয়, যন্ত্রতন্ত্র—তোড়জোড় আবশ্যক হয়। বৈজ্ঞানিকের তাহার যোগাড় করিয়া লইতে হয়। সর্ব্বসাধারণের মাথায় তাহা আসে না। এইরূপ যন্ত্রতন্ত্র তোড়জোড় সাহায্যে যে observation, তাহার নাম experiment বা পরীক্ষা। এইরূপে কোথায় দাঁড়াইয়া observation করিতে হইবে এবং কিরূপ যন্ত্রতন্ত্র দ্বারা observe করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটাইয়া, তাহা ঠিক করেন; কিন্তু observationএর ভারটা দেন—দশজন ইতর লোকের উপর। তাহারা observationএর পর যে সাক্ষ্য দেয়, বৈজ্ঞানিক তাহাই গ্রহণ করেন। দশজনের নিকট দশ রকম সাক্ষ্য পাইয়া, অগত্যা তাহার averageটা মানিয়া লন; এবং এইরূপে যাহা পান, তাহাই সংগ্রহ পূর্ব্বক এবং সঙ্কলনপূর্ব্বক, তাহাদের agreements ও differences আলোচনা করিয়া, সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম্মগুলি মিলাইয়া, তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য দেখাইয়া, নানাবিধ relation বা সম্পর্ক প্রদান করেন। সাক্ষ্যগ্রহণের পর যে সকল ফলাফল বা result পান, সেগুলিকে tabulate করেন, classify করেন, generalise করেন এবং একটা general statement দিবার চেষ্টা করেন। এই সব general statementগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Laws of Nature বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়। Man is mortal এটাও যেমন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, pressure of a gas varies as its temperature এটাও তেমনই একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে প্রথমটার আবিষ্কারে কোন বড় বৈজ্ঞানিকের দরকার হয় নাই। পৃথিবীর শত কোটি মাঝারি বৈজ্ঞানিকই উহা স্থির করিয়া লইয়াছে। কেন না, উহা তাহাদের immediate interest-এর বিষয়। আর দ্বিতীয় নিয়মটার আবিষ্কারে একজন বড় বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি যন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করিয়া, সকলকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিলেন যে gasএর ব্যবহার এইরূপ; এবং তাঁহার পর হইতে আমরাও পথের পথিককে ডাকিয়া দেখাইতে পারিতেছি যে, gasএর ব্যবহার ঐরূপ। এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহা একটা statement মাত্র; একটা description মাত্র, একটা বিবরণ বা বাক্য মাত্র। আর এই যে বিবরণ, ইহা conceptual termsএ বিবরণ মাত্র। মানুষ একটা concept, আমাদের সেই পূর্ব্বকথিত গরুর মতই concept; এবং মরণ-ধর্ম্ম আর একটা নূতন concept। ঐ বিবরণে মানুষের সঙ্গে মরণ-ধর্ম্মের সম্পর্ক পাতান হইয়াছে। তেমনই gas একটা concept এবং তাহার pressure এবং temperature আর দু'টা concept। Gasসম্পৃক্ত এই বিবরণে ঐ তিনটা conceptএর পরস্পর সম্পর্ক পাতান হইয়াছে। মানুষ আর মরণধর্ম্ম—এই দুই conceptএ পৌঁছিতে কোন বড় বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু gas আর তার চাপ আর উষ্ণতা, এই তিনটা conceptএ পৌঁছান সকলের ক্ষমতায় কুলায় না। ইহার জন্য বিশিষ্ট পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞানব্যবসায়ী নহেন, তাঁহারা এই তিনটি নামের তাৎপর্য্য সহজে বুঝিবেন না। এইরূপে বৈজ্ঞানিককে নানা নূতন conceptএর বা সংজ্ঞার সৃষ্টি করিতে হয়

এবং প্রত্যেকের এক একটা নাম দিতে হয়। সে নামের মাহাত্ম্য তিনি ভিন্ন ইতর লোকে বুঝিতে পারিবে না। এই সংজ্ঞাগুলির সৃষ্টিকার্য্যেই বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরী। সংজ্ঞাগুলি এমন হওয়া আবশ্যক যে, তাহাদের পরস্পর relation অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি এক একটি formula, সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষায় এক একটি statement. Physical Science অথবা যে কোন Science এইরূপ formulaর সৃষ্টিতেই ব্যাপৃত আছে। ইহাই বৈজ্ঞানিকের সর্ব্ব প্রধান কাজ, ইহাই scientific method Concept গুলি এমন হওয়া চায়, যাহাতে উহাদের পরস্পর সম্পর্ক অতি সরলভাবে অতি ছোট্ট formulaয় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যত সংক্ষিপ্ত এবং যত সরল হইবে, ততই বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরী হইবে। সৌর জগতের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কগুলির গতিবিধিনির্দ্দেশের জন্য টলেমি যে formulaগুলির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ গতিবিধির জটিলতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। তিনি কিন্তু পৃথিবীতে দাড়াইয়াই গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহার formula রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেড় হাজার বৎসর পরে কোপর্ণিকাস্ স্থান বদল করিয়া অন্যত্র দাড়াইলেন,—পৃথিবী ছাড়িয়া, সূর্য্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবামাত্র দেখিলেন, যে জ্যোতিষ্কগুলির গতিবিধিতে তেমন আর জটিলতা নাই। এখন নূতন formula তৈয়ার করিয়া, গতিবিধির নূতন বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইয়া পড়িল। কেপ্‌লার জিনিষটাকে আরও সূক্ষ্ম করিয়া আনিলেন। শেষে নিউটন আসিয়া এমন কয়টা নূতন concept গড়িয়া ফেলিলেন, যাহাতে কেবল সৌর-জগতের জ্যোতিষ্ক কেন, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্যের গতি-বিধির বিবরণ কয়েকটি formulaর মধ্যে পড়িয়া গেল। নিউটনের আগে হইতে গালিলিও তাঁহার পথ কতকটা সুগম করিয়াছিলেন। গালিলিও এবং নিউটন উভয়ে মিলিয়া যে নূতন Dynamical Scienceএর পত্তন করিলেন, তাহাই আজি পর্য্যন্ত বাহ্য-জগতের যাবতীয় দ্রব্যের গতিবিধি-নির্দ্ধারণের সব চেয়ে সরল ও সংক্ষিপ্ত উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই যে Dynamical Science, ইহা আর কিছু নহে, ইহা জড়জগতের যাবতীয় বস্তুর গতিবিধির একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা মাত্র, একটা descriptionএর চেষ্টা মাত্র। ঐ descriptionটা conceptual termsএ description. উহার conceptগুলি এমন করিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহাতে ঐ বর্ণনাটা অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। এত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, অক্লেশে মাথার মধ্যে উহা পুরিয়া রাখা যায় এবং ইচ্ছামত বিনা আয়াসে বাহির করিয়া প্রয়োগ করা চলে। এই সূত্রগুলা কতকটা আমাদের ব্যাকরণের সূত্রের মত। সহজে মাথায় পুরিয়া রাখিবার অনুরোধে এবং সহজে প্রয়োগ করিবার অনুরোধে উহাদের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকার দিবার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন সূত্রকারদের সম্বন্ধে গল্প আছে যে, সূত্র-প্রণয়নের সময় একটি অক্ষর কমাইতে পারিলে, সূত্রকারের পরমায়ু দশবৎসর বাড়িয়া গেল, এইরূপ তাঁহারা মনে করিতেন। আক্ষেপ এই, এই সূত্রগুলির তাৎপর্য্য, ব্যবসায়ী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। ইহার ভিতরের শব্দগুলা সমস্তই পারিভাষিক, সমস্তই মনগড়া। অপর সাধারণে ইহার মানে বুঝিবে না। সমস্তই লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙের মত। ইহাদের কার্য্যকারিতা ইহাদের প্রয়োগের বেলায়। প্রয়োগকালে ইহাদের কার্য্যকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। একটি সংস্কর্ষঃ সূত্রের ভিতরে স্বরসন্ধিঘটিত সহস্র ঘটনা generalised formএ লুকাইয়া আছে। এই সূত্রটির প্রয়োগ করিবামাত্র সন্ধিঘটিত কত প্রশ্নের এক নিশ্বাসে মীমাংসা হইয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্রগুলিও সেইরূপ। তিনটা laws of motion আর একটা law of gravitationএর ভিতরে জগতের অসংখ্য তত্ত্ব যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের ধীবরের কুপীর ভিতর যেমন একটা প্রকাণ্ড দৈত্য নিহিত ছিল, জড় জগতের সমস্ত movements বা গতিবিধিকে যেন ঠাসিয়া পুরিয়া, ঐ চারিটি সূত্রের মধ্যে রাখা হইয়াছে। যে যাদুকর এই অঘটনঘটনায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি বস্তুতই জগতের নমস্য। এই সূত্রকয়টির প্রয়োগ করিবামাত্র গুলি গোলা ক্রিকেট বল বৃষ্টিবিন্দু সমুদ্রের জল রেলগাড়ী ষ্টীমার হইতে চন্দ্রসূর্য্য রাহুকেতু এবং হেলির ধূমকেতু পর্য্যন্ত সকলেরই গতিবিধি যেন সেই যাদুকরের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। তিনি বনমানুষের হাড় ঠেকাইয়া, যাহাকে

যখন যেখানে উপস্থিত হইতে বলেন, সে তখনই সেখানে উপস্থিত হয়। অথবা তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মত কে কোথায় কখন্ উপস্থিত ছিল, কে কোথায় কখন্ উপস্থিত হইবে, তাহা চোখের সম্মুখে দেখিতে পান। তিনি গণিয়া বলেন, এবং গণনার ফল অব্যর্থ হয়। পৃথিবীর যাবতীয় মাঝারি মানুষ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। কোন্ মন্ত্রবলে তিনি এই অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, তাহার তাহারা ঠাহর পায় না। বস্তুতই তিনি মন্ত্রবলে তাহা করেন। মননকর্ম্মের জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে তিনি যে সূত্রের আকার দিয়াছেন, সেই এক একটি সূত্র এক একটি মন্ত্র। তিনি স্বয়ং সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি। সেই সূত্রের মধ্যে যে নামগুলি, যে সংজ্ঞাগুলি, যে শব্দগুলি, যে conceptগুলি বসিয়া আছে, তাহারা সেই সেই মন্ত্রের দেবতা। আদি-ঋষি বিশ্ববিধাতার মত তিনি সেই দেবতাগুলিকে সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং শব্দময়ী মূর্ত্তি দিয়া তাহাদিগকে বাঙ্ময় জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। স্বয়ং হোতা সাজিয়া, তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন; অধ্বর্য্যু সাজিয়া তাহাদের তৃপ্তিবিধান করিতেছেন; উদ্গাতা সাজিয়া তাহাদের স্তোত্র গায়িতেছেন; আবার আথর্ব্বণিক ঋত্বিক্ সাজিয়া, তাহাদিগকে বশীকরণ করিয়া, শান্তিপুষ্টি ও অভিচারকর্ম্মে তাহাদিগকে খাটাইয়া লইতেছেন।

আজকাল কথায় কথায় বলা হয়, এই Laws of Natureগুলা, এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলা, কেবল description মাত্র, কেবল বিবরণ মাত্র, কেবল predication মাত্র, কতকগুলা statement বা proposition মাত্র। এই propositionএর সমস্ত terms—ইহার subject এবং predicate—উভয়েই, conceptual। সহজে মনে রাখিবার জন্য এবং অক্লেশে প্রয়োগের জন্য, এই conceptগুলাকে এমন আকার দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে ঐ statementগুলা যথাসম্ভব ছোট এবং সরল হয়। এমন সাঙ্কেতিক ভাষার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে যে, সেই ভাষা ব্যবসায়ী ভিন্ন অপরে সহজে বুঝিতে পারে না এবং অপরে প্রয়োগ করিতেও পারে না। ব্যবসায়ীর নিকট প্রত্যেক term, প্রত্যেক নাম, প্রত্যেক শব্দ অর্থপূর্ণ; কিন্তু অন্যের কাছে উহা অর্থহীন হিং টিং ছট্ মাত্র। অব্যবসায়ীর কাছে এই হিংটিং ছট্ যতই অর্থশূন্য gibberish বা যতই mysterious হউক, যিনি ব্যবসায়ী, তিনি ইহার অর্থ জানেন। ইহার প্রত্যেক দেবতা তাঁহার পরিচিত এবং অধীন। তিনি যথাযথ এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিয়া দেবতাগুলিকে বশে রাখিতে পারেন। এই যে সাঙ্কেতিক ভাষা, ইহা যেন shorthandএর ভাষা। ব্যবসায়ীর নিকট সুগম, অব্যবসায়ীর কাছে হিজি-বিজি মাত্র। ইহার উদ্দেশ্য—কেবল মননকর্ম্মে শ্রম-সংক্ষেপ—economising of thought। এই shorthandএর আশ্রয় লইয়া, বৈজ্ঞানিকেরা ছোট্ট formulaগুলিকে অক্লেশে মনের ভিতর পুরিয়া রাখেন এবং স্বেচ্ছামাত্রে অক্লেশে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া প্রয়োগ করেন। এই জন্যই বলা হয়, physical laws are mere descriptions in conceptual short-hand of the perceptual world। যে কোন বিবরণ conceptual termsএই description। গরুর চারি পা আছে এবং মৌমাছিতে মধু খায়, এই যে বিবরণ, ইহাও conceptual languageএই বিবরণ। কেন না গোড়াতেই বলিয়াছি, গরু এবং মৌমাছি, কোন জীয়ন্ত গরু বা জীয়ন্ত মৌমাছিকে বুঝায় না; পা বলিলে আমার পা—তোমার পা বুঝায় না; মধু বলিলেও আমার ঘরে যে মধুটুকু সঞ্চিত আছে, তাহাকে বুঝায় না। এই সকল বিবরণে এবং বৈজ্ঞানিকদের দত্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিবরণে এই হিসাবে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ঐ বাক্যকে আমি একটু শোধন করিয়া লইতে চাই। আমি বলিব, physical laws are descriptions in conceptual shorthand of a conceptual world। কেন না, এই জগৎ Mean Manএর জগৎ; কোন জীয়ন্ত মানুষের জগৎ নহে। এই Mean Man নিজেই একটা কল্পিত মানুষ; উহার জগৎও কল্পিত জগৎ; উহা perceptual বা real জগৎ হইতে পারে না। মানুষ প্রকৃত পক্ষে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। মনুষ্যকর্তৃক সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ছিল না। সৃষ্টির পর ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই creationএর ব্যাপার। এই creation, অ-সৎ হইতে সতের উৎপাদন। যাহা ছিল না, তাহা সৃষ্টিকর্ম্মের ফলে উৎপন্ন হয়। আগেই বলিয়াছি, সৃষ্টিকর্ত্তা যে মানুষ, তিনি এখানে free agent। এই সৃষ্টিকর্ম্ম তাঁহার স্বাধীনইচ্ছা-প্রসূত। প্রত্যেক মানুষেরই অল্পাধিক

পরিমাণে এই সৃষ্টিক্ষমতা রহিয়াছে। কাহারও অল্প আছে, কাহারও অধিক আছে,—কাহারও বা অত্যন্ত অধিক আছে। যাহাদের অত্যন্ত অধিক আছে, তাহারা বড়লোক, তাহারা মাঝারি মানুষ হইতে দূরে ছটকিয়া পড়িয়াছে। এক্ষেত্রে তাহারাই genius। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাহারা genius, তাঁহারা ক্রমশঃ এই বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

এই ক্ষমতার নাম দেওয়া যাইতে পারে—intelligence। ইংরেজী দার্শনিক সাহিত্যে intelligence শব্দের ঠিক তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি জানি না। বের্গসনের বহিতে দেখিলাম, তিনি ইহাকে tool-making faculty বলিয়াছেন। এই tool শব্দের অর্থ—অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার। যে কোন দ্রব্য কর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাই হাতিয়ার। এই অর্থে হাত, পা, দাঁত প্রভৃতি আমাদের স্বভাবদত্ত হাতিয়ার। এই স্বভাবদত্ত হাতিয়ারগুলার কাজ supplement করিবার জন্য আমরা জড়জগৎ হইতে হাতিয়ার তৈয়ার করি। লাঠি, সোটা, তীর, বল্লম হইতে আরম্ভ করিয়া, ঘড়ি, ষ্টীমএঞ্জিন, দূরবীক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্তই এই অর্থে হাতিয়ার। বের্গসনের মতে এই হাতিয়ার তৈয়ার করা intelligenceএর কাজ। কোন একটা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য হাতিয়ারের ব্যবহার হয়। যিনি হাতিয়ার তৈয়ার করেন, তিনি সাবেক অভিজ্ঞতা বা experienceএর উপর ভর দিয়া, মনে মনে একটা design বা নক্সা তৈয়ার করিয়া লন। এই যে নক্সাটি, ইহা একটি conceptual হাতিয়ার। সেই conceptটাকে বাহিরে আনিয়া যখন তাহাকে একটা মূর্ত্তি দেওয়া যায়, তখন ঐ conceptual হাতিয়ারটি কর্ম্মসাধনোপযোগী perceptual হাতিয়ারে পরিণত হয়। তখন উহা perceptionএর বিষয় বা প্রত্যক্ষগোচর হয়। একটা অশরীরী conceptionকে এইরূপে একটা perceptible objectএ পরিণত করা, ইহাই intelligenceএর কাজ। যাহা প্রত্যক্ষ বস্তু, যাহা perceptionএর বিষয়, তাহাকেই real বলা যাইবে, এইরূপ আমি স্থির করিয়া লইয়াছি। এখন বলা যাইতে পারে, একটা conceptকে perceptএ পরিণত করা বা realএ পরিণত করা বা realise করা, ইহাই intelligenceএর কার্য্য। কিন্তু এই realisationএর পূর্ব্বে মনে মনে একটা conceptual design খাড়া না করিলে চলে না। এই conceptual design প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা থাকার দরকার। বাহ্য জগতে অবস্থিত perceptগুলি অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া মিলাইয়া মিশাইয়া যে নূতন concept করা হয়, সেই conceptকে আবার মূর্ত্তি দিয়া বাহ্যজগতে প্রক্ষেপ করিয়া, একটা নূতন গোছের perceptible objectএ পরিণতি করা, এ সমস্তটাই আমি intelligenceএর কাজ বলিতে চাহি। এই অর্থে intelligence নিজেই একটা হাতিয়ার; উহা Reasonএর হাতে একটা হাতিয়ার বা instrument। Reasonএর কার্য্যের দুই ভাগ। প্রথম ভাগে কতকগুলা বাহিরের percept হইতে একটা concept গড়িয়া তোলা হয়; এই কাজটা designerএর কাজ। দ্বিতীয় ভাগে সেই design অনুসারে একটা নূতন perceptual object নির্ম্মাণ করা হয়। এই ভাগকে architect, fashioner বা modellerএর কাজ বলা যাইতে পারে। এই প্রথম অংশটুকুই প্রকৃতপক্ষে Science। দ্বিতীয় অংশটুকুকে Science না বলিয়া Art বলা যাইতে পারে। Science এবং Artএ প্রভেদ কি, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব, যে Science উপস্থিত perceptগুলি অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন concept গঠন করেন। আর Art, Scienceএর নিকট সেই conceptগুলি ধার করিয়া লইয়া, তাহাকে বাহিরে realise করেন। কার্য্যতঃ Scienceকে এবং Artকে হাতধরাধরি করিয়া, একযোগে চলিতে হয়। বিজ্ঞানবিদ্যা কলাবিদ্যাকে ছাড়িয়া চলিতে পারেন না। কলাবিদ্যাও পদে পদে বিজ্ঞানবিদ্যার মুখাপেক্ষী হইয়া চলেন। কিন্তু মুখ্যতঃ Scienceএর কারবার conceptual worldএ, বা নামের জগতে; এবং Artএর কারবার perceptual worldএ বা রূপের জগতে। প্লেটো যে বলিয়াছিলেন, conceptগুলা বা ideaগুলাই বিশুদ্ধ জিনিষ, আর বাহ্য জগতে যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাহা ময়লা জিনিষ, তাহা এক হিসাবে ঠিক বটে। কোন artistএরই সাধ্য নাই যে, তিনি বৈজ্ঞানিকদিগের খাঁটি conceptগুলিকে সম্পূর্ণভাবে realise করেন। কিছু না কিছু

ময়লামাটী-আবর্জ্জনা তাঁহাকে মিশাইতেই হয়। একটা দৃষ্টান্ত লইব। গল্প আছে, হাওয়ার বেগে ছাদ হইতে ঝাড় দুলিতেছে দেখিয়া, গালিলিও পেণ্ডুলমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ঝাড়টার প্রত্যেক দোলনে ঠিক সমান সময় লাগিতেছে। অতএব একটা পেণ্ডুলমকে দোলাইয়া দিলে, উহার প্রত্যেক দোলনেই সমান সময় লাগিবে। পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্য কমাইয়া বাড়াইয়া, সেই সময়টুকু কমান বাড়ান চলিতে পারিবে। এইরূপে পেণ্ডুলমের দ্বারা সময়-নিরূপণ চলিতে পারে। ইহা হইতেই ক্লক ঘড়ির উৎপত্তি হইল। গালিলিও ছিলেন—বৈজ্ঞানিক। তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা কতকগুলা experiment এবং observationএর সাহায্যে একটা concept গড়িয়া তুলিলেন। আপনারা simple pendulumএর নাম শুনিয়া থকিবেন। ঐ simple pendulumটাই সেই concept। কিন্তু এই simple pendulumএর বাহ্য জগতে অস্তিত্ব নাই। উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ। একগাছি সূতায় একটা বল্ বা ভাঁটা ঝুলাইলে কতকটা simple pendulumএর মত হয় বটে, কিন্তু কতকটা মাত্র। Simple pendulumএর যে সূতা, তাহা অশরীরী। কোন chemical balance উহার ওজন ধরিতে পারিবে না। উষ্ণতাভেদে উহার দীর্ঘতারও কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। ঐ সূতায় যে ball ঝুলান আছে, উষ্ণতা-ভেদে উহা ছোটবড় হইবে না। কাজেই বৈজ্ঞানিকের এই যে Simple pendulum—কেহ কখন চোখে দেখে নাই, দেখিবেও না। উহার বসতি নামের জগতে; রূপের জগতে উহার স্থান নাই। কিন্তু এই simple pendulumএ মানুষের কোন কাজ চলিবে না। Artist বা কারিকর যখন সময়-নিরূপণের জন্য pendulum তৈয়ার করিতে যান, তখন তাঁহাকে পিতলের বা লোহার তারে পিতলের বা লোহার ভাঁটা ঝুলাইতে হয়। সেই তারটার ওজন নগণ্য নহে। গরমে উহা লম্বা হয়, হাওয়া লাগিয়া উহাতে মরিচা ধরে। কাজেই কোন কারিকরে এ পর্য্যন্ত simple pendulum গড়িতে পারে নাই। কারিকরের হাতে-গড়া পেণ্ডুলম ঠিক সময় রাখিতেও পারে না। যে পেণ্ডুলম আমরা চোখে দেখি এবং কাজে লাগাই, উহার reality থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চোখে উহা খাঁটি জিনিষ নহে। খাঁটি simple pendulumএ খানিকটা ময়লামাটী দিয়া উহা তৈয়ার করিতে হইয়াছে। পিতলটুকু বা লোহাটুকু সেই ময়লামাটী। উহা প্রকৃতপক্ষে আবর্জ্জনা। কেননা উহাকে বর্জ্জন করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিকের মনের মত simple pendulum হইত। বর্জ্জন করিতে পারা যায় নাই বলিয়া, উহা বৈজ্ঞানিকের ঠিক মনঃপূত হয় নাই। উহা ঠিক সময় রাখিতে পারিতেছে না। শীতগ্রীষ্মে উহার compensationএর ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। মরিচা ধরিলে তেল দিতে হইতেছে। বৈজ্ঞানিক খাঁটি জিনিষ লইয়া কারবার করেন। Artist বা কারিকর সেই খাঁটি জিনিষে ময়লা মিশাইয়া, কোনরূপে চলনসই করিয়া কাজে লাগান। কাজটা আগাগোড়া intelligenceএর ব্যাপার। তাহার বলেই বৈজ্ঞানিক pendulumএর design তৈয়ার করিয়াছেন। আর কারিকর সেই designটাকে বাহিরে realize করিয়া একটা toolএ বা হাতিয়ারে পরিণত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তাঁহার মনের ভিতরের designটাকে যখনই ব্যক্ত করিতে যান, লোহাপিতলের সম্পর্ক না রাখিয়া যদি কেবল কাগজপেন্সিলেই pendulumএর নক্সা আঁকিতে যান, তখনই তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্য artist সাজিতে হয়। কেন না পেন্সিলে-আঁকা পেণ্ডুলমটাও রূপের জগতের জিনিস—উহা অসম্পূর্ণ জিনিষ—উহা simple pendulumএর নক্‌সা নহে। আবার কারিকর যখন বৈজ্ঞানিকের পদতলে বসিয়া, সেই নক্সার ভিতরের তত্ত্বটুকু আয়ত্ত করিতে যান, তখনই তিনি ক্ষণেকের জন্য বৈজ্ঞানিক সাজেন। তথাপি বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিকমাত্র এবং শিল্পী শিল্পী মাত্র। উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্। যিনি designer, তিনি architect না হইতেও পারেন এবং যিনি architect, তিনি designer না হইলেও চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক designer—তিনি বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করেন—তাহা চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পান না, মানস-চক্ষুতেও অনুভব করেন না; হয়ত দিব্যচক্ষুতে তাহা দেখেন। বাঙ্ময় জগৎকে যদি নিতান্তই সৎপদার্থ বল, তাহা হইলে তিনি অসৎ হইতে সতের কল্পনা করেন, সৃষ্টি করেন, create করেন। আর যে শিল্পী—সে সেই অমূর্ত্ত সৎপদার্থকে মূর্ত্তি দেয়—একটা ideaকে সে realize করে। বিশুদ্ধ শব্দকে সে ময়লা করিয়া, বাহিরে প্রত্যক্ষ

মূর্ত্ত পদার্থে পরিণত করে। সে সৃষ্টি করেনা; কেবল model করে।

আজি আর না। নিশ্চয় আপনারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কথার জঙ্গলে পথ হারাইয়াছেন কি না জানি না। প্রাতিভাসিক জগৎ আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব জগৎ, প্রত্যেকের প্রত্যক্ষলব্ধ অতএব real জগৎ। ঐ প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশকে আমাদের সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া মনে করি, উহাকেই বাহ্য জগৎ বলি; উহা যখন সকলের, তখন উহা কাহারও নিজস্ব নহে;—অতএব উহা কাহারাও আন্তর নহে, সকলেরই বাহ্য। পরস্পর ব্যবহারের জন্য উহার অস্তিত্ব স্বীকার করি, অতএব উহা ব্যাবহারিক জগৎ। এই ব্যাবহারিক জগতের বিবরণ দিতে বিজ্ঞানবিদ্যা নিযুক্ত আছেন। বৈজ্ঞানিকেরা ঐ ব্যাবহারিক জগতের সন্ধানে বাহির হন; কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারেন না। ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু এক এক জনে এক এক রকম সাক্ষ্য দেয়। অগত্যা সকলের সাক্ষ্য মিলাইয়া মিশাইয়া তাঁহারা একটা মনগড়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন। উহা সংজ্ঞায় নির্ম্মিত, নামে নির্ম্মিত, শব্দে নির্ম্মিত, এ জন্য উহা বাঙ্ময় জগৎ। উহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না; প্রত্যক্ষ হইবারও নহে। কেন না, যে Mean Man তাহার সাক্ষ্য, সে স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ। বৈজ্ঞানিক এই জগতের designer ও creator, উহার কল্পনাকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি স্বকর্ম্মোপযোগী করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের মনের মত করিয়া উহাকে গড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি চর্ম্ম চক্ষুতে উহা দেখেন না; মানস চক্ষুতে বা দিব্য চক্ষুতে উহা দেখেন। এই বাঙ্ময় জগৎ লইয়াই বিজ্ঞানবিদ্যার কারবার। ইহা অশরীরী ও অমূর্ত্ত। ইহা প্রত্যক্ষ নহে; কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না; অথচ আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, যে ইহারই নাম জড় জগৎ। আমি বলিতে চাই যে বিজ্ঞান যাহাকে জড় জগৎ বলে, যাহাকে material world বলে, তাহাই এই অমূর্ত্ত জগৎ। সত্য প্রাতিভাসিক জগৎকে material world বলা চলিতে পারে না; উহার যে অংশ প্রত্যেকের নিকট বাহ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকেও material world বলা চলে না। ব্যাবহারিক জগতের সন্ধানে চলিয়া বৈজ্ঞানিক যে অমূর্ত্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই জড় জগৎ। ইহাকে যদি অসত্য জগৎ বলিতে চাহেন, আমার তাহাতে আপত্তি হইবে না। ব্যাবহারিক বাহ্য জগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ নিরূপণ আবশ্যক। তজ্জন্য আমাকে অগাধ জলে সাঁতার দিতে হইবে।

বাস্তবিকই এবার আমাকে অগাধ জলে সাঁতার দিতে হইবে। Physical scienceএর গোড়ার কথাগুলা তোলপাড় করিয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে। Physical scienceএ আপনাদের অনেকে হয়ত অব্যবসায়ী। আপনাদের আমার সঙ্গে আসিতে ভয় হইবে। আমাকে হিজিবিজি ভাষায় কথা কহিতে হইবে। সে ভাষা আপনাদের অভ্যস্ত নহে। কিন্তু আপনারা সকলেই পণ্ডিত। আপনাদের বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আছে। সমুদ্রের জলে ডুব দিয়া ডুবুরির মত দুই চারিটা মুক্তা-শুক্তি যদি তুলিতে পারি, আপনারা সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির প্রভায় তাহা যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

ধূলিলিপ্ত

[শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী]

পণ্ডিত কহিছে—"শোন—শোন কথাগুলি,
স্নাত তুমি—কেন পুনঃ মাখ পথ-ধূলি?"

আবিষ্ট নয়ন দুটি তুলি ভক্ত কয়,
"ধরার ধূলি কি তাঁরি পদধূলি নয়?"

মিলন

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

সাহিত্যক্ষেত্রে নাম কিনব ব'লে আমি আজ এ কাহিনী লিখ্‌তে বসিনি! এই যে আজ আমার কলমের ডগায় মসীবিন্দুটুকু টল্ টল্ কর্‌ছে, এ আজ শুধু হীরাকষ-মাজুফলের তরলসংমিশ্রণ নয়—এর সঙ্গে আমার বুকের জ্বালা, শোকের অশ্রু, অপরাধী আত্মার অফুরন্ত হাহা-কার মিশানো রয়েছে!

আমি জানি, তোমরা আমার এ কাহিনী শুন্‌লে, আমার বুকের জ্বালা জুড়াবে না, কিংবা আমার এ হাহাকারে তোমাদের সহানুভূতি মিশাতেও আসবে না; কিন্তু তবু আমায় লিখ্‌তে হবে! অভিমান ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নসিংহাসন হ'তে দারিদ্র্য-দীপ্ত কুটিরবাসী প্রেমকে একবার আঘাত ক'রে পরিণামে সেই উচ্চসিংহাসন হ'তে আবার কেমন প্রেমের শ্মশানে লুটিয়ে পড়ে—এ মহাসত্যের জীবন্তছবিটি যদি তোমাদের না দিয়ে যাই—আমার পাপের বোঝা যে আরও ভারী হয়ে উঠবে!

আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান—আদরের কন্যা! জনক-জননীর সেই সন্তানস্নেহ, বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে দুকূল ছাপিয়ে উঠেছিল। হাসিতে বাঁশীতে আমার জীবন-কলিটি ফুটে উঠতে লাগ্‌ল।—মনে হ'ত, ঐশ্বর্য্যের প্রখরদীপ্তির কাছে দুঃখের ম্লানছায়াটুকুও বেঁচে থাক্‌তে পারে না! ধনীর জীবনে অনন্ত জ্যোৎস্নাভোগই বিধাতার নির্দ্দেশ! দুঃখ?—সে শুধু নির্ধনের জন্য।

পিতার অগাধঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে নারীর কালোরূপ—তাও আমি তত গ্রাহ্য করিনি! দর্পণে যখন নিজের কু-চেহারাখানা দেখে ফেল্‌তুম, তখন হতাশ হতুম না,—ভাবতুম বাবার ঢের টাকা আছে—আমার সুন্দর বর হবে না, তো হবে কার? বাড়ীর পাশে দরিদ্ররজনীকান্তের পরীর মতন মেয়েটাকে যখন একটা সাঁওতালী চেহারার লোক এসে বে' ক'রে নিয়ে গেল, তখন সকলেই আপশোষ করেছিল।—কেবল করিনি আমি। আমার মনে হয়েছিল—ঠিক্‌ই হয়েচে!—গরীবের মেয়ের কপালে যা হবার তাই ঘটেছে—গরীবের রূপের আবার দর কি! বছর দুই পরে যখন দেখ্‌লুম, ক্ষান্তমণি একটি ফুট্‌ফুটে ছেলে কোলে করে—মা হয়ে—বসেচে, তখন বিধাতার সেই বিষম ভুল দেখে ভারী চটে ছিলুম! যেখানে 'মেলিন্স্ ফুড্' নেই, 'ফিডিং বট্‌ল্' নেই, যেখানে বেতের দোলা নেই, 'প্যারাম্-বুলেটার' নেই, যেখানে 'বিব্' নেই, রবরের 'চুষি' নেই, যেখানে আয়া নেই, যেখানে জন্মতিথি উপলক্ষে বছর-বছর কবিতা ছাপা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, যেখানে মাসে দু'বার 'ফটো' তোলাবার ব্যবস্থা হতেই পারে না, সেখানে কিনা এমন সুন্দর ছেলে জন্মাল!—আর, আমার বাবার এত টাকা—বিধাতা আমায় একবিন্দুও রূপ দিলেন না! তা', না দিক্—আমার বাবার অনেক টাকা আছে; তাতেই সব ঢেকে যাবে।

২

অনেক দেখা-শুনার পর, দিন ফেরাফিরির পর, অবশেষে আমার বিয়ের দিন এলো। শুভদৃষ্টির সময় বুঝলুম—ধনীর কন্যাকে কালোরূপ দিয়ে বিধাতা যে পাপ করেছিলেন, এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল!—বে-হায়া হ'য়ে শুভদৃষ্টির সময় আঁখির পলক ফেল্‌তে খানিকক্ষণ ভুলে গেলুম!

ক্ষণেকের জন্য আত্মহারা হয়ে গেলুম—এ দেবতার পুজো কি দিয়ে ক'রব? কি আছে আমার?—চকিতে মেঘ কেটে গেল—মনে হল—আমি বড় মানুষের মেয়ে, কি নেই আমার?—কিসের অভাব আমার? দৃষ্টি থেকে দীনতা মুছে গেল,—গর্ব্বের ভাব ফুটে উঠ্‌ল! তার পর, যখন শুন্‌লুম,—তিনি দরিদ্র, তাঁর সম্বলের মধ্যে বাগ্‌দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টিমাত্র, তখন বিজয়গর্ব্বে আমার হৃদয় ফুলে উঠ্‌ল! তার পর, যখন শুন্‌লুম তিনি শ্বশুরগৃহেই আশ্রয় নেবেন, তখন দারুণ অবজ্ঞায় আমার অধরের প্রান্তভাগ বক্র হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সব উল্টে গেল! দেখ্‌লুম—স্বামি-দেবতাটি আমার বাহিরে যেমন কোমল, ভিতরে তেমনই কঠোর!—তিনি আবার আমায় শাসন করতে আসেন! হাসি পেত আমার! আমার বাপের ভিটায় বসে, আমার বাপের অন্নে উদরপূর্ণ করে, তাঁর এত আস্পর্দ্ধা! তিনি কঠোর—বেশ,—আমিও কম নই! কাজেই, আমাদের মধ্যে বেজায় গরমিল হতে লাগ্‌ল। প্রথম প্রথম দাম্পত্যদ্বন্দ্বের ঢেউটা শোবার ঘরের ভিতরেই আবদ্ধ থাকৃত; কিন্তু আমার তখন মেজাজ গরম—আমি বেশীদিন চেপে থাক্‌তে পার্‌লাম না। ক্রমে মার কাণে ব্যাপারটা পৌছুল; কাজেই বাবার কাণে পৌছিতেও দেরী হ'ল না। বাবা একতরফাই বিচার কর্ত্তেন। তিনি জামায়ের উপরই মনে মনে চট্‌তেন। তার পর, একদিন জামাইকে মিষ্টি-মিষ্টি তিরস্কার কল্লেন। আমার স্বামীও তেমনই;—তিনি বিদ্যার তেজস্বিতায় ঐশ্বর্য্যবানের ভ্রূকুটিতে মাথা নীচু কল্লেন না,—তিনি বাবাকে স্পষ্ট বল্লেন—"আমি আপনার বাড়ীতে দাসত্ব কর্‌তে আসিনি!" বাবা একটু হাসলেন।—এই হাসিই কাল হ'ল! পরদিন দেখলাম, শ্বশুরের দেওয়া কাপড়খানা পর্য্যন্ত ফেলে রেখে, স্বামী তাঁর পৈত্রিক সেই কুঁড়েঘরে ফিরে যেতে উদ্যত!—বাড়ীতে কতজন কত সাধাসাধি কল্লে, তিনি কিন্তু অটল।

যাবার সময় তিনি আমায় ডেকে বল্লেন—"আমি চল্লুম; তুমি আমার সঙ্গে আস্‌তে চাও তো এসো!" আমার পোড়া কপাল; আমি বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্লুম—"শ্বশুরের দেওয়া সবজিনিসই যখন ত্যাগ করে চল্লে, তখন আর এ জিনিসটায় লোভ কেন?"

তিনি বল্লেন—"বেশ!" তিনি চলে গেলেন—আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। রাগে—অভিমানে আমার সর্ব্বশরীর রী-রী কচ্ছিল—প্রণাম কর্ত্তেও ভুলে গেলুম!

৩

রূপ না দিয়েছিলে, নাই দিয়েছিলে,—পোড়া অভিমান কেন দিলে বিধাতা? সে যে আমার সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলে! কেন আমি বঙ্কিমের 'ভোমরার' অবস্থা দেখে সাবধান হতে শিখলুম না? ভোমরার স্ব-পক্ষে বলবার তবু কিছু আছে; কিন্তু আমার যে কিছুই নেই! সেই যে খামের ভিতর তাঁর শেষ চিঠি এসেছিল, কেন তা না নিয়ে—না খুলে অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে দিলুম! কি ছিল তাতে, কি না-ছিল তাতে, কে আজ আমায় ব'লে দেবে? তার জন্যে আজ যে আমি কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত। আজ এমন হাহাকার কচ্ছি, কিন্তু সেদিন কি করেছিলুম? —চিঠি ফিরিয়ে দিয়ে, মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করে ছিলুম। ও-বাড়ীর 'আতর' যখন বল্লে—"ভাল কল্লিনি আতর!—তুই একখানা চিঠি লিখে ক্ষমা চা"- তখন ইচ্ছে করেছিল, 'আতর'কে ধরে দু-ঘা বসিয়ে দিই। "কি! আমি সেধে—ভিখিরীর মতন সেধে—পত্র লিখতে যাব!—আমি!—আমি যাব! আমি তো তোর মত স্বামী-কাঙ্গালী নই!" আতর গম্ভীর হয়ে বল্লে, "মেয়ে মানুষের অত তেজ ভাল নয়, আতর—" আমি বাধা দিয়ে বলেছিলুম—"যাদের বাপ গলবস্ত্র হয়ে জামায়ের হাঁটু ধরে মেয়ে 'পার' করে, তাদের শোভা না পেতে পারে!" দেখলুম, আতর ছল্‌-ছল্‌ চোখে চ'লে গেল! এতদিনে বুঝ্‌চি—আতর আমার সতীসাধ্বী; মাথায় সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে গেছে সে—সে যা বলেছিল, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি!

৪

তিনবছর ছাড়াছাড়ির পর পোড়া অভিমানের চিতা নিবে গেল! আমার চোখে অশ্রু ঘনিয়ে উঠল।—বাবা দেখতেন, মা দেখতেন; তাঁরা মুখই ভার করে থাক্‌তেন; কিন্তু কেহই আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার নামও করতেন না। পাড়াপড়শীরা শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার কথা তুল্লে, মা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তেন। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তুম না।

অবশেষে, নিজের গর্ব্ব নিজের পায়ে দলে, মিনতি করে স্বামীকে পত্র লিখলুম ;—একখানা—দুখানা—তিনখানা। কোন চিঠিরই জবাব এল' না। তারপর, শেষ যে চিঠি লিখি, সেখানা বাবার হাতে পড়েছিল ; তিনি আমাকে ডেকে করুণকণ্ঠে বল্লেন, "মিছি মিছি পত্র দিয়ে আর কি হবে মা !" কথা শুনে, তখন হাড় জ্বলে গেছ্‌ল—মনে ভাবলুম, যে পোড়াঅভিমান আমার নারীজীবন ব্যর্থ করে দিতে বসেছে, সেই সর্ব্বনেশে অভিমান বাবা নিজের হাতে নতুন করে আমার বুকের মাঝে জ্বালিয়ে তুল্‌তে চান ! বিশ্বের সকল সুখ—সকল স্নেহ একক'রে, স্বামি-প্রেমের অপরদিকে চাপিয়ে, ওজন করে দেখ্‌লে, সেগুলো যে ঢের—ঢের হাল্কা হয়ে পড়ে,—একথা বাবা না বুঝ্‌তে পারেন, কিন্তু মা'তো আমার বোঝেন ;—তিনি কেন তবে, আমায় স্বামীর কুঁড়েঘরে না পাঠিয়ে দিয়ে, এমন করে ঐশ্বর্য্যের বনবাসে রেখেচেন ! বাবার চেয়ে, মার ওপর রাগ হ'ত বেশী ! শেষে ঠিক কল্লুম আর চিঠি দেব না—নিজে গিয়ে স্বামীর পা'য় হাজির হ'ব ; দেখি, তিনি কেমন কঠিন থাকেন ! কিন্তু কে নিয়ে যায় ? রমেশদাদার কথা মনে পড়ল—হাঁ, তার মত দেবচরিত্র ব্যক্তির সঙ্গে যেতে কোন ভয়ও নেই, কোন কলঙ্কও নেই।

৫

রমেশদাদার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে ভাব—এক সঙ্গে খেলা করেছি, ঝগড়া করেছি—আবার ভাব করেছি। আমার পড়ার ভার তার ওপর ছিল।—না পড়্‌লে মার্‌ত, কাদ্‌লে—খেল্‌না দিয়ে ভোলাত। রমেশদা যে জাতে বামুন—সে যে আমার সত্যিকার দাদা নয়—একথা কখনও মনে হ'ত না। রমেশদাদার সুখ্যাতি শত্তুরেও কর্‌ত। পানটি অবধি খেত না ; কারুর সঙ্গে মিশত না ; লেখা-পড়ায় বাপ্ মার মুখোজ্জ্বল করেছিল। এম-এ পাশ করার পর তার বাপ মারা গেল ; তখন রমেশদার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, আমারও হচ্চিল। আমার বিয়ের ছমাস পরে—যখন আমার স্বামী রাগারাগি করে চলে গেলেন—তখনও রমেশদার 'সম্বন্ধ'-দেখা চল্‌ছিল। হঠাৎ রমেশদা নিজের বিয়ের সম্বন্ধকরা বন্ধ ক'রে দিয়ে বল্লে, তার বুক খারাপ, বিয়ে কর্ব্বে না। মা তার কত কাঁদাকাটি কর্‌ত।—হঠাৎ একদিন রমেশদার মা দুদিনের জ্বরে মারা গেলেন—রমেশদাকে বিয়ের জন্য জ্বালাতন করবার আর কেউ-ই রইল না। রমেশদার অতুলসম্পত্তি—আই-বুড় কন্যার পিতারা দলে দলে রমেশদার সাম্‌নে টোপ ফেল্‌তে লাগ্‌ল ; কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। সকলে ভাব্‌লে—তরুণ বয়সে, অভিভাবকহীন হয়ে, আর অতুলসম্পত্তি পেয়ে, রমেশদা বিগ্‌ড়ে যাবে ; কিন্তু রমেশদার কোন রকম বে-চাল দেখা গেল না।—যখনি যাও, দেখ্‌বে—রমেশদা বইএর গাদার ভিতর ডুবে রয়েছে ! হিতৈষীরা স্তম্ভিত—আনন্দিত হ'ল ; কুৎসাকারীদের ক্ষোভের সীমা রইল না। রমেশদার সংসারে লোকের মধ্যে চাকর, 'বামুন' আর, জনকয়েক অনাথ ছেলে—স্কুলে পড়ে।

৬

রমেশদাকে যখন আমার অভিপ্রায় জানালুম, তখন দেখলুম, তাঁর মুখখানা—হঠাৎ কঠিন হয়ে, আবার তখনই—ম্লান হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে, সে আমায় বল্লে—"কাকাকে (অর্থাৎ আমার বাবাকে) একথা বলেচিস্ ?"—আমি বল্লুন—"না।"

"তবে"—বলিয়া রমেশ দাদা, কেমন ধারা হ'য়ে, আমার পানে তাকিয়ে রইল।

"তবে—কি ? তুমি আমায় নিয়ে রেখে আস্‌বে। পার্ব্বে না ?"

"কাকাকে না জানিয়ে ?"

আমি বল্লুম—"হ্যাঁ।"

"কাকী মা ?"

"কেউ না।"

"আচ্ছা, ভেবে বল্‌ব-'খন।"

আমি বল্লুম—"ভাব্‌বার-টাব্‌বার সময় নেই—পার্‌বে, কি না, এখনি বল্‌তে হবে।"

অনেকক্ষণ কি ভেবে, রমেশদা আগেকার মতন আমার দিকে উদাসভাবে চেয়ে বল্লে—"আচ্ছা।"

রমেশদার সেই চাহনিটায় আমার ভিতরটা কেমন পলকের জন্য শিউরে উঠ্‌ল ; কিন্তু তখনি নিজের মনে ধিক্কার এল !—ছিঃ !—কার সম্বন্ধে কি ভাব্‌চি !

তারপর সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগলুম—স্বামীর কাছে পালাবার।

সে দিন বাবার অসুখ করেছিল; মা বাবার কাছে বসে আছেন। আমি রমেশদাকে জানিয়ে এলুম—আজ ঠিক সুযোগ।

তখন রাত সাতটা হবে। আমি এককাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম—পা কেঁপে উঠ্ল। রমেশদার বাড়ীর দরজায় গাড়ী প্রস্তুত ছিল; না ভেবেচিন্তে, সেই গাড়ীতে উঠে পড়লুম। মনে তখন একবিন্দু আনন্দ ছিল না, কেবল উদ্বেগ—উৎকট উদ্বেগ—বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। খানিকদূর গাড়ী যেতেই আমি বলে উঠ্লুম—"না রমেশদা, আমায় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চল—আমার যেতে ইচ্ছে কচ্চে না!" রমেশদা একটু কঠোরস্বরে বল্লেন—"এ ভয়টা আগে হওয়া উচিত ছিল—এখন আর ফিরতে পারব না!" গাড়ী তীরবেগে ছুটে চল্ল।

. . .

"এ কোথায় এলাম রমেশদা ?—এ যে দমদমার পথে চলেছি।"

রমেশদা অন্যমনস্কভাবে বল্লে, "হু—এ—দমদমার পথ।"

"সেবার তো কই দমদমার পথে দেখিনি!"

"সেবার, বোধ হয়, ই. বি. এস্ আর দিয়ে গেছলেম।"

"এবার ?"

"ই. আই. আর দিয়ে যাচ্ছি।"

"ই. আই. আর দিয়ে দমদমা যাওয়া যায় ?" সন্দিগ্ধ-চিত্তে প্রশ্ন কল্লুম।

"দু-দিক্ দিয়েই যাওয়া যায়—চুঁচুড়া যেমন।"

"ই. বি. এস্ দিয়ে গেলে না কেন ?"

"এ সময় সে লাইনের ট্রেন্ নেই।"

আমি আরও কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম;—রমেশদা বলে উঠ্ল, "চুপ্ কর—আমার মাথাটা বড় ধরেচে—।"

৭

"এ কোথায় আন্লে রমেশদা—এ তো সে ষ্টেশন নয়!"

রমেশদা বিরক্তিভরে বল্লে—"আঃ! ই. আই. আর. দিয়ে আসচি যে!"

আমি সভয়ে, ষ্টেশনের ফটক পার হয়ে, ঘোড়ার গাড়ীতে উঠ্লুম। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, জিজ্ঞেস কল্লুম—"রমেশদা, সত্য বল—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?—"

রমেশদাদা গম্ভীরভাবে বল্লে—"ঠিক জায়গায়ই নিয়ে যাচ্চি।"

আমি আর মনের ভয় চেপে রাখতে পাল্লুম না—বল্লুম—"আমার মনে কেমন সন্দেহ হচ্চে।"

"সন্দেহ—কিসের ?" এমন তীব্রস্বরে রমেশদা এই প্রশ্ন কল্লে যে, আমি উত্তর দিতে সাহস কল্লুম না। প্রায় আধঘণ্টা পরে একটা অতি নির্জ্জনস্থানে এসে গাড়ী থাম্ল। রমেশদা বল্লে—"ইন্দু, নামো।"

গাড়ীর দরজা খুলে, আমি চমকে উঠ্লুম—নির্জ্জন অন্ধকারপ্রদেশে একখানা "বাঙ্লো"! আমি বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠ্লুম—"রমেশদা—এ কোথায় আমায় নামাতে বল্চ ?"

এবার রমেশদা গম্ভীরভাবে জবাব দিলে—"এ মধুপুর—আমার 'স্বপ্ননিবাস'।—আগে নামো সবকথা পরে শুনবে।"

আমার পা থর থর করে কাঁপতে লাগ্ল—তবু নামলাম। তখন কি করি! একটা ঘরে গিয়ে বসলুম—ঘরটা পরিষ্কার ফিটফাট সাজানো দেখলাম। দেয়ালে তিনখানা বড় বড় ছবি টাঙানো—তিনখানিই কাপড় দিয়ে ঢাকা।

রমেশদা আমার সঙ্গে ঘরে ঢুকে বল্লে—"ইন্দু, খাবার তৈরী, কাপড় চোপড় ছেড়ে খেয়ে নাও তারপর সব কথা শুনবে।"

আমি রাগে—ভয়ে—কাঁপ্তে কাঁপ্তে বল্লুম, "রমেশদা—তোমার এ সব কি ব্যবহার ? মা'র পেটের ভায়ের মতন তোমায় বিশ্বাস করেছিলুম—এই বুঝি তার ফল ?"

"কি বলচিস্ ইন্দু ? তোর রমেশদা তত হীন নয়। —জানিস্ আমি কেন বে' করিনি ?"

আমি বল্লুম—"আর জেনে কাজ নেই, রমেশদা—ঢের হয়েচে—খুব বিশ্বাস রেখেচ বটে!—"

"অত ভুল বুঝিস্নি, ইন্দু—অত কালো চশমার ভেতর দিয়ে তোর রমেশদার দিকে চেয়ে দেখিস্নে। শোন, তবে—কেন আমি বে' করিনি।"

আমি খুব রেগে বলে উঠ্লুম, "এমনি করে আমার সর্ব্বনাশ করবে বলে ?"

"না—তা নয়! স্বামীর প্রতি তোর ব্যবহার দেখে, তোদের জাতের ওপর আমার ঘেন্না হয়ে গেছে!"

আমিও আরও রেগে বল্লুম, "সেই খেলা নিয়ে, ঘরে জোর দিয়ে ব'সে থাকতে পারতে তো ;—আমার সঙ্গে এ চাতুরি কল্লে কেন ?—কেন আমায় কলঙ্ক মাথাতে এখানে আন্‌লে ?"

এবার উত্তেজিতস্বরে রমেশদা বল্লে—"কলঙ্ক মাথাতে আনিনি তোকে ইন্দু—তোকে তোর স্বামীর কাছেই এনেচি ;—চিনিস্—এ কে ?"—এই বলেই সে সেই ঢাকা ছবিগুলোর একখানার পর্দ্দা সরিয়ে ফেল্লে। আমি সাশ্চর্য্যে দেখলুম—আমার স্বামীর ছবি !

আমি ভীত—চকিত হ'য়ে বল্লুম, "এ ছবি—এ—এ—এখানে কেন ?—"

রমেশদা, ভ্রুকুটি ক'রে বল্লে, "তা শোন্‌বার ঢের সময় পাবি ; এখন আর একখানা ছাখ্—" এই বলে,আর একখানা ছবির পর্দ্দা তুলে ফেল্লে ! দেখলুম—তিনি রোগ-শয্যায় শায়িত !

আমি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লুম—"আশঙ্কার আগুনে এমন তিল-তিল ক'রে আমায় দোগ্ধো না।—বল—কি হয়েচে।"

রমেশদা কম্পকণ্ঠে বল্লে, "তবে ঐ ছবিখানা নিজে খুলে ছ্যাখ্—মূর্চ্ছা যাস্‌নি !"

আমি বল্লুম, "আমি ও দেখ্‌তে চাইনে—আমায় সব কথা খুলে বল !"

রমেশদা গম্ভীরস্বরে বল্লে, "বল্‌তে হবে না, দেখাতে হবে।—আমার সঙ্গে তবে আয় !"

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে—'বাঙ্‌লো' ছেড়ে মাঠের দিকে চল্লুম। খানিকদূর যেতেই অদূরে স্তম্ভের মতন কি একটা দেখা গেল ! রমেশদা সেইদিকে চ'ল্লো ; আমি তাঁর পিছনে। যখন সেই স্তম্ভটার কাছে গেলুম, তখন রমেশদা আমার পানে তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, "এই নে—তোকে তোর স্বামীর কাছে এনে দিলুম। আড়াই বছর আগে সে রোগ সারাতে এখানে এসেছিল—আর ফিরে যেতে পাল্লে না ! বাপ-মায় প্রাণধরে তোকে যে খবর জানাতে পারেনি, আমি আজ তা' জানালুম !"

তারপর কি হয়েছিল, মনে নেই। যখন জ্ঞান হ'ল—দেখলুম—স্বামীর শ্মশানে—স্মৃতিস্তম্ভের মূলে—লুটিয়ে পড়ে আছি ! হায়, ক্ষমা চাইবারও অবসর দিলে না !

সংসার-রীতি

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু]

কৃষক-কুটীরে যবে বিনাশি আঁধার,
প্রদীপ প্রদানে আলো ধীরে ধীরে জ্বলি ;
বায়ু আসি হরি ল'য় আয়ুটুকু তার,
কুটীর আঁধার করি যায় দ্রুত চলি।
ভীষণআকারে বহ্নি ধরি নিজ কায়,
গ্রাসিতে উদ্যত হয় যবে সে কুটীর ;
বায়ুর বিক্রম সেথা সব দূরে যায়,
অনলের হয় সখা, নমে উঁচু শির !
সবলের পাশে হায় কেহ নাহি আসে,
যার যত পরাক্রম দুর্ব্বলের পাশে।

মন্দ্র

[শ্রীকুলচন্দ্র দে]

পুঞ্জ পুঞ্জ স্বর্ণ ঢালি অস্তাচলে তপন মিলায়,
কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্প ঝরে গন্ধ তার বাতাস বিলায়,
বিন্দু বিন্দু ঝরে মেঘ বসুন্ধরা ফলশস্যে সাজে,
"ইন্দ্র"* যায়—"মন্দ্র" তার সুধীচিত্তে চিরদিন বাজে।

* ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নূরজহান

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেহেরুন্নিসার জন্ম, ৯৮৪ হিঃ

নূরজহানের পিতা ঘিয়াস বেগ পারস্য দেশের একজন সম্ভ্রান্তলোক ছিলেন। তিনি শাহ্ তমাস্প রাজার অধীনে খোরাসানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পিতা খাজা মহম্মদ তোহ্রাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার এমন অর্থকষ্ট উপস্থিত হয় যে, রাজার রাজস্ব পর্য্যন্ত বাকী পড়ে। এই কারণে তিনি সপরিবারে দেশত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে বহু সার্থবাহ হিন্দুস্থানে যাতায়াত করিত। ঘিয়াসও হিন্দুস্থানে আসিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা সমভিব্যাহারে পথিকদলের সহিত যোগদান করিলেন। পথের মধ্যে দস্যুদের হস্তে পড়িয়া তাঁহারা নিঃস্ব হইলেন। পাঁচ ছয় দল যাত্রীর মধ্যে দুইটি উষ্ট্র ব্যতীত সমস্তগুলি মরিয়া গেল। পথক্লিষ্ট যাত্রীরা সময়ে সময়ে তাহাদের উপর আরোহণ করিয়া পথশ্রম দূর করিত। এদিকে ঘিয়াস-পত্নী গর্ভবতী থাকায় তিনি প্রায় অধিকাংশ সময়ই উষ্ট্রপৃষ্ঠে অতিবাহিত করিতেন। এইভাবে কান্দাহারের নিকট পৌঁছিলে মেহেরুন্নিসার জন্ম হইল। ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত ঘিয়াস-পত্নী প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন—তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার কেহ ছিল না। স্তনেও যথেষ্ট দুগ্ধ দেখা দিল না। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া, তাঁহারা রাত্রিকালে গোপনে পথিকদলের মধ্যে কন্যাটিকে রাখিয়া দেন। পরদিন প্রাতে পথিকগণের যাত্রার অনতিকাল পূর্ব্বে দলপতি মালিকমাস্দের এক ভৃত্যের কর্ণে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছিল। সে তৎক্ষণাৎ কন্যাটিকে লইয়া প্রভুর নিকট উপস্থাপিত করিল। সদ্যোজাত শিশুর সুন্দর মুখকমল দেখিয়া, অপুত্রক মালিকমাস্দ দয়াপরবশ হইয়া, তাহাকে লালন-পালন করিবেন, স্থির করিলেন। কন্যাটির স্তন্যপানের কোন সুবিধা না দেখিয়া মাস্দ, ঘিয়াস ও তাহার পত্নীকে সাদরে ডাকাইয়া আনিলেন ও বহুবিধ ধন রত্নাদি দিয়া ঘিয়াস-পত্নীকে কন্যার ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন।

মালিকমাস্দ প্রতি বৎসরই পারস্য হইতে পথিকদল লইয়া ভারতে আসিতেন। তিনি ফতেপুর শিক্রীতে উপনীত হইয়া, বাদশাহকে নানা মূল্যবান্ দ্রব্য উপঢৌকন দিলেন। আকবর উপহার দেখিয়া মাস্দকে বলিলেন,—"এবারের কোন উপহারই আমার তত ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না।" ইহাতে মাস্দ উত্তর করিলেন,—"শাহান্ সা! আমরা নগণ্য বস্ত্র-বিক্রেতা; আমাদের কোন্ উপহার আপনার উপযুক্ত হইতে পারে? তবে এ বৎসর আপনার জন্য কয়েকটি সজীব জহরৎ আনিয়াছি। এই সকল জহরৎ অমূল্য; যদি আপনি তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন, তবে দেখিবেন, এরূপ উপহার ইরাণ ও তুরাণ হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কখনও আনীত হয় নাই।" বাদশাহ সোল্লাসে তাঁহাকে ঐ সকল অমূল্য উপহার উপস্থাপিত করিতে আদেশ করিলেন। আকবর—ঘিয়াস ও তাঁহার পুত্র আবুল হোসেনকে (আসফ খাঁ) স্বীয় কর্ম্মচারিভুক্ত করিয়া লইলেন। সৌভাগ্যক্রমে

কার্য্যকুশলতার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মাস্থদ-পত্নীর বাদশাহের অন্তঃপুরে যাতায়াতের অনুমতি ছিল। তিনি মেহেরুন্নিসা ও তাহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া, প্রায়ই তথায় গমন করিতেন। ক্রমে ক্রমে মেহেরুন্নিসা যৌবনে পদার্পণ করিলেন—দিন দিন তাঁহার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি, তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্তঃপুরে মধ্যে মধ্যে যুবরাজ সেলিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। সেলিম তাঁহাকে আদর-আপ্যায়ন করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না; অধিকন্তু তিনি তাঁহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। উদ্ভিন্নযৌবনা মেহেরের হৃদয়েও ভালবাসার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। একদিন সেলিম মেহেরকে নির্জ্জনে পাইয়া, সোহাগভরে তাঁহার হাত ধরিলেন। মেহের পলাইয়া বেগমদের নিকট অভিযোগ করিল। অন্তঃপুরস্থ গুপ্তচরের সাহায্যে যথাসময়ে সমস্ত কথাই বাদশাহের কর্ণে পৌছিল।

আকবর চিরদিনই ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ ছিলেন। তিনি অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের মান সম্ভ্রমরক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিতেন। সেলিমের ব্যবহারের কথা শুনিয়া তিনি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও মেহেরুন্নিসাকে তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার অভিপ্রায়ে ঘিয়াসকে ডাকাইয়া শীঘ্রই তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। *

শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ

তুর্কজাতির আস্তাখলু শ্রেণীর আলিকুলী প্রথমে পারস্য-রাজ শাহ্‌তমাস্পের পরিবেষণকারী ভৃত্য ছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি সৌভাগ্যের অন্বেষণে ভারতে আসিয়া মুলতানে বাদশাহের কর্ম্মচারী খানখানানের অধীনে খ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। খানখানান তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার চেষ্টায় আলিকুলী বাদশাহের কর্ম্মচারিশ্রেণীভুক্ত হন ও মন্সবদারের পদলাভ করেন। আকবর এই অবসরে আলিকুলীর (শের আফগান) সহিত মেহেরের বিবাহপ্রদান করিলেন। সেলিমের নিকট হইতে মেহেরুন্নিসাকে দূরে রাখিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তিনি শেরকে বাঙ্গালা সুবায় বর্দ্ধমানে জায়গীর প্রদান করেন। পত্নীকে লইয়া শের সানন্দে বর্দ্ধমানে বাস করিতে লাগিলেন।

* অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার কর্ত্তৃক কাফি খাঁর অনুবাদ।

এই বিবাহের ফলে লড্‌লি বেগমের জন্ম—ইনি মেহেরুন্নিসা নামেও অভিহিতা হইতেন।

সেলিমের হৃদয়ে বরবর্ণিনী মেহেরের চিত্র প্রস্তরাঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বদা দৃঢ়াঙ্কিত ছিল—দূরত্ব বা কালের ব্যবধান তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই। যে মানসী-প্রতিমা শয়নে স্বপনে তাঁহার ধ্যেয় ছিল—তাহার পূজোপচারের জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন। পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর ৩ মাস বয়ঃক্রমকালে (১০১৪ হিঃ, ১২ই অক্টোবর, ১৬০৫) তিনি আগ্রার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং সর্ব্বাগ্রে কুতবুদ্দীন খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। কুতবুদ্দীন বাঙ্গালায় পৌছিয়া শের আফগানকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। "প্রেম ও কস্তুরীর গন্ধ যে লুকাইবার নহে" শের তাহা জানিতেন। তাই বাদশাহের অভিসন্ধি পূর্ব্বাহ্নেই গোপনে জানিতে পারিয়া, শের তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। অবশেষে কুতব স্বয়ং কোন কার্য্যব্যপদেশে শেরের জায়গীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শের অঙ্গরাখার নিম্নে বর্ম্ম ও তরবারি লুকাইয়া, কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত কুতবুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুতবুদ্দীন তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, নানা কথার পর বাদশাহের আযৌবন-পোষিত অভিলাষ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে পত্নীত্যাগ করিতে বলেন। শের এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে ক্রোধান্ধ হইয়া, কুতবুদ্দীনকে সবলে ছুরিকাঘাত করেন। পলায়নকালে কুতবুদ্দীনের একজন কাশ্মীরীভৃত্য পথরোধ করিয়া, শেরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে; ইহার মধ্যে কুতবের অন্যান্য অনুচর আসিয়া অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণনাশ করিল।

শেরের মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। শের—কুতবুদ্দীনের ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক গুরুতররূপে আহত হইয়া, সবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দেন। সম্রাটের হস্ত হইতে মেহেরের সতীত্বরক্ষার জন্য তিনি তাহাকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হন। গৃহে পৌছিয়া দেখেন—গৃহদ্বার বন্ধ ও তাঁহার শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী ক্রন্দন করিতেছেন। জামাতার সাড়া পাইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে তিনি বলিলেন—"এখন তোমার অন্দরে আসিবার প্রয়োজন নাই; তুমি

ঔষধালয়ে গিয়া ক্ষতের চিকিৎসা কর। মেহের ইতঃপূর্ব্বেই তোমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।” এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া রুধিরাপ্লুত শের প্রাণত্যাগ করেন। শুনা যায়, বুদ্ধিমতী মেহেরের মাতা পূর্ব্বেই শেরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, কন্যার জীবন-রক্ষার্থ এইরূপ ছলনা করিয়াছিলেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে (১০১৫ হিঃ) শের আফগান বর্দ্ধমানে কবি বহরাম শেকের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হন।

এইরূপে কিছুদিন অনাদৃতভাবে অতিবাহিত করিবার পর মেহেরের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হয়। রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১০২০ হিঃ, ১৬১১খৃষ্টাব্দ) নববর্ষ-উৎসবের দিন উপেক্ষিতা মেহেরুন্নিসার উপর আবার সম্রাটের সুনজর পড়ে। † আবার তিনি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এদিকে মেহেরের মন হইতে এক্ষণে স্বামি-শোকও কতকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছিল; তিনি এবার আর সম্রাটের প্রস্তাব

পীর বহরম
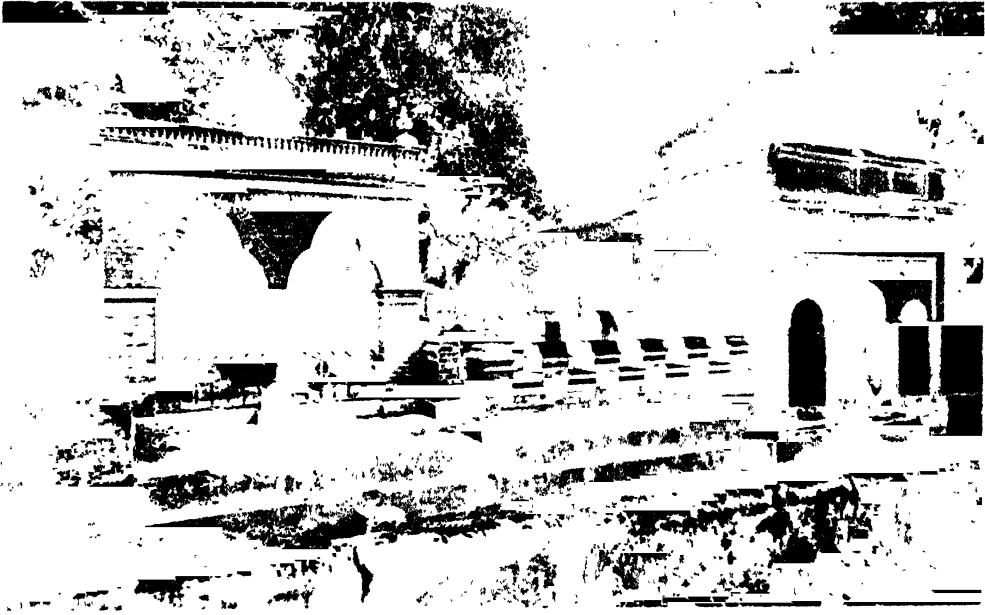
জাহাঙ্গীরের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ

(১৬১১—মে)

কুতবুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ যথাসময়ে রাজধানীতে পৌঁছিল। অবিলম্বেই মেহেরকে বন্দী করিয়া আনিবার আদেশ হইল। মেহের সম্রাটের সমীপে উপনীত হইলে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। সদ্যঃ-স্বামিবিয়োগবিহ্বলা মেহের সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মতি দিবার পূর্ব্বে স্বামি-হত্যার বিচারপ্রার্থনা করিলেন। জাহাঙ্গীর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া,তাঁহাকে পরিচারিকারূপে বিমাতা সলিমা সুলতান বেগমের হস্তে সমর্পণ করেন। *

প্রত্যাখ্যান করিলেন না। জাহাঙ্গীর মহাসমারোহে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই সময়ে মেহেরের বয়ক্রম আনুমানিক ৩৫ বৎসর।

বিবাহের পর হইতে মেহেরুন্নিসা “নূরমহল” নামে অভিহিতা হইতেন। পরে নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর রাজত্বের ১১বর্ষকালে স্বীয় নামের অনুকল্পে নূরমহলকে “নূরজহান” (অর্থাৎ জগজ্জ্যোতিঃ) আখ্যা প্রদান করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভেই নূরজহানের পিতা

* “তুজাক্”,“ইকবলনামা” ও “তাতিম্মা-ই-জাহাঙ্গীরীতে” উল্লিখিত আছে, মেহেরুন্নিসা সম্রাটের বিমাতা রুকিয়া বেগমের নিকট অবস্থান করেন। ‘মাসির-উল-উমরা’ সলিমা সুলতান বেগমের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

† কোন্ সময়ে জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন, এ কথা তিনি “তুজাকে” কোথাও উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাঁহাকে এক নববর্ষ উৎসবের দিন দেখিয়া পুনরায় মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করেন।

গিয়াস "ইৎমদ্দৌলা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, উজীরের পদে উন্নীত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র আসফ খাঁও উচ্চপদ-লাভ করেন।

নূরজহান

প্রেমে আত্মবিস্মৃত সম্রাট্ দিন দিন নূরজহানের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। শয়নে স্বপনে জাগরণে নূর জহান তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিত। সম্রাট্ মহিষীর এরূপ বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, সমস্ত রাজকার্য্য-পরিদর্শনের ভারও তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজদূত স্যার টমাস্ রো বাণিজ্যের সুবিধার্থ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সময় সম্রাট্ আজমীরে ছিলেন। রো তাঁহার পুস্তকে নূরজহান সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। রাজকার্য্যের ভার নূরজহানের হস্তে থাকায় তিনি বেগমকে বাণিজ্যের সুবিধাকল্পে বহু উপহার প্রদান করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে একখানি সুন্দর বিলাতী গাড়ী উল্লেখযোগ্য। রো বিলাত হইতে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবসায়ের জন্য আনিতেন, তৎসমুদয় নূরজহান স্বয়ং নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন (১৬১৭ খৃঃ, অক্টোবর)। তখনকার দিনে এ অনুগ্রহ বড় কম নহে।

জাহাঙ্গীরের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রথম বর্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু বিদ্রোহী হন। ইহার ফলে খসরু বিশ্বস্ত রাজপুত-কর্ম্মচারী অনুপরায়ের অধীনে নজরবন্দী হইয়া থাকিতে বাধ্য হন। নূরজহান, আসফ খাঁ, ইৎমদ্দৌলা ও খরম সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, খসরুকে ধরাধাম হইতে অপসারিত না করিলে, তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে কণ্টক থাকিয়া যাইবে; কারণ প্রজারা খসরুর বশতাপন্ন। যদি কখনও খসরু পিতার সহিত মিলিত হইবার সুবিধা পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত হইবে।

একদিন নূরজহান সম্রাটকে বুঝাইলেন যে, ভারতের ভাবী সম্রাট্কে রাজপুতের অধীনে রাখা কোনমতে যুক্তি-সঙ্গত নহে।* সম্রাট্ যখন মদ্যপানে একরূপ সংজ্ঞাশূন্য, তখন ইৎমদ্দৌলা ও আসফ খাঁ, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, খসরুর তত্ত্বাবধানভার খরমের উপর দেওয়াই কর্ত্তব্য। সম্রাট এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই; কিছুদিন পরে দাক্ষিণাত্য-গমনকালে খরম পিতাকে অনুরোধ করিয়া, খসরুর তত্ত্বাবধান-ভার আসফ খাঁর উপরে প্রদান করেন।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে খরম উদয়পুরের রাণাকে পরাজিত করিয়া, আজমীরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময় নূরজহান তাঁহাকে সম্মানার্হ বহুমূল্য পরিচ্ছদ, হীরকখচিত তরবারি, একটী অশ্ব ও একটী হস্তী প্রদান করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে মালিক অম্বর তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। (১৬১৭ খৃষ্টাব্দে) শাহ্-জহান দাক্ষিণাত্যে গিয়া তাঁহাকে বহুকষ্টে পরাজিত করেন। ইহার পর শাহ্জহান পিতার সহিত মাণ্ডুদুর্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে বহু উপঢৌকন প্রদান করেন। সম্রাট্ "আত্ম-জীবন-চরিতে" লিখিয়াছেন :—

"শাহ্জহানের নিকট হইতে আমি যে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার মূল্য ২০০০,০০০৲। ইহা ব্যতীত

* Embassy of Sir Thomas Roe—Foster, (Hak: Socy). Vol II, P. 281-3.

সে তাহার বিমাতা (?) [মূল 'তুজাকে' নূরজহানকে এইস্থলে মাতা 'ওয়ালিদা-ই-খুদ্' বলা হইয়াছে] নূরজহানকে ২০০,০০০৲ মূল্যের ও অপরাপর মাতাদের ৬০,০০০ টাকা উপহার দিয়াছিল।"

নূরজহান শাহ্‌জহানের এই জয়লাভ-ব্যাপারে এক বিরাট্ ভোজের আয়োজন করেন এবং শাহ্‌জহানকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি উপহার দেন। এমন কি, নূরজহান, শাহ্‌জহানের পুত্র ও অপরাপর স্ত্রীলোককেও বহুল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।*

"ওয়াকীতি-জাহাঙ্গীরীতে" লিখিত আছে, সম্রাট্ ১৬২০ খৃষ্টাব্দে নূরজহানের সহিত কাশ্মির গমন করেন। তথায় তাঁহার স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হইয়া পড়ে; কোন ঔষধেই ফললাভ না হওয়ায় তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। এই সময়ে দিবাভাগে একমাত্র মদ্যপানেই তিনি আরাম বোধ করিতেন। উত্তরোত্তর অধিক মদ্যপানে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়ে। তখন নূরজহান স্বয়ং তাঁহার শুশ্রূষার ভার লইয়া অল্পে অল্পে সম্রাটের মদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দেন ও তাঁহার খাদ্য ও পথ্যাদি সম্বন্ধে অধিকতর যত্নবতী হন। সম্রাট্ তাঁহার অক্লান্ত পরিচর্যায় অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিলেন।

আগ্রার উত্তাপ অসহ্য বোধ হওয়ায় জাহাঙ্গীর ১৬২১ খৃষ্টাব্দে জম্মু ও কাংগ্রার পার্ব্বত্য প্রদেশ অভিমুখে গমন করেন। তিনি বালুননামক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া, তথায় তাঁহার সুবৃহৎ তাঁবু ও লোকজন রাখিয়া, নূরজহান ও মাত্র জনকয়েক বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া কাংগ্রা যাত্রা করিলেন। নূরজহানের পিতা ইৎমদ্দৌলা পীড়িত থাকায় সম্রাটের সহিত গমন করেন নাই। পরদিন সম্রাট্ সংবাদ পাইলেন, ইৎমদ্দৌলার অবস্থা শোচনীয়। নূরজহান পিতার মৃতপ্রায় অবস্থার কথা শুনিয়া সম্রাট্‌কে অবিলম্বে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে অচেতনপ্রায় দেখিলেন। নূরজহান স্বামীর দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি উঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন?" মুমূর্ষু ইৎমদ্দৌলা বহুকষ্টে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন :—

"জননী গো আঁখি যার নিমীলিত চিরতরে।
উজ্জ্বল প্রভায় সেও চিনিবে পুলকভরে।"

ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই বৃদ্ধ ইৎমদ্দৌলার মৃত্যু হয় (১০৩১ হিঃ)।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর রো সুরাটে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, নূরজহান স্বীয় কন্যার (শেরের ঔরসজাত) সহিত বিবাহের জন্য খসরুর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই বিবাহ সংঘটিত হইলে খসরু যে নিশ্চিত মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর উপর অত্যধিক অনুরক্ত থাকায় নূরজহানের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এই বিবাহ সংঘটিত না হওয়ায়, নূরজহান সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার সহিত ১৬২১ খৃষ্টাব্দে কন্যার বিবাহ দেন ও তাহার ভবিষ্যৎ রাজ্যপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হন।

পূর্ব্বের ন্যায় নূরজহান এখন আর শাহ্‌জহানকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিলেন না—তাঁহার সম্প্রতি দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে বেগম ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং জামাতা শাহরিয়ার স্বার্থ-চিন্তায় তৎপর হইলেন।

১৬২২ খৃষ্টাব্দে (১০৩১ হিঃ) পারস্যসম্রাট্ কান্দাহার দুর্গ দখল করিলে, স্বার্থপর নূরজহানের পরামর্শে, সম্রাট্ শাহ্‌জহানকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু চতুর শাহ্‌জহান নানা ওজরআপত্তি করিয়া, দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলেন না। অবশেষে শাহরিয়ার কান্দাহার-বিজয়ে যাওয়া স্থির হইল। তাঁহার সমস্ত সৈন্য শাহরিয়াকে দিবার জন্য শাহ্‌জহানের উপর আদেশ হইল। ধূর্ত্ত শাহ-জহান সৈন্য সাহায্য না করিয়া, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং নূরজহান ও শাহরিয়ার জায়গীর দখল করেন। সম্রাট্ রণনীতিবিশারদ মহাবত খাঁ ও পুত্র পরভেজকে অবিলম্বে বিদ্রোহ-দমনে পাঠাইলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধে নানাস্থানে পরাজিত হইয়া, অবশেষে শাহ্‌জহান সপরিবারে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন ও তথা হইতে স্বীয় পুত্রদ্বয়—দারা ও ঔরঙ্গজেবকে প্রতিভূস্বরূপ পাঠাইয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। দারা ও ঔরঙ্গজেব লাহোরে সম্রাট্-দরবারে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হন ও নূরজহানের তত্ত্বাবধানে থাকেন।

* Tuzuk-i-Jahangiri—Trans. by Rogers; Ed. by H. Beveridge—Vol. I.

নূরজহানের ব্যাঘ্র-শিকার

তৎকালীন ভারতীয় বাদশাহদিগের বেগম ও দাসীগণের অধিকাংশই অশ্বারোহণ করিতে এবং তীর ও বন্দুক ব্যবহার করিতে পারিতেন; কিন্তু নূরজহান এই সকল কার্য্যে অনভ্যস্ত ছিলেন।

একবার জাহাঙ্গীর, খসরুর মাতা ও নূরজহানকে লইয়া শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। সে সময় একটা সুবৃহৎ ব্যাঘ্রকে জালের বেড়া দিয়া ঘেরাও করা হইয়াছিল। সম্রাট্ নানারূপ নেশায় অভ্যস্ত থাকায় মধ্যাহ্নকালে একটু বিশ্রাম করিতেন। প্রতিদিনের অভ্যাসমত এই দিনও তিনি ব্যাঘ্রকে মারিবার পূর্ব্বে নিদ্রাভিভূত ছিলেন। এদিকে ব্যাঘ্র ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বেড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িল। খসরুর মাতা দূর হইতে ইহা দেখিয়া, স্বামীর নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া, স্বয়ং বন্দুক লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে ব্যাঘ্রকে ধরাশায়ী করিলেন।

ব্যাঘ্রের তর্জ্জন-গর্জ্জন ও বন্দুকের শব্দে জাহাঙ্গীরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, রাণী বন্দুক হস্তে উৎফুল্ল মনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; আর অদূরে ভয়বিহ্বলা নূরজহান দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। সম্রাট্ রাণীকে বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও সেই দিন হইতে তাঁহার প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি নূরজহান বন্দুক-ব্যবহার শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন পরেই ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। রাজত্বের ১২ বর্ষে জাহাঙ্গীর বেগমদের লইয়া পুনরায় শিকারে বহির্গত হইলেন। ভৃত্যেরা ৪টা ব্যাঘ্রকে বেড়ায় ঘিরিল। নূরজহান স্বয়ং তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি চাহিলেন ও অব্যর্থ লক্ষ্যে দুইটা ব্যাঘ্রকে দুইটী গুলিতে ও বাকী দুইটীকে, দুইটী করিয়া চারিটী গুলিতে বধ করেন। * "তুজাকে" সম্রাট্ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত এরূপ সুন্দর লক্ষ্যে ব্যাঘ্র-শিকার আর কখনও দেখেন নাই। হস্তীতে আরোহণ করিয়া, হাওদার ভিতর হইতে চক্ষের পলকে চারিটী ব্যাঘ্র শিকার করা কম পারদর্শিতার কাজ নহে। জাহাঙ্গীর, ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, নূরজহানকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের এক জোড়া হীরার পুঁছি (bracelet) ও ১০০০ হাজার আসরফি উপহার দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সম্রাটের একজন সভাসদ্ একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—তাহার ভাবার্থ এইরূপ :—

"নূরজহান যদিও স্ত্রীলোক, তথাপি মনুষ্যের বেশে তিনি 'জান্-ই-শের আফগান' অর্থাৎ—ব্যাঘ্রহন্তা শের আফগানের স্ত্রী; অথবা আফগান-নর-শার্দ্দূলের সমুচিত দণ্ডদাতা।"

* "ওয়াকিয়াৎ-ই-জাহাঙ্গীরীতে" মথুরার নিকট একটী ব্যাঘ্র-শিকারের উল্লেখ আছে। Elliot—VI—366.

নূরজহানের প্রাধান্য

ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগকে নূরজহানের রাজত্বকাল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট্ নিজেই বলিতেন,—"নূরজহানকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে বিবাহ কি, তাহা আমি জানিতাম না। নূরজহানকে আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও রাজ্যভারগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাহার উপর শাসনকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছি। আমি মাত্র একটু মদ্য ও কিঞ্চিৎ মাংস পাইলেই সন্তুষ্ট।"

একমাত্র সম্রাটের প্রার্থনা 'খুৎবা' ব্যতীত রাজ্যের যাবতীয় কার্য্যই নূরজহান দেখিতেন—জাহাঙ্গীর নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। নূরজহান সম্রাটের পরিবর্ত্তে স্বয়ং প্রাতঃকালে "ঝরোকাতে" বসিতেন—প্রজাবৃন্দ রাজদর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিত। এই সময়ে সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীরা রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিতেন।

তৎকালীন ফার্ম্মাণে রাজমোহরের পার্শ্বেও নূরজহানের নাম সংযুক্ত থাকিত। এমন কি মুদ্রাতেও জাহাঙ্গীর নূরজহানের নাম যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রায় লেখা থাকিত :—

"সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশানুসারে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রায় সম্রাজ্ঞী নূরজহানের নাম সংযুক্ত আছে, সেই স্বর্ণের মূল্য শতগুণ অধিক।"

নূরজহানের বহু জায়গীরও ছিল। আজমীরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে রামসির নামক স্থানের সন্নিকটে তাঁহার অধিকাংশ জমিদারী ছিল। বোদা (টোডা?) পরগণাও নূরজহানের জায়গীরভুক্ত ছিল। সম্রাট্, খরমের

দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের সংবাদ নূরজহানের নিকট প্রথম জানিতে পারিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন এবং তাঁহাকে এই পরগণা দান করেন। ইহার আয় ২০০,০০০ টাকা।*

প্রজাবর্গ নূরজহানকে খুব সম্মানের চক্ষেই দেখিত। যে কেহ তাঁহার অনুগ্রহ-ভিখারী হইত, নূরজহান কখনও তাহাকে বঞ্চিত করিতেন না। তিনি বহু অনাথ বালিকাকে অর্থ-সাহায্য, এমন কি, স্বীয় ব্যয়ে তাহাদের বিবাহ পর্যান্ত দিয়া দিতেন। এইরূপে তিনি অন্যূন পাঁচ শত বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন।

নূরজহানের সৌন্দর্য্যবোধও খুব প্রবল ছিল। তিনি স্বয়ং "আতর-ই-জাহাঙ্গীরী"† নামে এক সুন্দর গোলাপ সারের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পেশোয়াজের দুদামি, উড়ানীর (veils) পাঁচতোলিয়া, বাদ্‌লা (brocade), কিনারী (lace) এবং ফরাস-ই-চন্দনী—তাঁহারই মস্তিষ্ক-প্রসূত।‡

আকবর-মহিষী সলিমা সুলতান বেগম ও ঔরঙ্গজেব দুহিতা জেবুন্নিসার ন্যায় নূরজহানও "মক্‌ফি" (অর্থাৎ গুপ্ত) নাম ব্যবহার করিয়া, পারস্যভাষায় বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—"যে সমস্ত গুণের জন্য তিনি সম্রাটের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অন্যতম।" §

মহাবত খাঁর বিদ্রোহ ¶

মহাবত খাঁর সহিত আসফ খাঁর পূর্ব্ব হইতেই মনো-মালিন্য ছিল। আসফ তাঁহাকে অবমানিত, অপদস্থ, এমন কি, তাঁহার জীবননাশের চেষ্টায় নিরত ছিলেন। শাহ্‌জহানের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে মহাবতকে বাঙ্গালা হইতে আসিতে আজ্ঞা করা হইল। ইহার মূলে যে আসফ খাঁ আদেশ, তাহা মহাবতের বুঝিতে বাকী রহিল না। ভাবী বিপদাশঙ্কায় মহাবত স্বয়ং ৪।৫ হাজার রাজপুত সৈন্য লইয়া সম্রাট্ সকাশে যাত্রা করিলেন।

জাহাঙ্গীর তখন বেহাট নদীর তীরে তাঁহার প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আসফ-শত্রু মহাবতও তাঁহার লোকজনের সমাবেশ দেখিয়া, মনে মনে সন্দেহ করিয়া, পূর্ব্বাহ্নেই সম্রাট্ ও নূরজহানকে বিপদের মুখে ফেলিয়া, সেতু পার হইয়া, নিজ আবাসাভিমুখে পলায়নপর হন।

মহাবত লোকজন লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট্ বাহির হইয়া আসিলেন। মহাবত তাঁহাকে বলিলেন, "এখন অশ্বারোহণে শিকারে যাইবার সময়, অতএব অবিলম্বে শিকারের বেশে আমার সহিত আপনাকে যাইতে হইবে।" সম্রাট্ কৃতঘ্ন মহাবতের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহার সহিত বাহির হইলেন। মহাবত সম্রাটকে নিজের আবাসে লইয়া গেলেন। এতক্ষণ তাঁহার নূরজহানের কথা মনে পড়ে নাই। সুচতুরা বেগম বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কিছুতেই নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না, বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় সম্রাটের সহিত প্রাসাদে ফিরিলেন; কিন্তু তথায় নূরজহানকে দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন, তিনি পলাইয়াছেন।

এদিকে নূরজহান, সম্রাটকে শিকারের বেশে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি শিকারে গিয়াছেন। তিনিও এই অবসরে একজন খোজার সহিত সেতু পার হইয়া, ভ্রাতা আসফ খাঁর আবাসে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া সমস্ত শুনিতে পাইলেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতা ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে তিরস্কারের ভাষায় বলিলেন—"তোমাদের তাচ্ছিল্য ও অব্যবস্থার জন্যই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। যাহা কখনও কল্পনায় উদিত হয় নাই, তাহা আজ বাস্তবে পরিণত হইল। এক্ষণে তোমরা নিজেদের ব্যবহারে কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া, সম্রাটকে বিপদের মুখে ফেলিয়া, এখানে নীরবে অবস্থান করিতেছ?

---

* Tuzuk-i-Jahangiri : Trans by Rogers and Edited by H. Beveridge, Vol. I, 380.

† Ain-i-Akbari, Blochmann, Vol. I.

কিন্তু "তুজাকে" (Vol. I, 270-1) উল্লিখিত আছে, জাহাঙ্গীরের বিমাতা সলিমা সুলতান বেগম, সম্রাটের রাজত্বের ৯ম বর্ষে ইহার আবিষ্কার করেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহার পূর্ব্বেই ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কারণ, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৭ম বর্ষে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সলিমার মৃত্যু হয়।

‡ দুদামি—ওজনে দুই দাম: পাঁচতোলিয়া - ওজনে পাঁচ তোলা। ফরাস-ই-চন্দনী - চন্দনকাষ্ঠের বর্ণ-বিশিষ্ট কার্পেট।

§ "One of the accomplishments by which she captivated Jahangir, is said to have been her facility in composing extemporary verses."

Beale-Keene's Oriental Biography.

¶ "ইকবলনামা-ই-জাহাঙ্গীরী" হইতে।

এই কালিমা দূর করিবার জন্য অবিলম্বে উপায় নির্দ্ধারণ কর।” অবশেষে স্থির হইল, পরদিন তাঁহারা সৈন্যসামন্ত লইয়া, বিদ্রোহীকে সমুচিত শাস্তি দিয়া, সম্রাটের উদ্ধার-সাধন করিবেন।

এদিকে মহাবত লোকজন লইয়া সেতু পুড়াইয়া দিলেন। আসফ ও অন্যান্য সকলে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে নদীপার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নূরজহান স্বয়ং তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে চলিলেন। সুগভীর নদীতে পড়িয়া তাঁহারা সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ নদী পার হইলে, শত্রুসৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। বেগমপক্ষীয় লোকজন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই সময় নূরজহান নাদিম নামে একজন খোজাকে দিয়া নবাব মহম্মদ* ও অন্যান্য অনুচরকে বলিয়া পাঠাইলেন— “এখন বিলম্ব বা ইতস্ততঃ করিবার সময় নহে। প্রবল পরাক্রমে শত্রুকে আক্রমণ কর,—নিশ্চয়ই তাহারা পলাইবে।”

এদিকে শত্রুরা অগ্রসর হইতে লাগিল। নদীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বেগমপক্ষীয় সৈন্যেরা পলায়নপর হইল। নূরজহানের নিকট তাঁহার জামাতা শাহরিয়ার শিশুকন্যা ছিল। এই সময় শিশুর ধাত্রীর হস্তে শত্রুর তীর আসিয়া বিঁধিল। নূরজহান স্বয়ং তাহার হস্ত হইতে তীর বাহির করিয়া দিলেন—তাঁহার বস্ত্র রক্তাক্ত। যে হস্তীতে বেগম আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। রাজপুতেরা বেগমের হস্তিঅভিমুখে নিষ্কাশিত অসি হস্তে ছুটিল। হস্তিচালক কোন উপায় না দেখিয়া হস্তীকে পরপারে লইয়া যাইতে বাধ্য হইল। সম্রাটের উদ্ধার হইল না; তাঁহাকে মহাবতের নজরবন্দী থাকিতে হইল।

*   *   *   *

কাবুল অবস্থানকালে সম্রাট্ নূরজহানের সহিত একদিন শা-ইসমাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। “ইকবলনামায়” কোন্ সময়ে নূরজহান সম্রাটের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

সম্রাটের পলায়ন

সম্রাটের মধুর স্বভাবগুণে এক্ষণে মহাবতের সহিত তাঁহার পুনরায় মিলন সংঘটিত হইয়াছে। তিনি মহাবতকে খুব অনুগ্রহদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মহাবতও সম্রাটকে করতলগত করিয়াছেন ভাবিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।* * * নূরজহান গোপনে সম্রাট্‌কে যে সমস্ত কথা বলিতেন, তৎসমুদয় জাহাঙ্গীর মহাবতকে খুলিয়া বলিতেন; অধিকন্তু মহাবতের বিরুদ্ধে নূরজহানের যে একটা অভিসন্ধি আছে, ইহাও একদিন সম্রাট্ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। এইরূপে জাহাঙ্গীর মহাবতের হৃদয় অধিকার করিলেন। এক্ষণে মহাবতও সম্রাটের উপর আর কোন সতর্ক প্রহরী রাখিবার প্রয়োজন দেখিলেন না।

নূরজহান মহাবতের বিরুদ্ধে গোপনে ও প্রকাশ্যে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি গোপনে অর্থের সাহায্যে* নিজে বহু সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। এদিকে তাঁহার খোজা হুসিয়ার খাঁ তাঁহার পত্র পাইয়া, লাহোরে ২০০০ লোক সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। পরে সম্রাট্ও কৌশলে পলাইয়া, নূরজহানের সৈন্যদলে আসিয়া যোগদান করিলেন।

মহাবত জাহাঙ্গীরের এই আকস্মিক পলায়নে বিস্মিত হইলেন। সম্রাট্ অবিলম্বে আসফকে মুক্তি দিবার জন্য মহাবতের উপর আদেশ পাঠাইলেন। মহাবত বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি নূরজহানের জন্য এখন নিরাপদ নহেন; এক্ষণে আসফকে মুক্তি দিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হইবে। কাজেই যতক্ষণ না তিনি লাহোর অতিক্রম করেন, ততক্ষণ তিনি আসফকে মুক্ত করিয়া দিবেন না। মহাবতের এই উত্তরে নূরজহান ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে আসফকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ পাঠাইলেন। অবশেষে মহাবত ভীত হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু

(১৬২৭ খৃষ্টাব্দ)

বৃদ্ধবয়সে সম্রাটের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার উপর

* ইনিই ‘ইকবলনামা-ই-জাহাঙ্গীরী’-রচয়িতা—অপর নাম মহম্মদ সরিফ; ইনি সম্রাটের বক্সী ছিলেন।

* নূরজহান মহাবতের বিরুদ্ধে অভিযান-ব্যাপারে স্বয়ং ১২ লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

Ain-i-Akbari, Blochmann, Vol. I, P. 338.

অল্পদিন হইল, খসরু ও পরভেজের মৃত্যুশোকে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। শরীরের অবস্থা সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া, তিনি কাশ্মির হইতে লাহোরে ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন। শাহরিয়া ইতঃপূর্ব্বেই লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পথে কাশ্মিরের রাজোরি প্রদেশের নিকট ৫৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল (১৬২৭, ২৮শে অক্টোবর)। তথা হইতে তাঁহার মৃতদেহ লাহোরে আনিবার ব্যবস্থা হইল। পরদিবস অনুচরবর্গ সকলেই পর্ব্বত-অবতরণ করিয়া বিম্বর প্রদেশে উপস্থিত হইল।

সম্রাটের মৃত্যুর পর নূরজহান ভ্রাতা আসফ খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু আসফ নানা ছল করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বহুপূর্ব্ব হইতেই জামাতা শাহ্‌জহান যাহাতে রাজত্ব পান, তাহার জন্য তিনি সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন—অপরদিকে নূরজাহানও স্বীয় জামাতা শাহরিয়া যাহাতে সিংহাসন লাভ করেন, তাহার আয়োজন করিতেছিলেন।

খসরুর পুত্র বুলাকী (দাওয়ার বক্স) নূরজহানের কৌশলে শাহরিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকিতেন; এক্ষণে শাহরিয়া লাহোরে গমন করায় ইরাদৎ খাঁর উপর বুলাকীর তত্ত্বাবধান ভার পড়ে। আসফ খাঁ ও ইরাদৎ অবিলম্বে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শাহ্‌জহানের নিকট পাঠাইলেন ও বুলাকীকেই সম্রাট্ করিবেন, এইরূপ লোভ দেখাইয়া, তাহাকে লইয়া লাহোরের রাজপ্রাসাদ-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান সভাসদ্ ও অপরাপর কর্ম্মচারীরা যখন আসফ খাঁর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা একে একে সকলেই আসফের দলভুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাহরিয়া সম্রাটের মৃত্যুর পূর্ব্বে লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র পত্নীর পরামর্শে অবিলম্বে লাহোরের রাজকীয় ধনসম্পত্তি অধিকার করিলেন ও নিজে সিংহাসন-লাভের জন্য লোকজন-সংগ্রহে বিপুল অর্থ বিতরণ করিলেন।

"বাদসানামায়" লিখিত আছে,—শাহরিয়া সম্রাটের মৃত্যুর পর স্বার্থান্ধ হইয়া অবিলম্বে লাহোরে ফিরিয়া আসেন। নূরজহানের ইচ্ছা ছিল, মূর্খ শাহরিয়া সম্রাট্ হইলে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ন্যায় তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। এই বৃথা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, নূরজহান যত শীঘ্র সম্ভব সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য শাহরিয়াকে পত্র লেখেন। *

অপরদিকে আসফ, বুলাকী ও লোকজনবর্গ লাহোর হইতে তিন ক্রোশ দূরে শাহরিয়ার সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে শাহরিয়া পরাজিত হন।

ইহার অনতিকাল পরেই শাহ্‌জহান আসিয়া সিংহাসন দখল করিলেন। আসফ খাঁ নূরজহানের মহল হইতে দারা ও ঔরঙ্গজেবকে লইয়া আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। মমতাময়ী মমতাজ বহুদিন পরে প্রাণপ্রিয় পুত্রদ্বয়ের দর্শন পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৬২৮)।

নূরজহানের শেষজীবন

জাহাঙ্গীরের ঔরসে নূরজহানের কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই।
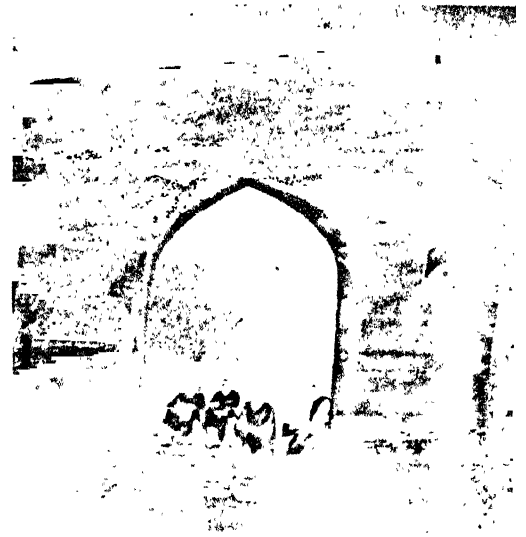
লাহোরে নূরজহানের সমাধির বহির্ভাগ

* Nurmahal who had been the cause of much strife and contention, now clung to the vain idea of retaining the reins of government in her grasp, as she had held them during the reign of the late Emperor. She wrote to Shahriyar advising him to collect as many men as he could and hasten to her.

Badshah-Nama—Elliot, vii, 5
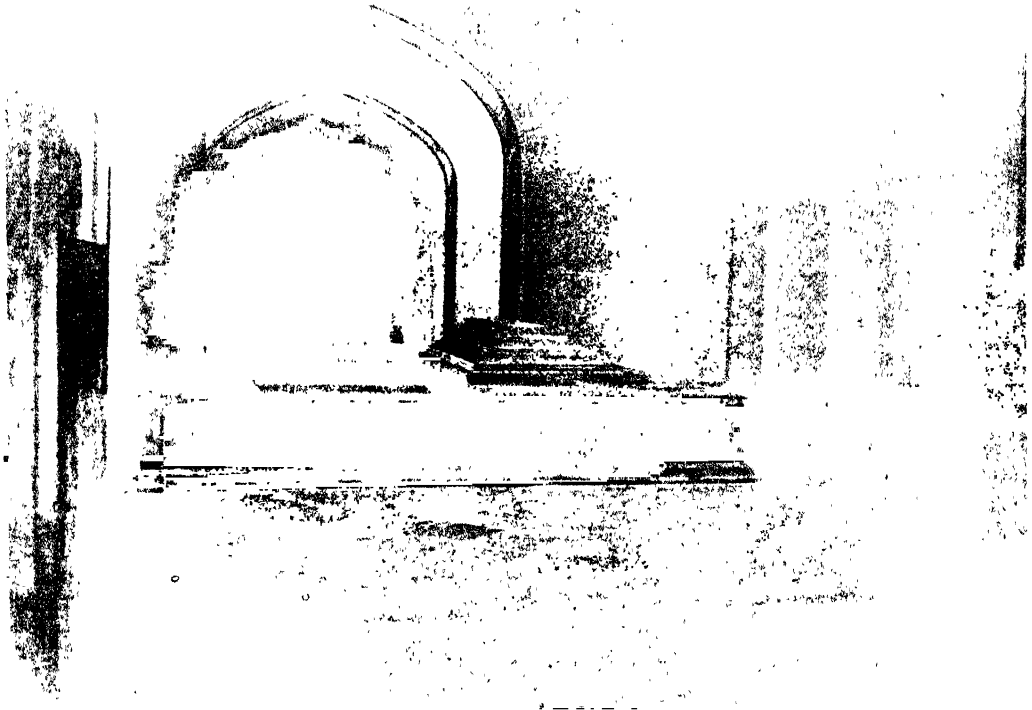
নুরজহানের সমাধি

শাহ্‌জহান সম্রাট হইয়া তাঁহার জন্য বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন; * কিন্তু তিনি বেগমের সহিত যে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, একথা বলা যায় না। কাফি খাঁ বলেন,—জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নুরজহান হিন্দু বিধবার ন্যায় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন; স্বেচ্ছায় কোন উৎসব বা আমোদ আহ্লাদের ব্যাপারে যোগদান করিতেন না, কেবল স্বামীর স্মৃতি বুকে করিয়া, মনোদুঃখে নির্জ্জনে দুঃখের দিন অতিবাহিত করিতেন। †

নুরজহান ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, স্বামীর মৃত্যুর ১৮ বৎসর পরে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে (২৯ শওয়াল, ১০৫৫ হিঃ) লাহোরে মৃত্যুমুখে পতিতা হন। মৃত্যুর পর স্বামীর সমাধির সন্নিকটে শাহদারায় তিনি নিজে যে সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথায় সমাহিতা হন। *

* Elphinstone ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে, নুরজহান মাসিক লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন।

† "পাদিশানামায়" (Vol. II, 475) নুরজহানকে পুনরায় এইস্থলে "নূরমহল" বলিয়া অভিহিতা করা হইয়াছে।

* লাহোরে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সমাধি বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় থাকিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর লাহোরে গমন করিয়া, এই দৃশ্যদর্শনে ব্যথিত হন এবং এই সমাধির সংস্কারের জন্য ৫০০০ টাকা দান করেন। এই প্রবন্ধে যে দুইখানি সমাধির চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা সেই সংস্কৃত সমাধির চিত্র।

সমস্যা

[শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, এম. এ.]
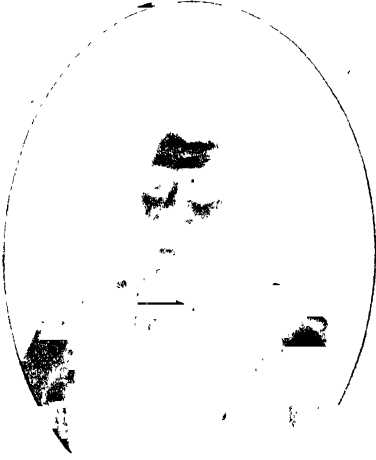
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, এম. এ.

আমার বুড়া লইয়াই কারবার করিতে হয়। তাই মনে হয়, যদি "আদ্যিকালের বুড়োটাকে" একবার পাইতাম! কিন্তু আমি ত "চন্দ্রহাস" নই যে, গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধরিতে যাইব। কোনও কোটাল ত এতদিন আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই যে, সেই "চিরকালের বুড়ো" "আমাদের খোঁজ করচে," কেন না "সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের পরে তার বড় লোভ।" আজ যিনি এ বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

*　　*　　*

'ফাল্গুনী'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"এই মর্ত্ত্যের লেখনী...আলোর নকল কতটা করিতে পারে জানি না, কিন্তু ঝাপসা...করিতে চমৎকার হাত পাকাইয়াছে। খুব বড় দূরবীণ এবং খুব জোরালো অণুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর অর্থ?—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।" কেন যে তিনি গোড়াতেই এই কথা বলিয়া লইলেন, তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। অ... নাটকখানির শেষে চন্দ্রহাস বলিতেছেন—"অর্থ না থা... মানুষের যে দশা হয়, তোমার তাই হবে। অর্থাৎ প... লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে, কোটাল তোমাকে... অবোধ, পণ্ডিত বলবে অর্ব্বাচীন, ঘরের লোক... অনাবশ্যক, বাইরের লোক বলবে অদ্ভুত।" আমি তাঁ... অবোধ, অর্ব্বাচীন, অনাবশ্যক, অদ্ভুত বলিয়া ত্যাগ কর... ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহি।

*　　*　　*

অবশ্য স্বীকার করি যে, আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে মাঝে এক আধ জন অর্ব্বাচীন লেখকের সাক্ষাৎ... যায়, যাহার রচনা পাঠ করিলে, ডষ্টয়ভ্স্কির একটা ক... পড়িয়া যায়। একদিন তিনি একটি বন্ধুর সহিত... করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন তরুণ লেখক... তাহাকে নিজের রচিত একটি প্রবন্ধ শুনাইবার জন্য প্রকাশ করিল। ধীরভাবে তাহার সহিত আলাপ... তাহাকে বিদায় দিয়া ডষ্টয়ভ্স্কি বন্ধুকে বলিলেন, ছোক্‌রাটির কি দরকার জান?—তের বছর সাই... বাস। তা' হ'লে ও মানুষ হবে।" তিনি নিজে... বিবিরিয়ায় বন্দী ছিলেন। আমাদের দেশে এম... বলিবার লোক আছে কি?

*　　*　　*

আমি বলিতেছিলাম, কেন যে অর্থমনর্থং... লিখিয়া গোড়াতেই লেখক নিজের লেখার উপর... প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। স... এখনই বলিয়া উঠিবেন—ফাল্গুনীর আগাগোড়া বুঝা গেল না; বস্তুতন্ত্র নহে,—ইত্যাদি; বস্তুতন্ত্রবি... আগেই সে সমালোচনা করিয়া রাখিয়াছেন,—

"আমার কবিতা ত তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর ম...

কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে।
এতে সার আছে রে, ভার আছে।
যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।"

*　　*　　*

নিছক্ mystic কাব্য লিখিতে বসিয়া, লেখক সমালোচকের ভ্রূকুটির কথা ভুলিতে পারেন নাই। দিগ্বিজয়ী কবিবর একদিন সব্যসাচী ফাল্গুনীর মত গদ্য-পদ্যের নিশিত শরজালে অরাতির মনে ভীতিসঞ্চার করিয়াছিলেন। 'সাধনা'র যুগে তাঁহার মত সমালোচক বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে ছিল না। সে সময়ে ইংরাজি সাময়িক সাহিত্যে বার্ণার্ড্ শ বরেণ্য সমালোচক। তিনি লিখিলেন,—এই গণতন্ত্রের যুগেও জনগণ সমালোচকের কাছে মাথা হেঁট করে। সমালোচনায় উপকার ত হয়ই, আনন্দও আছে। সেই আনন্দের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—'It has positive popular attractions in its cruelty, its gladiatorship, and the gratification given to envy by its attacks on the great, and to enthusiasm by its praises ·' আজ বার্ণার্ড্ শ'র নামোচ্চারণে সমগ্র ইংরাজ জাতি ঘৃণায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে; আর বাঙ্গালার সব্যসাচী ফাল্গুনী দিগ্বিজয় করিয়া, সাহিত্যের রাজটীকা ললাটে পরিয়া বিরাজ করিতেছেন।

*　　*　　*

তবুও তিনি সমালোচকের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না; আর বার্ণার্ড্ শ আরো সুর চড়াইয়া ইংরাজি পত্রিকায় ইংরাজ জাতির ও ইংরাজ সমালোচকের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতেছেন। সে নিন্দাবাদে কোনও ঘোর প্যাচ নাই, আব্‌ছায়া নাই; বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না; সোজাসুজি, খোলাখুলি লেখা। তিনি চিরদিনই ইংরাজকে কটু কথা শুনাইয়া দিয়া আসিতেছেন; এ নকার সমর-প্রসঙ্গেও তাঁহাকে দোষ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। যে ব্রিটিশ-সিংহের কেশর ধরিয়া তিনি ক্রীড়াচ্ছলে কৌতুক করিয়া আসিতেছেন, আজ তাহার রণোন্মাদের বিভীষিকায় তিনি তাঁহার Lion প্রবন্ধে বিশ্বের সমক্ষে তাহাকে স্বার্থান্ধ পশুরাজ বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিলেন। ইংরাজ এতদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার কশাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। আজ (বঙ্কিমের ভাষায় বলা যাইতে পারে)—"সুপ্ত সিংহ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল; মুমূর্ষু প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল—কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী!…"

*　　*　　*

ঠিকই ত; ইংরাজি সাহিত্যক্ষেত্রে যদি কেহ সন্ন্যাসী থাকেন, ত সে বার্ণার্ড্ শ। বহু পূর্ব্বেই ত তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন,—তোমাদের সুকুমার কলা, তোমাদের সমাজনীতি, তোমাদের ধর্ম্ম আমি আদৌ পছন্দ করি না। আমি আইরিশম্যান্; কিন্তু যে দেশ আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহার প্রতি আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই; যে দেশে বাস করিতেছি, তাহার প্রতিও তদ্রূপ। "I had no taste for what is called popular art, no respect for popular morality, no belief in popular religion, no admiration for popular heroics. As an Irishman I could pretend to patriotism neither for the country I had abandoned, nor the country that had…"

*　　*　　*

সমালোচকের দল যখন চারিদিক হইতে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল, তিনি নেশন্ পত্রিকায় তাহাদিগকে খুব কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া শেষে বলিলেন—আরো কিছু শুনাইতে পারিতাম, but that eternal blazon must not be in a liberal paper…

*　　*　　*

পুস্তকবিশেষের মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—আমি সামাজিক বিধি নিষেধের ও চলিত ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে লিখি; তোমাদের গোঁড়ামি ও ভণ্ডামি লইয়া তোমরা আছ; আর আমি?—I am a heretical and immoral writer.

যে ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারে, সে যে কাহারও তীব্র সমালোচনায় বিচলিত হইবার পাত্র নহে, ইহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। রবিবাবুর সঙ্গে বার্ণার্ড্ শ'র আকাশপাতাল ব্যবধান,—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেন্ট্‌সবেরি, এড্‌মণ্ড্ গস্, ওয়াল্টার পেটর প্রভৃতি সাহিত্য-রথীদের নাম না করিয়া, আমি যে কেবল সাহিত্য-সমালোচক বার্ণার্ড্ শ'র কথা

তুলিলাম, তাহার কারণ আছে। 'সবুজ পত্রে' রবি বাবু যে উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত Shavismএর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

* * *

হয় ত Shavism কিংবা Ibsenism বলিলে রবি বাবুর প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে, বোধ হয়, গূঢ় তত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। আমরা সকলেই বিচারক সাজিয়া মূঢ়ের মত অবিচার করিয়া থাকি। বোধ হয়, চেষ্টা করিয়া সকলে সমজদার হইতে পারে না; হয় ত সব সময়ে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টাও করা হয় না।

* * *

আজ না হয় একটা মহাপ্রলয়ের মধ্যে য়ুরোপের সমস্ত ওলট্ পালট্ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু গত শত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যা লইয়া সেখানকার লোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, সে সকল সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর ছিল কি না, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দাপটে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-নীতি পুরাতন খোলস ছাড়িয়া নূতন রূপে দেখা দিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করা হইল, সে ভাবিল—আমি স্বতন্ত্র; এ জগতে আমার জায়গা কাড়িয়া লইবার অধিকার কাহার আছে? ষ্টেটের নাই, চর্চ্চের নাই। শ্রমী বলিল—'ধনী এতকাল আসর জুড়িয়া বসিয়া আছে; আমাকে আমার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করিবার অবসর দেয় নাই; আর আমি ধনীর প্রসাদের জন্য তাহার উপর economic dependence একান্ত গৌরবের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত নহি; যতদূর সম্ভব আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে চাই।' নারী বলিল—'পুরুষকে বিবাহ করিয়া তাহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হয়,—আমার স্বাতন্ত্র্য এমন করিয়া স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিব কেন? যদি তোমরা বল, পুরুষ লইয়া সংসার পাতা আবশ্যক, সমাজ বাঁধা আবশ্যক, আমার তাহাতে আপত্তি থাকিবে কেন? জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ biological সত্যকে অস্বীকার করিয়া মানব জাতির বংশ-পরম্পরার সূত্র ছি[ন্ন] করিবার আকাঙ্ক্ষা বা স্পর্দ্ধা আমার নাই; কিন্তু তা[ই] বলিয়া পুরুষকে আমার ভর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমার নারীত্বের অপমান করা হয় না কি? খাওয়া পরার জন্য পুরুষের উপর নারীর এই একান্ত নির্ভর শীলতা,—ইহা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর? আম[রা] এই economic dependence হইতে মুক্ত হইতে চাই। তোমরা বল,—বিবাহ আমাদের বুড়া বয়সে পেন্‌সনে[র] মত,—old age insurance, খাওয়া পরার দুর্ভাবনা হই[তে] নিষ্কৃতি দেয়। কিন্তু পরের উপার্জ্জিত পয়সায় আম[ার] আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, আমি একা[ন্ত] পুরুষের স্কন্ধে চিরকাল গুরুভার হইয়া বিরাজ করিব, [এ] ব্যবস্থায় আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। তোমরা যদি ব[ল] —পুরুষের কিন্তু বিবাহে মোটেই আপত্তি নাই, পত্নী তাহ[ার] জগদ্দল পাথরের মত বুকের উপর চাপিয়া বসিবে না; তাহার নামটা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জাহির থাকা উচিত; পুরুষের এই তুচ্ছ পক্ষপাত ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিক দি[য়া] দেখিলে চলিবে না; তাহার নামটা আমার নামকে গ্রা[স] করিবে কেন? তোমরা বিবাহ বিচ্ছেদের আই[ন] করিয়াছ;—পুরুষের জন্য নরম, নারীর জন্য কড়া; নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা নারী করিতে পায় না, তোমরা কর। পুরুষের উপর নারীর এই politic[al] dependence আর কতদিন থাকিবে?'

* * * *

ধনীর উপর শ্রমীর political dependenceই বা ক[ত] দিন থাকিবে? যাহারা পার্লামেণ্টে আইন বিধিবদ্ধ কর[ে] তাহারা অধিকাংশই ধনী কিংবা অভিজাত-বংশধর। রাজ[্য] চালনার যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা তাহাদের হাতে; যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিও তাহাদের ইঙ্গিতেই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। শ্রমী[র] ভালমন্দর দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করে না। ধনী[র] উপর শ্রমীর এই অধীনতা সমাজের পক্ষে হিতকর কি? ধনী বলিতেছে—(অন্ততঃ উনবিংশতি শতাব্দীর য়ুরোপী[য়] ধনী বলিয়াছিল)—'শ্রমী, আমার কাছে এস; আ[মি] তোমাকে সপ্তাহে সপ্তাহে বেতন দিব, তুমি আমার কা[র]খানায় কাজ কর; তোমার চেয়ে কিছু কম টাকা তোম[ার] স্ত্রীকে দিব, সেও আসুক; তোমার ছোট ছেলেটিও [কি]

পারে, সেও কাজ করুক। আমি বাড়ি করিয়া দিতে পারি; এক একটা কুটুরি লইয়া এক একটা পরিবার থাকিবে, কিছু ভাড়া লাগিবে।' বিংশ শতাব্দীর শ্রমী বলিতেছে—'তুমি আমাকে যে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছ, আমি তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চাই। তুমি আমাকে বেতনের লোভ দেখাইয়াছিলে, আমি আমার হাল-চাষ, জরু-গরু ছাড়িয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এখন আমার একুল ওকুল দুকুল গেল। আমাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের ফাক্টরীতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক ছিল, তোমাদের নূতন নূতন কয়েকটা কলকারখানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; তোমরা আমাদের দণ্ডবিধান করাইয়াছিলে। শেষে দেশের লোককে কলকারখানার উপকারিতা বুঝাইবার জন্য মিস্ মার্টিনো সুন্দর সুন্দর গল্পরচনা করিলেন; আরো তোমরা কত কি করিলে! যাহারা বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিল, তোমরা তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিলে; আমরা আমাদের economic স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারাইলাম। য়ুরোপে কলকারখানার জয়জয়কার ঘোষিত হইল। যে জর্ম্মণি তাহার সমস্ত জাতীয় জীবনকে একটা বিরাট কলে পরিণত করিয়া সমগ্র য়ুরোপকে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিতেছে, তাহার শ্রমীদিগের করুণ মর্ম্ম কথা, বোধ হয়, তোমরা কিছু কিছু শুনিতে পাও। সেদেশে যখন প্রথম কলকারখানা স্থাপিত হইল, তখনকার দেশব্যাপী আন্দোলন ও দরিদ্রের হাহাকার তাহাদের দেশপূজ্য সাহিত্য-রথ জেরার্ড্ হাউপ্টমানের নাটকে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে না কি? আজ সেই হাউপ্টমান এই যন্ত্রীভূত জর্ম্মণির জাতীয়-জীবনের জয়গাথা গায়িয়া বার্গসোঁ—রোলন্দ—মেটার্লিঙ্ক প্রমুখ য়ুরোপীয় মনীষিবর্গকে ধিক্কার দিতেছেন। যাক্ সে কথা। কবে আমরা তোমাদের বিপুল কলকারখানার ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, আজ তাহা স্মরণ হয় না। আমাদের অস্থি, মজ্জা, মাংস, স্নায়ু তোমাদের কলের মধ্যে পড়িয়া, স্বর্ণ-গিনিতে রূপান্তরিত হইয়া, তোমাদের ব্যাঙ্কে ভারে ভারে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের বেদনা তোমরা কখনও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ বলিয়া ত মনে হয় না; মধ্যে মধ্যে এক একটা ফ্যাক্টরি-আইন করিয়া কথঞ্চিৎ আমাদের কষ্টের লাঘব করিবার ব্যর্থ অভিনয় করিয়াছ মাত্র। আমাদের শিশু ছেলে মেয়েদিগকে তোমরা জোর করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছ; তোমরা ভাবিলে তাহাদের বর্ণপরিচয় ও ধারাপাতের অঙ্ক-জ্ঞান জন্মাইলে তাহারা মানুষ হইয়া উঠিবে। আমাদের সঙ্গে আমাদের পুত্রকন্যার সম্পর্ক নূতন রকম দাঁড়াইল। পিতা আর পালনকর্ত্তা নহে; মাতা প্রসব করিয়াই খালাস। তাহাদের শরীরে যতদিন সামর্থ্য থাকিবে, তাহারা তোমাদের কারখানায় প্রত্যহ ৯।১০ ঘণ্টা করিয়া খাটিবে। তা'র পরে—workhouse!'

* * * *

এই industrialismএর সমস্যা য়ুরোপে বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, সকলে তাহা লক্ষ্য করে না। কিন্তু দুএকজন সূক্ষ্মদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিত কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির করিয়াছেন। হিবার্ট জর্ণালের সুধী সম্পাদক অধ্যাপক জ্যাক্স্ সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, কলকারখানায় পাশ্চাত্য জগতের আধ্যাত্মিক জীবন এত বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, একই কারণ হইতে militarism এবং industrialism এর উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"militarism and industrialsm, as they exist in Europe to-day, have their origin in a common source. Both illustrate the bent given to the human mind by the cult of mechanism, which has so long been dominant in the spiritual life of the western world;" লোকে বলে বটে, industrialism শান্তিস্থাপনের প্রয়াসী; militarism যুদ্ধ করিতে উৎসুক। কিন্তু, অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি, যে যুগ industrialismএ নিমজ্জিত, সেই যুগ এই যুগান্তকারী সমরাভিনয় দেখিতেছে।

ঠিক এই কথাটি আরো একটু ঘোরাল করিয়া স্বনামখ্যাত মড্ এগাটন্ কিঙ্ বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—হয়ত আমরা কামান দাগিয়া কেথিড্রাল নষ্ট করিতাম না, কিন্তু তথাপি আমরা যে industrial সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়াছি, সেই যন্ত্রের, কলকারখানার industrialism আমাদের জাতির সেই সকল শক্তি অল্পে অল্পে নষ্ট করিয়াছে যদ্দ্বারা একটা রীম্স্ গির্জ্জা গড়িয়া তুলা সম্ভবপর হইত। "It is probably true that we should not bring up big guns against Gothic cathedrals, but

we are not wholly clean of such crimes, for all that. As complacent units in modern industrial civilization we are all bearing a hand in the black miracle—the exact antithesis to the christian *making and mending* miracle—the black miracle of *undoing*. Krupp guns may destroy the glory of Rheims cathedral in a few days: the destructive method for which we are partly responsible is slower but surer. Our modern civilization, built up on mechanical industrialism (or, it were truer to say, imprisoned within it ensnared at every turn in its barbed wire entanglements), has been, throughout its whole devastating era, whittling away or corrupting those very powers in the race which made a Rheims cathedral possible".

কাউন্ট হার্ম্মান্ কেঁইসালিঙ্গ আশা করিতেছেন যে, এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে য়ুরোপ বুঝিতে পারিবে যে, তাহার চিন্তাপ্রবাহ ও তাহার কর্ম্মের ধারা তাহাকে কোন্ বিপথে লইয়া গিয়াছে; এই সমরানল তাহার সমস্ত অতীত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া, তাহাকে নূতন পথে চালিত করিবে। "This unparalleled conflagration, in burning itself out, will consume the past Karma of Europe, thus clearing the road to a new and better era."

*　　　*　　　*

য়ুরোপ আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া নূতন যুগে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া কাজ করিতে না পারিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এই অগ্নিপরীক্ষায় তাহার militarismএর সঙ্গে সঙ্গে তাহার industrialismও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে কি না বলা যায় না। এই ঘোর দুর্দ্দিনে খৃষ্টীয় চর্চ্চ কোনও আশার বাণী শুনাইতে পারিতেছে না। যে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় সমাজের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে মানুষ এক দণ্ডের জন্য হাঁফ ছাড়িবার সময় পাইতেছিল না; ইহজীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তি যাহার একমাত্র চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল; সে কেমন করিয়া পরকালের কথা ভাবিবে? ইহকালে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে ত পরকালে আত্মার সদ্গতির কথা ভাবিতে পারা যায়। সে ভাবিল—আমার ইহকালও গিয়াছে, পরকালও গিয়াছে। যখন যন্ত্রের ও কলকারখানার আবির্ভাব হইল, তোমরা বলিয়াছিলে এখন হইতে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব হইবে, অল্প পরিশ্রমে অধিক দ্রব্য প্রস্তুত হইবে।—হায় রে labour-saving machinery! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল; আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের তিলমাত্র লাঘব হইল কি? মিসরের রাজাদিগের আত্মার সদ্গতির জন্য মরুভূমিতে বিরাট পিরামিড নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, লক্ষ লক্ষ মিসরবাসী প্রাণপাত করিয়াছিল। আজ সে ফেরো (Pharaoh) নাই, সে যুগের ইতিহাসও প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে লীন; একটি একটি করিয়া পচিশটি রাজবংশের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল; কেবল ধূ ধূ করিতেছে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি, আর বিরাজ করিতেছে সেই বালুকা-বেষ্টিত বিপুল পিরামিড! সেই পিরামিড-গর্ভে কোথায় sarcophagusএর মধ্যে কাহার mummy রক্ষিত হইতেছে, কে জানে! সেই গুহাভ্যন্তরের অন্ধতমসায়, সেই sarcophagusএর তলদেশে, সেই নিষ্পেষিতমর্ম্মতন্ত্রী লক্ষশ্রমীর কঙ্কাল কঠোর অস্থি-সংঘর্ষের শব্দে নিশাচরকে কম্পিত করিয়া বেতালের সিংহাসনের পুতুলগুলার মত সেই sarcophagusকে চঞ্চল করিয়া তোলে না কি? তোমাদের এই capitalistic য়ুরোপীয় সভ্যতার সাহারায় কোটি কোটি মানব প্রাণপাত করিয়া, তোমাদের মুষ্টিমেয় capitalistএর জন্য যে বিরাট পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তোমরা জান না কি যে, এই সাহারার উপরে আমাদের অদৃষ্টদেবতা Sphinx মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া, তোমাদের ও আমাদের জীবনের মূলতন্ত্রী নাড়া দিয়া, সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতার জীবন-সমস্যার যে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন, তাহার যথার্থ উত্তর না দিতে পারিলে ফল হইবে—আমাদের অপমৃত্যু?

ধনী তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। শ্রমী চর্চ্চের

শরণাপন্ন হইল। খৃষ্ট বলিয়াছিলেন—তোমরা আমার কাছে এস, শান্তি পাইবে। পীড়িত শ্রমী চর্চ্চের আশ্বাসবাণী শুনিতে গেল। চর্চ্চ বলিল,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হইবে; ইহা বাইবেলের কথা; ইহার অন্যথা হইবে না। শ্রমী মাথায় হাত দিয়া ভাবিল,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে রাজী আছি, কিন্তু আমার কাজে আনন্দ কৈ? Capitalistএর দাসত্ব-শৃঙ্খল আমরণ আমার পায়ে বাজিতে থাকিবে কেন? ... তাহার পীড়িত আত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই আদিম পাপের কথা, মানবের অধঃপতনের কথা কি সত্য? Higher criticism উত্তর দিল—না, সত্য নয়; ও কথাটা জগতে বড় করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সেণ্ট্ পল; ইহার জন্য পল্ মূলতঃ দোষী; সদ্যোজাত খৃষ্টীয় চর্চ্চকে পল বিপথে লইয়া গেলেন; এই খানেই চর্চ্চের গোড়ায় গলদ। মানুষ আজন্ম পাপী; ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্ট সমগ্র পাপীমানবের ত্রাণকর্ত্তা; পলের এই দুইটি নূতন তত্ত্বের উপরে নবীন খৃষ্টীয় চর্চ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সেণ্ট্ পলের ধর্ম্ম; এই পলীয় তত্ত্বটিকে খৃষ্টীয় চর্চ্চ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। ৩২৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইন নাইসিয়াতে যে খৃষ্টীয় সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন, সেখানে এই পাপী মানবের উদ্ধার কল্পে Son of Godএর ক্রুশে মৃত্যু তত্ত্ব পাকাপাকি গ্রহণ করা হইল; Nicene creedএর মতে ভগবান খৃষ্টরূপে মানব হইলেন, তাহার উদ্দেশ্য যে, মানব ভগবান হইতে পারিবে। চারি শত বৎসর পরে আথানাসিয়স্, অগষ্টিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই তত্ত্বই নূতন করিয়া জাহির করিলেন। গোড়ায় কিন্তু ধরতা ধরাইয়া দিয়াছিলেন—সেণ্ট্ পল্।...শ্রমী মাথা তুলিল। তবে আশা আছে? সে বলিল—তবে পল্‌কে বাদ দিয়া থাকে কি? আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস টলমল করিতেছে; আলো চাই, হাওয়া চাই, শান্তি চাই, আনন্দ চাই,—কোথায় পাইব?

* * *

উত্তর হইল—চর্চ্চের খৃষ্টকে ছাড়িয়া ঐতিহাসিক যীশুর কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

শ্রমী আস্তে আস্তে কথাগুলির পুনরুক্তি করিল। চর্চ্চের খৃষ্টকে ছাড়িয়া ঐতিহাসিক যীশুর কাছে?...

কে তুমি? মেফিষ্টোফেলিস্? যাও চলে যাও; get thee behind Sat...

চুপ কর! অধীর হইয়া আমাকে অযথা কটূক্তি করিও না। আমি ত তোমাকে পল্ ছাড়িয়া, যীশুকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইতে বলিতেছি। আমি কে? আমার নাম—জিজ্ঞাসা; আমি তোমাকে synoptic Gospelগুলির যীশুর পদপ্রান্তে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছি। ফিরিয়া যাও, যীশুর কাছে ফিরিয়া যাও; আলো পাইবে, হাওয়া পাইবে, শান্তি পাইবে, আনন্দ পাইবে।

চর্চ্চের খৃষ্ট ছাড়িয়া, যীশুর সাক্ষাৎকার লাভ করিব কোথায়?

মার্ক এ? না।

ম্যাথিউ?· না।

লিউক?·· না।

যোহন?···নিশ্চয়ই নয়।

তবে কোথায়?...ঠিক Gospelগুলিতে নয়। পলের Epistleগুলির প্রভাব সমস্ত Gospelএর মধ্যে বিদ্যমান। মার্ক ত পলীয় Gospel, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে; আবার মার্কের Gospelএর উপরে ম্যাথিউ ও লিউক্ প্রতিষ্ঠিত। যোহনের Gospel আলেক্‌সাণ্ড্রিয় চর্চ্চের ধর্ম্মজিজ্ঞাসাপ্রসূত।

তবে?···আমি Gospelগুলির মধ্যেই কিন্তু ঐতিহাসিক যীশুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিতে পারি। যে সারতত্ত্ব সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা ম্যাথিউ ও লিউক্ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু উহার উপর মার্ক্‌এর প্রভাব নাই;—সেই non-Markan source of Mathew and Lukeকে পণ্ডিতেরা Q আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

Q?···হাঁ, Q; ঐতিহাসিক যীশুর উপদেশগুলি সংগৃহীত হইয়াছে; সংখ্যায় প্রায় এক শত হইবে।

Q? আচ্ছা দেখা যাক্ না, চর্চ্চের খৃষ্টকে ছাড়িয়া, সেণ্ট্ পল্‌কে ছাড়িয়া, Q'র মধ্যে শান্তি পাই কি না।

* * *

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য ভাববিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিপ্লব বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হইয়া গেল। পুরাতনের সহিত নূতনের বোঝা-পড়া আরম্ভ হইল। টম্‌পেইনের সময় হইতে যে রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পাশ্চাত্য সমাজে দেখা

দিল, কালক্রমে তাহা সামাজিক জীবনের মূল ধরিয়া নাড়া দিল। ষ্টেট্, চর্চ্চ, গৃহ,—সর্ব্বত্রই individualism-এর প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; গোষ্ঠীর আধিপত্য খর্ব্ব করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্র মনুষ্যত্বকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-সমস্যা সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিল। State ও individual, চর্চ্চ ও নেশন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি, নারী ও পুরুষ, ধনী ও নির্ধন—সকলেই এই নূতন আবর্ত্তে ঘূর্ণীপাক খাইতে লাগিল; সেই ভীষণ আবর্ত্তে সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ফেনিল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে য়ুরোপীয় সাহিত্যে ইব্‌সেনের আবির্ভাব হইল।

*   *   *

ইব্‌সেনকে য়ুরোপীয় সাহিত্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুগত্যা যে জীবন-সমস্যা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি তাহার বাণীমূর্ত্তি। ষ্টেটে, চর্চ্চে, গৃহে যে মিথ্যা সত্যের মুখোস পরিয়া,সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই মিথ্যাকে পরিহার করিতে হইবে। ১৮৭৬ সালের ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিউ পত্রিকায় যখন এড্‌মণ্ড্ গস্ ইংরাজ-পাঠকসমীপে ইব্‌সেনের Peer Gynt নাটক অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইংরাজসমাজ কতকটা যেন ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে সমস্ত পাশ্চাত্য য়ুরোপ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। পুরাতন যখন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে, সমষ্টি যখন ব্যষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, গোষ্ঠী যখন ব্যক্তির কাছে নতজানু, তখন ইব্‌সেন-সাহিত্য বিদ্রোহী সমাজ-পরমাণুর কাছে বাইবেল—কোরাণ—জেন্দাভেস্তা হইয়া দাঁড়াইল। সমাজদ্রোহের দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে ইব্‌সেনের শরণ লইতে হইবে। সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মিথ্যাকে জখম করিতে হইবে; নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার অস্বীকার করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমকে Doll's House-এ পরিণত করায় মানব-সমাজ বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে; সমস্ত মাল-মসলা রহিয়াছে,—রাজমিস্ত্রীর (Master-builder) প্রয়োজন। রাজমিস্ত্রী সে রকম পাওয়া যাইবে কি? Idealist ইব্‌সেন নবযুগের উন্নত সমাজশীর্ষে নবীন পতাকা উড়াইতে পারিলেন না। জর্ম্মণীর জেরার্ড্ হাউপ্‌ট্‌মানও নবযুগের মানবকে যে ঘণ্টাধ্বনি শুনাইতে চাহিয়াছিলেন, সে ঘণ্টা (The Sunken Bell) পর্ব্বতশীর্ষে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই সাগরগর্ভে মগ্ন হইল।

নারীর পক্ষসমর্থন করিয়া, ইব্‌সেন পুরুষের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিলেন। সুইডেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটককার আগষ্ট্ ষ্ট্রীণ্ডবর্গ্ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অবশ্যই নারীর প্রতি তাঁহার বিজাতীয় আক্রোশের কারণ যথেষ্ট ছিল। তাঁহার Confessions of a Fool পাঠ করিলেই তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। তিনি বলিলেন—পুরুষই কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নারীর নিকট হইতে ষোল আনা আদায় করিয়া লইতেছেন; বিনিময়ে যাহা দিতেছেন, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে? আমি বলি,—পুরুষ যতই আদায় করুক আর নাই করুক, নারী নিজের সুখের জন্য পুরুষের নিকট হইতে সতের আনা আদায় করিয়া লইতেছে। মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা,—নারীর এই চতুর্ব্যূহভেদ করিয়া পুরুষকে মুক্তির পথ না দেখাইয়া দিতে পারিলে, প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধি সমাজকে ছারখার করিয়া ফেলিবে। নারীকে সহচরী (comrade) করিবার চেষ্টা করিয়া দেখ, দেখিবে সে মাথায় চড়িয়া বসিবে।

*   *   *   *

গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে বার্ণার্ড্ শ ইব্‌সেনপন্থী হইয়া, পাশ্চাত্য সমাজের নূতন সংস্করণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। চর্চ্চ ভ্রূকুটি করিল; কিন্তু যাহারা Q'র মধ্যে ঐতিহাসিক যীশুকে অন্বেষণ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার কথা কাণ পাতিয়া শুনিল। তিনি কবুল করিয়া বসিলেন—

'I am a heretical and immoral writer.'

সমাজ-সমস্যার কথাগুলা খুব কড়া করিয়া তিনি শুনাইতে লাগিলেন। সমালোচকের মুখাপেক্ষা তিনি আদৌ করিলেন না।

*   *   *   *

Ibsenism কিংবা Shavism বলিলে যে,খুব গালাগালি দেওয়া হয়, এমন ভাব আমাদের দেশের লোকের মাথায় আসিল কেন, তাহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। 'সবুজ পত্র'কে আমাদের সাহিত্যে একটা আকস্মিক উৎপাত বলিয়া গণ্য করিবার কারণ আছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া

আলোচনা করা আবশ্যক। Ibsenism কিংবা Shavism নরওয়েতে কিংবা ইংলণ্ডে হয়ত প্রথমে সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সুর বদ্‌লাইয়া গেল,—ইব্‌সেন্ কিংবা শ'র নহে;—দেশের। সেইরূপ দেখা উচিত,—আমাদের সমাজের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কোথাও কোনও পাপের বীজ, অন্যায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে কি না, যদ্দ্বারা সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইতে বসিয়াছে। এক বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিলাম; অল্প-বিস্তর আলোচনাও দেখিলাম; কিন্তু 'সবুজ পত্র' আমাদের সাহিত্যে আকস্মিক উৎপাত, কি না, তাহার আলোচনা ভাল করিয়া কেহ করিলেন না।

*　　　*　　　*　　　*

ব্যাপারটা যে শুধু একটা পত্রিকার আলোচনা নহে; সমস্যাটা যে গুরুতর; সে সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেরই কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৩২১এর বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত রবিবাবুর সারথ্যে পত্রিকার গতি কিরূপে নিয়মিত হইল, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। 'হালদার গোষ্ঠী' হইতে 'ফাল্গুনী' পর্য্যন্ত যতটা পথ অতিক্রম করিয়া আসা গিয়াছে, তাহার ডায়ারি কেহ রাখিয়াছেন কি? প্রথমেই যে 'গোষ্ঠীর' সহিত ব্যক্তির বিরোধ গল্পচ্ছলে আলোচিত হইল, এটা কি আকস্মিক? উদ্দেশ্যবিহীন? কেন্দ্রস্থ রবির চারিদিকে বারমাস ঘুরিয়া বসন্তোৎসব করিয়া এ পত্রিকা আবার নূতন রাশিচক্রে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার music of the Spheres কাণ পাতিয়া অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু সে কি গান গাহিল?

*　　　*　　　*　　　*

প্রথম সংখ্যায় যখন সুপণ্ডিত সম্পাদক-মহাশয় আমাদিগকে জানাইলেন—'এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশাধিকার আছে, কেবল পীতবর্ণের নহে,' তখন বোধ হয়, কৌতুকময়ী দেবতা স্থির করিয়াছিলেন, যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে। তাই বোধ হয়, বৎসরের শেষ সংখ্যায় 'ফাল্গুনী' বাসন্তী রঙে বাহির হইল। সে যাহা হউক, আমাদের দেশের সমাজের সহিত এই নবীন সাহিত্যের সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে আমি দেশের সুধীবর্গকে আহ্বান করি।

*　　　*　　　*　　　*

এই ধরুন, রবিবাবুর 'ঘরে বাইরে' যে সমস্যা লইয়া আমাদের সমক্ষে হাজির হইয়াছে, তাহা কেমন নূতন। স্বামি স্ত্রীর কথাবার্ত্তা চলিতেছে:—

"আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা-পাওনা বাকী আছে।

"কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কম্‌তি হল কোথায়?

"এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখকাণ মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

"খুব জানি গো খুব জানি।

"মনে করচ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।"

*　　　*　　　*　　　*

গৃহকে মেহাং Doll's House হইতে দেওয়া উচিত নয়; সত্যের কষ্টিপাথরে প্রেমকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। বার্ণার্ড্ শ'র ('Getting Married') মুদী কলিন্স্ নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধেও বলিয়াছিল—"Look at my old woman; she's never known any man but me, because she don't know any other men to compare me with. Of course she knows her parents in—well, in the way one does know one's parents."

মাহিদা

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

আথেলিয়ায় ধীবরব্যবসায়ী পাহাড়ীয়াদের মধ্যে বৃদ্ধ এলবুকারের ধনী বলিয়া খ্যাতি ছিল। এলবুকার পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র পাকু ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। পাকুর বয়স ২১ বৎসর। কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ অঙ্গসৌষ্ঠব। পাকু অদ্বিতীয় সন্তরণপটু। সমুদ্রই তাহার আশৈশব সঙ্গী, উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ তাহার রঙ্গক্রীড়ার নিত্যসাথী।

পার্ব্বতীয় পুষ্প চয়ন করিয়া মাহিদা মালা গাঁথিতেছে

একদিন সমুদ্রকূলস্থ পর্ব্বতশিখরে বেড়াইতে গিয়া পাকু দেখিল, পর্ব্বতের উপর একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা বসিয়া আছে। মাজ্জিত কৃষ্ণবর্ণ, সুস্থ, সবল, সুঠাম দেহলতা, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! কবিকল্পিত মুখশ্রী। অর্দ্ধ অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে ফণিনীগঞ্জিত বেণী দুলিতেছে। একরাশি পার্ব্বতীয় পুষ্প চয়ন করিয়া বালিকা মালা গাঁথিতেছে, আর সে [illegible] পর আর একটি নিজেরই গলায় পরিতেছে। পাকু বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল; সহসা একটি কম্পন আসিয়া আজ [illegible] তাহার অক্ষত হৃদয় বিদ্ধ করিল! পাকু মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই বালিকাকেই সে বিবাহ করিবে।

বালিকার নাম মাহিদা; সে পাকুদের প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা পলতার কন্যা — একমাত্র নয়নরঞ্জন স্নেহের পুত্তলী। মাহিদার প্রকৃতিগত একটা বিশেষত্ব ছিল। অন্য বালিকারা যেমন দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে, প্রতিবেশী বালকগণের সহিত মিলিয়ামিশিয়া খেলা করে, মাহিদা তেমনটি পারে না। সে নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে এবং বালকগণের ত্রি-সীমানায় যাইতে চাহে না। এইজন্যই, প্রতিবেশিনীর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও, পাকু তাহাকে এতদিন এমন করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই।

তৎক্ষণাৎ বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য, পাকু মাহিদার

নিকট অগ্রসর হইল। পদশব্দ পাইয়া মাহিদা সচকিতে পাকুর দিকে ফিরিয়া চাহিল; পাকু সেই বড় বড় কাল কাল টানা চোখ ছুটিতে কি যেন একটা মধুর তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিল!

পাকু তাহার নিকটে আসিতেই বালিকা মালাগাঁথা বন্ধ করিয়া, অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পাকু তাহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেই, বালিকা, ব্যাধবাণ-ভয় ভীতা সারসীর মত, চিৎকার করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। পাকুও বালিকার অনুসরণ করিল।

গিরিশিখর মূলের নিম্ন দিয়া যে অল্পপরিসর অসমতল পথরেখা পর্ব্বতশ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার উপর দিয়া মাহিদা নিঃশঙ্কচিত্তে, দ্রুতগামী হরিণীর মত এত শীঘ্র ছুটিয়া পলাইতেছিল যে, পাকুর মত ক্ষিপ্রপদ যুবকের পক্ষেও তাহাকে ধরা অসম্ভব হইত—যদি না সেই সঙ্কীর্ণ পথটি ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভে যাইয়া শেষ হইত। ধীবরবালা মাহিদাও সন্তরণনিপুণা ছিল;—আর পথ নাই দেখিয়া, অগত্যা বালিকা সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল; হাসিতে হাসিতে প্রফুল্লচিত্ত পাকুও সঙ্গে সঙ্গে জলে তাহার অনুসরণ করিল।

বালকবালিকা বহুক্ষণ ধরিয়া সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিল। প্রথমে পাকুর মত সন্তরণপটুও মাহিদার সন্তরণ চাতুর্য্যের নিকট পরাভূত হইতেছিল; কিন্তু বালিকা অচিরে শ্রান্ত হইয়া পড়িল, পাকু গিয়া তাহার শ্রমক্লান্ত অবসন্ন দেহ-লতাখানি ধরিয়া ফেলিল। মাহিদা তখন এত পরিশ্রান্ত যে, সে তাহার সেই সলিলসিক্ত সুশ্রী মুখখানি আর জলের উপর তুলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না বারবার তাহা তরঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল।

মাহিদাকে পালকের মত তুলিয়া লইয়া পাকু সমুদ্রের পার্শ্বস্থ তটে উঠিয়া আসিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহারও শরীর তখন নিতান্ত অবসন্ন; তথাপি সে মাহিদার সুশ্রূষা করিতে লাগিয়া গেল। পাকুর একাগ্র যত্নে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাহিদা বেশ সুস্থ হইল; পাকু তখন প্রেমবিগলিত হৃদয়ে মাহিদার হাত দুখানি আপন হাতের মধ্যে লইয়া—তাহার সেই সদ্যঃসলিলধৌত নির্ম্মল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া—বিবাহের প্রস্তাব করিল। মাহিদা সজোরে তাহার হাত দুখানি মুক্ত করিয়া লইয়া, দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, সে কখনই বিবাহ করিবে না। পাকু কাতরভাবে তাহার অসম্মতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মাহিদা তাহার মুখের উপর স্পষ্ট করিয়া বলিল যে, সে পুরুষজাতিকে আন্তরিক ঘৃণা করে; তাহাদের সে কখনও ভালবাসিতে পারিবে না।—তাহারা অকৃতজ্ঞ—তাহারা নিষ্ঠুর—তাহারা নারীর জীবনকে কষ্টকর করিয়া তোলে; সে কখনও বিবাহ করিবে না, কখনও তাহাদের অধীন হইবে না।

পাকু কত তোষামোদ করিল, জানু পাতিয়া কত সাধিল, কত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিল,—মাহিদা সে সকলে কর্ণপাত করিল না; একগুঁয়ে মেয়ের মত কেবল ঘাড় নাড়িয়া তাহার অসম্মতি জানাইতে লাগিল। পাকু তখন শপথ করিয়া বলিল যে, সে কখনও তাহাকে কষ্ট দিবে না, সে তাহাকে আপন কলিজার চেয়েও ভালবাসিবে। মাহিদা এবার রাগিয়া খুব জোরে জোরে রুক্ষস্বরে বলিল—"আমি তোমার ভালবাসা চাই না, আমি বিবাহ করিব না।"

ঈপ্সিতপত্নীর নিকট এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পাকু কিছুমাত্র নিরুৎসাহ বা ক্রুদ্ধ হইল না। যদিও সে সেদিনের মত তথা হইতে চলিয়া গেল বটে কিন্তু মাহিদার সেই ঘন ঘন ললিত গ্রীবাসঞ্চালনে বিবাহে অসম্মতি-প্রকাশ,—সেই রাগরঞ্জিত ও কম্পিত ওষ্ঠ, দৃঢ় ও ক্রোধ-ব্যঞ্জক অস্বীকার উক্তি পাকুকে মাহিদার প্রতি আরও অধিকতররূপে আকর্ষণ করিল। মাহিদাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া পাকু গৃহে ফিরিল এবং তাহার স্নেহময় জনকজননীকে [illegible] পরিণীত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিল এবং সেই সঙ্গে ইহাও তাহাদের জানাইল যে, প্রতিবেশিকন্যা মাহিদা ব্যতীত অপর কোনও বালিকাকে সে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেইদিনই পাকুর মাতা, বৃদ্ধা পল্‌তার নিকট, পুত্রের বিবাহের ঘটকালি করিতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিল। মাহিদার মাতা পল্‌তা, সসম্মানে সে প্রস্তাব গ্রহণ করিল। তখন বিবাহের দিনস্থির করিয়া—পাকুর মাতা সহাস্যমুখে বাটী ফিরিল এবং পরম উৎসাহের সহিত পুত্রের বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল।

একমাত্র প্রিয় পুত্রের বিবাহউৎসব উপলক্ষে ধনী এলবুকার-গৃহে মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। সারা গ্রামখানিতে

হুলস্থূল। মাহিদা কিন্তু এই বিবাহের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়াছে।

অনেক ভাবিয়া সে তাহার মার নিকট গেল এবং বিবাহে তাহার অসম্মতি জানাইল। পল্‌তা, কন্যার এই স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া—তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং রুক্ষস্বরে তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, যেমন সকল মেয়েরই বিবাহ হয়, তাহারও সেইরূপ হইবে। পাকুকে কন্যাদান করিবে বলিয়া সে আঙ্গীগো দেবের শপথ লইয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে; সুতরাং, তাহার বিবাহ বন্ধ থাকিবে না। কারণ, অঙ্গীকারভঙ্গ করিলে, আঙ্গীগো দেবের অভিসম্পাতে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

মাহিদা বুঝিল, জননীকে আর অনুরোধ করা বৃথা,—তিনি বিবাহ দিবেনই; কিন্তু প্রাণ থাকিতে মাহিদা বিবাহ করিবে না—সে যে পাকুকে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, পুরুষজাতিকে সে ঘৃণা করে! মাহিদা বড় ভাবনায় পড়িল; আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন বলিয়া মনে করিল। দুই দিন ভূমিশয্যায় পড়িয়া অনেক কাঁদিল, কিন্তু কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না!—অবশেষে, বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রিতে, সে আঙ্গীগো দেবের শরণ লইবার জন্য ব্যাকুল হইল! দেবতার অভিশাপেই পাকুর সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, স্থির করিয়া—দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, মাহিদা কাহাকেও কিছু না বলিয়া—সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে কুটীর পরিত্যাগ করিল এবং গ্রাম-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত পাহাড়ীয়াদের জাতীয় দেবতা "আঙ্গীগো"র মন্দিরে "বিপন্মুক্তির প্রদীপ" জ্বালিয়া দিতে চলিল।

পাহাড়ীয়াদের সহসা কোনও বিপদের সম্ভাবনা হইলে, তাহারা তাহাদের দেবতা আঙ্গীগোর শরণাপন্ন হইত এবং সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিগ্রহের সম্মুখে একটা মৃন্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া দিত। যদি প্রদীপটা তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যায়, পাহাড়ীয়াদের বিশ্বাস—সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু যদি প্রদীপটা কিছুক্ষণ জ্বলে, পাহাড়ীয়ারা বিশ্বাস করে যে, বিপদ্‌টা কাটিয়া গেল।

আকাশ তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন, বায়ু অচঞ্চল এবং সমুদ্র-বক্ষ অসম্ভব স্থির;—যেন সহসা তাহার বিরাট বক্ষস্পন্দন এক নিমেষে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! নীরব গম্ভীর প্রকৃতি যেন একটা ভীষণ প্রলয়ঝঞ্ঝার অপেক্ষা করিতেছে! পথে—গ্রামপ্রান্তে—সমুদ্রকূলে—কোথাও জনপ্রাণী দেখা যাইতেছে না। সকলেই যেন আজিকার এই অন্ধকারময় প্রকৃতির ভীষণতা অবগত হইয়া, হইয়াছে! দূরে দূরে আঁধার মেঘের পশ্চাতে পর্ব্বতমা গগনস্পর্শী কৃষ্ণবর্ণ চূড়াগুলা যেন প্রেতের মত মাথা করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক্ এই স বিপন্ন কাতর নির্ভীক মাহিদা একাকী আঙ্গীগো দে মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে।

মন্দিরদ্বারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, এতক্ষণের ঝঞ্ঝা দেখা দিল,—স্থির-বায়ু সহসা অস্থির হইয়া উঠি প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষ মুহূর্ত্তে ফুলিয়া উঠিয়া ভীষণ তরঙ্গ বিকট বজ্রগর্জ্জন মাথায় করিয়া, আকাশবিস্তীর্ণ পুঞ্জ মেঘরাশি অকস্মাৎ যেন প্রলয়ের বারিরাশি লইয়া, বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল! ঠিক সেই সময়ে, প্রস্তরখণ্ড ঠেলিয়া, মাহিদা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করি

"আমি বিবাহ করিব না!—আমি কখনই করিব না!—আমি কিছুতেই তাহাকে বিবাহ পারিব না!—এ দারুণ বিবাহ-বিপদ হইতে মুক্ত কর, দেবতা!"

প্রস্তর নির্ম্মিত ভীষণমূর্ত্তি আঙ্গীগোর চরণতলে মাহিদা রুদ্ধশ্বাস কাতরস্বরে এইরূপ প্রার্থনা ছিল। ভিত্তিগাত্রস্থ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গবাক্ষপথে বহি প্রবল ঝঞ্ঝা, মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া, মন্দিরাভ্যন্ত মাহিদার অন্তরের উন্মত্ত ঝঞ্ঝাকে উপহাস করি মাহিদার "বিপন্মুক্তির প্রদীপ"টা সে বায়ুর তাড়নায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল! যদি যাইত, দেবতার চরণে মাহিদার সকল নিবেদন ব্যর্থ কিন্তু ঝঞ্ঝাঘাত সহ্য করিয়াও 'মুক্তি-প্রদীপ' জ্বলিতে

মাহিদা, প্রসন্নচিত্তে দেবতার চরণে পুষ্পা নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিল। তাহার প্রাণে একটা শান্তি আসিয়াছে;—বুকের উপর হইতে গুরুভার নামিয়া গিয়াছে; সে যেন আবার সহজে ফেলিয়া বাঁচিল!

বাটী ফিরিয়া মাহিদা দেখিল, তাহার মাতা বক্ষে ঘাত করিয়া কাঁদিতেছে, আর ঝড়বৃষ্টির উদ্দেশে গালি দিতেছে! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ভাবী জা

মঙ্গল-আশঙ্কায় তাহার মাতা কাতর হইয়া পড়িয়াছে! কারণ পাকু, বৃদ্ধ পিতা এলবুকারের সহিত, আজ প্রভাতে মৎস ধরিতে গিয়াছে—এখনও ফেরে নাই। সহসা এই ভীষণ দুর্য্যোগ! আর তাহারা পিতা-পুত্রে এসময়ে সমুদ্র-বক্ষে! মাহিদা এ সংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! তাহার চোখেমুখে-ললাটে—প্রতি সূক্ষ্ম শিরাতে ব্যথিত চিন্তা-রেখা ফুটিয়া উঠিল! সে ধীরে ধীরে, মাটির উপর যেন তাহার দেহের সমস্ত ভারটি রাখিয়া বসিয়া পড়িল!

দেবতার চরণে কায়মনে নিবেদন করিয়াছে বলিয়া, তাই শীঘ্র সে যে এরূপ কঠোর প্রত্যুত্তর পাইবে—মাহিদা তাহা একবারও ভাবে নাই! প্রভু আঙ্গীগো দেবের নিকট সে এই বিবাহ-সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিল বটে; কিন্তু সে তো এ ভাবে মুক্ত হইতে চাহে নাই! এ উপায়ে উদ্ধার পাইবার কল্পনা পর্য্যন্ত সে তো কখনও করে নাই!—"না না এ উপায়ে নয়!—এ উপায়ে নয়!" তাহার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"না না এ উপায়ে নয়!" মাহিদা ব্যাকুল হইয়া নিঃশব্দে—আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল! কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি পাকু আর না ফেরে!—যদি এই দুর্য্যোগে সমুদ্রের বক্ষে পিতা পুত্রের কোনও বিপদ্ হয়, তবে তো আমিই তাহাদের হত্যার কারণ হইব!—হায়, দেবতা! এ কি আমার কঠোর বর! এ কি নিষ্ঠুর দান প্রভু! আমি তাহাদের মৃত্যু দিয়া আমার মুক্তিলাভ করিতে চাহি নাই, চাহি নাই!" দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তায় মাহিদা সারা রাত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে যদি পাকু ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে সে আপনাকে একজন প্রণয়ী-প্রেমে পাগলিনী বাগ্‌দত্তার প্রসারিত বাহুপাশে আবদ্ধ দেখিতে পাইত! কারণ, মাহিদা সে স্ত্রীস্বভাব-সুলভ জিদ্ তখন ভুলিয়া গিয়াছে; তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া যৌবনতেজো-গর্ব্বিতা তরুণীর অহংকার তখন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে! পাকুর প্রতি তাহার সেই অন্যায় অসদ্ব্যবহারসত্ত্বেও তাহার প্রতি সেই উদার যুবকের অসীম স্নেহ ও গভীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের যে কতখানি মূল্য—কতখানি মর্য্যাদা—কিশোরী এতক্ষণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

গতকল্য দুর্য্যোগময়ী ভীষণা রজনীতে যাহারা গ্রাম হইতে অনুপস্থিত ছিল, অদ্য প্রাতে তাহারা সকলেই তাহাদের উৎকণ্ঠিত গৃহপ্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; কেবল স্বামিপুত্রের অদর্শনে কাতরা ব্যাকুলা এলবুকারপত্নী সমুদ্র-বেলায় তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। মাহিদাও পাকুর সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাহার সেই সূর্য্যাস্তকালীন কমলিনীর মত বিষাদমলিন মুখখানি, স্ফীত রক্তাভ নয়নদ্বয় অশ্রুচিহ্নিত বিবর্ণগণ্ড, তখনও পর্য্যন্ত যাহারই দৃষ্টিগোচর হইল, সেই মাহিদার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না! বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া সকলেই বলিল, পাকুর বাগ্‌দত্তা যে তাহার বিপদে এত কাতর হইয়াছে, ইহা পাকুর পরম সৌভাগ্য।

সারানিশি উদ্দাম নৃত্য করিয়া, সমুদ্র যেন তখন অলসনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে! বাল-সূর্য্যকরোদ্ভাসিত উজ্জ্বল নীলাকাশ যেন তখন হাসিতে হাসিতে সকলকে বলিতেছে যে—গতরাত্রিতে সে তাহার ভাণ্ডারশূন্য করিয়া কাল মেঘগুলোকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। মাহিদা বিকল-চিত্তে সমুদ্রকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল; বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, সেই অসীম প্রসারিত সমুদ্রবক্ষের যতদূর দেখা যায়—অভাগিনী প্রাণপণে, তাহার সমস্তশক্তি একত্র করিয়া, তাহার আরও সম্মুখে—একেবারে সমুদ্রের শেষ অবধি—দেখিতে পাইবার জন্য, বার বার বিষম প্রয়াস করিল—কিন্তু প্রতিবারেই তাহার চক্ষু দুইটি বাষ্পে ভরিয়া উঠিল; এবং, প্রতিদিন সে সমুদ্রের সহিত আকাশকে যেখানে মিশিতে দেখে, আজও তাহার অধিক দেখিতে না পাইয়া, নিষ্ফল হতাশার একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে সেখানে বসিয়া পড়িল! পাকুর মাতাও সেই সময় কাঁদিতে কাঁদিতে সমুদ্রতীরে আসিয়া বালুরাশির উপর আছড়াইয়া পড়িল এবং তাহার স্বামি-পুত্রকে লওয়ার জন্য বক্ষে করাঘাত করিয়া, দেবতার নিকট সমুদ্রের বিরুদ্ধে মর্ম্মভেদী করুণ অভিযোগ করিতে লাগিল। সে আজ স্বামীপুত্রহারা পাগলিনী! তাহাকে দেখিয়া, মাহিদার করুণ কোমল হৃদয়খানি যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; বালিকার শোককাতর চক্ষুদুইটির এমনি ভাব হইল, যেন তখনই বিদীর্ণ হইয়া রক্তপ্রবাহিত হয়! মাহিদা দুইহাতে আপনার উত্তপ্ত বক্ষপঞ্জরগুলা সবলে

চাপিয়া ধরিল, যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে তাহার প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু অধিকক্ষণ আর সে সহ্য করিতে পারিল না,—মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া পাকুর মার বেদনাতুর বুকের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল !

মাহিদার যখন জ্ঞান হইল, তখন বেলা অনেক হইয়াছে। প্রখর রবিকরে বেলাভূমির বালুকণাগুলি এই দুইটি শোকাতুরা রমণীর তপ্তবুকের মতই আগুন হইয়া উঠিয়াছে ! পাকু ও এলবুকারের তখনও কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পাকুর মার রক্তনয়ননিঃসৃত অজস্র অশ্রুধারা তখনও অভাগিনীর শীর্ণগণ্ড বহিয়া—বক্ষবস্ত্র সিক্ত করিতেছিল। মাহিদা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল—বৃদ্ধার অশ্রু মুছাইয়া দিল ; তার পর তাহার মুখের পানে চাহিয়া দৃঢ় অথচ একান্ত করুণ কণ্ঠে বলিল "মাগো ! তুমি আর কাঁদিও না—তাঁহারা নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন, সমুদ্র তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, সমুদ্রই তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন।" পাকুর জননী দুই হাতে ভাবী পুত্রবধূকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটচুম্বন করিল, বৃদ্ধার শূন্যবক্ষ যেন ক্ষণেকের জন্য পূর্ণ হইল—তাহার মনপ্রাণ যেন একটু শীতল হইল। গভীর স্নেহে মাহিদার শিরে তাহার শীর্ণ করতল বুলাইয়া দিতে দিতে, বেদনারুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"মাগো ! তুমি চিরজীবিনী হও ; প্রভু আঙ্গীগো দেবের কৃপায় তোমার বাক্য সত্য হউক !" আঙ্গীগো দেবের নাম শুনিয়া মাহিদা শিহরিয়া উঠিল ! বৃদ্ধা বলিতে লাগিল—"কিন্তু মা ! আমার অদৃষ্ট বুঝি পুড়িয়াছে ! আমার পাকু কি তাহার পিতাকে লইয়া আর ফিরিয়া আসিবে ?" মাহিদা এবারও স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল –"সমুদ্র তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছেন, সমুদ্রই তাঁহাদের ফিরাইয়া দিবেন !"

দিনের পর দিন চলিয়া গেল—স্নেহময়ী বৃদ্ধা মাতাকে শোকানলে দগ্ধ করিবার জন্য, শান্তিপূর্ণ আনন্দমুখরিত প্রফুল্ল গৃহপ্রাঙ্গণটি শ্মশান করিবার জন্য, অথবা বুঝি সেই উদ্ধত বালিকা মাহিদাকে শাস্তি দিবার জন্য, বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া পাকু আর ফিরিল না। সকলেই তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিল ; সকলেই স্থির করিল, সে দিনের সে ভীষণ দুর্যোগে নিশ্চয়ই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে ; কিন্তু মাহিদা সে কথা শুনিল না, তাহার ধ্রুববিশ্বাস যে, সমুদ্র তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন সমুদ্রই তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। এই বিশ্বাসবশে সরলা বালিকা প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া, সমুদ্রকূলের সেই গিরিশিরে গিয়া, তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা বসিয়া থাকিত। তাহার সেই ব্যাকুল শূন্যদৃষ্টির সম্মুখে অনন্ত নীল বারিরাশি নিত্য একইভাবে নৃত্য করিত। কতবার কত পরিচিত নৌকা কূলে আসিত, আবার ফিরিয়া যাইত; কিন্তু মাহিদা যাহাদের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে তাহারা কেহই আর ফিরিত না।

নানাসুখদুঃখ মাথায় করিয়া দেখিতে দেখিতে পাঁচবৎসর অতীত হইয়াছে। নূতন নূতন ঘটনার আবর্ত্তে পাড়ার পাঁচবৎসর পূর্ব্বের সে দুর্ঘটনার কথা প্রায় অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছে। তদবধি আর কেহই মাহিদাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হয় নাই। মাহিদা সেজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। শুধু বৃদ্ধা পলতা, মাঝে মাঝে তাহার অবোধ কন্যার পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে ! তাহার পুত্র বলিতে—তাহার কন্যা বলিতে—মাহিদাই যে একমাত্র সম্বল !—মাহিদা তাহার কাতর জননীকে প্রত্যহ বুঝাইয়া বলিত "ও মা ! তুমি কাঁদ না ; তোমার জামাতা বাঁচিয়া আছে, সমুদ্র তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, সমুদ্রই তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন।"

মাহিদার এই ভিত্তিহীন ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্য সত্য বাস্তব হইয়া দাড়াইল। উন্মাদিনীর মত হাস্য করিতে করিতে একদিন পাকুর মা ছুটিয়া পলতার বাটীতে আসিল এবং রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "ওগো ! তোমরা—এস গো দেখবে এস ; আমাদের পাকু আজ ফিরে এসেছে। ওরা কিন্তু বলেছিল, ডুবে গেছে—দেখবে এস গো দেখবে এস !" পাকুর মাতা নীরব হইবার পূর্ব্বেই, বাহিরে একটা বহুজন কণ্ঠোচ্চারিত উচ্চ আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল !

বিদ্যুৎবেগে পলতা কন্যার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বে নিরুদ্দিষ্ট জলমগ্ন ধীবরবালককে অভ্যর্থনার্থ সমবেত জনতার সহিত মিশিয়া গেল ! পাকু সেই বিস্ময়োৎসুক জনমণ্ডলীকে তাহাদের জলমগ্ন হইবার যে ইতিহাস বলিতেছিল, মুখে মুখে সে গল্পের কতকটা তাহাদের কাণে আসিয়া পৌছাইল। তাহারা শুনিল যে, ঝড়ের বেগে পাকুদের নৌকা ছুটিয়া বহুদূরে একটা পর্ব্বতের উপর গিয়া পড়ে, সেখানে তাহার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয় এবং সে নিজে দুইদিন অনাহারে সেইখানে

ছিল; তার পর, ঘটনাক্রমে, একখানা বড় জাহাজ সেইখান দিয়া যাইতেছিল,—পাকুর চিৎকার শুনিয়া, তাহাকে তুলিয়া লয়। পাকু এতদিন সেই জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট কর্ম করিতেছিল; সম্প্রতি জাহাজখানি এদেশে আসায়, পাকু ছুটী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পাকুর ইতিহাস শুনিয়া, সকলেই তাহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া স্থির করিল; এবং সে দু'দিন না খাইয়া পর্ব্বতের উপর ছিল শুনিয়া, কয়েকজন দয়ার্দ্রচিত্ত প্রতিবেশী তাহাকে কয়েকদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল। তার পর, এক নির্জ্জন সন্ধ্যায় পাকুর সহিত মাহিদার সাক্ষাৎ হইল। পাকু মাহিদাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল!—এতো পাঁচবৎসর পূর্ব্বের, সেই স্ফুটনোন্মুখ যৌবনপ্রভায় উজ্জ্বল, মার্জ্জিত কৃষ্ণবর্ণ সুস্থ সুগোলকায় সুন্দরী মাহিদা নয়! পাঁচবৎসর ক্রমাগত দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়া, কত দুঃস্বপ্নময় বিনিদ্র রজনীযাপন করিয়া—তীব্র অনুশোচনায় কাতর মাহিদার সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল!—যৌবনের অর্দ্ধপথে সে যেন বার্দ্ধক্যকে ডাকিয়া আনিয়াছে! উচ্ছ্বসিত রূপযৌবনের যে উন্মাদনাময় আকর্ষণে মাহিদার জন্য পাকু উন্মত্ত হইয়াছিল, মাহিদার সে আকর্ষণ আর নাই! পাঁচ বৎসর তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে ঝড় বহিয়াছে—যে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, স্বভাবকোমলা বালিকা তাহার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তাই, বোধ হয়, পাকু, সে ভগ্নপ্রতিমার সহিত সম্ভাষণমাত্র না করিয়া, অন্যপথে চলিয়া গেল!

পাকুর এই অন্যায় উপেক্ষায় মাহিদার দারুণ অপমান বোধ হইল। তাহার মুখখানি বর্ণের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। অভিমান-অশ্রুভারাক্রান্ত অভাগিনী, বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, ধীরে ধীরে—অবনত মস্তকে গৃহে ফিরিয়া গেল!

তিন-চারদিন ক্রমাগত ভাবিয়া ভাবিয়া, মাহিদার মনে হইল,—পাকু নিশ্চয় তাহার উপর রাগ করিয়াছে, নতুবা সে কি তাহাকে ভুলিতে পারে?—মাহিদার চক্ষের সম্মুখে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের একটি রমণীয় অপরাহ্ণ ভাসিয়া উঠিল। সেই জানু পাতিয়া—দীন ভিক্ষুকের মত—তাহার নিকট পাকুর প্রেমভিক্ষা, তাহার সেই ব্যাকুলনয়নের পিপাসিত করুণদৃষ্টি—মাহিদার চরণে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিবার জন্য তরুণ যুবকের সেই আবেগময় আকুল আগ্রহ! মাহিদার একে একে সকলই মনে পড়িতে লাগিল! সেই পাকু আজ এমন করিয়া, তাহার সহিত একটি কথাও না কহিয়া, চলিয়া গেল! না—না—এমন কখন হতেই পারে না! নিশ্চয় তাহার

পাকু বলিতেছে—"লনি! তুই আমায় বিয়ে কব্বি?"

উপর পাকু অভিমান করিয়াছে।—কেন সে পোড়ারমুখী, সকলের আগে যাইয়া, তাহাকে অভ্যর্থনা করে নাই? কেন সে প্রিয়তমের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া—তাহার বাহুলগ্ন হইয়া—তাহার দীর্ঘপ্রবাসের দুঃখকাহিনী শোনে নাই? মাহিদা, আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া সেই মুহূর্ত্তেই পাকুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। মনে মনে স্থির করিল,—সে পাকুর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইবে;—কেমন করিয়া তাহার বিপদে সে সারানিশি ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিয়া ছিল, কেমন করিয়া প্রত্যহ তাহার আশায় সে সমুদ্রকূলে সারাদিন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত, সে সব কথা বলিবে—এবং পাকুকে এখন কত ভালবাসে, বুক চিরিয়া তাহা দেখাইয়া আসিবে!

অনেক অনুসন্ধান করিয়া মাহিদা পাকুর সন্ধান পাইল; কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ভাগ্যপীড়িতা অভাগিনীকে পাকুর নিকট আর ক্ষমা চাওয়া হইল না—আর তাহাকে তাহার সে কাতর হৃদয়ের গভীর অসীম প্রেমের কথা বলা হইল না। মাহিদা গ্রামপ্রান্তে পৌছাইয়া দেখিল, সমুদ্রতটবর্ত্তী সুদূর অতীত কালের এক তিন্দুক তরুতলে দাঁড়াইয়া—তাহারই দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী লুনিয়াব কণ্ঠবেষ্টন করিয়া, সহাস্য প্রফুল্লমুখে পাকু বলিতেছে, "লুনি! লুনি! আমায় তুই বিয়ে কর্‌বি? আমি তোরে বড্ড ভালবাসি।"

জন্মাষ্টমী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চেয়ে আছে জগৎ সতৃষ্ণ,
এসো জগতের ত্রাণ, এসো ভারতের প্রাণ,
এসো নয়নাভিরাম কৃষ্ণ!
এসো চিৎ, এসো রস—কান্তি,
এসো জগতের আলো, এসো রাধিকার কালো,
এসো দয়া, এসো ক্ষমা—শান্তি!
মায়া কারাগারে ধরা বন্ধ,
এসো জ্ঞান জড়দেহে, এসো মুক্তি কারাগৃহে,
এসো প্রীতি, এসো গীতি—গন্ধ!
সম্বরি বিরাটরূপ রুদ্র,
সসীমে অসীম লয়ে, এসো হে গোপাল হয়ে,
ছোট বুকে এসো হয়ে ক্ষুদ্র!
এসো হরি, এসো প্রাণবঁধু হে,
এসো শক্তি, এসো কর্ম্ম, এসো ধ্যান, এসো ধর্ম্ম,
অপরূপ তুমি ব্রজমধু হে!
এসেছিলে নাশিতে ও শাসিতে;
এবার বাঁশরী তব গাবে গান অভিনব—
এবার আসিছ ভালবাসিতে।

ঋগ্বেদে দার্শনিক তত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম. এ.]

মৃত্যু ও মৃত্যুর পর *

মৃত্যু প্রাণীমাত্রেরই সহচর ; তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" ; তাই কবির অমৃতময় লেখনী-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্।" এই প্রাণীমাত্রের প্রকৃতিভূত মৃত্যুসম্বন্ধে, কত দেশের কত দার্শনিক কতভাবে মস্তিষ্কচালনা করিয়াছেন, তাহা কে স্থির করিবে ? বেদেও এ বিষয়টি একেবারে অগ্রাহ্য ছিল না। আমরা যে জন্মাবধি শিখিয়া আসিতেছি, মৃত্যুর পর যমালয় যাইতে হয়,—এ ধারণা কোথা হইতে পাইলাম, এবং কিরূপেই বা ইহা আমাদের চিন্তার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া গেল ? এ ধারণা যে অধুনাতন নহে,—ইহার অঙ্কুর যে জগতের আদিম সাহিত্য বেদে নিহিত, তাহা ঋগ্বেদস্থ ১০ ম ১৪ সূক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় ; এই সূক্তের সপ্তম ঋকে মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে ;—

"প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভিঃ
যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা
যমং পশ্যাসি বরুণঞ্চ দেবং ॥"

অর্থ।—'যাও, যাও, সেই পূর্ব্বপুরুষগণ-কর্ত্তৃক অবলম্বিত প্রাচীন মার্গদ্বারা সেই স্থানে যাও—যেখানে আমাদের যজ্ঞদ্বারা পরিতৃপ্ত যম ও বরুণকে দেখিতে পাইবে।'

এই সূক্তেই যমালয়ের বর্ণনা আছে। যমকর্ত্তৃক এই স্থান প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"যমো নো গাতুং প্রথমং বিবেদ।"

এখানে ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবগণ এবং অঙ্গিরস ও কব্যনামক পিতৃগণ যথাক্রমে আমাদের যজ্ঞভাগ ও নিবাপা-বলিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া পরস্পর মিত্রভাবে পরমসুখে বাস করেন ; এতৎ সম্বন্ধে ঋক্—

"মাতলী কব্যৈ যমো অঙ্গিরোভি
র্বৃহস্পতি র্ঋক্বভি র্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধু র্যে চ দেবা
ন্‌স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি।"

যম কেবল এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নহেন, একচ্ছত্র সম্রাট্‌ও বটেন। এই যমালয়-পুরাণে যেভাবেই বর্ণিত হউক—ঋগ্বেদে ইহাই স্বর্গ। ৯ ম ১১৩ সূক্তে সোমের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা আছে—"লইয়া চল—সেই 'অমৃত অক্ষয়' দেশে—'যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্'—যেখানে সর্ব্বদা আলোক বিরাজ করিতেছে, যেখানে স্বর্গ-লোক প্রতিষ্ঠিত ; আবার—'যত্র রাজা বৈবস্বতঃ'—যেখানে যমই হইলেন রাজা ; আবার 'যত্র কামা নিকামাশ্চ'—যেখানে সকল কামনা পূর্ণ হয় ; আর, 'যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদ প্রমুদ আসতে'—যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ নিয়ত বিরাজ করিতেছে।" এক্ষণে আপনারা বিচার করুন—এই বৈবস্বতাধিষ্ঠিত, অমর, অক্ষয় আনন্দধাম স্বর্গ কি না ? এ প্রসঙ্গে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, ঋগ্বেদীয় যমালয়ে দেবগণ ও পিতৃগণ একত্র বাস করেন ; সুতরাং ইহা দেবলোক ও পিতৃলোকের সংমিশ্রণ। তখন পিতৃলোক পৃথক্ কল্পিত হয় নাই। আবার, এই যমালয়ের প্রবেশমার্গ অক্ষিচতুষ্টয় বিশিষ্ট শবল বর্ণ দুইটি সারমেয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত—

* কলিকাতা 'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট' (Calcutta, University Institute) সভাগৃহে পঠিত।

"অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ
চতুরক্ষৌ শাবলৌ সাধুনা পথা।"

গ্রীক-সাহিত্যেও যমালয়-পরিরক্ষক Cerberusনামক ত্রিমূর্দ্ধ কুক্কুরের বর্ণন আছে। এই 'Cerberus' এবং 'সারমেয়' শব্দ দুইটির মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু সাদৃশ্যও দেখা যাইতেছে। আবার পূর্ব্বোক্ত সূক্তে যমের যে স্থান (position), আবেস্তা গ্রন্থে যিমেরও সেই স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে—অর্থাৎ উভয়েই মৃত্যুর অধীশ্বররূপে কল্পিত হইয়াছেন। আবার আমাদের যম, বিবস্বতের পুত্র বলিয়া খ্যাত, এবং আবেস্তোক্ত যিম, বিবনঘতের পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। 'যম' ও 'যিম' এবং 'বিবস্বৎ' ও 'বিবনঘতের' নামগত অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন, জেন্দ-আবেস্তায় বর্ণিত আছে যে, অহুর মজদের আদেশে যিম 'বর' নামক একটি নূতন জগৎ সৃষ্ট করেন; তথায় কেবল পুণ্যাত্মা লোক ও উৎকৃষ্ট পশুবৃক্ষাদি থাকে। আপনারা পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, ঋগ্বেদেও যম—যমপুরীর প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং, যম ও যমালয় সম্বন্ধে হিন্দু, পারসিক এবং গ্রীক মতের যে অনেকটা ঐক্য আছে, বলিতেই হইবে।

পুরাণ ও পরবর্ত্তিদর্শনে পড়িয়াছি যে—মৃত্যুর পর আত্মা স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুষ্ঠমাত্র শরীর ধারণ করে। ঋগ্বেদে, ঠিক এই কথাটির উল্লেখ না থাকিলেও, মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তি যে, এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, শোভনদীপ্তিযুক্ত দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা নিম্নলিখিত ঋকে স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে;—

"সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমে
নেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বাযবদ্যং পুনরস্তমেহি
সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ।"

অর্থ।—'যাও, সেই পরম স্থানে পিতৃগণের সহিত,—যমের সহিত মিলিত হও; যাও, সেই স্থানে গিয়া স্বকৃত সুকৃতের ফলভোগ কর। সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, শান্তিধামে গমন কর এবং তথায় শোভনদীপ্তিযুক্ত, বা জ্যোতির্ম্ময়, শরীর লাভ কর।'

আরও, মৃত্যুর পর মৃতজীব শরীর ত্যাগ করিলেও তাহার যে নিত্য ও বিভু জীবাত্মা অবশিষ্ট থাকে এবং তাহা পুণ্যধামে যায়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋকে [১০ ম ১৬ সূক্ত ৪ ঋ] বর্ণিত হইয়াছে,—

"অজোভাগস্তপসাতং তপস্ব
তং তে শোচিস্তপতু তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদ-
স্তাভির্বহৈনং সুকৃতং॥"

অর্থ।—'এই মৃতব্যক্তির যে অংশ 'অজ'—অর্থাৎ জন্ম রহিত—যাহা চিরকালই আছে, হে অগ্নে! তুমি সে অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর; তোমার তেজ সেই অংশকে উজ্জ্বল করুক। হে জাতবেদঃ! তোমার যেসকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহাদের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তির জন্মরহিত অংশটি পুণ্যভবনে বহন কর।'

মৃতব্যক্তির এই অজ-ভাগটি জীবাত্মাব্যতীত কি হইতে পারে?

এ প্রসঙ্গে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি ঋক্ উদ্ধৃত করিব। ১ম ১৬৪ সূ ৩০ ঋক্ ও ঋক্ দেখুন—

"জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভি
রমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনঃ সযোনিঃ॥"

অর্থ।—'মর্ত্ত্যের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন মৃতব্যক্তির অ জীব স্বধা ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করে।'

এক্ষণে সুধীগণ বিচার করুন—এই "অমর জীব," যা মর্ত্ত্য শরীরের সহিত উৎপন্ন, তাহা জীবাত্মা ব্যতীত হইতে পারে?

জীবাত্মার আরও স্ফুটতর উপলব্ধি নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌ দেখুন—

"অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতো
ঽমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা স যোনিঃ।
তং শশ্বংতা বিষূচীনাং বিযংতো
নান্যং চিক্যু ন নিচিক্যুরন্যম্॥"

অর্থ।—'মর্ত্ত্য বা অনিত্য শরীরের সহিত একত্র অমর্ত্ত্য বা নিত্য (জীবাত্মা) অন্নময় শরীর প্রাপ্ত কখন অধোদেশে—কখন ঊর্দ্ধদেশে—গমন করে; সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করে। লোকে ইহাদিগের এক চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না।

এই ঋক্‌টিতে স্পষ্টই জীবাত্মার শরীরধারণ

কর্ম্মানুসারে গতাগতি সূচিত হইতেছে। "লোকে ইহাদিগের একটিকে চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না"—এই প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—'একটি' মর্ত্ত্যদেহকে বুঝাইতেছে, 'অপরটি' নিত্য আত্মাকে বুঝাইতেছে।—দেহত্রয় ব্যতিরেকে আত্মাকে কেহ জানে না, ইহাই তাৎপর্য্য।

এই জীবাত্মা সম্বন্ধে আরও দেখুন,—[১০ ম ১৭৭সূ ৩ ঋ]

"অপশ্যং গোপমনিপদ্যমানম্
আ চ পরা চ পথিভিশ্চরং তং।
সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান
আ বরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বং তঃ॥"

অর্থ।—'দেখিলাম, এক গোপাল, তাহার পতন (বিনাশ) নাই; কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে; সে কখন অনেক বস্ত্র একত্র পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক পৃথক্ পরিধান করিতেছে। এইরূপে সে সংসারের মধ্যে বারবার যাতায়াত করিতেছে।' ইহার উপর সায়ণের ব্যাখ্যা দেখুন,—"জীবাত্মার ধ্বংস নাই, নানা যোনি ভ্রমণ করে, কোন জন্মে নানা গুণ ধরে, কোন জন্মে দুটি একটি গুণ ধরে। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্প গুণ সম্ভবে; উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋক্ কয়টিতে স্পষ্ট জীবাত্মার উল্লেখ নাই; এবং কোনটিতে "অজো ভাগঃ,"—কোনটিতে বা "অমর্ত্ত্য" ইত্যাদি দ্বারা উহাকে অস্পষ্ট ভাবে এবং শেষোদ্ধৃত ঋক্‌টিতে রূপক, বা Allegoryদ্বারা বুঝান হইতেছে। দেখিয়া যদি কেহ বিশ্বাসস্থাপন না করেন, তবে তাঁহাদের প্রতীতির জন্য স্পষ্ট আত্মা-শব্দের প্রয়োগ দেখাইতেছি—

"ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা কস্বিৎ
কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ।"

—'ভূমি হইতে প্রাণবায়ু ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে,—কে বিদ্বানের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারে?'

ইহা অপেক্ষা জীবাত্মা সম্বন্ধে আর স্পষ্ট উল্লেখ কি হইতে পারে?

পূর্ব্বে, একেশ্বরবাদপ্রসঙ্গে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কথা বলিয়াছি; এক্ষণে আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ [১ ম ১৬৪ সূ ২০ ঋ] দেখুন—

—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥"

অর্থ।—'দুইটি পক্ষী বন্ধুভাবে এক বৃক্ষে বাস করে; তাহাদিগের একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ করে না কেবলমাত্র অবলোকন করে।'

সায়ণাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, 'এই দুটি পক্ষী—জীবাত্মা ও পরমাত্মা; জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কেবলমাত্র অবলোকন করে।' মণ্ডুকোপনিষদেও এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং, বেদান্তদর্শনের বীজস্বরূপ ঋগ্বেদে 'আত্মা ও পরমাত্মা'-তত্ত্ব যে নিহিত, তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আবার, যে মায়াবাদ উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, এবং যে মায়া—আত্মা ও ব্রহ্মোপলব্ধির অন্তরায়-রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও বীজ ঋগ্বেদে নিহিত।—ইতঃপূর্ব্বে মায়াবাদসম্বন্ধে আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, উপনিষদে মায়াবাদ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ম্মবহুল বৈদিক যুগে উহা মনোরাজ্য অধিকারলোভে সমর্থ হয় নাই। বলা বাহুল্য, দেশে বেদালোচনার অভাবই তাঁহাদের এই ভ্রান্তধারণার কারণ। অদ্য দেখাইব, উপনিষদে মায়াবাদ অঙ্কুর-অবস্থায় প্রথম বিকশিত হইলেও উহার বীজ—আরও প্রাচীন বৈদিক যুগে—আর্য্যগণের আদিম সাহিত্য ঋগ্বেদে নিহিত। এ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটির [১ম ১৬৪ সূ ৩৭ ঋ] প্রতি লক্ষ্য করুন—

"ন বিজানামি যদি বেদমস্মি,
নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্য
আদিদ্বাচে অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ।"

অর্থ।—'আমি এই কি না, তাহা আমি জানি না; কারণ, আমি মূঢ়চিত্ত সম্যক্ বদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছি। জ্ঞানের যখন প্রথম উন্মেষ হয়, তখনই বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারি।'

ইহাদ্বারা কি মায়াপাশদ্বারা "সংনদ্ধ" বা বদ্ধ জীবের

আত্মোপলব্ধিতে অক্ষমতা এবং বদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষে মায়ার নাশ স্পষ্ট সূচিত হইতেছে না ?

ইহাতেও যদি অস্পষ্ট হয়, তবে মায়ার স্পষ্ট উল্লেখ [১০ম ১৭৭ সূ ১ ঋ] দেখুন—

"পতংগমক্তমসুরস্য মায়য়া
হৃদি পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রে অংতঃ কবয়ো বিচক্ষতে
মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥"

অর্থ।—'বিদ্বান্‌গণ মনে মনে আলোচনা করিয়া মানস চক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান ; দেখেন যে, অসুরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ কহেন, উহা সমুদ্রের মধ্যে ঘটিতেছে। তাঁহারা বিধাতার কিরণসমূহের ধামে যাইতে ইচ্ছা করেন।'

এসম্বন্ধে সায়ণ বলেন—'জীবাত্মা মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তাদ্বারা জানা যায়।—সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন ;—পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই মায়া হইতে মুক্তি।'

যদি কেহ এই ঋক্‌টি রূপকাত্মক বলিয়া বিশ্বাস না করেন,—তবে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন জীব, ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নানারূপ জল্পনা করে,—তদ্বিষয়ে স্পষ্ট ঋক্ [১০ম ৮২ সূ ৭ ঋ] দেখুন—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজান-
ন্যদ্ যুষ্মাকমংতরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা
চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরংতি ॥"

অর্থ।—'যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা বুঝিতে পার না ; তোমাদিগের অন্তঃকরণই সে ভাবের নহে, অর্থাৎ বুঝিতে অক্ষম। কুজ্ঝাটিকাতে আচ্ছন্ন জীব নানারূপ জল্পনা করিয়া থাকে···ইত্যাদি।'

এই "নীহার", বা কুজ্ঝাটিকা, যাহা ব্রহ্মোপলব্ধির অন্তরায়, তাহা যে মায়া, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা মৃত্যুর কথা বলিতে বলিতে, মৃত ব্যক্তির "অজ"—"তেজোময়" অংশ বা জীবাত্মার প্রসঙ্গ তুলিয়া,—জীবাত্মা, পরমাত্মা ও তদুভয়ের সম্বন্ধ এবং মায়াবাদের জটিল পথে আসিয়া পড়িয়াছি ;—আসুন, আবার প্রকৃত অনুসরণ করি।

পুণ্য ও পাপের ফলে স্বর্গ ও নরক-ভোগের কথাও ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। স্বর্গের উল্লেখ অনেকস্থলেই পাওয়া যায়—এই প্রসঙ্গেও আমরা বিস্তৃত ভাবে করিয়াছি। নরকের কথা কচিৎ দৃষ্ট হয়। নরক যে অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে অবস্থিত এবং তাহা যে পাপনিলয়, ইহা ৪র্থ মণ্ডলের ৫ম সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যংতঃ
পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপসঃ সংতো অনৃতা অসত্যা
ইদং পদমজনতা—গভীরম্ ॥"

অর্থ।—'ভ্রাতৃরহিতা যোষিতের মত, পতিবিদ্বেষিণী দুষ্টচারিণী ভার্য্যার ন্যায়, পাপী, অনৃত, অসত্য লোক এই গভীর পদ উৎপাদন করিয়াছে।

সায়ণ স্পষ্টই এই "গভীর পদে"র নরকরূপ অর্থ করিয়াছেন।

এইরূপে মৃত্যুর পর, স্থূলশরীরের বিনিময়ে, সূক্ষ্ম তেজোময় জীবাত্মারূপ শরীরধারণ, এবং কর্ম্মঅনুসারে স্বর্গ ও নরকভোগ, ইত্যাদি পুরাণের সহিত ঋগ্বেদীয় মতের ঐক্য দেখিলেন, এবং যে জন্মান্তরবাদ পুরাণের বিশেষত্ব—যাহা ভারতবর্ষের নিজস্ব,—যাহা ভারতীয় দার্শনিকগণেরই উর্ব্বর মস্তিষ্ক চালনার একটা উপাদেয় ফল,—এবং যাহার বীজ পাশ্চাত্য দার্শনিক Pythagoras কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়া, য়ুরোপে উপ্ত এবং শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অঙ্কুরও আপনারা—"অপাঙ্ প্রাঙ্"—ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ১ ম ১৬৪ সূ ৩৮ ঋকে দেখিয়াছেন।—এক্ষণে ইহার আরও স্ফুটতর উপলব্ধি দশম মণ্ডলের ১৬ সূ ৩ ঋকে দেখুন ;—

"সূর্য্যমাত্মা চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা
দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধর্ম্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতম্
ওষধীষু প্রতিতিষ্ঠাঃ শরীরৈঃ ॥"

অর্থ।—'হে মৃত, তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক, তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও, অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক।'

উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে ঠিক ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া, মৃত্যুর পর জীবাত্মার পুনর্জন্মাবধি বিবিধ দশা-বিপর্য্যয়ের উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনেও এতদ্বিষয়ক একটি সূত্র দেখিতে পাই ;—

"ইতরলাভে আবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ।"

—[সাংখ্যসূত্র, আখ্যায়িকাধ্যায়, সূ ২২]

অর্থাৎ—'যাগযজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও আবার জীবাত্মাকে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়' ; এ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ এই যে—জীব,মোক্ষ না পাওয়া পর্য্যন্ত পঞ্চাগ্নিযোগে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। পঞ্চাগ্নি—দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, নর ও যোষিৎ। স্বর্গ হইতে মেঘে, মেঘ হইতে জলের সহিত পৃথিবীতে, পৃথিবী হইতে শস্যাদির সহিত নরশরীরে, নরশরীর হইতে স্ত্রীশরীরে গিয়া দেহলাভ করে বা উৎপন্ন হয়। এইবার আপনারা দেখুন যে, পরবর্ত্তী সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রে, "পঞ্চাগ্নি যোগ"দ্বারা, যে জন্মান্তরতত্ত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার বীজ উপরিউক্ত ঋগ্বেদের সূক্ত হইতে অংশত গৃহীত কি না ?

এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌টিতে যে মৃত ব্যক্তিকে বিভিন্ন অংশদ্বারা পাচটি স্থানে যাইতে বলা হইতেছে, ঐ পাচটিই পরবর্ত্তিদর্শনশাস্ত্রে পঞ্চভূতরূপে পরিণত হইয়াছে। ঋক্‌স্থিত "সূর্য্য" তেজোরূপে, "বাত" —মরুৎ-রূপে, "দিব্"—ব্যোমরূপে, —"অপ্"—অপ্‌রূপে, এবং "পৃথিবী" ও "ওষধী" মিলিয়া—ক্ষিতিরূপে পরিণত হইয়াছে। মনে হয়, মৃত্যুর অপর নাম যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, তাহার বীজও ঐ ঋক্‌টিতে নিহিত রহিয়াছে। ঐ ঋক্‌ই পঞ্চভূতের মূল।

গত বৈশাখ, শ্রাবণ ও এই সংখ্যায় ঋগ্বেদীয় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে দেখুন, হিন্দুগণের নিখিল ধর্ম্মতত্ত্ব এবং নিখিল দর্শনের বীজ, জগতের আদিম সাহিত্য ঋগ্বেদে প্রথম উপ্ত হইয়াছে, কি না ? এই প্রবন্ধ তিনটিতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ঋগ্বেদ্ যেন একটি সুপুষ্ট বীজ যাহা হইতে এই বিশাল হিন্দুসমাজরূপ বটতরু,—পুরাণ, দর্শন, সম্প্রদায়ানুসারে বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি—আচার, রীতি, নীতি—রূপ শাখাপ্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া, বিশাল ভারতবর্ষের উপর বিরাজ করিতেছে। আমরা এইরূপে ঐ অপৌরুষেয় বেদের গভীর ও তদ্গত আলোচনাদ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণ করিতে পারি যে, জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও দার্শনিকতত্ত্বও বেদের প্রথম প্রভাতালোকে উদ্ভাসিত ও বিকাশিত হইয়া, জগদ্বাসিগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানারূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় যে, আমরা ভারতবাসী হিন্দুগণ,—আমাদেরই নিজস্ব—আমাদেরই মহনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের তপস্যা ও সত্যের প্রথম দিব্যজ্যোতিঃ—জ্ঞানরাজ্যের প্রভাততপন বেদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া, উন্নতির আকাঙ্ক্ষায়, মরীচিকাভ্রান্ত মৃগগণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ইহার ফলেই আমরা জাতীয়তা হারাইয়াছি—মানসিক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছি—শান্তি হারাইয়াছি।—আর চলিবে না। আমাদের পরম পূজার ও আদরের বস্তুর উপর এমন অশ্রদ্ধা ও অনাদর কখনই মঙ্গলাবহ হয় না,—তাই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।—অতএব, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, হে ব্রাহ্মণতনয়গণ! তোমরা তৎপর হও,—অণুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া, বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও,—এবং উহা হইতে নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবনে যত্নপর হও। দেশে শিক্ষাবিস্তারসত্ত্বেও, যদি বৈদিক তত্ত্বের বিকট আলোচনার জন্য বৈদেশিকগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তবে সে শিক্ষার অভিমান কর কোন্ মুখে ?

নিম্বালয়

[শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কটক হইতে অনূ্যন চৌদ্দ মাইল দূরে তালডণ্ডা কেনালের দক্ষিণে একটি কুটীরে অবস্থান করি। শুনিয়াছি, এখান হইতে নিকটেই "নিম্বালো" বা "নিম্বালয়" নামে একটি সিদ্ধস্থান অবস্থিত। 'এখান হইতে নিকটে,' অর্থাৎ সাত সমুদ্র তেরনদী পারে নয় বটে, কিন্তু বড় কম দূর নয়—অন্ততঃ সাতটি প্রান্তর ও তিনটি নদী পার না হইলে "নিম্বালয়ে" যাওয়া যায় না।

বেলা নয়টার সময় নিম্বালয় দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। অনতিদূরে, মহানদীর অন্যতম শাখা, 'পায়িকা' নদী। এই শীতকালে পায়িকা নদী শূন্যগর্ভা। এ সময়ে নদীতে সামান্যই জল থাকে; কেবল একপার্শ্বে ক্ষীণ স্রোত প্রবাহিত আর চারিদিক্ বালুকায় পূর্ণ। পায়িকা নদীর বালুকাস্তরণ উত্তীর্ণ হইয়া, "কাইজঙ্ঘার" জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বনপথের পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ যে কতকালের স্মৃতি বহন করিতেছে, কে বলিতে পারে! একটি লতা দেখিলাম। এত প্রাচীন যে, উহা এক বিশাল বনস্পতির আকারে পরিণত; কিন্তু তথাপি বনের প্রাচীনা গৃহিণীর মত শত শত বৃক্ষের উপরে তাহার হস্ত সম্প্রসারিত। এই জঙ্গলে মৃগ, শশক, শল্লকী ও ময়ূরাদি নানা পশুপক্ষী বিচরণ করে; সময়ে সময়ে ইহা ব্যাঘ্রেরও রম্য আবাসে পরিণত হয়। অশ্বত্থ-বটের ত কথাই নাই;—এক একটি সহকার বৃক্ষ এত পুরাতন, যে তিনজনে আঁকড়াইয়া ধরিলেও তাহাকে সম্যক বেষ্টন করা যায় না। বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে, প্রায় তিন চারি মাইল গিয়া, মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। পরে, সাঁতরাপুর গ্রামের অনতিদূরে, এক সিদ্ধস্থান বিল্ববনের নিকটে আসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম। সম্মুখে বৃহৎ চন্দন পুষ্করিণী। জল সেকালি পুষ্পে সমস্ত পুষ্করিণী শুভ্র আকার ধারণ করিয়াছে। সাঁতরাপুরের পরে মহানদীর কিনারায় এক বিশাল বটমূলে আশ্রয় লইলাম। তখন ঠিক মধ্যাহ্ন। এমন স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায় বসিয়া আর কি অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয়! মহানদীর পরে আরও একটি নদী পার হইতে হইবে—সেটি 'চিত্রতলা' বা চিত্রাঙ্গী নদী। কষ্টেসৃষ্টে প্রান্তরের পর প্রান্তর গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া, অবশেষে চিত্রতলা নদীতীরে উপনীত হওয়া গেল। তখন, বোধ হয়, বেলা দুইটা বাজিয়া গেছে। চিত্রতলা-তীরেই নিম্বালয় গ্রাম চিত্রাঙ্গিতবৎ অবস্থিত।

"নিম্বালয় গ্রাম
পদ্মবন ধাম"

চারিদিকে বটের গভীর ছায়া—বটেরা যেন হাত ধরাধরি করিয়া ঘিরিয়া আছে। যদিও নিম্বালয় একটি নির্জ্জন

সামান্য গ্রাম বটে, তথাপি ইহার নির্জ্জনতার মধ্যেও যেন এক তেজোময় নিগূঢ় প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায়—যেন কাহার অশব্দ বাণী ইহার অন্তরে অন্তরে প্রতিধ্বনিত। ক্ষুদ্র বনফুলের ন্যায় এই সামান্য গ্রামটির মাহাত্ম্য প্রচ্ছন্ন আছে বটে, কিন্তু ইহার পবিত্র সৌরভ উড়িষ্যার বড় অল্প দূর আমোদিত করে নাই। প্রায় চারিশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে এখানে ভক্ত স্বামী অচ্যুতানন্দ-দাসের আশ্রম ছিল। এককালে এখানে নিত্য সিদ্ধসাধুর সমাগম হইত।

"নিম্বালো বুলিণ বেঁউ গ্রামখণ্ডী
কহিবা তাঁহার গুণ।
সিদ্ধ সাধু যঁহি অহর্নিশি থান্তি
মোর অটই আশ্রম।" *

এখানে সুন্দর পদ্মপূর্ণ সরোবর থাকাতে যে, ইহা "পদ্মবনধাম" তাহা নয়· বস্তুতঃ এককালে পদ্মাসনে সমাসীন সাধুভক্তদিগের প্রস্ফুটিত মানসপদ্মে এই স্থান নিত্য শোভমান থাকিত বলিয়াই পদ্মবনধাম খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নিম্বালয়ের নিকটেই নিম্ববন ছিল। এবং একটি বট-বৃক্ষের অগ্র হইতে নিম্ববৃক্ষ উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানটি "নিম্বালয়" নামে খ্যাত হইয়া পড়ে।

"চিত্রতলা নদী সেই সে বট যে
নিম্ববন তার তটে।
নিম্ববৃক্ষে বলি একই সে বৃক্ষ
আছি বটর অগ্রতে॥" †

নিম্বালয়ে সেরূপ প্রাচীন কোন দেবমন্দিরাদি নাই যে, তাহার ঢাকঢোল বাদ্যবাজনায় চারিদিকের দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হইবে। কেবল সুবিশাল বটমূলে ভক্ত অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর সমাধিস্তূপ—প্রায় ছয় সাত ফুট উচ্চের একটি মাটির ঢিবি মাত্র। কথিত আছে, এই বটবৃক্ষ স্বামী অচ্যুতানন্দ অচ্যুতানন্দ পুরুষোত্তমের কল্পবটের শাখা আনিয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন। নিম্বালয় অচ্যুতানন্দের কেবল যে তপস্যার স্থান ছিল, তাহা নয় তাঁহার জন্মস্থান এবং সমাধিস্থানও বটে। এখানেই তাঁহার সমাধি হয় বলিয়া, এই স্থানে এখনও তাঁহার 'গাদি' বিরাজ করিতেছে। দেখিলেই মনে হয়, স্থানটি তপস্যার অনুকূল—ঋষির আশ্রম-তুল্য। চারিদিকে বিশাল ন্যগ্রোধের নিবিড় ছায়া। বিহগ-কুল নির্ভয়ে কলরব করিতেছে। বটের জটাজূট যেন ঋষির জটার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। জটাধারী বটবৃক্ষেরা যেন এখানে বিরাট সভা বসাইয়াছে। সরলচিত্ত কৃষক বালকেরা এখানে ওখানে খেলা করিয়া বেড়ায়। স্থানে স্থানে কুটীর। ভক্ত জনেরা বহুদূর হইতে আসিয়া এই স্থানের ধূলি শিরোদেশ ও অঙ্গে লেপন করিয়া চলিয়া যায়।

এই নিম্বালয় গ্রামটি উড়িষ্যার অন্যতম পবিত্র তীর্থ স্থান। ইহা সেই অমূর্ত্ত পুরুষের নামে ভক্তজনের মিলনের স্থান। এখানে অনেক অনেক সিদ্ধ সাধক ও ভক্তজনেরা অমূর্ত্ত পুরুষের ধ্যানধারণা ও নামকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এইখানে স্বামী অচ্যুতানন্দ দ্বাদশ শিষ্যের সঙ্গে লীলা করিয়া অন্তে পরম পুরুষের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। অচ্যুতানন্দরূপ মূলবৃক্ষ হইতে দ্বাদশ শিষ্যের দ্বাদশ শাখা বাহির হইয়া, সমগ্র নিরক্ষর উড়িষ্যাবাসীর মধ্যে ধর্ম্মভাব ও নিরাকার উপাসনা প্রসারিত করিয়া গিয়াছে। অচ্যুতানন্দ-রচিত শত শত গ্রন্থ তালপত্রে লিখিত পুঁথির আকারে উড়িষ্যার গৃহে গৃহে সযত্নে রক্ষিত। নির্জনে সজনে—ব্রাহ্মণ-শূদ্রে সকলেই অচ্যুত-গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। গ্রামে গ্রামে 'ভাগবতমেলনে' অচ্যুতকথা গীত হয়। তাহার অধিকাংশ গ্রন্থই ব্রহ্ম-সাধনা, যোগ ইত্যাদি বিষয়ক। নিম্নে তদ্রচিত কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থের নামোল্লেখ করিলাম—"তত্ত্ববোধন" "ব্রহ্মসংহিতা," "অকলিত সংহিতা," "বটসংহিতা," "শূন্যসংহিতা," "উমরঝুমরো" "অচ্যুতমালিকা" "গরুড়পুরাণ," "কাহানী," ইত্যাদি।

সাধু অচ্যুতানন্দের জন্ম করণ-কুলে। বর্ত্তমানে উড়িষ্যায় করণদিগের উপাধি মহান্তি। আমাদের দেশে কায়স্থ যেমন, উড়িষ্যায় করণ তেমনি।

"করণ কুলরে জন্ম হয়ি মহিমাখ্যাত।
কলিযুগশেষে করণী করিবে সে বিখ্যাত॥"
—(অচ্যুতানন্দকৃত 'কাহানী')

বঙ্গদেশে যে সময়ে চৈতন্য দেবের লীলা আরম্ভ হইয়াছে, সেই কালে উড়িষ্যায় স্বামী অচ্যুতানন্দেরও আবির্ভাব। সাধু অচ্যুতানন্দের কথা চৈতন্যদেবের গোচরে আসিলে,

* স্বামী অচ্যুতানন্দকৃত গরুড় পুরাণ, ৫ম অধ্যায়।
† গরুড় পুরাণ, ৫ম অধ্যায়।

তিনি তাঁহাকে স্বীয় দলভুক্ত করিবার জন্য সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। প্রথমে শ্রীসনাতন স্বামীকে তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। অচ্যুতানন্দ তদ্রচিত 'শূন্য সংহিতা'য় আত্মকথা লিখিবার কালে লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীসনাতন স্বামী কি চাহিণ আজ্ঞাদিলে শচীসুত।
অচ্যুতানন্দকু তুথে উপদেশ করহে যাঁই ত্বরিত॥"

* * * *

"নিম্বালো গ্রামরে লীলা আরম্ভিবে দ্বাদশ শাখার সঙ্গে।
বটপুটে বসে আশ্রয় করিবে নানা কৌতুক রঙ্গে॥" *

কিন্তু এমন এক পুণ্যশ্লোক সাধু ভক্তের কাছে শিষ্য সনাতনকে পাঠাইয়া চৈতন্যদেব স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি স্বয়ং ভক্ত অচ্যুতানন্দের উদ্দেশে নিম্বালয় অভিমুখে চলিলেন। সেখানে কিছুকাল নবদ্বীপ-কিশোরের প্রেম-লীলা সঙ্কীর্ত্তন চলিল।—

"ষড় গোসাঁইরূপ রঘুনাথ সঙ্গতে ঘেনিণ স্বামী।
চিত্রাঙ্গী তটরে প্রবেশ হইল নিম্বালো তটরে পুনি॥
শুভ সময়েরে শ্রীশচীসুতাঙ্কু অচ্যুত কলে দরশন।
প্রেমে গড়াগড়ি হইল অচ্যুত স্বামী কি কহে বচন॥" †

স্বামী অচ্যুতানন্দ সামান্য নিম্বালয় গ্রামে শ্রীচৈতন্যের ন্যায় মহাপুরুষকে অতিথিলাভ করিয়া, কিরূপে যে তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। অচ্যুতানন্দের আনন্দ আর ধরে না। সেই নির্জ্জন বটমূলে কিই বা তাঁহার আছে—কি দিয়াই বা তিনি অতিথিসৎকার করিবেন? আনন্দে—প্রেমে গদ্‌গদচিত্ত হইয়া, কেবল মধুর প্রেমপূর্ণ বচনে তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। বলিলেন—"তুমি মাতাপিতা, তুমি বন্ধু, তুমিই সম্পদ্, তুমি ইষ্টজন, জীবের জীবন, তুমিই পরিত্রাতা।"

"তুম্ভে মাতাপিতা বন্ধু সহোদর সকল সম্পত্তি মান।
ইষ্ট বন্ধু ধন জীবন জীবন তুম্ভে করি পরিত্রাণ॥" ‡

সেই নিম্বালয়ে অচ্যুত-চৈতন্যের মিলনে যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে জ্ঞান ও প্রেমের এক অপূর্ব্ব তুফান বহিয়া গেল। উভয়ে প্রেমে ও আনন্দে লুটালুটি খাইলেন। চৈতন্যদেব নিম্বালয়ে ভক্ত ঋষিতুল্য অচ্যুতানন্দকে নামসঙ্কীর্ত্তনে মাতাইয়া তুলিলেন। অচ্যুতানন্দের হাতে খোল-করতাল দিলেন :

"সুদয়া করি নবদ্বীপকিশোর খোল করতাল দেলে।
সঙ্কীর্ত্তন করি রাসলীলা সংসারে রচ বৈলে॥" *

বঙ্গের চৈতন্য-প্রভু ভক্ত ও জ্ঞানী অচ্যুতানন্দের অন্তরে যে প্রেমের রসসঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। "সঙ্কীর্ত্তন করি রাসলীলা রচ" বলিয়া, চৈতন্যদেব যে তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, অচ্যুত-জীবনে সেই উপদেশের ফল ফলিয়াছিল। অচ্যুতের "স্বরূপ মঠে" যখনই রসের তরঙ্গ উঠিত, তখনই তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের সঙ্গে রাসলীলা চলিত।

"সোয়াঙ্গ বিষে নিম্বাল গ্রামরে চিত্রতলা নদীকূল।
বার শিষ্য ঘেণি অচ্যুত রহিবে স্বরূপ মঠরে খেল॥" †

বারটি শিষ্যই তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল।

"কলিতে হবু রাস্ব্রসিয়া
বর দিমু বারটিয়া॥"

অর্থাৎ "কলিতে রাস করিবার জন্য তোমাকে বারটি শিষ্য বর দিলাম।" বারটি শিষ্যের মধ্যে নিম্নে কয়েকটির মাত্র নামোল্লেখ করিলাম। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিল—রামদাস। এতদ্ভিন্ন মুকুন্দ, অনন্ত, উথান, পবন, বালক, আনন্দ, গোবিন্দ, গদাধর ও মাথুরী প্রভৃতি আরও এগার জন প্রধান শিষ্য।

ভক্ত অচ্যুতানন্দ নিরাকার একাক্ষর পরব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। তদ্রচিত "তত্ত্ববোধন," "ব্রহ্মসংহিতা," "অকলিত সংহিতা" প্রভৃতি গ্রন্থের নামেই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সহস্র মূর্ত্তিপূজার আড়ম্বরের মধ্যেও যে অধুনা উড়িষ্যায় নিরাকার উপাসনা ও ভক্তিভাবের অন্তঃসলিল-স্রোত প্রবাহিত দেখা যায়, স্বামী অচ্যুতানন্দের ন্যায় ভক্ত সাধুরাই তাহার মূলে। ‡ "তত্ত্ববোধন" গ্রন্থের একস্থলে অচ্যুতানন্দ তাঁহার প্রিয়শিষ্য রামচন্দ্রকে বলিতেছেন ;—

* শূন্যসংহিতা।
† শূন্যসংহিতা।
‡ শূন্যসংহিতা।

* শূন্যসংহিতা।
† জগন্নাথদাস-কৃত 'ভক্তি চন্দ্রিকা', ১ম অধ্যায়। সোয়াঙ্গবিষে অর্থাৎ সোয়াঙ্গ পরগণা। নিম্বাল গ্রাম 'সোয়াঙ্গ' পরগণার অন্তর্ভুক্ত।
‡ বর্ত্তমানে উড়িষ্যায় অলেখ-সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ; ইহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। ঢেকানালে ইহাদের প্রধান গাদী।

"একা অক্ষরকু ভজিলে বাবু
জন্মমরণকু উত্তরিবু ॥" *

অচ্যুতের আশ্রয় যে একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম, তাহা তিনি অকলিত সংহিতায় স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"এতেক মিশি ব্রহ্মা একাক্ষর।
উদয় মার্গের এহু বিচার ॥
একব্রহ্ম পূর্ণপূর্ণশ্চ।
সদা অচ্যুত আশ্রয় ॥
এবং ভাবং মহা সূক্ষ্মম্।
জন্মজন্মান্তরে ভবেৎ ॥" †

জীবাত্মার অন্তরে পরমাত্মা যে কেমন করিয়া দেখিতে হয়, তাহা তিনি কেমন সামান্য ডিম্বের উপমা দিয়া সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন!—

"অনাম তলরে মণ্ডল গোটি।
পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকু অছরি ঘোটি ॥
তথি উপরকু নাহিটি কিছি।
ডিম্বর মধ্যেরে ছোয়াটি অছি ॥
ডিম্ব ফুটাই ছোয়াকু দেখিলে।
অন্ধকার মান ফিটিবে ভলে ॥" ‡

অর্থাৎ ডিম্বরূপ জীবাত্মার অন্তরে শাবকরূপ পরমাত্মা আছেন। ডিম্বটি ফুটাইয়া শাবকটির দেখা পাইলে, অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোক ফুটিয়া উঠিবে। ইহাই ত যোগীর সূক্ষ্ম আত্মদৃষ্টি। ব্রহ্মসাধকের লক্ষণ সম্বন্ধে অচ্যুতানন্দ কি বলেন, শ্রবণ করুন ;—

"পলক নিশ্চল সাধি পবন।
নিশ্চল করি বসি পাঁচ মন ॥ §
মন পবনকু করিণ এক।
তেবে সে বলিবা ব্রহ্মসাধক ॥
রজ তামস গুণকু ছাড়িব।
সত্ত্বগুণার মন বলাইব ॥
নাসাদ্বারে ধ্যান লাগাইথিব।
দেহ হজাই যোগিণ বসাইব ॥

* তত্ত্ববোধন, ৫ম অধ্যায়।

† অকলিত সংহিতা, প্রথম পটল।

‡ তত্ত্ববোধন, ৩য় অধ্যায়।

§ মন, অমন, সুমন, বিমন, কুমন—এই পাঁচ মন।

ওলটি পিছড়া টেকিবু দিঠি।
তেবে অন্ধকার যিবটি ফিটি ॥
ব্রহ্ম মণ্ডলকু বায়ি টেকিব।
জ্ঞানদীপরে ব্রহ্মকু চিহ্নিব ॥ *

অচ্যুতানন্দ-রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ঝুমর চরিত' গ্রন্থখানি উড়িয়্যাবাসী সকলের নিকট বিশেষ ভক্তি ও পূজা পাইয়া থাকে। 'ঝুমর চরিত' যাহার কাছে থাকে, সে উহাকে বহুমূল্য রত্নতুল্য জ্ঞান করে। সে সহজে কাহারও নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালের কথা অচ্যুতানন্দ ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই কারণে অনেকে ইহাকে 'গুপ্ত গীতা' বলিয়া থাকে। এই ঝুমর চরিতে তিনি একাক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কেমন স্পষ্ট সহজ ভাষায় বলিয়াছেন ঃ—

"একাক্ষর বসাণ হো নয়ন রে দেখ।
বসাই পারিলে নিশ্চয় দেখিবু অলেখ ॥
এ সূত্র জানি সুজনে জিনিবে কলিরে।
চক্রমান কর ভেদ জানিবে সংসারে ॥
এথি উপরেটি গুরু নাহি যে অচ্যুত।
তপস্যারে জন্ম হ'লে পাই এহু তত্ত্ব ॥" †

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে একজন বৈষ্ণব ভক্ত যে "ঈশ্বরের উপরে অন্য কেহ গুরু নাই" এই মহতী বাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ভক্ত অচ্যুতানন্দ যে এক অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, তদ্রচিত নানা গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্রহ্ম-সাধনার ফলে তিনি দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহার এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতে বিশেষতঃ উড়িষ্যা প্রদেশে ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটিবে, সে বিষয় তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থেই অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে কোন কোন বিষয় প্রকৃতই ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল কথার মিল হয় না। তদ্রচিত 'আগত-ভবিষ্য-কাহিনী' নামক একখানি

* তত্ত্ববোধন, ৩য় অধ্যায়।

† ঝুমরো চরিত ২০ অধ্যায়।

স্বতন্ত্র গ্রন্থই আছে, যাহাতে কেবল মাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দূরদৃষ্টির কল্যাণে, তাঁহার আয়ুর কতকাল ভোগ সে পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই নিজে জানিতে পারিয়াছিলেন ঃ—

"কলিরে বাষষ্টি বরস্ আয়ু হইবে ভোগ।
ঠিক পদ বাছি কহিলে স্বামী অচ্যুতানন্দ।"

—(অকলিত সংহিতা)

ভবিষ্যৎ কথা দৈববাণীর ন্যায় যেন তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত হইত। নিরাকার পুরুষ যেন তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া দিতেন। তাই তিনি প্রতিপদে 'নিরাকার উবাচ' বলিয়া নিরাকার পুরুষের উক্তিরূপে ঐ সকল প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষি-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ভারতের মহাপুরুষেরা ব্রহ্মসাধনার বলে চিরদিন এইরূপে দিব্যদৃষ্টির দ্বারা ভবিষ্যৎ-কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মোগল-রাজ্যকালের প্রারম্ভে গুরু নানক বাবর শাহকে "সাত পুরুষ দিল্লীতে রাজত্ব করিবে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দসিংহও ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—সমগ্র ভারত ইংরাজের করতলগত হইবে। শিখ-অধিপতি রণজিৎ সিংহের উক্তি "সব্ লাল হো যায়গা" তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র।

ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভর না থাকিলে, এরূপ দিব্য দৃষ্টি বা যোগ দৃষ্টি লাভ করা যায় না। সংসারে অচ্যুতানন্দের ধনজন মান বা যশে কিছু মাত্র কামনা ছিল না। সংসারে তাঁহার আশা নিম্বালয়ের বটপুট মাত্র। সেই বটমূলে বসিয়া, কিরূপে নিত্যপূর্ণপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আশা।—

"নিম্বালো গ্রাম চিত্রাঙ্গীতটরে।
নিবাস হইব বটমূলরে॥
বটপুটকু করিয়াছি আশা।
পামর অচ্যুত এতে ভরসা॥"

পুনশ্চ —"নিম্বালো গ্রাম নিবাস বটপুটআশা।
শ্রীহরিচরণে সর্ব্বদা করিছন্তি ভরসা॥"

—(কাহিনী)

স্বামী অচ্যুতানন্দের যদিও করণ-কুলে জন্ম, তথাপি উড়িয়্যাবাসী ব্রাহ্মণশূদ্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করে। কিন্তু প্রধানতঃ গৌড়-গোপালেরা তাঁহার শিষ্য স্থানীয়। গৌড় গোপালেরা তাঁহাকে দেবতা বা অবতার বোধে তাহার পূজা করে। অচ্যুতানন্দের এই সমাধিস্থানে নিত্য গোপালেরা আসিয়া কেহ বা মানত করে, কেহ কেহ বা এই স্থানের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে, কেহ বা সাধ্যমত দানধ্যান করে। সকলে প্রসাদ লইয়া চলিয়া যায়। বর্ত্তমানে এই গাদীর যিনি মহান্ত আছেন, তাঁহার নাম সুন্দরানন্দ গোস্বামী। তিনি অচ্যুতানন্দেরই বংশধর। ইনি অচ্যুতানন্দ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ। আর যাঁহারা গাদীর সেবায়েত, তাঁহারা অচ্যুত-শিষ্য রামচন্দ্র দাসের বংশধর। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায়, অচ্যুতানন্দের তিরোভাবের দিনে, এখানে পনের দিন ধরিয়া মহামেলা বসিয়া থাকে। সে সময়ে চিত্রাঙ্গী নদীর বালুকাস্তরণ বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ে পূর্ণ হইয়া যায়।

নিম্বালয়ের এদিকে ওদিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ—সিদ্ধগুম্ফা, ভক্তপীঠ প্রভৃতি নানা দর্শনীয় স্থান নির্দ্দেশ করে। সেদিন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল।

প্রিয়ার নয়ন

[শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী, এম্. এ. বি. এল.]

তৃণ কিংবা ধূলিকণা পড়ে যদি চোখে,
যাতনা তাহাতে কত—সকলেই জানে;
প'ড়েছে আমার চোখে তাহার নয়ন,—
ধৈরজ বল গো আমি ধরিব কেমনে?

ভিখারিণী

[শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী]
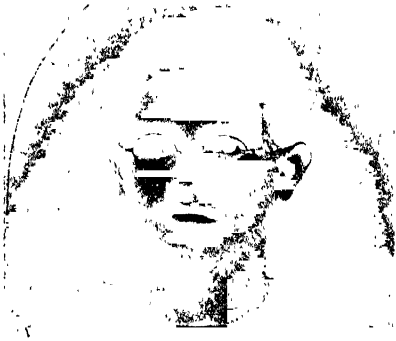
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

তখনও সম্পূর্ণ ফরসা হয় নাই, আধ তন্দ্রা, আধ-জাগরণে; শয্যায় শুইয়া গড়াগড়ি দিতেছিলাম, ঘুমের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। প্রভাতকাল, শরতের শান্ত-মধুর প্রভাত। ভোরের মৃদু বাতাস বারান্দার উপরকার টবের ছোট ছোট বেলফুলের গাছগুলির ফুলবাস বহিয়া জানালার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। পাশের বাটীর বারান্দায় একটা পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিল ঝুলান ছিল, ভোরের সেই মুক্ত প্রকৃতির আভাস বুঝি তাহাকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল; তাই, সেও তাহার সেই প্রাণভুলান স্বর গ্রামে গ্রামে বাতাসের স্তরে স্তরে মিলাইয়া দিতেছিল।

গলির মোড়ে তখন জনৈক ভিখারী গান ধরিয়াছে ;—

"গিরি! গৌরি আমার এসেছিল"।

শরতের এ হেন শান্ত মধুর প্রভাত বেলায় আগমনীর মূর্চ্ছনা কি তৃপ্তিকর! সে যেন কত যুগের পুরাণ কাহিনী মানসচক্ষের সামনে ফুটাইয়া তুলে, কত মাতৃপ্রাণের আকুল আহ্বানের অনুভূতি হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। কত স্মৃতি, কত আনন্দ, কত আশা, কত উন্মেষের ঝঙ্কার হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজাইয়া তুলে, কিন্তু শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, আগমনীর সেই দূরাগত অস্পষ্ট মূর্চ্ছনা আমার মনে এতটুকুও সুখ আনিয়া দেয় নাই। আশার উন্মেষ, কিংবা আনন্দের ঝঙ্কার হৃদয়ের কোথায়ও মুখরিত হইয়া উঠে নাই। সে মূর্চ্ছনা আজ মনের মধ্যে স্মৃতি ফুটাইয়াছিল বটে কিন্তু সে সুখের স্মৃতি নয়, বাল্যের মধুময় উৎসবের স্মৃতি নয়; কিসের স্মৃতি জানেন? অনেকদিনের পুরাণ একটা শোক-স্মৃতি। ভগবান! এ স্মৃতি কি মুছিবার নয়? কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়াই বলি।

সে আজ অনেক দিনের কথা: তাহার পর আমার জীবনে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সব কথা আজ ভুলিয়া গিয়াছি, অতীতের স্তূপে তাহারা চাপা পড়িয়া গিয়াছে; কেবল একটা ঘটনার কথা ত ভুলি নাই! অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু ভুলিতে পারি নাই। ভুলিলে আর প্রায়শ্চিত্ত হয় কৈ?

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি, এফ. এ. পাস করিয়া মেজাজটা তখন খুবই গরম। তখন মনে করিতাম, আমি বুঝি খুব একটা ক্ষণজন্মা পুরুষ। হায়, তখন কে জানিত, একদিন এই গর্ব্বস্ফীত মস্তক বিধির একটি অঙ্গুলিহেলনে নত হইয়া পড়িবে!

শরৎকালের প্রভাত—আজও যেমন ভিখারী আগমনী গায়িতেছে, সেদিনও ঠিক এমনই করিয়াই ভিখারী আগমনী গায়িয়াছিল। সকল বিষয়েই আজিকার প্রভাত আর সেদিনের প্রভাত মিলিয়া যায়, কেবল এক বিষয়ে নয়। সে দিন অন্তরে সুখ ছিল, প্রাণে শান্তি ছিল, মুখে হাসি ছিল, আর ছিল হৃদয়ে—উৎসাহ। কিন্তু আজ সে সকলের কিছুই নাই; আছে কেবল, শোকের জ্বালাময়ী স্মৃতি, নিরাশার তীব্র হাহাকার, আর প্রাণের গভীর বেদনা।

সে দিন প্রাতঃকালে, আমরা কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া

মেসের একটি ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। অধিকাংশ গল্পই আমাদের দেশের সংকীর্ণতা লইয়া। গল্প বেশ পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় আমাদের মেসের বৃদ্ধা ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু একটি মেয়েমানুষ ছোট একটি ছেলের হাত ধরে ভিক্ষা করতে এসেছে। আহা বাছার মুখখানি শুখিয়ে গেছে। শুনলুম, দুদিন বাছার কিছু খাওয়া হয় নি!"

হরিশ ছিল আমাদের দলপতি। সে সিক্সথ্ ইয়ারে পড়ে, ইংরেজী ভাষাটার উপর তাহার বেশ দখল ছিল। সে খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজী বলিতে পারিত। হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি উপলক্ষে নাসিকাকুঞ্চিত করে নাই এমন দিন তাহার জীবনে বোধ হয়, একদিনও আসে নি। সে প্রায়ই বলিত, "শীঘ্রই একজন সংস্কারকের আবশ্যক; তাহা না হইলে, এই অধঃপতিত জাতির মুক্তির আশা আর মোটেই নাই।"

আমরা একান্ত মনোযোগের সহিত হরিশের সেই যুক্তিযুক্ত সার কথাগুলি শুনিতাম, আর মনে করিতাম, হরিশের আদর্শে জীবনটাকে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, এ সংসারে উন্নতির আশা নাই।

আমরা এমনভাবে হরিশের কথা শুনিতেছিলাম যে, ঝির কথা কাণে প্রবেশ করিলেও, আমরা সে কথায় কান দিবার অবসর পাইলাম না। ঝি তখন আবার বলিল, "বলি হাঁগা বাবুরা, একটা স্ত্রীলোক যে দু'মুঠো অন্নের জন্য মরে, সেদিকে কি একবার দেখ্‌তে নেই। তোমরা কি রকম লোক গা।"

এইবার আমাদের বক্তৃতা থামিল; কথাটা শুনিয়া মনে বড় আঘাত লাগিল। ঝি ত ঠিকই বলিয়াছে, আমরা কি রকম লোক! একটা স্ত্রীলোক দু'মুঠো অন্নের জন্য লালায়িত আর আমরা তোফা গল্প জুড়িয়া দিয়াছি! আমিই প্রথমে বলিলাম, "ওহে, সকলে দু'চার পয়সা করিয়া, ঝির হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। কৈমন ঝি, তা হলেই হবে ত?"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই হরিশ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "বিনোদের যে দেখছি ভারি দয়া! ভায়া, দয়া করবার আগে সব দিক্ দেখে নিতে হয়। পাত্রাপাত্র না দেখে দয়া করায় লাভ ত নাই-ই বরং সমূহ লোকসান্।" পরে ঝির দিকে মুখ ফিরাইয়া হরিশ মুরুব্বিচালে জিজ্ঞাসা করিল, "যে স্ত্রীলোকটি ভিক্ষা করতে এসেছে, তার বয়স আন্দাজ কত বলতে পার?"

ঝি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "পঁচিশের বেশী হবে না।"

হরিশ তখন হাসিয়া বলিল, "দেখলে হে এই অল্পবয়সে কোথায় খেটে খাবে—না ভিক্ষা! এদের ভিক্ষা দিলে, আস্কারা দেওয়া হয়। না ঝি, তুমি গিয়ে বল—এখানে ভিক্ষা মিল্‌বে না।"

ঝি তখন কিছু চটিয়া গিয়া বলিল, "সুধু বয়স হইলেই বুঝি হয়, শরীর বুঝি সকলের সমান! আহা বাছার এক প হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে—আর সে খেটে খাবে? তোমরা কি রকম নিষ্ঠুর গা!"

হরিশের সকল কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছিল কিন্তু তথাপি কি জানি কেন, কি এক অজানিত বেদনা হৃদয়ের প্রত্যেক পঞ্জরে অনুভব করিতেছিলাম। আমি মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলাম, "দেখুন হরিশবাবু, আমার বোধ হয়, একবার ভিখারিণীর চেহারাখানা দেখে তাহার পর, যাহা হয় একটা স্থির করলে ভাল হয়! যদি সে বাস্তবিকই ভিক্ষা পাবার উপযুক্ত হয়, তা হ'লে কিছু দেওয়া যাবে, না হয় ফিরিয়ে দিতে কতক্ষণ?"

আমার কথা শুনিয়া অপরাপর বন্ধুরা বলিয়া উঠিল, "সেই ঠিক।" তৎক্ষণাৎ ভিখারিণীকে ডাক পড়িল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বৃদ্ধা ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক শীর্ণা রমণী একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া আমাদের কক্ষের দরজার একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিখারিণীর আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত থাকায়, তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু বালকটির মুখখানি দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল,—তেমন সুন্দর মুখ জীবনে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই সুন্দর মুখখানির উপর বিষাদের ছায়া পড়িয়া, এক নূতন রকমের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। বালকের কাতরদৃষ্টি আমাকে যেন কেমন করিয়া দিল, আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সে দৃষ্টি যেন অব্যক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতেছিল, "আমরা বড় দুঃখী, আমাদের কিছু খেতে দাও।" কিন্তু কি করিব? হরিশ তাহা হইলে এখনই তাচ্ছিল্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিবে!

হরিশ মাথামুণ্ড কি যে দেখিল, তাহা ভগবানই জানেন। কিছু ক্ষণ পরে সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "না বাপু এখানে কিছু মিল্‌বে না।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার কাণে একটি দীর্ঘনিশ্বাস প্রবেশ করিল।

হরিশ বলিল—"না বাপু, এখানে কিছু মিলিবে না।"

তাহার পর ভিখারিণী ছেলেটির হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। হায়, তখন কে জানিত, ঐ ভিখারিণীর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সকল সুখ, সকল শান্তি, আমার নিকট হইতে চিরবিদায় লইবে!

মনের মধ্যে সহসা এক বিষম বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, কেন আমি ডাকিয়া কিছু দিলাম না, না হয় দুটা গঞ্জনাই সহ্য করিতে হইত। এ যন্ত্রণার অপেক্ষা সে যে শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল।

শৈশবের কত কথাই আজ যৌবনের পুরদ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়া গেল, কত সুখের সে দিন ছিল! তখন তর্কের ধার ধরিতাম না, ভিক্ষার পাত্রাপাত্র মানিতাম না। যে আসিত, তাকেই একমুঠা করিয়া চাল দিতাম। মনে পড়িয়া গেল, যেদিন এণ্ট্রান্স পাস করিয়া প্রথম কলিকাতায় আসি, সে দিন মা চোখের জল মুছিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখিস বাপু, ইংরিজি পড়ে ইংরেজের মত কড়া হোস্ নে। মাকে যেন ভুলিস নি।"

আজ সেই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল; সত্যই ত আজ আমি সে বিনোদ নাই! কোথায় সেই কোমল প্রাণ —আর কোথায় এই কঠোর হৃদয়! হায় কেন এমন হইলাম? বালকের সেই করুণ চাহনি আজ আমার হৃদয়ের স্রোতকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিল।

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রোফেসারের নোট্ টুকিতেছি এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু কাল যে মেয়েমানুষটিকে তোমরা কিছু না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, সে কাল মারা গেছে।"

আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"বল কি! সে মারা গেছে!" হৃদয়ের প্রতি পঞ্জরের উপর কে যেন সবলে মুষ্ঠ্যাঘাত করিতে লাগিল। মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "হা ভগবান! এ পাষণ্ডের নরকেও কি স্থান আছে!"

আমার কথা শুনিয়া পাশের ঘর হইতে আমার জনৈক বন্ধু হাসিয়া বলিল, "তুমি যে দেখ্‌ছি একেবারে এক্টিং আরম্ভ করে দিয়েছ।"

আমি সে কথায় কাণ না দিয়া ঝি'কে বলিলাম, "স্ত্রীলোকটি কি করে মারা গেল ?"

ঝি চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "বাছার ছুদিন কিছু খাওয়া হয় নি। শুন্‌লাম সে নাকি গেরস্তঘরের বৌ ; অতিকষ্টে ছুদিন অনাহারে থেকে শেষকালে প্রাণের দায়ে বাছা ছেলেটির হাতধ'রে পথে বেরিয়েছিল। তোমাদের এখানে কিছু না পেয়ে, মেয়েটি গলির মোড়ের বাবুদের বাটীতে গেছ্‌ল। তাঁহারা যত্ন করে বাছাদের খেতে দিলেন ; কিন্তু ছুদিন উপোসের পর যা তা খেয়ে মেয়েটির কলেরা হল, সেই রোগেই মেয়েটি মারা গেল।" আমি মনের আবেগে বলিয়া উঠিলাম—"আর সেই ছেলেটি ?"

"ছেলেটির অবস্থাও ভাল নয়, বাঁচ্‌বে বলে ত আশা হয় না।"

আমি আর কোনও কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি সেই মোড়ের মাথার বাবুদের বাটীতে গিয়া হাজির হইলাম।

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে বালককে মেসে আনিয়া শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলাম। আমার অনেক শুশ্রূষার ফলে বালক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। জীবনে আমার সেইটুকুই সান্ত্বনা।

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে বালককে মেসে আনিয়া আমার শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলাম

হায়, এইখানেই যদি আমার শাস্তি শেষ হইত, তাহা হইলেও বা এতদিনে সে দুঃখ কতক পরিমাণে ভুলিতে পারিতাম ; কিন্তু তাহা হইলে আর দণ্ড হয় কৈ ?

একদিন শুনিলাম যে স্ত্রীলোকটি আমাদের নিষ্ঠুরতায় প্রাণ হারাইল, সে আমারই একজন অন্তরঙ্গ-বাল্যবন্ধুর স্ত্রী!

পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ চিরজীবন বিবাহ না করিয়া সেই মাতৃহারা বালককে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেছি আমার যত্নে সে তাহার মাকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে ; কি সময় সময় সে যখন জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার কি মা নেই ?" তখন আমি অন্তরে শতবৃশ্চিকদংশনজ্বালা অনুভব করিতে থাকি।

ভারত ভারতী

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ—চার্ব্বাক দর্শন (৩)

[শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সাংখ্যবেদান্তদর্শনতীর্থ]

সকল স্থানেই বিধির নিশ্চয় থাকিলে, পরে নিষেধ হয়, (যেরূপ যাহার প্রাপ্তি থাকে তাহারই প্রতিষেধ হয়) যদি পূর্ব্বে উপাধি-জ্ঞান হয়, তৎপর উপাধির অভাব বিশিষ্ট-সম্বন্ধ-রূপ-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইবে। সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের অধীন পুনঃ উপাধি জ্ঞান হইবে। এই ভাবে পরস্পরের আশ্রয়-(উভয়ের মধ্যে এক অপরকে না ছাড়া) রূপ বজ্রপ্রহার-তুল্য দোষ হয়, অর্থাৎ তাহা যেন 'বজ্রলেপের ন্যায় অভেদ্য হইয়া দাঁড়ায়, অতএব 'বজ্রলেপ' * তুল্য দোষ হেতু, অবিনাভাব অতি দুর্জ্জেয়, এবং নিরূপণ করা কঠিন বলিয়া (ব্যাপ্তি নিরূপণ) কার্য্যে অনুমান প্রভৃতির কোনরূপ অবকাশ (অবসরই) নাই। লোকের ধূমাদির জ্ঞানের পর বহ্নি প্রভৃতির প্রতীতি জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষমলক কিংবা ভ্রমনিবন্ধন জানিবে। কোথায়ও যে, তাদৃশ বস্তুদর্শনে তাহার অধীভূত অপর বস্তুর অনুমিতিও তৎফল দেখা যায়, তাহা মণি-মন্ত্র ঔষধ প্রভৃতির † ন্যায় ফলের কাদাচিৎক (কখনও হয় কখনও বা হয় না) অথবা যাদৃচ্ছিক [অর্থাৎ সকল সময়ে সকল মণি-মন্ত্রের ও ঔষধের ফল হয় না, অতএব প্রকৃতে সকল ধূমদর্শনে সকল বহ্নির ও অনুমিতি হয় না] সেই হেতু অনুমান দ্বারা সাধ্য যে, অদৃষ্ট (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি) ঈশ্বর, পরকালাদি কিছুই নাই। [অর্থাৎ অদৃষ্ট এবং ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে অনেক দোষ হয়, (১ম) অদৃষ্টাধীন নানাপ্রকার সৃষ্টি না হইলে অদৃষ্ট কোথা হইতে আসিবে? (২য়) ঈশ্বর সৃষ্টি করেন কেন? স্বার্থ বা করুণানিবন্ধন; প্রেক্ষাবানের (মহানুভবের) প্রবৃত্তি স্বার্থ-ও করুণা দ্বারা ব্যাপ্ত হইলেও প্রথম সৃষ্টিতে জীবের অভাবে কাহার প্রতি করুণা প্রকাশ পাইবে? যদি স্বার্থ নিবন্ধন ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তবে তিনি লোক-সিদ্ধ বিষয়-প্রার্থী রাজার তুল্য। তাঁহার অলৌকিকত্ব স্বীকার করিয়া বা অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি? আর করুণা-নিবন্ধন সৃষ্টিতেও ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়] আর যদি অদৃষ্ট—অসংখ্য জীবের বহুজন্ম সঞ্চিত সংস্কার—স্বীকার করা না হয়, তবে ত বিচিত্র কৌশল-পূর্ণ এই বিশাল জগতের অনন্ত পদার্থের নানারূপত্ব আকস্মিক (নিমিত্তশূন্য বা হঠাৎ) হইয়া পড়ে! প্রথমতঃ আকস্মিক হইবে না, হইলেও হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? স্বভাবনিবন্ধনই জাগতিক বৈচিত্র্যের (বহু পদার্থের নানারূপ সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় প্রভৃতি) উপপত্তি হইবে। তবে অদৃষ্ট-স্বীকারের আর প্রয়োজন কি আছে? এই সম্বন্ধে চার্ব্বাক-গুরু বৃহস্পতিও বলিয়াছেন;—"অগ্নি উষ্ণ (তাপ স্বভাব) জল (শৈত্য স্বভাব) তদ্রূপ সমস্পর্শ-(অনুষ্ণ-অশীতস্পর্শ) * বায়ু, ইহাদিগের এই ভিন্নধর্ম্মিতা-(চিত্রাঙ্কন) কে করিয়াছে? স্বভাবতই ইহারা সকল সময় এই ভাবে অবস্থিত আছে" অর্থাৎ স্বভাবই ইহাদের নানা ভাবের নিয়ামক। [এই

---

* আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে 'বজ্রলেপ' নামে একটি প্রলেপের প্রস্তুত প্রণালী ও তাহার উপাদান-দ্রব্যাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই লেপ বজ্রের ন্যায় অব্যর্থ ও অভেদ্য বলিয়া উক্ত নাম অন্বর্থ-মূলক হইয়াছে। দুর্ভেদ্য দুর্গ ও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে তাহার ব্যবহার হইত। আবার কোন কোন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বজ্রের (বৃহদ্গোলার) উপরি যে লেপ দেওয়া হইত, তাহাই বজ্রলেপ নামে কথিত হইয়াছে। প্রকৃত বিষয়ে চার্ব্বাকের উদ্ভাবিত যে দোষ, তাহা যেন বজ্রলেপতুল্য অখণ্ডনীয়। বৃহৎ কাশ্যপীয় শিল্পশাস্ত্রে, বৃহৎ পারাশরীয়-শিল্পশাস্ত্রে এবং বৃহৎ শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে উক্ত লেপের উল্লেখ আছে।

† প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে মণির নানাপ্রকার প্রভেদ, বিবরণ, ধারণ-বিধি, বিজ্ঞান, মূল্যাদির উপায় প্রভৃতি আছে। সকল মণির শক্তিগুণ সকলসময়ে প্রকাশ পায় না, অতএব যাদৃচ্ছিক জানিতে হইবে। মন্ত্র ও ঔষধ তদ্রূপ, সকল মন্ত্রদ্বারা সব সময়ে অভীষ্টলাভ করা যায় না। এবং কোন কোন ঔষধের ফল হয়, আবার কোন কোন ঔষধের যথোক্ত ফল হয় না।

* শ্রীমদ্ ভাস্করাচার্য্যও গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন
"যতো বিচিত্রাবদবস্তুঃশক্তয়ঃ।"

শ্লোকটী মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য-বার্ত্তিকের বলিয়া কেহ কেহ বলেন,তাহা ঠিক নয়; যে হেতু স্বভাববাদ খণ্ডনাবসরে উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। দ্বিতীয় পাদে 'সমস্পর্শ' স্থলে কোন পুস্তকে 'শীতস্পর্শ' পাঠও আছে। উজ্জ্বল-দত্তের মতে স্বভাব দুই প্রকার—নিসর্গ ও স্বরূপ; বাহ্য কারণের অপেক্ষা শূন্যকে স্বভাব বলে। তাহার মধ্যে নিসর্গ বহুকালের সুদৃঢ় অভ্যাসজনিত হয়। স্বতসিদ্ধ বস্তুর স্বরূপ বা ভাবকে অজন্য বা স্বরূপ বলে। "স্বভাবো দুরতিক্রমঃ" এই কুসুমাঞ্জলির কারিকায় উক্ত স্বভাব শব্দের অর্থ শব্দার্থ, পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সমূহ বৃহস্পতি মতের অনুসরণকারি চার্ব্বাক সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—'স্বর্গ (দেবধাম) অপবর্গ (নির্ব্বাণ) পারলৌকিক আত্মা, (অর্থাৎ পরলোকগামী আত্মা) প্রভৃতি নাই।' (বর্ণাশ্রমোক্ত ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত) ক্রিয়াসমূহ ফলজনক নয়'।

'অগ্নিহোত্র যাগ, বেদত্রয় (ঋক্, সাম, যজুঃ), ত্রিদণ্ড (বাগদণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড, অথবা যজ্ঞোপবীত), ভস্ম লেপন, এই সকল পৌরুষ সামর্থ্য বিহীন ব্যক্তিগণের বিধাতানির্ম্মিত-জীবিকার্জ্জনের উপায়মাত্র'। ৩ 'যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বিনষ্ট-পশু স্বর্গে যায়, তবে যজমান তাহার পিতাকে যজ্ঞে নিহত করেন না কেন?' ৪র্থ 'যদি মৃতব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার তৃপ্তি হয়, তবে দূরগামী লোকের সঙ্গে পাথেয় না দিয়া বাড়ীতে সেই পান্থের উদ্দেশে আহারীয় দ্রব্যাদি দান করিলেও হয়'। (৫ম) 'স্বর্গে থাকিয়া যদি পিতৃ-পুরুষেরা (পুত্রাদির) প্রদত্ত-বস্তু লাভে সমর্থ হন, অত্যুন্নত প্রাসাদের উপরিস্থিত ব্যক্তির ভক্ষ্য-বস্তু নিম্নতলে দান করিলে (তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি) ও হইতে পারে'। (৬ষ্ঠ) 'যত কাল বাঁচিয়া থাকিবে (অর্থ না থাকিলেও) ঋণগ্রহণপূর্ব্বক ঘৃত পান করিবে এবং সুখে থাকিবে, এই দেহ (মরণের পর) অগ্নিতে ভস্মরূপে পরিণত হইলে তাহার আর পুনরাবৃত্তি কোথায়?' (৭ম) (অর্থাৎ পরকাল না থাকায় মরণের পর আর ঋণপরিশোধের অভাবযন্ত্রণা পাইতে হইবে না।) (৮ম)'যদি এই দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হইয়া পরলোকে যান, তবে কেন বন্ধুগণের প্রতি স্নেহ-বশতঃ পুনঃ পুনঃ আসেন না?'(৯ম)'মৃতগণের প্রেত-কার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের জীবিকা-অর্জ্জনের নিমিত্ত ভিন্ন আর কিছু নয়।' (১০ম) 'ভণ্ড, ধূর্ত্ত, রাক্ষস, এই তিনই বেদত্রয়ের কর্ত্তা, (পরবঞ্চক) পণ্ডিতেরা জর্ফরী ও তুর্ফরী * প্রভৃতি বাক্য বলিয়া থাকেন, (অর্থাৎ কতগুলি বাক্য বেদনাম দিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য পণ্ডিতেরা প্রস্তুত করিয়াছেন)। (১১শ) 'অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বের ইন্দ্রিয়বিশেষ যজমান পত্নীর ধারণের কথা (যজুর্ব্বেদে) আছে, সেরূপ ভণ্ডগণ অপর বিষয়সমূহ (শাস্ত্রোক্ত কার্য্যাদি) অভিহিত করিয়াছেন'। (১২শ) 'এবং রাক্ষসের ন্যায় মৎস্য-মাংস ভক্ষণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, (অর্থাৎ রাক্ষস সেরূপ স্বত মাংসাশী, তদ্রূপ লোকদিগকে মাংসভক্ষণের আদেশ করিয়াছেন)। [এই চার্ব্বাকদর্শনের মতরূপ উপনিষৎ, মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, মনুস্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, ঊনবিংশসংহিতা, কৌটিল্যার্থশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, নৈষধচরিত, বাসবদত্তা, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সর্ব্বদর্শনশিরোমণি, অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি, কুসুমাঞ্জলি, প্রস্থানভেদ প্রভৃতিগ্রন্থে কোথাও নামমাত্রে, কোথাও বা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এবং 'বার্হস্পত্য সূত্র' নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহা আর এখন পাওয়া যায় না। 'ন্যায়কোষ'-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় ভীমাচার্য্য মহাশয় চার্ব্বাক শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—চারু (লোকসম্মত) বাক্ (বাক্য) যাহার, সে চার্ব্বাক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। পাণিনিসূত্রে "ক্রতুকথাদি সূত্রান্তাট্ঠক্" (এই ক্রতুকথাদিতে) 'লোকায়ত' শব্দের পাঠ আছে। অন্যত্র (৪ ৩-৩৬) পাণিনি-সূত্রের 'কারিকা'তে—চার্ব্বাক শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—"নয়তে চার্ব্বী লোকায়তে, চার্ব্বী বুদ্ধিঃ তৎসম্বন্ধাদাচার্য্যোঽপি চার্ব্বা, সলোকায়তশাস্ত্রে পদার্থান্ নয়তে উপপত্তিভিঃ স্থিরীকৃতা শিষ্যোভাঃ প্রাপয়তিঃ।" কিন্তু 'চার্ব্বী বুদ্ধঃ তৎসম্বন্ধা দাচার্য্যোঽপি চার্ব্বা'— এইরূপ পাঠই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। বৈদিক সাহিত্যেও কোন কোন স্থানে নাস্তিক্যভাবের আভাস পাওয়া যায় না এমন নয়। বিশেষতঃ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে চার্ব্বাক সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চার্ব্বাকমত য়ুরোপে গিয়া স্বীয় প্রভাব সম্পূর্ণ বিস্তার করিয়া আছে। সম্প্রতি, বোধ হয় যেন, ধীরে ধীরে পুনঃ ভারতে পূর্ব্ব-

* "জর্ফরী—হস্তারৌ' 'তুর্ফরী—ভর্ত্তারৌ', নিরুক্তে যাস্কমুনি-প্রণীতে।

"জন্মৌষধি-মন্ত্র তপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ" (পাতঞ্জলদর্শনম্)

গৌরব প্রস্তুত করিতে যত্নবান হইয়াছে। চার্ব্বাকসম্বন্ধে বহু ইতিবৃত্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'অনুসন্ধান' নামক প্রবন্ধে লিখিত আছে বলিয়া, সে সব, পুনঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না। পাঠকমহাশয়গণ সেই প্রবন্ধ পড়িয়া এই বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হইবেন। 'অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিতে' এই মতের অবতারণা এবং পরে খণ্ডন, এই দুই-ই রহিয়াছে। মীমাংসাদর্শনের 'শাস্ত্রদীপিকা' এবং বেদান্তদর্শনের তর্কপাদের ভাষ্য 'ভামতী'তে স্ব স্ব মতবিরোধী অপরাপর মতখণ্ডন যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ চার্ব্বাকদর্শনের মত নিরাস দেখা যায় না। 'দেহাত্ম' বাদীর মত শাবর ভাষ্যের প্রথমেই নিরাকৃত করা হইয়াছে। আস্তিকাবাদিগণের মতের বিস্তৃতি ও গ্রন্থবাহুল্যে নাস্তিকাবাদিগণের মতের উচ্ছেদ ও গ্রন্থের বিলোপ হইয়া গিয়াছে—এইরূপ প্রতীতি হয়। দশবৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত চন্দ্রিকা নামক মাসিক পত্রিকায় পণ্ডিত-প্রবর ৺অপ্পাশাস্ত্রি রাশি বড়েকর বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় 'নাস্তিক্যাৎ আস্তিক্যং শ্রেয়ঃ' নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে ভূয়ঃ আলোচনা করিয়াছিলেন। নাস্তিকমতপোষক আগমাদিবাক্য পাদটীকায় কয়েকটি মাত্র প্রদর্শিত হইল (*)। অতএব অতি সংক্ষেপে চার্ব্বাক দর্শনের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

---

* "অসদ্বেদমগ্র আসীৎ" (ব্রহ্ম উঃ ৪)
"অন্যোঽন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (ঐ „)
অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ (বেদাঃ সঃ)
"নাস্তিবাদার্থ শাস্ত্রংহি ধর্ম্মবিদ্বেষণং পরম্" (হরিবংশে অঃ ১৮)
"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ" (মনুঃ ৪। ১৬৩)
"তস্মান্নাস্তিকতাচৈব দুরাচারস্য জায়তে" (মহাভাঃ
"অতিমাত্রোজ্জিত ভীবনাস্তিকঃ (মাঘমহাকাব্যে)

উপদেশ-সাহস্রী

৫। কারণ ও কার্য্যবাদ

[শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্-এ.]

এই সংসারে তাবৎপদার্থই, পরস্পর কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে। কার্য্য হইতে, উহার কারণটি, সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক। কার্য্য যতটুকু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে, উহার কারণটি, তদপেক্ষা অধিক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কার্য্য—স্থূল; কিন্তু উহার কারণটি,—তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। এই নিয়মে, ক্রমে ক্রমে, কার্য্যের স্থূল-আকার পরিত্যাগ করিয়া, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণটির সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা অনুভবগোচরে আইসে। এইরূপে ক্রমে, পরম-কারণ ব্রহ্মবস্তুর নিরতিশয় সূক্ষ্মতা ও নিরতিশয় ব্যাপকতা বুঝিতে পারা যায়। কারণের স্বরূপটি, উহার কার্য্যের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। কার্য্যের মধ্যে, উহার কারণটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, কার্য্যের যে আকার—তদ্দ্বারা কারণের স্বরূপটি একবারে আবৃত ও তিরোহিত হইয়া পড়ে। এই জন্যই, কার্য্যমধ্যে অনুস্যূত কারণের সত্তা ও স্বরূপটি আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে না। এই জন্যই কার্য্যাপেক্ষা কারণটিকে সূক্ষ্ম বলা যায়। আবার, কার্য্যের যতটা পরিমাণ, তদপেক্ষা উহার কারণের পরিমাণটি কম হইতে পারে না; সুতরাং, বিকার বা কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত যাহা, তাহাই ঐ কার্য্যের উপাদান-কারণ। এই উপাদান-কারণটি, কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া থাকে; সুতরাং উহা কার্য্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। এইরূপে, কার্য্য-অপেক্ষা, উহার কারণটি—সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারি শ্রেণীর 'ভূত' বর্ত্তমান আছে। পৃথিবী—এই চারি প্রকার ভূতের উপাদান-কারণ। পৃথিবী, এই সকল ভূত অপেক্ষা, অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। কেননা, যে স্থানে এই চারি প্রকার ভূত বা প্রাণী অবস্থান করে না, পৃথিবী সে স্থানকেও ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

অতএব, পৃথিবী, এই সকল ভূত অপেক্ষা, সূক্ষ্মতর ও ব্যাপক হইতেছে। আবার, এই সকল ভূত, পৃথিবীরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ-বিশেষ বলিয়া, ইহারা পৃথিবী হইতে নিতান্ত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। ইহারা পৃথিবীরই আকার-বিশেষ মাত্র। ইহারা কেবল কার্য্যাকারে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র; কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, পৃথিবী-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নহে। স্বরূপতঃ, ইহারা সকলেই পৃথিবী বা মৃত্তিকা মাত্র। কেন না, মৃন্নির্ম্মিত যে কোন বিকার লও না কেন, উহারা ধ্বংসের সময়ে মৃত্তিকাতেই লয় পাইয়া যাইবে—মৃত্তিকারূপেই পরিণত হইবে। কার্য্যমাত্রই, উহার নিজ নিজ উপাদানের মধ্যেই লয় পায়;—অন্য কোন উপাদানে পরিণত হইয়া যাইতে পারে না। কেন না, কার্য্যগুলি উহার উপাদানেরই আকার-বিশেষ মাত্র। অতএব, মৃত্তিকার যত কিছু বিকার বা কার্য্য, সকলগুলি অপেক্ষাই মৃত্তিকা—সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

আবার, মৃত্তিকার উপাদান-কারণ—জল। জলীয় পরমাণুই, ঘনীভূত হইয়া, মৃত্তিকারূপে দেখা দিয়াছে। অতএব, ঘনীভূত পৃথিবী, তরল জলেরই বিকার। এই জন্যই, মৃত্তিকার সর্ব্বত্রই অনেক জলীয় রসের সত্তা দেখিতে পাই। রস—তরল জলীয় পরমাণুরই গুণ। এই রস, স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও, বিশেষ বিশেষ পরিণামের ভেদে, কটু-তীক্ষ্ণাদি বিবিধ আকার ধারণ করে। অতএব জল, পৃথিবীকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এইজন্যই, পৃথিবী অপেক্ষা জল, অধিকতর সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

আবার, জলের উপাদান-কারণ—তেজ। তৈজস পরমাণু বা উষ্ণতা,—পৃথিবীর সহিত জলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কেন না, সর্ব্বত্রই এই উষ্ণতার উপলব্ধি হইয়া থাকে। উত্তপ্ত লৌহ-গোলকে এবং সূর্য্য-কিরণাদিতে, জল বিলীন হইয়া যায়। কার্য্যমাত্রই, উহার উপাদান কারণরূপেই ধ্বংস হইয়া যায়—পরিণত হইয়া যায়। এইজন্যই, তেজ বা উষ্ণতা, জল হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

এই উষ্ণতা আবার, বায়ু হইতে উৎপন্ন হয় এবং বায়ুতেই লীন হইয়া যায়। অতএব বায়ু বা গতিশক্তিই,—উষ্ণতার উপাদান-কারণ। এই জন্যই, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, "সূর্য্য, প্রাণশক্তি হইতেই উদিত হয় এবং প্রাণশক্তিতেই অস্তমিত হয়।"

আবার আকাশ, এই বায়ুকে গ্রাস করে। অতএব, আকাশ, বায়ু-অপেক্ষা, অধিকতর সূক্ষ্ম এবং অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। আবার, এই আকাশাদি সকল পদার্থই, সত্তা ও স্ফুরণ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ব্রহ্ম-সত্তা ও ব্রহ্ম-স্ফুরণ, সকল পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান ও অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব, এই সত্তা ও স্ফুরণ, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক। এবং ইহাই, সকল দৃশ্য বস্তুকে গ্রাস করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ব্রহ্ম-সত্তা ও ব্রহ্ম-স্ফুরণের অপর কোন উপাদান কারণ নাই। কোন বস্তুই ইহা হইতে পৃথক্ নহে। কেন না, এই সত্তা ও স্ফুরণই, আকাশাদি যাবতীয় কার্য্যের আকারে দেখা দিয়াছে এবং ধ্বংসকালে, তাবৎ বস্তুই, এই সত্তা ও স্ফুরণেই লীন হইয়া যাইবে।

এই মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি ভূতগুলি, প্রাণিগণের শরীররূপে 'আধ্যাত্মিক' এবং সূর্য্য-চন্দ্রাদি পদার্থরূপে 'আধিদৈবিক' এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদিরূপে 'আধিভৌতিক'—এই তিন আকারের অনন্তাবস্থরূপে দেখা দিয়াছে। ব্রহ্ম-সত্তা ও ব্রহ্ম-স্ফুরণই তাবৎ বস্তুরই আদি—তাবৎ বস্তুর মধ্যেই অনুস্যূত—এবং তাবৎ বস্তুরই লয়ের আধার। তাবৎ বস্তুই, ধ্বংসকালে, এই আত্ম-সত্তা ও আত্ম-স্ফুরণেই পরিণত হইয়া যাইবে।

আত্মসত্তাই, সকল কার্য্যের অন্তরে থাকিয়া, উহাদের স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আত্মসত্তা, সকল বিকারের অন্তর্যামী। সকল বিকারে অনুস্যূত রহিয়াও, কোন বিকারই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সকল প্রাণীর বুদ্ধিকে, আত্মাই প্রকাশিত করিতেছেন। কার্য্যমাত্রই, বুদ্ধির ক্রোড়ীকৃত। আমাদের বুদ্ধিই ত, দেশ-কালে বিভক্ত করিয়া, কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, সকল বস্তুকে দেখাইতেছে। আত্মা এই বুদ্ধির দ্রষ্টা ও সাক্ষী। বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে, বুদ্ধিই ত সর্ব্বদা বিবিধরূপে বিকৃত হইতেছে। আত্মা, এই বিকারগুলির দ্রষ্টামাত্র। বুদ্ধিরই বিকার উৎপন্ন হয়; আত্মা নিত্য অবিকৃত। অতএব, অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি হইতেছে না। কেন না, অদ্বৈত আত্মার উপরে, বুদ্ধি এই সকল বিবিধ দ্বৈত-বস্তুর আরোপ করিতেছে মাত্র। আরোপিত বস্তুদ্বারা উহার আধারের কোন ক্ষতি বা ভেদ হয় না।

মা

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি অবলম্বনে)

[শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম.এ.]

১০। 'রাজসিংহ'

'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহ' ক্ষুদ্র আকারে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি আখ্যায়িকার বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়; কিন্তু পরিবর্দ্ধিত আকারে শেষ তিনখানি আখ্যায়িকারও পরে পুনঃপ্রচারিত হয়। এ অবস্থায় এই গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনা মাঝামাঝি স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি আরও দুইচারিখানিকে স্থূল দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা বলিয়া মনে হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্র পরিবর্দ্ধিত 'রাজসিংহে'র 'বিজ্ঞাপনে' স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন, রাজসিংহ তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। অতএব এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক বৃত্তান্তের একত্র সংমিশ্রণ কার্য্যে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং এইদিকে মনঃসংযোগ করাতে পারিবারিক জীবন বিবৃত করিবার জন্য, মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য, ব্যস্ত হন নাই। এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় পারিবারিক জীবনের চিত্র বা মাতৃচিত্র না থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় নহে। সত্য বটে, ভিক্টর হিউগোর 'নাইন্টি থ্রী', ডিক্‌ন্‌সের 'দি টেল অভ্ টু সিটিস্' প্রভৃতি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় এবং শেক্‌স্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক ও প্রাচীন ইতিহাসমূলক নাটকে মাতৃচিত্র আছে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের এক্ষেত্রে ত্রুটি তাদৃশ দোষাবহ নহে।

(।০) এই গ্রন্থে নায়ক রাজসিংহের অন্তঃপুরের ও প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণের কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে; কিন্তু এই প্রসঙ্গে জননীর স্নেহের কোনও কথা নাই।

(৵০) নায়িকার মাতার উল্লেখ কয়েক স্থানে আছে; কিন্তু কোথাও তাঁহার কার্য্যাবলী বর্ণিত হয় নাই। মোগল সম্রাট্‌কে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, উদয়পুরের মহারাণা ব্যতীত সকল রাজপুতই কন্যাদান করিত, সুতরাং মোগল বাদশাহের প্রস্তাবে, অন্য জননীর ন্যায়, নায়িকার জননীও অবশ্য কন্যার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হইলেন। 'রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ, আনন্দে মাতিয়া উঠিল'। [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। তাঁহার প্রকৃতি কন্যার মত ছিল না, কন্যা তাঁহাকে নিজমতে আনিবার চেষ্টা বৃথা জানিয়া, তাঁহাকে মনোবেদনা জানাইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যাহা কিছু মর্ম্মবেদনা-প্রকাশ সখীর নিকট। দিল্লী-যাত্রাকালে 'চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল।' [৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]। মাতা অবশ্য এ ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিলেন না। কন্যা স্বামীর ঘর করিতে যাইবার সময় যেরূপ কাঁদে, চঞ্চল সেইরূপ কাঁদিতেছে, ইহাই বুঝিলেন। বহুদিন পরে রাজসিংহের অন্তঃপুর হইতে কন্যা 'মাতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন', রাজসিংহও চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করা সম্বন্ধে রাজার মত জানিবার জন্য দূত পাঠাইলেন [৫ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]। এসব জটিল রাজনীতির কথা, সুতরাং এ প্রশ্নসম্বন্ধে রাজায় রাজায় পত্রব্যবহার চলিতে লাগিল, 'চঞ্চলকুমারীর মাতা পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।' [৫ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ]। মোগল পরাভূত হইলেও যখন রাজসিংহ বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা তুলিলেন না, তখন চঞ্চলকুমারী পিতাকে পত্র লিখিলেন, মাতাকে লিখিলেন না, তাহাও উক্ত কারণে—ব্যাপার জটিল রাজনীতির কথা। [৮ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ]।

(৶০) নিৰ্ম্মলকুমারী সম্বন্ধে গোড়ার কথায়ই বলিয়াছি, তাহার সখী সাজিতেই জন্ম। সে একবার নিজ মাতা, মাতামহীর কথা তুলিয়াছে, এই পর্য্যন্ত। 'আমার মা, মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন।' [৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ]। সপত্নীকন্যা পাইয়াও তাহার

মাতৃভাব ফুটে নাই, 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

(।০) দরিয়ার 'মাবাপ ছিল না'। [১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ]। দলনীর মত সে বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। স্বামী মবারকের নিকট সে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার মাতৃভাবের বিকাশের সুযোগসম্ভাবনা হইতে পারে না। বাদশাজাদী জেবউন্নিসার ইন্দ্রিয়লালসার সহিত দরিদ্রা দরিয়ার অকৃত্রিম প্রেমের বৈপরীত্য (contrast) দেখাইবার জন্যই কবি এই দরিয়াচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

(।/০) জেবউন্নিসা যেরূপ বিলাসনরকে ডুবিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের উপর মাতার প্রভাব, তাঁহার সহিত মাতার স্নেহসম্পর্ক অঙ্কিত করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ইউরোপের ইতিহাসপ্রথিতা বহু রাজ্ঞীর ন্যায় ইন্দ্রিয়পরায়ণা, রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-চাণক্য। সুতরাং এরূপ নারীর উপর মাতার প্রভাব থাকিতে পারে না এবং এরূপ নারীর প্রকৃতিতে মাতৃভক্তিও থাকিতে পারে না, মাতৃভাবেরও বিকাশ ঘটিতে পারে না। বিমাতা উদিপুরী যোধপুরী তাঁহার হাতের খেলানা, তাঁহার রাজনীতিক অভিসন্ধিসাধনের ক্রীড়াকন্দুক। বিমাতা ও সপত্নীকন্যায় যে প্রীতিসম্পর্ক 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব।

যোধপুরী

(।৵০) মোগলের অন্তঃপুরে কেবল একজনের হৃদয়ে মাতৃভাবের বিকাশ দেখা যায়—তিনি হিন্দুবেগম যোধপুরী। 'কপালকুণ্ডলা'য়ও হিন্দুবেগম মানসিংহের ভগিনীর চরিত্রে এই মাতৃভাব দেখা যায়। দুইটি অনেকটা একপ্রকারের চিত্র, অথচ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। শেক্স্পীয়ারের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও একজাতীয় একাধিক চিত্র অঙ্কিত করিবার সময়ে প্রত্যেকটির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন। উভয়ের প্রকৃতিতেই বিধর্ম্মী স্বামীর উপর ভক্তিপ্রীতি অপেক্ষা পুত্রস্নেহ প্রবল। ঔরঙ্গজেবকর্ত্তৃক হিন্দুর সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে দেখিয়া, যোধপুরী পতিভক্তি ভুলিয়া, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের কল্যাণার্থ নিজের বৈধব্য কামনা করিতেছেন এবং রাজপুতবীর রাজসিংহ যাহাতে মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহার পরামর্শ দিতেছেন। [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। খশ্রুজননীর স্বামীর প্রতি বিরাগ এত প্রবল নহে, তাহার কারণ, সেলিম ঔরঙ্গজেবের মত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং হিন্দুর উপর ঘোরতর অত্যাচার করেন নাই। 'কপালকুণ্ডলা'য় খশ্রুজননী বাদশাহের মহিষী হওয়া অপেক্ষা বাদশাহের জননী হওয়া অধিকতর সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং সেই লোভে পুত্রের সিংহাসনলাভার্থ স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। যোধপুরীও সে সৌভাগ্য বুঝেন; কিন্তু তাহার হৃদয় পুত্রের বিপদের আশঙ্কায় কাতর—'স্নেহঃ সদা পাপমাশঙ্কতে;' একবার সে ভরসা করিয়া, তিনি রৌশনারার নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, আবার 'রাক্ষসী জেবউন্নিসা ও ডাকিনী উদিপুরী'র হাতে লাঞ্ছিতা হইবার ভয় করেন। [২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। শুধু তাহা নহে। তিনি ভয় করেন যে, তাঁহার গর্ভজ পুত্র দিল্লীর তক্তে বসিবে তিনি এরূপ উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন, একথা 'বাদশাহ শুনিলে আমার ছেলে একদিনও বাঁচিবে না। বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ যাইবে।' [৭ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ]। যোধপুরীর পত্যনুরাগ অপেক্ষা স্বজাতি ও স্বধর্ম্মানুরাগ প্রভাবতর, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আবার তাহার স্বধর্ম্মানুরাগ অপেক্ষাও পুত্রস্নেহ প্রবলতর, তাহার পরিচয়ও এই পরিচ্ছেদেই পাওয়া যায়। তিনি যখন মোগলের অন্তঃপুর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, 'আমি এ ম্লেচ্ছপুরীতে এ মহাপাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না। আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল।'—তখন 'আপনি যদি আমার সঙ্গে এখন যান, আপনার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে,' নির্ম্মলকুমারীর এই যুক্তিতে তিনি নিরস্ত হইলেন এবং একদিন তাঁহার পুত্র দিল্লীর বাদশাহ হইতে পারে, এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিলেন।

(।৶০) বাদশাহের ঘরের মাতৃচিত্র দেখিলাম। এবার গরীব গৃহস্থের ঘরের মাতৃচিত্র দেখি। খিজির শেখের মাতা বুড়ী তসবীরওয়ালী বহুদিন পরে কার্য্যস্থান দিল্লী হইতে প্রত্যাগত প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে স্বহস্তে কাবাব রাঁধিয়া পরমযত্নে আহার করান, এটুকু বড় মিষ্ট, ঠিক বাঙ্গালী-জননীর মতই। ইহা রমণ বাবুর মাতা বা ব্রজেশ্বরের মাতার চিত্র অপেক্ষাও এই অংশে সুন্দর যে,

তাহারা উভয়েই পুত্রের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেও কেহই স্বহস্তে এমন আগ্রহের সহিত পাক করিয়া খাওয়ান নাই। রূপনগরঘটিত ব্যাপার গোপন করিতে না পারিয়া বুড়ী পুত্রকে সকল কথা বলিয়া ফেলিল, ইহাতে অবশ্য স্ত্রীস্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ক্ষীরিচাকরাণীর মত হারীর মা, তারীর মা প্রভৃতি প্রতিবেশিনীদিগকে না বলিয়া পুত্রকে বলাতে মাতৃ-

মাতৃমূর্ত্তি- দাক্ষিণাত্য-অঙ্কিত

স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য, উভয় বৃত্তান্তের প্রভেদ প্লটের বিবর্ত্তনের জন্যই ঘটিয়াছে; কেননা এ ক্ষেত্রে সংবাদটি দিল্লীতে পহুছান প্রয়োজনীয়, অন্যত্র সংবাদটি হরিদ্রাগ্রামময় রাষ্ট্র হওয়া প্রয়োজনীয়। তথাপি, ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় সাধারণ গৃহস্থঘরের এই নিতান্ত সাধারণ ধরণের মাতৃচিত্র মনোরম নহে কি?

১১। 'ইন্দিরা'

ছোট 'ইন্দিরা'য় মাতৃচিত্র ছিল না বলিলেই চলে। বড় 'ইন্দিরা'য় প্রবীণা জননী তিন তিন আছেন—যথা উপেন্দ্র বাবুর মাতা, ইন্দিরার মাতা ও রমণ বাবুর মাতা। ইঁহারা তিন জনেই সধবা। ইহা ছাড়া, নবীনা জননী সুভাষিণী আছেন। এই পুস্তকে গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র আছে, সুতরাং মাতৃচিত্রও আছে।

(৵০) উপেন্দ্র বাবুর মাতার উল্লেখ আছে; কিন্তু তাঁহার বাক্য বা কার্য্যের কোন উল্লেখ নাই। গ্রন্থারম্ভে ইন্দিরাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে ইন্দিরার শ্বশুরের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, শ্বাশুড়ীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। বধূ আনিবার জন্য তাঁহার সাধআহ্লাদের কথা নাই। কর্ত্তা-বর্ত্তমানে গৃহিণীর এসব বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও তাঁহার মতামতের খুবই মূল্য আছে। কিন্তু পুস্তকে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই। উপসংহারে ইন্দিরাকে 'প্রকাশ্যে গ্রহণ' করিয়া যখন উপেন্দ্র বাবু তাহাকে স্বগৃহে আনিলেন, তখন তিনি 'মাতাপিতার সমীপে সমস্ত কথা সবিশেষে নিবেদন করিলেন।...আমার শ্বশুরশাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন।' ইন্দিরার এই কথা কয়টি সম্বল। ইহাও ছোট 'ইন্দিরা'য় ছিল না। বলা বাহুল্য, ইন্দিরার 'পতিউদ্ধার' পুস্তকের প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়, সুতরাং ইহাতে তাহার শ্বশুরশ্বাশুড়ীর চিত্র অঙ্কিত করা প্রয়োজনীয় নহে—বিশেষতঃ ইন্দিরা যখন বরাবর বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সংস্পর্শে আসে নাই।

(৶০) ইন্দিরার মাতার কথা ইহা অপেক্ষা বেশী আছে, ইন্দিরার প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ আছে। গ্রন্থারম্ভেই দেখি, স্বামিসুখবঞ্চিতা ধনিকন্যা ইন্দিরা বলিতেছেন, 'একদিন মাকে বলিলাম, "মা, টাকা পাতিয়া শুইব।" মা বলিলেন, "পাগলী কোথাকার!" মা কথাটা বুঝিলেন। কি কলকৌশল করিলেন বলিতে পারি না', কিন্তু নিশ্চিতই তাঁহারই চেষ্টায় ইন্দিরার স্বামী কর্ম্মস্থান হইতে দেশে ফিরিলেন ও ইন্দিরার শ্বশুর তাহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কুমারী কন্যার বিবাহের জন্য মাতার উৎকণ্ঠা এবং বিবাহিতা কন্যার স্বামিসুখের জন্য মাতার উৎকণ্ঠা * এই দুইটি গার্হস্থ্যজীবনে নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা। প্রথমটির দৃষ্টান্ত, 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' প্রভৃতিতে পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যায়। মাতা কন্যাকে সধবাজীবনের সারসুখে বঞ্চিতা দেখিয়া তাহার দরদে দরদী হইলেন এবং দুঃখ ঘুচাইবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত এই বেদনা মেয়ের

* কালিদাসের বিদূষকও বুঝিত যে, কন্যা অধিক দিন স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, মাতা-পিতা তাহা পছন্দ করেন না।

একটি কথায় আত্মপ্রকাশ করিল, কন্যার যাতনা অসহ্য হইয়াছে বুঝিয়া তিনি তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

তাহার পর, ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় 'মা বহুযত্নে চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।' (২য় পরিচ্ছেদ)। বাঙ্গালী নারীজীবনে চুল বাঁধিয়া দেওয়ার ভিতর যে আদর-যত্ন, যে স্নেহমমতা আছে, সে কথা ননদভাজের প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি।

কন্যাকে বিদায় করিবার সময় জননীর করুণ ক্রন্দন ও শ্বশুরবাড়ী গিয়া কিরূপ ব্যবহার করিবে, তদ্বিষয়ে কন্যাকে উপদেশদান প্রভৃতি গ্রন্থে কিছুই নাই। ইন্দিরাকে ডাকাইতে লইয়া যাইবার পর মাতা 'ক নিদারুণ শোক পাইলেন, তাহার কোন উল্লেখও গ্রন্থে নাই, থাকিতেও পারে না। কেননা বৃত্তান্ত বরাবর ইন্দিরার জোবানী। যাহা তাহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, তাহার বিবরণ আশা করা যায় না। শেষে অনেক দশাবিপর্য্যয়ের পর, ইন্দিরা যখন পিতৃগৃহে ফিরিল, তখন পিতা তাহাকে 'চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন' এ কথা আছে, বাপমার কথা একত্র' একবার আছে, কিন্তু মাতার আহ্লাদের কথা স্পষ্টবাক্যে নাই। 'সে সকল কথা এখানে বলিবার অবসর নাই' (২০শ পরিচ্ছেদ) এই বলিয়া গ্রন্থকার সে সব চাপিয়া গিয়াছেন। পরে ইন্দিরার মাতা জামাতাকে আরও দু'-দিন থাকিতে কামিনীকে দিয়া অনুরোধ করিলেন, এই টুকু পাওয়া যায়। বাসর ঘরের কাণ্ডে মা একেবারে চাপা পড়িয়াছেন। শেষ পরিচ্ছেদ ছাড়া ছোট 'ইন্দিরা'য় তাঁহার মাতা সম্বন্ধে আর বড় কিছু ছিল না। সে হিসাবে বড় 'ইন্দিরা'য় নায়িকার মাতার চিত্র প্রশংসনীয়। যাহা হউক, গল্পের আরম্ভ ও শেষ ছাড়া ইন্দিরা যখন বরাবর বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছে, তখন তাহার মাতার এরূপ ক্ষীণরেখায় অঙ্কিত চিত্র নিন্দনীয় নহে। যে পরিবারে ইন্দিরা বিপন্ন অবস্থায় আশ্রয় পাইয়াছিল, সে পরিবারের দু'ইটি মাতৃচিত্র উজ্জ্বল বর্ণেই চিত্রিত হইয়াছে।

রমণবাবুর মা

(৶০) রমণবাবুর মাতার চিত্রটি এ দুইটির তুলনায় বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর। ['ছোট ইন্দিরা'য় রামরাম দত্তের (দুই) স্ত্রীর উল্লেখ ছিল; কিন্তু আসরে নামান হয় নাই। পুত্র-পুত্রবধূ একেবারে ছিল না।] 'কালীর বোতলটা গলায় গলায় কালীভরা'—তিনি স্বামী পাছে অন্য নারীতে আসক্ত হন তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সন্দিহান. তাঁহার রূপ নাই, অথচ রূপের দেমাক আছে; তিনি সঙ্কীর্ণহৃদয়া সন্দিগ্ধচিত্তা গর্ব্বিতা রূঢ়ভাষিণী স্বার্থান্বেষিণী।—এসব দোষই তাঁহার আছে; কিন্তু তাঁহার পুত্রস্নেহ (ও তাহারই অনুবর্ত্তি বধূর প্রতি প্রীতি) এই গুণে সব দোষ ঢাকা পড়ে।

[৭ম পরিচ্ছেদ] রমণবাবু সুভাষিণীর ষড়যন্ত্রে সোণার খারাপ রান্নার অজুহাতে পেটের ক্ষুধা পেটে রাখিয়া কিছুই না খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন, তৎপ্রসঙ্গে পুত্রগতপ্রাণা মাতার হৃদয়ের বেদনার বিবরণটি করুণ ও মধুর। 'মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছুই ত খেলি না বাবা।' মা বসিয়া যত্ন করিয়া ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, বাঙ্গালী গৃহস্থ জীবনে এ দৃশ্য পুত্রস্নেহের পরিচায়ক। ছেলের খাওয়া হইল না দেখিয়া, তাঁহার যে কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আহারের কষ্ট দেখিয়া তিনি যুবতী পাচিকার উপর নারাজ হইলেও ইন্দিরাকে নিযুক্ত করিতে রাজী হইলেন। তাহার পর, যখন রমণবাবু ইন্দিরার হাতের রান্না মাংস ব্যঞ্জনগুলি কুড়াইয়া খাইলেন, গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না।' [৮ম পরিচ্ছেদ]। এও সেই মাতৃস্নেহের পরিচয়। সুভাষিণী ইন্দিরাকে কথাটা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে—'ওর ছেলে পেট ভরে খাবে, তাই তোমার এত আদর।' ছেলের পাছে আহারে কষ্ট হয় সেজন্য তিনি দুইজন পাচিকা রাখিতেও স্বীকৃতা হইলেন। তাহার সঙ্কীর্ণচিত্ততা পুত্রস্নেহের নিকট পরাজিত হইল। 'সোণার রান্না আমার ছেলে খেতে পারে না। তাতেই জনেই থাক্।' [৯ম পরিচ্ছেদ]।

ইন্দিরা যখন স্বামিসঙ্গসুখ পাইল, তখন তাহার অভাবে গৃহিণীর আপশোষ 'আমার অমন রাঁধুনীটা নিয়ে গেল তার কিছু ভাল হয় নাই' [উপসংহার]—তাঁহারই উপযুক্ত। পরে ইন্দিরা সুভাষিণীর কন্যার বিবাহে তাঁহাদের বাড়ী গেলে, গিন্নী 'তাঁর ছেলের ভাল খাওয়া হয় না', কথাটা আমায় অনেক বার শুনাইলেন।' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিন্নীর স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা বড়ই কুৎসিত, কিন্তু ইহার ভিতরও তাঁহার পুত্রস্নেহ জাজ্বল্যমান।

সুভাষিণী

(।০) 'নবীনা জননী' সুভাষিণী বড় 'ইন্দিরা'য় একেবারে নূতন সৃষ্টি। কমলমণির মত সমদুঃখসুখা সখীর কার্য্যসম্পাদনের জন্যই এই চরিত্রের সৃষ্টি, কিন্তু তথাপি চরিত্রের সকল দিক্ ফুটাইবার জন্য গ্রন্থকার দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহেরও সুন্দর চিত্র উক্ত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কমলমণির বেলায়ও আমরা ইহা দেখিয়াছি। বাস্তবিক, সুভাষিণী যেন কমলমণিরই কনিষ্ঠা ভগিনী—তাহারই মত সদানন্দময়ী কৌতুকময়ী হাস্যময়ী, আবার তাহারই মত স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী অশ্রুময়ী। ইন্দিরার বিপন্ন ব্যক্তির জন্য, 'পতি উদ্ধারে'র জন্য, সুভাষিণীর কার্য্যাবলী পুনঃ পুনঃ কমলমণিকে মনে করাইয়া দেয়। সুভাষিণীর স্বামীর উপর আধিপত্যও কমলমণির অনুরূপ। মাতৃত্বেও সুভাষিণী কমলমণির পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য। কমলের এক পুত্ররত্ন, সুভাষিণীর একটি পুত্ররত্ন ও একটি কন্যারত্ন। মাতা ও শিশুপুত্রের কথোপকথন একটু একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

ছেলে বলিল—"আজি ? ও আজি !"

মা বলিল—"তুই পাজি !"

ছেলে বলিল—"আমি বাবু, বাবা পাজি।"

"অমন কথা বল্‌তে নেই বাবা !" এই কথা ছেলেকে বলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া সুভাষিণী বলিল, "নিত্যই বলে।"...... ...

ছেলে বলিল, "মা ! আঙ্গা হাত দেখ।" সুভাষিণী হাসিয়া বলিল, "আমি তা অনেকক্ষণ দেখিয়াছি।" [৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]।

সুভাষিণীর ছেলে সেখানে বসিয়াছিল। ছেলে বলিল, "আমি কলা কতা বল্‌ব।"... সে বলিল, "কলা, চাতু (চাটু) হাঁলি—আল্ কি মা।" সুভাষিণী বলিল, "আর তোর শ্বাশুড়ী।" ছেলে বলিল, "কৈ ছাছুলী ?"..."কুমুডিনী ছাছুলী। কুমুডিনী ছাছুলী।" [৮ম পরিচ্ছেদ]। উভয় পরিচ্ছেদেই সখীত্ব ও মাতৃত্বের একত্র সমাবেশ মনোহর। অবশ্য এই সুন্দর চিত্র কমলমণির তুলনায় টুকরা চিত্র। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সখীর কার্য্যসম্পাদনের জন্যই সুভাষিণীর সৃষ্টি। তাহার উপর, মাতৃভাব ও দাম্পত্যপ্রেমের যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই উপভোগ্য। 'আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।' ইন্দিরার এই শেষ কথায় আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিই।

১২। 'আনন্দমঠ'

(৵০) কল্যাণী

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি আখ্যায়িকায় মাতৃচিত্রের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইতে হয়। 'আনন্দমঠ' স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মাহাত্ম্যখ্যাপনের জন্য রচিত; 'সন্তান'গণ পুনঃপুনঃ বলিতেছেন 'আমরা অন্য মা মানিনা—আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই' ইত্যাদি; 'আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি আর কাহাকেও মা বলি নাই, কেননা সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক।' * তথাপি বিস্ময়ের বিষয়, মানবী জননীমূর্ত্তি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই অঙ্কিত হইয়াছে। † যখন ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে লোকে জঠরজ্বালায় মনুষ্যত্ব, মায়ামমতা হারাইয়া পশু বা রাক্ষসে পরিণত হইয়াছিল, 'মেয়েছেলেস্ত্রী বেচিতেছিল' [১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ] অথবা 'ছেলেপিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া' দিতেছিল [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ], সেই দুর্দ্দিনে মহেন্দ্রসিংহ ও কল্যাণী একমাত্র শিশুকন্যার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যগ্র—এই মধুর ও করুণ অপত্যস্নেহের বিকাশ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। যেন মাতৃত্ব কল্যাণীর আকারে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখি, 'কল্যাণী চিন্তাত্যাগ করিয়া গোশালে গিয়া স্বয়ং গোদোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইলেন।' পরক্ষণেই স্বামিস্ত্রীর কথাবার্ত্তায় জানা যায়, কল্যাণী নিজের প্রাণরক্ষার কথা না ভাবিয়া স্বামীকে বলিতেছেন—'তুমি মেয়েটি লইয়া সহরে

---

* ১ম খণ্ড দশম পরিচ্ছেদ ও ৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ। অন্য মা না মানিলেও সত্যানন্দ বিশুদ্ধ আর্য্যনীতির অনুবর্ত্তনে (মাতৃবৎ পরদারেষু) পরস্ত্রী কল্যাণী ও শান্তিকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন। ভবানন্দের পরদারানুরাগ অবশ্য নিতান্ত নিন্দনীয়। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানীঠাকুরও সত্যানন্দের ন্যায় প্রফুল্লকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন।

† এইরূপ আখ্যায়িকায় 'জননী' ও 'জন্মভূমি' উভয়েরই মাহাত্ম্যখ্যাপন ভিক্টর হিউগোর 'নাইন্টি-থ্রী'তেও দেখা যায়।

যাইও।' পরে তিন জনেই গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন যুক্তি করিয়া 'কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুইজনে বাঁচিবে।' অপত্যস্নেহ ও পতিভক্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

পরদিন জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ রৌদ্রে পথ চলিতে চলিতে কল্যাণী পথিশ্রমে ও ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন বটে, কিন্তু 'তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য হয় না।' চটীতে পৌঁছিয়া মহেন্দ্র দুগ্ধের চেষ্টায় গেলেন, কল্যাণী 'একা বালিকা লইয়া' বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দস্যুগণ কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাটিকে লইয়া 'এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।' [২য় পরিচ্ছেদ]। * দস্যুদর্শনে কল্যাণী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপৎকালে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন না। তাহারা যখন অলঙ্কার বিভাগ ও তর্কবিতর্কে ব্যস্ত, তখন 'দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া' বনমধ্যে পলাইলেন। [৩য় পরিচ্ছেদ]। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। কল্যাণী কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য অবসন্নদেহেও প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিতে লাগিলেন, দস্যুরা কন্যার ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া চীৎকারশব্দে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল। কল্যাণী 'কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া' বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। যেন তাঁহার আকুল আহ্বানের ফলেই সত্যানন্দ আসিয়া উভয়কে রক্ষা করিলেন [চতুর্থ পরিচ্ছেদ]। আশ্রয় পাইয়া তিনি ব্রহ্মচারিপ্রদত্ত দুগ্ধ কন্যাকে পান করাইলেন, স্বামী অভুক্ত বলিয়া নিজে সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও দুগ্ধপানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন না। ইহাও একাধারে অপত্য-স্নেহ ও পতিভক্তির সুন্দর নিদর্শন। পর পর কয়টি পরিচ্ছেদে অঙ্কিত নবীনা জননীর এই কল্যাণীমূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, বড়ই করুণ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দের কৃপায় স্বামিস্ত্রীর মিলন হইল। আবার সেই মাতৃকর্ত্তব্যপালন 'দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে।' ...পরে অরণ্যের বাহির হইবার জন্য স্বামিস্ত্রীতে পথ চলিতে লাগিলেন। নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া 'কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন।' উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মহেন্দ্র সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যাকুল ও বিমর্ষ, কল্যাণী স্বপ্নদর্শনে স্বামীর পথ নিষ্কণ্টক করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। 'কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন' এবং বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবেন এই অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু—পরক্ষণেই পত্নীভাব ও মাতৃভাবের প্রাবল্যবশতঃ হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। 'খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া—বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।' আবার পতিপ্রীতি ও অপত্যস্নেহের অপূর্ব্ব সম্মিলন!

ইহার পর, আর এক দৃশ্য। 'তাঁহারা ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন'—ইত্যবসরে শিশুকন্যা সুকুমারীর বিষভক্ষণ। 'সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল। "কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পূরিলেন। কল্যাণী বড়ী বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।...কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?" মন্দটাই আগে বাপমার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। উভয়েই সিদ্ধান্ত করিলেন "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"...মেয়ে কিছু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষে কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে। আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল।' কল্যাণী বিষ খাইলেন! এক্ষেত্রে পতিভক্তি ও সন্তানস্নেহের সঙ্গে গভীর ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

আবার বহুদিন পরে ৩য় খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে আমরা কল্যাণীর মাতৃভাবের বিবরণ পাই। ভবানন্দ তাঁহাকে ঔষধপ্রয়োগে নির্বিষ করিয়া, তাঁহার রূপতৃষ্ণায় অন্ধ হইয়া, তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। সতীসাধ্বী কল্যাণী এমন সন্তানধর্ম্মবিচ্যুত 'মহাপাপিষ্ঠে'র সঙ্গে বাক্যালাপ

* জঙ্গলে মাতা ও শিশুর বিবরণ লইয়া 'নাইন্টি-থ্রী'র আরম্ভ। উভয় বিবরণে অবশ্য বহু প্রভেদ। ভিক্টর হিউগো তাহার তিনটি শিশু অঙ্কিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শিশুর সংখ্যা কমাইয়া ভালই করিয়াছেন।

করিতেছেন—কেবল স্বামী ও কন্যার কুশলসমাচার জানিবার জন্য ব্যাকুলতাবশতঃ। তিনি আগে স্বামীর সংবাদ লইলেন, পরে কন্যার সংবাদ লইলেন। আবার সেই পতিভক্তি ও অপত্যস্নেহের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মিলনে বাধা আছে, কন্যার সহিত মিলনে বাধা নাই। সুতরাং স্বামীর মঙ্গলের জন্য আত্মহত্যা করিয়া, নারীর চরমসুখ স্বামীর চরণদর্শনে স্ব-ইচ্ছায় বঞ্চিতা হইয়া, তিনি কন্যার মুখ দেখিবার আশায় কষ্টময় জীবনধারণ করিয়া আছেন।

'ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?…সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এজীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। আমার কন্যা আনিয়া দাও।'

এই কথার উত্তরে ভবানন্দ বলিলেন—'তোমার কন্যা আনিয়া দিব' কিন্তু এই উপকারের পরিবর্ত্তে তিনি যখন কল্যাণীর নিকট নিতান্ত ঘৃণিত প্রস্তাব করিলেন, তখন কল্যাণী প্রাণাধিকা কন্যাকে পাইবার লোভেও সেই সতী-ত্ববিরুদ্ধ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। যাক্, সে কুৎসিত কথা আর বিশদভাবে বলিব না।

তাহার পর বহুদিন পরে ৪র্থ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে কল্যাণীর স্বামী ও কন্যার সহিত সুখ-সম্মিলন হইল। গ্রন্থকার সেই মধুর দৃশ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন নাই। তিনি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই নিমাইয়ের মাতৃভাবের যে করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহার পর পুনর্ব্বার মাতৃভাবের বিবরণ পুনরুক্তিদোষদুষ্ট হইত।

(৭/০) নিমাই

কল্যাণী নবীনা জননী, সন্তানসৌভাগ্যবতী। নিমাইও 'নবীনা জননী' কিন্তু তাহার সন্তানভাগ্য ভাল নহে। ভ্রমরের মত 'নিমাইয়ের একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে।' জীবানন্দের ক্রোড়ে সুকুমারীকে দেখিয়া তাহার সেই স্মৃতি, সেই মাতৃভাব জাগরিত হইল। 'মেয়ে কোথা পেলে? দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে নাকি—আবার বিয়ে করেছ না কি?' এই কৌতূহলাত্মক প্রশ্নের ভিতর ভিতর

মাতৃমূর্ত্তি—বোটিসেলী-অঙ্কিত

সুপ্ত মাতৃভাবের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া তাহার কোলে দিলেন, 'মেয়েটি সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটি কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় এই যুবতীকে ফুল্ল কুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল।'…'নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিণুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল।' এ মাতৃমূর্ত্তি কল্যাণীর মাতৃমূর্ত্তির ন্যায় মধুর, অথবা তদপেক্ষাও মধুরতর; কেননা হিন্দুর আদর্শজননী যশোদারাণীর ন্যায় তিনিও পরের সন্তানকে নিজসন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেছেন। 'সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোটাকতক জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐ ঝিণুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় মেয়েটি দেবে? আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—" বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়া চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে—আবার হাসে। এই হাসি ও অশ্রু, এই মেঘ ও রৌদ্রের লীলা, কমলমণিকে মনে করাইয়া দেয়। 'জীবানন্দ বলিলেন, "তুই নিয়ে কি করবি? তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।" নিমি বলিল, "তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটি দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও" [১ম খণ্ড, ১৫শ

পরিচ্ছেদ]। মধুর ও করুণে সম্মিলিত এই মাতৃমূর্ত্তির স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনের চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র।

[৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে] যখন নিমাই ভ্রাতৃবধূ শান্তির নিকট দাদার কুড়ান মেয়েটি সম্বন্ধে কথা কহিতেছিল —আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল— "মেয়েটি দিব্য সুন্দর, আহ্লাদে নুহুদ্ চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।" তবে মন্বন্তরের দিন কতলোক ছেলেপিলে পথেঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে, যখন আপন মাবাপে সন্তান পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিমাই পরের সন্তান মানুষ করিতে ব্যগ্র। সাধে কি গ্রন্থকার প্রেমের ঠাকুরের নামে তাহার নামকরণ করিয়াছেন।

নিমাই মেয়েটি লইবার সময় দাদাকে স্তোক দিয়াছিল বটে, 'এর পর না হয় নিয়ে যেও' কিন্তু যখন শেষে [৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদে] 'জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁটনাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, 'আমি মেয়ে দিব না।'

নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিল—"তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও তো নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাওনা কেন? আমার কি?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম্ করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল, ঝুপ-ঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হাঁ মা—কোথায় যাব মা?" নিমাইএর আর সহ্য হইল না। নিমাই, তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।"

এ দৃশ্যেরও স্বাভাবিকতা ও মাধুর্য্য বোধ হয় কাহাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না।

কমলমণির ন্যায় নিমাইএর চরিত্র-সৃষ্টির প্রধান প্রয়োজন —স্নেহময়ী ননদ ও সখীর কর্ত্তব্যসম্পাদন। কমলমণির ও সুভাষিণীর ন্যায় এই চরিত্রের সম্পূর্ণতাসাধনের জন্য গ্রন্থকার যে মধুর মাতৃভাবের বিকাশও চরিত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রশংসার্হ।

(৶০) এই দুইটি মনোহর মাতৃচিত্রের পরে পুস্তকের নায়িকা শান্তির মাতৃভাবের অভাবে বোধ হয় কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। পরন্তু শান্তিচরিত্রে কবি যে আধ্যাত্মিক দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, মাতৃত্ব তাহার সহিত আদৌ খাপ খায় না। তজ্জন্য শান্তির প্রকৃতির এই দিক্ একেবারে পরিহার করিতে হইয়াছে।

(।০) (।৴০) আর কয়েকটি স্থলে জননীর উল্লেখ গ্রন্থকার সংক্ষেপে সারিয়াছেন, তজ্জন্যও বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। মহেন্দ্রসিংহ, নগেন্দ্র দত্তের ন্যায়, গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই মাতাপিতৃহীন। কল্যাণীর দশাও সূর্য্য-মুখীর মত। 'তাহার মা, বাপ, বন্ধুরা এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে।' [১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ]। বলা বাহুল্য, মহেন্দ্রসিংহকে স্বাধীন গৃহপতি ও কল্যাণীকে পিত্রালয়ে আশ্রয়হীনা পরিকল্পনা করা (প্লটের) আখ্যানের বিবর্ত্তনের জন্য প্রয়োজনীয়।

(।৶০) 'শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে, মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান।' [২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ] অর্থাৎ শান্তির চরিত্র যে ভাবে পরিকল্পনা করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহাতে শৈশব হইতেই তাঁহাকে নিশি ঠাকুরাণী ও মনোরমা-কপালকুণ্ডলার ন্যায় মাতার প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার প্রয়োজন। (এই পরিচ্ছেদ পঞ্চম সংস্করণে পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট, পূর্ব্বে 'কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল।')

(।৷৵০) জীবানন্দ ও নিমাইএর মাতার সধবা ও বিধবা উভয় অবস্থারই বৃত্তান্ত এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মাতৃরূপে ও জননীরূপে এ [
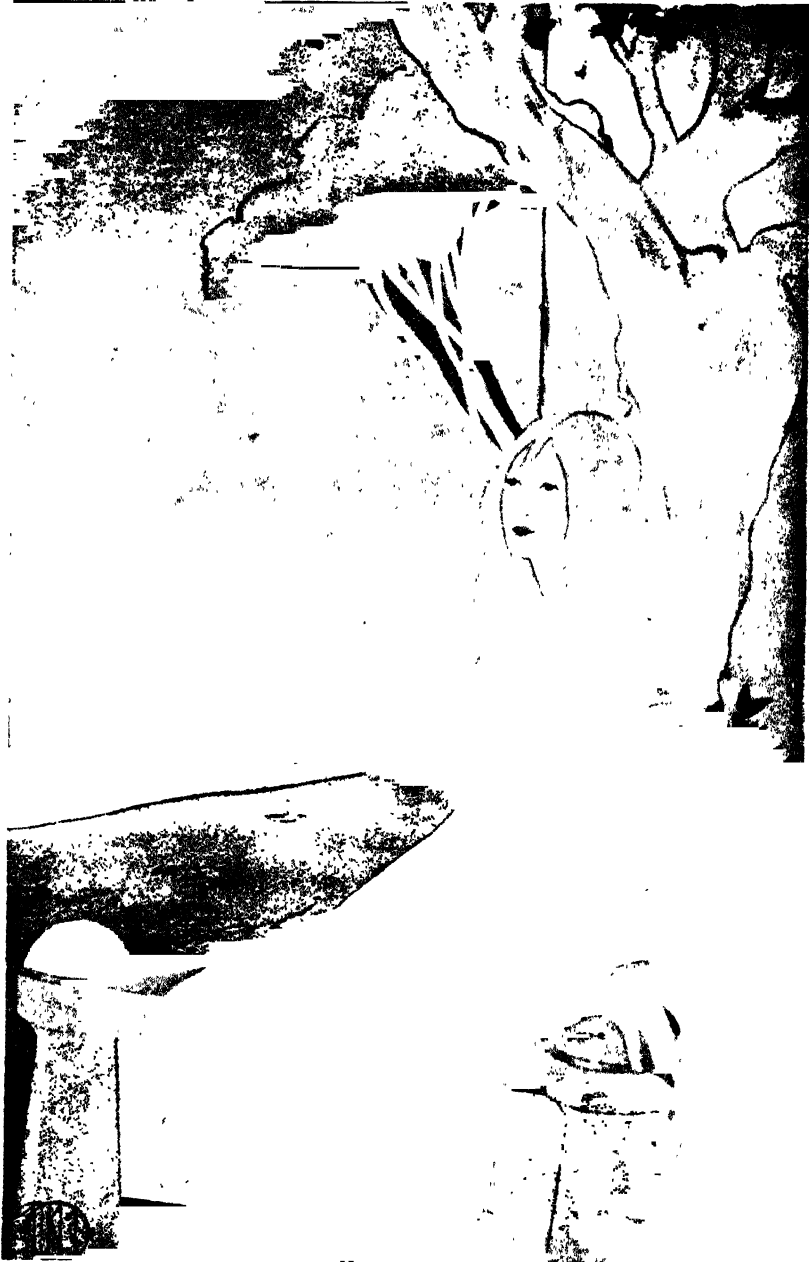
বিরহিণী

"সোণার বরণ হইল শ্যাম, সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম"।

—চণ্ডীদাস।

শিল্পী—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন]

তিনি পুত্রের মুখ চাহিয়া বধূর অশান্ত প্রকৃতি অন্যায় চক্ষে দেখিলেন না। নবকুমারের মাতা ও ব্রজেশ্বরের মাতার চরিত্রের মাধুর্য্য ইহাতে নাই। তবে নবকুমার ও ব্রজেশ্বরের মত জীবানন্দের প্রাণসংশয় অবস্থাও এখানে বর্ণিত হয় নাই। নিমাইএর স্বামিসৌভাগ্য কমলমণি-সুভাষিণীর মত, সুতরাং তাঁহার পার্শ্বে ইন্দিরার মাতা বা ভ্রমরের মাতার মত স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী মাতার চিত্র আবশ্যক হয় নাই।

১৩। 'দেবী চৌধুরাণী'

(৵০) প্রফুল্লর মা

আনন্দমঠে দুইটি নবীনা জননীর করুণকাহিনী, 'দেবী চৌধুরাণী'তে দুইটি প্রবীণা জননীর করুণকাহিনী। 'আনন্দমঠে' নবীনা জননী দুইজনেরই ক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু; কমলমণি ও সুভাষিণীর শিশুগণ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক-বয়স্ক। 'আনন্দমঠে' মাতা শিশুপালন করিতেছেন তাহার চিত্র দেখিয়াছি, 'বিষবৃক্ষে' ও 'ইন্দিরা'র মাতা শিশুর আধ আধ বাণী শুনিতেছেন, শিশুকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়াছি। বিধবা মাতা শিশুকন্যা লইয়া দারিদ্র্যের সহিত যুঝিতেছেন, এই চিত্র 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতিতে সামান্য আকারে দেখিয়াছি। বর্ষীয়সী বিধবা মাতা বিবাহ-যোগ্যা কুমারী কন্যা লইয়া দারিদ্র্যের সহিত কঠোরসংগ্রামে বিধ্বস্ত হইতেছেন, এই চিত্র 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাধারাণী'তে দেখিয়াছি। কন্যার লালনপালন ছাড়া হিন্দুর ঘরে কন্যা-জননীর দুইটি বিষয়ে উদ্বেগ দুশ্চিন্তা হয়; প্রথম সৎপাত্রে কন্যাদান; দ্বিতীয়, বিবাহান্তে কন্যার স্বামিসুখ। রাধারাণী, হিরণ্ময়ী, রজনী, প্রভৃতির বেলায় মাতার প্রথম প্রকারের দুশ্চিন্তার বিবরণ পাওয়া যায়; ইন্দিরা ও প্রফুল্লর বেলায় দ্বিতীয় প্রকার দুশ্চিন্তার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রফুল্লর বেলায় মাতার সেই দুশ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আবার দারিদ্র্যদুঃখ তাঁহার অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

'আনন্দমঠে'র প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদের ন্যায় 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদেও মাতার করুণ-কাহিনী বিবৃত। প্রথম পরিচ্ছেদে—'ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী' বলিয়া বিধবা দারিদ্র্যদুঃখাভিভূতা মাতার কন্যাসম্ভাষণ ও মাতা ও কন্যার কথোপকথন সকল পাঠকেরই পরিচিত, সমগ্র পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই পরিচ্ছেদে মাতা ও কন্যার দারিদ্র্যের ও তজ্জনিত দুর্দশার চিত্র এমনভাবে ফুটিয়াছে যে, পুস্তকের এই অংশ-পাঠকালে সহৃদয় পাঠকের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। ইহা দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরের বাস্তব দৃশ্য। এই 'পোড়ারমুখী' সম্বোধনে ও পরবর্ত্তী কথোপকথনে যে মাতৃহৃদয়ের কত বেদনা, কত স্নেহ, লুক্কায়িত আছে, তাহা কি বাঙ্গালী পাঠককে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হইবে?

মাতা স্নেহের প্রভাবে আত্মসম্মানবোধ বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে প্রতিবেশীর বাড়ী তরীতরকারী চাহিতে পাঠাইতে-ছেন বা নিজে চাউল ধার করিতে যাইতেছেন, তিনি উপ-বাসিনী কন্যার কথাই ভাবিতেছেন—নিজের কথা নহে। 'আমি মরিলে যা হয় করিস্, তুই উপস্ করিয়া মরিবি, আমি চক্ষে তাহা দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।' ইহাতে ওজস্বিনী বক্তৃতা নাই, অপত্যস্নেহ সম্বন্ধে গদ্য বা পদ্য উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু তথাপি স্পষ্ট বুঝা যায়, মাতার স্নেহ কত গভীর, মাতার বেদনা কত তীব্র।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। 'রাধারাণী'তে উদারহৃদয় উপকারক রুক্মিণীকুমারের দানসম্বন্ধে মাতা ও কন্যার কথোপকথন এবং অন্যান্য ব্যাপার হইতে মাতার আত্মসম্মানবোধের ও তৎসঙ্গে তাঁহার সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্লর মা বরাবর দরিদ্রা, রাধারাণীর মা সম্পদের অবস্থা হইতে দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইয়া-ছিলেন; সুতরাং তাঁহার যে পরিমাণ আত্মসম্মানবোধ দেখা যায়, প্রফুল্লর মার বেলায় সে পরিমাণ আত্মসম্মান-বোধ দেখা যায় না।

এই কথোপকথনের শেষার্দ্ধে মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিল, তখন বৈবাহিকের কৃত পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়াও পুনর্ব্বার অপমান-ভোগের ভয়ে তিনি সে প্রস্তাবে সহসা সম্মত হইলেন না। অন্য বিষয়ে তাঁহার আত্মসম্মানবোধ লুপ্ত হইলেও, এক্ষেত্রে তাহা তীব্র। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যাহা হউক, শ্বশুরবাড়ী গেলে মেয়ের দুঃখ ঘুচিবে, আর মেয়ের দুঃখ ঘুচিলেই তাহাতেই তাঁহার দুঃখ ঘুচিবে, এই আশায় তিনি শেষে ঐ প্রস্তা

সম্মত হইলেন। কেন না, মেয়ে যে স্বামীর ঘর, শ্বশুরের ঘর করিতে পায় না, সে মনঃকষ্ট তাঁহার দারিদ্র্যদুঃখ উপবাসক্লেশ অপেক্ষাও অধিক। পরামর্শ ঠিক হইলে 'তখন মা যে কয়টি চাউল ছিল, রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না।' ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মাতা কিরূপ কন্যাগতপ্রাণা।

যাত্রার পূর্ব্বে মাতা কন্যার চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলেন, কন্যা রাজী হইল না। 'ননদ ভাজ' প্রসঙ্গে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধেও ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, এই চুলবাঁধার সঙ্গে বাঙ্গালা নারীর জীবনে যে, কত স্নেহ-যত্ন, কত আদর-ভালবাসা জড়িত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মেয়ে যখন সাজিতে রাজী হইল না, তখন মাতার স্বগত উক্তি—'আমার মেয়েকে আর সাজাইতে হইবে না'—মাতৃ-গর্ব্বের পরিচায়ক। এত দুঃখের মধ্যেও কন্যার অনিন্দ্য রূপের জন্য মাতার গর্ব্ববোধ ও সুখবোধ মাতৃহৃদয়ের একটি সুন্দর রহস্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, প্রফুল্লর মা কন্যার বিবাহ দিয়া কিরূপে বৈবাহিক কর্ত্তৃক নির্য্যাতিতা হইয়াছিলেন এবং কন্যা কিরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে মাতা ও কন্যার গভীর মনোবেদনার কারণ জানা যায়। বেহাইবাড়ী পৌঁছিয়া বেহাইনের কথার উত্তরে 'প্রফুল্লের মা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব?" ইত্যাদি কথায় তাঁহার নিরুদ্ধ মনোবেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়ের হইয়া বেহাইনের সঙ্গে একটু 'বাড়ী বয়ে কোঁদল' নারীসুলভ কলহপ্রবৃত্তির পরিচায়ক নহে; বেহাইনের পুনঃ পুনঃ আঘাতে অনেক দুঃখে, অনেক অবমাননায়, কথা কয়টি বাহির হইয়াছিল।

"এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া প্রফুল্লর মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু মেয়ের কি দশা হয়, তাহা না জানিয়া তিনি ভূতনাথ গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে জানা যায়—'তোমার মা তোমরে সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।'...মাতা প্রত্যাখ্যাতা কন্যাকে লইয়া গৃহে গেলেন। পরপরিচ্ছেদে বর্ণিত তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্ক হৃদয়বিদারক। 'প্রফুল্লর মার যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক।' ভগ্নহৃদয়া মাতা জ্বরে পড়িলেন। অযত্নে অচিকিৎসায় জ্বর-বিকারে তিনি শেষে 'সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।' বলা বাহুল্য কন্যাকে প্রত্যাখ্যাতা দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিল; মৃত্যু তাহারই শোচনীয় পরিণাম।

অবশ্য প্লটের বিবর্ত্তনের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, প্রফুল্ল চরিত্রের বিকাশের জন্য তাঁহার মাতার তিরোভাব আবশ্যক। এই সাতটি পরিচ্ছেদে সূচনা—প্রফুল্ল মাতৃক্রোড়চ্যুতা শ্বশুরকুলত্যক্তা হইল। আর একটি ঘটনায় সে গৃহচ্যুতা হইবে; তখন ভবানী পাঠকের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে তাহার চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ও অভাবনীয় বিকাশ ঘটিবে।

(৶০) ব্রজেশ্বরের মা

প্রফুল্লর মার মত ব্রজেশ্বরের মাও প্রবীণা জননী; প্রফুল্লর মা দরিদ্রা বিধবা, ব্রজেশ্বরের মা সধবা ধনি গৃহিণী। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই সন্তানগতপ্রাণা। ব্রজেশ্বরের মাতার চরিত্রের এই দিক্ প্রথমেই চোখে পড়ে না। প্রথম প্রফুল্লকে দেখিয়া যে তাঁহার কর্ত্তার কাছে বধূগ্রহণের প্রস্তাব করিবার ঝোঁক হইল, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—'বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথাগুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লর দিকে অনেক টানিয়া বলিলেন।' (১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। আবার পঞ্চম পরিচ্ছেদে, শাশুড়ী বলিতেছেন—'বড় সুন্দর বৌ।' গ্রন্থকার অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন—'চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়।' নিরাশ্রয়ার উপর দয়াও ইহার ভিতর ছিল। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পুত্রস্নেহ এই বধূস্নেহের মূলে সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান। 'শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর করতে পেলাম না।" মন একটু নরম হলো।' [১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]। পর-পরিচ্ছেদে কর্ত্তার সঙ্গে তর্কের সময় তিনি বলিতেছেন—'হাজার হোক্ বেটার বউ।' প্রাণাধিক পুত্রের একটি রাঙ্গা বৌ হইবে, বাঙ্গালী মায়ের ইহা প্রাণের সাধ। এমন রাঙ্গা বৌ হাতে পাইয়াও হাতছাড়া হইতেছে, ব্রজেশ্বরের মার এ কি কম আপশোষ?

কর্ত্তা যখন ব্রজেশ্বরকে 'বাগ্দী বৌকে ঝাঁটা মেরে

তাড়াইয়া' দিতে হুকুম দিলেন, তখন গৃহিণী পুত্রকে নরম সুরে দু' এক কথা বলিয়া দিলেন, তাহাতে অবশ্য পুত্রস্নেহ অপেক্ষা বধূস্নেহই ফুটিয়াছে। যাক্ সে কথা।

তখনও পর্য্যন্ত ব্রজেশ্বরের প্রফুল্লর প্রতি প্রেমসঞ্চার হয় নাই। কিন্তু এইবার সেই বিপন্না অশ্রুমুখীকে দেখিয়া (১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) এবং তাহার রূপগুণের পরিচয় পাইয়া ব্রজেশ্বর তাহাকে ভালবাসিল। (১ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ)। ক্রমে ব্রজেশ্বরের হৃদয় প্রফুল্লময় হইল। ব্রজেশ্বরের ভাবান্তর ঘটিল। মায়ের প্রাণ তখনই তাহা লক্ষ্য করিল। 'প্রথমে মা জানিল। গৃহিণী দেখিল, ছেলের পাতে দুধের বাটীতে দুধ পড়িয়া থাকে।... মা মনে করিলেন—"ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।"... ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল।' [১ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ]। রমণ বাবুর মাতারও খিজির শেখের মাতার ন্যায় এখানেও সেই পুত্রের আহারের জন্য যত্ন ও উৎকণ্ঠার ভিতর প্রচ্ছন্ন মাতৃস্নেহ। কিন্তু এখানে যে গভীরতর কারণ রহিয়াছে, তাহা রমণ বাবুর বেলায় নাই। ব্রজেশ্বর মাতার কাছে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়াছিল। ঠাকুর-মা ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর কাছে ধরা পড়িল। প্রফুল্লর (অলীক) মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ব্রজেশ্বরের অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। 'ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া, ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। ব্রজ নির্জ্জীব, শয্যাগত।... শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে। আসল কথা আর বড় লুকান রহিল না। প্রথমে বুড়ী বুঝিয়াছিল, তারপর গিন্নী বুঝিলেন। এ সকল কথা মেয়েরাই আগে বুঝে। গিন্নী বুঝিলেন, কাজেই কর্ত্তা বুঝিলেন।... গিন্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন—"ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।" ...ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।' (১ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ)। সাধারণ গৃহস্থজীবনের সাধারণ কথা—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অথচ গভীর পুত্রস্নেহের করুণ বর্ণনা।

ব্রজেশ্বর সে ধাক্কা সামলাইল, সুতরাং ব্রজেশ্বরের মাও সামলাইলেন। তাহার পর, আবার বহুদিন পরে, যখন সাগর ও ব্রজেশ্বরের দেবীচৌধুরাণীর সহিত সাক্ষাতের পর, সাগর দুষ্টামি করিয়া রটাইল—'ব্রজেশ্বর এবার কৈবর্ত্তের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে' আর নয়ান বৌ সেই কথা শ্বাশুড়ীর কাছে পাড়িল, তখন গিন্নী বলিলেন—"যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌ব। বেটার বৌ ত আবার ফেল্‌তে পার্‌ব না।" [২য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ] এই 'আবার' কথাটিতে কতখানি পূর্ব্বসঞ্চিত বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কি প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে? ইহার অব্যবহিত পরে তাঁহার পুত্র ও কর্ত্তার সহিত কথোপকথন আরও করুণ।

'ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কি বল্‌ছিলে গা?"

গিন্নী বলিলেন, "এই বল্‌ছিলাম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস্, তবে আবার বৌ বরণ ক'রে ঘরে তুলি।" ব্রজেশ্বর অন্যমনা হইল, কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রদোষকালে গিন্নীঠাকুরাণী কর্ত্তামহাশয়কে বাতাস করিতে করিতে, ভক্তচরণে এই কথা নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনটা কি?"

গিন্নী। আমি ভাবি কি যে, সাগর বৌ ঘর করে না। নয়ান বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়। তা যদি একটি ভাল দেখে ব্রজ বিয়ে ক'রে সংসারধর্ম্ম করে, আমার সুখ হয়।

কর্ত্তা। তা ছেলের যদি সে রকম বোঝ, তা আমায় বলিও। আমি ঘটক ডেকে ভাল দেখে সম্বন্ধ কর্‌ব।

গিন্নী। আচ্ছা, আমি মন বুঝিয়া দেখিব।' [২য় খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ]। এই কথোপকথনে মাতৃহৃদয়ের আকুলতা, অপূর্ণ সাধ, পুত্রের সংসারসুখের জন্য উৎকণ্ঠা, কি সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে!

মাতা ব্রহ্মঠাকুরাণী দ্বারা ব্রজেশ্বরের মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়া 'কিছুই খবর পাইলেন না।' সুতরাং আপাততঃ 'কথাটার আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না।'

ইহার অনেক দিন পরে গিন্নীর এই সাধ মিটিল, মনের খেদ দূর হইল। 'বরকন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে, গিন্নী বরণ করিতেছেন।' (এইস্থলে প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে ও 'কপালকুণ্ডলায়' বধূবরণের কথা মনে পড়ে। ব্রজেশ্বরের মাতার চিত্র অবশ্য নবকুমারের মাতার চিত্র অপেক্ষা অধিকতর পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুট।) 'শাশুড়ী বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "বেশ বউ।" তাঁ'র চোখে একটু জল আসিল।

বরণ হইয়া গেল, বধূ ঘরে তুলিয়া শাশুড়ী সমবেত

প্রতিবেশিনীদিগকে বলিলেন, "মা, আমার বেটাবউ অনেক দূর থেকে আসিতেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। আমি এখন ওদের খাওয়াই দাওয়াই। ঘরের বউত রহিল,তোমরা নিত্য দেখবে, এখন ঘরে যাও,খাওদাও গিয়া।"

...গোলমাল মিটিয়া গেল; গিন্নী বিরলে ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, "কি মা?"

গিন্নী। বাবা, এ বৌ কোথা পেলে, বাবা?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয়,মা!

গিন্নী। বাবা, এ হারাধন আবার কোথা পেলে, বাবা? গিন্নীর চোখে জল পড়িতেছিল।

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন। এখন মা তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জ্জনে পাইলে, আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক্। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারও কাছে কিছু বলিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

...পাকস্পর্শের পর গিন্নী, আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বৌ।"

...হর। এতদিন মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে, আমার ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটি ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। যদি তুমি কোন কথা কহিবে তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, "তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক্।"

মাতৃমূর্ত্তি টিশিয়ান্ অঙ্কিত

গিন্নী বলিলেন, "তাই থাকবে।"

সময়ান্তরে গিন্নী ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন। বলিলেন, "আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম। তিনি কোন কথা কহিবেন না। সে সব কথার আর উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।"

[৩য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ]

এ ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। পুত্রস্নেহ, বধূস্নেহ ও গৃহিণীপনার এই সুন্দর সমাবেশ বড়ই মধুর, বড়ই করুণ।

(৶৹) এই দুইটি প্রবীণা জননীর চিত্রের পর সাগরের মাতার পূর্ণায়তন চিত্র নাই, কেবল - ব্রজেশ্বর যখন শ্বশুর মহাশয় পঞ্চাশ হাজার টাকা না দেওয়াতে রাগ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, 'শুনিয়া, সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তারপর সাগরের পালা।' [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]—এইটুকু উল্লেখ আছে; ইহাতে বোধ হয় কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না; কেননা সাগর অপ্রধানা পাত্রী, তাঁহার মাতার পূর্ণচিত্র প্রয়োজনীয় নহে। যাহা হউক, এই টুকুতেই কন্যার স্বামি-সুখের জন্য মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। জামাতার রাগ যাহাতে পড়ে, তজ্জন্য তিনি দিনের বেলায় নিভৃতে জামাতা ও কন্যার সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, ইহাও কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়।

(১০) নয়ান বৌয়ের চিত্র নিতান্ত কুৎসিত বাস্তব (realistic) চিত্র, 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে বলিয়াছি। জননী হিসাবেও তিনি এই প্রকৃতিরই পরিচয় দেন। স্বামী

আবার বিবাহ করিয়া 'নূতন বৌ' আনিলে, নয়ান বৌ একেবারে সংহারমূর্ত্তি ধরিলেন। 'নয়নতারার কতকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল। তাদেরই বিপদ্ বেশী। এ কয় দিনে মার খাইতে খাইতে তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল' * [৩য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ]। 'সতীন ও সংযমা' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রফুল্ল ও সাগরের মধুর প্রকৃতির সহিত এই (contrast) বিরোধিতা প্রকৃত (আর্ট) কলাকৌশলের নিদর্শন।

(১৵০) (১৶০) গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাগরকে স্নেহময়ী সপত্নী ও সখীর আদর্শরূপে এবং প্রফুল্লকে আদর্শ সপত্নী, বিমাতা, পত্নী ও গৃহিণীরূপে অঙ্কিত করা। সুতরাং তিনি ইহাদিগের মাতৃভাবের বিশদ বিবরণ দেন নাই। কেবল সংক্ষেপে জানিতে দিয়াছেন যে, উভয়েই পুত্রবতী ছিলেন। † প্রফুল্লকে বিমাতার আদর্শরূপে অঙ্কিত করিবার জন্য এ টুকুও বলিয়াছেন 'নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।' [৩য় খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ]। সপত্নীসন্তানে যাহার এত স্নেহ, তাঁহার যে নিজ সন্তানেও যথেষ্ট স্নেহ থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

(১৷০) (৷৷০) দিবা ও নিশির, অন্যান্য আখ্যায়িকায়, বিমলা, বসন্তকুমারী প্রভৃতির ন্যায় সখী সাজিতেই জন্ম। সুতরাং তাঁহাদিগের মাতৃভাবের বিকাশের জন্য গ্রন্থকার মোটেই আয়োজন করেন নাই। নিশির পূর্ব্ব-ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দিবার পূর্ব্বইতিহাসও পুনরুক্তিভয়ে অনুল্লিখিত। নিশির কথায় জানা যায় 'জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপমার কাছছাড়া। ছেলেবেলায় আমাকে ছেলেধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।' নিশি, শান্তি, মনোরমা ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রের যেভাবে বিকাশ করা কবির উদ্দেশ্য, তাহাতে মাতার প্রভাব হইতে তাঁহাদিগকে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজনীয়। ইহা আর্টের তরফ হইতে অনুধাবনীয়। বৈচিত্র্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণে ইহারা চারিজন মাতৃপ্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এক শ্রেণীর একাধিক চিত্র ঠিক একভাবে আঁকেন নাই। এবিষয়ে তিনি শেক্সপীয়রের সহিত তুলনীয়।

১৪। 'সীতারাম'

(৴০) 'সীতারামে'ও 'দেবী-চৌধুরাণী'র ন্যায় বিধবা বর্ষীয়সী মাতা এবং 'সধবা কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা' যুবতী কন্যার প্রসঙ্গ দেখা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার সদ্যঃ-সদ্যঃ 'দেবীচৌধুরাণী'তে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়া, পুনরুক্তিভয়ে আর এ গ্রন্থে মাতা ও কন্যার দারিদ্র্য-বর্ণনা ও কথোপকথন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। একেবারে 'বাড়ীতে মা মরে, অন্তিম কাল উপস্থিত' এই অবস্থায় আরম্ভ। ইহারাও সম্ভবতঃ দরিদ্র, কিন্তু বোধ হয় প্রফুল্ল ও প্রফুল্লর মাতার মত অত দরিদ্র নহে। কেননা 'দেবী-চৌধুরাণী'তে বিধবা মাতার একমাত্র অবলম্বন যুবতী কন্যা, 'সীতারামে' যুবতী কন্যা শ্রী ছাড়া পুত্র গঙ্গারাম বর্ত্তমান এবং সে গ্রন্থারম্ভে পূর্ণবয়স্ক। তাহার উপার্জ্জনে ইদানীং গৃহে তাদৃশ উৎকট দারিদ্র্য থাকিবার কথা নহে। পুনরুক্তি-ভয়ে, গ্রন্থকার এক্ষেত্রে কন্যার প্রতি মাতার স্নেহ এবং কন্যার অবস্থার জন্য মনোবেদনার চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, এক্ষেত্রেও প্রফুল্লর ন্যায় শ্রীর চরিত্রের বিকাশের জন্য তাঁহার মাতার তিরোভাব প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একশ্রেণীর একাধিক চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রফুল্ল ও শ্রী উভয়েই শ্বশুরকুল-পরিত্যক্তা হইলেও পরিত্যাগের কারণ ভিন্ন ভিন্ন। এইটি আরও বিশদ করিবার জন্য গ্রন্থকার শ্রীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন— 'আমি কুলটাও নহি, জাতিভ্রষ্টাও নহি।' 'দেবী-চৌধুরাণী'তে মাতা কন্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া শ্বশুরালয়ে বেহাইনের নিকট উপস্থিত হন। এখানে পুনর্গ্রহণের প্রসঙ্গ যে সময়ে উঠিয়াছে, সে সময়ে উভয় পক্ষেরই মাতা মৃত। পুনর্গ্রহণের প্রসঙ্গও অন্য প্রকারে উঠিয়াছে।

(৵০) পুনরুক্তিভয়ে গ্রন্থকার 'দেবীচৌধুরাণী'র ন্যায় এক্ষেত্রে শ্বশুরশাশুড়ীকে আসরে আনেন নাই।

* 'ছেলের ছেলের ঝগড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে' আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই কথাটি পাইয়াছি ; কিন্তু এখানে নয়নতারার ছেলেমেয়েকে মারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে।

† প্রমাণ—'যথাকালে পুত্রপৌত্রে সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল।' 'শাশুড়ী কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন।' [৩য় খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ]

গ্রন্থের ঘটনাবলির আরম্ভের পূর্ব্বে উভয়েই পরলোকগত, কেবল তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত গ্রন্থকার পূর্ব্ববৃত্তান্তের (Retrospect) মধ্যে বিবৃত করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়— 'তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন।' [শ্রীর প্রতি সীতারামের উক্তি, ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ]। এখানেও সেই বাঙ্গালী মায়ের রাঙ্গাবৌ আনিবার সাধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। (ব্রজেশ্বরের মাতার বেলায় পূর্ব্ববৃত্তান্তে এ সংবাদটুকু পাওয়া যায় না, পুনর্গ্রহণকালে বধূর চাঁদপানা মুখ দেখিয়া 'আহা এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর করতে পেলাম না' এই আক্ষেপোক্তি আছে।) তাহার পর জ্যোতিষীর কথামত সীতারামের পিতা পুত্রবধূ ত্যাগ করিলেন, এক্ষেত্রে ব্রজেশ্বরের মাতার মত গৃহিণীর তর্ক করা সম্ভব নহে, কেননা ফলিতজ্যোতিষের উপর তর্ক চলে না। এক্ষেত্রেও নগেন্দ্রনাথের ন্যায় সীতারামকে স্বাধীন গৃহপতি না করিলে প্লট জমে না, তজ্জন্য তাঁহার মাতাপিতার তিরোভাব ঘটাইতে হইয়াছে। মাতাপিতার অধীন পুত্রের চিত্র অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রদত্ত হইয়াছে।

(৶০) গ্রন্থে নন্দা-রমার মাতাপিতার উল্লেখ নাই। তবে কয়েক বার রমার 'বাপের বাড়ী' যাইবার প্রস্তাব আছে। [২য় খণ্ড, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ১১শ পরিচ্ছেদ]। সম্ভবতঃ সূর্য্যমুখীর ন্যায় তাঁহার মাতাপিতা মৃত, তবে শৈবলিনীর মত তাঁহার যে পিতৃকুলে কেহই বর্ত্তমান নাই, এরূপ নহে। নন্দার বেলায় বলা আছে, 'তাহার যাইবারও স্থান নাই।' [৩য় খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ]। ইহাতে অনুমান হয়, তাহার পিতৃকুলে কেহ নাই।

(।০) 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল নিশির শিষ্যা ও সঙ্গিনী, 'সীতারামে' শ্রী জয়ন্তীর শিষ্যা ও সঙ্গিনী। পূর্ব্বগ্রন্থে নিশির সামান্য একটু পূর্ব্বপরিচয়, মা-বাপের কথা আছে; জয়ন্তীর বেলায় তাহাও নাই। এক্ষেত্রেও পুনরুক্তিভয়ে গ্রন্থকার ঐ প্রসঙ্গ একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন।

(।৵০) গ্রন্থে নন্দার সপত্নী-সন্তানের প্রতি নিজপুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহের উল্লেখ আছে, 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। নিজসন্তানের প্রতি স্নেহের বর্ণনা নাই। 'দেবীচৌধুরাণী'তেও ঠিক এইরূপ। তবে সেখানে একেবারে প্রফুল্লর 'স্বর্গারোহণ'-কালে 'পুত্রপৌত্রে'র অস্তিত্বের কথা জানা যায়, এখানে তৎপূর্ব্বেই জানা যায় 'নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারিপাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে।' [৩য় খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ]। 'দেবীচৌধুরাণী'র ন্যায় এখানেও অনুভবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, যাহার সপত্নীসন্তানে এত স্নেহ, তাহার নিজ সন্তানে অবশ্যই স্নেহ আছে। গ্রন্থকার নন্দাকে প্রফুল্লর ন্যায় আদর্শ বিমাতা ও আদর্শ সপত্নীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া আর আদর্শজননীরূপে অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে রমার চরিত্রে মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা চিত্রিত করিয়াছেন।

(।৶০) শ্রী প্রথমজীবনে 'স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা', পরে 'সন্ন্যাসিনী।' সুতরাং তাহার মাতৃত্বসম্ভাবনা নাই। তাহার চরিত্রের যে ভাবে বিকাশ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য তাহাতে অবশ্য মাতৃভাবের স্থানও নাই। তথাপি গ্রন্থশেষে মুসলমান কর্ত্তৃক দুর্গআক্রমণ ঘটিলে, শ্রী বলিতেছেন—'নন্দা-রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কি কিছু উপায় হয় না?' [৩য় খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ]। এখানে নারীজাতিসুলভ মাতৃভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

রমা

প্রথম খণ্ড

(।৷০) যাহা হউক, গ্রন্থকার অন্যান্য চরিত্রে মাতৃভাবের বিকাশবিষয়ে কার্পণ্য করিয়া ছোটরাণী রমার চিত্রে ইহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রমা সন্তানস্নেহে অন্ধ হইয়া নিজের ও স্বামীর সর্ব্বনাশ ঘটাইতে বসিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাকে যতই দোষ দিই না কেন, তথাপি তাহার সেই পুত্রবাৎসল্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই স্নেহের কোন প্রসঙ্গ নাই। এই খণ্ডে শুধু দেখা যায় যে, রমা বড় কোমলপ্রকৃতি, নিতান্ত ভীরুস্বভাব, 'বিবাদে রমার বড় ভয়, সীতারামের সাহস ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়।' সে জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নে মুসলমানের সঙ্গে বিবাদে স্বামীর সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় সর্ব্বদা শিহরিয়া উঠে। সুতরাং সে সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, 'ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়, মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে, নহিলে কি বিপদ্ ঘটিবে।' [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ]। এই ভয়ের

প্রভাবেই ভবিষ্যতে তাহার চরিত্রের অদ্ভুত বিকাশ ঘটিল। সেই জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও ইহার বিষয় বেশী করিয়া বলিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়,' এবং ঐ গ্রন্থের ভিতরে কল্যাণীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—স্ত্রী 'বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক।' রমার চরিত্রে তিনি ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে ও অন্যত্র বাঙ্গালী নারীর সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিমলাকে না হয় বাঙ্গালিনী বলিয়া ধরিলাম না। শৈবলিনী, শান্তি, প্রফুল্ল, জয়ন্তী ও শ্রীর চরিত্রে এই গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; তজ্জন্য এ সব চরিত্র অস্বাভাবিক এরূপ প্রতিকূল সমালোচনাও শুনা গিয়াছে। সীতারামের নন্দাতে মন উঠে নাই, গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি শ্রীর অভাবে আক্ষেপ করিয়াছিলেন—'সহধর্ম্মিণী কই,—সমরে সিংহবাহিনী কই?' কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের শেষ দিকে দেখি, নন্দা বলিতেছে—'তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?' ইহাতে কি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, সমরে সিংহবাহিনী মূর্ত্তির অভাবের জন্য আক্ষেপ মিটে নাই?

যাহা হউক, রমার ভীরুতা বাঙ্গালী নারীর পক্ষে বড় স্বাভাবিক চিত্র। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখা যায়, ফুল্লরা সতী স্বামী কালকেতুবীরকে বলিতেছেন—'ফুল্লরার কথা রাখ কতক কাল জীয়া থাক, না যাইহ রাজার সমরে,' 'যদি থাকে প্রাণ আশ, তাজি নিজ দেশ বাস, প্রাণ লয়া যাও মহাবীর' (আর কালকেতুও ফুল্লরার কথা শুনি 'লুকাইল বীর ধান্যঘরে')। রমার চরিত্রে সেই ফুল্লরাচরিত্র পুনরুজ্জীবিত দেখি। ইহা নিন্দনীয় হইলেও বড় স্বাভাবিক চিত্র। হিন্দুনারী যে স্বামিভক্তির প্রভাবে স্বামীর চিতায় নিজের প্রাণ দেয়, সেই স্বামিভক্তিরই প্রাবল্যে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য, স্বামীকে শত্রুভয়ে পলাইতে বা লুকাইতে বা শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে উত্তেজিত করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই নারীহৃদয়ের আর একটি রহস্য দৃষ্টিগোচর হয়। 'রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। রমা বুঝিল, বিনা অপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি।' [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ]। কিন্তু 'সীতারাম যে আর তাঁহাকে দেখিতে পারেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল,' [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]। আমরা সূর্য্যমুখীর বেলায় ব্যতিরেকমুখে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সূর্য্যমুখী সন্তানবতী হইলে স্বামীর অবহেলার তীব্রতা ততটা অনুভব করিত না। এখানে সে কথা অন্বয়মুখে প্রমাণিত হইল। তবে অবশ্য মানুষের সহ্যশক্তির সীমা আছে, সুতরাং তৃতীয় খণ্ডে দেখা যায় যে, স্বামীর অবহেলাই রমার মৃত্যুর কারণ হইল।

যাহা হউক, স্বামীর মঙ্গলচিন্তার উপর এখন সন্তানের মঙ্গলচিন্তা আসিয়া রমার মুসলমানভীতিকে আরও প্রবল করিয়া তুলিল। সীতারাম দিল্লী গেলে এই ভয় রমাকে একেবারে আত্মহারা করিল। সে স্বামীর জন্য, এবং নিজের জন্য যত না হউক, সন্তানের জন্য, ভাবিয়া অস্থির হইল। 'যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। (সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে··· সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন।) তারপর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তারপর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে?···"আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে। তা ছেলে কাকে দিয়ে যাব?" ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ!···রমা একথা কাকে জিজ্ঞাসা করে?' [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।] স্বামী নিকটে নাই, রমা এ সন্দেহভঞ্জনের জন্য প্রথমে নন্দার কাছে গেল, পরে 'পুরবাসিনী আবালবৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল।' নন্দা সাহস দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে রমার মন মানিল না। অন্য সকলেই বলিল—"তারা ছেলে মারে না ত কি?" সুতরাং 'রমা সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া···ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।' [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]। তাহার পর যখন

অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, মুসলমানেরা আসিতেছে, তখন 'রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল।' পৌর-স্ত্রীগণ নন্দাকে 'পুরী বিনা যুদ্ধে মুসলমানকে সমর্পণ' করিতে ও প্রাণভিক্ষা মাগিতে পরামর্শ দিল। ইহা হইতে রমা নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাইল। [২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।]

রমা ভয়ের প্রাবল্যে, পুত্রস্নেহের আতিশয্যে, একটা বড় দুঃসাহসের, বড় দুর্নামের, বড় দোষের কায করিল। সে গভীর রজনীতে খাস দাসী মুরলা দ্বারা শ্রীর ভ্রাতা নগররক্ষক গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে নিজ কক্ষে ডাকাইয়া আনিল। ভাবিল, সপত্নীর দাদা নিজেরও দাদা। 'আপনি আমার দাদা হন, জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।' 'এ না করিয়া কি করি—প্রাণ যায় যে।' এই সব কথায় গ্রন্থকার রমার সাফাই গাহিয়াছেন। [২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।]

রমা শুধু গঙ্গারামকে এমন সময়ে এমন ভাবে ডাকিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুসলমানের হাতে নগর ছাড়িয়া দিয়া সকলের প্রাণভিক্ষা করিতে বিষম অনুরোধ করিল। গঙ্গারাম তাহাতে সম্মত না হইলে, 'রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।' বলিল—"তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম তাহার ব্যবস্থা করিবে, আশ্বাস দিল। কিন্তু রমার ভয় ঘুচে না। সুতরাং সে গঙ্গারামের নিকট মাঝে মাঝে মুরলাকে পাঠাইত, গঙ্গারামও কারসাজী করিয়া তাহার কাছে কিছু না ভাঙ্গিয়া বলিয়া রমার কাছে যাইত। [৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদ।] গঙ্গারামের মনে কি বিকার ঘটিয়াছে এবং এরূপ ব্যাপারের যে কি দোষ, তাহা রমা বুঝে নাই। কেন না 'রমার মন বড় পরিষ্কার পবিত্র।' 'কিন্তু মুরলার একটি কথা দৈববাণীর মত তাহার কাণে লাগিল।' যাক্, 'ও ছাই কথা' আর ফলাও করিয়া বলিব না। 'মুরলার কথা শুনিয়া রমার গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া, কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান হইল। এমন কথা, রমার মনে এক দিনও হয় নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল, যে সে দিক্‌টা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই।' এখন রমা নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝিল। 'আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না কি মুরলাকে যাইতে দিল না।' [২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার নিজেই সব কথা বলিয়া গিয়াছেন। টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

এই দারুণ অপরাধের জন্য রমা 'গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত' স্থির করিল, কিন্তু 'ছেলের কি হইবে?' সীতারাম আসিলে ছেলে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিবে সিদ্ধান্ত করিল। এখানেও পুত্রবাৎসল্য সকলের উপর।

একবার যখন রমা নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝিল, তখন 'আর কলঙ্কের পথে যাইব না, প্রতিজ্ঞা করিল।' কিন্তু মুসলমান সেনা নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে জানিয়া রমা আবার পুত্রস্নেহে অধীর হইয়া মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে পাঠাইল, "আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডে রমা না বুঝিয়া পুত্রস্নেহবশতঃ বড় অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাকে যদি পাপ বলিতে হয়, তবে ইহাও বলিতে হয় যে, তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার ইহার জন্য রমার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। এইবার সে কথা বলি।

রমা ও গঙ্গারামঘটিত ব্যাপার যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন তৎসম্বন্ধে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিল। 'সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না।' 'রমা কলঙ্ক-কথা শুনিয়া শয্যা লইল, কাঁদিয়া বালিশ ভাসাইল, শেষ গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরা ঠিক করিল।' সে নন্দার প্রশ্নের উত্তরে আদর্শ হিন্দু সতী সীতার মত সমস্ত জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলিতে চাহিল 'বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যুর্ব্যভিচারো যথা ন মে' এবং পরে সীতার মত প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতীতির জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইল। নন্দার কথায় আশ্বাস পাইয়া কলঙ্ক-

ভঞ্জনের ব্যবস্থার আশা পাইয়া রমা 'শয্যাত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল। এতক্ষণ তাহাও করে নাই।' [৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।] নারীর চরম কলঙ্কভয়ের নিকট প্রবল পুত্রস্নেহও পরাভূত হইয়াছিল।

বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রমা নন্দাকে বলিল— 'যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।' রাজার রাণী

মাতৃমূর্ত্তি—শিভালিয়র্ টেলর্-অঙ্কিত

অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা—প্রকাশ্য বিচারালয়ে সহস্র লোকের সমক্ষে লজ্জাকলঙ্কভয়, সন্তানের মুখ দেখিয়া, সমস্ত ভুলিবে। অপত্যস্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! [২য় পরিচ্ছেদ।] বিচারালয়ে যখন রমা অকপটে সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন 'রমা দেখিল, পুত্র কোথা?··· মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। তখন রমা সবিশেষ বলিতে আরম্ভ করিল।···রমা পুত্রের বিপদ্-শঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল—যখন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল।···তারপর সহসা রমা, ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনার আরও সন্তান আছে—আমার আর নাই। মহারাজ, আপনার রাজ্য আছে, আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই।" [৩য় পরিচ্ছেদ।] ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

তাহার পর রমা সকলরূপ কঠিন শপথ করিয়া সর্ব্বশেষে বলিল, "যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, আমি যেন সেই পুত্রমুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই। মহারাজ! আর কি বলিব—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মে জন্মে স্বামিপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।" হিন্দুনারী ইহার বাড়া দিব্য আর জানে না। [৩য় পরিচ্ছেদ।]

যখন আমরা রোগজীর্ণা ভগ্নহৃদয়া আসন্নমরণা রমার শেষ দেখা পাই, তখনকার দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া এই অরুন্তুদ কাহিনী সাঙ্গ করি। 'সেইখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষুতে জল আসিল········রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিলেন—"ওকে একবার কোলে নাও।" সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা, সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল— "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা।···কথা রাখিবে কি?" [১২শ পরিচ্ছেদ।]

পুত্রস্নেহে স্বামীর উপর সকল অভিমান দূর হইল। 'স্বামীর কোলে পুত্তুর দোলে মরণ হয় যেন' হিন্দুনারীর এই পরম সাধ পূর্ণ হইল।

রমার চরিত্রবিশ্লেষণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহার মাতৃভাবের বিকাশ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

শেষ কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা প্রকটিত, সর্ব্বত্রই যৌবন-জলতরঙ্গ ছল ছল করিতেছে, কোথাও বর্ষীয়ান্ ও বর্ষীয়সীদিগের সমাগম নাই, নায়ক-

নায়িকাগুলি সত্য সত্যই কবির মানসসন্তান, কুত্রাপি তাহাদিগের মাতাপিতার নামগন্ধ নাই—ইত্যাদি অভিযোগ সময়ে সময়ে শুনা যায়। 'গোড়ার কথা'য় বলিয়াছি যে, বাস্তবিকপক্ষে মাতাপিতা কতক স্থলে অনুল্লিখিত বা উল্লেখমাত্রে পর্য্যবসিত বা পরলোকগত হইলেও কতক স্থলে মাতাপিতার পুত্র বা কন্যার প্রতি আচরণের অল্পবিস্তর বিবরণ আছে। ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্যনাটকেও নায়ক-নায়িকার মাতাপিতা কোন স্থানে একেবারেই অনুল্লিখিত, কোন স্থানে সামান্য ভাবে উল্লিখিত, আবার কোন স্থানে বিশদভাবে চিত্রিত। দুষ্মন্তের মাতা ব্রত উপলক্ষ্যে পুত্রকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এই একটি মাত্র স্থলে তাঁহার উল্লেখ আছে; শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে, অঙ্গুরীয়দর্শনে রাজার পূর্ব্বকথা-স্মরণে অনুতাপকালে, আর রাজমাতার সংবাদ পাওয়া যায় না। অপ্সরা জননী প্রসবান্তেই শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার প্রতি মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। উত্তরচরিতে সীতানির্ব্বাসনের পূর্ব্বে হইতে শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃগণ গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন এবং জামাতার যজ্ঞস্থলে গিয়াছিলেন; তাহার পরেও তাঁহাদের একবার মাত্র উল্লেখ দেখা যায়। বসন্তসেনার মাতার সামান্য একটু চিত্র আছে। ভাস-কবির নাটকে বাসবদত্তার ও তাঁহার সপত্নীর মাতার স্নেহের কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে, অন্য সপত্নীঘটিত অনেক নাটকে সেটুকুও নাই। রাজ্ঞী-দিগেরও মাতৃভাবের পরিচয় অনেক নাটকে নাই, শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি কোন কোন নাটকে আছে। মালতী-মাধবে মালতী-জননীর স্বল্পমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। মালতীজনকের পরিচয় তদপেক্ষা স্পষ্ট; মাধবের পিতার কথা আছে, মাতার কথা নাই। শ্রেষ্ঠ ইংরাজ-কবি শেক্স্‌পীয়ারের নাটকে পোর্শিয়া, ডেস্‌ডেমোনা, কোর্ডিলিয়া, হেলেনা, আইমোজেন, রোজ্যালিণ্ড, সিলিয়া, হিরো, বিয়াট্রিস প্রভৃতির যে কখন জননী ছিলেন, তাহার হদিশ পাওয়া যায় না। মিরাণ্ডার পরলোকগতা জননীর সামান্য-মাত্র উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে জুলিয়েট-জননী পূর্ণাবয়বে চিত্রিত, রোমিও-জননীরও যেটুকু চিত্র আছে, তাহা সুন্দর। অতএব তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বঙ্কিম-চন্দ্র কাব্য-নাটকে আবহমানকাল-প্রচলিত প্রণালীরই অনুসরণ করিয়াছেন, একটা 'নূতন কিছু' করেন নাই।

আখ্যায়িকাকার কোন্ কোন্ স্থলে জননীর উল্লেখ করেন নাই, কোন্ কোন্ স্থলে সামান্যমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কোন্ কোন্ স্থলে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা মূলপ্রবন্ধে আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়াছি। এরূপ প্রভেদের হেতু কি এবং কোথায় কোথায় মাতৃচিত্র ও মাতৃভাব আশা করা যায়, অথচ সে আশা পূর্ণ হয় নাই, তাহাও বিচার করিয়াছি এবং কেন সে সকল স্থলে কবি এরূপ করিয়াছেন, আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত সে প্রশ্নের মীমাংসাও করিয়াছি। জানিনা, সে বিচার ও মীমাংসা সুধীজনগ্রাহ্য হইবে কি না।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলি প্রেমলীলার অভিনয়ে ভরপূর, কিন্তু সে প্রেমলীলার অভিনয়স্থল লোকসমাগম-শূন্য দ্বীপ বা অরণ্য নহে, পারিবারিক জীবনের লীলাভূমি গৃহ। সুতরাং এ অবস্থায় যদি আখ্যায়িকাগুলিতে পারি-বারিক জীবনের, মাতাপিতার, মাতৃস্নেহ-পিতৃস্নেহের, কোন প্রসঙ্গ না থাকিত, তাহা হইলে বড়ই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় হইত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেরূপ বিস্ময় ও ক্ষোভের কারণ বর্ত্তমান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ তূলিকায় চিত্রিত বিশাল চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিলে দেখা যায়, কোথাও নবীনা জননী সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতেছেন, সন্তানের সহিত ছেলেখেলা করিতেছেন, শিশুর আধ আধ বাণী শুনিয়া ও হাসিমুখ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া মনোবেদনা ভুলিতেছেন, সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিতেছেন, আবার কোথাও বা তিনি সন্তানের মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য লোকনিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোথাও নবীনা জননী তস্করকর্ত্তৃক হৃত সন্তানের জন্য দারুণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন, কোথাও পরের সন্তান দেখিয়া তাঁহার নিজ মৃত সন্তানের শোক উথলিয়া উঠিতেছে, তিনি পরের সন্তান দ্বারা মৃত সন্তানের স্থান পূরণ করিতে ব্যগ্র, আবার কোথাও স্বামি-পরিত্যক্তা যুবতী মর্ম্মবেদনায় মৃত পুত্রের জন্য ক্রন্দন করিতেছেন, আবার কোথাও তিনি পুত্রের মুখ দেখিয়া স্বামীর অবহেলাজনিত বেদনা ভুলিতেছেন। কোথাও দরিদ্রা বিধবা শিশুপুত্র বা শিশুকন্যাকে লইয়া প্রাণপাত

পরিশ্রমে দারিদ্র্যের সহিত যুঝিতেছেন, আবার কোথাও তিনি বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিতা কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ অশক্তা। কোথাও প্রবীণা সধবা জননী কন্যার বিবাহের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্তা হইয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, কোথাও তিনি শ্বশুরগৃহবাসিনী কন্যার পীড়াসংবাদে অস্থিরচিত্ত হইয়া তাহাকে দেখিবার জন্য,কাছে আনিবার জন্য, ব্যস্ত। কোথাও আবার জননী বিবাহিতা অথচ স্বামিসহবাস-বঞ্চিতা যুবতী কন্যার জন্য তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছেন এবং নিজের মান খোওয়াইয়াও তাহার মনোবেদনা দূর করিবার জন্য উপায়নির্দ্ধারণে ও তদবলম্বনে উৎসুক। কোথাও মাতা পুত্রের রাঙ্গা বৌ আনিবার জন্য কর্ত্তার নিকট বায়না করিতেছেন, কোথাও মাতা পুত্রের রাঙ্গাবৌ দেখিয়া আনন্দে বিভোর, কোথাও বা বধূর মরণসংবাদে পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া অথবা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের বিদেশে মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কোথাও আবার তিনি হারানিধিকে পাইয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতেছেন। কোথাও প্রবীণা জননী বিদেশ হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে আদরযত্ন করিয়া ভোজন করাইতেছেন, কোথাও বা তিনি পুত্রের আহারের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য নিজের হৃদয়ে বদ্ধমূল কৃপণতা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিতেছেন। কোথাও বাদশাহের ঘরে জননী পুত্রগর্ব্বে অন্ধ হইয়া, পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছেন, আবার কোথাও মাতা পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য নিজের ও নিজের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্মের অবমাননা-লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছেন। এইরূপ অসংখ্য মাতৃ-চিত্র, জননী-জীবনের সুখের দুঃখের চিত্র, আমাদের নয়ন-গোচর হয়। ঐগুলিতে যথেষ্ট মনোহারিত্ব ও বৈচিত্র্য, মধুর ও করুণভাব সঞ্চিত রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে, এই আখ্যায়িকাবলিতে, প্রবীণা জননী গর্ভজ সন্তানের মায়ায় অন্ধ হইয়া তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সপত্নী বা সপত্নীপুত্রের সর্ব্বনাশ সংসাধন করিতেছেন, এরূপ নিষ্ঠুরতার চিত্র নাই, অথবা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের অকালমৃত্যুতে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ করিতেছেন, 'সুতশোকে মাতা কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,' 'উপযুক্ত পুত্র গেছে আঁধারি ভুবন, জনকজননী বৃদ্ধ ধরাশয্যাগত,' এরূপ তীব্র বেদনাময় বিবরণ নাই। আবার মাতা শিশুসন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন, হিংস্র পশুপক্ষীর কবল হইতে প্রাণাধিক পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ বা দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতেছেন, এরূপ রোমাঞ্চকর অসাধারণ ঘটনারও সমাবেশ নাই। সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনের ঘটনা-বলীর মধ্যে মাতৃত্বের যেরূপ বিকাশ ঘটিতে পারে, যে টুকু সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য, করুণরস ও কবিত্ব থাকিতে পারে, কবি তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

তথাপি, অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃমহিমার পূর্ণায়তন চতুরস্রশোভী চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননীর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন নাই, বলিয়া অনেকে অনুযোগ-অভিযোগ করেন। এ কথার বিচার আবশ্যক।

নারী কন্যা, নারী ভগিনী, নারী পত্নী, নারী মাতা। ইহার মধ্যে নারীর মাতৃত্বই শ্রেষ্ঠ, কেননা মাতৃত্বেই নারীর পরিপূর্ণ নারীত্ব। এই মূর্ত্তিতেই তিনি আদ্যা শক্তির সহিত অভিন্ন। 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রের বাণী—প্রজনার্থং মহাভাগা। খৃষ্টান এই ভাবের ভাবুক হইয়া শিশুখীশুক্রোড়ে মেরি মাতার দর্শন পাইয়াছেন। শুনিয়াছি, ফরাসী দার্শনিক প্রত্যক্ষবাদী কোমত্ খ্রীষ্টধর্ম্মের আর সব ছাড়িয়া এই মাতৃমূর্ত্তির মহিমাপ্রচার করিয়াছেন, আর শাক্তহিন্দু এই মাতৃত্বকে idealise, spiritualise, vitalise করিয়া 'ধাত্রী সমস্তস্য চরাচরস্য' জগন্মাতার গণেশ-জননীমূর্ত্তি ধ্যানে পাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এ সব তত্ত্ব জানিতেন না অথবা 'পিতুরভ্যধিকা' মাতার মর্ম্ম বুঝিতেন না, এমন নহে। তিনি প্রৌঢ়-বয়সে জননীকে হারাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় শৈশবে মাতৃহীন হন নাই। সুতরাং জননীর স্নেহ তিনি প্রত্যক্ষভাবে শৈশব, যৌবন ও প্রবীণবয়সে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তিও বিদ্যাসাগর-মহাশয় বা স্যার গুরুদাস, ৺দ্বারকানাথ মিত্র বা ৺অক্ষয়কুমার দত্তের অপেক্ষা কম ছিল না। 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখিত আছে যে, 'বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার কর্ম্মস্থল যশোহর অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক একটা শিশিতে ভরিয়া লইলেন। যে জলটা জননীর পদস্পৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা গঙ্গোদক; জননী বলিলেন,

"করলি কি? গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি?" বঙ্কিমচন্দ্র ছলছল নয়নে বলিলেন, "মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড়?" (১৬১-৬২ পৃঃ), 'তাঁহার ন্যায় পিতামাতাকে ভক্তি করিতে আমি বড় একটা কাহাকেও দেখি নাই।' (বঙ্কিম-কাহিনী ১২ পৃঃ)। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি তদপেক্ষা কম নহে। যাঁহার হৃদয় মাতৃভক্তিতে এমন কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ, তিনি বড় আকারে একটা মাতৃচিত্র আঁকিলেন না কেন? হৃদয় পরিপূর্ণ বলিয়াই কি তিনি প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পান নাই? না, এই পবিত্র ও উদাত্ত ভাব তিনি তরল আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন নাই? কবিহৃদয়ের রহস্য কে বুঝিবে? শৈশবে মাতৃহীন কুপর উৎকৃষ্ট মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; আর তাঁহারই সমসাময়িক ও তাঁহা অপেক্ষা প্রতিভাশালী কবি গ্রে পিতার অবহেলার পাত্র ছিলেন, তাঁহার মাতা প্রাণপাত পরিশ্রমে তাঁহাকে লালনপালন করেন ও তাঁহার স্কুল ও কলেজের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, অথচ তিনি তজ্জন্য মাতার প্রতি স্নেহশ্রদ্ধাভক্তিকৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ-হৃদয় হইয়াও যৌবনের অবসানে মাতৃহারা হইয়া, মাতার উদ্দেশে একটি কবিতা লেখেন নাই, এই অসঙ্গতির কারণ কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমার তিনটি কথা বলিবার আছে। কথাগুলি অনুমানসিদ্ধ, সুধীজনগ্রাহ্য হইবে কি না, জানি না।

(১) আমার প্রথম কথা। 'শ্বাশুড়ীবধূ' প্রবন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি, আবার এই প্রসঙ্গেও সংক্ষেপে বলিতেছি—বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য রোম্যান্স-রচনা, 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' লেখা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। এই শ্রেণীর কাব্যে নায়কনায়িকার প্রণয়ের কাহিনীবর্ণনা কবির মুখ্য লক্ষ্য। প্রাচীন পুথি 'মধুমালতী উপাখ্যানে'র শেষের দুই ছত্রে কবি বলিতেছেন, 'পীরিতিবর্ণনগ্রন্থ কৈল সমাপন। শুনিলে রসিকজনের রসে ডুবে মন॥' এই শ্রেণীর সকল কাব্য সম্বন্ধেই উক্ত দুই ছত্র প্রযুক্ত হইতে পারে। শকুন্তলা, রত্নাবলী, মালতীমাধব, মালবিকাগ্নিমিত্র, কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্যনাটক এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির নহে। সর্ব্বত্রই নায়ক-নায়িকার 'পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,' এই সকলই কাব্যের প্রাণ। অবশ্য গল্প জমাট বাঁধিবার জন্য প্রতিমার সাজ বা চালচিত্তির হিসাবে, পারিপার্শ্বিক কতকগুলি অপ্রধান চরিত্র গ্রন্থভুক্ত করার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর বেশী জোর দেওয়া চলে না। প্রেমকাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যে অধিক স্থান যুড়িয়া থাকিবে, অন্য অবান্তর বিষয় সংক্ষেপে থাকিবে। তথাপি যে বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক-নায়িকা ভিন্ন অপর চরিত্রের, যথা কমলমণি, সুভাষিণী, রমা, রাধারাণীর মা, প্রফুল্লর মা, ব্রজেশ্বরের মা প্রভৃতি নবীনা বা প্রবীণা জননীর চিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়াছেন, ইহার জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পারিবারিক জীবনের সকল দিক্ সম্পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইবে, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সন্তানস্নেহ, সৌভ্রাত্র, প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ণায়তন চিত্র থাকিবে, ইহা কখনও এই শ্রেণীর কাব্যে আশা করা যাইতে পারে না। কতকগুলা ভিড় জমাইয়া মহাভারত লেখা চলে, রোমান্স-রচনা চলে না। বরং আধুনিক নাটকে সমগ্র মানবজীবনের চিত্র দিবার প্রয়োজনে অন্যান্য সম্পর্কের স্থান হইতে পারে, কিন্তু রোম্যান্সে চিত্রপটের এরূপ প্রসারবৃদ্ধি অশোভন ও অসঙ্গত।

সত্য বটে, ভিক্‌টর হিউগোর 'নাইন্টি-থ্রী'তে মাতৃভাবের একটি হৃদয়স্পর্শী চিত্র আছে, কিন্তু নাইন্টি-থ্রী যে আদৌ এই শ্রেণীর প্রণয়কাব্যই নহে, ইহা কেহ তলাইয়া দেখেন না। ইহাতে নায়ক-নায়িকার প্রেম (সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষসের ন্যায়) একেবারে বর্জ্জিত; এ হিসাবে আখ্যায়িকাটি নূতন এবং নিতান্তই অদ্ভুত ও অভিনব প্রকৃতির (Unique)। ইহাতে আছে (আনন্দমঠের ন্যায়) জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও গুরুশিষ্যপ্রীতির সঙ্ঘর্ষ অর্থাৎ দেশের প্রতি কর্ত্তব্য এবং স্নেহভাজনের প্রতি কর্ত্তব্যের বিরোধ—আর এই জননী জন্মভূমির প্রতি একাগ্র প্রেমের পার্শ্বে বৈচিত্র্যবিধানের জন্য ('আনন্দমঠে'র ন্যায়) এক পরম রমণীয় পার্থিব জননীমূর্ত্তি। মাতা দরিদ্রা, কুরূপা, ঘৃণিতা, সমাজের নিতান্ত নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্তা—অথচ মাতৃত্বের মহিমায় তাঁহার সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব ও পবিত্রতা অতুলনীয়। (শিশুচিত্রও সুন্দর)। এই নূতন ধাঁচের আখ্যায়িকার সহিত 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি কাব্যের তুলনা করা কি সঙ্গত?

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে বা ইংরাজী আদর্শে লিখিত

৺দীনবন্ধু মিত্র বা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের বা ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে হয়ত মাতৃভাবের পূর্ণতর চিত্র থাকিতে পারে, কিন্তু একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আধুনিক নাটকে সমগ্র মানবজীবনের চিত্র প্রদর্শন করিবার একটা চেষ্টা দেখা যায়, রোম্যান্সের সে উদ্দেশ্য নহে।

সংস্কৃত কাব্যনাটকে মাতৃচিত্র অধিক নাই, তাহাও 'শেষ কথা'র প্রথম অংশে বলিয়াছি। অবশ্য রামায়ণে কৌশল্যার ও কৈকেয়ীর) চিত্রে, মহাভারতে কুন্তীর চিত্রে মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু শ্বাশুড়ী-বধূ প্রবন্ধে বলিয়াছি, রামায়ণ-মহাভারত ও কথা-আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু, ইহাদিগের পরস্পরের তুলনা চলিতে পারে না।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে, শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনা, খুল্লনার মাতা রম্ভাবতী, নখিন্দরের মাতা সোনেকা, বেহুলার মাতা সুমিত্রা প্রভৃতি কয়েকটি করুণরসাত্মক মাতৃচিত্র দেখা যায় বটে কিন্তু এ সমস্তই দক্ষপত্নী প্রসূতি ও গিরিরাণী মেনকার সহিত একজাতীয়। এগুলির স্বাতন্ত্র্য বা নূতনত্ব কিছুই নাই। হিন্দুহৃদয়ে মেনকা মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি, সে কথা পরে বলিব। ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দরে' একটা নূতন ধরণের মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু এই চিত্র অঙ্কিত না করিলেও যে সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইত, তাহা বোধ হয় না।

(২) আমার দ্বিতীয় কথা। বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শাক্ত বিশ্বশক্তিকে জগজ্জননী-মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু তাহাতেও ভক্ত শাক্তের তৃপ্তি হয় না। তিনি আবার সেই জগজ্জননী মহামায়ার জননী দক্ষজায়া প্রসূতি ও গিরিরাণী মেনকাকে মাতৃভাবের, মাতৃস্নেহের, চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর ভক্ত বৈষ্ণব জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের যশোদা জননীকে (ও চৈতন্যের মাতা শচীদেবীকে) মাতৃস্নেহের, বাৎসল্য-রসের চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাদের শাস্ত্রে আদ্যাশক্তি জননীমূর্ত্তিতে প্রকট, যে দেশের দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে মা মেনকা ও মা যশোদা মাতৃ-মহিমার ক্ষীরস্রাবিনী মূর্ত্তপ্রতিমা, যে দেশের সমাজ এই মাতৃস্নেহসম্ভোগে বিভোর, যে দেশের সাহিত্য এই বাৎসল্যরসে মসগুল, সে দেশে সে সমাজে এমন দুঃসাহসিক কে আছে যে, ইহার উপর টেক্কা দিয়া বিরাট্ মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইবে? ইহা কি নিতান্তই অসাধ্যসাধন, পিষ্টপেষণ বা তেলামাথায় তেল ঢালার চেষ্টা হইত না!

শুনিয়াছি, হোমারের অমর কাব্যে ট্রয়ের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সব বৃত্তান্ত আছে, পেরিক্লীসের আমলের গ্রীক নাটক-কারগণ নাটকরচনাকালে সে সব বৃত্তান্ত হইতে আখ্যান-বস্তু গ্রহণ করেন নাই, অন্য প্রাচীন অপ্রথিতনামা কবি-দিগের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম বিচারকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নাটককারগণ হোমারের সঙ্গে তাল ঠুকিয়া কলমবাজীতে লাগিতে সাহস পান নাই, মহাকবির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছা করেন নাই, তজ্জন্যই তাঁহার কাছে ঘেঁসেন নাই। * মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাল্মীকি যে সব ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস সে সব সংক্ষেপে সারিয়াছেন, যেন পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন; আর যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা নিতান্ত অল্প, সেইখানেই কালিদাস নিজ প্রতিভা নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, কালিদাস কবিগুরু বাল্মীকির সহিত প্রতিযোগিতা নিষ্ফল জানিয়া সে পথে পা দেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও যদি এই কারণে অসংখ্য বৈষ্ণব কবি এবং অসংখ্য আগমনী ও বিজয়ার কবির সহিত টক্কর দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে কি তাঁহার একটা মহা অপরাধ হইয়াছে? বাস্তবিক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মাতৃভাবের এই যে দুইটি সুপবিত্র, সুন্দর, মধুর, করুণ, আদর্শ রহিয়াছে, এই যে পার্থিব ও স্বর্গীয় ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, জগতের সাহিত্যে ইহা অতুলনীয়, ইহার পার্শ্বে ঠিক এমনি একটি তৃতীয় আদর্শ খাড়া করিতে পারে, কাহার সাধ্য?

(৩) আমার তৃতীয় কথা। বঙ্কিমচন্দ্র বিরাট্ মাতৃ-চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, কিন্তু তিনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'

* "The absence of reference in Greek tragedy to the subjects of the Iliad and the Odyssey cannot be explained...but for the only tenable reason—the conscious abstaining of later Greek art from touching these great masterpieces".—Mahaffy: History of Classical Greek Literature. Ch. IV. p. 58.

জন্মভূমির প্রতি যে প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, 'কমলাকান্তের দুর্গোৎসবে' ও 'আনন্দমঠে' দেশ-মাতার যে বিরাট্-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই আমাদের সাহিত্যের, আমাদের সমাজের, আমাদের জাতীয় জীবনের অতুল্য অমূল্য অক্ষয় অবিনশ্বর সম্পত্তি—অহার্য্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা। অসংখ্য শাক্ত ও বৈষ্ণব কবি সাহিত্যে মাতৃভাবের বিকাশের চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বহুকবি-ক্ষুণ্ণ মার্গে বিচরণ করেন নাই, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা কি আর কেহ দিতে পারিত ? তিনি যে নূতন পথে বাঙ্গালীর শক্তিভক্তিসাধনা পরিচালিত করিবার জন্য নিজ অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহা দেশকাল-পাত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহার আবির্ভাবকালে এ পথে তাঁহার কোন সমানধর্ম্মা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, এখনও আছে কি না সন্দেহ। রামপ্রসাদ জগজ্জননীকে মা বলিয়া ডাকিয়া—'মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত, দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, তুমি কি ছাড়া জগত'—ইত্যাদি মাতৃগীতা গায়িয়া অমর হইয়াছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকে মা বলিয়া ডাকিয়া —'বন্দে মাতরম্। তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'—এই মন্ত্রে মহাশক্তির আবাহন করিয়া অমর হইয়াছেন।

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়

আশা

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

বল্কল কৌপীনধারী, শিরে জটাভার,
দীর্ঘশ্মশ্রু, ধূলা-মাখা, অস্থিচর্ম্মসার ;
ত্যজিয়া সংসার-সুখ, ছাড়ি পরিজনে,
শান্তি লভিবার আশে এসেছ বিজনে ?
সর্ব্বত্যাগী বটে ; কিন্তু দেখিবারে পাই
সে ত ছাড়িয়াছে ;—আশা ! তুমি ছাড় নাই।

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্‌. এ.]

৪১

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দয়াদিদির পিতা ও শ্বশুর উভয়েরই অবস্থা একসময়ে বেশ সচ্ছল ছিল। দয়াদিদির পিতা সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। যে গ্রামে তাঁহার বাস, সেখানে প্রতি সপ্তাহে দুই বার কাপড়ের হাট বসিত। প্রতি হাটে প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকার কাপড়ের আমদানি-রপ্তানি হইত। সেই হাটেই দয়াদিদির পিতার আড়ত ছিল।

নন্দরাণীর পিতা হারাধন সেই আড়তে সরকারী করিতেন। চাকরী উপলক্ষে হারাধন দয়াদিদিদের গ্রামেই বাস করিয়াছিলেন। বহুকালের ভৃত্য এবং বিশ্বাসী বলিয়া দয়াদিদির পিতার সঙ্গে হারাধনের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। হারাধনের উপাধি ছিল—মজুমদার, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ।

সেই গ্রামেই নন্দরাণীর জন্ম। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে আত্মীয়তার জন্য উভয়ের পরিবারবর্গের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং সেই জন্য "মজুমদার মহাশয়ে"র কন্যা নন্দরাণীর সহিত শৈশব হইতেই দয়াদিদি সখীত্ব সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছিল।

নন্দরাণী দয়াদিদির অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট; দেখিতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তাহার মুখ-চোক, অঙ্গের গঠনে সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না।

নন্দরাণী দয়াদিদির বিবাহ দেখিয়াছিল। কিন্তু দয়াদিদি নন্দরাণীর বিবাহ দেখে নাই। দশ বৎসর বয়সে দয়াদিদির বিবাহ। বার বৎসর বয়সে 'দ্বিরাগমনে' সে প্রথম শ্বশুরঘর করিতে যায়। যাইবার সময় সে নন্দরাণীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়াছিল মাত্র। শ্বশুরগৃহ হইতে ফিরিয়া সে আর নন্দরাণীকে দেখিতে পায় নাই।

দয়াদিদির শ্বশুরগৃহ-অবস্থানকালে ম্যালেরিয়া নূতনের সমস্ত প্রকোপ লইয়া তাহার পিতার দেশ আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে গ্রামের বহুলোক মরিল। মজুমদার মহাশয়ের গৃহও সে আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাঁহার স্ত্রী মরিল, পুত্র মরিল, নন্দরাণী মরিতে মরিতে বাঁচিল। একমাত্র কন্যাকে লইয়া জ্বর ও জরাজীর্ণ মজুমদার-মহাশয় নিজের দেশে পলাইল।

শুধু নন্দরাণীকে নয়, দেশে ফিরিয়া দয়াদিদি তাহার গ্রামের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের মধ্যে অনেককেই দেখিতে পাইল না। তাহার একবৎসরের পিতৃগৃহে অনুপস্থিতির সময় মধ্যে ম্যালেরিয়া গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোককে গ্রাস করিয়াছে। তাহার পিতার জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজন লইয়া যে তাঁতিপাড়া, তাহাও এই সময়ের মধ্যে একরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজ বাটীর লোকের মধ্যেও দুই তিনজন তাহার দৃষ্টি হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র নন্দরাণীর

চিন্তায় কাতর হইতে দয়াদিদির বহুদিন অবসর রহিল না। তারপর দুর্ঘটনাপরম্পরায় তাহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। শোক-সন্তপ্তা দয়াময়ীর ভবিষ্যৎ জীবনটা তাহার পূর্ব্বজীবনের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, যেন নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছে। গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর স্মৃতিও মুছিয়া গিয়াছে।

আজ প্রায় ত্রিশবৎসর পরে নন্দরাণীর সঙ্গে দয়াদিদির পুনঃসাক্ষাৎ। সেইজন্য প্রথমে সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। শুধু পারে নাই কেন, এই সময়ের মধ্যে উভয়ের অবস্থার এরূপ পার্থক্য হইয়াছে যে, দয়াদিদি নন্দরাণীকে চিনিয়াও চিনিতে সাহস করে নাই।

নন্দরাণীর এই অদ্ভুত অবস্থাপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলিব। দেশে ফিরিয়া মজুমদার মহাশয় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সেখানে ম্যালেরিয়ার দ্বিতীয় আক্রমণে তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগের জন্য তিনি কন্যার বিবাহের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বোপার্জিত সামান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির এবং কন্যার ভার শ্যালকের উপর দিয়া গিয়াছিলেন।

নন্দরাণীর যখন পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তাহার বয়স এগারো বৎসর। দুর্ঘটনাগুলা না ঘটিলে এই সময়ের মধ্যে তাহার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। পিতার মৃত্যুর পরেও তাহার বিবাহের সুযোগ ঘটিল না। সে ক্রমাগত তিন বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিল। তাহার দেহ কঙ্কাল সার হইল। জীবনের আশা রহিল না।

তিন বৎসর পরে যখন সে রোগমুক্ত হইল, তখন লোকচক্ষে সে একাদশ বৎসরেরই বালিকা ছিল। রোগে তাহার তিন বৎসরের পুষ্টি খাইয়া ফেলিয়াছিল। রোগ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছয়মাসের মধ্যে বন্যার জলের মত কৈশোরলাবণ্য চারিধার হইতে যেন নন্দরাণীর অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার মাতুল এতদিন পরে তাহার জন্য পাত্র দেখিবার প্রয়োজন বুঝিল। তাহাদের বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলায়, কাঁসাই নদীর তীরে একটি গ্রামে। একদিন নন্দরাণী তাহার প্রতিবেশিনী একটি বৃদ্ধার সঙ্গে নদীতে স্নান করিতেছিল। সেই সময় সে দেশের জমীদারের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

তাঁহার নাম ছিল—রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—এক কথায় —সাধারণ্যে সর্ব্বপরিচিত নাম রাজাবাবু। দেশে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল। নামে বাঘে গরুতে জল খাইত। সম্পত্তির অধিকার লইয়া তাঁহার আদেশে কত যে মারামারি, কাটাকাটি, গ্রামদাহাদি-ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আইনের জাল-বন্ধনে তখনও পর্য্যন্ত জমীদারের প্রতাপ এখনকার মত ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রজাগণ তখনও পর্য্যন্ত জমীদারকে রাজার মত দেখিত, ভয় করিত, শ্রদ্ধা দেখাইত। নিজের স্বত্বে অভিমানী, কথায় কথায় জমীদারের সঙ্গে সমকক্ষতা দেখাইতে আদালতে উপস্থিত হইত না। তাহাদিগের আপনাআপনির ভিতরে অনেক মোকদ্দমা তাহারা জমীদারের সালিসীতেই মিটাইয়া লইত।

গবর্ণমেণ্টের দত্ত উপাধি না হইলেও প্রজাসকল রাজাবাবুকে রাজা বলিত। সুতরাং তাঁহার পত্নী রাণী।

রাজাবাবুর যখন ষাটবৎসর বয়স, তখন তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। তাঁহার গর্ভে পুত্রকন্যা কিছুই হয় নাই। বিষয়ের উত্তরাধিকারিতার নিমিত্ত 'রাজদম্পতির' হৃদয়ে তীব্র সন্তান আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, পত্নীর শাসনে রাজাবাবু পুত্রার্থে পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পোষ্যপুত্র-গ্রহণ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি পত্নীর মনোমত কোন এক সুলক্ষণ বালকের মাতৃক্রোড় পরিত্যাগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ-"রাণীর" পরলোকপ্রাপ্তি হইল। রাজাবাবুরও পুত্রহীনতার একটা দুর্নাম অপনোদনের সুযোগ ঘটিল। বিশেষতঃ, গৃহিণীর অদর্শনে নন্দীগ্রামের বিশাল অট্টালিকার অন্তঃসারশূন্যতা একটা বিকট গ্রাসের লক্ষণ লইয়া রাজাবাবুকে নিত্য এমন বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল যে, তিনি অচিরে তাহাকে পূর্ণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না।

পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা ছিল কি না জানিবার উপায় নাই, —তবে যে কোন সূত্রেই হউক, অথবা বিধাতার একান্ত নির্ব্বন্ধেই হউক, পুনর্জীবনাগতা কিশোরী নন্দরাণী পত্নী-বিয়োগবিধুর জলবিহারী স্থিরসঙ্কল্প রাজাবাবুর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এই ষষ্টীপর বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার পট্ট-উত্তরীয়াঞ্চলে আবদ্ধা-নন্দরাণী নন্দীগ্রামের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর মাতুল ও তাহার দুই একজন প্রতিবেশীর বৈষয়িক উন্নতিলাভ হইল।

সকলেই মনে করিয়াছিল, বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বৃদ্ধ রাজাবাবু তাঁহার নবাগতা গৃহলক্ষ্মীটিকে তাঁহার অন্তঃপ্রজ্বলিত আত্মীয়বর্গের তত্বাবধানে নিক্ষেপ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। দেশের লোকের চক্ষু স্মিতাবিস্ফারণে উর্দ্ধনেত্রে পরিণত করিয়া, নন্দরাণী পূরা পঁচিশটি বৎসর তাহার আয়তি ধরিয়া রাখিল।

আরও বিচিত্র কথা—এই পঁচিশ বৎসরে নন্দরাণীর এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে। এই পুত্র ও কন্যা এবং কুলরক্ষিণীভার্য্যাকে পশ্চাতে রাখিয়া, রাজাবাবু জীবনটি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া, বৎসর-দুই-পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নন্দরাণীর পুত্রের নাম হরেন্দ্রনারায়ণ। কন্যার নাম ললিতা। কন্যা জ্যেষ্ঠা, বয়স এখন তেইশ বৎসর; পুত্রের বয়স উনিশ।

পুত্রের বিবাহ শীঘ্র দিবার প্রয়োজন বুঝিলেও কালাশৌচের জন্য নন্দরাণী তাহার বিবাহ এখনও দিতে পারে নাই। বিবাহ দিবার ইচ্ছায় তাহার জন্য একটি পাত্রীর সন্ধানে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। এবং সেই সূত্রে দেবদর্শন উপলক্ষ করিয়া, কালীঘাটে বাসা লইয়াছিল। এইখানেই দেবীর কৃপায় প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে নন্দরাণীর সহিত দয়াদিদির পুনর্মিলন ঘটিল। দেবীর কৃপায় তিনটি অসহায়া স্ত্রীলোক এক শক্তিমতী ভূম্যধিকারিণীর আশ্রয়-লাভ করিল।

(৪২)

কালীঘাটে নন্দরাণীর বাসায় দিন দুই অবস্থানের পর দয়াদিদি প্রভৃতি তাহাদিগের সঙ্গে নন্দীগ্রামে গমন করেন। আমাকে তাহারা যেরূপ দুর্গম পথ দিয়া নন্দীগ্রামে লইয়া গিয়াছিল, সে পথ দিয়া ইঁহারা যায় নাই।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"কালীঘাট হইতে বজরায় চড়িয়া প্রথমে আমরা তমলুকে যাই। সেস্থান হইতে পালকী করিয়া, আমরা নন্দরাণীর স্বামীর দেশে উপস্থিত হই। মধ্যে কত খালবিল যে, আমাদের অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এখন সে দেশের পথ কি রকম জানি না। সে সময় তাহা কিন্তু বড় দুর্গম ছিল। ধনিপত্নীর সঙ্গে চলিয়াছিলাম বলিয়া, আমরা ততটা পথকষ্ট অনুভব করি নাই।

"গ্রামে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ। সেখানে উপস্থিত হইয়াই নন্দরাণীর বাড়ী ও বৈভব দেখিলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কালীঘাটে তাহার সঙ্গের লোক-লস্কর দেখিয়া, তাহার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটা অনুমান করিয়াছিলাম। নন্দীগ্রামে গিয়া দেখিলাম, তাহা আমার অনুমানকে ছাপাইয়া গিয়াছে।

"এখন আমি নিঃস্ব হইয়াছি। কিন্তু এক সময়ে ধনীর কন্যা ও ধনীর পুত্রবধূ ছিলাম। ধনীর সংস্পর্শে সে সময় অনেকের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছিলাম। সুতরাং কালীঘাটে নন্দরাণীর অবস্থা দেখিয়া, আমি তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছু বুঝিতে পারি নাই। এমন কি, তাহাকে সকলে রাণী বলিয়া সম্বোধন করিতেছে দেখিয়া, আমি মনে মনে কিছু বিরক্ত হইয়াছিলাম।

"কিন্তু নন্দীগ্রামে আসিয়া বুঝিলাম—সে রাণী বটে!

"তুমিও সে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িয়াছিলে। তবে তখন নিতান্ত বালক বলিয়া এবং নানা কারণে চিত্তচাঞ্চল্যে অস্থির ছিলে বলিয়া, তাহা তুমি সম্যক্ বুঝিতে পার নাই।

"প্রথমে সে আমাদিগকে তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতরেই স্থান দিল। কিন্তু সেখানে প্রবেশের পর হইতেই তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। শুধু আমার নহে। ঠাকুর-মাও এই রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, যেন কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

"নন্দরাণীর ব্যবহারে কোনও ক্রটী ছিল না। সে আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতই শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিল। ঠাকুরমাকে ও দাক্ষায়ণীকেও সে ভক্তি দেখাইতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। তাহার পুত্র, কন্যা ও জামাতাকে দেখিলাম। দেখিলাম কেন, নন্দরাণী তাহাদিগকে দেখাইল। আমি তাঁতির মেয়ে—তাহারা কায়স্থ। সমাজে আমা হইতে তাহাদের উচ্চস্থান।—নন্দরাণী ঠাকুরমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

"দাস-দাসী রাণীর আদেশে, রাণীর মতই আমাদের সেবা করিতে লাগিল। তথাপি সঙ্কোচ। সঙ্কোচ শুধু আমাদের নিজের জন্য নয়। দাক্ষায়ণীর জন্য সেটা যেন বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম। দাক্ষায়ণী সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অবধি যেন বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল

না। সে তাহার গলার ঠাকুরটি লইয়া যেন ত্রস্তভাবে সেখানে দিনযাপন করিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে তাহার সমবয়সী অনেক বালিকা ছিল। ধনীর গৃহে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, অনেক আত্মীয়কুটুম্ব—দরিদ্র—নন্দরাণীর গৃহে প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহাদের পুত্র-কন্যাদিতে সে বিশাল অট্টালিকা একরূপ পরিপূর্ণ। তাহাদের মধ্যে দাক্ষায়ণীর বয়সী অনেকেই তাহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতে আসিত। কিন্তু এই অল্পভাষিণী বালিকার কাছে তাহারা বয়সোচিত প্রগল্‌ভতার সামান্য মাত্রও প্রশ্রয় পাইত না।

"আমি বুঝিলাম, সে বাড়ীতে সে অসংখ্য লোকের মধ্যে আমাদের থাকা চলিবে না। সেখানে দিন চারি পাঁচ অবস্থানের পর আমি নন্দরাণীকে আমার মনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম।

"আমাদের অবস্থার ব্যাপার আমি এ পর্যান্ত নন্দরাণীকে খুলিয়া বলি নাই। পিতামহী ও দাক্ষায়ণীর বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করি নাই। দাক্ষায়ণীর অবস্থার কথা বুঝিবার লোক আমাদের দেশে সেই সময় হইতেই বিরল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং সে কথা তুলিয়া, বিশেষতঃ ধনীর নিকটে তাহার উত্থাপনে ফল নাই বুঝিয়া, আমি দাক্ষায়ণীর ইতিহাস নন্দরাণীর কাছে যথাসম্ভব গোপন করিয়াছিলাম।

"এখন দেখিলাম—না বলিলে আর চলে না। বিশেষতঃ ঠাকুরমা যখন একদিন মুখ ফুটিয়া আমার কাছে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, তখন অগত্যা নন্দরাণীর কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতে হইল।

"গন্তব্য স্থানের কোনও নির্দ্দেশ ছিল না বলিয়া, নন্দরাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমরা তাহার সঙ্গে নন্দীগ্রামে আসিয়াছি। দাক্ষায়ণীর গলার ঠাকুরটির উপর সব নির্ভর করিয়া পথে বাহির হইয়াছি। এইজন্য নন্দরাণীর সঙ্গে অতদূরে আসিতে আমরা দ্বিধা করি নাই।

"নন্দরাণীও বুঝিয়াছিল যে, কিছুদিন তাহার গৃহে অবস্থান করিয়া, আমরা আবার দেশে ফিরিয়া যাইব। সেই জন্য সে আমাদের স্বতন্ত্র বাসস্থানের প্রয়োজন বুঝে নাই। আমার সঙ্গিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা সম্বন্ধে যথাসম্ভব শুচিতা-রক্ষাই সে কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিল। যথাসম্ভব রক্ষাও করিয়াছিল। ঠাকুরমার রন্ধনাদি কার্য্যের সময়ে সে বাড়ীর মেয়েছেলেদের তাঁহার কাছে বড় আসিতে দিত না।

"যখন নন্দরাণী আমার কাছে ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর প্রকৃত ইতিহাস শুনিল, হুগলী হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনার পর ঘটনা যখন তাহার কাছে বিবৃত করিলাম, তখন সে কিয়ৎক্ষণের জন্য আমার সম্মুখে হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। মনে হইল, যেন সে আমার কথা উপলব্ধি করিতে পারিল না।

"আমি উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণের জন্য নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, সে যেন কি এক কঠোর চিন্তায় তন্ময় হইয়াছে। তাহার মুখশ্রী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্ণের উপর বর্ণ মাখিয়া চিন্তার ক্রম-পরিবর্ত্তিত ভাবতরঙ্গে যেন অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে!

"কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার তন্ময়তা ঘুচিয়াছে বুঝিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'রাণী! আমার এ ইতিহাস শুনিয়া কিছু কি বুঝিতে পারিলে?'

"চিন্তাশেষে দেখি, নন্দরাণীর অপাঙ্গে অশ্রু সঞ্চিত হইয়াছে। আমার প্রশ্নের প্রহারেই যেন সে অশ্রু গণ্ডে পতিত হইল। সত্য কথা বলিতে কি, এ অশ্রুপতনের কারণ, আমি তখন নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমি মনে করিলাম, দাক্ষায়ণীর কাহিনী শুনিয়া নারীর করুণ-হৃদয় হয়ত গলিয়া গিয়াছে। অশ্রুবিন্দু মমতাময়ী নারীর আর্ত্তের উদ্দেশে আকাশে নিক্ষিপ্ত চিরন্তন উপহার।

"আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে যাইতেছি, এমন সময় নন্দরাণী বলিয়া উঠিল—'দয়াদিদি! আমি ত বুঝি নাই। বুঝিতে পারিবও না। বুঝিবার অবস্থা গিয়াছে। তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ?'

"আমি একটু বিস্মিতের ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার কি মনে হয়?'

'কিছু মনে করিয়ো না। আমার মনে হয়, তুমিও বুঝিতে পার নাই?'

"আমি অতি উল্লাসে নন্দরাণীর হাত দু'টি সবলে জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম—'নন্দরাণী! ঠিক বলিয়াছ—আমিও বুঝিতে পারি নাই। তবে তোমার মুখে একথা শুনিয়া বুঝিলাম, বিধাতা তোমাকে যে রাণী করিয়াছেন,

তা ভুল করিয়া করেন নাই। তুমি রাণী হইবারই যোগ্য।'

"এ সুখ্যাতির বাক্য নন্দরাণীর যেন মনোমত হইল না। সে বলিল—'তবে কি জান দয়াদিদি, তোমার একদিন বুঝিবার উপায় আছে। আমার নাই।'

"আমি বলিলাম—'আমার যদি থাকে, তা হ'লে তোমারও আছে।'

"নন্দরাণী মাথা নাড়িল এবং বলিল—'ভগবান তোমার ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া, দয়া করিয়া তোমাকে সতীর সঙ্গদান করিয়াছেন। আমাকে ঐশ্বর্য্য দিয়া জন্মের মত বুঝিবার শক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন। যে সদ্বুদ্ধিতে দেবতা প্রত্যক্ষ হয়, ধনের অহঙ্কারে তাহা অনেককাল চাপা পড়িয়াছে।'

"নন্দরাণীর এ আক্ষেপটা আমার মর্ম্মবিদ্ধ করিল। এতটা আক্ষেপের কারণ ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহার ধনের যে একটা খুব গর্ব্ব জন্মিয়াছে, সেটা তাহার সঙ্গে দুই চারি দিনের সহবাসেই বুঝিয়াছিলাম। আমার ও ঠাকুরমার কাছে যথেষ্ট দীনতা প্রদর্শন স্বত্বেও বাড়ীর ভিতরে অন্যত্র অনেক বিষয়ে তাহার অহঙ্কারকে পূর্ণমাত্রায় ফুটিতে দেখিয়াছি।

"আমাকে ইহার মধ্যে সে একদিন তাহার জমীদারী পরিচালনা দেখাইয়াছে। তাহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ এখনও নাবালক। স্বামীর উইলের মর্ম্মানুসারে অছি-স্বরূপ তাহাকেই জমীদারীর কার্য্য করিতে হয়। তাহার স্বামী যে ঘরে বসিয়া প্রজাদিগের মামলা-মোকদ্দমা শুনিতেন, সেই সুন্দর সাজানো ঘরের একাংশে চিক দিয়া, তাহারই ভিতর হইতে নন্দরাণী স্বামীর ন্যায় বিচারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। একটা ঝি তাম্বুলের পাত্র লইয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। দুইটা ঝি অবিরাম পশ্চাৎ হইতে বাতাস করে। পরিধানে ফিনফিনে চন্দ্রকোনা-ধূতি। কিন্তু সৌষ্ঠবে তাহার কাছে সধবার পরিহিত শাড়ী হার-মানিয়া যায়। প্রজাদিগকে তাহার আদেশ শুনাইবার জন্য এবং প্রজাদিগের আবেদন তাহাকে শুনাইবার জন্য, চিকের বাহিরে একজন 'পেস্‌কার' দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু অন্তঃপুরিকার সরমঢাকা অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য প্রজা-দিগকে শুনাইবার জন্য পেস্‌কারের আর বড় প্রয়োজন হয় না। তাহারা বিনা আয়াসেই রাণী মুখ-নিঃসৃত বাক্য শুনিয়া ধন্য হইয়া থাকে।

"তাহার ধনের অহঙ্কার অনেকটা দেখিয়াছি। তথাপি তাহার আক্ষেপ ও তজ্জনিত অশ্রুজলের মর্ম্ম আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানি না, অপ্রয়োজনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করাও পাপ। সুতরাং নন্দরাণীর আক্ষেপের কারণ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে বলিলাম—রাণি!—

"কথা কহিতে না কহিতে নন্দরাণী বলিয়া উঠিল—'এখানে কেহ নাই। এবং আমার হুকুম ভিন্ন আর কেহ এখন এখানে আসিবে না। তুমি আমাকে নন্দরাণীই বল।'

"'কেন?—ভগবান যখন তোমাকে রাণী করিয়াছেন, তখন বলিতে বাধা কি?'

"'বাধা নাই। এবং কয়দিন তোমার মুখে 'নন্দরাণী' শুনিয়া—আমি বিরক্ত না হইলেও—আমার আত্মীয়কুটুম্ব ও দাসীগুলা বিরক্ত হইয়াছে।'

"'আমি তাহা জানি। এবং সেই জন্যই সাবধান হইয়াছি। দোষ তাহাদের নয়, দোষ আমার। ভগবান যাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন, তাকে মর্য্যাদা না দেখাইলে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হয়।'

"'তা হ'ক, তুমি আমাকে নন্দরাণী বল। শুধু এখন নয়, ইহার পরেও বলিবে। সকলের সুমুখে বলিবে। বালো যেরূপ ভালবাসার আগ্রহে তোমাদের দীন কর্ম্মচারীর কন্যাকে কখন নন্দরাণী, কখন নন্দ, কখন বা নন্দী বলিয়া ডাকিতে, এখনও তোমার যখন যেরূপ অভিরুচি, সেই নামে আমাকে সম্বোধন করিও।'

"আমি কেবল নন্দরাণীর মুখের পানে চাহিলাম।

"নন্দরাণী বলিতে লাগিল 'ঐশ্বর্য্যমদে এমন অন্ধ হইয়াছিলাম যে, আমি কে, কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়াছি, সব ভুলিয়াছিলাম। এক একবার বাপ-মায়ের জন্য আমার আক্ষেপ হইত। কিন্তু সে কিসের জন্য? তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে কন্যার ঐশ্বর্য্যটা দেখিতে পাইত। এই ঐশ্বর্য্য তাহারা দেখিতে পাইল না, বলিয়াই দুঃখ। কিন্তু তাহারা কি করিয়া যে জীবনবিসর্জ্জন দিয়াছে, সে বিষয় একদিনের জন্যও আমার ভাবিবার অবকাশ হয় নাই। তাহাদের শোচনীয় মৃত্যু-চিন্তায় আমার দুঃখ আসে নাই। আজ আমার পুত্রকন্যার সামান্য একটু মাথা ধরিলে, ডাক্তার

অষ্টপ্রহর আসিয়া তাহাদের তত্ত্ব লয়। কিন্তু আমার ভাই—'

"নন্দরাণীর চোখে এইবারে ধারা ছুটিল। আমি বুঝিলাম, ঐশ্বর্য্যমদ এতকাল ধরিয়া অতি যত্নে নন্দরাণীর বাল্যস্মৃতিগুলাকে আগুলিয়াছিল। কোনও ক্রমে তাহাদিগকে তাহার মনের কাছে আসিতে দেয় নাই। ব্রাহ্মণবালিকার পুণ্যকাহিনী আজ সেই দ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

"নন্দীগ্রামের রাণী, আবার আমাদের গ্রামের সেই মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা নন্দরাণী হইয়াছে।

"ক্ষণেক নীরবতায় আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া নন্দরাণী আবার বলিতে লাগিল—'আমার ভাই—আমার পিতার একমাত্র বংশধর। ডাক্তার ও ঔষধের অভাবে তাহার শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়াছি। সেই সঙ্গে তোমার পিতা ও তাঁহার পরিবারবর্গের মহত্বও দেখিয়াছি। আমার ভাইকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদের কি ব্যাকুলতা! আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে তোমার মা পুত্রবিয়োগিনীর মত মাটিতে পড়িয়া রোদন করিয়াছে!'

"আমি বাধা দিলাম। বলিলাম—'আর পূর্ব্বকথা তুলিয়োনা বোন্। ভগবানের কৃপায় উত্তরোত্তর তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তোমার পুত্রকন্যা সুস্থ, দীর্ঘজীবী ও সুখী হউক। ঐশ্বর্য্য ভগবান যখন দিয়াছেন, তখন তাহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তবে তাহার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। তোমাকে সেই সে কালের ছোট বোন্‌টির মত দেখিলেও তোমাকে রাণী বলিব। তাহাতে তুমি আপত্তি করিয়ো না।'

"'তা হইলে, এতকাল পরে যে সামান্য একটু আলোক এই অন্ধ চক্ষুতে ফুটিয়াছে, সেটি আবার নিবিয়া যাইবে।'

"'তাহা যাইবার যদি ভয় দেখাও, তাহা হইলে, যখন যেমন বুঝিব, সেই ভাবেই তোমাকে সম্বোধন করিব।'

"এই সময় নন্দরাণী আমাকে গোটাকতক মনের কথা খুলিয়া বলিল। সেই কথাশেষে বুঝিলাম, এই কয়দিন একত্র বাসের পর আজ প্রথম নন্দরাণীর সহিত আমার সেই বাল্যকালের সখীত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

"সখীত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাহাকে অনেকগুলা মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। বলিবার যোগ্য আর যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহা সময়ান্তরে একটা অবকাশে তাহাকে বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত রহিলাম।

"আসল কথা, কথোপকথনের শেষে সেদিন আমি ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর ভবিষ্যৎ স্থিতি সম্বন্ধে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। ইহার পর দুঃখে অনভ্যস্তা দু'টি ব্রাহ্মণকন্যাকে দু'টি উদরান্নের জন্য আর বোধ হয় ইতস্ততঃ ঘুরিতে হইবে না। 'বোধ হয়' বলিলাম কেন, নন্দীগ্রামে বাস কেবল ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর পছন্দের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহারা যদি বলে, সেখানে থাকিব না, তাহা হইলে আমার একান্ত অনিচ্ছা, অথবা নন্দরাণীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও, আমাকে নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে। তখন ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে আমার দৃষ্টি রাখিবার উপায় থাকিবে না।

"সেই একমাত্র পছন্দের অপেক্ষায় আমি একটিমাত্র মনের কথা—মনের আসল কথা সেদিন নন্দরাণীকে বলিতে পারিলাম না। সেটি তোমার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর পুনর্মিলন-সংঘটন।

"নন্দরাণীর অবস্থা দেখিয়া, এবং তাহাদের প্রতাপের কথা শুনিয়া, আমার আশা হইল, ইহাদের সাহায্যে, যে কোন উপায়েই হউক, আমি দাক্ষায়ণীর স্বামি-সম্মিলন ঘটাইতে সমর্থ হইব।

"আমার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে, বিধিপ্রেরিতা হইয়া আমরা তিনটি অসহায়া স্ত্রীলোক নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। নন্দীগ্রামে আনিয়া তিনি আমাদের সুখ অসম্পূর্ণ রাখিবেন না।

* * * *

"পরদিন প্রাতঃকালে নন্দরাণীর অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট একটি সুন্দর নির্জ্জন বাগান-বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম।

"সেখানে আমাদের সচ্ছন্দে অবস্থানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা হইল। আমাদের পরিচর্য্যার জন্য ঝি-চাকর নিযুক্ত হইল। ফটকে দরোয়ান বসিল। ললিতার স্বামী ব্রজমোহনের উপর আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল।"

বালক বিজয়কৃষ্ণ *

[শ্রীজলধর সেন]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

অনেক দিন হইতে মনে করিয়া আসিতেছি, 'মহাত্মা বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী'র পবিত্র জীবনকথা আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই লিপিবদ্ধ করিয়া লেখনী পবিত্র করিব, কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ শক্তি ও সামর্থ্যের অভাবে, এতদিনের মধ্যে লেখা ত দূরে থাকুক, যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলাম, তাহাও সংগৃহীত হইল না। এখন দেখিতেছি, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণসম্বন্ধে আমার ন্যায় জ্ঞানভক্তিহীন ব্যক্তির কিছু না লেখাই ভাল; কারণ, আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই পবিত্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত যে চারি-পাঁচখানি জীবনকথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রভুর জীবনের অনেক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে বিশেষ ভাবে একখানির পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই পুস্তকখানির নাম 'বালক বিজয়কৃষ্ণ'। এই পুস্তকের যিনি লেখক, তিনি এই পুস্তক লিখিতে সর্বাংশে অধিকারী; কারণ, প্রথমতঃ তিনি শান্তিপুরের গোস্বামীবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ভ্রাতু-স্পুত্রের পুত্র; তৃতীয়তঃ - এবং বলিতে গেলে এইটিই প্রধানতঃ—তিনি পরম ভক্তিমান। সুতরাং, গোস্বামি-প্রভুর বাল্যজীবনের কথা যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্তসীতানাথ গোস্বামী সুন্দরভাবে বলিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কারণ নাই।

শ্রীযুক্তগোস্বামি মহাশয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের বাল্য-জীবনসম্বন্ধে যেসমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু সৌভাগ্যক্রমে আমি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের মুখেই শুনিয়াছি। সেই কথাগুলি, এতকাল পরে, লিপিবদ্ধ দর্শন করিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল।

গোস্বামি মহাশয়, তাঁহার 'নিবেদনে', ঠিক কথাই বলিয়াছেন; ভবিষ্য জীবনের বর্ণগন্ধোচ্ছ্বসিত পূর্ণবিকাশের প্রথম কলিকাটুকু শৈশবেই সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে; সূর্য্যের মধ্যাহ্নদীপ্তির প্রথম আভাস বালারুণোদয়ের প্রথম রক্তিমচ্ছটাতেই প্রতিভাত হয়। আমরা এই পুস্তক হইতে কয়েকটি ঘটনা তুলিয়া, এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিব।

"প্রভুর বয়স তখন ছয় কি সাত বৎসর; সেই সময় আমাদের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আগমন করেন। স্নানান্তে সাধুকে সচন্দন তুলসী দ্বারা শালগ্রাম-শিলার পূজা করিতে দেখিয়া প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি পূজার সামগ্রী আনিতে ছুটিলেন। পরে ফুল ও পাতায় কোঁচড় ভরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সাধুকে আসিয়া বলিলেন—'ও সন্ন্যাসি! আমায় তোমার ঠাকুরটি

* শান্তিপুর হইতে শ্রীসীতানাথ গোস্বামী-প্রণীত, মূল্য বার আনা মাত্র

দাও না, আমিও তোমার মত পূজো কর্ব্বো,—দেখনা কত ভাল ভাল ফুল এনেছি?' এই বলিয়া বালক ঠাকুরকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, সকলেই 'সর্ব্বনাশ! কি করে, কি করে!' বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া, তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। বাধা পাইয়া, অভিমানে তিনি কান্না জুড়িয়া দিলেন ও ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বালককে না ভুলাইলেও নয়, দেখিয়া সাধু একখণ্ড প্রস্তর প্রদান করিয়া বলিলেন —'এই লও খোকা, দিব্বি ঠাকুর,ভাল করিয়া পূজা করিও।' ঠাকুর পাইয়া শিশুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শরতের মেঘ হইতে উজ্জ্বল চন্দ্রমা ফুটিয়া আকাশকে যেরূপ আলোকিত করিয়া দেয়, হঠাৎ রোরুদ্যমান শিশুমুখে হাসি বাহির হইয়া, তাহার সরল মুখ সেইরূপ আলোকিত করিয়া তুলিল। আমাদের প্রভুর পূজার বড় ঘটা লাগিয়া গেল। প্রভু প্রাতে উঠিয়া; ঠাকুরকে স্নান করাইয়া, সুগন্ধি-কুসুমে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। চন্দনচর্চ্চিত তুলসীদল, ঠাকুরের উপর রাখিয়া মনে যাহা আসিত, নিজের মধুর ভাষায় তাহাই বলিয়া ঠাকুরের পূজা করিতেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব পূজা দেখিয়া, সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত, পূজান্তে আহারীয় দ্রব্য আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে চক্ষুঃমুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখন কখনও নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিতেন, ঠাকুর আহার করেন কিনা। আহারান্তে ঠাকুরকে ফুলশয্যায় শয়ন করাইতেন, শয্যার চতুর্দ্দিকে সাধের পিক্‌দান, পানদান, আতরদান রক্ষিত হইত, প্রভু কোমল শিশুহস্তে ঠাকুরকে ব্যজন করিতেন। অচিরকাল মধ্যে বালকের সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল এবং প্রতিদিন আমার সোণার প্রভুকে দেখিবার জন্য বাটী লোকারণ্য হইতে লাগিল।"

"বাল্যকালে গোস্বামী-মহাশয় কয়েকবার জীবন-সংশয়কর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার মাতুলালয়ে শিকারপুরে অবস্থানকালে জননীর সহিত হাওলার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, জননী গাত্র-মার্জ্জনা করিয়া দিবার সময় বালক হস্তচ্যুত হইয়া যায়। বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়াও বালককে পাওয়া গেল না, মুহূর্ত্তমধ্যে এই দুঃসংবাদ গ্রামময় রাষ্ট হওয়ায়, ঘাটে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলের মুখেই হা-হুতাশ! জোয়ার্দ্দার মহাশয় কয়েকজন জালিক আনয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল, যেখানে বালকের অন্বেষণ হইতেছে, তাহার বিপরীত দিক হইতে জলরাশি ভেদ করিয়া কে যেন বালককে তুলিয়া ধরিল। বালকের মাথায় তখন দীর্ঘকেশ ছিল, জলের উপরিভাগে কেশ পরিদৃষ্ট হওয়ায় মাতা স্বর্ণময়ী ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালককে তুলিয়া আনিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বালক বহুক্ষণ জলমগ্ন হইয়া একটুও জল উদরসাৎ করে নাই।"

"একবার জননী ও অন্যান্য পরিজনসহ তাঁহারা উভয় সহোদর নৌকাযোগে রঙ্গপুরস্থ শিষ্যালয়ে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায়, ঝাউবনে নৌকা বাঁধিয়া রাত্রিযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে দস্যুদলকর্ত্তৃক তাঁহাদের নৌকা আক্রান্ত হয়। সকলেই শেষমুহূর্ত্ত মনে করিয়া ইষ্ট নাম জপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বালক বিজয় বলিয়া উঠিল—'কেও, দুলাল দাদা!' দস্যুদল চমকিয়া উঠিল। দস্যু-সর্দ্দার নৌকামধ্য হইতে পরিচিতকণ্ঠে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া, নিকটে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল! বিস্ময়বিজড়িত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কেও, দাদাগোস্বামী? এতরাত্রে এখানে নৌকা লাগাইয়াছেন? সঙ্গে কে?—মাঠাকুরাণী? এখনই ত সর্ব্বনাশ হইত! শ্যামসুন্দর রক্ষা করিয়াছেন।'

"বাল্যকালে এক চোর, অলঙ্কারের লোভে, তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া এক জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু বধ করিবার সঙ্কল্প করিবামাত্র তাহার হৃদয় বাৎসল্য-রসার্দ্র হইল। নিজকৃত দুষ্কৃতির জন্য তাহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়ায়, সে তাঁহাকে এক পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া চলিয়া গেল।"

"বিজয়ের শিশুজীবনের মধুরস্মৃতি আমাদের প্রাণে তাঁহার প্রতি অটল শ্রদ্ধার ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার চরিত্র মানবের ক্ষুদ্রতা ও অপূর্ণতার অনেক ঊর্দ্ধে বিরাজ করিত। কথাপ্রসঙ্গে একটা অনেক দিনের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। এক সময়ে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে শান্তিপুরে বহুযাত্রীর সমাগম হয়, সমাগত যাত্রীদের মধ্যে একটি বালক বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হওয়ায়, সহযাত্রিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পীড়িত বালকের মাতা, আশ্রয়হীন অবস্থায় পথপার্শ্বে মৃত্যু-

কবলগ্রস্ত সন্তানকে লইয়া কাঁদিতেছিলেন। রোগযন্ত্রণায় বালক ছটফট্ করিতেছিল। তাহার পিপাসায় জলপ্রদান করে, অথবা তাহার দিকে চাহিয়া 'আহা' বলে, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। বিজয় এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাড়াতাড়ি গ্রাম হইতে শিবিকা লইয়া, সেই বালককে আমাদিগের নাটামন্দিরে আনয়ন করিলেন। কয়েকদিনযাবৎ অবিরাম শুশ্রূষা ও যথারীতি ঔষধাদির ব্যবস্থা হওয়াতে বালক রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। বিদায়-কালে মাতা তাঁহার হাতখানি বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বিজয় সেই বালকের শীর্ণ, দুর্ব্বল হাত দুইখানি ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরা সকলে হাঁ করিয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। পরের জন্য এইরূপ করিয়া যে কাঁদিতে পারে, সে নিশ্চয়ই দেবতা। শতকার্য্যে আমরা বিজয়ের করুণার পরিচয় পাইয়াছি। বিজয়ের সংস্পর্শে অতি মলিন জীবনও পুণ্যময় হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, স্পর্শমণি লোহাকে সোণা করে, পাপ মলিন মনকে যে চিন্তামণি নিষ্পাপ উজ্জ্বল করিয়া তুলে, লোহাকে সোণাকরার স্পর্শমণি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। জীবনপথের শেষসীমায় উপস্থিত হইয়া এখনও কৈশোরের সেই কথা বিস্মৃত হই নাই।"

"বিজয়ের স্নিগ্ধ সদানন্দ মূর্ত্তি, স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত লোচনদ্বয় ও স্নেহপূর্ণ পবিত্র হৃদয়, ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রাণেও বিমল আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়া দিত। তার বাতাস গায়ে লাগিলে হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিত। একদিন রাম, বিজয় ও গ্রহপতিধর্ম্মাচার্য্য এই তিনজন আমার সহিত আমাদের নাটমন্দিরে কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, পান্থঘাসী নামক একটী লোকের বাটুলের দ্বারা আহত হইয়া, সম্মুখস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে একটী ঘুঘু পক্ষী ধরাশায়ী হইল। আহত পক্ষীটাকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া বিজয় সজল নয়নে আমাকে বলিল—'জয়গোপাল দা! কে এমন নিষ্ঠুর কার্য্য করিল?' তাহার প্রাণ এই নৃশংসদৃশ্য সহিতে না পারিয়া, পক্ষীটীকে বুকে লইয়া, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাম ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী 'চোর পুকুর' হইতে জল আনিয়া পক্ষীর মুখে ও গাত্রে প্রদান করিল। মরণোন্মুখ পক্ষী দুই একবার কণ্ঠনালী নড়াইয়া পক্ষিজন্ম শেষ করিল। মৃতপক্ষীহস্তে বিজয়কে কাঁদিতে দেখিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের চক্ষে জল আসিয়াছিল। তিনি সস্নেহে বালককে কোলে টানিয়া বহু চেষ্টায় তাহাকে শান্ত করিলেন। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া পান্থ, চিরদিনের মত শিকার ত্যাগ করিয়াছিল।"

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামি মহাশয়ের পুস্তক হইতে উপরিউক্ত প্রকার অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে
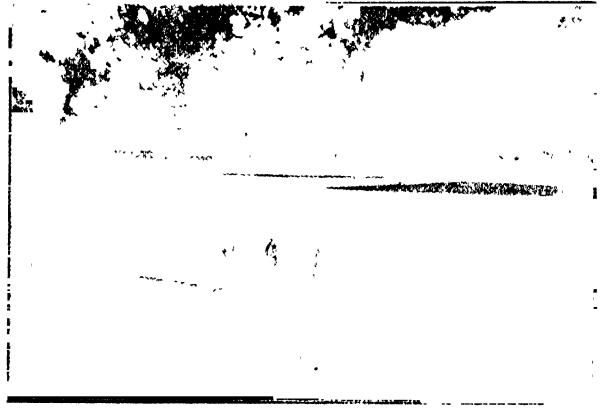
প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ

পারিত; কিন্তু যাহা উল্লেখিত হইল, তাহা হইতেই সকলে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বালক বিজয়কৃষ্ণ, পরে নানা ঘটনাপরম্পরার মধ্যদিয়া, কেমন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। আমরা বিজয়কৃষ্ণের চারিখানি জীবনচরিত পাঠ করিয়াছি; একখানি তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্রেয়-মহাশয়ের লিখিত; দ্বিতীয়খানির প্রণেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত, তৃতীয়খানি শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর মহাশয় লিখিয়াছেন; এবং চতুর্থখানি—'শ্রীশ্রী সদ্‌গুরুসঙ্গ' শ্রীযুক্তকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-লিখিত। শেষোক্তখানি উক্ত ব্রহ্মচারি মহাশয়ের এক বৎসরের (১২৯৮ সালের) ডায়ারি বা দৈনিক বৃত্তান্ত। এই কয়খানি গ্রন্থ হইতেই মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবনকথা অনেকটা জানিতে পারা যায়। 'অনেকটা' বলিবার অর্থ এই যে, আমার মনে হয়, এখনও উক্ত মহাত্মাসম্বন্ধে আরও বহুকথা অনেকে বলিতে পারেন, অনেকে জানেন।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনকথা পাঠ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে

যে, তাঁহার বাল্যজীবনের কথা বিশেষভাবে পাঠ করা কর্ত্তব্য, ইহাই সকলেই স্বীকার করিবেন। উপরিউক্ত গ্রন্থকয়েকখানিতে বাল্যজীবনসম্বন্ধে অনেক কথা থাকিলেও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামি-মহাশয়ের 'বালক বিজয়কৃষ্ণ' সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামি মহাশয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাহার পর, তিনি পরমভক্তিমান ব্যক্তি; সুতরাং, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

'বালক বিজয়কৃষ্ণে' আর একটা সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের সাময়িক মহাশয়গণের লিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণের বাল্য সহচর শ্রীযুক্তকৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী, তাঁহার সহাধ্যায়ী পরলোকগত পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী, গোস্বামি-মহাশয়ের অধ্যাপক শতায়ুর্বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য প্রভৃতির উক্তি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া, শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামি-মহাশয় গ্রন্থখানির মূল্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণসম্বন্ধে কত কথা বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ইচ্ছাতেই যদি কার্য্য হইত, তাহা হইলে এতদিন কত কার্য্য করিতে পারিতাম। জানি না, কবে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ.]

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

জীবে দয়া, নামেতে রুচি, দানে দারুণাসক্তি—
সকল শুভকার্য্যে নেতা, হৃদে অটুট ভক্তি।
ব্রতী যে তুমি—বিশ্বহিতে—লোকের হিতকর্ম্মে
দীক্ষিত যে—পরকে নিতি আপন-করা ধর্ম্মে।
করিয়া দেছ মুক্ত তুমি বাণীর মহামন্দির,
ভকতি-প্রীতি টানিয়া নেছ শত্রু-প্রতিদ্বন্দ্বীর।
বিনয়ে তুমি বেতসলতা, স্নেহের মহাসিন্ধু,
অটল তুমি সত্যপথে, চিরজীবন হিন্দু।
অতুল ধনগর্ব্বে যারা করিত সবে তুচ্ছ,
তুমি তাদের নামায়ে আনি' করিলে আরো উচ্চ
চূতমুকুল যবের শীষে সাজালে ঝাঁপি লক্ষ্মীর,
আঁধার নীড় ভাঙ্গিয়া দিলে ধন-পেচকপক্ষীর!
মরালযূথে আনিলে ডাকি পদ্মালয়ে হর্ষে,
সরল মধুর বচন তব অমিয়ধারা বর্ষে।
ভারতব্যাপি ধূপের মত ছড়াও পূতসৌরভ—
ধন্য তুমি, পুণ্য তুমি বঙ্গবাসীর গৌরব!

সম্রাট্ প্রথম-জেম্‌সের সম্মুখে নীত 'গায় ফক্স'

(শিল্পী—স্যর্ জন্ গিল্‌বর্ট, আর.এ)

আমার শিক্ষা

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ.]

মান্দালের সহিত আজন্মের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশে ফিরিতে হইল।

স্বদেশ! যে দেশ কখনও চক্ষে দেখি নাই, তাহার প্রতি কি কখনও আন্তরিক আকর্ষণ থাকে? যে দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ও লালিতপালিত হইয়া থাকি না কেন, আমি যখন বাঙ্গালীর সন্তান তখন, বাঙ্গালাই আমার স্বদেশ; কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র সম্প্রতি চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, কেতাবে যাহাই পড়িয়া থাকি, চাকরি সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের অন্যান্যপ্রদেশে বিদেশী মাত্র। বিবিধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি বটে; বিদেশে বাঙ্গালীর নাম খর্ব্ব হইতে দিব না, এই ইচ্ছা স্বতঃই অনুভব করি; এবং অভ্যাগত বাঙ্গালী সম্পূর্ণঅপরিচিত হইলেও কুটুম্বের অধিক যত্নে ও সমাদরে তাহার পরিচর্য্যা করিয়া তৃপ্তিলাভও করি; কিন্তু বর্ম্মা ছাড়িয়া বাঙ্গালায় যাইতে আনন্দিত হওয়া দূরে থাক, মনে হইতে লাগিল, যেন বনবাসে যাইতেছি!

এরূপ বিসদৃশ মনের অবস্থা হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরাজগবর্ণমেণ্ট বর্ম্মার অবশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া, এই দেশে দলে দলে কেরাণি পাঠাইতেছিলেন, সেই সময়ে আমার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের ফলে পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সামান্য বেতনে কমিসারিয়াটের কেরাণি হইয়া এদেশে আসেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে বর্ম্মী-ভাষা আয়ত্ত করিয়া মান্দালে কোর্টে উকিল হইয়া, নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দক্ষতা ও সাধুতার গুণে কয়েক বৎসরেই বিলক্ষণ অর্থ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম লাভ করেন। কি জানি কেন, যে শ্রেণীর বাঙ্গালী নিজের দেশে কোন প্রকার বিশিষ্টতার পরিচয় দেয় না, প্রবাসে সেই শ্রেণীর বাঙ্গালীর চরিত্রে বিবিধ গুণগ্রাম ফুটিয়া উঠে, সে পাঁচজনের একজন হইয়া উঠে। আমার পিতারও তাহাই হইল, ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাসৎকার্য্যে অগ্রণী হইলেন; তাঁহার অধ্যবসায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, পরোপকারিতা ও আতিথেয়তার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। উকিল হইবার কিছুদিন পরে, বন্ধুদিগের যত্নে রেঙ্গুণপ্রবাসী এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

আমার মাতার রেঙ্গুণেই জন্ম; সুতরাং স্বদেশের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। পিতা বর্ম্মায় আসিবার সময় মনের দুঃখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর কখনও দেশে ফিরিবেন না ও আত্মীয়স্বজনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। আমি বড় হইয়া অবধি, কলিকাতা দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেও, পিতামাতা একমাত্র সন্তানকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন না। এই সকল কারণে এপর্য্যন্ত স্বদেশের সহিত আমার পরিচয় হয় নাই।

আমি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবেমাত্র উকিলের ব্যবসারে প্রবিষ্ট হইয়াছি, আমার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্নেহময় পিতা এতদিন পরে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, স্বদেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি আমাদের অকূলে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। পিতা যেমন অজস্র উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই অকাতরে ব্যয়ও করিতেন। তিনি বরাবর বলিতেন— ছেলেরা বসিয়া খাইবে এই উদ্দেশ্যে অর্থসঞ্চয় করা পাপ;— পিতার কর্ত্তব্য, ছেলেদের যথাসাধ্য শিক্ষাদান করা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে প্রথমটা সাহায্য করা; তাহার পর, তাহারা নিজের ক্ষমতায় যাহা পারে করিবে। আমার অদৃষ্টক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতে না করিতেই তাঁহাকে হারাইলাম।

পিতা বর্ত্তমানে সংসারের কোন খবরই রাখিতাম না। শ্রাদ্ধাদির পর, শোকাবেগ কিছু প্রশমিত হইলে দেখিলাম যে, ব্যয়সংক্ষেপ না করিলে যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে,

শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবে; এবং ইহাও বুঝিলাম যে, আমি উপার্জ্জন না করিলে অধিকদিন চলিবে না। ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে যাইয়া দেখিলাম, বাহিরের ব্যয় কম করিলে পদে পদে পিতার নাম খর্ব্ব করা হয়, আবার নিজের আহার বা বসনভূষণের খরচ কমাইলে শোকাকুলা মা আমার অধীর হইয়া পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিলাম যে, মান্দালে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র না যাইলে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব।

মান্দালে ত্যাগ করিবার আরও যথেষ্ট কারণ ছিল। পিতা যে বিশেষ টাকাকড়ি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতি লোকের ব্যবহারও আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বের হিতৈষী বন্ধুগণ এখন প্রায় অপরিচিতের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। যাঁহাদের সাহায্যে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব আশা করিয়াছিলাম, তাঁহারা সাহায্যের পরিবর্ত্তে এসকল কার্য্যে যে সবুরের বিশেষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে জানিলাম যে, পিতার উচ্ছিষ্টে পরিপুষ্ট দুই একজন উকিল তাঁহার বড় বড় মক্কেলদিগের নিকট যাইয়া বুঝাইয়াছে যে, তাহারা পিতার নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া, তাঁহার কার্য্যের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে; সুতরাং আমার ন্যায় সদ্যঃকলেজপ্রত্যাগত অল্পবয়স্ক যুবককে মামলামকদ্দমার ভার না দিয়া তাহাদেরই দেওয়া উচিত। ইহার ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল, আমি নিয়মিতরূপে কোর্টে যাইয়া প্রত্যহই রিক্তহস্তে শুষ্কমুখে ও তিক্তহৃদয়ে ফিরিয়া আসিতাম।

মার নিকট এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও ব্যাপারটা তাঁহার চক্ষু এড়াইল না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"হীরু, তোর এই কষ্ট আমি আর দেখতে পারিনে। যেদিন আমার কপাল ভেঙ্গেছে, সেদিন থেকেই এ জায়গার উপর আমার বিষদৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পাছে তোর কোন ক্ষতি হয়, সেই ভয়ে এতদিন কিছু বলি নি। তোরই যখন কিছু হ'ল না, তখন আর বিদেশে পড়ে থেকে কি হবে? বাড়ীখানা বিক্রি করে—" বলিতে বলিতে মার শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার বড় সাধের বাড়ী—যাহা নির্ম্মাণ ও সজ্জিত করিতে সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল—সেই বাড়ী-বিক্রয়ের কথায় মার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

মার কথা শুনিয়া আমার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু সতীশের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। সতীশও উকিল, পিতার সাহায্যে একরকম পসার করিয়াছে, তবে অন্যের ন্যায় সে সেকথা ভুলিয়া যায় নাই। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য পিতা তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, বহুকালপূর্ব্বে তিনি Bengali Advocate নামে বর্ম্মাপ্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র-স্বরূপ এক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানা এখনও ধিকি ধিকি চলিতেছিল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিতা সতীশকে সেই সংবাদপত্রখানির ভার দিয়াছিলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে, সম্প্রতি আমিও সংবাদপত্রখানির পরিচালনে ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করিয়াছিলাম; সেই সূত্রে সতীশের সহিত আমার আলাপ ও ক্রমে বন্ধুত্ব হয়। আমাদের দুঃসময়ে সতীশই একমাত্র সহায় ছিল। তাহারই উৎসাহে আমি কয়মাস যুঝিয়াছি, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া সেও সম্প্রতি হতাশ হইয়া গিয়াছিল।

মার কথা সতীশকে বলিতে তাহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল; সে বলিল, "ভাই, এতদিন তোমার আশায় আশায় রেখেছি; কিন্তু এখন বুঝছি, তোমার এখানে বিশেষ কিছু হবার সম্ভাবনা নেই—মাঝে থেকে, তোমার বাবার নাম বজায় রাখতে গিয়ে তুমি মারা যাবে। আমার তো বোধ হয়, মা যা বলছেন, তাই ঠিক। তবে, একবার শেষ-চেষ্টা করে দেখব। কোর্ট থেকে একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছে, ওখানকার ইন্টারপ্রিটরের কাজ খালি আছে, মাইনে ২০০৲ থেকে ৩০০৲। একবার উঠে পড়ে লেগে দেখি, যদি কাজটা তোমার হয়।" সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমার জন্য সুপারিশের চেষ্টা করিল, Bengali Advocateএ লিখিল যে, পিতা পঁচিশ বৎসর ধরিয়া মান্দালের জনসাধারণের উপকার করিয়া গিয়াছেন, আমার বর্ম্মাতেই জন্ম, বরাবর এদেশে থাকিয়াই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বর্ম্মীভাষা সুন্দররূপে শিখিয়াছি; সুতরাং এ পদটি আমারই হওয়া উচিত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, যখন

আমাদের বংশের তিনপুরুষের বর্ম্মায় বাস নহে, তখন আমাদের domiciled বলা যায় না ; সুতরাং পদটি আমি পাইতে পারি না, উহা কোন খাঁটি বর্ম্মীকে দেওয়া যাইবে।

ইহার পর যত শীঘ্র সম্ভব বর্ম্মাত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম এবং মা ও সতীশের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, আমাদের মান্দালের বাড়ীখানি বিক্রয় হইলেই কলিকাতায় যাইয়া আলিপুরে প্র্যাক্‌টিশ আরম্ভ করিব। বাড়ীর দর উচিত মূল্যের অর্দ্ধেকও উঠিল না। সতীশের অনেক চেষ্টার ফলে, একজন মাড়োয়ারি বত্রিশ হাজার টাকায় বাড়ীখানা কিনিয়া লইল।

সতীশ না থাকিলে কি করিতাম জানি না। কলিকাতায় আমার পরিচিত কেহ না থাকায় সতীশ তাহার একজন আত্মীয়কে লিখিয়া আমার জন্য ভবানীপুর অঞ্চলে ৫০৲ টাকা ভাড়ায় একখানা বাড়ী ঠিক করিল। সেই আত্মীয়টিকে এবং তাহার কলিকাতার বন্ধুবর্গকে আমার পরিচয় দিয়া সানুবন্ধ অনুরোধ করিল, যেন তাঁহারা সর্ব্বদা আমার তত্ত্ব লন এবং যাহাতে আমার কাজকর্ম্মের সুবিধা হয়, সেই চেষ্টা করেন। যাহাতে আলিপুরে আমার শীঘ্র প্র্যাক্‌টিস্ হয়, সে উদ্দেশ্যে সতীশ আর একটি ফন্দি করিয়াছিল। তাহার কথা পরে বলিতেছি।

অবশেষে মান্দালে ত্যাগ করিবার দিন উপস্থিত হইল। সে দিন সকাল হইতে মা আমার বাবার ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিলেন ; আমি যখন তাঁহার হাত ধরিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম, তখন মনে হইতেছিল, বুঝি বুক ফাটিয়া যায়। পাছে মা অধীর হন, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ অনেক কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু গাড়ীখানা মোড়ের কাছে আসিতে যখন মা বলিয়া উঠিলেন, "ওরে একবার দাঁড়াতে বল—জন্মের মত বাড়ীখানা একবার দেখে নি"—তখন আর থাকিতে পারিলাম না, মার কোলে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম।

ষ্টেশনে সতীশ ছিল, অশ্রুসিক্ত চক্ষে আমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। ট্রেন ছাড়িবার সময় তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—"ভাই, তোমার ঋণ কখনও শুধতে পারব না"—বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠরোধ হইল, তাহাকে কত কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। কোথায় অনিশ্চিতের মধ্যে যাইতেছি, ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে! ছয় মাস পূর্ব্বে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম যে, এই ভাবে মান্দালে ত্যাগ করিতে হইবে! কি করিলে মার মনে একটু শান্তি আসে, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে শেষকালে অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে হাতে একখানা সংবাদপত্র ছিল, সেখানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। সেখানা Bengali Advocate, ট্রেণ ছাড়িবার সময় সতীশ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিল। কাগজখানার উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছি, একস্থানে নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া দেখিয়া, মনঃসংযোগ করিয়া পড়িতে লাগিলাম। সে অংশটুকুর অনুবাদ এই :—

"আজ আমাদের প্রিয়তম বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ রায় মান্দালে পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতেছেন। তিনি বর্ম্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও বিখ্যাত উকিল ৺নবীনকৃষ্ণ রায়ের এক মাত্র পুত্র। শ্রদ্ধেয় নবীনকৃষ্ণের পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ; কারণ, বর্ম্মাতে তাঁহার নাম জানে না, এরূপ কোন বাঙ্গালী নাই, এবং তাহা ছাড়া কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম। হীরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি ইহারই মধ্যে পিতার ন্যায় নানাসদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছেন এবং এই বয়সেই সংবাদপত্র পরিচালনের ন্যায় গুরুতর কার্য্য বৎসরাধিক কাল অতি নিপুণভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সকল প্রকার সৎকার্য্যে তাঁহার এরূপ উৎসাহ যে, পিতার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও পাছে সৎকার্য্যে বাধা পড়ে, সেই ভয়ে বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন যুবকের পক্ষে মান্দালের ন্যায় ক্ষুদ্রস্থান উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে বলিয়াই তিনি কলিকাতায় যাইতেছেন ; আলিপুরে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়া, পরে হাইকোর্টে প্রবেশ করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি আপাততঃ ভবানীপুরে ২৩৬নং বকুলবাগান রোডে অবস্থান করিবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, হীরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সফল হউক, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুন।"

ইহা পড়িয়া সতীশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার উপর একটু বিরক্তও হইলাম; কারণ, ইহার অধিকাংশই অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ। আবার এই অংশটুকুর পার্শ্বে সতীশ পেন্সিলে লিখিয়াছে—"এই সংবাদ যাহাতে কলিকাতার খানকতক খবরের কাগজে বাহির হয় তাহার বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি।" কলিকাতায় পৌছিবার কয়েকদিন পরে দেখিলাম, কয়েকখানি সংবাদপত্র সত্য সত্যই আমার সম্বন্ধে প্যারাগ্রাফটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছে।

(২)

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে যেরূপ ভয় ও ভাবনা হইয়াছিল এখানে আসিয়া কিছুদিনের মধ্যেই সে ভাবনা কাটিয়া গেল। সতীশের আত্মীয়টি ও বন্ধুগণের অনুগ্রহে কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই এবং নিজেকেও নিতান্ত অসহায় মনে হইত না।

এদিকে একরূপ নিশ্চিন্ত আছি বটে কিন্তু কাজকর্ম্মের সুবিধার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। প্রায় তিন মাস হইল আলিপুরে বাহির হইতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটাও মোকদ্দমা পাইলাম না, অথচ খরচ যথেষ্ট হইতেছে - দেখিয়া সময় সময় অশান্তি বোধ করি। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হওয়ায় ইচ্ছা থাকিলেও সামান্য খরচে সংসার চালাইতে পারি না। বৈঠকখানা সাজাইতে কয়েকশত টাকা ব্যয় হইয়াছে; চাকরদাসী ছাড়া একজন দরোয়ান ও একজন খানসামা রাখিতে হইয়াছে; আমার মত পসারহীন অন্য উকিলদের মত শেয়ারের গাড়িতে কোর্টে যাইতে পারি না—সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়িতে যাতায়াত করি, তাহা ছাড়া একজন মুহুরি রাখিতে হইয়াছে। হুহু করিয়া সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হইতেছে অথচ এক পয়সা উপার্জ্জন নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলে, আমার আলাপী জুনিয়র উকিলেরা নিজেদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া, আমাকে ব্যস্তবাগীশ বলিয়া ঠাট্টা করে। তাহাদের কেহ একবৎসরের অধিক আদালতে হাঁটাহাঁটি করিয়াও, এপর্য্যন্ত একটা টাকাও রোজগার করিতে পারে নাই, কেহ বা নয় মাসের মধ্যে একটা কমিশনের কৃপায় মাত্র চার টাকা পাইয়াছে, আবার কেহ দুই বৎসরে গড়ে তের টাকা করিয়া মাসে উপার্জ্জন করিয়াছে। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আজকাল প্রায়ই মনে করি, একটা সুবিধামত চাকরি পাইলে লাগিয়া যাই এবং সকালে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ আসিলে প্রথমেই তাহার বিজ্ঞাপনস্তম্ভ তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, যদি কোন চাকরির সন্ধান পাই।

সতীশ যে উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইবার কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। উহা যে কাহারও চক্ষে পড়ে নাই তাহা বলিতে পারি না; কারণ, আমি কলিকাতায় আসিয়া বসিতে না বসিতে, কন্যাদায়গ্রস্ত নানা-অবস্থার ভদ্রলোকেরা আসিয়া বিবাহের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা প্রলোভন দেখান এবং যাঁহারা সঙ্গতিহীন, তাঁহারা করুণভাবে নিজেদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, খবরের কাগজে আমার উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া বড় আশায় আমার নিকট আসিয়াছেন, ইত্যাদি। মহাগুরুনিপাতের বৎসরে বিবাহ অসম্ভব—শুনিয়া অনেকেই চলিয়া যান; কিন্তু কেহ কেহ তাহাতেও ছাড়েন না— অশৌচান্তে বিবাহের সম্মতির জন্য জেদ করেন; অনেক কষ্টে তাঁহাদের নিরস্ত করিতে হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে, বৈঠকখানায় ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া, বেশ আরামে একখানা নভেল পড়িতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, দরোয়ান কাহার সহিত বচসা করিতেছে। সে বলিল "বাবু আভি শুতল্ হ্যায়, আপ্‌কো কেয়া কাম হ্যায় বাংলাইয়ে না।"

মোটা গলায় রুক্ষস্বরে কে বলিল—"কেয়া কাম হ্যায় সে বাবুকো বাংলায়েঙ্গে, তোম খবর দেওগে ইয়া নেহি?" তাহার সতেজ কথাবার্ত্তায় দরোয়ান নরম হইয়া একটু বিনীতভাবেই বলিল—"হামারা কসুর নেহি হ্যায় বাবুজি। আদালৎকা কুছ কাম রহনেসে বাবুকো খবর দেনে শক্তা হ্যায়।" সে ব্যক্তি অসহিষ্ণুভাবে বলিল—"হাঁ হাঁ ওহি কাম হ্যায়, বাবুকো কহো।"

আমি স্পষ্টই বুঝিলাম, এ ব্যক্তি দালাল বা প্রার্থী নহে, এবং ইহাও মনে হইল, সে ধরণের লোক রাত্রিকালে আসে না। তাড়াতাড়ি ফরাস হইতে উঠিয়া একখানা চেয়ারে যাইয়া বসিলাম এবং একখণ্ড 'এলাহাবাদ ল রিপোর্ট' লইয়া লাল-নীল-পেন্সিল-হস্তে মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলাম।

দরোয়ান খবর দিতে আসিলে, আগন্তুক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া, আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া, স্মিতমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতেই আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম—মুখের হাসি মিলাইয়া গেল এবং মনের মধ্যে একটা নৈরাশ্যের ভাব খেলিয়া গেল। তাহার সাজসজ্জা দেখিয়া বুঝিলাম, সে মক্কেল হইলেও, তাহার নিকট আশা করিবার বিশেষ কিছু নাই।

আগন্তুককের পরিধানে একখানা মলিন কোরা কাপড়, হাটুর নীচে নামে নাই; গায়ে পুরাতন ও জীর্ণ একটা কাল রঙ্গের কোট, তাহার পাঁচটা বোতাম পাঁচ রকমের এবং সেলাই খুলিয়া যাওয়ায় পকেটের কিয়দংশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে; হ্যারিসন রোডের ফুটপাথে উপবিষ্ট পুরাতনকাপড়ওয়ালাদের নিকট যেরূপ কম্ফর্টার দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ একটা কম্ফর্টার উড়ানির পরিবর্ত্তে গলায় ঝোলান; এবং ধূলি-ধূসরিত পদদ্বয়ে পেনেলার জুতা,—তাহা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকট ছিঁড়িয়া যাওয়ায় আঙ্গুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এই লোকটা দরোয়ানের সহিত লাটসাহেবের মত চোটপাট করিতেছিল! লোকটা আবার হাত বাড়াইয়া, আমার সহিত শেকহাণ্ড্ করিতে আসিল! আস্পর্দ্ধা কম নয়! মুহূর্ত্তে আমার মন তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল; আমি বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি চান আপনি?"

"বসতে অনুমতি করলে, বোধ হয়, মশায়ের খুব বেশি মানের লাঘব হবে না"—বলিয়া আগন্তুক জুতা খুলিয়া, সেই ধূলাপায়ে ফরাসের উপর দিয়া যাইয়া, অম্লানবদনে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল—"আঃ, একটু তামাকের হুকুম করুন।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। দরোয়ানের সহিত তাহার কথাবার্ত্তার ধরণ শুনিয়া, লোকটার সম্বন্ধে আমার মনে একটা ধারণা হইয়াছিল, এবং তাহার কাপড়চোপড় সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের দেখিয়াই, বোধ হয়, আমার নজর প্রথমটা তাহার সাজসজ্জার দিকেই ছিল—মানুষটাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে অবসর ছিল না। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, লোকটার পোষাকের সহিত চেহারার সামঞ্জস্য নাই, শরীর দারিদ্র্যসূচক নহে, বেশ পরিপুষ্ট ও সবল। আরও দেখিলাম, তাহার চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল; কিন্তু অস্থির ও দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ;—মনে হয়, যেন অন্তস্থল ভেদ করিতেছে।

আমি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার পরিচয় জানিতে পারি কি?"

"পরিচয় দেবার সময় হলেই পরিচয় দেব, হীরেন্দ্র বাবু, সে জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

লোকটা যেই হউক, তাহার লম্বা লম্বা কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল; বলিলাম—"এক রকম জোর করেই, আমার বিনা অনুমতিতে, ঘরে ঢুকে বেশ আরাম করে বসে, আমার সময় নষ্ট করছেন; অথচ নিজের পরিচয় দেবেন না—এ মন্দ কথা নয়! এখন কি জন্যে এসেছেন, চট্‌পট্ করে বলে ফেলুন; আমার যথেষ্ট কাজ আছে।"

"আপনার যে কত কাজ, তা ভাল করে না জান্‌লে আপনার কাছে আসতুম না। রাগ করবেন না, হীরেন্দ্র বাবু; আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যে সত্য কথাই বলছি, তা আপনি মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পারছেন।—এখন কাজের কথা বলা যাক্। আমি, আর আমার দুজন বন্ধু, একটি গুরুতর কাজে ব্রতী হয়েছি; কি কাজ, তার সঙ্গে আপনার কি সংশ্রব, অথবা আপনাকে সে সম্বন্ধে কি করতে হবে, এ সব কথা এখন বল্‌তে পারব না। আপাতত আপনাকে সামান্য একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে; আমার উপর বিশ্বাস করে, সে প্রতিজ্ঞাটি করতে পারেন—ভালই; না হলে, আমাকে অন্যত্র যেতে হবে।"

লোকটি যেরূপ সহজভাবে ও গম্ভীরমুখে এই কথাগুলি বলিল, তাহাতে আমার একটু কৌতূহল হইল বটে; কিন্তু নিতান্ত দৈন্যদশাগ্রস্ত লোকের মুখে এই ধরণের কথা এরূপ বিসদৃশ শুনাইল, যে আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"আপনি যে ডিটেক্টিভ্ গল্পের পত্তন করলেন্ দেখ্‌ছি। এগুপ্ত রহস্যের মূলে কি কিছু আছে মশাই!—আকাশে খুন, না পিশাচী বেদৌরা, না বৈঠকখানায় বুজরুকি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, লোকটি বলিল—"ঠাট্টা করবেন্ না, হীরেন্দ্র বাবু। আমি আগেই আপনাকে বলেছি, যে-কাজের

সূত্রে আপনার কাছে এসেছি, সেটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা আপনিই ভেবে দেখুন দেখি, আপনি কি রকম প্রস্তাব করছেন! একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক এসে যদি আপনাকে একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কাজের সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞা করতে বলে, তা হলে আপনি কি বলেন?"

"আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারিনি। কাজটার সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলতে পারব না বটে কিন্তু আপনাকে কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তা বলছি। আজ রাত্রে ঘণ্টা-দু-একের জন্যে আমার সঙ্গে কোন জায়গায় যাবেন, সেখানে সেই কাজ সম্বন্ধে সমস্ত জানতে পারবেন, আর সে বিষয়ে আপনাকে কি ভার নিতে হবে, তাও শুনতে পাবেন। সে ভার নিতে আপনি রাজি না হন, কোন ক্ষতি নেই। এখন কেবল এইটুকু প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হল, সে কথা কাউকে বলবেন না; আর যে কাজের কথা আপনাকে বলা হবে, তার ভার নিতে যদি রাজি না হন, তাহলে ব্যাপারটা আপনি একেবারে ভুলে যাবেন। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে বলছি, যেখানে যেতে বলছি, সেখানে গেলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না; আর এ কথাও বলছি আমরা যে কাজে হাত দিয়েছি, সেটা কোন হীন বা গর্হিত কাজ নয়, তাতে লজ্জিত হবারও কিছু নেই।"

আমার মন বিলক্ষণ নরম হইয়া আসিল; বলিলাম—"ধরুন আপনাদের কাজের ভার নিলুম; তাতে আমার লাভ কি হবে?"

"লাভালাভের কথা সেখানে গেলেই শুনতে পাবেন।"

"আপনি যে প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন, তা না হয় করলুম; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা যে আমি রক্ষা করব, তা কি করে জানলেন?"

"নবীনকৃষ্ণ রায়ের সন্তান কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনাদের যে কোন দুরভিসন্ধি নেই তা কি করে জানব?"

"কি দুরভিসন্ধি থাকতে পারে, নিজেই মনে করে দেখুন না। আপনি কিছু গয়নাগাঁটি পরে যাবেন না; মনে ভয় হয়, একটা পয়সাও সঙ্গে নেবেন না; আপনার সব চেয়ে পুরাণ ছেঁড়া যে পোষাক তাই পরে যাবেন। আর আপনাকে ধরে রেখে যে বলব, এত হাজার টাকা দাও, তবে ছেড়ে দেব, সেসব দিন যে বহুকাল চলে গেছে, তা বোধ হয় আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

আমি শেষ প্রশ্ন করিলাম—"সব স্বীকার করলুম, কিন্তু আপনার কথায় বিশ্বাস করে, এই রাত্রিকালে কষ্ট করে, একটা অবিশ্বাস্য অসম্ভব ব্যাপারের উপলক্ষে অজানা জায়গায় কেন যাব? আপনি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত—কেবল তাই নয়, আপনার এমন কিছু নেই, যাতে করে আপনার উপর সামান্য বিশ্বাসও হতে পারে।" ইহা বলিয়া তাহার সাজসজ্জার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলাম।

লোকটি তাকিয়া ছাড়িয়া বসিয়া বলিল "ওঃ! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। আপনি যে মানুষের উপরটাই দেখেন, যাকে পরমহংসদেব "খোসাটা" বলতেন, তাই দেখে লোকের মূল্য ঠিক করেন, তা বুঝতে পারি নি। আপনার কথা যে রকম শুনেছি, তাতে মনে করেছিলুম, আপনার অন্তর্দৃষ্টি আছে; কিন্তু এখন দেখছি, আমার ধারণা ভুল। যা হোক, আপনি যে রকম প্রমাণ চান, তাই দিচ্ছি এই নিন"—বলিয়া ভদ্রলোকটি পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল, তাহার কতগুলা ফরাসের উপর পড়িল, কতক মেঝেয়, কতক টেবিলের উপর, দু একখানা পাপোসের উপর এবং এক খানা পিক্‌দানির মধ্যে পড়িল। টেবিলের উপর যে কয়খানা কগজ পড়িয়াছিল, তাহা কুড়াইয়া লইয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম—সব কয়খানা হাজার টাকার নোট!

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"এই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিদেবটি কে?" কিছু পরে সযত্নে সব কয়খানা নোট কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম—অধিকাংশই হাজার টাকার, খানকতক পাঁচশো ও একশো টাকার মোট এগার হাজার ছয়শো টাকার নোট।

নোটের তাড়াটি ভদ্রলোকের নিকট ফিরাইয়া দিতে গেলে, তিনি হাত নাড়িয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"আপনাকে নিয়ে যাবার মূলে যে আমার কোন খারাপ মৎলব নেই, তার জামিন-স্বরূপ ওগুলো আপনার কাছে রেখে দিন।"

আমি বলিলাম—"আমি তো পাগল হইনি, শেষকালে এই নিয়ে আমার হাতে দড়ি পড়ুক!"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন—"এখনও সন্দেহ? উঃ উকিলের কি মন! চোর ছ্যাঁচড়দের সঙ্গে কারবার করে, উকিলদেরও মনের গতি তাদের মত হয়ে যায়। চোর-ডাকাতেরা কি রকম সন্দিগ্ধচিত্ত তা জানেন তো?

"Suspicion always haunts the guilty mind,
The thief doth fear each bush an Officer."

ভদ্রলোকটি অতি সুন্দরভাবে এই দুই ছত্র আবৃত্তি করিলেন! নোটের তাড়া দেখিয়া আমার মনে যে সন্দেহের ছায়া অবশিষ্ট ছিল, সেক্স্‌পিয়ার হইতে এই কোটেশনে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিলাম—"নোটের কোন দরকার নেই, আপনার কথায় আর আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।"

কিছুমাত্র আহ্লাদ বা সন্তুষ্টির ভাব না দেখাইয়া ভদ্রলোক অতি পরিষ্কার ইংরাজিতে বলিলেন, "Right; but think over it again and if there is the slightest doubt or hesitation in your mind, I wouldn't advise you to come". (বেশ; কিন্তু এ বিষয়ে আপনি আবার ভাবিয়া দেখুন, যদি আপনার মনে একটুও সন্দেহ বা ইতঃস্ততের ভাব থাকে তা হলে আমি আপনাকে আসিতে বলি না।)

আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম যে, আমি যখন কথা দিয়াছি তখন আর পিছাইব না। তখন তিনি স্থির করিলেন, আমি রাত্রি এগারটার সময় বৃজিতলার মোড়ে উপস্থিত থাকিব; তিনি সেখান হইতে আমাকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবেন।

ভদ্রলোকটি বিদায়গ্রহণ করিলে, আমি বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। এই ভদ্রলোকটি এবং তাঁহার উল্লিখিত বন্ধু দুইটি কে? এরূপ কি কার্য্য হইতে পারে,যাহার জন্য তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এত ব্যগ্র অথচ যাহা অতীব গোপনীয়? আমাকেই বা ইঁহাদের কি প্রয়োজন? একবার চকিতের ন্যায় মনে হইল ইহারা 'এনার্কিষ্ট' নয়তো। এই কথা মনে হইতেই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল; কিন্তু আবার তখনই মনে হইল ভদ্রলোকটি বলিয়াছেন যে, কার্য্যটি কোন রূপ দূষণীয় নহে। এ সকল প্রশ্নের কোনরকম সন্তোষজনক জবাব মনে আসিল না, কৌতুহলের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম এবং দশটা না বাজিতে বাজিতেই একগাছা মোটা লাঠি হস্তে বাহির হইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য, যতদূর সম্ভব সামান্য কাপড়-চোপড় পরিয়াছিলাম, ঘড়িটা পর্য্যন্ত সঙ্গে লই নাই; সম্বলের মধ্যে ট্রাম ভাড়ার জন্য ছয় আনা পয়সা পকেটে ছিল।

এগারটার অনেক পূর্ব্বে বৃজিতলার মোড়ে পৌছিলাম সুতরাং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। পায়চারি করিতে করিতে দেখিলাম নিকটস্থ থানা হইতে একজন পাহারাওয়ালা আমার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম; মনে হইতে লাগিল নিশ্চয়ই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; এখনও কেহ যখন আসিল না, তখন ব্যাপারটা সমস্তই ভূয়া। ইতিমধ্যে পাহারাওয়ালা একবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, আমি কেন পায়চারি করিতেছি।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া বাড়ি ফিরিব ফিরিব মনে করিতেছি এমন সময় একখানা মোটরগাড়ি আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল,--আরোহী ডাকিলেন "হীরেন্দ্র বাবু!" গাড়ির ভিতর গ্যাসের আলো পড়ায় চিনিলাম সেই ভদ্রলোকটিই বটে,কিন্তু এখন বেশভূষার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! গায়ে বুটিদার সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিনের পাঞ্জাবী, তাহার উপর জরির পাড়ওয়ালা সিল্কের চাদর, পরিধানে ঢাকাই ফুলপাড় ধুতি, গলায় মোটা গার্ড চেন, পায়ে পম্প্‌ জুতা; আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে আঙ্গুলে তিন চারিটি হীরার আংটি গ্যাসের আলোতে ঝলমল করিয়া উঠিল।

আমি গাড়িতে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিতেই গাড়ি ধর্ম্মতলার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন "আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন তো হীরেন্দ্র বাবু! সময়ের মূল্য আপনি জানেন দেখে বড় খুসী হলুম। আপনি চুরট খান?" বলিয়া রূপার সিগার-কেস্‌ খুলিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমি বলিলাম "Thanks, আমি চুরট খাই না।"

"বেশ বেশ এই রকম অনাসক্ত লোকই আমরা চাই।" বলিয়া তিনি একটা ছোট কৌটা হইতে মোমের দিয়াশালাই বাহির করিয়া সশব্দে জালিয়া একটা চুরুট ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরাইলেন; আমি সেই

সুযোগে দেখিলাম তাঁহার হাতের আঙ্গটিগুলিতে বড় বড় হীরা ও পান্না বসান।

ফুৎকারে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি বলিলেন "আপনাকে সবরকমে বাজিয়ে দেখলুম, আপনি খাঁটি মানুষ বটে। আমার তো আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে এখন সাতকড়ি আর নকড়ি বাবুর পছন্দ হলেই হয়।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "আপনাদের ভিতর সাতকড়িও আছেন আবার নকড়িও আছেন? বেশ মিলেছে তো।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন "ও আমাদের নিজেদের তৈরি নাম। এ ব্যাপারের মূলে আমরা তিন বন্ধু আছি, তা আগেই বলেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের তিনজনেরই কিছু কিছু সংস্থান আছে, অর্থাৎ আপনারা যাকে বড়লোক বলেন আমরা তাই। তবে তিনজনেরই টাকাকড়ি সমান নয়, যথেষ্ট তারতম্য আছে; আমরা সেই হিসাবেই নিজেদের নাম রেখেছি। যার টাকাকড়ি সব চেয়ে বেশি তাঁর নাম নকড়ি, যাঁর তার চেয়ে কম তাঁর নাম সাতকড়ি, আর আমিই তিনজনের ভিতর সব চেয়ে গরিব, তাই আমার নাম ছকড়ি। আপনি আমাকে এই নামেই ডাকবেন।"

ও বাবা! ইনি যদি সর্ব্বাপেক্ষা গরিব হন, তাহা হইলে না জানি সাতকড়ি বাবু ও নকড়ি বাবু কি রকম! এই তিনজন ধনীর কি করিয়া যোগাযোগ হইল তাহা জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হওয়ায় ছকড়ি বাবুকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এবিষয়ে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না।

ছকড়ি বাবু বলিলেন "মোটামুটি বলতে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আপনার মনে আছে তো যে, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন বা না দিন, কোন কথা কাউকে না বলতে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?"

আমি "খুব আছে" বলিলে তিনি কহিলেন "আমাদের তিনজনের যোগাযোগ খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। আসল কথা কি জানেন হীরেন্দ্র বাবু, যখন ভগবানের কোন বিষয়ে একটা উদ্দেশ্য থাকে, তখন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে যে যোগাযোগ দরকার, তা আপনিই ঘটে যায়। নকড়ি বাবু একজন বিখ্যাত কারবারি লোক, লক্ষ্মীর বরপুত্র; সাতকড়ি বাবু একজন স্বনামধন্য এটর্ণি গভর্ণমেণ্টে খুব খাতির। এঁদের তুলনায় আমি অতি সামান্য লোক; ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়াটে একটু মোটা মাইনের চাকরি করি মাত্র, নকড়ি ও সাতকড়ি বাবুর সঙ্গে কার্য্যসূত্রেই আলাপ। আমার এমন অর্থবল নাই, যাতে এঁদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগ দিই; কিন্তু বছর দুই আগে ডার্বি সুইপে কিছু টাকা পেয়েছিলুম; সেই পুঁজির জোরেই এঁদের সঙ্গে এ কাজে যোগ দিতে পেরেছি। আমার থাকবার মধ্যে একটা মেয়ে"—বলিতে বলিতে তাঁহার গলাটা ধরিয়া আসিল—"তা যা মাইনে পাই, তা থেকেই তার একটা হিল্লে করে দিতে পারব। মাঝ থেকে ভগবান কতকগুলো টাকা পাইয়ে দিলেন, তার কতকটা না হয় সৎকাজেই খরচ করি।"

নকড়ি বাবু ও সাতকড়ি বাবুর মত ধনী লোকের সহিত একত্র কার্য্য করিব, ইহা সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। আনন্দে আমার মন নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু ক্ষণেক পরেই আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আমার এমন কি গুণ আছে যাহা দেখিয়া ইঁহারা সকলেই আমাকে মনোনীত করিবেন। ছকড়ি বাবু না হয় আমার পক্ষে আছেন; কিন্তু সাতকড়ি ও নকড়ি বাবু যে আমাকে পছন্দ করবেন তার স্থিরতা কি?

আমার আশঙ্কার কথা শুনিয়া ছকড়ি বাবু বলিলেন "আমি যখন পছন্দ করেছি, তখন সাতকড়ি বাবু বোধ হয় অমত করবেন না, কিন্তু নকড়ি বাবুর সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। তিনি লোক খুব ভাল কিন্তু একটু ছিট আছে। এদিকে সৎকাজে মুক্তহস্ত অথচ ভারি দৃষ্টিকৃপণ।"

ইহার পর কথাবার্ত্তা মন্দীভূত হইয়া আসিল। কোথায় যাইতেছি এতক্ষণ সে বিষয়ে আমার হুঁস ছিল না এবং বাহিরে তাকাইয়াও দেখি নাই; কিন্তু মনে হইল যেন আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া দুই ধারে ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ির মধ্যস্থিত রাস্তা দিয়া আসিয়াছি। এখন জানালা দিয়া দেখিলাম একটা প্রশস্ত রাস্তা দিয়া গাড়িখানা নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়াছে, রাস্তায় ট্রামের থাম ও তার রহিয়াছে। একটা মোড় পার হইলাম; তাহার মধ্যস্থলে তিন চারিটা ডালওয়ালা একটা গ্যাসের থাম লক্ষ্য করিলাম এবং মিনিট খানেক পরেই বোধ হইল, একটা ছোট পুলের উপর দিয়া গেলাম। এই সময় ছকড়ি বাবু "মাপ করবেন" বলিয়া জানালার পরদা টানিয়া দিলেন। আরও সাত-আট মিনিট পরে

ক্ষণেকের জন্য গাড়ি থামিল ; একটা গেট খোলার শব্দ পাইলাম। আরও কিছুদূর যাইয়া গাড়ি আবার থামিল, গাড়ির দরজা খুলিয়া গেল এবং "আসুন হীরেন্দ্র বাবু" বলিয়া ছকড়ি বাবু নামিয়া পড়িলেন।

আমরা নামিলাম একটা গাড়ি বারান্দায়। সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই লালরঙ্গের সৈনিকবেশধারী, কর্ণসংযুক্ত শ্বেতশ্মশ্রু, প্রশস্ত বক্ষে তিন চারিটা পদক বিলম্বিত একজন শিখ দরোয়ান টুল হইতে উঠিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। পার্শ্বের দিকে একটা বারান্দা দিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ছকড়ি বাবু অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ঘরটি আফিসঘর বলিয়া বোধ হইল। গৃহসজ্জায় বিশেষত্ব কিছুই নাই। ঘরের মধ্যস্থলে বনাতমোড়া একটা টেবিল তাহার উপর লিখিবার সরঞ্জাম ও কাগজপত্র রহিয়াছে ; টেবিলের চারিদিকে খানকতক চেয়ার, মোটা মোটা বইভরা একটা বুক কেস্ ও টেবিলের ঊর্দ্ধে একটা ঝাড়ে কয়েকটা বাতি জ্বলিতেছে। এই সকল দেখিতেছি এমন সময় দরজার পরদা সরাইয়া ছকড়ি বাবু ও তাঁহার পশ্চাতে সাহেবী পরিচ্ছদধারী একজন প্রৌঢ় এবং চোগাচাপকান-পরিহিত একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন।

ছকড়ি বাবু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "সাতকড়ি বাবু, ইনিই হীরেন্দ্র বাবু।" সাহেবীপোষাক-পরিহিত ভদ্রলোকটি অগ্রসর হইয়া হাস্যমুখে আমার সহিত শেকহ্যাণ্ড্ করিতে করিতে বলিলেন "So glad to see you. We have been anxiously waiting for you. We bid you a warm welcome my young friend"! (আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমরা আপনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম। যুবক বন্ধু, আপনাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।) এই কয়টি কথার সরল ভঙ্গি ও অমায়িক ভাবে আমাকে বড়ই আকৃষ্ট করিল।

চোগাচাপকান পরিহিত তৃতীয় ভদ্রলোকটি একটু পশ্চাতের দিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; তাঁহার দিকে ফিরিয়া সাতকড়ি বাবু বলিলেন "আসুন নকড়ি বাবু, হীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করুন।" নকড়ি বাবু কোন কথা না বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। লোকটিকে আমার আদৌ ভাল লাগিল না, তাঁহার মুখে যেন একপোঁচ বিরক্তি মাখান।

সকলে চেয়ারে উপবেশন করিলে সাতকড়ি বাবু বলিলেন "ছকড়ি বাবুর এঁকে পছন্দ হয়েছে, তাই নিয়ে এসেছেন ; এঁকে দেখে আমারও পছন্দ হয়েছে ; এখন নকড়ি বাবু মত দিলেই হয়। কি বলেন নকড়ি বাবু, তা হলে কাজের কথা আরম্ভ করি ?" নকড়ি বাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলে সাতকড়ি বাবু বলিতে লাগিলেন :—

"আর দিনকতক পরেই কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট চিরকালের জন্য উঠে যাবে। বাবুদের দল দায়ে পড়ে যাই বলুন, এর ফলে যে বাঙ্গালীদের ভয়ানক ক্ষতি হবে, তার কোন সন্দেহ নাই। যে ডেসপ্যাচে দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে যাবার কথা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীর কাছে প্রস্তাব করেছেন, তাতে তাঁরা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কলকাতায় থাকার জন্যে বাঙ্গালীদের political influence—ওর নাম কি, রাজনৈতিক প্রভাবের অন্যায় রকম বৃদ্ধি হয়েছে। আমাদের এই influence ভারতের অন্য জাতিদের পক্ষে খারাপ হলেও আমাদের পক্ষে একটা অমূল্য লাভ। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট দিল্লীতে গেলে আমাদের এই অমূল্য রত্নটুকু কর্পূরের মত উড়ে যাবে। আমাদের সকলের উচিত সেইটা যাতে না হয়, সে সম্বন্ধে প্রাণপণে চেষ্টা করা। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাঙ্গালীদের একখানা ভাল খবরের কাগজ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করা। এটার যে খুব দরকার তা মুসলমান-সমাজের নেতারা বুঝতে পেরে তাঁদের Comrade কাগজ দিল্লীতে তুলে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করেছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের কেউ এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। আপনি বুঝতে পারছেন, এই কাজটি যার দ্বারা সম্পন্ন হবে, সে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মহৎ উপকার করবে। কিন্তু কাজটা তো বড় সোজা নয় ; যা তা একখানা কাগজ বার করলে হবে না ; তাতে আরও খারাপ হবে। বাঙ্গালীর নাম রাখতে পারে, এমন কাগজ হওয়া দরকার ; একেবারে up-to-date হবে ; কাগজ ছাপা first class হবে ; ইণ্ডিয়ার সমস্ত বড় জায়গায়, এসিয়ার বড় বড় সহরে, আর লণ্ডনে রীতিমত correspondent থাকবে ; নির্ভীক স্বাধীন মত প্রকাশ

করতে হবে, অথচ গভর্ণমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে যাবে না; and above all মোটা মাইনের সাহেব রিপোর্টার পাঁচ সাত জন রাখতে হবে; আর editing staff উপযুক্ত অভিজ্ঞ লোক নিয়ে তৈয়ারি করতে হবে; ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে ছোকরা গ্রাজুয়েট এডিটার রাখলে চলবে না।"

আমি বলিলাম "আমাদের পক্ষে ওরকম উঁচুদরের কাগজ বা'র করবার ইচ্ছা নিতান্তই দুরাশা। ওরকম কাগজ বা'র করতে গেলে অগাধ টাকার দরকার। তত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?"

সাতকড়ি বাবু বলিলেন "সেই কথাই হচ্ছে। দিল্লীতে বাঙ্গালীদের একখানা কাগজ বা'র করবার জন্যে নকড়ি বাবু, ছকড়ি বাবু, আর আমি এই তিন জনে মিলে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করতে রাজি আছি। দুঃখের বিষয় আমরা তিন জন এ কাজে প্রকাশ্যভাবে হাত দিতে পারব না। খালি তাই নয়, কাগজখানার সঙ্গে যে আমাদের কোন সম্বন্ধ আছে তা আমরা চারজন ছাড়া জনপ্রাণীও যেন না জানতে পারে।"

আমি বলিলাম "এত লুকোচুরির কারণ তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"কারণ না থাকলে কি আর সখ করে লুকোচুরি করছি? কথাটা কি জানেন? ছকড়ি বাবু অনেক গোপন খবর এনে দেবেন, যে সব sensational খবর পেলে বড় বড় কাগজওয়ালারাও দু হাত তুলে নাচতে থাকে; সে রকম খবর আমরা প্রায়ই বা'র করব; এতেই আমরা অন্য সব কাগজের উপর টেক্কা দেব। এরকম খবর দু একটা বেরুলেই মহাসোরগোল পড়ে যাবে কাজেই ছকড়ি বাবুর সঙ্গে কাগজখানার সংশ্রব লুকিয়ে রাখতে হবে। আমার আর নকড়ি বাবুর সঙ্গে ছকড়ি বাবুর খুব দহরম-মহরম, তা অনেকেই জানে, সুতরাং আমাদেরও কাগজ-খানার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলে চলবে না। এই জন্যই আমরা এত সাবধানে চলছি; লুকিয়ে ছদ্মনাম নিয়ে এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েছি; আর এ সমস্ত কথা গোপন রাখতে আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছি।"

সাতকড়ি বাবু বলিতে লাগিলেন, "এখন এ কাজের ভার কার উপর দেওয়া যায়, তাই আমাদের মহাসমস্যার বিষয় এতটা টাকা বিশ্বাস করে অন্যের হাতে ছেড়ে দিতেই হবে। যে নিজে ধনী, তাকেই এত টাকা দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে সুতরাং যার উপর এ কাজের ভার দেব সে ধনী হবে; তাকে অন্য সমস্ত কাজ ফেলে এই ব্যাপারে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে; আর চিরকাল দিল্লীতে থাকতে হবে। তার নিজের পরিশ্রম করবার এবং অন্য লোককে খাটাবার ক্ষমতা থাকা চাই; সে উচ্চশিক্ষিত হবে, আর খবরের কাগজ চালানসম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা থাকবে। এতগুলি গুণ একত্র পাওয়া বড় শক্ত। অনেক খোঁজ করে যে দু একটি উপযুক্ত লোকের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তাঁরা যে এ ব্যাপারের ভার নেবেন সে আশা নেই। শেষকালে খবরের কাগজে আপনার কথা পড়ে আমাদের বড় মনে লাগল; আমরা ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে জানলুম খবরের কাগজে আপনার যে বিবরণ বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। ছকড়ি বাবুর মানুষ চেনবার আর লোক বশ করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। তাই তাঁকে পাঠিয়েছিলুম; আপনাকে পরখ করে যদি উপযুক্ত মনে করেন তা হলে চুপি চুপি এখানে নিয়ে আসতে; যদি আপনি সহজে না আসতে চান তা হলে কৌশল করে আনতে। আপনাকে আমাদের মৎলবের যে কথা বল্লুম, তাতেই বুঝতে পারছেন এ ব্যাপারটির সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর দিতে চাই। এরকম একখানা খবরের কাগজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হওয়া কত গৌরবের বিষয়, তা আর আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনার পারিশ্রমিক স্বরূপ মাসে পাঁচশো টাকা—"

নকড়ি বাবু বলিয়া উঠিলেন "আমি আপনাদের চারশো টাকার কথা বলেছিলুম, আবার একশো বাড়ান হল কেন?"

ছকড়ি বাবু বলিলেন "পাঁচশো টাকা অতিরিক্ত নয়। কোন সাহেবি কাগজের ম্যানেজার বা এডিটারের মাইনে পাঁচশোর কম নয়। আমরা যখন অন্য সব বাবদে সাহেবি কাগজের মত খরচ করছি, তখন এই একটি বিষয়ে টানাটানি করে' কি হবে? পাঁচশো টাকার কম দিলে হীরেন্দ্র বাবুর প্রতি অবিচার করা হয়।"

আমি বলিলাম "না না, এর জন্যে আপনাদের কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই, চারশো টাকাতেই আমার চলে যাবে।"

"এক পয়সাও না নিয়ে আপনার চলতে পারে সন্দে

আমাদের কাগজের ম্যানেজিং এডিটারের উপযুক্ত মাহিনা নয়। নকড়ি বাবু আপনি আর এতে অমত করবেন না।"

নকড়ি বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সাতকড়ি বাবু বলিতে লাগিলেন "হীরেন্দ্র বাবু, তা হলে আপনি কা'ল থেকেই লেগে যান। বারণ কোম্পানি কি জেসপ্ কোম্পানীর সঙ্গে দেখা ক'রে বিলেত থেকে লিনোটাইপ আর রোটারি মেশিন আনবার অর্ডার দিন; বলে দেবেন যেন করাচিতে ship করে; এঞ্জিন বোধ হয় বরণ কোম্পানিরাই দিতে পারবে, জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানির সঙ্গে দেখা ক'রে বিলেত থেকে একেবারে এক বছরের মত কাগজ আনাবার বন্দোবস্ত করবেন. পাইওনিয়রের সাইজের আট পাতা কাগজ হবে, কিন্তু পাইওনিয়রের মত glazed কাগজ হলে হবে না, ষ্টেট্‌সম্যান কি ডেলিনিউসের মত rough surface চাই। এ সবের জন্যে ওরা বোধ হয় কিছু কিছু বায়না চাইবে; সে জন্যে কা'ল আপনাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া যাবে। তাতেই বোধ হয় আপাততঃ চলে যাবে, তার পর যেমন যেমন দরকার হবে টাকা পাবেন। বিলেত থেকে মালগুলা এসে পড়লে বাকি সমস্ত টাকাটা পাবেন। হিসেবপত্র রাখা ও চিঠিপত্র লেখার জন্যে কা'ল পরশু থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে একজন কেরাণি রাখুন। ছকড়ি বাবু আফিসের কাজে দুই চার দিনের মধ্যে দিল্লি যাবেন। তিনি এলে সকলে পরামর্শ করে কি রকম staff রাখা হবে সেটা ঠিক করে ফেলা যাবে।"

আমি। রয়টার আর এসোসিয়েটেড্ প্রেসের টেলিগ্রাম নিশ্চয়ই নেওয়া হবে, ইণ্ডিয়ান নিউস্ এজেন্সিরও নেওয়া হবে কি? আর দেশী বিদেশী করেস্‌পণ্ডেন্টের কি বন্দোবস্ত হবে?

সাতকড়ি বাবু। র‍্যাট্‌ক্লিফ্ সাহেব বিলেতের করেস্পণ্ডেন্ট হবেন, আর কলম্বোতে চিদাম্বরম্ চেটি বলে একজন বড় ব্যারিষ্টার সিলোনের করেস্পণ্ডেন্ট হবেন, তা আমি ঠিক করেছি। চায়না জাপান আর পার্সিয়ার খবরের বন্দোবস্ত করতে আপনি রস্তমজির সঙ্গে দেখা করবেন, ঐ সব দেশে ওদের কারবার আছে কিনা। রস্তমজি আমাদের নকড়ি বাবুর বুজম্ ফ্রেণ্ড; নকড়ি বাবুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাবেন। আর ইণ্ডিয়ার ভিতর যেখানে যেখানে করেস্পণ্ডেন্টের দরকার, তার ভার আমি নিলুম।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "কাগজের নাম কি হবে, ঠিক করেছেন কি?"

সাতকড়ি ও ছকড়ি বাবু সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "Bengal Times"

ছকড়ি বাবু বলিলেন "আমাদের কাগজের মূল policy কি হবে, তা এর পরে আপনাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দেব। আর একটা কথা; আমাদের আসল নাম আপনাকে বলতে আর কোন আপত্তি নেই বটে, কিন্তু আপাততঃ বলবার কোন দরকারও নেই। আপনাকে যে অবিশ্বাস করছি তা নয়, কেবল সাবধানের হিসাবেই নাম বলছি না। যদি পরে দরকার হয়, তা হলে অবশ্যই আমাদের নাম জানতে পারবেন, তখন আমরা নাম জানতে দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবো না। ইতিমধ্যে আমাদের কোন কথা জানবার দরকার হলে নকড়ি গুপ্ত, সাতকড়ি গুপ্ত কি ছকড়ি গুপ্তের নামে জেনারেল পোষ্ট আফিসের কেয়ারে চিঠি লিখবেন। তা হলে কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে রইল, কাল বেলা ২টার সময় আপনার বাসায় গিয়ে টাকা দিয়ে আসব। এখন ওঠা যাক, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে।"

ছকড়ি বাবু ও আমি উঠিয়া পড়িলাম; সাতকড়ি বাবু উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নকড়ি বাবু তাঁহার বাহু ধরিয়া বসাইয়া নিম্নস্বরে তাঁহাকে কি বলিতে লাগিলেন! সাতকড়ি বাবু সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "না না, দরকার কি?" নকড়ি বাবু আবার কি বলিতে লাগিলেন।

শেষে সাতকড়ি বাবু বলিলেন "শুনুন ছকড়ি বাবু, নকড়ি বাবু আবার কি বলছেন। উনি বলছেন যে সমস্ত ভারই হীরেন্দ্র বাবুর উপর থাকবে, তবে নকড়ি বাবু সুবিধামত মাঝে মাঝে গিয়ে হিসেবপত্র দেখে আসবেন। আমার কিন্তু মনে হয় এতে আমাদের সঙ্গে কাগজখানার সম্পর্ক জানাজানি হয়ে যেতে পারে।"

নকড়ি বাবু। যাতে জানজানি না হয় সে রকম ভাবেই আমি চলব। হাজার হউক হীরেন্দ্র বাবু ছেলেমানুষ—

আমি। সে তো নিশ্চয়। আপনি যদি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে শুনে আসেন, তা হলে আমি সৌভাগ্য মনে করব।

সাতকড়ি বাবু। নকড়ি বাবু আর একটা কথা বলছেন। উনি বলছেন, হীরেন্দ্র বাবুর হাতে আমরা এত টাকা ছেড়ে দিচ্ছি, ওঁর কাছে কিছু জামিন নেওয়া উচিত।

ছকড়ি বাবু আরক্ত মুখে বলিয়া উঠিলেন "Preposterous! আমি এর ভিতর নেই, আপনারা যা ইচ্ছে করুন।"

সাতকড়ি বাবু অসহায়ভাবে একবার ছকড়ি বাবুর দিকে একবার নকড়ি বাবুর দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

নকড়ি বাবু ধীরভাবে বলিলেন "Business is business. হীরেন্দ্র বাবু যদি আমার নিজের ছেলে হতেন, তা হলেও তাঁর কাছে জামিন চাইতুম্।"

সাতকড়ি বাবু। কত টাকার জামিন নিতে চান আপনি? দশ হাজার, বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, এর বেশি তো নয়? এদিকে আমরা যে ওঁর কাছে পাঁচ লাখ টাকা ছেড়ে দিচ্ছি। এ রকম জামিন নিয়ে ফল কি?

নকড়ি বাবু। সদাগরি আফিসে যে কেশিয়ারদের কাছ থেকে জামিন নেয়, কেশিয়ারকে যত টাকা ঘাটতে হয় তত টাকারই কি জামিন নেয়? শতকরা দশ, পনর কি কুড়ি টাকা হিসাবে নেয়, আবার তেমন বিশ্বাসী লোক হলে তার চেয়ে কমও নেয়। আমরা এঁর কাছে নামমাত্র জামিন নিচ্ছি বৈ তো নয়, এঁকে পনর হাজার টাকার বেশি দিতে হবে না। কেমন, এতে তো আপনাদের কোন আপত্তি নেই?

ছকড়ি বাবু। অবশ্য পনর হাজার টাকা একটা কিছুই নয়, কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। জামিনের কথা যখন আগে ওঠেনি, আর এঁকে আনবার সময় যখন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি, তখন কি করে ওঁকে জামিনের কথা বলা যেতে পারে?

নকড়ি বাবু। বেশ, আপনারা যখন জামিন নিতে চাইছেন না, তখন নেবেন না। কিন্তু যে ব্যাপারের গোড়াতেই গলদ্ সে ব্যাপারের সঙ্গে আমি কোন সংশ্রব রাখতে চাই না।

ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া আমি বলিলাম "এর জন্যে আর এত গোলমাল কেন? আমি আহ্লাদের সহিত জামিন দেব।"

ছকড়ি বাবু নকড়ি বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "জামিন তো নেবেন, কিন্তু টাকার রসিদে আর সিকিউরিটি বণ্ডে তো নকড়ি কি সাতকড়ি নাম চলবে না, আসল নাম দিতে হবে, তার কি?" একটা কঠিন সমস্যার কথা বলিয়াছেন, এই ভাবে ছকড়ি বাবু মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

নকড়ি বাবু। ওসব কথা না ভেবেই কি জামিনের কথা তুলেছি? টাকাটা সাতকড়ি বাবুর Firmএর নামে নেওয়া হবে, বণ্ড সাতকড়ি বাবু নিজে তৈরি করবেন, আর সাতকড়ি বাবুর Firm টাকাকড়ি সংঘটিত কোন কাজে হীরেন্দ্র বাবুকে বাহাল করেছেন বলে জামিন নেওয়া হচ্ছে, এই মর্ম্মে বণ্ড তৈরি হবে। দলিলখানাতে খবরের কাগজের কোন উল্লেখ না থাকলেই হল। এতে হীরেন্দ্র বাবু সাতকড়ি বাবুর নাম জানতে পারবেন। তা যখন দরকার, তখন জানলে ক্ষতি নেই।"

কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সাতকড়ি ও ছকড়ি বাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, স্থির হইল আগামী কল্য যে সময় ছকড়ি বাবু আমাকে টাকা দিতে যাইবেন সে সময় জামিন ও তৎসংক্রান্ত দলিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা খবর দিয়া আসিবেন। নকড়ি ও সাতকড়ি বাবুর সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি ছকড়ি বাবুর সঙ্গে মোটরে যাইয়া উঠিলাম।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে ছকড়ি বাবু হঠাৎ নিজের দুই হাতের মধ্যে আমার হাতখানা লইয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন "আমায় মাপ করুন হীরেন্দ্র বাবু! এমন হবে জানলে আমি কখনও আপনাকে আনতুম না, অন্ততঃ আপনাকে জামিনের কথা বলে আনতুম।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "এর জন্যে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন, বুঝতে পারছি না! খালি জামিনের কথা কেন, আপনি তো আমার বাসায় কোন কথাই আমাকে বলেন নি। আর জামিনের কথাটা এমন কোন অন্যায় কথা নয়, যার জন্যে আপনাকে মাপ চাইতে হবে।"

"না হীরেন্দ্র বাবু, আমার মনে হচ্ছে আপনি কায়দায় পড়ে জামিন দিতে রাজি হয়েছেন। আমি যদি ঘুণাক্ষরে জানতুম যে নকড়ি বাবু ওকথা তুলবেন, তা হলে আপনার বাসাতেই সে কথার আভাস দিতুম। যা হোক, আমি আপনাকে এই নতুন সর্ত্ত থেকে অব্যাহতি দেব। জামিনের টাকাটা আমিই দিয়ে দেব, ওরা জানবে আপনিই দিলেন।

আমি বলিলাম "সে কি কথা? আপনি কেন টাকা দেবেন আর আমিই বা নেব কেন? টাকাকড়ি সংক্রান্ত চাক

করতে গেলেই জামিন দিতে হয়, আমি সেই হিসাবে দিচ্ছি। আপনি কেন এর জন্যে নিজেকে দায়ী করছেন ?"

ছকড়ি বাবু ছাড়িবেন না, আমিও শুনিব না ; অনেক বাদানুবাদের পর তবে তিনি নিরস্ত হইলেন। এতক্ষণ অন্য দিকে মনোযোগ দিবার অবসর ছিল না ; তাহার পর নানা চিন্তায় মন নিবিষ্ট থাকায় কোন্ রাস্তা দিয়া যাইতেছি, সে দিকে খেয়াল ছিল না এবং আমরা যে বাড়িতে গিয়াছিলাম সেটা কাহার বা কোথায়, সে সম্বন্ধে ছকড়ি বাবুকে প্রশ্ন করিবার কথাও মনে হয় নাই। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, আমরা চৌরঙ্গি ও রসা রোড দিয়া বাসায় ফিরিলাম। আমাকে বাসার সম্মুখে নামাইয়া দিয়া, ছকড়ি বাবু মোটর লইয়া চলিয়া গেলেন।

(৪)

পরদিন, বেলা ২টার কিছু পরে, একখানা প্রথম-শ্রেণীর ফিটনে ছকড়ি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলাম।

খানসামাকে তামাক দিতে বলিলে ছকড়ি বাবু বলিলেন, "থাক্ হীরেন্দ্র বাবু, আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আজ সকালবেলা আফিস থেকে চিঠি পেলুম, আজই আমাকে দিল্লীতে যেতে হবে ; আমার গোছগাছ কিছু হয় নি ; তাড়াতাড়ি এই কাজ চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরব। এই নিন্ আপনার টাকা"—বলিয়া একতাড়া নোট আমার হাতে দিলেন।

গণিয়া দেখিলাম, একশো টাকার দুইশত কেতা নোট। ছকড়ি বাবু বলিলেন, "বিশ হাজার টাকা পেলেন তো ? এখন একখানা রসিদ লিখে দিন, না হ'লে নকড়ি বাবু আবার হাঙ্গাম বাঁধাবেন—Fussy old Jew !"

রসিদ লিখিয়া দিতে যাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার কাছে টাকা পেলুম লিখব ?"

ছকড়ি বাবু কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ এটর্ণির নাম করিলেন ; বুঝিলাম ইনিই সাতকড়ি বাবু। গত রাত্রিতে ছকড়ি বাবুর মুখে সাতকড়ি বাবুর বিবরণ শুনিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক।

রসিদ লইয়া ছকড়ি বাবু বলিলেন, "জামিনের ব্যাপারটাও আজই চুকিয়ে ফেলা দরকার। কাল নকড়ি বাবু, সাতকড়ি বাবুকে বলে দিয়েছিলেন আগে আপনার কাছে থেকে জামিন নিয়ে, তবে যেন আপনাকে টাকা দেওয়া হয়। তার একথা আমরা গ্রাহ্য করতুম না, ধীরে সুস্থে জামিনের বন্দোবস্ত করতুম ; কিন্তু আজই যখন আমাকে দিল্লীতে যেতে হচ্ছে, আর কবে ফিরব তার ঠিক নেই, তখন এ বিষয়টা একেবারে মিটিয়ে যাওয়াই ভাল। সকালে আফিসের চিঠি পেয়েই সাতকড়ি বাবুকে বলে পাঠিয়েছিলুম, বণ্ডখানা আর জামিনের টাকাটার জন্যে একখানা রসিদ তৈরি করে রাখতে। এই নিন্, পড়ে দেখুন।"

পড়িয়া দেখিলাম, দস্তুরমত ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা বণ্ড্ এবং সাতকড়ি বাবুর প্রকৃত নাম ও ঠিকানাছাপা চিঠির কাগজে টাইপকরা ও সাতকড়ি বাবুর দ্বারা সইকরা পনর হাজার টাকার রসিদ। দলিলখানায় সই করিয়া দিলাম, প্রতিবেশীরা সকলেই নিজ নিজ আফিস-কাছারি চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, পাড়ার একজন মুদি ও আমার মুহুরীকে সাক্ষী করিতে হইল।

রসিদখানা আমার হস্তে দিয়া এবং দলিলখানা পকেটে লইয়া, ছকড়ি বাবু উঠিয়া পড়িলেন,—দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাঃ, জামিনের টাকা নিলেন না ?"

ছকড়ি বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নাঃ, আপনার সঙ্গে পারবার যো নেই। আমি মৎলব করেছিলুম, যদি টাকার কথাটা আপনার মনে না হয়, তা হলে আমি নিজেই টাকাটা দিয়ে দেব। তা আপনি যখন নাছোড়বান্দা, তখন আর কি করব ? দিন্, টাকাকড়ি কি দেবেন নিন্।"

আমি তখন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর পনর হাজার টাকার একখানা চেক্ লিখিয়া দিলাম। তাহা লইয়া ছকড়ি বাবু প্রস্থান করিলেন।

সেদিন আর কোন কাজকর্ম্ম করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। পরদিন আহারাদি করিয়া সাতকড়ি বাবুর উপদেশমত প্রেসের সরঞ্জাম ইত্যাদি অর্ডার দিতে বাহির হইলাম। ছকড়ি বাবুর প্রদত্ত সমস্ত টাকা সঙ্গে লইলাম ; বায়নার জন্য যাহা দরকার হয় দিব, বাকি টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিব।

কিছু খুচরা টাকার দরকার হইতে পারে ভাবিয়া, খান দুই তিন নোট ভাঙ্গাইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে কারেন্সি আফিসে উপস্থিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে কখনও কারেন্সি আফিসের ভিতরে যাই নাই। হলে প্রবেশ করিয়া,

একজন মাড়োয়ারিকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার নির্দ্দেশানুসারে একজন কেরাণির নিকট তিনখানা একশো টাকার নোট দিয়া, দশ টাকার নোট ও কিছু টাকা চাহিলাম। সে আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলায়, আমি কৌতূহলের সহিত সেস্থানের লোকের জনতা ও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে রাশিরাশি গিনি ও টাকা ওজন করা দেখিতেছি, এমন সময় একজন সার্জেণ্ট আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল "I arrest you." (আমি তোমাকে গ্রেপ্তার কর্‌চি)।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, আমি সার্জেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্ষণেক পরে, সে দৃঢ়স্বরে ইংরাজিতে বলিল, "আমার সহিত এস"। ইহাতে আমার চমক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, কি অপরাধে গ্রেপ্তার হইলাম জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় জ্ঞান হইল প্রশস্ত হলটি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং হলের যাবৎ লোক একদৃষ্টে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তখন, আর বাক্যব্যয় না করিয়া, সার্জেণ্টের সহিত চলিলাম। লক্ষ্য করিলাম—আমার পশ্চাতে দুইজন পাহারাওয়ালা দাড়াইয়া ছিল, তাহারাও পিছনে পিছনে চলিল।

একটা ঘরে উপস্থিত হইলে, চেয়ারে উপবিষ্ট একজন সাহেব আমার নোট তিনখানা দেখাইয়া বলিল, "তুমি জাল নোট চালাইয়াছ। সে সম্বন্ধে কি বলিতে চাও?"

আমি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলাম "জাল নোট! অসম্ভব।"

সাহেব। সম্ভব কি অসম্ভব, সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি না। তুমি কিছু কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা কর?

আমি। আমি কার্য্যসূত্রে অন্য অনেক নোটের সঙ্গে এই তিনখানা নোট পাইয়াছি। ইহা যদি সত্যই জাল হয়, আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না।

সাহেব। তুমি যে কৈফিয়ৎ দিলে, তাহা সকলেই দিয়া থাকে। আর কিছু বলিবার আছে?

আমি। আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না? যে নোটের সহিত এই তিনখানা নোট পাইয়াছি, সেগুলা আমার সঙ্গেই আছে; এই দেখুন, বলিয়া ভিতরের পকেট হইতে নোটের তাড়াটা বাহির করিয়া সাহেবের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলাম।

সাহেব তাড়াটা তুলিয়া লইয়া প্রত্যেকখানা নোট তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ অন্ধকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "সবগুলাই জাল!"

(৫)

পিতামাতার পুণ্যে অধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল না। পরে শুনিয়াছিলাম, গ্রেপ্তার হইবার সময় ও তাহার পরে, আমার ধরণধারণ দেখিয়া পুলিশ অনুমান করিয়াছিল যে, আমি নির্দ্দোষ। কি সূত্রে আমি নোটগুলা পাইয়াছিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া, পুলিশ যখন আমার বাসা হইতে ছকড়ির প্রদত্ত পনর হাজার টাকার রসিদখানা পাইল; আমার ব্যাঙ্কে যাইয়া জানিতে পারিল যে, সত্যসত্যই পূর্ব্বদিনে আমার চেক্‌ ভাঙ্গাইয়া কে পনর হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে; বৃজিতলার পাহারাওয়ালাকে আমার নিকট আনিলে সে যখন বলিল যে, তিন দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে আমি অনেকক্ষণ বৃজিতলার মোড়ে দাড়াইয়া ছিলাম ও তাহার পর একজন বাবু গাড়ী-গাড়িতে আসিয়া আমাকে লইয়া যায়; এবং পুলিস আমার অনুরোধে তিনমাস পূর্ব্বের কয়েকখানি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া যখন আমার পরিচয় জানিতে পারিল, তখন আমার কথায় পুলিশের অনেকটা প্রতীতি জন্মিল। তাহার পর, আমার প্রতিবেশীদের নিকট এবং আলিপুর, কোর্টে খোঁজ লইয়া, এবং মান্দালে হইতে টেলিগ্রাফে খবর আনাইয়া, বুঝিতে পারিল যে, জালিয়াতদিগের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। তখন আমাকে জামিনে খালাস দিল; সাবধান করিয়া দিল যে, জালিয়াতরা ধরা না পড়া পর্য্যন্ত, যেন কোন কথা কাহারও কাছে প্রকাশ না করি।

ছকড়ি, যে বিশিষ্ট এটর্ণির নাম করিয়া সাতকড়ির পরিচয় দিয়াছিল, পুলিশ ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিল যে, তিনি সত্যসত্য সাতকড়ি নহেন এবং পুলিস এ বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণও পাইয়াছিল। দেখা গেল, ছকড়ির প্রদত্ত পনর হাজার টাকার রসিদে যে সহি ছিল, তাহার সহিত এটর্ণি মহাশয়ের সহির কোন সাদৃশ্য নাই এবং তাঁহার আফিসে তাঁহার নাম-ধাম-ছাপা যে চিঠির কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহা রসিদের কাগজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। বুঝা গেল যে, রসিদের কাগজখানা জুয়াচোরেরা নিজেরা ছাপাইয়া লইয়াছিল।

পুলিসের বড়সাহেব হইতে ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, সকলেই এই তিন ধড়ীবাজ জুয়াচোরের অসাধারণ কৌশল ও কার্য্যতৎপরতায় চমৎকৃত হইয়া গেল। পুলিসের বড়সাহেব বলিলেন, তিনি পঁচিশ বৎসর পুলিসে কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু এদেশে যে এরূপ উচ্চশিক্ষিত, চিন্তাশীল ও সূক্ষ্ম-বিচারশক্তিসম্পন্ন জুয়াচোর আছে, এ ধারণাই তাঁহার ছিল না।

এই ঘটনার কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতে, মধ্যে মধ্যে দুই একখানা করিয়া বিশিষ্ট ধরণের জাল নোট তদন্তের জন্য পুলিসের হস্তে আসিতেছিল। জাল-নোট সাধারণতঃ অল্প মূল্যেরই হয় এবং তাহাতে প্রায়ই ছোটখাট খুঁত থাকে। এ নোটগুলি উচ্চমূল্যের ও নিখুঁত বলিয়া পুলিসের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, একজন সাহসী ও নিপুণ জালিয়াতের অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। আমার নিকট যে জালনোট পাওয়া গিয়াছিল সেগুলাও যে সেই জালিয়াতেরই প্রস্তুত, সে সম্বন্ধে পুলিসের কোন সন্দেহ ছিল না। তাহারা অনুমান করিল যে, ইদানীং পুলিসের অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জাল নোট চালাইবার অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় জালিয়াতেরা একযোগে অনেকগুলা জাল নোট চালাইয়া গা ঢাকা দিবার মতলবে এই ষড়যন্ত্রটি করিয়াছিল।

পুলিস স্থির করিল যে ছকড়ি আমাকে যে বাড়িতে লইয়া গিয়াছিল সেইটাই জালিয়াতদের আড্ডা। যে মোটরগাড়িতে আমি সেখানে গিয়াছিলাম এবং যে ফিটনে ছকড়ি আমাকে টাকা দিতে আসিয়াছিল, তাহার নম্বর কত, অথবা চালক দেখিতে কিরূপ, তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই; সুতরাং পুলিসকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইল। ছকড়ি আমাকে যে রাস্তা দিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার বর্ণনা শুনিয়া পুলিশ অনুমান করিল যে—বেলগেছিয়া, টালা বা পাঁইকপাড়ার কোন বাগান-বাড়িতে দিল্লীতে সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠার কমিটি বসিয়াছিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ঐ সকল অঞ্চল গুপ্তচরে ছাইয়া ফেলিল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইল। ছকড়ি-নামধারী ছদ্মবেশী জালিয়াৎ ধরা পড়িল। সে কিছুতেই নকড়ি ও সাতকড়ির নাম বলিল না। ছকড়ির প্রকৃত পরিচয়ও আমি গোপন রাখিলাম।

যথাকালে ছকড়ির বিচার ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হইল, কিন্তু আমার টাকা আর ফিরিয়া পাইলাম না। নিগ্রহভোগ ও দারুণ অর্থনাশের জন্য প্রথম প্রথম যখন বড় কষ্ট হইত, তখন এই মনে করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম যে এই ব্যাপার সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইত যদি সে সময় মা জগন্নাথক্ষেত্রে না থাকিতেন;—আমার গ্রেপ্তার ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতেন। তিনি যে এ বিষয়ে কিছু জানিলেন না, তাঁহাকে যে হারাইলাম না; ইহাই পরম লাভ মনে করিয়া শান্তিলাভ করিতাম।

এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই; কারণ, এই ঘটনার ফলে, আমার নাম সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া গেল। আমার পিতা যে একজন বড়লোক ও প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন, তাহা সকলে জানিতে পারিল এবং আমার অর্থের কথাটা একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই প্রচারিত হইল। ইহার ফলও ফলিল,—মক্কেলের আর অভাব রহিল না। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে যে "অমঙ্গল হইতেই মঙ্গলের সৃষ্টি হয়"—উপস্থিতক্ষেত্রে তাহা ঠিক ফলিয়া গেল! আমারও খুব শিক্ষা হইল।

অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মকাণ্ড

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

(১)
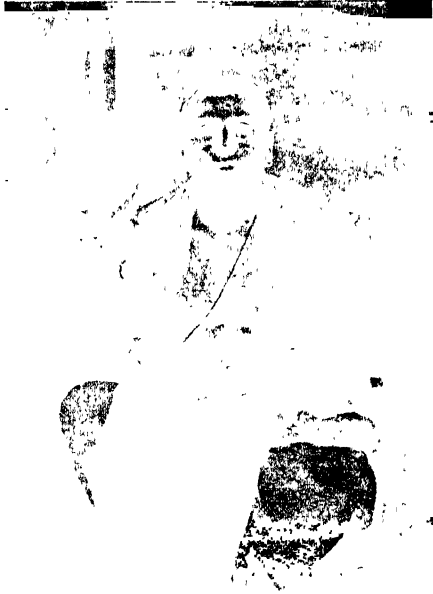
মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

সুখের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে অতৃপ্তি, আবার নূতনভাবে সুখের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা,— ইহা যেমন মানবের স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখকারণের উপর বিদ্বেষ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখসাধনের উপর বিরক্তিও মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই দুইটী অবস্থার পরস্পর মিলন যতই ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে, ততই, এই অবস্থাদ্বয়ের বাহিরে ইহার সহিত অসম্বন্ধ একটী কল্পিত অবস্থার প্রতি আমাদিগের অন্তর্দৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে। ব্যবহারক্ষেত্রে এই অবস্থার কোন অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, ইহা সত্য, কিন্তু ইহার কল্পনা সময়ে সময়ে আমাদের নিকট বড়ই মধুর বলিয়া প্রতীত হয়। এই অবস্থাকেই আমরা শান্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই শান্তির আকাঙ্ক্ষাই মানব-হৃদয়ে দার্শনিক-চিন্তার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া থাকে। অন্যান্য দার্শনিকগণ এই চিন্তা করিতে করিতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে ; কিন্তু অদ্বৈতবাদীগণ এই চিন্তার সাহায্যে, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই কথা আজ বলিব। সেই সিদ্ধান্ত কি ? সেই সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান – জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা এই তিনটি পদার্থ বাস্তবিক একই। ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আমাদের সমক্ষে প্রতিনিয়ত প্রতিভাসিত হইতেছে, বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই ভেদ পারমার্থিক নহে ; ইহা কল্পিত বা ব্যাবহারিক। এই কয়টী পদার্থের মধ্যে যাহাকে আমরা জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহা সত্য। জ্ঞেয়ভাব বা জ্ঞাতৃভাব, সেই জ্ঞানেরই উপর কল্পনা বলে আরোপিত - এবং এই আরোপিত ভাবদ্বয়ের অস্তিত্ব উপলব্ধিই আমাদের যাবতীয় অনর্থ বা অশান্তির মূলকারণ। আমরা যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, বা স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ এই জ্ঞাতৃভাব ও জ্ঞেয়ভাব সেই জ্ঞানের উপর আরোপিত থাকে ;—আমার প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায় প্রত্যেক ব্যবহারে, আমি ইহা বুঝিতেছি। এই প্রক প্রতিভাস ততক্ষণ আমার জ্ঞানকে ওতপ্রোতভা জড়াইয়া থাকে ; আবার কিন্তু যখন আমার সুষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই জ্ঞানের উপর জ্ঞাতৃভাব ও জ্ঞেয়ভাব আরোপিত থাকে না ;– তখন কে বিষয়হীন, আমিত্বহীন একমাত্র প্রকাশ-ভাবই আ আত্মাকে জড়াইয়া থাকে। এই প্রকাশ-স্বভাব জ্ঞা আমাদের আত্মা। এই বৈচিত্র্যময় অচিন্ত্যস্বরূপ অশেষ সংস এই জ্ঞানরূপ এক অবিনাশী আত্মার উপর আরোপি একই আত্মা যেমন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পিতা, আ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পুত্র বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; পিতৃত্ব প

বিভিন্ন ধর্ম্ম হইলেও যেমন একই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয়; অথচ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় সেই আত্মার স্বরূপগত কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিতে পারে না;—সেইরূপ তুমি বা আমি একই আত্মার উপর আরোপিত দুইটি ধর্ম্ম; ব্যবহার দশাতে তোমাতে ও আমাতে পরস্পর ভেদ উপলব্ধ হইলেও, তুমিত্ব বা আমিত্বরূপ কল্পনার আশ্রয়, সেই নিত্য-নির্ব্বিকারস্বরূপ আত্মার স্বরূপগত কোন ভেদই নাই। সমুদ্রের উপর যখন বড় বড় তরঙ্গ উদিত হয়, সেই তরঙ্গের একটী তরঙ্গ হইতে অন্য একটী তরঙ্গের ভেদ প্রতীতগোচর হইলেও, যখন সমুদ্র শান্তভাব ধারণ করে, তখন আর সেই তরঙ্গগুলির মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, সকল তরঙ্গই এক বিশাল জলরাশি হইতে আর পৃথক থাকে না, সকলই একজলে মিশিয়া এক বলিয়া প্রতীত হয়;—সেইরূপ, ব্যবহারক্ষেত্রে তুমি শত্রুমিত্র সুহৃদ্ বন্ধু স্ত্রী পুত্র ভৃত্য স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি নানাবিধ বৈলক্ষণ্যক্রান্ত ভাবসমষ্টি পরস্পর পৃথকভাবে প্রতীত হইলেও, এই ব্যবহারদশার অবসানে, অর্থাৎ সুষুপ্তি, সমাধি বা মোক্ষের দশায়, সকলই এক হইয়া সেই প্রকাশময়, আনন্দময় ও জ্ঞানময় এক বিরাট্ ভূমাতে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। এই ভূমার সহিত পরিচ্ছিন্নের মিলন, ইহাই হইল মানব জীবনের চরম উন্নতি বা পরম পুরুষার্থ—ইহারই নাম পরম শান্তি বা নির্ব্বাণ। এই ভূমার সহিত পরিচ্ছিন্নের মিলনের ভাবনা মনুষ্যহৃদয়ে যে অপার আনন্দের ভাব জাগাইয়া দেয়, তাহার অনুভূতি যাহার ভাগ্যে ঘটে, সেই ব্যক্তি জড় বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে না—বরঞ্চ তাহার কার্য্য করিবার সামর্থ্য, লোকহিতৈষণা, সর্ব্বজীবে আত্যন্তিক সমবেদনা প্রভৃতি বাড়িয়া যায়।—কেন যে বাড়িয়া যায়, তাহাই এক্ষণে বুঝিবার জন্য অগ্রসর হওয়া যাক্।

মানুষ যে কার্য্য করে—তাহার হেতু কি, এইটা প্রথমে বুঝিতে হইবে। তুমি জড়বাদী বৈজ্ঞানিক; তুমি বলিবে—মানুষ কার্য্য করে নিজের মঙ্গলের জন্য, আর নিজের অনর্থ পরিহারের জন্য। বেশ কথা; কিন্তু এই যে তাহার নিজের ইষ্টানিষ্টজ্ঞান, ইহা তাহার স্বতঃসিদ্ধ, না শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল? যদি স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল মানুষই নিজের ভাল-মন্দ বুঝিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হউক;—কায কি তাহাকে বাল্যকাল হইতে ভালমন্দ শিখাইবার এত যত্নে? সুতরাং, বলিতে হইবে—মানুষ কার্য্য করে শিক্ষা ও অভ্যাসের বলে। কার্য্য করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা, তাহার সুখাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত হইলেও, সুখের কি সাধন, তাহা তাহাকে যেভাবে শিখাইবে, এবং যেভাবে সে সুখ-সাধনাকে ভাবিতে অভ্যাস করিবে, কালে তদনুসারে কার্য্য করাই তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়িবে,—ইহা কে অস্বীকার করিবে?

তাহাই যদি হইল, তবে দেখা যাক্ যে,—এই শিক্ষা ও অভ্যাসের স্বরূপই বা কি? এবং ইহার দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইবার প্রকারই বা কিরূপ? সাধারণতঃ, আমরা আমাদের বালক বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দিয়া থাকি, তাহার নাম অপরা-বিদ্যা। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন—এই তিনটী বস্তুকে জড়াইয়া, তাহার সঙ্গে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার একটী পরিচ্ছিন্নভাব-জড়িত আভাসকে গাথিয়া, আমরা একটী ব্যাবহারিক আত্মাকে খাড়া করিয়া থাকি। এই ব্যাবহারিক আত্মাই হইল আমাদের এই শিক্ষার বা এই অপরা-বিদ্যার প্রধান আলম্বন। এই আলম্বনের বা সজ্ঞাতাত্মার, প্রতিপদে বিনাশ, হ্রাস বা উপচয় দেখিতে পাইয়া, আমরা ইহাকে, একটী ঘটপটাদি বস্তুর ন্যায়, পরিবর্ত্তনস্বভাব ও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি। সুতরাং, এই পরিচ্ছিন্ন আত্মভাবের যাহাতে উপচয় হয়, এবং যাহাতে ইহার অপচয় বা হানি না হয়, তাহারই জন্য আমাদের যাবতীয় শিক্ষাপ্রণালী প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিচ্ছিন্ন সজ্ঞাতাত্মাও আর একটী নহে;—ইহা প্রতি দেহভেদে বিভিন্ন এবং, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া, প্রতিদেহেই ইহার বৈলক্ষণ্য ও বিভিন্ন প্রকৃতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। তাহাই যদি হইল, তবে ইহাদের মধ্যে, ভিন্নস্বার্থের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতাবশতঃ, শত্রুমিত্র ও উদাসীনভাবের আবির্ভাবও অপরিহরণীয়। এই ভাবত্রয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে পড়িয়া, আমরা সংসার সমুদ্রে প্রতিমুহূর্ত্তে হাবুডুবু খাইয়া থাকি। ইহার প্রতিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও, আমরা ইহার প্রতিকার করিতে পারি না। তাহার উপর, অদৃষ্ট বলিয়া এমন একটী অপরিহরণীয়, অদম্য শক্তি আমাদের সকলকার্য্যের উপর খেলা করিতেছে যে, তাহাকে দমন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিবার শক্তি আমাদের নাই,—হইতেও পারে না; সুতরাং, এই অদৃষ্টশক্তির সহিত আমাদের এই জাতীয় শিক্ষা-পরিচালিত পুরুষকারের

যখন সামঞ্জস্য ঘটে, তখন আমরা কৃতকার্য্য হইলাম বলিয়া অভিমান বা উল্লাসে আত্মহারা হই। আবার যখন, এই অদৃষ্টশক্তির প্রতিকূলভাবে পরিচালিত হইয়া, আমাদের পুরুষকার বিফল হইয়া পড়ে, তখন আমরা বিপদে বা দুঃখে ব্যাকুল হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, পড়ি ;—ইহাই হইল আমাদের বর্ত্তমান বা ব্যাবহারিক-শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এই শিক্ষার উন্নতির ফলে, মানুষ যে কোন দিন এই দুঃখ-সমুদ্রের পারে গিয়া পঁহুছিবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

এই অপরা-বিদ্যার প্রভাব যতই মনুষ্য-জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিবে, মানুষের ভোগলালসা ও অতৃপ্তি সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে। ইহার অশান্তি ও আমিত্বের সঙ্কীর্ণতা, আর তাহার সঙ্গে নিত্যনিত্য নূতন নূতন অভাববোধ ও তাহার তাড়নায় বিশ্বতোমুখী ব্যাকুলতা—ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু, এই জাতীয় শিক্ষা ছাড়া, আর এক জাতীয় শিক্ষা আছে ; সেই শিক্ষা পরা-বিদ্যা—সেই পরা-বিদ্যার প্রসাদ লাভ হইলে, মানবাত্মার সঙ্কীর্ণভাব বিলীন হইয়া যায় ; আর, সেই সঙ্কীর্ণতামূলক রাগ দ্বেষ হিংসা ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি, সামাজিক সর্ব্বপ্রকার অশান্তির মূলীভূত দোষগুলি, মূলের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; সেই পরা-বিদ্যা কি ? উপনিষদ্ বলিতেছে, "অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে"—'তাহারই নাম পরা-বিদ্যা, যাহাদ্বারা সেই অবিনাশি ব্রহ্ম স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।'

সেই অবিনাশি ব্রহ্ম কি স্বরূপ ? তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উপনিষদ্ বলিতেছে, "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং" 'সেই ব্রহ্ম পরমার্থ সৎ, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ'।—সেই ব্রহ্মে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়—এই ত্রিবিধ ভেদ নাই ; তাহাই একমাত্র সৎ—ব্রহ্ম ব্যতিরেকে এই সংসারের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই। তাহাই যদি হইল, তবে আমার অস্তিত্ব কোথায় ? এই যে প্রমাতা সকল প্রকার ব্যবহারের কেন্দ্রীভূত চৈতন্যময় দেহোপাধিক আত্মা বা সাংসারিক জীব, ইহার কি তবে নিজের কোন সত্তাই নাই ?—এই প্রকার প্রশ্ন স্বতই জীবের হৃদয়ে সমুদিত হয়। এই প্রশ্ন শুনিয়া, ঔপনিষদ্ আচার্য্যগণ কি বলিয়া থাকেন ?—তাঁহারা বলেন, "তত্ত্বমসি"—'হে প্রমাতৃজীব ! তুমিও সেই ব্রহ্ম।' এই হইল মোটামুটি বেদান্তের, বা পরা-বিদ্যার, সারভূত উপদেশ। এ উপদেশ, প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য সমাজকে কোন্ পথে লইয়া যায় এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে—পারমার্থিক বস্তুজ্ঞান বিদ্যমা থাকিলেই যে উহা তৎক্ষণাৎ আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানে উচ্ছেদসাধন করে, তাহা নহে ; গুরুর মুখে শুনিয়া, বা শা পড়িয়া আমি যদি বুঝি যে, এই সংসারের বাস্তব সত্তা নাই-এ সংসারের মধ্যে সকল বস্তুই ব্যাবহারিক সৎ—এই পরব্রহ্ম সৎ—তাঁহারই সত্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চ ভোক্তা জীব সৎ হইয়াছে—ইহাদের সত্তা ব্রহ্মসত্তা হই ভিন্ন নহে ; এই প্রকার জ্ঞান হইলেই যে আমরা একবা নিষ্ক্রিয় হইয়া ব্রহ্মসত্তায় মিশিয়া যাইব, ইহা কখনই সম্ভব নহে। মানবের মনের গতি ও স্বভাবের তত্ত্ব পর্য্যালোচ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মানবের মন চিরন্ত অভ্যাস ও সংস্কারবশেই পরিচালিত হইয়া থাকে। যে আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের উপর আত্মভা ইহা একদিনে হয় নাই। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত জাতীয় সংস্কাররাশি, এবং এই জাতীয় সংস্কারের বশী হইয়া বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিবার অভ্যাস, আমা অন্তঃকরণে এমনই দৃঢ়ভাবে জমিয়া গিয়াছে যে, সংস্কার ও অভ্যাসের প্রতিকূলভাবে কার্য্য করিবার শ আমরা বর্ত্তমানদশায় একপ্রকার হারাইয়া বসিয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের এই প্রকার সংস্কার অধীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গীতাতে শ্রীভগ বলিয়াছেন—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥"

—'কেহই কোনকালে কার্য্য না করিয়া ক্ষণকালও থাকি পারে না! সকলেই, নিজ প্রকৃতিজাত গুণসমূ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, ক করিতে বাধ্য হয় ; অর্থাৎ তাহার আজন্মসিদ্ধ প্রকৃ তাহাকে কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়া থাকে।' এই ক করিবার প্রবৃত্তি, যতদিন আমাদের দেহাদির আত্মাধ্যাস আছে, ততদিন লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ন এই আত্মাধ্যাসের সঙ্গে যদি অপরাবিদ্যার যোগ তাহা হইলে, আমরা যাহা কিছু কার্য্য করি, সেই সব

কার্য্যই রাগ ও দ্বেষমূলক হওয়া প্রযুক্ত, মানব-সমাজে নানা প্রকার চিরকলহ ও অশান্তির সূত্রপাত করিয়া থাকে। এই চিরকলহ ও অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমরা যতই শান্তিসভা, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বিরাট্ আন্দোলন করি না কেন, অপরাবিদ্যার প্রসার যতদিন মনুষ্য সমাজের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে, ততদিন এইসকল সহস্রপ্রকার বহির্মুখী চেষ্টার বলে আমরা এই সামাজিক চিরকলহ ও অশান্তির হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইব না; বরঞ্চ, আমাদের সকল চেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া, ইহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবে, তাহা স্থির। অন্যদিকে, পরাবিদ্যার প্রসাদে আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, বাস্তবিক তোমাতে ও আমাতে স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই,—যাহা কিছু পার্থক্য প্রতীত হয়, তাহা ব্যাবহারিক, পারমার্থিক নহে; বস্তুতঃ তোমার আত্মা ও আমার আত্মা একই বস্তু; আমার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের দেহগুলি পরস্পর পৃথক্ হইলেও সেই দেহগুলির সহিত অবস্থাবিশেষে এক বলিয়া প্রতীত হইলেও বাস্তবিক যেমন আমি ঐ সকল দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও এক, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যাবতীয় দেহ আছে সকল দেহগুলি পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও সেই সকল দেহের সহিত সংস্কার-বশে যাহার অভেদাভিমান হইয়া থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা যেমন আমার আত্মা, তেমনই তাহা সকল দেহীরই আত্মা। সেই প্রকাশময় আনন্দময় অবিনাশী সত্তাময় আত্মরূপ বিশ্বব্যাপী মহাসমুদ্রের উপর আমরা ব্যবহার দশাতে পৃথক্ পৃথক একটী ছোট বড় জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই সেই চিন্ময় মহাসমুদ্র হইতে কোন প্রকারে পৃথক্ নহি। এই প্রকার বিরাট বিশ্বজনীন আত্মার অনুভূতি যদি একবার আমাদের অন্তঃকরণে উদিত হয় তাহা হইলে পরক্ষণেই আমাদের মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়া থাকে যে, তাহাই যদি হইল তবে আমরা এই যে আত্মপরভেদজ্ঞান করিয়া এই প্রকার অনর্থবহুল, রাগ-দ্বেষময় ব্যবহারের সৃষ্টি করিতেছি, ইহার ফল কি?—ইহার ফল দুঃখ ইহার ফল শোক ইহার ফল তাপ ইহার ফল দ্বেষ ইহার ফল হিংসা ইহার ফল অশান্তি ও দারুণ বৃশ্চিক-দংশন ছাড়া ত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমাতে আমাতে যদি ভেদটা ব্যাবহারিক মাত্র হয় পরমার্থতঃ তোমার তুমিত্ব ও আমার আমিত্ব যদি এক মহান্ আত্মারই অধিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে যেমন আমি আমার উপর কখন দ্বেষ করি না এবং আমি আমাকে সর্ব্বদা ভালবাসিয়া থাকি, সেইরূপ আমি তোমার প্রতি দ্বেষ না করিয়া তোমাকে ভালবাসিব। এই প্রকার যে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাবই বা বলি কেন বিশ্বজনীন আত্মভাব ইহাই হইল পরা বিদ্যানুশীলনের প্রথম স্তর। এই স্তরে উপনীত হইলে মানব প্রকৃতিবশে যাহাকিছু কার্য্য করে তাহার সেইসকল কার্য্যেরই মূলে এই বিশ্বজনীন আত্মভাব দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া তাহার কার্য্যের প্রণালী তখন আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে তখন বুঝিয়াছে তাহার এই বিশ্বজনীন আত্মভাবের উপলব্ধির পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে—ভোগবাসনা। দেহের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের যত আধিক্য হইবে, অন্তঃকরণে সঙ্কীর্ণতাময় রাগ-দ্বেষের আবিলতা যতই দূর হইবে ততই তাহার আত্মার এই পরিচ্ছিন্নভাব এই সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে; সেই সঙ্গে সেই বিরাট ভূমার অস্তিত্বে আত্মঅস্তিত্ব ডুবিয়া যাইবে, আর সেই সঙ্গে অনাবিল অপাপবিদ্ধ শাশ্বত শান্তির স্নিগ্ধ পীযূষধারার আস্বাদনে তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত নির্বৃতি করায়ত্তপ্রায় হইবে। এই প্রকার ভাবনাই হইল অদ্বৈত-বিদ্যার বা পরাবিদ্যার প্রথম পরিণতি ইহা কর্ম্মবাদের বিরোধী নহে; ইহা সঙ্কীর্ণাত্মভাবের সহিত জগতে উচ্ছৃঙ্খলতাময় রাজস ও তামস কর্ম্মজালের বিরোধী হইলেও সাত্ত্বিক কর্ম্মের পরিপোষক ইহার প্রভাব যতই বাড়িবে মানবসমাজেও ততই রাগ ও দ্বেষমূলক—অশান্তিজনক কর্ম্মের সংখ্যা হ্রাস পাইবে। এই পরা-বিদ্যার সহিত বিশ্ব-হিতকর সাত্ত্বিক কর্ম্মের আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—তাহা বারান্তরে আলোচিত হইবে।

"বাল-চরিতম্" *

[অধ্যাপক শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ.]

প্রকৃতি বা মূল না থাকিলে, বিকৃতি বা পরিণতি থাকিতে পারে না। সকল বিষয়েরই পরিণত অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে গেলে, তাহার মূলের পর্য্যালোচনা করিতে হয়—মূল না বুঝিলে, পরিণাম বুঝা যায় না। পরিণতি যদি মূলানুগত না হয়—তাহা হইলে তাহার বিচার করিবার উদ্যমের প্রথম করণীয়ই মূলের অনুসন্ধান। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আধুনিক "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের" মূল কোথায়, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূল কতদূর পর্য্যন্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে—তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইবার লোভে তদনুসন্ধানের একটু চেষ্টা করিতেছিলাম; ইতিমধ্যে "রাজসাহী বৈষ্ণব-সভার" অনুরোধে এই প্রবন্ধ-পাঠে প্রবৃত্ত হই। "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের" মূল ধরিতে গেলে, অর্ব্বাচীন কালের কবি ও গ্রন্থকারগণের লিখিত পুস্তকাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাচীনকালের কবি ও গ্রন্থকারগণের পুস্তকের দিকে অনুসন্ধানের জন্য ধাবিত হইতে হইবে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শ বাঙ্গালী কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" নামক সংস্কৃতে রচিত সুমধুর গীতিকাব্য ছাড়িয়া, জয়দেবের মূল অবলম্বন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরও আলোচনা না করিয়া, আমরা, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালে সঙ্কলিত বা রচিত শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণলীলার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই যে, মহাভারতের রচনাকালের পরে কালক্রমে বহুবহু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অবদান ও লীলা বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছিল। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে ভারতবর্ষে বহুনাটকও রচিত হইয়া ভক্তি-প্রবণ ভারতবাসীর নয়ন-সম্মুখে অভিনীত হইত।

ভারতবাসীর হিসাবে ন্যূনাধিক ৫০০০ পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে, বসুদেব-নন্দন বৈষ্ণবের হৃদয়-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, জগতের পাপ-ভার লঘু করিবার জন্য, অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন স্মরণাতীতকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার বলিয়া ভারতবাসীর নিকট ভক্তি ও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন; কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, যেসকল সংস্কৃতগ্রন্থে আমরা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে শ্রীকৃষ্ণেরলীলাপ্রসঙ্গ বর্ণিত দেখিতে পাই, সেসকল গ্রন্থও যে শ্রীকৃষ্ণ-সমসাময়িক, তাহা যেন কেহই ভুল না করি। প্রাচীনকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা, কিরূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে পরিণত ও রূপান্তরিত হইয়া, লোকের মনে স্থান পাইয়াছিল, তাহার একটু ঐতিহাসিক আলোচনার উদ্দেশ্যে—প্রায় দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা সম্বন্ধে জনসমাজের কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য—অদ্য মহাকবি ভাস বিরচিত "বাল-চরিতম্"-নামক নাটকের আলোচনা করিতে হইতেছে।

আপনারা, বোধ হয়, অবগত আছেন যে, এই মহাকবি ভাস এতকাল আমাদের নিকট নামমাত্রে পর্য্যবসিত ছিলেন। ন্যূনাধিক দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন কবি কালিদাস কর্ত্তৃক স্বরচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকে উল্লিখিত মহাকবি ভাসের নামটি কেবল এতদিন সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগী লোকের মনের উপরই ভাসিত। কিন্তু প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে চলিল, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর দেশের প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতিশাস্ত্রি মহাশয়ের অনুসন্ধান-কৌশলে, মহাকবি ভাসের রচিত ত্রয়োদশখানি রূপক (নাটক) আবিষ্কৃত হইয়া, সেই দেশেরই হিন্দুশাস্ত্রানুরাগী মহারাজের অর্থ-সাহায্যে, একে একে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গণপতিশাস্ত্রি মহাশয় এই অচিন্তিতপূর্ব্ব আবিষ্কারের জন্য সাধুবাদ প্রাপ্ত হইতেছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইহা একটি অতীব গৌরবময় আবিষ্কার। দেশে-বিদেশে এই কবির উদ্ভব-কাল লইয়া নানাপ্রকার তর্ক-

* মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক অবলম্বনে লিখিত এই প্রবন্ধ "রাজসাহী বৈষ্ণব সভার" এক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

বিতর্ক আরব্ধ হইয়াছে; কিন্তু এই বিষয়ে অদ্যাপি কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে নাই।

ভাসবিরচিত "বাল-চরিতম্" নাটকখানি পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও কৈশোরলীলা, অর্থাৎ বৃন্দাবন-লীলা ও মথুরা-লীলার কতকাংশ, অবলম্বন করিয়া এই অপূর্ব্ব নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে পূতনাবধ হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত বালকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার সহিত, ভাস-কবির এই নাটকে বর্ণিত লীলার, অনেক বিষয়ে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। তবে এই কথাও বলা যাইতে পারে যে, মহাকবি ভাস নাটকরচনা করিতে বসিয়া, নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োজনানুরোধে, প্রচলিত উপাখ্যান ও লীলা সম্বন্ধে স্বয়ং অনেক বিষয়ের রূপান্তর ঘটাইয়া থাকিবেন। কিন্তু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিলে অভিনয় অধিকতর রমণীয় হইতে পারিত, শ্রীকৃষ্ণজীবনে সেই সমস্ত ঘটনা সত্য হইলে, বা কবির নিজ সময়ে লোকসমাজে তাহার পরম্পরাগত জনশ্রুতি প্রচলিত থাকিলে, ভাস অবশ্যই তাহা নিজ নাটকে নিবদ্ধ করিতেন। সে যাহাহউক, ভাসকে প্রায় দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া মনে রাখিয়া, তদীয় নাটকের প্রাচীনত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া, তদ্বর্ণিত ঘটনাবলীর মূলসম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। "বাল-চরিতে" বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও কৈশোরলীলার সহিত ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত তত্তৎ লীলার কতখানি ঐক্য ও প্রভেদ আছে, তাহা অন্য সময়ে আলোচিত হইতে পারিবে। তবে, এই সুপ্রাচীন নাটকপাঠে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বন্ধে জনসমাজের মতের ক্রমবিকাশ ও পৌর্ব্বাপর্য্য অনেকটা বুঝা যাইতে পারিবে—"বালচরিত"-নাটক অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিবার ইহাও একটি কারণ। পুরাণাদিতে বর্ণিত বিষয়ের সহিত ভাসের নাটকে বর্ণিত বিষয়ের অনৈক্যের মধ্যে দুইটি গুরুতর কথার আলোচনা হইতে পারিবে—(১) প্রাচীন কালের অবতার-বাদ ও অবতার-সংখ্যা ও (২) শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও তাহার অর্থ। অদ্য কেবল ভাস-বিরচিত নাটকখানির কথাবস্তুই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কথাবস্তু

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রজনী। আকাশ-মণ্ডল সনীর-নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন। প্রচণ্ডবেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিতেছে। নব-জলধরের গম্ভীর নিনাদে মেদিনী কম্পমানা। চতুর্দ্দিকে সূচি-ভেদ্য অন্ধকার পিণ্ডীভূত হইয়া রহিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে ক্ষণ-প্রভার ক্ষণিক স্ফুরণে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। সুনিবিষ্ট পৃথিবীর যেন রূপ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এই ঘোর অন্ধকারে সকলেরই দৃষ্টি শক্তি নিষ্ফল,—কাহার সাধ্য পথ দেখিয়া চলে। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনে হয়,—

> "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
> অসৎপুরুষ সেবেব দৃষ্টির্নিষ্ফলতাং গতা॥"

—"যেন অন্ধকার শরীরকে লেপিয়া রাখিয়াছে, যেন আকাশ অঞ্জন বর্ষণ করিতেছে। দুর্জ্জন সেবা (১) যেমন নিষ্ফল, [এরূপ অন্ধকারে] দৃষ্টি-শক্তিও যেন তদ্রূপই নিষ্ফল।" অতিপাতী কার্য্য না থাকিলে, কেহই এরূপ দুর্দ্দিন-বিনষ্ট-চন্দ্রালোক রজনীতে স্বগৃহের বাহিরে যাইতে সাহস করে না। সমস্ত মথুরা নগরী (২) নিস্তব্ধ। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে সকলেই প্রসুপ্ত। কিন্তু একটি মনুষ্যকে, এইরূপ নৈশ-বিভীষিকায় ভীত না হইয়া, হতাশ প্রাণে প্রয়োজন-বশতঃ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া, প্রাকার-পরিবেষ্টিত মথুরা-পুরী পরিত্যাগ করিয়া অপক্রমণের উপায় চিন্তা করিতে হইতেছে। মন্দ ভাগ্য সে মনুষ্য কে?—মথুরা-পতি উগ্রসেন-তনয় মহারাজ কংসের ভগিনীপতি বৃষ্ণি-কুলের বসুদেব। পত্নী দেবকী আজ অর্দ্ধরাত্রিতে এক মহানুভব পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। পুত্রের জন্ম-সময়ে চতুর্দ্দিকে শুভ-সূচক নিমিত্ত প্রত্যক্ষ করিয়াও, পতি-পত্নী, দুরাত্মা কংসের নৃশংসতার কথা স্মরণ করিয়া, ভয়াকুল ও শুভ-নিমিত্তে বিশ্বাস-বিহীন। একটি একটি করিয়া দেবকী-গর্ভ-সম্ভূত ছয়টি পুত্রকেই দুষ্টমতি কংস বধ করিয়াছেন। সেই জন্য আজ পুত্র-জন্মের অব্যবহিত পরেই বসুদেব-পত্নী দেবকী,—

(১) প্রজা-নিপীড়নকারী কংসের অত্যাচার স্মরণ করিয়াই, বোধ হয়, কবি দুর্জ্জন-সেবার নিষ্ফলতার কথার অবতারণা করিয়া থাকিবেন।

(২) পরবর্ত্তীকালে ইহার নাম মথুরা-পুরী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

"অগণিত-পরিখেদা যাতিষণ্ণাং সুতানাং
অপচয়-গমনার্থং সপ্তমং রক্ষমাণা।
বহু-গুণ-কৃতলোভা জন্মকালে নিমিত্তৈঃ
সুত ইতি কৃত-সংজ্ঞং কংস-মৃত্যুং বহন্তী॥"

—"ছয়টি পুত্রের বিনাশ সাধিত হওয়ায়, সপ্তমটিকে রক্ষা করিবার জন্য, [শরীরের] পরিখেদ অগ্রাহ্য করিয়া, পুত্র-জন্ম-সময়ে শুভ-নিমিত্ত দর্শন করিয়া পুত্রের ভবিষ্যদ্‌গুণে লুব্ধ হইয়া, কংসের মৃত্যু-রূপী স্ব-নন্দনকে [ক্রোড়ে] বহন করিতে করিতে [স্বামী-সকাশে] যাইতেছেন।" শোকার্ত্তা জননী নবজাতশিশুকে বাহুতে বহন করিয়া বসুদেবের হস্তে লুকাইবার জন্য প্রদান করিতেছেন—এমন সময়ে ব্রহ্ম-লোক হইতে কলহ-প্রিয় মহর্ষি নারদ অসুর বীর্য্য-হন্তা, ত্রৈলোক্য-কারণ, মায়াবলম্বনে মানুষী-তনুর আশ্রয় করিয়া ইহলোকে অবতীর্ণ; সেই পুরাণ পুরুষের দর্শনলাভ করিবার জন্য, গগন-সঞ্চরী হইয়া মথুরা-পুরীর আকাশে বিচরণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ দূর হইতেই,—

"ভগবন্তং লোকাদিং অনিধনং অব্যয়ং লোকহিতার্থে কংসবধার্থং বৃষ্ণি-কুলে প্রসূতম্",

—"ভগবান্ লোকাদি, বিনাশ-বিহীন, অব্যয়, লোকহিতের জন্য কংসবধার্থে বৃষ্ণিকুলে প্রসূত," নারায়ণকে প্রণাম করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অলৌকিক-তেজঃপুঞ্জ-সমন্বিত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া, হর্ষ-বিস্ময়ফুল্লনয়নে বসুদেব পুত্র-বৎসলা পত্নী দেবকীর হস্ত হইতে সদ্যঃ প্রসূত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া, পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন। উৎসঙ্গে শিশুর গুরুত্ব অনুভব করিয়া, বসুদেব দেবকীর গর্ভ-ভার-বহন ক্লেশের কথা স্মরণ করিয়া, ভাবিলেন—

"বিন্ধ্য-মন্দার-সারোহয়ং বালঃ পদ্ম-দলেক্ষণঃ।
গর্ভে যয়া ধৃতঃ শ্রীমানহো ধৈর্য্যং হি যোষিতঃ॥"

—"অহো! বিন্ধ্য ও মন্দার পর্ব্বতের ন্যায় সারবান, পদ্ম-পলাশ-লোচন, শ্রীসম্পন্ন এই শিশুকে তিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন! সত্য সত্যই, স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য [প্রশংসনীয়]।" পুত্রকে পতির ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া দেবকী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন সত্য, কিন্তু—

"হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা॥" (৩)

—"আকাশে ও জলে [উভয়স্থলে] চন্দ্ররেখা যেমন দ্বিধা-ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, [দেবকীও] তেমন শরীরমাত্র সঙ্গে লইয়া, কিন্তু হৃদয়টি [অত্রস্থিত] শিশুটির উপর সংলগ্ন রাখিয়া, যেন দ্বিধা-ভিন্ন হইয়াই চলিয়া গেলেন।" কংস-রাহুর করাল-কবল হইতে পুত্র-চন্দ্রের রক্ষা-সাধন করিবার জন্য, বসুদেব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন সত্য; কিন্তু, নগর-দ্বার অতিক্রম করিয়া, ঘনীভূত অন্ধকারে তিনি আর পথ দেখিয়া চলিতে পারিতেছেন না।

হঠাৎ দীপিকালোক দর্শন করিয়া, বসুদেব ভাবিতে লাগিলেন—"বুঝি বা, আমি পুত্র লইয়া নগরাপক্রান্ত হইতেছি—ইহা কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়া, দুরাত্মা কংস আমাকে ধরিবার জন্যই দীপ লইয়া অগ্রসর হইতেছে।' ভয়ে তিনি খড়্গনিষ্কাসিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভয় শীঘ্রই অপসৃত হইল। অন্ধকারে পিতা পথ দেখিতে অসমর্থ, তাই, অপক্রমণের সহায়তা বিধান করিবার জন্য, ক্রোড়-স্থিত কুমারই এই দীপ-প্রভা বিস্তার করিয়াছেন। কতক পথ অতিক্রম করিয়া, কাল-বর্ষ-সম্পূর্ণ-তোয়া কলনাদিনী কল্লোল-কোলাহল-মুখরিতা কাল-ভগিনী কালিন্দীর তটে উপস্থিত হইয়া, এত পথগমনের পরিশ্রম ব্যর্থ হইল ভাবিয়া, বসুদেব "কিমিদানীং করিষ্যে" বলিয়া, বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইলেন। গ্রহ-ভুজঙ্গ-সঙ্কুলা দুস্তরা মহোর্ম্মি-মালা-চঞ্চলা যমুনা ভুজ প্লবেই পার হইবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন—কি আশ্চর্য্য! যমুনার জল, দ্বিধা-ছিন্ন হইয়া, পুত্র-সমেত তাঁহার অপক্রমণের পথ করিয়া দিয়াছে। এইরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে অনায়াসে যমুনা পার হইয়া বসুদেব চিন্তায় বিমূঢ় হইলেন—এত রাত্রিতে শিশু লইয়া কোথায় যাইবেন! স্মরণ হইল—যমুনার এপারে সমীপবর্ত্তী ঘোষকুলে তাঁহার বয়স্য নন্দগোপ বাস করেন। কিন্তু, দুরাত্মা কংসের আজ্ঞায়, স্ববন্ধু নন্দকে তিনি, নিজহস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া

(৩) এই শ্লোক—
"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"
কালিদাস-কৃত শকুন্তলা নাটকের এই শ্লোক স্মরণ করাইয়া দেয়।

কশাঘাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে লজ্জিত ছিলেন। আবার, গভীর রাত্রিতে বসুদেব ঘোষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন শুনিলে গোপালকেরা শঙ্কিত হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া তিনি এক ন্যগ্রোধমূলে রাত্রি প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত শিশুটি ক্রোড়ে করিয়া অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে, দূর হইতে ক্রন্দন-ধ্বনি কাণে প্রবেশ করিবামাত্র, বসুদেব কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই বয়স্য নন্দগোপ ক্রন্দন করিতে করিতে বস্ত্র দিয়া প্রচ্ছাদিত করিয়া, কি জানি হস্তে লইয়া, ঘোষ হইতে নির্গত হইতেছেন। সেই বস্ত্র-প্রচ্ছাদিত বস্তুটি কি? বসুদেব-কর্ত্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, নন্দ বলিলেন -"অদ্য অর্দ্ধ রাত্রিতে আপনাদের দাসী—আমার কুটুম্বিনী—যশোদা, জাত মাত্র-মৃত এই কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। প্রসব মাত্রেই যশোদা মোহগ্রস্তা হইয়াছে—মন্দভাগ্যা এখনও জানে না, ভূমিষ্ঠ সন্তান--পুত্র, কি কন্যা। আগামী দিবসে ঘোষকুলে ইন্দ্রযজ্ঞ-নামক উৎসব হইবে। গোপজনেরা আমার দুঃখে দুঃখিত না হয়—এইজন্য এই রাত্রিতেই, নিগড়-ভারে চরণ-চালনে ক্লেশ অনুভব করিয়াও, পিতা হইয়াও এই মৃত কন্যা লইয়া, নিজেই ঘোষ হইতে নির্গত হইতেছি।" বসুদেবের আশ্বাসবাণীতে সমাশ্বস্ত হইয়া নন্দগোপ মৃত কন্যাটিকে ত্যাগ করিলেন। তৎপর, নন্দ বসুদেবকে করণীয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, বসুদেব বলিতে লাগিলেন - "ভাই নন্দ! তুমি ত অবগত আছ যে, দুরাত্মা কংস আমার ছয়টি পুত্রের প্রাণ-সংহার করিয়াছে। আমার ক্রোড়স্থিত শিশুটি আমার সপ্তম পুত্র। এখন তোমার ভাগ্যবশতঃ যদি আমার এই পুত্রটি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া বাঁচিয়া থাকে—তাই, ভাই, তোমার নিকটই ইহাকে রাখিয়া দেও।" নন্দগোপ বসুদেব নন্দনকে ন্যাসরূপে রাখিয়াছেন শুনিলে কংশের আজ্ঞায়—"গতমেব মে শীর্ষম্"—"আমার মস্তক থাকিবে না" এই ভয়ে তিনি প্রথমতঃ সেই শিশুকে রাখিতে অস্বীকৃত হইয়াও, পূর্ব্বকৃত বহু উপকারের প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছায়, নন্দ বসুদেব নন্দনকে রাখিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু, মৃত কন্যা উৎসঙ্গে বহন করিয়াছেন—শৌচের প্রয়োজন—সেই জন্য ঘোষপাংশুদ্বারা শৌচবিধান করিতে যাইয়া, নন্দ, ধরণী ভেদ করিয়া, যুগ-প্রমাণ-সলিলধারা উত্থিত হইতে দেখিয়া, বিস্ময়ে তাহাতে শৌচসমাপন করিলেন; তৎপর, বসুদেব-পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তদীয় দেহভার গুরু বলিয়া অনুভব করিয়া, অতীব বলবান্ নন্দগোপও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কিন্তু, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া, আত্মদেহভার লঘু করিলে পর, তিনি তাঁহাকে বহন করিতে সমর্থ হইলেন। প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিষ্ণুর বাল্যলীলার সহায় হইবার জন্য, দৈত্যমর্দ্দন সমর্থ চক্র, শার্ঙ্গ (ধনু), কৌমোদকী (গদা), শঙ্খ ও নন্দক (অসি)—এই পঞ্চায়ুধ ও বিষ্ণু-বাহন পন্নগাশন গরুড়ও ঘোষে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রোড়স্থিত কুমারের কৃপায় নন্দের পদবন্ধনও খসিয়া গেল। রজনী প্রভাত হইল। বসুদেবও, যাদবকুলের দগ্ধভূয়িষ্ঠশেষ এই ন্যস্ত বীজটিকে রক্ষা করিতে বলিয়া, নন্দের নিকট আনন্দে বিদায় লইয়া, মথুরায় প্রত্যাগত হইতে চাহিলেন। নন্দগোপ তাঁহাকে বলিলেন--"এই শিশু--ঘোষকুলের কাহারও ঘরে ক্ষীর, কাহারও ঘরে দধি, কাহারও ঘরে নবনীত, কাহারও ঘরে পায়স, আবার কাহারও ঘরে তক্র খাইয়া—ঘোষকুলের পতিরূপেই এখানে থাকিবেন।" নন্দও ঘোষে চলিয়া গেলেন। বসুদেব পথিমধ্যে যাইতে যাইতে শিশুর ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া ভাবিলেন—"না জানি, কংসের ভয়ে নন্দই আমার নন্দনকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন!" কিন্তু তিনি নিজের ভ্রম সহজেই বুঝিতে পারিলেন। ক্রন্দন স্বপুত্রের নহে, রাত্রিতে নন্দ নিক্ষিপ্ত সেই কন্যাই প্রত্যাগত-প্রাণা হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। দেবকীর হস্তে এই কন্যা নিক্ষেপ করিয়াই তিনি কংসকে প্রতারিত করিতে মনস্থ করিলেন। এই কন্যার দেহভার অনুভব করিয়াও বসুদেব ইহাকে এক অদ্ভুত প্রাণী মনে করিলেন। সেইরূপই দ্বিধা বিভক্ত জল যমুনা পার হইয়া, তদ্রূপই প্রসুপ্ত মথুরা-পুরীতে তিনি অতি প্রত্যূষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আজ দুরাত্মা কংসের গৃহ জ্যেষ্ঠার আশ্রয়; কিন্তু বসুদেবের গৃহ লক্ষ্মীর আশ্রয়।

রাজপ্রাসাদে অশুভ নিমিত্ত পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। যাঁহার ক্রোধে শক্র নাশ, সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি যাঁহার বশঙ্গত, যিনি যমেরও যম, ভয়েরও ভয়দ, অদ্য সেই পরম-পরাক্রমশালী, মথুরানাথ কংসের নিকট কতকগুলি চণ্ডাল যুবতী কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে তথায় আসিয়া তাঁহার প্রতি অপবাদ-বচন প্রয়োগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজা অভ্যন্তরে যাইতেছেন, এমন সময়ে শ্মশান-

মধ্য হইতে উত্থিত পিঙ্গলাক্ষ, বিকটদশন, মধুক-ঋষির শাপের অধিষ্ঠাত্রী বজ্রবাহু নাম ধারণ করিয়া, চণ্ডালবেশে উল্কা-হস্তে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া—

"কংসস্য রাজ্ঞো হৃদয়ং প্রবেষ্টুম্"

—"রাজা কংসের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে" উদ্যত হইল। চণ্ডালবেশধারী শাপের মুখে তাহার পরিচয় ও তথায় আগমন-কারণ শুনিয়া কংস বলিলেন;—

"সৌবর্ণ-কান্তর-কন্দর-কূট-কুঞ্জং
মেরুং ন কম্পয়তি বায়স পক্ষবাতঃ।
হাস্যোহসি ভোঃ সমকর ক্ষুভিতোর্ম্মিমালং
পাতুং য ইচ্ছসি করাঞ্জলিনা সমুদ্রম্॥"

—"পক্ষীর পক্ষ-বায়ুতে যেমন মেরু কম্পিত হয় না, করাঞ্জলিদ্বারা যেমন সমুদ্রকে পান করিয়া ফেলা সম্ভবপর নহে, সেইরূপ আমার হৃদয়ে তোমার প্রবেশও অসম্ভব"। রাজা দেখিলেন—বজ্রবাহু অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তৎপর কংস শয়ন-কক্ষে যাইয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহাকে প্রসুপ্ত দেখিয়া বজ্রবাহু অলক্ষ্মী প্রভৃতি তাহার পরিজনবর্গ সঙ্গে লইয়া, রাজান্তঃপুরে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। তথায় কংসের রাজ-লক্ষ্মীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। বজ্রবাহু রাজ-শ্রীকে বলিলেন—"বিষ্ণুর আজ্ঞায়, তোমাকে কংসদেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।" বিষ্ণুর আজ্ঞা অনতিক্রমণীয়া মনে করিয়া রাজ-লক্ষ্মী রাজ-তনু ত্যাগ করিয়া অপগত হইলে পর, শাপ [বজ্রবাহু] তাহার ভৃত্যবর্গকে রাজপ্রাসাদে স্বজাতি-সদৃশী ক্রীড়া আরম্ভ করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর কংস প্রতীহারীকে স্বপ্নবৎ-প্রতীয়মান চণ্ডাল-প্রবেশের বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কাঞ্চকীয় সাংবাৎসরিক ও পুরোহিতের নিকট হইতে এই বায়ু-ভ্রান্তি, ভূমি-কম্প, ও উল্কাপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, উত্তর লইয়া উপস্থিত লইলেন। নিমিত্ত-পাঠ-পটু সাংবাৎসরিক ও পুরোহিতগণ বলিয়া পাঠাইলেন—

"ভূতং নভস্তল-নিবাসি নরেন্দ্র নিত্যং
কার্য্যান্তরেণ নরলোকমিহ প্রপন্নম্।
আকাশ-দুন্দুভি-রবৈঃ সমহী-প্রকম্পৈ-
স্তস্যৈষ জন্মনি বিশেষ-করো বিকারঃ॥"

—"হে নরেন্দ্র, নভস্তল-নিবসী সেই নিত্য পুরুষ, কার্য্য-বশতঃ নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া এইস্থানেই বিদ্যমান আছেন। তাঁহার জন্ম হওয়াতেই, আকাশদুন্দুভি-শব্দ সহিত ভূমিকম্প প্রভৃতি [প্রাকৃতিক] বিশিষ্ট বিকার লক্ষিত হইতেছে"। এই কথা শ্রবণ করিয়া কংস কাঞ্চকীয়কে আদেশ করিলেন—"জানিয়া আইস, কাহার জন্ম হওয়াতে সশৈলা বসুন্ধরা অদ্য কম্পিতা হইল"। তিনিও রাজাজ্ঞায় জানিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেবকীর গর্ভে এক কন্যা জন্ম-লাভ করিয়াছে"। বসুদেব তৎক্ষণাৎ রাজ সমীপে আহূত হইলেন। ষট্‌পুত্রের বধে শোক-কৃশ শরীর বহন করিয়া বসুদেব কংস-সমীপে উপস্থিত হইলেন। দেবকীর গর্ভজাত শিশু-পুত্র, কি কন্যা, ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে পর, বসুবেদ কুমার-প্রাণ রক্ষার্থে অসত্য কথাও বলিবেন নিশ্চয় করিয়া, উত্তর দিলেন—

"দারিকা প্রসূতা তয়া"

—"দেবকী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন"। কিন্তু—

"দারিকা বা কুমারো বা হন্তব্যঃ সর্ব্বথা ময়া"

—"কন্যাই হউক, আর কুমারই হউক, তাহাকে বধ করিতেই হইবে"—ইহাই কংস ধার্য্য করিলেন।—

"দারিকাসু স্ত্রীণামধিকতরঃ স্নেহো ভবতি"

—কন্যার প্রতি স্ত্রীলোকের স্নেহ অধিকতর"—সেই জন্য শোকাভিভূতা দেবকী রাজপাদমূলে প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিলেন—রাজা যেন সদয় হইয়া তাঁহার কন্যাটির প্রাণনাশ না করেন। কিন্তু নৃশংস কংস, বসুদেবের পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া, দেবকীর গর্ভজাত শিশুকে স্বহস্তে প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। স্নেহময়ীর জননীর প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। বসুদেব মনে মনে স্থির করিলেন যে, নন্দের অপত্য বিনষ্ট হইতে না দিয়া, ঘোষকুল হইতে স্বপুত্রকে আনিয়াই ভাগিনেয়-বধ-লোলুপ কংসের হস্তে প্রদান করিবেন। সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে,—

"দারিকেয়ং মৃতা পূর্ব্বং পুনরেব সমুত্থিতা।
অস্য বালস্য মাহাত্ম্যান্নৈষা বধমবাপ্স্যতি॥"

—"পূর্ব্বে এই কন্যাটি মরিয়া গিয়াও আমারই পুত্রের মাহাত্ম্যে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল; অতএব এই কন্যা [কখনই] হত হইতে পারে না"। সুতরাং, কন্যাটি রাজসমীপে

বসুদেব-কর্ত্তৃক আনীত হইল। কংস, স্ত্রীবধে কৃত-সংকল্প হইয়া, দেবকীর সপ্তম গর্ভ-জাত কন্যাটির শিশুত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া, ইহাকে অন্য কোন উপায়ে না মারিয়া, একটি শিলাখণ্ডে আঘাত করিয়াই বধ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—

"অস্মিন নাশং গতে গর্ভে মম শান্তির্ভবিষ্যতি,"

—"এই গর্ভজাত শিশু নষ্ট হইলেই আমার শান্তি হইবে"। কিন্তু শিলাতে প্রক্ষিপ্ত শিশুটির একাংশ তথায় পতিত রহিল, অন্যাংশ আকাশপথে উত্থিত হইয়া গেলে। তৎপর, সেই গগনোত্থিত অংশ হইতে সম্ভূত হইয়া, তীক্ষ্ণাগ্র শূলহস্তে লইয়া, কুণ্ডোদরপ্রভৃতি পরিজন সঙ্গে লইয়া, কালরাত্রি-সদৃশী রৌদ্রবেশধারিণী দেবী কাত্যায়নী তথায় উপস্থিত হইয়া, বলিলেন—

"শুম্ভং নিশুম্ভং মহিষং চ হত্বা
কৃত্বা সুরানাহত-শত্রুপক্ষান্।
অহং প্রসূতা বসুদেব-বংশে
কাত্যায়নী কংসকুল-ক্ষয়ায় ॥"

—"শুম্ভ, নিশুম্ভ ও মহিষাসুরকে বধ করিয়া, দেবকুলের অরাতি সমূহের বিনাশ-সাধন করিয়া, কংসকুলক্ষয়ের জন্য বসুদেব বংশে কাত্যায়নী-রূপে প্রসূত হইয়াছি"। কাত্যায়নী, নিজ পরিজনসহ বিষ্ণুর বাল্যচরিত অবলোকন করিবার জন্য, গোপালক-বেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া, ঘোষ-মধ্যেই অবতীর্ণ হইলেন। কংসের সেই কালরাত্রিও প্রভাত হইল। রাজা রাজ্যের শান্তির ব্যবস্থা করিতে শান্তি-গৃহে গেলেন।

এদিকে ঘোষমধ্যে সকল গোপজনই জানিতে পারিয়াছে যে, নন্দগোপ পুত্র ধন লাভ করিয়াছেন। গোপালকেরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে যে, নন্দের এই পুত্রের জন্মকাল হইতে ঘোষকুলে অত্যধিক তৃণজাল উৎপন্ন হইতেছে, গোধনেরা নীরোগ হইতেছে-এমন কি গোপজনগণ-মধ্যে মানসিক প্রীতি ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইতেছে—খাতে খাতে মূল,—গুল্মে গুল্মে ফল উৎপন্ন হইতেছে। বৃন্দাবনে নন্দগোপসুতের শৈশব-লীলা দর্শন করিয়া গোপজনেরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত। নন্দ-গোপীর রূপ ধারণ করিয়া আগতা পূতনা দানবীকে দশরাত্র-প্রসূত নন্দ-নন্দন, তাহার বিষ-লিপ্ত স্তন মুখে টানিয়াই, তাহাকে বধ করিলেন। তৎপর, শকট-বেষধারী শকট-দানবকে একমাসের শিশু পাদপ্রহারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। আর একমাস না যাইতে, শিশু গোপীজনদিগের বড়ই উৎপাত আরম্ভ করে-গোপীজনেরা নন্দগোপীর নিকট অভিযোগ করেন—উপায় না দেখিয়া তিনি পুত্রকে দাম [রজ্জু] লইয়া তাহার উদরে বাঁধিয়া উলুখলে আট্‌কাইয়া রাখেন। তৎপর, বালক উলুখলদ্বারা যমলার্জ্জুনের প্রাণ-নাশ করেন। আধাবন-প্রধাবন-বয়সে দামোদর গর্দ্দভ-বেশধারী ধেনুক-নামা দানবকে বামপাদে ধরিয়া তদ্দ্বারা তালফল পাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, অশ্ববেষধারী কেশীদানবকেও তিনি, মুখে হস্ত-কূর্পর প্রবেশ করাইয়া, বধ করেন। সঙ্কর্ষণ[বলরাম]ও শৈশবে নন্দ-গোপ-বেষধারী প্রলম্ব নামক দানবকে মুষ্টি-প্রহারদ্বারা বিনষ্ট করেন। একদিন বৃন্দাবনে গোপ-কন্যাগণসহ দামোদর হল্লীসক ক্রীড়া করিতেছেন— সমস্ত গোপজনেরা তাহা দর্শন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত। সঙ্গে গোক্ষীর, পাণ্ডুর সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্য গোপালকগণও আছেন। গোপগণ ও গোপাঙ্গনাগণ, নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া, প্রহৃষ্টমনে গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। গীত, বাদিত্র ও নৃত্য-এই তিন কার্য্যই অত্যধিক রূপে চলিতেছে—এমন সময় একটি গোপালক তথায় আসিয়া, অরিষ্টর্ষভ নামক দানবের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া, তাহাদিগকে পলাইতে বলিয়া গেল। দামোদর বলিলেন—"কিমসি সম্ভ্রান্তঃ"—"কোন চিন্তা নাই"—"অহমস্য দর্প প্রশমনং করোমি"—"আমিই ইহার দর্প শেষ করিয়া দিতেছি।" যে দানবের হুঙ্কারে গোপবনিতাগণের গর্ভস্রাব হইত, যাহার খুরাগ্রপাতে সদ্রুমকানন পৃথিবীও কম্পমানা হইত,—সেই অরিষ্টর্ষভ আজ বৃন্দাবনে নন্দগোপ পুত্র দামোদরের বধসাধনে উদ্যত। উগ্ররূপ, মহানাদকারী মহাবল সেই বৃষভ-রূপধারী দানবকে দেখিয়া বালক দামোদর একটু বিচলিত, ভীত বা বিস্মিত হন নাই। বরং, দানবকে সম্বোধন করিয়া, দামোদর বলিয়া উঠিলেন—

"কিমেতদ্ ভোঃ ভয়ং নাম ভবতোঽস্য ময়া শ্রুতম্।
ভীতানামভয়ং দাতুং সমুৎপন্নো মহীতলে ॥"

—"ওহে, ভয় বস্তুটি কি? যাহার কথা অদ্যই প্রথমতঃ তোমার নিকট শুনিতে পাইলাম। ভীত-জনকে অভয় দেওয়ার জন্যই [আমি] মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছি।" দানব

উত্তর করিল—"ভোঃ বালস্ত্বম্। অতঃ খলু ভয়ং ন জানাসি" —"তাই ত, তুমি বালক, সেই জন্যই ভয় কি বস্তু, তাহা জান না"। দামোদর, অপমানিত বোধ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কিং দষ্টঃ কৃষ্ণসর্পেণ বালেন ন নিহন্যতে।
বালেন হি পুরা ক্রৌঞ্চঃ স্কন্দেন নিধনং গতঃ॥"

—"শিশুকৃষ্ণসর্প দংশন করিলে কি কেহ মরে না? [দেখ] পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকেয় বালক হইয়াও ত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিলেন!" কঠিন-প্রস্তর-ময় শৈলদেশও পল্লবাকৃতি-বজ্রপাতে ভিন্ন হইতে পারে। দানব, দামোদরকে আয়ুধ লইয়া অগ্রসর হইতে বলিলে, দামোদর নিজভুজবলে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন—

"গিরিতট-কঠিনাংসাবেব বাহূ মমৈতৌ
প্রহরণমপরং তু ত্বাদৃশাং দুর্ব্বলানাম্।
অথ মম ভুজদণ্ডৈঃ পীড়ামানশ্চ শীঘ্রং
যদি ন পতসি ভূমৌ নাস্মি দামোদরোঽহম্॥"

—"যে বাহুদ্বয়ের অংসদেশ গিরিতটের ন্যায় কঠিন,আমার সেই বাহুদ্বয়ই আমার আয়ুধ—তোমার মত দুর্ব্বলেরই অন্য-প্রকার প্রহরণের প্রয়োজন। যদি, আমার ভুজদণ্ডে পীড়ামান হইয়া তুমি শীঘ্রই ভূপতিত না হও, তাহা হইলে আমার নাম দামোদরই নহে।" তৎপর দামোদর একচরণে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অরিষ্টর্ষভকে বলিলেন "যদি শক্তি থাকে, আমাকে এই স্থান হইতে বিচলিত কর।" বহুচেষ্টাতেও দানব তাঁহাকে স্থান-চ্যুত করিতে পারিল না। বরং স্বয়ং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আশ্বস্ত হইয়া দানব মনে ভাবিলেন, দুষ্প্রসহ এই বালক—

"রুদ্রো বায়ং ভবেচ্ছক্রো বিষ্ণুর্বাপি স্বয়ং ভবেৎ।
অমিথ্যা খলু মে তর্কঃ স এব পুরুষোত্তমঃ॥
যত্র যত্র বয়ং জাতাস্তত্র তত্র ত্রিলোকধৃৎ।
দানবানাং বধার্থায় সংবৃত্তো মধুসূদনঃ॥"

—"হয় রুদ্রই হইবেন, না হয় ইন্দ্রই হইবেন, না হয়ত স্বয়ং বিষ্ণুও হইতে পারেন—আমার এইরূপ তর্ক সমস্তই অমিথ্যা—তিনি নিশ্চিতই সেই পুরুষোত্তম হইবেন। আ, তাইত, যেখানে যেখানে [যে সময়ে] আমরা জন্মগ্রহণ করি, সেখানে সেখানে [সেই সময়ে] মধুসূদনও দানব-বধের জন্য অবতীর্ণ হন।" দানব আরও ভাবিল যে—

"বিষ্ণুণা হতস্যাপ্যক্ষয়োলোকো মে ভবিষ্যতি"।

—"বিষ্ণুর হস্তে হত হইলে আমার অক্ষয়-লোক-প্রাপ্তি হইবে।" অতএব, এই গোপ-বালকের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির। তৎপর, দামোদর, পর্ব্বতশিখর হইতে, দানবকে ধরণী-তলে ফেলিয়া দিলেন। বজ্র-বিদারিত হইয়া চূড়াসহ যেন গিরিবরের পতন সংঘটিত হইল।

তৎপর দামোদর শুনিলেন যে, যমুনার এক হ্রদ হইতে কালিয় নামক মহানাগের উত্থানের কথা শ্রবণ করিয়া সঙ্কর্ষণ পর্ব্বত হইতে নামিয়া তথায় চলিয়া গিয়াছেন। দামোদরও কালিয়নাগের দর্প-দমনের জন্য সেইদিকেই চলিয়া গেলেন। এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ দামোদরকে এই অসম-সাহসকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য ভয়ে চকিত ও ত্রস্ত হইয়া প্রিয়-হিত বচন প্রয়োগে তাঁহাকে যমুনা-হ্রদে প্রবেশ করিতে বারণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানুরাগে তাঁহারা সঙ্কর্ষণকেও বলিয়া দিলেন যেন দামোদর, নাগবধে অগ্রসর না হন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য—

"বিষ-দহন-শিখাভির্ম্মুখাৎ প্রোদ্গতাভিঃ
কপিশিতমশিবাভিশ্চক্রবালং দিশানাম্।
সরভসমভিযান্তং কৃষ্ণমালক্ষ্য শঙ্কী
নময়তি শিরসাস্তর্ম্মণ্ডলং চণ্ডনাগঃ।"

—"যাহার মুখ বিনির্গত অমঙ্গলময় বিষাগ্নিশিখা দিক্‌চক্রবালকে কপিশবর্ণ করিয়া দিত। সেই চণ্ড নাগ, কৃষ্ণকে সবেগে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া মস্তক-মণ্ডল আনত করিতেছে"। দামোদর যমুনা-হ্রদে প্রবেশ করিলেন—হ্রদ হইতে ধূমরাশি উদ্গত দেখিয়া, গোপালকগণ সকলেই চিন্তান্বিত। সঙ্কর্ষণ দেখাইতে লাগিলেন,—তোমরা দেখ—

"দামোদরোঽয়ং পরিগৃহ্য নাগং
বিক্ষোভ্য তোয়ং চ সমূলমস্য।
ভোগে স্থিতো নীলভুজঙ্গমস্য
মেঘে স্থিতঃ শক্র ইবাবভাতি॥"

—"হ্রদের সতল জল বিক্ষোভিত করিয়া নীল-নাগটিকে গ্রহণ করিয়া তাহার ফণার উপর দাঁড়াইয়া, দামোদর যেন মেঘো-পরিস্থিত ইন্দ্রের ন্যায়, শোভা পাইতেছেন।" কালিয়-ভুজঙ্গের পঞ্চফণা ধারণ করিয়া তিনি তাহারই উপর "হল্লীসক"-নৃত্য করিতে লাগিলেন। যাহার রোষাগ্নিতে সমস্ত ভুবন দাহযুক্ত হইতে পারে, সেই কালিয়কে দামোদর

নিজের একটি হস্তমাত্র প্রসারণ করিয়া দিয়া তাহা বিষে দগ্ধ করিয়া, আত্মশক্তির পরিচয় দিতে বলিলেন। কালিয় বিষাগ্নি-মোচন করিল সত্য, কিন্তু ভগবানের গোবর্দ্ধন ধারণ-সমর্থ, মন্দর-পর্ব্বত-তুলাসার, অপ্রতিম-প্রভাব-যুক্ত সর্ব্বলোকাশ্রয় সেই হস্তকে দগ্ধ করে কাহার সাধ্য? কালিয় বলিল—"ভগবন্ অজ্ঞানাদতিক্রান্তবান্, সান্তঃপুরঃ শরণাগতোঽস্মি"—"ভগবন্-অজ্ঞানবশতঃ কৃত আমার এই অতিক্রম ক্ষমা করুন, সপরিজন শরণাগত হইলাম"। কালিয় ভগবানের বাহন গরুড়ের ভয়েই, যমুনা-হ্রদে বাস করিত; ভগবান প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে গরুড়ের নিকট হইতে অভয় দান করিলেন। দামোদর বলিয়া দিলেন যে—

"মম পাদেন নগেন্দ্র চিহ্নিতং তব মূর্দ্ধনি।
সুপর্ণ এব দৃষ্ট্বৈদমভয়ং তে প্রদাস্যতি॥"

—"হে সর্পরাজ, তোমার মস্তকে আমার পদ-চিহ্ন দর্শন করিলেই সুপর্ণ [গরুড়] নিজেই তোমাকে অভয় প্রদান করিবেন"। দামোদরের আজ্ঞায় কালিয় বিষ-সংহার করিয়া, পুনরায় যমুনা-হ্রদে প্রবেশ করিয়া, তথায় বাস করিতে লাগিল। তৎপর দামোদরকে অক্ষতশরীরে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া, গোপাঙ্গনাগণ আহ্লাদে কৃষ্ণ-প্রদত্ত পুষ্পনিচয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। এমন সময়, কংস লোকদ্বারা দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে "ধনুর্মহ"-নামক উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারাও রাজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। দামোদর মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন যে—

"আকৃষ্য কংসমহমদ্য দৃঢ়ং নিহন্মি।
নাগং মৃগেন্দ্র ইব পূর্ব্বকৃতাবলেপম্॥"

—"সিংহ যেমন হস্তীকে আকর্ষণ করিয়া বধ করে—তিনিও তেমন পূর্ব্বকৃত অবমাননার জন্য কংসকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়া বধ করিবেন"।

এদিকে বলরামের সহিত দামোদর ব্রজে বিক্রম ও বীর্য্যের বহু পরিচয় দিতেছেন শুনিয়া, রাজা কংস মনে করিলেন যে, তাহাকে মথুরায় আনাইয়া রঙ্গমধ্যে যুদ্ধ করাইয়া, মল্লহস্তে নিহত করান। ভটমুখে কংস শুনিলেন যে, বলরাম-সহায় দামোদর রজকগণের বস্ত্র জোর করিয়া লইয়া গেলে পর, উৎপলাপীড়-নামক গন্ধহস্তী দ্বারা মহামাত্র তাহার অভিঘাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু বালক দামোদর দন্ত-সমাকর্ষণপূর্ব্বক সেই বলবান হস্তীর বধসাধন করেন। কংস এই বার্ত্তা শুনিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিয়া আসিবার জন্য, রাজা পুনরায় ভটকে পাঠাইয়া দিলেন। ভট এবার দামোদরের অপর একটি অদ্ভুত ক্রিয়ার কথা লইয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, পুষ্পভাণ্ড-হস্তা মদনিকানাম্নী এক কুব্জিকা পথে যাইতেছিলেন, দামোদর স্পর্শমাত্রে তাহার কুব্জত্ব দূর করিয়া দিয়া, মালাকারের দোকান হইতে পুষ্প লইয়া সাজিয়া, ধনুঃশালাভিমুখে [অস্ত্রগারের দিকে] চলিয়া গেলেন। রাজাদেশে ভট পুনরায় যাইয়া দেখিয়া আসিয়া বলিলেন যে, ধনুঃশালায় প্রবেশ করিয়া দামোদর অ-স্থান-রক্ষক সিংহবল-কর্ত্তৃক প্রবেশ-বিষয়ে নিষিদ্ধ হইয়া, তাহার কর্ণমূলে চপেটাঘাত করিয়া, তাহাকে বধ করেন, এবং ধনুঃশালাতে প্রবেশপূর্ব্বক, ধনুঃ দ্বিখণ্ডিত করিয়া, সম্প্রতি সভামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ঐ দেখুন—

"আপীড়-দামশিখিবর্হ বিচিত্রবেষঃ
পীতাম্বরঃ সজলতোয়দরাশিবর্ণঃ।
অভ্যেতি রোষপরিবৃত্তবিশালনেত্রো
রামেণ সার্দ্ধমিহ মৃত্যুরিবাবতীর্ণঃ॥"

—"চূড়াসূত্রে ময়ূর-পিচ্ছসংলগ্ন থাকায় বিচিত্র-বেষ, পীতাম্বর, সজল-জলধর-সমান-বর্ণ [তোমারই] মৃত্যুরূপে [ধরাতলে] অবতীর্ণ, দামোদর ক্রোধে বিশাল-নেত্র-যুগল পরিবর্ত্তিত করিতে করিতে বলরামসহ এইদিকেই আসিতেছেন"। ইহা শুনিয়া, কংস শঙ্কিতহৃদয়ে চানুর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে আহূত করিয়া, গোপালকদ্বয়ের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ দেখিবার জন্য স্বয়ং প্রাসাদে আরোহণ করিয়া বসিলেন। রাজা দেখিলেন, নন্দগোপ-পুত্র শ্যামসুন্দর দামোদর, বিপুল-বক্ষো-বিস্তার করিয়া, নীলাম্বর চন্দ্রধবলমূর্ত্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের সহিত রঙ্গমধ্যে আনীত হইল। দামোদর বলরামকে বলিলেন, "আর্য্য—

"মর্ত্ত্যেষু জন্ম বিফলং মম তানি ঘোষে
কর্ম্মাণি চাস্য নগরে ধৃতয়ে ন তাবৎ।
যাবন্ন কংসহতকং যুধি পাতয়িত্বা
জন্মান্তরাসুরমহং পরিকর্ষয়ামি"॥

—"আর্য্য! যতক্ষণ জন্মান্তরাসুর কংসহতককে যুদ্ধে পাতিত করিয়া পরিকর্ষণ করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ মর্ত্ত্যে

আমার জন্মগ্রহণই বিফল হইতেছে, এবং এই ঘোষকুলে ও নগরে মৎ-সম্পাদিত ক্রিয়াকলাপও আমার মনে কোন সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিতেছে না।" ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া কংসও পূর্ব্বশ্রুত, তাহাদের চরিতাবলীর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারও মনে হইল যে দামোদর,

"লোকত্রয়ং হি পরিবর্ত্তয়িতুং সমর্থঃ"।

—"ত্রিভুবনের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ"। রঙ্গমধ্যে নিযুদ্ধ আরম্ভ হইল—দেখিতে দেখিতে দামোদর সবেগে চাণূরমল্লের নিধন-সাধন করিলেন। সঙ্কর্ষণও মুষ্টিকের প্রাণ-বিয়োগ ঘটাইলেন। অপর দামোদর,—

"কংসাসুরং চ যমলোকমহং নয়ামি"

—"কংসাসুরকেও আমি যম ভবনে পাঠাইতেছি"—এই বলিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিয়া কংসের মস্তক আকর্ষণ করিলেন—এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিগৃহীত করিয়া প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ করিলেন, কংসও —

"বজ্রপ্রভগ্নশিখরঃ পতিতো যথাদ্রিঃ"

—"বজ্রাঘাতে ভগ্ন-শিখর পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন"। তাঁহার অংস, কণ্ঠ, কটি, জানু, কর, উরু, জঙ্ঘা প্রভৃতি গাত্রসন্ধিস্থল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ভর্ত্তৃ-পিণ্ড-নিষ্ক্রয়ের সময় উপস্থিত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বৃষ্ণিযোদ্ধৃগণ হস্ত্যশ্বরথপদাতি চতুরঙ্গ বলসহ অসি, প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি [দ্বিধার অসি] ও কুন্ত লইয়া দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে সাহায্য করিতে আসিতে লাগিল। এমন সময়ে, বসুদেব তথায় উপস্থিত হইয়া, নিজ-পত্নী রোহিণী-গর্ভ-সম্ভূত পুত্র বলরাম ও অপর-পত্নী দেবকী গর্ভ-সম্ভূত দামোদর-কৃষ্ণকে নিজপুত্র বলিয়া মধুরাবাসিগণের সম্মুখে পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন—

"কংসার্থং স্বয়মিহ বিষ্ণুরাজগাম"

—"কংসবধের জন্য বিষ্ণুই মধুরাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন"। বসুদেব লোকডাকাইয়া বলিলেন—

"গচ্ছ শীঘ্রং দমোদরস্যাদেশাদনাবৃষ্টিমাজ্ঞাপয়—মহারাজমুগ্রসেনমপনীয় নিগলান্নির্ব্বর্ত্ত্যাভিষেকং কৃত্বা প্রবেশয়েতি"—"শীঘ্র যাও, দামোদরের আদেশে অনাবৃষ্টি-নামক [গোপালককে] আজ্ঞা কর, যেন নিগড়মুক্ত করিয়া মহারাজ উগ্রসেনের পুনরায় রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করে। কংস-পিতা উগ্রসেন পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উগ্রসেন, বহুকাল পরে, বাসুদেবের প্রসাদে বিপন্মুক্ত হইয়া, বৃষ্ণিরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ, দেবশাসনে কংসনিসূদন মধুসূদনের পূজার জন্য দেবলোক হইতে সেইস্থানে পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

বিস্মিত

[শ্রীমতী অমলাবালা দেবী]

ওহে বিশ্বের ভূপ, সৃষ্টির তব
এ কি অপরূপ রূপ!—
হেরি—সুখের মাঝারে দুঃখ বিরাজে,
দুঃখের মাঝে সুখ!
রহে—হাসির ভিতরে অশ্রু লুকায়ে,
অশ্রুর মাঝে শান্তি;—
কভু—ভ্রান্তির মাঝে সত্য বিরাজে,
সত্যের মাঝে ভ্রান্তি!

কভু—পুণ্য সলিলে পাপের লহরী,
পাপের সলিলে পুণ্য;
কভু—শূন্যের মাঝে বিরাজ হে তুমি,
ধরণী কভু বা শূন্য।
সব—সুখ-দুঃখ আঁধার-আলোক,
নিঠুর-করুণ দৃশ্য;—
ওগো, একসুরে বাঁধা সকল রাগিণী—
একতারে গাঁথা বিশ্ব॥

বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির

[রায়সাহেব আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম. এ., এম. আর. এ. এস.]
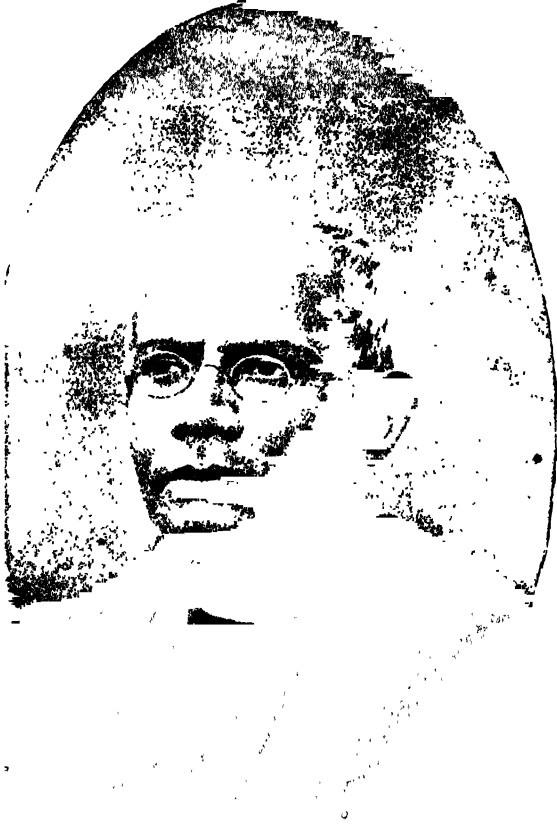
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে প্রস্তাব হইয়াছে যে বঙ্গে এক জ্যোতিষ-মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রস্তাবের উৎপত্তি আকস্মিক। এই হেতু ইহার সম্বন্ধে নানাজনে নানা বিতর্ক করিতেছেন। ইয়ুরোপে বহুকাল হইতে নভোযন্ত্রযোগে বহুপ্রাজ্ঞ জ্যোতিষ-মানকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া দৃষ্টফল পুস্তকে পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং অদ্যাপি সে কর্ম্মে বিরত হন নাই। আমেরিকা, আফ্রিকা, এমন কি অষ্ট্রেলিয়াতেও বৃহৎ বৃহৎ মানমন্দির আছে। এই ভারতবর্ষেও সরকারী মানমন্দির আছে, যেখানে গ্রহ ও তারার গতি ও স্থিতি পরীক্ষিত হইয়া থাকে। এত মানমন্দির থাকিতে, ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদগণের আবিষ্কৃত ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত থাকিতে, বঙ্গে এক নূতন এবং ক্ষুদ্র মানমন্দির নির্ম্মাণের কি প্রয়োজন হইয়াছে?

প্রস্তাবের উৎপত্তি জানিলে প্রয়োজন বুঝিতে পারা যাইবে। বর্দ্ধমান-সম্মিলনের তৃতীয় দিবসে (সোমবারে) প্রাতঃকালে মহারাজার উইলবাড়ী নামক বাড়ীতে এক ছোট সভায় সম্মিলনের কর্ত্তব্য আলোচিত হইতেছিল। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করিয়া সকলের মতামত জানিতেছিলেন। শ্রীপ্রাণানন্দ কবিভূষণ নামে এক পণ্ডিত বঙ্গদেশে সংস্কৃত জ্যোতিষ শিক্ষার ব্যবস্থা ও মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে সম্মিলনকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, দুই বিষয়ই সম্মিলনের বাহ্য। এই হেতু শাস্ত্রীমহাশয় সে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে প্রথমে সম্মত হন নাই। পরে স্মরণ করাইয়া দেন যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষ শেখান হইয়া থাকে। মানমন্দিরের প্রয়োজন আছে কি না, এবং সে সম্বন্ধে কিছু করা যাইতে পারে কি না, তাহা শাস্ত্রীমহাশয় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বেলা ৯টা বাজিয়া গিয়াছিল, মানমন্দিরের প্রয়োজন সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিবার সময় ছিল না। সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষ শিক্ষা হয়, কিন্তু সে নিমিত্ত মানমন্দির নাই। অপর বিজ্ঞান-শিক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মশালা যেমন আবশ্যক, জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত মানমন্দিররূপ কর্ম্মশালা তেমন আবশ্যক। কিন্তু সে বিষয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের বিচার্য্য। সে কথা রাখিয়া আমি পঞ্জিকাসংস্কারের নিমিত্ত মানমন্দিরের প্রয়োজন উল্লেখ করি এবং বলি মাসিক দুই শত টাকা

পাইলে মানমন্দিরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে। সভাস্থলে মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, পঞ্জিকাসংস্কারের নিমিত্ত তিনি বহুকাল যত্ন করিতেছেন; মাসিক দুইশত টাকা ব্যয়ে যদি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিনি সে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাজা বাহাদুরের এই উদার প্রস্তাবে সভায় তাঁহার জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, আমার বক্তব্যও শেষ হইল। কোথা হইতে কি হইল, তাহা ভাবিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আজি দশ বৎসর ধরিয়া যে প্রত্যয় আমায় অধিকার করিয়াছে, প্রবাসী হওয়াতে তাহার কিছুই করিতে পারি নাই। মহারাজা যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা আমি প্রথমে জানিতাম না; কিন্তু বুঝিলাম সৎক্ষেত্রে মর্ত্তেও বীজ-বপন করিলে বীজের উপচয় হয়।

আমার প্রত্যয়টা ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে দ্বারকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যমঠস্বামীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের জ্যোতির্বিগণের এক সভা হইয়াছিল। পঞ্জিকাসংস্কার সে সভার উদ্দেশ্য। আমি সে সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু উপস্থিত হইতে পারি নাই। দেশে পঞ্জিকাসংস্কারের চেষ্টা সফল হইতেছে না কেন, তাহা ইংরেজীতে লিখিয়া * সভায় পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। সভার কার্য্য বিবরণীতে দেখিয়াছিলাম যে, সভা পঞ্জিকা সংস্কারের নিমিত্ত মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক বিবেচনা করেন। বঙ্গদেশ সে সভার উপদেশ পালন করিতে যাইতেছেন। ইহাতে আমাদের আনন্দ হইতেছে।

প্রথমে পঞ্জিকাসংস্কারের কথাই পাড়ি। অনেক বৎসর হইতে বহু আলোচনা বাদ বিসংবাদ হইয়াছে। সভা হইয়াছে, পণ্ডিতগণ বিচার করিয়াছেন। কেহ পঞ্জিকা-সংস্কার আবশ্যক স্বীকার করিয়াছেন, কেহ করেন নাই; কেহ দুই এক বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, কেহ আমূল-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছেন। অনেকে উদাসীন আছেন; কিন্তু শুনিয়াছেন আমাদের পাজী লইয়া কি একটা গণ্ড-গোল চলিতেছে। সেটা কি, সেটার উৎপত্তি কি, মীমাংসা কি, ইত্যাদি জানেন না। কিন্তু যিনি ভারতবর্ষের দুই পাঁচ খানা পাঁজী খুলিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, সকল গণনা সব পাঁজীর মতে সমান নহে। দেশভেদে সূর্য্যের উদয়াস্ত-কালের প্রভেদ হয়, বিলাতী ঘড়ীর সময়ের প্রভেদ হয়, পাজীর তিথিনক্ষত্রেরও হয়। কিন্তু পাজীর গণনায় যে প্রভেদের উল্লেখ করিতেছি, এই প্রভেদ সেরূপ নহে। যখন গণনায় অনৈক্য, তখন সব সত্য হইতে পারে না। হয়ত কোনটা সত্য, হয়ত সবগুলাই অসত্য। এক বঙ্গদেশ হইতে যে সব পাজী প্রকাশিত হয়, সে সবের মধ্যেও সব বিষয়ের ঐক্য দেখা যায় না। অমুক পাঁজী অমুক মতে গণিত, এই পাজী এই মতে গণিত, ইত্যাদি লিখিয়া গণক নিশ্চিন্ত। কিন্তু ইহাতে হিন্দু-গৃহস্থ সন্দেহে, ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় আকুল হইতেছেন। অনেকে সন তারিখ বার জানিতে পাজী দেখেন। অনেকে সন তারিখ বার ছাড়া তিথি নক্ষত্র জানিতে এবং তাহা জানিয়া শুভাশুভ কাল, ব্রত-উপবাসাদির কাল, পুণ্যধর্ম্মকর্ম্মের কাল জানিতে পাজী দেখিয়া থাকেন। আমাদের পাজী কেবল বৎসর মাস তারিখ বারের পঞ্জী নহে; ইহা কালগণনা করে বটে, কিন্তু সেই গণিতকাল ধরিয়া, বার তিথি নক্ষত্রযোগ ধরিয়া, হিন্দুর পূজাপার্ব্বণ, ব্রত উপবাস, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত নিয়মিত করে। এক কথায়, পাজী না থাকিলে হিন্দুর সব অন্ধকার।

পূর্ব্বকালে যখন পাজী ছাপা হইত না, তখন গ্রহাচার্য্য গ্রামে গিয়া পাড়ায় পাড়ায় নবপঞ্জিকা শোনাইয়া আসিতেন। পাড়ার প্রবীণ প্রবীণা বৎসরের স্মরণীয় দিন মনে করিয়া রাখিতেন; অন্য বিষয়, যেমন বিবাহ, উপনয়ন, ব্রত, যাত্রা কাল আচার্য ও পুরোহিত স্থির করিয়া দিতেন। গ্রহাচার্য্য পাজীর গণিতভাগ দিতেন, পুরোহিত-ঠাকুর স্মৃতির ব্যবস্থা করিতেন। চন্দ্রসূর্য্যাদির গণিত না পাইলে পুরোহিত ঠাকুর ব্যবস্থা দিতে পারিতেন না। একারণ পুরোহিত ঠাকুর নিজের নিকটে সঙ্কেতে লেখা নূতন পাজী রাখিতেন।

এখনকার পাজীতে গ্রহাচার্য ও ব্যবস্থাদাতা পুরোহিত ঠাকুরের প্রয়োজন অনাবশ্যক হইয়াছে। ইহাতে গ্রহ গণিত অর্থাৎ বৎসর মাস দিন বার তিথি নক্ষত্র যোগকরণ আছে, এবং তদনুসারে স্মৃতি ও তন্ত্রের, পুরাণ ও ফলজ্যোতিষের ব্যবস্থাও আছে। পঞ্জিকা-প্রকাশকেরা পূর্ব্বকালের গ্রহাচার্য ও স্মার্তাচার্যের ব্যবসায় লোপ করিয়াছেন! ফুল পাজী, ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা প্রভৃতি ইংরেজী-বাঙ্গালা নামের

* Hindu Almanac Reform: A plea for a Hindu Observatory. Dec. 1904.

পাঁজীতে পুরোহিত-ঠাকুরের বৃত্তির ক্ষতি করা হইয়াছে।

পঞ্জিকাসংস্কার-অর্থে পঞ্জিকার গণিত-ভাগের সংস্কার। আজি জ্যৈষ্ঠমাসের ২৫ দিন কি না, আজি একাদশী কি না, আজি একাদশী ২৯ দণ্ড আছে কি না, আজি রেবতী নক্ষত্র কি না, আজি রেবতী নক্ষত্র এত দণ্ড এত পল কি না, এই সবের বিচার ও নির্ধারণ। আজি যে তিথি নক্ষত্র এবং তিথি নক্ষত্রের পরিমাণ লিখিত আছে, তাহা অশুদ্ধ হইলে স্মৃতি ও তন্ত্র ও ফলজ্যোতিষের ব্যবস্থা অশুদ্ধ হইবে। অতএব চন্দ্রসূর্য্যাদি-গ্রহগণনা পাঁজীর লক্ষ্য। ইহাই পাঁজীর মূল; পাঁজীতে লিখিত অপর সকল বিষয় সেই মূলের উপর ভর করিয়া থাকে।

পাঁজীর গণিতভাগ শুদ্ধ কি না, তাহা জানিবার উপায় কি? পাঁজীর গণিতের পরীক্ষা কি? প্রত্যক্ষফল ইহার পরীক্ষা। যেমন সূর্য দেখিয়া বলি সূর্যের উদয় হইয়াছে, উত্তরদিকে আমাদের দেহের ছায়া পড়িতে দেখিলে বলি মধ্যাহ্ন হইয়াছে, ছায়ার দিক দেখিয়া বলিতে পারি ঘড়ী ঠিক আছে, তেমন আমাদের চন্দ্র সূর্য দেখিয়া তারা হইতে অন্তর মাপিয়া বলিতে পারি পাঁজীর লিখিত তিথিনক্ষত্র-গণিত শুদ্ধ কি অশুদ্ধ।

বস্তুতঃ যেখানে চন্দ্র সূর্য সাক্ষী, সেখানে পরীক্ষার অভাব কি? সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় একদিন, এবং সূর্যোদয় হইতে দণ্ডাদি পরিমিত হয়। আজি দিবামান ৩৩ দণ্ড ২৮ পল কি না, তাহা ঘড়ী ধরিয়া অনায়াসে পরীক্ষা করিতে পারি। এক তারা হইতে গিয়া সে তারার নিকটে আসিতে সূর্যের যত দিন দণ্ড পল বিপল লাগে, তাহা আমাদের বৎসরের পরিমাণ। বর্ষপরিমাণ এত কি না, তাহা সহজে নিরূপিত হইতে পারে। সূর্যের পথ ১২ ভাগে ভাগ করিলে পাই ১২ রাশি। এক এক রাশি গমন করিতে সূর্যের যত দিন দণ্ডাদি লাগে, তাহা বৈশাখাদি মাসের পরিমাণ। কোন্ মাসে কত দিন দণ্ড পল, তাহা পরিমাণ করা কঠিন নহে। সূর্যের নিকটে ও সম্মুখে চন্দ্র আসিলে অমাবস্যা বলি। সূর্য্য হইতে চন্দ্র ১৩ অংশ (ডিগ্রি) দূরে যাইতে যত দণ্ড পল লাগে, তাহা তিথির পরিমাণ। প্রথম ১২ অংশ অন্তরের নাম প্রতিপদ, দ্বিতীয় ১২ অংশ অন্তরের নাম দ্বিতীয়া, ইত্যাদি। কখন্ কোন্ ১২ অংশ অতিক্রান্ত হইল, তাহা যন্ত্রযোগে মাপিতে পারা যায়। রবির পথ ২৭ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র। প্রথম ভাগের নাম অশ্বিনী, দ্বিতীয় ভাগের নাম ভরণী, ইত্যাদি। চন্দ্র যে দিন যে ভাগে থাকেন, তাহা পাঁজীর নক্ষত্র। ইত্যাদি। অতএব মানমন্দিরে চন্দ্রসূর্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে পাঁজীর শুদ্ধাশুদ্ধের পরীক্ষা হয়। যেমন দেখিলাম, পাঁজীতে তেমন লিখিত থাকিলে, দৃক অর্থাৎ দৃষ্টির সহিত গণিতের ঐক্য হইলে, পাঁজী শুদ্ধ।

চন্দ্র সূর্যের গতি দেখিয়া, মাপিয়া, পুনঃ পুনঃ মিলাইয়া গতির ক্রম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে গ্রন্থে হইয়াছে, তাহার নাম জ্যোতিষসিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত-সাহায্যে পাঁজী অর্থাৎ পাঁজীর তিথিনক্ষত্রাদি গণনা করিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন, সিদ্ধান্তে চন্দ্র সূর্যের গতি গণিবার যে সূত্র আছে, তাহা ধরিয়া গণনা কর, বৎসর মাস তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি গণনা সব ঠিক হইবে। সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া দেখ পাঁজীর গণনা ঠিক কি না; প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ আমাদের পাঁজীর মূল সূর্য-সিদ্ধান্ত; যেমন তেমন সিদ্ধান্ত নহে, স্বয়ং সূর্য সে সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পিতা পিতামহ এই সিদ্ধান্ত মানিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহা আমাদেরও মান্য। সূর্যসিদ্ধান্ত মানুষ-প্রণীত নহে যে ইহাতে ভুল থাকিবে; ইহা ঋষি-প্রণীত অপেক্ষাও বিশ্বাস্য, কারণ ইহা দেব-প্রণীত।

প্রথম পক্ষ প্রত্যক্ষবাদী, দ্বিতীয় পক্ষ আপ্তবাদী। পঞ্জিকাসংস্কারের বিরোধ, প্রত্যক্ষ ও আপ্তপ্রমাণের বিরোধ, শাস্ত্র শব্দের অর্থে বিরোধ। যে অর্থে মনুস্মৃতি শাস্ত্র নাম পাইয়াছে, সে অর্থে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তশাস্ত্র হইতে পারে কি? আয়ুর্বেদও শাস্ত্র; অথচ কে না জানে জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত ও আয়ুর্বেদ প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অভাবে অনুমান-প্রমাণ, অনুমান-প্রমাণের অভাবে আপ্তপ্রমাণ গ্রাহ্য। যেখানে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সুলভ, সেখানেও কি আপ্তপ্রমাণ মানিতে হইবে? স্বমতপোষক ও পর-মতদূষককে উদাসীন বলিতে পারা যায় কি?

আমি আপ্তবাদীকে শ্রদ্ধা করি। জানি তাঁহারা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, "আমাদের সাধ্য কি সেকালের মুনিঋষির

সমকক্ষ হই। আমরা অল্পজ্ঞান বা অজ্ঞান; আমরা নূতন শাস্ত্র করিতে পারি না। শাস্ত্রে কি আছে, কি নাই, তাহাই বুঝিতে ও ব্যখ্যা করিতে পারি। ব্যাখ্যা গ্রহণ করা বা না করা আপনাদের ইচ্ছা; কিন্তু আমরা শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। অতএব পাঞ্জী যেমন গণা হইতেছে, তেমনই হউক; অন্যথা করিলে ধর্ম্মহানি হইবে।"

কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী বলেন, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতেছি না। গ্রহ চরিত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে বলিয়া সে গ্রন্থ আপ্তবাক্য হইতে পারে না। প্রমাণ দেখুন। (১) সূর্য্যসিদ্ধান্তেই আছে, যুগের পরিবর্ত্তন হেতু কালের প্রভেদ হয়; অর্থাৎ গ্রহদিগের গতিকালের প্রভেদ হয়। অতএব সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের পক্ষে ঠিক হইবে না। ইহার কারণও স্পষ্ট। গ্রহাদি এত সূক্ষ্ম জানা যাইতে পারে না যে, যুগ যুগান্তরেও অঙ্কের ন্যূনাধিক ঘটিবে না। অতি অল্প ত্রুটিও বহুকালে বাড়িয়া উঠে। (২) সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে, সত্যযুগের অল্প অবশিষ্ট থাকিবার সময় সূর্য্যের অংশে এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া ময় নামক মহাসুরকে এই সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সে আদি-সিদ্ধান্তের পর ত্রেতাযুগের ১৩ লক্ষ ও দ্বাপরের ৯ লক্ষ, অন্ততঃ ২২ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে। তৎকালে দৃষ্ট গ্রহগতিকালে কিছুমাত্র ভুল না থাকিলেও জগতের পরিবর্ত্তনে এখন সে কালে নিশ্চয় অন্তর ঘটিয়াছে। এই কথাই "যুগভেদে কালের প্রভেদ হয়।"—(৩) সূর্য্যসিদ্ধান্ত দূরে থাক, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, যাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই সংস্কার হইয়াছে। (৪) বস্তুতঃ সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থেই প্রকাশ, পূর্ব্বে যে মত ছিল, তাহার ভ্রম দেখাইয়া নূতন মত স্থাপনা। জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে, কালান্তরে সংস্কার আবশ্যক না হইলে, এদেশে একটী সিদ্ধান্ত থাকিত, বহু রচিত হইত না। (৫) আমরা এক সূর্য্যসিদ্ধান্ত দেখিতেছি, বরাহ এক সূর্য্যসিদ্ধান্ত দিয়া গিয়াছেন। এই দুই সিদ্ধান্ত অবিকল এক নহে। এস্থলে কোন্‌খানা মানা যাইবে? (৬) আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের সব মানিতেছি, এমন নহে। আমাদের পাঞ্জীর সব অংশ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ধরিয়া গণিত হইতেছে না। (৭) ভারতবর্ষের যাবতীয় পাঞ্জী সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণিত হয় না। কিন্তু ইহাতে কাহারও ধর্ম্মহানি হইতেছে না। (৮) প্রাচীন সিদ্ধান্তের সংস্কার শাস্ত্রসম্মত, তাহা ওড়িশার ৺চন্দ্রশেখর সিংহ তাঁহার সিদ্ধান্তদর্পণ রচনাদ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পুরীতে জগন্নাথদেবের নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় নীতি সিদ্ধান্তদর্পণ অনুসারে হইতেছে। ইত্যাদি।

অনেক আপ্তবাদী যুক্তিতর্ক মানেন না; অনেকে মানেন, কিন্তু নূতনকে পুরাতনের স্থানে বসাইতে সম্মত হন না। নূতনের প্রতি সন্দেহ আমাদের স্বাভাবিক, কারণ নূতন আমাদের পুরাতনের তুল্য জ্ঞাত নহে। তথাপি যখন চন্দ্রসূর্য্যোদয়াস্ত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, গ্রহের সমাগম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন তাহা অস্বীকারও করিতে পারি না। এইরূপে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে আপ্তবাদী, কোন কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষবাদী হইয়াছেন। ইহারা প্রত্যক্ষাপ্তবাদী। পাঞ্জীর যে সব বিষয় দৃশ্য, সে সব বিষয়ে প্রত্যক্ষবাদী; যে সব বিষয় অদৃশ্য, সে সব বিষয়ে আপ্তবাদী। ইহারা বলেন, আকাশে রবির পথ আঁকা নাই; কখন্ রবি এক রাশি অতিক্রম করিতেছেন, কখন্ দ্বাদশ রাশি করিতেছেন, তাহা ত দেখিতে পাই না। কখন কোন্ তিথি হইয়া কত সময় থাকে, কখন চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে থাকেন, তাহা দৃশ্য নহে। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্তপ্রমাণ গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

কথাটা একটু তলাইয়া দেখা যাউক। রবিপথ, রাশি, তিথি, নক্ষত্র অদৃশ্য বটে; কিন্তু মানসচক্ষেও কি অদৃশ্য? প্রাচীনেরা সূর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তারা হইতে অন্তর মাপিয়াজুখিয়া বর্ষ-পরিমাণ,মাস-পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিথি ও নক্ষত্র অদৃশ্য; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য তারা দৃশ্য। এই যে কলমে লিখিতেছি, ইহার ভার কোথায় নিহিত, তাহা জানি না। কিন্তু তুলাযন্ত্রে ইহার ভার জানিতে পারি। বিদ্যালয়ে বালকেরা অঙ্ক কষে; রাম ঘণ্টায় এক মাইল, শ্যাম দুই মাইল বেগে চলিতে থাকিলে রামশ্যামের অন্তর কখন্ দশ মাইল হইবে, তাহা বলিতে পারে। যদি কেহ সেই সময়ে রাম-শ্যামের অন্তর মাপিয়া দেখে যে, অন্তর দশ মাইল নহে, তখন এই অনুমান করি যে, (১) অঙ্ক কষায় ভুল হইয়াছে, (২) রাম-শ্যামের বেগ নিরূপণে ভুল হইয়াছে, (৩) কিংবা দুই-তেই ভুল হইয়াছে। ভুলের কারণ যাহাই হউক, ভুল হইয়াছে কি না, তাহা মাপিয়া দেখিলেই চুকিয়া যায়। ঠিক এই কথা একদিন

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখরের সহিত হইতেছিল। আমি বলিতেছিলাম, পাঁজীতে যে তিথির পরিমাণ এত দণ্ড হইতে এত দণ্ড লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাহা তিনি কি প্রমাণে পরিবর্তন করিলেন? তিনি যাহা উত্তর করিলেন, তাহা স্মরণ রাখা উচিত। তাঁহার উত্তর, "বচন দ্বারা প্রত্যক্ষানুভব পরাভূত হয় না; তিথির পরিমাণ এত, তাহা প্রত্যক্ষানুভব করিতেছি।" বস্তুতঃ তিথি দৃকতুল্য হইতেছে কি না, তাহা দেখিলেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়। সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রহগণিত দৃকতুল্য করিতে হুকুম করিয়াছেন। সে উপদেশ ছাড়িয়া কাহার কথায় দৃশ্য ও অদৃশ্য তিথি—দুই প্রকার তিথি গ্রহণ করিতে হইবে? বৎসর মাস দিন তিথি নক্ষত্র যোগ—সবই অদৃশ্য। ফলে দাঁড়াইবে, যেটা দৃকতুল্য না হইবে সেটা অদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে কি? গ্রহণ গণনায় এক তিথি, দৈবকর্মে আর এক তিথি? কথাটা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

কেহ কেহ বলেন, আপ্তবাদী পঞ্জিকাসংস্কারের বিরোধী নহেন। কারণ তাঁহারা আমাদের শাস্ত্র উপহসনীয় করিতে পারেন না। এখন কলেজে কলেজে যুবকেরা জ্যোতিবিদ্যা শিখিতেছেন। ইহাঁরা ঘরে পাজীতে এক, বাহিরে অপর, জ্যোতির্বিদ্যা পাইলে সত্যের প্রতি ধাবিত হইবেন, ঘরের পাজী ছেলে-ভুলানা বহি মনে করিবেন। ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে না। আমার বিশ্বাস, আপ্তবাদী উদাসীন না হইলে প্রত্যক্ষবাদী হইতেন। কারণ তাঁহারা ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের অবমাননা সহিতে পারেন না। যাহাতে সে শাস্ত্র চিরদিন অভ্রান্ত সত্য থাকে, তাহাতে তাঁহারা সচেষ্ট আছেন। একারণ কেহ কেহ বলেন, পঞ্জিকা ব্যবসায়ী পঞ্জিকাগণক—ইহাঁরাই প্রকৃত বিরোধী। কেন বিরোধী, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। পঞ্জিকা-সিদ্ধান্ত জানেন বোঝেন; পঞ্জিকা গণিবার সারণী (tables) লাগাইতে জানেন। পঞ্জিকাসংস্কার অর্থেই কেহ নূতন গণিত, নূতন সারণী গ্রহণ। ইহাঁরা নূতন জ্যোতিষ জানেন না, নূতন সারণী বিনা শিক্ষায় লাগাইতে পারিবেন না। সুতরাং নূতন চলিত হইলে তাঁহাদের অর্থ ও যশ লুপ্ত হইবে। এই অনুমান সত্য কি না, জানি না। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ দেশের জ্যোতিষীই এতকাল জ্যোতিষ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা দেশের মান না রাখিলে কে রাখিবে? তাঁহারা মিথ্যাভয়ে ভীত হইলে সমাজের গতি কি হইবে? পাজী লইয়া কোলাহল কতকাল চলিবে? যদি বৃত্তিলোপের আশঙ্কা পঞ্জিকাসংস্কারের বিরোধের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে সে আশঙ্কা যথাসাধ্য দূর করা আবশ্যক। কারণ যাহাই হউক, বিরোধে দেশের হিত হইয়াছে। বিরোধীগণ প্রাচীনকে ধরিয়া রাখিয়া নবীনের হঠকারিতা নিবারণ করিয়াছেন, নবীনকে ভাবাইয়াছেন, নিজেরাও ভাবিবার অবসর পাইয়াছেন।

কেহ কেহ অধীর হইয়া বলেন, "পাজীতে কালগণনা হয়; যে কাল ঠিক জানিতেছি, তাহা গ্রহণ না করিয়া সকলের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি কেন? ইংরেজী সন তারিখ দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িতেছে, ইংরেজী জ্যোতির্বিদ্যা নাবিক পঞ্জিকা দেখিয়া আমাদের পঞ্জিকা প্রণয়ন করুন; যাহারা ঝগড়া করিতেছেন, তাঁহারা ঝগড়া করিতে থাকুন।" আমি এই নীতি অনুমোদন করিতে পারি না। দেশকে ছাড়িয়া, প্রাচীনকে ত্যাগ করিয়া আমাদের দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই; সমাজকে অপমান করিলে আমাদেরই অপমান হইবে। এ ছাড়া বিশেষ আপত্তি আছে। পাঁজী কাল-পরিমাণ করে; কিন্তু সে কালে কেবল দেবকার্য পিতৃকার্য নহে, লোক ব্যবহার নিয়মিত হইতেছে। আজি আমি ২৫ জ্যৈষ্ঠ, তুমি ২৪ জ্যৈষ্ঠ, তিনি ২৬ জ্যৈষ্ঠ গণিলে পাজীর দিনগণনা নিরর্থক হয়। আজি একাদশী; তুমি তাহা মান আর নাই মান, উপবাস কর আর নাই কর; আজি যে ১৩২২ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, তাহা না মানিয়া উপায়ান্তর নাই। ভুল হইলেও মানিতে হইবে। নতুবা সমাজ চলিতে পারে না। পারলৌকিক ব্যতীত ইহলৌকিক কার্যেও যখন পাজীর প্রয়োজন, তখন লোকবল চাই। সে কালের হিন্দুরাজা থাকিলে লৌকিক কাজের পাজী অক্লেশে ইচ্ছামতন পরিবর্তন করিতে পারিতেন। সে রাজার অধিকার এখন সমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অতএব ভুল হউক ঠিক হউক, যে পাজী বহুজনে মানে, সে পাজীই দেশের পাজী, এবং সে পাজীর সংস্কারে দেশের লোকের মত নিশ্চয় চাই। এমন কি, অনেক বিষয়ে

কেবল বঙ্গদেশ নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পাজীর ঐক্য দেখিতে চাই। সে বৎসর বাঙ্গালা পাজাতে ও ওড়িয়া পাজীতে রথযাত্রার দিনে একমাস অন্তর ঘটিয়াছিল। বঙ্গ-বিহার অযোধ্যা পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের যাত্রী স্ব স্ব দেশের পাজী দেখিয়া রথযাত্রার নিমিত্ত পুরীযাত্রা করিয়া কি বিষম ক্লেশে পড়িয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে বলিতে হয়, পাজীর সংস্কার না হয় নাই হউক, পাজীর ঐক্য হউক। ভিন্ন প্রদেশের স্বজনবন্ধুকে পত্র লিখিতে বসিলে ইংরেজী সন তারিখ লিখিতে হইতেছে। কারণ সে প্রদেশের পাজীর সন তারিখ আমাদের বাঙ্গালার তুল্য না হইতে পারে। দেশে সন তারিখের ঐক্যসাধন অসম্ভব কি ?

কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন যে, পাজীতে যে ভুল থাকিতেছে, তাহা কিরূপে জানিলে ? প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন, ভুল প্রত্যক্ষ হইতেছে। সব ভুল নিজেরা ধরিতে পারি না ; কারণ ভুল ধরিবার বিদ্যা বুদ্ধি যন্ত্র নাই ; কিন্তু ইংরেজী জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া দেখিতেছি, ইংরেজী নাবিক পঞ্জিকার সহিত মিলাইয়া দেখিতেছি, এবং জানিতেছি আমাদের পাজীর গণনা সব ঠিক নহে। ইংরেজী নাবিকপঞ্জিকা মুখ্যতঃ নাবিকদিগের নিমিত্ত গণিত ও প্রকাশিত। সে পাজীর গণিত যে সত্য, তাহাতে সংশয় নাই। কারণ যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য তাহা সে দেশে যেমন, এদেশেও তেমন প্রত্যক্ষযোগ্য। প্রত্যহ আকাশে গ্রহ-বেধ করিয়া সে পঞ্জিকা মেলানা হইতেছে। ইংরেজের মতন এক বিদ্বান ও বণিক জাতি যে পাজীর ভরসায় অকূল সমুদ্রে গমনাগমন করিতেছে, তাহা যে কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, কত অর্থব্যয়ে গণিত হইবে, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারি। জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিজ্ঞান-বিশেষ। দেশভেদে বিজ্ঞানের ভেদ হয় না। আমাদের আপ্তবাদীগণ এই উত্তরে তৃপ্ত হন না। কারণ ইহা একপ্রকার আপ্তবাদ। অমুকে বলিতেছে, অমুক পুস্তকে লিখিত আছে, অতএব তাহা মান্য বলা আপ্তবাদ বই আর কি ? যদি আপ্তপ্রমাণই মানিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মুনিঋষির প্রমাণ না মানিয়া ম্লেচ্ছপ্রমাণ মানিব কেন ? আমাদের কোন কোন আপ্তবাদী এমনও বলেন যে, ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান-বলে নানা অসাধ্য সাধন হইতেছে বটে, কিন্তু তা বলিয়া বিজ্ঞান নাম দিয়া কি সবই সত্য প্রচারিত হইতেছে ?

এখন আমার প্রত্যয়টা প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল ; আমি আপ্তবাদী ও সংশয়বাদীকে মানমন্দিরে পাজীর গণনা সত্য কি মিথ্যা তাহা প্রত্যক্ষ করাইতে চাই। তাঁহারা নিজে বেধ করুন, দেখুন, কি দাঁড়াইয়াছে। দেখিবার পরেও যদি সংশয় থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের উপদেশে দেশ অবশ্য চলিবে। তাঁহারা যেমন আমিও তেমন আমাদের প্রাচীন সিদ্ধান্ত মান্য করি ; সে সিদ্ধান্তের জন্য গর্ব্ববোধ করি ; যখন অন্যদেশ অন্ধকারে ঘুরিতেছিল, তখন আমাদের দেশ জ্ঞানের দীপ দেখাইয়া সে সব দেশকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। এ সব সত্য ; কিন্তু সে ত বহুদিনের কথা, এখন পুরাণের কথায় দাড়াইয়াছে। পুরাতন জ্ঞানের পর কত নূতন জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তের পর সিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে ; কিন্তু এখন আবার নূতন সিদ্ধান্ত রচনার সময় হইয়াছে। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় রাঘবানন্দ, সূর্যসিদ্ধান্তের গ্রহগণিতে বীজ যোগ করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় গ্রহচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গ্রহগণিতে কাল লইয়া কথা। এখন ঘড়ীতে কাল যত সূক্ষ্ম ও সহজে নিরূপিত হইতেছে, তখন তত হইত না ; একালে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রযোগে যত সূক্ষ্ম বেধ হইতেছে, সে কালে দূরবীক্ষণের অভাবে তাহা হইতে পারিত না। পূর্ব্বকালে দেশান্তর জানিতে কি কষ্ট করিতে হইত। কষ্ট করিয়াও ঠিক ফল পাওয়া যাইত কি না, সন্দেহ। একালে টেলিগ্রাফে সে কষ্ট অনুভব করিতে দেয় না। যখন প্রাচীন সিদ্ধান্ত মিলাইবার এইরূপ নানা সুযোগ জুটিয়াছে, তখন তাহা হেলায় হারাইলে আমাদের নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশিত হইবে। এখন একটা সামান্য মানমন্দিরে, এমন কি একটা ভাল ঘড়ী ও ইঞ্জিনীয়রের একটা "থিয়োডো-লাইট" দ্বারা যাহা সম্ভাব্য হইয়াছে, পূর্ব্বকালে তাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। জয়সিংহ কি বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র করাইয়াছিলেন ! অথচ সে সব করাইতে ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্য নিশ্চয় লইতে হইয়াছিল। তখনকার ক্ষুদ্র যন্ত্রে আর এখনকার ক্ষুদ্র যন্ত্রে আকাশপাতাল প্রভেদ হইয়াছে। আমাদের কাজের নিমিত্ত ইয়ুরোপের বৃহৎ মানমন্দির, কিংবা বৃহৎ যন্ত্র আবশ্যক হইবে না। আমাদের মানমন্দিরে সিদ্ধান্তের যন্ত্রও থাকিবে। আমার বিশ্বাস, নূতন যন্ত্রে একটু অভ্যাস হইলে সে কালের স্থূলযন্ত্র কেহ আর চাহিবেন না। যাঁহারা

পঞ্জিকা গণনা করিতেছেন, তাঁহাদেরই দুই তিন জন বেধক নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ তাঁহাদেরই নিমিত্ত মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাঁহারাই নূতন সংশোধিত পঞ্জিকা গণনা করিবেন। অন্যে যাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যা শিখিতে চাহিবেন, তাঁহারাও সময়মত মানমন্দিরে আসিয়া দৃগ্‌জ্যোতিষ শিখিবার সুযোগ পাইবেন। এইরূপে আমাদের সিদ্ধান্তরীতিতে দেশে জ্যোতিষচর্চ্চার সম্যক্ ব্যবস্থা হইতে পারিবে। বেধক মহাশয়দিগের সাহায্যার্থে সংস্কৃত সিদ্ধান্তে ও ইয়োরোপীয় সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ একজন থাকিবেন। এক পঞ্জিকাসংস্কার সমিতি হইবে। এই সমিতির সম্পাদক উক্ত অভিজ্ঞ হইবেন এবং টোলের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ও ইংরেজী-শিক্ষিত দেশহিতৈষী এবং মানমন্দিরের বেধকগণ সদস্য হইবেন। এই সমিতি চয়মাস অন্তর বেধফল প্রচার করিবেন; প্রচলিত পঞ্জিকার গণনার সহিত মিলাইয়া কোন্ বিষয়ে কত অন্তর পড়িতেছে, তাহা সাময়িক-পত্রে প্রকাশ করিতে থাকিবেন। সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করাইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পঞ্জিকাকার মহাশয়গণের নিকট পাঠাইবেন, দেশের পঞ্জিকার ঐক্যসাধন বিষয়ে যত্ন করিবেন। দুই তিন বৎসর পরে সমিতি নূতন গ্রহগণিত ও পঞ্জিকা-গণনার সারণী প্রকাশ করিতে পারিবেন। এই সারণী দেখিয়া পঞ্জিকা প্রকাশকগণ পাঁজী গণাইয়া স্মৃত্যাদির ব্যবস্থা দিয়া ইচ্ছামত নূতন পাঁজী প্রকাশ করিতে পারিবেন। নূতন গ্রহগণিত রচিত হইলেই মানমন্দিরের প্রয়োজন সমাপ্ত হইবে না। দেশে চিরদিন পাঁজী থাকিবে; জ্যোতির্বিদ্যারও শেষ হইবে না, মানমন্দিরেরও কার্য্যের শেষ হইবে না।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, পঞ্জিকাসংস্কার সহজে সিদ্ধ হইবে। আমাদের সিদ্ধান্ত না থাকিলে, পাঁজী না থাকিলে, পঞ্জিকাসংস্কার সহজে হইতে পারিত। অল্প চিন্তা ও শ্রমের দ্বারা জীর্ণ পুরাতন অট্টালিকার সংস্কার করিয়া নূতন কালোপযোগী করিতে পারা যায় না। পুরাতনের প্রতি আমাদের মায়া স্বাভাবিক; এদিকে নূতনের তাড়নাও অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। পুরাতন ও নূতনের সঙ্গতি-সাধন অল্পদিনে হয় না। পাঁজীর সম্বন্ধে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করুন, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইল যে আমাদের প্রচলিত বর্ষ-পরিমাণ কিছু দীর্ঘ। আমরা বর্ষ-পরিমাণ প্রত্যক্ষের তুল্য করিব, কি যেমন চলিতেছে তেমন রাখিব? যদি সত্যের প্রতি ধাবিত হই, তাহা হইলে নূতন বর্ষ ও পুরাতন বর্ষের ঐক্য থাকিবে না, পুরাতনকাল-গণনা পুরাতন মতে, নূতন-কাল গণনা নূতন মতে করিতে হইবে। বলিতে হইবে, শক ১৮৪০ অব্দের পূর্ব্বের বৎসর গণিতে হইলে পুরাতন সিদ্ধান্ত-বিধি, পরের বৎসর গণিতে হইলে নূতন সিদ্ধান্তবিধি গ্রাহ্য। রক্ষা এই, চারি পাঁচশত বৎসর গত না হইলে একদিনের প্রভেদ পড়িবে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর সমস্যা আছে। সেটা জ্যোতিষীগণের নিকট সায়ন ও নিরয়ন গণনা নামে খ্যাত। কথাটা সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য আকাশের যেখানে আসিলে নববর্ষারম্ভ হইত, এখন সেখানে হয় না, প্রায় ২২ অংশ (ডিগ্রি) পশ্চাতে হইতেছে। আজিকালি সবাই জানে, ইংরেজী ২১ মার্চ্চ দিবারাত্রি সমান হয়। এই সমান দিবারাত্রির দিন প্রকৃত বর্ষারম্ভ। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই দিনই বর্ষারম্ভ হইত। কেন এখন হয় না, সে কথার প্রয়োজন নাই। যদি সত্য ধরেন, প্রাচীন বিধি মানেন, হইলে এক বৎসর হইতে প্রায় ২২ দিন কাটিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতে হয়। সে বৎসর প্রচলিত মতে যে দিন ৮ই চৈত্র, নূতন মতে ১লা বৈশাখ ধরিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র থাকিবে না, উত্তরভাদ্রপদ প্রথম হইবে; মেষ প্রথম রাশি থাকিবে না, মীন প্রথম হইবে; বৈশাখ প্রথম মাস থাকিবে না, চৈত্র প্রথম হইবে। যদি সত্য না ধরেন, লোক ব্যবহারই প্রধান মনে করেন, তাহা হইলে কিন্তু নববর্ষদিন প্রভৃতি সব নাম কৃত্রিম হইবে। এখন আমরা কৃত্রিম নামেই চলিতেছি; বলিতেছি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুইমাস গ্রীষ্মকাল ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে চৈত্র বৈশাখ দুইমাস গ্রীষ্মকাল বলা কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিবর্ত্তন যে নূতন, তাহাও নহে। অনেকে সংস্কৃত পুস্তকে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু দেখিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বকালে, বেদের কাল হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নক্ষত্র-গণনা, মাস গণনা, মাসের সহিত ঋতুগণনার পরিবর্ত্তন অনেকবার হইয়াছিল। লোকে প্রথম প্রথম প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যকে স্বীকার করে। সমাজ পুরাতন হইলে, তাহাতে বহু বিধি

প্রথা কিছুকাল চলিত হইলে, পুরাতন যাহা অসত্য দাঁড়ায়, তাহার সহিত নূতন যাহা সত্য বিবেচিত হয়, এই দুই-এর সঙ্গতিসাধন কঠিন হইয়া উঠে ; যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক বলিয়া লোকে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এই কারণেই, যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক, মানিতে গিয়া এখন আমরা প্রকৃত নববর্ষারম্ভ বহু দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছি। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয়, এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা কৃত্রিমতা ত্যাগ করিতে পারিব না। আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা এজন্য আমাদিগকে নিন্দা করিবে বটে, কিন্তু প্রবল-প্রতাপশালী রাজার আজ্ঞা ব্যতীত লোকব্যবহার নিয়মিত করিতে কে পারিবে? যদি আমাদের পাঁজী গণিতের পুস্তকমাত্র হইত, তাহা হইলে কেবল সত্য ধরিয়া চলিলে চলিত। কিন্তু লোকাচার, কেবল সত্য ধরিয়া চলে না, চলিতে পারে না। একদিকে সত্য, অন্যদিকে লোকাচার, এই দুই এর ঐক্যসাধন চিরদিন দুরূহ। পঞ্জিকাসংস্কার প্রয়াস ব্যর্থ হইবার কারণ এই। তথাপি প্রয়াস করিতে হইবে, অল্পে অল্পে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে, অল্পে অল্পে লোকাচার লোকরুচি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রধান প্রশ্ন আবার উল্লেখ করি। আমাদের পাঁজীর সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে কি না, হইলে কি উপায়ে সংশোধন হইতে পারে, এই দুই প্রশ্নের উত্তরনিমিত্ত সকলের মতামত জানা চাই। যাঁহারা ইংরেজী জ্যোতিবিদ্যা শিখিয়াছেন, তাঁহারা পাঁজীর অনেক বিষয় ইংরেজীর সহিত মিলাইতে পারেন। তাঁহারা বলেন, পাঁজীর গ্রহগণিতের সহিত ইংরেজীর ঐক্য হয় না। ইংরেজী নাবিক-পঞ্জিকায় ভুল নাই, অতএব আমাদের পাঁজীতে ভুল লেখা হইতেছে। ভুল সংশোধন আবশ্যক, নচেৎ আমাদের সম্মানরক্ষা হয় না। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাহারা নানাকারণে, কেহ বা কতকগুলির সংশোধন বাঞ্ছা করেন, কেহ বা কোনটাই ভুল স্বীকার করেন না। পাঁজীতে অল্পে অল্পে কিছু কিছু নূতন না ঢুকিয়াছে, এমন নহে। মনে হয় কালে আরও নূতন নূতন গণনা প্রবেশ করিবে। কালের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যাইবে, অবস্থা বুঝিয়া শুঝিয়া আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া কালোপযোগী করা যাইবে? শেষোক্ত মত ধরিলে মানমন্দির দেশীয় গণকদিগের সাহায্য আবশ্যক বিবেচনা করি।

সদ্য-বিধবা

[শ্রীচিত্তগোপাল চট্টোপাধ্যায়]

জীবনের সাঁঝে পেয়েছিনু তোরে
দুখিনী দুলালি মোর!
ভাবি নাই কভু স্বপনেও ভুলে,
হেরিব এ সাজ তোর।
সদ্য-বিধবা কন্যা আমার,
দুটি হাত "শুধু" আজ!
কেমনে চাহিব অভাগিনী-পানে,
বুকে মোর হানে বাজ!
সিত-বাস পরি' ঘুরিবি সম্মুখে
নিশাসে নিশাসে কাঁদি',
আতপ-অন্ন কচি মুখে দিবি
সংযমে বুক বাঁধি';
একাদশী-নিশি বড় ভয়ানক,'
উপ'স-পাণ্ডুমুখে—

নীল ঢেলে যাবে বাছার আমার,
ঠোঁট দুটী যাবে শুকে'।
তেরটি শরতে মানুষ করেছি,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে;
আশার কিরণে দেবতা-চরণে
নিত্য এসেছি নেয়ে।
গীত-মুখরিত উৎসব-রাতে
বিবাহ-তটিনী নীরে,
দীপালি আমার ভাসায়েছিনু গো,
আশীষ চুমাতে ঘিরে।
সবে কূল ছাড়ি' দুলিয়ে দুলিয়ে,
সোহাগ-উর্ম্মিঘায়ে
যেতেছিল নাচি' প্রেমহিল্লোলে—
সহসা নিবিল বায়ে!

য়ুরোপে তিনমাস

[মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্. এ. এল্. এল্. ডি, সি. আই. ই.]

বৃহস্পতিবার—১লা আগষ্ট, ১৯১২।—

লর্ড রোল্যাণ্ডস্‌বির সহিত তাঁহার নিমন্ত্রণ অনুসারে দেখা করিতে গেলাম। রক্ষণশীলদলের (Conservative) মধ্যে ইনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নাকি একজন authority; কারণ ইনি একবার ভারতবর্ষ বেড়াইয়া আসিয়াছেন। প্রায় ঘণ্টা নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও সকল বিষয়ের, আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী, স্পষ্ট উত্তর দিলাম। আমার মতে এরূপ ক্ষেত্রে স্পষ্ট কথা বলাই উচিত, আর আমি বরাবর করিতেছিও তাহাই। তবে তাহার জন্য শুনিতে পাই, কোন কোন শ্রেণীর অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। লর্ড রোলাণ্ডস্‌বি নূতন ভারতবর্ষীয় Public Service Commission-এর মেম্বর হইয়াছেন, সেই জন্যই বোধ হয়, এত বিস্তারিতভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুখে ত আমার খুবই লৌকিকতা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের প্রকৃত অভিমত বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ফিঙ্ক (Fink) সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। হাইকোর্টের ও ব্যবসায়ের সুখদুঃখের পুরাতন কথা অনেক হইল। দুইটি ইউনিভার্সিটি হইতে আমার এল্ এল্ ডি. উপাধি প্রাপ্তিতে ও বহু মহাজন-সঙ্গলাভে ফিঙ্ক সাহেব আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ফিঙ্ক সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া, লর্ড হাল্‌ডেনের আমন্ত্রণ-মত তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। ইনি সামান্য ব্যারিষ্টার হইতে সমর-সচিব (War Member) হইয়াছিলেন; এখন লর্ড চ্যান্সেলার। শীঘ্র এত উন্নতি প্রায় দেখা যায় না। ইহার যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, রাজনীতি ও আইন জ্ঞান অসাধারণ, বক্তৃতাশক্তিও অসীম। এদিকে আবার ইনি অতি অমায়িক ও সাদাসিধা। ইঁহার সহিত আলাপে বাস্তবিকই প্রীতিলাভ করিলাম। আমিও মুক্তপ্রাণে আমার বক্তব্য বলিলাম। তাহাতে তিনি অতি সন্তুষ্ট হইলেন। প্রিভী কাউন্‌সিলে যাহাতে একজন ভারতবাসী উকীল জজ সময়ে স্থান পান, তাহার জন্য অনেক ওকালতি করিলাম। নিজ হাতে আমার নাম লিখিয়া, নিজের বই (ইউনিভারসিটি এণ্ড ন্যাশন্যাল লাইফ) উপহার দিলেন। অবশেষে, রাস্তার দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া, ওভারকোট পরাইয়া দিয়া, ইংরাজী আতিথ্যের চূড়ান্ত দেখাইয়া দিলেন। এখানে বাস্তবিক ছোট বড় ভদ্র সকলেরই এইরূপ শিষ্টাচার।

বাড়ী ফিরিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এটর্ণী এডওয়ার্ড ডালগজো সাহেব আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, আজ ভারতহিতৈষী, কংগ্রেসের জন্মদাতা, হিউম সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া
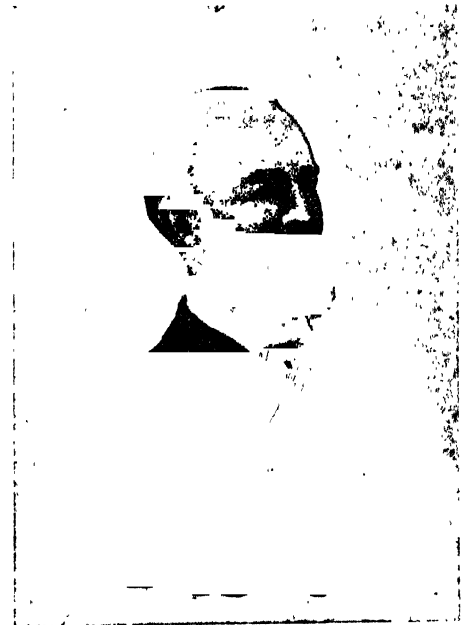
ভারতহিতৈষী হিউম্

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ভারত-হিতের জন্য ইনি অকাতরে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। গোখ্‌লে

সাহেব বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শনিবারে তাঁহার দাহ-ক্রিয়া হইবে এবং মঙ্গলবারে তাঁহার স্মরণার্থ ক্যাক্সটন হলে শোকসভা হইবে ;—এই দুই ক্ষেত্রেই আমাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, অনুরোধ করিয়াছেন। হিউম সাহেব অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যে তাঁহার মৃত্যুতেও প্রিয়জনবিয়োগ-শোকের ন্যায় আমাকে শোকাতুর করিল।

এত লোকের সহিত দেখা করিয়া, এত কথাবার্ত্তা কহাতে বিশেষ কাজ যে কি হয়, তাহা জানি না। তবে, আমার বিশ্বাস যে, ইংরাজমাত্রেই কোন না কোন রকমে, ইচ্ছা করিলে, ভারতবর্ষের উপকার করিতে পারেন; কারণ তাঁহারা আমাদের শাসনকর্ত্তাদেরও শাসনকর্ত্তা। সেইজন্য আমার মতে, যত অধিকসংখ্যক লেখক, বক্তা ও সাধারণ লোককে ভারত সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলা যায়, ততই লাভ। কিন্তু এ কাজ আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে কতদূর হওয়া সম্ভব! তবে, আমার সাধ্যানুসারে, এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর করা সম্ভব, তাহার ত্রুটি করিতেছি না। কিন্তু বহুশত ব্যক্তি, বহুবৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিলে, কতকটা ফল-লাভের সম্ভাবনা।

২রা আগষ্ট—শুক্রবার।—এটর্ণি ডালগডো সাহেবের সহিত ল-কোর্টস ও ইন্‌করপোরেটেড ল-সোসাইটি দেখিতে গেলাম। এখন আদালত বন্ধ, কাযেই বাড়িটি দেখাই সার হইল। বাড়ীর বাহিক-সৌন্দর্য্য বড় বিশেষ কিছু দেখিলাম না। বাড়ীর মধ্যস্থলে সাধারণের জন্য একটি বৃহৎ সুন্দর ওয়েটিং হল আছে। আমাদের দেশের কোন আদালতেই এত বড় হল নাই। কিন্তু এখানে নিজ এজলাসের ঘরগুলি ছোট; সাজসজ্জাও আমাদের দেশের অপেক্ষা কিছু বিশেষ ভাল নহে। উপস্থিত ১৯ জন জজ আছেন, আরও দুইজন নাকি শীঘ্রই বাড়িবে। বারান্দা (corridor)গুলি অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। ডিকেন্‌সের আদালত-বর্ণনায় বীভৎসরসের অবতারণার কারণ কতকটা বোঝা যায়। উকীল কৌন্‌সলীদের ঘরগুলিও অন্ধকার ও ছোট। এই আদালত-বাড়ীতে প্রায় ৭০০ ঘর আছে। ইন্‌করপোরেটেড ল-সোসাইটির প্রায় তিন হাজার মেম্বর। যে ব্যবসায়ের মেম্বরসংখ্যা এত অধিক, সে ব্যবসায়ের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কাযেই, অনেকেরই বিশেষ কিছুই হয় না। তবে, ইহাদের মধ্যেই ফাউলার, লয়েড জজ্জ প্রভৃতির ন্যায় লোকও আছেন।

ডিকেন্সের বর্ণিত 'আদালত-চিত্র'

৩রা আগষ্ট—শনিবার।—আজ হিউম সাহেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উপস্থিত হইতে হইবে। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রীজের উপর দিয়া, টেমস্ পার হইয়া, নেক্রোপলিস ষ্টেসনে গেলাম। এই সেতুটির উপর হইতে টেমস্‌কে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার দেখায়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুর উপর হইতে হাউস্-অব কমন্‌সের দৃশ্য গঙ্গাতীরবর্ত্তী অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণসীধামের শোভার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

নেক্রোপলিস হইতে ওয়েকিং ষ্টেসনে যাইবার জন্য আমাদিগের স্পেশ্যাল ট্রেণ প্রস্তুত ছিল। স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, মিঃ গোখ্‌লে, মিঃ এস্. পি. সিংহ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্যব্যক্তি মহাত্মা হিউমের সৎকার-কার্য্যে যোগ-দান করিতে যাইতেছেন। ওয়েকিংএ দাহ ও সমাধি

উভয় প্রক্রিয়ারই বন্দোবস্ত আছে। হিউম সাহেবের শবদেহ প্রাতঃকালেই দাহ করা হইয়াছিল। এক্ষণে গির্জ্জায় যথাবিহিত উপাসনাদির পর কাষ্ঠাধারে সযত্নে চিতাভস্ম রক্ষিত ও ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। অতি শান্ত শুদ্ধভাবে মহামনা ভারত-হিতৈষীর শেষকৃত্য সমাধা হইল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বিলাতী প্রণালী-সঙ্গত পান-ভোজন সেই মহাশ্মশানের একাংশেই সম্পন্ন হইল। দাহান্তেই খ্রীষ্টীয় ভূরিভোজন! আমাদের চক্ষে যেন বিসদৃশ লাগিল।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৪টা বাজিল। আজ, একটু অবসর ছিল বলিয়া, ষ্টীমারে—গ্রীণউইচ পর্য্যন্ত

জল ভ্রমণের ষ্টীমার

বেড়াইতে গেলাম। ঠাণ্ডা বেশ ছিল, সেইজন্য নদীর উপর একটু শীতবোধ হইতে লাগিল। টেমস্ নদীকে ঘন-সন্নিবিষ্ট অসংখ্য সেতুতে একরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর জাহাজ ও নৌকার ভিড়ে জল প্রায় দেখিতেই পাইবার যো নাই। কষ্টম্ হাউস, টাউয়র ব্রীজ, টাউয়র অব লণ্ডন, মন্যুমেণ্ট, টেম্‌স টনেল্ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে গ্রীণউইচে পৌছিলাম। নিকটেই একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ। এটি এখন নাবিকদিগের জন্য হাসপাতাল ও মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে। ইহার পশ্চাতেই গ্রীণউইচ অবজারভেটরী। এই স্থান হইতে নিদ্ধারিত সময় অনুসারেই ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সময়-নিরূপণ হয়। ছোট পাহাড়ের উপর অবজরভেটরী স্থাপিত। এইখানে টেম্‌স বেশ প্রশস্ত দেখিলাম, কিন্তু জল অতি অপরিষ্কার। মনে হইল যে, ডিকেনস্ বর্ণিত 'হোয়ার্ফ' এইরূপ স্থানেই কোথাও ছিল। স্থানে স্থানে কয়েকটি বাড়ীও আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আমাদের হাটখোলার গুদামের ধরণের। মোটের উপর আজিকার নৌকা-ভ্রমণটা মন্দ লাগিল না।

৩ই আগষ্ট—সোমবার।—Bank-Holiday—আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ। কিন্তু এদেশে ব্যাঙ্ক-হলিডেটা যে কি বস্তু, তাহা আমাদের ধারণা নাই। আমাদের দেশ—ছুটির দেশ; একটু কোন উপলক্ষ পাইলেই ছুটি ভোগকরাটা আমাদের চিরকালের অধিকার। এখানে কিন্তু তাহা হয় না। বৎসরের মধ্যে অল্পদিনই এমন ছুটি হয়, যাহাতে ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। সেইজন্য, মাঝে মাঝে এইরূপ ছুটি উপস্থিত হইলে, ইতর ভদ্র সকলেই একরূপ উন্মত্ত হইয়া পূর্ণপ্রাণে ছুটিটা ভোগ করে—আহার-বিহারের, আমোদ আহ্লাদের জন্য অত্যধিক অপব্যয় করে; সমস্ত দিন নানাস্থানে জটলা করিয়া বেড়ায়। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মদখাওয়াটা এইদিন খুব বাড়ে। পরদিনের আহারের সংস্থান আছে কিনা, একবারও তাহা ভাবে না। ইহারই নাম ব্যাঙ্ক বন্ধ ছুটি!

ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইয়া, প্রথমতঃ বিটিশ মিউজিয়ম, পরে টাওয়র অব লণ্ডনে গেলাম। সেদিন ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়া টাওয়র-ব্রীজ ও টাওয়র-অব-লণ্ডন বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম, আজ ভিতরে যাওয়া গেল। কেল্লাটি ছোটরকমের বটে; কিন্তু ইতিহাস প্রসিদ্ধ। উইলিয়ম-দি-কঙ্করর, ইংলণ্ড জয় করিয়া, এই কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। প্রথমে ইহা বহুদিন রাজার বাসস্থান ছিল। তাহার পর, দুর্গরূপে, এবং পরে কারাগার ও কোষাগাররূপে ব্যবহৃত

বিটিশ মিউজিয়ম

হইত। ইংলণ্ডের অনেক ঐতিহাসিক-কলঙ্কের অভিনয় এইখানেই হইয়াছে;—অষ্টম হেনরীর দুই স্ত্রী Anne Bolyn, ও Queen Katharine Howardকে এইখানে হত্যা করা হয়; Sir Thomas Raleigh এইখানেই কারাবদ্ধ হয়েন; Richard III-কর্ত্তৃক Edward V ও তাঁহার ভ্রাতা Duke of Yorkএর হত্যা এইস্থানে ঘটে। "Bloody Tower", "Traitors' Gate" ইত্যাদি নাম

অনেক নারকীয় কীর্ত্তির ঘোষণা করিতেছে। এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজমুকুট, রাজদণ্ড ও অন্যান্য রাজকীয় সোনারূপা ও জহরতের আস্‌বাব এইখানে রক্ষিত হইয়াছে; সে সকল সংগ্রহ দেখিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত Culiacan Diamond-শোভিত মুকুট এখানে রহিয়াছে। দিল্লীতে রাজশিরে যে মুকুট শোভা পাইয়াছিল, তাহাও দেখিলাম; কিন্তু জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর দেখিলাম না। শুনিলাম, উহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, সেইজন্য বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞী তাহা নিজের নিকট রাখিয়াছেন; টাওয়রে কেবল তাহার নকল আছে।
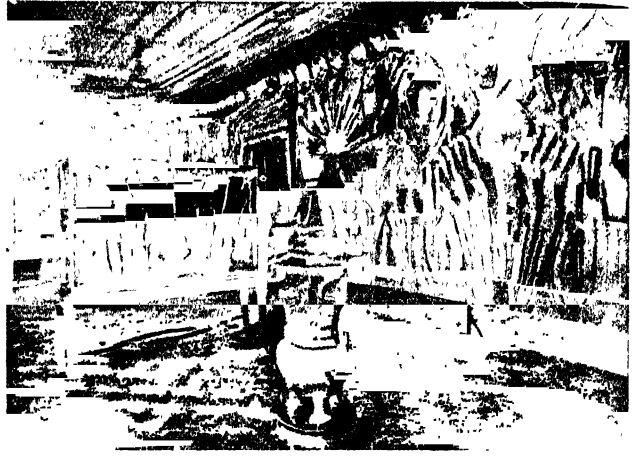
টাওয়র্ অব্ লণ্ডন অস্ত্রাগার

অস্ত্রাগারে নানাজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্মাদি দেখিলাম। ভারতবর্ষ হইতে আনীত প্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি আছে। বিখ্যাত যোদ্ধা ও রাজন্যগণের বিচিত্র লৌহবর্ম্ম, অস্ত্রগুলি থরে থরে সুন্দরভাবে সাজান রহিয়াছে। কামান, বন্দুক, পিস্তক, তরবারী, ঢাল,—কত রকমের কত যে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারিনা। যে খড়্গে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে ঘাতকহস্তে হত হইতে হইয়াছে, তাহাও কৌতূহলজনক সামগ্রীস্বরূপ যত্নের সহিত রক্ষিত; এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের বধ্যভূমিগুলিও রেলিং দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে! অদ্ভূত জাতি, অদ্ভূত ইতিহাস, অদ্ভূত ব্যবস্থা!

ব্যাঙ্ক-বন্ধ থাকায় টাওয়রেও লোকের অসম্ভব ভিড়। আমাদের গভর্মেণ্ট-হাউসে লেভির ব্যবস্থার মত, দর্শকদিগকে লাইনবন্দি করিয়া টাওয়রের অস্ত্রাগারে, ধনাগার প্রভৃতি দেখিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

টাওয়র হইতে Shepherd's Bush, White City, British-Exhibition প্রভৃতি দেখিতে গেলাম। সেখানেও জনতা বড় কম নহে। যেখানে যাই, সেইখানেই এই প্রকার! আজ, বোধ হয়, কেহই বাড়ীতে নাই; সকলেই কোথাও-না-কোথাও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একজিবিসনটি একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার! কত যে দোকান, হোটেল ও আমোদের বন্দোবস্ত, তাহার সংখ্যা নাই। য়ুরোপ, এসিয়া—এমন কি ভারতবর্ষের কোনও কোনও নগরের অনুকরণে চিত্রপটে ভিন্ন ভিন্ন নগর বসাইয়াছে, তবে চিত্রগুলি ভুলে পরিপূর্ণ। একজন পঞ্জাবী ময়রা পচা ঘিয়ে কচুরী ভাজিয়া বিস্তর পয়সা রোজগার করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ষ্টেসনে ফিরিলাম। গাড়ীতে স্থান পাওয়া দুঃসাধ্য। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া, ব্যাঙ্ক-বন্ধ-ছুটীর দিনকে নমস্কার করিয়া, বাড়ী পৌছিলাম।

৬ই আগষ্ট—মঙ্গলবার।—Lincoln's Inn Fields এটর্ণী আর্থার্ হণ্টরের সহিত দেখা করিতে গেলাম। কলিকাতার মত, এখানে সব এটর্ণি এক পাড়ায় থাকেন না; এবং অনেক স্থলে সকলে পরস্পরের সহিত পরিচিতও নহেন। দুইএকজন কেরাণী লইয়া অধিকাংশ উকীলেরা অন্ধকার ঘরে আপিস করেন। ডিকেন্সের বর্ণনা ইহাদের অধিকাংশের আপিস, এবং Law-Courts সম্বন্ধে খাটে;—এখন নাকি অনেক উন্নতি হইয়াছে—না জানি

ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ্

পূর্ব্বে কি অবস্থাই ছিল। পথে যাইবার সময়, ডিকেন্সের অমর-গ্রন্থ-বর্ণিত "Old Curiosity Shop" দেখিলাম।

কিম্বদন্তী যে, এই দোকান লক্ষ্য করিয়াই ডিকেনস্ সেই হৃদয়স্পর্শী গল্প রচনা করিয়াছিলেন। দোকানের উপরও বড় বড় অক্ষরে এই কথা লেখা আছে এবং অনেকে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কারণ, যে কিম্বদন্তী বহুদিন

স্যর হেনরী কটন মর্ম্মর-মূর্ত্তি

চলিয়া আসিতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়াও সুখ। বৃন্দাবনের গাছের গায়ে কাল' দাগ দেখাইয়া—ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মাখন খাইয়া হাতপোছার দাগ বলিয়া প্রণামী আদায় করেন, এবং অযোধ্যায় সীতাদেবীর চাকীবেলুন দেখাইয়া পাণ্ডা ঠাকুর অনেক রোজগার করেন।

হণ্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া St. James Park, Caxton Hallএ হিউম সাহেবের স্মৃতি সভায় উপস্থিত হইলাম। Mr. S. P. Singha, Sir. K. G Gupta, Mr. Nevinson, Mr. Barraclough স্যর হেনরী কটন্, মিঃ গোখেলে প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিতে সভাগৃহ পরিপূর্ণ। মিষ্টর গোখেলে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথম প্রস্তাব সমর্থনের ভার আমার উপর পড়িল। অল্প কথায় কিছু বলিলাম। ইহামতি হিউমের মৃত্যুতে সকলেরই হৃদয় শোকভারে আচ্ছন্ন। বক্তৃতার বড় সময় ছিল না, প্রয়োজনও হইল না। ডাক্তার গ্রব সাহেবের অনুরোধে, তাঁহার সহিত হ্যামটন-কোর্ট-প্যালেস রাজবাড়ী দেখিতে গেলাম। ট্রেণে ও ট্রামে করিয়া অনেকদূর যাইতে হয়। পথের দুইধারে পুরাতন সহর, ফলের ও শাকসবজীর বাগানগুলি-বুসীপাক (Bushy Park) ও টেমস্ নদীর উপর হাউস্ বোট্গুলির শ্রেণী দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমাদের দেশে যেরূপ বড় বড় বজরায় ধনীরা জলবিহার করেন, হাউস বোট্গুলি তাহা অপেক্ষাও বৃহৎ, এবং সুন্দররূপে গঠিত। ইহার কোন কোনটীর উপরে ছোট ছোট বাগান পর্য্যন্ত আছে। বড়-লোকেরা কখন কখন আমোদ করিয়া ইহার উপর বাস করেন; কিন্তু নদীর ধারে বদ্ধভাবে এরূপ নৌকায় বাস বড় স্বাস্থ্যজনক বোধ হয় না। কাশ্মীরেও হাউস বোটের যথেষ্ট প্রচলন।

হ্যাম্প্টন কোর্ট প্যালেসটি লর্ড উলসে নির্ম্মাণ করেন। তাহার প্রভু, অষ্টম হেনরী, তাঁহাকে পদচ্যুত ও অপমানিত করিবার পর, ইহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। এক্ষণে বহু সৈনিক কর্ম্মচারিগণের বিধবা পত্নী ও অনাথ পুত্রকন্যাগণ এখানে রাজাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বাড়ীটির সৌষ্ঠব তত বেশী বোধ হইল না। কিন্তু বাগানখানি এরূপ সাজান যে, এমন কখন দেখি নাই। তাজমহলের সম্মুখের জলাশয়ের মত, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ, একটী সুন্দর জলাশয় আছে। আর ফুলের কেয়ারীও এরূপ চমৎকার কোথাও কখন দেখি নাই। সাজাইবারও বাহাদুরী আছে বটে। সাজাইবার জন্য কত যত্ন-আয়াস পাইতে হইয়াছে, তাহার সীমা নাই, অথচ সে যত্ন-আয়াস যেন কেহ বুঝিতে না পারে, এই চেষ্টা।

হাউস অব লর্ডস্
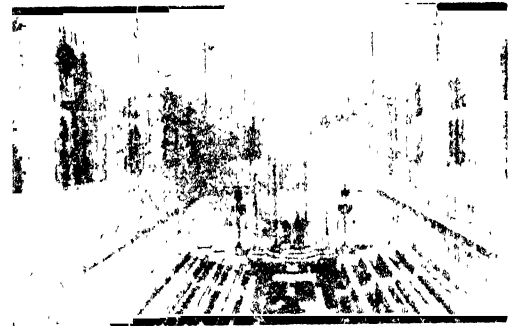
ইহাকে অযত্নে সাজানর বিশেষ চেষ্টা বলিলে, ইহার কতক বর্ণনা হয়। মনে করিতে হইবে যে, ফুলের কেয়ারিগুলি যেন অযত্নে, নিজেদের ইচ্ছামত, ঝোপের ন্যায় জন্মিয়াছে; কিন্তু

তাহা নহে ; উহারই মধ্যে অপূর্ব্ব কারিগরী আছে। ১৬০ বৎসরের একটি আঙ্গুরগাছ কাচের ঘরের ভিতর রহিয়াছে। গাছটির গোড়া মোটা, গুঁড়ির মত হইয়া গিয়াছে, অথচ এখনও অজস্র আঙ্গুর ফলিতেছে! আশ্চর্য্য! ফলগুলি রাজভোগে লাগে, কখন কখন নাকি, অধিক মূল্যে বিক্রয়ও হয়। জনশ্রুতি—এই গাছের শিকড় রাজবাড়ীর নর্দ্দমায় সংলগ্ন।—তাই কি ফলের এত সুতার? লর্ড উল্‌সের বেড়াইবার, লতাকুঞ্জের মত, একটা দীর্ঘ পথ আছে। পদচ্যুতির পর, সেইখানেই বোধ হয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "রাজার সেবায় আমি যেরূপ কায়মনোবাক্য নিয়োগ করিলাম, তাহার কিয়দংশও যদি ভগবদ্-সেবায় অর্পণ করিতাম, তাহা হইলে প্রাচীন বয়সে আমায় এ দারুণ অশান্তিতে পড়িতে হইত না।" উল্‌সের মুখ-নিঃসৃত এই মহাবাক্য সেক্সপীয়র অমর করিয়া রাখিয়াছেন। সকলেরই নিশিদিন এই কথা বারবার মনে করা উচিত। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া দীর্ঘপথ ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল।

বুধবার—৭ই আগষ্ট।—আমীরআলি সাহেবের সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে St. James Sreetএ ডিভন্‌শায়ার্ ক্লবে গেলাম। আহার ও নানাকথাবার্ত্তার পর, তাঁহার সহিত West Minister Palace Hotelএ মোসলেম্ লীগের বাৎসরিক সভায় যাইতে হইল। আমায় কিছু বলিবার জন্য তিনি বড়ই অনুরোধ করিলেন। পার্লামেণ্টের মেম্বর স্যর উইলিয়ম বল প্রথমে বক্তৃতা করিলেন। তারপর, আমি হিন্দু মুসলমানের: সদ্ভাবের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে সাধ্যমত কিছু বলিলাম। তৎপরে Edinburgh Reviewর সম্পাদক Harold Cox সাহেব বক্তৃতা করিলেন। সভাভঙ্গের পর, স্যর উইলিয়ম বল আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া অত্যন্ত আত্মীয়তা করিলেন: সঙ্গে করিয়া, পার্লামেণ্টের ভিতরে, মেম্বর-

হাউস অব্ কমনস

দিগের যাতায়াতের পথ দিয়া পার্লামেণ্ট-ঘরে লইয়া গেলেন। এখানে না কি মেম্বরব্যতীত অপরের যাইবার অধিকার নাই। হাউস্-অব-লর্ডস্ (House of Lords আমার এতদিন দেখা হয় নাই, তাহাও তিনি দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। হাউস-অব কমন্সের ধরণেরই সাজসজ্জা, তবে লালকাপড়মোড়া সব বসিবার আসন, এবং লর্ড চ্যান্সেলার Wool-Sack যথার্থই পশমের বস্তাবাঁধা নহে। প্রান্তদেহে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কাল আবার গার্থ সাহেবের নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য ব্রাইটন্ যাইতে হইবে।

পল্লীরাণীর খেদ

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়]

আমার বঙ্গ করে হাহাকার অশনবসন বিনা,
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরিতে বসেছে—ভিক্ষায় নাইক ঘৃণা!
দুয়ারে দুয়ারে মাগিছে অন্ন বুভুক্ষ ভিখারিগণ,
ক্ষুধাতুর ওই দলে দলে ঘোরে, কেহ না খাটায় জন!
বরষার কালে নিঃস্ব কুটিরে চালেতে নাইক খড়,
ভিজিয়া গিয়াছে বিছানাপত্র স্যাঁৎসেঁতে সব ঘর
কোলের শিশুটি ভিজিয়া মরিল দুঃখিনী জননী কোলে,
বেদনায় শিশুটি ভূমিতে লুটায়ে কাঁদিতেছে মা-মা বোলে!
অধীরা জননী অশ্রু মুছিয়া কোলের শিশুরে কয়,
'অভাগীর বুকে কেন এসেছিলি ওরে মোর প্রাণময়!'
অনাহারে, হায়, কথা নাহি ফোটে—জোটেনা দুমুঠো আর
রুদ্ধহৃদয়ে বেদনা-গুমরে দেখিতে পায় না কেহ,
মরণের দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখিছে—কোথায় মিলিবে স্নেহ!
শরমে শিহরি মরে ঘরে ঘরে—কিছু নাই জানাজানি.
অই শোন!—অই বঙ্গদুয়ারে ঘোষিত মরণ-বাণী,
ক্ষুধায় যেখানে মেলেনা অন্ন—প্রতিদিন অনশন!
সেই কি আমার সাধের বঙ্গ—শান্তির নিকেতন,
সেই কি আমার শস্যশ্যামলা শোভন বঙ্গদেশ!
জগতের এই শস্য-আগারে অনাহারে মরে শেষ!!
ভারতের এই পুণ্যভবনে—বঙ্গ পল্লীছায়,

জাপানের মঙ্গল-দেবতা *

[শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

জাপান যে পৃথিবীর উন্নত জাতিগণের মধ্যে অন্যতম, একথা আজকাল সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিগত রুষযুদ্ধে জাপানীরা দেখাইয়াছে যে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র জর্মাণদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহাদের নাবিকেরা ইংরেজদের ন্যায় পোতচালনবিদ্যায় সুদক্ষ, এবং বর্ত্তমান সময়ে, বাণিজ্যে তাহারা জর্ম্মণ ও মার্কিণদের সমকক্ষ। প্রোক্ত যুদ্ধের পর হইতেই জাপানীরা সভ্য জগতের অন্যান্য জাতিদের মধ্যে গণনীয় হইয়াছে—আজকাল

কৃষিদেবতা 'দাইকক্'

রণদেবতা 'বিষামণ'—পরাভূত শত্রুর উপর দণ্ডায়মান

সভ্য য়ুরোপবাসীরা জাপানীদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাপানীদের ধর্ম্ম বহুদিনের পুরান; এখনও উহার মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রভাব এবং আনুষঙ্গিক বিবিধ পূর্ব্ব-সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। যদিও শিক্ষিত ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্ম্মে, কিম্বা কনফুকস্ প্রবর্ত্তিত নৈতিক আদর্শে স্থাপিত ধর্ম্মে, বিশ্বাস করেন, তথাপি ইতর সাধারণে এখনও প্রথমোক্ত পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করে। প্রাচ্যজগতের অপরাপর দেশের ন্যায় জাপানীদেরও দেবতাখ্যান ও পৌরাণিক বিবরণীগুলি অত্যন্ত ভাবময় এবং উচ্চকল্পনা প্রসূত।

জাপানীদের দেবতাগণের মধ্যে সাতটি মঙ্গল-দেবতাই বিশেষ বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। ইঁহারা মানবসুলভ কঠিন

* 'OPEN CONRT' হইতে সংগৃহীত।

পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও জীবনের একঘেয়ে ভাবের উপর আনন্দ-জ্যোতিঃ বর্ষণ করিয়া থাকেন। সংখ্যা হিসাবে ইঁহারা ব্যাবিলন দেশীয় সাতটি দেবতার—যাঁহাদের নাম অনুসারে ইংরাজী বারগুলির নামকরণ হইয়াছে—অনুরূপ।

'দাইকক'

'এবিস'

আমাদের দেবতারা তেজস্বী যোদ্ধা এবং রণপ্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু জাপানীদের দেবতারা বেশ প্রফুল্ল ও শান্তিপ্রিয়। ইঁহাদের পর্ব্বদিনগুলিও, সেই জন্য, আমোদ ও উৎসবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সপ্তদেবতার মধ্যে বিষামণ (Bishamon) কতকটা আমাদের ইন্দ্রদেবের অনুরূপ। ইনি বিক্রম এবং ধনের দেবতা। ইঁহার বেশ শোভন ও উন্নত চেহারা। হস্তে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র। ইনি, যোদ্ধৃবর্গের, ধনবান বণিক্ শ্রেণীর ও বাবুভায়াদের পূজ্য। বলবিক্রমের দেবতা বলিয়া, ইনি নগর ও কেল্লা সমূহের রক্ষকরূপে পূজিত হন। ইঁহার বামহাতে একটি আদর্শ দুর্গের প্রতিরূপ এবং মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে চক্রমণ্ডল-প্রজ্বলিত রোষানল, দীপ্তি স্বরূপ বর্ত্তমান।

সৌন্দর্য্যদেবী বীণাবাদিনী 'বেন্‌জাইতেন্'

'ফুকুরোকুজু'

দাইকাকু (Daíkaku) হইতেছেন—অবস্থাপন্ন কৃষকদের দেবতা। ইঁহার হাতে হাতুড়ী অবস্থিত; এবং দুইটি চালের বস্তা হচ্ছে ইঁহার আসন। প্রবাদ—যখন ইনি এই হস্তস্থিত কাঠের হাতুড়ীটি নাড়েন, তখন তাহ হইতে ধনরত্ন ঝরিতে থাকে। গৃহস্থদের দরজার বহির্ভাগে প্রায়ই ইহার ছবি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়; এ কি, যাহারা এখন আর সিন্‌তো ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না

'জুরোজিন্'

হাস্যদেবতা 'হোতেই'

তাহাদেরও, বাটীর পুরোভাগে এই দেবতার ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ীরা—এবিসুয়ের (Ebisu) পূজা করিয়া থাকে। ইনি বেশ ভালমানুষ। ইনি সর্ব্বদা মাছ হাতে নিয়ে বেড়ান; কখনও আবার ছিপ্‌শুদ্ধ মৎস্য ইহার হাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানীদের লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন—বেন্‌জাইতেন্ (Ben zaiten)। ধন, রূপ, ভালবাসা, এবং যাহা কিছু জীবনের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের সহায়ক, সকলেরই ইনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উপরন্তু, ইনি নাবিক ও নৌযাত্রিগণের পূজ্য। বৌদ্ধদের ভিনাস্‌দেবীর সহিত ইঁহার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

অবশিষ্ট তিনটি দেবতা—বিশেষ কোন শ্রেণীর নিজস্ব নহেন; ইঁহারা মানবকুলের উপর সর্ব্বদা আশীষ বর্ষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন—ফুকুরোকুজু (Fúku-rokúgu) ও জুরোজিন্ (Júrójin)—মানুষের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করেন এবং সপ্তম দেবতা—হোতেই (Hoteí)—হর্ষোল্লাসের অধিষ্ঠাতা।

রণদেবতা 'বিষামণ'

ফুকুরোকুজুর মাথা খুব উঁচু। কপালটি মুখের প্রায় দ্বিগুণ লম্বা; সময় সময় আবার কপালের পরিমাণ অধিকতরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

জুরোজিনের সঙ্গে সর্ব্বদাই—হয় হরিণ, নয় বক—আছে; বাহন দুইটাই দীর্ঘায়ুর নিদর্শন।

হোতেইর—মোটা সোটা প্রফুল্ল চেহারা, মাথায় টাক্ ও পিঠে একটা বস্তা। ইনি খুব ছেলে ভালবাসেন এবং প্রায়ই তাদের সঙ্গে থাকেন।

জাপ-শিল্পী হোকুসাই-কর্ত্তৃক অঙ্কিত একটি চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইল; ছবিটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই দেবতাগণ জাপানীদের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। মৎস্যদেবতা এবিস্থ—দক্ষিণভাগে সঙ্কোচে আসীন। তার নীচেই দাইককু গাজরের মতন একটা সব্জীর উপর কাপড় ঢাকা দিচ্ছেন। দাইককুর সঙ্গে একটি ইঁদুর—চালের বস্তার সঙ্গে উহা থাকেই থাকে। ইঁদুরের পরেই, দেবতা ফুকুরোকুজু। ইঁহার লম্বা মাথা—একখানি রুমালের দ্বারা আবৃত। সর্ব্বশেষে, উপরে হাস্যদেবতা হোতেই। ইঁহার সর্ব্বদাই হাসিমুখ। মজা করিবার জন্য, ইনি পেটের উপর একটি মুখ এঁকেছেন; ছেলেরা এঁর চারিদিকে হাততালি দিয়া হাসিতেছে।

ছবিগুলি প্রাচীন জাপানের উদ্দাম কল্পনার উচ্চাঙ্গ
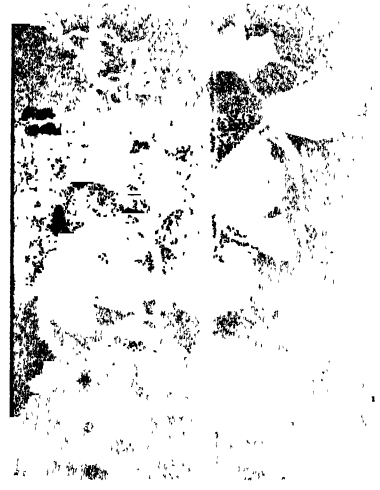
হোকুসাই-অঙ্কিত চারিটি মঙ্গল দেবতা

পরিচারক। এই চিত্রগুলি, শিল্পী ও শিল্পপ্রিয় ব্যক্তিগণের উপভোগ্য। চিত্রস্থিত মূর্ত্তিগুলির আঙ্গুলগুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে, তথাকথিত 'ভারতীয় চিত্রকলা'র উপর জাপ চিত্রশিল্পের প্রভাব, বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়!

ডুবরীর কথা *

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

জলমগ্ন দ্রব্যাদি উদ্ধার করিবার প্রণালী যে পুরাকালে প্রচলিত ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। আমাদের দেশে নিম্নজাতীয় একশ্রেণীর লোকেরা বহুকাল হইতেই কূপ, পুষ্করিণী, নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে ডুব দিয়া, জলনিমগ্ন দ্রব্যাদি উদ্ধার করিতে অভ্যস্ত—এজন্য অবশ্য তাহারা কোনও অঙ্গরক্ষক পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করে না। এখনও শ্রীক্ষেত্রে 'লুলিয়া', বা 'না-উড়িয়া', নামক, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে সমাগত, যে একশ্রেণীর মৎস্যজীবীজাতি দৃষ্ট হয়—তাহারা যেন জলচর বা উভচর জীব! 'লুলিয়ারা', সহজেই সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ হেলায় উপেক্ষা করিয়া, বহুদূর পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল সন্তরণ করিতে, এবং অনায়াসে অনেকক্ষণ জলতলে কাটাইতে পারে। তবে, নানা হিংস্রজীবসঙ্কুল সুগভীর সমুদ্রতলে প্রবেশ করিতে হইলে সুরক্ষিত দেহে যাওয়াই বিধেয়। মহাভারতাদিতে অনেকের সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবার কথা দেখা যায়; কিন্তু তাহাদের কোনও রূপ বস্ত্রাদি ছিল, কি না,—এপর্য্যন্ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিককে সে বিষয় অনুসন্ধান করিতে শুনি নাই। তবে, একথা স্থির যে, উপযোগী কলকৌশলব্যতীত দুই মিনিটের অধিককাল মানুষ জলতলে থাকিতে পারে না।

প্রতীচ্যখণ্ডের কথায়, গ্রীক্ থ্যুসিডিয়স্ বলেন যে, সাইরোকিউস্ অবরোধকালে জনকয়েক ডুবরী সমুদ্রনিমগ্ন জাহাজ হইতে অনেক জলমগ্ন দ্রব্য উদ্ধার করিয়াছিল।

সিন্ধুতলোপযোগী নানা যন্ত্রপাতি

সমুদ্রগর্ভে নির্ব্বিঘ্নে সুদীর্ঘকাল কার্য্য করিবার উপযোগী

* "ইংলিশ ম্যাগেজিন" (ENGLISH MAGAZINE) এবং "সী" (THE SEA) হইতে সঙ্কলিত।

কৌশল, সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভাবনা করেন ডাঃ হ্যালি। তাঁহার উদ্ভাবনা, ঘণ্টাকৃতি গৃহ। ইহার মধ্যে সাধারণ পোষাকেই

ঘণ্টাকৃতি ডুবরী-গৃহ

কার্য্য করা যায়। অধুনা এই গৃহের সেই ঘণ্টাকার পরিবর্ত্তিত, এবং গৃহমধ্যে আলোক, ঘণ্টা, দূরশ্রবণযন্ত্র প্রভৃতি সন্নিবেশিত, হইয়াছে; পম্পযোগে এতন্মধ্যে 'গাঢ়'বায়ুও সরবরাহের সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই ডুবরী-গৃহের কিন্তু একটা প্রধান অসুবিধা, ইহার মধ্যে থাকিয়া মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষে—অর্থাৎ, মাত্র ইহার তলদেশস্থ সীমা মধ্যে—কার্য্য করা চলে; যদৃচ্ছাক্রমে যত্র তত্র বিচরণ করিবার উপায় নাই। যথাস্থানে স্থাপিত হইবার পর, ইহার তলদেশস্থ অপসরণশীল ফলকটি উদ্ঘাটিত করিয়া, মধ্যে অবস্থিত কর্ম্মকারগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু সমুদ্রতলে—যেখানে প্রবল স্রোতঃ বর্ত্তমান, সেস্থানে—এই ফলক উদ্ঘাটনের সময় নানা বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে—এমন কি, শুনা যায়, একবার এই অবস্থায় একটি ঘণ্টাগৃহ হইতে জনৈক কর্ম্মকারকে হাঙ্গরে লইয়া গিয়াছিল! আবার, এই ঘণ্টাগৃহ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কখন কোমল পঙ্কোপরি গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার উদ্ধারসাধন দুর্ঘট হইয়া পড়ে! নিউইয়র্কে বস্তুতঃই একবার এইরূপ ঘটিয়াছিল;—শেষে, দলস্থিত একজন প্রত্যুৎপন্নমতিবলে সবেগে গৃহটি আলোড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহমধ্যে জল প্রবেশ করায়, তবে তাহা রক্ষা পাইল। সেইজন্য, প্রথমেই একেবারে স্থানবিশেষে স্থাপন না করিয়া—বারকয়েক স্থানান্তরিত করিয়া—তবে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইহা স্থাপন করাই বিধেয়। ফলে—প্রধানতঃ সেতুস্তম্ভ, আলোকস্তম্ভ, জেটি, প্রভৃতির ভিত্তিস্থাপনাদি কার্য্যেই এই ঘণ্টাগৃহ ব্যবহার করা চলে।

এতদ্ভিন্ন, স্থায়ীভাবে মাত্র একস্থানে কার্য্য করিবার জন্য, অন্যবিধ কৌশলও অবলম্বিত হয়। এইরূপ অন্যতম কৌশলেই, ষ্ট্রালবুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী, রাইন্-নদীর সেতু নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবস্থিত হইয়াছিল। সে কৌশল একটু বিবরণ শুনুন—সেতুটির স্তম্ভগুলির মূল চতুষ্কোণ গৃহাকৃতি, প্রত্যেকটির মধ্যভাগে, তলদেশ হইতে, একটি এবং দুইপার্শ্বে ভিত্তির ২০।২৫ হাত ঊর্দ্ধ—হইতে দুইটি সুপ্রশস্ত শূন্যগর্ভ নল উঠিয়াছে। মধ্যের তলদেশস্পর্শী নলটি নদীর জলাপেক্ষা অনেকটা, এবং অন্যদুইটি সামান্য-একটু উচ্চ পর্য্যন্ত উন্নত। কারুকরগণ ঐ পার্শ্ববর্ত্তী নল দুইটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহাদের মুখ দুইটি সুদৃঢ়রূপে ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্ত্তী নলটি দিয়া 'পম্প'-দ্বারা বায়ুপরিচালনা করিয়া সমগ্র স্তম্ভগর্ভস্থ জলনিষ্কাশন এবং তৎপরিবর্ত্তে গাঢ়বায়ুদ্বারা পূর্ণ করা হইল। তখন মজুরগণ রজ্জুনির্ম্মিত অবরোহণীযোগে নীচে নামিয়া গেল। মধ্যবর্ত্তী নলটিতে একটি মাটীকাটা কল সন্নিবিষ্ট ছিল; মজুরেরা তলদেশ হইতে তাহার কাজ চালাইতে লাগিল। নিম্নের চিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে উক্ত সেতুর যাবতীয় স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

পেয়রেন্-কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সমুদ্রতলবর্ত্তী 'হাইড্রোষ্টাট' পূর্ব্বোল্লিখিত ঘণ্টা-ঘরেরই মত; তবে, ইহাতে এককালে
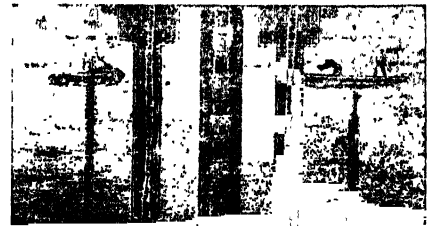
জলতলে সেতুর ভিত্তি-স্থাপন

বিশ-ত্রিশজন লোক অনায়াসে, সুখসচ্ছন্দে, দীর্ঘকাল ধরিয়া কার্য্য করিতে পারে। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে, এতদভ্যন্তরস্থ কারুকরগণই ইহাকে ইচ্ছামত ভাসাইতে ব

ডুবাইতে পারে। নিম্নের চিত্রে ইহার ভাসমান ও নিমগ্ন অবস্থা—উভয়ই প্রদর্শিত হইল। ইহা ত্রিতল এবং ইহার

'পেযরণে'র 'হাইড্রোষ্ট্যাট'
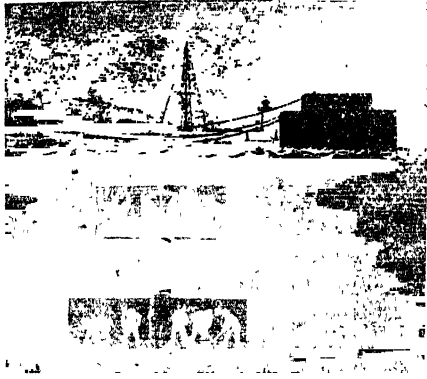
সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তলটির চতুষ্পার্শ্ব দোহারা করিয়া নির্ম্মিত। তবে, ঘণ্টাঘর অপেক্ষা এইগুলি সমধিক কার্য্যকর। এইগুলি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, অন্তর্ব্বর্ত্তী যন্ত্র-সাহায্যে ইহার নিম্নতলের চতুষ্পার্শ্ব জলপূর্ণ করিয়া দিলেই ইহা তলগামী, এবং উর্দ্ধতলটির চারিপার্শ্ব জলপূর্ণ করিলেই উর্দ্ধগামী, অর্থাৎ ভাসমান হয়।

ডুবরীর কার্য্য

একেলা স্বাধীনভাবে সমুদ্রতলে নানাকার্য্য করিবার পক্ষে ডুবরীর বিশিষ্টপরিচ্ছদ বা বর্ম্মই বিশেষ উপযোগী। এই পরিচ্ছেদর বা বর্ম্মের বিবর্ত্তন-কাহিনী বড়ই কৌতূহলজনক। আমাদের দেশের ডুবরীদের এরূপ কোনও পোষাক-পরিচ্ছদ নাই; সুতরাং, তাহারা এককালে দুই তিন মিনিট কালের অধিক জলতলে থাকিতে পারে না। যাঁহারা কুম্ভক করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা হয়ত দীর্ঘকাল মগ্ন অবস্থায় থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদেরও হিংস্রজন্তুকুল হইতে নিস্তার পাইবার আশা কম! যাহাতে সুদীর্ঘকাল অনায়াসে, বিনা আশঙ্কায় জলতলে কার্য্য করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশ্যেই প্রতীচ্যখণ্ডে এই বর্ম্ম উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

ডুবরীর গৃহ ও বর্ম্ম-উদ্ভাবনা

ডুবরীর সুরক্ষিত অঙ্গাবরণ উদ্ভাবনার সূচনা হয় ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময়ে বিলাতের 'রয়াল সোসাইটি'র সেক্রেটরী, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ডাঃ হ্যালেই সর্ব্বপ্রথম 'ডাইভিং বেল্', বা ডুবরী রক্ষণ ঘণ্টাগৃহ, উদ্ভাবনা করেন। উহার আকৃতি ঘণ্টার ন্যায় বলিয়াই এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। তিনি উহাতে করিয়া ৫০ ফীট নিম্নে অবতরণ করিয়াছিলেন। পরে, ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিভিল ইঞ্জিনিয়র জন্ স্মীটন্, হ্যালের উদ্ভাবিত সরঞ্জামে বায়ুসরবরাহের কৌশল সংযোগ করেন। ইতঃপূর্ব্বে ঐ 'ঘণ্টাগৃহে' বায়ু যোগাইবার জন্য কতকগুলি বায়ুপূর্ণ সীসকের পিপা সন্নিবেশিত থাকিত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেসলো নিবাসী কেলিংগার্ট নামক জনৈক উর্ব্বরমস্তিষ্ক মনীষা উদ্ভটদর্শন 'হেলমেট্ বেল', অর্থাৎ ঘণ্টাকৃতি শিরস্ত্রাণ, উদ্ভাবনা করেন—ইহা কতকগুলি ডিম্বাকৃতি বায়ুপূর্ণ চুঙ্গি মাত্র, ডুবরীর কটিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিত।

সীবের বর্ম্ম

আধুনিক বায়ুবাহী কৌশলের উদ্ভাবনকর্ত্তা অগষ্টস্ সীব্—ইনিই কেলিংগার্টের প্রণালীর উন্নতিসাধন করেন, এবং ১৮১৯ সালে ডুবরীর 'খোলা' পোষাক উদ্ভাবনা করেন। সীবের পরিচ্ছদের প্রধান উপকরণ একটি সীসকনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ ও স্কন্ধাবরণ, এবং কটিদেশপর্য্যন্ত লম্বিত একটি কোট্—ইহা গলদেশে আবদ্ধ থাকিত। এই পরিচ্ছদের কিন্তু একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল—ডুবরী যতক্ষণ জলমধ্যে থাকিত, ততক্ষণ তাহাকে সোজাভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে

হইত ; কারণ, তাহার চিবুক তির্য্যক্‌মুখী হইলেই, পরিচ্ছদ-মধ্যে জলপ্রবেশ করিয়া ডবিয়া মরিবার ভয় ছিল। এই

বর্ম্ম পরিধান

অসুবিধা বুঝিতে পারিয়া, সীব্ তাহা দূর করিতে কৃতযত্ন হইলেন। ফলে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, 'ইণ্ডিয়া রবর' আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই, উক্ত 'খোলা' অঙ্গরক্ষকের পরিবর্ত্তে, তাঁহার নব-উদ্ভাবিত 'বদ্ধ' পরিচ্ছদ উদ্ভাবিত হইল। বর্ত্তমানকালে ইহাই—অর্থাৎ ইহার সমুন্নত বৈজ্ঞানিক সংস্করণই—সর্ব্বত্র ডুবরী-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা পরিধান করিয়া ডুবরীরা সহজেই যথেচ্ছাক্রমে বসিতে, শুইতে, নড়াচড়া করিতে পারে।

ডুবরীদের আধুনিক অঙ্গাবরণ দুই খণ্ডে বিভক্ত ;—একটি পালিশকরা সীসকনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, আর একটি জলাভেদ্য উপকরণনির্ম্মিত দেহাবরণ। শিরস্ত্রাণটি দেহাবরণের সহিত সুবদ্ধ। মস্তকাবরণটির দুইপার্শ্বে দুইটি এবং সম্মুখভাগে একটি ডিম্বাকৃতি পিত্তলনির্ম্মিত কাচ-সংযুক্ত ক্ষুদ্র বাতায়ন আছে ;—এই ত্রিনেত্রে ডুবরী চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ডুবরীর শ্বাসরোধ হইবার আশঙ্কা নাই—পোষাকসংযুক্ত 'ফোর্স-পম্প'দ্বারা যথাবশ্যক বিশুদ্ধ বায়ু পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা আছে। জলতলে-গভীরতা অনুসারে—বায়ুভারের তারতম্য হয়। তজ্জন্য, পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্টস্থানে 'ওলন ফেলিয়া,' বা উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করিয়া, সেই স্থানের বায়ুচাপ নির্দ্ধারিত হয় ; এবং সেই চাপের গাঢ় বায়ুদ্বারা ডুবরীর বর্ম্মের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত তূণটি পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়—এবং পরে, সেই ভারের বায়ুই সরবরাহ করা হয়। ডুবরীর এই বর্ম্মের মোট ওজন প্রায় ১৭০ পৌণ্ড, অর্থাৎ ন্যূনাধিক প্রায় দুই মণ পাঁচ সের!

সীব-বর্ম্মের উন্নতি

সীবের জামাতা এবং সীব্ গর্ম্ম্যান্ কোম্পানীর অধ্যক্ষ ডব্লিউ. এ গর্ম্ম্যান্। সিব্-নির্ম্মিত উক্ত বর্ম্মে যাহা কিছু ত্রুটী ছিল, গর্ম্ম্যান্ সেগুলি বিদূরীত করেন। তিনি, উক্ত বর্ম্মের সহিত, কথোপকথনের সৌকর্য্যার্থে, একটি 'টেলিফোন' এবং আলোকের সুবিধার জন্য, কিরীটে একটি বৈদ্যুতিক 'ল্যাম্প্' সংযোজিত করিয়া, উহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। এই তাড়িতালোক এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট যে, ইহা ইচ্ছামত ঘুরাইতে-ফিরাইতে পারা যায়।

অন্যবিধ বর্ম্ম

সম্প্রতি মেলবোর্ণনিবাসী বুক্যানন্ এবং গর্ডন্ নামধেয় দুইব্যক্তি, গভীরসমুদ্রে প্রবেশ করিবার উপযোগী এক প্রকার বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সীব্ গর্ম্ম্যান

অবতরণোন্মুখ ডুবরী

কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বর্ম্মেরই উন্নত-প্রকরণ মাত্র। পরবর্ত্তী চিত্রে উহার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল।

ইহার সহিত সীবের বর্ম্মের পার্থক্য এইটুকু যে, ইহার

কিরীটটির আকৃতি একটু স্বতন্ত্র—গোলাকৃতি, হস্তাবরণাদি ও কিরীটটি সীসক-নির্ম্মিত, এবং বর্ম্মের নিম্নভাগও এক
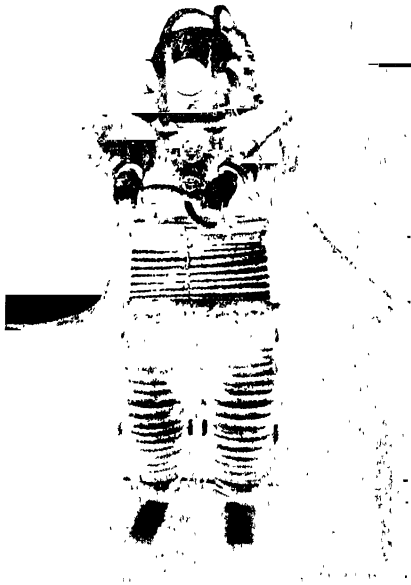
অভিনব বর্ম্মাবৃত ডুবরী

প্রকার বিমিশ্রধাতু-নির্ম্মিত। সমস্তটাই ধাতুময় করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সীবের বর্ম্ম পরিধান করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জলতলে থাকিলে, অঙ্গবক্ষকটির মধ্যে ক্রমে জল প্রবেশ করে—তাহাই নিবারণ করা।

বর্ম্মের কার্য্যকারিতা

বর্ম্ম পরিয়া ডুবরীরা দুইশতাধিক ফীট গভীরজল তলেও কার্য্য করিতে পারে—লিভরপুলবাসী হুপরই বর্ত্তমানকালে ইহার অগ্রণী। দেড়শত ফীট নিম্নে অনেকেই নামিয়া থাকে। তবে, গভীরজলেই ডুবরীরা সহজে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে সক্ষম হয়! একশত হইতে দেড়শত ফীটের মধ্যে সচরাচর ডুবরীরা, প্রত্যহ চারি হইতে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত, অনায়াসে কার্য্য করিতে পারে।

ডুবরীর কার্য্য

১। দীর্ঘকালপর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া জাহাজগুলির তলদেশের গাত্রে শেওলা ও ময়লা জমিয়া যায়, এবং লবণাক্ত জলে তলভাগের ধাতুর পাতটিও সম্প্রসারিত ও ক্ষয় হইয়া পড়ে। তজ্জন্য, মধ্যে মধ্যে ডুবরীদ্বারা জাহাজগুলির তলভাগ চাঁচাইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। 'গ্রেট্ ঈষ্টণ' নামক একখানি জাহাজের তলভাগ এইরূপে, ১২ জন ডুবরীদ্বারা, এক ফুট্ আন্দাজ, চাঁচাইয়া ফেলিয়া দেখা গেল, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর হওয়ায়, প্রায় দুই ইঞ্চ উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং উহার গতিও ঘণ্টায় প্রায় তিন 'নট্' * বৃদ্ধি পাইয়াছে।—ডুবরীর সাহায্য না লইলে, ইহা সাধ্য হইত না।

২। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে "রয়াল জর্জ্জ" নামধেয় ইংরেজের একখানি রণতরী নির্ম্মিত হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ আগষ্ট, ইহার তলদেশের একটি 'ষ্টপ্কক্' মেরামত করিতে গিয়া, সহসা ইহা স্পিট্হেডের নিকট জলমগ্ন হয়। স্ত্রী পুত্রসহ ৮০৫ জন সৈনিক ইহার আরোহী ছিল; তন্মধ্যে প্রায় ১০০ জন এই আকস্মিক বিপদে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'জর্জ্জের' শোচনীয় কাহিনী, কবিবর কাউপারের অমর লেখনীগুণে, প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরই সুপরিচিত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় ৫৭ বৎসর পরে, সীব্, আটজন ডুবরীকে তাঁহার নব-উদ্ভাবিত বর্ম্ম পরাইয়া, উহা উদ্ধারে কৃতযত্ন হয়েন। একাদিক্রমে চারি বৎসর পরিশ্রমের পর, জাহাজখানিকে মৃৎপ্রোথিত অবস্থায় দেখা গেল। অতি কষ্টে, উহার ১০৮টি কামানের মধ্যে, মাত্র কয়েকটি, এবং কতকগুলি কাষ্ঠফলক উদ্ধৃত হইল। সেই সকল উপকরণ সমবায়ে একটি সুবৃহৎ পাত্র নির্ম্মিত হইয়া, এক্ষণে মিউজিয়মে
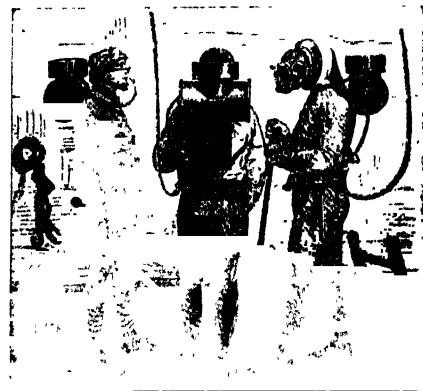
বর্ম্মপরিহিত ডুবরীদ্বয়

রক্ষিত হইয়াছে।—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মার্চ্চ 'ইউ-রাইডিস্'-নামক জাহাজ, ওয়াইট্ দ্বীপের নিকট, গভীর জলতলেনিমগ্ন হয়;—পরে 'পম্প' করিয়া সীব্-গর্ম্মান্

* সমুদ্রের এক মাইল, বা ২০২৫ গজ. দূরত্ব।

কোম্পানীই ইহা উদ্ধার করেন।—অগভীর জলমগ্ন হইলে, মাত্র 'পম্প' করিয়াই পোতগুলিকে উদ্ধার করা চলে। ১৮৯২ সালে যখন স্পেনের ফেরোলে রাজপোত 'হাউই' জলমগ্ন হয়,
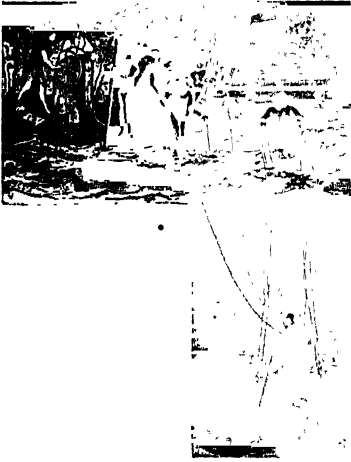
জলতলে ডুবরী

তখন এইরূপেই উহার উদ্ধারসাধন হইয়াছিল। জাহাজের যে-যে অংশে ছিদ্র হয়, ডুবরীরা সেইসকল অংশ সংস্কার করে; পরে, পম্পযোগে খোলের জল নিষ্কাশিত করিলেই জাহাজখানি ভাসিয়া উঠে। 'হাউই'কে এইরূপে উদ্ধার করিতে যে আটজন ডুবরী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ষ্টক্‌হল্মের 'নেপ্‌চুন্ স্যাল্‌ভেজ্ কো'র লোক। স্পেনের সম্রাট্ এই আট জনকে আটটি পদক, এবং অধ্যক্ষ, কাপ্তেন্ এড্‌লিণ্ড্‌কে K. C. M. G. উপাধি, প্রদান করেন।—রাজপোত 'স্থলতান্' মাণ্টার নিকট মগ্ন হইলে, তাহাও এইরূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

৩। সমুদ্রচারী পোত মাত্রেই—বিশেষতঃ রণতরীগুলিতে—জনকয়েক ডুবরী থাকা নিতান্ত প্রয়োজন;—সহসা, কোন অদৃষ্টপূর্ব্বক কারণে, জাহাজের তলদেশে ছিদ্রাদি হইলে, এবং জলমধ্যে অবস্থিত 'প্রোপেলর' (চালন-চক্র) অপরিষ্কার হইয়া, বা অন্য কোন কারণ-বশতঃ বিগ্‌ড়াইয়া গেলে, সেসকল সংস্কার-কার্য্য ডুবরীভিন্ন অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

৪। সমুদ্রগর্ভে, অনেক স্থানে, মগ্ন শৈলরাজি বর্ত্তমান আছে; এগুলি জাহাজের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক। সেই জন্য অনেকসময় এগুলি 'ডিনামাইট্', বা অপর কোন রাসায়নিক বিস্ফোরকদ্রব্যদ্বারা উড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। ডুবরীভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা এই কার্য্যসাধন সম্ভব-পর নহে। এতদর্থে শৈলগুলির গাত্রে ডুবরীরা বহুসংখ্যক ছিদ্র করে এবং সেইগুলি 'ডিনামাইট্'দ্বারা পূর্ণ করিয়া, পরে, দূর হইতে, তাড়িতপ্রবাহ প্রয়োগে তাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। এইরূপে ইল্‌ডেস্‌লাই শৈল উড়াইয়া দিতে, তাহার গাত্রে ষোল হাজার ছিদ্র করিয়া, তাহাতে ৭৬ হাজার পৌণ্ড ওজন ডিনামাইট্‌দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছিল। ইহাতে ব্যয় পড়িয়াছিল ১০,৫০,০০০৲ টাকা!

৫। ধনরত্নসম্ভারাদিপূর্ণ অর্ণবপোত জলমগ্ন হইলে, তাহার মাল পত্র উদ্ধারপক্ষে, ডুবরীদের সম্মিলিত সাহায্য প্রকৃতই অমূল্য। ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, স্পেনের ডাকবাহী ষ্টীমার "দ্বাদশ আল্‌ফান্সো", কাডিজ্ হইতে হ্যাভানা যাইবার পথে, গ্র্যাণ্ডো পয়েণ্টের সন্নিকটে ১৬০ ফীট্ জলতলে মগ্ন হয়। তাহাতে প্রায় ১৫,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সীব্-গর্ম্যান্ কো'র প্রধান ডুবরী—আলেক-জণ্ডর ল্যাম্‌বার্ট, ছয়মাস পরিশ্রমের পর, জাহাজের খাজনাখানার সন্ধান পাইলেন। অতঃপর, তিনি ক্রমে প্রায় ১০৫০,০০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করিয়া ৬৭,০০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন।—বক্রী ৪,৫০,০০০৲ টাকা মুদ্রাপূর্ণ পেটীকার কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তাহা উদ্ধার করা
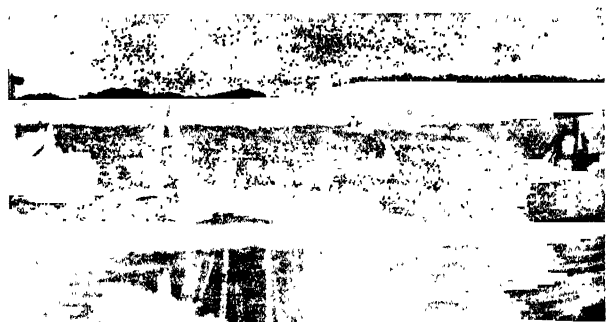
জলমগ্ন 'রয়াল্ জর্জ্জ'

অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। অনন্তর, টেষ্টর্-নামক এক ব্যক্তি সেই অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।
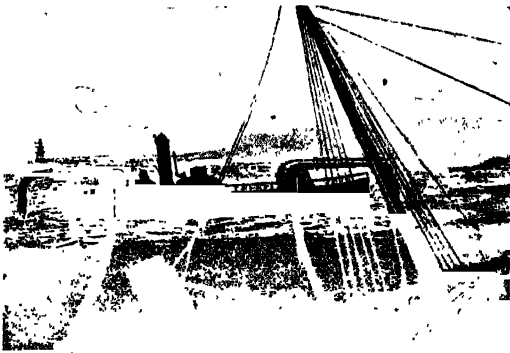
জলমগ্ন পোত উত্তোলন

পরে আবার, দুইজন জর্ম্মণ সেই কার্য্যে ব্রতী হয়; তন্মধ্যে একজন অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অপর জন উন্মাদ হইয়া যায়।—১৮৬৯ সালে শঙ্ঘাই সমীপবর্ত্তী, লিউকোণা মগ্ন শৈলে প্রতিহত হইয়া, ধনরত্নপূর্ণ 'হ্যামিল্লামিচেল' পোত ১৫৬ ফিট জলতলে মগ্ন হয়। রিডিয়াড ও পেঙ্ক নামক দুই ডুবরী এই ধনোদ্ধারে ব্রতী হয়, এবং রিডিয়াড বহুকষ্টে ৭০,০০০৲ এবং পেঙ্ক ১,৫০,০০০৲ টাকা মূল্যের ডলার উদ্ধার করে।—১৮৬৯ সালে P. & O. কোম্পানীর ধনপূর্ণ 'কর্ণাটিক্' জাহাজ সুয়েজ্ উপসাগরে মগ্ন হয়। ডুবরীরা তাহার প্রায় ৬,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের মুদ্রা উদ্ধার করিয়াছিল।—১৮৯৫ সালে একখানি চীনে ডাক জাহাজ নিউ সাউথ ওয়েল্সের উপকূলে ডুবিয়া যায়। ১৮৯৬ সালের আগষ্ট মাসে, সীব-গম্ম্যান কোংর অধীনস্থ, মে এবং ব্রিগস্ নামক ডুবরীদ্বয় ঐ জলমগ্ন জাহাজ হইতে ৮০০০ সভরেন্ উদ্ধার করে।—কেবল মুদ্রাই যে এইরূপে উদ্ধৃত হয়, তাহা নহে। লোরের নিকটে মগ্ন একখানি মেল্বোর্ণের জাহাজ হইতে, ডুবরীরা একবার সাত হাজার গাঁইট পশম উদ্ধার করে. ইহার মূল্য ১৫,০০,০০০৲ টাকা।—আর একখানি জলমগ্ন মাল-বোঝাই জাহাজ হইতে একবার ১২,০০,০০০ টাকা মূল্যের রেশম, নীল, লাক্ষা উদ্ধৃত হইয়াছিল। একবার পিয়ার্স নামক হুইটস্টেবল্ সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ডুবরী জলতলে একখানি শিকারীর ছুরী পাইয়াছিলেন; শুনা যায়, ইহা দশ বৎসরে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং হীরকাদি মণিরত্ন-খচিত ছিল।—মূল্য প্রায় ৩৫,০০০৲ টাকা! এমন কতশত মূল্যবান্ প্রাচীন দ্রব্যজাত যে সীব গম্ম্যান্ কোংর প্রদর্শনীতে রক্ষিত আছে, তাহা বলা যায় না। এখনও যে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন কত অপরিমিত রত্নসম্ভার নিহিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটির কথা বলি—আমষ্টার্ডামের উত্তরে, টশেলিং নামক ডচ্ দ্বীপের অদূরে, একখানি ফরাসী রণতরী প্রায় এক-শতাব্দী পূর্ব্বে জলমগ্ন হয়. প্রবাদ যে, তাহাতে ১,৫৫,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের মুদ্রা বোঝাই ছিল। ১৮০০ সালে, এই ধন ভাণ্ডার উদ্ধারকল্পে, একটি 'কোম্পানী' গঠিত হয়। এই কোম্পানীর যত্নে ১৮০০-১ সালে ৮,৩৬,৫৫০; ১৮৫৬-৬০ সালের মধ্যে ৬,৬১,৮৬০; ১৮৮৬ সালে ১০,২৯০ টাকা মূল্যের মুদ্রাদি হইয়াছে; কিন্তু, লোকের ধারণা, এখনও তথায় যথেষ্ট ধন প্রোথিত আছে।

৬। সমুদ্র সম্ভব মুক্তা, প্রবাল, স্পঞ্জ প্রভৃতি আহরণ ও উত্তোলন কার্য্যও, সুরক্ষিতদেহ ডুবরীভিন্ন, অপর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর নহে। এতদ্ভিন্ন—

৭। বন্দর, জেটী, সেতু, সেতুস্তম্ভ প্রভৃতি তৈয়ার কার্য্যেও ডুবরী রাজমিস্ত্রীদের বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধ হয়।

জলমগ্ন শৈল ইলেক্‌ট্রিসিটি উড়াইয়া দেওয়া

তবে, এবম্বিধকার্য্যে ডুবরীদের বর্ম্মাপেক্ষা ঘণ্টাকৃতি গৃহই প্রায় অধিকতর কার্য্যকরী হয়। ফোক্‌ষ্টোন্ বন্দরনির্ম্মাণকালে

১৩´ ফীট দীর্ঘ ও ১১´ প্রস্থে, এবং ১১; ফীট উচ্চ একটি ঘণ্টাগৃহ ব্যবহৃত হইয়াছিল; ইহার ওজন ছিল ২৬ টন, অর্থাৎ প্রায় ৭০২ মণ। দৃঢ় লৌহরজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া, কপিকলের সাহায্যে, এই গৃহ জলতলে নামাইয়া দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে তাড়িত ঘণ্টা, আলোক, কথোপথনের যন্ত্র, বায়ুপ্রবাহের কৌশল প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে অবস্থানকালে ডুবরীদের যে আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

৮। সময়ে সময়ে স্থলভাগেও ডুবরীর প্রয়োজন হয়। কথাটা শুনিয়া অনেকেই হয় ত হাসিবেন; কিন্তু প্রণিধান করুন।—আমি 'স্থল' কথাটা এই অর্থে প্রয়োগ করিতেছি—স্থলভাগে অবস্থিত জলপ্লাবিত খনি-খাদ। তাহার কথা বারান্তরে বলিব।
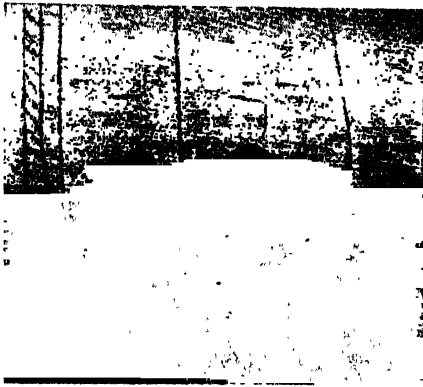
ডুবরী কর্ত্তৃক দ্রব্য সন্ধান

প্রত্যেক অর্ণবপোতেই প্রায় ডুবরী থাকে; সচরাচর—প্রত্যেক রণতরীতে আট জন, ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী প্রত্যেক পোতে চারি জন এবং ক্ষুদ্র রণতরীতে দুইজন করিয়া সুদক্ষ ডুবরী থাকে। প্রায় ৬০।৬২ বৎসর হইতে, প্রকার ডুবরী নিযুক্ত করিবার এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল ডুবরী পোর্টস্‌মথ্, সিয়রনেস্ ও ডেভেনপোর্ট প্রভৃতি কেন্দ্রে শিক্ষিত হয়। বস্তুতঃ অর্ণবপোত—বিশেষতঃ রণপোত—সমূহে ডুবরী থাকা নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ, যাইতে যাইতে পথে, বা যুদ্ধকালে, তলদেশে কোন কিছু অনিষ্ট ঘটিলে, অথবা সহসা নোঙ্গর, বা অপর কোনও দ্রব্য, জলমধ্যে পতিত হইলে, ইহাদের সাহায্যভিন্ন আর উদ্ধারের উপায় নাই।

এইবার ডুবরীদিগের পারিশ্রমিকের কথা বলিয়া প্রবন্ধ

ফোক্‌ষ্টোনের ডুবরীর দল

সমাপ্তি করিব। বলা বাহুল্য, কার্য্যের তারতম্য অনুসারে পারিশ্রমিকের ন্যূনাধিক্য নিয়ন্ত্রিত হয়। বিদেশের বন্দরে কার্য্য করিতে হইলে, ইংরেজ ডুবরীরা সাধারণতঃ প্রায় ৩০০ হইতে ৪৫০৲ টাকা বেতন পায়;—তদ্ভিন্ন, কার্য্যশেষে একটা থোক্ বকশিস্‌ও লাভ করে। আবার, ঠিক সেইরূপ কার্য্যের
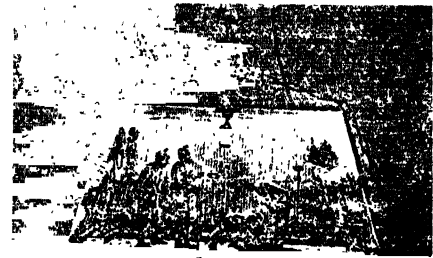
ঘণ্টাগৃহাভ্যন্তরে কার্য্যনিরত ডুবরীর দল

জন্যই, ইংলণ্ডে ঘণ্টাপ্রতি ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা, এবং খননকার্য্য করিতে হইলে, ৪৲ টাকা হইতে ৭৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। অবশ্য, ধনরত্ন-উদ্ধার ব্যপদেশে দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্যের জন্য এরূপ নির্দ্দিষ্ট একটা কিছু পারিশ্রমিক ধার্য্য করা সম্ভবপর নয়।

ডুবরীরা প্রায়ই দীর্ঘজীবন লাভ করে। তাহাদের মুখশ্রুত কাহিনীগুলি যেমন বিচিত্র, তেমনই কৌতুহলোদ্দীপক।

অবসরপ্রাপ্ত, নানাবৃত্তিধারী, প্রবীণেরও অসদ্ভাব নাই। যাহারা চিকিৎসাবিষয়ক উপাধিধারী, তাঁহাদিগের সঙ্গে ছাত্রবর্গ থাকিয়া, চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী আছেন। এতদ্ভিন্ন, কেহবা, আর্দ্দালী, কেহবা ভাণ্ডারীরূপে, কেহবা রসদ বণ্টনকারীরূপে, কেহবা ভারতসেনা এবং ইংরেজ ডাক্তার ও যোদ্ধ্কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে দোভাষীরূপে, কেহবা পত্রবাহক হরকরারূপে—নানা বিচিত্রপদে সমাসীন থাকিয়া, বিবিধ কার্য্য সুসম্পাদন করিতেছেন।

ইহারা স্বেচ্ছায় স্ব স্ব বৃত্তি ও কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, যেরূপ সোৎসাহে ও একান্তঃকরণে India Officeএর হস্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাদের গভীর রাজভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; এবং ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহারও যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এইটুকু—ইহারা যে, ঘরে বসিয়া যতটুকু সাধ্য পরোপকার করিতেছেন, তাহা নহে, বিদেশে—স্বদেশ হইতে শতসহস্র ক্রোশ দূরে, অপরিচিতদিগের মধ্যে, অজানা রাজ্যে আসিয়া, ইহারা পরহিতব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের সুদূরস্থিত আত্মীয়জনসহ পুনর্ম্মিলনের আশা সুদূরপরাহত হইয়াছে! যাহারা স্বদেশ স্বজনগতপ্রাণ ভারতবাসীর স্বভাবচরিত্র সুবিদিত আছেন, এই প্রবৃত্তির মূলে কি গভীর সমুচ্চভাব বর্ত্তমান, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিবেন! মাতা-পিতা-দয়িতা সন্ততি প্রভৃতি সকাশে, সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনা, স্বেচ্ছায় এত সুদূরসম্ভব করিবার মূলে যে কি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত, তাহা কি বৃটিশরাজ বুঝিতেছেন না!

বর্ত্তমান বিপৎপাতকালে, কিরূপে এই বিচ্ছিন্ন ভারতবাসী একত্রিত হইয়াছিলেন, আমরা এইবার সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। রাজনৈতিক জগতের প্রশান্ত আকাশে যখন এই মহাহবের ঘনঘটার সূত্রপাত হইল—বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আইনশিক্ষার কেন্দ্রগুলি এবং অন্যান্য শিক্ষাসঙ্ঘসংসৃষ্ট যাবতীয় ভারতবাসী স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, স্কটল্যাণ্ড, প্রভৃতি—যুক্তরাজ্যের যে যে স্থানে শিক্ষা-কেন্দ্র অবস্থিত, সকল স্থানেরই ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ এই আবেদনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে আগুয়ান হইয়া, অরাতিকুলের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তদুপযোগী সামরিক শিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। এই সকল আবেদনফলে কিন্তু সেই অপ্রিয় প্রাচীন সমস্যা উপস্থিত হইল।—প্রচলিত বিধিমতে হিন্দু, মুসলমান, পরজন্মবাদী (Animist), জৈন, শিখ প্রভৃতি জাতি যে, স্বেচ্ছাযোদ্ধৃশ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকারবর্জ্জিত। জনহিতৈষী ভারতবাসিগণ কর্তৃপক্ষের এই বিষম সমস্যাসঙ্কটের কথা বুঝিতে পারিলেন; বুঝিলেন, সে অধিকার বিচারের এখন সময় নহে। তাই, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, পর্য্যটক বা প্রবাসী ভারতবাসীরা নিঃসর্ত্তে ইণ্ডিয়া আফিসের অধীনে আত্মসমর্পণ করিবেন—ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহোদয় যথেচ্ছভাবে তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করুন।

লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের অভিভাবক
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন

এই সমীচীন সদ্‌যুক্তি-প্রদানের মূলমন্ত্রী শ্রীযুক্ত এম. কে. গান্ধী। ইঁহারই প্রভাবে ও যত্নে বুয়র যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সেবকসম্প্রদায় গঠিত হইয়া প্রভূত সৎকার্য্য ও সাহায্য দান করিয়াছিল। যুদ্ধসংঘটনের প্রাক্কালেই, সৌভাগ্যবশতঃ, তিনি বিলাতে গমন করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য তখন ভাল নহে; কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের এই সঙ্কটকালে প্রত্যেক ভারতবাসীরই সম্রাট্ রাজার সহায়তা করা উচিত। সুতরাং তিনি যাবতীয় প্রবাসী বিশিষ্ট ভারতবাসীকে সমবেত করিয়া, উল্লিখিত বার্ত্তা দিলেন।

বাড়াইয়া, দুই হস্তে তাহার হস্তদ্বয় ধরিয়া, জাতীয় ভাষায় কতক্ষণ কত কথা কহিল তাহার সে সময়ের আনন্দোৎফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া, প্রকৃতই মনে হইতেছিল, সে যেন তাহার দৈহিক সকল ক্লেশ একেকালে ভুলিয়া গিয়াছে। মাতৃভাষায় কথোপকথনের সাবকাশ পাইয়া, সে যে কি পর্য্যন্ত উৎফুল্ল হইয়াছিল, বিদায়কালে কৃতজ্ঞতাপূর্ণনয়নে চিকিৎসক-মহাশয়কে সে সেকথা জানাইতে ভুলিল না। বস্তুতঃ, বিদেশে অপরিচিত বিদেশিবর্গের নিকট শতগুণ আদর-সমবেদনা পাইলেও, বিজাতীয় ভাষায় তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রবাসীর আন্তরিক অভাব পরিতৃপ্ত হয় না—মাতৃভাষা যথাযথ মাত্রা যতি প্রাদেশিকতা সমন্বয়ে সমুচ্চারিত শুনিলে, প্রাণে যে কি বিমল আনন্দ সঞ্চারিত হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে তাহা বুঝিবেন না।

সৈনিক-হাসপাতালগুলির একটি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, কর্তৃপক্ষীয়েরা ভারতবাসীদিগের জাতিনির্ব্বিশেষে আহার্য্যাদির, মরণান্তে যথোপযুক্ত জাতীয় সৎকারের, এবং প্রত্যেকের জাতীয় সংস্কার অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যে সকল সৈন্য সুস্থ ও সক্ষম হইয়াছে, তাহারা শয্যাগত স্বজাতীয়বর্গের জন্য পাককার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। বলাবাহুল্য, হিন্দুমুসলমানের পাকশালাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত।

যুক্ত-সাম্রাজ্যে এখন যে সকল ভারতীয় ললনা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা স্বাভাবিক করুণাপ্রণোদনে বিবিধ

লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল কামিং গ্রসার

বিচিত্র স্বদেশী মিষ্টান্ন ও খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে এইসকল হাসপাতালে প্রেরণ করেন—এজন্য ভারতীয় সেনানীমণ্ডলী তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন, সৈনিকেরা সমরবিভাগের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে যেসকল নিয়মিত বস্ত্রাদি পাইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত অনেক ভারতবাসী ও ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজ তাহাদিগকে উষ্ণবস্ত্রাদি উপঢৌকন দিয়াছেন—সে জন্যও তাহারা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করে।

প্রথম চিঠি

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

এই খানি তার প্রথম চিঠি—হাতের প্রথম লেখা,
আখরগুলি হিজিবিজি—সা'র গুলি সব বেঁকা।
অস্ফুট ফুলের সৌরভ এ—গৌরবে তার ভরা,
খেলার ঘর এ তাজমহলের—শিল্পীশিশুর গড়া।
বালক-ফিডিয়াসের পুতুল - তৈরি নিজের হাতে,
শিশুকালিদাসের কাব্য—লেখা পুঁথীর পাতে।
র‍্যাফেলের এ হাতের ছবি—শৈশবেতে আঁকা,
খনির প্রথম মণি এযে—কাদা-ধূলায় ঢাকা।
তানসেনের এ সা ঋ গা মা, লীলার অঙ্ক রাখা,
টিনটিনি'র তোতলামি এ—মধুরতায় মাখা।
অর্জ্জুনের এ খেলার সায়ক—প্রভাত রবির ছটা,
আষাঢ়েরি প্রথমে এ—নবীন মেঘের ঘটা।
বসন্তের এ প্রথম কলি, চাঁদের প্রথম আলো,
এইখানি তার প্রথম চিঠি—বাসি যারে ভালো।
কোকিলার এ প্রথম সাড়া, শিখীর প্রথম কেকা,
এইখানি তার প্রথম চিঠি—হাতের প্রথম লেখা।

'বিরিঞ্চি'র বাসুদেবমূর্ত্তি

[শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্.]

[illegible] জেলায় ফেণি মহকুমা, আসাম-বঙ্গ রেলপথের [illegible] শাখার মধ্যপথে অবস্থিত। উক্ত মহকুমার এক [illegible] উত্তরে, বিরিঞ্চিনামক গ্রামে, আমিরাবাদ ও বেদারা-[illegible] পরগণার প্রধান জমিদারী-কাছারী বর্ত্তমান। বিরিঞ্চি কাছারীতে একটি বাসুদেব-বিগ্রহ স্থাপিত আছে; পর পৃষ্ঠায় তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। কথিত আছে যে, ফেণির [illegible] মুহুরী নদীতে জনৈক ধীবর এই মূর্ত্তিটি প্রথম প্রাপ্ত হয় এবং বিরিঞ্চি কাছারীতে স্থাপিত করে। তখন উক্ত জমিদারী ত্রিপুরারাজের অধীন ছিল; সুতরাং আড়ম্বরের সহিত বিগ্রহটির পূজানির্ব্বাহ হইত। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট গ্রামের উপস্বত্ব হইতে বিগ্রহের পূজার্চ্চনার ব্যয়সঙ্কুলন হইত। [illegible] সালে এই জমিদারী Alfred Courjon নামক জনৈক সাহেবের হস্তগত হয়, এবং তদবধি বিগ্রহের সেবাকার্য্যে [illegible] হইতে আরম্ভ হয়। ১২৯১ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ [illegible] জমিদারীর মালীক হ'ন। তাহার কিছুকাল [illegible] তহসিল কাছারীর সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর [illegible] সেবার সুবন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে, মূর্ত্তিটিকে [illegible] স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে যে, পক্ষ [illegible] তিনি, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, মূর্ত্তিটি স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত [illegible] তদবধি মূর্ত্তিটি বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া, বিরিঞ্চি কাছারীতেই এক ক্ষুদ্র টিনের ঘরে রক্ষিত ও পূজিত [illegible] তেছে। এপর্য্যন্ত বিগ্রহটির কথা বর্ত্তমান [illegible] কর্ণগোচর হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। [illegible] শিল্পের এরূপ একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাচীন [illegible] দের মফস্বলের কাছারী-বাড়ীতে রক্ষিত আছে, [illegible] শ্লাঘার বিষয় বটে। আশা করা যায়, রাজ [illegible] কর্ত্তৃস্থানীয় মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ [illegible] এই মূর্ত্তিটির বিষয় অবগত হইলে, ইহার [illegible] অবস্থার অপনোদন হইবে, এবং এই মূর্ত্তিটিকে [illegible] স্থানীয় হিন্দুদিগের সামাজিক এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি [illegible] করিবে।

হিন্দুবিদ্বেষী যবন সেনাপতি কালাপাহাড়ের কৃপায় পূর্ব্ববঙ্গে 'নাককাটা বাসুদেব' প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিরিঞ্চির বিগ্রহটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা সম্পূর্ণ অক্ষতাঙ্গ। কিংবদন্তী এই যে, কালাপাহাড়ের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই মূর্ত্তিটিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। বিগ্রহটির অপর বিশেষত্ব—ইহার চালচিত্রে বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্ত্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তির পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি সমূহের মধ্যে দশাবতারের মূর্ত্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি দেখিলে মনে হয়, যেন এইমাত্র শিল্পীর হস্ত হইতে উৎকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মূর্ত্তিটিতে কোন সন-তারিখ নাই। পাদপীঠের নীচেও প্রস্তর খণ্ডের কিয়দংশ এরূপ ভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে যে, দেখিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয়, পাদপীঠটি একটি স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন ছিল। মূর্ত্তিটি ধূসরবর্ণ মসৃণ একখণ্ড সমগ্র স্লেট প্রস্তরনির্ম্মিত; দুইফিট প্রস্থ এবং পাদপীঠ হইতে চারি ফিট উচ্চ। মধ্যে বিষ্ণু, দক্ষিণে শ্রী বা লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। বিষ্ণু বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, নিম্নে সর্পপাণি পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি গরুড়। পাদপীঠের দক্ষিণে নতজানু রমণীযুগল করযোড়ে স্তব করিতেছে, বামে পূজোপকরণহস্তে অপর রমণী উপবিষ্টা। পাদপীঠস্থ শতদলের উভয়দিকে দুটি মৃণাল উত্থিত হইয়াছে, তাহার বৃন্তে দুটি অর্দ্ধস্ফুট কোরক, তদুপরি বিষ্ণুর নিম্নহস্তযুগল সংন্যস্ত। জানুর নিম্নভাগে মনোহর বনমালা বিলম্বিত। মধ্যভাগের উভয়পার্শ্বে অশ্বমুখ কিন্নর নিম্নে কপিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। তদুপরি মকর, মকরপৃষ্ঠে সঙ্গিনী আরূঢ়া, তাহার অধোদেশ পক্ষ আকৃতি, ঊর্দ্ধদেশ নারীর আকৃতি। মূর্ত্তিটির শিরোভাগের দক্ষিণদিকে, বিচিত্র লতা বল্লরীর মধ্যে, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ ও বামন মূর্ত্তি,—বামদিকে পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধদেব ও অশ্বারূঢ় কল্কিমূর্ত্তি। প্রত্যেকের হস্তে যথাযোগ্য প্রহরণ বর্ত্তমান, এবং পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সর্ব্বোপরি মালাহস্তে উড্ডীয়মান অপ্সরাগণ।

সৌম্যদর্শন দেবমূর্ত্তির শিরে বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুদ্বয়ে কেয়ূর, হস্তে বলয়, গলদেশে বিচিত্র মাল্য ও মণিরত্নখচিত কণ্ঠহার, বক্ষে কৌস্তুভমণি, তদুপরি দীর্ঘ যজ্ঞসূত্র বিলম্বিত। কটীদেশে কৌপীন, তদুপরি মনোহর বহির্ব্বাস। পদদ্বয়ে নূপব। মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে পদ্ম, বামদিকের প্রথম হস্তে চক্র, দ্বিতীয় হস্তে শঙ্খ। কিরীটের উর্দ্ধদেশে, কীর্ত্তিমুখের স্থলে ছত্র। বিষ্ণু সমভঙ্গাসনে, এবং পার্শ্ব-চারিণী লক্ষ্মী ও সরস্বতী ত্রিভঙ্গাকৃতিতে কমলাসনে দণ্ডায়মান। সরস্বতী বীণা-বাদনরতা, শ্রীর দক্ষিণ হস্তে বরাভয়মুদ্রা প্রকটিত। উভয়মূর্ত্তি সাভরণা। মূল-মূর্ত্তির হস্তচতুষ্টয়ে গদাপদ্মশঙ্খচক্র-স্থাপনের ক্রমানুসারে মূর্ত্তিটিকে অগ্নি-পুবাণ ও পদ্মপুরাণ-বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্গত ত্রিবিক্রম ও সিদ্ধার্থসংহিতাবর্ণিত উপেন্দ্র-সংজ্ঞক বলা যাইতে পারে। কালিকাপুরাণে বাসুদেব মূর্ত্তির যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিতও বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির প্রভূত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যথা—

"পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজং।
বামার্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেঽধঃ শঙ্খমেবচ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদি চাদ্ভুতম।

*   *   *   *

"শীর্ষে কিরীটং সদ্যোতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্।
দধান দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম্।"

বিরিঞ্চির বাসুদেব-মূর্ত্তি

পাষাণনির্ম্মিত এই বিগ্রহটির পরিকল্পনা অতীব সুন্দর। মূল মূর্ত্তিটির প্রশান্ত বদনমণ্ডলে এক স্বর্গীয় সুষমা পবিব্যাপ্ত। পার্শ্বচারিণী দেবীযুগলের মহিমামণ্ডিত মুখশ্রীতে নারী-সুলভ কমনীয়তা ও করুণা যেন ক্ষরিত হইতেছে। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য-প্রণীত 'শুক্রনীতি' নামক গ্রন্থনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে মূর্ত্তিটিকে রাজসিক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। বাহনোপবিষ্ট, সালঙ্কৃত, বিবিধ আয়ুধধারী, উপাসক... ও উৎসাহদাতা মূর্ত্তি রাজসিকাখ্য। মূর্ত্তিত্রয়ের অবয়ব সুঠাম, সুশোভন ও সম্পূর্ণরূপ শিল্পশাস্ত্রসঙ্গত। হস্ত... প্রতিমূর্ত্তির গঠন ও স্থাপনভঙ্গি স্বাভাবিক ও মনোরম। বি... মূর্ত্তির

[illegible] করদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলির গঠন ও বিচিত্র সংস্থান, [illegible] ও করস্থিত আয়ুধাদির শিল্পচাতুর্য্য, হস্তী দুইটির [illegible]সাদৃশ্য, অতীব বিস্ময়জনক। বাসুদেবের ধরণীবদ্ধদৃষ্টি— [illegible] নিমীলিত নহে। শরীরের অবয়বসমূহ পরিপূর্ণ [illegible] নহে। এবিষয়ে পদদ্বয়ে যে কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট [illegible] তাহা আলোকচিত্র-গ্রহণের অসুবিধাজনিত। [illegible]রের ও পাদপীঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি অতিশয় [illegible]। মূর্ত্তিতে 'লাবণ্যযোজনা' শিল্পশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট [illegible] বক্ষ্যমাণ বিগ্রহটিতে এবিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি [illegible] হইবে না।

[illegible] অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' গোরক্ষপুরে [illegible] বিষ্ণুমূর্ত্তির যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, [illegible] সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, [illegible] যে তদপেক্ষা সুন্দর, তুলনা করিলেই তাহা [illegible] হইবে। বস্তুতঃ, কলিকাতা যাদুঘর, সারনাথ, [illegible], ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আমি বৌদ্ধ ও [illegible]গোর যেসকল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিয়াছি, [illegible] সহিত এই বিগ্রহটি সম্পূর্ণরূপে একাসনে [illegible]।

[illegible] অপর নাম বিষ্ণু। পৌরাণিকযুগে তিনি [illegible] অন্যতমস্বরূপে পূজিত হইতেন, এবং পুরাণাদিতে [illegible] দশাবতারের বর্ণনা আছে। সুতরাং পৌরাণিক [illegible] বিষ্ণুমূর্ত্তি রচনা আরম্ভ হইয়াছে, বলা যাইতে [illegible] বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি কোন্ যুগে উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা [illegible] বলা অসম্ভব হইলেও, ইহা প্রাচীন, সন্দেহ [illegible] পণ্ডিতগণের মত এই, বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী গুপ্তরাজ- [illegible] –৪৮০ খৃষ্টাব্দে) ও তৎপরবর্ত্তী যুগে হিন্দু [illegible] চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ [illegible] শতাব্দীকে ডাক্তার কুমারস্বামী তাঁহার 'The Art and Crafts of India and Ceylon' নামক [illegible] the flowering time of Hindu renaissance', [illegible] হিন্দু সভ্যতার চরমবিকাশের যুগ বলিয়া বর্ণনা [illegible]। ঐ পুস্তকের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, এই [illegible]ভাস্কর্য্য is 'characterised by the suavity and ful[illegible] of its forms, and its closely clinging tra[illegible]rent draperies'—মূর্ত্তিগুলির সুডৌল অঙ্গাবয়ব ও কমনীয়তা এবং স্বচ্ছ গাত্র-সংলগ্ন পরিচ্ছদ দ্বারা এই ভাস্কর্য্য বিশেষভাবে সূচিত হইয়াছে। এই বর্ণনা বিরিঞ্চির বাসুদেববিগ্রহটির সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য। মনুষ্যাকৃতির গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব-নামক বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গাঙ্গবংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দির নির্ম্মিত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ (ফর্গুসন সাহেবের মতে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে) বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত সূর্য্যোপাসক কোন উৎকল নরপতি-কর্ত্তৃক কণারকের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হয়।

বর্ত্তমান বিষ্ণুমূর্ত্তিটির সহিত উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রখচিত অনেকগুলি মূর্ত্তির রচনা-ভঙ্গির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পুনশ্চ, দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব দশাবতার স্তোত্র রচনা করেন; তাহার পূর্ব্বেই দশাবতারের রূপভেদ ও প্রকারভেদ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া, হিন্দু-সাধারণের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। অতএব, বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিরচিত হওয়াই খুব সম্ভব। জয়দেব কিয়ৎকাল লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ছিলেন, তৎপরই মুসলমানগণের অভ্যুদয় কাল। তখন স্থাপত্যের উন্নতি হইলেও উহা তক্ষণ শিল্পের অবনতির যুগ; কারণ, মূর্ত্তিরচনা মুসলমান ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং, তৎপূর্ব্বেই এই মূর্ত্তিটি খোদিত হওয়ার সম্ভাবনা। ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে' মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খাটরার বাসুদেব মূর্ত্তির যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেদার রায়ের আমলের বলিয়া কথিত হয়। কেদার রায় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং আকবর ও মানসিংহের সামসময়িক ছিলেন। তাঁহার যুগে হিন্দু-তক্ষণ-শিল্পের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা ঐ মূর্ত্তিটির সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। অথচ 'বারভূঞা'র অন্যতম কেদার রায় বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ ভাস্কর দ্বারা মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিরিঞ্চির বাসুদেব-মূর্ত্তিটি যে খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, অর্থাৎ সপ্তশত

হইতে পনের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; এবং মূর্ত্তিটির রচনানৈপুণ্য দেখিয়া, ইহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।

এই প্রাচীন ও সুন্দর মূর্ত্তি কোন্ ভাস্কর কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ, কাহার দ্বারা প্রথম কোথায় স্থাপিত হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার পক্ষে উপাদানের নিতান্তই অসদ্ভাব। একমাত্র এই বলা যাইতে পারে যে, মূর্ত্তিটির দ্বারা প্রমাণিত হয়, ন্যূনাধিক এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। অথচ এই স্থানের অতি সন্নিকটে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতোপরি শৈবদিগের একটি প্রধান ও প্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান। হিন্দুধর্ম্মে শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন তীব্র বিরোধ কোনকালেই ছিল না; সকল দেবতাই মূলতঃ এক, এই গভীর তত্ত্ব হিন্দু কোন কালেই বিস্মৃত হয় নাই;—মূর্ত্তিটিদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে। কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিলে এরূপ আরও অনেক কথা মনে উদয় হয়; কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর, যে হিন্দুভাস্কর্য্য একদা ভারতীয় সভ্যতাকে জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছিল, শিলাময় বাসুদেব মূর্ত্তিটি তাহার একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

খোকা

[শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস.]

ওই হৃদয়ের বিমল জ্যোতি
প্রেম মিলায়ে একাধারে,
সকল ক'রে জাগিয়ে কিরে
গড়িল বিধি তোর আকারে?
মানব প্রেমের মর্ম্মটিরে
মানব হ'তে বিমল ক'রে,
কোমল ক'রে ললিত ক'রে
চাইল বিধি ঢালিতে গ'ড়ে।
(তাই) চাঁদের আলো, ফুলের মধু,
ঢেউয়ের খেলা, পাখীর গানে,
হরিণ শিশুর চপল গতি
ঢেলে দিল তোর মধুর প্রাণে!
তাই বুঝি তোর নধর দেহে
হরষ রাশি রয় না ধ'রে,
চোখের চমক, মুখের হাসি,
(দেহের) চপল চলায় উছলে পড়ে!

ওই প্রেমের পুতুল, তাই কিরে তোর
একটুখানি দেহের মাঝে,
কোমল প্রেমে উছল করা
বিশাল এত হৃদয় রাজে?
জাগ্‌ছে তোর ওই তরুণ হিয়ায়
কোন্ স্বরগের রঙীন্ স্মৃতি?
(কভু) পশ্‌তে বুঝি পায় না সেথায়
এ সংসারের ভাবনা-ভীতি?
সেই স্বরগের স্বপন দেখে
সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলা,
হেসে গেয়ে সরল প্রাণে
তাই শুধু তুই করিস্ খেলা!
(তোর) সরল প্রাণের স্বরূপ-স্বপন
কখনো যেন না যায় টুটে;
(যেন) চিরদিনটি এম্‌নি রে তোর
বিমল হিয়ায় হরষ ফুটে!

প্রতীচ্য সাহিত্যে প্রাচ্য কথা

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.]

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে জরথুস্ত্রীয় যুগ

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে বৈদিক যুগ, যুগ, বৌদ্ধ যুগ প্রভৃতি নানাবিধ যুগের নাম ছে ; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে জরথুস্ত্রীয় যুগ সম্পূর্ণ নূতন। জরথুস্ত্র (Zoroaster) প্রাচীন অবতার-বিশেষ ; তিনি যে ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিয়া- অথবা সাজাইয়া গুছাইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং বর্ত্তমানকালের ভারতবর্ষের পার্সীসম্প্রদায়ের একমাত্র । ভারতবর্ষে জরথুস্ত্রের ধর্ম্মমত কখনও প্রচলিত বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই ; কিন্তু প্রাচীন শিল্প, রীতি, নীতি, ভাষা ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের প্রভাব ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) প্রাচীন ভারতে জরথুস্ত্রীয় যুগ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইংরেজী বৎসরের জানুয়ারী মাসের 'রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটী'র পত্রিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্পুনার "ভারতবর্ষের ইতিহাসে জরথুস্ত্রীয় যুগ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং, ইহার সম্বন্ধে এখন কোন মতামত প্রকাশ করা উচিত নহে। গত তিন বৎসর হইতে ডাক্তার স্পুনার, বোম্বায়ের লক্ষপতি সার রতন তাতার প্রদত্ত অর্থে পাটলিপুত্রের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করাইতেছেন। তিনি এতদিন পরে স্থির করিয়াছেন, পাটলিপুত্রে যে প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দরিয়াবুস (Darius), খয়ার্ষ (Xerxes) প্রভৃতি প্রাচীন পারস্যের হথামানিষীয় (Achaemenian) বংশের রাজগণের প্রাসাদসমূহের নকল। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন, তাঁহার পারস্যভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচীন পার্সিপলিস নগরের ধ্বংসাবশেষের বিবরণে দরিয়াবুস, খয়ার্ষ প্রভৃতি রাজগণের যে অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন, সেই মানচিত্র দেখিয়া এবং পাটলিপুত্রের খননে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ মাপিয়া ডাক্তার স্পুনার স্থির করিয়াছেন যে, পাটলিপুত্রের প্রাসাদগুলি প্রাচীন পার্সিপলিসের প্রাসাদসমূহের নকল। পাটলিপুত্রের প্রাসাদে যে স্তম্ভাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহাও দরিয়াবুসের প্রাসাদের স্তম্ভাবলীর অনুকরণ মাত্র। পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভে একটি মিস্ত্রির চিহ্ন (mason's mark) পাওয়া গিয়াছে, পার্সিপলিসে সেইরূপ মিস্ত্রির চিহ্ন বহুসংখ্যক দেখা যায়। চৈন পরিব্রাজক যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দেশে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষের লোকে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, অশোকের সময়ের প্রাসাদ, মন্দির, স্তূপ প্রভৃতি দৈত্যদানবে তৈয়ারী করিয়াছিল। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ময়দানব

একজন বড় স্থপতি। দানব বা অসুর একই অর্থবাচক। ময়দানব বা অসুর ময় ভারতবর্ষের লোক নহেন। সংস্কৃত "অসুর" ও পহ্লবী "অহুর" একই কথার ভিন্ন ভিন্ন আকার। প্রাচীন পারসিক 'ময়', বোধ হয়, পারস্যদেশের প্রস্তরশিল্প ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন। ডাক্তার স্পুনার অনুমান করেন যে, "অসুর ময়" —"অহুরমজ্দ" শব্দের ভারতীয় প্রতিশব্দ। "অহুরমজ্দ" প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মের প্রধান দেবতা। মহাভারতের ময় দানব, বোধ হয়, আবেস্তার "অহুরমজ্দ", অর্থাৎ "মজ্দ" শব্দ ভারতীয় উচ্চারণে "ময়" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাণকারগণ "অহুর মজ্দের" উপাসকগণ-কর্ত্তৃক ভারতে প্রস্তরশিল্প আনীত হইয়াছিল বলিয়া, 'ময়' দানবকে বড় স্থপতি বলিয়া গিয়াছেন। অশোকের শিল্পিগণ পারস্যদেশীয় ছিল বলিয়া, অশোকের ১০০০ বৎসর পরে ভারতবর্ষের লোকে তাহাদিগকে দানব বলিত। ডাক্তার স্পুনারের প্রবন্ধের শেষাংশ প্রকাশিত হইলে, সমস্ত কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ নিদর্শন

ষ্টাইন (Sir Marc Aurel Stein), স্বেনহেডিন (Sven Hedin), লেকক (Le Coque), গ্রুনবেডেল (Grunwedel), পেলিও (Pelliot) প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক গত বিশ বৎসরের মধ্যে মধ্য এসিয়ার মরুময় দেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়া, মরুভূমিতে বালুকামগ্ন বহু মহানগরীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রাচীন নগর খনন করিয়া, বহু বৌদ্ধ মূর্ত্তি, বৌদ্ধ মন্দির, সংস্কৃত ও চীন ভাষায় লিখিত পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল আবিষ্কার হইতে স্থির হইয়াছে যে, হাজার বৎসর পূর্ব্বে মধ্য এসিয়ার মরুভূমিগুলি শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র, জনপূর্ণ নগর ও প্রতাপশালী রাজা ছিল। এই রাজ্যের অধিবাসিগণ প্রাচীন ভারতের সভ্যতালোক পাইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। মরুভূমিতে প্রোথিত নগরসমূহে যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কৃত ও চীন ভাষা ব্যতীত একটি নূতন ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, ইহাই মধ্য-এসিয়াবাসী আর্য্যজাতির ভাষা। দুই একখানি এমন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে সংস্কৃত এবং ঐ নূতন আর্য্যভাষায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত আছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে মরুবাসী যাযাবর তুরস্কজাতি, সাইবিরিয়ার মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া, মধ্যএসিয়ার আর্য্যজনপদগুলি অধিকার করিয়াছিল। তুরস্কগণ আর্য্যসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য, মধ্য-এসিয়ার মরুভূমিতে প্রোথিত নগরসমূহে তুরস্কভাষায় লিখিত বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফরাসী পরিব্রাজক পেলিও, মধ্য এসিয়া হইতে ৩৫০৯ খানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ প্যারী নগরে লইয়া গিয়াছেন। এইগুলি এখন ফরাসীজাতির জাতীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। পেলিও কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে, "দশকর্ম্মপথ গাথা" নামক, একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ, ফরাসী পণ্ডিত ক্লড উয়ার্ট (Claude Huart) কর্ত্তৃক সম্প্রতি ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়া, প্যারীনগরের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থখানি তুরস্কভাষায় লিখিত। ইহা প্রাচীন সিরিয় দেশের সেকালের অক্ষরে লিখিত। ইহাতে বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধদেব, পূর্ব্ব কোন জন্মে জম্বুদ্বীপে—ভারতবর্ষে—বারাণসীর রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই জাতকবিবরণ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে তিব্বতীয়ভাষায় এই গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রালস্টন (W. R. S. Ralston), জর্ম্মনপণ্ডিত সিফ্নর—(F. A. V. Schiefner)-সম্পাদিত কাগ্যুর গ্রন্থ হইতে এই কাহিনী কতকগুলি উপাখ্যান ইংরাজীতে অনূদিত করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের নাম—'Tibetan Tales derived from Indian Sources'।

মধ্য-এসিয়ার মরুভূমিতে আবিষ্কৃত প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অনূদিত হইয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার দিগন্তবিস্তৃত প্রসার জগতে বিঘোষিত করিতেছে। দিন দিন আমরা জানিতে পারিতেছি যে, বর্ত্তমানকালের মহান্ ব্রিটন-দ্বীপের (Greater Britain) ন্যায় প্রাচীনকালে মহান্ ভারতবর্ষ অধিষ্ঠিত ছিল।

বিশ্বদূত

অনুষ্ঠান—প্রতিষ্ঠান

ভারতে পরসেবার প্রতিষ্ঠান

[illegible] ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে স্যর্ [illegible] ক্রেডক মহোদয় ভারতের কোন্ প্রদেশে কত [illegible] হিন্দু ও মুসলমান অনাথাশ্রম বর্ত্তমান আছে, তাহার [illegible] তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যায়, [illegible] বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের প্রদেশসমূহে হিন্দু ও [illegible] অনাথাশ্রমের সংখ্যা যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ,—[illegible], ৬ ও ৫, বোম্বাই, ১২ ও ৯, যুক্তপ্রদেশ, ১০ [illegible], পঞ্জাব, ১২ ও ৭; বঙ্গ, ৩ ও ৪, অন্যত্র ৬ ও ১। সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু অনাথাশ্রমের সংখ্যা ৪৯ এবং [illegible] অনাথাশ্রমের ৪১। পাঠক দেখিবেন, উক্ত কয়টি [illegible] মধ্যে বঙ্গেই অনাথাশ্রমের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। [illegible] ইহা প্রশংসার কথা নয়।"—বিশ্ববার্ত্তা।

শান্তিপুরে অনাথ-আশ্রম

[illegible] ছয় বৎসর হইল শান্তিপুরে একটি অনাথ আশ্রম [illegible] হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ৺বীরেশ্বর [illegible] মহাশয় বিগত ১৩১৪ সালে সাহাপাড়া হইতে [illegible] একটী বালক প্রাপ্ত হইয়া, এই আশ্রমের সূচনা [illegible]। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্প্রতি প্রমথনাথ মল্লিক, [illegible] দেবীসহ, এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করিয়া-[illegible] কিছুপূর্ব্বে রাণাঘাট মহকুমার 'সবডিভিসনাল [illegible]' রাণাঘাটের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে একটি [illegible] কন্যা, একটি ছয়মাসের বালক এবং তিন [illegible] একটি বালককে এই আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। [illegible] ছয়মাসের শিশুটী, নয়মাসের হইয়া, মারা [illegible]।"—বার্ত্তাবহ।

অবনত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়িনী সভা

[illegible] অনাথাশ্রমে'র সেবাবিভাগ হইতে ঢাকাতে বিধবা-[illegible] শিক্ষা ও উন্নতির জন্য একটি আশ্রম, আর অবনত [illegible] উন্নতির জন্য নানাস্থানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁহার পত্নী, শ্রীমতী সরলাবালা দত্ত, বিধবাশ্রমের কার্য্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম. এ, ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত 'অবনত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সমিতি'র সম্পাদক। প্রধানতঃ হেমেন্দ্রবাবুর যত্ন ও চেষ্টাতে পূর্ব্ববঙ্গে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায়ও একটি সমিতি ছিল, সেই সমিতি [illegible] নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে উভয় কার্য্যের ভার সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, [illegible] প্রভৃতি জেলাতে সমিতির সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে সর্ব্বশুদ্ধ [illegible]টি স্কুল আছে, তন্মধ্যে [illegible]টি মাইনর স্কুল, [illegible] বৎসর [illegible]টি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত '[illegible]' নামক স্থানেই সমিতির প্রধান কেন্দ্র, এখানে শ্রীমান্ হরিনারায়ণ সেন অবস্থিতি করিয়া নানা ভাবে জনসাধারণের উন্নতি করিতেছেন। তিনি এই কার্য্যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এখানে একটি মাইনর স্কুল, একটি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় আছে।"—[illegible] কৌমুদী।

বাগেরহাট পাঁজিয়া দরিদ্র-ভাণ্ডার

"পল্লীর রাস্তাঘাটের সংস্কার, জলাশয় সংস্কার, পল্লীতে গোধনের প্রাচুর্য্য বিধান, পল্লীর জঙ্গল নাশ, পল্লীর জল নিকাশ, পল্লীর শিক্ষা বিষয়ে ব্যবস্থা, পল্লীর ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা, দেশের বিভিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্যের সহিত পল্লীর ক্ষুদ্র অংশ মিলিত করা, পল্লীতে ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ, পল্লীর প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ, পল্লীর দীনদরিদ্রের অন্নসংস্থান প্রভৃতি কার্য্যই ইহার উদ্দেশ্য।"—জাহ্নবী।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির

"[illegible] খৃষ্টাব্দের মে মাসে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়-কর্ত্তৃক স্থানীয় [illegible] সেবাশ্রমের শাখারূপে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

"নবদ্বীপে প্রতি বৎসর নানা স্থান হইতে প্রায় ২০০ জন গর্ভবতী স্ত্রীলোক আসিয়া থাকেন। এই সমস্ত স্ত্রীলোক বিধবা, তাহারা গর্ভবতী হইয়া সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে নব-দ্বীপে আসিয়া থাকে। এখানে আসিয়া অনেকে গোপনে গর্ভ নষ্ট করে, অনেকে সন্তান প্রসব হওয়ার পর মৃত [illegible]

প্রয়োগ করিয়া অথবা অত্যন্ত অযত্ন করিয়া থাকে। কন্যা সন্তান হইলে, বেশ্যাগণ তাহাদিগকে কিনিয়া লয় এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত বালিকা জীবিকার জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। এই যে ঘটনা, যাহা নিত্য নিত্য গোপনে ঘটিতেছে, তাহা সকলেই জানেন।

"নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই সমুদয় জানিতেন এবং এই বিপদ হইতে আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোক ও সদ্যপ্রসূত শিশুগণকে রক্ষা করার জন্য, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন ও ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিয়া স্থানীয় হেলথ অফিসার ও পুলিশ সবইনস্পেক্টারকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য আদেশ করেন। প্রথমে কিছুদিন সেবাশ্রমেই গর্ভবতী ও শিশুগণকে রাখা হইত; শেষে, নানা কারণে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে ও নবদ্বীপ ধর্ম্মশালার বৃহৎ বাড়ী এই উদ্দেশ্যে ভাড়া লওয়া হয়। এখনও সেই বাড়ীতেই মাতৃমন্দিরের কার্য্য চলিতেছে।

"১৯১৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪ই তারিখে মাঘী মেলায় অক্লান্তভাবে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত রোগীর সেবা করিতে করিতে স্বয়ং বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া নিত্যানন্দ দাস মহাশয় মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরের সম্পাদক হইয়া, এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন।

"রাধারমণ সেবাশ্রম কর্তৃক এই মাতৃমন্দির পরিচালিত হয়, কৃষ্ণনগর কমিটি মাসিক ৫০ টাকা করিয়া ১৯১৪ সালে মে মাস হইতে সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আশ্রমে ৮টি শিশু, ৩টি প্রসূতি, ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিগণকে তিন মাস রাখা হয়।

"প্রতিষ্ঠান দুইটি কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নহে। এই আশ্রমে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। এই আশ্রমে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা সার্ব্বজনীন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় উদার ভক্তিপথের সাধক ছিলেন।"—সুরমা।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী

"সমবেত চেষ্টার দ্বারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে;—[ক] লোকহিতসাধন শিক্ষা, [খ] লোকহিতসাধন প্রচার, [গ] লোকহিতসাধন অনুষ্ঠান।

[ক] শিক্ষা—ইহার জন্য বড় বড় সহরে এক একটি ক্লাশ খোলা হইবে এবং তাহার সহিত (১) একটা তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান বিভাগ, (২) একটা লাইব্রেরী, ও (৩) একটি ছোট শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী সংযুক্ত থাকিবে। [খ] প্রচার;—সম্বাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ, ছোট ছোট পুস্তিকা প্রচার, বক্তৃতা, আলোচনা হিতসাধন মণ্ডলীর অধিবেশন দ্বারা সকল শ্রেণীর লোক হিতসাধনের ভাব ও চেষ্টার উদ্দীপনা ও কর্ম্মী লোক সংগ্রহই ইহার উদ্দেশ্য। [গ] অনুষ্ঠান বা হিতকার্য্য সম্পাদন;—ইহাই প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র; পূর্ব্ববর্ত্তী অপর দুইটি চেষ্টা ইহার সাহায্যের নিমিত্ত। ইহার প্রণালী মোটামুটি তিনটি ১। কর্ম্মী লোক সংগ্রহ ও কর্ম্মের আয়োজন। ২। অন্য লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদির সহিত যোগরক্ষা ও সহযোগিতা ৩। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মারম্ভ;—ইহা চারি বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে—[অ] শিক্ষা বিভাগ; [আ] স্বাস্থ্য বিভাগ [ই] আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিষয়ে গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন; [ঈ] অন্যান্য ভাবে লোকসেবা উল্লিখিত কার্য্যক্ষেত্রের একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ধনবল, জনবল ও সর্ব্বোপরি মনের বল সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলীর কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহার সফলতা নির্ভর করিতেছে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও ধনী দরিদ্র আবাল-বৃদ্ধ বনিতার সমর্থন ও সহকারিতার উপর।—সঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্. বি, 'মেওহস্পিট্যাল', কলিকাতা।

অপরাপর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা, অরফ্যানেজ; কলিকাতা, রেফিউজ; পোস্ত বাজার, বেনেভোলেণ্ট সোসাইটি; বারাকপুর, ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটি; কলিকাতা, অন্ধবিদ্যালয়; মূকবধির বিদ্যালয়; গয়া, কুষ্ঠাশ্রম; টালিগঞ্জ, সেবাশ্রম।—ইত্যাদি।

পুস্তক পরিচয়

মেয়েলি ব্রত ও কথা

[শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়, বি. এ.-সঙ্কলিত ;—মূল্য আট আনা মাত্র]

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে পূর্ব্ববঙ্গের, বিশেষতঃ পশ্চিম ঢাকা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্রতের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মেয়েলি ব্রত ও কথা সম্বন্ধে সাহিত্যসেবিগণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অনেকগুলি ব্রত-কথাও সংগৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু এখন তেমন চেষ্টা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। শ্রীযুক্ত পরমেশবাবুর ন্যায় আর সকলে যদি বিভিন্ন জেলার মেয়েলি 'ব্রত ও কথা'র বিবরণ-সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে, কিছু দিন পরে উক্ত বিষয়ের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত হইতে পারে; আমাদের মনে হয়, দেশের শিক্ষিতা গৃহলক্ষ্মীরা যদি এপক্ষে সযত্নে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে সহজে ইহা সাধিত হইতে পারে।

স্বাস্থ্যনীতি

[শ্রীযামিনীভূষণ রায়, কবিরত্ন, এম. এ, এম ডি প্রণীত ;—
প্রথমভাগের মূল্য ছয় আনা, দ্বিতীয়ভাগের মূল্য দশ আনা]

সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্তযামিনীভূষণ রায় মহাশয় এই দুইখানি পুস্তক বালকদিগের জন্য লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা, শুধু বালক-বালিকা কেন, যুবক যুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া বৃদ্ধ বৃদ্ধেরাও পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। তবে, কেবল পাঠ করিলেই হইবে না; পুস্তকের লিখিত ব্যবস্থামত কার্য্য করিতে ও করাইতে হইবে। এই পুস্তকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত।

বিবেকানন্দপ্রসঙ্গ

[শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত ;—মূল্য আট আনা]

ভারতের বর্ত্তমানযুগের পথপ্রদর্শক বিবেকানন্দের-প্রসঙ্গ দেশের সকলেরই পাঠ করা উচিত। আমাদের ধর্ম্মমত, বিশ্বাস, ও নানাবিধ কর্ত্তব্যসম্বন্ধে তিনি যেসমস্ত উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই কতকগুলির আলোচনা ইহাতে আছে। 'সেবা'সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "দরিদ্র নারায়ণের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইলে, ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।" আবার বলিতেছেন, "সকলে চেঁচাচ্চেন আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে।" 'পতিত'সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম, তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ? * * * গালি বল্‌ছেন, ছুয়োনা,—আমায় ছুয়োনা!" 'স্ত্রী-শিক্ষা'সম্বন্ধে বলেন, "রমণীগণের হৃদয়, শিক্ষাধারা, এরূপভাবে, গঠিত করা আবশ্যক যেন তারা নিজেরাই নিজেদের অভাবাদি বুঝিতে পারে।" এবংবিধ বাণীগুলির মূল্য-নির্দ্ধারণ সম্ভব নহে। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসার্হ।

বৈদ্যনাথকথা

[প্রকাশক, মজুমদার সিংহ এণ্ড কোং ;—মূল্য ।৵০ আনা]

পুস্তকখানির পৌরাণিক অংশটি বেশ হইয়াছে; ঐতিহাসিক অংশের গবেষণা আরও সুন্দর হইয়াছে। লেখক পুরাণোক্ত বচন, শিলালিপি, অপ্রকাশিত গ্রন্থ, সরকারী চিঠিপত্র প্রভৃতির দ্বারা ঐতিহাসিক অংশও অনুসন্ধিৎসুর বেশ পাঠোপযোগী করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি লিখিতে তিনি যথেষ্ট আয়াসস্বীকার করিয়াছেন; এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। ইতিহাস ও পুরাণের সামঞ্জস্য অনেক সময়েই সম্ভবপর হয় না; কিন্তু লেখক এসম্বন্ধেও অনুসন্ধানের ফলে পুরাণ ও ইতিহাসের সত্য এবং অসত্য মতের বিচার করিয়া, বৈদ্যনাথের প্রকৃত চিত্র দেখাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। পুস্তকখানি হিন্দুমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য।

তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজাপদ্ধতি

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সঙ্কলিত ;—মূল্য ১৷০ টাকা]

বর্ত্তমানকালের দুর্ব্বল অধিকারীদের পক্ষে স্থূলোপাসনা যে পরম মুক্তিলাভের হেতু, তাহা কুলার্ণবাদি শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। প্রভূত পরিশ্রমে নানা মূলতন্ত্রের মীমাংসা করিয়া, স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের বিবিধ তন্ত্রোক্ত নানাবিধ পূজাপদ্ধতি সংগৃহীত এবং যথোচিত সহজভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত বচনগুলির বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় বিষয়গুলি ইতরসাধারণের বোধোপযোগী হইয়াছে। 'রূপ-রহস্য'টি অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। 'মালাশোধন প্রণালী', 'পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি', 'শান্ত্যভিষেক' এবং বিবিধ 'পূজাপদ্ধতি' প্রভৃতি প্রকরণগুলি সকলেরই নিতান্তপ্রয়োজন। 'দশমহাবিদ্যা'র 'স্তব ও কবচ' ব্যতীত অপরাপর কতকগুলি বিশেষ আবশ্যক স্তব ও কবচও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চাশৎটিরও অধিক 'মুদ্রাপ্রণালী' ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 'মুদ্রা' ও 'প্রাণায়াম' সম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুগণ যত অধিক আলোচনা করেন, ততই দেশের—জাতির পক্ষে কল্যাণকর;—এ বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। দশমহাবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশে পুস্তকখানির সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। 'দীক্ষা-পদ্ধতি', 'সাধ্যোপাসনা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ফণিধ্বনি চক্র,' 'মাতৃকাযন্ত্র', 'কূর্ম্মচক্র' প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়—ক্রিয়াসমূহের প্রণালী এই গ্রন্থখানির অন্তর্ভূত হওয়ায় দেশের স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই ইহার উপকারিতা অনুভব করিবেন। স্মৃতিতীর্থ-মহাশয়ের এই পুণ্য উদ্যম যথার্থই প্রশংসনীয়। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই পুস্তকখান আচারনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে যেমন উপযোগী, তেমনই উপকারী।

"—ভেরী রেভরেণ্ড্ ফাদার ফ্রাকাটার মৃত্যু - মান্দ্রাজ মেলের মিঃ কর্ণিসের মৃত্যু।—

২৬এ—আই এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ।—

"—প্রথম, মধ্যম, ও শেষ এম. বী. পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হয়।—

"—সংস্কৃত মধ্যম পরীক্ষার ফল (বিভিন্ন কেন্দ্রের) প্রকাশ হয়।—

"—মিঃ আমেরিকার সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ব্রায়ানের পদত্যাগ করেন।

২৭এ কলম্বোর জজ্ মিঃ ওয়াল্টার পেরেরার মৃত্যু—

"—মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউসনের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার সুরেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু—

"—ময়মনসিংহের ব্যারিষ্টার মিঃ ডবলিউ সি, ঘোষের মৃত্যু।—

২৮এ—বোম্বায়ের বিখ্যাত এটর্ণী মিঃ এ. ক্র্যাগীর মৃত্যু—

২৯এ—স্যর চার্লস লেয়ার্ডের মৃত্যু—

৩০এ—স্যর নেথেনিয়ল্ বর্ণাবীর মৃত্যু।—

৩১এ—মিঃ বালগঙ্গাধর তিলক কর্ত্তৃক স্যর ভেলেণ্টাইন চিরোলের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ।

৩২এ—মাননীয় বড়লাট বাহাদুরের কার্য্যকালবৃদ্ধির সংবাদ প্রচার।

"—বোম্বায়ের "জামে জামসেদ" পত্রিকা সম্পাদক মানহানির জন্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। বিবিধ চা যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা মিঃ জ্যাকসনের মৃত্যু।—

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'সতীলক্ষ্মী' প্রকাশিত হইল; -মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়-প্রণীত 'ডাকাত ডাক্তার' প্রকাশিত হইল; -মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম প্রণীত ধর্ম্মমূলক নূতন উপন্যাস 'শবসাধন' প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১।০।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস, "শশাঙ্ক" মহারাষ্ট্রী ভাষায় অনূদিত হইতেছে।

পাটনা কলেজের অধ্যাপক, প্রথিতযশা-ঐতিহাসিক—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের তত্ত্বাবধানে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস," প্রথম ভাগ, হিন্দীভাষায় অনূদিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "আদ্যের গম্ভীরা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "ছোন্দেলী" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং "বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী" নামক দুইখানি গ্রন্থ "গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী"-ভুক্ত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের নূতন কাব্যগ্রন্থ "পঞ্চপাত্র" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বসন্তবাবুর "জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবন-স্মৃতি"ও নানা চিত্রসজ্জায় ভূষিত হইয়া, সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্ এ- মহাশয়ের পাশ্চাত্য প্রদেশে ভ্রমণ-কাহিনী-মূলক যে সন্দর্ভগুলি নানা মাসিকপত্রে এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেগুলি 'গৃহস্থ গ্রন্থাবলী'ভুক্ত হইয়া, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম দুই খণ্ডে 'কবরের দেশ' ও 'য়ুরোপে'র কথা থাকিবে। তৃতীয় খণ্ডে 'আমেরিকা'—'ইয়াঙ্কিস্থানে'র বিষয় সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "সমসাময়িক ভারতে"র চতুর্থ কল্প, 'য়ুরোপীয়ান পর্য্যাটকে'র প্রথম খণ্ড, কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ ছবি এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়-কর্ত্তৃক অনেকগুলি মূল্যবান্ পাদটীকা, সংযুক্ত হইয়া সত্বরই প্রকাশিত হইবে। তাঁহার "সমসাময়িক ভারতে"র প্রথম কল্পের চতুর্থ খণ্ড, এবং বহুচিত্রসুশোভিত "চৈনিক পরিব্রাজকে"র দ্বিতীয় খণ্ডযন্ত্রস্থ।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street; CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street; CALCUTTA.

ডালি।

শিল্পী শ্রীভবানী চরণ লাহা

আশ্বিন, ১৩২২

প্রথম খণ্ড] তৃতীয় বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

অভিষেক-সঙ্গীত

[স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

১

প্রবল বাড়ববহ্নির মত বারিধিবক্ষ হ'তে
উঠিয়া, যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোকস্রোতে ;
মথিয়া জলধি, দলিয়া মেদিনী, লঙ্ঘি' শৈলরাজি ;
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।
(কোরাস) বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

২

যে জাতি গ্রীসের করিল মুক্ত দৃঢ় বন্ধনপাশ ;
করিল বিধান—রবে না মানুষ মানুষের ক্রীতদাস ;
প্রচারিল স্বাধীনতার তন্ত্র বিপুল বিশ্ব মাঝে ;—
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।
(কোরাস) বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

৩

নিউটন যার বাঁধিল সূত্রে জগৎ-জগৎসনে ;
ডারুইন যার বাঁধিল নিয়মে জগতের জীবগণে ;
সেক্সপীয়র যার বাঁধিল ছন্দে হৃদয়রতনখনি ;—
এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে সে জাতির নৃপমণি।
(কোরাস) বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি

৪

মানিয়া লইল শাসন যায় অনার্য্যআর্য্যসুত ;
স্থাপিলে ভারতে গভীর শান্তি সাম্যমন্ত্রপুত ;
মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম্ম স্বাধীন চিন্তাস্রোতে ;—
সে জাতির রাজা এসেছে ভারতে সুদূর বৃটন হ'তে।
(কোরাস) বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

৫

কোথায় বৃটন, কোথায় ভারত, ভিন্ন আকাশ যার !
এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার ;
মধ্যে গভীর গরজে জলধি,—লঙ্ঘি' সে পারাবারে,
এসেছে ভূপতি—লহ মা ভারত, বরণ করিয়া তারে।
(কোরাস) বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' ;—
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি। *

---

* মহামান্ত শ্রীশ্রীভারত-সম্রাট্ ও ভারত সম্রাজ্ঞীর রাজ্যাভিষেক-উপলক্ষে লিখিত এবং কলিকাতা 'ইভনিং ক্লব' কর্ত্তৃক রাজ্যাভিষেক দিবসে গীত।

বেদের সরমা *

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.]

সরমা শব্দের অর্থ কুকুরী। বেদে যে 'সরমা' নাম পাওয়া যায়, তাহাও 'দেবকুকুরী' অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এই কুকুরী অর্থে সরমা সম্বন্ধে বৈদিক বর্ণনার বিশেষরূপ অর্থসঙ্গতি করিতে পারা যায় না। সুতরাং, সরমার প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্যই আমরা এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

সরমা বেদে ইন্দ্রের দূতীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পণি-গণ গাভীসকলকে লুকাইয়া রাখে, ইন্দ্রের আদেশে সে তাহাদের সন্ধান আনিয়া তাঁহাকে দেয়।

এই বৈদিক-উপাখ্যানের মধ্যেই সরমার প্রকৃততত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং এই বৈদিক উপাখ্যানের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিলেই সরমার প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইবে।

সরমাকে আমরা যে কুকুরীরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই, বেদে তাহার তাৎপর্য্য পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আর্য্যজাতির পাশ্চাত্য-শাখায় ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সরমারই অনুরূপ গ্রীকদিগের মধ্যে আমরা 'সিরিয়াস' (Serius) নাম প্রাপ্ত হই। এই 'সিরিয়াস্' স্বরূপতঃ নক্ষত্র, কুকুর নহে। গ্রীক্-ভাষার এই 'সিরিয়াস্' নামের লাটিন ভাষায় আমরা Canicula-রূপ প্রাপ্ত হই। Canicula শব্দের মূল canis, সংস্কৃত কুকুরবাচক 'শ্বন্' শব্দের অপভ্রংশমাত্র। সুতরাং canicula শব্দেই আমরা প্রথম কুকুরার্থের অনুপ্রবেশ দেখিতে পাই। তাহা হইতেই Sirius নামের সাধারণ অনুবাদ dog-star অর্থাৎ "কুকুর-নক্ষত্র" হইয়াছে। ইহা হইতে সরমা যে মূলতঃ কুকুর নহে, পরন্তু নক্ষত্রমাত্র, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এক্ষণে সরমার উপরিউক্ত নক্ষত্র-অর্থের দ্বারা তদীয় বেদোক্ত পণিদিগের নিকট হইতে গাভী-অনুসন্ধান-উপাখ্যান কিরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। আমরা সরমার পাশ্চাত্য-অনুবাদ যে 'কুকুর নক্ষত্র' পাইয়াছি, তাহার উদয়-সময় পাশ্চাত্য-ভাষায় 'dog-days'—'কুকুর দিবস' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই 'কুকুর দিবসের' কাল ৩রা জুলাই হইতে ১১ই আগষ্ট পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বর্ষাঋতুর সহিত 'কুকুর-নক্ষত্রের' সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানে Sirius বা 'কুকুর-নক্ষত্রের' উদয়ে উত্তর-ভারতে বর্ষা আরম্ভ হওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যায়:—"* * * * * to mark the beginning of the new and the end of the old year, at the time of the summer solstice, when the star Sirius, the Zend Tishtrya, rises, and the rains in the Northern India begin."—The Ruling Races of the Pre-historic times by J. F. Hewitt Vol. I p 14.

উপরিউক্ত Sirius গ্রীক্-মহাকবি হোমর কর্ত্তৃক Orion বা 'মৃগশিরা নক্ষত্রেরই' কুকুররূপে বর্ণিত হইয়াছে—"This was the dog-star Sirius, called by Homer the dog of Orion, and Mriga-vyadha, the deer-hunter, by the Hindus." Ibid p 23.

মৃগশিরা-নক্ষত্রের সহিত এইরূপে যোগ হইতে আমরা Sirius নামের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হই। Sirius—'মৃগশিরা'—'শিরস্' শব্দেরই যে স্পষ্ট অপভ্রংশ, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। Sirius প্রথম 'মৃগ-শিরা' নামক সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জকেই বুঝাইত বলিয়া বোধ হয়। পরে, এতন্মধ্যস্থিত অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র-বিশেষের সরমা নামের সহিত যোগ হইতে সরমার কুকুর অর্থানুসারে ইহার অর্থও কুকুর হইয়াছে; এবং তদনুসারে ইহার নামের অনুবাদও

* বর্দ্ধমান অষ্টমবঙ্গীয় "সাহিত্য-সম্মিলনে" পঠিত।

dog-star বা কুকুর-নক্ষত্র হইয়াছে। কেবল যে Sirius-নক্ষত্রই সারমেয়ের কুকুর অর্থানুসারে 'কুকুর-নক্ষত্র' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বেদে সারমেয়ের 'অর্জ্জুন' বা শ্বেতবর্ণ বিশেষণ হইতে গ্রীক্‌দিগের অপর এক নক্ষত্রের নাম যেমন আর্গাস্ (Argus) হইয়াছে, তেমনই ইহা কুকুররূপেও পরিচিত হইয়াছে। সেই ঋক্‌টী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"যদর্জ্জুন সারমেয় দতঃ পিশংগ যচ্ছসে।
বীবভ্রাজন্ত ঋষ্টয় উপস্রক্কেষু বপ্সতো নিসুস্বপ ॥" ২
—৭ম মণ্ডল—৫৫ সূক্ত।

"হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিশঙ্গবর্ণ সরমাপুত্র! তুমি যখন দন্ত প্রকাশ কর, তাহা আমার নিকট আহারের সময় স্ক্কনীপ্রদেশে আয়ুধের ন্যায় বিশেষরূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও।"

উদ্ধৃত ঋকে বাস্তোষপতি দেবতাই সারমেয়রূপে আখ্যাত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রীক-সাহিত্যে Argus (আর্গাস্)ও ইউলিসিসের অনুপস্থিতি-সময়ে তাঁহার বাটীর রক্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপরি-উদ্ধৃত ঋক্ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ হিউইট্ উপরি-উল্লিখিত মর্ম্মেই মন্তব্য করিয়াছেন; যথা—"* * * * * * the dog called, in the Rig-Veda, Arjuna, the fair one, and Saramuya, the yellow-dog * * * * who shows his teeth and is invoked as Vastoshpati, the lord or guardian (pati) of the house (Vastu) the dog Argus, who guards the house of Odusseus during his absence." Ibid Vol II p 23.

প্রথমতঃ, Orion বা মৃগশিরা-নক্ষত্র বৎসরারম্ভকরূপে পূজিত হইত; পরে বর্ষা-প্রবর্ত্তকরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়া Sirius বিশেষ প্রাধান্যলাভ করে। কিন্তু তাহা হইলেও মৃগশিরার কুকুররূপেই ইহা পরিচিত হয়। এসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হিউইট্ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"* * * * * * * it was the change from the earliest form of his worship as the year-star Orion to that of the rain-star Sirius, who ruled the year of five seasons, beginning with the summer-solstice, which was officially recognised when Isis-Satit the star Sirius, called by Homer the dog of Orion, brought back the body of Osiris from Byblus to Egypt." Ibid p 409.

এইপ্রকারে একদিকে Orionএর সহিত মৃগশিরার সম্বন্ধ হইতে এবং অন্যদিকে ইহারই উজ্জ্বল নক্ষত্রের সহিত সরমার সম্বন্ধ হইতে Sirius কুকুর-নক্ষত্র হইয়াছে।

এক্ষণে সরমা বা কুকুর যে পণিদিগের নিকট হইতে গাভী উদ্ধার করে, তাহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সরমা যখন Sirius বা বর্ষা-নক্ষত্র হইতেছে, তখন গাভীসকল যে বর্ষাকালীন মেঘ হইবে, তাহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ষা-নক্ষত্রের উদয়ে মেঘসকল আকাশে পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে, তৎপূর্ব্বে মেঘসকল পরিদৃশ্যমান হয় না - ইহাই মেঘদিগের লুক্কায়িত থাকা ও সরমাকর্ত্তৃক ইহাদিগের উদ্ধার বলিয়া রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে।

গাভী সকল পণিদিগের দ্বারা লুক্কায়িত হওয়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই পণিসকল কে? কোথায় গাভীদিগকে লুক্কায়িত রাখে? তাহা বুঝিতে পারিলেই সরমার উপাখ্যানের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই হয়। বেদের পণিসকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী অনার্য্যজাতি বলিয়াই পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতসকল প্রমাণ পাইয়াছেন। ঋগ্বেদের ভাষ্যে (১।১২৪।১০) সায়ণাচার্য্যও পণি বণিক্ অর্থেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ইহাদিগকে সমুদ্র-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ফিনিসীয়জাতি বলিয়াই মনে করি। পণি ও ফিনিসীয় এই উভয়ের মধ্যে শব্দগত বিশেষ সাদৃশ্যই বর্ত্তমান। ফিনিসীয়দিগের দেশ আসিয়া-মাইনরের সমুদ্র-বেষ্টিত সিরিয়া উপকূলেস্থিত ফিনিসিয়া। পণিদিগের দ্বারা গাভী বা মেঘসকল অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থ আমাদিগের নিকট সমুদ্রে জলরূপে মেঘের অবস্থানের রূপক বলিয়াই বোধ হয়। ফিনিসীয়-জাতি সমুদ্র-বাণিজ্য করিত বলিয়া, সমুদ্র তাহাদিগের দুর্গরূপে বর্ণিত হওয়া অস্বাভাবিক হয় না। Sirius বা সরমার উদয়ে তখন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপহেতু সমুদ্র হইতে অপর্য্যাপ্ত বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশমার্গে মেঘরূপে সঞ্চিত হয়। ইহাই সরমাকর্ত্তৃক গাভীদিগের

আবিষ্কার। দক্ষিণ-পশ্চিম মন্‌সুন্ (monsoon)-যোগে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত মেঘরাশি ভারতবর্ষে পরিচালিত হইয়া যে বৃষ্টিপাত করে, ইহাই ইন্দ্রকর্ত্তৃক গাভীদিগের উদ্ধাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে বেদের একটী ঋক্ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতে, ইন্দ্র কিরূপে বায়ু-গণ গুহা-লুক্কায়িত গাভীসকলকে উদ্ধার করেন, তাহারই বর্ণনা পাওয়া যায়; যথা—

"বীলুচিদারুজত্নুভির্গুহাচিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিন্দ উস্রিয়া অনু॥" ৫

—ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ৬ষ্ঠ সূক্ত।

"হে ইন্দ্র! দৃঢ়স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় গাভীসমুদয় অন্বেষণ করিয়াছিলে।"

মেঘ যে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়, নিম্নোদ্ধৃত ঋকেই তাহার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়—

"সহস্র শৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।" ৭

— ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল, ৫৫ সূক্ত।

"যে সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইল।"

মেঘ বর্ষণ করে বলিয়াই বৃষভরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে মেঘ যে গাভীরূপেও কল্পিত হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারেই সমুদ্র গভীর গুহারূপে পরিণতও হইয়াছে।

ফিনিসীয়দিগের স্থানের সহিত যে Orion বা মৃগশিরা-নক্ষত্রের যোগ আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে প্রমাণিত হয়—"This was the chief seat of the Phoenician worship of Tammuz or Dumuzi (Orion) —Ibid p, 409.

পণিগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও অনার্য্য বলিয়াই আর্য্যগণ তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন:—"Their special aversion were the trading races, whom they called Panis and who are to be Non-Aryan in speech." Ibid, p 106.

সারমেয় বা কুকুর-নক্ষত্র সিরিয়াস্‌ই যে বর্ষা-মেঘ দক্ষিণ হইতে আনয়ন করে, তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পুরাতত্ত্বের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে:—

"* * * * * * while Tishtrya (Sirius) brings the rains born from the southern constellation Satavaesa or Argo." Ibid, p 432.

বেদে সরমা ও পণির যে কথোপকথন আছে, তাহাতে সরমা বহুদূরের, বহুদিনের পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়ারই উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা:—

"কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি॥" ১

—ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১০৮ সূক্ত।

"হে সরমা! তুমি কি বাসনায় এস্থানে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ। এপথে আসিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আসা যায় না। আমাদিগের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ?" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

ইহাতে সমুদ্র পার হইয়া সরমার যাওয়ার আভাসই যেন পাওয়া যায়; কারণ 'রসা' নদীর জল বলিয়া অনূদিত হইলেও, 'রস' শব্দে যখন জল বুঝায়, তখন 'রসার' অর্থ জলাধারই হয়, এবং 'অর্ণব' শব্দের ন্যায় ইহাও সমুদ্রের বাচকই হইতে পারে। সুতরাং ইহাতে সরমার আবিষ্কৃত গাভী বা মেঘ যে দক্ষিণ-সমুদ্র হইতে আনীত হয়, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

গাভী-হরণ ও উদ্ধার উপাখ্যানের সহিত যে ফিনিসীয় বা সিরীয়দিগের দেশেরই বিশেষ যোগ—বেদের নিম্নোদ্ধৃত ঋকে তাহার বিশেষ প্রমাণ পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

"ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবোধিলম্।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥" ৫

—ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল—১১শ সূক্ত।

"হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভীহরণকারী বলনামক অসুরের গহ্বর উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলে; তখন বলাসুর-নিপীড়িত দেবগণ ভয়শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

উল্লিখিত ঋকের 'বল', আসিরীয় "বল"-নামধারী রাজগণ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা শ্রদ্ধেয় রমেশবাবুর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিরীয় ইতিহাসের বাবিল-

নাধিপতি "বল"দিগের সহিত বৈদিক "বলের" ঐক্যসাধন করিতে উৎসুক, এবং তিনি আসিরীয় "অসরের" সহিত অসুরের ঐক্যসাধনে উৎসুক। তাঁহার প্রণীত ঋগ্বেদের প্রথম দুই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখ এবং তাঁহার প্রণীত Aryan Witness দেখ।" ঋগ্বেদানুবাদ ২৩ পৃঃ।

গ্রীক্‌বীর ইউলিসিসের গৃহরক্ষক-কুকুর আর্গাসের (Argus) যে আমরা শত-চক্ষুর উল্লেখ পাই, উপরে 'শতভিষা'-নক্ষত্রের সহিত উহার অভিন্নতা হইতে তাহার তাৎপর্য্য আমরা পরিষ্কার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। শত নক্ষত্রের সমষ্টিভূতা বলিয়াই 'শতভিষা' নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর্গাস শত নক্ষত্রের সমষ্টিভূত হওয়াতেই এই শত নক্ষত্র ইহার চক্ষুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে শতভিষার শত নক্ষত্রের দ্বারা যেমন আর্গাসের শত চক্ষুর ব্যাখ্যা হইতেছে, তেমনই আর্গাসের কুকুররূপ কল্পনা দ্বারাও নক্ষত্র-কুকুররূপে কল্পিত হওয়ার ব্যাখ্যা হইতেছে।

বেদে দাহের মন্ত্রে প্রেতাত্মার পথে আমরা দুইটি প্রহরী-কুকুরের উল্লেখ প্রাপ্ত হই ; যথা—

"অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনাপথা।
অথা পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি ॥"
১০

"হে মৃত! এই যে দুই কুকুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র ; ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।"

এস্থলে কুকুর দুইটি "সারমেয়" শব্দের দ্বারা বিশেষিত হওয়ায়, সরমার সহিতই ইহাদের যোগ প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং সরমা যেরূপ নক্ষত্র, এই দুইটিও যে তদ্রূপ নক্ষত্র, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এই নক্ষত্র দুইটির অবস্থান কোথায়, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। ইহাদের অবস্থান ছায়াপথে (milky-way) বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। "বৃহদ্দেবতা" নামক বৈদিক-গ্রন্থে সরমা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন হয়। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সরমা ইন্দ্র কর্ত্তৃক পণিদিগের নিকট হইতে গাভী উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলে, পণিগণ গাভীদিগের দুগ্ধ পান করাইয়া তাহাকে আপনাদের বশীভূত করে। তখন সরমা প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ গাভী দেখিতে পায় নাই বলিয়া ইন্দ্রের নিকট প্রকাশ করে। ইন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিলে, সরমা সেই দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলে। এই বমনের দুগ্ধই ছায়াপথ-রূপে পরিণত হয়; এবং সরমা ইহার প্রহরী-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হয়। ইহাতে সরমা যে চারি চক্ষুবিশিষ্ট কুকুররূপ ধারণ করে, তাহাই যমের প্রহরী-কুকুররূপে ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হিউইট্ এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"Sarama was sent by Indra and the Angiras to get the cows of light from the Panis or traders, the sons of Orion. She failed to to bring them back, having been bribed by the Panis with a drink of milk; and according to the Brihaddevata, when she returned to Indra and told him she had not seen the cows, he kicked her, and she vomitted the milk given by the Panis. * This became the milky-way, and it was this that Sarama was placed to guard, for she became one of the four-eyed dogs of Sarama who guard the path, that is, the path from earth to heaven, the bridge of the gods, the milky-way." Ibid vol. II, p, 24.

বেদের প্রাগুক্ত দুই কুকুরের কথা জেন্দাবেস্তা গ্রন্থেও পাওয়া যায়। গ্রীক্‌দিগের Sirius যেরূপ সরমার অনুরূপ, তেমনই সরমার পরিণামভূত দুই কুকুরের ন্যায় সিরিয়াসের পরিণামভূত দুই কুকুরও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একটির নাম 'কুয়োন' (Kuon) ও অপরটির নাম 'প্রোশ্যোন'। এই উভয় নামের সহিত সংস্কৃত শ্বন্ ও প্রশ্বন্ শব্দের যথেষ্ট সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয়। লাটিন্ ভাষায় এই উভয়েরই যে নাম canis major (বৃহৎ কুকুর) ও canis minor

* Max Muller, Lecture on the Science of Languages, Second Series, 1st, edition p, 466-7.

(ক্ষুদ্র কুকুর) হইয়াছে, তাহারও মূলে কুকুরবাচক বেদের শ্বন্ শব্দই বর্ত্তমান। উভয়ই ছায়াপথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। এসম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত হিউইট লিখিয়াছেন :—

"These are the two four-eyed dogs of the Zendavesta, the twin dog-stars of the Greeks, Sirius or Kuon and Procyon the Sanskrit Svan and Prasvan, the dogs (Shvan) and the fire (pra) dog, canis major and canis minor, one on each side of the milky-way." Ibid vol. II. p. 24.

উপসংহারে নক্ষত্রের "সরমা" নাম বা কুকুর নাম কেন হইল, তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহা দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া আমরা মনে করি। এক ব্যাখ্যা এই যে, সরমা প্রথম কুকুর বুঝাইত না— প্রথম বর্ষা-নক্ষত্রকেই বুঝাইত। বেদে ইহার যে "অর্জ্জুন" বিশেষণ আমরা পাইয়াছি, ইহার উজ্জ্বল অর্থদ্বারা সরমা প্রথম যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের বাচক ছিল, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণই দেখা যায়। পরে সরমারই নিকট-বর্ত্তী ছায়াপথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় সরমার সহিত সম্বন্ধ হইতে যেমন "সারমেয়" নামে অভিহিত হইয়াছে, তেমনই কুকুরের ন্যায় বিনিদ্র ভাবে ইহারা আকাশের পথে প্রহরীর কার্য্য করে বলিয়া কুকুরের নামে "শ্বা" বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। সরমা যে প্রথমে কুকুরের বোধক ছিল না, কুকুর অর্থে সরমা শব্দের প্রয়োগ যে অতীব বিরল, তাহা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কুকুর অর্থে "সারমেয়" শব্দের বহুলপ্রয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথম-নক্ষত্রবাচক 'সরমা' শব্দ হইতে কুকুরের সহিত সাদৃশ্যমূলে রূপকভাবে "সারমেয়" কুকুরের বাচক হইয়াছিল, পরে প্রকৃত ভাবেই "সারমেয়" শব্দ কুকুরের অভিধেয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বৈদিক সুপণ্ডিত রেগোজিন সরমার কুকুররূপে বিকাশের যেরূপ প্রক্রিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে আমাদের বক্তব্যেরই সমর্থন করে ; যথা—

"Probably on account of her connection with these dogs, (twin Saramayas dogs—the messengers of Yama) Sarama was subsequently made out to be herself a dog." Vedic India by Z. A. Ragozin p. 256, footnote.

পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে, বেদে ও প্রাচীন সাহিত্যে নক্ষত্র-গ্রহাদির নামের সহিত যে জন্তুর সম্বন্ধ না দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। বেদে ভল্লুকের নামে নক্ষত্রের নাম ঋক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় ; * চন্দ্র, শশ ও মৃগের সহিত যোগ হইতে 'শশী'ও 'মৃগাঙ্ক' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃগের শিরের সহিত সাদৃশ্য হইতে নক্ষত্র-বিশেষের 'মৃগাশিরা' নাম হইয়াছে। রাশির নামে যে জন্তুনামের যোগ দেখা যায়, এই প্রকারেই যে তাহার প্রথম সূচনা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত জন্তু-নামের যোগের মধ্যেও পুরাতত্ত্বের একটি ক্রম পরিলক্ষিত হয়। ভল্লুক, মৃগ, কুকুর প্রভৃতির সহিত প্রথম পরিচিত হওয়াতেই আর্য্যগণ সম্ভবতঃ ইহাদের সহিত সাদৃশ্য দর্শন পূর্ব্বক গ্রহ-নক্ষত্রের তৎসূচক নামই প্রদান করিয়াছিলেন। সরমা বিশেষরূপে ইন্দ্রের দূতীরূপে বর্ণিত হওয়ায় ইন্দ্রো-পাসনার প্রাদুর্ভাব সময়েই যে আর্য্যদিগের দ্বারা গৃহপালিত পশুরূপে কুকুরের ব্যবহার প্রচলিত হয়, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনাসকল হইতে এক 'সরমা' নামের মধ্যে পুরাতত্ত্বের কত সূত্র যে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম।

* "অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহচিদ্দিবেয়ুঃ ॥"

ইয়াঙ্কিস্থানের "জের"

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম. এ.]

(১) জাহাজবক্ষে পুনর্ব্বার

ইয়াঙ্কিস্থানের পশ্চিমতম প্রদেশ দেখা হইল। এইবার সমুদ্র পাড়ি দিবার ব্যবস্থা করিলাম। স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে ২০০ মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত-মহাসাগরের ভিতর হাওয়াই দ্বীপ অবস্থিত। হাওয়াইয়ের তামাক ও আনারস আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান নগরের নাম হনলুলু। ক্যালিফর্ণিয়া হইতে জাপান যাইতে হইলে হনলুলুতে জাহাজ আসে। কাজেই হনলুলুতে কয়েকদিন কাটাইবার মতলব করা গেল।

হাওয়াই আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যস্থলে, কিন্তু ইয়াঙ্কিরা হাওয়াইকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা অর্দ্ধবিকশিত রাষ্ট্রের অধিকার প্রদান করিয়াছে। আমেরিকার বহু প্রদেশ রাষ্ট্র পুরাপুরি রাষ্ট্র বিবেচিত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ অর্দ্ধরাষ্ট্র বা Territory নামে অভিহিত হইত। হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ এইরূপ "টেরিটারি"। আমেরিকার সর্ব্বোত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আলাস্কা প্রদেশ। এই প্রদেশ ইয়াঙ্কিস্থান হইতে বহুদূরে। এই প্রদেশকেও ইয়াঙ্কিরা যুক্ত-রাষ্ট্রের একটা "টেরিটারি" বা অর্দ্ধাধিকারপ্রাপ্ত-রাষ্ট্র বিবেচনা করে। সুতরাং হনলুলু হইতে যাত্রা করিয়া ইয়াঙ্কিস্থান ছাড়িয়াছি বলা চলে না,—বৃহত্তর ইয়াঙ্কিস্থানের এক অংশ দেখিতে চলিয়াছি, বলিতে হইবে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোর পর হাওয়াই পর্য্যন্ত ইয়াঙ্কিস্থানেরই "জের" চলিতেছে।

যথাসময়ে জাহাজে চড়িলাম। ঠিক ছয় মাস পূর্ব্বে লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক আসিবার সময়ে শেষবার জাহাজে চড়িয়াছি। জাহাজে চলাফেরা করা আজকাল নিতান্ত ঘরোয়া ডালভাত খাওয়ার মত মামুলি কথা হইয়া পড়িয়াছে।

জাহাজের নাম "মাঞ্চুরিয়া"—মালিকেরা আমেরিকান। এই পথে আমেরিকান ও জাপানী দুই কোম্পানীর জাহাজ চলে। জাপানীরা কখনও আমেরিকান জাহাজে যাতায়াত করে না। তাহারা এ বিষয়ে ঘোরতর স্বদেশী। আমাদের সঙ্গে একজনও জাপানী যাত্রী নাই। চীনা মোসাফের অনেক।

এই জাহাজের কুলী, নাবিক, খান্‌সামা, বাবুর্চি ইত্যাদি সবই চীনা দেখিতেছি। কলিকাতায় বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীর জাহাজে চাটগাঁর মুসলমানদিগকে নিযুক্ত করা হয়। ইয়াঙ্কিরাও সেইরূপ চীনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে। চীনারা তাহাদের স্বদেশী পোষাকে কাজকর্ম করে—অবশ্য চীনে বিপ্লবের পর হইতে টিকি উঠিয়া গিয়াছে। জাহাজের কয়েকজন খালাসী আমাকে দেখিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি হিন্দু (অর্থাৎ ভারতবাসী)? হিন্দু ভাল, Japan no good." জাপানী-চীনা-সমস্যা ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে। এই গত সপ্তাহে যুদ্ধ বাধে বাধে হইয়াছিল। ইয়াঙ্কিরা, চীনাদের বন্ধু হইয়া জাপানের প্রতি ইহাদের বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। দুর্ব্বল চীনের অধোগতির সীমা থাকিবে না।

জাহাজের সঙ্গীত-ভবনে প্রতিদিন দুই তিনবার যন্ত্র সঙ্গীত হয়। ফিলিপাইন-দ্বীপবাসী বাদকদল এই জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিরা তাহাদের বিজিত ফিলিপিনো জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিতেছে—কালে স্বাধীন করিয়া দিবে। এই সকল গৌরবসূচক কার্য্যের বিজ্ঞাপন ইয়াঙ্কি-স্থানের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। ফিলিপিনো বাদক-দলের যন্ত্রসঙ্গীত নানা উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। ফিলিপিনোরা বেহালা, তানপুরা, সারঙ্গ ইত্যাদি তারযুক্ত যন্ত্রের ব্যবহার বেশী করিয়া থাকে। সাধারণ পাশ্চাত্য-"ব্যাণ্ডে" যে সকল সুর বাজান হয়, তাহা হইতে ফিলিপিনো-ব্যাণ্ডের গৎ বহু পরিমাণে স্বতন্ত্র বোধ হইল।

এই ছয় মাসের ভিতর একজনও ফিলিপিনোর সঙ্গে আলাপ হয় নাই। জাহাজে উঠিয়া অবধি এশিয়াবাসী যাত্রীদিগের চেহারা দেখিতে লাগিলাম। এক যুবককে

দেখিয়া ভাবিলাম "এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ফিলিপিনো।" জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম অনুমান ঠিক। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এই যুবক একজন পাদ্রী; পাঁচ ছয় বৎসরকাল আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সিকাগোতে ইনি বেশী সময় কাটাইয়াছেন; এক্ষণে সস্ত্রীক হনলুলু যাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "স্বদেশে না ফিরিয়া হনলুলু যাত্রা করিয়াছেন যে?" তিনি বলিলেন—"হনলুলুতে প্রায় ১৫,০০০ ফিলিপিনো বাস করে। তাহাদের মধ্যে নানাবিধ প্রচারকার্য্য আবশ্যক। আমি ধর্ম্ম-প্রচারক এবং শিক্ষা-প্রচারক, দুই প্রকার প্রচারকের কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি। হনলুলুর ফিলিপিনো-সমাজে আমাকে কার্য্য করিতে হইবে।"

ফিলিপিনোরা প্রায় সকলেই খৃষ্টান। লোকসংখ্যা এক কোটি। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পেন ইহাদের প্রভু ছিলেন; তাহার পর হইতে ইহারা ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ফিলিপিনোরা বিদেশী প্রভুদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে বেশী ভালবাসে?" যুবক পাদ্রী বলিলেন—"ইয়াঙ্কিকে। স্পেনিশজাতি ফিলিপিনোদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু শিক্ষা, শিল্প, সভ্যতা ইত্যাদি কোন বিষয়ে তাহারা ফিলিপাইনবাসীদিগের উন্নতিসাধনে চেষ্টিত হয় নাই। ইয়াঙ্কিরা ফিলিপিনোদিগকে সত্যসত্যই 'মানুষ' করিয়া তুলিতেছেন। ইয়াঙ্কি-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া আমরা সকল বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছি। আমাদের ধনসম্পদও বাড়িয়াছে।"

জাহাজে বসিয়া "তার" করা যায়, ডাকে চিঠি ফেলা যায়। একটা লাইব্রেরী আছে। তাহা ছাড়া একখানা দৈনিক পত্র বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে তারহীন-বার্ত্তাবহের সাহায্যে ইউরোপীয়-মহাসমরের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ও একটা গল্প-রসিকতা ইত্যাদিরও স্থান আছে।

(২) চীনা সহযাত্রী

লাইব্রেরীতে বসিয়া 'Hawaiian Folk-Tales' নামক পুস্তক পড়িতেছিলাম। আজ রবিবার; বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে, একজন সহযাত্রী পুরোহিত ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিবেন। যথাসময়ে লাইব্রেরী-গৃহ গির্জ্জায় পরিণত হইল। বক্তৃতা, সঙ্গীত, প্রার্থনা ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানই বাদ পড়িল না।

জাহাজের দৈনিক-পত্র কিরূপে সম্পাদিত হয়, নিম্নের বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যাইবে:—

"If enough 'ship-items' can be secured, a 'Special Social Edition' will be published during the voyage. The Editors would be very much pleased to have the assistance of every one in publishing this issue. If you have any joke, short-stories, poetry, or the results of any events happening a-board the ship, send it to the purser's office and we will publish it. Wanted: A daily reporter Apply at once."

মোসাফেরগণের ভিতর হইতে একব্যক্তি সংবাদদাতাও নিযুক্ত হইয়া যাইবেন। পারিশ্রমিকও রীতিমত জুটিবে। সকল কাজই ব্যবসায়ের নিয়মে চলে। কাগজের নাম 'Ocean Wireless News' দৈনিক মূল্য পাঁচ আনা।

প্রথমশ্রেণীতে স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকাসমেত প্রায় ২০০ যাত্রী। অনেকেই হনলুলু পর্য্যন্ত যাইবেন—প্রায় সেই পরিমাণ লোক হংকং যাইতেছে! হংকং যাত্রীরা চীন, শ্যাম, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ ও ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের যাত্রী। অন্যান্য মোসাফেরগণ জাপানের দুই তিনটা ষ্টেসনে ও ফিলিপাইনের ম্যানিলা বন্দরে নামিবেন। একটা ভাল কার্ডের উপর প্রত্যেক মোসাফিরের নাম ছাপান হইয়াছে। বন্ধুবর্গের নিকট উপহার পাঠাইবার জন্য জাহাজ-কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অনুরোধ করিয়া গেল। ছবি-ছাপা, নাম-ছাপা, কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির-করা—ইত্যাদি কাজ পাশ্চাত্য-সমাজে অতি সাধারণ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহাতে খুসী। আমরা ভারতবর্ষে এ সব জিনিষকে বহির্ম্মুখী ও নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত।

এশিয়াবাসীর গায়ে মুখে কপালে যেন দুর্ব্বলতার ছাপ মারা রহিয়াছে। ভারতের নরনারীর ত কথাই নাই,—তথাকথিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্রশাসনাবলম্বী চীনাজাতির লোকজনও দেখিতে নিতান্ত নিরীহ, গো-বেচারা ভালমানুষ। আর ইয়োরামেরিকার জনগণ সকল বিষয়েই তেজস্বী, কর্ম্মঠ, গতিশীল। ইয়োরোমেরিকানেরা দাঁড়াইয়া

আছে অথবা দৌড়াইতেছে, এশিয়াবাসী বসিয়া আছে, অথবা ধূলায় শুইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। চেহারা, গতিভঙ্গী, চালচলন, কথাবার্ত্তা, উভয়েরই বিপরীত। জাপানীরা আজকাল এশিয়ার ইংরেজ বা জর্ম্মাণ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহাদিগকে দেখিলেও ইহারা যে এশিয়াবাসীর জ্ঞাতি-কুটুম্ব, তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। এশিয়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নরম উপাদানে গঠিত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

জাহাজের চীনা-যাত্রীরা নিঃশব্দে, সাড়াশব্দ না করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। অন্যান্য মোসাফেরগণ পরস্পর মেলামেশা, বন্ধুত্ব, প্রণয় ইত্যাদি করিয়া লইতেছেন। চীনারা যে এশিয়াবাসী, সেই এশিয়াবাসী যে সকল ইয়োরেমেরিকান পুরুষের সঙ্গে কোন রমণী ছিল না, তাহারা দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই এক একজন Sweet heart বা "মিষ্টহৃদয়" সংগ্রহ করিয়া লইল। যে সকল রমণীর সঙ্গে কোন পুরুষ ছিল না, তাহারাও এক একজন সঙ্গী বাছিয়া লইল। বেচারা চীনাদিগকেই কেহ পুছে না। জাহাজের নাচগানে, আমোদপ্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে, কিছুতেই চীনারা গা ঢালিতে পারিতেছে না। East is East, West is West" অর্থাৎ "পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মিলন অসম্ভব"—কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে।

একজন চীনা-বণিকের সঙ্গে আলাপ হইল। চা-ব্যবসায় ইঁহার কার্য্য; চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, স্পেন, ইত্যাদি নানাদেশে তাঁহার কারবার চলিতেছে। এইজন্য সর্ব্বদা তিনি দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। ফরাসী, জর্ম্মাণ, স্পেনিস, ইংরাজী, জাপানী ও মাতৃভাষায় তাঁহার বেশ দখল আছে, সম্প্রতি বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিতেছেন।

আর একজন চীনাম্যান বিলাত ও আমেরিকার লৌহ-কারখানা পরিদর্শন করিয়া চীনে যাইতেছেন। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে জাতিভেদ—আর চীনের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ভাষাভেদ।" পরিচয়ে জানা গেল, ইনি চীনের একটা নামজাদা লৌহ-কারখানার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। ভারতবর্ষে সাকৃচিতে যেমন তাতার কারবার চলিতেছে, চীনেও সেইরূপ ইয়াংসিউ নদীর ধারে হাঙ্কাও নগরে একটা সুবৃহৎ 'Iron and Steel Works' আছে। হাঙ্কাও নগর সমুদ্র হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দূরে। এই কারখানায় ৩০০০ মজুর কর্ম্ম করে। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বিলাতে ছয় বৎসর 'Metallurgy' শিক্ষা করিয়াছিলেন। জর্ম্মাণিতেও মাঝেমাঝে ইঁহার শিক্ষালাভের সুযোগ জুটিয়াছিল। এইরূপে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওস্তাদ (Hankow) হাঙ্কাও কারখানায় প্রায় ১২।১৪ জন আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই কারখানা চালাইবার মূলধন আসে কোথা হইতে?" তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"মূলধন বিদেশী, প্রধানতঃ জাপানী।"

একজন চীনা-ছাত্র জাহাজে আছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্র এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছে। গ্রীষ্মাবকাশ দেশে কাটাইয়া আবার যথাসময়ে নিউইয়র্কে ফিরিবে।

কতিপয় ইয়াঙ্কির সঙ্গে আলাপ হইল। একজন ওয়াসিংটন নগরের ব্যাঙ্কার—চীনে ব্যাঙ্কিং-কারবার খুলিবার সুযোগ বুঝিবার জন্য হংকং যাইতেছেন। একজন পত্রিকা-সম্পাদক, সপরিবারে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বাহির হইয়াছেন। ইনি বষ্টনের অধিবাসী—অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যানের বন্ধু। ইহারা হনলুলুতে কিছুকাল কাটাইবেন।

জাহাজে একজন অধ্যাপক আছেন—ইনি মিশোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্রিকা-সম্পাদন বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি বলিলেন—"আমরা প্রত্যেকে সাত-বৎসরব্যাপী কার্য্যের পর এক বৎসর ছুটি পাই। আমি আমার অবকাশ জাপানে কাটাইব স্থির করিয়াছি। 'Japan Advertiser' কাগজের আফিসে কিছু কাজ করিবার ইচ্ছা আছে। সস্ত্রীক চলিয়াছি।"

একজন সিকাগোবাসী ভারতবর্ষে যাইতেছেন। ইনি বলিলেন,—"আমি ধাতু রত্ন হীরা জহরতের অলঙ্কার-নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। নূতন নূতন ধরণের pattern ও design প্রস্তুত করা আমার বিশেষত্ব। আমি প্রাচীন আলঙ্কারিক-রীতিগুলি বাজারে চালাইতেছি—নিতান্ত অনুকরণ করি না। আমার স্বচিন্তিত নূতন কায়দাও থাকে। মোটের উপর লোকেরা আমার কাজ পছন্দ করে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রাচীন শব্দে আপনি কি বুঝিতেছেন?" ইনি বলিলেন—"লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্, য়্যাজ্‌টেক্, মায়ান ইত্যাদি বুঝিতেছি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ স্পেনিস। আমার জন্ম জেব্যানিমা-খালের সমীপবর্ত্তী নিকারাগুয়া-জলপথে হইয়াছিল। সেই সূত্রে আমি মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন শিল্পরীতির প্রভাব লাভ করি। পরে সিকাগোতে আসিয়া

বাস করিতেছি। আমি পুরাতনের সঙ্গে নূতন রীতি মিশাইয়া এক অভিনব বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি। এই বার ভারতবর্ষ হইতে নূতন কতকগুলি রীতি আমদানি করিব।"

(৩) সাগরে সুখের নীড়

জাহাজখানা একটা আধুনিক নগর-বিশেষ। আরোহীরা অল্প-ব্যয়ে সকল প্রকার সুখভোগ করিবার সুযোগ পায়। বিলাস সামগ্রীর অভাব এখানে একেবারেই নাই।

মদের দোকান সর্ব্বদাই খোলা রহিয়াছে। যাহার যখন যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তখন সেইরূপ মদিরা সেবন করিয়া আসিতেছে। ধূমপানের জন্য একটা স্বতন্ত্র কামরা আছে। ধূমপানের ধূম এখানে এত বেশী যে, ঘরটা সর্ব্বদাই ধূমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। দৈবক্রমে এক মিনিট গিয়া উপস্থিত হইলে, মাথা ধরিয়া যায়। তাসখেলা, দাবাখেলা ইত্যাদিও বেশ চলিতেছে।

ডেকের উপর একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চৌবাচ্চায় প্রতিদিন জল ভরা হয়। যাত্রীরা ইচ্ছানুসারে সাঁতার-কাটা অভ্যাস করিতেছে। Indoor Base-ball খেলার জন্য পরদাদ্বারা ডেক ঢাকা হইয়া গেল। প্রবীণ নবীন সকলেই এই খেলায় মত্ত।

নাচ, গান, বাজনায়ও জাহাজ মাতিয়া রহিয়াছে। পিয়ানো-বাদকেরা দিনে তিনবার করিয়া কন্‌সার্ট বাজাইয়া থাকে। সঙ্গীত-গৃহে পিয়ানো বাজানো লাগিয়াই আছে। এতদ্ব্যতীত ডেকের উপর একটা অর্গ্যান হইতে আপনা আপনিই প্রসিদ্ধ গায়কগণের সুর বাহির হয়। ইহা একপ্রকার গ্রামোফোন বিশেষ।

পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নাচিতে ও গাহিতে পারে। কন্‌সার্টে কোন একটা সুর বাজিতে থাকিলে ইহারা অজ্ঞাতসারেই তালেতালে পা ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হয়। যখন তখন, যে কোন অবস্থায়, ইহারা নাচিবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের দেশে চৈত্র মাসে চড়কের ঢাকে কাঠি পড়িবামাত্র ভক্তগণের পীঠ যেমন সুরসুর করিয়া উঠে, এদেশে আবাল বৃদ্ধ-বণিতার চরণও সেইরূপ বাজনা শুনিলেই সুরসুর করে।

নাচিবার জন্য জাহাজের কর্ম্মচারীরা বিশেষ ব্যবস্থাও করিয়া দেয়। পরদা-ঝুলান, চেয়ার-সাজান ইত্যাদি বিষয়ে খালাসীরা সাহায্য করে। এইরূপে নাচ-গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া জাহাজ-কোম্পানীর নিজ কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। একজন করিয়া পুরুষ একজন করিয়া রমণীর সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করে। নাচের রীতি প্রায় সকলেই জানে। সুর বাজাইলেই জোড়া জোড়া লোক নাচ সুরু করিয়া দেয়। যে রাত্রিতে নাচ হয়, সেই রাত্রিতে ২।৩ ঘণ্টা আমোদ প্রমোদ চলে। নাচের পর মদ গৃহে গমন এবং পানভোজন ইত্যাদির যথাবিধি ব্যবস্থা আছে। নৃত্য-ব্যাপারটা জাহাজে বন্ধুত্ব জমাইয়া তুলিবার প্রধানতম উপায়। যতদিন পর্য্যন্ত নাচের ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আরোহীরা বড়ই বিমর্ষ ও দুঃখিতভাবে কাল কাটায়। নাচের রাত্রির পর হইতে ইহারা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

খেলাধূলা, আরাম ব্যায়াম, সুখ-স্বাস্থ্য ইত্যাদির সকল জিনিষই জাহাজে পাওয়া যায়। জাহাজে কয়েকদিন কাটাইতে পারা কলিকালে স্বর্গবাস স্বরূপ। তবে দুনিয়ায় বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ বড় বেশী দেখা যায় না;—জাহাজে ত না যাইবারই কথা।

সিকাগোর ধাতুশিল্পী বলিতেছিলেন—"মহাশয়, জাহাজে চলাফেরা করা বড়ই বিপজ্জনক। পরিবারস্থ পুত্র-কন্যারা লোকজনের দৃষ্টান্তে কুপথগামী হইয়া পড়ে। যে সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন অভিভাবক নাই, তাহাদের পক্ষে জাহাজে চলাফেরা আরও বিপজ্জনক। তাহারা নিজে হয় ত ভাল থাকিতে পারে; কিন্তু আরোহীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া লইবার জন্য উদগ্রীব। যেন তেন প্রকারেণ তাহাদের সঙ্গে কথা বলা, তাহাদের কোন একটা কাজ করিয়া দেওয়া, 'May I help you?' বলা, স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করা, ইত্যাদি নানাচ্ছলে ইহারা এই সকল রমণীকে বিরক্ত করিয়া তোলে। ইহা নিবারণ করা একপ্রকার অসম্ভব।"

চীনারা জুয়াখেলায় ওস্তাদ। দুই তিনদিন দেখিলাম চীনা ছাত্রটি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের ডেকে ঘনঘন আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ হইল। একদিন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। দেখিলাম, চীনা খালাসী ও আরোহীরা মহা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আট দশটা টেবিলের উপর জুয়াখেলা চলিতেছে। সকলেই

জুয়ার নেশায় বিভোর। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী মজা দেখিতেছে, কেহ কেহ বা জুয়া খেলিতে লাগিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, কোন কোন ইয়াঙ্কির ২।৩ হাজার টাকা লোকসান হইয়া গিয়াছে। চীনাদের জুয়ার আড্ডা দেখিবার জন্য দলে দলে যাত্রীরা তৃতীয়-শ্রেণীর ভিতর আসা-যাওয়া করিতেছে।

শ্বেতাঙ্গ-মহলেও জুয়ারি কম নাই। ধূমপানের গৃহে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা জুয়াখেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। জুয়ার নেশা শীঘ্র ছাড়ে না। একবার যে মজিতেছে, সে আর নিষ্কৃতি পায় না। জাহাজের সর্ব্বত্রই যেন দেওয়ালীর জুয়ার হাট দেখিতে পাইতেছি।

(৪) নানা কথা

বৈশাখমাসে ভারত-মহাসাগর নীলবর্ণ প্রান্তরের মত দেখাইতেছিল ; জ্যৈষ্ঠমাসে প্রশান্ত মহাসাগরকে সেইরূপই দেখিতেছি। এযাত্রায় কোন আরোহীকে সমুদ্র-পীড়ায় অস্থির দেখিলাম না। বেশ গরম পড়িয়াছে। স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কোয় শীতবস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। দু'এক দিন জাহাজ চলিবার পর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ভাসিতেছি। শান্ত সমুদ্র, সুনীল লবণাম্বু, ফুর্‌ফুরে হাওয়া, রাত্রিকালে তারকারাজি ও চন্দ্র-কিরণ—এই গেল বহিরাবেষ্টনের অবস্থা। আর জাহাজের ভিতর নাচ-গান, গল্প গুজব, খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা-দেওয়া। সময় কাটিতেছে মন্দ না!

দু'একদিন জাহাজ হইতে হঠাৎ বিপদ্‌সূচক বাঁশী ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। আরোহীরা শশব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যে যেখানে ছিল, সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধান ডেকের উপর হাজির। দেখিলাম, জাহাজের খালাসী ও কর্ম্মচারীরা সকলে সারি দিয়া ডেকের উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছে ; কিন্তু কোন বিপদের লক্ষণ কোথাও নাই। বষ্টনের পত্রিকা-সম্পাদক বলিলেন—"মহাশয়, জাহাজে আগুন লাগিলে, অথবা অন্য কোনপ্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে, আরোহীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জাহাজ-কোম্পানী দায়ী। এই নিমিত্ত খালাসী ও কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য। লোক-রক্ষাকার্য্যে পারদর্শী করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদিগকে অভ্যস্ত করান হয়। দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে জাহাজের কাপ্তেন হঠাৎ 'Danger-Signal' বাজাইয়া দেন। তাহা শুনিবামাত্র নাবিকেরা তাহাদের যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে কর্ম্ম করিতে লাগিয়া যায়। এই দেখুন, প্রত্যেক জালিবোটের সম্মুখে ১২।১৪ জন করিয়া খালাসী দণ্ডায়মান। কেহ কেহ নৌকাটা উপর হইতে জলে ভাসাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। কেহ কেহ 'Life-saving belt' লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যাহারা এই সকল কার্য্য পূর্ব্বে কখনও করে নাই, তাহাদিগকে নূতন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।"

ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার পূর্ব্বে উভয়পক্ষীয় খেলোয়াড়েরা আপোষে practise করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও mock fight বা কৃত্রিম-সংগ্রাম ইত্যাদি এইজন্যই অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াঙ্কিস্থানের বড় বড় হোটেলে দেখিয়াছি, আগুন লাগিলে দাসদাসীরা কে কি কার্য্য করিবে, তাহা মাঝে মাঝে শিখান হইয়া থাকে। জাহাজেও এইরূপ 'Fire-Drill' দেখিলাম। বিগত দুই তিন বৎসরের ভিতর জাহাজডুবি দুর্ঘটনায় বহুলোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। এই জন্য জাহাজ কোম্পানীগুলিকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। প্রত্যেক কামরায় বিছানার কাছে 'Life-saving bell' রহিয়াছে ; কিন্তু ইহার ব্যবহার প্রায় কোন লোকই জানে না। ইহার ব্যবহার শিখাইবার ব্যবস্থাও কর্ম্মচারীরা করিয়াছেন।

জাহাজে অনেক পাদ্রী ও শিক্ষক চলিয়াছেন। কেহ চীনে যাইতেছেন—কেহ কোরিয়ায় যাইতেছেন, কেহ ম্যানিলায় যাইতেছেন—কেহ বা জাপানে যাইতেছেন। পাদ্রীদের মধ্যে চিকিৎসকই বেশী।

একজন দশবৎসর ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জে কাজ করিতেছেন—স্থানীয় ভাষা শিখিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে বেঙ্গলে প্রচারক ছিলেন। ইঁহার ভাই কালিম্পং পাহাড়ে সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহার নিকট শুনিলাম—"ফিলিপাইন-দ্বীপবাসিগণের মধ্যে একপ্রকার লোকসাহিত্য প্রচলিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।" ইনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী—কিন্তু ইনি আমেরিকার প্রেস্‌বিটারিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের সংশ্রবে লোক-সেবা-কার্য্য করেন।

একজন ইংরাজ-(ক্যানাডাবাসী) পাদ্রী-চিকিৎসকের পরিচয় পাইলাম। ইনি তিনবৎসর ধরিয়া কোরিয়াদেশে

শিক্ষাপ্রচার ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। ইনি বলিলেন—"এতদিন আমরা কোরিয়া-বাসীদিগকে তাহাদের স্বদেশী-ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতেছিলাম। এক্ষণে কোরিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। জাপানীরা কোরিয়ার সর্ব্বত্র জাপানী-ভাষা প্রবর্ত্তন করিতেছে।"

ইয়াঙ্কিস্থানের পররাষ্ট্র-দৌত্যবিভাগের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী যবদ্বীপে যাইতেছেন। ইনি একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন—'The Present Military Situation in the United States'; লেখক Major General Greene. মাত্র দুই তিন মাস হইল পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি Normal Angell এবং Andrew Carnegie প্রমুখ শান্তিবাদীদিগের প্রচারিত মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য সজ্জিত না হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইবেন।"

পাদরীরা জাহাজের লাইব্রেরী গৃহে কতকগুলি পুস্তিকা ও রিপোর্ট বিলি করিয়া গেলেন। একটাতে দেখিলাম, এশিয়ায় ও আফ্রিকায় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারকগণের চেষ্টায় যে সকল অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাদের তালিকা আছে। ভারতবর্ষের বিবরণে লিখিত রহিয়াছে যে, কলিকাতার রিপণ কলেজ, সিটি-কলেজ, প্রেসিডেন্সী-কলেজ ইত্যাদি, এমন কি কাশীর সেণ্ট্রাল এবং হিন্দু কলেজ, লাহোরের দয়ানন্দ য়্যাংগ্লোবেদিক কলেজও খ্রীষ্টান প্রচারকগণের কৃতিত্বের সাক্ষী।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষাবিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী এই জাহাজে আছেন। ইনি শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি দেশ হইতে নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতেছেন।

ইয়োরামেরিকানদের শারীরিক-ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মানুষের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেকটারই চরম ভোগ করিতে ইহারা সুপটু। সকাল হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ইহারা অবিরাম ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। পানভোজনে ইহারা যেমন ওস্তাদ, ক্রীড়া-কৌতুকে, সন্তরণে, নাচগানে ও অমোদপ্রমোদেও ইহারা তেমনই কর্ম্মক্ষম। কোন বিষয়েই অল্পে ইহাদের তুষ্টি হয় না। ইহারা দুইতিন ঘণ্টা ধরিয়া জলের ভিতরেই ডুবাডুবি করিতে থাকে। তাহার পূর্ব্বেই হয়ত দুইতিন ঘণ্টা ধরিয়া ইহারা লাফালাফি করিয়াছে—এবং তাহার পরেই হয়ত অন্য কোন কাজে লাগিয়া যাইবে।

(৫) হনলুলুতে প্রথম-রাত্রি
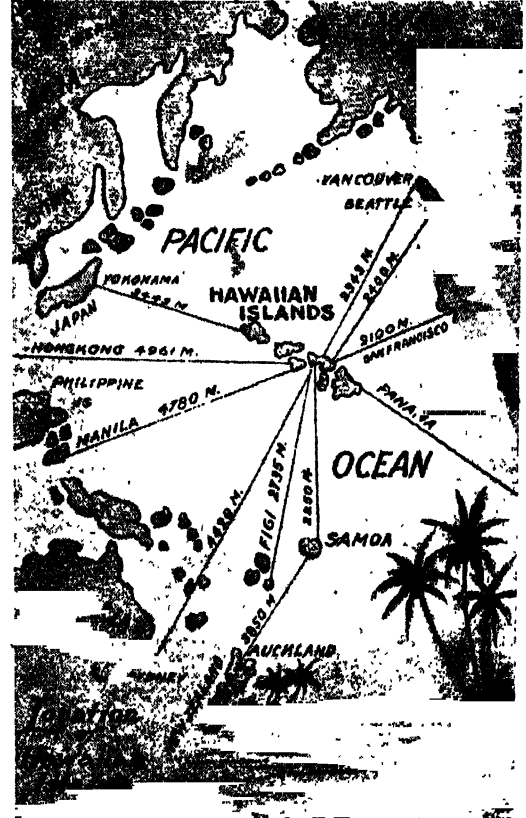
প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান।

রোজ প্রায় ৩৫০ মাইল চলিয়া ছয়দিনে হনলুলু পৌঁছিলাম। বন্দরে পৌঁছিবার কয়েকঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই ওয়াহুদ্বীপের পাহাড়গুলি দেখা গেল। এডেনের পাহাড় যে ধরণের, এই পর্ব্বতশ্রেণীও সেই ধরণের। তরুহীন, লতাহীন, কৃষ্ণধূসর প্রস্তরস্তূপ—শিরোদেশে আগ্নেয়গিরির মুখের মত সুবিস্তৃত গহ্বর!

যতই দ্বীপের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকিলাম, ততই সমুদ্রের জল নীলিমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবুজবর্ণ গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় জাহাজের আরোহীরা সকলে মিলিয়া আগ্রহের সহিত জলের দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিল। ফিলিপাইনের শিক্ষা-পরিদর্শক উর্দ্ধশ্বাসে জাহাজের সম্মুখ-ভাগে দৌড়াইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই একটা হৈচৈ

পড়িয়া গেল। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য জাহাজের ধারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কতকগুলি শার্ক মাছ জাহাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জলের ভিতর দিয়া দৌড়িতেছে, আর বহুসংখ্যক ছোট মাছ উড়িয়া উড়িয়া সমুদ্রে চলাফেরা করিতেছে। ক্রমশঃ মাছের ঝাঁক অদৃশ্য হইয়া গেল। জাহাজ ঘাটায় আসিয়া আমরা ঠেকিলাম। পচিশ ত্রিশজন হনলুলুবাসী দরিদ্র বালক জাহাজের নিকট সাঁতার কাটিতেছে। আরোহীদিগের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাহারা এইরূপ করিতেছে। আরোহীরা উপর হইতে ইয়াঙ্কি সিকি দোয়ানি ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলিতে লাগিল। ভিক্ষুকেরা জলে ডুবিয়া সেইগুলি অন্বেষণ করিতে থাকিল। একটা পয়সাও খোওয়া গেল না, দেখিলাম।

লোকজনের চেহারা দেখিয়াই বুঝিতেছি—ইয়োরা-মেরিকান-জাতির দেশ ইহা নয়। মার্সেল হইতে স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো পর্য্যন্ত যে সকল নরনারী দেখিয়াছি, তাহাদের হইতে ইহারা স্বতন্ত্র। মিশরের আলেক্জান্দ্রিয়ায় যে জাতি বাস করে, ইহাদিগকে তাহাদেরই জ্ঞাতি বিবেচনা করা চলিতে পারে—অবশ্য দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি। মিশরীয়েরা দীর্ঘাকৃতি, হনলুলুবাসীরা খানিকটা হ্রস্বাকৃতি,—প্রথম দৃষ্টিতেই এই প্রভেদ মনে হইবে। এখানকার লোকদিগের গায়ের রং মোটের উপর ভারতবাসির গায়ের রংয়ের মত বলা যায়—কিন্তু মুখের গঠন অনেকটা জাপানী ধরণের। —এশিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

হনলুলু নগরের বাসভবন

দুইতিনদিন হইতেই জাহাজে অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। আজ সমস্ত দিন গ্রীষ্মে আধপোড়া হইয়া গিয়াছি। শীতের পোষাকই এখনও পরা রহিয়াছে। হনলুলু ঠিক কলিকাতা ও বোম্বাই নগরদ্বয়ের সঙ্গে এক রেখার উপর অবস্থিত। কাজেই জ্যৈষ্ঠমাসের কলিকাতা, বোম্বাই, বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগর—সবই প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জে বিদ্যমান। গ্রীষ্মাবর্ত্তের (Torrid-Zone) গাছপালাও জাহাজ হইতে দেখিতে পাইলাম।

নামিয়া দেখি—একটা চলনসই ছোটখাট নগর গড়িয়া উঠিতেছে।—ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশের উদ্ভিদসমূহ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। 'তমালতালীবনরাজিনীলা অভাতিবেলা লবণাম্বুরাশিঃ' —ইত্যাদি বর্ণনা ওয়াহুদ্বীপের সাগরকূল-সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম। হোটেলটা যেন কুঞ্জবনের ভিতর অবস্থিত। আম, জাম
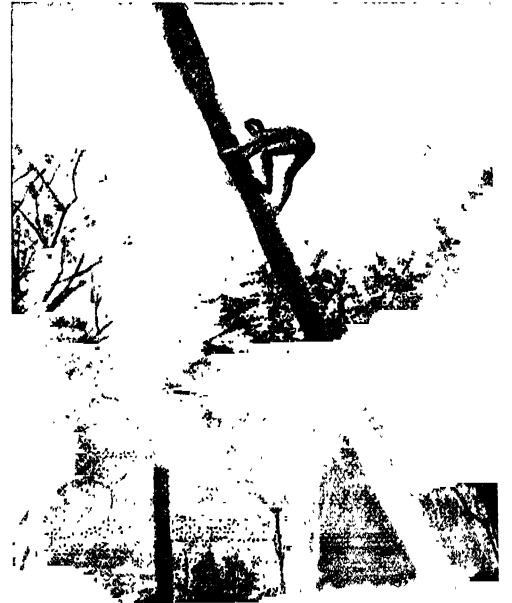
সমুদ্রতীরে নারিকেল গাছ

নারিকেল, কলা, খেজুর, বট ইত্যাদি নানাপ্রকার গাছের বাগানে গৃহখানি ঢাকা পড়িয়াছে। রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিলাম দোকানে আম্রফল সাজান রহিয়াছে।

...স্থানে থাকিবার সময়ে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের আনারসের ...শুনিয়াছি—এবারকার বিশ্বমেলায় এখানকার ...রস প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিতও হইয়াছে। হোটেলের আনারস বিস্তর দেখিলাম। নৈশ ভোজনের সময়ে

আনারসের ক্ষেত

...নাম—"আমের দিন প্রায় চলিয়া গেল। আর ...কদিন পরে আম পাওয়া যাইবে না। আজকাল ...ই পাওয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই পোকায় ভরা।" ...টেলে আজ পেপেফল ছিল। এত বড় ও এত মিষ্ট ...জীবনে কখনও খাই নাই। এই ফলের ইংরাজী ...ও পেপে।

...কালে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। হাওয়াই ...পপুঞ্জকে "ইয়াঙ্কিস্থানের জের" বলিয়াছি। সত্য কথা--- ...জাপানের জের। স্থানীয় লোকজন ছাড়া এখানে ...দের অস্তিত্বই বেশী বুঝিতে পারিতেছি। জাপানীরা ...নে, বাজারে, ট্রামে, রাস্তায়, সর্ব্বত্রই বিরাজমান। ...ই তাহাদের স্বদেশী-পোষাকই ব্যবহার করিতেছে। ...নীয় লোকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টান এবং কোট ...ট ব্যবহার করিয়া থাকে।—এখানে শ্বেতাঙ্গদের মহল্লা ...নগরসমূহের শ্বেতাঙ্গ-মহল্লারই অনুরূপ। জাপা- ...এখানকার লোকজনের সঙ্গে যেরূপ ভাবে মিশিতে ...শ্বেতাঙ্গেরা সেরূপ ভাবে কখনই সমর্থ নয়। হাও- ...কে বস্তুতঃ জাপানেরই এক অংশ বিবেচনা করিলে ...হইবে না।

ট্রামে আটদশ মাইল ঘুরিলাম। কণ্ডাক্টর ও মোটর-ম্যান দুই জনই ইয়াঙ্কি। খালি পায়ে, অথবা চটিজুতা পায়ে এবং মাথায় টুপি না দিয়া বহুলোক চলাফেরা করিতেছে। রাস্তায় আলোকমালার শোভা নাই। প্রাসাদ-তুল্য দোকানগৃহ, হোটেলগৃহ ইত্যাদিও দেখিতেছি না, -নিতান্তই "নিঝুমের পালা"!

মশার উপদ্রব যথেষ্ট। টেবিলের উপরে পিপড়া চলাফেরা করিতেছে। মিশরের হোটেলে মশারি ব্যবহার করিয়াছি—আর আজ হনলুলুতে ব্যবহার করিতেছি। এশিয়ার পশ্চিমসীমা ও পূর্ব্বসীমা একই ধরণের।

(৬) ওয়াহু হইতে হাওয়াই

সকালে উঠিয়া দেখি ভারতীয় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তপন আকাশে বিরাজ করিতেছেন। বাগানে

হাওয়াই সুন্দরী

চম্পকবৃক্ষ হইতে ফুলের গন্ধ ঘরের ভিতরেও পাইতেছি। বহুদিন পরে অনাবদ্ধ-প্রকৃতির স্বাধীন-বিকাশ দেখিতে পাওয়া

গেল। মন্দ মন্দ বাতাস্ বহিতেছে। বোম্বাই কিম্বা পুরীতে যাঁহারা সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক বৃক্ষে তাজা সবুজ-পাতা গজাইয়াছে—কোন কোন আমগাছে এখনও কাঁচা আম ঝুলিতেছে—সুদীর্ঘ নারিকেলগাছ হইতে মাঝে মাঝে এক একটা ফল মাটিতে পড়িতেছে। বাগানের ভিতর কতকগুলি পাতাবাহারের গাছ দেখিলাম—এগুলি আমাদের দেশীয় গাছ অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর। এক প্রকার নাতিক্ষুদ্র নাতি-বৃহৎ গাছে সুরক্তিম ফুল ফুটিয়াছে। দূর হইতে কুসুমিত শিমুলগাছ যেরূপ দেখায়, এই গাছ সেইরূপ দেখাইতেছে। ফুলে গন্ধ নাই—নাম Poinciana ; সপুষ্প বৃক্ষ দেখিলেই মনে হইবে, যেন গাছে আগুন লাগিয়াছে। জবা, করবী এবং অন্যান্য সুপরিচিত ফুলগাছও দেখিতে পাইলাম। বাগানের ভিতর একটা ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। তাহাতে পদ্ম
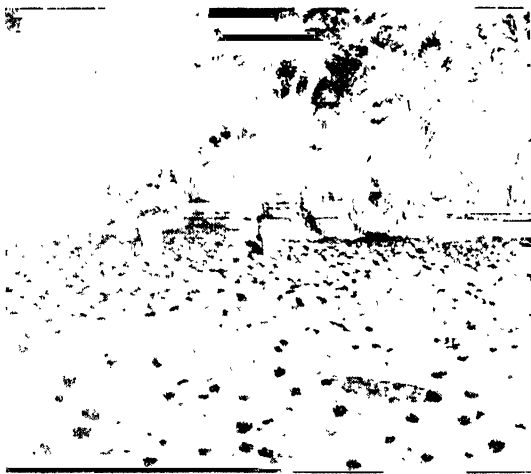
ফুটিয়া রহিয়াছে। হোটেলের চতুঃসীমার বাহিরেই ধানের ক্ষেত। দেখিবামাত্র মনে হইল—"ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা-ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি!" অনতিদূরে পাহাড়। বাগানের ভিতর কোন কোন বৃক্ষের শাখায় তোতাপাখী, ক্যানারি পাখী ইত্যাদির খাঁচা ঝুলিতেছে। আটটা নয়টা বাজিতে বাজিতে সূর্য্যতাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। কোথায় নিউইয়র্ক, সিকাগো, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো, আর কোথায় ওয়াহু-দ্বীপ ও হনলুলু!

মোটরকারে সহরের নানাস্থান দেখিয়া তিনটার সময় জাহাজে চড়িলাম। এই জাহাজে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের একটা হইতে অপরটায় যাওয়া-আসা করিতে হয়। জাহাজ-কোম্পানীর নাম Inter-Island Steam-Navigation-Company। সাধারণতঃ, বড় বড় পাচটা দ্বীপে এই কোম্পানীর জাহাজ চলিয়া থাকে।

২৫০ মাইলের সফরে বাহির হওয়া গেল। কোম্পানীকে দিলাম ১০৫৲। শনিবার বিকাল তিনটায় বাহির হইয়া মঙ্গলবার সকাল আটটায় ফিরিতে পারিব। পথখরচ, খাওয়ার খরচ সবই এই টাকার ভিতর ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

জাহাজের নাম 'Mauna Kea' 'মনাকিয়া' একটা পর্ব্বতের নাম ;—হাওয়াই দ্বীপে ইহা অবস্থিত—উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফিট। এই পাহাড়ের নামানুসারে জাহাজের নাম রাখা হইয়াছে। জাহাজের মালিক আমেরিকান, খালাসী বাবুরচি এবং খান্‌সামা সকলেই জাপানী।

খানাবিভাগের এক কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনি কি ভারতবাসী?" "আমি ভারতবর্ষের লোক।" বুঝা গেল এই ব্যক্তি পর্ত্তুগীজ-সন্তান—নাগপুরে এখন ইঁহার পরিবারস্থ লোকজন রহিয়াছে। ইনি একজন বাঙ্গালী মুসলমানের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে হনলুলুতে কার্য্য করিতেছেন। বহুকাল পরে স্বদেশী-লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া পর্ত্তুগীজ মন খুলিয়া অনেক গল্প করিলেন। ভারতবর্ষের নামে ইঁহার সত্যসত্যই একটা মমতার স্মৃতি জাগিতেছে।

ইয়াঙ্কিস্থানের ফেডারাল-কেন্দ্র ওয়াশিংটন-নগরে একজন রেপ্রেজেণ্টেটিভ বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, আমরা শীঘ্রই ইয়াঙ্কিসাম্রাজ্যের দ্বীপপুঞ্জে বাহির হইব।" হনলুলুতে পৌছিয়া শুনিলাম যুক্তরাষ্ট্রীয়-কংগ্রেসের কর্ত্তারা প্রায় দুই সপ্তাহকাল হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে কাটাইয়া আমেরিকায় ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বীপ-বাসিগণ যারপরনাই আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সহরে সহরে ছোটলাট, বড়লাট, কমিশনার ইত্যাদির আগমনে যেরূপ উৎসব-আমোদ অনুষ্ঠিত হয়, ইয়াঙ্কির রাষ্ট্র-নায়কগণের আগমনে প্রায় সেইরূপই হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজ বলিলেন—"মহাশয়, কয়েকদিন পূর্ব্বে কংগ্রেসের দল আমাদের এই জাহাজে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ

দেখিয়া গিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের জন্য এই জাহাজখানা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"তাঁহাদের খরচপত্র তাঁহারা নিজেই দিয়াছিলেন কি ?" পর্ত্তুগীজ বলিল—"হাওয়াই-টেরিটারির গবর্মেণ্ট হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। এইজন্য দৈনিক ৩০০০৲ খরচ হইত। Congressional-partyতে স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধবসহ প্রায় ১৫০ জন লোক ছিল।"

ওয়াহুদ্বীপ ছাড়িবার পর ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে মার্ত্তই দ্বীপে পৌছিলাম। এই দ্বীপও আগ্নেয় পর্ব্বতসমূহেরই উপাদানে গঠিত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র আগ্নেয়গিরির প্রভাব বিদ্যমান। এই সকল পর্ব্বতে আজকাল অগ্নুদ্গম প্রায়ই হয় না। কিন্তু হাওয়াই দ্বীপের একটা পর্ব্বতে জ্বলন্ত ধাতু ও প্রস্তরের গহ্বর দেখা যায়। সেই গহ্বর দেখিবার জন্যই বাহির হইয়াছি।

মার্ত্তই দ্বীপে নামিলাম না। শুনা গেল এইখানে এক চিনির কলে একজন ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত এঞ্জিনীয়ার কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহার গৃহ উড়িষ্যা দেশে। আমেরিকায় ইঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছে।

সকালে সাড়ে-ছয়টায় হাওয়াই দ্বীপে পৌছিলাম। বন্দরের নাম হিলো। এই নগর হনলুলু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। নানা উপায়ে ইহাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি ক্যানাডা,ক্যালিফর্ণিয়া ইত্যাদি জনপদে কৃষক, শ্রমজীবি ইত্যাদি জনগণকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত বহুপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নবীন ও উদীয়মান প্রদেশের উন্নতি এইরূপ সচেষ্ট প্রয়াসেই সাধিত হয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেও 'Hawaii-Promotion Committee উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

(৭) আগ্নেয়গিরির পথে

হিলো বন্দরেও নারিকেলের সারি দেখা গেল। জাহাজ হইতে নামিয়াই মোটর-কারে বসিলাম। সাতজন আরোহী —চালক জাপানী। হিলো নগরের কোথাও যাওয়া হইল না। দুই একটা রাস্তা মাত্র দেখান হইল। প্রদর্শক-কোম্পানীর উপর Hawaii-Promotion-Committee এইজন্য বিশেষ বিরক্ত। পর্য্যটকগণকে অন্ততঃ একবেলা হিলো নগরে কাটাইবার পরামর্শ দিবার জন্য Committee প্রদর্শক-কোম্পানীকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ক্রমশঃ তাহাদের অনুরোধ-অনুসারে কার্য্য

আগ্নেয়গিরির পথে

হইবে। তাহা হইলে হিলো বন্দরে ভাল হোটেল, দোকান, বাসগৃহ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নতি দ্রুত সাধিত হইবে।

হিলো সহরের সকল অঞ্চলেই স্থানীয় লোকজনের ভিতর জাপানীর সংখ্যা বেশী দেখিলাম। খাঁটি হাওয়াই-

হাওয়াই-দ্বীপের পল্লী-কুটীর
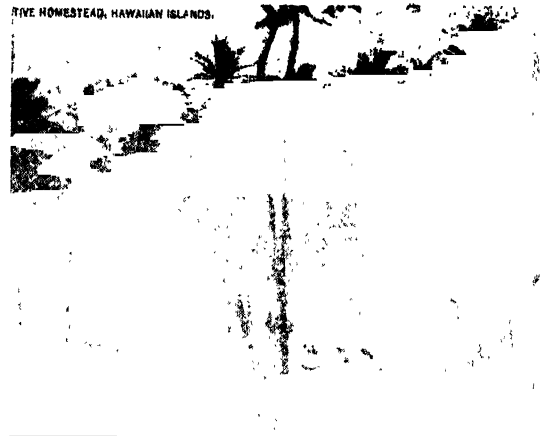
সন্তান চোখে পড়িল না বলিলেই চলে। জাপানী-ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রায় প্রত্যেক দোকানেই দেখিতেছি—জাপানী বালকবালিকারাই রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে। হিলো একটা জাপানী-নগর।

আকাশে কিছু কিছু মেঘ আছে—গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও মাঝে মাঝে পড়িতেছে। বাদলার দিনে বাঙ্গালা-দেশের

অবস্থান যেরূপ, ছিলো সেইরূপ বোধ হইল। প্রথমে নগরের নিকটে একটা জলপ্রপাত দেখিলাম। তাহার পর নগর ছাড়াইয়া চলিলাম।

মোটরে একজন ইয়াঙ্কি-রমণী রহিয়াছেন। ইনি যুক্ত-রাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলাইনা প্রদেশে বাস করেন। ইনি কিউবাদ্বীপে অনেকবার যাওয়া-আসা করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে ও কিউবা দ্বীপে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য নাই কি?" রমণী বলিলেন—"প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধাতু, স্বাস্থ্য, জলবায়ু ইত্যাদি প্রায় এক-প্রকার। কিন্তু কিউবার লোকজন অপেক্ষা হাওয়াই-দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসিগণকে বেশী করিতকর্ম্মা বোধ হইতেছে। বোধ হয় জাপানী ও চীনা-জনগণের উপনিবেশ এখানে আছে বলিয়া উন্নতি বেশী দেখিতেছি।" গাড়ীতে একজন কিউবাবাসী ইয়াঙ্কি-এঞ্জিনিয়ার এবং একজন হনলুলুবাসী ইয়াঙ্কি-সেনাপতি চলিয়াছেন। নানাপ্রকার গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া গেল।

এই পথে অজস্র পেয়ারাগাছ চোখে পড়িল। এতদ্ব্যতীত ইক্ষুক্ষেত্রও এই অঞ্চলের একটা বিশেষত্ব। যোজনব্যাপী প্রান্তরে একমাত্র আখের চাষই হইতেছে। ইক্ষুদণ্ডগুলি বেশ সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট দেখাইতেছে। কিন্তু সাধারণ-কৃষি-কার্য্য এক প্রকার নাই বলিলেই চলে; এমন কি, সমুদ্রের কিনারা ছাড়িয়া যাইবার পর আখের ক্ষেতও আর দেখিতে পাইলাম না; চারিদিকে বনজঙ্গল মাত্র বিরাজ করিতেছে। এই নিবিড় বনপথের ভিতর দিয়া মোটর চলিল। আগ্নেয়-গিরির Lava-প্রস্তরদ্বারা মোটরের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানসেবীর পক্ষে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ মূল্যবান্। আগ্নেয়গিরির আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থান বুঝিবার পক্ষে দ্বীপগুলি ভূতত্ত্ববিদের ল্যাবুরেটরীস্বরূপ। অধিকন্তু উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানবিদ্গণের পক্ষেও এই স্থান যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। সমুদ্রের কূল হইতে ত্রিশ মাইল আসিলাম। ক্রমশঃ উর্দ্ধভূমিতে উঠিয়াছি—শেষ পর্য্যন্ত ৪০০০ ফিট উচ্চ সমতলে পৌছান গেল। শিলিগুড়ি হইতে কার্সিয়াঙ্গে, অথবা কাঠগুদাম হইতে আলমোড়ায় উপস্থিত হইলাম। এই পরিমাণ উর্দ্ধভূমিতে উঠিতে থাকিলে স্বভাবতঃই নূতন নূতন উদ্ভিদের পরিচয় পাওয়া যায়। মোটরে বসিয়া তাহা বেশ বুঝিলাম। হাওয়াই-দ্বীপে উদ্ভিদ্রাশির বৈচিত্র্য-সৃষ্ট হইবার অন্তবিধ কারণও আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পার্ব্বত্য-উপকরণ আগ্নেয়গিরিজ Lava হইতে ভূমির উপর পতিত হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প পরিমাণ স্থানের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভূমি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে সামান্য সামান্য ব্যবধানেই বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ্রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। Botanist-মাত্রেই এই দৃশ্য দেখিতে লালায়িত হইবেন, সন্দেহ নাই।

যথাস্থানে আসিয়া হোটেলের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলাম। একখানা সুবৃহৎ সচিত্রগ্রন্থ চোখে পড়িল। নাম 'The Indigenous Trees of the Hawaiian Islands' by J F. Rock. গ্রন্থকার বলিয়াছেন:—

"Naturally, an island like Hawaü still in process of formation, represents widely-ranging districts: Ancient lava-flows, deserts, dense tropical rain-forests, dry or mixed forests, new lava-flows bare of any vegetation, Alpine zones, and almost any climate from dry desert-heat to the most humid air of the rain-forest, from tropical heat to ice and almost perpetual snow at the summit of the mountains. From a phylogeographic stand-point, the island of Howaii offers the most intere ting field in the Pacific. All these various districts with

ফার্ণ উদ্ভিদ

their peculiar climates support many interesting types of plant-coverings."

হোটেল পর্য্যন্ত আসিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নজরে পড়িল ফার্ণ উদ্ভিদ। হিমালয়-পর্ব্বতের নাতি-উচ্চ-প্রদেশে বহুবিধ fernএর জন্ম হয়। তিন্‌ধারিয়া, কার্সিয়াঙ্গ, দার্জ্জিলিঙ্গ ও কালিম্পঙ্গে নানাজাতীয় ফার্ণ দেখা যায়।

পথে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করিয়াছি। ঐ সকল পল্লীতে জাপানীদের গৃহই দেখিতে পাইলাম। হোটেলের খান্‌সামারা সকলেই জাপানী। এখানকার পরিদর্শক গ্রীক-মালিক অবশ্য ইয়াঙ্কি। গৃহের নাম— "ভল্ক্যানো হাউস।"

কংগ্রেসের ধুরন্ধরগণ এই হোটেলেই আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র মন্তব্য-বহিতে দেখিলাম। কামরায় বসিয়াই তিন মাইল দূরে আগ্নেয়গিরি-গহ্বরের শ্বেতবাষ্প ও ধূম দেখিতে পাইতেছি। হোটেল হইতে প্রায় ৪।৫ শত ফিট নিম্নে এই crater বা গহ্বর,—অল্প দূরেই উচ্চ পাহাড়। নাম 'মনালোয়া'; উচ্চতা ১৩৫০০ ফিট। মনাকিয়া পাহাড় এখান হইতে দেখা যায়। তাহার উচ্চতা ১৪০০০ ফিট। প্রশান্ত-মহাসাগরে ইহাই উচ্চতম পর্ব্বত।

(৮) প্রশান্ত-মহাসাগরের "জ্বালামুখী"

এতদিন ভূতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে আগ্নেয়-গিরির চিত্র দেখিয়াছি। তাহা হইতে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পিরামিডাকৃতি পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ধূম, বাষ্প, অগ্নি, প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদি নির্গত হয়। ভাবিয়াছিলাম, এইরূপ উচ্চ পর্ব্বতের শিরোভাগ হইতেই গলান "লাভা" বা গিরিজ-পদার্থসমূহের উদ্‌গীরণ দেখিতে পাইব। কিন্তু যথাস্থানে আসিয়া কিছু নিরাশ হইলাম। মনে পড়ে, বৃন্দাবন হইতে ত্রিশ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলাম। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, পাহাড়-পর্ব্বতের নামগন্ধও নাই, এমন কি রাত্রিকালে কোন উচ্চভূমিও দেখিতে পাইলাম না। পাণ্ডা-মহাশয় বলিলেন—"এই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসুন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দেখিতে পাইবেন!" আজ Volcano-Houseএ পৌঁছিয়া সেই কথাই মনে পড়িতেছে; কারণ আগ্নেয়গিরি আমার পাদদেশে! এই পর্ব্বত দেখিবার জন্য প্রায় ৩০০।৪০০ ফিট নিম্নে নামিতে হইবে। হোটেল

আগ্নেয়গিরি-হোটেল

অগ্ন্যুদ্গমের crater বা গহ্বর হইতে উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত। ঘরে বসিয়া বুঝিতেছি, যেন একটা প্রকাণ্ড অল্পোচ্চ মাঠের একস্থান হইতে শ্বেত-বাষ্প উড়িয়া আসিতেছে। বোধ হয় প্রান্তরের জনগণ গাছপাতা পোড়াইতেছে!

হোটেলের বাগানে দাঁড়াইয়া আর একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। ইহাকে পাহাড় বলিয়া সম্মান করিতে ইচ্ছা হয়। ইহার উচ্চতা মন্দ নয়, ত্রিভুজাকার শৃঙ্গও আছে। এই পর্ব্বতের মাথা হইতে যদি শ্বেত ধূম ও বাষ্প ইত্যাদি বাহির হইত, তাহা হইলে সত্যসত্যই আগ্নেয়গিরি দেখার সাধ মিটিত। শুনিলাম, এই পাহাড়েরও একটা শৃঙ্গ হইতে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদ্গম হইয়া থাকে। আট দশ বৎসর পর একবার করিয়া এই শৃঙ্গ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়। এই বৎসর হইবার সম্ভাবনা করা যাইতেছে। কিন্তু এখনও কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। এক্ষণে ঐস্থানে গেলে গিরি-শৃঙ্গের ভিতর নীরব, শান্ত, বাষ্পহীন, ধূমহীন গহ্বর মাত্র দেখা যাইবে। কাজেই ঐ পাহাড়ে উঠিয়া লাভ নাই। নিকটবর্ত্তী প্রান্তর-সদৃশ পাহাড়ের অগ্নিকাণ্ড দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মোটর-কারে বসিলাম। হোটেলের অনতিদূরে একটা বাগান। ইহার ভিতর বহুসংখ্যক কূপ-সদৃশ গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া গেল। গভীরতা ১৫।২০ ফিট মাত্র। ভিতরে জল নাই। কিন্তু কূপগুলির প্রাচীর বেশ

বাঁধান। এই জনপদের সর্ব্বত্র জমাট "লাভা"-প্রস্তরের:
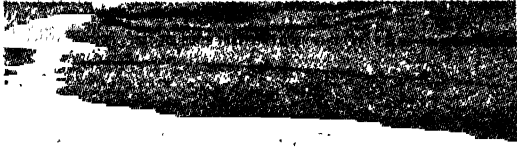
জমাট-লাভার প্রান্তর

টুকরা অথবা চাপ দেখিতে পাই। কূপগুলির প্রাচীরও এইরূপ লাভাদ্বারা গঠিত। প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম —"এই বাগানে দেখিবার বস্তু কি আছে?" উত্তর পাইলাম—"এই গর্ত্তগুলি।" এইগুলির নাম 'Tree Moulds' বা গাছের ছাঁচ। যাঁহারা সোনারূপা গলান অথবা অন্যবিধ ধাতু ঢালাইয়ের কায দেখিয়াছেন, তাঁহারা mould বা ছাঁচের ব্যবহার জানেন। কিন্তু এই সমস্ত বৃক্ষ ছাঁচের অর্থ কি?

প্রদর্শক বলিলেন—"ঐ যে অদূরে উচ্চ মনালোয়া পর্ব্বত দেখিতেছেন, উহা আগাগোড়া আগ্নেয়পর্ব্বত ছিল। সে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এক্ষণে কখনও কখনও একটিমাত্র শৃঙ্গে অগ্নি-গহ্বর ও অগ্নি-হ্রদ সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাহউক, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐ পর্ব্বতের তরল অগ্নিময় লাভা এই সকল মাঠে বাগানে গড়াইয়া পড়িত। এইরূপ অগ্নিকাণ্ডের ফলে বৃক্ষসমূহ ভস্মে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষগুলির গুঁড়ি যতখানি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ছিল ততখানি আজকাল কূপে পরিণত দেখিতেছেন। সেই লাভা বাঁধিয়া কূপগুলির প্রাচীর-গঠন করিয়াছে। একমাত্র এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই ভূতত্ত্ববিদেরা এই অঞ্চলে আসিলে অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকাব সার্থক হইবে।"

হোটেলের পশ্চাতেই গন্ধক-পর্ব্বত। নিকটে যাইয়া দেখি, অল্প-বিস্তৃত ভূমিখণ্ড গন্ধক-শিলায় সমাবৃত রহিয়াছে। গন্ধকচূর্ণ, গন্ধকস্তূপ ইত্যাদি স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বোধ হয় গন্ধকের লেশও নাই। এখানকার সর্ব্বত্র-বিরাজিত লাভারাশির উপরে গন্ধকের আবরণ পড়িয়াছে। নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ গর্ত্ত এবং সঙ্কীর্ণ ও বিস্তীর্ণ খালের ভিতর দিয়া শ্বেত ও পীত ধূম বাহির হইতেছে। এই ধূম গন্ধকের গুঁড়া সঙ্গে লইয়া উত্থিত হয়। কোন কোন স্থানে সূচ্যাকৃতি গন্ধক পর্ব্বতগাত্রে লাগিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্র গন্ধকের গন্ধ পাইতেছি। গন্ধকের ধূমে নিকটবর্ত্তী উদ্ভিদরাশির পত্রাবলী বর্ণহীন হইয়া গিয়াছে। মিশরের আসোয়ান পল্লীতে গ্রাণাইট-পর্ব্বত ও গ্রাণাইট-ধূলি দেখিয়াছিলাম। গন্ধকের বাষ্পে স্নান করিবার ব্যবস্থা আছে। হোটেলের কর্ত্তারা তাহার এক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন; মূল্য দিতে হয় দেড় টাকা।

এইবার মোটরকার ছাড়িয়া পদব্রজে "adventure" করিতে বাহির হইলাম। সঙ্গে চলিলেন কিউবার এঞ্জিনিয়ার এবং হনলুলুর সেনাপতি। হোটেল হইতে খাড়া প্রায় ৫০০ ফিট নামিয়া গেলাম। পার্ব্বত্য বনজঙ্গলের ভিতর পথ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় পনর মিনিট হাঁটিয়া জমাট-লাভার মাঠে উপস্থিত হইলাম। এই মাঠ হইতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখি, এক সুবিশাল গর্ত্তের ভিতর রহিয়াছি। এই গর্ত্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫।৬ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ২।৩ মাইল। প্রায় ৪০০।৫০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতগাত্র এই গর্ত্তের প্রাচীর-স্বরূপ।

"লাভার"-মাঠে তরুলতা কিছুই নাই। কৃষ্ণবর্ণ পোড়া-কয়লা অথবা ঝামার চাপ পড়িয়া রহিয়াছে। উপরে ধূলা-বালু কিছুই নাই। সুবিস্তৃত লাভা-প্রান্তরকে যোজনব্যাপী কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় বোধ হইতেছে; অথবা কৃষ্ণধূসর হস্তী বসিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, এই লাভা-ময়দান সেইরূপ দেখাইতেছে। এই সকল সমতল প্রান্তরের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোন স্থানে বোধ হইল যেন একটা সুবৃহৎ তরুবর আগাগোড়া লাভা-প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা গিরিজ-পদার্থ স্তরবিন্যস্ত-সোপান-পরম্পরার আকার গ্রহণ করিয়াছে। দ্রবীভূত উষ্ণপদার্থসমূহ শীতল হইবার সময় বিচিত্ররূপধারী হইয়া রহিয়াছে। লাভা-ময়দানের বিচিত্র রূপ দেখিতে দেখিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। বুঝা গেল, খানিকটা ঊর্দ্ধভূমিতে উঠিয়াছি। এই স্থান হোটেল হইতে বহুনিম্নে নয়। লাভা-প্রান্তরের পাদদেশ হইতে শিরোভাগ প্রায় ২০০।৩০০ ফিট উচ্চ।

ক্রমশঃ বাষ্প ও ধূমের রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। ছোট বড় নানা দিক হইতে শ্বেত-বাষ্প বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে বাষ্পমণ্ডলে ঢাকা পড়িয়া গেলাম। প্রায় ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে লাভা-ময়দানের উচ্চতম স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। এইখানেই বিরাট গহ্বরের কিনারা। গহ্বর হইতে অবিরাম শ্বেতধূম নির্গত হইতেছে। ইহার ভিতর তলদেশে টগ্‌বগ্‌ ও ছপাস্‌ ছপাস্‌ শব্দ শুনিতে পাইতেছি; কিন্তু অগ্নিশিখা দেখিতে পাইতেছি না।

হনলুলুর সেনাপতি বলিলেন—"মহাশয়, হাওয়াই-দ্বীপ যুক্তরাজ্যের অধীন হইবার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি এই আগ্নেয়গিরি প্রথম দেখি। তখন আমি গহ্বরের এত নিকটে আসিতে পারি নাই। কারণ তখন গহ্বর ছাপাইয়া উঠিয়া দ্রবীভূত উষ্ণ লাভা বাহির হইত। লাভার স্রোত বহুদূর হইতেই দেখিয়াছিলাম। ক্রমশঃ আগ্নেয়গিরির শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আজকাল এই অগ্নিকুণ্ডের তরলরক্তিম পদার্থসমূহ crater ভেদ করিয়া উঠে না। তবে মাঝে মাঝে গহ্বরের অল্প নীচেই গিরিবরের আগ্নেয়লীলা দেখিতে পাই। এক্ষণে প্রায় ৫০০।৬০০ ফিট নিম্নে অগ্নিকূপের রক্তোষ্ণ জল ফুটিতেছে।"

গন্ধকময় ধূমের গন্ধে হাঁচি কাসি ইত্যাদি ভোগ করিতে হইল। গহ্বরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। একস্থানে ক্ষুদ্র কাষ্ঠগৃহ নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহাতে বষ্টনের Massachusett Institute of Technolgy ভূতত্ত্ব-বিভাগ, পরীক্ষাগৃহ ও যন্ত্রগৃহ প্রস্তত করিয়াছেন। একটা মোটা লোহার তার গহ্বরের এক কিনারা হইতে অপর কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। ইহাতে শিশি ঝুলাইয়া গহ্বরের নিম্নতম প্রদেশ হইতে বাষ্প গ্যাস ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। শুনিলাম এইরূপে সংগৃহীত গ্যাসের বোতল ওয়াশিংটন নগরের বিজ্ঞানালয়ে পাঠান হইয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তিনচারিটা মোটর-কারে বহু সংখ্যক টুরিষ্ট গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একদল ইতালীয় সঙ্গীত-কোম্পানীর সঙ্গে অনেক গায়িকা আসিয়াছেন। পুরুষেরা ইহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন —"খবরদার বাষ্প ও ধূম হইতে বহুদূরে থাকিবে। গলার আওয়াজ নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।"

আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে থাকিলে অগ্নিকূপের তল-ভাগে তাণ্ডবলীলা কিছু কিছু দেখিতে পাইলাম। এক এক বার পলকের জন্য বিদ্যুৎ-রেখার মত তরল আগুনের চমক দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রকাণ্ড কড়া বা গামলার ভিতর দ্রবীভূত লাল আভা নৃত্য করিতে লাগিল। লীডস্‌, ম্যাঞ্চেষ্টার ইত্যাদি নগরের বড় বড় লোহ-কারখানায় গলান ধাতুর নদী দেখিয়াছি। সেইরূপ শত শত নদীর সমবায়ে এই অগ্নিকাণ্ড গঠিত। হাওয়াই-বাসীরা এই অগ্নি-কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে "পিলি" নাম দিয়াছে। আমাদের "জ্বালামুখী" এই ধরণের।

রাত্রিকালে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। মোটর-কার হইতে একটা নীরব, শীতল আগ্নেয়-গহ্বর দেখিতে পাইলাম। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্র অস্ত যাইবার পর শয়ন-গৃহ হইতে বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখি—

আগ্নেয়গিরি

"মহা অগ্নি জ্বলিল রে,
আকাশের অনন্ত হৃদয়,
অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, শুধু অগ্নিময়।"

দিবাভাগে যেখানে শ্বেত-বাষ্পরাশি দেখা যাইতেছিল, অন্ধকাররাত্রে সেখানে আকাশস্পর্শী অগ্নিস্তম্ভ দেখিতে পাইতেছি। অগ্নিশিখা অত ঊর্দ্ধে উঠে নাই। গহ্বর-তলের তরল-লাভার প্রভাবে সমস্ত আকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

রাত্রি এখন একটা;—সম্মুখে বিকট শ্মশানের চিতা

ধূধূ করিতেছে, আশে-পাশে, সম্মুখে-দূরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। গৃহের আলো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। দেড়-মাইল দূরে অন্ধকারভেদী ভয়ঙ্কর অগ্নিস্তম্ভ! গুণগুণ করিয়া গান ধরিয়া দিলাম—

"শ্মশান ভালবাসিস্‌ বলে' শ্মশান করেছি হৃদি ;
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে' নিরবধি।"

(৯) বর্ত্তমান-যুগের ধর্ম্মজ্ঞান

কিলাওয়া (Kilauea) পাহাড় বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। কাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বহুলোক এখানে আরাম করিতে আসে। "ভল্‌ক্যানো-হাউসে" কয়েকজন স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হইল। এই হোটেলের নিকট আর একটিমাত্র গৃহ আছে। ইহা Observatory বা পর্য্যবেক্ষণালয়। আগ্নেয়গিরি-সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের জন্য এই বিজ্ঞানমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-পরিষদের নাম 'Hawaiian Volcann Researeh Association.' ইয়াঙ্কিস্থানের ম্যাস্যাচুসেট্‌স্‌-প্রদেশের কয়েকজন বিজ্ঞানসেবীর চেষ্টায় এবং স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে এই ল্যাবরেটরীর সূত্রপাত হইয়াছে। হার্ভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একজন ভূতত্ত্ববিৎ এই গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মাত্র দুই তিন বৎসর হইল এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

কিলাওয়া পাহাড় দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। (১) স্বাস্থ্যান্বেষী ধনবান্‌ ব্যক্তিগণ সময় কাটাইবার জন্য এখানে আসেন। (২) বিজ্ঞান-সেবী পণ্ডিতগণ ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য এখানে আসেন। এই অঞ্চলের আকরে কোন প্রকার মূল্যবান্‌ ধাতু উৎপন্ন হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্যও ব্যবসায়ী ও শিল্প-ধুরন্ধর ব্যক্তিগণের সমাগম এইস্থানে হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে এই ধরণের তীর্থক্ষেত্রই দুনিয়ায় স্থাপিত হইয়াছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতি নূতন ধরণের মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিতেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মন্দির-মঠে অলৌকিক দেবতত্ত্ব প্রচারিত হইত। উপাসনা, প্রার্থনা, আরতি, মন্ত্রপাঠ,ইত্যাদি সেই সকল মন্দিরের নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতি ছিল। আজকাল সেই সকল মন্দির আছে সত্য ; এবং সেই ধরণের নূতন মন্দিরাদি সর্ব্বত্র তৈয়ারীও হয় সত্য ; কিন্তু সেই সমুদয় হইতে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে। সেগুলিতে কোন প্রাণ দেখা যায় না। প্রকৃত জীবন বর্ত্তমান যুগে অন্য রকমের মন্দিরে দেখিতে পাই। মানবাত্মা এক্ষণে বিজ্ঞান-গৃহে, লাইব্রেরীতে, মিউজিয়ামে, পর্য্যবেক্ষণালয়ে, শিল্প-কারখানায় এবং বিদ্যালয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এই সমুদয় ভবনই বর্ত্তমানযুগের যথার্থ মন্দির। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠান যে সকল স্থানে রহিয়াছে, সেই সমুদয় স্থানই বর্ত্তমান-মানবের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের উৎসাহ, তেজ, শক্তি, ভাবুকতা, জীবনবত্তা এই সকল নূতন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-গঠনে সম্যক্‌ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। দেবতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, স্বর্গনরকতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনায় মানুষ আজকাল সময় কাটাইতে চাহে না। তাহার শক্তি, ভক্তি, বুদ্ধি, সবই এক অভিনব ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহারা এই নূতন ছাঁচে-ঢালা ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা বর্ত্তমান মানবকে অধর্ম্মী বা ধর্ম্মহীন বিবেচনা করিতে পারেন।

ইয়োরামেরিকায়ও এইরূপ দেখিতেছি। বর্ত্তমান ভারতে কি দেখিতে পাই? বর্ত্তমান ভারতবাসী স্বাধীনভাবে জীবনী-শক্তির কোন লক্ষণ দেখাইতে পারিয়াছে কি? ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর ভারত তাহার স্বকীয় সন্তানের কোন গৌরবসূচক কার্য্য বা চিন্তা প্রকটিত করে নাই। বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির নকল আমাদের দেশে কিছু কিছু প্রবর্ত্তিত হইয়াছেমাত্র। নবযুগের অভিনব-ধর্ম্ম ভারতে অল্পমাত্র আমদানি হইয়াছে—ভারতবাসী স্বয়ং কোন জীবনীশক্তির নূতন পরিচয় দিতে পারে নাই। কাজেই আমাদের বিজ্ঞান-মন্দির, শিল্পশালা, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয়, অনুসন্ধান-সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি নিতান্তই অবজ্ঞেয়। দুনিয়ায় ইহাদের কোন প্রভাব নাই। বর্ত্তমান-জগতে আমাদের কোন স্থান নাই।

প্রাকৃতিক-শক্তিপুঞ্জ যেখানে বিশিষ্ট আকারে দেখা দেয়, বর্ত্তমান ইয়োরামেরিকানেরা সেখানে কল, যন্ত্র, কারখানা, হোটেল, পার্ক, স্বাস্থ্যনিবাস ইত্যাদি স্থাপন করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবাসী সেখানে দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিত। বর্ত্তমানযুগের ভারতবাসী সেখানে কি করিবে,

তাহা বলা যায় না, কেন না আধুনিক ভারতের কোন লোক স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে না। যাহাহউক, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবাসীর ধর্ম্মজ্ঞান হইতে "চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য" "জ্বালামুখী-মাহাত্ম্য," "সীতাকুণ্ড-মাহাত্ম্য" ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছিল। যেখানে দুই প্রবল স্রোতস্বতীর সঙ্গমস্থল, সেখানে হিন্দুরা তীর্থরাজ 'প্রয়াগ' স্থাপন করিয়াছিল। যেখানে তরঙ্গায়িত উচ্চভূমির পার্শ্বে গঙ্গা উজান বহিতেছে, সেখানে হিন্দুরা মহাদেবের ত্রিশূলের উপর কাশী স্থাপন করিয়াছিল। নদী, সমুদ্র, পাহাড়, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, প্রাকৃতিক অগ্নিশিখা, স্বাস্থ্যকর স্থান,—ইত্যাদির কোথাও বা হরিদ্বার, কোথাও বা পুরী-দ্বারকা, কোথাও বা দেওঘর, অমরকণ্টক, কাঞ্চী, মথুরা স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষেই হিন্দুর জ্ঞানে, তীর্থস্থান হয় বুদ্ধদেবের সমাধি-স্থান, না হয় আদ্যাশক্তির পীঠস্থান। এই গেল পুরাতন ভারতের কথা।

বর্ত্তমান-যুগের ভারতবাসী এই ধরণের তীর্থস্থান নূতন একটাও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এমন কি, এক্ষণে আমরা প্রাচীন কেন্দ্রসমূহেও প্রকৃত আস্থা-স্থাপন করি না। এদিকে ইয়োরামেরিকান-প্রবর্ত্তিত নব নব তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠায় ও আমরা যৎপরোনাস্তি পশ্চাৎপদ। এই জন্যই বলিতে হয় ভারতবর্ষ মরিয়া গিয়াছে এবং এই মৃত-ভারতে প্রাচীন বা নবীন কোন প্রকার ধর্ম্ম নাই। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ধর্ম্মহীন জাতি ভারতবাসী। গভীরভাবে বুঝিলে দেখিব—বর্ত্তমান ইয়োরোমেরিকায় ধর্ম্মজ্ঞান যথেষ্ঠ প্রবল ;—একমাত্র বর্ত্তমান সুতরাং তথাকথিত মামুলি আধ্যাত্মিতার বড়াই করা ভারতবাসীর পক্ষে ধৃষ্ঠতা মাত্র। যে সমাজে জীবন নাই—সেই সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান-ভারতে প্রাচীন-জীবনের খোলসমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার যথার্থ বেগ ও ধারা নাই। এদিকে নবীন-জীবনের বেগ এবং ধারাও বর্ত্তমান-ভারতে বিশেষ প্রকটিত নয় ; বিদেশ হইতে ইহার সামান্য মাত্র এখানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা অন্য কোন জাতির ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে কি ?

(১০) ভূমিকম্প-বিজ্ঞান

পর্য্যবেক্ষণালয়ের তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই সকল দ্বীপপুঞ্জের পর্ব্বতে শিল্পোপকরণরূপে ব্যবহার-যোগ্য ধাতু পাওয়া যায় কি ?" তিনি উত্তর করিলেন—"নিতান্ত অল্প—এক প্রকার না বলিলেই চলে। আকর খুঁড়িবার খরচ পোষাইবে না। এইজন্য mining, metallurgy ইত্যাদির কারখানা হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে আদৌ নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহা হইলে আপনারা কি একমাত্র আগ্নেয়গিরির লীলা বুঝিবার জন্য এইস্থানে বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন ? Volcano-Research Association, Massachusetts Institute of Tectnology এবং Carnegic Instituteএর পণ্ডিতগণের কার্য্য-বিবরণী ও অনুসন্ধানফল প্রকাশিত হইয়াছে কি ?" তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"আমাদের হস্তে এখনও প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। পৃথিবীর কম্পন-গণনাই বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র কার্য্য।"

এই বলিয়া তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার পর্য্যবেক্ষণালয়ের নিম্নতলস্থ গৃহে লইয়া গেলেন। ভূমিকম্প মাপিবার কয়েকটা ক্ষুদ্র বৃহৎ যন্ত্র এইখানে দেখিতে পাইলাম। যন্ত্রের নাম Scismograph. যন্ত্রগুলি ঘরের লাভা-মেজের সঙ্গে গাঁথা। ভূমির সামান্যমাত্র নড়ন চড়ন হইলেই যন্ত্রদ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"বিগত দুই বৎসরে সর্ব্বসমেত ৭০০বার ভূমিকম্প এই অঞ্চলে হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে আমরা সেইগুলির অধিকাংশই বুঝিতে পারিতাম না।"

ভূমিকম্প-বিজ্ঞানের এক্ষণে শৈশবাবস্থা চলিতেছে। জর্ম্মাণেরা এই বিদ্যায় অগ্রণী। তাঁহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি একজন রুশ-বৈজ্ঞানিক নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে পৃথিবীর কোন্ দিকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বে দিক্ বুঝিতে পারা যাইত না—কেবল দূরত্ব-মাত্র অনুসরণ করা যাইত।

তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"১৯০৫ সালে ভারতের শিমলা-পাহাড়ে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহা টোকিওর পর্য্য-বেক্ষণালয়ে জানিতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা দূরত্বমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন—পৃথিবীর কোন্ দিক্ হইতে তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারেন নাই। এক্ষণে রুশ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহাও পারি।"

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ আছে, একথা সকলেই জানে। তত্ত্বাবধারক বলিলেন—"কিন্তু এই তাপের ফলে ভূগর্ভস্থিত পদার্থসমূহ গলিয়া তরল ভাবে রহিয়াছে, কি শক্ত ভাবেই আছে, তাহা সুনিশ্চিত রূপে বলা কঠিন। এতদিন বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর-স্থিত উষ্ণপদার্থসমূহ দ্রবীভূত। কিন্তু ভূমিকম্পের সময়ে যে প্রণালীতে কম্পন পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়, তাহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল পদার্থ থাকিলে কম্পনের রেখা ও রীতি অন্য ধরণের হইত। এই কারণে কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন—প্রচুর উত্তাপ সত্ত্বেও ভূগর্ভের পদার্থসমূহ দ্রবীভূত হয় নাই।"

যথাসময়ে ফার্ণ-সমাবৃত-পথে জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। হাওয়াই-সন্তানগণ এবং জাপানীরা ষ্টেসনে আত্মীয়-স্বজনকে বিদায় দিতেছে। ফুলের-মালা ব্যবহার করা এদেশে একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দেখিতেছি। জাপানীরা অনেকটা হিন্দু-কায়দায় মাথা ঝুঁকাইয়া লোকজনের অভিবাদন করে। মাদুর, চাটাই, সতরঞ্চি ইত্যাদি বিছাইয়া তৃতীয়-শ্রেণীর জাপানী-আরোহীরা জাহাজের নিম্নতম ডেকে বসিয়া আছে। আমরা ভারতবর্ষে এইরূপেই ষ্টীমারে চলাফেরা করি। তিনচারিঘণ্টা পর্য্যন্ত জাহাজ দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া চলিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। যেন পদ্মার উপর নৌকা চালাইয়া সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করিতেছি।

(১১) চিনির কল

হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা দুইলক্ষ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশের ক্ষুদ্রতম জেলায় ইহার চারিগুণ লোক। গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভূমি, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি অনেকটা এক ধরণের। সুতরাং আশা করা যায়, বঙ্গীয় জেলার ধনসম্পদ শ্রীসমৃদ্ধি চারিগুণ হইবে।

হনলুলু ও হিলো নগরদ্বয় দেখিয়া বিপরীত বোধ হইতেছে। ইয়াঙ্কিস্থানের কোন নগরের সঙ্গে এই দুই নগরের তুলনা চলে না। কিন্তু আধুনিক ভারতের যে কোন নগরের অপেক্ষা এই নগরদ্বয় অধিকতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন মনে হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি কয়েকটা রাজধানীর কথা ছাড়িয়া দিলাম।

দুইলক্ষ নরনারীর ভিতর ত্রিশহাজার বালকবালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই দৃশ্য ভারতবর্ষে দেখিতে পাইব না। স্থানীয় জনগণের আর্থিক-অবস্থা বেশ সচ্ছল। দারিদ্র্য এই সমাজে নাই। চীনা ও জাপানী-জাতীয় লোকের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ - তাহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—স্বদেশে তাহাদের অবস্থা সুখকর ছিল না।

"The Industrial Condition of Women and Girls in Honolulu" নামক পুস্তকে নিউইয়র্কের Frances Blascoer বলিতেছেন :—

Work-rooms are not over-crowded ; the air and light are always good ; there is no high-speed machinery ; no processes dangerous to life and limb are unguarded ; fines and penalties are unknown ; shop-girls work only eight hours a day, have an annual vacation with full-pay for two weeks in most shops and of at least one week in all ; clerks, stenographers and teachers may well feel that they have found here their earthly paradise both as regards hours and salaries."

হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ সুবিশাল প্রশান্ত-মহাসাগরের কেন্দ্র-স্থলে ধূলিকণা মাত্র। কয়েক বৎসরের ভিতর এখানে সকল বিষয়ে যারপরনাই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানের মধ্য-পশ্চিম এবং মহাপশ্চিম জনপদসমূহ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে টেরিটারিমাত্র ছিল। হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ এক্ষণে সেই ধরণের টেরিটারি—কালে পূর্ণাধিকারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, আশা আছে।

হাওয়াইয়ের আদিমবাসিগণের সংখ্যা বর্ত্তমানে অতি অল্প—সমগ্র লোকসংখ্যার চতুর্থাংশ মাত্র। ইহাদের প্রধানত্ব কিছুই নাই—ইহারা ইংরাজী-ভাষাকেই মাতৃভাষা বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে। অন্যান্য সকল বিষয়ে ইহারা খাঁটি ইয়াঙ্কি-আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছে। জাতীয়তা, স্বদেশী, প্রাচীন গৌরবের অভিমান ইত্যাদি মনোভাব হাওয়াই-সন্তানগণের চিত্তে স্থান পায় না। আমেরিকার লোহিতাঙ্গ-ইণ্ডিয়ানদিগের যে অবস্থা, হাওয়াই-সন্তানগণেরও সেই অবস্থা। ইহারা ইয়াঙ্কিদিগকে বিদেশীয় বিজেতা জ্ঞান

করে না—ইয়াঙ্কিরাও হাওয়াই-বাসিগণকে বিজিত জাতি বিবেচনা করে না। ইয়াঙ্কি-সমাজ বিস্তৃত হইতে হইতে প্রশান্ত-মহাসাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। সেই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিমজাতিপুঞ্জ ন্যূনাধিক পরিমাণে ইয়াঙ্কি-সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়াছে। সেইরূপ সম্প্রতি ইয়াঙ্কি-সমাজ হাওয়াই-দ্বীপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—হাওয়াই-সন্তানগণ প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি-নীতি বর্জ্জন করিয়া খৃষ্টান ইয়াঙ্কি-সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং আদর্শের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব, ভাষার দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হাওয়াই-দ্বীপ-পুঞ্জের যত গোলমাল জাপানীদের লইয়া। তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক। খাঁটি হাওয়াই-সন্তান অপেক্ষা জাপানী-ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা বেশী। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ব্যবসায়ে, শিল্পে, সকল বিভাগেই জাপানীরা এখানে উন্নত! ইহারা তাহাদের জাতীয়-ধর্ম্ম, স্বদেশী সভ্যতা ইত্যাদি বর্জ্জন করিতে চাহে না। হাওয়াই দ্বীপ-পুঞ্জকে ইয়াঙ্কি-স্থানের প্রকৃত অঙ্গে পরিণত করিবার পথে জাপানীদের স্বদেশী-আন্দোলনও প্রকাণ্ড অন্তরায়। এই কারণে জাপানীদিগকে কোন উপায়ে এখান হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে ইয়াঙ্কিরা বাঁচিয়া যায়; কিন্তু এই বহিষ্কার সহজসাধ্য নহে।

একজন ভারতীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহার গৃহ সিন্ধুদেশে;—বয়স ১৯।২০ মাত্র। হনলুলু নগরে একটি-মাত্র ভারতীয় বণিকের দোকান আছে। এই যুবক তাহার তত্ত্বাবধায়ক। বিগত সাত বৎসর হইতে সে ভারতবর্ষের বাহিরে আছে। শ্যামদেশের বাঙ্কক নগরে প্রায় পাঁচ বৎসর ছিল। তাহার পর ফিলিপাইন-দ্বীপের ম্যানিলা নগরে কিছু-কাল কাটাইয়াছে। চীন এবং জাপানের কোন কোন নগরও ইহার দেখা আছে। হনলুলুতে এই যুবক দোকানে কার্য্য করে—শ্যাম এবং ফিলিপাইনেও এইরূপ দোকানেই কার্য্য করিত। ব্যবসাদারের সন্তান, অল্প বয়স হইতে ব্যবসায়েই লাগিয়া আছে—দোকানদারী-বুদ্ধি মন্দ নাই। ইহার দোকানে চীনা, জাপানী, ফিলিপিনো, কোরিয়ান, এবং জাভানী পদার্থ রহিয়াছে। ভারতীয় দ্রব্যও দেখিলাম। কিন্তু যুবক বলিল—"ভারতীয় দ্রব্যের কাট্‌তি ইয়াঙ্কি-মহলে অতি অল্প। ইয়াঙ্কিদিগকে তিনচারি দিন বক্তৃতা দ্বারা না বুঝাইলে ইহারা ভারতীয়-পদার্থ ক্রয় করিতে চাহে না। কিন্তু চীনা, জাপানী এবং প্রাচ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থানের জিনিষ ইয়াঙ্কিরা ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র।"

যুবক কয়েকমাস পরে আমেরিকায় দোকান খুলিতে যাইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কত মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করিবে, স্থির করিয়াছ?" যুবক বলিল—"বোধ হয় ১৫০০৲ টাকার বেশী নয়।" আমি বলিলাম—"তোমার থাওয়া-থাকার খরচই ত মাসে পড়িবে প্রায় ৩০০৲।" সে বলিল—"আমি এই কয় বৎসর বাহিরে থাকিয়া ইয়াঙ্কিদের ধরণ-ধারণ বুঝিয়া লইয়াছি। আমি চীন, জাপান, ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, ও ভারতবর্ষ হইতে এমন জিনিষ আমদানি করিব, যাহা বিক্রয় করিবার জন্য একদিনও বসিয়া থাকিতে হইবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দোকান-ভাড়া দিয়া জিনিষ রাখিতে পারিবে কি? বিজ্ঞাপনের জোর তুমি পাইবে কোথা হইতে?" যুবক বলিল—"আমি কোন বিখ্যাত দোকানের একটা আলমারি ও একটা টেবিলমাত্র ভাড়া করিয়া লইব। আমার জিনিষগুলি এত বিচিত্র ও নূতন বোধ হইবে যে, দোকানে যে কোন লোক আসিলেই তাহার দৃষ্টি আমার আলমারির দিকে পড়িবে। কাজেই নিজে দোকান-ভাড়া করিয়া বিজ্ঞাপন-প্রচার করা অপেক্ষা বড় দোকানের একটা কোণ ভাড়া লওয়াই অধিকতর লাভ-জনক। এই উপায়ে তিনচারি মাসের মধ্যেই আমি ১৫০০৲ টাকার মূলধন হইতে প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিতে পারিব।"

এই নগরের Young Mens' Christian Association বেশ ভাল জায়গায় অবস্থিত। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এই প্রতিষ্ঠানের জয়জয়কার। এখানে Y. M. C. A. ভবনে একটা হোটেল আছে। সহরের অন্যান্য হোটেল, রেস্তরাঁ ইত্যাদির নিয়মে এই হোটেল পরিচালিত হয়। কয়েকদিন এখানে আহার করা গেল। হাওয়াইয়ের খাঁটি স্বদেশী-জনগণ সকলেই খৃষ্টান।

অসহ্য গরম পড়িয়াছে—এই কয়দিনে শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে। দিনে ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ্য নাই। বিলাতে ও আমেরিকায় যত খাটিতে পারা গিয়াছে, এখানে তাহার চারিভাগের একভাগও পারা অসম্ভব; এমন কি মাথাধরাও সুরু হইয়াছে। এক বৎসরমাত্র শীতপ্রধান-দেশে থাকিবার ফলেই এই অবস্থা!

আখের চাষ এবং চিনির কারখানা—এই দুই বিষয়ে হাওয়াই প্রসিদ্ধ। এখানকার সংবাদপত্রের ব্যবসায়-বিভাগে এই দুই কারবার সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইয়া থাকে।

একটা চিনির কল দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। মোটর-কারের আশ্রয় লইতে হইল। সহর পার হইয়া সেনানিবাসে উপস্থিত হইলাম। সহরের উচ্চতম স্থানে 'ব্যারাক'গুলি অবস্থিত। ভারতবর্ষে গোরাসৈন্যদের যেমন দেখায়, থাকীপরা ইয়াঙ্কি সৈন্যগণকেও সেইরূপ দেখাইল। ইয়াঙ্কিরা ব্যবসায়ী জাতি ইহাদিগকে রণবেশে সজ্জিত দেখিলে কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের ইংরাজ-সৈন্য দেখিবার পর বিলাত-দেখিলে সেইরূপ বিস্ময়ই মনে জাগে। কারণ বিলাতের জনসাধারণকে দেখিলে নিতান্ত নিরীহ, শান্তশিষ্ট, ভালমানুষ বলিয়া বোধ হয়। একই জাতি ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করে। এমন কি, চেহারার ভিতর বিশেষ কোন প্রকার উগ্রতা বা প্রচণ্ডতা না থাকিলেও বিজিত-জাতি বিজেতা-জাতিকে স্বভাবতই যমদূতের মত ভয় করিয়া চলিতে বাধ্য।

সেনানিবাস অতিক্রম করিয়া মোটর পাহাড়ের অপর দিকে নামিতে লাগিল। সুবিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্র চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। এই সকলের ভিতর দিয়া ছোট ছোট রেলপথ বিস্তৃত। কোন ক্ষেতের ইক্ষুপত্রগুলিতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে; পাতাগুলি জ্বলিয়া গেলে দণ্ড-সমূহ সংগ্রহ করা হইবে। কোথাও বা রেলগাড়ীর উপর ইক্ষু-দণ্ডগুলি বোঝাই করা হইতেছে। এই অঞ্চলে বর্ষার জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; এইজন্য জলাভাব হয় না। কিন্তু অন্য প্রদেশে বৃষ্টি অল্প; সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জল তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আখের চাষ সম্বন্ধে কর্ম্মকর্ত্তারা বিশেষ উন্নত প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। ইক্ষুদণ্ডগুলি যাহাতে সতেজ, স্বাস্থ্যপূর্ণ ও ব্যাধিহীনরূপে গড়িয়া উঠে, তাহার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যত্নবান। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ইক্ষু-ক্ষেত্রের মালিকেরা হনলুলুতে একটা 'Experimental Station' স্থাপন করিয়াছেন।

খানিকক্ষণ পরে চিনির কারখানায় উপস্থিত হইলাম। সহর হইতে শুনিয়া আসিয়াছিলাম, কারখানা দেখাইতে কর্ত্তাদের আপত্তি নাই। এই কারখানার এঞ্জিনিয়ার ও তত্ত্বাবধায়ক চিনি-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তিনি বহুদিন হইতে এই কার্য্যে লাগিয়া আছেন। বীট হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জর্ম্মাণ-রীতিও তাঁহার জানা আছে।

চিনির কল

তত্ত্বাবধায়ক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের কি করা হয়?" যত জায়গায় কলকারখানা দেখিতে গিয়াছি, প্রত্যেক জায়গারই ম্যানেজার বা কর্ম্মকর্ত্তা সর্ব্ব-প্রথম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই কারবার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কতটা, এবং এখানকার কাজকর্ম্ম দেখিয়া আমি নিজে লাভবান্ হইবার কৌশল খুঁজিতেছি কি না—ইহা জানাই কর্ত্তাদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ব্যবসায়েই 'trade-secret' বা গুপ্ত-বিদ্যা আছে। সেইগুলি আগন্তুকমাত্রকেই বলিয়া দিতে কেহই ইচ্ছুক নন। কাজেই দর্শকগণের ব্যবসায়, কাজকর্ম্ম ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্বন্ধে সংবাদ লওয়া ম্যানেজার-দিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে ইঁহাদের দায়িত্ব-স্খলন হইবে।

ওস্তাদ মহাশয়কে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম—আমি নেহাৎ "টুরিষ্ট"মাত্র—ঘুরিয়া ফিরিয়া সময় কাটাইতেছি। কোন শিল্প বা ব্যবসায়ের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই। চিনির কল কেন, কোন কল বা যন্ত্রের কোন তত্ত্বই জানি না। নিরক্ষর ব্যক্তির মিউজিয়াম দেখা, আর আমার পক্ষে কলকারখানা দেখা, একই শ্রেণীর অন্তর্গত। তত্ত্বাবধায়ক আশ্বস্ত হইয়া কারখানা দেখাইতে বাহির হইলেন। অবশ্য জানাই আছে যে,—কারখানার

সকল স্থান এবং সকল কার্য্যপ্রণালী ইনি কোনমতেই দেখাইবেন না। যেগুলি সকলেই জানে এবং যেগুলি নূতন লোকে জানিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হইবে না—ইনি কেবলমাত্র সেইগুলিই দেখাইবেন। অন্যান্য কলকারখানা দেখিতে যাইয়া এইরূপ অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছি।

একটিগৃহে দেখিলাম গাড়ী হইতে ইক্ষুদণ্ডগুলি নামান হইতেছে,—কোন লোক নাই উপরে বিচিত্র কপিকলের সাহায্যে এগুলি গাড়ী হইতে নিয়ে ফেলা হইতেছে। দণ্ডগুলি যেখানে পড়িতেছে, সেইখানে বেশীক্ষণ থাকিতেছে না; কারণ তাহা সর্ব্বদা চলিতেছে—ইক্ষুদণ্ডসমূহ তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। কিয়দ্দূরে যাইয়া এগুলি কলে কাটা হইয়া যাইতেছে। তাহার খানিকপরে এই গুলি পেষা হইতেছে। প্রথম পেষা, দ্বিতীয় পেষা ও তৃতীয় পেষা সম্পূর্ণ করিবার কলও পরপর বসান আছে; সঙ্গে সঙ্গে আখের রস সংগ্রহ করিবার জন্য নদ্দমা ও চৌবাচ্চা যথাস্থানে লাগান রহিয়াছে। কাজেই ইক্ষুদণ্ড-গুলি নামান হইতে আরম্ভ করিয়া রস জমাইয়া রাখা পর্য্যন্ত কোন স্তরেই মানুষের পরিশ্রম আবশ্যক হয় না। অল্পসময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক ইক্ষুদণ্ড পেষা হইয়া যাইতেছে। এমন ভাবে নিংড়াইয়া রস বাহির করা হয় যে, এক ফোঁটা রস পর্য্যন্ত ছোবড়ার ভিতর থাকে না। ছোবড়াগুলিতে হাত দিয়া দেখিলাম, যেন রৌদ্রতপ্ত করাতের-গুঁড়ি হাতে লইয়াছি। ছোবড়াগুলি ফেলিবার জন্যও কোন শ্রমজীবীর প্রয়োজন নাই। কলের সাহায্যে আপনা-আপনিই এগুলি যথাস্থানে পাঠান হইতেছে। শুনিলাম এই ছোবড়া এঞ্জিনে জ্বালান হইয়া থাকে।

রস প্রস্তুত করা হইয়া গেলে পর, ছাঁকিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই জন্য চুণের ভাটি এবং জীবজন্তুর দগ্ধ-অস্থিপূর্ণ ভাটির ভিতর রস চালান করা হইয়া থাকে। এই ভাটিগুলির ভিতর দিয়া আসিলে রস পরিষ্কার হইয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—"কি মহাশয়, আপনারা ভারতবর্ষে ত হাড়ের কয়লায় ফিল্টারকরা চিনির বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন করিয়াছেন? আন্দোলন কতদূর অগ্রসর হইল?"

এইবার কতকগুলি হাঁড়ি দেখিলাম—কলে ঘুরিতেছে। তাহার ভিতর শ্বেতবর্ণ চিনি জমা হইতেছে। এই চিনি চতুষ্কোণ পিণ্ডের আকারে অথবা চূর্ণিত আকারে বাজারে পাঠান হয়। একটা কলে দেখিলাম যথানির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল বস্তার ভিতর ভরা হইতেছে—বস্তার মুখ শেলাই করিবার জন্যও কল আছে। তাহার পর এই বস্তাগুলি গুদামঘরে পাঠাইবার জন্য আর একটা কল দেখা গেল।

সমস্ত কারখানার ভিতর মাত্র ৮০ জন লোক কর্ম্ম করে। জাপানীদের সংখ্যা বেশী দেখিলাম। ফিলিপিনো এবং হাওয়াই সন্তান কয়েকজন মাত্র। এই কলের কাজ বৎসরে সাতমাস হয়, পাঁচমাস বন্ধ থাকে। মালিকদিগের নিজ ভূমিতেই ইক্ষুদণ্ডের চাষ হয়। আবাদে ২০০০ লোক খাটে। মালিকেরা সকলেই ইয়াঙ্কি—স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো-নগরে ইঁহাদের বড় আফিস। তত্ত্বাবধায়ক জর্ম্মাণ—তাঁহার সহকারী ফরাসী।

হাওয়াই সাগরের রঙ্গিন মাছ

হাওয়াই-অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগর নানাজাতীয় মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। এবারকার বিশ্বমেলায় হাওয়াই-ভবনে বিচিত্র রামধনুবর্ণ সমন্বিত মৎস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শুনিলাম প্রত্যেক জাহাজে হনলুলু হইতে স্যানফ্র্যান্‌সিস্কোয় মাছ চালান করা হয়।

হাওয়াই সন্তানগণ বেশ পাকা জেলে। ইহাদের মাছ-ধরিবার রীতি আদিম ধরণের। ভারতীয় ধীবরগণের জালবুনা ও জালফেলা এইরূপই। আজকাল জাপানীরা মাছের ব্যবসায় হইতে হাওয়াই-সন্তানগণকে হটাইয়া দিতেছে। বিদেশীয় ঔপনিবেশিকগণ হাওয়াই-বাসীদিগের "ভাত মারিতেছে।" এই নিমিত্ত একটা "দেশী-বিদেশী"

সমস্যা এখানে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। ইয়াঙ্কিরা জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিয়া চীনা-ঔপনিবেশিক চায়। এশিয়া-বাসিগণের মধ্যে চীনারা আজকাল ইয়াঙ্কিদের "সুয়োরাণী," জাপানীরা "দুয়ো"—আর ভারতবাসীরা নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল !

হাওয়াই-সাগরের রঙ্গিন মাছ

হনলুলুতে মাছ-ধরিবার জন্য বহু শ্বেতাঙ্গ আসিয়া থাকে। ছিপ্ দিয়া মাছধরা, জালে মাছধরা, নৌকাবক্ষ বা জাহাজবক্ষ হইতে বন্দুকের গুলি করা ইহাদের বিশেষ সখ। পাশ্চাত্য দেশে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ এবং ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে মাছধরা উন্নত স্থান অধিকার করে। মাছ-শিকারীরা অন্যান্য শিকারী ও খেলোয়াড়দের ন্যায় সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

হনলুলুতে একটা Aquarium (জলভবন বা মৎস্য-ভবন) আছে। নিউইয়র্কেও এইরূপ একটা দেখিয়াছি। তাহাকেও জলজন্তুর সংগ্রহালয় বলা চলে। এখানে সে বিরাট ব্যবস্থা নাই, কেবলমাত্র হাওয়াই-সাগরের নানাবর্ণে চিত্রিত নানারূপী মৎস্যের নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রায় ৪০০ জাতীয় রঙ্গিন মাছ দেখিলাম। অনেক জাতিই মানুষের খাদ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের ধীবর

(১২) পলিনেশিয়া ও ভারতবর্ষ

হাওয়াই-সন্তানগণ এক্ষণে সকল বিষয়ে ইয়োরামেরিকান-সমাজের অন্তর্গত। তাহাদের প্রাচীন বেশভূষা, রীতিনীতি, ধর্ম্ম, ভাষা, আহারবিহার সবই লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন-জীবনের পারম্পর্য্য-রক্ষা করিবার জন্যও কোন আগ্রহ নাই। সুতরাং হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া খাঁটি স্বদেশী ; অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বুঝিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। একটা অর্দ্ধসভ্য অথবা অসভ্য-জাতি উন্নত-জাতির সংস্পর্শে
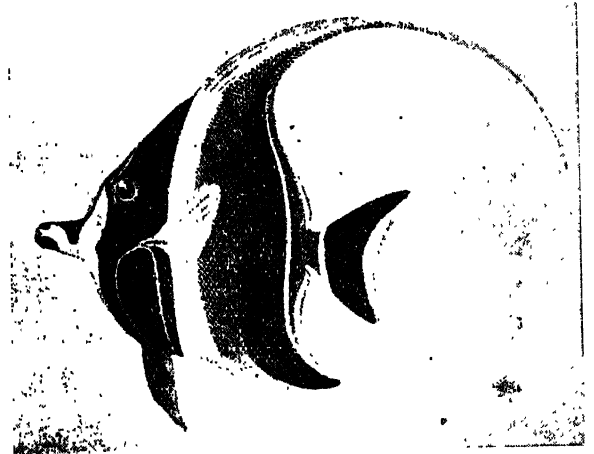
হাওয়াই-সাগরের রঙ্গিন মাছ

থাকিয়া কি উপায়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, একমাত্র তাহা লক্ষ্য করাই আবশ্যক। পর্য্যটকেরা সাধারণতঃ আর কিছু দেখেন না।

তবে এই-সকল দ্বীপে অনেক প্রকার তথ্য অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান অথবা মানব-

বিজ্ঞানের সেবক, তাঁহারা এই সমুদয় জনপদে বহুবিধ মূল্যবান্ তথ্য পাইবেন। প্রথমতঃ, ভৌগোলিক-অবস্থান, ঋতু-পরিবর্ত্তন, সমুদ্রের স্রোত, বায়ুর গতি, ইত্যাদি লক্ষ্য করিবার একটা প্রধান স্থানরূপে এই সকল দেশ আদৃত

অক্টোপাশ মাছ

হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বিচিত্র ভূমি, ধাতু, মৃত্তিকা, প্রবাল ইত্যাদির পরিচয় পাইবার জন্য ভূতত্ত্ববিদেরা দ্বীপসমূহে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপ-সমূহের সঙ্গে এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ের কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিবার সুযোগ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ ভারত-মহাসাগর ও প্রশান্ত-মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থ অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম মাত্র। এই-গুলি এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে সোপানস্বরূপ। এই কথা বুঝিতে পারিলে জীব-জগতের গতিবিধি নিরূপণ সম্বন্ধেও অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ ও জন্তু এই সকল দেশে বৈজ্ঞানিকগণের চোখে পড়ে। এই সমুদয় দেখিলে পৃথিবীর প্রাণিমণ্ডলের ক্রমবিকাশ ও ধারা বুঝিবার পথ পরিষ্কার হয়। চতুর্থতঃ, দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন নরনারীদিগের আকৃতি, শারীরিক গঠন, ভাষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম. সমাজ-পরিচালনা, রাষ্ট্র-শাসন, শিল্পকার্য্য, নৌচালন, কৃষি ইত্যাদি আলোচনা করিলে আদিম-যুগের মানবসম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই কারণে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ (anthropologists) এই সকল স্থানকে নিজেদের ল্যাবরেটরী বিবেচনা করেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ মালয়েনিয়া, মাই-ক্রনেশিয়া, অষ্ট্রেলেশিয়া, ও পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে প্রায়ই পর্য্যটন করিতে আসেন। এই চারিটি দ্বীপপুঞ্জের সমবেত-নাম ওশিয়ানিয়া (Oceanea). হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ পলিনে-শিয়া-পুঞ্জের অন্তর্গত।

এই দ্বীপগুলি ইংরাজ, ওলন্দাজ, ইয়াঙ্কি, জর্ম্মাণ, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ-রাষ্ট্রসমূহের অধীন। আমেরিকায় লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানদিগের যে অবস্থা, এই সকল দ্বীপের আদিমবাসি-গণের অবস্থাও সেইরূপ। ইহাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও জীবন-প্রবাহের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র ইয়োরামেরিকান-সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইতেছে। এই সমুদয়ের কোথাও স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয়তার প্রচেষ্টা, বিদ্রোহ, sedi-tion, ইত্যাদি দেখা দেয় না। তবে প্রভুগণের ভিতর পরস্পর বিরোধ থাকার ফলে স্থানীয় জনগণের মাঝে মাঝে ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি কয়েকটা দ্বীপের অবস্থা কিছু স্বতন্ত্র। এই স্থানের জনগণ প্রাচীন-সভ্যতার নিদর্শন এখনও বহন করে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সমুদয় জনপদের নরনারীদিগকে তাঁহাদের পরীক্ষার বস্তুমাত্র বিবেচনা করেন। ইহাদের প্রাচীন জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কৌতূহল

হাওয়াই-সন্তানগণের স্বদেশী খাদ্য

অত্যধিক ; কারণ প্রাচীন-জীবনের নিদর্শন শীঘ্রই বর্ত্তমান খৃষ্টীয়-সভ্যতার প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে আদিম ও অসভ্য এবং অৰ্দ্ধসভ্য মানবের পরিচয় জগতের কোথাও পাওয়া যাইবে না।

হুলাহুলি নাচ

এই সকল দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। হনলুলুতেও একটা আছে, ইহার নাম Museum of Polynesian Ethnology and Natural History. এই সংগ্রহালয়ে কয়েকঘণ্টা কাটান গেল। প্রধানতঃ হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ, এবং গৌণভাবে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের জীবজন্তু, উদ্ভিদ্, ধাতু, ধর্ম্মজীবন, কৃষিকার্য্য, যুদ্ধসজ্জা, বেশভূষা, ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

'মিউজিয়ামের' তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলাপ হইল ; নাম ব্রিগহাম। ইনি পঞ্চাশ বৎসর হইতে পলিনেশিয়ার নৃতত্ত্ব, লোকসাহিত্য, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা করিতেছেন। ইনি হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাধ্যাপক য়্যাগাসিজের ছাত্র ছিলেন। য়্যাগাসিজ যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক-অভিযানে বাহির হন, ইনি তখন পলিনেশিয়ায় আসেন। প্রথমতঃ Geology ও Botany বিষয়ে ইহার অনুসন্ধান চালিত হইয়াছিল। Natural History হইতে ক্রমশঃ Anthropologyতে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। ইনি কয়েকবার পৃথিবীর সংগ্রহালয়-সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি একবার জগৎ-ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম 'Report of a Journey around the World to study matters relating to Museums : 1912.'

হনলুলুতে একটা ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-সমিতি আছে। তাহার নাম Hawaiian Historical Society. এই সমিতির একজন কর্ম্মকর্তার সঙ্গে আলাপ হইল। নাম ওয়েষ্টারভেল্ট। ইনি একজন পাদ্রী ; বহুকালাবধি পলিনেশিয়ার লোক-সাহিত্য আলোচনা করিতেছেন। ইঁহার বিশ্বাস, প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মমতের সঙ্গে পলিনেশিয়ার ধর্ম্মমতের সংযোগ আছে। "Legends of Mani—a Demigod of Polynesia" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়েষ্টারভেল্ট বলিতেছেন :—

"Several hints of Hindoo-connection are found in the Mani legends. The Polynesians not only ascribed human-attributes to all animal-life with which they were acquainted, but also carried the idea of an alligator or dragon with them, wherever they went.

"The Polynesians also had the idea of a double-soul inhabiting the body. This is carried out in the ghost-legends more fully than in Mani stories, and yet "the spirit separate from the spirit which never forsakes man," according to Polynesian ideas, was a part of the Mani birth-legends. This spirit, which can be separated or charmed away from the body by incantations, was called the "hau." * * *

"How much these things aid in proving a Hindoo or rather Indian origin for the Poly-

nesians is uncertain, but at least they are of interest along the lines of race-origin."

পলিনেশিয়ায় সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। তাহার মধ্যে এক মত অনুসারে উত্তর-ভারতের জাতিপুঞ্জ এই দ্বীপপুঞ্জের জনগণের পূর্ব্বপুরুষ। ভারতবর্ষে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সেই সকল জাতীয় লোক ব্রহ্মদেশ, মালয় ইত্যাদি স্থান অতিক্রম করিয়া Indonesia বা ভারতীয়-দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করে। তাহার পর পলিনেশিয়ায় আগমন হয়। হনলুলুর ঐতিহাসিক-পরিষদের এক সভায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ W. D. Alexander L. L. D একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে পলিনেশিয়ার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের নাম 'The Origin of the Polynesian Race' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"The late J. R. Logan, the historian Fornander, Mr. S. Percy Smith and others who have made a special study of the subject, agree in the opinion, that the remote ancestors of these people emigrated from Nothern India before it was invaded by the Aryan-race. This opinion is founded on resemblances in physical appearances and customs between them and the aborigines of that region, such as the Todas Bhotiyas and other hill-tribes. The evidence of language, however, is entirely wanting.

"Mr. Logan's view was as follows :—A Survey of the character and distribution of the Gangetic, Ultra-Indian and Polynesian people renders it certain that the same Himalayo-Polynesian race was at one time spread over the Gangetic basin and Ultra-India."

উত্তর ভারত হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন —সেখান হইতে পলিনেশিয়ায় বসতি বিস্তার। এই সোপান বা ধারার সাক্ষ্যস্বরূপ Alexander দেখাইতেছেন :—

"It is certain that, it was from Indonesia that the principal food-plants of the Pacific, the bread-fruit, the banana, the taro, the ohia or jambo, sugar cane etc. were brought by the early emigrants."

লেখকের মতে যবদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে এখান হইতে পলিনেশিয়ান-জাতি হাওয়াই-অঞ্চলে আসিয়াছে। এইজন্য হাওয়াই সন্তানগণের ভাষায় সংস্কৃতের কোন প্রভাব নাই। এই অঞ্চলে বাস করিবার সময়েই হয় ত তাহারা নৌচালন-বিদ্যা শিখিয়াছিল :—

"It was probably during their long stay in the East-Indian Archipelago that the ancestors of the Polynesians developed that skill in navigation and fondness for maritime adventure, that have characterised them ever since."

দ্বীপান্তর

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

কি করিবে ? বেচারার অদৃষ্টে ছিল, তাই এমনটা ঘটিল। পুলিশের কাছে রামু কেবল বলিল যে, সে নির্দ্দোষী। পুলিশ কেন,-কেহই সে কথা বিশ্বাস করিল না।

অন্ধকার রাত্রি-রামু একা যাইতেছিল। এমন সময়ে পথ-পার্শ্বের একটা ঘর হইতে কার গোঁয়ানি শুনিতে পাইয়া প্রথমটা সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া খানিকক্ষণ শুনিল; দেখিল যে সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ থামেও না, কমেও না। রামু সে বাড়ীর কড়া নাড়িয়া একবার শব্দ করিল, কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না; দ্বিতীয়বার কড়া নাড়িল, তবুও সাড়া নাই। পাড়া নিশুতি—কাহাকেই বা সে ডাকে, কি করে, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া রামু সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুয়ার খোলাই ছিল।

উঠানে দাঁড়াইয়া "কে আছ গো" "কে আছ গো" বলিয়া দুই তিনবার সে ডাকিল—তবুও কেহই উত্তর দিল না। অথচ ঘরে সেই গোঁ গোঁ শব্দ। একে অপরিচিত জায়গা, অজানা বাড়ী, এই দু'পুর রাত্রি,—রামুর গা'টা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হঠিবার পাত্র নয়। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কিছুই দেখা যায় না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রামুর গায়ে একটা পিরাণ ছিল—তার পকেটে দিয়াশলাই ছিল। দিয়াশলাই জ্বালিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তবুও কম্পিত-হস্তে কাঠি জ্বালিয়া সে একটি কেরোসিনের ডিবি খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিল।

রামু দেখিল—তক্তাপোষে একজন পুরুষ তিন চারি টুক্‌রা করিয়া কাটা। রক্তে বিছানা, ঘর সব লাল। মৃতের মুখ বিকৃত, চিনিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। মেঝেয় একটি যুবতী হাত-পা-মুখ সব বাঁধা—কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। তৈজসপত্রাদি সমস্ত এলোমেলো, বিধ্বস্ত, চারিদিকে ছড়ান। কাঠের একটি বড় সিন্দুক আছে, সেটাও ভাঙ্গা।

রামুর আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। ডাকাতেরাই রমণীকে এইরূপ বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে এবং অনুমানে বুঝিল যে হতব্যক্তিই গৃহ-কর্ত্তা—এই রমণীর স্বামী।

রামু সর্ব্বপ্রথম যুবতীর বন্ধনমুক্ত করিয়া, বাহির হইতে জল আনিয়া, জলের ছিটা দিয়া, তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিল। রমণী সুস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সেই শব্দে পাড়া-পড়শী সকলেই আসিতে আরম্ভ করিল। "ডাকাত, ডাকাত, খুন্ খুন" শব্দে অদূরবর্ত্তি ফাঁড়ি হইতে পুলিশও আসিয়া হাজির। এই অসময়ে অপরিচিত জন-সঙ্ঘের ভিতরে এই ডাকাতী ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়িয়া রামচন্দ্র একবারে হতভম্ব হইয়া গেল।

এই পলায়নে-অক্ষম অপরিচিত ব্যক্তিই যে পলায়িত দস্যুদলের একজন-ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না, পুলিশের জমাদার-সাহেবেরও না। তখন সকলেই অকাল-নিদ্রাভঙ্গের রাগটা রামুর পৃষ্ঠের উপর কতকটা মিটাইয়া লইল—হিন্দুস্থানী জমাদার-সাহেবও ভাঙ্গা বাংলায় তাঁহার বাংলা-জ্ঞানের বাছাই নমুনাগুলি রামুর উপর প্রয়োগ করিয়া মুখে খানিকটা "খৈঁনী" পুরিয়া দিলেন।

প্রহারে, গালিতে, অপ্রত্যাশিত আকস্মিক এই বিপদে, বিড়ম্বনায় রামুর মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়া পড়িল। ততক্ষণে চৌবেজী-সিপাহী একনিঃশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ফাঁড়ি হইতে হাতকড়ি লইয়া আসিল।

রামু মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়াইয়া দিল; তাহার পর তাহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়া থানায় উঠিল। শেষে হাজত-ঘরে ঢুকিতেও দ্বিধা করিল না।

হাজতের এক ক্ষুদ্র কক্ষে, কত কত দিনের কত কত দোষী-নির্দ্দোষীর সুগভীর মর্ম্মতাপের বদ্ধ-বাতাসে রামুর

যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। সে তাহার নিজের অবস্থার আলোচনা করিতে চায়, কিন্তু তাহার কোন সূত্রই পায় না। রামু ভাবিল কি ঘোর দুঃস্বপ্ন! "দুঃস্বপ্নে ঘরে গোবিন্দ" বলিয়া চক্ষু মুছিল—চারিদিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল যে, এ স্বপ্ন নয়—কঠোর সত্য। সে আর থাকিতে পারিল না, শিশুর মত গুমরিয়া গুমরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া যে কোনও ফল নাই, তাহাও সে বুঝিল—তথাপি সে এ জলস্রোতকে বাধা দিতে পারিল না।

সে যে নিরপরাধ, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে আসিয়া এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে—একথা কেহই শুনিল না। কারণ একে সে অপরিচিত, তাহাতে ঘটনাস্থলে ধৃত;—অথচ এত রাত্রে সে যে এখানে কি করিয়া আসিল, ইহারও কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ সে দিতে পারে না।

নিঃসহায় রামচন্দ্র আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া—বিধিলিপিতেই অগত্যা নির্ভর করিয়া রহিতে চাহিল। কিন্তু তাহা পারে কৈ? তাহার সমস্ত চিত্ত শতমুখে নীরব নিবেদন করিতেছে—'ওগো আমি যে নিরপরাধ! আমাকে বিশ্বাস কর'। সে যে নিরপরাধ, এই অবিশ্বাস্য কথাটিকে অবাধ অশ্রুজল ভিজাইয়া ভিজাইয়া কেবল ভারিই করিয়া তুলিল।

রামচন্দ্র শুনিল, রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে এজাহার দিল—সাত আটজন লোক এসেছিল;—এ ব্যক্তিও তাহাদের মধ্যে একজন।

রামুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডাকাতি হইয়াছে মাঝেরগ্রামে। এখান হইতে চন্দ্রপুর বার-ক্রোশ দক্ষিণে। চন্দ্রপুরে রামুর বাড়ী। বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও একটি চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক পুত্র—কিশোর। এই দুইটি প্রাণী লইয়াই রামুর সংসার।

রামু লোকটার স্বভাব ছিল খুব অদ্ভুত। মুখটা বড়ই আল্‌গা ও কর্কশ; সামান্য কারণেই সে চটিয়া উঠিত; কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কহিত না; নিজেও কাহারও গৃহে যেমন বিনা কারণে যাইত না, তেমনই নিজগৃহেও কাহাকে সে অকারণ ডাকিত না। রামু এদিকে স্বল্পভাষী, কিন্তু 'কুকথায় পঞ্চমুখ'কেও হার মানাইয়া দিত।

এককালে রামুর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তাহার উঠানে, খামারবাড়ীতে কিছু কম হইলেও বিশত্রিশটা গোলা ও মরাই থাকিত; পনর-খানা লাঙ্গলের চাষ ছিল—কত লোক তার চাকরী করিত। আজ তার "তেহি নো দিবসা গতাঃ!" জমিদারের সঙ্গে এক মাম্‌লা বাধাইয়া তুলিয়া—মারপিট করিয়া—শেষে পণ করিয়া বসিল, থড়্‌কেগাছি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও সে মকদ্দমা চালাইবে। ঘটিলও তাই। দুইতিন বৎসরে মকদ্দমা যখন মিটিল—তখন রামুর হুঁস্ হইল; দেখিল তাহার আর কিছুই নাই। বিচারালয়ের পাণ্ডাদের অবশিষ্ট-প্রসাদ যেটুকু আছে, তাহাতে কোনও মতে কষ্টেসৃষ্টে তাহার দুইবেলা দুইমুষ্টি অন্ন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু রামু তাহাতে দুঃখিত বা চিন্তিত হইয়াছিল বলিয়া ত বোধ হয় নাই—কারণ সে বুক-ঠুকিয়া একটু হাসিয়া বলিত—"মকদ্দমা ত জিতেছি!" এ দশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

জমিদারকে যে চাষা মকদ্দমায় হারাইতে পারে, গ্রামে যে তাহার কি প্রতিপত্তি হয়, তাহা বলা শক্ত; অর্থাৎ যদি কখনও বঙ্গীয় চষ্য বংশ তাহাদের স্বজাতির ইতিহাস রচনা করে, তাহা হইলে রামচন্দ্রকে যে তাহারা গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি বীরবর্গের সহিত এক-আসন দিবেই—একথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি।

উক্ত কারণে এবং তাহার খামখেয়ালী-মেজাজের দরুণ গ্রামের সকলেই রামুকে একটু ভয় করিত। কাজেই রামচন্দ্র মণ্ডলের প্রতিপত্তিও ছিল অপ্রতিহত।

রামুর অবস্থা যখন বেশ চল্‌তি ছিল, তখন সে লোককে বিনা-সুদে টাকা দিত; তখন দিন গেলে কোন্ না দশবিশ-খানা পাতাও পড়িত; তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণবাড়ীতে সিধা, ঠাকুর-বাড়ীতে ভোগ, কালীবাড়ীতে পূজা, এ ত প্রায়ই সে পাঠাইত। আর তখন মেজাজটাও এত খারাপ ছিল না। মুখে হাসিও ছিল। আজকাল রামু বাড়ীতেও খুব অল্প কথা কয়; অবসর পাইলেই সে খামারবাড়ীর চালায়, তাল-পাতার বুনানি একখানি চাটাইয়ে বসিয়া তামাক খায়। মুখখানা চব্বিশঘণ্টাই গম্ভীর। মুখ ফুটিয়া সে রাস্তার লোককে একবারও বলে না—"ওগো, একবার এসে এই

তৈরি তামাকটা খেয়ে যাও।" যদি কোনও লোক কখনও স্বেচ্ছায় তাহার নিকট তামাক খাইতে আসিত, তাহা হইলে সে তাহাকে একটু মিষ্টমুখ না করাইয়াও ছাড়িত না। তাহার অনুরোধে এমনি একটা আদেশ থাকিত যে, যে আসিত, তাহাকে ভরাপেটে মুখের পান ফেলিয়াও একখানা বাতাসা ও একটু জল খাইতেই হইত।

গ্রামের বয়স্ক-লোকে রামুকে যেমন ভয় করিত এবং তাহার প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিত, ছোট ছোট ছেলেরা তেমনই তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত। পাঁচ ছয় সাত আট দশ বৎসরবয়স্ক ছেলেমেয়েরা মোড়ল-মহাশয়কে দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। সারাদিনই অন্ততঃ দু'টি তিনটি ছেলে রামুর সহচর থাকিতই। মাসের অর্দ্ধেক দিন তাহাদের মোড়ল-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাকিত—পূজা-পার্ব্বণে কোন সামগ্রী বা দুই-একটা পয়সা তাহারা সকলেই পাইত। ইহাদের সঙ্গে রামু হাসিত, খেলিত, এবং সময়ে সময়ে কোনও বালকের অদ্ভুত আব্দার পূর্ণ করিতে কচি পেয়ারাটি পাড়িয়া দিবার জন্য গাছে পর্য্যন্ত উঠিত।

সংসারে এত টানাটানি, অথচ পাঁচপরের ছেলেদিগের জন্য অর্থের অপব্যয়হেতু মোড়ল-গৃহিণী যদি কখনও তাহার স্বামীকে কিছু বলিত—ত' রামু বিরক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া কেবল শুনিয়া যাইত; বিরক্ত হইলে মুখ খিঁচাইয়া পত্নীকে বুঝাইয়া দিত যে, রামু তাহার শ্বশুরের পয়সা খরচ করিতেছে না।

সময় যখন যাহার মন্দ পড়ে, তখন সে ভাল করিলেও ভাল হয় না। রামুকে যে-সব ছেলেরা ভালবাসিত, রামুর কাছে যাওয়া আসা করিত—তাহাদের পিতামাতা অভিভাবকগণ তাহাদিগকে এজন্য নানারূপে নিগৃহীত করিত। রামুর উদ্দেশেও বলিত—"হতভাগা বুড়ো ডাক্‌রা, সব্বারই সর্ব্বনাশ করবে—আবার ছেলে-ভুলিয়ে সাধু সাজতে যায়?"

বছরদুই আগে যে মদনা গোয়ালার সঙ্গে বচসাসূত্রে তাহার এক-ক্ষেত কলাই রামু নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার গরু দিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিল—এবার বর্ষায় তাহার খড়ে-ঘরখানি পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া রামু যে নিজব্যয়ে ঘরখানি উঠাইয়া দিয়াছে, ইহাতেও লোকে রামুকে গালি দিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল—"ঘাটে-পড়া মড়ার ঠাট্ দেখে বাঁচি না। ম'লে যে গাঁয়ের আপদ যায়!"

লোকের মুখে কি হাত দেওয়া যায়? লোকে যাহাই বলুক্ না কেন, ইতিহাস কিন্তু শ্রীমান্ রামচন্দ্র মণ্ডলকে পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষের অধিক পুরাতন বলিয়া স্বীকার করেন না। তবে অল্পবয়সেই তাহার মাথায় বৃদ্ধত্বের ছাপটা পড়িয়া গিয়াছিল, এই যা'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামু গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার নাম করিয়া মাঝেরগাঁয়ে গিয়া ডাকাতি করিয়াছে, খুন করিয়াছে, এ খবর দেখিতে দেখিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমটা সকলেই বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেল;—ক্রমে ক্রমে সকলের মুখেই একটা হিংসকের বিজয়-তৃপ্তির আনন্দজ্যোতিঃ ফুটিতে লাগিল। রামুর দ্বারা যে এ প্রকার কার্য্য হইতে পারে, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিল; —যে দুই চারিজন অবিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারাও মুখ-ফুটিয়া সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

রামুর গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহার পত্নী বুক্-চাপড়াইয়া, মাথা-খুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিয়া ফেলিল। চন্দ্রপুর গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নয়—কিন্তু মোড়ল-পরিবারের এমন বিপদের দিনে আন্তরিক সহানুভূতি কেহই দেখাইল না। অনেকেই আসিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই সান্ত্বনার বদলে গায়ের ঝালই ঝাড়িয়া গেল; বহুদিনের চাপা-কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া বাঁচিল। "রামুর ফাঁসি এবার নিশ্চিত" "এত অত্যাচার কি সয়?" "পাপের কি সাজা নেই?" "ধর্ম্ম যদি না থাক্‌বে ত সংসারটা চল্‌চে কি করে?" প্রভৃতি শ্লেষে, ব্যঙ্গে, টিট্‌কারি-রঙ্গে এই নিরুপায়, আর্ত্ত, বিপন্ন মাতাপুত্র শোকের অপেক্ষা শঙ্কাতেই অধিক কাতর হইয়া পড়িল।

ঘটনার পর তৃতীয়দিন দ্বিপ্রহরে জেলা হইতে সদল-বলে পুলিশ-সাহেব চন্দ্রপুরে তদন্তে আসিলেন। রামুর গৃহে খানাতল্লাসী হইল। কতকগুলি উলুখড়কাটা দা', পাঁটাকাটা খাঁড়া, মাটিখোঁড়ার শাবল প্রভৃতি ডাকাতির সহায়ক অস্ত্র সন্দেহ করিয়া তাঁহারা লইয়া গেলেন—আর এমন করিয়া বাড়ীখানি এলোমেলো করিয়া দিয়া গেলেন যে, ডাকাতেরাও সেরূপ করে না। রামুর পত্নী ও পুত্র কনেষ্ট-বল হইতে পুলিশ-সাহেবের পর্য্যন্ত পদলুণ্ঠিত হইয়া কত

কাঁদিল, কত কাকুতি-মিনতি করিল—কিন্তু কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। কেবল নূতন পুলিশ-সাহেবই একবার কহিলেন—"হামি কি কর্‌বে মাঙ্গি, হামি সরকারী নোকর। মাট্‌ রোও টুম্‌—আডালট্‌মে যো হোগা—ওই হোবে। আবি মাট্‌ ডরো।"

গ্রামের সাতকড়ি বিশ্বাস, তিনু চৌধুরী, হরিশ মোড়ল, শিবু রাজবংশী, রাজকৃষ্ণ ভট্‌চাজ, যোগিন্‌ চাটুয্যে, যদু সা প্রভৃতি মাথালো-মাতব্বর ব্যক্তিগণ পুলিশ-সাহেবের নিকট তাঁহাদের নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া আসিলেন। কে যে কি বলিবেন, তাহা ত' পূর্ব্বেই গ্রামের অশ্বত্থতলায় ঠিক হইয়াই ছিল—সুতরাং সকলেই যে এ বিষয়ে একমত, তাহা আমরা পুলিশের গোপনীয় রিপোর্ট না দেখিয়াও জানিতে পারিয়াছি।

আদালতে মকদ্দমা আরম্ভ হইল। রামু পুলিশের নিকট যে এজাহার দিয়াছিল, আদালতেও তাহাই বলিল, একটি কথারও এদিক-ওদিক করিল না। তাহার সঙ্গে আর কে কে ছিল, প্রভৃতি প্রশ্নে সে বরাবর এক উত্তরই দিয়া আসিতেছে যে, সে—নিরপরাধ; সে এ ডাকাতি ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

রামুর গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত বড় বড় চক্ষু দুটিতে দৃষ্টি স্থির; বলিষ্ঠ দেহখানি অটল এবং নির্ভীক; মুখশ্রীতে একটা সুগভীর ব্যথা ও বিষণ্ণতায় ছায়া সর্ব্বদা মুখটিকে যেন আশঙ্কিত ও মলিন করিয়া রাখিয়াছিল। মাথা নত করিয়া সে প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া কাঠগড়ার ভিতর প্রবেশ করে—আবার দিনান্তে তেমনি নিরুপায় শ্লথ-গতিতে কারা-প্রবেশ করে।

পক্ষসমর্থনের জন্য রামু কাহাকেও অনুরোধ করিল না, কিন্তু সে দেখিল দুইজন বিখ্যাত উকীল বিনা-অনুরোধেই রামুর কার্য্য করিতে লাগিলেন। রামু শুধু তাহাতে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মকদ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ হইল। জজসাহেব দয়াপরবশ হইয়া ফাঁসি না দিয়া দশবৎসর দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা দিলেন। দণ্ড শুনিবামাত্র রামু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এইদিন রামু তাহার উকীল দুটিকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছিল—এবং কি বলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দণ্ডাজ্ঞা দিয়া জজ-সাহেব স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামুকে কিছুক্ষণের ছুটি দিলেন।

রামু গম্ভীরভাবে পুত্র কিশোরকে বলিল—"বাবা কিশুর, কারু সঙ্গে কোন রকম গোলমাল যেন ক'রো না। ভগবান্‌ যা' করেন ভালর জন্যই। এই সাজা আমার পূর্ব্ব-জন্মের পাওনা ছিল—তাই হয়ে গেল। এর জন্য দুঃখ ক'রো না।"

রামুর কণ্ঠস্বর সতেজ, চক্ষু শুষ্ক।

কিশোর কাঁদিয়াই আকুল, সে বলিবে কি? বলিল—"যারা তোমার নামে মিথ্যে—"

রামু বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"খবরদার!"

স্ত্রী কাঁদিতেছিল। এই তিন মাসে সে এমন কাহিল ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে আর চেনাই যায় না।

রামু স্ত্রীকে বলিল—"সংসার বরাবরই যেমন চল্‌তেছে—তেম্‌নি করেই চালিও। আমার জন্যে কোনও চিন্তা ক'রো না। দশটা বছর তো, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে যাবে। আমার অদৃষ্টে যা' ছিল, তা খণ্ডাবে কে? এতে কারুরই দোষ নেই।"

ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া লৌহ-শৃঙ্খল বাজাইতে বাজাইতে রামচন্দ্র কারাগৃহাভিমুখে রওনা হইল; সে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

রামু যে সত্যসত্যই খুনে-ডাকাত, আজ তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

রাত্রে নির্জ্জন অবরোধ-কক্ষে বসিয়া বসিয়া নিদ্রাহীন রামু ভাবিতেছিল—"নিশ্চয়ই আমি খুন করেছি। আমি ডাকাতি করতেই গিয়েছিলাম। হয়ত আমার মনে নাই, কিম্বা বরাবর ভয়ে আমি মিথ্যে কথাই বলে' এসেছি।" রামু যে নিরপরাধ, এখন আর সেকথা সে ভাবিতেই পারিল না।

এক একবার স্ত্রী, পুত্র, ঘরসংসারের কথা মনে পড়িতে লাগিল। রামু তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সে চিন্তাকে অপসৃত করিতে চাহে—কিন্তু সরানো জলের মত আবার

তাহারা তখনই আসিয়া জমিতে লাগিল। এই কারা-কক্ষখানকে সে যে চিন্তাশূন্য করিতে চায়—কারণ এখানে এখন তাহাকে বাধ্য হইয়াই যে থাকিতে হইবে!

পত্নীর অশ্রুসিক্ত, বেদনাতুর, ভরসাহীন দৃষ্টি, পুত্রের হতাশালিপ্ত ব্যথাঙ্কিত রোরুদ্যমান্ বদন-মণ্ডল, পাড়ার ছেলেগুলির সেই সুমধুর আদর আপ্যায়ন—বায়োস্কোপের ছবির মত, বাস্তব অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে একে একে রামুর মানসপটে বিম্বিত হইতে লাগিল। সংসারের কাজকর্ম্ম, আয়ব্যয় প্রভৃতিও সে আলোচনা করিল। একটি চৌদ্দ-বৎসরের বালকের উপর সংসার! গ্রাম শত্রুপূর্ণ! বুঝি এই দুটি নিরবলম্বন নিরুপায় মাতাপুত্র লোকের উৎপীড়নেই মরিয়া যাইবে। দরদরধারে রামুর শীর্ণ-কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পাষাণপুরীর পাষাণকুট্টিম ভিজাইয়া দিল।

নিদারুণ নিরাশা ও শোক রামুকে এমনই বিদ্ধ করিতে লাগিল যে, সে কখনও যাহা কামনা করে নাই, সেই মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা কামনা করিল। চিন্তার এ ধারাকে নেপথ্যে সরাইয়া, রামু আজ হইতে দশবৎসর পরের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহা অশ্রু-বেদনা-কাতর হৃদয়ের উপর কোনও মতেই ফুটিল না—একটি ক্ষীণ-রেখাপাত পর্য্যন্তও হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রথম মাস চারপাঁচ কিশোরদের খুব কষ্টেই কাটিল। সাংসারিক-কষ্ট অপেক্ষা লোকের ঠাট্টাবিদ্রূপেই ইহারা সর্ব্বাধিক দুঃখ পাইতেছিল। গ্রামের জমিদার হইতে নিম্নতম হাড়ি ডোম অবধি সকলেই আপন আপন সাধ্যমত কিশোরদের শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা রামুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত, তাহারাই রামুহীন এই নিরাশ্রয় পরিবারের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর পিছনে কিশোরদের একটা বাগান ছিল—সকালে দেখা গেল ভাল ভাল কলমের আমের চারাগুলিকে কে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। বেড়ের বাগানে ফলমূল যাহা ফলে, সন্ধ্যায় বেশ থাকে, কিন্তু সকালবেলায় আর তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। বাড়ীর পাশে একটা গর্ত্তে বর্ষার জল জমিত; সেটাতে কিশোরদের কিছু মাছ ছাড়া ছিল;—সেদিন কি প্রয়োজনে কিশোর জাল নামাইল; উঠিল কেবল শামুক, গুগ্‌লি ও পানা। এইরূপে লোকে কারণ-অকারণে তাহাদিগকে বড় উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

উৎপীড়নে সুখ হয়,যদি উৎপীড়িত উৎপীড়ককে বাধা দেয় বা উক্ত উৎপীড়িত ব্যক্তি কাতর হইয়া প্রকাশ্যে ক্ষমা-প্রার্থনা করে। কিশোর পিতৃ-আজ্ঞায় কাহাকেও কোন বাধা দিল না; যাহার যেমন ইচ্ছা,সে সেইরূপ ভাবেই কিশোরদের জীবিকা-নির্ব্বাহের পথে কণ্টক বিছাইল। কিন্তু যাহার জন্য এত করা, সে যখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপই করিল না, হাসিমুখে অক্ষত-চরণে চলিয়া গেল, তখন লোকে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

আগুণ জ্বলিতে জ্বলিতে ছাই হয়, আর বাতাস বহিতে বহিতে সুরভিময় হয়। গ্রামবাসীদের উত্তেজনাও ক্রমশঃ ভস্মে পরিণত হইল। কিশোর ও তাহার জননী ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতে লোকের সংস্রব আরও জোর করিয়া ত্যাগ করিতে লাগিল। তাহারা সকলের উৎপীড়নের পাত্র হইয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্যে গর্ব্বিত হইয়া যেন গ্রামবাসীকে নীরব-উপহাসে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

শ্রাবণ মাস। বিগত পাঁচদিন পাঁচরাত্রি ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রামপথে হাঁটুভোর জল। যত খাল-ডোবা ছিল, সব জলে কানায়-কানায় ভরা; ছাগল গরুও আজ পাঁচদিন যাবৎ গোয়ালে আবদ্ধ।

বেলা প্রায় দশটা। কিশোর একটা "মাথালি" মাথায় দিয়া গোয়াল পরিস্কার করিতেছে, এমন সময় কে ডাকিল—"কিশোর, কিশোর বাড়ীতে আছ?"

তাড়াতাড়ি ছাঁচ্‌তলার জলে হাত দুখানি আধ-ধোয়া করিয়া শশব্যস্তে কিশোর বাহিরে আসিল। দেখিল—এক অপরিচিত ব্যক্তি। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ; বেশ সুস্থ, সবল,দৃঢ়পেশীযুক্ত শরীর; দেহের বর্ণ শ্যাম, দাড়িগোঁফ্ কামান—হাতে চীনাবাজারের একটা ক্যান্‌ভাস্ ব্যাগ—ব্যাগের উদরটি পরিপূর্ণ।

কিশোর এই নবাগতের দিকে সসম্ভ্রমে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে ডাক্‌চেন? আমি ত'—"

আগন্তুক কহিল—"বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি আমায় চিন্‌তে পার নাই। তা কি করে' পারবে বল? আমিই কি চিন্‌তে পারি এখন? তোমার বয়স যখন চার পাঁচ বছর,

তখন কেবল একবারটিমাত্র আমি তোমায় দেখেছিলাম। আমি এখন রাজনগরে থাকি—আর বহরমপুরে এক সাহেবের কায করি। ছুটিও পাই না; তা ছাড়া নানান্ ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকি; ইচ্ছে করলেও ত আস্‌তে পারি না। আহা, আপনার লোক; হাজার হোক্। দেখ্‌লেও আনন্দ হয়।”

কিশোর চতুর্দ্দশবৎসরের কিশোর বালক হইলেও বিগত ছয়মাসের উৎপীড়নে সে স্বাবলম্বন এবং আত্মরক্ষায় এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে যে, সে মধুর কৈশোরের নর্ম্মলীলা এবং অপরিমিত বিশ্বাস-প্রবণতার সীমা পার হইয়া একবারে প্রৌঢ়ের সন্দেহপূর্ণ হৃদয়ের বিচারে ও পরিমাণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অকস্মাৎ অপরিচিতের এই স্নেহের আহ্বানকেও সে দুষ্টলোকের চক্রান্ত না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে, অতি সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনার নাম?”

আগন্তুক কহিল—“আমার নাম বদ্দিনাথ মণ্ডল। তোমার বাপের অর্থাৎ রামচন্দ্রের আমি সাক্ষাৎ খুড়্‌তুতো দাদা। আমি এখন রাজনগরে থাকি।”

উক্তগ্রামে তাহার একজন অদৃষ্টপূর্ব্ব জেষ্ঠতাত আছে, কিশোর ইহা জানিত। সে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।

বৈদ্যনাথ “বেঁচে থাক” বলিয়া তাহার মস্তকস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল; বলিল—“তোমাদের এখন ভারি বিপদ! তাই এ দুঃসময়ে একবার খোঁজ না নিয়ে থাকৃতে পার্‌লাম না। এতদিন অবিশ্যি রামু ছিল—আমার খোঁজখবর করার দরকারও তেমন ছিল না। আহা—” বলিতে বলিতে বৈদ্যনাথের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া সমস্ত সহানুভূতি তরল-মূর্ত্তিতে অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িল।

কিশোরের জননী বৈদ্যনাথকে চিনিতে পারিলেন না—তবুও এই দুর্দ্দশায়, নিঃসম্বল বৈরিবেষ্টনের মধ্যে যে ব্যক্তি উপযাচক হইয়া শুধু একটু চক্ষের জল ফেলিয়া যায়, সে যে আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয়! তাই ধীরভাবে তিনি কহিলেন—“হ’তে পারে, মস্ত গুষ্ঠি, কে কোথায় আছে, তা কি আমিই সব জানি?”

বৈদ্যনাথ হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিল। বৈঠকখানার দাওয়ায় কিশোর একখানি বড় পিঁড়ি পাতিয়া একবাটি মুড়ি ও একখানা পিতলের চিত্রিত রেকাবীতে একধারে কিছু মুড়্‌কি ও খানদুই গুড়ের বড়বাতাসা দিয়া জলখাবার আনিয়া দিল। তাহার পর যাহা জুটিল, তাহাই আহার করিয়া বৈদ্যনাথ বিশ্রাম করিল।

বৈকালে বৈদ্যনাথ বিদায় চাহিল, তখন বৃষ্টিটাও একটু ধরিয়াছিল; কিন্তু আকাশের রং তখনও বহুদিনের পুরাতন তুলার মত পাংশুটে। স্তরে স্তরে মেঘগুলি চারিদিক হইতে আসিয়া মাথার উপর জমাট বাঁধিতেছিল; মাঝে মাঝে শ্রান্ত অশনি গুরু গুরু রবে আলস্য ভাঙ্গিতেছিল।

কিশোর বলিল—“আজকে না গেলে হ’ত না? জল ত এখুনি এল বলে’? পথে কষ্ট হবে রাত্তিরে।”

বৈদ্যনাথ বলিল—“থাক্‌বার যো নেই বাবা—তা’লে চাক্‌রী যাবে।”

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুড়িটি টাকা দিয়া বলিয়া গেল, আপাততঃ এতেই যেন সে সংসার চালায়—সে মধ্যে মধ্যে আসিবে এবং তত্ত্বতাবাস করিবে এবং মাসে মাসে, যত দিন না রামু ফিরে, পনরটি করিয়া টাকা দিয়া সাহায্য করিবে।

কিশোরের মাতার মনে এই আগন্তুকের সম্বন্ধের সত্যতায় প্রথমে যে একটু সন্দেহ হইয়াছিল—এখন সেটা বেশ নিঃশেষে কাটিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যনাথ তাহার প্রতিশ্রুতিমত গত আটবৎসরকাল কিশোরদিগকে মাসিক পনর টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছে। সে মাসে মাসে একবার আসে এবং টাকা কয়টি দিয়া সংসারের সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিয়া আবার সেই-দিনই অপরাহ্নে চলিয়া যায়।

মাঘ মাস। কয়দিন হইতে শীতটা খুব জোরে পড়িয়াছে। উতলা বাতাসের একদণ্ডও বিশ্রাম ছিল না। বৈঠকখানা-ঘরের তক্তাপোষের উপর একটি বিছানায় মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈদ্যনাথ শায়িত—পদতলে কিশোর জ্যেষ্ঠতাতের পদসেবা করিতে করিতে নানারকম গল্প করিতেছিল। বৈদ্যনাথ মাঝে মাঝে কেবল হুঁ দিয়াই সারিতেছিল।

খানিকক্ষণ পরেই বৈদ্যনাথের নাসিকা-নিনাদে বুঝা গেল যে, তিনি নিদ্রার রথে আরোহণ করিয়াছেন—রথচক্র

ঘর্ঘর শব্দে স্বপ্নলোকের পথে ছুটিয়াছে। কিশোরও জেঠার লেপটা একটু টানিয়া লইয়া সেইখানেই একটু গড়াইতে গিয়া তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে একটা উচ্চ রোদনধ্বনি ও কোলাহলে কিশোরের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া কিয়ৎক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিল; ক্রমে ধীরে ধীরে বাটির মধ্যে আসিল; দেখিল উঠানে একজন লোক। তাহার চুল দাড়ি খুব বড় বড় —পাকিয়া একবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। এই আগন্তুকের মুখ দেখিবামাত্র কিশোরের হৃদয়-তন্ত্রীতে একটা আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বলিল—"আর কেঁদে কি হবে? কান্নার ত শেষ হল।"

এখন কিশোর বুঝিতে পারিল যে, এ তাহার নির্ব্বাসিত পিতা—ফিরিয়া আসিয়াছে। সে একবারে শিশুর মত চঞ্চল হইয়া, আগ্রহে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পিতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

রামু সস্নেহে পুত্রকে উঠাইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তপ্ত-অশ্রুর অজস্র অভিষেকে পিতাপুত্রে মিলন হইল।

গ্রামে বিদ্যুতের মত রাষ্ট্র হইয়া গেল—রামচন্দ্র মণ্ডল আবার দেশে ফিরিয়াছে। প্রথমটা যে শুনিল, সেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। যাহারা পূর্ব্ব-শত্রুতা স্মরণে গৃহ প্রবেশে অনিচ্ছুক, এবং যাহারা অন্য কোনও কারণে তাহার সম্মুখে আসিতে পারিতেছিল না—তাহাদের আগমনে রামুর বাড়ির সম্মুখের পথ হঠাৎ ভরিয়া গেল। সকলেরই সমুৎসুক দৃষ্টি আজ রামুর গৃহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

হঠাৎ এই দরদীদের বাহুল্যে কিশোর ও তাহার জননীও যেমন মনে মনে হাসিতেছিল, রামুও তেমনি যে একটু বিরক্ত না হইতেছিল, তাহা নহে। লোকের ভীড় কমিলে, রামু কি করিয়া এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সকলকে বলিল। তাহার কারাবাস ও পুলি-পোলাও-বাসেরও একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিল। আর সে উর্দ্ধকরে প্রণাম করিল মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে—কেন না তাঁহারই হীরকজুবিলি উপলক্ষ্যে সে এই দুইবৎসর পূর্ব্বে ছাড়া পাইয়াছে।

একে ত' শীতের দিন দেখিতে দেখিতেই কাটিয়া যায়; তাহাতে আবার সেদিন মেঘ করিয়াছিল, সুতরাং মেঘে ও সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষণিকশ্রী অপরাহ্ণকে টিপিয়াই মারিয়া ফেলিল। চৌদিকে মশক-সংঘ তিমির-সন্ধ্যার বন্দনারতি গাহিয়া উঠিল। রামু, কিশোর ও বৈদ্যনাথ তিনজনে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালাইয়া গল্প করিতেছিল।

কিশোর বলিতেছিল যে, তাহার জ্যেষ্ঠতাত এই বৈদ্যনাথ মণ্ডলই প্রকৃতপক্ষে বিগত আট বৎসর অত্যাচারিত, নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় সংসারটিকে রক্ষা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠতাতের সাহায্যের অর্থ হইতেই কিছু কিছু বাঁচাইয়া সে সে এখন দুইজোড়া বলদ কিনিয়াছে, জমিজমাও কিছু বাড়াইয়াছে, ঘরে চাষ সুরু করিয়াছে, গর্ত্তটার মাটি তোলাইয়া পুকুরের মত করিয়াছে, এবার আবার তাহাতে কিছু ভাল পোনাও ছাড়িয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রামু বৈদ্যনাথকে চিনিতে না পারিলেও অসীম কৃতজ্ঞতায় এই পরিচয়হীন আত্মীয়টির প্রতি সমস্ত মনেপ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। বিপুল ভাবাবেশে সে বৈদ্যনাথের মুখপানে চাহিতে পারিতেছিল না।

রামু বলিল—"আমার যে এমন দাদা ছিলেন, তা' যদি আমি জানতাম—তাহ'লে কি কিছু কষ্ট হত? আমি নিজের দুঃখে একদিনও কাতর হই নাই, কেবল তোমাদের যে কি ভাবে রেখে গেছি, এই চিন্তাই আমার পাগল করে তুলত। তোমাদের এমন অবস্থায় দেখব জানলে আমার যে অপরাধ নেই, এই কথাটা আমি যেমন বুক-জুড়ে বসিয়েছিলাম—তেমনই এই দুঃখকেও সরিয়ে ফেলে আমি দিন কাটাতে পারতাম।"

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। এ মৌন, কথার সমাপ্তিতে নয়, পর্য্যাপ্তিতে। কথা যখন আকণ্ঠ, কণ্ঠ তখন আপনিই রুদ্ধ হইয়া যায়।

রামুই পুনরায় কথা আরম্ভ করিল। হাত কচলাইতে কচলাইতে, ভূমিসন্নস্ত-দৃষ্টিতে, পাছে বেদনা দেওয়া হয়, এইরূপ শঙ্কা ও সঙ্কোচের সুরে রামু বলিল—"দাদা, কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

বৈদ্যনাথ স্বাভাবিক অচঞ্চল সুরে বলিল—"কি বলছ ভাই?"

"আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি নে। হরি কাকার এক ছেলে—তার নাম ত শরৎ। সে জন্মাবধি তার মামারবাড়ী রাজনগরেই থাকে জানি। তার পরে,

তাকে ত আমি কতবার দেখেছি—তাছাড়া সে ত চাষ-বাস করে, কোনও সাহেব-টাহেবের চাক্‌রী ত সে করে না!"

বৈদ্যনাথ প্রথমটা একটু হাসিল। সেই ক্ষীণালোকেই দেখা গেল যে, তাহার মুখমণ্ডলে লজ্জার একটা রক্তিম-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একটু হাসিয়া, একটু কাসিয়া, বৈদ্যনাথ গলাটা ঝাড়িয়া লইল। রামু উত্তরের প্রতীক্ষায় বৈদ্যনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিশোর একটু নড়িয়া-চড়িয়া নিকটে সরিয়া বসিল।

বৈদ্যনাথ ধীরে ধীরে বলিল—"চিন্‌তে না পার্‌বারই কথা বটে! আমিই কি তোমায় চিন্‌তাম? সন্ধান করে' নিলাম। তুমি এই খুন-ডাকাতিতে যখন গ্রেপ্তার হলে শুন্‌লাম—তখন প্রথমটা মনে বেশ স্ফূর্ত্তি হলো। ভাবলাম 'যা শত্রু পরে পরে', ভালই হলো: কিন্তু দু'এক দিন যেতে না যেতেই আমার মনটা যেন কেমন কর্‌তে লাগল। এমন আমার আর কখনও হয় নাই।

"হাঁ, আমার নাম মোটেই বৈদ্যনাথ নয়—আমার নাম বিশ্বেশ্বর। মাঝেরগাঁয়ের ও কাণ্ডটা আমিই করেছিলাম। যতই প্রমাণ হোক—যে যাই বলুক, আমি ত জানি যে, তোমার কোন দোষ নেই।

"হঠাৎ আমার তাই মনে হল যে, দোষ কর্‌লাম আমি, আর সাজা পাবে, যে একেবারে কিছুই জানে না। এই কথাটা আমার পাঁজরার মধ্যে এমন করে বিঁধে গেল যে, আমার আর কোন কিছু ভাল লাগ্‌ল না। ভাব-লাম, নিজেই গিয়ে ধরা দিই এবং সমস্ত কথা খুলে বলে' তোমায় ছাড়িয়ে আনি। কিন্তু সেটা সাহসে কুলোলো না; কারণ পনরকুড়ি বৎসরকাল এই সব কর্‌তে কর্‌তে ভেতরটা যেন কি রকম হয়ে'গেছে।

"হাঁ, যা বল্‌ছিলাম। নিজেকে ধরিয়ে দিতে যখন সাহস হলো না—তখন তোমাকে যাতে রক্ষা কর্‌তে পারি, এই হলো আমার প্রধান ভাবনা। রেতে ঘুম নেই; যদি একটু চোখটা এঁটে আসে, অমনি ভয় দেখে জেগে উঠি; পেটে ক্ষিদে থাকে, গলা দিয়ে ভাত নামে না; কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেও ভাল লাগে না; আবার একাও থাকৃতে পারি না। এ কি ভয়ানক যন্ত্রণা বল দেখি! এর চেয়ে ধরা পড়া অনেক ভাল ছিল! সব চেয়ে সেইটেই ভাই বড় কষ্ট, যে কষ্টের কথা কাউকে প্রকাশ করে বল্‌বার যো নেই।

"তুষের আগুণ ভিতর ভিতর ধিকিধিকি জ্বলে—তাঁকে থাবড়ে নেবাতে গেলে সে যেমন ছড়িয়েই পড়ে—আমারও দশা ঠিক তাই দাঁড়িয়েছিল।

"জেলায় গেলাম। খুব বড় যে সব উকীল, তাদের দু'জনকে তোমার দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুপে চুপে মকদ্দমার তদ্বির কর্‌তে থাক্‌লাম। তাতে যেন কতকটা আরাম পেলেম।

"কিন্তু তোমার অদৃষ্টে ভোগ আছে, কে খণ্ডাবে? রক্ষা করতে পার্‌লাম না যখন, তখন ভাবলাম—তোমার শাস্তি আমার কেন হল না। আবার সেই ভাব জেগে উঠ্‌লো! সময় সময় ইচ্ছে হতো নিজের গলা নিজে টিপে মেরে ফেলি—কোনও রকমে মরে' এ দুঃখের শেষ করি। কিন্তু আবার ভাবলাম মরে' লাভ কি? বরং তোমার না-ফেরা পর্য্যন্ত তোমার সংসারের সেবা করে একটু প্রায়শ্চিত্ত করি।

"এখানে ফাঁকিটা খুব ভালই দিলাম, উপরে ত দেবার যো নেই ভাই—" বলিতে বলিতে সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্তম্ভিত-চেতনায়, নিরুদ্ধশ্বাসে পিতাপুত্রে দস্যুর এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, কখন যে কেরোসিনের ডিবিটা নিবিয়া গিয়াছিল, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য হয় নাই।

অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না। রামচন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে ডাকিল—"দাদা, দাদা!"

দূরে সরকারী রাস্তার উপর দিয়া কিনু পাগলা তখন গাহিয়া যাইতেছিল—

"মন-মাঝি তোর বৈঠা নেরে—এ,
আমি আর বাইতি পার্‌লাম না।"

নগদ-বাকী*

[শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম. এ]

নগদ-বাকী—কথাটা হয়ত হেঁয়ালীর মত শুনায়। বৈয়াকরণিক মহাশয় যেন ইহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলিয়া ভ্রম না করিয়া ফেলেন। ইউরোপীয় মহাদ্বন্দ্বের ফলে সকলপ্রকার দ্বন্দ্বের প্রতি অর্থনৈতিকের ভীতি জন্মিয়া গিয়াছে। "রামেশ্বর" পদ লইয়া না কি রাম ও মহেশ্বরের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়; তখন ব্রহ্মা আসিয়া মীমাংসা করিয়া দেন—"রামেশ্বর মানে রামের ঈশ্বরও নয়, রাম যাহার ঈশ্বরও নয়।" ব্রহ্মা আজ্ঞা করিলেন, "রামই ঈশ্বর"। আমিও বলিতেছি, বর্ত্তমানকালে বাণিজ্যে "নগদ"টাও "বাকী"। ইংরাজিতে একটি কথা আছে, 'Extremes meet'—সকল প্রকার "অতি" মিলিত হয়—অতি-সাত্ত্বিকের ও অতি-তামসিকের নিশ্চেষ্টতার, উষা ও গোধূলির অস্পষ্টতার, তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মির ও গভীর অন্ধকারের অস্পষ্টতার প্রভেদ যেমন অগ্রাহ্য, বর্ত্তমানকালের বাণিজ্যের আদান-প্রদানে নগদ ও বাকীর পার্থক্য তেমনই ক্ষীণ। আধুনিক বাণিজ্যের টাকাকে 'নগদ' বলিলেও ঠিক হয় না, 'বাকী' বলাও চলে না; বরং 'নগদ-বাকী' কথাটাই বেশী প্রযোজ্য। আজকাল যাহাকে বণিক্-সম্প্রদায় Cash (নগদ) বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা Credit-cash (বাকী-নগদ বা নগদ-বাকী)।

বাণিজ্যে মা-লক্ষ্মী বাস করেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ; তাহার প্রতি মা-ষষ্ঠীর কৃপাও নিতান্ত কম নয়। অভিজাত-বংশের ইতিহাস-বিশ্রুত অনুর্ব্বরতাহেতু, পীতধাতু পরিমাণে বাণিজ্যের সঙ্গে পারিয়া উঠে না। ভারতবর্ষের কথা ধরিলেই দেখা যাইবে, গত ৫০ বৎসরে মোট বহির্বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) ১৮৬৪ সালে ৯০ কোটি টাকা হইতে [illegible] সালে ৪৩০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া [illegible] মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যও আছে। ১৯১২-১৩ এই এক বৎসরে ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্যের (Internal-trade) পরিমাণ ছিল মোট ৬,৮৭,৯৪০০০ হাজার টন। ভারতীয় রেলপথের যাত্রীসংখ্যা ১৮৯০ হইতে ১৯১১ এই ২১ বৎসরে শতকরা ১৬৮ জন হিসাবে অর্থাৎ ২॥ গুণের অধিক বাড়িয়াছে। রেলপথে-নীত (Carried) মালের পরিমাণ ১৮৯০ সালের অনুপাতে শতকরা ২১১ টন হিসাবে অর্থাৎ তিনগুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। দেশের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য (যতদূর হিসাব করিতে পারা গিয়াছে) গত ২২ বৎসরে ২। গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

যুক্ত-রাজ্যের (United Kingdom—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ও আয়রলণ্ড) মোট বহির্বাণিজ্য ১৮৯০ সালে ৭৪৪৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৯১২ ইংরাজিতে ১৩৪৩৬ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের (United States) মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৩৩৭ কোটি টাকা (৪২৭ কোটি ডলার) ছিল। ১৯১২ সালে ফরাসি-দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ৫৮৩৪ লক্ষ পাউণ্ড। জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯১২-১৩ সালে মোট ১০৬২৮ লক্ষ পাউণ্ড ছিল।

সুতরাং দেশের মুদ্রা পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঙ্ক, মার্ক বা টাকাই হউক, বর্ত্তমানকালের ব্যবসায়ে শুধু মুদ্রা দিয়া ব্যবসায়-পরিচালন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কোটি কোটি মুদ্রা ক্রেতা-বিক্রেতা বা উত্তমর্ণ-অধমর্ণের মধ্যে আদান-প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে একদিকে তাহা যেমন নিতান্তই ব্যয়সাধ্য ও অসুবিধাজনক হইয়া পড়িবে, অন্য-দিকে তেমনই চুরি-ডাকাতির ভয়ও বাড়িয়া যাইবে। কেবল আমাদের দেশে নয়, ইউরোপীয়-মুদ্রার ইতিহাসেও, মুদ্রার উপর স্বর্ণকারের অত্যাচার চির-প্রসিদ্ধ। আমাদের অঞ্চলে একটা প্রবাদ আছে—"সোণার আপনার বাপকেও ঠকায়।" ইউরোপীয় স্বর্ণ-ব্যবসায়ী বাপকে ঠকাইবার কোন সুবিধা করিতে পারিয়াছে কি না, হলপ করিয়া বলিতে পারি না; তবে দেশশুদ্ধ লোককে ঠকাইয়া নিজের সিন্দুক পূর্ণ করি-

* বর্দ্ধমান সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

বার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, তাহা প্রাচীন এম্‌ষ্টার্‌ডম্ নগরের "রাজকীয়-ব্যাঙ্ক" স্থাপনেই দেখিতে পাই। বর্ত্তমানকালে লণ্ডনের ন্যায়, মধ্যযুগে এম্‌ষ্টার্‌ডম্ নগর আন্তর্জাতীয় ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। সেখানকার স্বর্ণকারের "ব্যবসায়-বুদ্ধির" (?) অনুগ্রহে, পূর্ণ-ওজনের যত মুদ্রা, তাহা সিন্দুকে "তলাইয়া" পড়িত; আর স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর কৃপায় যাহারা "লঘিমা" লাভ করিত, তাহারা হাল্কা-শরীরে বাজারে বিচরণ করিত। ইহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতীয়-বাণিজ্যে পীতধাতুই মূল্যের পরিমাপক (Standard of value)। তাহার পরিমাণ পৃথিবীতে যে গতিতে বাড়িতেছে, তাহা সমগ্র পৃথিবীর বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে কুলাইয়া উঠিতে পারে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমেরিকা-আবিষ্কারের পর হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর মোট উত্তোলিত (raised) স্বর্ণের পরিমাণ ৩০৩ কোটি পাউণ্ড (বা প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা)। বিশেষতঃ সোণাকে শুধু টাকশালে পোড়াইয়া মার্কা-মারিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই না; কুবের-ঠাকুরের অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ আশীর্ব্বাদ শরীরে ধারণ করিয়া ও গৃহ সাজাইয়া ভক্তির পরিচয় দিই। সুতরাং যদি অন্যান্য প্রকার টাকার (Money) (স্বর্ণ ছাড়া) ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং একমাত্র স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য বাড়িয়া যাইবে—স্বর্ণের হিসাবে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইবে। তাহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়া লোকের অন্নসংস্থানের পথ বন্ধ হইবে।

প্রধানতঃ, তিন উপায়ে মুদ্রার ব্যবহার কমাইয়া দেওয়া হয়। (১) নোট, (২) চেক, (৩) হুণ্ডি। এই তিনটির প্রথমটিকে কাগজের টাকা বা Paper money বলা হয়। চেক এবং হুণ্ডিও অনেকাংশে টাকার কার্য্য করে, সুতরাং এই তিনটিরই সাধারণ-নাম "কাগজের টাকা" বলা যাইতে পারে।

১। নোট

নোট সরকার-বাহাদুরের একপ্রকার অঙ্গীকারপত্র-মাত্র। "সরকার অঙ্গীকার করিতেছেন যে বাহককে (নোটের) লিখিত টাকা দাবীমাত্র দিবেন"—নোটে এইরূপ অঙ্গীকারপত্র লেখা থাকে। ভারতবর্ষে সকল নোটই সরকারী।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষীয়-ব্যাঙ্কের নোট 'ইস্যু' বা 'বাহির' (Note issue) করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ড (Bank of England) ছাড়া আর কোন ব্যাঙ্কের নোট 'ইস্যু' বা 'বাহির' করিবার সনন্দ অর্থাৎ এক্তিয়ার নাই। ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ডের ন্যায় ভারত-সরকারকেও প্রত্যেকখানি নোটের পরিবর্ত্তে সেই পরিমাণ মুদ্রা,—স্বর্ণ অথবা রৌপ্য—"গুদাম-জাত" করিতে হয়। ইহার নাম 'Paper-Currency Reserve'—কাগজের টাকার রিজার্ভ। ভারত-সরকারের ঐ রিজার্ভ-ফণ্ডের কেবলমাত্র ১৪ কোটি টাকা ব্রিটিশ ও ভারতীয় "কোম্পানীর কাগজে" (Securities) "লাগাইয়া রাখা" (invest) যাইতে পারে। সরকার (Govt.) সকল সময়েই নোটের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে প্রস্তুত থাকায়, আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে; সুতরাং রোক (in coins) ১০০৲ টাকার বোঝা বহিয়া মরার চাইতে কোটের পকেটে হাল্কা নোটখানা লইয়া যাওয়াই সুবিধা মনে করি। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, ১৯১১-১২ সালে মোট ৬১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহা "ভাঙ্গাইবার জন্য" সরকার-বাহাদুর মাত্র ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৫৷ টাকা মজুদ রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যদিও বাকী ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে ১৪ কোটি মাত্র কোম্পানীর-কাগজে লাগাইয়াছেন, বাকী ৩১ কোটি টাকারও এক হিসাবে সাধারণ-সময়ে (অর্থাৎ বিশেষ কোন বিপ্লব উপস্থিত না হইলে) আর কোন আবশ্যকতা নাই। এই পরিমাণ টাকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য "কোশ" * (Bullion) রূপেই থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান বৎসরের কুরুক্ষেত্রের ফলে দেশে যে আতঙ্ক জন্মিয়াছিল, তাহাতেও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় মোট ৭ কোটি টাকার মাত্র নোটের চল্‌তি কমিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা

* স্যাৎ কোশশ্চ হিরণ্যঞ্চ হেমরূপ্যে কৃতাকৃতি—ইতি অমরকোষঃ। স্বর্ণের অথবা রৌপ্যের পিণ্ড অর্থে অমরকোষকার 'কোশ' ও 'হিরণ্য' শব্দের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিরণ্য শব্দের [illegible] স্বর্ণ অর্থে ব্যবহার আছে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

যাইবে, দেশের মোট চল্‌তি টাকার (রোক ও নোট) সংখ্যার এক-পঞ্চম হইতে এক-চতুর্থাংশ নোট।

বৎসর	মোট টাকার চল্‌তি	চল্‌তি নোট	টাকার চলন
১৯০৩	১৪৭	৩০	১১৭
১৯০৪	১৫২	৩১	১২১
১৯০৫	১৬৪	৩৬	১২৮
১৯০৬	১৮৫	৩৭	১৪৮
১৯০৭	১৯০	৩৫	১৫৫
১৯০৮	১৮১	৩৬	১৪৫
১৯০৯	১৯৮	৪১	১৫৭
১৯১০	১৯৯	৪২	১৫৭
১৯১১	২০৯	৪৭	১৬২
১৯১২	২১৪	৫১	১৬৩

এমন বিচার করুন, দেশের প্রচলিত-টাকার এই এক-চতুর্থাংশ নগদ, না নগদ-বাকী। সরকারের অঙ্গীকার-পত্র হইলেও নোট ত অঙ্গীকারপত্রমাত্রই। কিন্তু আমরা ইহাকে 'নগদই' বলি', 'বাকি' বলি না—বলিতে পারি না।

২। চেক

কিন্তু আধুনিক বাণিজ্য-জগতে সরকারী-মুদ্রা প্রভৃতি অপেক্ষা 'চেক' ও 'বিল-অব-এক্‌স্‌চেঞ্জের' (হুণ্ডির) প্রচলন বেশী। বর্ত্তমান বাণিজ্য-জগতের সহিত যাঁহারা বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখেন, তাঁহারাই জানেন, আজকাল দেশের মধ্যে কাহাকেও টাকা দিতে হইলে কোন ব্যাঙ্কের নামে চেক কাটিয়া দেওয়া হয়। বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে ব্যাঙ্ক হইতে একখানি 'ড্রাফ্‌ট' (Draft) বা 'বিল-অব-এক্‌স্‌চেঞ্জ' (Bill of Exchange) (হুণ্ডি) কিনিয়া আনিতে হয়। ইহারাও "কাগজ-বংশীয়"—তবুও ইহারা 'নগদ'।

রাম বসু যদি শ্যাম দত্তকে ৫৭০৲ টাকা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ব্যাঙ্ককে এইরূপ বরাত-চিঠি বা চেক লিখিয়া দেন—

"কলিকাতা-ব্যাঙ্ক প্রতি :—

বরাত-চিঠিদৃষ্টে শ্যাম দত্তকে অথবা তাহার বরাতী আর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে মোট ৫৭০৲ টাকা সমঝাইয়া দিবে।"

চেকের ফারম ছাপা থাকে, কেবল নাম ও টাকার সংখ্যাটি বসাইয়া দিলেই চলে। শ্যাম দত্ত যদি ব্যবসায়ী হয়, তাহা হইলে সে, যে ব্যাঙ্কের সহিত তাহার কারবার, সেই ব্যাঙ্কে এই চেক্‌খানি হাজির করে। যদি (রাম ও শ্যাম) উভয়ের একই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার থাকে, তাহা হইলে রাম বসুর হিসাবে খরচ লিখিয়া শ্যাম দত্তের হিসাবে জমা দিলেই ব্যাঙ্কের কার্য্য হইয়া গেল। শ্যাম দত্ত যদি বিত্তহীন (যে শ্রেণীর নাম মধ্যবিত্ত, সেই) শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে সে হয় ত কিছু নোট ও কিছু টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিতেছি; তাই উভয়কেই ব্যবসায়ী ধরিয়া লইব। ব্যবসায়ী হইলেও উভয়ের একসঙ্গে কারবার না থাকিতে পারে; রামের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া আনিয়া নিজের ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার যে হেঙ্গাম, তাহা অনেক সময় অসুবিধাজনক; এবং এতটা কষ্ট-স্বীকার করিবার প্রয়োজনও নাই। তাহার ব্যাঙ্ক বিনা পারিশ্রমিকেই তাহার জন্য এই কার্য্য করিতে প্রস্তুত। সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটিতেছে যে, এক ব্যাঙ্কের নামে চেক অন্য ব্যাঙ্কে জমা হইয়া যায়। পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট যে পাওনা থাকিত, তাহা লোক পাঠাইয়া উসুল করিয়া লইত। ইহাতে নানা অসুবিধাভোগ করিতে হইত। অনাবশ্যকভাবে এক ব্যাঙ্ক হইতে অন্য ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতে হইত। ধরুন, যেন কলিকাতা ব্যাঙ্ক দিল্লী-ব্যাঙ্কের নিকট ৫০ হাজার টাকা পাইবে। আবার ভারত-ব্যাঙ্ক দিল্লী-ব্যাঙ্ককে ৫২ হাজার টাকা দিবে। আবার কলিকাতা-ব্যাঙ্ক ভারত-ব্যাঙ্ককে ৫৩ হাজার টাকা দিবে। এই অবস্থায় যদি প্রত্যেক ব্যাঙ্কের প্রত্যেক আদান-প্রদানের জন্য টাকার দরকার হয়, তাহা হইলে কত টাকার আবশ্যক; অথচ যদি তাহারা সকলে একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে মাত্র ৩ হাজার টাকায় এই কাজ শেষ করা যাইতে পারে; এবং বহু পরিশ্রম ও ব্যয় কমিয়া যায়। মোট ১,৫৫,০০০৲ টাকার চেক, ৩০০০৲ টাকার দ্বারা নিকাশ করা হইল। উল্লিখিত চেকগুলি নিকাশ করিবার কালে নিম্নলিখিতভাবে হিসাব করা হয়—

নাম	প্রাপ্য	দেয়	মোট প্রাপ্য বা দেয় *
কলিকাতা-ব্যাঙ্ক	৫০ হাজার	৫৩ হাজার	–৩ হাজার
দিল্লী "	৫২ "	৫০ "	+২ "
ভারত "	৫৩ "	৫২ "	+১ "

এখন যদি কলিকাতা-ব্যাঙ্ক দিল্লী-ব্যাঙ্ককে ২ হাজার ও ভারত-ব্যাঙ্ককে ১ হাজার টাকা দেয়, তাহা হইলেই সকল দেন-পাওনা মিটিয়া যায়। ইহাতে ১৫২ হাজার টাকার ব্যবহার অনাবশ্যক হইল। যে ঘরে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের দৈনিক-হিসাব এইভাবে নিকাশ করেন,তাহার নাম 'ক্লীয়ারিং-হাউস' (Clearing-House) বা নিকাশ-আপিস।

গত ১৮৯০ সালে ভারতীয় সকল নিকাশ-আপিসের নিকাশের পরিমাণ ছিল ১৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ। ১৯১০ সালে তাহা ৪১০ কোটি ৮ লক্ষ এবং ১৯১১ সালে ৫৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯১০ সালে মোট প্রচলিত-টাকার পরিমাণ ১৬২ কোটি ও ১৯১১ সালে ১৬৩ কোটি ছিল; অর্থাৎ প্রচলিত টাকার তিনগুণ চেক একমাত্র 'ক্লীয়ারিং-হাউসেই' নিকাশ হইয়া গিয়াছে। ৪॥ শত কোটি টাকার চেক নিকাশ করিতে টাকার প্রয়োজন অতি অল্পই হইয়াছে।

বাকী যে সকল চেক নিকাশ-আপিসে (Clearing-House) নিকাশ হইবার জন্য দর্শন দেয় না, তাহাদের নগদত্বের প্রমাণটাও একবার শুনুন। অতিপূর্ব্বে, যখন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার প্রথার সৃষ্টি হয়, তখন গচ্ছিত টাকা পাহারা দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হইত। ক্রমে যেদিন ব্যাঙ্কওয়ালা বুঝিতে পারিল যে, যত টাকা সে গচ্ছিত রাখে, তাহা সময় সময় শোধ করিবার জন্য সমস্ত টাকা জমা রাখিবার আবশ্যক হয় না (কারণ অনেক টাকা ক্রমাগত তহবিলে পড়িয়াই থাকে), তখন হইতে সে অনাবশ্যক অংশটা ধার দিতে আরম্ভ করিল। হিসাবের মত লিখিলে এই দাঁড়ায়—

প্রথম অবস্থায়

দায় (Liabilities)	তহবিল ও সম্পত্তি (Assets)
গচ্ছিত—১০০০৲	নগদ—১০০০৲

দ্বিতীয় অবস্থায়

দায় (Liabilities)	তহবিল ও সম্পত্তি (Assets)
গচ্ছিত—১০০০৲	নগদ—৪০০৲
	কর্জ্জ—৬০০৲

চেকের প্রচলন বাড়িয়া যাওয়ায়, কালে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, যাহারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে আসে, তাহারাও সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া একখানা চেকের বই লইয়া যায়। তখন ব্যাঙ্ককে কর্জ্জ টাকাটা হিসাবের দুই দিকে (জমা ও খরচ) লিখিয়া রাখিলেই চলে। যেমন—

দায়	তহবিল ও সম্পত্তি
গচ্ছিত—১০০০৲	নগদ—১০০০৲
ঐ ৬০০৲	কর্জ্জ—৬০০৲
১৬০০৲	১৬০০৲

মনে করুন, অভিজ্ঞতাদ্বারা যদি ব্যাঙ্ক এই কথা স্থির করিতে পারে যে, ১০০৲ এক শত টাকা যদি গ্রাহকের নিকট তাহার দেয় হয়, তাহা হইলে মাত্র ৪০৲ টাকা তাহার সিন্দুকে থাকিলেই চলে, তাহা হইলে ঐ ব্যাঙ্ক ১০০০৲ মজুদ রাখিয়া আরও ৯০০৲ টাকা (অর্থাৎ মোট ১৫০০৲ *) কর্জ্জ দিতে পারে।

দায়	তহবিল ও সম্পত্তি
গচ্ছিত—১০০০৲	নগদ—১০০০৲
ঐ ৬০০৲	কর্জ্জ—৬০০৲
ঐ ৯০০৲	ঐ ৯০০৲
২৫০০৲	২,৫০০৲

এই সময় হইতে যাহারা টাকা গচ্ছিত রাখে, তাহাদিগকে ব্যাঙ্ক গচ্ছিত-টাকার জন্য সুদ দিতে আরম্ভ করিল; কারণ গ্রাহকের ১০০০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিয়া (উপরিউক্ত হিসাব দেখুন) ব্যাঙ্ক ১৫০০৲ কর্জ্জ দিয়া লাভ করিতে পারিতেছে। ব্যাঙ্ক যে হারে গচ্ছিত-টাকার সুদ দেয়, কর্জ্জ-টাকার সুদ তাহার অপেক্ষা শতকরা ১৲ টাকা বেশী চায়।

* যোগ চিহ্ন (+) দ্বারা প্রাপ্য ও বিয়োগ চিহ্ন (–) দেয় বুঝায়।

* $\frac{৪০}{১০০ \; ৪০} :: \frac{১০০০}{x}$ অথবা $\frac{৪০}{৬০} :: \frac{১০০০}{x}$ ∴ $x = ১৫০০৲$

এক ব্যাঙ্কের চেক ভিন্ন-ব্যাঙ্কে জমা হইবার জন্য গেলে 'ক্লীয়ারিং-হাউসে' (বা নিকাশ-আপিসে) কিভাবে নিকাশ হইয়া যায়, তাহা বলিয়াছি। বাকী যেসকল চেক একই ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসে, তাহার কতক আবার সেইখানেই জমা হইয়া যায়; অবশিষ্ট অংশের জন্য শুধু রোক টাকার (coins) দরকার। যে সকল দেশে ব্যাঙ্ক প্রাচীন-প্রতিষ্ঠানে (Institution) দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সেখানে ব্যাঙ্ককে গচ্ছিত-টাকার চেক আবশ্যকমত শোধ করিবার জন্য শতকরা ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা তহবিলে রাখিলেই চলে। অতি অল্পস্থলেই শতকরা ৩০৲ টাকার বেশী তহবিলে রাখিতে হয়। সুতরাং চেকের প্রতি-টাকার নগদত্বের পরিমাণ এক-পঞ্চমাংশ হইতে এক-চতুর্থাংশমাত্র।

ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব ও চেকের স্বাক্ষরকারীর সততার উপর বিশ্বাস—এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ না ঘটিলে, চেকের এত প্রসার অসম্ভব ছিল। ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইলে, ঐ ব্যাঙ্কের নামীয় চেক কেহ গ্রহণ করিত না। স্বাক্ষরকারী যদি প্রবঞ্চক হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের নিকট টাকা গচ্ছিত না রাখিয়াও সে চেক লিখিয়া দিতে পারে।

নোট অপেক্ষাও চেকে সুবিধা বেশী। ধরুন, আপনার কাহাকেও ১১৭৸৶০ দিতে হইবে। নোটে সেই টাকা দিতে হইলে তাহাকে আপনি ১১৫৲ টাকার বেশী নোট দিতে পারেন না; বাকী ২৸৶০ রোক টাকায় দিতে হয়। চেকে এ সব কোন লেঠা নাই। ফারমে যে সংখ্যা খুসি, লিখিয়া দিতে পারেন। আবার একশত টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের নোট চুরি যাইবার আশঙ্কা বেশী। ডাকে (Post) যদি ইহাদিগকে পাঠাইতে হয়, তাহাহইলে শীল (Seal) করিয়া, ইন্‌সিওর করিয়া দিতে হয়। আমাদের "জীবন্ত লগেজ" লইয়া নড়াচিড়া করার ন্যায়, ইহাদিগকে স্থানান্তর করা ব্যয়সাধ্য ও বিপজ্জনক। চেকের উপর আবার যদি কোণাকোণি "Not Negotiable" (হস্তান্তর-অগ্রাহ্য) লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মোটেই লেঠা নাই। ইহাতে হস্তান্তরের ঠিক বাধা নাই। তবে যে ব্যক্তি ঐ প্রকার চেক অন্যকে দিবে, তাহার উহার উপর যে অধিকার ছিল, তৃতীয় ব্যক্তির (যাহাকে চেক দেওয়া হইল) তাহার অপেক্ষা বেশী অধিকার জন্মিতে পারে না। সুতরাং চোর যদি সে চেক অন্যের নিকট বিক্রী করে, তাহা হইলে ক্রেতার ঐ চেকের উপর কোন অধিকার জন্মে না। কারণ বিক্রেতা—চোর, স্বত্বাধিকারী নহে। সুতরাং এইপ্রকার চেক অনায়াসে আধ-আনার এন্‌ভেলাপের ভিতর পুরিয়া পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এমন অবস্থায় চেক যে, সকলকে ডিঙ্গাইয়া উঠিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই যে, শত শত কোটি টাকার চেক দেশে চলিতেছে, ইহারা নগদ, না নগদ-বাকী? নগদ নয়, কারণ চেকও ত একপ্রকার বরাত-চিঠি; আর বাকীও বলিতে পারি না—কারণ চেক একখানা পাইলে পাওনাদার সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়।

৩। হুণ্ডি (Bill of Exchange).

উপরে ব্যাঙ্কের হিসাবের যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে এই কথাটা ধরিয়া লইয়াছি যে, ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকা কর্জ্জই দেয়; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে আরও অন্যান্য উপায়ে সে তাহার টাকার ব্যবহার করে। তাহার মধ্যে প্রধান একটির আমরা আলোচনা করিব। ব্যাঙ্কের হিসাবে 'বিল' (Bill) বা 'বিল-অব্‌-এক্‌সচেঞ্জ' (Bill of Exchange) অর্থাৎ হুণ্ডি, ব্যাঙ্কের টাকা "লাগাইবার" (Invest) একটি প্রধান উপায়। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ এই রকম দাঁড়ায়—

দায়

মূলধন—	১,০০,০০০৲
রিজার্ভ ফণ্ড—	৩০,০০০৲
গচ্ছিত—	২,০০,০০০৲
	৩,৩০,০০০৲

সম্পত্তি ও তহবিল

কর্জ্জ—	২,০০,০০০৲
কোম্পানির কাগজ—	২০,০০০৲
ঘরবাড়ী ও আস্‌বাব—	২০,০০০৲
হুণ্ডি—	৩০,০০০৲
নগদ—	৬০,০০০৲
	৩,৩০,০০০৲

একটা নূতন কথা এই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্ক নিজের মূলধনকেও দায় বলিয়া ধরেন; কারণ ব্যাঙ্ক মূলধনের জন্য অংশীদিগের নিকট দায়ী। রিজার্ভ-ফণ্ড সম্বন্ধেও ঐ কথা। "সম্পত্তি ও তহবিলের" দিকে তিনটি নূতন কথা দেখা যাইতেছে; (১) কোম্পানীর কাগজ (২) ঘরবাড়ী ও আস্বাব (৩) হুণ্ডি। ব্যাঙ্ক-পরিচালনে বড় হুঁসিয়ারী চাই। নগদ-তহবিল যদিও গচ্ছিত-টাকার এক-চতুর্থাংশ রাখিলেই চলে, তথাপি এমন ঘটিতে পারে যে, ডিপজিটারগণ হঠাৎ একদিন সকল টাকা চাহিয়া বসিবে। সুতরাং ব্যাঙ্কের নগদ ছাড়া আর যে সম্পত্তি থাকে, তাহা এমন হওয়া চাই, যেন অনায়াসে তাহা বিক্রয় করিয়া রোক-টাকা (Cash) পাওয়া যাইতে পারে। যে সকল সম্পত্তি জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্ক ধার দেন, তাহা এমন হওয়া চাই, যেন আবশ্যকমত তাহা অবিলম্বে বিক্রয় করিতে পারা যায় এবং তাহাতে কোন লোকসান না হয়। কোম্পানীর কাগজ এই শ্রেণীর। তাহার জন্য ক্রেতার অভাব হয় না এবং দরেরও বিশেষ উঠ্তি-পড়্তি (Fluctuation) হয় না। এই জন্য ব্যাঙ্ক নিজেও কিছু কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখে।

হুণ্ডি বা বরাত-চিঠি ভাল ব্যবসায়ীর হইলে, কোম্পানীর-কাগজের অপেক্ষা কম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হুণ্ডি ছাড়া আধুনিক আন্তর্জাতীয়-বাণিজ্য অসম্ভব হইয়া পড়িত। মনে করুন, কলিকাতার 'দাস কোম্পানী' লণ্ডনে মিঃ স্মিথের নিকট ১৫,০০০৲ টাকার পাট পাঠাইল। জাহাজে সেই মাল পৌছিতে অন্ততঃ ৫ সপ্তাহের দরকার। আবার স্মিথের সেই মাল বিক্রয় করিতে আরও ৬ সপ্তাহ লাগিবে। এমন অবস্থায়, তিনমাসের পূর্ব্বে স্মিথ সেই টাকা আদায় করিতে প্রস্তুত না হইবারই কথা। এ দিকে 'দাস কোম্পানীও' তিনমাস অপেক্ষা করিতে নারাজ। তখন হুণ্ডির সৃষ্টি করে। হুণ্ডিতে এই রকম লেখা থাকে—

"কলিকাতা——

তারিখ——

অদ্য তারিখ হইতে তিন মাস (ও অনুগ্রহের তিন দিন) পর, এই হুণ্ডি-দর্শনমাত্র——কে মোট ১৫,০০০৲ টাকা সমঝাইয়া দিবে। ইহার মূল্য আমরা পাইয়াছি।

স্বাক্ষর—দাস:কোম্পানী।

মিঃ স্মিথ প্রতি—"

কাগজখানা হাতে লইয়া তখন 'দাস কোম্পানীর' লোক ব্যাঙ্ক-অব-বেঙ্গলে (বা অন্য কোন ব্যাঙ্কে) উপস্থিত হয়। ব্যাঙ্কওয়ালারা তখন তাহার মাল-চালানী-রসিদ (Bill of Lading) ও মালের জাহাজী-ইনসিওরের রসিদ পরীক্ষা করে; এবং সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে ১৫,০০০৲ টাকা হইতে বাজার-দরে তিন মাসের সুদ কাটিয়া রাখিয়া, বাকী টাকা দিয়া হুণ্ডিখানা কিনিয়া রাখে। ধরুন, যেন বর্ত্তমান সময়ে 'ডিস্কাউণ্ট' (বা সুদের দর) শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ১৷৷০ টাকা হইলে ১৫,০০০৲ টাকার বর্ত্তমান-মূল্য

$$= ১৫,০০০৲ — \left(\frac{১৫০০০}{১০০} \times ১৷৷ \right)$$

$$= ১৫,০০০ — ২২৫৲$$

$$= ১৪,৭৭৫৲ \text{ টাকা।}$$

তাহা হইলে ব্যাঙ্ক-অব-বেঙ্গল ১৪,৭৭৫৲ টাকা দিয়া হুণ্ডিখানি কিনিবে। দাস কোম্পানী হুণ্ডির পরিবর্ত্তে চেক লইয়া ফিরিয়া আসিবে।

বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক লণ্ডনে তাহার ব্রাঞ্চ-আপিসে বা এজেণ্টের নিকট হুণ্ডিখানা ডাকে পাঠাইয়া দেয়। তাহারা হুণ্ডিখানা স্মিথকে দেখাইলে সে কোণাকোণি লিখিয়া দেয় "গৃহীত হইল—স্মিথ"। তখন ব্রাঞ্চ-আপিস হুণ্ডিখানা তাহাদের "সম্পত্তি"রূপে তিন মাস রাখিয়া দিতে পারে। সময় হইলে (when it matures) স্মিথের নিকট হইতে ১৫,০০০৲ টাকা আদায় করিয়া লয়। স্মিথ তখন তাহার ব্যাঙ্কের নামে চেক্ লিখিয়া দেয়। আবার সেই চেক হয়ত 'ক্লিয়ারিং-হাউসে' নিকাশ হইয়া যায়।

স্মিথ যদি ব্যাঙ্ক-মহলে (in Banking-circles) পরিচিত না হয়, তাহাহইলে একটু গোল বাধিতে পারে। স্মিথ তিনমাস পরে যে টাকা আদায় করিবে, তাহার বিশ্বাস কি? তাহাহইলে স্মিথ কোন 'একসেপ্টিং-হাউসের' (Accepting House) শরণ লয়। তাহারা স্মিথকে জানে এবং বিশ্বাস করে; এবং কিছু কমিশন পাইলে তাহারা হুণ্ডিখানাতে তাহাদের নামটাও স্বাক্ষর করিয়া দেয়;—অর্থাৎ, স্মিথ টাকা দিতে অসমর্থ হইলে তাহারা

টাকা শোধ করিবে। বাজারে 'এক্‌সেপ্‌টিং-হাউসের' খাতির (Credit) যথেষ্ট থাকায়, সেই হুণ্ডি তখন চেকের মত চলিতে থাকে। তখন ব্যাঙ্ক-অব-বেঙ্গলের লণ্ডন-ব্রাঞ্চ আবশ্যক বোধ করিলে, হুণ্ডিখানা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। অবশ্য বিক্রয় করিলে বাজারদরে তাহার যে বর্ত্তমান-মূল্য (Present-Worth) তাহাই পাইবে। সাধারণতঃ, কলিকাতার অপেক্ষা লণ্ডনে ডিস্‌কাউণ্টের (সুদের) দর কম, সুতরাং হুণ্ডি বিক্রয় করিলে মূল্য বেশী পাওয়া যাইবে। তাই ভাল হুণ্ডির এত আদর। ব্যাঙ্ক ইহাকে "লগ্নির" (Investment) মধ্যে আদর্শ-স্থানীয় মনে করে। এক প্রকার ব্যাঙ্ক আছে, যাহাদের ব্যবসায়ই হুণ্ডি-ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা লাভ করা। ইহাদের নাম 'ডিস্‌কাউন্ট্‌-হাউস্‌' (Discount-House)। ফলে, হুণ্ডির ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় ভিন্ন দেশে জিনিষ ক্রয় করিলেও জাহাজে বোঝাই দিয়া মুদ্রা পাঠাইতে হয় না।

স্মরণ রাখিবেন, পূর্ব্বোক্ত হুণ্ডি-বাবদ ব্যাঙ্ক-অব-বেঙ্গলের নামে লণ্ডনে ১৫০০০৲ টাকা জমা আছে। এখন কলিকাতার কোন ব্যবসায়ী যদি লণ্ডনে টাকা পাঠাইতে চায়, তাহা হইলে সে বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের লণ্ডনের ব্রাঞ্চ-আপিসের নামে একখানা বরাত-চিঠি (draft) কিনিয়া আনে। কলিকাতার ব্যবসায়ী তখন লণ্ডনের পাওনাদারের নিকট কাগজখানা পাঠাইয়া দেয়। টাকার মুখ আর কেউ বড় একটা দেখে না; বিশেষতঃ যেখানে টাকার পরিমাণ বেশী, সেখানে ত মোটেই না।

ভারতীয়-বাণিজ্যের আর একটা সুবিধা—"ভারত-সচিবের কাউন্‌সিল্‌-বিল" (Council Bills of the Secretary of States for India)। বিলাতে ভারত-সরকারের অনেকপ্রকারের দেয় (dues) আছে। তাহা শোধ করিবার জন্য ভারত-সচিব, ভারত-সরকারের নামে বরাত-চিঠি (drafts বিক্রয় করেন। তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা বিলাতের দেনা শোধ করা হয়। যাহাদের বিলাত হইতে ভারতে টাকা পাঠাইবার আবশ্যক, তাহারা সোণা না পাঠাইয়া "কাউন্‌সিল্‌-বিল" কিনিয়া ডাকে পাঠাইয়া দেয়। কাউন্‌সিল্‌-বিল দিয়া 'করেণ্‌সি-আফিস' হইতে টাকা বা নোট বাহির করিয়া লওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য ভারত-সচিব তাঁহার আবশ্যকের অতিরিক্ত টাকার "বিল" ও বিক্রয় করেন। তাহাতে বিলাতে ভারত-সচিবের কোষে বহু ক্রোর টাকার পীতমুদ্রা জমিয়া যায়। আবার ভারতীয় ব্যবসায়ী যখন বিলাতে টাকা পাঠাইতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে, তখন ভারত-সরকার, ভারত-সচিবের নামে বরাত-চিঠি বা টেলিগ্রাম বিক্রয় করেন। ইহাদিগকে "উল্‌টা-বিল" (Reverse Bills) বলে। *

ব্যবসায়ীর হুণ্ডিই হৌক, ব্যাঙ্কের বরাত-চিঠিই হৌক, ভারত-সচিবের কাউন্‌সিল্‌-বিল বা টেলিগ্রামই হৌক—ইহারা সকলেই ধাতব-মুদ্রাকে ব্যবসায়-ভূমি হইতে বেদখল করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। ইহারা সকলেই যে অন্ত্যজ—কাগজের টাকা মাত্র—ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ এদের "বাকী" বলিলেও গালি দেওয়া হয়। কিন্তু আর যাই বলুন, 'নগদ' বলিতে পারি না। কি বলিব?—নগদ-বাকী?

এমনই ভাবে, আমরা সকল কাজে টাকাকে পশ্চাতে ফেলিয়া "কাগজকে" প্রাধান্য দিতেছি। নগদের নামে, নগদ ও বাকীর একটা খিচুড়ীকে তক্তটা ছাড়িয়া দিয়াছি। টাকা ভারি, চাই নোট। নোটে খুচরা হয় না, আদর করি চেক। বিদেশে চেক চলে না, কিনিয়া লই হুণ্ডি, না হয় বরাত-চিঠি। হুণ্ডি দুষ্প্রাপ্য হইলে সরকারী বরাত-চিঠি বা টেলিগ্রাম। সভ্যতা-বিকাশের প্রধান সহায় নগদ টাকা—ধাতব মুদ্রা—আজ সম্মানের পরিবর্ত্তে কৃপার পাত্র! চেক, হুণ্ডি বা বরাত-চিঠি, এমন কি নোটও যেখানে গররাজি (অথবা 'ভক্তিবিহীন'—এমন কোন অব্যবসায়ী যদি থাকে যে, কাগজের টাকার উপর শ্রদ্ধাহীন) সেই স্থলে এই 'কুলীন'-মহাত্মার ডাক পড়ে! বর্ত্তমান-যুগের ধর্ম্ম-হীনতার আর পরিচয় আবশ্যক কি?

II

টাকার পরিমাণ ও ভারতীয়-দুর্ম্মূল্যতা।

বর্ত্তমানকালের একদেশদর্শিতারও একটা প্রমাণ দেখুন। দেশের সকল জিনিষের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৯০ হইতে ১৯১২—এই ২৩ বৎসরে, গড়ে সকল জিনিষের

* ১৯০৮ ও ১৯১৫ সালে ভারত-সরকার এই প্রকার বরাত-চিঠি ও টেলিগ্রাম বিক্রয় করিয়াছেন।

দর শতকরা ৪১৲ টাকা হিসাবে বাড়িয়া গিয়াছে। একদল বলিতেছেন "যত দোষ ঐ টাকার। তাহার বংশ এত বৃদ্ধি পাওয়াতেই জিনিষের দর এত বাড়িয়া গিয়াছে।" আর একদল টাকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—"হইলই বা টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি। তা'তে কি? আমার হাতে টাকা যদি বেশী আসে, তাহা হইলে কি আমি দশ টাকার জিনিষের জন্য ১৪৲ টাকা দিই? বরং ১০৲ টাকা খরচ করিয়া বেশী ৪৲ টাকা রাখিয়া দিই। যার ২০৲ টাকা সম্বল, সেও যদি ৫৲ টাকা মণ চাউল কিনে, ২০০৲ টাকা হাতে থাকিলেও সেই ব্যক্তি সেই চাউল ৫।০ টাকা দিয়া কিনিবে না।" ইঁহারা গোড়াতেই ভুলিয়া যান যে, "চল্‌তি-টাকা" (money in circulation) লইয়াই কথা হইতেছে; সিন্দুকের টাকাকে বাদই দেওয়া হয়। টাকার সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায়, তাহাহইলে সুদের হার কমিয়া যায়, কর্জ্জও বেশী পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায়ীরাও চড়া-দরে জিনিষ কিনিতে পারে; ব্যবসায়ী ক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এই ভাবেই টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, জিনিষের দর বাড়িতে থাকে। আরও এক-প্রকারে কথাটাকে প্রমাণ করা যায়।

ধরুন, যেন একদেশে কেবলমাত্র এক প্রকার ১০০টি দ্রব্য আছে এবং তাহার প্রত্যেকটির মূল্য ॥০ আনা। তাহাহইলে সেই দেশের ব্যবসায়ের জন্য ৫০৲ টাকার দরকার। অথবা—

আবশ্যক টাকার সংখ্যা = দ্রব্যের সংখ্যা × প্রত্যেকটির মূল্য।

$= ১০০ \times \frac{১}{২} = ৫০৲$

এখন যদি এমন হয় যে, প্রত্যেকটি টাকা বৎসরে দুই হাত ঘুরে, তাহা হইলে প্রত্যেকটি টাকা প্রকৃতপক্ষে ২টি টাকার কার্য্য করে। তাহাহইলে—

$$\text{আবশ্যক টাকার সংখ্যা} = \frac{\text{দ্রব্যের সংখ্যা} \times \text{প্রত্যেকটির মূল্য}}{\text{টাকার হস্তান্তরের দ্রুততা}}$$

তাহা হইলে উপরিউক্ত উদাহরণে—

$$\text{আবশ্যক টাকার সংখ্যা} = \frac{১০০ \times \frac{১}{২}}{২}$$

$$= \frac{৫০}{২} = ২৫$$

সুতরাং টাকার সংখ্যা যদি জানা থাকে, তাহাহইলে উপরিউক্ত Formula (ফরমূলা) হইতে দ্রব্যের মূল্যও স্থির করা যাইতে পারে। যেমন—

$$\text{টাকার সংখ্যা} = \frac{\text{দ্রব্যের সংখ্যা} \times \text{প্রত্যেকটির মূল্য}}{\text{টাকার হস্তান্তরের দ্রুততা}}$$

সুতরাং

টাকার সংখ্যা × টাকার দ্রুততা = দ্রব্যের সংখ্যা × প্রত্যেকটির মূল্য।

সুতরাং

$$\frac{\text{টাকার সংখ্যা} \times \text{টাকার দ্রুততা}}{\text{দ্রব্যের সংখ্যা}} = \text{প্রত্যেকটির মূল্য।}$$

যদি আমদানি ও কাট্‌তি স্থির (constant) ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাহইলে যে কোন দেশের জিনিষের

$$\text{গড়-মূল্য} = \frac{\text{মোট টাকার পরিমাণ} \times \text{টাকার দ্রুততা}}{\text{জিনিষের মোট পরিমাণ}}$$

একটি টাকা বৎসরে কত হাত পরিবর্ত্তন করে, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না—স্থির থাকে। এমন অবস্থায়, যদি জিনিষের পরিমাণও স্থির (অপরিবর্ত্তিত—fixed) ধরিয়া লওয়া যায়, এবং মোট-টাকার পরিমাণকে যদি তিনগুণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলে গড়-মূল্যও (average prices) যে তিনগুণ পড়িয়া যাইবে, তাহা প্রমাণ করিতে গণিতের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন নাই।

কোন কোন সময়ে এমন ঘটিতে পারে যে, টাকার পরিমাণ বাড়িয়া দ্বিগুণ হইল, অথচ টাকার হস্তান্তরের দ্রুততা অর্দ্ধেক হইয়া গেল; তাহা হইলে মূল্য বাড়িবে না। অথবা, সেই অবস্থায় দ্রুততা স্থির থাকিয়া যদি জিনিষের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া যায়, তাহা হইলে গড়মূল্য স্থির থাকিয়া যাইবে। তবে বাস্তব-জগতে মূল্যের determinant (সংঘটক) যতগুলি শক্তি আছে, তাহারা একাকী (singly) কার্য্য করিতে দেখা যায় না। তিনশক্তির মিলিতফল (combined effect) কি দাঁড়াইবে, তাহা একটিমাত্র বিষয় (factor) আলোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে না। তবে যে কোন শক্তির গতি—ঊর্দ্ধ বা অধঃ—পরিমাপ করিতে পারিলে ইহা সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না, ঐ

শক্তির চেষ্টা (tendency) গড়-মূল্যকে তাহার দিকে (তাহার ক্রিয়ানুসারে) পরিবর্ত্তিত করা। যেমন ধরুন, মালের পরিমাণ তিনগুণ বাড়িয়া গেল; তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না যে, ঐ শক্তির চেষ্টা (tendency) মূল্যকে এক-তৃতীয়াংশ করিয়া ফেলা। সুতরাং টাকার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহাহইলে সেই অনুপাতে মূল্যকে বাড়াইয়া দিবার একটা চেষ্টা (tendency) রহিয়াছে বলা অন্যায় নয়। তবে তাহার পরিমাণ-বৃদ্ধি জিনিষের পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা আবশ্যক। অল্পকালের মধ্যে কোন দেশের মুদ্রার প্রচলনের দ্রুততার (Rapidity of cirulation) বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং ঐ শক্তিটাকে (factor) স্থির (constant) ধরিয়া লইতে পারি। তাহাহইলে গড়-মূল্যের নিয়ামক (determinant) শক্তি রহিল টাকার সংখ্যাও দ্রব্যের পরিমাণ। ১৮৯০-৯৪—এই পাঁচ বৎসরের গড় লইয়া তাহাকে যদি ১০০ ধরিয়া লই, তাহা হইলে ১৯১১ সালের * টাকার পরিমাণ –১৬০, ব্যবসায়— ২২২ ও টাকার দ্রুততা –১০০ (কারণ ইহাকে স্থির ধরিয়া লওয়া গিয়াছে); অর্থাৎ টাকা শতকরা ৬০ ও ব্যবসায় ১১২ হিসাবে বাড়িয়াছে। সুতরাং

$$\text{গড় মূল্য} = \frac{১৬০ \times ১০০}{২২২}$$

$$= ৭২ \text{ (কিঞ্চিদধিক)}$$

যে সকল সংখ্যা আমরা পাইয়াছি, তাহাহইতে আমরা আশা করিতে পারিতাম যে ১৮৯০—৯৪ এই পাঁচ বৎসরের গড়কে ১০০ ধরিয়া লইলে, ১৯১১ ইংরাজিতে তাহার আনুমানিক মূল্য ৭২ হইত; অর্থাৎ মূল্য শতকরা ২৮৲ হিসাবে কমিয়া যাইত। অথচ প্রকৃতপক্ষে গড়-মূল্য ছিল ১৩৪—শতকরা ৩৪ টাকা বেশী!

কিন্তু টাকা হিসাব করিতে গিয়া আমরা খাঁটি নগদ ও নোটকেই ধরিয়াছি—"নগদ-বাকী"কে ধরি নাই। বাণিজ্য-জগতে নগদ-বাকীর চলনই যখন বেশী, তখন তাহার পরিমাণ হইতে কোন সন্তোষজনক জবাব পাই কি না, দেখা দরকার।

দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বৃদ্ধিকেই (K. L. Datta's Report, Chap VII. p. 95) নগদ-বাকীর বৃদ্ধির মাপ-কাটি ধরিয়া লইলাম। এই প্রকার হিসাব অবশ্য অনেকটা স্থূল। ইহাতে হুণ্ডি (Bill of Exchange) বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া খুব সূক্ষ্মভাবে (accurately) গণনা করিবার সুবিধা হইবে না। ইহার দ্বারা স্থূলভাবে একটা আভাস মাত্র পাওয়া যাইবে।

$$\text{গড়-মূল্য} = \frac{১৮৬ \times ১০০}{২২২} = ১২৯$$

অর্থাৎ গড়-মূল্য শতকরা ২৯৲ টাকা হিসাবে বাড়িত। ইহার মধ্যে হুণ্ডিকে আনিতে পারিলে আরও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইত। তাহার কোন সুবিধাজনক Statistics (সংখ্যাসংগ্রহ) আমরা পাই নাই।

গত ২০।২৫ বৎসরে আমাদের দেশে প্রাচীন-প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া টাকার প্রচলন বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে, যেখানে দ্রব্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করা হইত, সেখানে টাকার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং টাকার আবশ্যকতাও বাড়িয়াছে। অন্যদিকে, টাকার হস্তান্তরের সুবিধা বর্দ্ধিত হইয়া সেই আবশ্যকতা কতক পরিমাণে কমিয়াও গিয়া থাকিবে। জিনিষের আমদানি ও কাট্‌তির উপর তাহার মূল্য অনেকটা নির্ভর করে। গত ২২ বৎসরে এই সকল শক্তির ক্রিয়াও মূল্যে হয় ত প্রকাশ পাইয়াছে।

তবে এই কথা ঠিক, দ্রব্যাদির মূল্য যদি টাকার (money) আধিক্যহেতু পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য খাঁটি নগদ-টাকা দায়ী হইতে পারে না। যদি কেহ দায়ী থাকে তবে সে নগদ-বাকী অর্থাৎ বর্ত্তমান বাণিজ্যের কাগজের-টাকা। অন্ত্যজ জাতির স্বভাবসুলভ উর্ব্বরতা হেতু তাহার বংশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কুলীন "মুদ্রা-গোত্রীয় রজতচক্র" তাহার সঙ্গে বংশবৃদ্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং দোষের ভাগটাও তাহার ঘাড় হইতে নামাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

আবার বিবেচনা করুন, গত বারবৎসরে নগদ-টাকার যে কিছু বংশবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার দোষ বা গুণের জন্য দায়ী ভারত-সচিবের কাউন্‌সিল-বিল। কারণ গত কয়েক বৎসর যাবৎ সরকার (Govt.) কাউন্‌সিল-বিল শোধ করিবার জন্যই প্রধানতঃ নূতন টাকা মুদ্রিত করিয়াছেন।

---

* এই সকল সংখ্যা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত—'Enquiry into Rises of Prices in India.

কাউন্‌সিলই ভারতীয়-বাণিজ্যে অনেকস্থলে হুণ্ডির কার্য্য করে সুতরাং কাউন্‌সিল-বিলের বৃদ্ধির জন্য দায়ী বাণিজ্য ও বণিক-সম্প্রদায়। পুনর্মুদ্রিত পুরাতন টাকার সংখ্যা বাদ দিয়া খাঁটি নূতন-মুদ্রিত টাকার সংখ্যা ও বিক্রীত কাউন্‌সিল-বিলের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যে কত নিকট, তাহা নিম্নের তালিকায়ই স্বপ্রকাশ।

সরকারী বৎসর	খাঁটি নূতন মুদ্রিত টাকা	বিক্রীত কাউন্‌সিল বিলের পরিমাণ
১৯০৪-০৫	৭, ৮১ লক্ষ	৩৬,১২ লক্ষ
১৯০৫-০৬	১৬, ৮৮ "	৪৭, ৬৯ "
১৯০৬-০৭	২৩, ৩৮ "	৫০, ৪৭ "
১৯০৭ ০৮	১৫, ৭০ "	২৩, ৪৬ "
১৯০৮-০৯	২৪ "	৮, ০২ "
১৯০৯-১০	১১ "	৪১, ৪৯ "
১৯১০-১১	২০ "	৩৯, ৪৪ "
১৯১১-১২	৩ "	৪০, ১৬ "
১৯১২-১৩	১৬,০০ "	৩৮, ৮৩ "
১৯১৩-১৪	১০,২০ "	৪৬, ৬০ "

১৯০৭ সালে আমেরিকায় যে অর্থসমস্যা (Banking-crisis) উপস্থিত হয়, তাহার ফলে পরবর্ত্তী বৎসরে (১৯০৮-০৯ সালে) বিক্রীত কাউন্‌সিল-বিলের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ভারত-সরকার ভারত-সচিবের নামে বরাত-চিঠি ও টেলিগ্রাম বিক্রয় করেন। ফলে ভারতীয়-রাজকোষে টাকার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

১৯০৮-০৯ সালে সরকারের রিজার্ভ-ফণ্ডে নোটের অনুপাতে রোকটাকা শতকরা ১০৩টি হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০৯-১০ শতকরা ৬১.৬ এবং ১৯১০-১১ সালে শতকরা ৫২.৮টি থাকিয়া যায়। ১৯১১-১২ সালের পূর্ব্বের রিজার্ভ-কোষের এই অবস্থা দূরীভূত না হওয়ায়, সরকার-বাহাদুর ১৯০৮ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক টাকাই মুদ্রিত করিয়াছেন।

সুতরাং নগদ-টাকার বংশবৃদ্ধি বা লোপের জন্য কাগজের টাকাই দায়ী। নগদ-টাকা হইতে জন্মলাভ করিয়া বর্ত্তমানে 'নগদ-বাকীই' নগদের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং টাকার (money) উপর যদি কোন অভিযোগ থাকে, তাহাহইলে নগদকে বাদ দিয়া নগদ-বাকি বা কাগজের টাকার সঙ্গে বুঝাপড়া করুন।

বীর

[শ্রীসূর্য্যকুমার আইচ্ বি, এল]

অন্তিমভেরী ডেকেছে তোমায় জীবন তটিনী পারে ;
বিজয়মন্ত্র সম হে সাধক, লয়েছ হৃদয়ে তারে !
মায়ার সোহাগ-অঞ্চলখানি, মোহন আঁখির পাশ,
পরাজয় মানি গিয়াছে ফিরিয়া, বিদায়-বিধুর হাস।
মরণের দেওয়া অমর টীকাটী আছে তব ভালে থির,
ব্যর্থ নহে গো সাধনা তোমার, হে মম সাধক বীর!

লয়ে অপমান হারসম বুকে রিপুরে দিয়েছ মান,
পাষাণ ভেদিয়া উঠেছে তাহার রুদ্ধ-আকুল-তান।
দুঃখ তোমার অসীমে পড়িয়া আপনা গিয়াছে ভুলে,
দর্প, কামনা লভেছে শান্তি অক্ষয়বটমূলে।
আপনা বিলায়ে দিয়েছ ধরারে মহান মনীষী ধীর ;
ধরারে জিনেছ ওগো ধরানাথ, তুমি গো হেথায় বীর !

সারা জীবনের সুধা পিয়ে আহা বাড়িল আশার লতা,
নিঠুর সংসার বুক হ'তে কাড়ি লুটায়ে দিয়াছে কোথা !
ব্যর্থ-জীবন ভরিয়া উঠেছে বিপুল মরণ-গান,
তবু ত সারাটি বিশ্বের হিতে আপনা দিয়েছ দান !
দৈন্যে ভরিয়া ঝুলিটি তোমার, সন্তোষে নতশির
জনম-নিরাশি ! ধন্য তুমি গো, অকাম প্রেমিক বীর !

তমালে বেড়িয়া নবীনা মাধবী আশার প্রদোষে দুলে,
দারুণ ঝঞ্ঝা হরি সে তমাল লুকাল অজানা-কূলে।
লুটিল নবীন মাধবী-জীবন, বিশ্ব ভুলিল তারে,
তবু সে কেমনে শ্রান্তে জুড়ায় স্নেহের ক্ষীরোদ-ধারে !
ভুবন তোমার ধরারে বিলায়ে লয়েছ বাকল চির,
ধন্যবঙ্গবিধবাবালা গো, ত্রিলোকে অতুল বীর !

মালতী

[শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী]

রাইচরণ সাহা রামপুর গ্রামের একজন নামজাদা জমিদার। সাহা পরিবারের মধ্যে সাহেবিয়ানা অনেকটা অধিকার লাভ করিলেও, হিন্দুত্বটাকে সেখান হইতে একেবারে যে নির্ব্বাসন দেওয়া হয় নাই, তাহার প্রমাণ রাইচরণের কন্যা মালতী অষ্টমবর্ষে পিতামাতাকে গৌরীদানের পুণ্যসঞ্চয়ের সুবিধা দান করিয়া নয়বছর বয়সেই বিধবা হইয়াছে। এই পরিবারের মেয়েরা বিবাহের পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে থাকে এবং প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানে। বঙ্গসাহিত্যে কখন কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এ খোঁজ তাহারা না রাখিলেও, বঙ্গ-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য এবং অনেক বাজে উপন্যাস ও গল্প ইহারা পড়িয়া থাকে। মোটের উপর এই সাহা-পরিবার শিক্ষিত ছেলেমেয়েতে পূর্ণ; কিন্তু সমাজের মধ্যে এই পরিবারের বদ্‌নাম আছে। যাঁহারা গোঁড়া-হিন্দু, তাঁহারা বলেন—"রাইবাবুর পরিবার নামে হিন্দু; ওদের বাড়ীতে ম্লেচ্ছ-আচারের ত ত্রুটি হয় না।" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যাঁহারা কুসংস্কার-বর্জ্জিত-সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লিখাইয়াছেন, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন—"সাহা-পরিবার মাত্র কয়েক বিষয়ে সংস্কার-বর্জ্জিত। অন্ধ-সংস্কার ওঁদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে;—এই দেখ না, আটবছরে মেয়ের বিয়ে, আর নয়বছরেই সে মেয়ে বিধবা।" ইত্যাদি।

সমাজের মধ্যে এই পরিবারের এমন একটা বদ্‌নামের কারণ যে নাই, তাহা নহে। এই পরিবারে অতি বাল্যকালেই মেয়েদের এবং ছেলেদের বিবাহ দেওয়া হয়। রাইচরণ বাবু মনে করেন, হিন্দু-সমাজে যখন এই প্রথা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন অবশ্যই এর একটা গূঢ় কারণ আছে; প্রতিমা-পূজা কিম্বা ঐ ধরণের অন্যান্য পূজা অর্চ্চনাও একটা নিগূঢ় কারণে স্থাপিত। সুতরাং যতই সংস্কার ছেদন কর না কেন—ওসব রীতি-নীতি বদ্‌লান ভাল নয়, অর্থাৎ অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া এবং পুতুল-পূজা করা হিন্দু-সমাজের কল্যাণকর।

ওপাড়ার যাদব বসু রাইচরণের বিশেষ বন্ধু। তিনি বাস্তবিকই সংস্কার-বর্জ্জিত, অথচ হিন্দুসমাজের বাহিরে নন। সমাজের মধ্যে তিনি প্রাচীন-সম্প্রদায়ের কাছে নিন্দাভাজন হইলেও নব্য-সম্প্রদায়ের নিকট মাননীয়। রাইচরণের সহিত যাদব বসুর সব বিষয়েই মতে মিলিত—কেবল মিলিত না ওই অল্পবয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়ায় এবং পুতুল-পূজায়। কিন্তু এইরূপ মতভেদেও তাঁহাদের উভয়ের হৃদ্যতায় কোন ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয় নাই।

(২)

মালতী রাইচরণের বড় আদরের মেয়ে। কাজেই নয় বছর বয়সে যখন সে বিধবা হইল – পিতার মাথায় যেন বাজ পড়িল। গোলাপের কুঁড়ির মত সে ভবিষ্যৎ-বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ দুর্দ্দৈবের পাকে তাহাকে নষ্ট করিল, এই কথা ভাবিয়া রাইচরণ আকুল হইলেন। কৃপা মালতীর মা। মেয়ের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি কেবলই কাঁদিতেন, কেবলই মালতীকে কোলের কাছে টানিয়া 'হা হুতাশ' করিতেন। অবোধ বালিকা মালতী সে কান্নার তেমন কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইত না; তাই সে মাকে কতদিন সরল-ভাবে বলিয়াছে "মা,—তুমি কাঁদ কেন, তোমার কান্না দেখে আমার কান্না পায়। বর মরে' গেলে কেন এত কাঁদ! কেঁদ না।" মা কাঁদে, তাই মালতীর কান্না পায়! স্বামীকে মালতী বিবাহের সময় একবার এবং বিবাহের পর মাত্র কয়েকদিন দেখিয়াছে। সেই দেখার মধ্যে সে কোন আনন্দ পায় নাই, কোন স্ফূর্ত্তি পায় নাই; সে পাইয়াছিল—ভয় ও বেদনা; সেইজন্য বিবাহের পর তাহাকে যে কয়েক-দিন শ্বশুরবাড়ী থাকিতে হইয়াছিল, সে কয়েকদিন সে কেবলই কাঁদিত। রাত্রিতে স্বামী শয্যায় আসিলে সে ভয়ে জড়সড় হইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিত—আর বলিত—"আমি মার কাছে যাব।" স্বামী তাহার কাছে একটি অপরিচিত, কঠোর পুরুষ বলিয়া বোধ হইত।

শ্বশুরবাড়ী হইতে যেদিন সে মার কাছে আসিল, তাহার মনে হইল যেন জেলখানা হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

মেয়ে মাছ মাংস খাইবে না, অথচ বাড়ীর অন্য সকলে মাছ মাংস খাইবে; ইহা রাইচরণের চিত্তকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি মালতীকে লইয়া সস্ত্রীক আর একটি বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। বাড়ী-পরিবর্ত্তন করার উদ্দেশ্য এই যে—সেখানে রাইচরণ ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই কন্যার খাতিরে আমিষ-ভোজন ত্যাগ করিবেন; ভাই খুড়াদের সহিত একত্র থাকিলে সেখানে সকলেই আমিষ খাইবে, অথচ মেয়ে মালতী তাহা দেখিবে, ইহা রাইচরণের কাছে আদৌবেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না।

সকলেই মালতীকে প্রত্যহ নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সে যে বিধবা! মালতী তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হইয়া হাসিয়া বলিত,—"আমি বিধবা!" সে বিধবা হইয়াছে, সে তাহার দিদিমার মত আলো-চাউলের ভাত খায়—সাদা কাপড় পরে,—মাঝেমাঝে একাদশী করে,—ইহা তাহার কাছে এক নূতন আনন্দ বলিয়া মনে হইল। সে এরমধ্যেই যে কয়েকবিষয়ে সমবয়সীদের ছাড়াইয়া দিদিমার সহিত এক হইয়াছে, ইহা তাহার শিশু-জীবনের গর্ব্বকে যেন বাড়াইয়া তুলিল। পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা যখন তাহাদের বাড়ীতে খেলা করিতে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিত—"মালু, তোর ত বর মরে গেছে, তুই ত বিধবা। আচ্ছা ভাই, তোর কষ্ট হয় না? আর ত বিয়ে হবে না।" ইত্যাদি। মালতী বেশ সরল ভাবে, অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে বলিত—"বিয়ে হবে না; বেশ, বিয়ে করব না। আমি পুঁতুল বিয়ে দেব। তোদের বাড়ী কুল পেড়ে খাব; তারপর রাত্তির হ'লে দিদিমার কাছে শুয়ে উপকথা শুনব।" মালতীর সরল মুখের এই সব সরল কথা শুনিয়া, যাহারা তাহার সমবয়সী, তাহারা চুপ করিত, কিম্বা অন্য কিছু খেলার জন্য অনুরোধ করিত; অন্যান্য সকলে কেহ হাসিত, কেহ বা চোখের জল ফেলিত।

(৩)

কমলিনী যাদব বসুর মধ্যমা-কন্যা, বয়স ত্রিশ। সে আজ চারি বৎসর হইল স্বামীকে হারাইয়াছে। পনরবছর বয়সে যোগেশের সহিত যখন তাহার প্রথম মিলন হইয়াছিল, যোগেশ তখন পঁচিশবছরের তরুণ যুবক; কমলিনীও তখন যৌবনের তারুণ্যে ভরপুর ছিল। উভয়ের হৃদি-মিলনে তখন প্রেমের বাতাস বেশ ঢেউ তুলিয়াছিল। সংসারের মধ্যে তাহারা উভয়ে উভয়কে যেন অত্যন্ত আপনার বলিয়া চিনিয়াছিল। সূর্য্যের অভাবে যেমন পদ্ম ম্রিয়মাণ হইয়া যায়, যোগেশের অনুপস্থিতিতে তেমনই কমলিনীর প্রাণ কাতর হইত। সংসার যেদিন তাহাদের ললাটে শুভ-চন্দন পরাইয়া—বধূ বলিয়া স্বীকার করিল, সেইদিন প্রেমের দূত আসিয়া তাহাদের দুইটি কোমল-প্রাণের উপর প্রেমের মায়া ঢালিয়া দিল, বনের কপোত-দম্পতীর ন্যায় তাহারা সংসারে বিচরণ করিতে লাগিল।

কমলিনীর সে সুখের হাট যে দিন প্রথম ভাঙ্গিল, তখন তাহার মনে হইল সংসারে আর কেহ নাই;—সে যাহা দেখিতেছে সকলই মিথ্যা, সকলই স্বপ্ন। কিন্তু এই ব্যর্থতার অন্ধকারে সে বেশীদিন রহিল না। স্বামী-প্রেমের এবং অকৃত্রিম-প্রণয়ের পুণ্য-প্রভা তাহার কর্ম্মের মধ্যে, তাহার ব্যবহারের মধ্যে কয়েক বছর পরেই ফুটিয়া উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, কমলিনী ততই যেন সংসারের সর্ব্বত্র তাহার স্বামী-প্রেমের মহিমা দেখিতে লাগিল। তাহার অন্তর হইতে উদ্দাম কামনার তেজ কমিয়া আসিল—তাহার হৃদয় পবিত্রতার আস্বাদ পাইতে লাগিল। যাদব বসুর সংসারে কমলিনী আজ মায়ের স্থান অধিকার করিয়াছে;—বাড়ীর ছোট বড় সকলকেই সে মাতৃস্নেহে দেখিতেছে—সকলের সেবার মধ্যেই সে প্রিয়তমের সত্য প্রেমকে উপলব্ধি করিতেছে। স্বামী-বিয়োগের দারুণ আঘাতই তাহার অন্তরে চিরদিনের জন্য স্বামীপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করিল।

(৪)

মালতী এখন নবযৌবনের প্রভায় উজ্জ্বল। তাহার চোখেমুখে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যৌবনের তারুণ্য ফুটিয়াছে। তাহার সাজ বিধবার বটে, কিন্তু তাহার সকল তনুমন কিছু স্বতন্ত্রভাবে মণ্ডিত। সে যেন কোন দেবতার পূজার অনাঘ্রাত পুষ্পার্ঘ্য,—পূজার অপেক্ষায় পথ-চাহিয়া আছে। তাহার অন্তরের সৌরভ এখন চোখে মুখে ভরিয়া উঠিতেছে। আজ যখন কমলিনীর সহিত দেখা হইল, তখন তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। সে কমলিনীকে ছোটকাল হইতেই চেনে, বিশ্বাসও করে। তাই সে কহিল—"দিদি, আচ্ছা বল ত

বিধবার জীবনে কি কোন কামনা নাই? সে কি পাষাণ? সে কি পুতুল?” কমলিনীর মাতৃহৃদয় যুবতী মালতীর করুণ-প্রশ্নে দুঃখে দ্রব হইয়া গেল। কমলিনী বেশ জানিত, যে নারী-জীবনে কোনদিন স্বামীকে পায় নাই, স্বামী-প্রণয়ের অমৃত যাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, বৈধব্য তাহার পক্ষে অসহ্য। যে কোনদিন কাহারও ভালবাসা পায় নাই, সে সহসা অন্যকে বিনা-কিছুর বিনিময়ে হৃদয় দিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে নারী, জীবনের, যৌবনের প্রভাতে প্রণয়ের অমৃত-স্বাদ পাইয়াছে, যে স্বামীকে চিনিয়াছে, তাহার বৈধব্যের মধ্যে বেদনা আছে সত্য, কিন্তু সেই বেদনার অন্তরালে প্রেমমন্দাকিনী নিত্য বহিতেছে; সেখানে প্রেমের পূজা হইতেছে। তাই সে মালতীকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—“ভাই, কাদিস্ নে। তোর ত জীবন পাষাণ নয়, তুই ত করুণায়, প্রেমে ভরা।” মালতীর হৃদয় কমলিনীর স্নেহবাক্যে আরও যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। কমলিনীর দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

মালতী উপরতলা হইতে একদৃষ্টে তাহা দেখিল।

(৫)

রামপদ রাইচরণের বাড়ীর দেওয়ান-বাবুর মধ্যম-পুত্র। এই বালকটি বেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও দৃঢ়চরিত্র। সে রোজই বাবুদের বাড়ী আসে। মালতী প্রত্যহ তাহাকে দূর হইতে চাহিয়া দেখে, কোন কথাই বলে না। রামপদও মাঝে মাঝে মালতীর সাম্‌নে পড়ে, কিন্তু কেমন আল্‌গা-মনা হইয়া চলিয়া যায়।

একদিন দ্বিপ্রহরে রামপদ বাবুদের বাড়ীতে আসিয়া জল চাহিল। বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য ঠাকুরদাস তাহাকে জল দিবার জন্য আসিতেছে, এমন সময় মালতী উপর হইতে বলিল,—“ঠাকুরদাস, এদিক আয়!” ঠাকুরদাস উপরে গেল; একটু পরেই এক-রেকাব মিঠাই আনিয়া রামপদকে দিয়া বলিল,—“দিদিমণি দিয়েছে, খাও।” রামপদ মিঠাই খাইল, মালতী উপরতলা হইতে একদৃষ্টে তাহা দেখিল। এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, রামপদ ততই মালতীর নিকট হইতে অনেক অযাচিত উপহার পাইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় মালতী হঠাৎ রামপদর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রামপদ দেখিল তাহার সারা মুখে লজ্জার রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ তাহারই মধ্যে কামনা, লালসা দীপ্যমান। মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রাহ্মণবটুর অন্তরের মধ্যে কেমন ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এতদিনের অযাচিত উপহার—সে কি ইহারই জন্য? ব্রাহ্মণকুমারের মস্তক কি একটা ভাবনায় হেঁট হইয়া গেল। মালতী হঠাৎ যেন কি ভাবিয়া

সেস্থান ত্যাগ করিল। রামপদ চোখ তুলিয়া চাহিল, ভাবিল সম্মুখে মালতী বুঝি আছে; কিন্তু দেখিল মালতী চলিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যতটা অবজ্ঞার সঙ্গে সে মাথা নোয়াইয়াছিল, ততটা পরিমাণ আগ্রহের সঙ্গে সে আবার মালতীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল; চারিদিকে চাহিল, কিন্তু মালতীকে আর দেখিতে পাইল না।

এই ঘটনার পর হইতে রামপদ অকারণ ঘন ঘন বাবুদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল; কিন্তু রামপদ তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছে টের পাইলেই মালতী নিজকে লুকাইবার চেষ্টা করিত। ইহার পর সে আর কখন কোনদিন রামপদকে দেখা দেয় নাই।

মালতী সর্ব্বনাশের পথ হইতে জোর করিয়া নিজকে টানিয়া রাখিলেও তাহার মনের বাসনার নিবৃত্তি হইল না। সে চাহিতেছিল, নিজকে ফুলের মত পবিত্রভাবে কাহারও চরণে উৎসর্গ করিতে; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। যে চরিত্র-স্খলনের হাত এড়াইবার জন্য সে একজন তরুণ যুবককে উন্মাদ-লালসার মধ্যে ফেলিয়া নিজের হৃদয়কে কঠিন করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কয়েকমাস না যাইতেই পাড়া-প্রতিবেশী এবং স্বপরিবারের ব্যক্তিরাই তাহাকে সেই চরিত্র-দোষে দোষী স্থির করিল। দেখিতে দেখিতে মালতীর নামে সারাগ্রামে কুৎসা রটিয়া গেল। চরিত্রের উপর এইরূপ একটা কলঙ্ক আসিয়া পড়ায় কয়েক-দিন পর্য্যন্ত মালতী লজ্জায়, ঘৃণায় যেন আধমরা হইয়াছিল। সে দেখিল, সংসারে তাহাকে বন্ধুভাবে আশ্রয় দেয়, এমন কেহ নাই—সকলেই তাহাকে ধিক্কার দিতেছে। সমাজের মধ্যে তাহার চরিত্র-দোষের কুৎসা প্রবল হইতে লাগিল। এই সময় মালতীর মধ্যে কেমন একটা বিদ্রোহভাব জাগিয়া উঠিল। এতদিন সে সমাজের নিয়মকে, শাসনকে কতকটা ভয়ে, কতকটা সংস্কারে, কতকটা আত্মমর্য্যাদার জন্য মানিয়া আসিতেছিল; এখন সে দেখিল ঘরের বাহিরে গেলে যে অপমান হয়, সে অপমান ঘরের মধ্যেই বিধাতা তাহার জন্য আনিয়া দিয়াছেন। এখন সে ভাবিল—"যদি ঘরের বাহির হইয়া যাই, তাহা হইলে পতিতা হইব সত্য; কিন্তু লোকের নিত্য-কথার তীব্রজ্বালা ত আর সহিতে হইবে না। মান—সে ত ঘরের মধ্যেও নাই, বাহিরেও থাকিবে না। তবে কেন কথা সহিয়া মরি। কলঙ্কের ছিটা যখন আমার উপরে বিনা-অপরাধে আসিয়া পড়িয়াছে, না হয়—সে কলঙ্ককে সত্য-সত্যই একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। যে অপমানের কালি মাখিয়াছি, পথে বাহির হইলে তাহার আর ক্ষতিও নাই, বৃদ্ধিও নাই।"

এই সকল সর্ব্বনাশকর চিন্তা দেখিতে দেখিতে মালতীকে অত্যন্তই বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। মালতীর নবযৌবনের কামনা তাহাকে যে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে পারে নাই, সমাজের নিদারুণ সমালোচনা, অলীক কুৎসাপ্রচার তাহাকে সেই সর্ব্বনাশের অন্ধকার পথে নামাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

(৫)

সারারাত আকাশ ঘন মেঘে আছন্ন ছিল, বৃষ্টি পড়িবার খুবই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু পড়ে নাই। আজ প্রভাতে আকাশ নির্ম্মল হইয়া চারিদিকে দিব্য রৌদ্র উঠিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর তারকচন্দ্র বসু বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন, এমন সময় স্থানীয় ছোট-দারোগা একখানি পাল্‌কী লইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাল্‌কীর দ্বার বন্ধ। তারক বাবুকে সেলাম ঠুকিয়া দারোগা হোসেনবক্স বলিলেন—"হুজুর, কাল রাত্রিতে পথের পাশে একটি মেয়েকে অচেতন অবস্থায় পেয়েছি। মেয়েটির মাথায় ক্ষত আছে; সম্ভবতঃ, কেউ তাহাকে জখম করিয়াছে। হুজুর, এখন আপনি এর একটা কিনারা করুন।"

ইন্‌স্পেক্টর তারকচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"পাল্কী ঘরের ভিতরে নিয়ে চল।"—ঘরের ভিতরে যখন পাল্কীর দ্বার-উদ্ঘাটন করা হইল, তারক বাবু দেখিলেন মেয়েটির মুখ পরিচিত; কিন্তু তিনি ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছেন না, মেয়েটি কে? তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় কমলিনী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল—"কাকা, আজ বাজারে কে যাবে? বেলা যে বেড়ে যাচ্ছে।" তারকচন্দ্র সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিলেন—"মা, একবার এদিকে আয় ত।"—কমলিনী আসিল। পাল্কীর ভিতরে চাহিয়াই কমলিনী শিহরিয়া উঠিল;—কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"কাকা, এ ত রাইচরণ বাবুর মেয়ে।" তারকবাবু বিস্ফারিত-নেত্রে কহিলেন— "বলিস্ কি, মালতী?"

"দিদি তুমি ত আমায় ভালবাস; আমার কথা শুন্‌বে?"

(৬)

কয়েকদিন যত্ন এবং সেবার পর মালতী সুস্থ হইয়া উঠিল। কমলিনী তাহাকে অত্যন্ত আপনার মত ভালবাসিত। মালতীর মনে হইল এতদিন পরে যেন সে আশ্রয় পাইয়াছে; কিন্তু এই আশ্রয়ের মধ্যে তাহার প্রাণে শান্তি নাই। তাহার প্রাণের সকল কামনাই প্রায় লোপ হইয়া আসিতে লাগিল;—তাহার যৌবন তাহার দেহের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতে লাগিল;—তাহার সুন্দর আঁখি দিনান্তের স্থলপদ্মের মত শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল;—তাহার অঙ্গের লাবণ্য অঙ্গেই লোপ পাইতে বসিল। কমলিনীর অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নকে ফাঁকি দিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া মালতীর সকল সৌন্দর্য্য, সকল সৌকুমার্য্য, এক একটি দিন আসে, আর অসাড়ে চুরি করিয়া লইয়া যায়। কমলিনী বহু যত্ন করিয়াও সে চোরের গতিরোধ করিতে পারিল না। অবশেষে জীবনের অন্তিমে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বদিন রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইয়াছে, তখন মালতী কমলিনীকে কাছে ডাকিয়া কহিল—"দিদি, তুমি ত আমায় ভালবাস। আচ্ছা, আজ একটু আমার প্রাণের কথা শুন্‌বে?" কমলিনী মালতীর বিছানায় বসিয়া সস্নেহে বলিল—"বল শুনি।"

মালতী বলিতে আরম্ভ করিল—"দিদি—তোমরা ত ভেবেছ, আমি ভ্রষ্টা হয়ে ঘরের বাহির হয়েছিলাম। কিন্তু তা নয়, ভ্রষ্টা হবার পথে এগিয়েছিলাম, কিন্তু হইনি। লোকে আমায় কিন্তু ভ্রষ্টা বলেই জানে। একবার জীবনে দুর্ব্বলতা এসেছিল—অনেক কষ্টে তার হাত থেকে এড়িয়েছি; কিন্তু অন্য একটি নির্ম্মল জীবনকে পঙ্কের মধ্যে ফেল্‌তে গিয়েছিলাম। থাক সে কথা, লোকে যখন বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ কর্‌লে, তখন সহ্য কর্‌তে না পেরে ঘরের বাহির হয়েছিলাম,—ভেবেছিলাম কলঙ্ককে ভাল করেই নেব। কিন্তু তা ত হল না! পথের মধ্যে এসে যখন দাঁড়ালাম—অপরিচিত দু-একটা পুরুষের নজরে পড়তেই বুকের ভিতর যেন কেমন করে উঠ্‌ল,—মনে হ'ল নিজের ভিতর যে নারী আছে—তার অপমান এখনও হয় নাই—এখনও সে পবিত্র আছে। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার সমস্ত গা কেমন অবশ হয়ে গেল—মাথা কেমন ঘুরতে আরম্ভ হ'ল—চোখে ধাঁধা লাগ্‌তে সুরু হ'ল; ক্রমে কেমন অজ্ঞানভাব এসে আমার শরীরকে টলমল করে দিল;—হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম। যখন আমার জ্ঞান হ'ল, চোখ মেলে দেখ্‌লাম, দিদি, তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছি। তোমার যত্নে আমার

চেতনা হ'ল বটে—কিন্তু দিদি পাপের মহানরকে, অগ্নি-কুণ্ডের দিকে এগিয়েছিলাম—তাই তার আঁচ, তোমার সকল যত্নকে ব্যর্থ ক'রে দিনের পর দিন—আমার জীবনকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল,—"দিদি, সংসারে সকলের নিকট হতে ঘৃণিত হয়ে, তাড়িত হয়ে অবশেষে তোমার আশ্রয়ে এসে মরণের আশ্রয়ে যাবার পূর্ব্বে, অনেকটা শান্তি পেলাম বটে;—কিন্তু এ শান্তি আমার চিরশান্তি নয়—চিরশান্তির দ্বারে যাবার সময় হয়ে এল; বেশী দেরি নাই। দিদি, যে স্নেহ দিয়ে আমার পথে-ভাসা জীবন তোমার কোলে তুলে নিয়েছ—সেই স্নেহ দিয়েই আমার ত্রুটিকেও মার্জ্জনা ক'রে নিও।" এই বলিয়া মালতী থামিল।

কমলিনী এতক্ষণ ধরিয়া মালতীর করুণকাহিনী শুনিতেছিল, আর কেবলই আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছিল। মালতী চুপ করিতেই কমলিনী মালতীর মুখের দিকে সস্নেহ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"ভাই, যাবার সময় আর কাঁদাস্‌নে। যে দিন তোকে বিধবার সাজে দেখেছি—সেই দিন থেকে তোকে অত্যন্ত আপনার ক'রে নিয়েছি। তুই ভারি একটা ভুল বুঝিয়াছিলি—তাই অমন ক'রে গৃহত্যাগ করতে গিয়েছিলি। কিন্তু তা কি পার্‌লি? তোর ভিতরে যে আর একজন আছেন, তিনি তোকে সে পথে যেতে দিলেন না,—তুই আমার কোলে এসে পড়লি। তোকে ক্ষমা করবার কিছু নেই। তোকে আর যার ইচ্ছা সে পতিতা বলুক, আমি তোকে দেবী বলব;—তুই প্রলোভনকে পরাজয় করতে পেরেছিস্। তুই—"

কমলিনী আর কথা বলিতে পারিল না; সে দেখিল, মালতী ধীরে ধীরে চিরনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে।

হরগৌরী-রূপ

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

আধ মণিহার ঝলে,
আধ ফণীহার গলে,
আধেক চিকুর শ্যাম—আধ জটাজুট;
আধ-কণ্ঠে সুধা ক্ষরে, আধ কালকূট;
মৃগমদ-সুচন্দন—
আধ-অঙ্গে বিলেপন,
আধ অঙ্গে ভস্মলেপ বিচিত্র-সম্পুট,—
আধ ফণীচূড়া, আধ রতন মুকুট।
বিলোল-স্বর্ণালোৎপল—
আঁখি করে ঝলমল,
অন্যে অরুণের রাগ,—পঙ্কজ নয়ন!
চম্পক গৌর প্রভা—
আধ অঙ্গে মনোলোভা,
কর্পূর-গৌর-আধ—স্ফটিক-লাঞ্ছন।
আধ অঙ্গে স্মরবাস,
আধ অঙ্গে স্মরনাশ,
প্রপন্ন আশ্রয় আধ—সংহার-নর্ত্তন!
জগত-জননী আধ—জগত-জনন!
আধ দীপ্তি—আধ ছায়া,
আধ ব্রহ্ম—আধ মায়া,
আধ ভোগ, আধ যোগ,—জনন-মরণ।
আধ রিক্ত নির্ব্বিকার,
ঘৃণা-লজ্জা-পরিহার,—
চিতাভস্মলেপ অঙ্গে—কপাল-ভূষণ;
আধ সৌন্দর্য্যের রাগ,—
বিশ্বের ঐশ্বর্য্যভাগ,
সর্ব্বিতার্থ সর্ব্বকাম—সর্ব্বার্থ-সাধন।—

ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম-যৌবনে তিনিও এই ক্ষণিক আনন্দের সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন ;—

When Beauty and Beauty meet
All naked, fair to fair,
The earth is crying sweet,
And scattering—bright the air,
Eddying, dizzying, closing round,
With soft and drunken laughter ;
Veiling all that may befall
After——After-- —

Where Beauty and Beauty met,
Earth's still a-tremble there,
And winds are scented yet,
And memory—soft the air,
Bosoming, folding glints of light,
And shreds of shadowy laughter ;
Not the tears that fill the years
After——After——

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নায়িকা গাইয়াছিলেন,—

এমন যামিনী
মধুরা চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত !
পরাণে এমন
আকুল তিয়াষা,
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত !

প্রৌঢ়া আগ্নেসের বৃদ্ধ স্বামী অধ্যাপক মহাশয় বুঝিলেন যে 'এমন যামিনী, মধুরা চাঁদিনী' ব্যর্থ হয় নাই ; তাঁহার বন্ধু বার্ণার্ড

শচীর প্রসাদ-সুধা রতির চুম্বিত
নন্দন-বনের গন্ধে মোদিত মধুর

আগ্নেস্‌কে পান করাইয়াছিলেন। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছিল—Beauty and Beauty met … তিনি বার্ণার্ডকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

*　*　*　*

এই 'বাস্তব'-সাহিত্যের আমদানি আমাদের দেশে অল্প-বিস্তর হইতেছে। স্বয়ং রবিবাবু এ হাটে প্রধান ব্যাপারী। বঙ্কিমবাবুর রোমাণ্টিক-যুগ হইতে রবিবাবুর বাস্তব-সাহিত্যের যুগে পৌঁছিতে বড় বেশীদিন লাগে নাই। সাহিত্যের ভিতর দিয়া সামাজিক রীতিনীতির ও প্রচলিত-পদ্ধতির উপরে যে বিষম ধাক্কা লাগিতেছে, তাহা এড়াইবার উপায় আছে কি না জানি না ; সে ধাক্কা সাম্‌লাইতে না পারিলে হিন্দু-সমাজের মধ্যে নূতন রকম ভাঙ্গা-গড়া বোঝা-পড়া আরম্ভ হইবে, এ বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল কি মন্দ,—বলা বড় কঠিন। আমি কেবল কথা-সাহিত্যের একটি ধারা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। 'যৌবনে দাও রাজটীকা'—এই বলিয়া 'সবুজ পত্র' সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে ; সম্প্রতি রবিবাবু 'যৌবনের পত্র' পাইয়াছেন ; আমরা ভাবিতেছি,—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে।

*　*　*

'সবুজ পত্রের' একটা mission আছে, একটা নূতন কথা শুনাইবার আছে, বুঝিতে পারি। কিন্তু 'নারায়ণ' অবতীর্ণ হইলেন কেন ? শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের ঘোলে-জলে-মেশা বৈষ্ণব-রসের পসরা লইয়া, এবং শাস্ত্রী-মহাশয়ের সাদা-মাটা ধরণের বৌদ্ধতত্ত্ব সম্মুখে রাখিয়া, 'নারায়ণ' আসিয়াছেন। আবার তন্ত্রোক্ত শাক্তধর্ম্মের সহিত নিটশীয় শক্তিতত্ত্বের সমন্বয় করিয়া সুরসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাহিত্যিক-ভৈরবীচক্রের মাঝখানে বসিয়াছেন।

*　*　*

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের 'বারবিলাসিনী' বলিয়াছিল—

ওগো, আমি যৌবনে যোগিনী।
…　…　…　…
নিয়ে যেও পুষ্পমালা,
রেখে যেও রক্তজ্বালা,
…　…　…　…
ওগো আমি বারবিলাসিনী।'

রবিবাবুর 'পতিতা'র পরে এমন মর্ম্মস্পর্শিনী কবিতা আমাদের বাংলা-সাহিত্যে আর রচিত হইয়াছে কি না, আমার জানা নাই। কিন্তু এতকাল পরে তাঁহার 'নারায়ণ'-পত্রে বারবিলাসিনীর নিজমূর্ত্তিধারণ দেখিয়া আমাদের মত মাঝারি-ধরণের লোক কিঞ্চিৎ গোলে পড়িয়াছে। ডালিম, আঙ্গুর, চন্দনা কি সেই পূর্ব্বপরিচিতা 'বারবিলাসিনী'? এ কি সাহিত্যিক atavism!

* * *

বড় গোলে পড়িয়াছি। Atavism না Futurism? বিশ বৎসর চুপ করিয়া থাকিয়া একটা type ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া দেখা দিল না কি? 'প্রভাকর'—'হুতোমের' সমসাময়িক সামাজিক type-বিশেষ অর্দ্ধশতাব্দী পরে আবার ফুটিয়া উঠিল না কি? অথবা বৌদ্ধ-শাক্ত-বৈষ্ণবের নিট্‌শীয়-সংস্করণে ভবিষ্যতে বারবিলাসিনীর স্থান-নির্দ্দেশ ইঙ্গিতে সূচিত হইয়াছে?

* * *

Atavism অতীতের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলে। একটা বিলুপ্ত typeএর পুনরাবির্ভাবে আমরা হারাণো জিনিষের উদ্ধারের মত অনেক সময়ে আনন্দ পাই। Futurism অতীতকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিতে চায়। আমাদের এই futuristic-সাহিত্য কি বৌদ্ধ-শাক্ত-বৈষ্ণব-রস নূতন নিট্‌শীয়-কটাহে পাক করিয়া সমাজের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে? প্রবীণ সাহিত্য-রসিক পাঁচকড়ি বাবু কটাহ-সমেত রসটাকে Beyond good and evilএর ওপারে পাঠাইয়া দিতে পারিলে সমালোচকের আর কিছু বলিবার থাকিবে না।

* * *

এখন কথা হইতেছে এই যে, যেটাকে আমরা ময়লা, পঙ্কিল, morbid বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভরে চাপা দিতে কিংবা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি, সেইটাকেই একজন ইংরাজ-সমালোচক চিত্তোৎকর্ষের, আধ্যাত্মিক-উন্নতির ও সৌন্দর্য্যোপলব্ধির প্রধান সহায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা যে রচনাকে 'ভাল' 'উচ্চ অঙ্গের' বলিয়া বাহবা দিয়া থাকি, তাহা না কি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর রচনা। সেকালে ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ intellectual sanitationএর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সম্মার্জ্জনী-হস্তে সাহিত্যের আবর্জ্জনা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এখন না কি সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাহায্য করিতে হইলে healthy শিল্পীর চেয়ে morbid শিল্পীর উপকারিতা বেশী। সমালোচক বলিতেছেন—"What we thrust away from us with the conventional label affixed, 'repellent,' 'morbid,' 'sordid', 'evil', is often spiritually more profound, and aesthetically more beautiful, than those phases and aspects of life and feeling which we acclaim as 'noble', 'healthy', 'good', or 'happy'. And so the 'morbid' writer, who is largely pre-occupied with the fascination of evil impulses, with the beauty of sorrow, or the triumph of pain and sin, may enrich our spiritual comprehensiveness in a manner quite out of the power of the healthy artist to accomplish." বাস্তব কথা সাহিত্যের উপকারিতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-সমালোচকের এখন পর্য্যন্ত এইটিই শেষ কথা। কিন্তু তিনি এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিতেছেন যে, এইটাই polite-সাহিত্যের উন্নতির চরম-অবস্থা নহে। ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটা অন্যায়ের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে, যেটা নেপথ্যে অঙ্কুরিত হইয়া সাহিত্যিক-বিষবৃক্ষরূপে দেখা দিতে পারে। এই বাস্তব-সাহিত্য যদি idealismকে চাপা দিয়া আমাদের মনের গতি বিপরীত দিকে ক্রমাগত চালাইতে থাকে, তাহা হইলে সাহিত্যিক অবনতি অবশ্যম্ভাবি। আমাদের দেশের এই অর্ব্বাচীন বাস্তব-সাহিত্যের উদ্ভব হয় ত নিজের বিনাশের বীজ চক্ষুর অন্তরালে কোন্ এক অজ্ঞাত বীজ-কোষের মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াছে।

* * *

একদিন ছিল, যখন রুষ-সাহিত্যের ধারা idealismএর খাত কাটিয়া জীবনের আধ্যাত্মিক মূল-সত্যের উৎস হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া সমাজ ও সাহিত্যকে উর্ব্বর, সুন্দর, স্নিগ্ধ করিয়া চলিয়াছিল। প্রাণ চাই, সত্য চাই, সৌন্দর্য্য চাই;—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য স্থূল-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে; সে প্রাণ কেবলমাত্র উদ্দাম চিত্তবৃত্তির উন্মাদনায় চঞ্চল হওয়াটা

কেই চরম সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে নাই। ক্রমে সে ধারা পরিবর্ত্তিত হইল। লোকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া এমন চিত্র পাইল, যাহা æsthetically beautiful and emotionally seductive. এখন কিন্তু পাশ্চাত্য-সমালোচক ভবিষ্যতের জন্য একটু চিন্তিত হইয়াছেন। তিনি বলেন—It is a change of atttude that, should it be persevered in, would lead infallibly to a ripening of the seed of literary decadence; but one may conclude that it is, in fact, a sign of a pause in the flood of Young Russia's Idealism, to be followed by a new wave of spiritual energy.' আমাদের এই সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে কি? ইদানীং ফ্রান্সে এই প্রকার বাস্তব-সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটা প্রবল দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, উনবিংশ-শতাব্দীর বাস্তব কথা-সাহিত্য সমগ্র ফ্রান্সের মর্ম্মস্থান হইতে উদ্ভূত হয় নাই; উহা পারিসীয় সাহিত্যমাত্র; ফ্রান্সের জাতীয়-জীবন-প্রবাহের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। পারিসীয়-সাহিত্য জাতীয়-সাহিত্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। তাই প্রভান্সের খাঁটি দেশী ভাট ও কবিদিগের উপর আবার সমগ্র দেশের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; তাই আজকাল মিস্ত্রালের এত আদর।

* * * *

প্রসঙ্গক্রমে রুষ-সাহিত্যের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, রুষীয় সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। স্বদেশের সাহিত্যালোচনাপ্রসঙ্গে ডাক্তার ভিনোগ্রাডফ্ বলিতেছেন—'আমরা অনুবাদ করিতেছি, অনুকরণ করিতেছি, বিদেশী-সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছি, তাহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, অন্য জাতির ভাব ও ব্যবস্থাগুলি আয়ত্ত করিয়া লইতেছি। এই বিদ্যা লইয়া আমরা আমাদের ড্রয়িং-রূমে চমক লাগাইয়া দিই; অনেক সময়ে ইহা হয় ত আমাদের চরিত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করে; কিন্তু ইহার সহিত আমাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জাতীয়-সভ্যতার ধারার কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের স্বদেশীয় রুষ-সভ্যতার উৎস হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি; এবং সেই জন্য সমগ্র মানবজাতির সাধারণ-সভ্যতার পুষ্টিবিধান-কার্য্যে সাহায্য করিবার অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। যাহাদিগকে আমরা অশিক্ষিত বলি, তাহাদেরই মধ্যে আমাদের যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন আধ্যাত্মিক-উৎকর্ষের বীজ এখনও রক্ষিত হইতেছে। ইহার সহিত আমাদের পুঁথিগত cultureএর একটা বিষম বিরোধ রহিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।'

* * * *

এইখানে আমাদের দেশের সাহিত্যের ও সমাজের সহিত রুষ-সাহিত্য ও সমাজের তুলনায় সমালোচনা করা চলে। পুঁথিগত বিদেশী culture জাতীয়-সাহিত্যের উৎস পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে না; যদিই বা পৌছায়, আর কিছু হউক আর নাই হউক, জলটা কিছু ঘোলাইয়া দেয়। রুষিয়ার পণ্ডিত-মণ্ডলী জাতীয় সভ্যতার জাগরণের জন্য অশিক্ষিত জন-সাধারণের পুরুষপরম্পরাগত ভাব-প্রবাহের পূতধারায় সেই হারাণো-জিনিযের সন্ধান করিতেছেন। এইজন্য জর্ম্মনি রুষিয়াকে বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। যে রুষিয়া এত দিন বেটোবেন, ওয়াগ্নারের সুর-তাল-লয়ে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সে নব নব সুর রচিত করিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে চকিত করিয়াছে। সমস্ত মধ্য-য়ুরোপ অতিক্রম করিয়া তাহার এই নবীন স্বর লহরী ইংরাজের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে। ইংরাজ বলিতেছেন—"এ কি হইল? কেন এমন হইল? জর্ম্মনির orchestral music ঘনশ্রেণিবদ্ধ জর্ম্মন-চমূর মত একেবারে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে; হর্ষ-বিক্ষোভের আবেগ-কম্পনে শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ অনুভূত হয়। সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দ্দিনে যে সঙ্গীতকলা আমাদের নিত্যসহচরী ছিল, আজ তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছি। যে মোহিনী মায়া আমাদিগকে এতদিন বেষ্টন করিয়াছিল, আজ তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়া যে মুক্তির আনন্দ লাভ করিব মনে করিয়াছিলাম, সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম, কেন? রুষিয়ার এই নবীন সুর বড় মধুর লাগিল। ঘরে-বাহিরে ইহারই আলাপ চলিতে লাগিল। আমাদেরও ত খাঁটি দেশী সুর আছে; বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—সে সুর খুব

সঙ্গীতের প্রভাব।

শিল্পী—ব্রিটন্ বিভিয়রী. R. A.।

ভাল; কিন্তু তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না কেন? সে সুর-তাল-লয় রেকর্ড করা হইতেছে না কেন? খাঁটি দেশী-সঙ্গীতের ধ্বনি দেশের মর্ম্মস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া যেদিন সমগ্র জনগণ-মনকে সমীরণ-স্পর্শ-কম্পিত বন-বীথিকার তরুপল্লবের মত ঈষৎ হিল্লোলিত করিতে সমর্থ হইবে, সেইদিন এই নির্ম্মম, অর্থগৃধ্নু, রাষ্ট্রশক্তিলোলুপ, হিংস্র culture এর কঠিন স্ফটিকস্তম্ভ বিদারণ করিয়া যে নরসিংহের আবির্ভাব হইবে, সে ব্রিটিশ-সিংহের কেশর লইয়া কোনও দৈত্যশিশু ক্রীড়া করিতে পারিবে না।...."কার্লাইল্ ও ম্যাথু আর্ণল্ড, ফ্রুড ও গ্রীণ জর্ম্মনির দিকে ইংরাজের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল; আজ ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া ইংরাজের মন বিপরীত দিকে ফিরিয়াছে। সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; সাহিত্যের মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে আপন সত্বাকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে; ভাবের রাজ্যে বন্ধুর নিকট হইতেও ঋণ-গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতেছে।

* * * *

এমনি করিয়া সকলেই নিজের নিজের ঘর সামলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে ভুলিয়া পরের দিকে মুখ তাকাইয়া থাকায় আর তাহারা আনন্দ অনুভব করে না। সকলেই বলিতেছে—'এবার ফিরাও মোরে।' এতদিন যাহারা—

'ঘর করিল বাহির, বাহির করিল ঘর,
পর করিল আপন, আপন করিল পর,'

আজ তাহারা ঘরে ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; পরের মোহ কাটাইয়া আত্মনিমগ্ন, আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে যে, তাহাদের জাতীয় 'ঘরে-বাইরে'-সমস্যায় তাহারা ঘরের লক্ষ্মীকে বাহির করিয়াছে; বাহিরের যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর, তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে পারে নাই। এক একটা সঙ্কীর্ণ নেশনের গণ্ডীর মধ্যে ঘর বাঁধিয়া তাহারা আপন আপন জাতীয়-ইতিহাস গড়িয়া তুলিতেছিল; সেইটুকুই তাহাদের ঘর, আর সমস্তই—বাহির। এক একবার আলস্য-অবসাদের দিনে সমুদ্র-পার হইতে রাজপুত্র আসিয়া তাহাদের তন্দ্রাতুর চোখে সোনারকাটি বুলাইয়া দিত; তাহারা ভাবিত, পর বুঝি আপন হইল; পরের মালা গলায় পরিয়া নিদ্রাভঙ্গে সবিস্ময়ে ভাবিত,—'কে পরালে মালা?' আজ অপনোদিত-মোহ নেশনগুলা—

'সে মালা নিল না গলে; পরম হেলায়,
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেল!'

ইংরাজের মোহ কাটিয়াছে। ফরাসী ভাবিয়াছে,—যে হাল্কা আনন্দের ঊর্ণাতন্তুজালে আমাদের জাতীয়-জীবন এতদিন আচ্ছন্ন ছিল, আজিকার এই পূবে হাওয়ায় সে জাল ছিন্ন হইয়া আমাদের নিত্য-সনাতন জাতীয়তাকে প্রকটিত করিয়া দিয়াছে। ভারহেয়ারীণ-মেটালিঙ্ক-প্রমুখ বেলজীয় মনীষীগণ ভাবিতেছেন,—বিদেশী ভাবের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমরা যে জাতীয়-সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছি, আজ তাহার বলে—

'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।'

ইটালির এই নব-জাগরণের কবি ডি আনাঞ্জিয়ো রোমের পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া সমগ্র জাতিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছেন। সুপণ্ডিত অধ্যাপক টেভেলিয়ন্ লিখিতেছেন—"An Italian said to me: 'D' Annunzio was only a banner.' I replied: 'In England, I am afraid, the people would not choose a poet for their banner'." ..... জর্ম্মনি বলিতেছে—আজ আমরা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছি। অনেকদিন ফরাসী-সাহিত্যের রসে আমরা মস্‌গুল হইয়াছিলাম। য়েনার (Jena) রণক্ষেত্রে সেই ফরাসী কর্ত্তৃক দলিত ও পিষ্ট হইয়া আমরা ঘরের দিকে ফিরিলাম। Niebuhr হইতে আরম্ভ করিয়া Dahlmann এর ভিতর দিয়া ট্রাইট্স্কে, নিট্‌শে ও বার্ণ-হার্ডি পর্য্যন্ত যে সাহিত্যের ধারা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে আমাদের জনসাধারণের ভিতরে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে আমাদের জাতীয়-স্বতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদেশী ভাবের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজ আমরা আমাদের kultur জগতের উপরে প্রসারিত করিতে চাহি।'......এমনি করিয়া প্রত্যেক নেশন স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া শান্ত অথবা প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, একজন ইংরাজ-লেখক একটি কথায় তাহা বেশ ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন,—The price of Nationality is war... যাক্; এই নেশন-প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া ব্যাপারটাকে জটিল করিয়া তুলিব না।

* * *

সকলেই ঘরের দিকে ফিরিয়াছে;—আমরা কি কেবলই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িব? পর নহিলে কি আমাদের ঘর চলিবে না? যাঁহারা ডাকিতেছেন—'আগে চল্, আগে চল্ ভাই', তাঁহাদের প্রতি-পদক্ষেপের সহিত তাল রাখিয়া আমরা যদি চলিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহারা বলিতেছেন—'ওরা কাঁদ্‌বে, ওরা কাঁদ্‌বে!' বাস্তবিকই কি ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র পাথেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? কেন কাঁদ্‌বে? ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া? বাস্তবিকই কি আমাদের দেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কোনও দিন লুপ্ত হইয়াছিল? আমাদের দেশে স্বাধীন-চিন্তা জোর করিয়া রুদ্ধ করিয়া ষ্টেট্ কখনও individualকে যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে কি? চর্চ্চ কখনও individualকে পোড়াইয়াছে কি? সম্পূর্ণরূপে স্ববশে না থাকিলে উন্নতি করিতে পারা যাইবে না? নিয়মের নিগড় ভাঙ্গিতে হইবে? বিধি-নিষেধে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে? আমরা আমাদের স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছি না? দেশকে স্বদেশ বলিয়া চিনিতে হইলে বিদেশের সম্পর্কে আসিতে হইবে,—আমরা কি তাহাতে পরাঙ্মুখ? আমরা কি কেবল ঘুম-পাড়ানি গানে স্বদেশবাসিকে তন্দ্রাতুর করিয়া রাখিয়াছি?

* * *

'সবুজ পত্রের' মর্ম্মরে বোধ হয় যেন ইহার উত্তর পাইতেছি। কে যেন বলিতেছে—'যদি মুক্তি চাও ত ব্যক্তি হও; স্ব-তন্ত্র হও; individual হও।'

Individualism চাই?...হাঁ।

কিন্তু আজ আট বৎসর হইল, মার্কিণ-অধ্যাপক গেডিং লিখিয়াছেন,—সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে স্ব-তন্ত্র ব্যক্তিকে unit ধরিলে চলিবে না; familyকে, গৃহকে, unit ধরিতে হইবে; নহিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবি। যদি মার্কিণ-দেশেই এইটি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক মত হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদের গোত্র-গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতি বিরূপ হইব কেন? য়ুরোপের ঊনবিংশ-শতাব্দীর একটা মস্ত ভুলকে আমরা আমাদের সমাজ-রক্ষ প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গ্রহণ করিব কেন?... ...

গেডিং এর উত্তর দিয়াছেন,—হব্‌হাউস্। অত গিডিং-এর মতকে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক মত বলিলে সত অপলাপ করা হয়। আর আমরা ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমাত্রকে প্রশংসার্হ মনে করি না। Economic individualis কিম্বা রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমরা ঘৃণা করি। আমরা c ethical individualism। ইহা বিদেশের আমদা জিনিষ নহে; খাঁটি স্বদেশী জিনিষ।

কিন্তু এই Ethical individualismকে লাভ করি গিয়া আমরা economic কিম্বা রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র বর্জ্জন করিতে পারিব, এমন কথা কি জোর করিয়া ব যায়? Ethical স্বাধীনতা হইতে economic স্বাধীনত আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে কি বেশী দেরি লাগে? সম্প্র বিলাতের একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একজন পা লিখিয়াছেন—খৃষ্টীয় চর্চ্চে ethical ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দীক্ষ লাভ করিয়া খৃষ্টান economic individualism-এর জ উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই ব্যক্তিত্বকে সচেতন করিয়া তুলিয়া, সামাজিক বিধি-নিষেধে বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে কেবলমাত্র ethic অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলিবে কি? যদি না চলে তাহা হইলে ফল দাঁড়াইবে—সামাজিক ও economi anarchy।......

—সেও ভাল; তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে বাঙ্গালীর প্রাণ আছে, বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি আছে। কিন্ত এই যে জড়ত্ব......('সবুজ পত্রের' উক্তির শেষ অংশটা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলাম না। হঠাৎ একটা বায়ুর উচ্ছ্বাস সেই পাতাগুলির মধ্যে যেন একটা করুণ সুর জাগাইয়া তুলিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কাণে বাজিতে লাগিল —সেই সবুজ পত্রের মর্! মর্! মর্!)

* * *

কথা বলিতে বসিলে, ফস্ করিয়া শেষ করিয়া ফেলা সব সময়ে হয় না। কথার পিঠে কথা আসিয়া পড়ে। পাঠক অস্থির হইয়া হাল ছাড়িয়া দেন। আর নয়; এইবার 'নারায়ণ'কে স্মরণ করিয়া সহিষ্ণু পাঠক-পাঠিকার নিকট হইতে আমি বিদায় লইব।

'নারায়ণ' একটি geniusকে আবিষ্কার করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে ধন্য করিয়াছেন। যিনি সাহিত্যের 'আঁধার ঘরে' বর্ত্তিকা-হস্তে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীকে 'হাসির মূল্য' বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে কেমন করিয়া সাহিত্য-প্রাঙ্গণে অভিবাদন করিতে হইবে, হঠাৎ তাহা স্থির করা যায় না। কেন না Genius দেখিলেই একটা সঙ্কোচ আসে; একটু সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

ইস্কুল-মাষ্টারের অনেক বিপদ। Geniusএর হাত এড়াইতে হয় ত আর সকলে পারে, কিন্তু ইস্কুল-মাষ্টার পারে না। সম্প্রতি একটি ইংরাজ-মহিলা, মিস্ এভা ম্যাডেন্ তাঁহার স্মৃতিকথা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি জর্ম্মনিতে একটা মেয়ে-ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী একদিন তাঁহাকে বলিলেন —'আচ্ছা, আমি যদি একটি Geniusএর নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় জীবন-উৎসর্গ করি!' ......মিস্ ম্যাডেন্ বলিলেন—'সে কি?' যুবতী বলিলেন—'আমি কাছে না থাকিলে তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইবে না, জগৎ-সংসার অনেক ভাল জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইবে।' মিস্ ম্যাডেন বলিলেন,—'তোমার বাপ মা জানেন?' উত্তর হইল—'না, না; তাঁরা যে সেকেলে, আর আমি যে অত্যন্ত আধুনিক, modern'......কয়েকদিন পরে আর একজন যুবতী আসিয়া আর একটি Geniusএর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন—'আমি ভাবিতেছি, এই পুরুষ প্রবরের সেবায় আমি যদি নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীর মহদুপকার সাধিত হইতে পারে; তাঁহার স্ত্রীও সম্মতা আছেন।' শিক্ষয়িত্রী প্রশ্ন করিলেন 'তোমার বাবাকে বলিয়াছ?' উত্তর হইল,—'না; তিনি যে সেকেলে; আর আমি যে modern!' বাংলা-সাহিত্যের দুষ্ট সরস্বতী যদি এই নবাবিষ্কৃত Geniusটির পরিচর্য্যায় নিজেকে নিয়োজিত করিতে কৃত-সংকল্পা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও ইস্কুল-মাষ্টারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে না, পিতামহ ব্রহ্মারও মতা-মতের আবশ্যকতা অনুভূত হইবে না। পিতামহ অত্যন্ত সেকেলে; তিনি বুঝিতেই পারিবেন না যে, এই Geniusটি তাঁহার সৃষ্ট জগতের মহদুপকার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন

রাজার ডাকে*

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি. এ.]

ছুটে আয় রাজার ডাকে, বেজেছে রাজার ভেরী,
বেজেছে গভীর বিষাণ, নাচে মা দিগম্বরী।
তোরা কেউ গলিস্ নেরে আজকে কারো নয়নজলে,
তোরা কেউ টলিস্ নেরে, কেউ বা যদি পড়েই তলে;
পশেছে রাজার সাড়া, নিয়ে আয় পূজার খাঁড়া,
আজি দিন মহাকালীর আজি দিন আনন্দেরি।
ছুটে আয় রাজার ডাকে, বেজেছে রাজার ভেরী।
ধরাতে অনেক আছে শুন্‌তে মধুর প্রেমের কথা,
ধরাতে অনেক আছে কাঁদতে গেয়ে নিজের ব্যথা।
ভুলি যা প্রেমের বাহু, ভুলি যা স্নেহের আঁখি,
আজি বীর বীভৎসেরে, নেরে ভাই বরণ করি,
ছুটে আয় রাজার ডাকে, বেজেছে রাজার ভেরী।
নিয়ে আয় জবার মালা, হোমের সমিধ, বেলের পাতা,
নিয়ে আজ যূপের সিঁদুর, দেবীর খাপড়, মড়ার মাথা,
আজি ভাই বুকের জোরে ছিঁড়ে ফেল শতেক ডোরে,
দাড়ারে পালাস্‌নে কেউ মরণের ওই ঝিলিক্ হেরি,
ছুটে আয় রাজার ডাকে, বেজেছে রাজার ভেরী।
যদি না ভাঙ্গেই ঝড়ে বনের বৃহৎ বনস্পতি,
ধরাতে কম্‌বে যেরে, নূতন তরুর ঠাঁইটা অতি।
প্রলয়ের বর্ব্বরতা, বাড়ায় ধরায় উর্ব্বরতা,
এমনি দেয়রে তারে যুগে যুগে নূতন করি,
ছুটে আয় রাজার ডাকে, বেজেছে রাজার ভেরী।
আজিকে আয়রে ছুটে বীরের সনে নাচ্‌তে যাবি,
এবারে যুগের পরে বীরের মত মরতে পাবি।
মরিলে রাজার বরে, দেবতার আশীষ ঝরে,
নাচে মা ভয়ঙ্করী, নাচে মা শুভঙ্করী,
ছুটে আয় রাজার ডাকে, বেজেছে রাজার ভেরী।

* 'বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠন ও ভলেন্টিয়ার প্রেরণ-প্রস্তাব উপলক্ষে।

মধু-স্মৃতি

(৬)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

"মেঘনাদে"র পরই "ব্রজাঙ্গনা"—একের অব্যবহিত পর-ক্ষণেই এমন অপূর্ব্ব বিপরীতমুখী ভাব, দৃশ্য ও পরিকল্পনা, পরিব্যঞ্জনা কি অপরের সাধ্য? অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ভিন্ন অপরের পক্ষে এমন অসাধ্যসাধন কদাচ সম্ভবপর নহে! নিমেষের মধ্যে কি চমৎকার—কি সম্পূর্ণ, অপূর্ব্ব বর্ণরাগ-রঞ্জিত চিত্রপট-পরিবর্ত্তন—কি যাদুকরসম্ভব বিচিত্র ভাব ব্যঞ্জনা! ভীম-গর্জ্জনকারী উন্মত্ত বীচিমালা—তরঙ্গোচ্ছ্বাস-উদ্বেলিত অনন্ত বারিধির বেলাভূমি হইতে, চক্ষের পলকে যেন বিবিধ বিহগ-মধুপ-সমাকুল, বিচিত্র ফল-ফুল-বহুল; শ্রবণ-নয়ন-রঞ্জন, বিজন, অরণ্যানীসমাকীর্ণ, উত্তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাদ্রির বিস্তীর্ণ উপত্যকার আবির্ভাব! দিগন্তভেদী ভেরি-দুন্দুভিনিনাদিত ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝণ্‌ঝণা-মুখরিত, হতাহত সমাচ্ছাদিত, অগ্নিশিখা-উদ্ভাসিত রণাঙ্গণ হইতে নিঃসৃত হইয়া, পরক্ষণে যেন মোহিনীমন্ত্রবলে নিদাঘ-অরুণের মলয়-হিল্লোলে বসন্ত-রাগ-রঞ্জিত সুদূর মধু-বৃন্দাবনের কোকিল-কূজিত নিকুঞ্জকাননে বিশ্রাম! সম্মুখেই নীলবসনা যমুনা উজান বহিতেছে—কেশরকান্তি লইয়া কদম্বফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, মাধবীলতা তমালতরুকে জড়াইয়া আছে, বিকশিত নলিনীর পরাগরেণু অঙ্গে মাখিয়া প্রমত্ত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, বংশীবটে "মুরারি-মুরলীধ্বনি সদৃশ" বংশী মোহনসুরে বাজিতেছে,নীল আকাশে নীল নবঘনাবলীর নীলছায়ায় নীল বসুন্ধরা ছায়াময়ী করিতেছে! শিখিনী তরু-শাখাপরে নাচিতেছে—প্রতিধ্বনি সাড়া দিতেছে, ঊষা হাসি-তেছে, মলয়মারুত মধুরমৃদুগন্ধ মাখিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সারিকা ঝঙ্কার দিতেছে, কৃষ্ণচূড়া ব্রজবাসিনী মোহিনী গোপিনীদিগের কবরীদামে ভূষিত হইতেছে,নিকুঞ্জবনে শ্যাম-বিনোদিনীর সখীগণ করুণ-সঙ্গীতে বিশ্ব মোহিত করিতেছে! কি মনোমোহন শোভা—কি অপূর্ব্ব চিত্রাবলী!—যাদুকর মধুসূদনের কি মায়াবিনী শক্তি! কি মনোমুগ্ধকারিণী সৃষ্টি! গুরুগম্ভীর অমিত্রচ্ছন্দে শৌর্য্যবীর্য্যরণকীর্ত্তি-কাহি কীর্ত্তন করিতে করিতেই কটাক্ষেই আবার অমানুষী প্রতিভাবলে—কোন্ করুণ লেখনী-সঞ্চাল তিনি শ্রীরাধিকার বিরহগাথা মধুর গীতি-কবিত করুণ-ঝঙ্কারে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিলে বঙ্গের প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিদিগের ভক্তিরসসিক্ত অঙ্গু সম্পাতে যে ত্রিদিব-বীণাধ্বনি উত্থিত হইয়া স্বর্গেম একাকার করিয়া দিত, কতকাল পরে আবার যেন মো মধুর করে তাহারই পূর্ণ-পরিণত-অনবদ্যাঙ্গ পুনরাল সূচিত হইল। বৈষ্ণব-কবিদিগের প্রাণহরা সুর মধুসূদনে ব্রজাঙ্গনাতেই ঝঙ্কৃত হইয়াছে—সেই সুদূর অতীতের চিরম গীতিধ্বনি, 'ব্রজাঙ্গনার' পর আর কোথাও ত শ্রুত হই না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধুসূদনের রচনায় বৈষ্ণবেরাও বি হইয়া গিয়াছিলেন। কবির 'মধুসূদন' নাম সার্থ হইয়াছে!

ভূদেব বাবু, একদিন মধুসূদনকে বলেন, "ভাই, তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পারো?" মধু মধুসূদন, তারপরই ব্রজাঙ্গনা-কাব্য লেখেন।

'ব্রজাঙ্গনা' রচনা করিয়া, মধুসূদন, শ্রীরামপুরের প্রসি ভূম্যধিকারী, পরমভক্ত, বৈষ্ণব-চূড়ামণি গোপীকৃষ্ণ গোস্বা মহোদয়কে দেখিতে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া এতদূ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তদবধি মধুসূদনের প্রতি একা অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং মধুসূদনকে দেখিলেই যে আনন্দে অধীর হইতেন। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা জন্মিয়াছিল।

মহাত্মা গোপীকৃষ্ণের দেশমান্য সুযোগ্য পুত্র রাজ কিশোরীলাল গোস্বামী মহোদয়, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবে ও মধুসূদনের সৌহার্দ্দ উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি তাঁহার কো প্রিয়পাত্রকে পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দং

উদ্ধৃত হইল। "My father was very well-affected towards poet Michael M. Dutt. He used to come to our house very often when he lived with his family in Chandernagore. Unfortunately both my brother and myself were very young, much too young to appreciate his genius. I wish we could have made a note of everything notable that fell from his lips when he used to talk to father and us. I regret the opportunity lost ; * * * I wish the immortal poet Madhu Sudan Dutt had not been 'Michael'—the author of *Brajangana-Kabya.*"

স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী

শুনিয়াছি, 'ব্রজাঙ্গনা' অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিরচিত হয় সম্প্রতি পূর্ব্ব বঙ্গের জনৈক সমালোচক 'ব্রজাঙ্গনা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"মাইকেল শুধু অমিত্রাক্ষর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এমন নহে; তাঁহার লেখনী হইতে মিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ কবিতাও অমৃতধারার ন্যায় প্রবাহিত হইত। তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই সকল কবিতার কোনটিই ছন্দঃ, পদলালিত্য, ভাব ও মাধুর্য্যে মাইকেলের ন্যায় উচ্চকল্পের মহাকবির পক্ষে কোন অংশেও অনুপযুক্ত হয় নাই। মহাজন বৈষ্ণব-কবিগণের পরে, 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের' মত প্রাণমনোহারিণী মধুর কবিতায় আর কেহ কোন বাঙ্গালা-কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কি না, সন্দেহ।"

মধুসূদনের জীবনী-প্রণেতা লিখিয়াছেন—"খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যে, মধুসূদন ইহাতে বৈষ্ণবমহাজনোচিত ভাবের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘাজনক।" শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই কাব্য পাঠে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন,—"তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়।"

'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের' স্বত্ব মধুসূদন নিজে রক্ষা করেন নাই—একজন ভক্তকে দান করেন। সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত ও অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা-সম্বন্ধী নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। * * * কিন্তু এদিকে তিনি একজন কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি,

কাব্যখানির প্রতি তিনি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। 'ব্রজাঙ্গনা' পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন—মাইকেল

রাজা শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামী

তাই জানিতে পারিয়া, 'ব্রজাঙ্গনা'র সমস্ত স্বত্ব—(copyright) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই—বৈকুণ্ঠ বাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠ বাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

'ব্রজাঙ্গনা' সম্বন্ধে আর একটি অতি প্রীতিপ্রদ কাহিনী বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' প্রকাশিত হইলে, নবদ্বীপ-নিবাসী জনৈক পরমবৈষ্ণব উহা পাঠ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মধুসূদনকে দেখিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। মধুসূদন যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি এতটা খেয়াল করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া, অনুসন্ধানে মধুসূদনের বাটী অবগত হইলেন। তথায় গমন করিয়া, উপরিতলে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন যে, একজন সাহেববেশী কৃষ্ণকায় ব্যক্তি চেয়ারে বসিয়া, টেবিলের উপর কি লিখিতেছেন। আগন্তুক, ভ্রম-ক্রমে অপর কোথাও উপস্থিত হইয়াছেন, এই ভয়ে শশব্যস্তে যেমন গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, অমনি মধুসূদনের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িল। তিনি বিস্ময়ে—কৌতূহলী হইয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন ?"

বৈষ্ণব। এ বাটীতে কি মধুসূদন ছিলেন ?

মধুসূদন। কেন ? তাঁহাকে আপনার কি প্রয়োজন ?

বৈষ্ণব। মহাশয় ! আমি তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' পাঠ করিয়া বিমোহিত হইয়াছি ; তাই একবার সেই পরম-ভক্ত বৈষ্ণব-শেখর পুণ্যবান মধুকে দেখিব বলিয়া, নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছি। তিনি কোথায় মহাশয় ?

মধুসূদন। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) আমারই নাম মধুসূদন।

মধুসূদনের উত্তরে বৈষ্ণব একেবারে স্তম্ভিত—নির্ব্বাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎকাল অনিমেষনেত্রে তাঁহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া, আবেগভরে তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা ! তুমি শাপভ্রষ্ট। গৌর-অবতারে 'কালো-অঙ্গ গৌর' করিয়া আসিয়াছিলে ; এবার কি তাই আবার কালোরূপে—মধুসূদন হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ ?"

বাস্তবিকই মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' পদলালিত্যে ও ভাবমাধুর্য্যে এতই মধুর যে, পাঠ করিলে মনঃপ্রাণ ভাবে বিভোর হইয়া যায়—করুণ-ঝঙ্কারে হৃদয় পূর্ণ হয়। তাঁহার মিত্রাক্ষর-ছন্দে রচিত শ্রীমতি রাধিকার বিরহগীতি সম্বন্ধে, লর্ড বায়রণের ভাষায় বলা যাইতে পারে,—

—"But only in the sunny South
Such sounds are utter'd and such charms display'd,

So sweet a language from so fair a mouth—
Ah ! to what effort would it not persuade ?"*

মধুসূদন তাঁহার এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিকে এতই ভালবাসিতেন যে, সময়ে সময়ে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "মেঘনাদ অপেক্ষা আমার 'ব্রজাঙ্গনা' ভাল।" মিল্টনও তাঁহার 'Paradise Lost' অপেক্ষা 'L'allegro' গীতিকাব্যকেই উৎকৃষ্ট বলিতেন। পুত্রাপেক্ষা কন্যার প্রতিই জনকের স্নেহ যে সমধিক হইয়া থাকে, এই সকল উক্তিই তাহার উদাহরণ।

মধুসূদন প্রকৃত কবির আবেগে কবিতা লিখিতেন। যখন কবিতার ভাব আসিত, তখন ভাষা উৎসমুখমুক্ত বারিধারার মত উচ্ছ্বলিত হইত! সময় সময় তিনি সম্মুখে যাহা পাইতেন, তাহাতেই কবিতা লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে'র দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তি একখানি পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠায় লিখিত ছিল। নিম্নোদ্ধৃত খণ্ড-কবিতাই তাঁহার আবেগে কবিতা-রচনার বিশিষ্ট অন্যতম প্রমাণ—

"সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধ্যে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘসনে সৌদামিনী— সমরূপে, লো কামিনি,
গলে পীতধড়া রূপে ঝলঝল ঝলে॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেনে মৌনব্রত তুমি শূন্য-নিকেতনে॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি!
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে!"

* Ravenna, June 21, 1819.

মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনার' প্রথমভাগে শ্রীমতীর বিরহের দিব্যোন্মাদ-অবস্থা বর্ণনা করিয়া, কাব্যের উপর "পদাঙ্কদূত" হইতে "গোপী ভর্ত্তৃ-বিরহ-বিধুরা উন্মত্তেব" এই শ্লোকাংশ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ভাগে 'বিহার' বর্ণনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যে এই মধুর পদলহরীর তরঙ্গলীলা অকাল-নিদাঘে শুকাইয়া গেল!

তাঁহার শেষ নাটক—'কৃষ্ণকুমারী'। ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এখানি বঙ্গভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক ও বিষাদান্ত নাটক (Tragedy)। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ করিয়া, তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ ঠিক একমাসে, ইহা সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থের মুখপত্রে মধুসূদন কালিদাস হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন—

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ॥"

মধুসূদনই প্রথমে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য-রীত্যনুসারে নাটক-রচনা করেন। তাঁহারই পদাঙ্ক-অনুসরণে বঙ্গদেশের নাট্যসাহিত্য বর্ত্তমানকালে এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' সংস্কৃত-আদর্শে বিরচিত; কিন্তু তৎপরে, তিনি নিজ স্বাধীন-প্রবৃত্তিবশে সংস্কৃত-গ্রন্থকার-দিগের নির্দ্দিষ্টপথ, পরিত্যাগপূর্ব্বক পাশ্চাত্য-পথ অবলম্বন করিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি, একখানি পত্রে, রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন—

"If I live to write other Dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the *dicta* of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models."

—ইহারই ফল 'কৃষ্ণকুমারী'।

সম্প্রতি, 'অর্চ্চনা' পত্রে জনৈক লেখক 'বঙ্গীয় নাটকের ক্রমোন্নতি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —

"মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে 'ঐতিহাসিক-নাটক' আমদানী করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে, ভারতীয় পৌরাণিক-ঘটনা অবলম্বনে, 'শর্ম্মিষ্ঠা'; তৎপরে, গ্রীক পুরাণের ছায়া-পাতে, 'পদ্মাবতী' এবং অবশেষে, ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। * * * মধু-

সূদনের নিকট তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গীয়-নাট্যকারগণ যত ঋণী, তত বোধ হয় আর কাহারও নিকট নহে।"

তাঁহার জীবনীকার 'কৃষ্ণকুমারী' সম্বন্ধে বলেন—"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। বাঙ্গালাভাষায় এপর্য্যন্ত যে সকল বিষাদান্ত নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অতি অল্পই ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে।"

বঙ্গের সুধীসমাজ মধুসূদনকে, অমিত্রচ্ছন্দে মহাকাব্য রচনার হিসাবে, বাঙ্গালার মিল্টন বলিয়া উল্লেখ করিলেও, মনস্বী রাজনারায়ণ—নাটকে, প্রহসনে, গীতিকাব্যে ও অন্যান্য নানাবিষয়ে—তাঁহার সৃষ্টিকুশল-প্রতিভা (Constructive genius) দেখিয়া, তাঁহার সমালোচনার একস্থলে লিখিয়াছেন—"তাঁহাকে বাঙ্গালা-সাহিত্যের 'গেটে' (Johan Wolfgang Von Goethe) আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। 'গেটে' যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মণ-ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা-ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন।"

মধুসূদন তদানীন্তন নটকুলশিরোমণি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' উৎসর্গ করেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন বড়ই ভালবাসিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি, তাঁহাকে 'Friend Garrick' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি একখানি পত্রে কেশববাবুকে লিখিয়াছেন, "You suggest an under-plot; the suggestion is good—*what* can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick!—"

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ—রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহ ও উৎসাহেই মধুসূদন নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। শেষে, তাঁহাদিগের নাট্যসমাজের তিরোধানে, মধুসূদন নাটক লেখা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে,অবকাশকালে অমিত্রচ্ছন্দে 'সুভদ্রা' নামক নাট্যকাব্যের দুই অঙ্ক লিখিয়া, ও মুসলমান নরনারীর চরিত্রাবলম্বনে অমিত্রচ্ছন্দে 'রিজিয়া' নামক একখানি বাঙ্গালা নাটকের কিয়দংশ লিখিয়াই, বহুকালের জন্য নাটক লেখায় ক্ষান্ত হন। তাঁহার য়ুরোপ-যাত্রাও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। নাটকে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তনও মধুসূদনের কীর্ত্তি।

যেসময় মধুসূদন তাঁহার নাটকাবলী ও প্রহসনদ্বয় রচনা করেন, সেসময় তাঁহার আদালতের কার্য্য প্রায় বেলা ৩।৪ টার মধ্যেই শেষ হইয়া যাইত। তদনন্তর, তিনি পাইকপাড়ায়

৺কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গমন করিতেন। সেখানে রাজাদিগের সহিত রচনা-সম্বন্ধে নানা পরামর্শে, সরস কথোপকথনে, কখন কখন লেখনী-সঞ্চালনে ও সাহিত্যচর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করিতেন। প্রথমে যখন পাইকপাড়ায় যাইতে আরম্ভ করেন, তখন, একদিন অপরাহ্ণে, লিখিতে লিখিতে সহসা লেখনী ত্যাগ করিয়াই মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন—"আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হ'ল—আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন!" রাজারা ভাবিলেন—'এ আবার কি? খ্রীষ্টানের আবার সন্ধ্যা আহ্নিক কি?'—রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করায়, মধুসূদন হাস্য-সহকারে উত্তর দিলেন, "গেলাসরূপ কোষায়, দুই আউন্স পেগ্‌রূপ গঙ্গাজলে, আচমন কার্য্য সমাধানে আহ্নিককৃত্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে।" রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তখন মধুর হাস্যে সোৎসুকে মধুসূদনের অপরূপ "সন্ধ্যা-আহ্নিকে"র ব্যবস্থার আদেশ করিলেন।

বহুপরবর্ত্তীকালে, 'বিষবৃক্ষ' নামক উপন্যাসে, বঙ্কিমচন্দ্র

মধুসূদনের এই রহস্যটি রূপান্তরিত ও বিস্তৃত করিয়া দেবেন্দ্র-প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছিলেন। *

বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত মধুসূদনের সংশ্রব ১৮৫৮ সালে 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি-অনুবাদ হইতেই আরব্ধ হয়। বাঙ্গালা-নাটকের সংস্কার ও উন্নতির প্রবর্ত্তক মধুসূদনের কার্য্যসম্বন্ধে মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কিশোরীলাল হালদার, প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্য প্রবীন ও নবীন লেখকগণ এত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন যে, সেসকলের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

গৌরদাস বাবু বঙ্গীয়-নাট্যশালার মূল ইতিবৃত্ত (origin), অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়া, যোগীন্দ্র বাবুকে নিম্নলিখিত কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন—

"I trust your readers will find the * * account of the origin of the Bengalee Theatre interesting and, therefore, excuse us for its length; and although we were desirous of preserving the account for the information and interest of posterity, we would not have given it in this book, if the name of Modhu Soodun Dutt were not intimately connected with the Bengali Drama, and if he had not taken a prominent part in the promotion and success of the first Bengali Theatre, by composing plays for it, as well as attending the performances, and making suggestions to the actors for their improvement."

—'Reminiscences of Michael M. S. Dutta.'

—G. D. Bysack.

পাইক্‌পাড়ার সন্নিকটস্থ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত-কুঞ্জ (Emerald Bower.)-নামক বিচিত্র উদ্যানভবনে গিয়া, মধুসূদন প্রায়ই যতীন্দ্রমোহনের সহিত আমোদপ্রমোদ করিতেন। বিস্তৃত বৈঠকখানায় টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল না। ঢালা-ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়াশ্রেণী সুসজ্জিত থাকিত। সবুটপদশোভিত হ্যাট্‌কোট্‌-পেণ্টালুন-ধারী মধুসূদন, গৃহদ্বারের নিকটেই একটি তাকিয়া টানিয়া লইয়া, তাহার উপর হেলান দিয়া, অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় দ্বারের দিকে সবুট্‌-পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া,সিগারেটের* ধূম উদ্গীরণ করিতেন। তথায় যতীন্দ্রমোহনের সুন্দর টপ্পাগায়ক, খড়দহ নিবাসী স্বর্গীয় ষষ্ঠিচরণ মুখোপাধ্যায়কে দেখিলেই বলিয়া উঠিতেন, "মুখুয্যে মশাই! আপনার সেই গান্‌টা শুন্‌বো।" ষষ্ঠিচরণ অমনি তানপুরা-তবলা-সংযোগে তাঁহার প্রিয় গানটি এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর প্রাচীন-প্রসিদ্ধ টপ্পাগুলি গাহিতেন; তাঁহার গীতে মধুসূদন পরম পরিতুষ্ট হইতেন।

বন্ধু গৌরদাস কলিকাতায় থাকিলে, মধুসূদন অন্ততঃ সপ্তাহে দুইদিন তাঁহার বড়বাজারের বাটীতে গমন করিতেন। বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই, বামদিকের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, 'গৌর! গৌর!' বলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে উপরে উঠিতেন। গৌরদাস বাবু উপস্থিত না থাকিলে, ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিতেন, "রঘু! শোন্—শোন্—যা, 'মা'কে বল্‌গে তাঁর কেরেস্তান ছেলে এসেছে—শিগ্‌গির্‌ রুটি-ঘণ্ট পাঠিয়ে দিন্‌!" রঘু তৎক্ষণাৎ বাটীরমধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া, গৌরদাস বাবুর জননীকে মধুসূদনের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিত। পরম স্নেহময়ী-জননী তখন মধুসূদনের জন্য স্বহস্তে রুটি ও ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া, অন্যান্য মিষ্টান্ন ও ফলাদির সহিত বহি-র্বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু মধুসূদন অন্য কিছু তত পছন্দ করিতেন না—খাইতেনও না; কেবল রুটি-ঘণ্টই † তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি কখনও জলপান করিতেন না; তৎপরিবর্ত্তে আহারান্তে একটু 'বিয়ার' পান করিতেন।

* "বিষবৃক্ষ"—দ্রষ্টব্য।

* পাঠক! মনে করিবেন না যে, তখন এদেশে Cigarettes আসে নাই! তবে, জনৈক অশীতিপরবৃদ্ধ বলেন যে, "আমি জীবনে প্রথমে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনকে কাগজে পাকাইয়া Cigaretteএর ধূমপান করিতে দেখি।" উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখো-পাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "মাইকেলই বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে Cigarette ব্যবহার করেন। "রাসবিহারীবাবু লিখিয়াছেন, "He was a great smoker, especially of cigarettes." লেখক।

† বড়বাজারের প্রসিদ্ধ বসাক-বংশীয়দিগের 'রুটি ও ঘণ্ট' প্রস্তুত-প্রণালী বড়ই মুখরোচক ও উপাদেয়। এই দুইটি খাদ্যদ্রব্য-প্রস্তুত-চাতুর্য্য বোধ হয়, তাঁহাদের পরিবারমধ্যেই নিবদ্ধ আছে।

যেদিন গৌরদাস উপস্থিত থাকিতেন, এবং দেখিতেন যে, মধুসূদন রুটি ও ঘণ্ট ভিন্ন সজ্জীভূত খাদ্যসামগ্রীর অন্য কিছুই স্পর্শ করিতেছেন না, তখন তিনি জননীর স্বহস্ত-প্রস্তুত কোন কোন উপাদেয় খাদ্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "আচ্ছা এসব না খাও, ঐটা খেয়ে দেখ ; মা, ওটা তোমার জন্যই তৈয়ারি করিয়াছেন।" তখন তিনি তাঁহার অনুরোধে অন্য খাদ্য ও কিছু কিছু খাইতেন। তবে, রুটি ও ঘণ্টের দিকে ঝোঁকটা এতই বেশী ছিল যে, অনেক ভাল জিনিষ ফেলিয়াও মধুসূদন তাহাই খাইতেন।

একদিন রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে, কোন সামাজিক নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে, সকলে ধুতিচাদর পরিয়া আসিয়াছিলেন ; একমাত্র মধুসূদনই কেবল কোট-পেণ্টালুন পরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দিগম্বর বাবু বলিলেন—"মাইকেল ! আজিকে তুমি কাপড় পরিয়া আসিলে না কেন ?" মধুসূদন হাসিয়া উত্তর দিলেন—"কাপড় পরিয়া আসিলে যে গাড়ু-গামছা বহিতে হইবে ! কিন্তু ইহা Ruling raceএর পোষাক ; এতে সে ভয় নাই !"

মধুসূদনের প্রতিপক্ষ ও অমিত্রচ্ছন্দের বিরুদ্ধবাদিগণের বিবিধ বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও, এই সময়ে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) মধুসূদনের অপূর্ব্ব কবিযশঃ ও কীর্ত্তিপ্রভা বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম কোটীকণ্ঠে বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে, সেই সুদূর সমুদ্রতীরবর্ত্তী তমসাচ্ছন্ন প্রবাসাবাস মান্দ্রাজের (Benighted Madras) ন্যায়, আত্মীয়-বন্ধু-পরিবৃত সৌরকরবিভাসিত হরিতোজ্জ্বল বঙ্গদেশেও মধুসূদনের চির-অশান্ত হৃদয়, অনাবিল শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত মোকদ্দমায় * জয়লাভ করিয়া, তিনি ৭৫০০০৲ টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়দ্বয়, মধুসূদনের অন্যতম বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের মুখে তাঁহার আর্থিক-দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া, প্রচুর অর্থ হাওলাৎ দিয়া, তাঁহার বিপুল ঋণভার লাঘব করিয়াছিলেন। এই সময়ে, পুলিশ-আদালতের বেতন, পৈত্রিক সম্পত্তির, ও পুস্তক-বিক্রয়ের আয় প্রভৃতিতে তাঁহার কতক অর্থসাচ্ছল্য ঘটিয়াছিল। ফলে, তাঁহার চির-অশান্তিময় চিত্তে এই সময়ে যেন কথঞ্চিৎ শান্তির সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়াছিল—চির-আঁধারে যেন মুহূর্ত্তের জন্য দামিনী-স্ফুরণ হইয়াছিল। এই সময়, তিনি রাজনারায়ণবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in my forest-solitude. But thank God, I am not unhappy."

কিন্তু বলিতে পারি না, কি অজ্ঞাত কারণে, কি নিগূঢ় রহস্যে অচিরে আবার তাঁহার হৃদয়াকাশে বিষাদ-ময়ী পূর্ব্ব-স্মৃতির গাঢ় অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল। লব্ধদ্রব্যজাতে অতঃপর আর তাঁহার চিত্তে প্রসন্নতা জন্মে নাই। সংসারের ধন, জন, মান, যশঃ ও গৌরব—কিছুই আর তাঁহাকে শান্তিও তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ হয় নাই। এই দুর্ব্বহ মানসিক অশান্তির সময় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রচনা করিতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই—তৎপরিবর্ত্তে, মধুসূদন, তাঁহার মান্দ্রাজের অভিজ্ঞতা ও পূর্ব্ব-স্মৃতি বিজড়িত, 'আত্মবিলাপ' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের

* "Shortly afterwards (*i.e.*, after his arrival to Calcutta from Madras) we find him engaged in litigation with some of his relations for the recovery of his paternal property. While Mr. Dutt was in Madras, and his father on his death-bed, an attempt was made to have him disinherited. The dying man had been advised by his relations to leave his property by Will to some other person ; but he had still so much affection for his son, that he simply replied that, 'the property must go to him whose it was by right of birth.' Being thus baulked in their nefarious design, the evil-minded relations went so far as to forge a Will disinheriting young Dutt from his father's property. Litigation ensued, and justice was done, when the rightful owner ultimately succeeded in recovering his property. The total value of the property, the bulk of which consisted of landed-estates called "abad" in the Sunderbans, was estimated at Rs. 75,000 (seventy-five thousands)."

"Michael M. S. Dutt"—by K. M. Haldar, B.L.

"তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায়" প্রকাশিত করেন। আগ্নেয়গিরির গৈরিক নিঃস্রাবের তুল্য অগ্নিময়ী—মর্ম্মের অতলতলস্পর্শিনী—ভাবরাজিসম্পন্ন সেই অপূর্ব্ব কবিতাটি, যথাসম্ভব বিশ্লেষিত করিয়া, আমরা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

এই 'আত্মবিলাপ' শীর্ষক কবিতায় মধুসূদনের মান্দ্রাজ-প্রবাসের ও, তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর, তাঁহার জীবনের বিষাদময়ী অভিজ্ঞতারাজি অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, মান্দ্রাজে অবস্থানকালে যে নৈরাশ্যের ঝঙ্কার তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইয়াছিল, সেই সুষুপ্ত-ধ্বনি আবার জাগৃত হইয়া, এতৎসমবায়ে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মর্ম্মে মর্ম্মে ধ্বনিত হইয়াছিল। জীবন-প্রবাহ প্রবলবেগে কাল সিন্ধুনীরে মিশ্রিত—বিলীন হইবার জন্য ধাবমান হইতেছে, তবুও আশার নেশা ছুটিতেছে না; তিনি কেবলই আশার ছলনায় প্রতারিত হইতেছেন—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু ? হায় !
তাই ভাবি মনে !
জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন ;—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ;—একি দায় !"

সাংসারিক-জ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মধুসূদনের কিছুতেই চৈতন্যের উন্মেষ হয় নাই; তিনি হতাশার উত্তপ্ত বাতাসে ঝলসিত হইয়া, জীবনের সুখশূন্য বিভাবরী যৌবনেই পোহাই-বার আশায় আকুল হইয়াছেন—

"রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর, যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলমলে,—
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?"

আশারূপ রজনীর স্বর্গস্বপ্ন, প্রভাতের-বাস্তবের জাগরণে নৈরাশ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।—তিনি কাঁদিবার জন্যই জাগিয়া-ছিলেন; দুরাশা যেমন অমিত মনোরম, সে আশা-ভঙ্গে তেমনই মর্ম্মন্তুদ যাতনা!—তাই ব্যথিতচিত্তে বলিতেছেন—

"নিশার স্বপন সুখে সুখী যে, কি সুখ তার !
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণ-প্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশ,
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার !"

তাঁহার চিরদুর্ভাগিনী, পতিপ্রাণা প্রথমাপত্নী রেবেকা ম্যাক্টাভিসের সহিত মনোমালিন্য ঘটায়—বিবাহের সপ্তবর্ষ পরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার করুণ-হৃদয় ভীষণ অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে;—

"প্রেমের নিগড় গড়ি, পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায় !
না বুঝিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !"

সাহিত্যব্রতে অর্থোপার্জ্জনের যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও, তাঁহার অভিলাষানুরূপ অর্থলাভ হয় নাই—কমল তুলিতে গিয়া মৃণালকণ্টকে তাঁহার হস্ত রক্তাক্ত হইয়াছিল; মণিহরণ প্রয়াসে ভুজঙ্গের দংশনে—বিষম বিষে—জর্জ্জরিত হইয়াছেন—

"বাকী কি রাখিলি, তুই ! বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষতমাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন ! কেমনে ?"

ইংরেজি-সাহিত্যে বিশ্বব্যাপিনী যশোলাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় প্রদীপ্ত যৌবন ব্যয়িত হইয়াছিল—কলিকাতার পরশ্রীকাতর ইংরাজসমাজ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার গৌরব উপলব্ধি করিতে পারিয়াও, তাঁহাকে তাঁহার উপযোগী যথাযথ পদমর্য্যাদা প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিল—প্রসিদ্ধ ইংরেজ-কবিদিগের সমকক্ষ—সমধর্ম্মা পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে সম্মুখীন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল।—আবার অন্যক্ষেত্রে, প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী বঙ্গীয় পণ্ডিতসম্প্রদায়ও, তাঁহাকে নূতন অমিত্র-ছন্দের প্রবর্ত্তনে দেশের চিরাচরিত প্রথার উচ্ছেদসাধন ও মিত্রাক্ষরস্বরূপ নিগড় ভগ্ন করিতে দেখিয়া,প্রজ্জ্বলিত ক্রোধানলে

তাঁহাকে ভস্মীভূত, ও ভ্রুকুটি-বজ্রনিক্ষেপে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল;—তিনি দুর্জ্জয় শক্তিসহকারে ও প্রচণ্ড বিক্রমে, সেই ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিলেও, তাঁহাদের মাৎসর্য্যরূপ বিষদশনের সুতীক্ষ্ণ দংশনে প্রপীড়িত হইয়াছেন—

"যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি হায়, অনাহারে অনিদ্রায় ?"

অকিঞ্চিৎকর পার্থিব মুকুতার লোভে ধীবর অতলজলে প্রবেশ করে; কিন্তু শতমুক্তাধিক মূল্যবান যে আয়ু, তাহাই অর্থোপার্জ্জনরূপ বৃথা পরিশ্রমে তিনি কালসমুদ্রের জলে হেলায় ফেলিয়া দিতেছেন; তাই নিজেকে কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া শেষে বলিতেছেন—

"মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল-জলে
যতনে ধীবর ;
শতমুক্তাধিক আয়ু, কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্ পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে অবোধ মন ?
হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !"

এই কবিতাটির প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক মসীবিন্দু মধুসূদনের হৃদয়-শোণিতে সুরঞ্জিত! কালের সাধ্য নাই যে, অক্ষয় কীর্ত্তিফলক হইতে ইহা কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারে।

এস্থলে একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। পাঠকপাঠিকা দেখিবেন, মধুসূদন অতীত-জীবনের বহুবিড়ম্বনার উল্লেখ করিয়া, অনুতপ্ত হইয়াছেন—কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি যে কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ কোথাও ইঙ্গিত-আভাসও করেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মে যে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, এ কথা স্থির। আমরা যথাসময়ে সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

ইংরেজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি কলিকাতার ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাটী পরিত্যাগ করিয়া, খিদিরপুরে ৬নং জেম্‌স্ লেনে;—জেমস্ ফ্রেডারিক্ (Mr. James Frederick) সাহেবের উদ্যানবাটীর দ্বিতলে সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই বাটী তাঁহার খিদিরপুরের পৈতৃক বাসভবনের ঠিক উত্তরপূর্ব্ব কোণে, প্রকাশ্য রাজপথ হইতে, দৃষ্টিগোচর হইলেও, কিঞ্চিৎ দূরে, অবস্থিত। ইহা অদ্যাপিও পূর্ব্বের আকারে বর্ত্তমান আছে।

খিদিরপুর, মনসাতলা লেন নিবাসী 'মধুসূদন-স্মৃতি-সমিতি'র প্রবীণ সম্পাদক, উক্ত বাটীতে মধুসূদনের অবস্থান সম্বন্ধে আমাদিগকে লিখিয়াছেন—

"আমরা যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন মাইকেলকে ৬নং মনসাতলার বাটীতে এক পরমাসুন্দরী মেমের সহিত বাস করিতে দেখি। ছাত্রসুলভ চাপল্যে ও তারুণ্যের বাচালতায় তাঁহার বিষয় কত কি বলিতাম এবং তাঁহার সম্বন্ধে কত কি ভাবিতাম—তৎসমস্ত ঠিক মনে নাই; তবে দু'একটি কথা মনে আছে। তাঁহাকে 'মাইকেল' বলিয়া চিনিবার আগে, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতাম যে, একজন জুলফী-ওয়ালা, মাঝখানের দাড়ী কামান, ঘোর কালো ফিরিঙ্গীকে, কি দেখিয়া এমন এক পরমাসুন্দরী মেম পসন্দ করিয়াছে! উভয়কে একত্রে দেখিলে, কোকিলপেড়ে কাপড়ের কথা মনে হইত। যেমন মাষ্টার জেমি, * তেমনি তাঁহার ভাড়াটিয়া! প্রভেদের মধ্যে এই যে, বাড়ীওয়ালা জেমি সাহেবের ভাগ্যে পূর্ণশশী ও পূর্ণিমার আলোক লাভ ঘটে নাই। পরে, আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়—গার্ডেন রিচ মিশনরী * স্কুলের (Garden Reach Missionary School) প্রধান পণ্ডিত—'ছাত্রবোধ'-প্রণেতা পরলোকগত কবিবর ৺দ্বারকানাথ রায়, একদিন অধ্যাপনাকালে মাইকেলকে 'Father of Blank Verse in Bengallee' অর্থাৎ 'বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক' বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচয় দেন। তখনকার প্রায় সকলের মত, অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদিগের ভাল লাগিত না। এই ছন্দ লইয়া তখন চারিদিক হইতে নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা

* আজ পর্য্যন্ত লোকে মনসাতলার গলিকে সেইজন্য 'জেমি সাহেবের গলি' বলে।

চলিতেছিল। কারণ, তখন ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি সুকবিদিগের আধিপত্য-কাল। অমিত্রচ্ছন্দের গভীর চিন্তাশীলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, ভালরূপ শিক্ষালব্ধ রুচির প্রয়োজন। মিল্‌টন কাউ-পারের অমিত্রাক্ষর কবিতাবলী পণ্ডিত-মণ্ডলীর আদরের জিনিষ; ইতরসাধারণের নয়।”

শেষোক্ত বাটীতে অবস্থানকালে মাইকেল মধুসূদন, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ কাব্য ‘বীরাঙ্গনা’ রচনা করেন। বঙ্গভাষায় এ শ্রেণীর কাব্যও তাঁহার নূতন সৃষ্টি! সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি অভিদের (Publius Ovidius Naso) বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে ইহা রচিত। বীরাঙ্গনা কাব্য, মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য্য ও ব্রজাঙ্গনার করুণ ঝঙ্কারের অপূর্ব্বসম্মেলন। বীরপত্নী ও বীরনায়িকাগণ, তাঁহাদের পতি ও বাঞ্ছিতের উদ্দেশে পত্রপ্রেরণ করিতেছেন;—সেই পত্রাবলীসমূহে তাঁহাদের বিবিধ মানসিক অবস্থার—দেশ, কাল, পাত্রের বর্ণনা অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও লিপি চাতুর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার তুল্য এই শ্রেণীর কাব্য মধুসূদনের পরবর্ত্তী কোন বঙ্গীয় কবি এপর্য্যন্ত রচনা করিতে সমর্থ হইলেন না।

এই কাব্যের উপরিভাগে মধুসূদন বিশ্বনাথ-কৃত “সাহিত্য-দর্পণ” হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন;

“লেখ্য প্রস্থাপনৈঃ—

—নার্য্যাভাবাভিব্যক্তি রিষ্যতে।”

—সাহিত্য-দর্পণম্।

১২৬৮ সালের ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলাচরণের সহিত, “বঙ্গ-কুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।

ইতি সন ১২৬৮ সাল। ১৬ ফাল্গুন।”
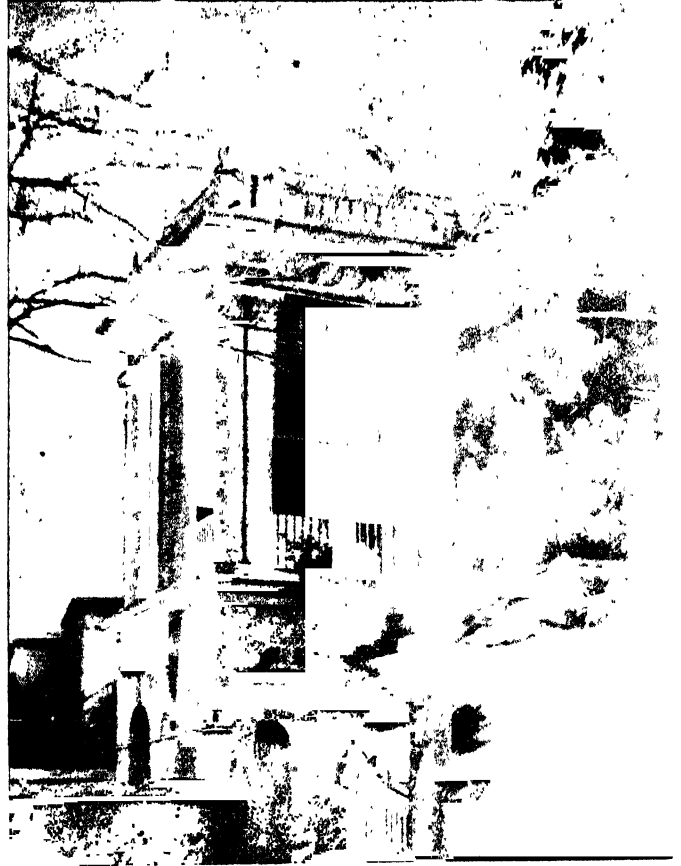
জেম্‌স্ লেনের বাটী

এই কাব্যে ‘দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী’-পত্রিকা সম্বন্ধে কবির জীবনী-লেখক বলেন, “রুক্মিনী-পত্রিকায় ভাগবতবর্ণিত যেসকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, কবি তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠ করিলে মনে হয়, যেন কোন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ভক্তেরই রচনা পাঠ করিতেছি। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, হিন্দুভাব মধু-সূদনের হৃদয়ে কিরূপ রাজত্ব করিত—এইসকল স্থল হইতে আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি।”

বীরাঙ্গনার ‘তারা’-পত্রিকা, নীতিবিগর্হিত হইলেও, কবিত্ব-সম্পদে ও রচনা-মাধুর্য্যে এতই সুন্দর যে, কলঙ্কী শশাঙ্কের ন্যায় ইহা চিরদিন কাব্যপিপাসুর মনোরঞ্জন করিবে;—অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে ইহার দোষ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

এইস্থানে প্রসঙ্গতঃ বলি যে, মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ভারতীয় অন্যান্য আর্য্যভাষায় অমিত্রাক্ষর

ছন্দে কবিতা রচনার নানাসময়ে বহুল প্রয়াস হইয়াছিল ; কিন্তু সফল হয় নাই। বিহারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ যুবককবি শ্রীযুক্ত রঘুবীর নারায়ণ, মহাকবি মাইকেলের পদানুসরণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

করিয়া হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা রচনার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের বিশ্বাস, এই নিস্ফলতার প্রধান কারণ এই যে, কেবল প্রতিভাবলেই ইহা সাধ্য নহে – একযোগে গ্রীক্‌-ল্যাটিন্‌ ও ইংরেজী ভাষায় অগাধ ব্যুৎপত্তি, সেগুলির ভাব ও ভাষায় নির্ব্যূঢ় অধিকার, না জন্মিলে তাহাদের অন্তর্নিহিত গূঢ়—সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যসুষমারাজি নিজস্বভাবে হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইলে, এই অপূর্ব্ব ভাবঝঙ্কারময়ী কাব্য-প্রতিভা উন্মেষিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। ক্ষণজন্মা মধুসূদনের এই অনন্যসাধারণ গুণরাজি ছিল বলিয়াই, তিনি অমিত্রাক্ষর কাব্যরাজ্যে একচ্ছত্রী সম্রাট্‌ হইয়া রহিয়াছেন।

"Blank-verse, once the target of wise-acre Pandits and carping critics, has, notwithstanding their ominous head-shakings and gloomy vacticinations, come forth bodied in "flesh and blood", to mark a new epoch in the annals of our literature—a literature that nurtured in its rich native soil, is destined like the gigantic banian to spread out its umbrageous branches over the vast Province of Bengal, * * like "the leaves of Vallombrosa", over the world. Blank-verse, like the stately steed, has outstripped the trotting jennet of Rhyme that capered and cantered with jingling bells, for ages past."

—'Reminiscenes of Michael M. S. Dutta.'

—G. D. Bysack.

মধুসূদনের প্রতিভার ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। নিজেদের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াই, সে সম্বন্ধে আমরা প্রথম হইতেই সতর্ক হইয়াছি ও দেশপ্রসিদ্ধ মনস্বীদিগের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া, বোধ হয়, সদ্বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছি—বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় লেখকদিগের ন্যায় সমালোচকের আসন গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি নাই। অল্পদিন হইল, জনৈক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, আজিও মধুসূদনকে কেহই চিনিতে পারেন নাই—যদি কেহ তাঁহাকে যথার্থরূপে চিনিয়া থাকেন, তবে সে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র, ও রমেশচন্দ্র। তাঁহারাই তাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে উপযুক্ত সম্মান দিয়াছিলেন।

কবিগুরু মিল্টনের ও তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দের উদ্দেশে, কবিবর উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কবিবর লর্ড টেনিসন যে দুইটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, সে দু'টিই ভারতের মিল্টন, মধুসূদনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য। তাঁহাদের ভাষায়, মধুসূদনের উদ্দেশে, আমরা বলিতে পারি ;—

"Michael ! thou should'st be living at this hour :
India hath need of thee * *
* * * We are selfish men ;
Oh ! raise us up, return to us again ;
And give us manners, virtue, freedom, power.
Thy soul was like a Star, and dwelt apart :
Thou hadst a voice whose sound was like the sea :
Pure as the naked heavens, majestic, free,

So didst thou travel on life's common way,
* * * and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay."

—— ——

"O MIGHTY-MOUTH'D inventor of harmonies,
O skill'd to sing of Time or Eternity,
God-gifted organ-voice of India,
Michael, a name to resound for ages;
Whose Titan angels, * *
Starr'd from Jehovah's gorgeous armouries,
Tower, as the deep-domed empyrean
Rings to the roar of an angel onset—
Me rather all that bowery loneliness,
The brooks of Eden mazily murmuring,
And bloom profuse and cedar arches
Charm, as a wanderer out in ocean,
Where some refulgent sunset of India
Streams o'er a rich ambrosial ocean isle,
And crimson hued the stately palmwoods
Whisper in odorous heights of even."

—— ——

যে মহাকবির আদর্শে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বিরচিত হয়, তাঁহার জীবনের সহিত মধুসূদনের জীবনের, কোন কোন বিষয়ে, সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে আমরা একটির উল্লেখ করিতেছি।—অভিদ * রাজাজ্ঞায় রোম হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, সুদূর কৃষ্ণসাগরের উপকূলে টমি নামক স্থানে সুদীর্ঘ নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। আমাদের মধুসূদনও গ্রহবৈগুণ্যে—ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুদূর মান্দ্রাজ-উপকূলে বহুবৎসরের জন্য প্রবাসী হইয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈ-মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, তাঁহার এই দীর্ঘপ্রবাস লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে অভিদের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছিলেন; "(Michael M. S. Dutt) though now doomed to reside at 'benighted' Madras, like Ovid on the shores of the Black Sea, is also a native of Bengal."

মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন—(১) ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী; (২) অনিরুদ্ধের প্রতি উষা; (৩) যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা; (৪) নারায়ণের লক্ষ্মী, (৫) নলের প্রতি দময়ন্তী; (৬) ভীমের প্রতি দ্রৌপদী নামক ছয়খানি পত্রিকার প্রথমাংশগুলি লিখিয়াছিলেন; কিন্তু য়ুরোপ যাত্রার ব্যস্ততায় সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে, য়ুরোপে কিম্বা ভারতবর্ষে, এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই!

আমরা 'গান্ধারী' পত্রিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 'বীরাঙ্গনা' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। গান্ধারীর স্বামী কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তিনি শ্যামলা ধরিত্রীর ও সুনীল আকাশের কোন সৌন্দর্য্যই দেখিতে পান নাই; পতি যে সুখে বঞ্চিত, সতীনারী কেমন করিয়া সেই সুখ ভোগ করিবেন?—তাই, পতি গত-প্রাণা গান্ধারী, কাপড় ভাজিয়া সপ্তবার চক্ষুদ্বয় পরিবেষ্টনে আপনার দৃষ্টিশক্তি রোধ করিয়া বলিতেছেন—

"আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর হে রোহিণীপতি,
চারুচন্দ্র; তারাবৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বর সাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকীর ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু,

* "By an edict of Augustus, however (A. D. 8), he was commanded to leave Rome for Tomi, a town on the inhospitable shores of the Black Sea, near the mouths of the Danube the habitation of the rude getae, and the extreme limit of the empire."

—The New Popular Encyclopedia.

সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন দণ্ডাবসানে অভিদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের আদেশ ছিল। কিন্তু তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর নির্ব্বাসনযন্ত্রণা ভোগ করিয়া সেই নির্ব্বাসনেই কঠোর দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন।

(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেণ তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন ;
হে উৎস গিরি দুহিতা জননী মা তুমি ;
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি!
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখি, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হ'য়ে ছাড়িনু সবারে ;
স্নেহহীন একি কথা ? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যতদিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।"

কি সুন্দর কোমল-করুণ অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কবিতা! ইহাও তাঁহার মানসিক অশান্তিনিবন্ধন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন স্বীয় প্রবর্ত্তিত অমিত্রচ্ছন্দের পূর্ণাঙ্গতা সাধন করিয়া গিয়াছেন। গাম্ভীর্য্যের ও মাধুর্য্যের সম্মেলনে এ কাব্যের ভাষা অতি উপাদেয় ও অতুলনীয়। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে কাব্যরচনার সমাপ্তি! এমন কি—বঙ্গভাষারও অমিত্রচ্ছন্দে রচিত শেষ কাব্য। ইহার পরে, অপর কোন কবি-কর্ত্তৃক এরূপ সুললিত অমিত্রচ্ছন্দে কোন কাব্য অদ্যাবধি রচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে, মধুসূদন ৩৷৪ খানি পৌরাণিক কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, সেগুলির একখানিও সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই!—তন্মধ্যে 'পাণ্ডব-বিজয়', 'সিংহল-বিজয়', 'ভারত-বৃত্তান্ত', ও 'দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর'ই উল্লেখ-যোগ্য। 'পাণ্ডব-বিজয়ে'র প্রারম্ভ কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেখুন—

পাণ্ডব-বিজয়।

প্রথম-সর্গ।

"কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ ; সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নবরঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃত রূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদপালনে পুষ্ট কবিমনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ যশের উদ্দেশে।
শুনি সে নদেরমুখে সুমধুর ধ্বনি
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরল গতি ;
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে,,
দেহ ফুল শরাসন, পঞ্চফুলশরে।

'সিংহল বিজয়ে'র প্রারম্ভ এইরূপ—

সিংহল-বিজয়।

"স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্র-মোহিনী—
মুরজা শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা,
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গল-বাদ্য বাজিছে চৌদিকে।
রুষি সতী শশীমুখী সখীরে কহিলা ;—
'হেদে দেখ শশীমুখী, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে।
কি লজ্জা, থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি সই। উদ্যান-স্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে ?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা!
জলধি জনক তাঁর, তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা, বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি প্রভঞ্জনে লয়ে,
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে!'

স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি, হ্রেষিল অশ্ব পদ আস্ফালনে,
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গ-বৃন্দ। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী সাজি বিমোহন সাজে।"

— ——

'ভারত বৃত্তান্তে' মহাকবি মধুসূদন মহাভারতের নানা ঘটনা অবলম্বন করিয়া, নানাবিষয় লিখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'মৎস্যগন্ধা' নামক খণ্ডকাব্যের সূচনা অংশ এইরূপ ;—

"ধীবর দাস-রাজ কন্যা সত্যবতীর অতুলনীয় রূপ সত্বেও, মৎস্যগর্ভে জন্ম বলিয়া,. তাঁহার অঙ্গে মৎস্য গন্ধ নির্গত হইত বলিয়া, কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী ছিলেন না। অপ্সরানিন্দিত অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাই তরুণ-যৌবনের রূপলাবণ্যকে ধিক্কার দিয়া তিনি 'যমুনা'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

প্রথম সর্গ

মৎস্য-গন্ধা।

"চেয়ে দেখ, মোর পানে, কল-কল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি নড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরী-বন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে!
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল: কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!"

কি করুণরসাত্মক—মর্ম্মস্পর্শী আত্মবেদনা!

এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি খণ্ডকবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে যে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও প্রয়োজন মত দুইএকটি যথাস্থানে উদ্ধৃত করিব।

মধুসূদন স্বীয় প্রবর্ত্তিত অমিত্রচ্ছন্দে, কাহাকেও কাব্য রচনা করিতে দেখিলে অত্যন্ত প্রীত হইতেন। সেসময় পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয়, ঐ ছন্দে একখানি ক্ষুদ্রকাব্য লিখিলে, মধুসূদন স্বয়ং যাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছিলেন।

সাহিত্য-বিষয়েও মধুসূদনের উদারতা অসীম ছিল। ঢাকা-নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র, তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া, 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' লেখেন। অমিত্রচ্ছন্দকে অমিত্রচ্ছন্দে ব্যঙ্গ করায়, মহানুভব মধুসূদন সুভদ্র, জগদ্বন্ধু ভদ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কোন লেখক, মেঘনাদ বধ হইতে বহুঅংশ আত্মসাৎ করিয়া,একখানি পৌরাণিক কাব্য রচনা করিয়া মধুসূদনকেই দেখিতে দেন। নিজগ্রন্থ হইতে অনুকৃত হইলেও, মধুসূদন, তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া, তাহা সংশোধন করিয়া দেন; কিন্তু তাৎকালিক কোন সম্পাদক এই লেখককে ক্ষমা করেন নাই—পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, সংবাদপত্রে তাহার পরাঙ্গপুষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়া দেন। কাব্যখানি অচিরেই বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইয়া গেল।

হুগলী-চুঁচুড়া-নিবাসী, ভূতপূর্ব্ব সরকারীউকীল, সুলেখক ও প্রবীণ কবি শ্রীযুক্তদীননাথ ধর মহাশয়ের সহিত মধুসূদনের খুবই আত্মীয়তা ছিল; তিনি একপ্রকার মধুসূদনের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। দীন বাবু একজন সুগায়ক ও অতিশয় পরিহাসপটু। রহস্যপ্রিয় মধুসূদনের সহিত ইঁহার অত্যধিক মাত্রায় হাস্যপরিহাস ও রসিকতা চলিত। মধুসূদন-সম্বন্ধে ইনি কয়েকটি মধুরস্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া, আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা সেগুলি অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"আমি মাইকেলের একরূপ শিষ্য ছিলাম—তাঁর কাছে কবিতা লিখ্‌তে শিখি।

"কলিকাতায় লালবাজারে (৬ নং লোয়র চিৎপুর রোডে) অবস্থিতিকালে মাইকেল 'মেঘনাদবধ' লিখেন। টোলের পড়ুয়ার মত হল্‌দে কাগজে, প্রাচীন পুঁথির আকারে, আমি তার অবিকল নকল করতাম। সেই সময়ে একদিন আমার গুরুজী আমাকে রহস্য করে বলেন, 'দেখ, দিনু! লালবাজারে এসে লালপানি খাওয়াই সঙ্গত; আবার লালপাণি খেলে লালবাজারেই গতি হয়।—সৌরচক্র

কিনা! তুমি কিন্তু দেখ্‌তে পাই—কেবল সাদা জলই খাও; লালবাজারের লালপাণিও খেলে না—টলেও পড়লে

শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর

না; বেশ খাড়া আছো। ভগবান্ করুন,—চিরকাল এম্নিই থেকো!”

“পুলিসকোর্টের ইন্টরপ্রেটরের পদে অধিষ্ঠানকালে, ফরাসী ছাড়া, মাইকেল প্রায় সকল ভাষাই জান্‌তেন। তিনি ঐ সকল ভাষায় এম্নি অবলীলাক্রমে কথাবার্ত্তা কহিতেন, যে শুনিয়া বোধ হইত যে, ঐ জাতীয় কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।”

“মাইকেলের ‘শর্ম্মিষ্ঠা নাটক’ পাইকপাড়ার রাজাদের Belgatchia Theatreএ অভিনীত হয়। ইংরেজী অভিজ্ঞদের জন্য মাইকেল নাটকাকারে তাঁর শর্ম্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ করেন। Sir John Peter Grantএর ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরেজ সুপণ্ডিত শ্রোতার অভিমত এই যে,—শর্ম্মিষ্ঠার ইংরেজী খানিই মূল নাটক—বাংলা শর্ম্মিষ্ঠা তার অনুবাদ।”

“মাইকেলের ‘পদ্মাবতী’ নাটকের একস্থানে আছে—পার্ব্বত্য প্রদেশে বিদূষক বলিতেছেন, “ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনিমাত্র” দূরে প্রতিধ্বনি হইল—ধ্বনিমাত্র!—মাইকেলের পত্নী, তাঁহাকে সম্বোধনচ্ছলে “Dear!” বলিতেই, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে “Dear!” বলিয়া উত্তর দিতেন। আমি তাই বলিতাম, “Mr. Dutt, আপনি দেখিতেছি, পরমা সতী Mrs. Duttএরই প্রতিধ্বনি!”

“১৮৬১ সালে একটি কবিতা লিখে মাইকেলকে দেখ্‌তে দিই;—কবিতাটি পরে একখানি সাপ্তাহিক বাংলা সম্বাদপত্রে ছাপা হইয়াছিল। মাইকেল, কবিতাটি বেশ করে পড়ে, বলেন, ‘এত Poetry নয়,—এ যে Pottery!’

“মাইকেল ন্যায্য বিষয়ে একটু কেন—খুবই গর্ব্বিত ছিলেন; তবে, সে গর্ব্ব করিবার তাঁহার অধিকার ছিল। একবার তিনি কৃষ্ণনগরের তাৎকালিক জনৈক প্রথিতযশা বিদ্বানের গর্ব্বোক্তি শুনিয়া বলেন,—‘When Michael takes up his pen, the Krishnagore men should look up to their laurels.’”

“মাইকেল-ভার্জ্জিল্ হোমর মূল ল্যাটিন্ ও গ্রীক ভাষায় পাঠ করিতেন। কেন এরূপ করেন, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন,—‘গঙ্গাজল যদি খাইতে হয়, তবে সাধ্য হইলে হরিদ্বারের নির্ম্মল পবিত্র জল খাওয়াই শ্রেয়ঃ; কলিকাতার গঙ্গার লোণা, জাহাজি-গোরার মলমূত্রমিশ্রিত, অপবিত্র জল ব্যবহার করা বিধেয় নহে।’”

“মাইকেলের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় বেশ গাঢ় হ’লে পর, একদিন পানপাত্র পূর্ণ করে, আমার সুমুখে রেখে, বলেন—‘লও হে, একপাত্র টেনে লও।’ আমি খেতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি শেষে আদরে আমার পিঠে গোটাকতক থাবড়া মেরে, আমার প্রতি Elihu Barret এর কবিতাংশ—‘Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates’ এবং পরক্ষণেই গ্লাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, Shakespeare হইতে—

‘Oh! Thou invisible Spirit of Wine,
It thou hast no name to be known by,
Let us call thee—Devil!’ আবৃত্তি করেন।”

“মান্দ্রাজে একটি নদীতে কিছুদিন ক্রমাগত প্রাতঃস্নান করায়, মাইকেলের গলা চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে যায়—তাঁর স্বরভঙ্গ হয়। তাইতে আমি বলি, ‘মধুর বোতলটা যে

চিড় খেয়েই রয়ে গেছে, ভেঙ্গে যায় নাই—এই আমাদের মহাভাগ্য!'

[হুগলী জাঁইপাড়া (জাঙ্গিপাড়া) কৃষ্ণনগরনিবাসী, বর্ত্তমানে, ভবানীপুর, বলরাম বসুর সেকেণ্ড লেন অধিবাসী, প্রায় শতবর্ষজীবী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই কথা বলেন যে—'মান্দ্রাজের একটি নদীর হিমস্নিগ্ধ জলে স্নান করিতে গিয়া, মধুসূদনের মধুময় কণ্ঠস্বর চিরদিনের নিমিত্ত ভগ্ন ও বিকৃত হইয়া যায়।' অতি স্থবিরের স্মৃতিশক্তি এখনও বেশ প্রখর। ইনি মধুসূদনের সময়ে পুলিশ কোর্টে কার্য্য করিতেন। মধুসূদন-কর্ত্তৃক একরাত্রে নীলদর্পণ অনুবাদিত হওয়ার কথা বলিবার সময়, এই শত-বর্ষজীবী স্থবিরও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধুসূদনের পিতা, রাজনারায়ণ দত্তের সহিত ইঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহাকে ইঁহার সুস্পষ্ট স্মরণ আছে। ইনি রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেখিয়াছেন! এক্ষণে ইঁহার বয়ক্রম প্রায় ৯৪ বৎসর।]

"মাইকেল দেখিতে কালো ছিলেন। আর গলাটা ভাঙা' ভাঙা' ছিল। তাহার কারণ ত বলিয়াছি। তাঁহার কোন বন্ধু এই দুটি বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করায়, তিনি হাসিয়া বলেন, 'তা হ'লেও আমি গলাভাঙা কোকিল;— 'প্যাঁক্ প্যাঁক্'-শব্দকারী শাদা হাঁস ত নই!'—কটাক্ষকারীর রং শাদা ফ্যাকফেকে ছিল।"

"আর এক সময়, তাঁহার বন্ধু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজ বংশমর্য্যাদার—কৌলীন্যের গর্ব্ব করায়, মাইকেল রহস্যচ্ছলে বলেন, 'কিন্তু যতই বল; তুমি দাদা, knave, slave, বামুনের মোট মাথায় করে তোমার বাপদাদারা বাঙালায় আসে; আর আমি 'দত্ত, কারো ভৃত্য নয়।'" *

* 'সধবার একাদশী'তে নিমে দত্তের মুখেও এই কথা স্থান পাইয়াছে।

মধুসূদনের জীবিতাবস্থায়, সন ১২৭৫ সালে, বহরমপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও ডাক্তার রামদাস সেন মধুসূদনের উদ্দেশে একটি কবিতা লেখেন। তাঁহার কোন কাব্যামোদী মান্যবন্ধু উক্ত কবিতা পাঠে পরম পুলকিত হইয়া, ইংরেজি কবিতায় তাহার একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়া, তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। ডাক্তার রামদাস সেন, তাঁহার 'কবিতালহরী' নামক গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায়, উহা সন্নিবেশিত করেন। সেই কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।—

On Michael M. S. Dutt, Esq.

"Sweet as the charming flute in pleasant May,
Radha's beloved Hurry was wont to play,
When at the notes enraptured with delight,
Each rustic gazed the grove with steadfast sight,
Michael's strains refined with many an art,
Fills with ecstatic joy Bengalee's heart,
The Heroine, Maid, and Tilottoma sweet,
Have sung their varied lays with metres meet;
And martial notes from Meghnad's bugle grave,
Hath roused with pride the heart of many a brave.
Sweet your lays with pathos filled of every kind,
Fit to delight poetic native mind,
The ear still lingers by thy music groves,
To hear new songs of thee, it so much loves."

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১১)

বিপুল পিতৃঋণ সঙ্গে করিয়া ভিখারীবেশে যে দিন নির্ম্মল তাহার পিতৃবন্ধুর দয়া-ভিক্ষা করিতে তাঁহার প্রসাদতুল্য হর্ম্ম্যদ্বারে প্রবেশ-প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই দয়া যে এমন শতবাহু প্রসারিত করিয়া অসীম স্নেহালিঙ্গনে তাহাকে একেবারে বক্ষস্থলে আঁকড়াইয়া ধরিবে, সে কল্পনা তাহার স্বপ্নের মধ্যেও ছিল না। জীবনের যে ভীষণ মুহূর্ত্তে সংসারানভিজ্ঞ কিশোরের চক্ষে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দিগন্তবিস্তৃত অগ্নিক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, সেই অন্তহীন নিরাশার সমুদ্রে তৃণগুচ্ছের ন্যায়ই সে এই দুরাশাকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গোপসাগরের অপর পারে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহার এ চেষ্টা সফল হইবে—এ ধারণাকে অতি অস্পষ্টভাবেও সে নিজের চিত্তে স্থান দিতে পারে নাই। আজিকালিকার দিনে, কোন্ সুদূর অতীতের পুরাতন বন্ধু, যাহার সহিত আঠার-কুড়ি বৎসরকাল ধরিয়া দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই, তাহারই ছেলের জন্য একরাশি টাকা অনায়াসে মুঠায় ভরিয়া তুলিয়া দেওয়া—বাস্তবিকই কল্পনার অতীত। এই নব-সভ্যতার যুগে ভাইএর দায়-অদায়ে যার-বাড়া নাই মায়ের পেটের ভাই-ই নিজেকে দায়ী করিতে অনিচ্ছুক; যখন বাপ ছেলের মুখ চাহেন না; ছেলের ত কথাই নাই—বাপের মুখ চাওয়া ত আজি কালিকার দিনের ধর্ম্মই নয়; তখন বন্ধুপুত্র, একালের এই নবীন সভ্যতালোকিতা সুদিনে, কতটুকু প্রত্যাশার অধিকারী?

কিন্তু কখন কখনও এজগতে বড় আশায়ও ছাই পড়ে; আবার কখন আশার অতিরিক্তও পাওয়া যায়। নির্ম্মল নামে এই ছেলেটি, ছোটবেলা মা-হারাইয়া—সেইসঙ্গে বাপের স্নেহ, নিজের ঘরের আশ্রয়, সবই হারাইয়া—ফেলিয়াছিল। সেই প্রথম জীবনেই যে আশালতার গোড়াতেই তাহার ছাই ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বোধ করি, এবার পিতৃবন্ধুর, অপ্রত্যাশিত স্নেহনির্ঝরের তলায় টানিয়া আনিয়া তাহার ভাগ্য নিজের সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তটা সারিয়া লইয়া থাকিবে।

মুরলীধর নির্ম্মলকে পাইয়া, যেন কি নিধি কুড়াইয়া পাইলেন, এমন তাঁহার ভাবখানা দেখাইল। সেই উচ্ছ্বাসের মুখে, তাঁহার চিরদিনের মাথার-ঘাম পায়ে ফেলা, এত দুঃখে উপার্জ্জন করা যে ধনদৌলত, নির্ম্মল যদি চাহিয়া বসিত, তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র রাজার মত সে সবই বোধ করি, তিনি তাহার হাতে সঁপিয়া দিতেও পারিতেন। এ অবস্থায় সেই কয়েকটা হাজার টাকামাত্র, সে জায়গায় ত ধর্ত্তব্যই নয়। নির্ম্মল হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া টাকাগুলা অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিতই গ্রহণ করিয়াছিল; এবং সেই ঋণশোধের জন্য একটি চাকরীর সুপারিশও সে চাহিয়া বসিল। একবৎসরের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাহার পক্ষে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার যে বৎসরকাল সেই রুদ্ধ-দ্বার মুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা—সেও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। পিসিমার ছেলে অজিত, কলিকাতায় মেসে থাকিয়া ডাক্তারি পড়িতেছে, সেখানে যে এই একবৎসর তাহার একটু স্থান সঙ্কুলান না হয়, এমন নয়; এতদিন ভার কুলাইয়া, হঠাৎ এই অসময়ে তাহার পিসেমহাশয় তাহাকে যে ঠেলিয়া ফেলিবেন, এ সন্দেহেও তাঁহাকে অপমান করা হয়। কিন্তু সে নিজেই আবার সেই দায়িত্ব-বিহীন, আশাউদ্যমে পরিপূর্ণ সুখের ছাত্রজীবনে ফিরিয়া যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতে লাগিল। যদি সে জীবনটা তাহার পক্ষে বড় প্রলোভনের না হইত, তাহাহইলে দ্বিধাও এতটা বেশি হইত না! কিন্তু সেই যশোমালা-ধৃতকরা বাণীর মন্দিরদ্বারটি তাহার নিকট বৈজয়ন্তিধামের স্বর্ণকবাটের চেয়েও ঈপ্সিত; তাই, সেখানকার স্বপ্ন হইতে সে জোর করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিল। মন যখন কান্নাকাটি করিতেছিল, তখন সে তাহাকে ধমক দিয়া, এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিল যে—

"কাঙ্গালের আবার ঘোড়া-রোগ কেন? যার মাথার উপর বিশহাজার টাকা দেনা, যার মা ভাই খাইতে না পাইয়া পরাশ্রয়ী হইয়া থাকে, সে কোন্ হিসাবে পরের উপর নিজের ভার চাপাইয়া দিয়া এক্‌জামিন্ পাশের ভাবনা ভাবিতে বসিয়া যাইবে? সেটা কি ধর্ম্ম হইবে? যদি বল, এখন এই অল্পবিদ্যা লইয়া তুমি কি করিতে পার? বড় জোর বিশ-ত্রিশ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি একটি করিতে পার। এই বই আর ত কিছুই পার না! কিন্তু আরও একটা-দুটা পাশ করিতে পারিলে তখন এর চেয়ে অনেক বড় কাজ তোমার জুটিতেও পারা সম্ভব। আচ্ছা, কি হইতে পারি? উকিল হইতে গেলে, সে অনেক দেরি। আর, আমার মত নিঃসম্বলের ওকালতির চেষ্টা কেবল ব্যর্থতার উদাহরণ রাখা। না থাকিবে বড় একটি বাড়ী, গাড়ী-জুড়ি, অথবা মোটা চেন এবং মূল্যবান ঘড়ি। মুন্সেফির জন্য বিলম্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব! বি এ পাশ করিয়া যদি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটশিপ্ দিই, তাহাতেও কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে অনেকখানি সন্দেহ রাখিয়াই দিতে হয়। কেন না এম. এ. পাশ না করিয়া প্রায়ই কেহ এদিকে চেষ্টা করে না; তাহাদের সঙ্গে আমি পারিয়া উঠিব কি? তবে? আরও চারপাঁচ বৎসর অপরের গলগ্রহ হইয়া, অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবমান হওয়াটা কি ঠিক? তার চাইতে, ইঁহার নিকট একখানি সুপারিস-চিঠি লইয়া, চাকরি-বাকরি খোঁজ করাই ভাল। এরপর আর কে আমার মুরুব্বী হইবার আছে?" এইখানে এক একবার কুমতি, বা স্বার্থপরতা, তাহার মনের কাণে কাণে একটা লোভের কথা, লাভের একটা প্রলোভন, শুনাইয়া দেয়। সে বলে—"আচ্ছা একটা কাজ কর না। এই বয়সে এমন করিয়া সব আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিবে কেন? তার চেয়ে যেমন অনেকেই করে তাই কর। তা দশে মিলে যা' করা যায়, তাহাতে ত পাপ নাই! তার সাক্ষী দেখ, একজন মানুষ মারিলে, খুনী বলিয়া তাহার ফাঁসি হয়, আর দশজনে মিলিয়া মারিলে, যোদ্ধা বলিয়া খাতির হয়। তাই বলিতেছি কি—ছেলের বিয়ে দিয়া ত অনেকেই দেনা শোধেন, বাড়ী করেন, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হন। তা তোমার ত ছেলে নাই, নিজেই আছ। নিজেকেই কেন ঐ দশহাজারে কোন বড়লোকের মেয়ের কাছে বেচনা? সবদিক বজায় থাকে —দেনাও শোধ হয়, শ্বশুরও পড়ার ভার নেন্; উকিল ছাড়িয়া ব্যারিষ্টার হইতে চাহিলে, তাহাও হইতে পার। সে ত বেশ হইবে!"

এ 'বেশ' হয়ত হইতে পারিত—বড় সহজেই হইতে পারিত; কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহা হইল না;—বাধারূপে যে আসিয়া এই চিন্তাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল, উকিল ব্যারিষ্টারের কাঁচা-পয়সার অপেক্ষা সে যে অধিক লোভনীয় এবং শোভনীয়। তার হাত ধরিয়া ভিক্ষা করাকেও হাইকোর্টের বক্তৃতা করার চেয়ে শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইতেই, নির্ম্মল লজ্জায় লাল হইয়া, পূর্ব্ব চিন্তাটাকে ছাড়িয়া দিয়া, নিজেকে ধিক্কার দিল: চোক রাঙ্গা করিয়া, মনকে বলিল—"মনের অগোচর পাপ নাই যে বলে, তবে জানিয়া শুনিয়া এমন ন্যাকামো কেন? তুমিই ত সেদিন সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছিলে; এখন সুযোগটাকেই বড় করিতেছ।" নিজের নূতন জীবনকে গড়িয়া লইয়া তাহাতেই একটি গন্ধর্ব্বলোক সৃজন করিতে ইহার পর আর সে নিতান্ত ক্লেশ বোধ করিল না। পঞ্চাশটি টাকা মাস মাহিনা এবং তার উপর আর একটি প্রাইভেট-টিউসনি। সকালে উঠিয়া, দু-একটি ছোটছেলেকে পাঠ মুখস্ত করাইয়া আসা, এবং তারপর নয়টা বাজিবার একটু পূর্ব্বেই কোন দিন ডালভাতে-ভাত, কোনদিন ডাল-ভাত, বড় বড় গ্রাসে মুখে তুলিয়া, ভাঙ্গাছাতা এবং ফরদা উড়ানি লইয়া, কলিকাতায় কর্ম্মত্রস্ত রাজপথে বাহির হইয়া পড়া!—আবার সন্ধ্যায়, তারকা এবং রাস্তার দুধারের গ্যাস্, এক সঙ্গেই উপর নীচেয় দুসারি আলো জ্বালিয়া দিলে তাহারই মাঝখান দিয়া শ্রান্তচরণে প্রত্যাবর্ত্তন!—তারপর? তারপরের সেই জলছবিখানি যেমনি জলে ধুইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে, সেইসঙ্গেই সেই কেরানীজীবনের সমুদয় অভাব, বিড়ম্বনা যেন কোন্ মন্ত্রবলে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়! দরিদ্র-সংসারে সে যেন লক্ষ্মীকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে! তাহার চরণস্পর্শে সে ধূলার ধরণী যে সোণা হইয়া উঠিবে না, সে কথা কে বলিল? অট্টালিকার খাটপালঙ্ককে তুচ্ছ করিয়া সে যখন সেই কুটীর-শয্যায় তাহার বক্ষে সেই সহানুভূতির সুখতপ্তস্পর্শে অনুভব করিয়া অপর্ণার ব্রীড়ানত মুখখানি চাপিয়া ধরিবে—দুইহাতে সেই মুখ তুলিয়া ধরিয়া সেই প্রেমে, প্রীতিতে পরিপূর্ণ সুখাবেশে অর্দ্ধনিমিলিত, হর্ষবিকশিত নেত্র দুইটির উপর সোৎসুকে চাহিয়া যখন বলিবে

—"ভাগ্যে আমার তুমি আছ অপর্ণা! তা নহিলে আমার কি থাকিত?" তখন হয় ত দেখিতে দেখিতে তাহার হস্ত-ধৃত সেই অতুলনীয় মুখখানা অধিকতর গোপন-আনন্দে ও নবোঢ়া-স্বাভাবিক লজ্জায় আরক্ত হইয়া, আবার তাহারই বক্ষে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিয়া, অর্দ্ধস্ফুট উত্তর করিবে —"আমারও।" না-ই বা সে উকিল ব্যারিষ্টার, বা ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পাইল? ঐ পঞ্চাশ-ষাট টাকা হইতে মাসে কুড়িটি করিয়া সে ঋণশোধের জন্য পাঠাইবে; বাকি ত্রিশ চল্লিশে মা, ভাই ছুটি, অপর্ণা এবং তাহার জননীকে সে কি আর পালন করিতে পারিবে না? ওঃ! খুব পারিবে। নিজের তাহার ছুবেলা ছুমুঠা ভাত, আর পরণের ছুখানা মোটাধুতিই যথেষ্ট! আচ্ছা, না হয় রাত্রে আরও একটা মাষ্টারি সে জোগাড় করিয়া লইবে। সে আর এমনই কি কঠিন?

দশহাজার ধনীকন্যার লোভনীয় চিন্তা আর একবার মানসপটে আনিয়া, সে তাহার এই অনেক-যত্নেগড়া, কলিকাতার গলিরাস্তার সেঁতাবাড়ীর ছোট্ট ঘরখানির পাশাপাশি স্থাপন করিয়া, আর একবার ছুইখানি চিত্রের উপরেই সমান দৃদৃক্ষ-নেত্রে চাহিয়া দেখিল। একখানিতে ভেলভেটের কৌচে শুইয়া হীরকজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরিত অঙ্গুলি দিয়া ষোড়শী তরুণী কার্পেটে ফুল তুলিতেছেন; তাঁহার স্বামী নীচের কামরায় বন্ধুদের সহিত রাজনৈতিক অলোচনায় ব্যস্ত, শিশুসন্তানটি ঘাঘরিপরা, ওড়না-উড়ান ধাত্রীর সহিত নির্ব্বাসিত। আর দ্বিতীয়খানিতে, সেখানেরও গৃহাধিকারিণী ষোড়শী; কিন্তু প্রথমার ন্যায় ইহাঁর মুখে রুজ-পাউডার লেপা নাই, কৃত্রিম-কুঞ্চনে কালো কেশ বিধাতার সৃষ্টিবিড়ম্বন কপালখানি ঢাকিয়া রাখে নাই, পরণে আঠার টাকা জোড়ার সাড়ি বা অঙ্গে 'লেড্‌ল'র বাড়ীর তৈরি সবচেয়ে হালফ্যাসানের জ্যাকেট্ আঁটিয়া নাই!—ইহাঁর পরণে বঙ্গলক্ষ্মী-মিলের, এই সেদিন মাত্র যে নূতন ধুতী ও সাড়ী বাহির হইয়াছে, সেই কল্কাপেড়ে মোটা সাড়ী; দাম সম্ভবতঃ পৌনেছুইটাকা জোড়া। বিধাতা ইঁহাকে নির্দ্দোষ ললাট দিয়াছেন এবং এমন স্বাভাবিক কুঞ্চনে কুঞ্চিত কেশও দিয়াছেন যে, এ ছুইএর একের জন্যও কোন প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক হয় না। অনাবৃত বাহুর উপর কাপড়ের পাড়টুকুই যেন একটা অলঙ্কারের মত দেখাইতেছিল; সুগোল হাতছুখানি বেড়িয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল যে কয়গাছি লাল-চুড়ি, তাহাদেরই যেন জন্মসার্থক হইয়া গিয়াছে! সাজিমাটি ও সাবানে কাচিয়া ঘরের বিছানাটি পরিপাটী করিয়া বিছাইতেছেন; কিন্তু এ কর্ম্মটি তিনি বড় সহজে নিরুপদ্রবে সম্পাদন করিতে পারিতেছিলেন না। একটি কুন্দকলিকার ন্যায় ক্ষুদ্রশিশু, তাঁহার সাধের পাতা বিছানার-চাদরখানি ছুইহাতে টানিয়া, ছোট ছোট বালিসগুলি ঠেলিয়া দিয়া, শতপ্রকারে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তাঁহার কাজ বাড়াইয়া তুলিতেছিল; জননী মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম-কোপে ধমক দিতেছিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষুদ্র দস্যুর আক্রমণ হইতে অবিরক্তচিত্তে তাঁহার সাম্রাজ্যটুকুকে সামলাইতেছিলেন; শিশু মায়ের ধমকে বিরক্তির চেয়ে স্নেহের প্রশ্রয় পাইয়া মহোৎসাহে পূর্ব্বকার্য্য করিতে থাকিয়া খিলখিল্ করিয়া হাসিতেছিল। অদূরে শিশুর পিতা শ্রান্তক্লান্ত শরীরে ম্লানমুখে দেখা দিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমের উপর উপরিওয়ালার তাড়নায় শরীরের সহিত মনও তেমনই ভারাক্রান্ত। নারী তৎক্ষণাৎ খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন—স্বামীর মলিন-উত্তরীয়, জীর্ণ-ছত্র গ্রহণ করিলেন; তাঁহার পা-ধুইবার জল, মুখ মুছিবার গামছা হাতে তুলিয়া দিলেন; পাখা আনিয়া মুখে বাতাস দিয়া সেবায় ও স্নেহে তাঁহার শরীর এবং মনের ক্লান্তিদূর করিয়া ফেলিলেন। শিশুও মায়ের দেখাদেখি কোথা হইতে একখানা পাখা আনিয়া বাপকে বাতাস দিবার চেষ্টায় মাটিতে এবং তাঁহার গায়ে বারকতক ঠোকাঠুকি করিল। তারপর, নিজেরই একটা জামা, বালতির জলে ভিজাইয়া আনিয়া, পরিচর্য্যা-হিসাবে পিতার পিঠে খানিকটা জল মাথাইয়া দিল। পতি-পত্নী ছুজনে পরস্পরের মুখ চাহিয়া সুখের হাসি হাসিলেন; ছেলেটি, বাপমায়ের অজস্র চুম্বনে আদরে একটু বিব্রত হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল।

সংসার হয় ত প্রথমচিত্রখানিরই দাম দিতে প্রস্তুত হইবে; দ্বিতীয়খানি সংসারচিত্রে হয়ত অবজ্ঞেয়, নগণ্য, কিন্তু সকলের দৃষ্টি একরকম নয়। দেখা যায়, একরকম রোগে রোগীর চক্ষে সাদাকেও হল্‌দে বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়; এবং শোনা গিয়াছে, সকল বর্ণই যখন অন্ধকারের মত কালো ঠেকে, তখন হইতে অন্ধত্ব-প্রাপ্তির আর খুব দেরি থাকে

না। নির্ম্মলের চক্ষেও হয় ত তেমনই কোনরূপ দৃষ্টিবিভ্রম-কারী পীড়ারই সঞ্চার হইয়া থাকুক, আর চিত্তবিভ্রান্তিই তাহার ঘটুক, সেও সোজাকে সোজা না দেখিয়া বাঁকা করিয়া দেখিল! তাহার চক্ষে দারিদ্র্যের সে সৌন্দর্য্য যেন ইন্দ্রালয়েরও সমুদয় ঐশ্বর্য্য-সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া আত্ম-গরিমায় এক অপরূপ রূপে দেখা দিল। ইহার নিকট সমস্ত জগতের সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য যেন তুচ্ছতার অপমানে মাথা নত করে, ক্ষুদ্রতার লজ্জায় মরিয়া যায়!

মুরলীধরবাবু নিজেই ডাকিয়া যদি তাহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় আলোচনা না উঠাইতেন, তাহা হইলে হয় ত নিজ হইতে সে বিষয়ে কথা বলা তাহার পক্ষে কিছু কঠিনই হইত। যাঁহারা এত করিয়া যত্ন স্নেহ করিতেছেন, এতবড় সহায় হইয়া যিনি এই আসন্ন-বিপদে রক্ষা করিয়া দেশের মধ্যে মাথাথাড়া করিয়া দাঁড়াইতে দিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে মুখ তুলিয়া হঠাৎ বিদায়ের কথা কহা কি সহজ! ইহাতে যেন এই দেখায়,—"কাজ হাসিল হইয়াছে ত, —আর কি? এখন চলিলাম!" বিশেষ তিনি যখন এই রকম রোগ-শয্যাশায়ী, পুত্রস্নেহে বঞ্চিত, এবং তাহার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপরায়ণ!

মুরলীধর সেদিন পশ্চিমের জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ধীরা তাঁহার কাণের কাছের চুলগুলি অঙ্গুলিদিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। নির্ম্মল পায়ের গোড়ায় বসিয়া পা-টিপিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এ কয়দিন সে এক একবার সাত-মহলের পাহারা ঠেলিয়া কোন-মতে এই বত্রিশ-কোটার শেষকোটায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদসেবা করিয়া যায়। এটুকু না করিয়া সে কিছুতেই এ বাড়ীর রাজভোগ গলাধঃকরণ করিতে পারে না। যেদিন কিছুতেই সেটুকুরও সুযোগ ঘটাইতে পারে না, সেদিনকার ক্ষীর সর মিঠাই মোণ্ডা যেন তাহার গালের মধ্যে কাঁটা হানিতে থাকে। এই সূর্য্যোদয়কালের স্মৃতিবিজড়িত —ইহার পরের আকাশ কি বৈচিত্র্যময়! অতীতগৌরব ইহার বিশাল—উদার বক্ষে শতশাসনলিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া যায়,পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যকে পরিহাস করিয়া সেখানে সপ্তবর্ণের, অযুত বর্ণের ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া চলিতে থাকে। অনন্তের বিরাট্ বক্ষে কোথাও সুনীল-জলধিগর্জ্জনহীন গানে শ্বেততরঙ্গে নর্ত্তনশীল, কোথাও সুবিশাল ধূসর গিরিশ্রেণী রক্তরাগকিরীটি, কোথাও বা স্বর্ণচূড় অভেদ্য দুর্গপ্রাকার প্রস্তরের সুমসৃণ ভীমকান্তি বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। চাহিয়া থাকিলে বড় সহসা চোক ফিরান যায় না।

মুরলীধর এই সমুদয় দেখিয়া তাঁহার ধীরাকেও অন্যদিন দেখাইয়া দেন। আজ কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে সঙ্কোচে উভয়েরই কেবলমাত্র উভয়গত মনকে জোরে জড়াইয়া রহিল! যেখানে সংসারের সহিত একটা যোগ লাগিয়া থাকে, সেখানে তাঁহাদের এতবড় একটা দুর্ভাগ্যের কাহিনীকে অত সহজে ভুলিতে পারা পিতা অথবা কন্যা কাহারও পক্ষে সহজ হইত না। পাখী যেমন তাহার পক্ষোদ্ভিন্ন দুঃস্থ শাবকটিকে বনের পত্রনিবিড় ডালে আব্ডালে লুকাইয়া ঢাকিয়া রাখে, তেমনই করিয়া লোকলোচনের সহানু-ভূতি, কৌতূহল বা কৌতুক হইতে তাঁহার এই ভাগ্যহীনা সন্তানটিকেও তিনি সর্ব্বদাই যেন সশঙ্কচিত্তে লুকাইয়া লইয়া ফিরিতেন। তাই কোনদিন কেহ তাঁহাদের এমন একটা অভাগ্যের উদ্দেশে তাহার কাছে দুফোঁটা চোকের জল ফেলিয়া, অথবা গোটাকত উত্তপ্ত সহানুভূতিপূর্ণ বচনের সহিত গরম গরম দীর্ঘনিশ্বাসেও একটা কাজ হাসিল করিতে পারিল না। বরং দয়ালুগণ অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই অহেতুকী করুণার বাষ্প সেই করুণার্দ্র অন্ধের পিতার প্রশান্ত শীতলতায় ঠেকিয়া শিলারূপ ধরিয়াছে! তাহাতে বৃষ্টির ফল ত ফলেই নাই, পরন্তু ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিলেও ধরা যায়। আজও একজন অপরলোকের সান্নিধ্যতাই তাঁহাদের মাঝখানে বাধার প্রাচীর তুলিয়াছিল। ইহার মাঝখান দিয়া দুজনে কাছা-কাছি হইতে গেলে, তাঁহাদের প্রবেশদ্বারটি ইহার দৃষ্টিকে হয়ত সকৌতুকে সেইদিকে টানিয়া আনিবে! পিতা কন্যা উভয়েই এবিষয়ে অত্যন্ত গর্ব্বিত! তাঁহারা যখন তাঁহাদের নিজের অধিকারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তখন সেখানে অপর কাহারও প্রবেশপথ নাই—সে শুধু তাঁহাদেরই নিজস্ব।

মুরলীধর বহির্ম্মুখী দৃষ্টিটাকে ফিরাইয়া আনিয়া একবার এদিক ওদিকে চাহিয়া নিজের পায়ের দিকে তাহা স্থির করিলেন; নির্ম্মলের সহিত তাহাতে চোখোচোখি হইল। উভয়েরই ওষ্ঠে একটু মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল। মুরলীধরের হাস্যে তাঁহার মানসিক চিন্তার ছায়াপাত হইল,—তাহার অর্থ; 'জিনিষটি খাঁটি!' নির্ম্মলের হাসিতে শুধু একফোঁটা

অকৃত্রিম আনন্দ ছিল, আর কিছু ছিল না। তাই সংসারী বৃদ্ধের চোখে বোধ করি অত মিষ্ট ঠেকিল।

ধীরে ধীরে হাতখানি পাতিয়া দিতেই সে নিজের স্থূল হস্ত দিয়া সেখানি ঈষৎ চাপ দিয়া দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। আবার একটি আশা সুখের শীর্ণ হাস্যরেখা রুগ্নের মলিনমুখকে ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল; সঙ্গেসঙ্গেই একটা হৃদয়মথিত দীর্ঘশ্বাসও বাহির হইয়া পড়িল। মনকে অন্য-দিকে ফিরাইবার জন্যই প্রথমতঃ কথাটা পাড়িয়া ফেলিলেন, —"বি. এ, এক্‌জামিন্ তা হলে আর এবার তোমার দেওয়া হইল না?"

এ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিতের পুঞ্জীভূত জমাকরা বেদনায় একটু ঢেউ উঠিল। সেও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আজ্ঞে না—কই আর হইল!"

"আস্‌ছে বৎসর দিবার ইচ্ছা করিতেছ কি?"

"ইচ্ছা! হ্যাঁ তা—তা—ইচ্ছা থাকিলেই বা কি? পড়া শোনা লইয়া থাকিলে ত এখন আর চলিবে না!" একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিয়া পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া সে কহিল —"তাই মনে করছি, একটা চাকরি কোথাও যদি জোটে, তবে তাই করি,কিন্তু—"সে একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিল। 'কিন্তু আজিকালিকার দিনে সুপারিস-ব্যতীত চাকরি কে দিবে?' এই কথা বলিতে গিয়াও আবেদনের ভাষাটা জিহ্বায় জোর করিয়া জড়াইয়া রহিল। কেবল মানুষকে 'দেহি' 'দেহি' বলিয়া বিরক্ত করিতে বড় লজ্জা করে— অভ্যাস ত নাই!

মুরলীধর বাবু একটু প্রতীক্ষা করিয়া তারপর কহিলেন —"ভাল, চাকরি করিতে চাহ? সে মন্দ কি? কিন্তু ইচ্ছা করিলে পড়িতেও পারিতে।"

নির্ম্মল এ ইঙ্গিতটা বুঝিল না; সে সরলভাবে তাঁহার দিকে চোক মেলিয়া চাহিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"কেমন করিয়া?" উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ কহিল "আমার দেখুন অতটাকা দেনা, তা ছাড়া খাওয়াইবার লোকগুলিও রহিয়াছেন। তবুও আপনার কাছে আসিয়াছিলাম তাই, তা নহিলে ত এতক্ষণ জেলে পচিতে হইত। আপনি—"

"শোন শোন,—ওসব কথা যাইতে দাও না। সে আর এমন কি বেশি করা হইয়াছে। ও দেনার জন্য তুমি একটুও ব্যস্ত হইও না; মনে কর ও দেনা তোমার নাই। যাক্ যাক্, পরে সে বোঝা যাইবে। এখনি তো তোমায় শোধ দিতে হইবে না। আমি সেই কথাই বলিতেছি; তা আচ্ছা কতকগুলো পাশ না করিয়া যদি এখন হইতেই কিছু কিছু বিষয়কার্য্য শিখিতে পার, সে খুব ভালই হয়। আমি কয়দিন এই কথাই তোমায় বলিব বলিব মনে করিতেছি; কিন্তু পাছে কিছু মনে কর তাই সাহস করি নাই। পাশের বিদ্যায় চেয়ে এতেও নেহাৎ অল্প অভিজ্ঞতা জন্মায় তাও নয়, অধিকন্তু এটা লক্ষ্মীলাভের একটা নিশ্চিত উপায়! কার্য্য-করী বিদ্যা! তা ভিন্ন এতে একটু স্বাধীনতা কতক বজায় রাখা চলে। সুবিধা ঢের, শুধু দরকার পরিশ্রমের, আর কষ্টসহিষ্ণুতার! আমার বুকের মধ্যে সে দুটি জিনিষ ভগবান দেননি।"

মুহূর্ত্তে নির্ম্মলের মনের পর্দ্দার একখানা বিভিন্ন দৃশ্যের ছায়াছবি ফুটিয়া বাহির হইল। অধ্যবসায়ের ফলে ব্যবসায়-লক্ষ্মী তাহার সৌধমন্দিরে ধরা দিয়াছেন। সে ব্যগ্র হইয়া দুইহাতে তাঁহার দুইচরণ স্পর্শ করিল, এবং বহুদিন ধরণীর ধূলিসংস্পর্শবিহীন চরণতল হইতে কল্পিত পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"আপনার উপদেশ বড় মধুর লাগিল! বড় আশাই পাইতেছি! আমায় পথ বলিয়া দিন – প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

"তবে কা'ল হইতেই আমার অফিসে ম্যানেজারের অধীনে কাজ শিখিতে আরম্ভ কর, আমি সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিব, তোমার কোন অসুবিধা হইবে না।" সূর্য্যের উপর চলন্ত মেঘ আসিয়া আসিয়া পড়িলে যেমন ম্লান দেখায় তেমনই মলিন হইয়া গিয়া যুবক কহিল—"এইখানেই?"

বৃদ্ধ কেবল উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ"।

মেঘ তখনই সরিয়া গেল; সে কহিল "আচ্ছা।"

(১২)

দিনকতক প্রবাসীর মতই গৃহহারাচিত্ত উড়ু উড়ু করিয়া অবশেষে অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিল এবং নূতন গৃহের প্রতিষ্ঠাকালে মন আবার আর একরকম করিয়া আকাশ-কুসুমচয়নে মালা গাঁথিবার চেষ্টার সূঁচে সূতা পরাইয়া বসিল।

একএকজনের কল্পনা-শক্তিটা কর্ম্মশক্তির চাইতে প্রখরা হইয়া থাকে; কিন্তু একসঙ্গে এই দুইটার সমান জোর সকলের মধ্যে দেখা যায় না। নির্ম্মলের চিত্তে এখনও যথার্থ

সাংসারিক কর্ম্মজীবনের ক্লান্তিচ্ছায়া ছাপ মারিয়া বসিতে পারে নাই। বয়স-হিসাবে এবং স্বভাববশেও বটে, সে বলিতে গেলে, এখনও যথার্থপক্ষে বালকভিন্ন আর কিছু নয়। তাই, সেই বালকোচিত কল্পনারাজ্যে তাহার এখনও কোন বাধাবিপ্লবের রেখাপাত দেখা যাইতেছিল না। দুরন্ত নিরাশার পর এতবড় একটা আশার কূল দেখিয়া তাহার বুক যেন দশহাত বাড়িয়া গিয়াছিল; এখন এমন অনেক কল্পনাকেই সে দ্বিধাবিহীন চিত্তে নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকে, যাহা আর কাহারও নিকট আকাশকুসুমেরই ন্যায় একান্ত অবিশ্বাস্য।

আরও পাঁচটা পাঁচরকম বড় ভাবনার মাঝখান দিয়া, সে নিজের ছোটখাট একখানি ভবিষ্য ইতিহাস রচনা করিয়া লইয়াছিল। ঐ রেঙ্গুন-নদীর একটি ধারে—যেখানে দিগন্ত-রেখা সবুজমাঠের বুকের কাছে মাথা নত করিয়া নুইয়া পড়িয়াছে, অঘ্রাণে যাহার সোনার-ক্ষেতে কর্ম্মী চাষার আবাল-বৃদ্ধ অন্নক্লিষ্ট জগতের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া বসে—তাহারই কোনখানটিতে নূতন তৈরি একখানি সুন্দর গৃহে সে সংসার পাতিয়া বসিবে; মা, শ্বাশুড়ি, ভাইগুলি, আর অপর্ণা! একখানি টমটম্—না একখানি পাল্কীগাড়িই রাখা দরকার; তাহা না হইলে ত অপর্ণা এই বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া ধীরার সহিত আলাপ করিয়া যাইতে পারিবে না। অথচ এই ধীরা হইতেই ত তাহার সব! সেদিন সকালে সে যদি উপর হইতে শুনিতে পাইয়া পাঁচকড়িকে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে নিষেধ না করিত, যদি কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ না করাইয়া দিত, তাহা হইলে সে আজ কি এমন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইত, না অপর্ণা-লাভই তাহার ঘটিতে পারিত? প্রবঞ্চক, জুয়াচোর বলিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হওয়াও তাহার ভাগ্যে তা হইলে আটক থাইত না!—উঃ! কিরূপেই সে এযাত্রা রক্ষা পাইয়া গিয়াছে!

ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায় দ্রবীভূত হইয়া গিয়া, মন তাহার সেই রক্ষাকর্ত্রী করুণাময়ীর দুখানি চরণোদ্দেশে বারবার প্রণাম করিয়া, প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার পবিত্র পদরজঃ মাথায় তুলিয়া লইয়া, সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার একটু-খানি প্রকাশ করিয়া ফেলিতে অনেকবারই তাহার মনে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখনই সে এই উদ্দেশ্যে তাহার সম্মুখীন হইয়াছে, তখনই তাহার মন সশঙ্কে যেন পিছু হটিয়া আসিয়াছে, অনেকখানি ইচ্ছার বেগও সে সঙ্কোচকে রোধ করিতে পারে নাই। সেই মৌন—দৃঢ়বদ্ধ অধরে দৃপ্তচ্ছায়া প্রতিভাসহীন বিশাল নীলাভনেত্রে এমন একটি দূরত্বের ব্যবধান ছিল, যাহাতে এই মানব জগতের কোন ব্যক্তিই তাহার মানবীয় কোন বৃত্তি লইয়া যেন তাহার সেই জগদাতীত ভাবের কাছে পৌঁছাইতে পারিত না। নিজের মনের মধ্যেই উচ্ছ্বসিত ভক্তির আবেগ নিরুদ্ধ রাখিয়া, সে নিঃশব্দে ফিরিয়া আইসে;—দুইটি ধন্যবাদের কথাও ঠোঁট দিয়া বাহির করিতে সাহসে কুলায় না। দেবীর নিকট ভক্ত যেমন বিশ্লেষণহীন ভক্তির নীরব অবদানের ভারে আপনার সমস্ত হৃদয় নত করিয়া দেয়, সেও যতই দিনের পর দিন সেই রোগশয্যাপার্শ্বের শরীরিণী সেবার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল, ততই তাহার প্রতি—একদিকে গভীর শ্রদ্ধায়, অপরদিকে তাহার ব্যর্থজীবনের দুর্ব্বিসহ দুঃখভারে সুগভীর করুণায় তাহার সারাপ্রাণ ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সে নিজের কাজকর্ম্মের অবশিষ্টকাল যতখানি সম্ভব, রোগীর কাছেই কাটাইতে চাহিত; কিন্তু দেখিয়া বুঝিত যে, তাহাতে ধীরা যেন একটু বিপন্ন বোধ করিয়া থাকে। তাই, তাহার জন্য সে নিজেকে অনেকখানি বঞ্চিত করিয়া রাখিত। সংসার যাহার নিকট একটা বিরাট্ শূন্যতার মূর্ত্তি, এই একমাত্র সত্য-বস্তু হইতে তাহাকে বঞ্চিত শুধু বিধাতাই হয়ত করিতে পারেন—মানুষ অতদূর পারে না।

কিন্তু কল্পনাশক্তি তাহার যতখানিই থাক, উদ্দীপনার অভাবও তাহার ছিল না। মাস পাঁচছয়েকের মধ্যেই সে "মুখার্জ্জী এবং হাম্পডেন কোম্পানীর" কর্ম্মকাজসম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা লাভ করিতে পারিল, এবং আরও মাসছয়-সাতেক পরেই তাহার সহকারীর পদটা পাকা হইয়া চারিশত টাকা বেতন ধার্য্য হইয়া গেল। পুরাতন কর্ম্মচারীদের মধ্যে অবশ্য কেহ কেহ এমন নাবালক উপরিওয়ালা অপছন্দ করিয়াছিলেন; কিন্তু কি একটা অস্পষ্ট আলোচনার ফিস্‌ফাস্ চলিবার পর, একটু মুচ্‌কি হাসি, একটু আশ্চর্য্য চাহনির সঙ্গে বিদ্রোহোদ্যত ভাবটা আপনা-আপনিই থামিয়া গেল।

নির্ম্মলের মনে এসময় সুখের সীমা ছিল না। সে এতদিন ধরিয়া যে একশত টাকা করিয়া পাইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে মাতাকে পঁচিশ টাকা করিয়া মাস মাস পাঠাইয়া,

বাকিটা ধারশোধের জন্য সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেছিল। প্রতিমাসেই একবার করিয়া সৌদামিনীর নামে কিছু টাকার আর একখানি মণিঅর্ডার লিখিবার জন্য তাহার হাতটা নিস্‌পিস্ করিতে থাকিলেও, তাঁহার সেইপ্রচ্ছন্ন-গম্ভীর মুখের ভাব স্মরণ করিয়া ভয়ে সে একবারও লিখিতে পারে নাই। সে টাকা যে ফিরতি-ডাকে ফেরত আসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবারও কিছু ছিল না। দারুণ অনিচ্ছা-সত্বেও, সে অগত্যা মনের ইচ্ছা দমন করিয়া, সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এ মাসে, মাহিনা বাড়িতেই, মাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইল, পিসিমাকেও কিছু দিয়া প্রণাম করিল; সেই সঙ্গেই যে আর একজনের পা-ত্নটির গোড়ায় মাথা নোয়াইয়া, সেখানেও প্রণামী রাখিয়া যাইবার জন্য, প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়াছিল।—সে আগ্রহ এবারেও পূর্ণ করা ঘটিয়া উঠিল না! কি জানি, তাঁহার টাকা লইবেন কি না! তা ছাড়া, যদি অপরে জানিতে পারে, তাহারা হয়ত হঠাৎ এক কথা বলিয়া সেই মহৎহৃদয়া অনাথার হৃদয়বিদ্ধ করিয়া ফেলিবে। কাজ কি! এতদিন যখন গিয়াছে, তখন না হয় আর ত্ন'একটা মাসও কাটিয়া যাক্। এই দীর্ঘ দিনের ভীরুতার পরিশোধ সে প্রাণপণ সেবাযত্নে নিশ্চয়ই তাঁহার অশেষ ত্নঃখময় জীবনের শেষটাকে শান্তির ক্রোড়শায়ী করিয়া তুলিবে! সে তাঁহার সেই বাক্যহীন স্নেহভাষাটুকু তাহার প্রতি, প্রত্যেক ব্যবহারে, প্রকটিত দেখিতে পাইয়াছে। মা নাই বলিয়াই বোধ করি বাড়ীর ছেলেদের চেয়েও তিনি তাহাকে একটু বিশেষ করিয়া যত্ন করিতেন; সেইখানেই বুঝি-বা এই একটা কৃতজ্ঞতার বন্ধনের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল!

একদিন সুযোগ বুঝিয়া, নির্ম্মল যখন তাহার জমান প্রায় হাজার টাকাটা নিজের ঋণ-পরিশোধকল্পে মুরলী বাবুর ব্যাঙ্কারের নিকট জমা দিবার কথা জানাইল, তখন আবার সেই প্রকার মৃত্নহাস্য তাহার মনিবের শুষ্ক অধরকে রঞ্জিত করিয়া দিয়া গেল। তিনি কহিলেন—"তার জন্য অত ব্যস্ত কেন? তোমাদের বাড়ী এখনও ছাড়ান হয়নি ত! কত-দিনের মেয়াদ আছে?"

বাড়ীর কথায় নির্ম্মলের একটা নিশ্বাস পড়িল। হাজার হউক প্রপিতামহের ভিটা! ভগ্নকণ্ঠে সে উত্তর করিল —"দেড় বৎসরের।"

"কতদিন হইল?"

"প্রায় এক বৎসর!"

"এক বৎসর! তুমি কি অতদিন আসিয়াছ? না, সেত এই সেদিন মনে হইতেছে!"

সেই স্মরণীয় দিনটাকে মনে মনে প্রনাম করিয়া, সে সস্মিতহাস্যে উত্তর দিল,—"এগার মাস আমি এসেছি। গত এপ্রেলের মাঝামাঝি আসিয়াছিলাম; সেদিনটা ১১ই এপ্রেল, শনিবার।"

"তোমার খুব মনে আছে ত! সেদিনটা আমারও স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। বেশ, ঐ টাকা তুমি আমার কলিকাতার এটর্ণি-অফিশে পাঠাইয়া দাও। বাকি আরও হাজার তিনেক টাকা চাই?—সে টাকাটা উহারাই দিয়া বাড়ী খালাস করিয়া লইবেন। তোমার মাতার, ভাইয়ের ওখানে থাকায় সম্ভবতঃ তোমার আপত্তি হইতে পারে। আর বিধবা মানুষ—তিনি যে এ ধর্ম্মকর্ম্মবিবর্জ্জিত দেশে আসেন, এমনও মনে হয় না। নিজের ভিটায় থাকাই তাঁর পক্ষে, বোধ হয়, সব চেয়ে ভাল হইবে। তুমি ঐখানেই তাঁকে খরচ পাঠাইয়া দিও; যখন যা দরকার, খবর লইও। সেই ভাল—না?"

নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উঃ, কতখানিই ইনি তাহার হইয়া ভাবিয়া রাখিয়াছেন! কি মহত্বপূর্ণ ওই হৃদয়খানি! কে-কোথাকার একজন পরের জন্য এমন সূক্ষ্মভাবে তাহার প্রত্যেক দায়িত্বটুকু, প্রতি সুবিধা অসুবিধাটি অবধি, ভাবিয়া স্থির করা এবং সেই বিষয়ে অকাতরে অর্থব্যয়, কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব, এমন ধারণা ইতিপূর্ব্বে তাহার কল্পনার মধ্যেও কোথায়ও স্থানলাভ করে নাই। বিস্ময়ে—আনন্দে সে যেন কিছুক্ষণ অবধি কথা খুঁজিয়াই পাইতেছিল না; এমন সময় হঠাৎ খুব খানিকটা অশ্রুজল, হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিয়া, তাহার চোক ত্নইটার দৃষ্টিশুদ্ধ অবরোধ করিয়া ফেলিল! মুখটা নীচু করিয়া, সে বিছানার চাদরের দাগগুলা টানিয়া ঠিক করিতে করিতে, কোনমতে কহিয়া ফেলিল—"আপনি আমায় এত দিচ্চেন যে, শুনিতে যেন আমার ভয় কর্‌চে! আমি বুঝ্‌তে পারছিনে যে—"

"কেমন করিয়া এ নেওয়ার বোঝা শোধ করিবে?—না?" লজ্জা পাইয়া, নির্ম্মলের আকর্ণললাট আরক্ত হইয়া

উঠিল। ইনি যে কথা বলিলেন, তাহা যে তাহারই নিজের বিহ্বল-আনন্দে অত্যভিভূত অন্তরেরই প্রতিধ্বনি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যথার্থই সে এই অত্যন্ত-প্রাপ্তি যেন আর সহিতে পারিতেছিল না, এবং এই পাওয়া একদিকে যেমন ইহার প্রদাতার স্নেহকরুণার মহত্ত্বে তাঁহার প্রতি তাহার চিত্তকে কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে ভরিয়া তুলিতেছিল, অপর আর একদিক হইতে এই অপ্রতিবিধেয় প্রতিগ্রহের লজ্জা ও ভাবনা তাহাকে কেবলই যেন পীড়া দিতেছিল! আদান প্রদানই জগতের ধর্ম্ম! পৃথিবীর সমুদ্‌সরিৎ আকাশকে বাষ্প পাঠায়, সে তাহাদের বৃষ্টি দান করে; প্রজা রাজাকে কর দেয়, রাজা প্রজাপালনের ভার লইয়া থাকেন। সাধারণতঃ, পৃথিবীর মানুষগুলাকে চতুর্ব্বর্ণাত্মক করিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছিল; সকল মানুষই প্রকৃতি-অনুসারে এই গুণকর্ম্মবিভাগের অনুবর্ত্তী। কাহারও মধ্যে ব্রাহ্মণ্য, কাহারও ক্ষাত্রধর্ম্ম কোথাও বৈশ্যত্ব এবং অপার শূদ্রভাব সর্ব্বদাই অভিব্যক্ত দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি নিজেই বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণা! কি জীবসমাজে কি প্রাকৃতিক-রাজ্যে সর্ব্বত্রই এই বাণিজ্যনীতি সুপরিব্যক্ত। যাহা-দের স্থূল-প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া বুঝি, সেই তাপ-আলোক হইতে অন্তসংজ্ঞাবিশিষ্ট বৃক্ষগুল্মাদি, আসন্ন-চেতন পশুপক্ষী ইত্যাদি হইতে বিশিষ্ট-চেতন মানব-পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে এই আদান-প্রদানধর্ম্ম সংক্রমিত হইয়া আছে। গাছের সেবা করিলে সে ফুল দেয়। সে যে স্নেহকারীর স্পর্শ ও আক্রমণকারীর আঘাতকে অনভিজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করে না, ডাক্তার বসুর নবাবিষ্কৃত 'বৃক্ষ-দর্শন' যন্ত্রে বৃক্ষ-প্রতিচ্ছায়ায় তাহার প্রমাণ। আমরা প্রত্যেক ভাল-মন্দের ফল যে এই জীবনেই অনুভব করিয়া থাকি, তাহা দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়; আর যেটুকু বা যায় না, সেটুকু এই বৈচিত্র্যময়ী ধরণীর বিচিত্রতা দ্বারাই আমাদের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে প্রতিনিমেষে দেখাইয়া দিতে ছাড়ে কি? আবার দেখ, একটা সামান্য কুকুর-বিড়াল, সেও তোমার কাছে সামান্য একটু আদরের বিনিময়ে সারারাত জাগিয়া তোমার ঘরের চারিপাশে প্রহরা-দৃষ্টি উন্মত করিয়া রাখিয়াছে; তোমার ঘরের শত্রু ইন্দুর আর-সুলা ধ্বংস করিয়া, দুইটা এটোকাঁটার ঋণপরিশোধ করিতেছে। তবে মানুষই কি সৃষ্টির ভিতর সব চেয়ে অকৃতজ্ঞ জীব? উত্তরটা বড় কঠিন! যদি সত্যতত্ত্ব প্রচার করিতে হয়, তবে খুব জোর করিয়া এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলাও যায় না। আবার খুব সহজেই 'হাঁ' বলিলেও সেই সত্য অক্ষুণ্ণ থাকেন, তাহাও মনে হয় না। তবে একথা নিঃসন্দিগ্ধ সত্য যে, এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অসীম-দৃষ্টিতে 'আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত'র ভিতর মানুষই সর্ব্বা-পেক্ষা অকৃতজ্ঞ জীব! কৃতোপকার মানুষেই বরং ভুলিতে পারে, অপর কেহ তাহা পারে না। মেঘ কখনও ভুলিয়া যায় না যে, তাহার নবজলধারা কোন মহাসমুদ্রের দয়ার দান; উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মধপ ভ্রমেও ভাবে না যে এই জন্মভূমি ধরিত্রীর বক্ষ ত্যজিয়া সে নক্ষত্রমণ্ডলের প্রতিবেশী হইয়া থাকিবে। তাই এই ধরণীর বক্ষেই সে তাহার ভস্মদেহের অন্তিম-শয়ন রচনা করিতে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু মানুষ ভুলিয়া যায় কোন অতীন্দ্রিয় সর্ব্ব-বিধাতা তাহার এই ভঙ্গুর জীবনকেও এমন সুখের জগতে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছে! সেই শুধু মা-বাপের স্নেহ, গুরুর করুণা, অন্নদাতার দয়া এবং বিশ্ববিধা-তার এই সকলের আধারভূত দেওয়া তুচ্ছ করিতে সমর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া সেও এই বাণিজ্যনীতির বহির্ভূত নয়; সেও পাওনা শোধ করিতে চাহে, নির্ম্মলও এই প্রতিদান-পরিশূন্য প্রাপ্তির চাপে পড়িয়া যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। কেমন করিয়া সে ইহার একটুখানিও শোধ করিতে পারে?

অথচ মুখের উপর একথা স্বীকার করিতে গেলে সে যেন বিশেষ করিয়া একটা গর্ব্বের মত শুনায়! এই যে অসময়ে এত বড় দেওয়া, এর কি যথার্থ প্রতিদান হইতে পারে?

সে নীরবে মাথা নত করিল। এ যত্নের দান-প্রত্যাখ্যান করাও অসঙ্গত, অথচ প্রতিদান তার চেয়ে আরও অসম্ভব! তাহার মত একজন পরমুখাপেক্ষী, একজন নিঃস্ব ব্যক্তি এই রাজোপম মহাধনীকে কি দিতে পারে? ভিখারীর মত লওয়া ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই।

মুরলীধর বাবু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার লজ্জিত মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; একটু পরেই ডাকিলেন—"নির্ম্মল!"

—"আজ্ঞে?"

—"আমার ধার শোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছ? কিছু ব্যস্ত হইও না। মনে জানিও, আমি তোমার জন্য যৎসামান্য যেটুকু করিতেছি এর মধ্যে মহত্ত্ব কিছুই নাই।

খুব দয়ালু বলিয়া আমি তোমায় দয়া করিয়া কিছু দিতেছি না,—বড়বেশি সুদের আশা করিয়া, আমার চিরদিনের ব্যবসাদারী-হিসাবে তোমায় আমি শুধু কিছু ধার দিয়া রাখিতেছি। যে দিন দরকার হইবে, সমুদয় পাওনাগণ্ডা সুদের সুদশুদ্ধ নিজেই চাহিয়া লইব। আপাততঃ তোমার মাকে নিজের ঘরখানি ফিরাইয়া দাও। তাঁর প্রতিও আমার কিছু কর্ত্তব্য আছে; তিনি যে জগুর স্ত্রী!"

যতই কেন সুদের লোভের কথা বলুন না, নির্ম্মল তাঁহার প্রতি ভক্তিউচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই সঙ্গে তাঁহার উপর আরও একটা ভাব সে তীব্রভাবেই যেন অনুভব করিয়া বসিল। সে জিনিষটা শুধুই ভক্তি নয় তা ছাড়া আরও কিছু। বোধ করি সে জিনিষটা ভালবাসাই সেদিন তাঁহার ঘরছাড়িয়া আসিবার সময় দ্বারের নিকট হইতে সে আবার একবার যখন ফিরিয়া তাঁহার দিকে চাহিল এবং সেখান হইতে তাঁহার দুই উৎসুক নেত্রের অনুসরণ-দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টিনিবদ্ধ হইয়া পড়িল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার সকল শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ দিয়া তাহার অন্তর্যামী যেন তাহাকে ডাক দিয়া বলিল, —"এমন স্নেহের প্রতিদান করিতে পথ খুঁজিয়া পাস্ না।ক তুই? কেন?—এর সঙ্গে সমান মাপে মাপিয়া ত ঐ জিনিসটাই ফিরাইয়া দিতে পারিস্। এর মতন এমন সহজ ব্যবসা ত আর নাই। তোমারটাও থাকিয়া যাইবে এবং ফেরৎ দেওয়াকে দেওয়া হইবে।" তখনই সে সঙ্গেসঙ্গে এই ভৎর্সনার জবাবও পাইয়া গেল। শুনিলাম বলিতেছে—"সে কি এখনও আর দিতে বাকি আছে? তাহা হইলে এই যে কাছ ছাড়িয়া একটু দূরে যাইতেছি মন এই টুকুতেই ব্যথিত হইতেছে কেন? ছুটি চাহিবার জন্য মন ত ছট্‌ফট্ করিতেছে, অথচ এ অবস্থায় ইঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেও মন কেমন করিতে থাকে, কেমন একটা লজ্জা বোধ হয়; নহিলে শীঘ্র শীঘ্র উঁহাদের আনিয়া— অপর্ণাকেও আমি এঁর সেবার জন্য এইখানেই রাখিয়া দিই। তাকে পাইলে ইহাঁরা দুজনেই নিশ্চয় খুব খুসী হইবেন। সেবা করিতে আপনার মত বোধ হয় খুব কম মেয়েই পারে। আমি তাহাকে পিসিমার বাড়ীতে অনেকবার রোগীর সেবা করিতে দেখিয়াছি।"

মনে মনে সে সঙ্কল্প করিল, আগামী বর্ষার পূর্ব্বেই একবার যেমন করিয়া হৌক ছুটির কথা পাড়িবে। বেশি-দিন নহে—দিনপনরর জন্য ছুটি লইয়া গিয়া বিবাহটা সারা এবং মাতাপুত্রীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসামাত্র। এই কথা মনে হইতেই মনে হইল নিজের বিবাহের ঘটকালিটা তাহাকেই আবার পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে। হঠাৎ একটা পূর্ব্বকথা স্মরণে তাহার মুখখানা সলজ্জ-আনন্দে সরক্তোজ্জ্বল প্রভাতপূর্ব্বগগনের ন্যায় হইয়া উঠিল। না, এবার পিসিমার কাছে নিজে হইতে কিছু বলা যাইবে না, সেজদাকে দিয়া বলাইতে হইবে। তাহার 'সেজদা' পিসিমার সেজ ছেলে,—সেই ডাক্তারিপড়া ছেলেটি!

তারপর রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া কেমন করিয়া, কি বলিয়া পিসিমার সাক্ষাতে কথা পাড়া হইবে, কি কি কথা তাঁহাদের 'নিশ্চিত আপত্য'-খণ্ডনের জন্য বলা যাইতে পারে, এবং শেষকালে অবশ্যম্ভাবী ফললাভের পর,—এমন কি ফুলশয্যার রাত্রে তাহার পুষ্পময়ীকে সে কেমন করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবে, ইহাও সে তাহার চিত্ত-গগনে আকাশ-কুসুম-রূপে ফুটাইয়া তুলিল। সে ফুলগুলি যেমন সুন্দর, তেমনই সৌরভাকীর্ণ—তাহা পৃথিবীর বাস্তব কুসুমের চেয়েও অনেক বিভিন্ন,—কেননা তাহা গগণফুল।

রাঁচি-ভ্রমণ

[শ্রীবিমলাচরণ লাহা বি. এ.]

কলিকাতার ধূলা এবং ধোঁয়ার মধ্যে জীবনটা দিন দিন এক-ঘেয়ে হইয়া উঠিতেছিল। তাই ভাবিলাম, কয়েকদিনের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ি;—উদার-আকাশ এবং মুক্ত-বাতাস অনেকদিন হইতেই আমাকে অন্তরে অন্তরে ডাকিতেছিল। বন্ধুবান্ধবের মুখে অনেক ভাল ভাল দেশের কথা শুনিতে শুনিতে একদিন সত্যসত্যই কলিকাতা ছাড়া হইয়া পড়িলাম।

যখন ভ্রমণের জল্পনা চলিতেছিল, তখন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেহ দারজিলিং, কেহ মধুপুর, কেহ রাঁচি, হাজারিবাগ, কেহবা বদ্রিনারায়ণ, এমন কি কেহবা লঙ্কা পর্য্যন্ত যাইতেও উপদেশ দিতেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কিন্তু—এই ঘরের কাছে বলিলেই হয়—রাঁচির পথেরই পথিক হইলাম।

ঠিক পথিক বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সে-কালে যখন যাত্রীরা পদব্রজে চলিয়া, চটির পর চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, দস্যু-তস্করের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবাসে যাইতেন, তখনকার দিনে পথিক কথাটার সার্থকতা ছিল; কিন্তু এখনকার দিনে রেলওয়ের কল্যাণে হাঁটাপথ একরকম উঠিয়াই গিয়াছে—এখন ট্রাম, রেল, ষ্টীমারের পথ; এখন বিদ্যুদ্দীপ্ত reserved গাড়ীতে 'বাঁকের' উপর সুখা-বেশেশয়ান যাত্রীকে পথিক আখ্যা দিলে ঐ কথাটার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়।

সে গবেষণা এখন থাকুক, ভ্রমণের বিবরণই বলি। যখন কোলাহল-কল্লোলিত হাবড়ার প্লাট্‌ফরম হইতে শেষ-ঘণ্টার শব্দে ব্যস্ত হইয়া গার্ড সাহেব বংশীধ্বনি করিলেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত লণ্ঠনের সবুজ আলোর সঙ্কেতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল যে, পরদিন প্রত্যূষে চক্ষু মেলিয়াই একটা নূতন দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইব এবং ছুটির কয়েকটা দিন খুব আনন্দেই কাটাইয়া আসিব।

অন্ধকার-রাত্রির আবছায়ার মধ্য দিয়া, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়া সশব্দে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। অপরিচিত দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া বাঙ্গালা-দেশের বাঁশবনের মধ্যে শিবের মন্দিরের চূড়ার দৃশ্য অন্ধকারে ঝাপ্‌সা দেখাইতে লাগিল। কোন্ ষ্টেসনের পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে নাই; কিন্তু যখন চোখ মেলিলাম, তখন দেখিলাম যে একটি বড় ষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছে। কুলিরা হাঁকিতেছে "আদ্‌রা, আদ্‌রা"। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম তখন ভোর ৫টা।

এখান হইতে পুরুলিয়া আধঘণ্টার পথ। এই পথটি যেন একখানি ছবির মতন সুন্দর। দূরে দূরে নীল-পাহাড়ের শ্রেণী, মাঠগুলি উচুনীচু, ভাঙ্গাচোরা, মধ্যেমধ্যে ছোট ছোট শীর্ণ গিরি-নদীগুলি গেরুয়া রঙ্গের বালির উপর দিয়া বনের মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ভুট্টার ক্ষেত; কোথাও বা পতিত জমি, কোথাও বা দূরে এক একটা পাহাড় ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ লোহিতাভ হইয়া আসিতে লাগিল, নীল পাহাড়ের পাশে যেন লাল-রঙ্গের একখানি আলোর থালার আধখানি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতেছে; অন্য আধখানি তখনও পাহাড়ের আড়ালে। সূর্য্যোদয়ের এই দৃশ্য দেখিয়া বাল্যকালে-পঠিত কয়েকছত্র কবিতা মনে পড়িয়া গেল—

"সূর্য্যিমামা রাঙ্গা জামা টেনে দিলেন গায়,
রাঙ্গাচোকে থেকে থেকে পাহাড়-পানে চায়"।

এখানকার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির নাম পঞ্চকোট বা 'পচেট'। তিনি সুপ্তসিংহের মত বিরাট্ দেহ লইয়া শুইয়া আছেন। পঞ্চকোটের রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ বাংলা-দেশে একসময়ে বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পচেট পাহাড়ের চূড়ায় এখনও তাঁহাদের পুরাতন-কেল্লার ধ্বংসা-বশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমে পুরুলিয়া ষ্টেসনের distant-signal দেখা দিল; তাহার পরই গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। রাঁচির যাত্রীদের

এইখানেই গাড়ী বদল-করিতে হয়। সময় সঙ্ক্ষেপ বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং রাঁচির গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। এই গাড়ীগুলি আকারে অনেক ছোট। কিছুক্ষণ পরেই বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। তখন প্রখর সূর্য্যকিরণ ঝাঁঝাঁ করিতেছে; মাঝে মাঝে রেলপথের পার্শ্বে লাল কাঁকুড়ে মাটি দেখা যাইতে লাগিল। প্রায় দেড় ঘণ্টার পরে ছোট ছোট পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। ডিনামাইটের সাহায্যে পাথর-কাটিয়া এই স্থানের রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। এটি দারজিলিং-হিমালয়ান রেলপথের একটি সংক্ষিপ্ত-সংস্করণ। দেখিতে দেখিতে গাড়ী নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। পথের এক পার্শ্বে গভীর খাদ; খাদের তলদেশে পাহাড়ে-নদীর চাল্ জলোচ্ছ্বাস; দূর পাহাড়ের গায়ে বনের সবুজ শাষ সোপানের ন্যায় স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। এ যেন এক সবুজের সমুদ্র! নিতান্ত অকবিও এখানে আসিলে কবি হইয়া যায়। এই পার্ব্বত্য-প্রকৃতিই "Meek nurse for a poetic child"! এই অগাধ সৌন্দর্য্যের মধ্যেই অনন্তের চিরন্তন রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে;—মুহূর্ত্ত এখানে অনন্তের কথা কহিতেছে। এ দৃশ্য দেখিলে মানুষ আস্তিক না হইয়া থাকিতেই পারে না। ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিলাম;—একটা যেন সৌন্দর্য্যের বন্যা আসিয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। মনে হইল, আজ আমি সৌন্দর্য্য-তীর্থের যাত্রী;—জন্ম-জন্মান্তর যেন এক অজানা সত্যের আভাসে স্বপ্নের মত প্রতীয়মান হইল। জানি না কতক্ষণ এইরূপ তন্ময় হইয়া ছিলাম।

কয়েকটী ষ্টেসনের পরেই দূর হইতে রাঁচি সহরের বাড়ীগুলি দেখিতে পাওয়া গেল। গাড়ী স্বনামপ্রসিদ্ধ পর্ব্বতদুহিতা সুবর্ণরেখা পার হইয়া রাঁচি ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। তখন বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছে।

রাঁচিতে আমাদের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া-করা ছিল। এখানকার বাড়ীগুলি দূরে দূরে অবস্থিত। স্বাস্থ্যের জন্য এখানে অনেকেই আসিয়া থাকেন, কারণ এখানকার জল ভাল। এই প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর বাসের জন্য এই স্থানটীই মনোনীত করিয়াছেন।

এখানকার অধিবাসীরা কোল ও মুণ্ডা। তাহারা অসভ্য পাহাড়ে-জাতি—বহুকাল একভাবেই ছিল; এখন
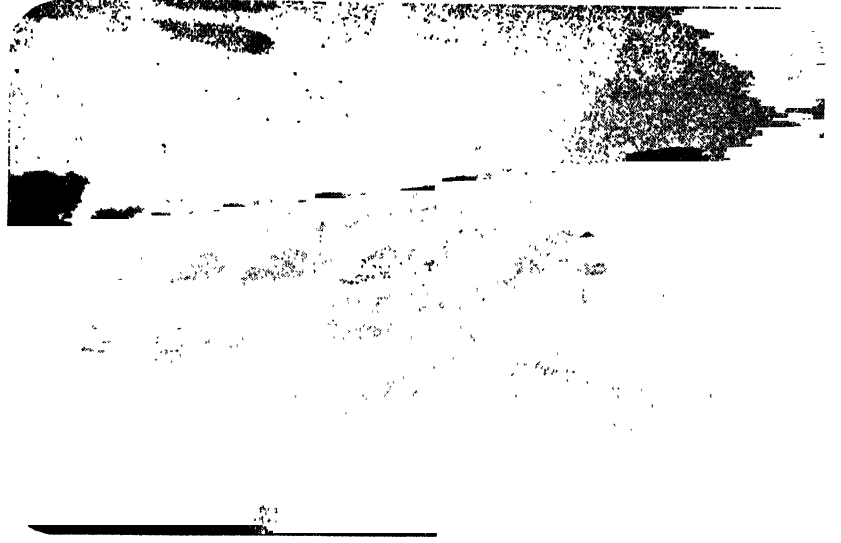
সুবর্ণরেখা সেতু

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সরঞ্জামগুলি একে একে এখানে তাহাদের মধ্যে আসিয়া জুটিতেছে। খ্রীষ্টান-মিশনরিগণ এ প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কোলেদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান হইয়াছে। কোলজাতি এই মিশনরিগণের নিকট বিশেষ ঋণী। ইহাদিগেরই যত্নে ও অধ্যবসায়ে কোলজাতি অনেক বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতেছে। ইহারা বেশ ইংরাজী বলিতে পারে। কোল-ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ ইংরাজকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

বরিয়াতু পাহাড় জগন্নাথপুরের ছুটিয়া মন্দির, রাঁচিপাহাড়, রাঁচিহ্রদ এবং মোরাবাদী পাহাড় এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য।

এখানে আর একটি বিশেষ দেখিবার জিনিষ আছে;—সেটি এখান হইতে ৩৫।৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। সেটি

মুণ্ডা নর্ত্তকীগণ

একটি জলপ্রপাত,—নাম হুন্‌ড্রু ঘোঘ। এবারে তাহা দেখা হইল না; পরে যখন দীর্ঘ অবসর লইয়া রাঁচি আসিব, তখন হুন্‌ড্রু-ঘোঘ দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা রহিল।

মধ্যে মধ্যে মোরাবাদী পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম। সহরের এই দিকটাই দেখিতে সুন্দর। এই পাহাড়ের মাথায় একটি সুন্দর বাড়িতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যরথ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বৎসরের অধিকাংশ সময় বাস করিয়া থাকেন। এই স্থান বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবিগণের পক্ষে একটি পুণ্যতীর্থ। এই পাহাড়ে উঠিলে দিগ্বলয়ে—নীলাভধূসর পর্ব্বতশ্রেণীর দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। বরিয়াতু পাহাড়টি এই মোরাবাদী পাহাড়েরই জ্যেষ্ঠ-সহোদর। এখানকার জগন্নাথপুরের মন্দিরটি প্রাচীন।

রাঁচি সহরের পথগুলি অতি সুন্দর। মোটর চালাইবার সুবিধার জন্য বহু অর্থব্যয়ে এই ধূলিশূন্য পথগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাঙ্গালা-দেশের মত ভূমির চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত না থাকিলেও এখানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। সহরের যাবতীয় সুবিধা ও পল্লীসুলভ নির্ম্মল জলবায়ুর গুণে, এবং রেলপথ নির্ম্মিত হওয়াতে অনেকেই এখানে বাড়ী করিতেছেন। এখানকার কূপোদক অতীব স্বাস্থ্যকর। যাহাদিগের পরিপাক-শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, তাঁহারা এখানে আসিলে অতি অল্প সময়েই নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন। এখানকার বাজারে টাট্‌কা ও বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; মাংসও সুলভ। মৎস্য বিশেষ দুর্ম্মূল্য নহে। উৎকৃষ্ট চাউল পাওয়া যায়, কিন্তু কলিকাতার তুলনায় মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক। এখানকার যাঁতাভাঙ্গা আটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাঁচির মালভূমি সাগরবক্ষ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ হইলেও ছোটনাগপুর প্রদেশের মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ নহে। মানভূম জেলা ছোটনাগপুরের এই মালভূমিতে উঠিবার একটি প্রশস্ত সোপান। শীতকালে শীতের কিছু আধিক্য হইলেও গ্রীষ্মকাল অন্যান্য পাথুরে-জেলার ন্যায় তত গরম নহে, কারণ ইহা সাগর-বক্ষ হইতে দুই হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত।

ইহার নিকটেই নাথেরহাট (নেতেরহাট) নামে আর
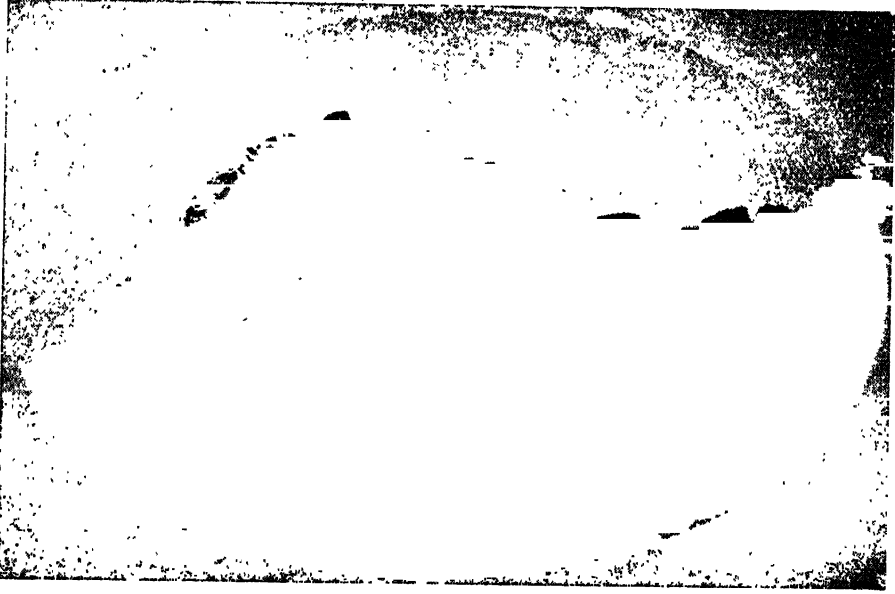
বরিয়াতু পাহাড়ের দৃশ্য

একটি মালভূমি আছে। ঐটি প্রায় ৩৫০০ ফিট উচ্চ। এই মালভূমির উপর শীঘ্রই একটি নূতন স্বাস্থ্য-নিবাস নির্ম্মাণের কল্পনা হইতেছে। যাঁহারা দার্জ্জিলিং বা কার্সিয়ং-এর জলবায়ুর দারুণ শৈত্য পছন্দ করেননা, এই স্থানটি তাঁহাদের প্রীতি-কর হইবে বলিয়া মনে হয়। সমতল-ক্ষেত্রবাসী বাঙ্গালীর ৪০০০।৫০০০ ফিট উচ্চস্থানের শীতপ্রধান জলবায়ু সহজে সহ্য

জগন্নাথপুরের মন্দির

জগন্নাথপুরের তন্তুবায়-সম্প্রদায়
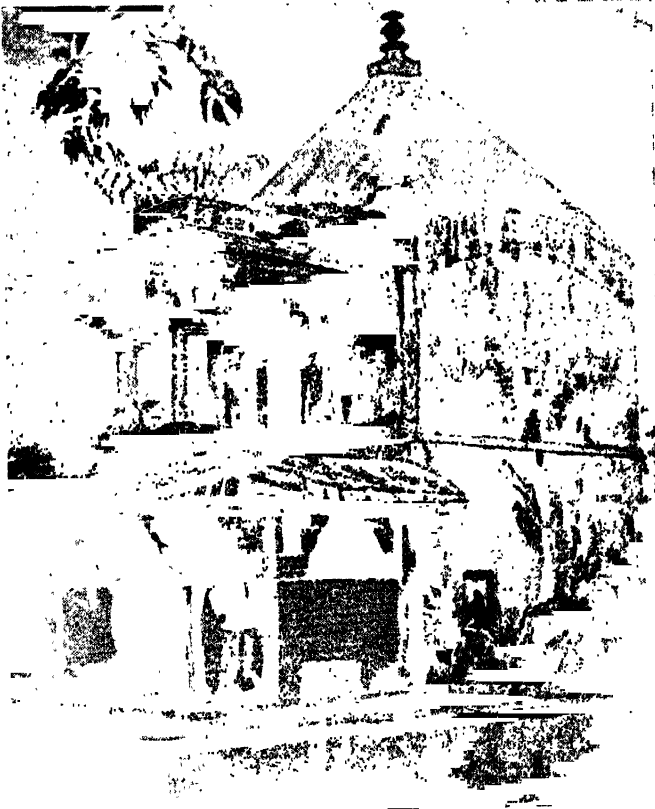
হয় না—অধিকন্তু দার্জ্জিলিং প্রদেশের জলও তেমন ক্ষুধাবৃদ্ধিকর নহে।

এক একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রাঁচি-হ্রদের দিকে বেড়াইতে যাইতাম। এই স্থান হইতে রাঁচি পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই চমৎকার। হ্রদের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। এই হ্রদের অপরপারে পৌঁছিলেই রাঁচি-পাহাড়ে উঠিবার পথ পাওয়া যায়।

সেদিন সন্ধ্যা বড় সুন্দর! আমরা কয়-জনে গল্প করিতে করিতে পাহাড়ে উঠিতে-ছিলাম। হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছিল। আঁকাবাঁকা পথটি পাহাড়ের গা-বাহিয়া সেফালিকুঞ্জের মধ্য দিয়া চূড়ার উপরকার একটি মন্দিরদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে। মন্দিরের কাছাকাছি গিয়া শুনিলাম, কে একজন বাঙ্গালা-কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। কণ্ঠস্বর খুব স্পষ্ট, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অপরি-চিত। কাছে গিয়া দেখি যে আমাদের

ঝরাফুলের কবি করুণানিধান বাবু নির্ণিমেষনেত্রে অর্দ্ধ-অস্তমিত সূর্য্যের পানে চাহিয়া একমনে কবিতা শুনিতেছেন,আর তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একজন অপরিচিত যুবক কবিতা পাঠ করিতেছেন। আমাদের আকস্মিক আগমনে কবিতা-স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। এই কবিটির নাম শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ। ইনি করুণাবাবুর সতীর্থ। তাহার পর প্রদোষের অর্দ্ধ তরল অন্ধকারে স্বর্ণমেঘের প্রতিফলিত আলোকে কবি-যুগলের সহিত স্বপ্নলোক হইতে অবতরণ করা গেল।

দেশ-ভ্রমণের দিনগুলি বড়ই মধুর। কত নূতন লোকের সহিত মুহূর্ত্তের পরিচয়ে যেন কতদিনকার স্মৃতির-ফল্গু উচ্ছলিত হইয়া উঠে। পরকে আপন করিবার, দেশকে চিনিবার পক্ষে দেশ-ভ্রমণ বড়ই প্রয়োজন। মোট কথা, রাঁচি আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমে অনেকস্থান বেড়াইয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু কোথাও বেশীদিন মন টিকে নাই। নূতনত্বের খাতিরে, নূতন নূতন দৃশ্যের ভিতরে দিনগুলা প্রথম প্রথম বেশ কাটিয়া যাইত, কিন্তু শীঘ্রই কেমন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িত। তখন ঘরমুখো বাঙ্গালীর মনে পড়িত

"ধন-ধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"

তখন স্বর্গীয় কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত সমস্বরে প্রাণ ভরিয়া গাইতে ইচ্ছা করিত—

"ওরে আমার সোণার বাঙ্গলা
তুই মা আমার সোণার কাশী।"

দেখিতে দেখিতে আমাদের ছুটির গণাদিনগুলি একে একে ফুরাইয়া আসিল। আবার সেই কলিকাতার ধূম ধূলির ভিতরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যাহা হউক ফিরিবার সময়ে রাঁচির বিখ্যাত সুবৃহৎ পেঁপে সঙ্গে করিয়া আনিতে ভুলি নাই।

"বেঙ্গল এম্বুল্যান্স কোর" প্রতি

[শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই. সি. এস]

স্বেচ্ছাসেবক শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় *

ডাক্ দিয়েছেন রাজা তোদের,
ঘরে ঘরে উঠ্‌ল সাড়া;
চল্‌রে ছুটে ভারতবাসী,
নবীন প্রাণে মাতোয়ারা।
বর্ব্বরতার করাল-মূর্ত্তি
বিশ্বে ক'রে পরিহাস;
শতেক যুগের পুঞ্জীভূত
সভ্যতারে করবে গ্রাস!
তাই যে আজি রাজা তোদের
ন্যায়ের পথে যুধিষ্ঠির—
ধর্ম্মযুদ্ধে যুঝ্‌তে তোদের
ডাক্ দিয়েছেন—চল বীর!

যাও—রাজার তরে, দেশের তরে,
রণ-বৈদ্যের সাজে;
আরব-পাথার পারে যথা
সমর-ভেরী বাজে।
যাও—অটল প্রাণে কামান মুখে
লাফিয়ে অবহেলে—
দাও—শুষ্ক-মুখে আহতদের
জীবনী-রস ঢেলে।
দেখাও—বাঙ্গালীও জানে কর্ত্তে
পুরুষত্বের কর্ম্ম,
দাও—শত্রুগণে শিখায়ে আজ
মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম!

* এই ষোড়শবর্ষীয় বালক রাণাঘাট-নিবাসী, আলিপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।

মান-ভঞ্জন

[শ্রীতেজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

অপরাধের মধ্যে অমল তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিল,—"তোমার চেয়ে কিন্তু তোমার পিসতুতো-বোন বীণাপানি বেশী সুন্দর দেখ্‌তে।" কমলা গ্রীবা বাঁকাইয়া উত্তর দিয়াছিল,—"তা হবেই ত, তোমরা পুরুষের জাঁত এই রকমই বটে। তোমাদের নজর কেবল পরস্ত্রীর দিকে, অথচ নিজের স্ত্রীকেও ভালবাসি ভালবাসি বল্‌তে ছাড় না। তোমাদের শিরায় শিরায় কাপট্য, ভণ্ডামি, মিথ্যা-অভিনয়। তোমরা এই রকমই ভালবাস বটে!" অমল আহত হইয়া বলিয়াছিল,—"কেন কমল, আমি কি তোমাকে ভালবাসি না?"—"সে দেখাই যাচ্ছে" বলিয়া কমলা রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

সেই ঘটনা হইতে আজ এই তিনদিন ভুলক্রমে অমলের পানে চূন অথবা খয়ের বেশী পড়িতে লাগিল,—অমলের মাছের ঝোল লবণহীন হইতে লাগিল। খদিরের আধিক্য-বশতঃ তিক্তপান চিবাইতে চিবাইতে অমল যদি কোনও দিন কমলার নিকট গিয়া একটু চূণ চাহিত, কমলা উঠিয়া গিয়া তাহার ছোট্‌ঠাকুরপোকে দিয়া চূণের হাঁড়িটা অমলের নিকট পাঠাইয়া দিত। ভাত খাইতে খাইতে মাছের ঝোল আলোণা দেখিয়া অমল যদি একটু লবণ চাহিত, কমলা আচিবুক ঘোম্‌টা টানিয়া অসম্ভব রকম অধিকপরিমাণে একখাম্‌চা লবণ অমলের পাতের সম্মুখে ফেলিয়া দিত। অমল যদি বলিত,—"এত নুণ কি হবে? আমাকে লোণা-ইলিশ ক'রে রাখ্‌বে নাকি? তা' তোমার একটু ভুল হয়েছে; লোণাইলিশ খায়, যখন বাজারে জীয়ন্ত ইলিশ থাকে না; আমি যে এখনও জলজীয়ন্ত বেঁচে রয়েছি।" কমলা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ছোট একটি চুম্‌কুড়ি কাটিয়া রান্নাঘর হইতে চলিয়া যাইত এবং ঠাকুরঝি শরৎকে পাঠাইয়া দিত। এমনি করিয়া অমল বেচারির উপর নীরবে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। অমল আর আফিস যাইবার সময় তাহার আফিসের পোষাক গোছান দেখিতে পায় না; জুতায় অসম্ভবরকম ধূলা পড়িয়া থাকে। আফিস হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আর গাড়ু গামছা ও চটিজুতা যথাস্থানে দেখিতে পায় না। চটীজুতাযোড়া সহসা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া জোড়ভঙ্গ হইয়া থাকে; খুজিতে খুজিতে এক-পাটী জুতাকে বৈঠকখানায় তক্তপোষের নীচে পাওয়া যায়, অপরপাটিকে দ্বিতলের শয়নগৃহের টেবিলের উপর পুস্তকা-দির মধ্য হইতে আবিষ্কার করিতে হয়। অমল মহা অসুবি-ধায় পড়িল। সে ভাবিল, সংসারের মধ্যে থাকিয়া এরূপ 'একঘরে' হইয়া থাকা পোষায় না; ইহার যা হো'ক একটা বিহিত করিতেই হইবে।

(২)

সেদিন রাত্রি দশটার পর অমল তাহার শয়নগৃহে টেবিলের সম্মুখে একখানি চৌকির উপর বসিয়া, হাতে একখানি বই লইয়া, কোনও পরিচিত-হস্তের চুড়ির মধুর টুংটাং শব্দের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আচক্ষু-অবগুণ্ঠনাবৃতা কমলা ঘরে প্রবেশ করিল, এবং অমল যে তাহার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ জাগিয়া বসিয়া আছে, তজ্জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ঘরের কোণ হইতে একখানি মাদুর লইয়া, অমলের পিছনদিকের অন্ধকার জায়গাটিতে পাতিয়া, নীরবে শুইয়া পড়িল। ঘরে যে দ্বিতীয় একটি মনুষ্য তাহার নয়নগোচর হইয়াছে, এরূপ কোন ভাবও সে প্রকাশ করিল না। অমল যেখানে বসিয়া ছিল, সেখান হইতে চৌকিটা আর একটু সরাইয়া লইয়া কমলার দিকে মুখ করিয়া বসিল। অমল সরিয়া যাইতেই কমলার মুখের উপর আলো পড়িল; সে অমলের দিকে পিছন ফিরিয়া মাথাটা বুকের কাছে অনেকখানি নামাইয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া রহিল। অমল দেখিল গতিক সুবিধা নয়;—ডাকিল, —"কমল, শোন।" কমলা একটু

নড়িয়া-চড়িয়া, আরও একটু বেশী শক্ত হইয়া শুইল। তাহার অর্থ 'সম্প্রতি আমি জাগিয়া আছি; কিন্তু তোমার কথা শুনিবার বা তোমার সহিত আলাপ করিবার কোনও আগ্রহ আমার নাই।' অমল উঠিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল এবং কমলার শিয়রের কাছে বসিয়া তাহার বাহুমূল একটুখানি ঝাঁকিয়া দিয়া কহিল,—"কমল, ও কমল!"

"কি, আঃ! একটু ঘুমোবারও যো নেই।"

"কমল, আমার ওপর রাগ করেছ, কমল?"

"তোমার ওপর রাগ কর্‌বার আমার দরকার?"

"তবে কথা কইছ না কেন?"

"তোমার সঙ্গে কি এতরাত্রে মহাভারত রামায়ণের কথা বক্ বক্ করতে থাক্‌ব? সর, আমার ঘুম পেয়েছে।"

"ঘুম পেয়ে থাকে যদি, ত বিছানায় ঘুমোবে চল, এখানে কি শোয়, ছি!"

"আর অত দরদ্ দেখিয়ে কাজ নেই, সর।" কমলা একটু সরিয়া শুইল। অমল কহিল,—"কেন কমল, ও কথা বল্‌ছ কেন? তোমার প্রতি কি আমার দরদ্ নেই? তোমায় কি আমি ভালবাসি না? আমার সঙ্গে এতদিন ঘর ক'রে বুঝি এই বুঝ্‌লে?"

কমলা মুখ তুলিয়া বলিল,—"ওগো, তুমি আমাকে খুব ভালবাস,—ভয়ানক ভালবাস, পৃথিবীতে কেউ কাউকে অমন্ ভালবাস্‌তে পারে না। এখন দয়া ক'রে সর, আমি ঘুমুই, কাণের কাছে আর ফ্যাঁসফ্যাঁস করো না।"

অমল মনে মনে ফন্দী আঁটিল যে, ইহাকে জব্দ করিতে হইবে। তখন সে কলস হইতে একগ্লাস জল ও একখানি পাখা লইয়া আসিয়া কমলার শিয়রের কাছে রাখিয়া কহিল,—"কমল, যদি ভাল চাও, ত উঠে এসে শোও।"

কমলা বলিল,—"আমি ভাল চাই না!"

(৩)

কমলা সেইরূপভাবেই শুইয়া রহিল। অমল দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া একেবারে তাহার মার ঘরে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"ও মা, শীগ্‌গির এস, তোমার বউ কি রকম কর্‌ছে; বোধহয় হঠাৎ কোন রকম ফিট্ হয়েছে, শীগ্‌গির এস! ওরে শরৎ, শীগ্‌গির আয়।" মা ও শরৎ শুইয়া শুইয়া পরদিবস কি রান্না হইবে, তাহাই আলোচনা করিতেছিলেন। অসম্ভাবিত দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া ও অমলের ভয়বিহ্বল চেহারা দেখিয়া, "কি হ'লোরে" বলিয়া কমলা যে ঘরে শুইয়াছিল, মাতা সেই ঘরে উর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন; শরৎশশীও মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। সে দ্বারের নিকট হইতে বৌদিদিকে মেঝের উপর শয়ান দেখিয়া ভাবিল, অচিরে বাবাকে সংবাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। সে ছুটিয়া পিতার নিকট যাইয়া বলিল,—"বাবা, বাবা, শীগ্‌গির এস, বৌদিদির হঠাৎ কি হয়েছে,—অজ্ঞান হয়ে গেছে, তুমি শীগ্‌গির এস বাবা!" কর্ত্তা তখন পাশবালিসের উপর পা তুলিয়া দিয়া আল্‌বোলায় তামাক টানিতেছিলেন। "কি হয়েছে রে বৌমার?" বলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলেন,—তাড়াতাড়িতে চটীজুতা খুজিয়া পাইলেন না, নগ্নপদেই অমলের শয়নগৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

অমলের বর্ত্তমান পরাজয়ে কমলা যখন মুখটিপিয়া টিপিয়া প্রাণভরিয়া খুব হাসিতেছে, এমন সময় গৃহিণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং "ও বৌমা, কি হয়েছে।' মা তোমার?" বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিয়া কমলার মাথা একেবারে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বসিলেন। কমলা শাশুড়ীর হঠাৎ আবির্ভাবে একটু অবাক্ হইয়া গেল; ভাবিল, 'মার কাছে গিয়ে বুঝি লাগানো হ'য়েছে, সে লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না, পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিল। এমন সময় কর্ত্তা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া উদ্বেগ-বিচলিতস্বরে বলিলেন,—"বৌমার কি হয়েছে গা?" গৃহিণী কখনও কাহারও ফিট হইতে দেখেন নাই; সুতরাং যদি সত্যই ফিট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা যে বিপজ্জনক নহে, বুঝিতে পারিলেন না; কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন,—"ওগো, একবার দেখ না গো, বৌমা যে নড়েও না চড়েও না, কথাও কয় না?" কর্ত্তা বলিলেন,—"মুখে, মাথায়, চোখে, জলের ঝাপ্‌টা দাও, মাথায় পাখা কর, ঘরের দোর জানালা খুলে দাও, ঘরে বাতাস চলুক।" তখন বাড়ীশুদ্ধ লোক মহাব্যস্তভাবে সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; একজন উঠিয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিল। এই আকস্মিক লোকসমাগমে ও মস্তকে প্রচুরপরিমাণে বারিবর্ষণে কমলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; ভাবিল—'এ আবার কি?' কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্মুখে এরূপ অবস্থায় সে যে সুস্থশরীরে নিরাপদে আছে, এ কথা জানাইতেও তাহার সাহস হইল না। তাহাহইলে যে সমস্ত কথা

প্রকাশ হইয়া পড়িবে—বাড়ীময় একটা মহা কেলেঙ্কারী হইবে, এবং শাশুড়ীর নিকট হইতে বিস্তর ভর্ৎসনা খাইতে হইবে। প্রত্যুৎপন্নমতি কমলা ফিটের ভাণ করিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে শাশুড়ী যখন, "ও বৌমা, বৌমা, ওমা, মা গো!" বলিয়া ফুকারিয়া উঠিলেন—কমলা তখন, যেন সবেমাত্র জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে এরূপ ভাবে, চক্ষু মেলিল, এবং আরও কিছুপরে উঠিয়া বসিয়া, চারিদিকে লোকসমাগম দেখিয়া যেন মহালজ্জিত হইয়াই, আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দিল। বধূমাতাকে চৈতন্য পাইতে দেখিয়া কর্ত্তা ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। শাশুড়ী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, কি হয়েছে মা তোমার?"

কমলা বলিল, "কি জানি মা, মাথাটা কি রকম ক'রে উঠ্‌লো, তারপর কি হ'লো বুঝ্‌তে পারলুম না।"

* * * *

সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে অমল আসিয়া বলিল, 'কমল, এখন কেমন আছ—মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'লো কি?'

কমলা হাসিয়া ফেলিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাও!"

"হেরে গেছ?"

"তা' তোমার সঙ্গে কে পারবে বল?"

সাতপুরুষে মনিব

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

ও ধনী! আজ সমাজ তোমায়
দেয় যে ডেকে বড় পীঁড়ি;
আমাদেরই বুকের পাঁজর
গড়ে নি সেই ওঠার সীঁড়ি?
খানার কড়ি ভূতে যোগায়,
মুনিব খাবে—কি আপ্‌শোষ!
উশুলের ঘর শাদা—তা হোক্,
(সেটা) মোদের মুনিবেরই দোষ।
গরীব প্রজার বারো মুনিব—
পাইক, কারকুন্, মোসাহেব;
তাদের জেব্ না ভরে যদি
বেরোয় মোদের যত আয়েব্।
তুমি কর সহরে বাস,
আসে টাকা ফূর্ত্তি কেনো,
রোগে তাপে পল্লী উজাড়—
সেটা ভাড়ার বাসা যেন।
তুমি মোদের রাজা—দেবতা—
সাতপুরুষে মুনিব তবু,
চাঁদা-মাথট্—যখন যা চাও
দিতে হয়নি কসুর প্রভু।
বার' ভূতের যোগান দিইনি,
তাদের চক্রে পড়্‌লেম গিয়ে;
বিদ্রোহী নাম রট্‌ল আমার—
হুলুস্থুল আমায় নিয়ে।

কালে-ভদ্রে তোমার দেখা—
ভুলে' যাচ্ছ চেনা-লোক,
মরা-কান্না কাঁদ্‌লাম পড়ে'—
মাছের মা'র কি পুত্র শোক!
দাওয়ান্‌জী কি বল্‌লে কাণে,
পা ছাড়িয়ে বল্‌লে—'তফাৎ!—
হাভাতে—তোর বদিয়াতী,
দেশে পাত্‌তে হবে না পাত।
ভিটেয় ঘুঘু চরাব তোর
আমি জমীদারের বাচ্ছা;'
মোসাহেবটি বল্‌লেন সুরে—
'মজাটি চাঁদ দেখ্‌বে আচ্ছা!'
জেলে দিলে—বাড়ী-জমি
কিনে নিলে করে' নীলাম;
খালি বাড়ী—ইজ্জত্ নিল
তোমার লেঠেল—নিধিরাম;
সসত্বা মোর ঘরের নারী,
বা'র করলে তার পেটের ছেলে;
লাথি খেয়ে মরে সতী,
আমি তখন পচ্‌ছি জেলে!
বেঁচে থাক, সুখে থাক,
সাতপুরুষে মুনিব আমার!
যাচ্ছি আমি খাস্ দরবারে—
যদি সেথায় থাকে বিচার!

তাজমহল

[শ্রীহরপ্রসাদ বাগ্‌চি, এম্. এ., বি. এল্.]

তাজমহল নির্ম্মিত হইবার সময় হইতে এপর্য্যন্ত, কত লোক কত রকমে, কত ভাষায়, কত ভাবে তাজমহলের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। বাইবেল ও সেক্ষপীয়র, গীতা ও উপনিষদ, কোরাণ ও জেন্দাবেস্তা, প্লেটো ও এরিষ্টটল প্রত্যেকটি লইয়া যে রকম এক একটি সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাজসম্বন্ধে

তাজমহলের সম্মুখ দ্বার

সমস্ত ইতিহাস, সমালোচনা, কবিতা, রচনা, উপাখ্যান, অখ্যায়িকা ইত্যাদি একত্র করিলে যে, তদপেক্ষা বিশেষ ক্ষুদ্রতর সাহিত্য প্রস্তুত হইবে, তাহা মনে হয়না। প্রত্যুত, পার্থিব সৌন্দর্য্য-লিপ্সা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, আগ্রার তাজমহল যত শ্রেণীর যত স্ত্রীপুরুষ আকর্ষণ করিয়াছে, পৃথিবীর কোনও স্বাভাবিক সুন্দর দৃশ্য তত লোককে আকর্ষণ করিয়াছে,কি না, সন্দেহ। দর্শকদিগের হৃদয়ের উপর নিজ স্থিরগম্ভীর সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিবার নিমিত্ত, ইহা দেশ, কাল ও জাতির অপেক্ষা করে না; ইহা যেন নিজের সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞানলাভ করিয়া, সকলকে আহ্বান করিতেছে; যেন বলিতেছে "এস!—স্বদেশীয় হও, বিদেশীয় হও, স্ত্রী হও, পুরুষ হও, শ্যামবর্ণ হও, গৌরবর্ণ হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও,—এস! একবার আমার গণ্ডীর মধ্যে এস! হয় আমাকে গভীর প্রেমের নিদর্শন মনে করে ভালবাস; আর, না হয়, আমার গাম্ভীর্য্য, বিশালত্ব ও বহুমূল্যত্ব অনুভব করিয়া বিস্মিত হও—স্তম্ভিত হও। একবার আমার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, হৃদয়ে গভীর রেখা অঙ্কিত না করিয়া ফিরিবার আশা করিও না।"

তাজমহল সম্বন্ধে আমার ন্যায় অ-কবি লোকের পক্ষে কিছু লেখা যদিও কেবল পুনরুক্তি দোষদুষ্ট,

নহে, বরং পৌনঃপুনরুক্তি দোষ-কলুষিত; তথাপি দুইটি কারণে, আমার মনে হয়, আমি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনধিকারী নহি। প্রথমতঃ, শৈশবকালাবধি দুই যুগেরও অধিককাল আমি এই তাজমহলের দেশে আছি। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিশ্বাস যে, তাজমহল সম্বন্ধে অনেকানেক রচনা ও প্রবন্ধাবলী বর্ত্তমান থাকিলেও, একটি ঐতিহাসিক অথচ সরল রচনার লঘুভার, তাজমহল-সাহিত্য বহিতে সক্ষম। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ রচনা আবশ্যকও বটে। তথাপি আমি পূর্ব্বহইতেই পাঠকপাঠিকাগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার রচনার মধ্যে কবিত্বপূর্ণভাবের আশা না করেন।

এস্থলে একটি কথা মনে পড়িল। একবার একটি ভদ্রলোক তাজমহল দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনারাই ভাগ্যবান্— আপনারা তাজমহলের এত নিকটে থাকেন—আপনারা বোধ হয় প্রত্যহ তাজ দেখেন।" আমার কিন্তু তখনই আশৈশব তাজমহলের দেশে থাকার অসুবিধার কথা মনে পড়িল; বলিলাম "না মহাশয়,—আপনি ভুল বুঝিয়াছেন— আপনারা যে আশা, উৎসাহ হৃদয়ে বহন করিয়া আনিয়া, জীবনে প্রথমবার তাজমহল দেখিয়া, আদর্শ্য সৌন্দর্য্য-দর্শন-সুখ উপভোগ করেন, আমি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছি। তাজমহলের সহিত অতি শৈশবেই পরিচয় হইয়া গিয়াছে; এবং বাল্যাবধি আমরা এক সঙ্গেই এতদিন কালের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছি। কবে যে প্রথম দেখা হইয়াছিল, মনেই নাই।"

কতরকমের লোক যে কতভাবে তাজমহল দেখিয়া যান, তাহা লক্ষ্য করিবার আমাদের বিশেষ সুবিধা ঘটে। মনুষ্যকল্পনা-উদ্ভূত, বিচিত্র-কারুকার্য্যখচিত, স্থপতি-বিদ্যার চরমোৎকর্ষ হইলেও, সকলেই যে তাজমহল দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করে, তাহা নহে। তাজমহল দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন, এরূপ লোকের কথাও আমি জানি। একবার আমার একটি স্থানীয় বন্ধু কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিবস হইতে পরেশনাথের মন্দিরের প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছিলেন। কালীঘাট হইতে অর্থ ও সময়ব্যয় করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখের বেঞ্চের উপর বসিয়া, কাচ ও মাটির টুক্‌রোগুলির মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াও বলিয়া ফেলিলেন, "এই দেখ্‌তে এতদূর আসা! —এরই এত প্রশংসা!" আমার বন্ধুটি বৃন্দাবন, বুদ্ধ-গয়া, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মুখে উক্ত কথা শোভা পাইলেও, কোনও তাজমহল-দর্শনকারীর মুখে উহা অত্যন্ত অশোভন—শুধু অশোভন নহে—অমার্জ্জনীয় মনে হয়। তিনি যে তাজমহল হইতে কোনও সুন্দরতর প্রাসাদ বা হর্ম্ম্য দেখিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে, কারণ, তাজমহল যে পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম প্রাসাদ, তাহা বহুকাল হইতে একবাক্যে স্বীকৃত। যাঁহারা তাজমহল দেখিয়া হতাশ হন, আমার মনে হয় যে, তাঁহারা, নিজ অনভিজ্ঞতাবশতঃ, একটা সৃষ্টিছাড়া অসম্ভাব্য আদর্শ মনে মনে আঁকিয়া তাজ দেখিতে আগমন করেন। এই প্রকৃতির লোক কখনই সুখী হয়েন না। সুতরাং, আমার অনুরোধ যে, তাজমহল দেখিতে আসিবার সময় কেহ যেন অসম্ভব কিছু একটা দেখিবার আশা লইয়া না আসেন— উক্ত শ্রেণীর লোকব্যতীত—সময়াভাবে বা মার্জ্জিত-রুচির অভাবে—পাঁচ মিনিটে, দশ মিনিটে তাজদর্শকের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক। একবার একটি বৃদ্ধা তাজ দেখিতে যাইয়া, কেবলই আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আঃ, পোড়াকপাল্! এই মোছলমানের কবর দেখ্‌তে এতদূর আসা! আমি আগে মনে করেছিলেম, তাজমহল না জানি কত বড়ই তীর্থ হবে। আহা, হতভাগারা একটা কবরের জন্য কত শ্বেতপাথরই নষ্ট করেছে গা! এতে কি কম শ্বেতপাথরের থালাবাটী হত!" সকলেই যে এই রকম, তাহা কখনই বলি না। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ লোকই তাজমহলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন এবং জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব অনুভব করেন। একটি মার্কিন মহিলা, তাজমহল দেখিয়া এতই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি অম্লানবদনে বলিয়াছিলেন—"আমি এই মুহূর্ত্তে মরিতে প্রস্তুত আছি, যদি কেহ আমার নিমিত্ত এইরূপ স্মৃতি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেয়!" এই ঘটনাটি, স্ত্রীসুলভ ভাবপ্রবণতার উদাহরণ হইলেও, কল্পনা-প্রসূত নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের পরিচিত একটি ভদ্রলোক আগ্রা দেখিতে আসিয়াছিলেন—কয়েকদিন এখানে থাকিবেন, অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। সেইদিন দ্বিপ্রহরের আহার শেষ করিয়া তিনি তাজমহল দেখিতে

গেলেন। রাত্রি ৯টার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, তিনি সেই রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি তাজমহল দেখিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়াছেন; তাজ অপেক্ষা ভাল 'এমারৎ' পৃথিবীতে যে থাকিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার দ্রষ্টব্যও আর কিছুই নাই।

সাধারণ দর্শকগণ যদি দিবালোকে একবার বিশেষরূপে, অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল যাপন করিয়া, তাজমহল পরিদর্শন করেন এবং শুক্লা-রজনীতে একবার জ্যোৎস্না-বিধৌত তাজমহলের শোভা সন্দর্শন করেন, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস, দেখিবার মত দেখা হয়। জ্যোৎস্নামণ্ডিত তাজের শোভা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত তাজের সৌন্দর্য্য শতবার দর্শন করিয়াও, দেখা শেষ করা যায় না। অতএব দর্শকদিগের কর্ত্তব্য যে, সম্ভবপর হইলে শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি হইতে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার মধ্যে আগ্রা আসিবার চেষ্টা করেন। আগ্রা অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান স্থান; সুতরাং অনভ্যস্ত বাঙ্গালীদের পক্ষে গ্রীষ্মকালে আগমন যথাসম্ভব পরিহার্য্য। এসকল দেশ পরিদর্শনের জন্য শরৎ ও বসন্ত ঋতুই প্রশস্ত; শীতকালও মন্দ নয়, তবে এ দেশে শীত কিছু বেশী।

তাজমহল

আগ্রায় থাকিবার স্থান সম্বন্ধে দুইএক কথা বলা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আগ্রা ফোর্ট ষ্টেসনের নিকটেই অধিকাংশ পান্থনিবাস ইত্যাদি স্থাপিত এবং সেইগুলি হইতে বাজারহাট নিকট। উক্ত ষ্টেসনের নিকটে একটি ধর্ম্মশালা ব্যতীত কতকগুলি ছোট বড় হিন্দুহোটেল আছে; তন্মধ্যে 'যশোবন্ত হোটেল'ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল—স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার উপযুক্ত পৃথক ঘরও পাওয়া যাইতে পারে; ভাড়াও বেশী নহে। এতদ্ভিন্ন, 'ভগবান হোটেল' ও মন্দ নহে। আগ্রা-সিটী ষ্টেসনের নিকটে সম্প্রতি দুইটি সুন্দর ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। সব ধর্ম্মশালারই প্রকোষ্ঠগুলি সম্পূর্ণ নগ্ন—সাজসজ্জার কোনও ব্যবস্থা নাই; তবে সুবিধা এই যে, এখানে থাকিতে বাড়ীভাড়া লাগে না। আগন্তুকদিগের সুবিধার জন্য প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মশালাতেই ২।৩ জন চাকর আছে। পর্য্যটকদিগের ইচ্ছামত হোটেলওয়ালারা খাবার সরবরাহ করিয়া জনপ্রতি নির্দ্দিষ্ট হিসাবে মূল্য লইয়া থাকে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, নিজেদের তত্ত্বাবধানে রন্ধন করাইতে পারেন; সে স্থলে ভৃত্যাদিগকে দৈনিক পারিশ্রমিক দিলেই চলে। সম্প্রতি আগ্রার কেল্লা ও তাজমহলের মধ্যে দেড়মাইলব্যাপী সুবিস্তৃত সুন্দর পার্ক নির্ম্মিত হইয়াছে। সহর হইতে তাজমহল যাইবার তিনটি পথ; একটি বরাবর যমুনার ধার দিয়া; দ্বিতীয়টি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তির পার্শ্ব দিয়া—এই দুইটি পথই ধূলিশূন্য এবং পার্কের মধ্য দিয়া গিয়াছে।—তৃতীয়টি পার্কের সীমানার বাহিরে এবং ধূলিপূর্ণ। শেষোক্ত পথটি
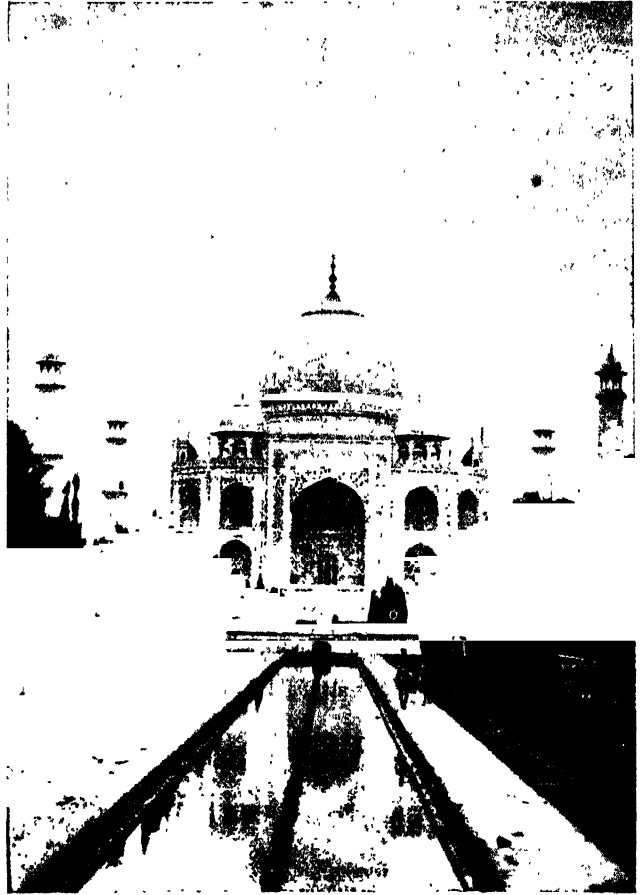
ভাড়াটিয়া এক্কা এবং গোশকট ইত্যাদির গমনাগমনের জন্য। প্রথম পথ দুইটি দিয়া, ভাড়াটিয়া এক্কা ব্যতীত, সকল প্রকারের যানই যাতায়াত করিতে পারে। তাজমহল যমুনা-নদীর এমন একটি বেঁকের উপর নির্ম্মিত যে, নদীপার্শ্ববর্ত্তী পথটির উপর দিয়া গেলে কখনই মনে হয় না যে, তাজ নদীর পরপারে নহে। দ্বিতীয় পথটি বাঁকাচোরা এবং উঁচুনীচু—কোথাও বহুদূরব্যাপী গুল্মাচ্ছাদিত ভগ্নগৃহস্তূপের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে, কোথাও বা কৃত্রিম হ্রদ ও জলাশয় পার্শ্বে রাখিয়া চলিয়াছে। প্রথম পথ দিয়া গিয়া, দ্বিতীয় পথ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করাই যুক্তিসঙ্গত।

তাজ কি, কত অর্থব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা কাহার কল্পনা সমুদ্ভূত, তাজ সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী কিছু আছে কিনা, ইত্যাকার প্রশ্ন অল্পবিস্তর প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়েই উদিত হইয়া থাকে। তাজমহল দেখিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে, দৃশ্যটি অধিকতর সুখপ্রদ ও উপভোগ্য হইবে।

'তাজ-বিবিকা রওজা'কে, সাধারণতঃ লোকে 'তাজমহল' বলিয়া থাকে এবং সংক্ষেপে শুধু 'তাজ' বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহা আগ্রার দুর্গ হইতে একমাইল দূরে, যমুনা নদীর দক্ষিণপার্শ্বে, অবস্থিত। এই সুবিস্তীর্ণ স্মৃতি-মন্দিরটি বাস্তবিকই পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ও পরমাশ্চর্য্যবস্তু। ইহা আকবরের পৌত্র, এবং আরঙ্গজেবের পিতা, সম্রাট্ সাহজাহান এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মুমতাজমহলের চিরবিশ্রামাগার। সাহজাহান মোগলজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-নির্ম্মাতা ছিলেন।

মুমতাজমহলের প্রকৃত নাম আর্জ্জুমন্দ বানু বেগম—ইনি নিজের কমনীয় কান্তি ও অনুপম দৈহিক সৌন্দর্য্যহেতু "মুমতাজমহল", অর্থাৎ "প্রাসাদ-শিরোভূষণ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধিই ক্রমশঃ অপভ্রষ্ট হইয়া প্রাসাদের নামে পরিণত হইয়াছে। মুমতাজমহলের পিতার নাম আসফ খাঁ—তিনি জাহাঙ্গীর-পত্নী নুরজাহানের ভ্রাতা এবং এৎমাৎউদ্দৌল্লার পুত্র। সুতরাং, মুমতাজমহল, সাহ-[জাহানের মাতুল-কন্যা—মুসলমানদিগের মধ্যে এইরূপ বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত ও প্রচলিত]। যখন সাহজাহানের বয়স ১৫ বৎসর, তখন, তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীর, মুমতাজকে সাহজাহানের সহিত বাগ্দত্তা করেন। আরও পাঁচ বৎসর পরে, যখন সাহ-জাহানের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, তখন তিনি উনবিংশতি-বর্ষীয়া মুমতাজমহলের সহিত শুভ-পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সম্রাট্ তাঁহাদের যৌতুকস্বরূপ পঞ্চলক্ষ মুদ্রা দান করেন।

মুমতাজব্যতীত, সাহজাহানের আরও দুই পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে পারস্যরাজ সাহ্ ইস্মাইল সফ্‌তীর প্রপৌত্রী অন্যতমা। এই দুইটি বিবাহসত্ত্বেও, সম্রাট্ মুমতাজমহলের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; এমন কি, ভারতবর্ষের অতি দূরদেশে যুদ্ধাভিযানের সময়েও মুমতাজ তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী হইতেন। তাঁহার গর্ভে সাহজাহানের আট পুত্র ও ছয় কন্যা জন্মে। দ্বিতীয় সন্তান জাহানারা বেগম, তৃতীয় দারাশিকো, চতুর্থ সাহসুজা, পঞ্চম রোশনারা বেগম, ষষ্ঠ আরঙ্গজেব এবং দশম মোরাদবক্স। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে উনচল্লিশ বৎসর বয়সে, সম্রাজ্ঞী, শেষ সন্তান প্রসবের সময়ে, বুরহন্‌পুরে দেহত্যাগ করেন। তখন সম্রাট্ তথায় খাঁজাহান লোদির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ছয় মাস পরে তাঁহার মৃতদেহ, প্রথম সমাধিস্থান জেনাবাদের উদ্যান-প্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত হইল এবং সম্রাট্‌পুত্র সাহসুজার তত্ত্বাবধানে আগ্রায় প্রেরিত হইল। যেখানে অদ্য এই স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এখানে পূর্ব্বে জয়পুরের রাজা মানসিংহের প্রাসাদ ছিল। ইহা, তাঁহার পৌত্র রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে, অন্য একটি প্রাসাদের পরিবর্ত্তে, গৃহীত হয়। যতদিন বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মাণ শেষ হয় নাই, ততদিন সমাধিটি একটি অস্থায়ী গম্বুজদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

তাজের বিচিত্র নক্সা কাহার কল্পনা-উদ্ভূত, এ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। স্পেনদেশীয় সন্ন্যাসী ফাদার ম্যান্‌রিক্ ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় ছিলেন। তিনি বলেন যে, জেরোনিমো ভেরোনেও নামা ভিনিসদেশীয় একব্যক্তি সম্রাট্ সাহজাহান-কর্ত্তৃক প্রাসাদের আনুমানিক ব্যয়নিরূপণ ও তাহার নক্সা প্রস্তুতকরণের নিমিত্ত আদিষ্ট হন। কার্য্যারম্ভের অতি অল্পকাল পরেই, ভোরোনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সকলের ধারণা যে, তৎপশ্চাৎ উস্তাদ ইসানামক একজন তুর্কীর হস্তে ইহার ভার অর্পিত হয়। তিনি আরও বলেন যে, কিম্বদন্তী এইরূপ যে, অষ্টিন্-দি বুর্দ্দোঁনামা একজন ফরাসী শিল্পবিশারদের উপর ইহার কারুকার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। সেকালে বাই-জান্টিয়ম, রোমীয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল এবং ইহা তাহাদের

রাজ্যের প্রাচ্যাংশের রাজধানী ছিল। অধুনা ইহা তুরস্ক-দিগের অধিকারভুক্ত এবং কনষ্টান্টিনোপল্ নামে প্রসিদ্ধ। ফাদার ম্যান্‌রিকের মত লোকদিগের সর্ব্বদা ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা যে, ভারতবর্ষের যাহা কিছু ভাল, তাহা য়ুরোপ হইতে, বিশেষতঃ গ্রীস ও রোম হইতে, আসিয়াছে। তাহাও যদি না হয়, অন্ততঃ ভারতবর্ষের পুরাতন সভ্যতা ফিনিশীয় বা মিশরীয় সভ্যতার ভগ্নস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। ম্যান্‌রিকের মতের অসম্ভবতা অন্যান্য অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য য়ুরোপীয় পরিব্রাজকদিগের বর্ণনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজকদ্বয়—টেভার্ণিয়র ও বার্ণিয়র সাহজাহানের রাজসভা পরিদর্শনকল্পে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই প্রসিদ্ধ সমাধি মন্দিরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। টেভার্ণিয়র তাজমহলের আরম্ভ ও সমাপ্তি উভয়ই দেখিয়াছেন; বার্ণিয়ার ইহার সমাপ্তির পাঁচ বৎসর পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যদি কোন য়ুরোপীয়ের কল্পনা হইতে ইহার নক্সা উদ্ভূত হইত, তাহা হইলে ইহা সম্ভব নহে যে, উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাহার কোনই উল্লেখ করিতেন না।

প্রাচ্যশিল্পের সকল লক্ষণ সম্বলিত এই সমাধি-মন্দিরটি স্থানীয় মতেরই পোষকতা করে যে, ইহা মাকরামত খাঁ এবং মীর আবদুল করিমের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রধান স্থপতি ওস্তাদ ঈশা, সিরাজনিবাসী আমনৎ খাঁ—যিনি তুঘ্‌রা অক্ষরে কোরাণের দুঃখসূচক অংশবিশেষে খোদিত করিয়াছিলেন এবং প্রধান রাজমিস্ত্রী বোগদাদনিবাসী মহম্মদ হানিফ্ প্রত্যেকেই সহস্র মুদ্রা পাইতেন। লাহোর নিবাসী চূড়া-নির্ম্মাতা কায়েম খাঁ, বিচিত্র মার্ব্বেল-পাথরের কারু-কার্য্য-সম্পাদক তুরুস্কনিবাসী মন্নু বেগ, আকবরাবাদের মহম্মদ ইউসুফ এবং পেশোয়ারের দীন মহম্মদ—যথাক্রমে ৬৯৫, ৭৮০, ১০০, এবং ৮০ টাকা বেতন পাইতেন। বালখ্-নিবাসী মনোহর সিং, কান্ধারনিবাসী মন্নুলাল, বোগদাদ্-নিবাসী হস্তলিপিকুশল মহম্মদ খাঁ এবং তুরস্কদেশীয় গম্বুজ-কারক মহম্মদ ইস্মাইল—প্রত্যেকে দুইশত মুদ্রা বেতন পাইতেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক লোক ছিলেন, যাঁহারা তুরস্ক, পারস্য, সিরিয়া এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া,একশত হইতে ছয়শত মুদ্রা বেতনে কার্য্য করিতেন।

তাজমহলে অন্ততঃ দ্বাদশ প্রকারের প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। সমস্ত শ্বেতপ্রস্তর জয়পুরেরর নিকটবর্ত্তী মক্‌রাণার পাহাড় হইতে এবং পীতপ্রস্তরসমূহ নর্ম্মদার তীরস্থিত পাহাড় হইতে আসিয়াছে। এখনও যে সমস্ত শ্বেতপ্রস্তরের থালা-বাটী-গেলাস ইত্যাদি জয়পুরে বিক্রয় হয়, বা যাহার উপর অধুনাতন আগ্রার শিল্পীরা পাথরের-খোদাই কারুকার্য্য করেন, তাহা মক্‌রাণার প্রস্তরে নির্ম্মিত। পাঞ্জাব হইতে জ্যাসপার, আরব্য প্রদেশ হইতে প্রবাল, বুন্দেলখণ্ডান্তর্গত পান্নারাজ্য হইতে হীরক, চীনদেশ হইতে স্ফটিক, তিব্বত হইতে টরকুইজ, বগ্দাদ হইতে কর্ণিলিয়ান, য়ামান হইতে এগেট, পারস্য হইতে অনিক্স ও এমেথিষ্ট, লঙ্কা হইতে স্যাফায়ার, গোয়ালিয়র হইতে চুম্বক এবং জসলমীর হইতে কিসমিসে পাথর আসিয়াছিল। "The White Marble came from Makrawa In Jaipur, the Yellow from the bank of the Nurbudda, Jasper from the Punjab, Coral from Arabia, Diamond from Panna in Bundelkhand, Crystal from China, Torquoises from Thibet, Cornelian from Baghdad, Agate from Yaman, the Onyx from Persia, Sapphire from Ceylon, Amethyst from Persia, the Loadstone from Gwalior and Plumpuddingstone from Jusselmere." ইহাতে গোশকটপূর্ণ লালপ্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহা সমস্তই ফতেপুর-সিক্‌রী হইতে আনীত হইয়াছিল। মূল্যবান প্রস্তরসমূহের অধিকাংশই ভারতবর্ষীয় স্বাধীন বা করদরাজাদিগের নিকট হইতে উপহার বা করস্বরূপ প্রাপ্ত।

তাজমহল-নির্ম্মাণের ব্যয় নিরূপণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বাল্যকালে আমরা একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম যে, ইহার নির্ম্মাণের ব্যয় মোট সপ্ততি সহস্র পাউণ্ড, অর্থাৎ সাড়ে দশলক্ষ টাকা। স্থানীয় লোকেরা অনুপ্রাসপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া ও ভাবের মিল রাখিয়া বলিয়া থাকে যে, ইহা নির্ম্মাণ করিতে বিংশ সহস্র লোক, বিংশ বৎসর সময় এবং বিংশ কোটী মুদ্রা আবশ্যক হইয়াছিল। একজন পারসী-ঐতিহাসিক এসম্বন্ধে নিজের ভাষায় যে মূল্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা খতাইলে

জানা যায় যে, ইহাতে ১,৮৪,৬৫,১৮৬৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৮,৫৫ ৪২৬৲ টাকা করদ রাজা ও নবাবেরা প্রদান করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট ৮৬,০৯,৭৬০৲ টাকা রাজকোষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। কেবল টাকার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া তাহার মূল্য ও আবশ্যকীয় বস্তু ক্রয় করিবার শক্তির প্রতিও পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন। সেকালে একটি সাধারণ মিস্ত্রী ৵০ দুই আনার অধিক পাইত না—আটা ।০ চারি আনা মণ, সুজি ॥৵০ নয় আনা মণ এবং ঘি ২॥০ আড়াই টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় হইত। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অন্যত্র অনুসন্ধেয়। আশা করি, এ স্থলে একটি প্রচলিত গল্পের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদিন সম্রাজ্ঞী মুমতাজমহল সাহজাহানকে বলিলেন —"প্রিয়তম! তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস, তাহা জানি; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার বাহ্যিক নিদর্শন পাইবার নিমিত্ত আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তুমি ত জান বাহ্যিক প্রকাশ ব্যতিরেকে প্রেমের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া, অন্ততঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে, অসম্ভব নহে"। কি কার্য্য করিলে মহিষীর বিশ্বাস চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়ীভূত হইবে, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন "তুমি এমন একটি বস্তু প্রস্তুত করিয়া আমার নামে উৎসর্গ কর, যাহা কোনও সম্রাট্ এপর্য্যন্ত তাঁহার মহিষীর জন্য করেন নাই এবং যাহা চিরকাল স্থায়ী হইবে"। সম্রাট্ প্রতিশ্রুত হইলেন বটে; কিন্তু সম্রাজ্ঞীর জীবনকালে তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এরূপ একজন কারুকর চাহেন, যিনি তাঁহার প্রিয়তমার বাঞ্ছিত সুন্দর ও আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। কিয়দ্দিবস পরে একটি লোক উপস্থিত হইয়া বলিল—"হুজুর, আমি আপনার মনোমত বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া দিব"। এতদিনে তাঁহার মৃতা পত্নীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে মনে করিয়া বাদসাহ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং তাহাকে সেই বস্তু নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই ব্যক্তি যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া একটি লোকদ্বারা একশকটপূর্ণ টাকা রাজকোষাগার হইতে চাহিয়া পাঠাইল। টাকা উপস্থিত হইলে মুঠামুঠা টাকা সেই নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শূন্য-শকট পুনরায় টাকা আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল। তখন যমুনা নদী আজকালকার ন্যায় ক্ষীণকায়া ছিলেন না; তাঁহার খরস্রোতে সে টাকা যে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা কে বলিবে? দ্বিতীয়বারও সে ব্যক্তি টাকাগুলির সেই ব্যবস্থা করিল।

সমাধির মর্ম্মরবেষ্টনী

পুনরায় টাকা চাহিয়া পাঠাইলে কোষাধ্যক্ষ সেই লোকটিকে সম্রাট-সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, এবং সে যে বিকৃত-মস্তিষ্ক তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সম্রাট কিন্তু সে সমস্ত কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুনরায় টাকা দিতে আজ্ঞা করিলেন। এতক্ষণ সেই লোকটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাদাহশ আদেশ প্রদান করিবার পর সে তাঁহার সম্মুখস্থিত ভূমি জমী চুম্বন করিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা, সেবকের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম; আমি দেখিতেছিলাম যে, আপনার যথেষ্ট অর্থব্যয় করিবার উপযুক্ত প্রশস্ত-হৃদয় আছে কি না; আমার ভয় ছিল পাছে আপনি কার্য্যারম্ভের পর অচিন্ত্যপূর্ব্ব খরচ দেখিয়া অধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং মৎকল্পিত বস্তুটিকে অসম্পূর্ণ রাখেন। এখন আমি সমস্ত সন্দেহ ত্যাগ করিয়া আপনার ঈপ্সিত বস্তু নির্ম্মাণে যত্নবান হইব।" ইনিই না কি পরে এই তাজমহল নির্ম্মাণ করেন।

রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত তোরণদ্বারের মধ্যদিয়া তাজমহল প্রবেশের পথ। এই দ্বারটির পর একটি বিস্তৃত পথ পার হইলে একটি বিশাল চতুষ্কোণ অঙ্গনের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পথটির দুই পার্শ্বে কতকগুলি বারাণ্ডাযুক্ত ঘর বর্ত্তমান। এই পথটির অপর সীমান্তেও ঠিক এইরূপ দুই-সারি ঘর ও সম্মুখে ফটক দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-দিকে কয়েকটি ধাপ উঠিয়া আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ফটকের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার পথ। এই দ্বারের বহির্ভাগে সুদূরবিস্তৃত বর্ত্তমান আজগঞ্জপল্লী। পূর্ব্বে এই অঙ্গনের মধ্যে ভিতরের দিকে চতুর্দ্দিকে একসারি ঘর ছিল এবং সেকালে এই অঙ্গন ও গৃহগুলি পান্থাবাস-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। পান্থ ও দরিদ্রজন এখানে রাজকীয় ব্যয়ে আহার ও বিশ্রাম, উভয়ই প্রাপ্ত হইতেন। পনর বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত উক্ত পথটি মৃৎপ্রোথিত ছিল। প্রায় আড়াই ফুট মাটি তুলিয়া ফেলিয়া সেই ইষ্টকাচ্ছাদিত পথ বাহির করা হইয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ গৃহগুলির নিম্নভাগ দর্শন করিলে, এবং দেওয়ালের গাত্রস্থিত দাগ দেখিলেই পুরাতন পথের উচ্চতা সহজে অনুমিত হইবে। ইষ্টকাচ্ছাদিত পথের উপর দিয়া গমনাগমন করিলে অত্যন্ত শব্দ হয় বলিয়া, তাহা কঙ্করাবৃত করা হইয়াছে; কিন্তু লক্ষ্য করিলে এখনও পাশে পাশে ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। বামদিকে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অতি সুবিশাল, অত্যুচ্চখিলানযুক্ত, রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত তোরণদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যায়। দ্বারের পার্শ্বে গম্বুজে উঠিবার পথ আছে। এই দ্বারের মধ্যে বামদিকে, একটি গৃহে বর্ত্তমান 'মিউজিয়ম' প্রতিষ্ঠিত। সময়াভাব না হইলে এটিও একবার দেখিয়া লওয়া মন্দ নহে। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গৃহীত তাজমহলের কতকগুলি আলোকচিত্র আছে; যত রকমের পাথর তাজমহলে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নমুনা আছে; আর আছে হস্তিদন্তের উপর রং ফলাইয়া অঙ্কিত সাহজাহান ও মুমতাজমহলের দুই-খানি সুন্দর চিত্র। এতদ্ভিন্ন আরও কিছু কিছু জিনিষ আছে; কিন্তু উপরিউক্ত বস্তুগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাজমহলের দ্বারের বাহিরে এবং ভিতরে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তর দিয়া নানাপ্রকারের পত্রপুষ্প অঙ্কিত হইয়াছে এবং কোরাণের অংশবিশেষ লিখিত হইয়াছে। এই দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমি প্রত্যেক দর্শক, পর্য্যটককে অল্পক্ষণ স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি। হঠাৎ বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া বাস্তবিকই মনে হয় যেন কোনও এক মর্ম্মর-নির্ম্মিত রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি—যেন "A Dream in Marb'e"। এই স্থলে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিবার জিনিষ আরও একটি আছে। এইখানে দাঁড়াইয়া তাজের গম্বুজোপরিস্থিত পিতলের কলস ও অর্দ্ধচন্দ্র ইত্যাদির অর্থাৎ পিত্তলাংশের প্রকৃত দৈর্ঘ্য অনুমান করা বিশেষ আমোদজনক; দেখিলে দুই তিন হাতের অধিক মনে হয় না—অথচ প্রকৃতপক্ষে উহা প্রায় ২০ হাত; কলসগুলির ব্যাসও সেই পরিমাণে বড়। ইহার যথাযথ পরিমাণ তাজমহলের বামপার্শ্বস্থ ইমারতের সম্মুখস্থিত উঠানের উপর যমুনার দিকে অঙ্কিত আছে। এটি দেখিয়া বাস্তবিকই তাজমহলের বিশালত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হয়।

তোরণদ্বারের দুইপার্শ্বে উক্তদ্বার-সংলগ্ন উদ্যান-প্রাচীরের সহিত মিশাইয়া নিম্নস্তম্ভাশ্রিত ছাদবিশিষ্ট একহারা দীর্ঘ বারাণ্ডা—বারাণ্ডার সম্মুখে প্রশস্ত রোয়াক। বার্ণিয়ার বলেন যে, এইস্থানে সাহজাহান-স্থাপিত 'সদাব্রত' হইতে দরিদ্রেরা বর্ষাকালে সপ্তাহে তিনদিন আহার্য্য পাইত। বামদিকের বারাণ্ডার শেষভাগে অত্রস্থ 'হর্টিকাল্চারেল গার্ডেন'। যাঁহারা শিবপুর বা অন্যস্থানের 'বোটানিক্যাল

গার্ডেন' দেখিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিবার মত কিছুই অবশ্য এখানে নাই। এই তোরণদ্বারের সম্মুখে কয়েকটি ধাপ নামিয়াই, প্রশস্ত সুরক্ষিত উদ্যানের মধ্যে উপনীত হওয়া যায়। উদ্যান ও তাজমহলের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীরের মধ্যস্থিত স্থানটির পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ১৮৬০ ফিট এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০০০ ফিট। তোরণদ্বারের সম্মুখে, উদ্যানের ঠিক মধ্য দিয়া, রকমারি ফোয়ারা-সুশোভিত কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী। ইহার দুই পার্শ্বে প্রস্তরাচ্ছাদিত পথ; তাহার পর নয়ন-মুগ্ধকর সবুজ ঘাসের মধ্যে সযত্নরক্ষিত ঝাউশ্রেণী। পূর্ব্বে এই উদ্যানে নানাবিধ ফলের বৃক্ষ ছিল। আজকাল ইহা, হাল-ফ্যাসানে, হরিৎ-শষ্পাচ্ছাদিত হইয়া, এবং মধ্যে মধ্যে বিচিত্র গন্ধ ও বর্ণের পুষ্পবৃক্ষের স্তূপ বা শ্রেণীদ্বারা সুশোভিত হইয়া, এক নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে। যদিও পূর্ব্বকালের সমন্বিত বৃক্ষগুলি এই স্থানের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিয়া, সমাধি-মন্দিরের সহিত স্বাভাবিক ভাবে মিশিয়া ছিল এবং সেই মিলনে এক প্রকার গম্ভীর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিত—বর্ত্তমান উদ্যানও এক অভিনবভাবে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তাজমহলই উদ্যানের প্রসাধন, কি উদ্যানই তাজমহলের অলঙ্কার, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন!

পূর্ব্বোক্ত পয়ঃপ্রণালী শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি হ্রদের দ্বারা' দ্বিখণ্ডিত। সম্প্রতি এই হ্রদটির চতুঃপার্শ্বের পুরাতন আমলের লৌহ কেদারাগুলি সরাইয়া, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট সহস্রমুদ্রাব্যয়ে চারিখানি মর্ম্মর-নির্ম্মিত আসন স্থাপন করিয়াছেন। সন্ধ্যার সময়, প্রকৃতি শান্ত হইলে পর, পয়ঃপ্রণালীর পার্শ্বস্থ পথে, তোরণদ্বারে ও হ্রদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, শব্দ করিলে তাহার প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়—সমাধি-মন্দির ও তোরণদ্বারে ঘাতপ্রতিঘাত করিয়া, সে প্রতিধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, ক্রমশঃ শূন্যে মিশিয়া যায়। মর্ম্মর-শোভিত হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থিত জল রাখিবার স্থান-গুলি, এবং দক্ষিণ ও বামপার্শ্বস্থ নালাদুটি, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীদরবারের সময় নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত খালের শেষভাগে, কয়েকটি ধাপ উঠিয়া, বর্ফী-প্যাটার্ণে পাথর-বসান একটি বেদী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পাথরগুলির মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে; পরিবর্ত্তিত প্রস্তরগুলিতে পরিবর্ত্তনের সন খোদিত আছে। অতঃপর, মর্ম্মর-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণীদ্বয় দ্বারা ২২২ ফুট উঠিলেই, মুমতাজমহলের সমাধিমন্দিরের শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত অঙ্গনে উপস্থিত হওয়া যায়। এই সোপানের প্রত্যেক ধাপ একখণ্ড প্রস্তরদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। এই মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত অংশটাই বাস্তবিকপক্ষে তাজমহল বা তাজ।

উপরিস্থিত মর্ম্মর-বেদীটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩১৩ ফিট – তদুপরি রক্ষিত সমাধিমন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮৬ ফিট এবং উচ্চতায় ২২০ ফিট। বেদীটির চতুষ্কোণে চারিটি ক্রমক্ষীণ মিনার; উদ্যানের জমি হইতে এইগুলি ১৬২ ফিট উচ্চ। মধ্যবর্ত্তী অষ্টকোণবিশিষ্ট ঘরটির মধ্যে পুষ্পাকারে বহুমূল্যবান বিচিত্র মণিখচিত, কারুকার্য্য সুশোভিত, শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধি-দ্বয় স্থাপিত; মুমতাজমহলের সমাধিটি ঠিক মধ্যস্থলে রক্ষিত এবং সাহজাহানের অপেক্ষাকৃত উচ্চ সমাধিটি একপার্শ্বে স্থাপিত। এই সমাধি দুইটি কিন্তু প্রকৃত সমাধি নহে; ইহা ভূগর্ভস্থ আসল সমাধিদ্বয়ের নকল মাত্র। আসল সমাধি দুইটি সাদাসিদে ধরণের, তাহাতে মোটেই কারুকার্য্য নাই। বার্ণিয়ার বলেন যে, সম্রাটের জীবনকালে ঐ ঘরটি বৎসরে মাত্র একদিন অনেক আচার অনুষ্ঠানের পর, উন্মুক্ত হইত এবং সে সময়ে অন্যধর্ম্মাবলম্বী কেহ প্রবেশলাভ করিতে পাইত না।

সম্রাজ্ঞীর সমাধিটি ঠিক মধ্যস্থলে কেন স্থাপিত হইয়াছে, এই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন যে, সম্রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সাহজাহান স্বেচ্ছায় সম্রাজ্ঞীর সমাধি সুন্দরতম স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি নিজে মহিষীর একপার্শ্বে অল্প একটু স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। আবার কেহ বলেন যে, সম্রাটের ইচ্ছা ছিল যে, তাজমহল শুধু তাঁহার পত্নীরই সমাধিমন্দির হইবে; তিনি নিজের জন্য অন্য এমারৎ প্রস্তুত করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ায়, তিনি সে সাধ পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে তাঁহার মৃত্যুর পর, ঔরঙ্গজেব এই তাজমহলই তাঁহারও চিরবিশ্রামাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট করেন।

বর্ত্তমানসময়ে তাজমহলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সুন্দর কারুকার্য্য, এই সমাধি দুইটীর উপর এবং তদ্বেষ্টন-কারী প্রাচীরের উপর, দৃষ্ট হয়। শ্বেতমর্ম্মর কাটিয়া যে

রকম সুন্দর জাল প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাদৃশ অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এক একখানি জাল এক একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। সমাধির উপরিস্থিত গোলাপফুলগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এক বর্গ-ইঞ্চি হইতেও অল্পস্থানে ৩৫।৪০ খণ্ড পাথর বসান রহিয়াছে। প্রাচীর-গাত্রে লক্ষ্য করিয়া গণনা করিলে সহজেই একবর্গ ইঞ্চির মধ্যে ৫০।৬০ খণ্ড বিভিন্ন রংএর প্রস্তর দেখিতে পাইবেন। 'বাদসাহ নামা'তে লিখিত আছে যে, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ধাতুনির্ম্মিত দীপাধার দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল লর্ড কর্জ্জন ইহা উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা মিশরদেশীয় কারিগরদ্বারা প্রস্তুত করান হইয়াছে এবং ইহার মূল্য ছয় সহস্র মুদ্রা।

তাজের বহির্ভাগে বিশেষ কারুকার্য্য নাই। কোরাণ হইতে বিলাপসূচক অংশবিশেষ শ্বেত-প্রস্তরের জমিতে কৃষ্ণ-প্রস্তর দিয়া খোদিত করা হইয়াছে। এই লেখার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে

যমুনাপার হইতে তাজ

নীচের অক্ষর এবং উপরের অক্ষর সমান দেখায়; শুধু তাহাই নহে, উপরে ক্রমশীর্ণ না হইয়া—নীচে যতটা প্রশস্ত দেখায়, উপরেও ঠিক ততটা। সত্যই কি তাজমহল উপরের দিকে ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়াছে? না;—সম্প্রতি আমি তাজমহলের উপরের গম্বুজের নিকট উঠিয়া, পার্শ্ব বিশেষের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ, স্বয়ং মাপিয়া দেখিয়াছি যে, তিলমাত্রও প্রভেদ নাই।
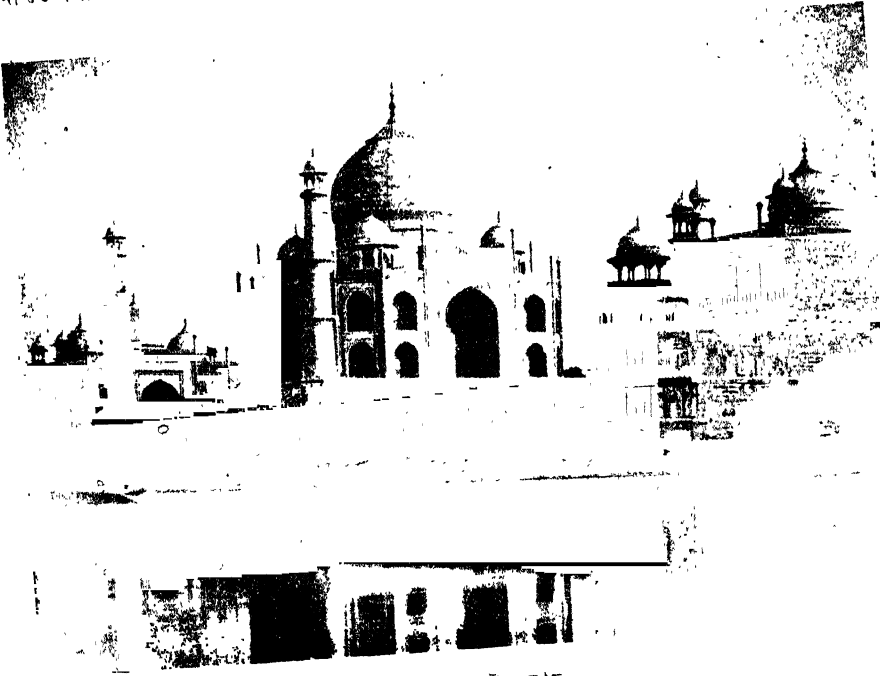
প্রস্তর-প্রাচীর নিম্মাণ করিবার পূর্ব্বে, সম্রাজ্ঞীর সমাধির চতুষ্পার্শ্বে সম্রাট্‌ সাহজাহান ছয়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া মণি-মুক্তা-খচিত এক স্বর্ণ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে, অপহৃত হইবার ভয়ে, তাহার পরিবর্ত্তে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া বর্ত্তমান প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা শেষ করিতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সমাধিদ্বয়ের উপর উভয়ের নাম, উপাধি ও মৃত্যু সন খোদিত আছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সম্রাজ্ঞী ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে এবং সম্রাট্‌ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

বর্ত্তমান সময়ে সমাধির উপর একটি দুইহস্ত-পরিমিত

তাজের দুই পার্শ্বে, তাজ হইতে প্রায় একশত গজ দূরে, রক্ত-প্রস্তরনির্ম্মিত ঠিক একই রকমের দুইটি বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন যে, এ দুইটিই মসজিদ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পরস্পরের সম্মুখস্থিত দুইটি

গৃহই কখনও মস্‌জিদ হইতে পারে না। পশ্চিমদিকস্থিত বাড়িটিই বাস্তবিক মস্‌জিদ, অপরটি শুদ্ধ তাহার প্রতিলিপি। ইহা 'জমায়ৎখানা', অর্থাৎ মিলন-স্থান, বলিয়া পরিচিত। যে সময়ে তাজমহল নির্ম্মিত হইতেছিল, সম্রাজ্ঞীর মশলা-সুরক্ষিত শবদেহ এই মস্‌জিদের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল—এই কথা বলিয়া ইহার মধ্যে একটি স্থানবিশেষ দর্শকদিগকে দেখানও হইয়া থাকে। তাজের গাত্রে কয়েকটি তারিখ খোদিত আছে—এই তারিখগুলি বোধ হয়, তাজমহলের অংশবিশেষের সমাপ্তিকাল নিরূপণ করিতেছে। মস্‌জিদ-মুখীন পশ্চিমদিকস্থ খিলানের বহির্ভাগে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ, ভিতরে প্রবেশপথের বামদিকে শেষভাগে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ, এবং সম্মুখের তোরণদ্বারটির উপর ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ খোদিত আছে। খৃষ্টীয় সন অবশ্য দেওয়া নাই, কিন্তু থতাইলে আমরা এই সনগুলি পাই। শেষোক্ত সনটি বোধ হয়, সমাধি-মন্দিরের সমাপ্তিকাল জ্ঞাপন করিতেছে।

তাজের পশ্চাদ্দিকে—যমুনার পরপারে—আর একটি অনুরূপ স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাহজাহানের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এখানে আর একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের তাজমহল নিম্মাণ করাইয়া, তাহা নিজের সমাধিস্থানস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিবেন, এবং সমাধি দুইটিকে একটি সেতুদ্বারা মিলিত করিয়া পরস্পরের ইহজীবনের প্রেমবন্ধনকে মৃত্যুর পরও বাহ্যতঃ অক্ষুন্ন রাখিবেন। কিন্তু মাত্র দুই গম্বুজ মধ্যস্থিত একসারি গাঁথুনি দেখিয়া, আমার মনে হয় যে—উহা স্থানীয় যমুনার জল বদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। পশ্চাদ্ভাগে নদী থাকা প্রযুক্ত তাজমহলের শোভা অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে—পাছে নদী সরিয়া যাওয়ায় সে শোভা নষ্ট হয়, সেইজন্য পরপারে বাঁধস্বরূপ কতকটা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

'বাদসাহনামা' হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আগ্রার সবডিভিজন হবেলী পরগণার অন্তর্গত ত্রিশটি গ্রাম, তাজ-মহলের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।—তৎকালে উক্ত গ্রামগুলি একলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল। ইহা ছাড়া তাজমহল-সংলগ্ন দোকান ও সরাইগুলির আয়ও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। শেষোক্ত উপায়েও বাৎসরিক আয় অন্যূন দুইলক্ষ মুদ্রা ছিল।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরবাসী জাঠলুণ্ঠনকারীরা প্রবেশ-পথের রৌপ্যদ্বার জোড়াটি খুলিয়া লইয়া যায়। এই একাদশ শত মোহরশীর্ষ প্রেকযুক্ত দরজা জোড়াটিতে ১,২৭,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। সম্রাট্ সাহজাহান সম্রাজ্ঞীর সমাধির উপর একখানি মুক্তার চাদরস্থাপিত করিয়াছিলেন; সেটি ১৭২০ খৃষ্টাব্দে "বড় সৈয়দ"দিগেরদ্বারা অপহৃত হইয়াছে। মোগল অধিকারের শেষভাগে 'বড় সৈয়দ'-পরিবারই একজনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, ইচ্ছামত ব্যক্তিকে সিংহাসনারূঢ় করাইতেন। তাঁহারা 'King-makers' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মুসলমান তাজকে জাঠ, মহারাষ্ট্রীয়, প্রত্যেকে যে যেমন করিয়া পারিয়াছে, নষ্ট করিয়াছে এবং যে যাহা পাইয়াছে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এক্ষণে ইহা বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং যথোপযুক্ত সংস্কৃতও হইয়াছে। লর্ড কর্জ্জনের ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর কার্য্যগুলির মধ্যে পুরাতন এমারৎগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে তাজমহলের ভার একটি কার্য্যকরী সমিতির উপর ন্যস্ত আছে; এই সমিতির সভ্য—কমিশনর, কালেক্টর, ডিষ্ট্রীক্ট জজ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র এবং সরকারী উদ্যান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

এদেশে ভূমিকম্প নাই বলিয়া তাজের মত প্রকাণ্ড প্রাসাদ এখনও যথাযথভাবে দণ্ডায়মান আছে। কেবল তাহাই নহে, এক পসলা বৃষ্টি হইবার পর তাজমহল দেখিলে মনে হয়, যেন অতি সম্প্রতি ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে। তখন সামান্য মলামাটি যাহা থাকে, তাহা ধৌত হইয়া, তাজ-মহল এক অবর্ণনীয় শুভ্র পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করে। তাজমহল বর্ণনার বস্তু নহে, রং ফলাইয়া অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার জিনিষ নহে—ইহা শুধু দেখিবার ও অনুভব করিবার সামগ্রী। ভাষায় শব্দ নাই, সাহিত্যে উপমা নাই, শব্দে শক্তি নাই, যে তাজমহলের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া বর্ণনা করিতে পারা যায়।

এইবার আসুন, প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক; ফিরিবার পথে পুনরায় সেই প্রবেশদ্বারের নিকট, তাজমহলের দিকে ফিরিয়া দেখুন—সম্রাট্ সাহজাহানের মরজগতের শক্তির চরম দেখুন, সম্রাজ্ঞী মুমতাজমহলের জগদ্বিখ্যাত সৌন্দর্য্যের উপসংহার দেখুন! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি মার্কিন ধর্ম্মযাজকের

বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম যে, একব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর সমাধির উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন— "In thy face I have seen the Eternal" 'তোমারই মুখমণ্ডলে আমি সেই নিত্যবস্তুর দর্শনলাভ করিয়াছি!' বাস্তবিক, যে প্রেমে অন্তর বিকশিত ও প্রশস্ত হইয়া নিত্য-বস্তুর উপলব্ধি ঘটে, তাহাই প্রেম নামের যোগ্য—তাহাই বাঞ্ছনীয় ও অনুসরণীয়। সেই হইতে সর্ব্বদাই মনে হয় যে, শব্দগুলি এই বিশাল সমাধিমন্দির হইতে অধিকতর বিশুদ্ধতর প্রেমেরপরিচায়ক।—একটিতে,মাত্র 'প্রেয়'র সে করা হইয়াছে; অন্যটিতে, 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়' উভয়ই মিলি হইয়াছে!

বঙ্গ-গৃহ

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

জ্ঞাতি কুটুম্ব—নিকট বা দূর—অধিকৃত যার সকল কক্ষ,
ক্ষুদ্রসুখে কি দুঃখেও যথা স্পন্দিত সেই জনতা-বক্ষ।
এক হেঁসেলের অন্নে যেথায় সকলের ক্ষুধা হয় গো শান্ত,
সে একই আঙ্গিনা যেথানে লুটায় সকলের দেহ হইলে শ্রান্ত,
পশু ও পক্ষী কুকুরটিও, কোন্ গৃহতলে স্নেহেতে পুষ্ট?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—দেবতারা সব যেথানে তুষ্ট!

কার দ্বার হতে ফিরে না অতিথি চিরকাল কিবা দিবস রাত্র
পাদ্য-অর্ঘ্য হাতে উন্মুখ কোন্ সে গৃহের মানুষ মাত্র,
নিমেষের তরে উন্মনা হ'লে কোথা জ্বলে শাপ-অগ্নি-কুণ্ড,
কে কোথায় তুষে অভ্যাগতেরে প্রদানি নিজের তনুজ মুণ্ড?
কোন্ গৃহদ্বারে আসেন শ্রীহরি হইয়া অতিথি—কুষ্ঠগ্রস্ত?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—অতিথি সেবায় নিয়ত ব্যস্ত।

তৃণ দিয়া মাথে কাদের আশীষ রাজেশ্বর হইতে নিত্য,
কোথা অকাতর মুষ্টিভিক্ষা তুষিয়া হাজার ভিখারী-চিত্ত,
এক কাঠা ধানে সাগর কড়ির ঝাঁপিটি কাদের লক্ষ্মী-মূর্ত্তি,
বিধবাগণের শুচি-প্রসন্ন, নিষ্ঠাতে চির প্রাপ্ত স্ফূর্ত্তি;
বার'মাসে তেরপর্ব্বে দ্বিজের স্বস্তি প্রসাদে পূর্ণ,—ধন্য,
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—জগতে এমন কোথায় অন্য?

বালকে কাহারা দেখে নারায়ণ গা ঢেলে সাধরে লভে সে পুত্র
জননী না হলে যেথা রমণীর জীবনে ছিন্ন সুখের সূত্র,
বিবাহ যথায় পুত্রকল্পে, পাকাচুলে পরি সিঁদুর কর্ত্রী
ভাবিছে বসিয়া কবে সে দেখিবে নাতির নাতি যে স্বর্গেবর্ত্তি
দৌহিত্রেরে খাওয়ায়ে কে ভাবে দ্বাদশবিপ্র ভোজনপুণ্য?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—প্রীতি ভক্তির উপমাশূন্য!

উপায়ক্ষম যেমন পুত্র, পিতা লয় ঘরে নাতির সঙ্গ;
কুণ্ঠিত নহে পালিতে স্বজন—হউক আতুর বিকল অঙ্গ;
সারাজীবনের অর্জ্জন কা'রা অকপট প্রাণে নিয়ত বণ্টে;
বিত্তবিহীন আত্মীয়গণে ভাগ দিয়া ল'য়ে আপন স্কন্ধে!
ভৃত্যেরও সাথে আত্মীয়তায় কাহাদের গৃহ সুসম্বদ্ধ?
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—প্রীতির অমৃতে অমর অঙ্গ!

কোন্ গৃহে নারী লক্ষ্মীশ্রী শক্তি কাষ্ঠা পরমাঋদ্ধি?
শিশু—আনন্দ; আশ্রিত আর আত্মীয় পালি তপঃসিদ্ধি!
কোন্ মন্দিরে পূজারী পুরুষ, অবহিত থাকে বরানুসন্ধ?
উরেন্ নিমাই শ্রীরামমোহন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ!
ধন্য সে গৃহ, বিশ্বের গুরু ধূলাখেলে শুয়ে যাহার কক্ষে;
সে যে গো আমার বঙ্গের গৃহ—রতনের হার ভারতবক্ষে!

নাম-পরিত্যাগ

[শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিভূ্ষণ, বি এ.]

পেশোয়া রাজের বিপুল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সমস্ত মধ্য-প্রদেশ জয় করিয়া বিলাসপুর হইতে কটক-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। সেনাপতি সদানন্দ রাও অতি তরুণ, রূপবান্ যুবক। সাহসী, বীর ও অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া তাহার সুখ্যাতি ছিল। "হীরককুণ্ড" নামক স্থানে মহানদীর তীরে আসিয়া তাহার একবার সম্বলপুর রাজ্য জয় করিবার বাসনা হইল। কিন্তু তৎকালে সম্বলপুর রাজ্য অজেয় বলিয়া একটা প্রবাদ ছিল। লোকে বলিত দেবী সম্বলেশ্বরী স্বয়ং দুর্গের দ্বার রক্ষা করেন। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এইখানেই কালাপাহাড় পরাজিত হইয়া পলায়ন করে;—আজিও কালাপাহাড়ের বিশাল জয়ঢাক দেবী সম্বলেশ্বরীর মন্দিরের নিকট পড়িয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সদানন্দ এ সকল কথা শুনিয়াছিল, কাযেই একটুক্ ইতস্ততঃ করিতেছিল। এমন সময় সে শুনিল সম্বলপুররাজের কন্যা "বিদগ্ধা" অসামান্যা সৌন্দর্য্যময়ী ও বিদুষী। তাহার রূপ-গুণের কথা শুনিয়া সদানন্দ সম্বলপুর-রাজ ত্রিবিক্রমের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা জানাইল। রাজা অস্বীকৃত হইলেন। সদানন্দ বীর ও পণ্ডিত হইলেও রাজবংশীয় নহে। তখন মহারাষ্ট্র-সেনাপতি যুদ্ধের ভয় দেখাইল। রাজা বলিয়া পাঠাইলেন—"বর্গী সেনাপতিকে বলিও, সম্বলপুররাজ যুদ্ধের ভয়ে ভীত নহে। তাঁহার ক্ষমতা থাকে, রাজ্যজয় করিয়া আমার কন্যালাভ করুন। বিজয়ী ক্ষত্রিয় বীরকে আমি স্বয়ং সন্তুষ্টচিত্তে কন্যাসম্প্রদান করিব।" সদানন্দ মহানদীতীরে শিবির-সন্নিবেশ করিল।

সম্বলপুর নগরের উত্তরপ্রান্তে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর "বুড়ারাজা" মহাদেবের মন্দির। প্রায় তিনশত বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান অতিক্রম করিয়া এই মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব একটু সমতল। পাহাড়টি নানাজাতীয় বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। মন্দিরের চারিধারে কতক-গুলি হরিতকী, আমলকী জাতীয় বৃক্ষ আছে, আর নিকটেই একটা বিশাল ভূর্জ্জবৃক্ষ! এ স্থান কি মনোরম, কি শান্তিপ্রদ, আর কি পবিত্র, তাহা যে সেখানে একবার উঠিয়াছে, সেই বুঝিতে পারিয়াছে। পাহাড়ের নিম্নেই মন্দিরের পূজক বাস করেন। তাঁহার ভরণপোষণের জন্য রাজা দুইশত বিঘা নিষ্কর জমি দিয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে পাহাড়ের নিম্নে একখানি পাল্‌কি নিঃশব্দে আসিয়া পৌছিল। একটি সুন্দরী কিশোরী পাল্‌কি হইতে বাহির হইয়া মন্দিরের দিকে উঠিতে লাগিল। তাহার বেশভূষা অতি সামান্য। পরিধানে একখানা মোটা তসরের সাড়ি ও হস্তে দুইগাছা হস্তিদন্তের বালা। দেখিলে খুব ধনীর কন্যা বলিয়া মনে হয় না। কিশোরী মন্দির-অলিন্দে আসিয়া একবার দাঁড়াইল, দেখিল একজন লোক "হত্যা" দিয়া শুইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। নিঃশব্দে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সে একাগ্রচিত্তে পূজা করিল; পূজার পর, বাহিরে আসিয়া দেখিল তখনও পূজারী আসেন নাই। কিশোরী তখন নিকটস্থ ভূর্জ্জবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া মহানদীর জলরাশির বর্ষা-কালীন শোভা দেখিতেছিল, আর আনমনে ভূর্জ্জবৃক্ষের ত্বকে নিজের নাম লিখিতেছিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল,—"মালক্ষ্মী! ছেলেবেলা হ'তে কত নাম এই গাছে লিখেছ, একটি নামও ত মোছেনি—তবে এ বুড়োর প্রতি স্নেহ দিন দিন মুছে ফেলছ কেন মা?" কিশোরী অতি স্নেহমাখা কণ্ঠে বলিল—"চিরদিনই ত আমি আপনাকে দেবতার মত ভক্তি করি।"

"মা, তবে সবদিন এ বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ না নিয়ে তুমি কেন মন্দির হ'তে চ'লে যাও?"

"আজ কদিন বাবা বড় ব্যস্ত আছেন, তাই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হয়।"

"মা, কাল রাত্রি হ'তে একটা লোক মন্দিরদ্বারে হত্যা দিয়েছে—এস, দেখ্‌বে এস।"

বালিকা বৃদ্ধের সহিত মন্দিরের বারান্দায় আসিল। বৃদ্ধ সেই লোকটির গাত্রাবরণ উন্মোচন করিল। কিশোরী দেখিল, একজন অসামান্য রূপবান্ যুবক নিমীলিত-নয়নে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বালিকা অতি মৃদুস্বরে বৃদ্ধের কাণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিল,—"কি মনস্কামনা ?" বৃদ্ধ বলিল,--"সে কথা আমি জানিনা মা! বাবা যদি এর মনস্কামনা সিদ্ধ করেন, তা'হলে আজ কিম্বা কাল রাত্রেই তিনি দেখা দেবেন; আর যদি প্রভু মনোরথ পূর্ণ না করেন, তা' হ'লে এ ব্যক্তি চিরদিন এমনই নির্ব্বাক হয়ে থাক্‌বে।" বালিকা এসব কথা জানিত, তাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আহা! বাবা যেন তা'র বাসনা পূর্ণ করেন।" এমন সময় সেই লোকটি চক্ষু মেলিল, সম্মুখে সেই অপূর্ব্বমূর্ত্তি দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিল; পরে চক্ষুর্ম্মুদ্রিত করিল—আর চাহিল না।

২

একদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর মহারাজ ত্রিবিক্রম দেব মন্ত্রণাগৃহে মন্ত্রীর সহিত আসন্ন-যুদ্ধের পরামর্শ করিতেছিলেন। কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী, যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট আয়োজন এখনও ত হইল না! যেরূপ বুঝিতেছি, তিন চারি দিনের মধ্যেই বর্গীরা দুর্গ আক্রমণ করিবে।" মন্ত্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"মহারাজ, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যে আয়োজন হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। দুর্গের দক্ষিণপার্শ্বে খরস্রোতা মহানদী—অপর তিনপার্শ্বে গভীর পরিখা। আর সিংহদ্বারে স্বয়ং মা ভবানী যুদ্ধ করিবেন। এ রাজ্যের জন্য ভয় কি মহারাজ? সমস্ত বর্গী সৈন্য মহানদীর প্রবলস্রোতে ভাসিয়া যাইবে।"

মহারাজ বলিলেন—"স্বয়ং ভবানী যে এ ভক্তিক্রিয়াহীন সন্তানের জন্য যুদ্ধ করিবেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

মন্ত্রী—"মহারাজ, আপনি কি প্রাচীন প্রবাদ ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি স্বর্গীয় মহারাজার মুখে শুনিয়াছি, তিনি কত যুদ্ধে মা সম্বলেশ্বরীকে স্বয়ং দুর্গদ্বারে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছেন!" মহারাজ চিন্তামগ্ন হইলেন।

এখন যেখানে সম্বলপুর নগর প্রতিষ্ঠিত আছে, অতি প্রাচীনকালে সেখানে দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল। পাটন রাজ্যের রাজকুমার সেই অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। সারাদিন সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে মৃগয়ার পর সন্ধ্যাসমাগমে তিনি নদীতীরস্থ এক বিশাল তিন্তিড়ি বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া নিশাযাপনের সংকল্প করিলেন। মধ্যরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, মা ভবানী বলিতেছেন, "বৎস, আমার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি এই বৃক্ষনিম্নে প্রোথিত আছে; তুমি উত্তোলন করিয়া এইস্থানে আমার প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাদির ব্যবস্থা কর—আর এই অরণ্য কাটিয়া এখানে নগর সংস্থাপন কর; আমি স্বয়ং তোমার নগররক্ষা করিব—যদ্ধবিগ্রহের সময় তুমি বা তোমার বংশীয় কেহ আমাকে দুর্গদ্বার পরিত্যাগ করিতে না বলিলে আমি দুর্গ পরিত্যাগ করিব না।" ইহাই প্রবাদ। আজিও সম্বলেশ্বরীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে সেই বিশাল তেঁতুলগাছ দাঁড়াইয়া আছে।

৩

বর্ষাকাল। অতি প্রভাতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পথঘাট প্রায় জনশূন্য; ক্বচিৎ কোথাও কোন কৃষক হলস্কন্ধে, গায়িতে গায়িতে চলিয়াছে—

"বাট ছাড় নন্দসুত মুই যিমি যমুনাতীর—।"

সেই পূর্ব্বকথিতা কিশোরী প্রত্যহ যেমন আসিয়া থাকে, তেমনই আজিও অতি প্রভাতেই 'বুড়া রাজার' মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল বারান্দায় একটি লোক বসিয়া আছে। আশা ও সফলতার আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া আছে। বালিকা চিনিল—এ যে সেই যুবক, যে "হত্যা" দিয়াছিল। তবে ত তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। কিশোরীর দয়ার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। সে তাহার সম্মুখে যাইয়া, সুমিষ্টস্বরে বলিল—"আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে?" যুবক স্থিরভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল—"হাঁ, বাবা মহাদেব আমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন বলেছেন।"

কিশোরী উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কি বাসনা? কি কষ্টে আপনি 'হত্যা' দিয়েছিলেন?"

যুবক বলিল,—"তোমার পরিচয় না পেলে সে কথা বল্‌ব না। তুমি কে?"

"আমি একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয়ের কন্যা, নাম সুভদ্রা।"

"দরিদ্রের ঘরে এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই,।"

কিশোরী লজ্জায় মুখ অবনত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল—"এখন বল্‌বেন কি?"

"হাঁ, এখন আর আমার তত আপত্তি নাই—তুমি আর কা'কেও বল্‌বে না ?"

"না।"

"দেবতার সাম্‌নে বল্‌ছ ?"

"হাঁ।"

তখন সেই যুবক একবার চারিদিকে চাহিল; দেখিল কেহ কোথাও আছে কি না। তাহার পর অতি মৃদুস্বরে বলিল—"আমার মনস্কামনা—প্রথম, এই রাজ্যজয়—আর দ্বিতীয়, রাজকন্যার সহিত বিবাহ।"

কিশোরী বিষণ্ণমুখে বলিল, "আপনার নাম কি ?"

"সদানন্দ রাও।"

"মহারাষ্ট্র সেনাপতি ?"

যুবক হাসিয়া বলিল—"হাঁ।"

কিশোরী তখন কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিল; পরে কতকটা উৎফুল্লভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আর কোন কামনা কি আপনার ছিল না ?"

যুবক তাহার মুখের দিকে আর একবার উৎসুকভাবে চাহিল; তাহার পর বলিল—"হাঁ, আর একটা কামনা ছিল—তোমার কাছে তা' গোপন করব না। তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে কি ?"

কিশোরী অচঞ্চলকণ্ঠে বলিল,—"ক্ষত্রিয়-বীর মিথ্যা কথা বলে, এ কথা আমি মনে করি না।"

"তবে শোন। সেদিন আমি যখন এখানে শুয়ে ছিলাম, আর প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত বাবাকে ডাক্‌ছিলাম, তখন তুমি আমর সাম্‌নে এসেছিলে—আমি তোমার সেই বিশ্বমোহন রূপ দেখে ভুলে তোমাকে পাবার জন্য বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম।"

কিশোরী মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—"রাজকন্যা বিবাহ করবেন—আবার আমাকেও চান্ ?"

যুবক লজ্জিত হইল; সে বলিল, "কি জানি, কেন এমন ভাব মনে হ'য়েছিল। দুই স্ত্রী বিবাহ করব একথা কখনও মনে হয় নাই। তবুও বাবার নিকট দুই-ই চেয়ে ফেলেছি।"

কিশোরী তখন নীরবে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সাহস পাইয়া যুবক বলিল—"বিশ্বনাথ যখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে বলেছেন, তখন মনে হয় নিশ্চয়ই তোমাকেও পাব।"

কিশোরী সহাস্যমুখে বলিল—"আচ্ছা, আপনি এক কার্য্য করুন। মন্দিরের পূজারী খুব ভাল জ্যোতিষ জানেন; আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসুন, আপনার দুই বিবাহ কি এক বিবাহ। পরে আপনার কথার উত্তর দেব।"

কিশোরীর কৌতুকপূর্ণ আগ্রহে যুবক উঠিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পূজারী বল্লেন আমার এক বিবাহ হবে।"

"তা' হ'লে রাজকন্যাই বিবাহ কর্‌বেন।"

"কিন্তু আমি তোমাকেই চাই।"

"কেন ?"

"রাজকন্যা পে'তে হ'লে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। রাজকন্যা কেমন, দেখি নাই;—কিন্তু তোমাকে—"

কিশোরীর সেই কমনীয় মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হইল। যথাসম্ভব কঠোরকণ্ঠে সে বলিল,—"যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকে ভয় করে, তাকে দরিদ্রের মেয়েও বিয়ে করে না!—আপনি যদি এ রাজ্য জয় করতে না পারেন, তা' হ'লে আমার সহিতও আর দেখা হবে না।"

যুবক অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "দেখ, রাজ্য জয় কল্লে যদি মহারাজ রাজকন্যাকে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করেন ?"

"তখন রাজকন্যাকেই বিবাহ করবেন।"

"আর তুমি ?"

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "মহাদেব ত আপনাকে দুইই দেবেন বলেছেন।" এই বলিয়া কিশোরী হাসিতে হাসিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; যুবক তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আর এক কথা—পুনরায় তোমার সঙ্গে কখন দেখা হবে ?"

"আপনি যদি যুদ্ধজয় করতে পারেন, তা' হলে জয়ী হবার পরদিন সন্ধ্যার সময় দুর্গপরিখার বাঁধাঘাটে আমাকে দেখ্‌তে পাবেন।"

এই বলিয়া সে মন্দিরমধ্যে চলিয়া গেল।

৪

যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। বর্গীরা নৌকাযোগে

মহানদী পার হইয়া নগরের চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়াছে। এখনও তাহারা দুর্গ আক্রমণ করে নাই।

রাজা সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় রাজ্ঞী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—"দেখ, মারাঠা সেনাপতির প্রতি বিদগ্ধার একটু অনুরাগ হয়েছে ব'লে বোধ হচ্চে—বিবাহটা দিলে কি দোষ হ'ত ?"

রাজার এ সংবাদ ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন—"তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?"

"মেয়েমানুষের মনের ভাব মেয়েমানুষে সহজেই টের পায়। বিদগ্ধা তা'র সখীদের সঙ্গে যে গল্প কচ্ছিল, তা' আমি শুনেছি। তা'তেই আমার মনে হয়।"

রাজা একটু বিরক্তভাবে বলিলেন—"আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।"

ইহার দুইতিন ঘণ্টা পরে মারাঠারা প্রবলবেগে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিল। ভীষণ শব্দে দুর্গপ্রাকারে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। মহারাজ সত্বর সজ্জিত হইয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রাজসৈন্য সুন্দর কৌশলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। তখন তিনি সিঁড়ি দিয়া সিংহদ্বারের উপরে উঠিলেন। দেখিলেন, এ কি ! সিংহদ্বারের উপর তাঁহার কন্যা বিদগ্ধা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাজা পূর্ব্বেই বিদগ্ধার উপর একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন—এখন ভাবিলেন, বুঝি সদানন্দের প্রতি অনুরক্তা হইয়া বিদগ্ধা এ সময়ে দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। রাজা তখন কঠোরকণ্ঠে বলিলেন, "বিদগ্ধা, তোমার যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন এখনও হয় নাই !"

মহিমময়ী কিশোরী পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল—"কি বাবা, আমি চ'লে যাব ?"

"হাঁ, তোমার এখানে কোন প্রয়োজন নাই; তুমি যাও।"

"আচ্ছা !"—নিমেষের মধ্যে কিশোরি-মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইল। রাজা বিস্মিত হইলেন। হতভাগ্য রাজা, কি করিলে ? মা জগদ্ধাত্রী কন্যারূপে তোমার দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন—তুমি চিনিতে পারিলে না ?—বিদায় দিলে ! মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় রাজার মনে হইল—একি মা ভবানী ?

রাজা তখন উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে বিদগ্ধাকে দেখিতে পাইলেন না—বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, বিদগ্ধা তাহার অনেক পূর্ব্বে হইতে শয়নগৃহে নিদ্রা যাইতেছে।

হায় মা ! কি পাপে এ দীন-সন্তানের সহিত এ ছলনা করিলে ? হতভাগ্য রাজা, নিয়তির কঠোর বিধান পূর্ণ করিবার জন্য মা আজ তোমাকে এমন নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যাগ করিলেন। মহারাষ্ট্র-সৈন্যের প্রবল আক্রমণে সেই রাত্রিতেই দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল—নগর অধিকৃত হইল।

পরদিন অপরাহ্নে রাজা ত্রিবিক্রম দেব ও রাজকুমার 'অরিন্দম' প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে বিজয়ী সেনাপতি সদানন্দ। সদানন্দ জয়লাভ করিয়াও রাজার বা রাজ্যের কোন অনিষ্ট করে নাই। সে কেবল বিজয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট। রাজা পরম সমাদরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তার পর রাজা বলিলেন—"সদানন্দ, আজ আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিব।"

সদানন্দ কথাটা বুঝিতে পারিয়াছিল; তবুও জিজ্ঞাসা করিল—"কি মহারাজ ?"

"আজ আমি বিজয়ী সেনাপতির হস্তে আমার বিদগ্ধাকে সমর্পণ করিয়া সুখী হইব।"

সদানন্দ একটু চিন্তার পর বলিল,—"মহারাজকে তবে সকল কথা খুলিয়া বলি। সে সব শুনিয়া যদি এ দরিদ্রের হস্তে রাজকন্যাকে সমর্পণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে এ দরিদ্র কৃতার্থ হইবে।"

রাজা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"কি কথা ?"

"আমি সুভদ্রা নামে এক দরিদ্র কন্যাকে বিবাহ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি।"

"কে সে সুভদ্রা ?—কাহার কন্যা ?"

সদানন্দ চিন্তিতভাবে বলিল—"তাহা আমি জানি না; তবে সে ক্ষত্রিয়কন্যা। আর বোধ হয় এখন পরিখার বাঁধা ঘাটে গেলে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।—সে এই কথা বলিয়াছে।"

"তাহার সহিত তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

"বুড়া-রাজার মন্দিরে।"

"সে দেখিতে কেমন ?"

"এমন রূপ আমি কখনও দেখি নাই।"

তখন কৌতূহলী হইয়া রাজকুমার সদানন্দের সহিত সেই বাঁধাঘাটের দিকে চলিলেন। দূর হইতে তাঁহারা দেখিলেন, একটি কিশোরী ঘাটের উপর বসিয়া পা-দুখানি জলে ডুবাইয়া বসিয়া আছে; আর পরিখার জলে রাজ হংসগুলি সাঁতার দিতেছে, তাহাই উল্লাসের সহিত দেখিতেছে। নিকটে যাইয়া সদানন্দ দেখাইয়া দিল, "এই সেই কিশোরী।" অরিন্দম দেখিলেন, তাঁহার ভগিনী বিদগ্ধা অতি সামান্যবেশে বসিয়া আছে।

সদানন্দের সহিত রাজকুমারকে দেখিয়া বিদগ্ধা লজ্জায় মুখ অবনত করিল। অরিন্দম হাসিতে হাসিতে তাহার চিবুক ধরিয়া সেই লজ্জাহর্ষমাখা মুখখানি তুলিলেন; কৌতুকের স্বরে বলিলেন, "কিরে, তুই সুভদ্রা হলি কবে হতে?"

বিদগ্ধা, কৃত্রিম ক্রোধের সহিত, সদানন্দকে বলিল,—"যাও, আর কাউকে বুঝি সঙ্গে আনতে বলেছিলাম?"

বিস্মিত সদানন্দ তখন কতক বুঝিতে পারিল। কৌতূহলী হইয়া রাজাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকৌতুকহাস্যে রাজকুমার বলিলেন—"বাবা! সুভদ্রাকে দেখবেন, আসুন।"

তখন অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত-রশ্মিতে কিশোরীর অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সদানন্দের হস্তে বিদগ্ধার কম্পিত হস্ত সংযুক্ত করিয়া, রাজা হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন—"সদানন্দ, আজ রাজকন্যা বিদগ্ধাকে তুমি দরিদ্রকন্যা সুভদ্রা বলিয়াই গ্রহণ কর। আজ হইতে, গোত্রত্যাগের সহিত সে নামও ত্যাগ করিল।" সদানন্দ ও সুভদ্রা, তখন উল্লাসে অধীর হইয়া, রাজার চরণে প্রণিপাত করিল। দূরে রাজপুরীমধ্যে তখন মধুর বাদ্য বাজিয়া উঠিল!

শক্তি পূজা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ.]

এসেছে মায়ের পূজা, বেজেছে বোধন-বাঁশী;
নিয়ে আয় দুখের রোদন; নিয়ে আয় সুখের হাসি;
নিয়ে আয় মঙ্গল ঘট, শঙ্খধ্বনি, গন্ধ ধূপের;
নিয়ে আয় খর্পর মা'র, খড়্গ বলির, কাষ্ঠ যূপের;
নিয়ে আয় বিল্বেরি দল; নিয়ে আয় রক্তকমল;
ছুটে আয় হিন্দু—ওরে ছুটে আয় বঙ্গবাসী!
এসেছে মায়ের পূজা, বেজেছে বোধন-বাঁশী।
এসেছে দীপ্ত অসুর, রক্ত দশন, শঙ্কা ভীতি!
এসেছে শঙ্কাহরণ বরাভয় ও ভক্তি-প্রীতি।
এলোরে স্নেহের বোধন; এলোরে মিলন-রোদন,
শৌর্য্যেরি উগ্রতাতে মিশলো দয়া—মিশলো আসি।
এসেছে মায়ের পূজা, বেজেছে বোধন-বাঁশী!
নিয়ে আয় বলির পশু, জবার মালা শোণিত-সিদূঁর;
নিয়ে আয় দান ও দয়া, ক্ষেম ও ক্ষমা, ভক্তি হিদূঁর;
নিয়ে আয় নৃত্য বীরের নিয়ে আয় ধৈর্য্য ধীরের;
আমাদের ব্যর্থজীবন সার্থক হ'ক স্বার্থ নাশি'—
এসেছে মায়ের পূজা, বেজেছে বোধন-বাঁশী।
এলোরে মহাষ্টমীর রুদ্র নটন, হুলাহুলি,—
বিজয়ার প্রণয়ভরা, আপনকরা কোলাকুলি।
এলো মা ভয়ঙ্করী; এলো মা শুভঙ্করী;
মা নামের কোমলভাবে ডুব্‌লো শ্যামার অট্টহাসি
এসেছে মায়ের পূজা, বেজেছে বোধন-বাঁশী।
ধরাতে কোথায় বল হিন্দুসাধক-শাক্ত ছাড়া—
ভক্তিরে শক্তিসনে মিশিয়ে দেছে এমন ধারা!
বীভৎস কোথায় জিত—শান্ততে হয় নিমজ্জিত—
শোণিতের তপ্তধারা শান্তিজলে যায় রে ভাসি'!
এসেছে মায়ের পূজা; ছুটে আয় বঙ্গবাসী!

ঔরঙ্গজেব *

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার বহু বর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ইংরেজিতে লিখিত ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যদুবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসি নাই—সে স্পর্দ্ধাও রাখি না। ইহাতে কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—মাত্র তাহারই একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস বলিতে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের একাদিক্রমে ৬০ বৎসরের ইতিহাস বুঝায়। ঔরঙ্গজেব সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগ (১৬৫৮-১৭০৭) পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে মোগলসাম্রাজ্যের যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যের আয়তন অশোক, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগলসাম্রাজ্যের অবনতির ভাবী লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের সময়েই ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে।

হিন্দুযুগের ইতিহাস-রচনা করিতে গেলে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপাদানের যে পরিমাণে অভাব অনুভূত হয়, মুসলমানযুগের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে তাদৃশ অভাব পরিলক্ষিত হয় না। পার্শীভাষায় লিখিত উপাদানসমূহ হইতে 'আরোহ-পদ্ধতি' (Inductive method) ক্রমে সুন্দররূপে যে ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে, যদুবাবুর নবপ্রকাশিত পুস্তক হইতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিলাতী উপাদানের উদ্গার নহে। ইহা, প্রধানতঃ, পারস্যভাষা হইতে গৃহীত উপাদানাবলী অবলম্বনে রচিত। যাঁহারা এতদিন Dow, Elphinstone,
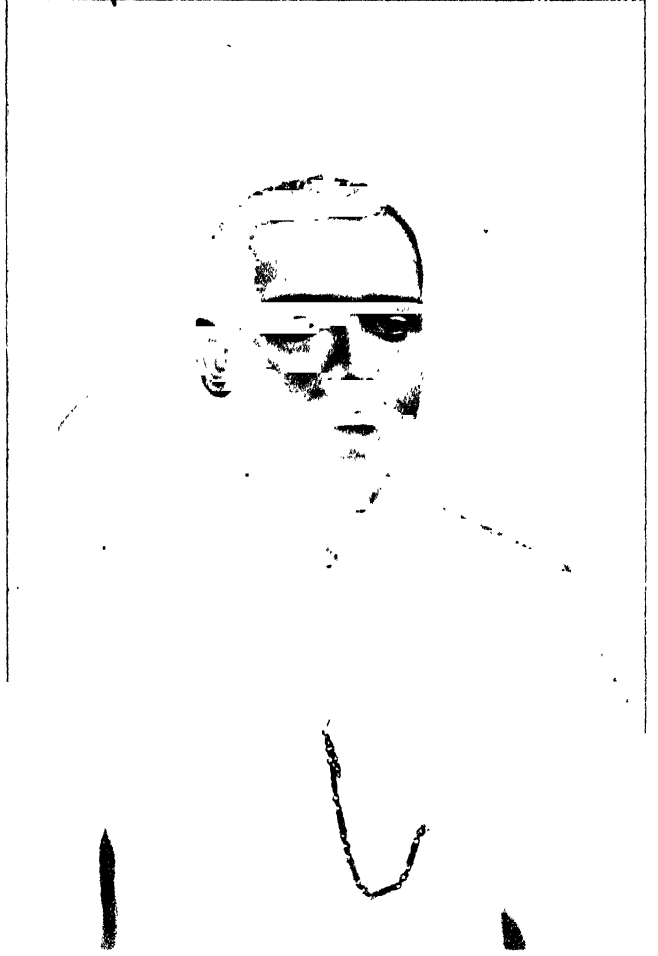
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

Lanepoole প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বুঝিবেন, এতকাল তাঁহারা ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে যাহা পাঠ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিতান্তই

---

* মূল্য প্রতি খণ্ড ৩৷৹ টাকা। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অকিঞ্চিৎকর—অধিকাংশস্থলে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। উহাদের বিবরণ হইতে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবকে সম্পূর্ণরূপে চিনিবার উপায় নাই।

অধ্যাপক যদুবাবু এই গ্রন্থখানি রচনা করিতে যেসকল উপাদানের সাহায্য লইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী, সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

(১) সম্রাটের অনুমোদিত বিবরণ

Official Annals.

যথা,—'পাদিশানামা', 'আলমগিরনামা', প্রভৃতি। এই শ্রেণীর ইতিহাস, প্রধানতঃ রাজকীয় কাগজপত্রাদি হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে রাজা-সংক্রান্ত কোনরূপ অসম্ভ্রম কথা প্রকাশ পাইতে পারিত না; কারণ, সম্রাট্ স্বয়ং এই সকল গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন আদি করিয়া দিতেন। এগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। এইরূপ ইতিহাসের সাহায্যে ঘটনাবলীর কাল ও ভৌগোলিক বিবরণ যথাসম্ভব অবগত হইতে পারা যায়। 'মাসির ই আলমগিরি'ও সরকারী কাগজপত্রাদি হইতে সঙ্কলিত। ইহা ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রচিত হয়; কাজেই গ্রন্থকার ইহাতে অনেক যথাযথ সংবাদ দিতে পারিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থখানি বড়ই সংক্ষিপ্ত।

(২) বে-সরকারী ইতিহাস—

Private History.

এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মামুন, অকীল খাঁ ও কাফি খাঁর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ, রাজকর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক রচিত হইলেও, সম্রাটের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য রচিত হয় নাই; পরন্তু এই ইতিহাস সমূহের মধ্যে রাজা-সংক্রান্ত নানা গুপ্তসংবাদ পাওয়া যায়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত 'মাসির-উল-উম্‌রা'ও এই শ্রেণীর ইতিহাস। পারসীভাষায় হিন্দুর রচিত, ঔরঙ্গজেবের শাসন-কালের দুইখানি ইতিহাস আছে। প্রথমখানি—ভীমসেন বুরহানপুরীর 'নস্‌খা-ই-দিলকাসা'। গ্রন্থকার দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী, তাঁহার গ্রন্থ হইতে দাক্ষিণাত্য-ব্যাপারের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয়খানি—ঈশরদাস নগর-রচিত, নাম—'ফতুহাৎ-ই আলমগিরি'। ইহা হইতে রাজপুতঘটিত বহু জ্ঞাতব্য বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

(৩) খণ্ডচিত্র—Monograph.

এই শ্রেণীর সন্দর্ভ কোন বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া রচিত; যথা, নিয়ামৎ আলিখাঁর 'গোলকুণ্ডা অবরোধের বিবরণ;' সিয়াবুদ্দীন তালিসের 'কুচবিহার, আসাম ও চট্টগ্রাম-বিজয়ের রোজনামচা।' গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের স্বতন্ত্র বিবরণ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের তরফ হইতে শিবাজী, সম্ভাজী, রাজারাম প্রভৃতির বিবরণও পাওয়া যায়।

(৪) ঔরঙ্গজেবের স্বহস্তলিখিত পত্রাদি

উপরে যে সমস্ত উপাদানের কথা বলিয়াছি, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহার মূল্য অধিক। সুখের বিষয়, যদুবাবু এইরূপ ২০০০ পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি হইতে তিনি শুধু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রারম্ভ ও শেষভাগের ঘটনা-বলীর বিবরণ পাইয়াছেন; মধ্যের প্রায় ৩০ বৎসরের ঘটনা সম্বলিত পত্রগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বিদেশী পর্য্যাটক্ টেভার্নিয়ার, বার্ণিয়ার ও মানুষী ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের গ্রন্থ হইতে তাৎকালীন দেশের অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্যাবলীর সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহারা ভারতের রাজনীতি বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা জনশ্রুতিমূলক। এজন্য যদু-বাবুকে অধিকাংশস্থলেই ইঁহাদের বিবরণ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কেবল যাহাকিছু তাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বা যেসমস্ত ঘটনায় তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, মাত্র সেগুলির বিবরণ যদুবাবু গ্রহণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি রচনা করিতে যদুবাবুকে যে কেবল বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা নহে;—তাঁহাকে বহু অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছে। অক্সফোর্ডের Bodleian Library, প্যারিসের Bibliotheque Nationale, British Museum প্রভৃতি হইতে বহু অর্থব্যয়ে তাঁহাকে 'Rotary Bromide Print'এর সহায়তায় বহু পাণ্ডুলিপির নকল আনাইতে হইয়াছে। অধিকন্তু পাটনার সুবিখ্যাত

'খোদাবক্স লাইব্রেরী' হইতেও তিনি নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সহায়তা পাইয়াছেন।

যদুবাবুর 'ঔরঙ্গজেবে'র মাত্র দুইখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ঔরঙ্গজেবের বাল্যজীবন হইতে সিংহাসনলাভ পর্য্যন্ত ঘটনামালা নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইতিহাস ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি গ্রন্থের লেখক আমাদের স্বদেশবাসী বলিয়া আমরা শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। যদুবাবু ইংরেজিতে গ্রন্থখানি রচনা করায়, পাশ্চাত্য সুধী-সমাজে ইহা সম্যক্ আদৃত হইয়াছে। আজ এই উৎকৃষ্ট ইতিহাসখানি বাঙ্গালায় রচিত হইলে, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ইহা ইংরেজিতে অনূদিত হইত এবং আমরা মনে করি, বোধ হয় এই একখানি গ্রন্থের জন্য য়ুরোপকে বঙ্গ-সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। দুইখণ্ড 'ঔরঙ্গজেবে' বর্ণিত বিষয়াবলীর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম —

ঔরঙ্গজেবের বাল্যজীবন

সম্রাট্ শাহ্‌জহানের তৃতীয় পুত্র, মহিউদ্দীন ঔরঙ্গজেব সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের গর্ভজাত। মালিক অম্বরের বিদ্রোহ দমন করিয়া জাহাঙ্গীর যখন শাহ্‌জহান ও তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া গুজরাট হইতে আগ্রায় ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে উজ্জয়িনীর পথে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পঞ্চমহল তালুকের অন্তর্গত দোহাদ্ নামক স্থানে, ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের ২৪এ অক্টোবর ঔরঙ্গজেবের জন্ম হয়। শৈশবে ঔরঙ্গজেব পিতার চেষ্টায় সুশিক্ষা এবং আরবী ও পারসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাল্য-জীবনের একটী ঘটনা হইতে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আগ্রা-দুর্গের বহির্ভাগে, যমুনাতীরে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মে তারিখে সম্রাট্ **হাতীর লড়াই** দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি হস্তী পলায়ন করিল—বিজয়ী হস্তিটী ঔরঙ্গজেব যেখানে অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই-দিকে ধাবিত হইল। ঔরঙ্গজেব পলায়ন না করিয়া তাঁহার বর্শা দ্বারা হস্তীর কপোলদেশে সবেগে আঘাত করিলেন। মত্ত হস্তী তাহার শুণ্ডপ্রভাবে ঔরঙ্গজেবের অশ্বকে ধরাশায়ী করিল; কিন্তু ঔরঙ্গজেব যথাসময়ে অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পুনরায় তাহার সম্মুখীন হইলেন। এই সময়ে লোকজন আসিয়া পড়িল—হস্তী পলায়ন করিল—ঔরঙ্গজেব রক্ষা পাইলেন। শাহ্‌জহান পুত্রের এই অসমসাহসিকতার পরিচয় পাইয়া, তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত ও 'বাহাদুর' (অর্থাৎ বীর) উপাধি প্রদান করেন।

ষোড়শবর্ষ বয়স্ক ঔরঙ্গজেব ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর সম্রাটের সৈন্যদলে দশ হাজার অশ্বারোহীর নেতৃত্ব লাভ করিলেন। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে উরচার বুন্দেলা সর্দ্দার জুজর সিং ও তাহার পুত্র বিক্রমজিতের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হয়, তাহার সহিত যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবও গমন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সম্রাট-পক্ষীয় সৈন্যগণের জয়লাভ হয়।

১৬৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই হইতে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মে পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেব **দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা** নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বহুবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রথমবার দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে ঔরঙ্গজেব বগলানা জয় ও অহমদনগরের নিজামশাহী বংশের আমূল উচ্ছেদ সাধন করেন; এই কার্য্যের দ্বারা তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব শা-নওয়াজ খাঁর কন্যা, দিলরাস বানুর সহিত সর্ব্বপ্রথমে বিবাহিত হ'ন (৮ই মে ১৬৩৭), পরে নবাববাইকে বিবাহ করেন; তবে কোন্ সময়ে এই বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ঔরঙ্গজেবের পুত্রকন্যার মধ্যে জেবুন্নিসাই সর্ব্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করেন (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৮)।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সম্রাটের প্রিয় কন্যা জঁহানারা অগ্নিদাহে শয্যাশায়িনী হ'ন। ভগিনীকে দেখিবার জন্য ঔরঙ্গজেব মে মাসে আগ্রায় গমন করেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে হঠাৎ তিনি পদচ্যুত হ'ন; এমন কি তাঁহার বৃত্তি পর্য্যন্ত সম্রাট্ বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার এই পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কিন্তু জঁহানারাকে লিখিত ঔরঙ্গজেবের একখানি পত্র হইতে ইহার কারণ জানা যায়। যাহা হউক অরোগ্যলাভের পর জঁহানারা পিতাকে অনুরোধ করিয়া ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঔরঙ্গজেবের উপর গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার অর্পিত হয়। ঔরঙ্গজেবের

স্নানার্থিনী।

কঠিন শাসনে রাজ্যে কোন আইনবিরুদ্ধ কাজ হইবার উপায় ছিল না। সম্রাট্ পুত্রের শাসনকার্য্যে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

দুই বৎসর পরে ঔরঙ্গজেবকে গুজরাট ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের শৈশবের লীলাভূমি বল্ক ও বদক্‌সান্ উদ্ধারার্থ **মধ্য এসিয়ায়** গমন করিতে হয়। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল কাবুল ত্যাগ করিয়া তিনি ২৫এ মে তারিখে বল্কে উপস্থিত হইয়া, প্রবলপরাক্রমে ভীষণ শত্রুর সম্মুখীন হ'ন। মোগলপক্ষীয় বহুরাজপুত এই যুদ্ধে জীবনদান করিল—বহু অর্থ, খাদ্যদ্রব্য ব্যয়িত হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। পিপীলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় অগণন শত্রু মোগলসৈন্যের চতুর্দ্দিকে তাহা একেবারে নির্ম্মূল করা সময়সাপেক্ষ। এদিক শীতঋতু আগতপ্রায়; কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ফলে ভারতীয় বহু ক্রোর মুদ্রা বৃথায় ব্যয়িত হইয়া গেল।

বল্ক হইতে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর ঔরঙ্গজেব কাবুলে প্রত্যাগমন করেন ও পরে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ হইতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত মুলতানের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ঔরঙ্গজেবের উপর টাট্টা বা সিন্ধুপ্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়।

এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে দুইবার **কান্দাহার অবরোধে** গমন করিতে হইয়াছিল (১৬ই মে হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৬৪৯ এবং ২রা মে হইতে ৯ই জুলাই ১৬৫২)। পারসিকেরা এই কান্দাহার দুর্গ শাহ্‌জহানের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল; কিন্তু ইহার পুনরুদ্ধারকল্পে ঔরঙ্গজেবের দুইবার, ও পরবর্ত্তী কালে দারার একবার, চেষ্টা (২৮এ এপ্রিল ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৬৫৩) ফলবতী হয় নাই।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই ঔরঙ্গজেব **দ্বিতীয়-বার দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা** নিযুক্ত হ'ন। এইসময় হইতেই তাঁহার কিশোরজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার আরম্ভ। ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে জুলিয়াস্ সিজারের নিকট Gaul যেরূপ শিক্ষাস্থল হইয়াছিল, ঔরঙ্গজেবের নিকট দক্ষিণাত্যও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। “আদব-ই-আলমগিরিতে” রক্ষিত বহুশত পত্র হইতে, পরবর্ত্তী ছয় বৎসর ঔরঙ্গজেব কিরূপে উপর্য্যুপরি অর্থাভাব হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন—কেমন করিয়া তিনি এক-দল সুদক্ষ কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিয়াছিলেন—কেমন করিয়া তিনি রাজ্যে শান্তি রক্ষা করিয়া, নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন, এই সমস্ত আবশ্যক সংবাদ জানা যায়। নিয়মিত সৈন্যাদি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে তিনি সৈন্যদলকে বিশেষ সুব্যবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, তৎকালে তিনি অশ্বারোহণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই কারণে পরবর্ত্তী ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জহানের পুত্রগণের মধ্যে যখন সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ঔরঙ্গজেব যে কিরূপ বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছিল।

ঠিক এই সময়ে **হীরা বাইয়ের (জৈনা-বাদী)** রূপলহরী ঔরঙ্গজেবের প্রাণে তুফানের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি বেগমকে এক উদ্যানে বেড়াইতে দেখিয়া মুগ্ধ হ'ন ও পরে মাতৃস্বসার অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে লাভ করেন। প্রেমে আত্মবিস্মৃত ঔরঙ্গজেব তাঁহার এরূপ বশীভূত হইয়া পড়েন যে, একদিন বেগমের অনুরোধে তিনি মদ্যপান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! অল্পদিন পরেই জৈনাবাদীর মৃত্যু হয় (অনুমান ১৬৫৪)।

ঔরঙ্গজেব বহুদিন হইতেই সমৃদ্ধিশালী গোলকুণ্ডা অধিকার করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। বহু ষড়্‌যন্ত্রের পর ও নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া তিনি গোলকুণ্ডা-রাজের উজীর মীরজুম্লাকে (মহম্মদ সৈয়দ) হস্তগত করিলেন। মীরজুম্লা একজন বিশেষ পারদর্শী ও ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের কথায় সম্রাট্ তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্মচারিদলভুক্ত করিয়া লন। মীরজুম্লা গোলকুণ্ডা ত্যাগ করিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার পুত্রপরিবারবর্গ গোল-কুণ্ডা-রাজ-কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইল ও তাঁহার সম্পত্তি রাজ-কোষভুক্ত হইল।

গোলকুণ্ডারাজকে মীরজুম্লার পরিবারবর্গকে মুক্তি দিতে বাধ্য করিবার জন্য, ঔরঙ্গজেব হঠাৎ **হায়দ্রাবাদ** আক্রমণ করিলেন (১৬৫৬, জানুয়ারী—এপ্রিল); রাজা গোলকুণ্ডায় পলায়ন করিলেন; পরে বহু অর্থব্যয়ে ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। মীরজুম্লা ২০এ মার্চ্চ তারিখে ঔরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হ'ন; কিছুদিন পরে তাঁহাকে দিল্লীতে সম্রাটের

নিকট গমন করিতে হয় ও তথায় তাঁহার উজীরের পদলাভ ঘটে (৭ই জুলাই)। তৎপরে, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী, ঔরঙ্গজেবের সহায়তার জন্য মীরজুম্লা দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হ'ন।

গোলকুণ্ডা অক্রমণের এক বৎসর পরে, ও বিজাপুররাজ মহম্মদ আদিল শাহ্‌র মৃত্যু হইলে, ঔরঙ্গজেব পিতার আদেশে **বিজাপুর** আক্রমণ (জানুয়ারী ১৬৫৭) এবং বিদর ও কালিয়ানীর দুর্গ অবরোধ করেন (২৯এ মার্চ্চ, ও ১লা আগষ্ট)। যখন তিনি সেই প্রদেশের বহু অংশ অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, সেই সময়ে সহসা, যেন কাহার অদৃশ্য করস্পর্শে, সমস্ত ব্যাপারের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

সম্রাট্ শাহ্‌জহান এখন ৬৬ বৎসরে উপনীত হইয়াছেন। দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ও ভাবী সম্রাট্, দারা প্রায় সমস্ত রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দারা, পিতাকে বুঝাইয়া, বিজাপুর-অভিযানে ঔরঙ্গজেবকে যে সৈন্য সাহায্য করা হইয়াছিল, তাহা ফেরৎ পাঠাইবার জন্য ঔরঙ্গজেবকে সম্রাটের আদেশ পাঠাইলেন; কারণ, বিজাপুর-রাজ এখন সম্রাটের অনুগ্রহপ্রার্থী এবং ক্ষতিপূরণার্থ বহু অর্থ, এমন কি তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ, দিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। ঔরঙ্গজেব তখন বিজয় গৌরবে উল্লসিত;—অকস্মাৎ এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে অবসাদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

সিংহাসন অধিকারে যুদ্ধ

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সম্রাট্ শাহ্‌জহান দিল্লীতে বিষম পীড়াক্রান্ত হইলেন। দারা, দিবারাত্র অক্লান্ত পরিচর্য্যা করিয়া, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তিনি কিন্তু ভবিষ্যতে সিংহাসন লাভের পথ সুদৃঢ় করিতেও বিস্মৃত হ'ন নাই। যাহাতে ভ্রাতারা রাজ্য-সংক্রান্ত কোনরূপ সংবাদ না পায়, তাহার জন্য তিনি বিশেষরূপে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু, ইহার ফলে, এক ভীষণ অনিষ্টের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্র জনরব উঠিল, সম্রাট্ নিশ্চয়ই আর ইহজগতে নাই। বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মচারীরা সকলেই মণিমাণিক্য-খচিত ময়ুর-সিংহাসনের দিকে লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিলেন। মুরাদ ও সুজা, যথাক্রমে গুজরাট ও বাঙ্গালায়, প্রকাশ্যভাবে রাজ-মুকুট গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন ভীষণ দুর্ভাবনায় অতিবাহিত করিবার পর, ঔরঙ্গজেবের মস্তিষ্ক হইতে এক নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইল। তিনি দারাকে বিধর্ম্মী বলিয়া প্রচার করিলেন এবং, তাহার হস্ত হইতে রাজ্য উদ্ধার করিবার ছলে, মুরাদের শরণাপন্ন হইলেন। ঔরঙ্গজেব, কোরাণ স্পর্শ করিয়া, মুরাদকে পঞ্জাব হইতে পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত মোগলরাজ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন।

এদিকে দারা, সুজাকে বাধা দিবার জন্য, একদল সৈন্য স্বীয় পুত্র সুলেমান শেকো ও মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহের অধীনে, এবং মুরাদ ও ঔরঙ্গজেবকে বাধা দিবার জন্য, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁর অধীনে, অপর একদল পাঠাইলেন। প্রথম দল বারাণসীর অপরপারে বাহাদুরপুরে, সুজাকে পরাস্ত করিয়া (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৬৫৮) মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল; কিন্তু দিপালপুরের বহির্ভাগে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ, উভয়ে মিলিত হইয়া, ভীষণ যুদ্ধের পর উজ্জয়িনীর ১৪ মাইল দক্ষিণে **ধরমাটের** যুদ্ধে (১৫ই এপ্রিল, ১৬৫৮) যশোবন্ত সিংহের সৈন্যকে নিষ্পেষিত করিলেন। দারা অবিলম্বে পুত্রকে বাঙ্গালা হইতে ফিরিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। দারার প্রধান ভুল হইয়াছিল—সৈন্য বিভাগ করিয়া দেওয়া। সুলেমান বিলম্বে সুদূর বিহার হইতে যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন পিতাকে সাহায্য করা ত দূরের কথা, নিজেকে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল।

উজ্জয়িনী হইতে বিজয়ী ভ্রাতৃদ্বয় রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আগ্রার ১০ মাইল উত্তরে, **সামুগরের** নিকট, **দারা** অপর একদল সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রমে তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন (২৯এ মে); কিন্তু ভাগ্যে তাঁহার **পরাজয়** ঘটিল। তিনি আগ্রা হইতে দিল্লী ও পরে পঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন করেন। ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আগ্রায় পৌছিয়া, পিতার যমুনা হইতে পানীয় জল বন্ধ করিয়া দিয়া, তাঁহাকে দুর্গ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করাইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহাকে হারেমে বন্দী করিয়া রাখেন। অতঃপর বিশ্বাসঘাতক ঔরঙ্গজেব মথুরায় এক ভোজে ভ্রাতা

মুরাদকে বন্দী করিয়া (২৫এ জুন) দিল্লীতে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন (২১এ জুলাই, ১৬৫৮)।

দারাকে বন্দী করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব অবিলম্বে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দারা পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ পর্য্যন্ত বহুকষ্টে গমন করিয়া পরে গুজরাটে পলায়ন করেন। তিনি দ্বিতীয়বার একদল সৈন্যসংগ্রহ করেন; কিন্তু আজমীরের নিকট পুনরায় তাঁহার পরাজয় ঘটে (১৪ই মার্চ্চ, ১৬৫৯)। অবশেষে দারা বুলনপাশের নিকট দাদর প্রদেশে উপস্থিত হইলে, তথাকার অধিনায়ক তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজেবের হস্তে অর্পণ করেন। **শৃঙ্খলাবদ্ধ দারাকে** অবমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য প্রকাশ্য-স্থান দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ঔরঙ্গজেব মোল্লাদের নিকট দারাকে বিধর্ম্মী প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে দারার মৃত্যুর আদেশ গ্রহণ করিলেন। পরে ঔরঙ্গজেবের একজন অনুচর দারাকে **হত্যা** করে (৩০এ আগষ্ট, ১৬৫৯)। মুরাদ বহুদিন পূর্ব্বে আমেদাবাদে আলি নকী নামে একজন লোককে হত্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আলি নকীর পুত্র, ঔরঙ্গজেবের পরামর্শে, রাজদরবারে পিতৃ-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিল। ঔরঙ্গজেবের নির্দ্দেশমত কাজির বিচারে গোয়ালিয়র কারাগৃহে **মুরাদের মস্তকোচ্ছেদন** করা হইল (৪ঠা ডিসেম্বর,১৬৬১)। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান শেকোকেও গোয়ালিয়র কারা-গৃহে গোপনে হত্যা করা হয়।

এদিকে সুজা পুনরায় একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসন লাভের আশায় এলাহাবাদ অতিক্রম করিলেন; কিন্তু **খাজোয়ার** যুদ্ধে (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৬৫৯) তাঁহার সৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হইল। সুজা দুই বৎসর কাল নানাস্থানে পরাজিত হইয়া অবশেষে **আরাকানে** গমন করেন (৬ই মে, ১৬৬০); কিন্তু তথায় আশ্রয়দাতা ব্রহ্ম-সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের অপরাধে তিনি সপরিবারে ধ্বংস হ'ন।

এইরূপে রাজ্যের সমস্ত কণ্টক একে একে উৎপাটিত করিয়া, ঔরঙ্গজেব ভারতের একছত্র সম্রাট্ হইলেন।

এইবার আমি ইতিহাস-রচনার প্রণালীসম্বন্ধে গুটি কয়েক আবশ্যক কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে যদুবাবু বর্দ্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনে অধিকাংশ কথাই আলোচনা করিয়াছেন; তথাপি এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি যতই আলোচিত হয়, ততই মঙ্গলের আশা করা যায়।

ইতিহাস-রচনার প্রণালী

পুরাতন যুগের সত্য উদ্ধার করা যদি ইতিহাসের উদ্দেশ্য হয়, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(১) প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা, ঐতিহাসিকের প্রথম কার্য্য; প্রথমে বর্ণিতব্য ঘটনার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে, সাক্ষীটি ইহা স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছে,না পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে। মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ বিজড়িত আছে কি না।

(২) সামসময়িক লেখক না পাইলে, ঘটনার যত নিকটবর্ত্তী সাক্ষী পাওয়া যায়, ততই ভাল।

(৩) আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুচিত। যেস্থানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলিবে না, সেরূপ স্থলে সর্ব্বশেষে রচিত বিশুদ্ধ অনুবাদ অবলম্বন করাই শ্রেয়। উদাহরণস্বরূপ আর্ভিন্-অনূদিত মূল্যবান্ টীকাটিপ্পনী সম্বলিত মানুষীর বিশুদ্ধ অনুবাদ Storia do Mogorএর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা বাহির হইবার পর Catrou কর্ত্তৃক প্রকাশিত মানুষী ও তদবলম্বনে লিখিত Orme's Fragments, Tod ও Wheeler একেবারে খেলো হইয়া পড়িয়াছেন। তবুও ভুলিয়া আমরা কেহ Storia দেখি না!

(৪) বাধ্য হইয়া অনুবাদ ব্যবহার করিলেও, 'কোটে-শনে'র কোটেশন্ ব্যবহার করা উচিত নহে। যাঁহার মত উল্লেখ করা হয়, তিনি ঠিক সেই কথাগুলি বলিয়াছেন কি না, তাহা ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। এই জন্যই ইংরেজিতে বলে, 'Always verify your references.'

(৫) প্রত্যেক ঐতিহাসিকের বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণ-পঞ্জী দেওয়া উচিত। ইতিহাসে বর্জ্জইস অক্ষরে প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া, তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের

নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক, প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

(৮) ইতিহাস-লেখক ব্যক্তিগত ভ্রমসংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর বিভিন্ন দিক্ হইতে আলোকপাত করিতে হইবে। শত্রুপক্ষ কি বলিয়াছে, মিত্রপক্ষ কি বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী কিরূপ দেখিয়াছে, স্বদেশী কবি কিরূপ সাক্ষী দিয়াছে---এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত ঘটনার স্বরূপ জানা যায়।

(৯) কোন প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে Bibliography of authorities classified according to credibility লিপিবদ্ধ বা সংগ্রহ করিয়া রচনায় হাত দিলে ভ্রমের সংখ্যা কম হয়।

বিলাতের Scientific School of History অথবা Critical School of History নিম্নরূপ প্রণালীতে চলেন :—

প্রথমতঃ বিষয়টী সম্বন্ধে যাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থের তালিকা করিয়া প্রাচীনতম ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য লেখকগুলির মত গ্রহণ করেন এবং যদি কোন কারণে এইসব লোকেদের মধ্যে কাহারও মত-বিশেষ বিশ্বাসের অযোগ্য হয়, তবে তাহার যুক্তি দিয়া পরবর্ত্তী যুগের কোন সাক্ষীর মত [অথবা নিজের স্বাধীন মত] তৎস্থানে স্থাপিত করেন। পরবর্ত্তী যুগের ভ্রান্তমত যেমন হুইলরের—কচিৎ কদাচিৎ উল্লেখ করা হয়; কিন্তু তাহা টীকায় ঘৃণার সহিত খণ্ডন করিবার জন্য মাত্র।

এইরূপে বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস-রচনায় যিনি হাত দিবেন, তাঁহার রচনার মূল্য স্থায়ী হইবেই হইবে; এবং যিনিই এই আপাতঃ অপ্রীতিকর শ্রম স্বীকার করিবেন, তিনিই দেখিবেন, ক্রমেই শ্রমের পরিমাণ লাঘব হইয়া আসিবে; অবশেষে তিনি নিজেই, Authorities-দিগের মূল্য সমালোচনা করিয়া, প্রামাণিক গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

অধ্যাপক যদুবাবু এই Critical method অবলম্বন করিয়া "ঔরঙ্গজেব" রচনা করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার গ্রন্থখানি ইতিহাস-জগতের Monumentস্বরূপ হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যদুবাবুর "ঔরঙ্গজেব" মোগলশাসনকালের ইতিহাসের একটী প্রধান Authority—ইহা বাদ দিয়া ঐ যুগের ইতিহাস-রচনায় হাত দিলে, সে পুস্তকের অঙ্গহানি হইবেই হইবে।

প্রত্যেক ঐতিহাসিকের এই মূলসূত্র (Motto) হওয়া উচিত—

"সত্য-প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক—সাধারণের গৃহীত হউক, বা প্রচলিত মতের বিরোধী হউক—তাহা ভাবিব না; —আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর নাই করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না;—সত্যপ্রচার করিবার জন্য, সমাজ, বা বন্ধুবর্গের উপহাস ও লাঞ্ছনা সহিব, তাহাও স্বীকার, তবু সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব।"

মা

[রাজা শ্রীসতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর]

মা-বলে, মা, ডাকলে তোরে
কত আয়েস হয়, মা, প্রাণে;
ডাকার মত যে ডেকেছে,
সে সুখ সুধু সেই, মা, জানে।
মায়ের মত মিষ্টি বুলি
নাই, মা, কোন অভিধানে;

তাই, মা, তোরে মা-বলেছে
আগম-নিগম— বেদ-পুরাণে!
তুই যে, মাগো, ত্রিতাপহরা—
ত্রিলোকবাসী সবাই জানে;
শমন-ভয়, মা, দূর করে দে
তোর চরণ-কমল-ছায়া দানে।

উত্তর-ব্রহ্মে—শাণরাজ্য

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেড়ায়গেরা বাগানের মধ্যে শাণদিগের বাসগৃহ, মরাই, আস্তাবল প্রভৃতি থাকে। বাটীতে প্রবেশ করিবার দরজা দুইটি; সম্মুখের সদর দরজাটি প্রধানতঃ রাস্তার ধারেই। সেই দরজা দিয়া সাধারণে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। পশ্চাতের খিড়কী-দরজা অতিক্রম করিয়া কোনও অপরিচিত ব্যক্তির অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; তাহাতে গ্রামদেবতা "পী নাং" রাগ করেন। তিনিই গৃহস্থদিগকে সমুদয় বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার ক্রোধ হইলে উদ্দৃক্ত ব্যাধি আসিয়া গ্রামবাসীকে আক্রমণ করে এবং সে বৎসর তাহাদের শস্যহানি হয়। অন্তঃপুরমধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যায়; সেইটিই গৃহস্থদের ঠাকুরঘর। প্রত্যহ তাঁহার পূজা এবং একপাত্র ভোগ দেওয়া বিধেয়। সঙ্কটকালে মোমবাতী (অর্থাৎ ধূপ), চন্দন, অন্ন, মদ্য প্রভৃতি উপচারে তাঁহার পূজা করিতে হয়।

শাণ-দেবতা পী নাং, বা গ্রাম-দেবতা

শাণরাজ্যে প্রচলিত চিকিৎসাদিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যকয়টি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—

এদেশে একমাত্র কবিরাজী চিকিৎসাই প্রচলিত। প্রত্যহ নিজ নিজ গৃহমধ্যে, ও সপ্তাহে একদিন, হাটবারে গাছতলায়, কবিরাজ মহাশয় হরিণের ছাল, বানরের ঘী, হরিতকীর আটি প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিজ্জ, এবং খনিজ, ও জীবজ উপকরণ লইয়া বসেন। হয়ত, কোনও বালিকা আসিয়া জানাইল—জঙ্গল হইতে পিঠে ঝোলা করিয়া কাঠ লইয়া আসিতে, হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়া, তাহার হাঁটু দুইটি কাটিয়া গিয়াছে; তাহার পিঠে ব্যথা ও জ্বর হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় খানিকটা ন্যাকড়া তৈলের হাঁড়ির মধ্যে ডুবাইয়া, রোগীর ক্ষতস্থানে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলেন। তৎপরে, খানিকটা গাছের ছাল তাহাকে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিয়া, ঔষধের মূল্য গ্রহণ করিলেন।

শাণেদের প্রেতাত্মা

পৃষ্ঠদেশে কালো দৈত্য ও বুকে লাল পরীর উল্কি আঁকা এক যুবক আসিয়া জানাইল, আট দিন পূর্ব্বে স্বপ্নে এক পরী

আসিয়া তাহাকে মরণের অভিসম্পাত করিয়াছে। পরদিন প্রাতেই মন্দিরে যাইয়া সে মণিবন্ধে সন্ন্যাসীর মন্ত্রঃপূত কবচ

শাণ দেবতা 'পিত্রন্', বা ইন্দ্র

পরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। অমুক খনিতে সে কাজ করিত, সেখানে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। ক্রমেই তাহার শরীর দুর্ব্বল হইতেছে। তাহার মাতা তাহাকে দৈবজ্ঞের কাছে যাইতে বলিলেও, মাতাকে বুঝাইয়া সে চিকিৎসকের কাছে আসিয়াছে। অবিলম্বে কবিরাজ মহাশয় এক পুরিয়া 'অম্লশূলান্তক-গণ্ডারখড়্গ-ভস্ম' হাঁড়িরমত কাঠের খলে, আড়াইকাঁচ্চা জলে মাড়িয়া যুবককে খাওয়াইয়া দিলেন। তিন দিন—অলাবু, বৃহতী, তেঁতুলপাতা, বোল্‌তার ডিম, মহিষের ভুঁড়ি ও ভাতের ফেণ-ভক্ষণ এবং রাত্রিকালে মদ্যপান ও নৃত্যগীত নিষিদ্ধ হইল!

এইরূপে তিনি নানাপ্রকার রোগের জন্য 'কুষ্মাণ্ডখণ্ড' 'শার্দ্দূলাস্থিচূর্ণ', 'বন্যবরাহাস্থ ঘৃত', 'মদমত্তমাতঙ্গদন্ত গুঁড়িকা', 'প্রস্তরভস্ম', এবং 'অজগর সালসা', অর্থাৎ সর্পের পিত্ত প্রভৃতি নানা বিচিত্র ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কবিরাজ মহাশয় অকৃতকার্য্য হইলে, চণ্ডু-নামান আবশ্যক হয়। যথাসময়ে গ্রামের বুড়ী অমুক—আসিয়া মদ খাইয়া দাওয়ার উপরে বসিল। একদল বাদ্যকর আসিয়া ঢাক-ঢোল-রামশিঙ্গা সহযোগে গ্রাম কাঁপাইয়া তুলিল। ক্রমে বুড়ীর উপর সম্পূর্ণরূপে চণ্ডুর ভর হইলে, পাগলের ন্যায় সে মাথা চালিতে লাগিল। এইবার সে যাহা বলিবে, তাহা দেবতার কথা। যথাকালে শোনা গেল, 'গৃহদেবতা রাগ করিয়াছেন; এই এই উপচারে তাঁহার পূজা করিতে হইবে।'—তৎপরে, দর্শনী লইয়া, বুড়ীর বিদায়গ্রহণ।

এক বাটীতে রোগী দেখিয়া পাড়ার পাঁচজনে সিদ্ধান্ত করিলেন, একাজ নিশ্চয়ই 'পীকার' অর্থাৎ ডাইনীর। বলা বাহুল্য, ওঝার ডাক পড়িল। ওঝামহাশয় আসিয়া প্রথমে রোগীকে মন্ত্রঃপূত করিলেন; তৎপরে, তাহাকে সজোরে বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। "বল্, কে তোকে এর ঘাড়ে চাপিয়েছে?" "বল্, নইলে এখুনি তোর শ্রাদ্ধ করবো!"—"দাওতো গা বাছা ঐ বল্লমটা এনে।"—"বল্‌বি না—বল্‌বি না?—কেমন, এইবার!"

শাণ-দেবতা 'ফিয়া য়েট্ সায়ান্', বা বিষ্ণু

যাতনায় অধীর হইয়া, রোগী গ্রামের একজনের না করিল।

"ক'টা মোষ তার?—বল্ শিগগির বল্‌চি!" পুনরা

বল্লমের আঘাত! "এঁ্যা—আচ্ছা! ক'টি শূয়োরের ছানা!" "তার কোন্‌মুখো ঢেঁকী!"—"ঠিক বল্‌চিস্‌তো?"—"বেশ ভাই!"—"আচ্ছা, যাও, বাপেরা প্রমাণ নিয়ে আসুন।"

শানেদের ধারণা নরকে পাপীর শাস্তি

'পুকে', অর্থাৎ গ্রামের মোড়ল, অন্যান্য পাঁচজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত, সাক্ষীস্বরূপ বসিয়া ছিলেন। প্রমাণ লইবার জন্য তাঁহারা উঠিলেন। অপরাধ প্রমাণ হইলে, গ্রামের শাসনকর্ত্তা 'সবওয়ার' কাছে নালিশ রুজু হইল। অপরাধী যথাযোগ্য দণ্ড পাইল।

কাহারও মৃত্যু হইলে, স্ত্রীলোকদিগের মর্ম্মভেদী রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য সকলকে শোকাভিভূত করিয়া তোলে। ক্রমে বুক বাঁধিয়া সকলে তাহার অন্তিম-কার্য্যে নিযুক্ত হয়। মৃতব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইলে, তাহার কবর হয়; নতুবা, সাধারণ ব্যক্তি হইলে, তাহাকে দাহ করা হয়। মৃত্যু আকস্মিক, অথবা সংক্রামক রোগজনিত, হইলে কবর দেওয়াই রীতি। কবরের পূর্ব্বে কয়েকমাসের জন্য শবটিকে তৈলসিক্ত করিয়া এবং তাহার মুখে সোণা অথবা রূপার মুখোস পরাইয়া—শবাধারে রক্ষা করা হয়। সেই কয়মাস মৃতের বাটীতে গ্রামের সকলে প্রত্যহ আসিয়া নৃত্যগীত, মল্লক্রীড়া, জুয়াখেলা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহাসমারোহে তাহার কবর হইয়া থাকে। শবদাহকালে চন্দনকাষ্ঠেরই চিতা প্রস্তুত হয়। শবদেহ ভস্মীভূত হইলে, ছাইগুলি প্রোথিত করিয়া, সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

গ্রামের মধ্যে দেখিলাম, কোথাও পরিষ্কৃত মাঠ, কোথাও আমবাগানের ঝোপ, কোথাও বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এদেশীয় লোকজন, মাচার মত বাটীগুলি ও দূরে পর্ব্বতশ্রেণী না থাকিলে, বাঙ্গালাদেশের পল্লী বলিয়া ভ্রম হইত। পথের ধারে গাছতলায় ক্ষুদ্র 'নাৎ'-মন্দিরগুলিও অনেকটা আমাদের ৺শীতলামন্দিরেরই মত। পুষ্করিণী এদেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; গৃহস্থেরা তৎপরিবর্ত্তে নদী, খাল, ঝরণা অথবা কূপ হইতেই জল লইয়া ব্যবহার করে।

দেখিলাম, কোনও প্রাঙ্গণে কতকগুলি কাঁচা মৃৎপাত্র শুখাইবার জন্য রাখা রহিয়াছে, কোনও গোশালায় ছেলে-কোলে করিয়া বৃদ্ধগৃহস্বামী মহিষকে জাব দিতেছেন, পার্শ্বে শূকরছানাগুলি খাবারের লোভে দাঁড়াইয়া আছে; কোন চালাঘরে শাণ সবতীরা ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভাণিতেছে; উঠানে বসিয়া বালকবালিকারা, মুরগী তাড়াইতে তাড়াইতে, চালুনি-সাহায্যে শস্য বাছিতেছে;—কোনও কামারশালায়, হাপরের পার্শ্বে, টুলের উপর বসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর শাণ-মিস্ত্রি ছাইএর মধ্যে তরবারী গুঁজিয়া শান দিতেছে;—কোন গৃহের বারান্দায় বৃদ্ধা কর্ত্রীঠাকুরাণী মাদুর বিছাইয়া রৌদ্রে
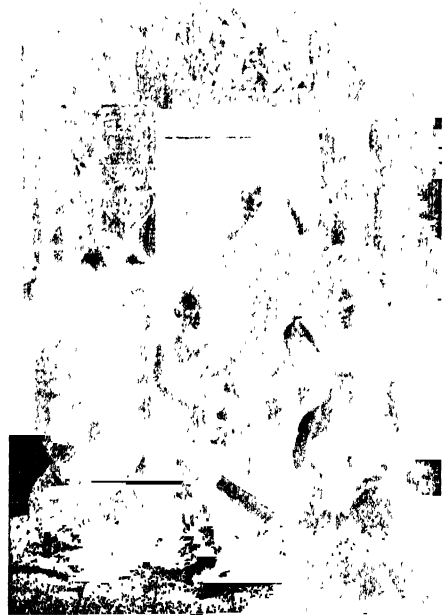
বৌদ্ধমন্দিরসংলগ্ন পাঠশালা

শুইয়া আছেন। বাটীর মধ্যে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই, রাস্তার উপরেও তেমন অধিকসংখ্যক লোকের যাতায়াত নাই!

একদিন বড় মজা হইয়াছিল—একটি সরু খালের উপরের সেতু অতিক্রম করিতেছি, এমনসময়ে কতকগুলি রমণীকণ্ঠের সমবেত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বলা-

সশিষ্য বৌদ্ধভিক্ষু

বাহুল্য, শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে চলিলাম! রাস্তার ধারে একটি বারান্দার মত ঘরে বসিয়া কয়েকজন প্রৌঢ় দাবা খেলিতেছিলেন; এই রোদনধ্বনি শুনিয়াও তাঁহারা কিন্তু উঠিলেন না! সন্দিগ্ধচিত্তে তুইটা রাস্তার সঙ্গমস্থলে একখানি বড় ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখি, 'ফুঙ্গী' গুরুমহাশয়ের পাঠশালে ডজনখানেক বালক তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া পাঠ হজম করিতেছে। নিস্তব্ধ পল্লীর মধ্যে বাঘ-তাড়ান স্বর এই বাছাদেরই!

কোচবক্সের ন্যায় ক্ষুদ্রটুলের উপর হেঁট হইয়া বসিয়া গুরুমহাশয় তন্দ্রানিমগ্ন। তাঁহার সম্মুখে বালকেরা তুইসারিতে বসিয়া 'আঙ্গ-আঙ্গের' সঙ্গে ধ্রুপদ সাধিতেছে। একটি বালকের দৃষ্টি আমার দিকে পড়িতেই বারোয়ারীর মণ্ডপমধ্যে, দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে উপবিষ্ট রাজন্যবর্গের ন্যায় সকলেই চুপ্!

দিবা তৃতীয়প্রহরে ইমনকল্যাণ স্থর তালের গুণে মাষ্টার মহাশয়ের নিদ্রার আবেশ হইয়াছিল। হঠাৎ কি রকম একটা ঠাণ্ডা হাওয়া-স্পর্শে তাঁহার কাঁচাঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ফুলধনু-আহত ত্রিলোচনের রোষকাতর চাহনির ন্যায় চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই, তিনি অকস্মাৎ বেত্র-দণ্ড তুলিয়া মন্মথভ্রমে প্রথম ছাত্রকে আক্রমণ করিলেন; অমনই অন্যান্য ছাত্র-কর্ত্তৃক পুনরায় গীতারম্ভ। গুরু-মহাশয়ের ভৈরব-রাগ কতক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল, সময়াভাবে তাহা দেখিবার অবকাশ পাই নাই।

একপ্রস্ত আহার করিয়া, তালপাতার পাততাড়ি ও দোয়াতকলম লইয়া, প্রাতে ৯ টার সময় ছেলেরা গুরুগৃহে পড়িতে যায়। পড়িবার সময়—প্রাতে ৮টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত; মধ্যে তুই ঘণ্টা আহারের ছুটী হয়। সেই সময় নিকটবর্ত্তী কোনও গৃহস্থের বাটী, বা দোকান হইতে ভাত কিনিয়া খাইয়া, ছাত্রেরা পুনরায় গারদ-মধ্যে প্রবেশ করে। সেই অবসরে হয়ত কয়েকজনে মিলিয়া কাট্-ফাটা রৌদ্রে খানিকটা বল খেলিয়া লয়।

এই 'চিন্‌লুভ্' খেলিবার প্রণালী বেশ। খেলোয়াড়েরা গোলাকারে দাঁড়াইয়া, বেতেবোনা একটি ছোট বল লইয়া খেলিতে আরম্ভ করে। হাঁটুর সাহায্যে 'কিক' করিয়া, অথবা লাফাইয়া, কাঁধের সাহায্যে 'হেড' করিয়া, প্রত্যেকে অপরের কাছে বল ছুঁড়িয়া দেয়, মাটীতে পড়িতে দেয় না! শূন্যে যে যতক্ষণ বল রাখিতে পারে, তার বাহাদুরী তত বেশী। বল সম্মুখে পাইলে হাঁটু ব্যবহার করে, কিন্তু পশ্চাতে অথবা পার্শ্বদেশে বল পড়িতে গেলে, অঙ্গভঙ্গীসহকারে

শাণ সহর

ঘাড় বাঁকাইয়া, অথবা ঘোড়ার চাট্‌মারার ন্যায় গোড়ালির সাহায্যে, তাড়াতাড়ি অন্য ছেলের দিকে বল সরাইয়া দেয়। কাহারও দোষে বল মাটিতে পড়িলে দর্শক ও খেলোয়াড়দের

মধ্যে তুমুল হাস্যকোলাহল উত্থিত হয় এবং কোমরে অথবা মাথায় হাত দিয়া কোনও দর্শক বা নৃত্যগীত করে।

সমগ্র পৃথিবীতে যে ব্রহ্মদেশ বৌদ্ধমন্দিরের রাজ্য বলিয়া খ্যাত—যে দেশের সহরে, পল্লীতে, মাঠে, গহনবনে, উচ্চতম পর্ব্বতশিখরে, সুনীল সমুদ্রতীরে—সর্ব্বত্রই সংখ্যাতীত বৌদ্ধমন্দির দণ্ডায়মান হইয়া দেশবাসীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও বৌদ্ধশিল্পের পরিচয় দিতেছে - ব্রহ্মদেশীয় সেই ধর্ম্মমন্দির বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। এস্থলে সহরের সুবৃহৎ 'প্যাগোডার' উল্লেখ না করিয়া, স্নিগ্ধশান্তিময় শাণ-পল্লীর ছায়াশীতল আম্র কুঞ্জের মধ্যে যে ক্ষুদ্র মন্দিরটী দেখিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহারই বর্ণনা করিতেছি।

ক্ষুদ্র শাখানদীতীরে, লোকালয়ের প্রান্ত-ভাগে, একটি সুন্দর উদ্যান। সেই ঘনবৃক্ষ-চ্ছায়াস্নিগ্ধ উদ্যানের চারিদিকে উচ্চ বেড়া। মধ্যে একটু অনাবৃত ও পরিষ্কৃত স্থানে মন্দির।

সেগুণকাষ্ঠে নির্ম্মিত সেই মন্দিরটী তৈল দিয়া পালিস করা এবং, ক্ষুদ্র হইলেও, তাহার শিল্পকার্য্য সুদৃশ্য।

উত্তর ব্রহ্মে ধর্ম্ম পুস্তকাগার

মেঝে—ভূমি হইতে দুই হাত উপরে। সম্মুখে একটি বড় এবং দুইধারের দেয়ালে দুইটী ছোট দরজা। ভিতরে ছাদ ও থাম-গুলি গিল্টি করা। কক্ষের পূর্ব্বদিকে একটি সিংহাসনের উপর স্বর্ণ, রৌপ্য ও দারুনির্ম্মিত কতকগুলি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এবং আট ফিট উচ্চ একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যাননিমগ্ন। মূর্ত্তিটি মর্ম্মরপ্রস্তরের, সোনালি রং করা। তাঁহার প্রশান্ত মুখখানি দেখিলে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারা যায় না। চারিদিকের ভিত্তিগাত্রে ভগবানের পূর্ব্বতন ৫২০ অবতারের কতকগুলি মূর্ত্তি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত। সিংহাসনতলে, দীপাধারে একটি বৃহৎ মোমবাতি এবং চৌকির উপর একটি পিত্তলাধারে কতকগুলি পতাকা ও ফুল সাজান।

ফুল বাগানের কোণে, আম্রকুঞ্জের সুশীতল ছায়াতলে, সন্ন্যাসীদের দুইটী আশ্রম। আশ্রম দুইটী দেখিতে অনেকটা মন্দিরের মত; তাহাদের মধ্যে তাদৃশ শিল্পকৌশল নাই। তক্তার দেওয়ালে বিভক্ত সন্ন্যাসীদের কক্ষগুলি বৃহৎ নহে।
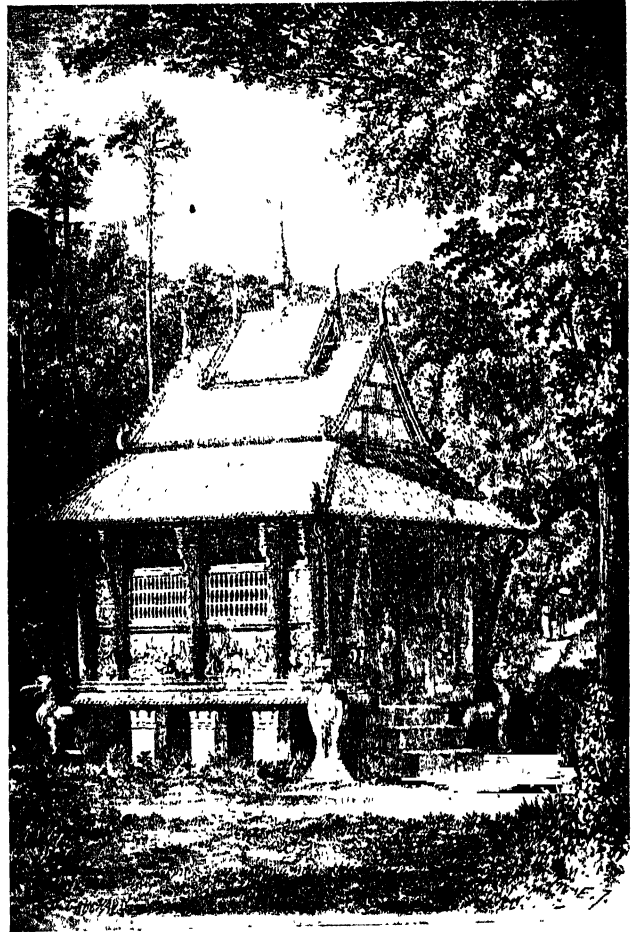
প্রধান পুরোহিতের কক্ষটি বেশ সাজান। একটি কাঠের সিন্দুকের উপর কতকগুলি তৈজসপত্র, আল্‌নায় ঝোলান তাঁহার উত্তরীয়বস্ত্র, একপার্শ্বে মাদুর, তোষক, বালিস প্রভৃতি তাঁহার শয্যাদ্রব্যগুলি গোছান এবং এক কোণে টেবিলের উপর একটি কাঠের মঞ্জুষা বসান। মঞ্জুষের পার্শ্বে ব্রহ্মী অক্ষরে পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রের পুথি, থুত্তা (সূত্র), উইনী (বিনয়), আবিদামা (অভিধর্ম্ম) ও জাদাগ (জাতক) প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত রক্ষিত।

যুগযুগান্তর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব, জাহাজডুবি হইয়া, সমুদ্রগর্ভে পতিত

হন। সেই সময় একটি মৎস্য তাঁহাকে পৃষ্ঠে বসাইয়া তীরে লইয়া যায়। মূর্ত্তিটি সেই মৎস্যের।
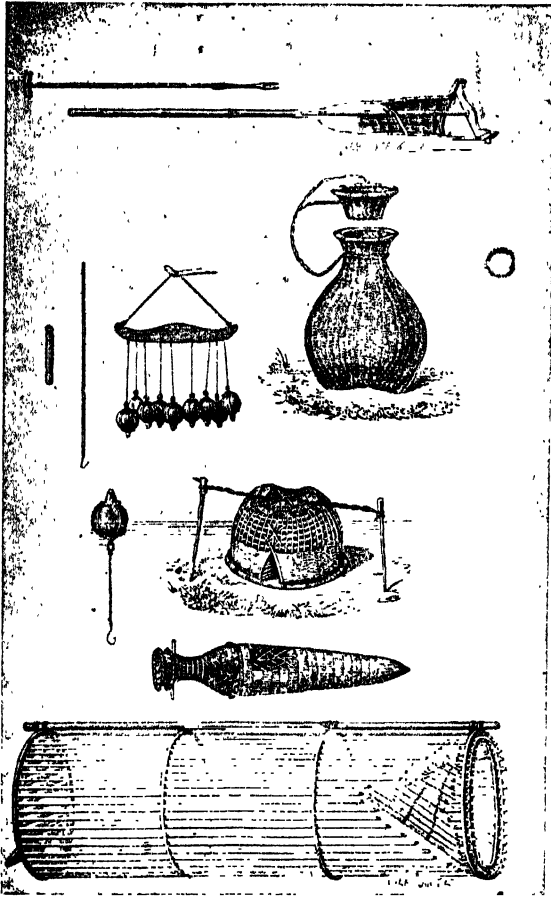
শাণেদের মাছ-ধরিবার সরঞ্জাম

যমালয়ে মানবের বিচার ও পাপীর নরকযন্ত্রণা অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রও উল্লেখযোগ্য। একটি চিত্রে ধর্ম্মরাজ, নথী ও দোয়াতকলম লইয়া, বিচারাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণে, করযোড়ে এক ভীষণদর্শন যমদূত ও বামদিকে বিচারপ্রার্থী এক মনুষ্যমূর্ত্তি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। অন্যান্যগুলির মধ্যে নরকদূত-কর্ত্তৃক মিথ্যাবাদীর জিহ্বাউৎপাটন, জীবহিংসাকারীর ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নমস্তকে কুঠার-ফলকে দ্বিখণ্ডিত হওন প্রভৃতি রোমাঞ্চকর দৃশ্য অঙ্কিত।

সন্ন্যাসীদের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ভাব নাই। জগতের 'কল্যাণমিত্র' মঙ্গলময় যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা—এই 'নলিনী দলগত জলমিব তরলং' জীবনের যাবতীয় মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া—নিষ্কাম, নির্লোভচিত্তে, পরম সাত্ত্বিকভাবে, নির্ব্বাণ লাভে তৎপর থাকিতেন;—মণিকাঞ্চন-রমণী স্পর্শণ, এমন কি দর্শন পর্য্যন্তও, নীতিবিরুদ্ধ মনে করিতেন—'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' মূলমন্ত্রধারী সেই মহর্ষিদের স্থলাভিষিক্তবর্গের অনেকেরই স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের সে মনোবৃত্তিও আর নাই; শুধু তাহাই নহে—তাঁহাদের অনেকেরই বিদ্যা নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই, আচার নাই,—আছে কেবলমাত্র বিকৃত উচ্চারণে কতকগুলি পালিমন্ত্র মাত্র সম্বল।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁহার শিষ্য

প্রভাতে ভিক্ষাসংগ্রহমানসে লোকালয়ে গমনকালে যে ধর্ম্মপ্রাণ সন্ন্যাসীদের দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিত, প্রাণধারণোপযোগী মুষ্ঠিমাত্র ভিক্ষাপ্রয়াসী যে মহাত্মাদের ভিক্ষাপাত্রে এক মুষ্টি অন্নদানকালে, তাঁহাদের ভূমিতল নিবদ্ধ, নির্ব্বিকার দৃষ্টি, প্রশান্ত বদন দর্শন করিয়া, গৃহস্থ স্বীয় নশ্বর জনম সফলজ্ঞান করিতেন—আশ্রমে যাঁহাদের দর্শনকালে স্বয়ং রাজাধিরাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, ও যুক্তকর উত্তোলন করিয়া, তিনবার চরণ বন্দনা করিতেন—তাঁহাদেরই শিষ্যের অনেকেই আজ পল্লীমধ্যে ইচ্ছামত হাসিতামাসা করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান; হাটে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিলাসের সামগ্রী ক্রয়বিক্রয়
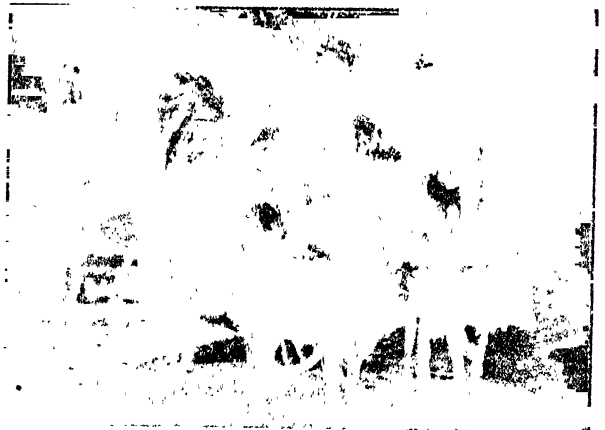
উত্তর-ব্রহ্মের গোশকট

করেন; দিবাভাগে বহুবার ভোজন করেন, মৎস্য মাংস উদরস্থ করেন, পুণ্যাশ্রমে মদ্যপান করিয়া বাঁশি, মন্দিরা ও ঢাক বাদ্যযোগে, দলে দলে, সঙ্গীতামোদে সময় অতিবাহিত করেন। সমাজের উপকারের মধ্যে, কেবল মাত্র পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি করা ভিন্ন আর কিছুই নাই এই সকল লোকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করা যায় না! * অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে ভাল লোক যে নাই, এমন কথা বলিতেছি না; তবে অধিকাংশের অবস্থাই এইরূপ এবং ইহারাই ধর্ম্মের কলঙ্ক স্বরূপ।

* এই প্রবন্ধের উপকরণ অনেক ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং লেখক সেই সকল গ্রন্থকারের নিকট ঋণী। এক্ষেত্রে সকলের নাম প্রকাশ করা অসম্ভব;—মাত্র বলিয়া রাখি, নরকের দৃশ্য ও শাণদিগের উপাস্য-দেবতাদের চিত্র কয়টী H. S. Hallet এর "A Thousand Miles in the Shan States" গ্রন্থ হইতে চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে গৃহীত হইয়াছে।

শাণ, কাড়িণ, কারেণ, তালাইং ও বর্ম্মী প্রদেশের অনেক সহর ও পল্লী ঘুরিয়া ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকাদি পড়িয়া লেখককে উক্ত সকল স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই জন্য সময়ে সময়ে একস্থানের বিষয় লিখিতে লিখিতে অপর স্থানের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যেটুকু ত্রুটি হইয়াছে সহৃদয় পাঠকপাঠিকা তাহা মার্জ্জনা করিবেন।—লেখক।

আগমনী

[শ্রীকালিদাস রায়]

এস গো জননী ফিরিয়া আবার জীর্ণ ভগ্ন কুটীর বক্ষে,
গৃহের হাস্যকলকোলাহলে শিশুর লাস্যে, স্নেহের চক্ষে,
এস প্রবাসীর আকুলানন্দ দুরুদুরু বুকে, মাতার হর্ষে,
এস মা লক্ষ সুতের কণ্ঠে, পুণ্যঘটের সলিলবর্ষে!
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ পা'ক মা বৃদ্ধি;
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি, তুষ্টি; আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি॥
এস মা অভ্র-উজল গগনে, এস মা শুভ্র কাশের ক্ষেত্রে,
এস অব্জের অরুণ চিত্তে, অপরাজিতার করুণ নেত্রে,
এস মা ইন্দ্রধনুর তোরণে, বিহগ কুলের কূজন ছন্দে,
এস কুমুদীর হৃদয়-তরীতে, কৌমুদীনীরে পরমানন্দে!
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ পা'ক মা বৃদ্ধি;
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি, তুষ্টি; আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি।
এস কল কল নদীর লহরে, পুণ্যপূরিত তরণী পুঞ্জে,
শালিধান্যের শ্যামসম্পদে, এস মা বাতাবী-আতার কুঞ্জে,
এস মা তরুণ অরুণোজ্জ্বল নীহারনিচিত শষ্প অঙ্গে,
এস মা শঙ্খবংশীস্বনে, গৃহে গৃহে আজি এস মা বঙ্গে!
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ পা'ক মা বৃদ্ধি;
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি, তুষ্টি; আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি।
পর্ণপুষ্পে পুণ্যপুলকে ও পদ পরশে পূরুক পল্লী,
বিসকিসলয়ে শোভুক মৃণাল, শিহরি উঠুক বিটপী বল্লী,
তোমার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ধেনু আপীন উছলি ঢালুক দুগ্ধ,
আজি জীবলোক চরণে তোমার লুটিয়া পড়ুক মন্ত্রমুগ্ধ!
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ পা'ক মা বৃদ্ধি;
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি, তুষ্টি; আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি।
শোকহত লাগি আন সান্ত্বনা, তাপিতের লাগি পরম শান্তি,
পীড়িতের লাগি নিরাময় বাণী, সুধার ভাণ্ড, মোহনকান্তি,
বন্যামগন সন্তানে রাখি অঞ্চল ছায়ে কর মা ধন্য,
ক্ষুধিতের লাগি আন মা অন্ন, তৃষিতের লাগি পীযূষস্তন্য!
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ, পা'ক মা বৃদ্ধি;
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি, তুষ্টি; আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি।

রণাঙ্গনে

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

সন্ধ্যাকাল অতীত প্রায়। সমুদ্রের উপকূলে—বহুদূরে কয়েকটা বাড়ী ঝোপের মধ্য হইতেও বেশ দেখা যাইতেছিল। অদূরে সমুদ্র ভীষণ-গর্জ্জনে দিঙ্‌নাদিত করিয়া ছুটিতেছে; অশান্তবক্ষে রণতরী ও ছোট ছোট ড্রেড্‌নটগুলি দুষ্ট শিশুর ন্যায় লাফালাফি করিতেছিল। খাণ্ডববন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার লেলিহান জিহ্বা এ অঞ্চল গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় নাই। তাই সবুজ শষ্প ও প্রকৃতির সরস সুষমা এখনও এখানে বর্ত্তমান। একটা কি যেন ভীম তাণ্ডব নর্ত্তনের আশঙ্কায়, জলদ সজল আকাশের বিদ্যুতালোকে, প্রান্তরটা থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছিল।

অন্ধকার গাঢ় হইল;—প্রলয়োপম ভীষণরূপ ধারণ করিল। পার্শ্ববর্ত্তী একটা বড় কানারা বৃক্ষ হইতে পেচক উড়িয়া গেল। নিম্নে একটা ছায়া—ক্রমে ঝোপের মধ্য হইতে আর একটা ছায়া—দেখা গেল। একটু দূরে কিসের আলোক দেখা যাইতেছিল; হাতধরাধরি করিয়া দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি সেইদিকে ধাবিত হইল। সবুজ ঘাসের উপর বুটের মচ্‌মচ্‌ ধ্বনি ডুবিয়া যাইতেছিল। দূরের আলোক নিবিয়া গেল। যে ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহা আঁধারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

করাক্‌-পিং—বন্দুক ছুটিল। দুইজন দাড়াইয়া দেখিতে লাগিল,—আবার আলো জ্বলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। হা হা করিয়া দুইজন হাসিয়া ফেলিল, এবং তীব্রগতিতে সেখানে উপনীত হইল।

'মাইরি সেম্,……ক্ষুধায় পেট চুঁচুঁ করে ডাক্‌ছে।'

'হুঁঃ—'

'মাইরি—'

'অলবা, চুপ্ রও;—ওদিকে কতদূর?'—অন্ধকারের ভিতর কামানের গুলির ন্যায় সেমের দুইটা বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু, তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল। সম্মুখে একটা বল্লরীবিতান; ফুটন্ত পাপ্‌ড়ীর মধ্যে কীটের ন্যায়, সেই কুঞ্জের মধ্যে একটা কপিশ তাঁবু খাটান রহিয়াছে—কাহারও বুঝিবার যো নাই যে সেখানে একটা তাঁবু আছে। দ্বারে ওভারকোটে সর্ব্বাঙ্গলুপ্ত এক সৈনিক-পুঙ্গব 'মেশিন-লাইট' হস্তে দণ্ডায়মান। সেমের প্রশ্নে এ লোকটা নড়িয়া উঠিল। দরাজ আওয়াজ রেওয়াজ করিয়া কহিয়া উঠিল—"সব ঠিক, সে অনেকক্ষণ হয়ে আছে।… ভাল কথা, কাজ হাসিল করেছ ত?" সেম, বা সেমের সঙ্গী, এ প্রশ্ন কাণেও তুলিল না। সাঁকুলি মাথার উপরে সন্ধ্যা ঘুরিয়া, ডুবিয়া গিয়াছে—তাহাদের নিরম্বু উপবাস গিয়াছে! দ্বার ঠেলিয়া দুইজনে ঘরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে একটা বড় টেবিল, আর তিনখানা চেয়ার। সেম ও তাহার সঙ্গী দুইজন, ক্লান্তদেহ কেদারায় ছাড়িয়া দিয়া, টেবিলের দিকে চাহিল। মিটিমিটি করিয়া একটা মোম-বাতি জ্বলিতেছিল; তাহারই ক্ষীণ দীপ্তিতেই টেবিলের উপর কাপড়ঢাকা কি একটা আবছায়ার মত দেখা গেল। সেম দ্রুতবেগে সেইদিকে গেল। ঢাকনি খুলিয়া ফেলিতেই সেমের চক্ষে পূর্ণ আনন্দের সতেজ রেখা ফুটিয়া উঠিল—এ যে রাজ-ভোগ!—'করেলি প্লেটে' এ যে দুষ্প্রাপ্য খাবার! সেমের সঙ্গী ঝাঁ করিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেল। খাবার লইয়া বুভুক্ষুদ্বয়ের কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল! হস্তের ক্ষিপ্রচালনে প্লেটটা উভয়ের হস্তচ্যুত হইয়া নীচের দুইটা ভাঙ্গা-কামানে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইল। তৃতীয় ব্যক্তি পাহারার কার্য্য করিতেছিল; শব্দ শুনিয়া সে ভিতরে আসিল। ব্যাপার দেখিয়া কহিল—'ঐ যা, ভেঙ্গে ফেল্লে! দু-দুটা বর্ব্বর জানোয়ার আর কি!' ততক্ষণে উভয়ের ক্ষুধা মিটিয়াছে, বুভুক্ষিতের উদর শান্তিলাভ করিয়াছে।…… সেম এবার মোলায়েম হইয়াছে; পেটের জ্বালায় বেচারার জানকবুল হইয়াছিল, মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল।

"সাবাস জন্—বেশ ত থাবার"! সেম হাসিয়া ফেলিল। তাহার সেই আগুনের-ভাটার মত দুইটা চোথের অস্বাভাবিক তীব্র দীপ্তিতে একটা আরামসূচক চিহ্ন বেশ লক্ষিত হইল। জন্ আবার বাহিরে যাইতেছিল; সেম তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"আরে রোস, কোথায় যাও"।

জন একটু চিন্তিত ভাবে কহিল,—"বাহিরে,··· ··· তাঁবুরই পাশে!"

"কোন্ ভয় নাই, কোথায় কে? আচ্ছা দিল্‌দার দুনিয়া ·· এ যে থালি মাঠ!"

"মাঠ ত থালি, কিন্তু ঘাস গজাতে কতক্ষণ। দেখ্‌চ না সমুদ্রের অতি নিকটেই আমরা আছি। কথন কি হয়, তা কি বলা যায়!"

সেম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল - "কাল রাত আটটা থেকে এ পর্য্যন্ত পরিথার, ঝোপের, মাঠের এবং আরও কত কি'র মাঝে হয়রাণ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাথা গরম হয়ে উঠেছে; কিন্তু আসন্ন বিপদের সাড়া ত কোথাও পেলুম না!"

জন চুপ্ করিয়া বসিল। সেমের অপর সঙ্গী টেবিলের উপর ওভারকোটে সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া তথন নাসিকা-ধ্বনির সহিত দিব্য আরামে ঘুমাইতেছে। সেম একবার সেই-দিকে চাহিল, তারপর আবার গল্প জুড়িয়া দিল। নির্ব্বাপিত সিগারে আর একটা ফুৎকার দিয়া, সেম বেশ গরম হইয়া বসিল। দীপদানে বাতীটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া শেষে হঠাৎ নিবিয়া গেল। অনেকক্ষণ গল্পের পর জন্ 'মেশিন লাইট' লইয়া উঠিল, সেমও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেল। 'বাইনো-কুলার' কসিয়া জন্ দেখিতে লাগিল, সেমও দেখিল—কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। স্থলপথে যতদূর দৃষ্টি যায়, মাঠে গাছে ছাইয়া আছে; আর জলপথেও ধূ ধূ জলরাশি মধ্যে কেবল সেই জাহাজগুলি! ক্ষণপরে সেম কহিল—"জন, ঠিক আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা যেন কি দেখ্‌চি!' জন মনোযোগের সহিত সেইদিকে চাহিল। অন্ধকারে তাহার মুথ আরও অন্ধকার হইয়া গেল—"তাইত একটা যেন 'ফ্লিট' নঙ্গর ক'রে (moored) আছে ব'লে বোধ হচ্ছে;—ভাল আপদ জুট্‌ল দেখ্‌চি!" সেম চাহিয়া চাহিয়া চোথ্‌টাকে অতিষ্ঠ করিয়া ফেলিল; পরে সে হাঁফ্ ছাড়িয়া বলিল—"নাঃ—ও কিছু নয়। ওথানে সমুদ্র সরু হয়ে বেঁকে যাওয়ায়, তীরের গ্রামের আবছায়া জলের উপর ঘন হ'য়ে জমে রয়েছে বলে' অমন বোধ হচ্ছে। কি বল?"—জন আবার চাহিল। সেমের কথাটা তাহার মনে লাগিল। সে দেখিল ঠিক্ তাই, একটা স্থলবর্ত্তী পদার্থের ছায়া বটে। বৃষ্টিপতনের ন্যায় বরফ পড়িতেছিল; উভয়ে হাতধরাধরি করিয়া চলিল। রাত্রি তথন ১০টা হইবে। বুকপকেটের ঘড়ি খুলিয়া সেম সময় দেখিল। উপরে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার! কোথাও দুই একটা ভীষণস্বর পেচক রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

উভয়ে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল। সেম আলো জ্বালিল। জন তাঁবুর দরজাটা ভালরূপে 'পিন্' দিয়া আঁটিয়া দিল। আবার সিগার ধরাইয়া কিছুকাল গল্প চলিল। শীতে গলার স্বর ক্রমেই দরাজ হইয়া জড়াইয়া যাইতে লাগিল। সেম বলিয়া উঠিল—"জন, বড় পিপাসা; গলা কেমন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ব্রাণ্ডি আছে—ব্রাণ্ডি?" জনের একটা কথা মনে পড়িল; বিপদসঙ্কুল স্থানে, বা অরক্ষিত বিশ্রামাগারে, 'ব্রাণ্ডি' থাওয়া রেজিমেণ্টের নিষেধ আছে। কথাটা চট্ করিয়া মনে পড়িয়া যাওয়ায়, সে সেমকে সাফ্ জবাব দিল—"ব্রাণ্ডি আছে; কিন্তু 'বেল পাক্‌লে কাকের কি?' রেজিমেণ্টের আইনে পান নিষিদ্ধ যে!" সেমও যে সেকথা না জানিত, তাহা নয়; কেন যে নিষেধ, তাহাও জানিত। কিন্তু আজ যেন সে কিছুতেই প্রলোভন দমন করিতে পারিতেছিল না। "বাই জোভ্! তা ত জানি, ব্রাণ্ডি থেলে মাতাল হয়, জ্ঞানকাণ্ড লোপ পায়—আর অরক্ষিত অবস্থায় শত্রুপক্ষ এসে সর্ব্বনাশ করে।—কেমন, এইত!—আজ ত আর কোন বিপদ হতে যাচ্ছে না! এই ত ঘড়িতে দেখ্‌চ—না ১২টা ২০মিনিট্, বাকী আছে মাত্র ঘণ্টা চারেক্। এই সময়ের মাঝে খুব এক পাল্টা ঘুমিয়ে নেব—আর এই সময়ের মাঝে এথানে কেহই আস্‌তেও পারে না। তবে আর, থেতে বাধা কি? কি বল জন?"

জন অনেক ভাবিয়া দেখিল—তেমন কিছু বাধা নাই। তাহার জিভ্‌ও যেন অসাড় হইয়া যাইতেছিল। একটা রবরের 'ব্যাগ' হইতে জন একটা বোতল বাহির করিল। ছিপি খুলিয়া, ঢকঢক্ করিয়া বোতলটাকে আধপেটা করিয়া, জনের দিকে কম্পিতহস্ত প্রসারিত করিয়া সস্মিতমুখে জড়িতকণ্ঠে কহিল—"আঃ বাঁ—চা—লে; এই নেও তুমি। ব্রাণ্ডিটা বড় কড়া।" সেম আর বলিতে পারিল না, হেলিয়া

ঢুলিয়া টেবিলের উপর 'ক্লোক'টা ছড়াইয়া বিপুলদেহ নিদ্রার ক্রোড়ে ঢালিয়া দিল। ব্রাণ্ডির বোতল হস্তে করিয়া, জন বসিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—রেজিমেণ্টের হুকুম অমান্য করিবে, না রক্ষা করিবে। তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উত্তেজনার মধ্যে ডুবিয়া গেল, যেন তাহার অন্তর-মথিত রাগিনীর সুর বাহির হইল—'ঢাল ঢাল, আরো ঢাল!'—জন ঢালিল। শূন্য বোতলটা হাত হইতে পড়িয়া গিয়া, একটা শব্দ করিল; কিন্তু জনের তাহাতে চৈতন্য হইল না। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; মাথা যেন সুষুপ্তির ভারে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। ঢুলিতে ঢুলিতে সেও সেমের শয্যাসঙ্গী হইল। অদূরে একটা নিশাচর পক্ষী ভীষণস্বরে ডাকিয়া উঠিল; জনের পা তুখানি একটু নড়িল, তারপর সব চুপ নিশ্চল! কেবল সাক্ষী রহিল—ঘরের কোণের আলোকটা!

* * *

সেমের হাতটা যেন বাধা বাধা ঠেকিতেছিল,—তখন তাহার ঘুমের ঘোর অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। সেম নিদ্রা-বিজড়িত কণ্ঠে কহিল—"আরে জন, হাতটা চেপে কেন?—ছেড়ে দাও"; কিন্তু হাত যে ছাড়া পায় না, বরং বুকেও যেন কিসের চাপ অনুভূত হইল। সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকা দিয়া সেম উঠিয়া বসিতে গেল—অমনি লোহার কতকগুলা কড়া ভীষণ বিকটশব্দে বাজিয়া উঠিল। চোখ রগড়াইয়া সেম দেখিল, ঘরে মশাল জলিতেছে। তাহার সম্মুখে জনৈক জেনরেল, আর তাহার আশেপাশে তুইজন 'তুষমন' চেহারার সৈনিক—সেমের হাতে শৃঙ্খল পরাইতেছে! এ কি অলীক-স্বপ্ন! তাই কি? ও কে, ঐ যে জন আর তাহার সঙ্গী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নতমস্তকে দণ্ডায়মান। বহুলোকে স্থানটা ভরিয়া গিয়াছে। রাত্রি এখনও যায় নাই—কিন্তু কোথাও অন্ধকার নাই। 'সার্চ্চলাইটে' সব দিনের ন্যায় পরিষ্কার। সেমের মাথা ঘুরিয়া গেল। এর অর্থ কি? গত রজনীর কথা মনে পড়িল। না—সে ত বন্দী নয়—বন্দী সে কিছুতেই হইতে পারে না—ককখন না! সেম উঠিয়া বাহির হইতে গেল, অমনি তুইজন ভীমকায় ব্যক্তির মাঝখানে সে আট্‌কাইয়া গেল—সেম বন্দী হইল। জেনরেলের মুখ হইতে গম্ভীরস্বরে যখন এই কথা বাহির হইল, "ঘুম তোমার ভেঙ্গেছে ত?" তখন তাহার জ্ঞান হইল। সে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে শত্রুপক্ষীয় জেনরেল দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝিল অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী; জীবনের বন্ধন ছিঁড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। একটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় সেমের বুক দরাজ হইয়া উঠিল—চক্ষু উজ্জ্বলতায় ভরিয়া গেল। জেনরেল তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মৃত্যুর তোমাদের বিলম্ব নাই!"

"মৃত্যুর তোয়াক্কা আমরা রাখি না!"—সেম বীরপুরুষের ন্যায় কহিল।

শ্লেষভরে জেনরেল—'বীরের জাতি!'

"নিশ্চয়ই!"—একটা বিজয়সূচক গর্ব্বে সেম ফুলিয়া উঠিল।

জেনরেল ক্ষণকাল কি ভাবিলেন; তার পর বলিলেন—"তোমরা এখানে কি কর্‌ছিলে?"

সেম মিতবাক্ হইয়া বলিল—"বিশ্রাম"।

"ভাল! যুদ্ধ হইতেছে ১০০ মাইল দূরে, আর তোমরা এখানে পূর্ব্ব হইতেই কেন?"

সেম চুপ্ করিয়া রহিল; জেনরেলের প্রশান্ত মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল।

"উত্তর দিতে বাধা আছে?"

সেম কোন কথা বলিল না। জেনরেল ভাবিতে লাগিলেন, 'বাধা আছে বৈ কি!' সোজা-কথায় প্রশ্ন করিতে হইবে; কহিলেন—"ভাল, তোমাদের রেজিমেণ্টের নাম ও নম্বর কি?"

সেম একনিঃশ্বাসে কথাটাকে ঘুরাইয়া উত্তর দিল—"জেনরেল! যুদ্ধে যেমন বন্দী হয়, আমরাও সেইরূপ যুদ্ধের বন্দী!"

জেনরেল একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আঃ! সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। এখন তোমাদের রেজিমেণ্টের নাম বল, নম্বর বল, যাতে আম্‌রা বুঝ্‌তে পারি যে তোমরা বিপক্ষের সৈন্য।—তারপর যা হয় করা যাবে!"

সেম কোন কথা বলিল না। জেনরেল ক্রুদ্ধ হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি খুলিলেন। ঘড়ি ধরিয়া কহিলেন—"৩০ মিনিট সময় দিলাম—এর মধ্যে তোমাদের সব খবর আমি চাই!"

সেম, কলের পুতুলের ন্যায়, দাঁড়াইয়া রহিল। সময় যাইতে লাগিল। জেনরেল হাঁকিলেন—'আর মাত্র তুই

মিনিট আছে ; এখনও বল, তোমরা কোন্ দলের সৈন্য! সময় যাচ্ছে!" সেম দাঁড়াইয়া রহিল—স্থির, ধীর অকম্প-পলক! সময়ের মেয়াদ কাটিয়া গেল। জেনরেল মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তবে শেষ চিকিৎসা করবে—তাই স্থির?"

সেম কহিল—"যাহা খুসি"।

বন্দীত্রয়কে সঙ্গে করিয়া জেনারেল বাহিরে আসিলেন ;—তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। কানারা বৃক্ষের নিম্নে দূরে দূরে তিনজন দাঁড়াইল। 'ফোর্ট গন্' হস্তে জেনরেল পায়চারি করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে প্রভাতের সূচনা হইতেছিল ; আর সৈনিকত্রয়ের জীবন কালরজনীর তমিস্রা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল।

সেমের দিকে চাহিয়া জেনরেল কহিলেন—"এই দেখ্‌ছ, বন্দুক প্রস্তুত! আর এক মিনিট সময়, তবু প্রমাণ কর যে তোমরা সৈনিক। রেজিমেণ্টের নামটা শুধু বল। আমরা লিখে দিচ্চি, সৈন্য ব'লে স্বীকারোক্তি পেলেই তোমাদের প্রাণ রক্ষা হবে। এর বেশী আর কি চাও? কি বল?"

"সেম উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, 'Why do you worry (ত্যক্ত করছ কেন?)? We are prisoners of war আমরা যুদ্ধে বন্দী!"

জেনরেল বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন—"You are a vile spy! (তোমরা ঘৃণ্য গুপ্তচর) আমি খুব জানি এখান থেকে ত্রিদিনের পথের মধ্যেও যুদ্ধ হয় নাই। তোমরা সৈন্য হ'তে পার না—কক্‌খনো না! তাই তোমাদিগকে গুপ্তচরের দণ্ড দিচ্ছি।—প্রস্তুত?"

বুক ফুলাইয়া সেম কহিল—"সে ত বহুক্ষণ!"

মুখের কথা শেষ না-হইতেই লৌহ গোলক ছুটিয়া গিয়া সেমের বক্ষে আঘাত করিল। মুখে সেই দৃঢ়তার চিহ্ন থাকিতে থাকিতেই ডুম্ করিয়া সেমের প্রাণহীন দেহ কানারা বৃক্ষের তলে পড়িয়া গেল! জেনরেল একবার হাতটা ঝাঁকি দিয়া, আবার লক্ষ্য স্থির করিয়া দাঁড়াইলেন। জনের মুখও সেইরূপ বীরত্বব্যঞ্জক। জেনরেল তাহার দিকে চাহিয়া, সেই একই প্রশ্ন করিলেন—"Prove that you are not a spy—প্রমাণ কর যে তুমি গুপ্তচর নও।" জন দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে সেই কথাই বলিল—"We are prisoners of war." জেনরেল বুঝিলেন—ঐ এক কথা ছাড়া আর কিছুই বাহির হইবে না। তিনি তখন বন্দুকের ঘোড়া টিপিলেন—গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল—ধূমরাশি সরিয়া গেলে জেনরেল দেখিলেন, জনের প্রাণহীনদেহ সেমের পাশে পড়িয়া আছে ; আর তাহাদের খুব নিকটেই সেমের সঙ্গী তৃতীয় ব্যক্তি সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জেনরেল একটু নরম হইলেন ; হাসিয়া কহিলেন—"কি হে মরাটা কি এতই সুখের?"

সেমের সঙ্গী চুপ করিয়া রহিল। বীরের শোণিত তাহার ধমনী তখনও সবল রাখিয়াছে। জেনরেল, উত্তর না পাইয়া, আবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তোমার সঙ্গীদ্বয় অন্তিম-শয়নে। তারা আর ত তোমার কোন কথা শুনতে পাবে না। তবে কেন বল না কা'ল বাহিরে তোমরা কোথায় কোথায় কি কাজ করেছ, বা কি দেখেছ! যাদের জানাবে বলে এ কাজ গ্রহণ করেছ, মরিয়া গেলে তারা ত আর জানতে পাবে না। তবে না হয় আমাদেরই কিছু—" জেনরেলের কথায় বাধা দিয়া—ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া—সে কহিয়া উঠিল—"Shame!—দণ্ডগ্রহণের সঙ্গে আর বাক্যদণ্ড চাহিন!—একথা যে মরণের পরেও দুঃস্মৃতি জাগিয়ে তুলবে!"

"তবে তাই ঠিক—You are a prisoner of war?"

দৃঢ়ভাবে সে কহিল—"হাঁ।"

জেনরেল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বন্দুক ছুড়িলেন। ভীষণ শব্দ হইল। ধূমের ঘোর কমিয়া গেলে, জেনরেল চাহিয়া দেখিলেন তিনটা শব পাশাপাশি, রহিয়াছে ; সূর্য্যের আলোকে রক্তমাখা ওভারকোটগুলা ঝকঝক করিতেছে!—বীরযুবকত্রয় তখন বীরভোগ্যা অমরাপুরী হইতে অলক্ষ্যে হাস্য করিতেছিল!

———

অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মকাণ্ড

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

(৩)

বেদান্তের মহাবাক্য কি? 'তত্ত্বমসি' (তুমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ)। এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নির্ব্বিকল্প নির্বিকার ব্রহ্মভাব যদি অনুভূতির বিষয় করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে অগ্রে নিজ সঙ্কীর্ণ-জীবভাবকে বিরাট্, বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপক আত্মভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। যাঁহারা বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা হয় ত একথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন। তাঁহারা বলিবেন, এই যে মহাবাক্য, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, জীব নিজ বীরত্ব বদ্ধনপূর্ব্বক ঈশ্বরভাব গ্রহণ করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,যে চিদানন্দময় পরমার্থস্বরূপ, যে ব্রহ্ম, তাহারই উপর অজ্ঞানবশে যে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইয়াছে, সেই জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বরূপ দুইটি কল্পিত-ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক, সেই ব্রহ্মস্বরূপেই আত্মসত্তার উপলব্ধি করানই এই বাক্যের যথার্থ উদ্দেশ্য; এবং ইহাই যদি এই মহাবাক্যের উদ্দেশ্য হইল, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্গে প্রপঞ্চের অস্তিত্ব সাধকেরপক্ষে একপ্রকার বিলীন হইল। তাহাই যদি হইল, তবে কর্ম্মের বা কর্ম্মীর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইল; সুতরাং অদ্বৈত-ভাবনার সহিত কর্ম্মের বিরোধ রহিয়াই গেল। ফলে দাঁড়াইল এই যে,অদ্বৈত-চিন্তার ফল—কর্ম্মের উচ্ছেদ; সুতরাং, অদ্বৈতবাদ কর্ম্মের বিরোধী নহে, এই সিদ্ধান্ত আর টিকিল কৈ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই মহাবাক্যের চরম উদ্দেশ্যবিষয়ে যাহা উক্ত হইল, তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু এই চরম উদ্দেশ্যসিদ্ধির পূর্ব্বে অদ্বৈতভাবনাপ্রবৃত্ত সাধকের আর একটি অবস্থা আছে—সেই অবস্থার নাম সাধনাবস্থা। এই সাধনাবস্থার মধ্য দিয়া না যাইলে, একেবারে সেই চরমাবস্থা বা সিদ্ধিতে উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বলিতে চাই, নির্ব্বাণমোক্ষ বা নিগু'ণ-ব্রহ্মভাবাভিব্যক্তি হইবার পূর্ব্বে জীবের সঙ্কীর্ণ জীবভাব পরিহারপূর্ব্বক, ঈশ্বরভাবের অভিব্যক্তিই অদ্বৈতবাদের গূঢ়মর্ম্ম। সকল উপনিষদ্ ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্র এই সাধনাবস্থার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছে। এই ঈশ্বরভাবের অভিব্যক্তিরই নাম ক্রমমুক্তি। এই ক্রমমুক্তির স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, অদ্বৈতবাদ কর্ম্মের বিরোধী নহে—প্রত্যুত ইহা সার্ব্বজনীন কর্ম্মবাদেরই পরিপোষক। এই ক্রমমুক্তির স্বরূপ কি এবং ইহা কি প্রকারে সুসম্পন্ন হইতে পারে?—এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

বেদান্তশাস্ত্রে মোক্ষের স্বরূপ দুইপ্রকার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, যথা—নির্ব্বাণমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি। যাঁহারা সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার এই জীবনকালের মধ্যে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদের প্রারব্ধ-কর্ম্মের অবসানে, এই দেহ-বিনাশের সঙ্গেই পরব্রহ্মরূপতার আবরক যে অজ্ঞান, তাহা একেবারে সংস্কারের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং, আর তাঁহাদের দেহান্তরে পরিচ্ছিন্ন-জীবভাবের আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর নহে। এই কারণে মৃত্যুর পরেই তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।—ইহাই হইল নির্ব্বাণ-মোক্ষ। কিন্তু যাঁহাদের তাদৃশ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এই জীবনে ঘটিয়া উঠে না—এবং দ্বৈতসংস্কারের প্রাবল্য-প্রযুক্ত অনেকের ভাগ্যেই তাহা সম্ভবপরও নহে—তাঁহারা এই কারণে ঈশ্বরভাবে সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানস্বরূপে আত্মার ভাবনা-নিরত হয়েন, এবং ভাবনার পরিপাক-দশায় তাঁহাদের আত্মাতে সর্ব্বপ্রপঞ্চসাক্ষী পরমেশ্বরের অভিন্ন-সত্তার উপলব্ধি এই জীবনেই কথঞ্চিৎ হইয়া উঠে। তাঁহাদের দেহপাতের পর, অন্তঃকরণে পরমেশ্বরাভেদভাবনার পরি-পাক-নিবন্ধন, একেবারে পরমেশ্বরভাবই আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই পরমেশ্বরভাবের উপলব্ধিকালে, তাঁহারা এই সামান্যতঃ-প্রসিদ্ধ যে পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মভাব—এবং তন্মূলক রাগদ্বেষাদি—তাহার সহিত আর সম্মিশ্রিত হয়েন না;

এবং এই ভাবে আপ্রলয়কাল যে অবস্থান, ও তাহার পরে পরব্রহ্মভাবের সমাপত্তি, তাহাই ক্রমমুক্তিপদ বাচ্য। এই ক্রমমুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, শ্রুতি বলিতেছেন—

"সএকধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা"—ইত্যাদি।
—ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৭।২৬।২।

"সেই ব্যক্তি এক হয়, আবার তিনও হয়; এইরূপ পঞ্চভাবে সপ্তভাবে নবভাবে তাহার স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে।"

ইহারই তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে যাইয়া, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "এবমেকোঽপিসন্ বিদ্বান্ ঐশ্বর্য্যযোগাৎ অনেক ভাবমাপন্ন সর্ব্বাণি শরীরাণি আবিশতি"।

"এইভাবে বিদ্বান্ বস্তুতঃ এক হইয়াও ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অনেক ভাব প্রাপ্ত হইয়া, সকল শরীরের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।"

এই পরমেশ্বরভাব বা বিশ্বাত্মভাব আত্মাতে আবির্ভূত হইলে, একটী স্থূলদেহের বা তৎসংসৃষ্ট ইন্দ্রিয়াদির উপর পরিমিত আত্মভাব আর থাকে না—একটি দেহের উপর আর সঙ্কীর্ণ আত্মভাব চিত্তে রাগদ্বেষাদি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। তখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যত জীবদেহ আছে, সেই সকল দেহতেই এক অবিনাশী আত্মার ব্যাপকসম্বন্ধ আসিয়া পড়ে—পরস্পরের মধ্যে দ্বৈতাত্মভাবের সত্তা-নিবন্ধন যে একটা পার্থক্যের অনুভূতি,তাহা লুপ্ত হইয়া যায়; আকীট, আপতঙ্গ, আচতুরাননাদি পর্য্যন্ত অসংখ্য জীবদেহের অধিষ্ঠানস্বরূপ স্বীয় আত্মার চিদানন্দময়-সত্তাতে সকল দেহের অনুপ্রাণন বা সর্ব্বত্র সমদর্শন ফুটিয়া উঠে। এই প্রকার অবস্থাই হইল—বেদান্তের ক্রমমুক্তি। এইরূপ মুক্তপুরুষ যাহা কিছু দেখেন বা যাহা কিছু করেন, তাহা একের দেখা নহে বা একের কার্য্য নহে, সকলের যাহা মঙ্গলকর, সকলেরই যাহা অশুভনিবারক, সকলেরই যাহা আধ্যাত্মিক উন্নতিকর, এই কার্য্যই তখন তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। তোমার, আমার, রামের, শ্যামের যে দেহাত্মভাব-জড়িত অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তর্য্যামিস্বরূপে তিনি তখন সকলের প্রাণের ব্যথা বুঝিতে সমর্থ হয়েন—তোমার আমার প্রাণের নিভৃত সুপ্ত-বাসনার সূক্ষ্মতম প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি তখন তাঁহার বিরাট্ বিশ্বজনীন আত্মভাব তোমার বা আমার হৃদয়ে জাগাইবার জন্য, তোমার-আমার সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে জাগাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ দেহাত্মভাব নাই; সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে কোন ভোগও নাই। ভেদবুদ্ধিপ্রসূত রাগ বা দ্বেষের তীব্র-কশাঘাতে তাঁহাকে আর বিচলিত হইতে হয় না। এই বিরাট্ বিশ্ব-জনীন ও বিশ্বপ্রেমময় আত্মভাবের উপলব্ধিই—ক্রমমুক্তি। এই ক্রমমুক্তির পথে যাইতে হইলে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের সাধনা একান্ত আবশ্যক। এই কর্ম্মের সাধনা অদ্বৈত-ভাবনার বিরোধী নহে—ইহা জ্ঞানের পথের কণ্টক তুলিয়া ফেলে, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য দেখাইবার উপায়স্বরূপ চিত্ত-বিশুদ্ধি সম্পাদন করে। এই কর্ম্মসাধনার স্বরূপ ও ফল-নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, শ্রুতি কি বলিতেছেন? শ্রুতি বলিতেছেন—

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন তপসা দানেন অনাশকেন চেতি।"

—"সেই এই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরকে বুঝিবার জন্য (তাঁহার সত্তায় নিজের সঙ্কীর্ণ আত্মসত্তা মিশাইয়া দিবার জন্য) ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ নিষ্পাদন করেন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন, দান করিয়া থাকেন এবং বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।"

এই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, কর্ম্মী-সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। কেন ও কি প্রকারে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তাহাও দেখা যাক।—আমাদের চিত্তের স্বভাবই এই যে, ইহা চঞ্চল অর্থাৎ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ইহা একান্তভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, চিত্তের রজোগুণের আধিক্যই এই চঞ্চলতার কারণ। চিত্ত হইল দর্পণস্বরূপ; আর এই দর্পণ-স্বরূপ চিত্তের চাঞ্চল্যই ইহাতে চিদাত্ম-প্রতিবিম্বের পূর্ণ-প্রকাশ হইতে দেয় না। জল নির্ম্মল ও স্থির হইলে তাহাতে যেমন পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে স্ফুরিত হয়,পঙ্কিল ও চঞ্চল জলে তেমন স্পষ্টভাবে উহার স্ফুরণ হয় না, ইহা সকলেরই বিদিত। সেইরূপ, আমাদের অন্তঃকরণরূপ দর্পণে চাঞ্চল্য ও অবসাদরূপ মলিনতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই অন্তঃ-করণে সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ব্রহ্মের পূর্ণ-প্রতিবিম্ব কখনও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতে পারে না; এবং অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত পূর্ণ-ব্রহ্মের সত্তাকে যে পর্য্যন্ত আমরা আত্মানু-ভূতির বিষয় করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের এই

অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মকাণ্ড

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

(৩)

বেদান্তের মহাবাক্য কি? 'তত্ত্বমসি' (তুমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ)। এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নির্ব্বিকল্প নির্বিকার ব্রহ্মভাব যদি অনুভূতির বিষয় করিতে চাও, তাহাহইলে তোমাকে অগ্রে নিজ সঙ্কীর্ণ-জীবভাবকে বিরাট্, বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপক আত্মভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। যাঁহারা বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা হয় ত একথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন। তাঁহারা বলিবেন, এই যে মহাবাক্য, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, জীব নিজ বীরত্ব বদ্ধনপূর্ব্বক ঈশ্বরভাব গ্রহণ করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,যে চিদানন্দময় পরমার্থস্বরূপ, যে ব্রহ্ম, তাহারই উপর অজ্ঞানবশে যে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইয়াছে, সেই জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বরূপ দুইটি কল্পিত-ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক, সেই ব্রহ্মস্বরূপেই আত্মসত্তার উপলব্ধি করানই এই বাক্যের যথার্থ উদ্দেশ্য; এবং ইহাই যদি এই মহাবাক্যের উদ্দেশ্য হইল, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্গে প্রপঞ্চের অস্তিত্ব সাধকেরপক্ষে একপ্রকার বিলীন হইল। তাহাই যদি হইল, তবে কর্ম্মের বা কর্ম্মীর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইল; সুতরাং অদ্বৈত-ভাবনার সহিত কর্ম্মের বিরোধ রহিয়াই গেল। ফলে দাঁড়াইল এই যে,অদ্বৈত-চিন্তার ফল—কর্ম্মের উচ্ছেদ; সুতরাং, অদ্বৈতবাদ কর্ম্মের বিরোধী নহে, এই সিদ্ধান্ত আর টিকিল কৈ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই মহাবাক্যের চরম উদ্দেশ্যবিষয়ে যাহা উক্ত হইল, তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু এই চরম উদ্দেশ্যসিদ্ধির পূর্ব্বে অদ্বৈতভাবনাপ্রবৃত্ত সাধকের আর একটি অবস্থা আছে—সেই অবস্থার নাম সাধনাবস্থা। এই সাধনাবস্থার মধ্য দিয়া না যাইলে, একেবারে সেই চরমাবস্থা বা সিদ্ধিতে উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বলিতে চাই, নির্ব্বাণমোক্ষ বা নিগুর্ণ-ব্রহ্মভাবাভিব্যক্তি হইবার পূর্ব্বে জীবের সঙ্কীর্ণ জীবভাব পরিহারপূর্ব্বক, ঈশ্বরভাবের অভিব্যক্তিই অদ্বৈতবাদের গূঢ়মর্ম্ম। সকল উপনিষদ্ ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্র এই সাধনাবস্থার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছে। এই ঈশ্বরভাবের অভিব্যক্তিরই নাম ক্রমমুক্তি। এই ক্রমমুক্তির স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, অদ্বৈতবাদ কর্ম্মের বিরোধী নহে—প্রত্যুত ইহা সার্ব্বজনীন কর্ম্মবাদেরই পরিপোষক। এই ক্রমমুক্তির স্বরূপ কি এবং ইহা কি প্রকারে সুসম্পন্ন হইতে পারে?—এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

বেদান্তশাস্ত্রে মোক্ষের স্বরূপ দুইপ্রকার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, যথা—নির্ব্বাণমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি। যাঁহারা সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার এই জীবনকালের মধ্যে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদের প্রারব্ধ-কর্ম্মের অবসানে, এই দেহ-বিনাশের সঙ্গেই পরব্রহ্মরূপতার আবরক যে অজ্ঞান, তাহা একেবারে সংস্কারের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং, আর তাঁহাদের দেহান্তরে পরিচ্ছিন্ন-জীবভাবের আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর নহে। এই কারণে মৃত্যুর পরেই তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।— ইহাই হইল নির্ব্বাণ-মোক্ষ। কিন্তু যাঁহাদের তাদৃশ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এই জীবনে ঘটিয়া উঠে না—এবং দ্বৈতসংস্কারের প্রাবল্য-প্রযুক্ত অনেকের ভাগ্যেই তাহা সম্ভবপরও নহে—তাঁহারা এই কারণে ঈশ্বরভাবে সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানস্বরূপে আত্মার ভাবনা-নিরত হয়েন, এবং ভাবনার পরিপাক-দশায় তাঁহাদের আত্মাতে সর্ব্বপ্রপঞ্চসাক্ষী পরমেশ্বরের অভিন্ন-সত্তার উপলব্ধি এই জীবনেই কথঞ্চিৎ হইয়া উঠে। তাঁহাদের দেহপাতের পর, অন্তঃকরণে পরমেশ্বরাভেদভাবনার পরি-পাক-নিবন্ধন, একেবারে পরমেশ্বরভাবই আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই পরমেশ্বরভাবের উপলব্ধিকালে, তাঁহারা এই সামান্যতঃ-প্রসিদ্ধ যে পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মভাব—এবং তন্মূলক রাগদ্বেষাদি—তাহার সহিত আর সম্মিশ্রিত হয়েন না;

এবং এই ভাবে আপ্রলয়কাল যে অবস্থান, ও তাহার পরে পরব্রহ্মভাবের সমাপত্তি, তাহাই ক্রমমুক্তিপদ বাচ্য। এই ক্রমমুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, শ্রুতি বলিতেছেন—

"সএকধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা"—ইত্যাদি।

—ছান্দোগ্যোপনিষদ্। ৭।২৬।২।

"সেই ব্যক্তি এক হয়, আবার তিনও হয়; এইরূপ পঞ্চভাবে সপ্তভাবে নবভাবে তাহার স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে।"

ইহারই তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে যাইয়া, আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "এবমেকোঽপিসন্ বিদ্বান্ ঐশ্বর্য্যযোগাৎ অনেক ভাবমাপন্ন সর্ব্বাণি শরীরাণি আবিশতি"।

"এইভাবে বিদ্বান্ বস্তুতঃ এক হইয়াও ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অনেক ভাব প্রাপ্ত হইয়া, সকল শরীরের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।"

এই পরমেশ্বরভাব বা বিশ্বাত্মভাব আত্মাতে আবির্ভূত হইলে, একটী স্থূলদেহের বা তৎসংসৃষ্ট ইন্দ্রিয়াদির উপর পরিমিত আত্মভাব আর থাকে না—একটি দেহের উপর আর সঙ্কীর্ণ আত্মভাব চিত্তে রাগদ্বেষাদি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। তখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যত জীবদেহ আছে, সেই সকল দেহতেই এক অবিনাশী আত্মার ব্যাপকসম্বন্ধ আসিয়া পড়ে—পরস্পরের মধ্যে দ্বৈতাত্মভাবের সত্তা-নিবন্ধন যে একটা পার্থক্যের অনুভূতি,তাহা লুপ্ত হইয়া যায়; আকীট, আপতঙ্গ, আচতুরাননাদি পর্য্যন্ত অসংখ্য জীবদেহের অধিষ্ঠানস্বরূপ স্বীয় আত্মার চিদানন্দময়-সত্তাতে সকল দেহের অনুপ্রাণন বা সর্ব্বত্র সমদর্শন ফুটিয়া উঠে। এই প্রকার অবস্থাই হইল—বেদান্তের ক্রমমুক্তি। এইরূপ মুক্তপুরুষ যাহা কিছু দেখেন বা যাহা কিছু করেন, তাহা একের দেখা নহে বা একের কার্য্য নহে, সকলের যাহা মঙ্গলকর, সকলেরই যাহা অশুভনিবারক, সকলেরই যাহা আধ্যাত্মিক উন্নতিকর, এই কার্য্যই তখন তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। তোমার, আমার, রামের, শ্যামের যে দেহাত্মভাব-জড়িত অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তর্য্যামিস্বরূপে তিনি তখন সকলের প্রাণের ব্যথা বুঝিতে সমর্থ হয়েন—তোমার আমার প্রাণের নিভৃত সুপ্ত-বাসনার সূক্ষ্মতম প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি তখন তাঁহার বিরাট্ বিশ্বজনীন আত্মভাব তোমার বা আমার হৃদয়ে জাগাইবার জন্য, তোমার-আমার সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে জাগাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ দেহাত্মভাব নাই; সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে কোন ভোগও নাই। ভেদবুদ্ধিপ্রসূত রাগ বা দ্বেষের তীব্র-কশাঘাতে তাঁহাকে আর বিচলিত হইতে হয় না। এই বিরাট্ বিশ্ব-জনীন ও বিশ্বপ্রেমময় আত্মভাবের উপলব্ধিই—ক্রমমুক্তি। এই ক্রমমুক্তির পথে যাইতে হইলে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের সাধনা একান্ত আবশ্যক। এই কর্ম্মের সাধনা অদ্বৈত-ভাবনার বিরোধী নহে—ইহা জ্ঞানের পথের কণ্টক তুলিয়া ফেলে, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য দেখাইবার উপায়স্বরূপ চিত্ত-বিশুদ্ধি সম্পাদন করে। এই কর্ম্মসাধনার স্বরূপ ও ফল-নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, শ্রুতি কি বলিতেছেন? শ্রুতি বলিতেছেন—

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন তপসা দানেন অনাশকেন চেতি।"

—"সেই এই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরকে বুঝিবার জন্য (তাঁহার সত্তায় নিজের সঙ্কীর্ণ আত্মসত্তা মিশাইয়া দিবার জন্য) ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ নির্ব্বাচন করেন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন, দান করিয়া থাকেন এবং বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।"

এই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, কর্ম্মী-সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। কেন ও কি প্রকারে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তাহাও দেখা যাক।—আমাদের চিত্তের স্বভাবই এই যে, ইহা চঞ্চল অর্থাৎ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ইহা একান্তভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, চিত্তের রজোগুণের আধিক্যই এই চঞ্চলতার কারণ। চিত্ত হইল দর্পণস্বরূপ; আর এই দর্পণ-স্বরূপ চিত্তের চাঞ্চল্যই ইহাতে চিদাত্ম-প্রতিবিম্বের পূর্ণ-প্রকাশ হইতে দেয় না। জল নির্ম্মল ও স্থির হইলে তাহাতে যেমন পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে স্ফুরিত হয়,পঙ্কিল ও চঞ্চল জলে তেমন স্পষ্টভাবে উহার স্ফুরণ হয় না, ইহা সকলেরই বিদিত। সেইরূপ, আমাদের অন্তঃকরণরূপ দর্পণে চাঞ্চল্য ও অবসাদরূপ মলিনতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই অন্তঃ-করণে সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ব্রহ্মের পূর্ণ-প্রতিবিম্ব কখনও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতে পারে না; এবং অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত পূর্ণ-ব্রহ্মের সত্তাকে যে পর্য্যন্ত আমরা আত্মানু-ভূতির বিষয় করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের এই

সঙ্কীর্ণ জীবভাবের বিলয় করিতে সমর্থ হইব না। এই কারণে সাধকের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্যকর্ম্ম এই যে—তাহার চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হইবে, এবং সেই চিত্তের চাঞ্চল্য বা রাজসভাব দূর করিতে হইবে। এই রাজস ও তামসভাব অর্থাৎ অবসাদ ও চাঞ্চল্য, দূর করিবার যত উপায় আছে, তাহার মধ্যে বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়। কেন যে ইহা সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়, তাহা বলি। পূর্ব্বেই সূচনা করিয়াছি যে, মানুষের—শুধু মানুষেরই বা কেন, জীবমাত্রেরই—স্বভাব এই যে, সে কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না; তাহার আজন্মসিদ্ধ প্রকৃতি—তাহার ইচ্ছা থাক বা নাই থাক—তাহাকে কোন-না কোন একটা কার্য্য করাইবে, ইহা স্থির। গীতাতেও এই কথা বলা হইয়াছে—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কার্য্যং সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

"কোন জীবই ক্ষণকালও কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না; আজন্মসিদ্ধ প্রকৃতিগুণ সকলকেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিয়া থাকে।" ইহাই যদি হইল আমাদের স্বভাব, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত আমাদের উপর এই কার্য্যপ্রসবিনী প্রকৃতির আধিপত্য নষ্ট না হইবে, সেইপর্য্যন্ত আমাদিগকে কার্য্য করিতেই হইবে—ইহা স্থির। কিন্তু এই কার্য্য যদি করিতেই হইবে, তবে এমনভাবে সেই কার্য্য করা উচিত, যাহাতে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা আমাদের চিত্তের অবসাদ ও চাঞ্চল্য আর না বাড়ে;—প্রত্যুত সেই অবসাদ বা চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে; কারণ, চিত্তের চাঞ্চল্য বা অবসাদ আমার সকল প্রকার দুঃখের মূলীভূত কারণ। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কিরূপ কার্য্য করিলে এই চাঞ্চল্য বা অবসাদ দূর হইতে পারে। ইহার উত্তরে অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, যে কর্ম্ম বিহিত, তাহাই কর্ত্তব্য। বিহিত কর্ম্ম কি? যে কর্ম্ম তুচ্ছ স্বার্থভোগলিপ্সাপ্রণোদিত নহে—যাহার অনুষ্ঠানের ফল দেহের অস্বাস্থ্য-নিবৃত্তি ও দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, যাহার অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, এবং অন্তঃকরণে সন্তোষের শান্ত জ্যোৎস্না ফুটাইয়া দেয়। সে কর্ম্ম করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া কিছুকালের জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ক্লেশ অনুভব করিতে হয়, এবং সেই ক্লেশানুভবের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধিতের ও তৃষিতের প্রতি একটা সমবেদনা জন্মাইতে থাকে; এবং তাহার ফলে পীড়িতের, ব্যথিতের দুঃখ দূর করিবার জন্য হৃদয়ে নিরুপাধিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, ও সেই জাতীয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইলে চিত্তে স্বর্গীয় সন্তোষের উদয় হয়। এই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই—বিহিত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কহে।—সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনস্থ ও সাধনাবস্থ সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা কিছু অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে, একটু প্রণিধান সহকারে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, সেই সকল বিহিত-কর্ম্মই এই প্রকার লক্ষণযুক্ত। ইহাই বিশিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য ভগবান মনু স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়াসুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥"

—"বেদাধ্যয়ন, গুরুগৃহে বাসকালে, ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গস্বরূপ, ব্রত সমূহ, হোম, শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পদার্থের বিচার ও অধ্যাপন, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ, গৃহস্থ-কর্ত্তব্য অতিথি-সেবা প্রভৃতি পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং অন্যান্য সর্ব্বভূতহিতকর যজ্ঞপদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মরাশি—ইহা সকলই এই শরীরকে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়া থাকে।"—ইহাই হইল হিন্দুর সনাতন কর্ম্মবাদ। এই কর্ম্মবাদের সম্যক্ অনুশীলন করিয়া, ইহার চরম-লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহাহইলে, সেই অনুষ্ঠানের ফলে, মানব চিত্তশুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়; অর্থাৎ, এই প্রকার কর্ম্ম করিতে করিতে দেহ রোগহীন হয়, চিত্ত অবসাদ ও চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হয়। এই প্রকারে বিশুদ্ধচিত্ত নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় যথাভূতবস্তুস্বরূপের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়। এই বিশুদ্ধ চিত্তদর্পণে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের ভূমানন্দময়ী মূর্ত্তি যতই প্রকাশপ্রাপ্ত হয় ও সমান-জাতীয় সংস্কার সমূহের আবির্ভাববশতঃ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, সেই পরিমাণে সাধকের শোক, দুঃখ, আধি ও ব্যাধি প্রভৃতির নিত্যসহচর—পরিচ্ছিন্ন-দেহাত্মভাব বিদূরিত হইতে থাকে; এবং তাহারই সঙ্গে সেই ভূমানন্দময় সর্ব্বভূতাত্মভাব জাগিতে থাকে।

বেদান্তশাস্ত্রের প্রবীণ আচার্য্যগণও ঈশ্বরোপাসনা এবং বিহিতকর্ম্মের প্রভাবে বিশুদ্ধসত্ত্ব জীবের এই পরমেশ্বর-ভাবাভিব্যক্তি বিস্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়াছেন—

"উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।"—বেদান্তসূত্র ১।৩।১৯।

এই সূত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—

“তস্মাদ্ যদ্ অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতং অপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্ত্তৃভোক্তৃরাগদ্বেষাদি দোষকলুষিত মনেকানর্থযোগি তদ্‌বিলয়নেন তদ্বিপরীত মপহত পাপ্মত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপদ্যতে।”

—“এই সূত্রের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, এই যে জীবভাব, ইহা পারমার্থিক নহে ; কিন্তু ইহা অবিদ্যা দ্বারা আরোপিতমাত্র। এই আরোপিত জীবভাবই কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, রাগদ্বেষ প্রভৃতি দোষনিবহে কলুষিত এবং সংসারের সকলপ্রকার অনর্থের হেতু। সাধক, বিদ্যার প্রভাবে, এই কল্পিত, সুতরাং অপারমার্থিক, জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া, সকল প্রকার অনর্থ হইতে বিমুক্ত পরমেশ্বরভাবকে লাভ করিয়া থাকে।”

ইহাই হইল—অদ্বৈতাত্মবাদীর চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য প্রাপ্তির পক্ষে বিহিত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রতিকূল নহে, প্রত্যুত অনুকূল। বেদান্তদর্শনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত দেশের শিক্ষিত-ব্যক্তিগণ, যেন এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অদ্বৈতাত্ম-ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই আমার তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন। তাই আবার বলিতেছি—অদ্বৈতাত্মভাবনা আমা-দিগের পক্ষে কর্ম্মের উচ্ছেদকারিণী নহে ; ইহার সহিত কর্ম্ম-বাদেরসম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যাঁহারা বলিয়া থাকেন—অদ্বৈতাত্মবাদ ভারতবর্ষের কর্ম্মবাদের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে ও করিতেছে, অদ্বৈত-বাদের অনুশীলনে মানুষ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়, এবং বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, যথেচ্ছাচারী হয় ; সুতরাং, অদ্বৈতাত্মভাবনা মনুষ্য সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে—ইত্যাদি ; তাঁহারা অদ্বৈতবাদের অভিপ্রায় বুঝেন না, সুতরাং, তাঁহাদের কথায় আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না।—অদ্বৈতদর্শনই একমাত্র জীবের সর্ব্বানর্থনিবৃত্তির পথ। ইহার সাহায্যে জীবের সঙ্কীর্ণভাব দূর হয়—সর্ব্বজীবের সহিত একাত্মভাবের উদয় ইহারই প্রসাদে হয়। ইহাই মানবের মানবত্বকে পূর্ণ করিয়া থাকে, সুতরাং, বিহিতভাবে ইহার আলোচনা, বর্ত্তমানকালে, আমাদের সমাজে প্রভূত মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিবে—ইহাই আমার ধারণা। শুধু আমারই বা বলি কেন, ভারতের বরণীয় ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণেরও ইহাই ধারণা ছিল ; এবং এই ধারণারূপ মহাভিত্তির উপরেই হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—এবং আশা হয় যে, এইভাবে থাকিবেও চিরদিন।

দর্পহারী

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি. এ.]

বেশ হয়েছে, বেশ করেছ, ওগো দয়াল হরি !
সবার কাছে মান হরেছ অপার কৃপা করি’ !
ভেবেছিলাম, আমার লাগি’
স্নেহ তোমার নিত্য জাগি’—
কেবল সুখ শান্তি দিয়া
জীবন দিবে ভরি’ !
ওগো আমার দর্পহারী—
সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারী !
আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলে,
সে নয় হিতকরী।

ফুলের মাঝে কাঁটার মত
সুখের সঙ্গে দুঃখ যত ;
ফুলটি নিলে চলবে নাকো
কাঁটায় পরিহরি’।
চিত্তে ছিল, উচ্চে আমি—
বুঝেছিলে অন্তর্যামী—
সবার নীচে নামিয়ে দিলে
ধূলি-ধূসর করি’ !
বেশ হয়েছে, বেশ করেছ, ওগো দয়াল হরি !
তোমার দে’য়া দুঃখ আজি মাথার ’পরে ধরি !

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ.]

(৪৩)

এই বাগানবাড়ীতে আসিবার পর হইতেই, দয়াদিদির মনে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমাকে মিলিত দেখিবার বাঞ্ছা জাগিয়া উঠিল।

তাহার মনে হইল, এমন শক্তিমান্ জমীদারের আশ্রয় পাইয়াও, যদি সে এ শুভকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে না পারিল, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে বোধ হয়, আর তাহা ঘটিয়া উঠিবে না—এরূপ শুভ সুযোগ জীবনে প্রায়ই একটিবারের জন্য আসে—আর আসে না!

আমাদের দেশের লোক কেহ নন্দীগ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। দয়াদিদিও কখন শুনে নাই। নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহার বোধ হইয়াছে, সে দাক্ষায়ণী ও পিতামহীকে সাতসমুদ্র তেরনদীপারে উপস্থিত করিয়াছে।

ভগ্নমন ও ভগ্নদেহ লইয়া পিতামহী আবার যে সেস্থান হইতে প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরিতে পারিবে, দয়াময়ীর সে আশা রহিল না। পিতামহীকে দেখিয়া এবং তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়াই, সেটা সে বুঝিতে পারিয়াছে।

তাহার বোধ হইল যেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত, দেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখ প্রাণকে তিনি কোনও প্রকারে জোর করিয়া দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। একটু অন্যমনস্ক হইলেই, যেন সে পিঞ্জর ফেলিয়া অনন্ত আকাশলক্ষ্যে ছুটিয়া যাইবে।

দাক্ষায়ণীকে পাইয়া, তাঁহার সুখেরও অবধি ছিল না—দুঃখেরও অবধি ছিল না। যুগে যুগে অজস্র-সঞ্চিত পুণ্য না হইলে দাক্ষায়ণীর মত বধূ কখন ঘরআলো করিতে আসে না। কিন্তু বড় দুঃখ, বধূ যদি আসিল, সে চৌকাটে পা দিতে না দিতেই, গৃহস্বামীর পাপে ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। বধূ, শ্বশুরগৃহবাসের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াও, তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইল না!

শৈত্য ও উত্তাপের অত্যধিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ, শৈল-দেহ গ্রন্থিসকল উত্তরোত্তর শিথিল করিয়া কালে তাহাকে যেরূপ বালুকাস্তূপে পরিণত করে, উল্লাস-বিষাদের নিত্য-ঘাত-প্রতিঘাতে পিতামহীর হৃদয়ও দিন দিন সেইরূপ চূর্ণ হইতেছিল।

এতদিন নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া দয়াদিদির তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ হয় নাই। দুই চারি দিন নূতন-বাড়ীতে বাস করিতে না করিতে পিতামহীর অবস্থা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিল, ঠাকুরমা আর অধিকদিন বাচিবেন না। বালিকা দাক্ষায়ণী সেটা বুঝিতে পারে নাই। পিতামহী, সদানন্দময়ীরূপে তাহাকে অঙ্কগত করিয়া, নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিতে দেন নাই। বিশেষতঃ, নূতন-বাসায় আসিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বিপুল ঐশ্বর্য্যের আবরণভার তিনজনের কাহারও সহ্য হইতেছিল না—দাক্ষায়ণীর একেবারেই না। সাধ করিয়া যাহার পিতা-মাতা দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করিয়া-ছিল, তাহাদের ভাবপুষ্টা বালিকা নন্দরাণী, অট্টালিকার মধ্যে কাঞ্চন-পিঞ্জরাবদ্ধা পাখীটির মত, নিজের সৌভাগ্যের মর্ম্মটা ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাগানবাড়ীতে আসিয়া তাহার অনেকটা স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। বালিকা এরূপ বাড়ী জীবনে কখন দেখে নাই। তবু স্থান নির্জ্জন এবং রাজান্তঃপুরযোগ্য কোলা-হল হইতে অনেকটা দূরে বলিয়া, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা দুই দিনের ভিতরেই তাহার অন্তর হইতে দূর হইয়া গিয়াছে।

পিতামহীর দৈহিক অবস্থা দাক্ষায়ণী বুঝিতে না পারিলেও, দয়াদিদির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে মনে মনে স্থির করিল, ঠাকুরমার অবসাদের ঔষধ-

সংগ্রহের একবার চেষ্টা করিবে। সে ঔষধে পিতামহীর জীবনরক্ষা হয়, সুখের কথা; না হয়, তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে চিত্তের অপ্রসন্নতা অন্ততঃ বিদূরিত হইবে।

দয়াদিদি, আমার হরণ-ব্যাপারের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিল। তাহাতে, সাধারণের সন্তুষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলেও, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, কথাটা লোকচক্ষে বিগর্হিত হইলেও, তাহা করা ভিন্ন তাহার অন্য উপায় ছিল না; অথবা, উপায় থাকিলেও, তদবলম্বনে তাহার সাহস ছিল না।

সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে অসদুপায় অবলম্বনের যে ফল, তাহা ফলিয়াছিল। তথাপি, আমি তজ্জন্য দয়াদিদিকে দোষ দিতে পারি না; দোষ যাহা, তাহা আমার ভাগ্যের।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"প্রথম তিনদিন ঠাকুরমা'র অবস্থা বুঝিবার আমি অবসর পাই নাই। প্রথম দিনটা ঘর গুছাইতেই একরূপ কাটিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কাহারও গুছাইয়া রাখিবার মত সম্বল কিছুই ছিল না; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, নন্দরাণী আগে হইতেই সেখানে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী অনেক দ্রব্যই পাঠাইয়াছে। ব্রজমোহনের উপর সেগুলি গুছাইয়া রাখিবার ভার ছিল; কিন্তু আমরা এত শীঘ্র নন্দরাণীর ঘর হইতে চলিয়া আসিয়াছি যে, সে এই অল্পসময়ের মধ্যে দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রক্ষা করিতে পারে নাই।

"সেস্থানে উপস্থিত হইয়া, ব্রজমোহনের সাহায্যেই আমাকে দিনটা অতিবাহিত করিতে হইল।

"দ্বিতীয়, তৃতীয় দিবসও সুবিধা হইল না। আমাদিগকে, বিশেষতঃ দাক্ষায়ণীকে, দেখিবার জন্য গ্রামবাসিনী বৃদ্ধা, তরুণী, বালিকা, সধবা, বিধবা, অনূঢা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অপর জাতীয়া স্ত্রীলোক, একরূপ দলে দলে, আসিতে লাগিল। দাক্ষায়ণীর কথা ইতিমধ্যে, রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া, সারাগ্রামটায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে!

"তৃতীয় দিনের শেষভাগে জনতা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, বাধ্য হইয়া ব্রজমোহনকে সেখানে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে হইল। তৃতীয় দিবসে আমরা নিজেদের বিপন্ন বোধ করিয়াছিলাম। মেয়েগুলা যে আসিয়া শুধু আমাদের দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে, তাহা নয়। তাহাদের অবিরাম প্রশ্নে আমাকে উত্ত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। দাক্ষায়ণী বালিকা; সে সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? ঠাকুরমা উত্তর দিতে অশক্ত। তাহাদের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর আমিই দিতে লাগিলাম। শেষে, উত্তর দেওয়া আমারও পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ব্রজমোহন সেটা বুঝিল এবং লোকজনের আসা একরূপ বন্ধ করিয়া দিল।

"চতুর্থ দিবসে আমরা লোকের দেখা হইতে নিস্তার পাইয়াছি।

"এতদিন কিন্তু রাজবাড়ী হইতে কেহই আমাদের দেখিতে আসে নাই—না নন্দরাণী, না তাহার কন্যা ললিতা, না তাহাদের অপর কোন আত্মীয়া। একমাত্র ব্রজমোহন মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের তত্ত্ব লইতেছিল। আমরা, অন্যসকল বিষয়ে তাহাদের আচরণে নিশ্চিন্ত হইলেও, তাহাদের অনাগমনে কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম।

"প্রথম তিনদিন মনে করিলাম, বহুলোকের সমাগম দেখিয়া, আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুযোগ হইবে না বলিয়া, তাহারা আসে নাই; অথবা, আসিয়া, বাগানের ফটক হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।

"চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যা পর্য্যন্তও যখন কেহ আসিল না, তখন আমাদের মনে একটা সন্দেহ হইল।

"আমাদের, অর্থাৎ, ঠাকুরমা ও আমার। দাক্ষায়ণী অবশ্য সন্দেহের কোনও ধার ধারে নাই। সে আজ, লোকের অভাবে কতকটা ফুরসৎ পাইয়া, বাড়ীর সংলগ্ন সুন্দর পুষ্করিণীর তীরে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। লোক না থাকিলেও, সেখানে তাহার সঙ্গীর অভাব ছিল না। পুষ্করিণীর চারিধারে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানাবিধ ফুলের গাছ ছিল। মাঝে মাঝে সুন্দর কেয়ারি-করা কামিনীফুলের গাছ, আপনাদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার আবরণে এক একটি কুঞ্জের মূর্ত্তিতে, সেই ছোট ছোট ফুল-গাছগুলির অভিভাবিকা-সঙ্গিনীর মত দাঁড়াইয়া ছিল। বালিকা, সেইসকল ফুলগাছের পার্শ্বে এক একবার দাঁড়াইয়া, শুধু দৃষ্টি দিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে-ছিল, অথবা, গলার ঠাকুরটির সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করিয়া দিতেছিল। নন্দরাণীদের বাড়ী হইতে কেহ আসিল, কি না, সে খবর লইবার তাহার প্রয়োজন ছিল না।

"প্রয়োজন হইয়াছিল—ঠাকুরমার, এবং তাঁহাদেরই জন্য,

তাঁহাহইতেও অধিক প্রয়োজন হইয়াছিল—আমার। নন্দরাণীর পরিচয়সম্বল করিয়া আমিই ত তাহাদের এখানে আনিয়াছি!

"একবার মনে করিলাম, ব্রজমোহনকে জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম না। মনে করিলাম, দেখিই না কতদিন তাহারা না আসিয়া থাকিতে পারে। দুইচারি দিন অপেক্ষা করিব। আসে ভালই, না-আসে, পুরীর পথ ধরিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে, শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইব। আমরা ত সন্ন্যাসিনী; লোকের সঙ্গে আমাদের বাধ্য-বাধকতার প্রয়োজন কি!

"ঠাকুরমার মনে কিন্তু কি যেন একটা কি, সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে! সে সন্দেহের বিষয়টা প্রথম প্রথম ঠিক ধরিতে না পারিলেও, আমি মনে মনে বুঝিয়াছিলাম;—নন্দীগ্রামে আমাদের অবস্থানে তিনি বিশেষ সুখী ছিলেন না।

"আমি তাঁতির মেয়ে-ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণকন্যা দুটীর সঙ্গিনী হইয়াছি। সঙ্গিনী হইবার পর হইতে, এই কয়মাস ধরিয়া তাঁহাদের আচারনিষ্ঠা দেখিতেছি।

"শুধু ব্রাহ্মণকন্যা বলি কেন—ইঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা বিধবা, অপর একজন কুমারী ব্রহ্মচারিণী। দুইজনেই বিষম কঠোরতা অবলম্বনে, অতি সন্তর্পণে, জীবনযাপন করিতেছেন।

"আমি, তাঁহাদের মধ্যে পড়িয়া, সঙ্গগুণে অল্পে অল্পে 'বামনী' হইতেছিলাম। আমারও আচার-ব্যবহার, ধীরে ধীরে, অনেকটা ব্রাহ্মণবিধবার মত হইতেছিল। আমাদের জাতির বিধবাদের যেসমস্ত আচার দোষাবহ নয়, সেগুলা ক্রমে ক্রমে আমার চক্ষে মন্দ ঠেকিতে লাগিল। আমি এখন ইহাদেরই মত হবিষ্যাশী, একাহারী। ঠাকুরমা'র মত আমিও একাদশীর দিনে নিরম্বু উপবাস করি। প্রথম প্রথম বড়ই ক্লেশ হইত; কিন্তু ঠাকুরমাকে সম্মুখে আদর্শ পাইয়া অভ্যাসবশে এখন আমার কষ্ট সহিবার ক্ষমতা হইয়াছে। সত্য কথা বলিতেছি, আমি তাঁতির মেয়ে, একথা না বলিলে কাহারও আমাকে শূদ্রাণী বুঝিবার সাধ্য ছিল না। দেশভেদে আচারভেদ। আমাদের দেশে কায়স্থ-বিধবারা ব্রাহ্মণ-বিধবারই মত আচার-পালন করেন; কিন্তু এখানে তাহার কিছু পার্থক্য দেখিলাম। শুধু কায়স্থ নয়,—এস্থানের ব্রাহ্মণ-বিধবারাও আমাদের দেশের মত বৈধব্যের কঠোরতা অবলম্বন করে না।

"নন্দরাণীর বাড়ীতে আসিয়া এই পার্থক্যটাই আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। যদিও ঠাকুরমা ইহার জন্য তাহাদের কাহাকেও দোষ দিতেন না, তথাপি রাজবাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে সংশ্রবে তাঁহার কেমন একটা কুণ্ঠাবোধ হইত। সেখানে যে কয়দিন ছিলাম, সেই কয়দিনই তাঁহাকে দেখিয়া সেটা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম।

"কিন্তু রাজবাড়ী হইতে অনেকটা দূরে আসিয়াও তাঁহার মনের অস্থিরতা কেন যে দূর হইতেছিল না, সেটা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার মুখ দেখিলেই মনে হইত, তিনি যেন সর্ব্বদাই সন্দেহাকুলিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন।

"আমি কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করি নাই; প্রশ্ন করিবার কোনও প্রয়োজন বুঝি নাই। দাক্ষায়ণী এ বাড়ীতে আসিয়া অনেকটা আনন্দিত আছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছিলাম। তোমরা যাহা বল, অথবা যাহা বুঝ, আমি কিন্তু তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীর সহচরী হইবার পর হইতে সেই ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

"আমি তাহাকে সর্ব্বদা ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা করিতাম। চেষ্টায় সফল হইতাম কি না জানি না; কিন্তু তাহার মুখ দেখিলেই মনে হইত, সে তাহার দৃষ্টির এক-আনা অংশ বাহিরে রাখিয়া, অবশিষ্ট পোনেরো-আনা ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

"সেই পোনেরো-আনা দৃষ্টি-শক্তি লইয়া লোকের ভিতরে, অবস্থার ভিতরে, যখন সে একবার চক্ষু স্থাপিত করিত, তখন ভিতরের কোন সামগ্রী তাহার আর অগোচর রহিত না।

"এ আমি নিজের বেলায় এক দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দাক্ষায়ণী কতকটা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়াছিল। নন্দরাণীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই আমার কিন্তু মনোমধ্যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল। অবশ্য নানা উপদেশে মনকে অনেকটা শান্ত করিলেও বুদ্‌বুদ্-গুলাকে নিবারণ করিতে পারিতেছিলাম না। সেই এক-একটা বুদ্‌বুদের মাথায় আমার পূর্ব্ব-জীবনের এক-একটা

ছবি, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা বুকে পূরিয়া, আমার কাণের ভিতরে ধ্বনি তুলিতে লাগিল। পিতার ঐশ্বর্য্য, শ্বশুরের সম্পদ্, সম্পত্তির নাশ, মৃত্যুর লীলা, পুত্রের অপঘাত —ছবিগুলার খোর এক-একটা, সূচীর আকারে, আমার বক্ষবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

"দাক্ষায়ণী, আমার পার্শ্বে বসিয়া, সম্মুখে একখানি আরসী রাখিয়া, সিঁথায় সিন্দূর দিতেছিল, এবং মাতৃদত্ত সেই ভস্ম-মাখা সিন্দূরে অতি-যত্নে কপালে টিপ পরিতেছিল। চোখ ঘুরাইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া, সে যেন নিজের সেই অবস্থানের অপূর্ব্ব রূপটী ওলটপালট করিয়া দেখিতেছিল।

"দেখিতে দেখিতে, আরসী হইতে চোখ তুলিয়াই সে বলিয়া উঠিল—'হাঁ দিদি, তুমি শ্বশুরঘর ছাড়িয়া আসিলে কেন?'

"কথা শুনিবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রত্যুত্তরে আমি প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—'কেন ভাই, আসিয়া কি অন্যায় করিয়াছি?'

'আগে বল, কেন ছাড়িয়া আসিয়াছ?'

"'বংশের সব নির্ম্মূল হইয়া গেল ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল; একমাত্র ছেলে ছিল, তাকেও শৃগালে খাইল—এই সকল কারণে সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলাম না।'

"দাক্ষায়ণী শুনিল, কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ ভাই, আমি কি শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া অন্যায় করিয়াছি?'

"দাক্ষায়ণী, ন্যায়-অন্যায়ের কথা কিছুই না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'শ্বশুরের বাস্তভিটায় সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবার জন্য তোমার শ্বশুরবংশের আর কেহ কি অবশিষ্ট আছে?'

"আমি বলিলাম—'কেহ নাই।'

"'কেহ নাই?'"

"'না দাক্ষায়ণী, আমি বংশের শেষ বধূ।'"

"দাক্ষায়ণী আরসী হইতে মুখ তুলিল—আমার মুখের পানে অতি কোমলদৃষ্টিতে চাহিল। সেই মধুময় দৃষ্টিই আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিল; তাহার চাহনিতেই বুঝিলাম, আমি অন্যায় করিয়াছি।

"আমি কৈফিয়ত দিবার জন্য বলিলাম—'পোড়া পেটের জন্য আমাকে ঘর ছাড়িতে হইয়াছে।'

"এইবার বালিকা ঈষৎ যেন বিরক্তির সহিত বলিল—'না দিদি, ওকথা বলিও না। ওকথা বলিলে মিথ্যা কথা হয়। আমার বাবার পায়ে তুমি হাত দিয়াছ, তুমি সত্য বলিতে ভয় পাইতেছ কেন?'

"আর আমি তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না, চিন্তার ভারে আক্রান্ত হইয়া তাহার সমীপে বসিয়া রহিলাম—অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। নন্দরাণীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে যে ঈর্ষা জাগিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। আমার বোধ হইল, আমার শ্বশুরের অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট ইটগুলি সব সোণার। আমি, সে অতুল ঐশ্বর্য্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া, নিজেকে দরিদ্র ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিয়াছি। আমি গ্রামত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর দুইটি ঘর অবশিষ্ট ছিল। ঘর দুইটি অৰ্দ্ধভগ্ন হইলেও, আমার মত বিধবার সেখানে যথেষ্ট স্থান ছিল। বাস করিতে ইচ্ছা করিলে গ্রামে আমার যে চাকরী জুটিত না, এমন নহে। শুধু অভিমানে ও লজ্জায়, আমি গ্রামবাসীর কাহারও গৃহে চাকরী স্বীকার করিতে পারি নাই।

"আমি সেই দশমবর্ষীয়া ক্ষুদ্র বালিকার কাছে অপরাধ স্বীকার করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি যে এই অধর্ম্মের কাজ করিয়াছি, তাহাতে আমার গতি কি হইবে?'

"দাক্ষায়ণী হাসিয়া উত্তর করিল—'তোমার যা গতি দিদি, আমারও তাই। আমিও তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।'

"এই এক কথাতেই আমি আশ্বস্ত হইলাম। পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তাহার পদধূলি লইলাম।

"রাত্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম—আমার স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি শ্বশুরকুলের চৌদ্দপুরুষ, আমার সেই ভগ্নগৃহের ঘনান্ধকারমধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। মুক্তির অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া, সকলে একসঙ্গে যেন কাহার সাহায্য-প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। আমি সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, সকলে কাতরকণ্ঠে আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল। 'ওগো! বংশের শেষপ্রতিনিধি মমতাময়ী কুলবধূ! শীঘ্র আমাদিগকে এই অন্ধকূপ হইতে মুক্ত কর।' কিন্তু হায়, আমার হাতে ত দীপ নাই! আমি তাহাদের মুক্ত করিব কি—আমি নিজেই, সে গাঢ়-অন্ধকার দেখিয়া, ভীত

হইয়াছি। মুক্ত করিব কি, আমিই মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।

"আমার মনে তখন এক বিষম অনুতাপ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার দীপ দূরে ফেলিয়া, হায়, কি লোভে আমি শ্বশুরের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়াছি? আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল, বক্ষ বিদীর্ণপ্রায় হইল। এমন সময় দেখি—দাক্ষায়ণী, এক অপূর্ব্ব সোণার প্রদীপহস্তে, বাড়ী-সম্মুখের পথ আলোকিত করিতে করিতে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই আমাকে বলিল—'দিদি! তোর চোদ্দ পুরুষের ঐশ্বর্য্য এই বাস্তুভিটার দীপ! ইহাকে নিক্ষেপ করিয়া, তুই কার ভস্ম সম্পত্তিতে লোভ করিয়াছিলি? এই নে—ইহার সাহায্যে তুই তোর চৌদ্দ-পুরুষকে অন্ধকার কারাগার হইতে উদ্ধার কর্।'

"পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, বুঝিয়াছিলাম—সুবর্ণদীপ হাতে লইয়া সতী সংসারের অন্ধকারময় পথে বাহির হইয়াছে; জন্মান্তরের পুণ্যফলে আমি তার আঁচল ধরিয়াছি। কার্পণ্য না করিয়া, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, যদি তাহার সেবা করিতে পারি তাহা হইলে, শ্বশুরকুলের মুক্তির জন্য আর চিন্তা করিতে হইবে না।

"সুতরাং, নূতন বাড়ীতে আসিবার পর হইতে, নন্দরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায়, আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম। দাক্ষায়ণীকে প্রফুল্ল দেখিয়াই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, দাক্ষায়ণীর প্রতি অগাধ স্নেহই পিতামহীর ব্যাকুলতার কারণ হইয়াছে।

"আমাদের বাড়ীখানি খুব বড় না হইলেও, দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। গৃহস্থের হিসাবে, তাহাকে ঠিক বাড়ী বলা চলে না—অনেকটা বৈঠকখানারই ধরণের। তাহার সদর-অন্দর দুইই সমান ছিল। কেবল একটা রান্নাবাড়ী তাহার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল বলিয়া, তাহা আমাদের বাসযোগ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ, সে বাগানে পুরুষ-মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল বলিয়া, আমাদের সদর-অন্দর আলাহিদা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাহিরের দিকে এক দরোয়ান পাহারা দিত; সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে দুইজন বিধবা, আর একটি বালিকা; সুতরাং, দরোয়ানকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইবার মত লোক আমাদের মধ্যে কেহই ছিল না।

"দাক্ষায়ণী পুষ্করিণীতীরে বেড়াইতেছিল। আমি, বাহির দিকের বারান্দায় বসিয়া, সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখিয়া, তাহার গতিবিধি দেখিতেছিলাম। দূরে, ফটকের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের রোয়াকে বসিয়া, দরোয়ান অতি তন্ময়তার সহিত সিদ্ধি বাটিতেছিল। ফটক ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া, মাদকসেবনের পূর্ব্বেই, তার চিন্তার নেশায় বুঁদ হইয়াছিল।

"আমি দেখিলাম, দাক্ষায়ণী, বেড়াইতে বেড়াইতে, পুষ্করিণীর তীর পরিত্যাগ করিয়া,ফটকের দিগভিমুখে চলিল। ভাবিলাম, সদরের দিকে যাইতে তাহাকে নিষেধ করি। আবার ভাবিলাম, সঙ্গিহীনা বালিকার ইচ্ছামত ভ্রমণের আনন্দে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। বাধা দিলাম না। দাক্ষায়ণী, দরোয়ানের সম্মুখ দিয়া, বাড়ীর অপরপার্শ্বের আম-কাঁটালের বাগানের দিকে চলিয়া গেল। যেখানে বসিয়া ছিলাম, সেখান হইতে আর তাহাকে দেখা গেল না। দেখিলাম, দরোয়ানও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

"তাহার দাসীত্ব গ্রহণের দিন হইতে, আমি তাহাকে সর্ব্বদাই চোখেচোখে রাখিয়া আসিতেছি। জাগরণে, এক দণ্ডের জন্যও সে তাহাকে কাছছাড়া করিয়াছি, অথবা একা থাকিতে দিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না।

"সুতরাং, সে দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র, বাড়ীর অপর পার্শ্বের বারান্দায় যাইবার জন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

"উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঘরের মধ্যে একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটায় অনুমান হইল, একটা গুরু সামগ্রী যেন মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

"আমি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল; দেখি ঠাকুরমা মেঝেয় পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছেন! আমি, সে দৃশ্য দেখিয়া, নিজেই প্রথমে সংজ্ঞাহারার মত হইলাম। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। ঝি কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, কিয়ৎক্ষণের জন্য ছুটি লইয়া, নিজের বাড়ীতে গিয়াছে। ঠাকুরমার সাহায্য করিতে আমি একা! দাক্ষায়ণীকে ডাকিবার আমার ইচ্ছা ছিল না; সে বালিকা, মায়ের এ অবস্থা দেখিলে ভয়ে ব্যাকুল হইতে পারে!

"মুহূর্ত্তে, সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলাম। ক্ষিপ্রগতিতে অপর গৃহে রক্ষিত জলের

ঘড়া লইয়া আসিলাম। জলাধার ভূমিতে রাখিয়া, একবার অঞ্চলে কোমর বাঁধিলাম।

"সেই ঘরের একপার্শ্বে, মেজের উপরেই, ঠাকুরমার শয্যা ছিল। আমি ভাবিলাম, শয্যা বিছাইয়া, অগ্রে তাহার উপর শয়ন করাইয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করি—অথবা, তাঁহাকে সুস্থ করিয়া, পরে শয্যার উপর রক্ষা করি? শেষোক্ত কার্য্যটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, আমি কলসী হইতে প্রথমে অঞ্জলিপূরিয়া জল লইলাম। ঠাকুরমাকে তদবস্থ দেখিয়া, চিত্তের অত্যন্ত চাঞ্চল্যবশতঃ, আমি একটা ঘটী আনিতে ভুলিয়াছিলাম। এইজন্য, এক হস্তের অঞ্জলি ভিন্ন, জল সংগ্রহের আমার অপর উপায় ছিল না।

"মুখে জল দিতে গিয়া আমার মনে হইল, ব্রাহ্মণকন্যার, বিশেষতঃ ঠাকুরমার মত নিষ্ঠাবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার, মুখে, শূদ্রাণী হইয়া, কেমন করিয়া অঞ্জলির জল দিব।

"মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত হইতে জল পড়িয়া গেল। যাহা জীবনে কখন করি নাই, তাহা করিতে আমার সাহস হইল না। হিন্দু-বিধবা দেহটাকে সত্যসত্যই আত্মার পিঞ্জর মনে করিয়া থাকে। নিজে ভাঙ্গিলে আত্মহত্যা হয় জানিয়া, পবিত্র স্থানে, পবিত্র মুহূর্ত্তে, পবিত্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

"মুখে জল দিতে সাহসী না হইয়া, সিক্তহস্ত তাঁহার বক্ষে সংলগ্ন করিয়া, আমি তাঁহাকে ডাকিলাম—উপর্যুপরি তিনবার ডাকিলাম—ঠাকুরমার সংজ্ঞা ফিরিল না। তখন মনে করিলাম, শুশ্রূষার জন্য দাক্ষায়ণীকে লইয়া আসি।

"চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়াই, বাগানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। তখন সন্ধ্যার একরূপ সূচনা হইয়াছে। জগৎকে আচ্ছন্ন করিবার প্রাক্‌কালে আঁধারের দেবতা নিজের দলবল লইয়া, সঙ্গোপনে যেন গাছের ঝোপ আশ্রয় করিতেছে। বাগানের বাহিরে দাক্ষায়ণী ত নাই!—বাগানের ভিতরেও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না!

"আমি ডাকিলাম—'দাক্ষায়ণী!'—উত্তর পাইলাম না! একবার, দুইবার, তিনবার। তৃতীয়বারেও যখন তাহার উত্তর পাইলাম না, তখন বুঝিলাম সে বাগানের ভিতর নাই। হয়ত এদিকে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াইয়া, আবার সে পুষ্করিণীর দিকে ফিরিয়া গিয়াছে।

"বাড়ী-বেড়িয়া পুষ্করিণীর দিকে যাইতেছি, এমন সময় দেখি যেন বাবুর মত কে একজন—সম্বস্তভাবে ফটক পার হইয়া, বাহিরে চলিয়া গেল।

"কে গেল, গেল—কি না গেল, তাহা জানিবার তখন সময় ছিল না। আমি দেখিলাম, দরোয়ান, তখনও পর্য্যন্ত, সেইরূপ একমনে সিদ্ধি বাটিতেছে। আমার উপস্থিতি যখন তাহার লক্ষ্য হইল না, তখন বুঝিলাম—সেই অপরিচিত ব্যক্তিও তাহার অলক্ষ্যেই বাগানে প্রবেশ করিয়া, আবার অলক্ষ্যে চলিয়া গেল।

"পুষ্করিণীর দিকে আসিয়াও দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল! এখন একরূপ হাসিতে হাসিতেই সে দিনের কথা বলিতেছি; কিন্তু, আমার সেদিনের অবস্থা কেহ স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিলেই, আমার আতঙ্কটাও সেইসঙ্গে প্রণিধান করিতে পারিবেন। একদিকে, পিতামহী সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন; অন্য-দিকে, দাক্ষায়ণীর দেখা মিলিতেছে না—সঙ্গে সঙ্গে, কি জানি কেন, কোথা হইতে, কেমন করিয়া আসা একটা লোকের সন্দেহজনক গতিবিধি। আমার বুক একরূপ তীব্রবেগে কাঁপিয়া উঠিল যে, মনে হইল আমিও বুঝি পিতামহীর মত পথের মাঝে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হই।

"অতি কষ্টে হৃদয়কে একরূপ স্থির করিলাম। বাড়ীর পূর্ব্বদিকে জলাশয়, দক্ষিণে ফটক, পশ্চিমে বাগান। এ তিনদিকেই আমি দেখিলাম। দেখিতে বাকি শুধু উত্তর-দিক্; কিন্তু সেদিকে বেড়াইবার স্থান ছিল না। উত্তর-দিকেই আমাদের পাকশালা; তাহার দুইচারি হাত দূরেই বাগানের উত্তর সীমায় প্রাচীর, তাহার গায়ে একটি ছোট দ্বার দেখিয়াছি মাত্র—সে দ্বার আমরা আজিও পর্য্যন্ত কেহ খুলি নাই। সুতরাং, প্রাচীরের ওপাশে কি আছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পাই নাই।

"পিতামহীর অবস্থা কি হইল—বুড়ী বাঁচিল, কি মরিল—তাহা দেখিবার এখন আমার সময় নাই। আমি, রান্নাঘর বেড়িয়া, উত্তর-দিকের প্রাচীরের গায়ের সেই ছোট দ্বারটীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

"উপস্থিত হইয়া দেখি, দ্বার খোলা। দ্বার হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখি, একটি সরু খাড়ি। একটি ছোট শান-বাঁধা ঘাট, দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া, খাড়িমধ্যে প্রবেশ

করিয়াছে। এখন কূলে কূলে জোয়ার ; প্রচণ্ডবেগে জলরাশি বাগানের প্রাচীরের গা বাহিয়াই যেন ছুটিয়াছে। ঘাটের সবে মাত্র চারিটি ধাপ ডুবিতে বাকি আছে—তাহা ডুবিতেও আর বড় বিলম্ব নাই। যেরূপ তেজে এখনও জল ছুটিতেছে, আর একটুপরেই তাহা দ্বারের চৌকাটপর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে।

"খাড়ি ও সেইসঙ্গে দ্বার খোলা, দেখিয়া আমার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি একেবারে বুঝিলাম, দাক্ষায়ণীকে হারাইয়াছি। কৌতূহলবশে দ্বার খুলিয়া, বালিকা সিঁড়ি বাহিয়া জলে নামিয়াছে, অমনি কোনও রকমে পদস্খলিত হইয়া, স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে!

"কি করিব? ঠাকুরমার ঐরূপ অবস্থা—বুঝি আর তাঁর সংজ্ঞা ফিরে নাই ; এদিকে দাক্ষায়ণীও স্রোতে ভাসিল! তবে, আমার আর জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? মনে করিলাম, আমিও স্রোতের জলে ঝাঁপ দিই। সহসা তখন মনের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, যদ্যপি জলে পড়িলে মৃত্যু হইবে বুঝিতাম, তাহা হইলে,সেই দণ্ডেই—আষাঢ়ের পুঞ্জপুঞ্জ মেঘাচ্ছাদিত আকাশতলে নদীর জোয়ারেরই মত প্রচণ্ডবেগে-আগত, অন্ধকারমুখী সন্ধ্যায়—আমি নদীজলে ঝাঁপ দিতাম ; কিন্তু, জলে পড়িয়া দাক্ষায়ণী ডুবিয়াছে বলিয়া, আমি অভাগিনীও যে ডুবিব, তাহার সম্ভাবনা কি? দাক্ষায়ণী সাঁতার জানে না, আমি সাঁতার জানি। ডুবিতে গিয়া, নদীতীরের কোন স্থানে হয়ত সংলগ্ন হইব।

একবার ঠাকুরমাকে দেখিয়া, পরে মরিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিব, স্থির করিলাম। মৃত্যুর সংকল্পই আমার সার হইল। মরণ-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই আমার আরাধ্য সচল দেবীর প্রতিমাটি আমার চোখের উপর পড়িয়া গেল। দ্বার বন্ধ করিয়া দুইচারি পদ অগ্রসর হইতেই, দেখি—দাক্ষায়ণী! এদিক্‌ওদিক্ চাহিয়া সে যেন আমাকেই অন্বেষণ করিতেছে!

"দেখিবামাত্র, অতিহর্ষে এমন বেগে গণ্ডপথে অশ্রুধারা ছুটিল যে, আমি কিছুক্ষণের জন্য দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। চলিতে চলিতে আমাকে একবার দাঁড়াইতে হইল ; সেই অবস্থাতেই বাষ্পগদগদকণ্ঠে আমি বলিয়া উঠিলাম—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি দাক্ষায়ণী?'

"দাক্ষায়ণী এতক্ষণ আমাকে দেখিতে পায় নাই—দেখিতে পাইলে সে চুপ করিয়া থাকিত না। অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বেশ ঘন হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল মুখশ্রী ঢাকিবার অন্ধকার বিধাতার ভাণ্ডারে নাই বলিয়াই, আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'তুমি কোথায়? আমিই ত তোমাকে খুঁজিতেছি। ঠাকুরমা তোমাকে ডাকিতেছেন।'

'ঠাকুরমা কেমন আছেন?'

'কেন, তাঁর কি হইয়াছে।'

"এই প্রশ্নেই বুঝিলাম, ঠাকুরমা সুস্থ হইয়াছেন। দাক্ষায়ণীকে তিনি তাঁহার মূর্চ্ছার কথা বলেন নাই। প্রশ্ন করিয়া আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। দাক্ষায়ণীকেও মিথ্যা কথা কহিতে পারিব না! সেই সত্যবাদিনীর সঙ্গিনী হইয়াও যদি মিথ্যা কহিতে হয়, তাহা হইলে জন্মই বৃথা। অথচ ঠাকুরমা যখন শুনান নাই, তখন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, দাক্ষায়ণীকে অসুখের কথা বলাটা আমি ভাল বিবেচনা করিলাম না। এইজন্য, তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, আমি প্রতি-জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ দোর কি তুমি খুলিয়াছিলে?'

"দাক্ষায়ণী বলিল—'না।'

"তবে কে খুলিল?

"দাক্ষায়ণী বলিল, "ঘরে চল ; সেখানে গেলেই সকল কথা জানিতে পারিবে। ঠাকুরমা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

"ঘরে ফিরিয়া দেখি, ওমা! এ কে!—'খুড়া-মহাশয় কোথা হইতে আসিলে?'

"খুড়ামহাশয় উচ্চ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল—'যমপুরী হইতে আসিতেছি, বেটি, তোমার মুণ্ডপাত করিবার জন্য। দুনিয়ায় এমন কোন্ জায়গা আছে যে, সেখানে লুকাইয়া যমকে ফাঁকি দিবে?'

"এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত উদ্বেগ-আতঙ্ক উল্লাসে পরিণত হইল। আমি, খুড়াকে প্রণাম করিতে করিতে, বলিলাম, 'তোমাদের বউ থাকিতে যমপুরীর কাহারও এখানে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। তুমি শিবের পুত্র গণেশ—সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—তাই, এই সতীমন্দিরে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ।'

"অধিকক্ষণ ধরিয়া আলাপের তখন অবকাশ ছিল না। ঠাকুরমাকে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম।

সর্ব্বাগ্রে তাঁহার তথ্য লওয়া প্রয়োজন, বুঝিয়া আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

"দেখিলাম, ঠাকুরমা সুস্থ হইয়াছেন; ইহারই মধ্যে হাত-পা-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, আহ্নিকে বসিয়াছেন। সুতরাং, এ সময়ে কোনও কথা কহিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না। আমি আবার খুড়া মহাশয়ের কাছে ফিরিলাম।

"খুড়ামহাশয়ের আগমনে, আমি বিশেষ বিস্মিত হই নাই। হুগলীতে খুড়ার চরিত্রের আভাস পাইয়াছিলাম। পরবর্ত্তী কালে, তাহাদের গ্রামে থাকিয়া, তাহাকে বিশেষভাবে চিনিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, খুড়া আমাদের অনুসন্ধানে বাহির হইবেই—আমাদের সন্ধান না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না। ঠাকুরমা'র উপর তার ভক্তি অতুলনীয়, অগাধ! তবে, এত শীঘ্র যে সে আমাদের খুঁজিয়া পাইবে, এটা বিশ্বাস করি নাই।

"তাহাকে পাইয়া, আমাদের সকলেরই আনন্দের অবধি রহিল না। নন্দরাণী ও তাহার আত্মীয়বর্গের আচরণে যদিও আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার কিছু ছিলনা, তথাপি আমার মন একেবারে আশঙ্কাশূন্য হয় নাই। আমরা তিনটি স্ত্রীলোক; আসিয়াছি—দেশ হইতে অনেক দূরে; পড়িয়াছি—এক বলবান্ জমীদারের আয়ত্তের ভিতরে। এদেশের লোকের সঙ্গে এখনও আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।

"নানাকারণে স্বভাবতঃই আমার মন কিছু উদ্বিগ্ন ছিল। বিশেষতঃ, ক্ষণ-পূর্ব্বে আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। এখন, সেটা অমূলক বুঝিলেও, আমি মনে মনে পূর্ব্বে ভয়ের দুই একটা কারণ গড়িয়া লইয়াছিলাম।

"এখনও নিতান্ত বালিকা হইলেও, দাক্ষায়ণীর রূপ অপূর্ব্ব। এই বালিকা-বয়সেও তাহার নয়নাভিরাম রূপের জ্যোতিঃ লোকের দৃষ্টি যেন সবলে আকর্ষণ করে;—তা, সে পুরুষই হউক, অথবা স্ত্রীলোকই হউক। এখানে আসিবার দুইতিন দিনের মধ্যেই, বালিকার রূপের খ্যাতি গ্রামের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে! সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"আমি কিন্তু বুকদিয়া ঢাকিয়া, পুরুষমানুষের দৃষ্টি হইতে সে রূপ সরাইয়া রাখিয়াছি। ললিতার স্বামী ব্রজমোহন দেখিয়াছে, কি না, জানি না; রাজবাড়ীর আর কেহ, এমন কি নন্দরাণীর পুত্রকেও, আমি দাক্ষায়ণীকে দেখিতে দিই নাই। যখন তাহাদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন বালক—মাকে দেখিবার অছিলায়—মাঝেমাঝে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিত। অন্বেষণ করিতে করিতে, মহলের যে অংশে আমরা থাকিতাম, সেইদিকে আসিত। তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম—মাতৃ অন্বেষণের ছলে, সে দাক্ষায়ণীকে দেখিতে আসিয়াছে।

"উনিশ বৎসর বয়সের হইলেও, হরেন্দ্রের আকার বালকেরই মত ছিল; মুখেচোখেও আমি তাহার বালক-ভাবই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীকে দেখিবার আকিঞ্চন তাহার কৌতূহলমাত্র, আমি অনুমান করিয়াছিলাম;—তাহার দুরভিসন্ধি, অনুমান করি নাই। এইজন্য কাহাকেও তাহার কথা বলি নাই। একবার, তাহার কৌতূহল চরিতার্থ দেখিতে আমার ইচ্ছাও হইয়াছিল; কিন্তু আমি ত জোর করিয়া, অথবা কৌশল করিয়া, দাক্ষায়ণীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব না! সুযোগ ঘটিলে সে তাহাকে দেখিতে পাইত; সুযোগ ঘটে নাই, তাই, দেখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও, সে দেখিতে পায় নাই।

"আমি মনে করিয়াছিলাম, হয় ত হরেন্দ্রই, দাক্ষায়ণীকে দেখিবার লোভে, সকলের অজ্ঞাতসারে বাগানে প্রবেশ করিয়াছে।

"সে তা করিলে, আমার বিলক্ষণ চিন্তার বিষয় হইত। তা করিলে, আমাদের নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিতে হইত; দুইদিনও আমাদের সেখানে বাস চলিত না।

"তৎপরিবর্ত্তে, খুড়ামহাশয়কে দেখিয়া, আমি সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হইলাম।

"বহুদূর হইতে, তিনচারি দিন ধরিয়া, খুড়া আসিতেছে। তাহার পথের ক্লেশ, আমাদের নিজের কষ্ট হইতেই, আমি অনুমান করিয়া লইয়াছি। তবু, নন্দরাণী আমাদিগকে রাণীর মত যত্নেই লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং, তাহাকেও সে সময় অন্য প্রশ্নে উত্ত্যক্ত না করিয়া, তাহার পরিচর্য্যাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বোধ করিলাম।

"আমি বলিলাম—'আজ বোধ হয় সারাদিন অন্নাহার হয় নাই।'

"সারাদিন কেন—চারদিন সারাপথ কেবল হাড়ের মত চিঁড়ে চিবাইয়াছি।'

আমি, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, একটা ঘটী জলপূর্ণ করিয়া আনিলাম। দাক্ষায়ণী পূর্ব্বেই তাহাকে বসিবার আসন দিয়াছিল। পা ধুয়াইয়া দিবার জন্য তাহাকে আসন ত্যাগ করিতে বলিলাম। খুড়া বলিল, 'পুষ্করিণীতে পা ধুইয়াছি।'

"এই সময়ে, রাজার দেবালয়ে, আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে, রাজবাড়ীর দেউড়ী হইতে, নহবতের ধ্বনি উঠিল। আমি বলিলাম—'তবে শীঘ্র সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া মুখে কিছু জল দাও।'

"'জল পরে দিব। আগে একটু তামাক খাইব।'

"'সর্ব্বনাশ! তামাক কোথা পাইব!'

"তামাক নাই শুনিয়া, খুড়া একটু তেজস্বিতার সহিত বলিয়া উঠিল—'সে কি দয়াময়ী! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে, আমার জেঠাইমাকে সঙ্গে আনিয়া সংসার পাতিয়াছ। আমার মত দু'দশটা ভূতপ্রেত সঙ্গে সঙ্গে আসিবে, এটা কি বুঝিতে পার নাই?'

"'তুমি কি ভূত?'

"'শুধু ভূত—গো-ভূত। আমি জানি, যখন ঘর ছাড়িয়াই তোমরা আসিয়াছ, তখন তীর্থস্থানভিন্ন অন্য কোথাও তোমরা যাইবে না। এমন ভাগাড়ে আসিবে, তা কেমন করিয়া জানিব! ভারতের সমস্ত তীর্থ খুঁজিয়া তোমাদের বাহির করিবার জন্য, দাদা আমাকে পথের খরচ দিয়াছেন। মানুষ হইলে, ফাঁকতালে তীর্থ দেখিয়া আসিতাম। গো ভূত বলিয়া, এই ভাগাড়ে আসিয়াছি।'

"খুড়ার কথায় লজ্জিত হইবার কারণ থাকিলেও, আমি মনে মনে বড় খুসী হইলাম। হরিহরের বাপ মা তাঁদের ভ্রম বুঝিয়াছেন—মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়াছেন—মাকে ফিরাইতে লোক পাঠাইয়াছেন। মায়ের সঙ্গে দাক্ষায়ণীও নিশ্চয়ই এইবার শ্বশুরের ঘরে স্থান পাইবে; হরিহরের সঙ্গে মিলিত হইবে।

"মনের উল্লাস মনেই রাখিয়া, আমি খুড়ামহাশয়কে—'অপেক্ষা কর, আমি তামাকের ব্যবস্থা করিতেছি।' এই বলিয়াই আমি ডাকিলাম—'ঝি!' উত্তর পাইলাম না। ভৃত্য স্বরূপচন্দ্র, সন্ধ্যার পর হইতেই বারান্দায় থাকিয়া, সারারাত্রি আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে! এতক্ষণে সে আসিয়াছে, মনে করিয়া ডাকিলাম—'স্বরূপ!' তাহারও উত্তর পাইলাম না।

"খুড়া বলিল—'ইহাদের কেন ডাকিতেছ?'

"'দোকান হইতে হুঁকা, কলিকা, তামাক আনিয়া দিবার জন্য।'

"'অত কষ্ট তোমাকে করিতে হইবে না'—এই বলিয়া খুড়া বারান্দার দিক্ লক্ষ্য করিয়া একটু মিটেকড়া স্বরে কাহাকে ডাকিল—'ভাই গো-ভূত!'

"বারান্দা হইতে কে উত্তর দিল—'হুজুর!'

"'একটু তামাক সাজ।'

"স্বর যেন পরিচিত; যেন কোথায়, কতদিন ধরিয়া, শুনিয়াছি। বিস্মিতভাবে খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কাহাকে সঙ্গে আনিয়াছ?'

"'নিজেই গিয়া দেখিয়া আইস।' -এই বলিয়া খুড়া আসনত্যাগ করিল এবং, একটা পুঁটুলির সঙ্গে বাঁধা, হুঁকা বাহির করিল। সেটা আমার হাতে দিয়া বলিল—'দয়াময়ী! এইটাকে আগে পেট ভরিয়া জল খাওয়াইয়া দাও।' এই বলিয়াই খুড়া গান ধরিল—

'যে ভাব জানেনা, ওরে মন, তার কিসের আনাগোনা।
যে ভাবের ভাবুক,সেই বোঝে রে ধিন্তাধিনা পাকা-নোনা॥'

"খুড়ার গান শুনিতে শুনিতে, হুঁকাতে জল পূরিবার জন্য, আমি ঘাটে চলিলাম। বারান্দায় পা-দিবামাত্র, কে একজন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

"আমাকে ব্রাহ্মণী-জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছে মনে করিয়া, আমি, নিজের অবস্থা জানাইয়া, তাহাকে প্রতিপ্রণাম করিতে যাইতেছি, এমন সময় সে বলিয়া উঠিল 'কাকিমা! আমি যে কার্ত্তিক!'

* * * * *

"সে রাত্রির আনন্দের কথা তোমাকে আর কি বলিব হরিহর! আনন্দে সারারাত্রির মধ্যে এক লহমার জন্যও আমি চোখের পলক ফেলিতে পারি নাই। সেদিনের সন্ধ্যাকালের বিষম আতঙ্কমুখে সতীর মর্য্যাদা রাখিতে, কোথা হইতে যেন কার্ত্তিক-গণেশ, দুইপুত্র দ্বারীরূপে মন্দিরদ্বার আগুলিতে ছুটিয়া আসিয়াছে!"

কল্পতরু

আহোমরাজ্যের অতীত স্মৃতি

[শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়]

১। ‘জয়দোল’ ও ‘জয়সাগর’

পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তে শ্যামলগিরিমালা পরিবেষ্টিত ও বহুনদনদীসমন্বিত, প্রকৃতির বিস্তৃত লীলাক্ষেত্র আসাম প্রদেশের স্থানে স্থানে কত যে প্রাচীন গাথা ও কীর্ত্তিরাশি কালের নিভৃত অঙ্কে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আছে—কত যে অতীত গৌরব-স্মৃতিমণ্ডিত ভগ্ন প্রাসাদ ও দেবমন্দির, পুরাবৃত্তকে বিস্মৃতি-সুষুপ্তি হইতে জাগরিত রাখিবার জন্য, এখনও বিদ্যমান দেহে নীরবে অবস্থান করিতেছে, সেগুলি আজিও, বঙ্গবাসী কেন, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত ;—সেগুলি বহু হৃদয়বান্ দর্শকের নিকট অতীব আনন্দ ও বিস্ময় উদ্রেককর।

ইংরেজী ১৯১২ সালের প্রথম ভাগে আমি, কর্ম্মসূত্র ব্যপদেশে, আহোমরাজগণের অতীত রাজধানী, বর্ত্তমান শিবসাগর * নামক স্থানে গমন করিয়াছিলাম। তখনও জেলার রাজধানী শিবসাগর হইতে জোড়হাটে স্থানান্তরিত হয় নাই। শিবসাগর যাইতে হইলে, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের নামতি আলী, নাজিরা, কিম্বা ধোদর আলি † হইয়া যাইতে হয়। ইহার মধ্যে নামতি আলী দিয়া যাওয়াই

জয়দোল ও জয়সাগর

সুবিধাজনক ; কারণ, শিবসাগর হইতে এই স্থানের ব্যবধান ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চারিক্রোশ। আমি নামতি-আলী

* ‘শিবসাগর’, অহোমরাজগণের সময়, ‘রংপুর’ বলিয়া দীর্ঘকাল পরিচিত ছিল।

† ‘ধোদর আলি ষ্টেসন’ অধুনা “শিবসাগর রোড ষ্টেসন” নামে পরিচিত। এই ধোদর আলি সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। -কোনও সময়ে জনৈক আহোম-নৃপতি রাজ্যের যাবতীয়

ষ্টেসনে নামিয়া, একখানি গো-শকটে আরোহণপূর্ব্বক শিবসাগরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বলাবাহুল্য, আসামের প্রায় সর্ব্বত্র গো-যানই যাতায়াতের একমাত্র উপায়।

অনুমান তিনক্রোশ দূরে আসিয়া দেখিলাম, একটি সুবৃহৎ সরোবরসদৃশ জলাশয়—চতুর্দ্দিকে বিরল অরণ্যাবৃত। প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া দীর্ঘিকার স্বচ্ছ চঞ্চল বারি, ধীরমন্দ প্রভাতবায়ুহিল্লোলে, থাকিয়া থাকিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল—কখনও তাহার ঋজু লহরীমালা, কুল কুল স্বরে কূলের নিকট আসিয়া, কি যেন বলিতে গিয়া, ভগ্ন মনে সরসীবক্ষে ফিরিয়া যাইতেছিল! শুনিলাম সেটি "জয়-সাগর" বলিয়া খ্যাত। দেখিলাম, সেই জয়-সাগরের কূলে একটি উচ্চ দেবমন্দির-সেটি "জয়দোল" নামে পরিচিত। দোল (দেউল) অর্থে—দেবমন্দির। উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সরণী বিস্তৃত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কারণ, জয়দোল'—'জয় সাগরের' কূলেই স্থাপিত ছিল, বলিয়াই বিশ্বাস হয়। দোলের সম্মুখে অনতিবৃহৎ নাটমন্দির-উপরে মস্ত খিলান করা ছাদ। মন্দিরগাত্রের নিম্নার্দ্ধ ভাগে, বিষ্ণুর দশাবতার এবং পুরাণোক্ত অনেকপ্রকার হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। সেগুলি নির্ম্মাতাদের সাতিশয় অধ্যবসায় ও শিল্প-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্তস্থল। মন্দিরের শিরোভাগ অসংখ্য পদ্মকলের ন্যায় চিত্রদ্বারা বিভূষিত।

দৈর্ঘ্যে ইহার আয়তন ১০০ শত পুরা, অর্থাৎ ইংরেজী মাপ অনুযায়ী ১২৮ একর; * চাতুষ্পার্শ্বিক পরিবেষ্টন ন্যূনাধিক দুই মাইল।

'ধোদ' (স্বভাবতঃ অলস বা অকর্ম্মণ্যব্যক্তি) প্রতিপালনে অভিলাষ প্রকাশ করায়, রাজ্যের অধিকাংশ ব্যক্তি, আপনাকে 'ধোদ' বলিয়া পরিচয় প্রদানকরিয়া,রাজধানীতে উপস্থিত হয়। সুতরাং, প্রকৃত 'ধোদ' নির্ণয়ার্থ, রাজমন্ত্রীর পরামর্শে, সেই সকল লোককে একখানি চালায় আবদ্ধকরতঃ তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করার ইচ্ছা প্রচার করা হয়। এই বার্ত্তা শ্রবণে, সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে, দুশ্চারিজনব্যতীত, অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়নপর হইলে, রাজাদেশে সেই সমস্ত কপট ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া, তাহাদের দ্বারা একটি 'আলি' (পথ) প্রস্তুত করান হয়। ধোদকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, এই পথের নাম 'ধোদের আলি' রাখা হয়।

* আসামদেশীয় এক পুরা অস্মদ্দেশীয় চারি বিঘার সমান; এবং ইংরাজী এক একর, ৩৲৬ বিঘার অনুরূপ।

উক্ত জয়দোল ও জয়সাগরের সহিত এমন একটি বিষাদময়ী স্মৃতি বিজড়িত আছে, যাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—যাবতীয় হৃদয়তন্ত্রী একসঙ্গে সকরুণ সুরের মূর্চ্ছনা তুলিয়া সমগ্র হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে! সেই করুণ কাহিনী এক্ষণে বঙ্গভাষায় একাধিক পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।* সুতরাং, এস্থলে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান না করিয়া, সংক্ষেপে মূল ঘটনাটি মাত্র বিবৃত করিতেছি।

যখনকার কথা উত্থাপন করিতেছি, তখন, সমগ্র আহোমরাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, দেশ ঘোরতর অরাজকতায় আচ্ছন্ন ছিল। প্রবল পরাক্রমশালী মন্ত্রিগণের হস্তে রাজ্যশাসনভার সংন্যস্ত থাকায়, তাহারা, স্বেচ্ছামত নৃপতিমনোনীত করিয়া, তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইত! যখন এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও রাষ্ট্রবিপ্লবে আহোমরাজ্য বিধ্বস্তপ্রায়, তখন, সচিববর্গের অনুগ্রহে, চুলিকফা নামক এক বালক রাজতক্তে অধিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহার তারুণ্য, এবং বালসুলভ-বুদ্ধির আধিক্য নিবন্ধন তাহাকে সাধারণে "লরা রাজা" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আসামী ভাষায় 'লরা' শব্দ—শিশু বা বালক সংজ্ঞাপক।

বয়সে তরুণ হইলেও, চুলিকফার কূটবুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি, নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হইবার জন্য, কতকগুলি কুক্রিয়াসক্ত দুর্নীতিপরায়ণ অনুচরের কুপরামর্শে, সিংহাসনোপযুক্ত নৃপকুমারগণকে হীনাঙ্গ বা বীতপ্রাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। † অচিরে পাষণ্ডমতি রাজার গুপ্ত মন্ত্রণায়, নিবিরোধী আহোম-রাজকুমারগণের হৃদয়শোণিত অজস্র প্রবাহিত হইয়া, শান্তিময় দেশকে শ্মশান-প্রেতের লীলাভূমি সদৃশ করিয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত নৃপকুমারই,গুপ্তচরকবলে পতিত হইয়া, হয় প্রাণত্যাগ করিলেন, অথবা চিরদিনের জন্য বিকলিতাঙ্গ হইয়া রহিলেন। ‡

এই ভীষণ দুর্দৈব সময়ে, তুঙ্গখুঙ্গ-বংশীয় গোবর নামক

* ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যক 'নব্যভারতে' প্রকাশিত "জয়মতী" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং "আহোমসতী" নামক পুস্তকে সুবিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† ইঁহারা বরগোঁহাই, বুরাগোঁহাই ও বরপাত্র গোঁহাই ছিলেন।

‡ তখনকার প্রথানুযায়ী, অক্ষতদেহ না হইলে রাজসিংহাসন লাভে কাহারও অধিকার ছিল না।

রাজার পুত্র গদাপাণি, তদীয় পতিব্রতা স্ত্রী জয়মতী কুঁয়রী † ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে, পুত্রদ্বয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থ, নিজের একান্ত অমতসত্ত্বেও, স্থানান্তরে প্রয়াণ করেন। তাঁহার পলায়নবার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া, চুলিকফা অত্যন্ত ভীত হইলেন; কারণ, গদাপাণি অত্যন্ত পরাক্রমশালী নৃপকুমার ছিলেন। তাঁহার গোপনাবাসের সংবাদ জানিতে নানারূপে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া, চুলিকফা, অবশেষে, জয়মতী কুঁয়রীকে প্রকাশ্যরাজসভায় আনয়ন করিয়া, পতির আবাস সংবাদ প্রকাশ করিতে আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী, পতির মঙ্গলার্থে, দীর্ঘকাল অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, হাস্যমুখে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—তথাপি স্বামীর গোপনসংবাদ ব্যক্ত করেন নাই।

সাধ্বীসতী জয়মতী কুঁয়রী, চুলিকফা-কর্ত্তৃক পাশব অত্যাচারে নিগৃহীত হইয়া, যেস্থানে জীবনত্যাগ করেন, সেই আদর্শ সতীর স্মৃতিপূত রুদ্রসিংহ—মাতার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষার্থে জীবনদানের অলৌকিক স্মৃতি জগতে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য—সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া, ইংরেজী ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে, এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী খনন করাইয়া, তাহার কূলে জয়দোল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জয়দোলে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধুনা মন্দিরটি বিগ্রহ-বিরহিত—ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল গোমহিষাদির আবাসস্থলরূপে পরিণত হইয়াছে।

বিশিষ্ট পর্য্যটকগণের মুখে শুনিয়াছি, জয়সাগরের ন্যায় বৃহৎ স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী এক শিবসাগর ব্যতীত ভারতের অন্যকোথাও সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না।

২। কেরাংঘর

পূর্ব্বোল্লিখিত "জয়সাগর" ও "জয়দোল" হইতে ক্রমশঃ উত্তরদিকে আসিয়া নিরীক্ষণ করিলে, দেখা যায় যে—কিঞ্চিৎ দূরে একটি ভগ্নপ্রাসাদ ধীরে ধীরে কালকবলে বিলীয়মান হইতেছে—সেটি 'কেরাংঘর' বলিয়া পরিচিত। আহোম রাজগণের সময়ে রাজ-প্রাসাদগুলি যাহাতে—দুর্গ ও প্রাসাদ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, এইরূপ ভাবে গঠিত হইত। "এই কেরাংঘরও উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে অনুকূল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 'আসাম বুরুঞ্জী' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আহোম নৃপতি স্থক্রম্ফা, তদীয় পিতা গদাপাণির মৃত্যুর পর, রুদ্রসিংহ নামধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক রংপুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তথায় রাজকীয় প্রাসাদাদি নির্ম্মাণকল্পে, তাঁহার আদেশে, কোচবিহার প্রদেশ হইতে ঘনশ্যাম নামক জনৈক সুনিপুণ ও প্রসিদ্ধ রাজমিস্ত্রী আনীত হয়। আহোম ইতিহাসের সহিত এই ঘনশ্যামের এক অবিচ্ছেদ্য বিষাদ স্মৃতি বিজড়িত আছে;

কেরাংঘর

সে কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। বলা বাহুল্য, এই কেরাংঘরের গঠনপ্রণালী ঘনশ্যামের নির্ম্মাণকুশলতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও বর্ত্তমান কালে, ইহার ভগ্নাবশিষ্ট কক্ষাদিতে তাহার সূক্ষ্মশিল্পের কোনও জ্বলন্ত নিদর্শন বিদ্যমান নাই। * তদ্ভিন্ন, আহোম-নৃপতি চুক্লেমুং-

---

† বঙ্গভাষার কোনও কোনও লেখক জয়মতী কুঁয়রীকে "রাণী" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জয়মতী কুঁয়রী রাণী ছিলেন না; কিম্বা তদীয় স্বামী গদাপাণি যখন অহোম-রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাহার বহুপূর্ব্বে জয়মতীর মৃত্যু হওয়াতে, রাজমহিষীরূপে সিংহাসনে উপবেশন করার ভাগ্যও তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই।

* প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত যে, এই কেরাংঘর নির্ম্মিত হইবার পর, এবং রুদ্রসিংহ লোকান্তর গত হইলে, ইহার একাধিকবার সংস্কার সাধিত হইয়াছে। কারণ, অবগত হওয়া যায়, রুদ্রসিংহের চতুর্থপুত্র সুরম্ফা, রাজেশ্বর সিংহ নাম লইয়া, সিংহাসন অধিরোহণ করিলে, তদীয়

প্রতিষ্ঠিত গরগাঞ রাজপ্রাসাদের অনিন্দ্য-কারুকার্য্য প্রভৃতির যেরূপ ভূয়সী প্রশংসা আহোম-ইতিহাসের স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে, এই কেরাংঘরসম্বন্ধে তদ্রূপ কোনও বিবরণ কোনও স্থানে লিপিবদ্ধ আছে, বলিয়া শুনা যায় না। ইহা যেন অপেক্ষাকৃত অসরলভাবে গঠিত বলিয়া মনে হয়; পূর্ব্ব-পশ্চিমে অধিক বিস্তৃত—উত্তর-দক্ষিণে অনেকগুলি বারান্দা, সরসা দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জনশ্রুতি, ভূগর্ভে আরও কয়েকটি তল আছে—এবং সেই হেতু ইহার অপর এক নাম 'তলাতল ঘর।' বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলে উপলব্ধি হয় যে, কথিত বিবরণ একেবারে অমূলক নহে। কারণ, নিম্নদেশে গমনাগমন হেতু এখনও একটি সুড়ঙ্গসদৃশ স্থান এবং কয়েক পঙ্‌ক্তি সিঁড়ি দৃষ্টিগোচরে আসে। তবে, অনুসন্ধিৎসু দর্শকগণের পক্ষে, ইহা আদৌ সুগম নহে; প্রথমতঃ—অতিশয় আর্দ্র হেতু কক্ষগুলির স্থানে স্থানে কুম্ভিকাসুরূপ এক প্রকার ছত্র, বা কোঁড়কে, আচ্ছাদিত থাকায় পদ-স্খলনের অত্যন্ত আশঙ্কা,—এবং দ্বিতীয়তঃ সন্ধি-মুখ অভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বাষ্পে পরিপূর্ণ।

এই প্রাসাদের উত্তর কোণে একটি অষ্টকোণ-বিশিষ্ট ঘর বিদ্যমান আছে; সেটি পূজার ঘর বলিয়া পরিচিত। তাহারই অত্যন্ত সন্নিধানে, এখন যাহা দ্বিতল বলিয়া ভ্রম হয়, তদুপরি আহোম-নৃপতিদের খাসপ্রকোষ্ঠ, অদ্যাপি কত অতীত স্মৃতিবহন করিয়া, কালের অলঙ্ঘ্যশাসনে ভগ্ন-অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার বহির্দ্দেশ দিয়া, সৌধ-শিখরে যাতায়াতের একটি ভগ্নসিঁড়ি আছে; কেহ কেহ অনুমান করেন, পূর্ব্বে ইহার উপরে আরও একটি তালা ছিল। কক্ষটির চতুঃপার্শ্বিক অবস্থা অবলোকন করিলে, উক্ত অনুমিতি ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বদক্ষিণ-দিকে একটি প্রকোষ্ঠ আছে—তাহা অপরাপর কক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন। কথিত আছে, ইহাতে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, আহোম-রাজমহিষীদের পৃথক বাসের ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আরও একটি কক্ষ নয়নগোচর হয়; তাহা ভোজনা-গার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বস্থানেই ছাদগুলি খিলান করা বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাসাদসান্নিধ্যে একটি বদ্ধ-সলিলা, বারিপর্ণী-আচ্ছাদিত, শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণী আছে।—কে জানে, ইহা কোনও সময় রাজ অন্তঃপুর-নিবদ্ধা কামিনী-কেলি-সরোবর ছিল, কি না—কে বলিতে পারে? কখনও ইহা ঢল ঢল যৌবনদৃপ্ত কলেবরে শোভারাশি উছলিয়া দিয়া, হৃদয়দেশে কুমুদ-কহ্লার ফুটাইত কিনা!—অধুনা কাল প্রভাবে হতশ্রী হইয়া এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আছে।

কেরাংঘর চতুর্দ্দিকে ইষ্টকপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরমধ্যে একটি বহুপুরাতন ঘর আছে; সেটি গোলা-বারুদখানা ছিল। কথিত আছে, ইহা রাজাদেশে এক রাত্রিমধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নাম 'কর ঘর'।

৩। রংঘর

উক্ত রাজপ্রাসাদের পশ্চিমদিকে—সরনীর অপর পার্শ্বে—এই 'রংঘর', বা 'রঙ্‌চোয়া ঘর', অবস্থিত। আসামীভাষায় রঙ্ অর্থে—ক্রীড়া বা কৌতুক এবং "চোয়া" দর্শন বা নিরীক্ষণ সংজ্ঞাপক; সুতরাং, নামকরণ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ক্রীড়া বা কৌতুক গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। আহোমনৃপতি প্রমত্ত সিংহ, সিংহাসনারোহণ করিবার পর, ইংরেজী ১৭৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে, সমগ্ররাজ্যের নূতন করিয়া জরিপকার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই সময়, রংপুরে উক্ত কৌতুক-গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই স্থান হইতে আহোমনৃপতিগণ বন্য-জন্তুর যুদ্ধাদিক্রীড়া-পরিদর্শন করিতেন। রংপুরের সমস্ত ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে, ইহাই যেন একটু সযতনে রক্ষিত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। এই ঘর অষ্টকোণবিশিষ্ট; কিন্তু পূর্ব্ব-পশ্চিমে, অন্যান্য দিক্-অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত। এই দুইদিকে তিনটি বৃহৎ, ও দুইটি করিয়া তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, খিলান, বা খাটাল (opening) আছে। গৃহটি দ্বিতল মধ্যে একটি বৃহৎ কক্ষ; পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে, অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দুইটি প্রকোষ্ঠ, দৃষ্ট হয়। পশ্চিমপ্রান্তস্থ

সভায় হিন্দু ও আহোম-জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে এক বাদানুবাদ হয় যে—নবীন নৃপতি কোথায় রাজধানী স্থাপন করিবেন? - হিন্দু-জ্যোতিষিগণ রঙ্গপুরে থাকার বিধি প্রদান করেন; কিন্তু আহোমগণ টাইমুং বলিয়া একটি স্থানে প্রাসাদ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। নবীন ভূপাল, হিন্দু জ্যোতিষিগণের পরামর্শানুযায়ী, রঙ্গপুরে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন; "তাহা ইষ্টকময় ও প্রশস্ত আকারের।" (*Vide*—Dist. Gazetteer, Sibsagur, pp. 180.) সুতরাং, অধুনা যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা ঘনশ্যাম-নির্ম্মিত, কিংবা রাজেশ্বরের রাজত্বকালে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আশা করি, আমরা 'কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি'র নিকট যথাকালে ইহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিব।

কক্ষটি সিঁড়ির ঘর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বদিকস্থ ঘরটি সমগ্রসৌধের সৌন্দর্য্যসাধনকল্পে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিম্বা কোনও বিশেষ কারণে ব্যবহৃত হইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমার অনুমান হয়, তাৎকালীন সম্ভ্রান্ত পুর মহিলাগণও উক্তরূপ পশ্বাদির ক্রীড়া, বা অন্যবিধ কৌতুক, দর্শনে বঞ্চিত হইতেন না—এবং ঐ ঘরটি তাঁহাদেরই প্রয়োজনার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তবে, আহোম ইতিহাসে এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিলুপ্ত হইলেও, সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে স্থানে স্থানে অদ্যাপিও সেগুলির যথেষ্ট আভাস প্রতিভাত হয়। আসামঅঞ্চলে আজিও, 'বিহু' উপলক্ষে, মহিষাদির যে যুদ্ধ ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন দেখা যায়, বলা বাহুল্য তাহা আহোমরাজগণের অনুষ্ঠিত উক্তরূপ পশ্বাদির ক্রীড়ার ক্ষীণস্মৃতির পরিচায়ক।

৫। শিবসাগর ও শিবদোল

রংঘর হইতে আনুমানিক এক মাইল পথ আসিয়া, দিক্ষু
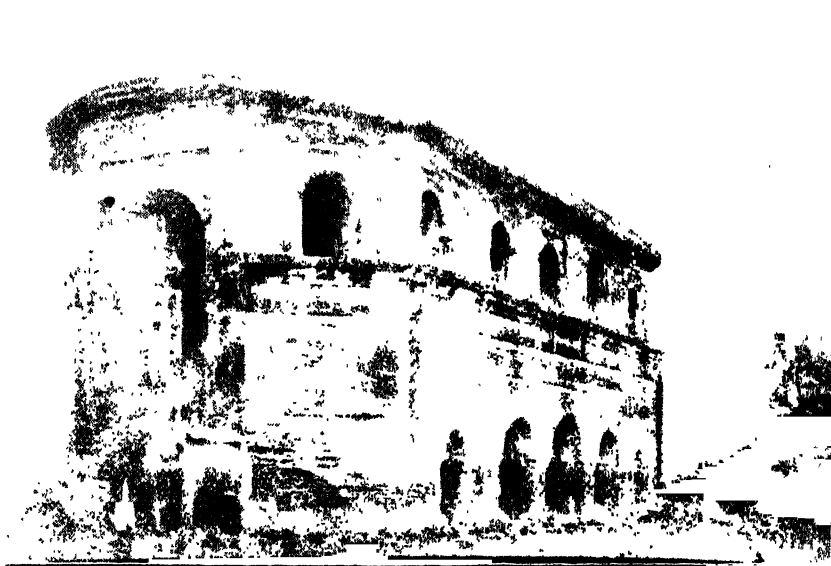
সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে, মধ্যস্থলে এক জায়গায়, একটি ফাঁক আছে—একটি মহাকায় হস্তী অনায়াসে তন্মধ্যে দাঁড়াইতে পারে; এবম্বিধ ফাঁক রাখিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্রীড়াদর্শনপ্রয়াসী রাজন্যবর্গ এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ, হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া, একেবার উপরের সিঁড়িতে উঠিতে পারিতেন। সংযোজিত চিত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই রংঘরও তদানীন্তন সাধারণ ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক চিত্রাদি-কার্য্যে বিভূষিত ছিল। ছাদের উপর ছোট ছোট তিনটি বুরুজ আছে—ঐগুলি পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত; দুইদিকে দুইটি হাঙ্গরের মুখ দৃষ্ট হয়।

কালপ্রভাবে, আহোমরাজ্যের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে, রাজাদের প্রবর্ত্তিত অনেকবিধ ক্রীড়া-কৌতুকাদি অধুনা

('দিখৌ' বলিয়া পরিচিত) নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। শিবসাগর দিক্ষুনদীর বামকূলে অবস্থিত।

আমি যে সময় শিবসাগরে গিয়াছিলাম, তখন শীতের প্রাক্কাল। সুতরাং, নদীটিকে বেশ শান্ত ও অনতিগভীর-তোয়া বলিয়া অনুমিত হইল; কিন্তু শুনিলাম, বর্ষা-প্রারম্ভে ইহা, যেন এক প্রচ্ছন্ন শক্তিতে বলবতী হইয়া, স্ফীতবক্ষে ব্রহ্মপুত্র-সঙ্গমের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিতে থাকে। তখন, তাহার সেই স্ফীতচঞ্চলবারি, উভয়দিকের তটভূমি প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। সেসময় দিক্ষুর সেই উচ্ছ্বসিত শোভা-সৌন্দর্য্য একদিকে যেরূপ মনোরম, অন্যদিকে ততো-ধিক ভয়প্রদ, বলিয়া বোধ হয়; কারণ, তখন ইহার স্রোতঃ অত্যন্ত প্রখরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

আমি, দিক্ষু পার হইয়া, শিবসাগরের সীমানায়

পৌঁছিলাম। শিবসাগর একসময় আহোমরাজগণের কীর্ত্তিস্থল ছিল। স্বনামখ্যাত "আহোম-আকবর" রুদ্রসিংহের পুত্র, কীর্ত্তিমান্ সম্রাট্ শিবসিংহ * এই নগরের স্থাপয়িতা। তাঁহার রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত শিবসাগর-দীর্ঘিকা ও মুক্তিনাথ প্রভৃতি দেবতার মন্দির অদ্যাপিও তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি ও সুযশ ঘোষণা করিতেছে।

শিবসাগর দীঘিকা একটি অতিশয় তৃপ্তিদায়ক ও মনোরম স্থান। ইহার চতুঃপার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত রাজবর্ত্ম থাকায়, পবিভ্রমণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। দীর্ঘিকার চারিদিকে আধুনিক আফিস আদালত, স্থানীয় শাসন ও বিচার পতির বাসস্থান, জেলখানা প্রভৃতি, এবং পুণ্যভাজন নৃপতি শিবসিংহ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরসমূহ বিদ্যমান আছে। । শিব সাগর দীর্ঘিকার জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল ইহাই সহরের সর্ব্বত্র পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

দীঘিকাটি ষট্‌কোণ আকারের; পরিমাণফল প্রায় ৩৯০ বিঘা; চতুঃপার্শ্বিক পরিবেষ্টন ১৫ মাইল। সুতরাং, সহজেই প্রতীত হয় যে, ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত জয়সাগর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রায়তন।

প্রত্যহ প্রদোষকালে, এই দীঘিকার সুনির্ম্মল মুক্ত বায়ু সেবন করা শিবসাগর অধিবাসীগণের নিত্যকর্ম্ম। আমিও, শিবসাগরে অবস্থানকালীন, নিজেকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করি নাই। বস্তুতঃ, এই স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও ঢল ঢল বারিপূর্ণ পুষ্করিণীই শিবসাগরকে স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিয়াছে।

শিবসাগর দীঘিকার তীরে যেসকল দেবালয় আছে, তন্মধ্যে "শিবদোল"ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা কলিকাতার সুবিখ্যাত Ochterloney Monument হইতে উচ্চতায় ৭-৮ ফুট অধিক।

মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা—'মুক্তিনাথ' (শিবমূর্ত্তি)।

শিবসাগর ও শিবদোল

সেই হেতু, মন্দিরটী "মুক্তিনাথের মন্দির" বলিয়াও পরিচিত। বিগ্রহটী অদ্যাপি যথারীতি পূজার্চ্চনায় বঞ্চিত হয়েন নাই।—মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ শিবসাগর-দীঘিকার দিকে; মন্দিরের চূড়ার উপর একটি ত্রিশূল দৃষ্ট হয়—তাহার বহির্দ্দেশীয় দৈর্ঘ্য সার্দ্ধ তিন হস্ত; লৌহ দণ্ডটির পরিধি দুই ইঞ্চি পরিমাণ। এই ত্রিশূল দণ্ডটি, মন্দিরের শিখরদেশ হইতে নিম্নে, ভূগর্ভপর্য্যন্ত প্রোথিত আছে।

অনেকের মতে, এই অত্যুচ্চ মন্দিরের চূড়াটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। আহোমদিগের সহিত যুদ্ধের সময় মগেরা উক্ত স্বর্ণ-চূড়াটি আত্মসাৎ করিতে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু দেবালয়টির অত্যুচ্চতা-নিবন্ধন তাহাতে সফলকাম হয় নাই। চূড়ার উপর যেসকল কামান ও গুলির দাগ আছে, তাহা তৎকল্পে মগেদের বিবিধপ্রয়াসের পরিচায়ক।

* শিবসিংহ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

† শিবসাগর-দীর্ঘিকার তীরস্থ শিবদোল, বিষ্ণুদোল ও দেবীদোল—১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে, শিবসিংহের দ্বিতীয়া মহিষী অম্বিকা দেবী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, বলিয়া আসাম-ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়।

আমি যে সময়ে শিবসাগরে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন মন্দিরটীর শিখরদেশের আবর্জ্জনাদি পরিষ্কৃত হইতেছিল। সেই সময়ে, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, উক্ত চূড়াটির আয়তন চারিহস্ত পরিমিত। উহা নীরেট স্বর্ণের নহে; তাম্র-কলসের উপর পুরু স্বর্ণপাত দিয়া মোড়া—তাম্রের ভিতর ফাঁপা; এই তাম্র প্রায় ১½ ইঞ্চি পুরু। উহাতে যে সকল কামান ও গুলির দাগ আছে, সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার—উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮½ ফুট এবং পরিধি ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি—মুখ বিবরের ব্যাস ৭ ইঞ্চি। এই বৃহত্তম কামানটী কবে, কাহার দ্বারা, নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই।

আহোম-ইতিহাসের একস্থানে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হুসেন খাঁর সহিত যুদ্ধে, হুসেন খাঁ আহোমগণ কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়নপর হইলে, তিনি ধৃত ও নিহত

আহোমরাজগণের পাঁচটি কামান

হ'ন। এবং আহোমগণ তাঁহার অধিকারভুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ২৮টী হস্তী, ৮৫০টী অশ্ব এবং অনেকগুলি কামান ও বন্দুক কাড়িয়া লইয়া আসে। অপিচ, এই যুদ্ধের পর (খৃষ্টাব্দ ১৫৩১) হইতেই আহোমরাজ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রথম-প্রবর্ত্তন হয়। তৎপূর্ব্বে তীরধনুক ও বর্ষার ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। সুতরাং, এই বৃহত্তম কামানটী পূর্ব্বে মুসলমান-নৃপতিগণের ছিল, কি না, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিবেচ্য।

বৃহত্তমটীর ব্যাস ৩½ ইঞ্চি—অন্যান্যগুলি আকারে অনধিক ½ ইঞ্চি। মন্দিরাগ্রভাগে যেসকল গোলাকার 'চড়িয়া' আছে, তন্মধ্যে বৃহত্তমটীর পরিধি ১৬ হাত।

মুক্তিনাথের মন্দিরের দক্ষিণদিকে 'দেবীদোল' ও বাম দিকে 'বিষ্ণুদোল' অবস্থিত।

শিবসাগরের যে তীরে মন্দিরগুলি অবস্থিত, সেই তীরে—স্থানীয় শাসন ও বিচারপতির আফিসের সম্মুখে—পাঁচটী কামান পড়িয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সংযোজিত চিত্রে যেটী ইষ্টকের গাঁথুনীর উপর সংরক্ষিত রহিয়াছে,

নাৎসুকো হিগুচী *

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

জাপানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় বহুবারই সংস্কারকার্য্য সাধিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দীর্ঘ সংস্কারযুগেই মহিলাদিগের প্রতিভা বিকাশের কদাচ অভাব হয় নাই। অবশ্য, হী-য়ান্ যুগের পর হইতে, শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলার সংখ্যা অনেক হ্রাস হইলেও, একেবারে বিরল হয় নাই। তবে Genji Monogatari "গেঞ্জি মনোগাতারি"-রচয়িত্রী শ্রীমতী মুরাসাকি শিকিবু (Murasaki Shikibu) এবং (Makura-no Soshi) "মাকুরা-নো-শশী"-রচয়িত্রী শ্রীমতী সীশোনাগোন্ (Seishonagon) প্রভৃতি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্না বিদূষীর ন্যায় প্রতিভাময়ীরমণী অধুনা বড়-একটা জাপানে জন্মে নাই, সত্য; কিন্তু তাহার কারণ, বোধ হয়, এই যে—উঁহাদের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালে, জাপানের দেশাচার ও রীতি-নীতি রমণীদিগের পক্ষে এরূপ কঠোরতর—উৎকটভাবে প্রকটিত হইয়াছে, যে তাহাতে তাহাদের প্রতিভা-বিকাশেরপক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। (Meiji Era) 'মীযি যুগ' পর্য্যন্ত বাস্তবিকই কোনও মহিলালেখিকাই,পূর্ব্ববর্ত্তিনী জাপসাহিত্যাকাশ-শোভিনী ভাস্বর তারকাবৃন্দের সমকক্ষরূপে প্রতিভাত হয়েন নাই। এই যুগই শ্রীমতী (Natsuko Higuchi) নাৎসুকো হিগুচির আবির্ভাবকাল। ইনি কল্পিত 'ইচিয়ো' (Ichiyo)-নামে লিখিতেন। ইঁহার রচিত উপন্যাসগুলি জাপানের জনসাধারণের—সমগ্র জাপজাতির—মনে প্রবল ও প্রভূত প্রভাববিস্তার করিয়াছিল।—প্রত্যুত, এক্ষেত্রে জাপানীরা প্রকৃত গুণের যথাযথ সমাদর করিয়াছিল।

নাৎসুকো হিগুচী

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী বহুসংখ্যক গ্রন্থকর্ত্রীর ন্যায়, নাৎসুকো হিগুচির জীবনীও দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত দ্বন্দ্বের করুণ বিবরণী-পূর্ণ। ইংরাজ-কবি কীট্‌সের ন্যায়, ইনিও, স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বেই, পরলোকগমন করেন। ১৮৭২ সালের ২৫এ মার্চ্চ তোকিও নগরে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই পিতৃহীনা হওয়ায়, জননী ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য, বালিকাবস্থা হইতেই ইঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইত। অতি কিশোর বয়স হইতেই বালিকার একান্ত-সাহিত্যানুরাগের উন্মেষ হয়—অতি তরুণ

* "Japan Magazine" হইতে গৃহীত।

বয়সেই তিনি জাতীয় পুরাণে সুব্যুৎপন্না হইয়া উঠিলেন। কবিতা ও সৎসাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং লিপি-কৌশলে স্বজাতি-সম্ভব শিল্প-দক্ষতা ছিল। ইংরেজী বা বাঙ্গালা লিপিলিখনে চিত্রশিল্পানুরাগ-প্রদর্শনের উপায় নাই—অন্যপক্ষে, সিদ্ধহস্ত চিত্রশিল্পীর ন্যায় বিচিত্র রেখাপাতই জাপানী হস্তলিপির বিশেষত্ব। সুতরাং, যাহাদের হস্তলিপিতে চিত্রশিল্পীসম্ভব রেখা-সম্পাৎ দৃষ্ট হয়, জাপানীরা তাহাদিগকে বিচিত্র প্রতিভা-সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগের নিকট যথেষ্ট আশা রাখে। তবে, কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলায় পেট ভরে না; সুতরাং, ভাবী গ্রন্থকর্ত্রী, পরিবার-বর্গের জীবিকার্জ্জনের উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া, রন্ধনের উপকরণের এক বিপণি স্থাপন করিলেন। ক্রেতাদিগের অপেক্ষায় এইখানে বসিয়া থাকিবার সময়, তিনি স্বীয় রচনার উৎকর্ষ-সাধনে এবং জাতীয় সাহিত্য সম্ভারের অপূর্ব্ব স্বাদগ্রহণে ব্যাপৃতা থাকিতেন।

তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। তদৃষ্টে বুঝা গেল যে, এই নবীন সাহিত্যযশঃপ্রার্থিনী, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার, সৈকাকু (Saikaku)কে নিজ আদর্শ ও গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। টোকুগায়া(Tokugawa)-যুগের শেষভাগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সত্যঘটনামূলক-উপন্যাস-রচয়িতা, এই সৈকাকু। নাৎসু-কো হিগুচি কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সেই প্রথম-গুরুকে ত্যাগ করিয়া ছিলেন। অতঃপর, তাঁহার রচনায়, মীযি-যুগের টমাস্-হার্ডি-স্বরূপ, আধুনিক শক্তিমান্ লেখক রোহান্ কোডা(Rohan Kuda)র শিষ্যা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার স্বকীয় ধীশক্তি, অনুকরণ ও শিষ্যত্বের উর্দ্ধে উপনীত হইল; তখন, আত্মশক্তি বুঝিতে পারিয়া, তিনি, তাঁহার নিজস্ব এক লিখন-ধারা উদ্ভাবিত করিয়া, স্বজাতি মধ্যে অক্ষয় যশোলাভ করিলেন। অভাব ও দারিদ্র্যের সহিত কঠোরসংগ্রামে তাঁহার আত্ম-নির্ভর-শক্তি জন্মিয়াছিল। মানব-জীবনের দুঃখ-কষ্টের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট পরিচয় থাকায়, তৎপ্রতি স্বতঃই তাঁহার সমবেদনা ছিল; সুতরাং, সেসকল যথাযথ ভাবে চিত্রণে তিনি এমন কৃতিত্ব দেখাইলেন যে, জাপানে ইতঃপূর্ব্বে কেহই তেমন পারে নাই। জাপানী সমাজের পাপ-পুণ্যসঙ্কুল অংশগুলি তাঁহার বিশেষ সুবিদিত ছিল। মানব-জীবন অসংখ্য দ্বন্দ্বভাবময়-সমাকুল হইলেও, যেগুলির উন্নতিসাধন একান্তকর্ত্তব্য ও সহজসাধ্য, সেইগুলিই তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিতেন। মানব-মনোভাবের চরম-বিশ্লেষণে এবং অবস্থা-চয়ের কার্য্যকারিতা ও প্রভাব নির্দ্দেশে তিনি অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার গল্পগুলি মানব চরিত্র অধ্যয়নাকাঙ্ক্ষী মনীষিগণের নিকটে যেমন সমাদৃত, সমাজতত্ত্বান্বেষীদিগের নিকটেও তেমনই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। হিগুচী, সমাজের চতুষ্পার্শ্বব্যাপী পাপের চিত্রগুলিতে যেমন যথাযথ—অথচ বিকট—বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রতি-ফলিত করিয়াছেন, নিরীহ ও গরীবদিগের প্রতি পীড়ন ও অত্যাচার কালিমাগুলিকেও তিনি তেমনই নবীন সভ্যতার বিকট কলঙ্করূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। ন্যায়-সত্য কেন চিরকাল বধ্যমঞ্চোপরি উপনীত, এবং অন্যায়-অনৃত কেন আবহমানকাল সিংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত থাকিবে, তাহাই নিরাকরণ করা যেন এই শক্তিময়ী লেখিকার একমাত্র উদ্দেশ্য!

নাৎসু-কো হিগুচি, নানা করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া, দেখাইয়াছেন যে, তরুণবয়স্কা বালিকার মধুর নিরীহ ভাবরাজি পাপাসক্ত মানবের শতচেষ্টাতেও কলুষিত—বিলুপ্ত হয় না;—তাহারা তাহাদের স্বর্গীয়—'ঋত' মাধুর্য্য চিরতরে অব্যাহতভাবে রক্ষা করে। তাঁহার বিশ্বাস, রমণীহৃদয়ের একনিষ্ঠারূপ সদ্‌গুণ অক্ষয়—চিরস্থায়ী; মানব, বা দানব, বলে ইহা বিধ্বস্ত—বিলুপ্ত হইবার নহে;—কেবলমাত্র রমণীর স্বেচ্ছাবশেই তাহা বিনষ্ট—বিলুপ্ত হইতে পারে;—অন্যথায় নহে। সমগ্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং নেত্রসমক্ষে নিয়ত শতশত নিষ্কলঙ্কা—নিরীহ বালিকা-গুলিকে হৃদয়হীন নির্দ্দয় পিতামাতা, বা অভিভাবকবর্গ-কর্ত্তৃক কলঙ্কসমুদ্রে নিঃক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া, তিনি নৈরাশ্য-দগ্ধদিগের হৃদয়ে আশাবারি সিঞ্চন করিতেন—বিক্রীত-দেহাদিগকে আত্মার স্বাধীনতা শিক্ষা দিতেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্লেদকর্দ্দমে নিমজ্জিতা—কাম-বিলাসের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিতা—অনেক তরুণীই যে এপর্য্যন্ত স্ব স্ব আত্মার নিষ্পাপতা রক্ষা করিয়াছে এবং যাবতীয় নিরীহ হতভাগিনীর পক্ষে যে তাহাই কর্ত্তব্য—পতিতাদিগকে সর্ব্বদাই তিনি এই সকল কথা শিক্ষা দিতেন—নির্ম্মম অবস্থাবিপর্য্যয়ে সমাজ সমুদ্রের-নিম্নতম তলে তাহাদের দেহ নিমগ্ন হইতে পারে;

কিন্তু, তথাপি, হৃদয়স্থীয় স্বাভাবিক গুণরাশির সহিত কাল, তাপ এবং পাপরূপ মেঘমালার বহু উচ্চে—উর্দ্ধে বিচরণ] করিতে সক্ষম। নাৎসু-কো হিগুচির এই নীতিমালাই তাঁহার যাবতীয় গল্পের মেরুদণ্ড।—ঘোর নৈরাশ্যসমুদ্রে ভাসমান্ অভাগীদিগকে আশার ভেলা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই যেন তিনি সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কে বলিতে পারে যে জাপানে এখনও এইরূপ সাহিত্য-প্রচার প্রয়োজন নহে? সমাজের—দেশের—জগতের আবর্জ্জনারূপে পরি বর্জ্জিতা—ঘৃণিতা, ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলঙ্ক ও বিলাসপঙ্কে নিমজ্জিতা, অভাগিনিদিগের হৃদয়ে সদেচ্ছার উন্মেষ করা—তাহাদের পরিত্রাণের চেষ্টা করা—কতই না অসাধ্য সাধন! কিন্তু সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পেই এই প্রতিভাময়ী বিদুষী সাহিত্য সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন।—তাঁহার সুষমাময়ী, শোভন, অপিচ পবিত্র লেখনিসম্পাতে তিনি অনবরত এইসকল চিত্রই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রকৃত নারীসম্ভব, নিয়ত সমবেদনা উচ্ছ্বসিত, হৃদয় লইয়া যেকেহ এই সকল গল্প পাঠ করিবে, সেই ই যে জাপানী সমাজের অন্তঃবাহী এই করুণ প্রবাহ অনুভব করিয়া, ইহার ভাবী পরিণাম কল্পনায় একান্ত কাতর হইবে-একথা দৃঢ়-নিশ্চয়। এই চরম নৈরাশ্যপীড়িতা শ্রেণীকে একমাত্র আশা-রশ্মিই রক্ষা করিতে সমর্থ, কিন্তু সে আশা রশ্মি কোথা হইতে উদ্ভূত, এবং কোথায়ই বা প্রতিভাত, হইবে? সরল নিষ্কল হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ—কুমারীসুলভ—সততায়, সেই রশ্মি উদ্ভূত ও প্রতিফলিত হওয়া যে সম্ভবপর, নাৎসু-কো হিগুচি একথা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। প্রত্যেক মানবহৃদয়েই দেবাংশ আছে, প্রত্যেকেই, ইচ্ছা থাকিলে, সেই ব্রহ্মবিন্দুর প্ররোচনায় নিজ নিজ নিয়তি পরিচালিত করিতে সমর্থ। এরূপ একটা আশা পোষণ করা সমীচিন, কি না—সেকথা এখনও বলা যায় না।—বাস্তব-জীবনে এইভাবে অনুপ্রাণিত একখানি করুণ সত্য—জীবন্ত সামাজিক-নাটক অভিনীত হইলে, সেটা ঠিক বুঝা যাইবে। ইহাতে মিলনান্ত নাটকের কতকটা উত্তেজনা আছে, সত্য; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এপর্য্যন্ত যদিও, পঞ্চাঙ্কের মধ্যে, মাত্র তৃতীয় অঙ্কের অধিক অভিনয় হইতে দেখা যায় নাই, তথাপি, মনে হয়—এগুলি যেন বিয়োগান্ত হইবারই পূর্ব্বলক্ষণ সূচনা করিতেছে।—সেক্ষপীয়রের ম্যাক্‌বেথের মত, যেন প্রথম হইতেই একটা অশরীরী ভূতযোনির অনুসরণ আতঙ্ক অনুভূত হইতেছে, এবং অভিনয় যত অগ্রসর হইতেছে, ততই যেন সেই ভীতি বর্দ্ধমান হইতেছে।

নাৎসু কো হিগুচি পঁচিশখানি পুস্তকরচনা করিয়া পরলোকে গমন করেন। অল্লায়ু গ্রন্থকর্ত্তৃর পক্ষে ইহা বড় সামান্য গৌরবের কথা নহে! তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থাবলী করুণ রসাশ্রিত—প্রত্যেক খানিই তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের ইতিকথা। মানব হৃদয়ের নিষ্পাপতার প্রতি তাঁহার অগাধবিশ্বাস সত্বেও, তিনি সহসা স্খলিতপদা রমণীবৃন্দের দুঃখে একান্তই অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সাঙ্ঘাতিক অধঃপতন কলুষাক্রান্ত হইয়া পঁচিশ বৎসর বয়সে, ১৮৯৬ সালের ২৩এ নভেম্বর, এই নরদেহ ত্যাগ করেন। এই কচিৎদৃষ্টপ্রকৃতিবিশিষ্টা রমণী যে চির অনূঢ়া ছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাঁহার কুমারী জীবনের গণা দিনকয়টা, তিনি তাঁহার স্বজাতীয়া অধঃপাতিতা পদদলিতা ভগিনীবর্গের উদ্ধারকল্পেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসিগণের বিশ্বাস, তাহাদের সাহিত্যে তাঁহার নাম অক্ষয়—অমর হইয়া গিয়াছে। হায়। তিনি যদি জীবিতা থাকিয়া, তাঁহার প্রতিভার পূর্ণপরিণতির ফল রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে, না জানি সে একটা কি কীর্ত্তি থাকিত।

তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে (Takekurabe) 'তুলনায় কে উচ্চ?' নামক গল্পটিই সর্ব্বজনাদৃত। ইহাতে তিনি জাপানী বাল্যজীবন অঙ্কিত করিয়াছেন—এই প্রসঙ্গই তাঁহার প্রিয় ছিল এবং এতদঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্তা ছিলেন। অনেকে এই পুস্তকখানিকেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। ১৮৯৫ সালে, অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ববৎসর, ইহা লিখিত হয়। আমরা ইহার গল্পাংশ নিম্নে প্রকটিত করিলাম -

'গ্রন্থসূচনায়, তোকিওর Daionji mae নামক একটি কদর্য্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে- স্থানটা 'Yoshiwara'—রাজধানীর রাত্রিহীন পল্লীর অদূরে সংস্থাপিত। এখানে যেসকল দরিদ্রা চরিত্রহীনার বাস, তাহারা বিলাসিকুলের কার্য্যকারকগণের সেবা করিয়াই দিনপাত করে। ইহারই অদূরে, Ryugenji নামক একটি বৌদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাপানী ধর্ম্মনীতি-অনুসারে চিরকৌমার্য্য রক্ষা করিতে

প্রতিশ্রুত হইয়াও, এই মন্দিরের পুরোহিত জনৈকা বিধবার প্রতি আসক্ত হয়েন এবং, কালে,তাহার গর্ভে একটি পুত্রোৎপাদনও করিয়াছিলেন। সেই পুত্রের বয়স এখন পঞ্চদশ-বর্ষ—নাম (Shinnyo) শিন্নিও। পুরোহিত পিতা নিতান্ত অর্থ-পিশাচ—অর্থোর্জ্জনের উদ্দেশেই তিনি এই পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন। বালকের বুদ্ধিবিকাশ হইলে, সে, পিতার প্রকৃতচরিত্র জ্ঞাত হইয়া, সাতিশয় কুণ্ঠিত হইল। সে প্রায়ই বলিত যে, সে যখন পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবে, তখন সে কদাচ পিতার ন্যায় আচরণ করিবে না। বালক, স্থানীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, এবং আবাল্য তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দিয়াছিল। সেটা একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়—তথায় বালক-বালিকা সকলেই একত্রে পাঠ করিত। মিডোরি-নাম্নী একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাও সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। এই বালিকার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বালিকাবয়সে,, অদূরবাসিনী জনৈকা চরিত্রহীনার নিকট বিক্রীতা হইয়াছিল—এখন সে তদঞ্চলের একজন বিখ্যাতা সুন্দরী বলিয়া প্রতিষ্ঠিতা। সেই কুমারীকে অসৎ-ব্যবসায়ীর হস্তে বিক্রয়ান্তে, তাহার পিতামাতা, প্রতিবেশী-দিগের মুখ দেখাইতে লজ্জিত হইয়া, পূর্ব্ববাসস্থান পরিহার-পূর্ব্বক Yoshiwaraর সন্নিকটে আসিয়া বাস করিতেছিল—এইখান হইতেই মিডোরি বিদ্যালয়ে যাইত। তাহার পিতা, নিকটবর্ত্তী একটি গণিকালয়ে হিসাবরক্ষকের কার্য্য করিত; মাতা স্থানীয় বিলাসিনীবর্গের সীবনকার্য্যাদি করিয়া যথাসম্ভব উপার্জ্জন করিত। মিডোরী এবং বালক শিন্নিও ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল—বিদ্যালয়ে উভয়ে একত্রে যাপন করে, একসঙ্গে খেলা করে। একদিন একটি ব্যায়ামক্রীড়ায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে, শিন্নিও পড়িয়া যায়—তাহার হাঁটু ছড়িয়া যায়। মিডোরি, দ্রুতপদে তাহার সন্নিহিত হইয়া, নিজের রুমালদ্বারা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল—তদ্দৃষ্টে সমবেত সকলে হাসিয়া উঠিল। বালকেরা, শিন্নিওকে লক্ষ্য করিয়া, উপহাসচ্ছলে বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখ-দেখ, শিন্নিও পুরোহিতের পুত্র হইয়া বালিকার প্রতি অনুরক্ত!" এই শ্লেষবাক্য বালকের অন্তরে বিঁধিল—সে মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইল। অতঃপর,আর সে মিডোরির সংশ্রবে ঘেঁসিত না। মিডোরি কিন্তু স্বপ্নেও তাহা সন্দেহপর্য্যন্ত করে নাই—পূর্ব্বভাবের যে আদৌ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, একথা সে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে নাই; শিন্নিওর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলেই সে পূর্ব্ববৎ অভিবাদন করিত—পূর্ব্ববৎ আচরণ করিত। বালক, কিন্তু উপহাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে, দূরে দূরে থাকিত—এবং ক্রমে, বালিকার সহিত সকলসংশ্রব পরিত্যাগ করিল। একদা, পথে কতকগুলা বালক মিডোরির প্রতি কর্দ্দম নিক্ষেপ করিতেছিল—শিন্নিও তাহা দেখিতে পায়, এবং, তাহাদের নিবারণ করা দূরে থাকুক, তাহাদের সহিত যোগদান করে! সেই হইতে মিডোরি আর তাহার সংশ্রবে যাইত না—কিন্তু তাহার হৃদয়ের নিভৃতনিলয়ে বাল্যপ্রেম-বহ্নি সমভাবে প্রজ্বলিত রহিল। অতঃপর মিডোরি শোটারো (Shotaro) নামক অপর এক হৃদয়বান্ বালকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। পথে, বালকেরা যখন বালিকার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিত—তাহার জ্যেষ্ঠার কথা তুলিয়া তাহার প্রতি অপমানসূচক বাক্যাদি প্রয়োগ করিত—তখন শোটারো তাহাদিগের হস্ত হইতে মিডোরিকে রক্ষা করিত।

একদা শরৎকালে—নিশীথে বৃষ্টি হইতেছে; শোটারো এবং মিডোরি একত্রে গৃহমধ্যে ক্রীড়ায় রত আছে; এমন সময় বহির্দ্দেশে সহসা একটা শব্দ শ্রুত হইল। দ্বারমুক্ত করিয়া তাহারা দেখিল—শিন্নিও দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। মিডোরি, এই ব্যাপার দৃষ্টে বিশেষ চিন্তিতা হইল। ইহার অল্পদিন পরেই, একদা সে শিন্নিওকে পথে দেখিতে পাইল—শিন্নিও একটি (Geta) যন্ত্রের ছিন্ন-তার বন্ধন করিতেছিল; বালিকার একান্ত ইচ্ছা হইল, পূর্ব্বের ন্যায় সে গিয়া শিন্নিওকে সাহায্য করে—বালক কিন্তু বিরক্ত হইল। ইহার পর আরও কিছু-দিন কাটিল—শীত আসিল, চলিয়া গেল;—শিন্নিওর পৌরোহিত্যকার্য্যে দীক্ষিত হইবার সময় উপস্থিত! একদিন প্রাতঃকালে, নিজ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, মিডোরি দেখিতে পাইল, দ্বারদেশে একটি (Suisen—Polyanthus Narcissus)—বকুল-কলিকা পড়িয়া আছে।—কোথা হইতে এই ফুল আসিল, কেহই বলিতে পারিল না! ফুলগুলি অতি সুন্দর—মিডোরি এই ফুল বড়ই ভাল বাসিত। সে সোৎসুকে ফুলগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া, মুগ্ধান্তঃকরণে একটি পাত্রে রক্ষা করিল।—পরদিন শুনিল, শিন্নিও পৌরোহিত্যে দীক্ষিত হইয়াছে!

—এইভাবে গল্পটি গ্রথিত; কিন্তু, যাবতীয় জাপানী কলার মত, এই গল্পের করুণ-রসাত্মক অংশগুলি প্রায় উহ্য —পাঠকপাঠিকার কল্পনাসাপেক্ষ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা গল্পের মর্ম্মাংশ যেভাবে বিবৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহার প্রকৃত-রসগ্রহণ আদৌ সম্ভবপর নহে। লেখিকা যথাযথ বর্ণসম্পাতে জাপানের শৈশব-জীবনের আনুপূর্ব্বিক চিত্র, যৌবনের বিচিত্র ভাবপ্রাবল্য ও তাহাদের প্রভাবের চিত্র, যেভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বাস্তবিকই অপরূপ! এইসকল বর্ণনচ্ছলে তিনি, মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিতোক্তি করিয়া, বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে--যৌবনের প্রভাব, পরিণত-জীবনের অদৃষ্টকে কচিৎ নিয়ন্ত্রিত করে।—তাঁহার মতে, জাপানের তথাকথিত সভ্যতার, বা সামাজিক আচার-বিধির, বিকটকঠোর পেষণে দেশবাসীর চরিত্র এবং মানসিক স্বাধীনতা এককালে নিষ্পেষিত—বিলুপ্ত, হইয়া যায়। এই সকল ভাব-অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া, শক্তিময়ী লেখিকা একটি বালিকা-জীবনের আবাল্য-বর্দ্ধিত প্রথমপ্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—উপসংহারে পরি-বর্জ্জন, প্রত্যাখ্যান—ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সত্য ও পবিত্রতা-বিরোধী ভাবসমূহের মধ্যে, দুইটি স্নিগ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের বিকাশ, ইহাতে দক্ষহস্তে চিত্রিত হইয়াছে। গল্পের অবান্তর—অপ্রধান চরিত্রগুলির ভিতর দিয়া, আধুনিক জাপানী-সমাজের অযত্নপালিত যুবকদিগের দুষ্টচরিত্র এমন বিশদভাবে বর্ণিত,—সাধারণসমক্ষে নীত হইয়াছে, যে জাপানীজাতি অবহিত চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ ও অনুধাবন না করিয়া পারে না।

জাপ-সমাজের একটা বিভাগ আছে, যাহার প্রভাবে জনসাধারণ কলুষপ্রবণ হয়—অথচ তাহারই মধ্য হইতে পুণ্যচরিত্র মহাত্মাও সমুদ্ভূত হয়েন। লেখিকা এই পুস্তক খানিতে সেই বিভাগেরই একটা যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন যে, সুযোগ-সুবিধা ঘটিলে, তাহাদের অনেকেই কি মহান্ হইতে পারে! মীযি যুগের (Meiji Era) জাপ-সমাজের নিম্ন-শ্রেণীয়গণের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতিরূপে পুস্তকখানি বহুকাল বিরাজ করিবে। ইহার ভাষা ও ধারা, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে, আধুনিক জাপনী মহিলা-প্রতিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দেশীয় সামন্ত রাজন্যবর্গের মহা-বিদ্যালয়সমূহ *

রাজকুমারকলেজ

[শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ]

শ্রীগণপতি রায়

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাজকোটে 'রাজকুমার কলেজ' স্থাপিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে কথিবাড়ের সামন্তবর্গ—উচ্চবংশীয় জনগণ,তাঁহাদের পুত্রগণের শিক্ষার জন্য, এই কলেজ স্থাপিত করেন। পরে, বোম্বাই বিভাগের রাজন্যবর্গের কুমারগণ তথায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন; অবশেষে, আজমীঢ়ে কর্ণেল ওয়ালটার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মেয়ো কলেজ স্থাপন করেন। তখন উহাকে কেহ 'মেয়ো কলেজ' বলিত না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, লর্ড মেয়োর মৃত্যু হইলে, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, উহাই 'মেয়ো কলেজ' নামে অভিহিত হয়। রাজ-কুমার কলেজে (বুন্দেলখন্দের) নওগাঁর রাজন্যবর্গ শিক্ষা-প্রাপ্ত হইতেন। স্যর এইচ. ডেলি (Sir H. Daly) মধ্যভারতের রাজন্যবর্গের শিক্ষার জন্য রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত করেন; ইহাই পরে 'ড্যালি কলেজ' নামে অভিহিত হয়। এই কলেজ পরে রাজকুমার কলেজের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে 'এচিসন্ কলেজ' (Aitchi-

* "Windsor Magazine" ইত্যাদি হইতে সঙ্কলিত।

son College) স্থাপিত হয়। এই সময়েই লক্ষ্ণৌতে, অযোধ্যার তালুকদারগণের পুত্রবর্গের জন্য, 'কল্ভিন্ বিদ্যালয়' (Colvin School) এবং, ছত্রগড়ের রাজন্যবর্গের সন্ততিগণের জন্য, 'রাইপুর কলেজ' স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, আরও দুইটি কলেজ স্থাপিত হয়—তাহার একটির

রাজকোট কলেজের অভ্যন্তর-ভাগ

নাম 'গিরাশিয়া কলেজ' (Girasia College), অপরটি কথিবাড়ে 'ওয়াদিবন' (Wadhivan) কলেজ। এইরূপে, তৎকালে, রাজকুমারগণের শিক্ষার জন্য, যে সমস্ত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে—আজমীঢ়,লাহোর, রাজকোট, ও ইন্দোরের মহাবিদ্যালয়গুলিই উল্লেখযোগ্য।

মেয়ো কলেজের প্রেসিডেণ্ট—বড় লাট, ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট—এজেণ্ট, সদস্য—আজমীঢ়ের কমিশনর এবং সতেরজন পলিটিক্যাল কর্ম্মচারী, সেক্রেটরী—কলেজের অধ্যক্ষ। মেয়ো কলেজের অধ্যক্ষ এবং এচিসন কলেজের গবর্ণর সৈনিক পুরুষ; অন্যান্য অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক য়ুরোপীয় হওয়া চাই। মেয়ো কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজের ছেলেদের শারীরিক বলবৃদ্ধির উপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত চারিটি কলেজে গড়ে মোট ১৮০ হইতে ১৯০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করে। মেয়ো এবং এচিসন কলেজে ৬০ জন, রাজকোট কলেজে ৪০ জন, ডেলি কলেজে ২০ জন—আবার, দুই-এক বৎসর অন্তর এই সংখ্যার ইতরবিশেষও হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ঈটন স্কুলের রীত্যনুসারে এই সকল কলেজে শিক্ষা দিবার কথা। তবে, ঈটন স্কুলে উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণী-পার্থক্য (class distinction) নাই; কিন্তু ভারতবর্ষের এই মহাবিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণী-পার্থক্য বিলক্ষণরূপে বিদ্যমান্। সুতরাং ইংলণ্ডের ন্যায় শিক্ষাপ্রণালী-প্রবর্ত্তন এদেশে কদাচ সম্ভবপর নহে। ইংলণ্ডে—ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিচারে—সকলে সমভাবে একস্থানে অধ্যয়ন করিতে
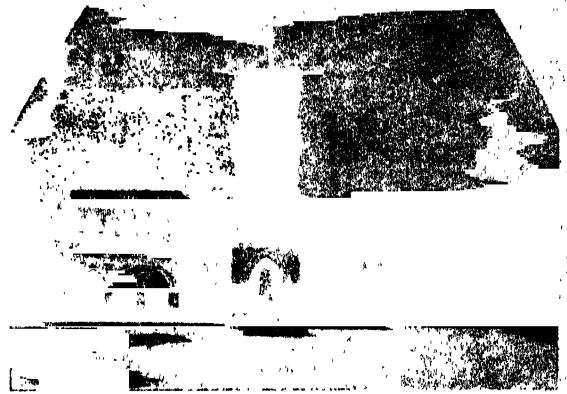
রাজকোট কলেজ

দ্বিধা বোধ করে না; কিন্তু ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজার পুত্রগণ, জমিদারের ছেলেদের সঙ্গে বাস করিতে, বা অধ্যয়ন করিতে কদাচ রাজি হয় না। মেয়ো কলেজ রাজপুতানার রাজন্যবর্গ ও ধনীব্যক্তিদিগের জন্য। মেয়ো কলেজে কেবল মাত্র ১৪০ জন ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে; কিন্তু তথায় ৬০জন মাত্র ছাত্র আছে। বালকেরা বার বৎসর তিন মাস বয়সে তথায় প্রবেশ করে, এবং সতের বৎসর নয় মাস বয়সে কলেজ পরিত্যাগ করে।
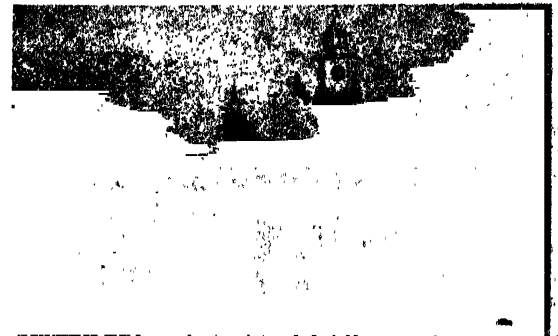
মেয়ো কলেজ—আজমীর

এচিসন কলেজে ছাত্রগণ অন্যূন এগার বৎসর বয়সে ভর্ত্তি হয় এবং আঠার হইতে বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কলেজ-পরিত্যাগ করে। রাজকোটে দশ বৎসর বয়সে কলেজে

ভর্ত্তি হইতে হয় এবং আঠার বৎসর বয়সে কলেজ-পরিত্যাগ করিতে হয়। ডেলি কলেজে দশ বৎসর হইতে সতর বৎসর-বয়স্ক বালকেরা প্রবেশলাভ করে এবং বিশ হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে কলেজ-পরিত্যাগ করিয়া যায়। ছাত্রদিগকে বোর্ডিংএ থাকিতে হয়। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার একজন "মোসাহিব" বা "মোতামিদে"র উপর ন্যস্ত থাকে। 'মোতামিদ' কিভাবে কার্য্য করিতেছেন, কলেজের অধ্যক্ষ তাহা লক্ষ্য রাখেন। দুজন মোতামিদ কলেজের শিক্ষক। এচিসন কলেজে মুসলমান ছাত্রগণ এক বোর্ডিংএ থাকে, ও হিন্দু ছাত্রগণ অপর বোর্ডিংএ থাকে। আবার, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ স্বতন্ত্র বোর্ডিংএ বাস করে। 'গোয়ালিয়র হাউস' কলেজ হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত। মেয়ো কলেজে মাত্র ১২টি ছাত্র নিজস্ব প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া অধ্যয়ন করে। রাজকোট কলেজে, মেট্রিকুলেশন অপেক্ষা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা নাই; এখানে ইংরেজী, গুজরাতী ও উর্দ্দু পড়ান হয়—তদ্ভিন্ন মুসলমান ছাত্রগণ আরবী ও পারসী অধ্যয়ন করে। ডেলি কলেজেরও ঐরূপ নিয়ম। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রত্যেক সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা, এবং নিম্ন শ্রেণীতে ৬ ঘণ্টা করিয়া ইংরেজী পড়ান হয়। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে, ইংরেজী কবিতাপুস্তক "Palgrave's Golden Treasury" এবং ইতিহাস "Buckley's History of England" পড়ান হয়।

অধ্যাপনা-প্রণালী

মেয়ো কলেজ—

ইংরেজী	১ম শ্রেণী	৯ ঘণ্টা	দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী	১৫ ঘণ্টা
মাতৃভাষা	,,	...	,, ,,	...
প্রাচ্যভাষা	,,	...	,, ,,	...
গণিত	,,	১০½ ঘণ্টা	,, ,,	৪½ ঘণ্টা
ইতিহাস	,,	...	,, ,,	৪½ ,,
ভূগোল	,,	...	,, ,,	৪½ ,,
বিজ্ঞান	,,	৯ ঘণ্টা	,, ,,	৪½ ,,

এচিসন কলেজ— রাজকোট কলেজ— ডেলি কলেজ—

	এচিসন কলেজ		রাজকোট কলেজ	ডেলি কলেজ
ইংরেজী	১ম শ্রেণী			
	২য় শ্রেণী	৯ ঘণ্টা	৯ ঘণ্টা	৬ ঘণ্টা
মাতৃভাষা	ঐ	...	৬ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা
প্রাচ্যভাষাদি	ঐ	২	...	...
গণিত	ঐ	৩	৫ ঘণ্টা	৮ ঘণ্টা
ইতিহাস	ঐ	...	৫ ঘণ্টা	৬ ঘণ্টা
বিজ্ঞান	ঐ	...	২½ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা
অঙ্কবিদ্যা	ঐ	...	১½ ঐ	

অধ্যাপকাদির বেতন-তালিকা

মেয়ো কলেজ :—

অধ্যক্ষের	মাসিক বেতন	১২৫০ টাকা
হেডমাষ্টারের	,,	৫০০ ,,
নয়জন সহকারী-শিক্ষকের	,,	৫০ হইতে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত
তিনজন ড্রিল-উপদেষ্টার	,,	২৭ (গড়ে)

রাজকোট কলেজ :—

	টাকা	আনা	পাই
অধ্যক্ষ	১১৬৬	১০	৮
প্রধান সহকারী-শিক্ষক	২৫০		
আটজন সহকারী-শিক্ষক	৫০ হইতে ১০০		
ক্রিকেট-শিক্ষক	৭৫		
ব্যায়াম-শিক্ষক	৫০		
অশ্বারোহণ-শিক্ষাদাতা	১৫		

ডেলি কলেজ :—

অধ্যক্ষ	৭৫০—৫০——১০০০ টাকা
সুপারিণ্টেডেণ্ট	১৮০ টাকা
চারিজন সহকারী-শিক্ষক	৩০ হইতে ১০০ টাকা
অশ্বারোহণ-শিক্ষাদাতা	৩৫ ,,
ড্রিল-শিক্ষক	১০ ,,

এচিসন কলেজ :—

গবর্ণরের বেতন	৪০০ টাকা
অধ্যক্ষ	৫০০—৫০——১০০ টাকা
সহকারী-অধ্যক্ষ	৪০০ টাকা
চারিজন সহকারী-শিক্ষক	৫০ হইতে ১০০ টাকা
বিজ্ঞান-শিক্ষক	৭০ টাকা
অঙ্কন-শিক্ষক	৭৫ টাকা
তিনজন প্রাচ্যভাষা-শিক্ষক	৩০ হইতে ৬০ টাকা
ব্যায়াম-শিক্ষক	২৫ টাকা
ড্রিল-শিক্ষক	২৫ টাকা
দুইজন বোর্ডিংএর মোসাহিব	৪০ (গড়ে)
সহকারী-মোসাহিব এবং অশ্বারোহণ-শিক্ষাদাতা	৩৫ টাকা
সহকারী-মোসাহিব	২৫ টাকা

মধ্যপ্রদেশের রাজকুমার কলেজ রাইপুরে। অপর চারিটি কলেজ-অপেক্ষা এইটির অবস্থা, নিতান্ত হীন হইলেও সন্তোষজনক। পূর্ব্বোক্ত সকল কলেজেই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অভিমতে এই সকল কলেজের জন্য একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাই ঐ সকল কলেজে অধীত হইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদ নবাবের স্কুল।—বাঙ্গালা দেশে মুর্শিদাবাদ নবাবের স্কুলে কেবল মাত্র নবাবের বংশধরেরা এবং আত্মীয় স্বজনেরা অধ্যয়ন করিতে পায়; অপর বড় একটা কেহ নহে। তাহাতে ৫০টি ছাত্রের অধিক প্রায়ই হয় না। স্থানটিও নিতান্ত স্বাস্থ্যকর নহে।

স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ

[শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত]
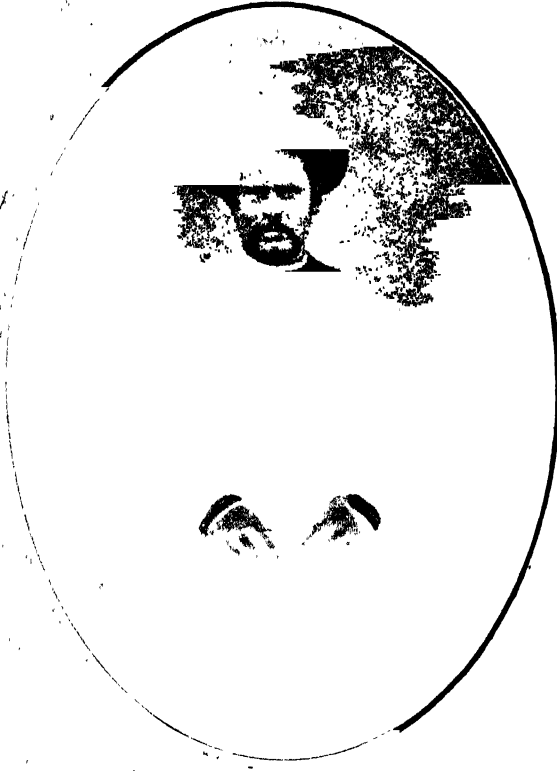
৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ

চরিত্রে ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষের তুল্য সুজন বড় একটা দেখা যায় না। চরিত্র, তাঁহাকে কর্ম্মে শক্তি দিয়াছিল; সে শক্তি তিনি ময়মনসিংহ নগরের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। উপকৃত নগরবাসিগণ তাঁহাকে ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথমনির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান-পদে বরণ করিয়া ছিলেন। গতবর্ষে তাঁহার স্মরণার্থ জনসাধারণের অর্থে নির্ম্মিত, মর্ম্মর প্রস্তর ফলক বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর-কর্ত্তৃক 'সূর্য্যকান্ত হলে' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার গুণের কতকটা সৎকার হইয়াছে। গত ২৫এ জুন, 'মেমোরিয়েল কমিটী'র উদ্যোগে, 'সূর্য্যকান্ত হলে' তাঁহার একখানি সুবৃহৎ তৈল-চিত্রও স্থাপিত হইয়াছে। প্রস্তর ফলকে ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষের কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৈল-চিত্রে তাঁহার সুন্দর প্রতিকৃতি, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের মনে একটী কর্ম্মশীল পুরুষের জীবন্ত স্বরূপ জাগাইয়া দিবে।

এই ঘোষ-পরিবার ফরিদপুরের অন্তর্গত ইদিলপুরের প্রসিদ্ধ রায়চৌধুরী বংশেরই শাখা। ইঁহারা তথা হইতে বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। ময়মনসিংহ নগর ইঁহাদের তিন পুরুষের কর্ম্মভূমি ও স্থায়ী নিবাস স্থল। এই নিবাস স্থান 'বড়বাসা' নামে পরিচিত।

৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ ইং ১৮৪১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রকান্তের পিতা ৺কৃষ্ণকান্ত ঘোষ সেকালের একজন খ্যাতনামা সিভিলকোর্ট আমীন ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস আমীনের সঙ্গে উৎকোচের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কিন্তু ৺কৃষ্ণকান্তকে কদাচ উৎকোচের কোনরূপ প্রলোভন স্পর্শ করিতে পারে নাই- বহুঘটনায় তিনি তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত, সাধু পিতার সাধু পুত্র। ইনি, প্রথমে, ময়মনসিংহ জেলা-স্কুলের ছাত্র ছিলেন; পরে ঢাকা কলেজে বি. এ পর্য্যন্ত পড়িয়া ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে এল্. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং পরবর্ত্তী সনে ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

উকিলের ব্যবসায়, বিশেষতঃ মফঃস্বলে উকিলের ব্যবসায়, অনেককেই মানুষের নিত্যকর্ত্তব্য হইতে বহু দূরে রাখিয়া দেয়। অর্থি শক্তি প্রত্যর্থীর আকর্ষণ, চুম্বকের অপেক্ষাও অতি বলবান্। উপার্জ্জন-লালসায় অনেক উকিলের আহার, বিহার, বিরাম, বিশ্রামেরও যথাসম্ভব অবসর থাকে না। ৺চন্দ্রকান্ত, নিত্যনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া, অর্থি-প্রত্যর্থীর সেবা করিতেন না। ইহাতে তাহার অর্থ উপার্জ্জনের যথেষ্ট ক্ষতি হইত; কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। দিবালোকে আমরা তাঁহাকে উকিল দেখিয়াছি; কিন্তু দীপালোকে তাঁহাকে

সদালাপ, আত্মচিন্তা এবং সৎগ্রন্থ পাঠক্রিয়া ব্যতীত অন্যকার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখি নাই। তাঁহার পিতৃব্য, প্রসিদ্ধ উকিল ৺কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের জীবনের ধারাও এইরূপ ছিল। তাঁহাদের আবাসবাটী যে 'বড়বাসা' নামে পরিচিত হইয়াছে, সেটা, প্রধানতঃ এই দুই ব্যক্তির গুণে।

অর্থের এবং অপর স্বার্থের কুহকে পড়িয়া বহুব্যক্তিকেই বিবেকবুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিতে দেখা যায়। চন্দ্রকান্ত সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। ময়মনসিংহ নগর—মোক্তারের দশত্রা, বিশত্রা এমন কি পঞ্চাশত্রার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 'লিগেল্ প্র্যাকটিসনর্স' আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর, ঐ প্রথা আইনতঃ অবৈধ বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু বহুমোক্তার, শিথিল-বিবেক উকিলগণের নিকট হইতে, পূর্ব্বের ন্যায় অর্থশোষণ করিতে থাকেন। চন্দ্রকান্ত কিছুতেই, মোক্তারদের মনস্তুষ্টির জন্য, আইনের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন, এবং বিবেকের আদেশ অবহেলা, করিতে প্রস্তুত হইলেন না। বহু মোক্তার তাঁহার প্রতি বাম হইয়া উঠিলেন। যেসকল জমিদারগৃহে তাঁহার প্রসার ছিল, মোক্তারের প্ররোচনায় সে প্রসার খর্ব্ব হইয়া আসিল—উপার্জ্জনের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। চন্দ্রকান্ত, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে, নিষ্কলঙ্কই থাকিয়া গেলেন। তাঁহার চরিত্রের এই দৃঢ়তা লোক প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

একসময়ে মিঃ রেনল্ডস্ ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাবু কালীশঙ্কর গুহ, ৺গঙ্গাদাস গুহ, ৺ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রকান্ত ঘোষ প্রভৃতি উকিলগণ, গাঙ্গাটিয়ার জমিদার ৺দীননাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে আনীত এক ফৌজদারী মোকদ্দমায়, মিঃ রেনল্ডসের সমীপে উপস্থিত হন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, মিঃ রেণল্ডস্ তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন; কিন্তু সাহেব তাহা করিলেন না—উকিলদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিয়া, আসামীপক্ষের কোন বক্তব্য না শুনিয়াই, তিনি খাস-কামরায় বসিয়াই, রায় লিখিলেন এবং এজলাসে আসিয়া ঐ রায় প্রকাশ করিলেন। ৺চন্দ্রকান্তের আত্মসম্মান-বোধ অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল। যে ফৌজদারী আদালতের বিচার-প্রণালী এরূপ অদ্ভুত, চন্দ্রকান্ত অতঃপর এজীবনে কখনও সে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হন নাই। অনন্তর, দেওয়ানী আদালতে তাঁহার যশঃ ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি ক্রমে ময়মনসিংহ 'বারের' এক শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রচুর অর্থ-প্রলোভনেও চন্দ্রকান্তকে, ব্যবসায়ের অনুরোধে, কেহ কোন দিন নিম্ন-আদালতে লইয়া যাইতে পারেন নাই। আইন-জ্ঞানে তাঁহার বিচক্ষণতা, ব্যবসায়ে তাঁহার প্রতিপত্তি ও সাধুতা, অর্থিপ্রত্যর্থীর সঙ্গে তাঁহার সদ্ব্যবহার, এই প্রদেশে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

কর্ম্মশক্তির বিকাশ, বহুপরিমাণে, সময় ও সুযোগের উপর নির্ভর করে। ১৮৭৭ সনে ৺সূর্য্যকান্ত আচার্য্য 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদুপলক্ষে, তিনি ময়মনসিংহ নগরের উপকারার্থ দশহাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করেন। মিঃ আলেকজাণ্ডর তখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি, ঐ অর্থে এক "অর্ণামেণ্টাল গার্ডেন" রচনা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। এখন যেস্থানে রেজেষ্ট্রী অফিস, সেই স্থানে একটি পঙ্কিল জলাশয় ছিল। এই স্থানটি বাগানের জন্য মনোনীত হয়।—নক্সা প্রস্তুত হইয়া গেল। পুষ্করিণী ভরাট হইতে লাগিল। ৺প্রাণকুমার দাস তখন ময়মনসিংহের অন্যতম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এবং ১৮৭৮ সনে চন্দ্রকান্ত ঘোষ 'টাউন কমিটী'র সভ্য হইলেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া, ইহাঁরা দুই জনে, "অর্ণামেণ্টাল গার্ডেনে"র পরিবর্ত্তে, "টাউন হল" নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই 'টাউন হল'-প্রতিষ্ঠা লইয়া উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণের সঙ্গে তাঁহাদের ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ৺চন্দ্রকান্ত হটিবার পাত্র ছিলেন না। পরে, রায় সূর্য্যকান্ত বাহাদুরও ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। চন্দ্রকান্তের অক্লান্ত চেষ্টায় "সূর্য্যকান্ত টাউন হল" নির্ম্মিত হইয়া, নগরবাসীর একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছে।

রাজা সূর্য্যকান্ত, পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী রাণী রাজ-রাজেশ্বরীর স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশে, নগরবাসীর কল্যাণসাধন-কল্পে, জনসাধারণের অগ্রহে, "সারস্বত সমিতি"র এক বার্ষিক অধিবেশনে, পঞ্চাশহাজার টাকা দান ঘোষণা করেন। এই অর্থে যাহাতে ময়মনসিংহ নগরে 'ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট' প্রতিষ্ঠিত হয়, বিভাগীয় কমিশনর তদ্রূপ যত্ন করিতে থাকেন। ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের প্রস্তাব নগরবাসিগণের মনঃপূত হইল না। ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ, রাজা সূর্য্যকান্ত বাহাদুরের অঙ্গীকৃত দানের টাকায়, ময়মনসিংহ নগরে

জলের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলেন। রাজা বাহাদুরও এই প্রস্তাবের অনুকূল হইলেন; কিন্তু এদিকে নগরের বহুলোক জলের কলের পক্ষে, এবং কতকলোক বিপক্ষে, মতপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতদুপলক্ষে, সূর্য্যকান্ত হলে জনসাধারণের এক বিরাট্ সভা হয়। চন্দ্রকান্ত ঘোষ তখন মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান; তিনি এরূপভাবে নগরবাসীদিগের প্রস্তাব করেন যে, সভায় জলের কলের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণই জয়ী হইয়াছিলেন। ৺চন্দ্রকান্তের উদ্যোগে এবং নগরবাসিগণের আগ্রহে, রাজাবাহাদুর, পঞ্চাশহাজারের পরিবর্ত্তে, একলক্ষ চৌদ্দহাজার টাকা দান করেন। চন্দ্রকান্তের যত্নে এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে, জলের কলের আনুমানিক ব্যয়ের বিবরণ প্রস্তুত, এবং স্থাননির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহা গৃহীত হয়। বঙ্গেশ্বর উহার ভিত্তিস্থাপন করিবেন, তাহাও স্থির হইয়া যায়। পরিতাপের বিষয়, ১৮৯১ সালের ১৮ই চন্দ্রকান্ত পরলোকে গমন করেন। ১১ই আগষ্ট মাননীয় স্যর চার্লস্ ইলিয়ট, ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বে, মহাসমারোহে 'রাজরাজেশ্বরী জলের কলে'র ভিত্তিস্থাপন করেন। ৺চন্দ্রকান্ত ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না সত্য; কিন্তু স্বর্গে—মন্দাকিনী তীরে বসিয়া, নগরবাসীর স্বাস্থ্য-সৌভাগ্য ভাবিয়া, আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিয়াছিলেন!—জলের কলে এই নগরের মহদুপকার করিয়াছে; তাই, পরামর্শদাতা চন্দ্রকান্তের নাম সূর্য্যকান্ত হলে মর্ম্মর প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। নগরের উন্নতি-সাধনে চন্দ্রকান্তের যত্নের বিরাম ছিল না। কি ড্রেন-সংস্কার, কি পথ-সংস্কার, কি নগরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-সাধন—সর্ব্বদিকে তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। নগরে মেথর খাটিবার বিধি তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন।

৺চন্দ্রকান্ত ঘোষের স্মৃতি ফলক

'ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউশন' (বর্ত্তমান—'ময়মনসিংহ সিটি স্কুল')কে প্রথম জীবনে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝাট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। চন্দ্রকান্ত উক্ত 'স্কুল কমিটি'র অন্যতম সভ্য ছিলেন। অনেক সঙ্কট-সময়ে তাঁহার সৎপরামর্শে স্কুলের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে।

চন্দ্রকান্ত অতি শৈশবেই মাতৃহীন হন। তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। চন্দ্রকান্ত, ঢাকা কলেজে পড়িবার সময়, স্ত্রী-শিক্ষার অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি মতগত-সংস্কারক ছিলেন না; কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে, মতের কোন মর্য্যাদা থাকে না—এই সত্যে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি, প্রথমতঃ, তাঁহার বিমাতার শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিয়া, আপন পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। এই সূত্রে তাঁহার গৃহে গ্রামের অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। তাঁহার বিমাতার তত্ত্বাবধানেই এই শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত
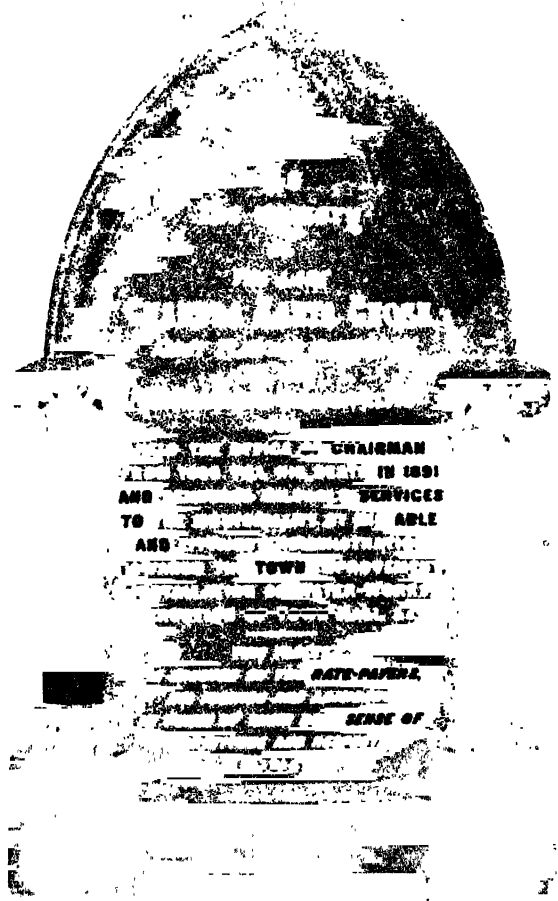
হইত। বজ্রযোগিণী গ্রামে যে বালিকা-বিদ্যালয় আছে, উহা, প্রধানতঃ, চন্দ্রকান্তের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ গ্রামের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুলটিও তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তিনি বহুকাল এই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে, ১২৭০ সনে, তিনি "সাবিত্রী উপাখ্যান" নামে একখানি গদ্যপুস্তক প্রকাশ করেন। উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা, বিবাহের উচ্চ আদর্শ, গৃহ-ধর্ম্ম, সন্তান-প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয়ের এমন সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে স্ত্রী-শিক্ষা-সংস্কারকার্য্যে তাঁহার কিরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

সৎপথে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালন, পুত্রকন্যাগণকে সুশিক্ষাদান, আত্মীয় স্বজনের উপকার সাধন—তিনি এই সমস্ত সৎগৃহস্থের কার্য্য আজীবন সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ধনতৃষ্ণার মোহে পড়িয়া ধর্ম্মপথ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই।

বাল্যসুহৃদ্ ও সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি তাঁহার অটুট ছিল। অনরেবল্ ৺গুরুপ্রসাদ সেন তাঁহার সতীর্থ ছিলেন—তাঁহার সহিত আজীবন একোনিষ্ঠ অকৃত্রিম বন্ধুতার সংবদ্ধ ছিলেন।

বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল, সূর্য্যকান্ত টাউনহলে ৺চন্দ্রকান্তের স্মৃতিফলক উন্মোচনকালে অন্যান্য কথার পর, বলিয়াছেন—

"The career of Babu Chandra Kanta Ghose is one, of which his fellow citizens may well be proud, and one which they would do well to emulate. It gives me great pleasure to be associated with the Memorial which I now unveil."

আমরা বঙ্গেশ্বরের মুখে চন্দ্রকান্তের উক্ত সুখ্যাতির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি ময়মনসিংহ-নগরবাসিগণ—উচ্চ-চরিত্র, এবং নিঃস্বার্থ জনহিতব্রতের জন্য—তাঁহাদের প্রথম-নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যানকে আদর্শ নাগরিক বলিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে চিরদিন স্মরণ রাখিবে!

চাষার খেদ

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

দোহাই নায়েব মশাই তোমার—
দোহাই মনিব, আজ
খোরাকীর মোর বড় টানাটানি
দেওনা যা কিছু কাজ।
ছেলেটি আমার জ্বরে ভুগিতেছে,
মেয়েটি আমার ঘরে
ছেঁড়া কাপড়েতে শরীর ঢাকিয়া
বয়সে লজ্জায় মরে।
ঘরে একজন গালে হাত দিয়া
ভাবিছে বিরলে বসি,
ঘরে নাহি চাল—কি যে হবে হাল—
ধারে চলে কসাকসি!
ও বাড়ীর অই দুলালী এখনি,
কড়াবুলি বলে যাবে,
দুমাসের ধার পারিনি শোধিতে
আজ বুঝি মাথা খাবে।
এখনও আমার জোটেনিক কাজ—
জোটেনিত টাকাকড়ি,
বাঁচাও মনিব—দাও কিছু কাজ,
তোমার পায়েতে পড়ি!
প্রথম যখন ক্ষেতে গিয়াছিনু—
খেটেছিনু আশা ক'রে,
সকলের মুখে হাসি ফুটেছিল
পেটের ভাতের তরে।
সকল বাসনা পুড়ে ছাই হ'ল—
পুড়িয়া গিয়াছে ধান—
থামিয়া গিয়াছে সব চাষাদের
মাঠের আশার গান!
কত মেহনতে ধারধোর ক'রে
করেছিনু বীজধান,
বড় আশা ছিল খাটিয়া-খুটিয়া
বাঁচাব ওদের জান্।
সব আজি শেষ—হরষের লেশ
নাইত আমার মনে,
ওদের দেখিয়া বুক ভেঙ্গে যায়—
সাধ হয় যাই বনে!

য়ুরোপে তিনমাস

[মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্. এ., এল্. এল. ডি.]

৮ই আগষ্ট, ১৯১২—কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও আমার বিশেষ বন্ধু গার্থ সাহেবের নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য সকালেই ব্রাইটন্ রওয়ানা হইলাম—ওয়েষ্ট ব্রম্পটন ষ্টেসন হইতে ক্ল্যাপহ্যাম-জংসন হইয়া আসিলাম। Chelsea পথে পড়িল। কার্লাইল, (Carlyle), একেলেসফিলিয়তে বদল করিয়া, এই স্থানেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া চেলসিয়াকে অমর করিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্যই তিনি (Sage of Chelsea) 'চেলসিয়ার ঋষি' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

নূতন "ল কোর্টস"

রেলগাড়ী হইতে লণ্ডনের 'ঈষ্ট এণ্ডের' জঘন্য পল্লীগুলি চোখে পড়িল। এরূপ দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লী লণ্ডনের মধ্যে থাকা সভ্যতার পক্ষে কলঙ্ক। লণ্ডনে ধন ও দারিদ্র্য—পাপ ও পুণ্য—যত আছে, এত, বোধ হয়, কোথাও নাই।—সেই জন্যই ইহাকে মহাতীর্থ বলিতে হয়।

ছুটীর আমোদ-আহ্লাদ এখনও ফুরায় নাই। কামেই রেস্তে বিষম ভীড়। গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যদেবের একটু কৃপা হয় বলিয়া, দেশশুদ্ধ লোক চারিদিকে বেড়াইয়া আনন্দ করে; সাধ্যপক্ষে কেহই বাড়ীতে বসিয়া থাকে না।

ব্রাইটনের পথের দৃশ্য বড় সুন্দর। ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে অবস্থিত হরিৎবর্ণের ক্ষেত্রগুলির বড়ই শোভা। এখন শস্য প্রায় সব পাকিয়াছে; কতক কাটাও হইয়াছে—হইতেছে। কোথাও কোথাও কৃষকেরা গাড়ীবোঝাই করিতেছে। এই পথেই প্রসিদ্ধ (Downs & Cliffs) উপত্যকা-অধিত্যকার শোভা পূর্ণভাবে বিরাজমান। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ব্রাইটনে পৌঁছিলাম। সহরটী খুবই বড়—ইংলণ্ডের দক্ষিণতম অংশ বলিয়া এখানকার জলবায়ুও চমৎকার। সেইজন্য, অনেকেই এখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আইসেন।—গার্থ সাহেব ষ্টেসনেই ছিলেন; যত্ন করিয়া জিনিসপত্র নিজেই নামাইয়া লইলেন। তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে তাঁহার বাসায় গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, এখানে দীর্ঘজীবি লোক যত বেশী দেখিয়াছেন, এত প্রায় তিনি কোথাও দেখেন নাই! জায়গাটি সব রকমে অতি সুন্দর বলিয়া, তিনি এইস্থানে বাস করাই স্থির করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে যাইবেন মাত্র; আর, অধিকাংশ সময় এখানেই কাটাইবেন। তাঁহার মত একজন ব্যারিষ্টার, একেবারে ভারতবর্ষে যাওয়া ত্যাগ করিলে, আমাদের 'বারে'র পক্ষে বিস্তর ক্ষতি। Original side-এ একপ্রকার উঠিয়া যাইবারই উপক্রম হইয়াছে। তবু, ভাল ভাল ইংরেজ ব্যারিষ্টর কয়জনের যাতায়াত যতদিন থাকে, তত দিন সহসা বড় কিছু হওয়া সম্ভবপর নহে।

Temperance Association-এর গুড্উইন্ সাহেব ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। গার্থসাহেব তাঁহাকে আমলই দিলেন না, পাছে তাঁহার বাড়ী যাই।

জলযোগের পর, গার্থসাহেব তাঁহার ভগিনী-ভাগিনেয়দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া দিলেন। গার্থসাহেবের ভগিনী-পতি Gordon সাহেব পূর্ব্বে কুচবেহারের মহারাজার ম্যানেজর ছিলেন। ছোট ভাগ্নীটি প্রায় আমার "বছমা"র মত; আমায় বড় স্নেহযত্ন করিল—হাত ধরিয়া লইয়া

বেড়ান, খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা, নিজের খেলেনা প্রভৃতি দেখান, এইরূপ নানামতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বাড়ী ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া আবার যেন বাড়ী পাইলাম; —তাহাকে 'বড়মা'র সবগল্প বলিলাম—শুনিয়া, সে বড় খুসী হইল। ছেলেদের আগ্রহে, সকলে মিলিয়া (Cenamatograph Theatre) সিনেম্যাটোগ্রাফ্ থিয়েটর দেখিতে যাইতে হইল। পথে, যাইতে যাইতে, সমুদ্রের চেহারাও কিছু কিছু দেখা গেল; কিন্তু, জলঝড় ছিল বলিয়া, ঠাণ্ডায় সমুদ্রের দিকে বেশী যাওয়া গেল না।

শুক্রবার—৯ই আগষ্ট—অদ্যই ব্রাইটন ত্যাগ করিব, মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু গার্থসাহেব থাকিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলেন—অগত্যা যাওয়া হইল না। কাল এখানে আসিয়া, নর্থ বৃষ্টল্ হইতে লেডি স্মাইর পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি, বৃষ্টলে যাইয়া দুই এক দিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। কি যে করিব, বুঝিতেছি না। কিছুদিন বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আজ বৈকালে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। ভদ্রলোকের বাড়ীতে বেশীদিন চাপিয়া বসিয়া থাকা উভয়পক্ষেরই অসুবিধা ও কষ্টকর, মনে করিয়াই এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু গার্থসাহেব কোন মতেই সে কথা শুনিলেন না।—তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা, আমি, দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট থাকিয়া, বিশ্রামলাভ করি। অগত্যা বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। সাহেব একয়দিন এমনি চোখে-চোখে রাখিলেন, এবং অতিথিসৎকারের চূড়ান্ত করিলেন, যে গুডউইন, পারেখ প্রভৃতি অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত দেখাপর্য্যন্ত করিতে যাইতে পারিলাম না! তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ, আসিবার দিন গুডউইনসাহেব ষ্টেসনে পর্য্যন্ত দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে থাকিবার বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তের সংবাদ পাইয়াই, গার্থসাহেব, এক মিনিটের জন্যও, আমায় চক্ষের আড়াল করিলেন না। গার্থসাহেব ভারতবর্ষে আমাদের সহিত যথেষ্ট আত্মীয়তা ও ভদ্রতা করেন বটে; কিন্তু এখানে তাহার আতিথ্যসৎকার-প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত-বিমুগ্ধ হইতে হইল। আমাদের মনে মনে—শুধু মনে কেন, মুখেও—গর্ব্ব খুব যে, হিন্দুর মত আতিথেয় জাতি নাই। অবশ্য, কলিকাতার বাবু-হিন্দুর কথা বলিতেছি না—হিন্দু সাধারণ সাতিশয় অতিথি সেবা-নিরত বটে; কিন্তু ভদ্রইংরেজ যখন আতিথ্যব্রত গ্রহণ করে, তখন তাহা অপূর্ব্বভাবে পালন করে। সকলের পক্ষে সকল সময়ে, এ আতিথ্যলাভ ঘটেনা বটে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যে যখন পায়, তখন সে চূড়ান্তরূপেই পায়। আমার বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে এবডিনে স্মিথসাহেবের বাড়ীতে, এবং অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ,
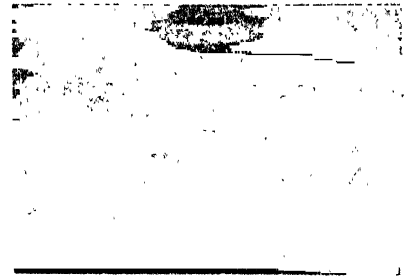
সেন্টএণ্ড্রুজ লীড্‌স্ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই ভাবেরই আতিথ্যপ্রিয়তা দেখিয়াছি। গার্থসাহেব, আমাকে ষ্টেসন হইতে লইয়া যাওয়া, আর ষ্টেসনে পৌছাইয়া, গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত—পাঁচদিন যথার্থ অনন্যকর্ম্মা হইয়া, অক্লান্ত দেহমনে আমার "সেবা" করিয়াছেন। জিনিষপত্র বহনপর্য্যন্ত নিজহাতে করিয়াছেন—আহার আমোদ গল্প—যাহাকিছু প্রয়োজনীয় এবং অনেক জিনিস, যাহা কোনমতে প্রয়োজনীয় নহে, তাহাও—আনন্দের সহিত করিয়াছেন। ইংরেজ চাকর-চাকরাণী স্থানীয় ও সামাজিক নিয়ম-অনুসারে যেসব ছুটি পাইতে পারে। তাহাও, আমার সেবার খাতিরে, বন্ধ করিয়াছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম নীতি, আইন, ব্যবসায় পরিচিত লোকজনসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, পরস্পরের পারিবারিক ও আর্থিক গুহ্যকথাপর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে কয়দিন চলিয়াছে। আপনার ঘরের লোকের মত ব্যবহার করিয়া, সকল বিষয়েই এমন খোলাখুলি কথাবার্ত্তা কার্য্যসংলিপ্ত কোন ইংরাজের সহিত আমার এত বেশী হয় নাই।

প্রথম সংস্করণের ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহের গার্থ সাহেবের অত্যন্ত সখ। এপক্ষে তিনি বিস্তর অর্থব্যয় ও শ্রম

স্বীকার করিয়া অনেক ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলিকে পরিপাটীরূপে বাঁধাইয়া সযত্নে রাখিয়াছেন—এই সংগ্রহ লইয়াই একরূপ উন্মত্ত হইয়া আছেন বলিলেই হয়। কেবল ভগিনী ভাগ্নী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতির জন্যই তাঁহার ভাবনা ও অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। নিজে এখনও অবিবাহিত; সুতরাং, অভাব খুবই কম।

ইহাঁর পিতা, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান-বিচারপতি গার্থ সাহেব, এক সময়ে খুবই ধনী ছিলেন; দৈবদুর্ব্বিপাকে অর্থনষ্ট হওয়াতে, ভারতবর্ষে চাকরী স্বীকার করিতে বাধ্য হন—দশ বারটি ছেলে-মেয়ে মানুষ-করিতে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। গার্থসাহেব, পিতার সেই ভার গ্রহণ করিয়া, নিজে অবিবাহিত থাকিয়া, পিতৃধর্ম্ম পালন করিতেছেন। অদ্ভুত জীবন! এরূপ লোক প্রায় দেখা যায় না!

সমুদ্রতীরে, স্বাস্থ্যলাভ ও আরামের জন্য, যত সহর আছে ব্রাইটন তাহাদের "রাণী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার সমুদ্রতীরবর্ত্তী সাত মাইল আগাগোড়া পাথর দিয়া বাধান। পাশাপাশি তিন-চারিটা বড় রাস্তা। ট্রাম-অমনিবস্ প্রভৃতির বন্দোবস্ত প্রচুর। স্নান করিবার, কাপড় ছাড়িবার, জন্য চাকাওয়ালা কাঠের ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারে বেঞ্চ-চেয়ার পাতা আছে; ইজি-চেয়ারও যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়। বহুলোকে স্নান করিতেছে—সাঁতার দিতেছে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা, খালি পায়ে, খেলা করিতেছে—দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; বালির কেল্লা-ঘর তৈয়ার করিতেছে—ভাঙ্গিতেছে। চারিদিকেই সজীবতা যেন মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সুন্দর বাগান ও বড় বড় হোটেল আছে, প্রবল সমুদ্রবায়ুতে কষ্ট বোধ হইলে আশ্রয় লইবার জন্য মাঝে মাঝে কাঠের ঘর আছে। 'ওয়েষ্টর্ণ্ পিয়র,' ও 'প্যালেস্ পিয়র নামে দুইটি 'পিয়র' আছে—সমুদ্রের ভিতর, অনেক দূর পর্য্যন্ত পোলের মত বাঁধিয়া এই 'পিয়র'গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপর কাঁচ-ঘেরা বসিবার—বেড়াইবার জায়গা, হোটেল, থিয়েটর, ব্যাণ্ড-ষ্টাণ্ড, দোকান, নানারকম খেলার ব্যবস্থা, মাছ-ধরিবার স্নান করিবার স্থান সবই রীতিমত আছে। সমুদ্রগর্ভে এত আমোদ-প্রমোদর ব্যবস্থা! ধন্য জাতি! দুই আনা পয়সা দিলেই এই দুই পিয়ারেই বেড়াইতে পাওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগ আরামের জন্য (Worthing) ওয়ার্দিং নামক স্থানে—সমুদ্রের মাঝখানেই—এই রকম ধরণে সমুদ্রহৃদয়ে বাঁধা এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ব্রাইটন হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁচের ঘরে বসিয়া সারা দিন নির্ম্মল সমুদ্র-বায়ুসেবনই চিকিৎসার প্রধান অংশ। সাগরতীরে ছোট 'ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রামওয়ে' আছে—তাহাতে করিয়া বেশ আরামে বেড়ান ও বায়ুসেবন চলে; কিংবা অমনিবসযোগে নিকট-বর্ত্তী ছোট ছোট গ্রামেও বেড়াইতে যাওয়া যায়। এইরূপে সমস্তদিনই একটা-না-একটা ব্যাপারে নিজেকে বেশ ব্যাপৃত রাখা যায়। কাজকর্ম্ম, বা পড়া শুনা করিবার সময় ব্রাইটনের মত জায়গায় পাওয়া কঠিন।

সমুদ্রতটে নৃত্যগীত, সভা-সমিতি-বক্তৃতা প্রভৃতির অভাব নাই। সোশিয়ালিষ্ট (Socialist) দলভুক্ত বক্তাগণ এমন ভাবের বক্তৃতা করিতেছে যে, আমাদের দেশে হইলে তৎক্ষণাৎ জেল!—এখানে কিন্তু তাহাদের প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপও নাই।

রবিবার দিন (Church Parade অর্থাৎ,) গির্জ্জায় যাইবার আগে ও পরে সুসজ্জিতা হইয়া স্ত্রীলোকদিগের ভ্রমণের পদ্ধতি আছে। লণ্ডন ও প্যারিসের নূতন নূতন ফ্যাশানের গাউন-পোষাক দেখিবার ও দেখাইবার এই এক প্রকৃষ্ট উপায়! তদুপলক্ষে তুলনায় পরস্পরের উপর হিংসা-উদ্রেকেরও অভাব নাই! গহনার চলন বড় বেশী দেখিলাম না। "ন্যাকড়া চোকড়া"তেই ইহাদের "মৌরস্ত"ও শেষ!

কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে ভ্রমণের পর, সহরের ভিতরে গেলাম। টাউন্ হল্, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম্ প্রভৃতি দেখা হইল। সকল জায়গাতেই এইসকল প্রতিষ্ঠান রীতিমত আছে। আর আমাদের দেশে বড় বড় সহরেও, এসকলের বিশেষ অভাব! রাজা চতুর্থ জর্জ্জ ব্রাইটনে সর্ব্বদা আসিতেন। তাঁহার বৈটকখানা-বাড়ীটি পূর্ব্বে যেমন চীন দেশের ধরণে সাজান ছিল, ঠিক তেমনি আছে। বড় বড় পাঁচটা সেকেলে ধরণের পুরাতন বেলওয়ারী ঝাড় আছে; এত বড় ঝাড় আমি কোথাও দেখি নাই!

ব্রাইটন হইতে দুই ক্রোশ দূরে, সমুদ্রের ধারে, (Rolling Dean) রোলিংডিন নামে একগ্রাম আছে; তাহা দেখিতে গেলাম। যাইবার সময় অমনিবস, ও আসিবার সময় খোলা গাড়ী, করিয়া আসিলাম। সমুদ্রের ধার দিয়

যাওয়া-আসাটা বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিকর বোধ হইল। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর বাড়ী Golf Link, Ladies' Cottage, প্রভৃতি আছে। এখানে সমুদ্রের খুব 'ভাঙন' ধরিয়াছে, দেখিলাম; রাস্তা-ঘর-বাড়ী বড় অধিকদিন রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই বোধ হয়, বড় যত্নও নাই। তবে, গ্রামটি পুরাতন ধরণের বলিয়া, অনেকে দেখিতে আইসে। রক্ষণশীল দলের একজন প্রধান-নেতা, স্যর্ এড্ওয়ার্ড কার্সনের এই স্থানে বাড়ী আছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর Burne-Jones ও বিখ্যাত লেখক রডিয়ার্ড কিপ্লিং কিছুদিন এখানে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহাদেরও বাড়ী আছে। নিকটেই পুরাতন একটি ছোট গির্জ্জা, Burne-Jon'es নিজহস্তে এই গির্জ্জার তিনটি সুন্দর বিচিত্র কাঁচের জানালায় ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন; বড়ই সুন্দর! ইহা দেখিতেও অনেকেই আইসে। বার্ম্মিংহম্ গির্জ্জাতেও বর্ণ-জোন্সের স্বহস্ত অঙ্কিত তিনটি কাঁচের জানালায় যে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছি; সেগুলি কিন্তু এমন সুন্দর নহে। এই ক্ষুদ্রগির্জ্জাতেই বর্ণ জোন্সের এবং বিখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়ম্ ব্ল্যাকির সমাধি আছে। সমাধির উপর, কেবল কয়েকটি সুন্দর শ্যামললতা রহিয়াছে - মর্ম্মর কীর্ত্তি স্তম্ভ প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহারও বোধ হয় কিছু গূঢ় অর্থ আছে।—শনিবার দিনটা জল বর্ষায় কোথাও আর বাহির হইতে পারা যায় নাই।

রবিবার—১১ই আগাষ্ট—রেলে করিয়া ডাইক্-নামক গ্রামটি দেখিতে যাওয়া গেল।—গ্রামখানি খুব উঁচু চওড়া জমির উপর, সেই জন্য নীচের পাহাড়গুলি এবং ছোট ছোট বাড়ী-গির্জ্জা, নদী-কৃষিক্ষেত্র বড়ই সুন্দর দেখায়—তাহার পরেই দূরে সমুদ্র। সমস্ত দৃশ্যটি উপর হইতে যেন একখানি সুন্দর ছবির মত মনে হয়। এখানেও আমোদ-আহ্লাদ, আহার-বিহারের সমস্ত বন্দোবস্তই রহিয়াছে। বহুলোক এখানে ছুটি, বা রবিবার, কাটাইতে আসে। সমগ্র সসেক্স প্রদেশের মধ্যে এমন সুন্দর স্থান নাকি আর নাই—উচ্চপাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকে সসেক্সের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। নীচে—একদিকে, ছোট গ্রামগুলি ছবির মত সাজান রহিয়াছে;—অপর দিকে সাগরলহরীর নৃত্য দেখা যাইতেছে। ওদিকে আবার দূরে মালার মত—ব্রাইটন, হোভ, ওয়ার্দিং, প্রভৃতি নগরগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিরাজমান;—বড়ই সুন্দর মনোহর দৃশ্য। বহুক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম।

সোমবার—১২ই আগাষ্ট—আজ ব্রাইটন হইতে বিদায় লইলাম। গার্থসাহেব কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না, আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা আর সম্ভবপর নহে। অগত্যা তিনি নিতান্ত দুঃখিত মনে বিদায় দিলেন; কিন্তু নিজে ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিয়া, গাড়ীতে বসাইয়া, মালপত্র উঠাইয়া দিয়া, তবে ছাড়িলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে আমারও বিশেষ কষ্ট হইল।

টেট্ গ্যালারি
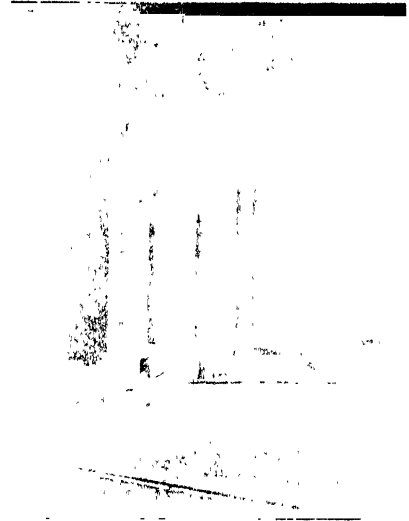
বুধবার—১৪ই আগষ্ট—ভারতীয় ছাত্রেরা কি ভাবে বিদেশে বাস করে, তাহার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিবার জন্য, ছাত্রদিগের সহিত কয়েক দিন, ২১নং ক্রমওয়েল রোড্স্থিত 'নর্থব্রুক সোসাইটী'র গৃহে বাস করা স্থির করিলাম। আজ সকালে মহারাজা ঝালোয়ার, তাঁহার সহিত সন্ধ্যার সময় আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শরীর ভাল নাই বলিয়া মাপ চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি পুনরায় বিশেষ অনুরোধ করিয়া টেলিফোঁ করিয়া বলিলেন যে, একবার যাইতেই হইবে—কারণ, তিনি শীঘ্র স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। অগত্যা সন্ধ্যার সময়, আকাশ একটু

পরিষ্কার হওয়াতে, নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বাহির হইলাম। তাঁহার হোটেল (Hans Mansions) 'হ্যান্স্ ম্যানশন্স্'—নিকটেই; যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট হইল না। দেশী-বিলাতী মিলাইয়া আহারের আয়োজন—নূতন ধরণের—একরকম মন্দ হয় নাই। মহারাজা নিজে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ অনুরাগী এবং দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী ব্যক্তিমাত্রকেই বিশেষ যত্ন করেন ও উৎসাহ দেন।—নানাবিষয়ের কথাবার্ত্তায় বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহার রাজ্য-ঝালোয়ার—দেখিতে যাইবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। বাস্তবিক, রাজা-মহারাজার মধ্যে এরূপ অমায়িক প্রকৃতির লোক বেশী দেখা যায় না। রাত্রি দশটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

শুক্রবার—১৬ই আগষ্ট—লণ্ডনে এতদিন আসিয়াছি, কিন্তু কার্য্যগতিকে ন্যাশন্যাল গ্যালরী এবং ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট্ গ্যালরী দেখা হয় নাই বলিয়া, আজ, চ্যারিং ক্রস ষ্টেশন হইয়া, সেখানে গেলাম। আজ দুই জায়গাতেই ছয় পেনী করিয়া দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে; সেইজন্য ভিড়ের কষ্ট বড় পাইতে হইল না। সপ্তাহে পাঁচ দিন সাধারণকে, বিনা দর্শনীতে, যাইতে দেওয়া হয়; সেই জন্য সে কয়দিন খুব ভিড়ও হয়। যাহারা ভিড় সহিতে চাহে না, তাহারা, যে দুদিন দর্শনী দিতে হয়, তাহারই মধ্যে যে কোনও দিন যায়। তবে, আজও ভিড় নিতান্ত কম নহে। নানাদেশীয় লোক দেখিলাম। একজন রুষ চিত্রকর, টর্ণরের একখানি সুন্দর নিসর্গ চিত্রের অনুকরণ করিতেছিল। এইরূপ বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপিগুলিও বহুমূল্যে বিক্রয় হয়। রুষ চিত্রকর, আমার পাগড়ী দেখিয়াই হউক, বা অপর কিছু মনে করিয়াই হউক, টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল ও আলাপ করিল। ইংরেজের অত্যাচার ইত্যাদির কথা আরম্ভ করিল। ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না;—লোকটা পুলিসের গুপ্তচর, কিম্বা রুষ এনার্কিষ্ট দলভুক্ত কেহ হইবে! আমার ছবি আঁকিয়া দিবে ইত্যাদি প্রলোভনের কথা বলিল। এরূপ লোকের সহিত, ভাল করিয়া না জানিয়া-শুনিয়া, বিশেষ আলাপ করা উচিত নহে—মনে করিয়া আমি অপর কথার অবতারণা করিলাম। তাহার পরেও, ভিন্ন ভিন্ন দুই জায়গায় লোকটার সহিত দেখা হইল। কেমন মনে হইল, সে যেন আমার সঙ্গ লইয়াছে! আরও সেইজন্য, তাহার সহিত অধিক কথাবার্ত্তা না কহিয়া, নিজমনে ছবি দেখিতে লাগিলাম। ইটালিয়ন, ফ্রেঞ্চ, ডচ্, ইংলিশ্ প্রভৃতি সমস্ত প্রসিদ্ধ চিত্রকরের উৎকৃষ্ট ছবিগুলি এই দুই গ্যালরীতে সংগৃহীত হইয়াছে। মাইকেল এঞ্জিলো, মূরিনো, রেম্ব্রাণ্ড, স্যার জস্যুয়া রেনল্ড্স্, টর্ণর, গেন্সবারো, হোগার্থ, মিলে, বর্ণ-জোনস্, ল্যাণ্ডসীর রমিনে, ওয়াট্স্ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পিগণের প্রধান প্রধান চিত্র এই দুই গ্যালরীতে বিস্তর রহিয়াছে। টর্ণর যেসকল ছবি শেষ করিয়া যান নাই, কেবল যেগুলির আভাষমাত্র করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সাজান আছে। টেট গ্যালারী, ওয়ালস কলেকসন প্রভৃতি সব না দেখিলে, এই অদ্ভুতকর্ম্মা শিল্পীর অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। পাঁচঘণ্টাকাল সতৃষ্ণনয়নে চিত্র দেখিয়াও দর্শনপিপাসা নিবৃত্তি হইল না। শরীর যখন নিতান্তই অপারক হইয়া পড়িল, তখন, ক্লান্তদেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

শনিবার—১৬ই আগষ্ট—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইয়া, ক্রষ্টাল প্যালেসের নিকট, টমাস জোন্স্‌সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। তিনি পীড়িত বলিয়া, আমায় যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৭৮ বৎসরের অবিবাহিতা ভগিনী ও ৫০ বৎসরের কুমারী কন্যা যথেষ্ট আদরযত্ন করিলেন। বড়নার কথা শুনিয়া সকলেই তাহার বন্ধু হইয়া পড়িলেন, এবং তাহাকে বিলাতে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কেন যে তাহার এদেশে আসা অসম্ভব, সেকথা আমি কিছুতেই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। মধ্যাহ্ন-ভোজন ও চা-পান সেইখানেই সমাধা হইল। ৮১ বৎসর বয়স্ক জোন্স্‌সাহেব এখনও কাটাইতেছেন মন্দ নহে। পুরাতন দুঃখের সুখের কথা অনেক হইল; অবশেষে, অতি দুঃখিতভাবে আমায় বিদায় দিলেন। তাঁহার কন্যা ও ভগিনী ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া অতি যত্নের সহিত গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

নিকটেই ক্রষ্টাল প্যালেস, কাঁচের প্রকাণ্ড বাড়ী—দর্শনীয় বস্তু। ১৮৫১ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের উদ্যোগে, হাইডপার্কে যে একজিবিসন হয়—সেই সময়ে কাঁচের এই প্রকাণ্ড বাড়ীটি প্যাক্সটন্ নামক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন

ন্যাশন্যাল্ গ্যালারি

কথায়-কথায় রেলওয়ে ষ্টেশন, কল-কারখানার বাড়ীগুলি, লোহা আর কাঁচে নির্ম্মিত হইতেছে ;—কাযেই, এখন আর কাঁচের বাড়ীর তত আদর নাই। কিন্তু কত বৎসর পূর্ব্বে—যখন এই প্রকাণ্ড কাঁচের বাড়ী এক-জিবিসনের জন্য প্রস্তুত হয় —তখন ইহা এক অভূত-পূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই মনে হইয়াছিল। একজিবিসনের পর, এই
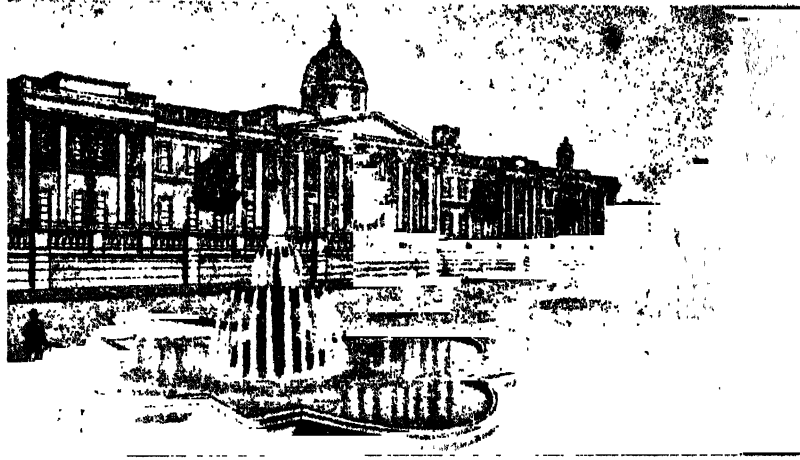
বাড়ী, ভিত্তিসমেত উঠাইয়া, লণ্ডনের বাহিরে—বর্ত্তমানস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বড় বড় নাচ-গান, খেলা, বক্তৃতা, একজিবিসন প্রভৃতি এই স্থানেই হয়। সেদিন এখানে হ্যাণ্ডেল-নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতার সম্মানে "হ্যাণ্ডেল্-উৎসব" হইয়াছিল ; চারি হাজার লোক সমস্বরে, হ্যাণ্ডেলের গান গায়িয়া, তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। তিনবৎসর-অন্তর এই মহান্ সঙ্গীত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রষ্ট্যাল প্যালেসের পরেই Alhambra Court ;—এখানে ভিন্ন ভিন্ন "কেথিড্র্যালে"র নমুনা, "নর্গ ট্টাউয়র গার্ডেনে"র, প্রসিদ্ধ প্রতিমূর্ত্তিগুলির 'প্লাষ্টার'-নির্ম্মিত নকল প্রভৃতি দেখিবার বহুদ্রব্য সজ্জিত আছে। ইহারই মধ্যেই আবার কন্‌সার্ট, ব্যাণ্ড্, থিয়েটর্, সিনেম্যাটাগ্রাফ্, কৃত্রিম হ্রদে প্রমোদ-তরণী, শৈল-রেলওয়ে, এরোপ্লেন্, প্রভৃতি অসংখ্য আমোদ ও শিক্ষার জিনিষও রহিয়াছে ;—ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীগুলি এই স্থানেই হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে ক্যানেডার প্রদর্শিত দ্রব্যজাত সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার হইয়াছিল বলিয়া, এখনও রাখিয়া দিয়াছে। ওটাওয়ার পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের নমুনায় যে বাড়ীটি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা করিতেই নাকি ৭০ হাজার পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। "All Red Track"-নামক একটি খেলা-ঘরের রেলওয়ে তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছে ; তাহার ধারে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নগরগুলির নমুনা করিয়া রাখিয়াছে।—যেন একনিঃশ্বাসে সমস্ত ইংরাজ সাম্রাজ্যটাই বেড়াইয়া আসা যায়। ইহাদের এইসকল আমোদের জায়গায় একবার বেড়াইয়া আসিলে, বহুজ্ঞাতব্য সমাচারসংগ্রহ করা যায়।

রবিবার—১৭ই আগষ্ট—মধ্যাহ্ন ভোজনের পর টেট্-গ্যালারী (Tate Gallery) দেখিতে গেলাম। এখানে এত সুন্দর সুন্দর ছবির সমাবেশ যে, এতদিন ইহা দেখা হয় নাই বলিয়া দুঃখ হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব-সংগ্রহ না দেখিয়া বিলাত হইতে যাইলে, মনে বিষম খেদ থাকিয়া যাইত। কেবলমাত্র এই চিত্রাগারটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, আর একবার বিলাতে আসিলে—বোধ হয়—কিছু বাহুল্য হইবে না। ইংলণ্ডের প্রধান চিত্রকর টর্ণরের প্রসিদ্ধ যাবতীয় ছবি ও তাঁহার—অসম্পূর্ণ—চমৎকার Study গুলি এই স্থানে আছে। সম্পূর্ণ ছবিগুলি অপেক্ষা, অসম্পূর্ণগুলি যেন আমার আরও চমৎকার মনে হইল। অসম্পূর্ণ ছবিগুলিতে যেন একটা বিচিত্র গৌরব ও মাধুর্য্য বর্ত্তমান। ইহার কারণ বোধ হয় যে, অসম্পূর্ণ ছবিগুলি তাঁহার পরিণত বয়সের কীর্ত্তি এবং এগুলি তাঁহার অন্নদাতা প্রভুর আদেশানুসারে তাঁহারই রুচি-অনুযায়ী অঙ্কিত নহে—এগুলি টর্ণরের নিজের উদ্ভাবনা-শক্তিপ্রসূত। এই চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হইলে যে কি মহান বস্তু হইত, তাহা মনে করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। [illegible] নিজে একজন চিনি-ব্যবসায়ী ছিলেন। খেয়ালের বশে অনেক

অর্থব্যয় করিয়া—সুন্দর সুন্দর চিত্র সংগ্রহ করিয়া, জাতীয় সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই ইহারই নাম 'টেট্‌গ্যালরি' টর্ণরব্যতীত সার্জ্জেণ্ট, মিল্লে, লেটন্, ল্যাণ্ডসীয়র, রেনল্ডস্, ওয়াটস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পিদের অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র কয়েকখানি এখানে আছে। রক্ষিত-বিলাত যাত্রার দিন সুরেশ লেটনের প্রসিদ্ধ চিত্র "The Sea Giving up its Dead"-নামক ছবির কথা বলিয়াছিল; আজ তাহার আসল ছবিখানি এখানে দেখিলাম—চিত্রকলার সম্পূর্ণ সাফল্য দেখিয়া প্রাণ তৃপ্ত হইল। নকল দেখিয়া যাহাদের সারা জীবনটা কাটে, কখন চকিতের ন্যায়ও, একটা-আধটা আসল দেখিলে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হয়। যাহা হউক, আলেখ্য-দর্শন এখনকার মত অনিচ্ছায় শেষ করিলাম। বিলাতের বড় বড় বন জঙ্গল ত দেখা হইল না! সেই জন্য, অমনিবসে করিয়া, সহর হইতে ৯ মাইল-দূরবর্ত্তী "এপিং ফরেষ্ট" দেখিতে গেলাম। লণ্ডন সহরের ভিতরে ও বাহিরে—নিকটেই—বেড়াইবার খোলা জায়গা এতগুলি আছে যে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আর আমাদের দেশে এই সকলের কত অভাব! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, বনের বেশী ভিতরে যাওয়া ঘটিল না। বনের ভিতর দিয়াই রাস্তাগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত অনেকে সান্ধ্যভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা এত লোক বেড়াইতেছে, বিশ্রাম করিতেছে, আমোদ করিতেছে যে, মনে হয়,—তবে এদের কাজ-কর্ম্ম করে কে? অথচ এত কাজকর্ম্ম সকলেই করে যে, আমাদের তাহা করা সাধ্য ও ধারণার অতীত। এত খেলাধূলা-বেড়ান লইয়া তাহারা নিজদিগকে কাজেরজন্য প্রস্তুত করে বলিয়াই বোধ হয়, কাজও এত করিতে পারে।

মদের দোকানের প্রাধান্যটাও আজ খুবই দেখিলাম। আমার এসবদিক্ এতদিন দেখিবার সময় হয় নাই। দুইপা-অন্তর এঅঞ্চলে মদের দোকান। বড় বড় আলো জ্বলিতেছে। রবিবার হইলেও, সব দোকানেই খরিদদারের বিষম ভিড়। তবে, রাস্তায় মাতালের বাড়াবাড়ি কিছু দেখিলাম না।—আশ্চর্য্য বটে!

ক্রিষ্ট্যাল্ প্যালেস্

সোমবার—২৯এ আগষ্ট—আজ "ওয়ালেস্ কলেক্‌শন্" দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সংগ্রহে ছবি, প্রতিমূর্ত্তি, চীনামাটির পোর্সেলেনের মিনার, সোণা-রূপা-পিতল লোহার কাজ, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির সুন্দর সমাবেশ—অতি নিপুণ সংগ্রহকারের কীর্ত্তি। শুনা যায় যে, সত্তরলক্ষ টাকা খরচ করিয়া, মার্কুইস্ অফ্ হেরেফোর্ড এই সকল সংগ্রহ করেন। একজন স্থানীয় রক্ষক, উপযাচক হইয়া, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া, অনেক বিষয়ের সংবাদ দিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কাণপুরে ইহার জন্ম হয়। শিল্পমন্দিরের দৌবারিক হইয়া, এব্যক্তি উচ্চশিল্পসম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখে দেখিলাম।

ওয়ালেস্-সংগ্রহ দেখিয়া, মাডাম টুশোঁর মোম-মূর্ত্তিশালা দেখিতে গেলাম। লণ্ডনে আসিয়া ইহা না দেখিয়া যাওয়া, বিশেষ লজ্জার কথা। এখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মোমের পূর্ণকায় প্রতিমূর্ত্তি যথোপযুক্ত পোষাক পরাইয়া, সাজান আছে। অবশ্য ভারতবর্ষীয় কাহারও মূর্ত্তি নাই। পাশ্চাত্য দস্যু, নরহন্তা, জালিয়াৎ, প্রভৃতির মূর্ত্তিও এখানে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু যে রামমোহন রায় বিলাতের মাটীতে দেহ রাখিয়া, বিলাতকে পবিত্র করিয়া, গিয়াছেন, তাঁহার পর্য্যন্ত একটা প্রতিমূর্ত্তি ইহারা করিয়া রাখে নাই!—দেখিয়া মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। আজিকার

মত দর্শনের পালা শেষ করিয়া, ক্লান্তদেহে বাসায় ফিরিলাম।

মঙ্গলবার—২০এ আগষ্ট—আজ সকাল বেলাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ছিল; বিকালে আবার বৃষ্টি-ঝড়-ঠাণ্ডা সমানে চলিতে লাগিল। এ অবস্থায় এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করা-অপেক্ষা, য়ুরোপে চলিয়া যাওয়াই মোটের উপর ভাল বোধ হইল। তাহাতে শরীর ও মন একটু ভাল থাকিতেও পারে, এবং অবশ্য-দ্রষ্টব্য নগরগুলা মোটামুটীভাবে দেখা যাইতে পারে। তবে, এতদিন লণ্ডন-বাস করিয়াও, এক লণ্ডনেরই যখন সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখা হইল না, তখন দুই-এক দিন করিয়া রোমপ্রভৃতির ন্যায় বড় বড় প্রাচীন সহরের কিই-বা দেখা হইবে। যাহা হউক, আর ইতস্ততঃ না করিয়া, কুক এণ্ড সন্সের বাড়ী যাইয়া, জাহাজ ও রেলওয়ের সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসিলাম।

বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট যথেষ্টই হইয়াছিল। অসম্পূর্ণ কার্য্য ফেলিয়া লণ্ডন ছাড়িতেও কষ্টটা বড় কম হইতেছে না;—কিন্তু কি করিব! এক্ষেত্রে এই পর্য্যন্তই রহিল!

বুধবার—২১এ আগষ্ট—যাইবার দিনের উদ্বিগ্নভাব, কাল সমস্ত দিনটাকেই যেন অপ্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল। আজ প্রাতঃসূর্য্য উজ্জ্বলরশ্মিতে সুখসম্ভাষণ করিলেন। জবাকুসুম-সঙ্কাশ-কাশ্যপেয়কে প্রণাম করিয়া, শয্যাত্যাগ করিলাম। সর্ব্বশক্তিমানের হস্তে চিরদিনই আত্মসমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি—আজ নূতন নহে। যাইবার উদ্যোগে আজ সমস্তদিনই কাটিল। সেই জন্য কোথাও দেখা করিতে যাইতে বড় পারিলাম না। ভারতীয় ছাত্রগণ, যাহার যেরূপ সাধ্য, উদ্যোগে সাহায্য করিল। ইহাদের লইয়া তিনমাস একরকম মন্দ কাটে নাই; ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে যথার্থই কষ্ট হইল।—মানুষ এমনই স্নেহ ও মায়ার বশ হইয়া পড়ে!

যে সকল কাজ সম্পূর্ণ করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার অনেক বাকী রহিয়া গেল। অসম্পূর্ণ কাজের ভার যেন আরও অধিকতর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ভগবান্ দিন দেন ত, আবার আসিয়া কায শেষ করিতে চেষ্টা করিব। চিরদিনের স্বপ্নদৃষ্ট—অধুনা সফলভূত-বিলাত-বাস অদ্য শেষ করিয়া, য়ুরোপযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।—ভগবান সহায় হউন, এই মাত্র কামনা!

অপূর্ব্ব সীতা

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, বি. এল্.]

রত্নময়ী বসুধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রতন-রূপিণী,
জিনি কোটি কোহিনুর, কোটি কোটি চন্দ্রকান্ত মণি
জিনি লাবণ্যের প্রভা অঙ্গে তব, অয়ি বরাননি!
হে কবিতা! চিন্তাহরা, চিরারাধ্যা বসুধা-নন্দিনি,
বনফুলে ফুলময়ী, সন্ন্যাসিনী, বাকলধারিণী
সীতাসমা নিরুপমা! শুনিছ না?—কি বিকটধ্বনি
চারিধারে!—কল্পনা-দণ্ডক এযে! ওই রণরণি
শত শব্দ-দানবের! ওই শোন, বাজিছে শিঞ্জিনী
উচ্ছৃঙ্খলা—মায়া-হরিণীর পায়ে!—মন্ত্রপাঠ করি,
তাই আজি, হে কবিতা, উপমার গুগ্‌গুল ঢালিয়া
শুভ্রচিন্তা-হোমাগ্নিতে, বনভূমি সৌরভে ভরিয়া,
যোগেন্দ্রবাঞ্ছিতধনে নিরোধের মহাধ্যানে স্মরি,
এই সনেটের গণ্ডী রচিলাম!—অপরূপা সীতা,
বন্দী হয়ে থাক হেথা, রামময়ী মোহিনী কবিতা!

খেয়ালী

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

কথন হাসি, কথন কাঁদি—কথন গাই গান,
ঠিকানা তার নাইকো কিছু—দয়াল ভগবান!
আপন মনে খেয়ালমত
আপন ধ্যানে আপনি রত,—
কোথায় আলো, আঁধার কোথা,
চায় না ফিরে প্রাণ!

দয়াল ভগবান!
একেলা আমি বিশাল ভবে—'দরদী' কেহ নাই—
জুড়াতে মোর হৃদয়খানি পাই নি কণা ঠাঁই!
ভাবনা তায় নাইকো তবু
খেয়ালি! তুমি আমার প্রভু—
খেয়ালে তব জনম মম,
খেয়ালে অবসান

দয়াল ভগবান!

নীর ও ক্ষীর

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

এই সুন্দর পুস্তকখানির লেখক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম. এ, মহাশয়। অধ্যাপক, মনীষী, উদারহৃদয়, শিক্ষা-প্রচারক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের পরিচয় প্রদান করা নিতান্তই অনাবশ্যক; বাঙ্গালা ভাষার সহিত, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত যাঁহার সামান্য পরিচয় আছে, তিনিই বিনয়কুমার বাবুকে জানেন। সেই বিনয়বাবু এই 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' লিখিয়াছেন—কর্ম্মবীরের লেখনী 'কর্ম্মবীর' লিখিয়াছে; সুতরাং, পুস্তকখানি যে অমূল্য রত্ন হইয়াছে, তাহা না বলিলেও হয়।

আজকালকার দিনে অনেকেই নিজের ঢাক নিজেই বাজাইয়া থাকেন। বিনয়বাবু যদি সে ভার নিজে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বিনয়বাবু—বিনয়বাবু হইতে পারিতেন না। তিনি নীরব-কর্ম্মী; ঢাক বাজাইয়া কাজ করা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। আর মনে হয়, তাঁহার জন্য ঢাক-বাজাইবার ভার কাহারও গ্রহণ করিবারও প্রয়োজন নাই—নাভি-নিহিত থাকিলেও কস্তুরিকা গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; বিনয়বাবুর অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের সৌগন্ধেও দিক্ আমোদিত হইয়াছে—এই 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর'ই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পুস্তকখানিতে গবেষণা নাই; যাহাকে originality বা 'মৌলিকতা' বলে, তাহাও এ পুস্তকে নাই—এখানি অনুবাদ। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর বুকর ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতখানি বিনয়বাবু বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন। অনুবাদই বটে; কিন্তু বইখানির অগাগোড়া পড়িয়া কেহই বুঝিতে পারিবেন না যে, বিনয়বাবু এখানি অনুবাদ করিয়াছেন—মনে হইবে, বুকর ওয়াসিংটন মহোদয় যেন বাঙ্গালাভাষাতেই তাঁহার অপূর্ব্ব অতুল্য, বরণীয় পবিত্র জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাহার পর, এত পুস্তক থাকিতে বিনয়বাবু এই ইংরেজী বইখানিরই অনুবাদ করিলেন কেন? ইহার উত্তরও অতি অল্প কথায় দেওয়া যাইতে পারে।—বিনয়বাবু নিজে প্রচারক; যাহাতে দেশের লোক সুশিক্ষা প্রাপ্ত—আমাদের যুবকগণ জ্ঞানে, ধর্ম্মে বিভূষিত—হয়, তাহারই জন্য বিনয়বাবু এতদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সেই চেষ্টার ফলই তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক। এই 'নিগ্রো-জাতির কর্ম্মবীর'ও সেই শিক্ষার উদ্দেশ্যেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে, একজন নিগ্রোও জ্ঞানে, ধর্ম্মে, লোকহিতৈষণায় কেমন করিয়া দেশের অগ্রণী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই এই কর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন কথায় দেখিতে পাওয়া যায়। চরিত্রের বলে মানুষ কেমন সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিতে—শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য এত, পুস্তক থাকিতে, বিনয়বাবু আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রচারক বুকর ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর পুস্তকপ্রচারে প্রকৃতপক্ষেই বঙ্গ-ভাষার গৌরববৃদ্ধি হয়।

বুকর ওয়াসিংটন সামান্ত নিগ্রো দাস ছিলেন, কোন দিন কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই! তাঁহার জীবনপথের পাথেয় ছিল শ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়—আর, তাঁহার হৃদয়ে ছিল, ভগবানের নাম। তাই, তিনি আজ শিক্ষা-প্রচারক ওয়াসিংটন;—তাই, আজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'টাস্কেজী বিদ্যালয়' আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ ও আদর্শ শিক্ষালয়। এই শিক্ষালয়সম্বন্ধে বুকর ওয়াসিংটন তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন—"বিশ বৎসর পূর্ব্বে একটা পোড়ো বাড়ীতে আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তখন টাস্কেজীর ছাত্র সংখ্যা ৩০ এবং শিক্ষক মাত্র একজন। আজ আমাদের ৬,৯০০ বিঘা জমি; তাহার ৩,০০০ বিঘা ছেলেরা চাষ করে। আমাদের এক্ষণে ৬৬টা বড় এমারত—ইহাদের ৬২টা ছাত্রদের নিজহাতে গড়া। আজ এই বিদ্যালয়ে ৩০ প্রকার কৃষি ও শিল্প বিষয়ক কাজকর্ম্ম শিখান হইতেছে। ইহার গৃহসম্পত্তি ইত্যাদির মূল্য সম্প্রতি ২,১,০০,০,০০৲; এতদ্ব্যতীত নগদ টাকা আছে ৩০,০০,০,০০৲। বার্ষিক ব্যয় আজকাল ৪,৫০,০০০৲; এই টাকার অধিকাংশই গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া আদায় হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের ছাত্র সংখ্যা ১৪০০।"

আর যিনি এই সকল কার্য্য করিয়াছেন, তিনি এখনও সেই দরিদ্র দাসের মতই থাকেন। তাঁহার জীবন-কথার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "আমার শৈশবের গোলামবাড়, গোলামখানার অনশন ও অনিদ্রা, যৌবনের কঠোর জীবন-সংগ্রাম—সর্ব্বদা দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের সহিত পরিচয়—সকল চিত্রই সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রৌঢ় বয়সের পূর্ব্বে আমি কখনও টেবিলে বসিয়া 'খানা' খাইবার সুযোগ পাই নাই।"—ইহাই কর্ম্মবীরের জীবন-কথা! এমন করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে, এমন করিয়া নিজের আদর্শ-জীবন লোকের সম্মুখে ধরিতে না পারিলে, কি শিক্ষা-প্রচারক হইতে পারা যায়?

এই আদর্শ দেখাইবার জন্যই বিনয়বাবু এই বইখানি লিখিয়াছেন। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে, কি না, তাহা ভগবানই জানেন; তবে বিনয়বাবু যে প্রাণপণে তাঁহার জীবনব্রত—শিক্ষা-প্রচার—সাধন করিতেছেন, এজন্য তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না।

এই পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর, কাগজ উৎকৃষ্ট, বাঁধাই মনোরম, মূল্য—বিনয়বাবু স্থির করিয়াছেন,—দেড় টাকা মাত্র; —আমরা বলিতে চাই, ইহা অমূল্য।

বঙ্গীয় আর্ত্তসেবকদলের কথা

"বেঙ্গল এম্বুলেন্স্ কোর", বা বঙ্গীয় আর্ত্তসেবকদলের অন্যতম সদস্য এই শ্রীমান্ বিনোদবিহারী (গোস্বামী) চট্টোপাধ্যায়, বালী—গোস্বামী-পাড়া নিবাসী ৺কুঞ্জলাল গোস্বামী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র, এবং ভবানীপুর কেদার বসুর লেন-নিবাসী ৺তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, বি. এল্. (ভূতপূর্ব্ব সব্‌জজ্) মহাশয়ের ভাগিনেয়। বিনোদ, প্রবেশিকাশ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া, কলিকাতার প্রসিদ্ধ "আর্মি-নেভি ষ্টোর্সে" মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিতেছিল। সেইখান হইতেই সে এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে লিখিত তাহার শেষপত্রে জানা যায় যে, তাহারা "আমারা" (AMARA) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় আভিযানিক সৈন্যদিগের স্থায়ী হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়া আছে। তাহারা একনিষ্ঠভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধন করিতেছে, এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের প্রশংসাভাজন হইয়াছে। ভগবান তাহাদিগের মঙ্গল করুন!

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়

প্রতিধ্বনি

হিন্দুর বিজ্ঞান-চর্চ্চা

অধুনা পাশ্চাত্য-জগতে বিজ্ঞানের যেসকল তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এই হিন্দু-জাতি তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান সম্যক্‌রূপে করায়ত্ত করিয়াছিলেন। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পের সম্মিলনে যে জলের উৎপত্তি, এ তথ্য পাঁচসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুরা অবগত ছিলেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রবিশেষে 'ঘৃতাচীধী' বা জল-প্রণয়ন বিদ্যার কথা আছে। সেখানে 'মিত্র' ও 'বরুণকে' জলের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্যর আইজাক্ নিউটন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। হিন্দুরা বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। "গমাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহ-মোজসা।"—গীতা। ১৫।১৩। নিকোলস্ কোপারনিকস্ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে ঘোষণা করিলেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকালেও উহা অবগত ছিলেন। "আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নিরক্র মীদসদন্ মাতরংপুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ত্স্বঃ।" —যজুঃ, ৩অঃ—৬মঃ। ১৮১৪ খৃঃঅব্দে জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন্ রেলগাড়ী আবিষ্কার করেন। বৈদ্যুতিক পাখা উহার অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়। ভোজ-প্রবন্ধে লিখিত আছে, "ভোজরাজের রাজ্যে ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এরূপ শিল্পী ছিল, যাহারা ঘোটকের আকারবিশিষ্ট চন্দ্রকলাযুক্ত এক প্রকার বাহন নির্ম্মাণ করিয়াছিল ;—উহা ঘণ্টায় ২৭ ক্রোশ যাইত এবং ভূমি ও অন্তরীক্ষেও চলিত। উহারা এক প্রকার পাখা প্রস্তুত করিয়াছিল যাহা, কলা-যন্ত্রের সাহায্যে, সর্ব্বদা এবং প্রচুর বাতাস উৎপাদিত করিত।"—(দয়ানন্দ স্বামীর 'সত্যার্থ প্রচার' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। অধুনা জর্ম্মণগণ—ভূমি ও অন্তরীক্ষে চলিতে পারে, এরূপ, এক যানের আবিষ্কার করিয়াছেন ; কিন্তু, উপরিউক্ত প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, হিন্দুরা বহুপূর্ব্বে উহা অবগত ছিলেন। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে ফুল্টন সাহেব বাষ্পীয় পোত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা অন্ততঃ ৫।৬ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ পোত আটলান্টিক মহাসাগরে চালাইয়াছিলেন। উহার নাম ছিল 'অশ্বতরী'। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, এই অশ্বতরীতে আরোহণ করিয়া, আমেরিকায়, উদ্দালক ঋষিকে আনিতে গিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে কেল্‌ভিন্ সাহেব 'কম্পাশ্' আবিষ্কার করেন ; কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরা, যখন মহাসাগরে যাতায়াত করিতেন, তখন হইতেই ইহার ব্যবহার জানিতেন। ঐ সময় ইঁহারা কামান ও বন্দুকও ব্যবহার করিতেন। কামানের নাম ছিল 'শতঘ্নী' ও বন্দুকের নাম ছিল 'ভূশুণ্ডী।' ১৯০৫ খৃঃ অব্দে রাইট্ সাহেব 'এরোপ্লেন' আবিষ্কার করিলেন ; কিন্তু মেঘনাদ, বহু পূর্ব্বে, এইরূপ এরোপ্লেনে উঠিয়া লঙ্কায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাবণের 'পুষ্পক রথ'—'এয়ারশিপ্' বা 'জেপেলীন' ব্যতীত আর কি ? অধুনা য়ুরোপের যুদ্ধে যে উপায়ে বিপক্ষ সৈন্যকে, আঘাত না করিয়া, সংজ্ঞাহীন করা হইতেছে—বিরাট্‌রাজ্যে, উত্তরগোগৃহ-সমরে, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন একা সেই উপায়ে, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি মহারথী পরিচালিত অসংখ্য কৌরব সেনাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ; উহার নাম ছিল—'সম্মোহন শর'। এখন এমন অনেক কল আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার দ্বারা মাটীর ভিতর হইতে জল টানিয়া বাহির করা যায়। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অর্জ্জুন, নিমেষ, মধ্যে ভোগবতী গঙ্গার জল তুলিয়া, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে পান করাইয়াছিলেন। এখন, কত বৎসর পরিশ্রমের পর পদ্মার উপর সেতু-নির্ম্মাণ করিয়া, ইঞ্জিনীয়রগণের কতই না শ্লাঘা ; আর কোন্ সেই অতীত ত্রেতাযুগে, শ্রীরামচন্দ্র, কত অল্প সময়ের মধ্যে, সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধিয়া, লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দুশিল্পাচার্য্যগণ পাথরপর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়াছিলেন ; কিন্তু এখনকার ইঞ্জীনীয়রগণ ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন না !

দিল্লীর কুতবমিনারের নিকটে যে লৌহস্তম্ভটি আছে, হিন্দু রসায়নবিৎগণের তাহা এক অদ্ভুতকীর্ত্তি! এমন

কৌশলে উহার লৌহ প্রস্তুত যে, সহস্র বৎসরেও উহাতে মড়িচা ধরিবে না। পাশ্চাত্যজগৎ আজিও সে কৌশল অবগত হইতে পারেন নাই। প্রাচীনকালে হিন্দুরা যে অসি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা প্রস্তরপর্য্যন্ত কাটা যাইত। ইহার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও নির্ম্মাণ কৌশল এখনও কেহ জানিতে পারেন নাই।—(প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৺রামদাস সেনের পুস্তক দ্রষ্টব্য)। হিন্দু ঋষিগণ মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে ও সৌরলোকে বিচরণ করিতেন। পাশ্চাত্যগণও এখন চন্দ্রলোকে যাইবার কল্পনা করিতেছেন। মঙ্গলগ্রহের সহিত বৈদ্যুতিক সঙ্কেত চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শারীর বিদ্যায়ও হিন্দুরা অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন; তাঁহারা, মানব-দেহের মূলাধারে, সার্দ্ধতিন লক্ষ নাড়ীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ও তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশটি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—(শিবসংহিতা, ২পং ১১); কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় কয়টি নাড়ীর সন্ধান হইতেছে? শিব, দক্ষের স্কন্ধে ছাগমুণ্ড বসাইয়াছিলেন; ও গণেশের স্কন্ধে হস্তিমুণ্ড বসান হইয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে শিবের ঐরূপ পারদর্শিতাই ছিল। আধুনিক চিকিৎসকগণ—বানর, ছাগ প্রভৃতি মনুষ্যেতর জীবের শোণিতের সহিত মানব-শোণিতের সাদৃশ্য প্রমাণ করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ফ্রান্সে, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিকে গৌরবর্ণ করিবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু অষ্টাবক্র ঋষি, তাঁহার বিদ্যাপ্রভাবে, ভগীরথের শরীরের অস্থি-সমাবেশ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত পাঁচন ও মকরধ্বজ, হিন্দুগণের এক অদ্ভুতকীর্ত্তি! প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও হিন্দুদিগের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল;—সীতার অগ্নি-প্রবেশে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রের বজ্র দন্তে চিবাইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি বজ্রের অনিষ্টকারিণী শক্তি নষ্ট করিবার উপায় জানিতেন। জহ্নু মুনি গঙ্গা-শোষণ করিয়াছিলেন; ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি প্রাকৃতিক বিদ্যায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। অধুনা, একজন জর্ম্মণ ডাক্তার কৃত্রিম-মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মনুষ্যমূর্ত্তি কথা বলিতে ও সঙ্গীত করিতে সক্ষম! রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতাকে হত্যা করিয়া, শ্রীরাম-চন্দ্রকে বিহ্বল করিয়াছিলেন;—এই মায়াসীতা, বৈদেহীর অবিকল-প্রতিমূর্ত্তি, শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া, অনেক বিলাপ করিয়াছিল। বলরামের একটি নাম সঙ্কর্ষণ;—যশোদার গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর জঠরে স্থাপিত করা হইয়াছিল। এরূপ অদ্ভুত-বিদ্যার আবিষ্কার পৃথিবীতে আবার কত দিনে হইবে,—কে জানে? শক্তিশেলে হত লক্ষ্মণ, বভ্রুবাহনের অস্ত্রাঘাতে মৃত অর্জ্জুন, ও লবকুশের সহিত যুদ্ধে নিহত শ্রীরামচন্দ্রের পুনর্জ্জীবনলাভ ইত্যাদি বিশদরূপে আলোচনা করিলে, প্রাচীনহিন্দুগণের উদ্ভিদ্-বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানলাভের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জগৎ, সেদিন ডারউইনের নিকট বিবর্ত্তনবাদ শুনিল; কিন্তু হিন্দুগণ, বহুদিন পূর্ব্বেই, উহা অবগত ছিলেন। 'কণাদে'র পরমাণুবাদ ও কপিলের বিবর্ত্তনবাদ আজও জগতের অতুলনীয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের আবিষ্কারসম্বন্ধে পাশ্চাত্যজগৎ এখনও 'ক' 'খ' পড়িতেছেন—হিন্দুরা বহুকাল পূর্ব্বেই ইহার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগণ 'পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (science), নিধি (জ্যোতিষ); বাকো বাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেব-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (যুদ্ধ), নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (নৃত্য, গীত, বাদ্য, শিল্পাদি) প্রভৃতিতে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন—(শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "উপনিষদ-ব্রহ্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য)।

—"ব্রহ্মবিদ্যা।"

বেলেডোনা ও ধুতুরা

বেলেডোনা, এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ধুতুরা (Stramonium), তত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। বাংলাদেশে বেলেডোনা না হইলেও চলে; ভারতের অন্যান্য স্থানে বহুলপরিমাণে এই বেলেডোনার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের পশ্চিম-অংশে—সিমলা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত—এই গুল্ম চারিদিকে বন্য-অবস্থায় জন্মিয়া থাকে। ইহাকে হিন্দিতে "সাগ-আঙ্গুর", বা "আঙ্গুর সেফা" বলে। হিমালয়ে এত অধিক পরিমাণে এই গুল্ম জন্মিয়া থাকে যে, তাহাতে—ভারতের অভাব মোচন করা ত কিছুই নয়—এমন কি, পৃথিবীতে আর কোথাও বেলেডোনার জন্য চাষ করিতে হয় না। উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্ রাসায়নিকগণ, যদি একবার হিমালয়-অঞ্চলে গিয়া,

এই ঔষধের কোন একটা কারখানা-স্থাপন করেন, তাহা হইলে, অতি অল্পসময়ের মধ্যে, পৃথিবীর বেলেডোনা জোগান ভারতের একচেটিয়া ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। বেলেডোনা ও ধুতুরা, একই গুল্ম না হইলেও, একজাতীয় বটে; এবং দুইই ভারতে পাওয়া যায়। ইহাদের সম্বন্ধে একটু যত্ন করিলে, কত নিরন্নের যে অন্ন জুটিতে পারে, তাহা বলা যায় না। বিলাতী ব্যবসায়ীরা, অনেক পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া, এই গুল্মের চাষ করিয়া থাকে; আর, আমরা স্বচ্ছন্দজাত প্রকৃতির এই অমূল্য দান হেলায় অবহেলা করিতেছি। সর্ব্বপ্রকার ব্যথার জন্য ঔষধাবলীর মধ্যে, শ্রেষ্ঠ-ঔষধ অহিফেনের নিম্নেই, বেলেডোনার স্থান। স্নায়ুকে একেবারে অসাড় করিবার গুণ, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এই কারণে ব্যথায় ইহার প্রলেপ, Pleurodynea, Chronic osteo-anthritis, প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যাহ্যিক প্রলেপ ও মালিশ অত্যন্ত উপকারী। স্ত্রীলোক, ঠুন্‌কা রোগে, স্তনের উপর মালিশ করিয়া অচিরে সুফল লাভ করিয়া থাকেন। ঘুংড়ি কাশি, হাঁপানী, Laryngismus-Stridulens, Chorea, Epilepsy, Spasmodic Stricture of Urethra, বাত ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, বাধক, নানাপ্রকার স্ত্রীরোগ, Cancerous ulcerations, ছুলি ও বিবিধ চক্ষুরোগ এবং অস্ত্র-চিকিৎসায় এই মহৌষধি বহুল-পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধুতুরা প্রায় ১০।১২ প্রকারের। বাংলাদেশের যথা-তথা, আমরা সচরাচর ৫।৬ প্রকারের দেখিতে পাই। ইহাদের গুণাগুণও কতকটা পৃথক্। ধুতুরা বহুপ্রকারের হইলেও, এলোপ্যাথিক মতে, কেবল ধুতুরা Stramoniumই ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর ধুতুরাকে আমরা শ্বেত-ধুতুরা বলিয়া থাকি; আবার, অনেক সময়, 'Datura Albo'কেও শ্বেত-ধুতুরা আখ্যা দিই। হিমালয়ের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, প্রায় ১০০০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া, ধুতুরার জঙ্গল রহিয়াছে; কিন্তু হায়! ইহাকে কাজে লাগাইবার কেহ চেষ্টাও করেন না। সিমলা শৈলের চারিদিকে, প্রায় ১৫০ মাইল ব্যাপিয়া, এই গুল্ম অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়—এমন কি, উত্তর কুলুপর্য্যন্ত এই গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। শতদ্রু নদীর উত্তরপার্শ্বে রামপুরপর্য্যন্ত কেবল ধুতুরা সিদ্ধি (Cannabis Sativa) ও Cassia Saphra গুল্মে আচ্ছন্ন। অনেক সময় Datura Stramoniumএর মধ্যে, Datura Fastuosa গুল্মও অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

Datura Stramoniumকে হাঁপানীর পক্ষে ধন্বন্তরি ঔষধ বলা চলে। Asthma Cigarettes বলিয়া যে জিনিস বাজারে বিক্রয় হয়—তাহা এই ধুতুরা পাতায় তৈয়ারী। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেকেই তামাকের সহিত ইহার ধূম পান করিয়া থাকে। ফোড়া ও ঘায়ের পক্ষে ধুতুরার পাতা মহৌষধি বলা চলে। অনেক সময় আমাদের দেশীয় বৈদ্যগণ মৃগী (Epilepsy) ও রস্‌তড়কা (Convulsions) রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতিতে, ইহার ফল ও পাতা বাটিয়া প্রলেপ (Poultice) দিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নানাপ্রকারের ফুলা ও ব্যথার জন্য, ধুতুরার পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, ঐ জলে আক্রান্ত-অঙ্গ ডুবাইয়া রাখিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই পাতার রস, কিঞ্চিৎ আফিমের সহিত মিশাইয়া, কিম্বা সৈন্ধব লবণের সহিত গরম গরম মালিশ করিলে, বাতের অসহ্য যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। কালো ধুতুরাও ভারতের সর্ব্বস্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই কালো ধুতুরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত; কিন্তু এ সম্বন্ধে ঠিক একটা সিদ্ধান্ত নিরূপিত হয় নাই। আমাদের দেশীয় চিকিৎসকগণ, অনেক সময়, এই ঔষধদ্বারা জলাতঙ্ক (Hydrophobia)-রোগ আরাম করিয়াছেন। জলাতঙ্ক হইবার পূর্ব্বেই, এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। কুকুরে কামড়াইবার ১৫ দিন হইতে ২০ দিনের মধ্যে ব্যবহার করিলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। যদি পূর্ব্বেই জলাতঙ্ক প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ছুরি দিয়া কপালের একস্থান চিরিয়া, কালো ধুতুরার পাতা ঘর্ষণ করিবে; মধ্যে মধ্যে পাতার রসও খাইতে দিবে। ধুতুরা পাতা আরও অনেক কাজে লাগে। এ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। যে কোন রসায়নতত্ত্ববিৎ এই বিষয়ের পরীক্ষায় একটু পরিশ্রম করিবেন, তিনিই দেশের ও দশের উপকার করিয়া ধন্য হইবেন।—

নিত্যানন্দ।

পল্লী-সমাজ

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায

বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এই যে মাসি, —রমা কই গা ?"

মাসী আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তা'হলে রমা, কি করবে স্থির করলে ?"

জলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল—"কিসের বড়দা ?"

"তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন্ ! রমেশ ত কা'ল এসে হাজির হয়েচে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা ক'রেই করবে বলে বোধ হচ্চে :—যাবে নাকি ?"

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল "আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ী ?"

বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল—"সে ত জানি দিদি ! আর যেই যাক্, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবিনে। তবে, শুনচি নাকি, ছোঁড়া সমস্ত বাড়ী বাড়ী নিজে গিয়ে বলবে---বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে, তা'হলে কি বলবে ?"

রমা সরোষে জবাব দিল, —"আমি কিছুই বোলবো না—বাইরে দরওয়ান তার উত্তর দেবে—"

পূজানিরতা মাসীর কর্ণরন্ধ্রে এই অত্যন্ত রুচিকর দলাদলির আলোচনা পৌঁছিবামাত্রই তিনি আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনঝির কথা শেষ না হইতেই অত্যন্তপ্ত খৈএর মত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দরওয়ান কেন ? আমি বল্‌তে জানিনে ? নচ্ছার ব্যাটাকে এম্‌নি বলাই বল্‌ব যে, বাছাধন জন্মে কখন আর মুখুয্যে-বাড়ীতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুক্‌বে নেমতন্ন করতে আমার বাড়ীতে ? আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব। তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখন ত আর আমার যতীন জন্মায় নি—ভেবেছিল যত মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তাহলে মুঠোর মধ্যে আস্‌বে—বুঝ্‌লে না বাবা বেণি ! যখন হল না, তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি সব জপতপ তুক্‌তাক্ করিয়ে, মায়ের কপালে আমার এমন আগুন জ্বেলিয়ে দিলে

যে, ছ'মাস পেরুল না ; বাছার হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল ! ছোট জাত হ'য়ে চায় কি না যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে ! তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েচে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্য্যন্ত পেলে না ! ছোট-জাতের মুখে আগুন !" বলিয়া মাসী যেন কুস্তি-শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

পুনঃ পুনঃ ছোট জাতের উল্লেখে বেণীর মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল ; কারণ, তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া।

রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসীকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, "কেন মাসি, তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও। জাত ত আর কারুর হাতেগড়া জিনিস নয় ? যে যেখানে জন্মেচে, সেই তার ভাল—"

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল,—"না, রমা, মাসী ঠিক কথাই বল্‌চেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আন্‌তে পারি বোন্ ! ছোট খুড়োর ওকথা মুখে আনাই বেয়াদবি। আর তুক্‌তাকের কথা যদি বল, ত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোট খুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচার্য্যির অসাধ্য কায কিছু নেই। ঐ ভৈরবই ত হয়েচে আজকাল রমেশের মুরুব্বি।"

"সে ত জানা কথা বেণি ! ছোঁড়া দশবারো বচ্ছর ত দেশে আসেনি—এতদিন ছিল কোথায় ?"

"কি ক'রে জানব মাসি ? ছোট খুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব, আমাদেরও তাই। শুন্‌চি, এতদিন নাকি বোম্বাই, না কোথায় ছিল। কেউ বল্‌চে ডাক্তারি পাশ ক'রে এসেচে, কেউ বল্‌চে উকিল হয়ে এসেচে—কেউ বল্‌চে সমস্তই ফাঁকি—ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল—যখন বাড়ী এসে পৌঁছল, তখন দুই চোখ নাকি জবাফুলের মত রাঙা ছিল।"

"বটে ? তা'হলে তাকে ত বাড়ী ঢুক্‌তে দেওয়াই উচিত নয় !" বেণী উৎসাহভরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল—"নয়ই ত ! হাঁ, রমা, তোর রমেশকে মনে পড়ে ?"

নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল,—"পড়ে বৈ কি। সে ত আমার চেয়ে বেশী বড় নয়। তা'ছাড়া শীতলাতলার পাঠশালে পড়তাম যে। কিন্তু, তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন।"

মাসী আর একবার জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তার ভালবাসার মুখে আগুন ! সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাঁসিল করবার জন্যে। তাদের মতলবই ছিল, তোকে কোনমতে হাত-করা।"

"তাতে আর সন্দেহ কি ! ছোট খুড়ীমাও—" বেণীর বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসীকে বলিয়া উঠিল —"সে সব পুরণো কথায় দরকার কি মাসি !"

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাক্, তাহার জননীর সম্বন্ধে রমার কোথায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন,—"তা বটে ! তা বটে ! ছোট-খুড়ী ভাল মানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠ্‌লে চোখের জল ফেলেন।" কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এ সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন ;—"তবে, এই ত স্থির রইল দিদি—নড়চড় হবে না ত ?"

রমা হাসিল। কহিল, "বড়দা, বাবা বল্‌তেন, 'মা, আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখন রাখিস্‌নে।' তারিণী ঘোষাল জ্যান্ত থাক্‌তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা,—যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, ভুল্‌ব না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে ত ! তা'ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার যো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোন্‌কে বিষয় ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করবার ভার শুধু আমারই ওপর যে ! আমরা ত নই-ই, আমাদের সংশ্রবে যারা আছে, তাদের পর্য্যন্ত সেখানে যেতে দেব না। আচ্ছা, বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ী যায় ?"

বেণী আর একটু সরিয়া আসিয়া গলা-খাটো করিয়া বলিল, "সেই চেষ্টাই ত করচি বোন্ ! তুই আমার সহায় থাকিস্, আর আমি কোন চিন্তে করিনে—রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি, ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয় ! তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচায্যি ! আর তারিণী ঘোষাল নেই—দেখি, এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষে করে ?"

রমা কহিল,—"রক্ষে করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো

বড়দা, এই আমি বলে রাখ্‌লুম, শত্রুতা করতে এও কম করবে না।”

বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া চৌকাটের উপর উঁচু হইয়া বসিলেন। তারপরে কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিলেন, “রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেল্‌তে চাও ত, এই সময়। পেকে গেলে আর হবে না, তা' নিশ্চয় বলে দিচ্চি। বিষয়-সম্পত্তি কি ক'রে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেখেনি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্ম্মূল করতে পারা যায়, ত ভবিষ্যতে আর যাবে না। এ কথা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখ্‌তে হবে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়!”

“সে আমি বুঝি বড়দা!”

“তুই না বুঝিস্ কি দিদি! ভগবান তোকে ছেলে গড়তে গড়তে মেয়ে গড়েছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। আচ্ছা, কা'ল একবার আসব। আজ বেলা হ'ল যাই'—বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িলেন। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বুকের ভিতরে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে অপরিচিত গম্ভীর-কণ্ঠের আহ্বান আসিল—“রাণী কই রে?”

রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলা তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার সমস্ত মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেছে। পরক্ষণেই, রুক্ষমাথা, খালি-পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো —রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। “এই যে বড়দা' এখানে? বেশ, চলুন—আপ্‌নি না হ'লে করবে কে? আমি সারা [illegible] আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কৈ, রাণী কোথায়?” বলিয়াই কবাটের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পলাইবার পথ পায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্ত্ত-মাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল—“এই যে! আরে ইস্, কত বড় হয়েছিস্ রে? ভাল আছিস্?”

রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু, রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল,—“চিন্‌তে পাচ্ছিস্ ত রে? আমি তোদের রমেশ দা'।”

এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু, ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি ভাল আছেন?”

“হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু, আমাকে 'আপনি' কেন রমা?” বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, “রমার সেই কথাটি আমি কোন দিন ভুল্‌তে পারিনি বড়দা! যখন মা মারা গেলেন, ও তখন ত খুব ছোট—সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল 'রমেশ দা, তুমি কেঁদো না—আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ ক'রে নেব'—তোর সে কথা বোধ করি, মনে হয় না রমা, না? আচ্ছা আমার মাকে মনে পড়ে ত?”

কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে একটিবার ঘাড় নাড়িয়াও জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে।

রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—“আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকী। যা' করবার ক'রে দাও ভাই—যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি তাই হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্য্যন্তও করতে পারচি না।”

মাসী আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি বাবু, তারিণী ঘোষালের ছেলে না?”

রমেশ এই মাসীটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই; কারণ, সে গ্রাম-ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষ্যে সেই যে মুখুয্যে-বাড়ী ঢুকিয়াছিলেন, আর বাহির হন নাই।

রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসী বলিলেন, “না হলে এমন বেহায়া পুরুষ-মানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ, তেম্‌নি ব্যাটা। বলা নেই কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ীর ভেতর ঢুকে উৎপাত কর্‌তে সরম হয় না তোমার?”

রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল।

"আমি চল্লুম" বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলেন। রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "কি বক্‌চ মাসী, তুমি নিজের কাযে যাও না—"

মাসী মনে করিলেন, তিনি বোনঝির কথার ইঙ্গিত বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিষ মিশাইয়া কহিলেন, "যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোদের মত চক্ষুলজ্জা হয় না। বেণীর অমন করে পালানোর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হ'ত, আমরা বাপু তোমার গমস্তাও নই, খাস্‌-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্ম্ম-বাড়ীতে জল তুল্‌তে, ময়দা মাখ্‌তে যাব। তারিণী মরেচে, গাঁশুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে; এ কথা আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর মুখের ওপর ব'লে গেলেই ত পুরুষ-মানুষের মত কাজ হ'ত।"

রমেশ তখনও নিস্পন্দ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

ভিতর হইতে রান্নাঘরের কবাটের শিকল ঝনঝন্‌ নড়িয়া উঠিল। কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল না। মাসী রমেশের নির্ব্বাক ও অত্যন্ত পাংশুবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, "যাই হোক্‌, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর দরওয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাইনে,—একটু হুঁস করে কাজ করো বাপু, যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্দরলোকের বাড়ীর ভেতর ঢুকে আব্‌দার ক'রে বেড়াবে। তোমার বাড়ীতে আমার রমা কখন পা-ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে বলে দিলুম—যাও।"

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল; এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এম্‌নি গভীর একটা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল।

ঘরের ভিতরে কপাটের অন্তরালে রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে, রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন তার উপায় কি! কিন্তু, আমি ত এত কথা জান্‌তাম না—না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম, সে আমাকে মাপ কোরো রাণি!" বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না।

বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পলায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

মাসীর সহিত চোখো চোখি হইবামাত্র তাহার সমস্ত মুখ আহ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল। সরিয়া আসিয়া কহিল, "হাঁ, শোনালে বটে মাসি! আমাদের সাধ্যিই ছিল না, অমন ক'রে বলা! এ কি চাকর দরওয়ানের কাজ রমা? আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম কি না,—ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত ক'রে বা'র হয়ে গেল! এই ত ঠি'ক হল!"

মাসী ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিলেন, "খুব ত হ'ল জানি; কিন্তু, এই চুটো মেয়েমানুষের ওপর ভার দিয়ে না সরে গিয়ে নিজে বলে গেলেই ত আরও ভাল হ'ত। আর নাই যদি বল্‌তে পার্‌তে, আমি কি বল্লুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন সরে পড়া উচিত কাজ হয়নি।" মাসীর কথায় ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল; এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, "তুমি যখন নিজে বলেছ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েচে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠ্‌ত না!" মাসী এবং বেণী উভয়েই যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসী রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কি বল্‌লি লা?"

"কিছু না। আহ্নিক করতে বসে ত সাতবার উঠ্‌লে—যাও না, ওটা সেরে ফেল না—রান্নাবান্না কি হবে না?" বলিতে বলিতে রমা নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

বেণী শুষ্কমুখে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি মাসি?"

"কি করে জান্‌ব বাছা? ও রাজা-রাণীর মেজাজ বোঝা

কি আমাদের দাসীবাঁদীর কর্ম্ম ?" বলিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে তিনি মুখখানা কালীবর্ণ করিয়া তাঁহার পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, এবং বোধ করি মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীরেধীরে প্রস্থান করিলেন।

২

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অর্জ্জিত হইবার সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যক। প্রায় শত-বর্ষ পূর্ব্বে, মহাকুলীন বলরাম মুখুয্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুয্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া, বর্দ্ধমান রাজসরকারে চাকুরি করিয়া এবং আরও কি কি করিয়া, এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন।

ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতৃ-ঋণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাই, দুঃখেকষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই নাকি দুই মিতায় মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, একগ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখদর্শন করেন নাই। বলরাম মুখুয্যে যে দিন মারা গেলেন, সে দিনও ঘোষাল তাঁহার বাটীতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য্য কথা শোনা গেল। তিনি নিজের সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া, নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন।

সেই অবধি এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুয্যে ও ঘোষাল-বংশ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকেও অস্বীকার করিত না। যাই হউক, আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ঘোষাল-বংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট-তরফের তারিণী ঘোষাল মকদ্দমা-উপলক্ষ্যে জেলায় গিয়া দিনছয়েক পূর্ব্বে হঠাৎ যে দিন, আদালতের ছোটবড় পাঁচসাতটা মুলতুবি মকদ্দমার শেষফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কোথাকার কোন্ অজানা আদালতের পরোয়ানা শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন, সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের কুঁয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

বড়-তরফের কর্ত্তা বেণী ঘোষাল খুড়ার মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং আরও গোপনে দল-পাকাইতে লাগিলেন, কি করিয়া খুড়ার আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর খুড়া-ভাইপোর মুখ দেখাদেখি ছিল না।

বহুবৎসর পূর্ব্বে তারিণীর গৃহশূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার-বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাটির ভিতরে দাসদাসী এবং বাহিরে মকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন।

রমেশ রুড়কি-কলেজে এই দুঃসম্বাদ পাইয়া পিতার শেষ-কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘকাল পরে কা'ল অপরাহ্ণে তাহার শূন্যগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ম্মবাড়ী। মধ্যে শুধু দুটো দিন বাকী। বৃহস্পতি-বারে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মুরুব্বিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল—হয় ত শেষ পর্য্যন্ত কেহ আসিবেই না, তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য্য ও তাহার বাড়ীর লোকেরা আসিয়া কায-কর্ম্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা না থাকিলেও, উদ্যোগ আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রমেশ বাড়ীর ভিতরে কাযকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। কি কাযে বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জনদুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া, বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতিবৃদ্ধ ৫।৬টি ছেলেমেয়ে লইয়া কাশিতে কাশিতে বাড়ী ঢুকিলেন। তাঁহার কাঁধের উপর মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চস্মা,—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। শাদা চুল, শাদা গোঁফ—তামাকের ধুঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া তিনি সেই ভীষণ চস্মার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন্, ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিতেই তিনি হাত ছাড়াইয়া লইয়া ভাঙা-গলায় বলিয়া উঠিলেন,—"না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি

দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে ;—কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যে-বংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যেকথা বেরুবে। আস্‌বার সময় তোমার বেণী ঘোষালের মুখের সামনে বলে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক্‌, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি।" একটু থামিয়া বলিলেন, "আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম ক'রে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্ম্মদাস শুধু ধর্ম্মেরই দাস, আর কারো নয়।" এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্য-ভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া লইয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলির হাত হইতে হুঁকাটা ছিনিয়া লইয়া তাহাতে এক টান্ দিয়াই প্রবলবেগে কাশিয়া ফেলিলেন।

ধর্ম্মদাস নিতান্ত অত্যুক্তি করে নাই। উদ্যোগ আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে না। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল, তাহারা প্রাঙ্গণের একধারে ভিয়ান চড়াইয়াছিল। সেদিকে পাড়ার কতকগুলা ছেলে-মেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাঙালাদের বস্ত্র দেওয়া হইবে। চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য্য থান ফাড়িয়া, পাট করিয়া, গাদা করিতেছিল—সেদিকেও জনকয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া, মনে মনে রমেশের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতেছিল। লোকজন, প্রজাপাঠক বাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া, কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছামিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া, ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া ধর্ম্মদাসের কাশি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যুত্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া 'না না' বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু ধর্ম্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড়ঘড় করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু কাশির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলি সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মদাস যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিবার সুবিধা তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। তিনি এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিলেন না। ধর্ম্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"কাল সকালে, বুঝলে ধর্ম্মদাস-দা, এখানে আস্‌ব বলে বেরিয়েও আসা হ'ল না—বেণীর ডাকাডাকি—'গোবিন্দ খুড়ো তামাক খেয়ে যাও।' একবার ভাবলুম, কাজ নেই—তারপরে মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বল্‌লে, জান বাবা রমেশ! বলে, 'খুড়ো, তোমরা ত রমেশের মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েচ, কিন্তু, জিজ্ঞেস করি লোকজন খাবে-টাবে ত?' আমিই বা ছাড়ি কেন?—'তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশও কারো চেয়ে খাটো নয়—তোমার ঘরে ত একমুঠো চিঁড়ের পিত্তেশ কারু নেই।'—বল্‌লুম 'বেণীবাবু, এই ত পথ, একবার কাঙালী-বিদেয়টা দাঁড়িয়ে দেখো।' কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু, বুকের পাটা ত বলি একে! এতটা বয়স হ'ল, এমন আয়োজন চোখে দেখিনি! কিন্তু, তাও বলি ধর্ম্মদাস-দা, আমাদের সাধ্যই বা কি! যাঁর কাজ তিনিই ওপর থেকে করাচ্চেন—তারিণী-দা' শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বৈ ত নয়!"

ধর্ম্মদাসের কিছুতেই কাশি থামে না। সে কাশিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলি মশাই বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন ; দেখিয়া ধর্ম্মদাস আরও ভাল বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলি বলিতে লাগিলেন, "তুমি ত আমার পর নও বাবা,—নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাত পিস্‌তুত বোনের মামাত ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর—সে সব তারিণী-দা জান্‌তেন। তাই যে কোন কাযকর্ম্মে—মামলা-মকদ্দমা কর্‌তে, সাক্ষী দিতে—ডাক্ গোবিন্দকে।"

ধর্ম্মদাস প্রাণপণবলে কাশি থামাইয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন,—"কেন বাজে বকিস্ গোবিন্দ? থক্—থক্—থক্—আমি আজকের নয়—না জানি কি? সে বছর সাক্ষী-দেবার কথায় বল্‌লি 'আমার জুতো নেই, খালি-পায়ে যাই কি করে?' থক্—থক্—তারিণী অম্‌নি আড়াই-টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিলে। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি! থক্-থক্-থক্-থ—"

গোবিন্দ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল,—"এলুম?"

"এলি নে?"

"দূর্ মিথ্যেবাদী !"

"মিথ্যেবাদী তোর বাবা !"

গোবিন্দ তাহার ভাঙা-ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিল—"তবে রে শালা ;" - ধর্ম্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া ধরিয়া হুঙ্কার দিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাশিয়া ফেলিল।

রমেশ শশব্যস্তে উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্ম্মদাস লাঠি নামাইয়া কাশিতে কাশিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল "ও শালার সম্পর্কে আমি বড়-ভাই হই কি না, তাই শালার আক্কেল দেথ —"

"ওঃ, শালা আমার বড় ভাই !" বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলিও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

সহরের ময়রারা ভিয়ান ছাড়িয়া চাহিয়া রহিল। চতুর্দ্দিকে যাহারা কাযকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, চেঁচামেচি শুনিয়া তাহারা তামাসা দেখিবার জন্য সুমুখে ছুটিয়া আসিল ; ছেলেমেয়েরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল ; এবং এই সমস্ত লোকের দৃষ্টির সম্মুখে রমেশ লজ্জায়, বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান ! এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে ?

বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কাপড়ের থাক্ দিতে-দিতে সমস্তই দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া আসিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "প্রায় শ'-চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি ?"

রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভিভূতভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃদু-অনুযোগের স্বরে কহিল, "ছিঃ গাঙ্গুলি মশাই ! বাবু একেবারে অবাক্ হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাযকর্ম্মের বাড়ীতে কত ঠেঙা-ঠেঙি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হ'য়ে যায়—আবার যে-কে সেই হয়। নিন্ উঠুন, চাটুয্যে মশাই,—দেখুন দেখি আরও থান ফাড়্ব কি না ?"

ধর্ম্মদাস জবাব দিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ গাঙ্গুলি সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্ব্বক খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "হয়ই ত ! হয়ই ত ! ঢের হয় ! নইলে বিরদ কম্ম বলেচে কেন ? শাস্তরে আছে, লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে ! সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যে মশায়ের কন্যা রমার গাছ-পিতিষ্ঠের দিন সিধে নিয়ে রাঘব ভট্‌চাযিতে, হারাণ চাটুয্যেতে মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেল ! কিন্তু আমি বলি ভৈরব ভায়া, রমেশ বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্চে না।' ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া, আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলেদের একখানা ক'রে দিলে নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী, সেই যুক্তিই করুন ; কি বল ধর্ম্মদাস-দা ?"

ধর্ম্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি, বাবাজী। ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার জো' নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেচে কেন ? বুঝলে না বাবা রমেশ ?"

এখন পর্য্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বস্ত্র-বিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। ইহার সুযুক্তি-কুযুক্তি সম্বন্ধে নহে ; এখন এইটাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহারা যাহাদিগকে ছোট-লোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এত বড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড করিয়া বসিল, সে জন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুক ক্ষোভ বা লজ্জার কণা-মাত্রও নাই।

ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, রমেশ সংক্ষেপে কহিল, "আরও ত'শ কাপড় ঠিক করে রাখুন।"

"তা নইলে কি হয় ? ভৈরব ভায়া, চল আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে বল ?" বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বস্ত্ররাশির নিকটে গিয়া বসিল।

রমেশ বাটীর ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেই ধর্ম্মদাস একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি অনেক কথা কহিল। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কাপড় গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ গাঙ্গুলি আড়চোখে চাহিয়া সমস্ত দেখিল।

"কৈ গো, বাবাজী কোথায় গো ?" বলিয়া একটি শীর্ণ-কায়, মুণ্ডিতশ্মশ্রু প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন। ইঁহার সঙ্গেও গুটিতিনেক ছেলে-মেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরণে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়।

বালক দু'টি কোমরে এক একগাছি ঘুন্‌সি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল—"এস দীনুদা, বোস। বড় ভাগ্যি আমাদের যে, আজ তোমার পায়ের ধূলো পড়্‌ল। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায়, তা' তোমরা—"

ধর্ম্মদাস গোবিন্দের প্রতি কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিল! সে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া কহিল, "তা' তোমরা ত কেউ এ দিক মাড়াবে না, দাদা,"—বলিয়া তাঁহার হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিল।

দীনু ভট্‌চায আসন গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় নিরর্থক গোটাদুই টান দিয়া বলিলেন, "আমি ত ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকরুণকে আন্‌তে তাঁর বাপের-বাড়ী গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারি আয়োজন হচ্চে—পথে আস্‌তে ও গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম, খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে ষোলখানা করে লুচি আর চার-জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে?"

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, "তা'ছাড়া হয় ত একখানা করে কাপড় ও—। এই যে রমেশ বাবাজী,—তাই দীনুদাকে বলছিলুম বাবাজী—তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে যোগাড় সোগাড় একরকম করা ত যাচ্চে, কিন্তু বেণী একেবারে উঠেপড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েছে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে—রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ীর টান্ রয়েচে; কিন্তু এই যে দীনু-দা, ধর্ম্মদাস-দা, এঁরাই কি, বাবা,তোমাকে ফেল্‌তে পারবেন? দীনু-দা ত পথ থেকে শুন্‌তে পেয়ে ছুটে আস্‌চেন। ওরে ও ষষ্ঠিচরণ, তামাক দেনা রে! বাবা রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই।"

নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভেতরে বুঝি ধর্ম্মদাস-গিন্নী এসেচে? খবরদার, খবরদার—অমন কাজটি কোরো না বাবা! বিট্‌লে বামুন যতই ফোস্‌লাক—ধর্ম্মদাস-গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চাবিটাবি দিয়ো না বাবা, কিছুতে দিয়ো না—ঘি ময়দা তেল নুন অর্দ্ধেক সরিয়ে ফেল্‌বে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়েই তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটোটি পর্য্যন্ত লোকসান্ হবে না।"

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া "যে আজ্ঞে" বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। ধর্ম্মদাস যে তাঁহার গৃহিণীকে ভাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া দিবার কথা এত গোপনে কহিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আন্দাজ করিল কিরূপে?

উলঙ্গ শিশু-দুটো ছুটিয়া আসিয়া দীনু-দা'র কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল—"বাবা, সন্দেশ খাব?" দীনু একবার রমেশের প্রতি, একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিল,—"সন্দেশ কোথায় পাব রে?"

"কেন, ঐ যে হচ্চে।" বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া দিল।

"আমরাও দাঁদা মশাই"—বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আরও তিন চারিটি ছেলে-মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্ম্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল।

"বেশত', বেশত'" বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, "ও আচায্যি মশাই,—বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ী থেকে বেরিয়েচে—খেয়ে ত আসেনি—ওহে—ও—কি নাম তোমার? নিয়ে এসো ত ঐ থালাটা এদিকে—"

ময়রা সন্দেশের থালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল—বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না, এম্‌নি ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল—"ওরে ও খেঁদি, খাচ্চিস্ ত, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল্ দেখি?" "বেশ বাবা।" বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল। দীনু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঃ, তোদের আবার পছন্দ? মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিকর, এ কড়াটা কেমন নামালে? কি বল, গোবিন্দ ভায়া, এখনো একটু রোদ আছে বলে, মনে হচ্চে না?"

ময়রা কোনদিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল "আজ্ঞে আছে বৈ কি! এখনো ঢের বেলা আছে—এখনো সন্ধ্যে আহ্নিকের—"

"তবে কৈ, দাও দেখি একটা গোবিন্দ ভায়াকে—চেখে দেখুক, কেমন কলকাতার কারিকর তোমরা! না না, আমাকে আবার কেন?—তবে আধখানা—আধখানার

বেশী নয়—ওরে ও ষষ্ঠিচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—”

রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল—“অম্‌নি বাড়ীর ভেতর থেকে গোটা-চারেক থালাও নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠিচরণ ?”

প্রভুর আদেশমত ভিতর হইতে গোটাতিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে ওই বৃহৎ থালার অর্দ্ধেক মিষ্টান্ন এই তিনটি প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, কৃশ, সৎব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

“হাঁ, কল্‌কাতার কারিকর বটে ! কি বল ধর্ম্মদাস-দা ?” বলিয়া দীননাথ রুদ্ধনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মদাস-দা’র তখনও শেষ হয় নাই। এবং যদিচ তাঁহার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোঝা গেল, এ বিষয়ে তাঁহার মতভেদ নাই।

“হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে” বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, “যদি কষ্টই করলেন, ঠাকুর মশাই, তবে মিহিদানা-টাও অম্‌নি পরখ ক’রে দিন।”

“মিহিদানা ? কৈ, আন দেখি বাপু ?”

মিহিদানা আসিল। এবং এতগুলি সন্দেশের পরে এই নূতন বস্তুটির সদ্ব্যবহার দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

“ওরে ও খেঁদি, ধরদিকি মা, এই দুটো মিহিদানা।”

“আমি আর খেতে পারব না বাবা !”

“পার্‌বি, পার্‌বি। এক ঢোঁক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি—মুখ মেরে গেছে বৈ ত নয় ! না পারিস্, আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ্, কা’ল সকালে খাস্। হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে ! যেন অমৃত ! তা’ বেশ হয়েছে। মিষ্টি বুঝি দু’রকম করলে বাবাজী ?”

রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, “আজ্ঞে না, রসোগোল্লা, ক্ষীরমোহন—”

“অ্যাঁ, ক্ষীরমোহন ? কৈ সে ত বা’র করলে না বাপু ?” বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া কহিল “খেয়েছিলুম বটে, রাধানগরের বোসেদের বাড়ীতে। আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বল্‌লে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।”

রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথাটা বিশ্বাস করা তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না।

রাখাল কি কাযে বাহিরে যাইতেছিল। রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল,“ভেতরে বোধ করি আচায্যি মশাই আছেন; যা ত রাখাল, কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আন্‌তে বলে আয় দেখি।”

সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু !”

রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, “বল্‌গে আমি আন্‌তে বল্‌চি।”

গোবিন্দ গাঙ্গুলি রমেশের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া চোক ঘুরাইয়া কহিল “দেখ্‌লে দীনু-দা, ভৈরবের আক্কেল ? এ যে মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ। সেইজন্যেই আমি বলি—”

তিনি কি বলেন, তাহা না শুনিয়াই রাখাল বলিয়া উঠিল—“আচায্যি মশাই কি করবেন ? ওবাড়ী থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেচেন যে।”

ধর্ম্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়েই চমকিয়া উঠিল—“কে, বড়-গিন্নী ?” রমেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “জ্যাঠাইমা এসেচেন ?”

“আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট বড় দুই ভাঁড়ারই তালা-বন্ধ ক’রে ফেলেচেন।”

বিস্ময়ে, আনন্দে, রমেশ দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দ্রুত-পদে ভিতরে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বীণার তান

সংস্কৃত

১। **বিদ্যোদয়ঃ**, এপ্রিল—জুন, ১৯১৫—

বঙ্গদেশস্য পৌরাণিকত্ব বিচারঃ—বেদে বঙ্গশব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দেশবাচক কি না সন্দেহের বিষয়। রামায়ণে বঙ্গশব্দের নাম উল্লেখ নাই। বোধ হয় রামায়ণের সময়ে বঙ্গদেশ ছিল না—বঙ্গদেশের নামও কেহ জানিত না। মহ ভারতে বঙ্গদেশের, বঙ্গরাজের এবং বঙ্গবীরগণের বহু উল্লেখ আছে এবং মৎস্য বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণেও বঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন বলিতেছেন, "ভারতাদিপুরাণবর্ণিত বঙ্গদেশস্য অধুনাতন বঙ্গদেশাৎ সীমাগতং পার্থক্যমস্তীতিবয়ং বিচারয়ামঃ।' ইঁহার সিদ্ধান্তানুসারে প্রাচীন সুহ্মদেশ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম ও প্রাচীন বঙ্গদেশ বর্ত্তমান নোয়াখালি-কুমিল্লা-বরিশালাদি ভূমিভাগ। 'যশোহর খুলনা' পুরাণে উপবঙ্গ নামে খ্যাত ছিল, 'পুর্ণিয়া মালদহাদি' ভদ্রগৌড়াখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'রংপুর-দিনাজপুরাদি'র পুরাতন নাম পৌণ্ড্রদেশ।

২। **শারদা**, ১ম বর্ষ, ৭,৮ সংখ্যা এবং ৩। **জৈনসিদ্ধান্ত ভাস্কর**, এপ্রেল জুন,—

কাশীস্যাদ্বাদ (দিগম্বর) জৈন মহাবিদ্যালয়স্য দশম বার্ষিক মহোৎসবেঽধ্যক্ষস্য লক্ষ্মবংশীয় কৃষ্ণাত্মজ ডাক্তার তুকারাম শর্ম্মণঃ ভাষণম্—প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ঋষভদেব নামক এক মহর্ষির আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি আদিম তীর্থঙ্কর। তিনি সম্যগ্দর্শনজ্ঞান চরিত্রাত্মক মোক্ষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জিনদর্শন প্রকট করিয়াছিলেন। তৎপর অজিতনাথ হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৩জন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সপ্তমতীর্থঙ্কর সুপার্শ্বনাথ ও ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বারাণসীতে, অষ্টম চন্দ্রপ্রভু চন্দ্রপুরগ্রামে এবং একাদশ শ্রেয়াংসনাথ সারনাথ ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্তিম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীরই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শাক্যমুনি গৌতম-বুদ্ধের সমকালীন ছিলেন বলিয়া এবং জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে শ্রীবর্দ্ধমান মহাবীরকেই জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বতীর্থঙ্করপ্রচারিত জিনমত পুনঃ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন মাত্র, কোন অভিনব মত সৃষ্টি [illegible] নাই। এই মহাত্মা খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে তিনি খৃ: [illegible] পঞ্চম শতাব্দীর লোক।

মৌর্য্যনৃপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহুস্বামী রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য বহুশিষ্যসহ দক্ষিণাপথ গমন করিয়াছিলেন। দেওর্ষি জৈনগণ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই উভয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন—দক্ষিণাপথের ভদ্রবাহু-শিষ্যেরা দিগম্বর এবং উত্তরাপথের জৈনেরা শ্বেতাম্বর।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে শাক্যমুনি ও বর্দ্ধমান রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমকালীন ছিলেন, এবং বর্দ্ধমান কুন্দগ্রামাধিপতি সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলার পুত্র ছিলেন। অজাতশত্রুর মাতামহ-ভগিনীই বর্দ্ধমানের জননী ত্রিশলা। এই নিকট সম্বন্ধ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অজাতশত্রুর সহিত শাক্যমুনির সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পরিচয়ের পূর্ব্বে তিনি সম্ভবতঃ জৈন ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর অজাতশত্রু তাঁহার মাতামহ বৈশালী-নৃপতির রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। কর্ণাট দেশে শ্রবণবেলগোলক নামক গ্রামের অনতিদূরে চন্দ্রগিরিতে মৌর্য্যভূপ চন্দ্রগুপ্ত ও ভদ্রবাহু বিষয়ক শিলালেখ আছে। কিন্তু উহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মতভেদ বর্ত্তমান।

দিগম্বর জৈন-গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উমাস্বামী সপ্ততত্ত্ব বিবরণাত্মক মোক্ষশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কুন্দকুন্দাচার্য্যও প্রবচনসার, পঞ্চাস্তিকায়, সময়সার, নিয়মসার প্রভৃতি বহুগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রাকৃত-ভাষায় ভূতাবলি ধবল-জয়ধবল-মহাধবল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্ত্তী গোম্মটসার রচনা করেন। আরও অনেক হস্তলিখিত জৈন-ধর্ম্ম গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

দিগম্বর-জৈনদিগের রচিত বহু ন্যায়-ব্যাকরণ-দর্শনাদি গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। অমোঘাচার্য্যকৃত শাকটায়নামোঘবৃত্তি, যক্ষবর্ম্মকৃত শাকটায়ন চিন্তামণি, শ্রীপূজ্যপাদ স্বামিকৃত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, অভয়নন্দিকৃত জৈনেন্দ্রমহাবৃত্তি, শ্রীপ্রভাচন্দ্রকৃত জৈনেন্দ্র শব্দার্ণব, শর্ব্ববর্ম্মকৃত কলাপ ব্যাকরণ, শ্রীশুভাচন্দ্রাচার্য্যকৃত প্রকৃত লক্ষণশব্দচিন্তামণি (স্বোপজ্ঞটীকা সহিত), পণ্ডিতরাজ বর্দ্ধমান কৃত গণরত্নমহোদধি প্রভৃতি ব্যাকরণগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। শ্রীপ্রভাচন্দ্রকৃত প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, শ্রীঅকলঙ্কদেবকৃত অষ্টশতী, শ্রীধর্ম্মভূষণযতিকৃত ন্যায়দীপিকা, বিদ্যানন্দিস্বামিকৃত অষ্টসহস্র ব্যাপ্ত পরীক্ষা, প্রমাণ-পরীক্ষা, প্রভাচন্দ্র কৃত ন্যায়কুমুদ চন্দ্রোদয় প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। অজিতসেন কৃত অলঙ্কার-চিন্তামণি, বাগ্ভটকৃত বাগ্ভটালঙ্কার ও কাব্যানুশাসন, সোমদেবসূরিকৃত

যশস্তিলকচম্পুকাব্য, বাদীভসিংহকৃত গদ্যচিন্তামণি, শ্রীভগবজ্জিনসেনকৃত পার্শ্বাভ্যুদয়, শ্রীহস্তমল্লিকবিকৃত সুভদ্রা নাটিকা, সমন্ত ভদ্রস্বামিকৃত জিন শতকচিত্রবন্ধকাব্য প্রভৃতি সাহিত্য-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পুস্তক। শ্রীঅকলঙ্কদেবকৃত রাজবার্তিক, বিদ্যানন্দিকৃত শ্লোক বার্তিক শ্রীপূজ্যপাদকৃত সর্ব্বার্থসিদ্ধি, দেবসেন সুরিকৃত (?) পদ্ধতি, উমাস্বামিকৃত মোক্ষ-শাস্ত্র প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থ প্রধান। নেমিচন্দ্রকৃত গোম্মটসার, ত্রিলোকসার ও ক্ষপসার, ভূতবলিকৃত ধবলত্রয় ধবল মহাধবল, শ্রীকুন্দকুন্দাচার্য্যকৃত নাটক সময়সার, আত্মখ্যাতি, প্রবচনসার, পঞ্চাস্তিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাকৃত (মহারাষ্ট্রী) ভাষায় লিখিত। ভদ্রবাহুস্বামিকৃত ভদ্রবাহুসংহিতা ও সার্দ্ধদ্বয়দ্বীপ প্রজ্ঞাপ্তি প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রধান। জৈনপুরাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ জিনসেনাচার্য্যকৃত আদিপুরাণ, রবিষেণকৃত পদ্মপুরাণ, (জৈন রামায়ণ) আদিরাজ সুরিকৃত পার্শ্বপুরাণ, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুষ্পদন্তকৃত ত্রিষষ্টি শলাকাপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতি।

সাংখ্যের ন্যায় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতিরা ঈশ্বরকে জগৎ-কর্ত্তৃত্ববান্ বলেন না। জৈনমতে জীব, পুদ্গল, আকাশ, কাল, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই ষড়্দ্রব্য এবং এই প্রপঞ্চ অনাদি ও অনন্ত। সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাত্মক মোক্ষমার্গ। অজীব হইতে জীবের পৃথক-স্থিতিই মোক্ষ। হিংসা, স্তেয়, অসত্য, অব্রহ্ম পরিগ্রহ পাপ। জৈনদিগের বিশ্বাস, পূর্ব্বে একবর্ণ ছিল, পরে ঋষভদেবের পুত্র ব্রাহ্মণ বর্ণও সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁর সংস্কার সংখ্যা ৫৩। অন্যধর্ম্মাবলম্বীরা জৈনমত গ্রহণ করিতে পারেন।

হিন্দী

। সরস্বতী, জুন, ১৯১৫—

নড়িয়াদের হিন্দু অনাথাশ্রম।—সংবৎ ১৯৬৬, সন ১৯০৮ এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে গুজরাত ও কাঠিয়াবাড় দেশে অসংখ্য বালকবালিকা নিরন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়াছিল।

হিন্দু অনাথাশ্রম-নড়িয়াদ—(সরস্বতী)

তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সহৃদয়তা ও পরোপচিকীর্ষার ফল উল্লিখিত অনাথাশ্রম। ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত ১৭৬ জন অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছে, এখন ৬৮ জন তথায় অবস্থান করিতেছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮৪ হাজার টাকা সাহায্য আদায় হইয়াছে; উহার মধ্যে ৩৫ হাজার টাকার স্থাবর-সম্পত্তি এবং ১১½ হাজার নগদ জমা আছে। নড়িয়াদ গুজরাত দেশের একটি গণ্ডগ্রাম।

পণ্ডিত বিহারীলাল চৌবে।—জন্ম ১৯০৫ সংবৎ কাশীর জৌনপুর জিলার মথুরাপুর গ্রামে। ইনি সরযূপারী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

স্বর্গবাসী পণ্ডিত বেহারীলাল চৌবে (সরস্বতী)

শিক্ষা প্রথমে বাড়ীতে ও টোলে, পরে কাশী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-কলেজে। প্রথম চাকরী, মাসিক ১০৲ বেতনে কলেজে অনুবাদকের কার্য্য। ফ্যালন সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত ইংরাজী-হিন্দী-অভিধান ইঁহার দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইয়াছিলেন। বিহারীলাল ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি 'সদাদর্শ', 'হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা' এবং 'কবি বচনসুধা' প্রভৃতি পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। বেনারস কলেজের কাজ শেষ হইলে চৌবেজী মাসিক ৫০৲ বেতনে রাঁচি নর্ম্মাল-স্কুলের দ্বিতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন এবং ৫ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করিয়াছিলেন। রাঁচি হইতে তিনি পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বেতন মাসিক ১০০৲ টাকা অবধি উঠিয়াছিল। কলেজিয়েট-স্কুল হইতে চৌবেজী পাটনা নর্ম্মাল-স্কুলে বদলী হইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে পাটনা সিটি-স্কুলে। সিটি-স্কুল হইতেই তিনি অবসর-গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসর-গ্রহণ করিয়া চৌবেজী কাশীবাস করিতেন। গত ফাল্গুনে শিবরাত্রি-তিথিতে বিহারীলালের দেহান্ত হইয়াছে। তিনি বিহার-প্রদেশে হিন্দী ভাষার সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তক অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য। তন্মধ্যে ভাষাবোধ, পত্রবোধ, বিহারি তুলসিভূষণ, বর্ণনাবোধ, পদবাক্যবোধ, প্রবোধ, 'বালোপহার' চারুচলন-

বোধ, দর্শাবতার, বাঙ্গালা গীতার অনুবাদ, Lambs Tales এর অনুবাদ, রণকুমার চরিত (অনুবাদ), শিক্ষাপ্রণালী, বেহট পিহারী তুলসীভূষণ বোধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মেলনে হিন্দী।—গত মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলনে রাও বাহাদুর সর্দ্দার মাধবরাও কিবে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, সমস্ত দেশীয়-ভাষা একই বর্ণে লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং হিন্দীকে সার্ব্বজনীন 'ভাষা স্বীকার করিয়া লইয়া সমস্ত স্কুলে উহা তৃতীয়' ভাষা রূপে অধ্যাপনা করা হউক। অনেক বাদানুবাদের পর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

২। **নিবন্ধমালা**, ভরতপুর, পুষ্প ২,—

রাবণের লঙ্কা কোথায়?—লেখক সরদার রাও বাহাদুর মাধব রাও বিনায়ক কিবে এম-এ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিষ্কিন্ধা বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তরে ছিল, আজকাল সেখানে রেওয়া রাজ্যে কন্ধো গ্রাম অবস্থিত। যেহেতু চিত্রকূট হইতে ৬২ মাইল চলিয়া রাম মাতঙ্গী ঋষির আশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথা হইতে সুগ্রীবের বাসস্থান একদিনের পথ অর্থাৎ ৩২ মাইল। অতএব কিষ্কিন্ধা ও চিত্রকূটের ব্যবধান প্রায় ৯২ মাইল। এই ব্যবধানে রেওয়া রাজ্যে কন্দোগ্রামে বৌদ্ধেরা ভারত স্তূপ স্থাপিত করিয়াছিল। লেখক অনুমান করেন, বৌদ্ধেরাও হয়ত কিষ্কিন্ধার স্মৃতি-রক্ষা করিতে ঐ স্তূপ স্থাপনা করিয়াছিলেন। লেখক বলেন, রামায়ণে লঙ্কা বর্ণনায় সমুদ্র বর্ণনা নাই, সুতরাং উহা সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল না। তাঁহার মতে বর্ত্তমান অমরকণ্টকের নিকটেই রামায়ণ-বর্ণিত রাবণের লঙ্কা ছিল। বি-এন্ রেল কোম্পানীর বিলাসপুর কটনী লাইনের ধারে পেডনারোড নামক এক ষ্টেসন আছে। উহার দশ মাইল দূরে পর্ব্বতশিখরে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা রেওয়া রাজ্যের বণ্ডবগড় পরগণার অন্তর্ভুক্ত। উহাই রাবণের গড় লঙ্কা।

৩। **বৈষ্ণবসর্বস্ব**, জুন, ১৯১৫—

শ্রীসনাতন ধর্ম্ম-মহাসম্মিলন।—এবার কুম্ভমেলার অপূর্ব্ব সুযোগে হরিদ্বারে ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। দরভাঙ্গার মহারাজ সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উক্ত সভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষাপ্রদ ঘটনা এই যে, মিথিলাপতি কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুরকে সিংহাসনে বসিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ইহা ধর্ম্মসভা, মহারাজ দরভাঙ্গা ব্রাহ্মণ; এ সভায় আমি তাঁহার সমান আসনে কিছুতেই বসিতে পারি না। অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নীচে বসিয়া আছেন, এরূপ অবস্থায় আমি সিংহাসনে বসিব, তাহা কখনই হইতে পারে না।" এই বলিয়া জম্বু-কাশ্মীরাধিপতি একজন সাধারণ লোকের ন্যায় সামান্য করাশ্ বিছানায় বসিলেন।

ভারতবর্ষের উত্থান ও পতনের কারণ, এবং পুনরুত্থানের উপায়।—যখন এদেশের পশুপক্ষী বানর পর্য্যন্ত আর্য্য-মহিলার উদ্ধারের জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, তখন এদেশের উত্থানের কোনই সন্দেহের কারণ ছিল না। তখন হইতেই দেশের উন্নতি হইয়া মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। মহর্ষি বাল্মীকি দেশোত্থানের ইতিহাস কাব্যরূপে রচনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পতনের মূল কারণ দ্রৌপদীর অপমান। মহাভারতে বর্ণিত কৌরবদিগের নাশ তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছে মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ সেই নারীনিগ্রহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই এবং এই জন্যই ভারত দিন দিন অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে।

সংসারের সকল প্রকার পাপ ও কষ্ট দূর করিবার সরল উপায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া। ভগবৎপ্রেম দ্বারা ব্রজবাসিগণ ভবসাগর হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, অতএব ভগবদ্ভজন দ্বারাই ভারতবাসী দিগের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণজনিত পাপ নিবারণ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে স্পষ্ট প্রকট হইতেছে যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সম্ভব।

৪। **নবজীবন**, বৈশাখ, সংবৎ ১৯৭২।

পণ্ডরপুর অনাথাশ্রম।—প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক পরলোক-

আশ্রমাগতা বালিকা (নবজীবন)

বাসী রায়বাহাদুর লাল শঙ্কর উমিয়া শঙ্করজী ত্রিবেদী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একদিন পণ্ডরপুরে চন্দ্রভাগা নদীতীরে তীর্থযাত্রীদিগের স্নানদানাদি দেখিতেছিলেন. এমন সময় তিনি একটি সদ্যজাত জীবিতশিশু পথিমধ্যে জনকজননী কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। শিশুটিকে তিনি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ অনাথ শিশু আরো সংগ্রহ করিয়া অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রথমতঃ এই আশ্রমের সমস্ত ব্যয় উক্ত মহাত্মা স্বয়ং বহন করিতেন, পরে বালক দিগের সংখ্যাধিক্য হইলে বন্ধুদিগের নিকট হইতে তিনি সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৬-৭৭ সনের দুর্ভিক্ষের পর আশ্রমে বালকবালিকার সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৮১ সন পর্য্যন্ত 'অনাথ-বালকাশ্রম' ও 'বালহত্যা প্রতিবন্ধক গৃহে'র কার্য্য নির্ব্বাহের ভার এক স্থানীয় কমিটির হাতে ছিল; পরে উহা বোম্বাই 'প্রার্থনাসমাজের' অধীন হয়। স্বর্গীয় শেঠ চতুর্ভুজ মুরার ১১০০০, ব্যয় করিয়া আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আশ্রমে ১৮২৯ জন বালক ও ৯০০ জন বালিকা আশ্রয় পাইয়াছে। এক্ষণ আশ্রমের স্থায়ী কোষে ৪২০০০,

টাকা মজুত আছে, উহার বার্ষিক সুদে ১৩৭১, আয় হয়। আশ্রমের বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৬০০০৻।

স্বর্গীয় শিবচন্দ্র জী ভরতিয়া (নবজীবন)

আশ্রমে প্রতিপালিত একটি বালিকা সব-এসিষ্টেণ্ট-সার্জনের কাজ করিতেছে, দুইজন ট্রেনিং কলেজের পরীক্ষা পাস করিয়া বোম্বাই শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেছে এবং একজন বোম্বাই 'সেবা-সদনের' 'নর্সে'র' কাজ করিতেছে। ৬জন বালক ছুতারের কাজ খুব ভাল শিখিয়াছে, দুইজন দত্তকরূপে গৃহীত হইয়া ২০।২৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী।

বিধবা ও কুমারী জননীরা যাহাতে গুপ্তভাবে আশ্রমে শিশুসন্তান পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, এজন্য বাহিরের দিকে দেওয়ালে এক সিন্ধুক

পরলোকগত রায় দেবীপ্রসাদ

রাখা হইয়াছে তাহাতে কোন শিশু রাখিলেই আপনা আপনি ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। উচ্চনীচ সকল জাতির শিশুই সমাদরে গৃহীত হয়।
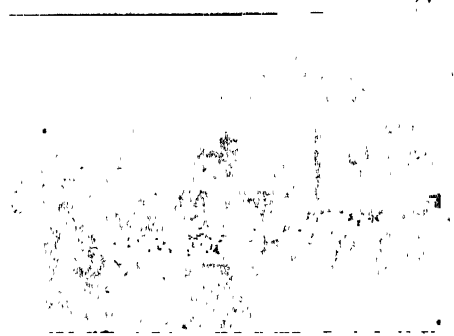
অনাথ-বালিকাশ্রম—পণ্ঢরপুর (নবজীবন)

গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি দূর দূর স্থান হইতেও রমণীরা যাইয়া এই আশ্রমে শিশু দিতেছেন। পশ্চিম-ভারতে পণ্ঢরপুরের 'বালহত্যা-

অনাথ-বালিকাশ্রম সংস্থাপক স্বর্গীয় লালশঙ্কর উমীয়া শঙ্কর জী (নবজীবন)

প্রতিবন্ধক গৃহ' ভ্রূণহত্যার স্রোতঃ রুদ্ধ করিয়াছে।

জগতের সর্ব্বত্রই War-babies !

মৈথিলী

১। মিথিলা-মোদ, চৈত্র, ১৩২২ সাল,—

প্রশ্নোত্তর-মালিকা—

সদা সুজন কর্ত্তব্য কী ? গুরুজন-বচন সুসংগ।
কী অবাচ্য ? নিন্দা পরক, কী থিক ত্যাজ্য ? কুসঙ্গ ॥ ১
কে নর নয়ন বিহীন ? জে নহিঁ দেখথি পরলোক।
কে সুমিত্র ? জে সর্ব্বদা হরথি সকল দুখ শোক ॥ ২
কে জগ বধির কহাবথি ? জে নে সুনথি হিতবাত।
কে রাক্ষস, জে স্বার্থ-হিত করথি পরকে অভিঘাত ॥ ৩
কে সজ্জন ? জে স্বহিত তজি সতত করথি পরকাজ।
কে মধ্যম জন ? স্বহিত কৈ জে সাধথি পর-কাজ ॥ ৪

২। মিথিলা-মোদ, বৈশাখ, ১৩২২ সাল,—

মৈথিলাক্ষরের আন্দোলন।—প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ও তাল-পত্রে লিখিত মৈথিলাক্ষর তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, ইহারা উভয়েই ঠিক একই প্রকার। নেপালদেশে নেবাড় জাতির এক প্রকার নেবাড়ী 'আখর' আছে। তাহাও বাঙ্গালা মৈথিলীর একজাতীয় অক্ষর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। * * পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন বাঙ্গালীরা স্বদেশের উন্নতি-কামনায় দেশকালানুরোধে কতিপয় বিকৃত মৈথিলাক্ষর বাঙ্গালা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

৩। মৈথিলামিহির, ১৭ জুলাই ১৯১৫,—

মৈথিলবিদ্বান্, মঃমঃ পণ্ডিত পক্ষধরমিশ্র।—ইনি সোদরপুরী ভৌরালবংশের শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহাদেব মিশ্রের পুত্র ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম সুমিত্রা দেবী। ইঁহার নিবাস ভটপুরা গ্রামে ছিল এবং ইনি রাজা ভৈরব সিংহের সভাপতি ছিলেন। ইনি ন্যায় এবং কাব্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পক্ষধর মঃ মঃ পণ্ডিত হরিমিশ্রের ছাত্র ছিলেন এবং এক একদিন ১৫ দিনের (এক পক্ষের) পাঠ শিখিতে পারিতেন। এজন্য ইঁহার পক্ষধর নাম সার্থক হইয়াছিল। শাস্ত্রার্থ লইয়া তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে, ইনি দুর্ব্বল পক্ষ গ্রহণ করিয়া
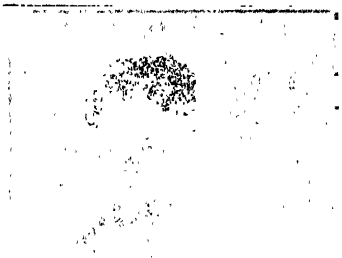
বড়লাট সভার নূতন শিক্ষাসদস্য স্যর শঙ্কর নায়ার (সরস্বতী)

জয়লাভ করিতেন। এজন্যও ইঁহাকে পক্ষধর বলা যাইতে পারে। পক্ষধর ইঁহার গৃহীত নাম; প্রকৃত নাম কি, তাহা জানা যায় নাই। মঃ মঃ গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত 'তত্ত্বচিন্তামণি'র উপর ইনি 'আলোক' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার নামে 'পীযূষবর্দ্ধক' উপাধির যোগ দেখা যায়। ইনি কাব্য ও শৃঙ্গাররসের বিশেষ বেত্তা ছিলেন। ইঁহার রচিত কবিতা অতি সুন্দর হইত। ইঁহার রচিত 'প্রসন্নরাঘব' নামক একখানি নাটিকা আছে। ইঁহার লেখনী-প্রসূত অন্যতম গ্রন্থ 'চন্দ্রালোকের' উপর মঃ মঃ মধুসূদন ঠাকুর, মঃ মঃ রাজা মহেশ ঠাকুর, বৈদ্যনাথ, জয়রাম, ন্যায় পঞ্চানন গোপীনাথ, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ, বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য্য, মথুরানাথ, গদাধর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ টীকা করিয়াছেন। 'চন্দ্রালোকের' ছায়া অবলম্বনে 'কুবলয়ানন্দ' নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মহাত্মা তুলসীদাসও স্থানে স্থানে প্রসন্নরাঘবের

দানবীর স্বর্গীয় মাণিকচন্দ্র হীরাচাঁদ (শ্রীজৈনসিদ্ধান্তভাস্কর)

অনুকরণ করিয়াছেন; ইনি আপন কাব্যে 'চোর', 'ময়ূর', 'ভাস', 'কালিদাস', 'হর্ষ', 'বাণ' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। 'জয়দেব'-রচিত 'রতিমঞ্জরী' নামক এক গ্রন্থ দেখা যায়; ইঁহারও এক নাম জয়দেব ছিল। উক্ত গ্রন্থ কোন্ জয়দেবের, তাহা নিশ্চয় বুঝা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইনি ১৫শ শতাব্দীর লোক। বাঙ্গালী রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের এক ছাত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আসামী

১। বাঁহী (বাঁশী), মে, ১৯১৫,—

অতীতর উকি।—ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন নাম অনেক ছিল। তাহার মধ্যে এই কয়টী প্রধান;—হ্লদিনী, হ্রদ, অন্তঃশীলা, অস্তিবলী, খাটাই, ব্রমিছায়ান ধৌনী, পর্ছিলেছ, ছেরছিলিছ, থামাউন, কামছ, তুত্রেনছ, কয়হতিকা, কর, কায়া এবং ছিয়ামে।

দিহঙের পুরাতন নাম,—হ্রদ লোহিত, দিহিঙর ধনী, হোয়ন হিরীর ছেরা লোহিত ও ছাম।

আসামের পূর্ব্বনাম,—পিটান, কামপীঠ, কাম্পতা, কাঠা হুমত, কড়া, গদা, গড়, উত্তর গড়, উত্তর গোল ও দক্ষিণ গোল।

উৎসাহ

বৃটিশ রাজ্যর হব ধন্য প্রজাগণ,
রাজ্যের মঙ্গল অর্থে খাটা প্রাণপণ,
আজ্ঞানাহি যেই হাথে মঙ্গল রাজ্যের,
হার্থক জীবন তার বাহুবল তার।

* * *

২। বাঁহী (বাঁশী) জুন ১৯১৫, আহার (আষাঢ়), ১৮৩৭,—

পুরণিপাছী মামামরা রুক (শ্রীউৎসবানন্দ গোস্বামী লিখিত)

—আমাদের প্রধান অনিষ্টের কারণ আমাদিগের শিষ্যগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখা এবং সামান্য একটী বালিকার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই মনের মধ্যে আকাশপাতাল ভাব উপস্থিত হওয়া। বিশেষতঃ নিজের সমাজের মধ্যে ঘৃণা, নিন্দা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কদর্য্যভাব থাকা অনুচিত। বৈষ্ণবমার্গে, ভক্তিমার্গে তেমন অস্পৃশ্যভাব থাকা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। সেরূপ ভাব আচার-বিচারহীন, অসভ্য, ধর্ম্মকর্ম্মহীন, ভক্তিমুক্তি-বর্জ্জিত, শরণ-সৎসঙ্গবিহীন পাষণ্ডের থাকিতে পারে। সেরূপ ভাব হইলে

স্বর্গীয় ধন্নুলাল জৈনী য়্যাটর্নী (শ্রীজৈনসিদ্ধান্তভাস্কর)

এই সনাতন হিন্দুসমাজ কিছুতেই টিকিবে না। কারণ এক হিন্দু সমাজের মধ্যেই যদি এরূপ নিন্দনীয় ছুঁতছুঁত 'ঘিন ঘিন' ভাব হয়, এবং একই সমাজের মধ্যে যদি মানুষ মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহা হইলে সেই সভ্য হিন্দুসমাজ আর সমাজ থাকিতে পারে না, অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কুলশীল, গৌরব ক্রমে লুপ্ত হইয়া সমাজবন্ধন বিশৃঙ্খল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমাদের মধ্যে ঘৃণাবিদ্বেষের ভাব বদ্ধমূল হইলে, মানুষে মানুষে শত্রুতার ভাব প্রবল হইবে এবং একতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া তাহার ফলে প্রত্যেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে।

ওড়িয়া

২। উৎকল সাহিত্য, সম্পাদক শ্রীবিশ্বম্ভর কর, কটক, ১৯শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২২,—

(ক) স্বর্গীয় রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুর—জন্ম ৫।৬।১৮৪৫ মৃত্যু ৬।৪।১৮৯৭) একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তীক্ষ্ণমেধা, সুগভীর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও অকুণ্ঠিত শ্রমশীলতাগুণে তিনি সামান্য কেরাণীগিরি হইতে দেশীয় হাকিমির (Statutary Civil Service) শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন এবং দেশী ও বিদেশী সকল শ্রেণীর লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চরিত্রে গাম্ভীর্য্য ও গৌরবের সহিত সৌজন্য, শিষ্টাচার ও সহানুভূতির অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। ক্ষমতার মাদকতা তাঁহার প্রকৃতির মধুরতা আদৌ বিকৃত করিতে পারে নাই। 'উৎকল-ভ্রমণ' প্রণেতা তাঁহার মনোহর কবিতাছন্দে নন্দকিশোরের চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

(খ) সাহিত্য গঠন—উন্নত-সাহিত্য জাতির ভিতরে প্রাণসঞ্চার করে। উন্নত-সাহিত্য-সংগঠন প্রতিভার কার্য্য। প্রতিভা সর্ব্বদা আসে না। সাধারণ সাহিত্যসেবকেরা সাহিত্যের জন্য কি করিতে পারেন? পুষ্টিকর উপায়ে খাদ্য সুলভ না হইলে বিষ প্রদান করিয়া জাতীয় প্রাণ বিনষ্ট করা তাঁহাদের উচিত নহে। সাধারণ শক্তি সাধনাবলে অন্ততঃ চারিখানা প্রতিভার স্থান পূর্ণ করিতে পারে। সাধারণ মানব মণ্ডলী সাধনার হোমকুণ্ড জ্বালিয়া না রাখিলে প্রতিভার আবির্ভাব সম্ভব নহে। প্রতিভা আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে না—সমাজমধ্য হইতে ফুটিয়া উঠে। প্রতিভার বিকাশ সাময়িক হইলেও উহা অনেকদূর পর্য্যন্ত পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। প্রতিভা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে উদিত হয়; অতএব সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে আমাদিগের চলিবে না। জাগ্রত মন, সুচিন্তিত উদ্যম, কঠোর সংযম ও সহিষ্ণুতা বিনা সাহিত্য-সাধন হইবে না। সাহিত্য-সাধনের তিনটী প্রধান অঙ্গ; যথা,—অধ্যয়ন, চিন্তা ও আলোচনা। গ্রন্থাধ্যয়ন, নিজ্জনাচিন্তা এবং সাহিত্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদান প্রদান না হইলে সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইবে না।

স্বর্গীয় রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুর (উৎকল-সাহিত্য)

"কল্যাণী"-শীর্ষক কবিতা ভাবার উজ্জ্বল তরঙ্গে, ভাবের স্নিগ্ধ-প্রগাঢ়তায় বড়ই সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রথ কাব্যতীর্থের "ওড়িয়া ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ও গতি" প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ। ইহা বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে তিনি ওড়িয়া ভাষার জন্মবৃত্তান্ত, সংস্কৃত ও পালির সহিত ইহার সম্বন্ধ,

উড়িষ্যায় বৈষ্ণব প্রভাবের কথা বেশ পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

"সরলা মহাভারতের সমালোচনা" একটি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। লেখক শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা ওড়িয়া সাহিত্য-সমাজে তাঁহার চিন্তাশীলতার জন্ম সুপরিচিত এই প্রবন্ধে তিনি উড়িষ্যার প্রাচীন কবি সরলাদাসের মহাভারতের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন উড়িষ্যার আচার,নীতি, সমাজ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু নূতন কথা কহিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় জৈন বিদ্যাপরিষদের অধিনায়ক
পণ্ডিত অর্জ্জুনলাল শেঠি, বি. এ. (শ্রীজৈনসিদ্ধান্তভাস্কর)

"হাতী" প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হস্তীর উৎপত্তি, স্বভাব, তাহাদের আবদ্ধ করিবার উপায় প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীজলন্ধর দেব "মহাভারত" প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির আলোচনাকালে প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিহাসপ্রিয় পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

"বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্পাদক নানা কথার আলোচনা করিয়াছেন। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি ওড়িয়া মুসলমানগণের অমনোযোগের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ও ওড়িয়া মুসলমানগণকে সাহিত্যসেবী হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

মরাঠী

১। মনোরঞ্জন, জুলাই, ১৯১৫,—

হাস্পাতালীজাহাজ 'লয়াল্‌টী'।—গোয়ালিয়রাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ মাধবরাও সিন্ধে উদ্যোগী হইয়া বিলাতের মহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সাহায্যার্থ 'লয়াল্‌টী' বা রাজ্যনিষ্ঠা নামক একখানি চিকিৎসা-পোত প্রেরণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনিই প্রধান উদ্যোগী এবং প্রথম পথপ্রদর্শক। পূর্ব্বে একবার 'গোয়ালিয়র' নামক জাহাজ পাঠাইয়া তিনি সরকার-বাহাদুরের সাহায্য করিয়াছিলেন। এবার ভারতের প্রায় সমস্ত রাজভক্ত রাজন্যবর্গ 'লয়াল্‌টীর' ব্যয়ভার বহন
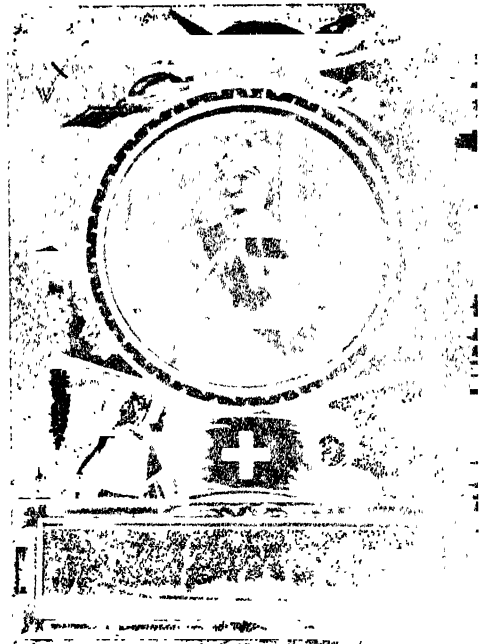
গোয়ালিয়রাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ শ্রী মাধবরাও সিন্ধের
"লয়াল্‌টী"—হাসপাতাল জাহাজ (মনোরঞ্জন)

করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩২টী রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা, গোয়ালিয়র, হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, ত্রাবণকোর জয়পুর, জোধপুর, ইন্দুর, ভোপাল, কোচীন, পাতিয়ালা, কপুরথলা, রামপুর, রেওয়া, পন্না, দতিয়া, ধার, রতলাম, সৈলানা, সিতামহু, দেবাস (সিনিয়র), দেবাস (জুনিয়র) ঝাবুয়া, বরবানী, রাজগড়, বনারস, ধোলপুর, রাজপুর, নরগুন্দ, বরদোয়ান (বর্দ্ধমান), সুকেট, রাঘোগড় ও ঝালোয়ার।

"লয়াল্‌টী"র আর্ত্তসেবিকামণ্ডলী (মনোরঞ্জন)

'লয়াল্‌টীর' কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষদিগের মধ্যে মেজর থোট্‌সন, মেজর টীরেল, মেজর ফ্রাঙ্কলিন ও ক্যাপ্‌টেন কাটক প্রধান। এতদ্ব্যতীত

একজন মিলিটারী এসিঃ সার্জ্জন, একজন মেট্রন বা মুখ্যনর্স, একশত নর্স, দশজন সব এসিঃ সার্জ্জন, দশজন কম্পাউণ্ডার, দশজন ওয়ার্ডের ভৃত্য, ১৫ চৌকীদার ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গ আছে। গত ২৯ নবেম্বর জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে। 'লয়াল্টীর' গতিবিধি ও কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে ক্যাপটেন ফাটকের রিপোর্টের মরাঠী অনুবাদ সবিস্তার এইবার 'মনোরঞ্জনে' প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক ডাঃ টি. কে. লাড্ড্ বি. এ. (ক্যান্ট্যাব্) ইত্যাদি
(শ্রীজৈনসিদ্ধান্তভাস্কর)

কুমারী ভানুমতী রতনলাল।—পশ্চিম ভারতে দিন দিন হিন্দু ললনাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। কুমারী কাশীবাই নবরঙ্গে, ডাঃ কৃষ্ণাবাই কেলবকর, সৌঃ অনুসূয়া বাঈ মত, কুমারী কৃষ্ণাবাঈ ঠাকুর, সোকয়াবাঈ মানকর অহল্যাবাঈ ওারকর, শান্তাবাঈ হেরলকর প্রভৃতি দক্ষিণী মহিলাগণ এম-এ,বি-এ, এম্-এস্ ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ পাশ্চাত্য-শিক্ষার উপাধিলাভ করিয়া-। এবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় একটী রাঠী বালিকা, উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার য়াছেন। ইঁহার নাম কুমারী ভানুমতী রতনলাল। ইনি হাই-র্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ও ল রিপোর্টার শ্রীযুক্ত রতনলাল রণছোড় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১৮৯৯ সনে অহ্মদাবাদে ইঁহার জন্ম য়াছিল।

ধার মহারাণীর শিকার।—প্রাচীন ভারতের বীরাঙ্গনা-নী অনেকেই শুনিয়াছেন। বর্ত্তমান-ভারতের অবলা-নারীজাতির ও সাহসের কথায় কেহ সহজে বিশ্বাস স্থাপন করে না। ধারের াণী, অদ্ভুত সাহস ও শিকার-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া ভারতীয়-রমণীজাতির কলঙ্কমোচন করিয়াছেন। কিছুদিন হইল ধারের মহারাণী চিমণাবাঈ সাহেবা এবং তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সৌঃ সীতারাজাসাহেবা যুগল-ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে সাবন্তোয়াড়ী রাজ্যের রাজকন্যা।

৩। মনোরঞ্জন, আগষ্ট ১৯১৫,—

গত ১০ই ও ১১ই জুলাই পুণানগরীতে মহোৎসাহে বোম্বাই প্রদেশের 'প্রান্তিক পরিষদের' অধিবেশন হইয়াছিল। একনিষ্ঠ রাষ্ট্র-সভাভক্ত মিঃ হোর্মসজী অর্দেসর ওয়াড়িয়া ব্যারিষ্টর, সভাপতির পদে সমাসীন ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ আপটে স্বাগত-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এযাবৎ এই প্রদেশে যে ৯টি প্রান্তিক সভার অধিবেশন হইয়াছে, তাহার ৮টি গুজরাত, মুম্বই, কর্ণাট প্রভৃতি পুনা ব্যতীত অন্যান্য মহারাষ্ট্রে হইয়াছিল; সিন্ধুদেশ করাচীতে ১৮৯৬ সনে একটি অধিবেশন হইয়াছিল। ১৯০৭ সনে সুরতে রাষ্ট্রীয় সভার (Congress) গোলযোগের পর ১৯০৮ সনে এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে, ১৯১১ সনে কলিকাতায়, ১৯১২ সনে বাঁকীপুরে রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্তু সাত বৎসর অন্তর পুনরায় এবার বোম্বাই প্রদেশে প্রান্তিক পরিষদের অধিবেশন হইল। ১৮৯৭ হইতে ১৮৯০ পর্য্যন্ত প্রান্তিক পরিষদের অধিবেশন আদৌ হয় নাই, তৎপর ৪টি অধিবেশন হইবার পর ১৯০৪ হইতে ১৯০৬ পর্য্যন্ত প্রান্তিক অধিবেশন বন্ধ থাকে। ১৯০৭ সনে সুরতে প্রান্তিক পরিষদের অধিবেশন হইয়া পুনরায় সাত বৎসর বিশ্রাম গিয়াছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্ণাট ও সিন্ধু প্রদেশ হ তে
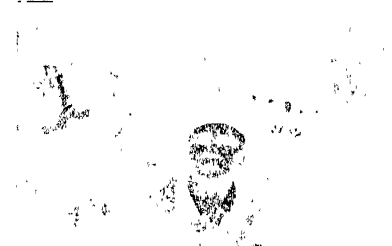
মুম্বই প্রান্তিক সভার সভাপতি এচ্. এ. ওয়াড়িয়া (সুধারক)

প্রায় ৬০ প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাগত[illegible]সংখ্যা প্রায় ১৫০০। শ্রীমতী রমাবাঈ, শ্রীমতী সৌঃ কাশীবাঈ কনি[illegible] শ্রীমতী সৌঃ বিদ্যাগৌরী রমণ ভাঈ বি-এ, শ্রীমতী কুমারী (?) কৃষ্ণাবাঈ ঠাকুর এম-এ

প্রভৃতি প্রায় ১৫০ কিংবা ২০০ মহিলাও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রমাবাঈ সাহেব রণেডে সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেই পরিষদের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশের মাননীয় লাটসাহেব, ভীষ্মপিতামহতুল্য লোকনায়ক দাদাভাই নৌরোজী ও সর ফিরোজসাহ মেহতা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পত্রদ্বারা প্রান্তিক পরিষদের কার্য্যে সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।
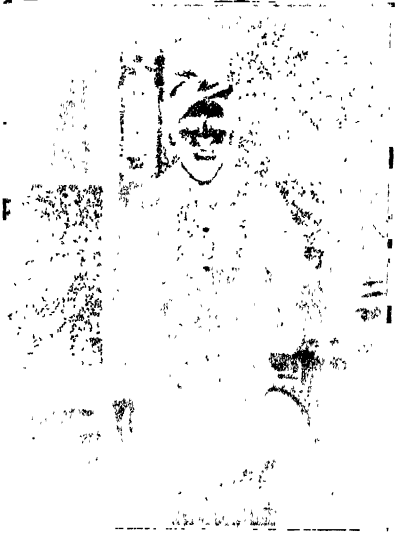
মুম্বই স্বাগত সমিতির সভাপতি রাঃ হরিনারায়ণ আপ্টে (সুধারক)

সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতে রাজভক্ত ভারতবাসীর ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ভারতের কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্পের উন্নতির উপায় বিবেচনা করা হইয়াছিল।

গুজরাতী

গুজরাতী পঞ্চ, ১৮ই জুলাই, ১৯১৫,—

গুজরাত সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে মিঃ প্রীতমরায় ব্রজরায় দেসাই বি-এ, শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, আর্য্যাবর্ত্তে ১০০০করা ৫৯ জন মাত্র শিক্ষিত (literate)। ভারতবর্ষে প্রতি পাঁচ গ্রামে একটী মাত্র পাঠশালা আছে। নিম্নশিক্ষাবিষয়ে ব্রহ্মদেশ সকলের অগ্রণী, প্রতি বৌদ্ধমঠে শিক্ষার ব্যবস্থাই ইহার মুখ্য কারণ। বাঙ্গালাদেশে প্রায় অর্দ্ধেক প্রাইমেরী স্কুল বেসরকারী। শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক অজ্ঞান। ভারতে ১২৮৮৬ কন্যা পাঠশালা আছে, অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৪৫ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয়। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৪০৭৪১৪; তন্মধ্যে [illegible]৫১টি বালিকা ইংরাজী পড়ে, ২৭৯ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষার্থিনী। ২৭৯ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর মধ্যে বাঙ্গালায় [illegible]৮১ এবং বোম্বাই প্রদেশের ৭৬ জন। ভারতে ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ৬৩৭০, অর্থাৎ ৯৯ গ্রামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়। হিন্দুস্থানে কলেজের সংখ্যা ১০৩, তাহার ৫৬টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের. ১৫টি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। সংবাদপত্র ও প্রসিদ্ধ সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যায় গুজরাতী ভাষা দরিদ্র। এক লণ্ডন সহরে ২৫ খানা দৈনিক ও ৪৩খানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সনে জর্ম্মণীতে শিক্ষা ও জন-সাহিত্য ৪৫৮২, অর্থশাস্ত্র ৪১৩১, ধর্ম্মগ্রন্থ ৩২১৫, বেপার ও উদ্যোগ বিষয়ক ২৫১০, বৈদ্যক শাস্ত্র ২০৮২, ইতিহাস ১৯৮১, জীবন চরিত্র ১২৫৪ এবং স্কুলপাঠ্য ৯৮১ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রী

২। বিবিধজ্ঞান জ্ঞানবিস্তার আণি মহারাষ্ট্র সাহিত্য পত্রিকা, মে ১৯১৫,—

গত মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মেলনে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ আহ্বান করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৮ বিষয়ে প্রবন্ধ আসিয়াছিল।

(১) বিষয়—গত ২৫ বৎসরের ঔপন্যাসিক সাহিত্যের গুণ, দোষ ও তাহার উন্নতির উপায়।

প্রবন্ধলেখক – রাঃ নারায়ণকৃষ্ণ বৈদ্য, ইন্দুর।

(২) বিষয়—নাটক সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপন্যাসের প্রমাণ।

প্রবন্ধ-লেখক—রাঃ বাগ্‌ভট নারায়ণ দেশপাণ্ডে বি. এ. প্রভৃতি

(৩) বিষয়—আধুনিক মাসিকপত্র গ্রন্থমালা প্রভৃতিতে যে সকল উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশিত হয় তৎসম্বন্ধে।

প্রবন্ধ লেখক—রাঃ গণেশ ভাস্কর গান বি এ, রত্নাগিরি।

(৪) বিষয়—প্রাচীন ও আধুনিক, সযমক ও নির্য্যমক কবিতা।

প্রবন্ধ লেখক—রাঃ নারায়ণ মহাদেব ভিড়ে, বি-এ প্রভৃতি।

(৫) বিষয়—মাসিকসাহিত্য, তাহার স্বরূপ ও সংশোধনের উপায়।

প্রবন্ধ লেখক—রাঃ নারায়ণ গোবিন্দ চপেকার বি-এ
রাঃ রামকৃষ্ণ দামোদর রমেশ্বর প্রভৃতি

(৬) বিষয়—আধুনিক গল্প, উপন্যাস নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে শৃঙ্গার অথবা অন্য কোন রসের আধিক্য হেতু লোকাভিরুচি বিকৃত হইতেছে কি না?

প্রবন্ধ লেখক—রাঃ অনন্তবামন বর্বে, পুণে।

(৭) বিষয়—গত পাঁচ বৎসরের সাহিত্যের সমগ্র ভাবে অথবা পৃথক্-ভাবে সমালোচনা।

(প্রবন্ধ আসে নাই)

(৮) বিষয়—অর্ব্বাচীন যুগে সমাজের উপর সাহিত্যের পরিণাম। নব্য-সাহিত্যের লক্ষ্য কোন দিকে?

প্রবন্ধ লেখক—ডাঃ রামচন্দ্র শঙ্কর কিবে প্রভৃতি।

(৯) বিষয়—গ্রন্থকার, গ্রন্থপ্রকাশক ও গ্রন্থবিক্রেতা এবং বর্ত্তমান সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সম্পাদকদিগের মধ্যে অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ও পরস্পর সহকারিত্ব কিরূপে স্থাপন করা যাইতে পারে?

(প্রবন্ধ আসে নাই)

(১০) বিষয়—নবীন গ্রন্থকারদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিবার উপায়।

প্রবন্ধলেখক—রাঃ রাঃ হরিরামচন্দ্র পিটকে, প্রভৃতি। নাগপুর

শোক সংবাদ

রায় ৺কালিকাদাস দত্ত, বাহাদুর, সি, আই, ই,

কোম্পানীর আমলের শেষভাগে, ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জুলাই, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মোড়লগ্রামে কালিকাদাসের

রায় ৺কালিকাদাস দত্ত, বাহাদুর, সি, আই, ই,

জন্ম। ইঁহার পিতার নাম রায় ৺গোলোকচন্দ্র দত্ত। ইনি প্রথমে গ্রাম্য-পাঠশালায় এবং পরে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট্ স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া, সেইস্থান হইতেই প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম-স্থান অধিকার করেন এবং পর বৎসর বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১১৮৬৯ সালে ইনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কুচবিহারের নাবালক নরপতি ৺নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অভিভাবকস্বরূপ, তাঁহার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি কুচবেহার-রাজ্যের নব প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সভ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ইনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" এবং ১৯০০ অব্দে সি, আই, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। একাদিক্রমে ৪২ বৎসর তিনি দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং রাজ্যশাসনে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ১৯১১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি কুচবেহারের দেওয়ানী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গত ১৯ এ শ্রাবণ বুধবার কলিকাতাতেই তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্, এখন বোম্বাই-প্রদেশে ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসন্স জজ; কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। ভগবান্ কালিকাদাসের সন্তপ্ত স্বজনগণের সন্তাপহরণ করুন।

৺কুসুমকুমারী দেবী

বঙ্গসাহিত্যসংসারে যশস্বিনী, শক্তিময়ী লেখিকা— "স্নেহলতা"-"প্রেমলতা" প্রভৃতির রচয়িত্রী—আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের গর্ভধারিণী, কুসুমকুমারী দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। সংসারের শতকর্ত্তব্য সাধন করিয়াও, সাহিত্য-সাধনায় এমন প্রতিষ্ঠালাভ করা, বড় সামান্য কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে! মাতৃহারা দেবকুমারকে আমাদের সান্ত্বনা দিবার কিছুই নাই; এমন মাতৃহীন কবি জীবনের প্রতিক্ষণেই তিনি কাতর হইবেন।

৺গোপালচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল্,

১২৫৩—ইংরেজী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই বাঁকুড়া জেলার ইন্দাশ গ্রামে গোলাপচন্দ্রের জন্ম তাঁহার পিতার নাম ৺শম্ভুনাথ সরকার। সংস্কৃত-কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম-স্থান অধিকার করিয়া, তিনি "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন; পরে, প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। অতঃপর তিনি কলিকাতা-হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন, ইনি দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া হিন্দুর দায়ত্ব ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি "সেনেট্ সভার" সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন এবং ১৮৮৮ সালের 'ঠাকুর আইন-অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে গোলাপচন্দ্র আইন-বিভাগের অধ্যক্ষ (Dean of the Faculty of Law) পদে প্রতিষ্ঠিত, হন; এবং ১৯১২ সালে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত "ল কলেজে"র অধ্যাপক মনোনীত হয়েন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। গত ২৪এ আগষ্ট—মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৯—৩৫ মিনিটের সময় কলিকাতায় শাঁখারিটোলা ঈষ্ট্-লেনস্থ বাসভবনে তাঁহার দেহান্তর ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্ষমেন্দ্রনাথ সরকার, এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়, স্বজনের সহিত গভীর সমানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

৺গোপালচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী, এম, এ বি, এল

৺রাজচন্দ্র চন্দ্র, এম্, এ, (য়্যাটর্ণী)

রাজচন্দ্র, স্বনামধন্য য়্যাটর্ণি স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮৬৯ সালের ৯ই মে কলিকাতা সহরেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রাথমিক-শিক্ষা একটি পাঠশালায়; পরে, তিনি হিন্দুস্কুলে প্রবেশ করেন, এবং, তথা হইতেই, ১৮৮৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। অনন্তর, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন এবং, ১৮৮৯ এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া, এবং ১৮৯৪ সালে য়্যাটর্ণিগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পিতার আফিশের অংশীরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৯৪ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বাচিত কমিশনররূপে মিউনিসিপালিটির সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তিনি সেই "সাবাশ আঠাশে"র একজন! মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতার "ডেপুটী শেরিফ্", এবং "আইজ্ কোর্টে"র "মার্শল্" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পুস্তক-পরিচয়

হোমিওপ্যাথিক মতে 'গৃহচিকিৎসা'

[ডাক্তার শ্রীঅমৃতলাল সরকার, এল্. এম্. এস্, এফ্. সি এস্ প্রণীত ;
—মূল্য বার আনা।]

স্বনাম-খ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার মহাশয় বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত এবং তিনি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক। তাঁহার প্রণীত এই পুস্তকখানি যে ভাল হইয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। আজকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দিন দিন চারিদিকে প্রচারিত হইতেছে। তৎসঙ্গে অনেকগুলি ভাল ভাল পুস্তকও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া চিকিৎসার সুবিধা হইতেছে; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার মহাশয়ের পুস্তকখানি তাহাদিগের অন্যতম। গৃহস্থের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপকারে আসিবে, আশা করা যায়। পুস্তকের গুণের হিসাবে ইহার মূল্য অতি অল্পই হইয়াছে; সকলেই বার আনা পয়সা দিয়া এই পুস্তকখানি ঘরে রাখিতে পারিবেন।

শ্রীভগবৎকথা

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এ তত্ত্বনিধি-প্রণীত ;
—মূল্য আট আনা মাত্র।]

অতি সহজ ভাষায় এবং সহজভাবে ভগবানের কথা বালকদিগকে বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর জানছেন, ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বর আনন্দময়, ঈশ্বর অমৃত, ঈশ্বর শান্ত ও মঙ্গল, এবং ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এই সাতটী কথা বিবৃত হইয়াছে, অর্থাৎ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবং অদ্বৈতং' এই কথাকয়টিই বুঝান হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি; বালক-বালিকাদিগকে এই ভাবে ভগবানের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা যে, প্রত্যেক পিতামাতারই অবশ্য কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সপ্তস্বরা

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত,—মূল্য এক টাকা।]

এখানি যে কবিতা-পুস্তক, তাহা নাম পড়িয়াই সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই সংগ্রহের অনেকগুলি কবিতা ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি নূতন। কবি বসন্তকুমারের কবিতা এখন নানা মাসিক-পত্রেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, অনেকেই তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে ভালবাসেন। সপ্তস্বরাতে যে সমস্ত কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই যে সুপাঠ্য ও উচ্চ-অঙ্গের হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না; তবে পল্লীসপ্তক, পুষ্পসপ্তক ও নারীসপ্তকের অনেকগুলি কবিতাই যে পাঠকগণের ভাল লাগিবে, এ কথা আমরা বলিতে পারি। এই পুস্তকে কয়েকখানি সুন্দর ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে; ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি পরিপাটী, উপহার দিবার উপযুক্ত।

ভারতেশ্বরী ও ভারত সম্রাট্

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত,—মূল্য একটাকা মাত্র।]

এই পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে। অল্পের মধ্যে ভারতেশ্বরী ও সম্রাটের জীবনের কথা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু সুন্দরভাবে গোছাইয়া বলিয়াছেন। রাজভক্ত ভারতবাসীর গৃহে গৃহে এই পুস্তকখানি থাকা বাঞ্ছনীয়। যতীন্দ্র বাবু সুলেখক, তিনি এই পুস্তকে যথেষ্ট লিপিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে ত্রিবর্ণ ও দ্বিবর্ণের চারখানি এবং একবর্ণের পঁচিশখানি চিত্র আছে। প্রথমেই ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও ভারত-সম্রাজ্ঞী মেরীর যে যুগলচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানির বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।

বারুণী

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম. এ., বি., এল., সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ-প্রণীত,—মূল্য একটাকা মাত্র।]

ইহা একখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ পুস্তক। লেখক মহাশয় বিভিন্ন সময়ে নানা মাসিক-পত্রে যে সমস্ত গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গল্পগুলি যখন পত্রান্তিতে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা ইহার প্রশংসা করিয়াছি। ইহাতে এগারটি গল্প দেওয়া হইয়াছে। আমরা সবগুলি গল্পই পাঠ করিয়াছি এবং শরৎ বাবু যে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি, তাহা প্রত্যেক গল্প পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। শরৎ বাবুর লেখনী সকল

বিষয়েই পরিচালিত হইয়া থাকে এবং তিনি সংস্কৃত কাব্য নাটক ও দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন, গল্প-লেখকের ক্ষেত্রেও তাঁহার যশঃ অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই অতি সুন্দর।

গৃহস্থালী

[৺ বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-প্রণীত ;—মূল্য একটাকা মাত্র।]

'পাক-প্রণালী' 'শুভ বিবাহ তত্ত্ব' 'যুবক যুবতী' 'জননী জীবন' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পরলোকগত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সর্ব্বজন-পরিচিত। তাঁহার রচিত শেষ পুস্তক এই 'গৃহস্থালী'। পুস্তকখানি তিনিই প্রেসে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর পুস্তক-প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। এই পুস্তকখানি গৃহস্থের পক্ষে নূতন-পঞ্জিকাস্বরূপ; প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে ইহা একখানি করিয়া থাকা উচিত। পারিবারিক ব্যবহার, একান্নবর্ত্তী পরিবার, সূতিকাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানশয্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক গৃহস্থের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এই পুস্তকে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গো-প্রতিপালন গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য; তাহারও কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এমন কি মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা ঔষধের কথা এই পুস্তকে দিতে গ্রন্থকার বিস্মৃত হন নাই। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি; এবং যখন দেখিব এই পুস্তকখানি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে, তখন অধিকতর প্রীতিলাভ করিব।

চিন্তা লহরী

[শ্রীনিবারণচন্দ্রদাশ গুপ্ত, এম. এ., টি. এল-প্রণীত মূল্য এক টাকা মাত্র।]

ইহা একখানি প্রবন্ধ পুস্তক। সরল ভাষায় দর্শন ও মনো-বিজ্ঞানের কতকগুলি কথা ও সূত্র পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করাই এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য। ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ যখন নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই লেখকের পাণ্ডিত্য ও লিপিকুশলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। দর্শন ও মনো-বিজ্ঞানের কঠিন ও জটিল তত্ত্বসকল নিবারণবাবু অতি সরল ও প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে পরলোক, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সৌন্দর্য্য ও তাহার প্রকৃতি, সুখ, অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার, স্মৃতি, স্বপ্নতত্ত্ব প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-শীর্ষক প্রবন্ধটি অতি সুন্দর; নিবারণবাবু বিশেষ নিপুণতার সহিত সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার প্রবন্ধে বিশেষ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সন্দর্ভে সত্য সত্যই বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমরা এই সুন্দর পুস্তকখানির সামান্য পরিচয় মাত্র দিলাম; বঙ্গীয়-পাঠকগণ নিশ্চয়ই এমন সারবান পুস্তকের রসাস্বাদনে বিরত হইবেন না।

মানব-সমাজ

[শ্রীশশধর রায় এম. এ., বি. এল. প্রণীত; মূল্য একটাকা মাত্র।]

বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত শশধর বাবুর নাম বিশেষভাবে পরিচিত। এই সমাজ তত্ত্ব লেখক প্রথমে কবিভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; তাঁহার লিখিত 'ত্রিদিববিজয়' কাব্য সে সময় যথেষ্ট প্রশংসালাভ করিয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরেই সমাজতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত উপাদেয় প্রবন্ধাবলি নানা মাসিক পত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে থাকে। এখন সকলেই উক্ত বিষয়ে শশধর-বাবুকে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন, তাহারই কয়েকটি এই 'মানব সমাজ'-নামক পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে ইহা বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কার। সমাজতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেই পুস্তক লিখিয়াছেন; এই 'মানবসমাজ' ব্যতীত এই বিষয়ের পুস্তক বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় দুইতিনখানির অধিক নাই।

মাসপঞ্জী

(আষাঢ়)—১৩২২

১লা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেসন পরীক্ষার ফলপ্রকাশ।—বেহারের ছোটলাট সাহেব 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে'র 'মেম্বর' এবং তাঁহার পদে স্যর এফ্ গেট সাহেবের নিয়োগ।

২রা—বরিশালে এক 'স্পেশ্যাল্ ট্রাইবুনালে'র অধিবেশন।—চট্টগ্রাম 'মিউনিসিপ্যাল স্কুল' ও 'যাত্রামোহন ইনষ্টিটিউটের' প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাচরণ সেনের মৃত্যু।

৩রা—'ওয়াটারলু' ডে উৎসব।

৪ঠা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্ সী. পরীক্ষার ফলপ্রকাশ।—বরিশাল সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ-অধিবেশন।

৫ই—বড়লাট মহোদয়ের জন্মোৎসব।—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।—কলিকাতা, ২২ নং ওয়ার্ডের ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর, বেনেপুকুরের তারাপদ দাসের মৃত্যু।

৬ই—বিদ্রোহের অপরাধে ডি ওয়েট্ অভিযুক্ত; দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ছয় বৎসরের জন্য কারাবাস এবং ২০০০ পৌণ্ড অর্থদণ্ডে দণ্ডিত।

৭ই—মহীশূরে এক "ইকনমিক্ কনফারেন্সে"র অধিবেশন।

৮ই "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সহকারী-সম্পাদক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।—দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান্ মিঃ এফ. এ. মেলরের মৃত্যু।—'কমন্স মহাসভায়' 'মিউনিসনস বিল' পেশ।

৯ই—সিমলায় 'সেণ্ট জন এম্বুল্যান্স এসোসিয়েসনে'র বার্ষিক অধিবেশন; —মাননীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ সভাপতি।

১০ই—যশোহরের সর্ব্বজনপ্রিয় উকীল প্রসন্নগোপাল রায়, বি এল্-এর মৃত্যু।

১১ই—'বেঙ্গল এম্বুল্যান্স কোরে'র কার্য্যস্থলোদ্দেশে যাত্রা।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার ফলপ্রকাশ।—ফরিদপুরের স্বনামধন্য "দাতা কালীকুমারে"র পুত্র তারকচন্দ্র দাসের মৃত্যু।

১২ই—"ইণ্ডিয়ান্ এক্সপিডিশনারী ফোর্স" পারস্য উপসাগরে কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ।—বিখ্যাত সঙ্গীত-বিশারদ অন্ধ শরচ্চন্দ্র বসুর মৃত্যু।—ভদ্রকে "ওড়িয়া পিপলস্ এসোসিয়েসনে"র বার্ষিক অধিবেশন।—লাহোরে "পঞ্জাব হিন্দু কন্ফারেন্সে"র অধিবেশন।—'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে'র দশম বার্ষিক অধিবেশন।

১৩ই—মহীশূরে "লোকাল বোর্ডস্ ও মিউনিসিপ্যাল কন্ফারেন্সে"র অধিবেশন;—দেওয়ান বাহাদুর পি. চেটী সভাপতি।—হুগলীর সেসন জজ বরদাচরণ মিত্রের মৃত্যু।—লণ্ডনের 'ডেলী মিরর'-সম্পাদক মিঃ এ. কিলি-এসীর মৃত্যু।—রুসীয়ান্ "ওয়ার মিনিষ্টারে"র পদত্যাগ।—মহীশূরের "লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে" বজেট্ পেশ।—কলিকাতায়, তন্ত্রাচার্য্য ৺ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের স্মৃতি-সভা।

১৪ই—সাউথ আর্কটের জজ মিঃ এ সি দত্তের মৃত্যুসংবাদ প্রচার।—কলিকাতায় মাইকেল মধুসূদনের দ্বিচত্বারিংশ এবং মেদিনীপুরেও একটি স্মৃতি-সভার অধিবেশন।—বিলাতে "কমন্স মহাসভা"য় "ন্যাসনাল রেজিষ্টরি বিল্" পেশ।—বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ ভিক্টর ট্রম্পরের মৃত্যু।

১৫ই—মিঃ ওডলোভ্যান্ রোসার মৃত্যু।—কানপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্চেয়ারম্যান প্রসিদ্ধ উকীল রায় দেবীপ্রসাদের মৃত্যু।—শিমলায় এক "রেলওয়ে কন্ফারেন্সের" অধিবেশন;—স্যর এ আর্ল সভাপতি।

১৬ই—লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়ান্ টী এসোসিয়েসনে'র বার্ষিক অধিবেশন;—মিঃ জে. ওয়ারেণ সভাপতি।—"ন্যাসান্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনে"র পরীক্ষার ফলপ্রকাশ।—রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের স্মৃতিসভা।—মাননীয় মিঃ গুলে সভাপতি।—"বোম্বাই কর্পোরেশনে"র জুবিলী।

১৭ই—বগুড়ার নবাব আব্দুল সোভান চৌধুরীর মৃত্যু।—চুঁচুড়ার ডাক্তার হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।—বিলাতে "মিউনিসনস্ বিল" পাস।

১৮ই—মেক্সিকোর ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ ডিয়াজের মৃত্যু।

১৯এ—কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী রাজচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু।—মেদিনীপুরে মিঃ টম্সনের সভাপতিত্বে "মেদিনীপুর কো-অপরেটীভ্ ব্যাঙ্কে"র বার্ষিক অধিবেশন।

২০এ—লর্ড কার্মাইকেল মহোদয় কর্তৃক কলিকাতা "ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে"র নবগৃহের ভিত্তিস্থাপন। কমন্স মহাসভায় 'ন্যাসন্যাল রেজিষ্টার বিল' পাস।

২১এ—অতঃপর যাবতীয় কাউন্সিলের সভ্যনির্ব্বাচন এপ্রেল মাসে হইবে—এই সংবাদ প্রকাশ।—পুনায় "ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল্ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্" স্থাপন।—স্যর থিওডোর হোপের মৃত্যু।

২২এ—পি. ডব্লিউ ডি. ৪র্থ গ্রেড্ 'একাউণ্ট্যাণ্টসিপ' পরীক্ষার ফল।

২৩এ—মালদহের শিমুলতলা-নিবাসী অধ্যাপক গৌরগোপাল সাংখ্য-ব্যাকরণ-তীর্থের মৃত্যু।—মিঃ জি. আর. লাউনডসের, স্যর আলি ইমামের স্থলে 'ল-মেম্বর' নিযুক্ত হইবার সংবাদপ্রচার।—গৌহাটীতে একটি 'ল'-কলেজ' স্থাপন।—বর্দ্ধমানের কাজীপাড়া-নিবাসী মৌলবী আব্দুল মজিদ সাহেবের ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ।

২৮এ—ইজিপ্টের সুলতানের উপর কোন অজ্ঞাতব্যক্তি কর্তৃক বোমা নিক্ষেপ; সুলতান অনাহত।—ময়মনসিংহ-বার্‌কারের উকীল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

২এ—পুনায় "বোম্বায়ের প্রাদেশিক কনফারেন্সে"র অধিবেশন;—মিঃ এচ. এ. ওয়াডিয়া সভাপতি।—রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, "হ্যামবার্গ-আমেরিকা লাইন" দেউলিয়া হইয়াছে।—জর্ম্মণ সাউথ্ ওয়েষ্ট আফ্রিকার গভর্ণর ডাক্তার সিজ ধৃত; উক্ত রাজ্যের যাবতীয় জর্ম্মণ সৈন্যের ইংরাজ-হস্তে আত্মসমর্পণ।

৬এ—কোইম্বাটোরে এক "কৃষি কন্‌ফারেন্সে"র অধিবেশন;—মাননীয় মিঃ ই. এফ বার্ব্বার সভাপতি।—টেনাভেলিতে এক "রায়ৎ কন্‌ফারেন্সে"র অধিবেশন;—মিঃ আর ভি. শাস্ত্রী সভাপতি।

১২এ—সাউথ্ ওয়েষ্ট আফ্রিকার জর্ম্মণ সৈন্যগণ ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করার সংবাদ-প্রাপ্তিতে ভারতবর্ষের নানাস্থানে আনন্দপ্রকাশ।

২৮এ—বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মেঃ বি. সেনের অগ্রজ, মেদিনীপুরের উকীল বিহারী দত্তের মৃত্যু।—মেজর জেনারেল স্যর এম. টি. ওলেহীর মৃত্যু।

২৯এ—"জুনিয়র" ও "সিনিয়র" স্কলারশিপে"র তালিকা-প্রকাশ।—ফরাসীয়ানের জাতীয় "কেত ডেন্ন" উৎসব।

৩০এ—মাননীয় কাপ্তান ডব্ল. এল. গ্রাণ্টামির মৃত্যু;—তদুপলক্ষে বোম্বায়ের যাবতীয় সওদাগরী আফিস বন্ধ হয়।—"ন্যাসন্যাল রেজিষ্টার বিল" পাস।

৩১এ—ভারত-গভর্ণমেন্টের নূতন চারি কোটী টাকা ঋণের "প্রসপেক্টস্" প্রচার।—স্যর জর্জ্জ বার্নিস্ ভারত-গভর্ণমেন্টের নূতন "কমার্শ মেম্বর" নিয়োগ-সংবাদ প্রচার।—মিঃ এল. স্যাণ্ডারসন্ কলিকাতা হাই কোর্টের প্রধান জজ নিয়োগ-সংবাদ প্রচার।—কলিকাতা "অনাথ আশ্রমে"র ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "চিকিৎসা-সঙ্কট" প্রকাশিত হইল; মূল্য ৸৹ আনা।

"মনোমোহন থিয়েটারে" অভিনীত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত, "রূপের ফাঁদ" প্রকাশিত হইল; মূল্য।৹ আনা।

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত নূতন উপন্যাস "ক'নেমা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।৹ আনা।

সুবিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেতার শিক্ষা" তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র আঢ্য প্রণীত "জ্যোতির্ম্ময়" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'পসরা' নামক গল্পপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

"বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" প্রভৃতি-প্রণেতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুহরায় রচিত "ব্যাঙ্গের আত্মকথা" নামক রঙ্গরসপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸৹ আনা।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নূতন উপাখ্যান "জ্যোতিঃহারা" প্রকাশিত হইল,—মূল্য ১।৹ টাকা। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "পোষ্যপুত্রে"র সংস্করণ বাহির হইয়াছে; মূল্য ১৷৹ টাকা।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু-কর্ত্তৃক সম্পাদিত সর্ব্বজনপ্রিয় "ধর্ম্মপদ গ্রন্থে"র, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত, তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে; আগামী পূজাবকাশের পরেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ আগামী পূজার সময় হইতে 'আটআনা সংস্করণ' নাম দিয়া ক্রমান্বয়ে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিলাতে যে প্রকার "ছয়পেন্স," "সাতপেন্স," "আটপেন্স" মূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তকাবলি প্রকাশিত হইতেছে; এদেশে ঐ প্রকার পুস্তক প্রকাশের এই সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা। কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই, ছবি প্রভৃতি বিষয়ে এই সংস্করণের পুস্তকগুলি সর্ব্বাংশে বিলাতী পুস্তকেরই অনুরূপ হইবে। অথচ আকারে ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোলপেজী প্রায় ২০ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ন্যূনাধিক তিন শত পৃষ্ঠা পূর্ণ পাঠ্য বিষয় থাকিবে। এই 'আটআনা সংস্করণে' সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন, স্মৃতি, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই পুস্তক প্রকাশিত হইবে। প্রথম পুস্তক শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত 'অভাগী' নামক নূতন গার্হস্থ্য উপন্যাস। এখানি যন্ত্রস্থ; পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

পাশ্চাত্য প্রদেশাদিতে প্রথিতযশা জনপ্রিয় গ্রন্থকারদিগের পুস্তকাবলীর বিবিধসংস্করণ প্রচারিত হয়; যাঁহার যেরূপ রুচি, অর্থসামর্থ্য ও প্রয়োজন, তিনি সেই সংস্করণ ক্রয় করেন। আমাদের দেশে একই পুস্তকের এরূপ নানাসংস্করণের প্রচার বড় একটা নাই। সেই অভাব পূরণ কল্পে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় গ্রন্থের মনোমদ "রাজসংস্করণ" প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। বলাবাহুল্য, ছাপা, বাঁধাই সাজসজ্জা প্রভৃতি সর্ব্ববিধানে এই সংস্করণের পুস্তকগুলি রাজোপযোগীই হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street; CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
[illegible], Street, Calcutta.

বন্দী সাহজাহান

শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ]

"পুত্র রহে পুত্রসম, না করে সে যতকাল কলত্র গ্রহণ ;
কিন্তু তনয়া রহে তনয়ার(ই) মত—তার সারা জীবন।"

কার্ত্তিক, ১৩২২

প্রথম খণ্ড] তৃতীয় বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

মাতৃ-মিলন

[শ্রীমতী মানকুমারী দাসী]

১

আঁধার নয়ন, মলিন বদন,
ছিন্নবাসে ঢাকা ক্ষীণাঙ্গখানি,
ধনীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে বালক,
"মা এসেছে দেশে"—শুনেছে বাণী।

২

"কই মা কোথা মা?" আর যে পারে না—
আকুল আগ্রহ পরাণে তার,
মা'র মুখ সে যে দেখেনি জীবনে—
আজি মিটাইবে পিপাসা ভার।

৩

সে যে অনাদৃত, চির-উপেক্ষিত,
তবু বুকে সাধ উঠিছে ফুটি;
তৃষিত নয়নে খুঁজিছে সঘনে—
মা'র কাছে যাবে কেমনে ছুটি।

৪

দ্বারে দ্বারবান্, শিরে শিরস্ত্রাণ,
করে বেত্র, মুখে কঠোর ভাষা ;
রুক্ষ মুখ চাহি ভরসা যে নাহি—
পূরাও, মা, আজি শিশুর আশা !

৫

"ভাগ—ভাগ"—ভাষে তাড়াইতে আসে,
যতই বালক পশিতে চায় ;
দু নয়নে জল করে ছল ছল—
"মা ! আমার কাছে আপনি আয় !"

৬

"আমি যে, জননি, কখন দেখিনি,
মায়ের করুণা, মমতা, হাসি ;
জনমের মত ঘৃণা-অবহেলা,
বুকে হ'য়ে আছে আগুনরাশি !

৭

"আজি পদতলে নয়নের জলে,
সকল অনল যাবে যে নিবে—
মা' যে কিবা ধন দেখিব নয়নে !—
কিন্তু বেটা কেন যেতে না দিবে ?"

৮

সে আপনাহারা, আঁখিযুগ-ধারা
কপোলে পড়িল ; অমনি সেথা
দূত আসি কহে—"ছাড় দ্বার দ্বারি,
প্রবেশ-নিষেধ আজি না' হেথা ।"

৯

ছুটিল বালক—শরীরে পুলক,
বৎস যথা ছোটে গাভীর পানে
"এই যে মা তবে ডেকেছে আমারে,
আমার মিনতি শুনেছে কাণে !"

১০

নিরখে অমনি জগৎ-জননী
সে চণ্ডীমণ্ডপ করেছে আলো,
লক্ষ্মী-সরস্বতী গুহ-গণপতি
মা'র পাশে আছে কেমন ভাল !

১১

দেখে, ত্রিনয়নে করুণামাখান ;
রাজ-রাজেশ্বরী মহিমা-মাখা,
দেখিলে হৃদয় কি জানি কি হয়,
চরণে না লুটি' যায় না থাকা !

১২

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া,
কহিল সে শুধু একটি কথা—
"তুই মা, যদি—মা ! আমার জননী,
মোর কেন তবে এমন ব্যথা ?"

১৩

নীরবে শুনিলা ধনীর গৃহিণী,
সে দীন বালকে লইলা টানি,
রাজভোগ কত খেতে দিয়া তারে,
নূতন বসন দিলেন আনি ।

১৪

কহিলা সাদরে—"তোর মা' যে আমি,
আজি থেকে বাছা থাক' এ ঘরে ।"
হাসে দয়াময়ী, দুর্গতিনাশিনী,
রাঙা পা' রাখিয়া অসুর 'পরে !

১৫

মুছিয়া নয়ন কহিল বালক—
"মোটেই আমার মা' নাই ভবে,
এক মা দেখিনু, দুই মা লভিনু ;—
'হতভাগা' আর কে মোরে ক'বে ?"

আমার দুর্গোৎসব

[শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আমি তখন সুদূর ওয়াল্টেয়ারে সুদীর্ঘ প্রবাস যাপন করিতেছি।—যাহার নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দেশত্যাগী হইয়া ওয়াল্টেয়ারবাসিনী হইয়াছিলাম, সে আমার অঙ্কশূন্য করিয়া, আজ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে; কিন্তু তখন যে আশা-পোষণ করিয়া গিয়াছিলাম, উদারহৃদয় সিন্ধু তাহাতে নিরাশ করে নাই। ভিষক্-শ্রেষ্ঠ সমুদ্রের শান্তিময় স্পর্শে, তখন, তিলে তিলে আরম্ভ করিয়া, তাহার পূর্ব্বস্বাস্থ্য আবার অক্ষুণ্ণ-ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু, সমুদ্রের তীরজাত স্মৃতি চিহ্ন—প্রবাল-অনুরূপ—দুটি নাতি-নাতিনীও লাভ করিয়াছি। সেখানকার অধিবাসীদিগের গুণে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, সেই সমুদ্রতীরেই আবাস স্থাপন করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইবার জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত। সারদার আগমন সূচিতকারিণী সোণামুখী শরৎ আসিয়াছে; সেই স্বর্ণাভ রৌদ্রে চারিদিক্ যেন হাসিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। আজ, এই প্রবাসে বসিয়া, সোণার শরতে জন্মভূমির সেই উজ্জ্বল পুরাণ চিত্র বড়ই মনে পড়িতেছে;—সেই পল্লীপথের ধারে ধারে শুভ্রকাশের চামরবীজন সেই কমল-কহ্লারাচ্ছন্ন দীর্ঘিকা, সেই হংস-কারণ্ডবকুলের কলরব, সেই পূজার আনন্দে মাতোয়ারা পল্লী, সেই সুপরিচিত আগমনী সঙ্গীত—

> "যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
> উমা নাকি বড় কেঁদেছে।"—

সহসা বলিয়া উঠিলাম—"আজ সেখানে কত ধূম!" অমনি সরু সরু মিহিকণ্ঠে উত্থিত হইল—"কোথায় ঠাকুমা—কোথায় ঠাকুমা?—কিসের ধূম ঠাকুমা?—বল না ঠাকুমা!" পার্শ্বেই ছোট ছোট নাতিনাতিনীগুলি বসিয়া আমার সহিত সমুদ্রের ভীমকান্ত মূর্ত্তিদর্শনে নিমগ্ন ছিল, তাহাদেরই কণ্ঠে ঐ ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। এই অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ—এই ভৈরব গর্জ্জন—এই অনুপমেয় নি-সর্গ সৌন্দর্য্য-সমাবেশে যদিও এখানে মনে হয় যেন নিত্যই দুর্গোৎসব, তবুও "জন্মবিটপীমূল-ক্রোড়ে মন ধাবতি"—সে ত আর ভুলিবার নহে। বলিলাম—"কিসের ধূম, জান না? পরশু যে দুর্গাপূজা।" তাহারা বলিল—"দুর্গা-পূজা কেমন ঠাকুমা?—আমরা ত কই দেখিনি!" আমার চমক ভাঙ্গিল; ভাবিয়া দেখিলাম—সত্যই ত। আমরা যখন এখানে আসি, তখন উহারা নিতান্ত শিশু; তারপর, প্রায় তিন বৎসর হইল এখানে আসিয়াছি!

এখানে—অর্থাৎ এদেশেও দুর্গাপূজা হয়; কিন্তু সে অদ্ভুত রকমে! প্রতিমা দালানে বসাইয়া, তিনদিনব্যাপী পূজাদির পর, আমাদের মত প্রতিমার বিসর্জ্জনাদি নাই; ঠাকুরও আমাদের দেশের মত নয়!—পথে পথে বাজনা বাজাইয়া, ঠাকুর নাচাইয়া নাচাইয়া, লইয়া বেড়ায়; পরে, ঘরে তুলিয়া রাখিয়া দেয়; বৎসরান্তে সংস্কার করিয়া আবার বাহির করে। এখানকার লোকগুলা রংমাখিয়া বাঘ সাজিতে খুব ভাল বাসে; লাঠি খেলাও চলে;—এ সমস্তই পথে পথে, বা কখনও কখনও বারোয়ারীর মত, মণ্ডপ করিয়া, তাহাতে সম্পন্ন হয়।

তারপর, পৌত্র-পৌত্রীগণের হুকুম হইল—"ঠাকুমা,

দুর্গাপূজা কর, আমরা দেখ্‌ব।" আমি বলিলাম—"তবে তথাস্তু।"

আজ পঞ্চমী। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চাতালের কোণেই বারান্দা—সেইখানে আসিয়া বসিলাম।—কি উপায়ে এখন রাতারাতি দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়! মনে হইল, পূজা ত ঘটে-পটেও হয়; তবে ভাবনা কিসের! বলিলাম—"পাঁজি খানা কেউ আন্‌তে পার?" অমনি—"আমি পারি—আমি পারি" রব উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকাও সশরীরে উপস্থিত হইলেন। এই বার প্রতিমা-অঙ্কনের পালা। কার্ডবোর্ড কাটিয়া আকার ও কাঠাম স্থির হইল; পঞ্জিকা সম্মুখে রাখিয়া, তুলি-রং প্রভৃতি লইয়া, প্রতিমা অঙ্কনে নিযুক্ত হইলাম। ক্রমে মহামায়া যেমন বর্ণের জালের মধ্যে ধরা পড়িয়া—একটু একটু করিয়া—সেই চিরপরিচিত ভক্তবাঞ্ছার মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়া—প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, তখন বধূঠাকুরাণীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিলেন—"বাঃ! এ ত চমৎকার হয়েছে!—তা, মা, আজ কি খাবেন-দাবেন না?" আমি বলিলাম—"কবার খাব?" তখন হাসির একটা মহারোল পড়িয়া গেল; কারণ, আমি চিত্রাঙ্কনে এমনি বিভোর হইয়া গিয়াছিলাম যে, বারংবার ডাকাডাকিসত্ত্বেও, আহার করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায় এবং চিত্রও সম্পূর্ণপ্রায়।

আজ ষষ্ঠী। প্রত্যূষে উঠিয়াই "বাণ্ডী স্লাটি"তে বলিলাম, অর্থাৎ, এখানকার ভাষায়, গাড়ী-যুতিতে বলিলাম। অবিলম্বে মালেয়া কোচ্‌ম্যান গাড়ী তৈয়ার করিয়া আনিল। বলিলাম, "পট্টম চল বেগী বেগী পো"—অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র যাও। 'বিশাখা পত্তন' হইতে 'ভিজিগাপট্টন'—'ভাইজাগ-পট্টম'—ও অবশেষে 'পাটনা' পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে; কালে আরও কি দাঁড়ায়—বলা যায় না! বাজার, হাট, জনপদ, আফিস, স্কুল, ধর্ম্ম-শালা, বোর্ডিং, হাসপাতাল, পোষ্টাফিস প্রভৃতি সবই এই ভাইজাগের ভিতর; এখানে না গেলে, কিছুই মিলে না। আমাদের বাংলোখানি একেবারে সমুদ্রের উপর। এ জায়গাটাকে 'অপ্‌ল্যাণ্ড' বলে, এবং পাটনা এখান থেকে এক ক্রোশের উপর। আমরা যেখানে আছি—এখানে উদয় অস্ত কেবল নব নব শোভার পটপরিবর্ত্তন, ঝুরঝুরে বালি, ও তাহার উপর কড়ি-শামুক-ঝিনুক, লোহিতাভ কর্ক্কটিকা, আর এলো-মেলো হাওয়া, ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না! তাই, পূজার আয়োজনের দ্রব্যসম্ভারের জন্য সওদা করিতে ভাইজাগ্ যাইতে হইল। প্রতিমার সাজের জন্য রঙ্গিন কাপড়ের টুকুরা, জরী প্রভৃতি লইয়া, বাড়ী ফিরিবার মুখে দেখিলাম—সৌখীন-খেলনাজাতীয় দ্রব্যাদি নিলাম হইতেছে, তাহার মধ্যে ছোট ছোট আলোও আছে। আমার আদেশ ক্রমে, কোচম্যান্ তখন আমাদের 'সওকার' অর্থাৎ মুদিকে ডাকিয়া আনিলে, সে, দর-দস্তুর করিয়া, ঐ আলোগুলি এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, কিনিয়া দিয়া, বলিল—"আর কি চাই আম্মা?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"দুর্গাপূজা হবে যে; এখনো অনেক জিনিস চাই। সে তাদের ভাষায় আনন্দপ্রকাশ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"কব্ পূজা আম্মা? কালকো সামকো? বাবু কহাঁ হায়?" আমি বলিলাম—"বাবু নেহি, বাচ্চালোক ও আমি।" সে, তাহাদের প্রথা-অনুযায়ী, দুদিকে ঘাড়নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল, এবং অন্য যেসকল সামন্ অর্থাৎ দ্রব্যাদি, আনিতে হইবে, জানিয়া লইয়া—চলিয়া গেল। আমিও বাড়ী ফিরিলাম। হল-ঘর, পূজার দালানে পরিণত হইয়াছে, টেবিল, প্রতিমার চৌকীরূপে পরিণত হইয়া, ও পুণ্য শুভ্র আলিপানার আস্তরণ পরিধান করিয়া, দেবীপ্রতিমা বক্ষে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে; পুষ্প-পল্লব ও সহকারপত্রে মণ্ডিত মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছে। নবক্রীত ছোট ছোট আলোর ঝাড়গুলি প্রজ্বলিত হইয়া, শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভারত-ভ্রমণ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ীমহাশয় ওয়াল্টেয়ারে আসিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার সময় ছেলেদের যে ছোট ছোট পূজার বাসনের সেট্ উপহার দিয়াছিলেন, তাহা আজ কাজে লাগিয়া গেল। আসনে, বসনে, বাসনে ভূষণে আলোকে, পুলকে, শঙ্খে, ঘণ্টা কাঁসরের সমাবেশে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াগেল। দেবী, যেন সত্যই, সেই কার্ডবোর্ডের ছবির মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া হাসিতে লাগিলেন। পূজাবাড়ী জম্-জম্ করিতে লাগিল। সমুদ্রের উপর, বেড়াইতে যাইবার পথের ধারেই, বাড়ী; সুতরাং, এই অভিনব-উৎসব দেখিতে স্থানীয় নরনারীর সমাগম হইতে লাগিল। পরিচিত, অপরিচিত, অভ্যাগত, ও অনাহুতের আগমনে পূজাবাড়ীর অনুরূপ ভিড়েরও কিছু কমি হইল না। প্রতিমা দেখিয়া বউমাদের মুখে হাসি

ধরে না। তাঁহারা বলিলেন—"তিন বৎসর এখানে আসিয়াছি পূজা দেখি নাই; মা' এবার বাস্তবিকই আমাদের ঠাকুর দেখালেন।"

আজ সপ্তমী।—প্রথমেই নববস্ত্র পরিধান করিয়া স্থানীয় ঝি চাকর-বেহারা প্রভৃতি, তাহাদের তেলিগু বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইয়া, দলে দলে প্রতিমাকে গললগ্নী বাসে প্রণাম করিল। ছেলেদের-মানুষ-করা পুরাণ ঝি 'মাতৃ'রও আজ আনন্দের সীমা নাই—সেও স্নাতা, শুচী ও তসরপরিহিতা হইয়া

প্রবাসে চিত্রাঙ্কন-রতা লেখিকা

আসিয়া, প্রণাম করিয়া, ভক্তি গদগদকণ্ঠে বলিল—"মায়ের কি শোভাই হয়েছে!"

'দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃপ্রিয়াং' ইত্যাদি, যে-মন্ত্র পড়িয়া দেশে পুরোহিতমহাশয় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইতেন, তাহা, কাহারও সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল না এবং এ প্রবাসের পূজায় দেশীয় পুরোহিতও কেহ উপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং, আমার সদ্যোরচিত দুর্গা-স্তোত্রে সে-কার্য্য সমাধা হইল। পট্ট-বস্ত্রাবৃতা বধূমাতারাও সেই মন্ত্র পড়িয়াই পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। ঠাকুর-ঘরের সমুদ্রের দিকের দ্বারটি খোলা রহিয়াছে—নীরনিধি তরঙ্গভঙ্গে সুগম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে দেবীর চরণে প্রদানের জন্যই যেন রাশিরাশি শুভ্রফেন পুষ্পাঞ্জলি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, প্রতীত হইতে লাগিল। যিনি শরতে সমুদ্রতীরে বাস করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে সাগরকূলে শারদীয় প্রকৃতি কিরূপ চিত্তোন্মাদকারিণী! বিচিত্র-বর্ণবিকাশের মধ্যে সাগর ও অম্বরে মিলিয়া ইঙ্গিতে যেন বলিতেছেন—"দেখ, আমাদের মধ্যে কে সুন্দর কে শ্রেষ্ঠ।" বালকবালিকারাও এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত। রঙ্গেভঙ্গে আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া, ছোট ছোট এক-একটী সাগরেরই মত অবিশ্রান্তভাবে উঠিতেছে—পড়িতেছে—ছুটিতেছে—হাসিতেছে—ক্রীড়া করিতেছে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, আহারের প্রতি দৃষ্টি অবধি নাই! এখানে সূর্য্যাস্তের শোভার ও তুলনা নাই! আর্দ্র বেলাভূমে, অস্তমিত রবিচ্ছটা নিপতিত হইয়া, যেন একখানি সুবিস্তৃত স্বর্ণমুকুর পাতিয়া দিয়াছে। দিগ্বধূরা কেহ গোলাপী, কেহ সোনালী, কেহ চম্পক, কেহ ধূসর নানাবর্ণের, অম্বরাবৃতা হইয়া যেন দেবীদর্শনার্থে সমাগতা।

পশ্চাতে ওই সদোস্নাতা শ্যামাসুন্দরী সন্ধ্যা, আলুলায়িত চাঁচর কেশে স্যমন্তকমণি ধারণ করিয়া, ধীরগম্ভীর পাদবিক্ষেপে আগমন করিতেছেন।

এইবার সন্ধ্যারতি। শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁশর প্রভৃতির সঙ্গে আর একটি অভিনব বাদ্যসম্প্রনিত হইতেছে—একটি টীনের ক্যানেস্তারা-পিটুনীর চোটে 'সমুদ্র-গর্জ্জন মূক হইয়া গিয়াছে ও সমুদ্রতীর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আলোকমালায় বারান্দা প্রভাময়ী। সহসা দেখিলাম, অনেকগুলি লোক বাংলোর সিড়িতে উঠিতেছেন। ক্রমে, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর নিকটবর্ত্তী হইলে, বুঝিলাম, তাহা পরিচিত। চাহিয়া দেখি, দাতা-দাতুস্পুত্র, মাতুল-মাতুলানী ও আমার পুত্রদিগের বন্ধুবান্ধবে প্রায় ১২।১৩ জন সমাগত—পূজার ছুটীতে একই ট্রেনে সবাই বেড়াইতে আসিয়াছেন। পূজাবাড়ীতে নিমন্ত্রিতের যে অভাবটুকু ছিল, তাহাও পূর্ণ হইল। যাহারা আমার মত অবস্থায় সুদীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইয়াছেন, তাঁহারা আমার আজিকার দিনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। আমার নবাগত অতিথিরা, ভ্রমণের আনন্দের উপভোগে, দেশে পূজার আনন্দত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমার এই কুটিরের বারান্দায় পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদের দেবীদর্শন হইল। বিস্মিত হৃদয়ে এবং উৎফুল্লচিত্তে বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাপার কি? ওয়াল্টেয়ারে দুর্গোৎসব!" ভায়া বলিলেন, "এসব বড়দিদির কীর্ত্তি। যা হ'ক, সমুদ্রের ওপর মানিয়েছে বেশ!" সমুদ্রের সহিত আমাদের এত নিকটসম্বন্ধ দেখিয়া, তাঁহারা বড়ই প্রীত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রধান ভাবনা হইল—মাথার গোড়ায় যখন এই অবিরাম দারুণ গর্জ্জন, তখন বিরাম-দায়িনী সুপ্তিদেবী বোধ হয় এস্থল হইতে অন্তর্হিতা! যাহা হউক, এরাত্রে আনন্দের আতিশয্য যতটা হইয়াছিল, স্থানের প্রাচুর্য্য ততটা হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়!—'যদি হয় সুজন, ত তেঁতুল পাতায় ন'জন!' এইরূপে, গল্প-স্বল্পে, পান-ভোজনে, হাস্য-পরিহাসে, কাঁসর-ঘণ্টায়, পূজা-আরতিতে অষ্টমী-নবমী দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। বলি ও গঙ্গাজল ছাড়া, আর কোনও অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই।

আজ বিজয়া!—বাল্যকালে শ্রুত সেই সঙ্গীতটি আমার কাণে বাজিতেছিল—

"কি কর শিখরবর,
পোহাল নবমীনিশি;
মলিন হ'তেছে দেখ
উমা মায়ের মুখশশী!"

কিন্তু আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরবরদিগের মুখ, মলিন হওয়া দূরে থাক্, আরও প্রফুল্লই হইয়া উঠিয়াছে!—'আজ ভাসান—আজ ভাসান' করিয়া মহা-উল্লাসে কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছে। কাপড় জামা পোষাক আসাক বাহির করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পূজার ন্যায়, ভাসানও আনন্দ-উৎসবপূর্ণ মনে করিয়াছে। বিসর্জ্জনের বিষাদ, তখনও তাহাদের শিশুহৃদয় স্পর্শ করে নাই। অতঃপর, বধূমাতা দেবী-প্রদক্ষিণ করিয়া বরণ করিলেন, অঞ্চল দিয়া চরণ মুছাইলেন; পান ছেঁচা, মিষ্টান্ন যথারীতি মুখে দেওয়া হইলে, বাড়ীর ব্রাহ্মণঠাকুর ও চিনিবাস চাকর প্রতিমা লইয়া সমুদ্রতীরে চলিল এবং তাহার পশ্চাৎ বাড়ীর সকলেই চলিলেন। ছেলেরা মহানন্দে সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া চলিল। তাহারা বোধ হয় ভাবিয়া ছিল, তাহারা যেমন প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে, ঠাকুরও সেইরূপ আসিবেন। কিন্তু—

যবে বিসর্জ্জিলা শ্রীনিবাস ভৃত্য পুরাতন
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি নীল সিন্ধু জলে,
কাঁদিল বালকবৃন্দ হাহাকার করি
গড়াগড়ি দিয়া সবে পড়ি বেলাভূমে;
শেষে, উঠি তীরবৎ বেগে, লাগিলা হানিতে
অবিরাম মুষ্টিবৃষ্টি 'চিনে'র মস্তকে—
"কেন তুই দিলি ফেলে—দে এনে এখুনি";
ঝরিল আঁখির ধারা ঝরঝরে ঝরি,
কমলের দল হতে ক্ষরে যেন মোতি,
অবিরাম প্রস্ফুটিত আরক্তিম কোমল কমলে।
দেখিতে দেখিতে সদয় হৃদয় সিন্ধু,
তরঙ্গদোলায় বহিয়া সম্ভ্রমে সাথে
দিয়া গেল ফিরে গোধূলীর স্বর্ণরাগ,
রঞ্জিত সৈকতে! উঠিল আনন্দরোল
বালকমণ্ডলে; বুকে করে নিয়ে মায়ে
ফিরে এলো ঘরে। বাজিল মঙ্গলবাদ্য
ঘন শঙ্খরব। আমার কুটীর মাঝে সমুদ্রের তীরে।

লভিল বিজয়সিদ্ধি হর্ষে পুরবাসী—
ভাঙের কচুরী, আর মিঠাইয়ের মাঝে
মোর দুর্গোৎসব শান্তি আনন্দমিলনে।

ওয়াল্টেয়ারে দুর্গোৎসব হইয়াছিল, সে আজ বহুবৎসর, কিন্তু সে দেশজাত আমার শেষ দুটি পৌত্র পৌত্রী যখন আধ-আধ ভাষায়, তাহাদেরই উদ্দেশ্যে লিখিত, কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া বলিতে থাকে—

জন্মেছি ভাই এই দেশেতে—
আমরা দু ভাই বোনে,
একসকালে সাগরকূলে
একটী ঘরের কোণে।
রাঙ্গামাটীর গ্রামখানি
গেরুয়া বসন পরা,
মলয় বাতাস সদাই উদাস—
ছোটে পাগলপারা।
সোণার থালাখানি
যেন ভাল সিঁদুর মেখে!
কোথায় এমন জাগে রবি
জলের ভিতর থেকে!
সুনীল নীরে মেঘের শিরে
লতায়-পাতায় নানা,
কে যেন ভাই ঢেলে দেছে
কাঁচা সোণার পানা!
কোথায় এমন পাগল-জলে
জেলে-ডিঙির মেলা!
ভেসে উঠে, তলিয়ে করে
লুকাচুরী খেলা,
কোথায় এমন পথের ধারে
কেয়াগাছের সার,
কোথায় এমন 'জীডি পপ্পু'
বাদাম মানে হার!
'সীমাচলে'র পথে পথে
ঝর্ণা এমন ঝরে—
অনারসের পাহাড় এমন
সোণার টোপর পরে!
সাগরকূলে জন্ম ব'লে
নামটি 'সাগরিকা'।
ভোরের বেলায় জন্ম তোমার
তুমি প্রভাত রাকা!
নামটি দেশের ওয়েল্টেয়ার—
সবাই ভালবাসে;
বছর বছর খেতে হওয়া
কতই লোকে আসে!

—তখন, আজিও নানাসুখের স্মৃতির সহিত মানস নেত্রে সেই দুর্গোৎসব ফুটিয়া উঠে!

পূজা সমাপ্ত হইলে, হাসিয়া, তখন সবাইকে বলিলাম—"একদিন এক গণককার আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল—'মায়ী! আপনার যে মহামায়ার পূজাটি করতে হবে'—সে কি এইরূপে, ক্রীড়াচ্ছলে সম্পন্ন হইল?—যদি তাই হয়, তবে তাহাতেই বা ক্ষতি কি! মহামায়ে! সকলই ত তোমার লীলা!

ঝড়ের তরী

[শ্রীইন্দিরা দেবী]

ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে, বইছে ঝড়ের হাওয়া,
ওরে মাঝি 'সামাল' 'সামাল' কঠিন হবে যাওয়া।
তাল হয়ে বইছে নদী, সামাল সামাল বাচ্‌বি যদি,
স্রোতের মুখে যাস্‌নে ভেসে—ভার হবে কূল পাওয়া।
ছে বাতাস খর বেগে, কাঁপ্‌ছে তরী (পালে লেগে),
ঢাকল আকাশ কালো মেঘে, যায়নাক চোক চাওয়া।
ঝড়ের মুখে নামিয়ে নে' পাল, জোর করে তুই থাক ধরে হাল,
আজ না পারিস্ পৌছুবি কাল, শেষ হবে তোর বাওয়া।
ওরে মাঝি, সামাল—সামাল, বইছে ঝড়ের হাওয়া॥

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান"—এই শব্দটি আমাদের মনে কোন্ ভাবের উদ্রেক করে, প্রথমতঃ, তাহাই আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

'বোম্বায়ে আম' 'শান্তিপুরে ধুতি' প্রভৃতির ন্যায় 'ব্রহ্মজ্ঞান'—এই শব্দের পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষীয়' বিশেষণপদ যদি এইরূপই দেশবাচক-অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তবে 'ব্রহ্মজ্ঞানকে' 'ইংলণ্ডীয়' 'স্পেনীয়' ইত্যাদি বিবিধ অংশেও বিভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপে বিভক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞান—অর্থাৎ 'ভারতবর্ষীয়' 'ইংলণ্ডীয়' বা 'চৈনিক' ব্রহ্মজ্ঞান—তাহা 'পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান' 'কাপিল সাংখ্য' বা 'ডারউইনের থিওরি' এইরূপ কোনএকটি পরিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণজ্ঞান মাত্র রূপেই আমাদের চিত্তমধ্যে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

'ব্রহ্মজ্ঞান'—এই শব্দের অর্থ চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহার পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষীয়'—এই বিশেষণপদ প্রয়োগ করা চলে না। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান দেশকালাদি পরিচ্ছিন্ন কোন একটি জ্ঞান বিন্দুমাত্র নহে; যাহা দেশকালাতীত, অনন্ত ও অসীম জ্ঞানের সমষ্টি, তাহাকেই 'ব্রহ্মজ্ঞান'—এই আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। এখানে যে আমরা 'ভারতবর্ষীয়'—এই পদ 'ব্রহ্মজ্ঞান' শব্দের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিতেছি, ইহা পূর্ব্বোক্ত 'বোম্বায়ে' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের তুল্যার্থে নহে; ইহা হইতে—'ভারতবর্ষে বিকাশপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞান'কে আমরা 'ভারতবর্ষীয়-ব্রহ্মজ্ঞান', এই নামদ্বারা লক্ষ্য করিতেছি—এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, 'ব্রহ্মজ্ঞান' শব্দের পূর্ব্বে কোন প্রকার পরিচ্ছিন্ন বিশেষণ প্রয়োগ করা চলিতে পারে না।

আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায় যে, শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—'উপাস্যের ভাবে ভাবিত না হইলে উপাসক হওয়া যায় না'—'ব্রহ্ম ভূত্বা ব্রহ্মমর্চ্চয়েৎ'; অতএব—ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, জ্ঞাতাকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। জ্ঞান যখন বৃহৎ, বা অপরিচ্ছিন্ন হয়—তখনই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"সযোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—'যিনি সেই পরমপুরুষ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়াছেন।' দার্শনিকগণও এই শাস্ত্রোক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, 'To know in reality means to become'—যাহা জানিতে হইবে, তাহা না হইলে, তাহা জানা যায় না;—অর্থাৎ, 'জ্ঞেয়র ভাবে ভাবিত না হইলে জ্ঞাত হওয়া যায় না।'

ভারতবর্ষ—ভারতবাসিগণ—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে হইলে—প্রথমতঃ, আমাদিগকে জানিতে হইবে—'ব্রহ্ম' বলিতে আমরা কি বুঝি, এবং 'জ্ঞানে'র স্বরূপ কি?

'বৃহ' ধাতু হইতে 'ব্রহ্মশব্দ' উৎপন্ন হইয়াছে। 'বৃহ' ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধ; অতএব, ব্রহ্মশব্দ বৃদ্ধ-বস্তুর বাচক—যাহা বৃহত্তম ও ব্যাপকতম, তাহাই সুতরাং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের এইরূপই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ আমরা পাইতেছি; অর্থাৎ, যাহা দেশতঃ কালতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে (unconditioned), তাহাই ব্রহ্ম। 'বৃদ্ধি' শব্দ—এস্থলে নিরতিশয়, এই অর্থের বাচক; এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার উপপদ প্রয়োগ করিতে গেলে, ইহার প্রকৃত অর্থকে সঙ্কোচ করিয়া ফেলা হইবে—ইহার নিরতিশয় ভাবকে বাধিত করা হইবে। ব্রহ্ম—যদি আপেক্ষিক বৃদ্ধিযুক্ত পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে, এরূপ করা সম্ভব হইত।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হইতে আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহাতে আমাদের ধারণা হইল—যাহাপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই, তাহাই ব্রহ্ম। এখন, ইহা হইতে ব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ দাঁড়াইল, তাহাই দেখিতে হইবে। 'যাহা'—বলিতে আমরা কতখানি বুঝি? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই 'সর্ব্বং' বলিতে, শাস্ত্রকারগণ 'আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত'—এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। তবেই, জগতের যাহা কিছু সৎ বা উত্তম পদার্থ, তাহারই সমষ্টিকে ব্রহ্ম—এই পদ দেওয়া

যায় না। সর্ব্বং—বলিতে যাবতীয় সৎ এবং অসৎ পদার্থ—ভাব-গুণাদি সমস্তেরই নিরতিশয় বা অপরিচ্ছিন্ন ভাব; সুতরাং, ব্রহ্ম শব্দের নির্গলিত অর্থ—বিশ্বজগতের অন্তরে এবং বাহিরে—সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত রহিয়াছেন, প্রকৃতির সহিত সম্মিলিতরূপে তিনিই বিরাট্‌মূর্ত্তিতে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সাধন করিতেছেন, এবং প্রকৃতির পরসীমায় নির্গুণ ব্রহ্মরূপে তিনিই একমাত্র বিরাজিত। প্রকৃতি-সম্মিলিত পরমাত্মাই নির্গুণ ব্রহ্মের বোধস্বরূপ, বা স-গুণ ব্রহ্ম। এই স-গুণ ব্রহ্মকে ধ্যান-ধারণাদ্বারা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন।

এইবার আমাদের, 'জ্ঞান'সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে হইবে; তবেই, আমরা 'ব্রহ্মজ্ঞান'—এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।

জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত আছে; তাহার মধ্যে, জ্ঞানকে প্রধানতঃ,সন্দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Experiment)—এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। জ্ঞানের স্বরূপ লইয়া, দার্শনিকদিগের ভিতরে, বিস্তর মতভেদ আছে। যাহারা স্থূলপ্রত্যক্ষবাদী, বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষকেই তাঁহারা জ্ঞানের একমাত্র উপাদান-কারণ বলিয়া থাকেন;—জ্ঞানের অন্য পূর্ব্বভাব ইঁহারা স্বীকার করেন না। মানব যে—কোনও পূর্ব্বসংস্কার লইয়া জন্মে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে অপারগ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ অনেকেই প্রায় স্থূলবাদী। ইঁহারা, চিত্তের প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারের কথা স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান জীবনের ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজ জ্ঞানই ইঁহাদের মতে আত্মজ্ঞান। ইন্দ্রিয়বাহ্য অর্থ বা বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজ ক্রিয়ার সংস্কার, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজ ক্রিয়ার লেপ (Impression),—এইগুলিই ইঁহাদের মতে, জ্ঞানোৎপত্তির কারণ।

জর্ম্মণদেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কাণ্ট, জ্ঞানের দুটি উপাদান স্বীকার করিয়াছেন।—কাণ্টের মতেও, বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র কারণ নহে। সহজ অন্তর্জ্ঞান, বা ঔৎপত্তিক জ্ঞানও, ইঁহার মতে জ্ঞানের কারণ।

ইন্দ্রিয়িক এবং বিশুদ্ধ-আন্তর বা ঔৎপত্তিক জ্ঞান—কাণ্ট বলিয়াছেন—জ্ঞানের এই দুইটি ঘটকাবয়ব। ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি—পণ্ডিত কাণ্ট, এই তিনটিকেই প্রকারান্তরে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ জ্ঞানের দুইটি রূপকে প্রধানতঃ স্বীকার করিয়াছেন; একটি জ্ঞান—সাধারণতঃ দর্শন-শ্রবণাদিদ্বারা জন্মে, অপর জ্ঞানটি—জ্ঞেয় পদার্থসম্বন্ধে একটা ভাব। যেরূপ সূর্য্যের আলোক, জগতের সমস্ত বস্তুর সহিত মিশিয়া, জ্ঞেয়পদার্থকে প্রকাশ করে অথচ নিজে, যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাই থাকে; সেইরূপ, যে জ্ঞান, জ্ঞেয়পদার্থসকলের সহিত একীকৃতরূপে, আমাদের প্রত্যক্ষ হয়—তাহাই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান; ইহার—প্রথমটি লৌকিক ও দ্বিতীয়টি পারিভাষিক জ্ঞাননামে কথিত হয়। বাহ্যজগৎকে যখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত করি, তখন দেখিতে পাই—সেখানে আবির্ভাব-তিরোভাব-স্বরূপিণী প্রকাশা-প্রকাশাত্মিকা দিনযামিনী অবিরাম পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করিতেছে; শীত বসন্তাদি ঋতুচক্র অবিরত ঘুরিতেছে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—বা শরীরের—মধ্যে যখন লক্ষ্য করি, তখনও দেখিতে পাই—ইহাতেও অহরহঃ চক্রের অবিশ্রান্ত আবর্ত্তন রুদ্ধ নাই; শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণাপানের ক্রিয়ার বিরাম নাই। 'আমি' একবার উদিত, একবার অস্তমিত হইতেছি; হাসিকান্না এবং জন্মমৃত্যু পর্য্যায়ক্রমে একটার পর একটা চলিতেছে। আবার, একটুখানি নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, ইহাও বুঝিতে পারা যায়—প্রাণাপানাদি সমস্তক্রিয়া ও জন্মমরণরূপ সমুদয়ব্যাপারই যথাক্রমে চলিতেছে বটে; তথাপি, আমার এই সদাপরিবর্ত্তনশীল বিদ্যুচ্চঞ্চল-'আমি'র মধ্যে, আর একটি অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বদা স্থির 'আমি' আছে, যাহা কদাচ উদয়াস্তময় ক্রিয়া সম্পাদন করে না। ভারতবর্ষীয় ঋষিরা, এই সত্যকে জানাইবার জন্য, বলিয়াছেন—'অন্তশ্চতি রোচনাস্য প্রাণাদ পানতী ব্যখ্যম্ মহিষো দিবম্।' —অর্থাৎ, সূর্য্যের রোচনা রোচমানাদীপ্তি শরীরের মধ্যে মুখ্য প্রাণের প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তি; উহাদ্বারা ইনি শরীরযন্ত্রকে ধারণ বা পোষণ করেন। দ্যুলোক ও ভূলোক—এই লোকদ্বয়ের মধ্যেও, ইঁহার (সূর্য্যের) রোচমানাদীপ্তি বিচরণ করিয়া, প্রাণন ও আপানন—পর্য্যায়ক্রমে—এই দ্বিবিধক্রিয়া সম্পাদন করে; একবার উদিত, একবার অস্তমিত হয়। মহান্ সূর্য্য অন্তরীক্ষকে, উদয়াস্তময়ের মধ্যে, প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইঁহার কদাচ অস্তময় হয় না; ইনি সদা স্বপ্রকাশ ও নিয়ত স্থির।

এই আত্মার স্থিতি—যে শুধু জীবেরই মধ্যে, তাহা নয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুর অন্তরকেন্দ্রই ইহার স্থিতি-গৌরবে গৌরবান্বিত। ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ বলিয়াছেন, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।'—'একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা, বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া, আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূর্ণপুরুষের দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ণিত রহিয়াছে।' জড়জগতের, সহিত প্রত্যেক বস্তুতে স্থিত, সেই প্রত্যগাত্মরূপী পরমপুরুষের সম্বন্ধ, ইহাতে অধিকতর বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

'একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃসাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"—'সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত সেই এক পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎকর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, জ্ঞানস্বরূপ, সকলের সাক্ষী ও সঙ্গরহিত এবং সৃষ্টপদার্থের যেসকল গুণ, তাহার সমুদয়ই তাঁহাতে অনবস্থিত।

ভারতবর্ষ, এই বোধাত্মক পারিভাষিক জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া, এই নিগূঢ় আত্মতত্ত্বের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন—বস্তুর মধ্যে এক অচঞ্চল সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন—এবং এই জড়াদির অন্তর্ব্বর্ত্তী চেতনা পদার্থকে 'চিৎ' জানিয়া গভীর আনন্দে বলিয়াছিলেন—

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
পরমে ব্যোমন্,
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।'

—ইহা হইতে এইরূপই উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে, 'ব্রহ্মের জ্ঞান'—এইরূপই বুঝায়। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই মূলতঃ পরমসত্তা; সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে যে জানে না, সে বস্তুতঃ কিছুই জানে না—সে জড়পদার্থই। আর, সেই 'সত্যজ্ঞানমনন্ত অদ্বিতীয় পুরুষকে যিনি অতিনিকটে—আপনার আত্মাতে—সাক্ষাৎউপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি জ্ঞান পদার্থই। তিনি, সেই অজ্ঞানলেশহীন শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরমজ্ঞানীর সহিত একাত্মরূপে, তাঁহার কামনার সমুদয়বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাওয়া এবং হওয়া—ইহার মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'যে বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি!' তবেই, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যখন জীব আপনার মধ্যেই প্রাপ্ত হইতেছে, তখন, জ্ঞানই তাহার স্বরূপ। ভারতবর্ষীয় ঋষিরা বলিতেছেন—

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম, তদেবাহমস্মি!'

—জ্ঞান-স্বরূপকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করাই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান, এবং তাহা করিয়াই ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে আত্মবান্ হইয়াছিলেন। আর, এই মহাতত্ত্ব তাঁহারা কেবলমাত্র আপনার মধ্যেই গোপন রাখেন নাই-উপনিষদের অক্ষয় রত্নভাণ্ডারে এই তত্ত্ব, এই চিরন্তন সত্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়—আর কোথাও হইতে পাওয়া যায় না—ইহার অর্থ কি?—অতঃপর আমাদের ইহাই চিন্তা করিতে হইবে।

চিকিৎসাশাস্ত্র, বা আয়ুর্ব্বেদ, ভিন্ন অন্যশাস্ত্র ঔষধাদির জ্ঞানপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না! ইহার কারণ, রোগ নির্ণয় ও ঔষধাদি প্রস্তুতকরণ, এই শাস্ত্রেরই বিষয়; গ্রহাদির সঞ্চারণ ও সাধুবাক্য কখনও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ব্যাকরণশাস্ত্র পাঠব্যতীত শিক্ষার উপায় নাই।—সেইরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানই উপনিষদের বিষয়। উপনিষদ ভিন্ন, তাহা অন্য শাস্ত্রাদি পাঠদ্বারা জ্ঞান করা যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যে—'বিষয়' শব্দের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়—"অনন্যলভ্য বিষয়, ইতি বিষয়স্য লক্ষণম্।" সুতরাং, যাহাতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তাহার বিষয়। উপনিষদ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়, সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র উপনিষদের বিষয়।

ব্রহ্মজ্ঞান যে উপনিষদেরই বিষয়, তাহা 'উপনিষদ' শব্দের অর্থ হইতেও সম্যক্ প্রকারে জানা যায়। 'উপ'-'নি'-পূর্ব্ব'সদ' ধাতু হইতে 'উপনিষৎ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 'সদ'ধাতুর অর্থ—অবসাদন, গতি, ও বিশরণ। অতএব, যাহা সংসার-বীজভূতা অবিদ্যার বিশরণ—অর্থাৎ, বিনাশসাধন—করে, তাহাই উপনিষৎ শব্দে উক্ত হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যাই একমাত্র এই সকল কার্য্যসাধনে সমর্থ; অতএব, ব্রহ্ম-বিদ্যাই উপনিষৎ শব্দের অর্থ।

এক্ষণে, এই উপনিষদ্রূপ উচ্চগিরিশৃঙ্গে আরোহণের জন্য, ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ কোন্ সোপানশ্রেণীর বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা দেখিব।

সাধন সোপানের পাদদেশে—প্রথমেই, আমরা কর্ম্ম-কাণ্ডের সুদৃঢ়ভিত্তি-রচনা দেখিতে পাই। কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদে, প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ডের বহুবিস্তৃত অধিকার স্থাপন করা হইয়াছে; কর্ম্মের পর—উপাসনা, এবং তৎপরে—জ্ঞানকে উপাসনার পশ্চাদ্বর্ত্তীরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মকাণ্ডের স্থান অগ্রে দেওয়া হইয়াছে; ইহার অর্থ এই যে—ভারতবর্ষের ঋষিরা কর্ম্মকেও জ্ঞানের সহিত সমচক্ষে দেখিয়াছিলেন। কর্ম্মভিন্ন জ্ঞানলাভ অসম্ভব বুঝিয়াই, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্গণ প্রথমতঃ কর্ম্মমার্গেরই গুণগানদ্বারা লোককে কর্ম্মহীনতা হইতে কর্ম্মে আনয়ন করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন; অর্থাৎ তমঃশক্তির পরাভবদ্বারা রজঃশক্তিরই উদ্বোধন করিয়াছিলেন। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—পূর্ব্বাপর্য্যক্রমে ইহাদের ক্রমনির্দ্দেশিত করা হইয়াছে। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই তিনের—পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কি? কর্ম্ম—আদি, উপাসনা—মধ্য, এবং এই দুই সাধনার লভ্যফল—জ্ঞান। বেদের এই জ্ঞান কাণ্ডই উপনিষদ্-শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে, কর্ম্মের স্বরূপ যাহা বর্ণিত হইয়াছে—'কর্ম্ম' বলিতে, আমরা যাহা বুঝি—তাহার সহিত, এই বেদোক্ত কর্ম্মতত্ত্বকে মিলাইতে গেলে, আমরা কি শিক্ষা পাই? এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই, কি না? যদি পাই, তাহা কি?

ঈশোপনিষদে, বৈদিক কর্ম্মকে 'অ-বিদ্যা' শব্দদ্বারা উক্ত করা হইয়াছে—

"অবিদ্যয়ামৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃত মশ্নুতে॥"

এই মন্ত্রটির মহীধরকৃত ভাষ্য পাঠ করিলে জানা যায়—'অবিদ্যা'শব্দের অর্থ—বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও 'মৃত্যু'-শব্দের অর্থ—স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান বা সংসার।—'অবিদ্যয়া কর্ম্মণা—অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, উভয়ং তীর্ত্ত্বা.........'

'স্বাভাবিক কর্ম্ম-জ্ঞান' বলিতে আমরা কি বুঝিব?

যে কর্ম্ম স্বভাবের প্রেরণায়—বিনা-উপদেশে—আমরা করিয়া থাকি, তাহাই স্বভাবিক জ্ঞান। স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান ও মৃত্যুকে সমান পদার্থ বলা হইয়াছে, এইজন্য, যে—কর্ম্মজ্ঞান থাকিতে লোকে, পৌঃনপুনিক জন্মমৃত্যুময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অমৃতত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে না;—তাহাই স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত, স্বভাবের প্রেরণাদ্বারা প্রেরিত হইয়া, এই কর্ম্মাশ্রয়পূর্ব্বক, পুনঃপুনঃ সংসার বা মৃত্যু-সাগরেই আবর্ত্তিত হইতেছে; কারণ, জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম স্বভাবতঃ ইনিম্নগ।—

'জীবানাস্তু সর্ব্বতিণিতং নিম্নগাস্তুঃ।' ইহা প্রায়শঃই 'আহার-নিদ্রা-ভয়মৈথুনঞ্চ.....'ইহারই মধ্যে আবদ্ধ। 'বিজ্ঞান'—অর্থাৎ, বিশেষরূপ জ্ঞান নহে; আবার 'বিজ্ঞান' বলিতে আজিকালি যাহা বুঝায়—জড়-বিজ্ঞানও মৃত্যুর রাজ্য অতি-ক্রমপূর্ব্বক জীবকে অন্যত্র লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। কারণ, 'ফিজিওলজি' (Physiology) বা শারীরতত্ত্ব জানিয়া যদি দেহেন্দ্রিয়াতীত 'কোন সৎবস্তুকে না জানা যায়,' তবে, এই দেহ-বিজ্ঞান জ্ঞাতাকে, দেহভিন্ন আর কোন্ অবিনশ্বর সত্যবস্তু দান করিতে সক্ষম হইবে? তেমনই তাপতড়িৎ প্রভৃতির জ্ঞানদ্বারা, স্থূল জড়রাজ্যে বিচরণব্যতীত, অপর কোন্ মহৎলাভ হওয়া সম্ভব—যদি-না তাহাদের সূক্ষ্মতম ও ব্যাপকতম রূপকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়!

তাপ-তড়িৎ যে শক্তিসমুদ্রের কণা, তাহাকে যদি জানা যায়, তবে—বুদ্ বুদ্ জ্ঞান লইয়া, মহাসাগর বোধের ন্যায়—ইহা জ্ঞানের অতীতই রহিয়া গেল। বৃক্ষকে জানিতে গেলেও, তাহার প্রত্যক্ষরূপকে জানিলেই যেমন তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জানার শেষ হইল না;—তাহার বীজভূত অব্যক্তাবস্থাকেও স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদাদির প্রকৃষ্ট কারণ, তাহার অণু সমূহের সংস্থান-কৌশলানুসারে পরিবর্ত্তন, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কোন্ গুণের তারতম্যানুক্রমে কোন্ কোন্ ভেদ বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, এই সমুদয়—সূক্ষ্মতম ব্যাপকতম ব্যাপারকেই বিশেষরূপে জানিলে, তবেই চৈতন্যাবেষ্টিত জড়ের প্রকৃতপরিচয় জানা হইবে। কর্ম্মের প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে, এসকল গূঢ়, অথচ একান্ত সত্য-তত্ত্বসকলকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কর্ম্মদ্বারা দেহ ও মন সংগঠিত হইয়া আসিলে, কর্ম্মেরও প্রকৃতি-পরি-বর্ত্তনের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।

এইরূপ সকল বিষয়েই; যেমন—এইরূপে, জীবসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারা, আমরা জগতে দুই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি; এক—জীবকে স্থূলপ্রত্যক্ষরূপে এক্ষণে আমার এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যেরূপে দেখিতেছি, এবং অপর—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী, এই দেহপরিগ্রহের নিমিত্ত কারণরূপ—

পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের স্বরূপ। এই পাপপুণ্যাদির কর্ম্মের প্রকৃতস্বরূপ বোধ না-করিতে পারিলে, বর্ত্তমান জীবের যথার্থ পরিচয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। কেননা, ইহাই তাহার এই স্থূলপ্রত্যক্ষরূপের বীজ;—এই শাখা, পত্র, পুষ্পাদির মূলীভূত কাণ্ড।

বৈদিক-কর্ম্ম—কর্ম্মফলকে দীর্ঘ করার চেষ্টা। মানুষ স্বভাবতঃ ভোগপ্রিয়। সংসার, বা সংসারাতীত, স্থানে যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে সুখাদি ভোগ করিতে পারা যায়, তাহারই জন্য উদ্যমের নাম—বৈদিক-কর্ম্ম। এই বৈদিক কর্ম্মকেই,অ-বিদ্যা শব্দদ্বারা বিশেষিত করিয়া,বলা হইয়াছে—'... ... বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'।—অর্থাৎ, এই অ-বিদ্যা বা বৈদিক-কর্ম্ম, 'মৃত্যু' বা স্বাভাবিক কর্ম্মকে পরাভব করিবার জন্য; কিন্তু ইহাদ্বারা অমৃতলাভ সম্ভব নয়।—অমৃতলাভের জন্য, বিদ্যা বা, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন।

বৈদিক-কর্ম্মদ্বারা—স্বাভাবিক কর্ম্মের যথেচ্ছগতি প্রতিহত হইলে, জৈবিক-ধর্ম্ম হইতে উত্তোলিত হইয়া,মানব জীবশ্রেষ্ঠরূপে—শম-দমাদি সিদ্ধিদ্বারা—দেবভাব প্রাপ্ত হয়েন। পরে, ইহাকেও নশ্বর জানিয়া, উচ্চশ্রেণীর উপাসকের মনে—ফলাকাঙ্ক্ষী বিনিবৃত্ত হইয়া—কেবলমাত্র ভগবদ্প্রীতিকাম হইয়া—নিষ্কামকর্ম্ম-চেষ্টা আইসে। এইজন্যই, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞানে—কর্ম্মের স্থান সর্ব্বপ্রথমে ও বহুবিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিজাতীয় ভাব, স্বজাতীয় ভাবকে নষ্ট না করিয়া দেয়, ইহার জন্য সাবধানতা লওয়াই, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞানে—উপাসনা এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'প্রণবো ধনুঃ'—ইহাই উপাসনার সঙ্কেত। একটাকে ছাড়িয়া, আর-একটা অবলম্বনপূর্ব্বক যথেচ্ছভাবে আবর্ত্তের মধ্যে আবর্ত্তিত হইতে থাকিলে, সংসারের মধ্যেই চিরন্তন আবর্ত্তন ঘটে; কর্ম্মদ্বারা শুচি-শুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে একটা-কিছু অবলম্বন করিলে, চঞ্চলচিত্ত ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিয়া, জ্ঞানমার্গের আশ্রয় হইতে সহজেই সমর্থ হয়, এবং সর্ব্ব-অখিলকর্ম্ম,জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত; কেননা, জগতে জ্ঞানই একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও ব্যাপকতম পদার্থ—জ্ঞানই অপরসমুদয় বৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া থাকে। আবার, আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, যাহা বৃহৎ বা মহৎ, অসীম বা অপরিচ্ছিন্ন, পরিচালিত নহে—পরিচালক - তাহাই ব্রহ্ম বা বৃহত্তম। সেই 'ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞানমানন্দম্ শুদ্ধং জ্ঞানময়ং।'

লাটিমের ন্যায়, কর্ম্মের বেগে, ঘুরিতে ঘুরিতে, উপাসনাদ্বারা গতির বেগ স্থির হইয়া আসিলে, লাটিমের ঘোর কমাইয়া, কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলেই—তখন জ্ঞান মার্গে আরোহণ ঘটে; এবং নিজস্বরূপদর্শনলাভে জীবাত্মা, পরমাত্মায় অভিন্নত্ব উপলব্ধিদ্বারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারে; এবং—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'পাওয়া' ও 'হওয়া'র মধ্যে কোন প্রভেদই নাই—অমৃতত্বই লাভ করিয়া থাকে।

ইহাই—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মকে এত বড় করিয়া, অথচ এত অন্তরাপেক্ষাও অন্তরতমরূপে, আপনারই নিভৃত হৃদয়মন্দিরের নিভৃততমস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আর কোন দেশে কেহ কখনও দেখিতে শিখে নাই—যেমন এই ভারতবর্ষীয় ঋষিরা দেখিয়াছিলেন; এবং, তাই, এমন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

'বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তম্।'

বিভিন্ন

[শ্রীহেমনলিনী দেবী]

বিদ্যা অভিমানী কয়, 'এত ভুল কেন
মানব করিছে নিত্য?—ক্রীড়নক যেন
সাজায়ে তুলেছে তারা জগৎ ঈশ্বরে,—
খেলা-রথে তুলি, হায়, টানাটানি করে!'
চলিছে ভক্তের রথ বাধা নাহি মানে,
বিদ্বানের কথা কারো পশিল না কাণে!
তাদের আনন্দ শুধু ছুটি ঊর্দ্ধদেশে—
ধ্বনিছে সবেগে যেন কাহার উদ্দেশে!
চলে গেল তারা, দূরে চলে গেল রথ,
জ্ঞানীর সম্মুখে শুধু—শূন্য দীর্ঘপথ!

গুরু ও শিষ্য

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

গুরু কহিলেন, "পুত্রের তরে যজ্ঞ করিতে হবে ;"
জমিদার ক'ন দেওয়ানে ডাকি'—"ফর্দ্দটা কর তবে।"
আজ্ঞা করেন শিষ্যরে প্রভু, ফুলায়ে বিশাল শিখা :
নিমেষের মাঝে অতি প্রশস্ত ফর্দ্দ হইল লিখা।
দক্ষিণা স্মরি' গুরুর আননে উথলি' উঠিছে হাসি ;
ব্যক্ত করেন যজ্ঞমহিমা, আলোড়ি' শাস্ত্ররাশি।
ভাবেন শিষ্য, "নীরস বিশ্ব যে-নিধিবিহনে, হায় !
গুরুরে তুষ্ট করিলে যদি বা সে রতন পাওয়া যায়" !
হিন্দুর গুরু—মূর্ত্ত দেবতা ; সংসার-পারাবার
উর্ম্মিবহুল অতল-অকূল—গুরু সে কর্ণধার !

২

বিপুলবিত্ত—উদারচিত্ত—দীন-ভিখারীর পিতা,
জমিদার যিনি ; গৃহেতে গৃহিণী—অতুলা, অনিন্দিতা—
কমলার মত রূপসী ললনা, গুণে যেন বীণাপাণি ;
পরিজন কভু সে মুখকমলে শোনে নি কঠোরবাণী।
কহেন পতিরে, "কি কাজ যজ্ঞে ?—অন্তর্যামী সে নাথ ;
তাঁর পায়ে যাবে নাকি এ হিয়ার নীরব আর্ত্তনাদ ?
শিশুহীন হিয়া, রহিয়া রহিয়া, করে যবে হাহাকার—
তাহারি তুষ্টি সাধিব জগতে ভুলিতে বেদনাভার।"
পতি ক'ন, "তবু, কহিলেন প্রভু, নিজে করিবেন যাগ ;
এত শেষবার—চেষ্টা করিয়া ভাল মতে দেখা যাক্।
গুরুর দয়ায় সম্ভব সবি ; সংসার-পারাবার
উর্ম্মিবহুল অতল-অকূল—গুরু সেতু তরা'বার।"

৩

যজ্ঞেশ্বরের জাগিল করুণা, নারীর নীরব স্বরে—
কলঙ্কহারা চাঁদপারা শিশু দিলেন অঙ্ক'পরে !
কর উৎসব পুরবাসী সব, বাজা—তোরা শাঁখবাজা ;
নন্দ-ভবনে এ'ল যেন আজ বৃন্দাবনের রাজা !
ওগো ভাণ্ডারী, সপ্তাহতরে খোল ভাণ্ডারদ্বার ;
দেবমন্দিরে পাঠাও সাজিয়ে—পূজা ষোড়শোপচার।
পাঠাও ঘোষণা—সপ্তাহ ধরে' ভূস্বামী নিজগেহে
অনাথা আতুরে অন্ন যোগাবে সন্তানসম স্নেহে।"
যজ্ঞের ফলে জনমিল শিশু—শিষ্য ভাবেন মনে ;
গুরুরে তুষ্ট করেন যতনে অকাতর বিতরণে !

৪

পতি ক'ন, "প্রিয়ে, কি যাদু জানে ওকমল উপমা মুখ !
চন্দনসম স্নিগ্ধ সরস পরশে জুড়ায় বুক !
মকভূম পারা হৃদে ছিল ধরা, নয়ন খুলিতে তার
মানস লোভন শ্যাম-সুশোভন কি মরতি বসুধার !
উষা খোলে আঁখি—ওকালো আঁখির মধুর চাহনি দেখে,
ফুল হাসে—বুঝি ও রাঙ্গা ঠোটের হাসিটি অধরে মেখে,
পাখী গাহে—সেও ওসোণা মুখের মধুর কাকলী শিখে,
এরে পেয়ে যেন—কস্মু ভুলেছে ফলের বাসনাটিকে !
নন্দ-ভবন— আনন্দঘন— যাদুমণি যশোদার,
এমনি করে' কি গোকুল ভুলা'ল সোণার কাঠিতে তার ?"

৫

দুদিনের মত বর্ষ পূরিল—দেখিতে দেখিতে ; আজ,
হবে সে খোকার অন্নপ্রাশন নামকরণের কাজ !
পুরবাসী সবে মাতে উৎসবে, হরষলহরী বয় ;
বাদ্যের রবে' মুখরিত পুরী, দেশ আনন্দময় !
সুবেশ-ভূষিত যুবকেরা ঘোরে হাসিমুখে দলে-দলে ;
শিশুরা হাসিছে পান্তুয়া পেয়ে সুকোমল করতলে,
কেহ কাঁদে—কেহ সন্দেশ তা'র করে হেসে লুণ্ঠন,
যুবতীরা হাসে—চাঁদ মুখ হ'তে খুলি অবগুণ্ঠন ;
অঙ্গে জ্বলিছে স্বর্ণাভরণ, হাসিতে দুলিছে দুল,
সে হাসি-লহরী পেয়ে যেন পুরী মধুরসে মশ্‌গুল !
বঙ্গভবনে আনন্দ আজো— বঙ্গললনা বুকে ;
হাসো বালা আরো— বাঁচুক বাঙ্গালী হাসিটি হেরিয়া মুখে !

৬

শেষ হোম-আদি পরে, যথাবিধি অন্ন ছোঁয়ায়ে মুখে,
আদর করিয়া শিবাতনয়ে গুরু লইলেন বুকে !
দু'টি হাতে তাঁর গলাটি জড়ায়ে হেসে খোকা শতকুটি,
ঘুমঘোরে শেষে মুদিল আরামে অবশ নয়নদু'টি।
বুকে ধরে তা'য়—রতনজড়িত ক্ষীণ সে ক্ষুদ্র কায়—
কোলাহল হ'তে চলিলেন গুরু—বহে যেথা মৃদুবায়—
দূর উপবনে—সরসীর তীরে—অতি নিরজন ঠাঁই ;
নয়ন তুলিয়া দেখেন চাহিয়া—কেহ কোনদিকে নাই।
উঠে দূরে শুধু মহাকোলাহল—করে যে-যাহার কাজ ;
জমিদার-জায়া প্রজাগণে নিজে ভোজন করান আজ !
হীরকে-হিরণে ঝলমল শিশু ঘুমায় অঙ্ক পরে,
ভাবেন বিপ্র—"মেয়ে বিয়ে দিয়ে নিত্যঅভাব ঘরে ;
আরো দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা—সংযোগ বিধাতার ;
পাঁচহাজারের উপরে হবে এ জড়োয়া অলঙ্কার,
কে জানিবে—আমি নিয়েছি বলিয়া ; নির্ব্বোধ জমিদার ;—
মেয়ে-বিয়ে বলে' চেয়ে তার কাছে, বেশী কি পাইব আর ?"

৭

ঘনিয়ে আসিছে চারিধার হ'তে নিশীথ-অন্ধকার !
বহুক্ষণপরে, অন্তঃপুরেতে এসে কন্ জমিদার,
"খোকন্ কোথায় ?—প্রজাগণ মম চাহে দরশন তার।"
'খোকা কোথা ?'—তাহা কেহ নাহি জানে, কেহ দেখে নাই আর !
খোঁজ্ খোঁজ্ সবে—মাণিক-মুকুতা বিজড়িত কলেবরে,
কোথা সবাকার নয়নানন্দ—আলোক আঁধার ঘরে !
ক্ষীণ-জ্যোছনায় সহসা সুদূর পানাপুকুরের জলে,
পাওয়া গেল তার মৃত তনুখানি—ঘন শৈবাল-দলে !
কোমল কণ্ঠে হার ছিঁড়ে নিতে রুদ্ধ হয়েছে শ্বাস—
দারুণ কঠিন কর-নিপীড়নে হ'য়েছে সর্ব্বনাশ !
নিমেষে নীরব উৎসব রব - বিপুল অলঙ্কার-
লোভে কে, হায় রে, নিষ্ঠুর হেন—পরাণ হরিল তার !
জনৈক ভৃত্য ছুটে এসে কহে, "আমি দেখিয়াছি তায়—
যার তরে হেন অভিষেক-ক্ষণে রাম-বনবাস, হায় !
গুরুদেব—প্রভু, দেখিয়াছি আমি—আঁধারে অঙ্গঢাকি',
নৌকা খুলিয়া যান্ পলাইয়া, গহনা লুকায়ে রাখি !"
"হা গুরু !"—বলিয়া পড়িল ঢলিয়া মূর্চ্ছিতা শিশুমাতা—
"সব নিয়ে, কেন প্রাণে বাচালে না ?—তুমি যে তনয়দাতা !"

৮

ফুলসুকুমার তনু তনয়ের করিয়া ভস্মশেষ—
ফিরিলেন ঘরে জমিদার, হায়, ধরিয়া সতীর বেশ !—
"বিপুল বিত্ত—তাহার অর্দ্ধ লিখ গুরুদেবনামে ;
অপর-অর্দ্ধে দরিদ্রসেবা হোক্ মোর বাসধামে !
গুরুদেবে দিব বিত্ত, তিনি যে করে'ছেন উপকার—
মরশিশু কেড়ে—এঁকেছেন বুকে চির শিশু যশোদার !
উঠ প্রিয়তমে ! এস মোর সনে, মুছে ফেল মনোদুখ—
বৃন্দাবনেতে হেরিবে তোমার হারা-খোকনের মুখ !
মরমানবের মায়ায় মোহিলে এমনি বিপদ হয়,
অল্পব্যথায় এই কথা ক'টি বুঝালেন দয়াময়।
ভুলিওনা, প্রিয়ে, মর্ত্তদেবতা হিন্দুর গুরু—সব
দুঃখ পালাবে, লাজে নতশিরে, মনে মানি, পরাভব !
যজ্ঞের শিশু, যজ্ঞেশ্বরের অঙ্কে পেয়েছে ঠাঁই—
চেয়ে দেখ, প্রিয়ে, পরাণ খুঁজিয়া—আর ত অভাব নাই !"

একান্ত পিয়াসী

[শ্রীলীলা দেবী]

হে সুদূর ! হে চির সুদূর !
পাগল ঝড়ের মত ক্ষিপ্ত মোর হিয়া—
তোমা তরে দশদিকে উঠিছে ভাসিয়া
মর্ম্মগান বিরহ বিধুর।
হে অনন্ত অসীম বিপুল !
অন্তর অবোধ মোর, সে তোমারে চায়
বাঁধিবারে ক্ষুদ্র তার প্রেমের সীমায়—
ওষ্ঠ তার ক্রন্দন আকুল !

হে বন্ধু, হে দুর্লভরতন !
সিক্ত বায়ে এ কুন্তল উড়ে বারংবার
মনে পড়ে নিকুঞ্জের কেতকী-সম্ভার
কদম্বের বাস অতুলন।
হে নবীন, হে চিরসুন্দর !
তোমার বেণুর তান যেন আসে ভাসি—
বিক্ষুব্ধ, প্রলুব্ধ হিয়া—একান্তপিয়াসী
শুনিবারে চরণ নূপুর !

দিবা-স্বপ্ন

[পরলোকগতা সুশীলা সেন]

রাজা

রাজ-প্রাসাদের নিভৃত সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে রাজা সুপ্তিতে শয়ান, রহিয়াছেন। বাহিরে শ্রাবণের অন্ধকার-আকাশ, আপনার ঘন মেঘাবরণের অন্তরালে, আগন্তুক উষাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।—শুধু, কোথা হইতে একটা পাখী, নিবিড় অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলই ডাকিয়া উঠিতেছিল; সেই স্বরে রাজার সুখতন্দ্রা টুটিয়া গেল। সারারাত বৃষ্টি হইয়া বাহিরে যেন শীতের হাওয়া দিয়াছে। তন্দ্রাতুর রাজা নিজের আতপ্ত কোমল গাত্রাবরণখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। অদূরে, রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে, নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সুপ্তপ্রায় রাজার কর্ণে সে স্বর যেন কোন এক চিরজ্যোতির্ম্ময় প্রভাতের পুষ্প সৌরভ-গীতি বহন করিয়া আনিতে লাগিল—যেন সে আনন্দময় প্রভাতের আলোকধারার ক্ষয় নাই, শেষ নাই। নব-জীবনের নির্ম্মল উৎস যেন সে আলোক হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনা, একটা বিফলতা, রাজার রুদ্ধবক্ষে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। শিয়রের গবাক্ষ-পথদিয়া আর্দ্র-শীতল প্রভাতের বায়ু রাজার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিয়া গেল; রাজা আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

তখন—রাজা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। যেন, তিনি তাঁহার অমাত্যগণ সঙ্গে লইয়া মৃগয়ায় গিয়াছেন। বনের মধ্যে বেলা পড়িয়া আসিতেছে; শ্রান্ত রাজা, মৃগয়া সমাপ্ত করিয়া, একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন; সঙ্গীগণ গৃহে ফিরিবার উদ্যোগে ব্যস্ত। বসিয়া বসিয়া রাজার ভাল লাগিল না, তিনি বেড়াইতে চলিলেন। কিছুদূরে গিয়া দেখিতে পাইলেন, অরণ্য-প্রান্তে বালুতট ধূ ধূ করিতেছে, এবং সেই বালুকাস্তূপের উপরে একটি নয়ন-মনোহর সৌধচূড়া। অঙ্গে তাহার কত শিল্প, কত কারু-কার্য্য, কত না রত্ন-মণি! শুভ্র মর্ম্মর-সোপানাবলীর উপরে কারুকার্য্যখচিত রজতসিংহদ্বার। রাজা দ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন—চারিদিকে মণি-মাণিক্য ঝলমল করি-তেছে। দেখিলেন, নিভৃত-কক্ষ মধ্যে ঢুকিবার আর একটি দ্বার রহিয়াছে। রাজা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া চমকিয়া উঠিলেন!—একি অন্ধকার! এ কি জীর্ণতা ইহার মধ্যে? বহু বহুদিনের পুরাতন, মলিন ধূলা সেথায় জমিয়া আছে। একটি প্রদীপও কেহ রাখিয়া যায় নাই। বাহিরের মুক্ত আকাশের আলোক-বায়ু এখানে চিররুদ্ধ; রূপরসগন্ধ-ময়ী বিশ্ব-প্রকৃতির কোন সাড়া সেখান হইতে পাওয়া যায় না। শূন্যরুদ্ধঘরে দাঁড়াইয়া রাজার বুকের ভিতরটা যেন হা হা করিয়া উঠিল। রাজা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই-লেন। গৃহ-বাহিরের মণি-মাণিক্য-বিভূষিত রূপ আবার তাঁহার চক্ষে পড়িল—যেন তাঁহার মনে হইল, মণিগুলি হইতে রক্তাভ জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—যেন অসংখ্য লোকের দেহের শোণিতধারা দিয়া সেগুলি রচিত!—রাজা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সেখান হইতে দূরে দূরে সরিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে সহসা পথের মধ্যে কোথা হইতে দক্ষিণবায়ু সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্পদলের সৌরভবার্ত্তা রাজার কাছে দিয়া গেল!—কোথায় রে কোথায়? কোন্ "কুঞ্জ-বনে, কোন্ নিভৃত গহনে"র মধ্যে ফুল ফুটিয়াছে?—আনমনে রাজা সেই দিকে চলিলেন। সহসা দেখিলেন, পথপ্রান্তে

রাজা দেখিলেন—একটি নয়নরঞ্জন সৌধচূড়া

প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির মধ্যে, অমল-ধবল একখানি গৃহ। রাজা কাছে সরিয়া আসিলেন। দেখিলেন—কালের নির্ম্মম হস্ত তাহার শুভ্র-সুগঠিত অঙ্গে হাত বুলাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই জীর্ণতা ও ক্ষয়ের চিহ্নের উপরে আকাশের শুভ্রকিরণ যেন অভ্যন্তরের আর কোন্ শুভ্রতাকে জাগাইয়া তুলিতেছে! রাজা দেখিলেন—গৃহখানির চারিদিকে অবারিত দ্বার—যেন সকলকে আহ্বান করিতেছে। একটি দ্বার দিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কি এক সম্ভ্রম ও ভক্তিতে তাঁহার হৃদয়পূর্ণ হইয়া গেল: রাজা পাদুকা খুলিয়া বাহিরে ফেলিয়াছিলেন। ভিতরে গিয়া তিনি কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনি বর্ণনা করিতে অক্ষম—যেন তাহা সকল ভাষা ও বর্ণনার অতীত কিছু! তাঁহার মনে হইল, বাহিরের আলো এবং শোভা সেথায় আসিয়া যেন প্রাণ পাইয়াছে—তাহারই মধ্যে একটি শুভ্র শতদল ফুটিয়া আছে।—ধ্বংস নাই ক্ষয় নাই, জরা নাই, মরণ নাই!—কোন্ অফুরন্ত প্রাণের দেশ হইতে অনন্ত প্রাণস্রোত নিরন্তর সেখানে বহিয়া আসিতেছে, এবং সেই প্রাণময় আলোকময় বায়ুতে নিভৃতকক্ষের কমলদলগুলিকে প্রতিদিন নব-শোভায় সৌরভে ফুটাইয়া তুলিতেছে;—যেন তাহার প্রাণেরও শেষ নাই—ফোটার শেষ নাই! কোথা হইতে এ ফুল ফুটিল? রাজা নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিন্দু বিন্দু রক্ত কে যেন পুষ্পমূলে সিঞ্চন করিতেছে।

রাজা আত্মবিস্মৃত ব্যাকুলহৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন—"এই ত আমার গৃহ। এই পবিত্র শীতল ছায়ে আমি চিরদিন থাকিব।" কথা শেষ না হইতেই, আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং সেই গর্জ্জন-ধ্বনির মধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে—"রাজা এ গৃহ তোমার নয়। যে রত্নমণ্ডিত গৃহ পূর্ব্বে দেখিয়া আসিলে, সেই ত তুমি! তাহার অভ্যন্তরের শূন্যতা তোমারই হৃদয়ের ছবি।"

নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর এ কার হৃদয়ের ছবি?"

মেঘগর্জ্জনে আবার ধ্বনিত হইল—"বৎস! ইহ এক চিরভিখারী যোগীর আত্মা!"

রাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আমাকে এই আত্মার অধিকারী কর! এখানে আমাকে থাকিতে দাও! আমি সেই শূন্য রাজ-প্রাসাদ চাহি না।" ঘনগম্ভীর নাদে গৃহকম্পিত করিয়া মেঘ আবার ডাকিয়া উঠিল; "রাজা

সেই শব্দে চমকিত হইয়া নিজের শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন।

তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে; পাণ্ডুর আকাশে বিদ্যুৎরেখা চমকিয়া উঠিতেছে এবং মেঘের অন্তরাল দিয়া অস্পষ্ট প্রভাত-রবির একটু ক্ষীণ কিরণলেখা তাঁহার শয়ন-কক্ষের শুভ্র মর্ম্মরফলককে প্রতিফলিত হইয়াছে।

নিত্যপ্রথামতে রাজ-কিঙ্কর রাজবেশ লইয়া দ্বারে আসিয়া দাড়াইল; কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, রাজা তখনও শয্যাপ্রান্তে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! এবং আরও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাহাদের রাজার কঠিন শুষ্ক নেত্র-প্রান্তে একফোঁটা অশ্রু ঝকঝক করিতেছে!

পথের পথিক

সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া এক ব্যক্তি কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে ফিরিতেছিল। জনকোলাহল এবং শকট চক্রের শব্দে নগরের পথ মুখরিত। পথিক দেখিল, সকলেই আপন-আপন অভিপ্রায় লইয়া চলিয়াছে, কেহ বা নূতন আশার রঙ্গিন জাল বুনিতে-বুনিতে চলিয়াছে, কেহ বা নিরাশার ছিন্ন গ্রন্থি আবার আশার সূত্র দিয়া গাঁথিয়া-গাঁথিয়া চলিয়াছে। সকলের মুখেই নানাস্বার্থ অভিগামী বাসনার বিচিত্র প্রকাশ এবং তাহার উপরে দিবাবসানের শান্তিপূর্ণ সকরুণ ম্লান-আলোক যেন একটী অন্তহীন বিষাদ ছায়ায় মণ্ডিত করিয়াছে।

কোলাহলপূর্ণ নগর পরিত্যাগ করিয়া, পথিক একটী প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। দুইধারে ধানের ক্ষেত, মাঝখান-দিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ দূরতর গ্রামের দিকে গিয়াছে। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইয়া, পথিক আশ্রয় অন্বেষণ করিল। দেখিল পথিপার্শ্বে বহু-পুরাতন একটী গৃহের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে ভাঙ্গা দেওয়ালের মৃত্তিকা-স্তূপ—কীটদষ্ট দরজা-জানালার ভগ্নাবশেষ—বহুপুরাতন দিনের মনুষ্যাবাসের সুখ-দুঃখময় জীবন-যাত্রার সাক্ষ্য দিতেছে; এবং তাহার মধ্য হইতে একটী অশ্বত্থগাছ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার নবপল্লবিত সতেজ-নবীনতা যেন চারিদিকের জীর্ণতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। পথিক ভগ্নগৃহভিত্তির উপরে উঠিয়া বসিল। দেখিল—কেহ কোথাও নাই, কেবল প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে; চারিদিক নিস্তব্ধ, নিবিড় শান্তিতে পূর্ণ। ধানকাটা শেষ হইয়াছে, পরিত্যক্ত জনহীন মাঠগুলি সম্পদচ্যুত দরিদ্রের মত পড়িয়া আছে এবং তাহার উপরে অস্তগামী-সূর্য্যের আলোক, সুগভীর স্নেহ-ধারার মত, ঝরিয়া পড়িয়া যেন তাহার সকল তাপ জুড়াইয়া দিতেছে। ভাঙ্গা-দেওয়ালে ঠেস দিয়া পথিক শুনিল, গৃহগামী পাখীদের শেষ কাকলী আকাশের কোলে মিলাইয়া গেল। শ্রান্তপথিক, দুই জানুর মধ্যে মাথা রাখিয়া, বহুদিনের কথা ভাবিতে লাগিল; তাহার হৃদয়, যেন অপরিসীম অবসাদ-ভারে, নুইয়া পড়িল; তাহার মনে হইল, তাহার শান্তি যেন ঐ অনন্ত-প্রসারিত আকাশের মতই চিরপুরাতন এবং অন্তহীন।

ভাবিতে ভাবিতে পথিক কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারিল না।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে এক স্বপ্ন দেখিল।—যেন সে এক নিবিড় অরণ্যে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার শরীর শ্রান্ত হইল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল; তবুও সে কোনও পথ পায় না। অরণ্যের বিরাট্ গম্ভীর শোভা তাহার হৃদয়ের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তির সংবাদ বলিতে লাগিল; কিন্তু সে শান্তিতে তাহার হৃদয় জুড়াইল না। চারিদিকে সুপক্কফল-শোভিত শ্যামল বৃক্ষরাজি, যেন ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, তাহাকে নীরবে আহ্বান করিতে লাগিল। পথিক, একটী ফল লইয়া নিজের শুষ্কমুখে তুলিয়া দিল। কিন্তু কই? তাহার তৃষ্ণা ত ঘুচিল না!—অধীর, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সে অরণ্যের একপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বনের ঘন-অন্ধকার সেখান হইতে ঈষৎ বিরল হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু দূরে প্রাচীরের মত কৃষ্ণাভ বনরেখা আকাশপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। পথিক বুঝিতে পারিল, ইহার মধ্যে নদী আছে; ওপারের তটভূমির উপরে গাছের সারি দেখা যাইতেছে। পথিক নদীর দিকে চাহিল। দেখিতে পাইল, সম্মুখেই দুই উচ্চ তটের মধ্যে স্বল্পতোয়া, খর স্রোতা, নৃত্য-লীলাময়ী এক ক্ষুদ্র নদী। তাহার হর্ষ-আকুল কুলকুল-ধ্বনি—অবিরাম অপ্রতিহত—উদ্দামগতি, আপনার আনন্দে আপনি বিভোরভাব—পথিকের হৃদয়কে কি যেন প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতে লাগিল। নিজের শ্রান্তশরীর বালুতটের উপর এলাইয়া দিয়া, হাতের উপর মাথা নত করিয়া, সে আপন মনে নদীর উচ্ছ্বাস শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সহসা তাহার মনে হইল, নদীর কলগুঞ্জন

যেন ভাষা পাইয়াছে—যেন সে পথিককে ডাকিয়া কি বলিতেছে! মধুর কলকণ্ঠে সে যেন জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক! শ্রান্ত পথিক! তুমি কি খুঁজিতেছ?" পথিকের রুদ্ধবক্ষে অশ্রুবেগ উথলিয়া উঠিল; সে মৃদুস্বরে কহিল—"আমি 'প্রতিদান' খুঁজিতেছি।"

নদী কহিল, "প্রতিদান?—কিসের প্রতিদান?"

পথিক, মস্তক তুলিয়া, তীব্রকণ্ঠে কহিল—"কিসের?—জিজ্ঞাসা করিতেছ 'কিসের'?—পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ! এখানে কেহ কি তাহার দানের প্রতিদান কখনও পাইয়াছে? নিষ্ঠুর,—নিষ্ঠুর এ জগৎ! দেখ, আমি কি না দিয়াছি! যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে আমার সমস্ত দিয়াছি! আমার সমস্ত জীবনের সব দুঃখ, সব সুখ, সকল সাধনার ধন তাহাকে দিয়াছি—নিজের জন্য কিছু রাখি নাই—চাহি নাই; কিন্তু সে তাহা চিনিল না, দেখিল না। প্রেমের নৈবেদ্যে, ডালি পরিপূর্ণ করিয়া সাজাইয়া, তাহার পূজা করিলাম; কিন্তু তাহার হৃদয় আমি পাইলাম না!" বলিতে বলিতে আবেগভরে থামিয়া পড়িল; নিস্তব্ধ বনভূমিতে আবার নদীর অশ্রান্ত সঙ্গীতধারা জাগিয়া উঠিল!—যেন সে অপরিসীম দয়া-স্নেহে বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, "দুর্ভাগা পথিক! বল, তোমার জীবনের কথা আমাকে বল।" স্নেহস্বরে আশ্বাস পাইয়া, পথিক বলিতে লাগিল, "সে আমাকে চিনিল না; সেই দুঃখ হৃদয়ে লইয়া আমি পথে বাহির হইলাম। ভাবিলাম আমার এই তুচ্ছজীবন আমি জগতের কাজে দান করিব। দীন-দুঃখীর ঘরে ঘরে গিয়া, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে লাগিলাম; কঠিন পরিশ্রমে অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া, সেই অর্থ দরিদ্রকে দান করিলাম। ভাবিলাম, আমার জীবন দিয়া তাহাদের দুঃখের জীবন কিনিয়া লইব। পৃথিবীময় ঘুরিলাম; কিন্তু, হায়! কি দেখিলাম!—কেবল স্বার্থ!—স্বার্থ! মানুষ কেবল নিজেকে লইয়াই আছে! হায়! আমার অন্তরের গোপনে যে ক্ষতটি ছিল, তাহা জুড়াইল না; কেবল বারবার তাহাতে আঘাতই লাগিল। দারুণবেদনা লইয়া আসিয়াছি, হে নদি! তুমি কি আমার এ বেদনা দূর করিতে পার!"

আগ্রহ-ব্যাকুলকণ্ঠে নদী কহিল, "পারি, পথিক, পারি।"

সেই গভীর-আশাপূর্ণ সান্ত্বনাবাণী শুনিয়া, পথিকের চক্ষু উছলিয়া উঠিল।

"এস, পথিক! আমাকে বহুদূরপথ যাইতে হইবে। যাইতে যাইতে আমি তোমাকে আমার কথা শুনাইয়া যাইব।"

পথিক উঠিল; নিস্তব্ধ নদীতট বাহিয়া স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিল—দূরে পরপারের ছায়াময় বৃক্ষ-শ্রেণী হইতে একটা অজানা পক্ষী মধুরকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল।

সজল—কোমলকণ্ঠে নদী কহিতে লাগিল, "বৎস! আমার জীবনের কথা শুনিবে কি? এক মহাকায় পর্ব্বতের পাষাণবক্ষভেদ করিয়া আমি জন্মলাভ করিয়াছিলাম। যেদিন প্রথম এই আকাশের আলো দেখিলাম, পাখীদের আনন্দ আহ্বান শুনিলাম, মনে হইল—ধন্য আমি! এমন সুন্দর জগতে জন্ম পাইলাম। আনন্দে অধীর হইয়া, পৃথিবীর বক্ষে আমি ঝরিয়া পড়িলাম; কঠিন মাটির বুক দ্রব করিয়া দিয়া, আমি ছুটিয়া চলিলাম। তারপর, কত পথ, কত কঠিন শিলাময় বাধা, আমি অতিক্রম করিয়াছি। এই সুন্দর ধরণীকে ভালবাসিবার, সেবা করিবার একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা আমাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিল। আমাকে দেখিয়া কত লোক কাছে আসিল; আমার তীরে তাহারা ঘর-বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। আমি, তাহাদের অঙ্গ শীতল করিলাম, তৃষ্ণা দূর করিলাম, তাহাদের ঘরের আঙ্গিনা ধনধান্যে পূর্ণ করিয়া দিলাম; তাহাদের যত রোগ-বালাই, যত আবর্জ্জনা, সব তাহারা আমারই বক্ষে ফেলিতে লাগিল। তাহাদের সকল অস্পৃশ্য-মলিনতা আমি, গ্রহণ করিয়া, আমার বালুকা-ধারায় শোধন করিয়া লইলাম এবং আমার বক্ষের নির্ম্মল শোণিত দিয়া তাহাদের পালন করিতে করিতে চলিলাম। এইরূপে পথ বাহিয়া আসিলাম; কিন্তু কাহাকেও আমি ধরা দিলাম না। এই দুই-তীরের প্রত্যেক বৃক্ষটিকে আমিই বাড়াইয়া তুলিয়াছি; তাহাদের শাখে যতগুলি পাখী আসিয়া বসে, তাহারা কেহই আমার অপরিচিত নহে। আমার দুই-তীরের যত গ্রাম-নগরের সকল পুত্রকন্যারাই, আজন্ম-মরণ আমার স্নেহধারা লাভ করিয়াছে। আমি তাহাদের নিকট কিছু চাহি না। তাহাদের রোগ-ব্যাধি-জঞ্জাল আমি বক্ষে লইতে পারিয়াছি—ইহাতেই আমার সুখ।"

পথিক শুনিতে শুনিতে চলিল। করুণাবিগলিত স্নেহ-কাহিনী শুনিয়া, সে কিছুক্ষণের জন্য নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নদীর সহিত বহুদূরে সে

আসিয়া পড়িয়াছে। এখন নদীর আর সে ক্ষীণমূর্ত্তি নাই; পরপারের তটরেখা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; বিপুল বিক্রমে নদী সাগরসঙ্গমে ধাইয়া চলিয়াছে।

সকলের পরিচিত ছোট নদীটি, সকলকে ছাড়িয়া আজ কোথায় চলিল? একটা অব্যক্ত-বেদনায় পথিকের বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "নদি! তোমার কাহিনী শেষ করিলে না? ভালবাসিয়া, নিজের জীবন সকলকে দান করিয়া, এখন কোথায় চলিলে?"

মেঘমন্দ্র তরঙ্গনাদের মধ্যে সে দূর হইতে দ্রুত-প্রস্থান-পর নদীর কলকণ্ঠ শুনিতে পাইল, "বৎস! আমার জীবনের চরম-পরিপূর্ণতার মধ্যে আমি চলিয়াছি— ক্ষুদ্রধারা অনন্ত-ধারায় মিশিবে। আমার এই ক্ষুদ্রপ্রাণ দান করিয়া আমি আজ অনন্ত-প্রাণ লাভ করিতে চলিলাম।"

পথিক ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হে নদি! পৃথিবীতে তোমার এত প্রেম তুমি দান করিলে, তাহার সার্থকতা কি হইল? আমাকে বলিয়া যাও!"

সাগর-যাত্রী নদী উত্তর করিয়া গেল, "ঐ যে গ্রামে, প্রান্তরে, নগরে, আমার জলধারা রখিয়া আসিয়াছি, তাহাই আমার সার্থকতা। বৎস! নিজেকে দান করিয়াই আমি সার্থক হইয়াছি, প্রতিদান চাহি না।"

পথিক স্পন্দহীননেত্রে জলস্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল। নদীর শেষ-কথার প্রতিধ্বনি তরঙ্গে-তরঙ্গে, আকাশে-বাতাসে, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! দূরে—বহুদূরে একটী সুপ্তোত্থিত পাখী হর্ষ-উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সহসা সেই ধ্বনিতে যেন সায় দিয়া উঠিল।

সেই শব্দে পথিকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিল, রাত্রি শেষ হইয়াছে। উর্দ্ধে, পূর্ব্বাকাশ যেন নব-দিবসের আসন্ন-জন্মদান-উদ্বেগে পাণ্ডুর হইয়া আছে; এবং নিম্নে, সকলের পদতলে, নিশার শিশির বক্ষে লইয়া ধরণীতল, বাহু বাড়াইয়া, যেন নিজেকে দান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

দেখিয়া, বহু—বহুদিন পরে পথিকের শুষ্ক নয়ন করুণার অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; বহু—বহুদিন পরে তাহার মনের দুঃখসহ শ্রান্তিদূর হইয়া গেল। সে নতমস্তকে বলিয়া উঠিল, "নিজেকে দান করিয়াই আমি সার্থক হইয়াছি; প্রতিদান চাহি না।"

অভিভাষণ

[স্বর্গীয়া কুমারী প্রতিভা দত্ত]

মাতৃরূপে, কন্যারূপে, ভগ্নিরূপে, সখিরূপে
　　কি স্নেহের ডোরে,
বাঁধিয়াছ, হে সুন্দরি! জগতের অনাদৃত
　　অভাগিনী মোরে।
বিশুষ্ক মরুর মত আমার নিকটে, সখি!
　　ছিল এ ধরণী,
বুলায়েছ নয়নে কি অপূর্ব্ব তুলিকা তুমি,
　　হে মোর মোহিনি!
আমার জীবনকুঞ্জে নবীন বসন্ত তুমি—
　　ভ্রমরঝঙ্কার,
স্বরগের পারিজাত, পূত মন্দাকিনীধারা—
　　কুসুম-সম্ভার।
চাঁদিমা-জ্যোছনা তুমি—শীতল মলয়া—আর
　　বাঁশরীর তান,
দোয়েল, চাতক, শ্যামা, চন্দনা, ডাহুক, টিয়া—
　　কোকিলের গান।
স্নেহের সরসীস্নিগ্ধ ভালবাসা-প্রবাহিনী—
　　অতীতের কথা,
শৈশবের চিরপ্রিয়, চিরসুখময়ী সেই
　　পিরিতির ব্যথা।
সুমধুর সপ্তস্বরা-সেতার-এস্রাজ—আর
　　মধুভরা বীণা,
সকলি আমার তুমি, আমি শুধু চিরদিন
　　তব স্নেহাধীনা।

কবি ও দার্শনিক

[শ্রীফুলকুমারী গুপ্ত]

মহান্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরসে যাহার হৃদয়বিগলিত হইয়া যায়, যিনি প্রতিপদে ভাববন্যায় প্রবাহিত হইয়া—ভাবসাগরের ভাবুক হইয়া—ভাষার সাহায্যে তাহাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন, সুধিসমাজে তিনিই কবি আখ্যা লাভ করেন। কবির পক্ষে শুধু বাহিরের সৌন্দর্য্যই পর্য্যাপ্ত নহে—অন্তররাজ্যেও তাঁহার প্রবেশ করা আবশ্যক ;—অর্থাৎ, বস্তু বা রূপ ছাড়িয়া, তাঁহাকে বস্তুত্বে আসিতেও হয়। এই অবস্থায় আসিতে হইলে, সকলের সহিত সমান সমানুভূতিতে অবস্থান করিতে হয় ; সমানুভূতির গুণে সকলের সুখ-দুঃখ ও ভাব-অভাব আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কবিকে, এই অবস্থায় আসিতে হইলে, প্রথমে বাহ্যজগতের চন্দ্র-সূর্য্য-জল-বায়ু-আকাশ-অবনী-প্রভৃতি বস্তু—ও তাহাদের রূপ-রাজ্যে অবস্থান করিয়া, ক্রমশঃ জীবজগৎ, ও তৎপরে মানবজগতে আসিতে হয়। বাহ্যজগতের কেন্দ্রস্থানে মানব অবস্থিত ; এজন্য বাহ্যসংসারের জলস্থল, আকাশ-অবনী প্রভৃতিতে যাহাকিছু শোভা ও সৌন্দর্য্য আছে, তৎসমুদয় একা মানবদেহে দেখা যায় ; আর মানবের অন্তরে অন্তররাজ্যের গুণগরিমা-পরিপূর্ণ থাকে। যে কবি, প্রকৃত কাব্যতুলিকায়, বাহিরের প্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও অন্তরের দোষগুণযুক্ত বৃত্তি-বিমণ্ডিত একটি পরিপূর্ণ মানব-অঙ্কিত করিয়া, লোক-সমাজে উপহার দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবিনামের যোগ্য। বিধাতৃসৃষ্টির চরমোৎকৃষ্ট বস্তু—মানব। সৃষ্টির সকল ছন্দ ও কবিত্ব মানবে আসিয়া একীভূত হইয়াছে ; তাই, প্রাকৃত গুণ ও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মানব-রচনায় যে কবির লেখনী সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এমন কবিই মানবসংসারে অমরের পদলাভ করেন। শুধু রূপমুগ্ধ হইলে, প্রকৃত কবি হওয়া যায় না। কবি হইতে হইলে, প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইতে হয়। প্রকৃতির প্রকৃত উপাসক হইলে, তবে প্রকৃত কবিত্বসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারা যায়।

কবিকে যেমন—ভাবসাধন করিতে করিতে—প্রকৃতির স্তর অতিক্রম করিয়া, অন্তর-রাজ্যে আসিতে হয়, দার্শনিককেও তেমনি—তত্ত্ব, অর্থাৎ প্রাকৃতজ্ঞান, সঞ্চয় করিতে করিতে-অন্তররাজ্যে আসিতে হয়। দার্শনিক ও কবি, উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য একই ; তবে উভয়েরমধ্যে প্রভেদ এইমাত্র যে—একজন, ভাববশে সর্ব্বত্রই আপনাহারা, অন্যজন, সর্ব্বক্ষণই তত্ত্বজ্ঞানে—আমি-জ্ঞানে—জাগরিত, জাগরিত ও মোহিত !—উভয় গুণীর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। কবি ভাববশে প্রকৃতির সকলসম্পদই ভোগ করেন ; কিন্তু কোনখানেই প্রকৃত 'আমি' জ্ঞান তাঁহার অক্ষত থাকে না ; দার্শনিকের সর্ব্বত্রই তাহা পূর্ণমাত্রায় থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চয়ই যখন দার্শনিকজীবনের উদ্দেশ্য, তখন কবির ন্যায় ভাববাহুল্য কোথাও তাঁহার শোভা পায় না। কবিকে সাধুগণ—প্রাকৃতশিশু বলেন ; অর্থাৎ, প্রকৃতির অঞ্চল ধরিয়া, মাতৃগতপ্রাণ শিশুর ন্যায়, কবি সততই প্রকৃতির কোলে অবস্থান করেন ও সুখ দুঃখে বিপদ-আপদে কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন ; তাই শিশুর সহিত কবির তুলনা। আরও, শিশু যেমন—নিয়ত মাতৃ-সন্নিধানে থাকিলেও—অজ্ঞানতাবশতঃ মাতৃতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কবি তেমনি, তাঁহার সমুদয় হৃদয়াবেগ কবিতাপুঞ্জে নিয়ত প্রকৃতিজননীর চরণযুগলে অঞ্জলি প্রদান করিয়াও, ভাবাধিক্যে কখন তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু দার্শনিকের সহিত, প্রকৃতির সম্বন্ধ অন্যরূপ ; অর্থাৎ, পতি ও পত্নীর মতন ;—পতি যেমন পত্নীর অন্তরবাহির, সমুদয়বিষয়, জ্ঞাত থাকিয়া, তাঁহার সহিত প্রাণে প্রাণে বিনিময় হইয়া, একাত্ম হইয়া যান, প্রকৃতির সহিত দার্শনিকের সেইরূপ গূঢ় সম্বন্ধ। তত্ত্ব-

প্রধানা প্রকৃতির তত্ত্বই নিগূঢ় বস্তু; দার্শনিক এই তত্ত্বকেই সম্বল করেন বলিয়া, তাঁহাকে প্রকৃতির পতিপদ প্রদান করা হয়। প্রকৃতিকে লইয়া উভয়েরই কারবার; তবে, উভয়ের মধ্যগত অবস্থা-পর্য্যালোচনা করিয়া, সুধিগণ উভয়কে প্রকৃতির সহিত এইরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন। দার্শনিক, তত্ত্বের ভিতর হইতে, সজ্ঞানে প্রকৃতির সহিত আলাপন করেন; আর কবি, ভাবে উন্মাদ হইয়া, প্রায় অজ্ঞানবস্থায়ই প্রকৃতির পরিচর্য্যা করেন। এইসব দেখিয়া-শুনিয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে—তত্ত্বই যখন প্রকৃতির শেষ-পর্য্যায়, ভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে সেই শেষতত্ত্ব পর্য্যায়ে গিয়াই যখন বিশ্রাম করিতে হয়, তখন তত্ত্বপ্রিয় দার্শনিকই যথার্থ কবি নাম পাইবার যোগ্য। কারণ, শুধু ভাববশে থাকিলেই প্রকৃত কবি হইবার উপায় নাই; কবি হইতে হইলে, প্রাকৃতিক ছন্দনীতির অনুসরণ করিতে হয়। যে মহাছন্দ ধরিয়া এই মহাবিশ্ব নিয়মিত হয়, যাহার তাল ধরিয়া রবি-শশী-তারা যথাকালে গগণমণ্ডলে উদিত হয়, জল-স্থল আকাশ-অবনী যে ছন্দের তাল ধরিয়া আপনাদের যথাকর্ত্তব্যসাধন করিয়া যায়, সেই মহাছন্দের মহানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, কেহই প্রকৃত কবিত্ব-সম্পত্তিলাভে সমর্থ হয়েন না। দার্শনিক তত্ত্ব-আলোচনা করিবার ফলে, সেই মহান্ প্রাকৃতছন্দের ছন্দনীতি ধরিয়া ফেলেন; আর কবি, ভাববশে, উহার উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ান মাত্র—প্রকৃতরূপে উহাকে ধরিতে পারা, প্রায়শঃ, সাধারণকবির ভাগ্যে ঘটে না;—যিনি ধরিয়াছেন, তিনিই যথার্থ কবি হইতে পারিয়াছেন। তাত্ত্বিক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে, কবি যথার্থই কবিনামের যোগ্য হয়েন।

সমুদয় জাগতিক বস্তুরই দুইটি করিয়া বিভাগ আছে;—একটি বাহ্যিক, ও অন্যটি আন্তরিক। কবির ভাবচক্ষু অনেক সময় অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না—কেবলই বাহির বা রূপ লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে—তাই, কবিরা, প্রায় বস্তুর বস্তুত্ব ছাড়িয়া, রূপজমোহে জ্ঞানহত হইয়া যান, এই মোহ-মদিরাই, অনেকের নিকট, কবির কবিত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইজন্যই—বিকশিত কুসুম, সুশোভন কুঞ্জবন, কোকিলের কুহুতান, ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্‌গান, চাঁদের বিমলকিরণ, রবির উজলবরণ, ইত্যাদিই প্রায় কবি-জনের কবিতার প্রাণ হয়। এ সকলই বস্তুর বহিরাঙ্গ, বা রূপ, মাত্র। যে মুহুর্ত্তে কবি, এই বাহ্যবিভাগ ছাড়িয়া, অন্তররাজ্যে বা গুণময় ভূমিতে আসিয়া উপনীত হয়েন, সেইক্ষণ হইতেই কবির দিব্যচক্ষু উন্মিলিত হয়—তিনি তখন, রূপ ও গুণযুক্ত একটি যাথার্থবস্তু-অঙ্গনে অধিকারী হইয়া, যাথার্থ কবিনাম পাইবার যোগ্য হয়েন। ফল কথা, বস্তুর স্বরূপ না জানিলে, বস্তুকে ধরিতে পারা যায় না; তাই, বস্তুজ্ঞানবিরহিত সাধারণ কবির কবিতা, প্রায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেশ কাল-পাত্র-অবস্থার অধীন হইয়া, অকালে কাব্যরাজ্য হইতে বিদায়গ্রহণ করে। একথা, এদেশের আধুনিক ও প্রাচীন কবিসমাজের তুলনা করিলেই, বেশ বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ, পূর্ব্বতন কবিরা তত্ত্বজ্ঞ থাকায়, তাহাদের কৃত কবিতা ও কাব্য আজিও সমুজ্জ্বল প্রভায় বর্ত্তমান আছে; আর, আধুনিক—শুদ্ধ ভাববিহ্বল—কবির কৃত কাব্য-কবিতা, প্রায় তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই কাব্যজগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়।

দার্শনিক, তত্ত্বপ্রাধান্যে, সর্ব্বদাই সমতালাভ করিয়া থাকেন। কবিও, ভাবসাধন করিতে করিতে, অনেক সময়, দার্শনিকের ন্যায়, সমতা-বোধ লাভ করেন; অর্থাৎ, বস্তু ছাড়িয়া, বস্তুর ভাবে ভাবিত হইয়া থাকেন। এই ভাবময় অবস্থায় আসিয়া, কবিকুল—কখন জলের ভাবে ঢেউ, চাঁদের ভাবে জোছনা, পাখীর ভাবে খেচর ও জলচরের ভাবে জলচর সাজিয়া থাকেন—ঐ সকল বস্তুর সহিত ভাববশে আপন অবস্থাও বিনিময় করিতে উদ্যত হয়েন। মাননীয় কবীন্দ্র ডাঃ স্যর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয়, এই কবিজনোচিত ভাবপ্রধান অবস্থায় উপনীত হইয়া, তাঁহার "কড়ি ও কোমল" গ্রন্থে, কখন পারাবত দেখিয়া—পারাবত সাজিয়া—তাহাদের সুখদুঃখে ওতোপ্রোতঃভাবে ভাসমান হইয়াছিলেন; আবার, কখন বা জলচরগণকে অবাধে জলমধ্যে সন্তরণ করিতে দেখিয়া, আপনাকে তাহাদের সমশ্রেণী ভাবিয়া, জলচরের জাতি সাজিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, ভাবুকদশা আগত হইলে, কবিকুলের এরূপভাব হওয়া যে অতিস্বাভাবিক—তাঁহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সমতার মূলে, তত্ত্ব না থাকিয়া, কেবল ভাব থাকায়, ইহার জ্ঞানফল যখনকার তখনই;—অর্থাৎ, পূর্ব্বে ও পরে, কিংবা অতীত ও ভবিষ্যতে, ইহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। তবে, এই সাম্যভাব কবি-হৃদয়ে কতকটা অঙ্কিত হইয়া যায় বলিয়া, অনেক কবি শেষে দার্শনিক হইয়া পড়েন। ভাবের ভাবমাত্রই কল্পনাশীল—এ কারণ, তাহা অসম্পূর্ণ; ভাবুককুলও সে কারণ ভাবেরবশে কেবল বস্তুকে ধরি-ধরি-ছুঁই-ছুঁইভাবে ধরিয়া নাড়াচাড়া করেন—বস্তুর স্বরূপতত্ত্ব ধরিতে প্রায় দেখা যায় না।' ভাবোন্মত্ত কবির কবিতা ও কল্পনা, সাধারণের নিকট উপাদেয় হইলেও, দার্শনিকের নিকট তাহা কখনই উপাদেয় হইতে পারে না। দার্শনিক, সকল বস্তুকেই, পরিপূর্ণভাবে দেখিতে চাহেন; তাই, কবির ভাবভরা কল্পনা দার্শনিকের নিকট পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কবিত্বের শেষ—তত্ত্বময় মহাছন্দ; ইহা না ধরিলে কখনও কেহ প্রকৃত কবি হইতে পারে না। তাই, যে কবি প্রকৃতির যত অভ্যন্তরে প্রবেশলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই কবি নামের তত যোগ্য হইয়াছেন;—শুদ্ধ ফল-ফুলের রূপ বা বহিরাঙ্গ লইয়া যে-কবি দুর্ল্লভ কবিজন্ম যাপন করিয়া যান, সূক্ষ্মদর্শিগণ কখনই তাঁহাকে প্রকৃত কবি আখ্যা দিতে স্বীকৃত হয়েন না। তাঁহাদের মতে প্রকৃততত্ত্বজ্ঞব্যতীত কাহারও প্রকৃত কবিহইবার উপায় নাই। এ মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে যাইলেই, বর্ত্তমান-জগতের পুরাতন শ্রেষ্ঠকবিকুলের উপর নয়ন নিপতিত হয়। ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস যে একজন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ কবি ছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যপাঠেই বুঝিতে পারা যায়। তত্ত্বজ্ঞ না হইলে, কোন কবিই কখন সম্পূর্ণ অন্তর-বাহির-সমন্বিত মনুষ্যরচনায় সিদ্ধকাম হইতে পারেন না। বাহ্যজগতের শীর্ষস্থানে মানব প্রতিষ্ঠিত; এজন্য মানবে বিধাতার সৃষ্টিনৈপুণ্য একাধারে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। এই মানবকে যে কবি, স্বীয় তুলিকায় রং-ফুটাইয়া, অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় কবিকুলের মধ্যে মহাকবি উপাধি পাইবার যোগ্য। ভারতীয় পূর্ব্বতন কবিকুল, তাঁহাদের কৃত কাব্যে, কিরূপ মানবরচনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কাব্যপাঠেই জানা যায়। তাঁহারা যে, ভাবরাজ্য ছাড়িয়া, উর্দ্ধতত্ত্ব জগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাকৃত-তত্ত্বের প্রথমভূমিতে আদিরস বর্ত্তমান; অর্থাৎ, যে যৌগিক কারবারে জগৎবিকশিত, আদিরস তাহার প্রথম সোপানে বর্ত্তমান; তাই, দার্শনিকজ্ঞানমণ্ডিত ভারতীয় কবিকুলের মধ্যে অনেকেই আদিরসঘটিত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে, ইহা দোষের মধ্যে গণনীয়, কিন্তু, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট, এই আদিরসই, রস-রাজ্যের প্রথমভিত্তি বলিয়া কথিত হয়।—তাই, কবিকুলকে প্রথমেই ইহা অবলম্বন করিতে হয়। যথার্থই, পূর্ব্বতন কবিরা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন; তাই, পুরাতন কোন কাব্যের কোথাও ধরি-ধরি-ছুঁই-ছুঁইভাব বিদ্যমান নাই। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি উইলিয়ম সেক্সপিয়রও দার্শনিকভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; তাই, তিনি আবহমানকাল জগতের মধ্যে কবিকুলচূড়ামণি হইয়া বাস করিতেছেন। ভাবের মূল—জ্ঞান; সেই জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই, কবিকুল কবিতারাজ্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে পারেন। যে-কবি প্রকৃতির সেই পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, তৎকৃত কাব্যও কদাচ স্থায়িত্বলাভ করে না—তাহা, বিশেষকালে আবির্ভূত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ হইতে বিদায়প্রাপ্ত হয়। সংসারে ইহাই চিরন্তন নিয়ম।

কবি, ভাবজগতের যে-ভাবেই তাঁহার কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হউন, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির হাতে পড়িলেই, তাহা হইতে প্রকৃততত্ত্বই বাহির হইয়া আইসে। অনেকে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে', আদিরসের আধিক্য দেখিয়া, তাহার প্রতি নাসিকাকুঞ্চিত করিয়া, তাহার অশ্লীলতা-গন্ধে আকুল হইয়া পড়েন; কিন্তু, তত্ত্বজ্ঞের হাতে পড়িলে, ঐ আদিরসই আবার পারমার্থিক রসে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—এবং সঙ্গে সঙ্গে, ঐতিহাসিকভাবের পরিবর্তে, দার্শনিকভাবেরও সমাবেশ হইতে পারে। বস্তুতঃ, পারমার্থিকতত্ত্বের প্রথম সোপানেই আদিরস বর্ত্তমান। ভারতভূমি চিরদিনই তত্ত্বপ্রধানা; এইজন্য, ইহার দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-ধার্ম্মিক-জ্ঞানী ইত্যাদি সকলেরই বিশ্রামস্থানসেই চরম পরম কেন্দ্র।

ব্যক্তজগতের আদিতে পুরুষ ও প্রকৃতির বিকাশ—এই আদিতত্ত্বের আদিলীলায় যে ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাস ভাবতরঙ্গে প্রবাহিত না হইল—যাঁহার লেখনী, সেই ভাবরসে আপ্লুত না হইল,—তাঁহার কবি নামধারণই যে অনর্থক। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞ কবিকুল, সেই জন্য, প্রায়সকলেই প্রথমে সেই আদিলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত। ইহাতে দোষ ধরিবার বিষয় কিছুই নাই; স্বভাব-জ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তিরাই ঐসকল বাক্যের দোষোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েন। ভাব ও তত্ত্ব-আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, কবি ও কবিতার মূল কোথায়, এবং কোথায় গিয়া বা কবি, কবিরাজ্যের স্থিরাসনে উপবিষ্ট হইয়া, চিরতরে কবি-নাম অক্ষত রাখিতে পারেন।

দূরের আহ্বান

[শ্রীকামিনী রায়, বি. এ.]

শ্রীকামিনী রায়

পূর্ব্বাহ্ন

উত্তর হইতে আইছে শীত,
দক্ষিণে বসন্ত গাইছে গীত,
কি মোহন ! কি মধুর !
"চল দূর—অতিদূর !"
ফেলিয়া ত্বরিতে জনম-নীড়,
মেলিয়া পক্ষ করিয়া ভীড়,
উড়িনু সকলে করি কলরব
ঊর্দ্ধে অধোতে নীল অর্ণব
সম্মুখে কাম্যপুর—
"অতিদূর—অতিদূর !'
সুনীল ব্যোম সুনীল জল,
পক্ষে পশিছে অসীমবল,
বক্ষে গীতের সুর—
"চল দূর—অতিদূর !"
হেলায় চলেছি, খেলার রঙ্গে,
বায়ুতরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গে,
পথ ঋজু, নহে ঘুর,
"শুধু দূর—অতিদূর ।"

অপরাহ্ন

শীতল পবন অতল জল,
চরণ রাখিতে নাহিক স্থল,
আসিছে আঁধার ক্রূর—
"যেতে হ'বে অতিদূর ।"
ব্যাথিয়া আসিছে পক্ষ সবল,
কই দেখা যায় বালুকা ধবল,
সীমানা লবণাম্বর ? —
"সে যে দূর —বহুদূর ।"
চালাও, চালাও চালাও ডানা,
পড়িলে মরিবে আছেই জানা,
চলিলে মিলিবে পুর—
"হয় হোক্ যতদূর ।"
পড়িছে সাগরে মরিছে ভাই ;
দাঁড়ায়ে কাঁদিব সময় নাই ;
উঠিছে তুফান প্রবলতর,
চালাও পক্ষ বাঁচ কি মর,
পাও কি না পাও পুর—
"চল আরো কিছুদূর ।"
কে ডেকে আনিলে গাও গাও
কূলের সন্ধান দাও গো দাও
আঁধার করগো দূর
পান্থ পাইবে পুর !
চপলা চমকে ধাঁধিয়া আঁখি,
ঝটিকা-দোলায় সহস্রপাখী
পারে আসে সিন্ধুর—
পান্থ পাইছে পুর !

ওস্তাদজি

[শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী]

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেখিয়া অবধি আমার ধারণা হইয়াছিল যে, ওস্তাদজি বড় যে সে লোক নয়। তিনি যে বড়ঘরাণা, তাহা তাঁহার পোষাক, চালচলন দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত। পাণ্ডা দুর্গাপ্রসাদ বলিয়াছিল যে, সেতারে সিদ্ধহস্ত এমন ওস্তাদ আর নাই। তবে লোকটির মতিস্থির নাই; কখনও কখনও আসে, আবার না বলিয়া কহিয়া কোথায় চলিয়া যায়। দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের কাশীর পাণ্ডা দুর্গাপ্রসাদ বড় সুন্দর সেতার বাজাইতে পারে। আমরা একদিন তাঁহার বাড়ীতে সেতার শুনিতে গিয়াছিলাম; সেইদিন সেখানে ওস্তাদজির সঙ্গে প্রথম দেখা হইয়াছিল। পাণ্ডার বৈঠকায় একটি বৃদ্ধ মুসলমান শাদা পোষাক আর শাদা টুপী পরিয়া বসিয়া ছিলেন;—তিনিই ওস্তাদজি।

দুর্গাপ্রসাদ ভাল সেতার বাজাইতে পারেন, সারা বেনারস সহরে তাঁহার সুখ্যাতি। তিনি চারি-পাঁচবার বাজাই বার পরে সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিয়া ওস্তাদজির হাতে সেতার দিল; তিনি বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেদিন দুর্গাপ্রসাদের বৈঠকায় কাশীর অনেক ভাল ভাল ওস্তাদের আগমন হইয়াছিল। বৃদ্ধের বাদ্য আরম্ভ হইলে সকলের কথা বন্ধ হইয়া গেল, ওস্তাদেরা সম্মুখে সরিয়া আসিল।

দুর্গাপ্রসাদ ভাল বাজাইতে পারেন বটে, কিন্তু ওস্তাদজির বাজনা অন্য রকম। তাহার শীর্ণ অঙ্গুলিগুলির মৃদুস্পর্শে তারের ভিতর হইতে যেন আর একরকম সুর বাহির হইল। তেমন সুর আর কখনও শুনি নাই, আর কখনও শুনিব কি না, জানি না। কতদিন হইয়া গেছে, সে সুর আজিও কাণে লাগিয়া আছে!

সেইদিন আমার স্বামীর সাধ হইল, আমাকে সেতার শিখাইবেন। দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডা দুর্গাবাড়ীর পায়স-প্রসাদ হইতে বাসন-মাজা মজুরণী পর্য্যন্ত সমস্তই আনিয়া যোগাইতেন। তাহারই উপর ওস্তাদ আনিবার ফরমাইস্ হইল। দেখিলাম যে ওস্তাদ সেই বৃদ্ধ!

ওস্তাদ আসিল, সেতার আসিল, বাঁয়া তবলা আসিল। আমি শিখিতাম, আমার স্বামী বসিয়া শুনিতেন। কিন্তু অধিক সময় ওস্তাদজি বাজাইতেন, তিনি সঙ্গত করিতেন; আর আমি মন্ত্রমুগ্ধার মত বসিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য যে, আমার সেতার-শিক্ষা দ্রুতপদে অগ্রসর হয় নাই।

আমার ধারণা ছিল যে ওস্তাদজি মুসলমান। কথাবার্ত্তা, চালচলন, পোষাকআশাক, এমন কি চেহারাটি পর্য্যন্ত তাঁহার মুসলমানের মত। সেদিন কি যেন কি একটা ব্যাপার ছিল, বাড়ীতে গাওনাবাজনার মজলিস হইবে। সকালবেলায় ওস্তাদজি আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ওস্তাদজি, আপনি কি হিন্দুর তৈয়ারি খাবার খাইবেন?" একবার লক্ষ্ণৌতে এক মৌলবী হিন্দুর তৈয়ারি মিঠাই ফেরৎ দিয়া ছিল; সেই অবধি তিনি জিজ্ঞাসা না করিয়া মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করেন না। ওস্তাদজি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু সাহেব, কেন খাইব না? আমি কি মুসলমান?" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ওস্তাদজি, আপনি তবে কি?" উত্তর হইল "আমি হিন্দু, গৌড় ব্রাহ্মণ।"

আমরা অনেক দিন পঞ্জাবে আর পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু এমন লম্বাদাড়ি বাবরিচুল, তাহাতে মেহেদি মাখানো, চুড়িদার পায়জামা আর আচকান পরা গৌড়-ব্রাহ্মণ আমরা আর কখনও দেখি নাই।

সেতার শিখিতে লাগিলাম, "দা—দেরে—দারা" আর "দ্রিম—দ্রিম" শুনিতে শুনিতে কান কালা হইয়া গেল। ক্রমে এক একখানা করিয়া পাঁচসাতখানা গৎ শিখিয়া ফেলিলাম—ইমন, ঝিঁঝিঁট, পূরবী, সিন্ধু, ভৈরজ। ক্রমে হাত দোরস্ত হইল; কিন্তু আমার মন যেমনটি বাজাইতে চাহিত, তেমনটি ত পারিতাম না! যে সুর সদাই আমার কাণে বাজিত, তাহা আমার মেজরাপ্ দিয়া বাহির হইত না। কেবল ওস্তাদজি আসিয়া যখন তাঁহার পুরানো সেতারটির উপর দিয়া কম্পিত-হস্তে বিদ্যুদ্বেগে অঙ্গুলিচালনা করিয়া যাইতেন, তখনই সে সুর জন্মিত।

ওস্তাদজির নিজের একটি সেতার ছিল। সেটি এত বড় যে, তাহা প্রথম দেখিয়া আমি তানপুরা মনে করিয়াছিলাম।

সেটা সেতার, আর সুর-বাহারের মাঝামাঝি। ওস্তাদজি যখন সেইটা বাজাইতেন, তখন আমরা দুইজনে তন্ময় হইয়া শুনিতাম। প্রতিদিন আমার সেতারশিক্ষা হইত পনের-মিনিট; কিন্তু আমরা ওস্তাদজির বাজনা শুনিতাম—একঘণ্টা হইতে দুইঘণ্টা; সুতরাং ছয়মাস পরে, আমি দেখিলাম যে, মোটে সাতটি গৎ শিখিয়াছি!

ছয়মাস পরে একদিন ওস্তাদজি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন। একমাসের বেতন ফেলিয়া, বাসায় তৈজসপত্র, চাল-ডাল, কাপড়-চোপড় ফেলিয়া—ওস্তাদজি, কেবল সেই সেতারটি লইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন! একদিন গেল, দুইদিন গেল; রোজ নিত্যই ভাবিতাম ওস্তাদজি আসিবেন। একমাস গেল—ওস্তাদজির কথা ক্রমে ভুলিয়া গেলাম।

ওস্তাদজি যেদিন নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহার আগের দিন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। সেদিন আমার বসিবার ঘর [illegible] হইতেছিল বলিয়া আমরা ভিতরের দিকে ছেলেদের ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন কেবল টুনি হইয়াছে। টুনি-বাবুর ঘরে নাই, এমন জিনিস নাই; সে যেখানে যাহা পায়, কুড়াইয়া লইয়া আসে; এবং 'দাই' যদি তাহা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর রাগিয়া ঠোঁট ফুলাইতে ফুলাইতে আমার কাছে নালিশ করিতে আসে। তাঁহার ছবি তুলিবার শখ ছিল—এখনও অল্পবিস্তর আছে। তিনি যখন যেখানে বদ্‌লি হইতেন, ফটোগ্রাফের রাশিরাশি কালো কাচ সঙ্গে লইয়া যাইতেন; আর যে যখন দেশবিদেশের ছবি চাহিত তাহাকেই তুলিয়া দিতেন। তিনি যখন ছবি ছাপিতেন, তখন প্রায়ই দুইচারিখানা নষ্ট হইয়া যাইত। টুনি সেই-গুলি জমাদারের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আপনার ঘরে জমা করিত।

ওস্তাদজি বসিলেন, আমরা বসিলাম; বাবু সেতারের সুর বাঁধিতে লাগিলেন। টুনিবাবু ঘরের এক কোণের একটা টিনের ভাঙ্গা পেটরা হইতে একরাশি ধূলাকাদা-মাখা ছবি বাহির করিয়া ওস্তাদজিকে দেখাইতে বসিল।

লক্ষ্ণৌ—বেলগুসা

একখানা ছবি দেখিয়া ওস্তাদজি চমকিয়া উঠিলেন; সেটা একটা পুরাণো ভাঙ্গা গোর! তিনি টুনিকে বলিলেন, "ববুয়া, ছবি খানি আমাকে দিবে?" টুনিবাবুর কি সুমতি হইল, সে বলিল—"হাঁ দিব।" ওস্তাদজি ছবিখানা হাতে লইলেন; তাঁহার শীর্ণ হাতদুইখানি কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল; আমরা আশ্চর্য্য হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "ওস্তাদজি, একখানা ভাল ছবি দেখিবেন?" ওস্তাদজি মাথা নাড়িলেন। তিনি একখানা 'য়্যাল্‌বম্‌' আনিয়া দিলেন, বৃদ্ধ একমনে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ ওস্তাদজি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন—"কা'ল আসিব।"

সে কা'ল আজিও আসে নাই। যাইবার সময়ে বৃদ্ধ একহাতে টুনির সেই ময়লা ছবিখানি, আর একহাতে সেতারটি লইয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন আমাদের সেলাম করিতেও ভুলিয়া গেলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন কথায় কথায় আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ওস্তাদজি যে ছবিখানা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন, সে খানা কিসের ছবি? তিনি বলিয়াছিলেন যে,ছবিখানা লক্ষ্ণৌ হইতে উণাও যাইবার পথে একটি গোরের। তাঁহারা শিকার করিতে গিয়া পথে এক "পড়াও"তে তাম্বু ফেলিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। সেই পড়াওয়ের কাছে নদীতীরে একটি সুন্দর পাথরের ছত্রি আছে। ছত্রির নীচে একটি শাদা-পাথরের গোর আছে। গোরের উপরে পারসীতে কেবল একটি কবিতা লেখা আছে; নাম বা তারিখ কিছুই নাই। কবিতাটির অর্থ এই; "হে পথিক! জগতে তুমি যদি শান্তি পাইয়া থাক, তাহা হইলে একবার গোরের উপরে চরণ স্থাপন করিও, আমি চির-অশান্তি লইয়া জীবনের পথে ঘুরিয়াছি, তোমার পাদস্পর্শে জুড়াইব।" তিনি বলিলেন যে কবিতাটি বড় সুন্দর; সেই জন্য গোরটির ছবি তুলিয়াছিলেন। ছত্রিটা তখন জঙ্গলে ভরিয়া গেছে, কবরের উপরেও অনেক আগাছা জন্মিয়াছে।

অনেকদিন পরে বাবু লক্ষ্ণৌ বদলি হইলেন। আমাদের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে তিনি সব প্রথমে চাকরি পাইয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিলেন। তাহার পর, দশ বৎসর পরে আবার লক্ষ্ণৌ আসিলেন। আমিও আসিলাম। প্রথম দিনকতক মনের সাধে দিলখুসা, সেকেন্দ্রাবাগ, কৈশরবাগ মছলিভবন, সাদৎজঙ্গের কবর, প্রভৃতি দ্রষ্টব্যগুলা দেখিয়া বেড়াইলাম। যখন নগরীর তামাসা পুরাতন হইয়া গেল, তখন একদিন তাঁহাকে সেই গোরস্থানে লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলাম। কিছু দিন পরে তিনি রাজি হইলেন। আমরা একদিন প্রভাতে উঠিয়া উণাওয়ের পথ ধরিয়া যাত্রা করিলাম।

লক্ষ্ণৌ – সেকেন্দ্রাবাগ

তখন কাণপুরের রেল হইয়াছে; কিন্তু প্রথমবার তিনি যখন গিয়াছিলেন, তখন এক্কায় চড়িয়াই কাণপুরে যাইতে হইয়াছিল। পথচিনিতে পারিবেন না বলিয়া, তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

আঁকাবাঁকা সহরের পথ ছাড়িয়া কাণপুরের সোজারাস্তা ধরিয়া চলিলাম। সে পথ বে-মেরামত, এখন আর তাহাতে তত লোক চলে না। রাস্তার উপরে ঘাস গজাইয়াছে, পথ জনশূন্য, মাঝে মাঝে এক একখানা গরুর-গাড়ী আসিতেছে, যাইতেছে। বড়ই আনন্দে চলিতে লাগিলাম। পথে ঘোড়ার গাড়ী চলিতেছে; আশেপাশে আমবনের মধ্যে যে সকল গ্রাম লুকাইয়া আছে, তাহা হইতে বালকবালিকাগণ গাড়ী দেখিতে পথের ধারে দৌড়াইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে দূরে, রেলের পথে রেলগাড়ী যাইতেছে।

দুইপ্রহর বেলায় পথের ধারে, একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-গাছের তলায় গাড়ী দাঁড়াইল। অশ্বত্থের তলে একটি নূতন শিবমন্দির এবং তাহার পার্শ্বে একটি নূতন কূপ। গাড়ী য়ান বলিল "এই সেই পড়াও।" এই সেই পড়াও!—বাবু কিন্তু তাহা চিনিতে পারিলেন না। সেখানে যে দুইতিন ঘর লোকের বাস ছিল, রাস্তায় লোকচলা বন্ধ হওয়ায় তাহারা উঠিয়া গিয়াছে। পথ হইতে অনেক দূরে, রেলের ধারে নূতন গ্রাম বসিয়াছে। কেবল পুরাতন দেবস্থানটির আর পুরাতন কূপটির জীর্ণদশা গিয়া নূতনদশা হইয়াছে।

আমরা সেই অশ্বত্থ-তলে আশ্রয় লইলাম। ক্ষণেকপরে সেই নদীতীরের, 'ছত্রি'র সন্ধানে বাহির হইলাম। ছোট নদীটি দিগন্ত-বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে; তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহারই তীরে, শিবমন্দির হইতে দূরে 'ছত্রি'টি দাঁড়াইয়া আছে। এখন তাহা নদীর দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যেন ক্ষুদ্রকায় নদীর স্বচ্ছক্ষীণ অঙ্গে কোনও তরুণী আপনার নবযৌবনপুষ্পিত-দেহের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে।

প্রাণ জুড়াইল। এমন স্নিগ্ধ, এমন শান্ত, এমন সুন্দর স্থান কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। নদীতীরে 'ছত্রি'র ছায়ায় বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ বসিয়া ছিলাম, মনে নাই। ক্ষণেকপরে দেখি, একজন কৃষক নদীতীরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের দিকে চাহিয়া আছে; আমাদিগকে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিয়া সে চলিয়া গেল। আমরা তখন 'ছত্রি' দেখিতে উপরে উঠিলাম।

বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের একপার্শ্বে একটি ছোট ঢিবির উপরে 'ছত্রি'টি দাঁড়াইয়া আছে। ছবিতে দেখিয়াছিলাম যে, তাহার উপরে এবং চারিপাশে জঙ্গল; কিন্তু এখন তাহার চারিদিক্ বেশ পরিষ্কার। ঢিবির উপরে আবাদ হয় না। কে যেন তাহা একটি সুন্দর বাগানে পরিণত করিয়াছে। সারি সারি বেল, যুঁই, চামেলি, আর রজনীগন্ধার গাছ; যুঁই আর চামেলি মাটিতে লতাইয়া পড়িয়াছে। 'ছত্রি'তে গাছপালা কিছুই নাই, তবে নদীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় ছাদের পাথর-গুলি সরিয়া পড়িয়াছে। 'ছত্রি'র ভিতরে শাদা পাথরের একটি গোর। তাহাতে নক্সা বা বাহার কিছুই নাই, কেবল সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে পারসীতে দুইছত্র লেখা আছে। তিনি তাহা পড়িলেন—বড় মিষ্ট।

কে তুমি চিরজীবন অশান্তিতে কাটাইয়া গিয়াছ? একদিনের তরেও কি শান্তি পাও নাই? সেইজন্যই এই জন-শূন্য প্রান্তরে, শান্তস্নিগ্ধ নদীতীরে শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছ? হে অশান্ত! জীবনের পারে অশান্তির স্মৃতিকণাটুকুও স্পর্শ করিতে চাহ না; তাই পরিচয় গোপন করিয়াছ? কে তোমার মৃত্যু-শীতল বক্ষের উপরে শুভ্র মর্ম্মরের বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, আর তাহার উপরে ছায়ার জন্য পাষাণের ছত্র উন্নত করিয়াছিল?

'ছত্রি'র ভিতরে রাশিরাশি শুষ্ক ফুল, আর মালা, তাহা ছাড়া কণামাত্রও আবর্জ্জনা নাই। অজ্ঞাত! কে তোমার শুভ্রমর্ম্মর-সমাধির উপরে শুভ্র-পুষ্পরাশির মালা সাজাইয়া রাখে? কে তোমার শেষশয্যাপার্শ্বে অমল-ধবল কুসুম-রাশির চয়নক্ষেত্র করিয়া গিয়াছে? কে সে? সে তোমার কে? তুমি কত দিন চলিয়া গিয়াছ? সে কি আজিও তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে?

'ছত্রি'র মধ্যে সহসা মনুষ্যের ছায়া পড়িল; আমরা চমকিয়া উঠিলাম। সে সেই কৃষক। তাহাকে সঙ্গে লইয়া নদীতীরে স্থানচ্যুত পাষাণখণ্ডের উপরে বসিলাম। কৃষক 'ছত্রি'র কথা বলিতে লাগিল।

বহুদিনপূর্ব্বে এই 'টীলা' দেখিয়া, বাদশাহের বেগমের সাধ হইয়াছিল যে, এইখানে বাস করিবেন। সাধপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, বেগমের কালপূর্ণ হইল। বাদশাহ, তখ্‌ত-ছাড়িয়া, ফকিরি গ্রহণ করিলেন; প্রাসাদ-নির্ম্মাণের জন্য যৈসমস্ত মাল-মসলা আসিয়াছিল, তাহা দিয়া এই 'ছত্রি' নির্ম্মিত হইল—বাদশাহ নিরুদ্দেশ হইলেন।

মাঝে মাঝে তিনি আসেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে, সেতারের মধুরশব্দে মুগ্ধ হইয়া, পশুপক্ষী 'ছত্রি'র চারি-

দিকে দাঁড়াইয়া থাকে। প্রভাতে সেতার থামিয়া যায়—মোহ কাটিয়া—পশুপক্ষী চারিদিকে পলাইয়া যায়। ফকির নদীতে স্নান করিয়া, ফুলের মালা গাথেন, মালা দিয়া বেগমের সমাধি সাজাইয়া, তিনি কোথায় চলিয়া যান, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবার সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসেন। তিনি যখন বিদেশে চলিয়া যান, তখন নিশীথ রাত্রিতে কবর হইতে করুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয়, চারিদিকের দশখানি গ্রামের লোক তখন ভগবানের নাম করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাগ্‌দয়ালের পুত্র নওলকিশোর একজন বড় উকিল। তাহার বাপ এখনও চুড়িদার পায়জামা, নিমর চাপকান, চাঁদটুপি, আর দিল্লীর নাগরজুতা পরিয়া বেড়ায়; কিন্তু সে হ্যাট-কোট-নেকটাই পরিয়া আদালতে যায়। বাপের ভয়ে, সে তাহার টিকিটি কাটে নাই বটে; কিন্তু সেটি সযত্নে চুলের সহিত মিশাইয়া রাখে। প্রাগ্‌দয়ালের অনেক বয়স হইয়াছে। সে পূর্ব্বে নবাব-সরকারে চাকরি করিত। নবাবী-আমল অতীতের কথা হইলে, নওলকিশোর লায়েক হইয়া উঠিল, রোজগার করিতে আরম্ভ করিল; বুড়ার দুঃখ ঘুচিল—সে কেবল পুরাণো জমানার গল্প করিয়াই দিন কাটাইত। লক্ষ্ণৌতে, আমাদের বাংলোর পাশেই মুন্‌সী প্রাগ্‌দয়ালের বাড়ী। আমি তাহার সম্মুখে বাহির হইতাম, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের বাড়ী যাইতাম। একদিন সন্ধ্যার পরে বাবার সহিত মুন্‌সীজির বাড়ীতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় উন্নাও-রোডের ধারের সেই 'ছত্রি'র কথা উঠিল। বৃদ্ধমুনসী সে কথা শুনিয়াই, আমাদের পাইয়া বসিল—কিছুতেই ছাড়িল না। তখন শীতকাল। কয়দিন ধরিয়া মেঘ করিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল! বৃদ্ধমুন্‌সীজি খানসামাকে নয়া-ছিলিম ভরিতে আদেশ করিয়া গল্প আরম্ভ করিল।

মহম্মদ আলী সাহেব আমলে বড়বাকীর রূপরাজ একজন প্রসিদ্ধ সেতারী ছিল। সারা হিন্দুস্থান ভরিয়া তাহার সুখ্যাতি ছিল। কত নবাব, বাদশাহ, রাজা, মহারাজা, বড় বড় ভেট দিয়া তাহাকে লইয়া যাইত। হয়দরাবাদ, মইসুর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জয়পুর প্রভৃতি রিয়াসতে তাহার মুশাহরা বন্দোবস্ত ছিল। ইদানীং তাহার বয়স অধিক হইয়াছিল বলিয়া সে আর কোথাও যাইতে চাহিত না। কতলোক আসিয়া ফিরিয়া যাইত, কতধনদৌলৎ, হীরা,

লক্ষ্ণৌ কৈশরবাগ

মোতি, টাকা আশ্রফি ফিরিয়া যাইত। রূপরাজ কোথাও যাইতে চাহিত না। কেবল নওরোজ আর ঈদের সময়ে তাহাকে লক্ষ্ণৌ আসিতে হইত;—সে বাদশাহের হুকুম ঠিক তামিল করিত।

রূপরাজ নিঃসন্তান ছিল। তাহার স্ত্রী অনেকদিন পূর্ব্বে মরিয়াছিল। হরেক-কিসেমের লোক সেতার ও সুরবাহার শিখিবার জন্য রূপরাজের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। রূপরাজ সকলেরই খোরাক যোগাইত এবং কিছু কিছু শিখাইত।

তাহাদের জাতি নাচিয়া-গাহিয়া বেড়ায়; তাহাতে তাহাদের অপমান নাই। জানকীবিবি—নবাব মহম্মদ আলী ও আমজাদ্ আলী, দুইজনেরই বড় পেয়ারের তওয়াইফ্ ওয়ালী ছিল। তাহার মিঠি আওয়াজে মুগ্ধ হইয়া বাদশাহ আমজাদ্ আলী তাহার নাম দিয়াছিলেন—"বুলবুলজান্।" যখনকার কথা বলিতেছি, তখন জানকীর যৌবন কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার আওয়াজ মোলায়েম হইয়া যেন আরও মিঠা হইয়াছে। জানকীর ফুটন্ত-মল্লিকার মত এক বেটী ছিল।
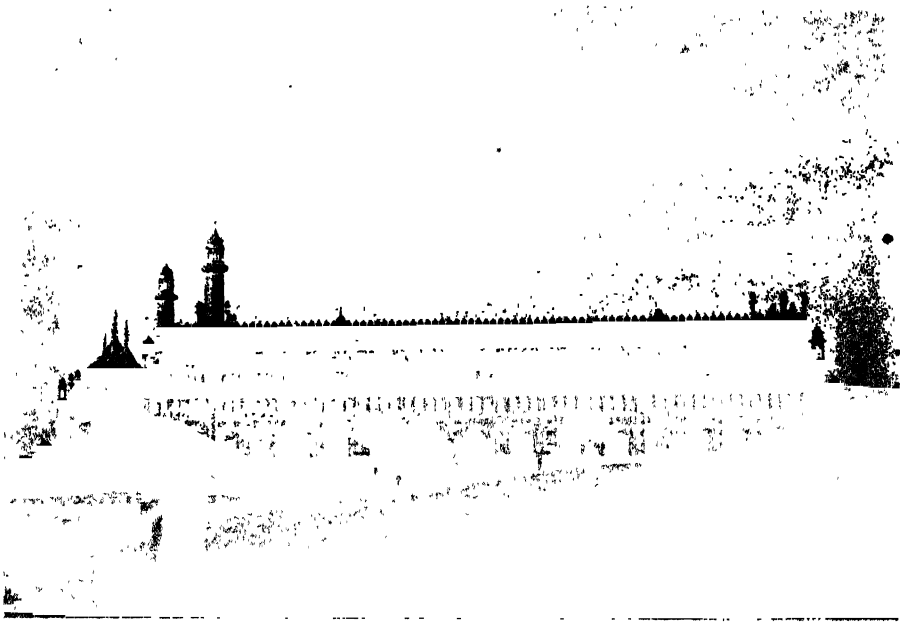
লক্ষ্ণৌ মছলিভবন

সাকর্দদের মধ্যে একজন সেতারে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল; সেই জন্য বুড়া রূপরাজ তাহাকে বড়ই ভালবাসিত। সে বাঙ্গালা মুলুকের লোক, তাহার হরেকিষণ কি তারাচন্দ, এমনই একটা নাম ছিল! রূপরাজ সে নাম বদলাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল প্রেমরাজ। প্রেমরাজ সর্ব্বদা ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত এবং বড় বড় মজলিসে, এমন কি জাঁহাপনা সুলতান্শাহ্ বাদশাহের মজলিসে—রূপরাজ যখন ক্লান্ত হইত, তখন প্রেমরাজ বাজাইত। বড় বড় নামজাদা তওয়াইফ্ বাই মুজ্‌রা করিতে আসিলে, প্রেমরাজ সারেঙ্গীর সুরে সুর-মিলাইয়া বাজাইত। এ খাতির রূপরাজের আর কোন সাকির্দ পাইত না।

জানকী অমৌসীর এক নটের বেটী। তাহারা হিন্দু; তাহার নাম নারগিস্। বাদশাহ আমজাদ্ আলী সোহাগ করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন নারগিস্। সহরের দুষ্ট লোকেরা বলিত যে নারগিস্ জাঁহাপনা খোদের বেটা; কিন্তু সে কথা মিথ্যা। জানকী হিন্দুর মেয়ে; সে মজ্‌রা করিত বটে, কিন্তু সে কস্‌বী ছিল না।

এমনই সময়ে তাহাদের দুজনের দেখা হইয়াছিল। সেবারে শীতকালে বক্‌রীদ্ পড়িয়াছিল। বক্‌রীদে দিলখুসা-মঞ্জিলে মজলিস্ বসিত। সেবারে জানকী গায়িল, নাচিল; রূপরাজ সেতার বাজাইল; আর রিফাত খাঁ সঙ্গত করিল। সেখানে নারগিস্ আর প্রেমরাজ দুজনেই উপস্থিত ছিল। প্রেমরাজের বয়স তখন ১৮।১৯, আর নারগিসের বয়স ১৩।১৪। মজলিস শেষ হইবার ঠিক আগে যত বাই-

তওয়াইফ হাজির হইত, তাহাদিগের জশন হইত। তোমরা 'জশন' বুঝিলে না? 'জশন' বড় রঙিলা চিজ; বাদশাহী জমানার পরে জশন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্ত বাই তওয়াইফওয়ালী একসঙ্গে নাচিতে থাকে। সেদিনকার জশনে রূপরাজ আর প্রেমরাজ একসঙ্গে সেতার বাজাইল, রিফাত খাঁ সঙ্গত করিল, আর সেই দিন নারগিস্ নাচিল, গায়িল। মজ্‌লিসের সমস্ত লোক, ইতর ভদ্র, আমীর ওমরাহ, রইস হইতে নকীব হরকরা চোবদার পর্য্যন্ত সকলেই দিল্‌খুলিয়া তারিফ্ করিল। অনেকে মোহিত হইল, বাঙ্গালী প্রেমরাজ সেইদিন মরিল।

জানকীবাই অমৌসীর কাছে একটা গাঁওয়ে বাস করিত। সাহানশাহ নাসিরউদ্দিন সেখানে তাহাকে সুমেরু-তুল্য সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সেখানে প্রসিদ্ধ নামজাদা ওস্তাদ-কলাবৎদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত। এক হফ্‌তা, হররোজ মজ্‌লিস হইত। সে সালে বক্‌রীদের মজলিস্ ভাঙ্গিলে, জানকী সকলকে অমৌসীতে লইয়া গেল! রূপরাজের সঙ্গে প্রেমরাজও গেল।

হরদম নাচ্‌না গাহ্‌না ভিন্ন সেথানে অন্যকাজ ছিল না। সারাদিন মজলিস্, আর বাকী ফুর্সতে খানা আর আয়েশ। অমৌসীতে বনগঙ্গার ধারে জানকীর মহল। সেই আঁকাবাঁকা বনগঙ্গার তীরে, ডহর-গহুমের শ্যামলক্ষেত্রের মাঝে ঘাটের মর্ম্মর সোপানে বসিয়া প্রেমরাজ বাজাইত—নারগিস্ নাচিত আর গায়িত। এইভাবে এক হফ্‌তা কাটিয়া গেল। বাই, তওয়াইফ, ওস্তাদ, কলাবৎ নাচ গান লইয়া উন্মত্ত ছিল। কেহই ইহাদের দুজনের দিকে নজর দেয় নাই। জানকী বাইয়ের কুঠীর নিকটে বন-গঙ্গার ধারে একটা বড় ভারি 'টীলা' আছে। তাহার উপর গাছপালা জন্মিত না। সেইখানে শ্যামলতৃণক্ষেত্রের উপরে প্রেমরাজ বাজাইত, নারগিস্ গায়িত অথবা নাচিত। তাহারা ভাবিত, কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না, কিন্তু একজন দেখিত; সে সয়তান!

সয়তান গিয়া খোজা আফ্‌সিয়াব খাঁকে সংবাদ দিল। সে সংবাদ শাহজাদা ওয়াজিদ্-আলির কাণে পৌছিল। শাহ-জাদা জমিন্ ও আস্‌মানের ভবিষ্যৎ-মালিক, স্বয়ং তওয়াইফ-ওয়ালীর কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া জানকী-বাইয়ের দুয়ারে উপস্থিত হইলেন। জানকী শাহজাদার খাতির করিল বটে, কিন্তু কন্যাদান করিতে পারিল না, বাদশাহজাদা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিলেন।

একবার একসঙ্গে অনেকের তলব্ আসিল—যিনি বাদশাহের বাদশাহ, মালিকের মালিক, তাঁহার দরবারে বাদশাহ আমজাদ্ আলী, ওস্তাদ রূপরাজ, আরও আউধ-সুবার অনেক রইসের ডাক পড়িল। ওয়াজিদ্-আলী তখ্‌তনশীন হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে খোজা আফ্‌সিয়াব খাঁ যাদুমন্ত্রে উড়াইয়া নারগিস্‌কে ছত্রমঞ্জিলে লইয়া গেল। অনেকদিন পরে প্রেমরাজ শুনিতে পাইল যে নারগিস্ এখন অসূর্য্যম্পশ্যা হজরৎ খয়রাবাদী বেগম।

দিন কাটিতে লাগিল। কন্যা হারাইয়া জানকী-বাই সহসা অতিবৃদ্ধা হইয়া পড়িল; সে মজুরা করা ছাড়িয়া দিল। প্রেমরাজও দেওয়ানা ফকিরগোছ হইয়া গেল; তাহাকেও কেহ আর বাদশাহী মজ্‌লিসে দেখিতে পাইত না। দিন-কত পরে শুনিতে পাওয়া গেল, বাদশাহ খয়রাবাদী বেগমের উপর নারাজ হইয়াছেন, কারণ মহল সরায় আমদানীর পরে তাহাকে কেহ হাসিতে দেখে নাই!

সে আর হাসে নাই! যে দিন নারগিসের মুখে আবার হাসি ফুটিল, তাহার ক্ষণেক পরেই খয়রাবাদী বেগমকে মহল সরার সমস্ত খোজা ও বাঁদী একত্র হইয়া সাদৎবাগে গোর দিয়া গেল। জানকী বাই তখনও বাঁচিয়া ছিল; সে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া নারগিসের দেহ লইয়া গিয়া আঁকাবাঁকা বন-গঙ্গার ধারে ডহর গহুমের ক্ষেত্রের মধ্যে শোয়াইয়া রাখিল, এবং লাখ-লাখ টাকা খরচ করিয়া শাদা-মর্ম্মরের 'ছত্রি' বানাইয়া দিল—"

আমি এই সময়ে বলিয়া উঠিলাম, "ছত্রিটা কিন্তু শাদা পাথরের নয়।" প্রাগ্‌দয়াল কিন্তু সহজে পরাজিত হইবার লোক নহে; সে বলিল, "পাথর আগে সবই শাদা ছিল, এখন জলে ঝড়ে কালো হইয়া গিয়াছে।"

"ছত্রি বানাইয়া দিয়া, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করিয়া জানকী-বাই কাশীবাসিনী হইল। প্রেমরাজ সেই অবধি নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। দুই বৎসর পরে কোম্পানী-বাহাদুর বাদশাহকে কলিকাতায় ধরিয়া লইয়া গেল; লোকে বলিল প্রেমরাজ বাঙ্গালী, সেই-ই সলা দিয়া আংরেজ কোম্পানীকে লইয়া আসিল। সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন, তবে

বাঙ্গালীর জন্যই যে সুবে আউধের বাদশাহী গিয়াছে, এ কথা খুব ঠিক, বহুৎ বহুৎ ঠিক।”

এখনও মাঝে-মাঝে আঁকাবাঁকা বনগঙ্গার ধারে, ডহর গম্বুমের ক্ষেত্রের মধ্যে শাদা-পাথরের 'ছত্রি'র নীচে বসিয়া প্রেমরাজ প্রিয়তমাকে সেতার বাজাইয়া শুনাইয়া থাকে। সে দেবদুর্লভ বাদ্যশুনিয়া বনের পশু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তাহা আর মানুষের কাণ অবধি পৌছে না।

লক্ষ্ণৌ—নবাব সাদৎজঙ্গের কবর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌনগরী ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সেই 'ছত্রি'টির কথা ভুলিতে পারি নাই। ওস্তাদজির কোন ছবি তোলা হয় নাই; যদি ছবি থাকিত, তাহা হইলে বুড়া মুন্সী প্রাগ্‌দয়ালকে দেখাইতাম এবং জিজ্ঞাসা করিতাম সেই-ই প্রেমরাজ কিনা।

অনেকদিন পরে আর একবার ওস্তাদজিকে দেখিয়াছিলাম। তখন আমরা নাগপুর হইতে এলাহাবাদে আসিতেছি। পথে ইচ্ছা হইল যে, একবার নর্ম্মদা দেখিয়া যাইব। জব্বলপুরে আসিয়া নামিয়া পড়িলাম, টঙ্গায় চড়িয়া মিরগঞ্জে চলিলাম। কত গ্রাম, কত গণ্ডগ্রাম পার হইয়া ভেড়াঘাটে যাইতে হয়। জব্বলপুর হইতে ভেড়াঘাট আটক্রোশ পথ। পথে একখানি বড়গোছের গ্রামে টঙ্গা দাঁড়াইল, ঘোড়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। সেইখানে একদল লোক দেখিলাম; তাহারা ভেড়াঘাট হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা আপনাআপনি বলাবলি করিতে করিতে যাইতেছিল—“এমন সেতারী কখনও দেখি নাই, এমন মিষ্টবাদ্যও কখনও শুনি নাই। লোকটা যেন যাদুকর বহুত উমর হইয়াছে, কিন্তু তালিম আদমী বটে। হাত বড়ই মিঠ', আমি বহুৎ বহুৎ ভারি ভারি ওস্তাদের বাজনা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মিঠা ইস্তিমাল্ জন্মে কখনও শুনি নাই!” জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ভেড়াঘাটের মঠে এক ওস্তাদ আসিয়াছেন; তাঁহার মত সেতার বাজাইতে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি এ অঞ্চলে আর কখনও আসেন নাই!

টঙ্গা ছাড়িল। ভেড়াঘাটে পৌছিলাম। নর্ম্মদার জল-প্রপাত, মর্ম্মরশৈল সমস্ত ছাড়িয়া ওস্তাদের সন্ধানে বাহির হইলাম। মঠের লোকে বলিল যে, ওস্তাদ দূরে গণ্ডগ্রামে বাস করেন; তিনি সন্ধ্যাকালে আসিবেন। আজ চৌষট্টি-যোগিনি-মন্দিরে মজ্‌লিস্ হইবে। দিন কাটিল, চৌষট্টি-যোগিনি-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা হইল; ওস্তাদজি আসিলেন; বাজনা আরম্ভ হইল।—আমরা চিনিলাম, কিন্তু তিনি চিনিতে পারিলেন না।

দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিল। তখন বাবু জিজ্ঞাসা

করিলেন "ওস্তাদজি ! বড়াবাঁকীর রূপরাজমিশ্রকে চিনিতেন কি ?"

প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সামলাইয়া ওস্তাদজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবুসাহেব, তুমি কে ?" উনি পরিচয় দিলেন ;—কাশীর পাণ্ডা দুর্গাপ্রসাদের কথা, আমার সেতার শিক্ষার কথা, ছত্রির ছবি-দেখার কথা—সকল কথাই বলিলেন। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল ; এইবার তিনি চিনিতে পারিলেন। আমরা দুজনে তখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য ধরিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলেন না ; তবে অনেক অনুরোধ উপরোধের পরে বলিলেন—"প্রভাতে বলিব।" ওস্তাদজি সে রাত্রি চৌষট্টি যোগিনি-মঠেই কাটাইবেন – আমরা থাকিব রেষ্ট্ হাউসে। প্রভাতে উঠিয়া শুনিলাম ওস্তাদজি নাই—বৃদ্ধ রাত্রিতেই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

এই ঘটনার একমাস পরে এলাহাবাদে একজন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি তখন উঁনিকে চিঠি লিখিতেছিলাম—সে তখন বিলাতে। সন্ন্যাসী নব্য তন্ত্রের ; মাথায় জটা নাই, লম্বা কালো চুল, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, কৌপিন ও চিমটার বদলে গৈরিক আলখাল্লা আর একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ।

সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, "আপনার ওস্তাদ স্বর্গীয় লালা প্রেমরাজ একটি পুরাণো সেতার ও একখানি পত্র আপনাকে দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সেই পত্র।" ওস্তাদজি নাই ! সন্ন্যাসীকে বসিতে বলিয়া চিঠিখানি খুলিলাম। চিঠিখানি বাংলায় লেখা :—

"মা,

তুমি আমার শিষ্যা—একমাত্র শিষ্যা। বিবাহ করি নাই, সন্তানহীন, সুতরাং তুমিই আমার সন্তান। আমার একটি অনুরোধ আছে ; গুরুর শেষ অনুরোধ মনে করিয়া তাহা পালন করিও। এই সন্ন্যাসী আমার নিকট সেতার শিখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কালপূর্ণ হওয়ায় তাহা আর হইল না। সন্ন্যাসী আমার পুরাণো সেতারটি দিবেন ; সেটি তাহার গোরের উপরে রাখিয়া দিবে।

মুন্সী প্রাগ্‌দয়াল আমার বন্ধু। শুনিয়াছি তাহার নিকট তোমরা সমস্ত কথাই শুনিয়াছ। সেই সমাধিটি জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, ছবিতে ইহা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলাম। সেইজন্যই কাশীত্যাগ করিয়াছিলাম। সমাধি দেখিয়া চোখে জল আসিয়াছিল। 'ছত্রি'টি বনগঙ্গার বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; তাহার উপরে বড় বড় গাছ জন্মিয়াছে, পাথরগুলা সরিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই ছত্রিটি ভাঙ্গিয়া তাহার বুকের উপর পড়িবে ! তাহার পর যাহা করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ত দেখিয়াই আসিয়াছ।

মনে করিয়াছিলাম ভিক্ষা করিয়া তাহার সমাধি সংস্কার করিব ; কিন্তু সময়ে কুলাইল কই ? মা, তোমাকে মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি, আমার পুরাণো সেতারটি তাহার কবরের বুকের উপরে রাখিয়া আসিও।

আশীর্ব্বাদক—

প্রেমরাজ শর্ম্মা।"

সেতার দিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। বাবু আসিলে পত্র দিলাম ও সেতার দেখাইলাম। দুইদিন পরে সেতার লইয়া তিনি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন।

তিনচারি দিন পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর, চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু !

তিনি, প্রাগ্‌দয়াল ও নওলকিশোর সেই 'ছত্রিতে' সেতার রাখিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যারপূর্ব্বে তাঁহারা ফুলের মালা ও দীপে ছত্রি ও কবর সাজাইয়া সেতারটি কবরের বুকের উপরে শোয়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। রাত্রে ঝড়বৃষ্টির জন্য ফিরিতে পারেন নাই। সেই রাত্রিতে বনগঙ্গা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া—'ছত্রি', কবর ও সেতার—সবগুলিকে অনন্তে মিশাইয়া দিয়াছে !—সেখানে আর কিছুই নাই !

স্যর্ জনষ্টন্ ফর্ব্স্ রবর্টসন্

[শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা দেবী—মিসেস্ বি. সি. সেন]

স্যর জনষ্টন্ ফর্ব্স রবর্টসন্ ১৮৫৩ খৃঃ ১৬ই জানুয়ারী লণ্ডন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বর্ত্তমানকালে বিলাতী রঙ্গালয়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা। ইঁহার পিতার নাম —জন্ ফর্ব্স্ রবর্টসন। তিনি এবার্ডিন নিবাসী, শিল্পাদি সম্বন্ধে সমালোচনায় তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল এবং তিনি সংবাদপত্র লেখক ব্যবসায়ী ছিলেন। স্যর জনষ্টন্ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তাঁহার অপর দুই পুত্র—মিঃ ইয়াণ রবার্টসন ১৮৫৮ খৃঃ এবং মিঃ নর্ম্মাণ ফর্ব্স ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মিঃ ইয়াণ রবর্টসন ও মিঃ নর্ম্মাণ্ ফর্ব্স উভয়েই ১৮৭৮ খৃঃ হইতে বিলাতি রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া, কালে বিখ্যাত অভিনেতা হইয়া, যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন।
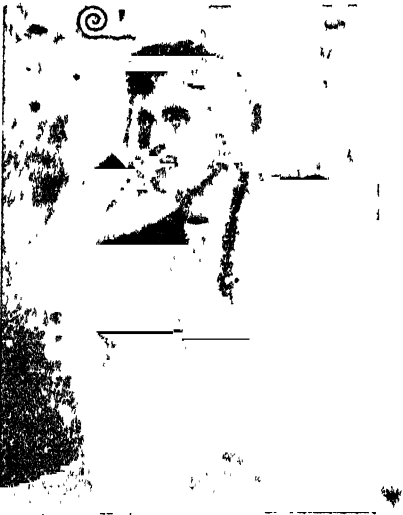
স্যর্ জনষ্টন ফর্বস্ রবর্টসন্

স্যর জনষ্টন ফর্বস্ রবর্টসন্ বাল্যকালে ফ্রান্সের 'চার্টর হাউসে' এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে 'রয়েল্ একেডেমী স্কুলে' বিদ্যালাভ করেন। এই 'রয়েল একেডেমী স্কুলে' তিনি চিত্রবিদ্যাশিক্ষার্থে ভর্ত্তি হন। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ কখনও হ্রাস হয় নাই, কিন্তু ১৮৭৪ খৃঃ হইতে তিনি রঙ্গমঞ্চে নিজ পারদর্শিতা দেখাইবার জন্য মনোনিবেশ করেন। অতঃপর, 'Mary, Queen of Scots' নাটকে 'Chastelard'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম লণ্ডনের রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা সেমুয়েল ফেলপস্ তাঁহার শিক্ষা গুরু ছিলেন—তাঁহার অধীনে তিনি করুণোদ্দীপক নাটকে অভিনেতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্বন্ধে বিধি বিধানগুলিতে প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত হয়েন। অচিরেই স্যর্ জনষ্টনের নৈপুণ্যতা এবং কার্য্যকুশলতা—সুললিত স্বর এবং বিচিত্র বক্তৃতাশক্তি, তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে শীর্ষস্থান দিয়াছিল; এবং তিনি প্রধান-অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

স্যর জনষ্টন্ ফর্ব্স রবর্টসন আমেরিকার রাজধানী নিউ ইয়র্কের স্বনামধন্যা প্রধানা অধ্যক্ষা ও অভিনেত্রী এবং 'ম্যাকসিন্ ইলিয়ট থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিণী মিস ম্যাক্সিন ইলিয়টের সহোদরা ভগিনী অভিনেত্রী মিস্ গার্টু্ড ইলিয়টকে ১৯০০ খৃঃ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। মিস্ গার্টু্ড ওরফে লেডী ফর্ব্স রবর্টসন একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। স্যর জনষ্টনের সহিত ১৯০০খৃঃ গার্টু্ডের বিবাহ হওয়ার পর, তিনি থিয়েটারে যোগদান করিলে স্যর্ জনষ্টন্ তাঁহাকে নিজ নাট্য দলে প্রধানা-অভিনেত্রীরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন; এবং নিজ নাট্যদলে সকল নাটকেই তাঁহারা স্বামী স্ত্রী—প্রধান নায়ক ও নায়িকা রূপে অভিনয় করিতেন। এই প্রসঙ্গে মিস্ গার্টু্ড ইলিয়ট্ অর্থাৎ লেডী ফর্ব্স রবার্টসনের, সহোদরা—মিস্ ম্যাক্সিন্ ইলিয়টের সম্বন্ধেও অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলি।

এই স্বনামধন্যা অভিনেত্রী—মিস্ ম্যাক্সিন ইলিয়ট— লণ্ডন 'লিরিক থিয়েটারে' এক সময়ে স্বদলবলে অভিনয় করেন এবং তাঁহার নিজ পরিচালনাধীনে Mr. H. V. Esmond-লিখিত "Under the Greenwood Tree" নাটকে মিস্ ম্যাক্সিন্ নিজেই প্রধানা-নায়িকারূপে

'জিপ্‌সি'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত বিগত ১৯১৩খৃঃ তাঁহার নিজ লণ্ডনের 'হে-মার্কেট্'স্থিত 'হিজ্ ম্যাজেষ্টিস্ থিয়েটারে' Mr. Louis N. Parker-কর্ত্তৃক নাটকাকারে লিখিত "Joseph and His Brethren"-অভিনয়ে মিস্ ম্যাক্সিন্ ইলিয়ট্ তাহার প্রধানা-নায়িকা "জুলেকা"র ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন এবং স্যর্ হার্বট ট্রি নিজেই "জেকবে"র ভূমিকা-অভিনয় করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রসিদ্ধ অভিনেতা সেমুয়েল ফেল্‌পস্ তাঁহার গুরু ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ হইতে বিগত ১৯১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত, একাদিক্রমে উনচল্লিশ বৎসর কাল, রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হওয়া অবধি, স্যর জনষ্টন ফর্ব্স রবর্টসন, ইংলণ্ডের ভুবনবিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী-দিগের সহিত মিলিত হইয়া অভিনয় করিয়া জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন। স্যর্ ফর্ব্স্ রবর্টসন্ বিভিন্ন থিয়েটারে ভিন্ন ভিন্ন নাটকে অনেক জনপ্রিয় ভূমিকার অভিনয় করিয়াছেন। নানা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের সহিত স্যর্ ফর্ব্স্ রবার্টসন্ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণী, হলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপের বিভিন্নস্থানে অভিনয় করিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। তিনি সেক্সপীয়রের অন্যান্য অনেক নাটক বিশেষদক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছেন।—এক কথায়, সকলে বলেন যে, ভুবনবিখ্যাত, ইংলণ্ডের একচ্ছত্র অভিনেতা-সম্রাট্ স্যর হেন্‌রী আরর্ভিংএর স্বর্গারোহণের পর, মহাকবি সেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত নাটক—হ্যাম্‌লেট-অভিনয় করিবার জন্য স্যর্ ফর্ব্স্ রবর্টসন্-ব্যতীত ইংলণ্ডে দ্বিতীয় আর কেহ নাই। স্যর জনষ্টন ফর্ব্স রবর্টসন, হ্যাম্‌লেট্-অভিনয় করিয়া অভিনেতৃ-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই হ্যাম্‌লেট্ অভিনয়সম্বন্ধে পরে বলিতেছি। এখন, তিনি ১৮৭৪ খৃঃ হইতে ১৯১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত যেসকল ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিম্নে তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত তালিকা দিই—

১৮৭৪ খৃঃ—১৮৭৫ খৃঃ—স্যর জনষ্টন জীবনে সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডনের "প্রিন্সেজ্ থিয়েটারে," স্বর্গীয়া অভিনেত্রী মিসেস্ রোজবীর সহিত "Mary Stuart, Queen of Scotts"-নাটকে 'চেষ্টলার্ডে'র ভূমিকা অভিনয় করেন। এই তাঁহার প্রথম অভিনয়। ইহার পরে, চার্লস্ রীডের পরি- ইংলণ্ডের ব[illegible]ধানা—সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মি- টেরীর সহিত, সদলবলে অভিনয় করিবার অভিপ্রায়ে দীর্ঘ-ভ্রমণে বাহির হনএবং বিখ্যাত অভিনেতা সেমুয়েল ফেল্‌পসের সহিত লণ্ডন 'গেইটী থিয়েটারে' অভিনয় করিবার জন্য, ও সামুয়েল্ ফেল্‌পসের থিয়েটারে নাটকাদি অভিনয়সম্বন্ধে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে, 'গেইটি থিয়েটরে' যোগদান করেন। তিনি ছয়বৎসরকাল, অভিনয়বিষয়ে দক্ষতা লাভোদ্দেশে, উক্ত স্যামুয়েল্ ফেল্‌পসের শিষ্যত্ব করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃঃ—১৮৭৭—এই বৎসর তিনি জীবনে প্রথম, পেশাদার-অভিনেতারূপে জনসাধারণ সমক্ষে লণ্ডনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'লাইসিয়ম থিয়েটারে' অবতীর্ণ হইয়া, দর্শকমণ্ডলীকে যথোচিত বিনীতভাবে, অভিবাদন করিলেন।—অতঃপর, তিনি নিজেই রীতিমত একজন অভিনেতা বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। এই বৎসরই তাঁহার কার্য্যজীবনের যথার্থ সূচনা।

১৮৭৮ খৃঃ—এই বৎসর লব্ধপ্রতিষ্ঠ দম্পতী—অভিনেতা-অভিনেত্রী মিষ্টার ও মিসেস্ (পরে স্যর) স্কোয়ার ও লেডী বেনক্রপ্টের সহিত লণ্ডনের 'প্রিন্স-অফ-ওয়েলস' থিয়েটারে যোগদান করেন ও "Diplomacy"-নাটকে 'কাউন্ট অর্লকে'র ভূমিকা অভিনয় করেন। এই নাটকখানি পর্য্যায়-ক্রমে 'প্রিন্স্-অব্-ওয়েলস্' এবং 'হে-মার্কেট্' থিয়েটারে অভিনীত হয়।

১৮৭৯ খৃঃ—এই বৎসর পুনরায় উপরিউক্ত "Diplomacy" নাটকে 'জুলিয়ন্ ব্যোক্লর্কে'র ভূমিকা গ্রহণ করিলেন এবং "Forget Me-Not"-নাটকে 'কর্ হোরেস ওয়েল্‌বি'র ভূমিকা ইত্যাদি অভিনয় করিয়া, পরে উল্লিখিত স্যর্ স্কোয়ার ও লেডী বেন্‌ক্রপ্টের সহিত যোগদান করিয়া "Duty", "Ours", "Money", "School" ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৮০—১৮৮১ খৃঃ—লণ্ডন 'কোর্ট থিয়েটারে', রুষ-অভিনেত্রী Modjeskaর সহিত এবং 'প্রিন্সেস্ থিয়েটারে' প্রসিদ্ধ মার্কিন অভিনেতা ও নাট্যকার উইলসন্ বেরেটের সহিত অভিনয় করেন এবং সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট'-নাটকে "রোমিও"র ভূমিকা প্রথম অভিনয় করেন।

১৮৮২ খৃঃ—এই বৎসর তিনি সর্ব্বপ্রথম মিঃ আর্ভিং ([illegible] স্যর্ হেন্‌রী আর্ভিংএর) সঙ্গে যোগদান করিয়া

সেক্সপীয়রের "Much Ado About Nothing"এ "Claudio"র অংশ অভিনয় করেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত নাটকে স্যর হেন্‌রি আর্ভিং "Benedick"এর মিঃ উইলিয়ম্ টেরিস্ "Don Pedro"র এবং মিস্ ইলেন টেরী "Beatrice"এর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।—আর এক কথা—স্যর্ হেন্‌রি আর্ভিং তাঁহাকে এই নাটকের গির্জ্জার দৃশ্যটী পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিতে আদেশ করেন। ফর্বস রবর্টসন্ এই দৃশ্যপটটী এত সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছিলেন যে নিউইয়র্কে "Players' Club"এ উহা এখনও সুরক্ষিত আছে এবং স্যর্ আর্ভিংএর জীবন-চরিতে এই দৃশ্যপটটী তাঁহার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৮৩ খৃঃ—১৮৮৫ খৃঃ – এই ৭।৮ বৎসর কাল অনুগামী (Junior) অভিনেতারূপে অভিনয় করিয়া, পুনরায় স্যর স্কোয়ার ও লেডী বেনক্রপ্টের দলে লণ্ডনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'হে মার্কেট থিয়েটারে' প্রধান-অভিনেতা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ১৮৮৩ খৃঃ নভেম্বর মাস হইতে ১৮৮৫ খৃঃ জুলাই পর্য্যন্ত, যতদিন প্রোক্ত থিয়েটর বেন্‌ক্রপ্টের পরিচালনাধীনে ছিল,ততদিন,তিনি তথায় ছিলেন। এই সময়ে "Lords and Commons", "Diplomacy"ও "Peril" নাটকাদিতে অভিনয় করিয়া, "Rivals" নাটকে "Captain Absolute"এর "Masks and Faces" নাটকে Sir Charles Pomnarderর এবং "Katherine of Petruchio" নাটকে "Petruchio"র ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৮৫—১৮৮৭খৃঃ—খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী মিস্ মেরী এণ্ডর্সনের সহিত 'Pygmalion','Romeo,' 'Orlando', 'Ingomra' ও 'Claude Melnotte'এর ভূমিকা অভিনয় করিতে আমেরিকা গমন করিলেন।—তথায়, নিউইয়র্কে "Orlando"র ভূমিকা প্রথম অভিনয় করেন। তৎপরে, আবার কুমারী মেরী এণ্ডর্সনের সহিত আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, লণ্ডন 'লাইসিয়াম থিয়েটারে' উক্ত মিস্ এণ্ডর্সনের দলে সেক্সপীয়রের "The Winters Tale" নাটকে অভিনয় করেন। ফর্বস রবর্টসন এই নাটকোপযোগী থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের পোষাক-পরিচ্ছদের নমুনা পরিকল্পনা এবং নির্ব্বাচন করিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিযুক্ত করিলেন।

১৮৮৮ খৃঃ—এই বৎসর মিস্ ওয়ালিসের সহিত লণ্ডন 'শ্যাফ্‌টস্‌বরী থিয়েটারে' অভিনয় করেন।

১৮৮৯ খৃঃ—১৮৯২খৃঃ—লণ্ডনের 'গ্যারিক থিয়েটারে' স্যর্ জন্ হেয়ার, Kt.র সহিত যোগদান করিয়া, "The Profligate" "Tosca",ও "Lady Bountiful" ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেন। এসকল নাটক, লণ্ডনে অভিনয় করিবার পর, আবার আমেরিকায় অভিনয় করিতে সমুদ্র-যাত্রা করেন। পুনরায় স্যর হেন্‌রী আর্ভিংএর দলে জুটিয়া মহাকবি সেক্সপীয়রের "King Henry VIII" নাটকে "Duke of Buckingham"এর ভূমিকা অভিনয় করেন। এই মহানাটকে স্যর হেন্‌রী আর্ভি স্বয়ং—"Cardinal Wolsey"র, মিঃ উইলিয়ম টেরিস্ "King Henry VIII"র,মিস্ ইলেন টেরী 'Queen Katherine'এর এবং মিস্ ভাওলেট ভেমব্রাঘ্ 'Queen Anne Bolleyne' এর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৯৩—১৮৯৪ খৃঃ—এই সময়ে তিনি আবার, পূর্ব্বোক্ত সেই স্যর জন্ হেয়ারের সহিত যোগদান করিয়া—"Diplomacy"-নাটকে "Julian"এর "Caste"-নামক নাটকে "D'alroy"র ও "Money"-নাটকে 'Evelyn'এর ভূমিকা অভিনয় করিলেন।

১৮৯৫—২৮৯৬ খৃঃ—পূর্ব্বের কয়েক বৎসর অপেক্ষা এই দুই বৎসরে স্যর্ ফর্বস্ রবর্টসন্ জনসাধারণের নিকট বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; সে সম্বন্ধে দুই একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

তখনকার রাজকবি লর্ড টেনিসনের—(১) Sir Lancelot and Queen Guinevere, (২) The Coming of Arthur, (৩) The Passing of Arthur, (৪) Lancelot and Elaine, (৫) Guinevere এবং (৬) Merlin and Vivien ইত্যাদি কয়েকটি কবিতার উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টর-নাট্যকার মিষ্টর জে. কমিনস্-কার—"King Arthur"-নামক নাটকরচনা করিয়া, সর্ব্বপ্রথম স্যর হেন্‌রী আর্ভিংকে প্রদান করেন। বিজ্ঞাপনে ইহা, কেবলমাত্র "King Arthur"-নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়। এই নাটক স্যর

হেনরী আর্ভিং 'লাইসিয়ম্ থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত করেন।

এই "King Arthur" ও পূর্ব্বোক্ত "King Henry VIII"—এই দুইখানি নাটকে স্যর ফর্বস্ রবর্টসন যেরূপ কৃতিত্বের সহিত নিজ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকাগণ 'স্যর হেনরী আর্ভিং-এর জীবন চরিতে' প্রদত্ত তাহার সমালোচনা পড়িলেই একটু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। *

এই "King Arthur" নাটকে স্বনামখ্যাতা অভিনেত্রী মিস্ লেনা য়্যাশ্‌ওয়েল—"Elaine"র ভূমিকা অভিনয় করেন। এক্ষণে ইনি লণ্ডন 'কিংস্‌ওয়ে থিয়েটারে'র একমাত্র সত্বাধিকারিণী, পরিচালিকা ও প্রধানা অভিনেত্রী। স্যর হেনরী আর্ভিং, এই "King Arthur"-নাটক অভিনীত করিবার প্রাক্কালেই মিঃ উইলিয়ম টেরিসের একমাত্র আদরিণীকন্যা, বর্ত্তমান 'লণ্ডন নিউ্‌জিকেল কমেডী'র এক চ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী, অভিনেত্রীকুলরাণী মিস ইলেনিন্ টেরিস, ওরফে মিসেস্ সিমুর হিকসকে দিয়া উক্ত "King Arthur" নাটকের প্রধানা নায়িকা "Elaine"র ভূমিকা অভিনয় করাইবার উদ্দেশে তাঁহাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে মিস্ ইলেনীন্ সেই সময় অন্য থিয়েটারে নিযুক্ত থাকায়, তিনি স্যর হেনরী আর্ভিং-এর প্রস্তাবিত "Elaine"র ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেইজন্য কুমারী লেনা য়্যাশ্‌ওয়েল্‌কে উক্ত "Elaine"র ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্যর্ আর্থার পিনেরো প্রণীত "Notorious Mrs. Ebbsmith" নাটকে স্যর ফর্বস্ রবর্টসন্ "Lucas Cleeve"এর ভূমিকা অভিনয় করেন; ইহা লণ্ডনে 'গ্যারিক থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৯৫ খৃঃ স্যর ফর্বস্ রবর্টসন, স্যর্ হেনরি আর্ভিংএর দলে "King Arthur" নাটকে শেষ অভিনয় করেন এবং এই বৎসর স্যর ফর্বস রবর্টসন, তাঁহার নিজ-পরিচালনাধীনে, 'লাইসিয়াম থিয়েটারে' সেক্সপীয়রের নাটক "রোমিও জুলিয়েট"এ তিনি নিজেই "রোমিও"র ও স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মিসেস্ প্যাট্রিক কেম্পবেল "জুলিয়েট"র ভূমিকাগ্রহণ করেন।—ইহার পর, ক্রমান্বয়ে একবৎসর পর্য্যন্ত—"Michael and his Lost Angel," "For The Crown," "Magda" ও সেরিডেনের "The School for Scandal" প্রভৃতি নাটকে এবং সেক্সপীয়রের "Hamlet"-নাটকে—অভিনয় করেন। এই সকল নাটক-ব্যতীত তিনি সেক্সপীয়রের "Macbeth", এবং "The Second Mrs. Tanmqueray" নামক অপর একখানি নাটক জর্ম্মনী ও হলণ্ডে অভিনয় করিবার জন্য সদলবলে রওনা হইলেন।—এই সময়ে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়—১৮৯৫ খৃঃ অব্দেই স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শুভ-জন্মদিন-উপলক্ষে নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় অভিনেতা হেন্‌রি আর্ভিংকে 'নাইট' উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। ইহার পূর্ব্বে থিয়েটারের অভিনেতাদের মধ্যে আর কাহারও অদৃষ্টে "নাইট, বা স্যর" উপাধি লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই!

১৮৯৭ খৃঃ—এই বৎসর 'য়্যাভিনিউ' থিয়েটরে "Nelson's Enchantress" নাটক অভিনীত হয় এবং স্যর ফর্বস্ প্রধান নায়ক "Nelson"এর ভূমিকাগ্রহণ করেন অতএব, বলিতে হইবে যে, স্যর ফরবস রবর্টসন ১৮৯৫ খৃঃ হইতে লণ্ডনের অভিনেতৃমণ্ডলীর—রঙ্গজগতের প্রধান অধিনায়কের স্থান অধিকার করেন এবং সেই সময় হইতে স্বাধীনভাবে ও নিজ পরিচালনাধীনে বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয় সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৯৮—১৮৯৯ খৃঃ—এই দুই বৎসর, ভিন্ন-ভিন্ন নাট্যকার-রচিত নূতন-নূতন নাটক প্রচার ও অভিনয় করিতে লাগিলেন; তদ্ভিন্ন—"Palleas and Melisande," "The Moonlight Blossom," "The Sacrament of Judas," "Carrotts," "The Devil's Disciple" by G. Bernard Shaw এবং সেক্সপীয়রের "Macbeth" পুনরায় অভিনয় করিলেন।

১৯০০ খৃঃ—এই বৎসর তিনি কুমারী গার্ট্রুড্ ইলিয়টের পাণিগ্রহণ করেন।—তিনি, বোধ হয়, পরিণয়ানন্দে বিভোর হইয়া, এই বৎসর আর কোনও রঙ্গানুষ্ঠান করিবার সাবকাশ পান নাই!

১৯০১ খৃঃ—নিজে পরিচালনা করিয়া স্বাধীনভাবে অভিনয়ের উদ্দেশে, তিনি এই সময় লণ্ডনের 'কমে

* See A. Brenton's "Life of Sir Henry Irving"—Vol. II pps. 209-10.

থিয়েটর' এক সিজন (Season)—নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভাড়া লইলেন।

১৯০২—১৯০৩ খৃঃ—পুনরায় স্বাধীনভাবে অভিনয় করিবার জন্য, লণ্ডনের 'লিরিক্ থিয়েটার' উপর্য্যুপরি দুই বারের (Two Seasons) জন্য ভাড়া করিয়া, "Mice and Men", "The Light That Failed" এবং সেক্সপীয়রের নাটক "Othello" অভিনয় করিলেন, এবং অভিনয় শেষ হইবার পর আবার আমেরিকায় দুই 'সিজন্' অভিনয়ার্থ লণ্ডন পরিত্যাগ করিলেন।

'হ্যামলেট্'-বেশী জনষ্টন্ এবং 'ওফেলিয়া'-বেশে তৎপত্নী
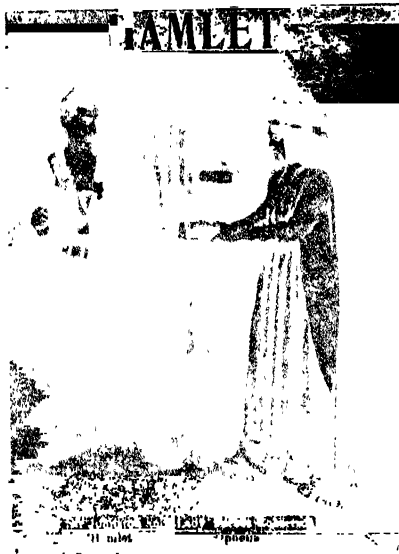
১৯০৪ খৃঃ—লণ্ডনের 'ডিউক অব্ ইয়র্ক' এবং 'স্কেলা'-নামক থিয়েটার দুইটিতে দুইসিজন্ অভিনয় করিলেন।

১৯০৫—১৯০৬ খৃঃ—প্রথম বৎসরে কয়েকটা রবিবারে অভিনয় করিবার পর (সাধারণতঃ রবিবারে থিয়েটার হয় না) তিনি ইংলণ্ডের মফঃস্বল সহরগুলিতে এবং আমেরিকায় সদলবলে অভিনয়ার্থ বাহির হইলেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে বার্ণার্ডশ-প্রণীত "Caesar and Cleopatra" অভিনয় করিলেন, এবং "Merchant of Venice" "Hamlet" ইত্যাদিও পুনরায় অভিনয় করিলেন। ১৯০৭ খৃঃ—মিঃ হেনরী জেমস-প্রণীত "The High Bid" নাটক নূতন প্রচার ও অভিনয় করিলেন।

১৯০৮—১৯০৯ খৃঃ—লণ্ডনের 'সেণ্ট্ জেমস্' থিয়েটরে মিঃ জেরোম্-লিখিত "The Passing of the Third Floor Back" নাটক অভিনয় করেন। কিছুকাল এই-খানে অভিনয় করিবার পর, সদলবলে 'টেরিজ্ থিয়েটরে' উঠিয়া আসিয়া তথায় অভিনয় করিতে থাকেন।

১৯০৯—১৯১০ খৃঃ—এই বৎসর, তাঁহার লণ্ডনস্থিত ইংরেজ দলবল লইয়া, উপরি-উক্ত নাটক—"The Passing of the Third Floor Book"—আমেরিকার নিউ ইয়র্কে, তাঁহার স্বালিকার থিয়েটারে, অর্থাৎ 'মেকসিন্ ইলিয়ট থিয়েটারে, সম্পূর্ণ এক সিজন্ অভিনয় করেন। তারপর, ক্যানেডার গবর্ণর জেনারেলের বিশেষ নিমন্ত্রণে, তিনি তথায় অভিনয়ার্থে যাত্রা করেন ; এবং ১৯১০ খৃঃ অব্দের শেষাশেষি আবার আমেরিকাতে আর-এক সিজন সেই "The Passing of the Third Floor Book"-নাটক অভিনয় করেন। অতঃপর, নিউ ইয়র্কে পুনরায় গমন করিয়া তিনি বোষ্টন, সিকাগো, ফিলাডেলফিয়া ও অন্যান্য বড় বড় সহরে অভিনয় করিতে লাগিলেন।

১৯১১ খৃঃ—তিনি আমেরিকাতে "The Passing of The Third Floor Back" অভিনয় করিবার জন্য তৃতীয়বার যাত্রা করিলেন এবং এক উপকূল হইতে অন্য উপকূল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে,—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে—প্রায় ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার মাইলের মধ্যে, সদল-বলে অভিনয় করিয়া বেড়াইলেন।

খৃঃ ১৯১২—এই বৎসর, রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণকল্পে ইংলণ্ডের বড়-বড় সহরে অনেক নাটকের অভিনয় করিলেন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে (Spring) কিছুদিনের জন্য বিদেশে নানাস্থানে অভিনয় করিতে গেলেন।

১৯১৩ খৃঃ—এই বৎসর, জনসাধারণসমীপে বিদায়-গ্রহণোদ্দেশে স্যর্ রবর্টসন্, লণ্ডনে 'ড্রুরি লেন'স্থিত 'থিয়েটার রয়েলে' শেষ-অভিনয় করিয়া, তিনি রঙ্গালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে ২২এ মার্চ্চ হইতে ৬ই জুন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে 'Hamlet', 'The Passing of The Third Floor Back', 'The Sacrament of Judas', 'The Light that Failed,' 'Mice and Men', 'Caesar and Cleopatra', 'The Merchant of Venice', 'Othello', ইত্যাদি অভিনয়ান্তে, সর্ব্বশেষে 'হ্যামলেট' অভিনয় করিলেন। অবসরগ্রহণের

সাজসজ্জেই, সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে, রাজা পঞ্চম জর্জ্জ-কর্ত্তৃক তিনি "নাইট" উপাধিতে ভূষিত—রাজসম্মানে সম্মানিত হন। এই বৎসর বিলাতী থিয়েটরের প্রসিদ্ধ-নাট্যকার মিঃ. 'জে. এম. বেরী'ও রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়া—"Barrie, Bart"-হন।—বলা বাহুল্য "বেরনেট" যে, উপাধি-"নাইট" অপেক্ষাও অনেক উচ্চ ও সম্মানিত।

স্যর ফর্বস-রবর্টসন্ একাদিক্রমে ৩৯ বৎসরকাল রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া, সমগ্র য়ুরোপবাসীকে যে বিচিত্র চরিত্রাভিনয়ে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহা—"Hamlet" চরিত্র। স্যর হেন্‌রী আর্ভিংএর পর, 'স্যর ফর্বস রবর্টসন্' যে অন্যতম অদ্বিতীয় হ্যাম্‌লেট-অভিনেতা, একথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন। ১৮৯৫ খৃঃ তিনি সর্ব্বপ্রথমে, হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। হ্যাম্‌লেটের ভূমিকা তিনি যে-রকম অভিনয় করিতেন, তাহাতে লোকে সেই 'ডেন্' রাজকুমারের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন।

বর্ত্তমানকালের ইংলণ্ডের প্রধান হাস্যরসোদ্দীপক অভিনেতা, নাট্যকার ও অধ্যক্ষ, 'হিক্স থিয়েটার' ও 'অলড়ুইচ্ থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী, নানানাটক-প্রণেতা মিষ্টর সিমুর হিক্স, তাঁহার "২৪ বৎসরের আত্মচরিত্র"-গ্রন্থে ফর্বস রবর্টসন-কর্ত্তৃক 'হ্যামলেটের' ভূমিকা অভিনয়সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বঙ্গালা ভাবার্থ এই—

"ফর্বস্-রবর্টসনের কথা ভাবিতে গেলে, মনে একটা প্রতীতি জন্মে, তিনিই যেন ডেনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ রাজকুমার হ্যাম্‌লেট্—ইংরেজী ভাষাতে কথা কহিতেছেন! ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা হইল, কি না, বলিতে পারি না। আমি, অন্ততঃপক্ষে সাতবার, তাঁহাকে ডেনদেশীয় রাজকুমার সাজিতে দেখিয়াছি। অভিনয় দেখিয়া এত বেশী আনন্দ হইত যে, একসপ্তাহের মধ্যে তিনবারও দেখিতে-গিয়াছি—বিনা-পয়সায় দেখা নয়, প্রত্যেকবারেই গাঁটের-কড়ি খরচ করিয়া গিয়াছি! দর্শকবৃন্দের মধ্যে আমিই যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশীবার তাঁহার "Hamlet" দেখিতে গিয়াছি, তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"তাঁহাকে সুবিখ্যাত সেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট্-অভিনয় করিতে যে দেখে নাই, সে ভালরূপ অভিনয় যে কি—তাহাই বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার অভিনয় মর্ম্মগ্রাহী এবং দর্শক তদ্দ্বারা সেক্সপীয়রের ভাবরাজি যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন —কোন রূপ কষ্ট হয় না। ডেনদেশীয় রাজকুমারের ব্যবহার, তিনি যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন—সেরূপ অন্যকেহ কদাচ পারিবে, কি না, সন্দেহ। তাঁহার অভিনয়ে অর্থশূন্য বৃথাচীৎকার বা ভাববিরহিত কলের পুতুলের মতন হাত-পা ছোড়া নাই; তাঁহার অভিনয়ের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ভাবে পূর্ণ। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে-না-করিতেই, তিনি সকল লোককে এতদূর আকৃষ্ট করিয়া ফেলেন যে, তাহা বর্ণনাতীত! আমি, ইহা পরের মুখের কথা শুনিয়া বলিতেছি না; আমি নিজে দেখিয়া, মর্ম্মগ্রহণ করিয়া বলিতেছি—এরূপ সুনিপুণ অভিনেতা-জগতে কোথায়? তাঁহাকে হ্যাম্‌লেট্-অভিনয় করিতে দেখিলে প্রকৃত রাজকুমার বলিয়া ভ্রম হয়;—তাঁহাকে দেখিলে যথার্থই বিকৃতচিত্ত বলিয়া মনে হয়; এ কথা কথনই অন্তরে স্থান পায় না যে, তিনি একজন অভিনেতা—পাগলের পাগলামী নকল করিতে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছেন! তাঁহাকে দেখিলে—ইহা কিছুতেই বুঝা যায় না যে, তিনি অভিনেতারূপে রঙ্গমঞ্চ শোভা করিতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে কেহ এরূপ বিবেচনা করিতে পারিবেন না যে, বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ সাহেব অভিনেতৃদিগকে উপদেশচ্ছলে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা তিনি পাঠ করিয়া আসিয়া, সদর্পে ও সগর্ব্বে তাহাই যেন দর্শকবৃন্দকে দেখাইতেছেন!"

মহানিশা

শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১৩)

মুরলীবাবুর বাড়ীখানিকে বাড়ী না বলিয়া প্রাসাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটি লোহার বিচিত্র-কারুকার্য্যযুক্ত রেলিংঘেরা সুবৃহৎ উদ্যানের মাঝখানে সেই অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহা শুধু ঐশ্বর্য্য-মহিমায়ই সমুজ্জ্বল নহে, সৌখীনতায়ও দিব্য নয়নরঞ্জন। রেঙ্গুন সহরের মধ্যে এমন প্রকাণ্ড এবং ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা আর দ্বিতীয় ছিল না।

বাগানে নানাপ্রকার গাছপালা, উদ্ভিদ্‌গৃহ, ক্রীড়াভূমি, বসিবার জন্য মর্ম্মর, চায়না ও লৌহাসন, পরীশিশু ও সুন্দরী নারীর প্রতিকৃতি, একটা কৃত্রিম ফোয়ারা, পুলবাঁধা ঝিল এবং কবিজনপ্রিয় লতা-বিতান; ইহাতে কোন কিছুরই অভাব ছিল না। প্রকাণ্ড গেটের দুধারে গাড়ি-ঘোড়ায় ভরা আস্তাবল, রক্ষীদের ঘর। ঝিলের ধারে স্বতন্ত্র এক অট্টালিকায় নাচঘর, ভোজঘর প্রভৃতি; এ ধারে সবুজ তৃণা-স্তরণ-বিস্তৃত খোলা-জায়গায় ক্রীড়াস্থান। সবুজ বনাতের ঝুলওয়ালা চাপকানের উপর উর্দ্দি-পরিয়া সাদা পাগ্‌ড়ীবাঁধা ভৃত্যবর্গ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মালীরাও পরিচ্ছন্নবেশে পাইপে করিয়া জল-সিঞ্চনকার্য্য করিতেছে; হঠাৎ দেখিলে কোন বিলাতী লর্ডের বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়।

টেনিস খেলা হইতেছিল। দুচারিটি ইংরাজ-নরনারী, স্থানীয় একটি উচ্চপদস্থ বর্ম্মীদম্পতি এবং গৃহস্বামীর পুত্র ব্রজরাজ স্বয়ং এই দলটিতে ছিল। ইহার মধ্যে কেহ কেহ খেলিতেছিলেন, দর্শকও কেহ কেহ ছিলেন। ব্রজ ও তাঁহাদের অংশীর কনিষ্ঠা-কন্যা মিস্ এথেল হ্যাম্পডেন দুজনেই ক্রীড়াবিরত দ্রষ্টা হইয়াছিলেন। দু একটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে রঙ্গিন্ ফ্রক পরিয়া বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতি গুলির মত ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতে ছিল। রাস্তার কাছ পর্য্যন্ত তাহাদের হাসির লহর তরল বায়ু-স্রোতের মত লঘুগতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। ফুলের মত হাসিমাখান মুখগুলি মধ্যে মধ্যে সবুজ-পত্রমণ্ডিত বৃক্ষন্তরালে যাইয়া, মধ্যে মধ্যে আবার মেঘমুক্ত নক্ষত্রবিন্দু-গুলির ন্যায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়া, উদ্যানের শোভাকে সার্থকতা দান করিতেছিল!

চারিদিকে চাহিয়া এথেল হ্যাম্পডেন কহিলেন, "কই? মিঃ চাটার্জ্জীকে আজও তো দেখিতেছি না! তিনি কি সর্ব্বদাই আফিস-ঘরে লুকাইয়া থাকেন?"

ব্রজর খেলার দিকে আদবেই লক্ষ্য ছিল না; সে ছিল হ্যাম্পডেনের স্বর্ণসূত্রসন্নিভ কেশজালের মধ্যে সায়াহ্ন-তপনের শেষ স্বর্ণরশ্মিটুকুর লুটাপুটি খাওয়া দেখিতেছিল; সে তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিল "না থাকিয়া করিবে কি? খাতাপত্র-ঘাঁটা ও অঙ্ক-কষা ছাড়া আর তো সে কিছুই শেখে নাই। রাত্রিদিন যে খাটুনিটা সে খাটে, আমি হইলে কোন্ কালে চাকরী ছাড়িয়া পালাইতাম।"

এই বলিয়া সঙ্গিনীর কৌতুকচঞ্চল সুনীল নেত্রের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল "বলুন, মানুষ কি কেবল হিসাব-কষিতেই জন্মেছে?"

এথেলও মৃদু হাসিলেন, কিন্তু হাসিটা তেমন প্রসাদ-প্রসন্ন নয়। কহিলেন "না, তা জন্মে নাই; কিন্তু সকলেই যদি হিসাবটাকে বাঘের মত দেখিতে থাকে, তা হ'লে বড় বেশি একটা বেহিসাবি-কাণ্ড ঘটিয়া দাঁড়ায় না কি? অবশ্য মিঃ চাটার্জ্জীর মত অত হিসাবীও ভালবাসিনা।" মিঃ চাটার্জ্জীর জন্য এই কুমারীর মাথা ঘামান ব্রজ মনে মনে পছন্দ করে না, অথচ আজকাল প্রায়ই এই অপছন্দ জিনিষটাই ঘটিতে থাকে। প্রথম প্রথম সে সঙ্কুচিত অনিচ্ছুক নির্ম্মলকে তাহার ঘোর আপত্তি না মানিয়া নিজের দলে টানিয়া লইয়াছিল; কিন্তু যেদিন তাহার

এই রূপসী সহচারিণী তাহার নূতন বন্ধুর অসাধারণ দৈহিক বর্ণসম্পদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নিজের মনের মধ্যে রোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের বনিয়াদ টলিয়া গিয়াছে। ব্রজ আর তাহাকে ধরাপকড় করিয়া টানিয়া আনে না; সেও তাহাতে দুঃখিত না হইয়া বরং রক্ষাই পাইয়া গিয়াছে। সাতজন্মের অভ্যাস,—সে কি এমন কায়দা-দুরস্তভাবে এই সব অভিনয়ে যোগদান করিতে পারে! ব্রজ আজও একটু মুখ ভার করিয়া কহিল "ঐ দুইরকমই আপনি সংসারে পাইবেন, এ ছাড়া তৃতীয় রকম হয় না মিস হ্যাম্পডেন, অবশ্য দুঃখের বিষয় সংশয় নাই।"

বাহিরে—বাড়ীর বাহিরে নয়, ঘরের বাহিরে—এই হাসিখেলা চলিতেছিল;—হাস্যে, লাস্যে, উৎসাহে, কৌতুকে ব্যায়াম ও বিশ্রাম জমিয়া উঠিতেছিল; আর এই বাড়ীর ভিতর বড় বড় দুইটা জমকালো সাজান হল পার হইয়া দক্ষিণদ্বারী একটা অনতিবৃহৎ আফিস ঘরে দুইজন সহকারী লইয়া সেই স্নিগ্ধ, সুন্দর অপরাহ্ণে তখন পর্য্যন্তও মিঃ চাটার্জ্জী আয়ব্যয়ের ত্রৈমাসিক ঠিক করিতে নিবিষ্টচিত্ত।

'মিঃ চাটার্জ্জী' বলিয়া উঁহাদের দেখাদেখি নির্ম্মলের নাম উল্লেখ করা গেল বটে, কিন্তু 'মিষ্টার' বলিতে বাঙ্গালী-বাবুদের যাহা বুঝায়, এই চাটুয্যে-মহাশয়ের ভিতর সেই সকল বাবুসুলভ গুণগ্রামের কিছুই বর্ত্তমান না থাকায় ইঁহাকে ইঁহার নিজনাম 'নির্ম্মল' বলিয়া উল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। যেহেতু, এই ছেলেটির গলায় এক-টুকরা রঙ্গিন্ ন্যাকড়া ঝুলান ছিল না, প্যাণ্টুলেনের হাঁটু তোলা ছিল না, মুখে নারী-প্রসাধনসুলভ পাউডর লেপা ছিল না, ওষ্ঠাধরে চুরোটিকা ধূমোদ্গীরণ করিতেছিল না, এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে কোনপ্রকার ক্লেশানুভবও ছিল না। তবে এত 'ছিলনা'র মধ্যে একটী গুণে অর্থাৎ একটী অজুহতে সে এই 'মিষ্টার চাটার্জ্জী' নামে আখ্যাত হইতে পারে। আর সেইটাই বিশেষ করিয়া ঐ সমস্ত 'ছিল'র মধ্যে ব্রজর ছিল না। সে জিনিষটা যদিও অবশ্য নির্ম্মলের নিজের কোনই বাহাদুরীই ছিল না, কারণ সেটা দৈবায়ত্ত—তাহার স্বোপার্জ্জিত নহে। গায়ের সুন্দর রংটাই শুধু তাহার এই কালো-সার্জ্জের সুটটার সহিত আশ্চর্য্য রকম মানাইয়া যাইতেছিল, এবং বোধ করি এই 'একটিমাত্র থাকাতেই' ওই কিশোরী ইংরাজ মেয়েটির দৃষ্টিতে নির্ম্মল তাহার সহস্র ত্রুটি লইয়াও একজন 'মিষ্টারে' পরিণত হইতে পাইয়াছিল।

এই দিকটাতেই "মুখার্জ্জী এবং হ্যাম্পডেন কোম্পানি"র আফিস। বাড়ীতে লোক বড় কম এবং সমস্ত নীচেতলাই অনর্থক পড়িয়া থাকিত; মুরলীধর বাবু এইটাই আফিসের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এইদিকের তিন চারিটা ঘরে সারবন্দী টেবিল-কেদারা পাতিয়া কেরাণীর দল সারাদিন খাটিয়া সারা হইয়াছে। এই কতক্ষণ কাজ সারিয়া তাহারা যে-যার স্থানে চলিয়া গিয়াছিল; কেবল নির্ম্মলের আফিসের দুইজন কেরাণী এখনও ছুটী পায় নাই।

রাশিরাশি কাগজপত্র টেবিলের মাঝখানে, ফাইলে ফিতা দিয়া বাঁধা, শ্রেণিবদ্ধ সাজান; তাহা হইতে আবশ্যক হিসাবপত্র নোট করিয়া আর কতকগুলি খাতা-পত্রে টুকিয়া লওয়া হইতেছিল। তিনজনেই কর্ম্মে তন্ময়; গণেশের কলমের মতই তাহাদের লেখনি প্রায় অনিবৃত্ত-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ঘড়িতে সাড়ে-ছয়টা বাজিয়া গেল। পশ্চিমের জানালা দিয়া সূর্য্যাস্তের লালে-সোণায়-মেলানো আলো তাহাদের কর্ম্মনত ললাটের উপর স্মিতদৃষ্টি মেলিয়া দিয়া, যেন জননীর স্নেহদৃষ্টির মতই মৃদু-অনুযোগে কহিতে লাগিল, "আর কত খাটিবে! এই দেখ, সারাদিনের কাজ শেষ করিয়া দিনের আলো আমিই এই নদী-জলের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ঐ ঘন-নিবিড় সেগুনগাছের ছায়ার মধ্যে এইবার বিশ্রাম-শয়ান হইব!" সে অনুজ্ঞা বোধ করি নির্ম্মলের কাণে পৌঁছিয়াছিল; সে কলমদানের মধ্যে কলমটা ফেলিয়া মাথা তুলিল। কেরাণী দুজন তখনও দুখানা সাদা কাগজের অঙ্গ অঙ্কের সাঙ্কেতিক-রেখাক্ষরে ভরাইয়া যাইতেছিল; কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

নির্ম্মল তাহাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। সেই বেলা প্রায় নয়টা হইতে ইহারা এইখানে এই রকমে, এই একই কাজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আছে; আরও বোধ হয় এক আধ ঘণ্টা এই ভাবেই কাটাইতে হইবে। তাহার মন যেন করুণায় আর্দ্র হইয়া আসিল। নিজেও অবশ্য সে ইহাদেরই সহিত একই সময়ে এইখানে আসন গ্রহণ করিয়াছিল; তাহার সারা দিবসও ইহাদের সমানভাবে

কাটিয়াছে এবং শরীর মনও এখন ঈষৎ ক্লান্ত অনুভূত না হইতেছে, তাহাও নয়। কিন্তু, একে সে তাহার নিম্নতন কর্ম্মচারী দুজনকার অপেক্ষাই অল্পবয়স্ক, শরীর ও স্বাস্থ্যে দৃঢ় এবং তাছাড়া মাঝখানের আধঘণ্টা ছুটীর অবসরে সে যে একবার ত্বরিৎচরণে উপরে উঠিয়া গিয়া, তাহার পরমবান্ধব, পিতৃপ্রতিম প্রভুর সেবা শুশ্রূষায় নিজের কর্ম্ম-ক্লান্তি বিদূরিত করিয়া আইসে; ইহারা তো সে সুযোগ পায় না! অধীনস্থ কর্ম্মচারীদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের তরুণ প্রভু সহানুভূতিসূচিত স্বরে কহিল, "আপনারা এইবার বাড়ী যান; আমার কাজ তো শেষ হইয়া গিয়াছে, আপনাদের বাকি কাজটুকু আমিই সারিয়া লইতে পারিব।"

কাজ লইবার এমন সহজপন্থা সহৃদয়তার মত আর নাই। যাহারা এইমাত্র ঈষৎ বিরক্তিবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, উদ্ধতনের এই আন্তরিকতায় তাহা ক্ষণমধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়া বরং তাহার স্থানে নিজেদেরই যেন একটু ন্যূনতা বোধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহারা বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে সে কি? আপনিও তো আমাদের চাইতে কিছু কমক্ষণ বসেন নাই।"

"তা হোক! আপনাদের অপেক্ষা তো আমার বয়স অল্প; কাজ করিবার ক্ষমতা আমার বেশী থাকাই উচিত। তা ছাড়া, মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য আমি তবু তো একবার নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পাই; আপনারা তো সে সুযোগও পান না! ছাড়িয়া দিন ওটুকু আমিই শেষকরিয়া ফেলিতেছি।"

এ রকম কতবারই হইয়াছে। যে জিনিষটা কেরাণী জীবনের পক্ষে একান্ত দুর্ল্লভ দর্শন, এই আফিসে ঢুকিয়া ইহারা সেই উড়ম্বর-পুষ্প-সদৃশ, মনিবের সহানুভূতির শুভদর্শন পাইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত মাথা নোয়াইয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মল তাহাদের পরিত্যক্ত একখানা খাতা টানিয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ হিসাব-কষা আরম্ভ করিয়া দেওয়াতে তাহাদের চোকের দৃষ্টি হইতে মনের আশীর্ব্বাদটুকু কুড়াইয়া পাওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। তা নাই ঘটুক; সে যেখানে কোনপ্রকার কর্ত্তব্যের নিকট নিজেকে দায়ী করিয়া ফেলে, সেখান হইতে ফিরিয়া পাওয়ার আশা করিয়া তো কিছু করে না। তাই পাইলে দুএকজন ভিন্ন অধিকাংশের মতই উপরি-পাওনার ন্যায় সেটা খুব আনন্দেরই হয়; কিন্তু না পাইলে তাহাতে কোনরকম ক্ষোভের কারণ ঘটিতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মের ফলই এইটুকু; ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে ফলে বড় শান্তি পাওয়া যায়।

কাজ শেষ করিয়া আফিস ঘরের অপরভাগে তাহার নিজের ঘরে গিয়া, তাড়াতাড়ি পোষাক বদলাইয়া সে অতিশয় ব্যস্তভাবে সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার অসংখ্য ঘর দ্বার পার হইয়া, কোথা দিয়া কোথায় আসিয়া, শেষে উপরে উঠিবার একটা সিঁড়ি অতিক্রম করিতে লাগিল। বাড়ীখানা যেমন বৃহৎ তেমনই সুসজ্জিত। চেষ্টাবান নিধনব্যক্তি যখন নিজের অধ্যবসায়বলে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন, তখন সর্ব্বপ্রথম স্থাপত্য শিল্পের উপরই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নিজের বাড়ীটি প্রতিবেশীবর্গের মাঝখানে যাহাতে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি খুব প্রখর থাকে। তারপর সেই কল্পনার প্রাসাদকে বাস্তবে আনিয়া সেকালের তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বারমাসে তেরপার্ব্বণ উপলক্ষে প্রতিমা সজ্জার উপর ব্রাহ্মণ ভোজন কাঙ্গালীভরণ, পুরাণকথন প্রভৃতিতে নিজেকে বাড়াইয়া দশের মধ্যে শ্রেষ্ঠআসনগ্রহণের চেষ্টায় নিবিষ্ট হইতেন; কিন্তু এখনকার ইঁহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, পূজাপার্ব্বণ সমুদয় অনার্য্যপ্রথা—এ সমস্ত কোলারীয়, দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতি আদিমবাসী হইতে আসিয়াছে, অতএব আর্য্যসন্তানের পক্ষে এ সমুদয় ত্যাজ্য—লোভী ব্রাহ্মণগণ ভোজনপ্রীতিবশেই দেশের সর্ব্বনাশকর জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া, ঠকাইয়া দক্ষিণা-গ্রহণ করিতেছিল। আর ঠকা হইবে না। কাঙ্গালীভোজনে দেশে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়;—ইহাতে মহা পাপ! বেদই তো চাষার গান! অনার্য্য ভয়ে একান্তভীত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অদ্ধসভ্য আর্য্যগণের মনঃকল্পিত দেবতার নিকট সাহায্য প্রার্থনাভিন্ন কোন বড় জিনিষ ইহাতে কিছুই নাই। পুরাণে বা আর আছে কি? ক্ষুদ্র মানব-কল্পনার অদ্ভুত, উদ্ভট রূপকমালা কাহার কি শ্রেয়ঃ দানে সমর্থ? কাজেই ওসকল অনাবশ্যক বাজে মালের পৌনঃপুনিক আমদানি না করিয়া তাঁহারা নূতন, তাজা-আমদানিকরা ফ্রেঞ্চ-ফ্যাসনের গৃহসজ্জায় বাড়ীখানিকে পটের মত করিয়া তোলেন। মধ্যে মধ্যে এই সব ইন্দ্রভবনে আধুনিক অমরঅমরীর পদার্পণে সুর-সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইহাতে কুটিল-ষড়যন্ত্রকারী ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের দল

একেবারে জব্দ হইয়া যায়, কারণ এ সভার সুধা এবং সুখাদ্য কিছুই সেইসব পুরাতন পুরোহিতবংশধর ইদানীং ব্রাহ্মণ-ঠাকুরগণের নোংরা-হাতের স্পর্শদোষে দূষিত হইতে পায় না। সেসকল তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে শ্রদ্ধাস্পদ মহামান্য পিরু-খানসামার চাপকানের বোতাম-আঁটা হাতে পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে।

অনেকসময় এই গৃহ-সম্পত্তিটির প্রতি একটু অতিরিক্ত মমতাবশতঃ গৃহাধিকারী নিজের গৃহিণীটির অঙ্গ খালি করিয়াও গৃহ-সজ্জার ত্রুটিপূরণ করিতে অকুণ্ঠিত থাকেন। মুরলীধরবাবুও অনেকটা এই শ্রেণীর লোক। গৃহ-সম্পত্তি ও গৃহ-সজ্জার উপর ইঁহার বিশেষ রকম একটা ঝোঁক দেখা যাইত। এই সুদূরে এতবড় রাজ-অট্টালিকাতেও তাঁহার মন উঠে নাই, মৌবিন্ ও মৌলমেনে তাহার আরও দুইখানি বাড়ী ছিল। তবে সেগুলি বস্তু এমন প্রাসাদ-সদৃশ নয়।

নির্ম্মল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মুখের একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাহাকেও দিয়া একটু খবর লইতে হইবে। ধীরা দিনরাত্রির প্রায় তৃতীয়াংশ সময়ই বাপের নিকট থাকে। তাই সে ঘরে তো হঠাৎ গিয়া ঢুকিয়া পড়া যায় না। এইখানে যে বর্ম্মীদাসী অপেক্ষা করে, আজ এখন সে উপস্থিত ছিল না। অগত্যা অনুপায়ে তাহারই প্রতীক্ষা করিবার অভিপ্রায় করিয়া সে একটা খোলা-জানালার নিকট গিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল।

ইহার নীচে বাগানের যে অংশে টেনিসকোর্ট, সেই অংশটাই। খেলা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, ক্রীড়াশীলগণ চা-পান শেষে, কেহ বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন, কেহ কেহ যুগলে-মিলিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাদের অলস-মন্থর লীলাসরস গতিভঙ্গী এবং কল-ঝঙ্কারি সঙ্গীতময় হাস্যধ্বনি সে কিছুক্ষণ অবধি চুপ করিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং শুনিল।

সকলের নিকট হইতে অল্পদূরে একখানা লৌহবেঞ্চে ব্রজ এবং মিস্ হাম্পডেন পাশাপাশি বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এখেলই অধিকাংশকাল বক্তা এবং ব্রজর অনিমেষ-মুগ্ধদৃষ্টি তাঁহার সেই প্রভাতকুন্দকুসুম-সদৃশ শুভ্রমুখে, সেই নীলাম্বুনীল-চঞ্চল নেত্রেবদ্ধ করিয়া কাণের ভিতর দিয়া বোধ করি সেই বাক্য-সুধা মরমের মধ্যেই গ্রহণ করিতেছিল। দূর হইতেও তাহার কালো চোখের সেই নির্ব্বল আলোটুকু নির্ম্মলের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইতে বাধা পায় নাই। নির্ম্মলের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা শোকের দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এই ঘনায়মান শ্যামসন্ধ্যাতলে, ওই নিকুঞ্জপাশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাগতিক-অনৈক্যসমষ্টিমধ্যে বদ্ধিত, ওই দুই মূর্ত্তির মধ্যে এ ঘনিষ্ঠ যোগ কেন? ব্রজ কি তাহার ওই আকুলভরা দৃষ্টি দিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তিনীর সহিত তাহার ভেদ দেখিতে পাইতেছে না? এই সার্থকতাবিহীন কামনায় ফল কি? দেশের লোকের প্রবৃত্তিস্রোত এমন বিচারহীন পথে ছুটিতে চাহিতেছে কি জন্য? অনেক ভাবিয়াও এ কথার উত্তর সে নিজের কাছে খুঁজিয়া পায় নাই। নিজের চিরন্তন আদর্শের বাহিরে সংস্কারান্ধ জীব যে কেমন করিয়া সুখান্বেষণে ছুটিয়া যায়, ইহা তাহার নিকট এক গভীরসমস্যা! তাহার মনে হইল, মরিয়া গেলেও সে বোধ হয়, এরকম পাবে না। অত কথাই কি, এই ধরিয়া লও, যদি গৃহকর্ম্মনিপুণা, শাদাসিধে বাঙ্গালীর মেয়ে অপর্ণার পরিবর্ত্তে কেহ তাহাকে একটি দশকন্যান্বিতা পঞ্জাবী নারীর স্বামীত্ব গ্রহণ করিলে রাজত্ব দান করিতেও চাহে, সে বোধ করি তাহাতেও রাজী হয় না। উঃ!—না পাগল সে! এ কি মনে করিতেছে! অপর্ণাই যে তাহার জীবনের একমাত্র ঈপ্সিততম ধন, তাহাকে ভিন্ন সে জীবনধারণ করিতেই পারিবে না। আহা, কবে যে সে তাহাদের কাছে যাইতে পাইবে? সে এখানে এই রাজভোগে ডুবিয়া আছে; আর সেখানে মাতা-পুত্রীতে তাহারা সেই সুখলেশহীন অধীন-জীবনের শতলাঞ্ছনার তলায় পড়িয়া! হে ভগবান! ইঁহাকে শীঘ্র একটু ভাল করিয়া দাও, ছুটি চাহিবার মত এতটুকুও সুলক্ষণ দেখা দিক, সে একবার দিনপনর যোলর জন্যও তাহাদের কাছে তা হইলে ছুটিয়া যায় এবং তাহাদের সব দুঃখের অবসান হয়!

পশ্চাতে কাহার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ হইল। কে? এ কি তাহার স্বপ্ন, না সত্য! সেই দূর নীলাম্বুধির পারে, সুদূর পশ্চিম-বঙ্গের একখানি ক্ষুদ্র পল্লীভবনে, সেই এক পরিচিত রন্ধনচুল্লীর পার্শ্বে দীর্ঘ প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে, অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে যে দীর্ঘশ্বাস নর্ত্তনশীল নীলশিখার সরল ঊর্দ্ধগতি কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে নিঃশ্বাস কি এতদূরেও বহিয়া আনিতে পারা যায়? হায়! নিজেকে নিরুপায় ভাবিয়া; কতবড় ভীরু

তায় সে তাহাদের কতখানি উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছে? না, এ কাপুরুষতার প্রশ্রয় আর নয়! আজ রাত্রেই সে পিসিমাকে পত্রে সকল কথা খুলিয়া লিখিবে। হাঁ, আর এও তো বড় মন্দ হয় না; যদি তাহার পিসতুত-ভায়ের সাহায্যে তাঁহাদের এখানে আনাইয়াই বিবাহ করে! চমৎকার কল্পনা! এমন সহজ কথাটা এতদিন তাহার মনেও পড়ে নাই!

ফিরিয়া দেখিল যাহার জন্য সে এতক্ষণ এখানে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এ সেই নিজে। ঘরের মেঝেয় পুরু গালিচা বিছান; কখন সে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা জানাও যায় নাই, বিশেষ তাহার গতিও অত্যন্ত লঘু; সাধারণতঃ সকল অন্ধেরই এইরূপ হইয়া থাকে।

সে সসম্ভ্রমে একটু অগ্রসর হইয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, "আমি মালেয়ামের তল্লাস করিতেছিলাম। সে এখানে নাই, তাই দাঁড়াইয়া আছি। এখন ও ঘরে তা' হ'লে যাইতে পারি কি?"

ধীরাও ইহার পূর্ব্বে তাহার অবস্থিতিতে অজ্ঞই ছিল; সাড়া পাইয়া তাই প্রথমটা ঈষৎ চমকিত হইল; কিন্তু তাহার বিবর্ণ গাল দুইটি হয় ত মনেরই কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে অল্প লালিমা লাভ করিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কণ্ঠেও গভীর বিষাদের সঙ্গে নবমিশ্রিত একটা আশাসূচক স্বরের ঝঙ্কার পাওয়া গেল। সে তাহার স্বাভাবিক মৃদুতা অপেক্ষা একটুখানি চঞ্চল স্বরে কহিয়া উঠিল, "আপনি এসেছেন, ভালই হইয়াছে। বাবা, আজ বোধ করি তেমন ভাল নাই। একটু যেন ছটফট করিতেছেন। অথচ কেবলই আমায় বাহিরে বেড়াইয়া আসিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আপনি গিয়া দেখিবেন, চলুন তো, ডাক্তার বলিলেন, ও কিছু না।"

বলিতে বলিতে বালিকার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল; দুর্ব্বলতার প্রবল আক্রমণ অনিবার্য্য বুঝিয়াই সে চুপ করিয়া মুখখানি নত করিল। ভগবান একদিক দিয়া এবং সে আর একদিক দিয়াই নিজের সমস্তটাকে,—তাহার নিকট জগৎ-ছবি যেমন ঘন-তামসে আবৃত—তেমনি করিয়াই ঢাকিয়া রাখে। জগতের চক্ষে অতিবড় সহানুভূতির পাত্র বলিয়াই কি, সে ঐ বস্তুটার সহিত পরিচয়ে আসিতে এমন ভয় পায়! তাহার মুখের কথা এমনি কদাচিৎ, যে নির্ম্মল এতদিনের ভিতর এতগুলা কথা আর কোনদিন শুনিতে পাইয়াছে, এমন তাহার মনে পড়িল না; এবং এই কারণেই তাহার এই চলিষ্ণুভাব তাহাকেও কিছু ভীত করিল। সাধারণ বালিকার ন্যায় এ মেয়ে বড় সহজে অন্যের কাছে তো তাহার হৃদয়-কবাট খুলিতে চাহিবে না! তবু সেভাব ঢাকিয়া লইয়া অভয় দিয়াই কহিল "আজ গরমটা অত্যন্ত বেশি কি না; সেই জন্যই বোধ করি একটু ছটফট করিয়া থাকিবেন। আচ্ছা আমি গিয়া দেখিতেছি।"

নির্ম্মল দুইপদ অগ্রসর হইতেই ধীরাও তাহার নিঃশব্দ, মৃদুসঞ্চারী গতিতে তাহার অনুসরণ করিল। জন্মান্ধ তাহার নিজের চিরপরিচিত গৃহে চক্ষুষ্মানের মতই অসঙ্কোচ-গতি, কেবল জন্মগত অভ্যাসানুযায়ী অতি ধীরগতিশীলা।

(১৪)

প্রকাণ্ড বাড়ীটার অসংখ্যগৃহ কত বিচিত্রসাজে সাজিয়া নীরব, নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে। দাসদাসীদের মার্জ্জন হস্ত এবং ডাক্তারের আসা যাওয়ার পদস্পর্শ ভিন্ন মানব সংস্পর্শবিবর্জ্জিত পাঁচ সাতটা খালিঘর পার হইয়া অবশেষে সেই রোগীর গৃহদ্বারের নিকট আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল। নির্ম্মল যতক্ষণ নিজের জুতা খুলিতেছিল, ততক্ষণে ধীরা পর্দ্দাটা ধীরহস্তে সরাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেই ঘরের মধ্যস্থ রোগীর দৃষ্টি অমনি তাহার উপর, পতিত হইল; কিন্তু সন্ধ্যার ছায়া বাতায়নরুদ্ধ গৃহে তখন গাঢ়তর হইয়া আসাতে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে? লুলু? মালেয়াম?"

"না বাবা আমি!" বলিয়া ধীরা পিতার বিছানারদিকে অগ্রসর হইয়া গেল। নির্ম্মলও তখন ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিছানা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে। "আঃ, তুমি রাত্রিদিন এমন করিয়া এই বদ্ধঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে ধীরা! এই এত করিয়া বুঝাইয়া পাঠাইয়া দিলাম; দু-মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিলে! না, তুমি বড় অন্যায় করিতেছ!"

"আচ্ছা বাবা আমি এখনই যাইতেছি!" ধীরা পিতার মাথার দিকে খাটের পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার কপালে আস্তে-আস্তে হাত রাখিল "তুমি ভাল আছ!

কোন অসুখ করিতেছে না ?" তাহার মুখখানা নত হইয়া ললাটের কাছে দুখানি কোমল ওষ্ঠাধর প্রায় নামিয়া আসিয়াছিল। তা দিনের মধ্যে এমন না হোক, তবু দশ পনের বারও আসে;—কিন্তু এবার তাহারা ব্যর্থ আশায় ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, এঘরে তাহারা শুধু দুটিমাত্র তাহার আঁধার জগতের প্রাণীই বর্ত্তমান নয়; আরও একজন দর্শক এখানে উপস্থিত আছে। আবার একবার পিতার মুখে চোখে হাতবুলাইয়া সেইটুকুকে যেন নিজের মধ্যে ভরিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাড়াইল। নিৰ্ম্মল হাজার অন্ধকার হইলেও, হাজার হউক ছেলেমানুষ, দৃষ্টি তাহার বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ। সে পাশে দাড়াইয়া সবই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার মনটা বড়ই উতলা হইয়া উঠিল। ওই নীরব স্পর্শটুকুর মধ্যে কতবড় একটি মহান্ পূজা অব্যক্ত রহিয়াছে। উঃ, কি গভীর নির্ভরতা পূর্ণ ভালবাসা এই মুমূর্ষ পিতার প্রতি লইয়াই এ বালিকার প্রত্যেক অনুপলটি কাটিতেছে! ভগবান! ইহার ভবিষ্যতের কথা কি ভাবিতেছ ?

"কেমন আছেন ?"

"ভাল আছি, বসো, বাবা বসো, ধীরা !"

"কি বাবা, আমিও কি তোমার কাছে বসিব ?"

"পাগ্‌লি! তুই যে রাত্রিদিন চব্বিশ ঘণ্টাই আমার কাছে বসিয়া আছিস্। দু বৎসর—আজ এই সাতষট্টি বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ দুবৎসর—তোর এই ঘরের মধ্যে এম্‌নি করেই যে কাটিয়া গেল। তবু তোর বসার সাধ মেটে না ধীরা ?

ধীরা দুএকপা গিয়াই আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল; পিতার বাক্যে সে নিৰ্ম্মলের সান্নিধ্যস্মরণে লজ্জা পাইয়া মৃদু মৃদু আপত্তি প্রকাশ করিল; কহিল "চব্বিশ ঘণ্টা কই বাবা রাত্রে কোথায় আমি থাকিতে পাই ? রাত্রে তো জনার্দ্দন থাকে, মান্নি থাকে, আমি তো ওঘরে শুই, ঘুমিয়ে পড়ি।"

মুরলীধর হাসিলেন "তুমি যা শুয়ে ঘুমোও, সে কি আর আমি জানিনে। ওরে ধীর,—তুই আমায় ফাঁকি দিয়ে যা কিছু করিস্, সে সবই আমি খবর রাখিরে। রাত্রে যদি বা অনেক কষ্টে এখান থেকে উঠিয়ে দিই, তো ওই দরজার কাছে কতবারই যে একটি ছোটছায়া ঘুরে যায়, সেটা বন্ধ করা আমার সাধ্যে হয়ে উঠেনা। ঘরে একটা আলো দিতে ব'লে দে না মা!"

নিৰ্ম্মল বিছানার উপর মাটিতে পা রাখিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছিল; পিতাপুত্রীর কথাগুলা তাহার মনের মধ্যে একটা করুণার তুলিকায় শ্রদ্ধা সহানুভূতিমাখা হইয়া বুলাইয়া যাইতেছিল। এই রহস্যপূর্ণা অন্ধ নারীর জীবন-ইতিহাসের সেই গুপ্ত অধ্যায়টি এই একমাত্র তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখ দিয়া আজ ব্যক্ত হইল, সেটুকু তাহার কর্ণে পৌরাণিক বীররমণীগণের কাহারও চেয়ে ছোট বোধ হইল না। সেখানি কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্রতম অথচ পবিত্রতম উৎসর্গিত হৃদয়ের সেবার ইতিহাস! যযাতিসন্তান পুরুর মতই নৈষ্ঠিক পিতৃপরায়ণতার সকরুণ উদাহরণ!

ধীরা পিতার স্নেহাভিব্যক্তিতে লজ্জা পাইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, আলোকের কথায় ফিরিয়া বলিল "আলো তো তোমার চোখে সহ্য হয় না বাবা, ?"

"সে যে দিনের আলো! আর মধ্যে মধ্যে তোদের মুখগুলি না দেখে যে থাক্‌তে পারিনে মা! নিৰ্ম্মল! আমার খুবকাছে সরে এসে, আমার কপালটায় হাত দাও।"

ধীরা একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। দ্বারের বাহিরে গিয়া তাহার মনে, হইল যদি সে দেখিতে পাইত তা হইলে কত সময় এই দ্বারের নিকট হইতে গোপনেই তো তাঁহাকে দেখিতে পারিত, সর্ব্বদা কাছে বসিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল!

"আঃ, তোমার হাত বড় ঠাণ্ডা, যেন কপালটা আমার জুড়িয়ে গেল! ধীরার হাত বড় নরম, নরম কিন্তু ঠাণ্ডা নয়। কোথা থেকেই বা হবে! চব্বিশ-ঘণ্টাই যে সে এই জ্বলন্ত কপালে, পায়ে হাত দিয়েই রেখেছে! নির্ম্মল! আমার যা কষ্ট, তা কারুকে বলিবার নয়, লোকে জানে আমি বড় সুখী, কেননা, আমার অনেক টাকা আছে। কিন্তু তারা হয় তো জানে না, আমি মনে মনে তাদের কতখানি ঈর্ষা করি। হাঁ নির্ম্মল, সত্যকথাই আমি তোমায় বলিতেছি। এখন সত্যভিন্ন আর কিছু বলিবার বা ভাবিবার সময়ও আমার নাই। এমন কি এক এক সময় এত অসহ্য আমার বোধ হইয়াছে যে, আমার বাগানের মালি মিয়াং, আমার খানসামা, মালি, এদের সঙ্গে নিজের

অবস্থা আমার বদলাইয়া লইতে ইচ্ছা হইয়াছে। রাস্তা দিয়া সবল, সুস্থ ছেলেসঙ্গে ভিখারীকে যাইতে দেখিয়া, আমার ওই বারান্দা ছাড়িয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার সেই ছেলেটির হাত ধরিয়া দোর দোর ঘুরিতে সাধ গিয়াছে। কেন না আমি তা'র মুখে সুখের আলো দেখিতে পাইয়াছি। কি বলিব? জীবন আমার অসহ্য হইয়াছে, কিন্তু······মরণ?······উঃ, সে আরও অসহনীয়! আমার সময় তো শেষ হইয়াই আসিল; আর যে বেশীদিন কাটিবে সে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। কিন্তু যে ভাবনা সঙ্গে লইয়া আমায় মরিতে হইতেছে, তাহাতে মরিয়াও আমার গতি হইবে না।" এভাবে নিজের সম্বন্ধে দৌর্ব্বল্য-প্রকাশ মুরলীধর বাবুর স্বভাব নয়। মেয়ের মত লোকের নিকট হইতে নিজের অন্তর বাহিরের শতকষ্ট ঢাকিয়া রাখার চেষ্টাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই আজ হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত-আত্মপ্রকাশে নির্ম্মল একটু ভয় পাইয়া গেল।

"অসুখ বোধ করচেন কি? ডাক্তারকে একবার ডাকতে বল্‌বো?"

"ডাক্তার!" মুরলীধর বাবু হাসিলেন "ডাক্তার কি করিবে? ঢের চেষ্টাই তাহারা এই দুবৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। একটা পয়সাওয়ালা লোক আধমরা থাকিলে তাহাদেরই মঙ্গল নয়, তা সে কথা তারাও বিলক্ষণ বুঝে এবং চেষ্টারও ক্রটী করে নাই। না ডাক্তার নয়। এখন আমার এ ভবরোগ শান্তির কাল নিকট হইয়া আসিতেছে সে আমি টের পাইতেছি। এখন তোমার হাতেই আমার শেষ শান্তির ভার।"—

নির্ম্মল বিস্ময়ে চোক ডাগর করিয়া চাহিল; তাহার ভয় হইতেছিল, তিনি প্রকৃতিস্থ আছেন কি না? মুরলীধর পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন "হ্যাঁ নির্ম্মল, যাবার আগে—"

"বাবা, বাবা, আমি বাপহারা হয়ে আপনার কাছে বাবার চেয়েও অধিক স্নেহ পেয়েছিলাম। আপনি ওসব কথা বারবার বলিতেছেন; ওতে আমার প্রাণের মধ্যে কি রকম করিয়া উঠে।"

নির্ম্মল মাথা হেঁট করিয়া হঠাৎ চুপ করিল। তাহার নাসারন্ধ্র আরক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল; চোকে জল টলটল করিতেছিল। অকস্মাৎ সেই সরলচিত্ত দুর্ব্বল রোগীও বড় বেশী বিচলিত হইয়া উঠিলেন; বোধ হইল তাঁহার কোটরনিবিষ্ট চোখের কোলে ফোঁটাকয়েক জল রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ তিনি নীরব থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে নিজের কম্পিত-হস্ত উঠাইয়া তাহা তাঁহার পার্শ্বস্থ অবনত মস্তকের উপর ক্ষণকাল স্থাপন করিলেন; মনে মনে সেই সঙ্গে অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ বোধ করি অজস্রধারেই বর্ষিত হইয়াছিল। তারপর বহুচেষ্টায় মানসিক উদ্বেগ দমন করিয়া পূর্ব্বের মত মৃদুকণ্ঠেই কহিলেন "যা অনিবার্য্য, তার জন্য প্রস্তুত না থাকাতেও কোন ফল নাই! তাই আজ আমার শেষ কাজটুকু সারিয়া ফেলিতে চাই! ধীরা থাকে, তাই এত-দিনেও একদিন বলিবার অবসর পাই নাই। তোমায় আমি আমার ব্রজর চেয়েও ভরসা করি; তোমাকেই তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি গেলে ধীরার কি গতি হইবে?"

যে স্বরে এ জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হইল, তাহা বোধ করি পাষাণকেও কাঁদাইয়া ছাড়ে। বিশেষ যখন এই বিদায়োন্মুখ পিতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুল-চিন্তায় স্নেহাতুর চিত্তের স্বাভাবিক কল্পিত দুশ্চিন্তার অংশ নাই বলিলেই হয়। বোধ করি সন্তান সম্বন্ধে এত বড় দুশ্চিন্তা বক্ষে লইয়া কোন পিতা কখনও পরলোকের পথে বাহির হন নাই।

সে কি বলিবে? বলিবার কি আছে? শুধু উত্তর করিল "ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন!" এর চেয়ে বেশী সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট দাবী করাও যেন ক্ষুদ্র মানবচিত্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারপর রোগীর পাণ্ডু অধরে এক ফোঁটা তীব্র দুঃখের জ্বালা হাসির আকারে দেখা দিল।

"একদিন তো যেতেই হইবে? ব্রজর ব্যবহার তো দেখিতেছ? সে কি ওর সুখ চাহিবে? না ও যাহাকে বিবাহ করিয়া আনিবে। যদি কখনও আনে, সেই বিবি বউই কি ওর দুঃখ বুঝিবে?"

এইখানে নির্ম্মল একটু চমকিয়াছিল; ইনি বিবিবউ'এর উল্লেখ হঠাৎ করিলেন কেন? কিছু শুনিয়াছেন না কি? মুরলীধরবাবু তেমনই আত্মবিস্মৃতভাবে কহিয়াই যাইতেছিলেন "উইলে আমি ওকে ব্রজর সঙ্গে আমার বিষয়ের ভাগ সমান দিয়াছি। আফিস যতদিন চলিবে, তাতেও ওর এক-তৃতীয়াংশ ভাগ থাকিবে। ব্রজর সঙ্গে এই লইয়া অনেক কথা কাটাকাটি হইয়া গেছে; সে বলে 'একটা অন্ধের অত টাকা

কেন? খোরপোষ হইলেই ওর পক্ষে তো যথেষ্ট হইল! ওর কিসের দরকার! কিন্তু কেন? কেন ও কিছুই পাইবে না? একটা মানুষের পক্ষে কি শুধু দুটি দুটি খাইতে পাওয়াই পর্য্যন্ত? ও দান-ধ্যান করিবে, ভোগ করিবে; যদি ওর বিবাহ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় যদি ওর সন্তান জন্মায়, তখন তারা ভোগ করিলে তো ও সুখী হইবে? টাকায় কার দরকার নাই?—কিন্তু আমি ওকে শুধু দুটো টাকা দিয়াই তো চলিয়া যাইব, আর কিছু তো পারিব না। কে ওকে যত্ন করিবে, ওর বিষয় রক্ষা করিবে? ওর মুখ কে চাহিবে?"

এবার মুরলীধর অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া বকিয়া কিছু শ্রান্তও হইয়াছিলেন। বলিবার কোন কথা না পাইয়া নির্ম্মলও চুপ করিয়া রহিল।

এদিকে বাহিরে সারাদিনের গুমোট কাটাইয়া কখন খুব মেঘ করিয়া আসিয়াছিল, এবং কোন্ সময় ঝড় উঠিয়া এখন বদ্ধখড়খড়ির পাখিগুলায় ঝটাপটি করিয়া প্রাণপণে রুদ্ধ সার্সি ঠেলিয়া বায় গর্জ্জিয়া উঠিল, খড়খড়ির ফাঁকে বিদ্যুৎ ঝলকিয়া বজ্র হাঁকিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যের এ সকরুণ অভিনয় বোধ করি প্রকৃতিরও অসহ্য হইয়াছিল।

"বাবা নির্ম্মল!" নির্ম্মল চমকিয়া উত্তর করিল "আজ্ঞে?"

"কার হাতে অভাগিনীকে দিয়ে যাব নিমু? কে ওর টাকার লোভে ওকে বিয়ে ক'রে সতীন গঞ্জনা দেবে না? কে এমন মহৎ আছে যে, যথার্থ দয়ার পাত্রীকে প্রকৃত দয়া ক'রে গ্রহণ করবে?"

বড় কঠিন সমস্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! নির্ম্মলের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল। শরীরের ভিতর রক্তটা যেন ওঠানামা, আন্‌চান করিতে লাগিল। সে যে কি করিবে, কি বলিবে, তাহার কোন থেই যেন খুঁজিয়া পাইল না। তিনি যে কি কহিতেছেন, সে কথা বুঝিতে না পারিবার ভান আর এখন করা চলে না। বহুপূর্ব্বেই এ আভাস শতচ্ছলে মনের মধ্যে জাগিতে চাহিলেই তাড়না খাইয়া মুখ নত করিয়া ফিরিয়াছে; কিন্তু আজও কি আর মনকে নেত্রসঙ্কেত করিয়া বুঝাইবে? তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হঠাৎ যেন শিহরিয়া উঠিল। কে যেন ভিতর দিক হইতে ডাক দিয়া বলিল 'এইবার নিমু, তোর কঠোর পরীক্ষার কাল আসিয়াছে। দেখি, ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিস্ কি না!' কিন্তু কি যে সে ধর্ম্ম, সে বিচার সে তাহারই হাতে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া গেল বুঝাইয়া দিয়া গেল না। শুধু মুচকি হাসিয়া বলিল 'কচিখোকা তো নও; নিজেই বুঝিয়া দেখ না কি ধর্ম্ম?' আতঙ্কে তাহার যেন বাক্যস্ফুরণশক্তি রহিল না। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়া হয় ত সে এখনই নিজের সর্ব্বনাশ সাধিয়া বসিবে! ইহার পর কাকে বিসর্জ্জন দিবে, তারও কিছু ঠিকানা নাই।

মুরলীধর বোধ করি, এভাব তাহার নিকট আশা করেন নাই। সুস্পষ্ট না বলিলেও তিনি যে তাহার নিকট নিজের কৃতোপকারের কি মূল্য চাহিতেছেন, সেকথা অস্পষ্টভাবে সেই প্রথম হইতেই তিনি যে রকম উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে নির্ম্মল যে সে ইঙ্গিত বুঝিয়াই নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে পারিয়াছে, এই সম্ভাবনাই তাহার কল্পনায় ছিল। এখন তাহাকে নীরব দেখিয়া তাহার মনে হইল, তাহার প্রস্তাব বুঝিয়াই সে নিজের অনভিমত বিষয়ে চুপ করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে মনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইল। একটু অভিমানও আসিল; কিছু কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন "পৃথিবীর মধ্যে এক তোমারই আমার একটু ভরসা ছিল। তোমার হাতে ওকে দিয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতাম! কিন্তু তুমিও বোধ করি, আমার অন্ধ মেয়েকে ঘৃণা করিয়া—"

তাহার এই কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা যে এতবড় একটা অর্থ বিকৃতি করিয়া বসিতে পারে, এমন সম্ভাবনা নির্ম্মলের সংসারানভিজ্ঞ চিত্তে উদিত হয় নাই। এখন বুঝিতে পারিয়া তাই সে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই চম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিল "না না, ওকথা আপনি মনে করিলে লজ্জায় আমি মরিয়া যাইব। না না ওরকম চিন্তার আভাসও কখনও আমার মনের কোণেও না দেখা দেয়, ওঁকে আমি দেবী বলিয়া মনে করি। ভক্তি করি, প্রণাম করি।—"

নিজের যথার্থ মনের কথাই সে এই আকস্মিক উত্তেজনার মুখে বলিয়া ফেলিয়াছিল। ও রকম একটা বড় আঘাত না খাইলে হয় ত তাহার এ সলজ্জ-সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিত না।

বৃদ্ধের মুখ ঘরের সবুজ আলোকেও উজ্জ্বল দেখাইল "তবে ওকে বিয়ে কর। শ্রদ্ধাই যথার্থ ভালবাসা। ওকে শ্রদ্ধা করা মানেই ওর অবস্থার প্রতি করুণা করা। সেই-

টই ওর সবচেয়ে দরকার; আর কিছু না হইলেও একরকম চলে।"

নির্ম্মলের বুক দুপ্ দুপ্ করিতেছিল। ভিতরে এত জোরে শব্দ হইতেছে যে, মনে হইতেছে, বাহিরে কাহারও নিকট সে শব্দ পৌছিতে বাকি থাকিতেছিল না। তাহার মুখ মাথা চোক কান সমুদয় একসঙ্গে আগুন লাগার মত ঝাঁঝাঁ করিতে লাগিল। কথা তাহার বাহির হইল যেন গ্রামোফোনের কম্পিত স্বরের মধ্য দিয়া, মানুষের গলার স্বর যেন সে নয়।

বলিল, কোনমতে বলিল, "কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু সেখানে, দেশে আমি এক বিধবার মেয়েকে বিবাহ করিব স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। এতদিন তাঁরা আশায় বসিয়া আছেন।·· ··· সে কি ধর্ম্ম হইবে?" এই ধর্ম্মাধর্ম্মের সমস্যাটাই আপাততঃ তাহার নিকট ধীরা বা অপর্ণার চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

মুরলীধরও এই উত্তর শুনিয়া অল্পক্ষণ কি ভাবিলেন। তাঁহার মুখের সেই ক্ষণপূর্ব্বের উজ্জ্বলতা একটু ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। পরে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁদের অবস্থা মন্দ?"

"খুবই মন্দ।"

"মেয়ের বয়স?"

নির্ম্মল কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে উত্তর দিল "বোধ করি বৎসর তের, এমনি হইতে পারে।"

"কে আছেন?"

"মা ভিন্ন আর কেহ নাই। মা পিসিমার ওখানে—"

"বুঝিয়াছি। নির্ম্মল, শুধু এই জন্যই আমি তোমায় এত করিয়া চাহিতেছি! দয়ার তোমার অন্ত নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যাকে তুমি দয়া করিয়া নিজের স্ত্রী করিতে স্বীকার করিয়াছ, তাহ'তেও আমার ধীরা কত অংশে দয়ার পাত্রী! সে গরীব! কিন্তু ধীরার বিপুল-সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্তা না থাকিলে ধীরার পক্ষে সে ধন থাকিয়াও নাই। তার মা আছে; মায়ের কোলের চেয়ে সন্তানের নিরাপদ স্থান আর কোথায়? ধীরার মা থাকিলে তার জন্য আমি এত ভাবিতাম না। সেই ওকে দেখিত। ধীরার বয়স ষোল পার হইয়া গিয়াছে। সে হিসাবেও ওর বিবাহ আগে হওয়া হওয়া উচিত। আর সবার চেয়ে বড় কথা, ওর দৃষ্টি নাই! পরের হাতভিন্ন এক পা নড়িবার শক্তি যার নাই, তার চেয়ে আর কৃপাপাত্রী এ সংসারে কে?"

যুক্তিগুলা এমনই অকাট্য যে, এসম্বন্ধে তর্কাতর্কি, নির্ম্মল তো না হয় নানাকারণে করিতেই পারে না, বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল-ব্যারিষ্টারদের পক্ষেও করা শক্ত হইত। ঘর-ভরা নিস্তব্ধতার বক্ষে আঘাত করিয়া মধ্যে মধ্যে বায়ু গর্জ্জিয়া, হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল। দুজনের কেহ আর কোন কথাই কহিতে পারিল না। অনেকদিনের সৃষ্টি-করা একটা কিছু ভাঙ্গিতে গেলে যে, ভাঙ্গা খুব সহজ হয় না, এ জ্ঞানটুকু ছিল বলিয়াই মুরলীধরও হঠাৎ আর সে সচিন্তিত বাহ্য-নীরবতা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না।

ঝুনঝুন্ করিয়া অনেকগুলি সরু চুড়ির আওয়াজ আসিল; মোটা পর্দ্দাখানা সরিয়া গেল; ধীরা ডাকিল "বাবা!"

"এসো।"

নির্ম্মলও হঠাৎ সসংজ্ঞ হইয়া একটু নড়িয়া বসিল।

"এইবার আর তুমি রাত্রিদিন বসিয়া থাক, বলিতে পারিবে না! এই দেখ, কতক্ষণ বাহিরে বেড়াইয়া আসিলাম! এ কি! তোমার গা কেন গরম? জ্বর হইয়াছে? গরম বই কি! খুবই তো গরম! আচ্ছা, আপনি দেখুন তো, গরম নয়?"

নির্ম্মল নিজের ভাবনা ভুলিয়া গিয়া সচমকে উঠিয়া রোগীর কপালে হাত দিয়া দেখিল "তাই তো! গরমই তো বোধ হইতেছে! একটু আগেও তো ছিল না।"

ধীরা দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গিয়া দাসীকে ডাকিয়া বলিল "শীঘ্র ডাক্তারকে ডাকিয়া আন্।"

(১৫)

সকালেও সেই সামান্যসর্দ্দি-জ্বরটুকু রহিয়া গেল। ডাক্তার ইহার জন্য প্রকৃতিদেবীকে দায়ী করিয়া নূতন একটা 'মিক্সচর ও পিল' ব্যবস্থা দিয়া কহিলেন যে, রাত্রি-নাগাৎ জ্বরটুকু খুবসম্ভব ছাড়িয়া যাইবে। ধীরার এ সান্ত্বনায় তেমন আস্থা হইল না; ডাক্তারসাহেব রাত্রেও বলিয়াছিলেন যে "সকালে আর জ্বর পাওয়া যাইবে না।" নির্ম্মল নিজের আফিসে কাজ করিতেছিল; কিন্তু আজ কাজে তাহার তেমন মন লাগিতেছিল না। ঘণ্টাদুইয়ের মধ্যে সে

একবার উপরে গিয়া দেখিয়া আসিতেছে, আবার তখনই একবার যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। সে গতরাত্রেও বার-বার রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়াছিল।—সকাল হইতেও সেই-খানেই উপস্থিত ছিল; শেষ যখন দেখিয়া আসিয়াছে, তখন জ্বরটা কমিতেছিল বটে কিন্তু বড় দুর্ব্বল এবং অস্থির ভাব সে লক্ষ্য করিয়াছিল। 'সে উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় শিকারের পোষাকে ব্রজ আসিয়া কহিল, শিকারে যাবে তো চল। এমন মেঘছায়ার সুন্দর দিনটা বৃথা অপব্যয়ে ফল নাই। উঠে পড় দেখি।"

নির্ম্মল তাহার প্রভুপুত্রকে দেখিয়া, লেখা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সম্ভ্রমের অভিবাদনেও তাহাকে বঞ্চিত করে নাই। কিন্তু তাহার নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে কহিল "আজ আমার যাওয়া তো হইতেই পারে না, আপনারও আজ না গেলেই ভাল হইত না? ওর জ্বরটা এখনও ছাড়িল না।"

"বাস্, বাস্! সাহেব বলিতেছেন সর্দ্দিজ্বর, ও কিছুই না। অথচ এই লইয়া তোমরা কাণ্ড করিতেছ, যেন কি একটা বাতশ্লেষ্মার বিকারই বা হইয়াছে! দীরাটা একাই না হয়, যা খুসী পাগলামী করুক,তুমি তো দেখিতেছি পুরুষমানুষ হইয়া আবার তা'কেও হারাইতে বসিয়াছ! তবে যাবে না? কিন্তু ভারি আমোদ হইবে, তা বলিয়া রাখিতেছি। এমন সুযোগটা নষ্ট করিলে!"

নির্ম্মল চুপ করিয়া শুনিয়া একটু বিষণ্ণভাবে হাসিল "কি জানি কি সুযোগ! আর দুর্য্যোগই বা কোন্‌টা। না, আমি যাইব না।—"

"না যাও, কি করিব! মিস্ হ্যাম্পডেনকে আমি প্রথম হইতেই বলিয়াছিলাম। তাঁহার বিশ্বাস হইল না।" ফিরিবার জন্য ব্রজ তাহার সবুটচরণ উঠাইল; তাহার মুখে বিরক্তির চেয়ে আর একরকম একটা ভাব প্রকটিত হইতেছিল, তাহা বোধ করি মিস হ্যাম্পডেনের উপরে ঈর্ষাপূর্ণ বিজয়ানন্দের।

'নির্ম্মল, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি আমায় যেতে বলিয়াছিলেন না কি?"

"সর্ব্বদাই তো বলিয়া থাকেন! আমাদের মতন কালা-আদ্‌মী তো তুমি নও; না বলিবেনই বা কেন?" অপ্রচ্ছন্ন ঈর্ষার তীব্র উচ্চ হাসি হাসিয়া, সে সশব্দে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মল ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল;—'ভাগ্যে এঘরে কেরাণীরা এখন কেহ উপস্থিত নাই! ব্রজ-দা পাগল না কি!'

সে কাজে মন দিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িল।

"কে? দাদা? না, ওঃ আপনি? 'আপনি এসেছেন?"

"কেন, কেন? কোন কিছু—"

"হাঁ, বাবার জ্বরটা হঠাৎ বাড়্‌ছে, চাকরদের কেবল পাশ ফিরিয়ে দিতে বলছেন।—কি হবে? আমি কি করি?"

এতদিনের পরিচয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কা'লই সে দীরাকে তাহার সহিত কথা কহিতে শুনিয়াছে। আর আজ যেন, তাহার মধ্যে তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-মর্য্যাদা গাম্ভীর্য্য, কিছুরই স্থান ছিল না; সেসব কোন্ ভয়ের বন্যাতাড়নে ভাসাইয়া দিয়া, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিঃসহায় এই বালিকা, এই আত্মীয়তাবন্ধনবিহীন যুবকের কাছে নিজের গভীর বিপদের দিনে আশ্রয় খুঁজিতে আসিয়া দাড়াইয়াছে! যাহার নিজের কিছুই করিবার সামর্থ্য নাই, সে আজ জীবনের এই বড় দুঃসময়ের মুহূর্ত্তে তাহাকেই কাতর ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে—'সে কি করিবে!'

নির্ম্মলের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল।—জ্বরটা আবার বাড়িতেছে!—কিন্তু নিজের ভাবনা লুকাইয়া, তখন ভীতাকে অভয় দেওয়াই দরকার। সস্নেহ-সান্ত্বনায় তাই বলিয়া ফেলিল "ভয় কি! জ্বর সারিয়া যাইবে। ডাক্তার কতক্ষণ পূর্ব্বে এসেছিলেন?"

"বারটায় একবার দেখিয়া গিয়াছেন; তখন জ্বর প্রায় ছিলই না। তাঁকে ডাকাইব কি?"

"তা, ডাকান্; আমি ততক্ষণ গিয়া দেখি। ব্রজ-দা'রও খবর লইবেন, তিনি হয় ত এখনও বাড়ী আছেন।"

"যান্, আপনি শীঘ্র যান্; আমি ঝিদের বলিতেছি।—" বলিতে থরথর করিয়া ঠোঁট কাঁপিয়া, কথা বাধিয়া গেল; পা-দুখানাও বড় কাঁপিতেছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া সহানুভূতি পূর্ণ বেদনায় বারেক চাহিয়া দেখিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া আসিল! অন্ধ-বালিকার অতলস্পর্শ গভীরদুঃখ বোধ করি, সে নিজের প্রাণে অনুভব করিতে পারিয়াছিল তাই, সমবেদ-

মার মুখে তাহার [illegible] ছিন্ন করিয়া উঠিতে [illegible] ঘটে নাই।

ঘরে কেবল একজন বর্ম্মী ভৃত্যব্যতীত অপর কেহ ছিল না। নির্ম্মল [illegible]—এই অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগীর চেহারায় একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি অর্দ্ধমুদিত-নেত্রে মধ্যে মধ্যে মস্তক-সঞ্চালন করিতেছেন ; থাকিয়া-থাকিয়া যেন চমকিয়া-চমকিয়া উঠিতেছেন ; আবার, কোন সময় বা, সহজভাবে স্থির হইয়া চোক বুজিয়া থাকিতেছিলেন। সে কপালে হাত দিয়া দেখিল, উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চোখের সামনের জানালাটা খোলা ছিল, সেটা বন্ধ করিয়া আসিয়া, সে রোগীর কাছে বসিল। রোগী, খাট নড়িয়া উঠায়, চাহিয়া দেখিলেন—"কে রে! ধীরা এলি! আয় মা! আমার বুকে মাথাটা রেখে, আমার গলা ধরে, আমার মধ্যে মিশে থাক! আয় মা আমার! আয়, আয়—"

"বাবা, আমি নির্ম্মল।"

"নির্ম্মল! ওঃ, তুমি? তুমি কি আমার ধীরার হাত ধরে এসেছ? দুজনে এসেছ? ওকে তুমি নিয়েছ তো?"

আবার সেই কথা! সমস্ত মনটা যেন গুটাইয়া একান্ত ছোট হইয়া গেল। যে পূজায়, যে দেওয়ায় পরার্থপরতার গন্ধ নাই; যে দান, নিজের আত্মার কল্যাণার্থেই-দেওয়া অনেকখানি পাওয়ার খানিকটা-মাত্র পরিশোধ, সে দানেও এত ইতস্ততঃ!

মুরলীধর এইবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নিম্নার্দ্ধ শরীরের কলকজার অতবড় বিকৃতিতেও যে মস্তিষ্ক কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; এবার, এই জ্বরের ধমকে সেখানেও একটু অত্যাচার আরম্ভ হইলেও, এখনও তেমন বড় আক্রমণ ঘটিতে পায় নাই। একখানি হাত তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া, ক্ষুব্ধস্বরেই কহিলেন, "স্বার্থপরতা করিতেছি? কি করিব বাবা, যেদিন বাছা আমার এই শরীরভরা রূপ, হৃদয়-ভরা মহত্ত্ব লইয়াও এ পৃথিবীতে অতিবড় [illegible]-কাঙ্গালের মত এসেছে, সেইদিন ভগবান নিজেই যে আমার মনে এই স্বার্থপরতায় বীজবপন করে দিয়াছেন। গরীবের মেয়ের যা অভাব, তা তুমি তোমার টাকা দিয়ে পূরণ করিতে পার; [illegible] হাজার টাকা তুমি ঢেলে দিলেও কেউ না বলিবে না। কিন্তু ওরা যা চাই, যা টাকায় দেওয়া যায় না—তারজন্য বড় উঁচু মনের সহানুভূতি চাই; সে তো টাকায় কেনা যায় না।"

ধীরা প্রবেশ করিল। তাহার মুখের [illegible] বিবর্ণতা চোখে পড়িয়া নির্ম্মলকে যেন মনের মধ্যে অপরাধী করিয়া তুলিল। সে, তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করিল "ডাক্তার আসছেন?" মুরলীধরের নিকট হইতে উত্তর এড়াইয়া আপাততঃ সে বাঁচিল।

"হ্যাঁ, তাঁর মোটরের শব্দ পেয়েছি; দাদা কিন্তু শিকারে চলে গেলেন।"

শেষকথাটা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই বাহির হইয়া আসিল। পিতার রোগবৃদ্ধির সংবাদপাওয়ার পরই যে, [illegible] আমোদ করিতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা এই 'গেলেন' শব্দটাতেই নির্ম্মলও বুঝিয়াছিল; কিন্তু পাছে রোগীর মনেও এ ধারণাটা পৌছায়, সেই ভয়ে এবিষয়ে সে আর কিছু বলিল না। ডাক্তার আসিয়া যথারীতি রোগীর শরীর পরীক্ষা করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নির্ম্মল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল, জ্বরটা বোধ হইতেছে, নিউমোনিয়া-দোষস্থ। এখনকার অবস্থা একটু [illegible] দিকেই লইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ, এসকল রোগীর [illegible] বিশেষ ভয় এই যে, জ্বরবৃদ্ধিতে বড়সহজেই মস্তিষ্ক আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।—সে হইলে ত রক্ষাই নাই! ঔষধপত্রের কিছু কিছু নূতন ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডাক্তার তখনকার মত বিদায় লইলেন; বলিয়া গেলেন, ঘণ্টাদুই পরেই আসিবেন এবং রাত্রের জন্য তাহার বাঙ্গালীসহকারী যেমন মধ্যে মধ্যে থাকেন, তাহা হইলেই বোধ হয় চলিবে; কেন না অত শীঘ্র কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায় না; তবে বলাও যায় না, যদি রোগের দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটে তা হলে—!"

নির্ম্মল, ডাক্তারের মন্তব্যে, বিশেষে আঘাত পাইয়াছিল। এত শীঘ্র যে এমন কিছু ঘটিতে পারে, এ ধারণা একটু আগেও তাহার যেন ছিল না। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি অন্ধকারভীত শিশু যেমন গভীর অনুরাগে চাহিয়া থাকে, তেমনই করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যথিতচিত্ত তাঁহাকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিতে গেল। সে চিন্তিতভাবে ফিরিতেছিল; পশ্চাতে কে ডাকিল "দাঁড়ান!" সে ফিরিয়া দেখিল ধীরা।

ধীরা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কি বলিলেন ?"

নির্ম্মল কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলিল, "ডাক্তার বলিলেন জ্বরের জন্য বিশেষ ভয় নাই।" ধীরা একটু চুপ করিয়া থাকিল; কথাটা বিশ্বাস করিবে, কি না, বোধ করি ইহাই ভাবিল। তারপর অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল "সত্যই কি ভয় নাই ? না না, যদি সত্য না হয়; তবে ?—তবে—আমায় তবে কিছু বলিবেন না।"

অন্ধের নিকট অনেক-জিনিষ লুকান চলে, কেবল নিজের মনটাকে, সেই দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি হইতে, ঢাকিয়া রাখা দায় হয়। নির্ম্মল একেই এই আকস্মিক দুঃসংবাদের তীব্র আঘাতকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছিল না; তার উপর আবার এ প্রত্যভিঘাত—তাহার পক্ষে দুঃসহই হইয়া উঠিল; বাষ্প-সজল গাঢ়স্বরে—"ভগবানকে ডাক, ধীরা! তিনি সব ভাল করিবেন!" বলিয়া সে নিজের চোক মুছিল। ধীরা ধীরে ধীরে পাশের দেওয়ালটা চাপিয়া ধরিল।

"তুমি ওঁর কাছে যাও, আমি ওষুধগুলি আনিতে পাঠাইয়া এখনি আসিতেছি।" বলিয়া নির্ম্মল দ্রুতপদে চলিয়া গেল; তাহার এই শোচনীয় অবস্থা চোখে দেখিয়াও তাহাকে করুণা করিতে পারিল না।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে ছুটিতেছে; সমস্ত বড়রোগেই এই রকম হইয়া থাকে। রোগী এদিক-ওদিক করিতেছেন, পাশফিরিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক দিনের রক্তহীন মুখ প্রবল জ্বরের প্রকোপে ঈষৎ রাঙা দেখাইতেছিল। তিনি প্রথমটা ধীরাকে দেখিতে পান নাই। সে তাহার শব্দহীন শান্ত-গতিতে নিকটে আসিয়া তাঁহার মাথার বালিস, বিছানার প্রান্ত হাত দিয়া ঝাড়িয়া, পরিষ্কার করিয়া দিল; তার পর অভ্যাসমত ভূমে জানু-পাতিয়া বসিয়া তাঁহার মাথার চুলের মধ্যে নিজের সরু সরু আঙ্গুলগুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলে, সেই স্পর্শে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, "কে ? নিমু ?"

"না বাবা, আমি।"

"তুমি, ধীরা ? কতক্ষণ এসেছ মা ?"

"এই এলাম বাবা! বাবা তুমি কেমন আছ ? কিছু কমেনি কি ?"

"উঃ, না রে মা! না, এ একেবারেই [illegible] ওরে মা আমার! যদি যেতে হয় তোকে কার কাছে রেখে যাব রে মা— কার কাছে ? তার চেয়ে আয়, তোকে বুকে নিয়ে একসঙ্গে দুজনেই চলে যাই!"

নির্ম্মল সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিল। ধীরা মুখ ফিরাইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। হাত-দুখানি তাহার যথাস্থানেই রহিয়া গেল, কিন্তু আঙ্গুলগুলির গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া সেই প্রসারিত বুকে লুটাইয়া পড়িয়া তাহার ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল "তাই নিয়ে যাও বাবা, নিয়ে যাও! আমায় তুমি নিয়ে যাও, আমি তা' হ'লে বাঁচি, ওগো বাঁচি।" কিন্তু চেঁচাইয়া কান্না ছাড়িয়া নিঃশব্দে রোদনও তাহার পক্ষে কি কঠিন! চোখের দৃষ্টির মত বুঝি সে চোখে একটু জলও ছিল না; শুষ্ক তপ্তমরু-বালুরাশির মধ্যে যেমন ক্ষুদ্রনির্ঝর কোথায় শুকাইয়া মরিয়া যায়, তেমনি তাহারও এই অন্তহীন সীমানির্দ্দেশ-পরিশূন্য, অসীমঅন্ধকার-বিভীষিকার মধ্যেও সে প্রাণভরা অশ্রুর নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল! এই স্নেহপ্রসন্ন মুখ সে কোনদিনই চোখে দেখে নাই বটে; কিন্তু এই যে সকল-দুঃখ-ভুলানো, সকল-অভাব-জুড়ানো-এই সান্ত্বনা-শীতল স্পর্শ টুকু! আর ওই অমৃত-গলানো সুর-টুকু! ওগো, এইটুকুই যে এ অন্ধের পৃথিবী— তাহার চন্দ্র—তাহার সূর্য্য—তাহার দিবস—রজনী—তাহার এই অন্ধ নেত্রের আলো—এই দুর্ভাগ্যময় অন্ধজীবনের অবলম্বনযষ্টি! ঐটুকু হারাইলে, সে কি লইয়া এই এতবড় অন্ধকারময় জগতে বাঁচিয়া থাকিবে ? কেমন করিয়া তাহার আলোক-লেশহীন এই তমসাচ্ছন্ন দীর্ঘ-দিবসরজনী কাটিবে ?

সারারাত্রি একভাবেই কাটিয়া গেল; ডাক্তার একজন সারারাত্রিই রহিলেন; ডাক্তার-সাহেবও বার-দুই আসিয়া-ছিলেন; তার বেশী আর পারিয়া উঠেন নাই, প্রয়োজনও ছিল না। নির্ম্মলের ত্রুটিহীন সেবা দেখিয়া মাহিনাকরা শুশ্রূষাকারিগণ বিস্ময়বোধ করিতেছিল। সে একাই সব করিতেছিল; কাহাকেও নিজের কাজছাড়িয়া দিতে তাহার মন সরিতেছিল না।

ধীরাও সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সারারাত্রি জাগিয়া পিতাকে ছুঁইয়া বসিয়া রহিল। ভগবান যে তাহাকে এইটুকুব্যতীত আর সকল ক্ষমতার বাহিরেই রাখিয়া দিয়াছেন।

জ্বরের ঘোরে রোগী ক্রমাগতই "ধীরা, ধীরা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিলেন; কিন্তু বাহ্যচেতনা অনেক সময়েই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসায় ধীরা যখন নিজের গভীর যন্ত্রণা প্রাণপনে চাপিয়া তাঁহার মুখের উপর মুখ নত করিয়া ডাকিতেছিল "বাবা"! "বাবা", তখন তিনি চোখমেলিয়া একবার তাহার যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও ছিলেন না, বা একটা সাড়াও দিতেছিলেন না। তাহার বোধ হইতেছিল, যেন পিতা তাহার নিকট হইতে ইহার মধ্যে দূরে—বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন; যেন সেখান হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এখানকার কোন খবর বা শত আহ্বান যেন সেখানে পৌছিতে পারে না। একটা অজ্ঞাত, মহাভয়ে তাহার সারাপ্রাণটি অবসন্ন হইয়া আসিল।

ভোরের দিকে সকল রোগই একটু নরম পড়ে; রোগী একটু স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। "নাড়ীর গতি ভাল" এই রায় দিয়া ডাক্তার-সাহেব ফিরিয়া গেলে, অপর ডাক্তারটিও কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে পাশের-ঘরে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিছানায় চলিয়া গেলেন। ঘরে রাত্রের শুশ্রূষাকারীদের পরিবর্ত্তে অপর লোক আসিল; কেবল নির্ম্মল, আর ধীরাই নিজেদের স্থান পরিবর্ত্তন করিল না। ব্রজ কা'ল সুকালবেলা সেই যে বাহির হইয়াছে, আর সে বাড়ী ফিরে নাই। ঘোড়ার রেকাবে পা দিতে দিতে যখন বাপের অসুখের কথা কাণে গেল, তখন "এন্‌গেজমেণ্ট" বন্ধ করিয়া বাপের উদ্দেশে ছুটিয়া গেলে নেহাৎ অসভ্যাচরণ হয়। কাজেই সে নিরুপায় হইয়া ধীরার দাসীকে বলিয়া গেল, "ও কিছু নয়, অমন তো কতবারই হইয়াছে; এও তেমনি।" কথাটা শুধু মুখেরই নয়, মনেও তাহার সেই বিশ্বাস। পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্যাম্পে সহরের বাহিরে সে রাত্রে নিমন্ত্রণ খাওয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকায় সে বাড়ীতে ফিরিতে পারে নাই। তা না পারুক, সে জন্য এখানেও কোন ক্ষতিবোধ করিবার কেহ ছিল না, বরং এখানে থাকিলেই সে হয় ত কিছু-না-কিছু গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিত। অন্যের সহিত মত মিলাইয়া এক-যোগে কাজ করা বাঙ্গালীর ধর্ম্ম নয়; তার মধ্যে আবার আধুনিক ফ্যাসানের বাঙ্গালীদেরই বিশেষ করিয়া "হামবড়া"-ভাবটা কথায় কথায় প্রকাশ পায়। সমাজের বন্ধন তাঁহারা "দাসত্ব" বলিয়া মনে করেন; 'প্রাণে'র চেয়ে 'জ্ঞান'ই তাঁহাদের কাছে বড়। তাঁহারা যে এই স্বাতন্ত্র-প্রেমদ্বারা কেমন করিয়া বিশ্বপ্রেমের উন্মেষ করেন, ইহা ঠিক ধারণা করাও সাধারণের পক্ষে দুরূহ। ব্রজর মতটা এই নবনীতি-শাস্ত্রের পাঠশালায় শিক্ষা করা; কাজেই সেটাও সকলের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

আর সকলে চলিয়া গেলে নির্ম্মল দেখিল ধীরা উঠিল না, বা নড়িল না। রোগী তখন ঘুমাইয়াছেন। যদিও নিদ্রা গাঢ় নয়, তন্দ্রা-আবল্যের ভাব-মিশ্রিত, ক্লেশময় নিদ্রা; তথাপি এ অবস্থায় সেও অপ্রত্যাশিত। সে নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল "আপনি এইবেলা একটু ঘুমাইয়া নিন্; আবার সারাদিন ত আছে।" ধীরা মাথা তুলিল; শব্দানুসারে তাহার দিকে ফিরিয়া তেমনই মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি করিতেছেন?"

"ঘুমাইয়াছেন।"

"ঘুম—ঠিক ত?"

সে আজ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। পৃথিবীর মধ্যে সে একমাত্র একজনের উপরেই নিজের সমস্ত নির্ভরটুকু ঢালিয়া দিয়াছিল। সেই তিনিই যখন তাহাকে ফাঁকির-ঘরে বসাইতে প্রস্তুত, তখন আর কাহার উপর ভরসা স্থাপন করিতে পারা যায়? ইহা বুঝিয়াই নির্ম্মল হৃদয়ে ব্যথা পাইল এবং পরম আহ্লাদের সহিত উত্তর করিল "সে কি! না না, ঘুম বই কি! ডাক্তার বলিলেন শুনিলেন না, নাড়ী একটু ভাল, জ্বরও দু-ডিগ্রি কমিয়াছে; বুকটাও কিছু ভাল।"

ধীরা উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাহার দৃষ্টিহীন নীল-নেত্র নির্ম্মলের দিকে মেলিয়া থাকিয়া আকুল দীর্ঘশ্বাসের সহিত কহিল, "ডাক্তারেরা কিছুই জানে না!"

এতদিন যে সে তাঁহাদের কথার উপরই অমূল্য বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া পিতার আরোগ্য-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় ছিল, আজ তাহার সেই পরম-বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া উঠিয়াছে।

"তাঁরাও তো দেবতা নন; কাজেই সব সময়, সব কথা ঠিক হয় না। আপনি যান, কাল হইতে একভাবেই বসিয়া আছেন। উমি জানিতে পারিলে কতই ব্যস্ত হইবেন!"

নির্ম্মলের অনুযোগে যে একান্ত স্নেহসুর ছিল, তাহাকে

হঠাৎ ধীরার বড়-বড় চোখের ঘনপাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া আসিল। সে ক্ষণপরে কহিল "আপনারও হয় ত রাত্রে খাওয়া হয় নাই, তা আপনিই যান না। আমি ততক্ষণ থাকি।"

গত সন্ধ্যা হইতে এ বাড়ীতে আহার-নামধেয় কোন অতি প্রয়োজনীয় বস্তু জগতে বর্ত্তমান আছে, এমন কথা কাহারও মনেও পড়ে নাই। আর এইটুকু পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ করিবার মত দুর্ব্বল শরীর নির্ম্মলের নয়। তবে চিন্তা ও উদ্বেগের যে একটা ক্লান্তি আছে, সেইটুকুই সে অনুভব করিতেছিল; সে বলিল "আমার পক্ষে এটুকু কিছুই না।"

"তবে থাক্, দুজনেই থাকি।"

বেলা আটটা অবধি সেই একভাবেই কাটিল। ডাক্তার সাবধানে নাড়ীর গতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন; বলিলেন "খুব সম্ভব, এ ধাক্কাটা কাটিয়া যাইবে। তবে কি না—!"

নির্ম্মল এই অবসরে স্নানাদি সারিয়া ফেলিবার জন্য বিদায় লইল। ধীরাকে অনুরোধ করা হইলে প্রথমবারে সে উত্তর করিল না দ্বিতীয় বারে ঈষৎ বিরক্তভাবে উত্তর দিল "দরকার বুঝিলে যাইব।"

ব্রজ অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া এই কতক্ষণ বিছানা ছাড়িয়াছে। নীচে নামিতেই তাহার সহিত নির্ম্মলের সাক্ষাৎ হইল। বোধ করি পিতাকে দেখিতেই সে উপরে যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল "কি খবর?"

"একটু ভাল" বলিয়া নির্ম্মল দাড়াইল; হয় ত ব্রজ তাহাকে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। কিন্তু তাহার কৌতূহল প্রবৃত্তি ততদূর সজাগ ছিল না। সে যেটুকু শুনিল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়া উঠিল "আমি তো বলেছি, ও কিছুই নয়। রোগা মানুষের অমন একএক দিন হয়েই থাকে। ব্যস্, তবে আর কি; আর একটু ঘুমাইগে। কা'ল তুমি গেলে না, কিন্তু এমন 'সাক্‌সেস-ফুল পার্টি' প্রায়ই হয় না! ভারি আমোদ হয়েছিল। মিস হ্যাম্পডেন আবার ক্যাম্পে ফিরবার আগে সেই বনের মধ্যে নিজের হাতে চা-তৈরি করলেন। সে সব [illegible] চমৎকার আমোদ হল্লো! যত ছোটা গেল, তত খাওয়া, আর তত হাসি।"

এই বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে চটিজুতা ফট্‌ফট্ করিতে করিতে হাস্যস্মৃতিস্মরণে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। নির্ম্মলও নিজের সত্যবাদিতায় বিরক্তিবোধ করিয়া গম্য-স্থানোদ্দেশে প্রস্থান করিল। এই মন্দের-ভালকে 'ভাল' না বলিলে হয় ত একবার পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ ঘটিতে পারিত।

(১৬)

শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহার সারিয়া রোগীর ঘরে গিয়া নির্ম্মল দেখিল, তিনি তখনও বেশ সহজভাবেই ঘুমাইয়া আছেন। একজন শুশ্রূষাকারিণী একখানা খাতার পাতা উল্টাইতেছেন; ইহাতে রোগীর ঔষধ, পথ্য, 'টেম্‌পেরেচারের' ওঠানাবা সম্বন্ধে সবিশেষ খবর লিখিয়া রাখা হইতেছিল। ধীরা তখনও বাপকে ছুঁইয়া সেই কৃষ্ণনগরের কারিগরের-গড়া প্রতিমার ন্যায় ঠিক তেমনই বসিয়া আছে। উঠিতে বলা অনর্থক জানিয়া সে তাহাতে বিরত হইল। মনে মনে বলিল "থাক্, যতক্ষণ পারে আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া লউক, কেন পরে নিমিত্তের ভাগী করিবে।"

এখানে এখন কোন আবশ্যক নাই দেখিয়া, সে কাছাকাছি একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল। রাত্রের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার বলিয়াছেন, যদি জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আবার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে হঠাৎ বিপদের সম্ভাবনা আছে। অবশ্য সেই সম্ভাবনাই বেশী।

এই ঘর একসময় মুরলীধর বাবুর বিশ্রামকক্ষ ছিল। এখনও ইহা সেই পূর্ব্বাবস্থায়ই রহিয়াছে। সাম্নের দেওয়ালে পাশাপাশি দুখানি বৃহৎ তৈলচিত্র। ইহার একখানি মুরলীধর বাবুর এবং অন্যখানি যে ধীরার স্বর্গগতা জননীর, তাহা তাহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য হইতেই জানা যায়; প্রভেদ কেবল ইন্দিবর-প্রফুল্ল-নেত্রের সজীববৎ দৃষ্টিটুকুতেই। নির্ম্মল সেই চোখের দিকে চাহিতেই কেমন যেন বিপন্নভাবে হঠাৎ নিজের দৃষ্টি নত করিতে বাধ্য হইল। তিনি যেন শুধু আজ স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের অবসান আশাতেই এমন উৎফুল্ল নহেন; কন্যাসম্বন্ধেও যেন তাহার প্রতি তাঁহার বড় আশ্বাসের, আশীর্ব্বাদের দৃষ্টি সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। যেন সে দৃষ্টি বলিল "বেশ করিয়াছ! একেই তো বলে মানুষের কাজ! ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম!"

সে থতমত খাইয়া গেল।

সেদিনের সেই প্রথম অভিব্যক্তির পর হইতেই এমনই উত্তেজনার ভিতর দিয়া সময় কাটিতেছে যে, এসম্বন্ধে ভাল

করিয়া, কোন্ কথা মনে মনে বিচার করিয়া, দেখিবার মুহূর্ত্ত-কাল অবসরও তাহার ঘটে নাই। প্রথম হইতেই যে কথাটা অস্পষ্ট-ইঙ্গিতে অর্দ্ধ-ব্যক্ত ছিল, এখন আর কোন-খানে কিছুমাত্র তাহার অস্পষ্টতা বিদ্যমান নাই। তিনি তাহার নিকট কৃতোপকারের মূল্য চাহিতেছেন, আর সে দাবী বোধ করি, অসঙ্গতও নয়! এ অবস্থায় কে না এটুকু প্রত্যাশা করে? তাঁহার অবস্থা মনে করিয়া, সহানুভূতিতে তাহার মন যেন গলিয়া পড়িতেছিল। তাই আজ নিজের অক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া, সে নিজের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অপর্ণা স্ত্রী-হিসাবে এই জন্মান্ধ, অল্পভাষিণী, আত্মদুঃখ-ভারাবসন্না ধীরার চেয়ে যে শতগুণে আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহাতে সন্দেহ করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না; কিন্তু দয়া-হিসাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, তার চেয়েও বোধ করি, ইহার অবস্থা অধিকতর সঙ্কটের। কাজেই দয়ার্হা এক্ষেত্রে ধীরাই বেশি। লাভ ক্ষতির কথা স্বতন্ত্র; দয়া দেখাইতে গেলে যা করা উচিত, তাই বলা গেল। আচ্ছা, সে কেন ধীরার অভিভাবকত্ব চাহিয়া লউক না? সে ও তাহার স্ত্রী অপর্ণা—দুজনে ইহাকে দেখা-শোনা করিবে, এই সর্ত্তে লেখাপড়া হইয়া থাক। অপর্ণাকে ত্যাগ করিতে গেলে, তাহার বুক ধসিয়া যাইবে। সঙ্কল্প-ভঙ্গ এবং নিজেকে বলি দেওয়া—একসঙ্গে এই দুইটা কঠিনকার্য্য করিবার মত মনের বল পাওয়া বড় শক্ত! আজ, যদি সুযোগ আইসে, তাহা হইলে সে সঙ্কোচত্যাগ করিয়া, সবকথা তাঁহাকে স্পষ্টই বুঝাইয়া বলিয়া, এই প্রার্থনাই করিবে। তিনিও হয় ত সম্মত হইবেন। তাহা হইলে সে ও অপর্ণা তাহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাণপণ সেবা যত্নে ধীরাকে ভুলাইয়া রাখিবে, ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিবে, দেবীর ন্যায় পূজা করিবে। হ্যাঁ—পূজাই তো করিবে! সে যথার্থই তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে। আর অপর্ণাকে? যে-দয়াধর্ম্মের দোহাই সে মনকে প্রথমটায় দিয়া আসিয়াছিল, আজ আর শুধু সেই মনোবৃত্তিটিকে সর্ব্বময় করিয়া রাখিলে আঁখিঠারা হয়। সে অপর্ণাকে একেবারে আপনার মনে করিয়া, মনের সিংহাসনখানাই দিয়া ফেলিয়াছে। সে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে—তাহাকে সে ছাড়িতে পারিবে না। সে কথা মনে করিলেও যেন বুকখানা ভাঙ্গিয়া পড়িতে যায়। এমন কি, আজ অপর্ণার যদি মৃত্যুও হয়, তথাপি সে অন্যকে তদীয় স্থানে অভিষিক্ত করিবে না। পর্দার পিত্তলের রিং-গুলা মৃদুরবে বাজিয়া উঠিল; মুখ ফিরাইতেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সে সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেই পারিল না। কবাটের উপর একখানি হাত রাখিয়া, সবুজ পর্দার সম্মুখীন হইয়া ধীরা দাঁড়াইয়া আছে। বোধ করি এইমাত্রই সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। এঘরে অপর কাহারও থাকা সম্ভব, একথা হয় ত তাহার মনেও হয় নাই। একখানি চওড়া-পাড়ের সাড়ি যেমনতেমন করিয়া পরা; কাল স্নানের পর আর চুলবাঁধাও হয় নাই। সেই রুক্ষরুক্ষ চুলগুলি কপালে, বুকে, যেখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। মুখের দিকে চাহিতেই নির্ম্মলের বোধ হইল, যেন এই কয়-ঘণ্টায় তাহার উপর দিয়া একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে। আর যুগটাও খুব শান্তির যুগ নয়—বিপ্লবেরই যুগ। চোখের নীচে বৃত্তাকারে দুটি ঘনকালির রেখা পড়িয়াছিল; মুখের অস্বাভাবিক শুভ্রতার মধ্যে সেই দুটি রেখা স্পষ্টতর দেখাইতেছিল। তাহার স্বাভাবিক পরদুঃখকাতর চিত্তে সেই নীরববেদনাবিদ্ধ-সুক্ষ্মমুখ তীব্রআঘাত করিয়া উঠিল। সে উঠিয়া, তাহাকে নিজের অবস্থিতি-সংবাদ জ্ঞাপনোদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিল, "উনি জাগিয়াছেন কি?"

"একবার জাগিয়াছিলেন; ডাক্তার সাহেব দেখিয়া যাইবার পর আবার ঘুমাইয়াছেন। আপনি এখানে আছেন, আমি জানিতাম না।" বলিয়া সে চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিতে উদ্যত হইল।

"না—না, আমি অনেকক্ষণ জিরাইয়া লইয়াছি। আপনি এখন ওই সোফাখানায় একটু শুইয়া ঘুমাইয়া নিন;—আমি ওদিকে দেখিগে।"

ধীরা ইহার ভিতর ঘরের মধ্যে আসিয়া—তাহার আন্দাজী একখানা বড়আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িয়াছিল। সে-যে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। নির্ম্মল ঘুমাইবার প্রস্তাব করিলে, মুখে সে বলিল "আচ্ছা";—কিন্তু সেখান হইতে উঠিবার-নড়িবার কোন চেষ্টাই তাহার দেখা গেল না। সেই প্রকাণ্ড কেদারা-খানার মধ্যে, তাহার কোমল ভেলভেট-আসনের ভিতর তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি প্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল। দুটি হাত পরস্পর-সংবদ্ধ করিয়া, শূন্যের দিকে তাহার শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া দিয়া, সে এমনই স্থিরভাবে বসিয়া রহিল যে, তখন তাহার

প্রাণের স্পন্দন পর্য্যন্ত চলিতেছিল কি না, বহুক্ষণ নীরব পর্য্যবেক্ষণদৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়াও নির্ম্মলের তাহা বোধগম্য হইল না। চলিয়া আসিবে মনে করিয়াও, তাই সে তাহার এই জড়ত্বভাব দেখিয়া সেখান হইতে সরিয়া আসিতে অসমর্থ হইল। তাহার মনে হইতেছিল, পাছে এমন করিয়া থাকিয়া কোন্ সময় হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইয়া কোথাও সে চোট্ খায়! সে যদি কাঁদিত, ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি, তাহার জন্য এমন করিয়া সে অপরকে ভাবাইয়া তুলিত না; কিন্তু এই যে, এমন করিয়া সে তাহার এতবড় সাঙ্ঘাতিক ভয়টাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে নিজের বুক দিয়া তুলিয়া লইয়া, তাহাকে সেইখানেই চাপিয়া রাখিয়া অগ্নিগর্ভ শান্তমূর্ত্তি ভূধরের ন্যায় ভিতরে গুমিয়া রহিল; ইহাতেই না হঠাৎ একটা অতর্কিত বিদারণে বিস্ফোরকের আবির্ভাব-ভয় রাখিতে হইতেছিল! আর ভয়ের সহিত এই সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিটিকে পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিতেই বা কাহার না মাথা নত হইয়া আইসে! 'বিপদিধৈর্য্যম্'—এযে বড় গুণ! সে উদ্বিগ্নচিত্তে মিনতি করিয়া কহিল, "শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন্, অসুস্থ হইলে লাভ কি?"

এইবার নীরবে উঠিয়া, সে টেবিল-কেদারাগুলা ঘুরিয়া যেখানে ঘরের একটি কোণে একখানা বড় সোফা ছিল, সেইখানে গিয়া, নিজের কাপড়-চোপড়গুলা একটু গুছাইয়া লইয়া, তাহার উপর শুইয়া পড়িল। চারিদিকে এত ছোট-কেদারা, টুকিটাকি জিনিষপত্র—তবু তাহার কোথাও বাধিল না। দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেই নির্ম্মলের স্মরণ হইল—এ ঘর তাহার পিতার বসিবার ঘর; হয় ত জীবনের অধিকাংশকাল তাহার এই ঘরেই কাটিয়াছে। সেদিকে আর না চাহিয়াই সে চলিয়া যাইবার জন্য দ্বার খুলিল। বাতাসে বোধ করি, কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। "আপনি যাইতেছেন! তবে চলুন, আমিও যাই।" অকস্মাৎ ভয়বিহ্বলকণ্ঠে এই কথা বলিয়াই সে ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল! "আমি থাকিতে পারিব না।"

নির্ম্মল অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এতদিন সে তাহাকে দেখিতেছে—এতখানি কাছাকাছি দুজনে সর্ব্বদাই রহিয়াছে; কিন্তু তাহার সেই অভেদ্য পাষাণমূর্ত্তির অভ্যন্তরে যে এমন আনির্ভরশীলা একটি বালিকা-জীবন লুকান ছিল, সে দিকটা সে এপর্য্যন্ত কোন অবসরে দেখিতে ফাঁক পায় নাই। সে-যে নিজেকে আজ কি অসহায় বলিয়া ভাবিয়াছে, কিসের যে একটা নিদারুণ আতঙ্কে তাহার সারাপ্রাণ কাঁদিতেছে! কোন একটা অনির্দ্দেশ্য বিপদের আবছায়ায় তাহার মন ছম্‌ছম্ করিতেছে;—মনে হইতেছে, যেন একটা ভীষণমূর্ত্তি মৃত্যুদূত তাহার দুই কঠোরবাহু বিস্তার করিয়া নিঃশব্দ-উল্লাসে তাহার সহিত মুখোমুখি করিয়া অগ্নি-নেত্রে চাহিয়া যেন একপা-একপা অগ্রসর হইতেছে। তাহার অন্ধকার হৃদয়তলেও যেন সেই বজ্রজ্বালাময় দৃষ্টিছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার সর্ব্বশরীরে কি যে একটা আতঙ্ক-শিহরণ আনিতেছিল, সে সবই যেন এই একটুখানি ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া তাহার কাছে এই একটি জীবমমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যে, যাহাকে সে পূজার প্রতিমা বোধে রাশিকৃত কমলকহ্লারের পুষ্পাঞ্জলি চরণে ঢালিয়া দিয়াই তৃপ্ত হইতে এবং তৃপ্ত করিতে চাহিতেছিল, তাহার নিজের পক্ষে বুঝি বা শুধু ফুলেই পর্য্যাপ্ত নয় ফলেও বুঝি তাহার কিছু কিছু আবশ্যক আছে। শুদ্ধা ভক্তি খুব বড় জিনিষ; কিন্তু মানুষ গড়িতে ভগবানের কেবল অমর আত্মাদ্বারাই কার্য্যসাধন ঘটে নাই—নশ্বর, তুচ্ছ জড়পদার্থ পঞ্চভূতেরও সেখানে আবশ্যক ঘটিয়াছিল মর্ম্মরসৌধ-রচিবার পক্ষে তুচ্ছ মাটি-কাঠের প্রয়োজনীয়তা যেমন অল্প নহে, তেমনি শুধু এ দুই বড়জিনিষ লইয়াই একটা মানবজীবনের শেষ পর্য্যন্ত বোধ করি, চলিতে পারে না। সে ফিরিয়া পূর্ব্বের আসনখানা গ্রহণ করিল এবং স্নেহ সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ চিত্তদ্বার তাহার উদ্দেশ্যেই খুলিয়া দিয়া কহিল "আমি এইখানে বসিতেছি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও।"

ধীরাও এ সান্ত্বনা গ্রহণ করিল, না করিবার শক্তি তাহার যে ছিল না। সে একটা গভীর-নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্তভাবে আবার চোখ মুদিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ ঘরে কোন সাড়াশব্দই রহিল না। নির্ম্মল অনেকক্ষণ পরে নিজের গভীর চিন্তার মধ্য হইতে জাগ্রত হইয়া একবারমাত্র তাহার দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিল, তখনও সে ঘুমাইতে পারে নাই; তাই আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া জানালার বাহিরে অনির্দ্দেশ্যভাবে চাহিয়া সে নিজের সেই স্রোতোবাহিত চিন্তাধারাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

"ডক্টর লি! কোনমতেই কি আপনি ইঁহার জীবনের আশা করিতে পারেন না?"

"না, মিঃ চাটার্জ্জী! আশা করি না, এমন কথা তো আমি বলি নাই। তবে এ কথা খুব নিশ্চিত যে, আশা খুবই অল্প। এত অল্প বলিয়াই বলিয়াছিলাম, প্রায় আশাহীন।"

"আচ্ছা, আর কয়দিন বাঁচা সম্ভব, তাহা কি বলিতে পারেন?"

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিলেন "জ্বর যখন আবার বাড়িতেছে, তখন সমস্তই অনিশ্চিত। তবে এখনও চব্বিশ-ঘণ্টাকাল সম্ভবতঃ ভয়ের তেমন কোন কারণ পাওয়া যায় না।"

নির্ম্মল গভীর-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোগীর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ক্ষীণকণ্ঠে রোগী ডাকিলেন "ও মা ধীরা!"

"এই যে আমি রহিয়াছি বাবা" বলিয়া নির্ম্মল তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অগ্নিতপ্ত-ললাটে শীতল করতল স্থাপন করিল। রোগীর মুখে যন্ত্রণার আর্ত্তচিহ্ন। স্বর ঘন, কম্পিত। তিনি কহিলেন "ধীরা! ধীরা কোথায়?"

"সে ও ঘরে ঘুমাইতেছে। ডাকিব কি?"

"না ঘুমাক্! নির্ম্মল! বড় যন্ত্রণা! বোধ হয় আর বাঁচিলাম না; তুমি রহিলে—ধীরা রহিল, দেখিও।

নির্ম্মল তাঁহার ললাটের স্ফীতা-শিরার উপর সুগন্ধ-বারি-সিক্ত ন্যাকড়ার পটি বাঁধিবার জন্য কাঁচের পাত্রে পটি ভিজাইয়া ধীরস্থিরকণ্ঠে কহিল "আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা কিরূপ করিব, বলিয়া দিন। বিবাহটা আপনার সাক্ষাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

মুরলীধর চমকিয়া পূর্ণ-বিকসিতনেত্রে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বিবাহ! তোমার? ধীরার? তবে আজই হয় না কি? হইতে পারে না কি? হয় ত কা'ল আর সময় থাকিবে না!"

নির্ম্মল একটুখানি থামিয়াই উত্তর করিল "তা হইবে না কেন? হওয়াইলেই হয়। আমি এখনই ব্যবস্থা লইতেছি।"

সমাধি-সাধ

[শ্রীমতী জোহরা রহমান]

যেথা কোমল মাটীর বক্ষ জড়ায়ে সবুজ তৃণের দল
বুকে ধরে আছে স্ফটিকের সম মেঘভাঙা হিম-জল;
শান্ত সমীর ধীরি ধীরি বয় চুমিয়া ঘাসের ফুল,
সেইখানে দিও সমাধি আমার, কুলের প্রদীপ-কুল!
যেথা কোয়েলার আবেশজড়িত কুহু কুহু রব নাহি,
যেথা পাপিয়ার করুণকণ্ঠে দিগ্‌বালা দেখে চাহি,
যেথা মানবের রোদন বেদন কিছুই না যায় জানা;
আর কোনো ভূমি দিওনা আমার সে নীরব স্থানবিনা!

মৌন মধুর সুপ্তিমাখানো সুগভীর ভাবভরা,
আলোময়ী রাতে বুকে পড়ে যার জ্যোছনার শতধারা,
স্বপ্নলহরী লুটে পড়ে সেথা বড় মনোরম ঠাঁই!
চিরবিরামের বিছানা আমার সেখানে বিছায়ো ভাই।
তটিনীর সেই কুলুকুলু গান দূরহতে ভেসে আসে,
দূর কুসুমের গন্ধ বহিয়া বায়ু ফেরে আশে পাশে,
সব(ই) দূর দূর সব(ই) সুমধুর সব(ই) কোমলতাময়;
শান্তির সে নীড়ে চিরদিন তরে মুদিব নয়নদ্বয়!

দাদামহাশয়ের দেশে

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

অচিরগত কুম্ভ-যোগের অব্যবহিতকালপূর্ব্বে আমাদের 'দাদামহাশয়ের দেশ' দেখিবার সৌভাগ্য-লাভ হইয়াছিল। কুম্ভস্নানের তখন পক্ষাধিককাল বিলম্ব থাকিলেও এই মৌন-মহিমময় গিরিপ্রহরীদ্বারা একদিকে শান্ত-সংযত এবং অন্যদিকে বিগলিত-স্নেহ-প্রবাহময়ীদ্বারা অবিরাম-অভিষিক্ত এই দেশকে যেভাবে দেখিব ভাবিয়াছিলাম, তাহার পক্ষে অত্যন্ত অসময়েই যাত্রা করা হইয়াছিল। ক্ষুদ্র হরিদ্বার সহরটি তখন এক মহানগরীতে পরিণত। যাইতেছে। যদি পশ্চিম-ভারতের এই দেশওয়ালি অশিক্ষিত যাত্রীরা কুম্ভের বৃহস্পতি-মীন-মেষের সন্ধিক্ষেত্রস্থ রবি, চতুর্দ্দশী-তিথি ইত্যাদি বুধজন-পরিজ্ঞাত যোগক্ষণের "তোয়াক্কা" রাখিত, তাহা হইলে গত বিষুবসংক্রান্তির দিন সে দেশে যে কি-ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না।

যাহারা ভিড়ের ভয়ে গৃহের উপরে লুকাইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এই মহতী মেলার কথা বলিতে

ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাট

পূর্ণ-কুম্ভের প্রায় তিনমাস-কালস্থায়ী মহামেলা তখন দিন দিন পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছিল। সে অঞ্চলের লোকেরা ত্রিশে চৈত্রের অপেক্ষায় বসিয়া নাই। ট্রেণের পর ট্রেণ-বোঝাই হইয়া তাহারা আসিতেছে এবং ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত্তঘাটে স্নান ও পিণ্ডাদি-দানান্তে যদৃচ্ছা ত্রিরাত্রি অথবা একঅহাহে দ্রষ্টব্য-স্থানগুলি দর্শন করিয়া চলিয়া যাওয়াও ধৃষ্টতা মাত্র। এ মেলার গমনাগমনপথের রেলের ভিড়ে, ত্রিমাসব্যাপী মহা-জনতায়, সজ্জিতোজ্জ্বল অসংখ্য বিপণিবৃন্দে এবং সতত সর্ব্বত্র-দৃশ্যমান রাজপুরুষগণের সতর্ক-ব্যবস্থায় এ মেলা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামেলা বটে; কিন্তু ইহাই মাত্র সে মেলার প্রাণ নয়! ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর সাধুসম্প্রদায়ের সমন্বয়ই এই মেলার প্রধান বিশেষত্ব।

সপ্ত-মোক্ষ-দায়িকা-পুরীর অন্তর্ভূত এই মায়াপুরী তীর্থের "হরিদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে স্নাত্বা কনখলে তীর্থে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—এই পঞ্চস্থান-মাহাত্ম্য এ মেলার যাত্রিবর্গের নিকটে এখন যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তাহারা এখন কোনক্রমে যথাকর্ত্তব্য সারিয়া দক্ষিণে কন্‌খল্ এবং উত্তরে হৃষীকেশ—এইপ্রায় দশক্রোশ স্থানব্যাপিয়া যে "বাবা লোগ" ও সাধু "মহান্ত মহারাজ"-গণ নিজ নিজ সম্প্রদায়সহ সদলবলে 'ঝণ্ডা' গাড়িয়া আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে ছুটিতেছে। নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, নির্ম্মলা, রামাইৎ, হনুমানী, দশনামী, প্রভৃতি আখড়ার মহান্তগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র সহস্র সাধু সমভিব্যাহারে রাজোচিত সম্ভ্রম-সম্পদের সহিত মাসাবধি কাল ধরিয়া হরিদ্বারে বাস করিতেছেন। ইহাভিন্ন সাধারণ সন্ন্যাসী-বিরাগীদলের কুটীর তো যত্রতত্র। বৃক্ষতলে, বালির চড়ায় সম্পূর্ণ নিরালম্ব স্থানেও ইহাদের আড্ডা পড়িয়াছে। পুরাণে শুনা যায় যে, নরকলুষহারিণী গঙ্গা, জাহ্নবীজলস্নাত পাপীর পাপভার নিজ অঙ্গে গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু সেই সন্তান-কলুষ সমলা জননী আবার তাঁহার নীরে সাধু-স্নানের প্রতীক্ষা করেন—প্রকৃত সাধুর স্নানে আবার তিনি নির্ম্মলা হন। কিন্তু এ কল্পনা বুঝি এখানে খাটে না। হরিদ্বার-তলবাহিনী এই নির্ম্মল-সলিলার স্বতঃশুদ্ধ স্ফটিক-সঙ্কাশ সলিলে মুহূর্ত্তের জন্যও কল্মষ-কালিমা-অর্পণ অথবা ইহাতে কোন নূতন মহিমা প্রদান বুঝি মানবের পক্ষেই অসম্ভব—তা সে যত বড় পাতকী, কিংবা মহাপুণ্যবান্‌ই হউন না কেন। সেই লক্ষ লক্ষ সাধুবর্গের মধ্যে কত কত মহাত্মা যে ছদ্মবেশেও আছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ভাগ্যক্রমে যদি কেহ তাঁহাদের কাহারও দর্শনলাভ করিতে পারে, সেই আশায় নানা-দেশের অগণ্য নর-নারীবৃন্দ দলে দলে সেইদিকে ছুটিতেছে।

যেদিন আমরা হর্‌কি-পইড়ির রামঘাট নামক একটি ক্ষুদ্রঘাটে হরিদ্বারের জীবন-প্রবাহময়ী, বিগ্রহিনী তীর্থ-দেবীকে প্রত্যক্ষ করি, সেইদিনের কথা মনে পড়িতেছে। যাঁহারা মুঙ্গের রাজমহল কাশী ও প্রয়াগের গঙ্গা দেখিয়াছেন, তাঁহারা দূর হইতে প্রথমে তাঁহাকে গঙ্গা বলিয়াই স্বীকার করিতে চান না। হরিদ্বারের গঙ্গা, যাঁহার এত নাম, তিনি ঐ অতটুকু খাতের মধ্যদিয়া বহিয়া যাইতেছেন—এ হইতেই পারে না। প্রবীণা জননীর তরুণী-মূর্ত্তি সন্তানের যেমন সহজে চিনিবার উপায় থাকে না ঠিক যেন সেই দৃশ্য! কিন্তু সেই অগভীরা অনতি-বিস্তৃত-হৃদয়া প্রবাহিণীর নিকটস্থ হইয়া আর কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা রহিল না। সহস্র-শিলাখণ্ডময় সরণে শুদ্ধদর্পনোজ্জ্বলশরীরা, কিশোরী পার্ব্বতী বাল-স্বভাব-সুলভ খল খল শুভ্রহাস্যে, কলকল সঙ্গীতে, লীলাচঞ্চলাঞ্চলে কি তড়িত-চপল গতিতেই ছুটিয়া চলিয়াছেন! সে শোভা যে না দেখিয়াছে সে হয়ত বুঝিবে না। আর কি সেই শীতল-স্পর্শ! প্রতি অঙ্গে রোমাঞ্চ-সঞ্চার করিয়া তাহার স্পর্শানুভূতি পদের নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে! পুণ্যসলিলশীকরসিক্ত বায়ুই যেন শরীরের অর্দ্ধেক গ্লানি দূর করে! দৃশ্যে চক্ষু বিগতক্লেশ হয়—স্বাদের কথা তো এ জন্মে ভুলিবারই নহে। স্বর্গ-মন্দাকিনীর যে সুধাসলিল পান করিয়া দেবতায়া অমরত্ব লাভ করেন সেই সুধার স্বাদ হরিদ্বারের তুষার-শীতল গঙ্গানীরে যেন অবিকৃত-ভাবেই বর্ত্তমান আছে। সেই পর্ব্বতমূলস্থা সপ্তধারা নীলধারার অমৃত-ধারায় স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" কথাটির অর্থও বুঝি তখনই হাতে হাতে লাভ করা যায়। অতি দুর্দ্দশাগ্রস্থ মনও কয়েক-মুহূর্ত্তের জন্য আশা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, শোক বিস্মৃত হইয়া, এমনই বিমল-আনন্দে ভরিয়া উঠে যে, তাহার চির-অপূর্ণ চিত্তক্ষোভে তখন তৃপ্তির পূর্ণতায় অন্ততঃ কয়েক-মুহূর্ত্তের জন্যও জন্মান্তরগ্রহণকারণকে এই প্রচণ্ড পাবন-ধারার মুখে ছাড়িয়া দিয়া অনন্ত-সমুদ্রাভিমুখে পাঠাইয়া দিয়া থাকে।

এইখানে আর একটি দিনের কথাও স্মরণ করিতে চাই। জনতার জন্য সেদিন রামঘাটের বামপার্শ্বস্থ অট্টালিকার বহির্গাত্রস্থ বৃক্ষকোটরের মত কয়টি খিলানের মধ্যে কয়জনে আশ্রয় লইয়াছিলাম। ঘাটের বামদিকে একটু জল ভাঙ্গিয়া, জলের সল্লবেগ এবং জলমগ্ন পিচ্ছিল শিলাদল অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইতে হয়; তাই সেদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সম্মুখে নীলপর্ব্বত, উত্তরে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ-শিখর-শ্রেণী, প্রায় ক্রোড়ের নিকটে সেই স্ফটিকোজ্জ্বল জলস্রোত! কলনাদে কর্ণ জুড়াইতেছে, চক্ষু দৃশ্যমুগ্ধ, শিলাপ্রহত-প্রবাহ মাঝে মাঝে ছিটাইয়া উঠিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তি-কয়টির সর্ব্বাঙ্গ

অভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। এমন সময়ে, উর্দ্ধে—বোধ হয় সেই অট্টালিকা কিংবা তাহার পার্শ্বস্থ অপর কোন বাটী হইতে, উচ্চ-উদাত্ত-কণ্ঠের একটা সঙ্গীতধ্বনি সেখানে ভাসিয়া আসিল! সকলে মনের সমস্ত চেষ্টাকে শ্রবণপথে আনিয়া, কিছুক্ষণ পরে প্রথমে সে সঙ্গীতের এইটুকুমাত্র অর্থগ্রহণ করিলেন—"পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে!" বাঙ্গালীর কণ্ঠোত্থিত বাঙ্গালা গান! সকলে খিলান-কোটর হইতে মস্তক বাহির করিয়া উদ্ধে, বামে, দক্ষিণে চাহিতে লাগিলেন; শ্রোতা কয়টির মন তখন উত্তরে দৃশ্যমান শৃঙ্গধরের দুর্গম তুষারশিখর ভাঙ্গিয়া, গঙ্গোত্রী-গোমুখী ছাড়াইয়া, কবি-কল্পনার শেষসীমা—"অম্বর-স্খলিত" প্রপাতের-সম, শত জ্যোতিঃধারা ধরিয়া উদ্ধ হইতে উর্দ্ধে ছুটিয়াছিল। ধূর্জ্জটির জটিল জটাজাল এবং এই বিশ্ব ব্রহ্ম-কমণ্ডলুর অতীত সে গম্য স্থান! যেখানের চির-কীর্ত্তনিত মহাসঙ্গীতে ঘনীভূত স্থিরআনন্দ তরল-পুলকরূপে দ্রবীভূত হইতেছেন, এবং সেই বিগলিত-পুলকধারা, ক্রমনিম্নগতিতে বহিয়া

কুশাবর্ত্ত ঘাট

কাহাকেও দেখা গেল না। কিন্তু জলকল্লোল আর তখন সেই সঙ্গীতের ভাষাকে ঢাকিতে পারিল না! বরং সেই কলনাদের সঙ্গে মিশিয়া সে সঙ্গীত এক বিচিত্র, নূতনভাবে অন্তরীক্ষবাসী কোন সিদ্ধচারণ-উচ্চারিত স্তোত্রের মত গঙ্গা-বক্ষে ধ্বনিত হইতে লাগিল! সেই বহুবার-শ্রুত বঙ্গ-কবির প্রসিদ্ধ জাহ্নবি-স্তব সঙ্গীত—

"নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল-জটাপর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সমশতধারা জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে
নামি ধরাতলে, হিমাচলমূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে!"

বহুস্থানে, বহুবার এ সঙ্গীত শুনা গিয়াছে; কিন্তু সেদিনের মত আর কখনও শুনি নাই, বোধ হয় কখনও শুনিব না! আনিয়া যেস্থান হইতে করুণারূপে বিশ্বমূলে নিত্যক্ষরিত হইতেছে! সেই—সেই বচনাতীত, মাত্রঅনুভবগম্য স্থলটিই বুঝি তাহাদের সে গতির লক্ষ্য ছিল। তারপরে যখন সঙ্গীত শেষ হইয়া আসিল, কবির ভাষা তাঁহার প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করিল—

"পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম-'শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগিরথি, জাহ্নবি, সুরধুনি, কল-কল্লোলিনি গঙ্গে!"

তখন সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদেরও মন সেই উর্দ্ধতম লোক হইতে নামিয়া আসিয়া, এই ভবসুখদুঃখক্লান্ত আপন সত্তায় পৌঁছিল, এই দৃশ্যমান পৃথিবী তাহাদের অনুভবে আসিল।

তাহারাও তখন কবির প্রার্থনার সঙ্গে একীভূত হইয়া, সজল-নয়নে আপন প্রাণের বাসনাও নিবেদন করিয়া সেই চরমা ও পরমা-গতির উদ্দেশে প্রণত হইল।

পুরাণাদিতে তপোবন-বর্ণনায় তথাকার জীবজন্তুগণের যে খাদ্যখাদকসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া বিচরণের কথা আছে, এখানের মনুষ্য-মৎস্যের সম্বন্ধ দেখিলে সেকথা কে কবি-কল্পনা বলিবে? পশ্চিমের প্রত্যেক তীর্থ-বাসীরাই মৎস্যাহারত্যাগী বটেন; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এমন স্নেহভাবের আদান-প্রদান আর কোনস্থানে দেখা যায় না। প্রত্যেক ঘাটেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছেরা শিশুর মত লুটাপুটি করিয়া, গাদাগাদি হইয়া মানুষের হাত হইতে পুরী মিঠাই ছাতু খাইতেছে বটে; কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে, মানুষের সঙ্গে তাহাদের আদর-আব্দারের গলাগলি ভাবটিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য! খাইতে না দিলে তো কাহারো ছাড়ান্ নাই; ঘাড়ে পড়িয়া স্নানার্থীর হাতখানি তাহাদের ব্যাদিতাস্যে কবলিত করার চেষ্টায় নিজেদের ইচ্ছাটি, অতিআদরের সঙ্গেই জানাইয়া দেয় এবং আহার আদায় করিয়া তবে নিষ্কৃতি দান করে। একদিন একটি ক্ষুদ্রবাঙ্গালীদলের মধ্যে, একটি মেয়েকে এই মাছেদের মধ্যে এমনই আত্মহারা হইতে দেখিলাম যে, সে মাছগুলির মধ্যে যাহাকে পারিতেছিল, শিশুর মত বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বনেরই যেন উদ্যোগ করিতেছিল—মৎস্যকুলের তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই; পিছ্লাইয়া হড়্কাইয়া বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছে মাত্র! মেয়েটির আত্মীয়কয়টি এবং আরও অনেক দর্শক সানন্দে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন; ইতিমধ্যে একজন বিচক্ষণ হিন্দুস্থানী যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে 'বাঙ্গালীরা মাছ খায় কি না, তাই তাহারা মাছ দেখিয়া এত খুসী হইতেছে;—' ইহাদের দেখিয়া "বংগালি লোগ্‌কা বহুৎ লালচ্ লাগ্‌তা হ্যায়।" বিচক্ষণের এ মন্তব্যে, মৎস্যাহারী চিরকলঙ্কিত বাঙ্গালীকয়টি ছাড়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

বিল্বকেশ্বর

হাস্যমুখরিত পশ্চিমদেশবাসীকয়টি বোধ হয়, জানেন না যে—স্থানকালোচিতভাব চিরাগত-সংস্কারকেও সময়ে সময়ে ভুলাইয়া দিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি দিনের আনন্দ-স্মৃতির উল্লেখভিন্ন ইহাতে অন্য কিছুই থাকিবে না; সে কারণ, দক্ষালয়ের সতীতীর্থ, বিল্বকেশ্বর, ভীমগোদা প্রভৃতি হরিদ্বারের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্যস্থানগুলির কথাও আমাদের পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা নাই। এই 'ভারতবর্ষে'ই সেদিন যোগ্যতম ব্যক্তির লেখনী হইতে সে সবস্থল আলোচিত হইয়াছে; কেবল 'শিভালিক-পাহাড়' ও 'নীল-পর্ব্বত'—এই দুইটীর কথামাত্র একটু বলিবার আছে। পশ্চিম-শিবালয়-পর্ব্বতটি হরিদ্বারের মনুমেণ্টবিশেষ!—এই পর্ব্বোতোপরি 'সূর্য্যকুণ্ড' ও 'গঙ্গাদেবী', 'মনসাদেবী' প্রভৃতির মূর্ত্তি থাকিলেও

ভীম গোদা

চণ্ডীর পাহাড়, বা নীলপর্ব্বত হরিদ্বারের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার অপর-পারে অবস্থিত। উচ্চতায়ও ইনি শিভালিক হইতে খর্ব্ব এবং মনুষ্য চেষ্টাদ্বারা ইহাতে সুগমপথও পাওয়া যায়। পথটিও নানাজাতীয় বন্যপুষ্পভূষিত শ্যামদ্রুমচ্ছায়াযুক্ত। যাত্রীর শ্রমনিবারণার্থে স্থানে-স্থানে এক-একখানি পরিষ্কৃত বিস্তৃতপ্রস্তরাসনও যেন কেহ পাতিয়া রাখিয়াছে। এই নীলাদ্রির উপরে দাঁড়াইলে, উত্তরের যে মহানদৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাও বুঝি যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিবে না।—যেন নীলাকাশস্পর্শকামী অতি উত্তুঙ্গ নীলসমুদ্রের উদ্বেলিত মহাতরঙ্গদল, প্রাণপণবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, সহসা যেন কাহার আদেশে মন্ত্রমুগ্ধভাবে স্তব্ধঅচলে পরিণত হইয়াছে। শৃঙ্গের পার্শ্বে শৃঙ্গ, শিখরের পশ্চাতে শিখর, ঘননীলের পর ঘনতর—ঘনতম নীল। নিম্নে রক্ত পীত শ্বেত পুষ্পপত্রাভরণ সজ্জিতা শ্যামা অরণ্যানী, হরিৎহিরণের সেও যেন এক সমুদ্র! আর সেই নীলের ক্রোড় হইতে ক্রম প্রবাহিতা শিলা ও বালুকার স্তর-বিন্যস্তসৈকতে "নৃত্যপুলক গীতিমুখরা কলুষহরতরঙ্গা" গঙ্গার রজত-রেখা। এক একবার মনে হইতেছিল—"মায়ের বাপের বাড়ী" বলিয়াই কি এ দেশকে এত মহিমাসুন্দর দেখিতেছি?—অথবা বাস্তবিকই এক্ষেত্র এমনই! একি বাস্তব কোন দৃশ্য? কিংবা কল্পনার খেলা। মনে পড়িল, চন্দ্রশেখর শ্রীশৈল এবং আদিনাথে যেন এমনই দৃশ্যের কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল। ঐ উত্তুঙ্গ হিমালয়, যদি সেই শ্যাম-অরণ্যানীর পশ্চাতে—বালুকাময় বেলাভূমে—ধরণীসমতলভাবে নত হইয়া, ক্রমোচ্চ দৃশ্যে দিক্‌প্রান্তে গিয়া মিশিত, তাহা হইলে চণ্ডীর পাহাড়টিকে বঙ্গসমুদ্রের উপকূলস্থ চন্দ্রশেখর পর্ব্বত বলিয়া এক-একবার ভ্রম হইতে পারিত; কিন্তু ঐ প্রবাহিতা জ্যোতিঃধারা, ঐ

চণ্ডীর পাহাড়ের মত ইহার যাত্রীসংখ্যা বেশী নহে। দুরারোহতায় ইনি প্রায় চন্দ্রশেখর পর্ব্বত। ইহার শিখরদেশে উঠিলে, পাদমূলস্থা ক্ষুদ্র হরিদ্বার সহরটি যেন ত্রি-অদ্রি-বেষ্টিতা—রেখাকারা একটি গুপ্তপুরীর মতই দেখায়!—সেই ক্ষুদ্র পুরীটিতে কয়টি মনুষ্যই বা ধরিয়াছে; কিন্তু দক্ষিণে, বামে, ও সম্মুখের চড়ায় বিস্তৃতভাবে যেন একটা নিশ্চল মানবারণ্য নির্ম্মিত হইয়াছিল! সেই গজরাজ-গর্ব্বহারিণী বেগবতীর বক্ষে, শৃঙ্খলের-পর-শৃঙ্খল সংযোজিত হইয়া, তাঁহার বেগকে স্থানে স্থানে মন্দীভূত করিয়া তুলিয়াছে। এই কুম্ভ-মেলাস্থ মানবগণের গমনাগমনপথের জন্যই, নূতন করিয়া সপ্ত-নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখা গেল।

সর্ব্ব শোভার ঔজ্জ্বল্যস্বরূপা জাহ্নবী, তাঁহাকে ত কল্পনায়ও স্থানভ্রষ্ট করিবার সাধ্য কাহারও হইবে না ; তাই, এ 'দাদা মহাশয়ের দেশে'র সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও তুলনা চলে না।

ক্রমেই হরিদ্বারে জনতা বৃদ্ধি হইতেছিল। মাঝে মাঝে, এক একদিন উষ্ট্রপৃষ্ঠে ডঙ্কা বাজাইয়া মহান্ত মহারাজেরা হস্তী আরোহণে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানার্থে যাইতেন। যেদিন গুরুকুলের বালক-বিদ্যার্থীদের স্নান করিতে যাইতে দেখা গিয়াছিল, সেও একটী স্মরণীয় দিন। তাহাদের সঙ্গে ডঙ্কা বা ব্যাণ্ডের ঘোর রোল অথবা নিশান পতাকা হস্তী অশ্ব কিছুই ছিল না। কুক্ষিতলে কুশাসন, বক্ষে যজ্ঞোপবীত ও মুক্ত-উত্তরীয় এবং হস্তে আষাঢ় দণ্ড লইয়া শিশুব্রহ্মচারীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে উদারমন্ত্রমাত্র উচ্চারণ করিতে করিতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিল। আট দশ হস্ত অন্তরে একজন করিয়া অধ্যাপক তাহাদের চালকরূপে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে-ছিলেন। এই আড়ম্বরহীন শিশু-যতিবর্গের প্রতিও দর্শকেরা সমান ভক্তিতে মস্তকনত করিয়াছিল।

সেই সর্ব্বজন-অপেক্ষিত দিনের অব্যবহিতপূর্ব্ব রাত্রির দুই ঘটিকা হইতে নর-সমুদ্রপ্রবাহ রাজবিধির বেলা-প্রহত হইয়া দ্বিগুণ কল্লোলে চতুর্গুণবেগে ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল। এত যে বন্দোবস্ত, এত যে খবর্দারি, তথাপি গবর্মেণ্ট-নিযুক্ত, মাড়োয়ারী সেবক সমিতি এবং স্বদেশী স্বেচ্ছা-সেবক সম্প্রদায় দল, রক্ত-ক্রুশ্‌ চিহ্নিত হইয়া ক্যাম্বিশের খাটে লোহিত পতাকা উড়াইয়া, জনতা-পিষ্ট হতাহত যাত্রীবর্গকে মাঝে মাঝে হাস্‌পাতাল অভিমুখে লইয়া চলিতেছিল। সে দৃশ্য দেখিয়া দুই পার্শ্বের জনতা কিছুমাত্র বিচলিত হইতে ছিল না ; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে "গঙ্গা মায়িকি জয়!" শব্দে চীৎকার করিয়া, সম্মুখে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল ;—যেন এ দৃশ্য তাহাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব কিছু নয়, ইহার জন্য যেন তাহারা প্রস্তুত হইয়াই চলিয়াছে। সেদিন তাহাদের "জীবন মৃত্যুপারের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" এবং তখন তাহাদের মধ্যে "আগে ভাগে প্রাণ কে করিবে দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি!" কি জলন্ত বিশ্বাস ও ধর্ম্মোন্মত্ততাও সেদিন সেই লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। ধর্ম্মলাভ-কামনায়, প্রাণের মমতা বিসর্জ্জনের যদি কোন' মূল্য থাকে, তাহা হইলে তাহারাই সেদিনের স্নানের যথার্থ ফললাভ করিয়াছে।

চণ্ডীর পাহাড়

গভীর দুঃখের মধ্যেও মানুষ এক এক সময় হাসিয়া

লয়। রাত্রি চারিটার সময় সদলে কোনরূপে ব্রহ্মকুণ্ডে মাথা ডুবাইয়া আসিয়া বাসার ছাতের উপর আশ্রয় লওয়া গিয়াছিল। নিম্নস্থ পথ দিয়া ক্যাম্বিশের দোলায় পুনঃ পুনঃ গতায়াত দেখিয়াও যখন উন্মত্ত স্নানার্থীরা কেহই পশ্চাদ্‌পদ হইল না, তখন আমাদের দলস্থ একজন নিরতিশয় ব্যথিত ও হতাশভাবে বলিলেন, "এদের কি ক্যাম্বিশের দোলায় চড়্‌বার এতই সখ্‌ হ'য়েছে? ওরা হয়ত মনে ভাব্‌ছে যে প্রথমটা লালনিশান উড়িয়ে, চটের দোলায় ওঠা বটে; কিন্তু বটে; কিন্তু তার ব্যতিক্রমেই এযে কি রকম মৃত্যু, তা বুঝ্‌তে পারা যায়।"

বেলা প্রহরাধিক হইতেই দর্শকদিগের চক্ষু গঙ্গার চড়ার দিকে নিবদ্ধ হইল—সাধুসম্প্রদায়ের স্নান তখন আরম্ভ হইয়াছে। একপথ দিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া স্নানান্তে পার্শ্বস্থ অপর পুল দিয়া তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে ফিরিতেছিলেন। নিজ নিজ মঠের সম্ভ্রম অনুযায়ী রাজসমারোহে তাঁহারা চলিতেছেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠ সম্বদ্ধ ডঙ্কার ভীমশব্দ, ব্যাণ্ডের

হৃষীকেশ সাধারণ দৃশ্য

তার পরেই 'বিষ্ণুশর্ম্মার' মত 'সহস্র ঘণ্টা নিনাদিত' রথ! মাঝের অবস্থাটা কি ওদের দেখা নেই? মুদ্দফরসের বাঁকের মধ্যে প্রায়োপবেশনে বসে জোড়ায় জোড়ায় পুঁটুলি বাঁধা হয়ে, কন্‌খলের পারের চড়ায়ও যেতে হবে যে একবার! ক্যাম্বিশের খাট থেকেই একেবারে হরিদ্বার প্রাপ্তির ফলে একলাফে রথে ওঠা ঘট্‌বে না!" একজন শ্রোতা বাধা দিয়া বলিলেন, "এই লক্ষ লক্ষ লোকের ব্যাপারে ২৫।৩০ জন মরা একটা বেশী কথা কি?" প্রথম বক্তা ঈষৎ ক্রোধের সহিত উত্তর দিলেন, "যতক্ষণ না নিজে, অথবা নিজের দলের কেউ ঐ ২৫।৩০ জনের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়ে, ততক্ষণ এ মৃত্যু তুচ্ছ ঝঙ্কার, শান্তিরক্ষক পুলিশবর্গের অশ্বের দরবরি এবং স্বর্ণ রৌপ্যোজ্জ্বল পতাকা ছত্রদণ্ডবাহী সাধারণ সন্ন্যাসী বর্গের ঘন ঘন জয়নাদে দর্শকদিগের মনে কি যে এক বিপুল সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বহুমূল্য আস্তরণে ভূষিত হইয়া এবং রৌপ্য-সিংহাসনে পৃষ্ঠদেশ শোভিত করিয়া গজরাজগণ ধীর গম্ভীর-গতিতে চলিয়াছেন। হাওদার উপরে মহান্তগণ; কোনটির উপরে মহান্ত-ক্রোড়ে সেই মঠের নিজস্বচিহ্ন বিগ্রহ-মূর্ত্তি, পাদুকা বা গ্রন্থ বিরাজ করিতেছেন। স্বর্ণ-মণ্ডিত শিবিকায়ও পাদুকা বা গ্রন্থ চলিতেছেন। উপরে

স্বর্ণছত্র, পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ড চামর ঘন ঘন চলিতেছে, ধূপাধার বাহী ধূপ পোড়াইতে পোড়াইতে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। এই রাজোচিত অভিযান কি তাঁহাদের সম্প্রদায়গত গৌরব প্রদর্শনের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? ঐ যে কৌপীন-পরিহিত সর্ব্বত্যাগীর দল ধূলা-ভস্ম-ভূষিত শরীরের উপরে এক একটা জরীর শাল ফেলিয়া সুউচ্চ উজ্জ্বল পতাকা স্কন্ধে লইয়া সহুঙ্কারে নাম ঘোষণা করিতেছে, সে নাম কাহার? কৌপীন-সম্বল দেহে সে রাজ সৈনিকের বেশে, সে স্বর্ণ পতাকায় তাহারা আজ কাহার গৌরব ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে? সে কি সেই গজপৃষ্ঠাসীন স্বর্ণমুকুটধারী মহান্ত মহাশয়ের? রাখেন নাই। দূর হইতে সেই সুদীর্ঘ জটামণ্ডিত, ভস্ম-ধূসরিত সন্ন্যাসীদিগের রিক্তহস্তগুলি আজানুলম্বিত করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবের গতিই দর্শকদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিল।—যেন সারি সারি শঙ্করই চলিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা বলেন, কুম্ভ যোগের প্রচলনকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্য দেব, এই যোগে ছদ্মভাবে সন্ন্যাসিবর্গের সহিত স্নান করিয়া থাকেন। কে জানে আচার্য্য কোন্‌টি তুমি? তোমার শিষ্যদলের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের এই "সকল-অভ্যাস হারা সর্ব্বশিশুসম" সাজে সাজাইয়া কোন্ পথে কাহার উদ্দেশ্যে লইয়া চলিয়াছ? এই অভিযান যেন
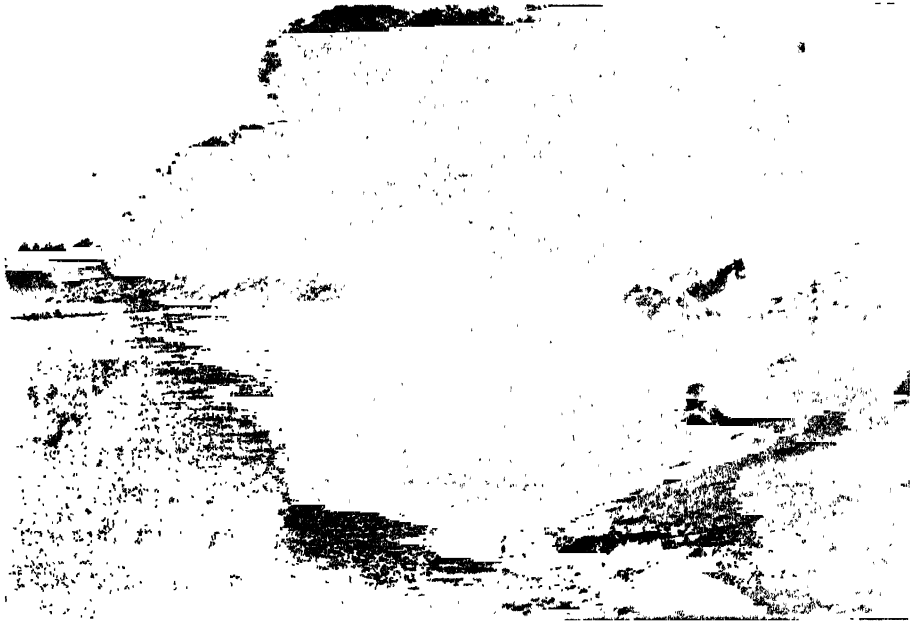
হৃষীকেশ- স্নানের ঘাট

এ কথায় মন যেন সাড়া দেয় না। যে রাজাধিরাজের নামে জয়ঘোষণা চলিতেছে, মহান্তও যে তাঁহারই একজন দাসমাত্র, একথা তিনিও যে তাঁহার চিহ্নিত বস্ত্রে ও মুণ্ডিত মস্তকে প্রমাণ দিতেছেন। সেই রাজরাজের নিজস্ব সৈনিক-বর্গেরই যে এ অভিযান এবং তাঁহার নামেই যে ইঁহাদের এই অভিমানের অভিনয়। নিজস্ব বলিতে ঐ কৌপীন ভিন্ন তাঁহাদের ত অন্যকিছুই নাই। প্রায় সকল দলেরই শেষে এক একদল ন্যাংগা সন্ন্যাসী চলিতেছেন। নির্ব্বাণী-আখ্যা-ধারী তাঁহারা কাষ্ঠ-ধাতু-তৃণ বা চীরখণ্ড—কিছুরই কৌপীন দর্শকদের সেই পথে যাত্রার এবং সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিরই একটু আভাস দিতেছিল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল, ধূসর চড়ার বক্ষে আর দৃষ্টি চলে না। তখনও স্রোত অটুটভাবে যাইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা; চড়ার বক্ষে অত্যুজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক্ আলোকমালা এককালে সর্ব্বস্থানে জ্বলিয়া উঠিল। দর্শকেরা তখন সুগভীর কৃতজ্ঞকৃতার্থতার সহিত অগণ্যতারকোজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া প্রণত হইল। যাহার জীবনে এমন দিন আরও একবার আসিয়াছিল, নয় বৎসর পূর্ব্বে সেই এলাহাবাদ

কুম্ভের কথা স্মরণ করিয়া, সে আজ যেন অধিকতর কৃতার্থতা বোধ করিতেছিল।

হৃষীকেশে 'ভরত'ই প্রধান দর্শনীয় দেবতা হইলেও—এ দেশের সর্ব্বত্র গঙ্গাই মুখ্যাতীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ঋষিকুণ্ডে'র উপরে—রামচন্দ্র এবং 'লছমন ঝোলা'র পথে লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, ভরতের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রাচীন। শ্রীসমৃদ্ধি বলিতেও যাহা কিছু, তাহা ইঁহারই অঙ্গে এবং মন্দিরে দৃষ্ট হইল। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণমূর্ত্তির 'ভরত' নাম শুনিয়া, একজন অপরকে এ বিষয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিতেছিলেন। একটি গীতা পাঠরত পণ্ডিতের কর্ণে সে কথাটি বোধ হয়, প্রবেশ করায় তিনি সহসা আপনা হইতেই উত্তর দিলেন, "লোকান্ বিভর্ত্তি যঃ সঃ ভরতঃ";—তাঁহার এই অযাচিত উত্তরে দলের সকলে কৃতজ্ঞভাবে মস্তক নোয়াইলেন।

হরিদ্বারের গঙ্গা অপেক্ষা হৃষিকেশের গঙ্গার প্রসারতা কিছু অধিক। হৃষিকেশ সহরের বহির্ভাগে, জনহীন বালুকা সৈকতে চন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দিরটিও একটি দ্রষ্টব্য-স্থান। হিমালয় মূলস্থা জহ্নবীকে সেই শিবসন্নিকটবাসী সাধুরা সেখানে 'চন্দ্রভাগা' নাম দিয়াছেন। তাঁহার অপরপারে ঝোপের মধ্যে মধ্যে কত কুটীর অৰ্দ্ধলুক্কায়িত দেহে তাহাদের অধিবাসী মহাত্মাগণের আভাস নীরবে জানাইতে-ছিল। সেইখানে দুইটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী দেখিয়া সকলে যতখানি চমকিত, ততখানি আনন্দিতও হইয়াছিলাম। সন্ন্যাসিনী দুইটিরই পরিধানে মলিন গৈরিকবস্ত্র; একজনের হস্তে কোন কিছুই নাই, অপরের এক এক গাছি 'কড়'মাত্র রহিয়াছে;—কক্ষে কলসী লইয়া, উভয়েই জলাহরণে আসিয়াছিলেন। অনেকগুলি কণ্ঠের যুগপৎ নানাপ্রশ্নে, তাঁহারা যেন বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সামান্য দু'-একটি কথার মাত্র উত্তর দিয়া, তাঁহারা জল লইয়া চলিয়া গেলে, সেখানের একজন সাধু গল্প করিলেন যে, উঁহারা ৭।৮জন বাঙালীস্ত্রী-পুরুষে ক্ষুদ্র একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া, হৃষীকেশের একপ্রান্তে অদ্য ৮।১০ বৎসর তপশ্চর্য্যা করিতে-ছেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে একব্যক্তি সদারাপত্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া আছেন। কুম্ভমেলায় আসিয়া, বাঙ্গালী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর নাম আমরা এই প্রথম শুনিলাম; তাই, সকলেরই সেইদিকে যাইবার প্রবল ঝোঁক উঠিল। তখন সূর্য্য প্রায় অস্তমিত; তথাপি সেই বালু ও শিলারাশি ভাঙ্গিয়া কণ্টক-বিক্ষত পদে হৃষিকেশের বাহির পথ ধরিয়া, সকলে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের উপনিবেশ দেখিতে ছুটিলাম।

স্থানটি নদীর বালুকাময় ভাঙ্গনের খানিকটা উচ্চে অবস্থিত। নিকটে লোকের বাস নাই। হিংস্র পশুর আক্রমণ রক্ষার্থে অথবা আশ্রমপালিত ফুলফলের চারাগাছগুলির রক্ষার্থে আশ্রমটুকুর চারিদিকে কণ্টকের বেড়া দেওয়া রহিয়াছে। মধ্যের ঘনতৃণাচ্ছন্ন জমীটুকুতে তিনখানি কুটীর। সম্মুখে গিরিমুখাভিগামী বদরীনারায়ণের পথটি প্রত্যহ প্রত্যুষে অনন্তাভিমুখযাত্রীর আনন্দকলরোলের মত ধ্বনিতেই স্পন্দিত হইতে থাকে। পার্শ্বে হিমালয়ের অনন্ত-দেহের উদাত্ত গম্ভীরদৃশ্য, সেই আশ্রমবাসী কয়টিকে অহরহঃ যেন জলস্থল-অন্তরীক্ষব্যাপী এক 'মহতো মহীয়ান' বিরাট্ সত্তার নিঃশব্দ-ইঙ্গিত জানাইতেছে। সে দৃশ্যও বুঝি না দেখিলে, বুঝিবার নয়। উদাসীন কয়টিকেও স্থানের যোগ্যব্যক্তি বলিয়াই মনে হইল। সেই গম্ভীর, অথচ 'শান্তি রসাস্পদ' স্থানের মত, তাঁহারাও গম্ভীর ও শান্তকান্তি। যিনি সস্ত্রীক ধর্ম্মা-চরণ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ১৬।১৭ বৎসরের এক কুমারী কন্যা এবং যুবক পুত্র আছেন। মেয়েটির ক্ষীণশরীরে ও কর্ত্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশে, তাহাকে একটি ১৩।১৪ বৎসরের ক্ষীণকান্তি বালকভিন্ন কিছুই মনে হয় না। মাতাটি যেন তদপেক্ষা কিছু অধিক বয়স্ক বালক; মাতা ও কন্যায় এইমাত্র প্রভেদ। সকলেই গৈরিকধারী। পিতাটির নির্ব্বাক্-নিস্তব্ধ দীর্ঘক্ষীণমূর্ত্তি দর্শকদের মনে যেন একটা শান্ত-বিষাদের অজ্ঞাত আভাষই আনিয়া দিতেছিল। যেন মনে হইতেছিল, ইঁহারা বুঝি সংসারে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন; কিন্তু সার্থক সে কষ্ট, যাহা শেষে এমন পথ দেখাইয়া দেয়। ইঁহারা কেহই বড় বশী কথা কহিলেন না; কেবল একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধসন্ন্যাসীই সকলকে মধুর-ভাষায় আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গী একটি অৰ্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তি; তাঁহারা দুইজনে একখানি কুটীরে থাকেন, অন্য একখানিতে সেই গৃহস্থসন্ন্যাসীটি সপরিবারে, বাকীটিতে অপর এক সন্ন্যাসিনী বাস করেন। এই ৭জন মাত্র তাঁহাদের লোক-সংখ্যা। তাঁহাদের আহারের জন্য কিরূপ চেষ্টা পাইতে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, সেখানের 'ধরমশালা' হইতে তাঁহারা প্রত্যহ প্রত্যেকে ৩।৪ খানি রুটী ও ডাল পান,

তাহাতেই তাঁহাদের বিনা আয়াসে আহার সমাধা হইয়া থাকে। সে দেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা যেকেহ ইচ্ছা করিলে এইরূপ আহার পাইতে পারেন। পুরাণ-কীর্ত্তিত দানশীল প্রাতঃস্মরণীয় রাজগণের সহিত এদেশের মাড়োয়ারীদিগের কীর্ত্তির তুলনা দেওয়া চলে। হরিদ্বার ও বদরীযাত্রীদিগের জন্য তাঁহাদের অর্থব্যয় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হরিদ্বারের "সুরজমল ঝুঁনঝুনওয়ালা" এবং হৃষিকেশের "বাবা কালি-কম্লীর ধরম শালা" * এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড। হরিদ্বারের এই মেলার অনেকস্থানেই "সেবাশ্রম", "সেবা সমিতি" প্র্যাকার্ডসংযুক্তগৃহ-তাম্বু বা আড্ডা দেখা গিয়াছিল বটে; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্তকার্য্য করিতে বোধ হয়। মাড়োয়ারী সেবক-সমিতিরাই অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের অর্থবল, লোকবল এবং হৃদয়ের বলও, বোধ হয়, ভারতের সকল জাতিকে ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। এইখানে আর একটিদিনের কথাও মনে পড়িল— যেখানে 'কৈলাস'-নামে একটি অনতি-উচ্চ পার্ব্বত্যস্তূপের উপরস্থ আশ্রমে শ্বেতপ্রস্তর গঠিত বিশালদেহ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এবং 'কৈলাসেশ্বর' শিব পূজিত হইতেছেন,

হৃষীকেশ ভরতজীর মন্দির

সেই পুরাণ-বর্ণিত "—আকাশগঙ্গা-সলিল-তরঙ্গ গণনাদিতে, ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত-বেদধ্বনি সুনাদিতে" কৈলাস ধামের প্রতিচ্ছবি ধরিয়া যে আশ্রম হিমালয়তলে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার কিছুদূরে, লছমন ঝোলার পথের এক বৃক্ষচ্ছায়াশূন্য বালিকঙ্কর ও কণ্টকপূর্ণ ক্রমোচ্চ অধিত্যকায় একজন বিশালদেহা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইতেছিল। সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রতপ্ত বালুকাভূমি হইতে অবসন্ন, মললুণ্ঠিত দেহটিকে একটু ছায়ায় স্থাপনের চেষ্টায়, পথিককয়টি অনতিদূরস্থ কুটিরবাসী জনৈক সন্ন্যাসীর সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াও বিফল হইল। অবশ্য সে মৃত্যুন্মুখী নারীটির আর তাহার প্রয়োজনও ছিল না; একটু পানীয় এবং দেহসন্ধিগুলি সরলভাবে স্থাপনের জন্যই যেন তাহার প্রাণটি তখনও দেহপিঞ্জরের মধ্যে আছ্‌ড়া-পিছ্‌ড়ি করিতেছিল। সেইটুকুমাত্র পাইয়াই তাহার আত্মাটি নিজগন্তব্যপথে যাত্রা করিল। রৌদ্রতাপ-নিবারণার্থ তাহার মুখের উপর কাপড় ভিজাইয়া দেওয়া, বা ছায়ায় লইয়া যাইবার জন্য যে ছুটাছুটি, সবই তখন বৃথা হইয়া গেল; কিন্তু, তথাপি, সেই উদাসীনটির ব্যবহারে মাড়োয়ারী সেবক-সমিতির কথা স্বতঃই মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যদি অদূরে কৈলাস না হইয়া, সেই সাধারণ (?) মানবগণের আড্ডা হইত, তাহা হইলে এই প্রাণীটিকে, হয়ত, এমনভাবে পড়িয়া মরিতে হইত না।
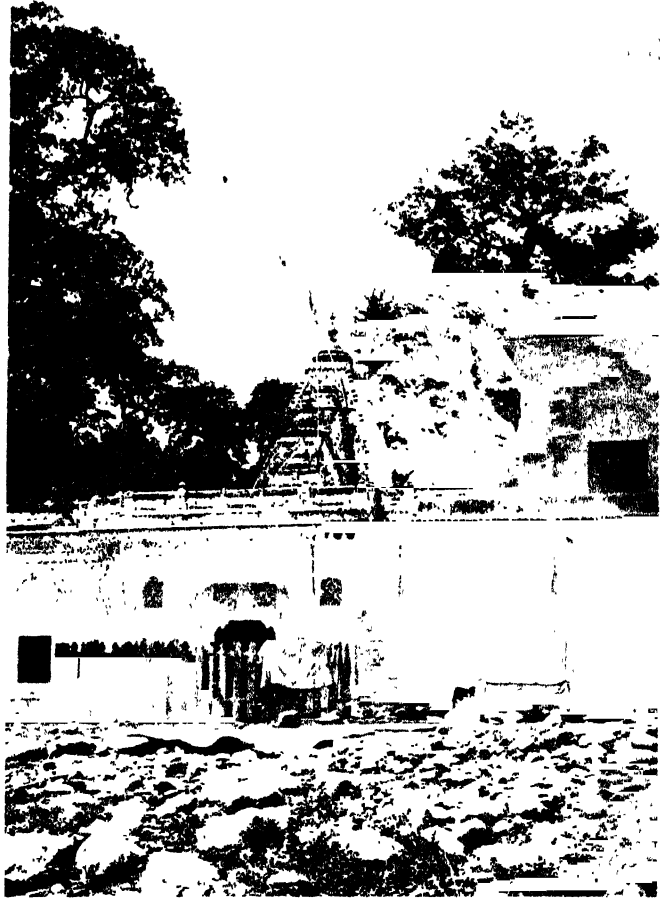
* হৃষীকেশ ও ৺বদরীনাথের ৺কালি-কমলির ধরম-শালার বিবরণ বহুপুস্তকে এবং কাগজে লিপিবদ্ধ দেখা গিয়াছে; সেজন্য তাহারও পুনরুক্তি প্রয়োজন বোধ হইল না।

এ অন্যায়নিন্দায় হয় ত নিজেই কলুষিত হইতেছি। যাঁহারা সেস্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের এ নিন্দা-সুখ্যাতির গণ্ডী এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অভিমানের বহু-উচ্চে পৌঁছিয়াছেন। মানবের জীবন ও মৃত্যু, তাহার ক্ষণধ্বংস সুখ ও দুঃখ, যন্ত্রণা ও তাহার তুচ্ছ উপশম, এই সমস্ত বিরোধী অবস্থার মধ্যে তাঁহারা আমাদের মত বিচলিত হন না। নিজের বিষয়ে এবং অপরের পক্ষে, উভয়তঃই বোধ হয়, তাঁহারা এই নীতির অনুসরণ করেন। যে তখনই সর্ব্বাবস্থা হইতে মুক্ত হইতেছে, মানবের সামান্যচেষ্টায় তাহার পক্ষে যে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, ইহা বুঝিয়াই তাঁহারা নিশ্চেষ্ট—নিষ্ক্রিয় রহিলেন।

লছমণঝোলা

সেই লছমন ঝোলার পথে পর্ব্বতগাত্রে সারি সারি কত কুটিরই দেখা গেল। যেখানে পার্ব্বত্য পথের একটি উচ্চচড়াই, যাহার নিম্নে "সূর্য্যাকরপ্রতাপ-রহিত তাল তমাল শাল-সরল ব্যালোলবল্লীলতাচ্ছন্ন" উপত্যকায় "মদনমথন মৌলী"র "জীবন চাঞ্চল্যময়ী" "মালতী-পুষ্পমালা" গাছটি গিরিরাজগুহা-বিদারী নির্ঘোষে ও ঝঙ্কারে পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়া, এবং সফেনতরঙ্গে শত-শত শ্বেত-পদ্মমালা গ্রথিত ও মুহূর্ত্তে ছিন্নভিন্ন করিয়া, ক্রমনিম্নগতিতে ছুটিতেছেন—তাহার অপর পারে, স্তরবিন্যস্ত শিলারাজি ও শ্বেতবালুকাময় সৈকতের পর, হরিদ্‌বনানীদের মধ্যে, মাড়োয়ারী দিগের নবকীর্ত্তি—শ্বেতগাত্র পঞ্চশত আশ্রমকুটির শোভা পাইতেছে। সেই "স্বর্গাশ্রমের" অধিবাসীদের সম্মুখে, শুভ্রবর্ণা তুষার-শীতলা ভাগীরথীর মাতৃক্রোড় এবং মস্তকের উপরে, স্নেহশীল দাদামহাশয়ের আশীর্ব্বাদোত্থিত দৃঢ়বাহু তাঁহাদের জাগতিক সুখ দুঃখ, সংযোগবিয়োগ, ভাব-অভাবের হস্ত হইতে সম্পূর্ণই মুক্ত রাখিয়াছে। হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ ছাড়াইয়াও ঊর্দ্ধতমলোকে তাঁহাদের লক্ষ্যকে স্থির রাখিবার জন্যই যেন দাদামহাশয়ের সদাসম্বদ্ধ সঙ্কেতবাণী অম্বরে অটলোন্নতভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার পদ-গলিত চলদম্বুধারা, কোথাও মৃদু ও কোথাও উদাত্ত ধ্বনিতে, এই কথাই গাহিয়া চলিয়াছে। মহান্ হইতে সৃষ্টি হইয়া মহতের সহিত সম্মিলন, অসীম হইতে সীমার মধ্য দিয়া বহিয়া পুনর্ব্বার সেই অসীমে আত্ম-সমাধান, পিতাপুত্রী সে দেশে কেবল সেই কথাই সঙ্কেতে জানাইয়া থাকেন। সেই ঈষদ্ দোলায়মান লৌহসেতুপার হইয়া, মাতার স্নিগ্ধবক্ষ আশ্রয় করিয়া, আমরা আমাদের দাদামহাশয়ের পদতলে পুনর্ব্বার মস্তক লুণ্ঠিত করিলাম।

ভাই ভাই

[শ্রীসুনীতি দেবী]

(১)

মাতৃহীন বালক রাধাচরণ পিতার বড় আদরের ছিল। জ্যেষ্ঠ-পুত্র হরিচরণের পর যেকয়টি পুত্রকন্যা হইয়াছিল, নিষ্ঠুর যম তাহাদের সকলকেই পিতামাতার কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল ; তাই শেষবয়সের এই সন্তানটিকে বুকে জড়াইয়া বৃদ্ধ গোবিন্দচরণ একটু শান্তিলাভের আশা করিতেছিলেন ; এমন সময় স্বামীপুত্রের মায়া কাটাইয়া গোবিন্দচরণের পত্নী ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। বাড়ীতে সুগৃহিণী না থাকিলে বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী ফোটে না বলিয়া গোবিন্দচরণ হরিচরণের বিবাহ দিলেন। বধূ কাত্যায়নীর উপর সংসারের সকল ভার পড়াতে, সে অল্প-বয়সেই গৃহিণীপণায় সুদক্ষ হইয়া উঠিল। নিজে ছেলে-মানুষ হইলেও শিশুরাধাচরণকে সে মাতৃস্নেহে পালন করিতে লাগিল। রাধাচরণ পিতা ও বৌঠাকুরাণীর অত্যধিক আদরে লালিত হইয়া সবে দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে, সেই সময় গোবিন্দচরণের মৃত্যু হইল। জমিজমা ও সংসারের খরচপত্রের হিসাব লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া হরিচরণ এতদিন ছোট-ভাইটির দিকে তাকাইবার অবকাশ পান নাই। মৃত্যুকালে গোবিন্দচরণ তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, রাধুকে তুমি মানুষ ক'রো। বৌমা ত তাকে যথেষ্ট ভাল-বাসেন ; তুমিও তাকে দেখো, যেন সে মানুষ হয়।" সেই দিন হইতে হরিচরণ ছোট-ভাইয়ের সকলপ্রকার শিক্ষার ভার নিজহাতে তুলিয়া লইলেন।

হরিচরণ নিজে বিশেষ কিছু লেখাপড়া শিখেন নাই। তাঁহার সাধ হইল, রাধাচরণকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া দশজনের মধ্যে একজন করিতে হইবে। নীতি-শিক্ষার দিকেও হরিচরণের একটু অতিরিক্ত দৃষ্টি ছিল। খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদে যোগ দিলে ছোটছেলে বিগ্‌ড়াইয়া যায়, তাঁহার এই ধারণা ছিল। তাছাড়া খেলা করিয়া বেড়াইলে পড়াশুনা কেমন করিয়া হইবে ? যেমন করিয়া হউক, রাধাচরণকে মানুষেরমত মানুষ করিয়া তুলিতেই হইবে, এই প্রতিজ্ঞা হরিচরণকে কঠিন করিয়া তুলিল। রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠনিরত বালকের ম্লানমুখ দেখিয়া এক এক সময় তাঁহার কষ্ট হইত বটে ; কিন্তু তখনই তিনি মনে করিতেন, "যদি আল্‌গা দিই, তবে ছেলেটার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হইবে। এখন বরং একটু কষ্ট করুক, শেষে ওরই ত ভাল হইবে।"

এত শাসনের ফলেও রাধাচরণের লেখাপড়ায় বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। দাদার বকুনির ভয়ে সে যখন পাঠ্যপুস্তকের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিত, তখন তাহার মন মাঠময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তাহার চক্ষের সামনে অক্ষরগুলি চীনভাষার বর্ণমালা, অথবা গোলকধাঁধার ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হইত। হরিচরণ স্কুলের মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন যে, রাধুর মোটেই লেখাপড়া হইতেছে না। এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিয়াও যখন তাহার কিছু হইল না, তখন হরিচরণ রাধুর বুদ্ধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেন। তথাপি তিনি হাল ছাড়িলেন না। ঘসিতে ঘসিতে একদিন যে মরিচা পরিষ্কার হইয়া রাধুর বুদ্ধি তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণধার হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? এবার রাধুর সকাল-বিকাল খেলা করাও বন্ধ হইল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একটু অবসর পাইয়া রাধু রান্না-ঘরে বৌঠাকুরাণীর অঞ্চলের আশ্রয়ে স্থান খুঁজিতে গেল। সেইসময় হরিচরণ কি কাজে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া রাধুকে দেখিতে পাইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন, "রান্নাঘরে কি কর্‌ছিস ? রাঁধুনীবামুন হবি বুঝি ? তাই পড়া ছেড়ে রান্না শিখ্‌তে এসেছিস্ ?" কাত্যায়নী বলিলেন, "আহা, বাছা সেই সকালথেকেই ত পড়্‌ছে। একটু আমার কাছে এসেছে তা কি হয়েছে।" হরিচরণ বলিলেন, "ওটুকু পড়াতে কি হবে ? হাকিম-মাজিষ্ট্রেট হ'তে গেলে

আরও পড়্‌তে হয়। ওর ত আমাদের মত চাষা বামুন হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না—দুপয়সা রোজগার ক'রে খেতে হবে।" রাধু ধীরে ধীরে গিয়া পড়িতে বসিল এবং যে লোক প্রথমে লেখাপড়া আবিষ্কার করিয়াছিল, মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

রাধুর মাজিষ্ট্রেট হওয়ার কথাটা কেমন করিয়া, কি জানি, গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাস্তায়, ঘাটে রাধুর বন্ধুরা তাহাকে দেখিলেই তাহাকে খেপায়,"ওরে, মাজেষ্টার সাহেব-আস্‌ছে রে। আমাদের কবে শেষে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবে।" রাধু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রে শুইবার সময় বৌঠাকুরাণীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদকাঁদস্বরে রাধু বলিল,"বৌঠাক্‌রুণ, দাদাকে বলো, আমি মাজেষ্টার হব না। আমি দাদার মতন থাক্‌ব।" কাত্যায়নী তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি জান ভাই, আমি মেয়ে মানুষ, আমার কথায় ত আর হবে না।"

ইহার উপর রাধুর কপালে আর এক গ্রহ আসিয়া জুটিল। কাত্যায়নীর পিতামাতা কেহ ছিল না; তাই তাহার ছোট ভগিনী সিদ্ধেশ্বরী মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতেছিল। একদিন তিনি লোকমুখে সংবাদ পাইলেন যে, সে সেখানে বড় কষ্টে আছে। তিনি হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"সিধুকে যদি আমাদের কাছে এনে রাখি, তবে কি কোন অসুবিধা হবে? মেয়েটা শুন্‌লাম সেখানে বড় কষ্টে আছে।" হরিচরণ বলিলেন—"তোমার মামার আপত্তি না থাক্‌লে নিয়ে এসো। তাঁদের চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করা যাক্‌।" পত্রের উত্তরে কাত্যায়নীর মামা জানাইলেন যে, সিদ্ধেশ্বরীকে পাঠাইয়া দিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। ভাবে বোধ হইল, যত শীঘ্র পাঠান যায় ততই সুবিধা। হরিচরণ নিজে গিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে লইয়া আসিলেন।

কাত্যায়নী সন্ধ্যার সময় রাধুকে বলিলেন, "সিধু ছেলে-মানুষ, সে ত একলা শুতে পারবে না, আমার কাছে শোবে। তুমি আমার পাশের খাটে থেকো, কেমন?" তাহার মামুলি-অধিকারে আর একজন হস্তক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া রাধু জ্বলিয়া গেল। সে রাগিয়া বলিল, "তা কক্ষনো হবে না।" হরিচরণ শুনিতে পাইয়া তাহাকে বকিয়া বলিলেন, "বুড়োধাড়ী ছেলে, একলা শুতে পার না? পুরুষমানুষ পুরুষমানুষের মত হবে।" রাধু অভিমানে চোখ মুছিল। সিধু দশবছরের মেয়ে কিরূপে ছেলেমানুষ হইল, আর তার চেয়ে মোটে দুবছরের বড় হইয়া সে কেমন করিয়া বুড়োধাড়ী হইল, তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইল না। হরিচরণ সেখান হইতে সরিয়া গেলে কাত্যায়নী সিধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিধু, তুই একলা শুতে পারবি?" সিধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা পারব। সেখানে ত কারো কাছে শুতাম না।" তখন কাত্যায়নী রাধুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুই ভাই, আমার কাছেই থাকিস্‌। তোকে একলা শুতে হবে না।" রাধু বিষম অভিমানী; প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "দরকার নাই। তুমি তোমার বোনকে নিয়ে থাক। তুমি কথা না তুল্‌লে ত দাদা জান্‌তে পারত না। এখন দাদা ধারণ করে গেছে কি না, তাই ভারি সোহাগ দেখাচ্ছ। দাদার কথা না শুনলে আমারই হাড় গুঁড়ো হবে। তোমার কি?" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। তার সবচেয়ে রাগ হইল সিদ্ধেশ্বরীর উপর; সে না আসিলে ত আর এত কাণ্ড হইত না।

(২)

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। পড়াশুনায় রাধুর দিনদিনই অবনতি হইতে লাগিল। হরিচরণের নীতিশিক্ষার ফলে রাধু তাঁহাকে যমের মত ভয় করিতে শিখিল। ভালমন্দ সকল কাজই সে তাঁহাকে লুকাইয়া করিত। সমস্ত কথাতেই শাসন; তাই বেচারা সব সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, কোন্‌ কাজটা ভাল, আর কোনটা সত্যই মন্দ।

পাড়ায় একদিন কেনারাম বিশ্বাস একটা ম্যাজিক-লণ্ঠন আনিয়া সকলকে তামাসা দেখাইতে লাগিল। রাধুর ইচ্ছা হইল, সে নিজে একটি কিনিয়া মজা করিবে। বৌঠাকুরাণীর কাছে গিয়া বলিল, "বৌঠাক্‌রুণ, পাঁচটা টাকা আমায় যদি দাও, তবে আমি তোমাদের এক আশ্চর্য্য জিনিস দেখাব।" তারপর সবিস্তারে ম্যাজিক-লণ্ঠনের আকৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে লাগিল। কাত্যায়নী বলিলেন, "তোমার দাদা ওসব ভালবাসেন না জানই ত; ও টাকা দেবেন না, বোধ হয়।" রাধু জাঁক করিয়া ছেলেদের বলিয়াছিল, সে একটা কিনিবেই। তাই সে কাত্যায়নীর কাছে জেদ ধরিয়া বসিল, "সবে পাঁচ টাকা বৌঠাকুরুণ, তুমি

চাইলে দাদা ঠিক দেবেন। কেনারাম বলেছে, তাকে টাকা দিলেই সে কল্‌কাতা থেকে আনিয়ে দেবে।" কাত্যায়নী নিরুপায় হইয়া হরিচরণকে বলিলেন; হরিচরণ রাগ করিয়া রাধুকে এক চড় মারিয়া বলিলেন, "যত রকম ব'য়ে যাবার চেষ্টা, না ?" রাধু মুখ হাঁড়ি করিয়া রোয়াকের উপর বসিয়া আছে, এমন সময় কেনারাম ও অন্য ছেলেরা সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে রাধু বাবু ? দাদা টাকা দিলেন না বুঝি ?" আর একটা ছেলে বলিল "তুমিও যেমন! ম্যাজেষ্টার-সাহেবের টাকার ভাবনা কি ?" এই উপহাসে রাধুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। দাদার জন্যই ত এত অপমান! যেমন করিয়া হউক, দাদাকে এবার সে জব্দ করিবেই, ঠিক করিল।

পরদিন সকালে হরিচরণ ব্যস্তভাবে আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগো, আমার চাদরের খুঁটে দশটা টাকা বাধা ছিল, নিয়েছ ?" কাত্যায়নী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "না আমি ত টাকা দেখিনি!" হরিচরণ বলিলেন "চাটুর্য্যে মশায় দশটাকা ধার নিয়েছিলেন, কাল সন্ধ্যাবেলা দিয়ে গেলেন, আমি বাক্সে তুল্‌তে ভুলে গিয়েছি। কে নিল, তাও ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।" কে নিয়েছে, তাহা সিদ্ধেশ্বরীর বেশ জানা ছিল। সে রাধুকে টাকা লইয়া বই-খাতার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিতে দেখিয়াছিল। হরিচরণের সাম্‌নে হয় ত সেকথা বলিত না। সে ঠিক করিয়াছিল, চুপিচুপি দিদিকে বলিবে; দিদি যা হয় ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে রাধু তাহাকে রাগাইয়া দিয়াছিল। সিধুর বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠাতে, ও-পাড়ার বামা-পিসিমা কাত্যায়নীকে বলিতেছিলেন "তোমার বোনের অমন রাজলক্ষ্মীর মত রূপ,—খুব ভাল ঘরেই বিয়ে হবে, সেজন্য ভাবনা করো না।" রাধু তখন টাকা জোগাড় করিয়া উৎফুল্ল হইয়া সেখান দিয়া যাইতেছিল; শুনিতে পাইয়া বলিল "ইস্, মেয়ে একেবারে রূপের অহঙ্কারেই গেলেন; কক্‌খনো বাঁদরীর বিয়ে হবে না—যা ঝগড়াটে।" সকলের সাম্‌নে অপমানটা সিধুর বড় লাগিয়াছিল। সেই রাগে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়াই সে বলিয়া ফেলিল "রাধুদাকে আমি টাকা নিতে দেখেছি।" হরিচরণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া রাধুর সন্ধানে চলিলেন। রাধু তখন কেনারামকে টাকা দিয়া খুব বাহাদুরী ফলাইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। হরিচরণ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "হতভাগা, টাকা কি করেছিস্।" রাধু বুঝিল যেমন করিয়া হোক্, সব ফেঁসে গিয়েছে। সে সাহসে ভর করিয়া বলিল "ম্যাজিক্ লণ্ঠন কিন্‌তে দিয়েছি।" তারপর হরিচরণ তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া ভিতরে লইয়া আসিলেন। একখানা কাঠ সাম্‌নে পড়িয়া ছিল; সেইটা দিয়াই বিষম প্রহার করিতে লাগিলেন। কাত্যায়নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ছেলেমানুষ একবার দোষ করেছে, তাই কি এত মার্‌তে হয়। ছেড়ে দাও গো, ছেড়ে দাও।" হরিচরণ বলিলেন "ছেলেমানুষ বলেই ত মার্‌ছি। যদি এতে কিছু শিক্ষা হয়। তা না হলে যে বড় হ'য়ে চুরি-ডাকাতি শিখ্‌বে।" মারের চোটে রাধু জ্ঞানহারা হইয়া বলিল "চুরি কোথায় কর্‌লুম, বাবা বুঝি এসব একা তোমাকেই দিয়ে গেছেন ? তুমিই আমার ভাগ চুরি ক'রে খাচ্ছ, চাইলে একটা পয়সাও দেও না।" হরিচরণের হস্ত হইতে কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া গেল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "তোমার বুদ্ধি এতদূর পেকেছে, জান্‌তাম না। তোমার ভালর জন্যই এত করছি।" এই বলিয়া হরিচরণ রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাধুর পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল; সে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কাত্যায়নী কি করিবেন, বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সিধু দেখিল রাগের মাথায় কথাটা হরিচরণের মত লোককে বলিয়া দেওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল "রাধুদা, কেঁদোনা, ওঠো।" রাধু মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। কাত্যায়নী তাহার নিকট আসিয়া বসিলেন। হাত ধরিতেই সে জোরে হাতছাড়াইয়া উঠিয়া গেল। কাত্যায়নী কত ডাকিলেন, সে শুনিল না।

দুপুরবেলা, ভাত খাইবার সময়ও রাধু আসিল না, দেখিয়া কাত্যায়নী হরিচরণকে বলিলেন "রাধু তখন যে চ'লে গেছে, আর আসেনি।" হরিচরণ বলিলেন "যাক্‌গে যেথানে খুসী।" সন্ধ্যার পরও যখন রাধু আসিল না, তখন হরিচরণ তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। কিন্তু সারা-গ্রাম খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। রাত্রি দ্বিপ্রহর-পর্য্যন্ত হরিচরণ লণ্ঠন হাতে করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, কাত্যায়নী

ও অনুতপ্তা সিধু তখনও পর্য্যন্ত জাগিয়া তাঁহার পথ-চাহিয়া বসিয়া আছে। হরিচরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তিনি কোন কথা না বলিয়া দাওয়ায় বসিয়া পড়িলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল; হরিচরণ কত স্থানে লোক পাঠাইলেন, কত স্থানে নিজে গেলেন; কিন্তু রাধুর কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না! কাত্যায়নী কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। হরিচরণ আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন; তাঁহার শরীরও ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

(৩)

রাধাচরণ স্থির করিয়াছিল রাঁধুনী বামুনগিরি করিয়া খাইবে, তথাপি দাদার অধীনে আর থাকিবে না। সে ভাবিল একবার কোনমতে কলিকাতায় যাইতে পারিলে তাহার আর কিছুই ভাবনা থাকিবে না। পথ চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া, একদিন রাস্তার ধারে পড়িয়া সে ঘুমাইতেছে, এমন সময় একখানা গরুরগাড়ি আর একটু হইলেই, তাহার উপর আসিয়া পড়িত। গাড়োয়ান তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাইয়া তাহাকে ডাকিল। সে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, গাড়ির মধ্যে একজন বাবু বসিয়া আছেন। পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলে মনে হয় বেশ বড়লোক। হঠাৎ তাহার মাথায় কি খেয়াল চাপিল; দৌড়িয়া তাঁহার নিকট গিয়া বলিল "বাবু, আপনার রাঁধুনি বামুন দরকার? আমাকে রাখবেন?" কথা শেষ হইতে না হইতেই সে পড়িয়া গেল; অনাহারে, পথশ্রমে শ্রান্তদেহে তাহার দাঁড়াইবার শক্তিও ছিল না। ভদ্রলোকটি তাহার এইরূপ অবস্থা ও পাগলের মত কথা শুনিয়া, গাড়ি থামাইয়া তাহাকে উঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া নাম ধাম জানিলেন। কেন বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, সে অনাথ, বাড়িতে তাহার কেহ নাই।

ভদ্রলোকটির নাম রামরতন চট্টোপাধ্যায়; তিনি কলিকাতায় ওকালতি করেন। নিজগ্রামে কিছু বিষয়আশয় আছে; তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে তিনি দেশে আসিয়াছিলেন। এই প্রিয়দর্শন বালকটির দুরবস্থা দেখিয়া তিনি দয়াপরবশ হইয়া; বলিলেন "আচ্ছা আমার সঙ্গে চল। রাঁধবার দরকার নাই; আমার বামুন আছে। কল্‌কাতায় গিয়ে তোমার যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। কি বল?" সেই হইতে সে কলিকাতায় রামরতন বাবুর বাড়িতে স্থান পাইল। একদিন কথায়-কথায় রামরতন বাবুর স্ত্রীকে নিজের কথা সব খুলিয়া বলিল। তিনি বলিলেন "মাগো! কেমন ধারা ভাই! মায়ের পেটের ভাইকে শেষে মেরে তাড়িয়ে দিলে!"

রামরতন বাবুর ছেলেদের পড়াশুনা করিতে দেখিয়া রাধাচরণেরও পড়ায় মন গেল। দাদার তাড়ায় যে পড়া বিষের মত লাগিত, এখন সেই পড়ার মধ্যেই যেন সে অমৃতের সন্ধান পাইল। রাধাচরণের বুদ্ধির অভাব ছিল না। যখন একবার পড়ায় মন গেল, তখন তাহাকে আঁটিয়া উঠে কাহার সাধ্য! রামরতন বাবুর ছেলেরা বলিল "বাবা, রাধাচরণের ভারি বুদ্ধি। ওকে স্কুলে দিলে হয় না?" রামরতন বাবু বলিলেন "ভালই ত।"

রাধাচরণ স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল। ক্লাসে কোন ছেলে তাহার সঙ্গে পড়ায় পারে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল দেখিয়া রামরতন বাবু তাহাকে কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন।

একদিন রামরতন বাবু স্ত্রীকে বলিলেন "দেখ, আমাদের শৈলর সঙ্গে রাধাচরণের বিয়ে দিলে কেমন হয়? মুখুয্যে বামুনের ছেলে; রূপগুণ ত স্বচক্ষেই দেখ্‌ছ।" রামরতন বাবুর পত্নী বলিলেন "ওমা, তাহলে ত ভালই হয়; শৈলও চিরদিন আমাদের কাছে থাকতে পায়!" ছেলেদের মত জিজ্ঞাসা করিয়া একদিন রামরতনবাবু রাধাচরণকে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। রাধাচরণ মাথা নীচু করিয়া থাকিল। রামরতন বাবু তাহার সম্মতি বুঝিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিলেন।

রাধাচরণ যেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেবার হরিচরণ তাহার খবর পাইয়াছিলেন; শুনিলেন, তাহার ভাই ধনীগৃহে পরমসুখে আছে, লেখাপড়া ভালই করিতেছে। বঝিলেন, সে তাঁহাদের চায় না; তাহা না হইলে এতদিন খোঁজখবর লইত। তাঁহাদেরই যেন তাহার ঠিকানা জানিবার উপায় ছিল না; সে ত একখানা চিঠি লিখিতে পারিত। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হরিচরণ নীরব রহিলেন। সে যদি সুখে থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট! বিবাহের সংবাদও হরিচরণের নিকট পৌছিল। কিছুদিন পরে তিনি সংবাদ পাইলেন রাধাচরণ ডেপুটি হইয়াছে। হরি-

চরণের কতদিনের সাধ আজ পূর্ণ হইল ; কিন্তু আজ তাহা লইয়া আনন্দ করিবার কিছুই ছিল না। হরিচরণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাত্যায়নীকে সংবাদ দিতে গেলেন।

কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেবার স্বদেশী-আন্দোলনে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছে। রামরতন বাবুর ছেলেরা ঠিক করিয়াছেন, ৩০এ আশ্বিন কোন একটা পল্লীগ্রামে গিয়া কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া আসিবেন। তাঁহারা আসিয়া রাধাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাদের সঙ্গে স্বদেশী-প্রচারে যাবে?" রাধাচরণ বলিল "বেশ ত, একবার তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আস্‌তে দোষ কি?"

সকালবেলা তাঁহারা একটা গ্রামে পৌছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ দেখে কে? তাঁহারা গান গাহিয়া গ্রাম মাতাইয়া তুলিলেন; "ভাই ভাই একঠাঁই" বলিয়া সকলের হাতে রাখীবন্ধন করিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। পথে তাঁহাদের দেখিয়া একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিল "বাবুরা ত পরের সঙ্গে ভাই ভাই বলে কোলাকুলি করছেন ওদিকে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে হয় ত লাঠালাঠি, মকদ্দমা, কত কি?" কথাটা রাধা-চরণের কাণে যাইতেই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কতদিন পরে আজ এই শ্যামল পল্লীতে আসিয়া আর একটি শস্যশ্যামল পল্লীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। হরি-চরণের কথাও মনে হইল। সত্যই ত নিজেরা 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই', আর পরকে 'ভাই ভাই একঠাঁই' বলিলে কি হইবে? তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল, এমন সময় অগ্রবর্ত্তী যুবকদল গান ধরিল—

"মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
　　ঘরের হয়ে পরের মত
　　　　ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।"

বাড়ি ফিরিয়া রাত্রে রাধাচরণের ঘুম হইল না। কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া কাণে বাজিতে লাগিল—"ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে"; সে একবার ভাবিল তাহার দাদারই দোষ; তিনি তাহাকে একটুও ভালবাসিতেন না। একদিনও ত মনে পড়ে না, যেদিন একটু আদর করিয়া কথা বলিয়া-ছিলেন। তখনই মনে পড়িল পিতার মৃত্যুর সময় তাহাকে কেমন করিয়া বুকে জড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, রাধুর জন্য ভেবো না; ওকে আমি কখনও ছাড়ব না।" সেদিন পিতৃশোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে যখন শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, হরিচরণ ভাবিয়াছিলেন সে ঘুমাইতেছে। তখন তাহার মাথার নিকট বসিয়া, কি গভীর স্নেহে তিনি তাহার ললাট চুম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মুখে আদর করিতে জানিতেন না; তাই বলিয়া কি ভালবাসিতেন না? রাধা-চরণের এখন মনে হইল, তাহারই অন্যায় হইয়াছে। হরিচরণের শিক্ষা দিবার প্রণালীতে ভুল ছিল বলিয়া, তিনি ত হৃদয়হীন নহেন।

পরদিনই রাধাচরণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, বাড়ির আর সে শ্রী নাই; বাড়িতে কেহ বাস করে বলিয়াও বোধ হয় না। তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, যদি কেহ বাড়িতে না থাকে। সে তখন অতি ধীরে ধীরে উঠানের শিউলি-গাছের কাছে আসিয়া ডাকিল, "দাদা!" কোন সাড়া পাইল না। আর একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "বৌঠাকরুণ"। কাত্যায়নী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাধাচরণ তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ, চিন্‌তে পারছ না?"

কাত্যায়নী আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাধাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথায়?" কাত্যায়নী বলিলেন, "তিনি ওপাড়ায় কি কাজে গেছেন, এখনই আসবেন। তোমার জন্যে ভেবে ভেবে তাঁর কি চেহারা হয়েছে যদি দেখ!" বলিতে বলিতে কাত্যায়নীর চোখে জল আসিল। রাধাচরণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঠিক সেই সময়ে হরিচরণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাধাচরণ তাঁহার পা জড়াইয়া বলিল, "দাদা, তোমার রাধুকে ক্ষমা কর।" রাধাচরণ বিস্ময়ের আবেগ কাটাইয়া উঠিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া বলিলেন, "রাধু, ভাই, তুইও আমায় ক্ষমা করিস; আমারও বড় ভুল হয়েছিল।"

যেদিন রাধাচরণ চলিয়া যায়, সেদিন কাহারও ঘুম হয় নাই; আর আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, আজও কাহারও ঘুম হইল না।

শিশুর আদর

[শ্রীমৃণালিনী সেন]

অনেক দিন আগে একখানি ইংরাজী মাসিক-পত্র পড়েছিলাম। সেখানির নাম 'রয়াল ম্যাগেজিন' (The Royal Magazine)। একজন লেখক—লেখিকা নয়—একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটার নাম 'Do Men Love Children Better'? অর্থাৎ 'পুরুষেরা কি শিশুদের অধিক ভালবাসে ?'—'অধিক'—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক (better than women do)। কেমন, এই ত অর্থ ?

আমি সেই সংবাদপত্রের উক্ত প্রবন্ধটি ছিঁড়ে রেখেছিলাম। তাতে অনেকগুলি ছবিও ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, যে প্রবন্ধে পুরুষজাতির সম্বন্ধে এমন একটা বড় সার্টিফিকেট রয়েছে, কোন সাহিত্য-রথ সেটাকে বাঙ্গালায় তরজমা ক'রে, অপত্যস্নেহ সম্বন্ধেও পুরুষজাতির প্রাধান্য স্থাপন করবেন; কারণ এমন প্রলোভন ত্যাগ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। কিন্তু এতদিনের মধ্যে যখন কাহারও দৃষ্টি সেই প্রবন্ধের উপর পড়ল না, তখন আমি স্ত্রীলোক হইয়াও তাঁহাদের শিশু-প্রীতির এই সার্টিফিকেটখানি, সায়-ছবি এখানে প্রকাশ করে দিচ্ছি। এই থেকেই সকলকে স্বীকার করতে হবে যে, পুরুষেরা আমাদের যতই নিন্দা করুন (অবশ্য সকলেই যে করেন, তা বল্‌ছি না) আমরা কিন্তু তাঁহাদের গুণেরই বিশেষ পক্ষপাতী—তা তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন!

সেই প্রবন্ধের মধ্যে,লেখক-মহাশয় একস্থলে বলেছেন—"Women, as a rule, only love their *own* little ones, men adore children indiscriminately, simply because they are children"—অস্যার্থ—"এটা একটা ধরাবাঁধা কথা যে, স্ত্রীলোকেরা কেবল তাহাদের পেটের ছেলেমেয়েদেরই ভালবাসে; আর পুরুষ মহাশয়েরা, কোন বাছবিচার না ক'রে, যার ছেলে মেয়ে হোক না কেন—ভালবাসেন; তাঁহারা ছেলেপিলেদের ভালবাসেন—যেহেতু তারা ছেলেপিলে।" কেমন? উপরের ইংরাজীটুকুর ইহাই ত অর্থ ?

আপনারা মনেও করবেন না যে, এই উক্তিটার সত্য-মিথ্যা নিয়ে আমি একটা তর্ক জুড়ে দেব। ষোল-আনা ইচ্ছা থাক্‌লেও, তা আমি করব না—আমার উদ্দেশ্য যে মোটেই তা নয়;—আমি যে পুরুষের গুণগানই করতে বসেছি—সন্তানের প্রতি স্নেহসম্বন্ধে যে তাঁরা কম নন, সেই কথাটাই বল্‌তে বসেছি;—তর্ক করতে যাব কেন?

প্রবন্ধ লেখকমহাশয় তাঁর প্রবন্ধে যেসকল কথা বলেছেন, তার আর অনুবাদ দিচ্ছি নে—যেটুকু দিয়েছি, তাই যথেষ্ট। তিনি যে ছবিগুলি ছাপিয়ে দিয়েছেন, এবং যাঁদের ছবি, তাঁদের সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়েছেন, তাহাই তুলিয়া দিতেছি। আসলকথা নিয়ে তক করবার ভার আমার অপেক্ষা যোগ্যতরা লেখিকাগণের উপর দেওয়া রইল।

ছবি দেখ্‌লে এবং সংক্ষেপ বর্ণনা শুনলেই, পাঠকপাঠিকাগণ বুঝতে পারবেন যে, ইংরেজ লেখক-মহাশয় সাধারণ গৃহস্থের ঘর থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন নাই; তিনি যাঁদের কথা বলেছেন, তাঁরা সম্রাট্, মহারাজা, রাজা, রাজমন্ত্রী, প্রধান সচীব প্রভৃতি;—সুতরাং তাঁর কথার জোর বেশী। সে কথা থাকুক, এখন সকলে ছবি দেখুন এবং পরিচয় গ্রহণ করুন - আমারও পুরুষজাতির স্তুতিগান শেষ হউক।

পরপৃষ্ঠার প্রথমে দক্ষিণ দিকের ছবি দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, যিনি দাঁড়িয়ে, তিনি আমাদের মহামহিম, সদাশয় ভারত-সম্রাট্ জর্জ্জ মহোদয়। তাঁহার পার্শ্বে যে বালিকা বসিয়া আছেন, তিনি সম্রাট্-দুহিতা—সম্রাট্‌মহোদয়ের একমাত্র কন্যা। মহামহিম সম্রাট্ মহোদয়, এমন একটা প্রকাণ্ড রাজ্যের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলেও, অবসর সময়টুকু সন্তানগণের সহিত আমোদ

জৰ্ম্মণ সম্রাট্‌ ও ভারত সম্রাট্‌
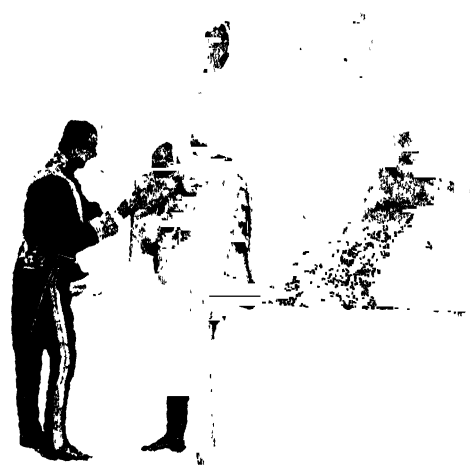
স্পেনের রাজা ও রুষ-সম্রাট্‌

আনন্দেই অতিবাহিত করেন এবং তিনি তাঁহার ঐ মেয়েটিকেই বড় ভালবাসেন; ইংরাজীতে আছে—'he is intensely proud of his only daughter' কি সুন্দর কথা! একটু ছোট মন্তব্যপ্রকাশের লোভসংবরণ করা অসাধ্য হইল—মহামহিম সম্রাট্‌মহোদয় কিন্তু মেয়েটিকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। এ স্থানে এ পক্ষেরই জিত!

এবারে ঐ চিত্রের বামদিকের যে ছবি দেখছেন, তার পরিচয় আর দিতে হবে না—গোফজোড়া দেখেই চিন্‌তে পারচেন যে, তিনি ইংলণ্ডের সুতরাং আমাদের, পরমশত্রু জৰ্ম্মণসম্রাট্‌—কাইজর! জৰ্ম্মণ সম্রাট্‌ যা করছেন তাতে তাঁকে এখন সকলেই একবাক্যে নর-দৈত্য ব্যতীত আর কোন নামে অভিহিত কর্‌বেন না। এই নরশোণিতপিপাসু জৰ্ম্মণ-সম্রাটের কঠিন হৃদয়ের এক কোণে সন্তানস্নেহ রয়েছে।—একটু সুবিধা পেলেই তাঁর ঐ দুইটি 'নাতি' এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে; আর তিনি হয় ত তখন ভুলে যান যে, একটু আগেই তাঁর নিষ্ঠুর আদেশ কত নাতি ঠাকুরদাদা-হারা হয়েছে!

এখন আর একজন সম্রাটের কথা। উপরে পার্শ্বে দক্ষিণ দিকে যাঁর ছবি তিনি রুষের সম্রাট্‌—জার (Tsar); আর তাঁর কোলে যিনি ব'সে আছেন, তিনি সম্রাট্‌-কুমার (Tsar-vitch)। এই কুমারটি একবার হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন; সে সময় সমস্ত রুষরাজ্যের সম্রাট্‌ এমন অধীর হইয়া পড়েন যে, তিনি রাজকার্য্য পর্য্যন্ত একেবারে ত্যাগ ক'রে দিনরাত ছেলে নিয়েই পড়ে থাক্‌তেন। প্রবন্ধ লেখক সম্রাটের কথাই বলিয়াছেন, সম্রাজ্ঞীর কথা বলেন নাই। এজন্য আমি তাঁকে দোষ দিচ্ছিনে, কারণ তিনি ত সে কথা বল্‌তে, বা সে ছবি দেখাতে বসেন নাই।

ঐ চিত্রের বামদিকে যাহার ছবি দেখিতেছেন, তিনি স্পেনের রাজা; আর তাঁর কোলে যিনি রয়েছেন, তিনি যুবরাজ অষ্টেরিয়াস্‌ (Prince of the Asturias)। এই ছেলে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন রাজার আর আনন্দের সীমা ছিল না। তারপর ছেলে যখন কয়েকমাসের হোল, তখন তিনি পাত্রমিত্র-সভাসদ্‌ অতিথি-অভ্যাগত—সকলকেই এই অমূল্যরত্ন দেখাতেন, আর আনন্দে তাঁর মুখখানি প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠত। তিনি যেখানে যেতেন, ছেলে তাঁর সঙ্গেই থাক্‌ত। একবার একটা ভারি তামাসা হয়েছিল। রাজা গিয়েছেন পেরীতে বেড়াইতে; রাজকুমার ও রাণীও সঙ্গেই আছেন। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ও সভাসদ্‌গণ প্রকাণ্ড একটা দরবার ক'রে রাজা ও রাণীকে অভ্যর্থনা করেন; রাজকুমার সেখানেও ঝির কোলে হাজির। রাজা সেই শিশুকে প্রেসিডেণ্ট এবং আমীর ওমরাহদিগের সহিত পরিচিত করিয়ে দিলেন, তাঁরাও সকলে রাজার এই অ[illegible] রত্নটিকে বেশ আদর করলেন, কোলে নিলেন। [illegible] শিশু ঝিয়ের কোলে গেল। রাজা-রাণী বিদায় গ্রহণ [illegible]

যে হোটেলে তাঁদের থাক্‌বার স্থান হয়েছিল, সেখানে চ'লে গেলেন; কিন্তু বিদায়-সমারোহের মধ্যে পুত্রের কথাটা আর মনে হয়নি। হোটেলে পৌঁছে মনে হোল ছেলেকে ত আনা হয় নাই। তখন ছুট মোটর—ছুট গাড়ী; রাজা একেবারে দ্বারের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই ঝি ও কুমারকে নিয়ে মোটর ফিরে এল—রাজাও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন—তাঁর মুখে হাসি দেখা দিল।

মিঃ গ্লাডষ্টোন

পার্শ্বের ঐ বুড়া আর কেহ নহেন, উনিই পরলোকগত মহামতি গ্লাডষ্টোন (Mr. Gladstone) প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের কথা সকলেই জানেন। আর তাঁর কোলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর আদরিণী নাতিনী মিস ডোরোথি ড্রু (Miss Dorothy Drew)। এই মেয়েটিই এখন মিসেস প্যারিশ্ (Mrs. Parish) এই নাতিনীটি মিঃ গ্লাডষ্টোনের একেবারে গলার মালা ছিলেন। রাজকার্য্য শেষ ক'রে এসে মহামন্ত্রী একেবারে নাতিনীর বুড়াঠাকুরদাদা হ'য়ে বসতেন; কখন বা তিনি ঘোড়া হতেন, আর নাতিনী 'হেট্ হেট্' ক'রে চাবুক হাঁকরাত। তখন, না জান্‌লে, কার সাধ্য বুঝতে পারে—ইনিই বৃটীশরাজ্যের মহামান্য বীর গ্লাডষ্টোন! মহামতি গ্লাডষ্টোনের জীবন-চরিতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

নিম্নে যাঁর ছবি দেখছেন, তিনি মাননীয় ডিউক অব গ্র্যাফ্‌টন্ (Duke of Grafton)। ইনি সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন; কিন্তু বাড়ীতে আসিলেই তাঁহার দুইটি নাতি কোলে চেপে বসত; তখন আর তিনি কোন কাজ করতে পারতেন না; গুরুতর কাজ উপস্থিত হ'লেও, তা বন্ধ থাকত। তিনি এক সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে, কখনও মোটর-গাড়ীতে চড়বেন না। বহুদিন তিনি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন; কিন্তু আশি বৎসর যখন তাঁর বয়স, তখন ঐ দুই নাতির পাল্লায় প'ড়ে তাঁকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে হয়েছিল।

ডিউক অব গ্রাফ্‌টন

আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। বামে একসঙ্গে তিনখানি ছবি দেখ্‌ছেন। তার মধ্যে সকলের উপরে যাঁহার ছবি দেখ্‌ছেন, উনি বিশ্ববিশ্রুত জেনারেল বুথ; আর উঁহার কোলে বসিয়া আছেন একটি নাতিনী এই নাতিনীটিকে জেনারেল বড়ই ভাল বাসেন; এই বালিকার কাছে জেনারেল সর্ব্বতোভাবে পরাজয় স্বীকার করেন।

তিন কৃতী পুরুষ

ঐ ছবির মাঝখানে একদিকে ব'সে আছেন মিঃ চেম্বার্লেন, আর একদিকে ব'সে আছেন, তাঁর পুত্র মিঃ অষ্টেন চেম্বার্লেন; আর পিতা ও পিতামহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন পৌত্র—মাষ্টার চেম্বার্লেন; তিন-পুরুষ একসঙ্গে। এই বালকটি পিতা ও পিতামহের নয়নের মণি; মন্ত্রণাসভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পিতাপুত্র উভয়েই একেবারে মাষ্টার চেম্বার্লেনের খেলার সাথী হইয়া যাইতেন; তখন আর কাহারও রাজকার্য্যের কথা মনে থাকিত না।

ঐ ছবির সকলের নীচে যিনি, উনিই মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড (Mr. Ramsay Macdonald)। উনি যে বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও জননায়ক, তাহা যাঁহারা ইংলণ্ডের খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন। সভায় মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মুখের কাছে কেহ অগ্রসর হ'তে পারেন না; কিন্তু উনিই আবার যখন ঘরে ফিরে আসেন, তখন ছেলেমেয়ে কেমন ওঁকে পেয়ে বসে, তা ছবিতেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন।—তখন আর সভাস্থলের সে মূর্ত্তি থাকে না; উনি একেবারে বালক হইয়া যান।

মিঃ সিম্‌স্

এইবার যাঁহার ছবি দেখিতেছেন, তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'রেফারি' (Referee) পত্রের সম্পাদক মিঃ সিমস্ (Mr. G. R. Sims); আর তাঁর কোলের কাছে যে সুন্দর মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছেন, উনি মিস্ মিন্‌টি ল্যাম্ব্ (Miss Minty Lamb)—মিঃ সিম্‌সের ভাইঝি। মিঃ সিম্‌স্ এই ভাইঝিটিকে এত ভালবাসেন যে, তিনি ঐ ভাইঝির সম্বন্ধে একখানি সুন্দর বই লিখিয়াছেন; সেই বইখানির নাম "Mustard and Cress."

ও-কথা শেষ হইল; এখন আমার কৈফিয়ৎ।—

আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, পুরুষজাতিকে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যেই আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি এবং এতক্ষণ বাক্যব্যয় করিলাম, তাহ'লে আপনাদের মহাভুল হ'য়েছে। আমার উদ্দেশ্য কি, জানেন? আমি দেখাতে চাই যে, 'যারা ধান ভানে, তাদেরও চুল বাঁধবার অবকাশ' হ'তে পারে। আমাদের দেশে যেসমস্ত মহারথী মহাকর্ম্মী, তাঁরা এই 'চুল বাঁধারও' অবকাশ পান না! তাঁরা কার্যাস্থল হইতে যখন ঘরে ফেরেন, তখনও কাজের-ভাবনাই মাথার মধ্যে নিয়ে, গম্ভীর পণ্ডিত—যাকে ইংরাজীতে বলে 'Solemn Owl', তাই—হ'য়ে আসেন। তখন, ছেলেপিলে তাঁদের কাছে ঘেঁস্‌তে সাহসই পায় না; আর তাঁরাও সেটা মোটেই ভালবাসেন না। ছেলে আছে—তার প্রসূতি আছেন—চাকর-বাকর আছে—ঝি আয়া আছে; ছেলেপুলে যেন তাদেরই! বাড়ীতে এসে যে ছোটছোট ছেলেপিলে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে হয়—ছেলেদের সঙ্গে একেবারে ছেলে বনে' যেতে হয়, এটা তাঁরা ভাবেনও না, অনেকে ভাবিতেই পারেন না! ছেলেপিলেরাও তাই, তফাতে-তফাতে থাকে, ভয়ে পিতা নামক জীবের নিকটস্থ হয় না। আর, তার ফল যে কি হয়, তা ঘরেঘরেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। আগে, যা হোক, বাড়ীতে বুড়ো ঠাকুরদাদা থাকতেন; ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াত; তাঁরাও নাতি-নাতিনীদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতেন। এখন ত, একদফা, বুড়োই কমে যাচ্ছে—পৌত্র-দৌহিত্রের মুখ দেখ্‌বার মত বয়স হবার আগেই তাঁরা হিসেব-নিকেশ করে চ'লে যাচ্ছেন; যদি বা দুদশজন পেন্সনপ্রাপ্ত জজ, মুন্সেফ, বড় চাকুরে ঠাকুরদাদা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাঁরাও, আর সেকেলে ঠাকুরদাদাদিগের মত চলেন না; তাঁরা, তাঁদের অর্শ, বহুমূত্র, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির, সেবা নিয়েই ব্যস্ত।—আর শরীর অমন হ'লে কি ঠাকুরদাদাগিরি করা চলে?

এখন ছোটছোট ছেলেমেয়েরা দাঁড়ায় কোথায়? যাদের কাছে তারা দাঁড়াবে, তাদের ফুরসৎ নেই; তাঁরা দিবানিশিই হাকিম, উকিল, ব্যারিষ্টর, ডাক্তার অফিসর বাবু (?), ইত্যাদি। কিন্তু ছেলেদিগের সঙ্গে আমোদ করবার সময় করে নিলে যে, তাঁদেরও শরীর ভালথাকে, কাজে স্ফূর্ত্তি হয়, এ কথা তাঁরা মোটেই বোঝেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'দিনরাত চিন্তা, দিনরাত ভাবনা—ও সকলের সময় কই?' সেই কথার উত্তর দেবার জন্যই, উপরের লিখিত মহোদয়গণকে এ-ক্ষেত্রে টেনে এনেছি। মহামহিম ভারত-সম্রাট্, রুস-সম্রাট্, জর্ম্মণ-

কাইজর, মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন, চেম্বার্লেন, জেনারেল বুথ—এঁরা বুঝি সব নিষ্কর্ম্মা লোক? এঁরা সকলেই বুঝি খেয়ে, আর ঘুমিয়ে, সময় কাটান বা কাটিয়েছেন? এঁদের উপর কি সব কাজের ভার আছে, বা ছিল, তা একবার ভেবে দেখুন ত! এঁরা কিন্তু ওরই মধ্যে সময় ক'রে নিয়ে, ছেলেমেয়ে নাতিনাতিনীদের সঙ্গে আমোদ-আনন্দ করেন এবং তাতে উভয়পক্ষেরই কত উপকার হয়; ছেলেমেয়েরাও, আমোদের সঙ্গেসঙ্গে, কত শিক্ষা পায়; আর, কর্ম্মক্লান্ত পিতা-পিতামহেরাও, তাদের সহবাসে কত আনন্দ, স্ফূর্ত্তি লাভ ক'রে, নববলে বলীয়ান হয়েন। এই কয়টি কথা বল্‌বার জন্যই, আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

শিরোপরি মধ্যাহ্ন-তপন,
সুসজ্জিতা হস্তিনায় জ্বলিছে গগন গায়
কৌরবের গৌরব-কেতন,
মদমত্ত পৌরব-ভবন।
কেশবের সম্বর্দ্ধনাতরে,
কুরুরাজ সভা আজি, গৌরব বৈভবে সাজি,
ধর্ম্মদূতে মহা সমাদরে
রাজগৃহে নিমন্ত্রণ করে।
বৈতালিক ঘোষে দ্বিপ্রহর—
"চণ্ড তেজে জ্বলে রবি; ফুল্ল-কমলিনি-ছবি,
মৃণালে জড়ায় অহিবর,
আতপ-উত্তপ্ত-কলেবর।
জলযন্ত্রে শিখি করে পান
সুস্নিগ্ধ শীতলধারা, মদস্রাবী মাতোয়ারা,
রাজহস্তী করে মুহুঃ স্নান
বিমথিয়া সরসীর প্রাণ।"
সভা-ত্যজি উঠিলা কেশব;
ধরি সাত্যকির কর, কৌরবের সমাদর,
দম্ভভরা আতিথ্য-গৌরব—
ভ্রূভঙ্গেতে করি পরাভব—
অতিক্রমি পুরীর তোরণ,
বাহিরিয়া রাজপথে, উপনীত উভয়েতে
রাজভ্রাতা বিদুর ভবন,
ক্ষুদ্র এক কুটীর-সদন।
ভিক্ষুক কুটীরস্বামী হেথা,
নিত্যভিক্ষা মাগিবারে গিয়েছে গৃহস্থ-দ্বারে,
পত্নী তাঁর গৃহে স্নানরতা;
(রাজবালা দেবক-দুহিতা!)
দ্বারদেশে 'বিদুর'—'বিদুর'—
সহসা জাগিয়া স্বর কাঁপাইল কলেবর
রমণীর হৃদয়ের পুর—
কার এই আহ্বান মধুর!
পুনঃ স্বরে করিল আকুল—
"সখা কিগো গৃহে নাই? সখী কোথা?" "যাই" "যাই"
ছুটে নারী বিবশা, ব্যাকুল,
বিসরিয়া অঙ্গের দুকুল।
ভুলে গেছে দেহ বস্ত্রহীন;
সখা ডাকে বারেবারে, ছুটে নারী গৃহদ্বারে,
আনন্দেতে বাহ্যজ্ঞান লীন,
নারীলজ্জা-প্রতি উদাসীন!
মুক্তদ্বারে চকিতে তখন,
বিবশা সখীর ছবি মুহূর্ত্তেকে অনুভবি,
রমণীর লজ্জা-নিবারণ—
খুলিলেন উত্তরী-বসন।

ত্বরিতে সখীর অঙ্গ ঘিরি
করিলেন সম্ভাষণ, নারী অর্দ্ধ-সচেতন
সাদরে আহ্বানি হস্ত ধরি,
উভয়েরে গৃহে নিল বরি।
পাদ্য-অর্ঘ্য-স্নান সমাপন,
উপাসনা-পূজা সারি, বসিলা কেশব-নারী,
আকুলা ভাবিয়া বিড়ম্বন :—
সখারে কি করাবে ভোজন!
বন্ধু তার এল করি স্নেহ!
হেরি ধার্ম্মিকের নাশ— ত্যজিয়া অধর্ম্ম-দাস
ধৃতরাষ্ট্রে, ভিক্ষান্নের দেহ
স্বামী-স্ত্রীর, অন্নহীন-গেহ ;—
স্মৃতিতলে কি যেন কি ফুটে।
চকিতে সহসা উঠি, গৃহমাঝে যায় ছুটি ;
সুশ্যাম কদলীপত্রপুটে
নারী তবে ভোজ্য আনে ছুটে।
পত্রপুটে পক্ক-রম্ভাফল
সম্মুখে রাখিয়া তাঁর, 'খাও' বলি আরবার
তুলে দেয় মাখি অশ্রুজল,
সখা-হস্তে আনন্দ-বিকল।
বিদুর আসিলা—স্কন্ধে ঝুলি ;
কেশবে হেরিয়া গেহে, সম্ভাষি রোমাঞ্চ দেহে,
দেখেন ফেলিয়া ফলগুলি,
নারী তাঁরে খোসা দেয় তুলি ;
কেশব সানন্দে দেন মুখে।
হাহাকারে নিবারণ করিয়া বিক্ষুব্ধ মন
বিদুর কহেন মহাদুখে—
"এ কি খেলা খেলিছ কৌতুকে ?
কি করিস্ ওরে অবোধিনী ?
দীন বিদুরের ঘরে, বান্ধব সাজিয়া ওরে,
কে এল, কি বুঝিবি রমণী ?
কি খাওয়ালি তাঁরে অভাগিনী ?"
নিবারিয়া কহেন কেশব—
"স্নেহশীলা সখী কাছে সখা তার আসিয়াছে,
বন্ধুগৃহে এসেছে বান্ধব,
তাহে কেন এত কলরব ?
কারে সখা কহ, অবোধিনী!
নারীর এ প্রেমভাব বুঝিবারে অসদ্ভাব
হ'ল তব জ্ঞানের, হে জ্ঞানী!—
জ্ঞানের অতীত এ কাহিনী।
ফল-খোসা হ'তে দৃষ্টি তুলি,
দূরে রাখি বুদ্ধিজ্ঞানে, চাও রমণীর পানে,
হের তারে, অন্যসব ভুলি ;
স্কন্ধ হ'তে ফেল সখা, ঝুলি।
বুঝ, হেরি তব পত্নী-মুখ,
কোন্ মহা-উপচারে তৃপ্ত করে সে আমারে,
কি আহারে পাই হেন সুখ ;
কারে সখা কহিছ 'কৌতুক' ?"
বাহ্যজ্ঞান ভাবাবেশে লীন,
পত্নীর হেরিয়া মূর্ত্তি বিদুরের প্রেম-স্ফূর্ত্তি
ক্রমে হ'য়ে ভাবে অতিহীন,
আপনারে অতি প্রেম-দীন।
ক্রমে গণ্ড ভাসে অশ্রুজলে ;
বাক্যহীন স্তব্ধ হ'য়ে, ভোক্তার মুখেতে চেয়ে,
ভাব হেরি সে মুখকমলে,
পড়ে সে যুগল-পদতলে।
হস্তে ধরি তোলেন কেশব—
আলিঙ্গন করি বুকে, কহেন প্রফুল্লমুখে,—
"ভাল লাগে এবে কি এসব ?
তোমাদের সব(ই) অসম্ভব।
অতিক্রান্ত দ্বিপ্রহর বেলা ;
ক্ষুধায় উদর জ্বলে, পতিপত্নী দোঁহে মিলে
আরম্ভিলে শুধু ছেলেখেলা ;—
হ'ল ভাল পাগলের মেলা!
ওঠো, ওঠো, আন ভিক্ষা ঝুলি ;—
ভিক্ষা তো প্রচুর হেরি ; সখি! নাহি সহে দেরী,
পাকশালে চল অঙ্গ তুলি।
আশা করি, যাও নাই ভুলি—
রন্ধনই (যে) নারীধর্ম্ম-সার!
সখা যে ছাড়-না ঝুলি, দেখাবে না ভোজ্যগুলি ?—
ভাগ্যে তবে আজি অনাহার! –
সখাগৃহে খোসা-খাওয়া সার ?"

অশ্রুজলে ভাসিয়া বিদুর,
পরশি চরণতল, কহেন, "কেন এ ছল,
হে প্রভু! রহস্য কর দূর ;
অন্ন খাবে শূদ্রাণী-বধূর ?—
জানত শূদ্র এ হীন-দাস।"
কেশব কহেন ছলে, "গৃহেতে অতিথি এলে,
খোসা দিয়া পূরি তার আশ,
এরূপ করাও উপবাস ?
শুনিনা কৃপণ গৃহী, তব
অন্যায় শতেক ছল, অতিথির ন্যায্য বল
প্রকাশি আদায় করি লব,
প্রাপ্য মোর অন্নপান সব।
ওগো সখী, পাকশালে যাও !"
"হে মাধব, হে কেশব, বুঝিয়া জানিয়া সব,
ছল করি কেন অন্ন চাও ?
ব্যথাহারী হ'য়ে ব্যথা দাও !
ঝুলিতে এ তণ্ডুলের কণা !
শূদ্রহস্তে ক্ষুদ খেতে, তুচ্ছ তব কৌতুকেতে
বুকে মোর এ শেল দিও না।
হে মাধব, করহে করুণা !"
"হে জ্ঞানী পুনশ্চ তব ভ্রম !"
বুঝান কেশব তারে, ভুবনের মর্ম্মাধারে,
ফুটে আছে যে সত্য পরম ;
প্রেমে নাই উচ্চ-নীচ ক্রম।
প্রেমান্নের তুচ্ছ উচ্চ নাই,
নিঃস্নেহের রাজভোগে ঘৃণা করি, মহালোভে
ভগবান(ও) ফেরেন সদাই ;
চণ্ডালের(ও) হেন অন্ন চাই !
শূদ্রাণীর সমাপ্ত রন্ধন ;
দম্পতির অবিরল দুনয়নে বহে জল,
বসিলেন করিতে ভোজন
কেশব স্মরিয়া জনার্দ্দন !

শরৎ-দর্শনে

[শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী]

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

১

বরষার বারিধার
থামিয়াছে, নাহি আর
ঝর ঝর প্রপাত-গভীর,
মেঘে দামিনীর খেলা—
সঙ্গমের মহামেলা—
বজ্ররবে ঐক্যতান ধীর।

২

কুহেলিকা গেছে সরে,
খরতাপ দিবাকরে,
বসুন্ধরা জাগরণ গায় ;
দিগন্ত উঠেছে জাগি—
শারদ সমীর লাগি,
নভতল ঢাকা নীলিমায় !

৩

সমুজ্জ্বল তারকায়
চন্দ্রমার দীপ্তিভায়
ধরণীর শিরোশোভা করে,
দৃশ্যপট রূপান্তর—
স্বচ্ছতায় মনোহর—
শরতের আগমনী ভরে।

৪

ঈষৎ হিমানী স্পর্শে
প্রকৃতি শিহরে হর্ষে
চরাচরে সুখপরশন ;
কিবা বাদ্য কিবা গীতে
কি চেতনা চারি ভিতে—
নেত্রে সুধু প্রিয় দরশন।

৫

যে বাঁধ নয়ননীরে
বেধেছিনু ধীরে ধীরে,
বহুদিন, বহুব্যথা সয়ে,
দুখের তরঙ্গে তায়
আবার ভাঙ্গিয়া যায়
আছিলাম নিত্য ভয়ে ভয়ে।

৬

ভাঙ্গিল না বরষায় —
শোকের দারুণ ঘায় —
কত ঝড় কত বৃষ্টি ধারে,
আজিকে শরৎ-বায়,
ভাঙ্গন লেগেছে তায়—
অকস্মাৎ চূর্ণ করিবারে।

৭

সুধু প্রাণ কাঁদি উঠে,
বিশ্বময় ধায় ছুটে,
হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত তুফান্ ;
বাঁধন গিয়াছে দূরে
জীবনের অন্তঃপুরে—
ঝঞ্ঝা-বাত্যা— প্রলয়-মহান্

৮

শরতের চন্দ্রালোকে—
বেদনা-ব্যথিত শোকে
ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—
আজি সব একাকার,
নাহি সাধ্য রাখিবার
সংযমের বাঁধনে পরাণ !
স্নিগ্ধতা শরত রাগে
মিলনের অনুরাগে
আজ কেন উতলা এমন ?
প্রাণ চায়—প্রিয়জনে
পুনঃ নব-প্রীতিসনে
অন্তরেতে করিতে বরণ।

৯

শরতের প্রভাকরে
দিব্যকান্তি শোভা ধরে
দাড়াও আসিয়া মোর প্রাণে ;
তোমার পরশ দিয়া,
সার্থক করিয়া হিয়া—
আপনার সব দিব দানে !

হিন্দুবিবাহে পণপ্রথা

[শ্রীকুসুমকুমারী দেবী]

হিন্দুসমাজে বিবাহে পণপ্রথা অতি প্রাচীন কালেও ছিল; কিন্তু তাহা এরূপ ভাবে নহে। বর্ত্তমান পণপ্রথার যে বিকট পিশাচী-প্রতিমা দেখিয়া আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইতেছি, প্রাচীনকালে কি উহা সেইভাবে বিদ্যমান ছিল? তাহা নহে। বর্ত্তমানে যে পণপ্রথা কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের রক্তশোষণের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে; প্রাচীন কালে পণপ্রথা সে অবস্থায় ছিল না।

আমাদের পুণ্যময় পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থের দাস ছিলেন না; তাঁহারা ছিলেন—ধর্ম্মের দাস। এই পণপ্রথা ছিল—তাঁহাদের যৌতুক ভাবাপন্ন। এই যৌতুক-প্রথার ক্রমবিকাশ ধর্ম্মে আরম্ভ হইয়া, অধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। গৃহস্থের অর্থ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাই, সামাজিক-উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে আমরা অযৌতুক কন্যাদান প্রথার অনাদর দেখিতে পাই। বিবাহ-প্রথার বিশুদ্ধতা-পরিরক্ষণ জন্য সবস্ত্রা সালঙ্কৃতা কন্যাকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া সুপাত্রে সমর্পণ করাই হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য। যাঁহারা এই সুন্দর প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন কল্পনাও করেন নাই যে, উন্নত বিংশ শতাব্দীতে কি ভয়ানক নিম্মম-প্রহারী সমাজ-বিধ্বংসী অস্ত্ররূপে ইহা ঘুরিয়া বেড়াইবে!

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে; কালের কুটিল-চক্রে সামাজিক নীতির বহুপ্রকার উত্থান-পতন হইয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে এই যৌতুক-প্রথারও ক্রমবিকাশ হইয়া আসিতেছে; কিন্তু গতশতাব্দী পর্য্যন্ত পণপ্রথায় ইহার ক্রমাবনতি এতদুর পরিস্ফুট হয় নাই। পুরাণেতিহাসে দেখা যায়, শুভবিবাহ সময়ে কোথাও অর্থের হেতু উৎপীড়ন সংঘটন হয় নাই। সমাজ-বন্ধন তখনও এত শিথিল হয় নাই। প্রত্যেক গৃহস্থ তখন সামাজিক দেহের অঙ্গস্বরূপ ছিলেন। সমাজের একাংশে আঘাত লাগিলে, সমস্ত সমাজ ত্রাসিত ও ব্যথিত হইয়া পড়িত। একের ইষ্টানিষ্টে সমগ্র সমাজের মঙ্গলামঙ্গল হওয়া অবশ্যম্ভাবী—এ জ্ঞান তৎকালে তাহাদের চিরন্তন ছিল। অবশ্য কালের সহিত সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তখনও যৌতুক-প্রথা বরপক্ষের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। পিতৃদত্ত যৌতুকে কন্যারই একমাত্র অধিকার, জামাতা তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। শাস্ত্রের আদেশ, বিবাহকালে যাহা কিছু বরকে দেওয়া যায়, তৎসমস্তই কন্যার প্রাপ্য; তাহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। কন্যার মৃত্যুর পর তাহাতে তাহার সন্তান-সন্ততির অধিকার। অবশ্য এ সব কথা এখন সকলের প্রীতিপ্রদ হইবে না; কিন্তু জাতীয়-জীবনে অগ্রসর হইতে গিয়া আমরা পশ্চাতের মহান্‌আদর্শ কতটা দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

বিবাহকালে যৎকিঞ্চিৎ বরায়োদ্দিশ্য দীয়তে।
কন্যায়া স্তদ্ধনং সর্ব্বং অবিভাজ্যঞ্চ বন্ধুভিঃ॥—ব্যাস।
মদ্দত্তং দুহিতুঃ পত্যো স্ত্রিয়মেব তদন্বিয়াৎ।
মৃতে জীবতি বা পত্যো তদপত্যমৃতেস্ত্রিয়া॥—দায়ভাগ।

পণপ্রথার উৎপত্তি—বরপক্ষের দারিদ্র্যে। আপনার পুত্র আছে, সাধ-আহ্লাদও আছে; কিন্তু বিবাহোৎসবের সঙ্গতি নাই। আমি কন্যাদায়গ্রস্ত এবং সঙ্গতিশালী; আমারও ইচ্ছা, সুপাত্রের সহিত আমার কন্যারত্নটীর বিবাহ নিতান্ত দীনভাবে সম্পন্ন না হয়; এক্ষেত্রে আপনাকে কিছু অর্থ ব্যয়করণার্থে দান করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এ দানে কন্যার কোন অধিকার হইতে পারে না। ইহা পাত্র-পক্ষের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য। যৌতুকের উপর পণদানের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। সেই সময়ই বিবাহকালে বরের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ ও কুলীনগণের মর্য্যাদাস্বরূপ, কিছু অর্থদানও এই পণপ্রথার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু যে সমাজে জনসাধারণ সঙ্গতিহীন কন্যাপক্ষ হইতে অপাত্রের জন্যও অর্থাকাঙ্ক্ষা করেন, সে সমাজের অধঃপতন

অবশ্যম্ভাবী নহে কি? প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে দীনও কন্যার পিতা হইতে বাধ্য। কন্যাসন্ততি কেবল ধনীর গৃহেই জন্মায় না; সুতরাং, কন্যা পিতৃত্বের সহিত পণদান শক্তির অপরিচ্ছেদ্য সম্বন্ধস্থাপন করিলে, ধনী-দরিদ্রসম্বন্ধ উঠাইয়া দিতে হয়। ব্যক্তিগত বৈষম্যের সহিত সামর্থ্য-বৈষম্যও মানিতে হইবে।

পুরাণের দৃষ্টান্ত অনেকের অপ্রাসঙ্গিক কল্পনা মনে হইতে পারে; কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সর্ব্বত্রই স্বয়ম্-প্রকাশ। সত্যবান্, সাবিত্রীর বিবাহে পণগ্রহণ করেন নাই; বরং, অলঙ্কার ইত্যাদিও ফিরাইয়া দিয়া, অমূল্য সাবিত্রী-রত্নকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আত্ম-তৃপ্তিতে কৃতার্থানুভব করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎকালে মহতের কাছে পণ—রূপ গুণ;— অর্থ নহে।

বিবাহের সময় কন্যাকে যৌতুকদান স্বাভাবিক। কন্যার প্রতি পুত্র অপেক্ষা কমস্নেহথাকা সম্ভব নহে। কন্যাও পুত্রের ন্যায় স্নেহের পাত্রী; সুতরাং, পিতৃধন কন্যাও দাবী করিতে পারে। তবে বিধানানুযায়ী পিতৃসম্পত্তিতে পুত্র বর্ত্তমানে কন্যার বিশেষ অধিকার না থাকায়, বিবাহকালে সাধ্যানুসারে যৌতুক দেওয়া পিতার পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। শাস্ত্রেও ইহার বিধান আছে, দেশাচারও এস্থলে শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছে। নিরাভরণা কন্যা সম্প্রদানে পিতা আপনাকে প্রত্যবায়ী মনে করেন! প্রকৃত-পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রায় প্রত্যেক পিতামাতারই ইচ্ছা থাকে যে—কন্যাকে অবস্থানুসারে সালঙ্কারা করিয়া যথাসাধ্য যৌতুক-সহকারে সুপাত্রে অর্পণ করেন। নিতান্ত নীচপ্রকৃতির না হইলে, কেহই সাধ্যমত দান করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে যৌতুকদানে সমর্থ হ'ন, তাঁহারা এজন্য অন্তরে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু, হায়! এই পবিত্র প্রীতিমূলক যৌতুকদান-প্রথা কালক্রমে ভয়ঙ্কর ঘৃণিত বাধ্যতামূলক পণদান প্রথায় পরিণত হইয়াছে—প্রকৃত উদ্দেশ্য লুপ্ত হইয়াছে। সেই স্বাভাবিক সুন্দর প্রথাকে নৃশংস সমাজ কিরূপ হেয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভাবিলে লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইতে হয়।

কন্যাদান পুণ্য কর্ম্ম। পণের জন্য পীড়ন অধর্ম্ম। ইহাতে বিবাহের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, ও অর্থের প্রতি অযথা অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা হয়। ক্রমে ইহা হইতেই সামাজিক ও পারিবারিক অশান্তির সূত্রপাত হয়; ফলে ছল ও প্রতারণার উৎপত্তি হইয়া, সংসার উচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়া থাকে। এই প্রকার বিবাহে পরিবারের মধ্যে যথার্থ আত্মীয়তা সংস্থাপিত কদাপি হইতে পারে না। ইহাকে ধর্ম্মতঃ বিবাহ বলা বিড়ম্বনা মাত্র; ইহা পবিত্র 'বিবাহ' নামে বাচ্য না হইয়া 'বর বিক্রয়' নামে অভিহিত হওয়াই সঙ্গত।

শুনিতে পাওয়া যায়, অনেকে বলেন, "আমরা পুত্রের বিবাহে কোন প্রকার পণের কথাই উল্লেখ করি না।" কথাটা কোন কোন স্থানে সত্য, ও শুনিতেও ভাল বটে; কিন্তু অভ্যন্তর কপটতায় পরিপূর্ণ। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা এমন ঘরে কুটুম্বিতা করেন, যেখানে অর্থের জন্য কিছুমাত্র যাচ্ঞা করিতে হয় না। বিত্তসম্পন্ন কন্যার পিতা অযাচিত ভাবেই প্রচুর অর্থ দান করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন দরিদ্রের কন্যাকে বিনাপণে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সমাজে এমন কয়জন আছেন? সমস্ত বাঙ্গলাদেশ খুঁজিলে দুইএকজন ব্যক্তির হয়, কি না সন্দেহ! সমাজের এখন এমন জঘন্য অধঃপতন হইয়াছে!—এখন একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, এই ঘৃণিত পণ-পীড়ন কতদূর অধর্ম্ম ও অনিষ্ট কর?

সমাজের এই প্রতিকূল বেগকে না ফিরাইতে পারিলে, সমাজের অঙ্গে এই বিষমব্যাধির প্র-সর রোধ না করিতে পারিলে, ক্রমশঃ ভীষণ ধ্বংসরূপী হইয়া দাঁড়াইবে!

দুই উপায়ে ইহা সংসাধিত হইতে পারে। প্রথম—কন্যার বিবাহ না দেওয়া, ও দ্বিতীয়—এই কুৎসিত পণপ্রথার উচ্ছেদ করা। প্রথমটি একেবারেই অসম্ভব। শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক পিতা শিক্ষা সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সৎপাত্রে বিবাহ দিতে বাধ্য। তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, চিরানূঢ়া কন্যা গৃহে রাখিলে কোন পাপ নাই, এবং কুলীনদিগের মধ্যে অনেকস্থলে এ প্রথার প্রচলন ছিল—এমন কি, স্থানে স্থানে এখনও আছে; তথাপি, সাধারণভাবে এ প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন একেবারেই অযৌক্তিক ও সমাজের বিষম অকল্যাণজনক। অতএব সমাজ-নীতির পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। সমাজ পুরুষ-রমণী লইয়া গঠিত। পুরুষ বিপথ-গামী ও ভ্রান্তপথাবলম্বী হইলে, তাহাকে সেপথ হইতে ফিরাইয়া আনা রমণীর প্রধান পালনীয় কর্ত্তব্য।

পারিবারিক বিষয়ে বাঙ্গালী-সমাজে পুরস্ত্রীগণের ক্ষমতা অদ্বিতীয়; ইহা আধুনিক ব্যাপার নহে, চিরকালই ইহা চলিয়া আসিতেছে। যখন মহাদেব পার্ব্বতীকে লাভ করিবার জন্য, হিমালয়ের নিকট সপ্তর্ষিকে বিবাহের ঘটকালী করিতে পাঠাইতেছিলেন, তখন আর্য্যা অরুন্ধতীকেও বলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ, বিবাহকার্য্যে পুরস্ত্রীগণেরই বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পরে যখন অঙ্গিরা ঋষি হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, গুণময় দেবাদিদেবের গুণব্যাখ্যাপূর্ব্বক পার্ব্বতীর পরিণয়ের প্রস্তাব করিলেন—তখন, নগাধিরাজ সম্পূর্ণরূপে সফলমনোরথ হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াও একবার নগরাণী মেনকার মত লইবার জন্য, তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। কারণ, গৃহস্থ লোকে কন্যা-সংক্রান্ত সকলকার্য্যেই গৃহিণীর কথা অনুসারে চলিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, গৃহিণীরাই কুটুম্বদিগের সহিত বিবাদের মূল কারণ। সুতরাং, পণ-প্রথারূপ বিষমদুর্নীতির উচ্ছেদসাধন করিবার অস্ত্র তাঁহাদেরই হস্তে। তাঁহারা যদি সকলে একমত হইয়া, এই দুর্নীতি দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা হইলে যে উহা অচিরে লয়প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

আজ যদি গৃহিণীগণ মমতাময় হৃদয়ে ন্যায়ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, আপন আপন পুত্রের বিবাহে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হন যে, যে বিবাহে কঠিন পণগ্রহণ হইয়াছে, সে বিবাহে মাঙ্গলিক শঙ্খশব্দ, শুভহুলুধ্বনি ও চিরন্তন স্ত্রী-আচার সম্পাদিত না করেন, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যেই এই অকল্যাণকর কুপ্রথা বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইবে। মঙ্গলময়ী সুমাতা সুগৃহিণী হওয়াই রমণী জন্মের সার্থকতা। বাঙ্গালীর স্ত্রৈণ অপবাদ, ধর্ম্মেরদিকে সার্থককরিতে সমর্থা হউন—ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ঐতিহাসিক চিত্রে দেখা যায়, জীবন না দিলে জীবনী-শক্তির আবির্ভাব হয় না। দেশ কিংবা সমাজ কোন গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বিধাতার বিশেষ বিধানে লোক-লোচনসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকে। পাপ যাহা, তাহা চিরদিনই পাপ; 'স্নেহলতা', আত্মহত্যা করিয়া অবোধ কিশোরী কুমারীদিগকে যে সৎদৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। তবে, এ দৃষ্টান্ত কুমার-কুমারীদিগের মাতা-পিতার নয়নসম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রজ্বলিত হউক—ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

অমঙ্গলের বিনাশেই মঙ্গলের উৎপত্তি। এই অমঙ্গল বিনাশ করা গৃহলক্ষ্মীদিগের একান্তকর্ত্তব্য। এই ভীষণ পণপ্রথার বিষময় ফলে কত শত শত বালিকা যে লাঞ্ছিত হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এখনও যদি ইহার প্রতিকার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে ইহাদের অভিসম্পাতরূপ জ্বলন্তবহ্নিশিখা এই অধঃপতিত হিন্দুসমাজকে অচিরে ভস্মসাৎ করিবে।

আপনারা আবারও ভাবিয়া দেখুন। বর এবং অভিভাবকদিগের হস্তে যদিও এই পণাকাঙ্ক্ষা অনেকটা নির্ভর করে সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা অলঙ্কার-প্রয়াসিনী ধনগর্ব্বিতা রমণীমণ্ডলের লজ্জাকর-আকাঙ্ক্ষা সমধিক নহে কি? ইহাদের দারুণ-অর্থলিপ্সা ও বিপুল শোষণপ্রবৃত্তির প্ররোচনায়, অনেকস্থলে পুরুষদিগকে নৃসংশ ধ্বংসরূপী হইয়া, এই আনন্দময় শোভনীয় সভায় সমুপস্থিত হইতে হইতেছে। এইরূপে কত ভদ্র-সন্তানই যে হর্ষ-বিষাদে নিমজ্জিত হইয়া, শোচনীয় অকাল-বার্দ্ধক্য—অকাল-মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে, ভাবিলে কণ্টকিত হইতে হয়! ভীষণতর ক্ষয়কারী এই কন্যাদায় বিকট-রাক্ষসীরূপে বদনবিস্তার করিয়া, দিন দিন মহাবেগে বঙ্গগৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—এই ভীষণ রাক্ষসীকে দূর করিতেও একমাত্র বঙ্গগৃহলক্ষ্মীরাই সমর্থা। মাতা-পিতার কন্যা, কন্যার জননী হইয়া বঙ্গরমণী স্নেহময়ী দয়াময়ী—এই পূত-নামে আর কলঙ্ক প্রলেপ করিবেন না। অন্য রত্নের আকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া সাদরে অসমর্থের কন্যারত্ন গৃহে আনিয়া, সংসার উজ্জ্বল করুন—ইহাই ঐকান্তিক নিবেদন।

এই বাধ্যতামূলক নীচ-পণপ্রথার মূলচ্ছেদ করিতে সর্ব্বশক্তিময়ী মা সর্ব্বমঙ্গলা বিশ্বজননী আমাদিগকে শক্তি-প্রদান করুন।*

* 'মহিলা-মণ্ডলীর' অধিবেশনে পঠিত।

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

[শ্রীহেমনলিনী দেবী]

সে বৎসর আমাদের গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড় বেশী হইয়াছিল। প্রায় বৎসর-খানেক জ্বরে ভুগিয়া কুইনাইন গিলিয়া বড়ই বিরক্তি-বোধ হইতেছিল। ডাক্তারকে জোর করিয়া বলায়, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,"আমি কি চেষ্টার ক্রুট করছি মশায়?—দেশটার জলই খারাপ হ'য়ে গেছে—ওষুধে কি কর্ব্বে? আপনি যথেষ্ট ওষুধ খেয়েছেন, আর এসবে কোন ফল হবে না; আপনি দিনকত 'চেঞ্জে' যাবার ব্যবস্থা করুন।"

কথাটা আমারও মনে লাগিল। কিন্তু মুখে বলা, বা মনে করা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। তিনমাস ছুটি লইয়া বসিয়া আছি; একবৎসরকাল ছেলে-মেয়ে ও নিজের অসুখে ডাক্তার-কবিরাজের খরচ জোগাইয়া হাতটাও এখন সচ্ছল ছিল না। কিন্তু প্রাণের মায়া ও দন্তের বেদনা সব চিন্তাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল; আর শ্রীমতী গৃহিণী যখন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিলেন—শুনিলাম গোপনে গহনা-বিক্রয়েরও ব্যবস্থা চলিতেছে—তখন, আর ঘরে থাকিবার চেষ্টা বৃথা!—কোথায় যাইব? অনেকে অনেক স্থানের নাম করিলেন, সে মসুরী হইতে ওয়াল্টেয়ার পর্য্যন্ত! আমি মনে মনে হাসিয়া নিকটস্থ ও স্বল্পব্যয়ে-বাসোপযোগী দেওঘরে যাওয়াই স্থির করিলাম। শুনিয়া গৃহিণী খুসি হইলেন; তাঁহার বিশ্বাস হইল, এইবার আমি নিশ্চয়ই ভাল হইব। কারণ বাবা-বৈদ্যনাথ যখন আমায় টানিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার দয়া হইয়াছে। অবশেষে একদিন পত্নীর সযত্নসম্বৃত অশ্রুজলে আর্দ্র হৃদয় লইয়া—বৈদ্যনাথে চলিয়া আসিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠ মাস। এদেশে ভয়ানক গ্রীষ্ম। জীবনে আমি কখন এমন উত্তপ্তবায়ুর কল্পনাও করি নাই। পশ্চিম-আগত অগ্নিময় বাতাস পথের কাঁকর-বালি উড়াইয়া দিয়াছে। কা'ল এখানকার ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন,—এ হাওয়াকে ভয় করিবেন না; এই পশ্চিমে-বাতাসই এখানের স্বাস্থ্যের মূল।' হউক স্বাস্থ্যের মূল; কিন্তু এ আগুনের তাপ সহ্য করিতে পারি না, এই গরম ও প্রধানতঃ বালির দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া সেদিন আমি বায়ুর প্রবেশপথগুলি রুদ্ধ করিয়া ঘামে বিছানা ভিজাইতে ভিজাইতে মধ্যাহ্ন-নিদ্রার জোগাড় করিতেছিলাম। ঘুম কি হয়? অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বুঝি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—হঠাৎ একটা শব্দে সেটুকু ভাঙ্গিয়া গেল, —"খবর লে বাবা, খবর লে।"

ঠিক্ আমার মাথার কাছের জানালার নীচেই ঐ শব্দটা উঠিল। বুঝিলাম এখানে যাহা হইয়া থাকে,—কোন ভিখারীর উপদ্রব। অল্প রাগ হইল, চুপ করিয়া থাকিলাম। ঘন ঘন নিঃশ্বাসের বেগ বোঝা যাইতেছে; ভাবিতেছিলাম বক্‌বক্ সুরু করিলেই তাড়াইয়া দিব। ভাবিতেছি,—কিন্তু কৈ কেহ তো কথা কহে না? প্রায় দশ-মিনিট হইয়া গেল; শব্দে বুঝিতেছি বাহিরে কেহ আছে, কিন্তু সে নীরব। এই সময় আবার শব্দ হইল,—"বহুৎ হুয়া বাবা, আব্ হামারা ইয়াদ্ লে!"

কি কাতর স্বর! উঠিয়া জানালা খুলিয়া ফেলিলাম। ওঃ!—আমি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম! এ কি?—দেখিলাম একজন শীর্ণকায়, কৌপীন-সম্বল দুর্দ্দশাগ্রস্ত কুষ্ঠরোগী—সেই জানালার নীচে একটু ছায়া পাইয়া সেইখানে শুইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে চক্ষুর অসহনীয় তীক্ষ্ণ-রৌদ্র—ছায়াহীন-রৌদ্র;—এইখানে একটু ছায়ার সন্ধান পাইয়া হতভাগ্য ছুটিয়া আসিয়াছে। হাতে-পায়ে একটিও অঙ্গুলী নাই। মুখাকৃতি বিকৃত,—সে সতৃষ্ণ-নয়নে পার্শ্বস্থ কূপের দিকে চাহিয়া ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। বৈদ্যনাথে অনেক কুষ্ঠরোগী দেখিয়াছি; অনেককে দেখিয়া দয়াও হইয়াছে। আবার কতজনের প্রতি বিরক্তও হইয়াছি। তাহাদের অতৃপ্ত ভিক্ষা ও চীৎকারের জ্বালায় বাড়ীর দুয়ার হইতে দূর করিয়াও দিয়াছি; কিন্তু এই নির্ব্বাক্

ভিখারীকে দেখিয়া আমার হৃদয় যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! আমি কথা বলিতে পারিতেছিলাম না; সে কিন্তু আমাকে দেখিয়া উঠিয়া পড়িল; যেন পলাইবার চেষ্টা। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ব'স ব'স, পালাচ্ছ কেন? তুমি কি চাও বল—ভয় কি?"

সে দূরে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে কি দেখিল; তাহার পর ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল—"আপ্ বাঙ্গালী হেঁ বাবু!" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, কেন? বাঙ্গালীর খোঁজ নিচ্ছ কেন?"

সে বলিল, "উও কোঠীকো বাঙ্গালী-বাবুকা পাশ্ ভিখ্ মাঙ্গ্‌নে গিয়া বাবু সাব্," বলিতে বলিতে তাহার স্বর রুদ্ধ হইল; ফিরিয়া দেখাইল, দুই-তিনটা আরক্তিম প্রহারচিহ্ন তাহার শীর্ণপৃষ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে! আমার বাঙ্‌স্ফূর্ত্তি হইতে ছিল না। সে আবার বলিতে লাগিল, "বাবুজিকে বহুৎ মেহেরবাণি—বাবা তেরা ভালা করেগা বাবু! ইয়ে আপ্‌লোক্‌কা যব্ খুসি হায়—মমতা হোয়, কুছ্ দিজিয়ে; লেকিন্ অন্ধা লুল্‌হা-নাচার আদমীকো মারনা ক্যা কুছ্ বাৎ হায়? হাম্ তো উন্‌কা কুছ্ কসুর নেই কিয়া? তব্ হাম্ উন্‌হে ক্যা কহি,—হামপর ভগমান্ নারাজ—হেমান্‌কো ক্যা কহিঁ!"

আমি সে কথার উত্তর দিলাম না; বলিলাম, "তুমি আমার কাছে কিছু চাও কি?"

তাহার শুষ্কচক্ষু যেন আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল; হর্ষ-বিকৃত ব্যগ্রস্বরে সে বলিল, "হুজুর—মহারাজ হেঁ! যিস্‌কো হিরদ্ মে কিরপা বৈঠ্‌তা হায়, ও হি দুনিয়াকা রাজা-মহারাজ! আজ্ সমুচ্ দিন হাম্ উপাস্ ছি, হে মালিক! যব্ কুছ্ খানেকো মিল্ যায়—তব্"—।

উঠিয়া রন্নাঘরে গেলাম। ঠিকা-বামুন আমার আহারের পর নিজে খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। চাকরটা স্নান করিতে গিয়াছিল—তাহার ভাত চাপা-দেওয়া আছে! আমি তাহাই উঠাইয়া লইয়া সেই ভিক্ষুকের সম্মুখে দিলাম। কিন্তু সে খাইবে কি?—ভাত দেখিয়া তাহার চোখে জল বাহির হইয়াছে; সে কাঁদিয়া বলিল, "তিনমাস কো বাদ অন্ন্‌কো মুখ দেখা বাবু সাব্!"

আমি বলিলাম, "কেন, তুমি নিত্য কি খাও?"

"সাত্তু, সুখ্‌নি, আরুই,—পয়সা যো কুছ্ ভিখ্ মিলে, এহি কিন্ কর খাঁতে হেঁ। ভাত পাকানেকো কুছ্ হালৎ হায়?"—বলিয়া, সে আপনার পঙ্গু দুইহাত তুলিয়া দেখাইল। আমার অন্তর শিহরিয়া উঠিল, এবং মনে হইল, ইহার কি আপনার লোক কেহ নাই? কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা এখন উচিত নয়, ভাবিয়া বলিলাম, "তুমি এখন খাও দেখি, দরকার হয় তো আরও চেয়ে নিও।"—

সে খাইতে লাগিল। প্রথমতঃ বড় বড় গ্রাস—এতবড় গ্রাস যে, আমার ভয় হইল, বুঝি তাহার শুখ্‌না-গলায় তাহা আট্‌কাইয়া যাইবে! ক্রমে ভাতের পরিমাণ কমিয়া আসিল, এতক্ষণ কেবল ডালভাতই তুলিতেছিল—এবার তরকারীতেও হাত দিল। আমি অবাক্ হইয়া দেখিতে-ছিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, "তিবণ দেকে ভাত—বাবু, বহুৎ রোজ নেই খায়া। পৌর শাল কৌন্ রাজাকা লেড়্‌কাকো মুড়্‌নামে বহুৎ কাঙ্গালী খিলায়া গিয়া—ওহি বখৎ পুরী তরকারী আউর বহুৎ চিজ্—দহী-মিঠাই পেড়া—সব্ কোইকো দু'দু আনা পয়সা মিল-রহে! ভগমান উন্‌কো রাজ বাড়াই দেল্ বাচ্চা কো কুশল করে—খুব খিলায়া!"

আহার শেষ হইতে হইতে, আমার চাকর আসিল। তাহাকে বলিতে, সে জল আনিয়া, তাহার ক্ষুদ্র-অঙ্গুলিতে ঢালিয়া দিল। যথাসাধ্য স্থানপরিস্কার করিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহাকে দেখিয়া আমার একটা কেমন কৌতূহল জন্মিয়াছিল। তাহার জীবনে যা-কিছু জানিবার কথা আছে—তাহা শুনিবার জন্য, আমার প্রাণে, কেন কি-জানি, অনেকখানি ঔৎসুক্য আসিয়াছিল। আমি বলিলাম "এত রৌদ্রে আর কোথা যাবে! এস, আমার বারান্দায় খানিক বস্‌বে, এস।"

চাকরটা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তাহাকে দুআনার পয়সা দিয়া বলিলাম, 'যাঃ বখামি করিস্ নে—বাজার-হ'তে খাবার এনে গিল্‌গে যা; বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে।"

"আমার ভাত নিয়ে দুনিয়ার কুঠেকে দান করুন; আর আমি বাজারের শুখ্‌নো খাবার খেয়ে মরি!" বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি তখন সেই কুষ্ঠ-রোগীকে লইয়া সামনের বারান্দায় গিয়া বসিলাম।

সম্মুখে ত্রিকূট-পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গ আরক্তবর্ণে মাথা

তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; নীচে ঘন শালবনে রৌদ্র যেন ঝল্‌সাইয়া উঠিয়াছে। কাষ্টিয়ার্স-টাউনের নূতন অট্টালিকাগুলি শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল রৌদ্রে তীক্ষ্মমূর্ত্তি ধরিয়া চক্ষুর অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি সম্মুখের ক্যাম্বিসের পর্দ্দা টানিয়া দিয়া, একটা বেঞ্চে বসিয়া, ধীরে ধীরে তাহার জীবনীসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলাম। সেও কখন বিষাদ-লজ্জায়-ক্ষোভে, কখন বা অশ্রুজলে, ভাসিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিল।

(২)

সে বলিতে লাগিল—"বাবু, আমায় গরীব দেখিতেছ; গরীব চিরদিনই ছিলাম বটে, কিন্তু দুঃখী ছিলাম না। ক্ষেত-খামার ছিল না বটে; কিন্তু দুইবেলা মজুরী করিয়া আমি যাহা আনিতাম, আমার স্ত্রী ঘরে বসিয়া লোকের চাউল কুটিয়া, ময়দা-পিসিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত—তাহাই, আমাদের ক্ষুদ্র-সংসারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তখন আমাদের একমাত্র কন্যা! হায়, কি সুখের মধ্যেই সে জন্ম লইয়াছিল!—সুখ, বড় সুখ;—বাবুজি, দুঃখ যে কাহাকে বলে আমি তখন বোধ হয় জানিতামই না। শরীরে প্রচুর বল, কর্ম্মে উৎসাহ—আমার নিজের কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহিত করিত। আবার গৃহে পত্নীর সেবা, ভালবাসা, কন্যার স্নেহ—সব মিশিয়া তখন যেন আমায় দিনরাত স্বর্গে স্বর্গে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত। সেখানে দুঃখ কি, তাহা জানিব কিসে?

"এমনই করিয়া কতদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে—অবশেষ এই যা দেখিতেছ—আমার সুখের দিন শেষ হইল। আর জন্মে কি পাপ করিয়াছি জানি না; কিন্তু পাপ—বড় পাপ—করিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিশ্চয় কাহারও সুখের ঘরে বেড়া-আগুন দিয়া কাহাকেও জ্বালাইয়া মারিয়াছি—এ আমার তাহারই দণ্ড। সুখ ত নির্ম্মূল হইয়াই গিয়াছে—তাহার উপর এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা, এ আমার সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত।"

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া একবার সে আমার দিকে চাহিল; তাহারপর, নির্ব্বাক্‌ভাবে দক্ষিণাভিমুখে চাহিয়া, কি ভাবিতে লাগিল। তাহার এই অল্প কয়টি কথায়, আমারও মন কেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—আর তাহাকে প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ পরে সে আবার বলিতে লাগিল—

"ওই যে ছোট ছোট পাহাড়গুলি দেখা যায়, বাবুজি, ঐ চূড়ার আকার পাহাড়টির নাম 'মন্দার'। মন্দার জান বোধ হয়; 'মধুসূদনজি' স্বয়ং ঐখানে বিরাজমান।" এই কথা বলিতে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; পঙ্গু-হস্তদ্বয় যোড় করিয়া সে ললাটে স্পর্শ করাইল। বলিল, "ঐ পাহাড়েরই ক্ষুদ্র পল্লীখানিতে আমাদের ঘর। ঐস্থানেই আমার বাল্যের ক্রীড়াক্ষেত্র—যৌবনের ঘর।—আঃ! সে যে কত কথা বাবু, কত বলিব? আমরা জাতিতে গোয়ালা। শৈশবে আমি, সঙ্গীদের সঙ্গে বাঁশী বাজাইয়া, ঐ পাহাড়ের তলায় গরু চরাইতাম। নদীর জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া, স্নানশেষে ভিজা-কাপড়ে মারামারি কাড়াকাড়ি করিয়া, বনফুল তুলিয়া ঠাকুরজির পূজার জন্য আনিয়া দিতাম। কোনদিন পাণ্ডারা লইত, কোনদিন বা এ ফুলে পূজা হয় না বলিয়া, ফিরাইয়া দিত। যাহার ফুল ফেরৎ আসিত, তাহার আর দুঃখের সীমা থাকিত না! ফিরিয়া আসিতে আসিতে আমরা কোনদিন কাহারও আলুর ক্ষেত হইতে আলু, কাহারও জনেরার-ক্ষেত হইতে কচি জনেরা উজাড় করিয়া, খোলা-মাঠে শুকান ডালপালা জ্বালিয়া আলু, জনেরা পোড়াইয়া খাইতাম। সে কি দিনই যে গিয়াছে বাবু!—তারপর, সন্ধ্যায় একদল দুরন্ত ছেলে হৈ-রৈ করিয়া বাড়ী ফিরিত। ছোট ভাই-ভগিনীগুলি এতক্ষণ আমাদের আশায় পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত—এইবার তাহারাও আমাদের সহিত মিলিয়া খেলায়-চীৎকারে—ক্ষুদ্র গোপপল্লীটি সঙ্গীত-নৃত্য-পুলকিত করিয়া তুলিত। রাত্রিতে কোনদিন, আধ-আঁধারে প্রাঙ্গণে বসিয়া, মাতৃদত্ত ডালভাত-শাকভাত খাইতাম—কোনদিন পর্ব্বোপলক্ষে, পিঠা-পায়স হইত; সেদিন ত আরও সুখ, আরও আনন্দ! রাত্রিতে যে কোথায় পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম, কে জানে? ঘুম ভাঙ্গিয়া মনে পড়িত, মাসীমার 'আনারিয়া কন্যা'র গল্পের শেষটা আমি শুনি নাই। তাহার পর? আবার সেই প্রভাত—আবার সেই আনন্দ-রক্তিম নবসূর্য্যালোকের মধ্যে চিরপরিচিত সুখময় দিবসের প্রবেশ!—সে আর কি শুনিবে বাবুসাহেব?

"পরে—যৌবনের কথা? এখন সে-কথা ভাবিতে আমার ভয় হয়, বাবু! কি দুর্দ্দাম আনন্দই তখন আমার

ছিল! এখন সে কয়টা দিন, আমার স্বপ্নে রাজা, কি বাদ্‌সা, হওয়ার মত, কি একটা অদ্ভুত স্মৃতির মধ্যে ফেলিয়া, জ্ঞান-বুদ্ধিকে চম্‌কাইয়া দেয়। সে স্মৃতিকে আমি ভয় করি। আমি? এই আমি—আমার আবার সুখের দিন ছিল? এও কি বিশ্বাস করিবার কথা? না—না, এ-আমি—সে আমি নই।"

আবার, সে নীরব হইয়া, মুখ ফিরাইল। তখন নৈঋত-কোণে কয়েকখানি কালো-কালো মেঘের টুকরা ভাসিয়া উঠিতেছিল; আর, তাহারই ছায়াতলে নিম্নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতচূড়াগুলি—পরিস্ফুট নীলবর্ণে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। রুগ্নভিখারী সেইদিকে চাহিয়া, একটি সুদীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার শুষ্ক, কোটরগত চক্ষুতে যেন কেমন এক শিখাহীন অগ্নির ভাব দেখা গেল! আমি প্রশ্ন করিলে সে মুখ তুলিয়া বলিল—

"হাঁ, ঐ যে সবচাইতে উঁচু পাহাড়টা দেখিতেছ, ঠিক্ উহারই তলে আমার ঘর ছিল। ঐ পাহাড়ের তলা দিয়া উঁচু-নীচু পথ বাহিয়া আমার তরুণী-পত্নী সাঁজের-বেলায় জল আনিতে যাইত। আর আমি, সমস্তদিনের শ্রমলব্ধ শস্যের বোঝার উপর বসিয়া তাহার পথ-চাহিয়া থাকিতাম? কলসী-মাথায় হলুদরঙ্গের আঁচল দুলাইয়া, সে আমার পাশ দিয়া, ঘরে ঢুকিত; এবং আমি এখনও বসিয়া আছি—ধান বা ফসলগুলি এখনও ঝাড়িয়া রাখি নাই—বলিয়া আমায় বকিতে বকিতে গিয়া ভিজা-ঘুঁটেয় উনান জ্বালিতে বসিত। আমিও একটা ঝাঁপ লইয়া ধান ঝাড়িয়া দিতাম—তখনই চাউল কুটিয়া আমার স্ত্রী ভাত-রাঁধিতে বসিত। এই সব শ্রান্তিক্লান্তির মধ্যে দুঃখ কোথাও ছিল কি? কি জানি—শ্রমকে লোক যে কেন দুঃখ বলে, তা আমি জানি না। তাহার পর রাত্রি! বাবুসাহেব—দুঃখীর রাত্রির সঙ্গে কি ধনীর রাত্রির তুলনা হয়? আমার স্ত্রীকে আমি বড় ভালবাসিতাম। আর সে?—আঃ, এ দুনিয়ার খেলা কি অদ্ভুত বাবু?—তার মধ্যেও আবার সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই স্ত্রীজাতিটা!—সে তো কুটিলা ছিল না, তবু ঐ অল্পবয়সী স্ত্রীলোকটির যে যোয়ান-মরদ্ থাকিতে পারে, তাহা আমি কোনদিনই জানিতে পারি নাই!—তার ভালবাসায় যে ভাণ থাকিতে পারে—না না—ভাণও বুঝি নয়—রমণীর হৃদয়ই বুঝি এমনই চঞ্চল, এমনই তরল—আর এমনই লঘু। তার দোষ কি বল?—হাঁ, শোন সে কথাও—তখন সে সত্যই আমাকে ভালবাসিত। একটু গরম-জল লইয়া সে আমার পায়ে মালিশ করিতে আসিবে—আর আমি বাধা দিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া জলটুকু ফেলিয়া

কলসী-মাথায় হলুদরঙ্গের আঁচল দুলাইয়া, সে আমার পাশ দিয়া, ঘরে ঢুকিত।

দিব—এই ছিল আমাদের প্রতি নিশীথের প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ!—

"যাক্, আজ ওকথা থাক্—তুমি শুনিয়াই বা কি করিবে?—এমনিভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল, তখন আমার কন্যা চুন্নার বয়স আট বৎসর। সুস্থ, পরিপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহা বালিকা, আমার ও তাহার জননীর অনেক শ্রমলাঘব করিয়াছিল। আমি তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিতেছিলাম। এইসময় পাপরোগ দেখা দিল! প্রথম হইতেই সাংঘাতিক মূর্ত্তি! সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল—হাতে পায়ে ক্ষত দেখা দিল। ওঃ! সে কি কষ্ট—কি কষ্ট, বাবুসাহেব! দুঃখী-গরীবের পক্ষে রোগ যে কত দুঃখ, তাহা তোমরা জান না।

একমাত্র স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনে তিনটি জীবের কি হয়? কন্যাকেও একজনের বাড়ীতে রাখালী করিতে পাঠাইলাম, সে সেইখানেই থাকিত, সেইখানেই খাইত। মধ্যে মধ্যে ছুটি পাইলে, সে দৌড়িয়া আমায় দেখিয়া যাইত। দুপ্রহরে ঝণার কোণে—নদীর ধারে মহিষের দল ছাড়িয়া, আমার ঘা ধুইয়া দিয়া যাইত।

"বড় কষ্টেই দু'বৎসর কাটিল। সে যে কত কষ্ট, তুমি শুনিলে ভয় পাইবে বাবু! স্ত্রী প্রভাতে উঠিয়া কার্য্যে যাইত; যাইবার সময় একঘটি জল মাথার কাছে দিয়া যাইত; ঘরে যেদিন থাকিত, সেদিন দুমুঠা ছাতু দিয়া যাইত; নতুবা এক-মুঠা চাল কি বুট, আমার সমস্ত দিনের আহারীয় ছিল—তাহাই ভিজাইয়া খাইতাম। এমনও হইয়াছে—কত দিন অবশ-হাতে জল ঢালিতে গিয়া, ঘটীর জল উল্টাইয়া গিয়াছে, সমস্ত দিন তৃষ্ণায় মরিয়াছি। তাহার পর, ঘায়ে মাছি বসার যন্ত্রণা, ও বাবু—সে যে কি যন্ত্রণা—তা আর, কি বলিব!—"

শুনিতে শুনিতে সত্যই আমারও প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল—সে অন্যমনে বলিয়াই যাইতেছিল, "সন্ধ্যায় স্ত্রী ফিরিত। সে ক্লান্তিতে অবসন্ন,তাও জানিতাম; তবু, একটি কথা বলিলেই যে সে আমায় গালাগালি দিত, মারিতে আসিত, তাহা আমার বড় অসহ্য ছিল। বাবু—বাবু! আমি কি সাধ করিয়া তাহাকে সে কষ্ট দিতেছিলাম? মরণ যে কিছুতেই আসে না!

"দিন দিন আমার স্ত্রী আমার প্রতি আরও নিষ্ঠুর, আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। ভাল করিয়া খাইতেও দিত না। আর সেবা?—কি বলিব তোমায়; কোন-কোন দিন সে আমার তৃষ্ণার জলটুকুও দিতে ভুলিতে লাগিল! উঠিতে শক্তি ছিল না; অতিকষ্টে সরিয়া সরিয়া গিয়া অত্যাবশ্যক কর্ম্মাদি করিতাম। যদি বা কোন দিন না পারিয়া নিকটে বসিতাম, সেদিন আর আমার রক্ষা ছিল না। সে সকল সেবা সে আমার কিছুই করিত না যদিও—চুন্না আসিয়া সমস্ত করিত,—তথাপি গালি দিবার মালিক ছিল সেই স্বয়ং! আবার আমার যত্ন করিত বলিয়া কন্যাও তাহার প্রিয় ছিল না; তার মা তাকেও শুধু-শুধু গালি দিত।—

"আমার দুরবস্থা তখন চরমে দাঁড়াইয়াছে! হাত-পা ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছেই—তাহার উপর মুখে তখন ভয়ানক ঘা। সকলেই বলিল—এইবার আমার জিব খসিয়া যাইবে। যাক্, ক্ষতি নাই—কিন্তু জীবনটাও এই সঙ্গে যায় না কেন? হাঁ বাবুজি, এত কষ্টেও মানুষ বাঁচে কেন, বলিতে পার? মানুষের এই শরীর এত কষ্ট সহিতে পারে কেন?—বুঝিতে পারি না—আমি বুঝিতেই পারি না যে, মানুষ মরণকে ডরায় কেন?"

এইখানে সে একটু থামিল, আবার তখনই বলিতে লাগিল। "মরণকে ভয়? মরণকে ভয় কে না করে বাবু? আমি—এই যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য আমি—আমিই কি মৃত্যুকে ভয় করি না? দুইদিন যদি উপবাস দিই, তৃতীয়-দিনেই যে মৃত্যুর দ্বারে উঠিতে পারি;—তবে ভিক্ষা করিয়া এ পাপদেহ রাখিয়াছি কেন? যাহারা সুখী, সংসারে যাহাদের সুখসান্ত্বনার উপায় আছে,—তাহারা তো বাঁচিতে চাহিবেই; আমিই যখন মরণকে ভয় করি, তখন তোমরা করিবে না কেন? আমি বেশ বুঝিয়াছি, মানুষ সব পারে—মরিতে পারে না—সহজে পারে না।"

আমি একবার কি উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"না না বাবু, শোন শোন! তুমি এখনও লায়েক হও নাই। সংসারে বয়সের হিসাবে মানুষ ঠিক্ বুড়া হয় না, দুঃখ কষ্ট বা অভাব মানুষকে যত আক্কেল দিতে পারে, বয়সে তা দিতে পারে না। তুমি তো একে বাচ্চা আদ্‌মি—তাহাতে—যাক্, শোন। মরিতে উদ্যত কতবার আমিও হইয়াছি, রেলে পড়িয়া বা জলে ডুবিয়া মরিবার প্রলোভন যে কতবার আমায় আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? কিন্তু হাথ মরিতে পারি নাই!

কেন পারি নাই?—অবশ্যই তখন মন বলিয়াছে 'পাপ হইবে',—গত জন্মের কত পাপের ফলে এজন্মে এত শাস্তি পাইতেছি,—আবার কেন পাপ করিতেছ?' এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সত্যই কি তাই? শুধু পাপের ভয় কি? ইহার মধ্যে প্রাণের মায়াই কি ওই কথাগুলায় জোর দিত না?

"অনেক বেশি বলিতেছি—নয়? আমার এসব কথা ত কেহ কখনও শুনিতে চায় না, তুমি কেন এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিতে চাও বাবু? এই ঘৃণিত জীবনের নির্লজ্জ ইতিহাস, ইহাতে তো কোন নূতন কথা নাই,শুনিয়াই বুঝিতেছ তোমার এমন আশ্চর্য্য বা ভাল—কিছুই লাগিতেছে না। পৃথিবীতে কত ভাবে কত মানুষ নষ্ট হইয়া যায়,—কে তাহার খোঁজ লয় বা খোঁজ পাইয়াও দৃষ্টি দেয়?—কিন্তু জানিও যে নষ্ট হয়—যাহার জীবন বিফল হয়, তাহার সবই বিফল—পৃথিবীও তাহার পক্ষে নষ্ট হইয়া যায়। এত বড় সুখ-সৌন্দর্য্যময় পৃথিবী—তাহাদের কাছে মাটি বৈ আর কিছুই নয়!—লোকের মুখে হাসি দেখিয়া এখন আমার হাসি পায়; আশ্চর্য্য বোধ হয়, আমিও একদিন হাসিয়াছি—খুব বেশিই হাসিয়াছি;—কিন্তু এখন বিস্মিত হই—কেন হাসিতাম? কিসের জন্য হাসিতাম?—হাসিবার মত আমার কি ছিল?—না, এও আমার একটা ভুলই হয় ত? নিজের হাসি হারাইয়া আমি জগতের হাসি মুছিয়া দিতে চাই—নয়? এই কথাই ঠিক।—তবে এ কথাও সত্য যে, জগৎ যাহাকে বিফল করিয়া দিয়াছে—সেও জগৎকে বিফল করিয়া দিতে চায়! যে আমাকে তাহার সুখ-সম্পদের কাছ হইতে সরাইয়া দিয়াছে,—আমিও তাহাকে আমার কাছ হইতে সরাইয়া দিব। যদিও ইহাতে তাহার ক্ষতি নাই; তাহার পক্ষে আমি অতি তুচ্ছ—অতি ক্ষুদ্র,—তথাপি আমার পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ;—পৃথিবীর ঐ বঞ্চনা, আমার পক্ষে এত প্রকাণ্ড—এত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, ধনজনপূর্ণ পৃথিবী তাহার তুলনায় এতটুকু!—"

আমি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "শোন—থামো! তুমি ভুল করিয়াছ,—মস্ত ভুল! জান না তুমি—" তাহার বিকৃত ওষ্ঠে কেমন অদ্ভুত হাসি দেখা গেল। আমার কথায় সে সবেগে বাধা দিয়া বলিল, "থামো বাবু, তুমিও শোন,—তোমরা পণ্ডিত লোক, আর আমি মূর্খ চাষা; তোমরা আমার ভুল পদেপদে ধরিতে পার; তুমি আমার ভুল ধরিলে লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে। কিন্তু জানিও বাবু,—আমি তোমাদের কাগজে কালির আচড়-পাঁচড় হইতে কিছু না শিখিলেও, ভগবানের দাগায় হাত বুলাইয়া যাহা শিখিয়াছি—তাহা কেহ না বুঝিলেও সেটা সত্য,—অন্ততঃ আমার পক্ষে। তবে একটা কথা, সুখ আর দুঃখ—দুটা জিনিষে খুব পার্থক্য আমি আর বুঝিতে পারি না। সব যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক হইয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকুই বুঝিয়াছি যে,—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সুখ একটি প্রকাণ্ড ব্যবধান—আর মৃত্যু তাহার মিলন-সেতু। বোধ হয় আমার এসব ভাবনা ভুল; তোমরা এসব কথার সঙ্গত মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। আমি কেবল ভুলই বুঝিয়াছি। কিন্তু যাহা বুঝিয়াছি—তাহা আমার পক্ষে অল্প নয় বাবু? আমি এ সকল কথা কখনও ভাবি নাই, জানিতামও না। এখন মনে হয়—বাবু সাহেব, আমার কথা শুনিতে শুনিতে তোমার বিরক্তি লাগিয়াছে?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "না বিরক্তি লাগিবে কেন? বল—তারপর কি হইল বল।"

"হাঁ শোন, শেষ হইয়া আসিল এবার আমার কথা। কি বলিতেছিলাম? জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ? যাক্ সে কথা, পরের কথা বলি এবার। স্ত্রীর সহিত মনান্তর লইয়াও কিছুদিন চলিল। সে আমার কষ্টের চূড়ান্ত করিলেও আমি তাহাকে কখনও কিছু বলি নাই,—বলিলে সাজিবেই বা কেন? দিনান্তের একমুঠা অন্ন যে আমার তাহার উপরই নির্ভর করিত!

"অবশেষে আরও কঠিন কথা শুনিলাম। মাঝে মাঝে আমার রুগ্নশয্যার পাশে আমার দু-একজন আত্মীয় আসিয়া দাঁড়াইতেন; বোধ হয় আমায় সেই কথা ভাল করিয়া শুনাইবার জন্যই সে কয়দিন তাঁহারা ঘনঘন আসিয়াছিলেন। শুনিলাম,—আমার স্ত্রী দোস্‌রা ঘর করিবে! কাহার ঘর করিতে যাইবে—তাহাও শুনিলাম। কি বলিব বাবু? বুঝিতেছ কি আমার সেদিনের যন্ত্রণা? সর্ব্বাঙ্গের গলিতক্ষতের মুখে যেন কে বিষাক্ত আগুন ছোঁয়াইয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ কষ্ট আমার বেশী হইয়াছিল, বল দেখি?—সামর্থ্যহীনতার জন্য স্ত্রী অন্য-পুরুষের আশ্রয়ে যাইতেছে, পুরুষের চক্ষে এদৃশ্য বা কষ্ট সামান্য দুঃখ নয়;—কিন্তু সে কষ্টহইতেও আমার কি ভাবনা বেশি

হইয়াছিল, জান? আমার সব ভাবনা ডুবাইয়া, কেবলই ভয় হইতেছিল যে, সে চলিয়া গেলে এ অক্ষম রুগ্নের কি দশা হইবে? কে একঘটী জল দিবে—কে একমুষ্টি ছাতু ফেলিয়া দিবে। এই ভাবনাই আমার প্রবল হইল। মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা সেদিন যেমন হইয়াছিল, এমন আর কোন দিন হয় নাই। যদি চলিবার শক্তি থাকিত,—চুন্না, চুন্না, মা আমার; না মা, আমি তোমার কথাই রাখিব।"

বলিতে বলিতে সে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনায় আমিও ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম, "শোনো একটা কথা, তুমি জান কি? ঈশ্বর যা করেন—"

সে বলিল,—"হাঁ আমি জানি, ভগবান যাহা করেন, তাহা ভালর জন্যই—এই ত তুমি বলিবে?—আমিও তাহাই বলিতেছি। সন্ন্যাসীর কথায় আমার চুন্নাও যে সেই প্রলাপই ধরিয়াছিল!—শোন বাবু, শীঘ্র শুনিয়া লও।—সেদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'একথা সত্য কি না!' সে অম্লানমুখে স্বীকার যে,হাঁ,সে আর আমার ঘরের কষ্ট সহিতে পারে না; খাটিয়া খাটিয়া তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে,—ইত্যাদি। আমি আর কিছু বলিলাম না, তবু জিজ্ঞাসা করিলাম কন্যা কোথায় থাকিবে? সে বলিল, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে; শীঘ্রই বর খুঁজিয়া তাহার বিবাহ দিতে হইবে। তা যতদিন না হয়—যেমন আছে তেমনই থাকিবে।—

"তাহার পর,—যাহা ঘটিবার ঘটিল। সেদিন আর আমার স্ত্রী ঘরে ফিরিল না; ঘরে সন্ধ্যার দীপ আর জ্বলিল না। বাবু,—বুঝিয়া লও তুমি, একথা আর আমি বলিতে পারিব না! সন্ধ্যা ঘন হইয়া আঁধার হইয়া গেল, সাম্‌নের বড় তারাটাও আস্তে আস্তে পাহাড়ের নীচে নামিয়া গেল। আমি মুখ ফিরাইয়া শুইলাম। ভাঙ্গাচালের ভিতর দিয়া কালো-আকাশ দেখা যায়, জলভরা মেঘ আসিয়া যেন আমার চাল ছুঁইয়া দাঁড়াইয়াছে? জল আসিবে কি?—যদি আসে—এইখানে পড়িয়াই ভিজিতে হইবে। হউক্—ক্ষতি কি?—জীবনের ভাবনায় এত দুঃখেও আমার হাসি আসিল।

"অনেকক্ষণ পরে যেন মানুষের পায়ের শব্দ আসিল। কে আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিতেছে বুঝি?—মুখ ফিরাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। এমন সময় উঠানে শব্দ উঠিল,—"বাবা—বাবা!"

"এ কি—এ যে চুন্না! আমার চুন্না, সে আমায় বাবা বলিয়া ডাকিল? কি মধুর স্বর, এই কি আমার কন্যার স্বর?—এত মিষ্টি কণ্ঠ তাহার?—হাঁ সেই বটে। আছে, এখনও আমার কালো-আকাশে একটি তারা জাগিয়া আছে। চিৎকার করিয়া ডাকিলাম,—'চুন্না!'

'কি বাবা, এই যে আমি তোমার কাছে।'

"আমার গলিত-হস্তে তাহাকে স্পর্শ করিলাম; মুখে হাত দিয়া বুঝিলাম চুন্নাই বটে। আমার ঔরসজাতা—আমার দুহিতা—আমার চুন্না এই! সে আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত রাখিল। এই একটু স্পর্শে আমি তাহার হৃদ্‌স্পন্দনধ্বনির সমস্ত নিগূঢ় কথাটুকু বুঝিয়া লইলাম। আরও বুঝিলাম সেইদিন প্রথম,—ভগবান আছেন! দুঃখীর দুঃখেও চোখ দিয়া দেখিবার জন্য কোন দয়ালু, শক্তিময় কেহ আছেন! এই যে এত গ্রীষ্ম দেখিতেছ, কিন্তু ঐ আকাশে কেমন শীতল মেঘ দাঁড়াইয়া আছে, দেখিতেছ কি? বাবু সাহেব, আমি মূর্খ, তোমায় বুঝাইব কি!

"হাঁ তারপর; চুন্না আমার জন্য ভাত আনিয়াছিল—আমাকে দিয়া সেও খাইল। পরে আমার পাশে বিছানা করিয়া শুইল। আমি বলিলাম, 'তুই মনিব বাড়ী যাইবি না মা?'

"আমার কথা শুনিয়া সে একটু চুপ করিয়া থাকিল, পরে বলিল,—'আমি গেলে তোমায় কে দেখিবে বাবা?'

"তাহার কথা শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে যে কি হইল বুঝিয়া লও বাবু! অনেক কষ্টে চোখের জল থামাইয়া বলিলাম—'এখানে থাকিলে খাইবি কি চুন্না! আমার যে ক্ষমতা নাই—'

"সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ভয় কি বাবা, ঠাকুরজি আহার মিলাইবেন।' বলিয়াই আমার মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিল। ঠিক্ কথা, ঠাকুরজি আছেন বটে! যাহার কেহ নাই, তাহার তিনি আছেন, একথা বালিকার নিকট প্রথম শুনিলাম।

(৩)

"পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, মাথার কাছে একঘটি জল ধরা আছে —কিন্তু চুন্না নাই। কোথায় গেল সে?—মনিব-বাড়ী গিয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু আর কি সে আসিবে না? না না, কি অন্যায় ভাবিতেছি! যাক্, সে যেখানে সুখে থাকে থাক্। আমার ভাগ্য আমায় যে ভাবে রাখিবে, তাহাই ভাল;—সে কোমলা পুষ্প-কলিকাকে কেন এ দগ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের সহিত জড়াইতে চাই?—আমি নীরবে দুয়ারের দিকে চাহিয়াই ছিলাম;—দেখিলাম রাস্তায় একখানি গরুর গাড়ী আসিতেছে—তাহার সহিত চুন্না। সে গাড়োয়ানকে কি বলিতেছিল। গাড়ী আমার দুয়ারেই আসিয়া দাড়াইল। চুন্না নিকটে আসিল। আমি বলিলাম, —'এ গাড়ী কেন চুন্না?"

"একটু হাসিয়া চুন্না বলিল, 'বৈজ্-নাথজি যাইব বাবা!'

'বৈজ্নাথ জি! কেন?'

'সেখানে বেশ ভিক্ষা পাওয়া যায়; সকলে বলিল, তোর বাবাকে লইয়া সেখানে যা, দুজনেরই পেট চলিবে।'

এ গাড়ী কেন চুন্না

"ওঃ—এই ক্ষুদ্রা বালিকা আমার ভার লইতেছে! তৃণগ্রন্থি আসিয়া এই মজ্জমানকে আশ্রয় দিতেছে। আমার চোখে জল দেখিয়া বালিকা কাতর হইল,—নিকটে আসিয়া কহিল,—'সে তো পরের বেটী পর বাবা, তোমার আপন কন্যা থাকিতে তুমি কাঁদিবে কেন? তোমার দুঃখ কি, চল—আমি 'গোঁসাইজির থানে' ধরণা দিয়া তোমাকে ভাল করিব—ভয় কি?'

"কিছুক্ষণ পরে আমি স্থির হইয়া বলিলাম, 'এ গাড়ীর ভাড়া তুই কোথায় পাইবি চুন্না?'

'গাড়ীর ভাড়া! বাবা, চাক্‌রী করিয়া ত' কখন একপয়সাও লই নাই; দুবেলা দুটি ভাত খাইয়া কাজ করিয়াছি। তাই লালাজি আমায় পাঁচটা টাকা দিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী একখানি নূতন কাপড় দিয়াছেন, আর দুইখানি পুরানো কাপড় আগেই দিয়াছিলেন। মার কথা শুনিয়া তাঁহারা বড় দুঃখিত। কত কথা বলিলেন কা'ল। তাঁহারাই ত বৈজ্নাথ যাইতে বলিলেন। একটাকা দিয়া এই ফিরতি গাড়ীখানি তিনিই করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কন্যা ও জামাইও এই সঙ্গে দেওঘর যাইবেন। চল বাবা, কোন ভাবনা নাই।'

"অত দুঃখের মধ্যেও যেন সুখের হাওয়া বহিয়া গেল। লালাজির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভ-প্রার্থনা রাখিয়া কন্যার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

"তাহার পর দেওঘরে আসিয়া কোনদিন অন্নকষ্ট পাই নাই। সারাদিন বাবার ধামে পড়িয়া থাকিতাম। চুন্না ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। তাহাতেই দুইজনের পক্ষে যথেষ্ট হইত। দুইবৎসর এইভাবেই গেল। ক্রমে আমার শরীরের ক্ষত শুখাইয়া আসিতেছিল, লাঠির উপর ভর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে কষ্ট হইত না; কিন্তু একটা ভাবনায় ক্রমেই আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। চুন্নার বিবাহের বয়স হইয়াছে, এ বয়সে আমাদের দেশের মেয়েদের 'গাউনা'ও হইয়া যায়; আর আমার মা, এই হতভাগা বাপের জন্য কি চিরদিন এমনই ভিখারিনীর মতই ঘুরিয়া বেড়াইবে! কুলরক্ষা—জাতি রক্ষা—কিন্তু হায় ভগবান্! এই স্নেহশীলা বালিকা না থাকিলে আমার কি হইবে?

"কিন্তু এ ভাবনা বেশি দিন ভাবিতে হইল না। শোন, শোন বাবু, শীঘ্র শুনিয়া যাও—এইবার আমার এ পাতক-গ্রস্ত-জীবনী শেষ হইয়া আসিয়াছে! তেস্‌রা-সনের প্লেগের গল্প শুনিয়াছ কি? দেওঘরের পাণ্ডাবংশ উৎসন্ন গিয়াছিল সেই প্লেগে। বাঙ্গালী-বাবুরা সব পলাইয়াছিল; কিন্তু বাসিন্দারা কেউ পালায় নাই। ফলও হইয়াছিল তেমনই, যা ছিল তার অর্দ্ধেকলোকও দেওঘরে নাই! আমি আর যাইব কোথায়?—আর অতশত জানিতামও না বাবু, 'পিলেগ কারণ'—না কারণ, সব 'কারণেই' ত মানুষ মরে; তা ইহাতেও মরিবে—তাহাতে পলাইব কেন? পিতা-কণ্ঠায় গিয়া বাবার মন্দিরের পাশে পড়িয়া থাকিতাম। উঃ, কি ভয়ানক মড়ক বাবু! ঐ বড় পুষ্করিণীটির পাশে দিনরাত মড়া পুড়িত—অবশেষে, তাও না; মুখাগ্নি করিয়া ফেলিয়া যাইত! শুনিয়াছি তোমাদের বাঙ্গ্‌লা-মুলুকে এই সব ছোঁয়াচে-রোগে মৃত-মানুষকে ফেলিতে লোক জুটে না; কিন্তু আমাদের দেশে তা নয়—সহজে কাহারও অগতি হয় না। যাহার কেহই নাই, ভিন্নজাতিতেও তাহার সৎকার করে।

"হাঁ, যা বলছিলাম—কথা! সেদিন সকালবেলায় চুন্না উঠিতে পারিল না; বলিল, 'বড় মাথা দরদ করিতেছে।'

"হাত দিয়া দেখিলাম, গা গরম। বুঝিলাম কা'ল রাত্রিতে ভিজিয়া—ভিজামাটিতে শুইয়া, তাহার জ্বর আসিয়াছে। তারপর, আর কি বলিব? আমার চুন্নাকেও ঐ কালরোগে ধরিল। আমাকে ছুঁইয়াও গেল না—লইল আমার প্রাণপুত্তলিকে—আমার আন্ধার নয়নকে! ও বাবু—আমার মা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতে, অজ্ঞান হইয়া পড়িল; একটু জ্ঞান হয়, আর যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। বার বার—"

হতভাগ্য যন্ত্রণায় কাঁপিতেছিল! একটু দম্ লইয়া আবার বলিল—"কাঙ্গাল আমি, ডাক্তার-বৈদ্য কোথায় পাইব? একে তো গ্রামে কেহই ছিল না, তবু সরকারী-ডাক্তারখানায় ডাক্তারবাবু আছেন; কিন্তু পয়সা পাইব কোথায়? মন্দিরের পাশে বটগাছতলায় একজন সাধু থাকিতেন—মাঝেমাঝে, গরীবদুঃখীর রোগে চিকিৎসাও করিতেন। আমি ছুটিয়া তাঁহারই কাছে গেলাম। তিনি শুনিবামাত্র আসিলেন; কিন্তু সে কালরোগ—মানুষে তাহার কি চিকিৎসা করিবে? এই সময় চুন্নার একটু জ্ঞান হইয়াছিল, ধীরে ধীরে ঠোঁট নড়িতেছিল। তাহাকে জল দিয়া আমি সাধুকে বলিলাম, "আমার এ কি হইল বাবা? বৈদ্যনাথ আমার এ কি করিলেন?"

"নিশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তিনি যাহা করেন তাহা ভালরই জন্য—মঙ্গলের জন্য।'

"এমনই কি কথা—তিনি বুঝি আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন। চুন্নার কাণে বুঝি সেই কথাটাই ঢুকিয়াছিল। প্রলাপে সে কেবলই ঐ কথা বলিয়াছিল, 'ভগবান যা করেন ভালর জন্য—ভালর জন্য।' ও বাবু, সে চীৎকার যে এখনও আমার কাণে বাজিয়া উঠিতেছে। সে কথা কি আমি কখনও ভুলিব? মা—ও মা, কি ভাল আমার হইয়াছে, তাহা আমায় বুঝাইয়া কেন গেলি না মা? তোকে হারাইয়া আমি কি পাইলাম, তাহা আমায় কে বলিবে মা?"

হতভাগ্য কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। একটিও সান্ত্বনার কথা আমার মুখে আসিতেছিল না। সত্য—মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছার গুপ্তমর্ম্ম আমরা কেহই বুঝিতে পারি না। জানি না, এই দুঃখীর বিফল—ব্যথিত জীবনের পরিণতিতে তাঁহার কোন্ মঙ্গলউদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে—বুঝি না;—কিন্তু

না বুঝিলেও তখন, কেবল তাঁহার চরণেই অন্তর নত হইতেছিল; জিহ্বার অনুচ্চারিত-বাণী শুধু তাঁহাকেই ডাকিয়া এই অশ্রুসাগরমগ্নের প্রতি করুণাপ্রার্থনা করিতেছিল। দয়াময়!—

* * * *

তখন, অস্তর্নিহিত সূর্য্যের তপ্তকিরণচ্ছটায় চারিপাশ সাজাইয়া দলে দলে জলভরা কালোমেঘ আসিয়া পশ্চিম-আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনতিদূরে মেঘচ্ছায়া-কৃষ্ণ পর্ব্বত-তলে ক্রমোচ্চ-বিন্যস্ত নগরীর চিত্রবৎ-সৌন্দর্য্য! পথে দুইচারিটি পথিক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বলিল, "এইবার আমি যাই বাবু! তোমার দয়া চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে।"

যদিও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছিল, কিন্তু মুখে কথা আসিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "এখন যাইবে কোথায়?"

"বাবার দুয়ারে! আর কোথায় যাইব বাবুজি? সেই ঘটনার পর, ওঃ, আমার মুখের-ঘা খুব বাড়িয়া উঠে;— কিছুই খাইতে পারিতাম না; কেই বা দিবে? তবু দয়ালু লোকেরা যা কিছু বাবার-প্রসাদ, দুধ, গঙ্গাজল আমার মুখে দিতেন, তাহাও খাইতে পারিতাম না। খুব গন্ধ হওয়ায় পাণ্ডারা আমার বাবার মন্দিরের বাহিরে সরাইয়া দিল— গাছতলায় পড়িয়া মরিতেছিলাম।—"

কি ভয়ানক! আমার বুকের রক্ত যেন স্থির হইয়া উঠিতেছিল! "তারপর?—"

"তারপর বাবু! হাঁ, এখানের হেডমাষ্টার বাবুকে জানেন? সেই বাবু—তিনিই জানিতে পারিয়া, লোক-দিয়া আমাকে তাঁহাদের কুষ্ঠাশ্রমে লইয়া যান। চিকিৎসা করিয়া এই দেখুন, আমার সব ঘা ভাল করিয়াছেন। সেইখানেই ছিলাম। তারপর ঘা ভাল হওয়ায়, আর সেখানে আরও রোগী আসায় তাঁহারা আমায় বিদায় দিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন, আপনার মঙ্গল করুন—যাঁহারা গরীবের উপর দয়া করেন—ঠাকুরজি তাঁহাদের সকলের কুশল করুন। আমরা তো সংসারের কাহারও কিছু অনিষ্ট করি না; তবে লোকে আমাদের দেখিয়া রাগে কেন? শুধু শুধু আমাদের কষ্ট দেয় কেন? একটু মিষ্টকথা বা একমুঠি চাউল পাইলেই ত আমরা সুখী; তবে লোকে আমাদের কে দেখিয়া বিরক্ত হয় কেন বাবুজি?"—

মনে শতশত প্রশ্নোত্তর উঠিতেছিল; কিন্তু প্রশ্ন-উত্তর, চিন্তা-বিবেচনা, এ সকলের ঊর্দ্ধ হইতে—আমার জ্ঞানেরও সীমার উচ্চপ্রান্ত হইতে—স্খলিত একবিন্দু-শিশিরকণা আসিয়া আমার হৃদয়ে ও নয়নপ্রান্তে সঞ্চিত হইয়াছিল। তাহারপর সেই দীনহীনের মর্ম্ম-বিগলিত করুণস্বরের মঙ্গল প্রার্থনায়, কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা আসিয়া সেই জলকণার উপর পড়িয়া, বিচিত্র-রঞ্জিত বর্ণচ্ছত্রোজ্জ্বল রামধনুর সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিতেছিল;— প্রশ্ন-কুহেলিকা নিমেষে অন্তর্দ্ধান করিল!

বেদনা ও কৃতজ্ঞতা—উভয়-ভাবোচ্ছল নয়নে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ভিখারী চলিয়া গেল। অসহ্য উত্তাপময়, ও দুঃখীর জীবনের অসহনীয়-বেদনার কাহিনীর সহিত জড়িত গ্রীষ্মমধ্যাহ্ন তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণের তৃণ-শূন্য, রক্তবর্ণ, তরঙ্গায়িত দীর্ঘপ্রান্তরমুখ হইতে জলকণা-স্পৃষ্ট শীতলবায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; দূরে—নগর মধ্যে পরিস্ফুট জনকোলাহল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুস্থানী; স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা দলবদ্ধ হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে—কেহ কেহ উচ্চকণ্ঠে ভজন ধরিয়াছে—

"দেশ দেশ ছোড়কে বাবা বন মে লিহিন্ ঘর—
দুখীয়া কা ঠাকুর মেরা ভোলা মহেশ্বর।—
হো হো কাশী—বৈদ্যনাথ—বাবা বিশ্বেশ্বর।"

অজ্ঞাতে আবার আমার মস্তক নত হইল! উঠিয়া দেখিলাম, আর বেলা নাই—রৌদ্র নামিয়া নিবিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি কাপড় লইয়া, তখনই 'কুষ্ঠাশ্রম' দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

"সেবা-সদনে" বঙ্গমহিলা

[শ্রীশরৎরেণু দেবী—মিসেস্ এ. সি. মুখার্জ্জি]

বোম্বাইয়ের গামদেভী নামক স্থানে "সেবা-সদন" স্থাপিত। আমাদের দেশের কি সুশিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা মহিলাগণ, বোম্বাইয়ের 'সেবা-সদন' বা তাহার কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে বোধ হয় কিছুই অবগত নহেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তাই সেবা-সদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিগত ইংরাজী ১৯০৮ সালে সেবা-সদন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহানুভব মালবারী ইহার প্রতিষ্ঠাতা; তিনি ইহার উন্নতিকল্পে নিজের অর্থ ও সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ের কিছুদূরে, মালাড নামক একগ্রামে, সেবা সদনের আর একটি বাড়ী ছিল; সেইখানে ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের রাখা হইত এবং বোম্বাইয়ের সেবা সদনে বড় মেয়ে, কুমারী সধবা ও বিধবা আছে। ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল, মেয়েদের লেখাপড়া ছাড়া অনেক কাজ শিখান হইত একজন জাপান জাপানী দেশের রেশমের ভাল ভাল কাজ শিখাইত; একজন বেগম জরীর কাজ শিখাইতে আসিতেন।

যাহারা জরীর এবং রেশমের কাজ ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন সেই জরীর এবং রেশমের কাজ করিয়া সংসার-যাত্রানির্ব্বাহ করিতেছেন।

সেবা-সদনের খুব বড় হাসপাতাল ছিল। মেয়েরা নার্সের কাজ শিখিত, এবং তাঁহাদের বেতন দেওয়া হইত। যে সমস্ত স্ত্রীলোক হাসপাতালে—প্রসবের পর—মারা যাইতেন কোন অভিভাবক না থাকিলে, তাঁহাদের শিশুদিগকে সেবা-সদন লালন পালন করিত। সেবা-সদনের হাসপাতাল কেবল গরীবদিগের জন্য ছিল; গরীবদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও হাসপাতালে রাখা হইত এবং যেসকল গরীবের মেয়ে নার্সের কাজ শিখিতে আসিত, তাহাদের বেতন দেওয়া হইত।

অন্য হাসপাতালে নার্সের কাজ শিখিবার সময় বেতন দেওয়া হয় না। যে কয় বৎসর শিখিতে হইবে ততদিন তাঁহাদের মাসে ২০৲ টাকা দিতে হয়; পাস হইলে তাহার পর বেতন দেওয়া হয়; কিন্তু সেবা সদনের উদ্দেশ্য গরিবদের সাহায্য এবং গরিবের দুঃখ দূর করা; তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই নার্সদের বেতন দিতেন।

পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকাদের রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া বড়লোকের ছেলেদের মতন রাখিতেন। একবার, একটি ২।৩ মাসের মেয়েকে এক গাছতলায় কুড়াইয়া পাওয়া যায়। এখন সে তিন চারি বৎসরের। কিন্তু এই গরিবদের এত সুখ সহিল না; আজ দুই বৎসর হইল গরিবদুঃখীর পরম বন্ধু মালবারী দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন।

এখন পূর্ব্বের ন্যায় রেশমের কাজ, জরীর কাজ, তাঁতের কাজ, মোমের কাজ শিখান হয় না; কারণ, শিক্ষয়িত্রীদের বেতন দিবার অবস্থা আর সেবা-সদনের নাই! এখন হাসপাতালও নাই, কেবল একটি ছোট ডিসপেন্সারী আছে—গরিবদিগকে ঔষধ দেওয়া হয়; একজন পার্শী লেডীডাক্তার বিনাবেতনে সেবা সদনে চিকিৎসা করেন।

এখন মালাড-আশ্রমের ছেলেরা বোম্বাইয়ের সেবা-সদনে আসিয়াছে। তাহাদের লেখা-পড়া ছাড়া বেতের কাজ ও অন্যান্য আবশ্যক শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের মোজা-বুনা, সেলাই, কাটিং এবং ক্রুসের কাজ শিখান হয়। সেবা-সদনের মেয়েরা ছাড়া, বাহিরের অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয়া গরিব মেয়েরা সেলাই এবং মোজা-বুনা শিখিতে এখানে আসেন; জামা-কাটা ও সেলাই শিখাইবার জন্য ৪০৲ টাকা বেতনের একজন দর্জ্জী আছে। বাহির হইতে যে সব মেয়েরা সেলাই করিতে আসেন, তাঁহারা এক একজন মাসে প্রায় ২০।২৫৲ টাকা করিয়া পান; অনেক গরিব অথচ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা এইরূপে আপনাদের বৃদ্ধ পিতামাতা, ছোট ছোট ভাইবোনদের প্রতিপালনের ও লেখাপড়া-শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে সক্ষম হয়েন।

সেবা-সদনের 'হোম-ক্লাস'

'হোম-ক্লাসে' গৃহস্থলোকের মেয়ে-বৌরা শিখিতে আসেন। 'হোম-ক্লাস' যখন স্থাপিত করা হয়, তখন অন্যান্য স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ বাধা দিয়াছিলেন পাছে 'হোম-ক্লাস' খুলিলে তাঁহাদের স্কুলের মেয়েরা সেখানে যায়। সেইজন্য 'হোম-ক্লাসে' নিয়ম করা হইয়াছে, যে, ছোট মেয়ে লওয়া হইবে না, কেবল বিবাহিতা ও বড় কুমারীদিগকে 'হোম-ক্লাসে' মারাটি, ইংরাজী, সাধারণ শেলাই, সামান্য আর্ত্তসেবা যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি আবশ্যক, ও গান, গীতা শিখান হয়; অন্যান্য মেয়েদের সুবিধার জন্য বারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা 'হোম-ক্লাসে' আসেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বিবাহিতা ও অনেকেরই পুত্রকন্যা হইয়াছে। তাঁহারা সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শিখিতে আসেন; বেতন নামমাত্র লওয়া হয়; মাসিক দুইআনা চারিআনা যাঁহার যাহা ইচ্ছা ও সাধ্য তিনি তাহাই দিয়া থাকেন।

সেবা-সদন যে মেয়েদের কেবল লেখাপড়া বা শিল্পকার্য্য শিখাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে; মেয়েদের সম্মতি লইয়া তাহাদের জাতীয়-রীতিঅনুসারে সুপাত্র অন্বেষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালক সেবা-সদনে রাখা হয় না, দশ বৎসর বয়স হইলেই তাহাদিগকে অন্য অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সেবা-সদনের 'নর্ম্মাল-ক্লাস'

নর্ম্মাল-ক্লাস মাষ্টারদিগের সুবিধার জন্য সকাল ৬টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত খোলা হয়। নর্ম্মাল-ক্লাসে মারাটি, সামান্য শেলাই, গান, কিছু ডাক্তারীর বিষয় মেয়েদের শিখান হয়। নর্ম্মাল-ক্লাসে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের কম বয়স্ক মেয়ে লওয়া হয় না। নর্ম্মাল ক্লাসের মাষ্টারেরা অধিকাংশই বিনাবেতনে কাজ করেন।

ডাক্তার ঢোলসে ও ডাক্তার মিসেস বাহাদুরজী বিনাবেতনে এখানে ডাক্তারি শেখান। ইঁহাদের আরও একটি নর্ম্মাল ক্লাস আছে; সেটা গুজরাটিদিগের জন্য। নর্ম্মাল-ক্লাস, হোম-ক্লাস, ছাড়া সেবা-সদনে ইংরাজী, গুজরাতি, সেলাই, মোজা বুনা, টাইপ-রাইটিং, নার্সিং ক্লাশ আছে; এবং এখনও অনেক মেয়েকে সেবা-সদন মাসে ২০৲ টাকা দিয়া অন্য হাসপাতালে নার্সের কাজ শিখান।

'চাল'-শিক্ষক

'চাল' কথাটির একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। এখানে অধিকাংশ ভাড়াটিয়া বাড়ীই ৫।৬ তলার কম নহে। এক

গৃহহীনের গৃহ

একটি বাড়ীতে ৫০০।৬০০ ঘর থাকে। ঐ সকল বাড়ীকে 'চাল' বলে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অবস্থার লোকে স্ত্রী পুত্র লইয়া এই সকল চালে বাস করেন। ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলে, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে শিক্ষার কোন উপায় নাই; তাহার প্রথম কারণ অর্থাভাব (একজন শিক্ষয়িত্রী ন্যূনপক্ষে মাসিক ২০৲ টাকার কমে বাড়ীতে পড়াইতে আসিবেন না); আর এক অসুবিধা সময়াভাব। সাধারণ গৃহস্থ বা দরিদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরা কচিকাচা ছেলে লইয়া ব্যস্ত থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে স্কুলে যাইয়া লেখাপড়া শেখা অসম্ভব; অথচ ধনী পরিবারের মহিলাদিগের অপেক্ষা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারেরই শিক্ষার বেশী দরকার। এই অভাব দূরীকরণার্থ সেবা-সদন হইতে 'চাল-শিক্ষক' নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এই মহিলা-শিক্ষকেরা 'চাল'বাসী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের মহিলাদিগকে তাঁহাদের সামান্য অবসরকালে লেখাপড়া শিক্ষা, সূচকার্য্য ইত্যাদি বিনা অথবা সামান্য পারিশ্রমিকে শিক্ষা দেন। কলিকাতা এত বড় সহর; এবং এখানে এত গণ্য মান্য ভদ্র ও শিক্ষিতা মহিলার বাস

সত্ত্বেও, যে তাঁহারা তাঁহাদের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভগিনীদিগকে শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন না, ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়।

মালবারীর মৃত্যুর পর, মিঃ দয়ারাম গিডুমল্ ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিলে, মাননীয় লালুভাই শ্যামলদাসের পরামর্শ এবং কুমারী ইঞ্জিনিয়র্ ও ভগিনী সুশীলাবাইয়ের কার্য্যদক্ষতাগুণেই ইহা রক্ষা পায়।

যাহারা বিনাবেতনে সেবা সদনে শিক্ষা দেন, কেহ তাঁহাদের অল্পশিক্ষিতা মনে না ভাবেন; কারণ, তাঁহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তা মহিলা। তাঁহারা পারিশ্রমিক লইয়া চাকরি করিলে, মাসে দুই-তিন শত টাকা সহজেই উপার্জ্জন করিতে পারেন; কিন্তু পরের জন্য যাহাদের প্রাণ কাঁদে, সাধারণের কার্য্যে যাহারা জীবন উৎসর্গ করেন, তুচ্ছ রজতখণ্ড তাঁহাদের প্রলোভিত করিতে পারে না। সেবা-সদনের সুশিক্ষিতা দরিদ্রকন্যাদিগকে, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাতি শিক্ষিত যুবকগণ বিনাপণে বিবাহ করিয়া সেবা-সদনের বিশেষ উপকার করেন। আমাদের দেশের একজন যুবক বি. এ. পাস করিয়া—দরিদ্র ত দূরের কথা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা পর্য্যন্ত—বিনাপণে বিবাহ করিয়া উপকার করেন না। আমাদের দেশে যদিও কোন উদার-হৃদয় যুবকের মনে ঐরূপ সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, তথাপি পিতামাতার জন্য তাঁহারা সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। কিন্তু এখানকার যুবকগণ, বি. এ এম. এ পাস করিয়াও, দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন কন্যাদিগকে বিনাপণে বিবাহ করেন। ঐসকল কন্যাদের বিবাহের খরচ 'সেবা-সদন ফণ্ড' হইতে দেওয়া হয়; অধিকন্তু বিবাহের সময় ২।৩ খানি গহনাও সেবা-সদন হইতে ঐ দম্পতীযুগলকে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন ধনীলোকও এই বিবাহে সাহায্য করিয়া থাকেন; তাঁহারা চেষ্টা করিয়া পাত্রের সন্ধান করিয়া থাকেন এবং আর্থিক সাহায্যও করিয়া থাকেন।

বোম্বাইয়ের জনসাধারণও সেবা-সদনের অনাথ-বালক-বালিকাদিগকে বিশেষ কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায়ই খাবার, ফল ইত্যাদি ছেলেদের জন্য পাঠাইয়া দেন; কখন কখন বা নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া, সকলকে খাওইয়া যান।

সেবা-সদনের উদারহৃদয়া মহিলাগণ দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা পয়সার অভাবে করিতে পারিতেছেন না। তবে সুখের বিষয়, বোম্বাইয়ের মাননীয়া লাটপত্নী শ্রীমতী লেডী ওয়েলিংডন-মহোদয়া সেবাসদনের উন্নতিকল্পে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুইবার সেবা সদনে আসিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেকবারেই তন্ন-তন্ন করিয়া সেবা-সদনের বন্দোবস্ত দেখিয়া গিয়াছেন।— এমন কি, কিরূপ খাদ্য সেবা সদনের অনাথ বালকবালিকাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, তাহা জানিবার জন্য তিনি দেশীয় অন্নব্যঞ্জন নিজে খাইয়া দেখিয়াছিলেন।

আশ্রমের আশ্রিতগণ

সেবা সদনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য স্বর্গীয় মহাত্মা মালবারী ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন; তাহা ছাড়া দুই-খানি বাড়ীও দিয়া গিয়াছেন। ঐ বাড়ীদুইখানির ভাড়া ইত্যাদি হইতে সেবা সদনের ব্যয়ের কতকাংশ নির্ব্বাহ হয়; বাদবাকী খরচের জন্য সেবা-সদনকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না; বোম্বাইয়ের জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ সেবা-সদনে মাসিক ও বার্ষিক চাঁদা দিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ের কতিপয় শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্তা মহিলাও মাসিকসাহায্য করেন ও তাঁহারা নিজে সেবা-সদনের বালিকা, ও বিধবাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিতভাবে সেবা-সদনে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐরূপ সাহায্য না পাইলে, সেবা-সদন-সমিতির এখন এমন অর্থবল নাই যে, তাঁহাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলা-শিক্ষয়িত্রী বেতন দিয়া রাখিয়া,

সেবা-সদনের আশ্রমের মেয়েদের ও যাহারা বাহির হইতে শিখিতে আসে, তাহাদের শিক্ষা দিতে পারেন।

যেসকল কুমারী ও বিধবা মেয়েরা আশ্রমে বাস করেন, তাঁহাদের সকলকেই যে সেবা-সদনে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নহে; যাঁহারা স্কুলে গিয়া শিখিতে চান, তাঁহাদের স্কুলে পাঠান হয় ও মাহিনা ইত্যাদি সেবা-সদনফণ্ড হইতে দেওয়া হয়।

অনেক কুমারী বালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সেজন্য উপস্থিত মেয়ের সংখ্যা সেবা-সদনে খুব কম; হিন্দু-আশ্রমে এখন ১৬ জন ও পারশী-আশ্রমে ৭ জন আছেন; এবং বালকবালিকা আশ্রমে ৩২টী দরিদ্র বালকবালিকা আছে।

সেবা-সদনে প্রতিপালিত হইয়া, লেখাপড়া শিখিয়া, অনেক শিক্ষিতামহিলা বিবাহিত হইয়া, সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক বড় বড় জেলায়, এইরূপ এক-একটি সেবা-সদন স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু খালি চাঁদার খাতায় সহি করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; ইহার জন্য কাজে-গতরে খাটিতে হইবে। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক অবৈতনিকভাবে সেবা-সদনে কার্য্য করিয়া থাকেন;—কেহ চাঁদা আদায় করেন, কেহ বাগানের তত্ত্বাবধান ও মালীদিগকে উপদেশ দেন, কেহ বাড়ী-ঘর মেরামত ইত্যাদির জন্য নক্সা ইত্যাদি করিয়া দেন ও মিস্ত্রিদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি একজন বিলাত ফেরৎ ডাক্তার প্রত্যেক বৃহস্পতি-বার সেবা-সদনে "গার্হস্থ্য-শুশ্রূষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। এই বক্তৃতায় সাধারণেও যোগ দিতে পারিবেন এবং যিনি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিয়া যথারীতি শিক্ষা করিবেন, তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে।

আমার যতদূর ধারণা, আমাদের দেশের ধনী বা শিক্ষিত সম্প্রদায় চাঁদার টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত হন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাগণ বোম্বাইয়ের পারশী, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটি

গামদেবী সেবা সদন

মহিলাদিগের উৎসাহ ও মহত্ব অনুকরণ করুন। তাহা হইলে অনেক পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা তাঁহাদের দয়ায় মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, অনেক বিধবার চক্ষের জল নিবারিত হইবে, অনেক অসহায়া কুমারী বালিকা পাপের পথ হইতে রক্ষা পাইবে।

আমার বিশ্বাস যে, দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত বালকবালিকা, বৃদ্ধবৃদ্ধা, কুমারী ও বিধবাদের সেবা করিলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। বাঙ্গালীর মেয়েদের প্রীতি-প্রবণতা প্রসিদ্ধ; শুধু তাই নয়, যে দেশ একসময়ে অতিথি-সৎকার, দরিদ্র-সেবা, দরিদ্রের দুঃখমোচন, অনাথ বালক-বালিকাদের আশ্রয় দান, ইত্যাদি কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সে দেশের উপস্থিত অবস্থা দেখিলে বাঙ্গালীজাতি দয়াধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন, বলিয়াই মনে হয়। সে অপযশঃ অচিরে অপনোদন করা বিধেয়।

মরুর মায়া

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, এম. এ.]

মরুপ্রান্তে তাহাদিগের বাস। শৈশব হইতেই, মরুভূমির তপ্ত-বালুকারাশির উপর ক্রীড়া করিয়া, তাহারা মরুভয় হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা বরাবরই শুনিয়া আসিয়াছে, দিক্ চক্রবালের বক্ষে কৃষ্ণপর্ব্বতের যে চূড়া পরম আরামে হেলিয়া আছে, তাহার অপরপার্শ্বে স্বর্ণখনি। এই খনি, তাহার অতুল-সম্পদ ও উজ্জ্বল-রূপ লইয়া, মরুভূমির ক্রোড়ে, মরুভূমির স্বর্ণবর্ণ বালুকারাশির মত, নিশ্চিন্তমনে বাস করিতেছে। কৃষ্ণপর্ব্বত, শান্ত্রীর মত, তাহার শিখরে দণ্ডায়মান ;—কাহাকেও তাহাকে স্পর্শ করিতে দিবে না। সে যেন পুরাকালের রাক্ষস—যে যায় তাহাকেই উদরস্থ করে। আজপর্য্যন্ত যতলোক ঐ ধনরাশির লোভে গিয়াছে, কেহই ত ফিরিয়া আসে নাই।

তাহারা ক্রীড়া করিতে করিতে কতবার ভীতভাবে ঐ পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে! কতবার তাহাদিগের ভয়বিকৃত শিশু-মস্তিষ্ক কল্পনাচক্ষে উহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছে ; এবং, এই কল্পনাকে সত্য মনে করিয়া ত্রস্তপদে, কম্পিতহৃদয়ে কতদিন তাহারা গৃহে ছুটিয়া আসিয়া জননীবক্ষে মুখ লুকাইয়াছে। কত রাত্রিতে স্বপ্নে উহার ভীষণ-মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া, চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে!

জ্যোৎস্না রাত্রি। তপ্ত-বালুকারাশি হইতে, ধূপের সুমিষ্ট গন্ধের মত, সুরভিরাশি উত্থিত হইয়া মন্দপবনে মিশিয়া যাইতেছে। দিগন্তবিলীন কৃষ্ণপর্ব্বতের শিখরদেশে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছিল। চন্দ্রদেও সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিয়া উঠিল, "হাঁ ভাই ভীমসিং! ঐ কৃষ্ণপর্ব্বতের ওপারের সোণার-খনির ধন লুট করে আন্‌লে হয় না? চল না, ভাই, তুমি আর আমি যাই।" ভীমসিংহ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, "ওখানে গেলে কি আর ফিরে আস্‌বে—যে যাবে? ঐ পাহাড় ত গিলে খেয়ে ফেল্‌বে।"

চন্দ্রদেও হাসিল, "এত ভয়, ভীমসিংহ? বীর আমরা; বাহুবলে ওর কাছ থেকে কি রত্ন জিনে নিতে পারবো না? ভাগ্যলক্ষ্মী ত তাকেই বরমালা দেন, যে তা পাবার জন্য সচেষ্ট হয়—যে তাঁকে জিনে নিতে পারে। চল ভাই, আমরা যাই।"

ভীমসিংহ উত্তর দিল না। তাহার প্রাণে তখন প্রেমের নূতন উন্মেষ, গৃহে তরুণী নববধূ ; তাহাকে ফেলিয়া এ নিশ্চিত-মৃত্যুর মুখে সে কেমন করিয়া যাইবে।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, চন্দ্রদেওর সোৎসুক মুখের দিকে তাকাইয়া ভীমসিংহ কহিল, "চন্দ্রদেও, পাগলামী কোরো না ; এ দুরভিলাষ ছাড়। কেন মৃত্যুর মুখে যাবে ভাই?"

চন্দ্রদেও হাসিল, কিছুই বলিল না। দুইজনে নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল ;—একজন একটি সলজ্জ মুখের মধুর দৃষ্টির কথা, অপরজন কৃষ্ণপর্ব্বতের অপর-পার্শ্বের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কথা ;—একজনের মানস-নয়নে একটি আরক্ত-সুন্দর তরুণ মুখ, অপরজনের কল্পনাচক্ষে বিস্তৃত স্বর্ণের প্রান্তর প্রতিভাত হইয়া উঠিল। দুইজনেই অন্যমনস্কভাবে, মুগ্ধনয়নে, স্মিতহাস্যে কহিয়া উঠিল, "কি, সুন্দর!" চমক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভীমসিংহ কহিল, "রাত্রি হ'ল ; চল, চন্দ্রদেও, বাড়ী যাই।"

একদিন গ্রামবাসী সকলেই শুনিল, চন্দ্রদেও গত রজনীতে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা চিন্তাসাগরে ভাসমান ;—পুত্রের কি হইল, কে জানে। ভীমসিংহ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিল ; তবে কি সে পাগল সত্যসত্যই ধনলোভে মরণ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে? হায়! বন্ধুকে সে কেন সেদিন তেমন করিয়া নিষেধ করে নাই, কেন তাহাকে বুঝাইয়া অনুরোধ করিয়া এ ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করে নাই? সে যখন চন্দ্রদেওর পিতা-মাতাকে সে রজনীর কথা জানাইল, তখন তাঁহারা আর অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না।

পুত্র কি আর ফিরিয়া আসিবে? সে যে জন্মের মত গিয়াছে!

প্রথম প্রথম চন্দ্রদেবওর বিচ্ছেদে ভীমসিংহ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তরুণী-ভার্য্যার ভালবাসায় অল্প-কালের মধ্যেই সেদুঃখ অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল। মাঝে মাঝে সে ভাবিত, "চন্দ্রদেও কি নির্ব্বোধের মত কাজ করিল! যে ধন আছে, কি নাই, তাহার উদ্দেশে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। গৃহে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল না। জীবনটা বৃথাই বিসর্জ্জন দিল।"

একদিন সন্ধ্যাকালে সে নির্জ্জনে মরু-প্রান্তে একটি কৃষ্ণ-প্রস্তরের উপর বসিয়াছিল। বালুকারাশি সন্ধ্যা-গগনের রক্তিমাভা আপন বক্ষে ধারণ করিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল; তপ্তবালুকার সুরভি ও দিবসের শেষ রক্তিমাভা মিলিত হইয়া, সমস্ত মরুভূমিখণ্ডকে একটী বিরাট্ রক্তশতদলের শোভায় সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।—কোন্ দেবতার অর্চ্চনার জন্য এ পুষ্প নিবেদিত হইয়াছে? কে সে রুদ্র, সুন্দর, মহাকাল, যাঁহার চরণতলে এ পুষ্প টলমল করিতেছে? ভীমসিংহের ভক্তি-মুগ্ধ হৃদয় তাঁহার চরণতলে আপনা হইতেই ভয়ে, সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়িতেছিল। সে ভাবে-বিভোর, এমন সময় কে ডাকিল—পরিচিত, প্রিয়কণ্ঠে কোথা হইতে ধ্বনিত হইল "ভীমসিংহ! ভাই!" এ স্বর ত সে বহুদিন হইল শ্রবণ করে নাই? কোথায় সে শৈশব-বন্ধু, যৌবন-সুহৃদ চন্দ্রদেও? ভীমসিংহ চমকিয়া উঠিল,—সম্মুখে চন্দ্রদেও দাঁড়াইয়া। এ কি সত্য? না কল্পনা? চন্দ্রদেও কি সত্যই ফিরিয়াছে?—না এ তাহার প্রেতাত্মা? ভয়ে ভীমসিংহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই নীরব সন্ধ্যায়, নির্জ্জন মরুভূমি-প্রান্তে—এ কি ভয়ানক ব্যাপার! সে কি প্রেতের হাতে প্রাণ হারাইবে? রাজপুতের বীর-হৃদয় টলিয়া উঠিল।

"ভীমসিংহ! ভাই! এতদিন পরে দেখা; তবু চুপ ক'রে রৈলে যে? বন্ধুকে কি ভুলে গেলে?"

এ কি এ মায়াময়ী মরুভূমির মায়া? ভীমসিংহ নীরব, নিশ্চল। ভয়ে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, [illegible]রে বল নাই। চন্দ্রদেও-মূর্ত্তি অগ্রসর হইল; ভীমসিংহ অস্ফুট চীৎকার করিয়া সরিতে চাহিল—পারিল না।

"ওকি ভাই! অমন কচ্ছ কেন? ভয় পেয়েছ? আমি চন্দ্রদেও, আবার ফিরে এসেছি। চিন্‌তে পাচ্ছ না?"

এতক্ষণে ভীমসিংহের কথা ফুটিল, "চন্দ্রদেও, তুমি! বেঁচে আছ? আমি কি ঠিক তোমায় দেখ্‌ছি?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চন্দ্রদেও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ভয় পেয়েছ ভীমসিংহ! আমি চন্দ্রদেও—ভূতও নই, প্রেতও নই। জীয়ন্ত চন্দ্রদেও সশরীরে ফিরে এসেছি। শুধু ফিরে এসেছি? না, ভীমসিং, ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় ক'রে নিয়ে এসেছি। এই দেখ তাঁর জয়মাল্য—মাথার মুকুট করে এনেছি!" চন্দ্রদেও তাহার জীর্ণ-মলিন-বস্ত্র হইতে একখণ্ড পীতবর্ণ প্রস্তরের মত কি বাহির করিল। বিস্মিত ভীমসিংহ চাহিয়া দেখিল বিশুদ্ধ, সুন্দর, স্বর্ণতাল ব্যতীত তাহা আর কিছুই নহে। সে নিকটস্থ হইল।

চন্দ্রদেও কহিতে লাগিল, এই দেখ, মরণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, কি রত্ন আহরণ করে এনেছি। আজ ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না: আজ অতুল সম্পদের সন্ধান এনেছি। কৃষ্ণপর্ব্বতের মায়াচক্র এড়িয়ে, বিজয়ীবেশে ফিরে এসেছি, দেখ। ভাই, কি বল্‌ব, কি সম্পদ সেখানে! একা একা তার কি সম্ভোগ করব? তাই ছুটে এসেছি, তোমাকে তার অংশ দিতে। এস ভাই, আজ ভাইকে আবার বুকে নেও; অনেকদিন পরে কাছে পেয়ে হৃদয় তৃপ্ত হোক।"

ভীমসিংহ বন্ধুকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সজলচক্ষে কহিল, "এস ভাই, বিজয়গর্ব্বে ঘরে ফিরে এস। বুড়ো বাপ-মা কেঁদে কেঁদে অন্ধপ্রায়। নয়নের মণি তুমি তাঁদের; চল তাঁদের নয়ন জুড়াও।"

গৃহে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। পুত্রহারা পিতামাতা, হারানিধি প্রাপ্তহইয়া, যেন নূতনজীবন প্রাপ্ত হইলেন।

সেদিন গভীর নিশীথ পর্য্যন্ত দুই বন্ধু একত্র হইয়া গল্প করিল;—সে কত সুখ-দুঃখ, কত আশা-নিরাশার কথা। পথের কথা, পথশ্রমের কথা, স্বর্ণখনি-প্রাপ্তির কথা, তাহার অতুলঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়া বলিয়া তাহার যেন তৃপ্তি হইতেছিল না। ভীমসিংহও অতৃপ্ত-হৃদয়ে, পরম আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল। চন্দ্রদেও যখন কহিল, "এবার তুমি আর আমি যাব, কেমন? এখন আর কিছু কষ্ট হবে না। পথ আমি চিনে নিয়েছি, পথে নিদর্শনও রেখে এসেছি।

প্রচুর পরিমাণে জল সঙ্গে থাক্‌লেই হ'ল। আর কোন ভয় নেই। কেমন, যাবে?" তখন ভীমসিংহ আর আপত্তির সুর তুলিল না। স্বর্ণের রূপ দেখিয়া, তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই ধনলাভ করিয়া, তাহার ভবিষ্য-জীবন কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, কল্পনা-চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। অর্থ তাহাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিবে, তাহার সুন্দরী পত্নীকে লক্ষ্মীশ্রীতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে! হায় বেচারী, দরিদ্রের পত্নী হইয়া কতই শ্রমে না দিন কাটায়!

কিন্তু তাহারা যখন যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন পরিবারস্থ কেহই সম্মত হইলেন না। চন্দ্রদেওর বৃদ্ধ পিতামাতা হারানিধি পুনঃ হারাইবার ভয়ে পাগলপ্রায় হইয়া উঠিলেন। পার্ব্বতী ত কাঁদিয়াই আকুল! সে ঐশ্বর্য্য চাহে না, সে ভীমসিংহকেই চাহে!

কিন্তু যুবকদ্বয় কি এতই মুর্খ যে, লক্ষ্মীকে, হাতের কাছে পাইয়া, পায়ে ঠেলিবে? কখনই নহে! তাহারা যাইবেই —সম্মতি না পায়, ত গোপনে পলাইবে। একদিন গভীর রজনীতে, কাহাকেও না বলিয়া, সুপ্তিমগ্ন, নিশ্চিন্তচিত্ত আত্মীয়-স্বজনের বিশ্বাসকে পদদলিত করিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

একমাস পরে কৃষ্ণপর্ব্বতের অপরপার্শ্বের মরুপথে ভারবাহী দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। অগ্রগামী মূর্ত্তির হস্তে একটী জলপাত্র—তাহার কি ভীষণ আকৃতি! দেহ কঙ্কাল-সার, অক্ষি কোটরগত, কেশজাল ধূলি-ধূসরিত, গতি বৃদ্ধের ন্যায় অস্থির। এই কি সেই কান্ত, সুন্দর, তরুণ যুবক চন্দ্রদেও? লোলজিহ্ব, রক্তবর্ণ-চক্ষু, পাগলের মত চলিয়াছে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, বদ্ধস্বরে বিকট রব করিয়া, সঙ্গীতকে উপহাস করিতেছে। পশ্চাদ্‌গামী ভীমসিংহেরও বিবর্ণ মুখমণ্ডল, ক্লান্তদেহ, শ্রান্তচরণ—ভীষণ পরিশ্রমের পরিচয় দিতেছিল।

চন্দ্রদেও পশ্চাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "জল খাবে?" ভীমসিংহ উত্তর করিল "এখনই? এই সকালে এত জল খাব? তবে দুপুরে কি হবে? জল ত প্রায় ফুরিয়ে এল!"

পদতলে তপ্তপ্রস্তর সূর্য্যতাপে ফাটিয়া শতধা হইয়া গিয়াছে। কোথাও শ্যামলের চিহ্ন নাই—শুধু বালুকা-রাশি ও রক্তকৃষ্ণ-প্রস্তরখণ্ড ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখনও বেলা বেশী হয় নাই; ইহারই মধ্যে সূর্য্যদেব প্রচণ্ড-প্রতাপ প্রদর্শন করিতেছেন; কিরণচ্ছটা নীলগগনে ছড়াইয়া পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। অসীম নীল যেন অগ্নিগর্ভ নীলকান্তমণি, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। পদতলে বালুকাকণা ক্ষুদ্রবক্ষে সূর্য্যকিরণ ধারণ করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে; সে হাসি হীরককণার মত জ্বলিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে জ্যোতিঃবিকীরণ করিতেছে। স্নিগ্ধ শ্যামল কিছু নাই! কেবল জ্বালা! চতুর্দ্দিকেই শুধু কিরণ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে;—শুভ্র; উজ্জ্বল, অসহনীয়!

তাহারা কেবল চলিয়াছে। চন্দ্রদেওর শরীর জ্বরে কাতর, তাহার উপর এই উত্তাপ, এই পরিশ্রম তাহার মরুপিপাসাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সে জলপাত্রটী তুলিয়া ঘন ঘন মুখের নিকট ধরিতেছিল। তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িতেছিল, নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল, শরীরে অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতেছিল।

চন্দ্রদেও জলপাত্রটী মুখের নিকট ধরিল। ভীমসিংহ পশ্চাৎ হইতে বজ্রস্বরে কহিল "চন্দ্রদেও, জল আর খেয়ো না।"

কাতরকণ্ঠে চন্দ্রদেও ভিক্ষা করিল "একটু! বড় পিপাসা যে ভাই!"

"আমার কাছে ওটা দাও! তুমি এগুলি ধর!" ভীমসিংহ আপনার হস্তধৃত একত্রবদ্ধ খনন-অস্ত্রগুলি অগ্রসর করিয়া দিল।

চন্দ্রদেও বিকট স্বরে কহিল, 'না! না! ওটা বড় ভারী; আমি নিতে পারব না! আমি জল আর খাব না। এটা আমার কাছেই থাক্!"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহিত হইল। চন্দ্রদেও আবার পানপাত্রটী মুখের কাছে উঠাইল;—"ঐ যে, জল খেয়ে ফেলেছ! ওটা তোমার কাছে থাক্‌লে হবে না! তুমি ওটা দাও।"

"এই এক-চুমুকমাত্র! ক্ষমা কর ভাই, আর বেশী খাব না।"

ভীমসিংহ ভাবিতে লাগিল—'চন্দ্রদেও বলিয়াছে গ্রামে পৌছিতে আজ সন্ধ্যা হইয়া আসিবে। দুই দিবস

ধরিয়া তাহারা আসিতেছে—সেই সুদূরের উদ্দেশে; কখন্ তাহার সন্ধান মিলিবে, কখন্ গগনপ্রান্তে শ্যামল-বনের রেখা তাহার নৈকট্যের পরিচয় দিবে।

ভীমসিংহ জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, আর কতদূর?"

"এই পাহাড়ের পথ শেষ হ'লেই গ্রাম দেখা যাবে। আর খুব বেশী দূর নেই।"

গ্রাম দেখা যাবে? সেই চিরপরিচিত, শৈশব-কৈশোরের লীলাভূমি, যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র, সুখের আলয়, আপনার গ্রাম! অর্থের প্রলোভনে, সেই কোন্ এক রজনীতে—সেই কতদিনের কথা—তাহার মায়া ত্যাগ করিয়া, প্রিয়তমার বাহুপাশ মুক্ত করিয়া, চলিয়া আসিয়াছে। আজ যেন কত যুগযুগান্ত-শেষে তাহার বক্ষে ফিরিয়া যাইতেছে! কখন্ গ্রাম দেখা যাইবে? সেই তাহার স্নিগ্ধ-শ্যামল ক্ষেত্রগুলি স্বর্ণ-শস্যের বোঝা বহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বর্ণ? স্বর্ণ!—স্বর্ণের জন্যই ত এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। এ পরিশ্রম, এ কষ্ট ত সেই সার্থক করিয়াছে; সাফল্য ত আজ তাহারই দীপ্তিতে গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভীমসিংহ স্বর্ণপূর্ণ বস্ত্রাধার সাদরে স্পর্শ করিল। আজ তাহারা যখন গ্রামে পদার্পণ করিবে, তখন সেখানে কি হর্ষোচ্ছ্বাস না জাগিয়া উঠিবে! সকলের আনন্দমুখ, বিশেষ করিয়া একজনের আনন্দমুখ, দেখিবার জন্য ভীমসিংহ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জন্যই ত এত কষ্ট সহ্য করা! না-জানি সে কত কষ্টে এই দীর্ঘ বিরহের মাস কাটাইয়াছে। আজ তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া চন্দ্রদেও চীৎকার করিয়া উঠিল "শুয়ে পড়, ভীমসিং শুয়ে পড়। ঐ দেখ আন্ধি আস্‌ছে।"

ভীমসিংহ সভয়ে দেখিল, গগন অন্ধকার করিয়া ধূলার-মেঘ প্রচণ্ড দৈত্যের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। চক্ষু মুদিয়া, মস্তক আবৃত করিয়া তাহারা বালুকারাশির উপর শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ—সে যেন কত যুগ—ধরিয়া বালুকার ভীষণ প্রহার ও বদ্ধ-নিঃশ্বাসের গুরুতর বেদনা সহিয়া তাহারা যখন উঠিল, তখন তাহাদিগের মস্তক দেহ বালুকাকণায় ভরিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রদেও জলপাত্র মুখের নিকট ধরাতে ভীমসিংহ জিজ্ঞাসা করিল "জল কতটা আছে?"

ভীমসিংহের মুখের নিকট জলপাত্রটী ধরিয়া চন্দ্রদেও কহিল, "তুমিও কি খাবে? তবে এই নাও।" কিন্তু পাত্রটি তাহার হস্তে দিল না।

ভীমসিংহ দেখিল জল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এবং তাহাও 'আন্ধির' হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া বিমলিন হইয়া গিয়াছে। সে কহিল, "ওটা আমার হাতে দাও।"

উত্তরে চন্দ্রদেও জিনিসটিকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "না, না, দোব না! তোমার খেতে হয়, এই ত মুখের কাছে ধর্‌ছি, খাও।"

তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল। ভীমসিংহের মস্তিষ্কও উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, "চন্দ্রদেও যদি এইভাবে জলপান করিতে থাকে, তাহাহইলে এই স্থানেই তাহাদিগের যাত্রাশেষ। রৌদ্রতেজ ত প্রখর হইতে প্রখরতরই হইতেছে। গ্রামে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইবার কথা। প্রায় অর্দ্ধ-দিবস ত সম্মুখে পড়িয়া আছে। জল নাই! তবে কি মরিব? এই মরণ-মরু কি দুজনার রক্তপান করিবার জন্য তৃষিত হইয়াছিল? তাই কি সেবারে চন্দ্রদেও তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল? এই ভীষণ মৃত্যু কি তাহার ললাটে বিধাতা-পুরুষ লিখিয়া দিয়াছিলেন? এই জনহীন প্রান্তরে, আশয়শূন্য, বান্ধবশূন্য অবস্থায় মরণ! মৃত্যুকালে কাছে কেহ নাই যে, একফোঁটা জল দিবে, কর্ণে মন্ত্রজপ করিবে। শেষে কি প্রেতাত্মা এই মরুতে তৃপ্তিহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইবে? কি ভীষণ! না, না না,—মরা হইবে না;—বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া বাঁচিব? চন্দ্রদেওর হস্ত হইতে কি জলপাত্র কাড়িয়া লইব? তাহাতেই বা কি হইবে? যে জল আছে, তাহাতে একজনের অতি কষ্টে চলিতে পারে, দুজনের জলতৃষ্ণা নিবারণ তাহা দ্বারা অসম্ভব! একজন বাঁচিতে পারে, কিন্তু অন্য জন? তাহাকে ত মরিতেই হইবে। কে বাঁচিবে, আর কে মরিবে? চন্দ্রদেওই বাঁচুক। না, না, আমি মরিতে পারিব না। এই ভীষণ মৃত্যু! এতদিনের এত কষ্ট, সবই বিফলে যাইবে? কিন্তু কি হইবে? একজনকে ত মরিতেই হইবে! আমিই মরি, চন্দ্রদেও পথ চেনে, সে গ্রামে ফিরিয়া যাক্। আমার শ্রমলব্ধ যাহা কিছু, সে পার্ব্বতীকে দিবে; পার্ব্বতীর দিন সুখে কাটিবে ত! হায়, পার্ব্বতী! তাহাকে

ধনরত্নে বিভূষিতা করিয়া তাহার তরুণ-দেহখানিকে লক্ষ্মী-শ্রীযুক্তা করিব, আর আমি সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য ভোগ করিব—তাহা আর এ জনমে হইল না। পার্ব্বতী! পার্ব্বতী!"

ভীমসিংহের কণ্ঠ ঠেলিয়া বেদনার কাতরধ্বনি ফুটিয়া উঠিল। হস্ত বজ্রমুষ্টিতে বদ্ধ করিয়া, অশ্রুহীনচক্ষে ভীমসিংহ কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রদেও জলপান করিতেছিল, তাহার কর্ণে সে ধ্বনি পৌঁছিল না।

ভীমসিংহ মনে মনে কহিল, "ঐ আবার জল খাচ্ছে। খাবে না বলে, তবু খায়। বারণ কর্‌লে শোনে না। কথাও রাখে না। ওকে ত প্রতিশ্রুত করিয়ে নেব; কিন্তু ও যদি কথা না রাখে। আমি মরে গেলে যদি আমার ধন ও পার্ব্বতীকে না দেয়? এত ধন! যদি লোভ না ছাড়্‌তে পারে? তবে পার্ব্বতী যে কষ্ট পাবে! আমি ফিরে না গেলে—আমি ফিরে না গেলে—ত সে বিধবা হবে। তখন ত সে অলঙ্কার পরবে না। তার ধনরত্নের তখন আর কি প্রয়োজন থাকবে? তার ত সকল সুখ, সমস্ত সাধ বিসর্জ্জন দিতে হবে। না না, আমার মরা হবে না। পার্ব্বতীর জন্যে আমায় বাঁচতেই হবে। তবে কে মরবে? চন্দ্রদেও? হাঁ, চন্দ্রদেওই মরুক! ও কি স্বেচ্ছায় মরবে? কখনই না। ওকে মরতেই হবে। আমি জোর করব। আমিই ওকে মারব। নইলে ও ত বাঁচ্‌তে দেবে না। তবে? এই ত পিছনে আছি, পিঠে ছুরীটা বসিয়ে দিই।"

সূর্য্যালোকে ছুরিকা ঝলসিয়া উঠিল। ভীমসিংহের ক্ষীণ চক্ষুদুটি সে আলোকে ধাঁধিয়া গেল।

"ছিঃ! ছিঃ! এ কি করতে যাচ্ছিলাম! চন্দ্রদেও, বন্ধু!—ভাই—তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলাম! তাও এমন ক'রে! ধিক্ আমাকে! চন্দ্রদেও—শৈশবে যার সঙ্গে একত্র আহার, খেলা, শয়ন, কৈশোরে যে স্বপ্নসঙ্গী, যৌবনে যে কর্ম্মসহায়,—সেই চন্দ্রদেও! সে ত তার সুখ-সম্পদে আমাকে সঙ্গী করেছে!— আর আমি?"—

চন্দ্রদেও অগ্রে অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল। সে কহিল "কি ভীষণ পিপাসা!" পর মুহূর্ত্তেই ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা জলপান করিয়া ফেলিল।

"আবার জল খায়! দুজনকেই মরতে হবে দেখ্‌ছি। কারোই বাঁচা হবে না। গুরুজনের কথা না শুনে—এই হ'ল। কেন এসেছিলাম? কেন সোণার লোভ করেছিলাম? কেন কথা শুনিনি? কেন? ঐ চন্দ্রদেওর জন্যেই ত। ও যদি আমায় লোভ না দেখাত। ঐ ত যত অনিষ্টের মূল! লোভ দেখিয়ে নিজেও গেল, আমাকেও মারলে। উঃ, আমি মর্‌তে পারব না। যা থাকে কপালে, বাঁচ্‌তেই হবে;—কিছুতেই মরতে পারব না। প্রেতকৃত্য হবে না—এই শরীরটা এই মরুভূমিতে পচ্‌বে, শুকাবে? না—না, তা হবে না। পথের ধারের ঐ কঙ্কালটার মত সাদা ধব্‌ধবে হয়ে, বড় বড় দাঁত বা'র ক'রে চক্ষুহীন গর্ত্ত নিয়ে আমাকেও পড়ে থাক্‌তে হবে? আমি মরতে পারব না। মরতে হয় ত ঐ চন্দ্রদেওই মরুক। ওর নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, ওই ভোগ করুক। জল খাবে ও—আর মর্‌ব আমি? ও বাড়ী গিয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে স্ফূর্ত্তি করবে, আর আমি এখানে পচে গলে কঙ্কাল হ'য়ে থাক্‌ব? ওর বাড়ীর লোক হাসবে, আর আমার পার্ব্বতীয়া কাঁদবে? তা হবে না! ওকেই মরতে হবে! ও যে রকম করে জল খাচ্চে, ও ত মরবে না। ওকে মারতে হচ্ছে। ও মরে গেলেই বা ক্ষতি কার? বুড়ো বাপ মার? তাঁরা কতদিনই বা আছেন। তা ছাড়া, আমি তাঁদের পুত্রস্থানীয় হতে পারব—তাঁদের সেবা যত্ন করতে পারব! কিন্তু আমি না গেলে যে পার্ব্বতীর সব যাবে। আর সে—ছেলেমানুষ সে! অল্পবয়স তার! দীর্ঘজীবন তার সম্মুখে পড়ে আছে—কি করে সে দিন কাটাবে? অনাথিনীর বেশ কি তারে সাজে?—না! চন্দ্রদেওই মরুক।"

ছুরিকা আবার উঠিল।

"কি নীরেট মূর্খ আমি! পথ ত চিনি না! অথচ ওকে মারতে যাচ্ছি। ও মরলে ত এ ভীষণ মরুতে পথ-হারিয়েই মরব। রাশিরাশি পাথরের পাশদিয়ে এঁকে-বেঁকে কত হাজার পথ, তার মধ্যে কোন্‌টা যে পথ, তা'ত জানিনে। শেষে অপথে গিয়ে মরব? এ কি হ'ল। মৃত্যু তবে নিশ্চিত? আমাকেই মরতে হ'ল। ও ত বেঁচে যাবেই। এই রে! ঠিক ধরেছি! ঐ জন্যেই ও আমাকে জলের ঘটি দিচ্ছে না। এই ত ওর মৎলব! আমি মরে গেলে, আমার ধনরত্ন সব নিয়ে, দেশে গিয়ে ও আমোদে দিন কাটাবে। আমি এখানে পচ্‌ব, পার্ব্বতী কেঁদেকেঁদে

দিন কাটাবে; আর ও মজা কর্ব্বে! এই ওর মৎলব ছিল। আমি যাব মরে—আর ও বাবে বেঁচে। ওঃ! ওঃ!

"ঐ যে—দূরে আকাশের কোলে ঐ কি দেখা যাচ্ছে? ঐ যে সবুজ বনের-রেখা, ঐ যে মন্দিরের চূড়ো, ঐ বাড়ী-গুলোর অস্পষ্ট ছায়া না? ঐ ত গ্রাম দেখা যাচ্ছে! এখন আর কি—পথ ত চিনে নিতে পারব। এখন চন্দ্রদেও? কে তোকে রাখে? বড় না মনে করেছিলি, জল খাবি আর গান কর্‌তে কর্‌তে দেশে ফিরে যাবি। ভীমসিং মরুভূমিতে মরে পচে থাক্‌বে? তুই তার সর্ব্বস্ব লুটে তার পার্ব্বতীকে পথের ভিখারিণী কর্‌বি! এখন দেখ!"

দীপ্ত ছুরিকা পৃষ্ঠভেদ করিয়া চন্দ্রদেওর তরুণ বক্ষে প্রবেশ করিল। অতর্কিত আঘাতে ভূপতিত হওয়ায় তাহার হস্ত-ধৃত জলপাত্রটী বালুকারাশির উপরে গড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে কথা ফুটিল না, বিস্ময়বিমূঢ় নয়নদুটীর জ্যোতিঃহীন স্থিরদৃষ্টি বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর মুখের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

জলহীন জলপাত্রটি তুলিয়া লইয়া ভীমসিংহ গগন-প্রান্ত-দৃষ্ট গ্রামের পানে ছুটিল। কিছুতেই আর তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কিন্তু এ কি! গ্রাম মিলাইয়া যায় যে! অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হয় যে!—বিভ্রম! ভীমসিংহ হস্তদ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিল।—কৈ, কিছু নাই ত! গগন-প্রান্তে সৌধচূড়া কই! শ্যামল বনের-রেখা এই ছিল যে! এখন ত কিছুই নাই!

মরীচিকা! মরীচিকা!! মরণ-মরু মায়ার-খেলা খেলিয়াছে! মায়াবিনী, ডাকিনী—সে মিথ্যামায়া রচনা করিয়াছিল, আবার মুছিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে মনের সাধে রক্ত-শোষণ করিবে! না—না, না, ছুটিয়া যাই;—পলাই।

পাগলের মত ভীমসিংহ ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ একখণ্ড প্রস্তরে পা লাগিয়া সে আছাড় খাইয়া পড়িল—আর উঠিল না!

পতিব্রতা

[শ্রীমতীবীণাপাণি রায়]

স্বর্গের সুষমা সম কে তুমি সুন্দরি!
উজলিয়া মর্ত্ত্যভূমি অমরা ত্যজিয়া,
কি মাধুর্য্য! কি গরিমা! সারাদেহ ভরি
শত পুষ্প হার যেন র'য়েছে বেড়িয়া।
হীরার মুকুট যেন জ্বলে শিরোপরি
ওই বস্ত্রপ্রান্ত টুকু, শত আভরণ
তুচ্ছ মনে গণি, সতি!—আহামরি!
ওই শঙ্খ-লোহা হেরি জুড়ায় নয়ন।
কাঙ্গালিনী হও যদি, কিন্তু রাজরাণী
তুমি দেবি! অমূল্য-সম্পদে,
দেবতা-ব্রাহ্মণ আর নরনারী যত
নমিবে সম্ভ্রমে, সতি! তব রাঙ্গা পদে
বিষধর বশীভূত কটাক্ষ-ঈক্ষণে,
জ্বলন্ত-পাবক—বারি, তোমার পরশে,
আনন্দদায়িনী, সর্ব্বজন প্রিয়া, শুধু
ব্যাভিচারী ভস্মীভূত আঁখির ঝলসে।
আছ তুমি, বঙ্গ-লক্ষ্মি!—পাপ ধরামাঝে
হয়নি প্রলয়, সতি! সৃষ্টি তাই আছে!

নিরাকুলি ব্রতের নিয়ম

[সুরমাসুন্দরী ঘোষ]

মাসের মধ্যে একদিন, যেকোন বারেই হউক, নিরাকুলির ব্রত করিতে হয়। গৃহিনীরা হাড়িভরে তৈল আনিয়া অগ্রে কিছু নিরাকুলির ব্রতের জন্য তুলিয়া রাখেন এইরূপ সিন্দূর, পান, সুপারী সবেরই অগ্রভাগ নিরাকুলির জন্য রাখেন। তারপর সাধ্যানুসারে কেহ কেহ সন্দেস-বাতাসা-নাড়ু ইত্যাদি মিষ্টান্নও দিয়া থাকেন।

গৃহিণীরা রাত্রীতে, খাওয়া-দাওয়ার পর, হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একখানা ধোয়া পীড়িতে একটি পূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া, তাহাতে সিন্দূরের পুত্তলি ও আমের পল্লব প্রদান করেন। এই ঘাটের সাম্‌নে একখানা পাত্রে পান-সুপারী-বাতাসা ও ছোট একটি বাটিতে করিয়া তৈল রাখিয়া দেন। পরে ৪।৫ জন সধবা মিলিত হইয়া বসেন, ও গৃহিণী ব্রতের নিম্নলিখিত কথা বলিতে থাকেন। ব্রতের কথা শেষ হইলে, উলুধ্বনি ও ঘট নমস্কার করিয়া সকলের কপালে সিন্দূর ও হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ব্রত-কথা

ভগবান নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর রাণীর নাম পদ্মাবতী। রাণী নিরাকুলির ব্রত করতেন। একদিন রাজা, রাজসভায় বসে পান চেয়ে পাঠালেন; রাণী তখন ব্রত করতে বসেছেন, কাজেই পান দিতে দেরী হ'তে লাগ্‌ল। রাজা রাগ ক'রে উঠে, এসে রাণীর নিরাকুলির ঘট লাথি মেরে ফেলে দিলেন! কিছুদিন পর, নিরাকুলির কোপে রাজার রাজ্যে আরাজক উপস্থিত হ'ল;—হাতীশালে হাতী মরে, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে, প্রজারা সব বিদ্রোহী হল, তারপর বিদেশী এক রাজা, ভগবান রাজার রাজ্য দখল কর্‌তে এল। রাজা তখন—রাণী ও তাঁর পাঁচবছরের একটি ছেলে ছিল, তাদের নিয়ে, খিড়কীর দরজা দিয়ে রাজ্য-ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। রাণীর ছিল দশমাস গর্ভাবস্থা, অবিশ্রান্ত হেঁটে হেঁটে তাঁর প্রসব বেদনা উপস্থিত হল। রাজা কি করেন নিরুপায় হয়ে লতাপাতা দিয়ে একখান। কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করে দিলেন; সেখানে রাণী একটি পুত্র প্রসব করলেন। রাণী, শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, রাজাকে বল্লেন—'আমাকে একটু আগুন এনে দাও।'—'বন-জঙ্গলে কোথায় আগুন পাব—দেখি নিকটে কোন গৃহস্থাশ্রম আছে কিনা?" এই বলিয়া, রাজা আস্তে আস্তে কিছুদুর অগ্রসর হতে লাগ্‌লেন।

এদিগে আবার ঐ দেশের রাজার মৃত্যু হয়েছে; রাজ-সিংহাসন শূন্য, তাই রাজহস্তী মালা-চন্দন ও রাজপাট নিয়ে ঘুরছে। হস্তী, ভগবান রাজার দীন-বেশের মধ্যেও, তাঁর অঙ্গে রাজ-লক্ষণ দেখে, তাঁর গলায় মালা দিয়ে পিঠে তুলে তাঁকে নিয়ে গেল।

রাজ্য পেয়ে, রাজা-রাণীর কথা একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেলেন। এদিকে রাজা আস্‌লেন না, দেখে, রাণী বড়ছেলেটির কোলে ছোটছেলেটিকে দিয়ে, নদীতে স্নান করতে গেলেন। নদীর ঘাটে এক সওদাগরের নৌকা, বারো-বছরযাবৎ, চড়ায় ঠেকে রয়েছে; রাণী ঘাটে নেমে যেই নৌকাখানায় ধাক্কা দিলেন অম্‌নি নৌকা ভেসে গেল নৌকা নদীতে ভাস্‌তে দেখে, সওদাগর তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখেন—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী! সওদাগর, মাঝী-মাল্লাদের বল্‌লেন "স্ত্রীলোকটি তো বড় লক্ষ্মী! ওর স্পর্শেই আমাদের নৌকা ভেসেছে; ওকে নৌকায় তুলে নিলে, আর কখন চড়ায় ঠেক্‌বার ভয় থাক্‌বে না!" মাঝীরা তখন পদ্মাবতীকে তুলে নিতে এল। পদ্মাবতী বল্লেন—"বাছারা! আমাকে স্পর্শ করোনা; একটু অপেক্ষা কর, আমি স্নান করে নিই।

রাণী, সূর্য্যদেবকে আরাধনা করে, বল্লেন, "হে ঠাকুর! আমার সৌন্দর্য্য তুমি নিয়ে আমাকে গলিতকুষ্ঠ দান কর!" রাণী যেই ডুব দিয়ে উঠ্‌লেন অম্‌নি তাঁহার রূপ বিকৃত হয়ে গেল! দেখে, মাঝীরা ঘৃণায় কেহ স্পর্শ করতে চায়

না; কিন্তু কি করবে? সদাগরের হুকুম অমান্য করতে পারে না; কাজেই, তাকে নৌকায় তুলে নিলে।

এদিকে নিরাকুলি ঠাকরুণ দেখ্‌লেন—তাঁর পরম ভক্তিমতী, পদ্মাবতীর পুত্র দুটি অনাহারে মারা যায়! তখন, তিনি কপিলেশ্বরী গাভীকে বল্লেন—"তুমি পদ্মাবতীর ছেলেদের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ। প্রাতে উঠে, গোয়ালা কপিলেশ্বরী গাইকে যেই চর্‌তে মাঠে ছেড়ে দেয়—অম্‌নি সে, দৌড়িয়ে অরণ্যের ভিতর গিয়ে, ছেলে দুটিকে পেট ভরে দুধ দিয়ে, আরও কিছু দুধ কচুর পাতে করে গর্ত্তের মধ্যে রেখে আসে। কপিলেশ্বরী, সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে গেলে, গোয়ালা, দুহিতে গিয়ে, তার বাটে দুধ পায় না! একদিন গোয়ালা কারণ-অনুসন্ধান করতে, গাইয়ের পেছনে পেছনে এসে, দেখে—রাজপুত্রের মত রূপবান দুটি ছেলেকে কপিলেশ্বরী দুধ দিচ্ছে! গোয়ালা তখন ছেলে দুটি কোলে নিয়ে বাড়ী গেল। গোয়ালিনী ছিল নিঃসন্তান; তাই, ছেলে দুটি পেয়ে, তার বড় আহ্লাদ হল; তখন সে, মনে মনে এক ফন্দি এঁটে, ছেলে দুটিকে ঘরে লুকিয়ে রাখলে। তারপর, পেটের উপর একটা ধামা বেধে, পাড়ায় পাড়ায় দুধ যোগাতে গেল। পাড়ার লোকে, বন্ধ্যা-গোয়ালিনীর গর্ভলক্ষণ দেখে, ভারি খুসী হ'ল। তারপর, গোয়ালিনী রাত্রিতে সাতবার উলু দিল; পাড়ার লোক বুঝিল—গোয়ালিনীর ছেলে হয়েছে। পরদিন সকলে ছেলে দেখ্‌তে এল। গোয়ালিনী, ছোট-ছেলেটিকে দুবার দেখায়ে, বল্লে—"আমার যমজ-ছেলে হয়েছে। ক্রমে ক্রমে, ছেলেদুটি বড় হ'তে লাগল; আর, যেন তাদের রূপও উছ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

গোয়ালা রাজার বাড়ী ঘাটালের কাজ করত। সেদিন সওদাগরী নৌকা ঘাটে এসেছে; তাই, বাণিজ্যের মালপত্র রাত্রিতে পাহারা দিতে, গোয়ালার ডাক পড়্‌ল। গোয়ালা বুড়ো, রাত জাগতে পারে না;—ছেলে দুটিকে পাঠিয়ে দিলে।

কিছুক্ষণ বসে ছোটভাই বল্লে, "দাদা, ঘুম পাচ্ছে, একটা গল্প বল।" বড়ভাই বলিল, "অন্য কি গল্প বলিব! আমাদের নিজেদের গল্পই বলি, শুন।"—এই বলিয়া সে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বল্‌তে লাগ্‌ল।

যে নৌকায় পদ্মাবতীকে নিয়ে গিয়েছিল, এ সেই নৌকা। পদ্মাবতী নৌকায় শুয়ে সব কথাই শুনে, তার ছেলে দুটিকে চিন্‌তে পেরে, কেঁদে উঠল। সওদাগর কান্না শুনে এসে ছেলে দুটিকে ধমকাইতে লাগল। রাত্রি প্রভাত হলেই, রাজদরবারে নালিশ করতে—রাজার কাছে পদ্মাবতী ও ছেলে দুটিকে নিয়ে গেল। ছেলেরা 'নৌকার লক্ষ্মী'কে কি বলিয়াছে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় ছেলেটি বলিল, মহারাজ, আমরা উঁহাকে ভালমন্দ কিছুই বলি নাই। বলিতে ছিলাম—

"মা গেল বনে, বাপ গেল রণে,
আমরা দুভাই ফিরি নানাস্থানে।
যেই ছিল গোয়ালার কপিলেশ্বরী গাই,
সে গুণে বেচে আছি আমরা দুটি ভাই।"

এই বলিয়া তাদের কাহিনী বলিল; শুনে পদ্মাবতীর কান্না থামে না। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কাঁদ কেন?' পদ্মাবতী বল্‌লেন, "এদুটি আমারই ছেলে।" এদিকে রাজার সব অতীত কথা স্মরণ হল।—রাণী রাজাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন; কিন্তু, রাণীর কুরূপ দেখে, রাজার মনে সন্দেহ হচ্ছিল। তাই, গোয়ালাকে ডাকিয়া, 'ছেলে কোথায় পাইয়াছে,' জিজ্ঞাসা করিলেন। গোয়ালা, যেরূপে পাইয়াছে স্বীকার করিল। রাজা, খুসী হইয়া, গোয়ালাকে ধনরত্ন দান কর্‌লেন। রাণী, তখন স্নান করে এসে, সূর্য্য-দেবকে আরাধনা করে, বল্লেন, "তোমার কুরূপ তুমি নাও, আমার সুরূপ আমায় দাও!"—অম্‌নি তাহার রূপ-যৌবন ফিরে এল। তারপর, রাজা বল্লেন, "চল রাণী অন্তঃপুরে, যাই।" রাণী বল্‌লেন "অকুলে যিনি কুল দিয়েছেন, সেই নিরাকুলির ব্রত আগে করব, তারপর, অন্তঃপুরে যাব। আমাকে আগে সোণার নিরাকুলি গড়াইয়া দাও।" রাজা তখন সোণার গড়াইয়া দিলেন। রাণী দেবী তেল, পান, সিন্দূর ও মিষ্টান্ন দিয়া নিরাকুলির ব্রত করিয়া স্বামী-পুত্র লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তারপর, পৃথিবীতে প্রচার করে দিলেন—'যে-গৃহস্থ নিরাকুলির ব্রত করে, তার দুঃখদৈন্য থাকে না; যখন যে বিপদে পড়ে, নিরাকুলির কৃপায় তা হ'তেই মুক্তিলাভ করতে পারে।'

সে কোথায় ?

[শ্রীঅমলা দেবী]

আমার বৃদ্ধপিতা, কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কলিকাতার হটুগোল এবং সংসারের ঝঞ্চাট হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া, বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে অবশিষ্ট-জীবনটা অন্যত্র কাটাইবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায়, একদিন দাদার বন্ধু নবীন-বিলাতফেরত ব্যারিষ্টর মিষ্টর রায়চৌধুরী বলিলেন, ছোট-নাগপুর-অঞ্চলে মানভূম জেলায় অনেকগুলি বেশ সুন্দর নিভৃত স্থান আছে; তন্মধ্যে রাঘব-পুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সম্প্রতি সে অঞ্চলে গিয়াছেন, কি না, জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, আট-নয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাঘবপুরে ছিলেন। অনেক তর্কযুক্তির পর সেবার পূজার ছুটিতে রাঘবপুর যাওয়াই স্থির হইল। কয়েকবার যাতায়াতে আমাদের পরিবারস্থ সকলেরই সেস্থানটি পছন্দ হওয়াতে, পিতামহাশয় দেখিয়া শুনিয়া, একখানা বাড়ী কিনিয়া, সেইখানে স্থায়ী হইলেন। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমাদের বৃহৎ পরিবার। ছুটি-উপলক্ষে সকলে একত্র হইলে সেই বাড়ীতে সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইত; কিন্তু সচরাচর সেখানে থাকিতেন—পিতা মহাশয়, মাতাঠাকুরাণী, অবিবাহিতা একটি ভগিনী এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ; অন্যান্য সকলে অবসরমত যাতায়াত করিতেন।

রাঘবপুর স্থানটি খুব বড় নয়। যতটা সহর, ততটা সুন্দর বা স্বাস্থ্যকরও নয়; কিন্তু সহরের বাহিরে আমাদের বাড়ী যেদিকে, সে স্থানটি বড়ই মনোরম। সহর ছাড়িয়া অনেক দূরে, পথের দুইপাশে প্রকাণ্ড বাঁধ; তার আশেপাশে ধানক্ষেত; বড়-বড় ঝাউ, বট ও অশ্বত্থগাছ দীর্ঘপথগুলিকে সুন্দর ও ছায়াপূর্ণ করিয়া রাখে। আমি যেবার প্রথম যাই, তখন অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। সহর অতিক্রম করিয়া দেখিলাম, যতদূর দৃষ্টি যায়, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, অসমান প্রান্তরভূমি; মাঝে-মাঝে ধান্যে পরিপূর্ণ ক্ষেতগুলি নবোদিত-সূর্য্যের আলোকে ঝলমল করিতেছে।

আমাদের বাড়ীর অবস্থিতিস্থান বড় সুন্দর। সহর হইতে দুইটি পথ, একটি সুদীর্ঘ প্রান্তর বেষ্টন করিয়া, আমাদের বাড়ীর সম্মুখে মিলিত হওয়াতে, দক্ষিণের বারন্দায় বসিলে, দৃষ্টি বহুদূর চলিতে চলিতে সেখানে আকাশের সীমারেখা টানিয়া দেয়, সেখানে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী—আকাশের গায়ে মেঘের মতন দেখা যায়; তাহার পাদমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পরপারে সহরের ঘনসন্নিবিষ্ট 'দালান'সমূহ ছবির ন্যায় দেখায়; তাহারও নীচে ছোটবড় নানাপ্রকার কুটীর-সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; দিবাশেষে, দূরে ঘরে-ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিলে, মনে হয় কে যেন মাতা ধরিত্রীকে মণিমালায় ভূষিত করিয়াছে।

আমি খুব কমই অবসর পাই; তাই—কর্ম্মস্থলের কোলাহল ও শ্রান্তির পর—শান্তির ভিখারীর ন্যায় ক্ষুধা-লোলুপচিত্তে সেই নিভৃত স্থানের নির্জ্জনবাস বড়ই উপভোগ করি।

ক্রমে তিন বৎসর কাটিয়া গেল; ইতোমধ্যে আমার ভগিনীটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পূজার ছুটি-উপলক্ষে সকলে একত্র হইয়া রাঘবপুর চলিয়াছি। পথে ট্রেণের কিছু গোলোযোগ হওয়াতে, রাঘপুর পঁহুছিতে—প্রায় রাত্রি দশটা বাজিল। তখন বাসার সকলে, আহারাদি সমাপ্ত করিয়া, বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন। সকলকে একত্রে পাইয়া পিতামাতার আনন্দের সীমা নাই। মিলনের প্রথম-আনন্দ-বেগটা প্রশমিত হইলে, মা স্বয়ং রন্ধনশালায় যাইয়া মুগের-ডাল ও ভাত প্রস্তুত করিলেন; রাত্রি বারটার সময় সেই গরম ডাল-ভাত খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। তখন কে কোথায় শয়ন করিবে, তাহারই ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

মাঝখানে বড় হল, তাহার উভয়পার্শ্বে তিনটি করিয়া ছয়টি শয়নকক্ষ। পূর্ব্বদিকের তিনটির মধ্যে দক্ষিণের বারান্দাসংলগ্ন কক্ষটি পিতার। তাহারই পাশে একটি ছোট ঘর; সেটি কেহই পছন্দ করে না;—আমার শয়নের ব্যবস্থা

সেইটিতেই আমি করিয়া লইলাম। সুরেশকে আমার নিকট থাকিতে অনুরোধ করায়, সে রীতিমত বিদ্রোহী হইয়া কহিল, "ওটা ভূতের ঘর; তা জান না বুঝি? শুয়ে দেখো কি ব্যাপার হয়!" আমার এক ভগিনীপতি হাসিয়া কহিলেন, "তোমার ত আত্মা ডেকে-আনা অভ্যাস আছে—তোমার ভয় কি?" বলাবাহুল্য, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সহিত 'থিওজফি'-সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; পরলোকগত আত্মার সহিত ইহলোকের যোগাযোগ বিষয়ে কোন কথা হইলেই, তিনি ওসকল 'ভাঙ্‌খোরের বুজরুকি' বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন। যখন শুনিলাম, অনেকেই সেই ঘরে মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়াছে, এমন কি কণ্ঠস্বরপর্য্যন্ত শোনা গিয়াছে—কে যেন বলে "সে কোথায়? সে কোথায়?" তখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্থির করিলাম, সেই কক্ষেই শয়ন করিব। ভগিনীপতি হাসিয়া কহিলেন, "এই রে, মাথায় স্পিরিট ঢুকেছে দেখ্‌ছি!—কা'ল থেকে আরও জোরে থিওজফি চালাতে পারবে।"

কোন কথা না কহিয়া, আমি উৎসুকচিত্তে শয়ন করিতে চলিলাম। স্বহস্তে সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া, শয়ন করিলাম; তারপর, কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।

একসময় পাশের বারন্দায় খস্‌খস্‌ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল;—কাণপাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করায় বুঝিলাম, আমাদের "সাপড়া" কুকুরটা যেন পাশফিরিয়া শুইল; আমিও তখন পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া আবার ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেবার যেন গভীর নিদ্রা আসিল না—ঘড়ির আওয়াজ, পাহারার সাড়া, আর "সাপড়ার" অবিশ্রান্ত ছট্‌ফটানি, সবই শুনিতেছিলাম। হলের ঘড়িতে দুটা বাজিয়া গেলে, আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। বাহিরে বাতাস ছিল, কি না, জানি না—আমার পশ্চাতে পূবের বারন্দার দরজা যেন ঠকাস্‌ করিয়া পড়িল, কেহ, ঠিক যেন, খুলিয়া আবার বন্ধ করিল; ঘুমের ঘোরে মনে করিলাম—বাতাস; পরক্ষণেই স্মরণ হইল যে, সকল দ্বার ত আপন-হাতে বন্ধ করিয়াছিলাম। সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ চাহিয়া দেখিলাম—দ্বারের যে অংশে ছিটকিনি থাকে, সে অংশ নীচে পড়িয়াছে, অপরাংশ তাহার উপর পড়ায় তাহার মধ্যের ফাঁক দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নারেখা আমার শয্যার উপর পড়িয়াছে। ভাবিলাম, সম্ভবতঃ আমার ভুল হইয়াছিল; উঠিয়া দ্বার উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া, পুনরায় শয়ন করিলাম।

তখন পাহারার সাড়া আর পাওয়া যাইতেছে না—"সাপড়াটা" ছট্‌ফট্‌ করিয়া হয়রাণ হইয়া, বোধ হয়, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ঘড়িও শুনি নাই; অনুমানে বুঝিলাম, রাত্রি আর অধিক নাই। পশ্চিমের হলের দিকে মুখ করিয়া, সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে, নিদ্রার চেষ্টায় রহিলাম। নানাকল্পনায় মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিল। রাত্রি জাগিয়া কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিবার স্পৃহা, বা ক্ষমতা, কোন দিনই আমার ছিল না;—সেদিন সেইঘরে একাকী শুইয়া, কি জানি কেন, কতকথা মনেপড়িতে লাগিল। ইংরাজি, বাংলা যত নাটক-নভেল পড়িয়াছিলাম—সেগুলির যত নায়ক-নায়িকা যেন আমায় দখল করিয়া বসিল। কোন্‌ হতভাগ্য নায়ক, অবিশ্বাসিনী প্রণয়িনীর পাল্লায় পড়িয়া, আত্মহত্যা করিয়াছিল—অথবা প্রণয়িনীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিল; আবার, কোন্‌ অপ্রেমিকের হাতে পড়িয়া কোমলপ্রাণা সাধ্বী সতীরমণী কত অন্যায় পীড়ন সহ্য করিয়া, দিন দিন মলিন হইয়া, পুষ্পের ন্যায় অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল;—এই সকল নানাচিন্তার মধ্যে হঠাৎ কাহার ঘননিশ্বাসের সহিত অস্ফুট রোদনধ্বনি শোনা গেল। ভাবিলাম—তাই ত! এ কি কল্পনার নায়ক-নায়িকারা, আমাকে একা পাইয়া, তাহাদিগের বেদনা আমাকেই জানাইতে আসিয়াছে;—অথবা নিদ্রার অভাবে সহসা মস্তিষ্কের বিকার জন্মিল!

দেখিতে দেখিতে, কে যেন, মাথার দিক্‌ হইতে সরিয়া, ক্রমে আমার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সে কোথায়? ওগো! বল না—সে কোথায়?"

আমি উঠিয়া বসিলাম, আবার শুনিলাম সেই স্বর কাঁদিয়া কহিতেছে, "ওগো! সে কোথায়?" চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে সুন্দরী স্ত্রী-মূর্ত্তি! চক্ষের পলকে সে মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল কিন্তু তাহার সজল নয়নের সেই কাতর-ভাবটি আজিও ভুলিতে পারিতেছি না। উন্মুক্ত, দীর্ঘ কেশরাশি দুই স্কন্ধ বাহিয়া সম্মুখে-পশ্চাতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; যেন কোন গভীর বেদনা সবলে চাপিয়া রাখিবার নিমিত্ত সুকোমল হস্তদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপিত;—কিন্তু সেই হস্তান্তরাল হইতে রক্তস্রোত বহিয়া তাহার শুভ্র-বসন রঞ্জিত করিয়াছে! সেই

রক্তসিক্ত বস্ত্র দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ;—ভীত হইবার অবসর পাইলাম না—কি দেখিলাম, ভাবিতে ভাবিতে কতক্ষণ কাটিল স্মরণ নাই—সহসা সেই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন কহিল "রাম—রাম—সীতারাম—রাম !"

বুঝিলাম রাত্রি শেষ হইয়াছে ; আমাদের ময়নাপাখী স্বাভাবিক অভ্যাস-বশতঃ ঊষার আলোক দেখিয়া রাম-নাম স্মরণ করিয়া যেন সুপ্রভাত ডাকিয়া আনিল। আমি এক-লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া একেবারে বাগানে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই সময় সুদন মালীও তাহার কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম ; তখনও বাড়ির অন্যান্য সকলে নিদ্রিত—আর কেহ কোথাও নাই।

সুদন যে বহুকাল হইতে সেই বাড়ীতে কাজ করিতেছে, তাহা তাহারই নিকট শুনিয়াছিলাম। আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলে প্রথমতঃ সে ভীতভাবে প্রণিপাত করিয়া যেন কোন কঠিন-দণ্ডের প্রতীক্ষায় আমার মুখের দিকে সকরুণ-নেত্রে চাহিয়া রহিল। আমি তাহাকে অভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই কতদিন এ বাড়ীতে আছিস্ ?" সে কহিল "দশ বৎসর।" বাড়ির পূর্ব্ব-মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে এক সাহেবের নাম অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া কি বলিল আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দশবৎসর পূর্ব্বে তাহাকে কে আনিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায়, সে বাড়ীর ভিত্তি-স্থাপন হইতে সুরু করিল। বুঝিলাম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল এক সাহেব, তাহার নিকট হইতে কলিকাতার নরেন্দ্র বাবুর পুত্র জজসাহেব কিনিয়াছিলেন। তিনিই সুদনকে আনিয়াছিলেন। জজসাহেব বাড়ী বিক্রয় করিলেন কেন এবং এখন তিনি কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে সে হাত-কচ্‌লাইতে-কচ্‌লাইতে যে কাহিনী বর্ণনা করিল তাহাতে বুঝিলাম, অন্যের নিকট বাড়ীসম্বন্ধে যাহা শোনা গিয়াছিল তাহা সত্য দশ-বৎসর পূর্ব্বে বাড়ীতে এক ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেইদিন হইতে জজসাহেবের সন্ধান কেহ জানে না। তাহার পর এক সাহেব নীলামে কুঠীটি ক্রয় করিয়াছিল ;—কয়েকবৎসর পরে পিতামহাশয়ের নিকট বাড়ী বিক্রয় করিয়া সেও রাঘবপুর ত্যাগ করে। মালীর বর্ণিত কাহিনীটি এইবার লিপিবদ্ধ করি।

(২)

রামজীবন চক্রবর্ত্তী এক সময়ে ধনে মানে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবাপন্ন হইয়া, আপনার দোষে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া যখন পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বাল্যবন্ধু উমাপদ বাবুর সাহায্যেই তিনি বিপদসাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া কোনরকমে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামজীবন বাবুর একমাত্র সন্তান—কন্যা ইন্দ্রাণী যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়, সেইদিন হইতেই স্থির হয় উমাপদ বাবুর পুত্র অজয়-নাথের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাঁহাদিগের আশৈশবের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করা হইবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজয়নাথ ও ইন্দ্রাণীর মনেও সে ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল। মাঝখানে রামজীবন বাবুর আর্থিক পরিবর্ত্তন এবং অকাল-মৃত্যুতে, সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল।

অজয়নাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন করিতে যায়, তখনও তাহার বালকত্ব ঘুচে নাই। তাহার পিতা মনে করিলেন, তখনও তাহার বিবাহোপযোগী বয়স হয় নাই। এফ্. এ. পরীক্ষায় পাশ হইবার পর অজয়নাথের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল ;—সে চঞ্চলতা নাই—সে স্থির গম্ভীরভাবে সর্ব্বত্র আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে শিখিয়াছে। তখন আর কেহ তাহাকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে না। সেবার মাঘ মাসে বিবাহ হইবে, স্থির হইল।

অজয়নাথ কলিকাতার ছাত্রনিবাসে থাকিয়া পড়ে। তাহার অল্পসংখ্যক বন্ধুর মধ্যে মহেন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উভয়ে হরিহর-আত্মা। মহেন্দ্র প্রায় প্রতি শনিবারই অজয়কে তাহাদিগের বাড়ীতে লইয়া যায় ; তাহার মাতা অজয়কে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। সেবার বড়দিনের ছুটী-উপলক্ষে অজয় মহেন্দ্রকে বর্দ্ধমানে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলে, মহেন্দ্র মহা-আনন্দের সহিত বন্ধুর নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিল। অজয়ের নিকট তাহার আসন্ন-সম্ভাবী বিবাহের প্রস্তাব এবং ইন্দ্রাণীর বর্ণনা শুনিয়া তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে একদিন অজয় মহা উৎসাহে বন্ধুকে লইয়া ইন্দ্রাণী-দের বাড়ী উপস্থিত হইল, এবং বন্ধুর সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া আপনি কৃতার্থ হইল।

ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া মহেন্দ্রনাথের এক অভূতপূর্ব্ব

চিত্তবিকৃতি জন্মিল। অজয়নাথের সহিত তাহার যে গভীর সখ্য ছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া সে সংকল্প করিয়া বসিল যেমন করিয়া হউক ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিতে হইবে।

ইন্দ্রাণীর অদৃষ্ট-অনুসারে মহেন্দ্রনাথের পথ সহজ হইয়া আসিল। সেবার সহসা রামজীবনবাবু কঠিন রোগ-গ্রস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। সেই সময় মহেন্দ্র শারীরিক পরিশ্রম এবং অর্থসাহায্য দ্বারা বহুপরিচর্য্যা করিল। অজয়নাথ তখনও বন্ধুর উদ্দেশ্যসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট তাহার উদার-চরিত্রের অনেক প্রশংসা করিয়াছে; কিন্তু রামজীবন বাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে ইন্দ্রাণীর মাতা যখন অকূল-সাগরে ভাসিলেন, সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইলে, তাহার পরিচয় পাইয়া ইন্দ্রাণীর মাতা স্বীকৃতা হইলেন; অর্থবলহীন উমাপদবাবু নির্ব্বাক্ রহিলেন। মহেন্দ্রনাথের পিতা—নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী যেদিন কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন সেদিন অজয়নাথ বুঝিল, তাহার এতদিনের আশার-মূল-উচ্ছেদ হইল—তাহার পরম-সুহৃদ্ মহেন্দ্রনাথের দ্বারা। বন্ধুর ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক আহত হইলেও সে বুঝিল—কি ধন, কি ঐশ্বর্য্য, কি বিদ্যাবুদ্ধি, কোন বিষয়েই সে মহেন্দ্রনাথের সমকক্ষ নয়—মহেন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং ইন্দ্রাণীর যোগ্য। অজয় ইন্দ্রাণীর কল্যাণকামনায় আপনার প্রিয়তম বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিরাশার বেদনা নীরবে মস্তক পাতিয়া লইল।

ইন্দ্রাণী তখন নিতান্ত বালিকা নয়; তাহার আজন্মের বাসভূমি ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইলে তাহার মন দমিয়া গেল। সেদিন বৈশাখ মাসের শুক্লা-নবমী তিথি; তাহার পরদিন ইন্দ্রাণীকে চিরদিনের মত বর্দ্ধমান ত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ণিমা তিথিতে তাহার বিবাহ। নিঃসম্বল বৈবাহিকার সাহায্যার্থে নরেন্দ্রবাবু উভয়পক্ষের ব্যয়ভার বহন করিবেন, স্বীকৃত হইয়া কলিকাতায় বিবাহ দিতে হইবে, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সেদিন ইন্দ্রাণীর মাতা পরলোকগত স্বামীর বন্ধু-বান্ধবগণকে আহ্বান করিয়াছেন; তাই ইন্দ্রাণীদের ক্ষুদ্র গৃহ সেদিন পরিপূর্ণ;—আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব যে-যেখানে ছিল, সকলেই ইন্দ্রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অবসর বুঝিয়া ইন্দ্রাণী একটু নির্জ্জনস্থানের সন্ধানে চলিল। বাড়ীর পশ্চাতে ইন্দ্রাণীর পিতার স্বহস্তরচিত বাগানের ভিতর একটি গাছতলায় বসিয়া সে নানাকথা ভাবিয়া আকুল হইল। উমাপদ বাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণটিকে সে জন্মাবধি আপনার করিয়া লইয়াছিল—সেই নিভৃত-জীবন এবং তাহার চক্ষে সুপরিচিত পথ-ঘাট, এই বাগান, গাছপালা, নানা সুখ-দুঃখ-ভরা জীবন—সবত্যাগ করিয়া, কোন্ অপরিচিত রাজ্যে সে চলিয়াছে ভাবিয়া ইন্দ্রাণী দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। রজনী প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে; অর্দ্ধোদিত চন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি তখনও ভাল করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই; সমস্ত পৃথিবী তখনও সংশয়গ্রস্থ মানবের ন্যায় অর্দ্ধ-আলো-অর্দ্ধ-ছায়ার অন্তরালে আছে। এমন সময় অজয়নাথ পিতার অন্বেষণে সেইপথে ইন্দ্রাণীদের বাড়ী অভিমুখে যাইতে যাইতে অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিয়া দাঁড়াইল। অদূরে বৃক্ষতলে উপবিষ্টা ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল ইন্দ্রাণী কাঁদিতেছে। অজয় কহিল "ইন্দ্রাণি! তুমি কাঁদছো কেন?" ইন্দ্রাণী তখন চোখের জল মুছিয়া কহিল "কেন কাঁদ্‌ছি, তুমি জিজ্ঞাসা কোরো না।"

অজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "কেন ইন্দ্রাণি! আমার কি দোষ?"

ইন্দ্রাণী কহিল "দোষ কিছু নয়—কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, তুমি কি নিষ্ঠুর! ছেলেবেলা থেকে একত্রে বসবাস ক'রে আমাকে বিদায় দিতে তোমার একটু কষ্টও হচ্ছে না? আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন কাঁদ্‌ছি? তুমি কি বুঝ্‌বে, আমি কেন কাঁদ্‌ছি!"

অজয় অবনত-মস্তকে ইন্দ্রাণীর ভর্ৎসনা-বাক্য শুনিল; একবার ভাবিল মনের ভাব মনেই গোপন থাক, প্রকাশ করিয়া কাজ নাই;—কিন্তু যখন মনে পড়িল হয় ত জীবনে আর কখন ইন্দ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, ইন্দ্রাণীর মনে চিরকাল বিশ্বাস থাকিবে—অজয় নিষ্ঠুর! তখন আর সে আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিল "ইন্দ্রাণি! আমাকে দোষ দিও না। আজ যদি বলি যে তোমার সঙ্গে আমার সব আশা, শান্তি সুখ সববিসর্জ্জন দিলাম,তা হ'লে হয় ত বিশ্বাস করবে না কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন শুধু তুমি সুখী হবে ব'লে আপনার চিত্ত কি ক'রে দমন করেছি।" ইন্দ্রাণী বিস্মিত

হইয়া কহিল, "আমি সুখী হব কি সে?" অজয় কহিল, "সকলের বিশ্বাস—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে মহেন্দ্র সর্ব্বতোভাবে তোমার যোগ্য। আমরা অর্থহীন; কোন কথা কইবার অবসর পাইনি।" ইন্দ্রাণী কহিল, "আমি চিরদিন দুঃখে মানুষ হয়েছি—ধন-মান নিয়ে কি হবে?" অজয় তখন তাহাকে বুঝাইয়া কহিল, "শোন ইন্দ্রাণি! তোমার মা, তোমার কল্যাণ-কামনায়, সৎপাত্র-জ্ঞানে যার হাতে তোমাকে সমর্পণ করছেন, তাকেই ভক্তি কোরো—নির্ব্বন্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে না। আমাকে আজন্মের বান্ধব ব'লে মনে রেখো—আজ, সব ভুলে গিয়ে, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি সর্ব্বসুখসম্পদ পরিবেষ্টিত হ'য়ে দীর্ঘজীবন ভোগ কর। শান্ত হও; নিয়তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে কোন ফল নেই।" অজয়ের উপদেশবাক্যে ইন্দ্রাণীর মনে রাগ আসিল। সে উপদেশ, ইন্দ্রাণী জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই।

(৩)

ইন্দ্রাণীর বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। উমাপদ বাবু স্বয়ং, কন্যাকর্ত্তা হইয়া, সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া, যাহাতে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, যথাসামর্থ্য চেষ্টা করিলেন। পিতার অনুরোধে অজয়নাথও বিবাহসভায় উপস্থিত ছিল; কিন্তু বিবাহান্তে, মহেন্দ্রনাথের পার্শ্বে বিবাহ-সজ্জায় ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া, তাহার সকল সংযম ও ত্যাগের সংকল্প ভাসিয়া গেল—আশৈশব-কল্পিত বাসনার শিখা জ্বলিয়া উঠিল—বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার সীমা স্মরণ করিয়া, হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইল!—সেদিন অজয়ের প্রথম মনে হইল, মহেন্দ্রকে বর্দ্ধমানে নিমন্ত্রণ না করিলে, সমস্ত ঘটনা অন্যরূপ হইতে পারিত! তারপর, ইন্দ্রাণীর ভর্ৎসনা-বাক্য এবং বিদায়ের অশ্রুজল স্মরণ করিয়া, তাহার মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে, বিবাহান্তে, বরকন্যা যখন বাসরঘরে প্রবেশ করিল, তখন, সকলের অলক্ষিতে, উৎসব-ভবন নীরবে ত্যাগ করিয়া, অজয় পথে বাহির হইয়া পড়িল;—বাকী রাত্রিটুকু, লক্ষ্যহীন হতভাগ্যের ন্যায়, পথে-পথে ঘুরিয়া, রাত্রিশেষে কখন গৃহে ফিরিয়া শয়ন করিয়াছিল, কেহ জানে না।

সেদিন, সেই উৎসব-ভবনের সুখ-হিল্লোলের উন্মাদনার মধ্যে, কাহারও শূন্যহৃদয় ও বিষণ্ণ-মুখ স্মরণ করিয়া, ইন্দ্রাণীর নয়নপল্লব একবারও কি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছিল? কলিকাতায় পঁহুছিয়া অবধি, বিবাহরাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রাম আনন্দ-উৎসবে, বালিকা ইন্দ্রাণীর কিছুই চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। তারপর, শুভদৃষ্টির সময় মহেন্দ্রনাথের আবেগভরা, চঞ্চল-নয়নে তাহার নয়ন মিলিত হইল। উভয়ের হস্ত পুষ্পমালায় সংবদ্ধ হইলে, পুরোহিতের সহিত মন্ত্র-উচ্চারণ করিতে করিতে, মহেন্দ্র যখন কম্পিত হস্তে ইন্দ্রাণীর হাতখানি চাপিয়া ধরিল, তখন তাহার মনে কি এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল—বালিকাসুলভ সরলবুদ্ধিতে ইন্দ্রাণী সেই মুহূর্ত্তে যেন আপনাকে মহেন্দ্রনাথের পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল; এবং কিছুদিন, স্বামীর আদরে-সোহাগে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিয়া, ধন্য হইয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর বিবাহের পর, দুইতিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে বন্ধুদ্বয় একত্রে বি. এ. পাশ করিয়া, অজয় আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হইল—মহেন্দ্রনাথ ধনী পিতার সুপারিশে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিল। অজয়ের অদ্ভুত আত্মসংযম এবং বুদ্ধির প্রভাবে, ইন্দ্রাণীর বিবাহের পরও, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে নাই; মহেন্দ্র নিমন্ত্রণ করিলেই অজয় ছুটিয়া যাইত এবং বন্ধুর সহবাসে পূর্ব্ববৎ আনন্দ-অনুভব করিত। ক্রমে, মহেন্দ্র যখন ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ানের কাজে নিযুক্ত হইয়া, বাকুড়ায় জজ্‌পদে অভিষিক্ত হইল, তখন অজয়নাথও হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া, যথেষ্ট অর্থ-উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রাণী তখন পূর্ণবয়স্কা রমণী। এতদিন, মহেন্দ্র অনেক আগ্রহপ্রকাশ করা সত্ত্বেও, তাহাকে স্বামীর সহিত বিদেশে পাঠান হয় নাই; কিন্তু সে যখন, বয়সের সঙ্গেসঙ্গে জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ক হইয়া, গৃহিণী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়া উঠিল, তখন কিন্তু তাহাকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার জন্য মহেন্দ্রের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তখন ছুটির সময়টাতেও বাড়িতে মন বসিত না; ছুটি না ফুরাইতেই চলিয়া যাইবার জন্য, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায়, সে ছটফট্ করিত। ইন্দ্রাণী বুঝিল, স্বামীর সে ভালবাসা আর নাই!

পুত্রের চালচলন লক্ষ্য করিয়া, পিতামাতাও চঞ্চল হইলেন। বধূকে সঙ্গে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেই পুত্র, নানাকথা কহিয়া, সে প্রস্তাব খণ্ডন করিবার চেষ্টা করে।

এই অনুচিত-ব্যবহারে নরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং সে-বার বধূকে স্বয়ং লইয়া যাইবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহেন্দ্র নিজে যাহাকিছু উপার্জ্জন করিত, আমোদ-প্রমোদেই সে সমস্ত ব্যয় করিত—সুতরাং সে ধনী পিতার নিকট কিঞ্চিৎ 'কাবু' ছিল। পূজার ছুটি-অন্তে, মহেন্দ্র চলিয়া গেলে, পুত্রের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বিনা-সংবাদে, একদিন নরেন্দ্রবাবু ইন্দ্রাণীকে লইয়া বাকুড়ায় পঁহুছিলেন।

পূর্ব্বরজনীতে বন্ধুবান্ধবগণ সহ আমোদে মত্ত মহেন্দ্র, নিশাশেষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সবেমাত্র শয়ন করিয়াছে, এমনসময়, কঙ্কর-নির্ম্মিত পথে ঘড়্ঘড়্ শব্দে একখানা গাড়ি কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় ক্রুদ্ধস্বরে জজ্ সাহেব হাঁকিলেন, "কোই হায়?" ঠিক সেইসময় বেহারা আসিয়া জানাইল, কলিকাতা হইতে "বাবাজি" আসিয়াছেন—সঙ্গে "বহুমাও" আছেন! জজ্ সাহেবের নির্ব্বিবাদ সুখের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; ফিরিঙ্গি স্বভাবাপন্ন মহেন্দ্র, দু-একটি অপভাষায় সমস্ত ঘটনাটিকে 'যহন্নমে' পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, উঠিয়া বসিল; পরক্ষণে, পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া, শশব্যস্তে শয্যা, ত্যাগ করিয়া, প্রণাম করিলে, দু-চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর, পিতা বুঝিলেন পুত্রের অবস্থা স্বাভাবিক নয়; তিনি, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস, শয্যাত্যাগ করিতে মহেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। আহারান্তে, পিতার সহিত অতিসংক্ষেপে দুই-চারিটি বাক্যব্যয় করিয়া, কাছারী চলিয়া গেল—সে-বেলা ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টে স্বামী-সন্দর্শন ঘটিল না। দীর্ঘদিবস-অন্তে, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, কর্ম্মশ্রান্ত মহেন্দ্র শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ইন্দ্রাণী তখনও বসিয়া আছে! সেটা তাহার নিকট অত্যন্ত অযথা এবং অস্বাভাবিক মনে হইল; অতি নীরসভাবে কহিল, "বসে আছ কেন? অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়।

স্বামীর আদর-কাঙালিনী, ক্ষুধিতচিত্তে সারাদীর্ঘ-দিন অপেক্ষা করিয়াছিল; তাদৃশ উপেক্ষা তাহার বক্ষে শেলসম বাজিল! তারপর, তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, বিনাবাক্যব্যয়ে স্বামী অকাতরে নিদ্রামগ্ন হইলে, দুঃখে-অভিমানে ইন্দ্রাণী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। ইন্দ্রাণী ভাবিল, স্বামী যখন প্রথম ডাকিয়াছিলেন, তখন ইচ্ছা-সত্ত্বেও আসিতে পারে নাই বুঝি সেই অপরাধেই এই শাস্তি! কতআশা করিয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে—দীর্ঘপথ কতসুখের কল্পনায় কাটাইয়াছে; প্রথম সাক্ষাতে স্বামী কি বলিবেন—কি করিয়া বক্ষে টানিয়া ঘন-আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবেন—কত আদরে, কত সোহাগে তাহাকে অধীর করিয়া দিবেন! আর এখন কি না এই ব্যবহার? এই প্রথম-সম্ভাষণ? মুহূর্ত্তের জন্য ইন্দ্রাণীর নিকট জগৎ-সংসার শূন্য মনে হইল! পরক্ষণে, চকিতের ন্যায় তাহার হৃদয়ে একটা আশার সঞ্চার হইল; হয় ত স্বামী অভিমান করিয়াছেন—যেমন করিয়া হউক, সে অভিমান ভাঙ্গিতে হইবে। ব্যথিত চিত্তভরা সংশয় ও আতঙ্ক লইয়া, ইন্দ্রাণী সারারাত্রি জাগিয়া—বসিয়া কাটাইল; পাছে প্রভাতে উঠিয়া তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া স্বামী চলিয়া যান!

ক্রমে, রাত্রি শেষ হইয়া আসিল; শরতের নির্ম্মল-প্রভাতে চতুর্দ্দিক হাসিয়া উঠিল; প্রভাতের বায়ুতে ইন্দ্রাণীর শরীর শীতল হইল; অদূরে নির্জ্জন-প্রান্তর পাখীর কলগানে সজীব হইয়া উঠিল। প্রভাতের প্রথম-আলোকরশ্মি জানালার ভিতর দিয়া নিদ্রিত মহেন্দ্রনাথের মুখের উপর পড়িয়াছে; ইন্দ্রাণী পলকহীন নয়নে নিদ্রাভিভূত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আছে; সেইসময় মহেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া, চলিয়া যাইতে যাইতে, কি মনে করিয়া একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। ইন্দ্রাণী তখনও বসিয়া আছে, শয্যা স্পর্শও করে নাই। মহেন্দ্র বিরক্তির সহিত কহিল, "তুমি শোওনি?"

"না।"

"কেন?"

ইন্দ্রাণী তখন সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল্‌বে? আমি এসেছি ব'লে অসন্তুষ্ট হয়েছ?"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার অসন্তোষে তোমার কি আসে-যায়?"

কথাগুলি ইন্দ্রাণীর প্রাণে লাগিল; সে করুণস্বরে কহিল, "তোমার অসন্তোষে আমার কি আসে যায়? অমন কথা কেন বল্‌ছ? আমি তো জেনে-শুনে কোন অপরাধ করিনি?"

মহেন্দ্র, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, রুক্ষস্বরে কহিল, "অপরাধ আছে কি না, অত বিচার করবার অবসর আমার নেই। বিনা-অনুমতিতে এসেছ যেমন, তেমন—তুমি আপন মনে থাক, আর আমি আপন মনে থাকি।" ইন্দ্রাণী উত্তর দিতে যাইতেছিল; কিন্তু, তাহার অপেক্ষা না করিয়াই, মহেন্দ্রনাথ কক্ষ ত্যাগ করিল। মর্ম্মাহত ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু মহেন্দ্র আর আসিল না। শেষে ইন্দ্রাণী মনে করিল, রাত্রিকালে সাক্ষাৎ হইলে আবার একবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু সে রাত্রির পর কত রাত্রি কাটিয়া গেল, ইন্দ্রাণীর মনের কথা আর বলিবার অবকাশ হইল না। সেই অনুতাপ তাহাকে পরলোক পর্য্যন্ত পীড়ন করিয়াছিল, কি না, কে জানে?

একসপ্তাহ অন্তে, পুত্রবধূর বন্দোবস্ত পাকা করিয়া, নরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় ফিরিলেন। সেই একসপ্তাহকাল, পুত্রের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া, পুত্রবধূর জন্য ব্যথিত হইলেও মহেন্দ্রকে ফিরাইবার উপায়ান্তর নাই, স্থির জানিয়া, ইন্দ্রাণীকে রাখিয়া যাওয়াই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। ইন্দ্রাণী কোন কথাই কহিল না—আকুল-অশ্রু সম্বরণ করিয়া, ধীরভাবে শ্বশুরমহাশয়কে বিদায় দিয়া, আপন কক্ষে শয্যায় পড়িয়া, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। তারপর আরও এক বৎসর কাটিল। ইতোমধ্যে নানাঘটনায়, নানা-পীড়নে ইন্দ্রাণীর শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িল; তথাপি, অজয়-নাথের উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া, অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত নিঃসঙ্গ, নীরস জীবনভার সে নীরবে বহন করিতে লাগিল।

একসময় মহেন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যেন তাহার সকল সুখের পথে কণ্টকস্বরূপ আসিয়া জুটিল—পিতার ভয়ে তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলাও কঠিন; অথচ, তাহার সংসর্গও অসহ্য। ইন্দ্রাণীর সবই যেন মহেন্দ্রনাথের স্বভাববিরোধী। সে গীতবাদ্যে পটু নয়, ইংরাজি-ভাষায় তাহার দখল নাই, তাহার হাবভাব-বিলাসিতা নাই, নানা-কৌশলে কাহারও মনহরণ করিতে সে সক্ষম নয়। এমন স্ত্রী লইয়া সাহেবমহলে তাহার পদমর্য্যাদা কি করিয়া রক্ষা হয়? ক্রমে, মহেন্দ্রনাথের সেভাব কমিয়া আসিল। সে দেখিল, ইন্দ্রাণী নিতান্তই অস্থাবর-সম্পত্তির ন্যায় গৃহকোণে পড়িয়া থাকিয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছে। তাহার আচরণে রাগ-দ্বেষ নাই, হিংসা নাই; তাহার গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নাই;—সর্ব্ববিষয়ে সে নির্ব্বিকার! সাহেবে-মেমসাহেবে বাড়ি বোঝাই হইলেও, স্বামীর অনুমতিক্রমে সে আপন গৃহকোণে আশ্রয় লইয়া, দীর্ঘকাল আপন মনে কাটাইয়া দেয়। তখন মহেন্দ্র ভাবিল, এমন স্ত্রী বাড়ীতে থাকায় কোন হানি নাই; অপরপক্ষে, সুবিধা অনেক। ইন্দ্রাণী তখন আনন্দ-নিরানন্দ—সমস্ত অতল-জলে ডুবাইয়া দিয়া, স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল;—আশা ছিল, একদিন স্বামী তাঁহার ভুল বুঝিবেন। আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতে স্বাভাবিক আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে এবং আনন্দ-উৎসবে অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া, সে সকলকে ভুলাইয়া রাখিত,—শুধু একজন তাহাতে ভুলিত না!

কোন বিশেষ কার্য্য-উপলক্ষে অজয়নাথের বাঁকুড়া আসিবার কথা শুনিয়া, মহেন্দ্র তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলে, অনেক বিবেচনার পর, অজয় বন্ধুর আতিথ্য-গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। বহুকাল পরে ইন্দ্রাণীর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ! তাহার সুবর্ণ-কান্তি মলিন দেখিয়া, প্রথমতঃ অজয়ের মনে নানাসংশয় উপস্থিত হইল; কিন্তু সে সংশয় দূর হইতে অধিকদিন লাগিল না। কি অভাবে ইন্দ্রাণী দিনদিন মলিন হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া, অজয়ের মনে দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইল। কার্য্যশেষে, অজয়নাথ কলিকাতা-ফিরিতে আগ্রহপ্রকাশ করায় মহেন্দ্র মহা আপত্তি উত্থাপন করিয়া কহিল, "আশেপাশের দুএকটা ভাল যায়গা দেখে যাও। রাঘবপুরে আমি একখানা বাড়ী কিনেছি; সে যায়গাটা যে কি সুন্দর, একবার দেখ্‌লে ভুল্‌তে পার্‌বে না।" দেশভ্রমণে কোনদিন অজয়ের আপত্তি ছিল না; কোন নির্জ্জনস্থানে একখানি বাড়ী-প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা তাহারও ছিল; সুতরাং, অজয়কে সম্মত করিতে, অধিক বিলম্ব হইত না। বিশেষতঃ, রাঘবপুর বাঁকুড়া হইতে অধিক দূর নয়। মহেন্দ্র প্রতি শনিবার তথায় যাইয়া থাকে। এরূপস্থলে, অজয়ের কোন বক্তব্যই রহিল না।

রাঘবপুর বাসকালে, বন্ধুর কি পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে, তাহা অজয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না। বাঁকুড়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই, কলিকাতা-উদ্দেশ্যে রওনা হইবার পূর্ব্বে, ইন্দ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অজয় কহিল, "ইন্দ্রাণি! আমাকে বন্ধু ব'লে মনে রেখো—আপদ-বিপদে স্মরণ করলেই আস্‌ব।"

ইন্দ্রাণী কোন উত্তর করিল না; নীরবে অজয়ের কথাগুলি শুনিয়া রাখিল। অজয় চলিয়া যাইবার পর, আপদ-বিপদের কথা স্মরণ করিয়া, মাঝে মাঝে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত।

অজয়, কলিকাতায় ফিরিবার কিছুদিন পরই, সংবাদ পাইল মহেন্দ্র রাঘবপুরে বদলী হইয়াছে। স্বামী আগে রাঘবপুর চলিয়া গেলে পর, অন্যান্য আস্‌বাব্‌পত্রসহ, কয়দিন পরে ইন্দ্রাণীও রাঘবপুর পঁহুছিল। সেখানে যাইয়া, প্রথমটা সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। চারিদিকে খোলা-মাঠ; আশে পাশে অন্য কাহারও বসবাস নাই! মহেন্দ্র যতক্ষণ বাহিরে থাকে, ইন্দ্রাণী ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। বাড়ির পশ্চাদ্ভাগে একটি ছোটবাগান প্রস্তুত করিয়া, স্বহস্তে শাকসব্‌জী লাগাইয়া, ইন্দ্রাণী বড় আনন্দ পাইল। আহারান্তে, সকলে বিশ্রাম করিতে গেলে, পরিচারিকাসহ ইন্দ্রাণী কাছাকাছি কৃষকদিগের ভগ্নকুটীরে, বা গাছতলায় বসিয়া, তাহাদিগের সহিত গল্পগুজব করে। বাড়ির পূর্ব্বদিকে মাঠের পরপারে কৃষকপল্লী; পশ্চিমে প্রকাণ্ড বাধের পর বহুদূরবিস্তৃত প্রান্তর; মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। বাধের পরপারে একটী নির্জ্জন কুটীর। তাহাতে কেহ বাস করে, কি না, ঠিক্‌ বুঝিতে পারা যায় না; তবে, ইন্দ্রাণী তাহার রন্ধনশালায় বসিয়া দেখিতে পায়—প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় একটি শিশু প্রান্তরের মধ্যে বৃক্ষতলে খেলিয়া বেড়ায়—আবার, আপন মনেই কুটীরের দিকে যায়।

শিশুটীকে দেখিবার ইচ্ছায় একদিন ইন্দ্রাণী একাকিনী ধান-ক্ষেতের ভিতর দিয়া বাঁধের পরপারে উপস্থিত হইল। শিশুটী তখন ধূলা-বালি লইয়া খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া, ইন্দ্রাণীর মনে কেমন স্নেহের সঞ্চার হইল;—সে মুখ যেন সে কোথায় দেখিয়াছে। তাহাকে কাছে ডাকিতে, সে তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু তুলিয়া ইন্দ্রাণীকে দেখিতে দেখিতে পিছু-হটিয়া চলিল। কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলে, সহসা দ্বার খুলিয়া কে তাহাকে কুটীরমধ্যে টানিয়া লইয়া পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল। ইন্দ্রাণী সেদিন গৃহে ফিরিয়া মালির বৌকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কোন গৃহস্থ তথায় বাস করে না।

ইন্দ্রাণীর মন কিছুতেই মানে না; কি-এক অদৃষ্ট-বন্ধন, তাহাকে যেন সেই কুটীরবাসিনীর সহিত বাঁধিয়া রাখিল। ইন্দ্রাণী প্রত্যহ লক্ষ্য করে, অতিপ্রত্যূষে এবং সন্ধ্যার পর এক স্ত্রীলোক, কুটীর হইতে বাহির হইয়া, বাঁধের জলে স্নানান্তে জল লইয়া, ফিরিয়া যায়। অন্য কোন সময়, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। ক্রমে, ইন্দ্রাণীর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল;—সেই কুটীর-অভ্যন্তরস্থ রহস্য-ভেদ করিবার নিমিত্ত, সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যার পর, চন্দ্রালোকে ইন্দ্রাণী একাকিনী কুটীর অভিমুখে চলিল। কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া, সে দেখিল, কেহ কোথাও নাই; দ্বার ঈষদুন্মুক্ত। ইন্দ্রাণী, নিঃশব্দে কুটীরে প্রবেশ করিয়া, দেখিল, বাহির হইতে যেরূপ দেখায়, ইহা ঠিক সেরূপ দরিদ্রের কুটীর নয়। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ঘর; ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর খোলার ছাত; ঘরের মেজেগুলি পরিষ্কার বিলাতী-মাটীর; আস্‌বাবপত্র নিতান্ত মন্দ নহে। একটি কক্ষে এক রমণী, শিশুটীকে ঘুম পাড়াইতেছে। তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, ইন্দ্রাণী বিস্মিত-নয়নে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। রমণী সুন্দরী নয়; সাধারণ সাঁওতাল যুবতী; তাহার পরিচ্ছদ কিন্তু পরিষ্কার; গৌরবর্ণ নয়—কিন্তু দেহসৌষ্ঠব অতি চমৎকার। ইন্দ্রাণী ভাবিতে লাগিল এ রমণী কে? একাকিনী অসহায় একটি মাত্র শিশু লইয়া থাকে! ইহার কি আর কেহ নাই? এমন সময়, গম্ভীরস্বরে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল! সেই ডাক শুনিয়া ইন্দ্রাণীর আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল; সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—মহেন্দ্রনাথ! ক্রোধভরে তাহার ভ্রূ-কুঞ্চিত; তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ। ইন্দ্রাণীর সে সময় জ্ঞান ছিল না! সে ভাবিতেও পারিল না যে—এমন সময় তাহার স্বামী কখনো গৃহে ফিরিয়া আসেন্‌না; অতএব, গৃহে তাহাকে না পাইয়া, তাহারই সন্ধানে মহেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা সম্ভব নয়! ইন্দ্রাণী হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল, শিশুটীও জাগিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল; ইতাবসরে মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া, কুটীরের বাহিরে আসিল। তারপর, ইন্দ্রাণী যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, গৃহে ফিরিয়া তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। অনেক ভর্ৎসনার পর, যখন তাহার নির্ম্মল-চরিত্রে দোষার্পণ করিতেও স্বামী কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন, অসহ্যবেদনায় শয্যায় পড়িয়া, ইন্দ্রাণী কাঁদিতে লাগিল; সে রাত্রি স্বামীর সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না।

সেইদিন হইতে ইন্দ্রাণীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র যখন-তখন ইন্দ্রাণীর পবিত্রচরিত্রে কলঙ্ক-আরোপ করিতে ছাড়িত না। আর-সকল কথা নীরবে সহ্য করিলেও এ অপবাদ, এ দারুণ অপমান ইন্দ্রাণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তারপর, ক্রমে মহেন্দ্র যখন এক একদিন অধিক মাত্রায় মদ্যপান করিয়া, তাহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন ইন্দ্রাণী চতুর্দ্দিক গাঢ়-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিল।

কাহাকে সে দুঃখ জানাইবে? কে দু'টি ভাল উপদেশ দ্বারা তাহার স্বামীকে সুপথে ফিরাইতে পারিবে? সেই ঘোর-অসময়ে অজয়নাথের কথা তাহার স্মরণ হইল।

সেবার, বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া অবধি, অজয়ের মনে শান্তি নাই; তাহার অসীম ধৈর্য্য টলিল। ইন্দ্রাণীর পরিণাম চিন্তা করিয়া, মনে বড়ই অনুতাপের উদয় হইল; ভাবিল—কেন মহেন্দ্রনাথের হস্তে ইন্দ্রাণীকে সমর্পণ করিতে দিলাম? কেন তাহাকে কাড়িয়া লইলাম না? ইন্দ্রাণী যে, স্বামীর অনাদরে দিনদিন শুষ্ক-পুষ্পের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে বিষয়ে অজয়ের কোন সন্দেহ ছিল না। মহেন্দ্রনাথের অধোগতির পরিণামও সে দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিল। তাহার অত্যাচার হইতে কি করিয়া ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করা যায়—তাহাই দিবা-নিশি চিন্তা করিয়া, অজয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অজয় চক্ষুকর্ণ প্রসারিত করিয়া রাখে; মহেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কোন কথা হইলে, আগ্রহের সহিত শোনে; এবং সংবাদপত্রে তাহার গতিবিধি যথাসম্ভব লক্ষ্য করে। মহেন্দ্র বাঁকুড়া হইতে বদ্‌লি হইয়া, সপরিবারে রাঘবপুর গিয়াছে—শুনিয়া, ইন্দ্রাণীর অবশ্যম্ভাবী বিপদ-কল্পনা করিয়া, রাঘবপুর যাওয়ার জন্য অজয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। একসপ্তাহ অন্তে, মহরমের ছুটি উপলক্ষে, সে রাঘবপুর যাইবে—স্থির করিল।

যেদিন সন্ধ্যার পর অজয় রাঘবপুর পহুঁছিল, সেদিন ইন্দ্রাণী মহা-উদ্বেগে সম্মুখের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দ্বারে গাড়ি দাঁড়াইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া গাড়ির নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু অজয়কে দেখিয়া নিরাশভাবে পিছু হটিয়া কহিল, "তুমি!" অজয় কহিল, "তুমি কার আশায় দাঁড়িয়ে আছ?"

"আমার স্বামী।"

"কেন—সে কোথায় গেছে?"

ইন্দ্রাণী অত্যন্ত কাতর-নয়নে চাহিয়া কহিল, "জানি না; তিনদিন বাড়ী আসেন না। কতদিকে লোক পাঠালাম, কেউ কোন সংবাদ দিতে পারে না! আমি বড় ব্যস্ত হয়ে আছি।"

ইন্দ্রাণীর অবস্থা দেখিয়া, অজয় বুঝিল—মহেন্দ্রনাথের আরও কতটা উন্নতি হইয়াছে। তখন জ্যোৎস্নায় সমস্ত মাঠ-ঘাট প্লাবিত করিয়াছে; যতদূর দৃষ্টি যায়, মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশের তলে, বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। অজয় সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছায়, বাহিরে দাঁড়াইয়া, ইন্দ্রাণীকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিল; এমন সময় অদূরে, কুটীরদ্বার খুলিয়া, একটি লোক টলিতে-টলিতে বাহির হইল; শিশুক্রোড়ে এক রমণী তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া, বহুচেষ্টায়ও তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। ইঙ্গিতে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া, লোকটি বাঁধের পাশ দিয়া, ক্রমশঃ ইন্দ্রাণীদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অজয় ইন্দ্রাণীকে ডাকিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে, ইন্দ্রাণী সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল,—সেইস্বরে লোকটিও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তমধ্যে পরস্পরকে চিনিয়া লইল। অজয়নাথেরও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, লোকটা আর কেহ নয়—স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ। ইন্দ্রাণীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। অজয় তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল; ইন্দ্রাণী সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিছু ভয় নেই, আমি ঠিক আছি। একটা কথা বলি শোন, ওই আমার স্বামী। আজ বুঝলাম, ওই স্ত্রীলোক—

অজয় তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "আমি জানি।"

সবিস্ময়ে ইন্দ্রাণী অজয়ের মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "জান?" তারপর ধীরে ধীরে কহিল "আমি এতক্ষণ ভাব-ছিলাম, এতদিন তুমি আমাকে বলনি কেন! কিন্তু ভালই করেছ। এতদিনে বুঝতে পারছি, কেন ওই শিশুকে দেখে এত মায়া হ'ত—কেন মনে হ'ত, ওই মুখ যেন কোথায় দেখেছি। ওই ঘরের সঙ্গে আমার কি একটা যেন বাঁধন ছিল—মনটা ছুটে ছুটে কেবল ওইদিকেই যেত।"

তখন, ইন্দ্রাণীর একে-একে সকল কথা মনে পড়িল। রাঘবপুরের বাড়ী-কেনা, প্রতি শনিবার তথায় যাতায়াত,

বাঁকুড়া হইতে বদলি হওয়াতে স্বামীর উৎসাহ-প্রকাশ—সে সবই এই সাওতাল রমণীর জন্য। ইহারই জন্য ইন্দ্রাণীকে উপেক্ষা! এতদিন ইন্দ্রাণী নিজের অযোগ্যতা মনে করিয়াই, অপরাধী-জ্ঞানে, স্বামীর পথ হইতে আপনাকে সযত্নে সরাইয়া রাখিয়াছিল। সেদিন, রমণীসুলভ অভিমানে তাহার মন ভরিয়া উঠিল; সে গর্ব্বভরে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন-করিয়া হউক স্বামীকে ফিরাইতেই হইবে, আপনার পদ প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে, আর নীরবে থাকা কিছু নয়।

যে পথে মহেন্দ্রনাথ আসিতেছিল, ইন্দ্রাণী সেদিকে চাহিতেই, অজয় বুঝিল—সে কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে। অজয় কহিল, "সে ফিরে গেছে।"

ইন্দ্রাণী উৎকণ্ঠাভরে কহিল "ফিরে গেছে? কোথায়? ওই ঘরে?"

অজয় কহিল, "না, ওই ঘরের পাশদিয়ে দক্ষিণদিকে গেল; বোধ হয়, বড়-রাস্তায়।" ইন্দ্রাণী সভয়ে কহিল "আবার কোথায় গেলেন? চল, দেখে আসি।"

অজয় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল "আমি যখন এসেছি, তোমার আর ভাবতে হবে না। চল, তোমাকে ঘরে রেখে, আমি তার সন্ধানে যাই।"

তখন উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রাণী অজয়কে বসিতে অনুরোধ করিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী কহিতে লাগিল। কি কারণে কৌতূহলপরবশ হইয়া একদিন ওই স্ত্রীলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কি অশেষ লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইয়াছিল—সেইদিন হইতে কথায়-কথায় কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে;—সমস্ত কথা সে অজয়কে বলিল। তাহার পর অজয়ের হাত ধরিয়া, কহিল, "তবু, তোমার উপদেশ আমি ভুলিনি; স্বামীকে চিরদিন ভক্তি করেছি। তাঁকে আমি ভালবাসি, তা নইলে এত অত্যাচার সহ্য করতে পারতাম কি? তুমি আমাদের দুজনারই বন্ধু; বিপদে সাহায্য করবে বলেছিলে; আমাকে স্পর্শ ক'রে, প্রতিজ্ঞা কর যে—আমার স্বামীকে উদ্ধার ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দেবে?" অজয়নাথ সেই সাধ্বী-রমণীর অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃপূর্ণ পবিত্র মুখপানে বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিল। সহসা কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল; বিকট-হাসির রবে, উভয়ে চাহিয়া দেখিল—পিস্তল হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান—মহেন্দ্রনাথ! ইন্দ্রাণী, কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু চক্ষের পলকে মহেন্দ্রনাথের হস্তস্থিত পিস্তল-নিঃসৃত গুলি তাহার সুকোমল বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল;—ছিন্নলতার ন্যায় সে অজয়নাথের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। আবার সেই বিকট হাসিতে গৃহকম্পিত হইল—ইন্দ্রাণীর মৃতদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যে কামনা অজয়নাথের হৃদয়ে উঠিল, মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গুলিতে তাহার সে কামনা পূর্ণ হইল!

পরদিন প্রভাতে, সকলে শুনিল জজ্‌-সাহেব মদোন্মত্ত অবস্থায় পত্নী ও বন্ধুকে হত্যা করিয়া ফেরার হইয়াছেন।

* * * *

জজ্‌সাহেব, হয় ত, নূতন-সাজে এখনও সমাজের বক্ষে বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু সতী-সাধ্বী, স্বামীর আদরের কাঙালিনী, ইন্দ্রাণীর আত্মা, আজও—মৃত্যুর পরপার হইতে—স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; আমার কাণে আজও—সেই ভগ্নহৃদয়ের ব্যথাভরা কাতর-স্বর বাজিতেছে—"সে কোথায়? ওগো! বল না, সে কোথায়?"

শান্তি

[শ্রীযোগমায়া দেবী]

ভোগমায়া যত—এতদিনে ফুরায়েছে
সুখ-শান্তি-আশাতৃষ্ণা সব ভেসে গেছে
তবুও একটি আশা জাগিতেছে প্রাণে

সে আশা—সেবিতে পদ সে অনন্তধামে!
ফুরায়েছে সব আশা আমার জীবনে;
এবে ব্রত শুধু—সেবা শান্তিময় প্রাণে!

কাশ্মীর-যাত্রা

[শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা]

এই কাশ্মীরের কথা কত কত খ্যাতনামা, কৃতবিদ্যগণ, কত কতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, আমার মত অল্পমতিজনের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতামাত্র। তবে, সেই সৃষ্টিকুশলীর সৃষ্টি-নৈপুণ্যে, মনুষ্যমাত্রেরই দুইটি

কাশ্মীরের পথে—'ট্যানিন্ গ্লেন্' –লিডার উপত্যকা

চক্ষুর ভিতর দিয়া, একই দৃশ্যবস্তুর বিভিন্ন ছাপ পড়িয়া থাকে। তাই একের দেখার সহিত অন্যের দেখার বিশেষ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। একমাত্র সেই আশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া, এই পুনঃপুনঃ কথিত বিষয়কথনে প্রয়াসী হইয়াছি। তুলনার হাতে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইব, কি না, ভগবান জানেন !

সশরীরে স্বর্গারোহণে কার না সাধ যায়—বিশেষ, তা যদি পুণ্যকর্ম্ম-সাপেক্ষ না, হয়। তাই বহুদিবসাবধি এই ভূস্বর্গ অধিরোহণের নিমিত্ত চিত্তমধ্যে এক দুরন্ত অভিলাষ স্থান পাইয়াছিল। এরূপ বাসনা একবার ঠাঁই নিলে, আর তাহা দূর করা দায় হইয়া পড়ে। অথচ, বিধি প্রসাদাৎ এমনই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথাকার সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" বলিয়া বিশেষ-বিধির বিধান করিয়া গিয়াছেন এবং যথায় এই শাস্ত্রানুমোদিত বিধিপালনে গৃহস্থমাত্রেরই সম্যক্ নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ষোড়শী রূপসী সঙ্গে থাকিলে তবু বা এই বিবর্জ্জন বিধির সার্থকতা বোঝা যাইতে পারে; কিন্তু যেখানে সে বালাই নাই, সেখানে নরোচিত সেই চিরন্তন স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অবশ্য, এই জলবায়ুপরিবর্ত্তনের যুগে, শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সপরিবারে স্বাস্থ্যকরস্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিন্তু সুদূর দুর্গমপথে, যেন করুণার-বশেই,

কাশ্মীরের পথে – বনশোভা

তাঁহারা কোমলাঙ্গীদিগকে সঙ্গিনী করিতে নারাজ হয়েন। তীর্থযাত্রার কথা—সে স্বতন্ত্র! ধর্ম্মের অনুরোধে, এই ধর্ম্ম-

প্রধান দেশের অবলাগণ, অনেক সময় আপনারাই দলবল বাঁধিয়া বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ যে নয় তীর্থ, নয় সুগম, স্বাস্থ্যকর-স্থান! সুতরাং এস্থলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মতই বৎসরের পর বৎসর কাটাইতে লাগিলাম। এদিকে জীবনের মৌরশী-পাট্টার মেয়াদও ফুরাইয়া আসিতেছে এবং তৎসঙ্গে দেহত্যাগের দিনও ঘনাইতেছে; ইতি-চিন্তা করিয়া, "যা-থাকে কপালে, আর যা-করেন হরি" বলিয়া আমরা বঙ্গমাতার তিনটি সাহসী কন্যা এই মর্ত্তের সুরলোকগমনে কৃতসংকল্পা হইলাম। বাধা দিবার লোকের অভাব হয় নাই; কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী!" পূজার ছুটিতে ভিড় হইবে জানিয়া আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দিনধার্য্য করিয়া রওনা হইলাম। হাবড়া ষ্টেসনে রেলগাড়ীতে চড়িতেই গার্ড আসিয়া যখন জিজ্ঞাসায় জানিল যে, আমরা "পথে নরো বিবর্জ্জিতঃ" হইয়া চলিয়াছি, তখন সে সাগ্রহে আমাদের সকলপ্রকার সুবিধা করিয়া দিল এবং আমরাও পরম আরামে রাত্রি কাটাইলাম। আরও একরাত্রি, ঙইদিনের পথ চলিয়া তবে রাউলপিণ্ডীতে পৌছিব। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি বঙ্গের সমতলক্ষেত্র ছাড়াইয়া বন্ধুর পার্ব্বত্য-প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। ক্রমেই অরুণকিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আমাদের বাষ্পীয়যানও সেই প্রখরতাপে উত্তপ্ত হইয়া যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া স্থানান্তরে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল। আমরা, সেই উত্তপ্ত শকট-বাসীরা কিন্তু ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াও অন্তরের শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সময়ে সন্ধ্যার সুশীতল সমীরণে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া শারীরিক সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলাম।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাউলপিণ্ডীতে গাড়ি থামিল। এইখানেই রেলের পথের ইতি। আমাদের জিনিষপত্র শ্রীনগরে পৌছাইবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল; সেই অনুসারে এক টোঙ্গাগাড়ীতে মাল বোঝাই করাইয়া আমাদিগের ভৃত্যসহ রওনা করাইয়া দিলাম। রাউল-পিণ্ডী হইতে 'ল্যাণ্ডো' গাড়ীতে ৭।৮ দিনে, টোঙ্গাগাড়ীতে ৪।৫ দিনে, এবং সম্প্রতি 'মোটরে' দেড়দিনে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে পৌছান যায়। স্বর্গ[illegible]র সখ্‌ বড় বেশী বলিয়া, আমরা শেষোক্তযানে যাইবার বন্দোবস্ত আগে থাকিতেই করাইয়া রাখিয়াছিলাম। তদনুসারে "হরিরাম কোম্পানীর" লোক আসিয়া আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া পরদিন বেলা ৯টার সময় সারথীসহ রথ প্রেরণে প্রতিশ্রুত হইয়া গেল। ষ্টেসনে আমাদিগের কোন পরিচিত বন্ধুর পরিবার আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন; তিনি সাদরে আমা-দিগকে তাঁহার বসতবাটিতে লইয়া গিয়া রাত্রিযাপনের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাত্রিপ্রভাতে যথাসময়ে আমাদিগের যান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এক পঞ্জাবী-সারথী প্রথমেই মাতৃসম্বোধনে আমাদের হৃদয় স্নেহে স্পর্শ করিয়া, সুরলোকের সঙ্কটিয়া পথগমনে

কাশ্মীরের বনপথে

মাতাদিগকে আশ্বস্ত করিল। তা না হইবেই বা কেন? আমরা যে স্বয়ং "হরিরামের" শরণাপন্ন হইয়াছি। এ নামের মাহাত্ম্য যাবে কোথা? সঙ্গে হাল্‌কা বিছানা-পত্র ও একটি ছোটবাক্‌স ভিন্ন আর কিছু লইয়া যাবার নিয়ম নাই; কেন না, চড়াইপথে বেশী ভার লইয়া ওঠা মুস্কিল। আমাদিগকে উঠিতে হইবে ৬০০০ ফিট উপরে। সে ত কম কথা নয়? পিণ্ডীতে আসিয়াই শীতের আভাস পাইলাম; তাই সঙ্গে শাল, কম্বল ইত্যাদি সম্বল লইতে হইল।

রাস্তার রজঃ-রাশির উৎপাত হইতে কোমল চক্ষুকে রক্ষার নিমিত্ত, সকলেই নাসিকাগ্রে নীল-চস্‌মা আঁটিয়া বসিলাম। ততঃপর, হস্তপদকে উত্তমরূপে আবৃত করিয়া, কর্ণরন্ধ্রের মধ্য দিয়া শৈত্যবায়ের গোপন-আলাপন বন্ধ করিবার চিন্তায় বিব্রত রহিলাম। গাড়ী যতই হু-হুশব্দে ছুটিয়াছে, ততই আমাদের কর্ণ বধির হওয়ার উপক্রম হইতেছে। তখন শিরাস্তরণের সাহায্যে তাহার বিহিত-বিধান করিয়া, হৃষ্টচিত্তে তাবৎ নৈসর্গিকশোভা সন্দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম।

শ্রীনগরের পথে

সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম সেই নগাধিরাজ, সত্য সত্যই যেন "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধিবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" পার্ব্বত্য প্রদেশ হইলেও এসময় এখানের আকাশে, মেঘের মেলা মোটেই নাই; তাই ধূলির এত প্রাদুর্ভাব। অনুমান ৪১৫ মাইল সমভূমিতে চলিয়া এবারে 'মোটর'খানা চড়াইপথ ধরিল। রাস্তা অনেকটা দার্জ্জিলিঙ্গের মত, কিন্তু বড় দুর্গম। স্থানেস্থানে এত সঙ্কীর্ণ যে, দুইখানা গাড়ী পাশাপাশি চলা ভার। সে সবস্থানে এত সন্তর্পণে যাওয়া আবশ্যক যে, বিচক্ষণ চালক নইলে সমূহবিপদের আশঙ্কা আছে। তাই যাত্রিদিগের সতর্কতার নিমিত্ত সেই সব পাকে-পাকে "caution" লিখিত লাল নিশান প্রোথিত রহিয়াছে।---বাহাদুর চালক বটে! আমাদের চালকের চালনকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছিলাম এবং মাঝে মাঝে মায়ের প্রাণের মঙ্গল-কামনায় পুত্রের দীর্ঘজীবন যাচ্ঞা করিতেছিলাম।
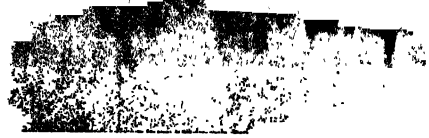
আহা! চতুর্দ্দিকে কি বিরাট-মূর্ত্তি! ক্ষুদ্র হৃদয়মধ্যে ইহার কিছুরই থৈ পাইতেছি না। দুইচক্ষু ভরিয়া যতটা আনিয়া দিতেছে, আমার অন্তরমধ্যে ততটা রাখিবার স্থান কোথায়? তাই তখন এই চক্ষুকে যাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলাম, আজ তাহা ফিরাইয়া চাহিতেছি! সে তাহা দিবে কেমনে? সে যে পথের মাঝে তাহা ফেলিয়া-ছাড়িয়া আসিয়াছে—যে পারে সে কুড়াইয়া নিবে বলিয়া?—যার ভাণ্ডার বড়, সে তাতে বোঝাই রাখিবে বলিয়া! তাই ভাবি, কবে এ ক্ষুদ্রভাণ্ডার বাড়াইয়া বড় করিতে পারিব, আর আমার চক্ষু তাহা ভরিতে গিয়া কূল পাইবে না।

বর্ব্বর শা'র সেতু—শ্রীনগর

আমাদিগের প্রথম আড্ডা (halting place) "নারি" পৌছিতে তখনও ঘণ্টাদুই বাকি—প্রায় হাজারদুই ফিট উঠিয়াছি এমন সময় আমাদের মোটর-গাড়ীর দমকল ঘন ঘন উত্তপ্ত হইয়া যেন ফাটফাট-গোছ হইতেছিল। যদি সে দৈবাৎ বিকল হইয়া পড়ে, তবে এই জনমানবশূন্য পথে আমাদের দশা কি হইবে, ভাবিতে আতঙ্ক উ[illegible] হইতেছিল। কিন্তু যিনি এ প্রাণ [illegible] তিনি তাহার রক্ষারও উপায় রাখিয়াছেন।

তাই দেখ না, তাঁরই ইঙ্গিতে, সময় বুঝিয়া এই পাষাণের দেশে, কেমন তাঁহারই বিগলিত করুণা

কাশ্মীরের নিসর্গ-দৃশ্য

স্নেহময়ী মাতারমত নির্ঝরিণীরূপে নামিয়া আসিয়া, আপন বক্ষের সুধাধারায় সকল তাপ সন্তাপ বিদূরিত করিতেছে! দেখিয়া কেবল বলিতে ইচ্ছা হয় "ধন্য তুমি, ধন্য; ধন্য তব করুণা; ধন্য তব রচনাকৌশল!"

এইরূপে ধরিত্রীমাতার বক্ষসুধা পান করিতে করিতে, আমাদের যান পথশ্রমেও ক্লান্ত না হইয়া বেলা দুইপ্রহরের পর 'মারি'তে পৌঁছিল। আমরাও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাকে কিছুকালের জন্য রেহাই দিয়া আপনা পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইলাম; আর চাহিয়া দেখিলাম যেন রাজসরকারের চির দরবার বসিয়াছে। শৈলো[illegible]; পদাশ্রিত নগ্ন, দীন, দরিদ্র হইতে সম্রান্ত,সম্পদশালী সকলেই আপন পদমর্য্যাদাঅনুসারে উচ্চে নীচে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রভুর অসীম মহান্‌শক্তির সাক্ষী দিতেছে। নতুবা এই

কাশ্মিরী মুসলমান

অনাদিকাল ধরিয়া, ছোটবড়নির্ব্বিশেষে কে এই একই প্রেমসূত্রে বাঁধা পড়িয়া থাকিত? কেনই বা নিশ্চল নির্ব্বিকার থাকিয়া তাঁহার চির-অধীনতা স্বীকার

কাশ্মীরে বিবাহের শোভা-যাত্রা

করিত বল? এই দরবারের খাসমহলে, কেহ বা শুভ্র তুষার-কিরীট মস্তকে ধারণ করিয়া, কেহ বা শোভন শ্যামল-পরিচ্ছদে অঙ্গ-সমাচ্ছাদিত করিয়া, কেহ বা নগ্ন-দেহের স্নিগ্ধধূসরকান্তি লইয়া, সেই প্রজা-বৎসলের জয় ঘোষণা করিতেছে! দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! কালের ধ্বংসকুশলীহস্ত এখানে পরাস্ত মানিয়াছে! দৈবের দুর্ব্বিপাক এখানে প্রবেশাধিকারলাভ করিতে পায় নাই! এক নিত্য-সত্যসনাতনরূপে জগজ্জনকে সেই অনাদি অনন্ত বিরাটের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। আবার বলিলাম, "ধন্য! তুমি ধন্য; ধন্য তব রচনাকৌশল!"

কাশ্মিরী রমণী

কিন্তু এই সত্য-সনাতনের রাজ্যে, এই অনিত্য ধূলি-মাখার ধুম কেন? এ ভূস্বর্গে প্রবেশ করিতে হইলে, অঙ্গে ভস্ম মাখিয়া, মুখে "হরিরাম নাম" উচ্চারণ করিয়া, অন্তরে বিরাগী না হইয়াও, এই ভণ্ডতাপসী সাজা কেন? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! তাই আপনার আত্মার কাছে জবাবদিহি করিতে গিয়া, আতঙ্কে যতই অঙ্গের বিভূতি-রাশি ঝাড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইতেছি, ততই সেই কৌতুকময়ী, আমাদের মুখে-চক্ষে-বক্ষে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, আমাদিগকে ছদ্মবেশী-তাপসী সাজাইতে কৃতসংকল্প হইতেছে। কত কাকুতি-মিনতি, কত খোসামুদি করিলাম! কিন্তু সে, তার রঙ্গতামাসা ছাড়িল না। [illegible] রোষপরবশ হইয়া ইহার প্রতিশোধের উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় রহিলাম।

'মারি'তে ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর, আবার রওনা দিলাম। এবার চলিলাম ছায়াময় সুগমপথে—নীচের দিকে। পথের দুইধারে সারিসারি বৃক্ষসকল আপনাদের প্রশস্তবাহু প্রসারণপূর্ব্বক, অদিতি-নন্দনকে অন্তরাল করিয়া আছে। তাই তার তাপে পুড়িতে না পাইয়া, ধরিত্রী আপনার আর্দ্রকোমল হৃদয়ে পথিকের পথকষ্ট বিমোচন করিতেছে! ভাবিলাম, এইভাবে বাকি পথ যাইতে পারিলে আর ভাবনা কি? কিন্তু মনের উল্লাসের সঙ্গে বিধি-বিবাদী হইয়া বসে। অকস্মাৎ আমাদের চতুষ্পদ-যানের একপদ বিকল হইয়া, পথিমধ্যে যাত্রাভঙ্গ করিল। এইবার বুঝি "নরো বিবর্জ্জিতঃ" হইয়া পথ-চলার সুখ মিটিয়া যায়! কিন্তু মধুসূদন তাহা হইতে দিবেন কেন? নারীর বড়াই নারায়ণ ভাঙ্গবেন কেন? অচিরাৎ আমাদের কার্য্য-পরায়ণ সুসন্তান সেই অচলপদে চলৎশক্তি আনিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মাতাগণকে তাহাদের রাত্রিযাপনের স্থান "কোহালা"তে পৌছাইয়া দিল।

অদূরেই পান্থশালার দুইটি কক্ষ অধিকার করিয়া আমরা সেদিনের মত সুস্থির হইলাম। প্রথমেই সলিল-সংযোগে অঙ্গের বিভূতি বিধৌত করিয়া দিয়া, তাহাকে চরণাশ্রিত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইলাম। তখন কাহার কলধ্বনি কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল! বাহিরে আসিয়া দেখি, এক তরতরবাহিনী তরঙ্গিণী হেলিয়া-দুলিয়া নাচিয়া-খেলিয়া চলিয়াছে! আপনার উল্লাসে কখনও বা উছলিয়া পড়িতেছে! আজ জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে তার এ কিসের উল্লাস? তার এত ত্বরা কেন? সে ত জানে, এ যাওয়া জন্মের-মত যাওয়া! একবার গেলে, আর ফিরিয়া আসিবে না! কার ডাকে তার এ উন্মত্ততা? অথবা বিচেতনেও নারীর ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিতে জানে দেখিয়া, এ নারীহৃদয়ে গৌরব অনুভব করিলাম। সে কল-কলভাষে এ পথের পথিকগণকে বলিয়া যাইতেছে, "যাও মর্ত্তবাসিগণ তোমরা এই ঊর্দ্ধপথে

উঠিয়া যাও ; তবেই নিম্নের শোভাসম্পদ দেখিবার তোমাদের যথার্থ অধিকার জন্মিবে। যাহা এতদিন দেখ নাই, যাহা কাছে থাকিয়া দেখা হয় না, দেখা যায় না, তাহা দেখিয়া নয়ন-মন তৃপ্ত করিবে! তোমাদের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ রাখিবে না বলিয়া, মাঝে-মাঝে, ঐ দেখ অদ্রিরাজি কেমন আপনা-হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এই স্বর্গ-মর্ত্তের মিলিতরূপ দেখাবে ব'লে, আকাশ আজ আপনাকে মেঘমুক্ত রাখিয়াছে। আজ এ দিব্যলোকের মাহাত্ম্যে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াই, দেখিবে যাহা কিছু পঙ্কিল, যাহা কিছু অশোভন সকলই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।" ভাবিলাম—তাই ত! যে শিল্পী এই সুরলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই যে মর্ত্যধামেরও নির্ম্মাতা! একই সুধার দ্বারা এ-লোকে সে-লোকে বহিয়া যাইতেছে। তাই ঊর্দ্ধে ছুটিয়াছে—নিম্নের সুধার সঙ্গে ; আবার নিম্নে চলিয়াছে ঊর্দ্ধের সুধার অন্বেষণে। সেদিন, যথায়-তথায় থাকিয়া এই দুই-লোকের সুধাপানের অধিকারী হইব, সেইদিনই ধন্য হইয়া যাইব। তখন—সেইদিন এই ঊর্দ্ধে উঠা সার্থক মানিব!

হ্রদ-তটে—কাশ্মিরী শিশু

আদর্শ আমার

[শ্রীসরলা দত্ত]

তুমি নহ চকিত-চঞ্চল—
তুমি চির-শান্তসুকোমল,
তোমার লাবণ্যদীপ্তি, কামনা—সাধনা তৃপ্তি—
ওমা! চিরসুলক্ষণা!
তোমারে আদর্শ করি,
বাহিব জীবন-তরী—
ওপারে আনন্দ-গীতি, মধুরললিত-স্মৃতি—
তুমি ওপারে সান্ত্বনা!

উপহার

[শ্রীমতী হেমনলিনী বসু]

অপবিত্র—অসুন্দর যাহাকিছু হয়—
দেবতার পায় দিতে যোগ্য তাহা নয়,
অম্লান—কোমল ফুল স্ফুটসুষমায়,
শোভে তাই দেবতার সুপবিত্র পায়।
আরাধ্য-দেবতা যিনি—সে দুর্ল্লভধনে,
উপহার দিতে যদি ইচ্ছা কর মনে—
প্রেমঅশ্রুসিক্ত-শুভ্রহৃদয়কমল
দিয়ে সে চরণে—কর জনমসফল।

জ্যোতির্ম্ময়ী

[শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী।]

পূর্ণ একবৎসর প্রবাসের পর, দাদা গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন। শুনিলাম সঙ্গে নববধূ! সংবাদ পাইয়া প্রাণটা বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গতবৎসর এমনই দিনে, গৃহলক্ষ্মী হারাইয়া মনস্থির করিবার জন্য তিনি প্রবাস-যাত্রা করিয়াছিলেন। আর আজ ফিরিতেছেন, সঙ্গে নববধূ! পুরুষজাতটা কি?—বড় ঘৃণা হইল!

সারাদিন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও, পরলোকগতা সেই সতীলক্ষ্মী বউ'এর মুখখানা কেবলই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই সুন্দর মুখখানাতে কি করুণ ভাবটুকুই ফুটিয়া থাকিত!

জীবনের মধ্যাহ্নকালে, জীবনদেবতা যখন দাসীকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন এ অভাগিনীকে আশ্রয় দিবার মত শ্বশুরকুলে বা পিতৃকুলে কেহই ছিলেন না। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান সে সময়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন। দূর-সম্পর্কীয় মাতুলপুত্র অতুলচন্দ্র সে সময়ে আমাকে আশ্রয়-দান করিলেন। সেদিনকার কথা আজিও ভুলি নাই। হৃদয়ে কি তীব্র-বেদনা, প্রাণে কি দারুণ-সংশয় লইয়া ভ্রাতৃ-গৃহে যাত্রা করিয়াছিলাম। সম্পর্কে মাতুলপুত্র হইলেও, তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও দেখি নাই; মায়ের নিকট বহুপূর্ব্বে তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি আমা-অপেক্ষা দুইবৎসরের বড়, এই মাত্র জানি;—তাঁহার গৃহে কি-ভাবে গৃহীত হইব, কি ভাবে বাস করিতে হইবে, কিছুই জানিতাম না। শিশুকাল হইতেই বড় অভিমানী ছিলাম—স্বামীও সে অভিমানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। সেই জন্যই, ভয়ে-ত্রাসে-সংশয়ে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইয়া-ছিল; কিন্তু প্রাঙ্গণে পালকী লাগিতেই, একটি হাস্যমুখী, সুন্দরী রমণী আমার হস্তধারণ করিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া—আমার সকল ভয়, সকল সংশয় দূর হইল। সে আমার দাদার বউ! তাহার সেই সুন্দর মুখখানিতে যেন করুণা উছলিয়া পড়িতেছে। জানিতে পারিলাম, দাসদাসীপরিপূর্ণ এই প্রকাণ্ডপুরীর সে-ই গৃহিণী। গৃহে দাসীরা ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোক কেহ নাই। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বউ-এর গুণে, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তাহার জীবন সুখের ছিল, কি দুঃখের ছিল—তাহা আমি ভাবিয়া উঠিতে পারিতাম না। কখনও মনে হইত, তাহার মত সুখী এ জগতে কেহ নাই; কখনও ভাবিতাম, তাহার দুঃখের সীমা নাই।

তাহার সহিত দাদার ব্যবহারেও কিছু বিচিত্রতা ছিল। দাদা যে বউকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। তাহার সুখবিধানে তিনি সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিতেন—তাহার সামান্য অসুখে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। সন্তান-জন্মের পর হইতে, তাহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, দাদা তাহাকে সংসারের কোন কাজ করিতে দিতেন না। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন বউ-এর কোলে দুইমাসের খোকা। সেই অবধি, দাদা আমার হাতেই সংসারের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তার উপর দাসদাসীর অন্ত ছিল না। তবে, পত্নীর সঙ্গলাভের একটা প্রবল-আকাঙ্ক্ষা দাদার মধ্যে কখনও দেখি নাই; বরং অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি, অবসরটুকু নির্জ্জনে একাকী যাপন করিতেই দাদা ভালবাসিতেন। দুদণ্ড স্ত্রীর সহিত বসিয়া একটু হাসি-গল্প করিতে, তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যই ইহার কারণ বলিয়া, আমি ইহার সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিতাম।

বউ-এর মুখ মাঝে-মাঝে বিষণ্ণ দেখিতাম; কিন্তু বিরক্তি-ভাব কিছুমাত্র ছিল না। দাদা যতটুকু সময় তাহার কাছে থাকিতেন, সে প্রফুল্ল-বদনে তাঁহার সেবা করিত। দাদার মুখে একটু হাসি দেখিলে, সে কৃতার্থ হইয়া যাইত। সে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা! দাদার মনে কি যেন একটা কষ্ট ছিল।

মাঝে মাঝে দেখিয়াছি, বউ যখন আপনা ভুলিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে, তিনি ছলছলচক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। এই দুইটি নিকটতম-বন্ধনে-আবদ্ধ নর-নারীর জীবন, আমার নিকট একটি প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(২)

আমার আগমনের প্রায় দুই বৎসর পরের একদিনের কথা মনে আছে। দাদার আফিসের কয়েকদিন ছুটি ছিল; দাদা সেই অবসরে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

রাত্রে কাজকর্ম্ম সারিয়া, উপরে গেলাম। বউকে ঘরের মধ্যে না পাইয়া, তাহার অন্বেষণে ছাদে গিয়াছিলাম। চন্দ্রালোকে সেদিন সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত! চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, প্রকৃতির কি সুন্দর বেশ! নির্ম্মল, মেঘশূন্য আকাশে তারাগুলি কি সুন্দরই দেখাইতেছিল! দক্ষিণা-বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া মুখেচখে আসিয়া লাগিয়া বসন্তের আগমনবার্ত্তা জানাইতেছিল। বৃক্ষ-লতাগুলি নবসাজে সজ্জিত হইয়া মৃদুহিল্লোলে নাচিতেছিল; নব-মুকুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক সেদিন আমোদিত! মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর বেশ দেখিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিভ্রম উপস্থিত হইল। গত জীবনের কত সুখস্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া, নিজের অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস রুদ্ধহৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই মনে হইল—ছিঃ, আমি যে বিধবা! আমি ব্রহ্মচারিণী! সংযমই যে আমার ধর্ম্ম! সুখ বা দুঃখ, কিছুতেই বিচলিত হইবার অধিকার ত আমার নাই!

সহসা রুদ্ধ-ক্রন্দনের একটা স্বর যেন আমার কাণে গেল। মনে হইল, বউএর সন্ধানে আসিয়াছিলাম,—সে কোথায়? এই রাত্রে অমন বুকফাটা-কান্না কাঁদে কে? ছাদের যে অংশটা সিঁড়িঘরকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে গিয়া দেখিলাম, দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া বউ রোদন করিতেছে। ব্যর্থ-জীবনের দুঃসহ দুঃখ, যেন তাহার বুকের দ্বারে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে।

আমার আদরের বউকে এ অবস্থায় দেখিয়া, দাদার প্রতি একটা বিজাতীয়-ঘৃণা মুহূর্ত্তের জন্য আমার হৃদয়টাকে ছাইয়া ফেলিল। এই সতীলক্ষ্মী পত্নীর মনে যে কষ্ট দিতে পারে, সে মানুষনামের অযোগ্য! আমি নীরবে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলাম। বহুক্ষণ পর, সে একটু শান্ত হইলে, আমি বলিলাম—"বউ! তোকে কোন দিন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আজ একটা কথা আমায় বল্‌বি? তোকে দেখে যেন মনে হয়, তোর মনে বড় কষ্ট। আমি ত তোর পর নই; আমার কাছে সত্য ক'রে বল্‌দেখি, দাদা কি তোর সঙ্গে কোন মন্দব্যবহার করেন? তোকে কি ভালবাসেন না?"

শিহরিয়া উঠিয়া সে বলিল—"অমন কথা বোলোনা ঠাকুরঝি! দেবতার নামে ওকথা মনে আন্‌লেও পাপ হয়। আমার মত একটা অপদার্থ নারীকে তিনি কত ভালবাসেন!"

"তবে কাঁদ্‌ছিলি কেন?"

ম্লানহাসি হাসিয়া সে কহিল,—"আমার স্বভাবদোষ ঠাকুরঝি! নিতান্তই স্বভাবদোষ! ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বভাব, যত পাই, আরও তত চাই। তোমার দাদার মত স্বামী, কয়জনের ভাগ্যে হয়?"

আমি বিস্মিতনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম—"তোর কি এখন একাএকা ছাদে আস্‌তে আছে? চল্, নিচে যাই। খোকা একা র'য়েছে।"

সে তখন, তাহার দ্বিতীয়-সন্তানের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে কিছু না বলিয়া, আমার সঙ্গে নীচে আসিয়া, নিদ্রিত-খোকাকে বুকে লইয়া শুইল। ইহার একমাস পরে, মৃত দ্বিতীয়-সন্তান প্রসব করিয়াই, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সেই অজ্ঞানাবস্থায় তিনদিন থাকিয়া, চতুর্থদিন ভোরবেলা সে প্রাণত্যাগ করিল। হায়! অভাগা খোকা! আর অভাগিনী আমি! পূর্ব্বজন্মে কতই না পাপ করিয়াছিলাম; যাহাকে জড়াইয়া ধরি, সেই ত্যাগ করিয়া যায়!

(৩)

শোকের প্রথম-অবস্থায় দাদা যেন কেমন হইয়া গেলেন। মৃতার হাতদুখানা চাপিয়া ধরিয়া, সেই শয্যা-পার্শ্বে স্তব্ধ হইয়া, কতক্ষণ যে বসিয়া রহিলেন, তাহার ঠিক নাই। মাঝে মাঝে আপনমনে, অস্ফুটস্বরে কত কথাই

বলিতে লাগিলেন। একটা কথা আমার কাণে গেল, "দয়াময়! দয়াময়! তুমি জান, এ প্রার্থনা ত আমি করি নাই।" এই অসম্বদ্ধ কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম! দাদার জন্য একটা ভয় আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল; শোকে কি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল?

আমি ধীরেধীরে উঠিলাম, ধীরেধীরে খোকাকে আনিয়া দাদার কোলে ফেলিয়া দিলাম। তুইবৎসরের শিশু কি বুঝিয়াছিল, জানি না; তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় থাকিয়া-থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। মাতৃহীন-শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া, দাদার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল; আমি ঠাকুর-দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া, সেস্থান ত্যাগ করিলাম।

একমাস দাদা বড়ই অস্থির হইয়া বেড়াইলেন। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই ভীত হইলাম। শেষে, একদিন বলিলাম, "দাদা, কিছুদিনের জন্য বেরিয়ে পড়; এভাবে থেকে শরীর যে ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

দাদা যেন কূল পাইলেন; বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই যাবোরে! তুই একা থাক্‌তে পার্‌বি ত?"

আমি কহিলাম, "কেন পার্‌ব না, দাদা! এত চাকর-বাকর রয়েছে, সরকার-মশাই রয়েছেন। আমাদের জন্য কিসের ভাবনা?"

একদিন সন্ধ্যার পর, খোকার মুখচুম্বন করিয়া, আমাকে ছলছলচক্ষে খোকার যত্ন করিতে বলিয়া, দাদা প্রবাসযাত্রা করিলেন। আমি ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, মনে মনে কহিলাম, "হে ঠাকুর দাদার মনে শান্তি দাও।"

দাদা আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, প্রথমে বৈদ্যনাথে একমাস, তারপর কাশীতে একমাস থাকিয়া, বৃন্দাবন যাইবেন। সেখানে কিছু অধিকদিন থাকিয়া, পরে মুশৌরী পাহাড়ে কিছুদিন বাস করিয়া, বৎসরান্তে দেশে ফিরিবেন। দাদা একবৎসরের ছুটি পাইয়াছিলেন। বউ-এর অভাবে গৃহ শ্মশান হইয়াছিল; দাদা চলিয়া গেলে, বাড়ী একেবারেই শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

আমি খোকাকে লইয়া পড়িলাম। মাতৃহীনশিশুপালন করা—যে কি বিষম পরীক্ষা, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতাম না। যে এ পরীক্ষায় না পড়িয়াছে, সে কল্পনায়ও আনিতে পারিবে না,—পদে-পদে কি কঠিন পরীক্ষা!

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে, বউ আমার হাত-দুখানা ধরিয়া সজলনয়নে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরঝি! এবার আর আমি বাঁচ্‌ব না, জানি। খোকাকে তুমিই দেখো। আর আর—" কথাটা তাহার মুখে বাধিয়া যাইতেছিল—"আর—নতুন মা পেয়েও, যেন খোকা আমাকে একেবারে ভুলে যায় না, তুমি এটা দেখো।" তখন এজন্য আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম, সত্য; কিন্তু, সে যাইবার পর হইতেই, এই কথাগুলি আমায় বড়ই পীড়ন করিত।

দাদার শয়নগৃহে বউ-এর একখানা তৈলচিত্র ছিল। দাদা বিদেশে যাইবার পর হইতেই, আমি খোকাকে লইয়া সেই গৃহেই শয়ন করিতাম, এবং দিবসের অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটাইতাম। ঐ তৈলচিত্রের প্রতি সর্ব্বদাই খোকার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতাম। সেই গৃহে প্রবেশ করিলেই, খোকা সেই চিত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, আধ-আধ ভাষায় কহিত,—"ঐ মা—ঐ আমাল্‌ মা—কেমন সুন্দল্‌ মা!" আমি তখন বড়ই আনন্দ বোধ করিতাম। তাহার মাতার স্মৃতি তাহার হৃদয়ে ক্ষীণ হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই, ঐ চিত্রপটের মূর্ত্তি তাহার হৃদয়পুটে জীবিত হইয়া উঠিবে, এই আশাই হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম। কেবলই মনে করিতাম, তাহার শেষ-প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিলে, তাহার স্মৃতির নিকট অপরাধিনী হইব।

বৈদ্যনাথ হইতে দাদার দুই-তিনখানা পত্র পাইলাম; কাশী হইতেও নিয়মিত পত্র পাইয়াছি। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার কোন পত্রাদি পাইলাম না।

একমাস পর, মুশৌরী হইতে তাঁহার এক পত্রে জানিলাম, তিনি বৃন্দাবনে দুইদিনমাত্র ছিলেন। মুশৌরীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া, গৃহে ফিরিবার পথে, তিনি পুনরায় বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। গৃহাগমনের দুইদিন পূর্ব্বে, দাদার যে শেষ পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা বৃন্দাবন হইতেই লেখা। দাদার সেইপত্রেই নববধূর আগমন-সংবাদ পাইয়াছিলাম।

সংবাদ পাইয়া, খোকাকে বুকে ধরিয়া, কত কান্নাই না কাঁদিলাম। সেই অ-দেখা নূতন-বউএর উপর একটা দারুণ বিরক্তি, আমার হৃদয় পূর্ণ করিল। আমার আদরের বউ-এর স্থান দখল করিতে আসিতেছে—এতবড় ধৃষ্টতা তার! দাদার পুরাতন শয়নগৃহের সমস্ত জিনিষপত্র সরাইয়া, সেইখানেই আমার ও খোকার চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত করিলাম। অন্য একটা ঘরে দাদার সমস্ত আস্‌বাবপত্র

গোছাইয়া দিলাম। আমার অসময়ের আশ্রয়দাতা, আমার স্নেহময় দাদার কথা স্মরণ করিয়া, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, নূতন-বধূর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া, কেবলই সেই করুণ-চাহনিপূর্ণ মিষ্ট মুখখানা চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

(৪)

নববধূ আসিল। তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম! এ কি! এই কি নূতন-বধূ! ইহার বয়স ত অষ্টাদশের কম হইবে না! এ ত ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, নতমুখী, লজ্জাবতী-লতা নয়; ইহার মুখে যে একটি জীবনের ইতিহাস অঙ্কিত! যে আনন্দ, যে উৎসাহ, যে আশা, যে শঙ্কা, নববধূর আননে খেলা করে; ইহার মুখে ত তাহার কিছুই দেখিলাম না। এ মুখে যে প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য! জীবন-পরীক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে, জয়ীর মুখমণ্ডলে যে শান্ত, সহিষ্ণু, গভীরভাব ফুটিয়া উঠে, ইহার নয়নে আমি সেই ভাব দেখিলাম। কিন্তু কি রূপ! দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়! দাদা কি অবশেষে রূপের নেশায় একটা মায়াবিনীর কুহকে পড়িলেন; তাহা না হইলে, এই আঠার-উনিশ বছরের নূতন-বউ কোথায় পাইলেন?

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম; একটা প্রণাম করিতেও মনে হইল না। সে ধীরে-ধীরে, আমার নিকটে আসিয়া, আমার হাত, দুটি ধরিয়া, আমার মুখপানে চাহিল। তাহার প্রতি বিরক্তি-সত্বেও স্বীকার না করিয়া পারিলাম না, বড় স্নিগ্ধ, বড় অতলস্পর্শী সে দৃষ্টি! দাদা হাসিয়া বলিলেন—"কি রে সুশি, অমন ক'রে চেয়ে আছিস্ কেন?"

আমি লজ্জিত হইয়া, তাড়াতাড়ি, নববধূর পদধূলি লইতে গেলাম। সে আমার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"থাক্ ভাই, হাজার-হ'লেও তুমি বয়সে বড়।"

খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া, উপরে পাঠাইয়া দিলাম। দাদার জন্য জলখাবার ঠিক করিয়া লইয়া উপরে যাইতেছি; দালানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমাদের [illegible]—সেই চিত্রের নিকট দাঁড়াইয়া—দাদা ও নূতন-বউ! নূতন-বউ-এর কোলে খোকা। তাঁহাদের উভয়ের নয়নে অশ্রুচিহ্ন! আমাকে দেখিয়া নববধূ সরিয়া গেল। খোকা তখনও তাহার ক্রোড়ে; দেখিলাম, তাহার বদনে সুগভীর স্নেহের গদ্‌গদ্ ভাব। এই নূতন প্রাণীটি আসিয়া অবধি, আমাকে অবাক্ করিয়া দিতেছিল! ইহার কি সকলই অদ্ভুত!

একমাস কাটিল। নববধূ তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলেরই চিত্তজয় করিল; পারিল না, কেবল আমার। তাহার যে কোন গুণ ছিল না, তাহা নয়; কিন্তু আমি জোর করিয়া নিজেকে তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতাম। কেবলই মনে হইত, তাহাকে ভালবাসিলে, আমার স্বর্গগতা সতীলক্ষ্মী বৌ-এর স্মৃতির অবমাননা হইবে। খোকা ত এই একমাসে তাহার নূতন মাতাতে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। "মা"—"মা" করিয়া সে সর্ব্বক্ষণই তাহার পাছে-পাছে ঘুরিত। সেও সহস্রকর্ম্মে আবদ্ধ থাকিলেও, খোকা "মা" বলিয়া ডাকিলেই, তাহাকে বুকে তুলিয়া, আনন্দে গলিয়া যাইত। একদিন দেখিলাম, সে খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার গর্ভধারিণীর চিত্রপটের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। খোকা আনন্দে হাসির লহর তুলিয়া বলিতেছে,—"বারে! এ মা, ও মা—আমাল্ দূতা মা! কি ছুন্দল্, দুই মা!" বলিয়া নূতন-মাতার গণ্ডে বার বার চুম্বন করিতেছে। মাতাও আনন্দে গলিয়া গিয়া, তাহাকে আদর করিতেছে, আর আনন্দাশ্রুতে তাহার চক্ষু ভাসিয়া যইতেছে! এ দৃশ্য আমায় সেদিন বড়ই বিচলিত করিয়াছিল—নূতন-বধূর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। আমি এক-রকম জোর করিয়াই, সেস্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম। না, নিজেকে এভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না! এই মায়াবিনীর মায়ায় কিছুতেই ধরাদেওয়া হইবে না!

আমার এই ভাব সে বেশ বুঝিত; তাহার বুদ্ধি খুবতীক্ষ্ণ ছিল। সে একটি কথাও বলিত না, বা অনর্থক তাহার সঙ্গদান করিয়া আমায় বিব্রত করিত না। সংসারের ভার আমার হাতেই ছিল। দাদা বা বউ কোন বিষয়ে, কোন কথা বলিত না। সুতরাং, আমার কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই ছিল। দাদা, তাঁহার অবসরসময়টুকু, নূতন-বধূর গৃহেই কাটাইতেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া যখন খোকাকে লইয়া খেলা করিতেন, তখন গৃহে আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া যাইত; খোকাও আনন্দে বিহ্বল হইয়া—একবার পিতার, একবার মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, হাসিয়া, নাচিয়া সে আনন্দ সম্পূর্ণ করিয়া তুলিত। আমার হৃদয়ের বেদনা তখন অসহনীয় হইত। কৈ, দাদাকে এভাবে সে বউ-এর সঙ্গে সময় কাটাইতে তো

দেখি নাই। তখন নববধূর সমস্ত গুণগ্রাম আমার নিকট মিথ্যা হইয়া যাইত। তাহার ও দাদার প্রতি একটা ঘৃণায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইত। দাদা বোধ হয়, সেটা বুঝিতেন; তাঁহাদের নিকট গিয়া বসিতে আমাকে প্রায়ই ডাকিতেন; কিন্তু আমি কখনই যাইতাম না। যদি কখনও দৈবাৎ কোন আবশ্যক কার্য্যে গিয়া পড়িয়াছি, ত আমার মুখের ভাব দেখিয়াই বোধ হয়, দাদার মুখ অকস্মাৎ মলিন হইয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রে আহারে বসিয়া দাদা বলিলেন—"সুশী, রাত্রে কাজকর্ম্ম সারা হ'লে একবার আমার ঘরে যাস্, একটা কথা আছে।" অবসর পাইতে প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিল; দাদার শয়ন গৃহে গিয়া দেখিলাম—দাদা শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় আছেন, নূতন-বউ অনতিদূরে ভূমিতলে নতমস্তকে বসিয়া আছে। তাহার মুখে একটা ব্যাকুলভাব। আমি গৃহে প্রবেশ করিলে সে দাদার প্রতি কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দাদা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তুমি কেন ব্যাকুল হ'চ্ছ! সুশী একটা ভ্রান্ত-ধারণা নিয়ে থাকে, সেটা কি ভাল?" আমি একটু দূরে মৃত্তিকা-আসন গ্রহণ করিলে দাদা বলিলেন—"সুশী, জ্যোতিঃ আমার নবপরিণীতা পত্নী নয়; সে আমার কৈশোরের বিবাহিতা, পরিত্যক্তা প্রথমা-পত্নী!"

(৫)

গৃহমধ্যে বজ্রপতন হইলে অধিকতর চকিত হইতাম কি না, সন্দেহ। দাদার প্রথমা পত্নী! কৈ, দাদার একাধিক বিবাহের কথা তো শুনি নাই! তখন মনে হইল, দাদার বাল্য ও কৈশোর জীবনের ইতিহাস ত আমি কিছুই জানি না। তাঁহার গৃহে আসিবার পূর্ব্বে ত তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতই ছিলেন!

দাদা বলিতে লাগিলেন—"আমার ষোল বৎসর বয়সে, আট বৎসরের বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত আমার বিবাহ হয়। আমার পিতা ও জ্যোতিঃর পিতা একদেশবাসীই ছিলেন। জ্যোতিঃর পিতার অবস্থা সামান্য হইলেও, জ্যোতিঃর অসামান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া, আমার পিতা তাহাকে পুত্রবধূ করিয়াছিলেন। দেশে আমাদের জমীজমা ছিল, একখানি পাকাবাড়ীও ছিল। আমি সে বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছিলাম। সুতরাং জ্যোতিঃর পিতা তাঁহার একমাত্র সন্তানের জন্য আমাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়াই, অষ্টনবর্ষীয়া কন্যা দান করিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিলেন।

"পিতা আলিপুরের সব্‌জজ ছিলেন। আমাদের গ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল থাকাতে, এযাবৎ বাবা একাকীই কর্ম্মস্থলে থাকিতেন—আমি ও মা দেশে থাকিতাম। বিবাহকার্য্য মহাসমারোহেই সম্পন্ন হইল। আমিও পিতামাতার একমাত্র সন্তান; জ্যোতিঃও তাই। সমারোহের ত্রুটি হইল না; কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। ফুলশয্যার নিমন্ত্রণে, বরপক্ষের একব্যক্তির সহিত, কন্যাপক্ষের একজনের সামান্য একটা কথা লইয়া তর্ক বাধিল। তাহা ক্রমে কলহে পরিণত হইল। উভয়পক্ষে ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। তারপর আমার শ্বশুর-মহাশয়ের একটা কথায় আমার পিতা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া, নববধূকে সেই রাত্রেই তাহার পিত্রালয়ে ফেরত পাঠাইয়া, সেই অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। সেইদিন হইতে জ্যোতিঃ পরিত্যক্তা হইল। আমাদের গৃহে ফুলশয্যার আমোদপ্রমোদ বন্ধ হইয়া গেল। পিতার আদেশে ফুলশয্যার তত্ত্ব ফেরৎ পাঠান হইল। আমার মা কাঁদিতে লাগিলেন, আমি পুষ্পশয্যায় একাকীই রাত্রি কাটাইলাম। নববধূর সহিত একটি কথা বলিবার অবসরও পাইলাম না। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় তাহার যে চোখদুটি দেখিয়াছিলাম, তাহা নেশার মত আমার মনে অনেক দিন জাগিয়া ছিল।

"আমার শ্বশুর-মহাশয় ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, স্ত্রীকন্যা লইয়া দেশত্যাগী হইলেন। পিতা দেশের মধ্যে আমার পুনরায় বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিই আমাকে কন্যাদান করিতে প্রস্তুত হইলেন না। সতীনের উপর কে মেয়ে দিবে, হইলেনই বা তাঁহারা আজ দেশত্যাগী! যেদিন আমার পিতার কাল হইবে, তার পরদিনই হয় ত তাঁহারা মেয়ে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আর, যে এক বউ এক সময়ে ত্যাগ করিতে পারে, সে দ্বিতীয় বউ ত্যাগ করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? বাবা, আমাকে আর মাকে লইয়া কলিকাতায়, এই বাটী ক্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেশের বাড়ী ও জমীজমা যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া টাকা সুদে খাটাইতে লাগিলেন।

দেশের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।

"তিন বৎসর পরে, পঞ্চসহস্র মুদ্রা, ও নানাঅলঙ্কার ও দানসামগ্রী লইয়া দশমবর্ষীয়া লতিকা আমাদের গৃহে আসিল। ৺পূজার সময় এলাহাবাদে বেড়াইতে গিয়া, সেখানকার বাঙ্গালী উকীলের কন্যা লতিকাকে দেখিয়া বাবা তাহাকে পুত্রবধূ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিশেষ কোন বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। এলাহাবাদে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। পূর্ব্ববিবাহের কথা গোপন রহিল,—কেহই জানিল না। আমিও নববধূর নিকট কোন দিন সে কথা জানাইব না বলিয়া, পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। বিশেষ সে বিষয়ে কোন তাপ-উত্তাপ আর আমার ছিল না। তিনবৎসর পূর্ব্বে একদিন দেখা; সেই আটবৎসরের বালিকার কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

"বিবাহের পর তিনবৎসরের মধ্যে পিতামাতা উভয়েই আমাদের মায়া কাটাইলেন। আমি বাইশবৎসর বয়সে, ত্রয়োদশবর্ষীয়া লতিকে লইয়া সংসার-সমুদ্রে ভাসিলাম। আমাদের মাথার উপর রহিলেন বৃদ্ধ সরকার পীতাম্বর। পিতামাতার অভাবে গৃহ অন্ধকার হইয়াছিল,—তবে লতির যত্নে দিনগুলি কাটিতেছিল একরকম মন্দ নয়। জ্যোতিঃর কথা তখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাহার উপর লতির একনিষ্ঠ, আপনহারা প্রেমে আমি ক্রমেই ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। লতির যে কি গুণ ছিল, তা ত তুই জানিস্। সে ক্ষীণ লতিকার মতই আমাকে বেড়িয়া বেড়িয়া একটু-একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। দেহটা তার কোন দিনই সবল ছিল না—মনটাও তার বড় নরম ছিল। আমার সর্ব্বদাই মনে হইত সামান্য আঘাতেই সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেই জন্যই তাহাকে বড় সাবধানে রাখিতাম। আমার জীবনের এই অংশটা বড় সুখ, বড় শান্তিপূর্ণ ছিল। সে সুখ, সে শান্তি আর এ জীবনে পাইব না!

"আমার এই বিবাহের প্রায় পাঁচবৎসর পরে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, চিকিৎসক আমাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেন। অনেকদিন হইতেই বৃন্দাবন-দর্শনের অভিলাষ ছিল; এই সুযোগে তাহা পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। লতিকে তাহার মাতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম। লতির সন্তান-সম্ভাবনা বলিয়া তাকে সঙ্গে লইতে পারিলাম না। তখন জানিতাম না, এই বায়ুপরিবর্ত্তনের সঙ্গেসঙ্গে আমার জীবনের কি মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হইবে!—জানিতাম না, আমার জীবনের সুখ-শান্তি চির-জন্মের মত আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে। সুশী, তুই আমার বাহিরটাই দেখিস্,—কিন্তু আমার অন্তরের কথা তুই কি কিছু জানিস্? জানিলে আমার উপর কখনই বিরক্ত হইতে পার্‌তিস্ না। লতির জীবনের শেষ কয়দিন তাহাকে শান্তি দিতে পারি নাই; সে দুঃখ আজীবন আমার সকল সুখকে ঢাকিয়া রাখিবে। এ সংসারে কেবল একজন আমার হৃদয়ের যন্ত্রণার ভার বুঝিতে পারে, সে এই জ্যোতিঃ! তুই চমকিয়া উঠিলি? কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হইল না? সুশী, তুই জ্যোতিঃকে এখনও চিনিতে পারিস নাই—ক্রমে পার্‌বি।

"যাক্। বৃন্দাবন পৌঁছিয়া এক পুরাতন সহপাঠিবন্ধুর গৃহে অতিথি হইলাম। কিশোর-কিশোরীর লীলাভূমি বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়-হরণ করিল। সন্ধ্যা হইলে যমুনার কূলে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। মনটা আমার কোন্ সুদূর অতীতে, কোন্ ছায়া-লোকে বিচরণ করিত! কল্পনানেত্রে কত দৃশ্য দেখিতাম—প্রাণটা বিমল আনন্দে পূর্ণ হইত।

"যে স্থানটিতে আসিয়া বসিয়া থাকিতাম, তাহার অদূরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একটি কিশোরী কলসকক্ষে যমুনায় জল লইতে আসিত। সে কোন দিকে চাহিত না,—ধীরেধীরে সোপানাবরোহণ করিয়া তাহার কুম্ভ পূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত। তাহাকে দেখিয়া সম্ভ্রমে আমার হৃদয় পূর্ণ হইত। সেটা তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়; সে অসাধারণ সুন্দরী হইলেও তাহার সৌন্দর্য্য আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিত না—আমার হৃদয় তখন লতিময়। তাহার মুখে এমন একটা অটল-গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাহার বয়সে তাহা আর কোথাও দেখি নাই। সে যেন আপনার বলে আপনি বলী—আপনার ভার আপনি বহন করিতে সক্ষম,—কাহারও মুখাপেক্ষী সে নয়। অপরকে আশ্রয়দান করিতেই যেন সে অভ্যস্ত; কাহারও আশ্রয়-গ্রহণের কোন প্রয়োজন যেন তাহার কিছুমাত্র নাই। তাহার সীমন্তে

সিন্দুরবিন্দু, চরণে অলক্তক-রাগ দেখিয়া বুঝিলাম, সে সধবা; কিন্তু সেই কুটীরে অন্য কোন মনুষ্যের বাসচিহ্ন লক্ষিত হইত না। আমি বড়ই বিস্ময়বোধ করিলাম; কিন্তু অপরিচিতা, বয়স্থা রমনীর সহিত কি করিয়া বাক্যালাপ করিব? সেইজন্য কৌতূহল-সম্বরণ করিয়া থাকিলাম। একদিন রহস্য-উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা-বেলা, নিত্যকার মত যমুনাতীরে বসিয়া আছি; সহসা কুটীরদ্বার ঠেলিয়া আলু-থালুবেশে সেই রমণী বাহির হইয়া আসিল। সে দ্রুতপদে সহরের রাস্তা ধরিল। পরক্ষণেই আমায় দেখিতে পাইয়া, উন্মত্তার মত আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া কাতরস্বরে বলিল—'রক্ষা করুন, আমার মার প্রাণ বুঝি যায়!' -

"আমি বাক্যব্যয় না করিয়া কুটীরাভিমুখে ছুটিলাম। প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে দেখিলাম, একটি প্রৌঢ়া-স্ত্রীলোক উঠানের মাঝখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। স্ত্রীলোকটি অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্য মোহ গিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। আমি তাঁহার অচেতনদেহ ক্রোড়ে লইয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তাঁহার কন্যাটি ইহার মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল;—সে আমায় সাহায্য করিতে লাগিল। প্রৌঢ়ার মুখ দেখিয়া আমার মনটা যেন একটু চঞ্চল হইল;—যেন চিনিচিনি অথচ চিনি না।

"বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর, তাঁহার জ্ঞানের লক্ষণ দেখা গেল। রাত্রি বেশী হইয়া যায় দেখিয়া আমি উঠিলাম। মাতাকে একটু ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইতে বলিয়া, পরদিন পুনরায় সংবাদ লইব জানাইয়া, আমি কুটীর ত্যাগ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে অনাবশ্যক কতকগুলি কথা বলিয়া আমাকে বিদায় করিল না।

(৬)

"পরদিন প্রভাতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া তাহাদের সংবাদ লইতে গেলাম। কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া, বালিস ঠেসান দিয়া সেই প্রৌঢ়া বসিয়া আছেন। আমি প্রবেশ করিতেই সহাস্য-বদনে তিনি বলিলেন—'এস বাছা, এস। কাল আমি চোক না চাইতেই ফাঁকি দিয়ে পালালে কেন বাবা? মেয়ে বল্লে, 'মা, সে বাবুটি নইলে তোমায় বাঁচাতে পারতুম না'; তোমার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলুম। ওরে জ্যোতি, একখানা আসন দে মা!' পূর্ব্বদৃষ্টা কিশোরী একখানি আসন বিছাইয়া দিয়া গেল। 'জ্যোতি' নাম শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রুত একটা নাম ও তৎসঙ্গে কোঁকড়াচুলের বেড়া-দেওয়া একখানি কচিমুখের কথা মনে পড়িল।"

"আমি কেন বৃন্দাবন আসিয়াছি, কোথায় আছি, কোথায় বাস, কি করি—ইত্যাদি নানাপ্রশ্নে বৃদ্ধা আমায় বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছিলেন। তিনি মাঝেমাঝে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, সেটা বেশ অনুভব করিতেছিলাম।

"কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—'তোমার নামটি কি বাবা?' আমি বলিলাম 'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' এই কথা শুনিয়া তিনি এমন চমকাইয়া উঠিলেন যে, আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তারপর অত্যন্ত উৎসুকভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাদের বাড়ী কি গ্রামে? তোমার বাবার নাম কি কালিদাস চাটুর্য্যে ছিল?' আমি উত্তর করিলাম,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি তাঁকে চিনতেন?'

"গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন—'চিনতে আর দিলেন কৈ? বিনাদোষে আমার জ্যোতিঃকে তিনি ত্যাগ ক'রলেন! তাই ত তখন-থেকে ভাবছি, মুখখানা যেন চেনাচেনা ঠেকছে। তখনও ত গোঁফদাড়ী গজায়নি; তাই চিনতে পারছিলাম না।'

"তারপর তাঁর আর ধৈর্য্য রহিল না; তিনি—'ওগো তুমি কোথায় গো, তোমার হারানিধি যে তোমার ঘরে ফিরে এসেছে—' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

"আমার সকল সংশয়ের মীমাংসা হইল। তাই বুঝি কাল ইঁহাকে দেখিয়া পরিচিতের মত বোধ হইয়াছিল। বহুদিনপূর্ব্বে দর্শন, এবং বৈধব্যবেশের জন্যই তাঁহাকে ভাল চিনিতে পারি নাই। তাহা হইলে সেই কিশোরী, যাহাকে আজ কয়দিন প্রত্যহ দেখিয়া শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই ত আমার কৈশোরের বিবাহিতা পরিত্যক্তা, প্রথমা-পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ী! আট বৎসরের বালিকার ষোড়শবর্ষ বয়সে অনেক পরিবর্ত্তন হয়, তাইতে তাহাকে চিনিতে পারি নাই! আর চিনিবই

বা কি করিয়া? সেই শুভদৃষ্টির সময় চকিতের মত একবার দেখিয়াছিলাম বৈ ত নয়! সে এই আটবৎসরে একটু একটু করিয়া বাড়িয়া আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সে কি আমার জন্য? তখনই মনে হইল, লতি! সে ক্ষীণা লতিকা যে আমাকেই আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। তাহার ত কোন পৃথক্ সত্তা নাই! আমিও ত এযাবৎ আমার প্রাণের একনিষ্ঠ-প্রেম দ্বারা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। সে যে আমার সন্তানের জননী! হায় ভগবান, আমাকে এ কি পরীক্ষায় ফেলিলে? এ যে বড় বিষম—বড় জটিল পরীক্ষা! জীবনে এই প্রথম পিতার প্রতি একটা ব্যর্থ-রোষ আমার হৃদয়ে স্থান পাইল। তাঁহার অবিমৃষ্য-কারিতার ফলেই আজ আমার এই দশা!

শাশুড়ীঠাকুরাণীর ক্রন্দনের বেগ কমিয়া আসিয়াছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—'সর্ব্বস্ব বিক্রী করে, মেয়ে নিয়ে ভেসে পড়লুম। আমি কত বুঝিয়ে বল্লুম, বেয়াই এর পায়-ধরে পড় গে; তাহ'লে তিনি জ্যোতিঃকে ফেলতে পারবেন না। কর্ত্তাকে তুমি জানতে না; তিনি দরিদ্র হ'লেও বড় অভিমানী ছিলেন। কারও কাছে মাথা-হেঁট করতেন না। আমার কথা শুনে, তিনি গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন—'গিন্নি, সহধর্ম্মিণী হ'য়ে, স্বামীর অপমান করছ? কার পায়ে ধরতে যাব? যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে বিনাদোষে একটা অবলা-বালিকাকে ত্যাগ করতে পারে, তার পায়-ধরতে যাব? গিন্নি! আমার মেয়ের এ অপমান, আমি পিতা হয়ে স্বীকার করতে পারব না। জ্যোতিঃ আমার কি সামান্যা! সে যে শক্তির অংশ! তার চেয়ে চল, বৃন্দাবনে যাই। সেখানে মেয়েকে এমন শিক্ষা দেব যে, সে জগতে ধৈর্য্য ও সংযমের মহিমা প্রচার করবে। সে মদনমোহনকেই বরণ ক'রে তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে।'

"আমি ভাবিলাম, এমন পিতার না হইলে কি এমন কন্যা হয়!

"শ্বশ্রূমাতা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, এইখানে এসে কিছু টাকা দিলুম, এই কুঁড়েখানি বেঁধে [illegible] টাকা লাগিয়ে রাখা [illegible]ছিল। তাই দিয়েই আমা[illegible] একরকম কেটে [illegible]তে লাগ্‌ল। মনের শান্তি ত [illegible] ঘুচিয়েই এসেছিলুম—তীর্থস্থানে থেকে তবু [illegible]রকমে বেঁচে রইলুম। কর্ত্তার মনের জোর খুব ছিল,—কিন্তু শরীরে এ আঘাত সহ্য হোল না। বৃদ্ধবয়সে দেশত্যাগী, অপমানী অসম্মানী হ'য়ে তিনি যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌লেন। অবশেষে তাহার হৃদ্‌রোগ হ'ল। তারপর, তোমার আবার বিয়ের সংবাদ পেয়ে মুখে কিছু বল্‌লেন না; কিন্তু একেবারে শয্যাশায়ী হ'লেন। অনেক যত্নে, অনেক চেষ্টায়, তিনটা বছর ধ'রে রেখেছিলুম; কিন্তু আর পার্‌লুম না। আজ একবৎসর তিনি আমাদের মায়া ত্যাগ করেছেন। যা রেখে গেছেন, তাতে আমাদের মায়েঝিয়ের একরকম ক'রে কেটে যায়। কিন্তু আমিই আর ক'দিন বাবা! আমি ম'লে ও হতভাগীর কি দশা হবে, ভেবে ভেবে যে আমি সারা হয়ে গেলুম।'

"আমি যে তাঁহাকে কি বলিব, কি সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলাম। মুখে কথা ফুটিল না।

"তিনি বলিলেন,—'যদি এসেছ বাবা, বিধি যখন দয়া করে মিলিয়ে দিয়েছেন, তখন আর মেয়েটাকে পায়ে ঠেল্‌তে পাচ্ছ না। তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও, আমিও নিশ্চিন্দি হ'য়ে চোখদুটো বুঁজি। সতীনের ঘর কর্‌তে হবে; তার আর কি কর্‌বে? যেমন তপিস্যে করেছিল, তেমনি তো ফল পাবে?'

"তিনি ত নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হই কি করিয়া? আমি যে বিষম-সমস্যায় পড়িলাম! এক-দিকে বিনাদোষে পরিত্যক্তা আমার প্রথমা-পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ী, অন্যদিকে আমাতে নির্ভরশীলা, আমার পাঁচবৎসরের ঘরণী-গৃহিণী—আমার সন্তানের জননী লতিকা। কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারি না;—উভয়দিকেই ধর্ম্মে পতিত হই।

"আমি কোন কথা না বলিয়া উঠিলাম। শ্বশ্রূমাতার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলাম, 'আমি তবে এখন আসি। কা'ল আবার আস্‌ব।' তিনি শশব্যস্তে কহিলেন, 'তাও কি হয় বাবা! সময়ে জামাই খাওয়াবার সুখ ত হয়নি। আজ যদি এভাঙ্গা কুঁড়েঘরে এসেছ, দুটি শাকভাত না খেয়ে যেতে পারছ না।' আমি বিনীত ভাবে বলিলাম, 'আজ আর হবে না মা, আমার বন্ধু ব'সে থাক্‌বেন। কাল এসে তখন খাব।' তিনি সম্মত হইলেন। আমি যাইবার জন্য ফিরিলে একবার বলিলেন, 'মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌বে না, বাবা! আচ্ছা

থাক্, কাল ত আস্ছই। দেখো বাবা, ফাঁকি দিও না যেন।'

"আমি হাঁফ-ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বস্তুতই, তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমার অন্তরে তখন বিষম-দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে।

"সমস্তদিন মনের মধ্যে যুদ্ধ চলিল। কি করি? মীমাংসা আর হয় না। জ্যোতিঃকে গ্রহণ করিতেই হইবে; কিন্তু পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীকে শুধু আশ্রয়দান করিলেই কি তাহার প্রতি সকলকর্ত্তব্যের অবসান হইল? তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিব কি? না-পারিলেই বা শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে কেন? সে, যে-তেজস্বী পিতার সন্তান, তাহার দ্বারা এটা সম্ভব মনে হইল না।

"তারপর মনে হইল, লতি! সে সরলা বালিকা, সে কিছুই জানে না। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত সহ্যকরিতে পারিবে সে? বোধ হয় না। জ্যোতিঃকে গ্রহণ করিতে হইলে, লতিকে হারাইতে হয়। উঃ, কি ভীষণ পরীক্ষা! সমস্তদিন সংগ্রামের পর শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, স্থির করিলাম, জ্যোতিঃকে এখন বুঝাইয়া রাখিয়া যাইব। লতিকে একটু-একটু করিয়া জানিতে দিয়া, তাহাকে প্রস্তুত করিয়া, পরে জ্যোতিঃকে লইয়া যাইব। তাহা হইলে, লতি বোধ হয়, সামলাইতে পারিবে। হায় রে কপাল! কাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছিলাম?

(৭)

"পরদিন সন্ধ্যার পর জ্যোতিঃদের কুটীরাভিমুখে চলিলাম। সেদিন কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, আকাশ ঘোর অন্ধকার! সেই ঘন-কৃষ্ণ আকাশে তারাগুলি কি উজ্জ্বলই দেখাইতেছিল! আবার যমুনার কালো জলে, সেই ছায়া পড়িয়া, সমস্ত জলটা ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বড় সুন্দর সে দৃশ্য! আমি তন্ময় হইয়া, কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"জ্যোতিঃদের কুটীরে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, রান্নাঘরের দাওয়ায় মাদুর-পাতিয়া বসিয়া, গৃহভ্যন্তরস্থা, রন্ধন-নিরতা কন্যাকে কি উপদেশ দিতে-ছিলেন। আমাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন,—'ঐ ঘরের দাওয়ায় ব'স, বাছা, আমি আস্‌ছি।'

"আমার জন্য পূর্ব্বেই আসন-বিস্তৃত ছিল; আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। শ্বশ্রূমাতা ধীরে-ধীরে সেখানে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শরীর তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল—তিনি বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতেছিলেন। একটু পরে, বলিলেন —

'তা হ'লে জ্যোতিঃকে নিয়ে যাচ্ছ তো বাবা? আর আমারও একটা ফিল্লে ক'রে যেও। দেহটা ভাল নেই, একা থাক্‌ব কি ক'রে, তাই ভাব্‌চি। কর্ত্তা যা রেখে গেছেন, তা দিয়ে একটা পেট খুব চ'লে যায়। তোমার অর্থের প্রত্যাশী আমি নই। তবে মেয়েটা চ'লে গেলে, একা কি ক'রে থাক্‌ব, তাই ভাব্‌ছি। এই তো একমাস জ্বরে ভাজা-ভাজা হ'য়েছি। সেদিন মেয়ের কথা না শুনে, হেঁটে রান্না-ঘরে গিয়েই ত অতকাণ্ড হ'ল। দু'পা না-যেতেই ভিরমী গিয়ে পড়্‌লুম। তা মদনমোহন যা করেন, ভালর জন্যই করেন। সেদিন অতবড় কাণ্ডটা না হ'লে যে, তোমায় ফিরে পেতুম না, বাবা! তা হ'লে ওকে কবে নিয়ে যাচ্ছ?' আমি নতমস্তকে বলিলাম,—'এখন যে নিয়ে যেতে পাচ্ছি না, মা! আপনি একটু ভাল না হ'লে, যাওয়া ত হ'তে পারে না। আপনি ভাল হ'লে, আপনাকে সুদ্ধ নিয়ে যাব।'

"বোধ হইল, এ কথার তিনি সন্তুষ্টই হইলেন। তারপর আহারের পালা। রন্ধন খুব ভাল হইয়াছিল, আয়োজন যথেষ্ট ছিল, ক্ষুধারও খুব উদ্রেক হইয়াছিল। সুতরাং আহার বেশ ভালরকমই হইয়াছিল। তবুও শাশুড়ী নিকটে বসিয়া, 'কি দিয়ে যে খা'ওয়াব, কিছুই নেই—সেদিন কি আর আছে!'—ইত্যাদি বলিয়া মনের দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। জ্যোতিঃ অবগুণ্ঠনটানিয়া দিয়া, পরিবেশন করিতেছিল। তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল, কি না, বলিতে পারি না। তাহার দিকে চাহিবার সাহস, আমার হয় নাই; বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছিল। আহারান্তে শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন—'আজ আর যেতে পাচ্ছ না, বাবা, এইখানেই থাক।' আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। এত শীঘ্র, এভাবে ধরা দিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। শ্বশ্রূ-মাতাকে কি বলিব? তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি; আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইল না। আমি নীরব রহিলাম। আমার এই নীরবতাই, তিনি সম্মতির লক্ষণ ধরিয়া লইলেন।

উঠিয়া রান্নাঘরে গিয়া, কন্যাকে কি উপদেশ দিয়া আসিলেন, জানি না।

"কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় কাটিল। রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া, তিনি বলিলেন—'অনেক রাত হ'য়েছে, এবার শুতে যাও। ঐ পশ্চিমের ঘরটায় বিছানা হ'য়েছে।' আমি উঠিলাম;—আজ আটবৎসরের বিবাহিতা-পত্নীকে প্রথম সম্ভাষণ করিতে যাইতেছি! কিন্তু পত্নী সম্ভাষণে যাইবার মত মনের অবস্থা ত আমার নয়। তাহাকে কি বলিব? লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিলাম। প্রাঙ্গণ পার হইয়া, গৃহে প্রবেশ করিলাম। দ্বারের দিকে পিছন করিয়া জ্যোতিঃ গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। আমার পদশব্দে, সে ফিরিল। আমি প্রবেশ করিলে, সে আমায় প্রণাম করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে গেলাম; কিন্তু সে সরিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব—আমি যে কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আমি যে তাহার নিকট কত অপরাধী, তাহা বুঝিতেছিলাম। জ্যোতিঃ প্রথমে কথা কহিল। আমার সকল সংশয়, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া, অত্যন্ত সহজভাবে সে বলিল—'তুমি মাকে যা ব'লেছ, তা আমি শুনেছি। তাই তোমায় বল্‌ছি, আমি যে যাব না।'

"আমি বিস্মিত হইয়া, তাহার পানে চাহিলাম। সে বলিল, 'তোমার সুখের সংসারে আগুন লাগাতে যে আমি যেতে পারি না।' আমি বলিলাম,—'এটা কি অভিমানের কথা, জ্যোতি!'

"জিভ-কাটিয়া, শশব্যস্তে সে কহিল 'ছিঃ ছিঃ, অমন কথা ব'ল না। অভিমান ক'র্‌ব কেন? তুমি ত আমায় ত্যাগ করনি। আমার জ্ঞান হ'তেই বাবা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তোমার কোন দোষ ছিল না। তাঁরই শিক্ষায় জ্ঞান হওয়া অবধি তোমার মানস-মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন ক'রে তোমার পূজা কর্‌ছি। তোমার উপর অভিমান ক'র্‌ব? মদনমোহন আমার অন্তরের কথা জানেন। তিনি জানেন, দরিদ্র হ'লেও আমরা অত নীচমনা নই।' আমি বলিলাম,—'তবে যেতে চাইছ না কেন?' স্মিতহাস্যে জ্যোতিঃ বলিল—'তুমি কি ভুলে যাচ্ছ, এর মধ্যে একজন রয়েছে? তাকে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে কি বিয়ে করনি? তোমার পিতার ভুলের জন্য কি সে দায়ী? সে নিরপরাধা বালিকা কি এই শাস্তির যোগ্য? তোমার এই পূর্ব্ব-বিবাহের কথা কি সে জানে?'

"নত মস্তকে আমি বলিলাম,—'না।'

"'তবে? তবে কি ক'রে আমায় নিয়ে যেতে চাইছ? বিনামেঘে এই বজ্রাঘাত কি সে সইতে পার্‌বে? সইতে পেরে যদি তার কিছু হয়, তবে কি তুমি কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? না আমিই নিজেকে ক্ষমা ক'র্ত্তে পাব্‌ব? না—না; স্বামী হ'য়ে, গুরু হ'য়ে,তুমি এ আদেশ আমায় করিও না।' আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! এত কথা এ বালিকা কোথায় পাইল? যে একদিনও সংসার-ধর্ম্মপালন করে নাই, স্বামী যে কি-জিনিষ, একদিনের তরেও যে জানে নাই, সে—এই ত্যাগের কথা, সংযমের কথা কোথায় পাইল!

"আমি বলিলাম—'আর, তোমায় ত্যাগ করলে ধর্ম্মে পতিত হব না?'

"দৃঢ়স্বরে সে বলিল—'না, তা হবে না। তুমি আমায় গ্রহণ করিলে কবে যে, ত্যাগ করিবে? তোমার পিতা তাঁর পুত্রবধূকে ত্যাগ করেছিলেন বটে; কিন্তু তুমি যে কোনদিনই আমায় গ্রহণ কর নাই। সুতরাং তুমি যাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, যে এতকাল তোমার গৃহিণী, সম্ভবতঃ তোমার সন্তানের জননী, তাহাকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম।'

"ধীরে ধীরে আমি বলিলাম—'আর তোমায় রক্ষা করা কি আমার ধর্ম্ম নয়?'

"হাসিয়া সে বলিল—'হ্যাঁ; কিন্তু আমি যে এখনও নিরাশ্রয় হইনি। তুমি যদি আবার বিয়ে না করতে, তবে অন্য কথা ছিল। মা যতদিন আছেন, ততদিন আমার কোন ভাবনা নেই।'

"আমি বলিলাম—'তারপর?'

"'তারপর? তারপর, মদনমোহন একটা পথ দেখিয়ে দেবেনই। তুমি ভাব্‌ছ কেন? আমার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেসঙ্গে, বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন, ত্যাগ আর সংযমই আমার ধর্ম্ম। বাবার আশীর্ব্বাদে, আর মদনমোহনের কৃপায় আমার সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি।'

"আমি ক্রমেই বিস্মিত হইয়া যাইতেছিলাম। এইরূপ মহান্‌ত্যাগের কথা কি কেহ কখনও শুনিয়াছে? এই মহিমময়ী নারীর স্বামী আমি! গর্ব্বে ও আনন্দে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল।

"কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলাম। সহসা জ্যোতি—'রাত হ'য়েছে, এখন ঘুমোও'—বলিয়া পুনরায় আমার পদধূলি লইয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারপর, যে কয়দিন বৃন্দাবনে ছিলাম, প্রত্যহই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। জ্যোতিঃ আমায় কত যত্নই করিত, কত রকম করিয়া রন্ধন করিয়া খাওয়াইত। সে আমায় যত্ন করিয়া এত সুখ পাইত যে, সে সুখে তাহাকে বঞ্চিত করিতে আমার ইচ্ছা হইত না। যাহাকে জীবনে কিছু দিতে পারি নাই, নিতান্ত স্বার্থপরের মত তাহার সেবা লইবার জন্য প্রত্যহই তাহাদের গৃহে যাইতাম। বৃন্দাবন ত্যাগের পূর্ব্বদিন তাহাদের নিকট বিদায় লইতে গেলাম। জ্যোতি আমার আগমন-প্রতীক্ষায় গৃহে বসিয়াছিল। আজ তাহার মুখখানা বড়ই মলিন দেখিলাম। আত্মসংযমের যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও তাঁহার ঠোঁট দুখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আমি ম্লান বদনে বলিলাম—'জ্যোতি, তোমার ঘরের কি কিছু নেই পরিবর্ত্তন হবেনা?' মাথা নাড়িয়া সে বলিল—'না—এমন পাপ আমি ক'র্ত্তে পারব না। তোমার কাছে যা পেয়েছি তাই আমার যথেষ্ট তোমার দেখা পেয়েছি;—তুমি আমায় গ্রহণ কর্ত্তে চাচ্ছ এই সুখের স্মৃতিটুকুই আমার সমগ্র জীবন-যাত্রার যথেষ্ট সম্বল। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, এর বাড়া কোন আকাঙ্ক্ষা যেন আমার প্রাণে স্থান না পায়।'

"আমি কাতর কণ্ঠে বলিলাম—'কিন্তু তোমাদের এ ভাবে ফেলে রেখে আমি কি ক'রে শান্তিতে থাক্‌ব? যত-দিন জানিনি, ততদিন ভিন্ন কথা ছিল। এখন জেনে শুনে এ ব্যবস্থা তো চলে না।'

"সে বলিল,—'না, তাতো চলেই না। আমিও যতদিন তোমায় দেখিনি, ততদিন একভাবে ছিলাম; এখন তো মাঝে মাঝে দেখা না দিয়ে পারবে না। শুধু চোখের দেখা বই তো নয়। তাতে কি কোন দোষ হবে? বোধ হয় না।'

"আমি তখন তার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম—

"জ্যোতি, আমার কোন কথা যে রাখ্‌লে না,—একটা অনুরোধ রাখ্‌বে কি? আমি তোমার স্বামী আমার অর্থ-গ্রহণে তোমার কোন অপমান তো নেই। আমি তোমাদের এই দারিদ্র্যে ফেলে রেখে সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে কেমনে থাক্‌ব? আমাকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'র না।'

"একটু নীরব থাকিয়া জ্যোতি বলিল,—'না স্বামীর অর্থগ্রহণে অপমান কি? তবে আমাদের কিছু অর্থকষ্ট নেই তো?, তা তোমার যদি তাতে তৃপ্তি হয় তবে আমি কিছু বল্‌ব না।'

"বিদায়ের সময় হইলে আমি বলিলাম—'তবে আসি—'

"ম্লাননয়নে, 'এস'—বলিয়া সে নত হইয়া, আমার পদধূলি লইল। আমি মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইতেই আমি বাহু-প্রসারণ করিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলাম; সে চকিতের মত সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে মুখে অভিমানের লেশমাত্র নাই, সংযমের দীপ্তিতে সে মুখখানা দীপ্ত! আমি লজ্জিত হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিলাম। পথে চলিতে চলিতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, সেই গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া জ্যোতিঃ সতৃষ্ণ নয়নে আমার পানে চাহিয়া আছে! আমি বুঝিলাম, সুখ শান্তি চিরজন্মের মত আমায় ত্যাগ করিয়াছে—আমার জীবনের পরীক্ষা সবে আরম্ভ হইল।

(৮)

"গৃহে ফিরিয়া আর তেমন করিয়া লতির সামনে দাঁড়াইতে পারিলাম না। আমাদের দুজনের মাঝে একটা প্রকাণ্ড সত্য, মিথ্যার আকার ধরিয়া, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কেবলই মনে হইত, তাহার সহিত প্রতারণা করিতেছি। লতি যে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতাম। সে এইসময় হইতেই মলিন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। খোকার জন্মের পরই সে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাকে বাঁচাইবার আশা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলাম। তাহার শরীর সম্বন্ধে অধিকতর সাবধান হইলাম—কিন্তু কুসুমে একবার কীট পশিলে কি আর তাহার রক্ষা আছে? আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতে লজ্জিত হইতাম; তাহার সহিত একাকী বেশী সময় যাপন করিলে যেন কথা খুঁজিয়া পাইতাম না। তাহার সদানন্দ মুখখানা দিনদিনই ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল। আমার সেই সময়কার হৃদয়যাতনার কথা বর্ণনাতীত। যে রমণী তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, আমায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত—সে আমার চক্ষুর সম্মুখে দিন-দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তাহা সহ্য করিয়াও আমি বাঁচিয়া রহিলাম।

"তারপর দু'তিনবার বৃন্দাবন গিয়াছি। আমার নিকট হইতে এই যত্নটুকু দাবী করিবার অধিকার জ্যোতিঃর আছে, বলিয়া মনে করিতাম। সে ত ইচ্ছা করিলে সকলই দাবী করিতে পারিত—কিন্তু অন্যের সুখের জন্য সে ত আত্মবলিদান করিয়াছে! জ্যোতিঃকে যতই চিনিতে লাগিলাম, তাহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া, তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ততই আমার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নিকট গেলে, আমার সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইয়া যাইত—এমনই স্নিগ্ধ তাহার সঙ্গ! জীবন-পরীক্ষায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, মাঝে মাঝে তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতাম।

"জীবনে দুইটি রমণী আমার জীবনের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একটি অতিশয় দুর্ব্বলা;—ক্ষীণা লতিকার মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তাহার মানসিক বল কিছুমাত্র ছিল না, এতই কোমল সে ছিল! আমার মুখের দিকে চাহিয়াই সে বাচিয়াছিল—তাহার কোন পৃথক্ সত্ত্বা ছিল না। তাহার এই একান্তনির্ভরশীল, একনিষ্ঠ প্রেমে—তাহার প্রীতি, করুণায় আমার চিত্ত ভরিয়া উঠিত!

"আর একটি ধীর, গম্ভীর, ধৈর্য্য ও সংযমের আধার। আপনাতে সে আপনি পূর্ণ, আপনার বলে আপনি বলীয়ান্। আশ্রয়দান করিতেই যেন সে অভ্যস্ত, আশ্রয় পাইবার কোন প্রয়োজন যেন তাহার নাই। শীতল হস্তপ্রলেপে অপরের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করিতেই যেন সে এ পৃথিবীতে আসিয়াছিল। তাহার এই মহান্ আত্মত্যাগে, তাহার প্রতি সম্ভ্রমে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিত!

"একের কোমলতায় তাহাকে আশ্রয়দান করিবার জন্য প্রাণ ছুটিয়া যাইত; অন্যের দৃঢ়তায় তাহার নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু হতভাগ্য আমি, এই দুইয়েরই নিতান্ত অযোগ্য ছিলাম। জীবনের এই কয়বৎসর যে কি যাতনা ভোগ করিয়াছি, তা তুই কল্পনায়ও আনিতে পার্‌বি না। আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল—একজন আমার জন্যই ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; আর-একজন অন্যের জন্য কি মহান্ আত্মত্যাগ করিল! কিন্তু, সেও কি যাতনাভোগ করে নাই? এ বিষম পরীক্ষায় জয়ী হইতে, তাহার সমস্ত শরীর-মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছিল। সে যাতনাও কি আমার হৃদয়ে প্রতিঘাত করে নাই?—অন্তর্যামী জানেন!

লতির জীবিতাবস্থায়, শেষ যেবার বৃন্দাবন যাই, তুই ত জানিস্? সেবারও জ্যোতিঃকে আনিবার কথা পাড়িতে সে কাতর বচনে, অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিল—'স্বামী হ'য়ে অধর্ম্মে মতি কেন দিচ্ছ? আমার মনে যে দিবারাত্রি সংগ্রাম চল্‌ছে, তা কি দেখ্‌তে পাও না—তবে কেন আমার কষ্ট বাড়াচ্ছ?'

"আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতেও আর এ বিষয়ে কিছু বলিব না, স্থির করিলাম। তাহার সঙ্কল্প অটল! তাহার কঠিন পরীক্ষা কঠিনতর করিয়া আমার কি অভীষ্টসিদ্ধ হইবে!

"সেইবার বিদায়ের সময় আমি তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে গেলে, কি এক অব্যক্তযাতনা যে তাহার মুখের উপর খেলিয়া গেল, তাহা বর্ণনাতীত! সরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে যখন বলিল,—'আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমায় এমন ক'রে কষ্ট দাও?'

"আমি লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলাম। কাতরস্বরে বলিলাম—'ক্ষমা কর, জ্যোতিঃ!'

"বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর বজ্রাঘাত হইল। লতি আমায় ত্যাগ করিল। শোকে, দুঃখে, অনুশোচনায় আমার জীবন দুঃসহ হইল। গৃহ আমার শ্মশানতুল্য বোধ হইতে লাগিল। তখন স্থির করিলাম, দুএকমাস এদিক ওদিক বেড়াইয়া, বৃন্দাবনে জ্যোতিঃর কাছে যাইব। আমি জানিতাম, এই সময়ে জ্যোতিঃ আমায় সান্ত্বনা দিতে পারিবে, তাহার শীতলহস্তপ্রলেপে আমার দগ্ধহৃদয় শীতল হইবে। একমাস বৈদ্যনাথে ও একমাস কাশীবাস করিয়া বৃন্দাবন গেলাম।

জ্যোতিঃর নিকট যে কি সমবেদনা—কি শান্তি পাইলাম, তাহা বলিবার নয়। আমার হৃদয়টা স্থির হইল! তাহাকে এইবার আমার সঙ্গে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে, সে কি বলিল জানিস্? সে বলিল—'হ্যাঁ, আমি যাব, কিন্তু এখন নয়। আমি যদি এখনই তোমার সঙ্গে যাই, তবে তোমার কি মনে হবে জানি না; কিন্তু আমার মনে হবে, আমি বুঝি এই কামনাই করেছিলাম।'

"তারপর শিহরিয়া উঠিয়া সে বলিল,—'উঃ, ভাব্‌তেও

গায়ে কাঁটা-দিয়ে ওঠে! যদি কোনদিন আমার অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে এ কামনা মুহূর্ত্তের জন্যও জেগে থাকে? উঃ, সে যে অসহ্য! কিন্তু মদনমোহন জানেন, আমি যেভাবে ছিলাম, সেভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে পার্‌তাম। না—এখন তুমি কোথাও কিছুদিনের জন্য যাও, আমি মনটা স্থির ক'রে নিই। এখন আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌ব না।'

"উঃ, নারীহৃদয় এত মহান্! আর আমরা আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া ইহাদেরই অবজ্ঞা করিয়া থাকি?

"কাতরকণ্ঠে আমি বলিলাম,—'জ্যোতিঃ, আমি যে তোমার ছায়ায় শীতল হ'তে এসেছি। তোমায় ছেড়ে এখন কোথায় যাব? তোমার কাছ ছেড়ে গেলে এমন ক'রে কে আমায় শান্তি দেবে?'

"দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া,সেই যোড়হস্ত মস্তকে ঠেকাইয়া সে বলিল—'যিনি শান্তি দিয়েছেন, তিনিই শান্তি দেবেন। একমনে তাঁহাকেই ডাক। তাঁর বলে বলী হ'য়েই আমরা শান্তি পাই ও সেই শান্তি বিলিয়ে কৃতার্থ হই। তুমি এখন কাছে থাক্‌লে আমার সমস্ত সাধনা বৃথা হবে। তোমার ও কাতর মুখেরপানে চাইলে, আমি আর আমাতে থাকি না। তোমার কাছে আমার শেষভিক্ষা—কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাও। আমি না ডাক্‌লে এসো না; সময় হ'লে আমি আপনি তোমায় ডাক্‌ব।'

"তারপরদিনই বৃন্দাবন ত্যাগ করিলাম। কয়েকদিন হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া মুশৌরীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। দীর্ঘ আটমাস পর জ্যোতিঃর এক পত্র পাইলাম—'বড় বিপদ, এসো।'

"বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম, শ্বশ্রূমাতা ঘোর সান্নিপাতিক জ্বরে অচৈতন্য। আমরা দুজনে মিলিয়া তাঁহার অনেক চিকিৎসা, অনেক সেবা করিলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি দিনদশেক ভুগিয়া সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন। জ্যোতিঃর আর এক বন্ধন কাটিল। সে যথাসময়ে মাতার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য শেষ করিয়া, আমার গৃহে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সুশি! আমার জীবনের সমস্ত কথাই তো শুনিলি। এখনও কি তুই জ্যোতিঃর উপর রাগ করিয়া থাকিবি?"

দাদার কাহিনী শুনিতে শুনিতে অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি উঠিলাম; জ্যোতিঃর পদতলে পতিত হইয়া বলিলাম—"আমায় মাপ কর ভাই, তোমায় চিন্‌তে পারিনি—আমায় মাপ কর।"

সে দুইহস্তে আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—

"ছিঃ ভাই, ওকথা বল্‌তে নেই!"

মিলন

[শ্রীঅমরবালা দেবী]

গোপন-মিলন তব অতীব মধুর;
নাহি তায় কোন আশা—ভালবাসা ভরপুর;
সেথা নাহিক রিপুর লেশ,
সেথা নাহিক হিংসা-দ্বেষ,
সেথা নাহি অপমান—দান প্রতিদান—
আনন্দের এক শেষ;
সে মিলন শুধু আত্মার(ই) মিলন—
আত্ম-গরিমা দূর!
সেথা নাহিক বিষের জ্বালা,
সেথা নাহিক ধূলার খেলা,
সেথা আনন্দকুসুম ঝরে ঝরে পড়ে
অনিল সুবাসে পুর!
সেথা অতি শোভাময়, নাহি চন্দ্রোদয়,
তারকা-তপন আলো;
ত্রিগুণ-অতীত—সুষমা-জড়িত—
নিজগুণে নিজভালো,
সে মিলন—শুধু তাঁহার(ই) উপমা—
অতুল—তুলনাদূর।

গোলক-ধাঁদা

[কুমারী শ্রীমতী লাবণ্যময়ী দেবী]

"গোলক-ধাঁদা" বলিলে যাহা বুঝায়—পণ্ডিতী ভাষায় "গহন," "কলিল," বা "ধন্দ গৃহ" বলিলে, ঠিক তাহা বুঝায়ও না; অন্যপক্ষে, আরও বিষম দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং,

চিত্র নং ১—সেণ্ট্ কোয়েণ্টিনের ধাঁদা

'গোলক-ধাঁদা'—আভিধানিক শব্দ না-হইলেও—'গোলক-ধাঁদা'ই। ইংরেজীতে 'গোলক ধাঁদা'—অর্থবাচক কয়েকটি শব্দ আছে; তন্মধ্যে (Labyrinth) "ল্যাবিরিন্থ", আর (Maze) "মেজ্"—এই দুইটি শব্দই প্রসিদ্ধ। 'ল্যাবিরিন্থ' কথাটা, গ্রীক্ শব্দজ; অর্থ—'পথ'।

পাশ্চাত্য-প্রদেশের এই 'গোলক-ধাঁদা'র উৎপত্তি-বিবরণ বড়ই বিচিত্র! প্রতীচ্যখণ্ডের সাধারণ ধারণা যে—প্রাচীন-কালে গ্রীসের এবং অন্যান্য প্রদেশের ভূগর্ভে যে বিবিধ ধাতুর খনি বর্ত্তমান ছিল, শক্তিমান্ ও কার্য্য-কুশল ব্যক্তি মাত্রেই সেইসকল খনিজ-পদার্থ লাভের উদ্দেশে গুপ্তসুড়ঙ্গ সকল প্রস্তুত করিত; এইরূপে ক্রমে বহুসংখ্যক সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই অন্ধকারময় পথগুলি এতই জটিল হইয়া পড়িল, যে অনভিজ্ঞ লোক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই, প্রায় পথ হারাইয়া ফেলিত এবং সহজে আর বাহির হইতে পারিত না!—গোলক-ধাঁদার এবংবিধ বিপত্তি-কল্পনা করিয়া কালে, কতদেশে কত রূপ-কথার সৃষ্টি হইয়াছে!

প্রাচ্যদেশবাসীরা আবার বলেন—মিশর-সম্রাট্‌দিগের দ্বাদশ বংশাবতংসের নাম (Labyris) "ল্যাবিরিস্"; তাহা হইতেই নাকি, 'ল্যাবিরিন্থ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে!

চিত্র নং ২—চার্টার্স গির্জ্জার ধাঁদা
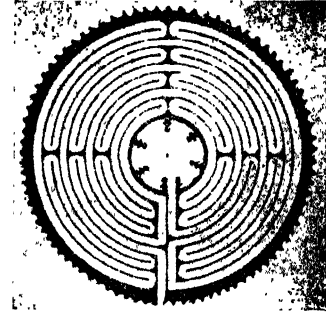
"মহাভারত"—'বনপর্ব্বে' কাম্যবনের বর্ণনায়ও বৃক্ষ-বীথিকা-রচিত গোলক-ধাঁদার উল্লেখ দেখিতে পাই।

ফলে মনে হয়, "গোলক ধাঁদা" শব্দটি গোলকে উপনীত হইবার নানা-ধর্ম্মাবলম্বীর কল্পিত অসংখ্য ধন্দময় জটিল পথের পরিকল্পনাবাচক।

প্রতীচ্য পুরাবৃত্তে কয়েকটি বিখ্যাত গোলক-ধাঁদার উল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টিই প্রধান—
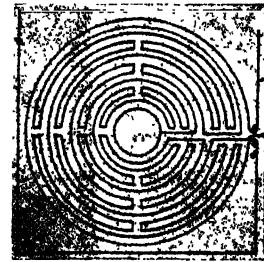
চিত্র নং ৩—লুকাগির্জ্জার ধাঁদা

(১) 'ইজিপ্সিয়ান্'—ইহা, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ১৮০০ বৎসরপূর্ব্বে, সম্রাট্ পেটেসুচিস্ (Petesuchis), ওরফে টিথোইস্ (Tithoes)-কর্ত্তৃক মোরিস্ হ্রদের তীরে নির্ম্মিত

হয়। ইহাতে তিন সহস্র কক্ষ ছিল—তাহার অর্দ্ধাংশ ভূগর্ভে নিহিত !

চিত্র নং ৪—এসেক্সের স্যাফ্রন্ ওয়াল্ডেনস্থিত ধাঁদা
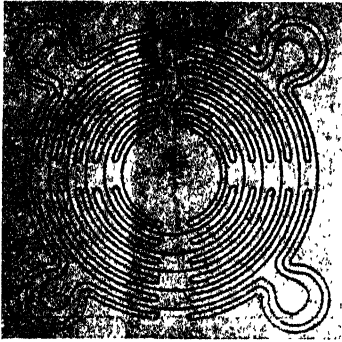
(২) 'ক্রেট্যান্' নামক গোলক ধাঁদাটি—'মিনোটর' দৈত্যকে বন্দী করিবার জন্য ডিডেলস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়—প্রবেশের সময় সূতার 'গুলি' বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গেলে, তাহা ধরিয়াই নিষ্কৃতিলাভ ঘটিত !

(৩) 'ক্রেট্যান্' পয়ঃ-প্রণালীর সহস্র জটিল বাঁক ধাঁদার মত চতুষ্পার্শ্বে প্রসারিত ছিল !

(৪) 'লেম্নিয়ান্' ধাঁদাটি—স্মিলুস, হোলস্ এবং থিয়োডোরস নামক স্থাপত্য-শিল্পিত্রয়-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহাতে দেড়শত স্তম্ভ ছিল এবং একটি বালকেও সেগুলি স্বেচ্ছামত নানাস্থানে যা সন্নিবেশিত করিতে পারিত !

আ (৫) 'ক্লুসিয়ম্'-স্থিত গোলক-ধাঁদাটি, ইট্রুরিয়ার সম্রাট .র্সেনা কর্ত্তৃক স্বীয় সমাধি মন্দিরের জন্য নির্ম্মিত ।ছিল !
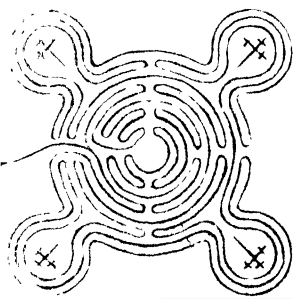
চিত্র নং ৫—নটিংহাম-শায়ারের স্নিণ্টনস্থিত ধাঁদা

(৬) 'সেমিয়ান্' গোলক-ধাঁদাটি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪০ বর্ষে থিওডোরস্-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় !

(৭) 'উড্ষ্টকে'র প্রসিদ্ধ গোলক-ধাঁদা—সম্রাট্ দ্বিতীয় হেন্‌রি-কর্ত্তৃক সুন্দরী রোসামণ্ডের চিত্তবিনোদনার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল !
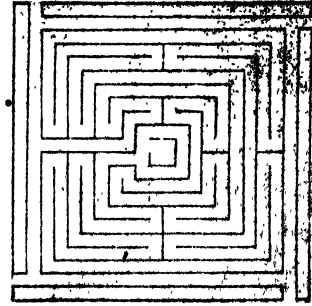
চিত্র নং ৬—হের্টফোর্ড-শায়ারের থিওবোল্ডস্থিত ধাঁদা

(৮) লণ্ডনের 'হ্যাম্পটন কোর্ট' প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত ঘনসন্নিবিষ্ট নাতিদীর্ঘ তরুরাজিযোগে নির্ম্মিত গোলক-ধাঁদাটি অনুকরণমাত্র ! কলিকাতার উপকণ্ঠে স্থাপিত 'সাত পুকুরে'র বাগানে, বর্দ্ধমানরাজের উদ্যানে প্রভৃতি নানাস্থানে—আঢ্যদিগের প্রমোদ-উদ্যানে—এইরূপ অনুকৃতিসমূহ প্রায়ই দেখা যায় !

নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে খৃষ্টান সম্রাট্গণের রাজপরিচ্ছদে কারুকার্য্য স্বরূপ নানাপ্রকারের গোলক ধাঁদা-চিত্র চিত্রিত হইত। ক্রমে গির্জ্জা ও উপাসনা মন্দিরের শোভাবর্দ্ধনের জন্য ঐরূপ বিচিত্র-আকারে বিন্যস্ত লতা-গুল্ম-বীথিকার
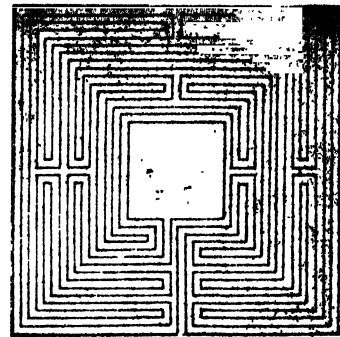
চিত্র নং ৭—ষোড়শশতাব্দীর ইতালীয় ধাঁদা

বহুলপ্রচলন হইয়াছিল। ক্রমে, কেহবা জটিল সুড়ঙ্গ-খনন, কেহ বা পয়ঃ-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া, কেহবা ভূগর্ভস্থ অট্টালিকার স্থাপত্য-কৌশলের পরিচয় দিতে, অনেকে বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর, টালি বা কঙ্কর সাহায্যে, শ্যামল-তৃণা-

স্তরণের উপর বক্রগামী নানামুখী পথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতির দ্বারা এইসকল গোলক-ধাঁদার অনুকরণ করিতেন। পাপের বিষম
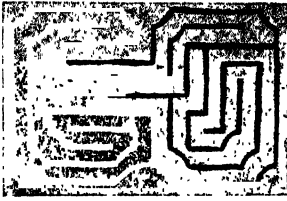
চিত্র নং ৮—হ্যাম্পটন্-কোর্টের পরিকল্পনাকারীদিগের কৃত ধাঁদা

ঘূর্ণীপাকে কিরূপে মানবগণ জড়িত হইয়া পড়ে, তাহাই বুঝাইবার জন্যই, বোধ হয়, সে-কালের বিভিন্ন ধর্ম্মমন্দিরে এইসকল গোলক-ধাঁদা পরিকল্পিত হইত। দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নিম্নে তদানীন্তন বিভিন্নস্থানের কয়েকটি গোলক ধাঁদার বিন্যাস-প্রকরণের চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

১ নং।—ইহা সেন্ট কুইন্টিনের ফরাসী গির্জ্জাভ্যন্তরে—ঠিক মধ্যস্থলে নির্ম্মিত ছিল; ইহার ব্যাসের পরিমাণ ৩৪॥ ফিট। এই চিত্রের কৃষ্ণবর্ণ রেখাগুলিই মধ্যস্থলে পৌছিবার পথ। যদি একটি পেন্সিল লইয়া 'A' চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর ঐ রেখাটির অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হও, তাহা হইলে, দীর্ঘ-ভ্রমণের পর, প্রায় সমুদায় চক্রটি প্রদক্ষিণ করিয়া, অবশেষে ঠিক মধ্যভাগে যাইয়া উপস্থিত হইবে;—কিন্তু যাইবার সময় তোমার ইচ্ছামত অপর কোনও দিকে যাইলে চলিবে না।—সেণ্ট মার্টিন-গির্জ্জার
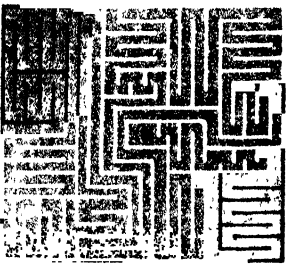
চিত্র নং ৯—একটি ওলন্দাজ ধাঁদা

মেঝায় জেরুসালেমের মন্দির ও যাত্রিগণের বিশ্রামস্থানের অনুকরণে, এইরূপ একটি গোলক-ধাঁদা অঙ্কিত আছে। যাহাদের জেরুসালামে যাইবার 'মানত' ছিল, অথচ কার্য্য-গতিকে ঐ তীর্থস্থানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, তাহাদের অনেকেই, সেই সত্যপালনার্থে এই গোলক-ধাঁদায় 'পরিক্রমা' করিয়া যায়। অনুতপ্তগণ, প্রায়শ্চিত্তকল্পেও, অনেকে এখানে আসিত; তাহারা 'হামাগুড়ি' দিয়া এই চক্রটি সমুদায় প্রদক্ষিণ করিত।
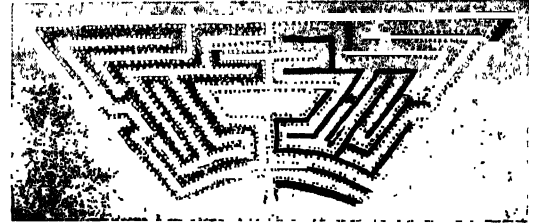
চিত্র নং ১০—হ্যাম্পটন্ কোর্ট প্রাসাদস্থিত ধাঁদা

২ নং।—ইহা চার্ট্রার্স-গির্জ্জায় অবস্থিত—প্রস্থে প্রায় ৪০ ফুট হইবে। অনুশোচনার্থী পাপীদিগকে ইহা পরিক্রমণ করিতে হইত। শাদা রাস্তাটিই ইহার মধ্যে যাইবার পথ।

৩ নং।—লুকা গির্জ্জার প্রবেশপথে একখানি টালির উপর এই ধাঁদাটি চিত্রিত আছে। এটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। ইহার ব্যাসের পরিমাণ মাত্র ১৯॥০ ইঞ্চি। কৃষ্ণবর্ণ রেখাটিই ইহার মধ্যে যাইবার পথ। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে জনৈক পর্য্যাটক এই ধাঁদার পার্শ্বে লিখিয়াগিয়াছেন যে, পথের সন্ধানে ক্রমাগত লক্ষ-লক্ষ পদাঙ্গুলিস্পৃষ্ট হওয়ায়, ইহার গাত্রে যেসকল মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, সেগুলির চিহ্ন লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে!
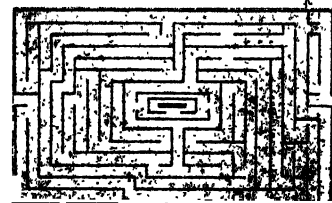
চিত্র নং ১১—হর্টসের হ্যাট্‌ফিল্ড্-হাউসস্থিত ধাঁদা

৪ নং—ইহা এসেক্সের স্যাফ্রন ওয়াল্ডেনে প্রতিষ্ঠিত। ইহার ব্যাস প্রায় ১১০ ফীট। কৃষ্ণ রেখাটিই ইহার প্রবেশ-পথ।

৫নং—ইহা নটিংহাম্-শায়ারের স্নিণ্টন প্রদেশে সেন্ট-য়্যানিজ-ওয়েলের নিকটে ছিল। ইহার ব্যাস প্রায় ৫১ ফীট ও সমগ্র পথের দৈর্ঘ্য ৫৩৫ গজ। কালবশে, ইহা

ভূ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ২৭এ ফেব্রুয়ারী তারিখে এইস্থান কর্ষিত হইবার সময়, ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্বেত রেখাটিই ইহার প্রবেশ পথ।

৬নং—হার্টফোর্ড-শায়ারে থিয়োবোল্ড্‌স্থিত এই ধাঁধার চারি কোণের যে কোনও দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই বরাবর ঘুরিতে-ঘুরিতে ঠিক্ মধ্যস্থলে যাওয়া যায়।

৭নং—ইহা পূর্ব্বোক্তটিরই অনুরূপ। ১৫৫১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত, সেরিলো-প্রণীত ইতালীর স্থাপত্য শিল্পসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকে ইহার প্রতিকৃতি আছে।

চিত্র নং ১২—অতীতকালে সাউথ কিন্সিংটনে অবস্থিত ধাঁধা

৮ নং—১৭০৬ খৃঃ অব্দে 'লণ্ডন এণ্ড ওয়াইজ' কর্ত্তৃক প্রকাশিত "দি রিটায়ার্ড গার্ডনর" নামক পুস্তকে 'হ্যাম্পটন্ কোর্ট'-আখ্যায় এই ধাঁধাটির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল।

৯ নং—ইহা ওলান্দাজদের একটি ধাঁধা।

উপরোক্ত ধাঁধাগুলি সমস্তই অতি প্রাচীন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে, আমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকে সময়াতিপাত করিবার উদ্দেশে, নানাপ্রকার গোলক-ধাঁধার উদ্ভাবনা হইয়াছে। আজকাল অনেকেই তাহাদের উদ্যানের শোভাবর্দ্ধনের জন্য, বিচিত্র ফুলগাছের কেয়ারী করিয়া, নানারূপ গোলক-ধাঁধা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১০ নং—নৃপতি তৃতীয় উইলিয়ম এইরূপ গোলকধাঁধা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই 'হ্যাম্পটন্ কোর্ট'-ধাঁধাটি তাঁহারই রাজপ্রাসাদের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই চিত্রে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুপাতের দ্বারা যে পথ-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই প্রবেশ ও নির্গমের একমাত্র সহজ ও সরল পথ। অন্য কোনও পথে গিয়া পড়িলে, ক্রমাগতই একই পথে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া হায়রাণ হইতে হইবে।

১১ নং—মার্কুইস অফ্ স্যলসবরির 'হ্যাটফিল্ড হাউস'-নামক হর্ম্ম্যে এই ধাঁধাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। যদিও কাগজে অঙ্কিত এই চিত্র হইতে, ইহার প্রবেশ ও নির্গমের পথ অতি সহজেই আবিষ্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধাঁধাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে, বাহির হওয়া অত্যন্ত কঠিন;

চিত্র নং ১৩—একটি জর্ম্মণ ধাঁধা

—বিপথে গিয়া, সম্মুখে যাইবার আর পথ নাই দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া, শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহে, আবার সেই পূর্ব্বস্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

১২ নং—প্রিন্স অ্যালবার্টের ইচ্ছানুসারে সাউথ কেন্সিংটনের 'রয়্যাল হর্টিকল্‌চারেল সোসাইটি'র উদ্যানে এই ধাঁধাটি তৈয়ারী হইয়াছিল। এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার তিনটি স্বতন্ত্র পথ আছে বটে, কিন্তু "A" চিহ্নিত পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল।

১৩ নং—ইহা জর্ম্মণদের একটি গোলক ধাঁধা। দেখিতে অতি সুন্দর। চিত্র দেখে, ইহার মধ্যে যাওয়া আসা বেশ সহজ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পথটি অত্যন্ত জটিল।

চিত্র নং ১৫—ডর্সেট প্রদেশের পিম্পার্ণে স্থিত ধাঁধা

১৪ নং—এই ধাঁধাটি ডর্সেট্ প্রদেশের পিম্পার্ণ নামক স্থানে ছিল। ইহা ন্যূনাধিক তিন বিঘা জমির উপর, একফুট উচ্চ 'আল'-নির্ম্মাণ করিয়া, প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ

স্থানটি চাষের উপযোগী বলিয়া ১৭৩০ খৃঃ অব্দে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, ঐস্থানে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে, কি প্রকারে গোলক ধাঁদার জটিলতার সহজে সমাধান সম্ভবপর, তাহারই একটু আলোচনা করি।

চিত্র নং ১৫—মসেঁা বেসেঁার ধাঁদা সমাধান-প্রকরণ

মনে করুন, কোনও একটি গোলকধাঁদা দেখিতে গিয়াছি; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সহজ এবং সরল পথটি আমার অজ্ঞাত।—তখন, আমি কি করিব? তখন, প্রথমে আমায় দেখিতে হইবে, তাহার প্রবেশ পথের দুইপার্শ্বে যে 'ফ্লাল' বা বেষ্টনী দেওয়া আছে, তাহার কোনও অংশ বিযুক্ত আছে, কি না, (যেমন ১০ নং গোলক ধাঁদার মধ্যে, যে দুইটি পথের বেষ্টনীর চারিপার্শ্বে মোটেই বিন্দুচিহ্ন নাই, সে-দুটি অন্যান্য বেষ্টনী হইতে সম্পূর্ণ বিভক্ত অবস্থায় আছে)। যদি না থাকে, তবে বরাবর দক্ষিণ দিকের অথবা বামদিকের বেষ্টনীটি ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে এবং যেখানে দেখিব বেষ্টনীটি বাঁকিয়া গিয়াছে, বা আর পথ নাই, সেখানে আবার বেষ্টনীটির অপরপার্শ্ব দিয়া সেই পথেই আবার ফিরিয়া চলিতে হইবে; এইরূপে

চিত্র নং ১৬—হ্যাট্‌ফিল্ড্‌স্থিত ধাঁদার সমাধান-পদ্ধতি

সমগ্র গোলক-ধাঁদাটি পরিভ্রমণ করিয়া, যেপথে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই পথেই আবার নির্বিঘ্নে বাহির হইয়া পড়িব! তবে, প্রত্যেক পথ দিয়াই দুইবার যাওয়া-আসা করিতে হইবে—এই মাত্র!

কিন্তু যে-সকল গোলক-ধাঁদার মধ্যে বিযুক্ত-বেষ্টনী আছে, তাহার সকল অংশ এ উপায়ে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না।—যেমন, ১১ নং গোলক-ধাঁদার মধ্যে যদি এই উপায় অবলম্বনে প্রবেশ করা যায়—তাহা হইলে অচিরে বাহির হইয়া আসিতে পারিব বটে; কিন্তু কোন কালেই ঠিক মধ্যস্থলে পৌছিতে পারিব না। এক্ষেত্রে মধ্যস্থলে পৌছান অত্যন্ত কঠিন।

এইরূপ বহুধাবিযুক্ত বেষ্টনী-বিশিষ্ট গোলক-ধাঁদার মধ্যস্থলে পৌছিবার একটি সহজ উপায়—১৫ নং চিত্রে

চিত্র নং ১৭ ফিলাডেলফিয়ার ধাঁদা ও তৎ সমাধান

প্রদর্শিত হইল। এক্ষেত্রে, প্রথম হইতেই—একে-একে যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া, যেখানে নির্গত হইতেছি তাহা উত্তমরূপে চিহ্নিত করিয়া যাইতে হইবে। কারণ একবার যে পথে গিয়াছি, আবার যেন সে পথে না গিয়া পড়ি। এইরূপে, একচক্র ঘুরিয়া, যখন চিহ্নিত প্রবেশ পথের কাছে আসিয়া পড়িব, তখন আর সে পথে অগ্রসর না হইয়া, ফিরিয়া অন্য পথ ধরিতে হইবে। এইরূপে অগ্রসর হইতে-হইতে অবশেষে ঠিক্ মধ্যস্থলে গিয়া পৌছিব।

কিন্তু উপরোক্ত দুইটি উপায়ের কোনটিই মধ্য-স্থলে পৌছিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কারের পক্ষে প্রশস্ত নহে! তবে, যদি গোলকধাঁদাটির একখানা নক্সা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, সে-কার্য্য অ

সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। ১৬ নং চিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহাতে যতগুলি 'কানা'-পথ ছিল, দাগ-কাটিয়া সেগুলি বন্ধ করা হইয়াছে যাহাতে অনর্থক উহার মধ্যে ঘুরিয়া না কষ্ট পাইতে হয়। এখন আমরা

চিত্র নং ১৮ কেন্দ্রে উপনীত হইবার সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব পথ কোনটি ?

যদি "A" চিহ্নিত পথে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, সহজেই "B"র কাছে আসিয়া পৌছিব। অথবা, যদি "C" চিহ্নিত পথে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, "D"র কাছে আসিয়া পৌছিব। এখন দেখিতে হইবে A-B-E কিম্বা C-D-E কোন্ পথটা অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। এইটুকু বিচার করা বিশেষ শক্ত নয়, যে কেহ দেখিলেই মোটামুটি বুঝিতে পারিবে, যেন C-D-E-F, এই পথটই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত!

এইবার যে তিনটি গোলকধাঁধার চিত্র প্রদত্ত হইল, ইহাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র কাগজ-কলমেই দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর কোনও স্থানে যে এগুলি কখনও নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৭ নং—এই গোলকধাঁধাটির নাম 'ফিলাডেলফিয়ার ধাঁধা'। শুনা যায়, বৎসর বার পূর্ব্বে ফিলাডেলফিয়াবাসী জনৈক ব্যবসায়ী পর্য্যাটকের সহসা 'ধাঁধা'র প্রতি 'বেজায় ঝোঁক চাগিল।' দিবারাত্রি কেবল বিবিধ-প্রহেলিকার সমাধান করাই তাঁহার কার্য্য হইয়া উঠিল; সুতরাং, তাঁহার ব্যবসায়ও মাটী হইয়া গেল! এই ধাঁধাটি পাইয়া, তিনি না কি পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন ধরিয়া ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়া, অবশেষে-ব্যর্থ ও হতাশ হৃদয়ে, তিনি আপনার মস্তকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন! ঘটনাটি সত্য, কি না, বলিতে পারি না; তবে, এটা ঠিক যে, এ ধাঁধাটি এমনকিছু কঠিন নয়, যে বার বার সমাধানের চেষ্টা করিলেও ব্যর্থকাম হইতে হইবে!

এখন দেখা যাউক যদি এক রাস্তায় দুইবার আনাগোনা না করা হয়, তাহা হইলে, "A" হইতে "B"র কাছে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথপাওয়া যাইতে পারে, কি না?

এ ক্ষেত্রেও সমস্ত 'কানা' পথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন 'A' হইতে 'C' এবং 'F' হইতে 'B'র কাছে আমাদের যাইতে হইবে, কিন্তু যখন 'C'র কাছে আসিব' সেখান হইতে 'D'র কাছে যাইবার তিনটি পথ আছে (১, ২, ৩)। আবার, যখন 'E'র কাছে যাইব, সেখান হইতে "F"র কাছে যাইবারও তিনটি পথ আছে (৪, ৫, ৬)। "C" হইতে "E"র কাছে যাইবার এবং "D" হইতে "E"তে যাইবার পথে "তারকা" (•) চিহ্ন আছে। এইবার, একটু মনঃসংযোগ করিয়া' আমরা এই চিহ্নিত পথগুলি ধরিয়া অগ্রসর হইলেই "A" হইতে "B"র নিকট

চিত্র নং ১৯ রোজামণ্ড সুন্দরীর প্রমোদ গৃহ

পৌছিতে পারিব। ১৯ এবং ২০ নং ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিবার ভার, আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের উপর ন্যস্ত করিলাম। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য, আমরা কেবলমাত্র এইটুকু বলিয়া দিতে পারি, যে, এই প্রবেশ পথ আবিষ্কার করিবার সহজ উপায় হইল—প্রথমে, নির্গত হইবার পথ আবিষ্কার করা!

স্থানটি চাষের উপযোগী বলিয়া ১৭৩০ খৃঃ অব্দে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, ঐস্থানে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে, কি প্রকারে গোলক ধাঁদার জটিলতার সহজে সমাধান সম্ভবপর, তাহারই একটু আলোচনা করি।

চিত্র নং ১৫—মসোঁ দেমোঁর ধাঁদা-সমাধান-প্রকরণ

মনে করুন, কোনও একটি গোলকধাঁদা দেখিতে গিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সহজ এবং সরল পথটি আমার অজ্ঞাত।—তখন, আমি কি করিব? তখন, প্রথমে আমায় দেখিতে হইবে, তাহার প্রবেশ পথের দুইপার্শ্বে যে 'আল' বা বেষ্টনী দেওয়া আছে, তাহার কোনও অংশ বিযুক্ত আছে, কি না, (যেমন ১০ নং গোলক-ধাঁদার মধ্যে, যে দুইটি পথের বেষ্টনীর চারিপার্শ্বে মোটেই বিন্দুচিহ্ন নাই, সে-দুটি অন্যান্য বেষ্টনী হইতে সম্পূর্ণ বিভক্ত অবস্থায় আছে)। যদি না থাকে, তবে বরাবর দক্ষিণ দিকের অথবা বামদিকের বেষ্টনীটি ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে এবং যেখানে দেখিব বেষ্টনীটি বাঁকিয়া গিয়াছে, বা আর পথ নাই, সেখানে আবার বেষ্টনীটির অপরপার্শ্ব দিয়া সেই পথেই আবার ফিরিয়া চলিতে হইবে; এইরূপে

চিত্র নং ১৬—হ্যাট্‌ফিল্ড্‌স্থিত ধাঁদার সমাধান-পদ্ধতি

সমগ্র গোলক-ধাঁদাটি পরিভ্রমণ করিয়া, যেপথে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই পথেই আবার নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া পড়িব! তবে, প্রত্যেক পথ দিয়াই দুইবার যাওয়া-আসা করিতে হইবে—এই মাত্র!

কিন্তু যে সকল গোলক-ধাঁদার মধ্যে বিযুক্ত-বেষ্টনী আছে, তাহার সকল অংশ এ উপায়ে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না।—যেমন, ১১ নং গোলক-ধাঁদার মধ্যে যদি এই উপায় অবলম্বনে প্রবেশ করা যায়—তাহা হইলে, অচিরে বাহির হইয়া আসিতে পারিব বটে; কিন্তু কোনও কালেই ঠিক মধ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব না। এক্ষেত্রে মধ্যস্থলে পৌঁছান অত্যন্ত কঠিন।

এইরূপ বহুধাবিযুক্ত বেষ্টনী-বিশিষ্ট গোলক-ধাঁদার মধ্যস্থলে পৌঁছিবার একটি সহজ উপায়—১৫ নং চিত্রে

চিত্র নং ১৭—ফিলাডেলফিয়ার ধাঁদা ও তৎ-সমাধান

প্রদর্শিত হইল। এক্ষেত্রে, প্রথম হইতেই—একে-একে যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া, যেখানে নির্গত হইতেছি, তাহা উত্তমরূপে চিহ্নিত করিয়া যাইতে হইবে। কারণ, একবার যে পথে গিয়াছি, আবার যেন সে পথে না গিয়া পড়ি। এইরূপে, একচক্র ঘুরিয়া, যখন চিহ্নিত প্রবেশ পথের কাছে আসিয়া পড়িব, তখন আর সে পথে অগ্রসর না হইয়া, ফিরিয়া অন্য পথ ধরিতে হইবে। এইরূপে অগ্রসর হইতে-হইতে অবশেষে ঠিক্ মধ্যস্থলে গিয়া পৌঁছিব।

কিন্তু উপরোক্ত দুইটি উপায়ের কোনটিই মধ্য-স্থলে পৌঁছিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কারের পক্ষে প্রশস্ত নহে! তবে, যদি গোলকধাঁদাটির একখানি নক্সা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, সে-কার্য্য অতি

সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। ১৬ নং চিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহাতে যতগুলি 'কানা' পথ ছিল দাগ কাটিয়া সেগুলি বন্ধ করা হইয়াছে—যাহাতে অনর্থক উহার মধ্যে ঘুরিয়া না কষ্ট পাইতে হয়। এখন আমরা

চিত্র নং ১৮—কেন্দ্রে উপনীত হইবার সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব পথ কোনটি ?

যদি "A" চিহ্নিত পথে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, সহজেই "B"র কাছে আসিয়া পৌঁছিব। অথবা, যদি "C" চিহ্নিত পথে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, "D"র কাছে আসিয়া পৌঁছিব। এখন দেখিতে হইবে A B E কিম্বা C D E কোন্ পথটা অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। এইটুকু বিচার করা বিশেষ শক্ত নয়, যে কেহ দেখিলেই মোটামুটি বুঝিতে পারিবে, যেন C-D-E-F, এই পথটই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত।

এইবার যে তিনটি গোলকধাঁধার চিত্র প্রদত্ত হইল, ইহাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র কাগজ-কলমেই দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর কোনও স্থানে যে এগুলি কখনও নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৯ নং—এই গোলকধাঁধাটির নাম 'ফিলাডেলফিয়ার ধাঁধা'। শুনা যায়, বৎসর-বার পূর্ব্বে ফিলাডেলফিয়াবাসী জনৈক ব্যবসায়ী পর্য্যটকের সহসা 'ধাঁধা'র প্রতি 'বেজায় ঝোঁক চাপিল।' দিবারাত্রি কেবল বিবিধ-প্রহেলিকার সমাধান করাই তাঁহার কার্য্য হইয়া উঠিল; সুতরাং, তাঁহার ব্যবসায়ও মাটী হইয়া গেল! এই ধাঁধাটি পাইয়া, তিনি না কি পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন ধরিয়া ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়া, অবশেষে—ব্যর্থ ও হতাশ হৃদয়ে, তিনি আপনার মস্তকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি সত্য, কি না, বলিতে পারি না; তবে, এটা ঠিক যে, এ ধাঁধাটি এমনকিছু কঠিন নয়, যে বারংবার সমাধানের চেষ্টা করিলেও ব্যর্থকাম হইতে হইবে!

এখন দেখা যাউক—যদি এক রাস্তায় দুইবার আনাগোনা না করা হয়, তাহা হইলে, "A" হইতে "B"র কাছে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথপাওয়া যাইতে পারে, কি না ?

এ ক্ষেত্রেও সমস্ত 'কানা' পথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন 'A' হইতে 'C' এবং 'E' হইতে 'B'র কাছে আমাদের যাইতে হইবে, কিন্তু যখন 'C'র কাছে আসিব' সেখান হইতে 'D'র কাছে যাইবার তিনটি পথ আছে (১, ২, ৩)। আবার যখন 'E'র কাছে যাইব, সেখান হইতে "F"র কাছে যাইবারও তিনটি পথ আছে (৪, ৫, ৬)। "C" হইতে "E"র কাছে যাইবার এবং "D" হইতে "F"তে যাইবার পথে "তারকা" (*) চিহ্ন আছে। এইবার, একটু মনঃসংযোগ করিয়া' আমরা এই চিহ্নিত পথগুলি ধরিয়া অগ্রসর হইলেই "A" হইতে "B"র নিকট

চিত্র নং ২০—রোজামণ্ড-সুন্দরীর প্রমোদ কুঞ্জ

পৌঁছিতে পারিব। ১৯ এবং ২০ নং ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিবার ভার, আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের উপর ন্যস্ত করিলাম। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য, আমরা কেবলমাত্র এইটুকু বলিয়া দিতে পারি যে, এই প্রবেশ পথ আবিষ্কার করিবার সহজ উপায় হইল—প্রথমে, নির্গত হইবার পথ আবিষ্কার করা!

"ফেল্—পাশ"

[শ্রীপ্রমীলাবালা মিত্র]

(১)

সেবার 'দারভাঙ্গা হাউসে' আই এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল; গেজেটে বাহির হইতে এখনও তিন-চারিদিন বিলম্ব আছে। দেবব্রত বসু, যথাসময়ে নিজ পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য, বন্ধুবান্ধবসহ তথায় উপনীত হইয়া দেখিল, তাহার 'রোল-নম্বর' কাটা! দেবব্রত পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া একটা স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাড়াইল। বন্ধুগণ সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল— "সে কি! দেবব্রত ফেল্ হইল। এ পর্যন্ত সকলেই যে একবাক্যে বলেছিলেন, দেবব্রত ফেল হইবার ছেলে নয়! দেখা যাক এখন আমাদের কি হ'ল!"

সকলেই নিজ নিজ নম্বর দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কেহ আনন্দিত, কেহ বা দুঃখিত অন্তরে নিজ নিজ আবাসে প্রতিগমন করিল।

দরিদ্র পুত্র দেবব্রত নতমস্তকে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ট্রেনে গিয়া উঠিল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্যই আজ দুইদিন সে কলিকাতার ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছিল। প্রথমবার দেবব্রত ম্যাট্রিকিউলেশনে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হইয়া স্কলারশিপ্ পাইয়াছিল; এবারও শিক্ষকমণ্ডলী, এবং আত্মীয়স্বজন তাহার অধ্যবসায় দেখিয়া, সে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে—বলিয়াছিলেন। সহায়-সম্পত্তিহীনা, দরিদ্রা বিধবার একমাত্র পুত্র দেবব্রত—আর ত পড়িবার সুবিধা পাইবে না! তাহার জননী অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিয়া, এক ভদ্রলোকের হাতে-পায়ে ধরিয়া, পাঁচটি করিয়া টাকা পুত্রকে পাঠাইতেন; দেবব্রত অবসর মত একটি ট্রিউশনি করিয়া ৭৲ টাকা পাইত; তাহাতেই কায়ক্লেশে পুস্তক, স্কুল, ও খাইখরচ সঙ্কুলান করিয়া লইত। কিন্তু যে অবধি সে পরীক্ষায় উচ্চ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইল, সে অবধি সে মাতৃদত্ত ৫৲ টাকা আর গ্রহণ করিত না। একজন বন্ধুর অনুগ্রহে তাহার মেসের ভাড়া লাগিত না; সেই মহাপ্রাণ বন্ধু সময়ে অসময়ে দেবব্রতকে অন্যান্য অনেক সাহায্যই করিত।

প্রবেশিকা-পরীক্ষার পূর্ব্বেই দেবব্রতের পিতা তাহার শুভপরিণয় কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন। দেবব্রতের স্ত্রী তাহার পিতামাতার বড়ই আদরের একমাত্র কন্যা ছিল। বাপমায়ের অত্যধিক আদর পাইয়া মেয়েটি বড়ই বাক্‌চতুরা হইয়াছিল; শ্বশুর গৃহে আসিয়াও সে বাক্‌চাতুরী ছাড়িতে পারে নাই। শ্বশুর মারা গেলেন, অবস্থা মন্দ হইল; কিন্তু নলিনার সেই নাকেমুখে কথাবলা, সেই ঠাট্টাতামাসার ভাব কিছুতেই গেল না।

দেবব্রত গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া সে জননীর নিকট মুখ দেখাইবে? যদিও তিনি মুখে কিছুই বলিবেন না; তথাপি হায়, আজ দেবব্রতের জন্য বৃদ্ধাকে না জানি কতটা মনস্তাপই পাইতে হইবে! তাহার পর বন্ধুবান্ধব—দেবব্রতের কিশোরী বধূ—সকলেই যে আশায় উদগ্রীব হইয়া আছে। আজ দেবব্রত কেমন করিয়া নতমস্তকে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে? ইহার আগে তাহার মৃত্যু হইল না কেন?

ষ্টেশনে ট্রেন থামিবামাত্র দেবব্রত নামিয়া পড়িল। গঙ্গারঘাটে গিয়া একখানি পরিচিত নৌকায় পার হইয়া হালিসহরের বিশালাক্ষীর ঘাটে পৌছিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গঙ্গা তখন তারার মালা গলায় পরিয়া চাঁদের-হাসি বুকে মাখিয়া আপনমনে একূল ওকূল করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। ওপারের শ্রেণীবদ্ধ ঝাউগাছগুলি মর্ম্মরশব্দে সন্ধ্যার বন্দনা গায়িতেছে। দেবব্রত সেই ঘাটের খেজুরকাঠের সিঁড়ির উপর বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল। "এখনই এই গঙ্গাগর্ভে ডুব দিলে ত সকল যন্ত্রণার অবসান হয়!" দেবব্রতের জননীর সেই স্নেহ-করুণ বদন ও বালিকা-বধূর স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যভরা কচি-ঢল-

ঢল মুখখানি তাহার হৃদয় মুকুরে ভাসিয়া উঠিল। হায়, মরণের পথেও এত বাধা!

এমন সময় 'কল'-প্রত্যাগত ছেলের দল রাস্তা দিয়া সুমধুর রামপ্রসাদীসুরে গাহিতে গাহিতে গেল—

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না।—
এমন মানব-জমি রইল পড়ে—
আবাদ করলে ফলত সোণা।"—

দেবব্রত ভাবিল "সত্যকথাই ত। আমি এমন মানব জমিতে আবাদ করতে শিখ্‌লাম না। সামান্য পরীক্ষায় ফেল হয়েছি ব'লে এত কাতর, না জানি দুনিয়ায় কতরকমে কতবার ফেল হ'তে হবে। হৃদয়ে বল দাও মা।" বলিয়া দেবব্রত উঠিয়া দাড়াইল। ক্রমশঃ সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দ্বার সন্নিকটে গিয়া পদদ্বয় অবাধ্য হইল; তাহারা আর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না। অতিকষ্টে, ধীরে ধীরে মৃৎপ্রাচীরঘেরা বাড়ীর ক্ষুদ্র দ্বারটিতে আঘাত করিয়া ভগ্নপ্রাণে, করুণস্বরে দেবব্রত ডাকিল "মা!" সেই মাতৃসম্বোধনে কত করুণতা, কত ব্যথা, কত কাতরতা, কত আকুলতা অভিব্যক্ত, মাতৃপ্রাণ তাহা বুঝিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। জননী ক্ষিপ্রহস্তে দ্বারোন্মোচন করিয়া জ্যোৎস্নালোকে পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার দেবু যে পরীক্ষায় ফেল হইবে, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় বাছার কোন অসুখ করিয়াছে। পুত্রকে ধরিয়া দাবায় বসাইয়া, মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা?"

"ফেল্ হয়েছি মা!" লজ্জাভিমানে ঝরঝর করিয়া দেবব্রতর চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। মাতা আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "তা হ'লেই বা; অমন কত হয়; আস্‌চে বছর আবার পাশ দিও।"

"না মা, আর আমি পড়্‌ব না। এইবার পড়ার মুখে ছাই দিয়ে চাক্‌রীর চেষ্টা কর্‌ব; তোমাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা দেখ্‌ব।"

দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা তাহার স্ত্রী খিলখিল্ শব্দে হাসিয়া উঠিল। দেবব্রতর শরীরের সমস্ত রক্ত তড়িৎ-বেগে মাথায় উঠিয়া জমাট বাঁধিয়া গেল।

২

যথাসাধ্য যত্নে জননী পুত্রকে আহার করাইয়া শয়ন কক্ষে পাঠাইলেন। তাহার পর বধূকে আহার করাইয়া অতিযত্নে সাধ্যমত বস্ত্রাদিদ্বারা সজ্জিত করিয়া দিলেন। বধূ মলিনা একখানি চিত্রপটের আকার ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে পানের ডিবাহস্তে স্বামি সম্ভাষণে চলিল।

যাইবার সময় শাশুড়ী বলিয়া দিলেন, "আবাগের ঝি, দেখিস যেন এমন কথা বলিসনে, যাতে দেবু আজ মনে কষ্ট পায়, তোর ত মুখের আগল নেই।"

মলিনা ঘরে গিয়া দেখিল, ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত। তাহার বড় রাগ হইল। অন্যদিন সে আলো নিবাইতে গিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, আর আজ তাহার এতটা সাজ সজ্জা কিনা বৃথায় যাইবে! সে শাশুড়ীর নিষেধবাক্য ভুলিয়া গেল। পানের ডিবাটা ঠক করিয়া একটা বাক্সের উপর বসাইয়া শয্যার নিকট গিয়া বলিল, "কি গো ফেল বাবু, মুখ দেখাইবে না, না কি?" দেবব্রত পাশ বালিসটা অধিকতর আগ্রহভরে চাপিয়া ধরিল। বধূ তাহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া আবার কহিল, "ফেল হ'লে বুঝি লোকে শুনতে পায় না? আজ কি বিছানায় আমার স্থান হবে না?" দেবব্রত সরিয়া শুইল। আস্তে আস্তে বলিল, "এই যে, শোও না।"

শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ মলিনা এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। তখনও তাহার প্রাণে ক্ষীণআশা জাগিতেছিল, এখনই স্বামী নিশ্চয়ই তাহাকে সোহাগভরে প্রত্যেক মতন কত "মধুমাখা ছাইপাশ" কথা বলিবেন।

অনেকক্ষণ পরে নিরাশ হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল, দেবব্রতও হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের এদিক ওদিক ঘুরিয়া, কখনও বা বিছানায় শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। তাহার কাণে কেবলই ধ্বনিত হইতেছিল, "কি গো, ফেলবাবু, মুখ দেখাইবে না, না কি?"

৩

প্রাতে উঠিয়া জননী বধূকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, দেবু কা'ল ঘুমিয়েছিল? কিছু অস্থির হয়নি ত?" বৌমা বলিল "ঘুম?—বাবা, সারারাত একটু সাড়া শব্দও ছিল না!" জননী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

সেদিন, প্রাতঃকাল হইতে দেবব্রতের বন্ধুগণ ও

শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়মণ্ডলী গৃহের দ্বারে জমায়েৎ হইয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল। দেবব্রত গৃহের বাহির হইল না! জননী সাধ্যমত তাহাদের একটা যা' তা' বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সকলে কাণাঘুসা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

স্নানান্তে ঘাট হইতে আসিয়া মলিনা মাথা মুছিতে মুছিতে দেবব্রতর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেখ দেখি, একটু যদি যত্ন ক'রে পড়্‌তে, ত আজ আর এতকথা শুন্‌তে হ'ত না! ঘাটে নাইতে নাইতে সরসী ঠাকুরঝি বল্লে—"কি রে বৌ, আমাদের ভাইকে শেষে ফেল হওয়ালি?"

কথা কয়টা বলিয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। জড়পদার্থের মত নীরবে বসিয়া দেবব্রত সকল শুনিলমাত্র, কোনও উত্তর দিল না। তাহার মনের মধ্যে একটা দুষ্ট প্রবৃত্তি উঁকি দিয়া কি যেন বলিয়া গেল। দেবব্রত শিহরিল; তাহার অলক্ষ্যে নিয়তি হাসিল।

মাতা আসিয়া ডাকিলেন "দেবু!" দেবব্রত চমকিয়া উঠিল, উত্তর দিল না। মাতা আবার বলিলেন, "হরিশ ঠাকুরপোকে বল্লুম এই কথা; তা তিনি শুনে বল্লেন, 'এবার অনেক ছেলেই ফেল হয়েছে, ফেল অমন অনেকেই হয়,—বিশেষ এটা শক্ত পাশ। আসচে বছর যাতে পাশ হ'তে পারে, ভাল ক'রে পড়্‌তে বলগে।' তা' তুই ওঠ্; নেয়েটেয়ে আয়; গাছের পেঁপে পেকেছে, নারকেল সন্দেশ করেছি; খেয়ে একটু জল খা। অমন ক'রে ব'সে থাকলে কি হবে? মন ঠিক ক'রে ফেল।"

ছোট একটি "হুঁ" দিয়া উঠিয়া, তৈলমর্দ্দন করিয়া দেবব্রত স্নান করিতে গেল। পাছে কাহারও সঙ্গে দেখা হয়, সেইজন্য সকলে যে ঘাটে স্নান করে, সে ঘাটে গেল না, একটা আঘাটায় ডুব দিয়া দেবব্রত বাড়ী ফিরিল।

মাতা পুত্রকে জলযোগ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি রাঁধ্‌ব, বল দেখি? কি খাবি? চিংড়িমাছ দিয়ে এঁচোড় দিয়ে রাঁধ্‌ব?" পুত্র বলিল, "তা'হলে তোমার কি হবে?"

"কেন? আগে নিরামিষ ঢেলে রাখ্‌ব'খন! কৈবর্ত্ত-বৌকে ভাল-দেখে কিছু চিংড়িমাছ আন্‌তে দিইগে; আর এবারে আঁব তেল যা হয়েছে! বৌমা খেয়ে বলে, এমন কোনওবার হয়নি। শেষ পাতে তাই খাবি'খন। শেষে দুধও একটু আছে। ঐ ঘোষাণির গাই বিইয়েছে কি না; তাই সে এখন আমায় যোগান দেয়, আবার আমার হ'লে আমি শোধ দেব! তারপর, আর কি কর্‌ব বল্ দেখি? কলকেতা থেকে যে মুগের দাল এনেছিস্, তাই দুটি ভাতে দেব, ঘি দিয়ে খাবি'খন?" আহার্য্য-ব্যবস্থার ক্রমবৃদ্ধির বন্দোবস্ত শুনিয়া দেবব্রতর মুখে হাসি দেখা দিল। সস্মিতমুখে সে বলিল, "তাই হ'; কিন্তু ক্রমেই যে তোমার বাড়্‌তে চলল দেখ্‌ছি।"

"তা বাছা, তুই বাড়ী থাকিস্‌নে, যে ক'দিন আছি, খাওয়াই, তারপর ত আছেই। এই দেখ্ না, বৌমাকে দু-পয়সার মৌরালমাছ, কোনদিন বা একখানি মাছের দাগা এনে দেয়, কেটেকুটে তাইতে কাচকলা, হ'ল ত একটা আলু দিয়ে ঝোল ক'রে দিই, বাছা আমার দুবেলা তাই দিয়ে খায়। আর আমার কোনদিন একটু নিরামিষ ঝোল করি, কোনদিন ভাতেভাত হয়; তাই তিরিপ্তি হ'য়ে, তোদের কল্যাণ মানাতে মানাতে খাই। আসচে বছর হরির ইচ্ছেয় পাস কর্, তখন তোর মা মুগের-ডাল ভাতে, ঘি ডাল, ডালনা দিয়ে ভাত খাবে। এখন তোদের কল্যাণে এই আমার ভাল। ও বৌমা! পানটান্ আছে? দেবুকে দাও। যা, ঘরে যা। আজ দুপুর বেলায় 'রামায়ণের' 'সীতাহরণ'টা আমায় শোনাতে হবে, মনে আছে ত?"

দেবব্রতর মরা-প্রাণে স্নেহের উৎস ছড়াইয়া জননী কার্য্যান্তরে গেলেন। দেবব্রত উঠিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। মলিনা পান লইয়া ঘরে আসিয়া বলিল—"মাকে এখনই ব'লে দেব, তুমি পড়ার বই না প'ড়ে বাজে বই পড়্‌ছ!" দেবব্রত একমুহূর্ত্তে পূর্ব্বের প্রফুল্লতা ভুলিয়া মলিনমুখে বলিল, "তোমায় কে বললে যে, আমি বাজে বই পড়্‌ছি?"

মলিনা বলিল, "আমি আর দেখ্‌তে পাই না কি না! ঐ ক'রে একবার ত ফেল্! আস্‌চে বছরেও তাই হবে না কি? ছি ছি,—আমায় সবাই অপয়া বল্‌ছে।"

"ও বৌমা, কুট্‌না কুট্‌বে এস!" শাশুড়ীর ডাকে মলিনা চলিয়া গেল। দেবব্রত ভাবিতে লাগিল, "এই কি শান্তি-প্রদায়িনী গৃহলক্ষ্মী স্ত্রী! এই কি স্বামীর সুখদুঃখের সমভাগিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী? ইহাদের দ্বারাই কি লোকে সংসারে

স্বর্গসুখ উপভোগ করে?" হায় হায়! আজ যদি শ্লেষ-ভর্ৎসনার পরিবর্ত্তে, মলিনা সান্ত্বনা-সোহাগ দিয়া দেবব্রতর প্রাণে সুখ-শান্তি দিতে চেষ্টা পাইত, তাহাহইলে দেবব্রতর হৃদয় এত ব্যথিত হইত না! দেবব্রতর হৃদয়ে ফেল রূপ যে ক্ষত হইয়াছে, মাতা তাহাতে আশা প্রলেপ দিয়া শুষ্ক করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অপরদিকে মলিনা তেমনই ক্ষতাবরণ টানিয়া-ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতেছে।

দেবব্রতর বাল্যসুহৃৎ মন্মথ আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার পৃষ্ঠস্পর্শ করিল; চমকিয়া চাহিয়া দেবব্রত মাথা নত করিল। পিঠ্‌ চাপড়াইয়া মন্মথ বলিল, "কি হে, ফেল কি আর কেউ হয় না, নাকি? এ বিশ্বরাজ্যে একা তুমিই ফেল হয়েছ? চেষ্টা ক'রে আবার পড়, যাতে আসচে বছর 'সাকসেসফুল' (Successful) হ'তে পার। এমন নিঝুম হ'য়ে ঘরে ব'সে থেকে ফল কি? আর এখনও গেজেট বেরোয়নি তো।" মথনীচু করিয়াই দেবব্রত বলিল, "বড়আশায় নিরাশ হ'লেই, লোকের মন এমনি ছন্নছাড়া হয়। গেজেটে আর নূতন খবর কি বেরুবে!"

"নাহে—না, কত অমন হয়। সেবার গিরীশের ছোট ভাই—পরেশের, গেজেট বেরোবার আগে শোনা গেল, পাশ হয়েছে। খুব আমোদ ভোজের বন্দোবস্ত হচ্ছে, বেচারা লেমনেডের অভাব দিতে যাচ্ছে, এমন সময় কল্‌কাতা থেকে তার এক আত্মীয় টেলিগ্রাফ করলেন, 'তোমার পরীক্ষার খবর ভুল, তুমি ফেল হইয়াছ।' বল দেখি, তখন তার কি অবস্থা হ'ল? কিন্তু সে মনের ভাব চেপে রেখে বল্লে 'আচ্ছা, আসচে বছর ত পাশ হবই, ভোজটা এবার হ'য়ে থাক্‌।' এই কথা ব'লে আমোদে যোগ দিলে। আর সব ছেলের চাইতে সেই বেশী আমোদ ও লম্ফঝম্ফ করেছিল।"

দেবব্রত বলিল, "ভাই, আমার পড়ার খরচের অভাব, জান ত? চাক্‌রী না করলে, সংসার ত আর চলে না! আর সংসারের সুখ যা, তা'ও আমার নেই। ফেলের সঙ্গেসঙ্গে সব হারিয়েছি;—নহিলে তত ক্ষতি বিবেচনা কর্‌তাম না।" শেষের কথায় অত কাণ না দিয়াই, মন্মথ বলিল, "আর একটা বছর যো-সো ক'রে চালিয়ে নাও না; দুই একখানা ছাড়া, নতুন বই ত আর কিন্‌তে হবে না তোমার।"

ইত্যাদি কথাবার্ত্তার পর মন্মথ উঠিয়া গেল। দেবব্রতও মাতার সাদর আহ্বানে রন্ধনাগারে মাতৃহস্তরচিত অমৃত ভক্ষণে গেল।

রাত্রে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল। দেবব্রতর মনটা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু প্রফুল্ল ছিল। সে সোহাগ মিশ্রিতস্বরে বলিল, "মলিনা, দুঃখ করো না; —অযোগ্য স্বামী তোমার, তোমার কচি মনটিতে অনেক ক্লেশ দিলে।" মলিনা বলিল, "আমার অদৃষ্টে এই ছিল, নইলে এমন হবে কেন? পাড়ায় মেয়েরা আজ আমায় কি না বলছে। আজ তুমি পাশ হ'লে, কি এত কথা আমায় শুনতে হ'ত?" মলিনা কেমন ঐ এক রকমের ছিল, তাহার কথাবার্ত্তার বাঁধন ছিল না বলিয়া, তাহার কথাগুলি এমন রূঢ় হইয়া পড়িল। হিন্দু স্ত্রী জ্ঞানতঃ পতিদেবতার প্রাণে ব্যথা দিয়া কথা বলিতে আজিও শিখে নাই।

দেবব্রতর প্রাণ একেবারে ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। সে রাত্রিও নীরবে কাটিয়া গেল।

প্রাতে উঠিয়া দেবব্রতকে কেহই দেখিতে পাইল না।

* * * *

গ্রীষ্মের দুপুরে রোদ্র খাঁখাঁ করিতেছে। আমের বাগানে ছেলের দলের চীৎকার, ঝড়ের শব্দকেও ঢাকিয়া দিয়াছে। লহরমালা বুকে ধরিয়া, হাসিমুখরে বিশাল গঙ্গা সাগরের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিশালাক্ষীর ঘাটের সম্মুখবর্ত্তী ছায়াপ্রদ বৃহৎ অশ্বত্থমূল হইতে জলের নিকটবর্ত্তী তীর পর্য্যন্ত ভীষণ জনতা হইয়াছে। এক বৃদ্ধা তাহার মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিয়া কাঁদিয়া দর্শকমণ্ডলীর প্রাণ করুণায় বিগলিত করিতেছে।

এমন সময়, গেজেটহস্তে দ্রুতপদে, মন্মথ আসিয়া দেবব্রতর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল—দ্বার ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল, মন্মথ ডাকিল, "দেবব্রত, কোথায় হে! কেমন বলিনি যে, গেজেট বেরোলে, তবে ঠিক খবর পাওয়া যাবে! এই দেখ, একেবারে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছ! এইবার ভোজের ব্যবস্থা কর!" বলিতে বলিতে মন্মথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, শয়নগৃহের দাবায় বসিয়া মলিনা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

মন্মথ লজ্জা ভুলিয়া আকুল-অন্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বৌদিদি!" মলিনা কাঁপিতে কাঁপিতে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে, গঙ্গার দিক দেখাইয়া দিল। দেবব্রতর বাড়ী

হইতে গঙ্গা দেখা যাইত। মন্মথ উন্মাদের মত গঙ্গাভিমুখে ছুটিল।

গেজেট হস্তে ঘাটের নিকট যাইয়া দেখে—সেখানে লোকে লোকারণ্য। সে অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; দেখিল গ্রামের ডাক্তার হরিশবাবু দেবব্রতের নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছেন; সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। একটু পরেই ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ভয় নাই—মরে নাই।" তখন সকলে ধরাধরি করিয়া দেবব্রতকে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

অনেক চেষ্টার পর দেবব্রতের চেতনা-সঞ্চার হইল; কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শমত কেহই তখন তাহাকে পাশের সংবাদ দিল না—এ প্রকার দুর্ব্বল-অবস্থায় সংবাদটা পাইলে হিতে-বিপরীতও হইতে পারে।

সন্ধ্যার মধ্যেই দেবব্রত সুস্থ হইল। এতক্ষণ কেহই তাহাকে পাশের সংবাদটি দেয় নাই। দেবব্রতকে সুস্থ দেখিয়া মলিনা আর মনের আনন্দ গোপন করিতে পারিল না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগো ফেল নয়—**পাশ**!"

মানস-মিলন

[শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা]

এস, প্রিয়তম! মম হৃদি কুঞ্জাগারে
অন্তরের মধ্যস্থলে এ নিভৃত স্থান;
অশরীরী হয়ে—মানবের অগোচরে
চিরানন্দে করিব মিলন-সুধাপান।
গুপ্তমনোরাজ্য মাঝে প্রেম হ্রদনীরে,
ডুবিব মৃণাল হয়ে ভাবের কন্দমে
সরোরুহ সাজে সখা, তিষ্ঠ তদুপরে
নাহি হেথা বাধা-বিঘ্ন স্পর্শ আলাপনে!
কখনো, মানস-রাজ্যে—পূত প্রেমাসনে—
উপবিষ্ট রব দোঁহে পরিয়া বল্কল,
উচ্ছ্বাসিত হবে হিয়া ধর্ম্মের প্লাবনে
তৃণবৎ তুচ্ছ করি পাপ ধরাতল!
কখনো মানস রাজ্যে প্রেম কুঞ্জবনে—
একটি বরষ যথা একটি পলক—
জগতের অগোচর সদা সঙ্গোপনে
হেরিব দোঁহারে দোঁহে—আঁখি-অপলক!
কখনো মানস পটে রচিব চিত্রিত,
নবশঙ্খ—নবসাটী করি পরিধান—
শরৎ-ঋতুর রাঙ্গা প্রভাতের মত
হেরিব হরিণ-নেত্র বঁধুর বয়ান!
কখনো মানসাকাশে—সুখের সমীরে—
ভাসি বেড়াইব দোঁহে—পরীর মতন—
লজ্জা-ঘৃণা-ক্ষোভ-ভীতি রবেনা শরীরে
তৃপ্তি মহাতৃপ্তি ভরে জুড়াবো জীবন!
এসহে হৃদয়াকাশে মানস মোহন!
প্রেম-পারিজাত ফুলে, মহামাল্য হার
গাঁথিয়া পূজিব পদ; কেন, অকারণ,
কালী অবতার ক্লেশ* সহিবে ধরায়?
নিশীথে—যমুনাকূলে—কত লজ্জা-ভয়ে—
কখন কখন হয় ক্ষণিকমিলন,
অতৃপ্তি লইয়া ফিরি আয়ান আলয়ে,
ঝরিয়া ঝরিয়া মরে তৃষিত নয়ন!
আয়ান-আলয়, আর কুটিলার ঘরে
কতব্যবধান প্রাণে—কত হাহাকার!
অশরীরী হয়ে, এস হৃদয়ের পুরে,
মিলনে বিরহভয় রহিবেনা আর!
বরষ চলিয়া যাবে—আসিবে বরষ—
অফুরন্ত হবে এই অমৃত মিলন!
নেত্রে নেত্র, বক্ষে বক্ষ, অধরে অধর,
আত্মাতে মিশিয়া আত্মা—দিবে আলিঙ্গন—
খেলিব প্রেমের খেলা, হে রাখালরাজ!
কুটিলার গোচরে হইবে প্রেমালাপ—
নাহি হবে ব্যভিচার—নাহি রবে লাজ—
আত্মার পবিত্ররতি নিষ্কাম নিষ্পাপ!

---

* কৃষ্ণ-কালী।

উল্কি-রচনা

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, এম. এ.]

উল্কি শিল্পী মি. সদর্ল্যাণ্ড ম্যাকডোনাল্ড

খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে উল্কি, কুসংস্কারের অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত হইয়া, মানব জাতির মধ্যে আপনার শক্তি সম্পন্ন রূপে বজায় রাখিয়া চলিতে পারে নাই। মাঝে তাহার পতন হইয়াছিল এবং এখনও অনেকস্থলেই, সে মাথা নামাইয়া চলিতেছে। কলিকাতায় রমণীসমাজে তাহার আদর নাই বটে ; কিন্তু আজ কালি কলিকাতার যুবকদিগের অনেককেই বাহুতে উল্কিধারণ করিতে দেখা যায়।

অসভ্য, আপনার অঙ্গসৌষ্ঠবসাধনার্থ, রং এবং উল্কি দুইই ব্যবহার করিত। প্রাচীন সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও শরীরের সৌন্দর্য্যবিধানার্থ রঙের ব্যবহার দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমক ও গ্রীক, মিশরীয় ও আসিরীয় জাতিরা উল্কি দ্বারা দেহ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতার যুগে, উল্কির প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়.

পৃষ্ঠে—উল্কির পরী

উল্কি না হইলেও, চন্দন ও কুঙ্কুমের পত্রলেখার দ্বারা যে শরীরের সৌষ্ঠব-সম্পাদিত হইত, প্রাচীন-সাহিত্য ত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেয়। সভ্যতার যুগে, উল্কির প্রচলন থাকুক, আর নাই থাকুক, ভারত যখন সভ্যতাকে হারাইল, তখন যে উল্কির প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। আজও,

পৃষ্ঠে - [illegible]

বঙ্গে না হউক, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উল্কির আদর ত যথেষ্ট আছে। অনেক প্রদেশে, স্ত্রীলোকে যদি উল্কি ধারণ না করেন ত নিন্দাহ হইয়া থাকেন।

অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের মধ্যে, উল্কির ব্যবহার কমিতেছে বটে, কিন্তু সভ্যতার লীলাভূমি য়ুরোপ ও আমেরিকায় উল্কির আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহাদিগের মধ্যে, রমণী অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যেই উল্কির আদর বেশী।

ইউরোপের নাবিকগণ, বহুকাল হইতেই, বাহুতে উল্কি চিহ্নধারণ করিয়া আসিতেছেন। সাগরে তরণী হঠাৎ নিমজ্জিত

পৃষ্ঠে [illegible] ও কপোত

হইলে, বা নিজে কোন প্রকারে সাগরের জলে প্রাণ হারাইলে, এই চিহ্নদ্বারা মৃতদেহ চিনিয়া লওয়া যাইবে, এই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ, হয় ত, ইহারা উল্কি ধারণ করিতেন, কিন্তু এখনও

মনে হয়, শরীরকে সুন্দর করিবে, মনে করিয়াই ইঁহারা উল্কি-চিত্র করাইয়া লন—কারণ, ইঁহারা মুখ, হাত, পা ভিন্ন শরীরের সকলস্থানেই উল্কি-রচনা করাইয়া থাকেন। অশিক্ষিত বা

পৃষ্ঠে উল্কির শ্যেন

অল্পশিক্ষিত সামান্য বেতনভোগী নিম্নপদস্থ নাবিকগণের মধ্যেই যে ইহা দৃষ্ট হয়, তাহা নয়; পরন্তু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও ইহা অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

কয়েকবৎসর হইতে সৈনিকদিগের মধ্যেও ইহার বহুল প্রচার দেখা যাইতেছে। মৃত লর্ড রবর্টস মনে করিতেন যে সমস্ত সৈনিকদিগের উচিত, আপনদলের পরিচায়ক চিহ্ন আপন অঙ্গে ধারণ করা। এই হইতেই, উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ সকল সৈনিকপুরুষদিগের মধ্যে দলের চিহ্ন উল্কিরূপে ধারণ করা রীতির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লর্ড রবর্টসের একমাত্র পুত্র, যিনি বুয়র যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, আপনার বামবাহুতে তাঁহার নিজদল 'কিংস রাইফেল্‌ কোরে'র (King's Rifle Corps) বিশিষ্টচিহ্ন 'মল্টীজ ক্রশ' আঁকাইয়া লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহাসমরে, এই উল্কি চিহ্নই অনেক নিহত-ব্যক্তির পরিচয় জানাইয়া দিতেছে।

কটীতে উল্কির কটীবন্ধ

আমাদিগের যুবরাজ, রুষিয়ার রাজপুত্র, য়ুরোপীয় অন্যান্য অনেক এবং এসিয়ার কোন কোন রাজবংশের পুরুষদিগের দেহে উল্কি-রচনা আছে। যিনি এই সকল বিশিষ্ট-ব্যক্তিদিগের অঙ্গে উল্কি রচনা করিয়াছেন, তিনি আপনাকে উল্কি-কলাবিদ্ বলিয়া গৌরব অনুভব করেন। লর্ড রবর্টসের পুত্রের দেহে ইনিই উল্কি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি বলেন, সেই চিত্রটি অঙ্কিত করাই ইঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। ইনি মনুষ্যদেহে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত করেন—কোনটী বা পরী মূর্ত্তি, কোনটী বা ভীষণ দৈত্যাকার, মকরাকার বা সর্পাকার। ইনি এই অঙ্কন-বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার নাম মিঃ সদরল্যাণ্ড ম্যাক্‌ডোনল্ড্।

বাহুতে উল্কির 'মল্টীজ ক্রশ'

য়ুরোপের অনেক প্রসিদ্ধব্যক্তিই ইঁহার নিকট আসিয়া, বা ইঁহাকে ডাকাইয়া লইয়া, আপনাদিগের অঙ্গ-সৌষ্ঠব এই প্রকারে বাড়াইয়াছেন (?)। ইঁহার নিকট যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই পুরুষ; রমণীর সংখ্যা অতি অল্প।

একবার, একজন সৈনিক-পুরুষের পায়ে, ইনি উল্কি দ্বারা মোজা চিত্রিত করিয়া দেন। মোজাজোড়ার প্রত্যেক সেলাইটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া আঁকিয়া দিতে হইয়াছিল। যুদ্ধে, সেই সৈনিকপুরুষ আহত হওয়ায়, তাঁহার এই মোজা ছিঁড়িয়া যায়; ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলে, দেখা গেল যে, সেখানে সাদা নূতন চর্ম্ম গজাইয়াছে; সৈনিকপুরুষ, তখন, ইঁহার নিকট মোজা রিপু করিয়া লইতে আসিলেন। রিপুকর্ম্মে যেরূপ সেলাই ব্যবহার হয়, ঠিক সেই সেলাই-এর নক্সা আঁকাইয়া লইয়া, তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

বাহুতে উল্কির 'কসাক্'-সেনানী

একটি লোকের পৃষ্ঠদেশে, ইনি এক ভীষণাকৃতি মকর অঙ্কিত করিয়া দেন। সেই লোকটি, এক অসভ্যদেশে পতিত হওয়ায়, অসভ্যেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করে। তিনি, তখন, আপন পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করিয়া, ঐ মকরটি তাহাদিগকে দেখাইলেন;—অসভ্যেরা ভীত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

একবার, একজন ধনী আমেরিকান মহিলা ইহার নিকট আপনার গণ্ডদ্বয় গোলাপী আভাযুক্ত করিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই মহিলাটি প্রতিদিনই রুজের সাহায্যে গণ্ডে গোলাপ ফুটাইতেন; কিন্তু তাহা ত স্থায়ী নয়, ধুইলে

উঠিয়া যায়। তাই, মহিলাটির সখ হইল, যাহা ধুইলে উঠিবে না, বার্দ্ধক্যে লোপ পাইবে না, যাহা চির বসন্তের মত সতেজ, এমন গোলাপ কপোলে ফুটাইতে হইবে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, অনেক পরীক্ষা, অনেক পরিশ্রম—অনেক চেষ্টার ফলে, এই মহিলার সখমিটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। মহিলাটি, চিরযৌবনার কপোল-সৌন্দর্য্য লইয়া, দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই চেষ্টা, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের গণ্ডকেও গোলাপী করিয়া দিয়া গিয়াছে!—তিনি, নিজ দেহেই ইহার প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদিগের দেশে, কাজল, তেলা বা কোনও প্রকার উদ্ভিজ্জ রস দিয়া উল্কি রচনা করে। হাড়ীর পিছনে যে কালী লাগে, তাহাদ্বারাও কেহ কেহ উল্কি-রচনা করে। খনিজ-পদার্থ হইতে প্রস্তুত রং দ্বারা উল্কি-রচনা করা চলে না; কারণ, তাহা দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে, সেইস্থলে প্রদাহ

বাংলা—(দেশী) উল্কির সর্প

হয় এবং প্রদাহান্তে ক্ষতের দাগ ভিন্ন, রং বা চিত্রের কোনও চিহ্ন, থাকে না। এইজন্যই, বৃক্ষ-নির্য্যাস উল্কিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সচরাচর উল্কিতে বহুবর্ণের সমাবেশ দেখা যায় না। আমাদের দেশের উল্কির বর্ণ, সাধারণতঃ, সবুজ-আভাযুক্ত নীলই দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন, লাল-উল্কিও দেখা যায়। জাপান দেশের উল্কিবাদেরা, এই দুই বর্ণ ব্যতীত, আর একপ্রকার মেটে বর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের উল্কি চিত্রে নানাবর্ণের সমাবেশ দেখা যায়।

পদদ্বয়—উল্কির সাজ

বহু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলে তিনি উল্কিতে ব্যবহার করিবার উপযোগী করিয়া চারিবর্ণের রং প্রস্তুত করিয়াছেন। শরতের আকাশের মত গভীর নীল, নবদূর্ব্বাদলের মত সুন্দর শ্যাম, বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল পীত এবং ঈষৎ লালের আভাযুক্ত কোমল গোলাপী,—এই চারি বর্ণ এবং উপরিউক্ত সর্ব্বদা ব্যবহৃত তিন বর্ণের বিচিত্র সমাবেশে তাঁহার চিত্রগুলি অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়া উঠে। তাই তাঁহার এত আদর এবং প্রতিপত্তি।

এক একটি চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহার সাত আটদিন লাগে, কখন কখন তাহারও বেশী সময় লাগে।

আমাদিগের দেশেও এক-একটি উল্কিচিত্র বড় সুন্দর হয়; বেশীর ভাগই লতাপাতা এবং কল্কাতোলা দেখা যায়। উল্কিতে দেহ সৌন্দর্য্য বাড়ে কি কমে, তাহা বিবেচনা করিবার ভার। পাঠক-পাঠিকাগণের সৌন্দর্য্য জ্ঞানের উপর রাখিয়া, আমি এই খানেই বিদায় লই।

পরাজয়

[শ্রীমণি-মৃণালিনী সেন]

সে অনেক দিনের কথা। সুধীর তখন মেডিকেল কলেজের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সমস্তদিনের পর, কলেজের পড়া ও মনুষ্যদেহসম্বন্ধীয় ব্যাপারে মাথা ঘামাইয়া, সে মনে মনে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে নাম লিখাইতে পারিল না বলিয়া, অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে করিতে, নিতান্ত বিরক্তমনে, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট দিয়া, বাড়ী অভিমুখে আসিতেছিল; সহসা, পাশের বাড়ীর উপরিতল হইতে, তাহার মাথার উপরে একপশলা বরফ-জল বৃষ্টি হইয়া গেল। নিতান্ত রাগান্বিত হইয়া, অপরাধীকে দুই চারিটা উপযুক্ত কড়া-কথা শুনাইতে মনস্থ করিয়া, মাথার জল মুছিতে-মুছিতে, উপরদিকে চাহিয়া দেখিল, অপরাধী নহে—অপরাধিনী,—তাহার উপর পরমা-সুন্দরী—কিশোরী, বয়স ত্রয়োদশ চতুর্দশের মাঝামাঝি। সুধীরকে উপরের দিকে চাহিতে দেখিয়া, উচ্চহাস্য করিয়া, কিশোরী বলিল, "কেমন জব্দ, তুমি না আর এ বাড়ীতে আস্‌বে না। ও মা! দেখ, প্রকাশ দা পালাচ্চে, তবু আমি ঠাণ্ডাজল দিয়ে মাথা-ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছি।"

সুধীর অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সে খুব ভাল রকমই জানিত, এটা সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থের বাটী। মেয়েটি, বোধ হয়, অন্য কাহারও সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, তাহার উপর এই অত্যাচার করিয়াছে। বন্ধুমহলে ও নিজ বাটিতে, তাহার নাম ছিল, "সুধীরা"—সে এত লাজুক ছিল। তাহার পর, সে স্ত্রীলোক দেখিলে, এত সঙ্কোচ ও মান্য করিত যে, রাস্তা হাটিতে-হাটিতে কখনও তাহাকে কেহ উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখে নাই। সুতরাং, এক্ষেত্রে 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি'-পন্থা অবলম্বন করিয়া, সে পলায়ন করিল, কিন্তু জানালার উপরে সে যে-ছবি দেখিয়াছিল, সে-ছবি মনের উপরে রাজত্বস্থাপন করিয়া রহিল—তাহা মুছিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

২

সুধীর ধনী পিতামাতার একমাত্র পুত্র। তাহার উপরে, মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া, পাঁচখানি স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছে; সুতরাং, কন্যাবহুল বঙ্গদেশে যে তাহার দর খুবই বাড়িয়া উঠিল, একথা বলা বাহুল্যমাত্র। সুধীর কিন্তু বিবাহ করিতে, বা বিবাহ সম্বন্ধীয় যে-কোন কথা হউক-না কেন, শ্রবণ করিতে একান্ত নারাজ। পিতার তর্জ্জন-গর্জ্জন, মাতার অশ্রুজল, কিছুতেই তাহাকে বিবাহে মত করাইতে পারিল না। অবশেষে, পাত্রীপক্ষীয়েরা বাড়ী বহিয়া আসিয়া, তাহাকে কন্যা দেখাইতে লাগিলেন। সে, শরীর খারাপের ওজর দেখাইয়া, প্রয়াগে পলায়ন করিল। প্রয়াগেও কি রক্ষা আছে? সেখানেও কলেজের পাঠাবস্থার একবন্ধু, উদীয়মান উকিল; তাহার একটি বিবাহযোগ্যা ভগিনী আছে। সে নাকি পরমাসুন্দরী, এবং তাহার বন্ধু ভগিনীর বিবাহে টাকাও দিবেন অনেক। সুধীর, জ্বালাতন হইয়া, দেশেই ফিরিবে, এবং ফিরিয়া, মরিতে হয় মরিবে—স্থির করিয়া, পিতামাতাকে পত্র লিখিল। সে-যে চিরকালই অত্যন্ত মুখচোরা ও লাজুক, তাহা না-হইলে, অনায়াসেই পিতামাতাকে বলিয়া, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ মেয়েটির পিতামাতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাদের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদভাজন হইতে পারিত।

(৩)

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, সুধীর যেন মনে শান্তি পাইতেছিল না। সর্ব্বক্ষণই তাহার মনে, মেঘঢাকা-চাঁদের মত, ঝাপটাকাটা, কোঁকড়া-কোঁকড়া-চুলে ছাওয়া একখানা মুখ উঁকি-ঝুঁকি মারিত।

শয়নে-ভ্রমণে, আহারে নিদ্রায় যেন তাহার শান্তি ছিল না। এই সময়ে, একদিন সে গড়েরমাঠে ফুটবল-ম্যাচ দেখিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—একজন অপরিচিত

লোক তাহার পিতাকে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করিতেছে। তাহার পিতা, তাহাকে দেখিয়া, ইঙ্গিতে ডাকিয়া বলিলেন, "সুধীর, ভদ্রলোকের জাতি যায়। একজন ভিন্ন শ্রেণীর জমীদারের ছেলের সহিত ইহার কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল। ইনি জানিতেন না যে তাহারা ভিন্ন শ্রেণীর। ইহারা প্রবাসী। এলাহাবাদে ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ম্ম করেন, ইহারা সেখানেই অধিকাংশ সময় থাকেন। বিদেশ হইতে, পরের কথায়, কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া, মহাবিপদে পড়িয়াছেন। শুনিলাম, প্রয়াগে ইহারই বাটিতে তুমি ছিলে!"

ও ভগবান! মানুষ যেখানথেকে যত পালাতে চেষ্টা করে সেখানেই তত জড়িয়ে ফেলতে চাও! অস্থির ভাবে সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "এসকল কথা আমার নিকট বলিবার প্রয়োজন কি?"

পিতা বলিলেন, "তোমাকে আজ রাত্রে, এখনই আমার সঙ্গে ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে যাইতে হইবে। তোমাকে এই বিবাহ করিতেই হইবে।"

সুধীর পিতার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মরণাপন্ন রোগী লইয়া, পিতা যখন একা যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে জয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখনও মুখে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন প্রকটিত হয়, এখনও তাই। ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট শুনিয়া, ভয়েও আশায় তাহার বক্ষ অস্বাভাবিক স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার পূর্ব্বদৃষ্টা বালিকা নহে ত! এটিও ত বয়স্থা-কন্যা, পরমা-সুন্দরী, ইহারও পিতামাতা প্রবাসী।—নিশ্চয়ই সেই; তা না হ'লে, সেই তাহাকে প্রথম-দর্শনাবধি প্রায় দুইবৎসর, প্রত্যহ নিয়ম করিয়া সে ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে গমনাগমন করিয়াছে, কিন্তু সেই তন্বী সুন্দরীর সন্ধান বা সাক্ষাৎ ত মিলে নাই!

(৪)

শুভদৃষ্টির সময় অতি আগ্রহে সুধীর চাহিয়া দেখিল। ও হরি! এক নিমেষের মধ্যে তাহার শূন্যে-নির্ম্মিত প্রাসাদ যেন তাহারই মাথার উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোথায় সে বিদ্যুল্লতাতুল্যা, তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী রূপসী! এ মেয়েটিও সুন্দরী বটে; কিন্তু এযে তাহার চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলিরও যোগ্যা নহে। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম, একটি তরুণ শান্তশ্রী যেন তাহার কচিমুখখানিতে, নব-কিসলয়েরই মত, মাধুর্য্য মাখিয়া দিয়াছে। চোখ দুটিও বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল; কিন্তু দৃষ্টি কোমল, তবে, তাহার মত বিদ্যুৎস্ফুরণকারী দৃষ্টি এ নয়নে নাই। এ যেন হরিণীর ন্যায় সরলা সশঙ্ক।

বাসরঘরে অজস্র ব্যঙ্গ-তামাসা সবই সুধীরের অভেদ্য গাম্ভীর্য্যের আবরণে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। বিরক্ত হইয়া, বর্ষীয়সীরা উঠিয়া গেলেন, দুএকজন নবীনা শুধু, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হওয়ায়, বসিয়া রহিলেন, বর, তাহাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, শয়ন করিল।

(৫)

চারু, পিতামাতার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা, সুতরাং, খুবই আদরের ও অত্যন্ত অভিমানী। পিতামাতা চারুকে যৌতুকও দিয়াছিলেন খুবই বেশী। সুতরাং চারু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া শাশুড়ী ও অন্যান্য সকলের খুবই স্নেহচক্ষে পড়িল।

ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যার সময় সুধীর মাতাকে বলিল, "মা! আমি তোমাদের অনুরোধে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাকে আর জ্বালাতন করিও না।"

গৃহমধ্যে সমবেত নিমন্ত্রিত সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মাতাও মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! তাই হবে, এখন স্ত্রী আচারের কাজকর্ম্মগুলা ত শেষ হ'ক, বাছিরে, ছেলে, পাগলা বাপ আমার!"

সুধীরের এরূপ অপমান ব্যবহারে অভিমানিনী চারু প্রতিজ্ঞা করিল, সে মরিবে সেও স্বীকার, তবুও স্বামীর নিকটে স্ত্রীর পদবী ভিক্ষা করিবে না। কেন—সে কি এতই কুরূপা ও নিগুণ যে, স্বামীর নিকটে অনাদরের পাত্রী হইবে? নিতান্ত বিয়ের কনেটির মত সে আর বালিকা নহে, সে আদর অনাদর বেশ ভালরূপই বুঝিতে পারে।

ফুলশয্যার স্ত্রী আচার সম্পাদনের পরই, বরের হঠাৎ অত্যন্ত মাথা ধরিয়া উঠিল। সে বাহিরে শুইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। চতুরা মাতা পূর্ব্ব হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, "বাহিরের ঘর সমস্ত জোড়া; অপর নিমন্ত্রিত কুটুম্বকুটুম্বিনীগণ কোথায় শয়ন করিবে?" সুধীরকে নিজ-কক্ষে শয়ন করিতে বলিয়া, মাতা নিজে গিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া, মাথায় গোলাপ জলের পটি দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। পরে, সে নিদ্রিত হইয়া

পড়িলে, নববধূকে আনিয়া শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল।

শাশুড়ী চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই, হঠাৎ পাখাখানা বন্ধ হইয়া গেল। সুধীরের মাথার অসুখ আছে, ইহা চারু পূর্ব্বেই সমবয়স্কা, সম্পর্কীয়া ননন্দাদিগের মুখে শুনিয়াছিল। সে দেখিল পাখা থামিতে-থামিতেই, সুধীর মুদিত চক্ষে 'উঃ আঃ' করিতেছে, এবং তাহার অতিগৌর গণ্ডস্থল যেন যন্ত্রণায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর পরমসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া, চারুর যেন দৃষ্টি নামিতেছিল না। সহসা, এই সময়ে, সুধীর চক্ষুরুন্মীলন করাতে, চোখোচোখি হওয়ায়, অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, কি-করিবে ঠিক করিতে না-পারিয়া, যেন তাহার শিয়রস্থিত পাখাখানা খুঁজিতেছিল, এইভাবে পাখাটা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। সুধীর, আর একবার কি মনে করিয়া, চারুর মুখেরদিকে চাহিয়া দেখিল। চারুর আকর্ণমূল রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বিদায়ের দিন, শ্বশুরবাটির অন্যান্যসকলে, সুধীরকে প্রণাম করিয়া আসিতে, চারুকে বলিলেন। চারু, প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইল না। পরে, শাশুড়ী যখন স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "আমার ঘরের লক্ষ্মি! ছেলেটা পাগল; কিন্তু তা হ'লেও ত তোমার স্বামী। মা, স্বামীর চেয়ে মহাগুরু এ পৃথিবীতে নাই। বিদায়ের সময় স্বামীর পদধূলি নিয়ে এস, মা!" তখন, সম্পর্কীয়া এক ননন্দার সহিত সে সুধীরের পাঠগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে সেখানে পৌছাইয়া দিয়া, ননন্দা পলাইয়া গেল। রাগে, লজ্জায়, ক্ষোভে চারুর চোখ-ফাটিয়া জল আসিল। ছি! কি ঘৃণা! কি লজ্জা! চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স—কিশোর সৌন্দর্য্য—লইয়া, সে কি স্বামীর চক্ষে এতই হেয়? যদি তাহার মনে ইহাই ছিল, বিবাহ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? সুধীর চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া, কি লিখিতেছিল; অলঙ্কারের মৃদুরবে, একবারও পশ্চাৎফিরিয়া চাহিয়া দেখিল না; যেমন নতমস্তকে লিখিতেছিল, তেমনভাবেই লিখিতে লাগিল। স্বামীর চরণে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে গিয়া, অভিমানে, ক্ষোভে সুধীরের পায়ের উপর দুইফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়া গেল। কিছু বিস্মিতের ন্যায়, সুধীর চারুর অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখখানি দেখিতেছিল; বোধ হয়, কিছু বলিতেও ইচ্ছা ছিল; কিন্তু চারু, কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া, দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অকস্মাৎ, তাহার অজ্ঞাতসারে কেমন করিয়া চোখের জলটা, ঠিক সেই সময়েই স্বামীর চরণের উপর পড়িল, ইহার জন্য সে যতদূরসম্ভব লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং সুদূর অথবা নিকট-ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

(৬)

চারুর সমবয়স্ক সঙ্গিনীরা, বরের কথা শুনিবার জন্য, তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত, চারু এসকল কথার কোন উত্তর দিত না। উত্তর দিবার তাহার কি ছিল যে, সে উত্তর দিবে! অপমানে, অভিমানে, লজ্জায় তাহার যেন লোকসমাজে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিত না। যাহার জন্য সে আজ এত অপ্রস্তুত হইতেছে, এমন কি, তাহার মাতা অবধি তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিলেন যে, চারু জামাতার সহিত কথা কহে নাই!—তবুও, কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চারুর, স্বামীর উপর ঘৃণা বা রাগের উদ্রেক হইল না। শুধু অভিমান—একটা দারুণ অসীম অভিমান ও দুঃখ আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিল।

এইসময়ে জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ করিতে, শ্বশুর স্বয়ং আসিলেন। শ্যালক খুড়শ্বশুর এবং অন্যান্য সম্পর্কীয়গণ পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ করিতে যাইয়া, বিফল হইয়া ফিরিয়া গেলে, সুধীরের শ্বশুর বেহাই-বেহাইনকে দিয়া বলাইয়া, স্বীকার করাইয়া আসিয়াছেন। সুধীর, পিতামাতা ও শ্বশুরের সনির্ব্বন্ধ-অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, নিমন্ত্রণে গেল। রাত্রি না থাকিয়া, আহার করিয়াই চলিয়া আসিবে, মনে করিয়াই সে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া গেল। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, যে গৃহে আসিয়া সে বসিল, শ্যালিকাবৃন্দ ও শালাজেরা আসিয়া, সশব্দে সেই গৃহদ্বারে শিকলি টানিয়া দিল।

উচ্চ চীৎকার এবং ডাকাডাকিতে কোন ফল নাই দেখিয়া, ক্লান্ত হইয়া, সে বিছানায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু তাহার নিদ্রার সম্ভাবনা খুবই অল্প দেখা গেল। এই সময়, দরজার পাশ হইতে, নিম্নস্বরে কথোপকথনের মৃদুগুঞ্জন শ্রুত হইল। সুধীরও, তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত

হইয়া, কথাগুলা শুনিবার চেষ্টা করিল। কথা কহিতেছেন—তাহার শাশুড়ী; চারুকে অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করিতেছেন;—চারু কিছুতেই শয়নগৃহে যাইবে না। শালাজ বলিতেছেন, "ছি, ঠাকুরঝি! স্বামী গুরুলোক; গুরুলোকের সহিত আগে কথা কহিলে কিছু দোষ নাই।" ঠাকুরঝি উত্তর করিল, "তুমি বুঝি আগে সাধিয়া কথা কহিয়াছিলে?"

নানারূপ তর্কবিতর্কের পরে, চারু যখন হাঁ, কি না, কিছুই উত্তর না দিয়া, শয়নগৃহে প্রবেশ করিল, সুধীর তখন চারুর কথা শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছিল; কিন্তু চারু গৃহে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে প্রণাম করিলমাত্র—কোন কথা কহিল না, বা শয্যায় শয়ন করিবার মত কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না। খাটের সম্মুখেই, মেঝের উপরে, ধনীজন গৃহোচিত মোটা কার্পেট পাতা ছিল; একটা বালিশ লইয়া, তাহার উপরে শুইয়া, সে নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া রহিল।

সুধীর, অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়াও, চারুর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া, ঘুমাইয়া পড়িল। সে মনে করিল, চারু হয় ত সাধিয়া কথা কহিবে। নিদ্রিতা চারুর শ্যাম-সুন্দর মুখের উপরে উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিকের শুভ্র আলো পড়িয়া, তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সুধীর তখনও, সেই জানালায়-দৃষ্ট অপরিচিতা সুন্দরীর কথা মনে করিয়া, চারুর মুখের সহিত তাহার তুলনা করিতেছিল।

(৭)

সুখেদুঃখে একবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চারু শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে। চারু আসিতেই, শাশুড়ী তাহার উপরে লোক লৌকিকতা, সংসার-দেখা, দেবসেবার ভার ছাড়িয়া দিলেন; চারু সকলই প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিল, এবং শাশুড়ীর পছন্দমত সমস্তকাজই সুসম্পন্ন করিতে লাগিল। সকালে সংসারের সমস্ত লোক, ও দাসদাসীদিগের পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধান করিয়া, মধ্যাহ্নে শ্বশুরের আহারের নিকটে বসিয়া খাওয়াইয়া, শাশুড়ীর নিকটে বসিয়া, তাস খেলিয়াও তাহার দীর্ঘ-বেলা কাটে না।

তাহার নারী-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান স্বভাবটা, সে কার্য্যের আবরণে আচ্ছাদিত রাখিতে চায়। হৃদয়ের স্তরেস্তরে যে দাগ বসিয়া গিয়াছে, তাহা মুছিবার কোন উপায় নাই। দারুণ তৃষ্ণা—সম্মুখে সুশীতল নির্ম্মল জল; কিন্তু জলপানের অধিকার তাহার নাই;—এ মর্ম্মান্তিক দুঃখে যেন তাহার হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইতে বসিল।

স্বামীর পান, জল, জলখাবার, মায় পরিধানের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত, ভৃত্যাদি সত্ত্বেও, সে নিজে যথাসময়ে দিত, কিন্তু সে কোনদিন স্বামীর সহিত কথা কহিত না। স্বামী নিদ্রিত হইলে, স্বামীর সুন্দর মুখখানি সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া দেখিত। সে, অত্যন্ত অভিমানী ছিল বলিয়াই, একদিনও চক্ষের জল ফেলে নাই। শ্বশুর শাশুড়ী, পুত্র ও পুত্রবধূর এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদের যতদূর সাধ্য, ততদূর স্নেহ ও যত্নে, পুত্রের অন্যায় আচরণ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তৃষ্ণায় যাহার আকণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে মিষ্টান্ন বিড়ম্বনামাত্র।—সন্দেশ রসগোল্লা খাইলে বরং আরও জলপিপাসা বাড়ে।

(৮)

সেদিন বিজয়া দশমী। সুধীরের মাতা, বারবার করিয়া, তাহাকে সকাল সকাল ভাসান দেখিয়া ফিরিতে বলিয়া দিয়াছেন। সেদিন, তাহার পশ্চিম প্রবাসিনী জ্যেষ্ঠা-শ্যালিকার আসিবার কথা আছে। তাহার বিবাহ, এলাহাবাদেই হইয়াছে। সুধীরের বিবাহের সময়, সে সূতিকাগৃহে ছিল বলিয়া, আসিতে পারে নাই। দুইবৎসর পরে, সে কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার নাম রমা। রমা আসিয়া, চারু ও সুধীরের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সুধীরের যথোপযুক্ত দণ্ডপ্রদান করিতে বদ্ধসঙ্কল্প হইল।

সুধীর, যখন বিজয়ার ভাসান দেখিয়া, ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছে। শ্যালিকা-সুন্দরী তখনও ফিরিয়া যান নাই শুনিয়া, বাধ্য হইয়া, সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সুধীরের পদনিম্ন হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছিল!—এ যে সেই সুন্দরী—এ যে তাহারই আপন শ্যালিকা!

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, রমা একটু অপ্রস্তুত হইয়া, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিগো, পরিচয় দিব না কি?" সুধীর তখন উত্তর করিল "পরিচয় দিতে হইবে না, চিনিতে পারিয়াছি। আপনাকে বহুপূর্ব্ব হইতেই চিনিতাম।" তখন, তাহাকে 'প্রকাশ-দা' বলিয়া সম্বোধন করা ও মাথায় জল ঢালিয়া দেওয়া প্রভৃতি

সমস্ত কথা বলিয়া, অবশেষে বলিল, "ওরূপ করিয়া অতর্কিত পথিক বেচারীদের মাথায় জল ঢালিয়া, তাহাদের ভেড়া বানান ব্যবসায়টি কতদিন আপনি শিখিয়াছেন ?"

ইহার মধ্যে যে কতখানি সত্য নিহিত ছিল, একমাত্র বক্তা-ব্যতীত, অপর কেহ তাহা জানিত না, এবং সেও সে-কথা প্রকাশ করে নাই। হাস্য পরিহাস, গল্প গুজবে প্রায় রাত্রি বারটা বাজিয়া গেলে, রমা বিদায় গ্রহণ করিল।

দিদিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া, চারু নিজ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামী তখনও চেয়ারের উপরে বসিয়া, টেবিলের উপরস্থিত কি কাগজপত্র দেখিতেছেন। সেদিন চারুর শরীর ও মনটা মোটেই ভাল ছিল না, সেদিন, যেন কেবলই একটা চাপা-কান্না তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

শ্বশুর, শাশুড়ী, পিতামাতা সকলকেই বিজয়ার প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিয়াছে; বাকি এখন শুধু স্বামী। পিছন ফিরিয়া ত প্রণাম করা যায় না; অথচ সে কথা কহিয়া, তাঁহাকে সম্মুখ ফিরিতেও বলিবে না। এরূপ অবস্থায়, প্রায় আধঘণ্টা বসিয়া থাকার পর, তাহার বড় কান্না পাইল। ঠিক এইসময়ে, সুধীরও শয়ন করিবার জন্য চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চারু তাহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া, প্রণাম করিল। তাহার সেদিন চুলবাঁধা হয় নাই। মাথা নিচু করিতেই, এলোখোঁপা খুলিয়া গিয়া, এলোচুলের রাশি সুধীরের দুই পায়ে পড়িল। অন্যদিনের মত আজ মাথা-ঠেকাইয়াই সে মাথা তুলিল না; কিছুক্ষণ, চুপ করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল; তাহার অশ্রু, সুধীরের পদদ্বয় ভাসাইয়া দিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংযম করিয়া, সে উঠিয়া বসিল, মুহূর্ত্তের অসাবধানে যে স্বামী তাহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন—মুহূর্ত্তের অনবধানতার জন্য তাহার হৃদয়ের যত ক্ষুধা, যত দৈন্য যে স্বামীর নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—ইহাতে যেন সে মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ করিতেছিল। কোথায় গেল তাহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা! সে-যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কখনও প্রেমভিক্ষা করিবে না, এবং স্বামীও যেমন তাহাকে অবহেলা করিতেছেন, সেও তেমনি অবহেলা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবে। তবে, সেবার কথা যদি বল, সেবা-কথাটা স্ত্রী-জাতির স্বধর্ম্ম- তাহার কথা ছাড়িয়া দাও।

চুম্বক-প্রস্তরের লৌহাকর্ষণী শক্তির ন্যায়, স্বামীর পায়ে কি শক্তি আছে যে, সে পা-দুখানি দেখিলেই কেমন আপনা আপনি সেই পায়ের উপর মাথা রাখিতে ইচ্ছা করে—সে ইচ্ছা সহজে দমন করা যায় না।

অপমানে ও লজ্জায় আরক্তমুখী চারু, উঠিয়াই পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল; সুধীর তাহাকে পলায়ন, বা কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, তাহার মুখখানি দুইহাতে ধরিয়া তুলিয়া, কোন কথা না কহিয়া, নীরবে গাঢ় চুম্বন করিল। সে চুম্বনে দুইটি বিচ্ছিন্ন হৃদয়ের মধ্যে যেন নূতন বন্ধন আনিয়া দিল।

ঠিক এমনই সময়ে, বাহিরে হারমোনিয়ম বাজাইয়া কে গাহিয়া উঠিল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে!
ধরবে সব হায়, অমনি টুটে যায়,
সলিল ব'য়ে যায় নয়নে।"

প্রার্থনা

[শ্রীমতী জীবনবালা দেবী]

বধির হই যেন— নিয়ত তব বাণী
যদি না-পশে মোর শ্রবণে;
অন্ধ হই যেন— নিয়ত তব রূপ
যদি না-দেখি আমি নয়নে।
বাক্যরোধ যেন হয়গো—তব কথা
যদি না বলি সদা বদনে;

চিত্তহারা যেন হইগো—তব স্মৃতি
যদি না থাকে চিত্তে যতনে।
স্পর্শজ্ঞান মোর হরিয়া লও—যদি
তোমার পরশন নাহি পাই,
স্বপনে জাগরণে— জাগিয়া থাক প্রাণে;
জগতে আর কিছু নাহি চাই!

জল্লেশ্বর-শিবমন্দির

[শ্রীঅনুজা ঘোষ]

জলপাইগুড়ি—রাজসাহী-কোচবিহার বিভাগের উত্তর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসনাধীন, একটি জেলা। তথা হইতে পূর্ব্বদিকে—আট মাইল দূরে 'জল্লেশ' নামক স্থানে ৺মহাদেবের একটি বৃহৎ প্রাচীন মন্দির আছে। ইহা 'জল্লেশ্বর-মন্দির' নামে খ্যাত। ইহা এ প্রদেশের একটি তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। প্রতিবৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে, অর্থাৎ ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে, প্রায় ৩০।৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। শুদ্ধ এ প্রদেশ নহে, আসাম, বেহার, ভুটান ও নেপাল হইতে পর্য্যন্ত যাত্রিগণ আসিয়া, উক্তদিন দেবাদিদেবের চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। কালিকাপুরাণে জল্লেশ্বরের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে—
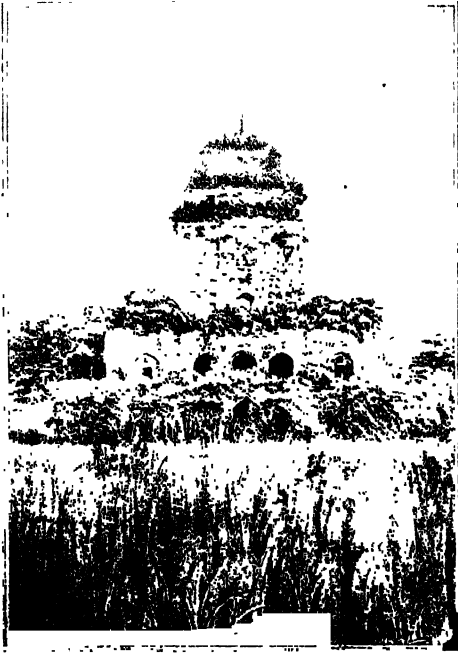
জল্লেশ্বর শিবমন্দির

"কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশ নামে আপনার অতুল লিঙ্গ দেখাইয়াছিলেন, সেখানে নন্দী জগৎপিতার পূজা করিয়া সশরীরে গাণপত্য লাভ করিয়াছিলেন। নন্দিকুণ্ডে স্নান করিয়া নক্তব্রত করিবে। তাহার পরদিন, জল্পীশ দেবের মন্দিরে গমন করিবে। সেখানে, মহানদীতে স্নান করিয়া, জল্পীশ দর্শনপূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া, সেইরাত্রি যাপন করিবে। এই জল্পীশ, বরাভয় হস্ত কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ; জল্পীশ দেবের পীঠ অতি পুণ্যপ্রদ। যে ইহার বিষয় সম্যক জানে, সে শিবলোকে গমন করে। ইত্যাদি।"

কামরূপের বর্ম্ম-রাজবংশের শেষরাজা জল্লেশ্বর বর্ম্মা, প্রথমে এই জল্লেশ্বর মন্দির স্বীয় নামানুসারে নির্ম্মাণ করাইয়া, প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর, ষোড়শ শতাব্দের প্রথমভাগে, যখন বক্তিয়ার খিলিজি আসাম ও ভুটান আক্রমণ করিতে আসেন, তখন তাহার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক এই মন্দির ধ্বংস হয়।—এইরূপ প্রবাদ আছে। তাহার পর, অনেকদিন এই মূর্ত্তি মৃত্তিকাস্তূপে প্রোথিত হইয়া অপ্রকাশ থাকে। পরে, বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা মহারাজ প্রাণনারায়ণ মৃগয়া করিতে উক্ত স্থানে গমন করিয়া, লোকমুখে শুনিতে পান যে, এই অরণ্যমধ্যে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট-সময়ে একটি পার্ব্বত্য-বন্যগাভী যাতায়াত করে। তাহা শুনিয়া, কৌতূহলবশতঃ পরদিন একাকী সশস্ত্র হইয়া, সেই-গাভীর অনুসরণ করেন। ক্রমে, গভীরতর অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, একটি ভগ্নস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া, উক্ত গাভীটি, স্বয়ং অস্বাভাবিকভাবে দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া, প্রস্থান করিলে, মহারাজ প্রাণনারায়ণ উক্ত স্তূপ খনন করাইয়া গৌরীপট্টসহ এই মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। অনন্তর, এই স্থানের ভীষণ জঙ্গল কাটাইয়া, মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন।

এই মন্দির নির্ম্মাণকালীন, দেশদেশান্তর হইতে

কারুকরসকল আনান হইয়াছিল। মন্দিরটি সমভূমি হইতে পাঁচতলা এবং নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট ছিল। ইহার নাম ছিল-‘নবরত্ন মন্দির’; পরে, মহারাজ প্রাণনারায়ণ কার্য্যসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পরলোকে যাত্রা করিলে, তৎপুত্র মহারাজ মোদনারায়ণ-কর্তৃক ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। মন্দিরমধ্যে একস্থানে, একখানি প্রস্তরফলকে, নিম্নলিখিত এক চরণ শ্লোক উৎকীর্ণ আছে --

“শাকে বেদাব্ধি কাল ক্ষিতি পরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ।
প্রাসাদশ্রেণী রম্যং প্রচিত নবরত্নাখ্য মস্মিন্নর্থাৎ।”

এই শ্লোকাংশের নির্দ্দেশমতে, না কি, ইহার নির্ম্মাণকাল প্রায় সাড়েচারিশত বৎসর, কিন্তু কোচবিহার রাজগণের রাজত্বকাল গণনায়, মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকাল ২৫০ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে, দেখা যায়। অতএব, শেষোক্ত বয়সই সমীচীন। এখনও মন্দিরের অন্যান্যঅংশ বিলক্ষণ সুদৃঢ় আছে; কিন্তু গত ১৮৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ ভূমিকম্পে উহার উপরের অংশ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। দেবাদিদেবের মস্তকের উপর এখন চন্দ্রসূর্য্য-তারকা খচিত নীল-আকাশ চন্দ্রাতপস্বরূপ হইয়াছে।

মন্দিরের দুইপার্শ্বে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল; এক্ষণে, সংস্কারাভাবে মজিয়া গিয়া, কীটাকুলিত দুর্গন্ধময় জলের আধার হইয়াছে। শিবরাত্রির সময় কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হয়, এবং অগণ্য যাত্রীবর্গ, ঐ জলে স্নান করিয়া, মহাদেবের পূজা করে।

এখানে, এতদুপলক্ষে প্রায় একপক্ষব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসে। তাহা শিবরাত্রির দিন হইতে আরম্ভ হয়; নানাদেশ হইতে পণ্যব্যবসায়িগণ সকলপ্রকার বস্ত্র এবং ভুটিয়াগণ তাহাদের স্বদেশ-উৎপন্ন কম্বল, চামর ও ভুটিয়া অশ্ব, কুকুরপ্রভৃতি বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। প্রায় লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি এখানে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে বর্ষেবর্ষে এমন একটি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; কিন্তু পথ-ঘাট, পানীয় জল প্রভৃতির এরূপ শোচনীয় অবস্থা যে, তাহা বর্ণনা করিবার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধসহ যে চিত্রখানি প্রকাশিত হইল, তাহা মন্দিরের পূর্ব্বের আকৃতির চিত্র। বর্ত্তমানে ঐ গম্বজ ভূমিসাৎ হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরের আলোকচিত্র গ্রহণের অভিলাষ ছিল, কিন্তু সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, সে সুযোগ ঘটে নাই।

সন্দেহে

[শ্রীমতী গিরিবালা দাসী]

বেসেছিলে এত দিন
অভাগীরে কত ভালো,
আঁধার হৃদয়টিতে
দিয়েছিলে কত আলো!
পথেরই সে ধূলিকণা—
আনিয়া যতনে তারে,
কেন, দেব! রেখেছিলে
তোমার গৃহের দ্বারে?
নগণ্য হৃদয়টুকু—
বেদনায় ম্রিয়মান,
করেছিলে তারে, প্রভু,
অজস্র করুণাদান!
ছোট ব’লে কোনদিন
দাওনি তো পায়ে ঠেলে,
দলিতা—ঘৃণিতা—দেখে,
তবুও করেছ কোলে!
এত যে অসীম দয়া—
অনন্ত করুণাভরা,
কে আছে গো, দয়াময়,
এ জগতে—তুমি ছাড়া!
এতদিন কত ভালো
বেসেছিলে অভাগীরে,
আজি কেন, প্রাণনাথ,
পাশরি’ যেতেছ তারে?
তোমার অসীম দয়া,
তোমার প্রণয় ধারা,
ব’হে যাক্ হৃদিমাঝে—
হই তায় আত্মহারা।

শেষ-খেয়া

[শ্রীশশিবালা দেবী]

স্যর ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "খেয়া"র যে কোনও কবিতা বুঝিতে হইলে, কবির জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র;—যে উদ্দাম-কল্পনাশক্তি ও প্রেমতৃষ্ণা পাইয়াই যৌবন মধ্যাহ্ন তপনের তাপে তিনি দগ্ধ হইয়াছেন, শেষবয়সে তাঁদেরই পরিণতি, অস্ত-রবির সোণার কিরণে উজলবরণে দেখা দিয়াছে! যে প্রেমতৃষ্ণা সামান্য রমণীরূপের ভিখারী রূপে প্রথম দেখা দিয়াছিল, আজ তাহা আকাশ জল বাতাস আলোর শোভায় মাতুয়ারা এবং তাহাদের আদিজনক সেই রাজাধিরাজের দর্শন লিপ্সু!

তারপর, কবির সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু! এই মৃত্যু পরশ পাথরে ঠেকিয়া কবির—অসাধারণ হইলেও পার্থিব—প্রতিভার তরণীখানি "সোণার তরী"তে পরিণত হইয়াছে। বইখানির "খেয়া" নাম হইতেই বুঝা যায়, কবির মন আর এপারে নাই!

"খেয়া" লিখিবার কিছু পূর্ব্বে—

"বেলাগেল তোমার পথ চেয়ে,
আমায় পার কোরে নেও খেয়ার নেয়ে!"—

নামক গানটী লিখিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই কবির মন ওপারের ঘোমটা-ঢাকা ঐ ছায়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। "খেয়া"-শীর্ষক একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন—

"খেয়া নৌকা পারাপার করে নদী স্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হ'তে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
শুধু হেথা দুই তীর, কেবা জানে নাম,
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হোতে।"

এ পারাপার—জন্ম মৃত্যু এবং গ্রাম দুটি ইহ পরলোক। এক একটি দিন এক একটি মনুষ্য জীবন! দিনে—কাজের ক্ষেত্রে সবাই সবার কাজ করে এবং সবাইকে আমরা দেখিতে পাই চিনি; কিন্তু রাতে তাহারা কোন এক অন্ধকার দেশে চলিয়া যায়, কি করে কিছুই জানি না! ঠিক এইভাব আমরা কবির আর একটি কবিতায় পাই।—

"ওপারেতে ধানের খোলা, এ পারেতে হাট,
মাঝে শান্ত নদী; সকাল সন্ধ্যা করার শুধু এঘাট ওঘাট"—

ইচ্ছা করিস যদি। আমাদের প্রকৃত বাড়ী এপারে নয়; এপারের দরকার বুঝিয়া, আমরা পণ্যদ্রব্য ওপার হইতে লইয়া আসি, এপারে তাহা বিক্রয় করিয়া, আবার সন্ধ্যা বেলায় নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যাই। মাঝখানের নদী পার হইতে, খেয়ার দরকার, এবং সেই নদী পার হওয়ার নাম 'মৃত্যু।' মৃত্যুতে বিভীষিকার কিছুই নাই, বরং, তাহা বিদেশ হইতে বাড়ী যাওয়ার মত আনন্দদায়ক।

শেষ খেয়া

এ লোকটির হাট হইতে ফিরিতে খুব দেরি হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া আগেই চলিয়া গিয়াছে। দিনের শেষে—বাকীতে—ঘুম আসে; সারা দিনের পরিশ্রমের পর, নিজের বাড়ীতে গিয়া, লোক বিশ্রাম করিয়া থাকে। পরকালের ঘোমটা ঢাকা ছায়ার কল্পনা, সকলের মনেই আছে; কবির বাড়ী যে ওপারে সোণারকূলে তাহা কবি বুঝিতে পারিয়াছেন। অস্তগামী সূর্য্যের আলোই ইহার কারণ অর্থাৎ, শেষবয়সে যখন যাহাদিগকে ভাল বাসিতাম তাহারা একে একে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন কেহ কেহ এপার হইতে ওপার সুন্দর দেখিতে থাকে। আবার ঘন সন্ধ্যায় ওপারের কল্পনা ছবি, কল্পনা বই আর কিছুই নয় বলিয়া, তাহার ছবিখানি কতকটা অস্পষ্ট।

'নামিয়ে মুখ, চুকিয়ে সুখ, যাবার মুখে যায়,
যারা ফেরত পথে ফিরেও নাহি চায়।'

কাল যে আবার এই পথেই কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতে হইবে, সেকথা বাড়ী ফিরিবার আগেই ভুলিয়া যায়। ভাটার টানে কর্ম্মাবসানে বাড়ী-ফেরা—অনেকটা ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়ার মতন। সহজ সাঁঝেরবেলা ভাটার স্রোতে

"ওপার হোতে একটানা একটি দুটি যায়
যে তরী ভেসে',
কেমন কোরে চিনবো ওরে—ওদের মাঝে
কোনখানা আমার ঘাটে ছিল, আমার দেশে।"

এই পৃথিবীতে তাহাদের মধ্যে কে আমার পরিচিত ছিল, তাহা এপারে দাঁড়াইয়া আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। অনেক পরিচিত, গত মুখচ্ছবি, মৃত্যুম্লানজ্যোতিঃ আমার চোখের কাছে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে চির-স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছি না।

"ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি হেথায়
পাড়ি ধরবে সে'; এখন নেয়ে আছেরে কোন নায়?"

মৃত-পরিজন আমাদের মৃত্যুর সময় আমাদিগকে কোলে করিয়া; সেই অপরিচিত দেশে লইয়া যায়। কথাটা যদিও কল্পনা; কিন্তু এ কল্পনাতে সুখ আছে—ইহাতে মৃত্যুভয় অনেকটা লাঘব হয়। এই স্তবকটি কবির নিঃসহায় অবস্থা এবং গত জীবনের অপূর্ণ কাজের জন্য অনুতাপভরা।

"ঘরে যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর,
পারে যারে যাবা গেছে পার,
ঘরেও নয় পারেও নয়, যেজন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে?"

বলা হইয়াছে, শেষ খেয়া এবং পথিকটি সঙ্গিহারা। তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া যথাসময়ে চলিয়া গিয়াছে। তাই তার অবস্থা ঘরেও নয়, পারেও নয়।

'ফলের বার নেইকো আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়।'

—গত জীবনের অনুশোচনা- পথের-সম্বল কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই। ফলের সময় পার হইয়া গেলে যেমন ফল হওয়ার আশা বৃথা; সেইরূপ, যাহার জীবন পার হইয়া গিয়াছে, তার আর মৃত্যু সময়ে সঞ্চয়ের চেষ্টাও হাস্যজনক; কিন্তু তাহা হইলেও

'অনুতাপে চোখের জল বাধন মানে না'

এবং সে চোখের জল ফেলিতে বসিয়া, গত জীবনের ইচ্ছাকৃত অপব্যয় মনে করিয়া নিজের অবস্থার প্রতি একটু ধিক্কারের ভাবও আসে। 'দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বলল না, সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়' পুণ্যাত্মাদের জীবনের আলো চোখে ঝরাতে না ঝরাতেই স্বর্গের আলো চোখে ফুটিয়া ওঠে। সন্ধ্যার আগে-ভাগেই বাড়ী ফিরিতে পারিলে, আর রাস্তার অন্ধকার ভোগ করিতে হয় না।

নিবেদন

[শ্রীমতী সুষমারাণী হালদার]

সকল কাজে, সবার মাঝে,
তোমায় যেন পাই—
এই কথাটি বলতে, প্রভু,
এসেছি আজ তাই।
দাঁড়িয়ে ভবনদীর কূলে,
যাই না যেন তোমায় ভুলে;
যেমনভাবে যেথায় থাকি,
তোমায় যেন পাই,—
এই কথাটি বলতে, প্রভু,
এসেছি আজ তাই।

এস আমার হৃদয়মাঝে,
ওগো হৃদয়স্বামী!
তোমায় পেলে, জগতে আর
চাই না কিছু আমি।
দীন-দয়াল নামটি ধ'রে—
দীনকে কেন রাখ্‌চো দূরে?
আমি যে, দেব, কেবল করি
নামের ভরসাই—
এই কথাটি বলতে, প্রভু,
এসেছি আজ তাই।

সেকালের কথা

[পরলোকগতা নিস্তারিণী দেবী]*

পরলোকগতা নিস্তারিণী দেবী

কি পাপে কি হলো

শ্যামনগরের পার্ব্বতীবাবু—কৃষ্ণগোপালের ভাবীশ্বশুর-শাশুড়ী, আমার বাবার খরচায়—নৌকা ক'রে, বিদেশে বিয়ে দিতে এসেছিলেন। আস্‌বার পথে তাঁর একস্থানে চাকরীর যোগাড় হ'ল। সেই স্থানে তিনি মেয়ে নিয়ে নৌকা ক'রে রওয়ানা হলেন। ইচ্ছা সেইখানেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। এতদূর এসে, মেয়ে নিয়ে অন্যকাহারও সঙ্গে বিয়ে দেবেন, এ পাপ ধর্ম্মে সইবে কেন বল! এত জুয়াচুরী সইবে কেন? তাঁদের নৌকা ডুবে গেল। পার্ব্বতী কোন রকমে মাস্তুল ধ'রে প্রাণে বাঁচলেন, আর সকলে ডুবে ম'রে গেল। শেষে, তিনি কি পাপে কি হ'ল ব'লে দুঃখ করে বাবাকে এক চিঠি লিখে দিলেন।

আবার খন্যানের খড়ো-বাড়ী

আমার মা, দাদার বৌ, আমরা তিন বোন, আর তিন ভাই, যদু, কালী, তারিণী, খন্যানের খড়ো বাড়ীতে এলুম। আবার ঘরকন্না হ'লো। দাদা [illegible] থেকে আসা যাওয়া করেন। তখন যদু ও কালীচরণের বয়স ৭ বৎসর। গাঁয়ের পাঠশালায় পড়ে। বড় ভায়ের কাছে থাকি। ভাইয়ের বউ ও ছেলেপিলেদের মানুষ করি। বউদের লালনপালন করি, তারা সব ছোট ছোট।

পালা ক'রে রান্না

আমরা তিনজনে পালা ক'রে রাঁধি। খড়োবাড়ী; [illegible] টিটি করে।

* নিস্তারিণী দেবী গত [illegible] দেহত্যাগ করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ধারাবাহিক রূপে সেকালের কথা লিখিতেন। মধ্যে কিছু দিন লেখা বন্ধ থাকে। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অবশিষ্ট লেখার কিয়দংশ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গীয়া নিস্তারিণী দেবী পরলোকগত মনস্বী দেশভক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভগিনী ছিলেন; পরলোকগত প্রভাকর উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

বড় কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। বাবার যত রোজগার বাড়্‌তে লাগ্‌ল, খড়ো-বাড়ীতে ততই আমাদের কষ্ট হইতে লাগ্‌ল। যাদের আছে, তারা, কষ্ট সহিবে কেন? আমরা তো সবই সইতে পারি, ছেলেদের জন্যই কষ্ট।

সিঁদ দিল

আমাদের বাড়ীতে চুরী হইল। যেদিন চোর সিঁদ দিল, সেদিন সে বেচারী ধরা পড়তে-পড়তে বেচে গেল। আমি জেগে ছিলাম, ঠুকঠুক্‌ শব্দ শুনে, বড় ভয় হ'ল। বাড়ীতে সবাই জানতে পারে—আমাদের একটুখানি বাড়ী, এত লোক, সহজেই চোর ধরা পড়বে—এ সব জেনেও যে সিঁদ দেয়, তার মত আহাম্মক আর দুনিয়ায় নাই।

বাপের ঠাকুর

সিঁদের খবর পেয়ে, বাবা পাকা বাড়ী করবার ইচ্ছা করলেন। খড়ো বাড়ীর জায়গা ঠাকমার ভেয়েরা ভোগ করবে, এই জন্য অন্যজায়গায় বাড়ী করবার কথা হ'ল। "বটুকরা" বাবার ঠাকুর নিয়ে সেখানে আছেন।

দেনা ক'রে বাড়ী করা

নতুন-বাড়ী যখন তৈয়ার হ'তে লাগল, তখন কেউ জানত না যে, ঘরগুলো এত বড় বড় হ'য়ে পড়বে। খরচ এত বেশী হ'ল যে, শেষে দেনা হ'ল। থাকবার জন্য বাড়ী, মানুষ জীবনে একবার করে, রোজকার সব সময়েই করে, যাদের খুব বেশী পয়সা আছে, তাদেরই একথা বলা চলে!

সাউলীবড়্‌তলার হানাবাড়ী

জায়গা কিনতেও হ'ল না। সাউলীবড়্‌তলা সরস্বতী নদীর ধারে। এখন যেখানে কালী চাটুয্যের বাড়ী—সেখানে আমাদের বড় বাড়ী হ'ল। আমাদের বাড়ী দুর্গোৎসব হল। আমরা এখন "খন্নেনের বাবুরা" হলুম। শেষে, এই খন্নেনের বাবুদের বাড়ীর ইটে খন্নেন-ষ্টেশনের কতক গাঁথুনি হ'ল। যেটুকু রইল, সেটুকু পড়ো বাড়ী, হানা-বাড়ীতে পরিণত হ'ল—এখন সে বাড়ী কারও ভোগে হয় না। যার শেষ এই রকম হয়েছিল, তার আগেটা এমন ভাল হয়েছিল যে, তখন খন্নেনে আমাদের মত বাড়ী আরকারও ছিল না!

'কাঁটালে'রা

আমাদের বাড়ীর কাছে যে বড়লোক ঘোষেদের কাঁটালগাছ দেখা যেত, সেই ঘোষেদের আমরা "কাঁটালেরা" বলতাম ব'লে, খন্নেন-শুদ্ধ লোক তাদের "কাঁটালে" ব'লে জানত। আমাদের সে সময় এমনই প্রতিপত্তি ছিল।

সিপাইদের লড়াই—খোট্টানি বিয়ে

আমার বেশ মনে পড়ে, সিপাইদের যখন লড়াই হয়, তখন সিপাইদের এক মেয়ের বাপ, পাছে মেয়ে বিধর্ম্মীর হাতে অপমানিত হয়, এই ভেবে তার মেয়েটাকে শুক্‌নো পাতকুয়ায় ফেলে পালিয়েছিল। সেই খোট্টার মেয়েকে এই 'কাঁঠালেদের' মহীন্দ্র ঘোষ, কুয়া থেকে হাত ধ'রে তোলে। সে মেয়েকে তারা আর জাতে নেয় না—শেষে, মহীন্দ্র ঘোষ সেই খোট্টাদের মেয়েকে বড়োবয়সে বিয়ে করে। কত পরোপকারী লোক তখনকারকালে ছিল। তারা যে কত সাহসী ছিল, তার প্রমাণ এই যে—এরকম খোট্টার মেয়ে বিয়ে করতেও ভয় পেতোনা। তার ওপক্ষের ছেলে কানাই, না কি, বর্দ্ধমানকে গিয়ে, লুকিয়ে, কসাইয়ের দোকান ক'রে বেশ তপয়সা জমিয়েছিল। কলকে আড়াল দিয়ে, যেমন লোকে গুরুজন দেখলে তামাক খেয়ে সম্মান দেখাত, এখনকার লোকে সেটুকুও দরকার মনে করে না।

সমাজের ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে সব চলে

তখন সমাজের ভিতরে থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে সব রকম স্বেচ্ছাচার চলত, ব'লে, এখনকার মত সমাজের বুকে ব'সে দাড়ী উপ্‌ড়াতে কেউ সাহস পেত না। তুমি লুকিয়ে উচ্ছন্ন যাও, তাতে সমাজ কিছু বলবে না। বয়াটে ছেলেকে বাড়ীথেকে তাড়িয়ে দিলেও, তাকে ক্ষুধায় কাতর দেখলে মা, যেমন অন্য ভাইদের লুকিয়ে, দাদাড়ে বসিয়ে, তাকে ভাত খাইয়ে বিদেয় করে,—সেইরূপ সুমাতার মত, সমাজও সন্তানের দোষ গ্রহণ করে না। কিন্তু সমাজকে মান্‌ছে না, এ কথাটা বলা তখনকারকালে বড় কঠিন ছিল। সমাজ ত একজন লোক নিয়ে ছিল না। সমাজের দৃষ্টি ছিল—অনেক লোকের বিশুদ্ধি রাখা। সমাজের ব্যবস্থাও সবরকম লোকের উপযোগী ছিল।

কালীর সত্য সত্য কালীঘাটে পইতে

কালীচরণের (দেবীবেণু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখিকার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ছেলেবেলা থেকেই ধর্মভাব, রোজ শত ভগবানাম না লিখে, সে জল খেত না। কালীঘাটে, নমঃ নমঃ করে, সত্য সত্য তার পইতে দেওয়া হ'ল। এখানে পইতে দিলে খরচ সামান্যই হয়। এখনও কেউ কেউ মা-কালীর কাছে পইতে দেয়।

বামুন-পণ্ডিতেরা সবাই পণ্ডিত ছিল না

কালীর খুব স্মরণশক্তি ছিল। সে সন্ধ্যা আহ্নিকের বই খানা সব মুখস্থ ক'রে ফেলেছিল। শুধু, না বুঝে, সে মুখস্থ কর্ত্তে পারত না, এজন্য এখান থেকে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কাছে গিয়ে শ্লোকের মানে বুঝে, তবে বাড়ীতে এসে মুখস্থ করত।

কালীর চণ্ডীপাঠ

কালীর বুদ্ধি ছেলেবেলা থেকে খুব খুলেছিল। দাদা তাকে দুর্গাপূজার সময়ে চণ্ডীপাঠ কর্ত্তে বলেছিলেন, কিন্তু পাছে অশুদ্ধ হয়, এই ভয়ে, ব্রাহ্মণের পাঠের পর, কালীকে বইদেখে পাঠ করিতে বলায়, সে বলেছিল, "ঐটুকু বই, তা আবার দেখেদেখে পাঠ করব কি? আপনি ধরুন, আমি বলে যাই।" সেইবারেই আমাদের বাড়ী নির্ভুল চণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। এই কালীই বড় হ'লে, যখন 'এলে' পড়ে, তখন নিজের পাঠ্য ইংরাজি কবিতার (মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট') বইখানা পূরা মুখস্থ ক'রে, মাষ্টারদের শুনিয়ে, প্রাইজ পেয়েছিল। সে নিজের মনের ভাবগুলো খৃষ্টানী রংএ ছুবিয়ে নিয়েছিল।

কালীর পড়ার ধরণ

কালী বেশীক্ষণ পড়্ত না। সে ছেলেবেলা থেকে, বই হাতে ক'রে কেবল ভাব্‌ত, আর খাতায় কি লিখ্‌ত। বরাবর ঐ এক ধরণ। ঘড়ির যেমন দম দিয়ে দেয়, সেই রকম সে, নিয়ম করে, সারাদিনের মধ্যে তিন ঘণ্টা সমানে পড়তে বস্‌ত। সে পেন্‌সিল দিয়ে, কখনও বা কলম দিয়ে, শাদা কাগজে লিখে লিখে, পড়া মুখস্থ করত। চিরদিন একই ধরণে সে পড়ত; প্রতিবারই সে স্কুলে সর্ব্বপ্রথম থাক্‌ত। পড়ার জন্যে, সে বাড়ীতে কি স্কুলে—কোথাও কখনও মার খেয়েছে, একথা কখনও শুনিনি।

বিল কর; আমি বড় হ'লে, চাকরী ক'রে, শোধ দেব

একদিন দাদার ছুরী হারিয়ে গেছে। কালী সেখানে বেড়াচ্চে দেখে, দাদা বল্লেন, "কালী, ছুরী বের কর। তুই নিশ্চয়ই নিয়েছিস।" কালী বল্লে, "আমি ছুরী জানি না।" দেবী তাকে এক চড় মারে, মেরে বল্লে "তুই নিস্‌নি, তবে কি ভূতে নিয়েছে?" কালী অভিমানে রেগে হিন্দুস্থানীতে বলে, "আমি তোমার ছুরী নিইনি। তবু যদি মনে কর আমি হারিয়েছি, তবে তুমি বিল কর্ত্তে পার, আমি বড় হ'য়ে, চাকরী ক'রে সব টাকা মায় সুদ শোধ করব। তুমি মারবে কেন?" কালীকে মারবার কাহারও অধিকার ছিল না, মা বাবার নিষেধ ছিল। আমরা সকলকে বারণ করবার জন্য যা বল্‌তাম, কালী তাই শুনেই শিখেছিল। সে কথা রেখেছিল। দাদার অসময়ে, সে দাদার পরিবারদের বরাবর প্রতিপালন করেছিল।

ঈসাহি তো যাগা

কালী, দাদা, হরিদা—যারা জব্বলপুরে জন্মেছে, তারা খুব রেগে গেলেই, হিন্দুস্থানী কথা তাদের মুখ থেকে বাহির হইত। বুঝি বাঙ্গালা কথাতে রাগের কথা কহিলে, বাঙ্গলা ভাষাটা রেগে যায়, এই মনে করে কালী রেগে গেলেই হিন্দুস্থানী কথা কহিত। একদিন দেবী, কালীকে কি জন্যে, একটা কাঠের বাড়ী চটাং ক'রে মেরে দিল। আমরা শব্দ শুনে ছুটে বারণ করতে গিছি; গিয়ে শুনলাম, কালী রেগে গরগর কর্ত্তে কর্ত্তে বলছে, "আপ্ মারনেকা কোন্ হ্যায়। হাম ফকীরী লেগা, ঈসাহি তো যাগা, নেই তো ঘর ছোড় দেগা।" সেই মারই শেষ মার। তার ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছিল। তখনকার অবাধ্য ছেলেরা এই বলেই বাপ্ মাকে ভয় দেখাত। কালী অবাধ্য ছিল না, কিন্তু কথাগুলো শিখেছিল।

'তা'র' 'পিলে ভানান'

খরেনে বড় অভাবের মধ্যে আমরা ছিলাম। দেবীচরণ মাঝে-মাঝে বাড়ী আসে। বাড়ীর দেনার জন্য সে বড়

কাতর। গহনা বিক্রয় ক'রে মাঝে-মাঝে দেনা দেয়। মস্ত বাড়ী, প্রকাণ্ড বাগান;—সবই আছে, কেবল অন্ন বস্ত্রের অভাব। ওদিকে খানাকুল কৃষ্ণনগরে আমার স্বামী পিলে রোগে ভুগ্‌ছেন। মা, পিসিকে পাঠিয়ে, তাঁকে আনালেন; ইচ্ছা—সে বদ্যি দেখাবেন। ডুলি করে তিনি এলেন, কবিরাজও এলো। সাত-পুরু কাপড় জড়িয়ে, সাতটা কলপাতা উপরে উপরে রেখে, তার উপর আগুন জ্বালিয়ে পিলে-দাগান হ'ল। ঘা হ'ল। তেল দেওয়া যেতে লাগ্‌ল। শেষে, মাছি বসে, মেচেতা পড়্‌ল।

মুড়ির মত পোকা

শেষে ঘায়ে পোকা পড়ল;—এক একটা পোকা মুড়ির মত বড়। শেষে, ঘা ফোড়ার ডাক্তার কালী হালদার টার্পিন তেল ঢেলে, ঘা ভাল ক'রে দিল। ভারি কষ্ট, আহারে অরুচি। মার ইচ্ছা, তাঁকে যত্ন করে খাওয়ান। বাড়ীর লোকেরা, তার জন্য খরচ করতে বিরক্ত। তাঁকে ও এতদিন রাখবার কথা নয়। তাকে তবে আবার বাগানের বেগুনটি, পলতা-শাক তুলে, আলাদা করে খাওয়ান কেন?

দিনমানে স্বামীকে দেখ্‌বার যো ছিল না

তখন দিনমানে স্বামীকে কারও দেখার যো ছিল না। তখনকার লজ্জায়, আর এখনকার লজ্জায়—আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখনকার লজ্জা বাহিরে, তখনকার লজ্জা মনের ভিতরকার। এখনকার বিলাতি-ধরণের লজ্জা—একটা আদবকায়দা, হাবভাবের মত দেখায়। দিনের বেলা, তে মহল বাড়ী ঘুরে, যেতে আস্‌তে তাঁর বড় কষ্ট হ'ত। আমিও তাঁকে দিনমানে ধ'রে আন্‌তে পারতাম না। অন্য সকলে তাঁকে তাচ্ছিলা করত। তাঁর কষ্টের আর সীমা ছিল না।

রাতকানার কষ্ট

আবার রাত্রে তিনি ভালরকম দেখ্‌তে পেতেন না, সামান্য রাতকানা হ'য়ে গিয়েছিলেন। আপনিই ধীরে ধীরে নড়াচড়া করেন। ঠক্‌ঠক্ ক'রে গুঁতো লেগে যায়। তিনি মনের দুঃখে কাঁদতেন। ছেলে আশুর নাম ক'রে—যেন ছেলের জন্য মন কেমন করছে, এই ছুতা ক'রে—কাঁদতেন। মা বল্লেন, "আশুর জন্য মন কেমন কচ্চে, বাড়ী যাবে?" তিনি বল্লেন, "যাব।" তখন, তাঁকে পেড়োর কাছে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসা হ'ল। তিনি নিজের বাপ-ছেলের কাছে গিয়ে যেন জুড়ুলেন।

'বোর' বাধা দিয়ে গাড়ী ভাড়া

ছোটভাই তারিণীর 'বোর' বাধা দিয়ে গাড়ী ভাড়া দেওয়া হ'ল। মার কাছেও পয়সা থাকত না। দাদা তখন কর্ত্তা, যখন যা মনে হচ্চে তাই কচ্চে। বাড়ীতে খাবার দাবার কষ্ট তত নাই। ক্ষেতের মত বেগুন, গাছের আম কাঁটাল, পুকুরের মাছ তখন সবই আছে। ধেনো জমি থেকে ধান আসছে। দাদা যা পান তা বাড়ীর দেনা দেয় সমানে—বাবাও কিছু দেন, দাদাও কিছু দেন। বাড়ীর দেনাই যেন আমাদের সংসারের লক্ষ্মী তাড়িয়ে দিলে। ধেনো জমি বিক্রি হ'ল। বাড়ী বাঁধা পড়ল।

দেনা করে যে, গোল্লায় যায় সে

দেনা করে, দিতে না পেলে মানুষ অস্থির হয়, তখন দেনাদারকে পাওনাদারে [illegible] সিংহের মত কামড়াতে থাকে। আমাদের সময়ে এই দেনা করে বাড়ী করার পথ, আমরাই গাঁয়ের লোকদের দেখাইয়াছিলাম।

ভজন বুঝিয়া ভোজন

যে নিজের ভজন বুঝিয়া ভোজন করে, তাকে যেমন কুপথ্যের জন্যে পেটের কষ্ট পেতে হয় না, তেমনই যে সাবধানী, সেও সুখে থাকে, সেইই আসল ধার্ম্মিক লোক। দেনার দুঃখের পর, দাদার বউ মারা গেল—দাদার একছেলে ভগবতী মারা গেল; আর তিনটি ছেলেকে আমরা মানুষ করতে লাগ্‌লাম।

দাদার ছোটছেলে—ভবানী

দাদার ছোটছেলে—ভবানীচরণ তখন দুই বছরের। এই ভবানীচরণই শেষে 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' হন ও দেশের লোকের পূজো পান্; শেষ দেশের পাঁচজনের চক্রে পড়ে, রোগে-শোকে যেন তাঁকে সপ্তরথীতে ঘিরে, অভিমন্যুর মত মেরে ফেল্লে।

আমার খালি হাত

দেবীচরণ ছুটি নিয়ে বাড়ী আস্‌ছেন। কল্‌কেতা' চিঠি এসেছে; শ্বশুর লিখেছেন, আমার স্বামী হঠাৎ মা

গেছেন। দাদা, আমার স্বামীর মরা-খবর নিয়ে, নূতন কাপড় নিয়ে, অন্তঘরে গিয়ে, আমার দিদিকে ডেকে মরা-খবর দিলেন; আমার সব ফুরিয়ে গেল। আমি শুনে, চুড়ী খুলে, শুধু-হাত ক'রে, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। সবাই বল্লে চাণকে, ছেলে আশু গোস্বামী আছে, সেই শ্রাদ্ধ করবে!

সতীনেরা সকলে খবর পায় না

আমার সৌভাগ্য যে, আমার স্বামীর মৃত্যুর খবর যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আমার সতীনেরা অনেকেই এ খবর হইতে বঞ্চিত থাকিয়া, মাছ-ভাত খাইয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত মহাপাতক করিয়াছিলেন। আমি ১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হইলাম; ৯।১০ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই, একবৎসর স্বামী আমার পিত্রালয়ে ছিলেন। আর, শেষে যখন শ্লীপদে পঙ্গু হন, তখন ১০।১২ দিন ছিলেন। আমার স্বামিভোগ মোটেই কপালে লেখা ছিল না।

কালীঘাটে আলাপী আমার সতীন

অনেক দিন পরে, যখন কালীঘাটে গিয়াছি, তখন একজন আমারই মত বুড়ীর সঙ্গে ভাব হ'লে, পরিচয় নিয়ে জান্‌লাম, সে আমারই মত হতভাগিনী—সে আমারই সতীন। সে এখনও জানে না, তার স্বামী মরেছেন, কি বেঁচে আছেন। আমি খবর দিলে, সে কাঁদতে লাগ্‌ল। কান্নাটা তার ভিতর থেকে বেরুচ্চে ব'লেই বোধ হ'ল। বিয়ের পর কিন্তু সে, স্বামী কেমন—তা একদিনও দেখে নাই।

দুঃখের দিন মনে কল্লে সুখ হয়

সে সব দুঃখের কথা, এখন মনে হ'লে হাঁসি পায়; গল্পে শুনেছিলাম, একজনের এক পায়ের জুতা ছিল না। সে দুঃখ করছে, এমন সময় দেখে রাস্তা দিয়ে এক খোঁড়া যাচ্ছে!—আমারও সেই দশা হ'ল।

আকালের বছর এল, বাবা মরিলেন

আমাকে শেখাবার জন্যেই যেন, আকালের বছর এল; ওদিকে পশ্চিম হইতে বাবার মৃত্যু-সংবাদ আসিল। দেশের লোক হা-অন্ন হা-অন্ন করিয়া কাঁদে। বাড়ীশুদ্ধ সকলে, বাবার জন্য কাঁদে। দাদার ছেলেরা, মা'র জন্য কাঁদে। দাদা, দেনার জ্বালায় ছটফট্ করে। আমি, একরূপ আধমরা হ'য়েই দিনপাত্ করি। এমন দুঃখ যেন শত্রুরও না হয়।

'উঠন্তি-মূল, পত্তনেই চেনা যায়'

কথায় বলে—উঠন্তি-মূল, পত্তনেই চেনা যায়! কালীচরণের ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় চাড় ছিল। সে, ঠিকসময়ে, রোজই একবার প'ড়ে নিত। তাতেই সব একজামিনে ফাষ্ট থাক্‌ত। বড় হ'লে, যখন ভাইপোরা ফেল্ হ'ত, তখন তাদের শুনিয়ে-শুনিয়ে বল্‌ত, যে-ছেলে রোজ গোড়া থেকে নিয়মমত তিনঘণ্টা ক'রে পড়ে, সে ছেলে কখনও ফেল্ হয় না। তার, সবকাজে নিয়ম ছিল। নিয়ম যে মেনে চলে, তাকে স্বভাবের নিয়ম বা অদৃষ্টকে ভয় ক'রে চল্‌তে হয় না; তাই, ঘটনাচক্রে, তাকে ফেল্ কত্তে কখনও পারে না।

"মাদুলী ধুয়ে রোজ জল খেতো"

কালীচরণের তাগায় মা-কালীর মাদুলী অনেকদিন বাঁধা ছিল। সে যেমন রোজ ঠিক সময়ে সন্ধ্যা আহ্নিক কত্ত, তেমনই নিয়ম ক'রে, সহস্র দুর্গানাম জপ না ক'রে, জল খেত না। ঠিক একই সময়ে মাদুলী ধুয়ে জল খেত। এত নিয়মে নিজেকে বাঁধ্‌তে পেরেছিল ব'লেই, ভগবানের বড় নিয়ম, তাকে তাঁর মনের মত গ'ড়ে তুলেছিল। সে, যতদিন বেঁচেছিল, যাকে যত টাকা মাসে সাহায্য কর্ব্বো বলেছিল, তাকে তাই শেষপর্য্যন্ত দিয়ে গিয়েছিল। এখন, অতিবড় আত্মীয় এলেও, লোকে হোটেল দেখিয়ে দেয়—নিয়ম ক'রে দেওয়া ত চুলোয় যাক! তখন, অন্নপূর্ণার মত গৃহিণীরা, অতিথি এলে খাবার-দাবারের তরি-তরকারি বাড়িয়ে দিত।

আমার বরপুত্রকে মাল্লে, তোদেরকাছ থেকে নিয়েযাব

একদিন দাদা, কালীকে মেরেছিলেন; তাতে, সেদিন তিনি স্বপনে দেখেছিলেন, যেন মা কালী মাথার কাছে এসে বল্‌ছেন, 'আমার বরপুত্রকে মার্‌লি। ওকে আমি তোদের কাছ থেকে নিয়ে যাব।' তারপর থেকে, দাদা কালীচরণকে মার্‌তে গেলেই ভয় পেতেন; যেন মনে হ'ত, কালীচরণ যাদু জানে।

বলিদানের জিনিস বিলিয়ে দিতে হয়

কালীপূজা আমাদের বাড়ী খুব ঘটা ক'রেই হ'ত। কালী-

পূজায় যে শসাবলি, আকবলি,কুমড়োবাল তখন দেওয়া হ'ত, সে সকলই বিলিয়ে দেওয়া হ'ত। ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে যা দেওয়া হ'ত,দাতার তাতে কোন অধিকার থাক্‌ত না। এখন ঠিক বিপরীত। পুরোহিত বামুনকে যা হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাই তারা পায়।

দৈবজ্ঞের গণনা

কালীচরণের হাত দেখে, এক দৈবজ্ঞ ঠিক বলেছিল যে, 'এছেলেকে ইংরেজী পড়ালে, এ ঘরে থাক্‌বে না। এছেলে খুব বড় লোক হবে; দেশের সকলেই একে মান্‌বে।' তখন কথাটা কানে নিই নি। এখন মনে হয়, ভক্তরাই দৈবজ্ঞ। যে সত্যি রাখে, সত্য তাকে রাখবে-না কেন?

পইতে হ'লে বামুন হ'ল

এখনকার ছেলেদের, পইতে হবার আগে যেমন, পরেও তেমন; তখন সেরূপ ছিল না। তখন পইতের সঙ্গে কান-বিঁধান হ'ত না। কান বিঁধানর মন্ত্র নাই। এটা পইতের অঙ্গই নয়। টিকি রাখার মত একটা পুরাণো প্রথা। পইতে হ'লেই, আসল বামুন হয়। একসন্ধ্যাতে দু'বার খেতে নাই। রেলগাড়িতে, যেখানে 'ছত্রিক' জাত আছে, সেখানে জল খেতে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লে সন্ধ্যা কবতে নাই। যার পইতে হয়েছে, সেই ঠাকুর-পূজো করতে পারে। একাদশীর উপবাস করে। যেন, ধর্ম্মরক্ষার জন্যে, তার সব-তাতেই একটা সংযম-অভ্যাস করতে হয়। আজ নব্বই বৎসর হ'তে চল্ল, এই সংযমের বলেই এতদিন বেঁচে আছি। স্বার্থ না ছাড়্‌লে সংযম আসে না। কালীচরণের স্বার্থ, পইতের পর কেন, গোড়া থেকেই ছিল না। তার সঙ্গে যে কথা কইত, সেই তাকে ভালবাস্‌ত; আবার কথা কইবার লোভ ছাড়্‌তে পারত না।

ছুটির দিন গরীবের ছেলেদের জড় ক'রে শেখাতো

সে, নূতন ভাল জিনিস যা শিখ্‌ত,ছুটির দিনে তা গরীবদের ছেলেদের জড়ক'রে শেখাত। তার মনে হ'ত, এরা আর আমি এক। মানুষে মানুষে ভিন্নভাব নাই। এটা পাড়াগেঁয়েদের যত সহজে হয়, সহুরেদের তত সহজে হয় না। কালীচরণ, সঙ্গীগুলিকে তার মনের মত ক'রে নিয়েছিল। যারা 'ছুত' জাত, তাদের মধ্যে ভাললোকদের সঙ্গেও আমরা সম্বন্ধ পাতাই—ঘৃণা করি, তাদের মন্দ লোকদের স্বভাবকে।

মেসে থাকা

জব্বলপুর মিশনরী স্কুলে দাদা যখন পড়্‌তেন, কালীচরণকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন; কালী পড়া শুন্‌ত। এত ছোট বয়সে পাদরীসাহেবেরা তাকে খৃষ্টানী শুনিয়ে দিয়েছিল। কাঁচা বাঁশ নোয়ালে, সহজে নোয়। ছোটছেলেদের ধর্ম্ম-উপদেশের ফল, বড় হ'লে পাওয়া যায়। সে, যদুগোপালের সঙ্গে যখন কলিকাতার মেসে থাক্‌ত, তখন, তার থাক্‌বার কষ্ট দেখে, তার বন্ধুদের মধ্যে একজন তাকে ৮৲ মাসে লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য কবত। পড়ার জন্য সে বড় বেশী কষ্ট পেয়েছিল। এজন্য বড় হলে, আমাদের গোষ্টির কেন, যেকেহ পড়ার কষ্ট পেয়েছে ব'লে সাহায্য চাইতে আস্‌ত, সে তখনই তাকে সাহায্য কবত।

দুঃখের আরম্ভ

বাবা কারও চিরদিন থাকে না, স্বামীও চিরদিন বেঁচে থাকেন না; কিন্তু ছেলেবেলায় বাপ-ম'রে-যাওয়া বড়ই কষ্টের। স্বামী কেমন দেখলুম না, স্বামী স্বর্গে গেলেন। এ সকল দেখে-শুনে, যে মরণ-বাচন তৈয়ারি করেছে,তাকে গাল দিতে ইচ্ছা কবত। আমরা, সংসারে জড়িয়ে পড়্‌লে, মরণকে ভয় করি, কিন্তু,সংসার আরম্ভ না ক'রে,মরণের দাগা পাওয়া বড় কষ্ট। আমি বিধবা হলুম; আমার দুঃখের আরম্ভ হ'ল।

দাদার বউ মারা গেল

দাদার বউ মারা গেল। দাদা আর বিয়ে কর্ত্তে চায় না। আমার মা বড়ই কাতর; মা কত ঠাকুর মানে। মায়ের বৌয়ের বড় সাধ। যাদের পিতামহের অনেক বিয়ে, তারা বিয়ে কত্তে ভয় পায় কেন, বলত? সময়ে সব হয়।

ছোট ভাইয়ের ক'নে দেখ্‌তে গিয়ে বড় দাদার বিয়ে

দাদা, ছোটভাই তারিণীর, ক'নে দেখ্‌তে গেলেন। মেয়েটি বড় কুৎসিত; কিন্তু দাদা এসে বল্লেন, মেয়েটি বল্লে, 'ঐ বরকে বিয়ে কর্ব্বো, যে দেখ্‌তে এসেছে'। মা বল্লেন,"বেশ ত বাঁরা, তোমার ত আর কুৎসিতের খেদ নাই; (দাদার বউ ডাকের সুন্দরী ছিল—পার্ব্বতীর মত গড়ন);

তুমিই বিয়ে কর।" শেষ, দাদার সঙ্গেই সেই মেয়ের বিয়ে হ'ল।

সেই মা

ছোটছেলে ভবানী, যাকে তোমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ব'লে খাতির কর, সে তখন ২।৩ বছরের। তাকে বলা হ'ল, 'তোর সেই মাই এসেছে।' সে, মরা-মা এসেছে শুনে, ভারি খুসি হ'ল। সে, সেই মাকেই, মা ব'লে ডাক্‌তে শিখ্‌ল; কিন্তু নূতন-বউ, প্রাণ-ধ'রে সতিনের ছেলেকে কোলে নিতে পারত না। ছেলে, কোলে লাফিয়ে পড়্‌ত। দাদা বলতেন, 'নাওনা, এই তোমার ছেলে।'

বউ, স্বাধীন হ'য়ে, কষ্ট দিতে লাগ্‌লো

ভাইপোদের লালনপালন ক'রে, মায়া জন্মালো—ছাড়্‌তে পারি না। বউ, বড় হ'য়ে, কষ্ট দিতে লাগ্‌ল। দাদার চুঁচুড়ায় পুলিশে কাজ হ'ল—২৫৲ টাকা মাইনে। মা খন্নেনে রইলেন। আমি, দাদার বউ নিয়ে, চুঁচুড়ায় গেলুম। দাদার বড়ছেলে কল্‌কাতায়, মেজ আমার সঙ্গে। সামান্য চাকুরী, বড়ই কষ্ট।

বউ কুটো নেড়েও উপকার করে নি

বউ কুটাটাও নাড়্‌ত না। একাদশীর উপবাস ক'রে, কায করতে হ'ত। আমার জর হ'ল, ভাই বল্লেন, কদিন বামুন রাঁধ্‌বে। পুলিশের বামুন-চাকরদের দিয়ে, লুকিয়ে রাঁধাচ্চি। এরা ভাল লোক, এরা কি রাঁধ্‌তে চায়?

সধবার ব্যারাম, আর বিধবার ব্যারাম অনেক তফাৎ

সত্যই দাদা বলেছিলেন, বিধবার ব্যারাম আবার কি? তাই, কি করি? ম'রে ম'রে রাঁধি আর কাঁদি। কিছুদিন কাট্‌লো। একবার চুঁচ্‌ড়ার বাড়ীতে, ভূতের ভয় পেয়েছিলুম। দাদার মেজছেলেকে একদিন শিয়ালে নিয়ে গিয়েছিল, পেয়ারা-তলায় কুড়িয়ে পেলুম।

গোহাড়ের ঝাড়ুদারী ধরা পল্লো

বাড়ীতে, মাঝে-মাঝে, গো-হাড় পড়ে। একদিন বড়বেশী গো-হাড় পড়্‌লো। দাদাকে থানাতে খবর দিতে বল্লাম। দাদা পুলিশ হ'লেও, প্রথমে কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেন না। পরদিন, যে ঝাড়ুদার সকালবেলা হাড় ঝাড়ু দিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গেল, সেই শেষে ধরা পড়্‌ল। তার পেছন-পেছন দাদা গিয়ে, তাকে, সেই হাড়গুলো আর একজনকে দিতে দেখে, ধ'রে ফেল্লেন। ঢ-সরিকের বাড়ী। এক-সরিক ভাড়াটে রাখ্‌তে দেবে না। সেই, ঝাড়ুদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, হাড় যোগাড় ক'রে ফেলত। রোজ হাড় পাবে কোথা? দাদা, তাকে খুব মেরে ধ'রে ধমকে দিলে, আর হাড় পড়েনি। ভূতের রোজা পুলিশ!

দেবী দারোগা

দাদার দারোগাগিরির চাকুরী হ'ল। হুগলীর দুর্গাচরণ রক্ষিতের বড়বাড়ীটা আমরা ভাড়া নিয়েছিলুম। দাদার দারোগাগিরিতে যেমন খুব নাম হ'ল, তেমনই খুব বদনামও হ'ল। ত্রিবেণীর ডাকাতি, দাদাই সন্ন্যাসী সেজে ধরেন। দাদা, পিপুলপাতীর থানায় রাতের চৌকিদারদের চাপরাস লুকিয়ে ফেলেন, থানার চৌকিদারেরা, তারপর আর, বড় একটা ঘুমুতো না। বড় বদমায়েসদের, খুব মারধোর ক'রে, না ফল হ'লে, মদ খাইয়ে, দাদা তাদের মনের কথা বার ক'রে নিতেন এইতেই তাঁর বদনাম হয়।

কালী—খৃস্টান হ'ল

কালীকে, তার কোন বন্ধু, একদিন, কায়েতের মেয়ের রাঁধা রুটি, না-জানিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল। কালী, জান্‌তে পেরে, সব খাকার ক'রে ফেল্লে। সে মনে করেছিল, তার জাত গেছে; কারণ, তার মনে এক, মুখে এক কখনও ছিল না। সে শুনে এসেছে কায়েতের রুটি খেলে বামুনের জাত যায়। তার তিনদিন পরে, যখন তার খৃষ্টান-বন্ধু পইতে কেটে দিলে, তখন সে, কাপ্‌তে কাপ্‌তে তারিণীর কাছ থেকে এক দণ্ডী পইতে চেয়ে নিয়েছিল। তারপর কি না, শেষ ডফ্ সাহেব তাকে খৃষ্টান কল্লেন!

আমি যে-চাকরাণী সেই-চাক্‌রাণী

খন্নেনে বড়কষ্ট হওয়ায়, দাদার কাছে সকলেই চ'লে এলেন। খরচ দাদা দেন, কালীও পাঠান। কালীর বউ কিন্তু প্রথমে আমাদের কাছেই ছিল; শেষ, সে তার খৃষ্টান-স্বামীর কাছে যেতে চাইলে। মিশন-হাউসে কালী তাকে নৌকা ক'রে নিয়ে গেল। নৌকা ডুবু-ডুবু হয়েছিল।

আমরাও আলাদা হলুম। দাদার বড় ছেলের পইতে হ'ল। ছোটভাই তারিণীর বিয়ের কথা হ'ল। আমি আবার সকলের রাঁধ্‌বার ভার নিলুম।

এক চড়ে বিয়ে করতে রাজি করা

গুরুচরণ চাটুয্যে এসেসর, ডিপুটি কালেক্টর, তখন হুগলী বাবুগঞ্জে; যে বাড়ীতে এখন ব্রজমোহন্ মল্লিক থাকেন, সেই বাড়ী তৈয়ার করেছিলেন। তাঁর মেয়ে কালো; দাদার মত, সেখানেই তারিণীর বিয়ে হয়। এক মেয়ে; বিষয়-আশয় আছে। তারিণী, কালো মেয়ে ব'লে, বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়নি। দাদা তাকে এক চড়ে বিয়ে কর্‌তে রাজি কর্‌লেন।

"আপ্‌সে ফাড় লেও"

চুঁচ্‌ড়া, বড়বাজারে গঙ্গার ধারে দাদা যখন বাড়ী কিন্‌লেন, তখন আমার অবস্থা, আগেও যেমন তখনও তেমনই। চাকর-বাকরপর্য্যন্ত বউয়ের দেখাদেখি আমাকে তাচ্ছিল্য করত। আমার, রাত্রে খাবার কোন বরাদ্দ ছিল না। চাকরকে কাঠ চেলিয়ে দিতে বল্লে, বল্‌ত, 'আপ্‌সে ফাড় লেও'।

এস্তোক জুতা সেলাই, মায় চণ্ডীপাঠ

আমাকে সব কাজ কর্‌তে হ'ত। যখন বড়অসহ্য হ'ত, কালীকে চিঠি লিখ্‌তুম। কালী, আমার বিলি কর্‌বার জন্য, বৈমাত্র-ভাই গোপালকে চিঠি লিখ্‌লে। গোপালের বাসায় থাক্‌লে, মাসে ছয়টাকা, যা তার বেশী খরচ পড়্‌বে, কালী মাসে মাসে দিতে চাইলে। যখন দাদা চুঁচ্‌ড়োয় ছিলেন-না, গোপাল সেসময়, আমাকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজের বাসায় রাখ্‌লে।

অভাগা যেখানে যায় সাগরশুকায়ে যায়

গোপালের বাসায় গেলুম। একঘর ভাড়াটে ছিল। তাদের সকলের রান্নাও একসঙ্গে হ'ত; সকলকেই ছটাকা ক'রে দিতে হ'ত। আমি আলাদা রাঁধ্‌তে লাগ্‌লুম। তারা উনুন ছেড়ে দিত—অনেক দেরীতে। আলু-ভাতে ভাত রোজ রোজ অবেলায় খাওয়ায়—আমার আমাশয় হ'ল। কালী, রোজ বিকেলে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, ডফের স্কুল থেকে পড়িয়ে যাবার সময়, আমায় দেখে যেত।

দাদাকে কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হ'ল

পরের দোষ ঘাড়ে চাপিয়ে নিলে, অনেকসময় বিপদে পড়্‌তে হয়। পরের জন্য জামিন হ'লে, যেমন নিজেকে দিতে হয়- সেইরূপ দাদার কাজের গোলমাল হয়েছিল। দাদা, এত সৌখিন মেজাজের ছিলেন যে, গোলাপ জলে নাইবার ইচ্ছা হ'লে, সে সখও মিটিয়ে নিতেন। একটু ময়লা লেগেছে ব'লে, শালখানাও মাঝিকে দিয়ে-দিতে যিনি কুণ্ঠিত হ'তেন না, তিনি, পানথেকে চুণ-খস্‌লে হিসাব দিতে যাবেন কেন? এইজন্য দাদা গা-ঢাকা দিলেন। কালী, তিনখানা নৌকা ক'রে—বাড়ীর সকলকে নিয়ে—কলকাতায় বাসাভাড়া ক'রে, রেখে দিলে।

দাদার ভাল সময় হ'ল

দাদার আবার, সব চুকেবুকে গেলে, ভালসময় হ'ল। দাদা, নিজের পরিবার-ছেলেদের নিয়ে, চুঁচ্‌ড়ায় ফিরে গেলেন। আমি চুঁচ্‌ড়ায় যেতে চাইলুম না। কালী, ১২৲ বাড়ীভাড়া ক'রে, আমায় কলকাতায় আলাহিদা রেখে দিলে। ছোটভাই তারিণী এসে বল্লে "দিদি, আমায় বউ নিয়ে থাক্‌তে একটু যায়গা দাও।" আমি, তাকে দুঃখিত দেখে, থাক্‌তে বল্লুম। তারিণী, বউকে নিয়ে, আমার কাছে রইলো। সবার খরচই কালী দিতে লাগ্‌ল।

বৌয়ের মা, বউ, তারিণী—সব এককাট্টা

তারিণীর বউ বড়-হয়েছে, স্বাধীনতা পেয়েছে; তার মাও আনাগোনা করেন। তার ইচ্ছা যে, তার তাঁবে আমি থাকি। খেতে সবাইকে কিন্তু কালী দেয়। তারিণী তখন, ডফ্ সাহেবের স্কুলে চাকুরী করে, ২৫৲ মাহিয়ানা পায়। সব টাকা, যা-ইচ্ছা করে। আমার কষ্ট আবার আরম্ভ হ'ল। আজ বউ বলে, 'বাজার ওর হাতে দেওয়া কেন? আরও কম খরচে হ'তে পারে।' 'কেন এত কাট পোড়ে?' 'তেল বেশী লাগে কেন?' 'হাঁড়ি কেন ভাঙ্গে?' এইভাবে, নানারকমে তাড়না কত্তে আরম্ভ কল্লে। বৌয়ের মা, তার সঙ্গে এসে যোগ দিলে; ছোটভাইও, শেষকালে, তার সঙ্গে যোগ দিলে।

প্রাণধনের মায়ায় প'ড়ে গেলাম

বউ, প্রসব হ'তে, বাপের বাড়ী গেল। ষষ্ঠী-পূজার দিন, ২১ দিনের ছেলে আমাকে লালনপালন করতে দিল।

শাহজাদী ও বৃদ্ধভৃত্য

বউ ছেলে নেবে না। ছেলে আমার নেওটো হ'য়ে গেল। ছেলের উপর আমার মায়া জন্মে গেল। আমার ভিতরের গর্ব্ব, যেন সব জল হ'য়ে গেল। বউ যা বলে, তাই করি। ছেলে নিয়ে, কালীকে একবার দুঃখের কথা বল্‌তে গেলুম। কালী বল্লে, 'তুমি তো তাদের খাচ্ছ না, তোমায় যত্ন ক'রে তাদের রাখ্‌তেই হবে।' মুখপোড়া ছেলের মায়ায় প'ড়ে গিয়ে, আমার দুর্দ্দশার সীমা রইল না। শেষে, কোথা থেকে যেন সহ্য করবার শক্তি এলো!

দিব্য-দৃষ্টি

[শ্রীঅপর্ণা দেবী]

বৃন্দাবনের দুয়ারে দুয়ারে
অন্ধ-বালিকা 'দুলি',
চিরপরিচিত পাড়াটি ঘুরিয়া,
ভরায় ভিক্ষার ঝুলি।
কে-যে আপনার, কে-যে পর তার,
জানেনা সে অন্ধবালা ;
করুণা-উপেক্ষা—সমভাবে গাঁথি',
করেছে গলার মালা।
জীবনের সাথী যষ্টিটি ধ'রে,
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া প্রতিগৃহদ্বারে,
পেয়েছে যে দুটি অন্ন,
হবেনা তাহাতে দুবেলা তাহার—
তবু সুখে ফোটে প্রীতি-হাসিধার—
ভাবিছে নিজেরে ধন্য।
যমুনার তীরে তার সে কুটীর—
জীর্ণ পাতায় ঘেরা,
সে জানে—সে গৃহ বিশ্বমাঝারে
সকলের চেয়ে সেরা।
জীর্ণ সে তার শয্যাটি পাতি—
যষ্টিটি রাখি' পাশে,
বিশ্বরাজায় স্মরিয়া পুলকে—
ঘুমাইয়া পড়ে শেষে।
সাতদিন আজ উঠে নাই 'দুলি'
শয্যা হইতে তাব—
বরষার দিনে, ভিক্ষা মাগিতে
যষ্টিটি ভাঙ্গি' পড়ে রাজপথে,
তাই বড় ব্যথা পাঁজর ক'খানি—
ভেঙ্গেগেছে বুঝি হাড়!
ভাসিছে নীলায় শারদ-চন্দ্রিমা,
হসিত ধরণী-রাণী,
রজত-ধারায় ভাসিয়া আসিছে
কি মধুর বিশ্ববাণী!
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটিয়া কুসুম
ভরায়েছে দিক্ গন্ধে,
বহিতেছে ধীরে স্নিগ্ধসমীর
মধুর—করুণ ছন্দে,
উজানে মাতিয়া কুলু-কুলুতানে
গাহিছে যমুনা ধীরে—
আন্ধা 'দুলি' যে কুটীরে তাহার
ভাসিছে অশ্রুনীরে!
তিনদিন আজ জোটেনি আহার,
দেহ—ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ ;
পার্শ্ব ফিরিতে নাহিক শকতি,
ফুরায়ে এল বা দিন!
তবু, 'দুলি' তার বিশ্বরাজারে
স্মরে পুলকিত দেহে—
অন্ধনয়ন উছলিয়া আসে—
স্মরিয়া রাজার স্নেহে।
মধুর মোহন বাঁশরীর সুরে
কে যেন ডাকিল তায়,
'বিশ্বরাজার আরতি হেরিতে
আয়রে দুলিয়া আয়!'
পাশরিল ক্ষুধা—টুটে গেল ব্যথা—
ছুটিল আপনা-ভুলি
বিশ্বরাজার নিকুঞ্জ কাননে
মুক্ত-নয়না 'দুলি'!
ভুবন ভরা সে কুসুমগন্ধে,
ধীরসমীরের মর্ম্ম-ছন্দে
রচিয়া বিশ্বগীতি,
কালিন্দীর ধীর কুলু-কুলুস্বনে—
চন্দ্রিমার ঝরা রজত-কিরণে—
ভাসিছে প্রকৃতি সতী।
বসি' পাদমূলে—প্রেমে পুলকিতা—
নয়নে অশ্রুধার,
গাঁথি দিব্যমালা—কাহার চরণে
দেয় 'দুলি' উপহার?

মহারাণী বায়জাবাঈ সিন্ধিয়া

[শ্রীসরলাবালা দে]

ভারতের ইতিহাসে নানাবিধ গুণ সম্পন্না, বিদুষী, রাজকার্য্য পারদর্শিনী, ও বীররমণীর অভাব নাই; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই কথা লোকসমাজে প্রচারিত হয় না। আমরা আজ যাঁহার কথা লিখিতেছি, সে সময়ে, তাঁহার মত বীর, তেজস্বিনী, শক্তিময়ী, আত্মসম্মানজ্ঞানী ও রাজকার্য্যে নিপুণা রমণী অতি বিরল ছিল।

সিন্ধিয়াবংশের প্রতিষ্ঠাতা রণোজী সিন্ধিয়ার পৌত্র, দৌলত রাও সিন্ধিয়ার নাম ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। বায়জাবাঈ সিন্ধিয়া তাঁহারই সহধর্ম্মিণী। বায়জা বাঈয়ের পিতা সখারাম ঘাট্‌গে কোল্‌হাপুর প্রদেশের একজন জায়গীরদার ছিলেন। তিনি 'সর্জেরাও' নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। সর্জেরাও—অত্যন্ত সাহসী, পরাক্রমশালী ও বীর পুরুষ ছিলেন; সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকায়, তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি সহ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। এই নিমিত্ত, বায়জাবাঈ বালিকা বয়স হইতেই অশ্বারোহণ, ভল্ল-নিক্ষেপ ও বন্দুক-চালনা প্রভৃতি সৈনিকজনোচিত কার্য্যসকল শিখিয়াছিলেন; ইহার উপর, তিনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন—কোনও কোনও ঐতিহাসিক তাঁহাকে "দাক্ষিণাত্যের সৌন্দর্য্য-লতিকা" আখ্যাও দিয়াছেন। একাধারে অপূর্ব্ব রূপবতী ও গুণবতী বলিয়াই, অনেক মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন; এমন কি, তরুণবয়স্ক দৌলতরাও সিন্ধিয়া পর্য্যন্ত, এই মুগ্ধমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশেষে, দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার পরামর্শে, সর্জেরাও—আপনার কন্যা বায়জাবাঈকে দৌলত-রাওয়ের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং তদবধি সিন্ধিয়ার দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিলাভ ঘটে।

বিবাহের পর, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, বায়জাবাঈ আপনার স্বামীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, দৌলতরাও অনেক রাজকীয়কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতেন; এবং সমর-ক্ষেত্রেও তাঁহাকে সঙ্গিনী করিতেন। বিখ্যাত আসায়ের যুদ্ধেও বায়জাবাঈ, স্বামীর সহিত থাকিয়া, যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন; এবং সুবিখ্যাত বীর আর্থর ওয়েলেসলি (পরে, ডিউক অব ওয়েলিংটন) যখন সমবেত মহারাষ্ট্র-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করেন, সে যুদ্ধক্ষেত্রেও বায়জাবাঈ, মহারাজ দৌলতরাওয়ের সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অতি কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে, স্বামীকে লইয়া, অশ্বারোহণে পলায়ন করেন। আসায়ের যুদ্ধের পর যে সন্ধি হয়, তাহা একরূপ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অনিচ্ছায়ই হইয়াছিল; ফলে, অচিরেই সিন্ধিয়া দরবার ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে নানাবিষয়ে মতভেদ সূচিত হয়; এবং পুনরায় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার উপক্রম হয়। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি ও রেসিডেন্ট, সিন্ধিয়ার উপরে মহারাণীর অমিত-প্রভাবের কথা বিদিত ছিলেন। তজ্জন্য, বায়জা-বাঈকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, সন্ধিতে এই নূতনসর্ত্ত যোগ করিয়া দিলেন যে, মহারাণী বায়জাবাঈ বার্ষিক দুইলক্ষ টাকা, এবং তৎকন্যা চিমনাবাঈ একলক্ষ টাকা, তহশীলের জায়গীর পাইবেন। অতঃপর, সিন্ধিয়ার সহিত ইংরেজদের আর কোনও বিসংবাদ ঘটে নাই।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, মহারাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়া সহসা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, সকলেই তাঁহার জীবনসম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। তাঁহার পুত্রসন্তান না-থাকায়, ব্রিটিশ-রেসিডেন্ট—পোষ্যপুত্র লইবার জন্য, তাঁহাকে এই সময় বারংবার অনুরোধ করেন; কিন্তু মহারাজ দৌলতরাও, প্রত্যেকবারই একই উত্তর দেন যে, যখন তাঁহার বায়জা-বাঈয়ের মত বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য্যে পারদর্শিনী পত্নী বর্ত্তমান, তখন তাঁহার আর পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রয়োজন কি! মহারাজের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দৌলত-রাওয়ের আর এক জ্যেষ্ঠা-পত্নী ছিলেন; তাঁহার নাম রুক্‌মা-বাঈ। তিনি প্রকৃতই "দুয়োরাণী";—কোন-কিছুরই

ধার-ধারিতেন না; বায়জাবাঈ-ই সর্ব্বদা স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে থাকিয়া, তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন—স্বামীর আরোগ্যের নিমিত্ত নানাবিধ দান-যজ্ঞাদি করিতেন, এবং অতিদূর তীর্থস্থান হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া, তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া, মহারাজের রোগমুক্তির নিমিত্ত শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন। মহারাজা কিন্তু নিয়তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না; ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। বায়জাবাঈ সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অন্তঃপুরস্থা রমণীগণ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, স্বর্গীয় মহারাজার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার পর, বায়জাবাঈ রাজ্যশাসন করিবেন এবং সেইজন্যই তিনি দত্তকপুত্রাদি গ্রহণ করেন নাই। এইরূপে নানামতে বুঝাইয়া, সকলে তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিল। অনন্তর, রাণী বায়জাবাঈ স্বামীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার চিতার উপর এক ছত্রী নির্ম্মাণ এবং তাহার সংস্কার ও প্রাত্যহিক দীপদানাদির জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা স্বতন্ত্র ব্যয়নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। যখন মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয়, তখন লর্ড আমহার্ষ্ট এখানকার গবর্ণর জেনারল। দেশীয় রাজ্যসমূহকে বৃটিশ-অধিকারভুক্ত করিবার ইচ্ছা, তাঁহার বড় ছিল না। সেইজন্য তিনি মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ইচ্ছানুসারে, বায়জাবাঈয়ের হস্তে রাজ্যসমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে শাসনের পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। মহারাণীর যোগ্যতা ও শক্তি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না; সুতরাং, সকলেই ইহাতে সন্তুষ্ট হন। তিনি, আপনার স্বামীর রাজত্ব-সময়ের বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী ও সর্দ্দারগণকে স্ব স্ব পদে ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে ও ভ্রাতা জয়সিংহরাও-এর পরামর্শে, অতিসুন্দররূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

যখন তিনি রাজসিংহাসনে আরূঢ়, সে সময়ে ভারতের চারিদিকে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিতেছিল। মহারাণী কিন্তু নিজরাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। এদিকে নিজরাজ্যেও তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভাব ছিল না। ইংরেজ-কোম্পানী যখন মহারাণীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন, সেসময়ে তাঁহাকে এ অনুমতিও দিয়াছিলেন যে, মহারাণী, ইচ্ছা করিলে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন। সেই জন্য তিনি, অল্পদিন পরেই, সিন্ধিয়া-বংশেরই একটি বালককে দত্তক গ্রহণ করেন; এবং আপনার দৌহিত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেন। দত্তক গ্রহণের পরে বালকের নাম হয়—"জনকোজী রাও সিন্ধিয়া"। এই বালকের বয়স তখন ১১ বৎসর; সুতরাং, বায়জাবাঈ ই সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। এই বালককে কেন্দ্র করিয়া, রাজ্যের দুষ্ট কর্ম্মচারী ও সর্দ্দারগণ মহারাণীর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিত; এরূপ বুদ্ধিমতী, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও চতুরা রমণীর হস্তে রাজ্যশাসন ভার থাকায়, যাহারা নিজেদের স্বার্থসাধন কল্পে রাজ্যের কোনরূপ অনিষ্ট বা অমঙ্গল করিতে পারিত না, তাহারা জনকোজীরাওকে স্বহস্তে রাজ্যভার লইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎসাহিত, এবং মাতাপুত্রের মধ্যে মনোমালিন্যের চেষ্টা করিত। বালক জনকোজীরাও, রেসিডেণ্টকে ও গবর্ণর-জেনারেলকে তাঁহার হস্তে রাজ্যভার দিবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। জনকোজীরাও-এর বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ ছিল না, এবং তিনি সর্ব্বদা কুচক্রীর সংসর্গে থাকিতেন; তাহার উপর, বয়সেও বালক। সে জন্য, বৃটিশ রেসিডেণ্ট ও গবর্ণর-জেনারেল বায়জাবাঈএর ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে সম্মত হন নাই। তদানীন্তন বড় লাট লর্ডবেণ্টিঙ্ক স্পষ্টই জবাব দিয়াছিলেন যে, সিন্ধিয়া বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর নিমিত্ত তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছিল। সিন্ধিয়া স্বাধীন ও মিত্র-রাজা, ইংরেজ-কোম্পানী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। বায়জাবাঈয়ের কৃপাতেই জনকোজী, সামান্য অবস্থা হইতে সিন্ধিয়ার সিংহাসনে বসিয়াছেন; এজন্য তাঁহার বায়জা-বাঈয়ের উপরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ফলে, বায়জাবাঈ, যখন জনকোজীকে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন, তখনই সমস্ত অধিকার প্রদান করিতেন। অবশেষে, জনকোজীরাও কয়েকজন সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, এবং, বায়জাবাঈকে বন্দী করিবার নিমিত্ত, মহল আক্রমণ করেন। বায়জাবাঈ ৭০০ শত অনুচরসহ অতিকৌশলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বৃটিশ রেসিডেন্সিতে যাইয়া, সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু যদিও বৃটিশ-রেসিডেণ্ট বরাবরই তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, কি জানি কেন, এসময় কিছুই করিলেন না। বরং, মহারাণীকে এই পরামর্শ দিলেন যে, তিনি, রাজ্য

ছাড়িয়া, স্থানান্তরে যাইলে রাজ্যের সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। অগত্যা মহারাণী নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে গোদাবরী তীরস্থ নাসিকে থাকিতে অনুমতি পান। এদিকে ইংরেজ কোম্পানী, মহারাজা জনকোজীরাওকে গদীতে বসাইয়া পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন এবং বায়জা-বাঈকে গোয়ালিয়রে আসিতে নিষেধ করেন। মহারাণীর জন্য বার্ষিক চারিলক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

উচ্ছৃঙ্খল জনকোজীরাও কয়েকবৎসর রাজ্য করার পরই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার, বোধ হয়, দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ হইয়াছিল এবং মাতা বায়জা-বাঈয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করেন নাই।

জনকোজীরাওয়ের বিধবা-পত্নী তারাবাঈ, এক বালককে দত্তকগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজা জয়াজীরাও সিন্ধিয়া নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলে, মহারাণী বায়জাবাঈয়ের নির্ব্বাসনদণ্ড প্রত্যাহৃত হয় এবং তিনি গোয়ালিয়রে ফিরিতে আদেশ পান। জনকোজীর সময়ে তিনি অনেক দুঃখ, কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া, জয়াজীরাও পিতামহীর সর্ব্বদা মন-স্তুষ্টি করিতেন; এবং তাঁহার পরামর্শব্যতীত কোনপ্রকার গুরুতর রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহারাণী শেষ-অবস্থায় পূজা অর্চ্চনাদিকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে, পবিত্র শয়ন-একাদশীর দিন মহারাণীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে জয়াজী অত্যন্ত শোকার্ত্ত হন। তাঁহার শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন; এতদুপলক্ষে একলক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়াছিলেন। পরে পরলোকগতা পিতামহীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক ছত্রী নির্ম্মাণ করান;—মহারাজা দৌলৎরাওয়ের ছত্রীর পার্শ্বেই ইহা প্রতিষ্ঠিত।

আমরা উপরে মহারাণী বায়জাবাঈয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলাম; এইবার তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি অশ্বারোহণে অত্যন্ত পটু ছিলেন; স্বামীর জীবিতাবস্থায় তাঁহার সহিত অনেকবার অশ্বারোহণে শিকার করিতে গিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সেও প্রতিদিন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন, ও অন্যান্য সর্দ্দাররমণীগণকে ও দাসীদিগকে অশ্বারোহণে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একদল অশ্বারোহী স্ত্রী-পল্টন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন ইংরেজ-রমণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেই, প্রশ্ন করিতেন, তিনি অশ্বারোহণ করিতে পারেন, কি না; এবং উক্ত প্রশ্নের উত্তর শুনিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না; তাঁহাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া, তাহার পরীক্ষা লইতেন। যুদ্ধের কথা তাঁহার বড় ভাল লাগিত; একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার শিশুকন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, ও একহাতে বর্শা লইয়া, অশ্বচালনা করিয়াছিলেন। আসায়ের যুদ্ধে, ওয়েলেস্‌লি সাহেবের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া, কিরূপে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকের কাছেই হাসিতে-হাসিতে গল্প করিতেন। তিনি নিজে খুবভালরূপ অশ্বপরীক্ষা করিতেও জানিতেন।

তাঁহার বেশভূষা অতি সাধারণ ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর, তিনি কোনও অলঙ্কার ধারণ করেন নাই। শাদা রেশমী সাড়ী পরিয়া দরবার করিতেন।

কিন্তু তাঁহার মানসিক তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার ইংরেজ-কোম্পানীর প্রধান-সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়র গোয়ালিয়রে আসেন। তাঁহাকে জুতা খুলিয়া দরবারে আসিতে বলা হয়। কিন্তু সেনাপতি তাহাতে সম্মত হন নাই, তিনি বলেন যে ইংলণ্ডের রাজদরবারে যেরূপ সম্মান দেখান হয়, সেইরূপ সম্মান এখানেও দেখাইবেন, ইহার অধিক কিছু করিতে পারেন না। বায়জা-বাঈ উত্তরে বলিয়া পাঠান যে, ভিন্ন-ভিন্ন দেশে সম্মান-প্রদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা আছে, এবং যখন তিনি গোয়ালিয়রে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে সেই দেশের প্রথামতই সম্মান দেখান উচিত। লর্ড কম্বারমিয়ার ইহাতে রাজি হন নাই; অবশেষে, তাঁহাকে দরবারে জুতাপরিয়া আসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দরবারে বসিবার জন্য কোনওরূপ চেয়ার ইত্যাদি উচ্চাসন রাখা হয় নাই, পুরাতন রীতি-অনুসারে ফরাসের উপর গালিচা ও চাদর বিছাইয়া, বসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; ইহাতে পেণ্টুলেন ও বুট পরিহিত ইংরেজ সেনাপতি ও আফিসরদের অত্যন্ত অসুবিধা বোধ হইয়াছিল। ইংরেজ-সেনাপতি বিরক্ত হইয়া, মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার বুট না খোলার দরুণ চতুরা মারহাট্টা-রমণী খুব প্রতিশোধ লইয়াছে।

বৃদ্ধাবস্থায়, যখন তাঁহার রাজকার্য্যে আর বিশেষ কোন

অধিকার ছিল না, তখনও তাঁহার এইরূপ তেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই। তিনি নাসিক হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, গোয়ালিয়রে "ফুলবাগে" বাস করিতেন; এবং তাঁহার সম্মানের জন্য একদল ফৌজ "গার্ড অব্ অনারে"র মত নিযুক্ত ছিল। যখন তিনি বাহির হইতেন, এই ফৌজ তাঁহাকে সেলাম দিত, এবং এইজন্য তাহারা তাঁহার মহলের সম্মুখে দাড়াইয়া অপেক্ষা করিত। একদিন, মহল হইতে বাহির হইতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হয়; ফৌজের 'অফিসর' মহারাণীর বিলম্ব দেখিয়া, এক চেয়ারে বসিয়া আরাম করিতে থাকেন। মহারাণী, চিকের ভিতর হইতে ইহা দেখেন, ও বিরক্ত হইয়া অফিসরের কঠিন দণ্ডের আদেশ দেন।

পুরাতন রীতি নীতির প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। যাহাতে সকলে সেইরূপ চলে, সেবিষয়ে তিনি সমধিক চেষ্টা করিতেন। একদিন মহারাজ জয়াজী সিন্ধিয়া তাঁহার সহিত উজ্জয়িনীতে দেখা করিতে যান। তিনি আধুনিক ইংরেজী রীতি-অনুসারে কোট, প্যাণ্ট ও বুট পরিয়া যান। তাঁহার অনুচরেরাও ঐরূপ সামান্য পোষাকে যায়। মহারাজা মহারাণীর মহলে যাইয়া সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইলে, তিনি বলিয়া পাঠান, "আমি ওরূপ সামান্য সওয়ারের সহিত দেখা করিতে চাহি না। ঐ সওয়ার, ইচ্ছা করিলে, মহারাজা সিন্ধিয়ার সহিত আসিতে পারেন। উক্ত ব্যক্তি যে মহারাজা সিন্ধিয়া নহেন, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি, কারণ, সিন্ধিয়া সরকার রাজকীয় ঠাট-বাট ব্যতীত কখনও আসেন না।" ইহাতে মহারাজ জয়াজীরাও অত্যন্ত লজ্জিত হন, এবং পরদিন, দরবারী পোষাক পরিয়া ও সঙ্গে চোপদার-চাওয়ালদার ও ডঙ্কা-নিশান প্রভৃতি লইয়া, অতি ধুমধামে মহারাণীর সহিত দেখা করিতে যান, এবং মহারাণীও তাঁহার খুব আদর অভ্যর্থনা করেন।

তিনি, বীর ও তেজস্বী রমণী হইলেও, নীচ প্রতিহিংসা-পরায়ণা ছিলেন না। যখন গোয়ালিয়র হইতে, রেসিডেণ্টের পরামর্শে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়, তখন তাঁহার অশেষ কষ্টভোগ ঘটে। নির্ব্বাসন-সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা চিমনাবাঈ প্রাণত্যাগ করেন। এই চিমনাবাঈ অতিশয় সুন্দরী ছিলেন; এমন কি অনেক ইংরেজ মহিলা তাঁহার রূপলাবণ্যের নিকট আপনাদিগকে হীন মনে করিতেন। চিমনাবাঈয়ের মৃত্যুতে, বায়জাবাঈ অত্যন্ত শোকাতুরা হন। তিনি, একবার, গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন তীর্থস্থানে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজ-কোম্পানী তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। একবার বর্ষাকালে তাঁহাকে, গৃহের অভাবে তাম্বুতে থাকিয়া, বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজের নিকট আপনার দুঃখের কথা অনেকবার জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানী তখন তাহার কিছুই প্রতীকার করিতে পারেন নাই। পিণ্ডারী দমনে ও অন্যান্য কার্য্যে ইংরেজকে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। সে সময় তিনি গোয়ালিয়রে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং আপনার পূর্ব ক্ষমতা ও প্রভাব অনেকপরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের সিপাহী ও কর্মচারীরা তাঁহাকে অনেকবার ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল; কিন্তু বায়জাবাঈ স্বয়ং অতি বুদ্ধিমতী ও পরিণামদর্শিনী রমণী ছিলেন। তিনি তাহাদের পরামর্শে কর্ণপাতও করেন নাই। ফলে, তিনি, তাঁহার মত মহৎ ও উদার প্রকৃতির রমণীর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন।

রাজকার্য্য চালাইতে হইলে যেরূপ কুটিল নীতি ও নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়, মহারাণীর তাহারও অভাব ছিল না। গুপ্তমন্ত্রণাভেদ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ব্রহ্ম ও ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানীর, অনেক অর্থব্যয় হওয়ায়, রাজকোষ একেবারে নিঃশেষ প্রায় হয়। তদানীন্তন বড়লাট অর্থসংগ্রহের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে থাকেন। অযোধ্যার নবাব ইতিপূর্ব্বেই ৫০।৬০ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাঁহার কাছে আর প্রার্থনা করা যায় না। বড়লাট শুনিয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রেরা অতি মিতব্যয়ী; এইজন্য তাহাদের রাজা ও সর্দ্দারদিগের নিকট, অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে, এবং রাজপ্রাসাদে প্রায় ২।৩ ক্রোর টাকা প্রোথিত আছে। তিনি গোয়ালিয়রস্থ রেসিডেণ্ট্‌কে পরামর্শ দেন যে, বায়জাবাঈয়ের নিকট যত টাকা পারা যায়, যেন গ্রহণ করা হয়। বায়জাবাঈ এ পরামর্শ শীঘ্রই জানিতে পারেন। তিনি, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সর্দ্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, রেসিডেণ্টের নিকট সংবাদ পাঠান যে, অর্থাভাবে তাঁহার সৈন্যগণ বেতন পায় নাই এবং তাহারা বিদ্রোহোন্মুখী হইয়াছে; এসময়ে, ইংরেজ কোম্পানী তাঁহাকে ১০লক্ষ টাকা ঋণ দিলে, তিনি বড়ই

বাধিত হন। রেসিডেণ্ট এসংবাদে হতভম্ব হইয়া যান; তিনি কোথায় মহারাণীর নিকট টাকা আদায় করিবেন, ভাবিয়াছিলেন; তাহার পরিবর্তে, মহারাণী তাঁহার নিকট ঋণ চাহিতেছেন। তিনি মহারাণীর নিকট টাকার আশা ত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় লিখিয়া পাঠান যে, গোয়ালিয়র রাজকার্যে অর্থাভাব এবং এজন্য সৈন্যসকল বিদ্রোহী হইবার মত হইয়াছে।—এই কৌশলে রাজনীতি বিশারদ রেসিডেণ্ট পরাস্ত হন।

আর একবার তিনি তুলসী বৃক্ষের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। সিন্ধিয়া বংশের রাজপুত্র বা রাজকন্যার বিবাহে যেরূপ ধুমধাম ও জাঁকজমক হয়—তুলসী বৃক্ষের বিবাহেও সেইরূপ করেন। ইহাতে অনেক খরচপত্র দেখিয়া, তাঁহার দেওয়ান কহিয়াছিলেন যে, মহারাণীর এরূপ কার্য্য তাঁহার অভিমত নয়। মহারাণী, সেসময়ে কোনও উত্তর না দিয়া, চুপ করিয়া থাকেন। বিবাহোৎসব হইয়া যাওয়ার পর যখন তিনি রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেন, তখন সমবেত সর্দারমণ্ডলী নজর ও যৌতুক দেন। ইহাতে যাহা অর্থ পাওয়া যায়, মহারাণী তাহা তাঁহার দেওয়ানকে গণিতে বলেন। দেওয়ান দেখেন, যে যাহা খরচ হইয়াছিল, তাহা-অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থাগম হইয়াছে। তিনি মহারাণীর বুদ্ধির প্রশংসা করেন, ও নিজের প্রতিবাদের জন্য, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহারাণী অতিশয় অতিথি সৎকার পরায়ণা ছিলেন; এবং দীন দরিদ্রকে যথেষ্ট দান করিতেন। বিধবা হইবার পর, তিনি অনেক-প্রকার ব্রত নিয়মাদি করিতেন; এবং ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। কাশী হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত, অনেক তীর্থ তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি, কাশীতে স্নানের জন্য, সুন্দর ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহার জন্য তিনি ৩১লক্ষ টাকা খরচ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা বিঘ্ন হওয়ায়, তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। পণ্ঢরপুরে দ্বারকাধীশের মন্দির-নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; ইহাতে প্রায় ২লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। হোলকারবংশে যেরূপ প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈ, সিন্ধিয়াবংশেও সেইরূপ বায়জাবাঈ—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উভয়েই, সামান্য সর্দ্দারকন্যা হইতে পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রের রাজ্যের কুলবধূ হইয়াছিলেন, উভয়েই রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতেন ও স্বয়ং অতি সুন্দররূপে রাজকার্য্য চালাইতেন। উভয়েই তেজস্বী ও বীররমণী ছিলেন।

নানা তীর্থস্থানে মন্দির ও ঘাট নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে বায়জাবাঈয়েরও ইচ্ছা সাতিশয় বলবতী ছিল; কিন্তু, তাঁহার নির্ব্বাসন নিমিত্ত, তিনি তাঁহার সমস্তইচ্ছা পূর্ণকরিয়া যাইতে পারেন নাই। ফলে তিনি যে একান্ত ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দুঃখভোগেও অহল্যাবাঈ ও বায়জাবাঈ সমান ছিলেন। স্বামী সংসর্গ তাঁহাদের ভাগ্যে বেশীদিন ঘটে নাই। পুত্র হইতে উভয়েই কষ্ট পান, এবং, উত্তরকালে, প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুতে উভয়েই অত্যন্ত শোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন।*

* গোয়ালিয়র হইতে প্রকাশিত "মহারাণী বায়জাবাঈ সিন্ধিয়া" নামক হিন্দী-পুস্তক অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত।

বিজয়ী

[শ্রীমতী বিজনবালা দাসী]

রিক্ত করেছ দীনে, দীননাথ!
শূন্যবক্ষ মাঝে,
বিফল-বাসনা তুচ্ছকরিয়া,
তোমারি কণ্ঠ বাজে।
বিভব হইতে এসেছে দৈন্য,
আলোকে অন্ধকার,
ভস্ম করেছে সুখ-নিকেতন—
রক্ত-পাবকে তার।

গর্ব্বিত শির চূর্ণকরিতে—
আসিয়াছে অপমান,
ভক্তি এসেছে—দীনের হৃদয়ে
শক্তি করিতে দান।
মর্ম্মছিঁড়িয়া শোণিত-রেখায়
ঝরেছে অশ্রুধার,
পারনি দীনেরে ভিখারী করিতে—
তুমি যে রয়েছ তার।

বিন্দু ও রেখা-চিত্র

[শ্রীমতী মৃণালমালা দেবী]

মানবকুলের ভাব-অভিব্যক্তির জন্যই ভাষার সৃষ্টি। আর, সকলসময়ের চিন্তাশীল ও ভাবুকদিগের ভাবরাজি সংরক্ষণ মানসে, সেগুলি লিপিবদ্ধ এবং সহজ উপায়ে জনসাধারণকে ভাষাশিক্ষার পক্ষে সহায়তা করিবার জন্যই বর্ণমালার উৎপত্তি। যখন বিভিন্ন বর্ণমালা ছিল না, তখন চিত্রাক্ষর প্রচলিত ছিল। তবে, চিত্রাক্ষরই হউক, আর বর্ণমালাই হউক, সবই রেখার বিচিত্রসম্পাতে লিখিত হয়। ইংরেজী, লাতিন, গ্রীক, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালায় বড় একটা রেখা বৈচিত্র্য নাই— সকলগুলিই প্রায় সরলরেখা, বা সামান্য বৃত্তাংশের সমাবেশে গঠিত; কিন্তু জাপানী, গুজরাতী, তেলেগু, উড়িয়া, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালায় রেখাসম্পাত বৈচিত্র্য—সরু মোটা প্রভৃতি চিত্রোপম টান বা ভঙ্গী দৃষ্ট হয়। ফলে, কি বর্ণমালা, কি চিত্র, সকলেরই মূল— রেখা; রেখার তারতম্যেই চিত্র। আবার, বিন্দুর সমষ্টিই রেখা – ইহা গণিতের কথা। ছোট বড় বিন্দুসমন্বয়ে, এবং প্রয়োজনমত সরু মোটা একটিমাত্র রেখার সম্পাত বৈচিত্র্যে, কিরূপে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, এই প্রবন্ধে আমি তাহাই দেখাইতে বসিয়াছি।

ছোট বড় সরু মোটা বিন্দু সম্পাতে, "হাফটোনের" অনুকরণে, হস্তাঙ্কিত বামে সন্নিবেশিত চিত্রখানির মুন্সীয়ানা, পাঠক পাঠিকাগণ, মনোযোগপূর্ব্বক ইহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেই, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এরূপ একখানি ছবি আঁকিতে যে কত বিপুল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সুন্দরীর বিন্দু-চিত্র

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের নিরবচ্ছিন্ন রেখা প্রতিকৃতি
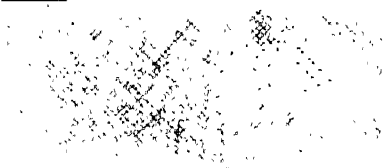
আমাদের রাজার এই অদ্ভুত চিত্রখানি একটি অবিভিন্ন রেখাতে অঙ্কিত। উপরের দক্ষিণকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর সমান্তরালভাবে, প্রয়োজনমত সরু মোটা করিয়া, ঘনসন্নিবেশে রেখাটি চতুষ্কোণ হইয়া, নীচের বাম-কোণে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে; অথচ, তাহাতেই মূর্ত্তিটি কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

এ ছবিখানিও রাজার চিত্রের ন্যায়, আর একখানি চিত্র। তবে, এক্ষেত্রে, এই অবিচ্ছিন্ন রেখাটি ডিম্বাকারে অঙ্কিত। রেখাটি, নাসিকার অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া, মণ্ডলাকারে,

স্থানে-স্থানে আবশ্যকমত সূক্ষ্ম ও স্থূল হইয়া, আলেখ্যখানির ঠিক নিম্নে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে।

একটি মাত্র রেখায় অঙ্কিত জনৈক মার্কিন ভদ্রলোকের প্রতিকৃতি

দক্ষিণ পার্শ্বের সুন্দর চিত্রখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাও একটিমাত্র নানামুখী অবিচ্ছিন্ন রেখায় অঙ্কিত। এই রেখাটি কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কোথায় শেষ হইয়াছে, আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকা খুঁজিয়া বাহির করুন।

আমাদের শিল্পপ্রিয়, বয়নকার্য্য নিপুণা পাঠিকাগণ, সামান্য চেষ্টা করিলেই, সহজেই, উল বা রেশম দিয়া কার্পেটের উপর এইরূপ চিত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

পুষ্প গুচ্ছহস্তা জনৈকা যোষিতের এক-রেখাচিত্র

ফলে -কার্য্যতঃ পরীক্ষায় সফলকাম হইয়াই, আমি এ কথা লিখিতে সাহসী হইলাম।

শারদ স্বস্তি

[শ্রীতরুলতা দেবী]

আলো আবার ফুট্‌ল বুঝি, প্রভাত দেখা দিল,
আভায় রাঙা পূব্বদিকে শুকতারা নির্নিমিখে
প্রণাম ক'রে, অশ্রুজলে বিদায় তবে নিল!
শীতলকরা শিশির-জলে পূর্ণ করে ঝারি
উষার দু'টি রাঙা চরণ ধুইয়ে, ধরা ক'রল বরণ—
একপ্রদীপে ক'রল আলো আননখানি তাঁরি!
শিউলি ফুলের বৃন্তরাগে প্রভাত হবার অনেক আগে
রাঙিয়ে ধরা রেখেছিল, অনুরাগের ডোর;
'একটি ক'রে, তাই ত ঝ'রে, ছড়িয়ে তারা তৃণের'-পরে,
মুছিয়ে দিল কখন তাদের, তমীর আঁখি-লোর!
প্রভাত-বায়ু গন্ধে তারি থম্‌কে দাঁড়াল;
শঙ্খ ধবল পর্ণ-ছটা— শ্যামল ঘাসে শুভ্রঘটা—
সরস্বতীর অঙ্গরাগে, আজ্‌কে হারা'ল!

সচল নদী জলের রাশি অচলতীরে নীরবে আসি'
সলিল-সেতু রচিল তাঁর আগমনের তরে;
দুইখানি তীর দুই ধারেতে, দূর-সুদূরে দুই পারেতে
প্রণাম তরে মিলিয়ে দিল, করের সাথে করে!
স্তব্ধ নদী-বক্ষ-বারি আনন-ছবি ধ'রল তাঁরি,
সোনার পাতে দেখ্‌ল উমা, প্রথম প্রাতে মুখ;
সরসিজের শিশির-ভরা গন্ধ আজি পড়্‌ল ধরা—
অস্ত হ'ল অন্ধকারের নীরব মনোদুখ!
অরুণ মেঘে তাম্র-থালে সাজিয়ে 'সাজি' কিরণজালে,
নীলআঁচলে অঙ্গঢাকে 'ওই যে পূজারিণী!
নম্রনত নয়নপাতে দাঁড়িয়ে বুঝি শারদ প্রাতে,
আলোক লেগে ঝলকে তা'র কেয়ুর-কিঙ্কিণী।

বীণার তান

হিন্দী

মর্য্যাদা—স্ত্রিয়োঁকী বিশেষ সংখ্যা - সম্পাদিকা শ্রীমতী উমাদেবী নেহরু—সংখ্যা ৫, সংবৎ ১৯৭১—

১। ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে স্ত্রীলোকের অংশ
—লেখিকা শ্রীমতী এনী বেসেন্ট—

স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া কোন দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিলে, সেদেশ জগতের রাষ্ট্রমণ্ডলীতে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারেনা। রাষ্ট্রের

শ্রীমতী এনি বেসান্ট

উন্নতির জন্য উচ্চশ্রেণীর পুরুষের যেরূপ আবশ্যকতা, সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরও আবশ্যকতা আছে। আধুনিক ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির স্থান অপ্রাকৃতিক ও অনিশ্চিত। ইহার মুখ্যকারণ, গতশতাব্দীতে ভারতবর্ষে যুগপৎ দ্বিবিধ সভ্যতার প্রচার হইয়াছিল, এবং অবস্থাভেদে, এদেশের পুরুষচরিত্র একপ্রকার, এবং স্ত্রীচরিত্র অন্যপ্রকার, সভ্যতার প্রভাবে গঠিত হইয়াছে। স্ত্রী সকলবিষয়ে প্রাচ্যভাবাপন্ন এবং পুরুষ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন; ইহার ফলে, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন না। ধর্ম্মবিষয়ে স্ত্রীর সহিত পুরুষের সহানুভূতি নাই এবং সার্ব্বজনিক জীবনে পুরুষের সহিত স্ত্রীরও কোন সহানুভূতি নাই। বিচারশীলতা বিনা ধার্ম্মিকজীবন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং আদর্শ বিনা সার্ব্বজনিকজীবন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এখন আদালত ও গৃহ—এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা প্রাচ্যভাবাপন্ন হইলেও, তাঁহারা এখন আর সে কালের আর্য্যরমণী নাই; তাঁহাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে; সার্ব্বজনিক জীবনে তাঁহারা অংশী না-হইলেও, গৃহে তাঁহাদের একাধিপত্য বর্ত্তমান। প্রাচীনভারতবর্ষের রমণীরা বীরত্বের আদর্শে গঠিত ছিলেন। দময়ন্তী, সীতা, গার্গী, কুন্তী, গান্ধারী এবং রাজপুতনা ও মহারাষ্ট্র দেশের বীরপত্নীরা তাহার উদাহরণ। ইঁহারা সভাগৃহে পতিকে পরামর্শ দিতেন, প্রয়োজন হইলে পতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমর করিতেন, অভিভাবিকারূপে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন এবং রাণীবেশে রাজ্যশাসন করিতেন। তারাবাই, চাঁদবিবি ও অহল্যাবাইর নাম কে না শুনিয়াছেন? ইহা ইংরাজী শিক্ষার ফল যে, এদেশে স্ত্রীপুরুষ পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতেই স্ত্রীজীবনে হীনতা আসিয়াছে ও জীবনের পূর্ণতা হইতে তাঁহারা দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং এজন্য পুরুষের জীবনেও অনেক কঠিনতা

হিন্দী লেখিকা মিসেস রামেশ্বরী নেহরু ([illegible])

উৎপন্ন হইয়াছে ও তাঁহাদের শক্তি ও দেশভক্তি ক্রমেই ম্লান হইয়াছে। কেবল স্ত্রীই পুরুষজীবনের মহত্ত্বের উদ্বোধন করিতে পারেন। স্ত্রী-বিহীন যজ্ঞদ্বারা আমরা দেবতাদিগের প্রীতিসাধন করিতে পারি না।

অতএব, ভারতবর্ষের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত, এদেশের বালিকা

দিগকে, একান্ত হইতে বাহির হইয়া, সার্ব্বজনিক জীবনে—তাঁহাদের পুরাতনস্থানে আসিয়া বসিতে হইবে। তাঁহাদিগের য়ুরোপীয় রমণীদিগের অনুকরণ করা নিষ্প্রয়োজন। য়ুরোপে স্ত্রীলোকেরা জীবন-সংগ্রামে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। স্ত্রী, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন;

হিন্দী লেখিকা মিসেস ব্রজলাল নেহেরু—(মর্য্যাদা)

তাঁহারা পুরুষের অঙ্গ, পুরুষও তাঁহাদের অঙ্গস্বরূপ। স্ত্রী-পুরুষ মনুষ্যত্বের দুইচক্ষু। কৃত্রিম উপায়ে, স্ত্রী ও পুরুষ, ইঁহাদের কাহারও কার্য্য সীমাবদ্ধকরা উচিত নহে। প্রত্যেককে, নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে, পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং আইনকানুন-রীতি-পদ্ধতি দ্বারা তাঁহাদের কাহারও কোন কার্য্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে বাধা দেওয়া উচিত নহে।

স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা প্রদান করা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়; দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলাকৌশলের ভাণ্ডার—পুরুষের ন্যায়—স্ত্রীলোকের জন্যও উন্মুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। সতীস্ত্রীর আবশ্যকতা আছে, বিদুষী রমণীরও প্রয়োজনীয়তা আছে। নারীর ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানপূর্ণ হওয়া উচিত; এবং বিজ্ঞানেরও, ধর্ম্মের দাস হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যেসকল সত্যশিক্ষা করিবেন, পুরুষ-অপেক্ষা তাহা তাঁহারা অধিক ব্যবহারে লাগাইতে পারিবেন। পুরুষ আজন্ম ব্যবস্থাকর, স্ত্রী আজন্ম শাসনকার্য্যে পটু।

ভারতের পুনরুত্থানের নিমিত্ত, স্ত্রীলোকের পক্ষে সমস্তক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকা উচিত; তাঁহাদের হাত স্বাধীন থাকা আবশ্যক এবং তাঁহাদের কার্য্যে কোন প্রকার বাধা থাকা উচিত নহে। স্ত্রীপুরুষ এজন্য নহে যে, একে অপরকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে; কিন্তু এইজন্য যে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আছে, উহারা জীবনের পূর্ণতা লাভবিষয়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিবে। মাতৃভূমির চরণে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব—উভয়ই উৎসর্গ করা আবশ্যক; কেননা, এই উভয়ের একতায়ই ভারতের শক্তি, মুক্তি ও দৃঢ়তা।

২। **শিশুপালন**—শ্রীমতী কিশনমোহিনী নেহরু—

আমাদের দেশে শতকরা ৩০—৪০টী শিশু প্রথমবৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয় বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম; কিন্তু তৃতীয় বর্ষ হইতে পুনরায় অধিকসংখ্যক বালকবালিকা প্রাণহারায়। বিলাতে, শতকরা বড় জোর ১০ জন শিশু এইরূপে নষ্ট হয়। ২-৩ বৎসর বয়স পার হইয়া গেলে, সেখানে আর মৃত্যুভয় তত থাকে না। ইহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ১—শিশুদের জীবন প্রথমতঃ এরূপ ক্ষণভঙ্গুর থাকে যে, সামান্য ভুলভ্রান্তি বা অমনোযোগ উপস্থিত হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; ২—অনেক শিশু দৈববশে দুর্ব্বল হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের জীবনের আশা কম; ৩—অনেক শিশুর পিতামাতা দুর্ব্বল; সুতরাং, তাহারাও মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে করিয়াই সংসারে আসে; ৪—কোন কোন পিতামাতার সন্তান আদৌ বাঁচেনা তাহার কোন সঙ্গতকারণ কেহ নির্ণয় করিতে পারেন না। এ ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে। জননীর অমনোযোগ ও

হিন্দী-লেখিকা—শ্রীমতী যমুনা বাঈজী—(মর্য্যাদা)

উদাসীনতা, কুপথ্য, সর্দ্দি কাশী, পেটের অসুখ, ছোঁয়াচে রোগ প্রভৃতির হাত হইতে শিশুরক্ষাকরা কঠিন। একবার কোন ব্যারাম হইয়া গেলে, আবার রোগের আশঙ্কা থাকে; এজন্য সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

বসন্ত-রোগের হাত হইতে শিশুকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহা সকলেই জানেন। অনেক শিশু,টীকা দেবার পর, হয় মারা যায় — নয়ত চক্ষুহীন হয়। শতকরা প্রায় ৯০ জনের চক্ষু, বসন্তদেবীর চরণে অঞ্জলি দেওয়া হয়। ছোঁযাচে রোগ হইতে দূরে রাখাই, শিশুদিগকে ঐরূপ রোগের হাত হইতে রক্ষাকরিবার একমাত্র উপায়। এজন্য ঘর-দুয়ার, অন্নজলবস্ত্র প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। শিশুদিগকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা, তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিজনক। পরিষ্কার শুদ্ধ বায়ু ও আলোক, শিশুদিগের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

শিশুদিগের আহার-সম্বন্ধে জননীর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাহা তাহারা সহজে হজম করিতে পারে, এরূপ পুষ্টিকর খাদ্য যথা-পরিমাণে দেওয়া উচিত। গুরুপাক দ্রব্য আদর করিয়া শিশুদিগের মুখে তুলিয়া দিলে, অনেকসময় তাহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। মাতৃদুগ্ধই শিশুদিগের উৎকৃষ্ট আহার। মাতৃস্তন্য বিকৃত হইলে, চিকিৎসা করা আবশ্যক। শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুধদেওয়া উচিত। দুইমাস যে শিশুর বয়স, তাহাকে দিনে দুইঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রিতে ৩ ঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। তৃতীয় মাসে তিন-তিন ঘণ্টা অন্তর, অষ্টম মাসে চারিঘণ্টা অন্তর দুগ্ধপান করাইলেই যথেষ্ট। তৎপর, ধীরে ধীরে মাতৃস্তন্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই অল্প অল্প গোদুগ্ধ পানকরাইতে অভ্যাস করাইতে হয়। প্রথম প্রথম - দিনে একবার, পরে - সহিয়া গেলে— দিনে দুইবার গরুর দুধদেওয়া যাইতে পারে।

হঠাৎ শিশুদিগের খাদ্যের পরিমাণ বা প্রকার পরিবর্ত্তন করা অনুচিত। গোরুর দুধে উপযুক্তপরিমাণে জলমিশাইয়া না দিলে, শিশুরা উহা হজম করিতে পারে না। নিম্নলিখিত অনুপাতে দুধে জলমিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে—

বয়স	দুধ	জল
১ দিন	।০	৵
১ সপ্তাহ	"	৶০
১ মাস	"	।০
২ মাস	"	।৵০
৩ মাস	"	৴০
৬ মাস	"	৶০
৯ মাস	৶০	৴।০

সিদ্ধ না করিয়া, কখনও শিশুকে গরুর দুধ খাইতে দিতে নাই। দুধের পাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক ; সামান্য একটু দুর্গন্ধ থাকিলেও তাহাতে শিশুদিগের পেটের অসুখ হইতে দেখা গিয়াছে। যেখানে ধূলা-বালি বা মাছির উৎপাত নাই, এমন জায়গায় দুধ সাবধানে রাখিতে হয়।

পূর্ব্বশিশুকাল হইতে বালক-বালিকাদিগকে স্নান করাইবার অভ্যাস রাখা ভাল। গ্রীষ্মকালে সাধারণ ঠাণ্ডাজলে, এবং শীতকালে যেরূপ ঠাণ্ডা গায় সয় এমন জলে স্নান করান উচিত। বেশীগরম জলে স্নান করাইলে, ঠাণ্ডাবাতাস লাগিয়া, শিশুর জ্বর হইতে পারে।

অনেক জননীরা শিশুকে শীতকালে এমন গরম কাপড়-চোপড় পরাইয়া দেন যে, তাহারা আদৌ ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারেনা। তাহা ঠিক নহে, বেশীগরম কাপড়, লাভ-অপেক্ষা, লোকসানই অধিক। যাহাতে শিশুদিগের তোতলামি প্রভৃতি কোন প্রকার কুঅভ্যাস জন্মিতে না পারে তৎপ্রতি জননীদলের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে, অদৃষ্ট ও প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া না দিয়া, ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয়ে

হিন্দী লেখিকা শ্রীমতী মগন্ বাঈজী (মর্য্যাদা)

জননী প্রথম হইতে মনোযোগ দিলে, তাহাদের ভবিষ্যৎ ও স্বাস্থ্য অন্য প্রকার হইতে পারে।

৩। হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীলোকের স্থান লেখিকা শ্রীমতী কুন্তীদেবী —

পাশ্চাত্য দেশের শক্তি ও প্রভুত্ব, বর্ত্তমানকালে জগদ্বিখ্যাত। ইহার মূল কারণ, তথায় দেবীগণের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। ভারতবর্ষও একসময়, দেবীগণের প্রতাপে, সমস্ত ভূমণ্ডলে একমাত্র শিক্ষকের উচ্চাসনে আসীন ছিল। "এতদ্দেশ প্রসূতস্য প্রভৃতি"— মনুবাক্য প্রসিদ্ধ। রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীনইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তখন ভারতীয় মহিলারা প্রেম ও উপদেশ দ্বারা পতির সহায়ক ছিলেন এবং সীতা ও দ্রৌপদীর ন্যায় বনবাসে পর্য্যন্ত স্বামীর সহচরী হইতেন। তাঁহারা জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে পতির সঙ্গিনী হইতেন এবং পুরুষেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত আদর ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। মন্বাদি প্রাচীন ঋষিদিগের প্রণীত স্ত্রীধন-সম্বন্ধীয় আইন, অতি

অদ্বিতীয়। প্রাচীনকালে আমাদের দেশ উন্নত ছিল; কেননা, তখন স্ত্রীদিগকে অত্যন্ত আদরপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হইত এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সমান ভাব বর্ত্তমান ছিল।

বিশ্ববিখ্যাত বীণাবাদিনী বঙ্গবালা দেবী সত্যবালা (মনোরঞ্জন)

ভগবান মনুর উক্তি—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

স্ত্রীপুরুষের তুল্যতা, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসদাচারের মূলভিত্তিস্বরূপ। হিন্দুদিগের ধার্ম্মিক, সামাজিক মর্য্যাদাসম্বন্ধে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন প্রকার পক্ষপাত হওয়া উচিত নহে। ঋগ্বেদের এক মন্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, 'একই বস্তুর সমভাগ হওয়াতে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে তুল্য।' সনাতনধর্ম্মে দেবীদিগের জন্য যেরূপ উচ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, আর কোন ধর্ম্মে তেমন নাই। ইঞ্জিল, কুরাণ ও জিন্দাবস্তা—পুরুষের চরণ স্ত্রীলোকের মস্তকের উপর স্থাপন করিয়াছে। কেবল এক ভারতের বৈদিক ঋষিগণই বলিয়াছেন যে—কি অধিকারে, কি স্বাতন্ত্র্যে, কি বিদ্যোপার্জ্জনে, কি শিক্ষায়, কি ধর্ম্মে—সকলবিষয়েই স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার। বৈদিক সময়ের পরেও, রামায়ণমহাভারতের পৌরাণিক-যুগে স্ত্রীপুরুষের তুল্য অধিকার ছিল। সমগ্রজগতে সীতার দ্বিতীয় আদর্শ দুর্লভ। তখন সকলবিভাগেই স্ত্রীজীবন স্বাধীন ছিল। তাঁহারা জ্যোতিষ, গণিত, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়, সাহিত্য প্রভৃতিতে সম্যক্ অভিজ্ঞা ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্রের তর্কস্থলে, এক আর্য্য দেবী মধ্যস্থা হইয়াছিলেন। রাজা জনকের সভায়, যোগিনী সুলভার অদ্ভুত বলবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ, এক যোগিনীর নিকট আধ্যাত্মিকতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। যখন ভারত স্বাধীন ছিল, তখন ভারতবাসীদিগের হৃদয় স্বাধীন, উন্নত, পবিত্র, সরল, স্বচ্ছ ও অসন্দিগ্ধ ছিল। এজন্য, ভারতের কন্যারাও, তাহাদের চিন্তায় ও কার্য্যে, সম্পূর্ণস্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা যুগপৎ বিদুষী ও সাধ্বী ছিলেন। তাঁহারা রাজকার্য করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে, রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধও করিতেন। ভারতের স্বর্ণযুগে, ভারতীয় মহিলারা ধর্ম্মোৎসাহ, বীরতা, বিদ্যা, আত্মোৎসর্গ ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

স্ত্রীলোকদিগের উচ্চরাজনৈতিক অধিকার গ্রহণ করার, দেশ-শাসন করার, নিয়ম-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার সকলের সহিত ন্যায্য ব্যবহার করিবার ও ধর্ম্মাধিকরণে আত্মপক্ষসমর্থন করিবার, অনেক উদাহরণ প্রাচীন ভারতে দৃষ্ট হয়। বেদের বিশেষ আদেশ, কোন বিবাহিত পুরুষ কোন ধর্ম্মকার্য্য, ভার্য্যাকে সঙ্গে গ্রহণ না করিয়া, আচরণ করিবেন না; করিলে, তাহা অপূর্ণ ও অসমাপ্ত হইবে। এজন্য পত্নীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী, তিনি স্বামীর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গিনী। আমেরিকায় স্বাধীনতার গর্ব্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রাচীনভারতের স্ত্রীদিগের অধিকারের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। যেব্যক্তি স্ত্রীর শরীর পবিত্র দেবমন্দির বলিয়া মনে না করে, সে খাটি হিন্দু নহে। মনু বলিয়াছেন, "স্ত্রীর দেহে পুষ্পাঘাতও করিবে না; কারণ, তাহা পবিত্র।"

৫। মাতা লেখিকা শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু, সম্পাদিকা স্ত্রীদর্পণ—

জননী, কেবল মনুষ্যের জীবনদানই করেন না এবং স্তন্যপান করাইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করেন না; পরন্তু তিনি সন্তানের সমস্ত মানসিক সংসারও শাসন করেন। মাতার শক্তি মহতী, তাঁহার আসনও পবিত্র ও উচ্চ; কিন্তু কয়জন জননী এই উচ্চাসনের যোগ্য? কয়জন এই অতুলনীয় শক্তিপ্রয়োগ করিতে জানেন? প্রাচীনকালে ভারতে এবং জগতের অন্যত্রও জননীকে আদর ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত। য়ুরোপের মধ্যযুগে মেডোনা মূর্ত্তিতে জননীর অর্চ্চনা করা হইত। এই আদর-সম্মানের কারণ এই যে, সভ্যতার সেই প্রারম্ভিক যুগে সমাজের ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত অনেক পুত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন মনুষ্য-সমাজ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত ছিল। সর্ব্বদা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে যুদ্ধকলহ হইত। অরণ্যের পশুদিগের সহিতও যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত। এই আবশ্যকতা-পূরণের ও জনবলবৃদ্ধির একমাত্র উপায় জননীই ছিলেন।

স্ত্রীলোকের জননী হইবার সাধ একেই স্বাভাবিক; তাহার উপর, সমাজে জননীর আদর ও সম্মান দেখিলে, প্রত্যেক রমণীর হৃদয়ে মাতা হইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে। জননী, তাঁহার কাম্যবস্তু পুত্রের সেবায়, তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিতে ভালবাসেন। সন্তান না থাকিলে, যেন গৃহ অন্ধকারময়। সকলপ্রকার সামাজিক অধিকারের সঙ্কোচ ও বন্ধনহেতু জননীর দৃষ্টি, মনোযোগ, স্নেহ, বাৎসল্য ও আনন্দ একমাত্র সন্তানের উপরই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে।

কিন্তু, আজকাল সময়ের পরিবর্ত্তনে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও বিচারবুদ্ধিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—আজকাল বিবাহ কেবল ভোগবিলাসের উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। আজকাল অনেকরমণীর হৃদয়ে জননী হইবার সাধ কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা, সন্তানপ্রতিপালন করিয়া, অমূল্যসময় ব্যর্থ করিতে ইচ্ছা করেন না; অনেকে বিবাহ করাই আদৌ পছন্দ করেন না। অনেকে, বিবাহ করিলেও, কৃত্রিম উপায়ে সন্তানোৎপত্তি রুদ্ধ করিয়া দেন। যেসকল কারণে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে জননী হইবার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইত, তাহা ক্রমে-ক্রমে লোপ পাইতেছে।

স্ত্রীজাতির হাতে এখন কেবল সন্তানপ্রতিপালনের একমাত্র কর্ত্তব্য ন্যস্ত নাই; এখন তাঁহারা স্বাধীন হইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন—তাঁহাদের মানসিকশক্তি বিকশিত হইয়াছে তাঁহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে এবং এখন তাঁহারা, পুরুষের অধীনতা-পাশ ছিন্নকরিয়া, আর্থিক স্বাধীনতার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। জননীজাতীয়া গৃহিণীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈকা আমেরিকাবাসিনী মহিলা মন্তব্য করিয়াছেন—"যে সকল অলস স্ত্রীলোকেরা উপার্জ্জন করিয়া খাইতে নারাজ, তাহারা জোঁকের ন্যায় সমাজের শোণিত পান করে।" এইরূপ বিচারবুদ্ধি পাশ্চাত্য দেশে মাতৃভাব দমন করিতেছে। তাহার পরিণাম এই যে য়ুরোপে সন্তানোৎপত্তি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে; জননীদিগের অনেককে খাটিয়া খাইতে হয় বলিয়া, তথায় সন্তান প্রতিপালনের জন্য Bottle-Institutes ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এইরূপ দৃশ্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সন্তান প্রতিপালনে জীবন অতিবাহিত করিয়া আমরা ভারতের গৃহলক্ষ্মী, গৃহদেবী, পূজ্য-জননীর আসনলাভ করিয়াছি। সন্তানের সেবাই আমাদের জীবনের সুখ ও লক্ষ্য। কিন্তু সে-দেশের বিদুষী ললনাগণও ত আমাদেরই ভগ্নী। সেখানেও, এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর, প্রত্যেক জাতির আত্মরক্ষার নিমিত্ত, বীরপুরুষের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জননীর আদর আবার সেখানে বাড়িয়াছে। যাহাতে দেশের ও জাতির কল্যাণ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা কর্ত্তব্য—ইহাই বর্ত্তমান সময়ের প্রধান নীতি। ভারতবর্ষেও জননী, উচ্চাসনচ্যুত হইয়া, পতিত হইয়াছেন, তাহার কারণ অন্যবিধ। এখানে মনুষ্যজননী- পশুজননীর পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০।১২ বৎসর অপেক্ষাও কমবয়সে বিবাহ হইয়া, তাঁহারা ১৪।১৫ বৎসরেই সন্তানের মাতা হইয়া পড়েন। তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়, দারিদ্র্যহেতু তাহাদিগকে, সেই শরীর লইয়া, সংসারের কাজ করিতে হয়। সন্তানও রুগ্ন হয়, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা—মানসিক বিকাশ, কিছুই হইতে পারে না। অনেকশিশু ৫।৬ বৎসরের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। এরূপ জনসংখ্যাবৃদ্ধি, দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। ভারতে এখন, সংখ্যা-বৃদ্ধি অপেক্ষা, মানসিক ও শারীরিক বলসম্পন্ন দেশ-প্রেমিক—দেশ-সেবক বীরসন্তানের অধিকতর প্রয়োজন। এজন্য, ভারতবর্ষে জননীজাতির সংস্কার ও সুশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য - উভয়দেশের স্ত্রীলোকদিগের ধারণা হওয়া উচিত যে, নারীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য যোগ্যাজননী হওয়া। প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের পক্ষে, শারীরিক-মানসিক ও আর্থিক শক্তি-অনুসারে, আপন আপন দেশ ও জাতির নিমিত্ত সেবক ও রক্ষক উৎপন্ন করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

৫। **স্ত্রীলোকের অধিকার** লেখিকা শ্রীমতী কমলাদেবী [illegible]—

স্ত্রী ও পুরুষ—উভয়েরই স্বত্ব ও অধিকার সমান; কিন্তু আজকাল এরূপ উক্তি, সময়ের ফেরে, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এখন যে স্ত্রীলোকের অবস্থা অত্যন্ত হীন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া, আমাদের উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এরূপ অবস্থা চিরকাল ছিল না। প্রাচীনকালে স্ত্রীপুরুষের তুল্য-অধিকার ছিল। সামাজিক বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে কর্ত্তব্যের ভাগ হইয়াছিল পুরুষের ভাগে যে কাজ পড়িল, তাহা লোকের দৃষ্টিতে সম্মানজনক হইল, কাজেই পুরুষ সম্মানিত। পুরুষ, মানের লোভে, স্ত্রীলোকদিগকে ক্রমে সেইসকল কার্য্যে বঞ্চিত করিয়া রাখিল। ইহাই সামাজিক, ধার্ম্মিক ও রাজনৈতিক ভেদভাবের মূলকারণ। বর্ণভেদের লীলা সকলেই জানেন। জন্মমাত্রই, একব্যক্তি আপনাকে নীচ ও অপরকে উচ্চ মনে করিতে শিখে। সাংসারিক ও সামাজিক-বন্ধনে স্বাধীনতা হারাইয়া, নিম্নশ্রেণীর শক্তি পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। যেসকল জাতি আত্মোন্নতির অবসর অধিক পাইয়াছে, তাহারাই আজকাল উচ্চজাতি। অনার্য ও নিম্নজাতীয় লোকেরা, দায়িত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়—স্ত্রীলোকেরও সেই দশা। পুরুষ অধিক শক্তিশালী কিন্তু, অবসর পাইলে, স্ত্রীলোকেরাও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দুর্গা, কৈকেয়ী, মদালসা, সীতা, লক্ষ্মীবাঈ, মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে, মানবজাতিরই অভ্যুদয় হইতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশে, বালক-বালিকা সমদৃষ্টিতে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হয়। এদেশে, কন্যাকে সকলেই হীনচক্ষে দেখে। স্ত্রীশিক্ষার অভাব, স্ত্রীজাতির উন্নতির দ্বিতীয় পরিপন্থী। বাল্যবিবাহ, স্ত্রীজাতির অবনতির তৃতীয় কারণ। বাল্যবিবাহ, স্ত্রীপুরুষ—উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। মনু যে দশ প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে, এক গান্ধর্ব বিবাহব্যতীত, আর সকলপ্রকার বিবাহেই পুরুষের প্রাধান্য দেখা যায়। পুরুষেরই সকল প্রকারের সুবিধা। পত্নী জীবিতা থাকিতেও, পতি স্ব-ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন; কিন্তু, যে বালিকা পতির মুখও দেখিতে পায় নাই, সেও, বিধবা হইলে, তাহাকে আজন্ম-ব্রহ্মচর্য্য করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ভারতে, স্ত্রী নিতান্ত উপেক্ষণীয় বস্তু; উঁহারা, কেবল পুরুষের ইচ্ছাপূর্ত্তির সাধনমাত্র। অবরোধপ্রথা, ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে চিড়িয়াখানার জন্তুতে পরিণত করিয়াছে। অন্তঃপুরের দূষিত বায়ু সেবন করিয়া, মুক্তবায়ু ও আলোকে বঞ্চিত হইয়া, দুর্গন্ধে বাস করিয়া, ভারতীয় ললনার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে

তাহা বর্ণনাতীত। এজন্য আমি, স্ত্রীলোকের উপর সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি আমাদের ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন, আমি জানিয়া শুনিয়াই উল্লেখ করিলাম না; যেহেতু, এখন পুরুষেরাও সে-সম্বন্ধে পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই।

৬। স্বর্গীয় প্রেম।

"যশ মে ভগ কয় রহা—যহাঁ আনন্দমুখ,
সকল সম্পদাপূণ—যহাঁ স্বর্গীয় সুখ।"

৭। সামাজিক সংগঠনে স্ত্রীলোকের স্থান—সম্পাদিকা—

সম্প্রদায় সদাচার বিধিনিষেধ ও আইনকানুনের একমাত্র উদ্দেশ্য, স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধে স্বচ্ছতা, সরলতা ও প্রেম উৎপন্ন করা। সমাজের স্থিতি ও উন্নতি, এই উভয়ের পরস্পরের মধ্যে যথোচিত পরিমাণে সম্মিলন, প্রেম ও সহানুভূতির পরিণাম এবং সমাজ, এই উভয়ের মিলিত উদ্যোগের ফলস্বরূপ। সংসারের আরম্ভ হইতে, উভয়ে উভয়ের সাথী। পুরুষকে পরিশ্রম অধিক করিতে হয়, স্ত্রীর ভাগে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা! স্ত্রীর কোমলতা-নম্রতা তাহার দুঃখের মাত্রা বর্দ্ধিত ও চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছে। অতীতের ভুলভ্রান্তি যাহাই হউক, ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া আবশ্যক। সেইসকল ভুল বিচার করিলে, দেখা যায়, পুরুষ যে সামাজিক জাল-বয়নের ভার, নারীকে বাদ দিয়া আপন হাতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ভুল। পুরুষ, সমাজ-রচনার সকলপ্রকার কঠোরতা নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, স্ত্রীকে কেবল তাঁহার শারীরিক সুখবিধানে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে, উভয়েরই এবং সমাজেরও সমূহক্ষতি হইয়াছে। পুরুষ, একা ভাল করিয়া সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারেন নাই; স্ত্রী—দুনিয়ার সম্পর্ক হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে, উভয়েরই পতন হইয়াছে। পুরুষ, নিজের সেবার জন্য, স্ত্রীর অধীন হইয়াছেন স্ত্রী, পুরুষের সেবা-ব্যতীত, আর কোন যোগ্যতারই অধিকারিণী নহেন।

খাজমদ সকল মদের রাজা। কোন অধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন হইতে দেখিলে, আমাদের মনে বড় দুঃখ লাগে। প্রভুত্বের নেশার কখনও তৃপ্তি হয় না; প্রয়োগের সঙ্গেসঙ্গে উহা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। যে অভাগীদের উপর এইরূপ মতাবলম্বীদিগের শাসন পতিত হয়, তাহাদের অধোগতি অনিবার্য্য। তাহাদের সমস্ত সদ্‌গুণ বিনষ্ট হয়; সঙ্কোচ-ভীরুতা প্রভৃতি রোগ তাহাদিগকে বেষ্টন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা,গরু-ভেড়ার মত,অপরের শাসনে অভ্যস্ত ও পরের সম্পূর্ণ আশ্রিত, হইয়া পড়ে। এজন্য, স্ত্রীপুরুষ—উভয়েরই, আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক প্রণালী হইতে, ক্ষতি হইয়াছে। স্ত্রীর সাহায্যব্যতীত পুরুষ একা সমাজ সংগঠন করিতে পারেন না; এবং সমাজের উন্নতি ও উদ্ধার, পুরুষ অপেক্ষা, স্ত্রীর উন্নতির উপরেই অধিক নির্ভর করে। এইজন্যই, স্ত্রীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিতে পারা যায়।

সমাজ, কোন মানবিক ব্যবস্থা নহে; উহা প্রাকৃতিক, স্বতঃব্যবস্থিত। মানুষের মত, সমাজেরও শরীর-প্রাণ ও মস্তিষ্ক আছে। স্ত্রীপুরুষ—উভয়েই সজীব-সমাজের অঙ্গ। ইহাদের ত্যাগ, প্রেম ও সহানুভূতি সমাজ সংগঠনের পক্ষে আবশ্যক। সমাজের উন্নতির জন্য, এই উভয়েরই উন্নতির প্রয়োজন; কিন্তু স্ত্রীর অধোগতিতে সমাজের অধিকতর দুর্গতি উপস্থিত হয়। সমাজের শারীরিক-মানসিক-নৈতিক ও আর্থিক স্থিতি, পৃথকপৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। নারীর সহিত সমাজের এইসকল অবস্থার উন্নতির-অবনতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। সামাজিক জীবের স্বাস্থ্য—শারীরিক-আরোগ্য—মানসিক-শক্তি—নৈতিক-সংস্কার—সমস্তই জননীর উপর নির্ভর করে। জননী শিশুকে, স্তন্যপান করাইয়া, তাহার সহিত আশৈশব দশবৎসর একত্র বাস করিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনগঠন করিয়াছেন। শৈশবে উপ্ত বীজ, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া, যৌবনে মানবজীবন সম্পূর্ণ করে। বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা, এদেশের জননীর স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়াছে। ঐ কারণে, শিক্ষার অভাবে, ও পুরুষের দাসত্ব করিয়া, রমণীর জীবনের বিকাশ হইতে পারে না। তাহাদের নৈতিক-সাহস ও চরিত্রের দৃঢ়ত্ব আদৌ দেখা যায় না। সদা-সঙ্কুচিতা, ভয়ভীতা, দুর্ব্বলচিত্তা, ভগ্নস্বাস্থ্যা জননীর সন্তানও সেইরূপই হইতেছে। তাহাতেই, আমাদের সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা। স্ত্রী-পুরুষ—উভয়েরই আর্থিক স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য। আর্থিক অধীনতা স্ত্রীলোককে পুরুষের চক্ষে হীন করিয়া ফেলে। শারীরিক ও মানসিকশক্তি-অবসর-অভাবে, বিকশিত হইতে না পারিলে, নারীজীবন ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য ও হেয় হইয়া পড়ে; তাহাদের নৈতিক-অবনতি হইতে থাকে। অতএব, স্ত্রীজাতিকে, অর্থোপার্জ্জন করিয়া, পরিবার প্রতিপালনে অংশী হইতে দেওয়া পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতির সংস্কার ও উন্নতির উপর, পুরুষের উন্নতি, এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। অতএব, মহিলাদিগকে,

ভিন্নজাতি বলিয়া মনে না করিয়া, হেয় ও আনত বিবেচনা না করিয়া, জীবনের সকলপ্রকার চিন্তা ও উদ্যোগে অংশীরূপে গ্রহণ করা পুরুষের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, স্ত্রীপুরুষের মিলিত-শক্তিতে, পুনরায় সমাজের উন্নতি ও গৌরবশ্রী দেখিয়া, আমরা ধন্য হইতে পারিব।

মহারাষ্ট্রী

মনোরঞ্জন সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ —

পুনর্বিবাহ – লেখিকা শ্রীমতী কুমারী কৃষ্ণাবাঈ ঠাকুর, এম এ.—।

এই বিষয়ে, অধিকার-পূর্ব্বক কিছু বলিতে হইলে, শাস্ত্রজ্ঞান, আচার পদ্ধতি ও রীতিনীতিসম্বন্ধে বিশিষ্টজ্ঞান, পরিণত-বয়স, অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ-অনুভব, উদাহরণ প্রভৃতি থাকা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, এই বিষয়টি এরূপ স্বাভাবিক যে, শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলেও যেহেতু ইহা বুঝিতে পারে না, বা এ সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না, এমন নহে। পুণ্যশীল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বিধবা-বিবাহ) আইন-পাশ করাইতে যে এত আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার বীজ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান-রহিত প্রেমমূর্ত্তিতে নিহিত ছিল। এবিষয়ে বিচার ও আলোচনা করিতে হইলে, উচ্চ-উদারপ্রাণ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়, যুক্তিপূর্ণবিচারবুদ্ধি, স্বার্থহীন মন, এবং সমাজে বিধবাদিগের 'কষ্টপ্রদস্থিতি'সম্বন্ধে পূর্ণ-অনুভূতি থাকা প্রয়োজন।

পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, কি না, এসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ বিদ্যমান। ঈশ্বরচন্দ্র, রাণাডে—প্রভৃতির মতে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত; অপরপক্ষের মতে উহা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যুক্তিতর্কদ্বারা কখনও তত্ত্ববোধ হইতে পারে না। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, কি না, নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা—ন্যায় নীতি ও ভূতে-দয়া, এই তিন আদিতত্ত্ব দ্বারা বুঝিতে হইবে। কেবল শাস্ত্রের শব্দ ও ধ্বনির উপর নির্ভর না করিয়া, তাহার মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। শাস্ত্রে ও লোকাচারে বিরোধ উপস্থিত হইলে, আমরা শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া দেশাচারকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিই। অতএব, বিধবাবিবাহসম্বন্ধেও, বৃথা-শাস্ত্রালোচনা না করিয়া, বর্ত্তমান সামাজিক-অবস্থায় উহার প্রয়োজনীয়তা আছে, কি না, লোকাচার উহা অনুমোদন করে, কি না, উহার কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে, তাহা দূর করার উপায়—প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করা অধিকতর লাভজনক।

কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রীপুরুষসকলের স্বার্থ, সুবিধা ও মত বিবেচনা করিয়া, যে রীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই প্রকৃত লোকাচার। দেশাচার ও সামাজিক রীতিনীতির উৎপাদক, পালক ও পরিচালক — দেশের জনমণ্ডলী। রীতি-প্রচলন করা, না-করা, প্রত্যেকব্যক্তির হাতে। আমরাই যে আচার ও নীতির জনক ও পালক, একথা বিস্মৃত হইলে, আমরা, স্বাধীনতা হারাইয়া, লোকাচারের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। তখন, আমাদের কল্যাণকর আচার-পদ্ধতিও, আমাদের ব্যক্তিত্ব-নাশ করিয়া, সমাজে প্রবল হয়। অতএব, যাহাতে ন্যায়বুদ্ধি ও ভূতে-দয়ার উপর লোকাচার প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের সকলেরই তাহা কর্ত্তব্য।

সমাজ বলিতে, অনেকলোকের সমষ্টি বুঝায়। যে সমাজে বিচার-হীন ও পরাবলম্বী লোকের সংখ্যা অধিক, তাহা অন্ধ-সমাজ—তাহাতে ধর্ম্মবিষয়ে, আচারবিষয়ে ও রীতিনীতিবিষয়ে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়—অনেক অনিষ্টকর কুপ্রথা প্রচলিত হয়—অন্যায় নিষ্ঠুরতা—স্বার্থপূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধাচার রীতিতে পরিণত হয়।

বিবাহ ধার্ম্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারস্বরূপ। স্ত্রী ও পুরুষ—উভয়ের শক্তি ও সদগুণাবলীর সাহায্যে সংসারযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে ও জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে—পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। দম্পতি বিবাহদ্বারা বুদ্ধিতে, মনে, হৃদয়ে দেহে ও আত্মায়—পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সুখী হন। দৈহিক-মিলনদ্বারা প্রজা উৎপন্ন হইয়া, জগতের স্থিতিরক্ষা হয়।

মহারাষ্ট্রী-লেখিকা—কুমারী কৃষ্ণা[illegible] এম এ — মনোরঞ্জন।

প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের জীবনে ঐহিক সুখ ও সঙ্গলিপ্সা, প্রেমপিপাসা, সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছা এবং স্বার্থ ও পরমার্থ-সাধনবাঞ্ছা, অল্পবিস্তর জাগরূক আছে। স্ত্রীপুরুষের মিলন ও বিবাহ, এইইচ্ছাও আকাঙ্ক্ষা সাধনের নিমিত্ত।

নৈতিক দৃষ্টিতে স্ত্রীপুরুষের নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণিবিভাগ হইতে পারে —

(১) আজন্মব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী পুরুষ বা স্ত্রী, (২) শুদ্ধপবিত্র বিবিক্ত-জীবন, (৩) বিবাহিতা বালবিধবা, (৪) পুনর্বিবাহিত প্রৌঢ়-জীবন।

পতি পত্নীর জীবদ্দশায় যেরূপ গাঢ় প্রেম থাকে, একের পর [illegible]

গমনের পর, সেরূপ প্রগাঢ়প্রেমপুটে ঐহিক বাসনা ও লালসা আবদ্ধ থাকিতে পারে না—ক্রমে ঔদাসীন্য আসিয়া পড়ে। বালবিধবাদের মনে, কিছুমাত্র দাম্পত্যপ্রেম জন্মে না। অনেক পত্নী, বিবাহিত-জীবনেও পতিপ্রেমে বঞ্চিতা থাকে। বিধবা হইলে, তাহাদের পক্ষে একলক্ষ্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্যপালন করা কঠিন। স্ত্রীবিয়োগের পর, পুরুষ,পুনর্বিবাহ না করিয়া মৃতপত্নীর স্মরণ ও ধ্যান করিয়া, চিত্তের শান্তি ও আত্মার কল্যাণজনক অনুষ্ঠানে অবশিষ্ট-জীবন অতিবাহিত করেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অনেকে বৃদ্ধবয়সে পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে ইতস্ততঃ করেন না। পুরুষ—সবল, স্বাবলম্বী ও সামর্থ্যবান। তাঁহারা—লোকনিন্দা গ্রাহ্য করেন না। স্ত্রী—স্বভাবতঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তা মহারাষ্ট্র ছাত্রীমণ্ডলী—(মনোরঞ্জন)

চঞ্চলচিত্ত ও পরমুখাপেক্ষী। তাহাদের জন্য, কঠোরসন্ন্যাসব্রত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বিধবার দুঃখ অপার; কিন্তু সকল অনর্থের মূল, স্ত্রীজাতিকে, এদেশে সজীব প্রাণী বলিয়া কেহ মনে করে না। তাহাদের শিরে অনন্ত দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের মনে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত করিয়া দেওয়া হয় নাই কেবল লোকনিন্দার ভয়ের শাসনে তাহাদিগকে ভীত ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহাতে বিচারশীলতা জাগ্রত হয় ও সুশিক্ষার প্রচার হয়, তাহা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বালবিবাহ প্রচলিত থাকিলে, বর পতি-নির্ব্বাচনে পত্নীর মত না-থাকিলে, বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যে বাধ্য করা অন্যায় ও অসঙ্গত। বিধবা হইলেই, আপনা-আপনি বৈরাগ্য, আসিয়া উপস্থিত হয় না; তদুপযোগী শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। যতদিন সমাজে বালবিবাহ প্রচলিত থাকিবে, যতদিন স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত না-হইবে, যতদিন পুরুষ আপন দৃষ্টান্তদ্বারা, স্ত্রীর বৈধব্য-জীবনযাপন সুগম না করিবেন, তত দিনপর্য্যন্ত, বিধবাকে বলপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য করিলে, অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ করা হইবে। বালবিধবা পুনর্বিবাহ করিলে, এবং কোন পুরুষ বালবিধবা বিবাহ করিলে - সমাজে তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক সম্মানের চক্ষে দেখা উচিত। তাঁহাদিগের উপর কোন প্রকার ঠাট্টা, বিদ্রূপ, নিন্দা ও অসম্মানজনকবাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে।

নির্ব্বাসিতা

[রাজকুমারী শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী]

নিবিড় বিজন-বনে নীরবে লক্ষ্মণ—
ভাসি আঁখিনীরে—
বিষাদ-ব্যথিত হিয়া, প্রতিমায় বিসর্জ্জিয়া,—
নিরঞ্জন জাহ্নবীর তীরে;
আকুলহৃদয়ে দাঁড়াইয়া, ভাবিতেছে মনে,—
'হায় রে! কেমনে যাব ফেলি এ রতনে!'

ক্ষণকাল পরে, সাধ্বী বলে ধীরে ধীরে—
মুছি অশ্রুধার—
'লক্ষ্মণ! বলিয়ো তাঁরে— সেই চির-গুণাধারে,
এ দাসীরে করি পরিহার,
বৃথা ক্ষোভে না-হয়ে কাতর, ভ্রাতৃবর্গসনে,
সুখেতে পালুন প্রজা—সুপ্রশান্ত মনে।

পত্নিভাবে পরিত্যাগ ক'রেছেন তিনি
যদিও আমায়,
তাঁরি ক্ষুদ্রপ্রজা হেন　　গণনীয় হই যেন,
থাকি আমি যখন যথায়!
তিনি— এ বিশালসসাগরা রাজ্যের রাজন,
তাঁর অধিকার ছাড়া নহি কদাচন,
চিরদিন বিধি যেন করেন তাঁহার
মঙ্গল সাধন! —
তাই শুনি, এ বিজনে— এ বেদনা ভুলি মনে,
শান্তিময় হেরিব কানন;
নিকটে—বা দূরে—বাস করি, সজনে—বিজনে,
আমি তাঁর চিরদাসী—তাই জানি মনে।
নারীর দেবতা পতি, পতি প্রাণ মন—
পতি মহানিধি,
হে সৌম্য রঘুনন্দন! যাও, যথা সে রতন,
হইয়ে আমার প্রতিনিধি;
কৃতাঞ্জলিপুটে, নতশিরে প্রণমি চরণে,
বলিবে 'তাঁহারি সীতা জীবনে মরণে!'
স্বপনে—বা জাগরণে—পতিবিনা আর
কভু নাহি জানি,
পতিপ্রিয় অনুষ্ঠান　　করি যদি যায় প্রাণ,
সে মম সুখের বলে মানি;
অতএব, তাঁহার নিদেশে, এই ঘোর বনে
যাপিব জীবন, সদা তাঁরে ভাবি মনে।
যাও বৎস! অগ্রজের পালহ আদেশ
মোরে পরিহরি;
মম ভাগ্যে ছিল যাহা, ঘটিয়াছে আজি তাহা,
কি হইবে পরিতাপ করি;—
কেন বৃথা দোষ তুমি তাঁরে—কি দোষ তাঁহার?
নিতান্তবিমুখ জানি নিয়তি আমার!"
এত বলি নীরবিলা জনক নন্দিনী—
পতিপ্রাণা সতী;
ভাসিয়া নয়ননীরে,　　আকুল লক্ষ্মণ-ধীরে
প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণতি
চ'লে যায় ব্যথিত হৃদয়ে,　　অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
অতুল রতনে ফেলি বিজন কাননে।
অদূরে শোভিছে কিবা বাল্মীকিঋষির
শান্ত তপোবন—
মাধবী, মল্লিকা, এলা, মালতী, যূথিকা, বেলা,
বল্লরী বিতান অগণন,
মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ, বসন্ত উদয়ে
সাজিয়াছে রক্তাশোক নবকিশলয়ে!
পল্লবিত তরুলতা ঘনসমাবেশে
কিবা অনুপম,
রবিকর খরধারে,　　পরেশিতে নাহি পারে,
শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়া মনোরম,
কমণ্ডলু জপমালা শাখে　ঝুলিছে বল্কল,
যেন রে তপস্বী বেশ ধরে তরুদল!
বহিছে আপন মনে, কুল কুল করি,
গোদাবরি জল,
সুদূর অযোধ্যাপানে,　　নেহারি আকুলপ্রাণে
আঁখিজল ঝরে অবিরল।
কতক্ষণে, সজলনয়নে, কহে সাধ্বী ধীরে—
"এরূপে কি, রঘুরাজ! ত্যজিলে দাসীরে?
হে নাথ! কেমনে কহ বাঁচিবে এ দাসী
ও পদ বিহনে?
তোমার বিরহ রবি,　　ধরি অনলের ছবি,
দহিবে যখন এ বিজনে!
হায় নাথ! বল কেবা আর, স্নেহবারি দানে,
নিবাইবে দুঃখানল এ পোড়া-পরাণে?
আজি কি হে এইছলে ত্যজিলে দাসীরে,
রঘুকুলপতি!
এ জগতে, রঘুবীর,　　তোমাবিনা জানকীর
বল, নাথ! কোথা তার গতি?"
মুরছি পড়িলা রাজবালা বেলাভূমি 'পরে—
পুষ্পিত-বল্লরী যথা ছিন্ন বায়ুভরে।

মেয়েলী শাস্ত্র-তন্ত্র-মন্ত্র-প্রবাদমালা

[শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী]

প্রত্যেক সমাজের উপর সেই সামাজিক রমণীদিগের প্রকৃত প্রভাব কতদূর, তাহা সাধারণলোকে যথাযথভাবে অনুভব করিতে পারেন না। পত্নী প্রভৃতি সবভাবে তাহারা পুরুষের সেবাদি ত করিয়াই থাকে আবার, মানুষমাত্রকেই তাহারাই 'মানুষ করে' সংসারকে তাহারাই মাথায় করিয়া রাখে—সমাজ যন্ত্রের প্রধান শক্তি তাহারাই, তাহাদের প্রভাবেই সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

চৈতন্যময় স্বয়ং ব্যষ্টিলক্ষণাক্রান্ত। তাই, সৃষ্টজাবৎপদার্থই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ভাগে- অনু পরমাণুতে বিভক্ত। জীব জগতে সমগ্রমানবমণ্ডলী একটি মহাজাতি। এই মানবজাতির মধ্যে আবার, দেশ ধর্ম—বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে কত শত বিভাগ! প্রতিধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়গত আবার কত বিশেষ-বিশেষ বিধি বিধান আছে। সমগ্রসৃষ্টিই যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন, তেমনই প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ দ্বিবিধ অনুশাসন-দ্বারা অনুশাসিত,— এক, সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত শাস্ত্রবিধি; দ্বিতীয়, সেই ধর্ম্মভুক্ত শক্তিরূপিণী মহিলাগণ-কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বিচিত্রনীতি সূত্র—যাহাকে দেশাচার, * সমাজবিধি, 'কু সংস্কার,' মেয়েলী-'শাস্তর' প্রভৃতি বিস্তৃত সংক্ষিপ্ত নানা আখ্যায় অভিহিত করা যায়। তাই বলিয়া, যাবতীয় দেশাচার সমাজবিধি-কুসংস্কারই যে মেয়েলী শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত— তাহা নহে। তবে, সেগুলির অধিকাংশই মূলতঃ মেয়েলী-শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত—বলিয়াই মনে হয়। ফলে—মেয়েলী-শাস্ত্র বিবিধমুখী; সর্ব্ববিধ শাস্ত্র বা বিদ্যা সম্বন্ধেই তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র বিধি বিধান—টীকাটিপ্পনী আছে!—প্রত্যেক দেশে—প্রত্যেক-জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন সেই গণ্ডিভুক্ত পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রবিধানাদি আছে—তেমনই সেই সকল শাস্ত্রবিধানেরই আর একটা করিয়া মেয়েলী সংস্করণও আছে। বলা বাহুল্য যে, এই মেয়েলী-সংস্করণের বিধি-বিধানের অনেকাংশই কার্য্যতঃ অনুসৃত অনুষ্ঠিত হয়।— প্রকৃত পক্ষে, যতবিধ বিদ্যা—কলা—শাস্ত্রপ্রভৃতি মানব-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির উপরেই মহিলাদিগের স্বতন্ত্র টীকা টিপ্পনী আছে এবং সর্ব্বত্র - যাবতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই - মেয়েলী শাস্ত্র তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতিই প্রায় সর্ব্বাগ্রেই অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম— কর্ম্ম—চিকিৎসা—বিজ্ঞান— সমাজনীতি প্রভৃতি মানব-জ্ঞানের সর্ব্ববিধ মুখ্য বা গৌণ শাখা-প্রশাখারই উপরে মহিলাগণকৃত এই পূরণকারী (complementary) বা যৌগিক (supplementary) ভাষ্যাদির প্রভাব ভাবিয়া দেখিলেই, স্পষ্ট বুঝা যায়—মানব সমাজে রমণীর স্থান কোথায়? প্রকৃত এবং, সর্ব্বত্র তাহাদের যথাপ্রাপ্য মর্য্যাদা তাহাদিগকে প্রদত্ত হয়— কি না?

সে যাহা হউক, যে মেয়েলী শাস্ত্র - তন্ত্র—মন্ত্র প্রভৃতির এতটা প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, বিভিন্ন সম্প্রদায়— সমাজ— প্রদেশগত, সেইসকল শাস্ত্র তন্ত্র-মন্ত্রাদি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, সে-গুলির যথার্থ মূল্যবত্তা—সমীচীনতা দোষগুণ, এবং সঙ্গেসঙ্গে সেই-সেই সম্প্রদায়, সমাজ ও প্রদেশের আচার সংস্কারাদির বেশ একটা পরিস্ফুট ইতিবৃত্ত — তথ্য পাওয়া যাইতে পারে—বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়াই, আজ আমি (নমুনার স্বরূপ কয়েকটিমাত্র মেয়েলী শাস্ত্র-তন্ত্র মন্ত্র এবং "ডাকের কথা" সংগ্রহ করিয়া "ভারতবর্ষের" পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম। অবশ্য, এগুলির প্রত্যেকটিই যে, আমাদের —মেয়েলী—নিজস্ব, এমন স্পর্দ্ধার কথা আমি বলি না। তবে, এইগুলি যে, মুখ্যতঃ মেয়েদের মধ্যে—মহিলা-মহলেই সমধিক প্রচলিত, ইহা স্থির। এই প্রস্তাবটি বিশাল—দুই

* দেশাচারের প্রভাব বড় সামান্য নহে ব্যবহারশাস্ত্রমতে শাস্ত্রের বচনাপেক্ষাও দেশাচারের মূল্যবত্তা অধিক -"In Hindu Law, Usage outweighs the written Text of Law" - MAYNE ON HINDU LAW & USAGE ভাঃ সঃ।

চারি জনের চেষ্টা এপক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই, আমি সমগ্র বাঙ্গালাভাষা ভাষী প্রদেশের ভগিনীমাত্রকেই যথাসাধ্য আমার এই প্রচেষ্টায় যোগদান করিতে সাদরে সনির্ব্বন্ধে অনুরোধ আহ্বান করি, কারণ, সকলের সমবেতচেষ্টা-ব্যতীত এই বিপুলকার্য্যে সফলকাম হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে।*

মন্ত্র-তন্ত্র

এগুলি প্রায় উদ্ভট ভাব ও অর্থ প্রকাশক--বিচিত্র শব্দ সমষ্টি।

বাড়ী বন্ধন।--(১) অসিদ্ধ ব্রাহ্মণের সাতটি কন্যা--কাপাসী, কাসুন্দী, রক্ত, মহিষী, কেঁকড়া, কুঁচে, কচ্ছপ--যাত্রা নাস্তি। শুয়ে বলিলে ঘররক্ষা, বসে' বলিলে বাড়ী রক্ষা, দাঁড়িয়ে বলিলে পাড়া রক্ষা।--বাম পাশে বামকালী, রক্ষা করো মা আমার বাড়ী।

(২) বাড়ীবন্ধন, বেড়ুলাবন্ধন, পাতালে বন্ধন নাগ, ... র বাড়ীতে ফেলে দিলে লোহার জাল। লোহার জাল ধরে যে আসে, দোহাই-ধর্ম্ম তারে নাশ।

(৩) রাম নামের ঘরখানি, কৃষ্ণ নামের চাল, হরিনামের বাঁধনগুলি, দুয়ারে গোপাল।

শয়নকালে এই মন্ত্রের যে কোনওটি উচ্চারণ করিয়া, তিনটি তুড়ি ও তিনবার হাত-তালি দিলে, বাটীতে চোর প্রবেশ করিতে পারে না।

দুঃস্বপ্ন-প্রতিকার।--(১) দুর্গা গেলেন ইন্দ্রের বাটী, ইন্দ্র দিলেন খাট-বাট। 'কাজ কি আমার খাটবাটে, কাজ কি আমার রত্নসিংহাসনে! আমি বড় বিপদগ্রস্ত হ'য়ে এসেছি!'--'কি বিপদ--কি বিপদ?'--'স্বর্গের ভগবানচন্দ্র, পদ্মের মালা গলায় দিয়ে, জলেডুবে মরেছেন!'--দিবাস্বপন, দিবাস্বপন। পদ্ম নয়, সে চাঁদমালা--চার' চাঁদ--পদ্মের পাতায় দধিভোজন!'--দুঃস্বপন দূরে যা--সুস্বপন ঘরে আয়।

(২) 'শ্রীগোবিন্দ'--এই নাম দশবার জপ ও স্মরণ এবং "অশ্বত্থ"-বন্দনা করিতে হয়।

* আমরা লেখিকার এই প্রস্তাব সাদরে অনুমোদন করি, এবং আমাদের পাঠিকাবর্গকে এই শ্রেণীর সংগ্রহ পাঠাইতে একান্ত অনুরোধ করি।--ভাঃ সঃ।

ভূতের ভয় নিবারক।--ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নি আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ বুকে আছেন--করবে তোর কি?

সর্পভয় নিবারক--গরুড় গরুড় গরুড়! অলিতে গলিতে--বনেবাদাড়ে বেড়াই, মা! লেজ দেখিয়ে, মুখ লুকিয়ে রেও! "আস্তিকস্য ইত্যাদি"--'মনসা প্রণাম'।

রোগ-নিবারণ।--শোনরে নাটা--শোনরে কাটা, সাগরে পড়ুক তোর ডাল, আমার বাছাকে নিরোগ করিস তো বাঁচবি কতকাল।

বিধি নিষেধ

এগুলি প্রায়ই কার্য্যকারণ সম্পর্ক বিহীন, অমূলক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন, কতকগুলি বা শিশুদিগকে ভয় প্রদর্শন চ্ছলে শিক্ষাদিবার উদ্দেশেই রচিত, বলিয়াই মনে হয়।--

১। শনি-মঙ্গলবার পাকশালার হাঁড়ি বাড়াইতে ফেলিতে নাই।

২। বৃহস্পতি ও জন্মবারে কাপড় ক্ষারে দিতে, সেলাই করিতে, ধোপার বাড়ীদিতে এবং ক্ষৌরাদি করিতে নাই।

৩। লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি পূজার পরবর্ত্তী সাত-দিন, কোথাও যাত্রা, ক্ষৌরাদি ও ক্ষারাদি কার্য্য নিষেধ।

৪। চড়কের পর সজিনা ডাঁটা ভক্ষণ নিষেধ--কারণ, উহা শিবের জটার তুল্য।

৫। শয়ন একাদশীপর্য্যন্ত কলমী, কমল প্রভৃতি তুলিতে নাই--কারণ, ঐকালে নারায়ণ কমলবনে শয়ান থাকেন।

৬। জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার দেখিবার পর--আর সিঙ্গী মাছ খাইতে নাই।

৭। জগন্নাথ মহাপ্রভুর চন্দ্রবদন দর্শন করিবার পর--আর চাঁদা মাছ খাইতে নাই।

৮। লোকের পাতে আস্ত কলা খাইতে দিতে নাই--ভাঙ্গিয়া দিতে হয়--কারণ, আস্ত কলা পিণ্ডে দেওয়া হয়।

৯। উত্তর শিরঃ হইয়া শুইতে নাই কারণ, ঐরূপে শায়িত করিয়া কোনও কোনও বর্ণের শবদাহ হয়।

১০। পূর্ব্ব শিরঃ হইয়া শয়ন করিলে--"পূর্ব্বধর্ম্ম বিনশ্যতি।"

১১। পশ্চিম শিয়রে শয়ন করিয়া স্বয়ং শিব দুর্গার পাল

বেচারা গণেশেরই কি অনর্থই না ঘটিয়াছিল, সুতরাং, তাহাও পরিত্যাজ্য।

১২। বালিশের উপর বসিলে—পাছায় ফোড়া হয়।

১৩। দাড়াইয়া প্রস্রাব করিলে, পূর্ব্বপুরুষের মুখে পড়ে!

ডাকের কথা

'ডাকের কথা' বা 'প্রবাদমালা', এপর্যান্ত পুঁথি কেতাবে—কাগজ পত্রে বহুসংখ্যকই প্রকাশিত হইয়াছে। তবে, আমি এপর্যান্ত এসম্বন্ধে প্রায় চারিসহস্র বাঙ্গালা-প্রবাদ,সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে সকল, এই প্রবন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া প্রকাশ করিতে গেলে, প্রবন্ধের অযথা কলেবর বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং, সেচেষ্টা হইতে অগত্যা বিরত হইলাম। কেবল, যেগুলির একটু বিশেষত্ব আছে, তাহার কতকগুলিই এখানে বর্ণমালাক্রমে প্রকটিত হইল:

কথায় বলে—

১। অকম্মা নাপিতের ধামাভরা ক্ষুর।

২। অকেজো বউটি বড়, লাউ কুটতে বিষম দড়!

৩। অগুণ মানুষ গুণ না চেনে, মূষা না চেনে বিড়ালী, অপ্রেমিকে প্রেম না চেনে, কাঠ না চেনে কুড়ালী।

৪। অঘটন ঘটায় যত, বিষ্ণে তার বলব কত!

৫। অনেক ভুভাগ্য—যার ঘরে নাই মা, অনেক ভুভাগ্য—যার ঘরে নাই ছা!

৬। অবাক করলে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে!

৭। অবাক সৃষ্টি করলেন চুপে, নাক নাই—তার আতর গোঁফে!

৮। অবোধেরে ঠকায় বোধায়, বোধারে ঠকায় খোদায়।

৯। অভদ্রা বরিষাকাল—হরিণ চাটে বাঘের গাল! 'শোনরে হরিণ তোরে কই, সময়গুণে সকল সই!'

১০। অভাগীর বক্ত!—জোয়ান্ দেখে করলাম খসম—, সেও হাগে রক্ত!

১১। অভাগীর বক্ত ফাটা;— একে ঠেটা, তায় ইঁদুরকাটা!

১২। অমানুষে মানষ নিন্দে, বদনা নিন্দে ঝারি, জোনাক পোকায় সূর্য্যে নিন্দে—ঐ দুঃখেই মরি

১৩। অমানুষের বোল—তিত নিসিন্দের ঝোল!

১৪। অদ্ধেক সকল ঘর-গোষ্ঠী, আর অদ্ধেক মা ষষ্ঠী।

১৫। অল্পজলের তিত পুঁটি, তার এত ফট্ ফটি।

১৬। অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি।

১৭। অসহন সইতে নারি, থালায় জল রেখে ডুবে মরি!

১৮। অষ্টাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা!

১৯। অষ্টাঙ্গে আশলা, গোদাপায়ে পা-শলা!

২০। অসতী সতীরে নিন্দে, ঘি নিন্দে ময়বারে বেশ্যা যে—সে পুতে নিন্দে, চোর নিন্দে চৌকীদারে!

২১। অক্ষয় কবচের জোরে, মোর পুতে কেবা মারে!

২২। আয়ি ঘর যাও, ভাই ঘর যাও, কাট্‌না কেটে ভাত খাও।

২৩। আড়ের মুড়া—ঘৃতের মুড়া, দাও জামাইয়ের পাতে রুইয়ের মুড়া—কাষ্ঠ মুড়া, দাও এনে মোর পাতে!

২৪। আয়েস লুকাবি, বয়েস লুকাবি, গালভাঙ্গা কোথায় লুকবি!

২৫। আক্ চেঁচে্তে কুকসিমের কথা!

২৬। আকাল গেল—সুকাল এল, কত দোষ দিয়ে বোন্‌পো গেল!

২৭। আকাশ থেকে বাহির হল জনপাঁচ সাত; যার যেখানে মর্ম্মব্যথা, তার সেখানে হাত!

২৮। আগে না-পাল্লে রাখ্‌তে, এখন এলে রাজা নিতে!

২৯। আগে না বুঝিলে, বাছা, যৌবনের ভরে; শেষেতে কাঁদিতে হবে অজঝর ঝুরে!

৩০। আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া—তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে!

৩১। আজিকে বিফল হল, হতে পারে কাল, তুফানে পড়েছে নৌকা—ছাড়িবনা হাল!

৩২। আটে-কাঠে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়।

বস্তু, ব্যক্তি, বর্ণ, বা স্থানবিশেষ-বিষয়ক

এখানে, আমি একটা কথা বলিয়া রাখি—সম্প্রদায়, বংশ এবং গাই প্রভৃতি সম্পর্কীয় যেসকল 'ডাকের কথা' প্রচলিত আছে, সেগুলিতে প্রায়ই কোন-না কোন পক্ষের বিদ্রূপ-ভাষণ—নিন্দাবাদ আছে। আশা করি, সেগুলিকে কেহ, 'মান-হানিকর' মনে করিয়া, উষ্মাপরবশ হইবেন না—কারণ সেগুলি 'কথার কথা' মাত্র !

১। আকাশ থেকে পড়্‌লো—এটা ঘুণে খেগো চাঁদ,
নিমাই মোড়ল না থাক্‌লে শান্তিপুর আঁধ !

২। আগে হাটে, পাঁঠা কাটে, প্রদীপ উস্‌কোয়, দই বাটে, ভাঁড়ারী, কাঁড়ারী, রাঁধুনী বামুন—যশ না-পায় এই সাতজন !

৩। আগে হাটনী, পান-বাটনী, প্রদীপ বেড়ানী, বউর ধাই—এই সকল কাজে যশ নাই।

৪। আপ্‌না-আপ্‌নি বেড়াই, বাছা,
আপানার বলে কঁদে,
রাজা-পাত্র-সাধু মহাজন -
সকলেই আমার পোদে !

৫। আফিমে—ভাল, গেজেল—চোর,
আর, গুড়ুকখোরের ঘরে সদাই সোর !

৬। আবর তাঁতি গোবর খায়,
মাগের কথায় মক্তে যায় !

৭। আমরা বেদিয়ার জাত—মাঠে ফেলি টোল,
বৃষ্টি-বাদল হলে পরে, বসে বাজাই ঢোল !

৮। আমার নাম যমুনাদাসী—
পরের খেতে ভালবাসি !

৯। আমার নাম রণরঘু—ভিটেতে চরাই ঘুঘু।

১০। উত্তুরে লোক পরিপাটী,
দেখলে লাগে দাঁত-কপাটী !

১১। উড়ো-সম্পর্কে পাইকের নাতী,
মাড় খেয়ে মর্‌লো তাঁতি !

১২। এক গাঁজার তিনধর্ম্ম—তোতা, পেচা, কুম্ভকর্ণ !

১৩। এক টাকায় পোদ—চৌধুরী,
লাখ টাকায় বামুন—ভিখারী !

১৪। এক বোকা কেতো কামার, আর এক বোকা
ভাসুর আমার, আর এক বোকা তুই !—
পথ না দেখে পথে কাটা দেয়,
আর এক বোকা সেই !

১৫। এমন রাজার রাজ্যে— কে করিল বিধি,
ঘোল খায় কৃষ্ণদাস— কড়ি দেবে নিধি !

১৬। কথাতে সাউ শুঁড়ি, কথাতে বাটপাড়ী !

১৭। কার ঘুম ধানিগাছে—যদি ঘুম চক্ষে আছে !

১৮। কাগজ কলম কালী— এই তিন নিয়ে বালী।

১৯। কাঙ্গাল কুষ্ঠী বেণে,
বেচে কি ?—শুঠ, আর ধনে !

২০। কাঙ্গাল বাঙ্গাল খস্তে-- এই তিন নিয়ে নস্তে।

২১। কালী ! কত কবরি কর,
তবু না কাতর হবে চাঁদ সদাগর !

২২। কায়েত, কালসাপ, দেদোনারী--
তিনজনকে পরিহরি।

২৩। কায়েত হাড়া, বেগুনের খাড়া !

২৩(ক)। কায়েত কুকড়ো কাক—তিন দিয়ে খায়
বামুণ কুকুর বাঘ - তিন সঙ্গী না চায়।

২৪। কাল বামুণ, কটা শূদ, বেটে মুসলমান
ঘর জামাই, আর পোষ্যপুত্র - পাঁচজনই সমান !

২৫। কেবা জানে গাই-গুই—উদনারায়ণের ভাই মুই,
কোদাল পাড়ি, ভাত খাই,
লেগে যায়—তো লেগে যাই !

২৬। কৈবর্ত্ত করুণাময়, যা করেন---তাই হয় !

২৭। কায়েত মরে' জলে ভাসছে,
কাক বলে, কি ফিকিরে আছে।

২৮। খুয়ে বুনো তাঁতি, আট-চোকে হাত !

২৯। গরুর মধ্যে এঁড়ে, মানুষের মধ্যে ভেড়ে,
খাওয়ালে দাওয়ালে মারে তেড়ে !

৩০। গাঁজা গুলি অন্নভাঙ্গা, তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গা।

৩১। গাঁজা-তাড়ি প্রবঞ্চনা, এই তিন নিয়ে সরশুনা।

৩২। গুপ্তিপাড়ার মাটিতে বাঁদর

৩৩। গুলি-খিলি-মতিচুর --এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

৩৪। ঘোষ-বসু মিত্র— কুলের অধিকারী,
অভিমানে বালীর দত্ত যান্ গড়াগড়ি !

৩৫। ঘোষাল রসাল বড়, বন্দ্যঘাটী শাদা।

৩৬। গোয়াল সন্তুষ্ট বড় পেলে চিঁড়ে দই।

৩৭। চণ্ডী, সপিণ্ডী, কুশণ্ডী—তিন নিয়ে বামন ডি।

৩৮। চার' শাস্ত্র পড়ে যদি মুসলমানের পোলা
তবু না ছাড়িবে তার 'ত্যাল্' 'খাড়্' 'ক্যালা'।

৩৯। চাষা বাড়িলে বামন মারে, কমিলে গরু মারে!

৪০। চোক খোল্লী, দাঁত গজা—
সেই লোকটি নয়কো সোজা!

৪১। ছোট লোকের কড়ি হ'লে—বুদ্ধি হয় নট,
গাধা যখন পাহাড়ে ওঠে—পাহাড়ে দেখে ছোট।

৪২। জগন্নাথে গেলে, হাড়ীর ঝাঁটা খেতে হয়।

৪৩। জল জঙ্গল-আঁধার রাত,
এঁড়ে গরু, ভেড়ে জাত!

৪৪। জলের শত্রু পানা, গায়ের শত্রু কাণা!

৪৪ (ক)। ঠগ তামলী, বিষম তেলী,
সোনারবেণের সঙ্গে পথ না চলি;
যদি আসে সাথে, নড়ী নেবে হাতে।

৪৫। ডোম, বাগ্দী, হোড়েল জাত,
পোষ না মানে আধেক রাত।

৪৬। তাঁতী গোসাই-পচা ভুর,
এই তিন নিয়ে শান্তিপুর।

৪৭। তাল-বাবলা-ছুঁচো বোঁচা,
এই চার নিয়ে মড়াগাছা।

৪৮। তেল, গুগ্গুল, ভেলা—
তিন বৈদ্যের জ্বালা!

৪৯। দাঁতাল-মাতাল সিঙ্গেল অস্ত্রধারী,
কখন না বিশ্বাস করিও এই চারি!

৫০। দূর জামায়ের কাঁধে ছাতি,
ঘর-জামায়ের মুখে নাতি!

৫১। নেয়-থোয়, করে হিত—তাকে বলি পুরোহিত।
দেয় থোয়, রাখে মান—তার নাম যজমান।

৫২। নরা-গজা বিশেষয়, তার অর্দ্ধেক ঘোড়া হয়;
বাইশ বল্দা, তেইশ ছাগলা, গুণে গেঁথে
বরা পাগলা।

৫৩। নিষ্কর্ম্মা পুরুষের তিনটি দড়,
আহার নিদ্রা রাগটি বড়।

৫৪। পাখীর মধ্যে ওঁচা—নাম কাদাখোঁচা!

৫৫। পোল্ (বাগান), পাগল, পুলো (খড়)—
এই তিন নিয়ে উলো।

৫৬। ফল ফল—কদলীফল, সেবায় নারী, আর
ইন্দ্র-জল।
বা, ফলের মধ্যে আম্রফল, সুন্দরী নারী,
আর গঙ্গাজল।

৫৭। বাঁশ, বাকশ, ডোবা—তিন নস্তের শোভা।

৫৮। বানর-সভাকর-মদের ঘড়া—
এইতিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।

৫৯। বামণ গণক কউয়া—এইতিন পরের খাউয়া।

৬০। বেণ্যে কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে—সৈন্ধব লূন!

৬১। বেহারের বামণগুলা বেড়ায় যেন হস্তী,
ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, আর, তর্পণ নাস্তি,
ভোজনান্তে শতরঞ্জে দেয় তারা কিস্তি,
লাঙ্গলের মুট্ ধরে সবাই পায় স্বস্তি!

৬২। বৈশ্য—বিশ্বাস ঘাতক!

৬৩। ভাঙ্গা ঢোল, তালকাণা যন্ত্রী,
শণি রাজা, তার কুব্জ মন্ত্রী!

৬৪। মাছ চিনে গভীর জল,
পাখী চিনে ডাল,
মা জানে পুতের দরদ—ছাতি ফাটে যার!

৬৫। মাতার সমান্ নাই শরীর-পোষিকা,
কান্তার সমান্ নাই শরীর-তোষিকা!

৬৬। মিছে ডুমুর গুমর করে,
পাক্লে পরে খসে পড়ে!

৬৭। মিড়-মিড়ে প্রদীপ,
আর বিড়-বিড়ে বউ!

৬৮। মুচীর নেই নাক, শুঁড়ির নেই কাণ!

৬৯। মুখুটী কুটীল বড়, বন্দ্যঘাটী শাদা,
তার মধ্যে বসে আছে—চট্ট মহারাজা!

৭০। মোগল-পাঠান হদ্দ হৈল—পারসী পড়েন তাঁতি;
বাঘ পালালে—বিড়াল এল, শীকার কর্ত্তে হাতি।
ময়ূর গেল—ছাতারে এল, ফুলিয়ে বুকের ছাতি!

৭১। যদি বেণ্যে বৈষ্ণব হয়, তবু অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।

৭২। যুগীর গীতে ভণিতা নাই!

৭৩। সকল তাঁতী তাঁত বুনে,
আপন আপন কোলে টানে!

৭৩। সহজে কৈবর্ত্তজাত নীচ সঙ্গে গণি,
ন নীচ যবনাৎ'—তা হৈতে অধিনী।

৭৫। সিদ্ধি খেলে বুদ্ধিবাড়ে,
গাঁজা খেলে—লক্ষীছাড়ে!

৭৬। সো-শুড়ি-এঁড়ে—
এই তিনকে যে বিশ্বাস করে, সে ভেড়ের ভেড়ে!

নীতিমূলক

১। উঠে পড়া, পাশ মোড়া, মধ্যে মধ্যে ভীমে চোঁড়া
ক্ষেপার চৌদ্দ,ক্ষেপীর আট—এই নিয়ে জনম কাট!
এও যদি না পার—ভাগ্যের খাদে ডুবে মর!

২। কখন খেওনা তুমি—তালে আর ঘোলে,
কখন ভুল না যেন—কু লোকের বোলে।

৩। কফ পিত্ত-বাই—তিন নষ্ট করেন, পটল ভাই!

৪। কজ্জ করে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায় যায়—
তার স্থবিধা পায় পায়।

৫। কাগার শক্র বগা, বগার শক্র বাগা, বাগার শক্র সিংহী, সিংহীর শক্র শৃগাল, শৃগালের শক্র মহাকাল।

৬। কাক হ'লেন কোকিল-পাখী, শেয়াল হ'লেন চন্দ্রমুখী, স্বর্গের বলিরাজা হলেন ব্যাঙ্—অবশেষে, বামনের হাত হৈতে পুছ কল্লেন চ্যাং!

৭। কাণা-খোঁড়ার সহস্র দোষ, কুঁজের নাই অন্ত,
একশত বেয়াল্লিশ দোষ—উঁচু যার দন্ত!

৮। কাদা মেখে ধোয় কাদা—তারে কে না-বলে গাধা!

৯। কাপড় কিনবে কাদা পায়,
গরু কিন্‌বে কাপড় গায়।

১০। কালী-কলম-কসী—তিন নিয়ে দপ্তরে বসি।

১০। কি মজার শ্বশুরবাড়ী—
যার আছে পয়সা কড়ি।

১১। কুল কলাই—পথের বালাই।

১২। কেশে কুশ ব্যাণা—অভাবে সোন্না।

১৩। কুকুর হ'ল শেয়ালের শক্র, বাঘের শক্র ফেউ।

১৪। খিড়কী-সদরে লাগিয়ে কাঠী,
তবে গিয়ে সিঁদ কাটি।

১৫। খুষকীবাত, হারাম জাত।

১৬। খেয়ে মোতে, মুতে খায়,
সকাল বিকাল নিকালদেয়,
তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।

১৭। গরু বিকায় হাটে, কাপড় বিকায় পাটে!

১৮। গৃহস্থে অলক্ষ্মী পায়, চাল কুটে পিঠা খায়।

১৯। গো পো, চখে খো।

২০। ঘর বাধবে ছাইবে না, ধার দেবে চাইবে না,
বাড়ীতে হাট বসাবে, প্রাত গবাসে মুড়া খাবে।

২১। ঘোল কুল কলা, তিনে নাশে গলা।

২২। চরকা মোর ভাতার-পুত, চরকা মোর নাতী,
চরকার দৌলতে মোর দোরে বাধা হাতি!

২৩। চাউল দেবে যত তত, জল দেবে তার তিন তত;
উথলালে দিবে কাঠি, জ্বাল দিবে উজান ভাটা,
তুলে দেখবে ফাটা ভাত, কেন ঝরিয়ে পাড় পাত!

২৪। চিড়ে বল—মুড়ি বল—ভাতের সমান নয়,
পিসী বল—মাসী বল—মায়ের মত কি হয়!

২৫। ছরত। সচ্চরিত্র। ছয় ভাই,
ছরত বিনা নাই ঠাঁই!

২৬। ডাক দিয়ে বলে রাবণ
কলা পুতগে আষাঢ় শ্রাবণ।

২৭। তাল তেঁতুল কুল—তিনে করে বাস্তু নির্ম্মূল।

২৮। নদীর কূলে চাস—হয় তো ভাল—
নয় তো মন্দ—নয় তো সর্ব্বনাশ!

২৯। পরে তসর, খায় ঘি—তার পয়সার অভাব কি?

৩০। পূবে বাঁশ, পশ্চিমে হাঁস,
উত্তরে কলা দক্ষিণে মেলা।

৩১। বাস করবে—গাঁয়ের মাঝে,
জমী করবে—যার মা বাপ আছে।

৩২। বাসকরবে নগরে, মরবে গিয়ে সাগরে।

৩৩। বিনাশ করিবে আগে—ঋণ অগ্নি-ব্যাধি,
কি জানি, আপদ ঘটে পুনঃ বাড়ে যদি।

৩৪। ভরার চেয়ে অ ভরা ভাল—যদি ভর্ত্তে যায়,
আগের চেয়ে পিছে ভাল—যদি ডাকে মায়।

৩৫। ভাত উথলালে দিবে কাটী,
জ্বাল দিবে গুটি-গুটি, তবে ভাতের পরিপাটি।

৩৬। মাগ করবে জেয়াদা, তুই করবে তো কাদা।

৩৭। মাছ খাবে তো মাগুর, ভজ্‌বে তো ঠাকুর।

৩৮। মাছের মা, শাকের ছা, কচি পাঁটা,
বুড় মেষ দৈয়ের আগ, ঘোলের শেষ।

৩৯। মাছ ধুইলে মিঠে, মাংস ধুইলে সিটে।

৪০। যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তে পা-ধোও।

৪১। যদি থাকে আগা (ঘৃত) পাছা (দুগ্ধ),
কি করে তার শাক্‌-মাছা!

৪২। যার নাই পয়সা-কড়ি,
শাশুড়ী মারে ঝাটার বাড়ী।

৪৩। বাজার ভালবাসা - গৃহস্থের খাসি-পোষা।

৪৪। সজিনার শাক্‌ বলে— আমায় করে হেলা,
আমায় খোঁজ করে— টানাটানির বেলা।

৪৫। শ্বশুরবাড়ী মধুরাপুরী,
দিন পাঁচ সাত আদর ভারি।

৪৬। সমস্ত আশ্বিন, কার্ত্তিকের আট
যে নাচে সে খয়ের কাঠ।

৪৭। হয় না হয় - ভবার যায়,
খায় না খায়—সকালে নায়
তার কড়ি বৈদ্য না খায়।

৪৮। ক্ষীরের মত মিষ্ট নারী,
স্বর্ণ-ক্ষুরে এঁড়ে, বাড়ীর কাছে গেড়ে—
এদের যে বিশ্বাস করে—সে এক ভেড়ের ভেড়ে।

কৃষি-বিষয়ক

১। আঁতে-পুতে করে চাষ, অভাবে সোদর-ভাই;
ঘরে বসে পুছে বাত—
এ বৎসর যেমন তেমন, আর-বৎসর হা ভাত!

২। আট কাজলা, বিছেলেজা,
পালের আগে চলে—গোঁজা,
ছয় মোটা, দুই সরু—
এই দেখে কিন্‌বে গরু।

৩। আয় থাকতে বাঁধে আলি,
তবে খায় নানাশালী।

৪। আশ্বিন গেল—কার্ত্তিক এল,
ছোট-বড় ধান গর্ভ পেলো;
আমার ক্ষেতের পোকা-মাকড়
সব দূর যা—দূর যা।

৫। আশ্বিন-কার্ত্তিকে যদি দিলে ঈশনে,
তবে কোদাল কাঁদে-করে নাচ্‌গে যা কিষ্‌ণে।

৬। আষাঢ় ধুলে, শ্রাবণ পেলে, কন্যা কাণে কাণ;
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে—কোথা রাখ্‌ব ধান!

৭। আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা- যদি বর্ষে কোণা,
তবে পদ্মতে হয় কাল-আমনা।

৮। আষাঢ়ে যে না খাটালে পর,
মিছে কাজে তার সংসার!

৯। আষাঢ়ে রোয় দলকে, শ্রাবণে রোয় কলকে,
ভাদ্রে রোয় শীষকে, আশ্বিনে রোয় কিস্‌কে!

১০। এক জোয়, সাত পোয়!

১১। এক বেটার আশ, আর নদীর কূলের চাষ!

১২। ও কথা কারে ক'ও, বীজ ধান নিয়ে ঘরে যাও।

১৩। কর্ক্কট ছর্ক্কট, সিংহে শুকা, কন্যা কাণে কাণ,
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে—কোথা রাখি ধান!

১৪। কি কর্ব্বে কার্ত্তিকের চাষে,
ভাত পাই না ভাদ্‌মাসে।

১৫। খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়,
দাঁড়িয়ে খাটায় আধেক পায়;
ঘরে থেকে পোছে বাৎ—
এ বৎসর যেমন-তেমন, ফিরে বৎসর হা ভাত!

১৬। গরু কিন্‌বে আগে-পাছে,
পুকুর কাটাবে বাড়ীর নীচে।

১৭। ঘাস খেলে, জল খেলে, গৃহস্থের উপকার করলে,
গো-জন্ম ত্যজে গন্ধর্ব্ব জন্ম পেলে!

১৮। চৈতমাসে চৈত-কামড়ি,
বৈশাখমাসে ঝেঁৎলা মুড়ী!

১৯। জানু-ভানু-কৃশানু—শীতের পরিত্রাণ!

২০। টক-টেঁশো-আঁটিসারা শস্যশূন্য-আঁশভরা,
এই আম—বিলাবায় ধারা।

২১। ঠক্‌রে-ঠাক্‌রে আন্‌বে,
ত্রিমাত্রা পথে হাঁড়ী জ্বালাবে।

২২। ডাকে পাখী—না-ছাড়ে বাসা,
সেই জান্‌বে আসল্‌ উষা।

২৩। তাল যদি হ'ল কাত,
বার বৎসর দেখে এক রাত।

২৪। তাস-গল্প-পাশা, তিন কম্মনাশা।

২৫। তেল মাখ্‌বে থাবা-থাবা,
চিৎ হ'য়ে শোবে বাবা;
গর্ত্ত দেখে পাতবে পাত—
তবে খাবে প্রবাসের ভাত।

২৬। দশ টাকার ঋণ, এক টাকার ঘৃত কেন।

২৭। দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা,
পূব-দোয়ারী তাহার প্রজা,
উত্তরদ্বারীর মুখে ছাই,
পশ্চিম-দুয়ারীর মুখে আগুন দিয়ে পালাই!

২৮। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, আর গুরু ছয়;
উপাসনা না করিলে গুরু কত্তে হয়।

২৯। দৈয়ের আগ, ঘোলের শেষ,
মাছের মা, শাকের ছা।

৩০। ধান হেন ধন নাই—যদি না হয় ভুষা,
ভায়ের মত বন্ধু নাই—যদি না করে হিংসা!

৩১। ধিকি জাল, ঘন কাঠী—তবে দুধের পরিপাটী।

৩২। নটে ঘটে আড়ায়ে, সজিনা বারমাস।

৩৩। পটকা গরুর হাপানি বড়।

৩৪। কালে আঞ্জায়—তুলে বেচে,
তার তুল্য কি ফসল আছে!

৩৫। ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটী,
বাঁশ রেখে তার পিতামহরে কাটি।

৩৬। বাড়ীর বুড়ো, ক্ষেতের হুড়ো।

৩৭। বাপের জন্মে নাইক চাষ, ধানকে বলে দুব্বঘাস!

৩৮। বার বাড়ী, তের খামার—
যে বাড়ী যাই, সেই বাড়ী আমার।

৩৯। বুনলাম ধান, হৈল তিল,
ফল্‌লো রুদ্রাক্ষ (ওকড়া), খেলাম কিল!

৪০। মরুক্ গরু—হউক ধান;
বছর বছর কিনে আন!

৪১। মেঘ হ'য়েছে চাকা-চাকা,
কি কর শ্বশুর লেখা-জোখা
ক্ষেতের মাঝে বাঁধগে আল,
জল হবে—আজ, কি কাল!

৪২। যদি ওয়াল (শুকাল) কচুর পাত,
পাতে রৈল চাষার ভাত!

৪৩। যদি বর্ষে ঠায়, তবে মেল মাদার ভেসে যায়।

৪৪। যদি বর্ষে মকরে, খন্দ হয় টাকরে!

৪৫। যে ধান কাটে—সে মাস কাটে।

৪৬। যেমন তোমার কম্মের আটা,
তেমি আমার মুড়ির কাটা!

৪৭। লঙ্কার বাণিজ্য, ক্ষেতের কোণা!

৪৮। লাভ লোকসান্ জেনে—চাষ করে না
সোণার বেণো!

৪৯। লেটা পেটা মিন্‌সে, লোটাকাণী ভয়সা,
ভাদ্রমাসে টোটে পাণি, শেষ আছে এর
বিশেষ জানি!

৫০। শ্রাবণ পাণি, সিংহে শুকা, কন্যা কাণে কাণ,
বিনাবায়ে তুলা বসে কোথা রাখবি ধান!

৫১। সোমে বুধে না দিও হাত,
ধার ক'রে খেয়ো ভাত।

৫২। হাউস আছে, যোগ নাই।

৫৩। হালে ছেড়েবে—সোণার পাতি,
তার অর্দ্ধেক কাধে ছাতি;
ঘরে বসে পোছে বাং—
এবছর যেমন তেমন, ফিরে বছর হা ভাত!

৫৪। হালুয়া হাল চসে, রুষাণ বুনে ধান;
আগে খায় চোর চোট্টাল, পিছে পায় রুষাণ!

৫৫। হাল-ভাগা নেই—গো-ভাগা আছে।

৫৬। হাসিয়ে ললিতে বলে,
এই মেঘে ভাসবে জলে!

৫৭। হেলে যায় হাল নিয়ে,
বিধাতা যান তুল নিয়ে।

৫৮। হেসে সূর্য্য বসেন পাটে,
চাষার গরু বিকোয় হাটে!

৫৯। ক্ষেতের কোণ, বাণিজ্যের ধন।

৬০। ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্য, পথে পথে নবান্ন।

যুবার গান

[শ্রীআমোদিনী ঘোষ]

তরুণী উষার পুষ্পরথের আগে
তরুণ অরুণ আমি !
বিবশাধরণী নিবিড়তিমিরে লীন,
অচেতন প্রাণ—স্পন্দন-ধারা ক্ষীণ,
নবীনজীবন নব-জাগরণ আনি,
দূর করি সেই যামী,
আনি নবালোক—নবজ্ঞান—নবশিক্ষা,
নব-জীবনের নির্ম্মল নবদীক্ষা,
নীচতার কীট লুকায় বিবরে -
তিমিরের অনুগামী,
তরুণী উষার পুষ্পরথের আগে
অরুণ সারথি আমি ।
নব-বরষের কল্যাণ ধ্বজবাহী—
আমি নব জলধারা !
মিথ্যায় মোহে—অজ্ঞানে পরমাদে,
জাতীয়জীবন তরণী যখন বাধে
পঙ্কের খাতে—শুষে মরে স্রোত,
প্রাণ কল্লোলভরা,
রৌদ্র-দীর্ণ তট দুইদিকে জাগে,
শাদ্বল ক্ষেতে মরুনিশ্বাস লাগে,
ঝলসে মুকুল-ফুল-পল্লব
জীবন-আসার হারা—
নব-বরষের কল্যাণ ধ্বজবাহী
আমি নব জলধারা !
যা কিছু জীর্ণ—ভগ্ন মলিন ছিন্ন—
আমি তাহা অপসারি,
বিজয়-বিষাণ টঙ্কারি মহানাদে,
ঘর্ঘরি রথ বাহিরি কর্ম্মপথে,
মহাসাগরের আনি জলধারা
প্রণালী-খনন করি,

আনি বরিষণ—প্লাবন প্রবলধার
উচ্ছল জল উচ্ছ্বাস বরষার—
মহাতরঙ্গের উঠে কল্লোল
ধরণী ধৌত করি—
যা কিছু ভগ্ন—জীর্ণ মলিন ছিন্ন—
আমি তাহা অপসারি !
চরণে আমার মহাকাল নত,
ভয়—চিরভয় হেরে ;
বজ্রবাহুর ভীমতাড়নের বেগে
গিরি দেয় পথ—সাগরশুখায় আগে,
নদী বহে আনে পণ্য-পসরা—
অঞ্জলি হেসে ভরে !
কোন্ পাতালের অতল গভীরতলে—
কাদের ভস্ম ঢকা আছে ধূলিজালে—
আনি সে পাবনী গঙ্গার ধারা,
তাহাদের শিরোপরে—
চরণে আমার মহাকাল নত,
ভয়—চিরভয় হেরে !
মুক্ত আমার উদারপরাণ—
গগন বিহারী আমি !
স্বার্থের কীট বাঁধে নাই বাসা বুকে,
দেবতার দেখা এখনো জাগিছে চোখে,
অনন্তের মহাধ্বনি আত্মার পুরে
এখনো যায় নি থামি ;
বিষবৃক্ষের কণ্টক শাখাজালে
এখনো আঁধার ঘেরে নি হৃদয়দলে,
এখনো পক্ষে লাগে নি পঙ্ক—
কর্দ্দমতটে নামি,
মুক্তপক্ষে রবিকর-চারী—
গগন-বিহারী আমি !

মহাগীত

[৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "চন্দ্রগুপ্ত"]

খাম্বাজ—চৌতাল

আজি গাও মহা গীত মহা আনন্দে,
বাজ মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক্ শুধু,
সাগরে জীবন তরণী।
উলসি উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে
স্বর্গে উঠুক ধরণী।

চঞ্চল চল চরণ ভঙ্গে,
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে,
ছুটুক ভাতি নয়নে
উঠিয়া গীতি মধুর মন্দ,
লুটিয়া নিউক সুধা চন্দ্র,
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি
ধরণী অরুণবরণী।

স্বরলিপি

সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] [স্বরলিপি—শ্রীপ্রমালা ঘোষ

খাম্বাজ- চৌতাল

আস্থায়ী—

	১´	০	২	০	৩	৪
আজি }	ন ন	র্স র্স	র্স র্স	র্স র্রর্স	র্সর্র	র্রর্স	ণ ধ
	গা -	ও -	ম হা	গী ত	মহা	আ	ন ন্দে

১´	০	২	০	৩	৪
মপ	প মপ ধ	ম ম	গ গ	স গ	গ ম
বাজ	মৃ দ ঙ্গ	গভীর	ছ ন্দে	পাল্ তু	লে দাও

১´	০	২	০	৩	৪	
প পন নর্স র্সর্স		নর্স র্স	নর্স র্স	নর্স	র্রর্স ণধ	{ নন }
ভেসে যা ক্ শুধু		সাগরে	জীবন	তর	ণী -	{ আজি }

অন্তরা ও আভোগ—

১´	০	২	০	৩	৪
ম ম	ধ ধ	মম	ম -	র্স র্স	র্স র্স
উ ল	সি -	উছ	লি -	উঠু ক্	নৃত্য
উ ঠি	য়া -	গী-	তি -	মধু র	ম ন্দ

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
প ন র্স র্স ন র্র্স ণ ধ র্স র্গর্গ র্গ র্মর্গর্র
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু স্বর্গ নামিয়া
লুটিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র অসহ পুলকে

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্স ন র্স ন র্স ন র্স ন র্র্স র্সন র্স র্স র্স | নন |
আসুক মত্ত্যে স্বর্গে উঠুক ধরণী - - | আজি |
উঠুক শিহরি ধরণী অরুণ বরণী - | আজি |

সঞ্চারী—

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
স - গম ম ম ম ম মপপ প প
চ ঞ্চ ল চ - ল চরণ ভঙ্গে

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মপ পধ ধ ধ ধ ণধ প প মমম র্ম ধপ
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে কটুক হাস্য

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
মম ম রর স সগ গ গপ প মম ম ম ম
সরস অধরে ছুটুক ভাতি নয়নে - -

কথা—শিবাষ্টকস্তোত্রম্] **লক্ষ্ণৌ ঠুংরী** [সুর—শ্রীমতী কল্পনা দেবী

রা গা | সা রা | সা মা | গা । | রা গা | মা গা | মা ধা | পা ।
প্র ভু মী - শ ম নী - শ ম শে - ষ গু ণং -
১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০

মা গা | মা । | পা পা | পাঃ ধঃ | র্সা ণা | ধা । | পা মা | গা ।
গু ণ হী - ন ম ঘী শ স র লা - ভ র ণম্—
১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০

গা মা | মা । | ধা ধা | ধা । | পা ধা | র্সা । | ণা ধা | পা ।
র ণ নি র জ্জি ত চ্ জ য় দৈ - ত্য পু রং -
১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০

গা মা | মা পা | পা পা | পা ধা | র্সা ণা | ধা । | পা মা | গা ।
প্র ণ মা - মি শি ব - শি ব ক - ল্প ত রুম্

মহিলাকুলের সর্ব্বতন্ত্রী প্রতিভা

যোদ্ধবেশে ইটালী

এডিনবরার ট্রামে রমণী-কণ্ডক্টর্

এনফিল্ডে ডাক-পার্শেল বাহিকা রমণী-হরকরা

গোলাগুলি-প্রস্তুত-করণার্থে স্বকীয় মোটর গাড়ীতে সমাগতা রমণীকুল

উত্তর ফ্রান্সের "আবে ডি রয়ামোঁ" হাসপাতালস্থিত স্কটিশ্ আর্ত্ত সেবিকাদিগের অধিনায়িকা—ফিল্ড্‌মার্শাল্ ফ্রেঞ্চের ভগিনী—শ্রীমতী হার্লি

ক্যানেডিয়ন্ হাসপাতালের জনৈক চিকিৎসার্থী কিরূপে আহত হইয়াছে, আর্ত্তসেবিকাকে আঁকিয়া বুঝাইয়া দিতেছে
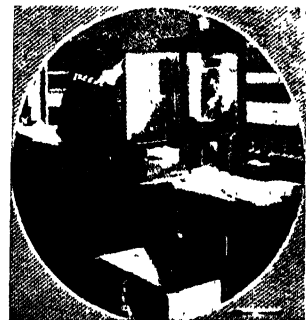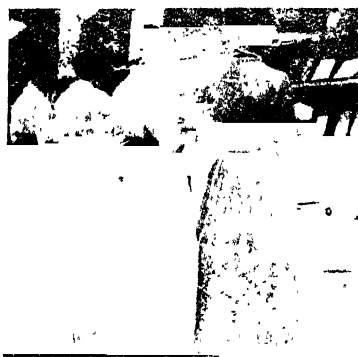
মহাযুদ্ধে (পারস্য উপসাগরে) বাঙ্গালী দম্পতী—শ্রীযুক্ত এ সি মুখার্জ্জি এবং আমাদের 'সেবাসদনে বঙ্গরমণী' প্রবন্ধ লেখিকা শ্রীমতী শরৎবেণু-দেবী—মিসেস্ এ. সি. মুখার্জ্জি

পেট্রোগ্রাড্—সামরিক হাসপাতালে সেবা রতা আত্মসেবিকা

এডিনবরায় ট্রাম কণ্ডাক্টর-কার্য্যে রতা মহিলাদিগের পরিচ্ছদ

আহতদিগের ক্ষতধৌত-কার্য্যরতা আর্ত্ত-সেবিকামণ্ডলী

এডিনবরায়—রমণী রেল-টিকেট্-কলেক্টর্
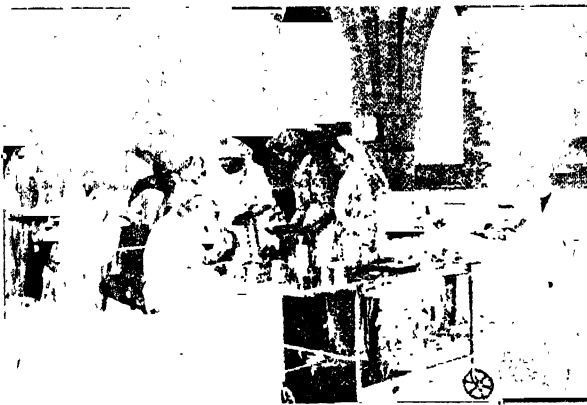
গোলাগুলি-প্রস্তুতকারণোদ্দেশে সমাগতা, বিশিষ্ট কোট ও টুপি (overalls and mob caps)-পরিহিতা মহিলাবৃন্দ
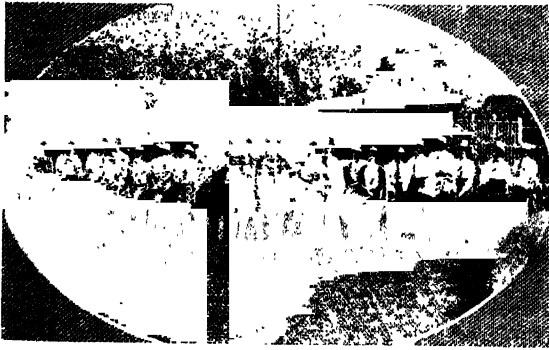
ফ্রান্সে—কার্য্যাবসরে সেনা-আর্ত্তসেবিকাবৃন্দ

সসেক্স—লিওযেসের নিকটবর্ত্তী প্লাইণ্ড কলেজে ক্ষেত্র-কার্য্যে ব্রতী ছাত্রীবৃন্দ

বিশিষ্ট পরিচ্ছদাবৃতা রমণীগণ গুলি গোলা প্রস্তুত করিতে কর্ম্মশালায় চলিয়াছে

লণ্ডন—ভিক্টোরিয়া-ষ্টেশনে বিশিষ্ট-পরিচ্ছদ পরিহিতা রমণী কর্ম্মচারিণী মণ্ডলী

মোটর পরিচালন-পারদর্শিনী রমণীগণ—আহতদিগকে প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করিতে মোটরে চলিয়াছে

র‍্যাপ্রেসে জার্ম্মানদিগের গুলিতে আহত শিশুগণ,—'লা পেনে' আর্ত্তসেবিকামণ্ডলীর আশ্রয়ে

'য়্যাবে ডি রোয়েমোঁ' হাসপাতালে রন্ধনকার্য্যে ব্রতী মহিলামণ্ডলী

"শেল্"-গোলা নির্ম্মাণ নিরতা রমণী

মাসপঞ্জী

(শ্রাবণ—১৩২২)

১লা—লাহোরের 'পাইসা ই-সুলা' নামক সংবাদপত্রকে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সতর্ক করিবার সংবাদ-প্রচার।

২রা—রায় অভয়শঙ্কর গুহ বাহাদুরের মৃত্যু।

৩রা—মাদুরার বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ পি প্যারেরার মৃত্যু। ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও জ্যোতিষী পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্নের নবতিতম বর্ষ বয়সে মৃত্যু।

৪ঠা—'ষ্টার অফ উৎকলে'র প্রচার বন্ধ হইবে, এই সংবাদ-প্রচার।—

৫ই—মাননীয় এফ এম্ [illegible]এর মৃত্যু।—খুলনার বিখ্যাত উকীল গুরুদাস সেনের মৃত্যু।—বাকুড়ার জ্যোতিষী যোগেন্দ্র গোস্বামীর মৃত্যু।

৬ই—পারসী মহাকাব্য "কৈসর নামা"-রচয়িতা বিখ্যাত মুসলমান কবি খাজা অজিমুদ্দিনের ৮২ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌয়ে তনুত্যাগ।

৭ই—বিদ্রোহী সেনাপতি কেম্পের সাত বৎসরের জন্য কারাবাস এবং তিন হাজার পৌণ্ড অর্থদণ্ড।—স্যর স্যাণ্ডফোর্ড ফ্লেমিঙের মৃত্যু। তারাপুরের মোহন্ত বাবারঘুনাথ মাহাজীর মৃত্যু।

৮ই—ইরোডে 'কোইম্বাটোর সার্কল থিওজফিক্যাল কনফারেন্সে'র অধিবেশন,—সদাশিব আয়ার সভাপতি।—কলিকাতার ডাক্তার [illegible] এন্ চাটার্জ্জীর ৪৭ বৎসর বয়সে শিলঙে মৃত্যু।—হসপেটে 'বেলেরি জেলা কন্ফারেন্সে'র অধিবেশন;—মাননীয় মিঃ রামানুজ-চারী সভাপতি।—ইরোডে "কোইম্বাটোর জেলা কনফারেন্সে"র অধিবেশন।—কলিকাতার কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতি উৎসব।—ইরোডে "কোইম্বাটোর স্পেশ্যাল কন্ফারেন্সে"র অধিবেশন; মিঃ মাধবরায় সভাপতি।

৯ই—কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনর সুপ্রতিষ্ঠ হাজী নূর মহম্মদ জ্যাকেরিয়ার ৬১ বৎসর বয়সে মৃত্যু।—"মাড়ওয়াড়ী সহায়ক সমিতি"র বার্ষিক অধিবেশন;—ডাঃ এস.পি সর্ব্বাধিকারী সভাপতি।—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে "উত্তরপাড়া সাহিত্য সম্মিলনে"র সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন।

১০ই—লণ্ডনে "এম্পায়ার ডে" উৎসব।—প্রসিদ্ধ অভিধান লেখক স্যর জেমস্ মরের মৃত্যু।

১১ই—ঢাকায় লর্ড কার্মাইকেল মহোদয় কর্ত্তৃক নবীন লব্ধোপাধিক সনন্দ বিতরণের দরবার।

১২ই—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যুদ্ধের জন্য সাড়ে চারি কোটী টাকা ঋণ-গ্রহণের বিশদ বিবরণী প্রচার।—মুর্শিদাবাদ—সাহেড়া-রামনগরে "শাখা-ব্রাহ্মণ সভা" স্থাপন।

১৩ই—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২৪ বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন।

১৪ই—সাধু কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয় পুত্র মিঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেনের (মিঃ পিটার সেনের) মৃত্যু।—গত কয়েক মাসের মধ্যে লাহোরের ১০ খানি (দেশীয়) দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচার রহিতের নোটিশ।

১৫ই—কলিকাতায় "বরিশাল সেবা সমিতি"র বার্ষিক অধিবেশন;—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সভাপতি।

১৬ই—কালকটের 'জামোরীন'—রাজা বাহাদুরের মৃত্যু।—বাঁকিপুরে "মহেশনারায়ণ স্মৃতি-সভা"র অধিবেশন।

১৭ই—বাঁকিপুরে "খাঁ বাহাদুর খোদাবক্স স্মৃতি"-উৎসব।

১৮ই—বারাসতের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হরিনাথ ঘোষালের মৃত্যু।

১৯এ—আই.এ ও বি.এ. পরীক্ষার ফলপ্রকাশ।—ভারতের নানাস্থানে "বৎসরব্যাপী সমর স্মৃতি" উৎসব। এলাহাবাদের "অভ্যুদয়" পত্রিকার জামীন দিবার আদেশ।—কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুরের মৃত্যু।

২০এ—"ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে"র বার্ষিক অধিবেশন।—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মিঃ মার্টিন ম্যাটেন্সের মৃত্যু।—রায় রামদাস ভট্টাচার্য্য বাহাদুরের মৃত্যু।—অমৃতসরের ডাঃ ঈশ্বর দত্তের মৃত্যু।

২১এ—"সেনের বর্ণাডিনো ম্যাকাডো" পর্ত্তুগালের 'প্রেসিডেণ্ট' নির্ব্বাচিত হন।—জর্ম্মাণ কর্ত্তৃক 'ওয়ারশ' অধিকার।

২২এ—ফরিদপুরের "সঞ্জয়" সম্পাদকের নামে মানহানির অভিযোগ।

২৩এ—ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ্ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু। 'অভ্যুদয়' প্রেসের কার্য্য বন্ধ; স্বত্বাধিকারী জামীন দিতে অনিচ্ছুক। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ কাওয়ানের মৃত্যু।—কুমিল্লার মুন্সেফ অন্নদাপ্রসাদ সরকারের মৃত্যু।

২৬এ—কলিকাতা "কমার্শ্যাল" পরীক্ষার ফলপ্রকাশ।—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মিঃ রিচার্ড মার্শের মৃত্যু।—লাহোরের "ন্যাশনাল" পত্রিকার প্রচার স্থগিত।

২৭এ—মুর্শিদাবাদ—মাড়গ্রামে "শাখা ব্রাহ্মণ সভা" স্থাপন।

২৮এ—মিঃ ফ্রাঙ্ক্ গ্রামাল্, আর. এ'র মৃত্যু।

২৯এ—বাঙ্গালোরের "ডেলী পোষ্ট" পত্রের প্রচার একসপ্তাহের জন্য স্থগিত;—৩১এ হইতে পুনঃ-প্রচারের আদেশ।

৩০এ—"মাদ্রাস মেলে"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যর চার্লস ল্যাসনের মৃত্যু।—লক্ষ্ণৌর "ইণ্ডিয়ান ডেলী টেলিগ্রাফের" উর্দ্দুর প্রচার রহিত।

৩১এ—হবিগঞ্জের পণ্ডিত কামিনীকিঙ্কর স্মৃতিচূড়ামণির ৺কাশী প্রাপ্তি।

৩১এ—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে"র বার্ষিক অধিবেশন,—মিঃ রিচার্ডসন সভাপতি।—আগ্রার উকীল মিঃ জি. সি সিজিন্সের মৃত্যু।

৩২এ—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কনভোকেসন্';—উইলিংডন সভাপতি।—প্রাকৃগভর্ণরের পদত্যাগ।—বিখ্যাত ব্যাঞ্জো বাদক প্রফেসার এ কে. কৌতুভের মৃত্যু।—এন. ডব্লু রেলওয়ে-প্রেসের "মেসিন্-ম্যান"দের ধর্ম্মঘট।

সাহিত্য-সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি. এল. মহোদয়ের "কবি-কথা" ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা "শাশ্বতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল— এক্ষণে ইহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির হইল। প্রথম খণ্ডে কালিদাস ও ভবভূতির নাটকগুলি কথাকারে লিখিত হইয়াছে; মূল্য দুই টাকা। ২য় খণ্ডে মহাকবি ভাসের নাটকগুলি থাকিবে।

"চিরন্দাসিতা মাতা" প্রণেতা কবিবর ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্রের একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহার নাম "রামায়ণ মহাকাব্য"। মাত্র আদিকাণ্ডই সুললিত পদ্যে রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য বাঁধাই ।৹ ও কাগজের মলাট ১৲ টাকা।

উদীয়মান ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'History of the Begums of Bengal' বাহির হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি. এল. মহোদয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম. এ. এই পুস্তক খানির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন।

"কালিদাস ও ভবভূতি" ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও উত্তরচরিত নাটকের বিস্তৃত সমালোচনা, পুস্তকাকারে, সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদসহ শ্রীদিলীপকুমার রায়-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য –১৲ এক টাকা।

চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸৹ টাকা ও ২৷৹ টাকা। প্রথম খণ্ডে "মিশরের কথা" ও দ্বিতীয় খণ্ডে "ইংরাজের জন্মভূমি"র কথা আছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহোদয় "চণ্ডীদাস" নামে একখানি পঞ্চাঙ্ক নাট্যকাব্য লিখিয়াছেন। পূজার পরই উহা যন্ত্রস্থ হইবে সম্ভাবনা।

"সোমনাথ" ও "সেলিনা" প্রণেতা—শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের "কণ্ঠহার" নামক একখানি সামাজিক নাটক মহাসমারোহে "মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে" অভিনীত হইতেছে। নাটকখানি এখন যন্ত্রস্থ আছে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "তিনবন্ধু" নামক উপন্যাসের সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

কলাকৌশলী গল্পলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ছোট গল্পগুলি "ছোট ছোট গল্প" নামে একত্রে পুস্তকাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১৲ টাকা।

'শিশু'-পরিচালক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের আদ্যাশক্তি সতীর কাহিনী সম্বলিত "সতী" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৵০।

"সিংহল বিজয় নাটক"—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। তাঁহার শেষ নাটক, যাহা সংশোধন করিতে করিতে কবির প্রাণবিয়োগ হয়, সেই অপ্রকাশিত নাটক প্রকাশিত হইতেছে। পুস্তক যন্ত্রস্থ।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক, বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের নূতন জ্যোতিষ-গ্রন্থ "গ্রহ-নক্ষত্র" তিনশত পৃষ্ঠায়, শতাধিক চিত্রসমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

"গানের পুস্তক"—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে;—মূল্য ২৲ টাকা

গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ-প্রকাশিত" হইয়াছে;—মূল্য ৷৹ আনা।

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের নূতন গল্পপুস্তক "সই-মা" প্রকাশিত হইয়াছে।

উদীয়মান গল্পলেখক শ্রীযুক্ত কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ছোট গল্পগুলি পুস্তকাকারে "মৃগনাভি" নামে প্রকাশিত হইতেছে।

"বিক্রমপুরের ইতিহাস"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "ভীমসেন" গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

প্রথিতযশা রঙ্গ-রসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক এম. এ., বি. এল.-রচিত কতকগুলি সরস প্রবন্ধমালা ও হাসির সমষ্টি "রঙ্গ ও ব্যঙ্গ"-নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে;—মূল্য এক টাকা।

"জাপান-প্রবাস"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের "নব্য-জাপান" অচিরে প্রকাশিত হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street; CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street; CALCUTTA.
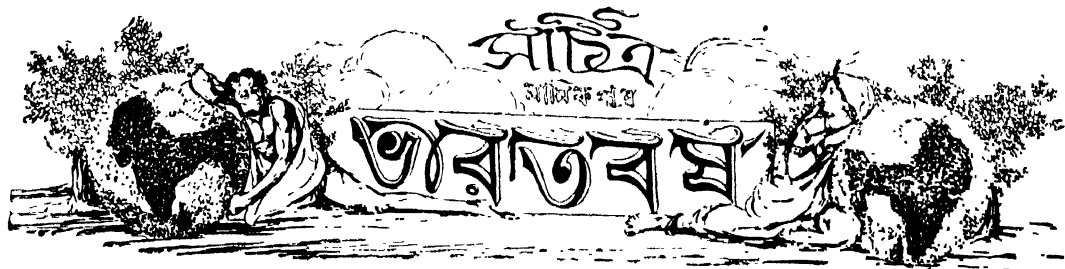
অগ্রহায়ণ, ১৩২২

প্রথম খণ্ড] তৃতীয় বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

বৈষ্ণব

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ.]

মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা,
যুগল-রূপের উপাসী গো, পিপাসী সে রূপের মোরা।
স্মরণে তার পরশ মধু, নামে ঝরে পীযূষধারা ;
মুগ্ধ মোদের মানস-বধূ পেয়ে তাহার বাঁশীর সাড়া।
কোথায়—কুরুক্ষেত্রে কোথা গভীর পাঞ্চজন্য বাজে,
গাণ্ডীবেরি টঙ্কারেতে দলে দলে সৈন্য সাজে ;
আমরা তাহার ধার-ধারিনে—খুঁজি কোথায় তমালছায়ে
মিশেছে রাই কনকলতা, কল্পতরু শ্যামের গায়ে।

বিজ্ঞান-জ্ঞান তোমরা লহ, শাস-বরুণ-প্রভঞ্জনে ;
তুচ্ছ কর বিশ্বনাথে, দর্পহারী নিরঞ্জনে।
জ্ঞান তাহারে চিনিয়ে দেবে, প্রমাণ তারে আনবে কাছে ;
এমন দারুণ দুষ্ট আশায়, বৈষ্ণবেরি প্রাণ কি বাঁচে !
চাইনে মোরা শক্তি, ওগো—ভক্তিভরে ডাক্‌লে তারে,
প্রণয়ী সে রাখালরাজা দূরে কি আর থাকতে পারে ?
মগ্ন রব সে রূপ-ধ্যানে, মনে মনে গাঁথবো মালা,
আস্‌বে হৃদয়-কুঞ্জে—ওগো, আস্‌বে মোদের চিকণ-কালা।

আমরা ভীরু, আমরা ভীত, মর্য্যাদা-জ্ঞান নাইক মনে ;
ক্ষুদ্র- তবু চাই গো ধরা ঢাকতে প্রেমের আচ্ছাদনে।
যুদ্ধ করো, শত্রু নাশো, কাঁপাও ধরা গর্জ্জনেতে ;—
আনন্দ পাই আমরা ত্যাগে—শান্তি যে পাই বর্জ্জনেতে।
রক্ত মেখে তোমরা নাচ, টলাও ভারে বসুন্ধরা ;—
প্রীতির ফাগ ও কুঙ্কুমেতে হোলিখেলা খেলবো মোরা।
দাও দেবে—দাও টিট্‌কারী গো, নিত্য রটাও নূতনকথা ;—
নিবিড় মিলন-আনন্দেতে ভুলবো মোরা সকল ব্যথা।

আমার পুরী-দর্শন

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্, এ, বি-এল্]

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম এ, বি এল

আমি সে দিন নীলাচলে পুরুষোত্তমদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিতে অনেকেই যাইয়া থাকেন; বিশেষতঃ, আজকাল রেলগাড়ীর সাহায্যে পুরীদর্শনের বিশেষ সুবিধা।

নানালোক নানাউদ্দেশ্য লইয়া পুরী যান। কেহ পুরীকে Sanitarium, বা বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান, মনে করিয়া স্বাস্থ্যার্থে তথায় যাইয়া থাকেন। কেহ বা সহজে অনন্তের চিত্র দেখিবার আশায়—অনন্ত প্রসারিত নীলিমার নীল-তরঙ্গলীলায় অনন্তের বিশালত্ব, বিরসত্ব, ভয়ঙ্কারিত্ব, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিয়া—আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিবার জন্য তথায় গিয়া থাকেন। কেহ বা জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া—ভারতীয় শিল্পের স্থাপত্য-কৃতিত্বসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইবার জন্য পুরী গিয়া থাকেন। কেহ বা অতি-অবসরের, বা কার্য্যের জন্য অতি-অনবসরের, একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য—শুধু ভ্রমণউদ্দেশ্যেই তথায় গিয়া থাকেন। ক্বচিৎ বা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তাঁহার প্রধান তীর্থে গিয়া, সেই সর্ব্বপাপহারী জগন্নাথদেবের দর্শনমানসে শুধু ভক্তির আবেগ উচ্ছ্বাস লইয়া পুরী গিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন। যখন পুরী যাইবার পথ আজকালকার মতন এত সুগম ছিল না, তখন পুরী যাইবার উদ্দেশ্য শুধু জগন্নাথদেবকে দর্শনই ছিল। তখন তাঁহারা যে ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশদেশান্তর হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত পণ করিয়া—কত অত্যাচার, কত লাঞ্ছনা, কত বিপদ মাথায় করিয়া, পথের নানা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া, সেই পুরুষোত্তমকে দেখিতে আসিতেন, তাহা আধুনিককালের বিলাসপ্রিয় লোকের ধারণারও বহির্ভূত। তখন এক কাল ছিল। ধর্ম্মের দোহাই দিলে, তখন আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদেরই পিতামহী প্রপিতামহীগণ—তাঁহাদের তরুণবয়স, এমন কি আসন্নপ্রসব অবস্থাও উপেক্ষা করিয়া জগন্নাথদেবের স্থানে, কাহাকেও না বলিয়া—পথের দূরত্ব ও নানা বিপদ হাসিমুখে মাথায় করিয়া—সেই দেবাদিদেব পুরুষোত্তমের কাছে ছুটিয়া যাইতেন। ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের কি আগ্রহ ছিল! শুনা যায়, সুপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননদেবের পিতা, অশীতিবর্ষ বয়ক্রমকালে, উপযুক্ত পুত্র-কামনায়, ত্রিবেণী হইতে সুদূর পুরীপর্য্যন্ত সত্যসত্যই হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক কঠোরতা অবশ্য সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য বটে, সেকালের ধর্ম্মের জন্য একাগ্রতা!—সে কথা এখন থাকুক।

গতবর্ষে আমিও, যা'ক একটা উদ্দেশ্য লইয়া, সপরিবারে পুরী গিয়াছিলাম। পুরীর দ্রষ্টব্য যাহাকিছু, সবই দেখিয়াছিলাম। সে কথা অনেকেই অনেক রকমে অনেক-বার বলিয়াছেন। তাহার পুনরুত্থাপন, পুরাণো গল্পের

পুনরুল্লেখের মতনই বিরক্তিকর। তাই, এখানে পুরীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের বিরাগভাজন হইতে আমি একান্তই নারাজ। তবে, একবিষয়ে আমি কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি সকলেই দেখেন; কিন্তু সে বিগ্রহমূর্ত্তি সকলে কি একই ভাবে দেখেন? তাহা ত সম্ভব নয়। প্রত্যেকেরই যে অধিষ্ঠানস্থান ভিন্ন। সকলেই যে নিজের সামর্থ্য-অনুসারে সেই বিগ্রহমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পায়। বাহ্যিক মূর্ত্তি অবশ্য সকলেরই পক্ষে সমান। কিন্তু সেই বাহ্যিক মূর্ত্তিকে কেবল দেখিলে ত চলিবে না। দেখিবার বিষয় হইতেছে, মূর্ত্তি যাহার পরিচায়ক মাত্র। সকলেই নিজনিজ ভাব ও কল্পনা-অনুসারে বিগ্রহমূর্ত্তিতে তত্ত্বদর্শন করিতে প্রয়াস পান। তাহার ফলে সকলেই সেই তত্ত্বের আংশিক পরিচয় পায় মাত্র। অন্ধের হস্তিদর্শনের মত, সকলেই নিজ দর্শনগ্রাহ্য অংশকেই তত্ত্বের সমস্তটা মনে করিয়া মহাতৃপ্ত হয়। তবে, এই বিভিন্ন মত হইতে সমগ্রের আভাস, বোধ হয়, পাওয়া যাইতে পারে। বাহ্যিক মূর্ত্তি হইতে অর্থগ্রহণ করিবার সামর্থ্য সকলের সমান নয়।

যাহা হউক, আমি জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে কি দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখানে বলিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে হয়ত বা কাহারও ভবিষ্যতে পুরী দর্শনের পক্ষে সহায়তা করিতে পারিবে।

জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত; প্রবেশের চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। তার কোন একটি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে আবার আর একটি প্রাচীর মন্দিরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে; ইহাতেও চারটি দ্বার আছে। আমরা সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; তারপর বাইশটি সুবিশাল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের দ্বারের সম্মুখে আসি; তারপরই, মন্দিরের চারিধারের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণটিকে রত্নবেদী (?) বলে। ইহারই মধ্যস্থলে নভঃস্পর্শী, সুবিশাল, নয়নাভিরাম, হিন্দুর কলাবিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভ, ভক্তের প্রাণমাতান শ্রীমন্দির! বাহির ও ভিতরের মধ্যস্থলে প্রধানদর্শনীয় স্থান জগন্নাথদেবের ভোগের নিমিত্ত প্রকাণ্ড রন্ধনশালা ও ভাণ্ডারগৃহ। জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা তাঁহারই উপযোগী, —বোধ হয়, পৃথিবীতে এমন অপরূপ জিনিস আর কোথাও নাই। রথের সময়, যখন শ্রীক্ষেত্রে লক্ষলক্ষ লোকের সমাগম হয়, এই রন্ধনশালার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনই সকলের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এমন সুব্যবস্থা না থাকিলে লোকের যে কষ্ট হইত, তাহা বর্ণনার অতীত। এই রন্ধনশালায় সাতশত চুল্লীতে রন্ধন হয়। প্রতি চুল্লীতে একবারে নয়টি হাঁড়ি বসাইয়া রাঁধিবার ব্যবস্থা আছে।

এখন শ্রীমন্দিরের কথা বলি। শ্রীমন্দিরের চারি অংশ। প্রথম ভোগমন্দির, দ্বিতীয় নাটমন্দির, তৃতীয় জগমোহন এবং চতুর্থ বিমান। চারিভাগে বিভাগ করিবার পদ্ধতি উড়িষ্যার প্রায় সকল মন্দিরেই পরিলক্ষিত হয়। ভুবনেশ্বরের অনেক মন্দিরের প্রায় এই ধরণ। এই বিমানের মধ্যেই নির্মিত পুরুষোত্তম ও শালগ্রাম শিলা বিরাজিত উচ্চ বেদিকাতে শোভিত। মন্দিরের বাহিরে—প্রাঙ্গণের চারিধারে নানা দেবদেবীর ছোটবড় অনেক মন্দির, তন্মধ্যে বিমলাদেবীর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ, এবং তাহার নামেই শ্রীক্ষেত্রের আর এক নাম বিরজা-ক্ষেত্র। পাণ্ডাগণের সাহায্যে জগন্নাথদর্শনের জন্য বিমানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। একদ্বারবর্তী মন্দিরে, প্রবেশের আর কোন পথ নাই; তজ্জন্য, মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন—প্রদীপের আলোর সাহায্যে দেবদর্শন করিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষীণদৃষ্টিহেতু আমার ভাগ্যে দেবদর্শন তেমন ভাল করিয়া হয় নাই। বড়ই অনুশোচনা হইল, সময় থাকিতে কেন দেবতাদর্শন করি নাই। এই রকম অবহেলা করিয়াই আমরা মৃত্যুর সময় পরপারের পাথেয়ের জন্য কত না কাঁদিয়া আকুল হই। যাহা হ'ক, তখন নানারূপ চিন্তা আসিল। ভাবিলাম, এই ত্রিমূর্ত্তি বিগ্রহ কিসের প্রতিমা? বরাবর শুনিয়া আসিয়াছি, ইহা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁহাদের ভগিনী সুভদ্রার মূর্ত্তি; কিন্তু এ কথা মনে লাগিল না। ভাবিলাম যে, সুভদ্রা ত কোথাও শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত একত্রে বিগ্রহরূপে পূজিত হ'ন নাই। নানাকারণে এই কথার উপর আমার আস্থা হইল না।

স্বর্গদ্বারের সম্মুখে গুরু নানকের এক মঠ আছে।

সেই মঠের অধ্যক্ষ সাধুর সহিত একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মঠের মধ্যে গ্রন্থসাহেব যেমন পূজিত হ'ন, সেইরূপ শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তিও পূজিত হ'ন -দেখিলাম ; কিন্তু জগন্নাথের পার্শ্বে বলরাম বা সুভদ্রা নাই। সাধুকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—ত্রিমূর্ত্তির অর্থ কি ? তাঁহার মতে ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। একই ব্রহ্মের এই ত্রিমূর্ত্তিতে তিন ভাবের বিকাশ। তাঁহার এই মতও মনঃপূত হইল না ; কেননা, মধ্যের সুভদ্রা মূর্ত্তি ত দেবীর ! অবশ্য, মন্দিরমধ্যস্থ মূর্ত্তিতে দেব বা দেবী বুঝিবার কোন লক্ষণ নাই। কিন্তু মধ্যের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রমূর্ত্তি যে দেবীমূর্ত্তি, আয়তনের হিসাবে ইহাই গ্রহণীয়।

আমাদের পাণ্ডাঠাকুরকে ত্রিমূর্ত্তির সমস্যাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি পূজারী ; জগন্নাথের পূজা করিয়া থাকেন ; তাঁহার সংস্কৃত-ভাষায় কিছু বোধও আছে। তিনি বলিলেন—ও ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরই মূর্ত্তি-ত্রয় বটে। আমার এ কথাও ভাল লাগিল না। পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম যে, এ ত্রিমূর্ত্তি মূলতঃ বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি —বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—শ্রীক্ষেত্রে পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। এখনও উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে, বৌদ্ধদিগের সাধনার জন্য মূলতঃ প্রস্তুত, অনেক গুম্ফা বা গুহা বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে যে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর, তাঁর একটি দন্ত এখানে আনীত হইয়াছিল এবং তাহারই উপর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃঃ সপ্তশতাব্দীতে ঐ দন্ত সিংহলে নীত হইয়াছিল ; তারপর, যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পুরীতে ক্রমে অস্তমিত হইল, তখন সেই বৌদ্ধধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই ত্রিমূর্ত্তি লইয়া এই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্মকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, বুদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট করিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু এ মত আমি কখনও গ্রহণ করিতে পারি নাই। ত্রিত্ব বা Trinity-বাদ বৌদ্ধমহাযানি সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন প্রচলিত হইয়াছিল, যেমন খৃষ্টধর্ম্মে Trinity-বাদ (God the Father, God the Son, God the Holy Ghost), সেইরূপ আমাদের ধর্ম্মেও এই ত্রিত্ববাদ বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। সুতরাং, জগন্নাথের এই ত্রিমূর্ত্তি যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত নহে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ হইবার কোন কারণ নাই। আরও—তিব্বত বল, চীন বল, জাপান বল—যে যে স্থলে বৌদ্ধমঠ স্থাপিত আছে, কোথাও এরূপ ত্রিমূর্ত্তি নাই। সুতরাং এই ত্রিমূর্ত্তি যে বৌদ্ধ-ত্রিমূর্ত্তি—বা তাহার অনুকরণে গঠিত—নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি—বহু প্রাচীন। এখানে শঙ্করাচার্য্যের, প্রসিদ্ধ চারি মঠের মধ্যে, গোবর্দ্ধনমঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি কি এখানে, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাজিয়া, বৌদ্ধ-ত্রিমূর্ত্তি হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন ? যে মন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব দীর্ঘ চব্বিশবৎসরকাল—প্রত্যহ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির প্রতি অপলক-নেত্রে চাহিয়া তন্ময় হইয়া—প্রেমভক্তিতে বিভোর হইয়া, সেই মূর্ত্তির মধ্যে বিরাটের ছবি দেখিতেন ; যাঁহার অঙ্গুলিভারের চিহ্ন ভোগমন্দিরের প্রাচীরগাত্রে এখনও দৃষ্ট হয়, যে মূর্ত্তি দেখিয়া চৈতন্যদেব আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি কি আমাদের নহে ? তাহা কি বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে ধার করা ? এ মত কিরূপে গ্রহণ করি ? যদিও এই মত আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের (বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় যে বৌদ্ধমত প্রচারের পর হইতে বরাবরই একদল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ আছে) মতের সমর্থন করে ; যদিও জগন্নাথের ত্রিমূর্ত্তি যে বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তিরই রূপান্তর, এই মত পাশ্চাত্য-সুধীজন অনুমোদন করেন ও তাঁহাদের অনুকরণে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও পরিপোষণ করিয়াছেন ; তথাপি, আমরা তাঁহাদের মত সমর্থন করিবার যথেষ্ট কারণ পাই না ; ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে মত প্রচলিত হয়, সে মত গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না।—কালপরম্পরায় যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, যাহার পূর্ব্ব-পরের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়—তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

অনেক ভাবিবার পর আমার ধারণা হইল, এই ত্রিমূর্ত্তি আমাদের শাস্ত্রসম্মত ত্রিমূর্ত্তিই। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তি কি ? পূর্ব্বকথিত পাণ্ডাঠাকুরকে বলিলাম, "ঠাকুর ! তুমি তো জগন্নাথের পূজা কর ; কি মন্ত্রে এই ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান কর, তাহা আমায় বলিবে কি ?" তিনি স্বীকৃত হইলেন। তিনি যে মন্ত্র লিখাইয়াছিলেন, পরপৃষ্ঠায় তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

জগন্নাথ ধ্যান—

ফুল্লারবিন্দবদনং পীত-নির্ম্মল বাসসং
পঙ্কজাসন-মধ্যস্থং শুদ্ধজাম্বূনদং প্রভুং
কেয়ূরকটকোপেতং হারকুণ্ডলমণ্ডিতং
শঙ্খং চক্রঞ্চ সম্মেরং মুকুটোজ্জ্বলভূষিতং
সোঽহমস্মীত্যভেদেন চিন্তয়েৎ আত্মপূজনং।

(২)

বলরাম ধ্যান—

বিষ্ণুং ভাস্বৎ কিরীটাঙ্গদবলয় নানাকল্প
হারোদারাঙ্গ্রী শ্রোণী ভূষণ আবদ্ধঃ
মণিমকর মহাকুণ্ডলমণ্ডিতাঙ্গং হস্তৈঃ
চক্র শঙ্খাম্বুজনাদমমলং
পীতকৌশেয়বাসং বিদ্যোৎভাসসমুদ্য
দিনকর সদৃশং পদ্মসস্থং নমামি।
শান্তং চন্দ্রান্তকান্তং মুষল হলধরং
বাসুদেবাগ্রজাত্মং ভোগীশং চারুনেত্রং
বিষধর মুকুটং সেবিতং দেববৃন্দৈঃ
বন্দেঽহং লোকনাথং ত্রিভুবনবিদিতং
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদানং রামং বামাভিরামং
বিকশিতবদনং রেবতী প্রাণনাথং।”

(৩)

সুভদ্রা ধ্যান—

“ধ্যায়েৎ সুবর্ণবর্ণাভাং ত্রিনেত্রাং চারুহাসিনীং
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং মধ্যেন্দুকৃতশেখরাং,
চতুর্ভুজাং শঙ্খচক্রধরাং বালা স্বরূপিণীং
উগ্রং ত্রিশূলনির্ভিন্নমহিষাং সিংহবাহিনীং
মুক্তাদা-লসৎকণ্ঠা মুনিভিঃ স্তুতিপাঠকৈঃ
সিদ্ধির্দেবীগণৈর্জুষ্টা কুমারীভিশ্চসেবিতা
সর্ব্বকামপ্রদাং দুর্গাং বরদাং ভক্তবৎসলাং।”
দুর্গা দেব্যৈ নমঃ।

এই ধ্যান শুনিয়া মোটামুটি বুঝিলাম যে, ইহা জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের ধ্যান হইতে পারে না। জগন্নাথ যাহাকে ‘সোঽহং অস্মি’ এইরূপ অভেদভাবে ধ্যান করিতে হয়, তিনি—পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর। তিনি—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম হলধর রেবতীমোহন আনন্দমূর্ত্তি বসুদেবাত্মজ, তিনি—বলরাম ভগবান সঙ্কর্ষণ। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু সুভদ্রার যে ধ্যান, তাহা তো সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা, ভগবতী দুর্গার ধ্যান। এই ধ্যান হইতে আমার ধারণা হইল যে, ত্রিমূর্ত্তি—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, এ ত্রিমূর্ত্তি নহে; অথবা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও এ ত্রিমূর্ত্তি নহে। তবে—এ ত্রিমূর্ত্তি কি?

শাস্ত্রে জানিয়াছি যে, তীর্থদর্শন দুই ভাবে হয়, এক—বাহ্য ভাবে, আর এক—আন্তর, বা আধ্যাত্মিকভাবে। কাশী যেমন বাহ্যভাবে তীর্থ, তেমনই আধ্যাত্মিকভাবেও কাশীতীর্থের অর্থ বুঝিতে হয়। আধ্যাত্মিক-অর্থে কাশী আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞানবিকাশক্ষেত্র; জগন্মধ্যস্থ আজ্ঞা চক্র, তার মধ্যে ভব ভবানী অবস্থিত। কাশী—বরুণা, অসি ও গঙ্গারূপা ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা বেষ্টিত। মোক্ষদায়ী তীর্থসকলের এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে এবং সেই অর্থে এই সকল তীর্থ মোক্ষদায়ক। এই পুরীতীর্থের কি এইরূপ কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে? আমার এইরূপ ভাবনা হইল বটে, কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। অন্তর্দৃষ্টি, বা যোগদৃষ্টি, উন্মীলিত না হইলে, বুঝি, শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমদর্শনের প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায় না। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান বলিয়াছিলেন, “তুমি এ লৌকিক চক্ষে—‘অনেনৈব সচক্ষুষা’—এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ নহ।” ভগবান অর্জ্জুনকে কৃপা করিয়া যোগদৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাই, অর্জ্জুন ভগবানের বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই যোগদৃষ্টিব্যতীত ভগবানের পুরুষোত্তমরূপও দেখা যায় না। ভগবান বলিয়াছেন—

“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।”
—(গীতা ১৫।১৮)

ভগবান অনুকম্পাপূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি না দিলে, এই পুরুষোত্তমরূপ কেহ কি দেখিতে পায়? শাস্ত্রে আছে—‘রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে’। শ্রীক্ষেত্রে অনেকেই জগন্নাথের রথ দেখিতে যান, কিন্তু কয়জন রথে সেই বামনকে দেখিতে পান? দিব্যদৃষ্টিব্যতীত যে তাঁহাকে

দেখা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'। দেহরথে দেহপরিচ্ছিন্ন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপী বামনকে যিনি দেখিতে পান, তাঁহারই পুনর্জ্জন্ম হয় না।—কিন্তু তাঁকে দেখে কে? অতএব, আমি যে মন্দিরমধ্যে অন্ধকারে ত্রিমূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া আর কি হইবে! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রা আসিল। সেই আধঘুমন্ত আধজাগ্রত অবস্থায় হঠাৎ যেন আলোক ফুটিয়া উঠিল। আমার অন্তর্দৃষ্টি ভগবৎপ্রসাদে বুঝি লাভ হইল। তখন দেখিলাম, এ পুরী—এ ক্ষেত্র যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশ্বক্ষেত্রের, এবং ভাণ্ডরূপ আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রের, বা পুরের, অনুকৃতিমাত্র। শাস্ত্রে এইপ্রকার বাহ্য অনুকৃতিদ্বারা আমাদের অন্তর্দৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকে। বাহ্যভাবে তীর্থদর্শনদ্বারা আমাদের অন্তরের যে তীর্থগুলি ফুটিয়া উঠে, এই বাহ্য শ্রীক্ষেত্রদর্শনে আমার অন্তরে সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাক্ষেত্র, বা পুর, এবং আমাদের নিজের ক্ষেত্রের, বা পুরের, তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। নিজের ভাণ্ড, বা পুর, বা ক্ষেত্রের, তত্ত্ব এবং আমাদের এই দেহপুরস্থিত পুরিশয় পুরুষকে না দেখিলে তো ব্রহ্মাণ্ড পুর এবং সেই ব্রহ্মাণ্ড পুরস্থিত পুরুষোত্তমকে, আমরা দর্শন করিতে পারি না।

ভগবান গীতাতে এই দেহকে নবদ্বার পুর বলিয়াছেন। শ্রুতিতেও এই দেহকে পুর বলা হইয়াছে; এবং পরমাত্মা সেই দেহে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তাঁহাকে পুরিশয় পুরুষ বলা হইয়াছে। শ্রীভাগবতে পুরঞ্জনের উপাখ্যানে রূপকে এই দেহপুর ও দেহপুরস্থিত আত্মার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ভগবান এই দেহকেই ক্ষেত্র বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥"

—গীতা ১৩।২-৩।

অতএব, দেহরূপ পুরে বা ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করিতে হয়। কিরূপে দর্শন করিতে হয়, তাহা এই পুরী বা শ্রীক্ষেত্র হইতে আমরা আভাষ পাই।

এই দেহপুর নবদ্বারযুক্ত। এই নবদ্বার দিয়া আমাদের জ্ঞান ও চেতনা বহির্ম্মুখী হয়। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারে চিত্ত বাহিরে গিয়া বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে ও বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে কর্ম্ম করে। সেই চেতনাকে ও জ্ঞানকে আমাদের ভিতরে ফিরাইয়া না আনিতে পারিলে, অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হয় না, আমাদের দেহপুরস্থিত পরমাত্মার দর্শন-লাভ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরাঞ্চি খানিব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

— কঠোপনিষৎ ৪।১

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।৩

অতএব, সেই পরমাত্মাকে, ও স্বগুণে নিগূঢ় তাঁহার আত্মশক্তিকে, দর্শন করিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষের প্রয়োজন। দেহপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সন্ধান করিতে হয়। সে পুরে প্রবেশের পথ চারিটি। পুরীতেও প্রবেশের পথ চারিটি। সে চারিটি পথ—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ। নিষ্কাম কর্ম্মপথ দিয়া, জ্ঞান সাধনার পথ দিয়া, ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়া, একান্ত ও অনন্য ভক্তির মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, পরমাত্মাকে সন্ধান করিতে হয়। ভক্তিমার্গই ইহাদের মধ্যে প্রশস্ত—সেইটিই পুরীপ্রবেশের সিংহদ্বার। আমাদের শরীরের তিনরূপ;—স্থূল-শরীর বা অন্নময়কোষ, সূক্ষ্ম-শরীর বা প্রাণময় মনময় ও বিজ্ঞানময়কোষ এবং কারণশরীর বা আনন্দময়কোষ। পুরীতে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে আমরা বাহিরের ও ভিতরের প্রাচীরবেষ্টিত যে স্থান দেখিতে পাই—সেখানে ভোগরন্ধনের বিরাট্ ব্যাপারের ব্যবস্থা আছে—তাহা এই স্থূল-অন্নময়-কোষের অনুকৃতি বা পরিচায়ক। আত্মা, এই অন্নময়-কোষে অবস্থিত থাকিয়া, অধ্যাসহেতু আপনাকে অন্নরসময় মনে করেন। তাই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন, "সোঽয়ং আত্মা অন্নরসময়ঃ।" এই বাহ্যকোষ পার হইয়া শরীরের ভিতরের কোষে প্রবেশ করিতে হয়। তাহাই আমাদের সূক্ষ্মশরীর; তাহা স্থূল-

শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মৃত্যুতে স্থূল শরীর নষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না—তাহা আমোক্ষ স্থায়ী। এ জন্য পুরীতে ভিতরের প্রাঙ্গণ উচ্চতর এবং তাহার নাম রত্নবেদী। তাহাই আত্মার লীলাক্ষেত্র। সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। এগুলি সাধনার বিভিন্ন স্তরের পরিচায়ক। ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরা বিরজাক্ষেত্রে উপস্থিত হই। তিনি মূলা প্রকৃতি। তিনি সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। আমাদের দেহরূপ ক্ষেত্রের উপাদান - বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি তাহা হইতেই ত অভিব্যক্ত। ভগবান বলিয়াছেন —

> "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
> ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
> ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
> এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥"
>
> — গীতা ১৩।৬—৭

এই ক্ষেত্র যাহা হইতে অভিব্যক্ত, সেই মূলা, অব্যক্ত-প্রকৃতি রজোহীন, শুদ্ধ, নির্ম্মল ভগবানের যোগমায়া সেই বিরজা দেবীকে দর্শন করিয়া, তাহার প্রসাদে শ্রীমন্দির ভগবান পুরুষোত্তম-দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের পূর্ব্বে, মন্দিরের বাহির অংশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের বাহিরের প্রাচীর-গাত্রে অনেকগুলি অশ্লীলমূর্ত্তি আমাদের নয়নপথে আসে। সেগুলি আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের বাসনাসংস্কারগুলির পরিচায়ক। যে মূল কাম হইতে যে 'সঙ্কামযত বহুস্যাং প্রজায়েয়' হইতে যে 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ' সেই কামের অভিব্যক্তিতে আমাদের সূক্ষ্মদেহের যে ভাব অভিব্যক্ত হয়, তাহারই প্রতিকৃতি এই মন্দিরের গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিমানে—যাহার মধ্যে ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত, তাহার গাত্রে—বাহিরে এরূপ কোন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। কেন না, সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পুরুষোত্তম-দর্শন-লাভ হইলে, সকলবন্ধন ছিন্ন হয়—সকল সংস্কার দূর হয়।

> "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
> ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"
>
> —মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮

মন্দিরের মধ্যে প্রথম জ্ঞানমন্দির; ইহা আমাদের প্রাণময় কোষের পরিচায়ক। আত্মা ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণময় হন। শ্রুতি বলিয়াছেন "সোঽয়ং আত্মা প্রাণময়ঃ"। প্রাণময়কোষ এই স্থানে অন্নময়কোষ হইতে সার রসাদি গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মশরীরকে পরিপুষ্ট করে। তাহার পর নাটমন্দির - ইহাই আমাদের মনোময়কোষ। আত্মা এই কোষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মনোময় হ'ন। শ্রুতি বলিয়াছেন—'সোঽয়ং আত্মা মনোময়।' এইখানেই মন ইন্দ্রিয়দ্বারে, বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিয়া, সুখ দুঃখ ভোগ করে; সর্ব্বদা চঞ্চল, বহির্ম্মুখ হইয়া সুখজ বিষয় গ্রহণ ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগের জন্য সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকে। এই মনোময়-কোষে আত্মা বদ্ধ হইয়া সংসারে যেন নৃত্য করে। আত্মা এই নাটমন্দিরে থাকিয়া নটেশ্বর সাজিয়া সংসারলীলা করেন। ইহাই নাটমন্দির। মনোময়কোষের পর, বিজ্ঞান-ময় কোষ; এই কোষে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মা বিজ্ঞানময় হন। "সোঽয়ং আত্মা বিজ্ঞানময়।' পুরীর জগমোহনই ইহার পরিচায়ক। এইখানে জ্ঞান, মোহিনীমায়ায় বদ্ধ হইয়া, জগৎ বিসর্জ্জন করেন, এবং আত্মা এই বিজ্ঞানময় কোষে থাকিয়া, তাহার সাহায্যে জগৎসৃষ্টি করিয়া তাহাতে বদ্ধ হন। এই প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রম করিয়া তবে আনন্দময়কোষে পৌঁছিতে হয়। এই আনন্দময়কোষে অবস্থিত আত্মাই পরমাত্মা। এই কোষে অবস্থিত থাকিয়া তিনি আনন্দময় হয়েন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন "সোঽয়ং আত্মা আনন্দময়ঃ।" তিনি শুদ্ধ আনন্দময় ন'ন, শ্রুতি বলিয়াছেন,'তিনি অনন্ত,সচ্চিদানন্দঘন।' পুরীতেও ভোগমন্দির, নাটমন্দির ও জগমোহন অতিক্রম করিয়া, বিমানের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এই বিমান আমাদের সেই আনন্দময়কোষের পরিচায়ক। ইহাই আমাদের অন্তরতম হৃদয়স্থ ব্রহ্মপুর। উপনিষদে দহর-বিদ্যায় ইহার বিবরণ আছে। এই দহরবিদ্যাসম্বন্ধে গীতার 'বিজয়' ব্যাখ্যার অষ্টম অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। দহরবিদ্যার বিস্তারিত বিবরণ 'ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে পাওয়া যায়। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তৎ অন্বেষ্টব্যং তদ্বাব-বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" (৮।১।১)

—অর্থাৎ, এই দেহমধ্যে অল্পায়তন হৃদয়পুরীকে বা বা ব্রহ্মপুরে যে (বক্ষরূপ) অন্তরাকাশ আছে, তাহার তত্ত্ব জানিতে হইবে। এই অন্তরাকাশে যাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তিনি যে ব্রহ্ম, তাহা বেদান্তদর্শনের 'দহর উত্তরেভ্যঃ' (১।৩।১৪) এই সূত্র ও তাহার ভাষ্য হইতে পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্যে আরও উক্ত হইয়াছে যে, বাহিরের আকাশাখ্য ব্রহ্ম যেরূপ, অন্তরের আকাশাখ্য ব্রহ্মও সেইরূপ। উভয়েই দ্যাবা পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র সকলই সমাহিত। সর্ব্বভূত, সমুদায় বাসনা তাহাতেই সমাহিত। সেই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম দৈহিক জরা-মৃত্যুর অধীন নহেন। ইহাই হৃদয়স্থ আত্মা। (৮।১।৩৪) স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়ম্ ইতি। তস্মাৎ হৃদয়ং অহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি" (৮।৩।৩)। হৃদিস্থ আত্মা সুষুপ্তিতে সম্যক্‌ প্রসাদযুক্ত হ'ন; ও সেই সময়ে এই আত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম-শরীর হইতে উত্থিত হইয়া আনন্দময় কারণ শরীরে পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজরূপ প্রাপ্ত হ'ন (৮।২।৪)।

*　　*　　*　　*

বৃহদারণ্যকেও আছে * * "হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম" (৪।১।৭)।—"অক্ষরং হৃদয়ং" (৫।৩।১)।

*　　*　　*　　*

মুণ্ডক উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে,—

"অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পরায় স তমসঃ পরস্তাৎ॥"
"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিম ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।"
"মনোময়ঃ প্রাণ শরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥" (২।২।৭)

এই দহরবিদ্যা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের হৃদয়াকাশে ব্রহ্মপুরে পরমাত্মা পরমেশ্বর অবস্থিত। এই ব্রহ্মপুর—এই হৃদয়স্থ আকাশই বিমান। পুরীর বিমান ইহারই অনুকৃতিমাত্র। এই বিমানে প্রবেশ করিলেই দেখিয়াছিলাম যে, ইহা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন; ইহাতে আলোক প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার। আমাদের হৃদয়গুহাও এইরূপ তমসাচ্ছন্ন। বাহ্য-আলোকে ইহা আলোকিত নহে। ইহাতে প্রবেশ করিয়া যে পরমাত্মার জ্যোতিঃদর্শন করিতে পারে—যে অন্তর্মুখ, অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতি—সে এই অন্ধকার হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিয়া আত্মার জ্যোতিঃতে সেই সর্ব্বহৃদিসন্নিবিষ্ট ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে সমর্থ। সে জ্যোতিঃ, সে দৃষ্টি, সে যোগচক্ষু যাহার না প্রকাশিত হয়, সে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। যে সংসার সাগর পার হইয়া, স্বর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ স্বর্গভোগ বাসনা দমিত করিয়া, পুরুষোত্তমদর্শনের জন্য প্রবেশ করিতে পারে, তাহার কর্ণে আর সংসার সমুদ্রের কোলাহল যাইতে পারে না। যিনি নিজ দেহপুরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়বিমানে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে পারেন; যিনি 'সোঽহমস্মি' এই অভেদে পরমাত্মার চিন্তা ও ধ্যান করিতে পারেন, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডপুরে এই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। তিনিও এই অভেদভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। ভগবান বলিয়াছেন যে, এই বিরাট বিশ্ব তাঁহার দেহের মধ্যে অবস্থিত। ভগবান বলিয়াছেন—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥"
—গীতা ১১।৭

অর্জ্জুনও ভগবানের বিরাটদেহ দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া বলিয়াছেন,

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।"—গীতা ১১।১৫

সুতরাং, ভগবানের বিরাটদেহে এই কৃৎস্ন জগৎ একত্র-সংস্থিত। ভগবানের এই বিরাট্‌দেহ ভগবানের ক্ষেত্র—তাঁহার পুর। ভগবান এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহাই শ্রীক্ষেত্র। এই শ্রীক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রেরও অধিষ্ঠাতা, নিয়ন্তা, অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দিব্যচক্ষে দর্শন করিতে হয়। এই বিরাট্ বিশ্বরূপক্ষেত্র বা পুরও আমাদেরই দেহ বা ক্ষেত্রের ন্যায় পঞ্চকোষবিশিষ্ট। ইহার প্রথমকোষ স্থূল অন্নময়। তাহাই ব্রহ্মের ব্যক্তরূপ। এই অন্নময়কোষ ভোক্তা জীবগণের ভোগস্থান;—সেখানে অন্নের কাড়াকাড়ি,

অন্নের ছড়াছড়ি, অন্নের আনন্দবাজার! সেখানে কোন ভেদাভেদ নাই, জাতিবিচার নাই, সেই বিরাট্ পুরুষের প্রসাদ পাইবার সকলেই সমান অধিকারী!

ব্রহ্মের তিন অভিব্যক্ত রূপ;—ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা। ইহার মধ্যে ভোগ্যরূপই এই ব্যক্ত অন্নরূপ। অন্ন ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে . . অথো অন্নেনৈব জীবন্তি অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। . . . সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি।" তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'অন্নং ব্রহ্ম', 'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ'। অন্নকে নিন্দা করিতে নাই।

এই অন্নময়কোষ ভগবানের বা ব্রহ্মের বিরাট শরীর। এই অন্নময়স্থিত আত্মাকেই বিরাট্ বলে। তাহার পর, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। এই কোষে বা সূক্ষ্ম শরীরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভরূপে ভগবান্ পুরুষোত্তম। এই বিশ্বের প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় শরীরবিশিষ্ট। এই তিন কোষ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময়কোষে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান অবস্থিত। যেমন আমার নিজের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয়াকাশে, বা আনন্দময়কোষে, আমাদের আত্মস্বরূপ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে হয় ও 'সোঽহমস্মি' এই অভেদে তাহাকে অনুভব করিতে হয়; সেইরূপ বাহিরে, এই বিরাট্ বিশ্বরূপ ভগবানের দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাহার ব্যক্ত অন্নময় কোষ ও অব্যক্ত প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষ অতিক্রম করিয়া, তাহার সেই আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময়কোষে সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে হয় এবং তাহাকে 'সোঽহমস্মি' এই অভেদে অনুভব করিতে হয়। যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হয়, তেমনই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এ জ্ঞানও বিজ্ঞান-সহিত লাভ করিতে হয়; এবং অন্তরে-বাহিরে—সর্ব্বত্র পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে বিজ্ঞান-সহিত জানিতে হয়। ইহাই জ্ঞানের সীমা, সাধনার সীমা। এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ হইলে এবং এই জ্ঞানে স্থিতি হইলে, মুক্তি হয়। এইরূপে শ্রীক্ষেত্র বা পুরী হইতে আমরা আমাদের ক্ষেত্র বা পুরতত্ত্ব, জানিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরে বিশ্বরূপ ভগবানের বিরাট্ দেহতত্ত্ব জানিয়া ও তাহার মধ্যে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া, মোক্ষলাভের প্রকৃত পন্থা বা উপায় জানিতে পারি!

আমাদের এই দেহরূপ পুরে বা ক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক, আমাদের হৃদয়াকাশে যেরূপে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে হয়, অথবা এ ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভগবানের বিরাট্ দেহে বা ক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক যেরূপ তাহার 'হিরণ্ময়েপরে কোষে' নিষ্কল ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে হয়, তাহার সঙ্কেত পুরীতে পুরুষোত্তমের মূর্ত্তি হইতে যে ভাবে জানা যায়, এক্ষণে তাহা আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পুরীর মধ্যে বিমানে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথে পুরুষোত্তমের মূর্ত্তি দর্শন হয়। সে মূর্ত্তি বর্ণনাতীত—কিস্তুত কিমাকার! তাহাতে মুখ, চক্ষু, নাসিকা, কর চরণাদির আভাস আছে, কিন্তু তাহাদের কিছুই অভিব্যক্ত নহে। সকল ইন্দ্রিয়গুলিরই 'আভাস' আছে কিন্তু কাহারও স্পষ্ট আকার নাই। ইহার কারণ কি? যে জাতি স্থাপত্যবিদ্যায় ও নানাবিধ শিল্পকলায় এরূপ পারদর্শী ছিল, যে জাতির শ্রীক্ষেত্রের বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অদ্ভুত শিল্পকলা এখন পাশ্চাত্য স্থাপত্যবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদন করে, তাহারা যে কাঠের মূর্ত্তি গড়িতে পারিত না, ইহা অনুমান করা যায় না। তবে, তাহারা পুরুষোত্তমের মূর্ত্তি এরূপ কিস্তুত কিমাকার করিয়া গড়িল কেন? এ মূর্ত্তি হইতে আমরা পুরুষোত্তমের স্বরূপ—আমাদের হৃদয়স্থিত ও বিশ্বেশ্বর বা ব্রহ্মাণ্ডকোষস্থিত পুরুষোত্তমের স্বরূপ কিরূপে বুঝিব?

তখন মনে হইল যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর যে মূর্ত্ত হইয়াও অমূর্ত্ত। তিনি যে অরূপ হইয়াও রূপবান। তিনি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের আভাসযুক্ত। তাহার এই ইন্দ্রিয়ের আভাস হইতেই যে, এ ব্যক্ত জগতে প্রতি ব্যষ্টি ক্ষেত্রে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হয়। গীতায় জ্ঞেয়-ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনাকালে ব্রহ্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥"

ইনিই ত আমাদের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা, ইনিই ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা, নিয়ন্তা—পরমব্রহ্মের পুরুষোত্তমরূপ। মূর্ত্তিদ্বারা

Symbol দ্বারা, বা কোনরূপ লিঙ্গ দ্বারা, তাঁহাকে দেখাইতে হইলে আর অন্যকোন প্রকারে কি তাঁহাকে দেখান যায়? তখন যে শিল্পী ব্রহ্মের এই অমূর্ত্ত মূর্ত্তরূপের, এই অরূপের রূপের কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তখন বুঝিলাম, এ মূর্ত্তিতে কেন শুধু হাতের একটা চিহ্ন বা আভাসমাত্র আছে, সম্পূর্ণ খোদিত হয় নাই। তখন বুঝিলাম, এ মূর্ত্তিতে চোখের আভাসমাত্র আছে; কিন্তু চক্ষু সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কারভাবে রঞ্জিত হয় নাই, তখন এ মূর্ত্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। তখন বুঝিলাম যে, আমার হৃদয়স্থিত পরমাত্মা অচক্ষু অথচ সর্ব্বদ্রষ্টা, অশ্রোত্র অথচ শ্রোতা, অকর্ত্তা হইয়াও সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশাসক, সর্ব্বান্তর্যামী।

তখন ত্রিমূর্ত্তির রহস্য বুঝিলাম। আমাদের হৃদয় মন্দিরে অবস্থিত পরমাত্মা পরমেশ্বরকে এই তিন ভাবে দর্শন করিতে হয়। যিনি আমাদের হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তম, যিনি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্থ, তাহার অন্তর্যামী, নিয়ন্তা পুরুষোত্তম, তিনি যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ! এই সৎরূপে, চিৎরূপে ও আনন্দ রূপে তাঁহাকে দেখিতে হয়। তিনি সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিমান। তিনি সৎরূপে সন্ধিনী শক্তিমান, তাঁহারই সত্তাতে এ বিশ্ব সত্তাযুক্ত, তাঁহার সত্তা হইতে সমুদায় ভাবের অভিব্যক্তি; তাঁহার সত্তাতেই সমুদায় বিধৃত। ওঁ তৎসৎ তিনি সৎ,—তিনি সত্তাস্বরূপ। এই সৎ স্বরূপে, সত্তা-স্বরূপে তিনি জগন্নাথ। এই সৎস্বরূপে বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইহার আধার—অধিকরণ। তাঁহার সত্তায় বিশ্বজগৎ সত্তাযুক্ত। তিনি আছেন—তাই আমি আছি—তাই এ জগৎ আছে।

তিনি যে সৎস্বরূপ, শ্রুতিতে তাহা বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন 'সদেব সোম্য ইদমগ্রআসীৎ, তৎ সত্যম্ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ'। শুধু তাহাই নহে; শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যে, 'তিনি আবার আনন্দ-স্বরূপ।' হ্লাদিনী-শক্তিমান এই আনন্দস্বরূপে আমাদের এবং এই বিশ্বের আনন্দময়কোষে অবস্থান করেন। শ্রুতিতে আছে —

"আনন্দময়ঃ, তেনৈষপূর্ণ, স বা এষ পুরুষবিধ এব।"

তিনি আনন্দময় পুরুষ, তাঁহাকে দর্শন করিলেই আর ভয় থাকে না, মুক্ত হওয়া যায়।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্যমনসা সহ।"

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।"

যিনি আনন্দব্রহ্ম, তিনি শিবং, তিনি সুন্দরং। তিনি রেবতীমোহন। যিনি রেবতী, তিনি আনন্দময়ী, তিনিই দুর্গা। তাই বলরামের ধ্যানে আমরা এই রেবতীমোহন, আনন্দময়, ব্রহ্মের আভাষ পাই।

ব্রহ্ম আবার চিৎঘন বা সম্বিৎ শক্তিমান। এই চিৎ— পুরুষোত্তমেরই পরাশক্তি— তাঁহার আত্মশক্তি, তাঁহার স্বগুণে নিগূঢ় আত্ম শক্তি। তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল ক্রিয়া-শক্তি সমীভূত জ্ঞানশক্তি। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে —

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নং এতদ্ব্যাপ্য স্থিতাজগৎ
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

অতএব, ভগবানের যাহা পরাশক্তি, তাহা চিন্ময়ী। সেই চিন্ময়ী শক্তিতেই ব্রহ্মের 'আমি বহু হইব'— এই কামনা বা ঈক্ষণ হয়, এবং তাহা হইতেই নামরূপের দ্বারা এ জগৎ ব্যাকৃত হয়। তিনি শব্দরূপা, বাকরূপা। তাই দেবীসূক্তে বাকদেবী বলিয়াছেন—

"ওঁ অহং রুদ্রেভিবসুভিশ্চরা
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যা
হমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥"

—তিনি চিকিতুষী, সর্ব্বদর্শিনী। তিনি ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেব গণকে ধারণ করেন। তিনি বিশ্বসৃজন করেন, বিশ্বধারণ করেন। এই জন্য পুরুষোত্তমের চিৎভাব তাঁহার পরাশক্তি ভাব। সেইভাবে স্ত্রীরূপে তাঁহাকে ধারণা করিতে হয়। তাই শ্রীমন্দিরে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যের মূর্ত্তিকে স্ত্রীরূপা বলা হয় এবং তাঁহার ধ্যান হইতে তাঁহার এই শক্তিরূপ, আদ্যাশক্তি দুর্গারূপ আমরা জানিতে পারি।

পুরুষোত্তমের এই সচ্চিদানন্দরূপ তিনভাব বস্তুতঃ ভিন্ন নয়—তিনভাব একই। এক পুরুষোত্তমেরই বিভিন্ন ভাব। তাঁহাকে সৎস্বরূপে, আনন্দস্বরূপে ও চিৎস্বরূপে, ভিন্ন ভাবে দর্শন করিলেও, তিনি যে স্বরূপতঃ একই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম, তাহা আমরা যোগ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারি। এই সচ্চিদানন্দভাব হইতেই পরমেশ্বরের পরমা-প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই তিনভাবের অভিব্যক্তি হয়। তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরমাত্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা এই তিন

গুণময়ী ভাববিশিষ্ট হন। তাই একভাবে দেখিলে এই ত্রিমূর্ত্তিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপে দর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা পরমাত্মা,—পুরুষোত্তমের পরমস্বরূপ নহে।

এই ত্রিমূর্ত্তি হইতে আমরা ব্রহ্মের প্রণব স্বরূপ ধারণা করিতে পারি। প্রণব ওঁম। পাতঞ্জল-দর্শনে আছে, 'প্রণব ঈশ্বরের বাচক।'—'তস্য বাচক প্রণবঃ'। তিনি এই ওঙ্কারদ্বারা বাচ্য হ'ন। আর কোন বাক্যের দ্বারা তাহার স্বরূপনির্দ্দেশ করা যায় না। এই প্রণবের চিন্তা, জপ ও অর্থ ভাবনাদ্বারা তাঁহাতে সমাধিসিদ্ধি হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম
যদোঙ্কার"। —(প্রশ্ন উপনিষৎ ৫।২)

"ওঁমিত্যেতদক্ষরং ইদং সর্ব্বং"। (মাণ্ডুক্য, ১) অতএব যিনি আমাদের হৃদয় গুহাবস্থিত পরমাত্মা পুরুষোত্তম, তিনি ওঁ। আমার পরমসুহৃদ স্বর্গগত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যে' 'নূতনে জগন্নাথ দর্শন' প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলেন যে, এই ত্রিমূর্ত্তি ওঙ্কার অক্ষরেরই রূপ। এই ওঙ্কারের তিন ব্যক্ত মাত্রা অ, উ, ম। আর অর্দ্ধ অব্যক্ত, অব্যাকৃত মাত্রা বা অমাত্র ও আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন

"অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত" এই ৪র্থ মাত্রা নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, অনির্ব্বাচ্য, অপ্রমেয়, প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মের স্বরূপ আমরা ধারণা করিতে পারি না, তাহার দর্শন হয় না। ব্রহ্মের যাহা সোপাধিক সবিশেষ ভাব বিশেষতঃ যাহা তাঁহার সগুণ পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাব, তাহাই যোগদৃষ্টিতে আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে দর্শন করিতে পারি। তিনিই ত্রিমাত্রা প্রণবের অ, উ, ম-স্বরূপ। প্রশ্নোপনিষদে ৫ম প্রশ্নে আছে যে, যিনি এই ওঙ্কারের একমাত্রামাত্র (অ) ধ্যান করেন, তাঁহাকে আবার এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যিনি দুইমাত্রা (অ, উ) ধ্যান করেন, তিনি ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন বটে; কিন্তু তাঁহাকেও আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। যিনি ত্রিমাত্রা ধ্যান করেন, তিনিই, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, পুরিশয় পুরুষকে দর্শনকরতঃ মুক্ত হ'ন।

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ"। ৫।

"তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ"। ৬।

—অর্থাৎ, যিনি ও এই ত্রিমাত্রযুক্ত অক্ষরদ্বারা এই পরমপুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে (অর্থাৎ সূর্য্যলোকে) উপনীত হয়েন। যেমন সর্প ত্বক হইতে মুক্ত হয়, তেমনি তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। তিনি সামমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে) উন্নীত হ'ন। সেই জীবঘন সমষ্টিজীবাধার হিরণ্যগর্ভ হইতে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পদ হইতে), তিনি পরাৎপর পুরিশয় (অর্থাৎ সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্ট) পুরুষকে দর্শন করেন। সেই বিষয়ে এই শ্লোক দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ৫।

তিন মাত্রা (অর্থাৎ ওঙ্কারের অকার উকার মকার এই মাত্রাত্রয়) পৃথক্‌রূপে এবং ব্রহ্মদৃষ্টিবর্জ্জিত, মৃত্যুগোচর অর্থাৎ, উপাসকগণ উহাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন না। কিন্তু এ মাত্রাত্রয় সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত বাহ্য, অভ্যন্তর, ও মধ্যম (অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের অভিধানরূপ) ক্রিয়াসমূহে পরস্পর-সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া, প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানী (অর্থাৎ, ওঁকার তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি) বিচলিত হয়েন না। ৬।"

এইরূপে আমরা পুরীর মন্দিরের এই ত্রিমূর্ত্তি হইতে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের এই প্রণবের অকার উকার ও মকার—এই ত্রিমাত্রা তত্ত্ব জানিতে পারি; এবং এই ত্রিমাত্রিক ওঙ্কাররূপে তাঁহাকে অভিধ্যানপূর্ব্বক পুরিশয় পুরুষকে জানিয়া, দর্শন করিয়া, ও তত্ত্বতঃ তাঁহাতেই প্রবেশ করিয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রাচীন ভারতের অর্ণবপোত

[শ্রীবিমলাচরণ লাহা, বি. এ. এম. আর এ. এস.]

সুপ্রাচীনকালে বৈদিকযুগে ভারতীয় আর্য্যগণ যে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতের বহির্ভাগে সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতীয়গণ ভিন্নদেশীয়দিগের নিকট পোত নির্ম্মাণকার্য্য শিক্ষা করেন নাই। যখন ভারতেতর জনভূমির অধিবাসিগণ অসভ্যাবস্থায় বর্ব্বরের ন্যায় আচরণ করিত, তখনও সুসভ্য ভারতীয় আর্য্যগণ, সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া, আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব জগতের সমক্ষে প্রতিপাদন করিত। তাহারা নানাবিধ পণ্যদ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয়ের জন্য স্বদেশের মধ্যে নৌকাযোগে, নদনদী অতিক্রম করিয়া, নানাস্থানে গমনাগমন করিতেন। পক্ষান্তরে, সম্পদ উপার্জ্জনের নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রায়ও ব্যাপৃত থাকিতেন। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পোতগমনের পথ, সামুদ্রিক নৌকাসকল, সমুদ্র, সামুদ্রিক পদার্থসমূহ, সমুদ্রযাত্রা এবং পোতভঙ্গ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুগণ—সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেও—বৈদেশিক বাণিজ্যোপযোগী বিষয়সমূহ সুবিদিত ছিলেন। বেদের নানাসূক্তে তাহার প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কয়েকটি সূক্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—
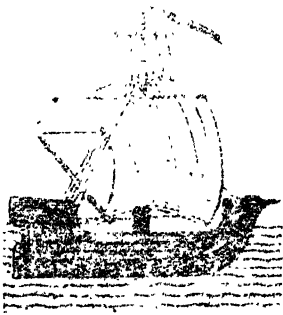
ভারতীয় প্রাচীন অর্ণবপোত চিত্র—নং .

"অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ।
বিয়াদ্বস্র ইন্দবঃ।"
(ঋগ্বেদ ৩য় অধ্যায় ৪৬ সূক্ত, ৮ ঋক্)

অর্থাৎ—"তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ যান সমুদ্রের ঘাটে রহিয়াছে, ভূমিতে রথ রহিয়াছে, সোমরস তোমাদের যজ্ঞকর্ম্মে মিশ্রিত হইয়াছে"। এখানে এই 'অরিত্র' শব্দের অর্থ—

"নৌকার দাঁড়"। ঋগ্বেদে (১—১১৬।৫) এবং বাজসনেয়ী সংহিতাতে একশত দাঁড়বিশিষ্ট জলযানের উল্লেখ আছে। 'নৌ', অর্থাৎ নৌকা, 'অরিত্রপরণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দুইটি সূক্তে (১।৪৬।৮, ১০।১০১।২) 'অরিত্র' অন্যভাবেও প্রযুক্ত হইয়াছে। নৌ শব্দটি ঋগ্বেদে, এবং পরে অন্যত্র, নৌকা বা জাহাজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, নদী পারাপারের জন্যই 'নৌ' বা 'নৌকা' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদিও যমুনা, গঙ্গা প্রভৃতি বড় বড় নদী পার হইবার জন্য বড় বড় নৌকার প্রয়োজন হইত, জাহাজের প্রয়োগ কিন্তু ততবেশী দেখা যায় না। নৌ বলিলে, দারুময় নৌকামাত্রও বুঝাইত (ঋগ্বেদ, ১০।১৫৫।৩)। উইল্‌সন্ সাহেব (Rig Veda I XLI) বলিয়াছেন যে, বৈদিকযুগে সমুদ্রযাত্রার উপযোগী জাহাজের বড় একটা উল্লেখ নাই, এমন কি—মাস্তুল পালপ্রভৃতি জাহাজের অংশ-বিশেষের আদৌ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তখনকার জাহাজ বা নৌকার সম্বল ছিল—একমাত্র অরিত্র। একথা আমরা কোন মতে স্বীকার করিতে পারি না।

* ঋগ্বেদ, ১০, ১০১, ২ ; শতপথব্রাহ্মণ ৪ ২।৫।১০.

। ১।১১৬।১৫ ; ২।৩৯।৪ ; ৮।৪২।৩ ৮।৮৩, ইত্যাদি।

। অথর্ব্ববেদ, ২।৩৬।৫ ; ৫।১৯।৮। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫-৩।১০।১। বাজসনেয়ী সংহিতা ১০।১৯। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪।১৩, ৬।৬।২১। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১—৮।১।৪ ; ৪—২।৫।১০ ইত্যাদি।

বৈদিকযুগে সমুদ্র-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, এবং পাল মাস্তুলপ্রভৃতি জাহাজের আবশ্যক অংশবিশেষেরও অভাব ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা অথর্ববেদের ৫।১৯।৮ শ্লোক দেখিতে বলি। এখানে একটি প্রপীড়িত ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত রাজ্যের ধ্বংসের সহিত একখানি ছিদ্রযুক্ত নিমজ্জমান পোতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এস্থলে, ভিন্নপাঠ থাকায়, ভাষ্যকার এইরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও (১।৫৬।২; ৪।৫৫।৬ প্রভৃতি)—সমুদ্রগামী বণিকদিগের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে ইহাও কথিত হইয়াছে যে—

"কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেমন ধনত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদের নৌকাসমূহদ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে। সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।" এই সূক্তে শতাধিক ক্ষেপণের বড় বড় পোত

বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে, আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই যে—ভারতবাসিগণ দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া স্বীয় বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন। মনুর অন্ততঃ চারিটি শ্লোক হইতে আমরা সমুদ্রগমনব্যাপার বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারি। যে যে শ্লোকগুলিতে সমুদ্রযানের কথা আছে, আমরা নিম্নে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম -

"সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্।
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেবচ।"

(৯ম অধ্যায়—৩৩১, ৩৩২)

"সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি।"

(৮ম অধ্যায়—১৫৭ শ্লোক)
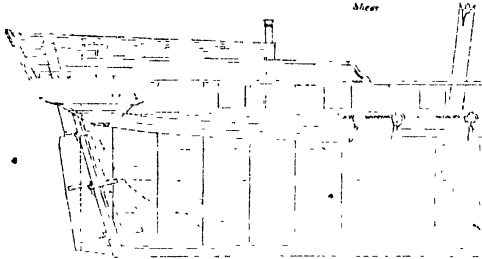
চিত্র—নং

সমুদ্রগমনোপযোগী ছিল—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেদের বহুসূক্তে এইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। 'বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র' যদিও নিতান্ত প্রাচীনগ্রন্থ নহে, তথাপি, ইহাতে সুপ্রাচীন যুগের বহুপ্রবাদাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতেও আমরা সমুদ্র-যাত্রার বিশেষ নিদর্শন দেখিতে পাই (১।২।৪; ২।২।২)।

ঋগ্বেদে 'প্লব' অর্থাৎ ভেলা, 'নাবাজ'—মাঝি, নব্যা—পোত-গমনোপযোগী নদী, 'মণ্ড' 'শম্বী' নদীউত্তরণকারী, প্রভৃতি বহুশব্দের প্রয়োগ আছে। ঋগ্বেদের যেসমস্ত ঋকের উল্লেখ করিলাম, তৎসমুদয় পাঠে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষ, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া, সামুদ্রিক, পোত সাহায্যে

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরোভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্।"

(৮ম অধ্যায়—৪০৬ শ্লোক)

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎ করান্॥"

(৭ম অধ্যায়—১২৭ শ্লোক)

"পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়োরাজ্ঞাপশুহিরণ্যয়োঃ
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশ এববা॥"

(৭ম অধ্যায়—১৩০ শ্লোক)

"আদদীতাথষড়্‌ভাগং দ্রু-মাংস মধু সর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চপুষ্পমূলফলস্য চ।

পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্মণাম্।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥"

(৭ম অধ্যায় - ১৩১ ১৩২, শ্লোক

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ॥
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্মমাসিমাসিমহীপতিঃ"

(৭ম অধ্যায়—১৩৮ শ্লোক)

রামায়ণ হইতে আমরা অবগত হই যে, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ প্রদেশ তৎকালে মহারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। রামায়ণে নদ নদী ও পর্ব্বতসকলের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে, রামায়ণগ্রন্থ রচনাকালে, হিন্দুদিগের দাক্ষিণাত্যে গমনাগমন ত ছিলই, অধিকন্তু, তৎকালে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী

"ভূমিঞ্চকোষকারাণাং ভূমিঞ্চরজতাকরম্"।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ—২৩ শ্লোক)

"ততঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হত"।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

"এতান্ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ
কাম্বোজ যবনাংশ্চৈব শকানাংপত্তনানিচ।
অন্বিষ্যবরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ)

উল্লিখিত শ্লোকসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রামায়ণ যুগে শকপ্রভৃতি জাতি অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রিয় ছিল এবং ভারত-বর্ষীয়দিগের সহিত ইহাদের বাণিজ্য কার্য্য
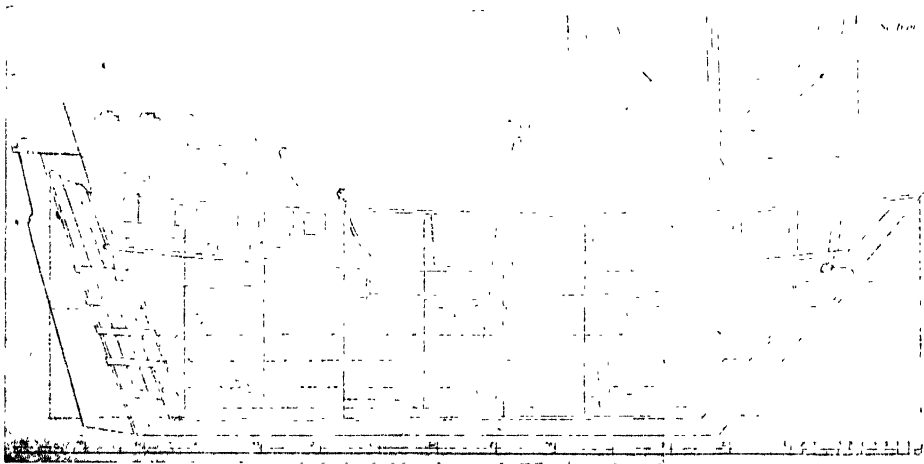
চিত্র- নং ৩

প্রদেশসমূহে বাণিজ্যাদি প্রচলিত ছিল। আমরা কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড—৪০ সর্গে দেখিতে পাই যে, তাহাতে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে ;—

"যত্নবন্তোযবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপ্যকং দ্বীপং সুবর্ণকারমণ্ডিতং॥"

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে আমরা রামায়ণ-যুগে সমুদ্র-যাত্রার বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হই—

"উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ।
কোট্যাঃ পরান্তাঃ সামুদ্রারত্নান্যুপহরন্তুতে॥"

(অযোধ্যাকাণ্ডের ৮৩ অধ্যায়—৫৪৩ শ্লোক)

"সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানিচ"।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ—২৫ শ্লোক)

প্রধানতঃ নির্ব্বাহিত হইত। বাল্মীকি-রামায়ণে যবদ্বীপ, সুমাত্রাদ্বীপ ও চীনদেশে হিন্দুরা যে গমনাগমন করিত, তাহার নিদর্শন সূচিত হইয়াছে।

মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, পাণ্ডবদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব, সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপে গমন করিয়া, তথাকার ম্লেচ্ছ-অধিবাসীদিগকে জয় করিয়াছিলেন—

"সাগরদ্বীপবাসাংশ্চ নৃপতীন্ম্লেচ্ছযোনিজান্
*　　*　　*　　*
দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব সনৃপং বশেকৃত্ব মহামতি।"

মিতাক্ষরা পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, হিন্দুগণ সুদূর সমুদ্রে পোত-সহযোগে বাণিজ্য-

ব্যাপারাদি পরিচালন করিত। সমুদ্র-যানের উল্লেখ আমরা বায়ুপুরাণ, হরিবংশ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, হিতোপদেশ, শকুন্তলা, রত্নাবলী, দশকুমার চরিত, কথা সরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচুরপরিমাণে পাইয়াছি। কথা সরিৎসাগরে সমুদ্র-গমনের অসংখ্য উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত। সুতরাং, এ সময়ে যে হিন্দুগণ সমুদ্র গমনোপযোগী পোত-নির্ম্মাণকুশল ছিলেন, তাহা ঐ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ তরঙ্গের ৫৮৬০ শ্লোকে এবং ষড়বিংশ তরঙ্গের ১২৪—১৫০ শ্লোকে লিখিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থের পঞ্চাশৎ তরঙ্গে লিখিত আছে যে, চিত্রকর দুইজন শ্রমণের সহিত বহুবিস্তৃত সাগর অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ্ঠান নগরে উপনীত হইলেন। অতঃপর শত্রুগণকে বিজিত করিয়া, আট দিন পরে মক্তিপুর দ্বীপে উপস্থিত হন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেন যে ভারতবাসিগণ গঙ্গা নদীর উপর দিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিত; এবং পালিবোত্রা পর্য্যন্ত গমন করিত।

ম্যাক্‌ফর্সনের (Macpherson's 'Annals of Commerce') গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভারতবাসিগণ তাহাদিগের বাণিজ্য ব্যাপার বন্দরে সমানয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা মিশর দেশের সহিত জাহাজযোগে ব্যবসার পরিচালনা করিতেন। প্লিনী বলেন যে, ষষ্ঠশতাব্দীতে ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্র দিয়া পারস্যের বন্দরে উপস্থিত হইতেন। আমরা 'রয়াল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটি'র Journal, পঞ্চম ভাগ, পাঠ করিয়া
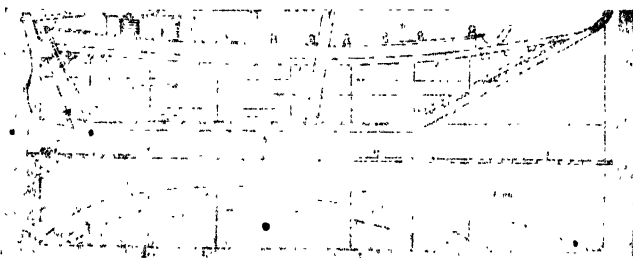
চিত্র নং ৪

জানিতে পারি যে—ফাহিয়ান্, ভারতীয় কর্ম্মচারীবর্গদ্বারা পরিচালিত একখানি জাহাজে করিয়া, তিনি গমন করিয়াছিলেন। সেই জাহাজে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আরোহীও ছিল। আমরা বরাহপুরাণ হইতে সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধী নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—
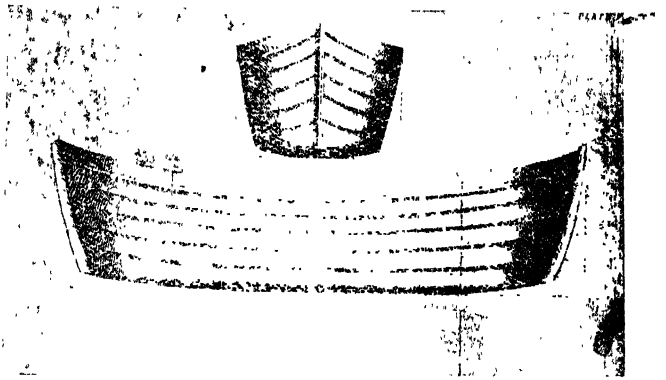
চিত্র নং ৫

"ধনস্তত্রৈব গমনে বণিগ্‌ভাবে মতিং দধৌ।
সমুদ্রযানে রত্নানি মহান্ত্যেতানি সাধুভিঃ।
রত্নপরীক্ষকৈঃ সাক্ষমানায়িষ্যে বহূনি চ
এবং নিশ্চিত্যমনসা মহাসার্থ পুরঃসরঃ
সমুদ্রযায়িভির্লোকৈঃ সংবিদঃ স্তচানিগতঃ।
শ্রমেন মহসা প্রাপ্যোমহাঞ্জলবণার্ণবং
পোতারূঢ়াস্ত তৎ সঙ্গে পোতবাহৈঃ কতোষিতাঃ।"

রাজতরঙ্গিণীতে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাই—

"সাংযাত্রিকঃ সোপ্যগচ্ছেন পোতচ্যুতোম্বুধৌ।
প্রাপপারং নিমজ্জ্যাসাৎ ভিন্নস্তস্যা পোতা নির্গতঃ॥"

উপরের এই সমস্ত শ্লোক হইতে অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারা যায় যে, অতিপুরাকাল হইতে ভারতবাসী নৌকা, পোত ও যান ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

এপর্য্যন্ত আমরা কেবল আমাদেরই পুরাণাদি হইতে অনেকশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতবাসিগণ পোত ব্যবহারে অতিপুরাকাল হইতেই সুনিপুণ ছিলেন। অতঃপর, আর এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে সে উদাহরণ বাহুল্যের আবশ্যক নাই। তবে, কেবল যে হিন্দুশাস্ত্রেই এই বিষয়ের প্রমাণ আছে, তাহা নহে; অন্যান্য

প্রাচীন সভ্যজাতিদিগের গ্রন্থে এবং দক্ষিণ সমুদ্রের বহুউপদ্বীপের পুরাবৃত্তে এই বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

Periplus of the Erythrian Sea নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে—আরব, গ্রীক ও হিন্দুবণিকেরা সকট্রা উপদ্বীপে গমন করিয়া বাণিজ্যার্থে অবস্থান করিত। ক্রফোড ও রালস্ বহুপ্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, যবদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসিগণ হিন্দু ছিল। উহারা ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। যবদ্বীপে বৌদ্ধদিগের যেসময়ে প্রাদুর্ভাব হয়, তখন হিন্দুগণ ঐদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্নিকটস্থ বালিনামক এক ক্ষুদ্রদ্বীপে বসতি করে। তাহারা অদ্যাপি তথায় প্রাচীনধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছে।

ও বাণিজ্যোৎসাহ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার ইংরেজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"Pliny the Elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who in his account of a voyage to the North, says, that in the Consulship of Quintus Metellus Celer, and Lucius Afranius (A. U. C. 694, before Christ 60), certain Indians who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the coast of Germany, and given as a present by the King of the Sulvians, to Metellus who was at that time Governor of Gaul The work of Cornelius Nepos has not

চিত্র নং ৬

যবদ্বীপস্থ হিন্দুগণ ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করে; সুতরাং, তাহারা যে উহার পূর্ব্বে ঐদেশে গমন করিয়াছিল, একথা স্বীকার করিতেই হয়। প্রায় দুইসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুরা যে স্বকীয় সমুদ্রপোতারোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া বসতি করিত, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এইরূপ বহুপ্রমাণদ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ বরাবরই সমুদ্রযাত্রা-কুশল ছিল। ট্যাসিটস্ নামক একজন রোমক ঐতিহাসিক হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা

come down to us; and Pliny, as it seems, has abridged too much. The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture whether the Indian adventurers sailed round the Cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern Seas; or whether they made a voyage still more ex-

traordinary, passing the Island of Japan, the Coast of Siberia, Kamschatska, Zembla in the Frozen Ocean, and thence round Lapland
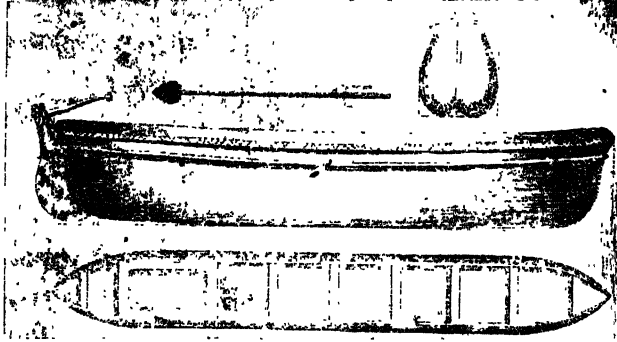
চিত্র নং ৭

and Norway, either into the Baltic or the German Ocean." —Tacitus translated by Murphy. Philadelphia, 1836, p. 606, Note. 2.

দুঃখের বিষয় যে প্রাচীনকালের পোতাদির চিত্র বড় একটা পাওয়া যায় না! বুড়োবুদরের চিত্রাবলীতে আমরা সাতখানি জলযানের চিত্র দেখিতে পাই। সাঞ্চী-স্তূপের-স্থাপত্য-শিল্পে দুইটি, পুরীতে একটি, ভুবনেশ্বরে একটি, এবং অজন্তায় চারিটি মাত্র চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কয়েকখানি চিত্র শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest Times" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সেগুলি দেখিতে পারেন। প্রাচীন ভারতের পোতাদির চিত্র এখনো নূতন কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে, সার্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষে যেরূপ নৌশিল্প প্রচলিত ছিল, আমরা এই প্রবন্ধে সেইগুলির চিত্র সমাবেশ করিলাম * — এগুলি শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে নাই। পশ্চিম সমুদ্রে ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে
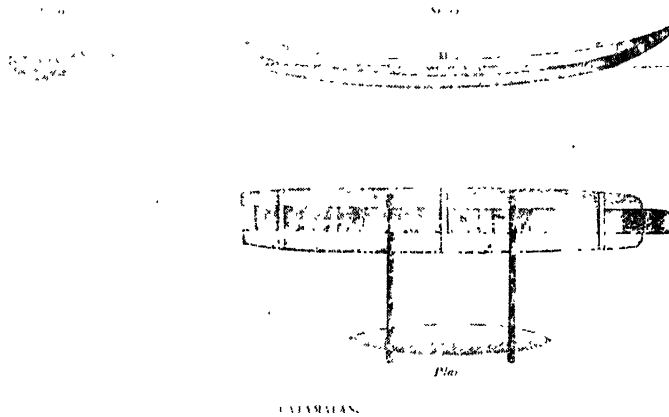
চিত্র নং ৮

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের বণিক্ ও নাবিকেরা যে সমুদ্রপথে যাতায়াত করে, তাহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই দুই প্রদেশের বণিক্‌গণ বাণিজ্য-ব্যাপারে যে কিরূপ সুকুশলী, তাহাদের বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থাই তৎপক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীনকালে এদেশে কিরূপ পোতাদি ছিল, তাহার চিত্রাদি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু নিতান্ত যেরূপ পোতাদি পরিদৃষ্ট হইত, তাহারও নিদর্শনস্বরূপ আমরা একখানি চিত্র প্রদান করিলাম। †

* এই চিত্রগুলি Edye সাহেবের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

† এই খানি Brinkley সাহেবের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রবন্ধটি 'Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society'-তে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার Indian Shipping নামক গ্রন্থে ভারতবাসীদের প্রাচীন নৌযানের অংশ বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি "যুক্তিকল্পতরু" নামক একখানি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহারই শ্লোকবলে তিনি ভারতীয় নৌবিদ্যার প্রাচীনতত্ত্বের দাবী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থখানি কবে, কোন্ সময়ে, লিখিত তাহা আদৌ তিনি আলোচনা করেন নাই। আমরাও সে পাণ্ডুলিপিখানি পড়িয়াছি; কিন্তু তাহা যে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, একথা বলিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। যে গ্রন্থ হইতে কোন বিষয়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, সেই গ্রন্থখানি প্রাচীন কি না তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। গ্রন্থখানি যদি প্রাচীন না হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে নৌবিষয়ক প্রাচীনত্ব ঐতিহাসিকের পক্ষে সুষ্ঠু প্রণালী নহে। আমরা রাধাকুমুদ-বাবুর গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসি নাই; প্রসঙ্গতঃ দুই চারিটি কথা তাঁহাকে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি মাত্র। তাঁহার পুস্তকখানি আপাতদৃষ্টিতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে; পুস্তকখানির পাদটীকায় অনুসন্ধিৎসার
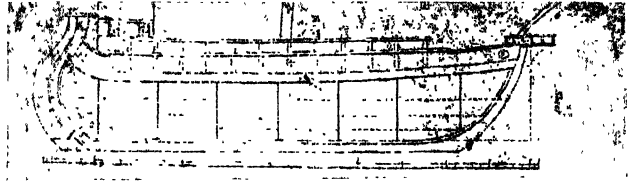
চিত্র নং ১০

পরিচয় পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন, সন্দেহ নাই। ইউরোপের মনীষিবৃন্দ গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়াছেন; আমাদের দেশের অনেকেই গ্রন্থখানি
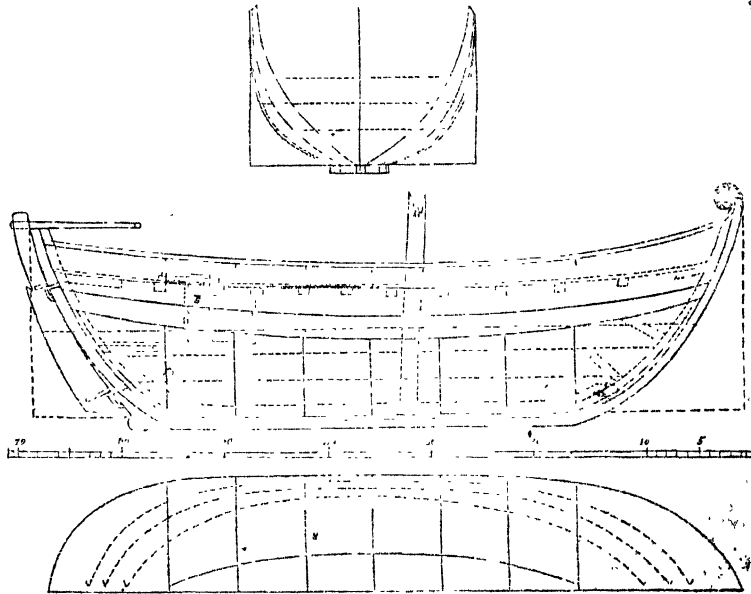
চিত্র নং ৯

প্রমাণের কোন সুবিধা হইবে না। নৌ-গঠনপ্রণালী, জলযান-গঠন-পদ্ধতি, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ক বহুব্যাপার, এই গ্রন্থে আছে বটে; কিন্তু সেগুলি যে প্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? অবশ্য আমরা বলিতেছি না যে, প্রাচীনকালে এগুলি ছিল না; কিন্তু তিনি যে পদ্ধতিক্রমে প্রাচীনত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা সমালোচনাকালে রাধাকুমুদবাবুর স্তুতিবাদও করিয়া-ছেন। আমরাও সেই স্তুতির প্রতিধ্বনি করিতেছি বটে; কিন্তু রাধাকুমুদবাবু অপর যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার প্রায় অধিকাংশ উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থে সেইগুলির নামোল্লেখ না থাকায় আমরা বিশেষ দুঃখিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (তৃতীয় ভাগ, ৭৮ সংখ্যা,

১৭৭১ শক) হইতে তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ইংরেজীতে অনূদিত করিয়া দিয়াছেন; এমন কি সেই পুণ্যশ্লোক লেখকের বহুপরিশ্রমলব্ধ পাদটীকার মন্তব্যগুলিও গ্রহণ করিয়া

চিত্র নং ১১

গ্রন্থের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন, অথচ কোথাও একবার সেই লেখকের নাম উল্লেখ করিবার অবসর পান নাই।

আমরা নিম্নে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও রাধাকুমুদবাবুর পুস্তক হইতে কয়েকটি মূল ও অনুবাদের পাঠোদ্ধার করিয়া

"রামায়ণের নানা স্থানে সমুদ্রযাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে...সমুদ্রান্তর্গত নগর ও পর্ব্বত সমুদয়ে গমন করিবে, কোষকারদিগের দেশে অর্থাৎ চীন দেশে যাত্রা করিবে এবং যবদ্বীপ ও 'সুবর্ণ-দ্বীপে'ও গমন করিবে। এই দুই দ্বীপই ভারত-সমুদ্রবর্ত্তী জাবা ও সুমাত্রাদ্বীপ।

- তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (৭৮ সংখ্যা, তৃতীয় ভাগ মাঘ, ১৭৭১ শক—১৫৭ এবং ১৭৮ পৃষ্ঠা)
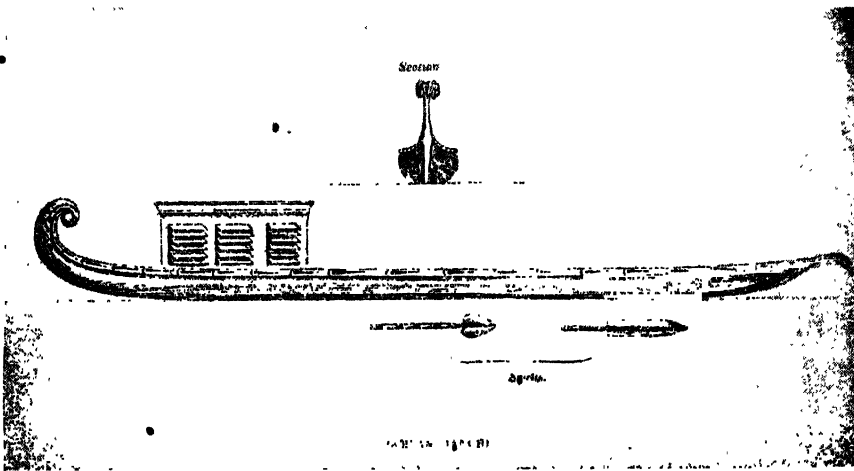
চিত্র নং ১২

দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, রাধাকুমুদবাবু অনুবাদে কিরূপ সিদ্ধহস্ত!

রাধাকুমুদ বাবু তাঁহার পুস্তকে উল্লিখিত অংশের কিরূপ অনুবাদ করিয়াছেন দেখুন—

"The Ramayana also contains several passages which indicate the intercourse between India and distant lands by way of the Sea. In the Kishkindhyá Kándam... In one passage he asks them to go to the cities and mountains in the islands of the sea; in another, the land of the Kosakaras......which is generally interpreted to be no other country than China; a third passage refers to the Yavana Dwipa and Suvarna Dwipa which are usually identified with the islands of Java and Sumatra."

—Indian Shipping, pp 55, 56
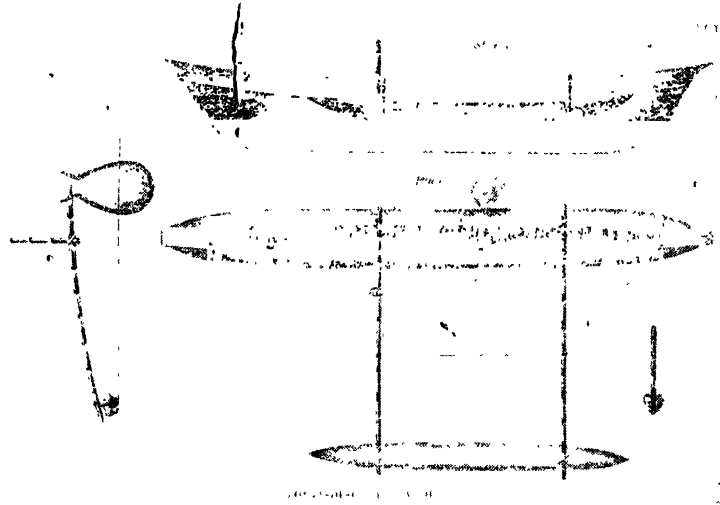
চিত্র নং ১৩

টীকাকার এই অর্থ করেন যে, "কোষকারাণাং ভূমিং কোষেরতন্তুৎপাদক জন্তুৎপত্তিস্থান—ভূতাং ভূমিং।"

—'কোষকারদিগের ভূমি', এবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—কোষের বস্ত্রের তন্তুৎপাদক যে জন্তু, তাহার উৎপত্তিস্থান। অতি পূর্ব্বকালাবধি চীনদেশের কোষেয় বস্ত্র বিশিষ্টরূপ

MANGALORE MANCHÉ.

চিত্র নং ১৪

বিখ্যাত আছে এবং তদনুসারে সংস্কৃতগ্রন্থকারেরাও তাহা 'চীনাংশুক' ও 'চীনচেলক' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"গচ্ছতিপুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং
যতঃ চীনাংশুকমিবকেতোর প্রতিবাতং নীয়মানস্য।"
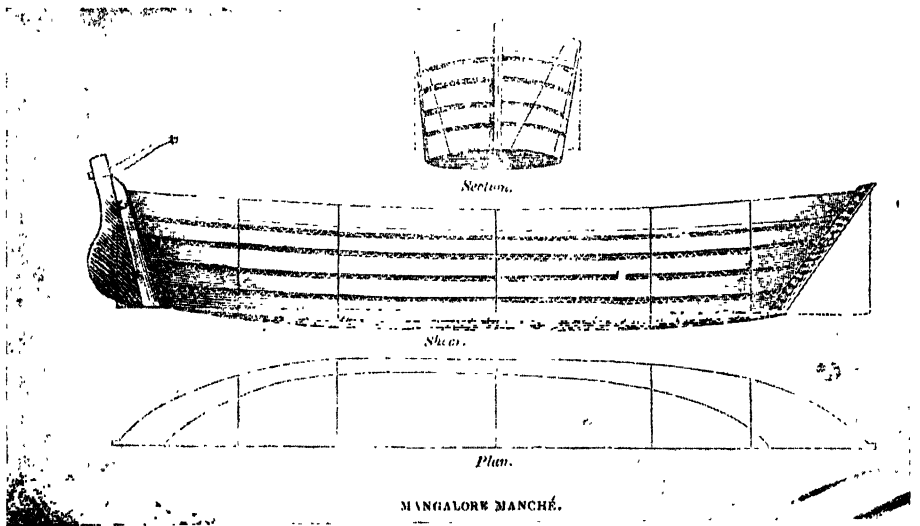
—শকুন্তলানাটকে প্রথমাঙ্কে।

প্রোক্ত মূলের পাদটীকায় আছে :—

........."সমুদ্রমধ্যাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনাপি চ"।

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে, ২৫ শ্লোক।

"ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং"।

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে, ২৩ শ্লোক।

"সর্ব্বাঙ্গমঙ্গলিপোচ্চ চন্দনেন্দুমৃতদ্রবৈঃ
সুগন্ধিমাল্যাভরণৈশ্চীন চেলৈঃ সুশোভনৈঃ।"
—রঘুনন্দনকৃত যাত্রাতত্ত্ব।

রাধাকুমুদ বাবুর Foot Note :—

"The passege in question is "সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতানপত্তনানি চ"। (Kishkindhyá Kaándam, 40, 25).—Indian Shipping, p. 55.

"The passage in question "ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং" (Kishkindya Kaandam, 40, 23). The commentator explains "কোষকারাণাং ভূমিং as কৌষেয়তন্তুৎপাদক তন্তুৎপত্তিস্থানভূতাং ভূমিং or the land where grows the worm which yields the silken clothes. The silken cloth, for which China has been famous from time immemorial, has been termed in Sanskrit literature চীনাংশুক and চীনচেল to point to the place of its origin. Thus in Kalidas's Sakuntala we come across the following passage:—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

In the Yátratattva of Raghunandan we find the following :—

"সর্ব্বাঙ্গমঙ্গলিপোচ্চ চন্দনেন্দুমৃতদ্রবৈঃ।
সুগন্ধিমাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ॥"
- Indian Shipping, p 55.

মূল—

"মহাভারতে অর্জ্জুন ও নকুলের দিগ্বিজয়ার্থে সাগরান্তর্গত বহুতর দ্বীপ ও ভারতবর্ষের বহির্ভূত অন্যান্য বিবিধদেশে যাত্রা বর্ণনা আছে।" —তত্ত্ববোধিনী, ঐ ১৫৮ পৃঃ।

অনুবাদ—

"In the Mahabharata the accounts of the Rájasúya Sacrifice and Digvijaya of Arjuna and Nakula mention various countries outside India with which she had intercourse."
—I. S., p. 57.

মূলের পাদটীকা—

"...টলেমি জাবাদ্বীপের সংস্কৃত নাম যবদ্বীপ লিখিয়া পরে তৎপ্রতিপাদক গ্রীক্ শব্দ তাহার অর্থ করিয়াছেন; ইংরেজি গ্রন্থকর্ত্তারা Bordey Island বলিয়া সেই শব্দের অনুবাদ করেন। —(Humboldt's Corn.) আর আল চিরুণি নামে একজন আরবি গ্রন্থকর্ত্তা প্রদেশীয় কতিপয় উপদ্বীপের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা ঐ সকল দ্বীপকে স্বরনদিব বলে এবং করাসীস জাতীয় এক পুরাবৃত্ত বেত্তা Reinaud)—এই শব্দ জাবা ও সুমাত্রা উভয়দ্বীপেরই প্রতিপাদক বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।" (Journal Asiatique Tome iv ive Serie p 205).

তত্ত্ববোধিনী, ঐ ১৫৮ পৃঃ।

রাধাকুমুদ বাবুর Foot Note :—

"Ptolemy adopted the Sanskrit name of the island of Java and mention its great equi equivalent while modern writers like Humbdlt call it the Barley Island Alberuin also has remarked that the Hindus call the Islands of the Malay Archipelago by the general name of Suvarna island which has been interpreted by the renowned French antiquorian Reinaud to mean the island of Java and Sumatra." (Journal Asiatique, Tome IV. IV e Serie, p. 205).

—Indian Shipping, p. 56.

বিলাতে Dr. Davids তাঁহার "Buddhist India" নামে একখানি সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। Rheys Davids সাহেবের নাম উল্লেখ না করিয়া, রাধাকুমুদবাবু নিম্নলিখিত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন,—

" In some our earliest documents; we hear of sea voyages out of sight of land. (Digh. 1. 222)" -Buddhist India; p. 94.

"Very interesting and conclusive evidence is supplied by a passage in the Digha nibaya (1-222.) which distinctly mentions sea-voyages out of sight of land".—I. S., p 73.

আবার—

"So the earliest documents speak of voyages lasting six months made in ships (Nava, perhaps 'boats') which could be drawn up on shore in the winter." (Samyutta 3, p. 155-5-51, Auquttora, 4, 127)—B. I., p. 96.

" In the Sainyutta Nikaya there are interesting passages which mention voyages

lasting for six months made in ships (Nava which means boats) which could be drawn up on shore in the winter."—I. S., p. 78.

এতদ্ব্যতীত রাধাকুমুদবাবু তাঁহার পুস্তকে (p. 73) 'নাব' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহার অর্থ করিতেছেন "boats." এই শব্দটি রাধাকুমুদ বাবুর নিজের নহে। পালিতে শব্দটি 'নাব' নহে 'নাবা'। অন্য কেহ লিখিলে, ছাপার ভুল মনে করিতে পারিতাম ; কিন্তু রাধাকুমুদ বাবু তাঁহার গ্রন্থের সূচনায় লিখিয়াছেন—

"The Sanskrit texts as well as the Pali, I have studied both in the original and in translations."—Indian Shipping, viii.

তাঁহার এই মূল পালি পড়ার নমুনা আমরা নিম্নে দিলাম—

(১) "বালহস্‌স জাতক" (I. Shipping pp. 29 to 15) বালহস্‌স বলিয়া কোন জাতক নাই ; তাহার নাম 'বলাহস্‌স'।

(২) "রাজবল্লীয়" (I. S., p. 28) বলিয়া কোন গ্রন্থ নাই,—নাম হইবে "রাজাবলীয়।"

(২) "ববেরু জাতক" I. S., p. 74)—ভুল ; নাম হইবে বাবেরু। ইত্যাদি

সংস্কৃতেও ভর্তৃহরিকে বর্তৃহরি লিখিয়াছেন।

—(I. Shipping p. 67.)

তিনি 'বোধি সত্ত্বাবদান কল্পলতা' হইতে ও প্রাগুক্ত উপায়ে রচনাদি উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। রাধাকুমুদ বাবু লিখিয়াছেন (Shipping, p. 113 I.) যে বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থখানি খ্রীঃ দশম শতাব্দিতে কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত। ক্ষেমেন্দ্র, দশম শতাব্দীর কবি, না একাদশ শতাব্দীর কবি ?

রাধাকুমুদ বাবুর গ্রন্থ হইতে বচনের পর বচন উদ্ধৃত করিয়া আমরা আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। রাধাকুমুদ বাবুর গ্রন্থে অনেক শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, একথা অস্বীকার করিব না। তবে, গ্রন্থখানির নাকি শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে, তাই তিনি যেসমস্ত গ্রন্থ হইতে তাঁহার মালমসলা গ্রহণ করিয়াছেন, সেগুলির যথাযথ যেন উল্লেখ করেন, আমরা ইহাই তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি।

চিত্র নং ১৫

ভারতের অর্ণবপোতসম্বন্ধে অনেক বিষয় তাঁহাকে এখনও অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রবন্ধে স্থান নাই, নচেৎ আমরা আরও কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতাম। আমাদের মনে হয় Sylvain Levi গ্রন্থের এই সমালোচনাকালে সত্যই বলিয়াছেন, "The History of Indian Shipping is to be written." রাধাকুমুদ বাবু বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান ; সুতরাং তিনি যে বিনয়ের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না—ইহা আমরা আশা করিতে পারি।

পল্লী-সমাজ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

"জ্যাঠাইমা ?"

ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়ারঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বেণীর বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে তাঁহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওয়া উচিত নয়; কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না। রমেশ নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল। আজও সেই কাঁচাসোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য তাঁহার নিটোল, পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জ্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখের দুইএকগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট, সবগুলিই যেন কোন বড়শিল্পীর বহুযত্নের, বহুসাধনার ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য তাঁহার দুটি চক্ষুর দৃষ্টি। সে দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে, সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে একসময় বড় ভালবাসিতেন। বধূবয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাশুড়ী-ননদের যন্ত্রণায় লুকাইয়া বসিয়া এই দুটি জায়ে যখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম-গ্রন্থি বন্ধন হয়।

তারপরে, গৃহ-বিচ্ছেদ, মামলা-মকদ্দমা, পৃথক-হওয়া, কতরকমের ঝড়ঝাপ্‌টা এই দুটি সংসারের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; বিবাদের উত্তাপে বাঁধন শিথিল হইয়াছে; কিন্তু, একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই।

বহুবর্ষপরে সেই ছোট বৌয়ের ভাঁড়ারঘরে ঢুকিয়া, তাহারি হাতের সাজানো সেই সমস্ত বহুপুরাতন হাঁড়ি-কলসির পানে চাহিয়া, জ্যাঠাইমার চোখদিয়া জলঝরিয়া পড়িতেছিল।

রমেশের আহ্বানে যখন তিনি চোক মুছিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি রক্তাক্ত-আর্দ্র চক্ষু-পল্লবের পানে চাহিয়া রমেশ ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল।

জ্যাঠাইমা তাহা টের পাইলেন। তাহাতেই বোধ করি, এই সদ্য পিতৃহীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহা করিয়া উঠিল, তাহার লেশ-মাত্র তিনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "চিন্‌তে পারিস্‌, রমেশ?" জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে, যতদিন না সে মামার বাড়ী গিয়াছিল, ততদিন, এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কিছুতে ছাড়িতে চাহেন নাই। সেও মনে পড়িল; এবং এও মনে হইল, সেদিন ওবাড়ীতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ী নাই বলিয়া দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই। তার পর, রমাদের বাটীতে বেণীর সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাহার মাসীর নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই।

বিশ্বেশ্বরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "ছি, বাবা, এসময়ে শক্ত হতে হয়।" তাহার কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না।

রমেশ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল, যেখানে অভিমানের কোন মর্য্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কহিল, "শক্ত আমি হয়েচি, জ্যাঠাইমা! তাই যা পারতুম, নিজেই করতুম; কেন তুমি আবার এলে?"

জ্যাঠাইমা হাসিলেন। "তুই ত আমাকে ডেকে আনিস্‌নি, রমেশ, যে, তোকে তার কৈফিয়ৎ দেব? তা শোন্‌ বলি। কাজকর্ম্ম হবার আগে আর আমি ভাঁড়ার থেকে খাবার-

টাবার কোনো জিনিস বার হতে দেব না। যাবার সময় ভাঁড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কাল এসে তোর হাত থেকেই নেব। আর কারু হাতে দিস্‌নি যেন! হাঁরে, সে দিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না।

একটু ভাবিয়া কহিল, "বড়দা' তখন ত বাড়ী ছিলেন না।"

প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল ; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে, সস্নেহ-অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, "আ আমার কপাল! এই বুঝি ? হাঁরে, দেখা হয়নি ব'লে আর যেতে নেই ? আমি জানি যে, সে তোদের উপর সন্তুষ্ট নয় ; কিন্তু, তোর কাজ ত তোকে করা চাই! যা, একবার ভাল করে বল্‌গে যা, রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেট হতে তোর কোন লজ্জা নাই। তা' ছাড়া এটা মানুষের এম্‌নি দুঃসময় বাবা, যে কোন লোকের হাতে পায়ে ধরে মিটমাট করে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মী মাণিক আমার, যা একবার—এখন বোধ হয়, সে বাড়ীতেই আছে।"

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না।

বিশ্বেশ্বরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "বাইরে যারা বসে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে জানি। তাঁদের কথা শুনিস্‌নে। আর আমার সঙ্গে তোর বড়দাদার কাছে একবার যাবি চল।"

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না জ্যাঠাইমা, সে হবে না। আর, বাইরে যারা বসে আছেন, তাঁরা যাই হোন্‌, তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।" সে আরও কি-কি বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার মনে হইল, জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশি মলিন হইয়া গিয়াছে। খানিকপরেই তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তাই। যখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা কয়ে কি হবে। যাহোক্‌, তুই কিছু ভাবিস্‌নে বাবা, কিছুই আটকাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আস্‌ব।" বলিয়া বিশ্বেশ্বরী তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা-কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যেপথে চলিয়া গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, রমেশ ম্লানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজী, বড় গিন্নী এসেছিলেন না ?" রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ"।

"শুনলুম ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেলেন না কি ?"

রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন।

"দেখ্‌লে ধর্ম্মদাস দা, যা বলেচি তাই। বলি, মৎলবটা বুঝলে, বাবাজী ?"

রমেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দরিদ্র দীনু ভট্‌চায তখনও যায় নাই। কারণ, তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না। সে ছেলে মেয়ে লইয়া যাহার দয়ায় পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক দুটো আশীর্ব্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাতপুরুষের স্তব স্তুতি না করিয়া, আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিল না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, "এ মৎলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া ? তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।"

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়াই ছিল ; নির্ব্বোধের কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, "বোঝো না, সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত ? তুমি এসব ব্যাপারের কি বোঝো, যে মানে করতে এসেচ ?"

ধমক্‌ খাইয়া দীনুর নির্ব্বুদ্ধিতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উষ্ণ হইয়া জবাব দিল, "আরে, এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোন্‌খানে ? শুনচ না, গিন্নী-মা স্বয়ং এসে বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন ? এতে কথা কইবে আবার কে ?"

গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, "ঘরে যাওনা ভট্‌চায্যি যে জন্যে ছুটে এসেছিলে - গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধ্‌লে, আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেয়ো, আজ আর হবে না। এখন যাও, আমাদের ঢের কাজ আছে।"

দীনু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠস্বরে থামিয়া গেল—"আপনার হ'ল কি গাঙুলি মশাই? যাকে-তাকে এমন থামকা অপমান করচেন কেন?"

গোবিন্দ ভর্ৎসিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্ক-হাসি হাসিয়া বলিল, "অপমান আবার কাকে করলুম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না, ঠিক সত্যি কথাটি বলেচি কি না। ও ডালে-ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায়-পাতায় বেড়াই যে! দেখলে ধর্ম্মদাস দা, বামনের আস্পর্দ্ধা? আচ্ছা—" ধর্ম্মদাস দা কি দেখিল, তাহা সেই জানে, কিন্তু রমেশ এই লোকটার নির্লজ্জতা ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

তখন দীনু রমেশের মুখপানে চাহিয়া নিজেই বলিল, "না, বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেচেন। আমি বড় গরীব, সে কথা সবাই জানে। ওদের মত আমার জমি জমা চাষবাস কিছুই নেই। এক রকম চেয়েচিন্তে, ভিক্ষেশিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভালজিনিষ ছেলেপিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেন নি—তাই, বড় ঘরে কাজকর্ম্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে কোরোনা, বাবা, তারিণী দাদা বেঁচে থাক্‌তে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাস্‌তেন তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌চি, বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে দেখে খুসীই হয়েচেন।" হঠাৎ দীনুর গভীর, শুষ্ক চোখদুটো জলে ভরিয়া উঠিয়া, টপ্‌টপ্ করিয়া দুফোঁটা সকলের সুমুখেই ঝরিয়া পড়িল। রমেশ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। দীনু তাহার মলিন ও শতছিন্ন উত্তরীয়প্রান্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "শুধু আমিই নই, বাবা! এদিকে আমার মত দুঃখীগরীব যে, যেখানে আছে, তারিণীদার কাছে হাতপেতে কেউ কখন অমনি ফেরেনি। সেকথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাও টের পেত না যে। আর, তোমাদের জ্বালাতন করব না—নে,মা, খেঁদি ওঠ্, হরিধন, চল্ বাবা ঘরে যাই—আবার কাল সকালে আস্‌ব। আর কি বলব, বাবা রমেশ, বাপের মত হও—দীর্ঘজীবি হও।"

রমেশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পথে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "ভট্‌চায্যি মশাই, এই দুটো তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখ্‌বেন! আর বল্‌তে সঙ্কোচ হয়; কিন্তু এ বাড়ীতে হরিধনের মায়ের যদি পায়ের ধূলো পড়ে ত বড় ভাগ্য বলে মনে করব।"

ভট্‌চায্যি মশায় ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "আমি বড় দুঃখী, বাবা রমেশ, আমাকে এমন করে বললে যে লজ্জায় মরে যাই।"

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নিজের রূঢ় কথা স্মরণ করিয়া গাঙুলি মশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই, তিনি থামাইয়া দিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ যে আমার নিজের কাজ, রমেশ—তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাই ত এসেছি—ধর্ম্মদাস দা আর আমি—দুই ভায়ে ত তোমার ডাকবার অপেক্ষা রাখিনি, বাবা!"

ধর্ম্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাশিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাশির ধমকে চোখ মুখ রাঙা করিয়া, হাত ঘুরাইয়া বলিল, "বলি শোন, রমেশ—আমরা বেণী ঘোষাল নই। আমাদের জন্মের ঠিক আছে।"

তাহার কুৎসিত কথায় রমেশ চমকাইয়া উঠিল; কিন্তু আর রাগ করিল না।

এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহারা শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কতবড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না। জ্যাঠাইমার সস্নেহ-অনুরোধ এবং তাঁহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে পীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দা'র কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকা-হাঁকিটাই সব চেয়ে বেশী।

বাড়ীর হইতেই তাহার কাণে গেল গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছে, "এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায়, ত আমার গোবিন্দ গাঙুলি নাম তোমরা বদ্‌লে রেখো, বেণী বাবু! নবাবি কাণ্ডকারখানা শুন্‌লে ত? তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি তা' জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা-করে বাপের ছাদ্দ করে, তা ত কখনো শুনিনি, বাবা! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি, বেণীমাধব বাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করে'চে।"

বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তা' হলে কথাটা ত বার করে নিতে হচ্চে, গোবিন্দ খুড়ো?"

গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া বলিল, "সবুর কর না, বাবাজী! একবার ভাল করে ঢুক্‌তেই দাও না—তার পরে—বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? একি, রমেশ বাবাজী? আমরা থাক্‌তে এত রাত্তিরে তুমি কেন, বাবা?"

রমেশ সে কথার জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "বড়দা', আপনার কাছেই এলুম।"

বেণী থতমত খাইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিল, "আস্‌বে বই কি, বাবা, একশবার আস্‌বে। এতো তোমারই বাড়ী। আর বড়ভাই পিতৃতুল্য। তাই ত আমরা বেণী বাবুকে বল্‌তে এসেছি, বেণী বাবু, তারিণীদা'র ওপর মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক্—আর কেন? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখজুড়োই—কি বল, হালদার মামা? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বাবা—কে আছিসরে একখানা কম্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না, বেণী বাবু, তুমি বড়ভাই—তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। তা ছাড়া, বড়গিন্নী ঠাকুরুণ যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—"

বেণী চম্‌কাইয়া উঠিল—"মা গিয়েছিলেন?"

"শুধু যাওয়া কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার—করাকর্ম্মা, যা' কিছু তিনিই ত করচেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?" সকলেই চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নী ঠাকরুণের মত মানুষ কি আর আছে?—না হবে? না, বেণীবাবু, সাম্‌নে বল্‌লে খোসামোদ করা হবে; কিন্তু যে যা' বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন, ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়?" বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল।

বেণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল—"আচ্ছা—"

গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল—"শুধু আচ্ছা নয়, বেণীবাবু! যেতে হবে, করতে হবে—সমস্ত ভার তোমার ওপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কিরকম করা হবে একটা ফর্দ্দ করে ফেলা হোক্ না কেন! কি বল, রমেশ বাবাজী? ঠিক্ কথা কি না, হালদার মামা?—ধর্ম্মদাস দা' চুপ করে রইলে কেন? কাকে বল্‌তে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে, জান ত সব।"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীত কণ্ঠে বলিল, "বড়দা', একবার পায়ের ধূলো যদি দিতে পারেন—"

বেণী গম্ভীর হইয়া বলিল, "মা যখন গেছেন, তখন আমার যাওয়া না-যাওয়া—কি বল, গোবিন্দ খুড়ো?"

গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্ব্বেই রমেশ বলিল, "আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে, বড়দা', যদি অসুবিধে না হয় একবার দেখেশুনে আস্‌বেন।"

বেণী চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল।

গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে, বেণীবাবু, কথার ভাবখানা?"

বেণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দের কথাগুলা মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্দ্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেণীঘোষালের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক-কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, "জ্যাঠাইমা!"

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের সুমুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন; এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন—"রমেশ? কেন রে?"

রমেশ উঠিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "একটু দাঁড়া, বাবা, একটা আলো আনতে বলে দি।"

"আলোয় কাজ নেই, জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না।" বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই একপাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন, "এত রাত্তিরে যে?"

রমেশ মৃদু কণ্ঠে কহিল, "এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি, জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞেসা করতে এলুম।"

"তবেই মুস্কিলে ফেল্‌লি, বাবা। এঁরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙুলি, চাটুয্যে মশাই—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "জানিনে, জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জানতেও চাইনে—তুমি যা' বলবে তাই হবে।"

অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তখন যে বল্‌লি রমেশ, এঁরাই তোর সবচেয়ে আপনার! তা যাই হোক, আমার মেয়েমানুষের কথায় কি হবে, বাবা? —এ গাঁয়ে যে আবার,—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা কাজকর্ম্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।"

রমেশ বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না। কারণ, এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এ রকম হয়, জ্যাঠাইমা?"

"সে অনেক কথা, বাবা। যদি থাকিস এখানে, আপনিই সমস্ত জান্‌তে পারবি। কারুর সত্যিকার দোষ অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে অপবাদ আছে—তা ছাড়া মামলা-মকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দুদিন আগে যেতুম, রমেশ, তা হলে এত উদ্যোগ-আয়োজন কিছুতে করতে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি।" বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

সে নিঃশ্বাসে যে কি ছিল, তাহার ঠিক মর্ম্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না। এবং কাহারো সত্যকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে পারে, তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না। বরঞ্চ, উত্তেজিত হইয়া কহিল—"কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী বললেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি, জ্যাঠাইমা আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না—সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্র নিমন্ত্রণ করে আসব। কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে—তুমি হুকুম দাও, জ্যাঠাইমা!"

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "এরকম হুকুম ত দিতে পারিনে, রমেশ। তাতে ভারি গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি মিথ্যের কথা নয়, বাবা। সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেচে, তাকে জবরদস্তি ঘরে ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক্‌, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হলে ত কোন মতেই চলতে পারে না রমেশ।"

ভাবিয়া দেখিলে রমেশ একথা যে অস্বীকার করিতে পারিত, তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের সড়্‌যন্ত্র এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল, তাই, সে তৎক্ষণাৎ প্রবলভাবে বলিয়া উঠিল, "এ গাঁয়ের সমাজ বলতে ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ—এরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল, জ্যাঠাইমা।"

জ্যাঠাইমা রমেশের উগ্রতা লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু শান্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "শুধু এরা নয়, রমেশ, তোমার বড়দা' বেণীও সমাজের একজন কর্ত্তা।"

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, "তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করগে, রমেশ। সবেমাত্র বাড়ীতে পা দিয়েই এঁদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।"

বিশ্বেশ্বরী কতটা দূর চিন্তা করিয়া যে এইরূপ উপদেশ দিলেন, তীব্র উত্তেজনার মুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না; কহিল, "তুমি নিজে এইমাত্র বললে জ্যাঠাইমা, নানান কারণে এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশি। তা' ছাড়া, আমি যখন সত্যিমিথ্যে কারো কোন দোষ-অপরাধের কথাই জানিনে, তখন, কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অন্যায়।"

জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "ওরে পাগ্‌লা,

আমি যে তোর গুরুজন—মায়ের মত। আমার কথাটা না শোনাও ত তোর পক্ষে অন্যায়।"

"কি করব, জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করেচি আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করব।"

তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখ অপ্রসন্ন হইল; বোধ করি বা মনে মনে বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, "তা'হলে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছল মাত্র।"

জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল; কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিকপরে আস্তে আস্তে বলিল, "আমি জানতুম, জ্যাঠাইমা, যা' অন্যায় নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে। আমার—"

"কিন্তু, এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল, রমেশ, যে আমার সন্তানের বিরুদ্ধে যেতে পারব না।"

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কাল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবী করিতেছিল। সে ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কাল পর্য্যন্ত তাই জানতুম, জ্যাঠাইমা। তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা' পারি আমি একলা করি, তুমি এসো না। তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।"

জ্যাঠাইমা আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকপরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে বলিলেন, "তবে একটু দাঁড়াও, বাছা, তোমার ভাঁড়ারঘরের চাবিটা এনে দিই"—বলিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘণ্টাকয়েকমাত্র পূর্ব্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, "আমার ভয় কি—জ্যাঠাইমা আছেন।" একটা রাত্রিও কাটিল না; তাহাকে আবার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল—"জ্যাঠাইমা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।"

(৪)

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ীর ভিতরে আহারের জন্য পাতা পাড়িবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল, হাকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া, ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রন্ধনশালার কবাটের একপাশে একটি ২৫।২৬ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া, ক্রোধে চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছে।

বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া প্রশ্ন করিল, "হাঁ বাবা, তুমিও ত গাঁয়ের একজন জমিদার। বলি যত দোষ কি এই ক্ষেন্তি বামনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার খুসি শাস্তি দেবে?" গোবিন্দকে দেখাইয়া কহিল, "ঐ উনি মধুয্যে বাড়ীর গাছ-পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশটাকা আমার কাছে আদায় করেননি কি? গাঁয়ের ষোলো-আনা শেতলা-পূজোর জন্যে জোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেননি কি? তবে, কতবার ঐ এককথা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে চান্, শুনি?"

রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙ্গুলি বসিয়াছিল, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার রমেশের দিকে, একবার প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিল, "যদি আমার নামটাই করলে ক্ষান্তমাসী, তবে সত্যি কথা বলি, বাছা! খাতিরের কথা কইবার লোক এই গোবিন্দ গাঙ্গুলি নয়, সে ত সবাই জানে। তোমার মেয়ের প্রায়শ্চিত্তও হয়েচে, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি—সব জানি। কিন্তু তাকে যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিইনি। মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁদ দেব, কিন্তু—"

ক্ষান্তমাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ম'লে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁদে করে পুড়িয়ে এসো, বাছা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কওনা? তোমার ছোট-ভাজ যে ঐ ভাঁড়ারঘরে বসে পান সাজচে, সে আরবছর মাসদেড়েক ধরে কোন্ কাশীবাস করে, অমন হলুদে রোগা শল্‌তেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল,

শুনি? সে বড়লোকের বড়কথা বুঝি? বেশি ঘেঁটিয়ো না, বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিন্‌তে পারি। আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া যায় না।"

গোবিন্দ ক্ষ্যাপার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল—"তবে রে, হারামজাদা মাগী—"

কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না। বরং একপা আগাইয়া আসিয়া হাতমুখ ঘুরাইয়া কহিল, "মার্ব্বি নাকি রে? ক্ষেন্তিবাম্‌নিকে ঘাটালে ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে, তা' বলে দিচ্ছি। আমার মেয়ে ত রান্না ঘরে ঢুক্‌তে যায়নি; দোর-গোড়ায় আস্‌তে না আস্‌তে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান করে বস্‌ল, বলি, তার বেয়ানের তাঁতি-অপবাদ ছিল না কি? আমি ত আর আজকের নই গো, বলি, আরও বলব, না, এতেই হবে?"

রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য্য ব্যস্ত হইয়া, ক্ষান্তর হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সানুনয়ে কহিল, "এতেই হবে, মাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী, ওঠ্ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ওপরে গিয়ে বস্‌বি চল্।"

পরাণ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, "এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ী থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না, তা' বলে দিচ্ছি। গোবিন্দ! কালিচরণ! তোমাদের মামাকে চাও, ত উঠে এসো বলচি। বেণীঘোষাল যে তখন বলেছিল, মামা, যেয়ো না ওখানে। এমন সব খানকি-নটীর কাণ্ড কারখানা জান্‌লে কি জাত-জন্ম খোয়াতে এ বাড়ীর চৌকাট মাড়াই? কালি! উঠে এসো।"

মাতুলের পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছরচারেক পূর্ব্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোটভগিনীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ শ্বশুরবাটী যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে সেই দুর্ঘটনার ইতিহাস এতলোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে, এই ভয়ে কালী মুখতুলিতেই পারিল না।

কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আজো কমে নাই। সে এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া, জোর গলায় কহিল, "যে যাই বলুন না কেন, এ অঞ্চলের সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাণ হালদার, আর যদুমুখুয্যে মশায়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেল্‌তে পার্‌ব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই ছুটো মাগীকে কেন বাড়ী ঢুকতে দিয়েছেন, তার জবাব না দিলে কেউ আমরা এখানে জলটুকুপর্য্যন্ত মুখে দিতে পারব না।"

দেখিতে দেখিতে পাঁচসাত দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়েরই লোক; সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন্ চাল সর্ব্বাপেক্ষা লাভ-জনক, ইহা তাহাদের অবিদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা, যে যাহার খুসি বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীনু ভট্‌চার্য কাঁদ-কাঁদ হইয়া একবার ক্ষান্তমাসী ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙুলি ও হালদার মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিক্ হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম্ম যেন লণ্ডভণ্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল।

কিন্তু রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না। সে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাংশুমুখে কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

"রমেশ!"

অকস্মাৎ একমুহূর্ত্তে সমস্ত লোকের সচকিত-দৃষ্টি এক হইয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কবাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল, কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল জ্যাঠাইমা আপনিই কখন্ আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল ইনিই বিশ্বেশ্বরী! ইনিই ঘোষাল বাড়ীর গিন্নী-মা!

পল্লিগ্রামে সহরের কড়াপর্দ্দা নাই। তত্রাচ বিশ্বেশ্বরী বড়বাড়ীর বধূ বলিয়াই হৌক, কিংবা অন্য যেকোন কারণই হৌক, যথেষ্ট বয়সপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং, সকলেই বড় বিস্মিত হইল। যাহারা শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার আশ্চর্য্য চোখ-

ভুটির পানে চাহিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ থামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন।

সুস্পষ্ট, তীব্র-আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ঘুরিয়া গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেমনি সুস্পষ্ট, উন্নতকণ্ঠে বলিলেন, "গাঙুলি মশায়কে ভয় দেখাতে মানা করে দে, রমেশ। আর হালদার মহাশয়কে আমার নাম করে বল্ যে, আমিই সবাইকে আদর করে বাড়ীতে ডেকে এনেচি—সুকুমারীকে অপমান করবার তার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজকর্ম্মের বাড়ীতে হাকা-হাকি, চেচা চেঁচি, গালিগালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যার অসুবিধে হবে, তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।"

বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কাণেই শুনিতে পাইল। রমেশকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না - হইলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাড়াইয়া দেখিতে পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় লইতে দেখিয়া, সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া, দ্রুতপদে একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল; এবং তৎক্ষণাৎ দুই চোখ ছাপাইয়া তাহার দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাজে বড় ব্যস্ত ছিল—কে আসিল না-আসিল, তাহার খোজ লইতে পারে নাই। কিন্তু আরগেই আসুক, জ্যাঠাইমা যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আস্তে-আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ গাঙুলি ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাড়াইয়া রহিল। কে একজন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে অস্ফুটে কহিল, "বসে পড না, খুড়ো। যোলাখানা লুচি, চারজোড়া সন্দেশ কে কোথায় খাইয়ে-দাইয়ে সঙ্গে দেয়, বাবা।"

পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, আশ্চর্য্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলি সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়াই রাখিল এবং আহারের জন্য পাতা পড়িলে তত্ত্বাবধারণের ছুতা করিয়া সকলের সঙ্গে পংক্তিভোজনে উপবেশন করিল না। যাহারা তাহার এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল; তাহারা সকলেই মনে মনে বুঝিল, গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিবে না।

অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত; এবং প্রত্যেকেই খুদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ী প্রভৃতি বাটীর অনুপস্থিত বালকবালিকার নাম করিয়া যাহা বাঁধিয়া লইলেন, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে।

সন্ধ্যার পরে কাজকর্ম্ম প্রায় সারা হইয়া গেছে; রমেশ সদর দরজার বাহিরে একটা পেয়ারা গাছতলায় অন্যমনস্কের মত দাড়াইয়া ছিল—মনটা তাহার ভাল ছিল না। দেখিল, দীনু ভট্টাচার্য্য ছেলেমেয়ে লইয়া, লুচিমণ্ডার গুরুভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একরূপ অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে খেঁদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত থতমত খাইয়া, দাড়াইয়া পড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে—"

সবাই যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটা বুঝিতে পারিল; এবং পলাইবার পথ থাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বলিয়া, আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে কহিল, "খেঁদি, এ সব কার জন্যে নিয়ে যাচ্চিস্ রে?"

তাহাদের ছোটবড় পুঁটুলিগুলির ঠিক সদুত্তর খেঁদি দিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া দীনু নিজেই একটুখানি শুষ্কভাবে হাসিয়া বলিলেন, "পাড়ায় ছোটলোকদের ছেলে-পিলেরা আছে ত, বাবা, এঁটোকাঁটা গুলো নিয়ে গেলে তাদের দু'খানা, চারখানা দিতে পারব। সে যাই হোক্, বাবা, কেন যে দেশশুদ্ধ লোক ওঁকে গিন্নী-মা বলে ডাকে, তা' আজ বুঝলুম।"

রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ফটকের ধার পর্য্যন্ত আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ভট্‌চায্যি মশাই, আপনি ত এদিকের সমস্তই জানেন; এ গাঁয়ে এত রেষারিষি কেন বলতে পারেন?"

দীনু মুখে একটা আওয়াজ করিয়া, বারদুই ঘাড় নাড়িয়া, কহিল—"হায় রে, বাবাজী, আমাদের কুঁয়াপুর ত পদে আছে। যে কাণ্ড এ ক'দিন ধরে খেঁদির মামার বাড়ীতে দেখে এলুম! বিশঘর বামুন-কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে কিন্তু চারটে দল! হরনাথ বিশ্বেস দুটো-বিলিতি আমড়া পেড়ে-

ছিল বলে তার আপনার ভাগ্নেকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে! সমস্ত গ্রামই, বাবা, এই রকম—তা ছাড়া মামলায়-মামলায় একেবারে শতছিদ্র! বৌদি, হরিধনের হাতটা একবার বদ্‌লে নে, মা।" রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এর কি কোন প্রতিকার নেই, ভট্‌চায্যি মশাই?"

"প্রতিকার আর কি করে হবে, বাবা—এ যে ঘোর কলি!" ভট্টাচার্য্য একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তবে একটা কথা বল্‌তে পারি বাবাজী। আমি ভিক্ষেসিক্ষে করতে অনেক জায়গাতেই ত যাই—অনেকে অনুগ্রহও করেন। আমি বেশ দেখেচি, তোমাদের ছেলেছোকরাদের দয়াধর্ম্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না করে আর ছেড়ে দেয় না।" বলিয়া দীনু যেরূপ ভঙ্গী করিয়া জিভ বাহির করা দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল। দীনু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না—কহিল, "হাসির কথা নয়, বাবাজী, অতি সত্য কথা। আমি নিজেও প্রাচীন হয়েচি—কিন্তু, তুমি যে অন্ধকারে অনেকদূর এগিয়ে এলে, বাবাজী।"

"তা হোক্, ভট্‌চায্যি মশাই, আপনি বলুন।"

"কি আর বল্‌ব, বাবা, পাড়াগামাত্রই এই রকম। এই গোবিন্দ গাঙ্গুলি—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আন্‌লে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—ক্ষান্তবামনি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই ওকে ভয় করে। জাল করতে, মিথ্যেসাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ওই-ই পাঁচজনের জাত-মেরে বেড়াচ্চে।"

রমেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া সঙ্গেসঙ্গে চলিতে লাগিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। দীনু নিজেই বলিতে লাগিল—"এই আমার কথা তুমি দেখে নিয়ো, বাবা, ক্ষেন্তিবামনি সহজে নিস্তার পাবে না। গোবিন্দ গাঙ্গুলি, পরাণ হালদার, দু-দুটো ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা! কিন্তু যাই বল বাবা, মাগীর, সাহস আছে। আর সাহস থাক্‌বেনাই বা কেন? মুড়ী বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে—সকলের সব কথা টের পায়। ওকে ঘাঁটালে কেলেঙ্কারির সীমা পরিসীমা থাক্‌বে না, তা বলে দিচ্চি। অনাচার আর কোন্ ঘরে নেই বল? বেণীবাবুকেও—"

রমেশ সভয়ে বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, থাক্, ওর কথায় আর কাজ নেই"—দীনু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কহিল, "থাক্, বাবা, আমি দুঃখীমানুষ, কারো কথাতেই আমার কাজ নেই। কেউ যদি বেণীবাবুর কাণে তুলে দেয় ত আমার ঘরে আগুন—"

"ভট্‌চায্যি মশায়, আপনার বাড়ী কি আরো দূরে?"

"না, বাবা, বেশী দূর নয়—এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে—কোন দিন যদি—"

"আস্‌ব বই কি, নিশ্চয় আস্‌ব"—বলিয়া রমেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া কহিল, "আবার কাল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্তু, তারপরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধূলো দেবেন।" বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল।

"দীর্ঘজীবী হও—বাপের মত হও!" বলিয়া দীনু ভট্‌চায অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্ব্বচন বাহির করিয়া ছেলেপিলে লইয়া চলিয়া গেল।

৫

এ পাড়ায় একমাত্র মধু পালের মুদির দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশবার দিন হইয়া গেল, অথচ, সে বাকী দশ টাকা লইয়া যায় না বলিয়া, রমেশ কি মনে করিয়া, নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

মধু পাল মহাসমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোটবাবুর আসিবার হেতু শুনিয়া গভীর আশ্চর্য্যে অবাক্ হইয়া গেল।

যে ধারে, সে উপযাচক হইয়া ঘরবহিয়া ঋণশোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখন চোখে ত দেখেই নাই, কাণেও শোনে নাই।

কথায় কথায় অনেক কথা হইলে। মধু কহিল, "দোকান কেমন কার ভাল চল্‌বে, বাবু? দু'আনা চার আনা একটাকা পাঁচসিকে করে প্রায় পঞ্চাশ ষাট টাকা বাকী পড়ে গেছে। এই দিয়ে যাচ্চি বলে দু' মাসেও আদায় হবার যো' নেই। এ কি—বাঁড়ুয্যে মশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃ পেন্নাম হই।"

বাঁহাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে, গোড়ালিতে কাদার দাগ, কাণে পৈতে জড়ানো, ডানহাতে কচুপাতায় মোড়া চারটি কুচোচিংড়ি—

"কাল রাত্তিরে এলুম---তামাক খা' দিক মধু"! বলিয়া বাড়ুয্যে মশাই গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"সৌরবি জেলেনির আক্কেল দেখ্‌লি, মধু—খপ করে হাতটা আমার ধরে ফেল্‌লে হে? কালেকালে কি হ'ল বল্ দেখি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক'কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?"

মধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "হাত ধরে ফেল্‌লে আপনার?" ক্রুদ্ধ বাড়ুয্যে মশাই একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—"আড়াইটি পয়সা শুধু বাকী, তাই ব'লে থামকা হাটশুদ্ধ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার? কে না দেখলে বল্! মাঠ থেকে বসে এসে, গাড়ুটি মেজে, নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলুম হাটটা একবার ঘুরে যাই। মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে;—আমাকে সচ্ছন্দে বল্‌লে কি না, কিছু নেই ঠাকুর, যা' ছিল সব উঠে গেছে! আরে, আমার চোখে ধূলো দিতে পারিস্? ডালাটা ফস্ করে তুলে ফেল্‌তেই, দেখি না—অম্‌নি ফস্ করে হাতটা চেপে ধরে ফেল্‌লে? তোর এই আড়াইটে—আজকের একটা---এই সাড়ে তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস্, মধু?"

মধু সায় দিয়া কহিল, "তাও কি হয়!"

"তবে, তাই বল্ না! গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে ষষ্ঠে জেলের ধোপা নাপতে বন্ধ করে, চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না!" হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবুটি কে, মধু?"

মধু সগর্ব্বে কহিল, "আমাদের ছোটবাবুর ছেলে যে! সেদিনের দশ টাকা বাকী ছিল বলে, নিজে বাড়ী-বয়ে দিতে এসেচেন।"

বাড়ুয্যে মশাই কুচোচিংড়ির অভিযোগ ভুলিয়া, দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, কহিলেন, "অ্যাঁ, রমেশ বাবাজী! বেঁচে থাক, বাবা—হাঁ এসে শুনলুম একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এঅঞ্চলে কখনো হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল, চোখে দেখতে পেলুম না। পাচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাড়ীর হাল। আরে ছিঃ, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!"

রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু দোকান-শুদ্ধ সকলে তাঁহার কলিকাতা প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহাকৌতূহলী হইয়া উঠিল।

তামাক সাজিয়া মধু দোকানি বাড়ুয্যের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া, প্রশ্ন করিল, "তার পরে? একটু চাক্‌রি বাক্‌রি হয়েছিল ত?"

"হবে না? একি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার? হ'লে হবে কি,—সেখানে কে থাক্‌তে পারে বল! যেমন ধুঁয়া—তেম্‌নি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ীঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস্, ত জান্‌বি তোর বাপের পুণ্যি!"

মধু কখনও কলিকাতায় যায় নাই। তাহাদের মেদিনীপুর সহরটা, একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া, দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বলেন কি!"

বাড়ুয্যে ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"তোর রমেশ বাবুকে জিজ্ঞেসা কর না, সত্যি, না মিথ্যে। না মধু, খেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে ঘরে পড়ে মরে থাকব, সে ভাল, কিন্তু বিদেশ যাবার নামটি যেন কেউ আমার কাছে আর না করে! বল্‌লে বিশ্বেস করবিনে, সেখানে সুসুনি-কলমি শাক, চালতা, আমড়া—থোড়-মোচা পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়! পারবি খেতে? এই একটি মাস না খেয়ে-খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেচি! দিবারাত্রি পেট ফুট্‌-ফাট করে, বুকজ্বালা করে, প্রাণ আইঢাই করে—পালিয়ে এসে তবে হাঁফ-ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গাঁয়ে বসে জোটে একবেলা, একসন্ধ্যে খাবো; না জোটে, ছেলে-মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করব—বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জার কথা নেই—কিন্তু, মালক্ষ্মী মাথায় থাকুন—বিদেশ কেউ যেন না যায়!"

তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে যখন সভয়ে নির্ব্বাক হইয়া গেছে, তখন বাঁড়ুয্যে উঠিয়া আসিয়া মধুর তেলের ভাঁড়ের ভিতর উখড়ি ডুবাইয়া একছটাক তেল বাঁহাতের তেলোয় লইয়া অর্দ্ধেকটা দুই নাক ও দুই কাণের গর্ত্তে ঢালিয়া দিয়া, বাকীটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, "বেলা হয়ে গেল, অম্‌নি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই।

এক পয়সার নুণ দে দেখি, মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাবো।"

"আবার বিকেলবেলা!" বলিয়া মধু অপ্রসন্নমুখে নুণ দিতে তাহার দোকানে উঠিল।

বাঁড়ুয্যে গলাবাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময়-বিরক্তির স্বরে কহিয়া উঠিল, "তোরা সব হলি কি, মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস্, দেখি?" বলিয়া আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা নুণ তুলিয়া ঠোঙায় দিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। গাড়ু হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"ঐ ত একই পথ—চল না, বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।"

"চলুন"—বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু দোকানি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া মিনতিস্বরে কহিল, "বাঁড়ুয্যে মশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচআনা কি অমনি—"

বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিল—"হাঁ রে, মধু, দুবেলা চোখো-চোখি হবে—তোদের কি চোখের চাম্‌ড়া পর্য্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটাবেটির মতলবে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে পাঁচপাঁচটা টাকা আমার জলে গেল—আর এই তোদের তাগাদা করবার সময় হল! কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস—দেখ্‌লে, বাবা রমেশ!"

মধু এতটুকু হইয়া গিয়া অস্ফুটে বলিতে গেল—"অনেক দিনের—"

"হলই বা অনেক দিনের? এমন করে সবাই পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না।" বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিস-পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

বাড়ী আসিয়া ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া, একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া রমেশকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, "আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলের হেডমাষ্টার। দু'দিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি; তাই বলি—"

রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুই মশায়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কিন্তু, সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়াই রহিল। কহিল, "আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।"

লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর-যাই-হোক্ একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি বিনীত, কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসন গ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল।

এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোটরকমের ইস্কুল, মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ৩০।৪০ জন ছাত্র পড়ে। দুইতিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্ণমেণ্ট সাহায্যও আছে। তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাইতেছে না। ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়াছিল, তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুই মশায় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী-বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতরে আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলেও চলিবে; উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে এই যে, তিনমাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই সুতরাং, ঘরের খাইয়া বনমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেডমাষ্টার মশায়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাষ্টার পণ্ডিতে চারিজন; এবং তাঁহাদের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতিবৎসর মাইনর পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম-বিবরণ পাড়ুই মশায় মুখস্তর মত আবৃত্তি করিয়া দিল। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দুজন শিক্ষকের কোনমতে—ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে আর একজনের সঙ্কুলান হয়; শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়! এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাষ্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিনচারিমাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবার করিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়াও সাতটাকা চারআনার বেশী আদায় করিতে পারে নাই!

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচছটা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয়—এবং এই পাঁচছয়টা গ্রামময় তিনমাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র ৭।০ আদায় হইয়াছে!

রমেশ প্রশ্ন করিল, "আপনার মাহিনা কত ?"

মাষ্টার কহিল, "রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পোনর আনা।" কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাষ্টার তাহা বুঝিয়া বলিল, "আজ্ঞে গভর্ণমেণ্টের হুকুম কি না, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সবইনস্পেক্টর বাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী-সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন আমি মিথ্যে বলচিনে।"

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না ?"

মাষ্টার লজ্জিত হইল। কহিল, "কি করব, রমেশবাবু! বেণী বাবু এ কয়টি টাকা দিতেও নারাজ।"

"তিনিই কর্ত্তা বুঝি ?"

মাষ্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই, সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, "তিনিই সেক্রেটরি বটে; কিন্তু একটি পয়সাও কখনো খরচ করেন না। যদুমুখুয্যে মশায়ের কন্যা—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকিলে ইস্কুল অনেকদিন উঠিয়া যাইত। এবৎসর নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন, আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে সমস্তসাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।"

রমেশ কৌতূহলী হইয়া, রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর একটি ভাই এ ইস্কুল পড়ে না ?"

মাষ্টার কহিল, "যতীন ত ? পড়ে বৈকি।"

রমেশ বলিল, "আপনার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্চে; আজ আপনি যান, কাল আমি আপনাদের ওখানে যাব।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া হেডমাষ্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া, জোর করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, বিদায় হইল।

(৬)

বিশ্বেশ্বরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনেই দশখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না; তাই সে গিয়া রমার মাসীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে না কি তক্ষক দাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট্ অশ্বত্থ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসীটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়িয়া যে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসর দেহটা, কাঠের নয় বলিয়াই হৌক, কিম্বা একাল সেকাল নয় বলিয়াই হৌক, জ্বলিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল না। কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাহা বিশ্বেশ্বরীর অগোচর ছিল না। অথচ পাছে রাগ করিয়া একটা জবাব দিতে গেলে এই স্ত্রীলোকটার মুখদিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বসিয়া ছিলেন।

তবে, পাড়াগাঁয়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই। রমেশও শুনিতে পাইল। তাহার জ্যাঠাইমার জন্য প্রথম হইতেই বরাবর মনের ভিতরে উৎকণ্ঠা ছিল এবং এই লইয়া মাতা-পুত্রে যে একটা কলহ হইবে, সে আশঙ্কাও করিয়াছিল। কিন্তু বেণী যে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন করিয়া অপমান ও নির্য্যাতন করিবে, এই কথাটা সহসা তাহার কাছে যেন একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে হইল। এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, ওবাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া যা'-মুখে-আসে তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে; কারণ, যে লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ বাচ-বিচার করিবারই আবশ্যক নাই।—পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না। কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। সেদিন দীনুর কাছে, এবং কাল মাষ্টারের মুখে, শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারি একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দ্দিকের পরিপূর্ণ মূঢ়তা ও সহস্র প্রকার কদর্য্য ক্ষুদ্রতার ভিতরে একা জ্যাঠাইমার হৃদয়টুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া, যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই মুখুয্যেবাটীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাষ—তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হৌক—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার এই ঘটনায় রমার বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া

গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া, এই দুই মাসী ও বোন্‌ঝিতে মিলিয়া, যে এই অন্যায় করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু, এই দুইটা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে, তাহা কোন মতেই ভাবিয়া পাইল না।

এমন্ সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। মখুয্যে ও ঘোষাল-দের কয়েকটা বিষয় এখন পর্য্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্য্যি-দের বাটীর পিছনে 'গড়' বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ-সম্পত্তি। একসময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল; ক্রমশঃ সংস্কার অভাবে মজিয়া গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না, ছিলও না। কৈ, মাগুর প্রভৃতি যেসকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু কিছু ছিল।

ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল; ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সরকার মশাই, লোক পাঠাননি? গড়থেকে মাছধরানো হচ্চে যে!"

সরকার কলম কাণেগুঁজিয়া মুখতুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কে ধরাচ্চে?"

"আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মখুয্যেদের খোট্টা দরওয়ানটাও আছে—দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগ্‌গীর পাঠান।"

গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; কহিল, "আমাদের বাবু মাছ-মাংস খান্ না।"

ভৈরব কহিল, "নাই খেলেন; কিন্তু, ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত।" গোপাল বলিল, "আমরা পাঁচজনত চাই; বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন। কিন্তু, রমেশ বাবু একটু আলাদা ধরণের।" বলিয়া ভৈরবের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া সহাস্যে একটুখানি শ্লেষ করিয়া কহিল, "এ তো তুচ্ছ দুটো সিঙি-মাগুর মাছ, আচায্যি মশায়। সেদিন হাটের উত্তরদিকের সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দুঘরে ভাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুঁচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে, তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেসা করলুম, 'কি করব বাবু?' আমার রমেশ বাবু আর মুখটা একবার তোলবারও ফুরসৎ পেলেন না। তারপর, পীড়াপীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাইতুলে বল্লেন, 'কাঠ? তা' আর কি তেঁতুল গাছ নেই?" শোন কথা! বল্লুম 'থাকবে না কেন? কিন্তু ন্যায্য-অংশ ছেড়ে দেবই বা কেন, আর কে কোথায় এমন দেয়?' রমেশ বাবু বইখানা আবার মেলে ধরে মিনিট পাঁচেক চুপ করে থেকে বল্লেন, 'সে ঠিক। কিন্তু দুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্যে ত আর ঝগড়া যায় না!'"

ভৈরব রীতিমত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল—"বলেন কি!"

গোপাল সরকার মৃদু হাসিয়া বারদুই মাথা নাড়িয়া কহিল "বলি ভাল, আচায্যি মশাই, বলি ভাল! আমি সেই দিন থেকে বুঝেচি আর মিছে কেন! ছোটতরফের মা-লক্ষ্মী, তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্দ্ধান করেচেন!"

ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু, পুকুরটা যে আমার বাড়ীর পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।"—

গোপাল কহিল, "বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দিবারাত্রি বই নিয়ে থাকলে, আর সরিকদের এত ভয় করলে, কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়! মখুমুখুয্যের কন্যা—স্ত্রীলোক; সেপর্য্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি! গোবিন্দ গাঙুলিকে ডেকে নাকি সেদিন তামাসা করে বলেছিল, "রমেশবাবুকে বোলো একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে!' এর চেয়ে লজ্জা আর আছে?" বলিয়া গোপাল রাগে দুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বাটীতে স্ত্রীলোক নাই। সর্ব্বত্রই অবারিতদ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল, রমেশ সাম্‌নের বারান্দায় একখানা ভাঙা ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে উত্তেজিত করিবার জন্য, সে সম্পত্তি-রক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা, পাড়িবা মাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া যুমন্ত বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বসিল—"কি, রোজরোজ চালাকি না কি? ভজুয়া?"

তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই চালাকিটা যে কাহার, তাহা সে ঠাহর করিতেই পারিল না।

ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অত্যন্ত বলবান এবং বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই

শিষ্য ; নিজের হাতপাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল।

ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া হুকুম করিয়া দিল—'সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেহ বাধা দেয়, তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে। যদি না আনা সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার একপাটি দাঁত যেন ভাঙিয়া দিয়া সে আসে।' ভজুয়াও এই চায়। সে তাহার তেলে-পাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে দ্রুতপদে ঘরে গিয়া ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাঙলা দেশের তেলেজলে মানুষ। হাঁকাহাকি, চেঁচা-চেঁচিকে মোটে ভয় করে না ; কিন্তু ঐ যে অতি দৃঢ়কায়, বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথাটি কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল ; ইহাতেই ভৈরবের তালুপর্য্যন্ত দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিকই রমেশের শুভানুধ্যায়ী ; তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময়মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া 'স'কার 'ব'কার চীৎকার করিয়া দু'টা কৈ-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত তাহার হইল না ! গালি-গালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব যদি বা একটা হুঙ্কার দিলেন, ভৃত্যটা তাহার ঠোঁটটুকু পর্য্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক ; ফৌজদারীতে জড়াইবার মত তাহার সাহসও ছিল না, সঙ্কল্পও ছিল না। মুহূর্ত্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ড হাতে ভজুয়া ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই, ভৈরব অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া, রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—"ওরে ভোজো যাস্‌নে ! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ, একদণ্ডও বাঁচ্‌ব না।"

রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নাই। ভজুয়া অবাক্ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কাঁদকাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, "এ কথা ঢাকা থাক্‌বে না, বাবা। বেণীবাবুর কোপে পড়ে তাহলে একটাদিনও বাঁচ্‌ব না। আমার ঘরদোরপর্য্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষে কর্‌তে পারবে না।"

রমেশ ঘাড়হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "কথাটা ঠিক, বাবু।"

রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুয়াকে তাহার নিজের কাজে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার-আকারেই এই ভৈরব আচার্য্যের অপরসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

(৭)

"হারে, যতীন্, খেলা করচিস্ ; ইস্কুলে যাবিনে ?"

"আমাদের যে আজকাল দু'দিন ছুটি দিদি ?"

মাসী শুনিতে পাইয়া কুৎসিৎ মুখ আরও বিশ্রী করিয়া বলিলেন, "মুখপোড়া ইস্কুলের মাসের মধ্যে পনরদিন ছুটি। তুই তাই ওর পেছনে টাকা খরচ করিস্। আমি হলে আগুন ধরিয়ে দিতুম।" বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। ষোল-আনা মিথ্যাবাদিনী বলিয়া যাহারা মাসীর অখ্যাতি প্রচার করিত, তাহারা ভুল করিত। এম্‌নি এক-আধটা সত্যকথা বলিতেও তিনি পারিতেন এবং আবশ্যক হইলেই বলিতেন।

রমা, ছোট ভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুটি কেন রে, যতীন ?"

যতীন দিদির কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া, কহিল, "আমাদের ইস্কুলের চাল-ছাওয়া হচ্চে যে ! তারপর চুনকাম হবে—কত বই এসেচে, চারপাঁচটা চেয়ার-টেবিল, একটা আলমারী, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না, দিদি।"

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বলিস্ কি রে !

"হাঁ, দিদি, সত্যি। রমেশবাবু এসেচে না—তিনি সব করে দিচ্চেন।" বলিয়া বালক আরও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুমুখে মাসীকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া-করিয়া এই ছোট ভাইটির মুখ হইতে সে অনেক তথ্যসংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই-এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া যান, তাহাও শুনিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে, যতীন, তোকে তিনি চিন্‌তে পারেন ?"

বালক সগর্ব্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ—"

"কি বলে তুই তাঁকে ডাকিস্ ?"

এইবার সে একটু মুস্কিলে পড়িল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোদ্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাষ্টারপর্য্যন্ত যেরূপ তটস্থ হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। ডাকা ত দূরের কথা—ভরসা করিয়া ইহারা কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিদির কাছে স্বীকার করাও ত সহজ নহে। ছেলেরা মাষ্টারদিগকে 'ছোটবাবু' বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিল। তাই, সে বুদ্ধিখরচ করিয়া কহিল, "আমরা ছোটবাবু বলি।"

কিন্তু, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে ভাইটিকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, "ছোটবাবু কি রে! তিনি যে তোর দাদা হ'ন। বেণীবাবুকে যেমন 'বড়দা' বলে ডাকিস্, এঁকে তেমনি 'ছোটদা' বলে ডাক্‌তে পারিস্ নে ?"

বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল—"আমার দাদা হয় তিনি ? সত্যি বল্‌চ, দিদি ?"

"তাই ত হয় রে"—বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখনি প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু ইস্কুল বন্ধ! এই ঢুটো দিন তাহাকে কোন-মতে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তবে, যে সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে, অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই সে থাকে কি করিয়া ? সে আর একবার ছট্‌ফট্ করিয়া বলিল, "এখন যাব, দিদি ?"

"এতবেলায় কোথায় যাবি রে," বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া, যতীন খানিকক্ষণ অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "এত দিন তিনি কোথায় ছিলেন ?" রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "এতদিন লেখাপড়া শিখ্‌তে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এম্‌নি বিদেশে গিয়ে থাক্‌তে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাক্‌তে, যতীন ?" বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল।

বালক হইলেও সে তাহার দিদির কণ্ঠস্বরের কি রকম একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে প্রাণ-তুল্য ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ উচ্ছ্বাস কখন প্রকাশ পাইত না।

যতীন প্রশ্ন করিল, "ছোটদা'র সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে, দিদি ?"

রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল—"হা ভাই, তাঁর সবপড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।"

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে তুমি জান্‌লে ?" প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ এসম্বন্ধে সে, কিম্বা গ্রামের আর কেহ, কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই, তাহাও নয়; কিন্তু কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখাপড়ার জন্য এই অত্যল্প কালের মধ্যেই সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূর্খ নয়।

যতীন এ লইয়া আর জেরা করিল না। কারণ, ইতি মধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেই, চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা, দিদি, ছোড়দা' কেন আমাদের বাড়ী আসেন না ? বড়দা' তো রোজ আসেন।"

প্রশ্নটা, ঠিক যেন একটা আকস্মিক অসহ্য ব্যথার মত, রমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, তখনি হাসিয়া কহিল, "তুই তাঁকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ নে ?"

"এখনি যাব দিদি ?" বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল। "ওরে, কি পাগ্‌লা ছেলে রে তুই!" বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভয়ব্যাকুল ছইবাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। "খবরদার, যতীন—কখ্‌খনো এমন কাজ করিস্‌নে, ভাই, কখ্‌খনো না।" বলিয়া ভাইটিকে সে যেন প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতিদ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিয়া, যতীন, বালক হইলেও, এবার বড় বিস্ময়ে মুখপানে চাহিয়া

চুপ করিয়া রহিল। একে ত, এমন ধারা করিতে কখনও সে পূর্ব্বে দেখে নাই; তা' ছাড়া, ছোটবাবুকে ছোটদাদা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অন্য পথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাঁহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে মাসীর তীক্ষ্ণ আহ্বান কাণে আসিতেই রমা, যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাড়াইল। অনতিকাল পরে, তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাড়াইয়া বলিলেন, "আমি বলি, বুঝি রমা ঘাটে চান করতে গেছে। বলি, একাদশী বলে কি এতটা বেলাপর্য্যন্ত মাথায় একটু তেলজল পর্য্যন্ত দিতে হবে না? মুখশুকিয়ে যে একেবারে কালীবর্ণ হয়ে গেছে!"

রমা, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া, বলিল, "তুমি যাও, মাসী, আমি এখনি যাচ্চি।"

"যাবি, আর কখন? বেরিয়ে দেখ্‌গে যা, বেণীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।" মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসীর অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া, তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রাঙ্গণের উপর মহাকোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা বড়ঝুড়ির প্রায় একঝুড়ি। ভাগ করিবার জন্য বেণী নিজে হাজির হইয়াছেন। পাড়ার ছেলে মেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাশির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই, "কি মাছ পড়ল, হে বেণী!" বলিয়া লাঠি হাতে ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিলেন।

"তেমন আর কই পড়ল!" বলিয়া বেণী মুখখানা অপ্রসন্ন করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল, "আর দেরি করচিস্ কেন রে? শীগ্‌গীর করে ভাগ করে ফেল্ না"

জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

"কি হচ্চে গো, রমা? অনেক দিন আস্‌তে পারিনি; বলি, মায়ের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই"—বলিয়া গোবিন্দ গাঙুলি বাড়ী ঢুকিলেন। "আসুন" বলিয়া রমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

"এত ভিড় কিসের গো?" বলিয়া গাঙুলি অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন—"ইস্! তাই ত গা—মাছ ত বড় মন্দ ধরা পড়েনি দেখ্‌চি। গড়পুকুরে জাল দেওয়া হল বুঝি?"

এসকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহুল্য মনে করিয়া মৎস্য-বিভাগের প্রতিই ঝুঁকিয়া রহিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সেকর্ম্ম সমাধা হইয়া গেল।

বেণী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকুই চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া, ধীবরের প্রতি একটা গোপন চোখের ইঙ্গিত করিয়া, গৃহ প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। এবং মুখুয্যেদের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথার সমান উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারাটা এমনি ভয়ানক মত যে, সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলে-বুড়া সবাই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবি গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কর্ত্রী বলিয়া চিনিল, তাহা সেই জানে। দূর হইতেই মস্ত একটা সেলাম করিয়া, 'মা-জী' বলিয়া সম্বোধন করিল এবং কাছে আসিয়া দাড়াইল। তাহার চেহারা যেমনই হৌক, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক;—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দি-বাঙলা-মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশ বাবুর ভৃত্য এবং মাছের তিন ভাগের একভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

রমা বিস্ময়ের প্রভাবেই হৌক বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হৌক—সহসা উত্তর করিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেণীর ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, "এই, যাও মৎ"। চাকরটা ভয়ে চারপা পিছাইয়া আসিয়া দাড়াইল।

আধমিনিট পর্য্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই। তখন বেণী সাহস করিলেন। যেখানে ছিলেন সেইখান হইতে বলিলেন—"কিসের ভাগ?"

ভজুয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটা সেলাম দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "বাবুজী, আপকো নহি পুছা।"

মাসী অনেকদূরে রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝনঝন্ করিয়া বলিলেন, "কিরে বাপু, মারবি না কি!"

ভজুয়া একমুহূর্ত্ত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণেই তাহার ভাঙা গলায় ভয়ঙ্কর হাসিতে বাড়ী ভরিয়া উঠিল। খানিকপরে হাসি থামাইয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি হাসিয়া কহিল, 'মা-জী?' তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সম্ভ্রমের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুকান ছিল। রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, "কি চাস, তোর বাবু?"

রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুয়া হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূরসাধ্য সেই কর্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল।

কিন্তু করিলে কি হয় -মাছ ভাগ হইয়া বিলি হইয়া গেছে। এতগুলা লোকের সম্মুখে সে হীন হইতেও পারে না।—তাই কটুকণ্ঠে কহিল—"তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল্‌গে যা, যা' পারে তাই করুক্‌ গে।"

"বহুৎ অচ্ছা, মা-জী।" বলিয়া ভজুয়া তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেণীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেও প্রস্থানের উপক্রম করিল।

তাহার ব্যবহারে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই যখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেছে, তখন হঠাৎ সে ফিরিয়া দাড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া, হিন্দি-বাঙলায় মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্য ক্ষমা চাহিল। এবং কহিল, "মা জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুর-ধার হইতেই মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। বাবু জী কিম্বা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে; কিন্তু,—" বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বুকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, "বাবুজীর হুকুমে এই জান্ উ হয় ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন; বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভজুয়া যা, মাজীকে জিজ্ঞাসা করে আয়, ওপুকুরে আমার ভাগ আছে কি না।' বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিশুদ্ধ দুইহাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "বাবুজী বলিয়া দিলেন অপরে যে কেউ যাই বলুক, ভজুয়া, আমি নিশ্চয় জানি মাইজীর জবান থেকে কখনও ঝুটবাত বার হবে না—সে কখনও পরের জিনিস ছোবে না'।" বলিয়া সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মাইবামাত্রই বেণী মেয়েলি সরুগলায় আস্ফালন করিয়া কহিল, "এমনি করে উনি বিষয় রক্ষে করবেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করচি, আমি আজ থেকে গড়ের একটা সামুক গুগলিতে ওকে হাত দিতে দেবনা, বুঝলে, না রমা!" বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ—হিঃ—করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

রমার কাণে কিন্তু একটা কথাও প্রবেশ করিল না। তাহার দুই কাণের ভিতর তখন লক্ষ করতালি একসঙ্গে ঝমঝম করিয়া যেন মাথাটা চেচিয়া ফেলিতেছিল। গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙা হইয়াই এমনি শাদা হইয়া গিয়াছিল, যেন কোথাও একফোটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শুদ্ধ এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"জ্যাঠাইমা?"

"কে, রমেশ? আয়, বাবা, ঘরে আয়।" বলিয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন।

ঘরে পা দিয়াই রমেশ একটুখানি চমকিয়া গেল। কারণ, জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়া ছিল, তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। তাহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত মনে হইল, ইহারা মাসীকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ত্রুটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জার মত নিভৃতে কাছে আসিয়াও বসে! এদিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাগমে রমারও অবস্থা-সঙ্কট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এগ্রামের মেয়ে, তাই নয়; রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও তাহার লজ্জা করে,

না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তা ছাড়া সেদিন মাছ লইয়া একটা কাণ্ডও ঘটিয়া গেল! তাই সবদিক বাঁচাইয়া যতটা পারা যায়, সে আড় হইয়া বসিয়াছিল।

রমেশ আর সেদিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, দিয়া, ধীরে সুস্থে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, "জ্যাঠাইমা!" জ্যাঠাইমা বলিলেন, "হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?"

রমেশ কহিল, "দুপুরবেলা না এলে তোমার কাছে যে একটু বস্‌তে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়।"

জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশও মৃদু হাসিয়া কহিল, "বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম; আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয় ত শেষ নেওয়া, জ্যাঠাইমা।" তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে, উভয় শ্রোতাই বিস্মিত ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

"বালাই, ষাট্! ও কি কথা, বাপ।" বলিয়া বিশ্বেশ্বরীর চোখদুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল।

রমেশ শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বেশ্বরী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "শরীরটা কি এখানে ভালথাক্‌চেনা, বাপ?

রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বারদুই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ যে খোট্টার দেশের ডালরুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এতশীঘ্রই খারাপ হয়? তা' নয়, শরীর আমার বেশভালই আছে; কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ডও টিঁক্‌তে পাচ্ছিনে—সমস্ত প্রাণটা যেন আমার থেকে থেকে খাবি খেয়ে উঠচে।"

শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া, বিশ্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইয়া, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তোর জন্মস্থান—এখানে টিঁক্‌তে পারচিস্‌নে, কেন, বল্ দেখি?"

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আমি বল্‌তে চাইনে। আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জান।"

বিশ্বেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া, বলিলেন, "সব না জান্‌লেও কতক জানি বটে। কিন্তু, সেই জন্যেই ত তোর আর কোথাও গেলে চল্‌বে না, রমেশ।"

রমেশ কহিল, "কেন চল্‌বে না, জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চায় না।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "চায় না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ডালরুটি খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্যে?"

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। আজ কেন যে তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যেপথটা বরাবর ষ্টেসনে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহারি একটা যায়গা আটদশ বৎসর পূর্ব্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতে সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্যসময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সন্তর্পণে ইহারা পার হয়; কিন্তু বর্ষাকালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটা বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙা তালেরডোঙা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারি সাহায্যে, ইহারা আছাড় খাইয়া, হাতপা ভাঙিয়া, ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখসত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজপর্য্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টামাত্রও করে নাই। মেরামত করিতে টাকাকুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই টাকাটা রমেশ, নিজে না দিয়া, চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আটদশদিন পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আটদশটা-পয়সা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসিবার সময়, পথের ধারে স্যাকরাদের দোকানের ভিতরের এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কাণে যাওয়ায় সে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, "একটা পয়সা কেউ তোরা দিস্‌নে। দেখ্‌চিস্‌নে ওর নিজের গরজটাই বেশী। না দিলে, ও আপনি সারিয়ে দেবে। তা' ছাড়া, এতকাল যে ও ছিলনা, আমাদের ইষ্টিশান যাওয়া কি আট্‌কে ছিল?" কে আর একজন কহিল, "সবুর কর না হে। চাটুয্যে মশাই বল্‌ছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলার ঘরটাও ঠিকঠাক্ করে নেওয়া হবে।" তখন হইতে সারা-সকালবেলাটা এইদুটো কথা তাহাকে যেন আগুন দিয়া পোড়াইতেছিল।

জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই ঘা দিলেন। বলিলেন, "সেই ভাঙনটা যে সারাবার চেষ্টা করছিলি, তার কি হল?"

রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, "সে হবে না, জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।"

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "দেবে না বলে, হবে না রে! তোর দাদামশায়ের ত তুই অনেক টাকা পেয়েচিস—এই ক'টা টাকা তুই ত নিজেই দিতে পারিস।"

রমেশ হঠাৎ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। কহিল, "কেন দেব? আমার ভারি দুঃখ হচ্চে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্য খরচ করে ফেলেচি। এ গাঁয়ের কারো জন্য কিছু করতে নেই।" রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল—"এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে, ভাল করলে গরজ ঠাওরায়। ক্ষমা করাও মহাপাপ, ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল!"

জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু রমার চোখমুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

রমেশ রাগ করিয়া কহিল, "হাসলে যে, জ্যাঠাইমা?"

"না হেসে করি কি বল্ ত, বাছা?" বলিয়া সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, "বরং, আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্চিস্, রমেশ, বল দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে?"

একটু থামিয়া, কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন—"আহা! এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল—তা' যদি জানিস্, রমেশ, এদের ওপর রাগ করতে তোর আপনিই লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েচেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক্, বাবা।"

"কিন্তু, এরা যে আমাকে চায় না, জ্যাঠাইমা!"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "তাই থেকেই কি বুঝতে পারিস্‌নে, বাবা, এরা তোর রাগের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখ্‌বি সমস্তই এক।" সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে আছ, মা।—হাঁ, রমেশ, তোরা দু'ভাই-বোনে কি কথাবার্ত্তা বলিস্‌নে? না, মা, সে কোরো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা' হয়ে গেছে, সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।—সে নিয়ে তোমরা দুজন মনান্তর করে থাক্‌লে কিছুতে চলবে না।"

রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, "আমি মনান্তর রাখ্‌তে চাইনে, জ্যাঠাইমা। রমেশদা'—"

অকস্মাৎ তাহার মৃদুকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকো না, জ্যাঠাইমা। সেদিন কোনগতিকে প্রাণে বেঁচেচ, আজ আবার উনি যদি মাসীকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন—একেবারে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে বাড়ী ফিরবেন।" বলিয়াই কোনরূপ বাদ প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিলেন, "যাস্‌নে, রমেশ, কথা শুনে যা।" রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, "না, জ্যাঠাইমা—যারা অহঙ্কারের স্পর্দ্ধায় তোমাকে পর্য্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে, তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি বোলো না—" বলিয়া তাহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্ব্বেই চলিয়া গেল।

বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত্ত বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "এ কলঙ্ক আমার কেন, জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসীকে শিখিয়ে দিই, না, তার জন্যে আমি দায়ী?"

জ্যাঠাইমা তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "শিখিয়ে দাও না এ কথা সত্যি। কিন্তু, তার জন্যে দায়ী তোমাকে কতকটা হতে হয় বই কি, মা।"

রমা অন্যহাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজে অস্বীকার করিয়া বলিল, "কেন দায়ী? কখ্‌খনো না। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না, জ্যাঠাইমা। তবে কেন আমাকে উনি, মিথ্যে দোষ দিয়ে, অপমান করে গেলেন!"

বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীর ভাবে বলিলেন, "সকলে ত ভেতরের কথা জান্‌তে পারে না, মা। কিন্তু, তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখ্‌খনো নেই, একথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি। তুমি ত জান না, মা; কিন্তু, আমি গোপনে সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েছি, তোমার ওপর ওর কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস। সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে দুঘরে যখন ভাগ করে নিলে, তখন

ও কা'রো কথায় কাণ দেয়নি যে, ওর তা'তে অংশ ছিল। তাদের মুখের ওপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই -- রমা যখন আছে, তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি পাবই— সে কখনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি, মা, এত বিবাদ-বিসম্বাদের পরেও তোমার ওপর ওর সেই বিশ্বাসই ছিল, যদি না সেদিন গড়পুকুরের —"

কথাটার মাঝখানেই বিশ্বেশ্বরী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আনত শুষ্কমুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে বলিলেন, "আজ একটা কথা বলি, মা, তোমাকে। বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক, রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক —অনেক বেশি। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই, মা, সেই জিনিসটিকে তোমরা চারিদিক থেকে ঘামেরে মেরে নষ্টকরে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে—আমি নিশ্চয় বলছি, তোমাকে, কোনকিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।"

রমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল; একটি কথারও জবাব দিল না। বিশ্বেশ্বরীও আর কিছু বলিলেন না। খানিক পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বেলা গেল, আজ বাড়ী যাই, জ্যাঠাইমা।" বলিয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, চলিয়া গেল।

(৯)

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার সমস্ত উত্তাপ যেন জল হইয়া গেল। সে বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, "এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া, কি কষ্টই না পাইতেছিলাম! বাস্তবিক, রাগ করি কাহার উপর? যাহারা এতই সঙ্কীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বলসঞ্চারের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছু হইতেই পারে না।" তাহার মনে পড়িল, দূরে সহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কাণে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া, কতবার ভাবিয়াছে—'আমাদের বাঙ্গালী জাতির আরকিছু যদি না থাকে, নিভৃতগ্রামগুলির সেই শান্তি-সচ্ছন্দতা আজও আছে—যাহা বহুজনাকীর্ণ সহরে নাই। সেখানে স্বল্পসন্তুষ্ট, সরলগ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুকদিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিতে যায়; শুধু সেইখানে, সেইসব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙ্গালীর সত্যকার ঐশ্বর্য্য অক্ষয় হইয়া আছে!'

হায় রে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার সহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এত পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই!

আর সেই কথাটা মনে পড়িতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন অসংখ্য সরীসৃপ চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। নগরের সজীব চঞ্চল পথেপথে যখন কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গেছে, তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্টগ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এইসকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মত রেহাই পাইয়া বাঁচিবে! সেখানে যাহা সকলের বড়--সেই ধর্ম্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্র আজিও সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে!

হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র! কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম্ম! আমাদের এইসমস্ত প্রাচীন নিভৃতগ্রামগুলিতে! ধর্ম্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ-বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য-সমাজ যে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহারি বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে।

অথচ, সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতি-ধর্ম্ম নাই বলিয়া সহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধার অন্ত নাই!

রমেশ বাড়ীতে পাদিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটি এগারো বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিছু না জানিয়া, শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই, রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া লিখিতেছিল; উঠিয়া আসিয়া কহিল, "ছেলেটি দক্ষিণপাড়ার দ্বারিকা ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছুভিক্ষের জন্যে এসেচে।"

ভিক্ষার নাম শুনিয়াই রমেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি কি শুধু ভিক্ষেদিতেই বাড়ী এসেচি, সরকার মশায়? গ্রামে কি আর লোক নেই?"

গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে ত ঠিক কথা, বাবু। কিন্তু কর্ত্তা ত কখনও কাকেও ফেরাতেন না; তাই, দায়ে পড়লেই, এই বাড়ীর দিকেই লোকে ছুটে আসে।" ছেলেটির পানে চাহিয়া প্রৌঢ়াটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "হাঁ, কামিনীর মা, এদের দোষ ত কম নয়, বাছা। জ্যান্ত থাকতে প্রাশ্চিত্ত করে' দিলে না, এখন, মড়া যখন ওঠে না, তখন টাকার জন্যে ছুটে বেড়াচ্চে! ঘরে ঘটিটা-বাটীটাও কি নেই বাপু?"

কামিনীর মা জাতিতে সদ্গোপ; এই ছেলেটির প্রতিবেশী। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বিশ্বেস না হয়, বাবু, গিয়ে দেখবে চল। আমার কিছু থাকলেও কি মরা বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি? চোখে না দেখলেও, শুনেচ ত সব? এই ছ'মাস ধরে আমার যথাসর্ব্বস্ব এই জন্যই ঢেলে দিয়েছি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলে-মেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে?"

রমেশ এইবার ব্যাপারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল যে, এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্ত্তী, ছয়মাস হইতে কাশরোগে শয্যাগত থাকিয়া, আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া, কেহ শবস্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয়মাসকাল তাহার সর্ব্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণপরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। আর তাহারও কিছু নাই। সেইজন্য ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।"

রমেশ, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা ত প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, মড়া পড়েই থাকবে?"

সরকার হাসিয়া কহিল, "উপায় কি, বাবু! অশাস্ত্র কাজ ত আর হতে পারে না! আর, এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে, বলুন? যাহোক্, মড়া পড়ে থাকবে না; যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে—হাঁ, কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?"

ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটা পয়সা দেখাইল।—কামিনীর মা কহিল, "সিকিটি মুখুয্যেরা দিয়েচে, আর পয়সা চারটি হালদার মশাই দিয়েচেন; কিন্তু যেমন ক'রে হোক, ন'সিকের কমে ত হবে না। তাই, বাবু যদি—"

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "তোমরা বাড়ী যাও, বাবু; আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে, লোক পাঠিয়ে দিচ্চি।"

তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ, গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত দুইচক্ষু তুলিয়া, প্রশ্ন করিল, "এমন গরীব এগাঁয়ে আর কয়ঘর আছে, জানেন আপনি?"

সরকার কহিল, "দু'তিন ঘর আছে—বেশী নেই। এদেরও মোটা ভাতকাপড়ের সংস্থান ছিল, বাবু; শুধু একটা চালতা গাছ নিয়ে মামলা করে দ্বারিক চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা, দু'ঘরেই বছরপাঁচেক আগে শেষ হ'য়ে গেল।" গলাটা একটু খাটো করিয়া, কহিল, "এতদূর গড়াত না, বাবু; শুধু আমাদের বড়বাবু, আর গোবিন্দ গাঙ্গুলিই, দু'জনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা করে তুল্লেন!"

"তার পরে?"

সরকার হাসিয়া কহিল, "তারপর, আমাদের বড়বাবুর কাছেই দু'ঘরের গলা পর্য্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গতবৎসর উনি সুদে আসলে সমস্তটাই কিনে নিয়েচেন। হাঁ, চাষার মেয়ে বটে; কিন্তু ওই কামিনীর মা, অসময়ে বামুনের যা করলে, এমন দেখ্তে পাওয়া যায় না!"

রমেশ, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, চুপ করিয়া রহিল। তারপর, গোপাল সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া, মনে মনে বলিল, "তোমার আদেশই মাথায় তুলে নিলাম, জ্যাঠাইমা! মরি এখানে—সেও ঢের ভাল; কিন্তু এ দুর্ভাগা গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।"

শিলিমপুরের পাষাণ-প্রশস্তি

—প্রশস্তি-পরিচয়—

[অধ্যাপক শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম্ এ.]

আবিষ্কার কাহিনী--উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলার অন্তর্গত খেতলাল থানার এলাকাধীন শিলিমপুর নামক মৌজায়, সুদীর্ঘ-প্রশস্তি-সমন্বিত কৃষ্ণবর্ণের একখণ্ড পাষাণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যে অঞ্চলে এই প্রশস্তি পাষাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই অঞ্চলে বাঙ্গালার মধ্যযুগের বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সদস্যগণ, প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে, পুরাতত্ত্বান্বেষণের জন্য অভিযানে বহির্গত হইয়া, এই অঞ্চলের কোন-কোন স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু, সময়াভাবে ও অন্যান্য অসুবিধা অনুভব করিয়া, তাঁহারা আলোচ্য প্রশস্তির আবিষ্কার ভূমিতে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, বগুড়া জেলার এই অঞ্চলে, ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খলসি-গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ বসুচৌধুরী মহাশয়ের কিছু ভূসম্পত্তি আছে। তাঁহার অধিকৃত ভূখণ্ডের অনেক স্থান, বহুশতাব্দী যাবৎ, পতিত-অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে, বিজয়বাবু কতকস্থানের পত্তন দিয়াছিলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে, অফিজুল্লা আকন্দ নামক কৃষক হল-কর্ষণ কালে প্রায় দ্বিহস্ত-পরিমাণ ভূমির নিম্নে প্রোথিত এই প্রস্তরখণ্ড পাইয়াছিল। তদবধি, ইহা কৃষকের সম্পত্তি মধ্যেই পরিগণিত ছিল। বিগত বৎসর [১৩২১ বঙ্গাব্দে] মাঘমাসে বিজয়বাবুর কর্ম্মচারিগণ কার্য্যোপলক্ষে শিলিমপুরে যাইয়া কৃষকের নিকট হইতে সেই পাষাণখণ্ড লইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কৃষক, প্রথমতঃ তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেও, পাষাণে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিটির উদ্ধার হইলে বঙ্গবাসিজনের উপকার সাধিত হইতে পারে— এই মনে করিয়া, বিজয়বাবুর কর্ম্মচারিগণ প্রস্তর-খণ্ড শিলিমপুর হইতে খলসিতে লইয়া আসেন। তৎপর, মাণিকগঞ্জ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার সরকার, বি এ., মহাশয় ও সেই স্কুলেরই অন্যতম শিক্ষক ও মদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ, বি এ., মহাশয় এই প্রশস্তির আবিষ্কার কথা আমাকে পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপিত করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান বৎসরের গ্রীষ্মাবকাশে বৈশাখ মাসের শেষভাগে আমি মাণিকগঞ্জ গিয়াছিলাম। বিজয়বাবুর আত্মীয়গণ, খলসি হইতে প্রস্তর খণ্ড আনাইয়া, তাহাতে ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইলে পর, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকে প্রস্তর-খণ্ড উপহার রূপে প্রদান করেন। সম্প্রতি ইহা সমিতির প্রতিমা গৃহে রক্ষিত আছে।

পাঠোদ্ধার কাহিনী কালের প্রভাব পাষাণ খণ্ডের উপর অধিকরূপে কার্য্য করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত, ইহাতে ক্ষোদিত লিপিটি সমগ্র অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। শিল্পীর কৌশলে অক্ষর গুলি এমন সুন্দর ভাবেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল যে পাঠোদ্ধার-কার্য্যে বড় ক্লেশ পাইতে হয় নাই। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দুইটি বর্ণ ও ২৪শ পঙ্‌ক্তিতে একটি বর্ণ মাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তদুদ্ধার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। ৫—৭ম পঙ্‌ক্তিতে কয়েকটি মাত্র অক্ষর স্থানে স্থানে কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু তদুদ্ধারও কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হয় নাই। মোট কথা, উৎকীরণ-কার্য্য সুচারু-রূপে সাধিত হওয়ায়, এবং বর্ণমালা গভীর ভাবে ক্ষোদিত হওয়ায়, প্রস্তর-খণ্ড দেখিলেই মনে হয় যেন, ইহার লিপিটি প্রত্যগ্র ক্ষোদিত। শিল্পীর বা লেখকের দোষে দুই একটি অক্ষরে মাত্র একটু প্রমাদ লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত পাষাণলিপি, বা তাম্র-শাসন, সমূহের মধ্যে এরূপ নির্ভুল লিপি কমই পাওয়া গিয়াছে। মূল-প্রস্তরলিপির সাহায্যে যেরূপ

শিলিমপুরে প্রাপ্ত—পাষাণ-প্রশস্তির অনুলিপি

পাঠ মূলানুগত বলিয়া উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই সম্প্রতি সুধী সমাজের গোচরীভূত করা হইতেছে।

ব্যাখ্যা-কাহিনী—নানাকারণে এই প্রশস্তির মর্ম্ম বঙ্গ-বাসিগণের পক্ষে জানা আবশ্যক মনে করিয়া, লিপির ব্যাখ্যা কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। নিম্নে সমগ্র প্রশস্তির, পাদ টীকাসহ, একটি বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সুধীগণ মদীয় ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়া ভুল প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া দিলে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। বিনা আলোচনায় ইতিহাসের এই জাতীয় উপাদানের সম্যগ্ ব্যবহার হইতে পারে না।

লিপি পরিচয়—পাষাণখণ্ড আয়তনে ১ ফুট ৪½ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৮½ ইঞ্চ প্রশস্ত। ইহা উভয়পার্শ্বের মধ্যস্থল হইতে পরিমাণে প্রায় এক ইঞ্চ করিয়া বর্দ্ধিত আছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, পাষাণখণ্ড কোন প্রাচীরের গাত্রে আঁটিয়া রাখা হইয়াছিল। লিপি পাঠেও এরূপ অনুমান যুক্তি-যুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহার চতুর্দ্দিক হইতে ½ ইঞ্চ করিয়া বাদ দিলেই প্রশস্তির লিপিটির আয়তন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র লিপি ২৫ পংক্তিতে সমাপ্ত। প্রথম পংক্তির "ওঁ ॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥"—এই গদ্যাংশ ব্যতীত লিপিটিতে সংস্কৃত-ভাষায় নানাচ্ছন্দে বিরচিত ২৯টি শ্লোক আছে। যে অক্ষরে ইহা উৎকীর্ণ, তাহা, একাদশ-শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ও মগধে, প্রচলিত লিপি বলিয়াই ধার্য্য করিতে হয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, মহাশয়, গৌড়েশ্বর নয়পাল দেবের বিজয় রাজ্যের ১৫শ সংবৎসরের [গয়ার কৃষ্ণদ্বারকা মন্দিরের] প্রস্তর-প্রশস্তির যে প্রতিলিপিখানি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিকে উপহার রূপে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অক্ষরের সহিত, এবং রাখালবাবুর অচির-প্রকাশিত "বাঙ্গালার ইতিহাসে"র [প্রথম-ভাগের] ২৩৩ পৃষ্ঠার পর সংযোজিত, গৌড়েশ্বর নয়পাল দেবেরই ১৪শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-নামক বৌদ্ধগ্রন্থের একখানি পুঁথির এক পৃষ্ঠার চিত্রের অক্ষরের সহিত, এবং সেই গৌড়েশ্বরেরই ১৫শ রাজ্যাঙ্কের [গয়ার নরসিংহ-মন্দিরের] আর একখানি শিলালিপির অক্ষরের সহিত, আলোচ্য শিলালিপির প্রত্যেক অক্ষর মিলাইলে মনে হয় যে, শিলিমপুরলিপি নয়পালদেবের সমসাময়িক, বা তদীয় রাজ্যের অনতি ভবিষ্যৎ, বা অনতিপূর্ব্বের, লিপি হইয়া থাকিবে। এই প্রশস্তির ভ, ত, প, য, র, ট প্রভৃতি অক্ষরের আকৃতি নয়পালদেবের সময়ের প্রস্তরলিপির তত্তৎ অক্ষরের আকৃতির অনুরূপ। স্বরবর্ণের মধ্যে 'ই', 'উ', ও 'এ'কারের চিহ্নও সর্ব্বত্র একরূপ লক্ষিত হয়। কতকগুলি বর্ণের আকৃতি পরস্পর প্রায় সমান বলিয়া, কখনও কখনও পাঠোদ্ধারে কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইতে হয়। প্রাচীন অক্ষর-তত্ত্ববিজ্ঞানে অন্যতম গুরুস্থানীয় ডাঃ কিলহর্ণ "বল্লভদেবের অসাম তাম্রশাসন"—শীর্ষক প্রবন্ধে [Epigraphia Indica Vol. V, p. 182] লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্যভারতে একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত অক্ষরাবলীর মধ্যে অনেকগুলির পরস্পর আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; "ভ" ও "ত"এর, "প" ও "য"এর, "চ" ও "র"এর, "ব" ও "ধ"এর, "ম" ও "স"এর, বিশেষতঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সংযোজিত "উ"কার চিহ্ন ও "র"ফলার চিহ্নের মধ্যেই সাদৃশ্য অনেকটা অধিক। আলোচ্য প্রশস্তিতেও আমরা এরূপ সাদৃশ্য—বিশেষতঃ "ভ" ও "ত"এর, "প" ও "য"এর, এবং 'উ'কার চিহ্ন ও 'র'ফলা চিহ্নের সাদৃশ্য—দেখিতে পাই। এই সকল কারণে, আলোচ্য লিপির কাল একাদশ শতাব্দীতে ধার্য্য করিতে হয়। এই লিপির আরও কয়েকটি বিশেষত্ব আছে—(১) রেফ সংযোগে ক, গ, জ, ত, প, ম ও ব এর দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে, কিন্তু রেফ সংযোগে য দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই এবং ধ "দ্ধ"-রূপ ও ভ কেবল একস্থানে ["হিরণ্য-গর্ব্ভ"—২য় পংক্তি] "ব্ভ" রূপ ধারণ করিয়াছে। (২) বিসর্গের পর "স"—একবার দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা "রতিস্সতো" [পং ১৪], কিন্তু—"তস্যাঃ সুতঃ" [পং ১৩], এই স্থলে "স"এর দ্বিত্ব করা হয় নাই। (৩) ১৭শ পংক্তিতে "তস্বৈৎপ্রতিঘম্"-স্থল ব্যতীত, এই লিপিতে কুত্রাপি অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। (৪) অনুস্বার মাত্রার উপর বিন্দু-চিহ্ন দ্বারাই সূচিত হইয়াছে; কিন্তু শ্লোকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের অন্তে, পদান্ত মাকারে বিরাম-চিহ্ন কুত্রাপি নাই—তাহা অক্ষরের পরে বিন্দু চিহ্নের নীচে বিরাম-চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। (৫) পদান্ত ত ও ন-কারে বিরাম-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে—এবং সেই সেই স্থলে ত ও ন অন্যান্য অক্ষরের অপেক্ষায় আয়তনে ছোট। (৬) "র্ব্ব" তে রেফ-চিহ্নের ব্যবহারাভাব সে-কালের

শিল্পিদের একটি রীতির মধ্যেই যেন গণ্য ছিল। এই লিপিতেও তাহা লক্ষিত হয়। দুই একস্থলে মাত্র সংহিতার নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, যথা—"নাম্নঃ তুলা" [পং ১৯] "শাসনং চ" [পং ২০]।

লিপি বিবরণ এই পাষাণ লিপিতে বরেন্দ্র-ভূমি-নিবাসী প্রহাস-নামক এক বিপ্রের কুল-প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে প্রশস্তিকার কবির নামোল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। প্রথম শ্লোকে ভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা যায় যে, প্রহাসের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রহ্মার অন্যতম মানস-তনয় অঙ্গিরার বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ভরদ্বাজ ঋষির সমান গোত্র ছিলেন—শ্রাবস্তি-প্রতিবদ্ধ. তকারি-নামক স্থানে তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল। শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত পরিচয় থাকায় তাঁহারা (শ্রৌত ও গৃহ্য) আহুতির আচরণকারী ছিলেন। চতুর্থ শ্লোকে পুণ্ড্র-জনপদের অন্তর্গত বরেন্দ্রী-মণ্ডলে অবস্থিত বালগ্রাম নামক এক বিশ্রুত গ্রামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রাম পূর্ব্বোক্ত তকারি নামক স্থান হইতে সকটী নামক [নদী বিশেষের বা স্থান বিশেষের নাম (?)] স্থানদ্বারা ব্যবধান যুক্ত ছিল। পঞ্চম শ্লোক হইতে জানা যায় যে, এই বালগ্রামের দ্বিজগণ প্রত্যেকেই নিজকে বিদ্যা, আভিজাত্য ও তপঃকার্য্যাদির আশ্রয় বলিয়া মনে করিতেন। বাল গ্রামের "পৃথ্বথণ্ডভব পণ্ডিতগণে"র বংশে উৎপন্ন দ্বিজগণ, "বিরল-বাস" ইচ্ছা করিয়া, এই গ্রামের সন্নিহিত শীয়ম্ব-নামক ভূখণ্ডে যাইয়া বাস নির্দ্দেশ করেন (৬ষ্ঠ শ্লোঃ)। পূর্ব্বকালে শীয়ম্বেও বহু-গুণ-বিশিষ্ট, তপশ্চরণে বিনয়ে ও নিজ নিজ বিদ্যাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, বহুব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন—কুল-বিধি পালন-কারী, তাঁহাদেরই মধ্যে দুই-তিনজন শ্রুতি-স্মৃতির অর্থ বিষয়ে জগজ্জনের সংশয়চ্ছেদে পটু থাকিয়া, সেই সময় পর্য্যন্তও উচ্ছিন্ন হন নাই (৭ম শ্লোঃ)। এই শীয়ম্ব নামক স্থানে পশুপতি নামা "ষট্‌কর্ম্মাচরণ নিপুণ" এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণের উদয় হয় (৮ম শ্লোক)। ৯—১০ম শ্লোক-পাঠে জানা যায় যে, পশুপতির প্রতিষ্ঠাবান্ পুত্র সাহিল—পিতার উদ্দেশ্যে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং মাতার উদ্দেশ্যে একটি জলাশয় খনন করান। সাহিলের পুত্রের নাম মনোরথ (১১শ শ্লোঃ)। মনোরথের অন্বর্থনামা পুত্রের নাম সুচরিত (১২শ শ্লোঃ)। সুচরিতের পুত্র তপোনিধি ভাবি-কুলসমুন্নতির "আদিহেতু" বলিয়া ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি কুমারিলভট্টের মতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সূক্তি-রসায়নের স্বয়ং স্রষ্টা, ও সদাচারের আকররূপী ছিলেন (১৪শ শ্লোঃ)। তপোনিধির পুত্র কার্ত্তিকেয় স্বশক্তি বলে বহু দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৫শ শ্লোঃ)। কার্ত্তিকেয় "মীমাংসা সাগর"কে গোষ্পদে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং "স্মৃতার্থ সংদেহচ্ছিৎ" বলিয়া লোকে বিদিত ছিলেন,—ইহা তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে (১৬শ শ্লোক) বর্ণিত হইয়াছে। অনঘ-বৃত্তি এই বিপ্র সত্যানুরাগ প্রভৃতি-অসংখ্য-গুণ বিশিষ্ট ছিলেন (১৭শ শ্লোঃ)। কার্ত্তিকেয়ের পুত্রের নাম প্রহাস। ১৮—১৯শ শ্লোকার্থ হইতে প্রহাসের মাতৃকুলের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় - কুটুম্ব পল্লী-কুলজাত বিষ্ণু নামক বিপ্রের প্রপৌত্রী, অজমিশ্রের পৌত্রী, অঙ্গদের পুত্রী, কলি পত্মনাম্নী রমণী তাঁহার জননী ছিলেন। ভবিষ্যতে প্রহাস যে "নিষ্ঠাবান্", "ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠ", ও "দক্ষিণাত্মা" সরল প্রকৃতিক হইবেন - তাহা তাঁহার জন্ম-সময়ের গ্রহসম্পৎ হইতেই সূচিত হইয়াছিল। তর্কে, তন্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞান ছিল বলিয়া, এবং তিনি সত্যবাদী, অলোভী ও অন্যান্য সদ্‌গুণ-বিভূষিত ছিলেন বলিয়া, সেই সময়ের জনসাধারণ তাঁহার পূজা করিত এবং নৃপতিবৃন্দ তচ্চরণে শিরঃপাতপূর্ব্বক প্রণামদ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিতেন (২০শ শ্লোঃ)। যুক্তিদ্বারা সন্দেহ নিরসনে সমর্থ হইলেও, বিচার কালে তিনি তুলা পরীক্ষাদ্বারা মতামত দিতেন (২১ শ্লোঃ)। মহা প্রভাবশালী জয়পাল দেব নামা এক কামরূপরাজ তুলাপুরুষ দানকালে সদ্‌ব্রাহ্মণ প্রহাসকে নয়শত সুবর্ণমুদ্রা ও দশ শতমুদ্রার আয়বিশিষ্ট শাসন-ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য বহু অনুরোধ করিলেও, তিনি কোনক্রমেই তাহা লইতে স্বীকৃত হন নাই (২২শ শ্লোঃ)। ২৩ ২৬শ শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতে, প্রহাস পিতামাতা ও নিজের উদ্দেশ্যে কি কি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায়। গ্রামের দুইটি দেবায়তনের জীর্ণসংস্কার করাইয়া তিনি পিতার উদ্দেশ্যে একটি ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং মাতার উদ্দেশ্যে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। নিজের পুণ্য-বৃদ্ধির জন্য প্রহাস, অন্ন-সত্র স্থাপন করিয়া, একটি উত্তুঙ্গ শুভ্র মন্দিরে বিধিবৎ অমরনাথ

স্থাপিত করিয়া, বাসুদেবের শরণাগত হইয়াছিলেন। এই দেবতার জন্য তিনি শাসনে একটি উদ্যান ও দেবতার পূজাদি-সিদ্ধির জন্য শিবীনপুঞ্জ নামক স্থানে সপ্ত দ্রোণ পরিমিত ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর, পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পার হইলে, প্রধান পুত্রগণের উপর গৃহভার সমর্পণ করিয়া, আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক, গঙ্গাতটে বাস করিতে লাগিলেন (২৭শ শ্লোক)। ২৮শ শ্লোকে কবি স্বরাবোর প্রশংসা করিয়াছেন। শেষ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রশস্তি লেখক শিল্পী সোমেশ্বর মগধ দেশবাসী ছিলেন এবং তিনি তন্মনাঃ হইয়া উৎকীর্ণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

এই প্রশস্তি হইতে উদ্ভূত ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত প্রস্তর প্রশস্তিতে রাজা, মন্ত্রী, বা প্রজার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথার উল্লেখ না থাকিলেও, ইহা প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে একটি মূল্যবান উপাদান বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে। তিনটি বিষয়ে আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (১) প্রশস্তির দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "শ্রাবস্তি" কোন্ শ্রাবস্তি? (২) আদিশূর নামক কোন রাজা বাঙ্গালার কোন অংশে রাজত্ব করিয়া থাকিলেও, বাস্তবিক তিনি দেশে নিষ্ঠাবান্ সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব অনুভব করিয়া থাকিবেন, কি না, এবং এরূপ অভাব অনুভব করিয়া তাঁহার পক্ষে কান্যকুব্জ বা অন্য কোনস্থান হইতে ব্রাহ্মণানয়ন কার্য্যের প্রয়োজন ছিল, কি না? (৩) প্রশস্তির ২২শ শ্লোকে উল্লিখিত কামরূপ রাজ জয়পাল কে? এবং কোন্ বংশে কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন? —এই তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া, আমরা উল্লিখিত প্রবন্ধে, আলোচনার ফলে, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তত্রয়ে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। আলোচ্য প্রশস্তিতে উল্লিখিত শ্রাবস্তি নগর এবং মৎস্য, লিঙ্গ ও কূর্ম্মপুরাণে উল্লিখিত রামের বহুপূর্ব্বতন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শ্রাবস্ত নামক রাজকর্তৃক নির্ম্মিত, "গৌড়দেশে" অবস্থিত, শ্রাবস্তী পুরী একই নগর, তাহা পুণ্ড্র জনপদেই অবস্থিত ছিল, এবং তাহা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও বায়ুপুরাণে উল্লিখিত কোশলের "শ্রাবস্তী" হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি; অর্থাৎ, আমাদের মতে, প্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্যে দুইটি বিভিন্ন শ্রাবস্তীর বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধা করিতে যাইয়া প্রাচীনলিপি ও প্রাচীনগ্রন্থ হইতে বাক্যোদ্ধার পূর্ব্বক কেবল ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পালরাজগণের রাজত্ব সময়ে, তাঁহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, এবং, এমন কি, তাঁহাদের রাজত্বের পরেও, বাঙ্গালায় কখন বেদবিৎ, স্বধর্ম্ম নিরত, সপ্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণের অভাব পরিদৃষ্ট হইতে পারিত না, এবং আদিশূর, ঐতিহাসিক রাজা হইয়া থাকিলেও, তাঁহার নিকট কান্যকুব্জ, বা, অন্য কোন দেশ, হইতে ব্রাহ্মণ আনাইবার প্রয়োজন অনুভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; —তবে মধ্যদেশাদি হইতে বিনির্গত হইয়া যে কখনও, অন্যান্য দেশের ন্যায়, বাঙ্গালায়ও নানা গোত্রীয় ব্রাহ্মণের আগমন ঘটে নাই, আলোচনায় তাহা অভিহিত হয় নাই। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে—আমরা সেই প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, প্রশস্তির জয়পাল বাঙ্গালার পালবংশীয় কোন রাজা ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয় না। একাদশ শতাব্দীতে কামরূপে নরক ও ভগদত্তের বংশোৎপন্ন, পালোপাধিক রাজগণ রাজত্ব করিতেন—তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনুমান করিয়াছি যে, প্রাগ্‌জোতিষাধিপতি ব্রহ্মপালের প্রপৌত্র, রত্নপালের পৌত্র, পুরন্দর পালের পুত্র ইন্দ্রপালের পরে, কোন সময়ে জয়পাল দেব কামরূপে রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকিবেন। ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট প্রকাশের যে শ্লোকে এক "ক্ষ্মাপাল" জয়পালের কথা উল্লিখিত আছে, তিনি কামরূপের এই জয়পাল হইতে পারেন, কি না—তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রশস্তির অনুবাদের সহিত যে টীকা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংযোজিত হইল, তাহাতেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক সামাজিক প্রশ্নের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রশস্তি-পাঠ

১। ও। নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

যং বিশ্ব-প্রভবং চতুর্যুগ চতুর্ভূতোদ্ভবং যং বিদু-
র্যো বর্ণাংশ্চতুরস্তথৈব চতুরো যো কল্পয়চ্চাশ্রমান্।
যস্মাদ্বশ্চতুরাননোদিত-চতুর্ব্বেদী-গিরঃ পৌ-

২। .... কৃষং
পায়াদ্বঃ স চতুর্ভুজোখিল-চতুর্ব্বর্গার্থি-কল্পদ্রুমঃ ॥ [†*]

* সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা সূচিত।
(†) শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ।

যেষাং তস্য হিরণ্যগর্ব্ব-বপুষঃ স্বাঙ্গ- প্রসূতাঙ্গিরো-
বংশে জন্ম সমানগোত্র-বচনোংকষো ভরদ্বাজতঃ।
তেষামার্যজনাভিপূ-
৩। ··········· ····· জিত-কুলং তর্ক্কারিতাখ্যয়া
শ্রাবস্তি-প্রতিবদ্ধমস্তি বিদিতং স্থানং পুনর্জ্জন্মনাং (ম্) ॥
[২ *]

যস্মিন্বেদ-স্মৃতি-পরিচয়োদ্ভিন্ন-বৈতান-গার্হ-
প্রাজ্যাবৃত্তাহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্যোম্নি শুভ্রে।
বাল্রাজন্তো-
৪। ··· ··· পরি পরিসরদ্ধোমধূমা দ্বিজানাং
দুগ্ধাম্ভোধি-প্রসৃত বিলসচ্ছৈবলালীচয়াভাঃ ॥ [৩ *]

তৎপ্রসূতশ্চ পুত্রেষু সকটী-ব্যবধানবান্।
বরেন্দ্রী মণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ ॥ [৪ *]

যস্মিন্নিত্যাভি-
৫। ··· ··· জন তপসামাশ্রয়ত্বেন নিত্যং
প্রত্যেকং তেষ্বহমহমিকা-দর্প্পবৎসু দ্বিজেষু।
আসীদস্মাবিব বহুগুণানন্তরৈক্কে ক ভূমৌ
তত্রত্যানামিতি বহুমতঃ [ক] শ্চিদেকো জনানাম্ ॥
[৫ *]

তৎপূর্ব্বথ ও ভ-
৬। ··· ··· ········ ব-পণ্ডিতবংশজানাং
স্থানং স্বকর্ম্মনিরত-দ্বিজ-সত্তমানাং (ম্)।
শান্তাত্মনাং বিরল-বাস-সমীহয়ৈব
শীরম্বকাখ্যমিহ সন্নিহি[ত]ম্বভূব ॥ [৬ *]

য[স্মিন্] প্রায়স্তপসি বিনয়ে স্বাসু বিত্তীষু বি-
৭। ·························· ··················প্রাঃ
প্রাপ্তা নিত্যামগণিত-গুণাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বে বভূবুঃ।
শ্রৌত-স্মার্ত্তার্থবিষয়-জগৎ-সংশয়-চ্ছেদকাশ্চ
দ্বিত্রা গোত্র-স্থিতি-বিধিভৃতোত্যাপি নোচ্ছেদ-ভাজঃ ॥

তস্মিন্নেকঃ পশুপতিরভূৎ পূজনী-
৮। ·· ·· ·· ·· ·· ·· ····· য়ো জনানাং
দেবঃ সাক্ষাদিব পশুপতি র্ভূতিভূৎ কামভিচ্চ।
যঃ ষট্কর্ম্মচরণ নিপুণঃ কর্ম্মভিঃ স্বৈরুদারৈঃ
কীর্ত্তি জ্যোৎস্নামুপরি বিদধে ভানুভাসামলক্ষ্যাং(ম্)॥
[৮ *]

পুত্রোথ তস্যাভবদ
৯। ·········· ····· ণ গোধ
মুখোত্তিরন সাহিল নামধেয়ঃ।
যঃ স্বৈর্গুণৈঃ প্রাপদপি প্রতিষ্ঠাং
কুল প্রবর্ত্তৈরপবৈরলভ্যাং (ম্)॥ [৯ *]

সাহিলাদিত্য লক্ষাঙ্ক বৈচুন্দাখ্যাং স শাসনং (ম্)।
চক্রে বিষ্ণুং পিতুর্ম্মাতুরর্থেনেহ
১০। ·· ·· ·· ·· ·· ····· জলাশয়ং(ম্)॥ [১০ *]

গুণোত্তরেণাধি গুণোথ সম্য-
ম্মনোরথৈঃ (পঃ) পূর্ণ-মনোরথেন।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বিনয়ো জয়েন
স্বরূপ সাম্যাতদপাদি তেন ॥ [১১ *]

পুত্রস্তেনাজনি গুণনিধিৰ্ব্বর্ম্মকর্ম্মৈকদক্ষ
১১। ··· ······ ·· ········ ······ ঃ
খ্যাতো লোকে সুচরিত ইতীহাখ্যয়ার্থ্যৈব।
সন্যক্ সাধ্ব্যা খলু নিতুলয়া ভার্য়য়া চর্য্যমাণো
নিত্যে কালং সুবিহিত গৃহস্থাশ্রমো যঃ সুখেন ॥
[১২ *]

শুদ্ধান্বয়া সন্নমস্ত সাধ্বী
ত-
১২। ·· পোনিধিং সা নিতুলা কুলস্য।
সমুন্নতেঃ সপ্ত্তি সদ্গুণোঘৈ-
রঘোষিতং ভাবিভিরাদিহেতুং (ম্)॥ [১৩ *]

[২*] শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ।
[৩*] মন্দাক্রান্তা „ ।
[৪*] অনুষ্টুভ্ „ ।
[৫*] মন্দাক্রান্তা „ ।
[৬*] বসন্ত-তিলকা „ ।
[৭*] মন্দাক্রান্তা „ ।

[৮*] মন্দাক্রান্তা ছন্দ।
[৯*] উপজাতি „ ।
[১০*] অনুষ্টুভ্ „ ।
[১১*] উপেন্দ্রবজ্রা „ ।
[১২*] মন্দাক্রান্তা „ ।
[১৩*] উপজাতি „ ।

নিষ্ঠাঙ্গতো ভট্টমতে পথেষু
স্রষ্টা স্বয়ং সূক্তি রসায়নানাং (ম্)।
কন্দঃ সদাচার-বরাঙ্ক
১১। ·· ·· ··············· রাণাং
কোন্তোভবেন্তো ন তপোনিধিঃ স্যাৎ॥ [১৪ *]

তপোনিধেস্তস্য তপোধিকা ভূৎ
স্বগ্গো (গ্‌র্গা) ভবানীব ভবস্য ভার্যা।
শক্ত্যা করিষ্যন্ বহু দেবকার্যং
তস্যাঃ সুতোজায়ত কাত্তিকেয়ঃ॥ [১৫ *]

গোষ্প-
১৪। ·· ·· দীকৃত-মীমাংসাসাগরঃ শ্রোত্রিয়াগ্রণীঃ।
লোকে স্মৃতাগে সন্দেহচ্ছিদেকঃ
খ্যাত এব যঃ॥ [১৬ *]

যতিস(ত) কীর্ত্তিস্ত্রিভুবন-গতা বৃত্তিরনঘা
গৃহস্থিত্যাহ্লাহংকৃতিরপি গুণৈর্যস্য গুরু-
১৫। ·· ········ ····· ····· · ····...ভিঃ।
শ্রুতো চ শ্রদ্ধাবিস্থিতিরথ হরৌ ভক্তিরচলা
পৃথগ্‌বক্তুং শক্তঃ ক ইহ ননু তস্যাখিল গুণান্॥ [১৭ *]

কবি-প্রবহাগ্য—কটুম্বপল্লী
কুলাজমিশ্রাঙ্গভবাঙ্গদস্য।
পুত্রীং পবিত্রীকৃত-
১৬। ····· ············ · গোত্রমগ্যাং
পত্নীং স লেভে কলিপব্ব(ব্বা) নাম্নীং (ম্)॥ [১৮ *]

তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রপৌত্রী ক্ষমমখিল বিধে
পুত্রমামুত্রিকে সা
সংপুত্রাপি প্রহাসং নিধিমধন ইব প্রাপ্য দীর্ঘং মুমোদ।
যঃ প্রাগেব গ্রহ-
১৭। ···········দ্ধি-প্রভব-শুভফলৈ র্ভাবি ভূয়ঃ-প্রতিষ্ঠো
নিষ্ঠাবানেক এব স্ফুটমবগমিতো
লক্ষণৈর্দ্দক্ষিণাত্মা॥ [১৯ *]

জ্ঞান [ং *] তর্কেথ তন্ত্রেহপ্রতিঘমিদমথো
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চান্তৎ
সত্যালোভাদি তস্য স্তুতি-
১৮। ················ ..বচন-পদং নৈব যথাত্মবাদাৎ।
প্রখ্যাতং লোকপূজা-নৃপতিবর-শিরঃ-শ্রেণি-
পাতাদিভিস্তৎ
বাচো সত্যাঃ সতাং স্যুঃ সম-সময়জন-
স্মেরতার্গাঃ কথং বা॥ [২০ *]

সন্দিগ্ধ-নির্ণয়ং যুক্ত্যা
১৯। ·· ·············· ·· কুব্বতোপি সহস্রশঃ।
যস্য ধর্ম্মতুলা নাসীদনালম্বিত-চুম্বকা॥ [২১ *]

যঃ কামরূপ-নৃপতেজ্জয়পালদেব-
নাম্নঃ তুলাপুরুষ-দাতুরচিন্ত্য ধাম্নঃ।
হেম্নাং শতানি নব নিভরমর্গ্যমানো
নৈ-
২০। ·· বাদদে দশ-শতোদয়-শাসনং চ॥ [২২ *]

সবিধি বিবুধ-সিন্ধৌ জীবিতং স্বং বিমুচ্য
স্বসুতজ উপকারে প্রেত্য পিত্রোরপেক্ষা।
ভবতি ন খলু কিন্ত্বাত্মীয়মানৃণ্যমিচ্ছ-
ন্নকৃত তদনয়ো
২১। ·· ····· ·· যৎ কার্য্যমামুষ্মিকং যঃ॥ [২৩ *]

ভগ্নং পুনর্নূতনমত্র কৃত্বা
গ্রামে চ দেবায়তন-দ্বয়ং যঃ।
পিতুস্তথার্থেন চকার মাতু—
স্ত্রিবিক্রমং পুষ্করিণীমিমাঞ্চ॥ [২৪ *]

সততমুচিতবৃত্তিঃ কল্প-
২২। ·· ··········· ······ম্বিত্বান্নসত্রং
রুচির-শিখর সাঙ্গোত্তুঙ্গ-শুভ্রালয়েস্মিন্।
বিধিবদমরনাথং স্থাপয়িত্বা বরেণ্যং
শবণমগমদেকং বাসুদেবং স দেবং (ম্)॥ [২৫ *]

[১৪ *] ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ।
[১৫ *] উপজাতি „ ।
[১৬ *] অনুষ্টুভ্ „ ।
[১৭ *] শিখরিণী „ ।
[১৮ *] উপজাতি „ ।
[১৯ *] স্রগ্ধরা „ ।
[২০ *] স্রগ্ধরা ছন্দ।
[২১ *] অনুষ্টুভ্ „ ।
[২২ *] বসন্ততিলকা „ ।
[২৩ *] মালিনী „ ।
[২৪ *] উপজাতি „ ।
[২৫ *] মালিনী „ ।

দদাবস্মৈ চ শ্রীয়স্মৈ দেবা-

২৩। .... য়োত্থানমুত্তমং (ম্)।

শিরীষ-পুঞ্জে পূজাদি-সিদ্ধ্যৈ ভূদ্রোণ সপ্তকং (ম্)॥

২৬*॥

পরে শতাব্দাদ্বয়সি স্থিতোথ

পুত্রানবস্থাপ্য গৃহে কৃতার্থঃ।

পশ্যন্ জগৎ স্বপ্ন-সমং বিমৃচ্য

সঙ্গান্ স গঙ্গা-ত-

২৪। .... [ট] মধ্যবাস॥ ২৭*

কবিঃ কাব্যগুণৈরেব শোভতেহস্মিতশ্চিরং (ম্)।

তন্মথাপিষ্ট-কাব্যস্য নশ্যন্ত্যেকপদে গুণাঃ॥ ২৮*

শিল্পবিদ্যাগধঃ কামী তন্মনা বর্ম-ভক্তিভিঃ।

সোমেশ্বরো লিখদিমাং প্রশস্তিং স্বা

২৫। ... .মিব প্রিয়াং(ম)॥

২৯*

অনুবাদ

ও। ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার করি।

(১)

পণ্ডিতগণ! যাঁহাকে বিশ্বের মূল-কারণ এবং চতুর্বর্গের ও চতুর্ভূতের * উৎপত্তি-স্থান বলিয়া জানেন; যিনি চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের উদ্ভাবন করিয়াছেন; চতুরাননের [ব্রহ্মার] চতুর্মুখোচ্চরিত-চতুর্ব্বেদ-বাক্য যাঁহার পুরুষকারের বর্ণনা করে;—সকল-চতুর্বর্গ-প্রার্থীর কল্পদ্রুম-রূপী চতুর্ভুজ [বিষ্ণু] আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

(২)

হিরণ্যগর্ভ-দেহাত্মক সেই [চতুর্ভুজের] স্বকীয় অঙ্গ হইতে প্রসূত § অঙ্গিরার বংশে যাঁহাদের জন্ম এবং

(২৬*) অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

(২৭*) উপজাতি "।

(২৮-২৯*) অনুষ্টুভ্ "।

* 'চতুর্ভূত'—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—মনুর এই ভূত-বিভাগ স্মরণীয়।—মনুসংহিতা ১অঃ—৪৩—৪৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

§ 'স্বাঙ্গ-প্রসূতাঙ্গিরস্'—ব্রহ্মার মানস-তনয়গণের মধ্যে অঙ্গিরা একতম; যথা,—"মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্। প্রচেতসং বসিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ"॥—মনু ১।৩৫। অঙ্গিরার কুল তিনটি

ভরদ্বাজের সহিত যাঁহাদের সমান গোত্র থাকার কথার উৎকর্ষ প্রচলিত আছে—সেই ব্রাহ্মণগণের কুলস্থান আর্য্যজন পূজিত কল তকারি নামে সুবিদিত স্থান শ্রাবস্তি প্রতিবদ্ধ ছিল।

(৩)

এইস্থানে [তকারিতে] বেদ-স্মৃতি-পরিচয়োদ্ধত, শ্রৌত ও গৃহ্য কর্মাতে প্রভূতভাবে পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত, আর্ত্তির আচরণকারী দ্বিজগণের উর্দ্ধাভিগামী হোমধূম—দুগ্ধসাগরে প্রসূত চঞ্চল শৈবাল-পংক্তি সমূহের আভা ধারণ করিয়া—তাঁহাদেরই কীর্ত্তিদ্বারা শুভ্র ‡ আকাশে বিশেষ ভাবে শোভা পাইত।

(৪)

বরেন্দ্রীর অলঙ্কার-স্বরূপ বালগ্রাম নামক বিশ্রুত গ্রামও তাহা হইতে [তকারি হইতে] প্রসূত হইয়া, সকটী দ্বারা ব্যবধানযুক্ত হইয়া, পুণ্ড্রজনপদেই বিদ্যমান ছিল।

পৃথক্ শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা কেবলাঙ্গিরস, গৌতমাঙ্গিরস ও ভারদ্বাজাঙ্গিরস।

'পুনর্জ্জন্মনাম্' দ্বিজগণের (ব্রাহ্মণগণের)।

‡ শব্দে "যশাসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ" সাহিত্য দর্পণের এই বাক্য স্মরণীয়। এইস্থলে শুভ্র আকাশ দুগ্ধাম্ভোনিধি সহিত এবং সমপতল শৈবালাবলীর সহিত তুলিত হইয়াছে।

। এই শ্লোকের "ততঃ প্রসূত" সমাসটির অর্থ অবধানযোগ্য। ইহার "তত" শব্দটি পূর্ববর্ত্তী শ্লোকের "যস্মিন" পদের সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ বালগ্রামটি "শ্রাবস্তি প্রতিবদ্ধ তকারি"-নামক স্থান হইতে প্রসূত। একগ্রাম অন্যস্থান প্রসূত—বলিলে, গ্রামটি সেই স্থানের অংশ বিশেষ, অথবা, সেই স্থান হইতে আগত নিবাস লোকজনদ্বারা গঠিত বলিয়াই মনে করিতে হয়। তাহা হইলে, "বাল গ্রাম" ["বাল" শব্দ হইতেও গ্রামটিকে নব প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়] ও "তকারি"র মধ্যে ব্যবধান অধিক নহে। এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান "সকটী"। "সকটী"-শব্দে কোন নদী বা স্থানবিশেষকে সূচিত করিয়া থাকিবে। "সকটী"-শব্দ হইতে অন্যকোন সঙ্গত অর্থ প্রতিভাত হয় না। শ্রাবস্তি-প্রতিবদ্ধ তকারি ও পুণ্ড্রের অন্তর্গত বরেন্দ্রীর অলঙ্কার বালগ্রাম—এই উভয় স্থানের মধ্যে অল্পব্যবধান ছিল বলিলে এই "শ্রাবস্তি" কোন "শ্রাবস্তি"? এই প্রশ্নের আলোচনা উপস্থিত হয়। ইহা কি লবের রাজধানী উত্তর-কোশলের 'শ্রাবস্তী', না, পুণ্ড্রজনপদেই তন্নামধেয় কোন নগরবিশেষ? এই "শ্রাবস্তি" কোশলের "শ্রবস্তী" হইলে, বরেন্দ্রীতে অবস্থিত বালগ্রামের ও কোশলের "শ্রাবস্তী"—এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম "সকটী" ধরিতে হয়; কিন্তু এই বিশাল ভূখণ্ডকে "সকটী" বলিবার কোন প্রমাণ নাই।

(৫)

বহুগুণবিশিষ্ট অনন্তরত্নের আধার কোন কূপের ন্যায়, [বহুগুণ-বিশিষ্ট ও অনন্ত রত্নের আধার] এইস্থানে [বালগ্রামে], বিদ্যা, আভিজাত্য ও তপঃকার্য্যাদির আশ্রয়-স্থানে দ্বিজগণ প্রত্যেকেই অহমহমিকা-দর্পে নিত্যদর্পিত ছিলেন বলিয়া, [তাঁহাদের মধ্যে] নির্দ্দিষ্ট কোনও একজন স্থানীয় জনগণের নিকট [সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে] সমাদর * লাভ করিতে পারেন নাই।

(৬)

এই গ্রামের পূর্ব্বখণ্ড-ভব পণ্ডিতগণের বংশে উৎপন্ন, শান্তাত্মা, স্বকর্ম্ম নিরত, দ্বিজ সত্তমগণের বিরল-বাস-ভোগের ইচ্ছা হওয়াতেই এই গ্রামের সন্নিহিত শীয়ম্ব নামক স্থান তাঁহাদের বাস-স্থান হইয়াছিল।

(৭)

এইস্থানে [শীয়ম্বে] অসংখ্য-গুণান্বিত পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী বিপ্রগণ তপশ্চরণে, বিনয়ে ও স্ব স্ব-বিদ্যাতে প্রায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেন। শ্রুতি স্মৃতির অর্থ বিষয়ে জগজ্জনের সংশয়-চ্ছেদ-সমর্থ [তাঁহাদেরই] দুইতিন জন [বংশধর] গোত্র-রক্ষা-বিষয়ক বিধির পালনকারি রূপে অদ্যাপি § উচ্ছেদ প্রাপ্ত হন নাই।

(৮)

সেইস্থানে লোকের পূজনীয় পশুপতি-নামক এক ব্যক্তি ছিলেন—তিনি যেন সাক্ষাৎ পশুপতি দেবই ছিলেন, [কারণ, উভয়েই] "ভূতিভূৎ" † ও "কামজিৎ" ‡। ষট্‌কর্ম্মাচরণ-নিপুণ * এই ব্যক্তি স্বকীয় মহৎ কার্য্য কলাপদ্বারা কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নাকে ভানু-কিরণেরও অলঙ্ঘ্য করিয়া ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত করিয়াছিলেন।

(৯)

অনন্তর কুল উদ্দ্যোতিত করিয়া, সাহিল-নামধেয় তাঁহার একপুত্র এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজগুণে অন্যান্য কুল-সত্তমগণেরও § অলভ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১০)

তিনি পিতার উদ্দেশ্যে শাসন-সমেত দানব-লক্ষ্য †

---

* বালগ্রামের দ্বিজগণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোনও বিপ্রস্থানীয় জনসাধারণের বহুমান প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই—অর্থাৎ, সমানগুণ-সম্পন্ন হওয়ায় প্রত্যেকেই সমভাবে সমাদৃত হইতেন।

§ অদ্যাপি—"বালগ্রাম" হইতে প্রহাসের পূর্ব্ব-পুরুষগণের "শীয়ম্বে" আগমন সময়েও, স্থানীয় বিপ্রবংশের দুইতিনটি বংশধর শ্রুতি-স্মৃতিতে নিজের পাণ্ডিত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, গোত্রস্থিতির জন্য বিহিত শাস্ত্রীয় নিয়মাবলী পালন করিতেছিলেন। শীয়ম্বের অন্যান্য বহুকুল ইতির্মধ্যে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

† 'ভূতিভূৎ'—মহাদেবপক্ষে—ভূতি - ভস্ম ;—ভস্ম-ভূষণ মহাদেব। বিপ্র-পক্ষে—ভূতি-সম্পৎ ;—সম্পদাধিকারী বিপ্র।—"ভূতির্ভস্মনি সম্পদি"—ইত্যমরঃ।

‡ 'কামজিৎ'—মহাদেবপক্ষে ইহার অর্থ—মদন-ভস্মকারী ;—স্মরহর হর। বিপ্রপক্ষে ইহার অর্থ—সর্ব্বপ্রকার কামনার ত্যাগ-কারী ;—জিতেন্দ্রিয় বিপ্র।

* 'ষট্‌কর্ম্ম' "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥"—মনু ১।৮৮

§ 'প্রবর' শব্দটি হলায়ুধ-কর্ত্তৃক "অগ্র্য"-পর্য্যায়ে ধৃত ; যথা "অগ্র্যং প্রধানং প্রমুখং পুরোগং মুখ্যং পরার্দ্ধ্যং প্রবরং প্রবর্হম্। অগ্রেসরং সত্তমমুত্তমংচ গ্রামাণ্যমগ্রণ্যমুদাহরন্তি॥"

—অভিধান-রত্নমালা ৮৯

† 'সাহিলাদিত্যলক্ষ্মং'—মূলে এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। "স-শাসনং"—এই শব্দদ্বয়কে পৃথক প্রযুক্ত ধরিলে, "স"-পদকে "চক্রে" ক্রিয়ার কর্ত্তা ধার্য্য করিতে হয়। তাহা হইলে, "বৈচুন্দাখ্যং" এবং "সাহিলাদিত্যলক্ষ্মং" পদদ্বয় ও "শাসনং" পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, মনে করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের এরূপ অর্থ করিতে হয়—"তিনি [সাহিল] সাহিলাদিত্য লাঞ্ছনযুক্ত বৈচুন্দাখ্য শাসন [-ভূমি] প্রদান করিয়াছিলেন"। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমার সহিত আলোচনা সময়ে এইরূপ ব্যাখ্যার পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু সাহিল, সাহিলাদিত্য [সাহিলের ও আদিত্যের (?)]-লাঞ্ছন-যুক্ত শাসনপ্রদান করিয়াছিলেন, ইহা যেন কেমন-কেমন ব্যাখ্যা মনে হয়। "স শাসনং চক্রে, বিষ্ণুংচ চক্রে।"—কিন্তু তার পর "জলাশয়ং চক্রে" বলিতে হইলে, আর একটি "চ" এর প্রয়োগ আবশ্যক হয়। এইরূপ নানাতর্ক উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া, এইস্থলে "সাহিলোদিত্যলক্ষ্মঞ্চ"—এইরূপ পাঠ অর্থানুগত হইতে পারে বলিয়া, তাহারই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। "দিত্যাঃ দৈত্যা লক্ষ্যং যস্য সঃ তম্"—এইরূপ বিগ্রহ-বাক্য করিয়া পদটিকে "বিষ্ণুং"-পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, মনে করা যাইতে পারে। বিষ্ণুর লক্ষ্যই দৈত্যগণ—অসুর-নিপাতের জন্য বিষ্ণু অবতারগ্রহণ করিয়া অনেকবার ধরাতলে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস।

MOHILA PRESS

বৈচুন্দাখ্য বিষ্ণু স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং মাতার উদ্দেশ্যে এখানে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন।

(১১)

ইন্দ্রিয়-গ্রামের জয় যেমন স্বরূপ সাদৃশ্য-বশতঃ বিনয়* উৎপাদন করে, সেইরূপ গুণোত্তর পুত্র মনোরথ তিনিও [সাহিলও] স্বরূপ সাদৃশ্য বশতঃ অধিক গুণান্বিত মনোরথ-নামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

(১২)

ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিশেষ-ভাবে দক্ষ, গুণ নিধি সুচরিত নামে অন্বর্থ সংজ্ঞক, বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত, পুত্র তাহা হইতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি [সুচরিত] সাধ্বী ভার্য্যা নিতুলা-কর্তৃক সম্যক্ সেবিত হইয়া সুব্যবস্থিত গৃহস্থাশ্রমে সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন।

(১৩)

সেই শুদ্ধ বংশজা সাধ্বী নিতুলা দেবী, [কুল]-সন্তান-গণের ভাবী সদ্‌গুণসমূহ-দ্বারা [ভবিষ্যমান] কুল সমুন্নতির আদি-হেতু-ভূত পাপ বিরহিত পুত্র তপোনিধিকে প্রসব করিয়াছিলেন।

(১৪)

যেমন তপোনিধি [তপস্যার আধার] না হইলে, অন্য কেহ মতবাদের † মধ্যে [কুমারিল] ভট্টের ‡ মতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সূক্ত রসায়নের স্বয়ং স্রষ্টা, ও সদাচার রূপ শ্রেষ্ঠ অঙ্কুরের মূল বলিয়া [পরিচিত হইতে পারেন না] -সেইরূপ [সুচরিত পুত্র] তপোনিধি * জন্মগ্রহণ না করিলে, অন্য কে আর [কুমারিল-] ভট্টের মতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সূক্ত রসায়নের স্বয়ং স্রষ্টা ও সদাচার রূপ শ্রেষ্ঠ অঙ্কুরের মূল বলিয়া [গণ্য] হইতে পারিতেন ?

(১৫)

[তপোনিধি] ভবের ভার্য্যা [তপোধিকা] ভবানীর ন্যায়, তপোনিধিরও তপোধিকা স্বধা নাম্নী ভার্য্যা ছিলেন। শক্তিধারা ‡ ভবিষ্যতে বহু দেবকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইবেন, কার্ত্তিকেয় নামে তাঁহার এরূপ একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১৬)

শ্রোত্রিয় শ্রেষ্ঠ তিনি [কার্ত্তিকেয়] মীমাংসা সাগরকে গোষ্পদে পরিণত করিয়া, পৃথিবীতে একমাত্র স্মৃতার্থ সংশয় চ্ছেদক বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

---

* 'বিনয়' শ্লোকের তৃতীয় চতুর্থ চরণের অর্থ হইতে প্রতীত হয় যে, 'বিনয়' শব্দ 'ইন্দ্রিয় জয়ে'র সমানার্থক। পুত্রের সহিত পিতার ন্যায়, বিনয়ের সহিতও ইন্দ্রিয় জয়ের "স্বরূপ সাম্য" আছে। মল্লিনাথও রঘুবংশের ১০।৭১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, "বিনয়" শব্দের প্রতিশব্দরূপে "ইন্দ্রিয় জয়" শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; যথা "প্রবোধ-বিনয়ৌ তত্ত্বজ্ঞানেন্দ্রিয়জয়ৌ"। কিন্তু মল্লিনাথের এই ব্যাখ্যা পণ্ডিত বামনশিবরাম আপ্তে মহাশয়ের নিকট সমীচীন বোধ না হওয়ায়, তিনি তাঁহার অভিধানে [p 861, Second Edition, 1912] লিখিয়াছেন -"R. 10-17 (where Malli renders বিনয় by ইন্দ্রিয়জয় or restraint of passions, unnecessarily in our opinion)."—সে যাহা হউক মল্লিনাথের পূর্ববর্ত্তী কালে বিরচিত এই প্রশস্তির প্রয়োগ হইতে তাঁহার ব্যাখ্যাটি যে সমীচীন, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। পিতাপুত্রের "স্বরূপ-সাম্য" সম্বন্ধে "আত্মা বৈ পুত্র নামাসি" এই শ্রুতি-বাক্যই প্রমাণ।

† 'পথেষু'—সংস্কৃত-ভাষায় "পথঃ" ও "পথিন্" এই দুইটি প্রাতিপদিকই সমানার্থক। এই স্থলে "পথ" শব্দে দার্শনিক মত (doctrine) বুঝাইতেছে।

‡ 'ভট্টমতে'—"ভট্টমত" বলিলে জগদ্‌-বিখ্যাত মীমাংসা-পারগ কুমারিল ভট্টের মতই বুঝায়। বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের ও তাঁহার প্রজ্ঞাতনামা পুত্রের প্রধানমন্ত্রী ভট্ট ভবদেব "ভট্টোক্ত নীতি" অবলম্বন করিয়া অনেক মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায়; যথা "মীমাংসায়ামশেষ নিবন্ধো যেন ভট্টোক্ত নীত্যা", [শ্লো. [Epi. Ind. Vol VI. p 205]

* তপোনিধি এই শব্দটিতে শ্লেষ আছে। তপোনিধি (১ তপস্যার আধার, ২ সুচরিতের পুত্র তপোনিধি সংজ্ঞা)।

‡ 'শক্তিধরঃ' "শক্তি" শব্দ পার্ব্বতী-নন্দনপক্ষে অস্ত্রবিশেষকে সূচিত করিয়াছে—"শক্তিধর" কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর। 'তপোনিধি নন্দনপক্ষে ইহার অর্থ সামর্থ্য। বহু তপস্যার পর, ভবানী, ভবকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হইয়া, শক্তিধর কার্ত্তিকেয়কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পুত্র, দেবসেনাপতি হইয়া, নিজের 'শক্তি'-নামক অস্ত্রদ্বারা অসুর-নিধন করিয়া, "বহুদেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তপোনিধির পুত্র কার্ত্তিকেয়ও নিজসামর্থ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে বহু সৎকার্য্য ["বহুদেবকার্য্য"] সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন শ্লোকে ইঙ্গিতে তাহাই বলা হইয়াছে। মদন প্রভাবে মহাদেবের তপস্যা ভগ্ন হইয়াছিল; কিন্তু মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য ভবানী যে তপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্ন হয় নাই— জয়যুক্ত হইয়াছিল ইঙ্গিতে ইহা সূচিত করিবার জন্য, কবি মহাদেবকে "তপোনিধি" বলিয়া এবং ভবানীকে "তপোধিকা" বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

(১৭)

সত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল; তাঁহার কীর্ত্তি ত্রিভুবন-গতা ছিল; গৃহ-স্থিতিতে তাঁহার বৃত্তি নিষ্পাপা ছিল; শ্রেষ্ঠ গুণাবলি-সত্ত্বেও তাঁহার অহঙ্কারাভাব ছিল; শ্রুতিতে তাঁহার শ্রদ্ধা অবস্থিত ছিল; এবং হরিতে তাঁহার ভক্তি অচলা ছিল;—এজগতে কে তাঁহার অখিলগুণের পৃথগ্ বর্ণনা করিতে সমর্থ?

(১৮)

কবি-বরগণের অগ্রণী কুটুম্ব-পল্লী-কুলোৎপন্ন * অজমিশ্রের অঙ্গভব [পুত্র] অঙ্গদের পবিত্রীকৃতোভয় বংশা কলিপদ্ম-নাম্নী কন্যাকে তিনি পত্নী রূপে লাভ করিয়াছিলেন।

(১৯)

নির্ধন ব্যক্তি নিধি পাইলে যেমন সুখী হন, বহু সৎপুত্রের জননী, বিষ্ণুর প্রপৌত্রী, এই রমণীও তাঁহা [কার্ত্তিকের] হইতে, পারলৌকিক- [আমুত্রিক] সকল কার্য্যবিধান সমর্থ পুত্র প্রহাসকে প্রাপ্ত হইয়া, দীর্ঘকাল সুখী হইয়াছিলেন। তিনি [প্রহাস] প্রথম হইতেই গ্রহ-সম্পৎ-প্রসূত শুভ ফল-দায়ক লক্ষণাবলীদ্বারা স্পষ্টই পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মহতী প্রতিষ্ঠার আধার হইয়া, একমাত্র নিষ্ঠাবান ও সরল-প্রকৃতিক ব্যক্তি হইতে পারিবেন।

(২০)

যথার্থতঃ বিদ্যমান আছে বলিয়া, তর্কে ও তন্ত্রে তাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞান তাঁহার পক্ষে স্তুতিবচন নহে—ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহেও ইহা [তাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞান] তাঁহার পক্ষে স্তুতি-বচন নহে;—সত্য, অলোভ প্রভৃতি আর আর গুণও তাঁহার পক্ষে স্তুতিবচন নহে। তাহা ‡ লোক-পূজা ও নরপতিবরগণের শিরোরাজি-পাত-পূর্ব্বক [প্রণামাদি]-দ্বারাই প্রখ্যাত ছিল। তাহা না হইলে, সমসাময়িক জনের হাস্যোদ্দীপক অসত্য বাক্য কিরূপে সজ্জনের বাক্য হইতে পারিত?

(২১)

সহস্র-সহস্র যুক্তিদ্বারা সন্দেহনির্ণয় করিবার সময়েও, তাঁহার ধর্ম্মতুলা * অনালম্বিত চুম্বক † থাকিত না।

(২২)

তুলাপুরুষ দানে ‡ প্রবৃত্ত, অচিন্ত্য-প্রভাব জয়পাল দেব-নামা কামরূপ রাজ-কর্ত্তৃক নিরতিশয় যাচ্যমান হইয়াও, তিনি [প্রহাস] নয়শত সুবর্ণ [মুদ্রা] ও দশ শত-মুদ্রার

---

* 'কুল্য' এই স্থানে "কুল হইতে জাত", এই অর্থে "কুল্য" শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। "কুটুম্বপল্লী" একটি কুলের নাম বলিয়া প্রতিভাত হয়।

†. 'মুমোদ'- এই ক্রিয়া-পদটি উল্লেখ যোগ্য। ইহা একটি বৈদিক প্রয়োগ। লৌকিক সংস্কৃতে "মুমুদে"-পদ হয়। কিন্তু কবিগণ যে প্রয়োজনানুসারে বৈদিক প্রয়োগের ব্যবহার করিতেন—ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। মহাভাষ্যের- "ছন্দোবৎ কবয়ঃ কুর্ব্বন্তি" এই বাক্য স্মরণীয়।

‡ তিনি যে লোকপূজা ও নৃপতিপূজা প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইতেই অনুমিত হইতে পারে যে, তর্কে, তন্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞান ছিল এবং তিনি যথার্থতঃ সত্যবাদী, অলোভী ও অন্যান্য সদ্গুণ বিভূষিত ছিলেন। এসকল কথা মিথ্যা হইলে, সজ্জনগণ ইহার উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেন না; কারণ, ইহার উল্লেখ করিলে, ইহা সমসাময়িক জনের হাস্যোদ্রেক করিত।

* 'ধর্ম্মতুলা'—"তুলাপরীক্ষা" বলিয়া পূর্ব্বকালে অভিযোগ নিরূপণ বিষয়ক একপ্রকার বিচার প্রথা প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে-সংশয়, যুক্তিদ্বারা নিরাস করিতে সমর্থ হইলেও প্রহাস, কেবল তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, তুলাপরীক্ষাদ্বারাই তদ্বিষয়ে মতপ্রদান করিতেন। 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে তুলা', অগ্নি, জল, বিষ, কোশ প্রভৃতি "দিব্যে"র কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে; ব্যবহারাধ্যায়ের দিব্যপ্রকরণের ৯৫ শ্লোঃ ও ১০০—১০২ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

† 'অনালম্বিত চুম্বক'- তাঁহার তুলাদণ্ডে "চুম্বক" সর্ব্বদাই আলম্বিত থাকিত। "চুম্বক" শব্দটির প্রয়োগ বড়ই বিরল। তুলাদণ্ডের উপরিস্থ আলম্বনকে "চুম্বক" বলে। চুম্বকের অন্যান্য অর্থ বলিয়া, 'মেদিনীকোষ'কার ইহার অন্যতম অর্থ "ঘটশ্চোদ্ধাবলম্বনে"—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি'র প্রসিদ্ধ টীকাকার অপরার্ক, ব্যবহারাধ্যায়ের [২য় অঃ] ১০০—১০২ শ্লোকত্রয়ের ব্যাখ্যায়, 'ব্যাস স্মৃতি' হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি শ্লোকে চুম্বকশব্দের প্রস্তুতার্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যথা- "মৃন্ময়ৌ সূত্রসম্বদ্ধৌ ধটমস্তক-চুম্বকৌ। শিক্যদ্বয়ং সমাসজ্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপি" ॥

‡ 'তুলাপুরুষদাতুঃ'—ষোড়শ-মহাদানের অন্যতমের নাম,—তুলাপুরুষদান; এই দান-সময়ে, দাতা, নিজ দেহ-ভার তুলিত করিয়া, সমপরিমিত সুবর্ণাদি মহামূল্যবানবস্তু ব্রাহ্মণকে দান করেন। "আদ্যন্ত সর্ব্বদানানাং তুলাপুরুষ-সংজ্ঞিতম্। হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং তদনন্তরম্ ॥-ইত্যাদি"—মৎস্যপুরাণোক্ত বচনাবলী দ্রষ্টব্য।

আর্য্যবিশিষ্ট শাসন-ভূমি কোনপ্রকারেই গ্রহণ করেন নাই।

(২৩)

যথাবিধি দেবনদী [গঙ্গাতে] নিজ প্রাণপরিত্যাগ করিতে পারিলে, প্রেতলোক প্রাপ্ত পিতামাতার পক্ষে স্বপুত্র-কৃত উপকারের [ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদির] * অপেক্ষা থাকে না, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু তিনি [প্রহাস] আত্মঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, পিতামাতার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক [আমুষ্মিক] কার্য্য-সম্পাদন করিয়াছিলেন।

(২৪)

এই গ্রামে দুইটি ভগ্ন দেবমন্দির পুনরুদ্ধার নূতন করাইয়া [জীর্ণ-সংস্কার সাধিত করাইয়া] § তিনি পিতার উদ্দেশ্যে ত্রিবিক্রম বিগ্রহ ¶ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং মাতার উদ্দেশ্যে এই [নিকটবর্ত্তী] পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

(২৫)

সতত উচিত বৃত্তি সেই [ব্রাহ্মণ] অগ্নসল করাইয়া, এই রুচির শিখর সর্ব্বাঙ্গ সম্বলিত, উত্তুঙ্গ শুভালয়ে * যথাবিধি বরেণ্য অমরনাথকে স্থাপিত করিয়া, বাস্তুদেবেরই একমাত্র শরণাগত হইয়াছিলেন।

(২৬)

তিনি এই দেবতার জন্য শ্মশানে একটি উত্তম উদ্যান এবং [দেবতার পূজাদি সিদ্ধির জন্য শিবীসুপুঞ্জ নামক স্থানে সপ্তদ্রোণ-পরিমিত ভূমিও প্রদান করিয়াছিলেন।

(২৭)

অনন্তর, পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে পর, কৃতার্থ এই ব্রাহ্মণ গৃহকার্য্যে পুত্রগণকে অবস্থাপিত করিয়া, জগৎকে স্বপ্নসম বিবেচনা করিয়া, আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গাতটে বাস করিতে লাগিলেন।

(২৮)

কাব্যগুণ যদি কবিকে অন্বেষণ করে, তাহা হইলেই কবি চিরকাল শোভমান থাকেন ; [কিন্তু কবি নিজমুখে কাব্যকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কাব্যের গুণসকল অচিরেই ["একপদে"] নাশপ্রাপ্ত হয়।

(২৯)

কামী ব্যক্তি যেমন তন্মনা হইয়া বর্ণসংযোগে § ভক্তি [লেখাদি] রচনাদ্বারা নিজ প্রিয়াকে চিত্রিত ¶ করিয়া দেন, সেইরূপ মগধদেশবাসী শিল্পবিৎ সোমেশ্বরও তন্মনা হইয়া অক্ষর-বিভাগ করিয়া, এই প্রশস্তি লিখিয়া দিয়াছেন।

---

* এস্থলে পুত্র সম্পাদিত পারত্রিক কার্য্যদ্বারা পিতামাতার উপকার সাধিত হয় তাহাই সূচিত হইয়াছে। এখানে একটি শাস্ত্রীয় আলোচনার অবতারণা হইতে পারে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গঙ্গায় তনু ত্যাগ করিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রহাসের জনক জননী গঙ্গার বিবুধ-সিন্ধুতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মুক্তপুরুষের জন্য পুত্রের পারত্রিক কার্য্যের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু প্রহাস, তাহা জানিয়াও যে তাঁহাদের জন্য দেবতাপ্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহার কারণ রূপে এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তিনি নিজের পিতৃমাতৃ ঋণ পরিশোধ করিবার ইচ্ছায় এইসকল কার্য্য করাইয়াছিলেন।

§ সে যুগে প্রথম মহীপালের ন্যায় নরপাল সম্পূর্ণ নূতন মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াও, পুরাতনের জীর্ণ-সংস্কারে হতাদর হইলেন না। প্রহাস সেই যুগেরই [একাদশ শতাব্দীর] লোক ছিলেন। এই বিষয়ে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড়লেখমালার" ১০৫-১০৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। নূতন প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা জীর্ণোদ্ধারের ফল অধিক, বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, যথা

(১) "মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াজ্জীর্ণকারকঃ"।

ইতি দেবীপুরাণে।

(২) "পুনঃ-সংস্কার কর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্।"

ইতি বৃহস্পতি-স্মৃতেঃ।

(৩) "বাপীকূপ তড়াগানাং সুরধাম্নাং তথানঘ।
প্রতিমানাং সভানাঞ্চ সংস্কর্ত্তা যো নরো ভুবি।
পুণ্যং শতগুণং তস্য ভবেন্মূলান্ন সংশয়ঃ॥"

ইতি হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে।

(৪) "লেপনগ্লাদনং চৈব যঃ করোতি পুনর্নবম্।
দেবস্যায়তনং কৃত্বা ন ভবেৎ কোটিজং ভয়ম্।

ইতি শ্রীহরিভক্তি বিলাসে।

¶ 'ত্রিবিক্রম'—বিষ্ণুপর্য্যায়েরই বিগ্রহ-বিশেষ। অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণের মতে ত্রিবিক্রমের আয়ুধাদি-বিন্যাস দক্ষিণাধঃ কর-ক্রমানুসারে এইরূপ ; যথা—পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ। কিন্তু হেমাদ্রিকৃত রচনানুসারে তাহা এইরূপ ; যথা—পদ্ম, কৌমুদকী (গদা), শঙ্খ ও চক্র। —"বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়" সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী (সংখ্যা ৩১) দ্রষ্টব্য।

* নিজপুণ্যোপচয়ের নিমিত্ত প্রহাস এই ["অস্মিন্"] শুভালয়ে অমরনাথ-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে মন্দির গাত্রে আলোচ্য প্রশস্তি-পাষাণ গ্রথিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা এই মন্দিরই হইয়া থাকিবে। শুভালয়কে "সাঙ্গ" বলাতে মনে হয় যে, ইহা গোপুরাদি সর্ব্বাঙ্গ সমন্বিত ছিল। ইহার একাংশে পিতার উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া থাকিবেন। মাতার উদ্দেশ্যে খনিত পুষ্করিণীও "ইমাম্" বলিয়া (২৪ শ্লোকে) বিশেষিত হওয়ায়, এই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ছিল, বলিয়াই মনে হয়।

§ 'বর্ণভক্তিভিঃ'—কামিপক্ষে ইহার অর্থ রক্তপীতাদি বর্ণদ্বারা রচিত [ভক্তি] পত্রাদি চিত্র। 'ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য'—'মেঘদূতে'র এই প্রয়োগ স্মরণীয়। শিল্পিপক্ষে—ইহার অর্থ অক্ষর-বিভাগ। "বর্ণো দ্বিপাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ বর্ণং তু চাক্ষরে।"

—ইত্যমরঃ।

¶ 'অলিখৎ'—এই স্থানে "লিখ" ধাতু, চিত্রীকরণ ও অক্ষর-বিন্যাস, এই দুই অর্থে শ্লিষ্ট।

ইটালি

[শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, এম. এ.]

সংবাদপত্র পড়িতে বসিয়া জনৈক ইটালীয় লেফ্‌টেনণ্টের একখানি চিঠি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের সঙ্ক গরুড়ের লড়াই; মহাকাবোর রৌদ্ররস এই সমরকে ভীষণোজ্জ্বল করিয়াছে। ছয় সহস্র ফুট উচ্চে আমরা যুঝিতেছি; মহান্ আল্পস্ পর্ব্বতমালা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র। উপত্যকা হইতে উপত্যকায়, গিরিশৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে, বায়ুতে, আকাশে, সমরনির্ঘোষ ধ্বনিত হইতেছে, প্রকম্পিত শৈলমালা যেন বেদনায় গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। ডান্টে কিম্বা সেক্ষপীয়র ভিন্ন কে এই বিরাট্ দৃশ্যের ভীমকান্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে? . . তুমি শুনিলে সুখী হইবে যে সমগ্র নেশনমণ্ডলীর এই বিপুল দ্বৈরথ যুদ্ধে ইটালি তাহার ইতিহাসের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া কার্য্য করিতেছে। গ্যারিবল্ডি—বীরশ্রেষ্ঠ দেবোপম গ্যারিবল্ডি, নক্ষত্রখচিত নিশাথে, অত্যুজ্জ্বল আভায় ও অনুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ তুঙ্গশৃঙ্গোপরি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েন। তাহার দেহযষ্টি সরল, চক্ষুদ্বয় প্রোজ্জ্বল, বাহুদ্বয় প্রসারিত। গম্ভীর অদৃষ্ট-দেবতার মত যেন তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন—পর প্রপীড়িত ইটালীর ভগ্নাংশের দিকে, যেখানে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুগাথা অগ্নির অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে। তিনি আমাদিগকে বর ও অভয় দিতেছেন। যেন তিনি বলিতেছেন—'অগ্রসর হও, ইটালি আমার, অগ্রসর হও; 'নেশন'শ্রেষ্ঠ তুমি, মানবেতিহাসের বিপুলনাট্যে বঞ্চিত নেশনগুলির সাধারণ অধিকার সমর্থন করিয়া, তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তুমি অবতীর্ণ হইবে; তোমাদের ডান্টে ও ম্যাট্‌সিনি ত এই ভবিষ্যদ্বানীই বহু পূর্ব্বে শুনাইয়া গিয়াছেন।'"

* * *

এই চিঠিখানি পড়িয়া ইটালির গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের কথা মনে পড়িয়া গেল। যে পর-প্রপীড়িত ইটালীর ভগ্নাংশের প্রতি গ্যারিবল্ডির প্রেতাত্মা তর্জ্জনী প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার দুঃখের কথা মনে পড়িয়া গেল। আর্য্যাবর্ত্তে তখন সবে মাত্র দুরন্ত সিপাহীবিদ্রোহ বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কোম্পানীর হাত হইতে তখনও ভারতবর্ষের শাসনভার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে ন্যস্ত হয় নাই। ইংরাজ দেখিল, যে ইটালিকে অষ্ট্রিয়ার মেটার্ণিক্ অবজ্ঞাভরে একদিন কেবল মাত্র 'একটা ভৌগোলিক নাম' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল, আজ সে রাষ্ট্রীয় একীকরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির, স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া একমাত্র অবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ছত্রতলে সকলকে সমবেত করিয়া রোমের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইংরাজ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত, সহসা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলীয়ন, তাহাদের সুখের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঠিক যে পরার্থ প্রণোদিত হইয়া তিনি এই নূতন কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাহা নহে; যদি এইসুযোগে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত আরও একটু পূর্ব্বদিকে সরাইয়া লওয়া যায়, তাহাতে নব-জাগ্রত ইটালীর বিশেষ কোনও আপত্তি না থাকিতেও পারে; সে ত বহুশত বর্ষের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে চায়, নেপোলীয়ন তাহাকে সেই মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন—অবশ্যই তিনি যাহা চাইবেন, তাহা পাইবেন। তিনি বলিলেন—আমি পীড্‌মণ্টের রাজাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; অষ্ট্রীয়াকে ইটালি হইতে বিতাড়িত করিয়া দিব; আমি কিন্তু চাই—নীস্ (Nice) ও স্যাভয় (Savoy)। পীড্‌মণ্টের রাজমন্ত্রী কাভুর (Cavour), একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সম্মত হইলেন। পীডমণ্টের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের বংশের পরিচয় ও গৌরব যে Savoy লইয়া, সেই স্যাভয় দেশটীকে ফরাসী আত্মসাৎ করিতে চায়! যে Nice গ্যারিবল্ডির জন্মস্থান, সেটি পরহস্তগত হইবে! তখন, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন না দিলে, বৃহদনুষ্ঠানে সাফল্য-লাভ করা যাইবে

না ; ফ্রান্স সহায় না হইলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। অগত্যা কাভুর সম্মত হইলেন।

প্রথম প্রথম কিন্তু ক্যাভুর ভাবিতে পারেন নাই যে, পীডমণ্টের রাজা সমগ্র ইটালির একেশ্বর হইতে পারিবেন। অষ্ট্রিয়াকে আপাততঃ আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ের পরপারে দূর করিয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে ; লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়াকে বিদেশীয়ের হাত হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, প্রথম পর্ব্ব ত সমাপ্ত হইবে ; তাহার পরে, আর কিছু করা যায় কি না, সে কথা পরে দেখা যাইবে। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মার্শাল্ র‍্যাডেট্স্কির অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া চলিল ; জনসাধারণকে প্রতিশ্রুত রাষ্ট্র অধিকার দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগকে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করা তাহার যেন নিত্যপ্রথা দাঁড়াইয়া গেল। ম্যাট্‌সিনির বিশ্বাস ছিল যে—কয়েকজন বিদ্রোহী সমস্ত লোকদিগকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইবে। সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ জোসেফ যখন মিলানে আসিবেন স্থির হইল, ম্যাট্‌সিনির বিদ্রোহীদল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সরাইয়া ফেলিবে, এ রকম আয়োজনও ভিতরে ভিতরে হইয়াছিল। নানাকারণে তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তবুও ম্যাট্‌সিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই যে—এরূপ বলপ্রয়োগে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ক্যাভুরের সহিত ম্যাট্‌সিনির এই বিষয়ে বিষম মতদ্বৈধ প্রকাশ পাইল। কিন্তু ঘটনাচক্রে র‍্যাডেট্স্কির সহিত ক্যাভুরের মনোমালিন্য জন্মিল ; তিনি পীডমণ্টের রাজ-প্রতিনিধিকে ভিয়েনা হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। ইংরাজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহার এই তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া খুসী হইয়াছিলেন। ... ... এমন সময়ে ক্রিমীয় যুদ্ধ আরব্ধ হইল ; পীডমণ্টের সৈন্য, ইংরাজ ও ফরাসীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, যুদ্ধ করিবার অবসর পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মানিল। ১৮৫৬ সালে যখন প্যারিসে সন্ধি হইয়া গেল, সার্ডিনিয়ার প্রতিভূস্বরূপ দাঁড়াইয়া কাভুর ইটালীর দুঃখের কথা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে জানাইয়া রাখিলেন। এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। এদিকে পার্ম্মা, মডেনা, নেপল্‌স ও পোপের অধিকারভুক্ত রাষ্ট্রে উৎপীড়ন চলিতে লাগিল ; ম্যাট্‌সিনির কথায় আর জনসাধারণ বড় একটা রক্তপাত করিতে সাহস করে না। ক্যাভুর ভাবিলেন - যদি ইংলণ্ডের সাহায্য পাওয়া যাইত। য়ুরোপে যদি কেহ

গ্যারিবাল্ডি
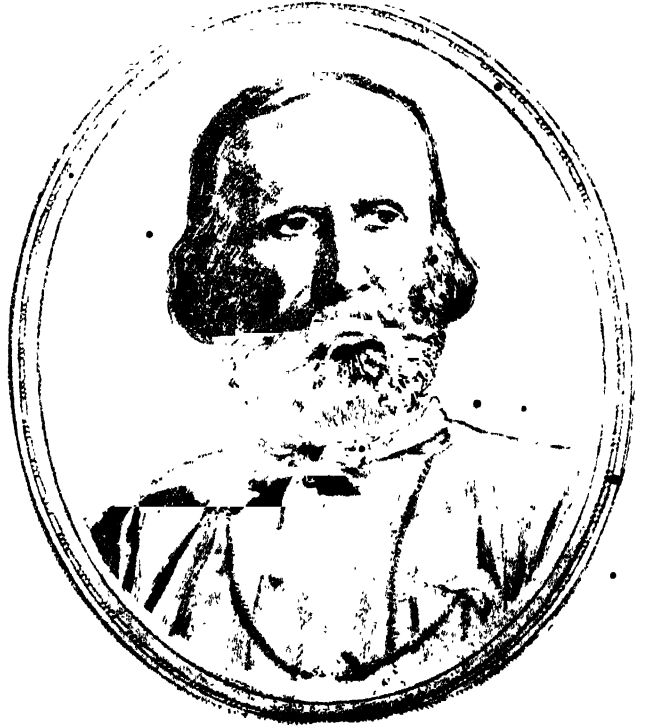
নিঃস্বার্থভাবে ইটালির সাহায্য করিতে পারিতেন, সে ইংরাজ, ফরাসী নহে। কিন্তু ইংরাজ তখন অন্য বিষয় লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ; সুতরাং ফরাসীর সহিত সর্ত্ত করিতে হইল। সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলীয়ন খুসী হইলেন। ... ... কিন্তু সমস্ত পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ম্যাট্‌সিনির দলভুক্ত অর্সিনি নামক এক ব্যক্তি নেপোলিয়নের উপর বোমা নিক্ষেপ করিল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল বটে ; কিন্তু সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইলেন। অনেক কষ্টে ক্যাভুর, তাঁহাকে Nice ও Savoy-এর প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহার মিত্রতা লাভ করিতে পারিলেন। কথা এক রকম পাকা হইয়া গেল ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে।

*　　*　　*

কিন্তু নেপোলিয়ন কি মনে করিলেন, বলা যায় না; সহসা ভিক্টর ইম্যানিউয়েলকে বলিয়া পাঠাইলেন—ইটালির রাষ্ট্রীয় সমস্যাসম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার করিবার জন্য একটা কংগ্রেস্ আহূত হইবে; সেই সভায় পীড্‌মণ্টের বক্তব্য শুনিয়া কিংকর্তব্য স্থির করা হইবে। ক্যাভুর বিস্মিত হইলেন; কি করা উচিত, তাহা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে অষ্ট্রীয়া বলিয়াছে—'আমি কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে সম্মত আছি—যদি পীড্‌মণ্ট্ উপস্থিত না হয়, আরও একটি কথা—পীড্‌মণ্ট্ সমরসজ্জা পরিত্যাগ করুক।' তিনি এ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কংগ্রেস হইল না। ভিয়েনা গভর্মেণ্ট, টিউরিণ গভর্মেণ্টকে Ultimatum দিলেন—'তিন দিনের মধ্যে

ড্যান্টে

তুমি disarm কর, নিরস্ত্র হও, সমর-সাজ ত্যাগ কর।'... ক্যাভুরের আনন্দের সীমা রহিল না। অষ্ট্রিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল; সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিল। একদল ভলণ্টীয়র-সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্ডি সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাজেণ্টায় ও সল্‌ফারিণোয় অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইল।

*　　*　　*

সহসা নেপোলিয়ন যুদ্ধে বিরত হইলেন। তাঁহার এই চিত্তবিকার কেন উপস্থিত হইল, আজও সে রহস্য সম্যক্ উদ্ঘাটিত হয় নাই!—তিনি কি ফ্রান্সের বলক্ষয় করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই? অথবা বিজয়ী পীড্‌মণ্ট্ পাছে ইটালিতে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন! ইটালির আসন্ন রাষ্ট্রীয় একীকরণ, তাঁহার বোধ হয়, একেবারেই অপছন্দ ছিল। গত্যন্তর নাই দেখিয়া, ক্যাভুর সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। লম্বার্ডি, পীড্‌মণ্ট্-রাষ্ট্রভুক্ত হইল; ভেনিসিয়া-অষ্ট্রিয়ার দখলে রহিয়া গেল। ক্যাভুর, ভিক্টর ইম্যানুয়েল, গ্যারিবল্ডি, সকলেই ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তর নাই।—১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াইল।

দক্ষিণে ফ্লরেন্সবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া, তাহাদের ডিউকপরিবারকে বহিষ্কৃত করিয়া, ভিক্টর ইম্যানিউয়েলের শরণাপন্ন হইল। মডেনার ডিউক অষ্ট্রীয়ার দলে চলিয়া যাওয়ায়, সেখানকার জনসাধারণ মডেনাকে পীড্‌মণ্টের রাষ্ট্রভুক্ত বলিয়া প্রচার করিল; পার্মাও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। বলোনিয়া ও রোমানিয়া (Romagna) তাহাদের সহিত যোগ দিল।...... এসকল ঘটনা নেপোলিয়নের আদৌ ভাল লাগে নাই। তিনি বলিলেন, —'Nice ও Savoy দাও, মধ্য ইটালির রাষ্ট্রগুলি লও।' ক্যাভুর বিষম সমস্যায় পড়িলেন। নেপোলিয়নের কর্তব্য পালিত হইল কই? ইটালি হইতে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত হইল না; তবুও তিনি নাস্ ও স্তাভয় চাহিতেছেন! কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই।—১৮৬০ সালে টিউরিণের পার্লামেণ্ট্ উক্ত প্রদেশদ্বয় হস্তান্তরিত করিতে সম্মত হইল।

*　　*　　*　　*

এদিকে, আরও দক্ষিণে, নেপ্‌ল্‌স্‌রাজ্যের শেষরাজা ফ্রান্সিস্, এত দেখিয়া শুনিয়াও, কিছু নূতন শিক্ষালাভ করিল না। বোনাপার্ট্ একদিন বলিয়াছিলেন—'বুর্ব্বোঁ বংশ কিছু ভুলিয়াও যায় না, কিছু শিক্ষাও করে না।' নেপ্‌ল্‌স্-এর ফ্রান্সিস্‌ও কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। ম্যাট্‌সিনির শিষ্যবর্গের সুবিধা হইল; তাহারা সিসিলিতে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। গ্যারিবল্ডি, একসহস্র ভলণ্টীয়র-সৈন্য লইয়া, জেনোয়া হইতে সিসিলি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্যাভুর ভাবিলেন—সব বুঝি মাটি হইল; এই সূত্রে যখন নেপোলিয়ন আবার ইটালির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া বসিবে; তখন উপায়?—ওদিকে গ্যারিবল্ডি, বিজয়ী বীরের মত, সিসিলির রাজধানী প্যালার্মোতে প্রবেশ করিয়া, রাজা ভিক্টর ইম্যানিউয়েলের নাম লইয়া, নিজেকে সিসিলির

Dictator বলিয়া প্রচার করিলেন।.....ক্যাভূরের ভয় হইল—পাছে গ্যারিবল্ডি,সিসিলিকে করায়ত্ত করিয়া, নেপ্‌ল্‌স্ অভিমুখে অভিযান করেন! নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই তাহা সহ্য করিবেন না। তখন সিসিলিও হস্তচ্যুত হইবে।... তিনি গ্যারিবল্ডিকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। সিসিলি পীড্‌মণ্টের সহিত সংযুক্ত হউক, আর কিছু করিয়া কাজ নাই। গ্যারিবল্ডি সেকথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি নেপ্‌ল্‌স্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন; ফ্রান্সিস রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া

ম্যাট্‌সিনি
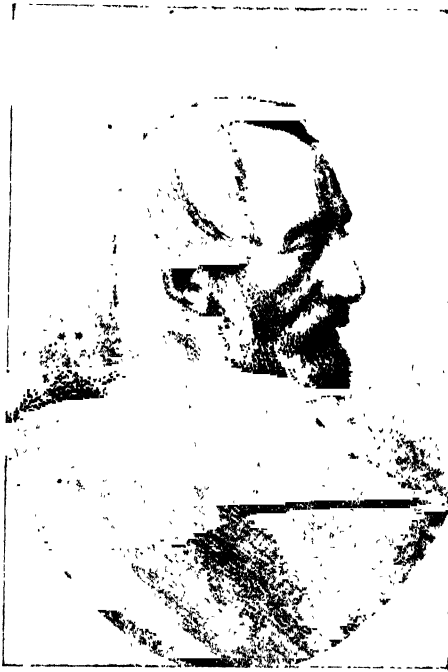
পলায়ন করিলেন। গ্যারিবল্ডি নেপ্‌ল্‌স্ এ প্রবেশ করিয়া নিজেকে সেখানকার Dictator বলিয়া জাহির করিলেন। ......ক্যাভূর দেখিলেন—সিসিলির পর নেপ্‌ল্‌স্, তাহার পরে রোম না কি? গ্যারিবল্ডিকে বারণ করিলে কোনও ফল হইবে না; সবদিক বজায় করিতে হইলে পীড্‌মণ্ট্‌কে খোলাখুলিভাবে এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যদি রাগ করিয়া গ্যারিবল্ডি নেপল্‌স্ ও সিসিলিকে গণতন্ত্র (republic) করিয়া ফেলে? রাজাকে ক্যাভূর বলিলেন—'গ্যারিবল্ডি ক্যাট্টলিকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে ভল্টার্নো নদীর পারে উপস্থিত হইতে হইবে, নহিলে ইটালি যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে।'..... ফলে দাঁড়াইল এই যে, গ্যারিবল্ডি ও ভিক্টর ইম্যানিউয়েল একত্র নেপ্‌ল্‌স্ এর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজার হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, গ্যারিবল্ডি নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে সংযুক্ত ইটালিরাজ্যকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্বীকার করিয়া লইল।—ভেনিস ও রোম কিন্তু ইহার বাহিরে রহিল। কয়েক মাস পরে ক্যাভূরের মৃত্যু হইল।

*　　*　　*　　*

গ্যারিবল্ডি ভাবিলেন—'এইবার রোম হস্তগত করিতে হইবে।' আবার সিসিলীয় ভলণ্টীয়র সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি ইটালিতে পদার্পণ করিলেন। রাজা কিন্তু, সৈন্য পাঠাইয়া, তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিলেন। ভিক্টর ইম্যানিউয়েল্ দেখিলেন যে রোম না-পাইলে ইটালিতে শান্তির সম্ভাবনা নাই। তিনি নেপোলিয়নের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন রোমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ফরাসি সৈন্য উক্ত নগরের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া আনিতে ইতস্ততঃ করিলেন। লোকে যদি বলে যে তিনি পোপের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন! অবশেষে স্থির হইল যে, ফরাসি সৈন্য রোম ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিবে বটে, কিন্তু ভিক্টরের সৈন্য তথায় পদার্পণ করিতে পারিবে না; পরন্তু ছয়মাসের মধ্যে ভিক্টর যেন টিউরিণ হইতে অন্যত্র তাঁহার রাজধানী সরাইয়া লইয়া যান। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গেল। একবার রাজধানী সরাইয়া লইয়া গেলে, আবার সহসা রোম নগরীকে ভিক্টর ইটালির রাজধানী বলিয়া জাহির করিতে পারিবে না। ১৮৬৫ সালে ফ্লরেন্স নগরী টিউরিণের স্থান অধিকার করিল। টিউরিণ অধিবাসিগণের আক্ষেপের সীমা রহিল না—রোম হইলে আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু......ফ্লরেন্স!

*　　*　　*　　*

এখনও যে ভেনিস্ অষ্ট্রিয়ার হাতে রহিল; শত ক্ষুদ্র চেষ্টাতেও যে তথায় অষ্ট্রিয়ার প্রতাপ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল; তাহা হইলে, সমগ্র ইটালির একেশ্বরত্ব হইল কোথায়? নেপোলিয়নেরও ইচ্ছা যে ভেনিস হইতে অষ্ট্রিয়া বহিষ্কৃত হউক; কিন্তু তজ্জন্য আবার অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

ভিক্টর ইমানিউয়েল তাঁহাকে এবার খোসামোদ করিতেও নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন না—কি জানি এবারেও যদি নেপোলিয়ন আরও কিছু জমি চাহিয়া বসেন! প্রুসিয়া সবেমাত্র ডেনমার্কের নিকট হইতে শ্লেজ্‌বিক হোলষ্টাইন কাড়িয়া লইয়া, উত্তরে তাহার রাষ্ট্রীয় সীমারেখা আরও সরাইয়া লইয়া গিয়া, দক্ষিণে অষ্ট্রিয়াকে টিউটন্‌ জাতির মধ্যে অপদস্থ করিয়া, তাহার স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং, ইটালির সুবিধা হইয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সন্ধিপ্রস্তাবে প্রুসিয়া সম্মত হইল। নেপোলিয়নও ভাবিলেন মন্দ কি। পরের দ্বারা যদি কার্য্যসমাধা হয়, তাহাতে তাঁহার আপত্তি থাকিবে কেন? কিন্তু একেবারে নির্লিপ্ত থাকিলে চলিবে না। তিনি গোপনে প্রুসিয়ার সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, ভেনিস হইতে অষ্ট্রিয়া তাড়িত হইলে, প্রুসিয়া যেন ভেনিসিয়াকে নেপোলিয়নের হস্তে অর্পণ করে; তিনি পরে বুঝিয়া সুঝিয়া ভিক্টর ইমানিউয়েলকে উহা দিবেন। গোপন সন্ধির কথা ভিক্টর ইমানিউয়েল কিন্তু বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

নীসের দৃশ্য

* * * *

১৮৬৬ খৃঃঅব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কাষ্টোজা-ক্ষেত্রে ইটালীয় সৈন্য পরাজিত হইল। সমুদ্রবক্ষে লিস্‌সার যুদ্ধেও ইটালির নৌবাহিনী হটিয়া গেল। সেই বিষম দুর্দ্দিনে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, দেশের সমগ্রশক্তি ভেনিসের উদ্ধারকল্পে নিয়োজিত করিতে না পারিলে কার্য্যসম্পন্ন হইবে না; এমন সময়ে সহসা যুদ্ধ স্থগিত হইয়া গেল। কোয়নিগ্‌গ্রেয়াট্‌জ ক্ষেত্রে প্রুসিয়া জয়লাভ করিয়া, ইটালির সহিত পরামর্শ না করিয়াই, অষ্ট্রিয়ার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, দিনকতকের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিল। কয়েকদিনের মধ্যে সন্ধি হইয়া গেল। ভেনিসিয়া ফরাসির হস্তে অর্পিত হইল। ফরাসি রাজপ্রতিনিধি ভেনিস বাসিগণের করে তাহাদের দেশ ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা সমবেত হইয়া, ভোট দিয়া, স্বেচ্ছায় ইটালিরাজ্যভুক্ত হইল। ভিক্টর ইমানিউয়েলের সাধন সিদ্ধ হইল। হায়, ক্যাভুর যদি এখন জীবিত থাকিতেন।

* * * *

কিন্তু রোম যে এখনও বাহিরে রহিল। বন্দী গ্যারিবল্ডি ক্যাপ্রেরা হইতে পলায়ন করিলেন। এক গুলি সশস্ত্র দলের সর্দ্দার হইয়া রোমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন; পরাজিত হইয়া সরিয়া পড়িলেন। মহাগোল বাধিয়া গেল। ম্যাট্‌সিনি বিরক্ত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে রোমের পোপ খৃষ্টীয় সঙ্ঘের এক বিরাট সঙ্গীতি আহ্বান করিলেন। এখন পর্য্যন্ত এইটিই রোমান ক্যাথলিক চর্চ্চের শেষ সঙ্গীত। ঠিক দুইদিন পূর্ব্বে নেপোলিয়ন প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। রোম হইতে ফরাসি সৈন্য ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; A 1. Berlin শব্দে দিঙ্মণ্ডল-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইত অবসর ভিক্টর ইমানিউয়েল বিনীতভাবে পোপকে রোমসম্বন্ধে আলাপ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কোনও ফল হইল না। এমন সময়ে সেডান্‌ ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন ধরা পড়ার সংবাদ ফ্লরেন্সে পৌঁছিল। কালবিলম্ব না করিয়া রাজার সৈন্য রোমের দিকে অগ্রসর হইল। রোম তাঁহার হস্তগত হইল। ভেনিসের মত, রোমের অধিবাসিরা স্বেচ্ছায় ভোট দিয়া, রোমকে ইটালি-রাষ্ট্রভুক্ত করিয়া দিল—১৮৭২ সালে রোম নগরী সমগ্র ইটালির রাজধানী হইল।

* * * *

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রিস্পি, রাজার ক্যাবিনেটে প্রবেশ লাভ করিলেন। একসময়ে তিনি, ম্যাট্‌সিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, রাজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রাজা না থাকিলে ইটালির রাষ্ট্রীয় স্বপ্ন বিষম অনর্থ ঘটাইবে। তখন তিনি, ম্যাট্‌সিনিকে ছাড়িয়া, গ্যারিবল্ডিকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথমাংশটা এমনি করিয়া আঁকা বাঁকা পথে চলিয়া, শেষটা নিজের

কাউণ্ট ক্যাভর

গন্তব্য ও কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাঁহার মত প্রতিভাসম্পন্ন রাজভক্ত পুরুষের আবশ্যকতা অতি শীঘ্রই বুঝা গেল। ১৮৮১ খৃঃঅব্দে আল্‌জীরিয়ার সীমান্তে একদল লোক একটা ফরাসি পল্টনকে আক্রমণ করে। ফরাসি গভর্মেণ্ট টিউনিসের শাসনকর্ত্তাকে বলিল যে, ফ্রান্স্‌ আততায়ীদিগকে শাস্তি দিবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে টিউনিস য়ুরোপের রাজন্যবর্গের নিকটে আবেদন করিল বটে; কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ফ্রান্স্‌ বিসার্টা দখল করিয়া বসিল। টিউনিস্‌ ফ্রান্সের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। .. ..এই ব্যাপারে সমগ্রইটালি ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইটালির অধিবাসীব্যতীত আর কেহ যে সিসিলির এত সন্নিকটে নিজ প্রভাববিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে, এমন চিন্তা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। বিশেষতঃ, টিউনিসিয়াতে বহুসংখ্যক ইটালীয় নরনারী কাজকর্ম্ম করিতেছিল; তাহাদের মনে এই আশা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছিল যে—একদিন টিউনিসিয়া, ইটালির উপনিবেশে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ইটালি এ সময়ে কিছুই করিতে পারিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের নেতৃগণ এখন ইটালিকে জর্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়ার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ক্রিস্পি ও সিডনি সন্নিনো বিশেষভাবে এই দিকে ঝুঁকিলেন। আরও একটু কথা ছিল।—পোপকে ছলে বলে কৌশলে নবীন ইটালির রাষ্ট্রতন্ত্রে সম্মত করিয়া রাখা হইয়াছিল। যদি কোনও সূত্রে তিনি, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মানির সাহায্য লইয়া, আবার নিজের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। মহিষী সমভিব্যাহারে রাজা হাম্বার্ট—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, ১৮৭৮ সালে রাজা ইমানিউয়েলের মৃত্যু হইয়াছিল।—ভিয়েনা নগরীতে উপস্থিত হইলেন।—অষ্ট্রিয়া, ইটালী ও জর্ম্মানিতে আনন্দের সীমা রহিল না।

১৮৮২ খৃঃ অব্দের মে মাসে মধ্য য়ুরোপের শক্তিত্রয়ের মৈত্রী কাগজে কলমে পাকাপাকি হইয়া গেল। দিনকয়েকের মধ্যেই গ্যারিবল্ডি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইটালির ইতিহাসে তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া আছে। আজ এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে, যেন তাঁহার প্রেতাত্মা আল্পস এর তুঙ্গশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বদেশবৈরীকে নিপাত করিবার জন্য গভীর নির্ঘোষে লক্ষ লক্ষ ইটালির সৈনিকগণকে আহ্বান করিতেছেন! ঘটনাচক্রে আজ ইটালির পরমবৈরী—অষ্ট্রীয়া, আর, অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন—ব্যারণ সিড্‌নি সন্নিনো। ১৯১৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইটালি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

* * * * *

জর্ম্মানির চ্যান্সেলর ডাক্তার ফন্‌ বেটম্যান, হলবেগ্‌ বলিলেন—'অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি কিম্বা জর্ম্মানি, কেহই ইটালিকে ভয় দেখায় নাই। একবিন্দু রক্তপাত না করিয়াও, একজন ইটালীয়ানের জীবন বিপন্ন না করিয়াও,' ইটালি তাহার অভীপ্সিত দ্রব্য পাইত, টাইরল প্রদেশে এবং ইজঞ্জো

নদীতীরে—যতদূরপর্য্যন্ত ইটালীয় ভাষা কথিত হয়—সর্ব্বত্রই ইটালীয় জাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হইত; ট্রীষ্ট্‌-প্রদেশে ইটালীয় জাতির 'নেশন'ত্ব বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত; আল্‌বানিয়াতে ইটালি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পাইত; ভ্যালোনা বন্দর সম্বন্ধেও কেহ কোন কথা কহিত না।—কেন তবে ইটালি আমাদের পরামর্শ লইল না?' তদুত্তরে ইটালির পররাষ্ট্র সচিব ব্যারণ সন্নিনো বলিলেন—'ইটালীয় জাতীয়তা-সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়া বরাবর একটা কূটনীতি পালন করিয়া আসিতেছে—আড্রিয়াটিক্‌ সাগরের তীরে, যেমন করিয়াই হউক,ইটালীয় জাতির নেশন'ত্ব ও জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই ক্রমে-ক্রমে ইটালীয় কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে ভিন্নজাতীয় লোক নিযুক্ত করা হইতেছে; নানাপ্রকার লোভ দেখাইয়া ভিন্নভিন্ন জাতির শতশত গৃহস্থকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিবার সুবিধা করাইয়া দেওয়া হইতেছে; ট্রীষ্টের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে; নূতন ইটালীয় স্কুল-স্থাপনে যৎপরোনাস্তি বাধা দেওয়া হইতেছে; ধর্ম্মাধিকরণে, বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ইটালীয় জাতিকে মাথা তুলিতে দেওয়া হইতেছে না। মাঝে মাঝে diplomatic কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। কিন্তু এবার, এই বল্‌কান্‌ ব্যাপারে, অষ্ট্রীয়া, সন্ধির সত্তমতে, আমাদিগকে আগে কিছু জানায় নাই, অথচ Article VII অনুযায়ী আমাদিগকে জানান একান্ত আবশ্যক ছিল। শেষপর্য্যন্ত আমরা Italia Irredenta (অষ্ট্রীয়াধীন-ইটালি সম্বন্ধে পাকা-কথা পাইলাম না; তাই, তেত্রিশ বৎসর পরে, ৪ঠা মে তারিখে মধ্য-য়ুরোপের শক্তিত্রয় মৈত্রী denounce করিতে হইল।'

* * * *

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে,যে দিন বিজয়ী গ্যারিবল্ডিকে ট্রেন্টিনো গিরিসঙ্কট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য প্রধান সেনাপতি দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"অগ্রসর হইও না; সন্ধি করিবার ব্যবস্থা হইতেছে"—সেইদিন হইতে এই ইটালীয় Irredentism-এর আরম্ভ। গ্যারিবল্ডি বুঝিতে পারিলেন, ভেনিস পাওয়া যাইবে; কিন্তু ট্রীষ্ট্‌-ট্রেন্ট্‌-ডাল্‌মেশিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই, আজ, আল্পসের গিরিসঙ্কটে ইটালীয় সৈনিক পুরুষের সম্মুখে তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা Italia mia'র দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে;—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় প্রোজ্জ্বল, বাহুদ্বয় প্রসারিত; অধিত্যকায়-উপত্যকায়, আকাশে-গিরিকন্দরে, স্তব্ধ নক্ষত্রালোকে, তাঁহার Italia mia যেন করুণ সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

* * * *

পালামেন্টে ক্রিস্পি যখন বুঝিতে পারিলেন যে—ট্রেন্টিনো পাওয়া যাইবে না; বিস্মার্ক যখন তাঁহাকে বলিলেন—'কি করিব? নেপোলিয়ন ও ফ্রান্স যোসেফ, দুই সম্রাটে
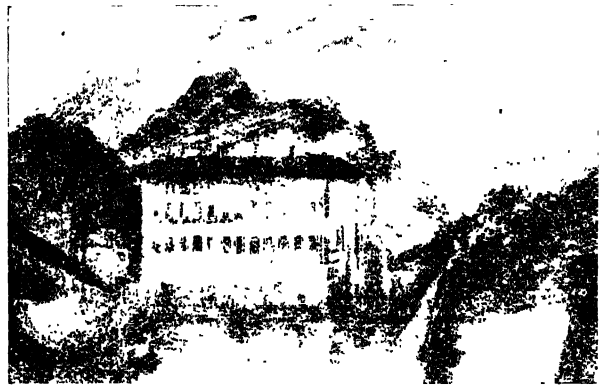
গ্যারিবল্ডির জন্মগৃহ

মিলিয়া সমস্ত ভাঙ্গাগড়া আগে হইতেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন; প্রুসিয়ার সহিত আদৌ এ বিষয়ে পরামর্শ করা হয় নাই';—তখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন যেন করিয়াই হউক, অষ্ট্রিয়ার সহিত সখ্যবন্ধন বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যখনই গোলযোগের চিহ্নপ্রকাশ পাইয়াছে, তখনই তিনি, কড়া ব্যবস্থা করিয়া, দুষ্টের দমন করিতে লাগিলেন। ভিতর ভিতর তিনিও যে Irredentist ছিলেন, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইটালির এমন কোনও অধিবাসী ছিল না, যিনি ট্রেন্টিনো পাইবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিতেন না। কিন্তু ক্রিস্পি, অনন্যোপায় হইয়া, শক্তিত্রয়-মৈত্রীর উপর একান্ত নির্ভর করিয়া, কার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে, অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র-সচিবকে ট্রেন্টিনোর শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহার একখানি পত্রে (৩১এ জুলাই, ১৮৯০)

দেখিতে পাই, তিনি লিখিতেছেন—'আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আমাদের রাষ্ট্রীয় সখ্যতা, ইটালি ও অষ্ট্রিয়া উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর। ইটালি তাহার চতুঃসীমার রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ফ্রান্সকে বন্ধুভাবে পাওয়া এখন তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে; সুতরাং, অষ্ট্রিয়ার সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাহার দরকার। যাহাতে এ বন্ধুত্ব নষ্ট হইতে পারে, এমন কিছু করা উচিত নয়। যদি অষ্ট্রিয়া আমাদের হাতছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত সে, আমাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, পোপের ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে।

ম্যাট্‌সীনর প্রবন্ধপাঠ-অপরাধে নাগরিক বধ

ওদিকে আবার অষ্ট্রিয়ারও ইটালিকে আবশ্যক; অবস্থা-বিশেষে ইটালি তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। আল্পস্‌ ও আড্রিয়াটিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, অষ্ট্রিয়া তাহার প্রাচ্য সীমান্তের দিকে বেশী মনোযোগ করিতে পারে; সেই দিকেই তাহার স্বার্থ ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে।' অতএব, অষ্ট্রিয়া যেন ইটালীয় জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলেন। উভয়েরই যখন উভয়কেই আবশ্যক, তখন দ্বন্দ্ব-কলহে কাহারও লাভ নাই।

* * * *

কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ট্রেন্টিনো-প্রদেশে ইটালীয়দিগের সংখ্যা প্রায় চারলক্ষ; খাঁটি অষ্ট্রিয়ান্‌—মাত্র দশ-বারহাজার। ট্রেন্টিনোর ভৌগোলিক অবস্থান দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহার ইটালির সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধ বিধির বিধান। স্থানে-স্থানে লম্বার্ড বা ভেনিসীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রধান কারবার—রেশমের। ব্যবসা চলিত প্রধানতঃ ভেনিসীয়া ও লম্বার্ডির সহিত। কিন্তু লম্বার্ডি ও ভেনিসীয়া স্বতন্ত্র ইটালি রাজ্যভুক্ত হইলে, এই ব্যবসাটি নষ্ট হইয়া গেল। এখন সেখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। সহরে অল্প লোকই বাস করে। গভর্মেণ্টের দিক্‌ দিয়া দেখিলে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশটাকে একটা প্রকাণ্ড সেনা-নিবাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেনানীর হুকুমে কোনও ইটালীয় শিল্পীর আবেদন গ্রাহ্য হইত না; কোনও কারণে, বা অকারণে, তাহাকে বহিস্কৃত করিতে পারিলে ভাল হয়; ইটালীয় অর্থে ট্রেন্টিনোর শিল্পবিস্তার নিষিদ্ধ। ইটালি হইতে গরু-ভেড়াপর্য্যন্ত আমদানি করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অষ্ট্রিয়ার চোখে—ট্রেন্টিনো 'দক্ষিণ টাইরল্‌' ভিন্ন আর কিছু নহে। ট্রেন্টিনো নামে যদি ইটালির গন্ধ থাকে, দক্ষিণে টাইরলে ত একেবারেই তাহা নাই।

ট্রিষ্ট, ফিউম্‌, ইষ্ট্রিয়া, ডলমেশিয়া-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা কথা বলা যাইতে পারে,—সহরগুলি জায়গার অধিবাসিগণ ইটালিয়ান; গ্রাম্য লোকগুলা অধিকাংশই স্লাভ। ট্রিষ্টের লোক-সংখ্যা দুইলক্ষেরও অধিক, কিন্তু অত্যাচারের সীমা ছিল না। অষ্ট্রিয়ান গভর্মেণ্ট, দূরদেশ হইতে স্লাভ আনাইয়া, ইটালীয়দিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল যে, অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ, সারায়েভোয় হত না হইলে, এই অঞ্চলে তিনি একটা স্লাভ ষ্টেট গড়িয়া তুলিতেন।

* * * *

অথচ ক্রিস্পি যে রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব। টাকার অত্যন্ত দরকার; কিন্তু প্যারিসে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বিস্মার্ক্‌কে বলিলেন—যদি জর্ম্মন্‌ ব্যাঙ্কগুলার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইটালিতে ব্যাঙ্ক স্থাপিত করে, তাহা হইলে ইটালির বড় উপকার করা হয়। ইটালির গরজ বুঝিয়া, বিস্মার্ক্‌, যেন কতকটা অনিচ্ছার সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেলে, ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে Banca

Commerciale Italiana স্থাপিত হইল। তিন কোটী মুদ্রা মূলধনের অধিকাংশই জর্ম্মন, অষ্ট্রিয়ান ও সুইস্ ধনীদিগের টাকা। আজিকার এই মহাসন্ধের প্রারম্ভে তাহার মূলধন দাঁড়াইয়াছে প্রায় এক সহস্র কোটী মুদ্রা! অল্পদিনের মধ্যেই ইটালির সমস্ত বাণিজ্য-পোত এই ব্যাঙ্কের জালের মধ্যে আসিয়া পড়িল; The Navigazione Generale Italiana, The Lloyd Italiano প্রভৃতি বড় বড় কারবারগুলা ইহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিল। এই ব্যাঙ্ক তখন লোহা-ইস্পাতের ব্যবসায়ে টাকা ধার দিতে লাগিল, রণতরী নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে লাগিল; জর্ম্মনি হইতে প্রতি বৎসর এগার লক্ষ মণ লোহা আমদানীর ব্যবস্থা করিল। রাসায়নিক, খনিজ ও তাড়িৎ বিজ্ঞানের দ্রব্যাদি ও জর্ম্মনি হইতে আসিতে আরম্ভ করিল। ক্রিস্পি-যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই হইল। 'শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্' নীতিসূত্র ধরিয়া আল্পস্ পর্ব্বত-লঙ্ঘন করিয়া জর্ম্মনজাতি ইটালির মধ্যে ধীরে ধীরে economic penetration আরম্ভ করিয়া দিল।

* * * *

বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া আরএক রকম অন্তঃপ্রবেশের পন্থা জর্ম্মনি অবলম্বন করিল। এই educational penetration অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। তখন য়ুরোপে জর্ম্মনির পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। ইটালি হইতে দলে দলে যুবকবৃন্দ, জর্ম্মনির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বদেশে জর্ম্মণির শিক্ষাদীক্ষাবিস্তারের অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাইল। ইটালির বাইশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইটালীয় ছাত্রবৃন্দকে অল্পে অল্পে শিখান হইল যে, ইটালীয় সভ্যতায় যাহাকিছু সুন্দর, যাহাকিছু সারবান, তাহা লাটিন-মস্তিষ্ক-সঞ্জাত নহে;—যে জর্ম্মন্ জাতিকে রোমের ইতিহাস-রচয়িতা ট্যাসিটস্ 'বর্ব্বর'-আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই জর্ম্মন জাতির মস্তিষ্ক-প্রসূত; তাহারই কঙ্কালসার লাটিন সভ্যতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া সমগ্রয়ুরোপীয় সভ্যতার চেহারা ফিরাইয়া দিল; লাটিন-ইটালিতে সমাগত জর্ম্মন জাতি যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহারই ফসল খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগের নবজাগরণে—Renaissanceএ দেখা গেল। সেই নবজাগরণের যুগের দেড়শত বিখ্যাত নাম উদ্ধৃত করিয়া একজন জর্ম্মন লেখক দেখাইলেন যে—তাহাদিগের মধ্যে ১৩০ জন নিঃসন্দেহে জর্ম্মন; তাঁহাদের চোখ, চুল, চেহারা, নরকপাল, সমস্তই তাঁহাদের জর্ম্মনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। বাকি ২০ জনও জর্ম্মন, কিন্তু সঙ্কর। এত বেশী বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া কিন্তু জর্ম্মনি ঠকিয়া গেল। তাহার cultural penetration, ইটালির অন্তর্নিহিত কোন এক কঠিন মন্বন্তরে ঠেকিয়া, পিছ্লিয়া গেল।

* * * * *

জর্ম্মনি এইবার ইটালির Home politicsএর ভিতর দিয়া বাজিমাৎ করিতে চেষ্টা করিল। দেশের অধিকাংশ লোক বুঝিতে পারিল ইটালির ভয় অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা জর্ম্মনিকে বেশী, কিন্তু দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ politician জিওলিটি, নিজের গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, জর্ম্মনির সহিত বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। সন্নিনো প্রমাদ গণিলেন। তিনি যে বরাবর জর্ম্মনিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। ক্রিস্পির বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াও তিনি জর্ম্মন-ব্যাঙ্কগুলাকে কখনও বেশী সুবিধা করিতে দিতে চাহেন নাই। অথচ পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য জিওলিটির মুঠার ভিতরে। জর্ম্মন রাজ-প্রতিনিধি ফন্ বুএলো তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—বিনা-যুদ্ধে ইটালি অনেকটা সুবিধা করিতে পারিবে। জিওলিটি, রাজার সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাকে এই কথা বুঝাইয়া দিল। গত্যন্তর না দেখিয়া সন্নিনো পদত্যাগ করিলেন। সমগ্র ইটালীয় জাতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—গ্যারিবল্ডির Italia mia কি জর্ম্মনির দাসী হইয়া থাকিবে?—দেশদ্রোহী জিওলিটির নিপাত হউক!—জিওলিটি রোম হইতে পলায়ন করিল। সন্নিনো স্বপদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তারপর? ...আল্পস্এর শিখরদেশেই এই গরুড়ের লড়াই!

জাপানের দিল্লী

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম্. এ.]

(১) তোকাইদো বা কিয়োটোর পথে

কাল রাত্রি হইতে গুমোট গরম পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়াই রেলে বসা গেল। সেদিন টোকিও হইতে উত্তরে গিয়াছিলাম—আজ টোকিওর দক্ষিণ-পশ্চিম, বা কিয়োটোয় "তোকাইদো" পথে যাত্রা করিয়াছি।

গাড়ীতে, আমেরিকার রীতিতে, 'পর্য্যবেক্ষণ'-কামরা আছে। এখানে বসিয়া বিশেষরূপে পশ্চাদ্ভাগ দেখা যায়। কামরার ভিতর চিঠিপত্র লিখিবার আসবাবপত্রও রহিয়াছে।

চারিদিকে পাহাড়দৃশ্য—ধানের ক্ষেত—এবং পাইনের সারি, তোকাইদোর পথেও দেখিতেছি। বাঁশের ঝাড় এই অঞ্চলে বেশীর মধ্যে চোখে পড়ে। প্রায়ই সমুদ্রের কিনারা দিয়া গাড়ী চলিতেছে। পল্লিকুটীরগুলির সমাবেশ, কৃষকদিগের আবাস—খড়ো চালা, কাঠের বেড়া-ইত্যাদি সবই খাঁটি জাপানী।

গাড়ী ঘণ্টা-দেড়েকের ভিতর কোজু ষ্টেশনে আসিল। এখানে নামিয়া অনেকে ইলেক্ট্রিক ট্রকে, অথবা মটর-কারে, বসিলেন। অনতিদূরে হাকোনে পাহাড়। গ্রীষ্মকালে এই পাহাড়ে বাস করা জাপানীদের একটা বিলাসবিশেষ। এই পর্ব্বতের অভ্যন্তরের হ্রদ এবং গন্ধক-প্রস্রবণসমূহ অতি প্রসিদ্ধ। ফুজি পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব হাকোনে হ্রদের উপর পড়িয়া থাকে। জাপানী চিত্রকরগণের কারুকার্য্যে এই প্রতিবিম্ব অনেক দেখিয়াছি। কাকেমনোতে, রেশমী পর্দায়, হাতপাখার উপরে—নানাস্থানে ফুজি-হাকোনে-চিত্র দেখা যায়।

এই অঞ্চলে তুঁতের চাষ হয়। কানাগাওয়া-প্রদেশ রেশম-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ জাপানের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম—সর্ব্বত্রই তুঁতের চাষ এবং রেশমের কারখানা দেখা যায়।

গাড়ী কোজু ষ্টেশন ছাড়িবামাত্র প্রদর্শক বলিলেন—"বামদিকে হাকোনে পর্ব্বতের সারি দেখিতেছেন; তাহার পরের সারীতে ফুজি শৃঙ্গ দেখা যায়। কিন্তু এক্ষণে আকাশ মেঘে ঢাকা; কাজেই দেখিতে পাইলেন না।"

একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গ কামরার ভিতর আছেন। ভারতবর্ষে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন মাত্র ভারতবাসী, যদি একাধিক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ভ্রমণ করেন—তাঁহার যেরূপ অবস্থা হয়, জাপানী রেলেও শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদিগের অবস্থা

ফুজি পর্ব্বতের দৃশ্য

সেইরূপই দেখিতে পাই। ইহারা নিতান্ত নির্জীবভাবে সময় কাটান—যেন জলের কুমীরকে ডাঙ্গায় তোলা হইয়াছে!

সহযাত্রীর মধ্যে কাউণ্ট ওকুমার পুত্র, কিয়োটো চলিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে একজন সরকারী কর্ম্মচারী আছেন। কিয়োটোতে মাস দুই-তিনেকের ভিতর নবীন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক হইবে—তাহার ব্যবস্থা অতি সমারোহের সহিত হইতেছে। এই ব্যাপার পরিদর্শন করিবার জন্য, ইঁহারা এখানে একসপ্তাহ থাকিবেন। একজন প্রবীণ জাপানী অধ্যাপক গাড়ীতে আছেন; নাম মুরাকামি—ইনি টোকিওর 'ইম্পীরিয়াল' বিশ্ববিদ্যালয়ে

সাহিত্যশিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি কোন বিদেশীয়ভাষা জানেন না। কিন্তু সমাজে ইহার প্রতিপত্তি খুব বেশী।

পাহাড়, উপত্যকা, সুড়ঙ্গ, স্রোতস্বতী, ঝরণা ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। জাপানের নদীগুলি
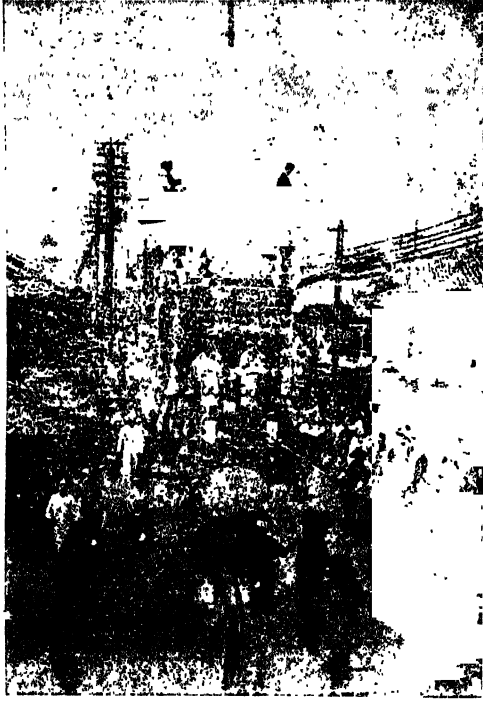
জাপানের রথ যাত্রা

একপ্রকার সবই দেখা হইয়া যাইতেছে; কোন নদীই দৈর্ঘ্যে বেশী বড় নয়। জাপানের মধ্যবর্ত্তী শিরদাড়া-স্বরূপ পর্ব্বতমালা হইতে বাহির হইয়া সমদ্রে এইগুলি পড়িয়াছে—কাজেই সুবৃহৎ নদী এখানে দেখা যায় না। প্রস্থেও নদী-সমূহের বিস্তার অল্পই—জলের অংশও কম। পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রস্তরময় নদীগর্ভ সর্ব্বত্র চোকে পড়ে; এই গর্ভের এক অতি সঙ্কীর্ণ অংশ দিয়া জলের প্রবাহ চলিতেছে। উত্তরের পথে যাহা দেখিয়াছি, তোকাইদোর পথেও তাহাই দেখিতেছি।

উর্দ্ধভূমিতে উঠিবার সময়ে গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগেও একটা এঞ্জিন লাগান হইল। রাস্তায় একটা বৃহৎ কাগজের কারখানা দেখা গেল।

গোতেম্বা-ষ্টেশনের কাছেও কুমার সহকারী বলিলেন—"ডাহিন দিকে পর্ব্বতমালার উপর কুয়াসা দেখিতেছেন। তাহার ভিতর দিয়া ফুজিশৃঙ্গ মাঝে-মাঝে উঁকি মারিতেছে। জুলাইমাসে ফুজি-পর্ব্বত ইহা অপেক্ষা বেশী দেখা যায় না। তবে, এখান হইতে ৫।৭ মাইল গেলে, ফুজির পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। প্রতিবৎসর সাত-আট হাজার লোক এই পথে ফুজি পর্ব্বতে আরোহণ করে।"

শ্বেত মেঘপুঞ্জের ভিতর কৃষ্ণাভ মোচাগ্র-সদৃশ তরুহীন পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম—কয়েক মিনিটের মধ্যে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ফুজি-পর্ব্বতমালার উপত্যকাগুলি স্তরে-স্তরে প্রান্তরের দিকে নামিয়াছে। বহুমাইলব্যাপী পর্ব্বত তরঙ্গের শোভা গাড়ীতে বসিয়া দেখা গেল। ফুজিশৃঙ্গ ১২৩০০ ফিট উচ্চ।

জাপানী উপকথায় ফুজিয়ামার গল্প সুপ্রসিদ্ধ। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, না কি, একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ এই পর্ব্বতের উত্থান হয়; সেই সঙ্গে পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত সৃষ্ট হয়। গর্ত্তের ভিতর জল প্রবেশ করে। আজ তাহা বিয়া-হ্রদ নামে পরিচিত।

ফুজি-পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অন্যান্য দেবদেবীগণের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, এই শৃঙ্গে তাহারা বসতি স্থাপন করেন। তিনি নারীজাতির উপর বড়ই নারাজ—এইজন্য, না কি, স্ত্রীলোকেরা এই পাহাড়ে উঠে না। কিন্তু সহস্র সহস্রযাত্রী প্রতিবৎসর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, সূর্য্যের স্তব করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আজকালকার পাশ্চাত্য টুরিষ্টগণও, সময় থাকিলে, একবার "Ascent of Fujiyama", বা "ফুজি-আরোহণ-পালা, সমাধা করিয়া থাকেন।"

রেলপথের ধারে—কোথাও চা-বাগান, কোথাও কমলা-লেবুর বাগান, কোথাও বা পদ্মের পুষ্করিণী দেখিতেছি। সুবিস্তৃত পদ্মফুলের আবাদ, পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

দুইটা বড় সহর পথে পড়িল—একটার নাম শিজুকা; ষ্টেশন হইতেই ইহার সমৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায়। অপর সহরের নাম নাগোয়া। এই নগর নব্যজাপানের এক শিল্প-কেন্দ্র। হোক্কাইদোর পথে সেন্দাই-নগর যেরূপ, তোকাইদোর পথে নাগোয়া-নগর সেইরূপ। বিশেষভাবে porcelain বা চীনামাটীর কাজের জন্য নাগোয়া বিখ্যাত। তোকুগাওয়া বংশীয় প্রথম শোগুন—ইয়ে-যসু এই নগরে একটা দুর্গনির্ম্মাণ করেন। সেই castle একটা দেখিবার

জিনিষ। বর্ত্তমান-যুগের পাশ্চাত্য রণ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত সৈনিকগণ এই দুর্গেই বাস করিতেছে।

খানিকদূর অগ্রসর হইবার পর, প্রদর্শক বলিলেন—"এই স্থানের নাম সেফিগাহারা; এইখানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাহাতে ইয়ে-যসু, অন্যান্য ডাইমোদিগকে পরাস্ত করিয়া, নিজের বংশের শোগুনী নিষ্কণ্টক করেন।" তাহার পর হইতেই তোকুগাওয়া-যুগের সূত্রপাত; সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন গৃহবিবাদ ও অশান্তির পরিবর্ত্তে সুদৃঢ় শাসন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং শান্তির আবির্ভাব হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই যুদ্ধ ঘটে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই ডাহিন দিকে বিয়া হ্রদের শেষ সীমা দেখিতে পাইলাম। হ্রদের অপর পারে উচ্চপর্ব্বত—প্রাচীরের মত দেখাইতেছে। এই স্থান হইতে হ্রদের দৈঘ্য ৭০ মাইল।

অন্ধকার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গলের নিবিড়তা বেশী লক্ষ্য করিলাম। পর্ব্বতদৃশ্য, পাইনকুঞ্জ, কচি সরু বাঁশের ঝাড়, অনুচ্চ ঝোপের সারি ইত্যাদি এক্ষণে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য গলির ভিতর দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। চারিদিকে পাহাড় ও উদ্ভিদের শোভা বিরাজমান।

টোকিও হইতে সাড়ে-তিনশত মাইল আসা গেল; সময় লাগিল ১১ঘণ্টা। মধ্যযুগে টোকিও হইতে কিয়োটো পৌঁছিতে ১১।১২ দিন লাগিত। প্রদর্শক বলিলেন—"টোকিও-হইতে নামিয়া, নাগোয়া-পর্য্যন্ত রেলপথ পুরাতন রাস্তার উপরেই নির্ম্মিত। নাগোয়ার পর, কিয়োটো-পর্য্যন্ত, ডাইমোরা যে-পথ ব্যবহার করিতেন, রেল-কোম্পানী আগাগোড়া সেইপথ গ্রহণ করেন নাই।" শুনিলাম, ৫৩টা চটি, বা সরাই, পার হইয়া, পূর্ব্বেকার লোকেরা কিয়োটো হইতে টোকিও আসিত। অনেকের মুখে এইসকল চটির ধারাবাহিক নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

কিয়োটো-ষ্টেশনে একজন উচ্চশিক্ষিত জাপানী আসিয়া দেখা করিলেন। ইংলণ্ড, জর্ম্মণী, ফ্রান্স, রুষিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া-ইত্যাদি দেশ ইঁহার দেখা আছে। চিত্রকলা, বাস্তুশিল্প এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা ইঁহার কার্য্য; ওসাকার প্রসিদ্ধ দৈনিক "আসাহি" পত্রে ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভারতীয় সুকুমারশিল্পসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য এই ব্যক্তি ভারতবর্ষে যাইতে চাহেন।

'ট্যাক্সি'তে হোটেলে পৌঁছিলাম। রাস্তাগুলি অতিশয় প্রশস্ত। আজ জাপানে "উল্টারথের" শোভাযাত্রা। রাস্তায়

জাপানের পথ
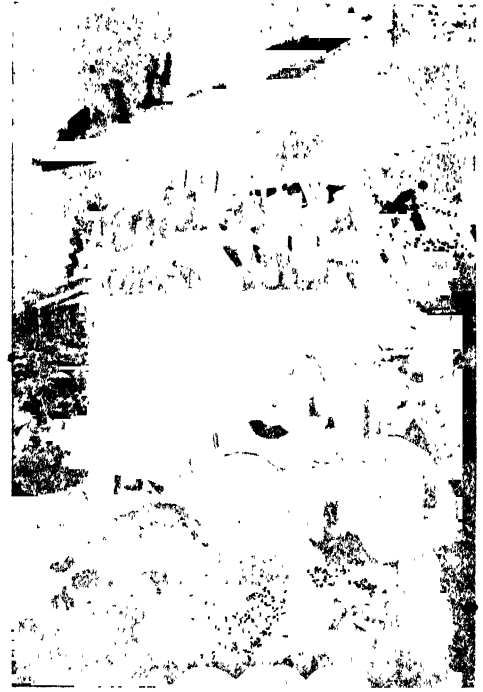
লোকের ভিড় দেখিতে পাইলাম—কোলাহল ভারতবাসীর সুপরিচিত। সাধারণতঃ, তড়িতের বাতিতে সহর রোজই গুলজার থাকে; তাহার উপর আজ কাগজের চীনা লণ্ঠন গৃহে-গৃহে জ্বলিতেছে। ট্রামগাড়ীগুলিতেও, "দেওয়ালী" উৎসবে, বিশেষ আলোকমালা সাজান হইয়াছে।

হোটেল একটা পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। কিয়োটো নগর চারিদিকে পর্ব্বতপ্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। কাজেই, হোটেলের গৃহে বসিয়া, সমস্ত নগরটাকে সমতল পার্ব্বত্য গর্ত্তের ভিতর সন্নিবিষ্ট দেখিতেছি। হোটেলের পাদদেশ হইতে, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম, পর্ব্বতপ্রাচীরের পাদদেশ পর্য্যন্ত, গৃহাবলীর খোলার ছাদগুলি সবই আমার নিম্নে শয়ান রহিয়াছে;—যেন মনুমেণ্টে দাঁড়াইয়া গোটা-সহর দেখিতেছি!

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, রিক্সতে নৈশ কিয়োটো দেখিতে

বাহির হইলাম। "আষাঢ় মাসে রথযাত্রা লোকের হুড়া-হুড়ি।"—আজ রাত্রে জাপানী সহরেও সেই হুড়াহুড়ি দেখা গেল। গতসপ্তাহে একটা মন্দির হইতে অন্যমন্দিরে কয়েকটা চালি, বা মন্দির, স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। আজ সেইগুলি পুনরায় যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আমাদের দেশে দশহরায়, বা অন্নপূজার ভাসানের দিন, ঘাড়ে করিয়া প্রতিমা লইয়া যাওয়া হয়; জাপানীরাও এই মন্দির-গুলি ঘাড়ে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে—দড়ির সাহায্যে রথ-টানিবার রীতিও আছে। পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশের "রাম-লীলা" এবং "ভরতবিলাপ" এবং মুসলমানের "মহরম"-ইত্যাদি অনুষ্ঠান, আর এই জাপানী শোভাযাত্রা—সবই এক এশিয়ার সামগ্রী।

কিয়োটো-নগরী

(২) চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্প

কিয়োটো-সহরটা একটা সুবিস্তৃত বাগানের মত। ঘরগুলি যেন এক-এক বিরাট্ প্রমোদকাননের কুঞ্জগৃহ। ঊর্দ্ধে সূর্য্যতপ্ত নীল আকাশ, চারিদিকে উচ্চ-উচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর, সমতলভূমির উপর সবুজ তৃণপত্রের আস্তরণ। উদ্যান-তরুর ফাঁকে-ফাঁকে কৃষ্ণাভ খোলার ছাদগুলি যেন তাহাদের অনুচ্চ মাথা তুলিয়া উঁকি দিতেছে। গৃহসমূহ—মানুষের তৈয়ারি কৃত্রিম পদার্থ বোধ হয় না। প্রকৃতির সাধারণ-আবেষ্টনের মধ্যে লোকাবাসসমূহ খুব খাপ খাইয়াছে। জাপানী বাস্তুশিল্পের ইহাই একটা বিশেষত্ব। মানুষের গড়া ঘরবাড়ীর সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য জাপানের প্রত্যেক পল্লীতেই লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বাস্তুশিল্প, তাহার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই গড়িয়া উঠে। কিয়োটো-সহরের গৃহ-সমাবেশ এবং গৃহনির্ম্মাণ-রীতি স্থানীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী। সহরটা দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যায়। টোকিওর গিঞ্জা-পাড়ায় এবং সরকারী ভবনসমূহে আজ-কালকার পাশ্চাত্য সৌধনির্ম্মাণ-রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। এগুলি জাপানের আবহাওয়ায়, এবং প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে, খাপ খায় নাই। কিন্তু কিয়োটোতে এখনও পাশ্চাত্য বাস্তুরীতির আক্রমণ দেখিতেছি না। কিয়োটো আজও জাপানের খাঁটি স্বদেশী।

যদি কোন চিত্রকর, কাগজ বা ক্যাম্বিশের উপর, এক খানা আদর্শপল্লী, বা নগরের নক্সা, করিতে বসেন, তাহা হইলে তিনি, প্রকৃত কিয়োটো-নগরের উদ্যান-পরম্পরা ও গৃহশ্রেণীর সামঞ্জস্য ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবেন, কি না, সন্দেহ। কিয়োটো-সহরটা একখানা কল্পনাপ্রসূত ছবির মতই মনে হইতেছে। কিয়োটো দেখিয়া শিল্পির কল্পনা পুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু কল্পনাদ্বারা কিয়োটো অতিক্রম করা সুকঠিন।

প্রকৃতির এই রম্যস্থানে সৌন্দর্য্যসেবক নরপতিগণ প্রায় একহাজার বৎসরপূর্ব্বে এক নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই নগরী য়ুরোপীয় রোমনগরীর মত immortal—অমর হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় হস্তিনাপুর-দিল্লী, হিন্দু-মুসলমানের চিত্তে যে স্থান অধিকার করে, জাপানীর মানসক্ষেত্রে কিয়োটো-নগরীর স্থানও সেইরূপ। কত ডাইমো, জমিদার, শোগুনবংশের উত্থান-পতন সাধিত হইয়া গিয়াছে, কত গৃহবিবাদ ও ঘরোয়া-সংগ্রাম ঘটিয়াছে; কিন্তু মিকাডো-সম্রাট্গণ এই কিয়োটো-সহরের প্রাসাদে জীবনযাপন করিয়াছেন। এই মহানগরীই জাপানী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে: এইজন্যই এখনও রাজকীয় উৎসবসমূহ কিয়োটোতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরলোকগত মিকাডোর রাজ্যাভিষেক এই নগরেই হইয়াছিল; বর্ত্তমান যুবক সম্রাটের রাজ্যাভিষেকও এই মহানগরীতেই অনুষ্ঠিত হইবে। জাপানী-সমাজের সনাতন প্রথা-অনুসারে এই রাজ্যাভিষেক-পর্ব্বের জন্য আয়োজন চলিতেছে। নবীনতম য়ুরোপ-আমেরিকার শিল্প-বিজ্ঞানে অধিকারী হইয়াও, জাপানীরা প্রাচীনরীতি ভুলিল না। জাপান, এশিয়াকে ভুলিতে

চাহে না—প্রাচীনকে প্রত্যাখ্যান করিবে না। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য লোকজন জাপানীদের এইকাণ্ড দেখিয়া বেশ একটুকু বিস্মিত হইতেছেন। কারণ, তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, জাপান পূরাপুরি য়ুরোপ-আমেরিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সকলেই ক্রমে-ক্রমে বুঝিতেছেন যে, জাপান—এশিয়ার মমতা কোনদিনই ছাড়িবেন না।

কোয়ানন দেবী

রাস্তায় দেখিতেছি, প্রত্যেক গৃহের মাদুর, চাটাই, কার্পেট-ইত্যাদি রৌদ্রে শুকান হইতেছে। ঘর বাড়ী পরিষ্কার করিবার ধুম পড়িয়াছে। প্রদর্শক বলিলেন, "জাপানী মিউনিসিপ্যালিটির নিয়মে, বৎসরে দুইবার করিয়া, প্রত্যেক পরিবার ঘরের আসবাব আগাগোড়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে বাধ্য। এই বৎসর সহরে রাজ্যাভিষেক ব্যাপার, কেবল গবর্মেন্টের আড়ম্বর মাত্র নয়, ইহা একটা জাতীয় যজ্ঞবিশেষ। দেশের প্রত্যেক নরনারীই সেই মহা-অনুষ্ঠানে, অংশীদারভাবে, গৌরব অনুভব করে। এই হিসাবে, বিলাতী রাজ্যাভিষেকে, আর জর্ম্মণ রাজ্যাভিষেকে, এবং জাপানী রাজ্যাভিষেকে, আর রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে, কোন প্রভেদ নাই!

টোকিওর মিউজিয়মে জাপানী সুকুমারশিল্পের সংগ্রহ বেশী দেখি নাই—কিয়োটোর সংগ্রহালয়ে অনেক দেখিলাম। জাপানী বন্ধুটি সঙ্গে আছেন; সম্মুখের গৃহে পুরাতন যুদ্ধসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, শিরস্ত্রাণ-ইত্যাদি দেখা গেল। বন্ধু বলিলেন—"এগুলি পারসীক রীতি অনুসারে গঠিত।—জাপানে পারস্যের প্রভাবও আছে।" কোন কোন আলমারিতে কাউণ্ট ওতানি সংগৃহীতদ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিপি, মাটির উপর চিত্রাঙ্কন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি-ইত্যাদি তুর্কীস্থান হইতে আনীত। ভারতীয় দ্রব্যের সংগ্রহও কিছু আছে।

প্রাচীন চিত্রসমূহ যুগ অনুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে। জাপানীসভ্যতার প্রথমযুগ নারা-নগরে প্রকটিত হইয়াছিল। উহা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের কাল। নারা নগর কিয়োটো হইতে অদূরে অবস্থিত; খৃষ্টীয় সপ্তম-হইতে নবম শতাব্দী-পর্য্যন্ত নারা যুগ চলিয়াছে। নারা-যুগের চিত্রশিল্প এই সংগ্রহালয়ে নাই; ইহা, বস্তুতঃ, বাস্তুশিল্প এবং স্থাপত্য-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ-হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী-পর্য্যন্ত হোজোবংশীয় ডাইমোগণ শোগুণী করিতেন। তাঁহারা য়েডো টোকিওর সমীপবর্ত্তী কামাকুরা নগরে রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রবর্ত্তন করেন। এই কামাকুরা যুগেও ভাস্কর্য্য এবং খোদাই শিল্পই জাপানে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তোমা নামক একব্যক্তি চিত্রশিল্পে বিশেষ এক প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। আজও 'তোমা-রীতি'-নামে উহা অবলম্বিত হইতেছে। রাজদরবারের নানাদৃশ্য ও ঘটনা, ডাইমোদিগের জীবনযাত্রা, এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-ইত্যাদি তোমাচিত্রের আলোচিত বিষয় ছিল। কতকগুলি কাকেমনো দেখাইয়া বন্ধু বলিলেন—"এইগুলি তোমারীতি-অনুসারে অঙ্কিত। এই সমুদয়ে রঙের বাহার এবং অলঙ্কারের পারিপাট্য বেশী।" তোমা রীতির অপর নাম—Yamato School, বা 'য়ামাতো-রীতি'; অর্থাৎ, জাপানের স্বদেশী-শিল্পকায়দা। জাপানী সমাজের ঐতিহাসিক দৃশ্য, বা ঘটনা লইয়া, চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে—এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে। Stewart Dick, তাঁহার 'Arts and Crafts of Old Japan'-গ্রন্থে বলিতেছেন—

"The eleventh, twelfth and thirteenth centuries formed a period of great literary

and artistic activity. Buddhism was then in the height of its power, and there is no greater period than this in the history of Japanese art, but of these old masters we know little more than names."

মিউজিয়মে প্রদর্শিত চিত্রসমূহের অনেকগুলিতে চিত্রকরের নাম দেখিতে পাইলাম না, কেবল যুগের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে (১৩৩৪-১৫৭৫) আসিকাগা বংশীয় ডাইমোরা প্রতিপত্তিলাভ করেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র কিয়োটোতেই ছিল। এইযুগে চীনের প্রভাব জাপানী-শিল্পে বিশেষভাবে দেখা যায়। জাপানী চিত্রকরগণ মিঙবংশীয় চীনারাজগণের আমলে, অনেকটা চীনাভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই যুগের প্রসিদ্ধ শিল্পীর নাম সে-শু। তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প 'Arts and Crafts of Old Japan' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"At the age of forty Sesshiu, satisfied that he had learned all he could from the artists of his native country, went to China to study under the masters there; but to his surprise and discouragement he found none there who could teach him more than he already knew. Then, said he, 'Nature shall be my teacher; I shall go to the woods, the mountains and the streams and learn from them.'"

সে-শুর চিত্রসম্পদ টোকিওর "কোক্কা"-পত্রে বিবৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য-অঙ্কনের ইনি পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

আশিকাগা-যুগে চীনা-প্রভাবের অপরএক পরিচয় আছে। এই সময়ে কানো-রীতি নামক শিল্পপদ্ধতি জাপানে প্রসিদ্ধ হয়। ইহার চরম-পরিণতি দেখা গিয়াছে পরবর্ত্তী তোকুগাওয়া-যুগে। তোমারীতির ন্যায়, কানো-রীতিও জাপানী শিল্পসংসারে বিখ্যাত; এই দ্বিতীয় রীতি অনুসারে চিত্রকরেরা রঙ্গের ব্যবহার করিতেন না। চীনা-হস্তলিপির প্রণালী-অবলম্বন করিয়া, শিল্পীরা শাদা-জমিনের উপর কাল-আঁচড় ফেলিতেন। "On the Laws of Japanese Painting"-গ্রন্থে Bowie কানো-রীতি সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"It took Japan captive. It had a tremendous vogue and following, and has come

বৌদ্ধধর্ম্মে রুদ্রদেব

down to the present day through a succession of great painters. * * * The Kano-painters are remarkable for the boldness and living strenghth of the brush strokes, as well as the brilliancy or sheen-shading of the *Sumi*. * * * The range of subjects of the Kano School was originally limited to classic Chinese scenery, treated with simplicity and refinement and to Chinese personages, sages and philosophers; colour was used sparingly."

কানো-রীতি-অবলম্বন করিয়া চীনশিল্পিগণ যথন সরলতার চরমসীমা দেখাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই, বাস্তু-শিল্পিগণ নিক্কো-পাহাড়ের সৌধ-নির্ম্মাণে অলঙ্কার-প্রিয়তার চূড়ান্ত কুরুচি প্রকটিত করিয়াছেন। একই

তোকুগাওয়া-যুগে সুকুমার-শিল্পের দুইবিভাগে দুইরীতি দেখিতেছি!

স্থাপত্যশিল্পের প্রকোষ্ঠগুলিতে নারা-যুগের কোয়ান্নন-দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। প্রস্তর বা ধাতুর মূর্ত্তি একটাও নাই—সবই কাষ্ঠময়। কোয়ান্নন—জাপানী বৌদ্ধ

[illegible]

ধর্ম্মের দেবতা—ইনি কৃপা বিতরণ করেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ কোয়ান্ননের সেবক ছিলেন না।—জাপানী সমাজের সর্ব্বত্র এইমূর্ত্তি দেখিতে পাই। অমিতাভ বুদ্ধ এবং কোয়ান্নন—এই দুই-দেবতার মূর্ত্তি বহু বনজঙ্গলে, কৃষিক্ষেত্রে, পথপ্রান্তে, এবং "পোড়ো" ভূমিতে দেখিয়াছি। আমরা বাঙ্গালাদেশের যেখানে সেখানে আজকাল যেমন শিবলিঙ্গ, অথবা কালীর স্থান দেখিতে পাই, জাপানের যেখানে সেখানে সেইরূপ "আমিদা" এবং "কোয়ন্নেন" দেখিতে পাওয়া যায়।

কামাকুরা-যুগের অনেকগুলি সুবৃহৎ কাষ্ঠমূর্ত্তি এক গৃহে সাজান রহিয়াছে। এইগুলির বেশভূষা, হস্তধৃতযন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন। লিখিত বিবরণপাঠ করিয়া, বুঝা গেল, এইসমুদয় দেবতা কৃপা, বা কেয়োন্নন-দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গ। এই গৃহে বিরাট্ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তিও দেখিলাম।

কামাকুরা-যুগের বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখিতে অতি ভীষণ ও কদাকার। কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতর জীবনীশক্তি আছে। কাষ্ঠশিল্পিগণ, খোদাই কার্য্যের মধ্যদিয়া, তীব্র ও উগ্র স্বভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলিকে দৈত্যের মর্য্যাদা প্রদান করিতেই প্রবৃত্তি হয়। জাপানী বন্ধু বলিলেন—"মহাশয়, এই দেবতাসমূহের অঙ্গে লাবণ্যবিন্দু মাত্র নাই; কেন জানেন? কামাকুরা-যুগে জেন্ (Zen) সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ প্রতাপান্বিত ছিলেন। তাঁহারা কঠোরতা এবং সংযম অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাজেই সৌন্দর্য্য, তাঁহাদের আমলে, দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অধিকন্তু, মধ্যযুগে আমাদের দেশ সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। এইজন্য দেবতাগণ সকলেই যুদ্ধপ্রিয়।"

বাস্তবিক পক্ষে, সুবৃহৎ ভীষণাকৃতি দৈত্যসদৃশ মূর্ত্তিগুলির সম্মুখীন হইলে Beauty of the Terrorভিন্ন, অন্য-কোন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না।

কতকগুলি মুখোস সংগৃহীত রহিয়াছে। নারা-যুগের মুখোসগুলি ধর্ম্মবিষয়ক। বন্ধু বলিলেন—"এইগুলিতে ভারতীয় ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছে; চোখ দেখিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আশিকাগা শোগুনদিগের আমলে নো নাটক প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সঙ্গে অনেক

বামদিকের মূর্ত্তিশ্রেণী
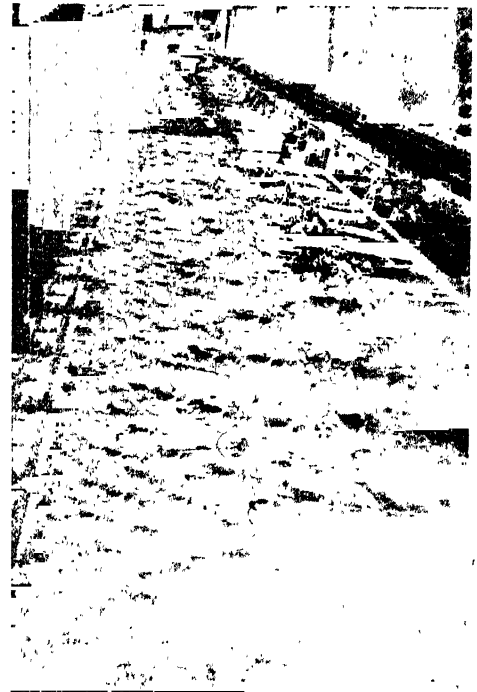
প্রকার মুখোস-প্রবর্ত্তিত হইয়া ছিল। সেইগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, এইসমুদয় খানিকটা বিলাসের সামগ্রী।"

কতকগুলি রুদ্রমূর্ত্তিসম্বন্ধে Cram বলিতেছেন—"Consider the poise and dash of such a splendid, sinewy thing as the Incarnation of War, the spring and the sweep of the body, the tensity of nerve, the howling savagery of
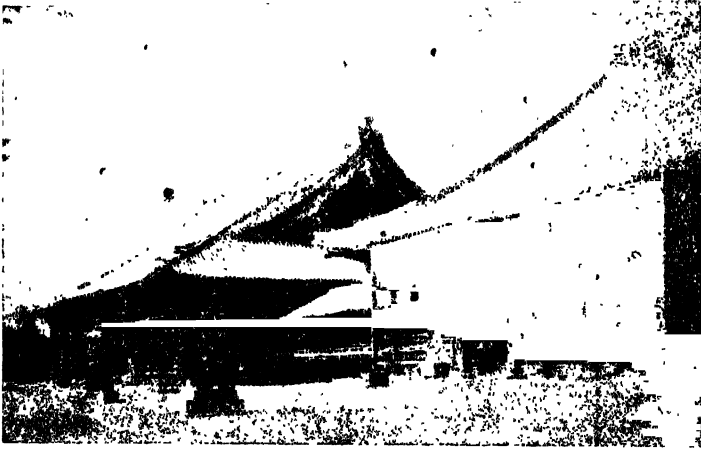
পশ্চিম হোঙ্গাঙ্গি-সম্প্রদায়ের মন্দির

the distorted face, or again the rigid alert ness, the power concentrated and controlled. In all of these the bodies are fully articulated, the faces are unmistakably portraits, yet portraits that are more than the effigies of individuals, they are amalgamations of a race, manifestations of national character. Note also the superb armour. * * * These are great statues, all of them works of the highest art : nothing better was ever produced in Europe after the fall of Rome."

(৩) বিয়াহ্রদে সান্ধ্যবিহার

রেলে আসিবার সময়ে, বিয়াহ্রদের সামান্য-অংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই হ্রদ, প্রাচীন জাপানী-সাহিত্যে ও শিল্পে সুপ্রসিদ্ধ। এখানকার আটপ্রকার সৌন্দর্য্য, জাপানে প্রবাদরূপে প্রচলিত। জাপানীরা এই হ্রদের কোনঅংশ হইতে শরৎকালের চাঁদ দেখিতে ভালবাসে, কোনস্থানে সান্ধ্যতুষার দেখিয়া মোহিত হয়, আরএক কোণে সূর্য্যাস্ত-গৌরব উপভোগ করিতে চাহে। হ্রদের উপকূলস্থিত কোন বৌদ্ধমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শুনিবার জন্য এখানকার নরনারী লালায়িত হয়। পাল তুলিয়া মাঝিরা যখন অগণিত নৌকা চালায়, তখন হ্রদের দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়। কোন সময়ে উজ্জল নভোমণ্ডল, কখনও বা নৈশবৃষ্টি, বিয়াহ্রদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। আবার জলের উপর হংস-কেলিও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়, সন্দেহ নাই।

হোটেলের পাদদেশে ট্রামে বসিলাম। দুইধারে পাহাড় এবং পার্ব্বত্য জঙ্গল। মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতেছে। অবশেষে, ওৎসু-নগরে পৌছিলাম। জাপানী পল্লীর গলি, কুটীর, মাছের দোকান, ফলের দোকান-ইত্যাদি সবই দেখা গেল। কাচা মাছ, পোড়া মাছ, ভাজা মাছ-ইত্যাদি সকলপ্রকার মাছ, সাজান রহিয়াছে। জাপানে নাপিতের দোকানগুলি ইয়াঙ্কি কায়দায় তৈয়ারি; পল্লীতে, সহরে—সর্ব্বত্রই এই পাশ্চাত্য-রীতি লক্ষ্য করিতেছি।

ক্ষুদ্র ষ্টীমারে বসিলাম। হ্রদের ধারে বেড়াইবার রাস্তা। ষ্টীমার হইতে রাস্তার উপরকার কাষ্ঠগৃহগুলি এবং পার্ক ও উদ্যানসমূহ বেশসুন্দর দেখাইতেছে। এই সমুদয়ের পশ্চাতে উদ্ভিদ-শোভিত পাহাড় দাড়াইয়া আছে। পাহাড়ের অপর-পার-হইতে সন্ধ্যার সূর্য্য মেঘের ভিতর দিয়া, কোনমতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—এদিকে হ্রদ একটা নিশ্চল পুষ্করিণীর মত শান্তভাবে শুইয়া আছে। হ্রদের চারিদিকে পর্ব্বত প্রাচীর। মেঘশূন্য আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ভাসিবার আয়োজন করিতেছে—রাত্রি সুরু হইলেই সমগ্র আবেষ্টনের উপর চন্দ্রমার একাধিপত্য স্থাপিত হইবে।

অল্পদূর পরে-পরেই এক-একটা ষ্টেশন দেখিতে পাইলাম। কয়েক মিনিট পরে-পরেই এক-একখান ষ্টীমার যাওয়া আসা করিতেছে। জেলের ডিঙ্গি, প্রমোদ-তরণী-ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়। ঘাটের কিনারায় জেলেরা মাছধরিবার আয়োজন করিয়াছে। কঞ্চির-বেড়া তৈয়ারি করিয়া, ইহারা মাছের ক্ষেত প্রস্তুত করিয়াছে। বেড়ার

পূর্ব্ব-হোঙ্গাঞ্জি সম্প্রদায়ের মন্দির

ভিতর মাছ একবার প্রবেশ করিলে, আর বাহির হইতে পারে না।

খানিক পরে, একটা কাষ্ঠসেতু পার হইলাম। এইখানে একটা সঙ্কীর্ণ নদীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। সেতুর একদিক তাড়িতের বাতি দিয়া সাজান রহিয়াছে। নদীর দুইধারে বাগান দেখিতেছি। অবশেষে, যেখানে নামিলাম, সেখানে অতি নিবিড় পাইন কুঞ্জ—উচ্চপাহাড়ের শিরোভাগ হইতে পাদদেশপর্য্যন্ত নামিয়াছে। বৃক্ষরাজির আভায় নদীর জল ঘোরতর সবুজবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইস্থানের এক মন্দিরে, নাকি, দশমশতাব্দী স্ত্রী-ঔপন্যাসিক মুরাসাকি শিকিবুর কলম ও দোয়াত রক্ষিত হইতেছে। ইনি "গেঞ্জি মনো গাতারি"-নামক প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থের লেখক। ফুজিপর্ব্বতের মত, বিয়াহ্রদও জাপানী চিত্রকরগণ কারুকার্য্যে বিশেষস্থান পাইয়াছে। কাকেমনোতে, পর্দায় এবং হাতপাখায় এইস্থানেব অষ্টবিধ গৌরব চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিয়াহ্রদ হইতে খালকাটিয়া কিয়োটো-সহরের ভিতর আনা হইয়াছে। এইজন্য পাহাড়ের ভিতর সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই কাজ কিয়োটোর একটা দেখিবার জিনিষ। খালের দ্বারা এই নগরের কামোনদীর সঙ্গে বিয়াহ্রদ সংযুক্ত হইতে পারিয়াছে। খালের উচ্চতম অংশ হইতে জলপ্রপাত হয়। প্রপাতের শক্তি ব্যবহার করিবার জন্য জাপানী এঞ্জিনিয়রেরা বিশেষব্যবস্থা করিয়াছেন। কিয়োটোর কারখানাগুলিতে এই প্রপাতে প্রস্তুত তাড়িতের শক্তিগ্রহণ করা হয়। শুনিলাম, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিছাত্র এই খাল-কটিবার প্রণালীসম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনা করিয়াছিল। পরে, তাহারই কর্তৃত্বে এইখাল কাটা হইয়াছে।

(৪) বৌদ্ধ মন্দির

জাপানে প্রাসাদ, মন্দির, সাধারণগৃহ—সকলই কাষ্ঠনির্ম্মিত। কাঠে আগুন-লাগা অতি সহজ; প্রায় প্রত্যেক গৃহই, একবার অথবা একাধিকবার, ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে, সুপ্রাচীন গৃহ আজকাল দেখা যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীর স্থাপিত একটা মন্দির দেখিলাম। ইহার ভিতর ৩৩৩৩৩ কোয়ান্নমূর্ত্তি আছে, বলিয়া জনশ্রুতি।

জেদো-মন্দিরের বিরাট্ ঘণ্টা
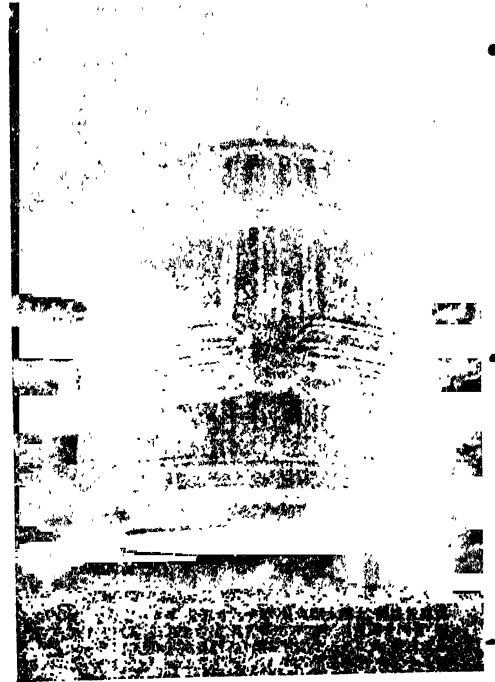
প্রকৃত প্রস্তাবে ১০০১ মূর্ত্তি বিরাজমান। কৃপাদেবীর মুখ এগারটা এবং হস্তসংখ্যা ১০০০।

সুদীর্ঘ কাষ্ঠমন্দিরের মধ্যভাগে বৃহদাকার দেবীমূর্ত্তি—কাঠের প্রতিমায় সোনালি রং করা। এইরূপ মূর্ত্তি ডাহিনে

ও বামে সারি সারি অনেকগুলি সাঙ্গান। প্রত্যেকের দাঁড়াইবার রীতি এবং হস্তপদ নয় কিছু স্বতন্ত্র। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে কোয়ান্নের সাঙ্গোপাঙ্গদিগের মূর্ত্তি বিরাজমান—গৃহটা দেখিয়া মন্দিরের দৃশ্য মনে পড়িল না। ভাবিলাম, যেন একটা মূর্ত্তির মালগুদামে উপস্থিত হইয়াছি!

বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে একটা পদ্মের পুকুর, তাহার ধারে একটা ক্ষুদ্র চটি। এইখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হোঙ্গাঞ্জি-মন্দিরদ্বয় দেখিতে অগ্রসর হইলাম। বৌদ্ধধর্ম্মের হোঙ্গাঞ্জি-সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব্ব ও পশ্চিম।

প্রথমে পশ্চিম-শাখার সৌধসমূহ দেখা গেল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কাউণ্ট ওতানি এইশাখার বর্ত্তমান কর্ত্তা। অন্যান্য সৌধের ন্যায়, এই গৃহাবলীও কয়েকবার পুড়িয়া গিয়াছিল—বর্ত্তমান গৃহসমূহ সে দিনকার তৈয়ারি। আশিকাগা ও তোকুগাওয়া যুগের মধ্যে হিদেয়শি শোগুনের প্রবল প্রতাপ ছিল। তাঁহার আদেশে এই মন্দির প্রথম-স্থাপিত হয়। এক্ষণে হিদেয়শির প্রাসাদ হইতে বহুদ্রব্য এখানকার সৌধে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। নিক্কোর সৌধ-অপেক্ষা পশ্চিম-হোঙ্গাঞ্জিসম্প্রদায়ের গৃহসমূহ অধিকতর সুন্দর দেখিতেছি। এখানকার কাঠের খোদাই, সোণালি কাজ, ল্যাকরশিল্প, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি উচ্চতর রুচির পরিচায়ক—প্রাচীরের পর্দ্দায় এবং ভিতরকার ছাদে যথার্থ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাইলাম।
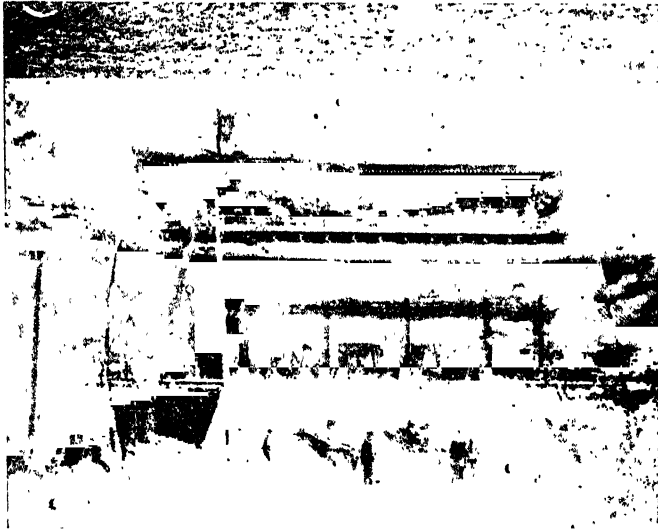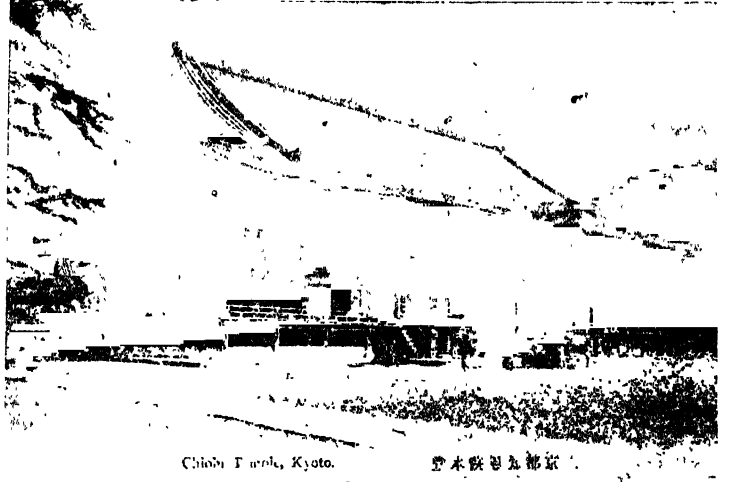
Chion Temple, Kyoto.

জোদো-সম্প্রদায়ের মন্দির

হোঙ্গাঞ্জিতে প্রকৃত কেকো দেখিতেছি—নিক্কোতে দেখি নাই।

জেদো-মন্দিরের দ্বিতল ফটক

গৃহগুলিতে প্রধানপুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতগণের বাসস্থান প্রদত্ত হয়। কয়েকটা গোমণ্ডপও রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইটা বড়মন্দির দেখিতে পাইলাম—একটাতে আসিদা বুদ্ধের মূর্ত্তি, অপরটাতে একজন বৌদ্ধসাধুর মূর্ত্তি। মন্দিরের ভিতরে বৌদ্ধ-পূজার সকলসরঞ্জামই আছে—প্রতিমাপূজার কোন অনুষ্ঠান বাদ যায় নাই। মন্দিরদ্বয় কাষ্ঠশিল্পের বিরাট্ নিদর্শন। মিশরের লুক্সর-কার্ণাকে প্রস্তরশিল্পের গৌরব-উপলব্ধি করিয়াছি; হোঙ্গাঞ্জি-মন্দিরেও অপূর্ব্ব বাস্তু-শিল্পের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছি।

পূর্ব্ব-হোঙ্গাঞ্জি-সম্প্রদায়ের সৌধে এবং মন্দিরদ্বয়েও এই শ্রেণীর কারুকার্য্য, চিত্রাঙ্কন-ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এই সকল গৃহনির্ম্মাণে ধনী-নির্ধন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে—

কেহ ধনদান করিয়াছে, কেহ শারীরিক পরিশ্রমদান করিয়াছে। অনেক দরিদ্ররমণী নিজেদের চুলকাটিয়া প্রকাণ্ড দড়িপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, প্রায় ৩০০ ফিট লম্বা চুলের

দেবীমন্দির মালপদাম

দড়ি ৫২টা পাওয়া গিয়াছিল এইগুলির সাহায্যে বড় বড় কাঠ টানিয়া তোলা হইত। বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও জীবিত আছে বলিয়াই, জনসাধারণের সমবেত সাহায্যে এইসকল বিরাট্ সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে।

মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে একজন প্রচারক "কথা" বলিতেছেন; শ্রোতৃমণ্ডলী স্থিরভাবে বসিয়া শুনিতেছে।

কাশী-মথুরা-ইত্যাদি সহরের অলিতে-গলিতে মন্দির দেখিতে পাই। কিয়োটোতেও তাহাই দেখিতেছি। বৌদ্ধমতাবলম্বী বিভিন্নসম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মন্দির-মঠ এবং স্মৃতিস্তম্ভ—জাপানের এই দিল্লীনগরে রহিয়াছে। কিয়োটো-জাপানী বৌদ্ধজীবনের বিরাট্ কেন্দ্র।

বলা বাহুল্য, মধ্যযুগের সকল মন্দিরই একাধারে ধর্ম্মকেন্দ্র, শিক্ষা-কেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র ও সমাজকেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমান যুগে মন্দিরাদির গৌরব দুনিয়ার কোথাও নাই—জাপানেও দেখিতে পাইলাম না। বিদেশীয় পর্য্যটকেরা, অথবা স্বদেশী পুরাতত্ত্ববিদগণ, এইসকল মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প নির্ম্মাণকাল-ইত্যাদিমাত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যেখানে সহস্র সহস্র লোকের অহরহঃ গতিবিধি হইত, আজ সেখানে দুই একজন antiquarian- archaeologist এবং globe trotter এর পদধ্বনিমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানযুগের মানবজীবন অন্যান্য ধারায় প্রবাহিত হইতেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দির একটা মন্দির দেখিলাম, উহা বৌদ্ধসাধু এনকো-কর্ত্তৃক স্থাপিত; ইনি জোদো-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের জন্যই কিয়োটোতে এই-সকল গৃহ রচিত হইয়াছে। একাধিক-বার সৌধগুলি আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে আমরা তোকুগাওয়া সঙ্ঘের পুনর্গঠন দেখিতেছি। একটা মন্দির, ৪১৫ বৎসর মাত্র হইল, পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে বিরাট সোণালি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

মন্দিরসমূহ এক উচ্চ পাহাড়ের গায়ে সমাবেশিত।

বৌদ্ধমন্দিরাভ্যন্তরীণ ডাইনদিকের দেবী মূর্ত্তিশ্রেণী
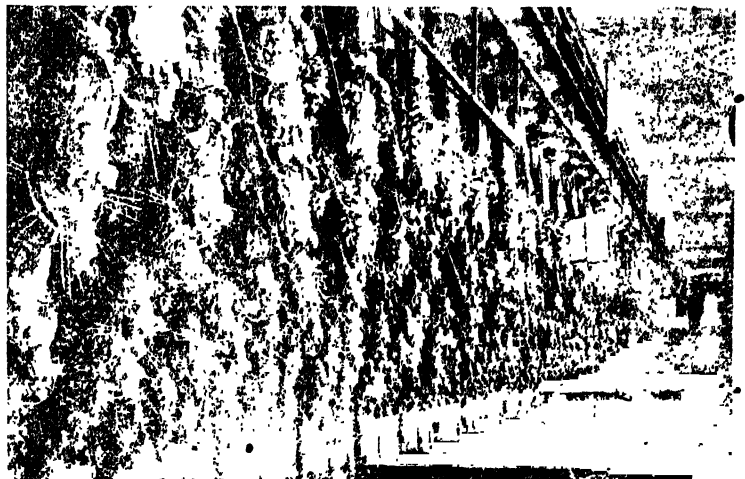
যে ফটক পার হইয়া এইসকল গৃহে আসিতে হয়, তাহা বাস্তুশিল্পহিসাবে উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। জোদো-সম্প্রদায়ের এইসকল সৌধ—প্রত্যেকটা গঠনগরিমায়, উচ্চতায়, দৈর্ঘ্যে

এবং আয়তনে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া শিল্পীরা এইসকল বিরাট্ মন্দির-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৃহসমূহের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পের নিদর্শন সংগৃহীত রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা একটা চিত্রশালা বা art-gallery— তোকুগাওয়া-যুগের "কানো" পদ্ধতি এই চিত্র-শিল্পে সবিশেষ প্রকটিত। সারস, পাইন, ক্রিশেন্থিমম্ শুভ্র তুষার, বাঁশ, চড়ুই ইত্যাদি নানা পদার্থের চিত্র পুরোহিত্যগৃহের প্রকোষ্ঠে

কোয়ান্নন‌দেবীর বিরাট্ মূর্ত্তি

প্রকোষ্ঠে দেখিলাম, একস্থানে জোদো এন্‌কো'র মূর্ত্তি দেখা গেল।

জাপানী বৌদ্ধমন্দিরের কোথাও দৈন্য, বা ক্ষুদ্রত্ব,

পিত্তলের ফিনিক্স্ পক্ষী

দেখিলাম না। প্রাচীন মিশরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যে বিপুলতা ও প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাই, মধ্যযুগের জাপানীরাও সেই বিপুলতা ও প্রাচুর্য্যের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছিল।

জাপানী বৌদ্ধমন্দিরের আবেষ্টনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি লক্ষ্য করিয়াছি—

(১) দ্বিতল ফটক;

(২) ঘণ্টা-গৃহ;

(৩) প্রধান মন্দির;

(৪) সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক সাধু, বা ধর্ম্মপ্রচারকের গৃহ,

(৫) প্যাগোডা, বা স্মৃতিস্তম্ভ বা, প্রবর্ত্তকের সমাধি,

(৬) গ্রন্থশালা;

(৭) পুরোহিত গৃহ;

(৮) চৌবাচ্চা এবং প্রস্তরদীপ;

(৯) সাধারণ কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য ঘর—রন্ধনশালা ইত্যাদি;

(১০) ঢাকীর ঘর।

একটা মন্দিরে বিরাট্ বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত; ইহার নাম দাইবুৎসু—'দাই' শব্দের অর্থ "মহা" এবং 'বুৎসু' শব্দ "বুদ্ধ" শব্দের জাপানী রূপ। এই মন্দিরে কোয়ান্নন‌দেবীর বহু চিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। দাইবুৎসুর মস্তক, কণ্ঠ এবং বক্ষস্থল মাত্র আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হিদেয়শি এই "বষ্ট" নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

(৫) জাপানী বাগান

বয়োবৃদ্ধ "গেন্‌রো" কাউণ্ট ওকুমার সঙ্গে আলাপ করা যেমন পর্য্যাটকমাত্রেরই একটা সখ, সেইরূপ তাঁহার ওয়াসেদা

ভবনের বাগান-দেখিতে আসাও বিদেশীয় 'টুরিষ্ট'দিগের একটা কার্য্যবিশেষ। শিবাপার্ক, উয়েনো পার্ক-ইত্যাদি বড়-বড় সরকারী উদ্যানের পরেই ওকুমার বাগান টোকিওতে প্রসিদ্ধ। জাপানের প্রত্যেক ধনীগৃহেই একটা করিয়া ছোট, বড় বা মাঝারি বাগান আছে। কাকেমনো, কিয়োমনো-ইত্যাদির ন্যায়, বাগানও জাপানী জীবনের একটা বিশেষত্ব।

নৌকাকৃতি 'পাইন্' বৃক্ষ

উদ্যান-রচনা জাপানে একটা কলা-বিশেষ। সুকুমার-শিল্পের অন্তর্গত। কাকেমনোর উপর চিত্রকরগণ যে বিন্যাস পরিচয় দেন, ভূমির উপর উদ্যান রচয়িতারা সেই বিন্যাসেরই পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জাপানের বাগান-গুলি দেখিলে চিত্রাঙ্কনের সৌষ্ঠব, সামঞ্জস্য এবং নৈপুণ্যই চোখে পড়ে। মনে হয়—যেন চিত্রশিল্পীরা গাছ, লতাপাতা পাথর-সুরকি, খাল-ঢিপি, ভিটা-ইত্যাদির দ্বারা মাটির উপর চিত্র-অঙ্কন করিয়াছেন। কাকেমনোর উপর অঙ্কন এবং বর্ণ-সমাবেশের যে যত্ন দেখিতে পাই, জাপানী উদ্যান-সমূহেও ঠিক সেই ধরণের সাজান-গুছান দেখিতে পাই।

এইসকল বাগানে, ক্ষুদ্র-আয়তনের ভিতর, বিরাট্ প্রকৃতির প্রতিকৃতি যথাসাধ্য সমাবেশিত করা হয়। নদী, ঝরণা, হ্রদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলভাগ, বাগানের মধ্যে রাখিতেই হইবে। পাহাড়, উপত্যকা, পার্ব্বত্যপথ ইত্যাদিও একান্ত আবশ্যক। সকলপ্রকার উদ্ভিদ্ যত্নসহকারে যথাস্থানে রক্ষিত হইয়া থাকে। জাপানীরা বৃহদাকার তরুসমূহের বামনরূপ প্রস্তুত করিতে বিশেষপারদর্শী। প্রত্যেক বাগানে এইরূপ dwarf trees অনেক দেখিতে পাই। বাড়ীঘরের আসবাবের মধ্যেও বামন বৃক্ষের সারি দেখিয়াছি।

অন্যান্যদেশের লোকেরা উদ্ভিদসমূহ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আকারে সাজাইয়া থাকে; কিন্তু জাপানীরা এইরূপ মাপজোক ভালবাসে না—তাহারা যথাসম্ভব প্রাকৃতিক সমাবেশই পছন্দ করে। বাগানে মানুষের হাত আছে, ইহা জানিতে না দেওয়াই জাপানী উদ্যানশিল্পীদিগের লক্ষ্য।

কোন কোন উদ্যানে প্যাগোডাগৃহ নির্ম্মিত হয়—ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর সেতু নির্ম্মাণকরারদিকেও উদ্যান-রচয়িতাদিগের ঝোঁক থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রস্তর-দীপের সারি প্রায় সকলবাগানেই দেখা যায়।

জাপানী উদ্যান সম্বন্ধে 'Impressions of Japanese Architecture' গ্রন্থে Cram লিখিয়াছেন—

"A picture always, you must note: line, texture, form and colour, all are duly and delicately considered, and a space of garden is composed with all the laborious study that goes to the making of a screen or kakemono."

উদ্যানরচনা-রীতি, অন্যান্য সকলশিল্পের ন্যায়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল। জাপানের সকলমন্দিরের আবেষ্টনই এক-একটা সুন্দর উদ্যান। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ জাপানের সর্ব্বপ্রথম উদ্যানরচয়িতা ও মালী ছিলেন। ক্রমশঃ, সাধারণগৃহের সঙ্গে, বাগান-তৈয়ারি করা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই বিদ্যাটা সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আশিকাগা-যুগে উদ্যানরচনা ডাই-মোদিগের একটা বিলাসে পরিণত হয়। চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে "ইকেবানা", বা "পুষ্পশৃঙ্গার", "নো-নাটক", "চা-নই", বা চামঙ্গল-ইত্যাদি নানাপ্রকার কলাবিদ্যার সঙ্গে, উদ্যান-রচনাও সমাজের ভিতর স্থায়ীঘর করিয়া বসে।

বস্তুতঃ, বর্ত্তমানকালে জাপানে যেসকল আদব-কায়দা, রীতিনীতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার-ইত্যাদি দেখিতেছি, সেগুলি সবই আশিকাগা শোগুনদিগের-আমলে এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। একটা বিশেষকথা এই যে, এই যুগেই চিত্র-শিল্পী সে-শু তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যবিষয়ক চিত্রসমূহ অঙ্কন করিয়াছিলেন। Landscape gardening এর সঙ্গে landscape artist এর প্রাদুর্ভাব—স্বাভাবিক নহে কি ?

আশিকাগা-যুগের একটা বাগান দেখিবার জন্য, সহর ছাড়াইয়া, বহুদূরে যাইতে হইল। কুমড়ার ক্ষেত এবং বাঁশের ঝোপের ভিতর দিয়া 'রিকশ' চলিল। বাগানের ভিতর কতকগুলিগৃহে প্রাচীনচিত্র দেখিতে পাইলাম। বিখ্যাত চিত্রকরগণের কার্য্য কাকেমনোতে, অথবা কাগজের প্রাচীরে, সন্নিবেশিত রহিয়াছে। পাখী, উদ্ভিদ্, চীনা দার্শনিক কনফিউশিয়াস, বুদ্ধ, লেওজ-ইত্যাদির চিত্র দেখা গেল। আশিকাগা-শোগুনদিগের হস্তলিপি, এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত কোন কোন দ্রব্যও, এই সকল প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হয়।

জাপানের হোমর-কবি—শিতো-সাবোর একটা কাষ্ঠমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। প্রদর্শক বলিলেন, ইহা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। একটা পিত্তলের ফিনিক্স পক্ষী দেখা গেল। প্রদর্শক বলিলেন, "এই বাগানে একটা সোণার মন্দির, বা 'কিঙ্কাকু', আছে। তাহার শিরোভাগে এই পাখীটি ছিল। ইহা ৫২০ বৎসরের পুরাতন।" এই সকল বস্তু দেখিতে-দেখিতে বারান্দায় আসিলাম। একটা কিম্ভূত-কিমাকার পাইনগাছ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, এমনসময়ে বাগানের একব্যক্তি বলিলেন, "গাছটাকে নৌকার আকৃতি-অনুসারে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। নিম্নভাগের শাখা-প্রশাখাগুলিতে এই জন্য বিশেষরূপে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া রাখা হইয়াছে। এই গাছটাও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর।"

এইসকল দেখিয়া, "কিঙ্কাকু"র নিকট আসিলাম। এই প্যাগোডা-ভবনের ভিতরকার ছাদ সোণালিবর্ণে রঞ্জিত। অমৃতসরের স্বর্ণমণ্ডিত শিখমন্দিরের সঙ্গে এই জাপানী Golden Pavilion-এর তুলনা করা চলে না। ঘরটা ত্রিতল—প্রথম ও দ্বিতীয়তলে বুদ্ধ ও কোয়ানোন-ইত্যাদির মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রথমতলে আশিকাগা যোশিমিৎসু সন্ন্যাসিবেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন—এইরূপ একটা কাষ্ঠমূর্ত্তি দেখিলাম। ইনিই এই প্যাগোডা এবং উদ্যান রচনা করাইয়াছিলেন (১৩৯৭ খৃঃ)।

কিঙ্কাকু একটা ক্ষুদ্রপুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত। ইহার বারান্দা হইতে বাগানটা বেশ সুন্দর দেখা যায়। শুনিলাম, এইখানে বসিয়া শোগুনেরা নাকি আকাশের চাঁদ দেখিতেন।

জাপানী বাগান—কিঙ্কাক-ভবন

এখান হইতে ঠিক সম্মুখে একটা পর্ব্বত দেখা যায়। প্রদর্শক বলিলেন, "একজন সম্রাটের আদেশ অনুসারে ঐ পাহাড়কে একবার গ্রীষ্মকালে রেশমাবৃত করা হইয়াছিল। শীতকালে বরফ পড়িয়া পাহাড়কে শুভ্রবর্ণ প্রদান করে—রেশমের শুভ্র আবরণে পাহাড় গ্রীষ্মকালে শীতঋতুর কথা স্মরণ করাইয়া দিত—এইজন্যই মিকাডোর ঐরূপ আদেশ।" ভারতীয় নবাব ওয়াজেদ আলি সা-ইত্যাদি এই ধরণের সৌখীন ছিলেন।

কিঙ্কাকু হইতে মুঠো মুঠো গোধুম পুষ্করিণীর জলে ফেলিতে লাগিলাম। তৎক্ষণাৎ মহা-উল্লাসের সহিত সহস্র সহস্র নানাবর্ণশোভিত রুই, কাৎলা ইত্যাদি মাছ—সেইগুলি খাইতে আসিল। এই দৃশ্য অতি চমৎকার।

বাগানের একঅংশে কয়েকটা ক্ষুদ্রগৃহ রহিয়াছে। তাহার ভিতর "চা-নউ", বা চা-মঙ্গল, অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদর্শকের সঙ্গে সেইঘরে প্রবেশ করিয়া আনুষ্ঠানিক চা তৈয়ারি দেখিলাম। চা গুঁড়া করা হইতে বাটিতে ঢালিয়া পরিবেষণ করা পর্যান্ত—সকল কাযসম্বন্ধেই বাধা-নিয়ম আছে।—এমন কি, কোন ব্যক্তি কোথায় বসিয়া কিরূপভাবে চা পান করিবে, তাহারও নিয়ম আছে। এইসকল কার্য্যের জন্য বিশেষপ্রকার গৃহও নির্ম্মিত হয়। জাপানী ধনাগৃহে 'চা-নউ'র জন্য স্বতন্ত্রপ্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কিঙ্কাকু ইত্যাদি ভবন এবং উদ্যানে আশিকাগা শোগুণ অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া চিত্র আনাইয়া তিনি তাহার প্রাসাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতেন। কিঙ্কাকু বাগানে য়োশিমিৎসু কিরূপ বিলাসভোগ করিতেন, Capt. Brinkley প্রণীত 'History of the Japanese People' গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় দিতেছি—

বিলাসী শোগুন আশিকাগা য়োশিমিৎসু

"Yoshimitsu prayed the Emperor to visit this unprecedentedly beautiful retreat and Go-Komatsu complied. During twenty days a perpetual round of pastimes was devised for the entertainment of the Sovereign and the Court nobles—couplet-composing, music, foot-ball, boating, dancing and feasting. All this was typical of the life Yoshimitsu led after his resignation of the Shogun's office Pleasure trips engrossed his attention—trips to Ise, to Yamato and so forth. He set the example of luxury, and it found followers on the part of all who aimed at being counted fashionable."

(৬) রেশমের কারবার

টোকিওতে 'নিশিমরা কোম্পানী'র দোকানে রেশমের উপর নানাপ্রকার সেলাইকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সুকুমার শিল্পের প্রধান কেন্দ্র কিয়োটো। এইখানে নিশিমরা কোম্পানীর কারখানা এবং প্রধান আফিস অবস্থিত।

কেবল রেশম-শিল্প কেন, জাপানের সকলপ্রকার "স্বদেশী" শিল্পই কিয়োটোতে গড়িয়া উঠিয়াছে। একহাজার বৎসর ধরিয়া যে নগর দেশের রাজধানী ছিল, তাহার আশ্রয়ে—চিত্রকর হইতে মালাকর পর্য্যন্ত—সকল-শিল্পীই সংরক্ষিত হইবার কথা। 'জাপানীর জাপান' বুঝিতে হইলে, এই কিয়োটোতেই আড্ডাগাড়া আবশ্যক।

কিয়োটোর অদূরে নারা এবং ওসাকা। ওসাকার প্রাচীন নাম নানিয়া। এই তিন নগরের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের জাপানী জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অক্সফোর্ডের 'ক্লারেণ্ডন প্রেস' হইতে 'A Hundred Verses from Old Japan' নামক একখানা পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে একজন কবি, সপ্তমশতাব্দী হইতে তাহার সময় পর্য্যন্ত, জাপানী কবিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ক্লারেণ্ডন প্রেসের সেই সঙ্কলন, ইংরাজী অনুবাদসহ, প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিতর, কবিতাবলীর উপযুক্ত, প্রাচীন চিত্রও আছে। এই সকল প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় কিয়োটো, নারা এবং ওসাকার সমাজই চিত্রিত রহিয়াছে। একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"Short as the joints of bamboo reeds
That grow beside the Sea

On pebble beach at Naniwa,
I hope the time may be,
When thou art away from me."

কিয়োটোর আব-হাওয়ায় না-আসিলে,জাপানীর জাপান সম্যক্‌ বুঝা যায় না। দশ-এগারবৎসর পূর্ব্বে একজন ইয়াঙ্কি-রমণী জাপানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তখন, রেলের প্রতাপ, আজকালকার মত বেশী ছিল না। রিকশতে জাপান-ভ্রমণ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তখনকার কিয়োটো সম্বন্ধে একথা বিশেষরূপেই প্রয়োজ্য। তাঁহার 'Jin-rikisha-Days' গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"Kioto remains the home of the arts, although no longer the seat of the government. For centuries it ministered to the luxury of the two courts, which gathered together and enlarged lists of artists and artsans, whose descendants, live and work in the old home Kioto silks and crapes, Kioto fans, porcelains, bronzes, lacquer, * * * and embroideries preserve their quality and fame and are dearer and better than any other."

বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা যাহা—জাপানের কিয়োটোও তাহা। কলিকাতা দেখিলে স্বদেশী-ভারত বুঝা যায় না; সেইরূপ টোকিও মাত্র দেখিলে স্বদেশী-জাপানের জীবনী-শক্তি ধরিতে পারা সুকঠিন।

'নিশিমুরা কোম্পানী'র কারখানাগুলিতে অনেকক্ষণ কাটাইলাম। রেশমের উপর রং-লাগান এবং চিত্র-আঁকা দেখিয়া, Embroidery ও Needle-work দেখিতে লাগিলাম। অল্পবয়স্ক যুবকগণ অতিশয় উচ্চ-অঙ্গের কার্য্য করিতেছে। ইহারা সকলেই কাগজের উপর চিত্র-আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। সরু সূঁচের সাহায্যে সেলাই এরূপ দক্ষতার সহিত হইতেছে, যে মনে হয় যেন রেশমের উপর চিত্রই অঙ্কিত হইতেছে। জীবজন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য-ইত্যাদি নানাবিষয়ের প্রতিকৃতি অর্দ্ধ-প্রস্তুত দেখিতে পাইলাম। কোন যুবক সমুদ্রের তরঙ্গ প্রকাশ করিতে ওস্তাদ, কোন ওস্তাদ সিংহ-সেলাই করিতে সুনিপুণ। নানাবর্ণের রেশমী সূতা চূড়ান্ত সামঞ্জস্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। যেন দর্শকমাত্রেই প্রকৃত সমুদ্রের ফেনিল অম্বুরাশির সম্মুখীন, অথবা জীবন্ত সিংহের চক্ষু ও লোম যেন তাহার মূর্ত্তি ঝলসিয়া দিতেছে। দোকানের ম্যানেজর বলিলেন—"আমরা ভারতীয় কারিগর পাইলে, তাহাদিগকে এই বিদ্যাশিখাইতে প্রস্তুত আছি। অন্ততঃ পাঁচবৎসরকাল সাগ্‌রিদী না-করিলে কেহ এই শিল্পে পারদর্শী হইতে পারিবে না।"

'দোশিসা'-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি—শ্রীযুক্ত হারাদা

জাপানের রেশমী "কারচুপী", বা সেলাই-শিল্প, সম্বন্ধে ইয়াঙ্কি রমণী লিখিয়াছেন—

"Their range of stitches, their ingenious methods and combinations, and the variety of effects attained with the needle and a few strands of coloured silk, easily place the Japanese first among all embroiderer. * They can simulate the hair and fur of animals plumage of birds, the hard scales of fishes and dragons, the bloom on fruits, the dew on flowers, the muscles of bodies, tin faces and hands, the patterned folds of

drapery, the clear reflection of lacquer, the glaze of porcelains, and the patina of bronzes in a way impossible to any but the Japanese hand and needle. * * * A needle-worker attains every colour-effect of the painter."

রেশম-কীট পালন এবং তুঁতের চাষ জাপানে বহুকাল অবধি চলিতেছে। ভারতবাসী এবিষয়ে জাপানীর পশ্চাৎপদ নহেন। তবে জাপানীরা ১৫।২০ বৎসর হইল নব্য ইয়োরামেরিকার কল-যন্ত্র-ইত্যাদির ব্যবহার সুরু করিয়াছে। ভারতবর্ষে "পোলু" পোষা এবং রেশমের "ঘানি" মামুলি কায়দায়ই চলিতেছে। অবশ্য, জাপানে এখনও এই সনাতন পন্থা অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

নব্য রেশমশিল্পের কার্য্যপ্রণালী এবং যন্ত্রাদি জাপানীরা ফরাসীদেশ হইতে আমদানি করিয়াছে। বলা বাহুল্য, স্বয়ং গবর্মেণ্ট এই ব্যাপারের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপানের Imperial Sericultural Institute হইতে 'Sericultural Investigations' নামক একখানা গ্রন্থাকার গ্রন্থ ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ২৫ বৎসরের ভিতর জাপানে আধুনিক রেশমশিল্পের ক্রমবিকাশ কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিবৃত আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থে নব্য-রেশম-বিজ্ঞান এবং রেশমশিল্পসম্বন্ধে সকলপ্রকার তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। অধ্যায়গুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

1. General Sketch on Silk-worm Rearing and Filature.
2. Experiments on Mulberry Cultivation.
3. Experiments on Silk-worm Rearing.
4. Physiological Researches and Pathological Researches on Silk-worm.
5. Experiments on Filature.

কিয়োটোর Sericultuaral Institute-এর তুঁত-ক্ষেত্র, রেশম-মিউজিয়ম, ল্যাবরেটরি এবং কারখানাগুলির ভিতর একজন কর্ম্মচারী লইয়া গেলেন। নূতন-কিছু দেখিবার নাই; তবে, লিখিবার কথা এবং ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিবার জিনিষ অনেকই আছে। এইধরণের কারখানা, অনুসন্ধানালয় এবং পরীক্ষাগৃহ-ইত্যাদি যত দেখিতেছি, ততই ভাবিতেছি—অভিভাবক ও সংরক্ষকের সাহায্য না পাইলে, কোনদেশের লোকই নূতন-নূতন পথে অগ্রসর ও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।—ভারতীয়শিল্পের সংরক্ষক ও অভিভাবক কোথায়?

(৭) একদিনের বৃত্তান্ত

জাপানী খৃষ্টানদিগের তত্ত্বাবধানে কিয়োটোতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তাহার নাম "দোশিশা"। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত হারাদা ৭বৎসর পূর্ব্বে একবার ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষা-বিভাগে হারাদার সঙ্গে দেখা হইল। জাপানী খৃষ্টানেরা তাঁহাদের জাতীয়স্বভাব কোন বিষয়েই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। কথাবার্ত্তায়, চালচলনে এবং আদব কায়দায় কোন জাপানীকে দেখিয়া তিনি বৌদ্ধ, কি শিন্টো মতাবলম্বী, কি খৃষ্টান, বুঝা যায় না। খৃষ্টধর্ম্ম জাপানে পরকীয় সভ্যতার অধীনতা প্রবর্ত্তন করে নাই। বরং, ইয়োরামেরিকার ধর্ম্মপরিষৎসমূহের সঙ্গে এখনপর্য্যন্ত জাপানী গির্জ্জাসমূহের যতটুকু বাধ্য বাধকতার সম্বন্ধ রহিয়াছে – তাহাও ছিন্ন করিবার চেষ্টা জাপানে অত্যন্ত প্রবল। টোকিওর প্রধান খৃষ্টান প্রচারক শ্রীযুক্ত এবিনার ন্যায়, অধ্যাপক হারাদাও শীঘ্রই জাপানী খৃষ্টধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আশা করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "চীনের খৃষ্টান সমাজও শীঘ্রই ইয়োরামেরিকার পরিষৎ-সমূহের অধীনতা-প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে কি?" হারাদা বলিলেন—"চীনা-খৃষ্টানেরা এখনও স্বদেশী-অর্থে চীনের ভিতর গির্জ্জা ও পরিষৎ স্থাপন করিতে পারেন নাই। কাজেই, বিদেশীয় প্রভাব ও আধিপত্য এড়ান, চীনাদেরপক্ষে কিছুকাল অসাধ্য।" প্রাচ্যজগতে, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার করিয়া, পাশ্চাত্যেরা তাঁহাদের ক্ষমতা বিস্তারের সাহায্য পান; ধর্ম্মপ্রচার তাঁহাদের রাষ্ট্রীয়-অধিকার বাড়াইবার উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জাপান 'ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়র'—কাজেই জাপানী খৃষ্টসমাজে পরাধীনতা সহ্য হইবে কেন? বিদেশ হইতে ধর্ম্ম-আমদানী করিলেই, বিদেশের অধীনতা-স্বীকার করিতে হয় না – জাপানী-ইতিহাসের প্রত্যেকযুগেই এই সত্য প্রচারিত।

ওসাকা হইতে একজন ব্যবসায়ী হোটেলে আসিয়া দেখা করিলেন। ইনি ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী—গ্র্যাজুয়েট। ইঁহার পিতামহ তোকুগাওয়া-যুগে একজন প্রসিদ্ধ প্রদেশ-শাসক ছিলেন। বর্ত্তমানে ইঁহার পরিবারস্থ লোকজন বড়-বড় শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ের মালিক। যুবক স্বয়ং আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে লাগিয়াছেন।

যুবকের সঙ্গে তিনচারিটা ফ্যাক্টরি দেখিতে বাহির হইলাম। কোন কোন কারখানার মালিক ইঁহার আত্মীয়। 'রামি'-নামক একপ্রকার চীনা-উদ্ভিদের ছাল হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার কল দেখা গেল। এই সূতার কাপড়ও কলের তাঁতে প্রস্তুত হইতেছে—বয়ন-ফ্যাক্টরির কলযন্ত্র এবং কার্য্যপ্রণালী তুলা-লিনেন-ইত্যাদিসম্বন্ধে যেরূপ, রামি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

চীনামাটির কাজ দেখিবার জন্য যুবক কিয়োটোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানায় লইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব এই কারখানা হইতে দুইজন জাপানী-কারিগরকে আমাদের দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এখানে কিছুকাল কাজ শিখিয়াছেন, শুনিলাম। পাথর-গুঁড়া করা হইতে কলাই-করা বাসনের উপর রং লাগান পর্য্যন্ত, সকল কার্য্যপ্রণালী দেখা গেল। আমাদের স্বদেশীবিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে বৃন্দাবনের "প্রেম-মহাবিদ্যালয়ে" আধুনিক Ceramics-বিদ্যা শিখান হইয়া থাকে। জাপানে শিক্ষা-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদার গোয়ালিয়র-রাজ্যে একটা সরকারী-কারখানা খুলিয়াছেন।

কারখানার মালিক শ্রীযুক্ত হিরায়োকা, সকলবিভাগ তন্ন-তন্ন করিয়া দেখাইলেন। একটা সংগ্রহালয় দেখিলাম —ইহার ভিতর দুনিয়ার প্রত্যেকদেশ হইতে আনীত চীনামাটির কাজ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যসুন্দর দেবের তৈয়ারি একটা ব্রাকেটও দেখিলাম। হিরায়োকা বলিলেন —"ডেনমার্কের কারিগরেরা রংএর ব্যবহারে, বিশেষ-পারদর্শী।"

নানাপ্রকার গল্পের সঙ্গে হিরায়োকার চা-নউ-গৃহে সান্ধ্য-ভোজন করা গেল। ইঁহার পত্নী বাহিরে গিয়াছেন বলিয়া অতিথি-সৎকার করিতে পারিলেন না, হিরায়োকা এইজন্য দুঃখ জানাইলেন।

(৮) আরাশিয়ামা পাহাড়ে স্রোতস্বতী

সেদিন কিয়োটোর পূর্ব্বপ্রাচীর-স্বরূপ পাহাড়ের অপর-পারে বিয়াহ্রদ দেখিয়াছি। আজ বিকালে পশ্চিমসীমা-স্থিত পাহাড়ের পাদদেশ দেখিতে যাইতেছি। এই পাহাড়ের নাম আরাশিয়ামা।

কুমড়া, কচু, ধান-ইত্যাদির ক্ষেত দেখিতে-দেখিতে ট্রামের ভিতর ঘণ্টাখানেক সময় কাটাইলাম। ক্রমশঃ নিবিড় বাঁশবনের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিল; সন্ধ্যাকালে একটা ঘাটের ধারে উপস্থিত হইল। কতকগুলি ছোট-বড়-মাঝারি গৃহ এবং সরাই—নদীর কিনারার রাস্তায় অবস্থিত। রাস্তার উপর চৌকি-পাতা রহিয়াছে; কোন কোনটায় লোক উপবিষ্ট। ঘাটে-ঘাটে নৌকাবাধা—কতকগুলি নৌকার উপর সাধারণের বসিবার জন্য আসন দেখিতে পাইলাম। অপর-পারেও এইরূপ—চৌকি, চা-গৃহ সেতুপার হইয়া অপর-পারে গেলাম না। নদী এখানে বেশীগভীর এইজন্য স্রোতস্বতীর কল-কলনিনাদ অনেকটা নির্ঝরের মত শুনিতে পাইতেছি।

একখানা নৌকাভাড়া করিয়া জলে ভাসিলাম। সু- পরিষ্কার জল; কিন্তু গভীরতা অতিশয় অল্প। নানানৌকায় নানালোক নদীর উপর শীতলবায়ুসেবন করিতেছে নদীর ভিতর মাঝে-মাঝে বিশালপ্রস্তরখণ্ড এবং দুইধারে উচ্চপর্ব্বত। পর্ব্বতমালাদ্বয় নানাবৃক্ষে সমাবৃত। প্রধানতঃ পাইন এবং ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছই চোখে পড়িল। কি দো-ভাষী বলিলেন—"এইসকল পাহাড়ে প্রাচীনযুগে শোগুন এবং মিকাডোরা চেরি-তরু এবং অন্যান্য বৃক্ষ লাগাইয়াছেন। স্রোতস্বতী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। তরুসমাচ্ছাদি উচ্চপর্ব্বতের শিরোদেশ যেন আকাশে মিশিয়াছে, মনে হয়। ফলতঃ, সবুজউদ্ভিদের ছায়ায় জলের বর্ণ ঘোরতর সবুজ হইয়া পড়িয়াছে। নদীর গতি কিছু বক্র—এই জ অল্পদূর নৌকাবাহিয়া গেলেই চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টি হ্রদের ভিতর ভাসিতেছি, বোধ হয়। গতবৎসর, আসে বোনে নাইল-নদীর উপর বেড়াইবার সময় বক্রগতি নদী এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু দক্ষিণ-মিশরের পর্ব্বত সমূহ কৃষ্ণ'গ্রাণাইট্'ময় আর জাপানের আরাশিয়ামা হরিৎ তরুকুঞ্জে সুশোভিত।

এই নদীর ধারে মিকাডোর একটা প্রাসাদ আছে

উহা সময়ে-সময়ে গ্রীষ্মভবনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তোকু-গাওয়া-যুগে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দোভাষী বলিলেন, "বিরাট্ প্রাসাদের রীতিতে এই গৃহনির্ম্মিত হয় নাই ক্ষুদ্র চা-নউ-গৃহের নিয়মে এই গ্রীষ্মভবন রচিত।"

নৌকায় বসিয়া কোন-কোন মাঝি মাছ ধরিতেছে। পাহাড়ের গায়ে একটা রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। নৌকা হইতে দুইখানা গাড়ী যাইতে দেখিলাম। একটা সরাইয়ের লোক আসিয়া নৌকায় আহার্য্য দিয়া গেল—ভাত, বেগুন ভাজা, শঁসা এবং দুগ্ধহীন জাপানী চা পাইলাম।

নদীতে উজান বাহিয়া সাতমাইল গেলে, জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। অতদূর অগ্রসর হইবার সময় নাই।

কিয়োটাতে দিনে যেরূপ গরম, রাত্রেও সেইরূপই দেখিতেছি। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালের রাত্রে রাস্তায়, বারান্দায়, রোয়াকে, ঘরের ভিতরে, বাহিরে, উঠানে জল-ছিটাইয়া, অথবা ঢালিয়া, ঠাণ্ডা করিতে হয়; তাহার পর, চৌকি, অথবা ফরাস, পাতিয়া, খালিগায়ে শুইয়া বসিয়া সময়-কাটাইতে হয়। জাপানীদিগকেও এইকয়দিন রাত্রি-কালে ঠিক সেইরূপে জীবনযাপন করিতে দেখিতেছি। দিবাভাগে নগরের দৃশ্যও ভারতবাসীর পরিচিত। দরজা-বন্ধ করিয়া, ঝাঁপের আড়ালে, অথবা পর্দ্দা লটকাইয়া, নানা-উপায়ে, সূর্য্যতাপহইতে ঘরকে রক্ষা করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া হাতপাখার ব্যবহার চলিতে থাকে। "পাখা ধরে ধরে হাতব্যথা করে, তবু ঘামঝরে—নিস্তার নাই।" একটা মন্দিরে দেখিলাম, একজন পুরোহিত যোগাসনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন—আর ডাহিন হাতে পাখাও চালাইতেছেন!

কালী পূজা

[শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী]

কোমল কুসুম করিয়া চয়ন যুগলচরণ দিব, মা, মণ্ডি',
এস, মা! আবার ধরার বক্ষে মুক্ত-চিকুরে, এস, মা চণ্ডি।
তোমার চরণ আশীষ পাইলে কে চাহে জননি দেবের স্বর্গ?
ধর, মা! আজিকে, বিশ্ব জননী, বিল্বপত্র শোভিত অর্ঘ্য।
বিশ্ব ব্যাপিয়া ভয়দ তিমির—অন্তরে আজ একি আনন্দ!
জগৎ-জুড়িয়া যেন গো বাজিছে মধুর-রাগিণী মধুর ছন্দ।

বাম-উর্দ্ধে শোভিছে কৃপাণ—অসুর শোণিতে হইয়া সিক্ত,
নিম্ন-হস্তে দুলিছে নৃশির—কিংশুক সম রুধির লিপ্ত।
সন্তানগণে, জগৎজননি! অভয়বরদা হ'য়েছ দক্ষে;
শোণিত-লিপ্ত নরশির হার, জননি, তোমার দুলিছে বক্ষে;
চরণে পতিত পতি—মহাকাল—ধূলায় লুটায় ধবল-কান্তি
এস মা জননি! অমার তিমিরে বিতর বিশ্বে বিমল-শান্তি।

নীলিম মাঝারে নমে সমীরণ, কাঁপাইয়া তরু লতিকাপর্ণে;
নীলিম জগতে, জননি আমার এসেছ, মা, তুমি নীলিম বর্ণে।
কুন্তলজাল দিয়েছ এলায়ে—ডাকিনী যোগিনী নাচিছে সঙ্গে—
উল্লাসময় অতুল শঙ্খ বাজিছে আবার দুখিনী বঙ্গে।
অমার আঁধারে হৃদয় লুকায়ে কুসুম বিতরে মধুর গন্ধে
হরষে মানব-সন্তান তব মহান্-মন্ত্রে চরণ বন্দে।

ভাবনা কিসের—কিসের নিন্দা—জননীর কাছে লইতে ভিক্ষা?
বিতর, জননি, আবার মানবে শক্তি মন্ত্রে অতুল দীক্ষা!
চরণের রেণু বিতর শীর্ষে—মানস-বাসনা কর, মা, সিদ্ধি;
বিতর, জননি, শ্রী অতুলনীয়—বিতর কীর্ত্তি—বিতর ঋদ্ধি।
দেব-বন্দিতা, বিশ্ব-জননি, আবার যখন এসেছ বিশ্বে,
হাস্যুক তখন আবার ধরণী, চরণ-কমল ধরিয়া শীর্ষে।

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১৭)

একদিন হ্যারিসন রোডের এক দ্বিতল মেসের বাসায় বেহারীরও সাধনার সিদ্ধি মিলিল। সেই বাসায়, এক নিরভিভাবক জমিদার-সন্তানের খবর পাইয়া, সে পূর্ণোৎসাহে সিঁড়ি উঠিয়া, এক মজলিসের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছিল। অভিভাবকশূন্য ছেলে কলিকাতায় বড় কমজম নেই—সেই সংখ্যাটাই বরং যেন মাত্রায় কিছুবেশী। কিন্তু তাহাদের ভাত-কাপড়ের অভিভাবক না থাকিলেও, বরকর্ত্তার অভাব নাই—আর, তাহারা সবাই তো আর বেহারীর 'দিদিমণির' যোগ্য নয়; কাজেই, বেহারী সেসবদিকে তাকাইতেই পারে না। সে চায়—ছেলের বেশ একটু জমিদারী থাকিবে;—কারণ, নগদ টাকা তো আর কেহ তাহাকে গণিয়া দেখিতে দিবে না—সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া কোম্পানির কাগজও দেখাইবে না—ছেলেটি অন্ততঃ বি. এ.-ক্লাশের ছাত্র হইবে; তাহার গায়ের বর্ণ বেশ সাফ হইবে; মুখখানি হাসিভরা, অবার তাম্বুলরাগহীন; মুখ 'বাড়সাই'এর দুর্গন্ধ ও দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিহীন; এবং ডাগর চোকের দৃষ্টিটুকু দুধারের বারাণ্ডা জানালার প্রতি কটাক্ষবিহীন হইবে—ছেলেটি চোকে চশমা পরিবে না, কোঁকড়া-চুলের মধ্যভাগে সিঁথি চিরিবে না, বাসরে সে সঙ্গীতরসজ্ঞা শ্যালিকা-বৃন্দের নিকট গালি খাইবে, অথচ অমায়িকতার জন্য উচ্চশ্রেণীর নিকট প্রশংসালাভে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু এমন ছেলে প্রায় চোখেই পড়ে না। হয়ত, ছেলে বি.এ.ও পড়ে—জমিদারের ছেলেও বটে—গায়ের রঙেরও কিছু জলুষ দেখা যায়; কিন্তু মোটা রকম দর-হাঁকিবার জন্য তা'র বাপ বর্ত্তমান—না হয়, ছেলে চশমাও পরে, টেড়িও কাটে, শিস্ দিয়া গান গায়িয়া সমবয়সীর সহিত ইয়ারকি দিতেও কসুর করে না! বেহারীর চিত্ত বিমুখ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যায়—সে-ছেলের দিকে চাহিতেই আর তাহার প্রবৃত্তি থাকে না।

মাঝখান হইতে এককাণ্ড ঘটিয়া গেল! বেহারী যখন দেখিল—বরের বাপের দল, এক পঞ্চায়তীতে পরামর্শ করিয়াই যেন, সকলেমিলিয়া তাঁহাদের পুত্রদিগের একদর ধরিয়া রাখিয়াছেন—কাশীর কৌটার মত সবদোকানের দেকানীই, তাহার মাল বিকা'ক্ আর নাই বিকা'ক্, সেই সমান দর হাঁকিয়া বসিয়া আছে!—তোমার গরজ হয় কিন', না-হয় রাস্তা বড়ই সোজা। তুমি 'ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির' আমলের পুরাতন ঝুঁটি-বাঁধা রাণী মুখো টাকাই দাও, আর এই নূতনসালের চক্‌চকে ঝক্‌মকে পঞ্চমজর্জ্জের জোব্বা-মুকুটপরা টাকাই বাহির করো—দরটা কিছুই তফাৎ হইবে না। অবশ্য, শুধু—মেকিটা না হইলেই হইল—মেয়েটির সকল অঙ্গগুলি বজায় থাকিলেই চলিয়া যাইবে! আর তা যদি নাও-থাকে—তা'হ'লে টাকায় চারি-আনা হিসাবে 'বাটা' ধরিয়া দিলেই তা'ও সংসারে একান্ত অচল নয়! তবে সেটা তেমন সহজসাধ্য হইলে, যে এতদিনে দ্বিতীয় কাঞ্চন-জঙ্ঘাসদৃশ রজত জঙ্ঘার সৃষ্টি হইত! তখন, সেও ভাবিয়া-ভাবিয়া এক ফন্দি বাহির করিল।

যাহারা বাঘের মত, কনে'র অভিভাবকের রক্তশোষণ-চেষ্টায়, ওৎপাতিয়া বসিয়া থাকে, সেদিকে না-ঘেঁসিয়া—সে এক-একদিন ক্রোশকয়েক পথহাঁটিয়া, রেলষ্টেশনে গাড়ি চড়িয়া, বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর, কলিকাতার মেসে-হোষ্টেলে হাঁটিয়া-হাঁটিয়া তাহার পায়ের পাদুকায় তালির-পর-তালি চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল—নিরভিভাবক ছেলের সন্ধানই তাহার উদ্দেশ্য।

'সাধনাতেই সিদ্ধি'—এ চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ কথা! কিন্তু সে-সিদ্ধি—ঈশ্বরসিদ্ধি বা বেতালসিদ্ধি তার ঠিকানা কি? সে আবার সাধনার অনুপাতের উপরই নির্ভর করে; কারণ, "যাদৃশী সা না যস্য, সিদ্ধিও তো ভবতি তাদৃশী?"

এমনই করিয়া কতকগুলা যাত্রাকে ব্যর্থ করিয়া, আজ সে মাহেন্দ্রযোগ দেখিয়া—শ্রীবিষ্ণু স্মরণে—বাড়ীর বাহির হইয়াছে। দিনটাও সেদিন খুব ভাল —ধ্রুবযোগ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা। হাওড়া-ষ্টেশনে নামিয়া, ঘুরিয়া-ফিরিয়া হ্যারিসন রোড়ের লম্বা রাস্তায় অনেকদূর চলিবার পর, এই বড় বাড়ীখানা চোখে পড়িয়া গেল, এবং খবরটাও হঠাৎ যেমন মিলিয়া গেল, তেমন সদাসর্ব্বদা যায় না। ছেলেটি জমিদারের বটে, রূপেও ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক! বাপ-খুড়ার কোন লেঠা নাই, সবই ভাল; কেবল পাশই মোটে একটা! তা, বয়সও তেমন খুবই কাঁচা, সময় এখনও হাতে যথেষ্টই আছে। বেহারীর মনটা আহ্লাদে যেন নাচিয়া উঠিল—'তবে তো এই-ই তাহার দিদিমণির বর!' মনে কিছুমাত্র দ্বিধা না রাখিয়া, সে সরাসর উপরে উঠিয়া গেল।

সে যখন বামুনঠাকুরের কাছে সংবাদ-সংগ্রহ করিতেছিল, সেই সময়ে একটি যুবক, তাহারই পাশ-কাটাইয়া বাড়ী ঢুকিল, এবং একটুখানি দাঁড়াইয়া, তাহাদের কথাবার্ত্তা কাণ-পাতিয়া কিছুক্ষণ শুনিবার পরে, মৃদু হাসিয়া উপরে উঠিয়া চলিয়া গেল। নিজের ভাবেই ভোর বেহারি তাহা লক্ষ্যও করিল না।

বেহারী যখন হঠাৎ সেই অপরিচিত যুবকবৃন্দের মাঝখানে আসিয়া পড়িল, তখন সেখানে ঘরের মেঝেয় একটা সতরঞ্চ বিছাইয়া একদল সম-অসমবয়স্ক মেসের ছাত্র মিলিয়া 'ড্রাফ্‌ট্' ও 'ডোমিনো' খেলিতে ছিল। তাহারা খেলিতেছিল বটে; কিন্তু মনগুলা যে তাহাদের খেলার মধ্যেই খুব জমিয়া গিয়াছিল, এমন তো বোধ হয় না। সকলেরই ঠোঁটে ঠোঁটে একরকমের চাপাহাসি, চোখে-চোখে কি যেন একটা ইঙ্গিতেরও আদান-প্রদান চলিতেছিল! একটু আগেই তাহারা ফিস্-ফিস্ করিয়া কিসের যেন একটা পরামর্শ আঁটিতেছিল—বেহারীর সহসা-আগমনেই সবারই জিহ্বা নীরব হইয়া গেল! পরক্ষণেই এক সঙ্গেই দু'তিন জনে তাহাকে প্রশ্ন করিল, "কি চান্, ম'শাই?"

বেহারী, প্রথমটা যেমন নিশ্চিত সাহসে সিঁড়ির পথটা কাটাইয়া আসিয়াছে, এখানে একসঙ্গে এই এতগুলি যুবকের খরদৃষ্টির দ্রষ্টব্য হইতেই, তাহার সেই অকুণ্ঠিত উৎসাহ একটু দমিয়া গিয়াছিল। এমনই করিয়া অনেক বারই যে, সে এইদলের হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিয়াছে! কোন চৌর্য্য-চেষ্টার লক্ষণও, নাকি, তাহার ওই নিরীহ-মূর্ত্তির মধ্যে দেখা গিয়াছিল-বলিয়া, সন্দেহপ্রকাশও হইয়াছিল; তা' ভিন্ন, পুলিশের গোয়েন্দা-সন্দেহ তো অনেকেই করিয়াছেন। সেইসব কথা মনে পড়িতেই, সে যেন কেমন-থতমত খাইয়া গেল। হয়ত সেই-সাগর-ছেঁচা মাণিক জমিদার-পুত্রটি এবারও বা তাহার এই অবিমৃষ্যকারিতারূপ পাথারে তলাইয়া যায়! 'কিন্তু না, তা হইলে চলিবে না—এই সামনের বৈশাখে দিদিমণির বিবাহ দেওয়া চাই-ই—নহিলে পাড়াশুদ্ধ লোকের অনিদ্রা-রোগ জন্মিয়া গেল!' শাস্ত্র এবং দেশের আইন, এত লোকের ভীতিকর কার্য্যকরাকে—পাপ এবং অপরাধজনক বলিয়া থাকেন। সাহস করিয়া সে দ্বারের সম্মুখীন হইয়া, একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে, আমি কুসুম-গঞ্জের জমিদারবাবু—বিনয়বাবুর কাছে এসেছি।"

একটি যুবক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "বটে—বটে, তবে তো আপনি আমার কাছেই এসেছেন!—আমিই বিনয় কুমার—কুসুমগঞ্জের জমিদার।"

অপর-একজন, হাতের দান ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া-পড়িয়া, বেহারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনার কি কাজটা বলুন, দেখি?—আমারই নাম বিনয়।"

অপর ব্যক্তি হা—হা 'করিয়া হাসিয়া উঠিল' "তোমাদের যা' বিনয়, তা ব্যাভারেই প্রকাশই পাচ্চে বটে! ওহে ভদ্দরলোক! ওদের কথা তুমি শুনচো কেন? ওরা তোমায় ক্ষেপাচ্ছে—দেখচো না! বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমারই নাম, ম'শাই—যা বলিতে হয়, আমাকেই আপনি বলিতে পারেন।" তখন সেইঘরে যতগুলি ছেলে ছিল—ফরসা, ময়লা, শ্যামল, চশমাচোখ, খালি-চোক—সবাই-মিলিয়া, মহারোলে উঠিয়া আসিয়া, বেহারীকে বেষ্টন করিল; সবাই পরস্পরকে গালি দেয়, ঘুসি মারে, পরস্পরের কান-ধরিয়া টানিয়া সরাইয়া দিতে যায়; আর চেঁচামেচি করিয়া বলিতে থাকে, "বিনয়কুমার তুই কিরে গাধা! ওগো ঘটকঠাকুর! আমিই বিনয়।"

বেহারী দেখিল, এই ছেলেগুলির—সকলের মধ্যেই সেই অভিপ্সিত বস্তুটির নিতান্তই অভাব! মনে মনে, নাকেখত

দিয়া, সে প্রতিজ্ঞা করিল—'এমন কর্ম্ম আর কখন করিবে না!' এক "নলোদ্দেশে" আসিয়া, এ যে—পঞ্চনলের পরিবর্ত্তে, তাহার পঞ্চদশ নল যুটিয়া গেল! এখন ছাড়িয়া দিলে যে, সে কাঁদিয়া বাঁচে! এদের একজনের সঙ্গেও সে তাহার দিদিমণির বিবাহ-সম্বন্ধ করিতে প্রস্তুত নয়! ছিঃ! বাপের বয়সী বৃদ্ধকে যাহারা এমন নাকানি-চোবানি করিতে লজ্জাবোধ করে না, তাহারা আবার ভালছেলে? সে খুব গম্ভীর হইয়া কহিল, "না, মশাই, আপনাদের মধ্যে যিনিই কেন বিনয়বাবু হোন-না, তাঁর সঙ্গে আর আমার কোন দরকার নাই—আমি চলিলাম। ক্ষমা করিবেন—এমন ব্যাপার জান্‌লে, আমি আস্‌তাম না!"

চারিদিক হইতে তখন তুমুল বিদ্রূপ-হাস্য উত্থিত হইল; কেহ 'হুর্‌রে'-বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল কেহ বা "রাই পায়ে ধরি, বিনয় করি, ফিরিওনা মানভরে,"—বলিয়া সুর করিয়া গান হাঁকিয়া দিল। বেহারী ফিরিল।

"কি মশাই! ব্যাপার কি? আপনি কাকে খুঁজছিলেন?" বলিতে-বলিতে পাশের ঘর হইতে একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। এ বাড়ীর কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া, ইহাদের সকলের উপরেই বেহারীর কেমন একটা ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল;—আর একটা নূতন আপদ যুটিল, মনে করিয়া, সে, সেদিকে না-চাহিয়াই, আপন মনে হন্‌-হন্‌ করিয়া সিঁড়ির দিকে চলিল। ছেলেটি, তাহাকে অনুসরণ করিয়া, সবিনয়ে কহিতে লাগিল, "আমি ওপরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; গোলমালে হঠাৎ ঘুমভেঙ্গে উঠে শুনলাম—সবাই 'আমি বিনয়'-বলে চিৎকার করছে। আপনি কি বিনয়কে খুঁজিতে ছিলেন, না কি? তা যদি হয়, তাহলে আমায় বিশ্বাস করতে পারেন; তবে বল্‌তে পারি না, সে আর কোন বিনয়, কি না? আমার নাম বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাড়ী কুসুমগঞ্জে—প্রেসিডেন্সি কলেজের ফার্ষ্ট-ঈয়রের ছাত্র আমি।"

এবারকার, এ কথাগুলির মধ্যে রহস্যগন্ধ পাওয়া গেল না। বিনয়ের যোগ্য স্বর বটে! বেহারী, দাঁড়াইয়া পড়িয়া, পিছন ফিরিয়া দেখিল—গৌরকান্তি নধরগঠন একটি যুবক, তাহার মাথায় সিঁথি-কাটা নাই, চোকদুটি কাঁচ-অবগুণ্ঠনবিহীন, গায়ে ছিটের সার্ট, পরণে একখানি দামী শান্তিপুরে ধুতী—বড়লোকের ছেলে হওয়া অসম্ভব নয়!

আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আমি বাকুল থেকে একটি বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলাম; কিন্তু এবাড়ীতে আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না!—ভদ্রলোকের সঙ্গে যে লেখা-পড়া-শেখা ছেলেরা এমন ব্যবহার ক'রতে পারেন, এ জ্ঞান আমার ছিল না!—যা'হোক—একটা শিক্ষা হয়ে গেল!"

ছেলেটি বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।—মুখ নীচু করিয়া, চটিজুতাদ্বারা মাটি ঘসিতে-ঘসিতে, মৃদুমৃদুস্বরে কেবল বলিল, "পাঁচজন এক-বয়সি জুটিলেই আর ও'দের জ্ঞান-গম্য থাকে না! এইজন্যই তো আমার সঙ্গে ওদের বনিবনাও নাই। আমি একাই থাকি।"

সকলঅপমান যেন সেইমূহূর্ত্তে বেহারীর সার্থক হইয়া গেল।

পল্লীগ্রামে 'ঝিউড়ি-ছেলে', অর্থাৎ কি না, মেয়েদের, স্বাধীনতার আদিও ছিল না—অন্তও নাই!—তাহাদের অগম্যস্থানই সেই পল্লীজগতে নাই! ঘাটে-মাঠে-বাটে, এমন কি—হাটেও, কখন-কখনও তাহাদের শুভদর্শনলাভ ঘটিয়া থাকে। এ দেশের মেয়েরা মোটেই অসূর্য্যম্পশ্যা নহেন; স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব দেখিয়া যাহারা আকুল, তাহারা, আবার পল্লীজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্নবান হইলেই, সহজে অভিষ্টলাভ করিতে পারেন। সকালে উঠিয়া, গ্রামের মেয়েরা-বধূরা, বাসিপাট সারিয়া, সেই যে—কাঁখে-কলসি কাঁধে-গামছা—বাটীর বাহির হইবেন—মাঠ-পথ ভাঙ্গিয়া বাড়ী বাড়ী দলবাড়াইতে-বাড়াইতে কোথাও, ঝরিয়া-পড়া পাকা আমের উপর দিয়া, রাশিকৃত পাকা-তেঁতুল-আমড়া পদদলিত করিয়া, বনফুল তুলিয়া, লতাগুল্ম ছিঁড়িয়া, এই নারীবাহিনী হাস্যে-রহস্যে প্রভাতবায়ু ও দিগন্তবিস্তৃত স্বর্দ্ধ-আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া, জলে নামিল।—দিক্‌-চক্রবাল ছাড়িয়া যখন তরুণসূর্য্য তাঁহার যাত্রা-পথের প্রায় আধাআধি উঠিয়া আসিয়া, জলের মধ্যে ঝলকে-ঝলকে হীরামণির বাতি জ্বালিয়া দিয়া, ডুব-সাঁতারে ডুবমারা সুখগুলি খুঁজিতে থাকেন—তখন তাহাদের ঘরের কথা মনে পড়ে! আফিস-স্কুলের তাড়া নাই; ছোটছেলেরা, পান্তাভাত ও নুনতেল-মাখা বাসি বড়ি-পোড়া খাইয়া, পাঠশালে গিয়াছে। মেয়ে-বউদের ভিতর যাহারা ছেলেমানুষ, তাহাদেরও ঐরূপে প্রাতরাশ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। এখন রান্নাবান্না যতক্ষণে

হয়—হইবে; সে পক্ষে—না বাহিরে, না পেটের মধ্যে—কোন অংশেই তাগিদ ছিল না! কাজেই, হাসি-কৌতুক, সাঁতার এবং সঙ্গীত, সমান জোরে চলিতে কোন বাধা পায় না! মাঠের পথে ছোটবধূগুলিও গলা-ছাড়িয়া গানের মহলা দেয়; সঙ্গে থাকে সমবয়সী জা' এবং ননদের দল—নিন্দা করিবে কে?

কিন্তু, এহেন পল্লী-স্বাধীনতা সত্ত্বেও, কয়েকটি জিনিষ পল্লী-সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় ছিল। গান গাহিলে এখানে দোষ ছিল না; কিন্তু বই পড়িলে খুব দোষ ছিল,—গায়ের যুবতী মেয়েরা গায়ের যুবাপুরুষদের সামনে দিয়া খালিমাথায় হাসিখুসী করিতে করিতে যত্রতত্র বেড়াইয়া বেড়াইতে সমর্থ; কিন্তু বধূরা নিজেদের স্বামীর সম্মুখে দিনের-আলোয় মুখ বাহির করিতে পেঁচার ন্যায় অনধিকারিণী। তাঁহাদের গান—মাঠে লুকাইয়া শোনা চলে; কিন্তু গভীর রাত্রে বদ্ধঘরের দরজা দিয়া স্বামীর সহিত সহজ-সরল সাংসারিক কথাবার্ত্তার মৃদু শব্দের একটুও যেন বাহিরে না-আসিতে পায়।

অপর্ণাকে যখন বিনয়কুমার নিজের চোখে একবার দেখিতে চাহিল, তখন বেহারী যত না দমিয়া ছিল, সে খবরে তারচেয়ে শতগুণ দমিয়া গেলেন সৌদামিনী। একে এত বড় মেয়ে ঘরে রাখার অপরাধে খোঁটায়-খোঁটায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে—তাহার উপর, যদি সাহেব বিবিদের মত, শুভদৃষ্টির পূর্ব্বেই, বরকন্যার দৃষ্টি-বিনিময়ব্যাপার গ্রামের ভিতর বসিয়া তিনি ঘটিতে দেন, তাহা হইলে, এখানে তাঁহার তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিবে!—এইসমস্ত কু-দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সমাজের মাথা-খাইতে দেওয়া তো চলে না!—কাজেই, বামা-ঝি, যখন আড়ালে দাড়াইয়া, বেহারী-সৌদামিনীর আলোচনা হইতে তথ্যসংগ্রহ করিয়া, রায়গৃহিণীর কাণে এই আশ্চর্য্যসংবাদ প্রচার করিয়া আসিল—তখন চণ্ডীমূর্ত্তিতে তিনি বাড়ুয্যে-বাড়ী অবতীর্ণ হইয়া, যাহা-খুসী বলিয়া, ভায়া-লজ্জাবিহীনা কনের-মাকে তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, "এসব করতে হয় তো, নিজের স্বোয়ামীর ঘরে গিয়ে করো—আমাদের এদেশের নাম খারাপ করো না, বাপু। ঘেন্না-পিত্তি আর কারু রইলোনা—মা, মা, মা! মেয়ের একটু রূপ আছে, বলে কি বারাণ্ দেওয়াতে হবে!"

রায়গৃহিণী, মনের সাধে, পাড়াময় ঘুরিয়া, ঘাটে বসিয়া, এসম্বন্ধে এক রঞ্জিতকাহিনী প্রচার করিয়া দিলেন যে—'মুখুযোদের সৌদামিনী, ধাড়ী-মেয়েটার বিবাহসম্বন্ধে হতাশ হইয়া, উহাকে বিবিদের মত নিজের বর-ধরিতে বেহারীর সঙ্গে কলিকাতার গড়ের মাঠে হাওয়া-খাইতে পাঠাইতেছিল; তিনি, জানিতে পারিয়া, তবে কত বুঝাইয়া-সমঝাইয়া, নিবৃত্ত করেন!'

দেখিয়া-শুনিয়া সৌদামিনী, হালছাড়িয়া দিয়া, ছলছল চোখে বলিলেন, "কাজ নাই, মামা—ওদের জবাব দিয়ে দাও। আমি তো তোমায় পই পই করেই বলচি যে, ওসব বড় নজর করতে যেওনা—আমাদের যে ওরকম কপালই নয়। নইলে, এত খোঁজেও, একটা পাত্তর ঠিক হলো না।"

কিন্তু এতদূর আশা—স্বর্গে উঠিয়া যে পাতালে ফস্ করিয়া নামিয়া পড়া, সে বেহারীর কর্ম্ম নয়। এত চেষ্টায় যদি তাহার দিদিমণির যোগ্য একটি বর মিলিল, তাও কি-না, পাঁচজনের হিংসায় পড়িয়া, শেষে হাতছাড়া হইয়া যাইবে! না—এরকম অন্যায় কোনমতেই হইতে দেওয়া হইবে না।—সে কর্ত্তার নিকট গেল।

রাধিকাপ্রসন্নের মুখখানি বিশেষপ্রসন্ন ছিল না; তাঁহার তেজারতী-কার্য্যে আজকাল বেহারীর অসবধানতা দিন-দিন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সে, আজকাল, মন দিয়া আদায়পত্র করে না—কিছু না; কোথায় বায়ে'-বায়ে' ঘুরিয়া বেড়ায়! বেহারা, মুখটি চূণ করিয়া, হাত কচলাইতে-কচলাইতে একপাশে দাড়াইয়া, নিজেকে সঙ্কোচের সময় না-দিয়াই, একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "একটা খুবভাল পাত্তর পেয়েছিলাম; সে ছেলেটি, নিজের চোকে, একবার কনে দেখতে চায়।"

রাধিকাপ্রসন্ন অকস্মাৎ যেন ঘুম-ভাঙ্গিয়া উঠিলেন; হতবুদ্ধির ন্যায়, বেহারীর সঙ্কোচজড়িত দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, ক্ষণপরে, বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনেটি কা'দের?"

দু'একটা ঢোক-গিলিয়া, বেহারী উত্তর করিল, "এই আমাদের অপর্ণা।"

"বটে! তা' গাউন-টোপ-জুতো—সব কিনে আনা হ'য়েচে?"

এ জিজ্ঞাসার অর্থ না-বুঝিয়া, বেহারী বিপন্নভাবে মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল। তবে এটুকু বুঝিল, কথাটা

একটু বাঁকা—বোধ হয় মনঃপূত হয় নাই। কি যে বলিবে, সে খুঁজিয়া পাইল। বুঝিয়া, রাধিকাপ্রসন্ন কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করিয়া দিলেন; তিনি কহিলেন, "বলি, মেমসাহেবের মেয়েকে গাউন-টাউন না-পরালে সেই সাহেব-বরের সাম্‌নে বা'র করবে কেমন করে? বেহারি—তোরও কি বাহাত্তুরে ধ'রেচে? বিয়ের আগে বর-কনের দেখা-শোনা কখনও হিন্দুর ঘরে হয়?"

বেহারী বুঝিল, এখানেও ইতঃপূর্ব্বেই পাড়ার লোকের শুভাগমন ঘটিয়াছিল। সে জানিত, এই বৃদ্ধব্যক্তিটি হিন্দুয়ানীর সম্বন্ধে কোনরকম কড়া মতপোষণ করেন না; খাওয়া-ছোঁয়ার ষোল আনা বিচারটুকু বজায় রাখিয়া, ছেলে-মেয়েরা, তাঁহার হিসাবে, আর সকলবিষয়েই মুক্ত। তাই, বড়আশা করিয়াই সে এই কঠিন ভূমে পা-ঠেকাইয়াছিল। পাড়া-পড়সার করুণা দেখিয়া, রাগে তাহার গা জ্বলিয়া গেল; সেই রাগের মাথায়, একটু সাহসও দেখা দিল—তাই, সে খপ করিয়া, সেই রোখের মুখেই, বলিয়া ফেলিল "ভাল-ছেলে, বড়-জমীদার, একপয়সা নেবে না—এত সুযোগ যদি শুধু একবার মেয়ে-দেখালেই পাওয়া যায়—"

"যদি মেথরের বাড়ী খাইলে একঘড়া মোহর দেয়, তা' হলেও, বোধ হয়, তোমার সেখানে ভাতখাইতে আপত্তি নেই?"

তুলনাটা যে নিতান্ত অযৌক্তিক হইতেছে, এ ভুল দেখাইতে মনে ইচ্ছা-জাগিলেও, মুখে সাহস আসিল না। দাঁড়াইয়া থাকিয়া-থাকিয়া, বেহারী কিছুপরে চলিয়া আসিল। বুঝিল—আরকিছু হইবে না; কিন্তু এক একজন মানুষ আছে, তাহারা পিপীলিকার জাতি—বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়াও, তাহাদের উদ্দেশ্য টলেনা; বরং, কাদার তালের মত, ঘা-খাইয়া-খাইয়া, সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়। বেহারীও সেই দরের মানুষ। এত খোঁজ-খাঁজ করিয়া সে যে একধারে এমন কার্ত্তিক-গণেশের আবিষ্কার করিয়াছে, এজিনিষ সে এমন সহজে হারাইতে রাজী নয়। যখন আরকাহারও সাহায্য পাওয়া গেল না, তখন সে অগত্যা অপর্ণার সন্ধানেই গেল। একখানি রাঙ্গাড়ুরে-সাড়ী পরিয়া রান্নাঘরের ঘেরাদালানে অপর্ণা বঁটি-পাতিয়া কুটনা-কুটিতে ছিল; বেহারী গিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, যেন অবাক্ হইয়া গিয়া, চোক্ ফিরাইতে ভুলিয়া, কেবল নির্ণিমেষে চাহিয়াই রহিল! বয়সের স্বধর্ম্ম এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন—এই দু'য়েতে মিলিয়া এই কিশোরীর শরীরে কি-যে দ্রুতপরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে, শীতের কোয়াসা-কাটা রৌদ্রে ফুটিয়া-ওঠা নববসন্তের গোলাপফুলটির দিকে যাঁহারা ক্ষণকাল এমনই নিমেষহীন নেত্রে চাহিয়া-থাকিয়াছেন—শুধু সেই তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। ভরা-গাল-দুটিতে আপনা হইতে যে দাড়িম্ব-বীজের সরক্ত আভা ফুটিয়া উঠিতেছে, আল্‌তা মাখাইয়াও সে রঙ্গের নকল করা যায় না। কণ্ঠে—ললাটে সুমর্স্পণ মর্ম্মর কাটিয়া যেন পালিস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যদিয়াও যেন থাকিয়া-থাকিয়া ভিতরের লালিত্য ফুটিয়া-ফুটিয়া উঠিতেছে। বেহারীর রূপমুগ্ধ হইবার আর বয়স ছিল না—নহিলে, বেহারীর মনে হইল, সে হয়ত এখনই মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শনে, দেবসমাজের ন্যায়ই মুহূর্ত্তে মোহপ্রাপ্ত হইয়া, ঘুরিয়া পড়িত! তাহার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল—কোনমতে একবার এই মুখখানা চোকের সাম্‌নে তুলিয়া ধরা!

সে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসিয়া পড়িয়া, নিম্নস্বরে বলিয়া ফেলিল, "কেউ তো আমার সহায় হলো না, দিদিমণি! তুমি যদি একটি উপকার করো।"

কথার ভণিতাটা দেখিয়া, অপর্ণার মনে কৌতূহল জাগিয়াছিল; সে বঁটির ধারের উপরে কুমড়া-খাড়া-ধরা, হাত খানা সেইভাবেই রাখিয়া, সকৌতুকে চোক তুলিয়া চাহিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি? বল দেখি!"

বেহারী, আব্দার করিয়া বলিল, "বলো আগে—যে শুন্‌বে।"

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল—হাসিতে-হাসিতে উত্তর করিল, "আমি এমন কখনও বলি না—শেষে কি দশরথ রাজার যো' হবে নাকি?"

কিন্তু বেহারীও ছাড়ে না! সে, বার-বার মিনতি করিয়া, বলিতে লাগিল, "সত্যি, দিদি; লক্ষ্মী দিদিটি আমার! এই কাজটি তোমায় আমার জন্যে কর্‌তেই হবে। আগে বল, যে করিবে; তা' হ'লেই আমি বল্‌বো; নহিলে—"

কিন্তু অপর্ণারও জেদ কম নয়—সে কিছুতেই প্রতিজ্ঞা করিতে স্বীকৃত হইল না; বরং বলিল, "তবে—ব'লে কাজ নেই!" তখন আর কি করিবে?—অগত্যা বেহারীকে গোপন-কথাটা বলিতেই হইল। চারিদিকে চাহিয়া—একটু

সরিয়া আসিয়া—গলার স্বর খাটো করিয়া, সে তখন কথাটা বলিয়া ফেলিয়া, মিনতিপূর্ণনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল। পুনরায় কহিল, "শুধু দু'মিনিটের জন্য তুমি একটিবার ঐ পাড়ার ওদিকে—যেখানে কামরাঙা-গাছগুলা—সেইখানটিতে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া একবারটি দাঁড়াইবে; আর কিছুইনা! বেলা চারিটা-আন্দাজ—এমনই সময়—একবারটি শুধু;—এইটুকু করো'।"

অপর্ণা প্রথমটা খুব হাসিয়া উঠিয়াছিল; লুটোপুটি করিয়া খানিকক্ষণ হাসিয়া-হাসিয়া বেহারীকে অপ্রতিভের একশেষ করিয়া দিল। তারপর, যখন সে হাসি বন্ধকরিয়া, আবার সোজা হইয়া বসিয়া, কুটিবার জন্য একগাছি কুমড়া খাড়া মাটি হইতে কুড়াইয়া লইল, তখন তাহার মুখখানা প্রবীণার মুখের মতই গম্ভীর দেখাইতে ছিল। কিন্তু ভালমন্দ কোন উত্তর সে করিল না। মৌনকে সম্মতি লক্ষণ বলিয়া যখন শাস্ত্রকারগণই গণনা করিয়াছেন, তখন বেহারী কেনই বা আশান্বিত না হইবে? "এতে তো কোনই দোষ নেই, দিদি; আমাদের গাঁয়ের সবই অনাসৃষ্টি, তাই একথাও আবার তোমায় বলিতে হলো—না হলে তো অতিসহজেই সব হইতে পারিত।"

বেহারীর কথার উত্তরে এবার গম্ভীরমুখে কনে কহিল, "বেহারী দা', পাদাড়ে চোরের মত লুকিয়ে দেখা দিয়ে—তেমন বিয়েয় সাতজন্মেও আমার কাজ নেই। দোহাই তোমার, তোমাকে বাগ্রতা করি—তুমি আর আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করো না!"

তাহার স্বর ইস্পাতের মত—যেমন অভেদ্য, তেমনি কঠিন। বেহারী, তাহার স্বভাব জানিত;—সেখানেও আর কোন আশা নাই বুঝিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। এমন শুভসুযোগ যে মানুষে কি করিয়া ব্যর্থ করে, তাই ভাবিয়া সে শুধু অবাক্ হইয়া গেল!

কিন্তু আমরা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বেহারী হাল-ছাড়িবার লোক নয়। তৃতীয় দিবসে সে, তাহার সম-ভিব্যাহারী গৌরতনু যুবককে পুষ্করিণীর প্রত্যাবর্ত্তন পথের ধারে একটি গাছের ঝোপে লুকাইয়া রাখিয়া, নিজে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। অপর্ণা আঁকাবাঁকা মেঠোপথে এখনই জল-লইয়া আসিবে—সৌদামিনীর ব্যবহারের জল সে-ই অদূর পুষ্করিণী হইতে আপনি লইয়া আসে; ঝিয়ের আনা জলে তাঁহার রান্না-খাওয়া হয় না। অপর্ণা এগ্রামে একরকম এক-ঘরে; স্পষ্টবাদিতার গুণে তাহার পড়সীরা তাহাকে তীব্র বিদ্রূপ করিয়া রেহাই পায় না—পাল্টা-উত্তর শুনিতে হয় বলিয়া, সবমেয়েরা তাহার সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না; তাই, সে প্রায় একাই থাকে। এমন সুযোগ, আর যে পারে, ছাড়ুক—বেহারী তো উপেক্ষা করিতে অক্ষম।

অপর্ণা ভরা-কলসী হেলাইতে দুলাইতে—ছলাৎ-ছলাৎ করিতে করিতে—আসিয়া দেখিল, বেহারী চোরের মত চুপ করিয়া আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছে। সে, তাহার সশঙ্কিত দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া, ঝোপটার দিকে চাহিতেই, সেখান হইতে খানিকটা ফরসা কাপড়ের মত কি-যেন দেখিতে পাইল; কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রথমটায় কোনপ্রকার সন্দিহান না-হইয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, 'বেহারীদা', কি মনের দুঃখে এইবার বিজন-বাস স্থির ক'রেছ, না কি?

বেহারী, তাহার মনটা টানিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, উৎসাহ দেখাইয়া কহিয়া উঠিল, "তা, ভাই, বুড়ো হচ্চি—বনে যাবার সময় তো হলো!" অপর্ণা বলিল, "যে-তোমাদের দেশেরলোক সুভদ্র! এঁদের কাছে বাসকরার চেয়ে, বনে-যাওয়া যে ঢের বেশী সুখশান্তিকর—সেটা স্থির। তা যখন যাবে, আমায়ও নিয়ে যেও।"

বেহারী, নিজের অজ্ঞাতসারে, অধীরদৃষ্টি ঝোপের দিকে নিঃক্ষেপ করিয়া, বাগ্র বচনে কহিয়া উঠিল, "তা', দিদি যাবার সময় খবর পাবে, তখন—তুমি এখন বাড়ী যাও।"

"কেন, বেহারীদা', যাবোই বা কেন? আচ্ছা, বেহারীদা', আমার বিয়ে হলো—না-হলো, ওদের অত মাথাব্যথা কিসের, বল্‌তে পারো?—আমরা তো কই, কারু—বেহারীদা'!—একি? ছিঃ!" জ্বলন্ত চক্ষে সে বারেক বেহারীর পানে চাহিয়া আর সে দিকে মুখ না-ফিরাইয়া, দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিয়া গেল। পুনঃপুনঃ বেহারীর দৃষ্টি ওই ঝোঁপেরদিকেই দেখিয়া, সেই শাদা জিনিষটাসম্বন্ধে তাহার মনে হঠাৎ একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠে; এবং মুহূর্ত্তেকে, একটা রহস্য তাহার নিকট ফাঁস হইয়া গিয়া, সহসা তাহাকে বিস্ফোরকের মত উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল! কিন্তু শেষ সে যে একটা জ্বলন্ত-অগ্নিগর্ভ বোমার মত ঐ "বেহারীদা'!" বলিয়া, তাহার বিশ্বাসঘাতকতায় ধিক্কার দিয়া, চলিয়া গেল—তাহা বিজয়ী বেহারীর বিজয়ানন্দ-রচিত লৌহবর্ম্মকে স্পর্শ

করিতেও পারিল না। সে তাহার নিজের কৃতকার্য্যতায় বিন্দুমাত্র সন্দিহান হয় নাই। তাই, গভীর-আনন্দে, মন তাহার এতবড় লজ্জার আঘাতটাকেও, নির্লজ্জের মত, অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিল। অপর্ণা দুইপদ গিয়াই দেখিল, একদল বউ ঝি মিলিয়া ঘাটের পথে চলিতে-চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া, তাহাদের দিকে চাহিয়াই কিসব ঠারাঠারি হাসাহাসি করিতেছে। বেহারীর প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিনয়কুমার নীরবে সমস্ত রাস্তা বেহারীর পাশে-পাশে চলিয়া আসিল। কিন্তু বেহারী যতবারই, বড়-মুখ করিয়া, কথাটা পাড়িতে যায়, ততবারই সে আশ পাশের দৃশ্য—ক্ষেত্রের শস্য ইত্যাদি পাঁচ-কথায় আসল কথাটাকে চাপা দিতে থাকে। বিস্ময়ে—ক্ষোভে—নৈরাশ্যে বেহারী যেন খেই-হারা হইয়াছে; শেষে সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিজের মনে সিদ্ধান্ত করিল যে, হয়ত অপর্ণাকে দেখিয়া এই জমিদার-নন্দনের এতই পছন্দ হইয়াছে যে—বেচারার মাথাটা পর্য্যন্ত ঘোলাইয়া গিয়াছে। থাক্—একটু পরেই আলোচনা করা যাইবে। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, দোকানে সে তাহার দিদিমণির ভাবী-বরকে ভালকরিয়া জল-খাওয়াইয়া, অনেক দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিল যে, এই ক্ষোভ—যেদিন তোমার বাড়ীতে প্রাণের অপর্ণা-দিদিকে বসাবো, সেইদিনই ঘুচবে।

বরটি, একটুখানি চুপ করিয়া, কি ভাবিল; তারপর, দোকান-ঘরের বাহিরে আসিয়া, একপাশে বেহারীকে ডাকিয়া লইয়া, তাহার হাতে গাড়ীভাড়া-মায়-জলখাবার-বাবদ কয়েকটি টাকা দিয়া, বলিল, "ম'শাই, অপরাধ নেবেন-না। একথা বল্‌তেও লজ্জা করে—বড় অন্যায় করে ফেলে, এখন যে কি-পর্য্যন্ত না লজ্জিত হচ্চি, তা' আর আপনাকে কি ব'লবো! সেদিন যে কি মতিচ্ছন্নই ধরেছিল, তাই, শুধু-শুধু এই আগুননিয়ে খেলা করতে গেলাম! আজ যা দেখ্‌লে এলাম—তা আমার চিরদিন স্মরণ থাক্‌বে। এমন গন্‌গনে আগুনের সহিত পরিহাস কর্‌তে আস্‌চি, জান্‌লে, কখন, এতবড় সাহস করিতাম না। আপনাকে সেদিন বামুন-ঠাকুরের কাছে 'নিখুঁত ভাল' জমিদার-পুত্রের খবর নিতে শুনে, কার জন্য এত বড় দাবী—তাই দেখ্‌বার কৌতূহলে ও একটু-তামাসার লোভে, আমিই এই ফন্দিটি সবাইকে শিখিয়েছিলাম। আমি বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নই—নলিনী কান্ত মিত্র, কায়স্থ-সন্তান; প্রণাম ম'শায়! চ'ল্লাম—পারেন তো মাপ কর্‌বেন।"

ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল এবং বেহারীর কুয়াসাচ্ছন্ননেত্রের সম্মুখদিয়া ছাড়িয়া গেল।

১৮

দিন-কতক এই ব্যাপার লইয়া দেশে বেশ-একটুখানি হুলস্থূল পড়িয়া গিয়া, তারপর, একসময় স্বাভাবিক নিয়মেই থামিয়া গেল; কিন্তু বেহারী, বা অপর্ণা—দু'জনের একজনও সেদিনের কথাগুলা মন হইতে বিদায় করিয়া দিতেপারিল না। দেশের লোক গোয়েন্দাগিরিতে বেশ দক্ষ—সত্য; সংবাদটা অবশ্য কাহারও অবিদিত ছিল না—কিন্তু, তথাপি, আপনাপন রুচিপ্রবৃত্তি অনুসারে এই ঘটনাটাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া, যাহার যাহা-খুসী অনেক রকম গল্পরটনা করিতেও তাহাদের মুখে আটকায় নাই। রাধিকাপ্রসন্ন, সবশুনিয়া, বেহারীকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতেই গিয়াছিলেন—এবং সৌদামিনীই শুধু, মুখে রাগ দেখাইয়া, মনের ভিতর গোপনে-গোপনে তাহাকে প্রাণভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। একটা মানুষ যে এ পৃথিবীর মধ্যে এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্যভাবেই তাঁহাদের শুভার্থী, এইটে দেখিয়া তাঁহার কাঠেরমত কঠিনপ্রাণটা যেন সেদিন অনেকখানিই নরম হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ঘটনার পর, প্রায় মাসেক-দু'মাসপর্য্যন্ত লজ্জায় আর বেহারী ঘটকালি-করিতে বাহির হয় নাই। এই সময়টা সে রাধিকাপ্রসন্নের হিসাব-নিকাশ সাফ করিতে নিজেকে নিজের সেই পুরাতন জোতটাতে জুড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, রাধিকাপ্রসন্নর তীব্রখোঁটা এবং পাড়ার লোকের তীক্ষ্ণশ্লেষের উত্তাপ যেমন একটু জুড়াইয়া আসিতে লাগিল, অমনই জমা-খরচ কাটিয়া সুদ-কষায় বেহারীর হিসাবে ভুলের অন্ত রহিল না! যেখানে পাঁচপয়সা বাদ পড়িবে, সেখানে সে পাঁচটাকা লিখিয়া বসে; পাই-আনা তো যখন-তখন ছাড়িয়া যায়!—রাগিয়া গিয়া, রাধিকাপ্রসন্ন গালির মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেন, চতুর্দ্দশপুরুষ-পর্য্যন্ত সে আস্বাদনের তিক্তরস বোধ করি হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেন! বেহারীর তিরস্কৃত—উড়ন্ত মনটা কিন্তু কিছুতেই নিজেকে নিজের চিরপুরাতন অভ্যাসের গণ্ডীতে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। এমনই করিয়া কিছুদিন গেলে,

একদিন আর থাকিতে না-পারিয়া, বেহারী আবার তাহার বেনিয়ানের ছোটা আঁটিয়া, আধ-ময়লা উড়ানীখানি বা-কাঁধে ফেলিয়া, চটিজুতা ঘসিতে ঘসিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

আদর্শটাও খর্ব্ব করিতে পারিব না, অথচ পণের টাকাও পোনেরো-আনা বাদ দিব—এ অবস্থায় এদেশে ভাল পাত্রে মেয়ে-দেওয়ার চেষ্টা এক প্রকার আকাশকুসুম! এই ফুলের-ফসল সে যথেষ্ট পরিমাণই আবাদ করিল; কিন্তু, একটি দুটি কুঁড়ি ধরিয়াই, মাঝখানে সেগুলি ঝরিয়া পড়িল মাত্র—ফুল একটিও ফুটাইতে সমর্থ হইল না! দু'-চারিজন, যাহারা, মেয়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিত্বের লোভে, মেয়ে-দেখিতে আসিয়াছিল, মেয়ে-দেখিয়াই তাহাদের অনেকেরই চক্ষু-স্থির হইয়া গেল! কেহ কেহ ভদ্রভাবে, কেহ বা অভদ্র-ভাষাতেই, এককথায় জবাব দিয়া গেলেন। কেহ বলিলেন, 'ছেলের সঙ্গে মানাইবে না!' তা, এ কথাটা হয় ত অযথার্থ নাও হইতে পারে। কেননা, বিবাহের বর'টি প্রায়ই চতুর্দ্দোলার আরোহী, ষোল হইতে-কুড়ির ভিতরকারই বয়সের তো!—কেহবা কহিলেন, 'এ মেয়েটি নিয়ে গেলে, প্রথম তো একটি আতুড়-ঘর বাঁধিতে হয়, মশাই! তা বিয়ের খরচের সঙ্গে আতুড়-খরচাটাও তো আর ধরিয়া লইতে পারিব না! কাজেই—ইত্যাদি।

বেহারীর পা হইতে মাথার চুল অবধি রাগে 'রি-রি' করিয়া উঠিত; মুখে উত্তর আসিত যে 'তা-নয়, ছেলের মায়ের আঁতুড়-খরচটাও আমাদের হিসাবেই ফেলিবেন।' কিন্তু সহসা তাহার অবমানিত বক্ষ-উদ্বেলিত করিয়া, তাহার দিদিমণির মুখখানি ক্ষুব্ধহৃদয়ের পরতে পরতে জাগিয়া উঠিত; সেই দু'টি বাঁকাভুরু উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া, টানাচোখে চাহিয়া, সেই রাঙ্গা-ঠোঁটের অভিমান-স্ফুরণের মধ্য হইতে স্পষ্টই ধ্বনিত হইত—'এমন লোকের বাড়ী তোমরা আমায় পাঠা'তে পার'বে বেহারীদা' ?—'ওরে, না রে, দিদি, না! আর যে-যা পারুক, বেহারী তোকে তার প্রাণ থাক'তে কোন কষ্ট-দুঃখের মুখে ধরিয়া দিতে পারিবে না—তা, তা'রজন্য তাহাকে যা'-করিতে হয়, সে করিতে প্রস্তুত আছে!

সে এইবার মনে মনে স্থির করিল, পণের টাকা যতই লাগে—লাগুক; সে-টাকা, যেমন করিয়া পারে সে, রাধিকা-প্রসন্নের নিকট হইতে আদায় করিবে। কেনই বা না দিবেন তিনি? তাঁহার যা' দু'পয়সা আছে, সে সবই যখন অপর্ণাকেই ভবিষ্যতে বর্ত্তিবে, তখন, দু'দিন আগেই বা কেন তাহার জন্য না-দিয়া, নিজের জেদের বশে তাহাকে চিরদুর্ভাগিনী হইতে দিবেন!—না, তা কোনমতেই হইতে পারিবে না।

সংসারে ফরমাইস দিলে, কি-না পাওয়া যায়? শুধুর দুধ চাহিলে, তা'ও যখন মিলে—তা' ফরমাইস-মত বর আর একটা মিলিবে না? হাজার টাকা নগদ ও অলঙ্কারে, এবং তা' ভিন্ন, বরাভরণ-নমস্কারী-ফুলশয্যা-কাঁসাপিতলের একপ্রস্থ দানসামগ্রী, আর চলনসই খাটবিছানা-সমেত এক, বি. এল. পাশকরা, উকিল বর পাওয়া গেল। ছেলেটি অবশ্য সোণার-চশমা চোখে দেয়—তা' তা'র জন্য চশমাওয়ালা কোন সাহেব বা বাঙ্গালী দোকানদারের বিলখানা আর তাঁহারা কনের বাড়ী পাঠাইতে চাহেন নাই। মাথার বাঁ দিকে চেরা-সিঁথিও সে কাটে, পানও যত পারে খায়, চুরোটের বাক্সও পকেটে-পকেটেই ফেরে এবং জমিদারীরও বাধা-আয় নাই—বাপের সামান্য পেন্‌সন্ আছে, নিজের বড়রকম ডিপ্লোমা আছে, সুশ্রী চেহারা আছে আর, —আলপাকার চোগাচাপকান এবং গরদের পাগ্‌ড়ীটা আছে। মনে একটু খুঁৎ রাখিয়া, বেহারী ছেলেটিকে একরকম পছন্দ করিয়া আসিল, এবং সৌদামিনীর কাছে বলিল, "মা, আর কোন ভাবনা নাই! এইবার, কেবল একবার দু'টিহাত এককরে দেওয়া! খাসা ছেলেটি এ'বার পাওয়া গেছে!" মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে সৌদামিনী, বলিতে গেলে, প্রায়একরকম হাল-ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। লোকের কথার খোটায়-খোটায় অনেক সময় তাঁহাকে তিতিবিরক্ত হইয়াই, এ কথাটা আবার স্মরণ করিতে হইত; তা' না হইলে, নিজের মনের ভিতর তিনি যেনএকরকম ঠিকদিয়াই ফেলিয়াছেন যে—তাঁহার এই আয়পয়-হীনা অভাগীমেয়েটি, তাহার শিশুজীবনের অত-বড় দুর্দ্দৈব কাটাইয়া কোনরকমে বাঁচিয়া উঠিবে, এমন সন্দেহ বিধাতা-পুরুষের মনে না থাকায়, তিনি, বোধ করি, ইহার'বর গড়িতে ভুলিয়াই গিয়া থাকিবেন! যখনই যেখানে একটু আশা করিতে যান—সেইখানেই, কোথা দিয়া যেন, একখানা কর্ম্মনাশাহস্ত ক্ষিপ্রবেগে বাহির হইয়া, এমনই অতর্কিতে সেই আশার মাথায় লোহার মুগুর মারে যে, সে আঘাত খাইয়া, মাথাতুলিতে সামর্থ্য ফিরিয়া পাইয়া, আবার

নূতন-আশা করিতে অনেকখানি সময়ের দরকার। তা', এসব ছাড়া, আরও একটা কারণও হয় ত ছিল। বেহারী যখন, তাঁহার মুখের কথাটিরও প্রত্যাশা পর্য্যন্ত না রাখিয়া, আপনা হইতে তাঁহার এই প্রকাণ্ড বোঝাটি নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে, তখন তাহার আর অনর্থক তাঁহার পশ্চাতে পেয়াদাগিরি করার দরকারই বা কি ?

আজ বেহারীর সেই সদা-গম্ভীর—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারও অধম—মুখে সফলতার কথা ও তাহার সমর্থনকারী হাসিটুকু দেখিয়া, তাঁহারও একটু ভরসা হইল ; কিন্তু সেই জমীদার-'নন্দনের' প্রদত্ত আক্কেল বেহারীর স্মৃতিপথ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কি না, সেসম্বন্ধে কিছুসন্দেহও যে তাঁহার না-হইয়াছিল, তা'ও নয়। এই ভোলা-রোগটি যে বেহারীর বিলক্ষণ আছে, সে-কথাটা তাঁহার ভালরূপেই জানা ছিল। তাই, খুববেশী উৎসাহ-প্রদর্শন না করিয়া, সহজস্বরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ছেলে ?"

বেহারী, নিজের মনকে, এতক্ষণ হংসের ন্যায় এই সম্বন্ধ-টির 'নীর' হইতে 'ক্ষীর' গ্রহণ করাইবার জন্য ভারি তাগিদ দিয়া, একেবারে তাহাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল। সৌদামিনীর কণ্ঠে আগ্রহের আভাস থাক, না থাক, তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া-গেল না ! সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল, "ছেলেটি, মা, একটি রতন ! বাংলা-বেহার-উড়িষ্যার মধ্যে এমন ছেলে তুমি আর দু'টি পাবে না, মা—একেবারে নিৰ্দ্দোষ ছেলে ! এই যে পাঁচ-পাঁচটা পাশ করেচে—তা' মনে এতরত্তি গুমোর-দেমাক্ দেখবে না। সেদিন দেখ্‌লাম, একমিন্‌ষে জেলে একটা মাছ নিয়ে এসেচে, তা যেমন চৌকাঠে পা দিয়েচে, অম্‌নি—কেঁদারা ছেড়ে উঠে—নিজে এগিয়ে গিয়ে, তাকেই কত অভ্যর্থনা ! তা' পানও'লা-শাকও'লা—যেকেউ পানটা-আনাজটা দিয়েযায়, কক্ষনো কাউকে 'না' বলে ফেরাতে জানে না ! অমনি নিজের হাতে তুলে রাখ্‌চে, আর তা'দের বিনি-কড়িতে কাজটি করে দিচ্ছে ! —অতি অমায়িক ভাব !"

সৌদামিনীর অধরপ্রান্তে যে হাসিটুকু ফুটিল, সেটুকুর মধ্যে, আনন্দাভাষের চেয়ে, করুণার আভাষই অধিক পাওয়া গেল ; কিন্তু তাহা বেহারীর পূর্ণানন্দের ব্যাঘাতকর হইল না। তাহার মন তখন খুবই ভরিয়া রহিয়াছে ; সে নিজের ঝোঁকেই বকিয়া চলিয়াছে। দু'চারিদিন এই পঞ্চৈশ্বর্য্যশালী মহারথীর গুণকীর্ত্তন-কাহিনী শুনিতে-শুনিতে তিতি-বিরক্ত হইয়া, অপর্ণা, একদিন আর সামলাইতে না পারিয়া, বলিয়া ফেলিল, "বেহারীদা' যাকে সুনজরে দেখ্‌বে, তা'র বাঁকাচলনও বেজায় সোজা হইয়া যাইবে ! ভূ-ভারতে কেউ যেন আর পাঁচটা পাশ করে না !"

"অ্যাঁ ! বলিস্ কি দিদি !"—বেহারী যেন আকাশ হইতে পড়িল ! এই পাঁচহাতিয়ার-বাঁধা বরটির সম্বন্ধে যে, তাহার কনেটির মনপ্রাণ, অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরিয়া থাকার পরিবর্ত্তে, তা'র মধ্যে অপর-কোন ভাবপ্রবেশ করা সম্ভব, এতবড় অবিশ্বাস বেহারীর সরলচিত্তে একনিমেষের তরেও সংশয় উপস্থিত করে নাই। সে, এই মুখরা—নির্লজ্জা কনে'র স-তাচ্ছীল্য মন্তব্যে, যেন একটু হতভম্ব হইয়া গেল !

অপর্ণা, মুখটিপিয়া হাসিয়া, বলিয়াগেল, "বলি যা'—তা' ঠিক কথাই। ভারি তো উকিল—ভারি তো পাশ্ !—আমাদের পলাশডাঙ্গার বাবুদের বাড়ীর ছেলেরা অমন পাশ ঢের করেছে ! তোমাদের যেমন বনগাঁয়ে বাস !—তাই, এখানে শিয়ালও রাজা হ'য়ে বস্‌তে পান।"

কথাটা বেহারীকে যেন মারিল। অপর্ণার জন্য সে যে বর এত খুঁজিয়া বাহির করিল, তেমন পাশকরা উকিল সে ঢের-ঢের দেখিয়াছে ! সে যে এততুচ্ছ করিয়া তাহার দেওয়া দান গ্রহণ করিবে, ইহা বেহারীর মনে ভাল ঠেকিল না। সে কিছুক্ষণ, ব্যথাহত চিত্তে বসিয়া থাকিয়া, তারপর, আবার নিজের টিনের পেটরাটি খুলিল। ইহার মধ্যে একটি ছোট পাঁচরঙ্গা বনাতের টুক্‌রায় রচিত 'বটুয়া'তেই বেহারীর যাহাকিছু পুঁজিপাটা। সে, ইতিমধ্যে, রেলভাড়া, মেসের বাসার উড়ে চাকর-বামুনের ঘুস্-প্রভৃতিতে ইহার একতৃতীয়াংশ খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল ; আজ, আবার, তাহা হইতে আরও কিছু পুঁজি খসাইয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। মনে মনে স্থির করিল, 'এ ছেলে এখন হাতেই থাক ; এর চেয়েও ভালপাত্র আরওএকবার খোঁজ-তল্লাস করিয়া দেখি। দিদিমণি ঠিক বলিয়াছে ; আজকাল উকিলের আর দর নাই। মাছের—পানের—শাকের—চাইতেও উকিল এখন শস্তা, কেবল বর-হিসাবেই যা' দরচড়া, দেখিতেছি !'

সকলজিনিষেরই একটা সীমা আছে। 'অতি'-বস্তুটা যে ভাল নয়, এসম্বন্ধে চির-প্রসিদ্ধিই ইহার প্রমাণ।

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ, অতি দানে বলির্বদ্ধঃ, সর্ব্ব মত্যন্তং গর্হিতম্।'—এবাক্য কূটনীতিজ্ঞ চাণক্যের, আজিকার নয়। আমাদের চলিত বাংলায় বলে, 'অতি-বাড় বেড়োনা ঝড়ে পড়ে' যাবে'। তা—দেখা যায়, সকল 'অতি'র শেষেই একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। বেহারীর এই অতি পছন্দর দায়ে, অপর্ণার বিবাহের যে সুযোগটুকু দেখা দিয়াছিল, তাহারও ভলম্ব ব্যর্থ হইয়া গেল। সে যাহাকে অতি কষ্টে পছন্দ করিয়াছিল, তাহারা মেয়ে দেখিয়া অবাক্ হইয়া ফিরিয়া গেলে, 'থোতা-মুখ ভোতা' করিয়া আবার যখন বেহারা সেই উকিল পাত্রটির দ্বারে গিয়া দাড়াইল, তখন সেখান হইতে আর কোন রকমই 'অনাত্মিক'-ভাবপ্রকাশ পাইল না; বরং, জুয়াচোর, ছোটলোক প্রভৃতি অনেকগুলি মিষ্টশব্দে কর্ণপরিতৃপ্ত করিয়া, তাহাকে, চোরের অধম হইয়া, ফিরিতে হইল। এ ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে বেহারীর সামর্থ্যে কুলাইল না; সে এই অপ্রত্যাশিত আশাভঙ্গে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল! উকিলপাত্রটি যে, তাহার বিলম্বে সন্দিহান হইয়া, গোপনে অনুসন্ধান লইতেছিলেন—সে সংবাদ সে জানিত না।

সেদিন রোষে-ক্ষোভে-আত্মধিক্কারেপূর্ণ বেহারী বাড়ী ফিরিয়া বিছানা লইল; মুখফুটিয়া একথা সে সৌদামিনীর নিকট ব্যক্ত করিতেও পারিল না। কিন্তু তা'র দরকারও বড় ছিল'না। এ অভিনয় আজ নূতন নয়; সৌদামিনী বরাবরই দেখিয়া আসিতেছেন, যেদিনই কোন বিশেষস্থানে হতাশ হইয়া আইসে—সেইদিনই, তাঁহার বেহারীমামার উদর-গহ্বরের ফাঁক বুজিয়া যায়—তাহার মাথা-ধরে, পেট-কামড়ায়, না হয় তো, অম্বলের বেদনাও ধরে। সেদিন বেহারীকে, বাড়ী ফিরিয়া, র‍্যাপারমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতে দেখিয়াই, সৌদামিনীর সদা-সন্দিগ্ধমনটা বিকল হইয়া, বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। অপর্ণার বয়স এইবার—পঞ্চদশপূর্ণ হইয়া, ষোড়শে পড়িতে চলিল; এই অগ্রহায়ণমাস যদি ব্যর্থ চলিয়া যায়, সম্মুখে পৌষ—মাঘমাসে এই ষোড়শ আরম্ভ হইয়া যাইবে।—একি সর্ব্বনাশ! সত্য-সত্যই কি ইহার কপালে বিবাহ লেখা নাই, না কি? উঠিতে যেন পা উঠিতে-ছিল না; তথাপি, কোনক্রমে রক হইতে উঠিয়া, আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—

"বেহারীমামা!"

"কেন, মা? এই যে আসুন, আমায় ডাকলেই তো হতো; আবার কষ্ট, করে,' নিজে—"

বেহারী তক্তপোসের উপর উঠিয়া বসিল এবং পরক্ষণে নামিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সৌদামিনীর আধখানা প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল; তিনি আরকোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয় মিটাইবেন কি—সন্দেহ তাঁহার সেই ক্ষণে আপনিই মিটিয়া গেল!

কিছুক্ষণ কেহ কোনকথাই বলিতে পারিলেন না; বেহারীর মন এঘটনায় আত্মাপরাধের ভারে যেন বিশ-মণ ভারী হইয়া রহিয়াছিল; সে কেবলই নিজের মূঢ়তাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছিল—'আমার দোষেই এমন সম্বন্ধও, হাতের কাছে আসিয়া, ভাঙ্গিয়া গেল! এ আমার অত্যধিক লোভের ফল! ছি—ছি, কেন এমন কর'লাম!'

তা—সৌদামিনী সেখবর জানিতেনও না; আর—জানিলেও, বোধ করি, তাঁহার কন্যার ভাঙ্গা-রাশি এবং নিজের ভাঙ্গা-কপাল ছাড়া, আর কাহাকেও দুষিতেনও না।

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া—অনেকক্ষণ পরে—কথা কহিলেন; গলার স্বরে বেহারীর লজ্জাক্লিষ্ট চিত্ত যেন চতুর্গুণ বেদনা পাইল। বলিলেন, "ওকে নিয়ে আমি কি করি, বেহারীমামা! লোকের গঞ্জনায়-গঞ্জনায় প্রাণ যে বার-হবার যো হয়েচে! ও কেন তখন ম'লোনা! তা'হলে তো আর এত—"

শেষকথাটা শুনিয়াই বেহারী হঠাৎ, আহতসিংহের মতন গর্জ্জিয়া, মাথা তুলিল।

"কি কথা বলো, ছোট মা! বালাই! ষাট্! লোকে না-খুসী বল্লেই বা; তা বল্লে কি, ওসব মনে করতে আছে! মেয়েজন্ম যখন হয়েছে, তখন, আজ না-হয় কাল, বে, হবেই; তবে, রাশটা দেখ্‌চি বড়ভাঙ্গা।—তা,' যা' হো'ক হ'য়ে যা'বে, মা।"

'মায়ের মুখের গালি লাগে না' বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তা' অপর্ণার পক্ষে আজ তো সে গালি আশীর্ব্বাদেরই কাজ করিল।—বেহারীর সমস্ত নিরুদ্যম, এই একটুখানি আঘাত খাইয়াই, কোথায় যেন ভাসিয়া গেল! সে, তখন, আবার মনের মধ্যে জোর করিয়া, উৎসাহ টানিয়া আনিয়া, কল্পনায় অনেক ভাঙ্গা-গড়া করিতে বসিল। কিন্তু সৌদামিনীর চিত্তকে সে আর, তাহার সেই বৃথা-আশার পুলকে, উল্লসিত করিল

না। এবার, হঠাৎ, আবার একটু আশা করিয়া ফেলিয়া, আবার যে তাহাতে ঘা-খাইবেন—সে আঘাত তাঁহার ভগ্ন-শরীর-মন বহিতে পারিবে না। চব্বিশঘণ্টাই একে মেয়ের জন্য দুর্ভাবনা—এতবড় মেয়ের বর না-জুটিলে পল্লিবাসিনী মায়ের যে কি-ভাবনা, তা' কে বুঝিবে? তার উপর, সাতজনের সাতরকম কথা।

পৌষের কন্‌কনে শীতের হাওয়া, মুখুজ্যেদের পুকুরে মৃণালের উপরকার পদ্ম-পাপ্‌ড়ির মধ্যস্থ ঝরা চাক্‌তিগুলি কালো করিয়া, পুকুর-পাড়ের সজনা-গাছের আলোকরা সাদা ফুলের রাশিতে গন্ধের হিল্লোল তুলিয়া, বহিয়া যাইতেই ঘুস্‌-ঘুসে-জ্বর সৌদামিনীর খুস্‌-খুসে-কাশী প্রবলমূর্ত্তি ধারণ করিল।

তখন পৌষ-পার্ব্বণের আসন্ন-আনন্দে পল্লিভবনগুলিতে ব্যস্ততার পরিসীমা নাই। প্রত্যেক গৃহস্থগৃহে স্বতন্ত্র একটি করিয়া ঢেঁকিশাল আছে; সেইখানেই আজকাল বড় বেশী ঘটা বাধিয়াছিল—দুপ্‌দাপ্‌, খট্‌খাট্‌ শব্দে সারা-দু'পুরই ঢেঁকিতে পা-পড়িতেছে। সাম্‌নে বসিয়া একজন নিড়াইয়া দিতেছে, একজন চূর্ণবস্তু কুলায় লইয়া ঝাড়িতেছে—কোথাও নারিকেল-ছেলা, কোথাও তিল-মাজা, বড়ি-দেওয়া—কোনখানে বা বাউনি-বাঁধার জন্য খড়ের দড়ি পাকাইতে গৃহিণী, বধূ ও কন্যাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছেন। চাষাদের বাড়ী-বাড়ী তো একরকম অন্নকূট-পর্ব্ব চলিতেছেই। ধান্যসিদ্ধ, ধানশুকান, ধানভানা, গোলা-মরাই নিকান-পোঁছান—মেয়ে-পুরুষের সমান কাজ। এই কর্ম্মজগৎ হইতে অবসর লইয়া, সহসা একদিন সৌদামিনী সকলকর্ম্মসমাপ্তির মৎলবে কঠিনরোগে শয্যাশায়িনী হইলেন। গ্রামের কবিরাজ, নাড়ী টিপিয়া, বলিয়া গেলেন—'রোগ আরোগ্য-আশাহীন।' দুঃখময় জীবনের শেষপরিণাম যাহা হয়, এ'ও তা' ছাড়া আর-কিছুই নয় যক্ষ্মা!

মেয়ে

[শ্রীঅমলা দেবী]

আজ্‌কে ভোরে সব্বার আগে
পড়েছে মনে আনন কার
জাগ্‌ছে মনে তাহার মধুর
বচনগুলি ক্ষুরের ধার
টলটলে তার চলনটুক্‌
ঢল ঢলে তার আননখানি
পড়লে মনে হেসে ওঠে
আমার মানস কাননখানি
নাচ্‌লে পরে প্রভাত বায়ু
কার নাচনি আসে মনে
উর্ম্মিমালার মধুর খেলায়
ভাবচি ক্ষণে ক্ষণে
কাহার চারু আননখানি
জাগছে মনে দিবসরাত!
তোতা পাখীর ললিতবাণী
ভাবছি দেখে ফুলের হাসি
হাসি মাখা তার মুখানি
কুলু কুলু নদীর ধ্বনি
ভাবছি শুনে তার বকুনি।
বর্ষাকালের কালো মেঘে
দেখছি গো তার, চুলের রাশি;
ক্ষণপ্রভায় চমকানিতে
দেখছি গো তার মধুর হাসি
শ্রাবণ ধারা ঝরে যখন
ভাবি তাহার নয়ন ধার
অভিমানী হৃদয় রাণী
মন ভুলানি সে আমার।
সন্ধ্যা বেলায় তারার মাঝে
নয়ন যেন দেখি কাহার
গোধূলির সেই লাল আলোতে
শিউরে ওঠে আঁচল তার
কমল দলের মাঝখানেতে
দেখেছি তার হাত দুখানি
ধরার সকল শোভার মাঝে
মিশিয়ে আছে হৃদয় রাণী।
দুখের মাঝে সুখের আলো
সে যে আমার চিরদিন
ভাবি তবে এই প্রবাসে
হৃদয় আমার বিষাদ হীন
সন্ধ্যা তারা তোতা পাখী
স্থির বিজলি সে আমার
আমার বুকের লহরী সে
নিদাঘ কালের বারির ধার।

মধু-স্মৃতি

(৭)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

"মধুস্মৃতি"-সূচনায় যে বৈদিক শিরোবচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সার্থকতা 'মধু'র জীবনীর প্রতিছত্রে—প্রতিবর্ণে জাজ্বল্যমান।—মধু'র সকলই মধুময়। আমরা তাঁহার জীবনের কর্ম্ম ও বৈচিত্র্যবহুল অংশ হইতেই এতৎ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম; কিন্তু, তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কাহিনী সকল জানিবার জন্য জনসাধারণের আকুল কৌতূহল উদ্দীপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, বিপুল পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সেই কালের বিবিধ বিচিত্র আখ্যান ও সমসাময়িক নানা দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলী—পঠদ্দশার বিবিধ বিবরণী এবং তাঁহার রচিত অপূর্ব্বপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেসকল অতঃপর যথাসন্নিবেশে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদিগের সমক্ষে উন্নীত হইবে।

সাগরদাঁড়ী—কপোতাক্ষী নদী

মধুসূদনের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র—তাঁহার জন্মভূমি, যশোহর জেলার কপোতাক্ষী নদীকূলে অবস্থিত, সাগরদাঁড়ী গ্রাম। যে চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার হাতে-খড়ি বিদ্যাশিক্ষা সূচিত হয়, তাহা এখনও বর্ত্তমান।

মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী—বঙ্গসাহিত্যে প্রথিতযশা মহিলা-কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু, এসম্বন্ধে আমাদিগকে সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—"স্বর্গীয় কাকামহাশয়ের প্রথমশিক্ষা চণ্ডীমণ্ডপেই হইয়াছিল। তারপরে, এই গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী 'সেখপাড়া'-নামক গ্রামে, মৌলবী-শিক্ষকের নিকটে, তিনি এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্রগণ পড়িতে যাইতেন। তখন তাঁহার বয়স সাত আট বৎসরের বেশী নহে।"

জন্মাবধিই পরতুষ্টি-সাধনে তিনি যে দৃঢ়ব্রত ও একান্ত স্বার্থশূন্য ছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন;—

"অতি বাল্যকাল হইতেই কবিবর খেলার সাথী ভ্রাতাদিগকে (পিতৃব্যপুত্র) এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহারা যাহা বলিতেন, তাহাই করিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতেন। তাঁহার বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একটি পাখীর ছানা পাইয়া পুষিয়াছিলেন। একদিন, তাঁহার এক ভ্রাতার সহিত রাগারাগি হইলে, ভ্রাতা বলিলেন, 'মধু! আমি আর তোর খেলার সাথী হইব না।' 'মধু', আকুল হইয়া, ভ্রাতা কিসে সাথী হইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা বলিলেন, 'তুই যদি তোর পাখীর ছানাটা কাটিয়া ফেলিস্, তবেই তোর সঙ্গে খেলিব।' বালক-মধু, তখনই পাখীর ছানা কাটিয়া, ভ্রাতাকে সাথী পাইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন!"

তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, জ্ঞানোন্মেষ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, সমভাবে বলবতী ছিল। বিদ্যার্জ্জনে তিনি অক্লান্তশ্রমী ও সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। পরিণত-বয়সে—কি সুখসম্পদে, কি ঘোরবিপদে—সংসারের সকলচিন্তা বিস্মৃত হইয়া, তিনি, কবিবর বায়রণের মত, অধ্যয়নে নিরত

থাকিতেন। যখন অধ্যয়নে নিমগ্ন, তখন কেহ তাঁহাকে কথা বলিলে, বলিতেন—

"জননী, ব্যথিত দেহে, হাত বুলাইলে,
থাকে কি বেদনা কভু?"

সেই গ্রাম্যপাঠশালায় মধুসূদন গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ও গণিত শিখিয়াছিলেন। গ্রাম্যগুরু পারস্য-ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালা-সংস্কৃতও অল্প জানিতেন। এই গুরুমহাশয়ের কথা মধুসূদন কখনও বিস্মৃত হন নাই।* গুরু ও পূর্ব্বোল্লিখিত মৌলবী সাহেব মধুসূদনকে সেই বয়সেই অনেক পারসী-কবিতা মুখস্থ করাইয়াছিলেন। পাঠশালায় মধুসূদন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁহার তাৎকালীন বিদ্যানুরাগসম্বন্ধে তাঁহার জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—"প্রাতঃকালে, পাঠশালার ছুটি হইলে, অন্যান্য বালকের ন্যায়, মধুসূদনও আহারের জন্য গৃহে আসিতেন। তাঁহার পুত্রবৎসলা জননী তাঁহার জন্য, নানা-প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া, অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনকে, সম্মুখে বসাইয়া, স্বহস্তে আহার না-করাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু আহার করাইতে একটু বিলম্ব হইলে মধুসূদন অস্থির হইতেন। তাঁহার সমবয়স্ক বাটীর অপরাপর বালকেরা, আহার করিতে বসিয়া, আহার্য্য বস্তুর জন্য, যখন চীৎকার ও কোলাহল করিত, মধুসূদন, সেই সময়, শীঘ্রশীঘ্র কোনরূপে আহার সম্পন্ন করিয়া, এক-এক-দিন, হয়ত, অসিদ্ধব্যঞ্জন-পর্য্যন্ত আহার করিয়া, সকলের অগ্রে গিয়া পাঠশালায় বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি হিন্দুকলেজে, সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।" তাঁহার শৈশবের আদর-যত্নের প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনী-কার বলেন, "যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজপুত্রগণেরও, বোধ হয়, সেরূপ হয় না। তাঁহার বাল্যের ভোগবিলাসের কথা অবগত হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অমিতব্যয়িতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। * * তিনি স্নানার্থে গমন করিলে, একবারে ৫।৭টী চুল্লিতে অন্নপ্রস্তুত হইয়া থাকিত। প্রত্যাগমন করিয়া, যে চুল্লির অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ হইত, তিনি তাহাই আহার করিতেন।"

শৈশবেই তিনি, তাঁহার জননী জাহ্নবী দাসীর নিকট, বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীনকাব্যসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। অনেকসময়, দেশের বাটীর সম্মুখস্থ বাদামবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া, তিনি তন্ময়চিত্তে কাব্যপাঠে নিমগ্ন থাকিতেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, ত্রয়োদশবর্ষীয় মধুসূদনকে, পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, কলিকাতায় আনাইয়া, খিদিরপুরের বাটীতে রাখিয়া, শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে অল্পদিন খিদিরপুরের ইংরাজী স্কুলে পাঠাভ্যাসের পর, মধুসূদন হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করিলেন।

মধুসূদনের এক সহাধ্যায়ী (হুগলী-নিবাসী ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ জজ্) লিখিয়াছেন—

"রাজনারায়ণ (দত্ত) বাবু সে-কালের সদর-দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান যশোহর জেলার সাগরদাড়ী গ্রামে; তন্নিকটে তাঁহার অনেক বিত্তবিভব ছিল। মধুসূদন, রাজনারায়ণ বাবুর একমাত্র সন্তান; অধিকন্তু বিদ্যাতে তাঁহার প্রখরবুদ্ধি দেখিয়া, স্বভাবতঃই রাজনারায়ণবাবু মধুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার আকুতি পালনকরিতে ত্রুটি করিতেন না। রাজনারায়ণবাবু মধুসূদনের গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন বটে; কিন্তু একবিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। আমি একদিবস পিতার নিকট পুত্রের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম; তাহাতে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, 'বাপু! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু কোষ্ঠীতে উহার ধনস্থানে শনিঠাকুর আছেন—আমার অভাবে মধুর যে কি-দশা হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমি অস্থির।'"

কলেজে পাঠ্যাবস্থায় মধুসূদনের চেহারা কিরূপ ছিল, সেসম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্রের নিকট আমরা জানিতে পাই—

---

* "In after-life, when our poet was residing in Calcutta, his old Guru (teacher) used to visit him there, from time to time, and was invariably treated with respect and consideration by his distinguished pupil."—National Magazine, Vol. VI, 1892.

হিন্দুকলেজ— কলিকাতা

" Turning my mental telescope, I see afar off, in 1840, Modhu 'diminished into a boy' of 15 or 16. His white clothing deepening his complexion ; he looks very like an Ethiop boy. But see 'Othello's visage in his mind.' The light from within peers through his eyes. * * * * He was then a slim, tallish youth, who won friends by an engaging smile and address."

হিন্দুকলেজে শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার যাবতীয় সহাধ্যায়ী—সকলেই একবাক্যে লিখিয়াছেন, "কলেজে, উৎকৃষ্টছাত্রগণের মধ্যে, মধুসূদন উজ্জ্বলো তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন।" ইংরাজি-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়ন ফলে—পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, প্রতিবৎসরেই, এককালে দুই-তিন শ্রেণী এবং অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রকে অতিক্রম করিয়া, তিনি বৃত্তিলাভ করেন। সিনিয়রদ্বিতীয়শ্রেণীতে পঠদ্দশায়, প্রথমশ্রেণীর সহিত প্রতিযোগী পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, তিনি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন *।

তাঁহার প্রতিযোগী জনৈক সহাধ্যায়ী, প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, তাঁহার গুণকীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "বয়সে মধু আমাপেক্ষা ছোট ছিল; কিন্তু এমনিই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির জোর যে, আমাদিগের অনেক পরে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়া, লম্ফে লম্ফে নিম্নশ্রেণীসকল অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমাদিগের সমাধ্যায়ী হইয়াছিল।"

গৌরদাস বাবু বলেন,—" He was, undeniably, the Jupiter among the bright Stars of the College"

বঙ্কবিহারী দত্তের কথায়,—" I was a very dull

* এই প্রতিযোগি-পরীক্ষায়, ইংরেজীতে "স্ত্রী-শিক্ষা"-সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখিয়া, মধুসূদন, রামগোপাল ঘোষ-প্রদত্ত স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় রৌপ্যপদক লাভ করেন। গভর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক-সভার অন্যতম সদস্য মাননীয় C. H. Cameron-মহোদয় এই সকল প্রবন্ধের যোগ্যতা পরীক্ষক ছিলেন।

boy at the commencement; but, by diligence and exertion, became one of the Stars of the College, of which Modhu was the Jupiter."

পরবর্ত্তীকালে, ৺কিশোরীলাল হালদার লিখিয়াছেন;—"In general Literature and English Composition, our poet was second to none of his contemporaries at the Hindu College."

হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে, তিনি ইংরাজি-সাহিত্যের ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ক এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের চরমপরীক্ষোত্তীর্ণ কোন ছাত্র, তত পাঠ করিয়াছেন, কি না, সন্দেহ। কলেজে 'বহুপাঠী ছাত্র' বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি ছিল।

আর এক কথা, সাহিত্যবিদ্ মধুস্থদনের গণিতশাস্ত্রেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।—তবে, গণিতের চর্চ্চা তিনি বড় ভালবাসিতেন না। একবার, ভূদেববাবু প্রমথ সহপাঠীদিগের সহিত, সেক্সপীয়র ও নিউটনের মধ্যে—প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্কদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। মধুস্থদন, সেক্সপীয়রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "সেক্সপীয়র, চেষ্টা করিলে, নিউটন হইতে পারিতেন; কিন্তু নিউটন, চেষ্টা করিলে, কখনও সেক্সপীয়র হইতে পারিতেন না।" হঠাৎ, একদিন এই সত্য সকলের সমক্ষে কার্য্যতঃ প্রতিপাদন করিয়া, তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন!—অধ্যাপক রীজ্ (V. L. Rees), ক্লাসে গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন-সমাধান করিতে দিলে, যখন কোন ছাত্রই তাহা সমাধান করিতে পারিল না, তখন মধুস্থদন, খড়ি-হাতে লইয়া, বোর্ডে গিয়া, তাহা প্রণালী-শুদ্ধ রীতি-অনুসারে সমাধান করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রতিপক্ষীয় সহপাঠীদিগকে লক্ষ্য করিয়া, "And so Shakespeare could be Newton, if he tried."—এই কথা বলিয়া সদম্ভে আসনগ্রহণ করিলেন। তাঁহার উঠিবার সময় যাঁহারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নানারহস্য-কৌতুক করিয়াছিলেন, তাঁহারা গণিতে তাঁহার অদ্ভুতকৃতিত্ব দেখিয়া, অধোবদনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মধু তখন বলিলেন—"কিন্তু আমার গণিত-শেখা এই পর্য্যন্তই শেষ।"

মধুস্থদনের মহাকবি হইবার, ও বিলাতে যাইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে আবাল্য হৃদয়ে জাগরূক ছিল, অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, হিন্দুকলেজে থাকিতে থাকিতেই গৌরদাস বাবুকে একখানি পত্রে, সেকথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন; "Oh! how should I like to see you write my 'Life'—if I happen to be a great poet—which I am almost sure I shall be, if I can go to England." তবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে—প্রথম বয়সে, ইংরাজী ভাষায় মহাকবি হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মনে প্রবল ছিল; কিন্তু পরে, কার্য্যক্ষেত্রে, তিনি বঙ্গসাহিত্যের মহাকবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন—সুতরাং, তাঁহাকে সেজন্য আর ইংলণ্ডে যাইবার প্রত্যাশায় থাকিতে হয় নাই।

সেই কৈশোরে, হিন্দু-কলেজে পঠদ্দশায় ইংলণ্ড গমনের জন্য তাঁহার কিরূপ উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তৎকর্ত্তৃক মুখে-মুখে-রচিত গীতটি হইতেই সকলে বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিবেন—

EXTEMPORARY SONG.

I.

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green—its mountains high:—
Tho' friends, relations, I have none
In that far clime—yet Oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory, or a nameless Grave!

II.

My father, mother, sister—all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes, like winter's dew.
And Oh! I sigh for Albion's strand,
As if she were my native-land!

Kidderpore, 1841. —M. S. Dutt.

অনুবাদ—

"দূর শ্বেতদ্বীপতরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ,

নাহি সেথা আত্মজন, তবু, লঙ্ঘি অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিম্বা অ নামা সমাধি।" *

জনক-জননী-ভগ্নী—আছে মোর স্নেহ পরকাশি,
তারা মোরে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি ;
বেগে ঝরে অশ্রু চোখে, হেমন্তের শিশিরের সম,
কাঁদি শ্বেতদ্বীপ তরে, যেন, সে-ই জন্মভূমি মম !"

ইংলণ্ড-গমনের আকাঙ্ক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার রচিত অন্যান্য কবিতাতেও আভাষ পাওয়া যায়।

হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদন গোপনে ইংলণ্ড গমনের মৎলব করিয়াছিলেন, কলেজের অধ্যক্ষ Kerr সাহেবের পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইয়া তিনি কিছুদিন কলেজে যান নাই ; নিম্নোদ্ধৃত পত্রে গৌরদাস বাবুকে এইসকল বিবরণ লিখিয়াছেন।—এই বয়সেই তিনি কিরূপ সৌখিন ছিলেন, এই পত্রে তাহারও যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কবি-যশের প্রতি তাঁহার আশৈশব ঐকান্তিক—তীব্র অনুরাগ এবং তাৎকালিক বিদ্যালয় সমূহের রীতি-নীতিও ইহাতে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়াছে।—তদ্ভিন্ন, আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি যে, তাঁহারা উভয়েই এইসময়ে "Mechanics' Institute"-এর সভাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

Kidderpore, 26th Nov., 1842.
Sunday.

My dear friend,

There's a bottle (or whatever you please to call it) of Pomatum for you. I don't require your thanks—but you must praise my readiness in obeying you : I am sorry I am not yet able to procure Lavender for you ; you must excuse this : I am very much importuning the man—the d—d shop-keeper who supplies me with these things.—To-morrow I won't go to College—this is my resolution.—I hate College—I hate K—r —I hate B !!! I am now plotting against my own parents ! I won't explain this, understand it yourself ! By the Bye—last evening you had the impudence to tell me (at the M. I.'s) that you will inform my father about my intention of running away to E—d and there by prevent me from doing so !!! If these are what really you think—you are *No friend of mine* —I can assure you.—If these are your sentiments, you be d—d ! Perhaps, you think I am very cruel, because I want to leave my parents Ah ! my dear ! I know that—and I feel for it ! But, "to follow Poetry," (says A. Pope) "one must leave both father and mother" —Too much of this :—You are wise—think on it.—I intended to write you a long letter but unfortunately a host of friends (acquaintances) are sitting 'round me.—I am called away to play the chess—my favourite chess. Write as long a letter as you please. I like to read long letters from *you* The answer of this will, (I believe) begin "Surely you are loading me with presents, etc." How acute my memory ! I read your letters with so much attention, that I can repeat them (each of them) word per word—tho' you couldn't recollect something of a letter of mine last evening at the M. I.'s !!!

Excuse this shameful scrawl. My pen is bad—and I don't know how to mend one !!!—Mind—I won't go to College to-morrow. I intend writing a note to the d—d fellow K—r for leave of 2 months.—I hope he will grant it. If he won't, I don't care : But I will absent.—I will—I will.

This is not a long letter !!!—Write one

---

* প্রথম stanzaর অনুবাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত।

exactly as long (longer if you can) as this:—and believe me,

Yours ever affectionately,
—M. S. Dutt.

নিম্নলিখিত পত্রাংশপাঠে পাঠক অবগত হইবেন যে, সুহৃদ্বৎসল মধুসূদন, কিরূপ প্রাণভরিয়া বন্ধু গৌরদাসকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে না-দেখিলে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইতেন—

* * * * *

What a long letter have I written! But I cannot help doing so, when I seize my pen with the intention of writing to you.—Where is B. B. D.? Is the Beggar gone home? Where is my Eutropius (Roman History in Latin). Gour! if you do not call on me here, some day or other, during this vacation, you will break my heart;—nay, never shall I set my foot on the ground where stands a Bysac's house:—With compliments, thanks, respects, tenderings of love, affection,

I remain,
Kidderpore, most beloved Bysack,
7th Oct., 1842. truly yours,
—M. S. Dutt.

P. S.—Your Byron, Vol. 2nd, and Crabbe, with thanks, are hereby returned.

তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করিবার পরে গৌরদাস বাবুকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিয়াছিলেন—

My dear friend,

You are such a boy, that you scarcely deserve any favour at all.—You see, how many times you have disappointed me: but, however, I should be glad to see you at any time you please. Give my compliments to Babu B. M. I have got my medal sent me yesterday by Mr. Kerr. Excuse me—Gour!—I can't write anything else, to-day being Sunday.

Yours as ever,
—M. S. Dutt

By the bye—I am writing a long poem.

পাশ্চাত্য প্রভার উজ্জ্বলদৃশ্য এইসময় অনেক হিন্দু কিশোরের হৃদয়েই মোহ-উৎপাদন করিয়াছিল। বালক মধুসূদনের চক্ষে কিরূপ ধাঁধা লাগিয়াছিল, পাঠক প্রোক্ত কবিতা-পাঠেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কৈশোরেই তিনি ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত, ইংরাজি মন্ত্রে দীক্ষিত, ইংরাজি ভাবে অনুপ্রাণিত ও ইংরাজি তন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিভা ও মনীষা, পরিণত-বয়সে গৃহাভিমুখী—স্বদেশের ও স্বজাতির ভাষার গৌরবের প্রতি আসক্ত—হইয়া, স্বজাতীয় ভাষার অপূর্ব্ব সংস্কারসাধন করিয়াছিল।

হিন্দুকলেজে মধুসূদন অনেকগুলি ইংরাজি কবিতা লিখিয়াছিলেন। অনেক কবিতা তাৎকালিক—'জ্ঞানান্বেষণ,' 'Bengal Spectator,' 'Literary Gleaner,' 'Literary Gazette,' 'Literary Blossom,' 'Comet'-প্রভৃতি সাহিত্যবিষয়ক নানাসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের এই পঠদ্দশায় ইংরেজী কবিতা-রচনা-সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন;—"Modhu has taken up to describe a night scene, in which, among other things, he thus alludes to the Stars—'Night holds her Parliament.'—The happy expression at once becomes a 'fond record in the tablet of my memory, and still holds a seat there'—fifty years have not been able to efface it.

"Shakespeare has—" the floor of heaven is thick inlaid with patines of bright gold." Byron addresses the Stars as the—"poetry of heaven." Modhu, in his teens, gives a proof of close poetic kinship. The Aryan by race,

is Aryan, too, in thought and expression.— I was Modhu's senior. I too liked poetry. But I never knew the way to Castaline. My head was a prose-quarry, without a vein of poetic-gold. Modhu's was a Helicon-quarry."

সেই চিরোচ্ছ্বাসিত 'হেলিকনে'র শৈল-নির্ঝরিণীর প্রথম প্রস্রবণ—সেই কমনীয় তরুণ প্রতিভার প্রথম লহরীমালা—কেমন মৃদুল-হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই রক্তরাগময়ী তপন দূতী অরুণরমণীর কপোলরাগের প্রথম রক্তিমরশ্মি—কিরূপ বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ১৭।১৮ বৎসর বয়সে রচিত কবিতাবলী হইতে পাঠক অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। তিনি, ঐসকল কবিতা হিন্দুকলেজে পাঠাবস্থায়, খণ্ড-খণ্ড আলগা টুকরা কাগজে লিখিয়াছিলেন। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে—সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে চিরবন্ধু গৌরদাস সেই কবিতাগুলি পরলোকগত মহাপ্রাণ সুহৃদের চিতাভস্মের ন্যায় আমরণ সযত্নে ও অতিসন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছিলেন। তদীয় সুযোগ্যপুত্র—মধুসূদনের পুত্রস্থানীয়—শ্রীযুক্ত লাল-বিহারী বসাক মহাশয়, তাঁহার পিতৃস্থানীয় সেই মহাকবির কৈশোরের স্মৃতিসম্বলিত, প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপি তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের মতই আজিও পরমযত্নে রক্ষা করিতেছেন। 'অপ্সরী'-নামে মধুসূদনের স্বহস্ত-লিখিত একখানি খণ্ড-কাব্য আজিও অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। খণ্ডকবিতাগুলির অধিকাংশই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার দু'একটি-ব্যতীত, অপরগুলি ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই।

SONNET.

I

[To a Star—during a Cloudy Night.]

Shine on, sweet emblem of Hope's lingering ray !
That while the soul's bright sun-shine is o'er cast,
Gleams faintly thro' the sable gloom.—the last
To meet beneath Despair's dark night away !
Tho' lawless clouds rest round thee—and they seem,
As it, impatient to enshroud thy brow,
Yet, O sweet star ! thy dim and struggling beam —
That, like the weed which angry Tempests throw,
Far from their native soil in the dark wave,
Now sinking, as if buried, disappears,
Now bursting forth from its dark cloudy grave,
Sails trembling on pale with a thousand fears,
Has charms that still may please the gazer's eye,
Thou solitary tenant of the sky !

Kidderpore, 1842 — M. S. D.

EXTEMPORARY SONNETS.

[*Composed during a morning walk*]

I love the beauteous infancy of day,
The garlands that around its temples shine ;
I love to hear the tuneful matin lay
Of the sweet Kokil perched upon the pine ;—
I love to see yon streamlet gaily run
And blush like maiden Beauty meek and fair,
When the bright beams of yon refulgent sun
Crowd on her trembling bosom pure and clear ;—
I love to see the Bee from flow'r to flow'r,
Sucking the sweets, to him they smiling yield :—
I love to hear the breezes in the bower
Singing melodious—or along the field ;—
All these I love and Oh ! in these I find
A balm to soothe the fever of my mind !

[Ki]dderpore, 1842 —M. S. Dutt.

II

[Composed during an evening walk.]

I love to see those clouds of golden dye
Float graceful o'er yon blue expanse, serene,
Like sweet remembrances of days gone by

In memory's atmosphere :—Those meadows green,
Tinged by the fading flushes of the sun,
(Who now behind the west path hid his head) :
Yon brook, that warbles low as it doth run,
Quite uncontrolled, by its own sweet will led ;
The breezes that, with innocence and glee,
Sing t'yon listening grove, an audience fair :
Yon distant cot—that group of children there :—
The Kokil's heart-enthralling melody—
All these, meek Even, do belong to thee,
And all these are thy earthly dowers here.

Jessore, 1842 —M. S. D.

EPISTLES IN VERSE

I

[To A "Gentleman"]

Dear Sir,
Plunged in the fathomless abyss of dark despair,
Friendless I drop oft many a silent tear :
I stretch my hands for succour all around ,
But Oh ! for me no succour can be found '
If thou, Dear Sir ' dost kindly deign to save
A helpless wretch from an untimely grave,
Do then : —if not, of Pity plead his cause
And listen to, obey her sacred Laws.

I remain, Dear Sir,
Your most humble, devoted
& obedient servant,
—M. S. Dutt

Kidderpore,
20th May, 1841

II.

Sir,
Your muse, I know, is a too powerful dame,
No censure lowers, no praise exults her name ;
For like the Lady, who hath e'er seen
No man but her own lord, nor e'er been
To any place but lives for age confined
In her own closet—she does bear in mind
That she is great ;—why will she then require
Praise from true Judges, or their censure care ?—

19th June, 1841.
Hindu College.

Your obedient servant,
M. S. Dutt

LINES.

The men'al throng that crowds the Indian shore,
Braves the fierce gale to try their helpless oar—
From such men, 'tis true, muse disdains renown
Thou must be thy prey, when to beauty's own.

The following Poems are Dedicated

To G. D. Bysack Esqr.

By

His most obdt.

Most humble &

Most affectionate

friend.

—The Author.

Kidderpore,
20th April, 42.

STANZAS

[To my Pillow [

I.

Companion of my lonely bed,
Oh gentle pillow ! thou'rt made
To people the bach'lor's embrace—
To comfort his sad loneliness !—

* * *
* * *

What, tho' these lips have ne'er tasted
Nectars of a Beauty's Cheek ;
Thou dost soothe my spirits wasted,
Gentle pillow soft and meek !—

II.

When night doth in her native hue
Paint the earth, the sky, the sea,
Ah ! sweet pillow ! who, but you,
Does then kindly solace me '
My weary limbs in thee do find
A friend so gentle, ever kind :
Tho' beauty ne'er my bed doth bliss,
Or ope for me the door to heaven :
Thou dost cheer my lone embrace .—
Sad comfort here to bach'lors given '

III.

I am no lover ;—love I not .
Tho' loved I once, be that forgot .—
My friends, they do not marry me,
They think not, care not that I die ·
My cup of life tastes bitter—why ?
Because there's none to comfort me ! -
Until one, beautiful and fair,
To bless my bed and banish care,
Doth to my lot, sweet pillow ' fall,
Be thou my mistress, wife and all !—

—M. S. D

THE PARTING

I heard the gun—Time's warning tongue—
In accents rough, loud and strong
Declare the birth of Day ;—
I looked around and saw dark night,
Retiring at th' approach of light—
To regions far away :—
The night clouds ' neath Aurora's eye—
Were melting in the half-lit sky :
The moon still lingered there,
The tuneful minstrels of the grove
Were chanting sweet their lays of love
To the infant morning fair :—

I rose : but Oh ' methought my heart
Would break from that loved one to part :
Nor would she let me go :
The light now entered bold the room,
And drove away the friendly gloom,
Night's remnant sole below—
I kissed her : and with many a sigh,
And tears descending from her eye,
She softly bade me "adieu "
O', with an aching heart and brain,
I took my way thro' fields and glen,
Besprinkled with the dew. *

10th July, 1841

A STORM.

The sable clouds now gathering fast,
The furiously howling blast,
Proclaim—the Storm is nigh ·
And, hark ' the heavens with canons loud
And shouts, that rend each gloomy cloud,
Hails his dread majesty '
He comes ' -the Sun himself has fled
As if affrighted from the sky -
Lo ' every tree he passes by,
Submissive bows its leafy head .
Dub'd pow'r ' the thunder 's his command,
The Lightning flushes from his eye,
The thunderbolts are from his hand
His breath convulses all sky '—
Now all around is overcast !
Ay, hark ' more furious roars the blast :—
Big drops of rain are falling down
So thick, and so impetuously,
As if the fountains of the sky
Had, at his bidding, over-flown .—
That dreadful noise,—' tis he who speaks
That dazzling flash of light—it breaks

* ইহা কি কোন অভিসারের কথা ?

From his dark awful eyes ;—
Behold ! the fiend, in wanton play,
Now flings the dark clouds far away
Himself now with'em flies !—
In this arena thus he plays the part,
Which oft Despair acts in man's wretched heart !

Kidderpore, —M. S. D
29th April, 1842.

SONG OF ULYSSES

(*Written by Ulysses*)

" *Have ye not seen my Penelope,*
That chaste that faithful maid ?"

— M. S. D.

Have ye not seen my Penelope,
That chaste—that faithful maid ?
Look there, O ! that "redcheeked" one,
Whose winning beauties ne'er fade,
Is my chaste Penelope ! —
As constant as the gentle doves,
And faithful too as they,
How fondly she returned my Love,
When I was far away !
O Penelope ! O Penelope !
My chaste—my faithful maid !
Lo ! I shall Love—nor Love the less —
Tho' life decay and fade,
My faithful Penelope !

Greece, 1705 A. D. —ULYSSES. *
27th March.

SONG.

I loved a maid—a blue eyed maid,
As fair a maid can e'er be O:—
But she, oft with disdain, repaid
My fondness and affection O.—
For her I sighed—and e'er shall sigh,
Tho' she shall ne'er be mine O.—
For this sad heart's starless sky
None but herself can light O.—

— M. S. Dutt

Kijirpore, 1705 A. D.

THE HEAVENLY BALL

A FRAGMENT.

DEDICATION :

To G. D. Bysac, Esqre.

I intended to make this a long poem, My Gour !
But I find me too idle to do it :—
But unfinished as it is—yet to you, My Gour !
I do dedicate, so you must take it :—
Tho' short—Oh ! too short is the time we've, My Gour !
To meet on this side of the tomb—killing thought !—
Yet, friendship—and Love shall be e'er ours, My Gour !
Where'er may Fate lead me—thou shan't be forgot !

—M. S. Dutt

I.

The night was fair—the heavenly hall
Was thronged with stars—all soft and bright
—'Twas plain—some spirit gave a ball—
For never, never mortal sight
Beheld a more splendid scene !—
The moon was on the chair—Fair Queen !—
A halo, rainbow-hued—as fair
As that which Future seems to wear,
When seen thro' Fancy's magic glass—
Encircled 'round her :—while her glance
Made e'en Darkness (oh ! so sweet it was !)
Put on a lovelier countenance !—

* * * *

* দেশ-কাল-পাত্র-সমন্বয়ে লিখিত।

* ইহার স্থান ও কাল, কেন যে এভাবে লিখিত—ঠিক বোঝা গেল না !

LINES.

Go fortunate lines ! and tell the maid
That 'tis for her I die !
O ! that some tears when I am dead,
Descending from that lovely eye
May hallow my untimely bier
And soothe my spirit lingering there !

— M. S. Dutt.

To A Lady.

I.

Oh ! That thou wert as fair within
As thy ang'lic outward is,
Then, of what value hast thou been
In this earth—a perfect bliss !

II.

Lady ! tho' beautiful thou art,
Tho' Nature hath gi'en thee ev'ry grace
Yet oh ! how cruel is thy heart –
Thou art deaf to the voice of distress.

—M. S. Dutt.

To another Lady

Oh ! deign to give a thought on me,
When these sad lines do meet thine eye,
Think then on him—who oft for thee,
Sweet one ! doth unregarded sigh !

— M. S. Dutt

25th Sept., 43.

When M. S. Dutt was present at mine.

G. D. Bysack.

To G. D. B.

Far from us thou' rt sitting : like a Star
That tears himself to shine and hue afar
From his companions : –Oh ! here come again !
The space you filled doth now vacant remain !
Thou wandering Star ! No longer thus stray
From thy own herd, 'mid flocks unknown away.

—M. S. D.

LINES.

I met thee—tears came in my eye –
Oh ! they were soothing tears—
The tribute of sad memory,
Dear Friend ! to parted years !

—M. S. Dutt.

To—

"On being asked ' Not love any more ?'—
'Can I cease to love thee ?—No—"

—*Byron.*

This heart, dear maid ! that those sweet eyes
Have conquered long ago,
Say, how can in rebellion rise,
Against its sovereign now ?—

2.

For liberty it grieveth not : —
Ah ! who for freedom sighs
When captured by those heavenly—wrought
And all-subduing eyes ·

3.

I am not false · nor love thee less,
Tho' thou oft with disdain
Imbitter'st all my happy days,
And leav'st me drowned in pain

4

Enough dear maid ! This will impart
What I have more to say :
You can peruse his wounded heart
In thy poetic lover's lay.

Kidderpore
and
Burra Bazar
The April 1841.

—M S D G D B

AN ACROSTIC.

G-o ! simple lay ! and tell that fair—
O-h ! 'tis for her, her lover dies !
U-ndone by her, his heart sincere
R-esolves itself thus into sighs !
D-ear cruel Maid ! tho' ne'er doth she
O-nce think—for her thus breaks my heart,
S-ad fate ! Oh ! Yet must I love thee,
B-e thou unkind, till life doth part !
Y-oung Peri of the East ! * thou maid divine !
S-weet one ! Oh ! let me not thus die :
A-ll-kind, to these fond arms of mine
C-ome ! and let me no longer sigh !

Kidderpore. —M. S. Dutt.

Stanzas

1.

I press'd her lily-hands in mine,
But she snatched them soon from me !
Ah ! cruel maid ! those hands of thine,
You now not—can alone soothe me !

2.

I love thee, and thou know'st it not,
Thou know'st not how I worship thee ;
I live in thee-- my every thought
Has been, is and shall be of thee !—

3.

Yes N. is beautiful and fair,
But oh ! where is that soft meekness
Which does thee so to me endear,
And grace oft thy far sweeter face !

4.

Let all go ' way—I care them not—
By thee I wish belov'd to be.

* "Young Peri of the west"
—*Byron.*

I live in thee—my every thought,
Let oft, sweet one, be' lone of thee.

—M. S. Dutt.

VERSES*

"I have a heart—but that it far away"
To where enthroned within a palace bright
Sits - ' fair as the infancy of Day,
Or the sweet Sun when bursting from the Night,
He sits upon his Orient purple throne !
There, with devoted heart, adore alone
The lovely object, who doth, to my eyes
Appear the sweetest ' neath these azure skies '

—M S. Dutt

TO BANEE MADHAB BOSE.

Banee ! it is now almost fine ! -- Yes, Night is gone—
Yet, oft studious to please that "Sweet One"
I'm sitting sleepless ;-- kissing her ? Ah ! no '
To kiss her is a perfect bliss below !
I am unfortunate : - The maids I love,
Prove either "faithless" or unkind !—By Jove
To kiss I like but oh. I can't get any ;
And for this oft I sigh, grieve, and weep ; Bany '
But shall I tell thee whom I loved and love ?—
Let that alone be known to all-knowing Jove !!'
But to return to our object :—I am sitting
At this hour wakeful—sonnets, stanzas writing—
For one, who now upon her couch, dear Bany !
peaceful sleeps
And lets the pillow press the breast for
which this fellow weeps
But Bany ! now a bird is crying—"koo, koo,
koo, koo, koo !

These verses are written at the request Gour Dass—the author's freind. But they are not intended to be addressed to any one.

—M. S. Dutt

As if telling me—"Sad lover ! Go to sleep ! Go !"
Hark ! the gun is also fired : Bah ! night is now
no more :
I most go to sleep, my friend ! I cannot write more :
For sleep, now and then, to me kind is
And gives me that maid once or twice to kiss !

—M S Dutt

THE SLAVE.

(*Written to illustrate a picture*).

"There is no flesh in man's obdurate heart !"

Cowper

1.

He sadly sits upon the bark,
His chained hands are on his face :
What bitter thoughts what visions dark
Of misery and wretchedness
Now, like a furious tempest, roll
Within his dark, bewilder'd soul !

2.

The ship that wafts him far away—
From country - home—Love's sunny world
Sits proudly on the ocean-spray—
Her giant-wings are all unfurl'd ;
Yes—soon she 'll walk the foaming—brine
And sever thee from all that's thine !*

3.

Far, far beyond the rolling wave,
Thou soon shalt press a sod unknown—
Or slumber in a nameless grave,
Sad, unlamnted, all alone—
Without a soothing sigh—a tear
Shed by Affection on thy bier !

4.

No more, no more, Oh ! never more,
Beneath the Cocoa's spreading shade,
Or by the solitary shore—
Or o'er the flow'r enamel'd glade,
Shalt thou, in pensive musing mood,
Court the soft charms of Solitude !
Or with thy lov'd and loving bride—
At ever the lovers' sacred hour
Stand by the mossy fountain side,
Or sit in the blushing bow'r,
To mark the stars peep out o' the skies,
Or gaze upon her brighter eyes :

6.

Or swiftly paddle thy canoe
Gay, chanting thy wild native song,
On the Lake's breast unruffled—blue,
Or the wide foaming brine along ;

* * * *

1842. —M. S. Dutt.

TO

(*With a nosegay of Roses*).

These Roses—imitations bright
Of those sweet cheeks—are thine:—
Mary ! tho' of their loved Sun's light
They are deprived who oft did shine
On them and shed his tenderest beam ;—
Yet oh ! beneath those heavenly eyes,
They all find a better paradise,
Than poets ever dream !—
Yes ; pillowed on that snowy breast,
They all find a place—sweet place ! to rest,
For which e'en Angels might have sighed
Ah ! there once laid—supremely blest—
They all blow and blush with hosest pride:
Thy eyes—the heavings of thy bosom—
will supply
Them with a Sun—and their loved Zypher's
sigh !

Kidderpore.
9th Sep., 1842. —M. S. Dutt.

* (Or) Bereaving thee from all that is thine !

SONG.

[The following little poem is dedicated to G. D. Bysack, Esqre., as a slight but sincere token of respect for his learning—admiration for his amiable qualities, and esteem for his valuable friendship ;—By the author—M. S. Dutt]

I.

I am like the Earth, revolving
Ever round the self-same Sun—boy.
Seasons—both of Joy and Sorrow,
I have, like her, as I run—boy.

II.

O ! her eyes soft—tender beaming,
And her sweet bewitching smile—boy,
Like Enchantment's potent spell—do
Call for th' gayer—brighter Springs—boy.

III.

But when frowns, like lowering clouds—do
Over-cast her sunny brow—boy,
Then, Oh ! then, the freezing Winter
Of dark sorrow chills my breast—boy.

IV.

Now, fond hope buds—blossoms sweetly,
Vernal thoughts do fill my head—boy,
Now, dark disappointment dreadful,
All my joys and hopes doth blast—boy.

V.

Thus I'm like the Earth, revolving
Ever round the self-same Sun—boy,
Seasons—both of Joy and Sorrow,
Like her, I have, as I run—boy !

Kidderpore, 1842. —M. S. Dutt.

SONNET.

Love ! I have bask'd me in thy summer-ray ;
And, Disappointment ! thy stormiest night
Of grief I've known ! and Joys, all sweet and bright,
(But vanishing, as flow'rs that fade away
Within the self-same hour that gives them birth !)
With vernal beauty once did bloom along
My path of life !—Yes !—Once this green-robed Earth—
Yon boundless heaven—the lark—his matin song—
The purling rills—the distant hills—the trees
(Whose green locks' round temples sweetly play)
The spreading Banian's shade—the warbling breeze,
Could charm my soul ! —But Oh ! man's brightest day
Is e'er succeeded by a night of gloom ;
And peace and rest for thee is only in the tomb !—

1842. —M. S. Dutt

SONNET.

Beloved Lake ! How oft I think of thee :
How oft I dream of thy calm silver breast,
Where the Moon-beams undisturbed ever rest,
And see themselves reflected beauteously.—
Where no rude gales, with boisterous revelry,
Disturb the Lotus—thy sweet daughters coy :
But many a breeze, with perfumes, gallantly
Comes to woo her, infusing purest Joy
To every heart.—Oh !—How I love to live,
Beloved Lake ! On thy sweet margin green,
There, in thy dear society, cease to grieve,
Nor brood on sorrows none should sympathize :
And, 'mid thy lonely and endearing scene,
No longer breathe such unregarded sighs.

1841. —M. S. Dutt.

উপরোদ্ধৃত ইংরাজি কবিতাসমূহ ইংরাজি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৭।১৮ বৎসর বয়সে

লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার কৈশোরের রচনার কোন প্রভাবই পূর্ণবয়সের রচনার উপর ছিল না। কবিকে বুঝিতে হইলে—কবি-জীবনের ক্রমবিকাশ জানিতে হইলে—তাঁহার প্রথম, মধ্য ও শেষ জীবনের প্রত্যেক রচনাই আলোচনা করিতে হইবে; ভালমন্দ বাদ দিলে চলিবে না! সেই জন্যই এই কবিতাচয় উদ্ধৃত হইল।

মধুসূদনের প্রথম-জীবনের কবিতাগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না; তবে, আমাদের মনে হয়, ইংরেজ-কবি 'বায়রণ'-প্রভৃতির খণ্ড কবিতাগুলি-অপেক্ষা—কি ভাষা লালিত্যে, কি ছন্দমাধুর্য্যে, কি ভাবগরিমায়—এগুলি কোনও অংশে হীন নহে! একজন ১৭।১৮ বৎসর-বয়স্ক বাঙ্গালী বালকের পক্ষে এরূপ কবিতারচনা নিতান্ত সাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক নহে।

কবিতাগুলি পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, কবি যৌবন উষায় অজ্ঞাতনাম্নী—সম্ভবতঃ 'মেরী'-নামধেয়া—কোন স্ফটিকাক্ষী, গোলাপ-সন্নিভ-কপোলা তরুণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রণয় প্রভাবে তাঁহার অন্তর্নিহিত সুষমা-উৎস উৎসরিত হইয়া কবিত্বতরঙ্গিণীর স্রোতঃ নিঃসারিত হইয়াছিল!

ভাবাবেগ প্রবল হইলে, ভাষা স্বতঃই যোগায়;—সে মাতৃভাষা। সে-কালে—যখন ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাব এদেশে তেমন বিস্তারিত হয় নাই—এই অল্পবয়স্ক বঙ্গ-বালকের বিজাতীয় ইংরেজীভাষার উপর মাতৃভাষা-অপেক্ষা এত বিশালতর অধিকার কিরূপে জন্মিল যে, সে অনর্গলে এমন উচ্চাঙ্গের ভাবময়ী কবিতারাজি রচনা করিতে লাগিল, একথা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়—বিচার-বিবেকশক্তি মূক—স্তব্ধ হইয়া থাকে! আবেগভরে বলিতে ইচ্ছা করে—

"ঈশ্বরানুগৃহীত ঐশীশক্তিসম্পন্ন বীণাপাণির বরপুত্র মাত্র মধুর পক্ষেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল!"

মধুসূদনের কৈশোরের কবিত্ব-তরঙ্গিণীর তরলোচ্ছ্বাস যৌবনে মহাসমুদ্রের গভীরগর্জ্জনে পরিণত হইয়াছিল। প্রেমিক-হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস বীরহৃদয়ের বীরোচ্ছাসে উদ্বোধিত হইয়াছিল। তাই, স্বদেশগতপ্রাণ মহাকবি প্রৌঢ়বয়সে তন্ময়চিত্তে পৌরাণিক বীরকীর্ত্তিগাথা গাহিয়া গিয়াছেন—তাহাতে তরল প্রেমোচ্ছ্বাসের বুদ্‌বুদ্ কণাও ছিল না। কিন্তু তাহার সূচনাও তাঁহার কৈশোরের সেই প্রেমোচ্ছ্বাসের ভিতরদিয়াই হইয়াছিল! যিনি যথার্থ প্রেমিক, তাঁহার হৃদয়—বিশাল—বিরাট্। মধুসূদনের প্রেমপিপাসু মহান্ হৃদয়—পুরুষোচিত বীরত্বের আধার ছিল। মধুসূদন চিরদিন রসিক, প্রেমিক ও বীর ছিলেন। এসম্বন্ধে সকল কথা আমরা তাঁহার চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব।

হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার যেমন সাহিত্য চর্চ্চা ও কবিত্বরসানুশীলনে প্রগাঢ় অনুরক্তি পরিলক্ষিত হইত, অপরদিকে বিলাসিতার মাত্রাও তেমনই অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছিল—সেরূপ অত্যধিক বিলাসিতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তিনি সকলবিষয়েই সকলের অগ্রণী ছিলেন। গৌরদাসবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে, খিদিরপুরের বাটী হইতে তিনি প্রত্যহ পালকী-আরোহণে কলেজে আসিতেন; সঙ্গে পরিচর্য্যার নিমিত্ত দুইটি ভৃত্য থাকিত। দিবাভাগে ৪।৫ বার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতেন। পরিচ্ছদের নূতনত্বে ও পারিপাট্যে তিনি সকলের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। নিত্যনূতন সুগন্ধিদ্রব্য না হইলে তাঁহার চলিত না। একদা, চুল ছাঁটা মনোমত হওয়াতে, তিনি এক সাহেব-নাপিতকে একটি মোহর দিয়াছিলেন! দাসদাসীদিগকে সামান্য কারণে পুরস্কৃত করিতেন। বিলাসিতার সহিত পরোপকার প্রবৃত্তিও তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলেজ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বিপন্নের সহায়তা কল্পেও তিনি সতত মুক্তহস্ত ছিলেন।

তাঁহার এক সহাধ্যায়ী বলেন;—"মধু বড় খোস্-পোষাকী ছিল এবং, সাহেবদিগের ন্যায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত। আমাদের সময়, হিন্দুকলেজ কলিকাতার ধনীবালকে খচিত ছিল; কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে মধু এইসকল লক্ষপতি ধনিপুত্রদিগের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।" সেই সহাধ্যায়ীই আরও বলেন-"মধুসূদনের ব্যঙ্গকরার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, এবং গীত-বাদ্যেও কম অধিকার ছিল না।"

হিন্দুকলেজে মধুসূদন পরিচ্ছদবিষয়ে সঙ্গীদিগকে নিত্য-নূতন উদ্ভাবনী দেখাইয়া বিস্ময়াভিভূত করিতেন। একদিন, হঠাৎ, ধুতিচাদর পরিত্যাগ করিয়া—বুট-পায়জামা ও আচকান পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন! তারপর, অচিরেই,

'আচকান'-পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজি-কোট্ গ্রহণ করিলেন—ইহা আর কখনও ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দেখাদেখি, অনেক ছাত্র চাদর(উড়ানী.) ত্যাগ করিয়া, তাঁহার প্রবর্ত্তিত এক, ছোটের দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। দিগম্বর মিত্রের ভ্রাতা—মাধব মিত্র—উড়ানী ত্যাগ করিয়া, টাইট-জামা পরিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল ছাত্রদিগের পক্ষে এসব পরিবর্ত্তন ভাল সাজিল না। তবে, প্রতিভাবান্ মধু যাহা করেন, তাঁহাকে তাহাই মানায়, তাহাই সাজে—সকলের চোখে তাহাতেই ভাল দেখায়। বন্ধুবর গৌরদাস যথার্থই লিখিয়াছেন, "Modhu was a Genius. Even his foibles and eccentricities had a touch of romance, and a taste of 'the attic salt', that made them savoury and sweet."

মধুসূদন যে কি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের আদর্শ শিক্ষাগুরু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এককথায় বলিয়া দিয়াছেন—"কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখি নাই!"

মনস্বী ভূদেব আরও বলেন, "মধুর বুদ্ধি বিদ্যুতের ন্যায় যেন চারিদিকেই খেলিত; আমার সেরূপ কিছু ছিল না। 'উত্তররামচরিতে', আত্রেয়ী ও বনদেবতার পরস্পরের কথোপকথন প্রসঙ্গে, কবি ভবভূতি লিখিয়াছিলেন,

'প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ-গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।'

আমাদের উভয়েরও ঠিক তাই হইয়াছিল; মধুর বুদ্ধি বিপদ মণির ন্যায় ছিল—প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ হইত।"

একবার কথাপ্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার জমীদার, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভূদেব বাবুকে বলেন, "আপনার ন্যায় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও দেখি নাই!" উত্তরে ভূদেব বলিলেন, "তোমরা আমাকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া থাক, আর সত্যই আমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বটে; কিন্তু আমি মাইকেলের শতাংশের একাংশও নহি!" উত্তরে রাসবিহারীবাবু বলেন, "সে কি? ওকথা আপনি বলেন বটে; কিন্তু আমরা ত

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

আপনাকে জানি!" তাহাতে ভূদেব বাবু উত্তেজিত হইয়া বলেন, "না হে—না, আমি ঠিকই বলিতেছি; তোমরা মাইকেলের দেখেছ কি? তোমরা দেখেছ তাহার wreck! তোমরা দেখেছ তাহাকে মৃতকল্প!—হিন্দুকলেজের সে মধুসূদনকে ত তোমরা দেখ নাই। দেখিলে, কখনও এমন কথা বলিতে না!"

রাসবিহারী বাবু বলেন, 'এরূপ এক-আধবার নয়—অন্ততঃ বিশবার; যখনই মধুসূদনের প্রসঙ্গ উঠিত, তখনই ভূদেববাবু উপরোক্তভাবে মধুসূদনের গুণপণার বিশেষত্বের কথা বলিতেন।"

মধুসূদন, তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া, যে ইংরেজী চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, মধুসূদন, পাশ্চত্য-প্রভাবে প্রণোদিত হইলেও, নিজের ব্যক্তিত্ব ও মহান্ হৃদয় কদাচ হারাইয়া ফেলেন নাই। তিনি, তাঁহার স্বদেশের প্রতি কিরূপ অনুরক্ত—স্বজাতির গৌরবে কতদূর গৌরবান্বিত—সখ্যতা ও প্রেমের অন্তঃসলিলা সরস্বতী তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীরভাবে প্রবাহিত ছিল—

নিম্নোদ্ধৃত কবিতার প্রত্যেক পংক্তি তাহা সুস্পষ্টরূপে... করাইয়া দিতেছে—

SONNET.

(Written at the Hindu College.)

Oh ! How my heart exulteth while I see
These future flow'rs, to deck my country's brow,
Thus kindly nurtured in this nursery !
Perchance, unmark'd some here are budding now,
Whose temples shall with laureate-wreaths be
crown'd,
Twined by the sister Nine :—whose angel-tongues
Shall charm the world with their enchanting songs
And time shall waft the echo of each sound
To distant ages :—some, perchance, here are,
Who, with a Newton's glance, shall nobly trace
The course mysterious of each wandering Star !
And, like a God, unveil the hidden face
Of many a planet to man's wandering eye,
And give their names to immortality !

M. S. Dutt.

শেষ কথা—মধুসূদনের ছাত্রাবস্থায় লিখিত পত্র ও কবিতাবলীতেআমরা বঙ্কুবিহারী দত্ত, বেণীমাধব বসু, গিরীশ-চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন সহপাঠীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশদবিবরণ-সংগ্রহকল্পে আমরা যথেষ্ট চেষ্টাযত্ন করিতেছি; কিন্তু এপর্য্যন্ত বিশেষ কোনও তথ্য সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগের কেহ, কৃপাকরিয়া, ইঁহাদের জীবন-কাহিনী ও প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে, বলা বাহুল্য, আমরা কৃতার্থম্মন্য বোধ করিব।

যাচ্‌না

[শ্রীমতী বিজনকুমারী]

কি জানি কি মোহবশে ভুলিয়া হে দয়াময়
শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'য়ে প্রভু পড়িয়াছি তব পায়॥
ভজন পূজনে আর শকতি নাহিক তার
দয়াময় দেহ মোরে এবে শান্তি লভিবার॥
ভরসা ত নাহি প্রভু তোমার নিকটে যেতে
কিছু ত নাহিক দাবী তোমারে অন্তরে পেতে॥
পাপী তাপী দীন হীন হৃদয় সঙ্কীর্ণ মোর
অজ্ঞান অধম আমি কোথা পাব পুণ্য জোর॥

আসিয়াছি শুধু দেব ! শুনিয়া অভয় বাণী
চির শান্তি পায় তথা পাপী তাপী সব প্রাণী॥
তাইত তোমার প্রভু পতিতপাবন নাম
তাপিতে ডাকিলে, তুমি পূর্ণ কর মনস্কাম॥
কল্পতরু হ'য়ে তুমি যে যা চায় তারে দাও
কেমনে বলিব দেব ! দয়াময় তুমি নও॥
তাইত যাচ্‌না প্রভু শান্তিময় তব ক্রোড়
দাও শান্তি সুধা-রাশি তাপিত জীবন মোর॥

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্. এ.]

(৪৪)

পিতামহীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গণেশখুড়া প্রথমেই কালীঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য, যদি সেখানে সে পিতামহীসম্বন্ধে কোনওকিছু জানিতে পারে। যদি না পারে, খুড়াস্থির করিয়াছিল, সেস্থান হইতে একেবারে কাশী-অভিমুখে চলিয়া যাইবে।—কাশীই হিন্দুর পক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দু বিধবার পক্ষে, শ্রেষ্ঠতীর্থ—তাহার শেষজীবনের পবিত্রতম অবস্থান-ভূমি।

গণেশখুড়া কালীঘাটে, নানাউপায়ে, ঠাকুমার তত্ত্ব লইবার চেষ্টা করিল; তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। এইখানে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রহ্মচারীর সাহায্যেই খুড়া নন্দীগ্রামে পিতামহীর অবস্থান জানিতে পারিয়াছিল।

অনুসন্ধানের সূত্র ধরিয়া খুড়া নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু মাঝখান হইতে খুড়া, তাহার পরম-স্নেহাস্পদ পেয়াদাপ্রবর, শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র সরদারকে কোথায় লাভ করিল? গণেশখুড়া, দয়াদিদির কাছে, ওইরূপ ভাবেই কার্ত্তিকের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধপ্রকাশ করিয়াছিল। এ মিলনে একটু বিশেষত্ব ছিল। কেন না, তাহার সঙ্গে খুড়ার পুনর্ম্মিলনের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আমাদেরই ছিল না, তা খুড়ার! আমরা জানিতাম, চাকরিসূত্রে আর আমরা হুগলীতে প্রত্যাগমন করিব না। সুতরাং, বন্ধুরূপে আমরা এই একবৎসর সেখানে যাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের সঙ্গে সে মিষ্টসম্বন্ধ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। অনেকের সঙ্গে, হয় ত, এজীবনে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না!—কার্ত্তিকও তাহাদের মধ্যে একজন।

দৈবঘটনায়, সেই কার্ত্তিক নন্দীগ্রামে গণেশখুড়ার সঙ্গী! কালীঘাটেই তাহার সহিত গণেশখুড়ার সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের পরেই, বিনা-মাহিনার চাকর-রূপে, সে খুড়ার অনুগামী হইয়াছে।

গণেশখুড়াকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও, কার্ত্তিককে, তাহার সঙ্গে, দেখিয়া দয়াদিদি অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিল। কৌতূহলপরবশ হইয়া, সে তাহার আগমনসম্বন্ধে দুই-একটা প্রশ্ন করিয়াছিল—উভয়কেই করিয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে সদুত্তর দেয় নাই। প্রশ্নে বুঝিয়াছিল, কার্ত্তিক, চাকরীতে ইস্তফা দিয়া, চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন আসিয়াছে, তাহা, দুইজনের কেহই, তাহাকে পরিষ্কার রূপে বলে নাই।

দয়াদিদি জানিত, কার্ত্তিক যে চাকরী করে, তাহার মাহিনা অল্প হইলেও, পাঁচরকমে সে অনেক পয়সা-রোজকার করিত। এমন চাকরী সে, হঠাৎ, পরিত্যাগ কেন করিল, দয়াদিদির জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।—ইচ্ছাপূর্ণ হয় নাই।

ইচ্ছাপূর্ণ হইতে গণেশখুড়াই দেয় নাই। সে, দয়াদিদিকে, সেসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল—"আমরা আসিয়াছি এই মাত্র জানিয়া রাখ। কার্ত্তিককে কালীর দানরূপে পাইয়াছি। তাহার সংসারে কেহ নাই। তাহার অসদুপায়ের উপার্জ্জনে যাহা-কিছু সে কিনিয়াছিল, মা কালী, করুণাবশে, তাহাসমস্ত কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহাকে তোমাদের চাকর করিয়া রাখিতে ইচ্ছা কর—আমরণ সে তোমাদের চাকরী করিবে।"

দয়াদিদি, ইহার পর, কার্ত্তিককে তৎসম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। সে, তাহাদের রক্ষিরূপে, সঙ্গে থাকিবে—এই জানিয়াই দয়াদিদি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিকের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। এরূপ বিজ্ঞ ভৃত্যকে সে যথেষ্ট লাভ মনে করিয়াছিল।

কিন্তু, একটা প্রশ্ন করিবার লোভ দয়াদিদি ত্যাগ করিতে পারে নাই। আহারাদিকার্য্য নিষ্পন্ন করাইয়া, সে যখন কার্ত্তিকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতেছিল, তখনও কার্ত্তিক তাহাকে 'কাকীমা' বলিয়া সম্বোধন করিল।

হুগলীতে-কার্ত্তিক, দয়াদিদিকে, 'ঝি' বলিয়া ডাকিত। একদিনও তাহার মুখ হইতে একটা সামান্য সম্মান-সূচক বাক্য বহির্গত হইতে সে শুনে নাই। আজ, উপর্য্যুপরি তাহার মুখ হইতে এই অপূর্ব্ব আপ্যায়ন কথা নির্গত হইতে শুনিয়া, দয়াদিদি জিজ্ঞাসা করিল—"হা, কার্ত্তিক! বাছিয়া-বাছিয়া এসম্পর্ক কোথা হইতে পাইলে?"

কার্ত্তিক বলিল—"তোমাকে দেখিয়া, প্রথমটা, আমি কতকটা হতভম্বের মত হইয়াছিলাম। সেখানে, তোমাকে 'ঝি' বলিয়া ডাকিতাম। একদিন ভুলে 'ঝিমা' পর্য্যন্ত বলি নাই। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিব ভাবিতে গিয়া, মুখ হইতে ওই কথাটাই বাহির হইয়া গিয়াছে!"

"তা, এত সম্পর্ক থাকিতে, অমন উদ্ভট্-সম্পর্কই বা মনে উদয় হইল কেন? আমাকে 'ঝিমা' ত বলিতে পার।"

"তোমার মুখ দেখিয়া তোমাকে 'ঝি' বলিতে আমার সাহস হইল না।"

"এখানকার চাকর বাকরে আমাকে 'মাসীমা' বলিয়া ডাকে—রাজার পুত্রকন্যাও আমাকে ওই সম্পর্কেই সম্বোধন করিয়া থাকে। তুমিও আমাকে তাই বলিয়ো।"

"তুমি বলিতে বল, বলিব, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, হঠাৎ, আজ আমার এক কাকীমার কথা মনে পড়িয়া গেল!"

"সে, কি তোমাদেরই জাত?"

"না। অনেক-দিন আগে আমি তাহাদের ঘরে চাকরী করিতাম। তুমি যেমনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় পা-দিয়াছ, অমনি দেওয়ালের আলোটা তোমার মুখের উপর পড়িল;—পড়িতেই, মনটা যেন কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বহুদিনপূর্ব্বে দেখা একখানি মুখ আমার মনে পড়িল; আমি, তাঁহাকে 'কাকীমা' বলিতাম—তাঁহার স্বামীকে 'কাকা-মহাশয়' বলিতাম। সেইসবকথা মনে, হঠাৎ, জাগিয়া উঠিতেই, আমি তোমাকে 'কাকীমা' বলিয়াছি।"

"হুগলীতে ত আমাকে কতকাল দেখিয়াছ; সেখানে কি একদিনও তা'র কথা মনে পড়ে নাই?"

"কই, তা' ত পড়ে নাই!"

"তাঁহাদের ঘরে কি-চাকরী করিতে?"

"রাখালি করিতাম।"

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"রাখালের কথা শুনিবামাত্র আমি চমকিত হইয়াছিলাম। আমি তাহার মুখের পানে একদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার এখনকার আধপাকা দাড়ী, গোঁফঢাকা মুখখানা, কিয়ৎক্ষণ দেখিতে দেখিতে আমারও বহুপূর্ব্বের একখানা শ্মশ্রুগুম্ফ-বিরহিত মুখ মনে পড়িয়া গেল!

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কতদিন তাহাদের গৃহের চাকরী পরিত্যাগ করিয়াছ?'

'প্রায় পঁচিশবৎসর।'

'কেন পরিত্যাগ করিলে?'

"তাহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কার্ত্তিক প্রথমে একথার উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আমি, তাহার সেভাব বুঝিতে পারিয়া, উত্তর শুনিতে একটু জেদ করিলাম। বলিলাম—'বলনা—কেন পরিত্যাগ করিলে।' কার্ত্তিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন সে, বলিবার চেষ্টা করিয়াও, বলিতে পারিতেছে না।

"তাই দেখিয়া, আমি বলিলাম—'তাহ'লে, বোধ হয়, তুমি কোনও অকার্য্য করিয়াছিলে?'

"কার্ত্তিক, একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বলিল 'করিয়াছিলাম,—চুরি করিয়াছিলাম—কাকীমার এক-ছড়া মুড়কিমাড়লী।'

"শুনিয়া, কার্ত্তিকসম্বন্ধে সমস্তই বুঝিলাম। সেত আমার শ্বশুরগৃহেই চাকরী করিত। আমারই মুড়কিমাড়লী সে চুরি করিয়াছিল।

"সে অপ্রিয়-কথোপকথন হইতে নিরস্ত হইবার জন্য, আমি তাহার কাছে অন্যপ্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম, বলিলাম—'খুড়া মহাশয়ের কাছে শুনিলাম, তোমার সংসারে কেহ নাই।'

'কেহ নাই! অসদুপায়ের উপার্জ্জনে সংসার-পাতিয়াছিলাম, সে সংসার টিঁকিবে কেন!'

"কিন্তু, তোমার ত মা-বাপ-ভাই-ভগিনীতে পরিপূর্ণ জাজ্বল্যমান সংসার ছিল! সকলেই ত আর অধর্ম্মের অর্থ-উপার্জ্জন করে নাই! আমি জানি—তোমার বাপ, মধু, একজন ধার্ম্মিক ছিল।'

"এই কথা শুনিবামাত্র, কার্ত্তিক বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—'তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?'

"আমি, সে কথার উত্তর না দিয়া, আবার বলিলাম—'তোমার নাম ত কার্ত্তিক ছিল না' !

"কার্ত্তিকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি ?'

'তোমার নাম ছিল—বনমালী, মনিবের বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা তোমাকে 'বুনো' বলিয়া ডাকিত।'

'কে তুমি ?'

'আমিই সেই তোমার কাকীমা।'

"সে তীব্রদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল। দেখিয়া-দেখিয়াও সে যেন দেখার মীমাংসা করিতে পারিল না।

"আমি বলিলাম—'আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না ?'

'কেমন করিয়া হইবে।'

"সে আমার শ্বশুরগৃহে রাখালির কাজ করিত। আমাদের ঐশ্বর্য্য সে দেখিয়াছে। সেই বাড়ীর বধূ আমি, উদরান্নের জন্য পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিতেছি—ইহা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে! আমার কথায় তাহার মাথা গুলাইয়া গিয়াছে। সে বিড়-বিড় করিয়া কি দু'চার কথা আপনার মনে বলিল—আমি বুঝিতে পারিলাম না। তারপর সে আমাকে বলিল,—

'হুগলীতে, তবে কি, আমি তোমাকে দেখি নাই ?'

'আমার কাঠামোকে দেখিয়াছিলে।'

'তোমাদের সে ঐশ্বর্য্য ?'

'তার-কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়! কিছু থাকিলে কি আর পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে আসিতাম !'

"কার্ত্তিক শুনিল। এবারে, হুঙ্কারের সঙ্গে, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—

'অমন ধর্ম্মের সংসারও ভাঙ্গিয়াগিয়াছে! রাজার বউ, আজ দাসী হইয়াছে !'

"এই বলিয়াই কার্ত্তিক আমার পদপ্রান্তস্থ ভূমিতে মাথা-সংলগ্ন করিল। আমি বলিলাম—

'যাহারা চলিয়াগিয়াছে, তা'রা ত পুণ্যবান ;—আমি পাপিষ্ঠা, তাহাদের শোকে অহোরাত্র জলিবার জন্য বাঁচিয়া আছি !'

"কার্ত্তিক, বোধ হয়, আমার এ উত্তর শুনিতে পাইল না। সে, কিয়ৎক্ষণের জন্য, অবনতমস্তকে আমার পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। তারপর, সহসা বালকের মত ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিব কি!—কোথা হইতে অতর্কিতে এক বিপুল শোকাবেগ আসিয়া আমার হৃদয় ঘেরিয়া ফেলিল; দেখিতে-দেখিতে আমারও চক্ষু জলে ভাসিয়াগেল।

"এই সময়ে, খুড়ামহাশয়, ঠাকুরমার ঘরে, তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। কার্ত্তিকের কান্নার শব্দশুনিয়া, খুড়া বাহিরে আসিল।

"তাহার ক্রন্দনের কারণ খুড়া, বোধ হয়, অন্যরূপ বুঝিয়া-ছিল। তাই, সে, ঈষৎরুক্ষস্বরে, কার্ত্তিককে বলিল—'কিরে, গাড়োল! ইহাদিগকে চীৎকারে উত্ত্যক্ত করিতে কি এখানে তোমাকে সঙ্গে আনিলাম ?'

"কার্ত্তিক বলিল—'না, খুড়াঠাকুর, আমি চীৎকার করি নাই।'

'তবে, ও গাধার মধুর ডাক, কা'র কণ্ঠহইতে নির্গত হইল ?'

'একশালা নেমকহারাম, কাকীমার মাদুলী চুরি করিয়াছিল। আজ, বহুকাল পরে, খুড়ামহাশয়!—যুগপরে—এখানে তাহাকে ধরিয়াছি; ধরিয়াই, দুইহাত দিয়া, তাহার গলা-টিপিয়াছি। সেই টিপুনীর জোরে সে, মরণ-যাতনায়, গোঁ গোঁ করিয়া উঠিয়াছে !'

'কোথায় সে ?'

'কোথায় সে! শুনিলে—কার্ত্তিকের হাতের সে টিপ খাইয়াছে। এ শুনিয়াও, সে কোথায়, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার কাছে হারমানিয়াছি বলিয়া, কি আমি দুনিয়ার যার'তা'র কাছে হারমানিব! এক টিপুনিতেই তা'র ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছি।'

"তাহার কথা বুঝিতে না-পারিয়া, খুড়া, কিছুক্ষণ যেন অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া; আমারও শোকাবেগ, আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই, বিলীন হইয়া গেল। আমার মুখে হাসি আসিল।

"খুড়া, আর কার্ত্তিককে কিছু না বলিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'হাঁ, দয়াময়ী! গাড়োলটা বলে কি ?'"

"আমি তাহাকে, কার্ত্তিকের কথায় কাণে দিতে নিষেধ করিলাম, এবং, আমাদের পরস্পরের পূর্ব্বসম্বন্ধের সংসামান্য আভাস দিলাম। কার্ত্তিক, সেই আভাস-অবলম্বন করিয়া, খুড়াকে আমাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস শুনাইতে বসিয়াগেল।

"খুড়া, হুঁকা-হাতে, শুনিতে বসিল। কার্ত্তিক, তামাক সাজিতে-সাজিতে, গল্প আরম্ভ করিল। আমি আর, সে পূর্ব্বকাহিনী শুনিয়া, মনটাকে নিরর্থক অবসন্ন করা ভাল বোধ করিলাম না। আমি ঠাকুরমা'র কাছে চলিয়া গেলাম।

"ঠাকুরমার ঘরের সমীপে উপস্থিত হইতেই, দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন আমার কর্ণগোচর হইল। সে কথাবার্ত্তায় বাধা না-দিয়া, তাহা শুনিবার জন্য, দোরের পার্শ্বেই একটু কাণ-পাতিয়া দাঁড়াইলাম।

"যাহা শুনিলাম, সে বড় আতঙ্কেরই কথা। আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাই। একটা অজানা-লোক, ফটক দিয়া, বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার প্রবেশ, দরোয়ান, হয় দেখিতে পায় নাই, নয় দেখিয়াও দেখে নাই। সে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে কথা কহিয়াছে।

"তবে, যাহার সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এ সে নয়—নন্দরাণীর পুত্র নয়; লোকটা বয়সে প্রবীণ। প্রবীণ হইলেও, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য, কতকটা সন্দেহজনক হইয়াছিল। সে দাক্ষায়ণীকে বলিয়াছে, 'আমি তোমাকেই দেখিতে আসিয়াছি!' আরও সে কত কি বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল—এমন সময়ে, খাড়ীর দিকের প্রাচীর-উল্লঙ্ঘন করিয়া, খুড়ামহাশয় বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়াই, লোকটা, চোরের মত, বাগান-ছাড়িয়া পলাইয়াছে। আমি, তাহাকেই ফটকের বাহিরে যাইতে দেখিয়াছিলাম।

"দাক্ষায়ণী, বালিকা হইলেও, অসাধারণ বুদ্ধিমতী। বালিকার, স্বভাবতঃ সরলহৃদয়ে, অন্যকোনও বিভীষিকার চিন্তা উদিত না-হইলেও, লোকটার চোরের মত পলায়ন তাহার ভাললাগে নাই।

"ঠাকুরমা'র কাছে, লোকটার কথা কহিতে-কহিতে, দাক্ষায়ণী বলিল, 'কাকামশায়কে দেখিয়া, লোকটা, অমন করিয়া, চলিয়া গেল কেন, ঠাকুরমা?'

"ঠাকুর মা। 'কেমন করিয়া বুঝিব? এদেশ আমার কেমন ভাললাগিতেছে না। এদেশের লোকের স্বভাবও, আমি, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।'

"দাক্ষায়ণী। 'কিন্তু, রাণী ত আমাদের ভালবাসিয়াছে।'

"ঠাকুর মা। 'তার ভালবাসার কাঁথায় আগুন। আমরা বিদেশী অসহায় তিনটি স্ত্রীলোক। আমাদিগকে একটা বনের মধ্যে ফেলিয়া, চারদিনের ভিতর সে আর দেখা করিল না!—দেখা চুলায় যাক্, একটা লোক পাঠাইয়া আমরা কেমন আছি, আছি কি না, খোঁজপর্য্যন্ত লইল না! নাতবৌ! না বুঝিয়া, দয়ার কথায়, এদেশে আসিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছিলাম।'

"কথাটা শুনিয়া, আমার মনটা বড়ই বিষণ্ণ হইল; সত্য বলিতে গেলে, আমিই ত তাঁহাদের এদেশে আনিয়াছি! ঠাকুরমা, প্রথমে, আসিতে চান নাই—নন্দরাণীর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল আমারই কথায় তিনি, এই একান্ত-অচেনা, বান্ধবহীন দেশে আসিয়াছেন।

"ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন—'আর, সে, ভালমানুষের মেয়েরই বা অপরাধ কি! সে যা করিয়াছে, আমাদের ভালর জন্যই ত করিয়াছে। বড়মানুষের চরিত্র সে বুঝিতে পারে নাই আমিও বুঝিতে পারি নাই।'

"আমিও পারি নাই। বাস্তবিক বলিতে গেলে, নন্দরাণীর উপেক্ষায়, আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, তাহার অট্টালিকা ত্যাগকরিয়া, চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া, নন্দরাণীর অভিমানে আঘাত লাগিয়াছে। সেইজন্য, আমারও মনে, আগে হইতেই, নন্দীগ্রাম-পরিত্যাগের সঙ্কল্প জাগিয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, সত্বর সেস্থানত্যাগ করিতে পারিলেই আমাদের মর্য্যাদা থাকিবে; বিলম্ব হইলে থাকিবে না। চার'দিন তা'র আগমনের প্রতীক্ষা করিয়াছি। পরদিবস, তাহাদের কেহ না আসিলে, রজমোহনের কাছে অভিপ্রায়-ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। মাঝে, একটা সন্দেহজনক-ঘটনা ঘটাতে, স্থানত্যাগের সঙ্কল্প আমার দৃঢ় হইয়া গেল। যাইবার সুযোগও ঘটিল। মনে মনে স্থির করিলাম—ইহার পর, নন্দরাণীর শত অনুরোধেও, যাইবার এসুযোগ আমরা পরিত্যাগ করিব না। ঠাকুরমা'র কথা শুনিয়া, তাঁহারও মনের ভাব তাই, বুঝিলাম। তাঁহার

কথা শুনিয়া, দাক্ষায়ণী বলিল—'রাণী কি, তবে, মুখে আমাদিগকে ভালবাসা জানাইয়াছে?"

"ঠাকুরমা উত্তর করিলেন—'তাহার আচরণ দেখিয়া ত, তাই বোধ হইতেছে। তাহার মনে কি-আছে, তাহা কেমন করিয়া জানিব?'

"দাক্ষায়ণী। 'তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে না কেন?'

"ঠাকুরমা। 'পাগলী! জিজ্ঞাসা করিলেই কি সে মনের কথা বলিবে! এজগতে মুখের জিজ্ঞাসায় মনের কথা বলে, এমন সাহসী কয়জন আছে! আর, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; তোমাকে লইয়াযাইবার লোক আসিয়াছে—কালই, তোমার খুড়শ্বশুরের সঙ্গে, দেশে চলিয়া যাও।'

"দাক্ষায়ণী। 'আমি একা যাইব?'

"ঠাকুরমা। 'ভাল, দয়াময়ীকেও তোমার সঙ্গে দিব।'

"দাক্ষায়ণী। 'আর তুমি?'

"ঠাকুরমা। 'আমিও, যতদূর পারি, তোমাদের সঙ্গে যাইব।'

"দাক্ষায়ণী। 'বাড়ী যাইবে না?'

"ঠাকুরমা। 'আমি আর বাড়ী কোন্‌মুখে যাইব?'

"দাক্ষায়ণী। 'কেন, ঠাকুরমা, বাবা-মা ত তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন!'

"ঠাকুরমা। 'পাঠাইয়াছেন, তুমি যাও—আমার কুল-লক্ষ্মী, শ্বশুরের ঘর আলো কর।—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি স্বামি-সোহাগিনী হও।'

"দাক্ষায়ণী। 'তুমি, তা'হ'লে, কোথায় থাকিবে?'

"ঠাকুরমা। 'তোমাদের কালীঘাটপর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, আমি, সেখান হইতে, কাশী যাইব। তবে, আমার মত পাপিষ্ঠাকে, বিশ্বনাথ কি চরণে স্থান দিবেন! কালীঘাট পর্য্যন্ত যদি পঁহুছিতে পারি, তা'হ'লে, নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিব।'

"কথাটা শুনিয়াই, আমি শিহরিয়া উঠিলাম! বুঝিলাম, যে-শারীরিক-দৌর্ব্বল্যে ঠাকুরমা আজ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, সে-রূপ দুর্ব্বলদেহে, জীবন লইয়া কালীঘাটপর্য্যন্ত পঁহুছিতেও তাঁ'র সন্দেহ হইয়াছে! দাক্ষায়ণী, ঠাকুরমার এ কথার, কি উত্তর করে, শুনিবার জন্য আমি আর-একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাক্ষায়ণী নীরব হইয়াছে। বুদ্ধিমতী, ঠাকুরমার কথার অর্থ, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

"তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল। আমাদের পরিচর্য্যার জন্য যে ঝি নিযুক্ত হইয়াছিল, সে, ঠাকুরমার শয্যাতলে বিছানা পাতিয়া, ঘুমাইতেছিল। আমাদের রক্ষকস্বরূপ চাকরেরও নাসিকাধ্বনি, ভিতরদিকের বারান্দা হইতে, শোনা যাইতেছিল। কেবল, আমরা কয়জনেই জাগিয়া আছি। অন্যদিন হইলে, আমরাও এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িতাম। ঠাকুরমার শরীর অসুস্থ; খুড়ামহাশয়ের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দাক্ষায়ণীও ক্লান্ত। আর অধিক-ক্ষণ রাত্রিজাগিলেই উভয়ের শারীরিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, বুঝিয়া, তাহাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিতে, আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"প্রবেশ করিয়াই, মিছামিছি রাত্রিজাগরণের জন্য, আমি উভয়কেই তিরস্কার করিলাম। দাক্ষায়ণীকে, এক অপ্রিয় বিষয় লইয়া, আর বেশিক্ষণ কথা কহিতে অবসর দিলাম না। খুড়ামহাশয়কে যখন অভাবনীয়রূপে এতদূর পাইয়াছি, তখন বুঝিয়াছি, আমাদের আতঙ্ক-আশঙ্কার একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। পরদিন হউক, অথবা তাহারও দুই একদিন পরেই হউক, আমরা নন্দীগ্রাম পরিত্যাগ করিব।

"দাক্ষায়ণী, ঠাকুরমাকে, আর কোন প্রশ্ন করিল না। সে, আমার তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়াই যেন, নিজের শয্যায় শয়ন করিল। আমি, ঠাকুরমা'র পদসেবার অছিলায়, তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

"যখন, নিশ্চিত বুঝিলাম, দাক্ষায়ণী ঘুমাইয়াছে, তখন, যথাসম্ভব অনুচ্চস্বরে, ঠাকুরমার সঙ্গে দুইএকটা কথা কহিলাম। ঠাকুরমাকে মৃতবৎ ফেলিয়া আমি দাক্ষায়ণীর অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। তারপর, আর সুশ্রূষা করা দূরে থা'ক্, এযাবৎ তাঁ'র অসুখসম্বন্ধে, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

"ঠাকুরমা, আমার দিকে পিছন করিয়া, পাশফিরিয়া শুইয়াছিলেন। যদি নিদ্রিত হ'ন, তা হ'লে, আর তাঁহাকে জাগাইব না, এই মনে করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম—'ঠাকুরমা!'

"ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, 'কেন?'

'তোমার ঘুমের কি ব্যাঘাত করিলাম?'

"ঠাকুরমা, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া, বলিলেন—'না—আমি ঘুমাই নাই। কিছু কি বলিতে চাও?'

'খুড়ামহাশয়ের সঙ্গে কি তোমার কোন কথা হইয়াছে?'

'অন্যকোনও কথা হয় নাই। আমি তাহাকে, দেশের কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র।'

'সে কথা আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছি;—সকলেই ভাল আছে।'

'না—সকলে ভাল নাই।'

'সে কি! খুড়া ত আমাকে বলিল, সকলে ভাল আছে।'

'তুমি কা'দের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ?'

'কেন—তোমার পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রের!'

'আমি তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। একবার, হরিহরের কথা জিজ্ঞাসা করিব, মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু তা'র নাম মুখ হইতে বাহির হইল না।'

'বল কি ঠাকুরমা!'

'তা'র কল্যাণ—যে দিবানিশি কামনা করিতেছে, সেই করুক। আমি আর,কল্যাণ-কামনার ছলে, মমতা জাগাইয়া, তা'র অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করি না।'

"কথা শুনিয়া, আমি, স্তম্ভিতের মত, বসিয়া রহিলাম, আমার, মুখ হইতে, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন—'যার কল্যাণে আমার কল্যাণ, আমার গ্রামের কল্যাণ সেই সাধুই ভাল নাই—গোবিন্দ-ঠাকুরপো আমার শোকে শয্যাগত হইয়াছেন—এইজন্মে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হইল না!'

'খুড়ামশাই যে আমাদের লইতে আসিয়াছে!'

'তোরা যা।' দাক্ষায়ণীকে লইয়া তা'র বাপমায়ের কাছে ফিরাইয়া দে'। তা'দের বলিস্, আমার যতদিন তা'কে কাছে রাখিবার সামর্থ্য ছিল, রাখিয়াছি; আর আমার সামর্থ্য নাই—আমি মরিতে বসিয়াছি!'

"বলিতে-বলিতে নীরব হইলেন। একথা শুনিয়া, তাঁহাকে যে কি-বলিব বুঝিতে না-পারিয়া, আমিও কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিলাম।—তাঁহার মনের অবস্থা কতকটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিলাম; মন দুঃখে ভরিয়া গেল। নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, মনে মনে বলিলাম—'মমতাময়ী! এত অভিমান—যে একমাত্র পুত্রের নামপর্য্যন্ত সে অভিমানগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে!'

"মনের কথা যেন ঠাকুরমা শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত, বলিয়া উঠিলেন—'দেখ, দয়া! শুধু মুখে কেন, পাষণ্ডপুত্রের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিতেও আমার ঘৃণা আসিয়াছে।'

"ঠাকুরমা আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার বলিলেন—'ইহাতে তাহারই বা দোষ কি! দোষ আমার!' বলিতে বলিতে তিনি একবার নিরস্ত হইলেন। বুঝিলাম, স্বামি নিন্দা সাধ্বীর মুখ হইতে বাহির হইল না।

"আমি তাঁহার অসম্পূর্ণ কথা শেষ করিলাম। 'দোষ তোমার অদৃষ্টের।'

"ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপালন করিয়া, বংশের এক একটা ছেলে, এক একটা সার্ব্বভৌম হইতে পারিত। যেমন করি নাই, তাহার ফল পাইয়াছি। সত্যধর্ম্ম কি, যে জানে না, সে আজ পরের অপরাধের বিচার করিতে বসিয়াছে! হায়! লোভে-অহঙ্কারে, হতভাগা কত নিরীহের যে সর্ব্বনাশ করিবে—কত লোকের যে অভিসম্পাত আমার বংশের উপর পড়িবে!'

"শোকোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া, আমি বলিলাম 'ঠাকুরমা! রাত্রি অনেক হইয়াছে, একটু বিশ্রাম কর।'

"যথাসম্ভব কথায় জোর দিয়া, ঠাকুরমা বলিলেন—'বিশ্রাম? দয়া! আজ একেবারেই বিশ্রাম লইতেছিলাম!'

'আমি তা দেখিয়াছি।'

'দেখিয়াছিস?'

'দেখিয়াছি। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, দেখিয়াও তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না।'

'কেন, দয়াময়ী?'

'ঠাকুরমা! তোমার মুখে জল দিতে আমার সাহস হয় নাই।'

'আঃ আমার পোড়াকপাল! তোর দেওয়া জল মুখে দিয়া মরিবার আশাতেই যে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়াছি!'

"আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন—'আমি যে, পুত্র-হারাইয়া, কন্যা পাইয়াছি! এজন্মে

তোকে গর্ভে ধরি নাই বলিয়া, আমার গর্ভ দিবারাত্রি কাঁদিতেছে!'

"ঠাকুরমার কথার মাধুর্য্য আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি, কাঁদিতে-কাঁদিতে, দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

"ঠাকুরমার কণ্ঠও বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি, আমাকে বিশ্রামের আদেশ দিয়া, মুখ ফিরাইয়া শুইলেন। বুঝিলাম, গভীরশোকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। এসময় তাঁকে, অধিক কথা কহাইলে, নিরর্থক উৎপীড়িত করা হয়; বুঝিয়া—আমি আবার বাহিরে আসিলাম। দেখি, কার্ত্তিক-গণেশ দুইজনে, তখনও পর্য্যন্ত মুখামুখী বসিয়া, ধূম পান করিতেছে।

"আমাকে দেখিবামাত্র খুড়া বলিয়া উঠিল—'দয়াময়ী! মুড়কিমাতুলী তোমার সোণারচাঁদ ভাসুরপো'র গলায় আটকাইয়া গিয়াছে। যদি বেচারাকে বাঁচাইতে চাও, তা'হইলে, কালথেকে ওকে প্রসাদ দিতে আরম্ভ কর। তোমার পাতের প্রসাদ অবিরত গলাধঃকরণ না করিতে পারিলে, সে মুড়কি বেচারীর হজম হইবে না!'

'বেশ! সে, যা-করবার, কাল করা যাইবে। আজ উভয়েই বিশ্রাম কর।'

'তথাস্তু।'—

"এই বলিয়াই,খুড়া,কার্ত্তিককে বলিল—'কিরে, গাড়োল, দয়াময়ীমা'র প্রসাদ খাইবি?"

"কার্ত্তিক, কলিকায় প্রাণভরা এক টান দিয়া, মুখ হইতে ধূম্ররাশি বাহির করিতে-করিতে, বলিল—'যতক্ষণ বাঁচিব।'

"আমি, তাহাদের পাগলামীর কথায় কাণ না দিয়া, খুড়াকে বলিলাম—'তোমার জন্য, ঘরের মধ্যে, বিছানা প্রস্তুত করিয়াছি।'

"খুড়া বলিল—'আপ্যায়িত।'

'তবে আর রাত্রি করিতেছ কেন?'

'রাত্রি আমি করি নাই—বিধাতা করিতেছেন।'

"তাহার উঠিবার ইচ্ছা নাই, বুঝিয়া, কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতে, আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

"সবে মাত্র শুইয়াছি, অমনই খুড়া আবার গান ধরিল। সেই গানের শব্দ শুনিয়া, দরোয়ান, দেউড়ী, হইতে 'কোন হায়'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, এতক্ষণ পরে, বাগানে লোক ঢুকিয়াছে বলিয়া, দরোয়ানজীর হুঁস হইয়াছে।

"খুড়ামহাশয় উত্তর করিলেন—'হাম হায়।'

"ইহার পরেই, দরোয়ানজীর আগমনের নিদর্শন পাইলাম। প্রথম-প্রথম, দুইএকটা অন্ধবীবন্ধসূচক কথা; তারপর, বিড়্‌বিড়্—ফিস্‌ফিস্; সর্ব্বশেষে, একেবারে চুপ্! সঙ্গে-সঙ্গে এক তীব্রধূমের গন্ধ আমারও গৃহপর্য্যন্ত প্রবেশ করিল।

"আমি বুঝিলাম, খুড়ামহাশয়ের তামাকের তলব আছে!"

শেষ-সঙ্গী

[শ্রীসুজাতা ঘোষ]

আমার কাছে ছিল যা'রা বসে—
একে-একে গেছে তা'রা চলে,
বিজন রাতের আঁধার ছায়ার তলে,
মিটি-মিটি দীপটি আমার জলে।
আঁধার ঘোরে ঘনিয়ে দিয়ে ছায়া,
বুকের ভিতর বাড়িয়ে দিয়ে মায়া,
কোন্ অনন্ত—অসীমতার মাঝে
সঙ্গী আমার করে আসা-যাওয়া!

নিসাড় ভাবে রাত এসেছে কবে—
ভুলে গেছে ফুট্‌তে যত ফুল,
মলয় পবন, কাঁপিয়ে সকল অণু
হৃদয়-দোলায় দেয়নি তো কৈ দুল!
জীবন-সঙ্গী ছিল আমার যারা—
আমার পানে তাকায়নিতো কেহ,
সঙ্গী আমার—বন্ধু আমার—ওগো!
আগুসারি দেখাও আপন গেহ!

বর্ণমালার সম্মিলন

[মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন, কবিসম্রাট]

প্রয়োজনবশতঃ এলাহাবাদে গিয়া বালীনিবাসী, দিনাজপুর—বালুরঘাটের জমিদার, শ্রীযুক্তরাজেন্দ্রনাথ সান্যালমহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উঠি; সেইস্থানে দিন পোনেরো অবস্থান করি। সান্যালমহাশয়ের চালচলন—একালের বড় লোকের মত ন, একালের মাঝারি-ভদ্রলোকের মতও নয়, সে-কালের বড় লোকের মতও নয়—সেকালের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মত খাঁটি রহিয়াছে। বাড়ীতে, পায়ে জুতা, বা খড়ম, নাই—গায়ে জামা, বা গেঞ্জি, নাই—পরিধানে সাদা ধুতী, গায়ে একখানি ছোটপাৎলা-কাপড়, পিঠের দিক্ হইতে আসিয়া, বুকের একঅংশ অন্যঅংশের উপরে পড়িয়া, দুইঅংশই দুইবাহুমূলে উপরে উঠিয়া, স্কন্ধে গ্রন্থিবদ্ধ। কাঁচা-সোনার মত রং, মুখের কাঁচাদাড়ীর ও মাথার এলোমেলো চুলের রঙে, আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। একহস্তে, সর্ব্বদা, দীর্ঘকালের গঠিত, হাতীর দাঁতের একটি নস্যদানী রহিয়াছে, কিন্তু, সেই সুগন্ধিনস্য, নিজেকে ব্যবহার করিতে বড় দেখিতে পাই নাই; দেখিয়াছি—ছাত্রদিগকে নস্য দিয়া, তাহাদিগের পুনঃ-পুনঃ হাঁচি দেখিয়া, রঙ্গ করিতে। মুখখানি সর্ব্বদা হাসি হাসি, সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সর্ব্বদা প্রসন্ন; সেই মুখে সর্ব্বদা 'জয় সীতারাম'—'জয় গুরু' উচ্চারণ! প্রকাণ্ড টাঙ্গাগাড়ী রহিয়াছে—তাহাকে ব্যবহার করিতে কখনও দেখি নাই, ছাত্রেরাই সর্ব্বদা ব্যবহার করে—স্থান হইলে—এখনও পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ উঠেন। সকালে-বিকালে-রাত্রে, পুত্রের অধ্যাপনার জন্য, এলাহাবাদ-কলেজের দুই প্রধান প্রোফেসর নিযুক্ত রহিয়াছেন। পুত্রটি স্থির, ধীর, পাঠে মনোযোগী, সধর্ম্মনিষ্ঠ, পিতৃমাতৃগুরু-ভক্ত। জিতেন্দ্রবাবু, ইংরেজীতে শিক্ষিত হইলেও—পাশ্চাত্যবায়ু সর্ব্বত্র বহিলেও, ইঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই, বাড়ীর উপরদিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে! বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কেহই, সন্ধ্যা-বন্দনা না-করিয়া, জলপান করে না; এ কলেজের অন্যছাত্রেরাও সন্ধ্যাবন্দনা-স্তব-পাঠ করে। সকলেরই কোশাকুশি—পঞ্চপাত্র আছে। দুইক্রোশ পথ হইতে প্রত্যহ কলসী কলসী গঙ্গাজল আসিতেছে, গঙ্গাজলে—সন্ধ্যাবন্দনা, তর্পণ, অর্চ্চনা, রন্ধন, পান—সমস্তই হইতেছে।

গৃহিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, ভ্রাতৃবধূ দশভুজা, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ লক্ষ্মী। গৃহে পাচক-পাচিকা নাই;—এইতিনটি মহিলাই, সকালে-বিকালে, ঝুড়ী ঝুড়ী ফলকাটিয়া, সন্দেশ-প্রস্তুত করিয়া, জলখাবারে রেকাব সাজাইতেছেন;—দুইবেলা, সমানে, দশ বারটা ব্যঞ্জনের সহিত, অন্ন, লুচী, নিমকী, সিঙ্গাড়া, কচুরী, পায়স প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক সন্ধ্যায় ৬০।৭০ জন ভদ্রলোকের আহার যোগাইতেছেন;—মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব নাই, সর্ব্বদা মুখ প্রসন্ন প্রফুল্ল হাসি-হাসি। দেখিলে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়, পঞ্চাশবৎসরের পূর্ব্বের হিন্দু গৃহের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে, এখনও যে বঙ্গদেশ হইতে প্রাচীন হিন্দুভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই—কোনও পুণ্যবানের গৃহে আছে—এজন্য আত্মশ্লাঘা ও গর্ব্বের অনুভব হয়। এখনও যদি, দেয়ালের ছবির মত, পুতুলের মত, গৃহলক্ষ্মীদিগকে গৃহসজ্জার উপকরণ না করিয়া, গৃহস্বামিনী করা হয়, তবে—হিষ্টিরিয়ার মাত্রা কমিয়া যায়, উড়িয়া ঠাকুরের পাচিত, আরসুলার রসসিক্ত, মক্ষিকার অঙ্গপুষ্ট ও কেন্নোখণ্ড মিশ্রিত, অন্ন-ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিয়া—বমনের সহিত অন্নপ্রাশনের ভাত তুলিয়া ফেলিতে হয় না।

সান্যালমহাশয়ের মত গুরুভক্ত দেখিয়াছি, মনে হয় না। তিনি যে কোনও কার্য্য আরম্ভ করেন, গুরুদেবকে টেলিগ্রাফ করেন, কার্য্যান্তেও টেলিগ্রাফ করেন—এইভাবে তিনি-চারিটা টেলিগ্রাম প্রত্যহ গুরুদেবের নিকটে গিয়া থাকে। এই প্রবন্ধের সহিত এই প্রসঙ্গের কোনরূপ সম্বন্ধ না-থাকিলেও, প্রবন্ধের মঙ্গলাচরণের উদ্দেশে, এই আদর্শচরিত পুণ্যশ্লোক মহাত্মার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম।

এলাহাবাদে—রাজেন্দ্রবাবুর গৃহে—সুখে রাজভোগে দিন কাটাইতেছি, এমনসময়ে বৰ্দ্ধমানাধিপতির স্বাক্ষরিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে'র নিমন্ত্রণ পত্র, হরিদ্বারের 'ঋষিকুলে'র মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত 'সংস্কৃত সাহিত্য-সম্মিলনে'র নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ-পত্র, প্রসিদ্ধবাগ্মী পণ্ডিতদীনদয়ালের স্বাক্ষরিত 'ভারতধৰ্ম্মমহামণ্ডলে'র নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ পত্র, এবং কাকিনা-রাজের স্বাক্ষরিত 'বগুড়া কায়স্থ-সম্মিলনে'র অনুরোধ পত্র, যুগপৎ পাই। সাহিত্য-সম্মিলনের মত, একসময়ে এক-গৃহের প্রকোষ্ঠ-চতুষ্টয়ে, নয়—পরস্পর সুদূরবর্ত্তী তিনস্থানে চারিটি সম্মিলন!—একস্থানে গেলে, অন্যস্থানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। তারপর, যেজন্য এলাহাবাদে রহিয়াছি, সেইটি হইতেছে—অন্যত্র যাইবার বিশেষ অন্তরায়।

এবার 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই. ই। শাস্ত্রীমহাশয় প্রতিভাশালী সুলেখক। তাঁহার নিকটে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যে উপকরণ সংগ্রহ রহিয়াছে, তেমন আর-কাহারও নিকটে নাই। বিদ্বান্ বুদ্ধিমানের হস্তে যদি উপাদান থাকে, তবে; তিনি, যে সেই সংগৃহীত উপাদান হইতে, অনেক অজ্ঞাত তথ্যের আবিষ্কার করিতে পারিবেন, সন্দেহ কি? সেইজন্য বৰ্দ্ধমান যাইবার জন্য একটা ঐকান্তিক প্রলোভন ছিল। তাঁহার মুখে অজ্ঞাত-ইতিহাসের অনেক নূতনকথা শুনিব, মুখ-কণ্ডূতি নিবারণেরও যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব—এজন্য বৰ্দ্ধমানে যাইবার পূর্ণ-অভিলাষ ছিল। এদিকে, হরিদ্বার 'গুরুকুলে' গেলে, অনেক রাজা রাজড়া, অনেক পণ্ডিত, কুম্ভের মেলায় অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, দেখিব—দুর্ল্লভ কুম্ভযোগে গঙ্গাদ্বারে গঙ্গার পুণ্যসলিলে স্নান করিব, বাঙ্গালী সংস্কৃত-বলিতে পারে না, যে-কলঙ্ক আছে, তাহার নিবারণের জন্য, কুঁতাইয়া-কুঁতাইয়া, ঢোকগিলিয়া, যদিকিছু বলিতে পারি—সেজন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব, এতগুলি ইচ্ছা ছিল!—আবার, আমার জন্মস্থানের অতিসন্নিহিত, বগুড়ায় গেলে—কাকিনা-রাজ ও বগুড়াবাসী কায়স্থবন্ধুদিগকে প্রীত ও আপ্যায়িত করিতে পারি এজন্য সেদিকেও একটা প্রবল মনের টান ছিল। পূর্ব্বোক্ত কারণে, ইহার একটিও করিতে না-পারিয়া, মনে বড়ই কষ্ট হইল। রাত্রিতে, জলযোগের পরে, শয্যায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছি; প্রবলইচ্ছার বাধায় মনঃকষ্টে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত চক্ষে ঘুম আসিল না—দুইটা বাজার ঠন্ ঠন্‌শব্দ শুনিয়াছি, স্মরণ হয়। সুতরাং, তাহার পরে চক্ষে একটু তন্দ্রা আসে; সেই অর্দ্ধজাগরণ-অর্দ্ধনিদ্রার সময়ে, দেখিলাম—ঠিক পঞ্চাশটি নয়—একটি হরিহরের মত অৰ্দ্ধাঙ্গে-অৰ্দ্ধাঙ্গে মিলিত, কাজেই—উন-পঞ্চাশটি সুবর্ণময় পুরুষ আমাকে ডাকিল; তখনই বুঝিলাম, উনপঞ্চাশের খেলা!—মাথা-গরম হইয়াছে, তাই, উনপঞ্চাশ ঘাড়ে চাপিয়াছে—আমি জাগিয়া নাই, এটি স্বপ্ন! সেই পুরুষদিগের মধ্যে একটি, হাঁসিয়া বলিল—"কি গো! স্বপ্নবলিয়া এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? জাগা-অপেক্ষা, স্বপ্ন যে ভাল—ভালস্বপ্ন হইলে ত কথাই নাই। জাগরণে—সাংসারিক চিন্তায়—সচলের উৎপীড়নে—মানুষকে পাগল করিয়া তুলে—গৃহে, পল্লীতে, গ্রামে, নগরে বিবাদ বিসংবাদের বিষে মানুষ জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে! কিয়ৎক্ষণের জন্য, মানুষ, স্বপ্নে, ভালবিষয়ের সংশ্রবে আসিয়া, সেগুলি ভুলিয়া যায় ও সোয়াস্তি পায়। বৈদান্তিকের প্রশংসা সত্ত্বেও—সুষুপ্তি অপেক্ষা সুখস্বপ্ন ভাল। সুষুপ্তিতে জ্ঞান নাই; সুখস্বপ্নে—ভাল ভাল বিষয়ের দেখা-শুনা-জানা—সব আছে, আবার, তা'র স্মরণও থাকে। তবে, সত্য বটে এ স্বপ্ন দেখার পালা অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে!—এখন আর সুশিক্ষিত সাহিত্যসেবীরা স্বপ্ন দেখেন না—অনেক পূর্ব্বে, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকদ্বয়, স্বপ্ন দেখিতেন—তাহারও অনেক পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র-প্রভৃতি কবিরা স্বপ্ন দেখিতেন। এক্ষণে আর সে পাঠ নাই; সভ্যশিক্ষিত সাহিত্যসেবীর কাছে স্বপ্ন আর ঘেষিতে পারে না—তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন না! তুমি উত্তরে বলিতে পার—'আমি সভ্যও নই, শিক্ষিতও নই, 'সাহিত্যিক'ও নই; আমি 'টুলো' ব্রাহ্মণপণ্ডিত!' এক্ষণে ত আর সভায় ন্যায়ের অবচ্ছেদকতা, বিষয়তা, প্রকারতা, বিশেষ্যতা, প্রতিযোগিতা-প্রভৃতি নাই; স্মৃতির একবাক্যতা, বচনের নির্বিষয়তা-প্রভৃতি কথা, ও ব্যাকরণের বিচিত্রবিতণ্ডার কথা উঠে না; যজ্ঞ ত অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে!—তবে, আর পোড়াকপালে জৈমিনীর পুরোডাশ-কপালের কথা তুলিয়া লাভ কি? না-বুঝিয়া, সাঙ্খ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতির এক শিকলী আওড়াইয়াই বা ফল কি? যোগ ত, ভোগের দ্বারে মাথা কুটিয়া-কুটিয়া, এক্ষণে বিয়োগগ্রস্ত!—আছে, কেবল বেদান্ত

তাও আমাদিগের গণ্ডী ও দণ্ডীর মঠ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সুতরাং, স্বপ্ন না-দেখিয়া, করি কি? কারণ, ঐভাবের স্বপ্নে যে আনন্দ আছে—সোয়াস্তি আছে।'—যাউক সে সমস্ত কথা; জিজ্ঞাসা করি—তোমরা যে বছরে বছরে 'সম্মিলন' কর, এ কি সম্মিলন? তোমাদিগের আবার সম্মিলন! সম্মিলন অর্থে—মিলন, মিলন অর্থে ত—মিল; তোমাদিগের মিল কৈ? মিল-থাকিলে, বঙ্গদেশে 'মিলে মিলে' ছাইয়া যাইত;—কিন্তু 'মিল' ত একটিও দেখি না! এক বঙ্গলক্ষ্মী-মিল'—সেও ত, 'সাত হাত ঘুরিয়া, এখনও দাঁড়াইতে পারিল না! এমন গরমিল্ জাতির কি কখনও 'মিল' হয়? যে-জাতির "ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই" প্রবাদ-বাক্য—ভাই ত ছোটকথা, শয্যা গুরুর আজ্ঞায়, যে জাতি মা বাপকে পর্য্যন্ত দেশান্তরী করে। তোমরা—কয়জন বাক্-বাদীর সঙ্গে মিলিতে যাইয়া—গুরু, পুরোহিত, পিতা, মাতা, খুড়া, জেঠা, মামাকে পর্য্যন্ত দূরে সরাইয়া দিতেছ;—তোমরা করিবে মিলন!!! রাজসাহীতে কেলেঙ্কারি করিয়াছ; আবার, বৰ্দ্ধমানে কি-হয় দাঁড়াইয়া দেখ। সভাপতি, বহুকষ্টে, বহুচিন্তায়, নানাপুঁথি ঘাটিয়া, বহুরাত্রি জাগিয়া, একটি অভিভাষণ প্রস্তুত করিলেন; আর, তোমরা, পান চিবাইতে চিবাইতে, তা'র সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলে—সেটি কিছুই হয় নাই, সাব্যস্ত করিয়া দিলে! এমনিই ত তোমরা গুণজ্ঞ, এমনিই ত তোমরা কৃতজ্ঞ! একটি পল্লীগ্রামের এক জমীদার, নিপুণ ভাস্করদ্বারা, তাঁ'র পিতার একটি মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। গ্রামবাসী বৃদ্ধভদ্রলোকেরা দেখিয়া বলিলেন, 'এ কি আপনার পিতার প্রতিকৃতি হইয়াছে!—কৈ, আপনার পিতার রঙ্ হইয়াছে কৈ?—এতে ত পাথরের রঙ্ই আছে! আপনার পিতার দেহ কেমন কোমল, কেমন নরম ছিল;—এ যে ভয়ঙ্কর কঠিন, আঙুলপর্য্যন্ত বসে-না—দাড়ি, গোঁপ, চুল পর্য্যন্ত বাগান' যায় না!—আপনার পিতা, সকালে-বিকালে, প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়া, প্রত্যেকের খবর লইতেন; মধুরকণ্ঠে কত সদুপদেশ দিতেন।—এ ত এক-পা নড়িতে পারে না, একটি কথাও বলিতে পারে না;—এ আবার কিসের প্রতিকৃতি!—এমন ভাস্করকে ঝাঁটামারিয়া তাড়াইয়া দিউন।'—তোমাদিগের নিকট হইতে, সভাপতিরও ত ভাগ্যলভ্য পুরস্কার এইরূপই!

এতেও কি কেউ, আর, সভাপতি হইতে রাজি হইবে? এজন্য বলিতেছি, তোমরা—দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান, নয় —ঘোলের তৃষ্ণা দুধে মিটাইবে, এইজন্য যোগ দাও! কথা কহিতে পারিবে না, শুনিয়া যাও।—তোমরা বল, আর নাই বল, তোমাদিগের সমস্তসম্মিলন ত কেবল আমাদিগকে লইয়া—আমাদিগের সম্মিলনেই ত তোমাদিগের সম্মিলন। বাক্-সর্ব্বস্ব জাতির, বাক্যভিন্ন, আর আছে কি? বর্ণের সম্মিলনেই—শব্দ, শব্দের সম্মিলনেই—বাক্য, বাক্যের সম্মিলনেই—মহাবাক্য। সুতরাং—অভিভাষণ বল, প্রবন্ধ বল, কাব্য বল, নাটক বল, উপন্যাস বল, গান বল, ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল জ্যোতিষ বল, বেদ-তন্ত্র স্মৃতি-পুরাণ বল—সকলেতেই আমাদিগেরই সম্মিলন। এই মহা-সম্মিলনে—এই প্রকৃত সম্মিলনে যোগ দাও। অপ্রকৃত মিথ্যা-সম্মিলনে যোগ দিয়া—হাহুতাশ করিয়া, লাভ কি?" সেই পুরুষটি, এইপর্য্যন্ত, বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। আর এক মহাপুরুষ, উঠিয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বর্ণচ্ছটায় সভা আলোকিত হইয়া উঠিল; বোধ হইল, তিনিই যেন সভার নেতা, তিনিই যেন হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাঁহারই যেন সকলে অংশ! তিনি উঠিয়া বলিলেন, "আমি প্রথমে বলিতে উঠিয়াছি, এজন্য, হয় ত, তুমি মনে করিবে, আমি হয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, নয় মূলসভার সভাপতি—আমি যাহা বলিব, সেগুলি আমার অভিভাষণ। আমি কিন্তু সভাপতি নই; আমাদিগের এ সভার সভাপতি কেহ নাই। ধরিতে-গেলে—শান্তিরক্ষার জন্যই ত সভাপতির প্রয়োজন? ক্রমে বুঝিবে, আমাদিগের মধ্যে কোনরূপ অশান্তি নাই, গোল মাল নাই। যখন 'অডর-অডর' বলিয়া গোলমাল থামাইবারও প্রয়োজন হয় না, তখন, আর, অজগল-স্তনের ন্যায়, একজন সভাপতি রাখিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং, আমি যাহা বলিব, তাহা—অভিভাষণ, অনুভাষণ, অতিভাষণ, বিভাষণ, সম্ভাষণ, অধিবাসন, পরিবেশন, বা সম্বোধন, উদ্বোধন, প্রবোধন, অববোধন, বোধন, বৰ্দ্ধন, সংবৰ্দ্ধন—কিছুই নয়;—অপভাষণ, বা নির্ব্বচন, বলিতে পার। ফল, ইহা হইতেছে—আত্মপরিচয় দান। সভাতার খাতিরে; এযুগে, কেহ কাহাকেও, পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না। তুমি, টুলো পণ্ডিত হইলেও, তোমারও গায়ে ইংরেজি-বাতাস

লাগিয়াছে- তাহার অনেক প্রমাণ আছে; সুতরাং, আমার পরিচয় না দিলে, তুমিও জিজ্ঞাসা করিবে না। কাজে-কাজেই, আমাদিগের আত্ম-পরিচয় প্রদানকরা কর্ত্তব্য হইয়াছে; বিশেষতঃ, এ সভ্য যুগটি হইতেছে—আত্মপরিচয় প্রদান করিবার যুগ, নিজের পদোদক নিজে খাইবার যুগ। আড়ম্বরের সহিত—ভাষার লম্ব তুলিয়া- নিজের পরিচয় নিজে না-দিলে—নিজের বিজ্ঞাপন নিজে না-দিলে—কেহই তোমাকে গ্রাহ্য করিবে না!—তাই, পরিচয়-প্রদানের দরকার হইতেছে।—ইতি ভূমিকা।

"এই বর্ণ বিপর্য্যয়ের দিনে 'বর্ণ'-বলিয়া পরিচয় দেওয়াটা বড়ই লজ্জাজনক।—কি করিব? আমাদিগের বর্ণত্ব ত আর ঘুচিবে না!—বর্ণ বলিয়া পরিচয় না দিলে, উপায় কি? মহর্ষি কলাপী 'সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায়ঃ'—বলিয়াছেন।—মহর্ষি পতঞ্জলি, অনেকবিচার করিয়া, 'বর্ণ নিত্য'—সাব্যস্ত করিয়াছেন। অসবর্ণমিশ্রণের ফল, আমরা হাতে হাতে অনুভব করিয়া থাকি। ই বর্ণ, উ বর্ণ, ঋ-বর্ণ, ৯-বর্ণ—যতক্ষণ অসবর্ণের সহিত মিলিয়া না থাকে, ততক্ষণ—ই বর্ণ, উ বর্ণ, ঋ বর্ণ, ৯-বর্ণই থাকে; না হয় পরবর্ত্তী অসবর্ণে-একেবারে য, ব, র, ল, হইয়া পড়ে—সঙ্কর হইয়া যায়। এতেও যদি তোমাদিগের চক্ষু না ফোটে, কি বলিব?—লজ্জার মাথায় পা মুছিয়া বলিতেছি, আমরা বর্ণ। বর্ণর দুই শ্রেণী—কিন্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্রের মত নয় —একের নাম—স্বর, অপরের নাম—ব্যঞ্জন। স্বর—স্বপ্রকাশ, স্বরাট্;—স্বরের প্রকাশে কাহারও সাহায্য লইতে হয় না, সে আপনই প্রকাশ পায়;—যেমন অ, আ-ইত্যাদি। অ আ'র উচ্চারণে অন্যের সাহায্য লাগিল না; ব্যঞ্জনের উচ্চারণে—স্বরের সাহায্য প্রয়োজন;—শুধু ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয় না;—ভিতরে স্বর না থাকে, আগে একটি থাকিলেও হইতে পারে—নয় ত উচ্চারণ হইবে না। আগে স্বর না-থাকিলে, উচ্চারণের সময়, আগে একটি কল্পিত-স্বর আসিয়া উপস্থিত হইবেই-হইবে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন;—"স্বয়ং রাজতে", ইহাতেই 'স্বর' হইয়াছে। ব্যঞ্জনের আত্মা—স্বর, ব্যঞ্জন স্বরের—শরীর। শরীরভিন্নও আত্মা থাকে;—দৃষ্টান্ত—স্বর। স্বরভিন্ন ব্যঞ্জন টিঁকিতে পারে না;—স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন, অগ্রসর হইয়া, তখনই যে অস্বর-ব্যঞ্জনকে ঘাড়ে তুলিয়া লয়! তোমরাও—বহুকষ্টে, বহুসাধ্য-সাধনায়—আত্মীয়-অন্তরঙ্গের অনাত্ম (মৃত) দেহকে কাঁধে করিয়া লও; সেও কিন্তু অতি অল্পকালের জন্য শ্মশানে ভস্মকরিবার জন্য। আমাদিগের কিন্তু সে ব্যবস্থা নয়;—আমরা চিরকাল ঘাড়ে করিয়া রাখি। আমাদিগের সহিত নিত্যব্যবহার করিয়া এত ঘনিষ্ঠতা করিয়াও, আমাদিগের নিকট হইতে, স্বজাতি-প্রেম শিখিলে না?—কি বলিব!

কোন সভা-সমিতি হইলে, তোমরা, বসা লইয়া—আসন লইয়া—গোলবাধাইয়া দাও, তোমাদিগের গণ্ডগোল থামাইতে যাইয়া, সভাপতি গণ্ডগোলে পড়ে—নেতারা, গোল থামাইতে যাইয়া, নিজেরাই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে চারিদিকে উন্মুক্ত বহুদরজা-সত্বেও, কে-কাহাকে ঠেলিয়া আগে বাহির হইবে, তজ্জন্য যে এখনও ফৌজদারী কোর্টে দাঁড়াও নাই—এই তোমাদিগের বাহাদুরি;—এজন্য তোমাদিগকে ধন্যবাদ! আর আমাদিগকে দেখ; আমরা কেমন অল্পস্থানে পাশাপাশি হইয়া বসিতে জানি, বসা-লইয়া আমাদিগের কোন গণ্ডগোলই নাই;—যেখানে একটু বেখাপ্পা দেখি, অমনই সন্ধিকরিয়া, এককরিয়া, সামলাইয়া লই। এ সন্ধির জন্য কাহাকেও মধ্যস্থতা করিতে হয় না! আমরাই আপনা-আপনি, করিয়া লই;—সমাজও একরূপ সন্ধি বন্ধন। শব্দেতে-বিভক্তিতে, ধাতুতে বিভক্তিতে, প্রকৃতি-প্রত্যয়ে কেমন মিল—দেখিলে চক্ষুঃজুড়াইয়া যায়। তোমাদিগের মত, গৃহহইতে বাহির হইবার সময়ে, আমাদিগের মধ্যে কখনও কি কোন গোলযোগ দেখিতে পাইয়াছ? ঈশ্বর যে, দয়া করিয়া, তোমাদিগের মুখখানিতে আমাদিগের জন্য একটি ক্ষুদ্রদরজা করিয়া দিয়াছেন, সেই ক্ষুদ্রদরজাটি দিয়া, আমরা কেমন একের পর একটি-একটি করিয়া, সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সুড়-সুড় করিয়া বাহির হইয়া পড়ি!—বাদ নাই, বিসংবাদ নাই, কোন গোল নাই—সকলে দেখিয়া চিনিয়া লয়, বুঝিয়া লয়। আমাদিগের আচরণ দেখিয়াও, তোমরা সভ্য হইলে না—দুঃখের বিষয়! আমি সেই বর্ণের ভিতরে স্বরবর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট 'অ'কার। ঈশ্বর যেমন—অরূপ হইয়াও—সরূপ, আমিও তেমনি 'অ'-বর্ণ হইয়াও স-বর্ণ! সর্ব্ববেদের আদি যে 'ওঁ'কার, এই ওঁ-কারের আদি আবার—আমি। অ-কার, উ-কার, ম-কার—এই তিনেই ত হইয়াছে 'ওঁ'। তুমি হয় ত বলিবে, 'বেদে—বিশেষতঃ, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন পুস্তক ঋগ্বেদে—কখনও, হ্রীঁ, ক্রীঁ

ের মত ভাষায় নিবদ্ধ—ওঁ থাকিতেই পারে না। "ও"-লিখিবার অক্ষর বাঙ্গলায় আছে—দেবনাগরে নাই। 'ও,' প্রাচীন হইলে, দেবনাগরে "ও" অক্ষর থাকিত। তন্ত্রের সৃষ্টি বাঙ্গলাদেশে; হ্রীঁ-ক্রীঁ-এর মত, 'ওঁ'—তন্ত্রের বীজ, তাই, বাঙ্গালায় তাহার অক্ষরও আছে।—বুদ্ধদেবের অন্তর্ধানের পরে, বৌদ্ধসম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হয়;—হীনযান ও মহাযান। মহাযানী বৌদ্ধেরাই বৌদ্ধ তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; চীনা-প্রভাবে বৌদ্ধ তন্ত্রে, ওঁ, হ্রীঁ, ক্রীঁ-প্রভৃতি বীজমন্ত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে—বৌদ্ধ শক্তি ও দেবতার মত ওঁ, হ্রীঁ, ক্রীঁ প্রভৃতি বীজমন্ত্রগুলিও হিন্দু তন্ত্রে আসিয়াছে। খ্রীষ্ট-জন্মিবার শতাধিকবর্ষপূর্ব্বে, তন্ত্রহইতে বেদেও এই ওকার, প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য, ওঁকারের নাম প্রণব—'প্রকৃষ্টরূপে' 'নব' এই ত প্রণবের অর্থ? এই অর্থই ওঁকারের নবীনত্ব প্রমাণ করিতেছে।' তুমি যদি একনিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেল, তবে, আমি নিরুত্তর হইব—কারণ, যা-দিয়া আমি তন্ত্রকে প্রাচীন বলিতে চাই, তুমি ত, একটু ঘুরাইয়া, সেইযুক্তি দিয়াই তন্ত্রকে আধুনিক করিয়া ফেলিলে!—তোমার কাছে, যখন, ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব, ওঁকারই কলিকা পাইতেছেনা—এককথায় তাহাকে পর্যান্ত যখন 'নাকচ' করিয়া ফেলিতেছ, তখন আর অন্যের ত কথাই নাই! সে যাহাহউক, প্রাচীন হয়—হউক, তাহাতে আর আমার যাইবে-আসিবে কি? আমি যেখানে সেখানে আছি, বলিয়াছি। 'তত্ত্বমসি'র—'তৎ'-এর ভিতরে আমি, 'ত্বং'-এর ভিতরে আমি, 'অসি'র গোড়ায় আমি। 'অসি'র মধ্যে 'অস্'-ধাতু আছে, অস্ ধাতুর অর্থ—'সত্তা', আমার সত্তায় কিন্তু অস্ ধাতুর সত্তা। সত্তা-রূপে যাহার প্রতীতি, সেই ত ব্রহ্ম! সুতরাং, আমি—ব্রহ্ম; ব্রহ্মের ভিতরে যে আমিই বিদ্যমান—তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? এই 'তত্ত্বমসি'র অর্থ লইয়া বড় গোল। বৈদান্তিকেরা "তৎ" অর্থে, ব্রহ্ম লইয়াছেন; "ত্বং" অর্থে, যাহাকে বলা হইতেছে, তাহাকে—সেই শ্বেতকেতুকে—ধরিয়াছেন; "অসি"—রহিয়াছ, এইঅর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, বলিতেছেন। অর্থাৎ, 'হে শ্বেতকেতু! (কোন বৈদিক ঋষি-পুত্রের নাম) ব্রহ্ম তুমি আছ!' দেখিলে, কেমন সাহেবি-বাঙ্গালা; বরং, 'তুমি, সেই ব্রহ্ম, আছ'—বলিলে, সাহেবি-বাঙ্গালার গন্ধ থাকিলেও, অর্থটা একরূপ বুঝা যাইত।—আঃ কপাল!—এরই জন্য আচার্য্য আড়াইশ পাতায় পুঁথি লিখিলেন! আবার নৈয়ায়িক বলিতেছেন—"তৎ (সে) বলিলে ত, পূর্ব্বকথিতকে বুঝায়,—কৈ! পূর্ব্বে ব্রহ্মের কোন কথাই ত নাই—তবে, 'তৎ' বলিলে, 'ব্রহ্ম' হইবে কেন?—এ আত্মার কথা—আত্মার কথা! পিতা, শ্বেতকেতুকে, বটবীজ ভাঙ্গিতে বলিলেন; শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন,—পিতা, তাহার একটি অংশকে, আবার ভাঙ্গিতে বলিলেন; শ্বেতকেতু তাহাও ভাঙ্গিলেন। আবার, তাহার অংশও ভাঙ্গিতে বলিলেন, তাহাও ভাঙ্গা হইল,—এইভাবে, ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, তাহার সূক্ষ্ম অংশ আর দেখিতে পাওয়া গেল না! তখন, পিতা বলিলেন, 'বল দেখি, এখন বটবীজ আছে, কি না? তুমি ত আর চোখে দেখিতে পাইতেছ না!' শ্বেতকেতু বলিলেন—'চোখে দেখি, আর, নাই দেখি—বটবীজ নিশ্চয়ই আছে, সূক্ষ্মভাবে আছে—নয় ত কোথায় গেল?' পিতার উপদেশে, শ্বেতকেতু একগেলাস জলে লবণ মিশাইলেন। পিতা বলিলেন, 'জলে লবণ আছে, কি না, বলিতে পার?—দেখিতে পাও কি, লবণ আছে?' শ্বেতকেতু বলিলেন, 'জলে লবণ মিশিয়া গিয়াছে, চোখে অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, চোখে দেখিতে না পাইলেই পদার্থ নাই, বলা ঠিক নয়। পিতা বলিলেন—"তত্ত্বমসি"—'সেই বটবীজ, তুমি আছ, অর্থাৎ সেইরূপ তুমি রহিয়াছ।' লক্ষণার আশ্রয়ে "তৎ" শব্দের অর্থ—'তদির, তাহার সদৃশ।' এরূপ লক্ষণা করিবার পদ্ধতি আছে—'চন্দ্রমুখ' বলিলে, 'চন্দ্রতুল্য মুখ' বুঝায়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, 'এইরূপ অর্থই ঠিক;—আমাদিগের ব্যাখ্যায় সাহেবীর গন্ধ নাই।' সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা বলেন—"তুমি, প্রকৃতির গুণে, এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছ যে, তুমি 'তত্ত্ব' হইয়া পড়িয়াছ—কখনও মহত্তত্ত্ব হও, কখনও অহঙ্কার তত্ত্ব হও।" তাই, কৃষ্ণচন্দ্রও বলিয়াছেন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—" ইত্যাদি-ইত্যাদি।

"আমি, কিন্তু এইসকল অর্থের মধ্যে একটিও পছন্দ করি না। আমার মতে যাহা, তাহা বলিতেছি;—'ওঁ তৎসৎ'—ইহার ভিতরেও 'অস্'ধাতুর খেলা;—সুতরাং, আমার খেলা! 'অস্' না-হইলে, 'সৎ' হইত না।—আমার উচ্চ প্রকৃতিটা একবার বুঝিয়া লও—আমি, নিজে মরিয়াও, 'সৎ'কে 'ব্রহ্ম' করিয়াছি। অবশ্য, বাক্যরূপে মরিলেও,

অব্যক্তরূপে 'সৎ'কে ত্যাগ করি নাই। 'তৎ'—সে 'স' হয়, এজন্য, কি আবার, পাণিনির সূত্র আবৃত্তি করিতে হইবে? 'তৎসৎ'—অর্থাৎ 'তৎসঃ'। তবে যে, 'স'—ইহার পরে হনুমানের ল্যাজের মত (ৎ) খণ্ড'ত'-টি আছে—সেটি আর-কিছুই নয়; হনুমানের সহিত একবার আলাপ করিয়া দেখিবে, সে মানুষ-অপেক্ষা অনেক উপরের;—আকারে-প্রকারে, পরণ-পরিচ্ছদে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে—মানুষ কেন?—তা'র উপরে যদি কেউ থাকে—সেও আঁটিতে পারে না! কেবল বাল্মীকিমহাশয় তা'র ল্যাজটুকু রাখিয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁ'র সেই বানরের চিহ্নটুকু দেখিয়া, আজপর্য্যন্ত আমরা তা'কে বানর ঠাওরাইতেছি।—সেইরূপ 'স'কেও আমরা 'মায়িক' বলিয়া—'মায়াবচ্ছিন্ন' বলিয়া—বুঝিতেছি;—নয় ত সে একেবারে 'ব্রহ্ম' হইত।—ঐ খাঁড় 'ত্'-টি খাড়া হইয়াই 'স'কে (তাহাকে) ব্যবধানে ফেলিয়াছে!—ঐটিই হইতেছে—মায়া! আবার দেখ, 'স'-এর পরে 'অং', —'ত'-এর পরেও 'অং'; সুতরাং, 'স'-ও 'অদন্ত', 'ত'-ও 'অদন্ত'; কাজে-কাজেই 'স'ও 'অ'কারান্ত, 'ত'ও 'অ'কারান্ত; খণ্ড'ত'—মিথ্যা-মায়া!

"'অদন্ত'-কথায় একটি গল্প মনে পড়িল।—ব্যাকরণের টোলে—বৈয়াকরণ-অধ্যাপক, একটি ছাত্রকে, 'গজ'-শব্দের রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাত্র বলিল, 'গজ কি অদন্ত'? নিকটে অধ্যাপকের বিধবা ভগিনী, শ্যামাসুন্দরী, ছিলেন; তিনি বলিলেন, 'বোকা! বলিস্ কি? গজ—অদন্ত কেমনে? বাবুদের দাঁতাল হাতীটি বুঝি দেখিস্ নাই?'

"শ্যামাসুন্দরীর মত, তোমরাও ত বেদের ব্যাখ্যা—পুরাণের ব্যাখ্যা—স্মৃতির ব্যাখ্যা, করিতেছ। আবার, প্রত্নতাত্ত্বিক সাজিয়া—তাম্রশাসন, শিলালিপিরও অদ্ভুতব্যাখ্যা করিতেছ!—'তৎসৎ' বলিতে 'তত্ত্বমসির' কথা মনে পড়িতেছে। এখানে, 'তত্ত্বে'র ভিতরে 'অস্'ধাতু নাই, 'ত্বং'-এর ভিতরেও 'অস্'ধাতু নাই; এই জন্য, 'অসি' পৃথক্ করিয়া দেওয়া আছে। 'অসি'র আদিতেই যে আমি; তাহা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'তত্ত্বং'-এর আদি—'ত'-এর ভিতরে, আমি; 'ত্ব'-এর ভিতরেও, আমি। এই 'ত্বং'-এ ব্যঞ্জনবর্ণ আছে—দুইটি; 'ত' একটি, 'ব'ও একটি; আর আছে—হসন্ত 'ম', বা অনুস্বার'।—বুঝিলে কিছু?

"সঙ্কেতে সৃষ্টি ও স্থিতি বুঝাইবার জন্য, দুইটি 'ত'কার দেওয়া হইয়াছে—সৃষ্টি ও স্থিতি যে এক! সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার স্থিতি না-থাকিলে, সে আসিল কোথা হইতে? 'সে জন্মিল'—অর্থ কি? 'সে' কর্ত্তৃপদ, 'জন্মিল' ক্রিয়াপদ। কর্ত্তা—ক্রিয়ার উৎপাদক; 'জন্মিল' যখন ক্রিয়া, তখন 'জন্ম' ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'সে', কর্ত্তার, থাকা চাই;—কাজে-কাজেই, জন্মিবার পূর্ব্বে—সৃষ্টির পূর্ব্বে 'সে'-র স্থিতি আবশ্যক। এইজন্য, এক 'ত' দুইবার রহিয়াছে; অর্থাৎ—'ত' সৃষ্টি, 'ত' স্থিতি—বা 'ত' সৃষ্টিকারক, 'ত' স্থিতিকারক। বলিতে পার—''ত'-এর আবার সৃষ্টি স্থিতি অর্থ—বা সৃষ্টিকারক, স্থিতিকারক অর্থ-কোন্ অভিধানে আছে?' অভিধান ত, প্রয়োগ দেখিয়া, পরশুদিন জন্মিয়াছে;—তাহার প্রমাণ কি? সৃষ্টি স্থিতি লইয়াই—ঈশ্বর; ঈশ্বরেরই যে যে 'তৎ সৎ' নাম, 'সৎ' যে 'তৎ'-এর রূপান্তর;—তা' পরে বলিতেছি' গায়ত্রীতেও এই 'তৎসৎ' আছে; আর অধিক কি দেখাইব? 'সৃষ্টিকারী-স্থিতিকারী' অর্থ না-থাকিলে 'তৎ'-বলিলে—ঈশ্বরকে বুঝায় কেন? এই 'তৎ'-এর, দুই 'ত'-এর ভিতরে, সৃষ্টি-স্থিতিকে দুইপাশে রাখিয়া, মধ্যে আমিই বিরাজমান। 'সৎ'-এর, একদিকে 'স', অন্যদিকে 'ৎ' রাখিয়া, মধ্যে আমিই বিদ্যমান। মধ্যে আমি না-থাকিলে, 'সৎ' সৎ হইত না!—মজা দেখিবে?—আমি, যদি 'স-'এর মধ্য হইতে বাহির হইয়া, পৃথক্ হইয়া—একটু-আগে গিয়া দাঁড়াই, তবে সব উলোট্ পালট্, একেবারে 'সৎ'এর অস্ত, ধ্বংস। এতেই বুঝ, আমি মধ্যে আছি বলিয়াই, সব সৎ। এখন আগেকার কথাই বলি—সৃষ্টিও যা, স্থিতিও তাই। সুতরাং, এক 'ত' এরই অর্থ সৃষ্টিকারী ও স্থিতিকারী; কিন্তু মূর্খে তা' বুঝিবে না—এইজন্য, আগে এক 'ত' দিয়া, তৃপ্তি হইল না; পরে, আবার ডবল ত দিয়া, সৃষ্টিকারী ও স্থিতিকারী অর্থ গ্রহণ করা হইল। পরে, 'বং'—অর্থাৎ সংহারকারী শিব! ব্রহ্মা, রজোগুণের সৃষ্টি করেন—সুতরাং—রক্তবর্ণ। বিষ্ণু, রক্ষা করেন—সেই সেই অবস্থায় বাঁধিয়া রাখেন—তমোগুণের কার্য্য করেন—সুতরাং—কৃষ্ণবর্ণ। শিব সংহার করেন—সেই সংহারের মধ্যে সৃষ্টিও করেন, পালনও করেন। হয় ত বুঝিলে-না, বুঝাইয়া দিই—এই যে কাগজখানিতে লিখিতেছ, এই কাগজখানি আগুনে ধর—কাগজখানি পুড়িয়া যাইবে, ছাই হইবে। এক অগ্নি-সংযোগে—কাগজখানির সংহার হইল, ভস্মের উৎপত্তি হইল। উৎপত্তিক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া,

সংহারক্ষণ-পর্য্যন্তই, তাহার স্থিতি।—উৎপত্তি স্থিতিও সংহার সেই একক্রিয়াতেই হইল। সুতরাং, দেব-দেব মহাদেব—এক সংহারে, তিন গুণকেই টানিয়া লইয়াছেন। সমস্ত রঙের মিশ্রণে শ্বেতবর্ণ (?) হয়, কি না; তাই, তিনি—শ্বেতবর্ণ। তাই তাহার একটি মন্ত্র 'বম্'। দেখনা, শিবভক্তেরা 'বম্—বম্' বলিয়া গালবাদ্য করেন। 'বম্', আর কিছুই নয়—'ওঁ' ও যা, 'বম্'-ও তাই,—একটু ওলট্ পালট্। 'অ'কার, 'উ'কার 'ম'কারে—"ওঁ"; 'উ'কার, 'অ'কার, 'ম'কারে—"বম্"। মহিম্নস্তবে যে একথা আছে। প্রলয়ের সময়ে 'বম', শব্দে ব্যোমকেশের বোমা পড়ে, আর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত চুরমার হইয়া যায়! এই 'বম্' হইতেছে—মহাদেবের বীজ। এখন বুঝিয়া দেখ, এই 'বমে'রও মধ্যে আমিই বিদ্যমান। জিজ্ঞাসা করিবে—'আমি' কি? 'আমি' যাহাই হউক—আমি যে তাহার অগ্রবর্ত্তী রহিয়াছি, তাহা ত তুমি স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছ। 'ত্বম্' যদি সাংখ্যের 'তত্ত্ব' হয়, তবে, তাহাকে ছেদন করিবার জন্য ত 'অসিব'ই প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণও ত বলিয়াছেন,—"জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত"। তবে, অসির পরে বিভক্তি নাই—এই এক আপত্তি। বিভক্তি চায় কে?—ভগবদ্ভক্তি চাই! ভগবদ্ভক্তি থাকিলে, বিভক্তি থাকুক, আর না থাকুক, তাহাতে কি আসে যায়? দেখিতে পাওনা—কথক, ভাগবতের ব্যাখ্যা-কথন এবং একাকার ধর্ম্ম বক্তা, ভক্তির বান ছুটাইয়া—শ্রোতাদিগকে ভক্তির তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যায়—কাঁদাইয়া আকুল করে; তাহারা কি বিভক্তির তোয়াক্কা রাখে?

আর, তোমরাও ত, ইংরেজিতে, বিভক্তি নাই বলিয়া, তাহাকে 'সায়েন্টিফিক্' ভাষা বল—সংস্কৃতের কথায় নাকি-সিট্‌কোয়, বাঙ্গালা ভাষা হইতে বিভক্তি তুলিয়া দিতে চাও! ফলে, অব্যয় পুরুষকে বুঝাইতে যে শব্দের ব্যবহার আছে, তাহাদেরও যে অব্যয় হওয়া উচিত;—তাহাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? এই জন্যই ত আমরা তন্ত্রের আদর করি। তন্ত্রেই ত—ওঁ, হ্রীঁ, ক্রীঁ, ক্লিঁ, হুঁ, ফট্ প্রভৃতি—যে বীজমন্ত্রগুলি আছে, সে সবগুলিই অব্যয়! তেমনই "ত্বং"-ও অব্যয়; এই অব্যয়ের আগা গোড়া—সর্ব্বত্রই—ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে আমি।—অব্যয়ের পরে, বিভক্তি জন্মিবে, কি না, এইতত্ত্ব লইয়া বৈয়াকরণদিগের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিচার চলিতেছিল। সর্ব্বশেষে, সিদ্ধান্ত হইল—অব্যয়ের পরে, বিভক্তি করিলেও, যখন টিঁকিতে পারে না, তখন আর অন্যবিভক্তি করিবার প্রয়োজন নাই—একপদসংজ্ঞা সম্পাদনের জন্য, অব্যয়ের উত্তরে প্রথমার একবচন 'সি'মাত্র হউক। উপনিষদ্, বৈয়াকরণের এই সিদ্ধান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া, বলিয়াছেন, 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের, 'তত্ত্বং' এর পরে, 'সি' নাই—'সি' নাই—'সি' নাই।' 'সি'-ও ত বিভক্তি; সংখ্যাকর্ম্মাদি অর্থের বিভাগ হয় যাহাদ্বারা, সেই ত বিভক্তি!—বিভক্তি লাগাইয়া কি ব্রহ্মের বিভাগ করিব? দেখ না, ব্রাহ্মেরা—ব্রহ্ম ছাড়িয়া—ব্রহ্ম ধরিয়াছেন!

দাঁড়াও, বাবা!—সেই অনাদিকালের 'অ'—আমি, অনেকক্ষণ বকিয়াছি—একটু জিরাইয়া লই।

প্রার্থনা

[শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসী]

সারাবরষের হৃদয়-বোঝা
বহিয়া এনেছি আজ
রাখিতে তোমার চরণতলে,
হে মোর হৃদয়রাজ!
ক্ষণতরে, ওগো, খুলিয়া দুয়ার
দাঁড়ায়ো, হৃদয়নাথ!
আমার ব্যাকুল হৃদয় তোমায়
করিছে, হে, প্রণিপাত!

অভাগা—কাঙ্গাল ব'লে,
জগতে মিলেনা ঠাঁই;
তোমার দুয়ারে, নাথ,
আজিকে এসেছি তাই।
ডেকে লও কাছে তব,
হে সখা—হে প্রিয়তম।
তব কর-প্রসারণে
মুছাও বেদনা মম!

বৃহস্পতি

[শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র]

দেবতা এবং ঋষিদিগের গুরু, কনকসন্নিভ বৃহস্পতি, আমাদের সৌরজগতের ষষ্ঠগ্রহ। মঙ্গলগ্রহের পর, বৃহস্পতির স্থান বা কক্ষা। সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্বের অনুপাত-ক্রমে দেখা যায় যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটি গ্রহ থাকিবার কথা; কিন্তু, বহুকালপর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও, জ্যোতিষীরা এইস্থানে কোন গ্রহ দেখিতে পান নাই। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে, সার উইলিয়ম হর্শেল কর্ত্তৃক, উরেনস্-গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে, উহাই সৌরজগতের শেষগ্রহ বলিয়া

ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণদ্বারা দৃষ্ট বৃহস্পতির দৃশ্য

তাৎকালিক জ্যোতিষীগণের ধারণা হইয়াছিল। তাঁহারা, তখন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যের শূন্যকক্ষার গ্রহটি আবিষ্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে, ১৮০১ খৃঃ অঃ, ১লা জানুয়ারী, প্যালারমো-নগরে জ্যোতিষী পিয়াজী (Piazzi)-কর্ত্তৃক কেরিজ (Ceres)-নামে একটি ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। তৎপরে, ১৮০২ খৃঃ অঃ, ২৮এ মার্চ্চ, ব্রিমেন্-নগরে, জ্যোতির্ব্বিদ্ ওলবার্স (Olbers), প্যালাজ (Pallas)-নামে আর-একটি ক্ষুদ্রগ্রহের আবিষ্কার করেন। ১৮০৪ খৃঃ অঃ, ১লা সেপ্টেম্বর, গটিঞ্জেন্ নগরে হাডিঞ্জ নামক জনৈক জ্যোতিষী (Juno) জুনো, এবং ১৮০৭ খৃঃ অঃ ২৯এ মার্চ্চ, জ্যোতিষী ওলবার্স, ভেষ্টা (Vesta)-নামে চতুর্থ ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার করেন। তৎপরে, ১৮৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, আর কোনও গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐ খৃঃ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর, ড্রিজেন-নগরে, জ্যোতিষী হেন্‌কী (Hencke), য়্যাষ্ট্রীয়া (Astraea), এবং ১৮৪৮ খৃঃ অঃ, ১লা জুলাই, হিবি (Hebe)-নামে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্ষুদ্রগ্রহের আবিষ্কার করেন। তৎপরে, প্রতিবৎসরেই, উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে; এবং, ১৯১১ সালপর্য্যন্ত, উহাদের সংখ্যা ৬৯১টী জানা গিয়াছিল। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে, Dr. Max Wolf কর্ত্তৃক, জ্যোতিষ্ক আবিষ্কারের ফটোগ্রাফির প্রবর্ত্তন হইলে, উহাদের আবিষ্কার অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে হইতে থাকে, এবং ১৯০৮ খৃঃ অব্দে, ১৫৭টির সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রগ্রহগুলির মধ্যে কেরিজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; উহার ব্যাস ৫০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পঞ্চদশ ভাগের একভাগের সমান, এবং আয়তন পৃথিবীর তিনসহস্র ভাগের একভাগ মাত্র। প্যালাজ নামক ক্ষুদ্রগ্রহটির ব্যাস ১০০ মাইল এবং ৪.৬১ বৎসরে ইহা একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। অধুনা-আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রগ্রহের কোন কোনটির ব্যাস ২০ মাইলের অধিক নহে। সমস্তক্ষুদ্র-গ্রহগুলি একত্রিত করিলেও আকারে আমাদের চন্দ্র হইতে অনেক ছোট হইবে, সন্দেহ নাই। উহাদের ক্ষুদ্রতমগুলির স্থূলত্ব চতুর্দ্দশ শ্রেণীর এবং বৃহত্তমগুলির স্থূলত্ব সপ্তম শ্রেণীর তারকার ন্যায়। সুতরাং, উহাদিগকে সাধারণচক্ষে দেখিবার উপায় নাই। এরোজ (Eros)-নামক ক্ষুদ্রগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে আইসে এবং উহারই গতিবিধির উপর নির্ভরকরিয়া, সূর্য্য হইতে উহাদের দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে। বৃহস্পতি, এইসকল ক্ষুদ্রগ্রহের উপর স্বীয় প্রভুত্ব যে হারে বিকাশ করেন, তাহাই অবলম্বনকরিয়া, পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির যথাযথ বস্তুসমষ্টি নির্ণয় করিয়াছেন। উহাদের চারিটির গতিবিধি, বৃহস্পতির ন্যায় নিয়মিত। অপরগুলির গতিবিধি, অত্যন্ত অনিয়মিত। প্যালাজ এবং অপরকয়েকটির অয়নমণ্ডলের কৌণিক অবস্থান ৩৫ ডিগ্রি অংশ। ওলবার্স, প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, মঙ্গল

ও বৃহস্পতির মধ্যে, পূর্ব্বে, একটি বৃহৎ গ্রহ ছিল ; কোন নৈসর্গিক দুর্ঘটনাবশতঃ, ঐ গ্রহটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রখণ্ড এই সকল ক্ষুদ্রগ্রহ। কিন্তু, পরবর্ত্তীকালে, নিউকুম্ব প্রভৃতি জ্যোতিষীরা, দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, নীহারিকাই উহাদের উৎপত্তির মূল। ঐ সকল ক্ষুদ্রগ্রহগুলিকে ইংরাজিতে Asteroids বলে এবং গ্রীক দেবতাদের নাম-অনুসারে উহাদের নাম-রচনা হইয়াছে।

বৃহস্পতি, সৌরজগতের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য্যাতীত, অপর গ্রহগুলিকে একত্রিত করিলে, বৃহস্পতির আয়তনের দুই-পঞ্চমাংশের অধিক হয়, কি না, সন্দেহ। ঐ পিণ্ড, চন্দ্র-অপেক্ষা, ৮১-গুণ বড় ; আর, বৃহস্পতি পিণ্ড, পৃথিবী হইতে ৩০০-গুণ বড় ;—উহার আয়তন (Volume) পৃথিবী অপেক্ষা ১২৩৩.২০৫-গুণ বড়, কিন্তু উহার ঘনত্ব (density) পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের অধিক নহে। বৃহস্পতির চাপ (compression) পৃথিবীর সপ্তদশভাগের একভাগ এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ২৫০ গুণ বেশী। সূর্য্য হইতে বৃহস্পতি, পৃথিবীর দূরত্বের ৫-গুণ দূরে আছে, অর্থাৎ ৪৭,৮০,০০০,০০ মাইল দূর। বৃহস্পতি ১১বৎসর ৩১৪.৯২ দিনে বার্ষিক-গতি নিষ্পন্ন করে, অর্থাৎ ঐসময়ে একবার সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আইসে ; উহাই বৃহস্পতির এক বৎসর। বৃহস্পতিও, বৃত্তাভাষ-পথে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া—কখনও সূর্য্যের নিকটে আইসে, কখনও বা দূরে যায়। যখন নিকটে আইসে, তখন ৪,৫২,০০০,০০মাইল ও যখন দূরে থাকে, তখন ৪৯,৮০,০০০,০০ মাইল দূরে যায়। উহার ব্যাস, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১-গুণ, অর্থাৎ ৮৮,৪৩৯ মাইল। উহার কক্ষা, অয়নমণ্ডলের উপর ১ ডিগ্রি —১৮ মিনিট— ৪০.৩ সেকেণ্ড অংশ এবং নিরক্ষবৃত্ত, কক্ষার উপর ৩ ডিগ্রি—৫মিনিট—৩০ সেকেণ্ড অংশ কৌণিকভাবে অবস্থিত আছে। বৃহস্পতি, স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর, ৯ঘণ্টা ৫৫মিনিট ২৬ সেকেণ্ডে একবার আবর্ত্তন করে ;—উহাই বৃহস্পতির আহ্নিক গতি, বা একদিন। আহ্নিক গতির বেগ

১৯০৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে, ক্যামেরার দ্বার সাত মিনিট খুলিয়া রাখিয়া সাধারণ প্লেটে, গৃহীত বৃহস্পতির উপগ্রহ-সমূহের আলোক চিত্র

১৯০৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে, (antihalo-plateএ) আভা প্রতিরোধক প্লেটে, এক মিনিট রাখিয়া গৃহীত বৃহস্পতির উপগ্রহ সমূহের আলোক চিত্র

এত বেশী বলিয়া, বৃহস্পতি অণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। বৃহস্পতি, যখন পৃথিবীর সন্নিকটে, সূর্য্যের বিপরীতদিকে, অবস্থান করেন, হিন্দু জ্যোতিষে, তখন, উহাকে বক্রগতি বলে। বক্রগতির মধ্যকালে যখন, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ব্ব গগনে বৃহস্পতির উদয় হয়, তখন, পৃথিবী হইতে, উহার দূরত্ব ৩৬,১০,০০০,০০ মাইল থাকে। গত বৎসর ২৭এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতির বক্রগতি (opposition) আরম্ভ হয়। যখন বৃহস্পতির পৃথিবী হইতে দূরে, সূর্য্যের দিকে অবস্থান করেন, তখন বৃহস্পতির অস্ত বলা যায়। এইসময়ে, সৌর কিরণে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বৃহস্পতি আমাদের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইয়া থাকেন। বৃহস্পতির অস্তকালকে, হিন্দুশাস্ত্রে, 'অশুদ্ধকাল', বা 'অকাল' বলে।—শুক্রের অস্ত হইলেও 'অকাল' হয়।—এই সময়ে, ব্রতনিয়মাদি গ্রহণ-গ্রহণ করিতে নাই ;—কন্যা-দানও সমিচীন নহে। বৃহস্পতি, কুম্ভরাশিতে স্থিতিকালে, ভারতবর্ষের কতিপয় তীর্থস্থানে 'কুম্ভমেলা' হইয়া থাকে—এই মেলাক্ষেত্রে লক্ষ-লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। বিগত বৎসর, বৃহস্পতি কুম্ভরাশিস্থ হওয়ায়, মহাবিষুব-সংক্রান্তির দিনে, হরিদ্বারে 'মহা-কুম্ভমেলা' হইয়াছিল।

আমাদের পৃথিবীর যেমন একটি চন্দ্র আছে, বৃহস্পতির সেইরূপ আটটি চন্দ্র আছে ; দূরবীক্ষণব্যতীত উহাদিগকে দেখা যায় না। ১৬১০ খৃঃ অব্দে, জানুয়ারী মাসে, জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্যালিলিও, বৃহস্পতির চারিটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন ;

উহাদিগকে সাধারণ দূরবীণে বেশ দেখা যায়। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে, 'লিক্‌ম্যান্'-মন্দির হইতে, অধ্যাপক বার্ণার্ড পঞ্চম উপগ্রহ আবিষ্কার করেন; ১৯০৪-৫ খৃঃ অব্দে ঐ মানমন্দির হইতেই, জ্যোতিষী পেরিণী (Perriene)-কর্ত্তৃক, দুইটি ও ১৯০৮ খৃঃ অব্দে,২৭এ জানুয়ারী, গ্রিন্‌উইচ্‌ মানমন্দির হইতে, জ্যোতিষী মিলট (Milotte)-কর্ত্তৃক একটি উপগ্রহ-ফটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়ে। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির কোনও নাম নাই; উহারা আবিষ্কারের ক্রমানুসারে—প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। প্রথম উপগ্রহটি,বৃহস্পতি হইতে ২,৫৩,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া,একদিন ১৮ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে একবার বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে; দ্বিতীয়টি, ৪,১০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া, তিনদিন ১৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে, তৃতীয়টি, ৬,৪৮,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া, সাতদিন ৩ঘণ্টা ৪২ মিনিটে এবং চতুর্থটি, ১৬,২০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া, ষোল দিন ১৬ ঘণ্টা ৩১ মিনিটে একবার বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে। পঞ্চম উপগ্রহটি ১২ ঘণ্টায়, ষষ্ঠ ও সপ্তম

১৮৯৫ মার্চ্চ ১৬—পর্য্যবেক্ষিত বৃহস্পতি ও তিনটি উপগ্রহ। (Belt) মেখলায় ঘোর দাগ এবং একটি উপগ্রহের ছায়া দৃষ্ট হইতেছে

উপগ্রহদ্বয়, যথাক্রমে, ২৫১ ও ২৬৫ দিনে, বৃহস্পতি-পরিভ্রমণ করে এবং অষ্টম উপগ্রহটি, বৃহস্পতি হইতে ১,৫০,০০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া, দুই বৎসরে একবার, বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে। এইসকল উপগ্রহের মধ্যে, পঞ্চম উপগ্রহটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহস্পতির নিকট। কাউয়েল ও ক্রমেলিন নামক জ্যোতির্বিদ্‌দ্বয়ের গবেষণার ফলে, জানা গিয়াছে যে, অষ্টম উপগ্রহটি, বৃত্তাভাস পথে, বিপরীত গতিতে, ভ্রমণ করিতেছে। বৃহস্পতি হইতে, উহার কৌণিক অবস্থান ৩০ ডিগ্রি অংশ। তিন-ইঞ্চি দূরবীণে, বৃহস্পতির সহিত প্রথম উপগ্রহ-চারিটির লুকোচুরি খেলা (Occultation and transit) দেখিতে বড়ই আমোদজনক। কখনও বা একটি উপগ্রহ বৃহস্পতির পশ্চাতে অদৃশ্য হইতেছে, কখনও বা আর-একটি বৃহস্পতি-বিম্বের উপর দিয়া গমন করিতেছে —তাহার ধূসরবর্ণের ছায়াটিপর্য্যন্ত বৃহস্পতির উপর দেখিতে পাওয়া যায়! সময়ে-সময়ে, উহারা, একই সরল-রেখায় পতিত হইয়া, পরম রমণীয় দৃশ্য ধারণ করে—কোনটি ধীরে
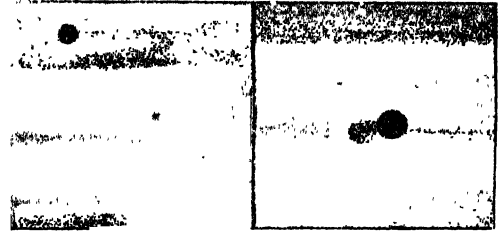
বৃহস্পতির উপগ্রহচয়ের রঙ্গ (Phenomena)। ১৮৯৪, ২০এ ডিসেম্বর, বামে ছায়াসহ তৃতীয় উপগ্রহ দৃষ্ট দৃশ্য দক্ষিণে নিম্নে প্রথম উপগ্রহের এবং উপরে দ্বিতীয় উপগ্রহের ছায়া

ধীরে দূরে চলিয়া যাইতেছে—কোনটি বা সন্তর্পণে বৃহস্পতির সন্নিকটে আগমন করিতেছে—দৃশ্য বড়ই মনোরম! সুনীল অম্বরে, অসংখ্যনক্ষত্রের মধ্যেও, বৃহস্পতিকে চিনিয়া লওয়া কঠিন নহে। ছায়াপথের পূর্ব্বে, পূর্ব্বগগণে, অত বড় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আর নাই। বৃহস্পতি, আগামী ১৭ই পৌষ, ... দণ্ডে, মীন রাশিতে যাইবেন।

বৃহস্পতির গায়ে, জেব্রার গায়ের ন্যায়, কতকগুলি, ধূসরবর্ণের, ডোরাটানা, দাগ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐসকল, ডোরাটানা, দাগকে belt বা মেখলা বলে। ক্যাসিনি (Cassini) সর্ব্বপ্রথমে উহা দেখিয়াছিলেন। তিনি উহার যে সকল লক্ষণ-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও জ্যোতিষী সমাজে পরিজ্ঞাত রহিয়াছে। ঐসকল মেখলা সদা-পরিবর্ত্তনশীল—কখনও বা দুই-তিনটি মেখলা দৃষ্ট হয়, কখনও বা বহুসংখ্যক মেখলাদ্বারা বৃহস্পতির গাত্র সমলঙ্কৃত হইয়া থাকে। মেখলাগুলি, অধিকাংশ সময়ে, সমান্তরালে থাকে, আবার, কখনও বা, তির্য্যক্ হয়। পর্য্যবেক্ষণ-সময়ে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, একটি সমান্তরাল-মেখলা, তির্য্যক্ হইয়া, উপরে ও নীচে দুইটি সমান্তরাল-মেখলার সহিত সংযুক্ত হইতেছে। কখনও বা, একটি স্থূল-মেখলা ক্রমে ক্ষীণ ও

তাহার পার্শ্বের অপর-একটি, স্থূল হইতেছে। আমাদের তিন-ইঞ্চি দূরবীণে গতবৎসর অনেকগুলি সূক্ষ্ম ও স্থূল মেখলা দেখাগিয়াছিল। উহাদের মধ্যে, বিষুব-প্রদেশের, দুইটি স্থূল-মেখলার উপরেরটির, দক্ষিণ-পার্শ্বের কতকাংশ অধিকতর স্থূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এইসকল মেখলা-ব্যতীত, সৌর-কলঙ্কের অনুরূপ, কলঙ্কও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, ক্যাসিনি এইরূপ একটি কলঙ্ক দেখিতে পান; উহা, ক্রমেই, মধ্যস্থল হইতে পার্শ্বের দিকে, সরিয়া যাইতেছিল এবং ক্রমে, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে, ১৭০২ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে, ঐরূপ কলঙ্ক আট বার দেখাগিয়াছিল। আবার, একই কলঙ্কচিহ্ন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর, পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের কোন-কোনটির গতি, ঘণ্টায় ৭ হইতে ২০০ মাইল পর্য্যন্ত, জানা গিয়াছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে, বিষুব-প্রদেশের মেখলার উপর, একটি রক্তবর্ণের কলঙ্ক দেখা গিয়াছিল। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে, ঐরূপ চিহ্ন পুনরায় দেখা গিয়াছিল। কলঙ্কগুলি, ঠিক যেন, তরল-পদার্থের উপর ভাসমান দ্বীপের ন্যায় অনুমান হয়। বিষুব-প্রদেশে, তরল-পদার্থের ন্যায়, কয়েকটি প্রবাহও দেখিতে পাওয়া যায়;—উহাদের গতি পরস্পর বিভিন্ন-মুখী। এইসকল কারণে, পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৃহস্পতি-গোলক আজিও তরল-অবস্থায় রহিয়াছে। উহার পৃষ্ঠদেশ, ঘন হইয়া, পৃথিবীর ন্যায়, কঠিন আবরণ অদ্যাপি আবৃত হয় নাই। বৃহস্পতি পৃষ্ঠে, ভূ পৃষ্ঠ-অপেক্ষা, সাতাইশ ভাগ কম সৌর-কিরণ পতিত হয়। বৃহস্পতির ঋতুগুলি, পার্থিব ঋতুর ১২-গুণ বেশী; অর্থাৎ, আমাদের, যেমন, দুইমাসে একঋতু, বৃহস্পতির, তেমনই, চব্বিশমাসে একঋতু হয়। এই হেতু, বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশে যেসকল পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার গতি মন্থর হওয়া উচিত; কিন্তু, তাহা না হইয়া, ঠিক বিপরীত হইতে দেখা যায়। ঐসকল দ্রুত-পরিবর্ত্তন দারুণ উত্তাপের কার্য্য।—বর্ত্তমানে, বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে অবস্থান করিতেছেন।

রাস-পূর্ণিমা

[শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, এম.-এ.]

হাসিছে প্রকৃতি রাসরঙ্গে,
ঢালে পুলক সকল অঙ্গে
প্রাণ ভরে গাও ভেসে যাক্ সুখ-সলিলে সকল অবনী।

শোভে গগনে শারদ-ইন্দু
উছলি উঠে সুধার সিন্ধু
স্বর্গ আসিয়া নামুক মর্ত্ত্যে স্বর্গে উঠুক ধরণী।

বেণুবাদন শুনিয়া কুঞ্জে
আসিছে ধাইয়া পুঞ্জে পুঞ্জে
গৃহের কার্য্য করিয়া তুচ্ছ, যতেক গোপের রমণী।

কর্ম্ম তাদের কামনাশূন্য,
কার্য্যকারণে অশেষ পুণ্য
শ্যামের শরণে লভিছে কূল অকূলে জীবনতরণী।

বন্দি ললিত পদারবিন্দে
বাজায়ে বংশী মধুর ছন্দে
আসিও অন্তে শ্রীগোবিন্দ ত্যজিব এ প্রাণ যখনি।

কালিদাসের যুগ*

[শ্রীপঞ্চানন মিত্র, এম্. এ.]

ভারতের কালিদাস আজ জগদ্বিদিত। কিন্তু, তাঁহার এই খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের উপর সমালোচকদিগের যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। আর, সেই 'বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ' বলিয়া নবরত্নের নামোচ্চারণ করিয়া, উজ্জয়িনীতে বা বিক্রমাব্দের খৃষ্ট পূঃ প্রথম শতাব্দীর কোলে, কালিদাসকে ফেলিয়া পালাইবার উপায় নাই। যদি, ষ্ট্রেটফোর্ডের অমরকবি অতুল নাট্যরচনা অপরাধে বেকন্ নামের কলঙ্কভাগী হয়েন, তবে, কুমার ও শকুন্তলার কর্ত্তা যে কাশ্মীরের মাতৃগুপ্তের সিংহাসনের গুরুভারে প্রপীড়িত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? আর, অন্ধকবি হোমরের মাতৃভূমি-পদবাচ্য হইবার জন্য যখন শতনগরীর বিবাদ সুপরিচিত, তখন, আমাদের কালিদাসকে লইয়াও ভারতমহাদেশের চতুর্দ্দিক্—নদীয়া, কাশ্মীর, এমন কি সুদূর সিংহল হইতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার খবর কেন না আসিবে? আর, তাঁহার জন্ম তারিখ লইয়া যদি মনীষিগণ প্রথম শতাব্দী হইতে হাজার বৎসর নাড়াচাড়া না করিবেন, তবে, তাঁহাদের মনীষাই ত রহিল না! বেণ্ট্‌লি-সাহেব প্রমাণ হাজির করিলেন—কালিদাস খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর; হিপলাইট্ ফশ্—সুর কমাইয়া অষ্টম শতাব্দী ঠিক করিলেন, 'নন্দগির' কার প্যাটার্সন্—তাঁহাকে একেবারে খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে লইয়া গেলেন এবং কিলহর্ণ, উইলফোর্ড-প্রভৃতি মহোদয়গণ—মাঝামাঝি পঞ্চম খৃষ্টাব্দ ঠিক করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন!

যাহাই হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই, সমালোচকদের এরূপ যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টিসত্ত্বেও, আমরা নির্ভয়ে এখনও বলিতে পারি, 'ঋতুসংহার ও মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র ও শকুন্তলা' একই কবি—স্বয়ং কালিদাসেরই অমরলেখনীপ্রসূত। ভাবিয়া দেখুন, আজ কেবল ইহাদের বলে, 'আমাদের কবি,' স্পেন্সর ও টম্সনের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর 'স্বভাব-কবি', শেলি ও সুইনবর্ণের ন্যায় গীতিকাব্যপ্রধান, ভল্টেয়ার ফেক্সো ওএসের ন্যায় জাতীয় মহাকাব্য-রচয়িতা, বোকাশিও-চসরের ন্যায় আখ্যায়িকায়-সিদ্ধহস্ত, কর্ণিল্-কাল্ডেরণের ন্যায় প্রচলিত প্রথার নাট্যরচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বীকার করি, হোমর, সোফোক্লিস, ভার্জ্জিল, ডান্টে, সেক্সপীয়র, মিল্টনের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন কালিদাসের নহে। কিন্তু সাহিত্যে, একাধারে, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবিকাশ অতি বিরল—উহা কেবল এক অদ্ভুত সাহিত্যযুগেই সম্ভব। সাহিত্যবিদ্‌গণ, সাধারণতঃ, প্রধান-প্রধান লক্ষণানুসারে সকল সাহিত্যযুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন;—প্রাচীন, মধ্য ও নব্যে স্থিত। ইহা কেবল যুরোপীয় সাহিত্য-ইতিহাসে নয়, সকল ধারাবাহিক জাতীয়-সাহিত্যেই দৃষ্ট হইবে। সাহিত্যে প্রধান অভিব্যক্তির বিষয়—হয় বহির্জ্জগত, না হয় অন্তর্জ্জগৎ; এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, এবং সেই যুগে সকলসাহিত্যিকের এক-এক পর্য্যায়গত সৌসাদৃশ্য থাকে। যখন কোনও সাহিত্যে ক্রমাগত দেখিতে পাই যে, অন্তর্জ্জগৎ ও পরজগৎ, একেবারে বহির্জ্জগৎ ও ইহজগৎকে চাপিয়া, কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিয়াছে—তখন, আমরা বুঝি, সাহিত্যে বা কলাবিদ্যায় মধ্যযুগ (Mediaeval) উপস্থিত। সেই মেঘমেদুর-অম্বরে আমরা পাই—কোনও বিদ্যাপতি, বা চণ্ডীদাস, বা Pre-Raphaelite চিত্রকর, বা Avalon Arthur। ইহার বহুপূর্ব্বে, অতীতকালের অন্ধকার ভেদ করিয়া, কখন-কখন এক দীপ্ত, সৌম্য, জ্যোতিষ্মান্ প্রাচীন যুগের আভাস পাওয়া যায়। সেকালে আর বহির্জ্জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ, দৃশ্যজগৎ, অদৃশ্যজগতের পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। সে যেন এক সত্যযুগের মধুময় পৃথ্বী;—আর মধুবর্ষণ করিতে আসেন শান্ত, উদার কোনও হোমর বা বাল্মীকি। একাল এযুগ খুব কম জাতির সৌভাগ্যেই মিলে। কিন্তু মধ্যযুগের পরবর্ত্তী যে এক বাক্‌বিতণ্ডা—মারামারি—দলাদলির কাল

* নারিকেলডাঙ্গা ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত।

আসে, তাহা সৰ্ব্বত্র সুপরিচিত ;—Renaissance বলুন, বা নবোত্থান বলুন, মূলে জিনিষ এক। হঠাৎ, একদিন চটক ভাঙ্গিল, জাতি জন্মিল, লোকেরা দেখিল, কবিরা গাহিল যে, এ জীবন সুখের— জীবন-উপভোগ ও জীবের উৎকর্ষসাধনই ঈশ্বরোপাসনা। বোকাশিও ও কাল্ডেরণ, কবিকুলগুরু ভাস, সেক্সপীয়র আসিয়া, অপ্রত্যাগত জীবের বিষয়ে ব্যস্ত না হইয়া, জীবজগতে বিশ্বপ্রাণ দেখাইতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু একই সঙ্গে, ঐ একই যুগে, আর একদল বিশ্বদূতের সংবাদ পাওয়া যায়—পরজগতের জ্বলন্ত চিত্র যাহাতে মন হইতে অপসারিত না-হয়, সেইজন্য সঙ্গে-সঙ্গে, যেন বিশ্ব নিয়ন্তার বিধান বুঝাইবার জন্য, কোনও Dante বা Milton প্রেরিত হন। কালিদাস-প্রসঙ্গে আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কালিদাসের আবির্ভাব এইরূপ কোনও যুগে হয় নাই। ভারতীয় সাহিত্যকে, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, প্রত্নতত্ত্বের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে, কালিদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, আমি দেখাইতে চাই যে, কালিদাসের যুগ সংস্কৃত-সাহিত্যে এক অপরূপ কাল। তখন ম্যাথুআর্ণল্ড যাহাকে 'নবযুগ' বলেন—সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। যখন কোনও বিশাল জাতীয় জীবনের প্রথম-উন্মেষ, বা শেষ-সঙ্গীতের কাল আসে—যখন বিজ্ঞান, সমাজ, ধৰ্ম্ম, সাহিত্য, সমভাবে আদৃত হইয়া, উৎকর্ষ লাভ করে—যখন সাহিত্যে ইহজগৎ ও পরজগৎ, বাগর্থের ন্যায়, সম্পৃক্ত দৃষ্ট হয়—তখন এই মহান্, ক্ষণস্থায়ী সমন্বয়-যুগের আবির্ভাব ;—তখন আমরা পাই তৎকালীন সৰ্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সকলরচনায় পারদর্শী কোনও গেটে, টলষ্টয়, বা কালিদাস। জানিনা, যখন, সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ববিদের নির্ঘণ্ট-বন্ধন না করিয়া, সাহিত্যিকের মর্য্যাদানুভূতি পাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইবে, তখন এ মত টিকিবে, কি না! কিন্তু কালিদাস যতই পাঠ করা যায়, ততই এ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়। 'রঘুরপি কাব্যং'-এর সরল ভাষায় যতই বিমোহিত হওয়া যায়, ততই মনে হয়, যেন ভারতের জাতীয় জীবিত-সাহিত্যের, সেই সরল প্রাণের মধুর ভাবের, যেমন আদিকবি বাল্মীকি, তেমনই শেষ-গায়ক আমাদেরই কালিদাস। আর, রঘুবংশ যতই পাঠ করা যায়, ততই মনে হয়, যেন উহা, হিন্দুর গৌরবের, হিন্দুর প্রাধান্যের, হিন্দুর ভারতসাম্রাজ্যের দ্যোতক—দীপ-নির্ব্বাণের পূৰ্ব্ববর্ত্তী অতি-প্রজ্বলিতশিখা।

'গুপ্তমূল-প্রত্যন্ত'-রঘুর ভারতজয় নির্ব্বিঘ্নে হইল ; 'গুরু সদৃশ' অজ, ইন্দুমতী লাভ করিল ; রামের ধৰ্ম্মরাজত্বও হইয়া গেল ; কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে, আবার ভারতরাজধানী অযোধ্যার রাজপথ শিবাসঙ্কুল, প্রাসাদ ভগ্ন, প্রমোদকানন বন্যমহিষ পরিবৃত হইবে। কালিদাস বুঝিলেন যে, যদিও গুপ্তরাজগণ, আসমুদ্রক্ষিতীশ সমুদ্রগুপ্তের কাল হইতে, ভারতবর্ষের এক-ছত্রাধিপতি হইয়াছে, ; যদিও সাকেতোপবনে রামের সেই অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন, যদিও তাঁহারা হূন-দিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন ;—তথাপি, এই জাতীয় অভ্যুদয় ক্ষণিক ; আবার, খণ্ডরাজ্যে ভারতবর্ষ শীঘ্রই শ্রীহীন হইবে। আপনারা ভাবিতেছেন যে, রঘুবংশের মধ্যে কিরূপে গুপ্তরাজগণের প্রচ্ছন্ন-প্রবেশাধিকার-লাভ হইল, বুঝা গেল না। ভারতের নেপোলিয়ন সমুদ্রগুপ্তের নাম, আজ, পাশ্চাত্য মনীষিদিগের গুণে, সুপরিচিত। তিনি, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—যাঁহাকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিক্রমাদিত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহার পৌত্র কুমার গুপ্ত, ও প্রপৌত্র স্কন্দগুপ্ত, ভারতের একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন। উহাঁরা, রাজসূয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, এবং, অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করায়, রঘুর বংশধরদিগের সহিত সাহিত্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া গেলেন। আজকাল একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে যে, কালিদাস কোনও গুপ্তরাজের অভিনন্দনার্থেই 'রঘুবংশ' লিখিয়াছিলেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, কুমারগুপ্ত বা স্কন্দগুপ্তের জন্ম উপলক্ষে, 'কুমারসম্ভব' লিখিত হয়। এখন দেখা যাউক, বাস্তবিক রঘুবংশে ইহার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়, কি না।

অনেকের মতে, রঘুবংশের প্রতিছত্রে, গুপ্তরাজের নাম লেখা আছে ; আর, ৪র্থ ও ৫ম সর্গের, নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক, সকলসন্দেহ মিটাইয়া দেয়—

"ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ং।
আকুমার কথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যোজগুর্যশঃ॥"৪।২০

"স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ।
ষড়্বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্‌জিগীষয়া॥"৪।২৫

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কিল তস্য দেবী।
কুমারকল্পং সুষুবে কুমারং॥

অতঃ পিতা ব্রহ্মণ এব নাম্না
তমাত্মজন্মানমজং চকার ॥"৫।৩৬

কিন্তু রঘুর চতুর্থ ও ষষ্ঠ সর্গ হইতে, ইহা-অপেক্ষা আরও অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাসের বর্ণনাবলী পড়িলেই বেশ বুঝা যায় যে, তিনি সমসাময়িক, স্বদৃষ্ট ঘটনাবলীব্যতীত, আর কিছুরই তথায় অবতারণা করেন নাই ;—এবং ঐসকল ব্যাপার যে কেবল ৫ম শতাব্দীতে, গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময়েই, সম্ভব, তাহা, নিম্নোদ্ধৃত 'রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটি'র পত্রে প্রকাশিত একটি গবেষণার মর্ম্ম হইতেই, স্পষ্ট প্রতীত হইবে। রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৫৮-৭১ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সে সময় পারস্যেরা ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে, বোধ হয়, বেলুচিস্থান ও কাণ্ডাহারের 'দ্রাক্ষাবলয়ভূমিতে' ও হুনগণ, তাহার উত্তরে, কাশ্মীরের কুঙ্কুমোৎপাদক-দেশসমূহে রাজত্ব করিতেছিলেন ;—ও তদুত্তরে, হিমালয়ের অপরপার্শ্বে, কাম্বোজ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি রাজ্যের এরূপ সন্নিবেশ ৫ম শতাব্দীর খুব অল্পসময় ধরিয়াই ছিল। আমরা চীন ও পারস্যের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, ৪৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শ্বেত হুনগণ বিদার-রাজাদিগের নিকট হইতে গান্ধারদেশ দখল করিয়াছিল। আবার, ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে এই হুনদিগের সহিত পারস্যরাজ ফিরোজের মহা-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে, ফিরোজ পরাজিত ও হত হন ও পারস্যের ভারত-সন্নিকটস্থ প্রোক্ত পরগণাগুলি হুনদিগের করতলস্থ হয়। চীন-পরিব্রাজক স্যুংইউনের নিকট হইতেও ইহার খবর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে, মহারাজ চিংকোয়াঙের রাজত্বের প্রথমবর্ষে, অর্থাৎ ৫২০ খৃষ্টাব্দে, তিনি গান্ধারে আসেন, ও তথায় দুইপুরুষ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ে-থা', অর্থাৎ শ্বেত-হুনদিগের বংশধর, দিগকে রাজত্ব করিতে দেখিতে পান। Indicoplaestes, অর্থাৎ ভারতযাত্রী গ্রীক-পর্য্যাটক, Cosmus, ৫২২ খৃষ্টাব্দে, লিখিয়া গিয়াছেন যে, সে-সময় উত্তর-পশ্চিমে হুন, রাজা সোলাস্ মহাসমারোহে রাজত্ব করিতেন। তাহা হইলে, আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের কিছুপরের এবং ৫২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের বিষয়ই রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। আরও, রঘু ও অজের কথা বর্ণনা করিবার সময় যে, কালিদাসের মনে গুপ্তরাজগণের কথা জাগিতেছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত "স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ","তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ং" এবং ষষ্ঠ সর্গের ৪র্থ শ্লোকবর্ণিত—"ময়ূর পৃষ্ঠাশ্রয়িনাগুহেন" তাহার অতিপ্রাঞ্জল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, গুপ্তরাজগণের কুলদেবতা কার্ত্তিকেয় ; আর, তাহাদের রৌপ্যমুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে ময়ূর-অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন, নিঃসন্দেহে দেখা গেল যে, রঘুবংশে বর্ণিত যবন, হুন ও পারস্যদিগের অবস্থান কেবল ৫ম শতাব্দীতেই সম্ভব ; কারণ, যদিও মহাভারত ও পুরাণাদিতে যবন ও হুনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের অবস্থিতিস্থান, স্থানীয় দ্রব্যনির্দ্দেশে, কালিদাসের ন্যায় স্থিরনিশ্চয় করা যায় না। কিন্তু, কথা হইতে পারে যে, কালিদাস ইহার অনেকপরে ঐসকল ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া তাঁহার যশঃ-কাব্য রচনা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে অপর প্রমাণও যথেষ্ট আছে। 'মাণ্ডাসোরে',৪৭২ খৃষ্টাব্দের,যে উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মেঘদূতের কয়েকটি শ্লোকের স্পষ্ট ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে, মেঘদূত অন্ততঃ তাহার পূর্ব্বে লিখিত। রচনার শ্রেষ্ঠতায়, ছন্দের মধুরতায়, উপমার সার্থকতায়, রঘুবংশ যে কবির প্রবীণত্বের পরিচায়ক এবং, সেজন্য, অন্ততঃ ইহার বিংশ বৎসর পরে লিখিত, তাহার কোনও ভুল নাই। সপ্তম খৃষ্টাব্দেই কালিদাস যে ভারতময় সুপরিচিত, তাহা আমরা 'আইহোল' উৎকীর্ণলিপিহইতে জানিতে পারি। ৮ম শতাব্দীতে, কুমারিলার পুস্তকে, তাঁহার নামোল্লেখ আছে —গন্ধবাহ নামক বিখ্যাত প্রাকৃত-কবি 'রঘুবংশ, মেঘদূত, বিক্রোমোর্ব্বশী' হইতে শ্লোকোদ্ধৃত করিয়াছেন। দশম শতাব্দীতে তিনি কবিকুলশিরোমণি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন ; কারণ, আমরা দেখিতে পাই, পোন্না কবি, নিজে কালিদাস-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করিতেছেন।

এখন, আমি কালিদাসের মাতৃগুপ্ত-নামসম্বন্ধে দুইএক কথা বলিয়া শেষকরিব। 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে জানা যায় যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য, তাঁহার কবিবন্ধু মাতৃগুপ্ত-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীর-সিংহাসন পুরস্কার দিয়াছিলেন। অনেকের মতে, ঐ মাতৃগুপ্তই কালিদাস। কিন্তু, যখন, আমরা দেখিতে পাই যে, রাঘবভট্ট, শকুন্তলার টীকায় এক কবি মাতৃগুপ্তের নাম করিলেন, এবং তাঁহার রচিত পুস্তক 'অভিনব ভারতীর'ও নাম করিলেন ; অথচ, কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত যে অভিন্ন তাহা কখনও ঘুণাক্ষরেও

বলিলেন না, তখন এ মত কিছুতেই টিকিতে পারে না। তাঁহার নাম যাহাই হউক, তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন, যতদিন তাঁহার রচিত অমর পুস্তকাবলী রহিয়াছে, যতদিন সংস্কৃত সাহিত্য আছে, ততদিন আমরা বলিতে থাকিব-

"পুষ্পেষু জাতী নগরীষু কাঞ্চী।
নদীষু গঙ্গা কবি কালিদাসঃ॥"

সিংহলে কালিদাস

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

কবি কালিদাসের কালনির্ণয়সম্বন্ধে বহুমতভেদ আছে। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে, তাঁহাকে খৃষ্টীয় ৫২২ অব্দের লোক বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে।

৫২২ খৃষ্টাব্দে, সিংহলে কুমারদাস-নামে একজন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন রাজা রাজত্ব করিতেন। ইনি একজন কবিও ছিলেন—তাঁহার "জানকী হরণ" কাব্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কুমারদাস, একবার কালিদাসকে, তাঁহার সভায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে, কালিদাস ও কুমারদাস উভয়েই একজন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হ'ন। একদিন কুমারদাস সেই রমণীর গৃহে যাইয়া, ভিত্তিগাত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া দিয়া আসেন—

"বনতম্বরা মল নো তলারোনট বনী।
মল দেদরা পণ গলবা গিয় সেবনী॥"

—অর্থাৎ, 'ফুলের কোনরূপ অনিষ্টসাধন না-করিয়া, বন্য-মক্ষিকা, মধু অন্বেষণে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আবদ্ধ হইয়া পড়ে; পরে, প্রাতঃকালে ফুলটির পাপড়ি বিকশিত হইলে, মক্ষিকা প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। কুমারদাস ইহার নিম্নে আরও লিখিয়া দেন যে, যে-কেহ ইহার যথার্থ উত্তর দিতে পারিবে, তাহাকে, তিনি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করিবেন।

প্রেমমুগ্ধ কবি কালিদাসও ইহার অল্পক্ষণ পরে, সেই রমণীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত। তিনি, ভিত্তিগাত্রস্থ সমস্যাটি দেখিয়া, তাহার নিম্নে এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়া দেন—

"সিয়তম্বরা সিয়তম্বরা সিয় সেবনী
সিয় স পুরা নিদি নো লবা উন্ সেবনা।"

—অর্থাৎ, 'সূর্য্যের আত্মীয় [সূর্য্যবংশীয় রাজা], পদ্মনেত্রা সুন্দরীর সাহচর্য্যে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন; এই রমণীর মোহ, তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়াছিল।'

এই ঘটনার পর, রাজা কুমারদাস, রমণীর গৃহে একদিন আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। তিনি, রমণীকে সমাধানকারের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অর্থলোলুপ রমণী তখন তাহা সযত্নে গোপন রাখিলেন। পরদিন, কালিদাস তাঁহার গৃহে আসিলে, রমণী, লোক দিয়া তাঁহাকে হত্যা করাইয়া, নিজে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন বলিয়া, রাজার নিকট পুরস্কারের দাবী করেন। রাজা, লোকজনের সাহায্যে সেই রমণীর গৃহ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করাইয়া, মাটীর ভিতর হইতে কালিদাসের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। অবিলম্বে, কালিদাসের জন্য, চিতার আয়োজন হইতে লাগিল। কুমারদাস, তাঁহার শোকে এতই অধীর হইয়াছিলেন যে, কালিদাসের দেহে অগ্নি-স্পর্শ করিবামাত্র, তিনি, নিজেকে, কালিদাসের মৃত্যুর একটি কারণ বিবেচনা করিয়া, সেই চিতায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি ডালভিস্ (D' Alwis)-সাহেবের "সিদ্ধার্থ সংগ্রহ" (P. C l i) ও উইলিয়ম্ নাইটন্ (William Knighton-সাহেবের 'History of Ceylon', 1845 (P. 105-6) নামক দুইখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে; কিন্তু, এই উভয় পুস্তকের গ্রন্থকারই, কোথা হইতে এই বিবরণটি পাইলেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই! চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত "পরাক্রমবাহু-চরিত্রে"ও এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, যখন এই ঘটনাটি লোকসমাজে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন কালিদাস যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর লোক ছিলেন, এইধারণা, সিংহল-বাসীদের মনে, বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

অরণ্য-বিহার

কুমার শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী]

কুমার শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরি

আমাদের দেশে, রাজগণের মধ্যে, বহুকাল হইতেই, মৃগয়া করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। একালেও, আমাদের দেশের অনেক লোকেরই, মৃগয়া করিবার অভ্যাস আছে। তবে, নানা-কারণে, তাঁহাদের উৎসাহ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়গণের, শিকারের সখ যতই প্রবল হউক, বঙ্গ-সাহিত্যে, মৃগয়া-সম্বন্ধে, দুই-একখানির অধিক পুস্তক এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; এবং তাহাও, নানা-কারণে, জনসমাজে তেমন বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে, কি না, সন্দেহ। য়ুরোপীয়-সাহিত্যে, শিকারসম্বন্ধে, অসংখ্যপুস্তক আছে; এবং মার্কিণ-জাতিও এবিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। আমাদের দেশের দুই চারিজন সামন্ত-নরপতি, সুদক্ষ শিকারী বলিয়া, খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ-কেহ শিকার-কাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইংরাজী-ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায়, আমাদের দেশের সকলশ্রেণীর পাঠকপাঠিকাগণ তাহা পাঠকরিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না। তাঁহারা, এইশ্রেণীর পুস্তকপাঠের জন্য, অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাঁহাদের আগ্রহ পূর্ণকরিবার শক্তি বর্ত্তমান লেখকের কতটুকু আছে, তাঁহারাই তাহা বিচার করিতে পারিবেন। আমি, কয়েক বৎসর, নানাস্থানে শিকারে ব্যাপৃত থাকিয়া, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার বিবরণ ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইলে, তাহা বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাগণের তৃপ্তিকর হইতেও পারে। অন্ততঃ, আমার ধারণা, এইসকল বিবরণ পাঠ করিয়া, আমাদের দেশের শিকারীরা, এ পথে অগ্রসর হইবার জন্য, প্রলুব্ধ হইতেও পারেন এবং, সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা ইহাতে পুষ্টিলাভ করিতে পারে। এইসকল কথা ভাবিয়াই, আমি, আমাদের শিকার কাহিনী, ধারাবাহিকরূপে, 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছি। 'ভারতবর্ষে'র ন্যায় চিত্রবহুল মাসিক পত্রিকায়, সচিত্র-শিকারকাহিনী প্রকাশিত হইলে, যাহাদের শিকার করিবার সখ ও সুযোগ আছে, তাঁহারা, তাহা পাঠে, কিছু উপকৃত হইবেন, এরূপ আশা, বোধ হয়, দুরাশা নহে।

বঙ্গভাষায়, শিকারসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইলে, প্রথমেই কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা একান্ত আবশ্যক। তাহার অভাবে, লেখক ও পাঠক, উভয়কেই অসুবিধায় পড়িতে হয়; কারণ, শিকারে যেসকল পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা, বিনা-ব্যাখ্যায় সকলের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য, আমরা প্রথমেই কতকগুলি অপ্রচলিত, দুর্ব্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম।

আমাদের শিকারের প্রধান বাহন হাতী; সুতরাং, হাতীকে, পরিচালিত করিবার জন্য, যেসকল "বুলি" ব্যবহৃত

হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই ব্যাখ্যা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। হস্তী-পরিচালনের জন্য, নিম্নলিখিত 'বুলি' গুলি অপরিহার্য্য ;—

বৈঠ = বোস্।

চৈ = ঘোর্।

মাইল = ওঠ্, সতর্কভাবে চল।

ঢং = থাম্।

পিছ্ = পিছনে হঠ্।

দেলে = শুঁড় দিয়া তোল্।

বরি = ফেলিয়া দে ; কিছু ধরিস নে।

তোল্ = পা দিয়া তোল।

ডুম্ = লেজ (না-নাড়াইয়া) স্থির করিয়া রাখ্।

ছাম্ = নিশ্চুপ হইয়া দাড়া ; ঠিক্ হইয়া ব'স।

ছামট্ = কামড়াইয়া ধর।

মার = আঘাত কর।

আগে = আগাইয়া চল।

"ব" দেওয়া = স্নান করাইয়া, বা চুবাইয়া, আনা।

লগুড়-লগুড় = গা রগ্‌ড়া (স্নানের সময়)।

ভিড়্—আগে ভিড়্ = অন্য হাতীর সঙ্গে মিলিত হ'।

তেরে = শয়ন কর্।

ঝুক্ = সম্মুখে ঝুকিয়া নীচু হ'।

আড়ি = সম্মুখে লাফাইয়া ওঠ্।

ডেগ্ = ডিঙ্গাইয়া যা' ; উল্লঙ্ঘন করিয়া যা'।

ঝপ্ = শুঁড় ঘুরা।

কুল বৈঠ্ = সম্মুখে একটু ব'স্ ; অর্দ্ধেক ব'স (সম্মুখে)।

পিছু বৈঠ্ = কেবল পশ্চাদ্ভাগ নীচু কর।

শিকারের হাতী সজ্জিত-করিবার জন্য যেসকল সরঞ্জামের আবশ্যক, তাহারও তালিকা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

হস্তীকণ্ঠ পরিবেষ্টিত করিয়া যে "ডুলসী" থাকে, তাহা রজ্জুনির্ম্মিত। প্রথমতঃ, তিন-চারি পাকের রজ্জুর ৫০।৬০ "ছড়া" (কম বেশীও হইয়া থাকে) দড়ি, সমান করিয়া লইয়া, তাহার উভয়-প্রান্তে দুইটী ফাঁস বাধাইবার ঘর প্রস্তুত করা হয়। সেই সম্মিলিত-রজ্জুবেষ্টনী হাতীর গলদেশে, হাঁসুলির মত, সন্নিবিষ্ট হয়। মাহুত, হাতীর স্কন্ধদেশে উপবেশনপূর্ব্বক, এই রজ্জুর ভিতর পা-প্রবেশ করাইয়া, হস্তীকে পরিচালিত করে, ঘোড়ার যেরূপ "রেকাব-দল," হস্তীপরিচালকের জন্য, "ডুলসীও" সেইরূপ।

হাতীর সাজ-সজ্জা

"ডুম্‌চি" (ডুমেলা সহ), গদি, গাদেলা, হাওদা, হাওদার দড়ি, গদির দড়ি ছড়, ছড়বন্দ প্রভৃতি হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিবার জন্য, একান্ত আবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন—গজবাগ্ (অঙ্কুশ), আকড়ি, কানার, বাণ্ডা, বেড়ী, আণ্ড় প্রভৃতি—ও অপরিহার্য্য।

এইসকল সামগ্রী ব্যবহারের নিয়ম, অভিজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন ; তথাপি, পাঠকসাধারণের অবগতির জন্য, তাহার বিবৃতি অনাবশ্যক নহে।

'ডুম্‌চির' কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।—হাতীর লেজের নিম্নভাগ দিয়া যে-রজ্জু প্রসারিত থাকে, তাহাকে 'ডুম্‌চি' বলে। এই রজ্জুর ক্রমাগত ঘর্ষণে লেজে ক্ষত হইতে পারে ; সুতরাং, ঘর্ষণ হইতে লেজটি রক্ষা করিবার জন্য, হাতীর লেজের ঠিক নীচেই, ইংরাজী 'U' অক্ষরাকৃতি, ধাতু-নির্ম্মিত, একটি চোঙ ব্যবহৃত হয়। এই চোঙটিকে 'ডুমেলা' বলে। ইহার ভিতর দিয়া রজ্জু প্রবেশ করাইয়া, তাহা কষিয়া লইতে হয় ; এরূপ করিলে, রজ্জুর সংঘর্ষণে, হাতীর লেজের নীচে ক্ষত হইবার আশঙ্কা থাকে

না। পিত্তল, বা তাম্র, দ্বারা 'ডুমেলা' নির্ম্মিত হইতে পারে। আমরা একবার, জলের কলে ব্যবহৃত, পরিত্যক্ত পাইপের দ্বারা ইহা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম; ইহাতে বায়বাহুল্য নাই, বটে; কিন্তু ইহা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। তবে, নূতন পাইপের দ্বারা প্রস্তুত করাইলে, কিছু অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে; পিত্তল, বা তাম্র,-নির্ম্মিত 'ডুমেলা' অপেক্ষা, তাহাতে খরচও অনেক কম পড়ে।

শিকারের তাম্বু

গদি-প্রস্তুত করিতে, ছালা ব্যবহৃত হয়; তাহা, উপরের আবরণ, ভিতরে আমরা সোলা ব্যবহার করি; কিন্তু, ত্রিপুরা অঞ্চলে, সোলার পরিবর্ত্তে, খড় দেওয়া হয়। 'গাদেলা'র-উপরে আমরা খেরো ও ভিতরে মেষলোম, পাটের কুচি, ব্যবহার করি।

হাতীর বক্ষঃসংলগ্ন রজ্জুই গদির দড়ি; ইহা পাশাপাশি বাঁধা থাকে। হাতীর, গলা ও লেজের ভিতর দিয়া, 'দুমচি'র দ্বারা যে পাঁচ আসে, তাহাতেই গদি কষা হইয়া থাকে। ইহার উপর, গদি-তোষক-প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। হাতী চলিবার সময়, আরোহীকে, যে রজ্জু ধরিয়া থাকিতে হয়, তাহাকেই 'ছড়' বলে। হাতীকে চালাইবার জন্য যে দণ্ড ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'গজবাগ'; ইহার সংস্কৃত নাম 'অঙ্কুশ'—ইহার আকার 'ণ'-এর মত; প্রভেদ এই যে, মূর্দ্ধণ্য 'ণ'-এর পুঁটলিটির পরিবর্ত্তে, ইহা সুক্ষ্মাগ্র। এই 'গজবাগ' লৌহনির্ম্মিত; কিন্তু, ঠিক এই আকারের দ্রব্যের, মাথাটা লৌহনির্ম্মিত ও দণ্ডটি কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলে, তাহাকে 'আকড়ি' বলে। এতদ্ভিন্ন, বংশনির্ম্মিত, পাঁচনের ন্যায় আকারবিশিষ্ট যে দণ্ড সর্ব্বদা-ব্যবহারের জন্য রাখা হয়, তাহাকে 'কানার' বলে।

হাতীর 'হাওদা' কাঠের ফ্রেমে নির্ম্মিত; কেহ-কেহ, ইহার দুইপার্শ্বে, বেতের ছাউনি দিয়া থাকেন। আমরা, একপার্শ্বে বেত, ও অন্যপার্শ্বে, তার ব্যবহার করি। হাওদা, রজ্জুর সাহায্যে, কষিতে হয়; এই রজ্জুর মধ্যস্থলে যে টানা' থাকে, তাহারই নাম 'ছড়বন্দ'।

'বেড়ি' শিকলদ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। ছইগাছি শিকল, পায়ের মাপে, কাটিয়া লওয়া আবশ্যক। উহা আটিবার জন্য, শিকল-প্রান্তস্থিত একটা আংটায় ফাঁক রাখিতে হয়। এই শৃঙ্খল-নির্ম্মিত কিঙ্কিণীযুগল, অন্য একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে।

'কানাচ' উল্লিখিত শৃঙ্খলের ন্যায়, অন্য একটি শৃঙ্খল; তাহার, নীচের দিকে, আর একটি সুদীর্ঘ শৃঙ্খল-ইহার মাথায় লম্বা, বা গোলাকার, লৌহ আবদ্ধ থাকে। হাতী, বাঁধিবার আবশ্যক হইলে, বেড়ির মত' শৃঙ্খলদ্বারা, তাহার পদদ্বয় আবদ্ধ করিয়া, উক্ত দীর্ঘ শৃঙ্খলটি মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়। হাতীকে, 'থানে' বন্ধন করিবার সময়, উহা, অগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থান অনুমান করিয়া লইয়া, মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার পর, সেই স্থানে লইয়া গিয়া, 'দাঁড়' করাইয়া, তাহার পদদ্বয়ে বেড়ি পরাইয়া দিতে হয়।

যে রজ্জুদ্বারা হাতীর পশ্চাতের পদদ্বয় বন্ধন করা হয়, তাহার নাম 'বাণ্ডা'। দুষ্ট হাতীর কণে একটি কড়া দিয়া, তাহা, তাহার পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে, সেই অবস্থায়, যদি সে চলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে, তাহার কাণে টান্ লাগে—সুতরাং, তাহাকে সংযত থাকিতে হয়; এই 'কড়ার' নাম 'আণ্ডু'।

স্ত্রী-পুরুষ ও বয়সভেদে, হাতী, বিভিন্ননামে পরিচিত হয়। পুরুষজাতীয় হাতীর নাম—'গুণ্ডা', 'নর', 'মাকনা', 'মেনা';—যেসকল হাতীর বয়স অল্প, (বাচ্ছাহাতী) তাহাদিগকে 'মেনা' বলে; পূর্ণবয়স্ক, অর্থাৎ জোয়ান, হাতী 'গুণ্ডা' নামে পরিচিত; বৃদ্ধহাতীর নাম 'নর'। দন্তহীন

হাতীর নাম 'মাকনা'—ইহাদিগকে 'মোকনা'ও বলে—ইহা, বোধ হয়, 'মাকুন্দ' শব্দের অপভ্রংশ।

স্ত্রী-হাতী দুই নামে পরিচিত; (১) 'মেনি' বা মিয়ানি, (২) 'কুন্‌কি'; হাতিনীর বয়স যতদিন অল্প থাকে, ততদিন সে 'মেনি'-নামে পরিচিত হয়—পূর্ণবয়স্ক হইলে, তাহার নাম হয় 'কুন্‌কি'।

হাতীর শ্রেণীবিভাগসম্বন্ধে বিশেষ-জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। এইবার, প্রধান প্রধান শিকারের নামের পার্থক্য ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুইএকটি কথার উল্লেখ আবশ্যক।

আমাদের দেশের প্রধান শিকার—ব্যাঘ্র। তাহারা নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও, কতকগুলি বাঘকে Game-Killer ও কতকগুলিকে Cattle-lifter বলে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বাঘগুলি অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট; শেষোক্ত শ্রেণীর বাঘগুলি অপেক্ষাকৃত ধীর। নাগপুর, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ-প্রভৃতি অঞ্চলে, এমন কি, আমাদের এ অঞ্চলেও গজারি বনে, Cattle-lifter অপেক্ষা, Game-Killar এর সংখ্যাই অধিক। কিন্তু 'হাওড়ে' ও নেপালে Cattle-lifterই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। Game-Killer জাতীয় ব্যাঘ্র-অপেক্ষা Cattle-lifterগুলি অনেক ভারী, আকারেও কিছু বড়। Cattle lifterগুলির আক্রমণ চেষ্টা অপেক্ষাকৃত অল্প; কিন্তু Game-Killerগুলি খুব উৎসাহের সহিত, হঠাৎ, আক্রমণ করে। বস্তুতঃ এই উভয়-শ্রেণীর ব্যাঘ্রের আকারগত পার্থক্য এত অল্প যে, সকলে তাহা ধরিতে পারে না; এমন কি, বহুদর্শী শিকারী ভিন্ন, অন্যলোকে তাহাদের প্রভেদ সহসা বুঝিতে পারে না।

আবার, Leopard (লেপার্ড) ও Panther (প্যান্থর), এই দুইজাতীয় ব্যাঘ্রের মধ্যেও পার্থক্য আছে। লেপার্ড-গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি; তাহাদের স্ফূর্ত্তি অত্যন্ত অধিক; তাহাদের শরীরও অনেকটা হাল্কা—'চাবুকের মত' শরীর বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ। 'প্যান্থর'গুলি অপেক্ষাকৃত ধীর; তাহারা লেপার্ড-অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদাকার।

বন্যমহিষও শ্রেষ্ঠ-শিকারের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা বিভিন্ন-নামে পরিচিত;—পুরুষজাতীয় অল্পবয়স্ক মহিষকে 'পাড়া' বলে; বড় হইলে, তাহাদের নাম হয় 'বয়ার'। স্ত্রীজাতীয় মহিষের নাম, 'কাড়্লি'।

বৃহৎ-জাতীয় হরিণের পুরুষগুলির নাম 'নর'; যতদিন তাহারা পূর্ণবয়স্ক না হয়, ততদিন, তাহাদিগকেও 'পাড়া'

স্বর্গগত মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্যচৌধুরী

বলে; পূর্ণবয়স্ক হইলে, তাহারা 'গাউজ'-নামে পরিচিত হয়। স্ত্রীজাতীয় বড়-হরিণকে 'ঢোলাইন' বা 'লাড়ি' বলে; ক্ষুদ্র-জাতীয় হরিণ—স্ত্রীপুরুষভেদে—'পাটি' ও 'পাটা' নামেই অভিহিত হয়।

শিকারে যাইতে হইলে, যথেষ্ট সরঞ্জামের আবশ্যক—আয়োজনে কোন ত্রুটি থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। শিকারের সময় যেসকল দ্রব্যের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহে ত্রুটি হইলে, অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়। শিকারের প্রধান সরঞ্জাম বন্দুক, টোটা। তাম্বু, খাটুলি, বিছানা প্রভৃতিও অপরিহার্য্য; এতদ্ভিন্ন, যাঁহার যেরূপ খেয়াল ও সখ্, তদ্রূপ দ্রব্য তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হয়। আমরা শিকারে যাইবার সময়, গোটা-দুশেক তাম্বু সঙ্গে লই; প্রত্যেক তাম্বুতে দুইজন করিয়া বাস করি—কেহ-কেহ বা, একটি তাম্বু একাকীই দখল করিয়া থাকি।

বন্দুকসম্বন্ধেও এখানে দুইএকটি কথা বলা আবশ্যক। সঙ্গেদায় দুইপ্রকার 'রাইফেল্' রাখা কর্ত্তব্য; এবং ভাল 'গ্রেনবোর' বন্দুক থাকা উচিত। 'গ্রেনবোর' বন্দুক, খুব নিকটস্থ শিকারের পক্ষে, অত্যন্ত উপযোগী। 'এক্সপ্রেস্ রাইফেল্', বিশেষতঃ Cardite-গুলির, Penetrating Power, অর্থাৎ, বিদ্ধ করিবার শক্তি অধিক; অথচ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

Shocking-Power, অর্থাৎ, ধাক্কা দিবার শক্তি, অল্প, কিন্তু সাধারণ রাইফেলের ধাক্কা দিবার শক্তি অধিক, বিদ্ধ করিবার শক্তি অল্প। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি ৫০।৬০ গজ দূর হইতে একটি ব্যাঘ্র সবেগে আক্রমণ (charge) করিতে আসে, ও সেইসময়ে যদি তাহাকে, ৩০৩, বা ৪৫০, অথবা ৪৭০ এক্সপ্রেস্, বা কডাইট-দ্বারা গুলি করা যায়, তাহা হইলে, তাহার মগজে বা মর্ম্মে (Heart or Lungs) গুলি-প্রবেশ করিলেই, তাহার গতিরোধ হইলেও হইতে পারে, নচেৎ নিষ্ফল; কিন্তু '১২ বোর' রাইফেল্ বা ঐ Magnum-দ্বারা গুলি করিলে, সেই-গুলি, তাহার যেখানেই লাগুক, তাহাকে এক 'পটকান' খাওয়াইবেই স্থির; সুতরাং, ইত্যবসরে, শিকারী একটু সময় পাইবেন। ব্যাঘ্রেরা পটকান খাইলেই, অনেকসময়, ফিরিয়া যায়।

আহার্য্যসামগ্রীর অভাবে কষ্ট, বা অসুবিধা, না হয়, এজন্য, শিকারে যাইবার সময়, আমরা কতককতক খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাই। লোকালয় হইতে বহুদূরে, দুর্গম গহন কাননের অভ্যন্তরে, যেসকল সামগ্রীসংগ্রহ করা কঠিন, এবং, যথাযোগ্য বন্দোবস্ত সত্ত্বেও, যাহা পাইতে অনেক বিলম্ব, বা অসুবিধা, হইবার সম্ভাবনা, তাহা সঙ্গে লওয়াই কর্ত্তব্য; যথা—চা, বিস্কুট, মিহি চাউল, ঘৃত, তৈল, মসলা-প্রভৃতি; এসকল সামগ্রী সঙ্গে না-লইলে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়। উদর বেশ পরিতৃপ্ত না-হইলে, শিকারে উৎসাহদান করিবে কে? আবার, সেই দূরদেশে, লোকালয় বিরহিত বিজন বিপিনে, শরীর অসুস্থ হওয়াও বিচিত্র নহে—কোন না কোন দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারে; সুতরাং, সঙ্গে একজন ডাক্তার লওয়া আবশ্যক।

যাহাহউক, আমাদের শিকার 'পার্টিতে' (দলে), সাধারণতঃ, ৪০।৫০টি হাতী, খানকয়েক গরুরগাড়ী লওয়া হয়। 'পার্টি' খুব বড় হইলে, এসকলের সংখ্যাও তদনুসারে বর্দ্ধিত করা আবশ্যক।

পূর্ব্ব-কথা

বাঙ্গালা ১৩০৭ সালে (১৯০০ খৃষ্টাব্দ), অগ্রহায়ণ মাসে, অর্থাৎ ঠিক পনর বৎসর পূর্ব্বে, আমার প্রথম শিকার যাত্রা। সেসময়, আমার বয়ঃক্রম নিতান্ত অল্প হইলেও, শিকারের উৎসাহ অত্যন্তপ্রবল ছিল। তবে, এই সময়েই যে শিকারে আমার 'হাতে খড়ি', একথা বলা যায় না; কারণ, ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই, আমি ঘুঘু, পারাবতাদি বিহঙ্গ-শিকার দ্বারা লক্ষ্যবেধে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম; সুতরাং বলিতে হয়, তখন আমি শিক্ষানবীশ-শিকারী। একাগ্রতা, উৎসাহ ও আন্তরিক-আগ্রহ ব্যতীত কোনকার্য্যেই শিক্ষালাভ হয় না; শিকারসম্বন্ধেও সেকথা তুল্যরূপে প্রযোজ্য। সে সময়েও, আমি-কখনও, কখনও অদূরবর্ত্তী পল্লীসমূহে শিকার করিতে যাইতাম। পূর্ব্বে, আমাদের পল্লীতে, প্রায়প্রতি-বৎসরই, সাত-আটটা 'লেপার্ড' ও 'প্যান্থর' আসিয়া উপদ্রব করিত; কিন্তু, গত চারি-পাচ বৎসর হইতে, এঅঞ্চলে আর তাহাদের সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। শেষবার, ১৯০৮

খৃষ্টাব্দে, আমাদের গ্রামে একটি লেপার্ড নিহত হইয়াছিল। এখানে আমি মোট তিনটি লেপার্ড শিকার করিয়াছি। সুতরাং, বলা বাহুল্য, 'পার্টি'তে মিশিয়া, দূরান্তরে শিকার-যাত্রার সময়, শিকারসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা, কেবল ঘুঘু পারাবত-প্রভৃতি খেচর-ধ্বংসেই আবদ্ধ ছিল না। সুদক্ষ শিকারী হইবার অভিলাষ, আমার, আবাল্য কম না। জানি না, জীবন-মধ্যাহ্নে, আমার সেই আগ্রহ কতদূর পূর্ণ হইয়াছে।

বহুজনপূর্ণ জনপদে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া উপদ্রব করিতেছে—গৃহস্থের গোয়ালঘর হইতে গরু বাছুর ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, একথা শুনিয়া বোধ হয়, কলিকাতা, বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের পাঠক-পাঠিকাগণ, আতঙ্ক ও বিস্ময়ে, অভিভূত হইবেন, এবং আমাদের মত, শোচনীয় অবস্থাপন্ন, ব্যক্তিগণের পক্ষে "অরণ্যং তেন গন্তব্যং—যথারণ্যং তথাগৃহম্", মনে করিয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যে প্রচুর সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন! কিন্তু, নিকটে কোথাও বাঘ আসিয়াছে, শুনিলে, আমাদের কিরূপ আনন্দ, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি হইত,—ব্যাঘ্র বিনাশের জন্য, হৃদয় কিরূপ ব্যাকুল ও আগ্রহে পূর্ণ হইত, তাহা অনধিকারীকে বুঝাইবার নহে।

'লেপার্ড' ও 'প্যান্থর' ভিন্ন, বৃহৎজাতীয় ব্যাঘ্র (টাইগার)ও, মধ্যে-মধ্যে, আমাদের এই থানে শুভাগমন করিতেন। তাঁহাদের দুইটি, এইগ্রামেই, ব্যাঘ্রলীলা-সংবরণ করেন; এতদ্ভিন্ন, এখান হইতে চারিমাইল দূরবর্ত্তী, ঘাটুরি-নামক স্থানেও, ৩।৪টি বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য মহাশয়কে ব্যাঘ্রলীলা-সংবরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ছোট-ছোট বাঘ এখনও সেখানে আসিয়া থাকে; সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিলেও চলে। যাহা হউক, এঅঞ্চল হইতে বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়েরা এককালে অদৃশ্য হইয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ, আমাদের গ্রামের ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী, 'গারুলা'-নামক স্থানেএখনও ছোট, মাঝারি, বড় সকল-রকম বাঘেরই অস্তিত্ব বর্ত্তমান। গভীররাত্রে বিভিন্নজাতীয় ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে নির্জ্জন, বনভূমি কিরূপ প্রকম্পিত হয়, তাহা, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কল্পনা করিবার শক্তি নাই!

আমাদের এখানে, চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও, লেপার্ডের বিষম উপদ্রব ছিল। এমন কি, আমাদের 'গোয়ালবাড়ী'র পশ্চাতেও প্রতিবৎসরই দুই একটি ব্যাঘ্র নিহত হইত। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, ১৩০৮ সালে, আমাদেরই কোন এক সরিকের, ভাঙ্গা-দোতালার কক্ষপর্য্যন্ত ব্যাঘ্র পদরজে পবিত্র হইয়াছিল; কিন্তু সেইস্থানেই তাহার ইহলীলার অবসান হয়।

বলাবাহুল্য, যাহাদের সঙ্গে ব্যাঘ্রের এমন নিত্যসম্বন্ধ, এতদূর ঘনিষ্ঠতা, তাহারা যে, ব্যাঘ্রের আক্রমণ আশঙ্কায়, নিয়ত উদ্বেগ কম্পিত হৃদয়ে অবস্থান করিবে, ইহা সম্ভব

জঙ্গীলাট স্যর ও.ক্ল.ডোইট্‌ ও চীফ্‌ জষ্টিস্‌ স্যর লোমেন পেথ-বৃহমের তাম্বু আক্রমণ-কারী বন্য হস্তীকে নিহত করিয়া ওডপার মহারাজ সূর্য্যকান্ত এবং তাঁহার সহকারী উড্‌ল্‌ সাহেব ও তৎপত্নী আসীন

নহে। বাঘ আসিয়াছে, শুনিলে, স্থানীয় লোকে ভয় পায় না; তবে, আজকাল আনাগোনা-দেখাশুনা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; সুতরাং, আত্মীয়তাও হ্রাস পাইতেছে।

পূর্ব্বে যখন এখানে সর্ব্বদা বাঘ আসিয়া উপদ্রব করিত; গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর হইতে ছাগল, ভেড়া, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু ধরিয়া, মুখে করিয়া, চম্পট দিত; এবং, আড্ডায় গিয়া, খুব ঘটা করিয়া, 'ফলারে'র আয়োজন করিত, সেসময়ে, গৃহস্থেরা, রাত্রিকালে, বাঘ-তাড়াইবার জন্য 'টিন্' ও 'সুল্‌পি' বল্লম; এবং, ব্যাঘ্রাচার্য্য মহাশয়ের নিরামিষাশী প্রতিবেশী, ভল্লুক-ভট্ট মহাশয়কে বিতাড়িত করিবার জন্য, আগুন ও 'সুল্‌পি' লইয়া প্রস্তুত থাকিত। আমাদের এই জেলার উত্তরাঞ্চলে (যে অঞ্চলকে আমরা সাধারণতঃ 'ভাটী'

বলি), এখনও, ৫।৭ জন একত্র মিলিয়া, বংশদণ্ডের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া (চোখাইয়া লইয়া), তাহার সাহায্যে বাঘ মারিয়া আনে। এখনও মহিষের পালে পড়িয়া, কখন-কখন বা, বড়শীতে বিঁধিয়া, এঅঞ্চলের ব্যাঘ্র নিহত হইয়া থাকে। আমাদের বাড়ীতেই একটি প্রকাণ্ড 'ষাড়' ছিল; একটা বড়-বাঘের সঙ্গে তাহার রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধশেষে, সে, বিজয়-চিহ্নস্বরূপ, উক্ত ব্যাঘ্র-প্রবরের মৃতদেহ একেবারে আমাদের বাড়ীতে আনিয়া হাজির করে! এইসকল দৃষ্টান্তে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, এঅঞ্চলে, অল্পদিনপূর্ব্বেও, বাঘের প্রাদুর্ভাব কিরূপ প্রবল ছিল। এখন, কিছু কমিলেও, দুর্লভ নহে; বরং, যথেষ্ট আছে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

ব্যাঘ্রেরা, সাধারণতঃ, 'ল্যেপার্ড' ও 'প্যান্থার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু, ইহাদের, আরও অনেক জাতি আছে; তাহাদের বিশেষ পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। এখানে যেসকল ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হইত, তাহারা 'ল্যেপার্ড' জাতীয়। কিন্তু ইহাদের কোন কোনটা অতিবৃহৎ। আমি, এই দুইজাতীয় বাঘ-ভিন্ন, অন্য জাতীয় বাঘ দেখি নাই; আর, দেখিয়া থাকিলেও, তাহাদের পার্থক্য নিরূপণের শক্তি আমার নাই। তবে, একবার, শ্রীযুক্ত মহেশকিশোর আচার্য্যচৌধুরী মহাশয়কে, থল্ দুচুৎ-নামক স্থানে, একটি বাঘ শিকার করিতে দেখিয়াছি; উহার বর্ণ, ভিন্নপ্রকার ছিল। 'ল্যেপার্ড' ও 'প্যান্থর'-জাতীয় বাঘের গায়ে পীতবর্ণের জমির উপর কৃষ্ণবর্ণ চক্র থাকে; কিন্তু এই বাঘটির বর্ণ পীত নহে—শুভ্র জমির উপর কৃষ্ণবর্ণ চক্র ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শিকারী, পিতৃব্যোপম, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়মহাশয় এই ব্যাঘ্রটির প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, তিনিও ঐস্থানেই এই প্রকার একটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন।—ইহা কোন্ 'জাতীয় ব্যাঘ্র, তাহা স্থির করিতে না-পারিয়া, তাহাকে 'প্যান্থর'-শ্রেণিভুক্ত করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, বার্দ্ধক্য-বশতঃ, তাহার এইরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল; কিন্তু বার্দ্ধক্যে ব্যাঘ্রের বর্ণ-পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা সচরাচর, দেখা যায় না।

মুক্তগাছার রাজবংশে শিকারপ্রিয়তা বহুকাল হইতেই বর্ত্তমান; ইহা, কতকটা যেন, আমাদের বংশগত সখ। যদিও স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য-বাহাদুর ও কেশবচন্দ্র আচার্য্যচৌধুরী মহাশয়দ্বয় সর্ব্বপ্রথমে 'শিকারী' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; তবে, তাঁহাদের পূর্ব্বেও, আমাদের বংশে শিকারীর অভাব ছিল না। স্বর্গীয় গৌরকিশোর আচার্য্য, রামচন্দ্র আচার্য্য, গোলোককিশোর আচার্য্য, রামকিশোর আচার্য্য, দুর্গাদাস আচার্য্য ও অমৃতনারায়ণ আচার্য্য-প্রভৃতি অনেকেই প্রতিষ্ঠাপন্ন শিকারী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৺গৌরকিশোরই প্রথম; মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক আহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র এই পন্থার অনুসরণ করেন। অনন্তর গৌরকিশোরের পুত্র ভবানীকিশোর শিকারে যোগদান করিয়াছিলেন। ভবানী-কিশোরের মৃত্যুর পর গোলোককিশোর ও গৌরকিশোরের দত্তক-পুত্র রামকিশোর এইবংশে শিকারের সখ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিকারী-জীবনের শেষভাগে, কেশবচন্দ্র এবং দুর্গাদাসও শিকারীর দলে যোগদান করেন। কিন্তু দুর্গাদাস আচার্য্যমহাশয় কিছুদিন শিকারের পর, এই সখ ত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন, অমৃতনারায়ণ কেশবচন্দ্রের সহিত শিকারে যোগদান করিলেন। মহারাজ সূর্য্যকান্তও প্রথমে ইঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া শিকারে প্রবৃত্ত হন; তিনি বোধ হয়, ১২৭৭ সালে প্রথম শিকার আরম্ভ করেন; তৎপরে ১২৮৮ সালে রামকিশোরের পুত্র মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্যমহাশয় ইঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন; অনন্তর ১২৯০ কি ১২৯১ সালে বরদাকিশোর, সারদাকিশোর ও মহেশকিশোর ইঁহাদের শিকারের দলে প্রবেশ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর একত্র মিলিয়া শিকার করিবার পর, কোন কারণবশতঃ ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত হন; এবং মহারাজ একপার্টিতে ও ইঁহারা স্বতন্ত্র একদলে শিকার করিতে থাকেন। আমরা শিকার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, সারদাকিশোর শিকারের সখ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শিকারীরা এই দুইদলে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বেই, কেশবচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন; অমৃতনারায়ণ দুই-চারি বৎসর এইদলে শিকার করিবার পর, পরলোক গমন করিলে, ১২৯৮ সাল হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এইদলে যোগদান করিয়া, শিকার আরম্ভ করেন। আমি ১৩০৭ সাল হইতে শিকারে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বরদাকিশোর দুই একবার আমাদের সঙ্গে ছিলেন;

তাহার পর, তিনিও শিকারের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ, ১৩১০ সালে, এইদলে যোগদান করেন। স্বর্গীয় মহেশকিশোর, মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত, এইদলেই ছিলেন। এখন, আচার্য্যচৌধুরী বংশের মধ্যে, আমরা তিনজন মাত্র এইদলে আছি; কিন্তু, আশা করি, ভবিষ্যতে আমাদের দল বৃদ্ধি হইবে। রাজা শশীকান্ত একবার, তাঁহার পিতার সহিত, এবং আরও দুই একবার, শিকারে গিয়াছেন; তাঁহারও শিকারের সখ আছে।

আমাদের তিনজন—আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব, আমি ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারাণ (ডাক নাম মদনবাবু), এতদ্ভিন্ন, মদীয় পিতৃবন্ধু, চব্বিশপরগণা গোবরডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়মহাশয়, প্রত্যেক বারেই, আমাদের সঙ্গে, শিকারে যোগদান করেন—বাঙ্গালী শিকারীগণের মধ্যে, প্রসিদ্ধ শিকারী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। গত ১২৯৩ কি ১২৯৪ সাল হইতে, প্রতিবৎসরই তিনি এইদলে মিশিয়া শিকার করিয়া আসিতেছেন।

ব্রিটন-বন্দনা

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

শৌর্য্য কাদের বীর্য্য কাদের, কোন্ সে জাতির অহঙ্কার,
টলায়ে পৃথ্বী কাঁপায়ে শূন্য বলিছে গর্ব্বে বারম্বার—
জাগ্‌রে জোয়ান, হ'রে আগুয়ান মানব শত্রু নিধন কর্;
ধর্ম্মের ধ্বজা নির্ভয়ে ওড়ে, কঠোর হস্তে কৃপাণ ধর!

জয় সে জাতির রাণী নৃপতির গাও আজি জয় গর্ব্বে মাতি'!
সর্ব্ব জগতে দর্পহারী সে ভারতবন্ধু ব্রিটিশজাতি!!

বক্ষ ফুলায়ে নির্ভয়ে কারা দেশের জন্য শোণিত ঢালে!
কর্ম্ম কাদের জীবন ধর্ম্ম, হাসিয়া মরে গো মৃত্যুকালে!
কাহারা জাতির সম্মান রাখি' ছুটিছে গগন-ভুবনময়!
ন্যায়ের বর্ম্মে আচ্ছাদি' দেহ যুদ্ধে কাহারা অকুতোভয়!
জয় সে জাতির রাণী নৃপতির—ইত্যাদি।

সাগরের বুক চিরিয়া কাদের বাণিজ্যপোত বিশ্বে ঘোরে!
তত্ত্বের লাগি দিবসরাত্রি কাহারা রভসে নভসে ওড়ে!
পাহাড় উপাড়ি' মৃত্তিকা খুঁড়ি' রহস্য কারা খুঁজিতে জানে!
সর্ব্ব জাতির শক্তি কাদের সেবিয়া নিজেরে ধন্য মানে!
জয় সে জাতির রাণী নৃপতির—ইত্যাদি।

অস্ত যায় না চন্দ্র সূর্য্য প্রতাপে কাদের রাজ্যমাঝে!
ব্যোমে কাহাদের বিজয় বার্ত্তা পবন-কণ্ঠে কেবলি বাজে!
সবারে কাহারা আলোক প্রদানি' জাগায়ে তুলিছে কর্ম্মবলে!
হোক্ তাহাদের জয় জয়কার, ধন্য তাহারা জগতীতলে!
জয় সে জাতির রাণী নৃপতির—ইত্যাদি।

শান্তি অটুট রাখিতে সেদিন সাদরে কাহারা মাগিল রণ!
বেল্‌জিয়ামকে বাঁচাতে কাহারা সর্ব্ব করিল সমর্পণ!
পৃথ্বী-অরাতি জর্ম্মান্‌জাতি দাপটে কাদের নোয়ায় শির!
স্কন্ধে তাদের স্কন্ধ লাগাও, বিশ্বে তাহারা বীর্য্যবীর!
জয় সে জাতির রাণী নৃপতির—ইত্যাদি।

য়ুরোপে তিনমাস

মাননীয় শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্. এ., এল্. এল্ ডি, সি. আই. ই. ।

বুধবার—২১এ আগষ্ট, ১৯১২।—সকলের সহিত দেখা-শুনা ও কথাবার্ত্তায় সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। ক্রমওয়েল রোডের বাটীতে কয়দিন থাকিয়া, ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বাড়িয়াছে। তাহারা নানাকষ্টে থাকে; অভাব অভিযোগেরও অন্ত নাই। বুঝাইয়া-সুঝাইয়া, অনেক মুস্কিলের আসানের উদ্যোগ হইয়াছে। কয়দিন, আমার সাহচর্য্যে তাহাদের প্রবাস বাস যেন কতকটা লাঘব হইয়াছিল। আমার প্রতিগমন উদ্যোগে ছাত্রদল ও কর্ত্তৃপক্ষগণ উভয়েই বড় নিরানন্দ। ইহা তাহাদের স্নেহ প্রাবল্যের কথা, আমার পক্ষেও ইহা বিশিষ্ট শ্লাঘা ও গৌরবের কথা; কারণ ইঁহাদের মন আকর্ষণ করা, অল্পদিনে ইঁহাদের

কেথিড্র্যাল্-মিলান্
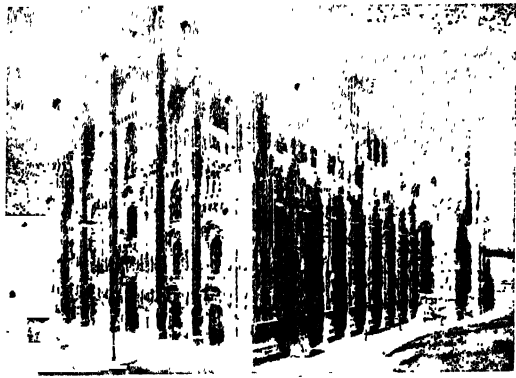
স্নেহের পসরা উপার্জ্জন করা পরম সৌভাগ্য মনে করি। আমারও তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিতে যথেষ্ট কষ্টবোধ হইতেছে।

মিঃ আর্ণল্ড, মিঃ ক্যাম্পিয়ন্, মিস্ বেক্, মিসেস্ উইলিয়মস্ প্রভৃতি বন্ধুগণ বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকলেই বারংবার পূর্ণ-সহৃদয়তার সহিত পুনরাগমনের কামনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অল্প!

বৈকালে 'মর্য্যাল-এডুকেশন লিগ'এর পক্ষ হইতে, মিঃ ফক্স পিট্ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সম্প্রদায় আমার হেগ (La' Hague) গমনের জন্য বিশেষ যত্ন, উদ্যোগ ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন; সেই বন্দোবস্তের কথা সবিশেষ জানাইবার জন্যই তাঁহার আগমন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সময় নষ্ট হইতেছে মনে করিয়া, ছেলেদের বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল—তাহারা এভাব চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। কথারভাবে ফক্স পিট সাহেবকে স্পষ্ট জানাইতেছিল, তাঁহার দীর্ঘকাল আমাকে আটকাইয়া রাখা ছেলেদের ভাল লাগিতে ছিল না। কাযেই আমিও তাঁর সঙ্গে অধিকক্ষণ ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না; কারণ ছেলেদের স্নেহাচ্ছন্ন মোহভাবের ছায়া আমায় মন আবরণে আবৃত করিয়াছিল। নিতান্ত কাজের কথা কহিয়া, তাঁহাকে অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় দিলাম।

শীঘ্র আহারাদি সারিয়া আমি ও নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ষ্টেসনে আসিবার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু, দেখি যে বাড়ীর সকলকেই বলিয়া দিয়াছে যে, তাহারাও একত্রে আহার করিয়া ষ্টেসনে যাইবে। আমিত একেই কোথাও যাইবার সময় কিছুই আহার করিতে পারি না, তাহার উপর এতগুলি প্রবাসী, চিন্তাক্লিষ্ট নানাবিঘ্নসমাবিষ্ট, স্বদেশবাসী যুবকের দুঃখভারপ্রপীড়িত মুখশ্রী আহার সময়ের স্বাভাবিক আনন্দ-কল্লোলের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে দেখিয়া আরও কাতর হইলাম। আহার মোটেই হইল না। তাহাদেরও কাহারও ভাল করিয়া আহার হইল না; সকলেই তাহা লক্ষ্য করিল এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। বাস্তবিক এতদিনের পর দেশাভিমুখে ফিরিবার সময় যে আনন্দ, উৎসাহ হওয়া স্বাভাবিক, তাহা মনে স্থান পাইল না—স্থান পাইলেও সেই সকল প্রবাসীর সম্মুখে তাহার পূর্ণ-প্রকাশ যেন আমার একটা বিশেষ অন্যায়কার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহা জন্মিবার ও প্রকাশ পাইবার বিশেষ অবকাশও হইল না; কারণ তাড়িতপ্রবাহপূর্ণ বায়ুস্তরের ন্যায় সকলের মনের অবস্থাও একভাবে প্রণো-

দিত। দেবতাও আজ বিরূপ—ঠাণ্ডা, বৃষ্টি, মেঘ, অন্ধকার সকলের চিত্তের অবসাদকে আরও যেন ঘনীভূত করিয়া দিল। নীরবে মোটর-ট্যাক্সির সাহায্যে সুদূর লিভারপুল ষ্টেসনে আসিলাম। সঙ্গিগণও কেহ মোটরে, কেহ বাসে সঙ্গে আসিলেন।

ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাক্তার গুরুসদয় মিত্র, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, অনুকূল চন্দ্র সিংহ, বিমলচন্দ্র দে, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে ষ্টেসনে আসিলেন। বিদায়কালে এত লোকের জনতা দেখিয়া ষ্টেসনের লোকেরা পাগড়ীধারী পুরুষকে রাজারাজ'ড়া মনে করিয়া লোক সরাইয়া, গাড়ী ছাড়া পর্য্যন্ত আবাসের জন্য সম্মানসূচক স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দিল। ফাষ্টক্লাস গাড়ী একলার জন্য রিজার্ভ করিয়া টিকিট আনাইয়া দিল, এবং সেলাম করা ও টুপি-খোলার ধুমে সমবেত বন্ধুগণের নিকট হইতে বিস্তর বক্‌সীস আদায়ও করিল। দ্বিজেন মৈত্র বেচারা ত কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। আমার আজ-যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা নানামতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ঘটিল না।—কোনও প্রকারে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ফক্স পিট-সাহেব যথাসময়ে আসিয়া জুটিলেন। জনসন, গিল্ড, স্পিণ্টর প্রভৃতি অন্যান্য ডেলিগেটও সেই ট্রেণে চলিয়াছেন। এত ভারতবাসীর জনতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন।

লণ্ডন হইতে সমুদ্রকূলে পৌঁছছিতে, গাড়ীতে মোট দুইঘণ্টা সময় লাগে; সমুদ্রধারে হারউইচে (Harwich) আসিয়া জাহাজে উঠিতে হয়। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নূতন ভ্রমণে ব্রতী হইলাম। ছাত্র-বন্ধুগণকে ছাড়িয়া আসা-জনিত মনের অবসাদ কিছুতেই গেল না। সেই জন্য, অন্যান্য ডেলিগেটদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ যোগ দিতে পারিলাম না; কতকটা নিজের চিন্তাতেই মগ্ন রহিলাম।—আসিবার সময়, ক্যালে হইতে ডোভার ইংলিশ-চ্যানেল পার হইতে দিনের বেলায় এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে নাই। কিন্তু হেগে যাইবার সময় হারউইচ হইতে 'হুক অফ্ হল্যাণ্ড'—এইটুকু সমুদ্র পার হইতে জাহাজে সমস্ত রাত্রি কাটিল। জাহাজে উঠিবার সময়েও বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বেশ ছিল; কিন্তু ক্যাবিনে বিশেষ কষ্ট বা নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

বৃহস্পতিবার, ২২এ আগষ্ট।—প্রভাতে ৪॥০ টায় নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলাম যে, সমুদ্রের পরপারে পৌঁছিয়া নদীতে

লুসার্ণ সাধারণ দৃশ্য

৪০ মাইল উজান বহিয়া, হুক অফ্ হল্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সকালেও বৃষ্টির বিরাম নাই। এত বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা যেন সঙ্গের সাথী। যাহাহউক, কোন রকমে জাহাজ হইতে নামিয়া রেলে উঠিলাম।

এস্থান হল্যাণ্ডের রাজ্ঞী উইলহেলামিনার রাজ্য অন্তর্ভুক্ত, হেগ তাঁহার অন্যতম রাজধানী। আমার প্যারিসে থাকার সময় রাণী উইলহেল্‌মিনা প্যারিসে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয়, প্যারিসবাসীরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল—তাঁহার সম্মান রাত্রে প্যারিস আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। এখানে—আচার, ব্যবহার, ভাষা, আইন—সবই স্বতন্ত্র। ইংরাজের রাজত্ব ছাড়িয়া, এইবার যথার্থ "বিদেশে" আসিলাম।

য়ুরোপের অধিকাংশ সহরের—বাড়ী ঘর দ্বার রাস্তা-ঘাট—সবই প্রায় একরকমের দেখিতেছি; কোন্ দেশে বা কোন্ নগরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হঠাৎ বলা আগন্তুকের পক্ষে বড় সহজ নহে। কিন্তু অন্যান্যস্থান-অপেক্ষা হলণ্ডের কিছু পারিপাট্য ও তারতম্য আছে। অন্যান্যদেশ-অপেক্ষা এদেশ সাধারণতঃ, পরিষ্কার ও বাড়ী-ঘর-দ্বারেরও একটী বিশিষ্ট সৌষ্ঠব আছে। "সভ্য" শ্রেণী

ভুক্ত উচ্চগণের পোষাকপরিচ্ছদ বা ধরণধারণ সাধারণ ভদ্র ইংরাজেরই ন্যায়; কিন্তু "ছোট"লোক—"চাষাদের" পোষাক সেকালের ডচ্‌দিগের মত। আমিও তাহাদের নূতনধরণের পোষাক দেখিয়া বিস্মিত এবং তাহারাও আমার পাগড়ী দেখিয়া চাহিয়া থাকে। দেখিতেছি য়ুরোপে পাগড়ীর জয় সর্ব্বত্র। অনেকে পাগড়ী দেখিয়া অকারণ সেলাম করে।

'হোটেল ডি ভিউ ডিলেন' নামক হোটেলে আসিয়া উঠিলাম। প্রত্যহ ১০।১২ টাকায় কষ্টেসৃষ্টে এসব

লুসার্ণের নিকটস্থ চিরনীহার-রাজ্য গ্রস্‌-রুগা টন্

হোটেলে চলে! এখানে পরিচারকেরা সকলেই ইংরাজী কথা বোঝে, এই সুবিধা। ঘর-দুয়ার বেশ পরিষ্কার; স্নানাদির সুবিধাও আছে। আমাকে যে সকল স্থানে যাইতে হইবে, সেগুলিও এই হোটেলের খুব নিকট। লিডস্‌-এর ভাইস-চ্যান্‌সেলার স্যাডল্যার, আমেরিকার ১২জন ডেলিগেট, ইঁহারাও এই স্থানে আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের ও অন্যান্য ডেলিগেটদিগের সহিত দেখাশুনা কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে।

বিশ্রামান্তে কংগ্রেস-আপিসে দেখাশুনা করিয়া আসিলাম; সহরও কতককতক দেখা হইল—রাজ-বাড়ী, রাজ-অশ্বশালা, আদালত, বাজার, দোকান ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানগুলি অন্যান্য স্থানের মত। সাধারণ বাড়ী-গুলি বিশেষ জাঁকজমকের না হইলেও সৌষ্ঠবযুক্ত; একটু কেমন যেন বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হইল। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার। রাস্তার ধারে ও মাঝে গাছের সারি-গুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। ট্রাম, মোটর, ব্যস্‌ ইত্যাদির অন্যত্র যেমন ছড়াছড়ি, এখানেও তাহাই। ইংলণ্ডের রাজদূত (Ambassador)এর উপর পত্র ছিল; তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম—কিন্তু তিনি বিলাত গিয়াছেন; কাযেই দেখা হইল না!

তথা হইতে, আর্ট গ্যালারিতে, ছবি দেখিতে গেলাম। একসময়ে ডচেরা চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। রেমব্রাণ্ড, ভ্যানডাইক, পটার-প্রভৃতি প্রসিদ্ধশিল্পিগণ সকলেই ডচ্‌। রেমব্রাণ্ড ও পটারের আসল কয়েকখানা ভাল ভাল ছবি রহিয়াছে। প্রাণীচিত্র-পারদর্শিতায় পটার অদ্বিতীয়—তাহার অঙ্কিত একটি বৃষের চিত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়—জীবন্ত বলীবর্দ্দ যেন সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আজ রাত্রে রাজপক্ষ হইতে ডেলিগেটদিগকে সান্ধ্য-সম্মিলনে আহ্বান করা হইবে। য়ুরোপের কোন ব্যাপারই এই সমস্ত পার্টি, খানা প্রভৃতি না হইলে যেন সম্পূর্ণ হয় না। অদ্যকার সান্ধ্যসমিতি হেগ সহর হইতে কিছুদূরে সেভনিং (Shavening) নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপনগরে অনুষ্ঠিত হইবে। হেগের কার্য্য সারিয়াই দেশভ্রমণে বাহির হইয়া কলোন্‌, হাইডনবার্গ, রাসল্‌, বন্‌ লুসার্ণ হইয়া, সেণ্টগথার্ড-টনেলের মধ্য দিয়া অ্যাল্‌পস্‌ পাহাড় পার হইবার ইচ্ছা আছে। তাহার পর মিলান, ভেনিস্‌, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপ্লস্‌ ও ইটালীর নগরগুলি দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। সুবিধা হয় ত, ভিসুভিয়স্‌ আগ্নেয়গিরিও দেখিয়া যাইব। ৩রা সেপ্টেম্বর রোমে স্যর রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা। এই স্থানগুলি সমস্তই যদি দেখা হইয়া না উঠে তাহা হইলে অগত্যা কতক কতক বাদ দিতেই হইবে। কিন্তু এত কষ্ট করিয়া আসিয়া কোন দ্রষ্টব্যস্থান বাদ দিতেও ইচ্ছা করে না। তিন মাস বিলাতবাসে যে স্বাস্থ্যলাভ হইয়াছে, এই ১৫ দিনের কষ্টে ও পরিশ্রমে তাহা নষ্ট হইবে—এই ভাবনা কিছু অধিক হইতেছে!

এদিকে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তিনদিনের স্থলে ছয় দিন থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। আমার তাহাতে আদৌ ইচ্ছা নাই। কারণ বড় বড় নগরে দুই এক দিনের অধিক থাকিতে পারিব না, আর এখানে পাঁচ

এচ্. এচ্. রাজ রাণা স্যর্ ভবানী সিং বাহাদুর, কে সি এস্. আই :— ঝালোবের মহারাজা

ছয়দিন অনর্থক কাটান হইতেই পারে না! তবে, কার্য্যক্ষেত্রে, কি হইবে, বলিতে পারি না। এখানে যদি বেশী বিলম্ব হইয়া যায়, অগত্যা অন্যান্যসহর দেখা হইবে না।

রাত্রে, আমেরিকান "President" ও ফক্স পীট-প্রভৃতির সহিত আমি সমুদ্রধারে সেভ্‌নিং-উপনগরে, 'ক্রান্স্ হাউস্'-নামক হোটেলে, সান্ধ্য সমিতিতে গেলাম। কংগ্রেসের সভাপতি ও মিউনিসিপালিটির মেয়র-প্রভৃতি সকলে, বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সহিত, অভ্যর্থনা করিলেন। প্রকাণ্ড হল, সুন্দর বন্দোবস্ত, লোক-সমাগমও অত্যধিক।

এত বিভিন্নজাতীয় য়ুরোপীয় নরনারীর একত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই! জর্ম্মণ, ডচ, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজ, রুসিয়ান, হঙ্গেরিয়ান, সুইস প্রভৃতি সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির প্রতিনিধি এবং দুইচারিজন ইজিপ্‌সিয়ানও উপস্থিত ছিল। ভারতবাসীর মধ্যে আমি একেশ্বর। পাগড়ীর মর্য্যাদা, যতদূর সম্ভব, রক্ষিত হইল। অপরিচিত কতলোকই যে, উপযাচক হইয়া, আলাপ-আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে বিন্দুমাত্র আলাপ পরিচয় না থাকিলেও, বা কেহ আলাপ না করাইয়া দিলেও, ইঁহারা অকুতোভয়ে অকপটচিত্তে আলাপ করিলেন। ইংরাজদের সহিত ইঁহাদের ইহাই বিশেষ প্রভেদ দেখিলাম। আধআধ ভাঙ্গভাঙ্গা ইংরাজী যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা অধিক হইল। অপর সকলের সঙ্গে আমার কষ্টেসৃষ্টে আদায়করা, ভাঙ্গা-ফ্রেঞ্চ দুইচারি বুলিতেই ভদ্রতা শেষ করিতে হইল। কার্ণেজীর সেক্রেটরী মিঃ ফক্সনরের সহিত আলাপ হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে ইঁহাদের দ্বারা কিছু উপকৃত হয়, তাহার চেষ্টা করিলাম।—এখানে কিছু হইবার সম্ভাবনা কম। পানভোজন, বক্তৃতাদি রীতিমতই হইল। ক্লান্ত-দেহে রাত্রি ১১টার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

শুক্রবার, ২৩এ আগষ্ট।—আজ কংগ্রেসের অধিবেশন। একটু সকালেই বাহির হইলাম। নূতন-নূতন রাস্তা-ঘাট দেখিতে দেখিতে যাওয়া গেল। সহরে গাছপালা বিস্তর। সমুদ্রের উৎপাত হইতে হলণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য বহুসংখ্যক বাঁধ ও খাল সহরের মধ্যে রহিয়াছে। গ্রীষ্ম-কালে এই স্থান নাকি অতি মনোরম; কিন্তু বর্ষায় যেন প্রাণান্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

স্থানীয় 'জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে'র ভিতর প্রকাণ্ড এক বাটিতে কংগ্রেসের সমাবেশ। স্থানমাহাত্ম্যটা কিছু বিচিত্র মনে হইল। জুয়োলজিকাল গার্ডেনএ পণ্ডিত সভার

মেটরহর্ণ—শৈলশৃঙ্গ
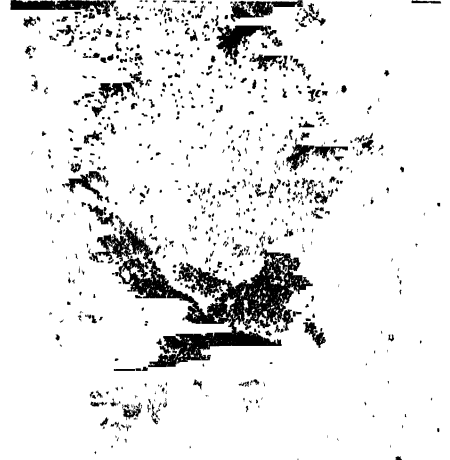
অধিবেশন কেন? সভাপতি ভ্যাণ স্মাণ্ডিক ও অন্যান্য অধ্যক্ষেরা বিশেষ যত্ন করিয়া প্লাটফর্ম্মের উপর নিজেদের নিকটে আসন দিলেন। প্রায় ১৫০০শত মেম্বর পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে আসিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীর নানা জাতীয় প্রতিনিধির অতি বিচিত্র ও বিরাট সমাগম। ফ্রেঞ্চ, ডচ, জর্ম্মণ, ইংরাজী—সকল ভাষাতেই বক্তৃতা হইতে লাগিল। ইংরাজী ছাড়া আর কিছুই ত শর্ম্মার বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কাজেই "জয়মিত্রের" মত, অপরের সাহায্যে অধিকাংশ বক্তৃতার সারসংগ্রহ করিতে হইল। অবশেষে, আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্য তলব করা হইল। অন্যান্য কংগ্রেসের মত এখানেও চারি মিনিটের অধিক কেহ বলিতে পারিবে না, এইরূপ নিয়ম ছিল। কারণ, সভাস্থলে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধবক্তা উপস্থিত। চারি মিনিটে, যথাসম্ভব নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সভার চারিদিক্ হইতে "আরও বল", "আরও বল", "আরও বল",

বলিবার জন্য তারস্বরে অনুরোধ হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী বক্তাগণ, সভাপতিকে "লিখিত দরখাস্ত" পেশ করিলেন যে, তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত চারি মিনিট, আমাকে দেওয়া হউক। সভাপতিও সে দরখাস্ত দয়াপূর্ব্বক মঞ্জুর করিয়া আমাকে আরও বলিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবল বন্যার ন্যায় নেশার ঝোঁকে বক্তৃতার স্রোত ছুটিল। বক্তৃতা ও বক্তৃতার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব তাহার আলোচনা করিয়া আর বর্ত্তমান প্রস্তাবের কলেবর বাড়াইব না। বক্তৃতা শেষে যে জয়ধ্বনি ও করতালি হইল, তাহা ভুলিবার নহে। বক্তৃতা শেষ হইবার পর জয়ধ্বনি ও করতালি শেষ হইতেও প্রায় দুই মিনিট লাগিল। ইহা

জংফ্রু—শৈলশৃঙ্গ

অদৃষ্টদর্শন জীবের মুখে ইংরাজী নূতন শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ মাত্র। আমার নিজপ্রাপ্য ইহাতে নিতান্ত কম। পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়াও, আনন্দধ্বনি নিবারণ করিতে পারিলাম না—অতিশয় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। প্লাটফর্ম্মের সকল লোকেই আগ্রহের সহিত "সেকহ্যাণ্ড" ও "কন্‌গ্র্যাচুলেট" করিতে লাগিলেন;—"Perfect speech" "beautiful speech" "well done" "bravo"—এই সকল শব্দে অভ্যর্থনা হইতে লাগিল। জীবনে গর্ব্বিত হইবার অবকাশ বড় অধিক হয় নাই। সমবেত য়ুরোপ ও আমেরিকার বিদ্বৎ-প্রতিনিধিগণের নিকট এত আদর, সম্মান ও অভ্যর্থনা পাইয়া যে গর্ব্বসঞ্চার হইল, ভগবান্ তাহার জন্য মার্জ্জনা করিবেন। আর কখনও এ গৌরব এ সম্মান পাইবার অধিকার হইবে কি না সন্দেহ। সভাভঙ্গ হইলে আলাপ করার নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া গেল! জলযোগের জন্য কত পুরুষ ও মহিলাই যে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। কোনও রকমে পরিত্রাণ পাইলাম।

বৈকালে পুনরায় কংগ্রেসের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতেছি, এমন সময় দ্বিতীয়সভার সভাপতি কেলিক্স এড্‌লার পুনরায় বক্তৃতা করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিলেন সভাপতির আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না; অগত্যা কিছু বলিতে হইল। আবার সেইরূপ জয়ধ্বনি ও করতালির পুনরভিনয়! বক্তৃতা করিবার জন্য সভায় বহুতর উমেদার উপস্থিত। তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে দ্বিতীয়বার তলব করাতে আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। বিলাতেও যে কালা বাঙ্গালীর ভাঙ্গাভাঙ্গা উচ্চারিত "মাথামুণ্ড" "আবল-তাবল" বুলি শুনিয়া আমাদের উড়িয়া বেহারার বাঙ্গালা বলার প্রশংসার মত প্রশংসা করিত; এখানেও তাহারই অধিকমাত্রায় পুনরভিনয় মাত্র।

দ্বিতীয় বক্তৃতার পর বন্ধুর সংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পরও তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হইল। "শরীর খারাপ" "অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে" ইত্যাদি কথায় ফক্সপিট কোনক্রমে আমাকে উদ্ধার করিয়া হোটেলে আনিলেন। আহারের জন্য পুনরায় কত জায়গায় যে নিমন্ত্রণ হইল—তাহার ঠিক নাই। কিন্তু বাধ্য হইয়া সে সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া হোটেলে পলাইয়া আসিলাম।

২৪এ আগষ্ট, শনিবার।—আজই রটার্ডামে যাইব মনে করিয়া, একেবারে জিনিষপত্র গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া কংগ্রেসে গেলাম। ক্রমাগত বৃষ্টিতে আর ভাল লাগিতেছে না; শরীর ও মন অবসন্ন হইবার উপক্রম। কংগ্রেসে যাইবা-মাত্র তিনটি নিতান্ত পীড়াপীড়ির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেই হইল; তাহা কোনমতেই এড়াইতে পারা গেল না। অগত্যা আজ রটার্ডামে যাইবার কল্পনাত্যাগ করিতে

হইল। কংগ্রেসের কার্য্য-উপলক্ষ করিয়া, দুইদল গোঁড়া খৃষ্টানে অত্যন্ত কলহ বিবাদ হইতে লাগিল; পরস্পরের প্রতি উভয়পক্ষই কটুভাষা প্রয়োগ করিল, প্রায় হাতাহাতি হইবার উপক্রম!—পুলিস ডাকিবার প্রয়োজন হইল। সভাপতি মহাশয় বারংবার শান্তিরক্ষার সঙ্কেত ঘণ্টা দিয়াও গোলমাল থামাইতে পারিলেন না। কেন যে জুয়োলজিক্যালে এমন সভার সমাবেশ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা যেন এখন কতকটা বুঝিতে পারা গেল। কয়েকজন এমনই ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, জুয়োলজিকালি গার্ডেনই তাঁহাদের যথার্থ স্থান বলিয়া মনে হইল। সভাপতির বিশেষ অনুরোধক্রমে প্রস্তাবের মীমাংসা করিবার ভার আমার উপর পড়িল। তিনি বলিলেন, "বিদেশীর কথায় এসব আহম্মকদিগের যদি চক্ষু লজ্জা আসিয়া পড়ে; অতএব আপনি এ গোলযোগ থামাইবার চেষ্টা করুন!" এরূপ কংগ্রেসে, এত সুযোগ্য বক্তা থাকিতেও বিভিন্নজাতীয় বিধর্ম্মগুলির সম্বন্ধে, আমার মত লোকের তিনবার বক্তৃতা করিবার সুযোগ সহজ গৌরবের কথা নহে! নবম দিবসে দিবারা বক্তৃতার কাদা পাত্রায়, বিষম গোলযোগ ভগবানের কৃপায়, আমার উপলক্ষ করিয়া আপাততঃ থামিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে "নীতি শিক্ষার সারগর্ভপ্রণালী জানিবার জন্য সমবেত য়ুরোপীয় ও আমেরিকান বিধর্ম্মগুলির নিকটে, আমি বহুদূর হইতে আসিয়াছি। একধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নসম্প্রদায়ের লোকের মতভেদ লইয়া, এই হাতাহাতি মারামারির সংবাদ যদি আমার দেশে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ও আমাদের উভয়ের দুঃখ ও লজ্জার কথা! যে দেশে আমি এই শিক্ষার আশায় আসিয়াছি, সেখানকার প্রচলিত ধর্ম্ম ও শাখা ধর্ম্মের তালিকা ছাপার অক্ষরে অনেকপৃষ্ঠা পূর্ণ করে, অথচ নিজ-নিজ বিদ্বেষভাব ভুলিয়া, তাহারা একরাজার ছত্রতলে নিজ নিজ ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, জানিয়াও তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।" একথায় শ্বেত-সভ্যগণের লজ্জাবোধ হইল; এবং সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল। পুনরায় বক্তৃতার তলবের ভয়ে বৈকালে আর কংগ্রেসে গেলাম না। অসংখ্য নিমন্ত্রণের মধ্যে একস্থানে জলযোগ করিয়া দ্বিতীয়স্থলে চা-পান এবং তৃতীয়তে রাত্রিভোজন করিতে গেলাম! সর্ব্বত্রই বিশিষ্টলোকের সহিত দেখা, আলাপ, আত্মীয়তা এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিমন্ত্রণের পীড়াপীড়ি হইল। সমাদরের আর অন্ত নাই;—এখন কেবল 'মরণং গোমতীতীরে' বাকি। ক্লান্ত-দেহকে একটু সুস্থ করিবার জন্য সেভিং সহরের সমুদ্রের পার্শ্বে বেড়াইতে গেলাম। সুন্দর সহরটি।—সমুদ্রের ধারে বড় বড় বাড়ী, হোটেল, পাহার, স্নানাগার ইত্যাদি। গ্রীষ্মকালে ইহা অতি মনোরম স্থান। কিন্তু অবিরত বৃষ্টির জন্য এখন অতি শ্রীহীনভাব ধারণ করিয়াছে।

পৃথিবীর শান্তি-সংস্থাপন জন্য যে, 'পিস্ কংগ্রেসের' অবতারণা হইয়াছে, তাহার জন্য প্রসিদ্ধ ধনকুবের কার্ণেজী যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, তাহা দেখিলাম। সুন্দর বাড়ী-বাগান দেখিয়া, আনন্দ করিতে-করিতে, মনে হইল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে এ শান্তি-সভার অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে, কে জানে! একজন ইংরাজ আমার কথা শুনিয়া, বলিল যে, 'যুদ্ধের সময় ইহা হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।' এক জর্ম্মণ বলিল, 'তাহা না হইয়া, পাগলা গারদরূপে ব্যবহার হইলেই ভাল হইবে।' জর্ম্মণদিগের "শান্তি বিচারালয়" সম্বন্ধে মনের ভাব—এই ছোট কথায় বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। নগরের মধ্যস্থানে অবস্থিত উপবনটি অতি চমৎকার, এবং উপনগরের সমস্ত বাড়ীগুলিই সুন্দর। বাস্তবিক এখানে বেশ একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য চারিদিকেই লক্ষিত হয়। বৃষ্টি না হইলে বড়ই আনন্দ হইত। অতি কষ্টে ও অসুবিধায়, জলবৃষ্টি মাথায় করিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই সুন্দর সহরের কতক-কতক অংশ দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

২৫এ, রবিবার।—রবিবার খৃষ্টান-সহরে কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকে। আমোদ-আহ্লাদ ত কই বন্ধ দেখি না! রবিবারের অজুহাতে কংগ্রেসের কাজ আজ হইল না; তাহার পরিবর্ত্তে পার্টির ধুম! অভ্যাগতগণের সম্বর্দ্ধনার জন্য এই সকল আমোদ-প্রমোদের আয়োজন। হেগ হইতে রেলে করিয়া লাইডেন নগরে যাওয়া গেল। লাইডেন—বহুপ্রাচীন, বিখ্যাত সহর! এখানকার ইউনিভার্সিটিও বহুকালের। চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য ইংরাজেরাও—তাহাদের নিজের ইউনিভার্সিটি উত্তমরূপে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে—এখানে পড়িতে আসিতেন। সহরের রাস্তার মধ্যস্থলেই বড়-বড় খাল; বড় বড় জাহাজ-নৌকা তাহাতে অবাধে চলিতেছে।

হল্যাণ্ডের নগরগুলি, সবই প্রায়, ভিনিস নগরের মত খালে পরিপূর্ণ। "God made the sea, Man made the cannal; God made the country, Man made the town" কথা ঠিক—ইহার রূপান্তর নহে। হল্যাণ্ডের লোকের এই স্পর্দ্ধা। বিপুল পরিশ্রমে, সমুদ্রের গ্রাস হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া, সুজলা-সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। সহরের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ হইতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য, খালের উপর বহুতর পোল আছে। আমাদের জাহাজখানি নিকটে যাইবামাত্র, পোলগুলি ঘুরিয়া, সরিয়া বা উঠিয়া, পথ দিতে লাগিল—সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধির চরমনিদর্শন। দেশময় চারিদিকে wind millএর ছড়াছড়ি। প্রসিদ্ধ চিত্রকর Rembrandt, যে wind millএর চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহাও পথে দেখা গেল। শুদ্ধ এই wind-mill—রেমব্র্যাণ্ডের পুণ্য নামের সহিত যাহার স্মৃতি বিজড়িত—তাহাই দেখিতে বহু তীর্থযাত্রী লাইডেনএ প্রতিবৎসর আসিয়া থাকেন। বড় বড় দুইটি দেবখাত হ্রদও পথে পড়িল। আমোদ, বা কার্য্য উপলক্ষে কত নৌকা-ষ্টীমর, বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া, চলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তীরে প্রাচীনতন্ত্রের নরনারী, প্রাচীনতন্ত্রের অপূর্ব্ব জাতীয়-চিত্র, বিচিত্র পোষাক ও কাষ্ঠের জুতা পরিয়া, আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, অথবা কাজকর্ম্ম করিতেছে। পুরাতন ছবিতে দেখা, ডচম্যান সহরে বড় দেখিতে পাই নাই—পল্লীগ্রামে খালের ধারে বিস্তর দেখিলাম। বৈকালে লাইডেন প্রদক্ষিণ করা হইল। কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বটানিকাল গার্ডেন, পিলগ্রিম-ফাদারদিগের গির্জ্জা, ইত্যাদি সব দেখা হইল। আদিম পিলগ্রিম-ফাদার-এর জননী যে-উদ্যানে শেষকতিপয় দিবস বাসকরিয়াছিলেন, তাহাও দেখা হইল। গির্জ্জাটি অতি প্রাচীন ও সুন্দর। এমনসুন্দর আলো অধিকাংশ গির্জ্জায়ই দেখা যায় না; কিন্তু বাহ্যসৌন্দর্য্য বিশেষ কিছুই নাই।

সহরটি পুরাতন। কাজেই, রাস্তা-ঘাট-বাড়ী, সবই যেন পুরাতন-ধরণের—ধীর, গম্ভীর চাকচিক্যহীন ভাবের—আধুনিক ভাব আদৌ নাই। চারিদিক দেখিয়া, মনে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব আসিল। হোটেলে ফিরিয়া আসিয়াই, আবার কংগ্রেস সভাপতি ভ্যান্ স্যাণ্ডউইচের বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণে যাইতে হইল; মাত্র আমার ও কক্সপিটের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। গৃহিণী, আদর-অভ্যর্থনার চূড়ান্ত দেখাইলেন। আমরা, আমাদের নিমন্ত্রিতগণকে ইহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারি না। নানাকথায় অনেকরাত্রি হইল। হল্যাণ্ডের স্ত্রীলোকেরা, ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাও যেন অধিক অতিথি সৎকারপ্রিয়, বলিয়া মনে হয়।

সোমবার, ২৬এ আগষ্ট।—কংগ্রেসের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। বক্তৃতা করিবার তলবের ভয়ে, আমি ত সভাস্থলে অগ্রণী না-হইয়া এদিক ওদিক্ করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভারত বিষয়ক কথা শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। কাজেই কোন-কোন শাখা-সভায় কিছু-কিছু বলিতেই হইল। হোটেলে পঁহুছিয়া আসিয়াও নিস্তার নাই;—সেখানেও জাভা-দ্বীপের একটি যুবক উপস্থিত। ধর্ম্ম মুসলমান, নাম সংস্কৃত, কথা কহিবার ভাষাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃত। ভারতবাসী একজন হিন্দু সহরে উপস্থিত, শুনিয়া তিনি দেখা করিতে আসিলেন। প্রাচীন ভারত, বর্ত্তমান জাভা, সংস্কৃত-সাহিত্য, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেককথা হইল। যুবক লাইডেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন।

রাত্রে কমিটির তরফ হইতে প্রকাণ্ড ভোজ দেওয়া হইল। বিলাতী এতবড় 'ব্যাঙ্কোয়েটে' আমি কখনও উপস্থিত হই নাই। প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত। রাজরাজেশ্বর, লণ্ডনে ইউনিভার্সিটি-প্রতিনিধিগণকে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতে এত লোক ছিল না; কারণ তাহাতে বাছা-বাছা লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। প্রধান টেবিলেই আমার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলেই নানারূপে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে বক্তৃতা করিবারও তলব হইল। ছাইভস্ম যৎকিঞ্চিৎ বলিতেও হইল। কিন্তু তাহার স্তুতিবাদে বড়ই লজ্জাবোধ করিতে লাগিলাম। কক্সপিট বলিলেন "তোমাকে আনিয়া ইংলণ্ডের মুখ রক্ষা হইল।" আমার "বক্তৃতা-শক্তি"কে কেহ কেহ বলিলেন, "rare-gift"; কেহ বা বলিলেন,"you have varied the tone of the Congress"। কাহারও মত "snpertb" "beautiful"—"but for you, the Congress would have failed".

ইত্যাদি ; "shake-hands"-এর দৌরাত্ম্যে হাতে রীতিমত থাকিলেও প্রিয়জনকে বলিতে দোষ নাই। এবং বিদেশে, ব্যথা হইয়া গিয়াছে। আর 'কনগ্রাচুলেসন্‌স্‌' শুনিতে-শুনিতে ভারতের খাতিরের সংবাদ দেশের সকললোকের পক্ষে, কান ঝালাপালা! কথাগুলিতে আত্মম্ভরিতার ছায়া কষ্টকর নাও হইতে পারে।

পাড়ি

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

মাঝ্-আকাশে পাড়ি দিয়ে, পৌছিল চাঁদ
অস্ত-লীলাচলে ;
রক্ত-আলো পড়্‌ল এসে শিউলি-রঙা
দূর্ব্বাদলে-দলে,—
কল্‌জেতে আর ধর্‌ছে না গো
ছড়িয়ে-পড়া মনটি আজ,
আলো-হাওয়ার ভেলায় চড়ে'
ভাবের সমুদ্দুরের মাঝ
সুদূর যুগের তরঙ্গেতে, অঙ্গে আমার
জ্যোৎস্না পড়ে ঢলে।

ভুবন মম বন্ধু-ভবন, সন্ধ্যা-ঊষা
তুলিয়ে দে যায় ভেলা ;
চিত্রিত মোর দীপের ছায়ে, দুঃখ-সুখে
খেল্‌ছে কতই খেলা!—
কাম-রাবণের সোণার মৃগ
প্রাণ যে করে অশান্ত,
বন্দিনী হায় আত্মা সীতা,
ছুট্‌ছি প্রভাত-দিনান্ত,
চল্‌তে দু'পা ঝর্‌ছে রূপা, কার নূপুরে
ফুলের হেলাফেলা!

তোমার শোভার দর্‌বারে নাথ, পাড়ি দেব
মুক্তি ত্রিবেণীতে,
কেটে যাবে বর্ষা-আধার, ভাঙ্‌বে স্বপন
মত্ত-রজনীতে ;
তত্ত্ব কমল ফুট্‌বে পথে
সত্য-সাগর-তরঙ্গে,
ভুবন-ভরা তপন-তারার
কিরণ তারের সাথসঙ্গে
গান বাজিবে, মন মজিবে, জাগ্‌বে বিবেক
সর্ব্ব-ত্যাগের গীতে।

ছোট্ট আমার ভাণ্ডারে নাথ, ধর্‌বে নাকি
তোমার মহাদান?
ফেল্‌তে গেলেও, ছাড়্‌তে গেলেও, তোল্‌পাড় হ'য়ে
উঠ্‌ছে আকুল প্রাণ ;
অবুঝ পাখীর তীর মিলিবে
অন্ত হ'তে অনন্তে,
অশান্ত প্রাণ শান্ত হ'বে
স্বর্গপুরীর বসন্তে ;
ধনের লাগি' রূপের লাগি' যশের লাগি'
পিয়াস অবসান।

নীচে

[শ্রীরসিকলাল রায়]

ফ্রেড্‌রিক্‌ উইলিয়ম্‌ নীচে

আমরা কোন-কোন প্রবন্ধে নীচে(নিট্‌শে)র * নাম উল্লেখ করিয়া ইংরাজী-সাহিত্যে অপরিচিত বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট একটি দায়িত্ব অনুভব করিতেছি। নীচে (নিট্‌শে) কে?—তিনি কি কার্য্য বা চিন্তাশক্তির বলে এমন উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন যে, প্রবন্ধে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তাঁহার নামের বড়াই না করিলেই চলিল না? এই প্রশ্নের উত্তরপ্রদানের জন্য সংক্ষেপে নীচের কথা আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা, যে ভাবে, তাঁহাকে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহারই একটু আভাস দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কবি-দার্শনিক (Poet-Philosopher) বা দার্শনিক-কবি (Philosopher-poet) ফ্রেড্‌রিক উইলিয়ম নীচের (Friedrich Wilhelm Nietzsche) সমস্তগ্রন্থ ১৮ খণ্ডে ডাক্তার অস্‌কার লেভির (Dr. Oscar Levy) সম্পাদনে অনূদিত হইয়া, এডিনবরার মিঃ টি এন্‌ ফাউলিস্‌ (T. N. Foulis)-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'Thus Spake Zarathustra' (1882), 'Human, All-Too Human' (1878), 'Beyond Good and Evil' (1886), এবং 'The Will to Power' (1883—1886) প্রভৃতি পুস্তকই প্রসিদ্ধ। নীচের 'Ecce Homo'তে তিনি আত্ম-জীবনের অনেক কথা কহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, তাঁহার 'The Genealogy of Morals' (1887), 'The Joyful Wisdom' (1882), 'The Dawn of day' (1881), 'Early Greek Philosophy and other Essays' 'Thoughts Out of Season' (1873-6), 'The Twilight of Idols' (1888), 'The Anti-Christ' (1888), 'The Birth of Tragedy' (1871), 'The Case of Wagner' (1888) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকাও উল্লেখযোগ্য।

নীচের গ্রন্থাবলীর উল্লিখিত ইংরাজী অনুবাদের মূল্য সমস্তশুদ্ধ প্রায় ৪ পাউণ্ড (কাপড়ে বাঁধা উৎকৃষ্ট-সংস্করণ)। এতদ্‌ব্যতীত তাঁহার জীবনচরিত, গ্রন্থসমালোচনা, মত-বিশ্লেষণ, দর্শনবিচার-প্রভৃতি 'নিট্‌শে সাহিত্য'-বিষয়ক বহুপুস্তক ইংরাজীভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজ সংস্কারক, 'ফেবিয়ান্‌ সোশ্যালিজম' আন্দোলনের অন্যতম নেতা মিঃ বার্ণার্ড শ' (G. Bernard Shaw), একদিকে জর্ম্মণ্‌ নীচে ও অন্যদিকে নরওয়েজিয়ান্‌ ইবসেনের*

* Nitzky, Nitzschky, Nitzschke, বা Nietzsche-এর মৌলিক অর্থ, সম্ভবতঃ—বিনীত, নম্র, নীচ।

* Henrik Ibsen (১৮২৮—১৯০৬) নরওয়ের নাট্যকার, সামাজিক বিপ্লববাদী ও সকল প্রকার কৃত্রিম সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিদ্বেষী। ইনি বাস্তবিকতার অতিমাত্র পক্ষপাতী। ইবসেনের প্রধান-প্রধান গ্রন্থ Peer Gynt, The Master Builder, A Doll's House, Hedda Gabler, Ghosts-প্রভৃতি।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের মত ইংরাজ-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। নীচের রচনাভঙ্গী, বর্ণনাচাতুর্য্য ও বাক্যবিন্যাস অত্যন্ত ওজস্বিতাপূর্ণ, সতেজ, সরস, অননুকরণীয় ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া সমালোচকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নীচে জাতিতে জর্ম্মণ, তাঁহার জন্ম হইয়াছিল স্যাক্সনির অন্তর্গত লাটজেনের (Latzen) নিকটবর্ত্তী রকেন্ (Rocken) নামক স্থানে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত, কিন্তু দরিদ্র, কুলে। তাঁহার পিতা Karl Ludwig Nietzsche সেই গ্রামে পাদ্রীর কার্য্য করিতেন; তাঁহারা বংশানুক্রমেই খৃষ্টধর্ম্মের পুরোহিত ছিলেন। আর Friedrich Nietzsche পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের সাধের ধর্ম্মযজ্ঞে নাস্তিক্যের শেষ আহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন—'Nearest the Church and furthest from God'—'যে যত মন্দিরের কাছে সে ততই ভগবানের নিকট হইতে দূরে!' স্কুলের পাঠ শেষ হইলে নীচে বন (Bonn) ও লিপজিক (Leipzic) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে, ২৫ বৎসর বয়সে, তিনি ব্যাজিল্ (Basel বা—বাল (Bale) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দশ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াই তিনি কার্য্যত্যাগ করেন। মৃত্যুর ১১ বৎসর পূর্ব্বে (জানুয়ারী ১৮৮৯) নীচে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২৫এ আগষ্ট ৫৬ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। নীচে প্রথমবয়সে দার্শনিক সপেনহৌর (Schopenhauer) ও কলাবিৎ ওয়াগনার (Wagner) এর শিষ্য ছিলেন। ১৮৭৬ সনে Richard Wagner সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ওয়াগনারের অন্ধোপাসক ছিলেন। ১৮৭৮ সনে নীচের "Human, All-to-Human," প্রকাশিত হয়। দেখাযায় তখন তিনি অনেক পরিমাণে ওয়াগনারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার মত এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, ইঁহাদের উভয়ের উপরই তাঁহার সমালোচনার শাণিত শর অবাধে নির্ম্মমভাবে নিক্ষিপ্ত হইত (১)। নীচের মত আরও অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়াছে এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, কটাক্ষ, ব্যঙ্গ ও টিটকারী অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার সকল বন্ধু ও গুরুর ভাগ্যেই পতিত হইত।

নীচে যে সকল মত পোষণ করিতেন এবং যে সকল সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, জনৈক ইংরাজ সমালোচক (২) তাহা নিম্নলিখিত ভাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—

১। জগতের কোন স্থির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই; এই সৃষ্টিকৌশল অনাদি অনন্ত কালযাবৎ প্রকাশ ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

২। মানব জাতির কোন লক্ষ্য এযাবৎ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মহাপুরুষ বা অবতার (The Superman) মানব জাতির লক্ষ্য স্থির করিয়া দেন।

৩। যে সকল রাজনীতি বা সমাজনীতি উন্নততর, শক্তিশালী, অলোকসাধারণ মহাপুরুষের আবির্ভাবের পরিপন্থী তাহা সমূলে উন্মূলিত করা আবশ্যক। কেবল শক্তিশালী, প্রবল, প্রভুস্থানীয় লোকদিগের নীতিই মানব-জীবনের লক্ষ্যের অনুকূল।

৪। খৃষ্টধর্ম্ম ও তাহার দাসত্বমূলক নীতি মানবজীবনের ঘোরতর শত্রু। খৃষ্টধর্ম্ম অবাধ স্বাধীন প্রেমে বাধা দেয়। ইহা মানব সমাজের চিরকলঙ্ক—ভয়ানক দোষ।

৫। বর্ত্তমান মানবসমাজ উন্নততর, শক্তিশালী, নূতন, শ্রেষ্ঠ মানবজাতি উৎপাদন করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে লৌকিক শক্তিমান্ মহাপুরুষ বা পূর্ণ মানবের আবির্ভাব সুগম হইবে।

৬। উন্নততর মানবজাতি উৎপাদন করিতে হইলে, বর্ত্তমান বিবাহ বিধির সংস্কার, যুবকগণের সুশিক্ষা, সমগ্র ইয়োরোপে এক সাম্রাজ্য স্থাপন (A United Europe) ও খৃষ্টধর্ম্মের বিলোপ-সাধন একান্ত আবশ্যক।

নীচের মতে সমাজনীতির দুই স্বতন্ত্রধারা বর্ত্তমান, দুর্ব্বল ও দাসদিগের জন্য একপ্রকার নীতি এবং প্রবল ও প্রভুদিগের জন্য অন্যবিধ নীতি *। দুর্ব্বলেরা তাহাদেরই উপযোগী ও

(১) 'Wagner is an actor and not musician; a symptom of impoverished life, a clever rattlesnake, a typical decadent.'—The Case of Wagner.

(২) M. A. Mugge.

* "There is master morality and slave morality. * * A higher culture can only originate where there are two distinct castes of society, that of the working

কল্যাণজনক সর্ব্বপ্রকার নীতি সমর্থন করে, এবং প্রবলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও গুণ অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করে (The ignoble nature is distinguished by the fact that it keeps its advantage steadily in view etc. These birds of prey are evil etc.)। পক্ষান্তরে প্রবলেরা সাধারণ গড্ডালিকাপ্রবাহের অতীত। তাঁহারা দুর্ব্বলের সমালোচনা ও আইনকানুনের সীমার বহির্ভূত, ঊর্দ্ধে সমাসীন হইয়া, আপনাদের প্রবৃত্তিপ্রেরিত ও শক্তিপরিচালিত নীতিমার্গ অনুসরণ করেন, দুর্ব্বলের মঙ্গলজনক ও সুখসুবিধা-প্রয়োজনসাধনোপযোগী, হীন নীতি-শাস্ত্রে তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। (The sentiment of surrender, of sacrifice for one's neighbour, and "all self-renunciation morality" must be mercilessly called to account etc are they not deceptions?)।

নীচের মতে খৃষ্টধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্ম, উহা এই প্রথম শ্রেণীর অপকৃষ্টনীতিমূলক (Christianity has sided with everything weak, low, and botched; etc. it has corrupted the reason of the strongest intellects etc.)। খৃষ্টধর্ম্মকে নীচে অনার্য্য চণ্ডালের ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিয়াছেন (It is the trans-valuation of all Aryan values, the triumph of *Chandala* values, the general insurrection of all the down-trodden and wretched against the race)। কিন্তু নীচে পুরাতন, সনাতনের প্রতি ও চিরাগত প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হন নাই (Master morality has profound reverence for age and for tradition)। ভগবান্ মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার চক্ষে সম্মান ও শ্রদ্ধা হারায় নাই (But he attacks Christianity because the lies of the Bible are unlike those of the venerable Law-book of Manu—Mugge)।

প্রভুনীতি অবলম্বন করিয়াই মনুষ্যেরা অর্থাৎ অল্প-সংখ্যক, প্রবল, প্রভুস্থানীয় মানব কুলতিলকেরা—উন্নততর, অলোক-সামান্য, পূর্ণমানবত্বে (Uebermench, Superman) উন্নীত হইতে পারেন। মানবত্বের বিকাশ—মানব-জাতির উৎকর্ষসাধন—জগতে ব্রাহ্মণের আবাহন আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ইহাই নীচের 'Eugenic' নীতি। এই নীতির বশীভূত হইয়াই তিনি বিবাহবিধির ও স্বাধীন প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য, বাতুল ও স্নায়ুরোগাতুরের বিবাহে অধিকার নাই—"There are cases where to have a child would be a crime—for example, for chronic invalids and extreme neurasthenics."। কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জীবন সংগ্রাম পশুদের জীবনের মূলনীতি হইতে পারে; কিন্তু মানুষ চায় প্রভুত্ব, ক্ষমতা, আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। মানব স্বাধীনতার ও ক্ষমতার বিনিময়ে সুখ ও দাসত্ব চাহে না (Man does not seek happiness and does not avoid unhappiness.); বরং সুখের বিনিময়ে মহত্ব, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের সহিত দুঃখক্লেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কারণ—"Suffering is the source of greatness." এই প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ইচ্ছাই মানব জীবনের মূলে ক্রিয়া করিতেছে *। ইহাকে নীচে Will to Power বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তিদ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—'Man can hence-forth make of him-

class, and that of the leisured class who are capable of true leisure; * * Slavey is of the essence of culture'—Beyond Good and Evil.

রোমকদিগের jus civile ও jus gentium এবং ভগবান্ মনুর দ্বিজ ও স্ত্রীশূদ্রের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নীচের মনে একরূপ ভাব জাগাইয়া দেয় নাই ত? হিন্দু সত্ত্বরজস্তমগুণভেদে অধিকারভেদ মানেন, নীচের Race of supermen কি হিন্দুর ব্রাহ্মণ? অথবা আমাদের সেকালের আর্য্যানার্য্যের নীতিভেদ কি ইয়োরোপে আবার ফিরিয়া আসিতেছে?

* "Wherever I found a living thing, there found I the Will to Power."

"Neither necessity nor desire, but love of power, is the demon of mankind. You may give men everything possible health, food, shelter, enjoyment but they are and remain unhappy and capricious, for the demon waits and waits and must be satisfied."

Nietzsche.

self what he desires!' শ্রেষ্ঠত্বলিপ্সা ক্রমে মানবকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে—তাহাকে 'Superman'-এ, অতিমানব-দেবত্বে, 'অবতারে' উন্নীত করিবে! আমরা বলি ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ, ঋষি ও অবতারের আবির্ভাব সম্ভব; নীচের মতে ইয়োরোপেই তাঁহার অতিমানব শ্রেষ্ঠ-জাতির অভ্যুদয় হইবে। এখন মনুষ্যসমাজ পশুদিগের অপেক্ষা যে পরিমাণে উন্নত, সেই আদর্শস্থানীয়, অলৌকিক, পূর্ণ মানবেরাও বর্ত্তমান মনুষ্যজাতি হইতে সেই পরিমাণে উন্নত ও অগ্রসর হইবে। সাধারণ শূদ্র (Slave) জাতীয় মানবেরা ব্রাহ্মণকে মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ—ব্রাহ্মণের চরম পরিণতি অবতার,—ঋষিত্ব, দেবত্ব;—"Our way goes upwards from species to superspecies." নীচে বোধ হয় জানিতেন না হিন্দুর দশ অবতারের মাত্র দুইজন ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অথবা তাঁহার মনে ব্রাহ্মণ বা race of supermen এর আদর্শ আমাদের বাহ্মণ অপেক্ষা অন্যরূপ ছিল।

নীচে স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইলেও, কখনও বিলাসিতার ও পাপের অনুমোদন করেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন বিলাসিতাই জাতীয় জীবনের অধঃপতনের কারণ;—"When a nation is going to the dogs, when people are degenerating physiologically vice and luxury are bound to result."

খ্রীষ্টধর্ম্মবিদ্বেষী, জড়বাদী নীচে ডারউইনের বিবর্ত্তন-মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, অনেকে মনে করেন। তিনি, কোন কোন স্থানে, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য, পাশবিক বল, চতুরতা ও ছল-বল-কৌশল-নীতি অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু নীচে ডারউইনকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি তাঁহার 'Will to Power' মতের কাছে ডারউইনের জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) কে আসর দিতে প্রস্তুত হন নাই। নীচে জ্ঞানী হইয়াও যুদ্ধের পোষকতা করিয়াছেন। তিনি মানব-জাতির কল্যাণের জন্য, জগতের উন্নতির জন্য যুদ্ধঘোষণা করিতে উপদেশ দিয়াছেন (If ye cannot be saints of knowledge, then. I pray you be at least its warriors. War and courage have done more great things than charity)। নীচের মনে বোধ হয় ব্রাহ্মণের পরেই যোদ্ধা ক্ষত্রিয়ের স্থান জাগিতেছিল। দুর্ব্বলের এজগতে বাঁচিয়া লাভ নাই—সে ব্যক্তিহিসাবেই হউক, আর জাতিহিসাবেই হউক †। কাইজার বোধ হয় নীচে-নীতি অনুসরণ করিয়াই জগতে বর্ত্তমান মহামারীর অবতারণা করিয়াছেন। ইয়োরোপে ক্ষমতাদৃপ্ত, ধনবল-বাহুবল-গর্বিত ইংরাজের চিরশত্রু জর্ম্মাণ নীচের শিরায় শিরায় ইংরাজজাতির প্রতি হিংসাপ্রসূত বিদ্বেষগরল জ্বলিতেছিল,—

"Shakespear, that marvellous Spanish-Moorish-Saxon synthesis of taste, over whom an ancient Athenian of the circle of Aeschylus would have half-killed himself with laughter or irritation * * * the absurd muddle-head Carlyle * * herd of drunkards and rakes * * the plebieanism of modern ideas is England's work and invention."

নীচের বিশ্বাস ছিল তিনি কাউন্টনামক সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষেরা (The Counts of Nietxki) ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নিগৃহীত হইবার ভয়ে, পোলাণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া, জর্ম্মণীতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাঁহার আভিজাত্যের এই ক্ষীণস্মৃতিটুকু তাঁহার জীবনের গর্ব্বস্বরূপ ছিল। বৈষম্যের পক্ষপাতী নীচে কুলীনবর্গকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিতেন এবং সাধারণ জনমণ্ডলীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারই এই বৈষম্যবাদই প্রভুনীতি ও দাসনীতিতে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

নীচে কর্ম্মফলের উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি 'Free will' স্বাধীন প্রবৃত্তি মানিতেন না। এইজন্য তাঁহার

† "For nations that are growing weak and contemptible, war may be prescribed as a remedy, if indeed they really want to go on living." বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ দেখিয়া গেলে নীচে হয়ত মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতেন, দুর্ব্বলতমই জগতে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতম। দৈহিক দুর্ব্বলতার পশ্চাতে, মানসিক, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক শক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব নহে।

মতে মানব তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য পাপপুণ্যের ভাগী হইতে পারে না ('He denied the existence of a free will'—Mugge. 'No one is responsible for the fact that he exists at all &c'—Nietzsche)। অথচ তিনি 'Will to Power' ব্যাখ্যা করিয়া, লোকমত গঠন করিয়া, লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, অলৌকিক পুরুষ বা The Superman সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা পুনঃপুনঃ ঢক্কানিনাদে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ("The Superman is the meaning of the earth. Let your will say: The Superman *shall* be the meaning of the earth!"—Thus spake Zarathustra.)। তাই নীচে হাসিয়া বলিয়াছেন, "মতের মূল্য কি? মত ত পরিবর্ত্তিত হইবেই, তাহা পোষণও পরিবর্ত্তন করিতে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার আছে।"*

নীচে খৃষ্টধর্ম্মকে দুর্ব্বলের ধর্ম্ম বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের মত এই যে, তিনি গ্রীকদার্শনিকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্মমত গঠন করিয়াছিলেন। মিঃ J. M. Kennedy তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"From Greece Nietzsche brought back his standard measure, his infallible scales, etc." গ্রীস হইতে নিট্‌শে তাঁহার অভ্রান্ত মাপকাটি লইয়া আসিয়াছিলেন ইত্যাদি। নীচে যে গ্রীকদর্শনের অতিমাত্র ভক্ত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধুজীবন সমালোচনা কালে, তিনি গ্রীকদার্শনিকদিগের স্থান ভারতীয় সাধুদিগেরও উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় সাধুগণের স্থান সকলের শেষে,—

Neither have I mentioned the Indian saints, who stand midway between the Christian saint and the Greek philosopher, and in so far represent no pure type (*)

'আমি ভারতীয় সাধুদিগের কথা ও উল্লেখ করি নাই। তাঁহারা খৃষ্টান সাধু এবং গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যবর্ত্তী, অতএব প্রকৃত ভাবে পূর্ণ আদর্শ নহেন।'

নীচের সর্ব্বপ্রথম না হইলেও, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক 'Thus spake Zarathusthra.' ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি পারস্যদেশীয় সেই প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কারকের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। নীচে জোরোয়াস্তারের মুখে তাঁহার নিজের উক্তি সাজাইয়া বাহির করিয়াছেন মাত্র। জোরোয়াস্তার—জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গ্রীক সুন্দরী নেতুশ্‌তাকে লাভ করিতে না পারিয়া কুটিলা রাণী অতোস্মার ষড়যন্ত্রে সম্রাট্ দারায়ুর বিরাগ ভাজন হইয়া, গৃহত্যাগী যুবক জোরোয়াস্তার—প্রস্রবনের ধারে পার্ব্বত্য গুহায় তিন বৎসর নীরব সাধনা করিয়া যে জগতের মূলসত্ত্বা, সপ্তধাতু ও অস্থর মজ্‌দের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, নিট্‌শে তাহা 'কল্পনাবলে' আয়ত্ত করিতে চাহিলে বাতুলতা প্রকাশ পায়। অলৌকিক শক্তিশালী Superman জোরোয়াস্তার সত্যধর্ম্মের আলোকে দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিতগণের 'হাওম'রস পান বন্ধ করিয়া এবং 'জাওথা' ও 'বরেশ্মা'দেবগণের উদ্দেশে বীভৎস উৎসবের সংস্কার করিয়া, অবশেষে বিদ্রোহী অসভ্যদিগের অসিধারে খৃষ্টের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'নীচে' মায়াপ্রপঞ্চের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া যে দেবতার আসন জগতের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা জ্ঞান, অথবা তাঁহার ভাষায় Science. *

আমাদের বিশ্বাস নীচের মত, ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক, তাহার স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত। মানুষ অবস্থার দাস হইলেও, প্রতি মানবজীবনের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নীচে সামাজিক শিক্ষারফলে, রোগে শোকে, মনস্তাপে, প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ে, জননী ও ভগ্নীর স্নেহে, স্বদেশে, বিদেশে, আত্মদর্শনের সাহায্যে, পর্য্যবেক্ষণের বলে, ভ্রমণকালে, সুধীসমাজে যে অভিজ্ঞতা, বিচারবুদ্ধি ও

---

* "We should not let ourselves be burnt for our opinions—we are not so certain of them as all that. But we might let ourselves be burnt for the right of possessing and *changing* our opinions."—Human, All-too-Human.

* নীচে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে, কিরূপ ভাবে হইয়াছিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে।

* নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।—গীতা

তীক্ষ্ণদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে তিনি মানসপটে প্রতিভাত সত্যের আলোক জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি, বিচার ও মত দেশ কাল-পাত্র-ভেদে কতদূর সমীচীন, তাহা আমাদের বিচার্য্য। নীচের ধীর, শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন, আবেগশূন্য উক্তিতে নূতনত্ব আছে, স্বাধীনতাও আছে। খৃষ্টান সমালোচকেরা তাঁহাকে "the outspoken Immoralist (স্পষ্টবাদী নীতিবিদ্বেষী) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দুর্নীতি কোন শ্রেণীর? কি প্রণালীর? নীচে Ecce Homo গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"A book for *free spirits*, and almost every-line in it represents victory—in its pages I freed myself from everything foreign to my real nature. Idealism is foreign to me * * I know man *better*—the term free spirit must here be understood in no other sense than this: a *freed* man, who has once more taken possession of himself.'

'মুক্ত আত্মাদিগের পুস্তক, ইহার প্রায় প্রতি ছত্রে বিজয় ঘোষণা করিতেছে—ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় আমি, যাহা কিছু আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়াছি। কাল্পনিকতা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমি মনুষ্যের প্রকৃতি বেশ জানি—মুক্ত আত্মা বলিলে এখানে বুঝিতে হইবে মুক্তপুরুষ, যিনি পুনরায় আত্মস্থ হইয়াছেন।'

নিট্‌শের মুক্তাত্মার কথা আমাদের পরিচিত 'বর্শা'কে স্মরণ করাইয়া দেয়।

নীচের মুক্তাত্মা ভয়, সঙ্কোচ ও বন্ধনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া, স্বাধীনতার ও সাহসের সহিত তাঁহার জীবনবেদে প্রচারিত সত্যের ঘোষণা করিয়াছে। নীচে বলিতেছেন,—

"My writings have been called a school of suspicion and especially of disdain. more happily also a school of courage and even of audacity. Indeed I myself do not think that anyone has ever looked at the world with such a profound suspicion(১); and not only as occasional Devil's Advocate, but equally also, to speak theologically, as enemy and impeacher of God etc."

"আমার লেখাকে লোকে সন্দেহবাদী ও অবজ্ঞাকারীর লেখা বলিয়া মনে করে; আরও সুখের কথা, আমার লেখাকে সাহসের, এবং এমন কি, ধৃষ্টতার উক্তিও বলা হয়। কেবল যে শয়তানের সমর্থক রূপেই এরূপ নহে, কিন্তু ধর্ম্ম-তত্ত্বের ভাষায় বলিতে গেলে, পরমেশ্বরের শত্রু ও বিরুদ্ধবাদী রূপে (২), এ সংসারের প্রতি আর কেহ এরূপ গভীর সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি করে না। নীচে আরও বলেন,—

"Life, in spite of ourselves, is not devised by morality, it demands illusion, it lives by illusion **. I am telling un-morally, ultra-morally, beyond good and evil."

'আমরা যতই ভাবি, আর যতই করি না কেন, মানব-জীবন নীতিদ্বারা গঠিত হয় নাই, উহা মোহ-ভ্রান্তি চায় এবং মোহ ভ্রান্তি দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে।** আমি আবার অপনৈতিক, অতিনৈতিক, সদসদের অতীত কথা কহিতেছি।" মুক্ত আত্মা সম্বন্ধে নীচে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—

"There are no such 'free spirits,' nor have there been such, but I then required them for company to keep me cheerful in midst of evils as brave companions and ghosts with whom I could laugh and gossip when so inclined and send to devil when they become bores etc. That such free spirits will be possible some day; that our Europe will have such bold and cheerful wights amongst her sons of to-morrow and the day after to-morrow actually and bodily, and not merely,

(১) ইহা কি মায়াবাদ, না সংশয়াত্মার কথা? আমরা জানি 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'।

(২) এইখানে নীচের উক্তি আমাদের দেশের নাস্তিক চার্ব্বাক-শিষ্যদিগের উক্তির সহিত তুলিত হইতে পারে।

as in my case, as the shadows of a *hermit's* phantasmagoria—I should be the last to doubt thereof."

'স্বাধীন মুক্তাত্মা (এ জগতে) নাই, কখনও ছিলও না ; কিন্তু দুঃখের মধ্যে আমাকে প্রফুল্ল রাখিতে পারে বলিয়া, আমি সেই সাহসী প্রেতসঙ্গীদিগের সাহচর্য্য চাই, আমার যখন ইচ্ছা, আমি তাহাদের সঙ্গে হাসি, কথা বলি, গল্প করি ; আবার যখন ভাল লাগে না, তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেই। কালে মুক্তাত্মা বাস্তব জগতে থাকা যে সম্ভব হইবে, আমাদের এই য়ুরোপে যে একরূপ সাহসী ও সদানন্দ অলৌকিক মানবাত্মা ভবিষ্যতে ভৌতিক দেহে, রক্ত মাংসের শরীরে বিচরণ করিবে—কেবল আমার এই কাল্পনিক ছায়াচিত্রে বা যোগীর মানসমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে না—সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।'

আত্মার বন্ধন কি ? নীচের মতে মায়ামোহই আমাদের বন্ধন। ভক্তির বন্ধন, শ্রদ্ধার বন্ধন, কর্ত্তব্যের বন্ধন, ধর্ম্মবিশ্বাসের বন্ধন, সংস্কারের বন্ধন, স্বদেশপ্রেমের বন্ধন আত্মার স্বাধীনতা হরণ করিয়া, মুক্তজীবকে জগতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কখনও কখনও জীব অকস্মাৎ সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত ও স্বাধীন হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। কোন্ শক্তির প্রেরণায়, কিসের আহ্বানে, কোন অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে, কোন্ আলেয়ার পশ্চাতে, কেমন করিয়া যে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া যায়, তখন সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না। ইহাই নীচের সদসদ্ বিবেচনার অতীত, পাপপুণ্যের অতীত, আসক্তিবিরক্তির অতীত ভববন্ধন ও কর্ম্মবন্ধন মুক্ত জীবের সংজ্ঞা।† আত্মার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নহে, প্রবৃত্তি-চালিত ভোগমার্গ নহে ; তাহা ভোগে ও ত্যাগে সমান উদাসীনতা, তাহা চিন্তা ও বাসনাকে যুক্তিজালে বাঁধিয়া নিয়ম, সংযম ও শাসনের অধীন করে,—

"That mature freedom of spirit which is equally self-control and discipline of the heart and gives access to many and opposed modes of thought."

নীচের মতে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য নাই। তাঁহার কাছে কখনও কখনও তড়িৎ প্রভায় যতটুকু আলোকরেখা আসিত, তাহারই সাহায্যে তিনি যতটুকু ধারণা ও অনুভব করিতে পারিতেন, তাহাই তিনি প্রচার করিয়াছেন। বিষয়রসে নিমগ্ন জীবের মগ্নচৈতন্য জাগরিত হইলে, সে যেমন মস্তক তুলিয়া সলিলের মধ্যে বাস করিয়াও এক একবার মুক্ত, অনন্ত আকাশের শোভা দেখিয়া লয়, নীচেও সেইরূপ ক্ষণিক আলোকের ক্ষণিকপ্রভায় সত্য দর্শন করিয়া আকুল হইতেন। নীচে স্বয়ং বদ্ধজীব ; মায়া-মোহের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, কল্পনা সম্বল করিয়া, প্রতিভার, অনুকম্পায় যতদূর দৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আপন রঙ্গে রঙ্গ মিশাইয়া, সে সুন্দর দৃশ্য অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পরমুখাপেক্ষী হন নাই বটে, কিন্তু প্রাচ্যদর্শনের প্রভাব তাঁহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মজ্জায় মজ্জায়, প্রকৃতির প্রতি লোমকূপে নূতন সঙ্গীতের সুর যোগাইয়াছে *। হিন্দুর শিষ্য বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের আভাস লইয়া খৃষ্টধর্ম্ম যে নূতন ধর্ম্মনীতি গঠন করিয়া পাশ্চাত্য জগতে সমাজভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানেরও নূতন দর্শনের যুক্তিতর্কের আঘাতে তাহার দুর্ব্বলভিত্তি রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান যুগে সেরূপ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ক্রমেই মলিন হইয়া

† যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥

অতএব আমাদের নির্বিকার মুক্ত পুরুষ সদাসন্তুষ্ট, মৌনী এবং ভক্তিমান্। নীচের Supermen এর লক্ষণ,—"Silent, solitary, and resolute, who knows how to be content and persistent in invisible activity ; * * men to whom cheerfulness, patience, simplicity, and contempt of the great varieties belong etc."

* It is difficult to be understood, especially when one thinks and lives *Gangasrotagati* among those only who think and live otherwise—namely, *Kurmagati* or at best 'froglike' *Mandukagati*.—Beyond good and Evil.

পড়িতেছে। মার্টিন লুথার হইতে আরম্ভ করিয়া ভল্টেয়ার, রুসো ও কণ্ডরসে প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে খৃষ্টধর্ম্মের অন্ধ সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি ইয়োরোপের বিদ্রোহী ভাব প্রাণের 'গুহ্যতম স্থান হইতে,' ভয়ে ভয়ে, ক্রমে ক্রমে ভাষায়ও ক্রিয়ায় পরিস্ফুট হইতেছিল। স্পষ্টবাদী নীচে কৃত্রিম রীতি-নীতি, প্রাণহীন বিধিনিষেধ ও শুষ্ক শাসনে অধীর হইয়া, প্রাচ্য দর্শনের স্বাধীন চিন্তার ধারার আস্বাদে সাহস পাইয়া, কুঠার হস্তে কাল্পনিক সংস্কার তরুর মূলোচ্ছেদ করিতে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের উপাস্য দেবতা জগৎপিতা জগদীশ্বরকেও তিনি ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই।‡

Christianity arose for the purpose of lightening the heart, but now it must first make it heavy in order afterwards to lighten it. Consequently it will perish.

'খৃষ্টধর্ম্ম হৃদয়ের ভার লঘু করিতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু এখন উহা প্রথমে হৃদয়ের ভার বৃদ্ধি করিয়া পরে উহা লঘু করিতে চেষ্টা করে। অতএব খৃষ্টধর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।'

এমন সাহসের সহিত গুরু-গম্ভীর-স্বরে আর কেহ কথনও খৃষ্টধর্ম্মের শিরে অভিসম্পাত করিতে পারিয়াছে কি? কিন্তু নীচে Prophet ছিলেন না, য়ুরোপ Prophet এর আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ধর্ম্মে, সমাজে, বিধিব্যবস্থায় ও রীতিনীতিতে আবর্জনা জমিলে, প্রতিবাদের ও সংস্কারের প্রয়োজন হয়। নীচের প্রতিবাদের পর য়ুরোপে সংস্কারের কার্য্য কবে আরম্ভ হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নীচে হিসাবে ভুল করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নীচে আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া বিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, অধিকার ভেদ না মানিলে উন্নতস্তরের মুক্ত আত্মার আনন্দ নৃত্য, মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি নিম্নস্তরের বদ্ধজীবের মরণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। নীচে বলিতে পারেন, 'আমি আত্মদর্শনের বলে যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিব, তাহার সুধা-কোষ-সঞ্চিত মধুপান করিয়া আমি স্বয়ং বিহ্বল হইয়া সত্য প্রচার করিব, জগতের ভালমন্দ বিচার করিয়া আমার প্রয়োজন নাই।' অনধিকার চর্চ্চাকরিয়া, নীচের সূক্ষ্মতত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিম্নশ্রেণীর হীন বিপ্লববাদ গল্প-উপন্যাস-মন্তব্য-সমালোচনার ভিতর দিয়া আমাদের উর্দ্ধ শ্রেণীর বিলাতীবাঙ্গালাসাহিত্যে ভাববিপ্লব সৃষ্টি করিতেছে। নীচের স্বাধীনতায় শঙ্কিত হইয়া মিঃ কেনেডি বলিয়াছেন,—'the more human and beautiful ideal, if preached to the wrong Congregation, may destroy the smaller virtues of Christianity and render it impossible to rear the higher virtues of Hellenism in its stead.'

নীচের নিকট যাহা সুন্দর ও আনন্দময় বলিয়া বোধ হইয়াছে তিনি তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন; যাহা তাঁহার চক্ষে কুৎসিৎ ও হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহা তিনি উপেক্ষার সহিত বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর, মধুরতর সাত্ত্বিক আদর্শ অন্ধমোহাচ্ছন্ন, কূর্ম্মগতি, কূপমণ্ডুকতুল্য, তামসিক লোকের নয়নে সহিবে কেন?

নীচে গ্রীসের যুক্তিবাদ পশ্চাতে ফেলিয়া আরও একটু পূর্ব্বে সরিয়া আসিলে সাধনরাজ্যে শেষ সত্যে পৌছিতে পারিতেন। যে সকল আবর্ত্ত ও বিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া উপনিষদ্ ও গীতার ধর্ম্ম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, য়ুরোপে বোধহয় এখন তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। নীচে বোধহয় কংস, শিশুপাল, বৃত্র ও দশাননের উচ্ছৃঙ্খলতাও উদ্দাম স্বাধীনতা অনুমোদন করেন নাই*। তিনি বুদ্ধও শঙ্করের স্বাধীনতা জনকের ভোগের মধ্যদিয়া এবং শুকদেবের ত্যাগের ভিতরদিয়া প্রকাশ হইবার 'কল্পনা'

‡ "The Christian concept of God—God as the deity of the sick, God as spider, God as spirit—is one of the most corrupt concepts of God that has ever been attained on earth."

* প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥
অন্যত্র—অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥—গীতা।

করিয়াছেন। তাই তাঁহার সুখদুঃখ ও পাপপুণ্যের অতীত মুক্ত আত্মার 'প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'। মুক্তজীব 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' নিত্য আনন্দস্রোত অনুসরণ করে। তাহার কর্ম্মবন্ধন নাই, আসক্তির বন্ধন নাই, ন্যায়ান্যায় বোধ নাই—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।।"

সেই—

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।"

কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী, বাস্তববাদী নীচে যদি কল্পনা ও ভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া, কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গণে মুক্ত আত্মার সাক্ষাৎ পাইতেন, তাঁহা হইলে তিনি শ্রীমুখে আমাদের সেই সনাতন সত্য শুনিতে পাইতেন,—

"নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবঁচ কর্ম্মণি।"

যে হেতু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 'যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে।' তখন তাঁহার সঙ্গে মিঃ কেনেডি উপস্থিত থাকিলে, তিনি উল্লাসে বলিয়া উঠিতেন—'Amen'!*

* এই প্রবন্ধ-রচনাকালে নীচের গ্রন্থমালার ইংরাজী অনুবাদ, মিঃ M. A. Mugge প্রণীত 'নীচে' নামক পুস্তক, 'জোরোষ্টা'র এবং কয়েকখানা ইংরাজী বিশ্বকোষের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।—লেখক।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

[শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর]

আজিকে—বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের পরমমিলনের দিবসে,
সকলবাধাহারা-হিয়ার রসধারা; প্রাণের পাই সাড়া হরষে।
শাস্ত্র আজি, তার রুক্ষ আঁখি তুলি,
শাসন করেনাক—ধরে না দোষগুলি,
হিয়ার অন্তরে মন্ত্র জাগে যাহা—আজিকে নহে তাহা ঘৃণ্য,
প্রেমের অস্ত্রে যে, সকলশাস্ত্রের, বাঁধন-শৃঙ্খল ছিন্ন।

ললাটে লেপি চুয়া, অর্পি পানগুয়া, বিপ্রে গোপবালা পরশে,
রঙীন 'আনকোরা' লভিয়া শাড়ীজোড়া, বাবুর শিরে প্রীতি বরষে।
ভৃত্যে বলি' "দাদা," আজিকে, ধনীবালা
সমুখে ধরে পরমান্ন-ভরা থালা;
দাসীর কর হ'তে আশীষ লভে, আজি, প্রভুর পুত্রেরা সাদরে;
আজিকে—বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের পরমমিলনের বাসরে।

নগর হ'তে, আজি, এসেছে ধনীজায়া—কাঙাল ভ্রাতাটির ভবনে
ভ্রাতার ব্যথা স্মরি', সোণার 'শেজ'পরি, রুচেনি তার সুখ-সেবনে;
সোহাগে ঢল ঢল, নয়ন ছল ছল
মুক্তাবরষে সে আজিকে অবিরল;
সোদর ধনবান্, প্রচুর করে দান, বক্ষে বাজে ব্যথা কত না—
দুখিনী ভগিনীর মুছায় আঁখিনীর—সারাটি বরষের যাতনা।

আজিকে—হেনদিনে—শ্বশুরগৃহকোণে ভাসিছে, কেগো, আঁখি-সলিলে?
শাশুড়ী নিঠুরা, রাগিয়া জ্ঞানহারা, "বাপের বাড়ী যা'ব" বলিলে।
যতনে কর্ত্তিক-যে, সকলে বঞ্চিয়া,
বুকের অঞ্চলে রেখেছে সঞ্চিয়া,
একটি দিন তরে, বিদায় মাগে সে যে, কাঁদিয়া সকলের চরণে,
সারাটি বরষেরে আঁধার ক'রনাক একটি দিবসের কারণে।

আজিকে—'সাত ভাই চম্পা'-সম, জাগি' রহ এ বঙ্গেরে উজলি';
ভ্রাতৃগরবিণী 'পারুল' ভগিনীর উঠুক হৃদিসুধা উছলি।
কাহার ভাই নাই—কে কাঁদে ধূলিতলে—
মুছাও অঞ্চলে তাহার আঁখিজলে,
একের অভাবেরে ডুবাও সাতটির স্নেহের সাত সুধা-সাগরে—
আজিকে—বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের পরমমিলনের বাসরে!

অরুণাঞ্চলে

[শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা]

উত্তর-জাপানে 'ওঙ্কেনো' উপসাগরের মধ্যে 'এস্‌সো' দ্বীপ। দ্বীপটির ধারে ধারে—আগ্নেয় উপসাগরের উপকূলে—দুই তিন ক্রোশ ব্যবধানে, ঘরকয়েকমাত্র অধিবাসী লইয়া, এক-একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ;—'মোরী' ইহারই অন্যতম। এক একটি নাতিবৃহৎ গৃহস্থপল্লীসদৃশ গ্রামগুলিতে দেখিবার-শুনিবার মত বড়একটা কিছু নাই; সুতরাং, এসকল অঞ্চলে যাত্রীর ভীড়ও তেমন নাই। তবে, বিদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, আর ভিন্ন-দেশবাসীর বিভিন্ন-রীতিনীতি—আচার-পদ্ধতির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার জন্য, দু' চারিজন পর্য্যাটক এতদঞ্চলে গিয়া থাকে। আর, যায় ব্যবসায়ীরা পাখীর পালক, ভল্লুকের চর্ম্ম-প্রভৃতি খরিদ করিতে; তদ্ভিন্ন, আমার মত, অবসন্ন প্রবাসীরা, শ্রম-অপনোদনকল্পেও, কচিৎ এখানে আসে। আমার মনে হয়, প্রবাসীর পক্ষে এদেশে উপভোগ্য যদিকিছু থাকে, তবে, সে স্থানীয় ছোটছোট সরাইগুলি। বস্তুতঃ, আত্মীয়জন পরিশূন্য নিব্বান্ধব প্রবাসীদের সর্ব্বতোভাবে সুখ-সাচ্ছবিধানের উদ্দেশে—বিদেশীকে স্বগৃহসম্ভব গার্হস্থ্য সুখে সুখী করিবার চেষ্টায়—সমুৎসুক এই সরাই-স্বামীদিগের মত আতিথেয় শ্রেণী অন্যকুত্রাপি বড়একটা দেখা যায় না!

বিদ্যাশিক্ষার্থে স্বদেশত্যাগ করিয়া, সাত-সমুদ্র-তেরনদী উত্তীর্ণ হইয়া, এই সুদূর দেশে—রাজ্যের পারে আসিয়াছি। উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা-যত্ন—একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন-পরিশ্রম করি। নিরবচ্ছিন্ন শ্রমে শরীর-মনে যখন ক্লান্তি-অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন—অবসর মত—লোক-সঙ্ঘের কোলাহল-মুখরিত, জীবন-সংগ্রামের বিকটরোল-আকুলিত, অসংখ্য অধিবাসীবৃন্দের শ্বাস-প্রশ্বাসদুষ্ট এবং কলকারখানার কলুষিত বাষ্পবায়ুপূর্ণ জনপদ হইতে পলাইয়া, ওজোন-বিমিশ্র মুক্তবায়ু সেবনে—পরিশ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে সুস্থ করিবার মানসে—প্রকৃতির অবিকৃত শোভা-সুষমা-সন্দর্শনে শান্ত-সবল হইবার উদ্দেশে—কোন জনবিরল স্থানে গিয়া কিছুদিন কাটাইয়া আসা বিধেয়। জাপানে প্রবাসকালে এতদুদ্দেশ্যে আমি প্রায় মোরি গ্রামে যাইতাম।

শিন্ মোরাণ্ হইতে মোরি যাইবার একমাত্র উপায়—ষ্টীমারযোগে—তিনঘণ্টার পথ। স্থানটা যদিও শীতপ্রধান বলিয়াই প্রসিদ্ধ, গ্রীষ্মের প্রাক্কালে কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য-শোভা ও জলবায়ু আমার বড়ই রমণীয় বোধ হইত। সেখানে গেলেই, একটি নির্দ্দিষ্ট সরাই-আশ্রমে আমি আশ্রয়গ্রহণ করিতাম।—সে আশ্রমটির প্রধান গুণ—সেটি একান্ত জনবিরল ও সাগরসৈকতপার্শ্বেই অবস্থিত।

প্রথম যেবার যাই, একটি উদ্ভিন্ন-যৌবনা পরমা সুন্দরী জাপবালা—আমি তাহাকে জাপ-যুবতীই ভাবিয়াছিলাম—আমার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইয়াছিল। প্রথম দিন, স্বজাতিসম্ভব বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট পরিচ্ছদাদি বিভূষিত নবীনা, যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন মনে হইল—যেন একটি নৃত্যপরা মযূরী আসিয়া উপস্থিত হইল—ভাবিতেছিলাম, যেন স্বর্গীয়া কোন দেববালা, পরমকৃপাপরতন্ত্রা হইয়া, সাক্ষাৎ করুণামূর্ত্তিতে আসিয়া মৎপরিচর্য্যায় ব্রতী হইয়াছেন। রূপসী যখন আহার্য্য পরিবেষণ করিতে, তাহাদের দেশীয় প্রথায়, আমার সম্মুখে, মাদুর মণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে, একটি নাতিক্ষুদ্র দারুময় হাণ্ডাপার্শ্বে, নতজানু হইয়া, উপবেশন করিল, আমি, নির্ণিমেষ নয়নে—বিহ্বলচিত্তে—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়—তাহার রূপ-মাধুরী—অঙ্গ-সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।

তরুণী—সাধারণ জাপানীদিগের ন্যায়, পল্লববিহীন স্ফীত; কোণ বিড়ালবিনিন্দিত বিকৃতাক্ষী নহে; তাহার ঘনপক্ষ্ম-সমন্বিত লোচনযুগল আকর্ণবিস্তারিত, তারকাদ্বয় যথা-বিন্যস্ত—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দুইটি অসিত মুক্তার ন্যায় ঝলসিতেছে। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সুকুঞ্চিত কেশপাশ বিচিত্র আকারে শিরোপরি সংবদ্ধ, মৃদুমধুর হাস্যবিকশিত বিম্বোষ্ঠ মধ্যবর্ত্তী

দন্তরাজি, মুক্তাবলীর ন্যায় সুগঠিত, সুসজ্জিত ও সমুজ্জ্বল। যুবতীর মুখশ্রী, অঙ্গসৌষ্ঠব এবং যথাবিন্যস্ত সরল বেশভূষা দেখিয়া, সহজেই তাহাকে যেন, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা, আমাদের স্বদেশীয় কোন সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূতা অনিন্দ্যসুন্দরী বলিয়া ভ্রম জন্মে—জাপানের সাধারণ মহিলা-

পরিবেষণরতা 'চওগা'

দিগের সহিত তাহার অণুমাত্রও সাদৃশ্য ছিল না! সুলভ—সাধারণ বেশ-ভূষায় ও প্রসাধন পরিশূন্যতায় তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য যেন সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে!

যুবতী, আমার আহার্য্য পরিবেষণ করিয়া, যখন অপেক্ষা করিতে ছিল, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া, অতীত বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া, দেশ-কাল-পাত্র পাসরিয়া, আত্মসংযম হারাইয়া, তাহার বাক্যসুধা পানাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া, সকৌতূহলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"উত্তর জাপানের কোন্ অঞ্চল তুমি ধন্য করিয়াছ, সুন্দরি?"

ব্রীড়াবনতমুখী বালা, উত্তরে কহিলেন, "গো মেন্ না সাই!"—(আমায় ক্ষমা করিবেন)। নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া, আমি অগত্যা অন্যকথা উত্থাপন করিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই, আত্মবিস্মৃত হইয়া, আবার সেইকথাই জিজ্ঞাসা করিলাম; সেবারেও সেই একই উত্তর পাইলাম—"গো মেন্ না সাই!"

ক্ষুব্ধ—ক্ষুণ্ণ—হইয়া, নিরাশবাঞ্জক স্বরে, প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তন-চ্ছলে, আমি তখন তাহাকে এক পেয়ালা গরম চা আনিতে অনুরোধ করিলাম।—কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! তাহাতেও সেই একই উত্তর প্রতিধ্বনিত হইল!—কেন? আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, সে আমার এই ভদ্রোচিত সামান্য উপরোধটি রক্ষা করিতেও বিনীতভাবে অস্বীকার করিতেছে! এবার, মনে-মনে নিতান্তই বিরক্ত হইলাম। তথাপি, কিন্তু আশা ছাড়িলাম না। অবশেষে, দেখি তাহাকে যতই—যাহা-কিছু বলি না কেন, সকল প্রশ্ন-অনুরোধ আদেশেরই সে ঐ একই উত্তর দেয়!—ঠিক যেন 'পড়া'-পাখী!—ঐ একটি কথা ভিন্ন, সে যেন দ্বিতীয় বুলিই জানে না!—অগত্যা, হতাশ হইয়া, আমি বিরত—নিস্তব্ধ হইলাম! সে, আমার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া লইয়া, চলিয়া গেল!

সন্ধ্যাসমাগমে সরাই স্বামী আসিয়া দর্শন দিলেন; অতিথির সুখসাচ্ছন্দ্যের কোনরূপ ত্রুটী হইতেছে, কি না, জিজ্ঞাসাবাদ করিতে—তত্ত্ব লইতেই তাঁহার আগমন। তাহার স্বাচ্ছন্দ্যবাদের উত্তরে, আমি সহাস্যে বলিলাম, "অসুবিধা অপরকিছুরই দেখি না; তবে, আপনার নিয়োজিত পরিচর্য্যাকারিণীটির ভাষাজ্ঞান ক্ষুণ্ণতা আমাকে কথঞ্চিৎ বিরত করিয়া তুলিয়াছে, বটে!"

তিনি, একটু অপ্রতিভভাবে, বলিলেন "হাঁ—আপনি সে অনুযোগ নিশ্চয়ই করিতে পারেন; কিন্তু আমি—যে কিরূপ বিপন্ন, আপনি কি তাহা দেখিতেছেন না?"—আমি বলিলাম, "কৈ?—আমি ত কিছুই দেখিতেছি না!"—সাশ্চর্য্যে সরাইস্বামী বলিলেন, "সে কি! দেখিতেছেন না, সে ত জাপানী নহে;—সে যে 'আইনু'!—দায়ে পড়িয়াই ঐ আইনুকে আমায় স্থান দিতে হইয়াছে!"—এতক্ষণে, এই গভীর প্রহেলিকাটির কতকটা রহস্য-সমাধান হইল—আমার মন হইতে একটা ঘোর অপসারিত হইল।

সরাই-স্বামী, যেন আমাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে, যুবতীর ইতিকথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কাহিনী প্রেমমূলক—

"উত্তর-আমেরিকার যেমন 'রেড্ ইণ্ডিয়ান্'-জাতি, উত্তর-জাপানের তেমনই 'আইনু'-জাতি—লুপ্তপ্রায় বর্ব্বর আদিম অধিবাসী। বর্ত্তমানে, সমগ্র 'এসো'-অঞ্চলে, ইহাদের সংখ্যা ছয়-হাজারের অধিক হইবে না।

"এই যুবতীটি সেই আইনু* জাতীয়া; জাপানীর ন্যায় বেশভূষা করে, বলিয়াই, সহসা দেখিলে, ইহাকে 'জাপ'বালা বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে।

"আইনুরা অসভ্য; কিন্তু শান্তশিষ্ট—সরলপ্রকৃতি-বিশিষ্ট। তবে, যাবতীয় বন্যজাতি-সাধারণের ন্যায়, ইহাদের ক্রোধ-প্রতিহিংসা—যে-কোনও প্রবৃত্তি একবার উদ্দীপিত হইলে, পরিতৃপ্তি-ভিন্ন, সহজে তাহা প্রশমিত হয় না। জীবিকা-সংগ্রহকেই ইহারা জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য মনে করে, এবং বর্ত্তমান ও অদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যতীত, অপর কোন কালের চিন্তা ইহারা করে না।

"জাপানীদিগের মত, নাতিদীর্ঘকায় হইলেও ইহারা বেশ সবল ও পরিণত দেহ-বিশিষ্ট। উল্কি-পরিতে ইহারা বড়ই ভালবাসে। অধিকাংশ আইনু রমণী, গুম্ফের অনুকরণে, মুখমণ্ডলে উল্কি চিহ্নিত করিয়া, স্ব স্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হতশ্রী করিয়া ফেলে। তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, এসম্বন্ধে জোর-জবরদস্তী নাই—যাহার অভিরুচি হয়, সেই-ই উল্কি ধারণ করে, যাহার রুচি নাই, সে উল্কি পরে না। স্বদেশজাত বল্কল-বস্ত্রের—হরিদ্রাবর্ণের সূত্রে লতাপাতাঙ্কিত পাড়-বিশিষ্ট—সুদীর্ঘ ঢিলা অঙ্গরাখা, কটিবন্ধদ্বারা আবদ্ধ করিয়া, স্ত্রীপুরুষে দেহ আবৃত করিয়া রাখে। স্বহস্ত-নির্ম্মিত 'সাকি'-নামক উগ্র সুরা ইহাদের প্রিয় পেয়। আদিমপ্রথায় নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র—তীর-ধনুক-বর্শা-প্রভৃতির—সাহায্যে মৎস্য, মৃগ, ভল্লুক-প্রভৃতি শিকার করিয়া, ইহারা জীবনধারণ করে। ভল্লুক-শাবক, অপত্য নির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়া, অবশেষে, একদিন, তাহার গলদেশ, কাষ্ঠখণ্ড-নিষ্পেষণে তাহাকে হত্যা করিয়া, মধ্যে মধ্যে ইহাদের মহাভোজের অনুষ্ঠান হয়। শিকার-লব্ধ—নিহত ভল্লুকগুলির করোটি, গৃহের পূর্ব্বদিকে, বংশদণ্ডোপরি রক্ষিত হইয়া, গৃহস্বামীর শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করে। গাছের ডালপালা-দ্বারা নির্ম্মিত তৃণপর্ণাচ্ছাদিত চূড়াকৃতি কুটীরে ইহারা বাস করে। আধুনিক সভ্যসমাজের সুবিধা-কুবিধা—বিলাপ-ব্যথা—সমন্বিত রীতিনীতি—আচার-ব্যবহারের ধার ইহারা ধারে না। জাতীয় প্রাচীন রীতিনীতি অন্ধবিশ্বাসে অনুসরণ করিয়া, ইহারা নির্ভাবনায়—হাসিয়া-খেলিয়া দিনযাপন করে।
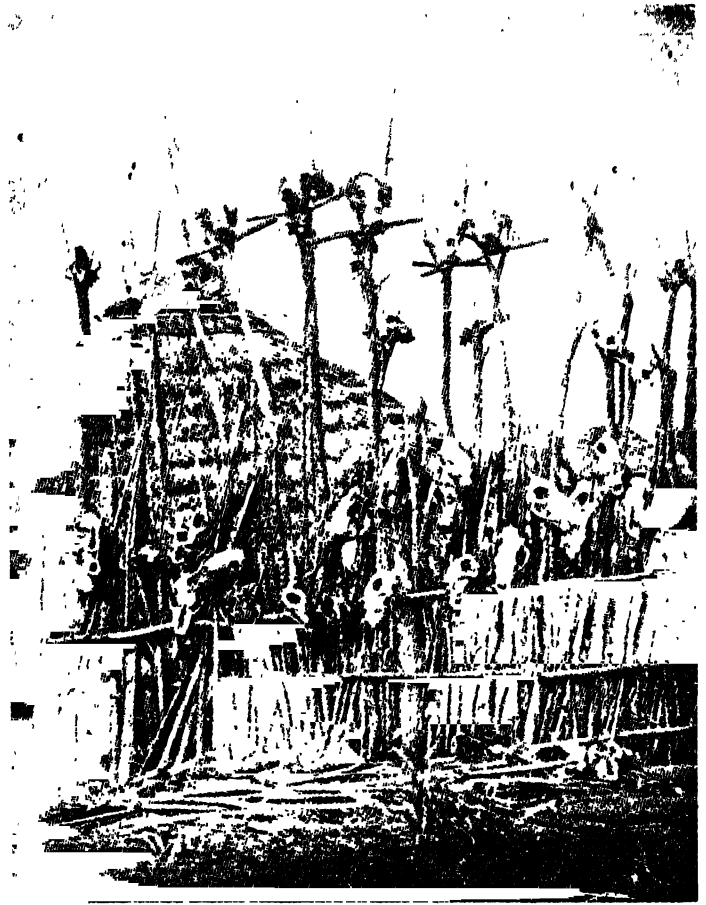
আইনু কুটীর

"আমাদের রূপকথার রাক্ষস-রাক্ষসীদের মত, খেক-

* পণ্ডিতপ্রবর Pfizmier বলেন, 'আইনু' অর্থে 'ধনুকধারী'; কিন্তু জাপানীরা বলে, ইহা ইনু,' অর্থাৎ 'সারমেয়' শব্দ হইতে উদ্ভূত, শ্লেষাত্মক শব্দ অর্থ, 'কুক্কুর জাতীয়'। বারান্তরে, ইহাদের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।—লেখক।

শেয়ালীকে ইহারা মায়াবী মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস, প্রণয় প্রবণ যুবক যুবতীকে শেয়ালীরা, ইচ্ছামত প্রিয়দর্শন তরুণতরুণীর রূপধারণ করিয়া প্রলুব্ধ করে।

"আইনুরা, জাপ সম্রাটের অধীন বটে ; কিন্তু জাপ রাজ ইহাদিগের যাবতীয় অধিকার প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—ইহাদের জাতীয় প্রাচীন রীতি নীতি বিধি ব্যবস্থাতে আদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এইসকল বর্ব্বর বিধিব্যবস্থা বড়ই নির্ম্মম—বড়ই কঠোর। শিক্ষা বা শোভনতা-সম্ভব সংযমনের প্রভাব সেসকল দেশাচারে- ব্যবস্থায় নাই! প্রতি গ্রামের সামাজিক - নৈতিক - সর্ব্ববিধ বিষয়ের ভার ন্যস্ত গ্রাম্য 'প্রধানে'র হস্তে—সেই-ই গ্রামের নেতা, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা!

"রাজ শাসনের একমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়—উপকূলে অবস্থিত শুল্ক সংগ্রাহকের অধিষ্ঠানে। গ্রামে যেসকল বৈদেশিক পণ্য আমদানী হয়, সেইগুলির উপর শুল্ক আদায় করিবার জন্য, জাপানী গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক নিয়োজিত, কয়েকজন তটরক্ষক কর্ম্মচারী—প্রহরী, এবং একজন শুল্ক-সংগ্রাহী মাত্র আছে।

"এই আইনু যুবতীর নাম—চিওগা। চিওগাদের গ্রামে, যে জাপানী প্রিয়দর্শন যুবক শুল্ক সংগ্রাহকরূপে নিযুক্ত ছিল, যুবতী তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার সহিত যথাবিহিত আনুষ্ঠানিক উদ্বাহকার্য্যও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারই কথায়, সে আত্মীয়-বান্ধব স্বদেশ-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, এই মোরিতে স্বেচ্ছা নির্ব্বাসনে আসিয়া আছে! যুবক কানাসাওয়াও তাহাকে ভালবাসে—প্রাণ লুটাইয়াই ভালবাসে। সম্প্রতি সে, অবকাশ লইয়া, দক্ষিণ-জাপানে—স্বদেশে—স্বগ্রামে গিয়াছে ; চিওগা এখনও জাপানী ভাষা জানে না ; তাই, পরিণীতাকে স্বজন সকাশে লইয়া যাইতে—পরিজনসহ পরিচয় করাইয়া দিতে—তাহার লজ্জা! যাহাতে সে-বাধা অচিরে দূর হয়—যাহাতে চিওগা সহজে সত্বর জাপানী ভাষাশিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যেই, সে তাহাকে এই সরাই স্বামীর নিকট রাখিয়া গিয়াছে। যুবতী তেমন চতুরা—তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্না—নহে, প্রণয়-পাত্রের বিরহে সে নিতান্তই কাতরা, অন্য চেষ্টাচিন্তার অবসর তাহার কোথায়? এতদিনে সে, সর্ব্বদা সর্ব্বতো আবশ্যক, 'গো মেন্ না সাই' পদটি মাত্র আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে, তবে, আকার-ইঙ্গিতযোগে, সে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, কিন্তু অভাগী নিতান্ত লজ্জাশীলা—অপরিচিতের সমক্ষে, অঙ্গ ভঙ্গি সংযোগে বক্তব্য প্রকাশ করিতে, সে বড়ই সঙ্কোচ অনুভব করে!"

চিওগার আনুপূর্ব্বিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া, অভাগিনীর প্রতি বাস্তবিকই একটা আন্তরিক সমবেদনা উদ্রিক্ত হইল। তদবধি, যেকয়দিন সেখানে ছিলাম, যখনই সে কোন কার্য্যোপদেশে আমার সমক্ষে উপস্থিত হইত, আমি ইঙ্গিত-অভিনয়েই তাহাকে নিজ বক্তব্য বিদিত করিতাম। প্রথম-প্রথম সে কেমন একটা কুণ্ঠা—লজ্জা বোধ করিত, তাহার গোলাপী মুখমণ্ডল অরুণচ্ছায়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। ক্রমে কিন্তু সে-দ্বিধা তিরোহিত হইয়া গেল। অতঃপর, আকার-আভাসেই আমাদের কথাবার্ত্তা চলিত। বাস্তবিকই, এই বর্ব্বরজাতীয়া যুবতীর আত্মভোলা ভাব দৃষ্টে—গভীর আন্তরিক প্রেমবিহ্বলতায় আত্মত্যাগের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহার প্রতি স্বতঃই কেমন একটা শ্রদ্ধা মমতা জন্মিয়াছিল। আমি নিয়তই, তাহার প্রণয় সাফল্য-কামনায়, হৃদয়ের সহিত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতাম!

ইহার পরেও, কয়েকবার মোরিতে গিয়াছি—চিওগাকে দেখিয়াছি। আহা! বেচারীর প্রণয়াস্পদ তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই—আশায় আশায় থাকিয়া বিরহিণী বালা যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে ছিল!

মধ্যে, একযোগে অনেকদিন, মোরিতে যাই নাই। দেশে প্রত্যাগমনের দিনকয়েক পূর্ব্বে, কি-একটা ছুটি-উপলক্ষে, আমি শেষ মোরিতে যাই।

সেই সরাইয়ে গিয়া উঠিতেই, অধিষ্ঠাতা আসিয়া অভিবাদন করিলেন—স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। আমার ব্যগ্র-নেত্র তখন আকুলভাবে ইতস্ততঃ কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিল, বোধ হয়, বুঝিলেন। দুই-চারিটা শিষ্টাচারসম্মত কথোপকথনের পরেই, বলিলেন, "আমাদের এখানে যে আইনু বালা ছিল, আপনার মনে পড়ে?"—আমি সোৎসুকে ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "হাঁ, খুবই মনে আছে।—কেন? সে কি এখানে নাই?—তাহার কি হইয়াছে?—"বাস্তবিকই সরাই-স্বামীর প্রশ্নে, আমার মনে সহসা যেন কেমন-একটা অজ্ঞাত-অস্পষ্ট বিষাদ-কাহিনীর—শোকসংবাদের তান উৎসরিয়া উঠিল! আমার ব্যাকুলভাব লক্ষ্য করিয়া, সরাইস্বামী বলিলেন,

"আহা! অভাগী চলিয়া গিয়াছে—জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে!"—বক্তার মুখমণ্ডলে একটা নিবিড় বিষাদের ছায়াপাত ছিল—তাহার নয়নপল্লব যেন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল! আমি উদ্বিগ্নভাবে, ত্রস্তকণ্ঠে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "জন্মের মত গিয়াছে!—সে কি?—আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না! আমাকে একটু খুলিয়া বলুন।"

সরাইস্বামী, আবেগপূর্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন—"দিনের পর দিন চলিয়া গেল; কিন্তু কানাসাওয়ার কোন উদ্দেশ বা সংবাদ পাওয়া গেল না! চিওগা ক্রমে অস্থির উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; সে সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক—চিন্তাকুল—বিষণ্ণ হইয়া থাকে। মাঝে-মাঝে ভীত ত্রস্তভাবে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা জাপানী ভাষায় আমাকে—আমার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করে, 'সে ফিরিয়া আসিবে ত?' আমরাও যথাসম্ভব আশ্বাসচ্ছলে-সান্ত্বনাকল্পে বুঝাইয়া বলি, 'আসিবে বৈ কি!—বোধ হয়, কার্য্যগতিকে—কিংবা শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন আসিতে বিলম্ব ঘটিতেছে।—ভাবনা কি?' সহসা একদিন, দক্ষিণ-জাপান হইতে, একজন জাপানী রাজকর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কানাসাওয়া কঠিন-রোগগ্রস্ত! সম্প্রতি, সে একটু ভাল আছে বটে; কিন্তু

আইনু মহাভোজ ও গ্রাম্য প্রধান

সে-রোগ এমন দারুণ, যে, আরোগ্যলাভ করিলেও, তাহার পক্ষে এই সুদূর প্রদেশে আসা আর-কখনও সম্ভবপর হইবে না! আগন্তুক, তাহারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছে!

"আগন্তুকের সহিত যখন আমার এই কথাবার্ত্তা হয়, তখন, চিওগা, অদূরে থাকিয়া, সবই শুনিয়াছিল, এবং ভাবে কতকটা অর্থগ্রহণও করিয়াছিল। পরে—অবসর ক্রমে—আগন্তুককে বিরলে পাইয়া, চিওগা নিজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'কানাসাওয়া আসিবে কি?'

"আগন্তুক কিরূপে জানিবে—এই আইনু-বালার সহিত কানাসাওয়ার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান!—সে কিরূপে বুঝিবে তাহার উত্তরের উপর তরুণীর কত আশা, ভরসা, সুখ, নির্ভর করিতেছে—অভাগীর সমগ্র ভবিষ্য-জীবনের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল, শুভাশুভ কেমন ওতপ্রোতভাবে বিমিশ্র হইয়া রহিয়াছে!—সে বিনাদ্বিধায়—নিরঙ্কুশচিত্তে—নিঃসন্দেহে—সরলভাবে বলিয়া বসিল, 'না—সে আর আসিবে না!' নবাগত, স্বপ্নেও বুঝিতে পারে নাই—এই উত্তরের পরিণামে কি বিষম বিপত্তি ঘটিবে! পরদিন হইতে চিওগাকে আর মোরিতে দেখা গেল না! সহসা, কখন—কোথায় সে অদৃশ্য হইয়া গেল! আগন্তুক—নবনিযুক্ত শুল্ককর্ম্মচারী—পরদিন প্রভাতে, নিজ কর্ম্মস্থলে—চিওগাদের গ্রামে—প্রস্থান করিল।

"আজ পক্ষকাল অতীত হইল, সেই নূতন শুল্ককর্ম্মচারীটি, কার্য্যোপলক্ষে, এখানে আসিয়াছিল। তাহারই মুখে আমরা চিওগার পরিণাম-বার্ত্তা শুনিলাম!

"চিওগা, সেদিন গভীর রাত্রে, চারিদিক্ নিস্তব্ধ—সকলে নিদ্রিত—হইলে, নিঃসাড়ে এখান হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে স্বগ্রাম-অভিমুখে চলিতে থাকে; সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে গ্রাম-প্রান্তে উপস্থিত হয়। নিজ জাতীয় বিধিবিধান তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না; তাই সে, ভাবিয়া-চিন্তিয়া, স্বজন-স্বগৃহাভিমুখে না গিয়া, একেবারে, গ্রামের মোড়লের কুটীরে উপস্থিত হইল!

"সে দিন, কি-একটা উপলক্ষে, মোড়লের বাড়ীতে এক মহাভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল;—গ্রামের নবীন-প্রবীণ সকলেই সেখানে সমবেত,—চিওগার আত্মীয়-স্বজনও সমুপস্থিত! ভোজের সূচনামাত্র চলিতেছে; এমন সময়ে, শীর্ণ-জীর্ণকায়া তেজোদ্দীপ্তা ব্রীড়াবনতমুখী চিওগা, একেবারে মোড়লের পুরোভাগে—সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

"তীব্রোজ্জ্বল-রক্তচক্ষু শ্বেতকেশ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট প্রবীণ সিংহোপম 'প্রধানে'র স্বভাবতঃ ভীষণগম্ভীরমূর্ত্তি—সম্প্রতি

সাকি-পানে অধিকতর গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল। চিওগাকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, শিকারলোলুপ শ্বাপদের ন্যায়, সে, কঠোর দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। চিওগা সম্ভ্রমানত মুখে, মধুর বিনম্র বচনে বলিল—

'তাত! আমি আসিয়াছি।'

"সকলের সাশ্চর্য্যদৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। বসন্তে জলদগর্জ্জনের ন্যায়, বিকট গম্ভীররবে মোড়ল জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এতদিন কোথায় ছিলে?'

"অবিকম্পিতস্বরে ধীরে-ধীরে অসঙ্কোচে সগর্ব্বে চিওগা সকলকথা ব্যক্ত করিল—স্বকৃত সকল অপরাধ স্বীকার করিল।—সে স্বীকারোক্তির স্বরে শঙ্কা-দ্বিধা-সঙ্কোচ-কুণ্ঠা-লজ্জা-অপরাধ-অনুশোচনার লেশমাত্র ছিল না! সমবেত সকলে, নির্ব্বাক্-নিস্পন্দভাবে, তাহার অপূর্ব্বকাহিনী শ্রবণ করিল।—সকলে, উৎকণ্ঠিতচিত্তে, অপরাধীর মৃত্যুস্থির ধারণায়, একদৃষ্টে মোড়লের মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। চিওগার নিষ্প্রভ মুখমণ্ডল তখন যেন কি-এক অপূর্ব্ব-গর্ব্বোদ্ভাসিত! স্বর্গীয় শান্তি যেন নিবিড়ভাবে তাহার সেই পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে বিরাজিত! অবশেষে, মোড়লের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল—বজ্রকঠোর নিনাদে, সমবেত সকলের অন্তরে ভীতিসঞ্চারিত করিয়া, তাহার আদেশ উচ্চারিত হইল—

'পিরিকা, বাচিরাণ্ অইও স্থেংস্থু!'

অর্থাৎ 'বাছা! তোমার আর বাচা হইবে না!' বর্ব্বর জাতির মধ্যে অপরাধের সূত্র বিচিত্র! দণ্ডবিধিও বিকট—চরম!—জাতীয়ধর্ম্ম উপেক্ষা করা—তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা—অমার্জ্জনীয় অপরাধ। আইনু রমণীর পক্ষে স্বজাতি ব্যতীত, অপর জাতীয়কে পাণিদান করা, সতীধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য!—ব্যভিচারিণী চিওগার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল!—চিওগা, পূর্ব্বহইতে প্রস্তুত হইয়াই—স্বেচ্ছাক্রমেই দণ্ডগ্রহণ করিতে আসিয়াছিল। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া, সে অণুমাত্রও বিচলিত—ক্ষুব্ধ বা কাতর—হইল না—বরং, যেন ইষ্টলাভে নিশ্চিন্ত—হৃষ্ট হইল! অতঃপর, সে সস্মিতাননে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মোড়লের মুখ হইতে, এই নৃশংস আদেশ, নির্গত হইবার পরক্ষণেই, তাহার জনকয়েক বলিষ্ঠ অনুচর আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চিওগার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল।—আপাততঃ, ভোজস্থগিত রহিল।—মোড়ল, আসনত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন; ধীরে-ধীরে সমুদ্রবেলা উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন—অনুচরবর্গ বদ্ধাবস্থায় চিওগাকে লইয়া, অনুসরণ করিল। সকলেই নির্ব্বাক্—নীরব; ভোজের আনন্দোচ্ছ্বাস সহসা অন্তর্হিত! চিওগার আত্মীয়স্বজন, যাহারা এই দলে উপস্থিত ছিল, কেহই ঘুণাক্ষরেও মোড়লের এই নিদারুণ আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে, বা তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে, সাহসী হইল না! কারণ, তাহারা জানিত, এবিধান—আদেশ অলঙ্ঘ্য—অপরিবর্ত্তনীয়!

সমুদ্র-বেলায় একখানি ক্ষুদ্র তরণি সংলগ্ন ছিল—তদুপরি চিওগার দেহ শায়িত হইল। তরণি ভাসিল—মোড়ল স্বয়ং কর্ণধার হইলেন, চারিজন সবলদেহ যুবক সজোরে ক্ষেপণী টানিতে আরম্ভ করিল। তরণি, তীর ছাড়িয়া, বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে চলিয়া গেল; ক্ষুদ্র তরণি—উত্তালতরঙ্গের স্রোতোবেগে অনুকূল বায়ুভরে ও ছয়খানি সবলনিক্ষিপ্ত ক্ষেপণী সহযোগে, সুদূরে নীত হইলে, সকলে মিলিয়া, সেই গভীর নীলাম্বুগর্ভে সেই সারল্য প্রতিমা বিসর্জ্জন দিল! এইরূপে চিওগার প্রেমব্রত উদযাপিত হইয়াছে—সে স্বর্গে গিয়াছে—চিরশান্তিলাভ করিয়াছে!—কিন্তু কানাসাওয়া কি বিশ্বাসঘাতক!"

সবেমাত্র সরাইস্বামী টিপ্পানসম্বলিত তাহার এই বিষাদ-কাহিনীর উপসংহার করিয়াছেন—আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে তখনও সেই করুণরোলের উচ্ছ্বাস পূর্ণবেগে ঝঙ্কৃত হইতেছে—এমনসময়ে, বহির্দ্দেশে একটা কলধ্বনি শ্রুত হইল; সরাইয়ের একজন পরিচর বলিতেছে—(ইয়ো ও কায়েরিনাগাই মাশ্‌তা!)—"তুমি এতদিনে এলে!" তদুত্তরে কে একজন কহিল, 'হাঁ, ভাইসকল, আমি আসিয়াছি! কিন্তু এখনও বড়ই কাহিল!' পরক্ষণেই আবার বলিল, 'কৈ?—চিওগা কোথায়?'

তখন, আর আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আগন্তুক—কানাসাওয়া! বিধাতার এ কি বিকট বিদ্রূপ! কানাসাওয়ার প্রশ্নের অপরে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, সরাই-স্বামী, ঝটিতি যাইয়া, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিরসবদনে, কম্পিতকণ্ঠে, বলিলেন, "সে, এখান হইতে চলিয়া

গিয়াছে!" উদ্ভ্রান্তভাবে ব্যাকুলতাবিজড়িত স্বরে কানাসাওয়া বলিল, "চলিয়া গিয়াছে! নিজের দেশে—জাতি-কুটুম্বের নিকটে—যায় নাই ত,? নিকটেই কোথাও গিয়াছে বুঝি?" বিশুষ্ককণ্ঠে ধীরে-ধীরে সরাইস্বামী বলিলেন—"না—হাঁ—তুমি আসিলে না! অপেক্ষা করিয়া—হতাশ্বাস হইয়া, শেষে—সে দেশেই ফিরিয়া গিয়াছে!" ভয়বিভ্রান্ত আকুলভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে, বিকৃতস্বরে কানাসাওয়া বলিল, "য়্যা! দেশে—যমের মুখে গিয়াছে সে!" কানাসাওয়া জানিত, স্বজাতীয়ের নিকটে চিওগা আত্মসমর্পণ করিলে, তাহারা, তাহাদের প্রতিশোধ-স্পৃহার যূপকাষ্ঠে তাহাকে নিশ্চয়ই বলি দিবে! একবার তাহাদের কবলে পড়িলে, আর তাহার নিষ্কৃতি নাই—মৃত্যু সুনিশ্চিত!

অতঃপর, তাহার নিকট আর কোন কথা গোপন করা চলিল না! সে যখন অনুমানে সকলকথাই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে, তখন আর, তাহাকে সন্দেহদোলায় দোদুলামান রাখিয়া—তাহার সংশয় বৃদ্ধি করিয়া— ফল কি! আজ হউক—দুদিন পরে হউক—লোক-পরম্পরায় যখন সে সকলকথা শুনিতেই পাইবে, তখন সে যাহাতে সত্বর অবিসংবাদী সত্য জ্ঞাত হইয়া, প্রবুদ্ধ হইতে—সান্ত্বনা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই করা শ্রেয়ঃ।

কানাসাওয়া অবহিতচিত্তে, স্থাণুর ন্যায় স্থির থাকিয়া, আনুপূর্ব্বিক সকল কথা শ্রবণ করিল! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস, বা একবিন্দু অশ্রুও ত্যাগ করিল না! তবে, যখন সে সেই করুণগাথা শুনিতেছিল, তখন, তাহার মূর্ত্তিতে কয়েকটি রিপু যেন প্রকট হইয়া পূর্ণাধিষ্ঠিত—মনে হইতে ছিল। যখন কথা শেষ হইল, তখন স্পষ্ট দেখা গেল—বিবেক, তাহার নিকট বিদায় লইয়াছে—পূর্ণ নৈরাশ্য আসিয়া সে পুণ্যপীঠ অধিকার রহিয়াছে!—সেদিন সে আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই!

পরদিবস প্রাতে দেখা গেল, সমুদ্র সৈকতে একটা হাণা বৃক্ষশাখায় কানাসাওয়ার শবদেহ দোদুল্যমান! বুঝি, সমুদ্র-সঞ্চারিণী চিওগার আত্মা—অনন্তের পারে প্রীতি-মিলনের আশায়—তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছে!

বাঁশীর সুর

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

সখি, মুরলী বাজায় কে?—
সকল-ভুলান সুরটী তাহার মরমে পশিল যে!
ঘরে থাকা মোর দায় হ'ল সখি,
অন্তর মাঝে সে রূপ নিরখি,
কোথা হ'তে সুর ভেসে আসে কাণে আমারে বলিয়া দে।
—সখি, মুরলী বাজায় কে?

ওলো, সে সুর পশিলে কাণে—
কতবার আমি মনেরে বুঝাই, মন কি প্রবোধ মানে!
সংসার-কাজ বৃথা মনে হয়,
কোথা চ'লে যায় লাজ মান-ভয়,
যেথা বাঁশী বাজে—উদাসী পরাণ সেথা চলে কোন্ টানে
—ওলো, সে সুর পশিলে কাণে।

বল্, বাঁশীর সুরে কি আছে?
কবে কোন্ দিন শুনেছি যেন লো মনে হয় মোর কাছে,
চির-পরিচিত এ মধুর সুর,
হৃদয়ে আমার আছে ভরপুর,
তবু যদি শুনি, কেন লো সজনী—হৃদয় আমার নাচে!
—বল্, বাঁশীর সুরে কি আছে?

বল্, কেমনে পরাণ ধরি?
ওই শোন্ পুনঃ বাজিল বাঁশরী পরাণ আকুল করি',
আমারেই যেন ডাকে বারবার,
কোথা গেলে বল্ দেখা পাব তার,
মুরলীর সুর পাগল করেছে—নিয়েছে পরাণ হরি'!
—বল্, কেমনে পরাণ ধরি?

বীণার তান

সংস্কৃত

শারদা, প্রয়াগে প্রকাশিতা, ৯—১০ সংখ্যে, সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখরঃ

"ভারতস্যাভ্যুদয়ঃ।"—বালবৃদ্ধযুবা, সকলের মুখেই আজকাল জন্মভূমির সমুন্নতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এইসমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, বুঝি ভারতের ভাগ্যভানুর পুনরুদয় অদূরবর্ত্তী; কিন্তু, দুঃখের কথা, ধার্ম্মিককলহজাত দ্বেষানলপ্রসারী 'পৃথগ্‌ভাব', পতিত ভারতকে আরও অধঃপাতিত করিতেছে। উহা এতকাল প্রবল প্রতাপে চলিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে, বলিয়া অনুমান হয়। উহাতেই ভারতের উন্নতিমার্গ রুদ্ধ হইবে এবং এদেশের দৈন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, বলিয়া ভয় হয়।

আমরা ধর্ম্মপার্থক্যের কথা বলিতেছি না, ধর্ম্মান্দোলন যে একেবারেই অকর্ত্তব্য, তাহাও বলিতেছি না। কিন্তু ধার্ম্মিক কলহই ভারতাবনতির প্রধান বীজ। ধার্ম্মিক পরিষদে যে সকল ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়, তাহা মনোরম সন্দেহ নাই; কিন্তু উহারা স্বমতপক্ষপাতপূর্ণ। আজকাল, ভারতে বহুবিধ ধর্ম্মমত প্রচলিত; অতএব, কোন সম্প্রদায়, স্বমত সমর্থন করিতে গেলেই, খণ্ডনমণ্ডনের প্রয়োজন হয়। খণ্ডনমণ্ডন হইতে বিদ্বেষবহ্নি উৎপন্ন হয় এবং উহা সমাজব্যাপ্ত হইয়া, দুঃখাবহ ফল প্রসব করে। বিদ্বেষানলদগ্ধ মানব, স্বমতখণ্ডনকারী অপরকে, শত্রু মনে করে, প্রকৃত শত্রু হইতেও স্বদেশবাসী ভিন্নধর্ম্মীকে অধিকতর পর ভাবে, ভিন্নসম্প্রদায়ের ধর্ম্মসভা-সমিতিতে গমন—পাপ ও কলঙ্ক মনে করে; পরধর্ম্মীর সঙ্গে সহবাস ও সদালাপও পাপ বলিয়া জ্ঞান করে। এইরূপে, ধর্ম্মকলহ, ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, জীবনের অন্যান্যবিষয়েও সঞ্চারিত হইয়া, অধার্ম্মিক কলহও উৎপাদন করে। ধর্ম্মবিষয়ে কলহপরায়ণ ব্যক্তিরা, বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া, অন্যান্য সাংসারিক বিষয়েও শত্রুপক্ষের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করে।

বিবাদ-কলহ ও খণ্ডনমণ্ডনদ্বারা সত্যধর্ম্ম নির্ণীত হয় না। আজকাল ভারতে ভেদবুদ্ধি এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, অন্যধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণের সহিত একত্র ভোজন, উপবেশন, বাস করা ত দূরের কথা—তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও, স্নানদ্বারা শুদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অতএব, ভারতহিতৈষী প্রত্যেকের, জীবনপণে ভারতের অবনতির মূল, মহানিষ্টকর, ধার্ম্মিক-কলহের নিরসন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

হিন্দী

১। সরস্বতী, আগষ্ট, ১৯১৫,—

সুযোগ্য পিতাপুত্র।—লেখক শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা, এল্. এম্. এস্., ডচ্-গায়েনা—

পিতা—মাননীয় স্যর শীতলপ্রসাদ দুবে; পুত্র—কপ্তান লক্ষ্মীপ্রসাদ দুবে। শীতলপ্রসাদের জন্ম—ফৈজাবাদ জিলায় বৈঠী নামক গ্রামে, ১৮৬৭
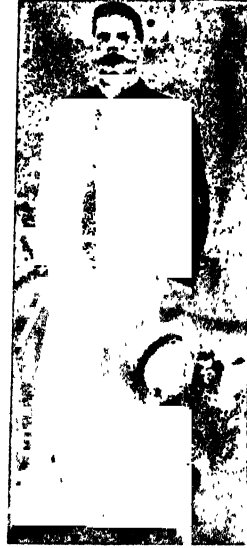
মাননীয় স্যর্ শ্রীশীতলপ্রসাদ দুবে

সনে হইয়াছিল। ১৪ বৎসর বয়সে ইনি জননীর সহিত ডচ্ গায়েনার রাজধানী 'সুরীনাম' যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা, শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে, জগন্নাথ-দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে আড়কাটীর হাতে পড়িয়া, স্বদেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেখানে, শীতলপ্রসাদ ডচ্ ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেন। ১৮৮৮ সনে, ইনি 'ইমিগ্রেশন্'-দপ্তরে দোভাষীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এইকার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইনি, সে দেশের ভারতীয় প্রজাদিগের অভিভাবকতুল্য। আজকাল, পণ্ডিত শীতলপ্রসাদকে, ডচ্-গায়েনার ৪৫ হাজার হিন্দুস্থানী ঔপনিবেশিকেরা, পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করে। য়ুরোপীয়েরা ইঁহাকে মহারাজ বলেন। দুবেজীকে হল্যাণ্ডের মহারাণী

'ওয়েলহেলমিনা', 'অর্ডার অব্ দি অরেঞ্জ নাসাউ' (Order Van Orange-Nassau)-উপাধিদ্বারা ভূষিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। দুবেজীর ব্যবহারে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। তিনি, কাজকর্ম্মের অনুরোধে, ইংরাজী-পোষাক পরিধান করেন বটে ; কিন্তু, তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল ও অমায়িক। অতি ক্ষুদ্রব্যক্তিও, দীনহীনবেশে, কোন সামান্যবিষয়ের জন্য, তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে, তিনি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন। দুবেজীর হিন্দুধর্ম্মে গভীর আস্থা আছে। তাঁহার জীবনের মুখ্যধর্ম্ম 'হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্থান'। তিনি প্রায় সাত বার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণ-আমেরিকার ওলন্দাজ-উপনিবেশে কিরূপে ভারতবাসীদিগের উন্নতি সাধিত হইবে—ইহাই স্যর শীতলপ্রসাদ দুবের জীবনব্রত। গায়েনার গবর্ণর ও অন্যান্য সরকারীকর্ম্মচারীরা, ইঁহাকে, নিজেদের সমানভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন।

ওলন্দাজ-সরকার, পণ্ডিত শীতলপ্রসাদের পুত্র, শ্রীমান্ লক্ষ্মীশ্বর দুবেকে একটি বৃহৎ ষ্টীমরের অধ্যক্ষ (কপ্তান) নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন তাঁহার 'হেড্ কোয়ার্টার্স' সিঙ্গাপুরে। ১৮৮৯ সনের ২০এ এপ্রেল, সুরীনামে

কাপ্তেন্ শ্রীমান্ লক্ষ্মীশ্বর দুবে, আর-এন্

কপ্তান লক্ষ্মীপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইনি গৃহে হিন্দী, উর্দ্দূ ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া, পরে, সুরীনামের সরকারী স্কুলে ও কলেজে ডচ্, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ ও ইংরাজী শিক্ষা করেন। ১৯০২ সনে, ইনি, ইঞ্জিনীয়ারিং কলকৌশল শিক্ষা করিতে, হল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। তথায়, ইঁহার জনৈক পিতৃবন্ধু, ওলন্দাজ ভদ্রলোক, ইঁহাকে নৌবিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে, ইনি 'রয়াল নেভি কলেজে' অধ্যয়ন করিয়া, মাত্র ২১ বৎসর বয়সে, এক জাহাজের তৃতীয় 'অফিসর'-পদে নিযুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই, ইনি, কর্ম্মে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া, দ্বিতীয় কর্ম্মচারী এবং পরে কাপ্তেনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি সিঙ্গাপুরে একখানা বাড়ী করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ এখনও অবিবাহিত। আশৈশব ইঁহাকে 'কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই—যেন সদাই সুপ্রসন্ন ও হাসিমুখ।

২। **সরস্বতী**, সিতাম্বর, ১৯১৭,—

"রাজা টোডরমলের জন্মভূমি,"—সীতাপুর জেলার অন্তর্গত, লহরপুর বা লাহরপুর গ্রামে, চৌপড়ী-নামক মহল্লায় (পাড়ায়) রাজা টোডরমলের জন্ম হইয়াছিল। এখনও তথায় তাঁহার গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, রাজা টোডরমলের নামে ঐ গ্রামে এক পুষ্করিণী আছে এবং, তাহার নিকটেই, 'রাজাকা তাল', বা 'রাজাপুর'-নামে এক গ্রাম এখনও টোডরমলের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে।
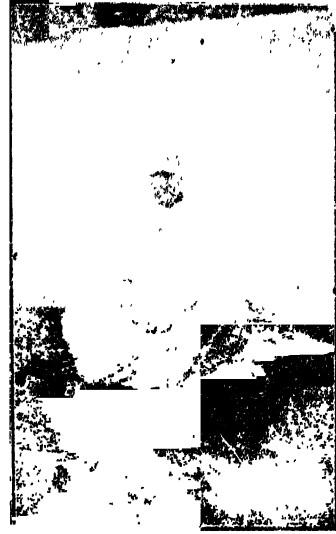
অনন্ত মহাপ্রভু

"অনন্ত মহাপ্রভু"—জন্ম সংবৎ ১৮৩৬, অযোধ্যা প্রদেশে, লক্ষ্ণৌ নগরে, সওয়াদতগঞ্জ মহল্লায়। পিতা—কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ শিবনন্দন বাজপেয়ী ; মাতা—গনিরাজ কুঁওরি। কানপুরে 'রাই' ও 'ঘীর' কারবার করিয়া, শিবনন্দন প্রচুর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন। শিবনন্দনের সহিত তাঁহার পিতৃব্যের সদ্ভাব ছিল না। সম্ভবতঃ জ্ঞাতিশত্রুদিগের প্ররোচনায়, একদিন কে গোপনে শিবনন্দনকে হত্যা করিল! ঘাতুক, অনন্তকেও হত্যা করিতে, তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু অন্ধকারে তাহার লক্ষ্যব্যর্থ হওয়ায়, বিধাতার কৃপায়, তাঁহার জীবন রক্ষা হইল। অনন্তের জননী, পুত্রকে লইয়া, কানপুরে গমন করিলেন। তথায় বালকের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইল। ইহার কিছুদিন পরে, অনন্তের মনে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি, তন্ত্রের সাহায্যে, শত্রুদমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন, ; কিন্তু তাহা পণ্ড হইল, এইসময়, শত্রুর চক্রান্তে, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য মোহকমসিংহের কয়েদ হইল। বৃদ্ধ জেল হইতে ফিরিলে, অনন্ত, তাহার সঙ্গে, কলিকাতা রওনা হইলেন। কলিকাতায় বৃদ্ধের সঙ্গপরিত্যাগ করিয়া, অনন্ত কামাখ্যা যাত্রা করিলেন। পথে, বালাগঞ্জে, এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। অনন্ত তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিলেন।

সাধুর উপদেশে তাঁহার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত হইল ; তিনি, বিদ্যাধ্যায়ন করিয়া, জগতের কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

গুরুর অনুমতি লইয়া, নবলখা-নামক পর্ব্বতে গমন করিয়া, তথায় তিনবৎসর যোগাভ্যাস করিলেন। তৎপরে, চন্দননগরে যাইয়া, সেখানে, একবৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলেন। তথা হইতে কাশী যাইয়া, নয়বৎসর পর্য্যন্ত, শাস্ত্রালোচনায় নিমগ্ন রহিলেন। কাশী হইতে তিনি টিকারী গমন করিলে, টিকারীর মহারাজা তাঁহাকে অত্যন্ত আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরে, জগন্নাথতীর্থ ও ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি পর্য্যটন করিয়া, অনন্তশম্ভু কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া, তিনি বিশ-বৎসর পাতিয়ালার নিকট এক পর্ব্বতে, এবং দশবৎসর লুধিয়ানা নগরের সমীপে এক পর্ব্বতে, যোগমগ্ন ছিলেন। পঞ্জাব হইতে বাহির হইয়া, নানাস্থান পর্য্যটন করিতে-করিতে, অনন্তস্বামী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যায় তিনি পাঁচ-বৎসর অবস্থিতি করেন। অযোধ্যা হইতে তিনি নেপাল ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া, স্বামীজী, গোরক্ষপুর জিলার অন্তর্গত, বরহজ নামক স্থানে, আজ প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। এখন তাঁহার বয়স, লোকে অনুমান করে, ১৫২ বৎসর। আজকাল, তাঁহার আহার একপোয়া মাত্র আন্দাজ দুধ। অনন্ত মহাপ্রভু প্রথমতঃ বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু এখন তিনি "বিধিনিষেধ রহিত স্থিতিকো পহুঁছগয়ে হৈঁ।"

৩। গৌড়হিতকারী, অগস্ত, ১৯১৫,—

"গৌড়দেশব্রাহ্মণ"— রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি দেবীবর, এবং প্রাচীন কুলপত্রাদি হইতে, আদি রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে—

কান্যকুব্জ হইতে মহারাজ আদিশূর-কর্ত্তৃক সমাহৃত—	তাঁহাদের সন্তান—
১। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়—ক্ষিতিশ	ভট্টনারায়ণ (রাঢদেশে)
	দামোদর-আদি (বরেন্দ্রে)
২। ভারদ্বাজ-গোত্রীয়—তিথিমেধা	শ্রীহর্ষ (রাঃ)
	গৌতম (বঃ)
৩। কাশ্যপ-গোত্রীয়—বীতরাগ	দক্ষ (রাঃ)
	সুষেণ, কৃপানিধি (বঃ)
৪। বাৎস্য-গোত্রীয়—সুধানিধি	ছান্দড় (রাঃ)
	ধরাধর (বঃ)
৫। সাবর্ণ-গোত্রীয়—সৌভরি,	বেদগর্ভ (রাঃ)
	পরাশর, রত্নগর্ভ (বঃ)

রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা, দুই ভিন্ন-ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে অধিকাংশ রাঢ়ীয়গণ সামবেদী এবং অধিকাংশ বারেন্দ্রগণ ঋগ্‌বেদী হইয়া পড়িয়াছেন—কাহারও কাহারও এরূপ অনুমান।

'নৈষধকাব্য'-রচয়িতা—শ্রীহর্ষ ও রাঢ়ীয় কুলের আদিম পুরুষ—শ্রীহর্ষ, একব্যক্তি ছিলেন না।* যেহেতু, 'নৈষধ' গ্রন্থকার, শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহরি ; এবং তাঁহার সময়ও, তিথিমেধাপুত্র শ্রীহর্ষের সহিত, মেলে না।

মৈথিলী

১। মিথিলা মিহির, ১১ সিতম্বর, ১৯১৫,—

"মৈথিলবিদ্বান্"—মঃ মঃ টিকাকার গোকুলনাথ উপাধ্যায়—ইনি মঃ পীতাম্বর উপাধ্যায়ের পুত্র। ইঁহারা চারি ভাই, চারি জনই দিগ্‌গজ পণ্ডিত—মঃ ত্রিলোচন, মঃ দন্তপাণি, মঃ জগন্নাথ ও গোকুলনাথ। ইঁহার সামসাময়িক পণ্ডিত বঙ্গদেশে—গদাধর ভট্টাচার্য্য ও জগদীশ ভট্টাচার্য্য, এবং মহারাষ্ট্রে—নাগেশ ভট্টাচার্য্য, প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, দৈব-বিড়ম্বনায় ইঁহার, পঞ্চমবর্ষীয়া, পরমস্নেহাস্পদা কন্যা অদ্ভুত-ভাবে অদৃশ্য হইয়াছিল। তাহার নামে ইনি—'কুল-কাদম্বরী' রচনা করেন। ইঁহার রচিত 'অমৃতোদয়'-নামক নাটক, 'পদবাক্য রত্নাকর' ও 'মাংস মীমাংসা-প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই যে, ইনি একবার রাজধানী দিল্লীগমন করিয়াছিলেন। তথায়, কোন সিংহদ্বারে, লিখিত ছিল—

'শাহ আকবর কূপসম, বিনগুণ বুন্দ ন দেত।'—(অর্থাৎ, আকবর বাদশাহ কূপের ন্যায় গভীর বিনাগুণে তিনি কাহাকে একবিন্দুও দান করেন না)।

গোকুলনাথ উহার নীচে লিখিয়া রাখিলেন—

'রাঘবসিংহ সমুদ্রসম, মূঢ়হু ঘটভরি লেত।'—(অর্থাৎ, মিথিলার রাজা রাঘবসিংহ সমুদ্রের ন্যায়, মূর্খও ঘটপূর্ণ করিয়া তাঁহার জল [অর্থ] গ্রহণ করে)।

ঐ কবিতা আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, তিনি উহা কে লিখিয়াছে, তাহার সন্ধান করিতে সহরে ঢোল পিটিয়া দেওয়াইলেন। গোকুলনাথ দরবারে হাজির হইলে, আকবর, তাঁহার কবিতা ও শাস্ত্রার্থ শুনিয়া, প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে পুরস্কৃত করিলেন। মঙ্গরৌণী নামকস্থানে এখনও ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

২। মিথিলামিহির, ২১এ আগষ্ট, ১৯১৫,—

টীপ্পনী—বাঙ্গালা হইতে বিহার স্বতন্ত্র হইবার পর হইতে অনেক বিহারী ও বাঙ্গালী সংবাদপত্রে বিহার-নিবাসী বাঙ্গালীদিগের অধিকার-প্রাপ্তি সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে,—অধিকার, আর কোন বিষয়েই নহে, কেবল সরকারী চাকুরীর। আমরা বুঝিতে পারি না, এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত লেখাপড়ির প্রয়োজন কি? সরকারী চাকরীই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। তাহার জন্য, ভাই-ভাই-এর মধ্যে, এরূপ ঝগড়া হইলে, লোকনিন্দা ভিন্ন—আর-কিছুই লাভ নাই। * * বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, নবীনচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি উদার প্রকৃতি মহাশয়-দিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবকম, যাঁহারা, বিহারের অন্নজলবায়ুপুষ্ট হইলেও, বিহারকে আপন-স্বদেশ, ও বিহারীদিগকে আপন-ভাই, মনে করিতে পারেন। এমন অনেক

বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা দুইতিনপুরুষ বিহারে বাসকরিয়াও, হিন্দীভাষা লিখিতে ও পড়িতে জানেন না; এবং হিন্দীপ্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে, শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে-প্রভৃতি যুক্তপ্রদেশবাসী, বঙ্গদেশে থাকিয়া, যেমন বাঙ্গালীদিগের তুল্য অধিকার প্রাপ্ত করিয়াছেন, তেমনই, তাঁহারা স্বার্থত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালাকেই তাঁহাদের জন্মভূমি, এবং বাঙ্গালা-ভাষাকেই তাঁহাদের মাতৃভাষা, বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িয়া

উৎকল সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩২২—

স্বদেশপ্রেম বনাম বিশ্বপ্রেম —সম্পাদকীয়—বিশ্বপ্রেমের সহিত স্বজাতি প্রেমের বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। স্বদেশ, বিশ্বের বাহির নহে। প্রেম প্রীতি, সম্মান, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি হৃদয়ের উন্নত ও কোমল বৃত্তিনিচয়, যদি অবাধে সমাজের, দেশের ও সমকালের যোগ্য পাত্রের প্রতি ধাবিত না হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের বিকাশ-সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহের কথা! স্বদেশপ্রীতির নামে স্বার্থের বিকটমূর্ত্তি মানবসমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ বিবাদবিসম্বাদ ও যুদ্ধবিগ্রহের মূলে এই বিকৃত বস্তুটির প্রভাব রহিয়াছে। পরিবারপ্রীতি মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এইপ্রীতি, যখন, তাহাকে প্রতিবেশীর মঙ্গল, গৌরব, সুখশান্তি ও দুঃখ দুর্গতির প্রতি উদাসীন করে,—তাহারও অভ্যুদয়দর্শনে, আনন্দের পরিবর্ত্তে, অন্তরে ক্লেশ উৎপাদন করে, তখন তাহা ঘোরবিকারের অবস্থা। পক্ষান্তরে, পরিবারপ্রীতি যখন, পরিজনবর্গের দোষত্রুটীর প্রতি অন্ধ হইয়া, কেবল তাহাদিগকে সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন, তাহা প্রীতি নহে—প্রীতির বিকার মাত্র। স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধেও এইকথা। —বস্তুতঃ, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সকলকে হৃদয়ের প্রীতি ও সম্মান অর্পণ করা, মানব সন্তানের পক্ষে গৌরবের কথা। পক্ষান্তরে, বিশ্বপ্রেমের ছল করিয়া, কেহ যদি নিকটস্থ প্রতিবেশীর প্রতি, স্বদেশের নরনারীর প্রতি, উপেক্ষাপ্রদর্শন করে,—তাহা হইলে, সে প্রেম, কোন কাল্পনিক বস্তুর ছায়ামাত্র—প্রকৃত স্বদেশপ্রেম নহে। যথার্থ প্রীতির নিকট স্বদেশ-বিদেশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই—উহা পাটীগণিতের হিসাবের মধ্যে নাই। 'সর্ব্বদেবনমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি।' স্বদেশ, কেবল ক্ষুদ্রশক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ কার্য্যক্ষেত্র।

আসামী

১। **বাঁহী,** ভাদ, ১৮৩৭ (আগষ্ট ১৯১৫), শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া-সম্পাদিত—

রায়-বাহাদুর কালীপ্রসাদ ছলিহা,—১৮৫৯ সনের ডিসেম্বর মাসে, স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ ছলিহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, কৃষ্ণদাস ছলিহা, সাধারণ অবস্থার লোক ছিলেন; তিনি চা বাগানে মুহুরির কাজ করিতেন। তাঁহার পিতামহ, শিশুরাম ছলিহা, যোগসাধনা করিতেন।

কালীপ্রসাদ পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন, পরে, নয় বছর বয়সের সময় শিবসাগর স্কুলে নাম লিখাইয়াছিলেন। অতিকষ্টে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া, পড়াশুনা করিয়া তিনি ১৮৭৮ সনে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। কিন্তু, অর্থাভাবে আর পড়াশুনা চালাইতে পারেন নাই।

এণ্ট্রান্স পাশ করার পর, ছলিহা মাসিক ত্রিশটাকা বেতনে, নাজিরায় 'আসাম কোম্পানী'র আফিসে, কেরাণীর কার্য্য করিতেন এবং গৃহে আইন অধ্যয়ন করিতেন। এইভাবে কিছুদিন কাজ করিয়া তিনি ১৮৮২ সনে পি-এল্. পরীক্ষা পাশ করেন। পরীক্ষার পরবৎসর, তিনি, ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হিংসায় ও প্রতিপত্তি হারাইবার ভয়ে, তাঁহার স্বজাতীয় কোন উকীলই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না। কালীপ্রসাদ নিরুপায় হইয়া, শিবসাগর হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়, তথাকার সুপ্রতিষ্ঠিত উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষমহাশয়ের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। সদাশয় ঘোষমহাশয়, তাঁহাকে নানা সদুপদেশ দিয়া এবং নিজের আইনের পুঁথি পড়িতে দিয়া, কালীপ্রসাদকে সুশিক্ষিত ও প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তারপর, ক্রমে কালীপ্রসাদ নিজেই একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাশালী উকীল হইয়াছিলেন।

উকীল হইবার কিছু পরেই, দামোদর বরুয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কালীপ্রসাদের বিবাহ হয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের দুইবৎসর পরেই, নিঃসন্তান অবস্থায়, তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। যাহা হউক, তিনি, পরে, তাঁহার মৃতপত্নীর এক সহোদরার পাণিগ্রহণ করিয়া, সুখী হইয়াছিলেন। তিনি বিধাতার কৃপায়, পাঁচটী পুত্র ও তিনটী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের দুইজন এখন পরলোকে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এখন বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতেছেন।

ওকালতী আরম্ভ করিয়া, ছলিহা দেশসেবা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি লোক্যালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য ছিলেন এবং পরে লোক্যালবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অনেক নিঃসহায় স্কুল-কলেজের ছাত্রকে তিনি পড়ার খরচ দিয়া সাহায্য করিতেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিলেই, যাহাতে প্রত্যেক আসামী ছাত্র সরকারী বৃত্তিলাভ করিতে পারে, এতজ্জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিলেন—কালীপ্রসাদ। গুয়াহাটীতে (গৌহাটী) কলেজ স্থাপন করিবার প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী—রায়বাহাদুর কালীপ্রসাদ প্রমুখ শিবসাগরের জনসাধারণ। শিবসাগর 'কটন লাইব্রেরী'ও তাঁহার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আসামের চীফকমিশনর ছলিহা কালীপ্রসাদকে জননায়ক বলিয়া, যথেষ্ট সম্মান ও আদর করিতেন এবং তাঁহার সহিত পত্রবিনিময় করিতেন। ১৯০১ সনে, সম্রাটের অভিষেক সভায়, যে পাঁচজন অসমীয়া ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কালীপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। সেই দরবারে, এবং ১৯১২ সনের 'দিল্লীদরবারে' তিনি দেশহিতৈষণার জন্য, সার্টিফিকেট (সরকারী প্রশংসাপত্র) পাইয়াছিলেন। গত ১৯১৩ সনে

সরকার বাহাদুর তাঁহাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দ্বারা ভূষিত ও সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৯১২ সন হইতে ছলিহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। গত ১৯১৪ সালের ১২ই এপ্রিল, বহুমূত্র রোগে, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রী

মনোরঞ্জন—মাহে সেপ্টেম্বর, ১৯১৫,—

রাওসাহেবাঞ্চাঙ্কনী—পঃ বাঃ রাওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক, সি.এস.আই., মহোদয়ের জীবনক্রম অত্যন্ত ওজস্বী, বোধপ্রদ ও অনুকরণীয়। রাও সাহেবের শিক্ষা, বোম্বাই এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ কলেজে হইয়াছিল। উনিশ বৎসর বয়সে, শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি সিন্ধুদেশ সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর,

পঃ বাঃ রাওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক

রাওসাহেব, বোম্বাই হাইকোর্টে, ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পরে, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় ডীন (Dean) এবং বড়লাটের আইন-সভার বোম্বাই প্রদেশের প্রথম ভারতবাসী সভ্য হইয়াছিল। তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। রাওসাহেব অনেক সার্ব্বজনিক আন্দোলনে ও জনসাধারণের হিতকরকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। নির্ভীক বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতার জন্য তাঁহার দেশে সুনাম ছিল। নিজের সাংসারিক ও ব্যবসায়ের সকল কাজ নির্ব্বাহ করিয়াও, তিনি এতগুলি মহৎকার্য্যে যোগদান করিবার সময় পাইতেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা। কর্ম্মশীল ও চিন্তাশীল লেখক ও বক্তা রাওসাহেব বিশ্বনাথ, ১৮৮৯ সনে, ৫৭ বৎসর বয়সে, ইহধাম পরিত্যাগ করেন। রাওসাহেবের জীবনের কতকগুলি মূলনীতি ছিল, তিনি তাহা সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন।

গুজরাতী

১। গুজরাতী পঞ্চ, ২২এ আগষ্ট, ১৯১৫

লগ্নার শ্রীপ্রধান বাঈ 'জৈন-কন্যাশালা'র স্ত্রীশিক্ষক—"জৈনশালায় ও জৈন কন্যাশালায় যেসকল পবিত্র জৈনেশ্বরদিগের জীবনচরিত্র সরল গুজরাতী ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা জৈনবিদ্যার্থী ও জৈন-কন্যাদিগের শিক্ষায় ইতিহাসরূপে প্রচলিত হইলে, ভবিষ্যতে প্রভূত উপকার হইবে। ইতিহাসে গীজনী, ঘোরী, গোলাম, খীলচী, তগলক, সৈয়দ, ও মোগল বংশের রাজ্যবর্ত্তীদিগের শাসন ও অধিকার লিখিত থাকে; কিন্তু, জৈন-শাসন সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইতে, আমাদিগের পবিত্র তির্থঙ্করদিগের জীবন চরিত্র, ঐতিহাসিক প্রণালীতে, শিক্ষাদিবার কোনই ব্যবস্থা নাই; ইহা বস্তুতঃই বিস্ময়ের কথা।"

২। দী ইণ্ডীয়ন্ লায়লীস্ট বচাপণ ক্যাম্প, ১৯শে আগষ্ট, ১৯১৫—মন্দ্রাস ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রফেসর ক্রফর্ট জর্ম্মণ বিষয়ে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, প্রাচীন জর্ম্মণেরা আফ্রিকাদেশীয় আদিম জাতিবিশেষ ছিল। তাহারা প্রথমে অসভ্য, বর্ব্বরদিগের ন্যায় য়ুরোপে আগমন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইলে, এবং জঙ্গলী হুণজাতি শক্তিহীন হইয়া পড়িলে, এই আফ্রিকা দেশীয় বর্ব্বর জর্ম্মণজাতি, অকস্মাৎ প্রবলবেগে য়ুরোপে প্রবেশ করিয়া, বসবাস করিয়াছিল।

গোলাপ ফুলের মৃত্যু

[শ্রীজীবনবালা দেবী]

আমারি সুখের আশে, প্রতিদিন শয্যাপাশে,
একরাশি হাসি ল'য়ে আসিস্ সুন্দরী,
দিয়া কি শীতল স্পর্শ, পরাণে জাগাস্ হর্ষ,
আ-মরি, আ-মরি!
দেখে তোরে শতবার, পিপাসা মেটেনা আর,
তপ্তবুকে বারবার সাপটিয়া ধরি;

দুরন্ত সোহাগে মোর, শুকায় সুতনু তোর—
গোলাপ-সুন্দরী!
তবু—যতক্ষণ শ্বাস, দিস্ যে মধুর বাস,
বহাস্ পরাণে মোর কি সুধা লহরী?
আমি তার প্রতিদানে, বধি ও-পেলব প্রাণে,
তপ্তবুকে বার-বার সাপটিয়া ধরি!

জীয়ন্ত সমাধি

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্. এ.]

আমরা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা বলিতেছি। তখন ধর্ম্মপরায়ণ আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব। তিনি একজন বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা এবং প্রজাগণের হিতকর কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের সময়েই বাঙ্গালায় 'বর্গীর হাঙ্গামা' উপস্থিত হয়।—মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিলে, মহারাষ্ট্রী অশ্বারোহী সৈন্যগণ—বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিবার আশায়—বাঙ্গালায় পদার্পণ করে। দিল্লীর বাদসাহ, তাহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিলেন এবং তাহাদিগকে ভারতবর্ষের বিবিধপ্রদেশের রাজকরের চতুর্থাংশ—'চৌথ' আদায় করিবার ফার্ম্মাণ্ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ, ফার্ম্মাণ্ পাইয়া, বলপ্রয়োগে ন্যায্যগণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য, বাঙ্গালাদেশে উপস্থিত হইল। এই মহারাষ্ট্রী-সৈন্যগণের আক্রমণই, আমাদের দেশে, "বর্গীর হাঙ্গামা"-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বর্গীরা, প্রজাগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত;—শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র সকল উৎখাত করিত—প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া, তাহাদের গৃহে আগুন-জ্বালাইয়া দিত। তখন হইতেই, দুরন্ত শিশুদিগকে ঘুম-পাড়াইবার সময়, জননীরা সুললিতস্বরে গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন—

"ছেলে ঘুমাল, পাড়া-জুড়াল—
বর্গী এল দেশে!
টিয়াপাখীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে?"

তবে, তখন শিশুদের পিতামাতাও, বর্গীর নাম-শুনিলে, ভয়ে থরহরি কম্পমান্ হইতেন। অনেকলোক, পৈতৃক বাস্তুর মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া, কলিকাতায়—ইংরাজদিগের নিকট আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, কলিকাতার চতুর্দ্দিকে, মহারাষ্ট্র-খাল খনন করা হইয়াছিল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মারাঠাগণ, উপর্য্যুপরি পাঁচবার, বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করে। বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব, আলিবর্দ্দী খাঁও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই। লুটপাট করিয়া পলায়ন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। দুর্ব্বল প্রজাগণের উপর তাহারা অমানুষিক অত্যাচার করিত।—অবশেষে, নিরুপায় হইয়া, প্রজাবৎসল আলিবর্দ্দী, প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তিনি, তাহাদিগকে, উড়িষ্যাপ্রদেশ এককালে ছাড়িয়া দিলেন; এবং মারাঠাগণ, ভবিষ্যতে, আর কখন বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার চেষ্টা না করিলে, তিনি তাহাদিগকে, বাঙ্গালার করস্বরূপ, বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। এসকল কথা বাঙ্গালার ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

কেবল যে মারাঠা সৈন্যগণই প্রজাগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত, তাহা নহে। আরাকান প্রদেশের মগদস্যুগণও, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গে উপদ্রব করিতেছিল। তাহাদেরই অত্যাচারের ফলে, দক্ষিণবঙ্গের সমৃদ্ধজনপদচয় সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছিল। এই মগদস্যুগণ, কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইত না; ইহারা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণদিগের জাতিনাশ করিতে চেষ্টা পাইত। ফলে, এই সময়ে, মারাঠা ও মগদস্যুদিগের উৎপীড়নে, বাঙ্গালার নিরীহ অধিবাসীবৃন্দ নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের ধনপ্রাণ আদৌ নিরাপদ ছিল না। দেশে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুর্দ্দিনে, গ্রামবাসিগণের দুঃখে কাতর হইয়া, তাহাদের হিতার্থে, একজন সামান্য বাঙ্গালী জমীদার, এই মগ ও মারাঠাতস্করদিগের বিরুদ্ধে অসি-ধারণ করিয়াছিলেন;—তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র খাঁ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং "গুড়"-উপাধিধারী ছিলেন। মধ্যবঙ্গ রেলপথে, বেনাপোল-নামক ষ্টেশন

হইতে, অর্দ্ধক্রোশ উত্তরমুখে গমন করিলে, রাজা রামচন্দ্রের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এই বেনাপোল একটি সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রামরূপে বিরাজ করিত—রামচন্দ্র খাঁ তাহার মালিক ছিলেন। কপোতাক্ষতীরে, চাঁদখালি নামধেয়, তাৎকালিক এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থানও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। সেই ভীষণ বিজাতীয় অত্যাচারের দিনে, এই প্রবল প্রতাপ জমীদার, যথাসাধ্য দেশবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার অধীনে বহুসংখ্যক পাইক সৈন্য এবং কতিপয় অস্ত্রধারী শিক্ষিত সৈনিকও ছিল।

রামচন্দ্র একদিন দূতমুখে শুনিলেন যে, মগদস্যুগণ চাঁদখালি লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র, তিনি দ্রুত সৈন্য-চালনা করিলেন; কিন্তু, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, সে দিন আর চাঁদখালিতে পৌঁছিতে পারিলেন না! রামচন্দ্র, পরদিন উষাকালেই সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন—সৈন্যেরা, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, ভীমবিক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করিল; মগেরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে চাঁদখালি হইতে দূর করিয়া দিলেন—গ্রামে শান্তি বিরাজ করিল। পলাতক গ্রামবাসিগণ, একে-একে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া, নূতন কুটীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র, একপক্ষকাল তথায় উপস্থিত থাকিয়া, প্রজাগণের সব সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে, তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে, রণক্লান্ত সৈন্যগণ, প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্ব-স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

পরদিনই রামচন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, মারাঠাগণ, দেশ-লুণ্ঠনের উদ্দেশে, গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এ বৎসর তাহারা সংখ্যায় বিস্তর ছিল। রামচন্দ্র, অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সৈন্যসংগ্রহ করিয়া, যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। ইছামতীর তীরে দুই দলের সংঘর্ষ ঘটিল। রামচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার দলস্থ অনেক সৈন্য নিহত হইল।—বাঙ্গালীর সৌভাগ্যরবি ইছামতীর নীলাভজলে অস্তমিত হইল!

সে সময়, অনেক জমীদারের গৃহমধ্যেই, মৃত্তিকাগর্ভে একটি গুপ্তগৃহ, বা 'পাতরাজ' থাকিত। শত্রুগণ, বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিলে, এই ঘরের অস্তিত্ব কিছুতেই জানিতে পারিত না। তবে, প্রধান অসুবিধা এই ছিল যে, ভিতর হইতে ইহার দ্বাররুদ্ধ করিবার উপায় ছিল না—বাহির হইতেই বন্ধ করিতে এবং বাহির হইতেই খুলিয়া দিতে হইত। মহারাঠাগণ তাহার প্রাসাদোপম বাটী আক্রমণ করিলে, রামচন্দ্র, নিরুপায় হইয়া, সপরিবারে এই গুপ্তগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার কালু নামে এক বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য ছিল। সেই, প্রভুর গুপ্তগৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী এক নারিকেল বৃক্ষে লুক্কায়িত রহিল—শত্রুগণ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলেই, সে গুপ্তগৃহের দ্বার খুলিয়া দিবে। মারাঠাগণ, রামচন্দ্রের প্রাসাদ লুঠ করিয়া, সব লইয়া গেল। তখন কালু, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, বংশীধ্বনিদ্বারা প্রভুকে সঙ্কেত করিল যে, শত্রুরা চলিয়া গিয়াছে।—কিন্তু, দুরদৃষ্টবশতঃ, দুইজন মারাঠা সৈন্য পশ্চাতে পড়িয়াছিল। তাহারা, বংশীরব শুনিয়া, সকলস্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শেষে, নারিকেল বৃক্ষোপরি সেই ভৃত্যকে দেখিয়া, তাহাকে শরবিদ্ধ করিল। কালু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দীঘিতে পড়িয়া গেল! গুপ্তগৃহ চিরতরে রুদ্ধ-দ্বারই রহিয়া গেল! সাতদিন পরে, গ্রামবাসিগণ ফিরিয়া আসিয়া, গুপ্তগৃহের অনেক অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। রামচন্দ্র খাঁ, সপরিবারে, সেই গুপ্তগৃহেই জীয়ন্তে সমাধি নিহিত রহিয়া গেলেন! শিশুর কাতর ক্রন্দনে, স্ত্রীলোকের আকুল বেদনে, পাতরাজ যে কিরূপ করুণা-মুখরিত হইয়াছিল?—অনাহারে ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, তাহারা যে "কালু!—কালু!"-বলিয়া প্রাণপণে কি মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে!

রামচন্দ্রের পরিজনসহ জীয়ন্ত সমাধি হইল;—তাহাদের স্মৃতি এখনও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। রামচন্দ্রের প্রাসাদ-গড়ের ভগ্নাংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গুপ্তগৃহের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। যে নারিকেল বৃক্ষে কালু লুক্কায়িত ছিল, অতীতের সাক্ষীস্বরূপ, সে বৃক্ষ এখনও দণ্ডায়মান। যে দীঘিতে কালুর মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সে দীঘিটি, "কালুর দীঘি"-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জনশ্রুতি যে, আজিও, গভীর নিশীথে, গুপ্তগৃহ হইতে, কাহার

উচ্চৈঃধ্বনি নিঃসৃত হয়—"কালু ! আমাদিগকে বাহির কর !" আর, সেই অন্ধকার মধ্যে প্রেতবৎ দণ্ডায়মান, উচ্চশীর্ষ নারিকেলবৃক্ষ, সমীরণে আন্দোলিত হইয়া, যেন বলিতে থাকে, "আর তোমাদের বাহিরে আসা হইবে না ; বাঙ্গালীর সাহস-সুষমা ঐ পাতালপুরেই নিহিত থাকুক্ !"

ভাই-বোন

[শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী]

আমাদের ভাই বোনে এত ভালবাসা—
প্রকাশ করিতে তার নাহি আছে ভাষা,
শৈশবের হাসি-খেলা,
আনন্দের মহা-মেলা,
আজিও স্মৃতির দ্বারে মধুর নিক্কণে
বাজিয়া উঠিছে নিত্য স্নেহের মিলনে।

জীবনের কোনখানে ব্যবধান নাই—
প্রাণখোলা বিশ্বভোলা আনন্দ সদাই,
একত্র হইলে পর—
আবার সে খেলা-ঘর
মনে পড়ে, ফিরে আসে শৈশব-জোয়ার,
দুঃখ-দৈন্য ভাসি যায় অকূলের পার।

কথা নাই—কথা আছে আদিঅন্তহীন,
কহিতে-শুনিতে কেটে যায় সারাদিন,
তবু মনে হয় যেন,
বাকী আছে ঢের হেন,
শৈশব-কৈশোর কথা নহে পুরাতন,—
ভাই-বোনে দেখা হ'লে ত্রিবেণী-সঙ্গম।

সুখের দিনের সুখ অসীম—অপার—
ভাগভাগী নাহি তার, সব আপনার ;
দুঃখ যদি কভু আসে,
চিত্তের প্রসাদ নাশে,
ভাসাইয়া ল'য়ে যায় গভীর অতলে—
কে কারে সান্ত্বনা দিবে সমদুঃখ হ'লে ?

আমাদের ভাই-বোন একডোরে বাঁধা—
কে ছিঁড়িবে স্নেহসূত্র, কে আনিবে বাধা ?
হৃদয়ে অনন্ত প্রীতি
উচ্ছ্বাসে বহিছে নিতি,
ভাটা নাই—অমানিশা দিলে দরশন,
পূর্ণিমা-জোয়ারে খেলে স্নেহের পবন।

তুমি-আমি, দুই কথা আমাদের নাই,
তোমার-আমার ভিন্ন দেখিতে না পাই,
ছায়া নাই মাঝখানে,
প্রাণের মিলন-তানে,
জীবনের সব এক, একই ভালবাসা,
——উপমা দিতে নাহি আছে ভাষা !

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—১৩২২

স্নেহের বন্ধন

স্নেহ ডোরে বদ্ধ বিচিত্র পরিবার

আমরা সকলেই অনেক 'সুখী-পরিবার' দেখিয়াছি—বেশ পাঁচজনায় মিলে সুখে বাস করিতেছে, ঝগড়া-গালাগালি নাই, হিংসা-দ্বেষ নাই—যেন তাহারা অভিন্নহৃদয়! কিন্তু, মনে করুন, যদি একটি বিড়ালের নিকট একটি ইঁদুর ছাড়িয়া দেওয়া যায়, অথবা একটি সর্প ও নেউল একত্রে রাখা যায়—তাহা হইলে, কিরূপ দৃশ্য হয়!—রক্তারক্তি—মারামারি!—ওঃ! সে কি বিভৎস দৃশ্য!—তবে, পোষ মানাইয়া, শিক্ষা দিলে, অবশ্য এরূপ, অনেক সময়, ঘটে না বটে; কিন্তু, তথাপি, আপনি নিশ্চিত বলিতে পারেন না যে, তাহারা বেশ আরামে—একত্রে বাস করিবে। সেটা, অনেকটা তাহাদের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। আমাদের ন্যায়, তাহাদেরও ইচ্ছা-অনিচ্ছা, হিংসা-দ্বেষ—ইত্যাদি আছে; তাহারাও যে রিপুর অধীন!

অনেক সময়, বিভিন্নশ্রেণীর পশুরাও আপনা-আপনি, পরস্পরের মধ্যে, এমন বন্ধুত্ব পাতাইয়া ফেলে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা একশ্রেণীরই জীব! এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল।—

একটি হিংস্র, ভীষণ বুলডগ ও একটি ক্ষুদ্র বানরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল; সকলেই ভাবিত, কুকুরটা কখন বাঁদরটিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিবে! কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, কুকুরটি, বানরটির, ভক্ষক না হইয়া, রক্ষক হইয়া পড়িল। পার্শ্বের প্রতিকৃতিটিতে দেখিতে পাইবেন, কিরূপ সুখে ও নির্ব্বিবাদে বানরটি বুলডগটির কোলে শুইয়া, পায়ের উপর মাথাটি রাখিয়া, ঘুমাইতেছে এবং বুলডগটি মাঝে-মাঝে একটি চোখ চাহিয়া দেখিতেছে যে, কেহ বানরটির অনিষ্ট করে, কি না।

কুকুরের ক্রোড়ে নিদ্রামগ্ন বানর

দুর্ব্বলকে রক্ষা করা প্রবলের ধর্ম—পশুপক্ষিদিগের মধ্যেও সে নীতি রক্ষিত হয়। একদা, দুটি বানরকে, জাহাজে করিয়া, কোন দেশে লইয়া যাওয়া হইতেছিল; পথিমধ্যে, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতরটি, দৈবক্রমে, দড়ি ছিঁড়িয়া, জাহাজ হইতে জলে পড়িয়া যায়; পড়িবামাত্র, অপর বানরটি তাড়াতাড়ি জাহাজের ধারে গিয়া, যে দড়ি দিয়া সেইটি বাঁধা ছিল, তাহা জলে ফেলিয়া দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দড়ীটি ছোট ছিল; সুতরাং, বানরটির চেষ্টা বৃথা হইল। পরে, একটি নাবিক, লম্বা একগাছি দড়ী ফেলিয়া দিবামাত্র, তাহা ধরিয়া সে উপরে উঠিয়া আইসে।

পশুপক্ষীর এরূপ জ্ঞানের, বুদ্ধির পরিচয় অনেক পাওয়া যায়। এইসকল দেখিয়া, মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদয় হয়, 'তাহারা মানুষ অপেক্ষা হীন কিসে?' একটি বিভিন্নশ্রেণীর

পশুকে আর-একটি পশু পালন করিতেছে—দেখিলেও, প্রত্যুত, কি এইরূপ মনে হয় না?

জনৈক কৃষকের একটি কুকুর ছিল; সে তিনটি বিড়াল-ছানা লালন-পালন করিয়াছিল। ছানাগুলির মাতা, এক শীকারীর গুলিতে প্রাণহারায়; আর, সেই দিন হইতেই, কুকুরটি নিজের খাদ্যদ্রব্য হইতে তাহাদিগকে ভাগ দিয়া, 'মানুষ করিয়া' তুলিয়াছিল।

কলহশীল দম্পতির কথায়, ইংরাজিতে লোকে বলিয়া থাকে, 'Oh! they live a cat and dog life!' বুঝুন, কুকুর-বিড়ালের পরস্পর কি সম্বন্ধ! কিন্তু আমি আরএকটি বিবরণ দিতেছি, তাহাহইতে দেখিতে পাইবেন যে, তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিতেও জানে। একটি বুলডগ একটি বিড়ালকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল—'ভালবাসা' ভিন্ন, আর-কি বলা যায়, বলুন? সে, যখন কাহাকেও নিকটে আসিতে দেখিত; তখন, তাহার থাবার মধ্যে বিড়ালটিকে রাখিয়া, আগন্তুকের প্রতি এরূপ কট্-মট্ করিয়া তাকাইত, যেন মনে হইত, সে বলিতেছে, 'কি! এতদূর আস্পর্দ্ধা, আমার কাছে ও-রহিয়াছে, তা' সত্বেও তুমি ও'র কাছে আসিয়াছ!'

কুকুরপালিত সিংহশিশু বালকপালিত মেষশাবক

আবার শুনা যায়, লর্ড রোজবেরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার একটি কুকুর আছে; সেও, আমাদিগের প্রোক্ত বুলডগের ন্যায়, একটি ছোট বিড়ালছানাকে ভালবাসিয়াছিল। বিড়াল ছানাটি তাহাকে রাগাইত, বিরক্ত করিত—এমন কি, বোধ হইত মধ্যে-মধ্যে যেন শাসন করিতেছে! কুকুরটি, ইচ্ছা করিলে, তাহাকে একগ্রাসে উদরস্থ করিতে পারিত; কিন্তু, ফুলধনুধারী দেবতার প্রভাবে, সে-ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না;—বরং, তাহাকে আদর করিতে সমুৎসুক হইত।

একবার, এক দুষ্টবালক একটা বিড়ালছানাকে জলে ফেলিয়া দেয়। একটি টেরিয়র কুকুর, তাহার ছানাগুলিকে স্তন্যদান করিতে-করিতে, ইহা দেখিল; সে, তৎক্ষণাৎ, জলে পড়িয়া, মুখে করিয়া, তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া, আপন সন্তানের ন্যায় তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তদবধি, সে, তাহার ছানাগুলির সহিত, স্তন্য দিয়া উহাকে লালন পালন করিয়াছিল। হায়রে মায়ের হৃদয়! ইহাকেও কি ইতরজীবের স্বাভাবসিদ্ধ বুদ্ধি (instinct) বলিতে হইবে?

পশুপক্ষীরা যে, ইচ্ছা হইলেই, অপর শ্রেণীর পশুর শাবক লালন-পালন করে, তাহা নয়। কারণ, একবার কতকগুলি নকুলের শাবককে, একটি মুরগির ছানাগুলির সহিত রাখিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয়, মুরগির ছানাগুলির, নকুলের ছানা হইতে বিভিন্নাকৃতির হইলেও, মুরগিটি নকুলের ছানাগুলিকে লালন পালন করিত এবং যখন তাহারা একটু বড় হইল, তখন সে, কট্ কট্ শব্দ করিয়া, তাহাদিগকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিত। কিন্তু, তাহারা, যাইতে অনিচ্ছুক থাকায়, গোঁৎ গোঁৎ করিয়া রব করিত। সুতরাং, মুরগিটি, ফিরিয়া গিয়া, তাহার এই ছোট পরিবারটির প্রতি, গর্ব্বের সহিত, দৃষ্টিপাত করিতে থাকিত। পরে, এই মুরগিটিই, তাহাদের পালয়িত্রী-মাতা হইল এবং, যদি কেহ শাবকগুলিকে লুকাইয়া রাখিত, তাহাহইলে, সে ছট্-ফট্ করিয়া বেড়াইত এবং, তাহাদের গলার স্বর শুনিবামাত্র, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিত।

শুনিতে পাওয়া যায়, বিড়ালেরা সন্তান-পালনে খুব দক্ষ;

বিশেষতঃ, তা ের ছোট হাঁসের ছানা প্রতিপালনের দক্ষতা দেখি . মনে হয়, যেন উহারা বড়ই স্নেহশীলা—

ছু'টী মুরগীর ছানার বিড়াল-প্রীতি

স্নেহের বন্ধনে উহারা এমনি জড়িত যে, সে বন্ধন-মুক্তির উপায় উহাদের নাই—উহাদের মধ্যে এমনই-একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে! কিন্তু মুরগির ছানা, প্রতিপালনে উহারা বিমুখ। তবে, শোনা যায়, একটি বুড়ি বিড়াল একদা দুটি মুরগির ছানা প্রতিপালন করিয়াছিল। সম্প্রতি এক-থানি বিলাতী সংবাদপত্রে পশু-পক্ষী প্রীতির একটি সুন্দর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্ণোয়্যল-প্রদেশীয় একগ্রামের একটি বিড়াল, কতকগুলি কোকিলজাতীয় পক্ষীর উপর অনুরক্ত হইয়া পড়ে, এবং বেশ আরামে একত্রে বাস করিতে থাকে!—কি সুন্দর মিলন—বিড়াল ও পক্ষী—খাদ্য ও খাদক।

নিম্নে আর-একখানি ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—দেখিবেন, একটি বিড়াল একপাল হাঁসের ছানাকে লইয়া বসিয়া আছে! আপনারা বলিতে পারেন যে, সে, আপন শাবক ভাবিয়া, মানুষ করিতেছে! হাঁ, তাহা হইতে পারে! কিন্তু একটি কাল গরু যে একটি শূকর-ছানাকে স্তন্য দিতেছে, তাহা তো আর তাহার ভ্রম বলিতে পারেন না! কারণ, শূকর-ছানা ও গো-বৎসে প্রভেদ অনেক! দুঃখের বিষয়, কিছুদিন এইরূপ স্তন্য দিবার পর, যাহার গরু, সে অনুসন্ধান করিয়া, সকলঘটনা জানিতে পারিয়া, শূকর-ছানাটিকে তাহার নিকট হইতে পৃথক করিয়া দিল; হতভাগ্য, শূকর-ছানাটি, গো-দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত হইল!

বিড়াল পালিত হংসশাবককুল

হংসশাবকদিগের বিড়াল-প্রীতি   গো-স্তন্যপায়ী শূকর-শাবক

চিড়িয়াখানায় এরূপ পালয়িত্রী-মাতা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, নিউইয়র্কে একটি পরিত্যক্ত ভল্লুক-শাবককে এক কুকুরে পালন করিয়াছিল। উক্ত শাবকের প্রতি তাহার এমন মায়া জন্মিয়াছিল যে, তাহার একটু চীৎকারধ্বনি শুনিলে, সে মুখের গ্রাস ফেলিয়া, তাহার নিকট ছুটিয়া যাইত!

আর-একটি ঘটনা বলিতেছি—সাউথপোর্ট চিড়িয়াখানায় পাঁচটি সিংহ-শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ঐ চিড়িয়া-খানার রক্ষকের একটি কুকুরের একটি-মাত্র বাচ্চা, দু-একদিন পূর্ব্বে, মরিয়া গিয়াছিল; কুকুরটি, সিংহের পাঁচ-পাঁচটি বাচ্চা দেখিয়া, মনে-মনে, বোধ হয় ভাবিল, 'কি অন্যায়! আমার একটিও শাবক নাই; আর, উহার

অতগুলি শাবক !' চিন্তামাত্রেই, সে সিংহীর একটি শাবক চুরি করিল। পরে, তাহাদিগকে পৃথক্ করা শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সিংহ-শিশুটি, অনেক্‌দিনযাবৎ, কুকুরটির নিকট ছিল।

আমেরিকায় আর-একটি এইরূপ পশু-প্রীতির বিবরণ দিতেছি—ব্যাপারটি বাস্তবিক বড়ই করুণ। সিন্‌সিনাটি পশুশালায় 'প্যাট্' ও গ্রানি-রনি' নামে দুটি অতি বুদ্ধিমান সিম্পাঞ্জি ছিল। তাহাদিগকে স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় পোষাক পরিতে ও চেয়ার টেবলে বসিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন;—তাহারা, কাঁটা-চামচ লইয়া, সাহেব-বিবির ন্যায়, বেশ মজা করিয়া খাইতে পারিত।

কুকুরদিগের সহিত পালিত খেঁকশেয়ালী

যদি কোনদিন 'গ্রানি'র অসুখ করিত, তাহা হইলে, 'প্যাট' তাহাকে জুড়াইয়া ধরিয়া আদর করিত, শুশ্রূষা করিত, যত্ন করিত,—একের কান্না অপরে প্রাণপণ দিয়া করিত—মোটের উপর তাহারা অভিন্ন-হৃদয় ছিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথায়? 'প্যাট্' যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিল; 'গ্রানির' দুঃখের শেষ রহিল না; দু-মাস সে কিছুই খাইল না; প্রিয়তমের বিরহে সে বড়ই কাতর হইল। অবশেষে দুজনায় শান্তিধামে পুনর্ম্মিলিত হইল।

কুকুর-পালিত ব্যাঘ্রশিশু
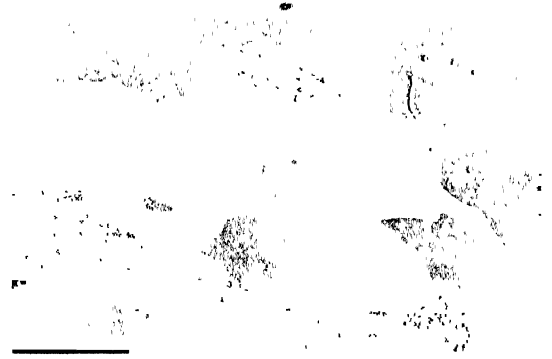
কুকুরে, ব্যাঘ্র-শাবককে স্তন্যদান করিয়া, লালন-পালন করিয়াছে—খেঁকশেয়ালীর শাবককে প্রতিপালন করিয়াছে —এমন সকল উদাহরণও নিতান্ত বিরল নহে। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের স্নেহবন্ধনে বদ্ধ একটি কুকুর ও বাঁদর আছে।

প্রকাশ ও গোপন

[শ্রীআমোদিনী ঘোষ]

প্রকাশ কহিল, ডাকি গোপন-চেষ্টারে,
"অয়ি মূঢ়ে ! আজ তুমি এস একধারে।
মিলিয়াছে বধূ-বর বাসর-শয়নে,
দীপেরে কোরো না ছায়া ; নয়নে নয়নে
উভয়ের হৃদি দোঁহে করিবেক পাঠ—
আজ রেখে দাও তব পুরাতন ঠাট।"
কহিল গোপন চেষ্টা—"আলোকে-বাহিরে
ভাবেরে পাবে না খুঁজি, আঁধার-কন্দরে
মতলেতে নীড় তার, আমি সে দুয়ারী,
তুমি যেথা ব্যর্থ—সেথা সাফল্য আমারি!"

পুস্তক-পরিচয়

দেবী রাবিয়া

[মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন-প্রণীত ;
মূল্য বাঁধাই, বারআনা ।]

দেবী রাবিয়া বসোরা নগরীর এক ক্ষুদ্র পল্লীতে দরিদ্র ইসলামের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে রাবিয়ার মাতৃবিয়োগ হয়। কৈশোরে তাঁহার পিতাকে দস্যুরা ধরিয়া লইয়া যায়। রাবিয়া, গ্রামের দশজনের কৃপায়, বাঁচিয়া থাকেন। তাহার পর, দস্যুরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া, ক্রীতদাসী করে। সেখানে তিনি অশেষ যন্ত্রণা পান। এইভাবে তাঁহার জীবন গঠিত হয়। নানাপ্রকার বিপদ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্য দিয়া, রাবিয়া ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করেন। সেই শিক্ষার ফলেই, দরিদ্র-কন্যা রাবিয়া, 'দেবী রাবিয়া' হন। যেমন পবিত্র এই জীবন, তেমনই যিনি এই জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন, তিনিও পরম পবিত্রচিত্তে, ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে লেখনী-সঞ্চালন করিয়াছেন। আমরা এই মুসলমান-মহিলার লিপিকুশলতা, বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে পুলকিত হইয়াছি ; এবং তিনি যে পবিত্রহৃদয়া ও ধর্ম্মপিপাসু, তাহা এই সুন্দর পুস্তকখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য, হিন্দু মুসলমান—সকলকেই অনুরোধ করি।

ম্যাডাম গেঁয়ো

[শ্রীনিঝরিণী ঘোষ-প্রণীত ;—মূল্য, কাপড়ের মলাট, একটাকা।]

যাঁহারা ফরাসী কশ্মবীর, ধর্ম্মবীরদিগের ইতিহাস অবগত আছেন—যাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসের সহিত পরিচিত—তাঁহারা ম্যাডাম গেঁয়োর নাম নিশ্চয়ই

ম্যাডাম গেঁয়ো

অবগত আছেন। শ্রীমতীনিঝরিণী ঘোষ-মহাশয়া সেই দেবীকল্পা মহনীয়া মহিলার জীবনকথা, সরল ও সুন্দর ভাষায়, বিবৃত করিয়াছেন। ধীরে-ধীরে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, এ মহিলার ধর্ম্মজীবন কিভাবে গঠিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিবরণ এই পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাধনপথের পথি মাত্রেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিবেন। ধর্ম্মপিপাসু মহিলাদিগের জীবন-কথা আমাদের দেশে যত অধিক পঠিত হয়, তত মঙ্গল। আমরা, এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

অম্বা

['আলো ও ছায়া'-প্রণেতৃ-প্রণীত ;—মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।]

'আলো ও ছায়া' নামক উৎকৃষ্ট কবিতা-পুস্তকখানি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কোনদিনই নাম প্রকাশ করিলেন না ; কিন্তু, যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা, সে নাম জানেন এবং সে নাম বিশেষ সম্মানের সহিতই উচ্চারণ করেন। আমরাও 'আলো ও ছায়া'র লেখিকা বলিয়া তাঁহার পরিচয়-প্রদান করিয়াই বিশেষ গৌরব অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার এই 'অম্বা' নামক নাট্য-কাব্য পাঠ করিয়া, অতঃপর, অসঙ্কোচে তাঁহাকে 'অম্বা'-প্রণেতৃ বলিয়াই শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করিব। এই নাট্য-কাব্যখানি এমন সুন্দর হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিতেছে—ইহার সমস্তটা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া—বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদিগকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিই কিন্তু আমরা তাহা করিব না ; যিনি প্রকৃত সাহিত্য-রস উপভোগ করিতে চান, যিনি একখানি নাটকের মত নাটক পড়িতে চান, যিনি মহাভারতের সেই তেজস্বিনী মহিলা 'অম্বা'র অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে চান, যিনি শ্রদ্ধেয়া লেখিকার শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় গ্রহণ করিতে চান, তিনি, পাঁচসিকা পয়সা ব্যয়ে, এই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া, পাঠ করুন—দেখিতে পাইবেন, বঙ্গমহিলা বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া, একজন তরুণ পাঠক বলিয়াছিলেন, 'It is too antiquated for modern taste'—অর্থাৎ, 'বর্ত্তমান রুচিতে ইহা গৃহীত হইবে না'। আমরা একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি ; আর, যদিই স্বীকার করি, তাহা হইলে, বলিব যে, আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য উপস্থিত—আমরা অধঃপতিত—তাই, ইহা আমাদের পক্ষে রুচিকর নহে! আমাদের মতে, এই নাট্য-কাব্যখানি প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া উচিত ; যাঁহারা, সখের দল করিয়া, মধ্যে মধ্যে নাট্যাভিনয় করেন, তাঁহারা এখানির অভিনয় করিতেছেন না কেন ?

আরো গল্প

[শ্রীসুখলতা রাও-প্রণীত ;—মূল্য আটআনা।]

নানাদেশীয় রূপকথা অবলম্বনে এই গল্পগুলি লিখিত। লেখিকা আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থপরিচিতা নহেন; তাঁহাকে এই গল্প-লেখার ক্ষেত্রে ইতঃপূর্ব্বেই আমরা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছি। তাই, তিনি আমাদের জন্য 'আরো গল্প' লিখিয়াছেন; আমরা তাঁহাকে 'আরো-ও গল্প' লিখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি এবং এই 'আরো গল্পে'র সোনার পুতুল, বামনবুড়ো, ফুলরাণী—কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টার নাম করিব—সবগুলি পাঠ করিয়া, পাঠকগণও যে, আমাদের এই অনুরোধে যোগদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছেলেমেয়েদের বাপ-খুড়োরাই যখন, এই গল্পগুলি পড়িয়া, আনন্দ উপভোগ করিতেছেন—তখন, ছেলেমেয়েরা যে ইহা প্রকৃতপক্ষেই উপভোগ করিবে, তাহা অণুমাত্রও বিচিত্র নহে। এই বইখানির আর-একটি বিশেষত্ব আছে—ইহাতে যেসমস্ত ছবি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই লেখিকার স্বহস্তাঙ্কিত। আমরা, আমাদের পাঠক-

শ্রীসুখলতা দেবীর অঙ্কিত 'আরো গল্পে'র একখানি চিত্র

পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার নিমিত্ত, লেখিকা মহোদয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়াই, এই বই হইতে একখানি ছবি তুলিয়া দিলাম। ইহা দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে—লেখিকা, শুধু কথায় ছবি আঁকিতেই পারদর্শিনী নহেন, রেখা-সম্পাতে ছবি আঁকিতেও তিনি সুনিপুণা।

সরল প্রসূতি-দর্পণ

[মিসেস পি. দাস-প্রণীত ;—মূল্য একটাকা মাত্র।]

এই পুস্তকখানি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার পূর্ণ নাম আমরা পুস্তকে পাইলাম না। তিনি যে ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞা, তাহা, এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়াই, বুঝিতে পারা যায়। তিনি শুধু কেতাব পড়িয়া বইখানি লেখেন নাই; নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই সমস্ত কথা লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি বেশ সরল ভাষায় লিখিত। আমাদের দেশের মহিলাগণ, এই পুস্তক পাঠ করিয়া, বিশেষ উপকৃতা হইবেন,—কেবল মহিলাগণ কেন?—চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থী যুবকগণও এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। পুস্তকখানি যে কেমন সুন্দর হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে এক স্থানের মর্ম্ম কতকটা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন—'পূর্ব্বে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার আগেই, উঠানে কিংবা তাহার সংলগ্ন কোন স্থানে, একখানি চালা বাঁধিয়া, তাহাই সূতিকাগৃহ-রূপে ব্যবহার হইত। এখনও, অনেকস্থানে, যে-ঘরখানি সকল-অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাই সূতিকাঘর করা হয়। অধুনা, পাশ্চাত্য-সভ্যতাফলে, সেই দোষটি ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। এখন অনেকে প্রসবঘরখানি বাছিয়া লইয়া থাকেন।—গৃহস্থ ও প্রসূতির সুবিধামতে, ঘরখানি শুষ্ক, পরিষ্কার—এবং অনবরত বাতাস আসা-যাওয়া করিতে পারে, অথচ প্রসূতি ও শিশুর গায়ে সোজাভাবে হাওয়া না-লাগে—এমন একখানি ঘর প্রসবার্থে লওয়া উচিত। ঘরখানি প্রসর ও দুর্গন্ধবিহীন হওয়া আবশ্যক। প্রসবকালে সূতিকাগৃহে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত, ধাত্রীসহ দুই-তিন জনের অধিক লোক থাকা অবিধেয়।

সুস্থ-প্রসবে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদিয়া উঠে,—ইহা একটি সুলক্ষণ। যে শিশু নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, শিশু সজীব, নির্জ্জীব কিংবা অবসন্ন। অনেক সময় দীর্ঘকাল প্রসব বেদনার পরে, বা প্রসূতির জরায়ুদোষ থাকিলে, শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়—রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া, শ্বাস প্রশ্বাস লুপ্ত প্রায় হয়, এবং শিশু কাঁদে না। এরূপ ঘটিলে, নাড়ী না কাটিয়া, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে, মুখ ও গলার মধ্যে যেসমস্ত শ্লেষ্মা, বা কফ, ও লালা থাকে, তাহা সত্বর পরিষ্কার করিয়া, শিশুর মুখে ফুঁ দিবে এবং তৎসঙ্গে দুই পাঁজরাতে মৃদুভাবে চাপ দিবে, বগলে ও বুকে ব্রাণ্ডি-মিশ্রিত সরিষার-তৈল মালিশ করিবে। ৪।৫ ফোঁটা ব্রাণ্ডি, চা'য়ের চামচের এক-চামচ জলের সহিত মিশাইয়া, শিশুর মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতেও যদি না-কাঁদে, তবে, নাড়ীটি কাটিয়া, কাপড়ের একটি পুঁটুলি করিয়া—কিংবা, একটি ছোট বালিস—শিশুর ঘাড়ের নীচে রাখিয়া, যেন মাথাটী (Sylvester's method) ঝুলিয়া থাকে, এমন ভাবে রাখিয়া, হাত দুইখানি মাথার উপর লইয়া, পুনরায় নামাইয়া, হাতসহ দুই পাঁজরে মৃদুভাবে চাপ দিবে। শীতলজলে কাপড় ভিজাইয়া, বুকেপিঠে, ঈষৎ জোরে সঞ্চালন করিবে; চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিবে—তাহা হইলেই, শিশু কাঁদিয়া উঠিবে; তখন দেখিবে, শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে—আর ভয় নাই।

'যদি এইরূপে কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, তবে, একটা গামলায় শীতল জল, আর-একটী গামলায়—হাত-সহ্য হয়, অথচ একটু কড়া রকমের—গরম জল রাখিবে। প্রথমে, শিশুকে, গরম জলে পা হইতে গলা পর্য্যন্ত

ডুবাইয়া—মাথাটি না ডুবে—দুই-এক মিনিট রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ আবার, ঐভাবে ঠাণ্ডা জলে ডুবাইবে। এইরূপ বার দুই-তিন করিলেই, শিশুর চেতনা হইবে;—কখন-কখন ঐরূপ একবার করিবার পরই শিশু কাঁদিয়া উঠে; আর কিছু করিতে হয় না।

'না-হয় ত, দুই পা ধরিয়া, মাথা নীচে ঝুলাইয়া, শীঘ্র-শীঘ্র নীচে-উপর করিয়া, ধীরে ধীরে ঝাঁক্‌রাইয়া পাছায় বারকতক চপেটাঘাত করিলেই শিশু কাঁদিয়া উঠে। বলা বাহুল্য যে, এইসকল প্রক্রিয়া, অতি প্রশস্তস্থানে ও খোলাবাতাসে, অতি শীঘ্র-শীঘ্র করিতে হইবে; যতক্ষণ শিশুর শরীরে কিছুমাত্র উষ্ণতা থাকে, ততক্ষণপর্য্যন্ত, হতাশ না-হইয়া, চেষ্টা করা বিধেয়। জন্ম গ্রহণের পর, কোন-কোন শিশুর মাথা চেপ্টা বা বিকৃত হয়, প্রসব-সময় পেলভিক অস্থি ও জরায়ুর চাপ মাথায় লাগিলে, এইরূপ হইয়া থাকে; এজন্য উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই, ইহা আপনিই সারিয়া যায়।

'শিশুকে প্রথম হইতে গো-দুগ্ধ প্রভৃতি খাওয়াইবার কোন প্রয়োজন নাই; স্তন ধৌতকরিয়া, তাহা শিশুর মুখে দিলে, আহার এবং ঔষধ—দুই-ই হয়। কারণ, সেই সময়, স্তনে যে দুগ্ধ থাকে, তাহা শিশুর পক্ষে 'ক্যাষ্টর-অয়েলে'র কার্য্য করে; সুতরাং, শিশুকে 'ক্যাষ্টর অয়েল' দিবার প্রয়োজন হয় না। স্তনে দুগ্ধ না-থাকিলেও উপবাসের আশঙ্কা নাই। বিধাতার এমনই সৃষ্টি যে, প্রসবের পরে তিনদিন মাতার স্তনে ভাল দুধ থাকে না; তাহাতে শিশুদের বিশেষ-কিছু ক্ষতিবোধ হয় না। ঐ তিনদিবস তাহারা শান্তিতে নিদ্রা যাইতে ভালবাসে। কিন্তু, এখনকার সূতিকাগৃহ, যেন ইংলিশ বলরুম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সেখানে তাস-খেলিয়া, গল্পকরিয়া, এবং অনেকে, দেখিতে আসিয়া, প্রসূতি ও শিশুর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটায়। ইহাতে, প্রসূতি ও শিশু কখনই বিশেষ ভাল থাকিতে পারেন না; থাকিলেও প্রসূতির চিত্ত সুস্থির থাকে না—একপ্রকার মৃদু-উত্তেজনা হইয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ও স্তনদুগ্ধহীনতা জন্মে। প্রাচীনেরা, কি আমরা, এবিষয় কিছু বলিলেও, নব্যসম্প্রদায় বড়-একটা গ্রাহ্য করেন না! এইরূপে, ধাত্রীদের অদৃষ্ট-জোরে, তাঁহারা যদি সারিয়া উঠেন—ভাল; নচেৎ, দুর্ভাগিনী ধাত্রীদিগের বিড়ম্বনার একশেষ হয়!

'নবপ্রসূত-শিশুর নাড়ী-বাঁধা ও স্নানের পর, তাহা যেরূপে 'ড্রেস' করার ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ করিয়া, মাতার নিকট দিলে, শিশু আপনিই ঘুমাইয়া পড়ে; অতএব, দুধের নিমিত্ত তাহাকে বিরক্ত করা বিধেয় নহে। নবজাত-শিশুর নিদ্রাই একান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ; সূতিকা গৃহে, মাতা ও শিশু যত নিদ্রা যাইবেন, ততই তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে।

'ইংরাজ-প্রসূতিরা আপন বিরাম নষ্ট হইবে বলিয়া, শিশুকেও নিজের কাছে রাখেন না; স্তন্যপান করাইবার সময়, ধাত্রী, শিশুকে মাতার নিকট লইয়া যান; তাহাতে, মাতা ও শিশু—উভয়েই স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করেন। আমাদের দেশীয় স্ত্রীদের মধ্যে, অনেকে সূতিকাগৃহে নাটক নভেল পড়িয়া থাকেন, কিংবা, কিছু সেলাই করিয়া, বা গল্প করিয়া, সময় কাটাইতে ভালবাসেন। তাহা অতীব অনুচিত;—কেননা, প্রসবকালে, যন্ত্রণা ও রক্তক্ষয়হেতু, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; সুতরাং, এসময় নিস্তব্ধভাবে বিশ্রাম করিয়া, তাহার ক্ষতিপূরণ করাই বিধেয়—একথা অনেকেই ভুলিয়াও একবার চিন্তা করেন না!— ইহার ফলে, সূতিকাগৃহের বাহির হইতে-না-হইতেই একটা-না-একটা কিছু দুর্নিমিত্ত ঘটে!'

জ্যোতিঃহারা।

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী-প্রণীত;—মূল্য দেড় টাকা।]

ইহার কতকাংশ পূর্ব্বে 'সুপ্রভাত'-নামক মাসিকপত্রে 'দ্বিপত্নীক'-নামে, ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখিকা মহোদয়া, এক্ষণে সে নামটী পরিত্যাগ করিয়া 'জ্যোতিঃহারা' নামে সমগ্র পুস্তকখানি ছাপাইয়াছেন। 'দ্বিপত্নীক'-অপেক্ষা, 'জ্যোতিঃহারা'-নামটি অধিকতর সঙ্গত ও সার্থক হইয়াছে, বলিয়া আমাদের মনে হয়। উপন্যাসখানি পাঠ করিতে-করিতে অনেকস্থলেই লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। যাঁহারা শুধু ঘটনার পাছে-পাছে দৌড়িতে চান, 'তারপর কি হইল' জানিবার জন্য, উৎকণ্ঠিত হইয়া, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া যান, তাঁহাদের পক্ষে, এই বইখানির কয়েকস্থানে হয় ত একেবারে পাতা উল্‌টাইয়াই যাইতে হইবে; কিন্তু যাঁহারা এই সুন্দর উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য বুঝিতে চান, লেখিকার শক্তি ও গুণপনার পরিচয় পাইতে চান, তাঁহাদিগকে সকল-অংশ পড়িতেই হইবে; আর, আমরা বলিতে পারি যে, তাহাতে তাঁহাদের সময়ের সদ্ব্যয়ই হইবে। গল্পের আখ্যানভাগ অতি সুকল্পিত; লেখিকা যে সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। এখন, এই বইখানি পড়িয়া যদি দেশের লোক লেখিকার লেখনী-ধারণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই মনস্বিনী লেখিকার, এতবড় একখানা বইলেখা সার্থক হইবে।

কেতকী

[শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-প্রণীত;—মূল্য ১৲ টাকা]

লেখিকা বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে অপরিচিতা নহেন।—"নির্ম্মাল্যে" আমরা তাঁহার যে গল্প-রচনা-শক্তির উন্মেষ দেখিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ছোট-গল্প সংগ্রহ-পুস্তকে তাহার উচ্চাঙ্গের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। পুস্তকখানির ভাষালালিত্য ও ভাবসম্পদ্ যেমন মনোহর তেমনই ছোট-গল্পের প্রাণ—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ও চরিত্র ফুটাইবার কৃতিত্বও চমৎকার। আমাদের বিশ্বাস—বঙ্গসাহিত্যামোদী-সমাজে "কেতকী" সমাদৃত হইবে। পুস্তকখানির কাগজ—ছাপাই—বাঁধাই সবই সুন্দর; আকার ২০০ পৃষ্ঠা।

মাসপঞ্জী

ভাদ্র—১৩২২

১লা—কলিকাতা, "বিজ্ঞান-সভা"র তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন।—বৈটকখানা বাজারে "চৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী সভা"র অধিবেশন।

২রা—কার্ডিন্যাল্ বেরাফিনো ভেন্নুটেলের মৃত্যু।

৩রা—শিলচরের 'উকিল-সরকার' রায় হরিচরণ দাস বাহাদুরের মৃত্যু।—সর্দ্দার স্যর্ জে. বি. রৈসানীর মৃত্যু।—বরিশালে শ্রীযুত গণেশদাস গুপ্তের সভাপতিত্বে ৺আনন্দমোহন বসুর স্মৃতি-সভা।—ঢাকা, মেডিক্যাল্ স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় লর্ড কার্মাইকেল্ মহোদয়ের বক্তৃতা।

৪ঠা—প্রখ্যাত আবিষ্কারক ডাঃ এর্লিকের মৃত্যু।—তুরস্কের বিরুদ্ধে ইটালীর যুদ্ধ-ঘোষণা।—এম্. ভেনিজেলস্, গ্রীসের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত।

৫ই—এলাহাবাদের বিখ্যাত রইস্, সৈয়দ্ মহম্মদ জামিলের মৃত্যু।—রঙ্গপুর, "বনপুর হরিসভা" স্থাপন।

৬ই—"সঙ্গিনী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা, লীলাবতী ঘোষের মৃত্যু।—বোম্বায়ের 'আর্য্যসমাজী' গৃহে ব্যারিষ্টর মিঃ জয়গোপাল শেঠীর সহিত আইরিশ্ কুমারী সেসিল্ ব্রেকের শুদ্ধিসাধনান্তে, সুশীলাবাই নামকরণে, বিবাহ।

৭ই—কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ উকিল গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর মৃত্যু।—এলাহাবাদের 'অভ্যুদয়'-পত্রিকার, বিনা-জামিনে, পুনঃ প্রচারের আদেশ।—মন্দালয়ে, বর্ম্মার ছোটলাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে, "বর্ম্মা প্রাদেশিক কৃষি ও কো-অপরেটিভ্" সম্মেলনের অধিবেশন।

৮ই—'শিলচর চতুষ্পাঠী'র, শ্রীযুক্ত, কামিনীকুমার চন্দের সভাপতিত্বে, সাধারণ-সভার অধিবেশন।—ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্-কর্ত্তৃক হেয়িটী-র রাজাকে 'অল্টিমেটম্' প্রদান।

৯ই—মাননীয় রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যু।—'ভিকার জেনেরল' রেভ্ঃ ফাঃ সিভাটির মৃত্যু।—শেঠ কুবেরজীর মৃত্যু।

১০ই—"মহারাট্টা"-পত্র-সম্পাদক মিঃ এন্. সি. কেলকার, এবং "ইণ্ডিয়ান্ পেট্রিয়ট"-সম্পাদক, মানহানির দায়ে অভিযুক্ত।—ভবানীপুর 'ব্রাহ্মসমাজের সাম্বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ।

১১ই—'পাথান কোটে'র 'ফাঁস খেয়াল' পত্রিকার প্রচার স্থগিত।

১২ই—"বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা"র বার্ষিক অধিবেশন।—'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর একাদশবার্ষিক স্মৃতিসভা।—হাটগাঁর উকীল জগৎচন্দ্র সেনের মৃত্যু।—প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবিকা, 'স্নেহলতা'-প্রভৃতি-রচয়িত্রী, কুমুদকুমারী দেবীর মৃত্যু।

১৩ই—"মোহম্মদী" ছাপাখানার জামিনের আদেশ সোসাইটী'র বার্ষিক অধিবেশন।—বরাহনগরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৪ই—মাননীয় মিঃ এম বি চৌবল, গো কৌন্সিলে'র সভ্যরূপে পুনঃ নির্ব্বাচিত।

১৫—কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালযের বি. এল পর বিখ্যাত 'এভিয়েটর্' এম্. পিগোঁর মৃত্যু।

১৬—স্যর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্সের পদত্যাগ।—লক্ষ্ণৌ ব্যাপী বৃষ্টি; ফলে, জলপ্লাবন।—'কো অপ প্রকাশ।—সামসুল উলমা এস্. ভি ভারুচা'র

১৭ই—লণ্ডনের জাপানী রাজদূত, মিঃ কে. ইনোর মৃত্যু।—পাবনায় 'হরিসভা'র মহোৎ

১৮ই—মাননীয় দাদাভাই নৌরোজীর ৯১তম জ সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয়।—মাননীয় খাজাগো মৃত্যু।—'শ্রীলঙ্কাশ্রী'-সম্পাদকের তিনমাস কারদ

১৯এ—লক্ষ্মীকান্ত আতৈর তি..ভাব মহোৎসব।

২০এ—স্যর্ উইলিয়ম্ প্লাউডেন্ এবং স্যর জন্ ফু সেণ্ট্ জন্ ষ্টীফেন্, ব্যারিষ্টরের মৃত্যু।—মহার সাগরের দৌহিত্র, জ্যোতিশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যু

২১এ—আসামের অন্যতম জননায়ক, মাননীয় ম গৌহাটীতে মৃত্যু।—যশোহর, জজানে বিগত ২৭.. ব্রাহ্মণ সভা"-স্থাপনের বিবরণী প্রকাশ।—রেঙ্গুনে পত্রিকার প্রচার বন্ধ।—বরিশালের অধ্যাপক মৃত্যু।—অক্সফোর্ড মিশনের রেভঃ সি. এইচ. ও

২২এ—'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে'র বিল্ পেশ।—হারাও বাহাদুরের মৃত্যু।—মজঃফরপুরে শ্রীমতী এনি বে 'বেহার থিওজফিক্যাল্ ফেডরেশনে'র অধিবেশন

২৩এ—জোড়হাট, তেজপুর, শিবসাগর, গৌহাটী- এম. সি. বড়ুয়ার মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ।

২৪এ—গৌহাটী, 'কর্জ্জন্ লাইব্রেরী' হলে, 'গৌ পরিষদে'র দ্বিতীয় মাসিক সভা।

২৫এ—স্যর্ ক্লড্ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মৃত্যু।—আজর্ম উপায় নিরাকরণের জন্য এজেণ্ট, জেনারেল কর্ত্তৃক সভা-অধিবেশন।—ডিব্রুগড়ে, মহাপুরুষ

[?]উৎসব।—রাজসাহীতে "রেট্-পেয়র্স অ্যাসসিএশনে"র কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভা।

—কলিকাতা 'সঙ্গীত-সমাজে' "ফরিদপুর সুহৃদসভা"র পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন।—শিবসাগরে রায়সাহেব পি. ডি. চালিহা-মহোদয়ের সভাপতিত্বে, "আসামসঙ্ঘে"র, স্থানীয় শাখার অধিবেশন।—স্যর ডব্লু ভ্যান্‌হর্ণের মৃত্যু।—ঢাকার "পশ্চিম ঢাকা সমিতি"র প্রথম অধিবেশন।—ঢাকা "শাখা সাহিত্য-পরিষদে"র তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

।—লাহোর 'ব'ন্‌স্পিরেসী' মামুলার বিচার ফলে ২৪ জনের প্রাণ-দণ্ড ও ২৭ জনের দ্বীপান্তরবাস আজ্ঞা।—শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল সভা-কর্ত্তৃক তত্রত্য ৺রামরাজা লাহিড়ীর বিধবা ও কন্যা-প্রদত্ত ১২ হাজার টাকায় "রামরাজা মেয়ে হাসপাতাল" ও "রামরাজা ধর্ম্মসভা" প্রতিষ্ঠানের জন্য দান স্বীকার —[?] উল্ ইস্‌লামের পদত্যাগ।

২৮।—ত্রিপুরার রাজকুমার ত্রিপুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুরের মৃত্যু।—পিটাপুর রাজ-কলেজের ১৮০ জন ছাত্র সস্‌পেণ্ড্।—মান্দ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান-জজ, স্যর আর্থর কলিন্সের মৃত্যু।—নড়াইলের জমিদার গোবিন্দপ্রসন্ন রায়ের মৃত্যু।

২৯এ—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও মধ্যম বি এল., এম্ এস্. সি এবং এম্. বি (অনর্স)-পরীক্ষার ফলপ্রকাশ।

৩০এ—বাঙ্গালোরের 'ডেলি পোষ্ট'-সংবাদপত্রের প্রচার রহিত।—স্যর জন্ হটনের মৃত্যু।—হাওড়ার উকিল আশুতোষ রায়ের মৃত্যু।

৩১এ—রাজা হরনাম সিংহের নেতৃত্বে, সিমলাশৈলের "গ্রাণ্ড হোটেলে" তত্রত্য আঢ্যগণ-কর্ত্তৃক বড়লাট বাহাদুর ও আর্ল [?] সাহেবের সম্বর্দ্ধনা ও বিদায় ভোজ।—শিলচরে, সুরমা-উপত্যকার হেডমাষ্টার-গণের 'কন্‌ফরেন্স' অধিবেশন।

গণেশ-জননী রূপ

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

বক্ষ-পক্ষপুটে ঢাকি'—
শাবকে লুকায় পাখী,
ব্যর্থ করে মাতৃস্নেহে শ্যেন-আক্রমণ;
সদ্যঃ ভুক্ত খাদ্য সুখে
তুলি' দেয় শিশু-মুখে,
আপনার ক্ষুধা-নিদ্রা করে সম্বরণ!
কে দেয় তীর্য্যকে শিক্ষা,
মাতৃমন্ত্রে দেয় দীক্ষা,
বন-বিহগীর বুকে বাৎসল্য এমন!
বিশ্বজয়ী সন্তান-পালন!

কোথা তার রক্তে লোভ,
মাতৃস্নেহে নাহি ক্ষোভ,
বাঘিনী শাবক-বক্ষে নিশ্চিন্ত শয়ান;—
নাহি হিংসাবৃত্তি জাগে,
নখর প্রকাশে রাগে,
ক্ষুধিত শাবক-মুখে স্তন্য করে দান!
কত না আগ্রহে স্নেহে—
অঙ্গ তার অবলেহে;
স্বভাব ভুলে—জীব-রক্ত-পান—
পায় জননীর প্রাণ?

পুণ্য—মুক্ত পয়োধর,
অঙ্কে শিশু ক্রীড়াপর,
বিলাস বিভ্রম-হীনা রমণী—জননী।
নত দৃষ্টি চাঁদমুখে,
উচ্ছ্বসিত স্নেহ বুকে—
বহে মমতার ধারা জগত-পালনী।—
অগাধ সমুদ্র-কোলে
শিশু-সোম যেন দোলে,
উষার উরসে তারা—জীবাঙ্কে ধরণী—
জীবমাতা করুণার-খনি।

প্রবৃত্তি-সংগ্রামে জীব—
চরণে দলিছে শিব,
উঠিছে জগতে তারি হুহুঙ্কার-ধ্বনি;
স্বার্থে স্বার্থে কি সংঘাত,
পরার্থের কি নিপাত,
ঘোর মহামেঘে গর্জ্জিছে অশনি!
তারি মাঝে প্রকৃতির—
মাতৃমূর্ত্তি আছে স্থির,
সর্ব্ব [?]—বিশ্বপটে গণেশজননী—
[?]—অপরিবর্ত্তিনী!